সত্যই ভালবাসিয়াছে। যে দিন সে গোপালের নবযৌবনের মূর্ত্তি দেখিয়াছে সেই দিন হইতেই সে তাকে মনে মনে কামনা করিয়াছে—আবার পরক্ষণেই তার এই মানসিক অভিসারের অপরাধের জন্য সকল দেবতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছে।

ভালবাসে সে গোপালকে—কিন্তু তার ধর্ম্ম তার কাছে ভালবাসার চেয়ে বড়।

আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। দুই বৎসরে শারদার দুটি সন্তান হইয়া নষ্ট হইয়া গেল। শারদার শরীর খুব খারাপ হইয়া পড়িল।

মাধবের ব্যবসায়ের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িল। কিন্তু তার দিন চলিতে লাগিল। বিন্দু মাঝে মাঝে টাকা পাঠায়। শারদার কাছে গোপাল যে টাকা দিয়াছিল তাহা হইতে দুই এক টাকা বাহির করিয়া সে মাঝে মাঝে খরচ করে। আর গোপাল মাধবের কাছে যে টাকা রাখিয়া গিয়াছিল তাহা সুদে খাটাইয়া মাধব যাহা পায় তাহাও সে বেশীর ভাগ খরচ করিয়াই ফেলে। গোপালকে সে মাঝে মাঝে চিঠি লিখিয়া সুদ আদায়ের কথা জানায়, কিন্তু গোপাল কোনও দিনই সে টাকার সম্বন্ধে কিছু লেখে না। এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে মাধব সে টাকাটা নিজের টাকার মতই খরচ করিতে আরম্ভ করিল। এমনি করিয়া তার সংসার একরকম চলিয়া যাইতেছিল।

কিন্তু দুই বছর পর বিন্দু গুরুতর রোগ লইয়া দেশে ফিরিল। তখন সে মাধবের গলগ্রহ হইয়া পড়িল। শারদারও তার সেবা করিতে করিতে অসহ্য হইয়া উঠিল। একে অভাবের সংসার, তার পর দুটি সন্তান হইয়া নষ্ট হইয়া গেল, তার পর এই চিররুগ্নার সেবা, ইহাতে শারদার মনটা বিষম খিঁচড়াইয়া গেল। সে খিটখিটে হইয়া উঠিল। সংসারে থাকাটা তার পক্ষে একটা বিষম বোঝা বলিয়া মনে হইল।

এই সময় তার মাঝে মাঝে মনে হইত গোপালের কথা। গোপালের কথা যদি সে শুনিত তবে সে আজ পায়ের উপর পা দিয়া পরম সুখে থাইতে পারিত—আদর যত্নের তার অবধি থাকিত না। এ কথা মনে হইলেই সে আপনাকে সংশোধন করিয়া লইত—এত বড় পাপের কথা মনে হইল বলিয়া সে অনুতপ্ত হইত। কিন্তু তবু মনে না করিয়া সে পারিত না।

শারদা ছিল প্রাণরসে ভরপুর। আনন্দ ছিল তার নিত্য সঙ্গী। কোনও দুঃখকষ্ট সে গায় মাখিত না, আনন্দে নাচিয়া কুঁদিয়া সে দিন কাটাইত। কিন্তু আজ দুঃখে কষ্টে মলিন হইয়া রোগে শোকে জীর্ণ হইয়া তার ভিতরকার জীবনরস শুকাইয়া গিয়াছে। তার মুখের নিত্য হাসি মিলাইয়া গিয়াছে, রূপের জৌলুস ঘুচিয়া গিয়াছে, কুড়ি না হইতেই সে মনে প্রাণে বুড়ী হইয়া বসিয়াছে। সে সংসারে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কলের মত সে তার সংসারের কাজ করিয়া যায়, আর দিনরাত সে বকর বকর করিয়া বকিয়া বেড়ায়। কোনও কাজে তার আসক্তি নাই, কোনও কিছুতেই আনন্দ নাই। খাটিতে হয় বলিয়া সে খাটে।

পরের বৎসর পূজার সময় নেউগী পরিবার আবার দেশে আসিলেন।

শারদা একদিন তাঁদের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। বড় বউ মনোরমা তো তাকে দেখিয়া অবাক! এ কি মূর্ত্তি হইয়াছে শারদার! তিনি যত্ন করিয়া শারদাকে কাছে বসাইয়া তার কথা শুনিলেন। তাঁর স্নেহের সম্ভাষণে শারদার অন্তর যেন স্নিগ্ধ হইয়া গেল! তার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

বড় বউর সে ছেলেটি এখন বেশ বড় সড় হইয়াছে—দিব্য পুষ্ট স্বর্ণকান্তি শিশুটি। সন্তান-বুভুক্ষু শারদা তাকে কোলে জড়াইয়া ধরিয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করিল। ইহার পর আরও দুইটি শিশু মনোরমার কোল আলো করিয়াছে। তাহাদিগকে আদর করিয়া শারদার আশ মিটিল না।

মনোরমা বলিল শিশু তিনটিকে লইয়া তার বড় কষ্ট হইয়াছে, ভয়ানক দুরন্ত তারা। শারদা আসিয়া যদি তাদের ভার নেয় তবে বেশ হয়।

শারদা আনন্দের সহিত সম্মত হইল। পরের দিন হইতে সে তার চাকরীতে ভর্ত্তি হইল। ইহার পর সে বেশীর ভাগ সময় নেউগী বাড়ীতেই থাকে, যতক্ষণ সেখানে থাকে ততক্ষণ তার আনন্দে কাটে। শিশুদের কোলে করিয়া, তাদের সঙ্গে খেলাধূলা করিয়া তার বিশুষ্ক প্রাণে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইল।

এক মাসের মধ্যে শিশু তিনটি শারদার ভয়ানক অনুগত হইয়া পড়িল। তাই এক মাস পর যখন মনোরমার যাইবার কথা উঠিল তখন সে শারদাকে বলিল, "তুই আমাদের সঙ্গে যাবি শারদী?"

এ প্রস্তাবে শারদা সহসা সম্মত হইতে পারিল না। তার বাড়ী ঘরের সঙ্গে সে এমন ভাবে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছিল যে বাড়ীঘর ছাড়িয়া যাইবার কোনও প্রস্তাব সে কখনও ধারণাই করিতে পারিত না।

সে বলিল, "জিগাইয়া দেখি ঘরের মানুষটিরে! কোন্‌খানে যাওন লাইগবো?—কতদূর?"

মনোরমা বলিল, "রংপুর।"

শারদার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "রংপুর! হ' চিনছি। আইচ্ছা আমি যাই জিগাইয়া আসি।" সে মহাব্যস্ত হইয়া উঠিল।

মনোরমা বলিল, "তুই কি রংপুর কখনও গিয়েছিস না কি?"

"না বৌ-ঠাইকান, আমি গরীব মানুষ, আমি যামু কেমনে। আমার বাপের বাড়ীর দেশের একজন আছে সেখানে, তাই।"

"তাই না কি? কে সে? কি করে?"

"তার নাম গোপাল। সে কি জানি কি করে—তামুকের কাম করে না কি! অনেক টাকা কামায় সে!"

"সে কি তোর কিছু হয়?"

"না বৌ-ঠাইকান—হ'বো কি আর?" কিন্তু সে এমন সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইয়া উঠিল যে মনোরমা তার সে ভাব লক্ষ্য করিল। শারদা বলিল, "পোলাপান কালে এক সাথে খেলছি আমরা এই আর কি।"

এ প্রস্তাব শুনিয়া মাধবের মুখ ভার হইয়া উঠিল। বিদেশে বিভূঁয়ে একা একা শারদা কোথায় যাইবে ভাবিতে সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। বলা বাহুল্য আজকাল আমরা দিল্লী বা বিলাত যতটা দূর দেশ মনে করি, সেকালে টাঙ্গাইল অঞ্চলের লোকে রংপুর দিনাজপুরকে তার চেয়ে দূর দেশ মনে করিত। বাড়ী ছাড়িয়া নড়িবার অভ্যাস যাদের কোনও দিনই ছিল না, তাদের ঘরের বউয়ের পক্ষে বিদেশ যাত্রার প্রস্তাব কাজেই খুব ভয়াবহ মনে হইল।

কিন্তু শারদা সকল আপত্তি উড়াইয়া দিল। সে বলিল বড়বধূর সঙ্গে থাকিতে তার কোনও ভয় বা চিন্তার কারণ নাই, মনোরমা তাকে মায়ের অধিক স্নেহ করে। তা ছাড়া তাহারা বেতন দিবে তিন টাকা, মাসে মাসে তিন টাকা করিয়া সে মাধবকে পাঠাইতে পারিবে, তাহাতে তার সংসার চলিবার কোনও কষ্ট থাকিবে না। চাই কি কিছু হাতেও হইতে পারে। পক্ষান্তরে এখন বিন্দু বাড়ী আসিয়া বসিয়াছে, তার রোজগারের টাকা পাওয়া যাইবে না। এখন সংসার চালান কঠিন। আর গোপাল আসিয়া যদি তার টাকা চাহিয়া বসে তবে চক্ষুস্থির হইবে। মাধব যে তার কত টাকা ভাঙ্গিয়া খাইয়াছে তার ঠিকানা নাই। শারদা যদি রোজগারের এই সুন্দর সুযোগ পরিত্যাগ করে তবে সে টাকা পরিশোধ করিবার কোনও সম্ভাবনাই থাকিবে না।

এইরূপ নানা যুক্তিতর্ক দিয়া শারদা স্বামী ও বিন্দুর সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ওদিকে নেউগী-গৃহিণী মনোরমার প্রস্তাবে একটু আপত্তি তুলিয়াছিলেন। বিন্দুকে লইয়া তিনি যে বিপদে পড়িয়াছিলেন সে কথা বলিয়া তিনি মনোরমাকে সাবধান করিয়া দিলেন। বয়সে বুড়া হইয়াও বিন্দু কেলেঙ্কারী করিতে ত্রুটি করে নাই, এবং শেষে ব্যারাম হইয়া অনেক জ্বালাইয়াছে। শারদা যুবতী, তাকে সামলান আরও কঠিন হইবে, শেষে রেল ভাড়া দিয়া তাকে দেশে পাঠাইতে হইবে। মনোরমা বলিল যে শারদা বিন্দুর মত নয়। গ্রামের লোকে সকলেই বলে শারদা সচ্চরিত্রা, কাজেই বিন্দুকে লইয়া যে অসুবিধা হইয়াছিল শারদাকে লইয়া সে অসুবিধার আশঙ্কা নাই। শেষ পর্য্যন্ত মনোরমার কথাই বহাল রহিল।

শারদা মনোরমার সঙ্গে রংপুর গেল। তার মনে আশা হইল রংপুর গিয়া গোপালের সঙ্গে দেখা হইবে। গোপাল হয় তো তাহাকে রংপুরে দেখিয়া ভয়ানক অবাক হইয়া যাইবে—এবং খুব খুসী হইবে। সেও গোপালকে দেখিবার জন্য ভারী উৎসুক হইয়াছিল।—এই, আর কিছু নয়, সুধু দেখা! বাল্যসুহৃৎ গোপাল—এত ভালবাসে তাকে—তার সঙ্গে সুধু দেখা! ইহার চেয়ে বেশী কিছু তার সংবিদের ভিতর সে আসিতে

দেয় নাই—কিন্তু মনের তলায় তার এ আকাঙ্ক্ষার নীচে ছিল একটা উন্মত্ত কামনা।

রংপুরে যাইয়া শারদা দেখিল তাহা ঠিক তাদের গ্রামের মত ছোট্ট একটি স্থান নয়। সেখানে গোপালকে খুঁজিয়া বাহির করা প্রায় অসম্ভব! বিশেষতঃ খুঁজিয়া বাহির করিবার মত গোপালের কোনও পরিচয়ই সে জানে না।

মাধবের কাছে গোপাল যে কাগজে ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিল তাহা শারদা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। কয়েক দিন পর সে সেই কাগজখানা বাবুর চাপরাশীকে দিয়া পড়াইল। চাপরাশী ঠিকানা পড়িয়া বলিল, "সে এখানে কোথায়? এ যে কাকিনার ঠিকানা।"

কাকিনা রংপুর হইতে তিন চার ক্রোশ এ কথা শুনিয়া শারদা হতাশ হইয়া গেল।

১৫

প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। শারদার দিন বেশ ভালই কাটিল। খাইয়া পরিয়া তার নষ্ট রূপ যৌবন ও স্বাস্থ্য ক্রমে ফিরিয়া আসিল। মনোরমার স্নেহ যত্নে সে পরম তৃপ্তি ও আনন্দের সহিত তার গৃহকর্ম্ম করে—অসুরের মত সে খাটে। মাসে মাসে সে তার বেতনের টাকা স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দেয় এবং মাসে মাসে স্বামীকে "প্রণাম শত কোটি নিবেদন" জানাইয়া এক একখানা চিঠি দেয়—চিঠি লিখিয়া দেয় চাপরাশী কিম্বা মনোরমা। মাধব টাকা পাইয়া মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। তাতে শারদা দেশের খবর জানিতে পারে।

মাধব প্রতি চিঠিতেই লেখে, "তুমি কবে বাড়ী ফিরিবে?" কথাটা খচ করিয়া শারদার বুকে আঘাত করে। তার অদর্শনে মাধব যে বড় দুঃখেই দিন কাটাইতেছে এ কথা তার মনে হয়। তখন স্বামীর জন্য তার মন অস্থির হইয়া উঠে। কিন্তু তার পর সে দুঃখ ক্রমে সহিয়া যায়।

গোপালের সঙ্গে তার দেখা হয় নাই, এবং দেখা হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই জানিয়া সে একরকম নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে।

সেদিন সকালে পুলিস ফণীভূষণের বাড়ীতে কয়েক-জন আসামীকে লইয়া আসিল। মনোরমা ও শারদা আড়াল হইতে এই আগন্তুকদিগকে দেখিতেছিল। দুইজন কনেষ্টবল দুইটি আসামীকে হাতকড়া দিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। দেখিয়া শারদার মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে চাহিয়া দেখিল—তার সন্দেহ নিশ্চয়তায় পরিণত হইল—আসামীদের মধ্যে একজন গোপাল!

ভয়ে শারদার নিঃশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। সে তাড়াতাড়ি সে স্থান হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। খানিকক্ষণ বৃথা ছটফট করিয়া শারদা বাহিরে গিয়া আড়াল হইতে চাপরাশীকে ডাকিতে চেষ্টা করিল। চাপরাশীর সন্ধান পাইলে সে বলিল যে একবার গোপালের সঙ্গে তার দেখা করাইয়া দিতে হইবে।

চাপরাশী হাসিয়া বলিল, গোপাল পুলিসের হেপাজতে আছে, তাকে তো তাহারা ছাড়িবে না। শারদার বিশ্বাস চাপরাশী একটা প্রকাণ্ড লোক, সে স্বয়ং হাকিমের চাপরাশী, তার হুকুমে সকলই হইতে পারে। সে তাই চাপরাশীর পায়ের উপর পড়িয়া আকুলভাবে অনুরোধ করিল যে চাপরাশী যেন গোপালকে মুক্ত করিয়া শারদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইয়া দেয়। সুন্দরী যুবতীর এ অনুরোধে চাপরাশীর অন্তর গলিয়া গেল, কিন্তু সে বলিল, তার হাত নাই। তবু সে শারদাকে একটু আশ্বস্ত করিয়া সংবাদ জানিতে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া চাপরাশী বলিল যে গোপালের বিচার আজ হইবে না। কাল তাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, আজ তাকে আনা হইয়াছে সুধু হাজতে রাখার হুকুমের জন্য। তার পক্ষে জামিনে মুক্তির জন্য দরখাস্ত হইবে। হাকিম যদি জামিন দেন তবে সে মুক্ত হইতে পারে—তাহা হইলে গোপালের সঙ্গে শারদার দেখাও হইতে পারে।

চাপরাশীর উপদেশ অনুসারে শারদা তখন মনোরমার পা জড়াইয়া কাঁদিয়া পড়িল। মনোরমা বলিল, এ সব বিচারের কাজ, ইহাতে সে স্বামীকে কোনও কথা বলিতে পারে না। বলিলে তিনি শুনিবেন কেন?

কিন্তু শারদা কিছুতেই পা ছাড়ে না।

অনেকক্ষণ পর মনোরমা বলিল, "আচ্ছা র'স আমি একবার জিগ্‌গেস ক'রে দেখি।"

ডেপুটিবাবু একবার ভিতরে আসিলেন, তখন মনোরমা তাঁকে সব কথা বলিল। শারদা তখন বাহিরে বসিয়া কাঁদিতেছে।

ফণীবাবু তার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তা কি হুকুম? ঐ লোকটাকে খালাস দিতে হবে?"

মনো। না, সে কথা আমি ব'লতে যাব কেন? তুমি যা ভাল বুঝবে ক'রবে। কিন্তু ওকে জামিনে খালাস দেবে কি? দাও তো বেচারীকে ব'লে একটু সুস্থ করি।

ফণীবাবু আবার বলিলেন, "তার নামই হুকুম। আচ্ছা আমি এ হুকুম তামিল ক'রবো।"

মনোরমা খোস খবরটা শারদাকে জানাইল। শারদা উৎফুল্ল হৃদয়ে উঠিয়া ঢিপ করিয়া মনোরমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "বউ ঠাকরাণ, আমারে বাঁচাইলেন আপনে।"

গোপালের জামিন হওয়ার প্রতীক্ষায় সে ব্যগ্রভাবে বসিয়া রহিল।

হুকুম হইল, কিন্তু শারদা দেখিল তবু পুলিসের লোক গোপালকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

শারদা ব্যাকুলভাবে চাপরাশীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চাপরাশী বুঝাইয়া দিল, ইহাদিগকে লইয়া জামিননামা লেখাপড়া করা হইবে, তার পর গোপাল মুক্তি পাইবে। এবং চাপরাশী আশ্বাস দিল যে সে গোপালকে শারদার কথা বলিয়াছে, গোপাল মুক্তি পাইয়াই শারদার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

বৈকালে গোপাল আসিল।

শারদা তার কাছে শুনিল একটা মিথ্যা অভিযোগে পুলিস তাহাকে সন্দেহ করিয়া ধরিয়াছে। অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা—তবে পুলিস যখন ধরিয়াছে তখন কি হয় বলা যায় না। হয় তো তার জেল হইতে পারে।

এ কথা শুনিয়া শারদা চমকাইয়া উঠিল। তার দুই চক্ষু বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

গোপাল সস্নেহে তাহাকে বলিল, "ভয় কি শারদী! ভগবান আছেন। আর হাকিমবাবুর ধর্ম্মজ্ঞান আছে!"

শারদা তবু অশ্রুরোধ করিতে পারিল না।

যখন সে গেল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। গোপাল আপনাকে ছিঁড়িয়া লইয়া গেল।

যাইবার সময় গোপাল বলিল, "আমার বাড়ী দেখতে যাবি না একদিন?"

শারদা বলিল, "এ বিপদ তো কাটুক আগে।"

গোপাল চলিয়া গেলে শারদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইল। তিন দিন সে দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটাইল, আহার নিদ্রা তার ঘুচিয়া গেল।

মনোরমা তার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন। তিন দিন পর কাছারী হইতে ফিরিবার সময় গোপাল আবার আসিল।

তখন বেলা ৩টা।

মনোরমা তখন নিদ্রিত।

গোপাল বলিল সে মুক্তিলাভ করিয়াছে, পুলিস তাকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

আনন্দে শারদা উৎফুল্ল হইল।

গোপাল আনন্দের আবেগে শারদার হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "চল তুই আমার বাড়ীতে।"

আপত্তি করিবার কথা শারদার মনে হইল না। সে একবার বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখিল মনোরমা ঘুমাইতেছে। কাজেই তাকে বলা হইল না।

সে গোপালের সঙ্গে চলিল।

গোপাল তাহাকে লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া রংপুর সহর দেখাইতে লাগিল।

এখানে আসিয়া অবধি শারদা বাড়ী হইতে বাহির হয় নাই। একেবারে পাড়াগাঁ হইতে আসিয়াছে সে, যা দেখিল সে তাতেই অবাক হইয়া গেল।

ঘুরিতে ঘুরিতে যখন সে মাহিগঞ্জে গোপালের বাসায় আসিল, তখন বেলা একেবারে গড়াইয়া পড়িয়াছে।

গোপাল কিছু খাবার কিনিয়া আনিয়াছিল। দুজনে বসিয়া খাইল, খাইতে খাইতে তারা দুজনে গল্প করিতে লাগিল।

কত রাজ্যের গল্প, অতীতের কথা, বর্ত্তমানের কথা, ভবিষ্যতের কথা। একটার পর একটা কথা আসিতে লাগিল—মুগ্ধ হইয়া দুজনে দুজনের কথা শুনিতে লাগিল।

শারদা জানিল যে গোপাল কাকিনায় তামাকের আড়তের কাজ ছাড়িয়া এখন এখানে মাহিগঞ্জের গোঁসাই বাড়ীতে কাজ করিতেছে। শীঘ্রই সে একটা নায়েবী পাইবে এমন আশা আছে। সে আরও অনেক টাকা জমাইয়াছে। শীঘ্রই একটা বাড়ী ঘর করিবে।

শেষে গোপাল বলিল, 'শারদী' তুই না কইছিলি মাধইব্যা তরে এক মাস ছাইর‍্যা থাইকবার পারে না।"

শারদা একটু হাসিয়া বলিল, "পারেই তো না।"

"এখন যে আছে? এক বচ্ছর তো হইলো!" বলিয়া গোপাল একটু হাসিল।

শারদা ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আছে কি সাধে? প্যাটের দায় বড় দায়।"

একটু পরেই গৃহে ফিরিবার জন্য সারদা উঠিয়া দাঁড়াইল। গোপালও দাঁড়াইল, কিন্তু সে বলিল, যে বড় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, এখন বাসায় ফিরিতে হইলে রাত্রি হইবে, আর রাত্রে মাহীগঞ্জ হইতে নবাবগঞ্জ যাইবার পথ মোটেই নিরাপদ নয়।

শারদা চমকাইয়া উঠিল—সে বলিল যাইতে তার হইবেই।

গোপাল চিন্তিতভাবে বলিল "তাই তো। বড়ই মুস্কিলে পড়া গেল। এতখানি যে দেরী হইছে তা' ভাবি নাই। কিন্তু এখন গেলে তো প্রাণ বাঁচানই দায়!" বলিয়া সে সেই দীর্ঘ পথের দিকে হতাশভাবে দৃষ্টি করিতে লাগিল।

ভয়ে শারদার মুখ শুকাইয়া গেল। এত বিলম্ব হইয়া যাওয়াতেই তো সে ভয়ে মরিতেছিল, কি বলিয়া সে বড়বধূর কাছে মুখ দেখাইবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। এখানে রাত্রি কাটাইয়া গেলে তার পর যে তার সে বাড়ীতে উঠিবার পথই থাকিবে না, সে কথা সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। সে বার বার গোপালকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, কোনও মতে তাকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিতে।

গোপাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আচ্ছা তুই র, আমি দেখি।" বলিয়া সে জমীদার বাড়ীর দিকে গেল।

শারদা একলা সেখানে বসিয়া পশ্চিম আকাশে অস্তগত সূর্য্যের বিলীয়মান ছটার দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে সুধু চাহিয়া রহিল। বুকের ভিতরটা তার ভয়ে শুকাইয়া গেল।

শারদা কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল। হায়! হায়! কেন তার এ দুর্ম্মতি হইয়াছিল? কেন সে মরিতে হতভাগা গোপালের সঙ্গে আসিতে গিয়াছিল। এখন যদি সে কোনও মতে বাসায় না ফিরিতে পারে, তবে তার যে আর কোনও উপায়ই থাকিবে না!

অনেকক্ষণ পর গোপাল শুষ্কমুখে ফিরিয়া তাকে বলিল যে সে জমীদার বাড়ীতে গিয়া একজন বরকন্দাজ সঙ্গে লইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, অন্ধকার রাত্রে কেহই নবাবগঞ্জ যাইতে চাহে না।

শারদা একেবারে অবসন্ন ভাবে শুইয়া পড়িল। ভয়ে তার সমস্ত শরীর অসাড় হইয়া পড়িল। সে কেবলি ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

গোপালের বাসায় কেবল একখানি ঘর, এবং এখানে সে থাকে একা। একটা চাকর দিনের বেলায় কাজ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। আহারাদি জমীদার বাড়ীতেই হয়। রাত্রে গোপাল একাই থাকে।

এইখানে শারদার রাত্রি যাপন করিতেই হইবে।

সে আর ভাবিতে পারিল না। কেবল অবসন্ন হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

গোপাল ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রসাদ আনিয়া শারদাকে খাইতে দিল। শারদা তাহা মাথায় ঠেকাইয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিল। গোপাল তাকে অনেক বুঝাইতে লাগিল—কিন্তু প্রবোধ সে মানিল না।

কাঁদিতে কাঁদিতে শারদা ঘুমাইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘর তখন অন্ধকার—এক কোণায় সুধু একটা মাটির প্রদীপ টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছে। কে যেন শারদাকে প্রবলভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে।

প্রবলবেগে আততায়ীর মুখে চোখে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া, আঁচড়াইয়া খিমচাইয়া শারদা কোনও মতে উঠিয়া বসিল। তারপর সে দিগ্বিদিক জ্ঞান না করিয়া যাহা পাইল তাই দিয়া সে পাপিষ্ঠকে প্রহার করিতে করিতে তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

তারপর সে উঠিয়া বসন সংযত করিয়া বাতিটা উস্কাইয়া দিয়া দেখিল, তার আক্রমণকারী গোপাল।

ক্রোধে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, চক্ষু দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল, নাসিকা স্ফীত হইয়া উঠিল, বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। অপরিসীম ঘৃণার সহিত গোপালের দিকে চাহিয়া সে সুধু বলিল, "পোড়াকপাইলা, এই মতলব তর ?"

গোপাল উন্মত্তের মত তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল। শারদা বাতি শুদ্ধ পিলসুজটা তার গায় ছুঁড়িয়া মারিয়া ছুটিয়া দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া সে ছুটিল। কোথায় যাইতেছে তাহা সে জানে না, কিসের মুখে গিয়া সে পড়িবে সে খেয়াল তার নাই—সে কেবল ছুটিয়া চলিল।

অনেকক্ষণ পর সে আসিয়া পড়িল একটা সড়কের উপর।

তখন সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। চারিদিকে সুধু অন্ধকার, সুধু মাঠ, জঙ্গল। আকাশে সুধু লক্ষ লক্ষ তারা জ্বল জ্বল করিতেছে--পৃথিবীতে একফোঁটা আলো কোথাও নাই।

ভাবিয়া সে কূল পাইল না। ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া গেল। সে একটা গাছের উপর উঠিয়া বসিল।

অনেক দূরে কয়েকটা আলো দেখা গেল। সে মুগ্ধ নয়নে সেই আলোর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। অত্যন্ত ধীরে ধীরে সে আলো অগ্রসর হইল তারই দিকে। শেষে সে দেখিতে পাইল কতকগুলি লোক মশাল জ্বালিয়া অগ্রসর হইতেছে।

ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া গেল। ডাকাত কি এরা ?

সে আর একটু উঁচু ডালে গিয়া বসিল।

আলো আরও অগ্রসর হইল। দেখা গেল তিনখানা গরুর গাড়ী ঘিরিয়া অনেকগুলি লোকজন মশাল জ্বালিয়া অগ্রসর হইতেছে।

যে গাছের উপর শারদা বসিয়া ছিল সেই গাছতলায় দাঁড়াইয়া লোকগুলি কথা কহিতে লাগিল।

একজন বলিল, পথ ভুল হইয়াছে, ইহা নবাবগঞ্জের পথ নয়।

অপর একজন দৃঢ়ভাবে বলিল এইটাই নবাবগঞ্জের সড়ক।

এই বিষয় লইয়া কিছুক্ষণ বিচার বিতর্কের পর গরুর গাড়ীর ভিতর হইতে একজন মুখ বাড়াইয়া বলিলেন যে দুইজন লোক অগ্রসর হইয়া দেখিয়া আসুক পথটা ঠিক কি না।

দুইজন অগ্রসর হইয়া গেল। অনেক দূর গিয়া তারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে ইহাই নবাবগঞ্জের পথ।

কথাটা শুনিয়া শারদা আশ্বস্ত হইল। ভয়ে তার প্রাণ একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছিল—আজ রাত্রি পাড়ি দিয়া সে যে জীবন্ত অবস্থায় কাল সকালের মুখ দেখিবে, সে ভরসা সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন তার ভরসা ফিরিয়া আসিল।

সে বুঝিল ইহারা নবাবগঞ্জ যাইতেছে। কে ইহারা, কি উদ্দেশ্যে যাইতেছে, সে কথা সে জানে না। ইহাদের আশ্রয় লইয়া ইহাদের সঙ্গে যাইবার কথা একবার তার মনে হইল, কিন্তু তার সাহসে কুলাইল না। কি জানি ইহাদের হাতে পড়িয়া সে আবার কি বিপদে পড়িবে!

যখন এই যাত্রীদল অনেকটা পথ চলিয়া গেল তখন শারদা ধীরে ধীরে গাছ হইতে নামিয়া আসিল। এবং দূর হইতে এই যাত্রীদলের মশালের আলোর দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে ইহাদের অনুসরণ করিল।

নবাবগঞ্জে আসিয়া তাহার বাসা খুঁজিতে অধিক বিলম্ব হইল না। কিন্তু বাসায় পৌছিয়া ভয়ে তার পা ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

তখন অনেক রাত্রি। বাড়ীর দুয়ার সব বন্ধ। কেমন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে তাহা সে ভাবিতে লাগিল। অনেক কষ্টে একটা প্রাচীরে উঠিয়া সে উঠানের ভিতর লাফাইয়া পড়িল। তার পতনের শব্দে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। কুকুর ক্রমে শারদাকে চিনিতে পারিয়া ক্ষান্ত হইল, কিন্তু কুকুরের শব্দ শুনিয়া এক দিকে বাড়ীর চাকর অপর দিকে ফণীবাবু স্বয়ং জাগ্রত হইয়া তাড়া করিয়া আসিলেন।

শারদা লজ্জায় ভয়ে মড়ার মত আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একটা মহা সোরগোলের পর যখন তাহাকে চেনা গেল তখন ডেপুটিবাবু শারদাকে যা নয় তাই বলিয়া গালিগালাজ করিলেন। মনোরমাও উঠিয়া আসিয়া তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিল।

শারদা দেখিতে পাইল যে ইহারা ধরিয়া লইয়াছে যে সে ভ্রষ্টা এবং সুধু তাই নয় সে ভয়ানক মেয়ে, চুরী ডাকাতি প্রভৃতি যে কিছু অপকার্য্য সে করিতে পারে। এ সম্বন্ধে তাহার কোনও কথা শুনিবার বা তাহার কিছু বলিবার আছে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিবার কোনও প্রয়োজনই ইহারা অনুভব করিল না।

লজ্জায়, ঘৃণায়, অভিমানে শারদা মরিয়া গেল। কিন্তু একটা দুর্দ্ধর্ষ ক্রোধ ও অভিমান তার ভিতর গর্জ্জিয়া উঠিল। সে ইহাদের কোনও কথার কোনও উত্তর দিল না, ইহাদের করুণা ভিক্ষা করিল না, একবার নিজের দোষ ক্ষালন করিবার সামান্য চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না। গোঁজ হইয়া বারান্দায় বসিয়া সে বাকী রাত্রিটা কাটাইয়া দিল।

১৬

পরের দিন সকালে উঠিয়া শারদা জানিতে পারিল যে তার দুষ্কৃতির কথা পূর্ব্বরাত্রেই রঙ্গপুর সহরময় প্রচার হইয়া গিয়াছে।

শারদাকে বাড়ীতে না দেখিয়া মনোরমা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামী কাছারী হইতে ফিরিতেই সে তাঁকে বলিল যে শারদাকে পাওয়া যাইতেছে না।

তৎক্ষণাৎ ডেপুটীবাবুর হুকুমে শারদার সন্ধানে চারিদিকে লোক ছুটিল, থানায় খবর গেল।

পুলিসের লোক সব কথা শুনিয়া স্থির করিল শারদা গোপালের সহিত উধাও হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ গোপালের বাসায় পুলিসের লোক চলিয়া গেল, সেখানে সংবাদ পাওয়া গেল গোপাল খালাস হইয়া তখনও সেখানে ফেরে নাই।

রাত্রিতে ফণীবাবুর বাসায়, ইনস্পেক্টারবাবু, অপর একজন ডেপুটী, মুন্সেফ প্রভৃতির মধ্যে এই শারদা-হরণ ব্যাপার লইয়া বহু আলোচনা হইল।

এইরূপে শারদা-হরণ ব্যাপারটি নানারূপ লতাপল্লবিত হইয়া সহরময় ছড়াইয়া পড়িল। সকল কথা শুনিয়া শারদা ঘৃণায় মরিয়া গেল।

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে মনোরমা শারদাকে আবার ভয়ানক তিরস্কার করিল। বলিল, সে এমন দুশ্চরিত্রা জানিলে মনোরমা তাকে কখনও সঙ্গে আনিত না।

শারদা একবার তীব্র দৃষ্টিতে মনোরমার দিকে চাহিয়া বলিল, "বেশ, তবে আমারে ত্যাশে পাঠাইয়া দ্যান।"

মনোরমা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সে অমনি মুখের কথা কি না?"

শারদা সেখান হইতে চলিয়া গেল।

নিষ্ফল আক্রোশে তার অন্তর জ্বলিতে লাগিল। মনোরমা তাকে বাড়ী হইতে বিদায় করিতে চায়—শারদাও ভাবিতেছিল এ বাড়ীতে আর এক দণ্ড তিষ্ঠান যায় না!

তার হাতে যে কয়টা টাকা ছিল সুধু তাহাই লইয়া রাগে গর গর করিতে করিতে সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

গোপাল তখন সেই বাড়ীর আশেপাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। কাল রাত্রে শারদা তাহার উপর ভয়ানক রুষ্ট হইয়াছে, এ কথা ভাবিয়া সে স্বস্তি পাইতেছিল না। তাহার কৃত কর্ম্মের জন্য অনুশোচনায় সে পীড়িত হইয়াছিল, কিন্তু তার চেয়ে বেশী হইয়াছিল তার ভয়। শারদা যদি রাগের মাথায় ডেপুটীবাবুর কাছে সব কথা বলিয়া দিয়া থাকে তবে হাকিমের ক্রোধে তার সমূহ বিপদ! তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আর একবার শারদার দর্শন লালসায় এই বাড়ীর আশে পাশে ঘুরিতেছিল। শারদাকে যদি কোনও ফাঁকে একবার দেখিতে পায় তবে সে তার পায় ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে—আর কোনও মতে তাকে ডেপুটির ক্রোধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিবে, এই ভরসায় সে ঘুরিতেছিল।

শারদা বাড়ী হইতে বাহির হইতেই গোপাল তার পা জড়াইয়া ধরিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিল—নাক কাণ মলিয়া সে বলিল, আর কোনও দিন সে অপরাধ করিবে না।

শারদা গম্ভীরভাবে তাকে বলিল, "ওঠ্—আমার সাথে আয়।"

গোপাল নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করিয়া মাঠের দিকে চলিল।

মাঠের মাঝখানে গিয়া শারদা বলিল, গোপাল আজই তাকে লইয়া দেশে যাইতে প্রস্তুত আছে কি না?

গোপাল একটু থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

ধমক দিয়া শারদা বলিল, "কিচ্ছু হয় নাই, তুই যাবি কি না ক'। যাস্ তো চল। নাইলে পালা, আর আমি তর মুখও দেখুম না।"

একটু থমকিয়া শেষে গোপাল বলিল, "আচ্ছা যামু।"

শারদা পা বাড়াইয়া বলিল, "তবে চল্"—

গোপাল বলিল, "কাপড়চোপড়?"

শারদা তীব্র স্বরে বলিল, কিছু প্রয়োজন হইবে না। সে বাড়ী হইতে একেবারে বিদায় হইয়া আসিয়াছে; গোপাল সঙ্গে যায় উত্তম, নতুবা সে যেদিকে দুই চক্ষু যায় চলিয়া যাইবে।

গোপাল কিছু বুঝিতে পারিল না। কিন্তু এখন শারদাকে ঘাঁটান সঙ্গত বোধ করিল না। সে তার সঙ্গে অগ্রসর হইল মাহিগঞ্জের দিকে।

শারদা হঠাৎ থামিয়া বলিল, "কিন্তু এক কথা, তুই আবার যদি আমার গা ছুইচস তো তর মাথা খাইয়া আমি ছাড়ুম। ক', তুই আমার গা ছুবি না আর।"

গোপাল সভয়ে বলিল, "কিছুতেই না। এই আবার নাক কাণ মলি।" বলিয়া সে নাক কাণ আবার মলিল।

শারদা ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাকে কঠিন দিব্য দিয়া পুনরায় প্রতিশ্রুতি আদায় করিল। তার পর তারা আবার অগ্রসর হইল।

সে সময়ে পথ-চলাচলের এত সুবিধা ছিল না। রংপুর হইতে তাদের দেশে ফিরিতে রেলে আসিলে দীর্ঘ পথ বেষ্টন করিয়া পোড়াদহ ও গোয়ালন্দে প্রবাস করিয়া ফিরিতে হইত। জলপথে সময় বেশী লাগিত কিন্তু শরীরের শ্রান্তি কম হইত। তাই তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া নৌকায় চলিল, এবং মাঝে মাঝে হাঁটিয়া চলিল। এমনি করিয়া সাত দিন পরে তাহারা দেশে ফিরিল।

গ্রামে আসিয়া শারদা গোপালকে বিদায় করিয়া দিল। গোপালকে সঙ্গে করিয়া নিজের গৃহে ফিরিতে সে কিছু সঙ্কোচ অনুভব করিল।

বাড়ীর কাছে আসিয়া শারদার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সমস্ত বাড়ীটা যেন একটা শ্রীহীন দৈন্যের বিকট মূর্ত্তি! এক বৎসর হয় সে বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে, এই এক বৎসরে তার গৃহের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা দেখিয়া তার কান্না পাইল। ঘর-দুয়ারের আশে পাশে যেটুকু স্থান ছিল তাহা গভীর জঙ্গলে ছাইয়া গিয়াছে, তার ভিতর পা ফেলিবার জায়গাটুকু নাই। উঠানের অর্দ্ধেকটা ঘাস জঙ্গলে ছাইয়া গিয়াছে। বেড়া টাটি যাহা ছিল তাহা জীর্ণ হইয়া খসিয়া পড়িয়াছে। বিন্দুর জন্য যে ছোট ঘর তোলা হইয়াছিল তাহার ভিটা শূন্য পড়িয়া আছে, তার উপরও আগাছা জন্মিয়াছে; আর তার নিজের বাসগৃহের খড়ের চাল যেন গলিয়া পড়িতেছে, বেড়াগুলি যেন কোনও মতে টিকিয়া আছে।

সেই ঘরের দাওয়ায় বসিয়া মাধব ক্লিষ্ট-কাতর মুখে তামাক খাইতেছিল। শারদার মনে হইল যেন এই এক বছরে মাধব একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছে। তার মাথার চুল তিন পোয়া পাকিয়া গিয়াছে, মুখের উপর চারিদিকে বার্দ্ধক্যের গভীর রেখা পড়িয়া গিয়াছে, আর শরীরখানা জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

দেখিয়া শারদার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

শারদাকে দেখিয়া মাধবের চক্ষু আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল; একটা অপূর্ব্ব পুলকে তার বয়োবিকৃত মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছুটিয়া গিয়া শারদাকে সম্ভাষণ করিল। আনন্দ তার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন করিয়া ছাপাইয়া পড়িতে লাগিল।

শারদা হাসিয়া মাধবের পদধূলি লইয়া জিজ্ঞাসা করিল মাধব কেমন আছে, বিন্দু কেমন আছে?

এই দুইটি কথার উত্তর দিতে গিয়া মাধব এমন দীর্ঘ দুঃখের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল যে শারদার হঠাৎ এমনি ভাবে আসিবার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার আর অবসর হইল না।

মাধবের কথা শুনিয়া শারদা ছুটিয়া ঘরে গেল। সেখানে বিন্দু তার অন্তিম শয্যায় শুইয়া আছে।

শারদাকে দেখিয়া বিন্দুর দুই চক্ষু গড়াইয়া জল

পড়িতে লাগিল। শারদা তাকে যথাসম্ভব মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দিল, তার চক্ষু মুছাইল, তার গায় মুখে হাত বুলাইল। তার পর সে উঠিল।

কোমরে কাপড় জড়াইয়া সে যথাসম্ভব ঘর-দ্বারের সংস্কারে মনোনিবেশ করিল। ঘরের মেঝে ঝাঁট দিয়া লেপিয়া সে পরিষ্কার করিল। মাধবকে কোদাল দিয়া উঠান চাঁচিয়া পরিষ্কার করিতে বলিল। ঘরের দাওয়া এবং উঠান আদ্যোপান্ত গোবর জল দিয়া নিকাইয়া সে বাড়ীর চেহারাটা দেখিতে দেখিতে তাজা করিয়া তুলিল।

তার পর তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া সে রান্না করিল। বিন্দুকে তার পথ্য দিয়া, স্বামীকে খাওয়াইয়া নিজে আহার করিল। আহারের পরই সে বাড়ীর চারিপাশের জঙ্গল পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত হইল।

তার সঙ্গে টাকা কড়ি সে যাহা আনিয়াছিল তার কতক খরচ করিয়া সে বাসের ঘরখানা মেরামত করিল।

পাঁচ সাত দিনের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে সেই শ্রীহীন বাড়ীখানা যেন আবার হাসিয়া উঠিল।

মাধব তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সে হঠাৎ এমন করিয়া চলিয়া আসিল কেন।

তার দিকে কটাক্ষ করিয়া সুমধুর সলজ্জ হাস্যে মুখ অলঙ্কৃত করিয়া শারদা বলিল মাধবের জন্য তার 'পরাণ পুড়িল' তাই সে চলিয়া আসিল।

মাধব এ উত্তরে এত কৃতার্থ হইয়া গেল যে এ সম্বন্ধে তার আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার রহিল না। পুড়িবেই তো "পরাণ'! শারদা যে মাধবকে কত ভালবাসে তা' তো মাধব জানে—কত আদর কত যত্ন করে সে, তার সুখের জন্য দিনরাত সে কত না ছোটখাট আয়োজন করে। সে কি পারে এতদিন তাকে ফেলিয়া সেই দূরদেশে থাকিতে ?

বিন্দুর ব্যাধি সারিবার নয়, তাই সে যেমন ছিল তেমনি পড়িয়া রহিল, কিন্তু তাহা সত্বেও মাধব ও শারদার ঘরে আনন্দ ফিরিয়া আসিল। তারা স্বামী স্ত্রীতে মহা আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল। যে দাগা পাইয়া, অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া শারদা রংপুর ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল তাহা সে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেল। এখন সংসার যে তাদের কেমন করিয়া চলিবে সে চিন্তাও সে বিস্মৃত হইল। নবদম্পতীর মত পরস্পরের প্রীতিতে তন্ময় হইয়া তারা আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল। বড় দুঃখের পর আজ শারদার মনে হইল এমন সুখ বুঝি নাই।

*   *   *   *

সহসা তাদের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কয়েক মাস পরে শারদার কলঙ্কের কথাটা গ্রামে কাণাঘুসা হইতে লাগিল। নীয়োগী মহাশয়ের গোমস্তা একবার রংপুর গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া একজনের কাছে গল্প করিল যে শারদা রংপুর হইতে গোপাল নামে এক ছোকরার সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছে।

যাহাকে গোমস্তা এ কথা বলিল, সে হাসিয়া উত্তর দিল শারদা মনের আনন্দে স্বামীর ঘর করিতেছে, সে বাহির হইয়া যাওয়ার কথা নিতান্তই রচা কথা।

এই কথা লইয়া দুইজনের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হইল। গোমস্তা বলিল, সে স্বয়ং ফণীভূষণের কাছে শুনিয়া আসিয়াছে যে একদিন রাত্রে শারদা গোপালের সঙ্গে গিয়া রাত্রি কাটাইয়া আসিয়াছিল; ধরা পড়িয়া তিরস্কৃত হওয়ায় পরের দিন সে গোপালের সঙ্গেই গৃহত্যাগ করিয়াছে।

তার শ্রোতা বলিল, "থো গা তোর দেখা কথা আমি শুইন্যা আইচি!" শারদা এখানে স্বামীর ঘর করিতেছে ইহার পরেও নাকি এই শোনা কথা বিশ্বাস করিতে হইবে যে একটি যুবকের সঙ্গে সে উধাও হইয়াছে।

গোমস্তা ইহাতে ক্ষিপ্ত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

কাজেই এ কথাটা লইয়া অনুসন্ধান ও আলোচনা হইল। ক্রমে গ্রামে অনেকেই জানিতে পারিল যে একটা কি কুকর্ম্ম শারদা করিয়া আসিয়াছে। কাণাঘুসা হইতে হইতে ক্রমে সকলে প্রকাশ্যভাবেই কথাটা আলোচনা করিতে লাগিল।

কথাটা ক্রমে এই আকার ধারণ করিল যে শারদা রংপুরে গিয়া নানাবিধ দুষ্কার্য্য করায় ডেপুটীবাবু কর্ত্তৃক গৃহ-বহিষ্কৃতা হইয়া সেখানে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া আসিয়াছে। শারদা মাধবকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়াছে এবং সঙ্গেও টাকা কড়ি লইয়া আসিয়াছে। শারদা আসিবার পর মাধব দু'হাতে পয়সা খরচ করিতেছে—এত টাকা শারদা পাইল কোথায়? দাসীবৃত্তি করিয়া যে বেতন পাওয়া যায় এ বৃত্তান্ত তখনও এ দেশে প্রায় অপরিচিত

ছিল। দাসীরা মনিব-বাড়ী কাজ করে, খাওয়া পরা পায়, আবশ্যক মত এটা সেটা পুরস্কার পায় বা দুইচার টাকা পাইয়া থাকে, ইহাই ছিল রেওয়াজ। সুতরাং দাসীত্ব করিয়া শারদার পক্ষে এত টাকা রোজগার করা যে সম্ভব ইহা কেহই কল্পনা করিতে পারিল না। সুতরাং বিষয়টা লইয়া বিস্তর আলোচনা হইতে লাগিল।

সুধু আন্দোলন আলোচনা রঙ্গরস ইত্যাদি ছাড়া হয় তো এ কথা লইয়া আর কিছু হইত না। কিন্তু একদিন তাঁতিদের মাতব্বর গোবিন্দ তাঁতির মেয়ের সঙ্গে শারদার সামান্য কারণে একটু বচসা হয়। তাহাতে প্রসঙ্গ ক্রমে গোবিন্দের মেয়ে একঘাট লোকের সামনে শারদার রংপুরের কল্পিত কীর্ত্তিকলাপ বিস্তর লতাপল্লবে শোভিত করিয়া প্রকাশ করে। ক্রোধে ক্ষোভে শারদা তাকে চতুর্দ্দশ পুরুষ সহকারে নানাবিধ অপূর্ব্ব বিশেষণে বিশেষিত করিয়াই নিবৃত্ত হয় নাই, তাকে এমন ভীষণ ভাবে প্রহার করিয়াছিল যে তিন দিন সে মেয়ের গায়ের ব্যথা সারে নাই।

কাজেই ব্যাপারটা লইয়া এখন সমাজের ধর্ম্ম ও নীতি-জ্ঞান ভয়ানক টন্‌টনে হইয়া উঠিল। বেশ্যাবৃত্তি করিয়াছে যে স্ত্রী, তাকে লইয়া ঘর করায় মাধবকে জাতিচ্যুত করা একান্ত প্রয়োজন, ইহা সকলেই অনুভব করিল।

দুই তিন দিন বৈঠক হইয়া মাধবকে সকলে বলিল যে সে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত।

মাধব ছিল অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক। তন্তুবায় প্রধানগণ ভাবিয়াছিল যে তাকে একটু শাসন করিলেই সে প্রায়শ্চিত্ত ও সামাজিক দণ্ড দিয়া জাতে উঠিবে এবং শারদাকে বাহির করিয়া দিবে। কিন্তু তারা আবিষ্কার করিল যে এই সব কথায় চিরদিনের নিরীহ মাধব ভয়ানক উত্তপ্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং সব কথার শেষে সমাজ-পতিদিগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া ফিরিল।

কাজেই 'একঘরে' করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

মাধব যখন বৈঠক হইতে ঘরে ফিরিল তখন শারদা তার মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইল। সে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে মাধব নামহীন কতকগুলি লোককে যা নয় তাই বলিয়া গালাগালি করিল। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর শারদা কথাটা বাহির করিল—মাধব কাঁদিয়া ফেলিল; —সে বলিল, "শালারা কয় কি শুনছস্? কয় তুই নাকি পেশাকার হইছিলি। শালাগো জিব্যা খইসা প'রবো—কুষ্ঠ হইবো শালাগো"—ইত্যাদি।

শারদা গম্ভীর হইয়া গেল। আরও দুই একটা প্রশ্নোত্তরের ফলে সে আবিষ্কার করিল যে নীয়োগী মহাশয়ের গোমস্তা কথাটা এখানে আসিয়া রটনা করিয়াছেন—এ কাহিনীর মূল গোপাল ঘটিত ব্যাপার! সে স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল।

তাহারা একঘরে' হইবার পরের দিন হঠাৎ বিন্দুর মৃত্যু হইল।

তাহার সৎকারের জন্য মাধব লোক ডাকিতে গেল। কেহ আসিল না।

ভীষণ বিপন্ন হইয়া মাধব মুখখানা ভার করিয়া বাড়ী ফিরিল। শারদা সমস্ত শুনিয়া বলিল, ইহাতে ভড়কাইলে চলিবে না, তারা দুইজনেই বিন্দুর সৎকার করিবে।

মাধব ও শারদা দুইজনে কোনও মতে বিন্দুর দেহ নদীর ধারে টানিয়া লইয়া তাহার সৎকার করিল।

(ক্রমশঃ)

মেঘদূত

শ্রীবীরেন্দ্রলাল রায় বি-এ

কবে তুমি কোন্ অতীতে গেঁথেছিলে ছন্দে গীতে
যুগান্তরের বার্ত্তা চলার বাণী;
জড়িয়ে তাহা দীর্ঘশ্বাসে ছড়িয়ে তাহা ফুলের বাসে
আজও ডাকে দিয়ে সে হাতছানি।
মেঘের চলা কাহার আশে? ঘুমিয়ে ব্যাথা মিলন পাশে!
বাদল বারি আজও নিতি ঝরে।

অন্ধকারের বাদল নিশা পায় না খুঁজে তাহার দিশা
আজও চাওয়া কাঁদে পাওয়ার তরে!
আজও নিতি প্রভাত সাঁঝে সেই অজানার বাঁশী বাজে
খুঁজতে যে যাই কোথায় ব্যথা বাজে—
জড়িয়ে বুকে হয় না পাওয়া সবটুকু সুর হয় না গাওয়া
সিঁথির আঁচল মুখ ঢাকে তার লাজে!!

বাঙ্গালার জমিদারবর্গ

আচার্য্য সার শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

(৩)

এদেশের ইহাই চিরাচরিত প্রথা যে ধনী জমিদার বা ধনী ব্যবসায়ী হইলে সচরাচর তাঁহারা সরস্বতীকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া ভোগবিলাসে নিমজ্জিত থাকেন। সেইজন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যদি আমাদের দেশে কেহ ধন সম্পত্তি বা জমিদারি রাখিয়া যান তাহা হইলে জানিতে হইবে যে তাঁহাদের উত্তরাধিকারীবর্গের চৌদ্দ পুরুষ পর্য্যন্ত অভিশপ্ত। কিন্তু এখনও এমন দুই-একটী জমিদারবংশ এদেশে আছে যেখানে কমলা ও সরস্বতী উভয়েরই সমভাবে অর্চ্চনা হইয়া থাকে। এই প্রসিদ্ধি বা খ্যাতির কথা উল্লেখ করিতে গেলে কলিকাতার লাহা পরিবারের কথা মনে হয়। স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ লাহা এই বংশের গোড়া পত্তন করিয়া যান, কিন্তু তদীয় পুত্র বিখ্যাত ধনকুবের মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার অপর ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও জয়গোবিন্দ ব্যবসা ও জমিদারি কার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করিতেন। মহারাজা দুর্গাচরণ নিজের ব্যবসা ও জমিদারি পরিচালনা ব্যতীত বহুবিধ কর্ম্মের মধ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মতালিকা এখানে দেওয়া অসম্ভব ; ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের মেম্বর-স্বরূপ তিনি যে সকল সুগভীর ও সুচিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি দেশের নানাবিধ সৎকার্য্যের জন্য অর্থদান করেন, তন্মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং মেয়ো হাঁসপাতালে পাঁচ হাজার টাকা এবং ডিষ্ট্রিক চেরিটেবেল্ সোসাইটীতে ২৪০০০৲ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যম শ্যামাচরণ লাহাও ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করিয়া ব্যবসাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কলিকাতার মেডিকেল-কলেজ-সংলগ্ন দাতব্য চক্ষু চিকিৎসালয় তাঁহারই অর্থে স্থাপিত হইয়াছে এবং এই কীর্ত্তি চিরদিন তাঁহাকে সজীব করিয়া রাখিবে। এতদ্ব্যতীত ডাফরিণ্ হাঁসপাতালেও তিনি ৫০০০৲ টাকা দান করেন। কনিষ্ঠ জয়গোবিন্দ লাহা ; ইনিও ইম্পিরিয়াল্ কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন। তিনি একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই সাধনায় সমান ব্রতী ছিলেন ; রসায়ন-শাস্ত্রচর্চ্চা ও জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, এবং এই জন্য একটী ক্ষুদ্র পরীক্ষাগার নিজ বাসভবনে নির্ম্মাণ করেন। তিনি প্রতি বৎসর যে ফুলের প্রদর্শনী করিতেন তাহাতেই তাঁহার কৃষ্টির (culture) সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যায় ইঁহার প্রভূত অনুরাগ ছিল ; আলিপুরের পশুশালায় যে সর্প-গৃহ আছে তাহা ইনিই নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তিনি নীরবে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া দান করিতে ভালবাসিতেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের সাহায্যকল্পে গভর্ণমেণ্টের হস্তে এক লক্ষ টাকা অর্পণ করিয়া যান। তাঁহার পুত্র অম্বিকাচরণ লাহাও এই সকল সদ্‌গুণাবলির অধিকারী হইয়াছিলেন। অম্বিকাচরণ একজন পশুতত্ত্ববিদ এবং এটী তাঁহাদের বংশানুক্রমিক রুচি ; বর্ত্তমানে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যচরণ লাহাও পক্ষীতত্ত্ববিদ বলিয়া স্বদেশে ও বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন ; কনিষ্ঠ পুত্র বিমলাচরণও বিশেষ কৃতবিদ্য। মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা কৃষ্ণদাস লাহা বিবিধ লোকহিতকর কার্য্যে মুক্তহস্তে অর্থ দান করিয়াছেন ; চুঁচুড়া জলের কল নির্ম্মাণের জন্য ভ্রাতৃগণের সহযোগে এক লক্ষ টাকা, বেনারস্ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫০০০৲ এবং রিপণ কলেজের সাহায্যকল্পে ১৫০০০৲ দান করিয়া যান। আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে যে, যখন ১৯২১ সালে খুলনার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য আমি সাধারণের নিকট আবেদন করি সেই সময় একদিন একখানি হাজার টাকার চেক্ রাজা কৃষ্ণদাসের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। ইনি চিন্তাশীল উদারপ্রকৃতি ও স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন। বিপুল অর্থব্যয়ে ছান্দোগ্য কণাদ প্রভৃতি উপনিষদের বঙ্গানুবাদ

করিয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধশালিনী করিয়া গিয়াছেন। পাছে লোকে ইঁহার নাম জানিতে পারে, সেইজন্য এই সকল গ্রন্থে তাঁহার নাম পর্য্যন্তও মুদ্রিত হয় নাই। রাজা হৃষীকেশ লাহাও নানাবিধ দেশহিতকর অনুষ্ঠানে সংযুক্ত থাকিয়া অদ্যাপিও আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছেন এবং ইঁহার পুত্র ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিসন্তান; "হৃষীকেশ সিরিজ" নামক যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় ইনিই তাহার কর্ণধার। এই সকল পুস্তক পাঠ করিলে তাঁহার যে কত গভীর পাণ্ডিত্য তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

এইবার কলিকাতা জোড়সাঁকোর ঠাকুরবংশের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক্। ভগবান্ তাঁর সমস্ত কৃপারাশি যেন ঐ এক পরিবারের উপরই বর্ষণ করিয়াছেন। দ্বারিকানাথ ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া ঠাকুরপরিবারের প্রত্যেকেই এক একজন ধুরন্ধর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের একজন যুগপ্রবর্ত্তক। তাঁহার পুত্রগণও—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা দরকার মনে করি না, কারণ তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বনামখ্যাত। সর্ব্বকনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের কথা বলা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। তিনি যে অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তাহা চিরদিন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ইঁহাদের বংশেরই অপর শাখাসম্ভূত অবনীন্দ্র ও গগণেন্দ্রনাথ চিত্রবিদ্যায় বিপুল খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত ইহা বলিতে হইতেছে যে এই সকল দৃষ্টান্ত অতীব বিরল, ইহা কেবল Exception proving the rule অর্থাৎ ব্যতিরেক কল্পে। দেশের বড় বড় বনিয়াদী জমিদার ঘরের বংশধরগণ প্রায়ই নিষ্কর্ম্মা, অলস ও গণ্ডমূর্খ; কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী আছেন বটে কিন্তু একেবারে নিষ্ক্রিয়। পশুর জীবনে ও মনুষ্য জীবনে পার্থক্য কি? পশুও মনুষ্যের ন্যায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করে এবং যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়া থাকে। ভগবান তাঁর অসীম করুণায় মানুষকে বোধশক্তি ও বিচারশক্তি দিয়াছেন, যাহার দ্বারা সে পশুপাখী ও অন্যান্য জীবজন্তু হইতে স্বতন্ত্র। অমর কবি Shakespeare বলিয়াছেন:—

What is a man if his chief good and
market of his time
Be but to sleep and feed? a beast, no more.
Sure, he that made us with such large
discourse,
Looking before and after, gave us not
That capability and God like reason,
To fust in us unused.

কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ জমিদারবর্গ যেমন অলস, নিষ্কর্ম্মা ও শ্রমবিমুখ, তেমনই জীবনযাত্রায় লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বৈচিত্র্যবিহীন। বিখ্যাত Sir John Lubbock (Lord Avebury) একজন ধনী শেঠের (Banker) পুত্র ছিলেন। নিজের কাজকর্ম্ম যেমন ভাবে করিতেন, বিজ্ঞানচর্চ্চায়ও সেইরূপ ভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি নিজে একজন বিশিষ্ট পতঙ্গবিদ্। তাঁহার অনেকগুলি পুস্তকের মধ্যে—Ants Wasps and Bees. The beauties of life. The uses of life. The pleasures of life প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; তাহাতে তিনি এই বলিয়াছেন যে, জীবনধারা সুখকর করিতে হইলে এক একটী খেয়ালের (Hobby) বশবর্ত্তী হওয়া প্রয়োজন। আমি খেয়াল বলিতেছি, কিন্তু বদ্‌খেয়াল নয়। সঙ্গীত-চর্চ্চা, উদ্যান-নির্ম্মাণ, পশুপালন, পাহাড়পর্ব্বতে আরোহণ ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের ধনী জমিদার বা ব্যবসাদারের মধ্যে এর একটীও দেখা যায় না। উদ্দেশ্য-বিহীন জড়ভরত হইয়া তাঁহারা প্রকৃত পশুর ন্যায়ই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

৬০ বৎসর বা ততোধিক পূর্ব্বে এই কলিকাতা সহরে দেখা যাইত যে, রাজপথে বা গড়ের মাঠে ধনীর সন্তানগণ প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যার পূর্ব্বে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেন। অনেকে আবার শিকার-প্রিয়ও ছিলেন। এখনও অনেক জমিদারের গৃহে ব্যাঘ্র ও অন্যান্য বন্যপশুর চর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ স্থলে মহারাজা সূর্য্যকান্তের বিষয় বলা যাইতে পারে। তিনি এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে "বংশপরিচয়" নামক গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃত

করিতেছি—"তিনি বসন্তের প্রারম্ভে পর্ব্বতের উপত্যকা প্রদেশে শিবির সন্নিবেশ করিতেন এবং কখনও খেদা করিয়া হস্তী ধরিতেন, কখনও হিংস্র ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি আরণ্য পশুর অনুসরণ করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার শতাধিক সুশিক্ষিত শিকারী হস্তী ছিল। ঐ সকল হস্তীর প্রতি তাঁহার এতাদৃশ যত্ন ছিল যে তিনি স্বয়ং উহাদিগকে লালনপালন ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। মৃগয়া ব্যাপারে তাঁহার অনন্য-সাধারণ দক্ষতা ইউরোপের প্রসিদ্ধ শিকারীগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।" গোবরডাঙ্গার জমিদারদিগেরও শিকারের জন্য সবিশেষ খ্যাতি আছে।

বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় যে রেড্‌রোড্, প্রিন্সেপ্ ঘাট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, ইডেনগার্ডেন প্রভৃতি স্থানে যাঁহারা প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় বিশুদ্ধ সমীরণ সেবন করিতে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৯৫জন অবাঙ্গালী। ইহাতে বোঝা যায় যে ধনী বাঙ্গালী সন্তানগণ কি প্রকার অলস-প্রকৃতি হইয়া উঠিয়াছেন, এবং সেই কারণে তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও আয়ুক্ষয় হইতেছে, অনেকেই ৩০।৪০ বৎসর পার না হইতে হইতেই বাত, ডায়াবিটিস্ ও হৃদরোগগ্রস্থ হইয়া পড়েন।

তিন বৎসর অতীত হইল বিশিষ্ট শ্রমিক-নেতা ও ভারত-বন্ধু Mr. Brailsford ভারত ভ্রমণ করিয়া তদ্দেশীয় জমিদার এবং ভারতবর্ষের জমিদারদিগের তুলনা করিতে গিয়া প্রসঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে যদিও ইংরাজ জমিদার-বর্গের প্রতি তাঁর বড় একটা শ্রদ্ধা নাই, তথাপি মুক্ত কণ্ঠে ইহা স্বীকার্য্য যে ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারিগণ কৃষি ও গো-পালনের উন্নতিকল্পে অজস্র অর্থব্যয় ও শক্তিসামর্থ্যের নিয়োগ করিয়া থাকেন। কৃষি ও গোজাতির উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্টের দিকে তাঁহারা তাকাইয়া থাকেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের জমিদারবর্গ এবিষয়ে একেবারেই উদাসীন।

আমাদের ধনাঢ্য জমিদারগণের জীবন কোন খেয়ালের পরিপোষক নয় বলিয়া তাঁহারা যে কি প্রকারে মহামূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে হয় তাহা জানেন না। ইউরোপের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় এই প্রকার ধনবহুল ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞান বা সাহিত্যচর্চ্চা করিয়াছেন বা তাহার উন্নতিকল্পে বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Henry Cavendish একজন সর্ব্বপ্রধান অভিজাত্য বংশোদ্ভব (Duke of Devonshine) ব্যক্তি। তিনি নিজ পরীক্ষাগারে বিজ্ঞান-চর্চ্চায় অধিকাংশ সময়ই নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার বাহ্যিক কোন আড়ম্বর ছিল না, চালচলনও সাদা-সিধা ছিল। একদিন যখন তিনি গবেষণায় নিরত আছেন এমন সময় জনৈক Bankএর Manager তাঁহার দরজায় করাঘাত করিলেন। Cavendish বাহিরে আসিলে সে ব্যক্তি তাঁহাকে অনুনয় সহকারে বলিলেন—মহাশয় আপনার প্রায় * এক কোটী টাকা বিনাসুদে Bankএ মজুত আছে; যদি অনুমতি দেন তবে সুদে খাটাইতে পারি। তিনি তাহার প্রতি এমন ভ্রূকুটি-কুটিল কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন যে বেচারা তৎক্ষণাৎ সেস্থান পরিত্যাগ করিল। কিছুকাল পরে আর এক ব্যক্তি ঐ বিষয়ে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে আসায় তিনি তাঁহাকে বলিলেন—দেখ, পুনরায় যদি আমাকে এরকম ভাবে বিরক্ত করিস্ তাহা হইলে সমস্ত টাকাই Bank হইতে উঠাইয়া লইব। এই ঘটনা হইতে এইটুকু বোঝা যায় যে অর্থের উপর তাঁহার কিছুমাত্র লালসা ছিল না। তিনি অকৃতদার ছিলেন এবং বিজ্ঞান-চর্চ্চাই ছিল তাঁর জীবন-যাত্রার সম্বল। নব্য রসায়ন-শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা লাঁবোসিয়ার (Lavoisier) বিত্তশালী ছিলেন, কিন্তু তিনি অবসর সময়ে নিজব্যয়ে পরীক্ষাগার নির্ম্মাণ করিয়া রসায়ন-চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া মানব জীবনের প্রকৃত সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

কৃষি ও গো-পালন বিষয়েও পাশ্চাত্যদেশের ঐশ্বর্য্যশালীরা মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। এস্থলে ইহা বলিলে দূষণীয় হইবে না যে আমাদের ভারত-সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া বিরাট রাজার ন্যায় বহু গোপালের মালিক ছিলেন। গো-জাতির উন্নতিকল্পে তিনি বাছিয়া বাছিয়া নানারকম ষাঁড় যথা Shorhorn, Alderny, Gnernsey প্রভৃতি breed সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার

* ইহা ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের কথা, তখনকার এক কোটী বর্ত্তমানের ৫ কোটী টাকার সমান হইবে।

সুযোগ্য পুত্র সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডও এই মাতৃধারা পাইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের গাভী ও বলদ প্রদর্শনীতে পুরস্কার পাইয়া থাকে। এখানে ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে একটী Pealigree Bull কখন কখন দশ হাজার পাউণ্ড বা লক্ষাধিক মুদ্রায় বিক্রয় হয়। ১৯১২ সালে আমি যখন ২।১ মাসের জন্য লণ্ডনে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তখন কেনসিঙ্‌টন্ (Kensington) নামক উপকণ্ঠে নানাস্থানে Dairy অর্থাৎ দুগ্ধ নবনীত প্রভৃতির দোকান দেখিতাম। কতকগুলির উপর বিজ্ঞাপন থাকিত Lord Rayleigh and Co. তিনি যে কেবল লর্ডবংশসম্ভূত তাহা নহে—ইংলণ্ডের তখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ-বিদ্যাবিশারদ। ইনি গোয়ালা বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিতেন না।

আমাদের দেশের গোজাতির দুর্দ্দশার দিকে তাকাইলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। ভারতবর্ষ প্রকৃত কৃষি-প্রধান দেশ। গো-জাতির উন্নতির উপর দেশের উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। আগামী প্রবন্ধে বাঙ্গালাদেশের জমিদারগণের মধ্যে কিরূপ ঘুণ ধরিয়াছে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল। *

* শ্রীমান্ অরবিন্দ সরদার কর্ত্তৃক অনূদিত।

গো-বেচারা

শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

সাহাবাজপুরের বিল ছাড়াইয়া নৌকাটা শেষে সত্যই খালের সঙ্কীর্ণ পথ ধরিল। বুড়ী এতক্ষণ একটা কথাও বলে নাই: বিলের প্রকাণ্ড পরিসর, দূরের নীচু আকাশ,—সবই যেন তা'র মনের পরিধি, কল্পনার বিস্তৃতি হইতে কেমন বড় বড়, তাই কথা বলিবার সাহসটুকুও আর তা'র ছিল না। খালের সঙ্কুচিত পরিবেশে নিজেকে সে অনায়াসে মেলিয়া দিতে পারে। বুড়ী উৎসাহে দাঁড়াইয়া পড়িল: এই ত খাল এসে গেছে!' কুসুম উত্তর দিল না। মাকে নীরব দেখিয়া বুড়ী ধৈর্য্য হারাইবার উপক্রম করিল: 'আরো কতো দূরে হয়ত বাড়ী—আমার যা ক্ষিদে পেয়েছে!' বুড়ীর কথায় নৌকার রুদ্ধ নীরব আবহাওয়াটা চঞ্চলতায় একটু মুখর হইয়া উঠিয়াছে যা হোক। মাঝি জল হইতে লগিটা উঠাইয়া হাতের উপর চালাইতে চালাইতে হাঁচির শব্দে হাসিলই বোধ হয়। গুরুচরণ আর তামাক টানিবে কি, বিষম খাইয়া কাশিতে কাশিতে মুখের লালায় গায়ের আধ-ময়লা ফতুয়াটার এক বিশ্রী অবস্থা করিল বটে!

কুসুমের মন কোলাহলে ভরিয়া আছে, বাহিরের শব্দের ঢেউ সেখানে পৌঁছিতে পারে না। দ্বিরাগমনের তেরো বছর পর আজ বাপের বাড়ী চলিয়াছে সে। বাপ-মা নাই; আছে শুধু একটা ভাই বাপের সেই বিরাট পুরী আগলাইয়া। একটা আতঙ্ক ভিতরটাকে তা'র কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছিল, কি গিয়া দেখিবে সে ঘর-দোরের অবস্থা! আছে কি তাদের সেই বড় রান্নাঘরটা, ঢেউ-তোলা টিনের ছাউনি, শালের মোটা মোটা খুঁটি-ওয়ালা? বাহিরের পুকুরের ঘাটলাটা ভাঙিয়া যায় নাই ত? বিনোদকে দেখিয়া গিয়াছিল সে তেরো বছরের। কেমন জানি দেখিতে হইয়াছে এখন। দিদির সিঁথিতে সিঁদুর নাই দেখিয়া যদি সে কাঁদিয়া ওঠে, কুসুম তখন কোন কথা বলিতে পারিবে কি? যে বাড়ী হইতে রাজরাণীর মত একদিন সে বিদায় লইয়াছিল, সেখানে তাকে ফিরিতে হইতেছে এ কি দীনতা লইয়া!

গুরুচরণ ততক্ষণ মাঝির সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে: 'বুঝলে আন্দ'দা, বাড়ীর মত বাড়ী বটে! চোখে না দেখলে বলতুম বুঝি গপ্‌প। এ বয়েসে ত বিয়েতে আর কম যাই নি, তেমন তেমন ডাকসাইটের বাড়ীতেও গিয়েছি। এমন বুকের পাটাই দেখিনি কোথাও। এই বৌ ঠাকরুণের বাবা বর-বিদায়ের সময় আমায় ডেকে বল্লেন, 'গুরুচরণ, তাড়াতাড়িতে কিছুই হয়ে উঠ্‌ল না, সন্তুষ্ট মনে এইই নাও।' কি বলব আন্দ'দা, বলেই

তিনি ঢাকাই তাঁতের একটা কাপড় আর পাঁচ টাকার একখানা নোট আমার হাতে গুঁজে দিলেন। আরে জমিদার ত দেশ জুড়েই আছে, এমন দরাজ বুক আছে ক'জনার? পরের বছর মেয়ের বিয়েতে সে কাপড়টাই বরকে দিলুম।'

নৌকা আর থামিবে না, বুড়ী নিশ্চিত বুঝিয়াছে। পাড়ে পাড়ে দুই একটা ছেলে দেখা যায়, বড়শী লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাদের দিকে আঙুল দেখাইয়া মনে মনে বুড়ী কি বকিয়া যায়; বেত-ঝোপ আগাইয়া আসিলেই নীচু হইয়া থাকে, বেতের ডগার কাঁটাগুলি পাছে গায়ে লাগে। দূরে কলাগাছের আড়ালে একটা ছনের ঘর দেখিয়া বুড়ী দস্তরমত লাফাইয়া উঠিল: 'ঐ ত—ঐ ত, বাড়ী এসেছে, রাস্নুটা ঘুমিয়ে আছে, দেখ্‌তে পারলে না ও।' গুরুচরণ একবার উঁকি দিতে দিতে বসিয়া পড়িল: 'দূর পাগ্‌লী—এ বুঝি তোর মামাবাড়ী? সে হবে কতো বড়, ইটের কোঠা—'

ইটের কোঠা বলিতেই গুরুচরণের আর একটি ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। দ্বিরাগমনের বার এই ইটের কোঠায় সে শুইয়া গিয়াছে। খাওয়া দাওয়ার পর বাহিরের ঘরে গিয়া সে দশ-পাঁচজন চাকরের সঙ্গে গল্প-গুজব করিতে বসিয়াছিল মাত্র, কর্ত্তা খোঁজ করিলেন গুরুচরণ কোথায়। যাইতে হইল তা'কে। গিয়া শুইতে হইল দালানে।

গল্প শেষ করিয়া গুরুচরণ উঠিয়া দাঁড়াইল। বাড়ী দেখা যায়। 'বাড়ী দেখা যায় রে বুড়ী'—কথার সঙ্গে সঙ্গে গুরুচরণ আড়মোড়া ভাঙিয়া লইল। বুড়ীকে আর কে রাখে! সে কি চীৎকার: 'ওঠ্, ওঠ্ শীগ্‌গীর রাস্নু—এখুনি নাব্‌তে হবে যে!'

কুসুম দেখিল কে একজন—হয়ত বিনোদ—বিনোদই নৌকা-ঘাটে একহাঁটু জলে তাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। বিষণ্ন নিষ্প্রভ মুখখানা হাসির রেখায় ঈষদুজ্জ্বল। বিনোদের এমন চেহারাই কুসুম আশঙ্কা করিয়া আছে। বাপের আমলের বাড়ী পাহারা দিবারই সে মালিক, ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার অধিকার তা'র নাই। মরিবার আগের বছর বাবা ছোট তরফের সঙ্গে কি মামলাই বাধাইলেন! এত পুরুষের লক্ষ্মীর আসন উঠিল টলিয়া, মাণিকনগরের বাজারটা হাতছাড়া হইল, উঠিল সিম-তাড়ার মহাল নিলামে। শ্বশুরবাড়ীতে দুঃসংবাদগুলি একটার পর একটা শাণিত ফলার মত গিয়া কুসুমের বুকে বিঁধিয়াছে। মন খুলিয়া কাঁদিবারও সেখানে তার অবসর ছিল না। সমস্ত দিনের কর্ম্ম-কোলাহলের পর, রাত্রির শুষ্ক অলস মুহূর্তগুলি! অবসন্ন দেহে তখন তার ঘুম আসিয়াছে গভীর হইয়া, স্মৃতির উত্তাপ কখন শীতল হইয়া গিয়াছে, সে টেরও পায় নাই।

'উঠে এসো দিদি'—কুসুম দেখিল বিনোদ বুড়ীকে কোলে লইয়া পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, গুরুচরণ মাল-পত্র নামাইতে ব্যস্ত। ঘুমন্ত রাস্নুর বিশীর্ণ দেহটা কোলের সঙ্গে মিশাইয়া কুসুম নামিয়া আসিল। অপরিচিতের দৃষ্টিতে দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া চারিদিকে কুসুম একবার চাহিয়া লইতেছে। সারি সারি হিজল আর মাদার গাছ খালের পাড়ে। কই, এ জায়গাটাতে ত এত ঝোপ ছিল না আগে। ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকারের মত হইয়া আছে। বড় কুলগাছটাই বা গেল কোথায়, আর সেই পেটেলরা, যারা পাটি বুনিত? তা'র বিবাহে তারা পাশার ঘর আঁকা নক্সা করা কি চমৎকার শীতল-পাটি বুনিয়া দিয়াছিল! তার বিবাহ! মনে পড়ে, বর-বিদায়ের পর বাবা আসিয়া তাকে নৌকাঘাটে তুলিয়া দিয়া গেলেন, সঙ্গে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল বিনোদ। নহবৎখানা হইতে একটা শানাইএর সুর আসিতেছে। তা'র মন যদি এখন কথা কহিতে পারিত, হইত বুঝি তেমনি সে আর্ত্তনাদ।

কুসুম অবাক হইয়া গেল, ঘাট হইতে বাড়ীর এতটুকু পথ কখন সে পার হইয়া আসিয়া পড়িয়াছে! বুড়ীর ডাকাডাকিতে রাস্নুর ঘুম ভাঙিয়াছে, সেও অনেকক্ষণ। রাস্নু আর কোলে থাকিবে না। মামার হাত ধরিয়া বেড়ান' যে কি সুখ, তার লোভ দেখাইতেও বুড়ী বাকি রাখে নাই। কুসুম রাস্নুকে নামাইয়া হাতমুখ ধুইতে গেল পুকুর-ঘাটে।

রাস্নু নিদ্রা-নিটোল মুখে একটু ম্লান হাসিয়া টলিতে টলিতে মামার কাছে আগাইয়া আসিয়াছে। 'এনেছো আমার জন্যে চকোলেট?'

বুড়ী লাফাইয়া উঠিল: 'জানো মামাবাবু, ও চকোলেট কেন চায়? পুঁটু আছে না আমাদের বাড়ীর পাশে?

পুঁটু খাচ্ছিল একদিন চকোলেট, ওকে দ্যায়নি কি না তাই। আমি খেয়েছি চকোলেট—অনেক—' হাত দিয়া বুড়ী একটা অসম্ভব পরিমাণ দেখাইয়া জিহ্বায় খানিকটা জল টানিয়া নিল।

ইহাতে রাস্থর আপত্তি করিবারই কথা: 'হেঃ—আমায় দ্যায়নি কি না!' রোগারোগা হাত তুলিয়া বুড়ীর দিকে রাস্থ রুখিয়া আসিল। ওর মুখের উপর পাঁচটা নখের দাগ বসাইয়া দেওয়া যায়!

চকোলেট বাজারেও পাওয়া যাইতে পারে কি না সে খবর বিনোদ নিশ্চিত জানিত না। বলিল, 'ও ত অনেক দূরে পাওয়া যায়, কাল যাব যখন নিয়ে আসব, এখন ত ভাত খাবে! রান্না হয়ত হ'য়ে গেছে,—ওরে রামরতন—'

শুধু রামরতনই নয়, দিদি আসিবে বলিয়া বিনোদ জুটাইয়া আনিয়াছে এমন অনেককেই। পরশু গাঙ্গুলী বাড়ীতে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ গেল, দশ গাঁয়ের লোক খাইয়াছে, সহর হইতে আসিয়াছিল এক পাচক ব্রাহ্মণ। এক-সন্ধ্যা রাঁধিয়া দিবার জন্য দুই টাকা কবুল করিয়া আনাইয়াছে বিনোদ তা'কে। দিদির ছেলেমেয়ে আসিবে, সঙ্গে দুই একজন লোকও হয়ত আছে, খাইবার বন্দোবস্ত একটু ভালরকম না করিলে চলিবে কেন?

হাত মুছিতে মুছিতে গুরুচরণ আসিয়া উঠানের এক পাশে দাঁড়াইল। আশ্চর্য্য হইয়া সে দেখিতেছে বার বছর আগে যেখানে মোরগ-ঝুঁটি ফুলের গাছ দেখিয়া গিয়াছিল আজও সেখানে সে রকম গাছই আছে! নাই শুধু দালানটার সেই উজ্জ্বলতা, আস্তর পড়িয়াছে খসিয়া, ধরিয়াছে লোনা আর শ্যাওলা।

'ও, তুমিই এসেছ এদেরকে নিয়ে। বোস' বোস', ও রামরতন, বলি এদের কি খেতে-টেতে হ'বে না না কি রে?" বিনোদ অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

বিনয়ে গুরুচরণের প্রায় বিগলিত অবস্থা। 'না না আমি খাবো কি? এই ত কমলাসাগর ষ্টেশনে খেয়ে এলুম চিড়া আর আঁকের গুড়।'

কুসুম বিরক্ত হইয়াই আসিয়াছে। 'এতো আয়োজন পত্তর তুই কেন করতে গেলি বিনোদ? খাবে কে? খাবার লোক ত গুরুচরণ আর মাঝি?'

—'বা, তোমরা আসচো—'

—'হাঁ আমরা আসচি! তোর দিদির ত খাবার কতই রেখেছে ভগবান, তাই রাজ্যিশুদ্ধ বাজার করে আনতে হবে!' গলাটা কুসুমের অস্বাভাবিক ভারী হইয়া আসিল।

বুড়ী রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, বাহির হইতে হইতে বলিল: 'অনেকগুলো মুড়িঘণ্ট খাবো আমি—একটা আস্ত মাথা।'

কুসুম তুবড়ির মত ছিট্‌কাইয়া পড়িল: 'হেঃ, একটা কেন! কত মাথাই ত খেয়েছিস্ রাক্ষুসী!'

দিদির এই আকস্মিক উত্তাপের কি কারণ থাকিতে পারে? ঘাড় নীচু করিয়া বিনোদ অনেকক্ষণ ভাবিল। নিরাশ হইয়া শেষে বড় বড় চোখ দুইটা তুলিয়া কুসুমের দিকে চাহিল—পশুর মত ভাষাহীন নির্ব্বোধ দৃষ্টি!

মহেশ তা'র তহবিলের বাক্সের উপর একটা ধূপতি বসাইয়া প্রচণ্ড উৎসাহে হরিকে স্মরণ করিতেছে, বিনোদ আসিয়া ডাকিল: 'মহেশ, তোমরা চকোলেট বেচ না?'

হরির উদ্দেশে নমস্কারটা পাইল বিনোদই। 'আপনি এসেছেন বাজারে এই ভোরবেলা কর্ত্তা? চকখড়ি? খুব বেচি। ক'পয়সার দোব?'

বিনোদ হাসিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িল: 'না না চক নয়, চকোলেট। ছেলেপিলেরা খায় বুঝি!'

—'ও বুঝেছি, সে সব কি আর আমরা রাখতে পারি কর্ত্তা? আর রাখলেও গাঁ-ঘরে চলে না ও-মাল।'

মহেশের মুখে নিরুপায়ের হাসি।

চকোলেট যখন মহেশের মনোহারী দোকানেও পাওয়া গেল না, যেখানে এমন কি বারো মাস মোমবাতি আর সিগারেটও পাওয়া যায়, তখন পরিশ্রম কেবল বৃথা। তবু বিনোদ সেনদের ডাক্তারখানাটাও একবার ঘুরিয়া আসিল। একেবারে খালি হাতে বাড়ী ফেরা কেমন দেখায়! যাহোক চার ছ' আনার মিষ্টি দিয়াই না হয় বুড়ী আর রাস্থকে ভুলাইয়া দেওয়া চলিবে।

কাল দিদি যা মেজাজ দেখাইয়াছে, বাড়ীর মধ্যে

মিঠাই লইয়া ঢুকিবার সাহস বিনোদের নাই। রাম্ম আর বুড়ীকে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া চুপে চুপে তাদের হাতে ঠোঙাটি সমর্পণ করিয়া সে ভিতরে ঢুকিল। কে জানিত কুসুমও তখন ঠিক ঘর হইতে বাহির হইবে!

—'এমন মাছ না আনলে কাল কি হ'ত রে বিনোদ?'

বিনোদের মুখ হইতে আল্‌গাভাবে, প্রতিধ্বনির মত, বাহির হইল: 'এমন মাছ?'

—'হাঁ, বাকী। জেলে এসে আজ পয়সা চেয়ে গেল।'

—'ওঃ, তা পয়সা দিয়ে দোব।'

—'দিয়ে দিবি? তোর কাছে আগেরও না কি চার টাকা পায়।'

যুধ্যমান রাম্ম আর বুড়ী আসিয়া কাঁদিয়া মায়ের কাছে দাঁড়াইল। বুড়ী নিজের ভাগের সন্দেশগুলি গোগ্রাসে গিলিয়া রাম্মর ভাগে চিমটি বসাইয়াছে।

—'কে দিল, জিজ্ঞেস করি, কে দিল তোদের সন্দেশ কিনে?' বিনোদের উদ্দেশে তাকাইয়া দেখিল কুসুম, কখন সে সরিয়া পড়িয়াছে।

গুরুচরণ কিন্তু এমন একটা বিপর্য্যয় কল্পনাও করে নাই। অনেক আশা লইয়াই সে বৌঠাকরুণের সঙ্গে আসিয়াছে। পাইবে-থুইবে কিছু, এ আশা এমন কি অসম্ভব! অসম্ভব নয় বলিয়াই ত সে রেল-নৌকার অসুবিধার মধ্যেও এই দুর্গম পাড়াগাঁয়ে আসিবার আগ্রহ দেখাইয়াছিল। কোন আকর্ষণই যখন আর নাই, এখন সে যাইতে পারিলে বাঁচে। আনন্দ মাঝিকে সে বলিয়া কহিয়া রাখিয়াছে; দুপুরে রওয়ানা হইতে পারিলেও, কমলাসাগরের সন্ধ্যার গাড়ীটা ধরা যাইবে।

কুসুম বলিল, 'ভাড়াটাড়া যা লাগে আমার কাছ থেকেই নিও গুরুচরণ, বিনোদের কাছে চেয়ো-টেয়ো না।'

গুরুচরণ যেন শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে: 'সে কি আর আমি বুঝি নি বৌঠাকরুণ? কি বাড়ী কি হয়েছে।'

কুসুম আগের কথায়ই জুড়িয়া দিল: 'ধারকর্জ্জে সব তল। ভাবে ও কিছু একদিনও? ও যদি মানুষ হ'ত, থাকৃত যদি ওর একটু জ্ঞান-গম্যি আজ আর তবে আমাকে চোখের জল ফেল্‌তে হয়, বল'? বাবার সেই সোনারপুরী, তুমিও ত চোখে দেখে গেছ! আর কেউ হলে হয়ত আবার সে-সব ফিরিয়ে আন্‌ত! আন্‌তে না পারুক, কেউ চাইত না হাড়ি ডোমের কাছে টাকা ধার।'

কুসুমের চোখ ভরিয়া জলের প্লাবন আসিয়াছে। অতীতের সহিত আজের বিসদৃশতা কিছুতেই সে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। বাড়ীর নিঃগাঢ় নিরানন্দ আবহাওয়া তা'কে যেন দম আটকাইয়া মারিয়া ফেলিতে চায়। পলাইয়া বাঁচিবারও বা তা'র উপায় কই? পরিচয়ের শীর্ণ স্মৃতি লইয়া এখনও দাঁড়াইয়া আছে কাঁচা-মিঠা আমগাছটা। এখনো সে দেখিতে পায়, আকাশে খুব মেঘ করিয়া আসিয়াছে, বাতাসের সে কি ডানা-ঝাপটানি! আম কুড়াইতে যাইবার এমন ইচ্ছা করিতেছিল তা'র! বাবা কিছুতেই যাইতে দিবেন না—কিছুতেই না। বসিয়া থাকিত সে, কখন ঝড় জল কমিবে, বাবাকে লুকাইয়া দুইটা আম যদি কুড়াইয়া আনা যায়! একটা বিনোদের একটা তা'র। আম দেখিয়া বিনোদের সেই সরল শিশু-হাসির শব্দ সে আজও শুনিতে পায় যেন।

ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া কুসুম দেখিল, রাম্ম আর বুড়ী পাড়ে দাঁড়াইয়া হাততালি দিতেছে, পুকুরে ডুবিয়া সাঁতরাইয়া বিনোদ তাদের জন্যই তুলিতেছে লাল সাপলার ফুল। সেই নির্ব্বোধ আনন্দ! সাপলার ফুলে তাদেরও আনন্দ ছিল—ভাই আর বোনের—ছোট-বেলায়। রাম্ম আর বুড়ী যেখানে দাঁড়াইয়া আছে, হয়ত তা'রাও সেখানেই দাঁড়াইত—ফুল তুলিয়া দিত রামরতনের বাবা। কুসুমের চোখে আজ আর সেই পরিচ্ছন্ন জগৎ নাই, কুজ্ঝটিকার মত সময়ের যবনিকা দৃষ্টি তা'র ঘোলাটে করিয়া দিয়াছে—গাম্ভীর্য্য নামিয়াছে তা'র দৃষ্টিতে। বিনোদেরও ত এমনি হওয়া উচিত ছিল। আজের আলোতে তা'র চোখ উজ্জ্বলতা খুঁজিয়া পায় কি করিয়া? শৈশবের সেই বিমূঢ় মনকে সে চিরদিনের মত বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, মাংসে, শোণিতে, স্নায়ুতে। বাহিরের শাণিত আঘাত সে দুর্গমুখে ফিরিয়া যায়, পাষাণপুরীর সুরক্ষিত স্তব্ধতায় জগৎ তা'র ভরা।

গুরুচরণ আসিয়া নৌকায় উঠিয়াছে। মনটা তা'র ভাল নাই। আনন্দ এই ছিলিম তামাকটা শেষ করিয়াই লগি ধরিবে। হাতে একটা পুটুলি লইয়া নিঃশব্দে বিনোদ আসিয়া ঘাটে হাজির।

—'তোমায় কিছু দিতে পারলাম না গুরুচরণ, এই কাপড়টা নাও।'

গুরুচরণ জিব কাটিয়া বলিল, 'সে কি কথা দাদাবাবু! এ বাড়ীর খেয়েছি কি আর কম? এই ত আন্দ'দাকে বলছিলুম—কেমন কি না আন্দ'দ'? আর ঋণ বাড়াবো না।'

বিনোদ কিছুই শুনিতে পায় নাই: 'কিনেছিলুম দু'বছর আগে, দু'দিনের বেশি পরি নি। এক ধোপ গেছে কেবল—'

গুরুচরণ ছইএর নীচে ঢুকিয়া পড়িয়াছে: 'আসবোই ত আরেকবার বৌঠাক্‌রুণকে নিতে, তখন হবে। আচ্ছা, দাদাবাবু আসি তবে।' নৌকা ছাড়িয়া দিল।

কাপড়টা! কাপড়টা সে বাক্স হইতে খুলিবার সময় দিদির ভয়ে ভাল করিয়া দেখিতে পারে নাই। একটু পুরোনো-পুরোনো দেখা যায় বৈ কি!

বাড়ী ফিরিবার পথে ভুলটা বিনোদের মনে পড়িল: উদ্ধবসাহার গদিতে ধারে চাহিলে কি আর টাকা পাঁচ-সিকের একটা কাপড় পাওয়া যাইত না?

আবিষ্কারের নেশায়

শ্রীরমেশচন্দ্র নিয়োগী বি-এ

গত বৎসর (১৯৩২ খৃঃ) জুলাই মাসে এবং অক্টোবর মাসে দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে খবর পাওয়া গেল যে, সম্বলপুর জিলায় বিক্রমখোল নামক স্থানে এবং গাঙ্গপুর রাজ্যের অন্তর্গত কতিপয় স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের উৎকীর্ণ-চিত্র-সম্বলিত কতিপয় লেখের আবিষ্কার হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে—বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের যুগের বেশী দিন আগে আমাদের দেশে লেখন-পদ্ধতির প্রচলন হয় নাই;—ভারতীয় লিপি বিদেশ হইতে আমদানী, উহা সেমিতিক বর্ণমালা হইতে গৃহীত ইত্যাদি। কিন্তু মোহেঞ্জোদাড়োর সিল প্রভৃতির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই অনুমান ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে,—ভারতীয় লিপি যে নেহাৎ সেদিনকার নয়, এ সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে।

প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন দেখিবার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ চিরদিনই আছে। এই আবিষ্কারের সংবাদে স্থানগুলি প্রত্যক্ষ করিবার স্পৃহা জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে অবস্থান দ্বারা দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি অপনোদন করাও অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। নানা কারণে পূজার ছুটীতে বাহির হইতে বাধা উপস্থিত হওয়ায় বড়দিনের ছুটীর প্রতীক্ষা করিতে হইল।

বিক্রমখোল গুহা কোথায় এবং গাঙ্গপুর রাজ্যের নবাবিষ্কৃত দ্রষ্টব্য স্থানগুলিই বা কোথায়—সেই সমস্ত স্থানে কিরূপে যাওয়া যাইবে এবং কোথায়ই বা অবস্থান করিতে হইবে, কিছুই জানি না। এই সম্বন্ধে জানিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা ও ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রশ্ন করিয়াও কোন জবাব না মিলায় অবশেষে উক্ত স্থানসমূহের আবিষ্কারক পণ্ডিত লোচনপ্রসাদের নামে (বিলাসপুর) একখানা পত্র লিখিলাম। সময় মত তাহারও কোন জবাব আসিল না।

পুরুলিয়াতে এক ঐতিহাসিক বন্ধু থাকিত—তাহাকে লেখা হইল—সে এই ভ্রমণে সঙ্গী হইতে রাজী কি না? এ দিকে বড় দিনের ছুটী আরম্ভ হইল—দুই দিন কাটিয়াও গেল—যাওয়া হইবে কিনা তাহাও স্থির হইল না। অবশেষে পুরুলিয়া হইতে জবাব আসিল বন্ধুটীর শারীরিক অবস্থা বিশেষ ভাল নয়,—তাহার যাওয়া হইবে না।

রাস্তার খবর কিছুই জানি না। ভগবানের নাম লইয়া একাই বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রয়োজনীয়

দ্রব্যাদির ব্যবস্থা আগেই করা হইয়াছিল। নাগপুর প্যাসেঞ্জার গাড়ী ধরিবার উদ্দেশ্যে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশনে পৌছিয়া জানিতে পারিলাম, ট্রেণের সময় বদলাইয়া গিয়াছে। কুলীর কাছে শুনিলাম ট্রেণ ছাড়িবার বিলম্ব নাই—এ দিকে টিকেট কাটিবার সময়ও নাই। কি করি না করি ইতস্তত: করিতেই দেখি কাউণ্টার একেবারে খালি। ভায়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিবার জন্য সঙ্গে গিয়াছিল, তা'র পরামর্শ মত টিকেট কিনিয়া ফেলিলাম।—ফিরিঙ্গী 'বালিকা'দের নিকট টিকেট কাটিতে সাধারণতঃ যেরূপ বেগ পাইতে হয় তাহা হইল না, আধ মিনিটের মধ্যেই টিকেট মিলিল। ষ্টেশনের ঘড়ীতে দেখিলাম গাড়ী ছাড়িবার সময় অপেক্ষাও এক মিনিট বেশী হইয়াছে। প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকিলাম, ভায়ার আর Platform Ticket করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার সময় হইল না।

টিকেট করিয়াছিলাম ঝাড়সুগড়া জংসন পর্য্যন্ত। উদ্দেশ্য ছিল, রাজগাঙ্গপুর ষ্টেশনে 'যাত্রাভঙ্গ' (Break journey) করিয়া সেখান হইতে গাঙ্গপুর রাজ্যের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিব—তার পর সম্বলপুর যাইব এবং সেখান হইতে সংবাদ লইয়া বিক্রমখোল যাইব। গাড়ীতে বিশেষ অসুবিধা হইল না, তবে পরে জানিয়াছিলাম—আমি যে গাড়ীতে উঠিয়াছি তাহা নাগপুর পর্য্যন্ত না যাইয়া রাঁচী অভিমুখে যাইবে, ট্রেণের বাকী অর্দ্ধাংশ নাগপুর যাইবে। যা' হক, সময়মত টাটানগর গিয়া গাড়ী বদলাইয়া নাগপুরের গাড়ীতে উঠিলাম। রাঁচী যাওয়ার গাড়ী ছিল বেশ ফাঁকা ও ভদ্রধরণের। আর এ গাড়ীগুলি যেন কুলী বোঝাই করিবার জন্যই তৈরী।

গাড়ীতে যাত্রীর মধ্যে এক মাদ্রাজী যুবক ও একজন 'উড়িয়া পুলিস'এর সঙ্গে আলাপ হইল। উড়িয়া পুলিস ভদ্রতা জানে। কম্বল পাতিয়া আমাদিগকে বসিতে অনুরোধ করিল। সে তা'র উপরিতন কর্ম্মচারী সব্ ইনস্পেক্টরের সঙ্গে একটা জালিয়াতি মোকদ্দমার তদন্তে যাইতেছিল। কর্ম্মচারীটিও ঐ গাড়ীতেই ছিলেন।

কনেষ্টবলটার দেশ সম্বলপুরে, তাহাকে নেহাৎ অশিক্ষিত বলিয়া মনে হইল না। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করা গেল—"সম্বলপুরঠারু বিক্রমখোল কেত্তে দূর হেব ?" আলাপ সাধারণতঃ হিন্দীতেই হইতেছিল। মাদ্রাজী ভদ্রলোকটী সহসা বাঙ্গালা ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা মহাশয়, আপনি উড়িয়া না বাঙ্গালী ?' আমি বলিলাম—'কেন, আপনার কি মনে হয় ?' তিনি বলিলেন—'না, আপনি যে বেশ উড়িয়াতেই আলাপ আরম্ভ করিলেন।' মনে মনে ভাবিলাম উড়িয়া বলার বিদ্যা আমার ঐ পর্য্যন্তই। প্রকাশ্যে বলিলাম—'মহাশয়ই বা কম কি ?' পুলিসটী বলিল 'বাঙ্গালা, বিহারী, উড়িয়া, হিন্দী—এই চার ভাষা বুঝা বা বলা বিশেষ শক্ত নয়—একটু চেষ্টা করিলেই হয়। কিন্তু মাদ্রাজী (তেলুগু) ভাষা একেবারেই দুর্ব্বোধ্য। বহু চেষ্টায় যা কয়েকটা শব্দ শিখিয়াছিলাম, তা'ও বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছি।'

এইরূপ চলিয়াছি—গাড়ীতে টিকেট-চেকার উঠিল। আমাদের গাড়ীতে এক বুড়ী ও একটী যুবতী বিনা-টিকেটে যাইতেছিল। উভয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ জানি না। চেকারপুঙ্গব বহু চেষ্টা করিয়াও বুড়ীকে উঠাইতে পারিলেন না ; বুড়ী কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। চেকার তখন যুবতীটিকে বলিলেন—'টিকেট করিস্ নাই কেন ?' অতি কষ্টে উত্তর আসিল—'গাড়ী ছাড়ি গলা।' চেকার ভাড়া চাহিল—ধমকাইতে লাগিল,—যুবতী থরহরি কাঁপিতে লাগিল, আর বুড়ীকে থাকিয়া থাকিয়া ডাকিতে লাগিল। বুড়ীর কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। বুড়ী দুই একবার মাত্র যন্ত্রণাসূচক 'উঁ আঁ:' করিয়াই সারিতে চেষ্টা করিল। অগত্যা চেকার যুবতীটীকে বলিল 'আচ্ছা, তুই তোর ভাড়া নিকাল্'। যুবতী তাহার যথাসর্ব্বস্ব দশ গণ্ডা পয়সা বাহির করিয়া চেকারের হাতে দিতে গেল, চেকার চটিয়া উঠিল ; বলিল—'ওতে হইবে না, ভাড়া বাহির কর, নইলে চালান দিব।' যুবতীটীর অবস্থা বর্ণনাতীত,—বুড়ীকে ডাকাডাকি, অবশেষে টানাটানি আরম্ভ করিল। বুড়ী নির্ব্বিকার। চেকার উহাদিগকে সামনের ষ্টেশনেই নামাইয়া পুলিসের হাতে চালান দিবে। যুবতী বলিতে লাগিল 'আমি কি করিব, আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে—অ-বুড়ী, পুরুষ মানুষের সঙ্গে একলা কেমন করিয়া যাইব ?' যুবতীটীকে চালান দিতেছে জানিয়া

বুড়ী যেন একটু সোয়াস্তিই পাইল। হয় ত ভাবিল,—যাক্, একজনের উপর দিয়া যায় ত' ভালই। যুবতী ভাবিল, যদি চালানই যাইতে হয়, তবে একসঙ্গে যাওয়াই ভাল—এক যাত্রায় পৃথক ফল্ কেন হইবে? বুড়ী সঙ্গে না গেলে পুরুষ মানুষের সঙ্গে একা সে সহায়হীন অবস্থায় কেমন করিয়াই বা যায়! চেকারও যুবতীটীকে ষ্টেশনে নামাইয়া পুলিসের হাতে দিবার অভিপ্রায়ে, ধমকাইয়া গাড়ীর দরজার কাছে লইয়া গেল, এবং গাড়ী থামিলে, তাহাকে নামিতে বলিয়া নিজে প্লাটফর্ম্মে নামিয়া পড়িল। পুলিস আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই গাড়ী ছাড়িল, যুবতীর আর নামা হইল না। চেকারও আবার গাড়ীতে উঠিল। পরবর্ত্তী ষ্টেশনে পুলিস ডাকিয়া দু ই জ ন কে ই উহাদের হাতে দেওয়া হইল—পরে কি হইল জানা যায় নাই।

রাজগাঙ্গপুর—বাজার

* * * *

যখনই গন্তব্য স্থানের কথা মনে হইতে লাগিল—তখনই নৈরাশ্য বোধ হইতে লাগিল। কোথায় চলিয়াছি? কোথায় উঠিব—গাছতলায়, মাঠে, কি লোকালয়ে রাত্রি কা টা ই তে হইবে! সেখানকার লোক কেমন—স্থান কেমন! শুনিয়াছি সম্বলপুর বনভূমি— খন্দ, গোণ্ড প্রভৃতি অসভ্য জাতির বাস। বাহির যখন হইয়াছি শেষ না দেখিয়া ফিরিব না, ঠিক্। চেকারকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসংশয় হইয়া রাজগাঙ্গপুরেই 'যাত্রা-ভঙ্গ' (break journey) করা স্থির করিলাম। সেখানকার সম্বন্ধেও কিছুই জানি না। কেবল নামের সাদৃশ্যেই গাঙ্গপুর রাজ্যের সহিত উহার সম্বন্ধ অনুমান করিয়াছিলাম। গাড়ী রাজ-গাঙ্গপুর পৌছিল। এখানেই নামিব, কি ঝাড়সুগড়া হইয়া সম্বলপুর গিয়া গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে খবর লইব—একটু ইতস্ততঃ করিয়া রাজগাঙ্গপুরেই নামিয়া পড়িলাম।

ষ্টেশনের অপর দিকে—লাইনের ও-পারেই মারোয়াড়ী ধর্ম্মশালা, সেখানে গিয়া উঠিলাম।

ধর্ম্মশালার বাসিন্দা লোকদের নিকট গাঙ্গপুরের প্রাচীন স্থানসমূহের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও সংবাদই মিলিল না, কিংবা এ রাজ্যের রাজধানী কোথায়, কতদূর তাহাও সঠিক জানিতে পারা গেল না। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে শুনিলাম—নিকটে কোথায় পিঁজরাপোল আছে, কোথায় কোন্ এক পাহাড়ে না কি এক সাধু আছেন—

রাজগাঙ্গপুর—স্কুল, ডাকঘর, বন-বিভাগের আফিস ইত্যাদি

তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা—তিনি না কি এক হাঁড়ী ভাতে ইচ্ছা লোককে উদরপূর্ত্তি করিয়া খাওয়াইতে ... সাথী মিলিল না বলিয়া সেখানে যাওয়া ...

এখানে গাঙ্গপুর-রাজের একটী বাংলো, পুলিস ষ্টেশন, বনবিভাগের অফিস, ডাকঘর এবং একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাড়োয়ারীদেরও একটী পাঠশালা আছে। এ দেশে অপরাহ্নে বাজার বসে। বাজারটী বেশ বড়। স্থানীয় বড় ব্যবসায়ী মাত্রেই মাড়োয়ারী। এখানে দুই এক ঘর বাঙ্গালীরও বাস আছে। এখানকার অধিবাসীদের অবস্থা বিশেষ ভাল বলিয়া মনে হইল না।

রাজগাঙ্গপুরের পোষ্টমাষ্টারটী বাঙ্গালী। তাঁহার নিকট গাঙ্গপুর রাজ্যের প্রাচীন দর্শনীয় স্থানসমূহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া কোন ফল হইল না। তিনি মাস কয়েক হইল এখানে আসিয়াছেন, কোথায় কি আছে জানেন না। তিনি বলিলেন—'রেঞ্জারবাবু হয় ত আপনাকে এ সম্বন্ধে সংবাদ দিতে পারেন।' এই বলিয়া একজন পিয়নকে সঙ্গে দিয়া আমাকে রেঞ্জারবাবুর নিকট পাঠাইলেন। রেঞ্জারবাবু উৎকল দেশীয়—নাম শরৎকুমার বহিদর। তিনিও কোন সংবাদ দিতে পারিলেন না—তবে বলিলেন প্রাচীন স্থানের মধ্যে 'পান পোস' বিখ্যাত—সেখানে বেদব্যাসের আশ্রম ছিল—শিব প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি বিক্রমখোলের নাম শোনেন নাই। আশ... ল লইয়া তাঁহার কাজ হইলেও আবিষ্কারাদি সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার পিতা রাসবিহারী বহিদর আজ ৩২ বৎসর রাজ-সরকারে কাজ করিতেছেন—গাঙ্গপুর রাজ্যের কোন স্থান তাঁহার অবিদিত নয়,, তিনি হয় ত আমার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন। রাসবিহারীবাবু সুন্দরগড়ে থাকেন। সুন্দরগড় এখান হইতে ৪০.৪২ মাইল—মোটর ভাড়া সাড়ে তিন টাকা। ঝাড়সুগড়া হইতে সেখানে যাইতে মোটর ভাড়া ৸০ মাত্র, দূরত্ব ২০.২৫ মাইল হইবে।

রাজগাঙ্গপুর—বাংলো

রাজগাঙ্গপুর—পর্ব্বতাধিত্যকা

খাওয়া-দাওয়ার কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিলাম না, সঙ্গে যা ছিল তাহা এবং দোকান হইতে কিছু খাবার খাইয়া লইলাম। দোকানের খাবার অখাদ্য।

ধর্ম্মশালার একটা ঘরে জিনিষপত্র রাখিয়া তালা বন্ধ করিয়া স্থানটী ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। ষ্টেশনের পিছন দিকে পাহাড়—কি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য! ক্রমে হ্রদ, পল্লী প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া পার্ব্বত্য পথে চলিলাম। পর্ব্বত-পথে তিন চার মাইলের বেশী একা যাইতে সাহস হইল না—ভয়, যদি পথ হারাই, কিংবা সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে!

ভাবিলাম এখানে যখন কোনরূপ সুবিধা হইল না, তখন ঝাড়সুগড়া হইয়া সুন্দরগড় যাওয়াই ভাল— ঝাড়সুগড়া পর্য্যন্ত টিকেট তো আছেই। এখানে রাত্রি-বাস করিয়া কোন লাভ নাই। রাত্রি ১০৷৷০টার সময় গাড়ী, সেই গাড়ীতে যাওয়া স্থির করিলাম।

সময়-মত গাড়ী আসিল,—রাত্রি প্রায় ১২টার সময় ঝাড়সুগড়া পৌছিলাম। কুলী মিলিল,—জিজ্ঞাসায় জানিলাম ষ্টেশন হইতে একটু দূরে বস্তীতে থাকিবার জায়গা আছে। ষ্টেশনে কিছু জলযোগ করিয়া লইলাম। কুলী আমাকে একটা মুসাফেরখানায় উঠাইল। প্রায় দুই দিক খোলা একখানা ঘরে একা রাত্রিবাস করিতে হইল। টর্চ্চের সাহায্যে ঘরখানা বেশ করিয়া দেখিয়া কম্বল বিছাইয়া লইলাম। কুলী যাইবার সময় বলিয়া গেল—নিকটেই সকাল ৭টার সময় সুন্দরগড়ের 'বাস' মিলিবে।

রাত্রিতে অন্ধকারে অপরিচিত স্থানে একলা বিশেষ ঘুম হইল না—একটু তন্দ্রা আসিল—হঠাৎ উৎকট সঙ্গীত ও হল্লায় তাহাও ছুটিয়া গেল। উর্দ্দু গজল আরম্ভ হইয়াছে—মনে হইল গজলওয়ালারা কিছু নেশা করিয়া লইয়াছে। মনে একটু ভয় ভয় করিতে লাগিল, ঘুম আর আসিল না। বহুক্ষণ পরে গীতের বিরাম হইল— সঙ্গীতকারীরা চলিয়া গেল, কি ঘুমাইয়া পড়িল জানি না। মানসিক উদ্বেগ সত্ত্বেও কিছুক্ষণ ঘুম হইল। খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গিল। মালপত্র ঐখানেই রাখিয়া বাহিরে গিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া আসিয়া Bus Stand এ দাঁড়াইলাম। Bus আসিবার দেরী আছে জানিয়া পায়চারি করিতে করিতে একটা গুজরাটী 'মসলাদার চা'য়ের দোকান চোখে পড়িল, ঢুকিয়া চা চাহিতেই দোকানওয়ালা বলিল 'বসুন এখনই চা দিতেছি।' চা যথাসম্ভব সত্বর তৈয়ার হইল। চা'ওয়ালা বলিল—এখানে অপেক্ষা না করিয়া গ্যারেজে (Garage) গিয়া উঠাই ভাল,—'বাস' ভর্ত্তি হইয়া গেলে এখান হইতে আর লোক নাও লইতে পারে। অগত্যা গ্যারেজে গিয়াই বাসে চড়িলাম।

'বাসে' একজন মুসলমান যাত্রীর সহিত আলাপ হইল। লোকটীর বাড়ী সম্বলপুর জেলায়। তাঁহার নিকট হইতে বিক্রমখোল প্রভৃতির সম্বন্ধে কোন সংবাদ মিলিল না। পরে আর একজন মুসলমান ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তিনি আপনা হইতেই বিক্রমখোল সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর মিলিল। সেখানে যাইতে হইলে বেলপাহাড় ষ্টেশনে নামিতে হয়। ষ্টেশন হইতে বিক্রমখোল মাইল ছয় দূরে হইবে। তাঁহার এই সংবাদটাই আমার বিক্রমখোল যাওয়ার প্রধান সহায় হইল। একবার ভাবিলাম সুন্দরগড় না গিয়া একবারে বেলপাহাড় হইয়া বিক্রম-খোল গেলেই ত হয়। কিন্তু পরে মনে হইল সুন্দরগড়ে

রাজগাঙ্গপুর—হ্রদ প্রভৃতি

গেলে গাঙ্গপুর রাজ্যের দর্শনীয় স্থানগুলির হদিশ মিলিতে পারে, আর দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা হইতে পারে, এবং বিক্রমখোল সম্বন্ধেও অধিকতর সংবাদ মিলিতে পারে। ঘণ্টাখানেক পরে Bus ছাড়িল। পার্ব্বত্যদেশ—শালবন,—বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া ত্বরিত বেগে গাড়ী চলিল। দুই ধারের বনের দৃশ্য কি মনোরম! আলাপী সাথীদের দুইজনই সুন্দরগড় যাইবেন।

ঘণ্টা দুই পরে গাড়ী সুন্দরগড় রাজধানীতে পৌছিল। যাত্রীরা একে একে সবাই নামিতে লাগিল। গাড়ী রাজ-কাছারীর সামনে আসিয়া থামিল। জনৈক উচ্চ পদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীর নামে কয়েকটা 'পার্সেল' ছিল—

ঐগুলি সেখানে নামাইয়া দিতে হইবে। 'বাস্' থামিবামাত্র 'G. P.' তক্‌মাধারী কনেষ্টবল সামরিক কায়দায় সেলাম করিল। বুঝিতে পারিলাম না সে কাহাকে সেলাম করিল—যাত্রীদিগকে, না ঐ জিনিষ-গুলিকে—না গাড়ীর চালককে, না গাড়ীকে? সাথীদের নিকট হইতে কোথায় নামিতে হইবে জানিয়া লইয়া নামিয়া পড়িলাম এবং সেখান হইতে খবর লইয়া বহিদর মহাশয়ের বাড়ীতে পৌছিলাম।

বহিদর মহাশয়ের বাড়ীখানি বেশ বড়। বহির্ব্বাটীতে তাঁহার নিজের লোক ও বাহিরের দুই একজন লোকও ছিল। তাহাদিগের নিকট বহিদর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকারের অভিলাষ জানাইলাম। তাহারা বিশ্রাম করিতে বলিয়া বলিল—তিনি সকালবেলা পূজা অর্চ্চা লইয়াই থাকেন—স্নানাহার সারিয়া রাজবাটী যান এবং বিকালবেলা ফিরেন। আরও বলিল—তাঁহার 'কৃষ্ণ-প্রেম' হইয়াছে—সাংসারিক কাজকর্ম্মে বড় একটা মন নাই। বাহিরের লোকজনের সঙ্গে তাঁহার দেখাশুনা বা আলাপ খুব কমই হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করিলাম—'তবে কি তাঁর সঙ্গে দেখা হইবে না?' উত্তর—'দেখা হইবে না কেন? আপনি বসুন!' নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর জানিতে পারিলাম এখানে কোন হোটেল নাই,—বাজারে লুচী-পুরী বা কিছু মিঠাই মিলিতে পারে। আরও শুনিলাম যাঁহারা এখানে আসেন, তাঁহাদিগকে বহিদর মহাশয়ের অতিথি হইতে হয়—তাঁর বাড়ীতে প্রত্যহ ভগবানের ভোগ হয়—অতিথি অভ্যাগতগণ প্রসাদ পাইয়া থাকেন—চাই কি আমার ভাগ্যেও নিমন্ত্রণ জুটিতে পারে, ইত্যাদি।

কতক্ষণে বহিদর বাবুর সঙ্গে দেখা হইবে,—কতটুকু আলাপ হইবে,—তিনি কেমন লোক—আহারের ব্যবস্থা কি করিব,—এই সব ভাবিতেছি এমন সময় একজন লোক খবর লইয়া ফিরিল। জিজ্ঞাসা করিলাম——'সংবাদ কি?' সে যেরূপ উত্তর করিল তাহাতে, বহিদর মহাশয়ের সহিত যে আদৌ দেখা হইবে এরূপ বোধ হইল না। একটু দমিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'তবে কি দেখা হইবে না?' সে ব্যক্তি উত্তর করিল—'হ'বে না কেন? বসুন, বিশ্রাম করুন,—পরে দেখা হইবে।'

আমি উৎকণ্ঠায় সময় কাটাইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার লোক গেল। একটু পরেই সংবাদ লইয়া ফিরিল। বলিল—'চলুন, তিনি বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন, আপনি দেখা করিবেন।' আমি তৎক্ষণাৎ চলিলাম—ঘরের বারান্দা চিক দিয়া ঘেরা—চিক সরাইয়া বারান্দায় উঠিলাম—বহিদর মহাশয় ও সম্বলপুরের একজন ভদ্রলোক—(ইঁহার সঙ্গে বহিদর মহাশয়ের বাড়ীতেই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আলাপ হইয়াছিল) চাটাইর উপর বসিয়া আমারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

বহিদর মহাশয় প্রতিনমস্কারান্তে বসিতে বলিয়া আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহার পুত্রের সহিত রাজগাঙ্গপুরে সাক্ষাৎ ও আলাপের কথা উল্লেখ করিয়া গাঙ্গপুর রাজ্যে দর্শনীয় প্রাচীন স্থান ও কীর্ত্তির আবিষ্কার বিষয়ের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—'আমি বহুদিন রাজসরকারে কাজ করিতেছি বটে, কিন্তু কোথায় কি আবিষ্কার হইয়াছে সে সংবাদ জানি না।'

প্রত্নতত্ত্বের প্রসঙ্গ হইতে ক্রমে আলাপ জমিয়া উঠিল। ক্রমে ভারতের সভ্যতা, কৃষ্টি, গৌরব, বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ, দার্শনিক জ্ঞানের চরম উন্নতি, মৌলিক একত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে বহুক্ষণব্যাপী আলোচনা হইল; গীতা ভাগবত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ এবং যোগদর্শন প্রভৃতিও বাদ গেল না। তিনি প্রাতঃস্নানের উপকারিতা, সাত্ত্বিক আহারের উপযোগিতা, সংযমের উৎকর্ষ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক যুক্তিগর্ভ বিষয়ের উল্লেখ করিলেন। তিনি যে একজন জ্ঞানী ভক্ত তাহা তাঁহার আলোচনা হইতে বেশ বুঝা গেল।

ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের দয়ানন্দ স্বামীর বক্তৃতায় শুনিয়াছিলাম—ভারতবর্ষ 'perfect land'—সর্ব্ববিধ সৃষ্টি-নিদর্শন এখানেই মিলে। রাসবিহারীবাবু বলিলেন—ভারতবর্ষ সৌন্দর্য্যের নিকেতন, শত সহস্র উপাদেয় মনোরম ফল-পুষ্পের বিকাশ এই দেশেই। ফুল হইতেই ফলের উৎপত্তি। জীবের উদ্ভবও ফুল হইতেই। সে পুষ্পও অসুন্দর হইতে পারে না, এবং জীবও শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর না হইবার কারণ নাই। কথাগুলি মন্দ লাগিল না। ভারতের অধিবাসীরা এককালে পৃথিবীর সভ্যতম জাতি

ছিল—আজ অবনতির যুগেও সে গৌরবের সমূহ নাশ হয় নাই—চেষ্টা করিলে তাহার পুনরুদ্ধার অসম্ভব নয়। এইরূপ বহুবিধ আলোচনা হইল।

ইহা ছাড়া মক্কাতে প্রস্তরনির্ম্মিত শিবলিঙ্গের অস্তিত্বের কথাও তাঁহার নিকট শুনিলাম। তিনি না কি হাজীদের নিকটও এ-বিষয়ে শুনিয়াছেন। দেখিলাম, বাঙ্গালাদেশের মত এখানেও একই রূপ প্রবাদ বর্ত্তমান।

গাঙ্গপুররাজ্য-সম্বন্ধে তাঁহার নিকট জানিতে পারিলাম —এখানকার রাজগণ বিক্রমাদিত্যের বংশীয়। এই বংশের পূর্ব্বে কেশরী বংশীয় রাজারা এখানে রাজত্ব করিতেন। মুসলমান রাজত্বকালে দুইজন চৌহান রাজকুমার পলাইয়া এ দেশে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। এক ভাইয়ের বংশ পঞ্চকোটে ও অপর ভাইয়ের বংশ গাঙ্গপুরে রাজত্ব করিতে থাকেন। রাজ-বংশের কোন লিখিত ইতিহাস নাই। এখানকার রাজগণের কুলোপাধি 'শেখর'। বর্ত্তমান রাজা নাবালক,—বয়স বার তের বৎসর হইবে —নাম 'বীরমিত্র শেখর'। ইঁহার পিতার নাম ছিল 'রঘুনাথ শেখর দেব'।

এই রাজ্যের পরিমাণ আড়াই হাজার বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় সওয়া লাখ। রাজস্ব ৯।১০ লাখ টাকা হইবে। বন ও খনিজাত দ্রব্য হইতেও রাজ্যের কিছু আয় হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা খুব বেশী নয়। ভাগ্যান্বেষী উৎসাহী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি একবার এদিকে পড়িলে বেকার সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। কিছু দিন খনি হইতে কয়লা তোলা হইয়াছিল ; কিন্তু উহা না কি অন্য স্থানের কয়লার তুলনায় নিকৃষ্টতর বলিয়া বেশী দিন চলে নাই। বর্ত্তমান সময়ের অর্থকৃচ্ছ্রতার প্রভাব এ দেশেও বিশেষ লক্ষিত হইতেছে।

রাসবিহারী বাবু পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজ-সরকারে কাজ করিতেছেন। রাজা নাবালক, বর্ত্তমানে রাজ্যের জরীপ হইতেছে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অবসর লইতে দেন নাই, রাজমাতাও বহু দিনের বহুদর্শী বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে ছাড়েন নাই। সেটেলমেণ্ট্ শেষ হইলে ইনি প্রকৃতপক্ষে সংসার হইতে অবসর লইতে পারিবেন।

তিনি সংসার হইতে একরূপ অবসর পূর্ব্বেই লইয়াছেন। বর্ত্তমানে সস্ত্রীক ভিন্ন বাড়ীতে বাস করিতেছেন, এবং সর্ব্বদা ধর্ম্মচর্চ্চা লইয়াই আছেন। ছেলেরা উপযুক্ত হইয়া আপন আপন কার্য্যস্থানে বাস করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন সদর-আলা, একজন বনবিভাগের কর্ম্মচারী ইত্যাদি। ছোট ছেলেটী স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা শ্রেণীতে পড়িতেছে।

আলাপ ভঙ্গ হইবার সময় রাসবিহারী বাবু আমাকে বলিলেন—'আপনার আহার এখানেই হইবে। আমার এখানে প্রত্যহ ভগবানের পূজা ও ভোগ হয়—আমার
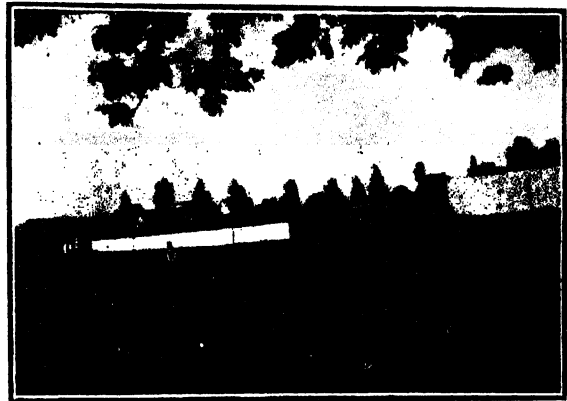
গাঙ্গপুর রাজধানী—সুন্দর গড়

এখানে যিনি আসেন তিনিই প্রসাদ লইয়া থাকেন। এ দেশে সিদ্ধ চাউলের ব্যবহার একরূপ নাই ; আর ভগবানের ভোগে আতপান্ন ছাড়া ত চলে না—আপনার হয় ত একটু কষ্ট হইবে।' আমি বলিলাম—'সে বিষয়ে আপনার ভাবনা নাই—আতপ আমি নিজেও খুবই পছন্দ করি—আতপ ত সাত্ত্বিক খাদ্য। আমাদের দেশে যতি ও বিধবাদের ত আতপই আহার।' রাসবিহারী বাবু আমাকে একটু বিশ্রাম করিয়া স্নানাদি সারিয়া লইতে বলিলেন।

আমি বহিদর মহাশয়ের বহির্ব্বাটীতে চলিয়া

আসিলাম। রহিদর বাবু আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এতক্ষণ আলাপ করিলেন—যাহা তিনি, হয় ত, খুব কম ক্ষেত্রেই করিয়া থাকেন। এই জন্যই বোধ হয় আমার একটু কদরও বাড়িল। আমার জন্য একটী লোক নিযুক্ত করা হইল—সে একটু আধটু ফাই-ফরমাইস খাটিবে ও সন্ধ্যাবেলা আমার মালপত্র "বাসে" তুলিয়া দিবে। তাহাকে পরোক্ষে বলিয়া দেওয়া হইল কিছু বখশীসও মিলিতে পারে।

সুন্দরগড়—ইবনদী

সরকারে কাজ করেন এবং ঐ জাতীয় কোন কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার কাছে শুনিলাম উড়িষ্যার করদ রাজারা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ নিয়োগীর (M. L. A.) হাত ধরা। তাঁহাদের উপর না কি নিয়োগী মহাশয়ের প্রভাব যথেষ্ট। ইঁহার সঙ্গেও অনেক আলাপ হইল।

নিকটেই ইব নদী,—অতি শীতল জল, কিন্তু খর স্রোত। লোকজন কাপড় বাঁচাইয়াই পারাপার করিতেছে। নদীর বালুকণায় অভ্রের প্রাধান্য, স্বর্ণরেণুও না কি চেষ্টা করিলে পাওয়া যায়। বালুর দানাগুলি বেশ বড় বড়। নদীতে স্নানাহ্নিক করিয়া পরম তৃপ্তি বোধ হইল।

স্নানাদি সারিয়া আসিবার অল্পক্ষণ পরেই আহারার্থ যাইতে হইল। অপরিচিত বিদেশে পঞ্চ ব্যঞ্জন-সহকৃত ভগবৎ-প্রসাদ লাভ হইল। ভোজনের সময় রহিদর মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনার হয় ত কষ্ট হইতেছে'। আমি উত্তর দিলাম 'কষ্ট ত মোটেই নয়; ভগবানের প্রসাদ, পরম উপাদেয় হইয়াছে।' আহারাদি সারিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম।

ওঙ্কার পাহাড়—রঘুনাথজীর মন্দির প্রভৃতি

সুন্দরগড়ের অনতিদূরে একটি চমৎকার পাহাড়—তা'র দুই ধার ঘিরিয়া ইব নদী প্রবাহিত। রাজ-বাড়ীর নিকট দিয়া পাহাড় পর্য্যন্ত রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে, বোধ হইল, সেনাবাস (military out-post)। উহার অল্প দূরে "রঘুনাথজীর" মন্দির। এই পাহাড়-টীর নাম "ওঙ্কার" পাহাড়। প্রবাদ, ঐ পাহাড়ে না কি সোণার খনি আছে—সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন। স্থানীয় লোকেরা এই কথাটী গোপনে রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকে; কিন্তু আবার না বলিয়াও যেন সোয়াস্তি পায় না।

সম্বলপুর হইতে যে লোকটী রাসবিহারী বাবুর কাছে আসিয়াছিলেন, তিনি ফটোগ্রাফী শিখিবার উদ্দেশ্যে অনেক দিন কলিকাতা ছিলেন। এখন হয় ত জমিদারের

ইব নদীর ওপারেও অনেকগুলি সুদৃশ্য পাহাড়

আছে। অপরাহ্ণ—রাসবিহারী বাবু মোটরকারে রাজ-গাঙ্গপুর রওনা হইয়াছেন। সাক্ষাৎ করিবার ও বিদায় লইয়া রাখিবার জন্য বাহির হইলাম, নমস্কার বিনিময়ান্তে তিনি বলিলেন—'ফিরতি সময় ওখান (অর্থাৎ রাজ-গাঙ্গপুর) হইয়া যা'বেন।' আমিও ইসারায় জানাইলাম 'আচ্ছা'। বলিবার বা শুনিবার সময় ছিল না—গাড়ী তখন চলিতেছিল। তার পর যতক্ষণ ছিলাম, যতদূর দেখিতে পারা যায় স্থানটী দেখিয়া লইলাম। এখানেও দুই একজন বাঙ্গালীর বাস আছে। সন্ধ্যাবেলা সময় মত 'বাস' ধরিতে বাহির হইলাম। আমার জন্য যে লোকটী নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাকে এবং পূজারী প্রভৃতিকে কিছু কিছু বথশিষ্ দিয়া ঝাড়সুগড়া রওনা হইলাম। বাসে উঠিবার পর একটী ব্যাপার ঘটিল—তাহা বেশ কৌতূহলপ্রদ বলিয়াই মনে হইল।

গাড়ীতে একটী লোক উঠিল, সঙ্গে বছর ছয়েকের একটী মেয়ে। নীচে এক বুড়ী দাঁড়াইয়া। মেয়েটী খুব কাঁদিতেছিল। বুড়ীও তা'কে ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছিল না। লোকটীও মেয়েটীকে রাখিয়া যাইবে না। জিজ্ঞাসায় জানিলাম লোকটী জাতিতে রজক। ঐ বালিকাটী তা'র মেয়ে; বুড়ীটী তার 'শাশ'। লোকটী বলিল মেয়ের লেখাপড়া শিখিবার বয়স হইয়াছে; এখানে রাখিয়া গেলে পড়াশুনা হইবে না। সে ঝাড়সুগড়া থাকে, সেখানে মেয়ের পড়ার ব্যবস্থা করিবে। দেখিলাম লোকটী তথাকথিত নিম্ন জাতীয় হইলেও শিক্ষার প্রতি তাহার প্রখর দৃষ্টি আছে। অত অনুন্নত প্রদেশেও, বিশেষতঃ নিম্ন জাতির পক্ষে, বিদ্যার এই আদর, আশ্চর্য্য বলিয়াই বোধ হইল। পথে একজন লোক বাস-চালকের সঙ্গে ঝাড়সুগড়াতে কোন আত্মীয়ের নিকট একখানা চিঠি দিতে আসিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি ডেপুটি কমিশনার (Deputy Commissioner) সাহেবের আদেশ আসিয়াছে যে, লোক মারফৎ, বিশেষ করিয়া 'বাস'এর সঙ্গে, কেহ চিঠিপত্র দিতে পারিবে না—দিলে দণ্ডনীয় হইবে; পোষ্ট অফিস আছে; চিঠি সেইখানেই দিতে হইবে। তাই চিঠি লওয়া হইল না। গাড়ীতে যাত্রীদের মধ্যে পুলিস-কর্ম্মচারীও একজন ছিল।

যা'হ'ক, গাড়ী সময়-মত ঝাড়সুগড়া পৌছিল। সকালবেলা একটা হোটেল দেখিয়াছিলাম মনে হইল। চা'র দোকান হইতে চা খাইয়া—হোটেলে খাইয়া লইব। খুঁজিতে খুঁজিতে একটী হোটেল মিলিল। ঢুকিয়া দেখি সেই পূর্ব্বপরিচিত চায়ের দোকান। হোটেলওয়ালা বলিল—'বাবু আপ্‌তো ফজিরমেঁ য়হাঁ চা পিয়া না?' আমি বলিলাম—'হাঁ, এখন চা দেও। আর তাড়াতাড়ি যদি পার আমাকে খাওয়াইয়া বিদায় কর, এই গাড়ীতেই যাইব।' আরও বলিলাম—'খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল হইলে কাল রাত্রে বা পরশু সন্ধ্যায় ফিরিয়া এখানে খাইয়া সম্বলপুর যাইব। সেখান হইতে আসিয়া তোমার হোটেলেই উঠিব—খাওয়া-দাওয়া করিয়া কলিকাতা ফিরিব। খাওয়া খারাপ হইলে এবারকার দণ্ডই যথেষ্ট।' হোটেলওয়ালা গুজরাটী ব্রাহ্মণ যুবক, সস্ত্রীক এখানে বাস করে। স্ত্রী রাঁধে, সে হোটেল করে। একটা বাচ্চা চাকরও আছে। হোটেলের কয়েকটী বাঁধা খরিদ্দার আছে। আরও কয়েকটী ছিল—তারা (বোধ হয় খাওয়ার ব্যবস্থা দেখিয়াই) খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। তবে দুই একদিনের মধ্যে কয়েকজন বাঙ্গালী বাবু মাসহারা বন্দোবস্ত করিবেন—ঠিক হইয়া গিয়াছে।

সুন্দরগড় বাজার

দেখিলাম কয়েকজন মারোয়াড়ী ও গুজরাতী

ভদ্রলোক খাইয়া গেলেন। তাগাদা করিতে করিতে অবশেষে আমার আসন পড়িল। জানিলাম ভাত পুনরায় রাঁধিতে হইয়াছে। খাওয়ার যা ব্যবস্থা দেখিলাম তাহা না বলাই ভাল। পয়সার খাতিরে কয়েক গ্রাস অন্ন অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। বলিলাম—'বাপু, এরকম খাওয়া'লে কোন বাঙ্গালীবাবুকে পা'বে না—আর আমার ফিরতি পথে তোমার হোটেলে ওঠার সম্ভাবনাও নাই।' লোকটী সোজা রাস্তায় ষ্টেশনে দিয়া গেল।

ষ্টেশনের নিকটেই একটা বড় খাবারের দোকান। সেখানে পানবিড়ি লইতে ৫।৭ মিনিট দেরী হইল। ইহার মধ্যে দুই একটী লোক আসিয়া খাবার খাইয়া চলিয়াও গেল। ইত্যবসরে একটী মারোয়াড়ী যুবক একজন রেলওয়ে কনেষ্টবল সঙ্গে করিয়া সেখানে আসিল। লোকটী দোকানে খাবার খাইয়া যাইবার সময় ভুলে কোন এক চেয়ারের উপর তার মণিব্যাগ ফেলিয়া গিয়াছে—তাতে ২৬ টাকা ছিল। পুলিস কি করিবে! চোর ধরিয়া দিতে পারিলে ত' হয়! দোকানে কত লোক আসে যায়, কাকে সে সন্দেহ করিবে? পুলিস তাহাকে বলিল—অনেকক্ষণ দেরী হইয়াছে, চোর হয় ত কখন পলাইয়াছে। তুমি যদি কাউকে সন্দেহ কর ত' বল, তল্লাস (Search) করিয়া দেখা যাইতে পারে। বহুক্ষণ খোঁজাখুঁজি হইল, কিন্তু টাকার কোনও 'পত্তা' মিলিল না। যুবকটী দোকানীকেই সন্দেহ করে, দোকানীর সঙ্গে বচসাও অনেকক্ষণ হইল। আমরা যারা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম, তাদের কেউ যায়গা ছাড়িয়া আসিতেও পারি না।—এদিকে ট্রেনের সময় যায়।

পরিশেষে একটা খোট্টা ছোকরাকে সন্দেহ করা হইল। সে না কি মারোয়াড়ী যুবকটী চলিয়া যাওয়ার পরই দোকানে আসিয়াছিল। সেই হয় ত ব্যাগটী মালিক-হীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া উঠাইয়া লইয়াছে। তবে উহাও অনুমান মাত্র,—কেহই তাহাকে বাস্তবিক লইতে দেখে নাই। এইরূপ কল্পনা জল্পনায় বহুক্ষণ কাটিল।

অবশেষে আমরা একে একে লোকটীকে বলিলাম—ম'শয় আমাদের ত ট্রেনের সময় যায়, কি করিব?' সে বলিল 'বাবুসাহেব, আপনাদের ত রোক্‌তে পারি না—যান, আমার নসিবে যা আছে হইবে—আপনারা কি করবেন?' আমরা একে একে ষ্টেশনে আসিলাম। পরে শুনিলাম, টাকার বা চোরের কোন হদিশই হয় নাই।

*   *   *   *

ষ্টেশনে আসিয়া বেলপাহাড়ের টিকেট করিলাম। গাড়ী আসিল, উঠিয়া বসিলাম। কোথায় যাইতেছি কে জানে। বেলপাহাড় হইতে বিক্রমখোল কতদূর, কোন্ দিকে—যাইবার ব্যবস্থা কি, সে সমস্ত কিছুই জানি না। বেলপাহাড় ষ্টেশন কেমন জায়গায়—থাকিব কোথায়—গাড়ী ত রাত্রি ১১।টায় পৌছিবে।

গাড়ী যথাসময়ে বেলপাহাড় ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। ওখানকার যাত্রী কেউ আছে কি না জানি না—গাড়ীতেও এত অল্প সময় মধ্যে কাহারো সঙ্গে আলাপ হয় নাই। ভাবিলাম রাত্রের মত ষ্টেশনেই পড়িয়া থাকিতে হইবে। রাত্রি প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও ব্যবস্থা করা যাইবে না। গাড়ী হইতে নামিতে যাইতেছি এমন সময় দৈবপ্রেরিতবৎ এক ব্যক্তি, আমি যে গাড়ীতে ছিলাম সেই গাড়ী হইতেই নামিতেছে দেখিলাম। আমি আর সেই ব্যক্তি ছাড়া আর তৃতীয় যাত্রী নাই। তাহার নিকট হইতে কিছু সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সে কেমন লোক, কোথায় তার ঘর, ইত্যাদি কিছুই জানি না,—গাড়ীতেও তার সঙ্গে কোনই আলাপ হয় নাই। যা'হক তাহার সঙ্গ লইলাম—মনে একটু 'কিন্তু' যে না হইল তাও নয়। ষ্টেশনেই রাত্রি কাটাইব মনে করিয়াছিলাম। ছোট ষ্টেশন—কুলী পর্য্যন্ত মিলে না। লোকটী আমাকে রেল লাইন দেখাইয়া বলিল—বিক্রমখোলের রাস্তা এই দিকে। সে অনেক দূর—ভীষণ জঙ্গল।

প্ল্যাটফর্ম্মে দেখিলাম এক মারোয়াড়ী বাবু লণ্ঠন হাতে উপস্থিত- সঙ্গে একজন কুলী। আমার সাথীটি তাহার মাথায় আপনার মোট চাপাইয়া মারোয়াড়ী বাবুর সঙ্গে চলিল। আমি তাহার সঙ্গ ছাড়িব কি না ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া সে আমাকে বলিল—চলুন আপনিও। চলিতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসায় জানিলাম,

তার বাড়ী এখান থেকে বেশী দূরে নয়। পথে বিক্রমখোল সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা চলিল। আধ মাইল তিন পোয়া মাইল হাঁটিয়া একটা জায়গায় (সোমড়া)—পৌছিলাম। সেখানে একটা খালি বাড়ী, আঙ্গিনা ঘিরিয়া চারি দিকে বেড়া দেওয়া। বাড়ীটা না কি স্থানীয় প্রজারা পথিকের সুবিধার জন্য করিয়া দিয়াছে। বাড়ী তৈয়ারী এখনও শেষ হয় নাই। মোট দুইখানা কুঠারী। আমাদিগকে সেখানে রাখিয়া মারোয়াড়ী বাবু আপনার 'ডেরা'য় চলিয়া গেলেন।

টর্চ্চের আলোতে ঘরটী বেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। সাথীটিও বিছানা করিয়া শুইলেন। অপরিচিত স্থান ও অপরিচিত দুই প্রাণী। যাহা হউক একটু একটু করিয়া ক্রমে গল্প জমিয়া উঠিল। ঘুম হইবার সম্ভাবনা দেখিলাম না। গল্প যতদূর চলে, ভাল! সময় বেশ আরামেই কাটিতে লাগিল। কাল সকালেই ত তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি—জীবনে আর কখনও দেখা হইবে এমন আশা নাই। কাল আবার কোথায় কি অবস্থায় পড়িব কে জানে! যখন এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছি ও অসুবিধা অপ্রত্যাশিত ভাবে কাটিয়া যাইতেছে, তখন হয় ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

লোকটীর নিকট বিক্রমখোল সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিলাম। লখনপুরের এক সাধু ঐ স্থানটী আবিষ্কার করেন। পাটনার সাহেব, বাঙ্গালীবাবু, আরও অনেকে সেখানে গিয়াছিলেন। সেখানে পাহাড়ের গায়ে 'পাউলি'তে কি যেন লেখা আছে। সেখানে গভীর জঙ্গল,—হিংস্র জানোয়ারের আবাস। দুই চারিজন সাথী লইয়া সুসজ্জিত হইয়া না গেলে বিপদের সম্ভাবনা। এখান হ ইতে সে স্থান ক্রোশ চারেকের কম হইবে না। এখান হইতে রওনা হইয়া, গিণ্ডোলা গ্রামে বিশ্রাম করিয়া, বাজার হইতে কিছু খাওয়া দাওয়া করিয়া, সেখান হইতে লোক লইয়া বিক্রমখোলে যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পথে 'বর্ত্তাব' বলিয়া একটী গ্রাম আছে। 'উলাব' বলিয়া আরও একটী জায়গা আছে—সেখানেও কিছু দর্শনীয় বস্তু আছে। উহার নিকটেই কোথায় না কি কবে ডাকাতের আড্ডা ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি।

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেম আমি সরকারের তরফ হইতে সেখানে যাইতেছি কি না? সঙ্গে পরীক্ষা করিবার যন্ত্রাদি আছে কি না ইত্যাদি। সেখানে যদি কিছু মূল্যবান্ আবিষ্কার এবং 'লভ্য' হয়, তবে তাঁহাকে কিছু ভাগ দিতে যেন না ভুলি। তাঁর ধারণা, ঐ পাহাড়ে সোনা রূপার খনি বা প্রাচীন যুগের রত্নাগার পর্য্যন্ত আবিষ্কার হওয়াও অসম্ভব নয়। আমি যেন আমার এই গরীব পথিক বন্ধুটার কথা ভুলিয়া না যাই। লোকটী এই গ্রামের (সোমড়া) পুরোহিত—নাম 'অন্নদাচরণ পাটজোষী'। সাংসারিক অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, কোনও রকমে চলে। পৌরোহিত্য ছাড়া দালালী কাজও সুযোগ পাইলে করিয়া থাকেন, তা'ও তিনি বলিলেন। তাঁ'র এক ভাইপো কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে কিছু দিন পড়িয়া এখন সম্বলপুর স্কুলে 'প্রফেসারি' করিতেছে; এবং কত বেতন পাইতেছে তাও বলিতে ভুলিলেন না। ইহা ছাড়া আরও অনেক আলাপ হইল। স্থির হইল, পরদিন ভোরে তিনি আমাকে একজন 'মনুষ্য' ঠিক করিয়া দিবেন, সে আমাকে বিক্রমখোল লইয়া যাইবে। দেখিতে দেখিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমিও পরদিনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি রাত্রি প্রায় শেষ। কতক্ষণ পরে লোকটীও উঠিল। ঘর তালা বন্ধ করিয়া উভয়ে বাহির হইলাম। শীতের ঠাণ্ডা। বহু কষ্টে কঙ্করময় রাস্তা হাঁটিয়া একটা 'পোখরীর' ধারে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া ফিরিলাম। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যত সত্বর হয়, আমাকে 'মনুষ্য' ঠিক করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে তাগাদা করিতে লাগিলাম। বহুদূর যাইতে হইবে—সেখানে কি ব্যবস্থা হইবে নিশ্চয়তা নাই; কিছু জলযোগ করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিলাম।

পাটজোষী মহাশয় গত রাত্রে যাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন—সময়মত সে আসিল না। এদিকে বেলা হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে একজন লোক আসিল। ইসারায় জিজ্ঞাসা করিলাম 'এই কি আমার 'মনুষ্য'?' উত্তরে জানিলাম—এ আমার 'মনুষ্য' নয়—ইনি স্থানীয় জনৈক ভদ্রলোক। উঁহার নিকট বিক্রমখোল সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাইলাম। ঐ ভদ্রলোকটি না কি নিজে সেখানে গিয়াছিলেন।

এদিকে 'মনুষ্য' মিলিতে দেরী হইতে লাগিল! সাথীটিকে তাগাদা সুরু করিলাম—তিনি ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন—'কৈ, যাকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল—তা'কে ত পাওয়া গেল না।' আমি তাঁহাকে বলিলাম—আমি তাঁর উপর নির্ভর করিয়া আছি—'মনুষ্য' সংগ্রহ করিয়া দিতেই হইবে—নইলে আমি এই অপরিচিত দেশে কোথায় কি করিয়া 'মনুষ্য' মিলাইব। তিনি তাঁহার তল্পীতল্পা উঠাইয়া লইয়া বলিলেন—'আপনি আমার সঙ্গে আসুন, দেখি কি করিতে পারি।' দুইজনে একত্র বাহির হইলাম। এক মাড়োয়ারী মহাজনের ডেরায় তাঁহার জিনিষ-পত্র কিছু রাখিয়া বাকীগুলি লইয়া চলিলেন। পথে মনুষ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলিল। অবশেষে একজন লোক মিলিল। তাহাকে আমার সঙ্গে গিণ্ডোলা যাইতে বলায় সে প্রথমে রাজী হইল না—তার কোথায় শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ আছে—সেখানে কাজকর্ম্ম দেখিতে হইবে। সাথীটি তাহাকে বলিলেন—'তোমার ভাবনা নাই, তুমি বাবুকে গিণ্ডোলা পৌছাইয়া দিয়াই ফিরিবে। বাকী সব ব্যবস্থা সেখান হইতেই হইবে; তুমি দুপ'রের মধ্যেই ফিরিতে পারিবে।'

আমি বলিলাম—'মহাশয়, তা হয় কি করিয়া, সেখানে আমার ব্যবস্থা করিয়া দিবে কে? এ লোকটী যদি আমার সঙ্গে না থাকে, তবে যাতে সেখানে আমার কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেই ব্যবস্থা করিয়া দিতে উহাকে বেশ ভাল করিয়া বলিয়া দিন।' তখন তিনি তাকে বেশ করিয়া বলিয়া দিলেন—সে যেন গিণ্ডোলাতে গিয়া আমাকে চৌকিদারের হাওলা করিয়া দেয়, এবং বলিয়া দেয় যে বাবু কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন—বিক্রমখোলের প্রচার করিতে,—বাবু গবর্ণমেণ্টের লোক ইত্যাদি। লোকটী সম্মত হইল। পারিশ্রমিক কত দিতে হইবে পাটজোষীকে স্থির করিয়া দিবার ভার দিলাম—তিনি একবার আমার মুখের দিকে ও একবার কুলীটির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—আচ্ছা তিন আনা দিবেন—আমিও তথাস্তু বলিলাম।

পরস্পর ছাড়াছাড়ি, নমস্কার বিনিময় হইল। ঠিকানা চাহিলাম—তিনি যেন একটু ভড়কিয়া গেলেন। আমি বলিলাম 'আপনি ত ঠিকানা লইবার কথা কাল রাত্রে বলিয়াছিলেন—যদি কিছু 'লভ্য' হয় তবে তার অংশ হইতে আপনি যাতে বঞ্চিত না হন সে ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঠিকানা রাখিলাম সেইজন্যই, লাভের ভাগ না দিলে আমার অন্যায় হইবে যে।'

'মনুষ্য'টীর হাতে আমার সুটকেস ও বিছানা দিয়া তাহার সঙ্গে গিণ্ডোলা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভাবিলাম—এইবার হয় ত উদ্দেশ্য সত্যসত্যই সিদ্ধ হইতে চলিল। এখানকার কুলীভাড়া বেশী নয়—সেখানে গিয়া দুইজন না হয় তিনজন 'মনুষ্য'ই লইব। ভয়ের জায়গা, একটু সাবধানে যাওয়াই ভাল।

আমরা চলিলাম—কত বন জঙ্গল, পার্ব্বত্য উপত্যকার মধ্য দিয়া দুই প্রাণী চলিতে লাগিলাম। স্থানে স্থানে গো মহিষ চরিতেছে। ক্রমে গভীরতর অরণ্য—পার্ব্বত্য-ভূমি। বনের মধ্য দিয়া রাস্তা—লোকজন কচিৎ কদাচিৎ যাতায়াত করে। কি সুন্দর দৃশ্য! গন্তব্য স্থানে পৌছিতে দেরী হইবে বলিয়া ফটো লইবার জন্য এক সেকেণ্ডও নষ্ট করিতে ইচ্ছা হইল না। পথিমধ্যে একটী পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী—তাহার উভয় পার্শ্বে সুদৃশ্য বনানী। নদীটির উপর বাঁশ, কাঠ জঙ্গল, মাটী ফেলিয়া রাস্তা তৈরী হইতেছে, কি সুন্দর দৃশ্য!—ভাবিলাম ফিরিবার সময় ঐ স্থানের ফটো লইব। তখন জানিতাম না যে গিণ্ডোলা হইতে অন্য পথে ফিরিতে হইবে। ঘণ্টা দেড়েক হাঁটিয়া বেলা ৯টা ৯॥০টার সময় গিণ্ডোলা গ্রামে পৌছিলাম।

'ডেরা ঘরের' নিকট পৌছিয়া লোকটী ফিরিতে চাহিল। আমি বলিলাম—'এইবার তুমি আমার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ফিরিতে পার।' চৌকিদার সেই-খানেই উপস্থিত ছিল। তাহাকে আমার বিক্রমখোল দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলা হইল। চৌকিদার বেশ ভাল লোক,—তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থার যোগাড় দেখিল। জিজ্ঞাসা করিল—খাওয়া দাওয়া সারিয়া বিশ্রাম করিয়া সেখানে যাইব কি না? আমি বলিলাম—'না, এখনই যাইব; সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিব।' সোমড়ার 'মনুষ্য'কে পাওনা মিটাইয়া দিলাম, সে চলিয়া গেল। এদিকে খবর পাইলাম আমার লোক ঠিক হইয়াছে।

'মনুষ্যে'র ভাড়া চৌকিদারকে দিয়াই ঠিক করাইয়া লইলাম। দুই আনা স্থির হইল—ভাড়া অপ্রত্যাশিত

বলিয়াই মনে হইল। চৌকিদারকে বলিলাম—'একজনে চলিবে কি? আরও দুই একজন লোক সঙ্গে লইলে ভাল হইত না কি? শুনিয়াছি জায়গাটী খুবই ভয়াবহ।' চৌকিদার এবং আরও দুই একজন লোক, যাহারা ডেরা ঘরে উপস্থিত ছিল তাহারা সকলেই বলিল—'ভয় নাই—একজনেই চলিবে।' উহাদের উপদেশ-মত মালপত্র ডেরা ঘরে উহাদের জিম্মায় রাখিয়া কিছু কাগজ-পত্র ও 'যন্ত্র' লইয়া প্রস্তুত হইলাম। উহারা বলিল—'যেত্তেমানে ইঠি আউছন্তি সবু—কাগজ-পত্র নেই যাউছন্তি।' আমি হাসিয়া উত্তর করিলাম—'যারা এখানে আসে, তাদের সবারই প্রায় একই উদ্দেশ্য।' দুইজনে বাহির হইলাম।

'মনুষ্য'টীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আরও দুই একজন লোক লইলে ভাল হইত না কি?' সে সাহস দিয়া বলিল—'কোন ভয় নাই, একজনেই চলিবে।' রাস্তায় বাহির হইয়াই সে বলিল—'বাড়ী হইতে টাঙ্গী লইয়া আসি।' পথের ধারেই তার বাড়ী—বাড়ীতে ঢুকিয়া একখানা টাঙ্গী লইয়া আসিল। সে আগে আগে চলিল, আমি তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম। দুই-জনের আত্মরক্ষার জন্য একখানা মাত্র টাঙ্গী, তবু আত্ম-প্রসাদ লাভ হইল। ভীষণ অরণ্যে একটা দুঃসাহসিক কার্য্যে যাইতেছি—সেখানে ভয় আছে—আত্ম-রক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্রেরও প্রয়োজন।

নূতন সড়ক তৈরী হইতেছে—'সানলাট' না কি শীগ্‌গিরই বিক্রমখোল দেখিতে আসিবেন। সে পথে গেলে প্রায় ক্রোশ খানেক বেশী হাঁটিতে হয়, তাই আমরা সিধা রাস্তায়ই চলিলাম। ক্রমে গ্রাম শেষ করিয়া মাঠ পার হইয়া লোকালয় ছাড়াইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বন মধ্য দিয়া পথ আছে—ক্রমে অল্প জঙ্গল হইতে গভীর জঙ্গলে ঢুকিলাম। পথে অল্প বিস্তর আলাপ হইতেছিল। পথ-প্রদর্শক বলিল, কিছু দিন আগে রাম-পুরের জমিদার প্রভৃতি এখানকার কোন এক বনে শীকার করিতে আসিয়া একটা 'বাঘ ছোআ' ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন। সাবধানেই চলিতেছি, হঠাৎ কি যেন একটা প্রাণী বাঁ-দিকের বনে ঢুকিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ওটা বাঘ না কি?' সাথী বলিল—'না, বাঘ নয়, "কুলীহা"' আমার বিশ্বাস হইল না যে উহা বাঘ নয়। পূর্ব্বাপেক্ষা একটু অধিকতর সাবধানেই চলিলাম।

গভীর বন—কিন্তু গাছতলা বেশ পরিষ্কার, বোধ হইল, যেন কেহ ঝাড় দিয়া রাখিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে বৃক্ষাদির সন্নিবেশ দেখিয়া মনে হইল যেন অদূরেই লোকালয়। কিন্তু কোথায়! শুধু বন আর বন। এই বনভূমি রামপুর জমিদারীর এলেকায়। এই বনের পাশে কোথাও গিণ্ডোলার কারও কারও দুই একখানা জমিও আছে—সেগুলি উলুখড়ের ক্ষেত। ক্রমে ঘণ্টা দুই পার্ব্বত্য পথে চলিয়া বিক্রমখোলের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে কতকগুলি স্থানীয় লোকের সঙ্গে দেখা হইল। অরণ্য গভীর হইলেও উহাদিগকে দেখিয়া সাহস বাড়িল।

বিক্রমখোলের পথে

বিক্রমখোলের উপরেই, দশ পনর হাত দূরে একটা জায়গায়,—বিক্রমখোলে নামিবার পথের বাম ধারে পত্রাচ্ছাদিত একখানা চালাঘর দেখিলাম। পাটনার সাহেবেরা 'মাগশির' (অগ্রহায়ণ) মাসে যখন আসিয়া-ছিলেন তখন তাঁদের খানা তৈয়ার ও বিশ্রাম করিবার জন্য না কি উহা তৈরী হইয়াছিল। আমার পথ-প্রদর্শকটী পাটনার সাহেবদের সঙ্গে এখানে ক্রমাগত এগার দিন আসিয়াছিল। তখন রোজ তিন আনা করিয়া পাই-

কাজ ছিল সকালে সাহেবদের সঙ্গে এখানে আসা, আর সারাদিন বসিয়া কাটাইয়া সন্ধ্যাকালে ফেরা। ইহা ছাড়া সে পাটোয়ারীর সঙ্গে একবার আসিয়াছিল। তার পূর্ব্বে আর কখনও আসে নাই। এই কুটীরের পাশ দিয়া ভগ্ন রাস্তা ধরিয়া নামিয়া বিক্রমখোলের সম্মুখে পৌছিলাম—বহুদিনের উদ্দেশ্য সফল হইল। উপরে যে লোকগুলিকে দেখিয়াছিলাম—তাহারা একে একে আসিয়া জুটিল।

বিক্রমখোলের আকৃতি কতকটা কুলা ধরণের—খাড়া ভাবে উঠিয়া মাথার দিকটা সম্মুখের দিকে একটু ঝুঁকা। উহা ঠিক গুহা নয়। হয় ত কোন কালে গুহাই ছিল, কালক্রমে সম্মুখের দিক্‌টা ধ্বসিয়া গিয়া পিছনের দিকের দেওয়ালটাই অবশিষ্ট আছে। উহার সম্মুখে হাত দুই আড়াই পরিমিত জায়গা কতকটা সমতল হইলেও ঢালু
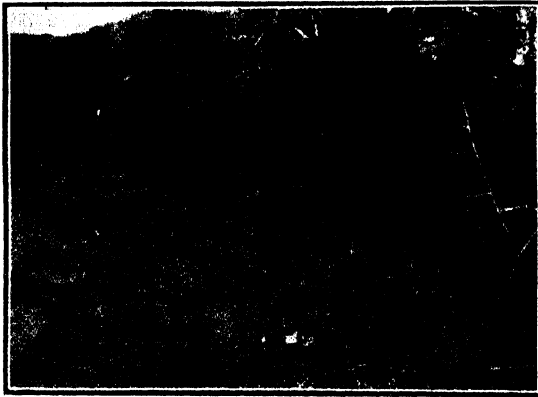
বিক্রমখোল (সম্মুখ দৃশ্য)

গোছের। তার পর পাহাড়ের গা ক্রমে প্রায় খাড়া ভাবে নীচে নামিয়া গিয়াছে। নিম্নে গভীর খাত—আবার ওদিকে উচ্চ পর্ব্বতোপত্যকা।

বিক্রমখোলের গাত্রে ৪ হাত × ২১ হাত পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া নানাবিধ দুর্ব্বোধ্য চিহ্ন সম্বলিত একটী সুবৃহৎ লেখ বর্ত্তমান। লেখের প্রায় মধ্য স্থানে নিম্নে বাম দিকে একটী চতুষ্পদ প্রাণীর চিত্র উৎকীর্ণ আছে। সমগ্র লেখের উপর কালি লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে এই লেখটী কোন প্রকারে কাহারও দ্বারা নষ্ট বা বিকৃত না হয় সেইজন্য ইংরাজী ও উড়িয়া ভাষায় তিনখানি পরওয়ানা টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐগুলি যথা—

রামপুর জমিদারী

জিলা সম্বলপুর শ্রীযুক্ত মহিমাবর ডেপোটি কমিশ্নর সাহেব বাহাদুরঙ্ক আদেশ মতে সর্বসাধারণঙ্ক বিদিত করাই দিয়া যাউঅছি যে এহি বিক্রমখোলর পথররে যাহা অক্ষর লেখা হোই আছি তাহা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা কিম্বা অন্য কৌণসি প্রকাররে নষ্ট করি পারিবে নাহি, নষ্ট করিবার দেখা গলে কিম্বা জানা গলে শক্ত দণ্ড দিয়া থিব।

Sd/লক্ষ্মণ সাহা পট আর······

14. 11. 1932 A. D.

দ্বিতীয়খানা—

বিজ্ঞাপন

শ্রীমান্ ডেঃ কঃ সাহেব বাহাদুরঙ্ক আদেশ মতে এতদ্বারা সর্বসাধারণঙ্ক সাবধান করি দিয়া যাউঅছি কি এই বিক্রমখোলরে যেউ অক্ষর গুড়িক লেখা হোউ অছি তাহা কেহ স্পর্শ করি পারিবে নাহি। এবং এই স্থানর কৌণ সে প্রকার পথর কেহ এঠারু অন্তর করি পারিবে নাহি।

Sd. Kavadhi.
P. I. Jharsugura.···
20. 11. 32.

তৃতীয়খানা—

Notice.

By order of D. C. the public is warned not to touch the rock where there is the inscription and also not to remove any rock from its vicinity.

Sd. Kavadhi.
P. I. Jharsugura.
20. 11. 32.

বিক্রমখোলের এই বিস্তীর্ণ লেখটী কোন্ যুগে উৎকীর্ণ তাহা এখন পর্য্যন্ত সঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। কবে যে পাঠোদ্ধার হইবে কে জানে।* এই লেখটীকে প্রথমে অশোকযুগের অনুশাসন বলিয়াই অনুমান করা

* এই লেখর পাঠ সম্বন্ধে চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হন নাই।

হইয়াছিল। পরে পণ্ডিতগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে উহা অশোকের যুগের বহু কাল পূর্ব্বের।

শুনিলাম পাটনার সাহেবেরা আসিয়া এই লেখটী বেশ করিয়া ধোয়াইয়া কুলীদের দ্বারা কালি লাগাইয়া দিয়াছেন। কালি লাগাইবার পূর্ব্বে ও পরে ফটো লইয়াছেন—ছাপও লইয়াছেন। তাঁহারা গাড়ী গাড়ী 'বহি' আনিয়া তাহার মধ্য হইতে লেখা বাহির করিয়া উহার সহিত ক্রমাগত ১১ দিন ধরিয়া না কি মিলাইয়াও কোন 'হদিস' পান নাই।

উপস্থিত দর্শকদিগের মধ্যে বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ অনেকে ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ বলিল "কেত্তে মানে আউছন্ যাউছন্ কেই পঢ়ি না পারিছন্।" অনেকের ধারণা ঐ লেখ হয় ত মানুষের কৃত নয়—মানুষে উহা পড়িবে কিরূপে! কেহ বা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা কি লেখা আছে পড়িতে পার?' আমি বলিলাম—'অত সহজে উহার পাঠোদ্ধার সম্ভবপর নয়—কত বিদ্বান্ লোক আসিয়াছে—আরও কত আসিবে—কবে পাঠোদ্ধার হইবে কে জানে।' আমার ঐ লেখা সম্বন্ধে কি মনে হয় জিজ্ঞাসা করাতে—দেখিলাম, এই লেখের উপর যাতে তাদের ভক্তির অপচয় না হয় এবং লেখটীর কোনও অনিষ্ট না হয়—সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া উত্তর দেওয়াই সঙ্গত। আমি বলিলাম—উহা 'দেব মানঙ্ক হই পারে' কিংবা 'পুরাণ রাজাঙ্কর হই পারে,—সত্যযুগের মনুষ্যঙ্কর হই পারে।' তাহারা বলিল, হাঁ, ঠিক। বর্ষীয়সী এক নারী বলিল—'বিক্রমখোল তীর্থ হই গলা'—বাস্তবিকই—পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর পক্ষে স্থানটী তীর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরদিন রামপুরের বহিদরবাবুও বলিয়াছিলেন—এ অসুরের দেশ ছিল—পাণ্ডবেরা হয় ত এখানে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন—দণ্ডকারণ্য ত এই স্থানকেই বলিত ইত্যাদি। সবই আনুমানিক—কিন্তু ঐ অনুমানের মূল কোথায়? এই কি ব্যাঘ্ররাজের রাজ্য মহাকান্তার প্রদেশ! এখানকার রাজাদের কি উপাধি ছিল 'ব্যাঘ্ররাজ'! বিক্রমখোলে উৎকীর্ণ প্রাণীটিকে বাঘ বলিয়া মনে করিলে—উহার সঙ্গে ব্যাঘ্ররাজের কোন সম্বন্ধ নির্ণীত হইতে পারে কি না তা'ই বা কে বলিবে!

লেখটী দেখিয়া লইয়া ক্রমে কাগজে অঙ্কিত করিয়া লইলাম—সূর্য্যের আলো খোলের সম্মুখ হইতে সরিয়া

বিক্রমখোল লেখের কিয়দংশ

গিয়াছিল এবং লেখের উপর ছায়া পড়িয়াছিল—ফটো লওয়ারও অসুবিধা ছিল যথেষ্ট। ফটো লইবার জন্য পিছাইতে গেলে গভীর খাত। যাহ'ক অতি কষ্টে

বিক্রমখোল—প্রাণীচিত্রসহ লেখাংশ

কয়েকখানা ফটো লওয়া হইল। উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে ১০।১১ বৎসরের একটী বালক বলিল এই অক্ষরগুলি ইংরেজী yএর মত—বালকটী স্কুলে পড়ে।

আমাকে ফটোর যন্ত্র বাহির করিতে দেখিয়া কয়েকটী

লোক বলিল—আমাদের ফটো তোল না বাবু। আমি বলিলাম আজ আর ফটো ভাল হইবে না। কাল সকালে আবার এখানে আসিব। তখন যদি তোমরা আস তবে অবশ্য তুলিব। যাহ'ক কাজ শেষ করিয়া উপরে উঠিলাম। আমার সাথীটি একটা গাছ দেখাইয়া বলিল—আমি ইচ্ছা করিলে উহার গায়ে আমার নাম লিখিতে পারি। দেখিলাম অসংখ্য নাম ঐ গাছের গায়ে লেখা রহিয়াছে। আমিও একটী নাম উহাতে যোগ করিলাম। তার পর বাসস্থান অভিমুখে ফিরিলাম।

পথিমধ্যেই জানিতে পারিলাম উলাপগড়ে উষাকুটী নামে একটা খোল আছে, সেখানেও পুরাণ লেখা আছে। স্থির করিলাম ডেরাঘরে ফিরিয়া কিছু আহার করিয়া সেখানে রওনা হইব। ফিরিবার সময় পিপাসায় বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। পরে একটা পার্ব্বত্য নদীর জলপানে তৃপ্তিলাভ করিয়া ক্লান্তকলেবরে বাসাঘরে ফিরিলাম। সেখানে চৌকিদার প্রভৃতি রান্না-খাওয়ার কি ব্যবস্থা করিব জিজ্ঞাসা করিল। বলিলাম—এ বেলা আর কিছু রান্না করিব না—দহি চিঁড়া মিলিলেই চলিবে।

উষাকুটী-পথে

চৌকিদারকে জলাশয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পোখরীতে গা ধুইতে গেলাম। আমরা যে পথে গিওোলা আসিয়াছিলাম সেই পথের ধারেই জলাশয়। স্নান করিয়া ফিরিলাম। খাবার ব্যবস্থা হইল। দই পাওয়া গেল না, ঘোল মিলিল; চিঁড়া ও গুড় আসিল। ঘোল বেশ চমৎকার। গুড়ের চেহারা দেখিয়া রুচি হইল না। এরা ত' এই গুড়ই খায়। তবু যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করিয়া লইলাম। 'কুশারী গুড়'* ছাড়া এখানে 'খাজুরী গুড়' বড় একটা মিলে না। খাওয়া শেষ হইতেই আমার গাইড্ প্রস্তুত হইয়া আসিয়া হাজির। কোথায় আমি তাগাদা করিব—না উহারাই তাগাদা করিতে লাগিল; বেলা বেশী নাই, শীতের দিন—ফিরিতে পথে সন্ধ্যা হইতে পারে—বনপথ—বিশেষ ভয়ের কারণ আছে। ক্যামেরা, কাগজপত্র, টর্চ্চের জন্য ভাল একটী bulb লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

বেলা বেশী নাই—চার মাইল পথ যাইয়া আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিতে হইবে। পথে সাথীটি জিজ্ঞাসা করিল আলোর ব্যবস্থা আছে কি না। পকেটে হাত দিয়া বুঝিলাম—আদত জিনিষই ভুল করিয়াছি, টর্চ্চের জন্য ফিরিতে গেলে আরও দেরী হইবে, তাই উভয়ে তাড়াতাড়ি হাটিতে আরম্ভ করিলাম। বহুদূর বনপথে চলিয়া একটা গ্রাম—সেখানে দর্শকটীর কি একটু কাজ ছিল সারিয়া লইল। উভয়ে আবার চলিলাম—বনের পর বন—বনমধ্য দিয়া পাহাড় ভেদ করিয়া রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। রেল লাইন পার হইয়া বনের 'ভী ষ ণ-র ম ণী য় তা' উপভোগ করিতে করিতে চলিলাম।

উলাপ পাহাড়ের প্রায় কাছে আসিবার পর জঙ্গলের ধারে কয়েকটী লোককে এক জায়গায় দেখিতে পাইয়া গাইড্ উহাদের একজনকে ডাকিল। গাইড্‌টি নিজে উষাকুটীর প্রকৃত অবস্থান ভাল করিয়া জানে না। সে লোকটী আসিল—স্কন্ধোপরি একখানা শাণিত কুঠার—গলায় পৈতা—গৌরবর্ণ সুশ্রী অবয়ব। সেও আমাদের সঙ্গে চলিল।

উলাপগড়ে পৌছিলাম। খাড়া পাহাড় বাহিয়া উপরে উঠিতে হইল। কোন্ যুগে পাহাড় কাটিয়া সিঁড়ি প্রস্তুত করা হইয়াছিল—তাহার চিহ্ন এখনও আছে, স্থানটি অতীব রমণীয়!

* ইক্ষুগুড়।

এখানেও প্রায় বিক্রমখোলের ধরণেরই সুপ্রাচীন লিপি বর্ত্তমান। উহাতেও একটী চতুষ্পদ জন্তুর চিত্র অঙ্কিত আছে। তবে উহার আকৃতি ভিন্ন ধরণের—কতকটা কাঠবিড়ালীর মত। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি চিত্র আছে। সেগুলিকে জ্যামিতিক চিত্র বলা যায়। উহা রং দিয়া আঁকা। যতদূর সম্ভব চিহ্নগুলি টুকিয়া লওয়া গেল। ঐ স্থানটীর প্রতি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কিংবা প্রত্নতত্ত্বান্বেষীর দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইল না। এই লেখে কালি মাখান হয় নাই। সূর্য্য প্রায় অস্ত যায় যায়। এই খোলটীর পাদদেশের নিকট দিয়া উলাপ যাইবার রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করার সময় হইল না—পাছে বনের মধ্যেই অন্ধকার হইয়া পড়ে।

উষাকুটী হইতে ফিরিলাম। অপর সাথীটি নিজের বাড়ীতে চলিয়া গেল। আমরা এখন দুইজন, সঙ্গে আলোর ব্যবস্থা নাই। রাস্তায় একটা শিয়াল যাইতেছিল; তাহা দেখিয়া সাথীটি জিজ্ঞাসা করিল—'ইহাই দেখিয়াছিলে কি?' আমি বলিলাম—'না। এটা ত শিয়াল।' "শৃগাল' হাঁ, ইহাই কুলীহা।" আমি যে প্রাণীটি সকাল বেলা দেখিয়াছিলাম, তাহার আকৃতি ভিন্ন প্রকারের। শৃগাল ত লাফায় না, দৌড়ায়—আর শৃগালের মাথাটা গোলও নয়। রাস্তা আর শেষ হয় না। জিজ্ঞাসা করিলাম—'অর্দ্ধেক পথ আসিয়াছি কি?' সে বলিল—'হাঁ, বড় ভাগ আছ।' ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। বহিদরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি রান্না করিবেন?'

ঠিক করিলাম খিচুড়ি খাওয়াই ভাল, রান্নায় হাঙ্গামা নাই। চাল ডালের পয়সা দিলাম। উহাদের হিসাব মত চাল ডালের অনুপাতে পোষাইবে না দেখিয়া পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম। চা'ল, মুগডাল, ঘী, লঙ্কা আসিল, জিরাও সংগ্রহ হইল। ডেরা ঘরের ভৃত্যটী হাঁড়ীতে জল চাপাইয়া দিয়া—আমাকে পুনঃ পুনঃ তাগাদা করিতে লাগিল। হাত পা আর উঠে না। যাহ'ক কষ্টে সৃষ্টে গিয়া চাল ডাল এক সঙ্গেই হাঁড়ীতে ছাড়িয়া দিলাম—উহা চাকর আগেই ধুইয়া রাখিয়াছিল।
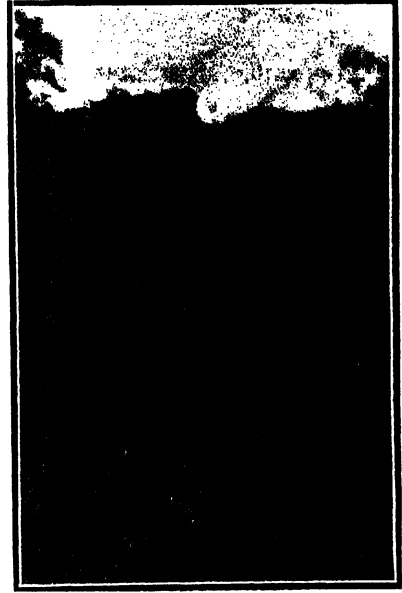
উষাকুটী (সম্মুখ দৃশ্য)

ঘী ও জিরা সম্ভার দিয়া খিচুড়ি নামাইয়া লইলাম। খাওয়া নেহাৎ মন্দ হইল না। তবে চা'লে কাঁকর থাকায় বড়ই অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল। খাওয়া দাওয়া সারিয়া ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। ঘরে বহিদরবাবু ও আ-

উষাকুটী (প্রাণীচিত্রসহ)
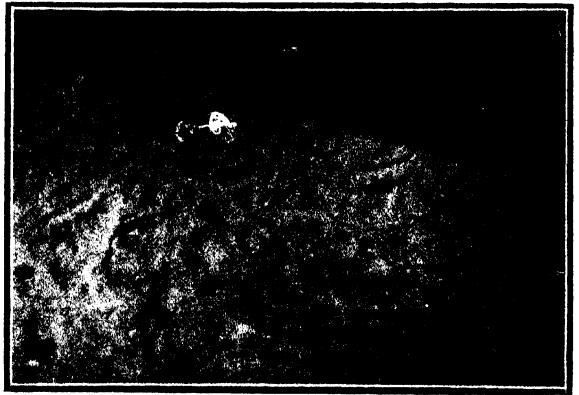
একজন থাকিল। রাত্রে ঘুম মন্দ হইল না। খুব ভোরেই পথপ্রদর্শকের আসার কথা ছিল—অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই মাঠে গিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া প্রস্তুত হইলাম।

পথ প্রদর্শক আসিল, বিক্রমখোলের পথে আবার রওনা হইলাম। রামপুরের বহিদর বাবুও সঙ্গে চলিলেন—তিনি লখনপুর যাইবেন। এবার নূতন রাস্তায় চলিলাম। অনেকটা ঘুরিয়া যাইতে হইল। দুই ধারের জঙ্গল কাটিয়া পথ প্রশস্ত করা হইতেছে—ছোট লাটসাহেব বিক্রমখোল দেখিতে না কি শীগ্‌গিরই আসিতেছেন। বহিদর বাবুর সঙ্গে অনেক আলাপ হইল। তিনি তাঁহার গন্তব্য পথে রওনা হইলেন—তাঁহার নিকট বিদায় লওয়া হইল। সময় মত বিক্রমখোলে পৌছিলাম।

সাথীটি প্রথমে কয়েক খণ্ড প্রস্তর গর্ত্তে ছুঁড়িয়া ও ঠুকিয়া শব্দ করিল—যদি কোন হিংস্র জন্তু থাকে সরিয়া যাইবে। আমরা দুই ব্যক্তি ছাড়া এবার সেখানে আর কেউ নাই। বেলা ৮টা ৮৷৷৹টা হইবে। এবার বেশী দেরী হইল না। কয়েকখানা ফটো লইয়া, খোলের যতদূর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা সম্ভব তাহা দেখিয়া, অন্য কোনও চিত্র বা লেখ প্রভৃতির নিদর্শন না দেখিতে পাইয়া ফিরিলাম। খোলের নিকট হইতে একখানা বাঁশের বাতা কুড়াইয়া লইয়া চাকু দিয়া চাঁছিয়া একখানা লাঠির মত করিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম। সাথীটি তাহার টাঙ্গীখানা আমার হাতে দিয়া বলিল ইহা দিয়া চাঁছিয়া লও। দেখিলাম টাঙ্গীতে মোটেই ধার নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—ছেলে পিলের ঘর; যদি তাহারা কখন ঝগড়া করিয়া একে অপরকে টাঙ্গী দিয়া আঘাত করে এই ভয়ে ধারান হয় নাই।

যা হ'ক সোজা রাস্তা ধরিলাম। পথে উভয়ের মধ্যে অনেক আলাপ হইল। তাহার নাম টুকিয়া লইলাম। সেও আমার নাম জানিয়া লইল—ভবিষ্যতে কারও সঙ্গে 'চলনদারী' করিবার সময় আমার কথার উল্লেখ ও গুণ-কীর্ত্তন করিবে। যাতে আমার কোনরূপ বিপদ্ আপদ্ না হয় সেজন্য সে অতন্দ্রিতভাবে আমার সঙ্গে চলিয়াছে—যাতে তার গাঁয়ের নামে কোনরূপ বদনাম না হয় সর্ব্বদা সেদিকে তার লক্ষ্য। বাসায় ফিরিয়া স্নান করিয়া পূর্ব্বদিনের মতই চিপীটক ভক্ষণ করিয়া উষাকুটী অভিমুখে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

এবার জিনিষপত্র লইয়া একেবারে বাহির হইয়া পড়িলাম। চৌকিদারকে চারি আনা বথ্‌শীষ দিলাম—সে ত মহা খুসী। সে বলিল—'বাবু যখন আবার আসিবে আমার জন্য দা'দের ঔষধ আনিও।' আমি বলিলাম—'আবার কবে আসিব তারও কোন ঠিক নাই—যদি কখনও আসি আর মনে থাকে তবে তোমার ঔষধ লইয়া আসিব'—সে খুসী হইল।

পথদর্শক আমার মালপত্র লইয়া চলিল। এবার উষাকুটী হইতে না ফিরিয়া একবারে ষ্টেশনে যাইব। বাসায় ফিরিতে গেলে অযথা সময় নষ্ট ও অতিরিক্ত পরিশ্রম হইবে।

উষাকুটীতে পৌছিয়া সেখানকার ফটো লইলাম। ইচ্ছা ছিল সেখানে কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ও ঘুরিয়া ফিরিয়া বেশ করিয়া দেখিয়া ষ্টেশনে যাইব। সাথীটির তাগাদাতে তাহা হইল না। ঠিক দুপর সময়, প্রখর রৌদ্রকিরণ, জনমানবহীন বনভূমি। এখানে না কি কোন বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে মেলা হইয়া থাকে। উষাকুটীতে অবস্থান কালে একখানা গাড়ী যাওয়ার শব্দ শুনা গেল।

উষাকুটী হইতে ফিরিবার পথে বাম দিকে বনের মধ্যে একটী প্রাচীন ভিত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিলাম। উহা কোন্ যুগের কে জানে? গঠন-প্রণালী দেখিয়া সুপ্রাচীন কালের বলিয়াই মনে হইল। কালবিলম্ব না করিয়া ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। ভাবিলাম দিনের গাড়ীই হয় ত ধরিতে পারিব। কিন্তু ষ্টেশনে পৌছিয়া শুনিলাম ঘণ্টা দেড়েক পূর্ব্বে গাড়ী চলিয়া গিয়াছে। রাত্রির গাড়ীর প্রায় ১২ ঘণ্টা দেরী। পথপ্রদর্শককে লইয়া বাজারে গেলাম। সেখানে এক মারোয়াড়ীর দোকান হইতে একখানা উৎকলী শাড়ী খরিদ করিয়া এবং কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া ষ্টেশনে আসিলাম।

ষ্টেশনে প্লাটফর্ম্মে একটী লোকের সঙ্গে বিক্রমখোল সম্বন্ধে আলাপ হইল। ষ্টেশন-মাষ্টারও আসিয়া বিক্রম-খোল সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন। ষ্টেশন-মাষ্টারটী বাঙ্গালী। তাঁহার বাড়ী যশোহর জেলায়। তিনি জাতিতে

কায়স্থ। তিনি বলিলেন 'আপনি হয় ত জানেন বি, এন, আর লাইনে ষ্টেশন-মাষ্টার বাঙ্গালী—তবে আমার এখানে উঠিলেন না কেন?' বাস্তবিক পক্ষে আমি ইহা জানিতাম না। যাহা হউক তাঁহার সঙ্গে নানারূপ সুখ দুঃখের আলাপ হইল। তাঁহার বাসায় ছেলে মেয়েরা সব অসুস্থ—তবু তিনি চা করিয়া খাওয়াইলেন। রাত্রে তাঁহার বাসায় নিমন্ত্রণ করিলেন, জাতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন আমি বৈদ্য। বলিলেন—আপনি বৈদ্য; ব্রাহ্মণের পরেই আপনাকে আমাদের হাতে ভাত খাইতে অনুরোধ করিতে পারি না,—রুটি খাইতে বোধ হয় আপত্তি হইবে না।

সন্ধ্যার পর তাঁহার বাসায় আহারটা বেশ ভালই হইল। আহারান্তে বিদায় লইয়া ষ্টেশনে আসিলাম। সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার আমার মালপত্র ষ্টেশন ঘরে রাখাইলেন এবং আমার সঙ্গে বিছানা কি আছে জানিয়া লইয়া—একটা অত্যুচ্চ টেবিলের উপরে শয্যা করাইয়া দিলেন। শুইয়া পড়িলাম। ঘুমও হয় না, সময়ও কাটে না। কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম তাহা জানিতে পারি নাই। হঠাৎ ডাক শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিল। গাড়ীর সময় হইয়াছে। উঠিয়া মালপত্র গুছাইয়া লইয়া ঝাড়সুগুড়ার টিকেট করিলাম।

সন্ধ্যাবেলায় যে সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন তিনিও বাঙ্গালী। কিন্তু এখন যিনি ছিলেন তিনি বিহারী। তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া ও মাষ্টার বাবুদের আমার নমস্কার ও প্রীতি সম্ভাষণ জানাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। রাত্রি তখন আড়াইটা। ঝাড়সুগুড়াতে আর নামিলাম না—সম্বলপুর যাওয়া ক্ষান্ত দিলাম। বাকি রাত্রি ও পরদিন সারাদিন ট্রেনে কাটিল। বন জঙ্গল সুড়ঙ্গ (টানেল) প্রান্তর অতিক্রম করিয়া গাড়ী চলিল। এত বড় বড় এবং এতগুলি সুড়ঙ্গ আর কোন লাইনে আছে বলিয়া জানা নাই। সুড়ঙ্গের মধ্যে গাড়ী ঢুকিলে কি অন্ধকার! সুড়ঙ্গে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে—গাড়ীও খুব
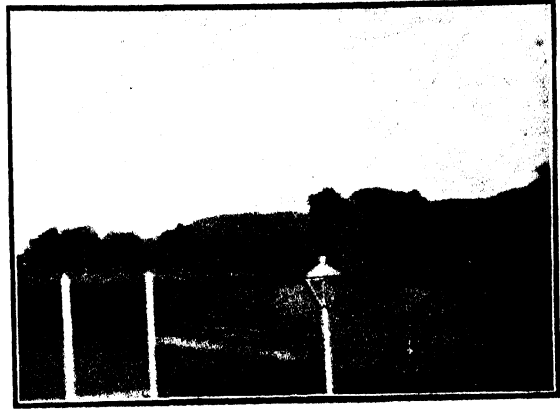
ষ্টেশন হইতে বেলপাহাড়ের দৃশ্য

চলে। পূর্ব্বে না কি সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রায়ই ট্রেন-ডাকাতি হইত—আততায়ীগণ সুড়ঙ্গ মধ্য হইতে চলন্ত গাড়ীতে উঠিয়া যাত্রীদিগের নিকট যাহা পাইত লইয়া পলাইয়া যাইত।

বনভূমি, প্রান্তর ও তথাকার অধিবাসীদের কথা, তাহাদের সরলতাপূর্ণ জীবন-কথা ও প্রাচীন ভারতের আরণ্য সভ্যতার কথা ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইলাম।

পথে কয়েকটা কমলালেবু ও কিছু ছোলা সিদ্ধ ছাড়া সারাদিন আর কিছু আহার হইল না। ১৬।১৭ ঘণ্টা একাদিক্রমে গাড়ীতে কাটাইয়া—রাত্রি সাড়ে সাতটায় হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিলাম।
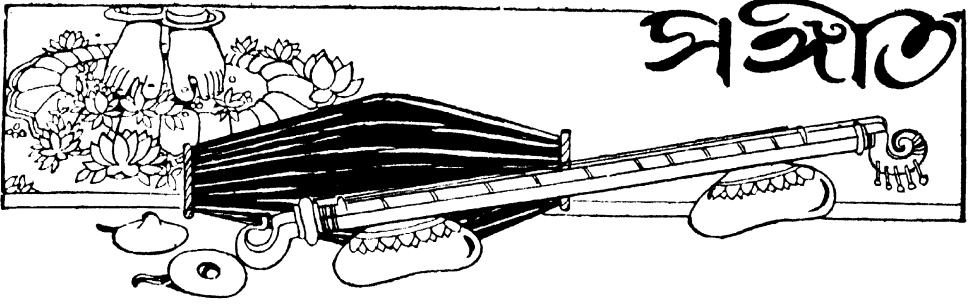
পাহাড়ী মিশ্র কাহারবা

অতীত স্মৃতির পথে গেছে চাহি সে।
মধুর মুখখানি আর হেরি নাহি রে ॥

অলস আবেশ গীতি
শুনেছি কত না নিতি
মিলন বিরহে আজো তাই গাহি রে ॥

বনের বিজন ছায়ে গাঁথিয়া মালিকাখানি
বিফলে কাটানু বেলা কেমনে বল না জানি ;

আশার সাগর তীরে
ভাসিয়ে নয়ন নীরে
(কভু) ভাসায়ে পারের ভেলা শুধু বাহিরে ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি— শ্রীহৃদয়রঞ্জন রায়

	+					°					+				
II	সগা	রগা	রা	সা	।	সনা	র্সা	পা	ধা	।	সা	-া	-া	-া	।
						°		°	°						
	অ	তী	ত	স্মৃ		তি	॰	র	প		থে	॰	॰	॰	

°					+					°				
সা	-া	সা	রা	।	মা	মা	মা	মা	।	গমা	পা	পা	পা	।
॰	॰	গে	ছে		চা	॰	॰	॰		হি	॰	॰	॰	

+					°					+				
গমা	গরা	সরা	সা	।	সা	সরগা	রা	-া	।	গা	গপা	গা	রা	।
সে	॰	॰	॰		ও	গো	॰	॰		অ	তী	ত	স্মৃ	

°   +   °

সনা সা পা ধা | সা সা -া -া | সা -া -া -া |

তি ০ র প   থে ০ ০ ০   ০ ০ ০ ০

+   °   +

সা ধা ধণা ধপা | মা পা মপধা ধপা | মা -া -া -া |

ম ধু র মু   খা ০ নি আ   র ০ ০ ০

°   +   °

মা -া সা রা | সরা মা -া -া | গমা পা -া -া |

০ ০ হে রি   না ০ ০ ০   হি ০ ০ ০

+   °   +

গমা গরা সরা সা | গা গপা গা রা | সনা সা পা ধা |

রে ০ ০ ০   অ তী ত স্মৃ   তি ০ র প

°   +

সা -া -া -া | সা -া -া -া II

থে ০ ০ ০   ০ ০ ০ ০

+   °   +

II ধা ধণধা পা মা | মা পা ধা মপর্সা | র্সা র্সা -র্া -র্া |

অ ল স আ   বে ০ ০ শ   গী তি ০ ০

আ শা র সা   গ ০ ০ র   তী রে ০ ০

°   +   °

র্সা -র্া র্সর্রা র্সা | র্সা -র্া -র্া -র্া | নর্সা ধনা দা ধা |

০ ০ ০ ০   শু নে ছি ক   ত ০ ০ না

০ ০ ০ ০   ভা সি য়ে ন   য় ০ ০ ন

+   °   +

ধর্সা ধা -া -া | পণা ধপা মা -া | ধা ধপা মা পা |

নি তি ০ ০   ০ ০ ০ ০   মি ল ন বি

নী রে ০ ০   ০ ০ ০ ০   ভা সা য়ে পা

	+				০				+				
	গ্মা	গরসা	রা	গা	রা	সা	-া	-া	সা	-া	-া	-া	
	র	০	হ	মা	ঝে	০	০	০	০	০	গা	ন	
	রে	০	র	ভে	লা	০	০	০	০	০		ধু	

	০				+				০				
	সরা	মা	-া	-া	গমা	পা	-া	-া	গমা	গরা	সরা	সা	II
	গা	০	০	০	হি	০	০	০	রে	০	০	০	
	বা	০	০	০	হি	০	০	০	রে	০	০	০	

	+				০				+				
II	সরা	রমা	মা	-া	মপমা	গমা	সা	রা	মা	-া	-া	-া	
	র	নে	র	বি	জ	০	ন	ছা	য়ে	০	০	০	

	০				০				১				
	মা	-া	-া	-া	মা	মধা	পধা	ধা	ধা	ধা	ধপা	ধা	
	০	০	০	০	গাঁ	থি	য়া	মা	লি	০	কা	খা	

	০				+				০				
	পধা	ধা	-া	-া	পণা	ধপা	মা	-া	মা	মপা	পা	পা	
	নি	০	০	০	০	০	০	০	বি	ফ	লে	কা	

	+				০				+				
	মপা	ধর্সা	ধা	ধা	ণা	ণধপা	মা	-া	মা	মধা	পমা	পা	
	টা	০	সু	বে	লা	০	০	০	কে	ম	নে	ব	

	০				+				০				
	গমা	গরসা	রা	গা	রা	সা	-া	-া	সা	-া	-া	-া	II
	ল	০	না	জা	নি	০	০	০	০	০	০	০	

"মহাপ্রস্থানের পথে"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আজকাল বসে বসে বই পড়ার মতো অবকাশও পাইনে, উদ্যমেরও অভাব—মনটা উড়ো পথে চলতে চায়, শরীরটা কর্ম্মবিমুখ। কিন্তু তোমার "মহাপ্রস্থানের পথে" বইখানি অনুরোধের দায়ে নয়, পড়ার গরজেই পড়েচি—কিছু তাতে কাজের ক্ষতিও ঘটেচে। এ বইয়ে তোমার দৃষ্টি, তোমার মন, তোমার ভাষা সমস্তই পথ-চলিয়ে, পাঠকের মনকে রাস্তায় বের করে' আনে। তোমার লেখা চলেছে শাস্ত্রিক পথ দিয়ে নয়, ভৌগোলিক পথ দিয়ে নয়, মানুষের পথ দিয়ে।

কত শতাব্দী ধরে দুঃসাধ্যসাধনরত মানুষের দুর্গম যাত্রার প্রয়াস নিরবচ্ছিন্ন বয়ে চলেছে—এই তীর্থযাত্রা তারই প্রতীক। কিছুদিন সেই টানে তুমি চলেছিলে। ঘরে ঘরে সকল মানুষই পূর্ব্বমানুষ পরম্পরার নিরবচ্ছিন্ন অনুবৃত্তি; ছড়িয়ে আছে বলে তার সূত্রটা ধরতে পারা যায় না কিন্তু ঐ সঙ্কীর্ণ গিরিপথে সঙ্কীর্ণ লক্ষ্যের আকর্ষণে এই চিরকালীন মানব প্রবাহের বেগটা সুপ্রত্যক্ষ। একই কামনা একই বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠতায় তারা সুদূর অতীত ও অনাগত যুগের সঙ্গে নিবিড় সংশ্লিষ্ট। এরা নানা প্রদেশের, নানা ঘরের, এরা বহু বিচিত্র অথচ এক—এদের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে সুখ ও দুঃখ, আশা ও আশঙ্কা, জীবন ও মৃত্যুর ঘাত সংঘাত,—এই যুগযুগান্তরপথের পথিক মানবচিত্ত আপন অশ্রান্ত ঔৎসুক্যের স্পর্শ সঞ্চার করেছে তোমার লেখায়—তার কৌতুক ও কৌতূহল পাঠককে স্থির থাকতে দেয় না।

তোমার ভ্রমণ বৃত্তান্তে যে সকল ঘটনা তুমি বিবৃত করেছ তার মধ্যে একটিতে তোমার স্বভাবকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এই তীর্থপথে তুমি যে লোকযাত্রায় যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছিলে তার মধ্যে শিক্ষিত, মূর্খ, সাধু অসাধু সকল রকম মানুষেরই সমাগম ছিল—মানুষকে এত কাছে এমন বিচিত্রভাবে স্বীকার করে নেওয়া কম কথা নয়। তবে কেন বেশ্যাকে বেশ্যা জানবামাত্র এক দৌড়ে দূরে চলে গেলে? কেন সাহিত্যিকের উপযোগী বৃহৎ নিরাসক্তির সঙ্গে নির্ব্বিকার কৌতূহলে তাকে দেখে নিলে না। যে সব নিষ্ঠাবতী বুড়ি তোমার ভক্তি ও আচারের শৈথিল্য দেখে তোমাকে মানুষ বলে আর গণ্যই করলে না তুমি কেমন করে নিজেকে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত করতে পারলে? এমন করুণা আছে যা পবিত্র, এমন কৌতূহল আছে যা সর্ব্বত্রই শুচি—সাহিত্যিক হয়ে তোমার ব্যবহারে কেন অশুচিতা প্রকাশ পেলে? তোমার বর্ণনা পড়ে স্পষ্টই বোধ হোলো অধিকাংশ ধার্ম্মিক যাত্রীর চেয়ে এই মেয়েটির মধ্যে স্নেহসিক্ত মানব-ধর্ম্ম পূর্ণতর ছিল, এ নিজে সকলের চেয়ে নীচে পড়ে গিয়েছে বলেই কোনো মানুষকেই অশ্রদ্ধা করতে পারেনি—যে মানুষ সকলের উপরে তারো এই স্বভাব। আমার এক এক সময় সন্দেহ হয় তুমি সব কথা স্পষ্ট করে লেখো নি, লিখ্‌লে তোমার ব্যবহারের কৈফিয়ৎ ঠিক মতো পাওয়া যেত।

আর একটি ছোট্ট কথা বল্‌ব। দেখ্‌লুম তুমি বাংলা খবরের কাগজের সূতিকাগারে সদ্যোজাত "কৃষ্টি" শব্দটা অসঙ্কোচে ব্যবহার করেচ। বাংলা ছাড়া আর কোনো প্রদেশে ভাষায় এমন কুশ্রী অপজনন ঘটেনি। অন্যত্র "সংস্কৃতি" শব্দটাই প্রচলিত—এটা ভদ্রসমাজের যোগ্য।

যাই হোক তোমার এ বইখানি নানা লোকের কাছেই সমাদর পেয়েছে, আমারও সাধুবাদ তার সঙ্গে যোগ করে দিলেম। ইতি ৫ নবেম্বর ১৯৩৩ *

---

* পত্রখানি শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যালকে লিখিত। 'মহাপ্রস্থানের পথে' বইখানি কিছুকাল পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়েছিল।—'ভারতবর্ষ' সম্পাদক।

ঘূর্ণি হাওয়া

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২১)

একা নন্দা চুপ করিয়া ত্রিতলের খোলা ছাদে বসিয়া ছিল।

আকাশে শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ একটুখানির জন্য ভাসিয়া উঠিয়া হাসিতেছে।

টবের উপর ফুলগাছগুলিতে ফুল ফুটিয়াছে, তাহার মৃদু গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। দ্বিতলে খাঁচায় বদ্ধ কোকিলটা চাঁদের আলো দেখিয়া মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছিল—কুহু কুহু।

নন্দা ভাবিতেছিল মানুষের ব্যবহারের কথা। মানুষ জাতিটাই অকৃতজ্ঞ, ইহারা উপকারীর উপকার পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে চাহে না।

দাসী আসিয়া জানাইল বাবু ডাকিতেছেন। বিরক্ত হইয়া উঠিয়া নন্দা তাহাকে তাড়াইয়া দিল।

ইহারই খানিক পরে অসমঞ্জ স্বয়ং ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দেখা গেল সে বেশ ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছে। আসিয়াই সে যখন নন্দার কপালে হাত দিল তখন নন্দা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও আবার কি, গায়ে হাত দিচ্ছ—কারণ?"

অসমঞ্জ উত্তর দিল,—"দেখছি অসুখ হয়েছে কি না?"

নন্দা তাহার হাতখানা সরাইয়া ফেলিয়া রাগ করিয়া বলিল, "থাক্; তুমি তো রোজই আমার জ্বর দেখছ। অমনি করে ডেকে ডেকেই না তুমি আমার জ্বর নিয়ে এসো।"

অসমঞ্জ একটু হাসিয়া বলিল, "তাই বটে; তোমার না কি মোটেই অসুখ হয় না নন্দা, তাই তুমি এ কথা বলছ। এ রকম কথা বলা বরং আমার মানায়, তোমায় মানায় না। তবু যদি রোজ মাথা ধরা, গা গরম না হতো,—"

নন্দা চুপ করিয়া আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল।

অসমঞ্জ বলিল, "শুনছো নন্দা, তোমার বিশুদার খবর পেলুম।"

নন্দা ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

অসমঞ্জ একটু হাসিয়া বলিল, "বেশই আছে, কোনও অসুখ বিশুখ নেই। শুনে আশ্চর্য্য হবে নন্দা, সে আর কোথাও নেই, এখানে—এই কলকাতাতেই আছে।"

বিশ্বপতি এখানে আছে অথচ নন্দাকে একটা সংবাদ দেয় নাই, তাহার সহিত একটীবার দেখা করে নাই, এ কথা কখনও বিশ্বাস হয়? নন্দা যখন তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া চোখের জলে ভাসিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিল, "পত্র দেবে তো বিশুদা,—একটা খবর দিয়ো কেমন আছ—" তখন সে জোর করিয়াই বলিয়াছিল, "দেব বই কি,—খবর নিশ্চয়ই দেব।"

অতখানি জোর দিয়া যে কথা বলে সে মানুষটা নিজেই কি মিথ্যা, অপদার্থ? মানুষ এমনও হইতে পারে?

তবু নন্দা জোর করিয়া বলিল, "বিশুদা এখানে আছে—খবর দেয় নি, এ কথা কার কাছে তুমি শুন্‌লে? এ কখনও হতে পারে—সে একেবারে—"

অসমঞ্জ বাধা দিল,—"হয় নন্দা, জগতে অসম্ভব কিছুই নেই; একদিন যা অসম্ভব থাকে কোনও এক সময় সেইটাই সম্ভব হয়ে যায়, এ কথা মানো তো? তোমার কৃত উপকার হয় তো তার মনে আছে, হয় তো মনে পড়ে তাকে তুমি কি রকম সেবা যত্ন দিয়ে বাঁচিয়েছ, তবু সে আসতে পারবে না,—আসার মত মুখ তার নেই। যে পবিত্রতা থাকলে মানুষ অবাধে সকলের সঙ্গে মিশতে পারে, সে পবিত্রতা তার নেই,—আগে হয় তো ছিল, এখন নষ্ট হয়ে গেছে। আমি কারও মুখে শুনে এ কথা বিশ্বাস করি নি, আজ নিজের চোখে তাকে দেখে আমার ভুল ভেঙ্গেছে। আজ পথে তার সঙ্গে আমার দেখা হল, সে খানিক আমার পানে চেয়ে থেকে ছুটে চলে গেল, আমি অবাক হয়ে কেবল তার পানে তাকিয়ে রইলুম।"

নন্দা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বুঝেছি, বিশুদা আবার নেশা করতে সুরু করেছে। যাক, সে কোথায় আছে সে খবরটা জানতে পেরেছ?"

অসমঞ্জ অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "সে সন্ধান না নিয়ে আমি আসি নি নন্দা। সেঁ যে জায়গায় আছে, সে জায়গায় ভদ্রলোকের ছেলে সজ্ঞানে যায় না।"

নন্দার মুখখানা কালো হইয়া গেল।

সেই রাত্রিটা সে মোটেই ঘুমাইতে পারিল না; ছোটবেলাকার স্মৃতিগুলা ছায়াচিত্রের মত তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

সেই বিশুদা,—তাহাকে কি স্নেহই না করিত, কত ভালোই না বাসিত। মনে পড়ে, একদিন পাড়ায় কোথায় কোন্ অকাজ করিয়া বিশুদা পলাইয়াছিল, দুদিন ফিরে নাই! নন্দা তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছিল। বিশুদা পলাইয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই, একদিন সন্ধ্যায় আসিয়া দেখা দিয়া গিয়াছিল।

এ সেই বিশুদা; এখানে—এত কাছে থাকিয়াও সে একটা সংবাদ দিল না, একবার দেখা করিল না।

মানুষের পরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক হইয়াও এত স্বাভাবিক হইয়া যায়, কয়েক মাস পূর্ব্বে যাহাকে দেখা যায়, প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য তাহারও মাঝে লক্ষিত হয়।

কিন্তু সেই বিশুদা—যে একদিন মাতালকে ঘৃণা করিত, চরিত্রহীনকে ঘৃণা করিত, আজ তাহাকে মাতাল করিল কে, চরিত্রহীন সাজাইল কে?

নন্দার চক্ষু দুইটী কতবার অশ্রু পূর্ণ হইয়া উঠিল। দুই হাতে আর্ত্ত বক্ষটাকে চাপিয়া ধরিয়া ভাষাহীন প্রার্থনা করিতে লাগিল—"ওকে ফিরাও প্রভু, ওকে ফিরাও; একটী মানুষের অমূল্য জীবন এমন ভাবে নষ্ট হতে দিয়ো না,—ওকে পথ দেখাও, ওকে আলো দেখাও।"

মধ্যরাত্রে অসমঞ্জের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

পার্শ্বে কে যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল,—"নন্দা—"

রুদ্ধ কণ্ঠে নন্দা উত্তর দিল, "কেন?"

স্ত্রীকে পার্শ্বে টানিয়া আনিয়া অসমঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি, এত রাত পর্য্যন্ত তুমি জেগে আছ, এখনও ঘুমোও নি?"

নন্দা উত্তর দিল না, স্বামীর বুকের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া সে নীরবে চোখের জল ফেলিল।

অসমঞ্জ অন্ধকারেই তাহার মুখের উপর হইতে চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "বুঝেছি, বিশুদার অধঃপতনের কথাই ভাবছ; তোমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু কেন নন্দা, সে তোমার এমন কেউ নিজের লোক নয় যার অধঃপতনে তোমার মনে আঘাত লাগবে। তুমি অত ভেঙ্গে পড়লে কেন নন্দা?"

রুদ্ধ কণ্ঠে নন্দা বলিল, "তোমায় এতদিন অনেক কথাই বলেছি, একটা কথা কেবল গোপন করে গেছি, সে জন্মে আমায় মাপ কর। বিশুদা আজ অধঃপাতের শেষ ধাপে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সে আজ মাতাল,—চরিত্রহীন,—তোমরা তাকে ঘৃণা করবে; কিন্তু যদি জানতে তার এই অধঃপতনের মূল কে, তা হলে তাকে ঘৃণা করতে পারতে না।"

সোৎসুকে অসমঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল, "কে নন্দা, কে তার অধঃপতনের মূল?"

"আমি—ওগো, সে আমি—"

নন্দা দুই হাতে অসমঞ্জের একখানা হাত নিজের মুখের উপর চাপিয়া ধরিল।

আকাশ হইতে পড়িয়া অসমঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি?"

উদ্ভাসিত চোখের জল কোনমতে চাপা দিয়া বিকৃত কণ্ঠে নন্দা বলিল, "হ্যাঁ, আমিই। তুমি জানো না, বিশুদা ছোটবেলা হতে আমায় খুব ভালোবাসত; আমার সঙ্গে তার বিয়ে হয় নি, সেইজন্মে সকলের 'পরে—বিশেষ করে আমার 'পরে রাগ করেই সে অধঃপাতের পথে গেছে, নিজেকে ধ্বংস করেছে।"

অসমঞ্জ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নন্দা নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল। তাহার মনে হইল, স্বামীর যে ভালোবাসা সে পাইয়াছিল, এই সময় হইতে তাহা সে হারাইয়া ফেলিল।

অসমঞ্জ পত্নীর মাথায় হাতখানা বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "তা হলে বুঝেছ নন্দা—তোমার জন্মেই সে

অধঃপাতে গেছে বলে তাকে সংশোধন করে ফিরাতে হবে তোমাকেই? তার স্ত্রীর সে ক্ষমতা নেই, কারণ তাকে কেবল স্ত্রী নামে পরিচিতা হওয়ার গৌরবটাই দেওয়া হয়েছে, স্বামীর 'পরে অধিকার তার এতটুকু নেই। আমি এতে মত দিচ্ছি নন্দা; কারণ, আমি তোমায় বিশ্বাস করি, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমার সেই বিশ্বাস, সেই ভালোবাসা তোমায় অটুট রেখে তাকে ফিরিয়ে আনবে তোমাকে দিয়ে।"

নন্দা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সত্যি তুমি আমায় বিশ্বাস কর?"

অসমঞ্জ গাঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ৷ করি, কেন না আমি তোমায় কেবল চোখে দেখে ভালোবাসি নি, মুগ্ধ হই নি; তোমায় আমি অন্তর দিয়ে পেয়েছি, তোমার অন্তরের পরিচয় পেয়েছি। তোমায় অবিশ্বাস? না নন্দা, সে দিন, সে সময় যেন না আসে, তোমায় যেন চিরদিন এমনই চোখে আমি দেখে যাই।"

নন্দার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া অসমঞ্জের হাতের উপর পড়িতে লাগিল।

অসমঞ্জ ডাকিল, "নন্দা—"

আর্দ্রকণ্ঠে নন্দা বলিল, "আমায় আশীর্ব্বাদ কর গো, যেন তোমার বিশ্বাস অটুট রেখে তোমার স্ত্রী হয়ে মাথার সিঁদুর নিয়ে মরতে পারি; মরার সময় যেন তোমায় সামনে দেখতে পাই।"

(২২)

মাস আট নয় বিশ্বপতির কোনও সংবাদ না পাইয়া সনাতন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

এই আত্মভোলা লোকটিকে সে যথার্থই স্নেহ করিত, ভালোবাসিত। কল্যাণী চলিয়া যাওয়ায় সনাতন বিশ্বপতির জন্যই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, এই লোকটাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে তাহাই সে ভাবিয়া পায় নাই। বিশ্বপতি সে আঘাত যখন হাসিমুখে সহিয়া গেল, তখন সত্যই সে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়া গেল। অনেক কিছু সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, চুপি চুপি দুই একটী মেয়ে দেখিয়া রাখিতেছিল, ভাবিয়াছিল—বিশ্বপতিকে সে আবার সংসারী করিবে। সংসারে থাকিতে গেলে এমন কত আঘাত মানুষকে সহিতে হয়; লোকে কি সে আঘাতের বেদনা ভুলিয়া গিয়া আবার নূতন করিয়া সংসার পাতে না? হয় সবই,—সন্তান মারা গেলে মা প্রথমে শোকে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেও আবার উঠে, আবার হাসে। অমন যে নিদারুণ সন্তান-শোক, তাহাও চাপা দিতে হয়।

কিন্তু তাহার সকল ইচ্ছা নিষ্ফল করিয়া বিশ্বপতি যখন নন্দার কাছে যাইতেছে বলিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল, তখন সনাতন নন্দার উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল।

হয় তো কল্যাণীকে লইয়া বিশ্বপতি সুখেই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত, যদি দীর্ঘ দিন পরে নন্দা আবার নূতন করিয়া মাঝখানে আসিয়া না দাঁড়াইত। সে আকর্ষণ করিল বলিয়াই বিশ্বপতি গৃহের মায়া উপেক্ষা করিয়া দূরে চলিয়া গেল, হতভাগিনী কল্যাণী গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় গেল কে জানে! বিশ্বপতির গৃহ শ্মশান হইল, কল্যাণীর বড় সাধের সাজানো সংসার ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। বিশ্বপতিকে সুখী করিবার জন্য সনাতন আবার যে আয়োজন করিতেছে, নন্দা সে চেষ্টাও ব্যর্থ করিয়া দিয়া বিশ্বপতিকে কাছে ডাকিয়া লইল।

দিনের পর দিনগুলা কাটিয়া যাইতে লাগিল, বিশ্বপতি ফিরিল না, একখানা পত্রও দিল না। সনাতন নন্দার উপর আক্রোশ লইয়া ফুলিতে লাগিল।

বাকি খাজনার দায়ে যেদিন জমীদারের গোমস্তা আসিয়া যা না তাই বলিয়া অপমান করিয়া গেল, সেই দিনই ঘরের দরজায় ডবল তালা ঝুলাইয়া দিয়া সনাতন একেবারে সোজা ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইল এবং কলিকাতার টিকিট কিনিয়া ট্রেন আসিবামাত্র সকলের আগে ট্রেনে উঠিয়া বসিল।

কলিকাতায় নন্দার বাড়ী গিয়া সে নন্দাকে বেশ দশ কথা শুনাইয়া দিবে। তাহাতেও যদি সে বিশ্বপতিকে মুক্তি না দেয়, সনাতন নন্দার স্বামীকে সব কথা বলিয়া দিবে এই তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

বেচারা অসমঞ্জের জন্য তাহার কষ্ট হইতেছিল বড় কম নয়। তাহাকে সনাতন একবার মাত্র দেখিয়াছিল। আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিয়াছিল—নন্দার এমন স্বামীকেও সে

ভালোবাসিতে পারে নাই,—এখনও সে বিশ্বপতিকে ভালোবাসে কি করিয়া? অসমঞ্জের মত সুপুরুষ, মহৎ হৃদয় লোক খুব কমই দেখা যায়। নন্দার অদৃষ্টক্রমেই সে এমন স্বামী পাইয়াছে। শিক্ষায়, চরিত্রে, আকৃতিতে, সম্পদে অসমঞ্জ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এমন কথা বলাও তো অত্যুক্তি নয়। নন্দা এমন স্বামীর স্ত্রী হইয়া আজও তাহাকে ছলনা করে, ইহাই বড় আশ্চর্য্যের কথা।

অসমঞ্জ বেচারা কিছুই জানে না। তাহার স্ত্রী পরপুরুষের চিন্তায় আপনহারা, সে বেচারা নিজের সমস্ত ভালোবাসা সেই স্ত্রীকেই উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া যাইতেছে। স্বপ্নেও তাহার মনে কোন দিন জাগে নাই—তাহার স্ত্রীকে যাহা সে ভাবে, সে তাহা নয়। কল্যাণীকে সকলে আজ ঘৃণা করে, তাহার নাম মুখে আনিতে যে কোনও মেয়ে মুখ বিকৃত করে, তাহার কথা কেহ শুনিতে চাহে না, কিন্তু সে যে অতৃপ্ত বাসনা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গেছে, নন্দার অন্তরের অন্তরালে তাহাই নাই কি? আজ নন্দা সতী সাবিত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা থাকিয়া লোকের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতেছে কি করিয়া? সনাতন তাহার উপরের আবরণ ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া জগৎকে দেখাইবে—আজ ভাগ্যদোষে কল্যাণী যেখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, নন্দার স্থানও সেইখানে,—পূজা পাইবার যথার্থ অধিকারিণী সে নয়।

সমস্ত পথটা সে ভাবিতে ভাবিতে চলিল, যদিই সে বিশ্বপতিকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতে না পারে, তাহা হইলে অসমঞ্জকে এসব কথা বলা উচিত কি না। এ সংবাদ শুনিলে অসমঞ্জের মনের সুখশান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যাইবে, হয় তো আঘাত সহিতে না পারিয়া সে আত্মহত্যা করিবে, নয় তো পাগল হইয়া যাইবে। সেইটাই কি ভালো হইবে? একজনকে রক্ষা করিতে গিয়া আর একজনকে হত্যা করার মহাপাপ কি সনাতনকে অর্শিবে না?

ট্রেণ যখন শিয়ালদহে আসিয়া পৌছিল তখনও সে কর্ত্তব্য ঠিক করিতে পারে নাই।

পথে চলিতে চলিতে সে একরকম কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইল। অসমঞ্জকে কোন কথা বলিয়া এখন লাভ নাই, নন্দাকে সতর্ক করিয়া দিলেই চলিবে।

নন্দার বাড়ীর সামনে যখন সে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন অসমঞ্জ কোথায় যাইবে বলিয়া বাহির হইতেছিল, মোটরখানা বাড়ীর সামনে প্রস্তুত হইয়া ছিল।

সনাতন নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, সসম্ভ্রমে একটা নমস্কারও করিল।

বৃদ্ধ লোকটীর পানে তাকাইয়া অসমঞ্জ মনে করিতে পারিল না ইহাকে কোথায় দেখিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা হতে আসা হচ্ছে?"

সনাতন কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল, "আমি নন্দা দিদিমণির দেশের লোক, তাঁর কাছেই এসেছি।"

অসমঞ্জ নিকটস্থ ভৃত্যকে আদেশ করিল, "একে বউদিদিমণির কাছে নিয়ে যাও, তাঁকে বলে দাও গিয়ে এ তাঁর বাপের বাড়ী হতে এসেছে।"

সে গাড়ীতে চলিয়া গেল, ভৃত্য সনাতনকে ঘরের মধ্যে বসাইয়া নন্দাকে সংবাদ দিতে গেল।

ধনীর গৃহসজ্জা দেখিয়া দরিদ্র সনাতন আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইয়া রহিল। এত নূতন ও আশ্চর্য্য জিনিস সে কখনও চোখে দেখে নাই। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনেই সে বলিল, "দাঠাকুরকে সহজে এখান হতে নিয়ে যাওয়া যাবে না তা বেশই বোঝা যাচ্ছে।"

নন্দা পর্দ্দার পাশে ভিতর দিকে আসিয়া দাঁড়াইল, একবার উঁকি দিয়া দেখিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "ওমা, তুমি সোনা দা? আমি ভাবছি দেশ হতে খবর না দিয়ে এমন অসময়ে কে এল? এখানে বসলে কেন,—ভেতরে এসো।"

সনাতন মলিন হাসিয়া উঠিল।

দ্বিতলে নিজের ঘরে নন্দা তাহাকে বসাইল।

তার পর,—"হঠাৎ যে সোনাদা, কি মনে করে? তুমি যে কলকাতায় আসবে তা যেন একেবারে স্বপ্নেরও অগোচর। দেশের সব ভালো? মুখুয্যেদের বাড়ী, শিরোমণি মশাইরা, জগৎ পিসী, তার ছেলে বউ—"

সনাতন ঈষৎ হাসিয়া জানাইল সব ভালো,—কারও কোনও অসুখ নেই।

নন্দা উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এবার বর্ষায় খুব জল হয়েছে—সেই সেবারকার মত? পুকুর, খানা, নদী, বিল সব জলে ডুবে গেছে,—পাড় ছাপিয়ে পথে

ঘাটে জল এসেছে? আচ্ছা সোনাদা, রায়েদের বাগানে সেবারকার মত এক বুক জল দাঁড়িয়েছে,—ছেলে মেয়েরা কাগজের নৌকো গড়ে, মোচার খোলার নৌকো করে তাতে ভাসায়? শুনছি না কি এবার ধান জন্মায় নি,—সব দেশে এবার না কি দুর্ভিক্ষ হবে? ওখানে ধান কি রকম হয়েছে সোনাদা?"

সনাতন বলিল, "দুর্ভিক্ষের কথা কি করে বলব দিদিমণি? আমাদের গাঁয়ে এবার তো বেশ ধানই হয়েছে; জল যেমন প্রতি বছর হয় তেমনই হয়েছে,—খুব বেশীও নয়, খুব কমও নয়—পরিমাণমত।"

আরও কত কি জিজ্ঞাসা করার মত কথা আছে, কিন্তু সনাতনের শুষ্ক মুখের পানে তাকাইয়া তাহার আহারের কথা মনে করিয়া নন্দা উঠিয়া পড়িল—"ওমা, তোমার খাওয়ার কথা একেবারেই ভুলে গেছি সোনাদা, আজ সারা দিন বোধ হয় তোমার খাওয়া হয় নি। একটু বোস, আমি বামুন ঠাকরুণকে তোমার খাওয়ার কথা বলে আসি।"

সনাতন বলিল, "আমি খেয়ে এসেছি,—আমার খাওয়ার জন্তে তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। ভোরে উঠেই ভাতে-ভাত রেঁধে খেয়েছি।"

কিন্তু নন্দা কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িল না। সনাতনকে হাত পা ধুইয়া জলখাবার খাইতে হইল।

নন্দা গল্প করিতে বসিল। সে গল্প তাহার গ্রামের সম্বন্ধে! কিন্তু আশ্চর্য্য—সকলের কথাই সে জিজ্ঞাসা করিল, বিশ্বপতি বা কল্যাণীর নাম সে মুখেও আনিল না।

অনেক কথাবার্ত্তার মধ্যে সনাতন জিজ্ঞাসা করিল, "দাঠাকুর কোথায় দিদিমণি, তাঁকে দেখতে পাচ্ছি নে। ওঁর কাছে বিশেষ দরকার বলেই এসেছি, আবার সন্ধ্যার ট্রেনে আজই আমায় ফিরে যেতে হবে।"

নন্দা শুষ্ক মুখে উত্তর দিল, "বিশুদা তো এখানে নেই সোনাদা।"

সনাতন বিশ্বাস করিল না, একটু হাসিয়া বলিল, "আমাকে কেন আর মিছে কথা বলে ভুলাচ্ছ দিদিমণি? আজ আট নয় মাস হল দাঠাকুর তোমার বাড়ী আসবে বলে এসেছে। তার পর এতগুলো যে পত্র দিলুম—একখানার উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না। মানুষটার আক্কেল দেখ একবার,—পেছন ফিরলে আর যদি একটা কথা মনে থাকে। আমি যক্ষের মত তার বাড়ী-ঘর আগলে নিয়ে বসে আছি,—একটা দিন আমার বাড়ী ফেলে নড়বার যো নেই,—যেন আমারই সব দায়। তুমিই বল দিদিমণি,—বুড়ো বয়সে লোকে কত তীর্থধর্ম্ম করে,—আমার সে তীর্থধর্ম্ম করা চুলোয় যাক, একদিনের জন্তে বাড়ী হতে বার হওয়া চলে না,—এ রকম করলে চলে কি করে? একটা মাত্র মেয়ে প্রায়ই খবর দিয়ে পাঠাচ্ছে—যেন তার কাছে গিয়ে শেষ জীবনটা একটু আরামে কাটাই। সত্যি কথা বল দিদিমণি,—চোখের দৃষ্টি গেছে, গায়ের শক্তি গেছে, এখন নাতি নাতনী, মেয়ে জামাই সব থাকতে কে আর খেটে খেতে চায়? ওই যে একটা কথা আছে—পরের বন্ধনে বন্ধন, আমার হয়েছে ঠিক তাই। পরের বাড়ী-ঘর জিনিসপত্র নিয়ে এমন জড়িয়ে পড়েছি, এক দণ্ড যদি হাঁফ ফেলবার অবকাশ থাকে। কেন বাপু, তোমার জিনিস বাড়ী তুমি গিয়ে দখল কর, আমি চলে যাই, আমি কেন জড়িয়ে থাকি?"

ক্ষীণকণ্ঠে নন্দা বলিল, "সে কথা ঠিক। কিন্তু বিশুদার দস্তুরই যে তাই সোনাদা। এই দেখ না, এই কিছু দিন আগে পুরীতে সেবারে কি ব্যারামটাই না হল। অত সেবা-যত্ন করে বাঁচিয়ে তুলে দেশে পাঠালুম। মানুষ কি না একখানা পত্র পর্য্যন্ত না দিয়ে কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে রইল। ভেবে মরি। তার পর এই সেদিন মাত্র ওঁর মুখে বিশুদার খবর পেলুম যে সে না কি এখানেই আছে, কিন্তু সে এমন জায়গায় আছে যেখানে সহজে কেউ যেতে পারবে না।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া সনাতন জিজ্ঞাসা করিল "তা হলে সত্যিই বিশুদা এখানে নেই?"

নন্দা জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "আমি কি মিছে কথা বলছি সোনাদা? এখানে থাকলে তুমি যে এতক্ষণ এসেছ নিশ্চয়ই দেখতে পেতে,—সে কোথায় লুকিয়ে থাকতো?"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে আবার বলিল, "যার যা স্বভাব তা কি কিছুতেই যায় সোনাদা? যে স্বেচ্ছায় পিছল পথে একবার পা দিয়েছে,

সে পিছলে যাবেই,—তার চলার গতি রোধ করবে কে, তাকে বাধা দিতে শক্তি কার? বিশুদাকে ঠেকান তোমার, আমার বা বউদির কাজ নয়। ও যখন জেনে-শুনে ধ্বংসের পথে চলেছে তখন ওকে বাঁচানো আমাদের সাধ্যাতীত।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সনাতন বলিল, "বুঝেছি দিদিমণি, আর বলতে হবে না। দাদাঠাকুরের এমনি অধঃপতন হয়, তবু আবার সে ঘরে ফিরত কেবল মা লক্ষ্মীর টানে। কিন্তু সে বাঁধন কেটে গেছে বলেই সে আর কোন দিন ঘরের পানে ফিরবে না। সে যাক্— কিন্তু আমিই বা আর কত দিন যখের মত ওই বাড়ী-ঘর আগলে বসে থাকব বল দেখি?"

বিস্মিতা নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরের বাঁধন কেটে গেছে—মানে?"

সনাতন শুষ্ক হাসিল মাত্র।

ইহার পর সে যখন কল্যাণীর গৃহত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করিল, তখন নন্দা একেবারে স্তম্ভিতা হইয়া গেল।

না, বিশুদাকে অধঃপাতে যাইবার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। এরূপ আঘাত পাইলে মানুষ আত্মহত্যা করে, বেদনা ভুলিবার জন্য যে কোন দিকে চলিয়া যায়, যে কোনও প্রলেপ দিতে চায়। বিশ্বপতি পাগল হয় নাই, আত্মহত্যা করে নাই, মদ খাইয়া জ্বালা জুড়াইতে চায়।

মনে পড়িয়া গেল কল্যাণীর সেই বিবর্ণ মুখখানা। দুই হাতে দরজাটা চাপিয়া ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার নয়নে সে কি দৃষ্টি, তাহার মুখে সে কি ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল! স্বামীর পার্শ্বে নন্দাকে দেখিয়া সে কি ভাবিয়াছিল,—তাহার অন্তরে কতখানি গ্লানি, কতখানি ঈর্ষা জাগিয়াছিল?

সে ভুল করিয়াছে,—সে নন্দাকে চিনে নাই। নন্দার মধ্যে যে সত্যকার স্ত্রী জাগিয়া আছে তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

এই সামান্য ভুলের বশে সে যে কাজ করিয়াছে তাহা যে অসীম, অনন্ত! ইহার তো শেষ নাই; সুতরাং সংশোধনও করা যাইবে না। তাহার সারা জীবনটা কলঙ্ক-কালিমা-মণ্ডিত থাকিয়াই যাইবে,—এ কলঙ্ক হইতে মুক্তি পাইবার পথ নাই, উপায় নাই।

হায় হতভাগিনি! করিলে কি? নিজের সর্ব্বস্ব নষ্ট করিলে, স্বামীর সর্ব্বস্ব নষ্ট করিলে, নন্দারও সুখশান্তি সব ঘুচাইলে!

অনেক অনুরোধেও সনাতন নন্দার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিল না; বলিল, "কি করে থাকব দিদিমণি, দাঠাকুরের জিনিসপত্র সব আমার জিম্মায় রয়েছে। যদি কোন রকমে এতটুকু নষ্ট হয়ে যায় আমি যে ধর্ম্মে পতিত হব। কোন্ দিন নিজের ঘরের কথা তার মনে পড়বে, সেদিনে সে ফিরে যখন দেখবে ঘর তার নষ্ট হয়ে গেছে—যেখানে যে জিনিসটী ফেলে গেছল সেখানে তা নেই, সেদিন আমায় কি বলবে, ভাবো দিদিমণি?"

এই অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকটীর মনের মহান ভাব দেখিয়া নন্দার চোখে জল আসিল।

রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "তুমি যাও সোনাদা। আমি শেষ একবার চেষ্টা করে দেখব যদি কোন রকমে বিশুদাকে ঘরে পাঠাতে পারি,—যদি তাকে আবার সংসারী করতে পারি। এ রকম ব্যাপার প্রায়ই তো ঘটে সোনাদা, মানুষ সামান্য ভুলে ভয়ানক সর্ব্বনাশও করে ফেলে। তা বলে সবাই তো ঘর ছেড়ে উদাস হয়ে বার হয় না,—ঘরের মানুষ ঘরেই থাকে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও বিশুদাকে আমি ঘরে ফিরাব। যত দিন সে দিন না আসে, তুমি তার ঘরখানা, তার দলিলপত্রগুলো দেখো।"

সনাতন বিদায় লইল।

(২৩)

মাত্র দুই দিনের জন্য যে অতিথিকে চন্দ্রা বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া স্থান দিয়াছিল, সে যে চিরকালের মতই আসন পাতিয়া বসিয়া পড়িবে তাহা চন্দ্রা ভাবে নাই।

চন্দ্রা চায় না বিশ্বপতি এখানে থাকিয়া এমনই ঘৃণিত ভাবে জীবন যাপন করে। যে যাহাকে ভালোবাসে সে তাহাকে নীচু দেখিতে চায় না। সে চায়—তাহার ভালোবাসার পাত্র উপরে থাক—আরও উপরে উঠুক।

চন্দ্রা বিশ্বপতিকে বাড়ী যাইবার জন্য যতই পীড়াপীড়ি করে, বিশ্বপতি ততই তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরে।

সেদিনে খুব রাগ করিয়াই চন্দ্রা বলিল, "তুমি বাড়ী যাবে কি না বল দেখি?"

বিশ্বপতি উত্তর দিল না, কেবল মাথা নাড়িল।

চন্দ্রা দৃপ্ত হইয়া বলিল, "ও-কথা বললে চলছে না। তোমার বাড়ী-ঘর সব গেল, আর তুমি এখানে দিব্যি শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছ। বাড়ী যাবে না, আমি কি তোমায় চিরকাল এখানে রাখব ?"

বিশ্বপতি বলিল, "বাড়ী-ঘর আমার কিছুই নেই চন্দ্রা।"

ঝাঁজের সঙ্গেই চন্দ্রা বলিল, "না, তোমার কিছু নেই, তুমি একেবারে পথের ভিখারী! তোমার মতলবটা কি বল দেখি? তুমি কি চিরকালের জন্মে এখানেই থাকতে চাও ?"

বিশ্বপতি হাসিল,—"থাকলামই বা, তাতে তো তোমার অসুবিধে নেই চন্দ্রা!"

চন্দ্রা এই আশ্চর্য্য-প্রকৃতি লোকটীর পানে খানিক তাকাইয়া রহিল। তাহার পর নরম সুরে বলিল, "আমার ক্ষতি অসুবিধা হোক বা না হোক, তোমার যে যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে, এ কথা তো অস্বীকার করতে পারবে না। আগে মনের মধ্যে যেটুকু সৎপ্রবৃত্তি ছিল, এখন তাও গেছে। আমার বাড়ীতে দিনরাত রয়েছ, লোকে জানতে পারলে মুখে যে চূণকালি দেবে, সে ভয়টুকু পর্য্যন্ত নেই। তোমায় কেউ দেখে আজ ভদ্রলোকের ছেলে বলতে পারবে কি? যেমন আকৃতি—প্রকৃতিও ঠিক তারই মত হচ্ছে যে।"

বিশ্বপতি প্রচুর হাসিতে লাগিল। তাহার হাসিতে বিরক্ত হইয়া চন্দ্রা বলিল, "নাও, হয়েছে, হাসি থামাও। সব তাইতে ওই যে হাসি, ও আমি দেখতে পারি নে। কি যে হয়েছে তোমার—মনুষ্যত্ব-জ্ঞান এতটুকু নেই। সেদিনে সেই ড্রাইভারটার সঙ্গে কি সব কথাবার্ত্তা বলতে সুরু করলে বল দেখি,—লজ্জায় তখন আমার মাথা যেন কাটা গেল।"

হাসি থামাইয়া বিশ্বপতি বলিল, "তখন সেটা না বুঝলেও পরে আমিও তা বুঝেছিলুম চন্দ্রা। কিন্তু জানোই তো—মাতালের হিতাহিত বোধ থাকে না। একটা কথা চন্দ্রা, তুমিই বা ওর কাছে ভদ্রলোকের ছেলে বলে আমার পরিচয় দিতে গেলে কেন, বললেই হতো তোমার বাড়ীর চাকর বা বাজার সরকার ?"

চন্দ্রা মুখ ভার করিয়া রহিল।

বিশ্বপতি বলিল, "সেজন্মে যে আমার মনে এতটুকু কষ্ট হতো—তা নয়। কেন না, জানই তো, আত্মসম্মান-বোধ আমার মোটেই নেই,—ওসব বালাইয়ের ধার আমি ধারি নে। হ্যাঁ, যেদিন পথে এখানে আমায় প্রথম দেখলে, সেদিনও একটু ছিল—যার জন্মে আমি আসতে চাইনি। কিন্তু তুমি আমায় জোর করে সেদিনে ধরে নিয়ে এলে। সেদিনে আমার মনে এতটুকু জ্ঞান ছিল—আমি ভদ্রসন্তান,—আমার সমাজ আছে, ধর্ম্ম আছে,—আমায় লোকের কাছে মুখ দেখাতে হবে। কিন্তু আজ সে জ্ঞান চাপা পড়ে গেছে চন্দ্রা,—আজ আমি পশুরও অধম হয়েছি। আজ আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয় সমুদ্রের বুকে বিছানা পেতেছি, ঢেউ আসছে—আসুক, আমায় তো ডুবাতে পারবে না।"

চন্দ্রা অন্যমনস্ক ভাবে জানালা-পথে বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল, খানিক নীরবে থাকিয়া মুখ ফিরাইল। দুইটী চোখের দৃষ্টি বিশ্বপতির মুখের উপর রাখিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমি যদি জানতুম তুমি পিছল পথের সন্ধানেই আছ, তা হলে তোমায় কখনই সেদিন ডেকে নিতুম না। যে ভুল করেছি, তার জন্মে নিজেই অনুতাপ করছি, কাউকেই সেজন্মে দোষ দিচ্ছিনে—দেবও না। কিন্তু একটা কথা বল দেখি, তোমার মত অনেকেই তো অধঃপাতে যায়, তারা কি আর সৎ হয় না, আর কি ঘরে ফেরে না ?"

বিশ্বপতি হাসিল, বলিল, "যাবে না কেন? আমিও যেতুম, যদি আমার কেউ থাকত,—আমার ঘর জ্বালাপ্রদ না হয়ে শান্তিপ্রদ হতো। আমি কোথায় ফিরে যাব? ঘর আমার কাছে শ্মশান হয়ে গেছে,—ঘরের দিক হতে কোন ডাকই আর আমার কাণে আসে না। আজ ভাবি চন্দ্রা, যদি কেউ থাকত— ; আমার মুখের পানে তাকাতে, আমার ব্যথায় সান্ত্বনা দিতে, আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে যদি আমার মা কিম্বা একটা বোনও থাকত চন্দ্রা—"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, আত্মগোপনের জন্যই সে তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া চন্দ্রার

পানে তাকাইল, বলিল, "আমার যে কেউ নেই তা তো জানোই। সেবার পুরী গিয়েছিলুম, মাত্র তিন মাস ছিলুম —সেও কেবল ব্যারামের জন্যে। ব্যারাম যদি না হতো, অনেক আগেই বাড়ী ফিরতুম। তুমি কি মনে কর—এই তিন মাসের মধ্যে বাড়ীর কথা আমার মনে পড়ে নি, আমি বাড়ী ফিরতে চাই নি? না চন্দ্রা, তা যদি মনে করে থাকো—জেনো সে ভুল ধারণা, কেন না, আমি অহোরাত্র বাড়ীর কথাই ভাবতুম—সে কি শুধু বাড়ীর জন্যেই? সে বাড়ী তো আজও আছে, তবে আজ কেন আমি তার আকর্ষণ অনুভব করছি নে? তার কারণ, তখন যে ছিল সে আজ নেই,—তখন যে কর্ত্তব্যপালনের উৎসাহ ছিল আজ তা নেই। আমি সব হারিয়েছি, আমার সব ফুরিয়ে গেছে।"

চন্দ্রা পলকহীন নেত্রে বিশ্বপতির পানে তাকাইয়া রহিল, আস্তে আস্তে বলিল, "তবে যে একদিন বলেছিলে বউদিকে তুমি ভালোবাস না?"

বিশ্বপতি একটু হাসিল,—"কর্ত্তব্যপালনের মধ্যেও নিষ্ঠা থাকে চন্দ্রা,—নিষ্ঠাটাই অজ্ঞাতে হয় তো এতটুকু ভালোবাসা গায়ে মেখে নেয়। তাকে হয় তো ভালবাসতুম—কিন্তু অন্তরে তাকে নিতে পারি নি।"

চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "যদি জিজ্ঞাসা করি কিসে সে তোমার অনুপযুক্তা হয়েছিল,—তার তো রূপ গুণ কিছুরই অপ্রতুল ছিল না, তবু কেন তাকে অন্তরে স্থান দিতে পার নি,—সেটা কি খুব অন্যায় হবে?"

বিশ্বপতি ধীরে ধীরে মাথা দুলাইল—"অন্যায় কিছুমাত্র নয় চন্দ্রা, যে এ কথা শোনে সেই জিজ্ঞাসা করে—কেন আমি তাকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসতে পারি নি। আমি এ সব বিষয়ে দিলখোলা লোক, কোন দিন কিছু গোপন করি নি—করবও না।"

বলিতে বলিতে সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখনই সে হাসি থামাইয়া বলিল, "দেখছ, কি রকম বেহায়া,—যে হাসির জন্যে এইমাত্র কত অপমান করলে, আবার—"

মর্ম্মপীড়িতা চন্দ্রা বাধা দিয়া বলিল, "কই, কখন তোমায় হাসির জন্যে অপমান করলুম?"

বিশ্বপতি বলিল, "মেয়েদের ওই বড় দোষ,—এইমাত্র যে কথা বললে—তখনই সেটা ভুলে যায়। শোন—পণ্ডিত চাণক্য কি বলেছেন মেয়েদের সম্বন্ধে—"

চন্দ্রা রাগ করিয়া বলিল, "চাণক্যের কথা তুমিই বোঝ, আমার বুঝবার দরকার নেই, শুনতেও চাই নে।"

বিশ্বপতি বলিল, "যাক, চাণক্য বেচারাকে না হয় নিষ্কৃতি দিলুম,—উলুবনে মুক্তো ছড়িয়ে যে কোন লাভ হবে না,—শেষে খুঁজে তুলতে প্রাণান্ত হবে, তা বেশ জানি। হ্যাঁ, রাঙাবউয়ের কথা বলছিলে তো? দেখেছিলে তো, সে কি রকম সুন্দরী ছিল?"

চন্দ্রা কেবলমাত্র মাথাটা কাত করিল।

বিশ্বপতি বলিল, "অমন রূপ গুণ কি আমার মত লোকের কুঁড়ে ঘরে মানায়? এ যেন বানরের গলায় মুক্তার মালা পড়েছিল,—বানরে তার কোনও মর্য্যাদা বুঝলে না—রাখলেও না। তার যা ছিল, তাতে তাকে মানাত রাজার ঘরে। আমি তাকে স্ত্রীর সম্মানটুকু পর্য্যন্ত দিতে পারি নি। কেন দিতে পারি নি সে কথা—"

সে থামিয়া গিয়া চন্দ্রার বিবর্ণ মুখখানার পানে তাকাইল।

বহুদিনকার পুরাতন একটা জনশ্রুতি চন্দ্রার মনে পড়িয়া গিয়াছিল; নন্দা—বিশ্বপতি—কল্যাণী, আরও কত কি।

চন্দ্রা অন্যমনস্ক ভাবে তাহাই ভাবিতেছিল। হঠাৎ বিশ্বপতির কথা থামিয়া যাইতেই, সে সচকিত হইয়া মুখ তুলিতে দেখিতে পাইল, সে তাহারই মুখের উপর নীরবে দুইটী চোখের দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়াছে।

চন্দ্রা বড় অস্বস্তি বোধ করিল। একটু নড়িয়া সরিয়া বসিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "তার পর—"

বিশ্বপতি জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের তার পর? তুমি বড় অন্যমনা হয়ে পড়েছ চন্দ্রা—"

চন্দ্রা জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিল, বলিল, "সত্যিই তাই, একটা কথা ভাবছিলুম।"

"বুঝেছি—আচ্ছা, একটু পরে কথা হবে এখন।" শ্রান্তভাবে বিশ্বপতি শুইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

'পড়া' কি ?

শ্রীভবনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, এম-এড্ (লীড্স্)

ও

শ্রীজগৎমোহন সেন বি-এস্‌সি, বি-এড্

খোকাখুকুদের প্রথম পড়তে শেখানোর জন্য এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি বই বাজারে বেরিয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেই এ কাজে হাত দিয়েছেন। "বর্ণ-পরিচয়ের" সনাতনী রীতি নিয়ে যখন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই কতকটা বিব্রত, সেই সময়ে "হাসিখুসী" দেখা দিয়েছিল তার শিশুলোভন ছড়া ও ছবি নিয়ে। বাংলা ভাষায় সম্ভবতঃ ঐ বইখানিই প্রথম শিশুমনস্তত্ত্বকে কাজে লাগিয়েছে। তার পর থেকে এ পর্য্যন্ত যত বই আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের সবগুলিই "হাসিখুসীর" ধরণে লেখা। এমন হ'তে পারে যে হাসিখুসী আশানুরূপ ফল দিতে পারে নি, তাই অন্য বইয়ের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করছি, কিন্তু হাসিখুসীই এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক। পরবর্ত্তী সব বইই হাসিখুসীর অনুবর্ত্তী,—সম্ভবতঃ উন্নততর সংস্করণ।

এই জাতীয় সব ক'খানি বই মূলতঃ বর্ণমালার ধারা অনুসরণ করে লেখা; এদের উদ্দেশ্য প্রথমে পাঠার্থীকে বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত করে পড়বার মূল সূত্রটুকু ধরিয়ে দেওয়া। বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয়ে সাহায্য করবার জন্য ছড়া এবং ছবির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে; এই জন্য নেওয়া হয়েছে যে বর্ণমালার স্বতন্ত্র অক্ষরগুলি শিশুর কাছে অর্থহীন। এ কথা বোঝা শক্ত নয়। বর্ণমালার, বিশেষতঃ আমাদের বর্ণমালার সুসমঞ্জস এবং সুন্দর শৃঙ্খলার মোহ কিন্তু এই জাতীয় সকল গ্রন্থকারকে অল্পবিস্তর অভিভূত করেছে বলে মনে হয়। তাই সকলেরই লক্ষ্য অক্ষর পরিচয়ের দিকে। এর ফলে শিশুর সম্বন্ধে বিচার্য্য অন্য অনেক কিছুই অবহেলিত হয়েছে। কথাটা একটু গোড়ার দিক থেকে বিচার করা যাক্,—বোঝবার সুবিধা হবে।

Dr. Hall এর Culture Epoch বা Recapitulation Theoryর বিশেষ পরিচয় দেওয়ার দরকার নেই। শিশুর জীবনে যে মানুষের অতীত ইতিহাসের পুনরভিনয় হয় তার প্রমাণ অনেক। যদি Dr. Hallএর সিদ্ধান্তকে সত্য বলে গ্রহণ করি, তবে দেখব যে বর্ণপরিচয়ের ব্যাপারটাতে আমরা শিশুর বৃত্তিবিকাশের স্বাভাবিক ধারার প্রতিকূলে চলেছি।

মানুষ প্রথমে বর্ণমালার সৃষ্টি করে তার পর লিখতে পড়তে শেখে নি। লিখতে এবং পড়তে শিখেই বর্ণমালার সৃষ্টি করেছিল। তার চেয়েও আগে মানুষের মুখে বাণীর বিকাশ হয়েছিল। বর্ণমালা পরিকৃষ্ট এবং পরিণত মনের অবদান। পরিণত মনের কাছেই তার appeal; সেখানে তার যত অর্থই থাকুক না কেন শিশুর কাছে সে অর্থহীন। স্বতন্ত্র অক্ষরগুলিকে সে চেনে না। কিন্তু ঐ স্বতন্ত্র অক্ষরগুলি দিয়ে যে শব্দ বা বাক্য গঠিত হয়, তাদের সঙ্গে শিশুর পরিচয় আছে। মানুষও প্রথম অবস্থায় সমষ্টিবদ্ধ শব্দ বা বাক্যকে জেনেছিল, তার পর সমষ্টির বিশ্লেষণ করে সে বর্ণমালার স্বতন্ত্র অক্ষরগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল।

যুক্তিসঙ্গত শৃঙ্খলা (Logical Order) এবং মানসসম্মত শৃঙ্খলার (Psychological Order) মধ্যে প্রভেদ অনেক। রাজ্য অধিকার এবং রাজ্য-শাসনের মধ্যে যে প্রভেদ শেষেরটার সঙ্গে প্রথমটার সেই প্রভেদ। মানুষ ভাষার উপর অধিকার স্থাপন করে তার সুশাসন এবং শৃঙ্খলার জন্য বর্ণমালা সমেত ব্যাকরণের সৃষ্টি করেছিল। লিপি সঙ্কেতে সে প্রথমে ভাবপ্রকাশ করতে এবং সঙ্কেতের ভিতর থেকে ভাবোদ্ধার করতে শিখেছিল। তার পরে বর্ণমালার সৃষ্টি।

শিশু মনের কাছে মানসসম্মত শৃঙ্খলার appealই বেশী। পরিণত মনের যুক্তি গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব

নয়, সহজ নয়। এ কথাটাও যে আমরা না বুঝি তা নয়। তাই বর্ণমালার শৃঙ্খলা এবং বর্ণপরিচয়ের রীতি অবলম্বন করলেও স্বতন্ত্র বর্ণগুলিকে একটা কৃত্রিম উপায়ে অর্থযুক্ত করবার চেষ্টা হয়ে থাকে—ছড়া এবং ছবির সাহায্যে। ছবি এবং ছড়ার মিল এই দুটির আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে শিশু অতি অল্প বয়সেই, যে বয়সে বই তার হাতে না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত, সেগুলি মুখস্থ করে ফেলে। এমন অনেক শিশুকে জানি যারা বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত না হয়েও হাসি-খুসীর পাতা ওলটাতে ওলটাতে ছড়াগুলি বলে যায়, বলবার সময় লাইনগুলি আঙুল দিয়ে দেখিয়েও দেয়। ঠিক জায়গাটিতে পাতা ওলটাতে তার একটুও ভুল হয় না। তাই বলে এ কথা বলা চলে না যে তারা পড়তে শিখেছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে ছবিকে এবং মিলকে অবলম্বন করেই তারা ছড়াগুলি বলতে এবং পাতা ওলটাতে পারে।

এটা visual এবং auditory impression এর ব্যাপার। সত্যিকারের পড়াতে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালনা হয় এতেও সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ই কাজ করে, কিন্তু একটু ভিন্ন ভাবে। এতে শিশুর চোখের পরিচয় নীচের লেখা লাইনগুলির সঙ্গে হয় না, হয় ছবির সঙ্গে, আর কাণের পরিচয় হয় অন্যের মুখ থেকে পাওয়া ভাষার বা ছড়ার শব্দরূপের সঙ্গে। এই দুটো পরিচয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ (association) স্থাপন করে শিশু কাজটা করে। কিন্তু 'পড়া' বলতে আমরা বুঝি কেবলমাত্র ভাষার লিপিরূপের সঙ্গে পরিচয়। যা কিছু বোঝাপড়া, সব হবে পাঠকের চক্ষু এবং পঠিতব্য বিষয়ের নীরব ভাষা বা সঙ্কেতের মধ্যে। তৃতীয় কোনো বিষয়ের বা বস্তুর বা ইন্দ্রিয়ের উপস্থিতি বা সহায়তা সেখানে নিষ্প্রয়োজন, —অবশ্য ইন্দ্রিয়াধিপতি মন বাদে।

খোকাখুকুরা ছবির বইখানি হাতে করে বড় মানুষের মতই ছড়ার পর ছড়া বলতে বলতে পাতা উল্‌টিয়ে যায়, দেখে আমরা আনন্দ পাই খুব। তারাও যে আনন্দ না পায় এমন নয়। কিন্তু আনন্দটাই এখানে সব নয়, লাভালাভের বিচার হওয়াও উচিত।

লাভের মধ্যে শিশুর মস্তিষ্কের চালনা কতকটা হয়। আগেই বলেছি অন্যের মুখে শোনা কথাগুলিকে ছবির সঙ্গে মনে গেঁথে রাখতে হয়। সে শিখে রাখে যে অজগরের ছবিটা দেখলেই বলতে হবে, "অ-'য় অজগর আসছে তেড়ে," আবার আমের ছবিতে "আমটি আমি খাব পেড়ে" ইত্যাদি। এ recognition ছবির,—অক্ষরের বা ভাষার লিপিরূপের নয়। বস্তুতঃ ছড়া শেখার ভিতর দিয়ে পড়তে শেখা তার হয় না। হয় না যে, তার প্রমাণ ছবিগুলি বাদ দিয়ে ছাপার হরফে ছড়াগুলি কিংবা তার শব্দগুলি যদি শিশুর সামনে ধরা যায়, তবে সে তাদের চিনতে পারবে না। পড়তে শেখাবার চেষ্টা ছড়ার মধ্যে নেই, যা আছে তা অক্ষর পরিচয়ের চেষ্টা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেটাও হয়ে ওঠে না। যিনি শেখান তাঁকে ছড়ার উদ্দিষ্ট অক্ষরগুলিকে বারে বারে নির্দ্দেশ করে দিতে হয়, বলতে হয় এটা 'অ', এটা 'আ' ইত্যাদি। তার কারণ এই যে অক্ষরগুলির দিকে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত ছড়ায় কিছু নেই, ছড়া নিজের দিকেই তার মনকে টানে বেশী।

এটা ঠিক যে শিশুর বাগ্‌যন্ত্রের কসরত্‌ খানিকটা ছড়ার আবৃত্তির ভিতর দিয়েই হয়ে যায়। কিন্তু ছড়ায় এমন অনেক শব্দ ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়, যাদের উচ্চারণ শিশুর পক্ষে কষ্টসাধ্য। যুক্তাক্ষর ত প্রথম শিক্ষার্থীর উচ্চারণের পক্ষে একটা বাধা। যুক্তাক্ষরকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে যুক্তাক্ষর-হীন ছড়া কোনো বইতে দেখেছি বলে মনে হয় না। সে কথা বাদ দিলেও দেখা যাবে শিশুর বাগ্‌যন্ত্রনিয়ামক পেশীর কসরৎ ছড়ার ভিতর দিয়ে কতকটা এলোমেলো ভাবে হয়।

ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু এটা সম্ভবতঃ অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যে রীতিতে সাজানো শিশুর বাণী-বিকাশের ধারা কতকটা তার বিপরীত। আমাদের ব্যঞ্জনবর্ণ সুরু হয় কণ্ঠ্য বর্ণ থেকে, শেষ হয় ওষ্ঠ্য বর্ণে, আর শিশু সাধারণতঃ উচ্চারণ আরম্ভ করে ওষ্ঠ্য বর্ণ থেকে। 'মা' 'বাবা' 'দাদা' প্রভৃতি কথা শিশুর বাক্‌স্ফূর্ত্তির প্রথম অবস্থায় যত সহজে ঠিক উচ্চারিত হয়, 'গাই' 'ঘর' প্রভৃতি তত সহজে ঠিক উচ্চারিত হয় না। শিশুকে "গাই"এর বদলে "দাই" 'ঘর'কে 'ধল' বলতে সাধারণতঃ শোনা যায়। যে বয়সে শিশুর হাতে

ছড়ার বই উঠতে দেখা যায় সে বয়সের উচ্চারণের কিছু নমুনা দিলেই কথাটা পরিষ্কার হ'বে। এগুলি কপোল-কল্পিত নয়, শিশুর কাছেই পাওয়া।

"এতো থোনাল বলনী লাণী দো
থন্ত তমল তলে,
এতো মা লত্তী বতো মা লত্তী
থাতো মা লত্তী ধলে।"

(এসো সোণার বরণী রাণী গো শঙ্খ কমল করে,
এসো মা লক্ষী, বসো মা লক্ষী, থাকো মা লক্ষী ঘরে।)

কিংবা "অয় অদাদল আত্তে তেলে
আমতি আমি থাব পেলে।"

(অ-য় অজাগর আসছে তেড়ে
আমটি আমি খাব পেড়ে)। ইত্যাদি।

তাই বলে বলছি না যে শিশু ওষ্ঠ্য, দন্ত্য, তালব্য, মূর্দ্ধণ্য এবং কণ্ঠ্য এই ক্রমে উচ্চারণ করতে শেখে। কোনো কোনো শিশুকে প্রথমে "কাকা" "গাই" প্রভৃতি বলতেও শোনা যায়, কিন্তু তালব্য এবং মূর্দ্ধণ্য বর্ণের উচ্চারণ শিশুর মুখে কখনো শুনেছি বলে মনে হয় না।

এই অবস্থায় ছড়া আবৃত্তি করার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই শিশুর "কথা গেলা"র (lisping) কু-অভ্যাস বদ্ধমূল হয়ে যায়। ছড়াগুলি গড়্ গড়্ করে বলবার দিকে শিশুর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। যে সময়ে শিশু কোনো কোনো বর্ণ সঠিক উচ্চারণ করতে শেখে নি, সেই অবস্থায় ঐ সব বর্ণ-সম্বলিত ছড়া তাড়াতাড়ি ক্রমাগত আবৃত্তি করবার ফলে ভুল উচ্চারণের যে অভ্যাস হয় সেটা অনেক দিন থাকে। বেশী বয়সের ছেলে মেয়েদের কথা দূরে থাকুক, প্রাপ্ত বয়স্কদের মুখেও "হস্বি" বা "রস্বি" (হ্রস্ব-ই), "দীঘ্ঘি" (দীর্ঘ-ঈ), "রিষিকেশ" (হৃষীকেশ) প্রভৃতি কথা শোনা যায়। ছড়ার বদলে গান-জাতীয় আবৃত্তি হ'লে কথাগুলো টেনে টেনে বলার ফলে এ জাতীয় দোষ কতকটা শুধ্‌রে যেত। কিন্তু সে কথা এখন থাক্।

ছড়ার বর্ণমালাকে যে ভাবে অর্থযুক্ত করবার চেষ্টা হয়, সে প্রণালী কৃত্রিম এবং কষ্ট-কল্পিত। বরং যখন দেখি "অ-য় অজাগর" বা "আ-য় আম" তখন গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য কতকটা বোঝা যায়। বোঝা যায় যে তিনি "অজাগর" বা "আম" কথাগুলির ভিতর দিয়ে "অ" বা "আ" প্রভৃতি অক্ষরগুলির প্রয়োগ দেখাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ বসে খায় ক্ষীর দই"-জাতীয় ছড়া যথেষ্ট শ্রুতিমধুর এবং আমোদজনক হলেও তার কষ্ট-কল্পিত অর্থ নিয়ে যে শিশুর মনে বিশেষ আমল পাবে এমন মনে হয় না।

শিশুর কাছে অপরিচয়ের বাধা খুব বড় বাধা। শিশু কেন, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মনও সম্পূর্ণ অজানা অচেনাকে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হয়। অজানাকে জানবার বা অচেনাকে চেনবার কৌতূহল সকলেরই আছে, কিন্তু জানিয়ে দেবার জন্য বা চিনিয়ে দেবার জন্য পরিচিতের মধ্যস্থতা চাই। তাই শিক্ষকের পক্ষে সদুপায় হ'চ্ছে পরিচিতের মধ্যস্থতায় অপরিচিতকে পরিচিত করানো। অপরিচিত স্বতন্ত্র অক্ষরগুলির সঙ্গে ছড়া এবং ছবির মারফতে শিশুর পরিচয়-স্থাপনের চেষ্টা যখন আমরা করি তখন এই সত্যকে অবলম্বন করেই করি। কিন্তু আগেই বলেছি এই পরিচয় স্থাপনের দিকে প্রচলিত ছড়া ও ছবির বিশেষ লক্ষ্য নেই।

আরো একটা কথা আমরা ভুলে যাই যে বর্ণ-পরিচয়টাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য পড়তে শেখানো অর্থাৎ (১) ভাষার লিপিরূপের সঙ্গে শিশুর চক্ষুর সাহায্যে পরিচয় এবং (২) সে পরিচয়ের সার্থক অভিব্যক্তি,—মুখে এবং লেখায়। বর্ণ-পরিচয়ের ব্যাপারটা একটা সোপান মাত্র। কিন্তু সোপান হওয়ার উপযোগিতা এর কতখানি সেটা সম্ভবতঃ আমরা কখনও বিচার করি নি, একটা চিরাচরিত রীতির অনুসরণ করে এসেছি মাত্র।

এই কথাগুলি মনে রেখে যদি আমরা শিশুকে পড়তে শেখাবার চেষ্টা করি তবে নিম্নলিখিত মত প্রণালী অনুসরণ করলে আশানুরূপ ফল পাবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়।

প্রথমতঃ শিশুর স্বাভাবিক বাণী-বিকাশের অনুসরণ করতে হ'বে। গোড়াতেই তার হাতে বই তুলে দেবার দরকার নেই। শিশুর পরিচিত প্রিয় বিষয়ে, ছবি বা বস্তুর সাহায্যে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা করতে হবে। তার সহজবোধ্য ভাষায় লেখা বই থেকে, কিংবা মুখে মুখে

তাকে গল্প শোনানো হবে। যিনি গল্প শোনাবেন তাঁর মুখের কথাগুলি স্পষ্ট এবং সু-উচ্চারিত হওয়া চাই। তাতে শিশুর মনে ভাষার ধ্বনিরূপের সুন্দর এবং সুস্পষ্ট ছাপ পড়বে। শিশু কথা বলতে শেখবার সঙ্গে সঙ্গে এ কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। যতদিন না শিশু ভাল করে উচ্চারণ করতে শেখে ততদিন এই কাজই চলবে। এমন আশা করা যায় যে এতে তার বাক্‌স্ফূর্ত্তি সাধারণতঃ যা' হয়ে থাকে তার চেয়ে অল্প সময়েই হবে।

এই কাজ যথাসম্ভব সুসম্পন্ন হ'লে শিশুকে শব্দের লিপিরূপের সঙ্গে পরিচিত করবার পালা আসবে। কিন্তু এখনও বই তার হাতে যাবে না। ছবি এবং খড়ির লেখা দিয়ে কাজ সুরু হ'বে। প্রধানতঃ তিনটি মূল সূত্রকে অবলম্বন করে শিক্ষক কাজ করবেন।

১। শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলিকে, অর্থাৎ সেগুলির প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত ক্ষেত্রে আছে - যেমন কাণ, মুখ, চোখ এবং হাত দুটিকে কাজে লাগানো চাই। তা'হলে সে নিজের চেষ্টায় অধিকার লাভের সুখ মিশ্রিত গর্ব্বটুকু অনুভব করে আত্মনির্ভরশীল হবে এবং স্বেচ্ছায় কাজে লেগে যাবে। তাকে জোর করে খাটাবার দুঃখ থেকে শিক্ষক মুক্তি পাবেন।

২। শব্দের অংশ বিশেষ বা বর্ণমালার এক একটি স্বতন্ত্র অক্ষরের পরিবর্ত্তে সমগ্র শব্দ বা ছোট বাক্য নিয়ে কাজ আরম্ভ হবে। আমরা দেখেছি যে শিশু বিশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র অক্ষরগুলির চেয়ে তাদের দিয়ে তৈরী শব্দগুলির সঙ্গেই পরিচিত। এই পরিচিত শব্দ বা বাক্য নিয়েই আমাদের কাজের পত্তন হবে। শব্দ বা বাক্যের লিপি-রূপের সঙ্গে আগে পরিচয় স্থাপন করে শিশু তাদের বিশ্লেষণ করবে এবং ঐ উপায়ে বর্ণমালার অক্ষরগুলির সঙ্গে তার পরিচয় হবে।

৩। এই বিশ্লেষণের কাজে সাহায্য করবার জন্য শিক্ষক যথাকালে স্বর বা ধ্বনিগুলির উপর একটু জোর দেবেন, যেন উদ্দিষ্ট ধ্বনিগুলির আক্ষরিক রূপের প্রতি পাঠার্থীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

এগুলি কি ভাবে করতে হ'বে বলছি, কিন্তু তার আগে আমাদের জেনে রাখা দরকার যে পড়ার পদ্ধতিটী শিশুর কাছে অজানা নয়। সে হয় ত কাগজের উপর কালি দিয়ে লেখা সঙ্কেত চেনে না, কিন্তু অন্য অনেব সঙ্কেতের বা অভিব্যক্তির মর্ম্ম গ্রহণে সে অনভ্যস্ত নয় হাতের নীরব সঙ্কেতে "এস" "যাও" প্রভৃতি আদেশ এব মুখভাবের অভিব্যক্তিতে ক্রোধ, বিরক্তি, আহ্লাদ, প্রশংস ইত্যাদি মনোভাব বুঝতে সে পারে। কাজটা পড়ার অনুরূপ একটা ব্যাপার। সুতরাং অক্ষর পরিচয় পরে জন্য রেখে আগেই পড়তে শেখাতে গিয়ে আমরা শিশুবে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো কাজে দীক্ষা দিচ্ছি না আমরা তার প্রকৃতির অনুকূল পথ দিয়েই যাব। বে যুক্তি দেবার দরকার নেই।

নিরক্ষর শিশুদের নিয়ে পাঠশালায় যে ভাবে কা আরম্ভ করা যেতে পারে সেই কথাই এবার দেখা যাক্ প্রথম সোপানে কি করতে হ'বে তার আলোচনা হ গেছে। এবার দ্বিতীয় সোপান। স্কুলে ভর্ত্তি হবার প অন্ততঃ দু' সপ্তাহ পর্য্যন্ত খোকাখুকুদের হাতে যেন বই যায়। এ সময়টা শিক্ষক শুধু ব্ল্যাক বোর্ডে ছবি এঁ বা অন্য ছবি দেখিয়ে সেই সম্বন্ধে মুখে মুখে তাদের স আলোচনা করবেন। তাদের প্রশ্ন করে তাদের দিয়েই ছবি বা উদ্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা আদায় করবার চে করবেন। উদ্দেশ্য, খোকাখুকুরা যেন স্কুলে আসার ক ভুলে যায়, মনমরা হয়ে না থাকে, আর যেন স্ফ‍ সহিত বাক্যালাপ করে।

কখনও বা খোকাখুকুরা শিক্ষকের নির্দ্দেশে ব্ল্যা বোর্ডে ছবি আঁকবে, কখনও বা শিক্ষক আঁকবেন ত দেখবে। তাদের মনোযোগ পাবার জন্য শিক্ষক হয় ছবির অংশ বিশেষ ইচ্ছে করেই আঁকতে ভুলে যা কিংবা ভুল করে আঁকবেন। উদাহরণ স্বরূপ শি হয় ত একটা মানুষের মাথা এঁকে তার নাকটা আঁব ভুলে গেলেন, আর খোকাখুকুদের ছবিটি পরীক্ষা কর বললেন। ভুলটা তারা শীগ্‌গির ধরে ফেলবে এই কাজটুকু করতে পারার জন্য যথেষ্ট খুসী উঠবে।

আবার কখনও তাদের শ্লেটে কিংবা ব্ল্যাক্ বে হিজিবিজি কাটতে দেওয়া হবে। ক্রমে তারা স তির্য্যক্, সমান্তর প্রভৃতি রেখা এবং বৃত্ত প্রভৃতি ক শিখবে,—অবশ্য শিক্ষক মশায়ের সহায়তায়। ক

বা সামনে একটী আদর্শ রেখে শ্লেটে তার নকল করবার চেষ্টা করবে।

এই ভাবে এক পক্ষ বা তদধিক কাল অতিবাহিত করে—শিক্ষক হয় ত একদিন কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে করতে সেই সম্বন্ধে দু'টি একটী কথা বেশ বড় বড় করে ছাপা হরফের মত অক্ষরে বোর্ডে লিখে দেবেন। তার পর হয় ত জিজ্ঞাসা করবেন, "বল ত, এ কি ?" বলতে তারা পারবে না, শিক্ষক পড়ে দেবেন,

"লাল ফুল।"

ছেলে একে একে কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করবে, শ্লেটে নকল করবার চেষ্টা করবে। ছোট ছোট ফুল দিয়ে বা কাঁইবীচি দিয়ে কথা দুটি গড়ে খেলা করবে। এই খেলার ভিতর দিয়ে কথা দু'টির আক্ষরিক রূপ তাদের মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে যাবে।

এই ভাবে প্রথমে গুটিচারেক শব্দের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেলে খেলার ভিতর দিয়ে শিক্ষক পরীক্ষা নিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ, অনেকগুলি কথার ভিতর থেকে ঐ "লাল" বা "ফুল" কথাগুলি তারা খুঁজে বার করবে, কিংবা না দেখে লিখবে। এ খেলায় তারা যথেষ্ট আনন্দ পাবে।

এই সময়ে শিক্ষক দেখবেন যেন বানান করা পড়ার সাধারণ রীতি তাদের উপর খাটানো না হয়। 'ল'-য় আকার "লা" আর ল=লাল, বা ফ-য় হ্রস্ব উকার 'ফু' আর 'ল'=ফুল, এই ভাবে যেন পড়ানো না হয়। 'ফ' বা 'ল' বা 'আ'-কার বা 'উ'-কারের সঙ্গে পরিচয়ের প্রতি দৃষ্টি দেবার সময় এ নয়। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য শিশুকে সম্পূর্ণ শব্দ (holographs) গোটাকতক চিনিয়ে দেওয়া। এর জন্য বানান করে পড়বার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। গল্প এবং খেলার ভিতর দিয়ে এ কাজ খুব সহজে করানো যেতে পারে। কাজের একঘেয়ে ভাব দূর করা শিক্ষকের কৌশল-সাপেক্ষ।

যখন "ফুল, লাল, জল, চুল, কাল, ঝুল," প্রভৃতি কতকগুলি কথা শেখানো হয়ে যাবে তখন বিশ্লেষণ করবার পালা আসবে। প্রথমে ফু+ল=ফুল, লা+ল=লাল; পরে ফ+উ+ল=ফুল, ল+আ+ল=লাল; এই ভাবে বিশ্লেষণ করে ছেলেরা স্বতন্ত্র অক্ষরগুলি চিনতে শিখবে।

এর পরের সোপানে পরিচিত বর্ণগুলির সাহায্যে তারা নূতন শব্দ গঠন করবে। যেমন 'কা | ল' এবং 'জ | ল' থেকে 'কা | জ'; 'তা | ল' থেকে 'ল | তা' ইত্যাদি। কখনও একটা শব্দের অংশ বিশেষ বাদ দিয়ে তাদের সেই অংশটুকু যোগাতে বলা হ'বে। যেমন, ু—ল, কা—া, ইত্যাদি।

এ সবই শিশুদের আনন্দদায়ক খেলা। কৌশলী শিক্ষক এই শ্রেণীর আরও অনেক খেলা জোগাড় করতে কিংবা উদ্ভাবন করতে পারেন। শ্রেণীতে প্রতিযোগিতার ইচ্ছাও শিক্ষককে এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করবে। এই উপায়ে বর্ণ পরিচয়ের পর যদি শিশুর হাতে বই তুলে দেওয়া যায় তবে সে 'লাল ফুল' পড়তে গিয়ে 'ল-য় আকার 'লা' আর 'ল' লাল, 'ফ-য়' হ্রস্ব উকার 'ফু' আর 'ল' ফুল করতে করতে গলদঘর্ম হবে না। একেবারে আমাদের মত করে 'লাল ফুল'ই পড়তে শিখবে। আর যা কিছু সে পড়বে তা টিয়াপাখীর 'কৃষ্ণ রাধা' পড়ার মত কোনো ব্যাপার হবে না বলেই আশা করা যায়।

প্রণালীর বিশেষ বিবরণ দেওয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়, দেওয়ার প্রয়োজনও নেই। শিক্ষকতার প্রতি যাঁদের অনুরাগ আছে, এ প্রণালীর মর্ম্ম গ্রহণ করতে তাঁদের জন্য এই সঙ্কেতই যথেষ্ট। এ যদি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবে শ্রম সফল জ্ঞান করব।

নাড়েন, বলেন—একি মশাই লাট-সাহেবের না হোয়াইট এওয়ের বাড়ী!—নম্বরটা বলুন! আশ্চর্য্য—এতগুলো বললুম তবু…

একজন পেটে-পাড়া বৃদ্ধ বললেন—"যখন নম্বর মনে নেই, তখন এর মাত্র সহজ উপায়—কোনো প্রকারে লালবাজার পুলিসে—ঐ দেখা যাচ্ছে,—গিয়ে গারদে ঢুকুন,—সেখানে খাবার আসরে মিশ্র মহাশয়ের দেখা পেতেও পারেন।"—বৃদ্ধটি সহজিয়া।

একজন পাতলা ছুঁচোলো চেহারার—গামছা কাঁধে লোক বললেন—"হ্যা হাঁ৷ আছেন, দালালও বটেন,—তাঁর নাম তো হরিপ্রাণ সার্ব্বভৌম। ঐ গাঁজার দোকানের ওপর-তালায় থাকেন,—আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি। অর্থাৎ সেইখানেই যাচ্ছি।"

হরিপ্রাণকে নিচের তলাতেই পেলুম—

"খুঁজে পাই না,—সার্ব্বভৌম হলে আবার কবে?"

হরিপ্রাণ বললে—"রাজধানীতে দিন কতক থাকুন না, আপনিও বাদ যাবেননা। বলাই চক্কোত্তি চা খাওয়ায় ভালো,—সহজেই 'চাচারিয়া' নাম পেয়েছে—দোকানে ভিড় ঠেলে ঢোকা যায়না। সাহিত্য-ক্ষেত্রে ধর-পাকড় চলেছে; রথী, সারথি, রথিনী, নাট্যলাট্ গদাই, পদাই, যাহোক একটা দেবেই দেবে।—সব গুণ-গ্রাহী যে! নেবেন একটা?"

বললুম—"সে সব পরে হবে, আগে বল'তো—আমার পরিচিতদের তুমি তো সেবার দেখেছিলে,—তাঁরা এখনো সব আছেন?"

বললে—"আছেন বইকি,—কোথায় আর যাবেন? সর্ব্বত্রই তরতি,—মিচ্ছেনা।"

"দেখা করিয়ে দিতে হবে যে।"

"তাঁরা সবাই মাণিকতলার মাল, মেলা কঠিন, ছড়িয়ে থাকেন, খুঁজে বার করতে হবে। নিমতলায় বসে থাকলে—এই শীতেই পাওয়া যায়,—তবে কথা কওয়া হয়না। আপনার যে তাড়া রয়েছে দেখছি,—হ্যাঁ—আর এক জায়গাও আছে,—থিয়েটারে বা সিনেমার বক্সে মেলে।"

"সে কি—এ বয়সে—? আর এত পয়সাই বা…"

"রাজধানীতে বয়স নেই। আপনি তো জানেন, এখানে প্রাণ বুড়ো হয়না। তবে তার একটা লাগসই কথা এতদিন ছিলনা,—বেরিয়ে গিয়েছে—'তরুণ'। এতদিন Cutture কল্‌চারই করতেন্, কৃষ্টি ছিল কি? যেমন সুমধুর তেমনি সোজা! না? ছেলেটা সেদিন বাংলা মানের বই মুখস্ত করছিল—'ঔষধ মানে ভেষজ।' শুনে ছুটে এই নিচের তালায় এসে বাঁচি! বললুম—'আর শুনিওনা, আমার দরকারই বা কি। এমন মিঠে ভাষাটা,—যাক্। তা ওঁরা পয়সা—"

"বক্সে পয়সা দিয়ে আবার কজন যায়। ও-গুলো বড় বড় আর বুড়ো-বুড়োদের খাতিরের খোপ্। Fill-up এর—ভরাটের একটা মূল্য নেই?"

"থাক ভাই—এখন দেখা হবার—"

"ভাববেন না—সে হবে'খন।"

"আমার যে আরো কাজ রয়েছে হরি, বাটা কোম্পানীতে একবার—"

"সেখানে কেনো?"

"১২ জোড়া জুতোর দরকার…"

"১২ জোড়া! তা ভালো ভালো দেশী কোম্পানী থাকতে বিদেশী—"

"বিদেশী জুতো বহু দিনের অভ্যাস—আমাদের fit and suit করেও বেশ, I mean—সয়ও ভালো। একটা কথা আছে না—where the shoe pinches,—তা টেরও পাই না। একদম গা সওয়া। তাই। দেশীর দিন তো আসন্ন হে,—তোমরা সেটা—"

"আচ্ছা চলুন এখন—স্নানাহার সেরে একটু বিশ্রাম করবেন।"

বাসায় রান্নার পাট নেই,—চা থেকে অন্নাদি সবই মিশ্র-কোম্পানীর আশ্রম থেকে এলো। আশ্রম জিনিষটা এতদিনে রাজধানীতে সার্থকতা লাভ করেছে। এখানে সব জিনিষেরই উৎকর্ষ। সাধু মাত্রেই আশ্রম-প্রিয়।

—"চাকা পানা এটা কি?"

—"ওটা চিংড়ি মাছের চপ্।—উদিকে নয়—উদিকে নয়—ওটা ল্যাজ্,—ঐ ল্যাজ ধরে কামড় মারুন। ধরবার সুবিধের জন্তে ওটা বোঁটা হিসেবে বেরিয়ে থাকে!"

আশ্রমে সবই সাত্ত্বিক আহার, মাছের বোঁটা বেরিয়ে ফলে দাঁড়িয়েছে। মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে হরির কৃপায়

আশ্রমবাসও সারা হয়ে গেল। একেই বলে ভাগ্য। যাঁর কাজ—তিনিই করিয়ে নেন—

* * *

বৈকালে দু'জনে বেরুলুম। হরিপ্রাণ একটা দোকানের সামনে দাঁড়ালো—দেখি বড় বড় হরপে লেখা—"ভারত-লক্ষ্মী নিবাস"। তার নিচে—"যাঁরা বিলিতী খোঁজেন অনুগ্রহ করে পাশে দেখবেন। একজন সার্ট গায়ে—বাক্স খুলে বসে, আর তিনজন খদ্দের বিদেয় করচে। ছিট্ কাপড় সার্ট, রুমাল, ফিতে, প্যাড্ পেপার, পেন্সিল্ নিব, 'Fountain-pen, ছড়ি ছাতা Safety-pin, (নিরাপদ বা আরাম-বন্ধ) Silk skirt মোজা, Silk—কি finish! দেখলে চক্ষু জুড়িয়ে যায়। সাবান, এসেন্স cream, paste powder,—দু'টি বিভাগ আলো করে রয়েছে। সবই দেশী—মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলুম।

সগর্ব্বে ভাবতে লাগলুম—এ জাত ঝুঁকলে কি না করতে পারে—উঃ বচর তিনেকের মধ্যে কি অভাবনীয়···উঃ···

হরিপ্রাণ বললে—"চিনতে পারলেন ?"

উচ্ছ্বসিত ভাবে বললুম ;—"কার সাধ্য চেনে, একি চার'বচর আগে—দিশি বলে ভাবতে পারতুম, না—আশা করতে পারতুম···"

হরি বললে—"সে তো বটেই, আমি জিনিষের কথা জিজ্ঞাসা করিনি, যিনি বাক্স কোলে বসে—ওঁকে চিনতে পারলেন ?"

বললুম—"পরিচিত কেউ নাকি ? রোসো—দেখি।"

দেখি তিনিও আমার দিকে চেয়ে। বললুম—"ব্রজ না ?" শুনতে পেয়ে—"আরে এসো এসো, কবে এলে, কেমন আছ—উটে এসো,—উটে এসো ভাই। বোসো —তারপর ?"

বললুম—"তারপর তোমার তো একগাছি চুলও পাকেনি, সেই চল্লিশেই থেমে আছ দেখছি ?"

ব্রজ হেসে বললে—"রাজধানীতে পাকেনা"—

বললুম—"ওই কথাই তো কেবল শুনছি—তবে এখানে হয় কি ?"

"এই যা দেখছো,—ওহে নটু পান এনে দাও—" বললুম—[illegible]চা পান পাওয়া যায় নাকি ?"

ব্রজ আমার দিকে চেয়ে বললে—"বাঁধাওনি বুঝি ? আরে ছ্যাঃ"

বললুম—"থাক ও কথা—তোমার দোকান দেখে ভাই ভারি আনন্দ পেলুম। এটা একটা কাজের মতো কাজ করেছ বটে। বাঙালীর মাথাও যেমন উর্ব্বর, বাংলার মাটিও তেমনি উর্ব্বর, দেখছি ২৩ বচরে সোনা ফলে গেছে। খুঁজে খুঁজে এই সব বাছা বাছা Choicest দিশি জিনিষের সমাবেশ করা কম বাহাদুরি নয়,—দেশের কাজ তো বটেই···"

ব্রজ একটু মৃদুস্বরে বললে—"এতে আমার বাহাদুরী আর কি আছে ? এর credit সবটাই দেশের লোকের, বিশেষ তরুণদেরই প্রাপ্য। তাঁরা না দয়া করলে, এ সব দেখতে পেতেনা। দিশি কথাটা—আহা ওর কি প্রবল মোহ ভাই—ওকেই বলে প্রেম। শুনলেই হল যে 'দিশি', তা সেটা দিশিই হোক্ অর্থাৎ ভারতেরি হোক বা ভার্জেনিয়ারই হোক্। শুনলেই—প্রাণের ভিতর দিয়া—বুঝলে ? দুশো বচরের তয়েরি জমি, দিশি বললেই ফল ফলে বসে আছে,—প্রমাণ দরকার হয় না। সেটা চেনা যে তাদের পক্ষে খুবই সহজ।"

"—কি রকম ?"

"মফস্বলে থেকে বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসে আছ যে দেখছি,—চলে এসো, চলে এসো—রাজধানীতে। এইটে বুঝলেনা ? যেটা তাদের প্রাণ চাইছে—চোখে ধরেছে, সেটা যে দিশি না হয়ে যায়না, তা সেটা ক্যানেডার হোক না কেনো। পালিস থাকলেই—"রূপ লাগে গেই নয়নে—", ভুলে গেছে নাকি ? চণ্ডীতে আছে না,—"চিত্তে কৃপা সমর নিষ্ঠুরতা" তাই হে। ওই কৃপা আছে বলেই অনেক দিশি দোকানই চলে। লেখাপড়া শিখে এ জাত ভুল করবে কেনো ? তাদেরি কৃপায় তিন বছরে দু'-খানা বাড়ী তুলতে পেরেছি—এই কলকেতায়,—বুঝলে !"

বললুম—"আচ্ছা ভাই, দেখা হবে'খন, কাজগুলো সেরে ফেলি" বলে উঠলুম।

ব্রজ বললে—"সন্ধের পর আসতেই হবে 'নিকেতনে' আজ 'ঝড়ের রাতে' দেখা চাই—admirable। আমার বক্স বাঁধা,—পাশ আছে। দেখবেনা ? রাজধানীতে তবে এলে কি করতে ? এসো—"

রাস্তায় পা দিয়ে বাঁচলুম। যেন সাপের গর্ত্তে ঢুকে পড়েছিলুম।

—"হরিপ্রাণ—পরিত্রাণ করো ভাই, আর দেখা শোনায় কাজ নেই।"

"আপনি ভাবচেন কেনো। ওটা বলতে হয় তাই বললেন। রাত ৯টার পর ব্রজবাবুর ফুরসৎ কোথায়? তখনি তো দিশি মাল (?) যারা যোগান দেয় তারা আসে; তারপর—'ক্যণ্টনে' চীনে-চচ্চড়ি, mind ফারপো নয়। চলুন 'চাচারিয়ার' চা টেষ্ট করবেন।"

চা খাবার ইচ্ছাটাও হয়েছিল। বললুম—'চলো।'

কি ভিড়! দাঁড়া—cup চলছে। "আসুন আসুন, বসুন,—ছোট না বড়ো?—কেক, চপ,—চিংড়ির না পাঁটার? বাইরের ক্যান্‌ভাসটা একবার দেখুননা।"

ফুট্‌পাতেই দাঁড়িয়ে ছিলুম। চোখ তুলতেই দেখি প্রকাণ্ড অয়েল-ক্লথে সাদা হরপে লেখা—

পৃষ্ঠপোষক—রসদক্ষ সুপ-শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত সুধাময় ভোজ-তীর্থ বলেন—চাচারিয়ার চিংড়ির চপ্ রাজধানীর কণ্ঠ-রত্ন। Patronised specially by Caste Hindus—

যাক, আমি ভাবতে লাগলুম—তাই তো, অয়েল-ক্লথ আবার এ কাজেও লাগে! পাড়াগাঁয়ে মা ষষ্ঠীর কৃপাতেই তো ও-ব্যবসা এতদিন বেঁচেছিল। এখন যেতে আসতে মাথায় ঠেকছে। ডেমোক্রেশী চারদিকেই চারিয়ে গেল দেখছি···

'বসুন' মানেই 'দাঁড়ান'—বেঞ্চি চেয়ার ভরতি। শেষ এক কোণে একটা কাট-বাক্সে স্থান পেলুম। যা বলবার হরিপ্রাণই বললে। পাশেই একটি Make up (সাজা) প্রৌঢ় চিংড়ির চপ্ চিবুচ্ছিলেন। গলাটা কিন্তু পল তোলা (করুগেটেড্)—বৃদ্ধই হবেন। একটা ডিম চাইতেই কণ্ঠস্বরটা পরিচিত বলেই বোধ হল।—"কি—অখিল নাকি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ,—কই আমি তো চিনতে,···ওঃ তুমি? কবে এলে ভাই, ইস্ একেবারে যে বুড়িয়ে গেছ, শরীরে যত্ন নেই কেনো—কি দুঃখে?—চাচা, এবারে বড় কাপ্ আর দুখানা চপ্—"

বললুম—"সে বলা হয়েছে ভাই। কেমন আছ, কোথায় আছ, কি করছো বলো।"

শুনলুম—কালিঘাটে মায়ের বাড়ী তার নিত্য প্রসাদ বাঁধা। কিছু রোজগারও করে। বিকেলে চা চপেই চলে যায়,—২।৩ আড্ডা আছে। বললে,—"ছেলেকে কলকেতায় রেখে মানুষ করছি,—কোরে খেতে হবে তো? এখন সব তাতেই art চাই—জানতো? রীতিমত সুমধুর মিথ্যে কথা কি করে কইতে হয় সেই জন্যেই এখানে রাখা রে ভাই। সেটা শিখে নিতে পারলে আমার কর্ত্তব্য শেষ, নিশ্চিন্ত হয়ে কাশী যাই।—ও ঠিক পারবে। বোদা-ছেলে নয়,—এসেই একটা film কোম্পানীর নজরে পড়ে গেছে। কি একটা কেতাবে চোরের পার্ট কেউ পছন্দমত করতে পারছিলো না। এমন করেছে-রে ভাই—কি আর বোলবো,—যেন তিন পুরুষের অভ্যেস! ছিঁচকেতেও পেছপাও নয়,—daring-এও (দুঃসাহসিকেও) ওস্তাদ। তোমার আশীর্ব্বাদে খাওয়া পরা আর কিছু নগদও পায়।"

—"বোসো—আমি একবার হাতীবাগানে রসময় উকীলের বাড়ী চললুম। বেরিয়ে পড়বেন—দেখা হবে না—দু দুটো মক্কেল বেহাত হয়ে যাবে। এইখানে এই সময় দেখা—বুঝলে!"

এই বলে অখিল বেরিয়ে গেল, একটা কথা কবারও ফাঁক দিলেনা।

হরিপ্রাণ হাসি মুখে বললে—"ওঁর ছেলের চোরের প্লে-টা দেখতে যাবেন? সত্যিই যেন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।"

আমি তখন অবাক হয়ে ভাবছি—শুনেছিলাম—রাজধানীতে যার অন্ন হয়না,—তার কোথাও হবেনা। বলে কিনা—সুমধুর মিথ্যা বলতে শেখবার জন্যে ছেলেকে আনিয়েছে। মামলার মক্কেল জোগাড়ও করে···কথায় কথায় শুনিয়েও দিলে—all is fair in Dollar and ফলার···

হরিপ্রাণ বললে—"ভাবচেন কি! উঠুন—"

বললুম—"চলো।"

(৩০)

আজ অষ্টাহ রাজধানীতে কাটছে—আর নয়, শুভস্য শীঘ্রম্। বিলম্বে নানা বাধা উপস্থিত হতে পারে। শ্রীনাথ

আর অম্বিকের সঙ্গে দেখার আশা ছাড়লুম! হলে সুখীই হতুম,—উভয়েই ধর্ম্মপ্রাণ ছিল—অনেক এগিয়ে থাকবে, —কিছু শুনতে পেতুম।—এতদিনই যখন বৃথা গেছে, থাক্‌গে।

স্নানটা সেরে অভ্যাস মত বিছানায় বসেই গীতাখানা খুলে 'ধর্ম্মক্ষেত্রে' উচ্চারণ করতেই—ভক্ করে প্যাজের-ক্ষেত্রের একটা তীব্র গন্ধ মনটাকে বিগড়ে দিলে। এ আবার কোথা থেকে বেরুলো,—চারদিকে চাইলুম। কই আর তো নেই। যাক্ কোত্থেকে কেমন ঢুকে পড়েছিল। ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু—"ধর্ম্মক্ষেত্রে"—রামঃ আবার তাই। বাসায় তো রান্নার পাট নেই, গন্ধ আসে কোত্থেকে? অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষ তাঁকে পেলুম নিজেরই মুখে। মনটা খারাপ হয়ে গেল—পাঠ বন্ধ করলুম।

না—আর না। হোটেলের চপ্ কালিয়া, অন্তর বাহির অধিকার করেছে। রক্ত-মাংস ছুই দখল ক'রেছে দেখছি। এখানে ভদ্রতা রক্ষার্থে Prejudice নেই বলতেই হয়,—কিন্তু ঢেঁকুর উঠলে ভদ্রলোকের কাছ থেকে পাঁচ হাত উঠে দাঁড়াতে হয়। নাঃ আর বাড়ীবাড়িতে—

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণু রচলোঽয়ং সনাতনঃ"

দাঁড়িয়ে যাবে। তখন শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গ ছাড়বেনা। 'ঠিকানা'-যাত্রীর আর সৎসাহসে কাজ নেই। বহু পূর্ব্বে মন্থুরা গিয়ে আসন নিয়েছেন।

হরিপ্রাণকে menu (ব্যবস্থা) বদলাতে বললুম।—যে ছুদিন আছি রেহাই দাও—

সে বললে—"সে কাল থেকে হবে, আজ order booked হয়ে গেছে,—আপনি যা ভালোবাসেন তাই, —সব চীনের 'চাউ-চাউ' (খানা)—"

নীরবে গ্রহণ করলুম, দানবকে বোঝাবে কে? সব কাজেরি পূর্ণাহুতি আছে,—তাই হোক্—

বললুম,—"ঢের দেখা হ'ল আর কোথাও বেরুচ্ছিনা ভাই।"

হরিপ্রাণ বললে—"সে কিঁ কথা—আজ যে 'দৈত্য সভা'—বড় বড় পণ্ডিত মহাপণ্ডিতের সাত্ত্বিক সমাবেশ। দেশের মান্য-গণ্য অনেককে দেখতে পাবেন। হিঁদু যে এখনো মরেনি—ধর্ম্মই যে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেটা দেখে যাবেন বইকি। এ সুযোগ আর মিলবেনা।"

বললুম—"'দৈত্য সভা' মানে?"

"আহা—monster meeting গো।"—

—"নাম—'চতুর-আশ্রম রক্ষিণী'। নামই উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করে, আবার উদ্দেশ্যই নামকে বজায় রাখে…"

সভাপতির নাম শুনে বললুম—"তিনি তো ইংরিজিতেই ভালো বক্তৃতা করেন জানি, সাধারণে কি তা…"

—"ওঁরা শাঁখের করাত—বাংলাটাও আজ শুনবেন—"

শুনতে ইচ্ছা হোলো—বললুম—"অত বড়ো লোক —ধার্ম্মিক বংশ, ভাল কথাই বলবেন। আমার এখন ঐ সবই দরকার।"

হরিপ্রাণ বললে—"তাই তো আপনাকে বললুম…"

* * * *

বক্তৃতা শুনছি আর ভাবছি, এত ধার্ম্মিকের একত্র সমাবেশ—বিশেষ রাজধানীর বক্ষে, কল্পনাতেই আসেনা। যে দিকে তাকাই—শিখা, টিকী, গরদ, মটকা, নামাবলী, মালাচন্দন। কি অনির্ব্বচনীয়। বক্তাও—সনাতনের সূতিকাগার থেকে ধর্ম্মকে রূপ দিতে দিতে ক্রমের দ্বারাতে করে মূর্ত্ত করে তুলে বললেন—কিন্তু ভাই সর্ব্বনাশ উপস্থিত, সব গেলো—আর থাকেনা। একটা নাস্তিকের দল এক ভারতমাতা খাড়া করে—আমাদের সনাতন জাতধর্ম্ম নষ্ট করতে অগ্রসর।—ভাই সকল তোমাদের দেবঅংশে জন্ম,—শুষনী শাক আর খেয়োনা, ঘুমের মাত্রা আর বাড়িওনা, জাগো—ভারতের গৌরব রক্ষা করো। ধর্ম্মহীন অসুরদের উদ্দেশ্য বিফল করতেই হবে, ধর্ম্মই আমাদের সহায়—ধর্ম্মের চেয়ে বল নেই;—ইত্যাদি ইত্যাদি…করতালির করকাপাত।

পরে মাঝারি, ছোট, ক্ষুদে বক্তারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে উঁচিয়ে আরম্ভ করলেন—

মোট্ কথা—"ঐ অসুরদের সংস্রব রেখনা, তাদের কথা ঘৃণার সহিত অবহেলা ক'রে তাদের বিরুদ্ধে সজ্ঘবদ্ধ হয়ে নগর গ্রাম, পল্লীবাসীদের সাবধান করে বেড়াবার জন্যে এইখানেই এসো, আমরা এই শুভদিনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই,—ইত্যাদি—"

ধর্ম্মকর্ম্মে দেশের লোকের এই সৎসাহস আর একতা

ৎসাহ আমার ভাল করে উপভোগ করা হলনা। সহসা দেখতে পেলুম—শ্রীনাথ বক্তৃতা দিচ্ছে, অম্বিক্ তার পাশেই মুকিয়ে রয়েছে। সহজেই চিনতে পারলুম,—কারণ কলপ্ নেই—পাকা গোঁফ লম্বা দাড়ি। বরাবরি এদের ধর্ম্মের দিকে ঝোঁক, সেটা জানতুম। তাই এতো খুঁজছিলুম। ঠাকুর মিলিয়ে দিলেন। দুটো ধর্ম্মকথা শুনে বাঁচবো,—যে বয়সের যা। সভার দিকে আর মন রইলনা, ভাংবার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে রইলুম।

পার্কের এক কোণে একটা দর্ম্মাঘেরা ঘরে আলো জলছিল। 'আঃ বাঁচলুম' বলে সেই দিকে দ্রুত পা বাড়াতেই হরিপ্রাণ বললে—"কোথায় যান? যা ভাবছেন ওটা সে স্থান নয়,—ওখানে meetingএর অপিস।"

বললুম—"মিটিংয়ের আবার আপিস কি? আমি যে—"

সে বললে—"তা বুঝেছি। তাইতো—থাকতে পারবেন না?…চারদিকে যে…"

এমন সময় সভা ভঙ্গ হল। মনটা শ্রীনাথ আর অম্বিকের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ায়, সে চেষ্টা ভুলে গেলুম।—"দ্যাখো দ্যাখো হরিপ্রাণ—তারা চলে না যায়,—ধরা চাই"—

—"ভাববেননা—আমি নজর রেখেছি—এইখানেই দাঁড়ান। তাঁরা ওই দর্ম্মার মধ্যেই ঢুকেছেন,—এখুনি বেরুবেন।"

বললুম—"ওখানে?"

হরিপ্রাণ,—"প্রথামত পণ্ডিতদের সম্মান রাখতে হয়।—ওখানে সেই কাজ হচ্ছে, মহামহোপাধ্যায় in charge—"

দেখলুম তাই বটে—এক এক করে বক্তারা এক এক সরা মিষ্টান্ন হাতে বেরিয়ে আসচেন।

হরিপ্রাণ বললে—"ট্যাঁকে 'এবং-ও' আছে।

শুনে ভারি আনন্দ হল। সাধে কি বলে রাজধানী—ভালো জিনিষের কদর এইখানেই আছে। এসব সনাতন প্রথা পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষা এইখানেই প্রত্যক্ষ করছি—বাঃ। বলে—পল্লীতে ফেরো;—কেন হে বাপু,—কি দুঃখে? আমাদের 'বিদেয়' তো দেখি সর্ব্বত্রই, সেটা বেড়েছে বই কমেনি, তার উপর আবার খালি পায় বাড়ী ফেরো,—বড় বড় ভক্তরা সব আসেন—ভরতের ভায়রাভাই, রামের পাদুকায় প্রগাঢ়. নজর! এখানে সে বালাই নেই—ভোজে জুতো চেপে নিশ্চিন্তে বসা চলে; সেটা কি কম স্বস্তি! ভগবান বুদ্ধি দিয়েছেন, তবু সেটা কেউ কাজে লাগাবেনা; কোন্ সুখে পল্লীতে ফিরবে?—

হরিপ্রাণ—'এই নিন' বলে আমার স্বগত-বেগটা চমকে দিলে। শ্রীনাথ আর অম্বিক সরা-শুদ্ধ, আমাকে জড়িয়ে ধরলে।—"উঃ কতদিন পরে!—সেই জ্বালামুখিতে দেখা', ১৭ বচর হবেনা? কেমন আছ ভাই? এখানে কি কাজে? কই এদিকে তো কখনো আসোনা?"

শ্রীনাথ এতগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করে ফেললে। বললুম,—"বিশ্বাস করো তো বলি—তোমাদের সঙ্গে দেখা করে শেষ বিদায় নিতেই এসেছিলুম। পরে হতাশ হয়েই ফিরছিলুম ভাই। কাল চলে যাবো, ভগবান তাই দয়া করে দেখা করিয়ে দিলেন…"

অম্বিক বললে—'শেষ বিদায় কি রকম? সাধনমার্গের সীমা টোপকেছ নাকি?"

শ্রীনাথ বললে "না-না ও সব পাগলামী নয়,—নিজের কাজ হলেই তো হ'লনা—সনাতন ধর্ম্মটা যে গোল্লা যেতে বসেছে—সেটা সামলে দিয়ে যাওয়া চাই তা নাতো আর এ সব নিয়ে রয়েছি কেনো? শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে যা বলেছিলেন, এখন তো আমাদেরও সেই অবস্থা "ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন মনে নেই? তবু এসব করে যাচ্ছি কেনো?"

অম্বিক উদাসভাবে বলে উঠলো—"জগদ্ধিতায়—

শুনে নিজের প্রতি ধিক্কারে গ্লানিতে চোখে জল এসে গেল, কথা কইতে পারলুমনা। উঃ এরা কত এগিয়েছে,—বোধহয় পৌঁছেই গেছে,—আমি সেই মাইভিই রয়ে গেছি। ভাগ্যে দেখা হ'ল…অতি কষ্টে বললুম "ভাই রে—এই জন্যেই দেখা করবার তরে প্রাণ আকুল হ'য়েছিল। কেবল অশান্তির মধ্যে পড়ে ছট্ফট্ করছিলুম।"

শ্রীনাথ বললে—"হবেই তো, তোমার কি সংসারের ঘেঁষে থাকার অবস্থা? চলে এসো ধামীতে।"

মনে মনে লজ্জায় মরে গেলুম—এরা কতটা এগিয়েছে! সংসার ছেড়ে নিজের কাজ সেরে, এখন স্বাধীনভাবে জগদ্ধিতায়ে লেগে গেছে। থাকতে পারলুমনা,—মহাপ্রস্থানের উদ্দেশ্য জানিয়ে, উপায় স্বরূপ জুতো জোগাড়ের কথা পর্য্যন্ত জানালুম—

শুনে শ্রীনাথ অবাক বিস্ময়ে অম্বিকের দিকে চেয়ে বললে—"দেখ্‌চো, ভায়া চিরদিনই প্রচ্ছন্ন ধর্ম্মী, নীরবে সব সেরে বসে আছেন,—এখন পায়ে পায়ে পৌঁছুবার সঙ্কল্প!"

অম্বিক মাথা চুলকে নিঃশ্বাস ফেলে বিমর্ষভাবে বললে "গুরুদেব আমাদের একি করলেন? সংসারে থেকে 'জগদ্ধিতায়' চালাতে আদেশ দিয়ে আবার বাঁধলেন কেনো? নচেৎ এমন সুযোগ—একত্রেই তো রওনা হওয়া যায়।" এই বলে অম্বিক মুখখানায় চিন্তার ভাব ছড়িয়ে ফেললে। শেষ শ্রীনাথের দিকে চেয়ে বললে—"কি বলো দাদা?"

শ্রীনাথ আমার দিকে ফিরে বল্লে—"একটু অপেক্ষা করাত পারনা? একসঙ্গেই 'শিবাস্তে' করা যায়... তামায় খুলে বলাই ভালো,—"

আমি তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলুম।

শ্রীনাথ আরম্ভ করলে—"কথা কি জানো—ঐ অম্বিক বললে। কুম্ভস্নানে গিয়েই তো কাল করলুম, রুদেবের সঙ্গে দেখা,—দেখি ছায়া নেই হিমালয়ের য় কায়া ফেলে রেখে চলে এসেছেন—বাঘে চৌকী চ্ছে! এসব যোগমায়া বোঝো তো? যাক্, দুজনেই দু—ভগবান ভাগ্যে যদি বিদেহ সাক্ষাৎ মিল্‌লো—ন ত্যাগের অনুমতি দিন।"

রুষ্টভাবে বললেন—"কেবল নিজের কাজ হয়ে নই হল, ভারতধর্ম্ম ডুবতে বসেছে যে। জীবনমুক্ত র পরও কিছুদিন ধর্ম্মরক্ষার্থে থাকতে হয়। যা—তায় লেগে থাক,—পরিত্রাণায়"—বলতে বলতে দাঁড়ালেন না—সট্‌ সরে গেলেন।

অম্বিক বল্লে—"সেও তো কবছর হয়ে গেল দাদা; কি...আর যে পারিনা।"

নাথ বললে..."এই অক্ষয়তৃতীয়ায় আর কেউ পারবেনা,—চলোনা।" আমার দিকে চেয়ে—"সবুর সবেনা কি ভায়া? এই সময়টা চলছে ভালো—মিলছেও handsome,, এই দেখনা handful—কিছু গুছিয়ে নিয়ে পাপ সংসারে ফেলে দিয়ে,—বুঝলে?" আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে—"ওঃ তোমার দেখছি এখনো,..আরে জীবন্মুক্তের এখন লীলা বই তো নয়। —মন প'ড়ে রয়েছে সেই ঊর্দ্ধে। সংসারটা সেরেফ্‌ শব-সাধনা রে ভায়া, তাকে কিছু দিয়ে ঠাণ্ডা রাখতে হয়। রওনা হবার আগে হরি মুদীর দোকান থেকে মাস তিনেকের সওদা—খুঁটিয়ে নিয়ে, আর কুণ্ডুর কাছ থেকে সবার ৬ জোড়া করে হাওলাতি পরিধেয় এনে দিয়ে, অলক্ষ্যে রাত ৯টার গাড়ীতে পাড়ি ধরা! সংসার তো আমাদের ছুটেই গেছে—এসব তো এখন পর-হিতায়র কোটায় গিয়ে পড়বে। অন্য পক্ষে ওরাও কি বেচারা গৃহস্থদের কম লুটছে? ওদেরও কিছু ধর্ম্মসঞ্চয় হোক্‌। তোমার দিনকতক সবুর সইবেনা?"

অম্বিক বললে—"ব্যবহারিক জীবনে আমার caseটা একটু tangle খেয়ে জোট পাকিয়ে আছে। এক সঙ্গেই যাবো। আমি বোলবো—বদরিনারায়ণ যাচ্ছি—তুমি কিন্তু কথা কয়োনা। এই একটি বন্ধুর কাজ করো ভাই,—জীবনে আর তো বলবনা। এ না বললে সে সঙ্গে যাবেনা—"

কথা কইতেই হল, বললুম—"কাকে সঙ্গে চাও? কে সঙ্গে যাবে?"

অম্বিক বললে—"গুরুদেব সংসারে থাকতে বললেন, কিন্তু সংসার তখন ফুরিয়ে গেছে। গুরুর ইচ্ছা মিথ্যা হতে দিতে তো পারিনা,—কাজেই মাথা খেয়ে যে বসে আছি রে ভাই!—তৃতীয় পক্ষে এক তিহারাণী চড়িয়ে বসেছি—"

বললুম—"তা তাঁকে নেওয়া কেনো?"

বললে—"তুমি বুঝচোনা, ওসব পথ আমার জানা আছে। চণ্ডির-পাহাড় পার হয়ে যেতে হবে তো। সেটা বাঘের আড্ডা, পুজো না দিয়ে পার হওয়া যায়-না। তেড়ে এলে কাজে দেবে,—তাই নেওয়া—"

শুনে শিউরে উঠলুম। নিশ্চয় তামাসা—

অম্বিক সেটা লক্ষ্য করছিল। বললে—"ওঃ—এখনো কাঁচাই আছ দেখছি। মরবে কে? আত্মা কখনো

'নাইক্তে হন্যমানে শরীরে।'
—মনে নেই বুঝি?"

জীবন্মুক্তদের কথা শুনে আমার ধর্মচেষ্টা ঘুলিয়ে তখন একঘটি জলের তেষ্টা পেয়ে গেছে। ভেবেছিলুম দ্রৌপদী নেই যে লপেটা খুঁজতে হবে। দেখছি এক এক করে সবাই জোটে! কোনো কথাই জোগাচ্ছিলনা।

শ্রীনাথ সহসা চিন্তাকুলভাবে বলে উঠলো—"ওসব হবেনা অম্বিক,—ভারি মনে পড়ে গেছে,—হরি রক্ষে করেছেন।"

সকলেই তার দিকে জিজ্ঞাসুর মত সাগ্রহে চাইলুম। যাক্ আর কেউ রক্ষা পাক্ না পাক্—আমি যেন বাঁচলুম এবং কারণটা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলুম।

শ্রীনাথ আমার দিকে চেয়ে বললে—"না: হোলনা—বড় হতাশ হলুম—বন্ধু। আমরা মনুপন্থী—বিধিনিষেধ মানি, পাঁচজনে পথ চলার দিন আর নেই—তুমি এগোও। নচেৎ কোনো বাধাই ছিলনা ভাই। জীবন্মুক্তের জুতোর ভাবনা নেই;—সভা লেগেই আছে,—কিন্তু বিধি নিষেধে বাধছে। আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিরা বহুপূর্ব্বে পাঁচকে ভূতের কোটায় ফেলে গেছেন। এতকাল পরে বুদ্ধিজীবীদের মাথায় সেটা এসেছে। যিনি যত বড়োই হোন, ভূতের ভয় সকলেরি আছে।—পথে 'পাঁচ নিষিদ্ধ'..."

অম্বিক একটু মুসড়ে গেল, বললে—"শ্রীনাথ শাস্ত্রজ্ঞান প্রবল—স্বীকার করি, কিন্তু মাঝে মাঝে শুভ কাজের পরিপন্থী। 3rd wing (তৃতীয় ছাটবার এমন মওকা আর মিলবেনা, তারও তাতে হ'ত, ধর্মার্থে এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর দেহটা দে হোতো;—ত্যাগের মহিমা দেখিয়ে যেতে পারতে আমারও blood pressure..."

তারপর দুচার কথার পর ছাড়াছাড়ি। প্রাণ ও স্পষ্টই অনুভব করলে প্রকৃতই যেন—আমার ভূ ছাড়লো,—আরামের নিশ্বাস যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে বেরুলো শুদ্ধ বিস্ময় তখনো পেয়ে রয়েছে...

হরিপ্রাণ আওয়াজ দিলে,—চমকে শুনলুম—"আহা—ভুল করলেন যে, ঠিকানা নিলেননা! স্থির হয়ে বেশ নিরিবিলিতে ওঁদের আশ্রমে বসে ধর্ম্মকথা শুনতেন,—অনেক আছে যে..."

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"আমাদের ঠিকানা ওঁদের জানা নেই তো?"

হরিপ্রাণ বললে—"না।"

বললুম,—"বাঁচিয়েছ ভাই,—চলো। সকালে ট্রেণ আছে?..."

হরিপ্রাণ শুনতে পেলেনা বা উত্তর দিলেনা।

ক্রমশঃ

দন্তমন্দির বা "ডালেডা মালিগাবা"

স্বামী সুন্দরানন্দ

সিংহলের প্রাচীন রাজধানী কান্দী (Kandy) সহরের "ডালেডা মালিগাবা" (Dalada Maligawa) বা "দন্তমন্দির" (Temple of the Tooth) বৌদ্ধদের একটী পরম পবিত্র ধর্ম্ম-মন্দির। ষোল শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীভগবান বুদ্ধের অস্থি-দন্ত (Tooth-relic) ভারতবর্ষ হইতে আনয়ন করিয়া ইহার উপর এই মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। প্রতি বৎসর তিব্বত, চীন, জাপান, শ্যাম ও প্রভৃতি দেশের শত শত ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ এই পবিত্র মন্দির দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। আমি এই প্রবন্ধে এই বিখ্যাত মন্দিরস্থিত শ্রীভগবান বুদ্ধের ভস্মাস্থি-দন্তের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

ভগবান গৌতম বুদ্ধ মহানির্ব্বাণ লাভ করিলে তদীয় শিষ্যগণ নিয়মে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করেন। তৎকালে গোদাবরী ও মহানদীর মধ্যবর্তী কলিঙ্গ নামক প্রদেশের প্রায় সব অধিবাসী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এই প্রদেশের রাজাও বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি শ্রীভগবান বুদ্ধের একটী ভস্মাস্থি দন্ত প্রতি বৎসর রাজকীয় জাঁকজমকে বাহির করিয়া উৎসব করিতেন। এই ভাবে এই পবিত্র দন্ত এই রাজ্যের রাজগণ কর্ত্তৃক ক্রমে আট শত বৎসর যাবৎ বিশেষ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে রক্ষিত হয়। পরে ইহার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের অপর এক বৌদ্ধ রাজা প্রধানতঃ এই পবিত্র দন্ত হস্তগত করিবার জন্য অগণিত সৈন্য লইয়া ইঁহাকে আক্রমণ করেন।

সন্ন্যাসী বেশে এই পবিত্র দন্ত লইয়া রাজপুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক টিউটি-কোরিন্ (Tuticorin) হইতে সমুদ্রগামী নৌকায় আরোহণ করিয়া লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হইয়া কলিঙ্গরাজ-বন্ধু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লঙ্কারাজ সিরি মেভন (Siri Mevan) কে উহা প্রদান করেন।

রাজা অযাচিত ভাবে এই অমূল্য উপহার লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হন এবং উক্ত রাজকন্যা ও তাঁহার জামাতাকে তৎবিনিময়ে প্রভূত ধন-রত্নাদি প্রদান করেন। তিনি তাঁহাদের জন্য একটী সুদৃশ্য রাজবাড়ী প্রস্তুত করাইয়া তাঁহাদিগকে রাজ-সম্মানে রাখিবার ব্যবস্থা করেন। রাজা সিরি মেভন এই পরম পবিত্র দন্ত বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত মূল্যবান মণি-মুক্তা-খচিত একটী আধারে রক্ষা করিয়া রাজবাড়ীর প্রস্তর-নির্ম্মিত সুদৃঢ় অট্টালিকার একটী প্রকোষ্ঠে স্থাপন করিয়া সৈন্য-সামন্ত দ্বারা একটী যাহাতে সামান্যমাত্র স্পর্শ করা হইত তাহাই অতি পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত। এই বস্তুদ্বয় যাঁহার অধীনে থাকিত, তাঁহাকেই লঙ্কার প্রকৃত রাজা বলিয়া লোকে মান্য করিত। লঙ্কারাজদের শত্রু কর্ত্তৃক ইহা একাধিকবার যখনই অপসারিত হইয়াছে, তখন হইতে উহা পুনঃ হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত সমগ্র লঙ্কায় শোকের উচ্ছ্বাস বহিয়া গিয়াছে। ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে যখন জপাহু (Japahu)—বর্ত্তমান উঃ পঃ প্রদেশ—সিংহলী রাজাদের রাজধানী ছিল, তখন তামিলরাজ কর্ত্তৃক এই দন্ত প্রধান লুণ্ঠিত দ্রব্যরূপে অপসারিত হইয়াছিল। তৎকালীন সিংহলী রাজা পরাক্রান্ত তামিল রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অসমর্থতা-প্রযুক্ত ভারতে যাইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া ইহা পুনরায় সিংহলে আনয়ন করেন।
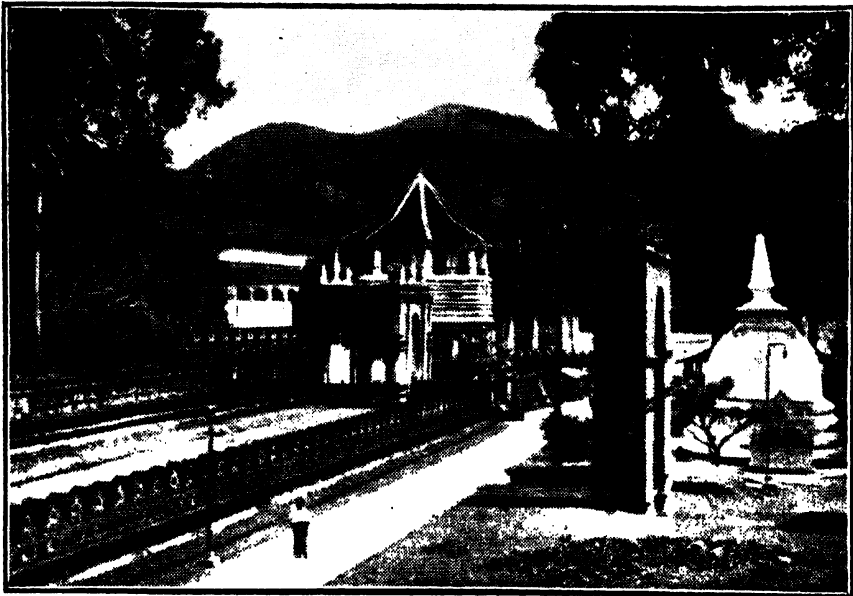
দন্ত-মন্দির

দিবারাত্রি বিশেষ ভাবে পাহারা দিয়া উহা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করেন। যে গৃহে এই দন্ত রক্ষিত হইয়াছিল উহা "দন্ত গৃহ" (House of the Tooth) বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই দন্ত প্রতি বৎসরে একবার রাজবাড়ীর মন্দির হইতে বাহির করিয়া বিরাট ভাবে রাজকীয় আড়ম্বরে মিছিল করিয়া সুবিখ্যাত "অভয়গিরি বিহার (Abhaya-Giri Vehara)এ লইয়া যাওয়া হইত।

অনেক বৎসর যাবৎ এই পবিত্র দন্ত ও শ্রীভগবান বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র লঙ্কাদ্বীপের বৌদ্ধরাজগণ কর্ত্তৃক বিশেষ সম্মান সহকারে রক্ষিত এবং পূজিত হইয়া আসিতেছিল। এই দুইটা অমূল্য জিনিষ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট এত পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল যে ইহাদের কোনও

অতঃপর পর্ত্তুগীজরা এই দ্বীপে আগমন করিলে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য কান্দীর সিংহলী রাজা তামিল রাজদের সাহায্য লাভের আশায় এই পবিত্র দন্ত ও মূল্যবান দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া জাফ্না গমন করেন। কিন্তু তিনি এখানে হঠাৎ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত হইলে এ দন্ত জাফ্নার তামিল হিন্দু রাজার হস্তগত হয়।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে পর্ত্তুগীজরা জাফ্নার হিন্দু রাজাকে পরাজিত করিয়া এই পবিত্র দন্ত তাঁহাদের রাজধানী "গোয়ায়" লইয়া যান। পর্ত্তুগীজদের কবল হইতে এই দন্ত উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ রাজগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার বিনিময়ে ব্রহ্মের পেগু প্রদেশের বৌদ্ধ রাজ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের টাকা দিতে এবং

সঙ্গে সঙ্গে মালাক্কা (Malacca) স্থিত পর্ত্তুগীজ-দুর্গের রসদ আবশ্যক মত সরবরাহ করিতে প্রস্তাব করিয়া গোয়ায় পর্ত্তুগীজ বড়লাটের নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন। লাট সাহেব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে গোয়াস্থিত তৎকালীন প্রধান রোমান ক্যাথলিক্ ধর্ম্ম-যাজক ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে বাধা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে অর্থ গ্রহণ করিয়া অখৃষ্টানদের পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া খৃষ্টানদের পক্ষে পাপ। শেষে ভগবান খৃষ্টের এই পর্ত্তুগীজ অনুচরবৃন্দ এই পবিত্র দন্তকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতেই দৃঢ় সংকল্প করিয়া এতদুপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করেন! নির্দ্ধারিত দিনে অগণিত জনসমূহের সম্মুখে ইহার ধ্বংসোৎসব আরম্ভ হয়। লাট সাহেব একটী প্রকাণ্ড পিত্তলের হামানদিস্তা (Mortar)র উপর এই পবিত্র দন্ত নিক্ষেপ করেন এবং প্রাগুক্ত প্রধান খৃষ্টধর্ম্মগুরু মহোদয় ইহাকে চূর্ণ করিয়া ধূলিতে পরিণত করিয়া পাথুরিয়া কয়লার প্রজ্জলিত অগ্নিতে উহা নিক্ষেপ করেন। পরে ভস্মরাশি একটী গভীর স্রোতস্বিনীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

কিন্তু এত আড়ম্বর করিয়া যাহাকে লোক-লোচনের বহির্ভূত করিবার জন্য নিশ্চিহ্ন করা হইল উহা কি প্রকৃতই শ্রীভগবান বুদ্ধের ভস্মাস্থি-দন্ত? লঙ্কাবাসী অনেক বৌদ্ধ বলেন যে জাফ্‌নার হিন্দুরা বানরের দাঁত পূজা করিতেন এবং উহাই পর্ত্তুগীজরা লইয়া গিয়াছিলেন। অনেকের মতে উহা নকল দাঁত ছিল। বুদ্ধের প্রকৃত ভস্মাস্থি দন্ত কান্দীর "ডালেডা মালিগাবা" মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রোথিত আছে বলিয়া বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন। কেহ কেহ বলেন যে পর্ত্তুগীজদের নিক্ষিপ্ত ভস্ম একটী প্রস্ফুটিত পদ্ম পাপ্‌ড়ি মেলিয়া গ্রহণ করিবার পর উহা পুনঃ ভস্মাস্থি দন্তে পরিণত হয়। পদ্মটী নদী হইতে সমুদ্র দিয়া ভাসিয়া লঙ্কার কূলে উপনীত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভার আমাদের উপর নহে। আমাদের বিশ্বাস শ্রীভগবান বুদ্ধের সত্য বা অসত্য যে ভস্মাস্থি দন্তই কান্দীর এই বিখ্যাত "ডালেডা মালিগাবা" বা "দন্ত-মন্দির"এ থাকুক না কেন, স্মরণাতীত কাল হইতে অগণিত ভক্তগণের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া ইহা যথার্থ ই মহা পবিত্র বৌদ্ধতীর্থে পরিণত হইয়াছে।

ব্যাধি

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই পাখীর প্রভাতী কলরবের সঙ্গে সঙ্গেই সেতারপর্ব্ব শেষ হইয়া গিয়াছিল। এখন তানপুরায় ঝঙ্কার তুলিয়া হারাণ আচার্য্য সাধিতেছিল একখানি ভৈরবী। আবেশে তাহার চোখ দুটী মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছে। তানপুরার উপর গাল রাখিয়া সে গাহিতেছিল—'চরণে চন্দন রাঙা জবা দিলে কে-রে!'

রুদ্রমূর্ত্তিতে একগাছা লাঠী হাতে ও-পাড়ার শ্যাম ঘোষাল আসিয়া বিনা ভূমিকায় হুঙ্কার ছাড়িয়া ডাকিল—হারাণে—শালা—!

তানপুরাটার স্ফীত উদরের উপর বাঁ হাতে তালি মারিয়া হারাণ তাল দিতেছিল। ফাঁকের ঘরে বাঁ হাত তুলিয়া হারাণ ইসারা করিল—সবুর। গানটা উপভোগ্যরূপে জমিয়া উঠিয়াছিল। ঘোষাল বসিল। যথাসময়ে গান শেষ করিয়া হারাণ তানপুরাখানি সযত্নে পাশে রাখিয়া দিতে দিতে কহিল—কি?

ঘোষালের রাগের সময় বোধ করি পার হইয়া গিয়াছিল। সে কাকুতি করিয়া বলিল—হারাণ, আমার ঠাকুর?

হাতের মেরজাপটা খুলিয়া হারাণ কহিল—জানি না ত।

ঘোষাল যোড়হাত করিয়া বলিল—দে ভাই,—কোথা রেখেছিস—কি ফেলে দিয়েছিস বল!

হারাণ বলিল—তোমার ঠাকুর ত আমি দেখেছি বাপু; আনা-টেক সোনার একটা পুট-পুটে পৈতে ছিল। সে আমি হাত দিই নাই। ছুঁচো মেরে হাত-গন্ধ আমি করি না।

ঘোষাল আরও মিনতি করিয়া বলিল—তোর পায়ে ধরি ভাই, আমার তিন-পুরুষের শালগ্রাম শিলা,—দে ভাই। বল্ কোথায় ফেলে দিয়েছিস?

হারাণ কহিল—বিশ্বাস না কর ত কি বলি বল। সত্যিই আমি জানি না।

ঘোষাল আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না, সে রোষে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, কহিল—কুষ্ঠব্যাধি হবে, মুখ দিয়ে পোকা পড়বে। চণ্ডাল—চোর—ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে—।

হারাণ কোন উত্তর দিল না। সে তানপুরাটা আবার কোলের উপর উঠাইল।

ঘোষাল সরোষে কহিল—দিবি না তুই? আমি পুলিশে খবর দেব—

হারাণ অবিচলিত ভাবে তানপুরার তারের উপর আঙুল চালাইয়া দিল। সুরঝঙ্কারে যন্ত্রটা সাড়া দিয়া উঠিল।

অকস্মাৎ ঘোষাল তাহার পায়ের গোড়ায় ক্ষিপ্তের মত মাথা কুটিতে কুটিতে কহিল,—মরব, আমি তোর পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

তাহার স্বর অবরুদ্ধ, চোখ দিয়া দরদর ধারে জল ঝরিতেছিল।

হারাণ বলিল—কেন মিছে আমার পায়ে মাথা খুঁড়ছ ঘোষাল? যাও না, ভাল ক'রে সব খুঁজে-পেতে দেখ না গিয়ে। গোল পাথর ত, গড়ে টড়ে প'ড়ে গিয়ে থাকবে হয় ত। পুষ্পকুণ্ড-টুণ্ডগুলো দেখগে যাও।

ঘোষাল চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে পরম আশ্বাসের হাসি হাসিয়া প্রশ্ন করিল—পাব—পাব—, পুষ্পকুণ্ডের মধ্যেই পাব হারাণ?

—দেখই না গিয়ে।

ঘোষাল দ্রুতপদে চলিয়া গেল, হাতের লাঠিগাছটা সেইখানেই পড়িয়া রহিল। যন্ত্রটায় ঝঙ্কার তুলিয়া হারাণ এবার ধরিল একখানি বাগে-শ্রী। গান চলিতেছিল, নিশি স্বর্ণকার আসিয়া দাওয়ার উপর নীরবে বসিল। গান শেষ করিয়া হারাণ বলিল—একবার তামাক সাজ দেখি নিশি।

হারাণের ঘরদুয়ার নিশির পরিচিত, সে তামাক টিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসিল। যন্ত্রের তারগুলি শিথিল করিয়া দিয়া কাপড়ের খোলের মধ্যে সযত্নে যন্ত্রটীকে পুরিয়া দেওয়ালে পোতা পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিল।

নিশি কলিকায় ফুঁ দিতেছিল, সে কহিল—একজন খরিদ্দার এসেছে দাদাঠাকুর। কিছু সোনা বেচবে? দরও এখন উঠেছে—চব্বিশ দশ আনা পাকা বিকুচ্ছে।

হারাণ রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

নিশি ডাকিল—দাদাঠাকুর!

মৃদুস্বরে উত্তর হইল—না।

মৃদুস্বরেই নিশি বলিল—কি করবে এত সোনা নিয়ে? আমিই ত তোমার গলিয়ে বাট তৈরী করে দিয়েছি—দেড় সের সাত পো' ত হবেই। কিছু ছেড়ে দাও এই সময় বুঝলে?

—টাকা নিয়েই বা কি হবে আমার?

—জমি-টমি কেন। কিম্বা দাদন-পত্র কর। এইবার একটা বিয়ে-টিয়ে কর বুঝলে। আজন্মই কি এমনি করে কাটিয়ে দেবে না কি?

হারাণ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। নিশি কলিকাটা কোলের কাছে নামাইয়া দিল, বলিল—খাও।...আরও একটা কথা দাদাঠাকুর,—ও সব কাজ এইবার ছাড়। আর কেন? ঠাকুর দেবতার অলঙ্কার—ও আর ছুঁয়ো না। ও হচ্ছে কাঁচা পারা—হজম কারও হয় না।

এতক্ষণে হারাণ কথা কহিল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া মৃদুস্বরেই বলিল—এই দেখ বাবা—হাত দেখ—পা দেখ, শরীর দেখ, খসেও যায় নি, রোগও হয় নি। আর নিতেই যদি হয় তবে দয়াল দেবতার নেওয়াই ভাল। ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে দেখে, ধরে না—কাউকে বলে দেয় না, চ্যাঁচায় না, দুঃখ করে না।...কাঠ আর পাথরের গায়ে রাজ্যের সোনা-দানা—রামচন্দর!... কাল রাত্রে, বুঝলি, ওই ঘোষালদের ঠাকুরঘরে ঢুকেছিলাম। গোল একটা নুড়ি, তাকে বেড় দিয়ে একটা সোনার পৈতে! নিলাম টেনে ছাড়িয়ে, তারপর ভাবলাম দিই ছুঁড়ে ফেলে। আবার ভাবলাম, থাক, এই পুষ্প কুণ্ডের মধ্যেই থাক। আবারও ত পৈতে গড়িয়ে দেবে—সেইটাই হবে হাতের পাঁচ।...নে, কল্কে নে।

নিশি কহিল—আচ্ছা এসব যে তুমি করছ—কি জন্যে—কার জন্যে করছ বল ত? না করলে সংসার, না কিনবে সম্পত্তি,—কি হবে এতে তোমার?

হারাণ বলিল—কল্কেটা পাল্টে সাজ,—ওটাতে আর কিছু নাই। তারপর গুণ্ গুণ্ করিয়া রাগিণী ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

নিশি আবার তামাক সাজিতে বসিল। টিকেতে আগুন ধরাইতে ধরাইতে বলিল—জিনিষগুলো যত্ন করে রেখেছ ত দাদাঠাকুর? দেখো, চোরের ধন বাটপাড়ে না নেয়!

মৃদু হাসিতে হাসিতে হারাণ বলিল—সে এক ভীষণ

কেলে সাপ—ইয়া তার ফণা—আমি যে ওস্তাদ, আমাকেই বলে,—দুইটী হাতের তালু পাশাপাশি যোগ করিয়া ফণার পরিধি বর্ণনা করিতে করিতে হারাণ সভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

* * *

দিন দশেক পর।

সেদিনও নিশি বসিয়া তামাক সাজিতেছিল। হারাণ কতকগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা কাঠী লইয়া ছোট ছোট আঁটী বাঁধিতেছিল। নিশি কহিল—এর মধ্যে নবগ্রহের ন রকম শুক্‌নো কাঠ কোথা থেকে যোগাড় করলে দাদাঠাকুর? তোমাদের দৈবজ্ঞিদের সন্ধান বটে বাপ্‌!

হারাণ বলিল—তুইও যেমন, দেবে ত চার আনা পয়সা, তার জন্যে বনবাদাড় ভেঙে কোথায় আকন্দ কাঠী কোথায় এ—কোথায় তা, যোগাড় ক'রে বেড়াই আমি। নিয়ে এলাম শুকনো ডাল একটা—তাই বেঁধে আঁটী ক'রে দিচ্ছি। এই কি দিতাম? বছরে বছরে রায়পুরের বাবুদের বাড়ী একটা ক'রে পার্ব্বণী দেয়, তাই, নইলে—হ্যাঃ।

—কিন্তু দেবকার্য্যের জিনিষ, শাস্তি-স্বস্ত্যেন করবে তারা।

মৃদু হাসিয়া হারাণ বলিল—আমাকে ত সবাই জানে বাবা, জেনে-শুনে সব আমার কাছেই বা আসে কেন? গ্রহের ফেরে যজ্ঞ তাদের পূর্ণ হবে না, তার আর আমি কি করব?

একটী লোক আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আজ্ঞে 'নব-গেগ্নে'র কাঠ নিতে এসেছি।

হারাণ বলিল—এই যে বাবা কাঠ বেঁধে বসে আছি আমি। তোমার বাড়ী রায়পুর ত?

—আজ্ঞে হাঁ।

—পয়সা এনেছ—চার আনা পয়সা?

লোকটী একটা সিকি ফেলে দিয়া কাঠ লইয়া চলিয়া গেল।

হুঁকা কলিকা হারাণের হাতে দিয়া নিশি বলিল—কিন্তু তোমার ভাল নয় দাদাঠাকুর, যাই বল তুমি। এত দিন বিদেশে বিভূঁয়ে গিয়ে যা করেছ ধরতে পারে নাই কেউ, এবার তুমি গাঁয়েও আরম্ভ করলে? আবার এই লোক ঠকান—

হারাণ হুঁকায় টান দিয়া বলিল—আর বুঝি জল হ'ল না,—মেঘ ধরে গেল। সে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। নিশি বিরক্ত হইয়া চুপ করিল। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল—ঘোষাল পুলিশে ডায়রী করেছে শুনেছ?

হারাণ বলিল—মিছে কথা। হলে এতদিন থানা-তল্লাস হয়ে যেত। আর করলে ত করলে, সাক্ষী প্রমাণ ত চাই।

একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ী বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল। ও প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া হারাণ প্রশ্ন করিল—কোথাকার গাড়ী হে?

গাড়োয়ান গাড়ী নামাইতেছিল। ছইএর মধ্য হইতে একটী বিধবা মুখ বাড়াইয়া কহিল—ভাল আছ দাদা?

হুঁকা হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হারাণ সবিস্ময়ে কহিল—কে রে,—হৈম? তুই হঠাৎ যে?

গাড়ী হইতে হৈম নামিয়াছিল, পিছনে তাহার বালক পুত্র তমোরীশ। দাদার পদধূলি লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হৈম বলিল—

বন্যেতে বাড়ী ঘর সব পড়ে গিয়েছে দাদা। এমন আচ্ছাদন নাই যে মাথা গুঁজে দাঁড়াই। কোথা, কার কাছে দাঁড়াব বল? অবস্থা ত জান—ঘর যে আবার করে নিতে পারব—সে সম্বলই বা কোথা? ভগবান শেষ কালে তোমারই কাছে দাঁড় করালেন আমাকে।

হারাণ কহিল—তা বেশ বেশ। তোরও ত বাপের ঘর। আয় ভাই আয়। বেশ করেছিস। তমোরীশেরই ত সব—দুদিন আগে আর পরে।

নিশি কহিল -তা' বৈকি, এ গুষ্টীর অধিকারীই ত উনি।

হৈম আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে ছেলেকে ভর্ৎসনার সুরে বলিল—মামাকে প্রণাম কর তমোরীশ! ছিঃ, এত বড় ছেলে, এও বলে দিতে হবে?

কোলের কাছে ফুটফুটে ছেলেটীকে টানিয়া লইয়া হারাণ বলিল—বকিস নে হৈম, অচেনা জায়গা—আমিও অচেনা—

মৃদু অনুযোগ করিয়া হৈম বলিল—চেনা না দিলে চিনবে কেমন করে বল ? এই ত দশ কোশের মাথায় থাকি। মলাম কি থাকলাম বোনের খোঁজও ত নিতে হয়। শেষ গিয়েছ তুমি, আমি বিধবা হলে—সে আট বছর হল। তমোরীশ তখন দু বছরের ছেলে, কেমন করে চিনবে বল ?

লজ্জিত হইয়া আচার্য্য কহিল—আয় আয় ভাই, বাড়ীর ভেতরে আয়।

তমোরীশকে সে কোলে তুলিয়া লইল।

গৃহিণীহীন গৃহখানিতে আবর্জ্জনা না থাকিলেও মার্জ্জনার পারিপাট্য নাই, অভগ্ন-অবয়ব হইলেও সম্পূর্ণ নয়, গৃহের মধ্যে যে একটী শ্রীময়ী মমতা থাকে—তাহা নাই।

হৈম বলিল—মায়ের আমলে কি রূপই ছিল এই ঘরের। সেই ঘর ! সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

হারাণ নিশিকে ডাকিয়া কহিল—চার পয়সার ভাল মিষ্টি এনে দে দেখি নিশি। ছেলেটা প্রথম এল—

সিকিটা হাতে লইয়া নিশি বলিল—ডাল নুন তেল কি আর কিছু যদি আনতে হয়, একেবারে আনতে দাও না।

—দৈবজ্ঞের বাড়ী রে এটা, ভুজ্যির ডাল নুন আছে। দু পয়সার তেল আনিস বরং। আর ভাবছি—মশারী একটা চাই আবার, যে মশা এখানে। বার আনার কমে হবে না কি বলিস ? তোর ঘরে বাড়তি নেই রে ?

খিড়কী হইতে ফিরিয়া হৈম কহিল—ছি ছি দাদা, ঘাট-পাদারগুলো ক'রে রেখেছ কি ? জঙ্গলে যে মানুষ ডুবে যায়। বিয়েও করলে না—না দাদা এবার তোমার বিয়ে দোব আমি।

আচার্য্য নিশিকেই বলিল—না থাকলে কি আর হবে। তা হ'লে রামা তাঁতীকে বলবি একটা মশারীর জন্যে। নিয়েই বরং আসবি। ওর ছেলের রাশি-চক্রটা দিয়ে যেতে বলবি, কুষ্টী ক'রে দেব।

নিশি বলিল—সে আমি পারব না বাবু। তুমি যেটা মিথ্যে যা তা কুষ্টী করে দেবে, সে পাপের ভাগী আমি হই কেন ? তার চেয়ে আমি নিজে দায়ী হয়ে নিয়ে আসব। তুমি পয়সা পরে দিয়ো আমাকে।

সে চলিয়া গেল।

নিশি চলিয়া যাইতেই হৈম বলিল—একটী কাজ তুমি করতে পাবে না দাদা। তোমার পায়ে আমি হত্যে দেব। ঠাকুর দেবতার জিনিষ—

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া আচার্য্য কহিল—না, সে ত আমি আর করি না।

* * * *

নিশীথ-রাত্রে হ্যারিকেনটী অনুজ্জ্বল করিয়া দিয়া হারাণ খিড়কীর ঘাটে গিয়া নামিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে আলোকটীকে উজ্জ্বল করিয়া দিল। তার পর ঘাটের বাঁ পাশে ভাঙিল। ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটী আকন্দ গাছের তলা খুঁড়িয়া বাহির করিল একটী ঘটী। সেটীকে লইয়া সে নিবিড়তর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

*

* *

থানা পুলিশের সংবাদটা সত্য বলিয়াই বোধ হইল। দফাদারটা দিন দুই হইল গান শুনিবার ছলে বসিয়া অনেকক্ষণ আলাপ করিয়া গেল।

গত রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া মানুষের চিহ্ন অনুসন্ধান করিতে গিয়া হারাণের নজরে পড়িল দুটী মানুষ।

সে চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিল—কে ?

উত্তর হইল—আমরাই গো।

আচার্য্য আবার প্রশ্ন করিল—আমরাই কে হে বাপু ?

—আমি রামহরি দফাদার আর থানার মুহুরীবাবু ! রোঁদে বেরিয়েছি।

সকালে উঠিয়া রাগিণী আলাপ তেমন জমিল না। তমোরীশ বসিয়া আছে ; প্রথম দিন হইতেই যন্ত্র-ঝঙ্কার উঠিলেই সে আসিয়া বসে। নিশিও নিয়মিত আসিয়াছিল। গান শেষ করিয়া আচার্য্য নীরবে তামাক টানিতেছিল।

হৈম আসিয়া দাঁড়াইল। সে বোধ হয় দাদার নিকট হইতে প্রথম সম্ভাষণ প্রত্যাশা করিয়াছিল। কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া শেষে সেই প্রথমে ডাকিল—দাদা !

আচার্য্য মুখ তুলিয়া চাহিল।

—আজ তমোরীশকে ইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে আসবে দাদা !

হারাণ বলিল—উঁহু—আজ দিন ভাল নয়।

হৈম দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল—কাকে কি বলছ? আমিও যে দৈবজ্ঞের ঘরের মেয়ে দাদা। দিন ভাল মন্দ—

সপ্রতিভ ভাবে হারাণ বাধা দিয়া বলিল—না,—মানে—পয়সা নেই হাতে আজ। আর ভাল দিন ত আরও আছে।

ছোট একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হৈম কহিল—তাই হবে। কিন্তু বই ক'খানা কিনে দাও।

ঘাড় নাড়িয়া হারাণ বলিল—দেব।

হৈম চলিয়া গেল।

যন্ত্রগুলায় আবরণ পরাইতে পরাইতে আচার্য্য কহিল—তমোরীশ, ভেতরে যাও ত বাবা!

বালকের বিলীয়মান পদধ্বনির প্রতীক্ষা করিয়া হারাণ মৃদুস্বরে নিশিকে কহিল—আমার বাড়ীটা তুই কিনবি নিশি? যা দাম দিস তুই। পুলিশ বড্ড আমার পেছনে লেগেছে।

নিশি চমকিয়া উঠিল। আচার্য্য বলিল—ভবী মিস্ত্রীকে দিলে দুশো টাকায় সে এখুনি নেয়। কিন্তু শালা পুলিশের গুপ্তচর—ঠিক বলে দেবে। তুই নে,...এক-শো টাকা তুই আমাকে দিস—না—একশো পাঁচ।

নিশি কহিল—দিদিঠাকরুণ, তমোরীশ, এরা কোথা যাবে?

হারাণ আর কথা কহিল না।

পরদিন সকাল বেলা আর হারাণের সেতার বাজিল না। নিশি আসিয়া ফিরিয়া গেল। তমোরীশ আবিষ্কার করিল মামার যন্ত্রগুলির মধ্যে তানপুরাটা নাই।

সন্ধ্যায় নিশি আসিয়া দেখিল—হৈম বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। পাশেই ম্লানমুখে কয়খানি নূতন বই হাতে তমোরীশ বসিয়া ছিল।

নিশি শুনিল হারাণ ভবী মিস্ত্রীকে পঁচানব্বুই টাকায় বাড়ী বেচিয়া কাশী চলিয়া গেছে। যাইবার সময় কয়খানি বই তমোরীশকে দিবার জন্ত দিয়া গেছে।

*

*　*

আচার্য্য কিন্তু কাশী যায় নাই। সে বর্দ্ধমান জেলা পার হইয়া মুর্শিদাবাদে গিয়া পড়িল। নিতান্ত পথে পথে যাত্রা। কাঁধে এক কম্বল, একটী পুঁটলী, হাতে তানপুরা।

একখানা গ্রামে প্রকাণ্ড দালান ঠাকুরবাড়ী দেখিয়া সে ঢুকিয়া পড়িল।

মুর্শিদাবাদ আমিরী চালের জন্মভূমি; বনিয়াদী চাল—পুরানো বন্দোবস্ত আজও এখানে মরে নাই। এ বাড়ীর বন্দোবস্তও পুরানো। অতিথিকে এখানে মানুষের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে হয় না, দেবতার প্রসাদ কামনা করিয়া দাঁড়াইলেই পাওয়া যায়।

অপরাহ্ন বেলায় নজরে পড়িল বনিয়াদী চালও এখনও সেখানে আছে।

ঠাকুরবাড়ীর পাশেই বাবুদের বৈঠকখানায় বড় হলে আসর পড়িতেছে, ঝাড়ে দেওয়ালগিরিতে বাতি বসান হইতেছে।

হারাণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া ছিলমচীখানসামার ঘরে ঢুকিয়া তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল। প্রকাণ্ড বড় ছিলমদানীটা কলিকায় কলিকায় ভরিয়া গেছে।

খানসামা বলিল—বড় সেতারী এসেছেন,—মজলিস বসবে আজ।

হারাণ কহিল—আমাকে শুনবার একটু সুবিধে করে দিতে হবে ভাই। তানপুরাটা সে ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিল। সেটার দিকে লক্ষ্য করিয়া খানসামা কহিল—আপনিও কি ওস্তাদ না কি?

আচার্য্য বলিল—গান-পাগলা মানুষ দাদা। ওস্তাদ টোস্তাদ কিছু নই।

*　*　*　*

মজলিসে স্থান সে পাইল।

দুগ্ধফেননিভ ফরাসের উপর সারি সারি তাকিয়া পড়িয়া ছিল। সোনারূপার সাত আটটা ফুরসী গড়গড়া পড়িয়া আছে। রূপার পরাতে প্রচুর পানের খিলি, আতরদানে আতর ও তুলা শোভা পাইতেছিল। দুই তিনটা গোলাপপাশ হইতে গোলাপজল ছিটান হইতেছিল। প্রকাণ্ড চারিটা হাতপাখা লইয়া চারিজন খানসামা চারি কোণে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছিল। সুগন্ধি ধূপ ঘরের চারিদিকে জ্বলিতেছে। ক্রমে

এক কোণে সে বসিল। প্রথমেই বিতরণ করা হইল পাণ ও আতর। সম্মানী সম্ভ্রমী ব্যক্তিদের গলায় ফুলের মালা দেওয়া হইল।

তার পর আরম্ভ হইল সঙ্গীত। ওস্তাদের সুনিপুণ অঙ্গুলী স্পর্শে সেতার সত্য সত্যই গান গাহিয়া উঠিল। জোয়ারীর তারগুলির ঝঙ্কারে মানুষ, আলো, এমন কি ঘরখানার জড় উপাদান পর্য্যন্ত যেন মোহাবিষ্ট হইয়া গেল। ঘরের জানালার গরাদেতে হারাণ হাত দিয়াছিল, সে অনুভব করিল লোহার গরাদের মধ্যেও সে ঝঙ্কার প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সঙ্গীতের গতি দ্রুত হইতে আরম্ভ হইল, দুনে বাজনা চলিল। আঙ্গুলের ছোঁয়ায় তারের মধ্য হইতে সুরের ফুলঝুরি যেন ছড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

মধ্য পথেই কিন্তু সঙ্গীত শেষ করিতে হইল। যন্ত্রী তবলচীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—আপকো হাঁত আর নেহি চলেগা।

বাদক লজ্জিত হইয়া বলিল—আমার শিক্ষা সামান্যই।

অবসর পাইয়া খানসামা সরবৎ ধরিয়া দিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুরা। ফুরসী গড়গড়ার ডাকে মজলিসটা মুখরিত হইয়া উঠিল। ধুতুরা ফুলের মত লম্বা একটী রূপার কলিকা আসিল ওস্তাদের জন্যে। ওস্তাদের হাত হইতে কলিকাটা ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইল।

ওস্তাদজী আবার সেতার তুলিয়া কহিলেন—আওর কই হ্যায় সঙ্গীত করণেকো লিয়ে।

মালিক মনোহর সিংহ চারিদিকে চাহিলেন, অবশেষে লজ্জিতভাবেই বলিলেন—দুসরা আদমী ত কোই নেহি হ্যায়!

হারাণ উঠিয়া পড়িল। আভূমিনত এক নমস্কার করিয়া যোড়হাতে কহিল, হুজুর—হুকুম হয় যদি, তবে আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।

গৃহস্বামী স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন,—পারবে তুমি?

ওস্তাদ কহিলেন—আইয়ে—বয়ঠিয়ে!

একজন বলিয়া উঠিল—পাগল নয় ত?

ওস্তাদ কহিলেন—কোকিল বনমে রহে বাবুজী—রঙ্গভি কালা উস্কা। লেকেন গানেওলাকে বাদশা ওহি।

গৃহস্বামী আতর পাণে মাল্য করিয়া হারাণকে সঙ্গত করিতে অনুমতি দিলেন। সঙ্গত আরম্ভ হইল।

আচার্য্যের হাতে চর্ম্মবাদ্য সেতারের সুরে সুর মিশাইল। অপূর্ব্ব সমন্বয়ে সুসঙ্গত রূপে সঙ্গত শেষ হইল। ওস্তাদ যন্ত্রখানি পাশে রাখিয়া তারিফ করিয়া উঠিলেন—বহুৎ আচ্ছা। বহুৎ মিঠা হাত আপকা।

মালিক একগাছি মালা আচার্য্যের গলায় পরাইয়া দিয়া কহিলেন—ওস্তাদজীর কোথায় বাড়ী? কি নাম আপনার?

যোড়হাত করিয়া হারাণ কহিল—ভবঘুরে হুজুর আমি। গানবাজনা করেই বেড়াই। নাম আমার নারায়ণচন্দ্র রায়।

এ নামটা পথে পা দিবার সময়ই সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল।

সেতার সঙ্গতের শেষে ওস্তাদের অনুরোধে হারাণ গানও গাহিল। খুসী হইয়া মনোহরবাবু হারাণকে সুরাপাত্র আগাইয়া দিলেন।

পাত্রটী কপালে ঠেকাইয়া হারাণ সসঙ্কোচে নামাইয়া রাখিল, করযোড়ে কহিল—হুজুর, সুরের কারবারী আমি, সুরা আমার গুরুর নিষেধ।

ওস্তাদজী কহিলেন—বহুৎ আচ্ছা। সাচ্চা আদমী আপ্।

মনোহরবাবু জড়িতকণ্ঠে বলিলেন—মদ না খাও, মাতলামী কিন্তু করতে হবে।

হারাণ কহিল—নাচব হুজুর? বাইজী নাচ?

চারিদিক হইতে রব উঠিল—বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা।

* * * *

মনোহরবাবুর আশ্রয়েই হারাণ আচার্য্য থাকিয়া গেল। এমনি একটী আশ্রয়ই যেন সে খুঁজিতেছিল। জীবনের চারিদিকে বিলাসের আরামে তাহার যেন ঘুম আসিল। কর্ম্মের দায়িত্ব নাই, শুধু বাবুর মনস্তুষ্টি করিলেই হইল। বাবু ঘামিলে সে বাতাস করে, অকারণে ছিলমচী খানসামাকে ধমক দিয়া নূতন কলিকা দিতে আদেশ দেয়। মনোহরবাবু শীকারে যান, সঙ্গে হারাণ থাকে। সে অবিকল তিতিরের ডাক ডাকে,

বনমধ্য হইতে তিতির সাড়া দিয়া উঠে। সন্ধ্যায় সেতার শোনায়, গান গায়, পাখীর মাংস রাঁধিয়া দেয়। রান্নাতেও হারাণের হাত বড় মিঠা। যায় না সে শুধু বাঘ শীকারের সময়। যোড়হাত করিয়া বলে—

আজ্ঞে আমার কত্তাবাবাকে বাঘে ধরে খেয়েছে। জ্যান্ত বাঘ দেখা আমাদের বংশে নিষেধ আছে।

মনোহরবাবুর জীবনে সে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। নারাণ রায় ভিন্ন একদণ্ড তাঁহার চলে না। হারাণের জীবনও বড় সুখেই কাটিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে সে কেমন হইয়া উঠে। বারবার ঠাকুরবাড়ীতে যায়, চারিদিকে চায়, পাথরের মন্দিরের প্রতি পাথরটা যেন মনে আঁকিয়া লয়। দ্বারের সশস্ত্র প্রহরীটাকে দেখিয়া অকারণে শিহরিয়া উঠে।

সেবার শীকারের পর্ব্বটা প্রবলভাবে জমিয়া উঠিয়াছিল। খাঁটী আমিরী চালে সমস্ত চলিতেছিল। বন্ধু, বাইজী, সঙ্গীত, সুরা, হাতিয়ার, হাতী, কিছুরই অভাব ছিল না। সন্ধ্যার পর হইতে নাচ-গানের আসর বসে। বাইজী নাচে, রায়জী সঙ্গত করে। রজনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রায়জী সঙ্গত ছাড়িয়া বাইজীর পদধূলি মাখিয়া গড়াগড়ি দেয়।

সেদিন মনোহর বাবু তারিফ করিয়া কহিলেন—বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা!

রায়জী কাঁদিয়া আকুল হইল—হুজুর আমার পরিবার বড় ভাল নাচত। আহা-হা—সে মরে গেল! দেখবেন সে নাচ হুজুর?

সাঁওতাল নাচ নাচিতে সুরু করিল সে।

সুরার অবসাদে ক্রমশঃ ক্রমশঃ উত্তেজনা কোলাহল স্তিমিত হইয়া আসিল। বাইজীর দল চলিয়া গেল। ঘুমে সব অচেতন। হারাণ উঠিয়া তাঁবুর দরজার পর্দ্দাটা টানিয়া দিল। তার পর মনোহরবাবুর পাশে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। মনোহরবাবুর নাক ডাকিতেছিল। বাতাসের আরামে সে ধ্বনি আরও গভীর হইয়া উঠিল। পাখাখানি রাখিয়া হারাণ তাঁহার বুকে হাত দিল। মোটা সোনার চেনটা সে খুলিতেছিল। অকস্মাৎ তন্দ্রারক্ত চোখ মেলিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে বকিতে মনোহরবাবু পাশ ফিরিয়া শুইলেন। হারাণের বুকটা গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল।

মনোহরবাবু উঠিয়া বিরক্তিভরে কহিলেন—এগুলো রাখ ত রায়জী। এই ঘড়ি চেন—বোতাম—বুকে লাগছে আমার।

হারাণের সর্ব্বাঙ্গ স্বেদাপ্লুত হইয়া উঠিল।

বাবু বলিলেন—নাও না হে খুলে!

হারাণ তাঁবুর দুয়ারের দিকে তাকাইল। জাগ্রত প্রহরীর পদশব্দের বিরাম নাই। জিনিষগুলি হাতের অঞ্জলিতে আবদ্ধ করিয়া সে নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া রহিল। প্রভাতে মনোহরবাবু উঠিতেই সে দুই হাতে জিনিষগুলি লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

বাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—ওগুলো তোমার বকশিশ রায়জী। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে বলতে ভুলে গিয়েছি।

হারাণ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

মনোহরবাবু বলিলেন—গুণী লোক তুমি রায়জী, তোমাকে এর চেয়ে ঢের বেশী দেওয়া উচিত। কিন্তু সিংহবংশের আর সে দিন ত নেই।

হারাণ ধীরে ধীরে কহিল—আমাকে কি বিদে[illegible] ক'রে দিচ্ছেন বাবু?

হাসিয়া মনোহরবাবু বলিলেন—বামুনজাত কি না দক্ষিণে পেলেই ভাবে বিদেয় করে দিল বুঝি। যা[illegible] বলে দাও দেখি, খেয়ে দেয়েই তাঁবু ভাঙতে [illegible] আজই উঠতে হবে।

* * * *

গজভুক্ত কপিথের মত সিংহবাড়ীর অন্তঃসার বহুদি[illegible] হইতেই নষ্ট হইতে বসিয়াছিল। সে দিন একটা ব[illegible] মহলের নায়েব সংবাদ লইয়া আসিল—বৎসর বৎস[illegible] নিয়মিতরূপে রাজস্ব না পাইয়া জমিদার বড় রুষ্ট হইয়াছে[illegible] —অষ্টম নালিশ দায়ের করিয়াছেন। মহলের টা[illegible] ইতিপূর্ব্বেই আদায় হইয়া সদরে আসিয়াছে। সুত[illegible] এখন সদর হইতে টাকা দিয়া মহল রক্ষা করিতে হই[illegible]

মনোহরবাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সদা[illegible] মুখে তাঁহার চিন্তার ঘন বিষণ্ণ ছায়া ঘনাইয়া আসি[illegible]

সদর-নায়েবকে ডাকিয়া তিনি [illegible]

কেঁয়ে বেটার কাছে একবার দেখে আস্থন তা' হ'লে। দশহাজার টাকা হলেই ত হবে।

নায়েব নতমুখে বসিয়া রহিল। বাবু বলিলেন—কালই যান তাহ'লে। কি বলেন?

ধীরে ধীরে নায়েব কহিল—লোকটা বড় পাজী। যা তা বলে। ওর কাছে টাকাও নেওয়া হ'ল অনেক।

মনোহরবাবু শুধু কহিলেন, হুঁ।

তার পর আবার মৃদুস্বরে বলিলেন—থাক তা হ'লে।

নায়েব প্রশ্ন করিল—কিন্তু অষ্টমের কি হবে?

—যাবে। কি করব—উপায় কি?

—অন্য কোথাও দেখব চেষ্টা করে?

—দেখুন। কিন্তু—। সজাগ হইয়া তিনি নল টানিতে আরম্ভ করিলেন। নায়েব চলিয়া গেল।

সন্ধ্যায় মজলিস বসিল। মনোহরবাবু হুকুম করিলেন—আজ করুণ রসের গান তুমি শোনাও রায়জী। মন যাতে উদাস হয়, চোখে জল আসে।

সুরা সেদিন তিনি স্পর্শ করিলেন না।

রাত্রে মজলিস ভাঙিল। পারিষদের দল চলিয়া গেল। বাবু বাড়ীর মধ্যে যাইবার জন্য উঠিলেন। হারাণ যোড়হাত করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

মনোহরবাবু হাসিয়া বলিলেন—কি রায়জী?

—একটা নিবেদন আছে হুজুর।

—কি বল।

—একটু নির্জ্জন—

মনোহরবাবু আলোক-ধারী খানসামাটাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাহার পশ্চাতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া হারাণ কহিল—

—হুজুর অভয় দিতে হবে আগে।

—কি ভয় তোমার? বল তুমি বল।

—গরীব ভিক্ষুক আমি হুজুর, আপনার অন্নে বেঁচে আছি আমি। হুজুর—আমার—আমার......

মনোহরবাবু বলিলেন—বল, ভয় কি?

হারাণের জিভটা যেন শুকাইয়া আসিতেছিল, সে কহিল—আমার কিছু টাকা আছে হুজুর—হাজার দশেক [illegible]। হুজুরের দরকারে যদি লাগে—

মনোহরবাবু স্থির দৃষ্টিতে হারাণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হারাণ বলিল—পরে আবার আমাকে দেবেন হুজুর।

মনোহরবাবু রুদ্ধকণ্ঠে শুধু কহিলেন—রায়।

তার পর আর তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না। অন্ধকারের মধ্যেই তিনি অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। আলোকের কথা তাঁহার আজ খেয়াল হইল না।

হারাণের চোখ দিয়া জল আসিল। বাবুর নীরব ধন্যবাদের ভাষা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। চাকরটাকে আলো লইয়া বাবুর সঙ্গে যাইতে বলিয়া দিয়া গুন্‌গুন্ স্বরে সে ধরিল একখানি বেহাগ।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে হারাণ উঠিয়া চলিল পতিত আবর্জ্জনাভরা একটা স্থান লক্ষ্য করিয়া। নির্দিষ্ট একটী স্থান খুঁড়িয়া বাহির করিল ধাতুময় পাত্র একটী। তাহার মুখাবরণ খুলিয়া হারাণ বাহির করিল—সোনার বাট একখানি। অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণ বর্ণ ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। সেখানা রাখিয়া তুলিল আর একখানি। সেও তেমনি উজ্জ্বল। ও-গুলি ছাড়া আরও দুইটী বস্তু ঝক্ ঝক্ করিতেছিল—সে তাহার নিজের চোখ।

সকালে উঠিয়া কিন্তু হারাণকে আর পাওয়া গেল না। তাহার তানপুরাটাও নাই।

মনোহরবাবু বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন—সে চলে গিয়েছে। আর আসবে না।

* * * *

হারাণ এবার আসিয়া উঠিল কাশীতে।

ভাগ্যগুণে অবিলম্বে আশ্রয়ও একটা জুটিয়া গেল। পথেই সে গিরিমাটীতে কাপড় ছোপাইয়া লইয়াছিল। গেরুয়ার উপর তানপুরা দেখিয়া লোকে তাহাকে শ্রদ্ধার উপর ভালবাসিল। তাহার সঙ্গীত শুনিয়া ডাকিয়া তাহাকে একটা মঠে আশ্রয় দিল।

চারিদিকে ধর্ম্মের সমারোহ। সেই সমারোহের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া হারাণ যেন ডুবিয়া গেল। সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মন যেন তাহার পবিত্র হইয়া গেছে। দিবারাত্রি শিব নামের কলরোলের মধ্যে সে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সন্ধ্যায় যোগীরাজের স্তব করে সে ধ্রুপদ ধামারের মধ্য দিয়া। তাহার

আচারে, ব্যবহারে একটা আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল যেন। ইতর রসিকতা আর মুখ দিয়া বাহির করিতে কেমন লজ্জা করে। সংযত মৃদুভাবে সে কথা কয়।

এদিকে অল্প দিনের মধ্যেই গানের জন্য তাহার খ্যাতি রটিয়া গেল। নানা মঠ হইতে নিমন্ত্রণ আসিতে আরম্ভ করিল। সাধু সন্ন্যাসীরা গানে মুগ্ধ হইয়া সাদরে কোল দিয়া বলেন—বিশ্বনাথকো রুপা আপকো পর হো গিয়া।

হারাণের চক্ষে জল আসে। সে জোর করিয়া তাঁহাদের পায়ে ধূলি লইয়া বলে—আশীষ করিয়ে মহারাজ!

কিন্তু দুটী মানুষের মুখ অহরহ তাহাকে পীড়া দেয়। তমোরীশের অসহায় কচি মুখখানি মনে পড়ে;—যখনই অনুদিত প্রাতে উষার আলোয় সে সেতার লইয়া বসে তখনই মনে হয় তমোরীশ কুরঙ্গ শিশুর মত নীরবে মুগ্ধ চক্ষু দুটী মেলিয়া গান শুনিতেছে। আর মনে পড়ে মনোহরবাবুর মুখ। তাঁহার সেই অবরুদ্ধ কণ্ঠের দুটী কথা 'রায়', তাঁহার সেই ছল ছল চোখ—সব মনে পড়ে।

তবু সে ভগবানকে ধন্যবাদ দেয় যে অন্তরে একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে।

মঠের ফটকে বসিয়া ভিক্ষা করে এক অন্ধ। পদশব্দ শুনিলেই সে চীৎকার করে—অন্ধকে দয়া কর বাবা। বিশ্বনাথ তোমার কল্যাণ করবেন বাবা! হারাণের পদশব্দেও সে ভিক্ষা চায়। হারাণ হাসিয়া বলে—আমিরে বাবা।

ভক্তিভরে অন্ধ কহে—সাধু বাবা, প্রণাম বাবা!

হারাণ আশীর্ব্বাদ করে।

এক এক দিন আক্ষেপ করিয়া অন্ধ বলে—আজ আর কেউ কিছু দিলে না বাবা!

—কিছু পাও নি? একটু চিন্তা করিয়া হারাণ সেইখানে দাঁড়াইয়াই গান ধরিয়া দেয়। চারি পাশে মুগ্ধ পথিকের দল ভিড় জমাইয়া দাঁড়ায়। গান শেষ করিয়া হারাণ সকলকে অনুরোধ করে—এই অন্ধকে একটা ক'রে পয়সা দিয়ে যান দয়া করে।

পয়সা পড়িতে থাকে। ভিড় ভাঙিয়া গেলে হাত ধুলাইয়া পয়সাগুলি তুলিতে তুলিতে অন্ধ কৃতজ্ঞতাভরে বলে—বাবা—সাধুবাবা!

হারাণ অন্যমনস্কভাবে অন্ধের দিকে চাহিয়া থাকে; তার পর অকস্মাৎ দ্রুতপদে সে চলিয়া যায়।

অন্ধটা রাত্রে মঠের মধ্যেই এক পাশে পড়িয়া থাকে। ছেঁড়া একটা কম্বল ও চামড়ার একটী বালিশ তাহার সম্বল।

সেদিন অন্ধটা বলিল—সাধুবাবা!

—কি রে?

—আমার একটী কাজ ক'রে দেবে বাবা?

—কি?

একটু ইতস্তত: করিয়া অন্ধ বলিল—কাল বলব।

পরদিন চলিয়া গেল। অন্ধও কিছু বলিল না, হারাণেরও সে কথা মনে ছিল না। তাহার পরদি[illegible] অন্ধ আবার কহিল—আমার কথা শুনলেন না সাধুবাবা?

হারাণ হাসিয়া বলিল—কই, তুমিও ত কিছু বল্লে না।

অন্ধ বলিল—আজ বলব।

—বল।

অন্ধ প্রশ্ন করিল—কে রয়েছে বাবা এখানে?

চারিদিক দেখিয়া হারাণ কহিল—কই—কেউ [illegible] নাই।

অতি মৃদুস্বরে অন্ধ বলিল—আমায় কিছু সোনা [illegible] দেবে বাবা?

হারাণ চমকিয়া উঠিল।

চামড়ার বালিশটা কোলের কাছে টানিয়া [illegible] অন্ধ কহিল—তামা, রূপো বড় ভারী হয় বাবা। অ[illegible] ক'বার এক সাধু আমায় এনে দিয়েছিল। কিন্তু [illegible] কালে—

সে চুপ করিয়া গেল। হারাণের হাত পা থর[illegible] করিয়া কাঁপিতেছিল।

অন্ধ বলিল—তার ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম বাবা।

চামড়ার বালিশটা ওপাশে সরাইয়া কনুইএর চাপ দিয়া সে বসিল। কহিল—সাধু বাবা!

—হুঁ।

—এনে দেবে বাবা?

হারাণ কহিল—দেব। কাল দেব।

পরদিন প্রাতে অন্ধটার কাতর ক্রন্দনে মঠে[illegible]

ভিড় জমিয়া গেল। তাহার সেই চামড়ার বালিশটা খোয়া গিয়াছে। সেই বালিশটার মধ্যেই তাহার জীবনের সঞ্চয় সঞ্চিত ছিল, কয়খানি সোনার বাট, কিছু টাকা—কিছু পয়সা।

অন্ধ বার বার বলিতেছিল—সেই চোর সাধু—সেই বদমাস—

দীনতা ও হীনতার তাড়নায় গালাগালির অশ্লীলতায় স্থানটাকে কদর্য্য করিয়া তুলিল। বুক চাপড়াইয়া, পাথরের চত্বরে মাথা কুটিয়া নিজের অঙ্গ ও পবিত্র দেবভূমি রক্তাক্ত করিয়া তুলিল।

* * *

মাস চারেক পরে মনোহর বাবু একখানা পত্র পাইলেন।

বর্দ্ধমান হাসপাতাল হইতে রায়জী পত্র লিখিয়াছে—

মৃত্যু শয্যায় শুইয়া আজ আপনাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা হইতেছে। আজ দুই মাস হইল অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া হাসপাতালে মরিতে আসিয়াছি। একবার দয়া করিয়া আসিবেন। ইতি—

আশ্রিত

নারায়ণচন্দ্র রায়

পরিশেষে হাসপাতালের চিকিৎসক জানাইয়াছেন—[illegible]লে সত্বর আসিবেন। এক সপ্তাহের অধিক রোগীর জীবনের আশা করা যায় না।

মনোহর বাবু রায়ের এ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে [illegible]লেন না। তিনি তাহার পরদিনই বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। অপরাহ্ন বেলায় তিনি হাসপাতালে হারাণের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—রায়জী!

সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া হারাণ পশ্চিমাকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। বাবুকে দেখিয়া ঠোঁট দুইটী তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

বাবু কহিলেন—ভয় কি? ভাল হয়ে যাবে তোমার।

বহুক্ষণ পর আপনাকে সংযত করিয়া হারাণ কহিল—আর না; বাঁচবার কথা আর বলবেন না। আমার [illegible] যাওয়াই ভাল।

মনোহর বাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

তাঁহার হাত দুটী ধরিয়া মিনতি ভরে হারাণ বলিল—আমাকে মাপ করুন বাবু!

অম্লান হাসি হাসিয়া বাবু কহিলেন—সে কথা আমি কোন দিন মনে করি নি রায়জী। তা ছাড়া তোমার আশীর্ব্বাদে সম্পত্তি আমার রক্ষা হয়েছে।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হারাণ বলিল—আরও অপরাধ আমার আছে। আমি আপনাকে ঠকিয়েছি। আমি পাপী। আমার নাম নারাণ রায় নয়—

বাধা দিয়া মনোহর বাবু বলিলেন—জানি, তোমার নাম হারাণ আচার্য্য। সে থাক।

কথায় কথায় বেলা পড়িয়া আসিল। বাবু কহিলেন—একটা কথা বলব রায়জী?

জিজ্ঞাসু নেত্রে হারাণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মনোহর বাবু বলিলেন—পাপের ধনটা দিয়ে একটা ভাল কাজ তুমি করে যাও যাবার সময়।

দুই হাতে বাবুর হাত ধরিয়া ব্যগ্রতা ভরে হারাণ বলিল—উদ্ধার করুন বাবু আমায় উদ্ধার করুন। ওগুলো যেন বুকে চেপে বসে আছে আমার,—প্রাণ আমার বেরুচ্ছে না।

বাবু কহিলেন—হাসপাতালেই টাকাগুলো তুমি দিয়ে যাও। এই হাসপাতালেই দিয়ে যাও।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হারাণ সংযত ভাবে ধীরে ধীরে বলিল—বর্দ্ধমান ষ্টেশনের ধারেই একটা ছোট বাড়ী শেষে করেছিলাম। সেই ঘরের মেঝেতে—

সে নীরব হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর আবার কহিল—এবার কটা বাঘ মারলেন?

আরও কয়টা কথা কহিয়া বাবু উঠিলেন—বলিলেন—কাল আবার আসব।

আরও একখানা পত্র গিয়াছিল তমোরীশের নামে। হৈম তমোরীশকে লইয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যার পরই তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। হৈম কাঁদিয়া কহিল—অসুখ হলে আমার কাছে গেলে না কেন?

তমোরীশকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে দুটী জলের ধারা তাহার গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ পর কহিল—তমোরীশ, আমার টাকা আছে তোকে বলে যাই।

হৈম বলিল—না দাদা, ব্যস্ত হয়ো না। ভাল হয়ে ওঠ আগে।

হৈমর মুখের দিকে হারাণ চাহিয়া রহিল।

ঔষধ দিবার সময় হইয়াছিল। একজন নার্স আসিয়া ঔষধ দিতে গিয়া রোগীর গায়ের উত্তাপ অনুভব করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। আবার সে একজন ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। অবস্থা দেখিয়া একটা ইন্‌জেকসন দিয়া ডাক্তার কহিলেন—তোমার যদি কোন কথা বলবার থাকে কাউকে—তবে বলে রাখাই ভাল।

হৈম কহিল—দাদা?

মুখের দিকে চাহিয়া হারাণ বলিল—নিশি কেমন আছে হৈম?

হৈম সে প্রশ্ন গ্রাহ্য করিল না, কহিল—তমোরীশকে কি বলবে বলছিলে দাদা!

পাশ ফিরিয়া শুইয়া হারাণ কহিল—'কাল—কাল বলব। ঠিক বলব।'

*   *   *

সেই রাত্রেই হারাণ মারা গেল। হৈম তমোরীশ কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেল। গোটা ঘরখানা খুঁড়িয়া, দেওয়াল ভাঙিয়াও কিছু না পাইয়া মনোহরবাবু একটী সকরুণ হাসি হাসিলেন। সে ধনটা কিন্তু ছিল—ছিল অদূরে নিবিড় একটা জঙ্গলের মধ্যে।

কলিকাতায় মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম-এ, এফ-আর-ই-এস-সি-এ-আই-বি (লণ্ডন)

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বার্ম্মিংহাম মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতিতে, সমস্ত পৃথিবীতে, বিশেষতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র, মিউনিসিপাল ব্যাঙ্কের সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা এবং ঐরূপ ব্যাঙ্ক স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। রাইট্ অনারেব্‌ল্ নেভিল চেম্বারলেন ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যখন বার্ম্মিংহাম করপোরেশনের লর্ড মেয়র ছিলেন, তখন একটা মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক স্থাপনের ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগে। তখন ইয়োরোপে মহাসমর চলিতেছে এবং ব্রিটিশ সরকার তখন সমর-ঋণ তুলিতে ব্যস্ত। যাহাতে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া ভাল সুদে টাকা খাটাইতে পারে এই জন্য বার্ম্মিংহাম মিউনিসিপালিটীর কর্ম্মকর্ত্তাগণকে নানা বাঁধাধরার মধ্যে ব্যাঙ্ক করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। পার্লামেণ্টের দুই হাউসে অনেক বাগ-বিতণ্ডার পর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট এই বিল রাজসম্মতি পাইয়া আইনে পরিণত হয়। এই বিলের একটী ধারায় এরূপ ব্যবস্থা ছিল যে মহাযুদ্ধ স্থগিত হইবার তিন মাস মধ্যেই এইরূপ ব্যাঙ্ককে ব্যবসা বন্ধ করিতে হইবে। সুতরাং যে আইনবলে মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা ইংরাজ জাতির সাময়িক সুবিধার দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছিল,—পাকাপাকি ভাবে মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া করদাতা, সাধারণ গৃহস্থ ও শ্রমিকের হিতসাধন তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। এই আইনবলে ১৯১৬ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর "বার্ম্মিংহাম করপোরেশন সেভিংস ব্যাঙ্ক" স্থাপিত হয়। এই ব্যাঙ্ক স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তাগণ করদাতাগণকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যদিও যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাঙ্ক তুলিয়া দিতে হইবে, তথাপি, যদি সত্য সত্যই বার্ম্মিংহামের জনসাধারণ মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক চায়, তাহা হইলে পৃথক আইন করিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখা অসম্ভব হইবে না। বার্ম্মিংহাম করপোরেশন সেভিংস ব্যাঙ্ক ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯১৬ হইতে কার্য্য আরম্ভ করিয়া ৩১শে অক্টোবর ১৯১৯ পর্য্যন্ত আমানত গ্রহণ করিয়াছিল এবং মোট ৬,০৩,৩১৯ পাউণ্ড জমা (Deposit) পাইয়াছিল। উক্ত জমা হইতে মোট ২,৯৫,৭০৪ পাউণ্ড তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং ব্যাঙ্কের খাতায় মোট ২৪,৪১১ জন আমানতকারীর নাম ছিল।

বার্ম্মিংহাম করপোরেশন সেভিংস ব্যাঙ্কের আয়ুষ্কাল ফুরাইবার [illegible] হইতেই যাহাতে পাকাপাকি রকমে মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক প্র[illegible] হইতে পারে তাহার চেষ্টা চ[illegible] ১৯১৯ সালের ২৫শে জুন বার্ম্মিংহাম করপোরেশন বিলের আলোচনা সুরু হইল। এবারে গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি নানা কার্য্যে ব্যাঙ্কের ক্ষমতা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইল। ১৫ই আগষ্ট ১৯১৯ বার্ম্মিংহাম করপোরেশন বিল রাজসম্মতি পাইয়া আইনে পরিণত হইল। ঐ বৎসরেই ১লা সেপ্টেম্বর হেড্ আপিষ ও সতেরটী শাখা লইয়া "বার্ম্মিংহাম মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক" কার্য্য আরম্ভ করিল। উক্ত আইন এবং বার্ম্মিংহাম করপোরেশন (জেনারেল পাওয়ার্স) আইন ১৯২৯ এবং বার্ম্মিংহাম মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক রেগুলেসন্‌স্ ১৯৩০ দ্বারা বর্ত্তমান ব্যাঙ্কের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে বিনা বাধায় বার্ম্মিংহাম মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় নাই। মহাযুদ্ধের সময় যখন সেভিংস ব্যাঙ্ক হিস[illegible] খুব বাঁধাবাঁধির মধ্যে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়, তখন জয়েণ্ট[illegible]

বিশেষ বাধা দেয় নাই এবং ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার পরে আংশিকভাবে সাহায্যও করিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে স্থায়ীভাবে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট বিরুদ্ধতা করিয়াছিল। বার্ম্মিংহামের তরফ হইতে বলিবার এই ছিল যে সেখানে যখন মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, তখন উহা তুলিয়া দিলে জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা হইবে। এই যুক্তির জোরে ও কয়েকজন কর্ম্মীর অদম্য চেষ্টায় ও উৎসাহে মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল। ধনিক (Capitalistic) সমাজে এইরূপ সার্ব্বজনীন (Socialistic) প্রতিষ্ঠানকে বাধা দেওয়া হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই ; এবং এইরূপ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে যে পুরাতন প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির লাভহানির যথেষ্ট কারণ আছে, তাহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না। তবে সর্ব্বসাধারণের এবং রাষ্ট্রের মঙ্গলের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এইরূপ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান যে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সমাজ-কল্যাণকর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কলিকাতা মহানগরীতে এইরূপ একটা ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের যে কিরূপ আবশ্যকতা আছে, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাউক।

কলিকাতা সহর এবং ইহার উপকণ্ঠে মোট ২০টী ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক আছে। ইহার মধ্যে ইংলণ্ড ও ব্রিটিশ উপনিবেশের ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৯টী, জাপানী ১টী, হল্যাণ্ড ও উপনিবেশ ২টী, আমেরিকার ২টী এবং ৬টী ভারতীয়। এই ৬টী ভারতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে একটী (এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) আবার বিলাতী ব্যাঙ্ক কিনিয়া লইয়াছে। অন্যটী ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া। এখন এই ব্যাঙ্কগুলির মূলধন এবং লাভের উদ্বৃত্ত মজুত তহবিল (Reserve) দেখা যাউক।

বৃটিশ ও ঔপনিবেশিক

...টার্ড ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া ...ষ্ট্রেলিয়া এণ্ড চায়না	মূলধন—৩০,০০,০০০ পাউণ্ড রিজার্ভ—৩০,০০,০০০ পাউণ্ড
...র্ণ ব্যাঙ্ক	মূলধন—১০,০০,০০০ পাউণ্ড রিজার্ভ—৫,০০,০০০ পাউণ্ড
...গুলে এণ্ড কোম্পানী	মূলধন—২,০০,০০০ পাউণ্ড রিজার্ভ—১,০০,০০০ পাউণ্ড
... কং স্যাংহাই ব্যাঙ্কিং ...রপোরেশন	মূলধন—২,০০,০০,০০০ ডলার রিজার্ভ—১,০০,০০,০০০ ডলার ৬৫,০০,০০০ পাউণ্ড
...াস্ কুক্ এণ্ড সন্স	মূলধন—১,২৫,০০০ পাউণ্ড রিজার্ভ—১,২৫,০০০ পাউণ্ড
...ড্স ব্যাঙ্ক	মূলধন—১,৫৮,১০,২৫২ পাউণ্ড রিজার্ভ—৮০,০০,০০০ পাউণ্ড
...র্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক ... ইণ্ডিয়া	মূলধন—১০,৭৫,০০০ পাউণ্ড রিজার্ভ—১০,৫০,০০০ পাউণ্ড
...ন্যাল ব্যাঙ্ক	মূলধন—২০,০০,০০০ পাউণ্ড [illegible],০০০ পাউণ্ড
পি এণ্ড ও ব্যাঙ্কিং করপোরেশন	মূলধন—২৫,৯৪,১৬০ পাউণ্ড রিজার্ভ—১,৮০,০০০ পাউণ্ড

জাপানী

ইয়োকোহামা স্পেসি ব্যাঙ্ক	মূলধন—১০,০০,০০,০০০ ইয়েন রিজার্ভ—১১,৭৩,০০,০০০ ইয়েন

হল্যাণ্ডীয়

নেদারল্যাণ্ডস্ ট্রেডিং সোসাইটী	মূলধন—৮,০০,৩০,০০০ ফ্লোরিণ রিজার্ভ—২,০০,১৫,০০০ ফ্লোরিণ
নেদারল্যাণ্ডস্ ইণ্ডিয়া কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক	মূলধন—৫,৫০,০০ ০০০ গিল্ডার্স রিজার্ভ—২,৪১,৯০,৩২৪ গিল্ডার্স

আমেরিকান

ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অফ্ নিউইয়র্ক	মূলধন—১২,৪০,০০,০০০ ডলার রিজার্ভ—৫,০০,০০,০০০ ডলার
য়্যামেরিকান এক্সপ্রেস্ কোম্পানী (প্রাইভেট)	মূলধন— ,৬০,০০,০০০ ডলার

ভারতীয়

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া (বিলাতী)	মূলধন—৫,৬২ ৫০,০০০ টাকা রিজার্ভ—৫,১৭,৫০,০০০ টাকা
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া (বোম্বাই)	মূলধন—১,৬৮,১৩,২০০ টাকা রিজার্ভ—৭০,০০,০০০ টাকা
ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া (বোম্বাই)	মূলধন—১,০০,০০,০০০ টাকা রিজার্ভ—১,০০ ০০,০০০ টাকা
এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (বিলাতী)	মূলধন—৩৫,৫০,০০০ টাকা রিজার্ভ—৪৪,৫০,০০০ টাকা
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পাঞ্জাবী)	মূলধন—৩১,২৬,০৪৪ টাকা রিজার্ভ—২১,১৬, ৭৬৭ টাকা
বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক (বাঙ্গালী)	মূলধন—৩,৫০,২৬২ টাকা রিজার্ভ—১,৫৯,৮৫১ টাকা

বর্ত্তমান বাজার দর অনুযায়ী ১৩৶০ আনায় এক পাউণ্ড, ১০০৲ টাকায় ৬২ গিল্ডার, ৮৩৷০ আনায় ১০০ ইয়েন, ১০০৲ টাকায় ৯৬·৭৫ হংকং ডলার এবং ২৯০৲ টাকায় ১০০ মার্কিন ডলার পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের প্রধান সহর কলিকাতায় বাঙ্গালীর ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের মূলধন ও রিজার্ভ দেখিলেই ব্যাঙ্ক জগতে আমাদের স্থান কোথায় বুঝিতে আর কষ্ট হয় না। অথচ বাঙ্গালায় এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রথমে বাঙ্গালী শেঠ ব্যাঙ্কারের সাহায্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া আজ যাহার মূলধন ও রিজার্ভ ৪২ লক্ষ পাউণ্ড তাহাও প্রথমে বাঙ্গালীর সাহায্যে এই কলিকাতায়ই স্থাপিত হইয়াছিল। পরে বাঙ্গালীর হাতছাড়া হইয়া গিয়া মূলধন টাকা হইতে পাউণ্ডে পরিবর্ত্তিত এবং হেড আপিস কলিকাতা হইতে লণ্ডনে স্থানান্তরিত

হইয়াছিল। আজ বাঙ্গলার লাহা-কর-মল্লিকগণের টাকায় বিলাতী ব্যাঙ্কের তহবিল পুষ্ট হইতেছে এবং বিদেশী ব্যবসায়িক সাহায্য করিতেছে।

বাঙ্গলার ধনিকগণ বসিয়া থাকিলেও, কলিকাতার নাগরিকগণের প্রতিনিধিগণের ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে উদাসীন হইলে চলিবে না। রাস্তা, ঘাট, ড্রেন, পাইখানা, আলোর সঙ্গে সঙ্গে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নতি দরকার, অন্য দিকে, যাহাতে নাগরিকগণের, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর নাগরিকগণের আর্থিক উন্নতি হয়, তাহাও বিশেষ দরকার। সর্ব্বসাধারণ যাহাতে আর্থিক উন্নতি করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাও বর্ত্তমান কালে নগর সভার অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করা হয়। নাগরিকগণের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই যে নগরের উন্নতি সহজসাধ্য হয়! দারিদ্র্য ও অভাবের উপর কোন সভ্যতা ও উন্নতির ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে না। সহজ কথায়, কলিকাতার নিজস্ব ব্যাঙ্ক না হইলে বাঙ্গালীর আপনার বলিয়া টাকা রাখিবার স্থান নাই। আজ নানা দরকারের মধ্যে বাঙ্গালীর অন্ততঃ একটী নিজস্ব ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

কলিকাতায় একটী মিউনিসিপাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার কথা প্রথম ১৯৩০-৩১ সালে উঠে। কাউন্সিলর সনৎকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে কলিকাতা করপোরেশন ঐ বৎসর একটী ব্যাঙ্কের 'স্কীম' তৈয়ার করার জন্য বাজেটে ৫০০০্ টাকা বরাদ্দ করে। ইহার পর হইতে প্রতি বৎসরের বাজেটে বরাদ্দ ছাড়া আর কিছু বিশেষ অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিষয়টী এখনও কমিটি ছাড়াইয়া করপোরেশনের সভায় পৌছে নাই। এই ব্যাঙ্কের 'স্কীম' সম্বন্ধে করপোরেশনের কাগজে শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী, রঙ্গস্বামী, ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, রামচন্দ্র শেঠ এবং বর্ত্তমান লেখক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ফাইন্যান্স কমিটি ও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেন নাই। যাহা হউক, ক্রমেই এইরূপ একটী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার সপক্ষে জনমত প্রবল হইতেছে; এবং আশা করা যায়, কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কলিকাতা করপোরেশন অদূর-ভবিষ্যতে একটি মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া নাগরিক তথা গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থ সঞ্চয়ে সাহায্য করিবে।

কলিকাতা মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে একটী 'স্কীম' তৈয়ার করিবার পূর্ব্বে একবার বার্ম্মিংহাম ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী দেখা যাউক। বার্ম্মিংহাম মিউনিসিপাল ব্যাঙ্কের কোন পৃথক মূলধন নাই। প্রথমে বার্ম্মিংহাম করপোরেশনের টাকা লইয়া কার্য্যারম্ভ হয়। পরে আমানতকারিগণের গচ্ছিত তহবিলের পরিমাণ এত বাড়িয়া যায় যে, করপোরেশনের সম্পূর্ণ টাকা ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন অংশীদার না থাকায় দরুণ এই ব্যাঙ্কের লাভ ব্যাঙ্কেই থাকিয়া যায় এবং রিজার্ভে পরিণত হয়। ১৯৩২ সালের মার্চ্চের হিসাবে দেখা যায় যে, রিজার্ভ জমিয়া ২,৭৪,৯৬০ পাউণ্ড ৩ শিলিং এবং ১১ পেন্সে দাঁড়াইয়াছে। করদাতাগণের লাভই ব্যাঙ্কের লাভ এবং তাহাদের সুবিধা করাই ব্যাঙ্কের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। অথচ ইহাতে মিউনিসিপালিটীর লাভ ব্যতীত লোকসান হয় নাই। করদাতাগণ ব্যাঙ্কের মারফতে কর দিয়া থাকেন; সুতরাং মিউনিসিপালিটীর কর আদায়ের খরচ কমিয়া গিয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে ২,৭৯,৮৮[illegible] খানি বিলের টাকা এইরূপে ব্যাঙ্কের মারফতে আদায় হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত, ব্যাঙ্কের সাহায্যে দিন দিন মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক শ্রেণীর নাগরিকগণ নিজ নিজ বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ব্যক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সহরের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া মিউনিসিপালিটীর কর বৃদ্ধি করিতেছেন। এইরূপে ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে লাভ না লইয়াও বার্ম্মিংহাম করপোরেশন লাভবান হইতেছে এবং দিন দিন সহরের নানা সদনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কের প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এইখানেই জানিয়া রাখা দরকার যে, এই ব্যাঙ্ক সকল রকম ব্যাঙ্কিং কার্য্য করে না। ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য্য যাহাতে স্বল্প প্রয়াসে নাগরিকগণ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা এবং অল্প আয়কারী ব্যক্তিগণকে নিজ নিজ বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য অল্প সুদে কর্জ্জ দেওয়া ও অল্প অল্প করিয়া তাহা সুদসহ আদায় করা। আর একটী প্রধান কার্য্য হইতেছে নাগরিকগণের নিকট হইতে নানারূপ ট্[illegible] আদায় করা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জয়েণ্ট ষ্টক্ ব্যাঙ্কের সহিত এই মিউনিসিপাল ব্যাঙ্কের কার্য্যতঃ কোন বিরোধ নাই; বরং যাহা উক্ত ব্যাঙ্কগুলির সাধারণ কার্য্যাবলীর বহির্ভূত তাহাই করা এবং নূতন করিয়া নাগরিকগণের আর্থিক সুবিধার সৃষ্টি করাই এই ব্যাঙ্কের কার্য্য।

কলিকাতায় একটী মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হই[illegible] মূলধন কোথা হইতে আসিবে এই প্রশ্ন প্রথম উঠিবে। কলিক[illegible] করপোরেশন মিউনিসিপাল ভাণ্ডার হইতে অগ্রিম টাকা দিয়া ব্যাঙ্ক খুলি[illegible] পারে। এইরূপে ব্যাঙ্ক খুলিলে বার্ম্মিংহাম ব্যাঙ্কের মত উল্লিখিত মূল[illegible] না থাকায় দরুণ সমস্ত আমানত টাকার জন্য কলিকাতা মিউনি[illegible]পালিটিকে দায়ী থাকিতে হইবে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় সম্ভব বলিয়া মনে হয় না; এবং এত দিন ব্যাঙ্কের অনুকূলে যতগুলি মতামত পাওয়া গিয়াছে তাঁহার কোনটাই ইহার সপক্ষে নহে। সুতরাং পৃথকভাবে মূলধন সংগ্রহ করিয়া মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করাই সমীচীন। নিম্নে কলিকাতার জন্য মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক স্থাপনের একটী খসড়া দেওয়া গেল।

মূলধন

কলিকাতা মিউনিসিপাল ব্যাঙ্কের মোট এক কোটী টাকা মূলধন হওয়া উচিত এবং ইহার মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা আপাততঃ সংগৃহীত হইয়া কার্য্যারম্ভ হওয়া দরকার। এই সম্পর্কে বার্ষিক ৪৷৷০ সুদে করপোরেশন ২৫ লক্ষ টাকা মিউনিসিপাল ব্যাঙ্কের জন্য কর্জ্জ হিসাবে ২৫ বৎসরে পরিশোধনীয় সর্ত্তে বাজার হইতে ধার করিলে তোলা শক্ত হইবে না। বার্ষিক সুদের এবং শতকরা এক টাকা [illegible] মূল টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিলে করপোরেশন হইতে বৎসর ২,১২,৫০০, ধরুন ২,১৫,০০০ টাকা খরচ হইবে। এই খরচ ২৫ বৎসর ধরিয়া চলিবে। অবশ্য মূলধন পরিশোধের টাকা জমার সঙ্গে সঙ্গে বার্ষিক খরচ কিছু কিছু কমিতে থাকিবে। এই ব্যাঙ্কের প্রত্যেক অংশ ৫০০্ টাকা করিয়া হওয়া উচিত। প্রথম এবং মূল অং[illegible]

করপোরেশন হইবে এবং পরে ইহার অংশ মফঃস্বলের জেলা ও মিউনিসিপালিটীগুলি ক্রয় করিতে পারিবে।

পরিচালন

এই ব্যাঙ্কে মোট এগারজন ডাইরেক্টর থাকিবেন। তাহার মধ্যে কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষ হইতে,—দুইজন কাউন্সিলর বা চেয়ারম্যান, দুইজন করপোরেশনের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, একজন ব্যবসায়ী ও একজন ধন-বিজ্ঞানে পারদর্শী—ইঁহাদের সকলকেই করপোরেশনের সাধারণ সভা মনোনীত করিবে। দুইজন ডাইরেক্টর আমানতকারীগণের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। যাঁহাদের ১০০০৲ কিম্বা উহার বেশী ব্যাঙ্কে জমা আছে, তাঁহারাই নির্ব্বাচনের এবং নির্ব্বাচিত হইবার অধিকারী হইবেন। যে সমস্ত জেলাবোর্ড এবং মিউনিসিপালিটী এই ব্যাঙ্কের অংশ গ্রহণ করিবে, তাহাদের পক্ষ হইতে তিনজন ডাইরেক্টর নির্ব্বাচিত হইবেন; কিন্তু কোন এক মিউনিসিপালিটী বা জেলা বোর্ড হইতে একাধিক ডাইরেক্টর নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না।

কার্য্যাবলী

এই ব্যাঙ্ক চলতি, সেভিংস, প্রভিডেণ্ট, স্থায়ী ও অন্যান্য প্রকারের জমা গ্রহণ করিবে এবং যাহাতে মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিকগণের অর্থসঞ্চয়ে সুবিধা হয় তাহার ব্যবস্থা করিবে। কলিকাতা সহরের মধ্যে জমি ক্রয় এবং গৃহ নির্ম্মাণের জন্য স্বল্প সুদে এবং মাসিক পরিশোধ করিবার শর্ত্তে মধ্যবিত্ত ও কর্ম্মচারী শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে কর্জ্জ দেওয়া হইবে। ইহা ব্যতীত কোম্পানীর কাগজ, মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চার প্রভৃতি জমা রাখিয়া কর্জ্জ দেওয়া হইবে। ইহা ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষকে অন্য প্রকারে কর্জ্জ দেওয়া হইবে না। জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপালিটী বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনুমতি পাইলে এই ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সর্ত্ত অনুযায়ী কর্জ্জ পাইবে। কিন্তু কর্জ্জের একদশমাংশ টাকা দ্বারা এই ব্যাঙ্কের অংশ কিনিতে হইবে। যে সকল জেলা বোর্ড এবং মিউনিসিপালিটী এইরূপে কর্জ্জ গ্রহণ করিবে বা অংশ কিনিবে তাহারা ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর নির্ব্বাচনের অধিকার পাইবে। এই ব্যাঙ্ক কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর নিকট হইতে উহার ঋণ (Debenture) কিনিয়া লইতে বা বিক্রয়ের ভার লইতে (underwrite) পারিবে। কলিকাতা করপোরেশনের সমস্ত তহবিল এই ব্যাঙ্কে থাকিতে পারিবে এবং করপোরেশনের হইয়া অন্যান্য কার্য্য করিতে পারিবে। এই ব্যাঙ্ক কলিকাতা সহরের যে কোন স্থানে শাখা খুলিতে পারিবে।

আইন

কাহারও কাহারও মত এই যে এইরূপ একটী ব্যাঙ্ক ভারতীয় কোম্পানী আইনে রেজেষ্ট্রী করা উচিত। ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডে দুই এক কোন সহরে কোম্পানী আইন সমিতিভুক্ত করিয়া মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছে, যথা, কিরকিনটিলক্ মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড। কিন্তু এই সকল ব্যাঙ্ক মর্য্যাদায় কখনও খাঁটী মিউনিসিপাল ... এবং তাহার কারণ খুঁজিতেও বেশী দূর যাইতে হয় না। প্রাইভেট্ ব্যাঙ্কের খোলস পরিয়া মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক সাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। ইংলণ্ডে যাঁহারা এইরূপ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাঁহারা মিউনিসিপাল আইনের সুবিধা না পাইয়াই এইরূপ করিয়াছেন। সকলেই বার্মিংহাম মিউনিসিপাল ব্যাঙ্কের মত একটী প্রতিষ্ঠানের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং যখন গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সেই সুবিধা পাওয়া যায় নাই, তখন বাধ্য হইয়া কোম্পানী আইনে সমিতিভুক্ত করিয়া ব্যাঙ্ক খুলিতে হইয়াছে। বিলাতে মিউনিসিপালিটীগুলির আভ্যন্তরীণ অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা বেশী থাকার দরুণ এইরূপ অর্দ্ধ প্রাইভেট মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক দ্বারাও অনেক উপকার হইয়াছে।

কলিকাতায় মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনের সংশোধন করিয়া কলিকাতা করপোরেশনকে একটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার অধিকার দেওয়া সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। পরে করপোরেশন এই নূতন আইন অনুযায়ী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইয়া উহা পরিচালনের জন্য যখন বিধি ব্যবস্থা (Regulations) প্রণয়ন করিবে, তাহা বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। বার্মিংহাম মিউনিসিপাল ব্যাঙ্কও এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সুবিধা

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এইরূপ একটী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইলে কলিকাতা সহরের এবং নাগরিকগণের কি উপকার হইবে? ব্যাঙ্ক দ্বারা যে দেশের প্রভূত উপকার হয় তাহা নূতন করিয়া এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র কলিকাতা সহরের বিশেষভাবে কি উপকার হইবে তাহা দেখা যাউক। ব্যাঙ্ক বলিতে বাঙ্গালীর কিছুই নাই, তাহা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের তালিকা হইতে দেখাইয়াছি। কলিকাতা মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক হইবে, বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ও শ্রমিককে অর্থ সঞ্চয়ের সুবিধা দিবে এবং নিজ নিজ বাসগৃহ নির্ম্মাণে সাহায্য করিবে। ইহা দ্বারা সহরের ক্রমোন্নতি হইবে এবং আয় বাড়িবে। এক কথায়, কলিকাতা সহর সমৃদ্ধিশালী হইবে। কলিকাতা করপোরেশনের কম সুবিধা হইবে না। ঋণ সংগ্রহে আর কষ্ট করিতে হইবে না এবং কম সুদে ঋণ পাইলে তাহাতে নাগরিকগণেরই সুবিধা হইবে।

ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে করপোরেশনের বার্ষিক ২,১৫,০০০৲ টাকা খরচ ধরা হইয়াছে। ইহারও অধিকাংশ উশুল হইয়া আসিবে। কারণ করপোরেশনের বর্ত্তমান ট্রেজারি ডিপার্টমেণ্ট প্রায় তুলিয়া দিয়া ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত করা চলিবে। ইহা ব্যতীত কলেকসন্, লাইসেন্স, ওয়াটার ওয়ার্কস্ এবং মার্কেট ডিপার্টমেণ্টের আদায়ী কাজের অধিকাংশ নূতন ব্যাঙ্ক গ্রহণ করিতে পারিবে এবং সেই অনুপাতে করপোরেশনের খরচ কমিবে। একাউণ্টস্ ডিপার্টমেণ্টের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের কার্য্য সমস্তই এই ব্যাঙ্ক গ্রহণ করিতে পারিবে। বার্মিংহাম করপোরেশনের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে এইরূপে ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা করিলে করদাতাগণের বিশেষ সুবিধা হয়। এইরূপ অনেকেরা কিছু অযৌক্তিক

এই ক'লকাতা সহরে নিত্যি কত লোক কত অসুখে ম'রছে,—তবু আমি ত বেঁচে আছি।"

এটা দুঃখের কথা,—সন্দেহ নাই। কিন্তু তার পরেই কৌটা খুলে, এক টিপ্ তামাক-পোড়া দাঁতের এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত লেপে দিয়ে একচোখ বুঁজে একবার থুতু ফেলে বলেন—"কিন্তু, ম'রলে তো হয়! তখন বুঝবেন কত ধানে কত চাল!—পিঠে খায়,—পিঠের ফোঁড় গোণে না তো! তাই এত বাড়্ বেড়েছে। কিন্তু বেশী নয়, একদিন কাঁধে এ ভার পড়লে যে বুকে হাত চাপ্‌ড়ে কাঁদতে হবে, এ আমি লিখে রেখে যেতে পারি!—হুঁ!—এ আর শোলোক আউড়ে ছেলে পড়ানো বিদ্যে' নয়।" ব'লে তিনি যে কটাক্ষপাত ক'রতেন, তা শুধু অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি ক'রতেন একা পণ্ডিত মশাই,—আর কেউ নয়।

দাঁতে দাঁত চেপে তিনি স্বগত ব'লতেন—

"উচ্ছন্নে গেল সব, জাহান্নমে গেল।…যেমন মা তার তেমনি ব্যাটা; কাকেই বা দোষ দিই? সবই আমার কপাল। নইলে অতবড় ছেলে যার এখোনো ঘরে ব'সে ব'সে শুধু বাপের অন্ন আর চা' ধ্বংস ক'রছে, সে কি কোনও দিন দুঃখ দূর ক'রবে? মা ম'রে গেলে নাম ক'রে এক [illegible] দেবে ভেবেছো? কখোনো নয়,—কখোনো নয়। এই আমি ব'লে রাখলুম, দেখে নিও! আর,—আর ঐ মাগী"……এর বেশী ব'লবার আর তাঁর সাহস হয় না।

ব'লতে ব'লতে থেমে গিয়ে ভাবেন "ভাগ্যিস্ গৃহিণী কাণে একটু কম শোনেন, তাই র'ক্ষে; নইলে—"

নইলে এর পরেও যে তাঁর ভাগ্যে আর কি ভাবে লাঞ্ছনা জুটতো, এ কথা কল্পনাতে আনতেও তিনি শিউরে ওঠেন।

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়।—

শ্রীমান টেবিলের ওপোরে প্রায় ঝুঁকে প'ড়েছে। হাতে ফাউণ্টেন পেন, সামনে খাতা খোলা।

কবিতা আজ তাকে লিখতেই হবে; কারণ 'ঝটিকা' সম্পাদক সেদিন দেখা হ'লেই ব'লেছিলেন—"আপনার কবিতার মধ্যে সত্যিকার প্রাণ আছে। এখনকার অনেকে যেমন শুধু 'কবি' নাম নেবার জন্যেই কবিতা লিখতে যান,—অথচ তাতে না থাকে ভাব, না থাকে ছন্দ; তবু তেমন কবিতাও কাগজে মুঠো মুঠো ছাপা হয়। কিন্তু সে দোষ আপনার কবিতায় নেই।"

"উচ্ছন্নে গেল সব, জাহান্নামে গেল—"

আনন্দে গদগদ স্বরে শ্রীমান জানিয়ে[illegible] জন্যে যদি কেউ কিছু প্রশংসাই [illegible] সে তো আমার প্রাপ্য নয়,—প্রাপ্য [illegible] কারণ আপনারাই আমাকে উৎসাহিত ক'[illegible]

তিনি মৃদু হাস্যে উত্তর দিয়েছিলেন—

"এ কথা হ'তেই পারেনা। যার মধ্যে প্রতিভা আছে, সে আপনিই আপনার প্রকাশ-পথ ক'রে নেবে,—সে কারো অপেক্ষা করে না। আপনার মধ্যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সেই প্রতিভাকে ;—অবশ্য, বললাম ব'লে বিশেষ কিছু মনে ক'রবেন না শ্রীমান বাবু ; আমার স্বভাবই এই যে পেটে যা আসে তাই মুখেও ব'লে ফেলি! আর এ কথা শুধু আমি একাই ব'লছি না, সেদিন "আকাশ" সম্পাদকও এই কথাই ব'লছিলেন।"

শ্রীমান যেন ঘুড়ির ল্যাজ্ ধ'রে আচম্‌কা আকাশে উঠে গেল।—ব'লতে গিয়েও হঠাৎ কোনও কথা ব'লতে পারলো না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে স্মিতহাস্যে সম্পাদক ব'ললেন—"গুণের আদর সর্ব্বত্র, অন্ততঃ গুণী মাত্রেই করে, এ কথা মানেন তো?"

একটু থেমে, একবার কেশে নিয়ে ব'ললেন—"তা, হাঁ্যা, আপনি এক কাজ করুন না?" হাত দুটো কচ্‌লে শ্রীমান সবিনয়ে ব'ললে—"বলুন।" তিনি ব'ললেন—"এই গিয়ে, আপনি যদি আপনার একটা ছোট খাটো কবিতাও ওঁর কাগজে দেন তো এই পূজো-সংখ্যায় ছাপিয়ে ওঁর ক্ষুদ্র কাগজটিকে ধন্য মনে করেন; ঐ কথাই উনি সেদিন ব'লছিলেন!"

অতিরিক্ত বিনয়ে শ্রীমান যেন মাটীর সঙ্গে মিশে ...ত চাইলো। একটু হেসে সলজ্জ স্বরে জানালো—"...াপনি যখন বলছেন, তখন—হেঁ হেঁ, তখন, আপনার ...ই কাজ ক'রবো।"

...ই সে আজ কবিতা লিখতে ব'সেছে,—লিখছে ...।

...ন্তা, অনেক সাধনার ফলে কাগজের বুকে ...শ ক'রলো—

...াজ কোন্ গৃহকোণে সুপ্ত র'য়েছো প্রিয়া,—
...য় যায় কি কখনো ঘুলঘুলি পথ দিয়া?
...থায় বুলবুল পাখী দ্রাক্ষা কুঞ্জে বসি,
...থা ফোটে কি কখোনো? দেখা দেয়
রবি শশি?
কতদিন হ'লো সই,—
নিয়াছ বিদায়, সেই ব্যথা স্মরি আজও যে আকুল হই।
মোর গৃহভরা অন্ধকারেতে আলো আর জ্বালি নাই,—
তোমার চরণ-চিহ্ন যে আজও বুকে আঁকা আছে ভাই!
মরণের সাথে দোস্ত ক'রেছি জীবনের সব দিয়া,—
জানি, তুমি মোরে ভুলিয়াছ, তবু তোমারে
ভুলি নি প্রিয়া॥

অনেক ভেবে, ওপোরে একটু বড় বড় অক্ষরে নাম দেওয়া হোল "বিরহ।"

দেরী হওয়ার কথা ভেবে, সেটা ডাকে না পাঠিয়ে কাগজে মুড়ে শ্রীমান নিজেই উঠে দাঁড়ালো;—ভেল-ভেটের লেডি স্যাণ্ডেলটা পায় দিয়ে ঘরের বার হ'তেই রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে মা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"কোথায় যাচ্ছিস বাবা?" বাবা হাত নেড়ে উত্তর দিল—"এই এখানে, আসছি এখনি……"

ব'লে পথে নেমে সে সাঁ সাঁ ক'রে ফুটপাত বেয়ে চ'ললো, সোজা "আকাশ"-অফিস-মুখো।

পথে কত পরিচিত অপরিচিত লোক, কত গাড়ী ঘোড়া, মটর, বাইক, বাস্, ট্রাম—কত কী! কিন্তু সেদিকে তার লক্ষ্য নাই। ভাবতে ভাবতে চ'লেছে "আকাশ" সম্পাদকের হাতে লেখাটা দিয়ে সগৌরবে জানাবে আর কেউ বাহক নয়, লেখক স্বয়ং, এবং এর জন্য ধন্যবাদও সে যে নেহাৎ কম ক'রেও বা'র দুই পাবেই, এ নিশ্চিত।

"আকাশ কার্য্যালয়"—

বড় বড় অক্ষরে সাইনবোর্ড খাটানো। ঘরে ঢুকেই শ্রীমান একটু থম্‌কে গেল।

চারিদিকে,—বড় বড় কাচের আলমারীগুলিতে বই ঠাসা; বৈদ্যুতিক আলোকে কক্ষ উজ্জ্বল, এবং ওপোরে একখানা পাখাও ঘুরছে। মাঝখানে একটা বড় টেবিল; চারি পাশের চেয়ারগুলির দুইটি অধিকার ক'রে যে দুইটি লোক উপবিষ্ট, তাদের একজন কৃশ; মাথার চুল ছ' আনা দু'আনা বার আনা হিসাবে ছাঁটা। মাঝখানে চেরা সিঁথি। মুখ লম্বা, গোঁফের দুপাশ ছাঁটা। অপর—

স্থূল; মুখমণ্ডল সুগোল, দাড়ি-গোঁফের চিহ্নও নাই; মাথার মাঝখানে টাক। গায়ে ঢিলাহাতা পাঞ্জাবী, গলায় ভাঁজ করা মটকার চাদর।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে নমস্কার জানাতেই স্থূলকায় মুখ তুলে দৃষ্টিপাত ক'রলেন।

শ্রীমান সবিনয়ে ব'ললে—"লেখাটা…"

তিনি ব'ললেন—"কোথা থেকে আসছেন?"

ঠাট্টার মৃদু হাসিতে উজ্জ্বল মুখখানার দিকে তাকিয়ে পথে নেমে প'ড়লো।

মনমরা অবস্থায় নিজের ঘরে এসে পৌঁছতেই শ্রীমান শুনলে,—সামনের বাড়ীর এইদিকের ঘর থেকে বামা কণ্ঠে হারমোনিয়মের সঙ্গে গান হ'চ্ছে—
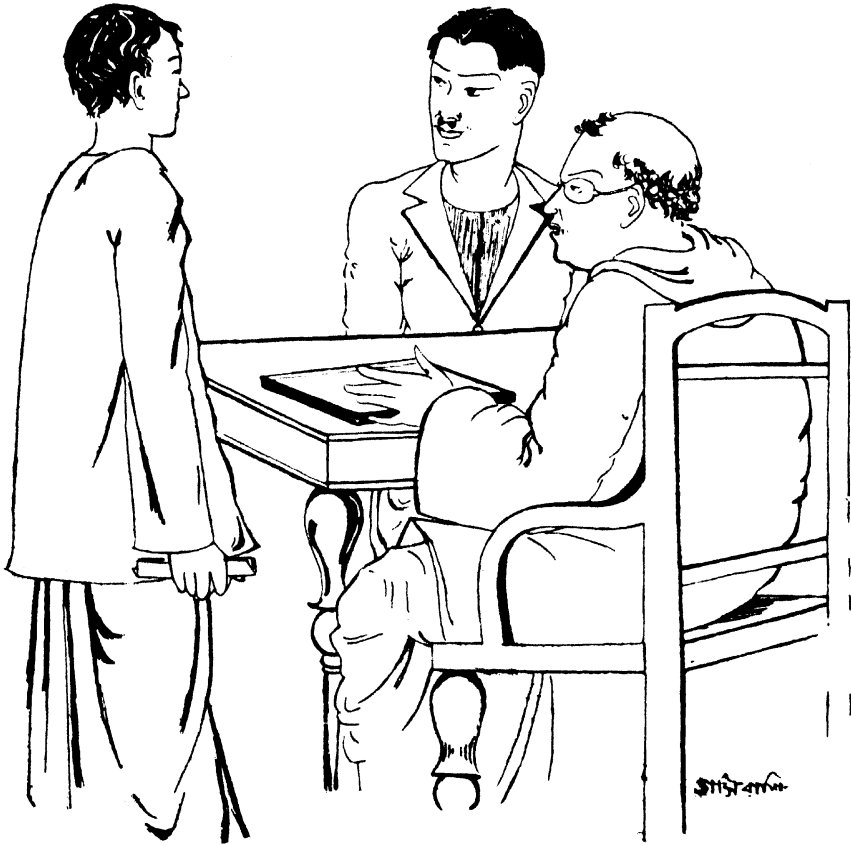
"লেখাটা——"

"আজ্ঞে, আসছি কাছ থেকেই, নাম শ্রীমান দেবশর্ম্মা, লেখাটাও আমারই।"

অঙ্গুলি নির্দ্দেশে টেবিলের একটা দিক দেখিয়ে তিনি ব'ললেন—"ঐখানে রেখে যান।"

শ্রীমান আর কোনও কথা ব'লবার সময় সুযোগ কিছুই পেলে না। একবার বক্র দৃষ্টিতে কৃশকায়ের

মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশটং

শুধু তোমার বাণী নয়কো বন্ধু হে

খোলা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শ্রীম'

গায়িকা তরুণী এবং সুন্দরীও বটে। রঙিনশাড়ী পরা, মাথার চুলগুলো ঢি. কাছে জড়ানো।… নীচের হাতে

"মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশটুকু দিও।—"

...ত নয়, প্রিয়ার অন্তরের গোপন-বার্ত্তা বহন ক'রেও সে ...সে নি,—...এসেছে নিচে মাছ ভাজবার গন্ধে..."

মক্‌চেন। ধীরে ধীরে কখন যে গান শেষ হ'য়ে গেল, সে তা জানতেও পারল না। হঠাৎ "মিউ" শব্দ কাণে আসতেই চ'মকে উঠে দেখ্‌ল জানালার নীচে যে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত্ত চ'ক্ষে তার দিকে চেয়ে আছে, সে হংসদূত নয়, প্রিয়ার অন্তরের গোপন বার্ত্তা বহন ক'রেও সে আসে নি। সে একটি কালো বিড়াল, এবং এসেছে নীচের মাছ ভাজ্‌বার গন্ধে।

স'রে আসতেই দেখলে টেবিলের ওপরে প'ড়ে আছে একখানা কাগজ-মোড়া "ঝটিকা" আর একখানা পত্র; পত্রখানা ঝটিকা-সম্পাদকের। তিনি লিখেছেন—"এই সংখ্যার 'ঝটিকা'য় আপনার কবিতার সমালোচনা একটি প্রকাশিত হ'য়েছে,—যদি আপত্তি না থাকে তবে প্রতিবাদ লিখে পাঠাবেন।"

"ঝটিকা'র মোড়ক খুলতেই শ্রীমান দেখলে তার কবিতার সমালোচনা ক'রেছেন একজন নারী,—নাম রেবা দেবী।

শ্রীমান দেখলে সে সমালোচনা নয়,—উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। প'ড়ে শ্রীমানের চোখের সামনে একবার বিশ্বসংসার সব দোল খেয়ে গেল। এবং মানসদৃষ্টির সম্মুখে এক মুহূর্ত্তে অপরিচিতা রেবা দেবী ক্ষণপূর্ব্বের গায়িকা মেয়েটির রূপে দেখা দিতেই শ্রীমান আনন্দে 'কণ্টকিত' হ'য়ে উঠ্‌লো।

পরদিন সকালে জানালার ধারে ব'সে এক শ্লেট কালি গুলে আঁকলো: একটি তরুণী মূর্ত্তি; বৃক্ষশাখায় ভর

নহে যে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই করপোরেশনের ২,১৫,০০০ টাকা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে খরচ বাঁচাইতে পারিবে।

অবণ্টনীয় লভ্যাংশ

নিট্ লাভের সমস্ত অংশই রিজার্ভ ফণ্ডে জমা করিতে হইবে এবং যে পর্য্যন্ত না রিজার্ভ মূলধনের সমান হয় সেই পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে হইবে। এবং তৎপরে লভ্যাংশ কিরূপে ব্যাঙ্কের ও নাগরিকগণের উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে হইবে, কলিকাতা করপোরেশন তাহার ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবে।

হিসাব

এই ব্যাঙ্কের হিসাবপত্রাদি সম্পূর্ণভাবে কলিকাতা করপোরেশনের হিসাব হইতে পৃথক থাকিবে। প্রত্যেক দুই সপ্তাহ অন্তর সাধারণের গোচরার্থ ব্যাঙ্কের দেনা-পাওনার হিসাব প্রকাশিত হইবে। দুইজন হিসাব পরীক্ষক—একজন করপোরেশনের এবং একজন আমানতকারীগণের পক্ষ হইতে ব্যাঙ্কের হিসাব পরীক্ষা করিবেন এবং পরীক্ষিত ষাণ্মাসিক হিসাব প্রকাশিত হইবে।

উপসংহার

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় একটী মিউনিসিপাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এখন পর্য্যন্ত করপোরেশনের মত বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হয় নাই। কলিকাতা করপোরেশনের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যেভাবে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিলে, করপোরেশনের সর্ব্বাপেক্ষা কম খরচ ও বেশী লাভ হয় সেই বিষয়ে একমত হইয়া, নগরের প্রতিনিধিগণ চেষ্টা করিলে অবিলম্বে ব্যাঙ্কের স্থাপনা হইতে পারিবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সম্পর্কে কাউন্সিলর সনৎকুমার রায় চৌধুরী, নলিনীরঞ্জন সরকার, রামচন্দ্র শেঠ প্রভৃতি যেরূপ উৎসাহ দেখাইতেছেন, তাহা সত্য সত্যই প্রশংসার্হ। ইঁহাদের সাধু ইচ্ছা এবং নিঃস্বার্থ চেষ্টা সফল হইয়া কলিকাতা তথা বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করুক, ইহাই তরুণ বাঙ্গালার ঐকান্তিক কামনা।

মানসী

শ্রীহাসিরাশি দেবী

শ্রীমান আমাদের অনেক গুণে গুণী; যথা—গান গাওয়া, আবৃত্তি করা, মাঝে মাঝে বল খেলা, ছোটো-খাটো বক্তৃতা দেওয়া, ছবি আঁকা ও কবিতা লেখা।

তবে তার এ সকল বিদ্যা প্রকাশের এক একটা বিশেষ ক্ষেত্র আছে; যেমন,—গান গায় সে বন্ধু-মহলে, বল খেলতে যায় সখের টীমে, বক্তৃতা দেয় কিম্বা আবৃত্তি করে সাধারণ সমক্ষে এবং কবিতা লেখে ও ছবি আঁকে ঘরের মধ্যে।

কিন্তু, এ কথা জানে সবাই; কারণ, ত্রৈমাসিক পত্রিকা "ঝটিকা"র তার কবিতা প্রকাশিত হয়, এবং ছবিও যে এক-আধখানা ছাপা না হয়,—এমনও নয়। তবু সে ছবি কাজল কালীতে আঁকা নয়,—বল খেলতে গিয়ে পা ভেঙে এসে হাঁটুতে কাজল কালী মাখিয়ে সে কাগজে ছাপ মেরে ছবি তোলে না,—রীতিমত চীনাকালীতে নিব ডুবিয়ে ধ'রে ধ'রে আঁকে, আর গুণ গুণ ক'রে গান গায়।

কিন্তু এ সবের আগে শ্রীমানের পরিচয় নেওয়াটা একটু দরকার; তাই লিখছি—তার আগের ও পেছনের লেজুড় ছেড়ে, কাট্-ছাঁট ক'রে নামের শুধু "শ্রীমান"টুকুই নিলাম।

বয়স কুড়ি কি একুশ, চেহারা মন্দ নয়—ফ্যাশানেও দুরন্ত, তবে স্কুলের শেষ ক্লাস পর্য্যন্ত হামাগুড়ি দিয়ে উঠেই মা সরস্বতীর সঙ্গ ছেড়েছে। বাপ পণ্ডিত মানুষ ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবেই না কি ভারতীর কাছে অনে[illegible] বার মাথা কোটাকুটি ক'রেছিলেন, কিন্তু দেবী অ[illegible] তাকে সঙ্গে নিতে নারাজ জেনে অগত্যা মাথা [illegible] বন্ধ ক'রেছেন।

বাড়ী,—অর্থাৎ পূর্ব্ব-পুরুষের সম্পত্তি—দালান বাড়ী[illegible] পুকুর এবং আরও যা কিছু কাছাকাছি কোন পাড়াগাঁ[illegible] হ'লেও, পণ্ডিত মশায়কে বাসা ভাড়া নিতে হ'য়েছে[illegible] ক'লকাতায়; কারণ, ছেলে বলে সে পাড়াগাঁয়ে থা[illegible] না, এবং তদীয় মাতা হাত মুখ নেড়ে বারম্বার স্মর[illegible] করিয়ে দেন—তাঁর জন্ম এই কলিকাতায়;—গ[illegible] মেয়ে হ'য়ে জল-স্যাঁত্সেঁতে ঘরে থেকে ও [illegible]

আঁশের পচা গন্ধ শুঁকেও তিনি যে শরীর টিকিয়ে এখনও 'পণ্ডিত মশায়ের' গৃহ উজ্জ্বল ক'রে আছেন,—পাড়াগাঁয়ের খোলা হাওয়ায় থাকলেও পুকুরের জলে ও 'ম্যালোয়ারী'তে তাঁর সে শরীর একটি দিনও টিকবে না।

সুতরাং অচিরেই যে তাহ'লে পণ্ডিত মশায়ের গৃহ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে, এ নিশ্চিত। তাই, সে অনুরোধ

হাসিরাশি—
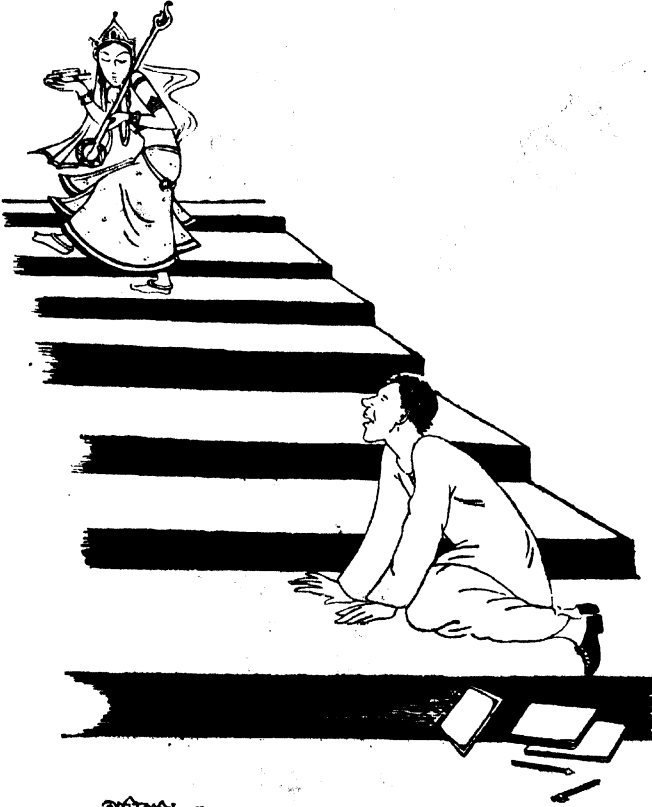
"স্কুলের শেষ ক্লাশ পর্য্যন্ত হামাগুড়ি দিয়ে উঠেই—"

:াক বা অত্যাচারেই হোক, পণ্ডিত মশায়কে মাসিক ক্তি টাকা ভাড়ায় যে বাসা নিতে হ'য়েছে, তার ওপোরে ।চে ঘর চারখানা, বারান্দা ছুটো, আর কলতলা বোধ য় দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে দেড় হাত।

কিন্তু এর মধ্যে ছুটি ঘর, অর্থাৎ ভাঁড়ার, রান্নাঘর এবং .বার ঘরটুকু ভিন্ন পণ্ডিত মশায়ের আর কোনও দিকে যাবার উপায় নাই; কারণ, অন্য ঘর ছুইটি প্রায় সর্ব্বদাই শ্রীমান ও তদীয় বন্ধুবান্ধবের অধিকারে সুরক্ষিত। সেখানে সংস্কৃত শ্লোকের স্থান নাই; আছে আলোচনা, সমালোচনা, গান ও গল্পের অফুরন্ত জায়গা।

তবু, মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যে বিদ্রোহ মাথা তুলে দাঁড়ায়, তা বুঝতে গৃহিণীর দেরী হয় না। ক্ষুদ্র চক্ষু ঘুরিয়ে,—মৃদু—অথচ তিরস্কারের স্বরে বলেন—

"ষাটের কোলে কাঠি দিয়ে—ব'লতে নেই—বাছা আমার এখন ডাগরটি হ'য়েছে; চ্যাটাই চাপা কি আর চিরদিন থাকে গা?—নিজে বুঝে সুঝে চ'লতে হয়।"

পণ্ডিত মশায়ের শরীর জীর্ণ না হ'লেও শীর্ণ বটে, বর্ণ ঘন কৃষ্ণ। খাঁড়ার মত উঁচু নাকের ছুপাশে গাল ছুটো তুবড়ে খোল হ'য়েছে, চক্ষুও কোঠরগত, তবে বড় বটে।

বেশীর ভাগ সময়েই আলগা গায়ে, খড়ম পায়ে ও হাতে কড়িবাঁধা হুঁকা নিয়েই ঘোরেন, আর হাওয়ায় ওড়ে মাথার বিঘৎ প্রমাণ টিকি।

গৃহিণী কিন্তু আকৃতি ও প্রকৃতিতে ঠিক তাঁর বিপরীত।

গৌর না হ'লেও উজ্জ্বল শ্যাম; বিপুল ও খর্ব্বাকৃতি।

কাংস্য-নিন্দিত কণ্ঠস্বরে পণ্ডিত মশায়ের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ক্ষণে ক্ষণে লোপ ক'রে দেওয়াতে বেচারা পণ্ডিত মশায় কোনও কথার প্রতিবাদ ক'রতে গিয়েও পেরে ওঠেন না,—সময়ে সময়ে কলহের ইচ্ছা প্রবল হ'লেও প্রথমে গৃহিণীর কণ্ঠস্বর এবং পরে রাঙা চোখের সাদা পানির ভয়ে তাঁকে চুপ ক'রে যেতে হয়।

আঁচলে চোখের জল মুছে গৃহিণী বলেন—"ইচ্ছে হয় একবার ম'রে 'মিন্‌সে'র হাত থেকে নিস্তার পাই; কিন্তু যম যে আমাকে ভুলে আছে। নইলে

দিয়ে সে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা। দি ওরিয়েণ্টাল আর্ট।

নীচের এক কোণে শিল্পীর নাম ও তারিখ, এবং অন্য কোণে লেখা থাকলো—"মানসী"।

মেদিনীপুর থেকে আনা ঝি বিধু সেদিন ব'লেছিল—"দেখ মা, একটা ভালো কথা কচ্ছু বাপু, গোঁসা কোরোনি বাছা। আমার যেন কেমুনতর লাগচু—তায় তরেই কইচু—!"

মা সন্দিগ্ধচিত্তে প্রশ্ন ক'রেছিলেন "কি ব'লতো মা!"

"তোমার ব্যাটার উপ্‌রে কেমন একটু উপ্‌রি নজর' হ'য়েছে—লাগচু বাছা! কিছু মনে কোরোনি।... এইবেলা ঠাকুর দুয়োরে মানত্‌ ক'রো দিকিন,—দেখ, ভালো হবে। বুলো তো আমিই তুমাকে এক সাধু-বাবার থানে লিয়ে যেতে পারি। গঙ্গায় লাইতে' গিয়ে দেখেছু,—হায় সেদিকে বাবা আছু—।"

কিছুদিন থেকে ছেলের হাবভাব যে মার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছিল তাও নয়, তবে সেটা মনে মনেই ছিল; আজ অন্যের মুখে শুনতেই; সে সন্দেহ দৃঢ়মূল হ'লো। মনে মনে মাথা ঠুকে সাধুবাবার উদ্দেশেই ব'ললেন—"হায় বাবা, কি অপরাধ ক'রেছি গো!"

কিন্তু মুখে ব'ললেন—"তুই আমায় বাবার কাছে নিয়ে যেতে ঠিক পারবি তো?—পথ হারাবি নি তো?"

বিধু এক বিঘৎ প্রমাণ কলতলায় উঁচু হ'য়ে ব'সে ব'সে কোনও রকমে পোড়া কড়ায় ঝামা ঘষছিল; হাতময় ও মুখে কালি, সারাদেহ ঘর্ম্মাক্ত। বিস্ময়ে ঝামা ঘষা থামিয়ে সেই কালিসুদ্ধ হাতই গালে রেখে ব'ললে—"পারবুনি? কি—বলচু গো!—হায় হায়। ও কথাটি বোলনি বাবা। বিধুর তোমার শরীল থাকলে আবার তোমায় ভাবনা কিসের গা?...ঠাকুর দুয়োর তো ঠাকুর দুয়োর,—বলোতো তোমাথে হায়—বিলেত ঘুরিয়ে লিয়ে এসে দিবে; পারবুনি কি গো?"

মা ব'ললেন—"তবে, তাই আমায় একবার নিয়ে যাস বাছা। শরীল তোর ভালোই থাক, প্রাণ ভ'রে আশীর্ব্বাদ ক'রছি।"

তদগদ চিত্তে বিধু ব'ললে—"তাই করো মা, তাই করো। হা দেখ, এই শরীলের তরে ক'তো দেশ যে ঘুরনু ফিরনু,—ওষুধ পালা করনু, তা আর কি বুলবো।... শেষে স'ব খুইয়ে এখন তোমার দরজায় এসেছি..."

ছলছল চোখে সে এইখানেই সে কথার ইতি ক'রলে।

যথাসময়ে সাধু বাবার শ্রীচরণতলে লুটিয়ে প'ড়ে মা

"বৃক্ষশাখায় ভর দিয়ে—..."

জানালেন—"তুমি তো আমার মনের কষ্ট সবই জ'না বাবা! আমার ছেলের মন তুমিই ভালো ক'রে দাও আর কিছু চাই না।"

সাধুবাবা দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ক'রে ব'লে

"সোব আচ্ছা হো যাবে মা, ডর না আছে ; তুয়োর মনের কষ্ট অষ্ট সোব হাম বুঝিয়েছে। উসোব দুদিনের আছে, তারপ'রে সোব আউর তু'র ছেলিয়াভি আচ্ছা হো যাবে।"

মা একটু ইতস্তত: ক'রে ব'ললেন—"কিন্তু, বিধু যে ব'লছিল, আমার ছেলের ওপোরে নাকি একটু উপরি ভাব হ'য়েছে !"

সাধু ব'ললেন—"হাঁ মা, একটু উপরি ভাব হইয়েছে বৈ কি! কিন্তু হামি তো পহেলেই বুলিয়েছে যে কিছু ডর না আছে।"

একটু হেসে ব'ললেন—"হামি দিব্য দৃষ্টিমে দেখতে পাচ্ছে যে তু' হামার যশোদা রাণীমা আছিস্। তুখে' কি তুর গোপাল কষ্ট দিতে পারে রে পাগলি ?"

একটা মাচুলী দিয়ে ব'ললেন—"এটা লিয়ে যা, হাঁতমে বাঁধবি, সোব আচ্ছা হোবে।"

"পারুবুনি ? কি ব'লচু গো!…………ও কথাটি বোলনি বাবা…।"

"…কষ্ট অষ্ট সোব হামি বুঝিয়েছে…"

"তাই বল' বাবা, তাই আশীর্ব্বাদ করো।"

ব'লতে ব'লতে উঠে আঁচলের গেরো খুলে একটি টাকা সাধুবাবার চরণতলে রেখে আর বার দুই মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে মা বিদায় নিলেন।

'ঝটিকা' সম্পাদকের বোনের বিয়ে। ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্রের সঙ্গেও অনুরোধ-পত্র পর পর এসেছে দুখানা; তাঁর একান্ত অনুরোধ, যেতেই হবে।

"ঝটিকা"ও তোমার কাছে চিরঋণী থাকবে—"

গরদের পাঞ্জাবী গায়ে, ভেলভেটের নাগরা পায়ে, আর সোনার বোতাম সেট্ প'রে শ্রীমান বার হ'য়ে প'ড়লো।

কিন্তু বিয়ে বাড়ীতে এসেই সে গেল থ'ম্‌কে।... চারিদিকে কেমন যেন একটা থমথ'মে ভাব,—না আছে বেশী লোকজন, না আছে তেমন আলোর জাঁক-জমক।—শুধু, শ্রীমানকে সামনে দেখতে পেয়েই 'ঝটিকা' সম্পাদক প্রায় ছুটে এসে তার হাত দুখানা জড়িয়ে ধ'রলেন; সকাতরে ব'লে উঠ্‌লেন "আমায় আজ বাঁচাও ভাই; তারা বিয়ে দেবে না ব'লে পাঠিয়েছে,—এদিকে আমার জাত-মান সব যায়।..."

শ্রীমানের চোখের সামনে শর্ষেফুল ফুটে উঠ্‌লো; শুক্‌নো জিভে কোনও রকমে ব'ললে—"বাঁচাবো? আমি? কেমন ক'রে?"

ঠোঁটের কোণে যেন একটু হাসি চাপা,...চোখের দৃষ্টিতে যেন কৌতুকের রাশি......

সম্পাদক ব'ললেন—"হ্যাঁ, আজ একমাত্র তুমিই আমায় বাঁচাতে পারো, কারণ, তুমি আমার স্বঘর, স্বজাত ও পরিচিত ভদ্রলোক। আর আমি আশা ক'রছি ভদ্রলোকের এ উপকার শুধু ভদ্রলোকেই ক'রতে পারে,—তুমিই পারবে। আমায় আজ বাঁচাও, এজ'ন্যে শুধু আমিই নই, "ঝটিকা"ও তোমার কাছে চিরঋণী থাকবে।"

এর পরের আর কোনও কথা শ্রীমানের কাণে গেল না। শুধু শুভদৃষ্টির সময়ে বধূর মুখ আর তার পাশের

লাল চেলী দেখে মনে হ'লো কে যেন একরাশি টিকের আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আরও দেখলে,—পাণের ছোপে লাল পুরু ঠোঁটের কোণে যেন একটু হাসি চাপা, গোল গোল ড্যাব্‌ডেবে চোখের দৃষ্টিতে শ্রীমান মুখ ফিরিয়ে নিলে।

সে সংখ্যার "ঝটিকা"য় বড় বড় অক্ষরে প্রকাশ হ'লো—

"সুকবি ও শিল্পী শ্রীযুক্ত শ্রীমানবাবু বিনা পণে "ঝটিকা" সম্পাদকের ভগিনীকে বিবাহ করিয়া—হিন্দুধর্ম্মের উদার আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। ভগবানের নিকটে আমরা এই নবদম্পতির দীর্ঘায়ু কামনা করি।"

লেখাটা চোখে প'ড়তেই শ্রীমান প্রথমে সে পত্রিকাখানিকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়লে, তার পরে এত দিনের এত যত্নে আঁকা ও জমা করা ছবি ও কবিতার খাতাগুলো পুড়িয়ে, সামনের সেই খোলা জানালাটা টেনে বন্ধ ক'রে দিলে।

কদমতলীর বিল

শ্রীদিগিন্দ্রনাথ আচার্য্য

কদমতলীর বিলে,—
বাতাসের সাথে লুকোচুরি খেলে বকেও শালিখে মিলে,

আমনের ক্ষেতে ফুটিয়া উঠিলে শাপ্‌লার ফুলরাশি,
সোণালী ঊষায় তাহাদের মুখে ফুটায় রঙিণ হাসি।

কচি কচি ধান বাতাসে দুলিয়া ঢলিয়া পড়েছে গায়;
প্রেমের বাসনা পরাণে জাগিয়া মিলেছে পরাণে হায়।

ও-পারের চরে পাণিকাক উড়ে মেলিয়া শতেক ডানা।
সুনীল আকাশে ভাসিয়া বেড়ায় সাদা মেঘ কয়খানা।

গাঙ্‌চিল বুনে মায়ার আঁচল ওপার এপার করি'—
কুরুবক মিলি' কাকলী করিছে সারা মাঠখানি ভরি'।

বাসনার সোণা ছড়ায়ে দিয়াছে সবুজ বিলের গায়।
মিঠে মেঠো হাওয়া ভাসিয়া বেড়ায় রঙিণ মেঘের নায়।

সোণা সোণা রোদে কেশ এলাইয়া ছোট ধানগাছগুলি
আদরে সোহাগে এ উহার গায়ে কেবলি পড়িছে ঢলি'।

কলমী-ফুলেরা হাসিয়া উঠেছে ভরিয়া সারাটি চক্।
ভেঁসালের গায়ে বাসা বাঁধিয়াছে ও-পারের কানি বক।

কচুরি ফুলেরা সরমে জড়ায়ে ঘোম্‌টা টানিয়া মুখে,
আথালের কোণে মুখ লুকাইয়া বেদন ঢালিছে দুঃখে।

ডিঙি নাও বেয়ে খেয়ার মাঝিরা নতুন বধূরে নিয়া,
বধূরে বেয়ে যায়, পুরাণ পালেরে শত জোড়া তালি দিয়া।

গাঁয়ের বধূর করুণ কাঁদনে বিদরিয়া উঠে বুক।
ছোট বিলখানি ঢেকে দিয়ে যায় বিষাদ কালিমা শোক।

সারাটি বরষ তাহার বুকেতে আঁকিছে নানান ছবি।
হাসি ব্যথা মাঝে দিবস কাটায় ও-গাঁয়ের ছোট কবি।
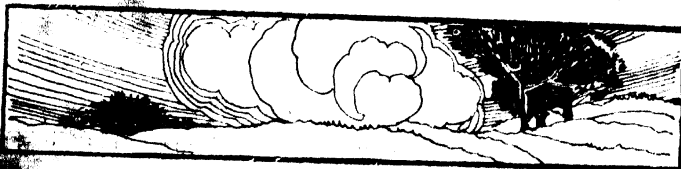
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১২৭৬ বঙ্গাব্দে (১৮৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে) ১৮ই চৈত্র তারিখে কলিকাতায় সুরেশচন্দ্রের জন্ম হয়। ইঁহার পৈত্রিক নিবাস নদীয়া ও যশোহর জিলাদ্বয়ের মিলনস্থানে—আঁশমালী গ্রামে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথমা কন্যা হেমলতা দেবীর বিবাহ-সম্বন্ধ কোন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারে প্রস্তাবিত হইলে বরপক্ষ যখন কিছু নগদ টাকা চাহেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, "আমি ব্রাহ্মণ—বেণের ঘরে মেয়ে দিতে পারিব না।" তাহার পর তিনি মেধাবী ছাত্র গোপালচন্দ্র সমাজপতিকে জামাতা করেন। সুরেশচন্দ্র ও যতীশচন্দ্র দুই পুত্র যখন শিশু তখন গোপালচন্দ্রের মৃত্যু হয় এবং তদবধি দৌহিত্রদ্বয় মাতামহের গৃহে লালিতপালিত হয়েন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থায় সুরেশচন্দ্র বাল্যকালে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষাই শিখিয়াছিলেন—যৌবনে নিজ চেষ্টায় ইংরাজী পাঠ করেন।

অল্প বয়স হইতেই সুরেশচন্দ্র বাঙ্গালা রচনায় মন দেন। ১৪।১৫ বৎসর বয়সে তিনি যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রবর্ত্তিত 'সুরভী' পত্রে কৃষিবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাহার পর তিনি 'সুরভী' ও 'সমাচার-চন্দ্রিকা' পত্রদ্বয়ে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। ১২৯৮ সালে ইনি 'বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নামক মাসিকপত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। পরবৎসর ইহা 'সাহিত্য' নাম গ্রহণ করে। ঐ সময় উপেন্দ্রনাথ "বিশেষ দ্রষ্টব্য"—শিরোনামায় লিখেন :—

"আমি 'সাহিত্যে'র সব স্বত্ব ত্যাগ করিলাম। 'সাহিত্যের' বর্ত্তমান সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়, অতঃপর 'সাহিত্যে'র স্বত্বাধিকারী হইলেন।"

"সূচনায়" সুরেশচন্দ্র লিখেন :—

"বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবার জন্য 'সাহিত্যের' জন্ম হইল। জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর, সাহিত্যে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

"এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব দিন দিন অধিকতররূপে বিস্তারিত হইতেছে। এই শিক্ষার ফলে আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ নানাবিধ নূতন ভাব ও অভিনব চিন্তার সহিত পরিচিত হইতেছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই, আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্য তাঁহাদের সেই চিন্তাশক্তি ও ভাবুকতার ফললাভে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। এখন যাঁহারা ইংরাজী শেখেন, তাঁহারা প্রায় বাঙ্গলা পড়েন না; বাঙ্গলা লেখেন না। বাঙ্গলা সাহিত্যের শৈশবদশায় যাঁহারা বাঙ্গলাসাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন, এখনও প্রায় তাঁহারাই বাঙ্গলা লেখক। তাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিয়াছেন, তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু কে তাহাতে জলসেচন করিবে? তাঁহারা যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন, কে তাহাকে পূর্ণ পরিণতির পথে লইয়া যাইবে? কারণ, তাঁহাদের পরে যাঁহারা বাঙ্গলা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। কৃতকার্য্য লেখকের সংখ্যা আবার তদপেক্ষাও অল্প।

"অথচ, সেকালের অপেক্ষা একালে দেশে চিন্তাশীলের সংখ্যা বাড়িয়াছে, জ্ঞানের জ্যোতিঃ অধিকতর বিকীর্ণ হইতেছে। তথাপি শিক্ষার অনুপাত অনুসারে ধরিতে গেলে, সেকালের তুলনায়, একালের বাঙ্গলা সাহিত্যকে অনেক দরিদ্র বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষিত যুবকগণের বাঙ্গলা সাহিত্যে সেরূপ মনোযোগ ও অনুরাগ নাই, এই জন্যই সাহিত্যের এত দুর্দ্দশা ঘটিতেছে।"

'সাহিত্যের' প্রথম বৎসরের লেখকলেখিকাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, প্রমীলা নাগ, সরোজকুমারী দেবী, বিনয়কুমারী বসু, বেণোয়ারীলাল গোস্বামী, প্রিয়নাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিত্যকৃষ্ণ বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ইঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এখনও বাঙ্গালার পাঠকসমাজকে রচনাসম্ভার উপহার দিতেছেন।

দ্বিতীয় বৎসরে কবি নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ও অক্ষয়কুমার বড়াল; বৈদিক সাহিত্যে সুপণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল; মহিলা লেখিকা কৃষ্ণভাবিনী দাস, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, 'নীহারিকা'-রচয়িত্রী; গিরিজা-প্রসন্ন রায় চৌধুরী, প্রসিদ্ধ সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু, 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-লেখক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত, 'রায় মহাশয়' লেখক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীণ লেখক ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রভৃতি ইহার লেখকদলে যোগ দেন। সেই সময় হইতেই 'সাহিত্য' সাহিত্যক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এই সময় সুরেশচন্দ্রের উদ্যোগে 'সুহৃৎ সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহারই এক অধিবেশনে তিনি 'মেঘদূত' খণ্ড-কাব্যের এক সমালোচনা-প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য—সমালোচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রকট। এই সমালোচনাই সুরেশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৩০ বৎসর বিশেষ দক্ষতা সহকারে 'সাহিত্য' সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার "মাসিক সাহিত্য সমালোচনা" যেমন অকাতরে গুণের পুরস্কার দিত—গুণীর প্রশংসাকীর্ত্তন করিত, তেমনই অসার রচনাকে কঠোর আক্রমণ করিত—সাহিত্যকে আবর্জ্জনার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত। মাসের পর মাস বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাজ এই সমালোচনা সাগ্রহে পাঠ করিয়া আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিত।

সাংবাদিকরূপে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ—দীর্ঘকাল 'বসুমতী' (সাপ্তাহিক) পরিচালনে। এই সময় তিনি আবার তাঁহার পুরাতন বন্ধু, বাঙ্গালা সাহিত্যের সুহৃদ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত একযোগে বাঙ্গালায় নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। উপেন্দ্রনাথের 'বসুমতী' সুরেশচন্দ্রের পরিচালনায় রাজনীতিক্ষেত্রে সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল।

ইহার মধ্যে—বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে যে আন্দোলন বঙ্গদেশ হইতে উদ্গত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয় তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সুরেশচন্দ্র সভায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। অনুশীলনফলে তাঁহার বক্তৃতাশক্তি স্ফূর্ত হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় বক্তাদিগের মধ্যে উচ্চ স্থানের অধিকারী করে। এই সময় ইনি "বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়ের" সম্পাদক হইয়াছিলেন।

'বসুমতী'—ত্যাগ করিবার পর তিনি দেশপূজ্য সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাঙ্গালী' পত্রের ও তাহার পর 'নায়কে' সম্পাদকীয় কার্য্যে সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং 'বসুমতীর' ও বন্ধুর প্রতি অনুরাগহেতু বর্ত্তমান লেখক জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় য়ুরোপের রণাঙ্গন পরিদর্শন জন্য বিলাতের মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় গমন করিলে, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে 'বসুমতী'র পরিচালন-কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

সুরেশচন্দ্রের অজস্র রচনা দৈনিক ও সাপ্তাহিকপত্রের চিরদীপ্ত হুতাশনের ইন্ধন যোগাইয়া বিস্মৃতির বিলোপ-রাজ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রে রচনার ইহাই অনিবার্য্য ফল—ইহাই নিয়তি। তিনি রাখিয়া গিয়াছেন—কয়টি গল্প ও কয়টি প্রবন্ধ। কিন্তু বিলাতের প্রসিদ্ধ সমালোচক প্যালগ্রেভের মত তাঁহার বৈশিষ্ট্য তাঁহার সমালোচনায় ও রচনা-নির্ব্বাচনে সপ্রকাশ ছিল। তিনি কোন রচনাই পরীক্ষা না করিয়া, প্রয়োজনমত প্রসাধন ব্যতীত পত্রস্থ করিতেন না। তাঁহার লেখনীর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে অনেক নূতন লেখকের অনুবাদও কিরূপ মনোরম হইয়া উঠিত তাহা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত 'ছিন্নহস্ত' প্রমাণ করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ভাবে সাহিত্যিক-মণ্ডলী রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যিকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনই—বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণ করিয়া—সাহিত্যিকমণ্ডলী রচনা করিয়া 'সাহিত্য' পরিচালিত করিয়াছিলেন। উত্তরকালে যাঁহারা সাহিত্যসেবায় অক্ষয় যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকে সুরেশ-চন্দ্রের সহকর্ম্মী ছিলেন। যাঁহারা 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক শ্রীযুত জলধর সেন মহাশয়কে শিক্ষকের কার্য্য ত্যাগ করাইয়া সাহিত্যের সেবায় আকৃষ্ট করেন, সুরেশচন্দ্র তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনিই কবিবর নবীনচন্দ্রের ভারত-ভ্রমণ বিষয়ক প্রবন্ধগুলি—পত্র হইতে প্রবন্ধে পরিণত করিয়া প্রকাশ করেন। সুরেশচন্দ্র সাহিত্য-

রসিক ছিলেন এবং সাহিত্যিক পরিবেষ্টন ব্যতীত আনন্দলাভ করিতেন না।

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে যে আন্দোলন হয়, তাহার সহিত তাঁহার সম্বন্ধের বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। রাজনীতিতে তিনি জাতীয় দলভুক্ত ছিলেন। পঞ্জাবে অনাচার, খিলাফৎ সমস্যা, শাসন-সংস্কার—এই কারণত্রয় লইয়া মহাত্মা গান্ধী যখন অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করেন, সুরেশচন্দ্র তখন ভগ্নস্বাস্থ্য। তথাপি তিনি অসুস্থ শরীরে কলিকাতায় লালা লজপতরায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশনে যোগ দেন। তাহাতেই তাঁহার ব্যাধি বৃদ্ধি পায় ও অল্পদিন পরে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

তিনি কাশ্মীর দরবারে সমাদৃত জম্বুর গভর্ণর শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই।

সমসাময়িক সমাজে সুরেশচন্দ্র বিশেষ সমাদৃত ছিলেন। সাহিত্যিক সমাজে এই শক্তিশালী লেখক "সমাজপতি" বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। বাস্তবিক সাহিত্যে সমাজপতি হইবার অনেক উপকরণই সুরেশচন্দ্রে ছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ তাহার উন্নতির জন্য পরিকল্পিত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান মাত্রেই সুরেশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করিত। সেই জন্যই তিনি সাহিত্য সম্মিলনে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেন এবং তাহার বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কখন তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান প্রদান করিয়া আপনাকে সম্মানিত করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কল্যাণকামী সদস্য ছিলেন—ইহার মন্দির নির্ম্মাণার্থ ভূমিখণ্ড ভিক্ষা করিতে কাশিমবাজারে মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নিকট গিয়াছিলেন এবং পরিষদের অন্যান্য কল্যাণকামীর সহিত পরিষদ-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে ও আগ্রহে পরিষদের মন্দির-প্রবেশ উপলক্ষে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার অমর গীত "জননী বাঙ্গলাভাষা" রচনা করিয়াছিলেন। সেই গীতে সুরেশচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার মন্ত্র কবির ভাষায় মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি সেই মন্ত্রই জপ করিয়া গিয়াছেন।

সুরেশচন্দ্রের স্মৃতি বহুদিন বাঙ্গালার সাহিত্যগগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত অবস্থান করিবে, সন্দেহ নাই।

১৩২৭ সালের ১৭ই পৌষ সুরেশচন্দ্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যতীশচন্দ্র পূর্ব্বেই পরলোকগত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অভাগিনী জননী হেমলতা দেবী এখনও জীবন্মৃতা অবস্থায় আছেন।

সবারে ভুলিয়া যাব ?

শ্রীঅজয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

যে পাখী গেয়েছে গান হৃদয়-মালঞ্চে বসি'
স্নিগ্ধ জোছনায়,
যে কবি পেয়েছে সাড়া মূর্ত্তিমতী বেদনায়
পুষ্প-লতিকায়,

যৌবন-কানন ঘেরি' যাহারা এনেছে ওগো
বেদনায় স্মৃতি,
নিঠুর জীবন ভরি' যে জন ঢেলেছে সদা
মধুময় প্রীতি,—

সবারে ভুলিয়া যাব অজানা দিনের সেই
প্রভাত বেলায় ?
আমারে বিলায়ে দেব সবারে ছিনিয়ে নেয়া
সুখের মেলায় ?

স্বপ্নময় জগতের অদৃষ্টলিপির বুকে
কামনা লুকায়।
অনন্ত সাগর পারে সে আনন্দ কলরবে
কামনা ভুলায় ?

বাপের বেটা

শ্রীবামনদাস মৈত্র বি-এ

"সাত-লাট" জমিদারীর প্রধান মণ্ডল দরাপ সরদারই শুভ পুণ্যাহের প্রথম নজরের টাকা প্রদানের অধিকারী। সিন্দূরে রঞ্জিত করিয়া এই টাকার ছাপ অঙ্কিত করা হয় নব বর্ষের সমস্ত খাতার প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষভাগে। গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া জমিদারীর সদর সেরেস্তায় এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

"সাত-লাট' জমিদারী যখন ত্রিলোচন রায়ের হস্তগত হয়, তখন বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করিবার অপরাধে "সাতলাটে"র পূর্ব্বতন জমিদারকে সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত করা হইলে, ত্রিলোচন রায় উপযুক্ত সেলামী প্রদানে উক্ত জমিদারীর ইজারা গ্রহণ করেন। পূর্ব্ব জমিদারের পক্ষপাতী প্রজাদিগকে স্ববশে আনিবার জন্য ত্রিলোচন রায়ের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যদি দরাপ সরদারের লাঠীর সহায়তা না পাইত, তবে বোধ হয় বিদ্রোহী প্রজাবর্গকে সহজে বশীভূত করা যাইত না। জমিদারী দখল হইবার তিন বৎসরের মধ্যেই প্রজাগণ বুঝিল, জমিদার ত্রিলোচন রায় বাস্তবিকই প্রজারঞ্জক। আরো বুঝিল, দরাপ সরদারের লাঠীর বহর যতই বিভীষিকাপ্রদ হউক না কেন, তাহার অন্তর মহিমময়।

দরাপ সরদার আজ বৃদ্ধ, বয়স ষাট বৎসর। সবল সুস্থ দেহে জড়তার কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় না। সুধু শুভ্র শ্মশ্রু, গুম্ফ ও কেশেই তাহাকে বয়স্ক বলিয়া মনে হয়।

আজ শুভ-পুণ্যাহের প্রত্যূষ।

সরদারের পুত্রবধূ পরী আসিয়া ডাকিল, "বাপজান, নহবতখানায় সানাই বেজে উঠেছে, উঠবে না?"

দরাপ উত্তর করিল, "মা, সানাইদার আজ কি সুর ধরেছে বলতে পারিস? এমন প্রাণ-মাতানো সুর ত কোন দিন শুনি নাই।"

ঈষৎ হাসিয়া পরী বলিল, "প্রত্যেক দিনই ত শোন এই সুর—'কানাই, বাপ ওঠ্‌রে, গোঠে যাবার সময় হ'ল।' তবে বাপজান, আজ তোমার কাণে, তোমার চোখে সবই সুন্দর ব'লে মনে হ'বে। এমন কি চরণ ঢাকীর ঢাকের বাদ্য আর শ্রীধর কাকার গানও।"

উচ্চ হাসিতে পরীর অন্তরে পুলক সঞ্চার করিয়া দরাপ সরদার বলিল, "কেন রে বেটী, কেন?"

পরী বলিল, "আজ যে হাল-খাতা।"

শয্যা ত্যাগ করিতে করিতে সরদার বলিল, "যদি তুল্‌লি সেই কথা, তবে শোন্। অনেক দিনের কথা—মওরা গাঁও দখল নিতে হ'বে। আমরা মাত্র ১৫ জন লেঠেল। আর আমাদের বিপক্ষে ৩০ জন। ভয় হ'ল,—যদি গাঁও দখল কর্ত্তে না পারি,—তবে মানও যা'বে, জানও যা'বে। প্রাণ থাকতে ত পালাব না। চরণ ঢাকী যাচ্ছিল মনসা তলায় বাজাতে, কাঁধে তা'র ঢাক। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকা যাওনি?' সব খুলে বল্লেম তা'কে। চরণ বল্লে—দরাপ সরদার, "সাত লাটে"র ১৫ জন লেঠেল কি মওরা গাঁয়ের ৩০ জন লেঠেলের সামনে যেতে ভয় পায়? কথা শেষ না হ'তেই তা'র ঢাকে পড়ল কাঠি। ঢাক গর্জ্জে উঠল। মেঘের গর্জ্জনে ময়ূর যেমন নাচে, ১৫ জন লেঠেলের প্রাণও ময়ূরের মত নেচে উঠল। চরণ চল্ল আগে—ঢাক বাজাতে বাজাতে, আমরা চল্লেম ১৫ জন লেঠেল তা'র পেছনে। মওরা গাঁও আমরা দখল করলেম পরী মা। আর শ্রীধর ভায়ার কথা বলছিস্, ও যখন গায়—

"কেঁদ না মা গিরিরাণী উমা আবার আসবে ফিরে,
একটা বরষ ক'দিনের মা—দেখতে দেখতে যাবে সরে।"

তখন চোখে জল আসে না?"

পরী উত্তর করিল, "আসে বাপজান।"

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। দরাপ সরদার উৎসব-বেশে সজ্জিত। পরিধানে চওড়া লাল পাড়ের শাড়ী, অঙ্গে সবুজ ফতুয়া, কাঁধের ওপরে জমিদার-দত্ত বহুমূল্য শাল, মাথায় রেশমের গোলাপী রঙের পাগড়ী, হাতে সর্ব্বজয়ী দীর্ঘ লাঠী। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার একমাত্র পুত্র তোরাপ, পিতার যৌবনের প্রতিমূর্ত্তি।

তোরাপ বলিল, "বাপজান, এইবার চ'ল।"

দরাপ সরদার বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তোরাপ, আকাশে মেঘ হয়েছে কি?"

"না বাবা, আকাশ ত পরিষ্কার।"

"তবে, তবে আলো এত কম কেন?"

"কম ত নয়। বাপজান, বাপজান—"

তোরাপের আর্ত্তস্বরে পরী ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, দরাপ সরদারের দীর্ঘ দেহ পুত্রের বক্ষের উপরে অবলম্বিত, স্কন্ধের শাল ভূমি-লুণ্ঠিত, পাগড়ী শিরচ্যুত, দেহ নিস্তব্ধ। পরী কাঁদিয়া উঠিল "ওগো, বাপজানের কি হ'ল?"

ক্ষীণস্বরে দরাপ উত্তর দিল, "সময় হয়েছে মা, এইবার ছুটি।"

তোরাপ পরীকে বলিল, "বিছানা করে দাও, বাবাকে শুইয়ে, হকিম আনতে যা'ব। ভয় নেই, সামলে নেবেন।"

দরাপ জড়িত স্বরে উত্তর দিল, "হকিম কিছুই কর্ত্তে পারবে না বাপ, হুজুরকে খবর দে। নজরের টাকা নিয়ে যা। আজ থেকে "সাত-লাটে"র প্রধান মণ্ডল তুই। যা বাপজান, হাল-খাতার সময় বয়ে গেলে জমিদারের অকল্যাণ হ'বে।"

পরী লজ্জা ত্যাগ করিয়া শ্বশুরের সম্মুখেই স্বামীকে বলিল, "যাক বয়ে হাল-খাতার সময়। হকিম নিয়ে এস। বাপজানকে বাঁচাও।"

"মা, মরবার সময় তোর বুড়ো ছেলের মনে কষ্ট দিসনে, তোরাপ যা বাপ।"

ধীরে ধীরে বৃদ্ধকে শয্যায় শোয়াইয়া তোরাপ বলিল, "যাচ্ছি, হকিম ডাকতে, হুজুরকে খবর দিতে,—নজর দিতে নয়।"

জমিদারের কাছারীতে ঢাক, ঢোল, সানাই, কাঁসী, নাকাড়া, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। দরাপ সরদার চক্ষু খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের বাজনা পরী।"

"আজ যে হালখাতা বাবা।"

"আমি বেঁচে থাকতে অন্যে নজর দেবে,—তা হয় না। আমাকে নিয়ে চল্ কাছারীতে। পারবি না, দরাপ সরদারের বেটার বউ তুই, তোরাপ সরদারের বউ তুই, তাহের আলীর মেয়ে তুই, একটা বুড়োকে নিয়ে যেতে পারবি না একটুখানি দূরে? না পারিস, আমার ছেলেকে ডেকে দে, সে বাপের বেটা, নিয়ে আমাকে যাবেই।"

বৃদ্ধের বুকের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরী ডাকিল, "বাবা—বাপজান।"

"কে পরী, একবার খাড়া করে দে মা আমাকে, হাতে লাঠীখানা এগিয়ে দে, অনেক কাল ওকে আমি বয়ে বেড়িয়েছি, অসময়ে অনেকবার আমাকে ও উদ্ধার করেছে—বিপদ থেকে। আজ এ অসময়ে ও আমাকে ভুলতে পারে না,—পরী—মা—বেঁচে আছি,—কিন্তু এ বাঁচার কোন দাম নাই।"

জমিদার কাছারীর পুণ্যাহের বাজনা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। পরী উত্তেজিত স্বরে বলিল, "এ কি হ'ল বাপজান, বাজনা এগিয়ে আসছে!"

বৃদ্ধের নয়ন কি এক আশায় জ্বলিয়া উঠিল। দ্বিধা-কম্পিত স্বরে বলিল, "না মা, হুজুরের কাছারীতে আজ হালখাতা, বাজনা বাজবে সেখানে, এগোবে না।"

"না বাবা, এগিয়ে আসছে, বাজনা এগিয়ে আসছে, শুনতে পাচ্ছি এগিয়ে আসছে এই দিকে, আমাদের বাড়ীর দিকে।"

বিপুল শক্তি প্রয়োগে মরণোন্মুখ বৃদ্ধ জানালার দিকে কর প্রসারণ করিয়া বলিল, "দেখ্, মা, জানলা দিয়ে, ভাল করে দেখ্।"

দুই করে জানালার গরাদ ধরিয়া—অপলক দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া পরী বলিতে লাগিল, "সকলের আগে আসছেন হুজুর নিজে, মাথায় তাঁ'র সোণার কলস। পেছনে পুরুৎ ঠাকুর, তাঁর পাশে খাতা হাতে দেওয়ানজী। দেওয়ানজীর দুই পাশে ছোট হুজুর আর তোমার ছেলে। তাঁ'দের পেছনে অনেক লোক,—বাবা, বাবা, তাঁ'রা এসে পড়লেন আমাদের বাড়ীতে।"

"মা, খোদা আমার প্রাণের ডাক শুনেছেন। মরবার সময়ে এত সুখ কারো হয় না। হুজুরের বসবার জন্য আমার সামনে শাল বিছিয়ে দে, সোণার কলস রাখবার জন্য আমার পাগড়ী বিঁড়ে করে রাখ্, টাকায় মাখাবার জন্য সিঁদুর গুলে রাখ,—ধূপকাঠী জ্বেলে দে। গরীবের ঘরে আজ বেহেস্ত নেমে এসেছে, পরী—আমি ধন্য।"

দেখিতে দেখিতে দরাপ সরদারের গৃহ-প্রাঙ্গণ জনসমারোহে পূর্ণ হইয়া গেল।

অঙ্গুলী-সঙ্কেতে বাদ্য থামাইয়া দিয়া ত্রিলোচন রায় উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "সরদার!"

গৃহাভ্যন্তর হইতে কম্পিত স্বরে চিরপরিচিত উত্তর আসিল, "হুজুর, তৈয়ার।"

জমিদারের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন সরদারের স্বরে মৃত্যুর অবসাদ পূর্ণ মাত্রায় পরিস্ফুট।

প্রথামত হালখাতার কার্য্য শেষ হইয়া গেল। ত্রিলোচন রায় সকলকে গৃহের বাহিরে যাইতে বলিলেন। ভিতরে থাকিলেন তিনি, আর সরদারের পুত্র তোরাপ।

মৃদুকণ্ঠে ব্যথাতুর জমিদার বলিলেন, "সরদার, চল্লে তাহ'লে?"

"যাবার কি সময় হয় নাই হুজুর?"

"হয় ত হয়েছে। কিন্তু তুমি আমার চিরসুহৃৎ; জমিদারীর স্তম্ভ, ছাড়তে যে প্রাণ কেঁদে ওঠে।"

দুই বৃদ্ধের চক্ষু হইতে অশ্রুর ধারা বহিতে লাগিল,—তোরাপ কাঁদিয়া উঠিল, প্রকোষ্ঠান্তর হইতে পরীর রুদ্ধ ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

দরাপ সরদার ডাকিল, "তোরাপ।"

"বাপজান।"

"চোখ মুছে ফেল্। খোদার নামে শপথ কর্, জমিদার যদি তোদের ওপরে হাজার অত্যাচারও করেন তবু জমিদারের মান ও প্রাণ রক্ষার জন্য জান দিবি।"

"আমার খোদা তুমি, তোমার নামে শপথ করলেম বাবা।"

দরাপ সরদার—জমিদারের দিকে নিষ্প্রভ দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "হুজুর, এইবার আমি নিশ্চিন্ত।"

"দরাপ, ভাই, মৌলানা সাহেব বাইরে আছেন, ডাকব তাঁকে ঈশ্বরের নাম কর্ত্তে?"

"না হুজুর। চরণ ঢাকীকে একবার ঢাক নিয়ে ভিতরে আসতে বলুন, আর আমার শ্রীধর ভায়াকে।"

ঢাক স্কন্ধে চরণ আসিয়া ঘরের ভিতরে দাঁড়াইল; সঙ্গে শ্রীধর, চক্ষে তাদের অশ্রু!

দরাপ সরদার বলিল, "চরণ বাজা।"

"না—না কাকা—বাজনা আসবে না।"

"না চরণ, বাজাতে হ'বে সেই বাজনা, যা শুনে আমরা ১৫জন লেঠেল ৩০জন লেঠেলকে হটিয়ে দিয়ে মওরা গাঁও দখল করেছিলেম। তার পর শ্রীধর ভায়া, তোর সেই গান, "কেঁদ না মা গিরিরাণী।" পরী মা, এইবার আমার কাছে আয়।"

চরণ ঢাকে কাঠি দিল,—ঢাক গর্জ্জিয়া উঠিল, ভৈরবের শিঙ্গার গর্জ্জনের মত, ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সমুদ্র-গর্জ্জনের মত, কাল বৈশাখীর জলদ-গর্জ্জনের মত। দরাপের অসাড় দুর্ব্বল দেহে যেন ঐশ্বরিক শক্তির আবির্ভাব হইল। কেহ বাধা দিবার পূর্ব্বেই সে লম্ফপ্রদানে শয্যা ত্যাগ করিয়া নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর সতেজ স্পষ্ট কণ্ঠে লড়াইয়ের হাঁক দিল,

"ত্রিলোচন—ত্রিলোচন!"

পুত্র তোরাপ সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিল,—বহির্ভাগে সমবেত জনতা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

"ত্রিলোচন—ত্রিলোচন।"

সরদারের দেহ কাঁপিয়া উঠিল,—ত্রিলোচন রায় তাহার পতনোন্মুখ দেহ ধরিয়া ফেলিলেন।

শ্রীধর কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহিল—

"কেঁদ না মা গিরিরাণী
উমা আবার আসবে ফিরে,
একটা বরষ ক'দিনের মা
দেখতে দেখতে যা'বে স'রে।
তোমার চোখে অশ্রু হেরে
উমার চোখে অশ্রু ঝরে,
কেঁদ না মা—কাঁদায়ো না
গৌরীপুরের সবাকারে।"

গানের শেষে বৃদ্ধ দরাপ সরদারেরও শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইল।

(২)

দরাপ সরদারের মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই জমিদার ত্রিলোচন রায় দেহত্যাগ করিলেন। জমিদার হইলেন তাঁহার যুবক পুত্র ত্রিভুবন রায়। ত্রিভুবন রায় বিলাসী, চরিত্রহীন। প্রবল-পরাক্রম ত্রিলোচন রায়ের কঠোর

শাসনও পুত্রকে সুপথগামী করিতে পারে নাই। সত্য কথা বলিতে কি, একমাত্র পুত্রের শোচনীয় নৈতিক অধঃপতনে বৃদ্ধ জমিদার এক প্রকার ভগ্ন হৃদয়েই ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যহিত পূর্ব্বে ত্রিলোচন রায় তোরাপ সরদারকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "ছেলে, আমিও চল্লেম। যে জমিদারী তোর বাপ আর আমি পত্তন করেছিলেম, ত্রিভুবনের কর্ত্তৃত্বে তা কত দিন থাকবে জানি না। আমার একমাত্র সান্ত্বনা তোকে রেখে গেলাম।"

ত্রিলোচন রায়ের শ্রাদ্ধাদির কয়েক দিন পরে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল যে সদর হইতে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী জঙ্গলাবৃত ভগ্নপ্রায় প্রমোদ-ভবন সংস্কৃত হইয়া বাসোপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রমোদ-ভবনটি ছিল ত্রিলোচন রায়ের পূর্ব্বতন জমিদারের সকল কুকার্য্যের ক্রীড়াভূমি। জমিদারী ত্রিলোচন রায়ের করগত হইবার পর হইতেই প্রমোদ-ভবন অব্যবহার্য্য অবস্থাতেই পড়িয়া ছিল। নবীন জমিদার যে দিন চারজন ভোজপুরী দারোয়ান সহ প্রমোদ-ভবনে পদার্পণ করিলেন, সেই দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তোরাপ সরদারকে হুজুরে হাজির হইবার জন্য আদেশ আসিল। তোরাপ আসিলে ত্রিভুবন রায় তাহার হাতে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন, "সরদার, কুলিগাঁও কাছারীর নায়েবের নামে এই পত্র। খুবই জরুরী। সদরে টাকা নাই, কুলিগাঁও হ'তে টাকা আনতে হ'বে। মনে রেখ সরদার, কাল প্রত্যূষের পূর্ব্বেই টাকা না পেলে আমার মান-সম্ভ্রম সব যাবে।"

তোরাপ উত্তর করিল, 'ভোরের পূর্ব্বেই টাকা নিয়ে আসব, ছোটবাবু।'

সেলাম করিয়া তোরাপ প্রমোদ-ভবন ত্যাগ করিল। একজন ভোজপুরী দারোয়ান নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল।

রাত্রি এক প্রহর উত্তীর্ণ হইবার পর তোরাপের অনুসরণকারী ভোজপুরী আসিয়া খবর দিল, তোরাপ গৃহত্যাগ করিয়াছে, বাড়ীতে আছে তায়েব ঢালীর কনিষ্ঠ পুত্র ভগিনীর রক্ষক রূপে।

জমিদার অনুচ্চ কণ্ঠে হুকুম দিলেন, "যাও নিয়ে এস, কোন গোলমাল যেন না হয়।"

রাত্রি দ্বিপ্রহরের একটু পূর্ব্বে তোরাপ কুলিগাঁও কাছারীতে উপস্থিত হইয়া নায়েবের হস্তে জমিদারের পত্র প্রদান করিল। নায়েব পড়িল, "যে প্রকারে পার অন্তত: আজিকার রাত্রির মত তোরাপ সরদারকে কাছারীতে অবরুদ্ধ রাখিবে।"

সবিস্ময়ে নায়েব জিজ্ঞাসা করিল, "সরদার, এ কি ?"

"নায়েব মশাই, এখনি টাকা চাই। ভোর না হ'তেই টাকা পৌছে দিতে হবে।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে নায়েব বুঝিতে পারিল কি উদ্দেশ্যে জমিদার তোরাপকে কাছারীতে অবরুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। প্রবল উত্তেজনায় নায়েবের দেহ কাঁপিয়া উঠিল। এ কি অত্যাচার! আর অত্যাচার তাহারই ওপর শ্বশুর যাহার দরাপ সরদার, স্বামী যাহার তোরাপ সরদার। আশঙ্কায় নায়েবের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। অতি কষ্টে স্খলিত স্বরে বলিল, "সরদার, বাড়ী ফিরে যাও, তীরের মত ছুটে যাও; জানি না সময় মত পৌছুতে পারবে কি না। কাছারীতে ঘোড়া নাই, পায়ে ছুটতে হ'বে।"

"নায়েব মশাই, কি বলছেন ?"

"সরদার, পশুর বুকে লালসার আগুন জ্বলে উঠেছে তোমার স্ত্রীকে দগ্ধ করবার জন্য,—চেষ্টা কর যদি বাঁচাতে পার।"

দীর্ঘ লাঠির উপর ভর দিয়া তোরাপ সরদার তড়িৎগতিতে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। প্রতি উল্লম্ফনে তাহার আর পরীর মধ্যের ব্যবধান কমিয়া আসিতে লাগিল, তবু দূরে—পরী তবু দূরে—হয় ত পরী নাই, জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে।

তোরাপ যখন মুক্ত দ্বার-পথে গৃহে প্রবেশ করিল, নির্য্যাতিতা পরী তখন বিষপানে মোহাচ্ছন্ন। তোরাপ ডাকিল, "পরী, পরীজান।"

পরীর সারা দেহ চঞ্চল হইয়া উঠিল। ক্ষীণ স্বরে বলিল, "এসেছ, ধর্ম্মরক্ষা কত্তে পারি নাই, তাই জান দিয়েছি, আমি বিষ খেয়েছি। এখনো বেঁচে আছি তোমাকে দেখবার জন্য।"

দুই হাতে পরীকে জড়াইয়া ধরিয়া তোরাপ আর্ত্ত-স্বরে বলিল, "পরী, আর একটুখানির জন্য বেঁচে

থাকতে হ'বে,—যতক্ষণ না ফিরি জমিদারের বুকের রক্ত নিয়ে।"

তোরাপের বুকে মাথা রাখিয়া পরী বলিল, "খুন ত কর্ত্তে পারবে না তা'কে। আমার শ্বশুরের আশীর্ব্বাদ, তাঁ'র মরবার সময়ে তোমার শপথ, জমিদারকে অমর ক'রে রেখেছে।"

"না—না পরী।"

"আমি সত্য কথাই বলছি। জমিদারকে খুন,—তাঁকে বাঁচাতে হ'বে। খানিকক্ষণ আগে আমার বাবা আর দুই ভাই রওনা হয়েছে তাঁকে খুন কর্ত্তে। তায়েব ঢালী আর তোমার সাকরেদ হাসান, হোসেনের হাত থেকে যদি কেউ জমিদারকে বাঁচাতে পারে, সে তুমি। যাও, দেরী ক'রো না।"

"যাব না—কথনো যাব না।"

"যেতে যে হ'বেই তোমাকে। তোমার বাবার আশীর্ব্বাদের,—তোমার শপথের কি কোনই মূল্য নাই?"

"কিন্তু পরী, তোমার বাবা, তোমার ভাই—"

পরীর চক্ষু দিয়া ধারাকারে অশ্রু বহিতে লাগিল। সখেদে নিম্নস্বরে বলিল, "মা নেই, ছোট ভাইটী ভোজপুরীদের তরবারির আঘাতে প্রাণ দিয়েছে। বাবা আর অবশিষ্ট দু'টী ভাই যদি সঙ্গে যায়—দুঃখ করবার কি আছে। কিন্তু তুমি—তোমাকে যে ছেড়ে যেতে হ'বে।"

"পরী যাচ্ছি জমিদারকে বাঁচাতে। ফিরে আসব নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গের সাথী হ'তে। যতক্ষণ না ফিরি বেঁচে থেক।"

চারগাছা তীক্ষ্ণফলক শড়কি, চর্ম্মাচ্ছাদিত ঢাল ও দীর্ঘ লাঠী লইয়া তোরাপ চলিল প্রিয়তমা পত্নীর ইজ্জৎ-হারী অত্যাচারী জমিদারের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য। বক্ষের ভিতরে মর্ম্ম ঈশ্বরের অন্যায় বিচারের প্রতিবাদে গর্জ্জন করিতে লাগিল,—বিবেক আজ মৌন, তর্কের ভাষার অভাবে।

জমিদারের প্রমোদ-ভবন মশালের আলোকে আলোকিত। চারজন ভোজপুরীর মধ্যে তিনজন ধরাশায়ী, মৃত। তোরাপ যে মুহূর্ত্তে ভগ্ন দ্বারপথে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল, সেই মুহূর্ত্তেই তায়েব ঢালীর শড়কি চতুর্থ ভোজপুরীর কণ্ঠ বিদীর্ণ করিল। তায়েব হুঙ্কার দিয়া বলিল, "এইবার দরজা ভেঙ্গে শয়তানকে টেনে বের কর।"

পশ্চাৎ হইতে গভীর নিঃস্বনে ধ্বনিত হইল, "খবর্দ্দার!"

তায়েব ঢালী ও তাহার পুত্রেরা ফিরিয়া দেখিল—তোরাপ সরদার।

তায়েব বলিল, "এসেছিস বাবা, লড়াই শেষ হয়েছে। এইবার শয়তানের পালা। আমাদের মশালের আলো দেখে, ঘোড়ায় চ'ড়ে পালাচ্ছিল, হাসানের শড়কির চোট খেয়ে ঘোড়া প'ড়ে গেল। শয়তান দৌড়ে গিয়ে ঘরে খিল দিয়েছে। আর তাকে বাঁচাবার জন্য আমাদের সামনে দাঁড়াল ওই চার জন দেশওয়ালী। এইবার দরজা ভাঙ্গতে হ'বে তোরাপ।"

তোরাপ ধীরপদে অগ্রসর হইয়া রুদ্ধ দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। শড়কিগুলি মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া দৃঢ় সংযত কণ্ঠে বলিল, "ঢালী, ছেলেদের নিয়ে ফিরে যাও। যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, জমিদার অমর।"

"তোরাপ, বাপ, পরীর যে ধর্ম্ম নষ্ট করেছে সে বাঁচবে কোন্ বিচারে?"

"বাপজান, পরী দেবী; ধর্ম্ম তার নষ্ট হয় নাই, অন্ততঃ আমার চোখে নয়। পরী মরতে বসেছে, সে বিষ খেয়েছে, তবু জমিদারকে বাঁচাব। আমার বাবার আদেশ, আমার পরীর আদেশ।"

"পরী বিষ খেয়েছে—আমি যে ছেলেদের চাইতে পরীকেই বেশী ভালবাসতেম, তোরাপ! খোদা—খোদা—"

বেদনা-ক্ষুব্ধ স্বরে তোরাপ চীৎকার করিয়া বলিল, "ঢালী, ডেক না খোদাকে, খোদা নাই—খোদা নাই—"

তায়েব ঢালী হাসান, হোসেনকে কঠিন কণ্ঠে আদেশ করিল, "ভাঙ্গ দরজা।"

"তা হয় না বাপজান, জমিদারকে মারবার আগে আমাকে মারতে হবে।"

"তবে মর্" এই বলিয়া তায়েব ক্ষিপ্রহস্তে তোরাপের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া শড়কি চালনা করিল। ততোধিক ক্ষিপ্রতা সহকারে তোরাপ শড়কির লক্ষ্য ব্যর্থ করিবার

জন্ত পার্শ্বে সরিয়া গেল। রুদ্ধ-দ্বারে বিদ্ধ হইয়া দীর্ঘ শড়কি সঘনে কম্পিত হইতে লাগিল। তায়েব ঢালী দ্বিতীয় শড়কি গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তোরাপ মৃত্তিকায় প্রোথিত একটি শড়কি উত্তোলিত করিয়া তায়েবের মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। সুকৌশলী ঢালী বাম-কর-ধৃত ঢাল সঞ্চালনে তোরাপের শড়কির লক্ষ্য ব্যর্থ করিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তায়েবের দুই পুত্র এক যোগে তোরাপের উদ্দেশে দুইটী শড়কি ত্যাগ করিল। যুগল শড়কি তোরাপের দুই পার্শ্বের পঞ্জরের চর্ম্ম ভেদ করিয়া গেল। তোরাপ বলিল, "সাবাস ভাই, এইবার হুঁসিয়ার।" সঙ্গে সঙ্গে তোরাপের উভয় করে শোভা পাইল ভয়াবহ দুই শড়কি—লক্ষ্য হাসান হোসেনের কণ্ঠ। তায়েব ঢালী চীৎকার করিয়া বলিল, "হাসান, হোসেন, হুঁসিয়ার।" তোরাপ বাম হস্তের শড়কির লক্ষ্য পরিবর্ত্তন করিয়া ঢালীর বক্ষ উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। দ্বিতীয় শড়কি তাহার করচ্যুত হইয়া হোসেনের কণ্ঠ বিদীর্ণ করিল। তায়েব ঢালী ও হোসেন একযোগে ভূপতিত হইল। চক্ষের নিমেষে তোরাপ তার শেষ সম্বল চতুর্থ শড়কি গ্রহণ করিয়া হাসানের শির লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। ললাটে বিদ্ধ হইয়া হাসান ঢলিয়া পড়িল।

পিতৃতুল্য তায়েব ঢালী ও সোদরপ্রতিম ভ্রাতৃদ্বয়ের শোচনীয় পরিণাম দৃষ্টে তোরাপের চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। চক্ষু যখন উন্মীলিত হইল, তোরাপ সবিস্ময়ে দেখিল, তায়েব ঢালীর লাঠী তাহার মাথার উপরে আঘাতোদ্যত। বাধা দিতে পারিল না। লাঠীর আঘাতে মস্তক হইতে অজস্র শোণিত স্রাবিত হইতে লাগিল। ঢালী কাঁদিয়া বলিল, "তোরাপ, জান দিলি।"

"ঢালী, জান দিলেম, জান নিলেমও"। চক্ষের পলকে তোরাপের লাঠী পড়িল তায়েব ঢালীর মস্তকে।

ঘুরিয়া পড়িবার সময় ঢালী বলিল, "জোয়ান মর্দ্দ, বাপের বেটা তুই।"

কোমর হইতে চাদর খুলিয়া তোরাপ মস্তকের আহত স্থান বাঁধিয়া ফেলিল। তার পর রুদ্ধ দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিল, "ছোটবাবু, বাইরে এস।"

ভয়বিহ্বল স্বরে জমিদার জিজ্ঞাসা করিল, "তোরাপ সরদার, মাপ করেছ আমাকে, বাইরে গেলে মেরে ফেলবে না ত?"

"ছোটবাবু, মাপ তোমাকে কর্ত্তে পারব না, তবে আমার কাছে তুমি নিরাপদ। যাদের হাতে তুমি মর্ত্তে বসেছিলে, তোমাকে বাঁচাবার জন্য আমি তাদের মেরেছি। কে তারা জান? বাপের মত যাকে দেখতেম, পরীর বাপ সেই তায়েব ঢালী;—নিজের ভায়ের মত যাদের ভালবাসতেম, পরীর দুই ভাই সেই হাসান আর হোসেন। আস্তাবলে ঘোড়ার ডাক শুনেছি। ঘোড়ায় চ'ড়ে মুর্শিদাবাদ চ'লে যাও। সকালে সব খবর প্রকাশ হ'য়ে পড়বে। হাজার হাজার লোক আসবে তোমাকে খুন কর্ত্তে। কেউ তাদের গতিরোধ কর্ত্তে পার্ব্বে না। আমি বেঁচে থাকলেও না।"

"যাচ্ছি তোরাপ, কিন্তু তুমি না বেঁচে থাকলে আমার জমিদারী—"

"ছোটবাবু, তায়েব ঢালীর লাঠী যা'র মাথায় পড়ে সে বাঁচে না। যাও।"

জমিদার প্রস্থান করিলে তোরাপ হাসান, হোসেনের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। লাঠীর উপর দেহভার ন্যস্ত করিয়া গতপ্রাণ ভ্রাতৃদ্বয়ের দিকে চাহিল। অশ্রুর প্রাবল্যে চক্ষুর ক্ষীণ দৃষ্টি ক্ষীণতর হইল। অস্ফুট সান্ত্বনার স্বরে তোরাপ বলিল, "দু'দণ্ডের ছাড়াছাড়িতে কিই-বা এসে যায়; হাসান, হোসেন।"

লাঠী ফেলিয়া দিয়া তোরাপ তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "আর ত এখানে থাকতে পারব না ভাই, পরীর কাছে যে'তে হ'বে।" উভয়ের মৃত্যুশীতল ললাটে রক্ত-লাঞ্ছিত চুম্বন-রেখা অঙ্কিত করিয়া তোরাপ লাঠীতে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার চাদর যেন শুভ্রতা ত্যাগ করিয়া লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। তায়েব ঢালীর নিকটে আসিয়া তোরাপ আবার বসিয়া পড়িল। পিতৃতুল্য বৃদ্ধের পদতলে মাথা রাখিয়া তোরাপ বলিল, "দুঃখ কিসের বাপজান, কেউ ত পেছনে পড়ে থাকব না, সবাই ত যাচ্ছি।"

লাঠীতে ভর দিয়া তোরাপ উঠিতে গেল। দুর্ব্বল হস্ত হইতে লাঠী খসিয়া পড়িল। অসাড় চরণদ্বয় তাহার দেহের ভার উত্তোলন করিতে অসমর্থ হইল। নির্ভীক

তোরাপ মৃত্যুর ভয় করে না, তবে মরবার পূর্ব্বে পরীর কাছে যেতে হবে। চীৎকার করিয়া বলিতে গেল, "বল চাই, পরীকে দেখতে যাব, যেতেই হবে—প্রতীক্ষমানা প্রিয়ার আশা পূর্ণ কর্ত্তেই হবে, আমার প্রিয়া দর্শনের আকুল আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুধিত প্রাণের প্রবল বাসনা পূর্ণ কর্ত্তেই হবে"—কণ্ঠ হইতে বাহির হইল অস্পষ্ট, অর্থহীন ঘড়ঘড় শব্দ।

*   *   *   *

মৃত্যুর শীতল করস্পর্শে পরীর হৃদয় তখন নিস্পন্দপ্রায়। দূরাগত বংশীধ্বনির মত সহসা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল তোরাপের আকুল আহ্বান, "পরী, পরীজান।" পরীর সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, নিস্তব্ধপ্রায় হৃদ্‌পিণ্ড আবার সঘনে স্পন্দিত হইতে লাগিল। পরী উত্তর দিল, "এসেছ, কোথায় তুমি?"

"এই যে আমি পরী, তোমার সামনে। জমিদারকে বাঁচিয়েছি। কিন্তু তোমার ভাই হাসান, হোসেন গিয়েছে, তোমার বাবা গিয়েছেন। আর আমি এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে। পরী,—পরীজান, চ'ল।"

নিশ্চিন্ত মনে পরম নির্ভরতার সহিত মৃদুস্বরে পরী বলিল, "আমার হাত ধর।"

রূপদক্ষ রদ্যাঁ

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস

প্যারিস্ সহরে ভাস্কর্য্য ও চিত্রের প্রদর্শনী আছে অনেকগুলি। সেগুলি ফরাসী জাতির ললিতকলার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগেরই পরিচায়ক। রদ্যাঁ মিউজিয়ম তাদের অন্যতম। প্রদর্শনীটি তুলনায় অতি ক্ষুদ্র হলেও তার সম্মান অনেক বেশী। সেই কারণে চারু শিল্পের কোন সমজ্‌দারেরই তা উপেক্ষার বস্তু নয়।

রদ্যাঁ যে আধুনিক কালের পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর, সে কথা সকল যুগের সকল লোকই মেনে নিয়েছে। ১৯১৭ সালে যখন রদ্যাঁর মৃত্যু হয়, তার পর ফরাসীরা তাঁর স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ এই মিউজিয়মটি প্রতিষ্ঠিত করেছে। এতে কেবল মাত্র রদ্যাঁর হাতের কাজগুলিই প্রদর্শনীয় বস্তু। ফরাসী জাতির গৌরব রদ্যাঁর উদ্দেশে এটা যেন ফরাসীদের জাতীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ।

অগীস্ত রদ্যাঁর জন্ম প্যারী সহরে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে। তিনি গরীব ঘরেরই ছেলে ছিলেন এবং ছোট বেলায় অনেক দিন তাঁকে মিস্ত্রীগিরি করে জীবিকা উপার্জ্জন করতে হয়েছিল। তার পর যখন তিনি ভাস্কর্য্যের কাজ আরম্ভ করলেন, তখন অনেক কাল তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তাঁর অনেক দিন পর্য্যন্ত একটা ষ্টুডিও ঘরও জোটে নি। তাঁর শোবার ঘরেই তাঁকে শিল্প-চর্চ্চা অভ্যাস করতে হত।

কিন্তু প্রতিভা বেশী দিন চাপা থাকতে পারে না। কিছু কাল পরে তাঁর 'নাক ভাঙা মানুষ' নামে মূর্ত্তিখানি সাধারণের কাছে যথেষ্ট সমাদর পেল এবং তাঁর সুযশঃ সেই সঙ্গে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভাস্কর্য্যে এমন নৈপুণ্য না কি অনেক কাল পর্য্যন্ত কেউ দেখাতে পারেন নি। তার পর ১৮৭৭ সালে তাঁর 'The age of Bronze' নামে প্রস্তর-মূর্ত্তিটি যখন প্রদর্শনীতে দেওয়া হল লোকের মন অবাক মানল। সে মূর্ত্তিখানি এমনি নিখুঁত এবং সজীব হয়েছিল যে, কেউ কেউ বললেন যে এ কথনই খোদিত মূর্ত্তি হতে পারে না। শিল্পী নিশ্চয় কোন জীবিত মানুষের ছাপ নিয়ে এটা নির্ম্মাণ করেছেন। আমাদের প্রতিভাশালী শিল্পীটি এ উক্তি শুনে বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি তখন ঠিক করলেন যে জগৎকে তাঁর শক্তির এমন পরিচয় দিয়ে দেবেন যে, নিন্দক জন তাঁকে ভবিষ্যতে আর যেন এমন অপবাদ না দিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'সেণ্টজন্' এর যে মূর্ত্তি খোদিত করেন তা জীবন্ত মানুষের আকার থেকে অনেক বড় করেই করেছিলেন। তাঁর নৈপুণ্যের গুণে সে মূর্ত্তিটি আগের থেকেও সুন্দর হয়েছিল। তাকে দেখে আর লোকের মনে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ রইল না, দুর্ম্মুখ জনেরও মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

রদ্যাঁ যে কেন জগতের ভাস্করদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাবার যোগ্য, সেটা বুঝ্তে হলে তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী ভাস্করদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য কোথায় সেইটারই অনুসন্ধান করতে হবে। সুতরাং ভাস্কর্য্য-শিল্পের ইতিহাস মোটামুটি একবার স্মরণ করে দেখ্তে হবে।

চিত্রকলায় মানুষের ব্যুৎপত্তির পরিচয় অনেক কাল আগে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের সময়ও পাওয়া যায়। প্রস্তর যুগের মানুষ যে তার গুহার দেয়ালে বা অস্ত্রের হাতলে নানা জীব-জন্তুর ছবি আঁকত, তার ভূরি ভূরি উদাহরণ মেলে। কিন্তু ভাস্কর্য্য-শিল্পে মানুষের হাতে-খড়ি হয় তার অনেক অনেক কাল পরে। তার কারণ সহজেই অনুমেয়। ভাস্কর্য্য শিল্প সম্ভব হতে হলে যে সমস্ত উপকরণের প্রয়োজন তা মানুষের অনেকখানি সভ্যতায় অগ্রগতি-সাপেক্ষ। সর্ব্বপ্রথম গ্রীসেই তার চর্চ্চার পরিচয় আমরা পাই। এবং সব থেকে আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ভাস্কর্য্য শিল্প গ্রীসে উঠে অল্প কালের মধ্যে সেইখানেই বিশেষ পরিবর্দ্ধিত হয়ে উঠে। তা এত পরিবর্দ্ধিত হয়েছিল যে শিল্পজ্ঞরা ভাস্কর্য্য-শিল্পের উন্নতির চরম সোপানেই তাদের স্থান নির্দ্দেশ করে থাকেন।

জীবন্ত মানুষের নিখুঁত প্রতিরূপ প্রস্তরে ফলিয়ে তুলতে প্রাচীন গ্রীকরা যে অদ্বিতীয় ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতি প্রাচীন গ্রীক মূর্ত্তিগুলি জীবন্ত মানুষের এমনি অনুরূপ যে তারা জীবন্ত বলেই যেন ভ্রম হয়।

মিলো-দ্বীপের ভীনাস্

ক্যুপিড্—মার্কেন্ত খোদিত

এইখানেই গ্রীক ভাস্করদের নৈপুণ্য। তার নিদর্শন স্বরূপ জগদ্বিখ্যাত 'মিলো দ্বীপের ভীনাস্' এর মূর্ত্তির কথা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। এই মূর্ত্তিটী খৃঃ পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে কোন এক অজ্ঞাত গ্রীক ভাস্করের নির্ম্মিত—পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা এই রকম অনুমান করেন। মিলো দ্বীপের সন্নিকটে সমুদ্রগর্ভ হতে এই মূর্ত্তিটী অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। এই জন্য এর এই বিশেষ]

নামকরণ। মূর্ত্তিটী এখন পারী সহরের 'লুভ্‌র্‌' চিত্র-প্রদর্শনীতে সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে। এই মূর্ত্তিটার গঠন-ভঙ্গিমা এমনি মনোরম এবং সুন্দর যে অনেক বিশেষজ্ঞ এই মত প্রচার করেছেন যে এটি নারী-সৌন্দর্য্যের আদর্শ স্বরূপ। আজকালকার দিনে যে সব নারী-সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতা চলে, তাতে শরীরের বিভিন্ন অবয়বের আদর্শ মাপ এই মূর্ত্তিটি হতেই সংগ্রহ করা হয়। এই

প্রস্তর মূর্ত্তি—হুদাঁ খোদিত

জাতীয় ভাস্কর্য্যের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হল যাতে মূর্ত্তিটি বাস্তব জিনিষের একেবারেই অনুরূপ হয় সেই বিষয়েই নজর দেওয়া।

গ্রীকরা ভাস্কর্য্য শিল্পে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছিল, তার পরবর্ত্তী যুগের ইয়োরোপীয় ভাস্কর্য্য তার ধারেও যেতে পারে নি,—তুলনায় তা এমনি নিকৃষ্ট ছিল। তার পর অনেক শতাব্দী কেটে যাবার পর মধ্যযুগে যখন ইতালী দেশে শিল্পকলার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়, তখনই আবার গ্রীকদের সেই লুপ্ত নৈপুণ্যের নিদর্শন আমরা নূতন করে পাই। যাঁর হাতে এটি সম্ভব হয় তিনি হলেন জগদ্বিখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী ফ্লোরেন্সএর মাইকেল এঞ্জেলো। তাঁর খোদিত 'ক্যুপিড' 'ব্যাকাস্‌' ও ডেভিডের মূর্ত্তিগুলি দেখ্‌লে আমাদের ভ্রম হয় তারা যেন

চুম্বন—রদ্যাঁ খোদিত

সেই প্রাচীন গ্রীসের শিল্পীর নির্ম্মিত মূর্ত্তি। তাঁর নাম না বলে দিলে সেগুলিকে একেবারেই গ্রীক মূর্ত্তি বলে ধরে নেওয়া যে কোন লোকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এ হতেই প্রমাণ হবে যে তাঁর আদর্শ ও প্রাচীন গ্রীক ভাস্করদের আদর্শ বিভিন্ন নয়—সম্পূর্ণ এক। এখানেও বাস্তবের সহিত প্রতিকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য রাখাই শিল্পীর উদ্দেশ্য।

তার পরের যুগে যে সব ভাস্কর মূর্ত্তি খোদিত করে কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছেন তাঁরা অধিকাংশই ফরাসী দেশীয়। 'বাপ্তিস্ত পিগাল্', 'আঁতোয়ান্ হুদোঁ', 'ফ্রাঁসোয়া রীদ্', 'মারকেন্ত' প্রভৃতি বিখ্যাত ভাস্করগণ সকলেই জাতিতে ফরাসী। এঁরা সকলেই কিন্তু সেই প্রাচীন গ্রীক আদর্শ তথা মাইকেল এঞ্জেলোর আদর্শে অনুপ্রাণিত। খোদিত মূর্ত্তির প্রতি অঙ্গটি কি ভাবে ঠিক বাস্তবের সঙ্গে মিলে, সেই ছিল তাঁদের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা। প্রতিকৃতির সঙ্গে বাস্তবের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মিলই এই সকল ভাস্করের আদর্শ।

সকল জাতীয় চারুকলারই সম্পর্ক মোটামুটি দুইটি জিনিষের সঙ্গে—ভাব ও তাহার রূপ। শিল্পী যাতে তাঁর নৈপুণ্যের দ্বারা প্রকাশ দিতে চান সেই হল তার ভাব। এবং তাকে শিল্পী যে বাস্তব আকার দান করেন সেই হল তার রূপ। প্রতি ভাবেরই অভিব্যক্তি হয় রূপের ভিতর দিয়ে। যেমন ভাষা ভাবকে প্রকাশ করে, তেমনি শিল্পীর মনের ভাবকে তাঁর চিত্র বা মূর্ত্তি প্রকাশ দিয়ে থাকে। ললিত কলার এই দুইটি দিককে ভিত্তি করে দুই জাতীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা সাধারণতঃ হয়ে থাকে। এক জাতীয় শিল্পী বলেন, ভাবের চেয়ে বাহিরের রূপটিই বড় জিনিষ। তাঁদের মতে আর্টের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক হল রূপ বা formএর সঙ্গে ;—ভাব বা ideaর সঙ্গে নয়। বাক্যে যেমন কোন কবির মতে ছন্দের সৌন্দর্য্য ও পদলালিত্যই বড় জিনিষ হয়ে পড়ে এবং ভাবকে তাঁরা কবিতার মুখ্য জিনিষ মনে করেন না, এ-ও সেইরূপ। তারই জন্য এঁদের আদর্শ হল এইটুকু দেখা যে, কি ভাবে মূর্ত্তি বা চিত্রকে নিখুঁত রূপ দেওয়া যায়। তাঁরা তাই জন্য মূর্ত্তি আঁক্‌বার বা খোদিত কর্‌বার আগে Anatomy ভাল করে পড়ে নেন। এবং তার ধরা-বাঁধা নিয়ম অনুসারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাপ নিয়মিত করেন। আর এক দল শিল্পী আছেন যাঁরা বলেন যে শিল্পীর মনে যে ভাব জাগে এবং পরে যাকে তাঁরা চিত্রে বা মূর্ত্তিতে রূপ বা অভিব্যক্তি দেবার চেষ্টা করেন, শিল্পীর চোখে তারই প্রাধান্য বেশী থাকা উচিত। ললিত কলার প্রাণ হল সেই ভাবটি এবং বাহিরের যে রূপ তা হল তার দেহ স্বরূপ,—তার সার্থকতা ভাবকে অনুরূপ অভিব্যক্তি দেওয়াতেই। কারু-শিল্পে মূর্ত্তি বা রূপটা গৌণ স্থান অধিকার করে মাত্র। এই শ্রেণীর শিল্পী সেই কারণে Anatomyর নিয়মের ধার ধারেন না, দেহের অনুপাতে হাতটা বড় হল কি ছোট হল তা নিয়ে মাথা ঘামান না। তিনি দেখেন তাঁর মূর্ত্তি তাঁর মনের ভাবকে অভিরূপ প্রকাশ দিল কি না।

প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর শিল্পীরা হলেন প্রথম শ্রেণীর, অর্থাৎ তাঁরা শিল্পে মূর্ত্তি বা রূপকেই প্রাধান্য দিতেন বেশী ; তাঁদের আদর্শ ছিল রূপকে সম্পূর্ণতা বা সর্ব্বাঙ্গীনতা দেওয়া। মাইকেল এঞ্জেলোরও আদর্শ ওই এক। তাঁর পরবর্ত্তী ভাস্করগণও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কিন্তু রদ্যাঁই প্রথম এই আদর্শকে দূরে ঠেলে অন্য আদর্শটিকে বরমাল্য পরিয়ে ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন বাহিরের রূপের থেকে ভিতরের ভাবটিই বড় জিনিষ এবং তাকে পরিস্ফুট কর্‌বার জন্য রূপকে যতখানি সমৃদ্ধ করা দরকার ততখানিই করা উচিত। তার বেশী কর্‌লে ভাবকে রূপ চাপা দিয়ে দেবে এবং ফলে শিল্পের প্রাণ নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু তাঁর এই মত একদিনেই তাঁর মনে পরিবর্দ্ধিত আকারে দেখা দেয় নি। তিনি প্রথমে মাইকেল এঞ্জেলো বা গ্রীক আদর্শ অনুসারে রূপকে প্রাধান্য দিয়েই মূর্ত্তি খোদিত কর্‌তে আরম্ভ করেন। পরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সে আদর্শ পরিবর্ত্তিত হতে থাকে ; এবং পরিণত হয়ে তাঁর শিল্পের বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্যকে ফুটিয়ে তুলে। তাঁর প্রথম বয়সের নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে সেই জন্য গ্রীক আদর্শের যথেষ্ট ছায়াপাত হয়েছে দেখা যায়। তাঁর The Age of Bronze বা 'সেণ্টজন' এর মূর্ত্তি বা তাঁর বিখ্যাত যুগল মূর্ত্তি—'The Baisey' এই শ্রেণীর। এগুলিতে দেহের অবয়বের নিখুঁত গঠনভঙ্গিমাই লক্ষ্য কর্‌বার বিষয়। একেবারে গ্রীক মূর্ত্তির মতই এদের রূপ।

পরিণত অবস্থায় তিনি যে সব মূর্ত্তি খোদিত কর্‌তে লাগ্‌লেন, তাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণতা বা গঠনের স্বাভাবিকতা আর আমরা পাই না। অবয়বগুলি Anatomyর নির্দ্দেশ অনুসারে ঠিক হয় নি বলেই মনে হবে। এমন কি যে প্রস্তর কেটে মূর্ত্তি গড়্‌তেন সে প্রস্তরের গাত্র হতে মূর্ত্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দিতেন না পর্য্যন্ত। প্রস্তরের দেহ হতেই সে মূর্ত্তিগুলি উঠেছে যেন,

দেখ্‌লে এই রকমই ভ্রম হবে। The Death of Adonis এই শ্রেণীর মূর্ত্তি। এখানে দেহের অবয়বের স্বাভাবিকতা মোটেই নাই। এমন কি চোখ মুখগুলি অস্পষ্টভাবে খোদিত। মূর্ত্তিটিতে প্রিয়জনের মৃত্যুতে নারীটির বেদনার ইঙ্গিতখানি অতি মনোরম। তাঁর এই নিদর্শনটীকে উপযুক্ত ভাবে বুঝ্‌তে হলে আমাদের বাহ্যিক রূপ হতে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে জড়িয়ে যে বিষাদের অভিব্যক্তিখানি ফুটে উঠেছে তার প্রতিই লক্ষ্য দিতে হবে বেশী। এই জাতীয় শিল্পই তাঁকে জগতে ভাস্করের শ্রেষ্ঠ আসনটি জয় করে এনে দিয়েছিল।

যে শিল্পী একদিন Age of Bronze খোদিত করে মানুষের মনে এই ধারণা জন্মে দিয়েছিলেন যে তিনি জীবন্ত মূর্ত্তির ছাপ নিয়ে তা নির্ম্মাণ করেছেন, সেই শিল্পীই পরবর্ত্তী জীবনে Death of Adonis জাতীয় এমন সকল মূর্ত্তির রূপ দিলেন, যাদের বাস্তবের থেকে অবাস্তবের সঙ্গেই মিল বেশী। কেউ বা বল্‌ল তাঁর অবনতি ঘটেছে, কেউ বা বল্‌ল তিনি পাগল হয়েছেন। কিন্তু যিনি খাঁটি শিল্পের সমজদার তিনি বুঝ্‌লেন ভাস্কর্য্য-শিল্পের একটি নূতন দিক আবিষ্কৃত হয়েছে।

আত্মহত্যার অধিকার

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষাকালেই ভয়ানক কষ্ট হয়।

ঘরের চালটা একেবারে ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে।

কিছু নারিকেল আর তাল-পাতা মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়াই কুড়াইয়া সংগ্রহ করা গিয়াছিল। চালের উপর সেগুলি বিছাইয়া দিয়া কোন লাভ হয় নাই। বৃষ্টি নামিলেই ঘরের মধ্যে সর্ব্বত্র জল পড়ে।

বিছানাটা গুটাইয়া ফেলিতে হয়, ভাঙ্গা বাক্স পেঁটরা কয়টা এ কোণে টানিয়া আনিতে হয়, জামা-কাপড়গুলি দড়ি হইতে টানিয়া নামাইয়া পুঁটুলি করিয়া, কোথায় রাখিলে যে ভিজিবে কম, তাই নিয়া মাথা ঘামাইতে হয়।

বড় ছেলেটা কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। আদর করিয়া তাহার কান্না থামানো যায় না, ধমক দিলে কান্না বাড়ে। মেয়েটা বড় হইয়াছে, কাঁদেনা; কিন্তু ওদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া এমন করিয়াই চাহিয়া থাকে যে নীলমণির ইচ্ছা হয় চড় মারিয়া ওকেও সে কাঁদাইয়া দেয়। এতক্ষণ ঘুমাইবার পর এক ঘণ্টা জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইল বলিয়া ও কি চাহনি? আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে, ঘরের চাল সাত বছর মেরামত হয় নাই। ঘরের মধ্যে জল পড়াটা নীলমণির এমন কি অপরাধ যে মেয়েটা তাকে ও-রকম ভাবে নিঃশব্দে গঞ্জনা দিবে?

ছোটছেলেটাকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া নিভা একবার এধার একবার ওধার করিয়া বেড়াইতেছিল।

হঠাৎ বলিল 'ওগো, ছাতিটা একবার ধরো, একেবারে ভিজে গেল যে! লক্ষ্মী, ধরো একবার ছাতিটা খুলে। ওরও কি শেষে নিমুনিয়া হবে?'

নীলমণি বলিল 'হয় তো হবে। বাঁচবে।'

নিভা বলিল 'বালাই ষাট্‌।—শ্যামা, তুইও তো ধরতে পারিস ছাতিটা একটু?'

শ্যামা নীরবে ভাঙ্গা ছাতিটা নিভার মাথার উপর ধরিল। ছাতি মেলিবার বাতাসে প্রদীপের শিখাটা কাঁপিয়া গেল। প্রদীপে তেল পুড়িতেছে। অপচয়! কিন্তু উপায় নাই। চাল ভেদ করা বাদলে ঘর যখন ভাসিয়া যাইতেছে তখনকার বিপদে প্রদীপের আলোর একান্ত প্রয়োজন। জিনিষপত্র নিয়া মানুষগুলি একোণ ওকোণ করিবে কেমন করিয়া?

'একছিলুম তামাক দে শ্যামা।' নীলমণি হুকুম দিল।

শ্যামা বলিল 'ছাতিটা ধর তবে?'

নীলমণি আকাশের বজ্রের মত ধমকাইয়া উঠিল: 'ফেলেদে ছাতি, চুলোয় গুঁজে দে। আমি ছাতি ধরব তবে উনি তামাক সাজবেন, হারামজাদি!'

তামাক অবিলম্বেই হাতের কাছে আগাইয়া আসিল।

ঘরের পশ্চিম কোণ দিয়া কলের জলের মত মোটা ধারায় জল পড়িয়া ইতিমধ্যেই একটা বালতি ভরিয়া গিয়াছে। সেই জলে হাত ধুইয়া শ্যামা বলিল 'তামাক আর একটু-খানি আছে বাবা।'

দুঃসংবাদ!

এত বড় দুঃসংবাদ যে সংবাদ-প্রদানকারিণীকে একটা গাল দিবার ইচ্ছা নীলমণিকে অতি কষ্টে চাপিয়া যাইতে হইল।

নীলমণি ভাবিল: বিনা তামাকে এই গভীর রাত্রির লড়াই জিতিব কেমন করিয়া? ছেলের কান্না দুই কাণে তীরের ফলার মত বিঁধিয়া চলিবে, মেয়েটার মুখর চাহনি লঙ্কাবাটার মত সারাক্ষণ মুখে লাগিয়া থাকিবে, নিমুনিয়ার সঙ্গে নিভার ব্যাকুল কলহ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে শিহরিয়া শিহরিয়া মনে হইবে বাঁচিয়া থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নিষ্প্রয়োজন,—আর ঘরে এখন তামাক আছে একটুখানি!

তামাক আনানো হয় নাই কেন জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া নীলমণি চুপ করিয়া রহিল। প্রশ্ন ক'রা অনর্থক, জবাব সে পরশু হইতে নিজেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে—পয়সা নাই। ছেলেটা বিকালে এক পয়সার মুড়ি খাইতে পায় নাই—তামাকের পয়সা কোথা হইতে আসিবে! নিজে গেলে হয়ত দোকান হইতে ধার আনিতে পারিত, কিন্তু—

নীলমণি খুসী হয়। এতক্ষণে ছুতা পাওয়া গিয়াছে।

'তামাক নেই বিকেলে বলিসনি কেন?'

'আমি দেখিনি বাবা।'

'দেখিনি বাবা! কেন দেখিনি বাবা? চোখের মাথা খেয়েছিলে?'

'তুমি নিজে সেজেছিলে যে? সারাদিন আমি একবারও তামাক সাজিনি বাবা!'

'তা সাজবে কেন? বাপের জন্য তামাক সাজলে সোণার অঙ্গ তোমার ক্ষয়ে যাবে যে!'

নীলমণির কান্না আসিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া সহসা উদ্গত অশ্রু সে দমন করিয়া লইল। না আছে তামাক না থাক্। পৃথিবীতে তার কীই বা আছে যে তামাক থাকিলেই সব দুঃখ দূর হইয়া যাইত!

বাহিরে যেন অবিরল ধারে জল পড়িতেছে না, ঘরের বায়ু যেন সাহারা হইতে আসিয়াছে, নীলমণির চোখমুখ এত জ্বালা করিতেছিল। খানিকক্ষণ হইতে তাহার হাঁটুর উপর বড় বড় ফোঁটায় জল পড়িতেছিল—টপ্ টপ্। অঞ্জলি পাতিয়া নীলমণি গুণিয়া গুণিয়া জলের ফোঁটাগুলি ধরিতে লাগিল। সিদ্ধ করা চামড়ার মত ফ্যাকাশে ঠোঁট নাড়িয়া সে কি বলিল, ঘরের কেহই তাহা শুনিতে পাইল না। ছেলেমানুষের মত তাহার জলের ফোঁটা সঞ্চয় করার খেলাটাও কেহ চাহিয়া দেখিল না। কিন্তু হাতে খানিকটা জল জমিলে তাই দিয়া মুখ ধুইতে গিয়া নীলমণি ধরা পড়িয়া গেল।

নিভা ও শ্যামা প্রতিবাদ করিল দু'জনেই।

শ্যামা বলিল 'ও কি করছ বাবা?'

নিভা বলিল 'পচা গলা চাল-ধোয়া জল, হ্যাগা, ঘেন্নাও কি নেই তোমার?'

নীলমণি হঠাৎ একটু হাসিয়া বলিল 'হোক না পচা জল। চাল-ধোয়া জল তো! এও হয় ত কাল জুটবে না নিভা!'

ইহাকে সূক্ষ্ম রসিকতা মনে করিয়া নীলমণি নিজের মনে একটু গর্ব্ব অনুভব করিল। এমন অবস্থাতেও রসিকতা করিতে পারে, মনের জোর তো তার সহজ নয়! ঘরের চারি দিকে একবার চোখ বুলাইয়া আনিয়া নিভার মুখের দিকে পুনরায় চাহিতে গিয়া কিন্তু তার হাসি ফুটিল না। নিভার দৃষ্টির নির্ম্মমতা তাকে আঘাত করিল।

অবিকল শ্যামার মত চাহিয়া আছে! এত দুঃখ, এত দুর্ভাবনা ওর চোখের দৃষ্টিকে কোমল করিতে পারে নাই, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই, রূঢ় ভর্ৎসনা আর নিঃশব্দ অসহায় নালিশে ভরিয়া রাখিয়াছে।

নীলমণি মুষড়াইয়া পড়িল।

সব অপরাধ তার। সে ইচ্ছা করিয়া নিজের স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতা নষ্ট করিয়াছে, খাদ্যের প্রাচুর্য্যে পরিতুষ্ট পৃথিবীতে নিজের গৃহকোণে সে সাধ করিয়া দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে, ঘরের চাল পচাইয়া ফুটা করিয়াছে সে, তারই ইচ্ছাতে রাতদুপুরে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। শুধু তাই নয়। ওদের সমস্ত দুঃখ দূর করিবার মন্ত্র সে জানে। মুখে ফিস ফিস করিয়া হোক, মনে মনে নিঃশব্দে

হোক, ফুস মন্তরটি একবার আওড়াইয়া দিলেই তার এই ভাঙ্গা ঘর সরকারদের পাকা দালান হইয়া যায়, আর ঘরের কোণার ওই ভাঙ্গা বাক্সটা চোখের পলকে মস্ত লোহার সিন্দুক হইয়া ভিতরে টাকা ঝম ঝম করিতে থাকে ;—টাকার ঝমঝমানিতে বৃষ্টির ঝমঝমানি কোন-মতেই আর শুনিবার উপায় থাকে না।

কিন্তু মন্ত্রটা সে ইচ্ছা করিয়া বলিতেছে না।

ঘণ্টাখানেক এমনি ভাবে কাটিয়া গেল।

নিভা এক সময় জিজ্ঞাসা করিল 'হ্যাগা, রাত কত ?'

'তা হবে, দু'টো তিনটে হবে।'

'একটা কিছু ব্যবস্থা কর ? সারারাত জল না ধরলে এমনি বসে বসে ভিজব ?'

'বসে ভিজতে কষ্ট হয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজো।'

নিভা আর কিছু বলিল না। ছেঁড়া আলোয়ানটি দিয়া কোলের শিশুকে আরও ভাল করিয়া ঢাকিয়া রুক্ষ চুলের উপর খসিয়া-পড়া ঘোমটাটি তুলিয়া দিল। স্বামীর কাছে মাথায় কাপড় দেওয়ার অভ্যাস সে এখনো কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

ছাতি ধরিয়া আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া শ্যামা তার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল, মধ্যে মধ্যে তার শিহরণটা নিভা টের পাইতে লাগিল।

'কাঁপছিস কেন শ্যামা ? শীত করছে ?'

শ্যামা কথা বলিল না। একটু মাথা নাড়িল মাত্র।

নিভা বলিল 'তবে ভাল করেই ছাতিটা ধর্ বাবু, খোকার গায়ে ছিটে লাগছে।'

আঁচল দিয়া সে খোকার মুখ মুছিয়া লইল। ফিস্ ফিস্ করিয়া আপন মনে বলিল, 'কত জন্ম পাপ করেছিলাম, এই তার শাস্তি।' নীলমণি শুনিতে পাইল, কিন্তু কিছু বলিল না। মন তার সজাগ, নির্ম্মম ভাবে সজাগ, কিন্তু চোখের পাতা দিয়া দুই চোখকে সে অর্দ্ধেক আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, একান্ত নির্ব্বিকার চিত্তেই সে ঝিমাইতেছে।

কিন্তু নীলমণি সবই দেখিতে পায়। তার স্তিমিত দৃষ্টিতে সকলের মুখ ভেংচা হইয়া বাঁকিয়া যায়, প্রদীপের শিখাটা ফুলিয়া কাঁপিয়া ওঠে, দেয়ালের গায়ে ছায়াগুলি সহসা জীবন পাইয়া দুলিয়া উঠিতে সুরু করে। মুখ না ফিরাইয়াই নীলমণি দেখিতে পায়, ঘরের ও-কোণে গুটাইয়া রাখা বিছানার উপর উপুড় হইয়া নিমু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিরক্তির তার সীমা থাকে না। তার মনে হয় ছেলেটা তাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। দুই পা মেঝের নদীস্রোতে প্রসারিত করিয়া দিয়া আকাশের গলিত মেঘে অর্দ্ধেকটা শরীর ভিজাইতে ভিজাইতে ওইটুকু ছেলের অমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়ায় আর কি মনে হয় ? এর চেয়ে ও যদি নাকী সুরে টানিয়া টানিয়া শেষ পর্য্যন্ত কাঁদিতে থাকিত তাও নীলমণির ভাল ছিল। এ সহ্য হয় না। সন্ধ্যায় ও পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই ; ক্ষুধার জ্বালায় মাকে বিরক্ত করিয়া পিঠের জ্বালায় চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ঘুমাইয়াছিল। হয় ত ওর রূপকথার পোষা বিড়ালটি এই বাদলে রাজবাড়ীর ভাল ভাল খাবার ওকে চুরি করিয়া আনিয়া দিতে পারে নাই। হয় ত ঘুমের মধ্যেই ওর গালে চোখের জলের শুকনো দাগ আবার চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। এত রাত্রে দুঃখের এই প্রকৃত বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে ও তবে ঘুমায় কোন্ হিসাবে ?

'নিমুকে তুলে দে' ত শ্যামা।'

নিভা প্রতিবাদ করিয়া বলিল 'কেন, তুলবে কেন ? ঘুমোচ্ছে ঘুমোক।'

'ঘুমোচ্ছে না ছাই। ইয়ার্কি দিচ্ছে। ঢং করছে।'

'হ্যাঁ, ইয়ার্কি দিচ্ছে! ঢং করছে! যেমন কথা তোমার! ঢং করার মত সুখেই আছে কি না।'

আধঢাকা চোখ নীলমণি একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিল। ওরা যা খুসী করুক, যা খুসী বলুক। সে আর কথাটি কহিবে না।

খানিক পরে নিভা বলিল 'ভাখো, এমন করে আর তো থাকা যায় না। সরকারদের বাইরের ঘরটাতে উঠিগে চল।'

নীলমণি চোখ না খুলিয়াই বলিল 'না।'

নিভা রাগ করিয়া বলিল 'তুমি যেতে না চাও থাকো, আমি ওদের নিয়ে যাচ্ছি।'

নীলমণি চোখ মেলিয়া চাহিল।

'না—যেতে পাবে না। ওরা ছোটলোক। সেবার কি বলেছিল মনে নেই ?'

'বললে আর করছ কি শুনি ? রাতদুপুরে বিরক্ত করলে অমন সবাই বলে থাকে।'

নীলমণি ব্যঙ্গ করিয়া বলিল 'বলে থাকে ? রাতদুপুরে বিপদে পড়ে মানুষ আশ্রয় নিতে গেলে বলে থাকে,—এ কি জ্বালাতন ? ওইটুকু শিশুর জন্য একটু শুকনো ন্যাকড়া চাইলে বলে থাকে কাপড় জামা সব ভিজে ? ময়লা হবার ভয়ে ফরাস তুলে নিয়ে ছেঁড়া সতরঞ্চি অতিথিকে পেতে দেয় ?—যেতে হবে না। বাস্।'

নিভা অনেক সহ্য করিয়াছে। এবার তার মাথা গরম হইয়া গেল।

'ছেলে মেয়ে বৌকে বর্ষাবাদলে মাথা গুঁজবার ঠাঁই দিতে পারে না, অত মান অপমান জ্ঞান কি জন্যে ? আজ বাদে কাল ভিক্ষে করতে হবে না ?'

নীলমণি বলিল 'চুপ্।'

এক ধমকেই নিভা অনেকখানি ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

'চুপ করেই আছি চিরটা কাল। অন্য মানুষ হলে—'

হাতের কাছে, ঘটিটা তুলিয়া লইয়া নীলমণি বলিল 'চুপ। একদম চুপ। আর একটি কথা কইলে খুন করে ফেলব।'

'কথা কেউ বলছে না।' নিভা একেবারে নিভিয়া গেল।

শ্যামা ঢুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বাপের গর্জ্জনে সে চমকাইয়া সজাগ হইয়া উঠিল। কাণ পাতিয়া শুনিয়া বলিল 'মা, ভুলু দরজা আঁচড়াচ্ছে।'

গরীবের মেয়ে, হা-ঘরের বৌ, নিভার মেরুদণ্ড বলিতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু তার বদলে যা ছিল নিরপরাধ মেয়ের উপর ঝাঁঝিয়া উঠিবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

'আঁচড়াচ্ছে তো কি হবে ? কোলে তুলে নিয়ে এসে নাচো !—ভালো করে ছাতি ধরে থাক শ্যামা, মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেব !'

নীলমণি বলিল 'আমার লাঠিটা কই রে ?'

শ্যামার মুখ পাংশু হইয়া গেল। সে মিনতি করিয়া বলিল 'মেরো না বাবা। দরজা না খুললে ও আপনিই চলে যাবে।'

'তোকে মাতব্বরি করতে হবে না, বুঝলি ? চুপ করে থাক।'

বাঁ পা'টি আংশিক ভাবে অবশ, হাতে ভর দিয়া নীলমণি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কোণায় তার মোটা বাঁশের লাঠিটি ঠেস দেওয়া ছিল, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া লাঠিটা সে আয়ত্ত করিল। উঠানবাসী লোমহীন নির্জ্জীব কুকুরটার উপর তার সহসা এত রাগ হইয়া গেল কেন কে জানে ! বেচারী খাইতে পায় না, কিন্তু প্রায়ই অদৃষ্টে প্রহার জোটে, তবু সে এখানেই পড়িয়া থাকে, সারারাত শিয়াল তাড়ায়। শ্যামা একটু করুণার চোখে না দেখিলে এত দিনে ওর অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া যাইত। কিন্তু নীলমণি কুকুরটাকে দেখিতে পারে না। ধুঁকিতে ধুঁকিতে লাথি ঝাঁটা খাইয়া মৃত্যুর সঙ্গে ওর লজ্জাকর সকরুণ লড়াই চাহিয়া দেখিয়া তার ঘৃণা হয়, গা জ্বালা করে।

শ্যামা আবার বলিল 'মেরো না বাবা, আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি।'

নীলমণি দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল 'মারব ? মার খেয়ে আজ রেহাই পাবে ভেবেছিস্ ? আজ ওর ভবযন্ত্রণা দূর করে ছাড়ব।'

ভবযন্ত্রণা নিঃসন্দেহ, কিন্তু শ্যামা শুনিবে কেন ? পেটের ক্ষুধায় এখনো তার কান্না আসে, ছেঁড়া কাপড়ে তার সর্ব্বাঙ্গ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া থাকে ; তার বুকে ভাষা আছে, মনে আশা আছে। ভবযন্ত্রণা সহ্য করিতে তার শক্তির অকুলান হয় না, বরং একটু বাড়তিই হয়। ওইটুকু শক্তি দিয়া সে বর্ত্তমান জীবন হইতেও রস নিংড়াইয়া বাহির করে,—হোক পান্‌সা, এও তুচ্ছ নয়। ভুলুর মত কুকুরটিরও মরিবার অথবা তাকে মারিবার কল্পনা শ্যামার কাছে বিষাদের ব্যাপার। তার সহ্য হয় না।

ছাতি ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া শ্যামা নীলমণির লাঠি ধরিল। কাঁদিবার উপক্রম করিয়া বলিল 'না বাবা, মেরো না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি বাবা !'

নীলমণি গর্জ্জন করিয়া বলিল 'লাঠি ছাড় শ্যামা, ছেড়ে দে বলছি ! তোকেই খুন করে ফেলব আজ।'

শ্যামা লাঠি ছাড়িল না। তারও কি মাথার ঠিক

আছে ? লাঠি ধরিয়া রাখিয়াই সে বার বার নীলমণির পায়ে পড়িতে লাগিল।

নিভা বলিল, কি জিদ মেয়ের ! ছেড়েই দে না বাবু লাঠিটা।'

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে নীলমণি বলিল 'জিদ বার করছি।'

লাঠিটা নীলমণিকে মেয়ের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইল ; কিন্তু বেড়ার ঘরের বেড়ার অনেকগুলি বাতাই আলগা ছিল।

মেয়েকে মারিয়া নীলমণির মন এমন খারাপ হইয়া গেল বলিবার নয়। না মারিয়া অবশ্য উপায় ছিল না। ও-রকম রাগ হইলে সে কখনো সামলাইতে পারে নাই, কখনো পারিবেও না। মন খারাপ হওয়ার কারণটাও হয় ত ভিন্ন ! কে বলিতে পারে ? মেয়েকে না মারিয়াও তো মাঝে মাঝে তার মরিতে ইচ্ছা করে !

জীবনে লজ্জা, দুঃখ, রোগ, মৃত্যু, শোকের ত অভাব নাই। মন খারাপ হইবার, দশ বছর জর ভোগ করিয়া যেমন হয় তেমনি মন খারাপ হইবার কারণ জাগিয়া থাকার প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তে এবং ঘুমানোর সময় দুঃস্বপ্নে !

বিশ বছর জর ভোগ করিয়া ওঠা উহারই একটা সাময়িক বৈচিত্র্য মাত্র।

কয়েক মিনিট আগে বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিয়াছিল ; হঠাৎ আবার আগের চেয়েও জোরে আরম্ভ হইয়া গেল। নীলমণির মান অপমান জ্ঞানটা এবার আর টিঁকিল না।

'লণ্ঠনে তেল আছে শ্যামা ?'

শ্যামা একবার ভাবিল চুপ করিয়া থাকিয়া রাগ আর অভিমান দেখায়। কিন্তু সাহস পাইল না।

'একটুখানি আছে বাবা।'

'জ্বাল তবে।'

নিভা জিজ্ঞাসা করিল 'লণ্ঠন কি হবে ?'

'সরকারদের বাড়ী যাব। ফের চেপে বৃষ্টি এল দেখছ না ?'

যেন, সরকারদের বাড়ী যাইতে নিভাই আপত্তি করিয়াছিল।

শ্যামা বলিল 'দেশলাই কোথা রাখলে মা ?'

নিভা বলিল 'দেশলাই ? কেন, পিদিম থেকে বুঝি লণ্ঠন জ্বালানো যায় না ? চোখের সামনে পিদিম জ্বলছে, চোখ নেই ?'

নীলমণি বলিল 'ওর কি জ্ঞান-গম্যি কিছু আছে ?'

নিজের মুখের কথাগুলি খচ্ খচ্ করিয়া মনের মধ্যে বেঁধে ! এ যেন তোতাপাখীর মত অভাবগ্রস্তের মানানসই মুখস্থ বুলি আওড়ানো। বলিতে হয় তাই বলা ; না বলিলে চলেনা সত্য ; কিন্তু আসলে বলিয়া কোন লাভ নাই।

সাত বছরের পুরানো লণ্ঠন জ্বালানো হইল।

নিভা মাথা নাড়িয়া বলিল 'না বাবু, ছাতিতে আটকাবে না। আর একখানা কাপড় জড়িয়ে নি। দে' ত শ্যামা, একটা শুকনো কিছু দে' ত। আর এক কাজ কর—দুটো তিনটে কাপড় পুঁটলি করে নে। ওখানে গিয়ে সব্বাইকে কাপড় ছাড়তে হবে। আমার দোক্তার কৌটো নিস্।'

নীলমণি একটু মিষ্টি করিয়াই বলিল 'হুঁকোটা নিতে পারবি শ্যামা ? লক্ষ্মী মা'টি আমার,—পারবি ? জল ফেলেই নে না, ওখানে গিয়ে ভরে নিলেই হবে। জলের কি অভাব !—তামাকটুকু ফেলে যাস নে ভুলে।'

সব ব্যবস্থাই হইল। নিমুর কান্নায় কর্ণপাত না করিয়া তাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া পিঠে একটা ছেঁড়া চটের বস্তা চাপাইয়া দেওয়া হইল।

দরজা খুলিয়া তারা উঠানে নামিয়া গেল। উত্তরের ভিটার ঘরখানা গত বৎসরও খাড়া ছিল, এবারকার চতুর্থ বৈশাখী ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে ; সময় মত অন্তত: দুটি খুঁটি বদলাইতে পারিলেও এটা ঘটিত না। ভুলু বোধ হয় ওই ভগ্ন স্তূপটির মাঝেই কোথাও মাথা গুঁজিয়া ছিল, মানুষের সাড়া পাইয়া বাহির হইয়া আসিল। তখন ঘরের দরজায় তালা লাগানো হইয়া গিয়াছে। দরজা আঁচড়াইয়া ভুলু সকরুণ কান্নার সঙ্গে কুকুরের ভাষায় বলিতে লাগিল 'দরজা খোলো' দরজা খোলো।'

বাড়ীর সামনে একহাঁটু কাদা, তার পরেই পিছল এঁটেল মাটি। ছেলে লইয়া আছাড় খাইতে খাইতে

বাঁচিয়া গিয়া নিভা দেবতাকেই গাল দিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কম—নীলমণিরই বেশী; শুকনো ডাঙাতেই বাঁ পায়ের পদক্ষেপটি তাকে চটু করিয়া ডিঙাইয়া যাইতে হয়,—এখন তার পা আর লাঠি দুই কাদায় ঢুকিয়া যাইতে লাগিল।

লাঠি টানিয়া তুলিলে পা আটকাইয়া থাকে, পা তুলিলে লাঠি পোঁতা হইয়া যায়। নিভার তাকাইবার অবসর নাই। শ্যামার ঘাড়ে কাপড়ের পুঁটুলি, হুঁকা কল্কি, লণ্ঠন আর নিমুর ভার। তবু শ্যামাই নীলমণির বিপদ উদ্ধার করিয়া দিতে লাগিল।

ঘোষেদের পুকুরটা পাক দিলে সরকারদের বাড়ী। পুকুরটা ভরিয়া গিয়া পাড় ছাপাইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম কোণার প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটার তলা দিয়া তিন-চার হাত চওড়া এক সংক্ষিপ্ত স্রোতস্বিনী সৃষ্টি হইয়াছে। তেঁতুল গাছটার জমকালো আবছা চেহারা দেখিলে গা ছম ছম করে। ভরপুর পুকুরের বুকে শ্যামার হাতের আলো যে লম্বা সোণালী পাত ফেলিয়াছে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে হাজার বৃষ্টির ফোঁটায় তাহা অজস্র টুকরায় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

নীলমণি থমকিয়া দাঁড়াইল। কাতর স্বরে বলিল 'ও শ্যামা, পার হ'ব কি করে!'

শ্যামা বলিল 'জল বেশী নয় বাবা, নিমুর হাঁটু পর্য্যন্তও ওঠে নি। চলে এসো।'

সুখের বিষয় স্রোতের নীচে কাদা ধুইয়া গিয়াছিল, নীলমণির পা অথবা লাঠি আঁটিয়া গিয়া তাকে বিপন্ন করিল না। তবু, এতখানি সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও, নীলমণির দু'চোখ একবার সজল হইয়া উঠিল। বাহির হওয়ার সময় সে কাপড়টা গায়ে জড়াইয়া লইয়াছিল, এখন ভিজিয়া গায়ের সঙ্গে আঁটিয়া গিয়াছে। খানিকক্ষণ হইতে জোর বাতাস উঠিয়াছিল, নীলমণির শীত করিতে লাগিল। জগতে কোটি কোটি মানুষ যখন উষ্ণ শয্যায় গাঢ় ঘুমে পাশ ফিরিয়া পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিতেছে,—সপরিবারে অক্ষম দেহটা টানিয়া টানিয়া সে তখন চলিয়াছে কোথায়? যে প্রকৃতির অত্যাচারে ভাঙা ঘরে টিঁকিতে না পারিয়া তাকে আশ্রয়ের খোঁজে পথে নামিয়া আসিতে হইল, সেই প্রকৃতিরই দেওয়া নির্ম্মমতায় হয় ত সরকাররা দরজা খুলিবে না, ঘুমের ভান করিয়া বিছানা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। না, নীলমণি আর যুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তার শক্তি নাই, কিন্তু আক্রমণ চারি দিক হইতে; পেটের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা, শীত, বর্ষা, রোগ, বিধাতার অনিবার্য্য জন্মের বিধান,—সে কোন্ দিক সামলাইবে? সকলে যেখানে বাঁচিতে চায়, লাখ মানুষের জীবিকা একা জমাইতে চায়, কিন্তু কাহাকেও বাঁচাইতে চায় না, সেখানে সে বাঁচিবে কিসের জোরে?

স্রোত পার হইয়া গিয়া লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিয়া শ্যামা দাঁড়াইয়া আছে। পাশেই ভরাট পুকুরটা বৃষ্টির জলে টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। নীলমণি সাঁতার জানিত না। কিন্তু জানিত যে পুকুরের পাড়টা এখানে একেবারে খাড়া! একবার গড়াইয়া পড়িলেই অথই জল, আর উঠিয়া আসিতে হইবে না।

নিভা তাড়া দিতেছিল। শ্যামা বলিল 'বাবা, চলে এসো? দাঁড়ালে কেন?'

নীলমণি চলিতে আরম্ভ করিল; ডাইনে নয় বাঁয়েও নয়। সাবধানে, সোজা শ্যামার দিকে।

হঠাৎ শ্যামা চীৎকার করিয়া উঠিল 'মাগো, সাপ!'

পরক্ষণে আনন্দে গদ-গদ হইয়া বলিল 'সাপ নয় গো সাপ নয়, মস্ত শোল মাছ! ধরেছি ব্যাটাকে। ইঃ, কি পিছল!'

তাড়াতাড়ি আগাইবার চেষ্টা করিয়া নীলমণি বলিল 'শক্ত করে ধর, দুহাত দিয়ে ধর,—পালালে কিন্তু মেরে ফেলব শ্যামা!'

সরকাররা বছর তিনেক দালান তুলিয়াছে। এখনো বাড়ীসুদ্ধ সকলে বাড়ী বাড়ী করিয়া পাগল। বলে 'বেশ হয়েছে, না? দোতালায় দুখানা ঘর তুললে, বাস্, আর দেখতে হবে না।'

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর সরকারদের বড় ছেলে বাহিরের ঘরের দরজা খুলিল। বলিল 'ব্যাপার কি? ডাকাত না কি?'

নীলমণি বলিল 'না ভাই, আমরা। ঘরে তো টিকঁতে পারলাম না ভায়া, সব ভেসে গেছে। ভাবলাম,

তোমাদের বৈঠখানার তো কেউ শোয় না, রাতটুকু ওখানেই কাটিয়ে আসি।'

বড়ছেলে বলিল 'সন্ধ্যা বেলা এলেই হ'ত!'

নীলমণি কষ্টে একটু হাসিল: 'সন্ধ্যায় কি বিষ্টি ছিল ভাই? দিব্যি ফুটেফুটে আকাশ—মেঘের চিহ্ন নেই। রাতদুপুরে হঠাৎ জল আসবে কে জানত।'

নিভা ছাতি বন্ধ করিয়া ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মাসিকের ছবির সদ্যস্নাতার অবস্থায় পড়িয়া শ্যামা লজ্জায় মার অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নিভার এটা ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু বড়ছেলের সামনে কিছু বলিবার উপায় নাই।

বড়ছেলে বলিল 'বেশ থাকুন। কিন্তু চৌকী পাবেন না, চৌকীতে আমার পিসে শুয়েছে। আপনাদের মেঝেতে শুতে হবে।'

'তা হোক ভাই, তা হোক। ভিজতে না হলেই ঢের। একখানা কম্বলটম্বল—?'

'ওই কোণে চট আছে।'

বড় ছেলে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

নীলমণি ঝাঁঝালো হাসি হাসিয়া বলিল 'দেখলে? তখনি বলেছিলাম শুধু জুতো মারতে বাকী রাখবে।'

নিভা বলিল 'ঘরে যে থাকতে দিয়েছে তাই ভাগ্যি বলে জেনো!'

নীলমণি তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া বলিল 'তা ঠিক।'

ঘরের অর্দ্ধেকটা জুড়িয়া চৌকী পাতা, বড় ছেলের পিসে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া তাহাতে কাত হইয়া শুইয়া আছে। শ্যামা লণ্ঠনটা মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া চৌকীর উপরে আলো পড়ে নাই, তবু এ বাড়ীর আত্মীয়কেও ফরাস তুলিয়া লইয়া শুধু সতরঞ্চির উপর শুইতে দেওয়া হইয়াছে, এটুকু টের পাইয়া নীলমণি একটু খুসী হইল। বড় ছেলের পিসে!—আপনার লোক। সে যদি ও-রকম ব্যবহার পাইয়া থাকে তবে তারা যে লাথি ঝাঁটা পায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য!

চারি দিকে চাহিয়া নীলমণির খুসীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। সুখশয্যা না জুটুক, নিবাত, শুষ্ক, মনোরম আশ্রয় তো জুটিয়াছে। ঘরের এদিকে একটিমাত্র ছোট জানালা খোলা ছিল, নিভা ইতিমধ্যেই সেটি ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বাস্, বাহিরের সঙ্গে আর তাদের কোন সম্পর্ক নাই। আকাশটা আজ একরাত্রেই গলিয়া নিঃশেষ হইয়া যাক, ঝড় উঠুক, শিল পড়ুক, পৃথিবীর সমস্ত খড়ের ঘরগুলি ভাঙিয়া পড়ুক,—তারা টেরও পাইবে না।

নীলমণির মেজাজ যেন ম্যাজিকে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। তার কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত মোলায়েম শোনাইল।

'ও শ্যামা, দাঁড়িয়ে থাকিস্ নি মা, চটগুলো বিছিয়ে দে চট করে। একটু গড়াই। আহা, ভিজে কাপড়টা ছেড়েই নে আগে, মারামারির কি আছে! এতক্ষণই গেল, না হয় আরও খানিকক্ষণ যাবে। ওগো, শুনছ? দাও না, খোকাকে চৌকীর এক পাশেই একটু শুইয়ে দাও না, দিয়ে তুমিও কাপড়টা ছেড়ে ফ্যালো।' গলা নামাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া 'ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন, অত লজ্জাটা কিসের শুনি? লজ্জা করে দরজা খুলে বারান্দায় চলে যাও না!'

কাপড় ছাড়া হইল। বাহিরে এখন পুরাদমে ঝড় উঠিয়াছে। ঘরের কোথাও এতটুকু ছিদ্র নাই, কিন্তু বাতাসের কান্না শোনা যায়। চাপা একটানা সাঁ সাঁ শব্দ। তাদের,—নীলমণি আর তার পরিবারকে, নাগালের মধ্যে না পাইয়া প্রকৃতি যেন ফুঁসিতেছে।

নীলমণির মনে হইল, এ এক রকম শাসানো। পঞ্চভূতের মধ্যে যার ভাষা আছে সে ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া ফেলিয়া বলিতেছে, আজ বাঁচিয়া গেলে। কিন্তু কাল? কাল কি করিবে? পরশু? তার পরদিন? তারও পরের দিন?

শ্যামা চট বিছাইতেছিল, বলিল 'মাগো, কি গন্ধ!'

নিভা বলিল 'নে, ঢং করতে হবে না, তাড়াতাড়ি কর।'

নীলমণি বলিল 'ঝেড়ে ঝেড়ে পাত্ না।'

নিভা বলিল 'না না, ঝাড়িস্ নি! ধুলোয় চাদ্দিক অন্ধকার হয়ে যাবে।'

নিভা ছেলেকে স্তন দিতেছিল, কথাটা শেষ করিয়াই সে দমক মারিয়া চৌকীর দিকে পিছন করিয়া বসিল।

নীলমণি চাহিয়া দেখিল, বড় ছেলের পিসে চাদর ফেলিয়া চৌকীতে উঠিয়া বসিয়াছে। লণ্ঠনের স্তিমিত

আলোয় পিসের মূর্ত্তি দেখিয়া নীলমণি শিহরিয়া উঠিল। একটা শব যেন সহসা বাঁচিয়া উঠিয়াছে। মাথার চুল প্রায় ন্যাড়া করিয়া দেওয়ার মত ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, চোখ যেন মাথার অর্দ্ধেকটা ভিতরে চলিয়া গিয়াছে, গালের ঢিলা চামড়ার তলে হাড় উঁচু হইয়া আছে। বুকের সবগুলি পাঁজর চোখ বুজিয়া গোণা যায়। বুকের বাঁ পাশে কি ঠিক চামড়ার নীচেই হৃদ্‌পিণ্ডটা ধুক ধুক করিতেছে।

পিসে নিশ্বাসের জন্য হাঁপাইতেছিল। খানিক পরে একটু সুস্থ হইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল 'একটা জান্‌লা খুলে দিন।'

নীলমণি সভয়ে বলিল 'দে তো শ্যামা, জানালাটা খুলে দে।'

শ্যামা আরও বেশী ভয়ে ভয়ে বলিল 'ঝড় হচ্ছে যে বাবা!'

'হোক, খুলে দে।'

শ্যামা পশ্চিমের ছোট জানালাটি খুলিয়া দিল। ঝড় পুবদিক হইতে বহিতেছিল, মাঝে মাঝে এলোমেলো একটু বাতাস আর ছিঁটে-ফোঁটা একটু বৃষ্টি ঘরে ঢোকা ছাড়া জানালাটি খুলিয়া দেওয়ায় বিশেষ কোন মারাত্মক ফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভীরু নিভা ছেলের গায়ে আর এক পরত কাপড় জড়াইয়া দিল।

পিসে বলিল 'ঘুমের ঘোরে কখন চাদর মুড়ি দিয়ে ফেলেছি, আর একটু হলেই দম আটকাত! বাপ্!'

নীলমণি জিজ্ঞাসা করিল 'আপনার অসুখ আছে না কি?'

পিসে ভর্ৎসনার চোখে চাহিয়া বলিল 'খুব মোটা-সোটা দেখছেন বুঝি? অসুখ না থাকলে মানুষের এমন চেহারা হয়? চার বচ্ছর ভুগছি মশায়, মরে আছি একেবারে। যম ব্যাটাও কাণা, এত লোককে নিচ্ছে আমায় চোখে দেখতে পায় না। যে কষ্টটা পাচ্ছি মশায়, শত্রুও যেন—'

'ব্যারামটা কি?'

পিসে রাগিয়া বলিল 'টের পান না? এমন করে শ্বাস টানছি দেখতে পান না? পাবেন কেন, আপনার কি! যার হয় সে বোঝে।'

বোঝা গেল, পিসের মেজাজটা খিটখিটে।

নীলমণি নম্রভাবে সান্ত্বনা দিয়া বলিল 'আহা সেরে যাবে, ভাল মত চিকিচ্ছে হলেই সেরে যাবে।'

পিসে বলিল 'হুঁ, সারবে। আমকাঠের তলে গেলে সারবে। চিকিচ্ছের কি আর কিছু বাকী আছে মশায়? ডাক্তার কবরেজ জলপড়া বিচ্ছুটি বাদ যায় নি। আজ চার বছর ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছি, কোনো ব্যাটা সারাতে পারল!'

কথার মাঝে মাঝে পিসে হাপরের মত শ্বাস টানে, এক একবার থামিয়া গিয়া ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতই চোখ কপালে তুলিয়া খাবি খায়। নীলমণির গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল। বাতাস! পৃথিবীতে কত বাতাস! তবুও ফুসফুস ভরাইতে পারে না। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে সে উপবাসী, পঞ্চাশ মাইল গভীর বায়ুস্তরে ডুবিয়া থাকিয়া ওর দম আটকাইল।

পিসে বলিল 'কি করে জানেন? বলে, ভয় কি, সেরে যাবে। বলে, সবাই টাকা নেয় চিকিৎসে করে, শেষে বলে না বাপু, তোমার ব্যারাম সারবে না, এসব ব্যারাম সারে না। আমি বলি, ওরে চোর ডাকাত ছুঁচোর দল! সারাতে পারবি না তো মেরে ফ্যাল্, দে মরবার ওষুদ দে।'

উত্তেজনায় পিসে জোরে জোরে হাঁপাইতে লাগিল। নীলমণি কথা বলিল না, তার বিনিদ্র আরক্ত চোখ দুটি কেবলি মিট্ মিট করিয়া চলিল।

তেল কমিয়া আসায় আলোটা দপ্ দপ্ করিতেছে, এখনই নিভিয়া যাইবে। ছেলেকে বুকে জড়াইয়া হাতকে বালিশ করিয়া নিভা দুর্গন্ধ ছেঁড়া চটে কাত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শ্যামা বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে।

নীলমণির হুঁকা কল্কি শ্যামা জানালায় নামাইয়া রাখিয়াছিল। আলোটা নিভিয়া যাওয়ার আগে নীলমণি বাকী তামাকটুকু সাজিয়া লইল। তার পর দেয়ালে ঠেস দিয়া আরাম করিয়া বসিয়া পিসের শ্বাস টানার মত সাঁ সাঁ শব্দ করিয়া জলহীন হুঁকায় তামাক টানিতে লাগিল।

'অনামী'

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে একদিন তরুণ দিলীপকুমার রায়ের প্রতিষ্ঠা কম ছিল না। সে প্রতিষ্ঠার মুখ্য কারণ, তিনি দেশে দেশে চারণের মতো গান গেয়ে বেড়াতেন, জনসাধারণ তাঁর কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মানের অর্ঘ্য পৌঁছে দিত। সঙ্গীত-চর্চ্চার অবসরে তিনি দুই একখানি গ্রন্থও রচনা করেন, তার মধ্যে 'ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জিকা' বইখানি তখনকার 'বিজলী'তে আমি নিয়মিত পড়েছি। আমার মতো অনেকেই সে বইখানি পড়ে তাঁর ডায়েরী-রচনার ভঙ্গীর প্রশংসা করেছিলেন।

তার কিছুকাল পরেই অকস্মাৎ দিলীপকুমার যোগ-জীবন গ্রহণ করে দেশত্যাগ করে গেলেন; গেলেন পণ্ডিচেরীতে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের আশ্রমে। এই 'অনামী' নামক বিরাট গ্রন্থখানি তারই ফল। বাংলা সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি ভাল বই বেরিয়েছে, সেগুলির সঙ্গে এই বইয়ের কোথাও সঙ্গতি নেই, এ কেবল নতুনই নয়, এ বই অসাধারণ। কেন তাই বলি। প্রথমত বইটি চার খণ্ডে সমাপ্ত। অনামী, রূপান্তর, পত্রগুচ্ছ এবং অঞ্জলী। প্রথম খণ্ডে দিলীপকুমারের মৌলিক কবিতা। সাধারণত রসসাহিত্য বলতে আমরা যে ধরণের কবিতা বুঝি, এ তা নয়, এগুলির মধ্যে পাই দিলীপকুমারের অধ্যাত্ম-জীবনের ব্যাকুলতা, সত্যানুসন্ধানের আন্তরিক প্রয়াস, একটি অসহায় আত্মসমর্পণের সুর, এবং সকলের চেয়ে বেশি করে শুনতে পাই তাঁর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের প্রার্থনা। তাঁর ভাষা গুরুগম্ভীর, সংস্কৃতানুসারী, তাঁর বক্তব্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে সমানে-সমানে চলবার পক্ষে এই ভাষাই বিশেষ উপযোগী। কোথাও কোথাও তার প্রবাহ উপলপীড়িত হয়েছে, কিন্তু সে কেবল তীরপ্রসারিত তপোবনের নীরবতাকে গভীর করবার জন্য। রসসাহিত্যের জনপদের ভিতরে না এসে সে গেছে অকূলের দিকে বিবাগী হয়ে।

অসাধারণ বই, কারণ এ বই তাঁর সর্ব্বত্যাগী, সকল প্রলোভনের অতীত বৈরাগী জীবনের একটি রেকর্ড। জীবনকে বৃহতের দিকে নিয়ে যাবার স্বপ্ন তাঁর, নিজেকে বড় করে, বিপুল করে জানার ইচ্ছা তাঁর, সে ইচ্ছা স্পষ্ট হয়েছে আত্মপ্রকাশের চেয়ে তাঁর আত্মপ্রচারের দিকটায়। অধ্যাত্ম জীবনের সহিত সাহিত্যিক জীবনের সম্ভবত মিলন ঘটে না, যদি ঘটে তবে রসের চেয়ে তত্ত্ব ঢোকে তাঁর সাহিত্য রচনায়; এ কথা ভুলতে হয় যে রসসাহিত্যে আধ্যাত্মিকতার অনধিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ। 'অনামী'র ভিতরেও এই ত্রুটি আছে কিছু পরিমাণে।

'রূপান্তর' খণ্ডে যে কবিতাগুলির তিনি অনুবাদ করেছেন, সেগুলি পাঠ্য হয়েছে। কয়েকজন অপরিচিত ও স্বল্পপরিচিত কবির কবিতাকে তিনি দিবালোকে বের করে এনেছেন, এজন্য বাঙালী পাঠকের নিকট তিনি ধন্যবাদভাজন।

'পত্রগুচ্ছ' খণ্ডে দিলীপকুমারের সম্পাদনার কৃতীত্ব কম নয়। এই চিঠিগুলি যথেষ্ট মূল্যবান। জগতের বহু মনীষীর সহিত তিনি ব্যক্তিগতভাবে কতখানি পরিচিত, একদিকে তারই ইঙ্গিত পাই এই পত্রগুলির মধ্যে। তাঁর কোনো কোনো কবিতা যে প্রকৃতই ভাল, এ সম্বন্ধে কয়েকজন মনস্বীর প্রশংসা-পত্র তিনি সযত্নে গ্রথিত করে দিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের পত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো চিঠির কোনো কোনো অংশ যদি তিনি প্রকাশ না করতেন তাহলে আর একটু শোভন হোতো। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি কখন্ কী মুড-এ তাঁকে পত্র লিখেছেন, কী লিখেছেন হয়ত তাঁদেরই স্পষ্ট মনে নেই, হয়ত তাঁরা অবহিত ছিলেন না যে এ চিঠি ছাপা হয়ে বেরোতে পারে,—এমন অবস্থায় দিলীপকুমার তাঁদের নিতান্ত ব্যক্তিগত কথাগুলি বাদ দিলেই ভাল করতেন। তৎসত্বেও এই পত্রগুলি শিক্ষিত সমাজে সমাদর লাভ করবে। তাঁর তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন, সত্যনির্ণয় সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠা ও অনুরাগ, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মবাদ ইত্যাদির সম্বন্ধে জ্ঞানী ও গুণীর চিন্তাধারা—এগুলি বিশেষ ভাবেই উপভোগ্য। এদেশ ও ওদেশের সাহিত্য বিষয়ে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের মতামত ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তিনি আমাদের নিকট পরিবেষণ করেছেন; এটি অনেকের কাছে নূতন। বার্ণার্ড শ-র সাহিত্য সম্বন্ধে অরবিন্দের কথাগুলি 'অনামী'তে সংযোগ করে দিলীপকুমার পাঠকদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছেন।

'অনামী' এমন একখানি বই যা অনেকগুলি বই পড়ার আনন্দ দেয়। গ্রন্থখানির বিপুলতার দিক থেকে বলছিনে, এর অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্যের দিকটার কথা বলছি। এর সুষ্ঠু গঠন, এর কারুকলা, এর বিষয়-বিন্যাস—পাঠককে অনেক দিন পর্য্যন্ত অভিভূত করে রাখে। এই বইকে সার্থক করে তোলবার জন্য মনে হয় দিলীপকুমার স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পরিভ্রমণ করে এসেছেন।

এমন আত্মবিশ্বাস যদি তাঁর থাকে যে বইখানি রসিক মাত্রেরই ভাল লাগবেই, তবে বলবার কিছু নেই, নীরবে তাঁর কথায় সায় দেবো। *

---

* অনামী: শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত ও সম্পাদিত। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

বাঙলার জমিদারবর্গ ও স্যার প্রফুল্লচন্দ্র

শচীন সেন, এম-এ, বি-এল

সংস্কার যখন অজ্ঞানতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বাড়িয়া উঠে, তখন সেই সংস্কার মানুষের সরল দৃষ্টিকে ঝাপ্‌সা করিয়া ফেলে। বাঙলার জমিদারবর্গের বিরুদ্ধে এমনই একটা অন্ধ সংস্কার জনসাধারণের মনে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাই জনসাধারণ অজ্ঞানতাবশতঃ যখন জমিদারবর্গের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনে, সেই অভিযোগকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের মত ব্যক্তি যখন জমিদারবর্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ জনসাধারণের সম্মুখে পেশ করেন, তখন তাহা উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না।

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র জ্ঞানী ও গুণী। তাঁহার মতকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করি। দেশের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন এবং অন্যায় ও অবিচারকে তিনি যখন কশাঘাত করেন, মাথা পাতিয়া আমরা তাহা গ্রহণ করি ও গ্রহণ করিব। কিন্তু তিনি যদি মিথ্যা আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টায় ভিত্তিহীন অভিযোগের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অভিযোগকে মানিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র "ভারতবর্ষে"র ভাদ্রের সংখ্যায় জমিদারবর্গের বিরুদ্ধে যে বিষ ঢালিয়াছেন, তাহাতে সমাজের শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ শুধু বাড়িয়াই উঠিবে। এ কথা তাঁহার মত জ্ঞানী লোকের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, আমাদের সমাজের স্তর-বিভাগ যে-ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা বিধ্বস্ত করিয়া দিবার মত বিরোধ ও কলহ ডাকিয়া আনা দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না। এ কথা ভুলিলেও সমীচীন হইবে না যে যে-বাণী তিনি জনসাধারণের কাছে প্রচার করিবেন, তাহার দায়িত্বও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন—"পল্লীর যাবতীয় দুর্দ্দশার একটি প্রধান কারণ ধনী জমিদারগণের পল্লীত্যাগ।" তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে "এ্যাগ্রিকালচার কমিশনে"র সম্মুখে এই বাণী তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। পল্লীর হতশ্রীর কারণ জমিদারগণের পল্লীত্যাগ—এই অভিযোগ কিছুতেই মানিয়া লওয়া যায় না; কিন্তু জমিদারবর্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে হইলে ইহাকে চরম অভিযোগ বলিয়া মানিতে হইবে। পল্লীগ্রামে নদী শুকাইয়া যাইতেছে, স্বাস্থ্য ক্ষীণতর হইতেছে, ভূমি-জাত দ্রব্যের দাম কমিয়া যাইতেছে, ভাল রাস্তার অভাব ঘটিতেছে, কচুরিপানা খালবিল ঢাকিয়া ফেলিতেছে, কৃষকের ঋণ বাড়িয়া যাইতেছে, কুটীর-শিল্প মারা যাইতেছে—ইত্যাদি পল্লীর হতশ্রীর প্রধান কারণ না হইয়া জমিদারের পল্লী-ত্যাগ পল্লীর দুর্দ্দশার প্রধান কারণ কি করিয়া হইল, বলিতে পারি না। তবে এ কথা যদি বলা হয় যে জমিদার-গণ পল্লীত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই নদী শুকাইতেছে, কচুরিপানা বাড়িতেছে, তাহা হইলে আমাদের কিছু বলিবার নাই।

এ কথা আমরা জানি এবং এ কথা আমরা মানি যে জমীদারগণের বিরুদ্ধে যদি কলহ ও বিরোধ ফেনাইয়া তুলিবার চেষ্টা না হইত, তাঁহাদের পূর্ব্বকার শক্তি ও অধিকার যদি থাকিত, তাহা হইলে হয় ত পল্লীর চেহারা তাঁহারা কথঞ্চিৎ বদলাইতে পারিতেন। কিন্তু যখন গণ-আন্দোলন আইনের সাহায্যে জমিদারবর্গের শক্তি ও অধিকার হরণ করিল, পল্লীর উন্নতির ভার সরকারের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল, তখন জমিদারবর্গকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া সঙ্গত হইবে না। প্রজাস্বত্ব আইনের সাহায্যে জমিদারবর্গের শক্তি যাহাতে থর্ব্ব হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা বহু দিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। ইহারই ফলে জমিদারগণ এখন শুধু খাজনা-সংগ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকার ও শক্তি যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। আজ সেই শক্তিহীন খাজনা-সংগ্রাহকদের নিকট হইতে পল্লীর যাবতীয় দুর্দ্দশা নিবারণ

আশা করা যায় কি না, সেই প্রশ্ন স্যার প্রফুল্লচন্দ্রকে করিব না, কিন্তু আমরাই তাঁহাকে বলিব যে জমিদারবর্গের পক্ষে পল্লীর হতশ্রী নিবারণ করা সম্ভব নহে। আজ ভূমির অধিকারী হয় ত জমিদার, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে ভোগ করিতেছে কৃষক। কৃষক যথারীতি খাজনা দিয়া গেলে জমিদার তাহার কোন ক্ষতিই করিতে পারেন না। এই কথা আজও বলিবার দরকার আছে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকিবার দরুণ আমাদের স্থিতিবান স্বত্ববিশিষ্ট কৃষকদের খাজনা দিতে হয় যৎসামান্য, যথা—

জেলা।	গড়পড়তা প্রতি একারের খাজনা	সাধারণ সময়ে প্রতি একারের উৎপন্ন শস্যের দাম
বাঁকুড়া	১ টাকা ১২ আনা	৪৭ টাকা।
মেদিনীপুর	৩ টাকা ২ আনা	৪৮ টাকা।
যশোহর	২ টাকা ৭ আনা	৫৭ টাকা।
খুলনা	৩ টাকা ৬ আনা	৬০ টাকা।
ফরিদপুর	২ টাকা ৯ আনা	৫০ টাকা।
বাখরগঞ্জ	৪ টাকা ৯ আনা	৭০ টাকা।
ঢাকা	২ টাকা ১৩ আনা	৬০ টাকা।
ময়মনসিংহ	২ টাকা ১২ আনা	৬০ টাকা।
রাজসাহী	৩ টাকা ৫ আনা	৫৫ টাকা।
ত্রিপুরা	৩ টাকা ২ আনা	৬০ টাকা।
নোয়াখালী	৪ টাকা ৪ আনা	৭৫ টাকা।

[এই তথ্যগুলি মাননীয় রেভিনিউ মেম্বর স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের বাঙলার সদস্য সভার অধিবেশনে সভ্যদের জ্ঞাতার্থে প্রচার করিয়াছিলেন।]

সমগ্র বাঙলাদেশে গড়পড়তা স্থিতিবান স্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের প্রতি একারের খাজনা তিন টাকার একটু বেশী।

এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে যুক্তপ্রদেশে প্রতি একারের খাজনা বাঙলাদেশ হইতে অনেক বেশী, যথা :—

ডিভিসন্	গড়পড়তা প্রতি একারের খাজনা		প্রতি একারের উৎপন্ন শস্যের দাম
মিরাট	ষ্ট্যাটুটারী	৩ টাকা ৮ আনা	৭৫ টাকা।
	অকুপ্যান্সি	৬ টাকা	
ঝান্‌সী	ষ্ট্যাটুটারী	৩ টাকা	২৭ টাকা।
	অকুপ্যান্সি	২ টাকা ৮ আনা	
গোরখপুর	ষ্ট্যাটুটারী	৫ টাকা	৭৮ টাকা।
	অকুপ্যান্সি	৪ টাকা ৮ আনা	
লক্ষ্ণৌ	ষ্ট্যাটুটারী	৭ টাকা	৬৩ টাকা।

[এই তথ্যগুলি যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির রিপোর্ট হইতে গৃহীত]

বাঙলাদেশে সামান্য খাজনা দিয়া আমাদের রায়তগণ জমি সাক্ষাৎভাবে ভোগ করিয়া থাকে এবং প্রজাস্বত্ব আইনে স্থিতিবান স্বত্ববিশিষ্ট রায়তদের যে-সব সুখ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে উক্ত সামান্য খাজনা দিয়া তাহারা প্রকৃতপক্ষে কিরূপে জমির মালিক হইয়াছে। অথচ এই খাজনা জমিদারবর্গ আদায় করিতে গেলেই স্যার প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়া উঠিবেন যে জমিদারগণ "প্রজার শোণিত" শোষণ করিতেছেন। কিন্তু তিনি যে-সব ব্যবসায়ীদের প্রশংসায় মুখর, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে শ্রমিকদের সবিশেষ অধিকার না দিয়া সত্যিকারের শোষণ করিতেছেন, তাহা বলিলে অপ্রিয়ভাষণ হইবে এবং স্যার প্রফুল্লচন্দ্রও হয় তো ক্ষুব্ধ হইবেন। যে মিথ্যা কুৎসা ও রটনা জমিদারবর্গের বিরুদ্ধে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাহার সঙ্গে স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের বাণী সংশ্লিষ্ট আছে, ইহা জানিয়া সত্যই আমরা ক্ষুব্ধ হইয়াছি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠিয়া গেলে বাঙলার কৃষকদের দুরবস্থা বাড়িবে বই কমিবে না। তাহাতে সরকারের ভূমিরাজস্ব কথঞ্চিৎ বাড়িতে পারে; কিন্তু কৃষকদেরও যে খাজনা বাড়িবে এবং অন্যান্য সুবিধা মারা যাইবে, তাহা সুনিশ্চিত। এই যৎসামান্য খাজনা দিয়া যে দিন চলিবে না, এ কথা কি স্যার প্রফুল্লচন্দ্র প্রজাদের বুঝাইয়া দিয়াছেন?

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র অভিযোগ করিয়াছেন যে জমিদারগণ নায়েব-আমলার উপর সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন এবং নায়েবদের খাজনা আদায় করিবার জন্য তাগাদা দেন। অশিক্ষিত জনসাধারণ এই অভিযোগ আনে, তাহার অর্থ বুঝি; কিন্তু স্যার প্রফুল্লচন্দ্র কি করিয়া এই অভিযোগ আনিলেন, বুঝিলাম না। এ কথা সবাই জানেন যে আমাদের দেশের জমিদারগণের ভূমি নানা জেলা

প্রক্ষিপ্ত থাকে। এই বিক্ষিপ্ত জমিদারী চালাইতে হইলে নায়েবের আশ্রয় না লইয়া উপায় নাই; কারণ একজন জমিদারের পক্ষে সমস্ত জেলায় উপস্থিত থাকিয়া খাজনা আদায় করা সম্ভব নহে।

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র আরও আপত্তি করিয়াছেন যে খাজনা আদায় করিবার জন্য জমিদারগণ নায়েব-আমলাদের "কড়া তাগাদা" দিয়া থাকেন। ইহা কি সত্যই জমিদারগণের অমার্জ্জনীয় অপরাধ যে তাঁহারা খাজনা আদায়ের জন্য নয়েব-আমলাদের কাছে "কড়া তাগাদা" পাঠাইয়া থাকেন? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ স্থিরীকৃত দিনে রাজস্ব না দিলে জমিদারগণের কি দুরবস্থা হয়, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র তাহা জানেন; অথচ শুধু জানিলেন না যে স্থিরীকৃত দিনে খাজনা না দিলে প্রজাদের কোন অন্যায় হয় কি না। খাজনার হার অধিক থাকিলে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন উঠিতে পারিত; কিন্তু সেই প্রশ্ন বাঙলার কৃষকদের নিকটে বড় কথা নহে। জমিদারী প্রথা স্যার প্রফুল্লচন্দ্র যে-ভাবেই গড়িয়া তুলুন না কেন, বাঙলার কৃষকদের কোন প্রথা অনুসারেই প্রতি একারে গড়পড়তা তিন টাকার কম খাজনা দেয় হইতে পারে না। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে—কৃষকদের এতো ঋণ কেন? কৃষকদের ঋণজালে আবদ্ধ হওয়ার কারণ খাজনার হার অধিক বলিয়া নহে। অথচ, কৃষকদের এই ঋণ-ভারের জন্য জমিদারবর্গকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র জমিদারবর্গের অলসতা ও অপদার্থতা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন ও রূঢ় কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি কৃষকদের কর্ম্মবিমুখতার বিরুদ্ধে কোন দিন অভিযোগ আনিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না। খাজনাকে "দুঃস্থ-প্রজাগণের শোণিতস্বরূপ" বলিয়া গালি দেওয়া যে উচিত হইবে না, তাহা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। "এ্যাগ্রিকালচার কমিশন" প্রজাদের সম্বন্ধে যে কথাটি বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানের যোগ্য—

"No legislation, however wise or sympathetic, can save from himself the cultivator, who through ignorance or improvidence, is determined to work his own ruin."

কৃষকদের ঋণের ভিতরের কথা যাঁহারা অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ ঋণ অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য গৃহীত হইয়া থাকে। এই ভাবে ঋণজালে আবদ্ধ হইবার বহু কারণ আছে; কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারবর্গ তাহাদের ঋণজালে আবদ্ধ হইবার হেতু নহে। বরঞ্চ অনেক অর্থনীতিবিদ্ ইহাই বলিয়াছেন যে, খাজনার হার কম হওয়াতে এবং আইনতঃ জমির উপর কৃষকের বহুবিধ অধিকার থাকাতে, কৃষকদের ঋণ অতি সহজেই বাড়িয়া যায় এবং ভূমির উৎকর্ষ হেতু কৃষকেরা অলস হইয়া পড়ে। কৃষকের দুরবস্থার নানা কারণ আছে, তাহার তালিকাও আমরা স্যার প্রফুল্লচন্দ্রকে দিতে পারি; কিন্তু এই কথা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, জমিদারগণ পল্লীর হতশ্রীর কারণ নহে; এবং বর্ত্তমানে আইনের কড়াকড়ির ফলে কৃষকদের প্রতি সাধারণতঃ জমিদারবর্গের অত্যাচারের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। কৃষকদের শোষণ করিবার সুযোগ এতই কম যে, জমিদারবর্গের স্কন্ধে শোষণের অপরাধ চাপাইয়া দেওয়া শুধু অনুচিত নয়, কুৎসিতও বটে। ন্যায্য খাজনা দাবী করিলে যাঁহারা শোষণ বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা বোধ হয় এমন শাসনতন্ত্রই কল্পনা করিয়া থাকেন যাহার অধীনে তাঁহাদের কোন ট্যাক্স দিতে হইবে না। যাঁহারা সরকারকে ট্যাক্স দিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন যে ঠিক সময়ে ট্যাক্স না দিলে তাঁহাদের কি অবস্থা হয়। এবং সেই কথা চিন্তা করিলেই সবাই বুঝিবেন যে জমিদারবর্গ ন্যায্য খাজনা আদায় করিয়া কোন অন্যায় কাজ করেন না।

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র আরও বলিয়াছেন যে বাঙলার জমিদারগণ বিলাসিতায় ও স্বেচ্ছাচারিতায় ডুবিয়া আছেন। কোন ব্যক্তিবিশেষের অপরাধের জন্য সমস্ত গোষ্ঠীকে অপবাদ দেওয়া সঙ্গত নহে। যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অর্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছেন, এ কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু শুধু জমিদার-সন্তানদেরই এই অপরাধ, তাহা বলিতে ঐতিহাসিক সত্যকে উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইবে। তিনি যাঁহাদের প্রশংসায় মুখর, অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা, তাঁহাদের ছেলেদের কোন বিলাসিতা নাই, শুধু আছে জমিদার-সন্তানদের, এ কথা বলা সুকঠিন। যিনি আইন-ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থসঞ্চয় করিয়াছেন, যিনি প্রফেসারী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন

করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ঘরে লক্ষ্মী বসাইয়াছেন, তাঁহাদের ছেলেদের যে জমিদার-সন্তানদের হইতে ভাল হইতেই হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অতএব কে বেশী বিলাসী, সেই প্রশ্ন লইয়া কোন গোষ্ঠীকে গালি দেওয়া সঙ্গত নহে। স্বেচ্ছাচারিতা ব্যক্তিবিশেষের রুচির কথা—ইহা জমিদার-নির্ব্বিশেষে ছড়াইয়া পড়ে। কোন অধ্যাপক স্বেচ্ছাচারী হইলে যেমন অধ্যাপকগোষ্ঠীকে অপরাধের মানদণ্ড অনুসারে অভিযুক্ত করা যায় না, সেই রকম, কোন জমিদারের স্বেচ্ছাচারিতা দেখিয়া সমস্ত গোষ্ঠীকে ব্যঙ্গ করা রুচিসঙ্গত নহে।

তদুপরি, এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। যাঁহারা অর্থবান, তাঁহাদের চালচলন একটু বিভিন্ন রকমের হইবেই। তাঁহাদের চালচলনে বিলাসিতার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সকল প্রকার বিলাসিতাই নিন্দনীয় নহে। তাঁহাদের চলার চারি পাশে থাকে একটু বাহুল্যের ভাব—এই বাহুল্য সমাজের দশজনকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলে। ঐশ্বর্য্যের এই মঙ্গলকর প্রকাশকে ঘৃণ্য বিলাসিতা বলিয়া ভুল করিলে অন্যায় করা হইবে। প্রয়োজনের বাহিরে জমিদারবর্গের ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ ছিল বলিয়া তাঁহারা স্কুলকলেজ স্থাপন করিয়াছেন, কূপ খনন করাইয়াছেন, পল্লীর রাস্তাঘাট মেরামত করাইয়াছেন, গুণীদের সমাদর করিয়াছেন, প্রভৃত লোক-পালন করিয়াছেন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে বাঙলা-দেশ জমিদারবর্গের সৃষ্টি;—তাঁহাদের অর্থে সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য পরিপুষ্ট হইত। এবং এখনও বহু প্রতিষ্ঠান জমিদারবর্গের অর্থে পুষ্টিলাভ করিতেছে। তিনপুরুষ ধরিয়া একজন জমিদার সাধারণতঃ বিত্তশালী থাকিতে পারেন না, তাই পূর্ব্বপুরুষদের দানশীলতার তালিকা দেখাইয়া আধুনিক পুরুষদের অপদার্থ বলিয়া গালিবর্ষণ করা অসঙ্গত। জমিদারী পুরুষান্তরে সব ছেলেদের ভিতর বণ্টন হইয়া গেলে তিনপুরুষের পর কোন বংশধর পূর্ব্ব সমৃদ্ধি পাইতে পারেন না। তাই জমিদারবর্গের সমৃদ্ধি কমিতেছে বলিয়া তাঁহাদিগকে দোষারোপ করিলে চলিবে না। আজকাল ২৫।৩০ ঘর বাদ দিলে খুব বড় সমৃদ্ধিশালী জমিদার আর নাই—তাহাও ক্রমশঃ ভাগাভাগি হইয়া সংকীর্ণ হইয়া আসিবে। সাধারণ জমিদারের অবস্থা এমন নয় যাহাতে তাঁহারা পল্লীর হতশ্রী নিবারণের জন্য অর্থ অযাচিতভাবে ব্যয় করিতে পারেন। তবুও এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে এখনও গ্রামে গ্রামে যে-সব মঙ্গলকর প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার সঙ্গে জমিদারের চেষ্টা ও অর্থ ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট আছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিব। জমিদারবর্গ প্রয়োজনের বাহিরে, স্বার্থের বাহিরে অযাচিত ভাবে অর্থ ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, বাঙলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যেও তাঁহারা অর্থ ঢালিয়াছেন। বাঙলাদেশে এমন কোন প্রতিষ্ঠান বা এমন কোন ব্যবসা খুব কমই আছে, যাহার সৃষ্টি বা পুষ্টি জমিদারবর্গের অর্থে সাধিত হয় নাই। ইহা সত্ত্বেও রব উঠিয়াছে এবং স্যার প্রফুল্লচন্দ্র সেই রবে সায় দিয়া থাকেন যে, জমিদারবর্গ তাঁহাদের রায়তদের জন্য কিছুই করেন না। হয় ত রায়তদের জন্য যতটা করা উচিত, ততটা তাঁহারা এখন করেন না। কিন্তু এই প্রশ্ন কি স্যার প্রফুল্লচন্দ্র নিজেকে করিয়াছেন যে জমিদার-বর্গের মধ্যে যাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে, কলিকাতার সম্পত্তিতে অর্থ ঢালিতেছেন, তাঁহারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসেন কেন এবং জমির উন্নতিকল্পে তাঁহাদের অর্থ ব্যয় করিতে এত কুণ্ঠা কেন? ১৮৫৯ সালের রেণ্ট এ্যাক্টের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত জমিদারবর্গের শক্তি চতুর্দ্দিক হইতে খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। আজ জমির উন্নতিকল্পে অর্থব্যয় করিলে তাহার কোন লভ্যাংশ ফিরিয়া পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এবং যে-সব কারণে খাজনা বৃদ্ধি করা যায়, তাহা আইনের নাগপাশে এতই সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে যে, জমিদারবর্গের পক্ষে জমির উন্নতিসাধনে অর্থব্যয় করিবার উৎসাহ নিবিয়া যায়। সাধারণ মানুষকে দেবতা বলিয়া ভ্রম করিবার হেতু নাই এবং জমিদারবর্গও দেবতার আসন গ্রহণ করিয়া বসেন নাই। তাঁহাদেরও স্বার্থবোধ আছে এবং তাঁহারাও অর্থ ঢালিয়া কিছু লাভের আশা করিতে পারেন। এই লাভের আশাকে গোড়ায় নষ্ট করিয়া দিয়া, প্রজাদের উপর তাঁহাদের অধিকার খর্ব্ব করিয়া, প্রজাস্বত্ব আইনের

নাগপাশে তাঁহাদের আটক্ রাখিয়া কি আশা করা যায় যে জমিদারবর্গ কেন রায়তদের উন্নতিসাধনে অযাচিতভাবে অর্থব্যয় করিলেন না; এবং সেই আশা সর্ব্ব সময়ে ফলবতী না হইলেই কি জমিদারবর্গকে "স্বার্থপর" "অপদার্থ" ইত্যাদি ভাষায় সর্ব্ব সম্মুখে অভিযুক্ত করা সমীচীন? এই সব কথা ভাবিয়াই "এ্যাগ্রিকালচার কমিশন" বলিয়াছেন—

"Where existing systems of tenure or tenancy laws operate in such a way as to deter landlords, who are willing to do so, from investing capital in the improvement of their land, the subject should receive careful consideration with a view to the enactment of such amendments as may be calculated to remove the difficulties."

কিন্তু এই দিক্ দিয়া সমস্যাকে অনেকেই চিন্তা করিয়া দেখেন না। জমিদারবর্গের হাত হইতে রায়ত সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীন করিবার চেষ্টায় সবাই প্রজাস্বত্ব আইনের প্রয়োজনীয়তায় মুখর হইয়াছেন; অথচ জমিদারবর্গের কেহ কেহ গ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রায়তদের উন্নতিকল্পে অর্থব্যয় না করিয়া থাকিতে চান বলিয়া তাঁহাদের অপরাধের অন্ত নাই। দেশের তাঁহারাই পরম শত্রু যাঁহারা জমিদার ও রায়তের সম্বন্ধ বিকৃত করিয়া দিতে চাহেন। সমাজের পরস্পরের মধ্যে যে নির্ভরশীলতা রহিয়াছে, তাহা যাঁহারা বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের মুখে আজ জমিদারবর্গের ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোভা পায় না। বিগত ৭০ বৎসর ধরিয়া জমিদারবর্গের শক্তি ও অধিকার খর্ব্ব করিবার যে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে, তাহারই ফলে জমিদারবর্গের বহু ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে। যেখানে ক্ষমতা কমিয়া যায়, সেইখানে সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বেরও হ্রাস হয়। সুতরাং আজ যদি জমিদার ও প্রজার মধ্যে পূর্ব্বকার নির্ভরশীলতা না থাকে এবং জমিদারগণ জমি ও প্রজার উন্নতির জন্য কম অনুপ্রেরণা অনুভব করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেই দোষ দিতে হয় যাঁহাদের আন্দোলনের ফলে নানাবিধ আইনের দ্বারা জমিদারদের শক্তি খর্ব্ব করা হইয়াছে।

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র ভাদ্র মাসের প্রবন্ধে এমন সব কথা বলিয়াছেন, যাহার মধ্যে যোগাযোগ খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল। তিনি যখন পূর্ব্বকার জমিদারবর্গের বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার কথা উল্লেখ করিয়া নিন্দা করিয়াছেন, তখনই আবার প্রশংসার্থে বলিয়াছেন যে পূর্ব্বে পল্লীগ্রাম জমিদারগণের বিত্তে "জমজম্" করিত, গুণীদের সমাদর হইত, জমিদারবর্গের চেষ্টায় মঙ্গলকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইত। এবম্বিধ পরস্পর-বিরুদ্ধ আলোচনা ও অভিযোগ শুধু দায়িত্বহীনতাই প্রমাণ করে। আমি স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের লিখিত প্রবন্ধ হইতে দু'একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"বাঙলার জমিদারবংশ এতকাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাস-ব্যসনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।"—ভাদ্র, ১৩৪০।

"আজ যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার জমিদারদিগের বিলোপ সাধন হয়, তাহা হইলে এক ভীষণ অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় ঘটিবে।"—কার্ত্তিক, ১৩৪০।

আবার বলিয়াছেন—

"বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা বাঙালী জমিদারগণের মধ্যে বহুদিন হইতে প্রবেশলাভ করিয়াছে।"—ভাদ্র, ১৩৪০।

"আমি ছেলেবেলায় দেখিয়াছি যে জমিদারগণ স্ব স্ব গ্রামের পুষ্করিণী ও দিঘী খনন এবং তাহার পঙ্কোদ্ধার ও রাস্তাঘাটের দিকে নজর রাখিতেন। কাজেই এখনকার মত পল্লী বনজঙ্গলসমাকীর্ণ ম্যালেরিয়ার আকর হইয়া উঠে নাই। এতদ্‌ভিন্ন, ধনী ও সঙ্গতিসম্পন্ন লোকের গৃহে বার মাসের তের পার্ব্বণ হইত।"—ভাদ্র, ১৩৪০।

আবার বলিয়াছেন—

"কিন্তু এই হৌসের মুচ্ছুদ্দিরা যখন কলিকাতার আশে-পাশে বাগানবাড়ী করিয়া নানাপ্রকার বদ্‌খেয়াল ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন এবং জমিদারী কিনিতে লাগিলেন, তখনই তাঁহাদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার হইল।"—ভাদ্র, ১৩৪০।

"বর্ত্তমান জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষগণ অনেক দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল, এমন কি কলেজ প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন।"—ভাদ্র ১৩৪০।

এ রকম পরস্পর-বিরুদ্ধ মন্তব্য তাঁহার প্রবন্ধকে আগাগোড়া ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে।

"ভাদ্র" সংখ্যার "ভারতবর্ষে" জমিদারবর্গকে কটু ও তিক্ত ভাষায় গালি দিয়া "কার্ত্তিকে"র সংখ্যায় স্যার প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন যে তিনি জমিদারদিগের "হিতকাঙ্ক্ষী"। "ভাদ্রের" প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ "কার্ত্তিকে"র সংখ্যায় তিনি বর্ত্তমান জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষদের সুখ্যাতি করিয়াছেন। যদি এই সুখ্যাতিই তাঁহার অন্তরের কথা হইয়া থাকে, তাহা হইলে "ভাদ্রে"র অসংযত ও অসঙ্গত মন্তব্যের সার্থকতা কি, বুঝিলাম না—অথচ সেই সব মন্তব্যের যে বিষময় ফল ফলিতে পারে, তাহা কি স্যার প্রফুল্লচন্দ্র জানেন না, অথবা বোঝেন না? পূর্ব্বপুরুষদের সুখ্যাতি করিয়া অবশেষে তিনি হুল্ ফুটাইয়া বলিয়াছেন—"হায়! আজ তাঁহাদের বংশধরদিগের প্রতি তাকাইলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে হয়।" বর্ত্তমান জমিদারগণ তাঁহার দীর্ঘনিঃশ্বাসের কেন হেতু হইল বলিতে পারি না। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র আশ্বাস দিয়াছেন যে তাঁহার দীর্ঘনিঃশ্বাসের হেতু "ভারতবর্ষে"র মারফতেই জানাইবেন। তাহা জানিতে পারিলে যদি আমাদের কিছু বলিবার থাকে, তাহা হইলে আমরাও তাঁহাকে জানাইব।

সত্যকে জানিবার ও জানাইবার চেষ্টায় আমাদের এই আলোচনা। যখন স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের মত লোক ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন জনসাধারণের মনে যে জমিদারবর্গ ও জমিদারী প্রথা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। শুধু এই কথা বলিয়াই আজ আমি বিদায় গ্রহণ করিব যে দেশের ও দশের কাজ তিক্ত ভাষণে, গালি বর্ষণে ও কটূক্তিতে সমাধা করা যায় না। সমস্যার জটিলতা তাহাতে বরঞ্চ বাড়িয়াই যায়। জমিদারের সঙ্গে কৃষকের, তথা জনসাধারণের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মিথ্যা রোষ প্রকাশ করিয়া তাহা সম্ভব হইবে না,—ভিত্তিহীন অভিযোগের উপস্থাপনেও তাহা সম্ভব হইবে না। সত্যকে চোখ চাহিয়া দেখিতে হইবে এবং পরস্পরের দুঃখ ব্যথা বুঝিতে হইবে। জনসাধারণের করতালির মোহে দলভুক্ত হইলে, শ্রেণী-বিরোধ শুধু বাড়িয়াই উঠিবে—মিলন তাহাতে ঘটিবে না, দেশের মঙ্গল তাহাতে সাধিত হইবে না।

ছুটী

শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা

মনে পড়ে প্রথম ভাগের পড়া
পল্লীগ্রামের শুক্‌নো দীঘির পাড়ে,
বস্‌তো সবে ধূলায় আসন পেতে
দখিণ দিকে গয়লা বাড়ীর ধারে।

মনে পড়ে কতই কথা আহা,
মনে জাগে মৌন হৃদির ক্ষত,
জেগে ওঠে আঁধার হৃদি মাঝে
রাত্রি শেষের শুকতারাটীর মত।

হয় না মনে অসীম পথের শেষ
থাম্‌বে যবে ক্লান্ত চরণ দু'টী
ছিন্ন-খাতার শেষের পাতা ভরে'
লিখে যাব দীর্ঘ পড়ার ছুটী।

সাময়িকী

শিক্ষা-সংস্কার—

প্রায় সাত মাস পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে চান্সেলার সার জন এণ্ডার্সন বলিয়াছিলেন :—

"আমাদিগের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে তিনটি প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধ আছে—সরকার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যে সব ব্যাপারে ইহার যে কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষরূপে সম্বন্ধ তাহার পক্ষেও একক তাহার সব ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা ও মত একত্রিত করা প্রয়োজন।"

তাহার পর তিনি বলেন, অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি কেবল প্রতিষ্ঠানত্রয়ের সমবেত চেষ্টায় নিষ্পন্ন হইতে পারে—(১) পরীক্ষা-প্রথার পরিবর্ত্তন ও সংস্কার (২) পাঠ্যতালিকার পরিবর্ত্তন, (৩) স্কুল ও কলেজের শিক্ষার পুনর্গঠন, (৪) শিল্প ও ব্যবসার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার সংযোগ সাধন।

ইহার পর গত ২৩শে নভেম্বর তারিখে কলিকাতায় লাটপ্রাসাদে শিক্ষা সম্বন্ধে এক বৈঠক বসান হইয়াছিল। এই বৈঠকে নানা বিষয়ে বক্তৃতা হয় এবং নানা কথার—অনেক অবান্তর কথারও—আলোচনা হয়। সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ প্রদানের স্থান আমাদিগের নাই—তাহার প্রয়োজনও নাই।

বৈঠকে আলোচনায় যে বিশেষ কোন ফল হইবে, তাহাও মনে হয় না। ইহার পূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জন বড়লাট হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার সম্বন্ধে এক কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন; তাহার পরও এক সমিতি হইয়াছিল। ফলে—শিক্ষার কোনরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, বলা যায় না।

এবার আলোচনার ফেনপুঞ্জতলে যে প্রস্তাবের সলিল-প্রবাহ দেখা যায়, তাহা—উচ্চ শিক্ষার সঙ্কোচসাধন।

ইহাতে আমাদিগের বিশেষ আপত্তি আছে। এই আপত্তির সর্ব্বপ্রধান কারণ—এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা আজও অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হয় নাই। যে সব দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক সে সব দেশে লোক আপনারাই নানাবিধ শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে; সে সব দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ও সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে না। সে সব দেশে সরকার উচ্চশিক্ষায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না—তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার। আর সে সব দেশে প্রাথমিক শিক্ষা যেভাবে কল্পিত তাহাতে তাহা মানুষকে কেবল বিদ্যার ভারবাহী করে না, পরন্তু বিদ্য যাহাতে কার্য্যকরী হয়, যে যে ব্যবসা অবলম্বন করিবে সে যাহাতে সেই ব্যবসা ভাল করিয়া করিতে পারে তাহার জন্য তাহাকে প্রস্তুত করা হয়; তাহাই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য থাকে। সাধারণতঃ লোক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া "যে যাহার পথ" দেখিয়া লয়। আবার তাহার পর শিল্প বা ব্যবসা শিক্ষা আরম্ভ করিয়া তাহারা অবসরকালে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পায়। এই মাধ্যমিক শিক্ষাও সর্ব্বতোভাবে উচ্চ শিক্ষার সোপান মাত্র নহে; তাহাও আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। সে শিক্ষাও সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। মূল কথা এই, সে সব দেশে শিক্ষা মানুষকে নিজ কার্য্যে নৈপুণ্য দান করে। সরকার শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন; কারণ, মানুষকে শিক্ষার দ্বারা উৎকর্ষ প্রদান করা সরকারের প্রথম কর্ত্তব্যের নামান্তর মাত্র। কিন্তু সরকার শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করেন না। এমন কি ডিসরেলী মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, শিক্ষার ব্যবস্থায় সরকারের হস্তক্ষেপ কিছুতেই সমর্থন-যোগ্য নহে; ইহা বর্ব্বর যুগের—যে যুগে "বাপ মা সরকার" লোকের কাজের স্বাধীনতা অস্বীকার করিতেন, সেই যুগের ব্যবস্থা। দেখা গিয়াছে, যদি মানুষকে অবিচারিত চিত্তে অজ্ঞাবহ করা অভিপ্রেত হয়, তবে শৈশব হইতে স্বৈরাচার আরম্ভ করাই ভাল—

It was a return to "the system of barbarous age, the system of paternal government; wherever was found what was called a paternal government was found a State educaton. It has been descovered that the best way to secure implicit obedience was to commence tyranny in the nursery."

শিক্ষা যতক্ষণ দেশের ও দেশের লোকের উপযোগী না হইবে ততক্ষণ তাহা সার্থক হইবে না। যে শিক্ষা সমাজ হইতে মূল দ্বারা রস আকর্ষণ করে না, তাহা কখন সমাজের উপযোগী হয় না। কাজেই দেশের লোককে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করিবার স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এখন সরকার প্রাথমিক শিক্ষারই মত মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার গ্রহণ করিতে চাহেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক সেই শিল্পবিদ্যালয়ের অধিকার হইতে ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষা বাহির করিয়া লওয়া হইবে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় প্রায় এক হাজার দুই শত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে—সরকারের মত, চারি শত স্কুলই যথেষ্ট! যে প্রদেশে দ্বাদশ শত স্কুলেও স্কুলের প্রয়োজন নিঃশেষ হয় নাই, সেই প্রদেশে চারি শত স্কুলই যথেষ্ট, ইহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। সেই জন্যই আমরা বলিয়াছি, সরকার উচ্চ শিক্ষার সঙ্কোচ সাধন করিতে চাহেন। আমরা তাহার বিরোধী।

বর্ত্তমানে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, আমরা তাহা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। দেখা গিয়াছে, প্রতিযোগিতায় অনেক স্থলে বাঙ্গালী ছাত্ররা পরাভব স্বীকার করিতেছে। ১৯২৮ হইতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ এই ছয় বৎসরে সিভিল সার্ভিসে ৮০ জন লোক গৃহীত হইয়াছে; ৮৪ জন বাঙ্গালী পরীক্ষা দিয়াছিলেন—মাত্র ৩ জন পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া চাকরী পাইয়াছেন। তেমনই আবার এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ১৯৩০ ও ১৯৩১ দুই বৎসরে ২০ জন লোক গৃহীত হইলেও ৫৩ জন পরীক্ষার্থী বাঙ্গালীর মধ্যে ১ জন মাত্র সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ১৯২৭ হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ—এই চারি বৎসরে হিসাব বিভাগের পরীক্ষায় বাঙ্গালী ছাত্রের সংখ্যা ১ শত ১১ জন ছিল; কিন্তু ৪৪টি লোক চাকরী পাইলেও তাহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা ৫ জন মাত্র। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে শিক্ষার আদর্শ আশানুরূপ উচ্চ নহে। বিশ্ববিদ্যালয়কে এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।

আলোচ্য বৈঠকের জন্য বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে যে বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত হইয়াছিল,—

সরকারের বিশ্বাস, নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে বর্ত্তমানে শিক্ষায় যে সব ত্রুটি আছে, সে সব দূর করা যাইতে পারিবে। শিক্ষা-পদ্ধতি কার্য্যকরী করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে:—

(১) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে সংযোগ সাধন করিতে হইবে।

(২) যাহাতে শিক্ষায় একই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সময় নষ্ট না হয়, তাহা করিত হইবে।

(৩) প্রত্যেক ক্ষেত্রে শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও বিকাশ যাহাতে উপযুক্তরূপ হয়, তাহা দেখিতে হইবে।

(৪) সরকারের ও দেশের লোকের নিকট হইতে শিক্ষার জন্য যে অর্থ পাওয়া যাইবে, তাহা যথাসম্ভব মিতব্যয়িতা সহকারে প্রয়োগ করিতে হইবে।

ইহাতে আমাদিগের সম্মতি আছে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—

(১) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে যে সংযোগ সাধন করা হইবে, তাহা কে করিবে? প্রাথমিক ও পরবর্ত্তী শিক্ষা যে সব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করিবেন, সে সব কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন করা হইবে? না—সে সব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও সরকারের অধীন করা হইবে?

(২) সরকার বিবিধ শিক্ষার বিস্তার সাধনজন্য মোট কত টাকা বা ব্যয়ের কত অংশ প্রদান করিবেন?

(৩) কারীগরী ও শিল্প শিক্ষা প্রদানের ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তারের কিরূপ ব্যবস্থা হইবে?

(৪) সার রাসবিহারী ঘোষ, সার তারকনাথ পালিত প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অর্থ দিয়া গিয়াছেন,

সে সকল ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে ত ?

আমরা বলি—"Let knowledge grow from more to more" কিন্তু দেশের লোককে শিক্ষার প্রকৃতি স্থির করিবার অধিকার প্রদান করিতে হইবে। আর এক কথা, দেশে কারিগরী ও শিল্পশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা-বিস্তার করিতে হইবে। যদি ভাগ করিয়া লইতে হয়, তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য সব শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা রাখিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেরূপ শিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে যে ইসলামিয়া কলেজ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই—তাহার সার্থকতাও প্রতিপন্ন হয় নাই। যাঁহারা "ইসলামিক কাল্‌চারের" নামে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার বর্দ্ধিত করেন, তাঁহারা যদি সে কলেজ তুলিয়া দিবার প্রস্তাবে প্রতিবাদ করেন, তবে প্রধানতঃ মহাত্মা মহশিনের অর্থে পরিচালিত মাদ্রাসা কলেজের উন্নতিসাধন করিয়া ইসলামিয়া কলেজকে শিল্প ও কারীগরী শিক্ষার কেন্দ্র করা যায়।

প্রাদেশিক মশ্লেম লীগও এ দেশে ও এই প্রদেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া সরকারকে সে জন্য এক কোটি টাকা ঋণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বলিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা আরও একটি কথা বলিব—শিক্ষা যথাসম্ভব শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় প্রদানের ব্যবস্থা প্রয়োজন। অথচ আমরা দেখিতেছি, এক দিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের মাতৃভাষার প্রতি সমাদর প্রকাশ করিতেছেন, অপর দিকে তেমনই সরকার তাহাকে অনাদর করিতেছেন। এ দেশে যখন ডাক্তারী শিক্ষা প্রদানের জন্য মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার একটি স্বতন্ত্র বিভাগে বাঙ্গালায় শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা ছিল—ক্রমে সেই বিভাগ ক্যাম্পবেল স্কুলে পরিণত হয়। তখন ক্যাম্পবেল স্কুলে এবং ঢাকা ডাক্তারী স্কুলেও বাঙ্গালায় ডাক্তারীর পঠনপাঠন হইত। ক্রমে কাম্পবেল স্কুলে ইংরাজীতে শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং নূতন যে সকল ডাক্তারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সকলেও ইংরাজীতে শিক্ষাপ্রদান করা হয়! এই ব্যবস্থা আমরা অকারণ ও অসঙ্গত বিলাস এবং ছাত্রের অর্থের ও উদ্যমের অকারণ অপব্যয় বলিয়া বিবেচনা করি। সরকার এক দিকে বলিতেছেন, বঙ্গদেশে আরও অধিক সংখ্যক ডাক্তারের প্রয়োজন, আর এক দিকে দেশের লোকের মাতৃভাষার সাহায্যে ডাক্তারী শিক্ষালাভের পথ অর্গলবদ্ধ করিতেছেন—এই দুই বিষয়ে কিরূপে সামঞ্জস্য সাধন করা যায়? বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে যে উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী দেখাইয়া গিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে—যখন কতকগুলি বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারী অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত, তখন বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি উৎকৃষ্ট ডাক্তারী পুস্তক রচিত হইয়াছে। ডাক্তার দুর্গাদাস করের মেটিরিয়া মেডিকা হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের সার্জ্জারী পর্য্যন্ত বহু গ্রন্থ যে কোন ইংরাজী গ্রন্থের তুলনায় হীন নহে। এই সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী 'ধাত্রীশিক্ষা' ও 'মাতৃশিক্ষা'ও বিশেষ উল্লেখযোগ।

শিক্ষার ব্যবস্থা যত অধিক পরিমাণে বাঙ্গালায় হইবে, শিক্ষা ততই অধিক ফলোপধায়ী হইবে এবং ততই মিতব্যয়িতার উপায় হইবে।

সরকারের চেষ্টা ও উদ্যোগ দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা তাঁহাদিগের শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাহাতে দেশের লোকের সম্মতি ব্যতীত অসম্মতি নাই। কিন্তু আমরা বলি, দুইটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে—

(১) উচ্চ শিক্ষার সঙ্কোচ সাধন করা হইবে না।

(২) আজ যখন দেশের লোকের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার রাজনীতিক্ষেত্রেও স্বীকৃত হইতেছে, তখন যেন জাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় ব্যাপার শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহাদিগের সে অধিকার অস্বীকার করা না হয়।

যাহাতে দেশের প্রাথমিক হইতে উচ্চ পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ শিক্ষার বিস্তার সাধিত হয়, তাহাই দেশের কল্যাণকর শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্দেশ্য হওয়া প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্যই স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

জগত্তারিণী পদক—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বৎসর জগত্তারিণী পদক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, সুরসিক সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রদান করিয়া প্রকৃত গুণী ব্যক্তির প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এই নির্ব্বাচনে আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত কেদার-বাবুর পরিচয় বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের নিকট দিতে হইবে না; তাঁহার 'কাশীর কিঞ্চিৎ' 'চীনভ্রমণ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'কোষ্ঠীর ফলাফল' 'ভাদুড়ী মহাশয়' পর্য্যন্ত যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার যে সকল গল্প, উপন্যাস, রঙ্গ-কবিতা
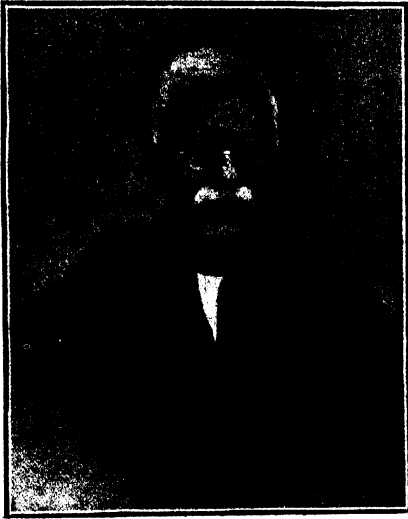
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশিত হইতেছে, তাহা তাঁহাকে বাঙ্গালার সাহিত্যিক সমাজে বরণীয় আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া যে অনাবিল রসধারা প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহা অতুলনীয়; তিনি সত্য সত্যই রসের ভাণ্ডার—একেবারে রসগোল্লা। এ হেন বৃদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারবাবুর এই পদক লাভে বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবকগণ আনন্দ অনুভব করিবেন; এবং তিনি আমাদের 'ভারতবর্ষে'র একজন সম্মাননীয় প্রধান লেখক বলিয়া আমরা ইহাতে বিশেষ গৌরব বোধ করিতেছি। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবন দান করুন, আর তিনি এমনই ভাবে রস পরিবেশন করিতে থাকুন।

যক্ষ্মা হাসপাতাল—

বাঙ্গালাদেশের সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, বাঙ্গালা দেশে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা ভীতিজনক ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সাক্ষাৎ শমন-কিঙ্করের আক্রমণে বাঙ্গালার অনেক সংসার শ্মশান হইতে চলিয়াছে। ইহার যথোচিত প্রতিকার যে হইতেছে, তাহা বলা যায় না। যক্ষ্মার চিকিৎসার সুব্যবস্থাও যে আছে এমন কথাও বলিতে পারা যায় না। সুবিস্তৃত বঙ্গদেশমধ্যে একমাত্র যাদবপুরে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। কলিকাতা সহরের কতিপয় সুপরিচিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক মিলিত হইয়া সেই আরোগ্যশালাটি পরিচালন করিয়া থাকেন। 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণ গত বৎসরের 'ভারতবর্ষে' সুলেখক শ্রীমান বিজয়রত্ন মজুমদার বর্ণিত যাদবপুরের হাসপাতালের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন। অতীব আনন্দের বিষয়, ঐ রচনা পাঠ করিয়া এক ভদ্রমহিলা হাসপাতালের উন্নতিকল্পে চৌদ্দহাজার টাকা দান করিয়াছেন। সম্প্রতি দানবীর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দে কার্শিয়ঙে তাঁহার ৫০,০০০ টাকা মূল্যের বাসভবনখানি যাদবপুরের শাখা প্রতিষ্ঠাকল্পে দান করিয়াছেন। রায় বাহাদুর ইতঃপূর্ব্বে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারকল্পে কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রায় ২লক্ষ টাকা ও সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। শশীবাবুর দানের তালিকা বড় অল্প নহে। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, বিপত্নীক, সন্তানহীন; দরিদ্র ও আর্ত্তনারায়ণের সেবায় তাঁহার দান তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণেরই পরিচায়ক। যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতালের কর্ণধার কলিকাতার সুপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তার সার নীলরতন সরকার প্রভৃতি সত্বর কার্শিয়ঙে যাদবপুরের শাখা প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

সার মাঙ্কারজী ভবনগরী—

বিলাতে পরিণত বয়সে সার মাঞ্চারজী মারোয়ানজী ভবনগরীর মৃত্যু হইয়াছে। জীবনের শেষ কয় বৎসর

তিনি বার্দ্ধক্যহেতু প্রায় কোন কাজে যোগ দিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তিনি ভারতবাসীর নিকট সুপরিচিত ছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তখন পার্শীরা ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্যবসা অবলম্বন না করিয়া সাংবাদিকের কার্য্য গ্রহণ করেন। তাহার পর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিলে ভবনগরের মহারাজা তাঁহাকে দরবারের জুডিসিয়াল কমিশনার করেন। সেই পদে থাকিয়া তিনি রাজ্যের শাসন-পদ্ধতিতে নানারূপ সংস্কার সাধন করেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতে গমন করেন। তখন কংগ্রেস এ দেশের প্রধান রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিতেছে। তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন নাই এবং সেই জন্য অনেকের অপ্রীতি অর্জ্জনও করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে ভারতের কথার আলোচনা করিয়া বিলাতের লোককে ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা জানাইবার চেষ্টা করিতেন। ভারতবাসীদিগের মধ্যে লালমোহন ঘোষ সর্ব্বপ্রথম বৃটিশ পার্লামেণ্টে সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তাহার পর দাদাভাই নৌরোজী সে চেষ্টা করিয়া সফল-প্রচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও একবার মাত্র পার্লামেণ্টের সভ্য ছিলেন। সার মাঞ্চারজী ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ও তাহার পরবার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পার্লামেণ্টের সভ্যরূপে তিনি এ দেশের কল্যাণ-সাধন চেষ্টাই করিতেন এবং বিশেষভাবে উপনিবেশসমূহে ভারতবাসীদিগের অসুবিধা দূর করিবার জন্য আন্দোলন করিতেন। ট্রান্সভালে ভারতবাসীরা যে অন্যায় ব্যবহার পাইত, সে সম্বন্ধে তিনি যে মত লিপিবদ্ধ করেন, বৃটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক সেক্রেটারী তাহা অখণ্ডনীয় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পার্লামেণ্টের পুস্তিকায় প্রচার করেন।

চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে—যখন এ দেশে শিল্পশিক্ষার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই, তখনই তিনি এ দেশে শিল্পশিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। সেই বিষয়ে তিনি বিলাতে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহাতে আমদানী ও রপ্তানী পণ্যের হিসাব উদ্ধৃত করিয়া তিনি প্রতিপন্ন করেন—ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর যে সব শিল্পোপকরণ বিদেশে রপ্তানী করে, সে সকলের অনেকগুলি ভারতেই শিল্পজ পণ্যে পরিণত করিয়া লাভবান হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি চামড়া, পশম ও বীজের উল্লেখ করেন। তিনি দেখাইয়া দেন, বিদেশে কলকারখানার জন্য উপকরণ না পাঠাইয়া ভারতবর্ষে যদি চামড়া পরিষ্কার করা, পশমী কাপড় বয়ন করা ও বীজ হইতে তৈল নিষ্কাষিত করা হয়, তবে তাহাতে যথেষ্ট লাভ হয়। অন্য কোন কারণে না হইলেও কেবল জাহাজ-ভাড়া লাভের জন্য ভারতবর্ষের তাহা করা প্রয়োজন। তাঁহার সেই মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করিলে এখনও আমরা উপকৃত হইতে পারি।

তিনি নানা সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন এবং কয়-খানি পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল বিলাতে বাস করায় তিনি লণ্ডন-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তথায় তিনি নানারূপে স্বদেশের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিতেন। তিনি স্বভাবতঃ ধীর ছিলেন এবং কোনরূপ উগ্রতা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। বিলাতে ভারতীয় ছাত্ররা তাঁহার নিকট নানারূপ আবশ্যক উপদেশ লাভ করিত।

তাঁহার সহিত যাঁহাদিগের রাজনীতিক মতের ঐক্য ছিল না, তিনি কখন তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না; পরন্তু আপনার বিচার-বুদ্ধিতে যাহা ভাল মনে করিতেন তাহাই করিতেন।

আজ আমরা তাঁহার সহিত মতভেদ বিস্মৃত হইয়া, তিনি তাঁহার স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর কল্যাণকল্পে যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছি।

পথের সন্ধানে—

গতবার আমরা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহেরুর নূতন মত প্রচারের আলোচনা করিয়াছিলাম। তিনি সেই মতই অভ্রান্ত মনে করিয়া তাহার প্রচারকার্য্য পরি-চালিত করিতেছেন। পথের সন্ধান হইতে তিনি পথের শেষ কোথায় তাহারও সন্ধান করিয়াছেন। ভারতবর্ষ কোথায় চলিয়াছে?—এই প্রশ্ন করিয়া তিনি নিজেই তাহার উত্তর দিয়াছেন:—

"সামাজিক ও অর্থনীতিক যে সাম্য মানুষের গন্তব্য স্থান, ভারতবর্ষ সেই সাম্যের দিকেই যাইতেছে। এক জাতির দ্বারা অন্য জাতির ও এক সম্প্রদায়ের দ্বারা অন্য সম্প্রদায়ের শোষণ শেধ করিবার দিকেই ভারতবর্ষ চলিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক সমবায় সাম্যবাদমূলক সঙ্ঘের মধ্যে জাতীয় স্বাধীনতার দিকে ভারতবর্ষ অগ্রসর হইতেছে।"

তিনি বলিয়াছেন—ইহা স্বপ্নমাত্র নহে, পরন্তু সহজে সিদ্ধ হইতে পারে। এমন কি যাঁহাদিগের দূরদৃষ্টি আছে, তাঁহারা ইহা দিকচক্রবালে সমুদিত দেখিতে পাইতেছেন।

কিন্তু পণ্ডিত জহরলাল যে স্থানে নবোদিত রবির জবাকুসুমরাগ দেখিতে পাইতেছেন, সে স্থানে পুঞ্জীভূত অন্ধকার ব্যতীত আর কি আছে? সেই পুঞ্জীভূত অন্ধকার বিলয়ভূয়িষ্ট বিদ্যুতের রেখায় প্রলয়-নিয়তিই লিখিতেছে। তাহাকে মুক্তি বলিয়া মনে করিবার কারণ কোথায়? আন্তর্জ্জাতিক সমবায় সাম্যমূলক সঙ্ঘের কল্পনা কবি-কল্পনা ব্যতীত আর কি বলা যায়? এই কল্পনায় মৌলিকতার আকর্ষণও নাই। ইতঃপূর্ব্বেও ইহার অভিব্যক্তি লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই হয় নাই। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, মানুষের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না। সেই জন্যই জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় যে রাষ্ট্রপতি উইলশন পৃথিবীকে গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি পৃথিবীকে ভণ্ডামীর জন্য নিরাপদ করা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন নাই।

যাঁহারা আগ্রার তাজমহল দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, যে সৌধ সম্রাট শাহজাহানের শোকের প্রতীক বলিয়া পরিচিত—তাহার বাহিরের সৌন্দর্য্যই মানুষকে আকৃষ্ট করে—কিন্তু সেই মর্ম্মরসৌধের মধ্যে অন্ধকার সমাধিতে যাঁহার শব রক্ষিত হইয়াছিল—তিনিই ঐ সৌধের কেন্দ্র। তেমনই পণ্ডিত জওহরলাল যে কথার তাজমহল রচনা করিয়াছেন, তাহার কেন্দ্র—রাজনীতিক ও সামাজিক বিপ্লব। এই রাজনীতিক বিপ্লবের সমর্থন পণ্ডিত জওহরলাল পূর্ব্বেও করিয়াছেন। এবার তিনি অর্থনীতিক [illegible] তাহাকেই উপস্থিত করিয়াছেন।

রাজনীতির দিক দিয়া দেখিলে কি মনে হয় না, ভারতবর্ষ অগ্রসর হইতেছে? ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের দিকেই চলিয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ তাহার গতি মন্থর বলিয়া অধীর হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা—পণ্ডিত জওহরলালের মত—দেশের, সমাজের, জাতির, জনগণের প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করিবার অবসর ত্যাগ করেন। গত অর্দ্ধশতাব্দীর রাজনীতিক ইতিহাস আমাদিগের কথার প্রমাণ। হিন্দুর পর মুসলমান ভারতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। মুসলমানগণ গর্ব্ব করিয়া বলেন—তাঁহাদিগের ধর্ম্মের মত গণতান্ত্রিক ধর্ম্ম আর নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের শাসন-ব্যবস্থা তাহার বিপরীত। সেই স্বৈরশাসন যখন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে—যখন সমগ্র দেশের অবস্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কথা—"অরাজক কে বলিবে? সহস্ররাজক"—প্রযোজ্য সেই সময় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে নূতন অভিনেতার আবির্ভাব। এ দেশের উৎপীড়িত নেতারা আপনারা উৎপীড়কের শাসন রোধ করিতে না পারিয়া বিদেশী বণিকের সাহায্য গ্রহণ করেন। তাহার পর—সে-ও একরূপ দ্বৈত শাসন। তখন বাঙ্গালার অবস্থা বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় ও ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন:—

"ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।"

তখন যে যে-স্থানে প্রবল হইয়াছে, সে-ই তথায় শাসক হইয়া উঠিয়াছে; জাতীয়তার আদর্শ যদি কখন থাকিয়া থাকে, তবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ক্রমে সেই বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে শৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়াছে। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। সেই শিক্ষার ফলে জাতীয়তার

নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রেল, ষ্টীমার, ডাক, তার—এই সকল সে আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সহায় হইয়াছে। জাতীয়তার বিকাশই দেশাত্মবোধের উদ্বোধন করিয়াছে। তাহার প্রত্যক্ষ ফল—জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেস।

কংগ্রেসের স্থাপনাবধি আজ পর্য্যন্ত দেশের শাসন-পদ্ধতিতে যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাও উপেক্ষনীয় নহে। প্রথমে ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না। ক্রমে ক্রমে তাহা হইয়াছে। যে লর্ড মর্লি বিলাতে গণতান্ত্রিকদিগের অন্যতম নেতা, তিনিও বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে এখনও বহুকাল স্বৈর শাসনই প্রচলিত রাখিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার এই উক্তির কয় বৎসর পরেই যে নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার প্রসঙ্গে ঘোষণায় সম্রাটের উক্তি :—

"বহুদিন হইতে—হয়ত বংশপরম্পরায়—স্বদেশপ্রেমিক ভারতবাসীরা স্বদেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছেন। আজ সাম্রাজ্যের মধ্যে সেই স্বরাজের সূচনা হইল।"

নূতন শাসন-সংস্কারে গঠিত ব্যবস্থা-পরিষদের উদ্বোধনকালে রাজপিতৃব্য ডিউক অব কনট বলেন, "স্বৈর শাসনের মূলনীতি বর্জ্জিত হইয়াছে। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া দেশবাসীর যে সন্তোষই ইংরাজ-শাসনের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন স্বৈর শাসনের মূলনীতি তাহার বিরোধী ; ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষায় ও অধিকারলাভ প্রয়াসের সহিতও তাহার সামঞ্জস্য সাধন করা যায় না।"

শাসন-সংস্কারে যে ভারতে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নহে ; কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনের প্রবর্ত্তন-পথ যে মুক্ত হইয়াছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

পণ্ডিত জওহরলাল দেশের মূক জনগণের জন্য বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। সে জন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতে পারি। কিন্তু জনগণের উন্নতি সাধন করিবার জন্য জননেতারা কি করিয়াছেন—জিজ্ঞাসা করিলে তাহার কি উত্তর পাওয়া যাইবে ? পণ্ডিত জওহরলালের সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়—দিব্যালোক তাঁহার নয়নে প্রতিভাত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা অবিকৃত অবস্থায় আইসে নাই ; ভ্রান্ত মতের কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া আসিবার সময় তাহা বিকৃতি লাভ করিয়াছে। অজ্ঞ জনগণকে তাহাদিগের অধিকারের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবার মত না করিলে কিরূপে তাহারা অধিকার লাভ করিবে এবং লাভ করিলেও কেমন করিয়া তাহা রক্ষা করিবে ? দেশে শিক্ষা বিস্তারের যে সুযোগ নূতন শাসন-সংস্কারে দেশের লোকের করতলগত হইয়াছিল, সে সুযোগের কতটুকু সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে ?

পণ্ডিত জওহরলাল আজ সব দৃঢ়বদ্ধ স্বার্থ নির্ম্মূল করিতে চাহিতেছেন। তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে ? তিনি অবস্থা বিচার করিয়া ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সাম্য আদর্শ হিসাবে যত কাম্যই কেন হউক না, বাস্তবজগতে তাহার স্থান নাই। দৃঢ়বদ্ধ স্বার্থ উন্মূলিত করিলে কি আবার তাহার আবির্ভাব হইবে না ? ফ্রান্সে কি হইয়াছে ? রুশিয়ায় কি হইতেছে ? মার্কিণে আমরা কি দেখিতে পাই ?

ফ্রান্স রাজার আসনে রাষ্ট্রপতিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু রাজশাসনে যে সামাজিক অবস্থা ছিল, তাহার পুনরাগমন রোধ করিতে পারে নাই।

রুশিয়ায় আবার সম্প্রদায়ের ও ব্যক্তির স্বার্থ আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

মার্কিণে দেখিতে পাই, উপাধির লোভও এত প্রবল যে, মার্কিণের ধনী কুমারীরা উপাধির লোভে বিলাতের দরিদ্র অভিজাত সম্প্রদায়ে বিবাহ করিতে উদগ্রীব !

সে অবস্থায় পণ্ডিত জওহরলাল কিরূপে সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার স্বপ্ন দেখিতে পারেন ? আমাদিগের মনে হয়, তিনি যাহাদিগকে শোষণের দুঃখ হইতে রক্ষা করিতে ব্যস্ত, তাহাদিগের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি তাহাদিগের সম্বন্ধে যে ধারণা মনে পোষণ করেন, তাহা প্রকৃত নহে—কল্পিত। অধিকার ব্যবহার করিবার শিক্ষা না পাইলে লোক অধিকারের স্বরূপ বুঝিতেও পারে না। সংস্কৃত একটি উদ্ভট শ্লোকে ইহার দৃষ্টান্ত আছে :—

"হর্য্যক্ষনখরছিন্ন করিকুম্ভ হ'তে
রক্তসিক্ত মুক্তাফল ধূলায় লুটায় ;

অজ্ঞ শবরের কন্যা যেতে সেই পথে
বদরী ভাবিয়া তাহা ফেলি চলি যায়।"

আজ তিনি কিরূপে মহাজনের স্বার্থ হইতে কৃষককে, বিদেশী ধনিকের স্বার্থ হইতে এ দেশের লোককে, জমীদারের স্বার্থ হইতে প্রজাকে, নেতার স্বার্থ হইতে জনগণকে মুক্তি দিবেন ?

প্রথমে আমরা মহাজন ও কৃষকের সম্বন্ধের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কৃষক নিজ প্রয়োজনে ঋণ করে—মহাজন তাহাকে ঋণ দেয়। অনেক স্থলে রোগে চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, চাষের প্রয়োজন—এই সকলের জন্যই ঋণ গৃহীত হয়। জামিন দিবার অন্য কোন সম্পত্তি না থাকায় কৃষক জমীই বন্ধক দেয়। যদি সে সে-সময় ঋণ না পায়, তবে হয়ত রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারে না, কন্যার বিবাহ দিতে পারে না, চাষের সুব্যবস্থা করিতে পারে না। অথচ এই তিনটিই অবশ্য করণীয়। প্রথম করণীয়—প্রাণ রক্ষার জন্য; দ্বিতীয় করণীয়—সমাজ ও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য; তৃতীয় করণীয়—জীবন ধারণের জন্য। পঞ্জাবে যে কৃষককে মহাজনের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভূমি হস্তান্তরের অধিকারে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাহাতে সুফল ফলিয়াছে কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে মহাজন যাহাতে কৃষককে অন্যায় উৎপীড়নে পিষ্ট করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য। সে সম্বন্ধে যে সব নূতন আইন হইতেছে, সে সকলের কথা সকলেই অবগত আছেন। সে সব আইন যাহাতে উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গত স্বার্থ রক্ষা করিয়া দুর্ব্বলকে সবলের অত্যাচার ও অনাচার হইতে অব্যাহতি দান করে, সে বিষয়ে অবহিত হওয়াই কর্ত্তব্য। রোগ দূর করিবার জন্য রোগীর জীবনান্ত করা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে।

বিদেশী ধনিকরা যে এ দেশে সরকারকেও ঋণ দিয়াছেন, তাহা এ দেশের সরকারের ও লোকের প্রয়োজনে। দেশে যে ধনের অভাব তাহা বলা যায় না। কারণ, এই বারই দেখা যাইতেছে, প্রায় ১৫০ কোটি টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে—এখনও হইতেছে। কিন্তু এই সঞ্চিত অর্থ দেশের উন্নতিকর কার্য্যে প্রযুক্ত হয় নাই। বিদেশ হইতে অল্প সুদে টাকা আনিয়া এ দেশে রেলপথ রচিত হইয়াছে; বিদেশীর মূলধনে এ দেশে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদেশের টাকার সহিত প্রতিযোগিতায় এ দেশে সুদের হার কমিতেছে ও কমিবে। যতক্ষণ দেশের কাজের জন্য দেশেই মূলধন পাওয়া না যাইবে, ততক্ষণ বিদেশের ধনিকদিগের অর্থ বর্জ্জন করিলে উপকার না হইয়া অপকারই হইবে। কয় বৎসর পূর্ব্বে বিদেশ হইতে মূলধন আনয়ন ভারতের পক্ষে কল্যাণকর কি না, তাহা বিচার করিয়া মত প্রকাশের জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে জাতীয়দলের কোন কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও সদস্য ছিলেন। তাঁহারা মত প্রকাশ করিয়াছেন—বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে ঋণ হিসাবে মূলধন সংগ্রহ করা ভারতের পক্ষে কেবল প্রয়োজন নহে, পরন্তু বিশেষ উপকারী। আজ কিরূপে আমরা নীতির নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া বিদেশী মহাজনের স্বার্থনাশ করিতে পারি? কোন্ সভ্য দেশ তাহা করিয়াছেন? মার্কিণ যখন রেলপথ রচনা করে, তখন অবাধে বিলাত হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়াছিল। অথচ মার্কিণ গণতন্ত্রশাসিত—তাহা বিদেশীর শাসনাধীন নহে।

জমীদারের স্বার্থ হইতে প্রজাকে রক্ষা করিবার প্রকৃত উপায় কি? জমীদার রাজস্ব প্রদান করেন; জমীর খাজনা বুঝিয়া রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। জমীদার সেই খাজনা আদায় করেন, সেই জন্য কিছু টাকা প্রাপ্য হিসাবে, লাভ করেন। জমীদার ইচ্ছা করিলেই প্রজার খাজনা বাড়াইয়া আপনার আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন না। বাঙ্গালার কথাই ধরা যাউক। বাঙ্গালার প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন প্রজার স্বার্থ রক্ষায় সরকারের আগ্রহের ফল। বাঙ্গালায় ভূমি রাজস্ব চিরস্থায়ী হইলেও জমীদার খাদ্য শস্যের মূল্যবৃদ্ধি ব্যতীত কোন কারণে খাজনা বাড়াইতে পারেন না। পাটচাষে প্রজার যত লাভই কেন হউক না, সেজন্য জমীদার খাজনা বাড়াইবার অধিকার লাভ করেন না। খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধিতেও খাজনা বৃদ্ধির হার নির্দ্দিষ্ট আছে, জমীদার তাহা লঙ্ঘন করিতে পারেন না। সুতরাং জমীদারের পক্ষে প্রজার উপর অত্যাচার বা অনাচার করা আইনবিরুদ্ধ। জমীদার যদি অন্যায় করিয়া খাজনা বাড়াইতে চাহেন, তবে

তাহা বে-আইনী হয়। এই অবস্থায় যাহাতে প্রজার অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া জমীদার অসঙ্গত ব্যবহার করিতে না পারেন, তাহার জন্ম সরকার এবং ব্যবস্থাপক সভা সতর্ক ব্যবস্থা করিয়াছেন ও করিতেছেন। অনেক স্থলে দেখা যায়, খাস মহলের প্রজার অবস্থা জমীদারের অধীনস্থ প্রজার অবস্থার তুলনায় অনেক হীন। সকল প্রদেশের ব্যবস্থাও একরূপ নহে। সুতরাং জমীদারের নাম শুনিয়াই "মারমূর্ত্তি" হইবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। বাঙ্গালা দেশে এবং হয়ত অন্যান্য প্রদেশেও জমীদাররা দেশে শিক্ষাবিস্তারে, চিকিৎসালয় স্থাপনে, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠায় যে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাও উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা সঙ্গত হইবে না। বর্ত্তমানে অনেক স্থলে প্রজাই অত্যাচারী, জমীদার সেই অত্যাচার সহ্য করিতে বাধ্য। বিশেষ প্রজাকে দুষ্টবুদ্ধি দিবার লোকেরও যে আজকাল অভাব নাই, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

নেতার স্বার্থ হইতে জনগণকে মুক্তি দিবার উপায় কি? এ দেশে যাঁহারা শ্রমিক-সঙ্ঘ গঠিত করিয়া নেতৃত্ব করেন, তাঁহারা শ্রমিক নহেন; অনেক স্থলে তাঁহারা শ্রমিকদিগকে শোষণ করেন। পণ্ডিত জওহরলাল যদি একবার এ দেশে "তথাকথিত" শ্রমিকসঙ্ঘগুলির নেতাদিগের পরিচয় লইবার চেষ্টা করেন, তবে অবশ্যই এ কথা স্বীকার করিবেন। আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা সরকারের দ্বারা শ্রমিক নেতা বলিয়া গৃহীত, তাঁহারাও শ্রমিক নহেন—কেহ সাংবাদিক, কেহ উকীল, কেহ ব্যবসায়ী, কেহ বা কোন সমিতির সদস্য হিসাবে শ্রমিক-সমস্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন। যতদিন শ্রমিকদিগের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হেতু তাহাদিগের মধ্য হইতেই নেতার উদ্ভব না হইবে, ততদিন নেতাদিগের সহিত তাহাদিগের স্বার্থগত যোগ থাকিবে না। ততদিন নেতৃগণের স্বার্থ হইতে শ্রমিকদিগকে রক্ষা করিতে হইলে শ্রমিকের বিলোপ করিতে হয়। এইরূপে রাজনীতিক্ষেত্রেও নেতারা যে জনসাধারণের নামে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন, সেই জনসাধারণের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ কি? পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কি কখন যুক্তপ্রদেশের দরিদ্র—নিরন্ন কৃষকগণের অবস্থা সম্বন্ধে কোনরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার "আনন্দ ভবন" কি প্রজার কুটীরের সহিত তুলিত হইতে পারে? তিনি জীবনযাত্রার যে প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কি দেশের সাধারণের জীবনযাত্রার প্রণালী হইতে বিশেষরূপ বিভিন্ন নহে? তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন —এ বিষয়ে রুসিয়ার কাউণ্ট টলষ্টয়ও আদর্শের সহিত বাস্তবের সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারেন নাই। তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সেভাবে দেখিলে তিনি কিরূপে নেতার স্বার্থ হইতে জন-সাধারণকে রক্ষা করিতে চাহেন?

এই সব বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, তিনি আলেয়ার পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেন। তিনি যাহা চাহিতেছে, তাহার অনিবার্য্য ফল—ধ্বংস।

তিনি যদি রুশিয়ার সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করিয়া— সমাজে সাম্য-প্রতিষ্ঠার কল্পনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বাস করেন, তবে আমরা তাঁহাকে বলিব—পুঁথিগত বিদ্যা প্রয়োগ-কালে বিষম বলিয়া বোধ হয়।—

"Mere scholarship and learning and the knowledge of books do not by any means arrest and dissolve all the travelling acids of the human system."

তিনি যদি বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের—অসামঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে রুশিয়ার—বলশেভিক রুশিয়ার আদর্শ ত্যাগ করিয়া প্রাচীন হিন্দুস্থানের আদর্শ অধ্যয়ন করিতে হইবে। তাহা হইলে তিনি অন্ধকারে আলোক পাইবেন—মরুভূমির মধ্যে প্রকৃত পথের সন্ধান পাইবেন। বিজ্ঞ লেখক ওলডেনবার্গ বলিয়াছেন, দুরারোহ পর্ব্বত ও দুর্লঙ্ঘ্য সাগর ভারতবর্ষকে অন্যান্য দেশ হইতে পৃথক করায় এই দেশের অধিবাসীরা যে-ভাবে আপনাদিগের সমাজ-বিন্যাস রচনা করিয়াছিল, তাহা অন্য কোন দেশে পরিলক্ষিত হয় না—ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। হিন্দুস্থানের নেতারা যে সমাজ-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা কঠোর মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত; কারণ, সে ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতাও অসাধারণ এবং তাহা কখন কালোপযোগী পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। সেই জন্যই তাহা বহু শতাব্দীর নানারূপ

উপদ্রব সহ্য করিয়াও আত্মরক্ষা করিয়াছে—করিতে পারিয়াছে। এই সমাজে সকল সম্প্রদায়ের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে এবং যে উপযুক্ত তাহার পক্ষে সেই স্থানে থাকিয়া উন্নতি লাভ করাও সম্ভব এবং উচ্চতর স্থান লাভ করাও অসম্ভব নহে। আজ যাঁহারা "জাতিভেদকে" বৈদেশিক দৃষ্টিতে দেখিয়া সর্ব্ববিধ উন্নতির অন্তরায় বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারা কি একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন—ইহার অর্থনীতিক ভিত্তি যেমন দৃঢ়, ইহা তেমনই মানুষের মনে সন্তোষ স্থায়ী করিতে পারে। এই প্রথার জন্যই ভারতে শিল্পের অসাধারণ উন্নতিলাভ সম্ভব হইয়াছিল। যিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই মধুসূদন খাস বিলাতে এক বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছিলেন, উড়িষ্যার যে সব শিল্পী "তারের কাজ" করে, তাহারা যে কৌশলের অধিকারী তাহা বংশপরম্পরাগত নৈপুণ্যের অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। শিল্পসমালোচক বার্ডউডও বলিয়াছেন—শত শত বৎসর বংশপরম্পরায় একই শিল্পে আত্মনিয়োগ করায় হিন্দু শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য স্বভাবজ হইয়া পড়িয়াছে।

সব নিয়মই পরিচালনের ক্রটিতে কলুষিত হইতে পারে; সেই জন্যই কালোপযোগী পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। মনুর সংহিতার সহিত পরাশরের সংহিতার তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, হিন্দু সমাজের ব্যবস্থাকাররা কখন কালোপযোগী পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অস্বীকার করেন নাই, পরন্তু সেরূপ পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিয়াই আসিয়াছেন।

তাঁহারা কখন বিপ্লব চাহেন নাই; তাঁহারা পরিবর্ত্তন শান্তির পথে প্রবাহিত করিয়া সাফল্যের বন্দরে আনিয়াছেন।

আজ যাঁহারা সেই আদর্শ ত্যাগ করিয়া প্রতীচীর আদর্শে কাজ করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা সমাজে সাম্যের নামে বিশৃঙ্খলার উদ্ভবই করিবেন। আজ দিকে দিকে যে বিশৃঙ্খলা প্রলয়-ঝটিকার মত দেখা দিতেছে, তাহাতে ভাঙ্গিবার সম্ভাবনাই প্রবল—গঠনের সম্ভাবনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা বলেন—না ভাঙ্গিলে গঠনের সুযোগ লাভ করা যায় না, তাঁহাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, যদি যাহা গঠিত হইয়াছে, তাহাতে কালোপযোগী পরিবর্ত্তন শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই করা যায়, তবে তাহাই কি অভিপ্রেত নহে?

কাজের আনন্দ ভাল, না উত্তেজনার আগ্রহ ভাল? সমাজে কিসের প্রয়োজন অধিক?

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যদি অসাধ্যসাধন করিবার চেষ্টায় প্রমত্ত হইয়া কাজ করেন, তবুও তিনি অসাধ্য সাধন করিতে পারিবেন না; অথচ দেশে অশান্তি ও অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়া—অজ্ঞ জনগণকে উত্তেজিত করিয়া আমাদিগের সামাজিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়া দিবেন। যাহা শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে নরচরিত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গিলে আমরা যদি আমাদিগের পুরাতন সভ্যতা, পুরাতন পদ্ধতি সব বর্জ্জন করিয়া বিদেশীর অনুকরণেই পরিচালিত হই, তবে তাহা কি জাতির আত্মসম্মানের পরিচায়ক হইবে? যে সমাজ-ব্যবস্থা রাজ্যত্যাগী রাজপুত্র সিদ্ধার্থের প্রচারিত ধর্ম্মের বন্যায় নষ্ট হয় নাই; শক হূন পারদ যবনের বিজয়বাত্যা যাহার উচ্ছেদসাধন করিতে পারে নাই, আমরা কি আপনারাই তাহা নষ্ট করিব?

দেশ কি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত? যিনি অহিংসায় বিশ্বাস অবিচলিত রাখিয়াছেন, সেই মহাত্মা গান্ধীও কি বলিতে বাধ্য হয়েন নাই—জনগণকে অহিংসায় অবিচলিত রাখা দুষ্কর? তিনি যে আন্দোলন স্বয়ং পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহাই যে অনাচারে কলুষিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—ইহাই যদি স্বরাজ হয়, তবে ইহা সহ্য করা যায় না। তাঁহাকে বার বার হতাশার বেদনায় প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। এ সব ভুলিলে চলিবে না।

বর্ত্তমানে বিপ্লবের অনিবার্য্য ফল—অত্যাচার, অনাচার, রক্তপাত, সর্ব্বনাশ!

সমাজে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্থিতি অনিবার্য্য। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় লইয়াই সমাজ। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থও ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে—হইয়া থাকে। সে সকলকে এক করা যায় না। তবে সে সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা যায়। তাহার প্রমাণ—হিন্দুর

সমাজ-ব্যবস্থা। হিন্দু-সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই সমাজে বর্দ্ধিত হইয়াও যে সে সমাজের ব্যবস্থা-বৈশিষ্ট্য পণ্ডিত জওহরলালকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, তাহাতে এ দেশে প্রচলিত একটি কথাই মনে পড়ে—প্রদীপের নিম্নেই অন্ধকার থাকে। পণ্ডিত জওহরলাল আপনার কথা ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন, তিনি যে সাম্যবাদ প্রচার করিতেছেন, স্বয়ং তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন না; তিনিই তাঁহার আদর্শবিরুদ্ধ কাজ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং অন্নার্জ্জন করেন না;—তিনি পিতার সঞ্চিত ধনের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন—তাহা দেশবাসীর মধ্যে বাটা করিয়া দেন নাই;—তিনি দেশের জনসাধারণের শ্রমসাধ্য কায না করিয়া মানসিক কায করিতেছেন; তিনি দেশের জনসাধারণের অশনবসন গ্রহণ করেন নাই। তিনি যদি বলেন—"আমি যাহা বলি, তাহাই কর; আমি যাহা করি, তাহা করিও না"—তবে তাঁহার উপদেশ ফলোপধায়ী হইবে না—ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

আজ দেশে কর্ম্মীর প্রয়োজন। দেশে শিক্ষা-বিস্তারের, শিল্পপ্রতিষ্ঠার, স্বাস্থ্যোন্নতিবিধানের উপায় করিতে হইবে। সে জন্য কর্ম্মীর কর্ম্মোদ্যম প্রয়োজন। আমরা গঠন চাহিতেছি; গঠনের কার্য্যেই আজ আমাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। সেই পথই উন্নতির পথ—মুক্তির পথ।

যাঁহারা সে পথ ত্যাগ করিয়া কেবল ধ্বংসের পথে প্রধাবিত হইবেন, তাঁহারা জাতিকে বিনাশের অসীম গহ্বরেই লইয়া যাইবেন, এ কথা ভুলিলে আমরা আপনাদিগের ক্ষতিই করিব।

আমরা দেশের উন্নতিপ্রয়াসী—মুক্তিকামী। কিরূপে সেই উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহার উপায় চিন্তা করাই আজ ভারতবর্ষের জননায়কদিগের প্রধান কর্ত্তব্য—একমাত্র করণীয় কার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সন্তরণবীর প্রফুল্লকুমার—

'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণ শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার ঘোষের সন্তরণ-কৃতিত্বের সংবাদ পূর্ব্বাবধিই পাইয়া আসিতেছেন। এবার তিনি বিশ্বখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে যখন তিনি কলিকাতার হেদুয়া পুষ্করিণীতে ৭২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট সন্তরণ করিয়া 'রেকর্ড' ভঙ্গ করেন, তখন অনেকে নানারূপ ওজোর-আপত্তি করিয়া তাঁহাকে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার তাহাতে একটুও বিচলিত না হইয়া, এবার বিরুদ্ধবাদীদিগের সকল কুযুক্তি খণ্ডন করিয়া

শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার ঘোষ

সন্তরণ-কৌশলে বিশ্বজয়ী বীরের খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গলাদেশের তুলনায় ব্রহ্মদেশের আবহাওয়া অনেকটা বিভিন্নপ্রকারের এবং সন্তরণের পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী নহে। শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার এবার সেই রেঙ্গুনে যাইয়া পৃথিবীর 'রেকর্ড' ভঙ্গ করিবার অভিলাষ করেন। তথায় রেঙ্গুনের মেয়র ডাক্তার ডুগালের নেতৃত্বে একটি

কমিটী গঠিত হয়। সেই কমিটীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রেঙ্গুনের একটি প্রকাণ্ড হ্রদে প্রফুল্লকুমার গত ২২এ অক্টোবর সকাল ৮টা ৬ মিনিটের সময় সন্তরণ আরম্ভ করেন। রেঙ্গুনের জল, হাওয়া এবং অনভ্যস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও প্রফুল্লকুমার অবিশ্রান্তভাবে ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট কাল সন্তরণ করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। পঞ্চাশ ঘণ্টা সন্তরণ করিবার পর প্রফুল্লকুমার একশত গজ দ্রুত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে ইচ্ছা করেন। কর্তৃপক্ষ তাহাতে অনুমতি না দেওয়ায় তিনি পঞ্চাশ গজ দ্রুত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম স্থান গ্রহণ করেন। যে অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান যুবক দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সে তাঁহার দশ গজ পশ্চাতে ছিল। সাড়ে ৭৯ ঘণ্টা সন্তরণ করিয়া তিনি যখন তীরে উঠেন তখনও তাঁহাকে বিশেষ ক্লান্ত দেখায় নাই। তিনি তীরে উত্তীর্ণ হইলে লক্ষ লক্ষ লোক জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করে। রেঙ্গুনবাসী তাঁহার গলদেশে জয়মাল্য অর্পণ করিয়া মহাসমারোহে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কলিকাতাবাসীরাও তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আশীর্ব্বাদ করি, প্রফুল্লকুমার তাঁহার সঙ্কল্পিত ইংলিশ প্রণালী সন্তরণে জয়যুক্ত হউন।

পুনর্গঠন—

বাঙ্গালার গবর্ণর বলিয়াছেন, বাঙ্গালা সরকার, বাঙ্গালার আর্থিক দুর্গতি দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বাঙ্গালার আর্থিক দুর্গতি যে অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দিন দিন দুর্গতি বৃদ্ধি পাইতেছে। গবর্ণর বলিয়াছেন, সমবায় ব্যবস্থা, ঋণভার হ্রাস, জমীবন্ধকী ব্যাঙ্ক—দুর্গতি নিবারণের জন্য এইরূপ এইরূপ আরও কতকগুলি উপায় নানা প্রদেশে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই যে, পল্লী পুনর্গঠন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না—হইতে পারেও না। এ জন্য কৃষির উন্নতি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কারণ, কৃষিই এ দেশের লোকের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন—জীবিকার উপায়। যে কৃষিতে দেশের শতকরা সত্তর জন অধিবাসীর অন্নসংস্থান হয়, তাহাই দেশের সর্ব্বপ্রধান শিল্প; এবং যদি তাহার উন্নতি সাধন করা যায়, তবে শিল্পোন্নতি, স্বাস্থ্যোন্নতি, ব্যবসার সমৃদ্ধি, প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার, হিন্দু ও মুসলমানের বেকার সমস্যার সমাধান এ সবই হইতে পারিবে।

আমরা বাঙ্গালা সরকারের এই সঙ্কল্পে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। বাঙ্গালার পল্লীর দুর্দ্দশার কারণ একাধিক। শতবর্ষাধিককালব্যাপী পরিবর্ত্তিত অবস্থায় বাঙ্গালার সমৃদ্ধ পল্লীগ্রামগুলি ধ্বংস হইয়াছে—পল্লীপ্রাণ প্রদেশে পল্লীর দুর্দ্দশার অন্ত নাই। জনবহুল গ্রামে আজ স্বচ্ছন্দবর্দ্ধনশীল লতাগুল্ম সূর্য্যের আলোক ও বায়ুসঞ্চার হইতে মানুষকে ও ভূমিকে বঞ্চিত করিতেছে; দেবালয়ে আর সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে না, পাঠগোষ্ঠী ছাত্রশূন্য।

কেবল বাঙ্গালার নহে, নানা দেশস্থ পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, অথচ পল্লীর দুর্দ্দশার সহিত দেশের লোকের দুর্দ্দশাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সে দিন বোম্বাইয়ের গবর্ণর সে প্রদেশের পল্লীগ্রামের পুনর্গঠন সম্বন্ধে এক আলোচনা-সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, সমবায় নীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, সহজে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে। এই সম্পর্কে আমরা আয়ার্লণ্ডের দৃষ্টান্ত ও ডেনমার্কের দৃষ্টান্ত দিতে পারি। উভয় দেশের ব্যবস্থায় প্রভেদ এই যে, ডেনমার্কে সরকার দেশবাসীর সহিত একযোগে সমবায়নীতি অনুসারে দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন; আর আয়ার্লণ্ডে যখন স্যর হোরেস প্লাংকেঠ প্রমুখ মহানুভবগণ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন তাঁহারা ইংরাজ সরকারের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া স্বাবলম্বী হইয়া কাজ করিয়াছিলেন। আজ ডেনমার্ককে সচরাচর "সমবায় সঙ্ঘ" বলিয়া অভিহিত করা হয়। তথায় কৃষিই লোকের প্রধান অবলম্বন এবং গত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তথায় সমবায় নীতিতে কাজ আরম্ভ হইবার পর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পণ্যের পরিমাণ শতকরা ৮৫ ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তথায় কৃষিক্ষেত্রগুলির সহিত দেশের অন্যান্য শিল্প ঘনিষ্ট সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছে।

আয়ার্লণ্ডে সুফল ফলিতে যে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল, তাহার কারণ—সমবায় নীতিতে যে কাজ হইয়াছিল, তাহা সরকারের সাহায্য লাভ করে নাই। তথাপি

তাহাতে বিস্ময়কর উন্নতি সংঘটিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

আজ যখন বাঙ্গালায় সরকার এই কার্য্যে অবহিত এবং বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতিতেও গঠনকার্য্যের ভার ব্যবস্থাপক সভার নিকট কৈফিয়তের জন্য দায়ী মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত, তখন অবশ্যই আশা করা যায়, দেশবাসীর ও সরকারের সমবেত চেষ্টায় বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের পুনর্গঠনকার্য্য অল্পদিনের মধ্যেই আশানুরূপ অগ্রসর হইবে। বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির বিরুদ্ধ সমালোচকরা দেখাইয়া দিয়াছেন, এই পদ্ধতিতে যে গঠনকার্য্য আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই, তাহার কারণ—গঠন বিভাগগুলি মন্ত্রীর অধীন হইলেও সেগুলির জন্য আবশ্যক অর্থ বরাদ্দ করিবার অধিকার মন্ত্রীদিগের নহে; পরন্তু সংরক্ষিত অর্থ বিভাগের। এ-বার গভর্ণর স্পষ্ট বলিয়াছেন—

"এ জন্য আবশ্যক অর্থ ব্যয় করিতেই হইবে। আমি প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি, আবশ্যক অর্থ প্রদান করা হইবে। কারণ, এই কার্য্যে যে অর্থ ব্যয়িত হইবে, তাহা সুপ্রযুক্তই হইবে এবং তাহাতে যথেষ্ট লাভ হইবে। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারে অনিশ্চয়ের ভাগ যে নাই, এমন নহে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় কি তাহা নাই? যদি দুই দিকেই অনিশ্চয়তা বিদ্যমান থাকে, তবে নিশ্চল না হইয়া অগ্রসর হওয়াই সঙ্গত।"

তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, অনুসন্ধান, অভিজ্ঞতা, সতর্কতা এই তিনের ফলে অনিশ্চয়তার হ্রাসসাধন হইবে।

এই কার্য্যের জন্য বাঙ্গালা সরকারের পরিচালক দেশের লোকের সহযোগ চাহিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে বলিতে পারি, দেশের লোক তাঁহার আহ্বানে সাগ্রহে অগ্রসর হইবে; কারণ—তাহারাই দুর্দ্দশাদুঃখে পিষ্ট হইতেছে। তাহারা দুর্দ্দশা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় সন্ধান করিয়া উপায় না পাইলেও তাহাদিগের নেতারা সরকারের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। এতদিন তাহারা সরকারের সহযোগ প্রয়োজন মত পায় নাই। সত্য বটে, সরকার সমবায় বিভাগের প্রবর্ত্তন দ্বারা কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং কোন কোন শিল্পের উন্নতি সাধন জন্যও সমবায় নীতি ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু এই সমস্যার সমাধানের জন্য যে উদ্যম প্রয়োজন লোকের সেই উদ্যমকে উন্নতির জয়রথে যুক্ত করিবার উপায় অবলম্বিত হয় নাই; ইহার জন্য যে আয়োজন প্রয়োজন, তাহা হয় নাই।

এ দেশে কৃষির প্রয়োজন কে অস্বীকার করিতে পারেন? অথচ এই কৃষিই অনাদৃত। কেবল যে বাঙ্গলার শতকরা ৭০ জন অধিবাসী কৃষির উপর নির্ভর করে, তাহাই নহে; পরন্তু কৃষির উন্নতি ব্যতীত এ দেশে শিল্পের উন্নতি সাধন—এমন কি শিল্প-প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হইতে পারে না।

তাহার কারণ—

(১) শিল্পের জন্য পণ্যোপকরণ প্রয়োজন। যদি কাপড়ের কথা ধরা যায়, তবে দেখা যায় কাপড়ের প্রধান উপকরণ তুলা। কৃষির উন্নতি ব্যতীত তুলার উন্নতি ও ফলন বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতেই হইবে। আজ কাপড়ের মত চিনির উপরও চড়া শুল্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশে চিনির কল প্রতিষ্ঠায় লোকের আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে। সেজন্য অধিক শর্করা-রসপূর্ণ ইক্ষুর চাষ প্রয়োজন। কোইম্বাটোর ইক্ষুর প্রচলন যাহাতে অধিক হয় এবং উন্নততর জাতীয় ইক্ষুর উদ্ভবসাধনের চেষ্টা হয়, তাহা করিতে হইবে। সেজন্য কৃষির উন্নতি সাধন প্রয়োজন।

(২) কৃষিজ পণ্যের লাভ হইতেই আমাদিগকে অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহার অন্য উপায় কোথায়? যে মার্কিণ আজ নানা কলকারখানায় পণ্যোৎপাদন করিয়া দিগ্বিজয়ী হইয়াছে, সেই মার্কিণ কৃষিজ পণ্যের লাভ হইতে সে সব কলকারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল।

কৃষির প্রয়োজন জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডও বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে কলকারখানার সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে কৃষি অবজ্ঞাত হইতেছিল। কিন্তু জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় খাদ্যশস্যাদি সম্বন্ধে পরমুখাপেক্ষিতার বিপদ সপ্রকাশ হওয়ায় বিলাতের লোকও কৃষিতে মন দিয়াছে।

এই কৃষিপ্রাণ দেশে কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য ত্রিবিধ কার্য্য প্রয়োজন।—

(১) গবেষণা ও পরীক্ষা। কোন্ কোন্ ফশল ও কিরূপ যন্ত্রপাতি দেশোপযোগী তাহা স্থির করিতে হইবে।

(২) প্রদর্শন। এই সব উন্নত ফশল ও যন্ত্রাদির ব্যবহারের লাভ কৃষককে দেখাইয়া দিতে হইবে।

(৩) ক্ষেত্রপ্রসার বৃদ্ধি। যাহাতে উন্নত ফশলের চাষ করিয়া ও উন্নত যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া কৃষক লাভবান হইতে পারে, সে জন্য তাহার ক্ষেত্রের প্রসার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

যাঁহারা বলেন, এ দেশের কৃষক অতিমাত্রায় রক্ষণশীল বলিয়া উন্নত যন্ত্রাদি ও উৎকৃষ্ট বা নূতন ফশল লইতে অসম্মত, তাঁহারা অন্যায় কথা বলেন। এ দেশের কৃষকাদি উন্নত যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে আগ্রহশীল; কিন্তু অর্থাভাবে সে সব সংগ্রহ করিতে পারে না। সমবায় সমিতির সাহায্যে যদি তাহারা সেরূপ যন্ত্রাদি লাভ করিতে পারে, তবে সে সব ব্যবহার করিতে কখনই অসম্মত হইবে না। ফসলের সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি—এ দেশের কৃষকরা কখন লাভজনক নূতন ফসলের চাষে বিরত হয় না। প্রমাণ স্বরূপ—গোল আলুর, কপির, সালগম ও গাজরাদির, চীনা-বাদামের চাষের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সব ফশল নূতন। কেবল তাহাই নহে, যাঁহারা বাঙ্গালায় নীলের ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে আর বলিয়া দিতে হইবে না, বাঙ্গালার কৃষকরা "মুলতানী" বীজ নামে পরিচিত উৎকৃষ্ট বীজ সর্ব্বদাই ক্রয় করিত।

ডেনমার্কের মত এ দেশেও বীজ ও সার প্রভৃতি ক্রয়ের ও পণ্য বিক্রয়ের জন্য সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সেজন্য দেশের লোককে অগ্রণী হইয়া দেশের সরকারের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। আজ সে কার্য্যের যে সুযোগ সমুপস্থিত, আমরা যেন সে সুযোগ না হারাই।

আজ আমরা দেখিতেছি, মফঃস্বলে নানাস্থানে বিদ্যুতালোকে সহর আলোকিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু যতদিন দেশের দুর্দ্দশার অন্ধকার দূর না হইবে ততদিনই আমরা "যে তিমিরে সে তিমিরে" থাকিব। [illegible]তঃ সহরের উপকণ্ঠে গ্রামে শিল্পের জন্য বিদ্যুতের প্রয়োগ-ব্যবস্থা করিয়া পরে—জার্ম্মাণীর অনুকরণে—গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের শক্তি সুলভ করা প্রয়োজন। তাহা হইলে অনেক শিল্প আবার গ্রামে ফিরিয়া যাইবে; হতশ্রী গ্রাম আবার শ্রীসম্পন্ন হইবে।

বাঙ্গালার পূর্ব্বাবস্থার আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—পল্লীগ্রামের শিল্পেই সহরের সৃষ্টি ও পুষ্টি অধিক হইত। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ সহরদ্বয়ের ইতিহাসের আলোচনা করিলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। এখনও যাহাতে তাহা হয়, তাহা করিতে হইবে।

যেসব শিল্প এক দিন কোন কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, আজ সে সব শিল্প আর সেরূপ নাই। বাঙ্গালার শিল্প-বিভাগ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-শিক্ষা প্রদান জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, আমাদিগের পাঠকগণ তাহার কথা অবগত আছেন। দেখা যাইতেছে, "ভদ্র" সম্প্রদায়ের বেকার যুবকরা সাগ্রহে শ্রমসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। যাঁহারা শিল্প-বিভাগের কারখানা পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, এ দেশের ভদ্র সম্প্রদায়ের যুবকরা হাপরের নিকট অগ্নিতাপে সাঁড়াশী ও হাতুড়ী ব্যবহার করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। এ-বার সরকার আদমশুমারের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও লিখিত হইয়াছে, পূর্ব্বে যাহারা কায়িক-শ্রমবিমুখ ছিল, আজ তাহারা কায়িকশ্রমে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করে না। বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত যুবকরা শিল্পে আত্মনিয়োগ করিলে নূতন ও উন্নত কার্য্য-পদ্ধতি সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবে এবং তাহাদিগের চেষ্টায় শিল্পে যে উন্নতি হইবে, অন্য কোন উপায়ে তাহা হইবে না।

আমরা মনে করি, বাঙ্গালা সরকার ক্ষুদ্রভাবে অবস্থিত শিল্প বিভাগের এই কার্য্যের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়াছেন।

অনুসন্ধানের জন্য বাঙ্গালা সরকার ইহার মধ্যেই এক সমিতি গঠনের আয়োজন করিয়াছেন। সরকারের এই কার্য্যতৎপরতায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি। সাধারণতঃ সরকারের কাজে যেরূপ বিলম্ব হয়, এ ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই সাফল্য-সূচনা করিবে।

এইরূপ একটি সমিতি গঠনের প্রয়োজন ইতঃপূর্ব্বেই

অনুভূত হইয়াছিল। জাতিসঙ্ঘের সার আর্থার সল্টার এ দেশে অর্থনীতিক সমিতি গঠন করিতে পরামর্শ দেন। তিনি সমিতিকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দুই ভাগে বিভক্ত করিতে বলেন। তাহার পর বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স এ বিষয়ে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে এক পত্র লিখেন। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স ভারতের বহির্বাণিজ্যেই অধিক মনোযোগী এবং তাঁহারা প্রধানতঃ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিষয় মনে রাখিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া দেশীয় বণিকদিগের দুইটি প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে পত্র লিখেন। তাঁহাদিগের পত্র পরবর্ত্তী বলিয়া সেগুলিতে বিস্তৃতভাবে আলোচনার সুবিধা হইয়াছিল। বিশেষ ইঁহারা এ দেশের ছোট ছোট শিল্পগুলির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। এ দেশের সামাজিক ও আর্থিক জীবনে এই সকল শিল্পের গুরুত্ব যে অসাধারণ, তাহা বলাই বাহুল্য। যতদিন এই সকল শিল্পের উন্নতি সাধিত না হইবে, ততদিন বাঙ্গালার পল্লীর পুনর্গঠন সম্ভব হইবে না—কারণ, ততদিন লোক পল্লীগ্রামে থাকিয়া অন্নার্জ্জনের পথ পাইবে না। তাহা উপলব্ধি করিয়াই বাঙ্গালার শিল্প বিভাগ কতকগুলি ছোট ছোট—স্বল্পমূলধনসাধ্য —শিল্পের জন্য লোককে শিক্ষা দিতেছেন। সামান্য পরিবর্ত্তনের ফলে এই সব শিল্পে কিরূপ উন্নতি সাধিত হইতে পারে, বাঙ্গালার ঠকঠকি তাঁতের প্রবর্ত্তনে তাহা দেখা গিয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মিষ্টার হাভেল হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন—শ্রীরামপুর অঞ্চলে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ঠকঠকি তাঁতের প্রবর্ত্তন ফলে প্রায় দশ হাজার তন্তুবায়ের আয় প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে—তাহারা মাসে ৪ হইতে ৫ টাকার পরিবর্ত্তে ৭ হইতে ৯ টাকা আয় করিতেছে। যদি এ দেশে ঠকঠকি তাঁতে যে সব কাপড় প্রস্তুত হয়, সে সকলের জন্য ঠকঠকি তাঁতই ব্যবহৃত হয়, তবে প্রায় চারি লক্ষ তন্তুবায়ের আয় এইরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং ফলে তাহারা বৎসরে ১৯ কোটি টাকারও অধিক আয় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধেও যদি এইরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, তবে তাহাতে দেশের কিরূপ উপকার অনিবার্য্য তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

সুতরাং বাঙ্গালার উটজ শিল্পগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের প্রয়োজন কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

বাঙ্গালা সরকার যে সমিতি গঠিত করিবেন, তাহার কার্য্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত ব্যক্ত করা হইয়াছে :—

(১) প্রাদেশিক সরকার যে সব বিষয়ে বোর্ডকে অনুসন্ধান করিতে বলিবেন, বোর্ড সেই সব অর্থ-নীতিক বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন।

(২) সরকারের সম্মতি লইয়া বোর্ড অন্যান্য অর্থ-নীতিক বিষয়েও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

সুতরাং বোর্ডের কাজ করিবার ক্ষমতা সঙ্কীর্ণ করা হয় নাই।

সরকার স্থির করিয়াছেন, অনুসন্ধান জন্য বৎসরে পনের হাজার টাকা প্রদান করা হইবে। ইহা আমরা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। আমাদিগের মতে দেশের অর্থনীতিক উন্নতি সাধনের কার্য্যে এ পর্য্যন্ত সরকার যে অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট নহে। বাঙ্গালা সরকারের উটজ শিল্প সম্বন্ধীয় শেষ বিবরণের ভূমিকায় দেখা যায়—১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে শিল্প বিভাগে উটজ শিল্প সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিবার লোক নাই! এই অবস্থায় জিলার কর্ম্মচারী ও জিলা বোর্ড প্রভৃতির দয়াদত্ত সাহায্যে নির্ভর করিয়া বিভাগকে উটজ শিল্প সম্বন্ধীয় বিবরণ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। যে বিবরণ এইরূপে প্রস্তুত হয়, তাহা কতদূর নির্ভরযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে।

সরকার যে সমিতিকে বাঙ্গালার আর্থিক উন্নতি সাধনকল্পে পুনর্গঠন কার্য্যের উপদেশ দিবারও উপায় নির্দ্ধারণের ভার দিবেন, সে সমিতি যাহাতে আবশ্যক অর্থাভাবে কাজ করিতে বাধা প্রাপ্ত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেই হইবে। সেইজন্য আমরা উপযুক্তরূপ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করিতে বলিতেছি।

প্রস্তাবিত বোর্ডের গঠন সম্বন্ধে মতভেদ আছে এবং থাকিবার সম্ভাবনা। বাঙ্গালা সরকার যেরূপ ব্যাপক-ভাবে প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে বোর্ডের আয়তন বর্দ্ধিত হইয়া যাইবে। বিশেষ এ দেশে দেখা গিয়াছে, কোন কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি প্রেরণ

কালে সর্ব্বত্র যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখেন না বা রাখিতে পারেন না ; কেন না, প্রতিষ্ঠানে ষড়যন্ত্র প্রবেশ করে। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে তিনি বন্দরের সহিত কোন কাজে সম্পর্কিত নহেন—তিনি কাপড়ের কলের কোন বিষয় জানেন না—তিনি ব্যাঙ্কিং বিষয়ে অনভিজ্ঞ ; সেরূপ লোকও কলিকাতার বন্দরের পরিচালন সমিতিতে, তুলার কমিটীতে, ব্যাঙ্কিং সন্ধান সমিতিতে অবাধে সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন।

বাঙ্গালার অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং অর্থ-নীতিক ব্যাপার অন্যের সাহায্য না লইয়া বুঝিতে পারেন, এমন অল্পসংখ্যক উৎসাহী সদস্য লইয়া কাজ করিলে বোর্ডের কাজ যেরূপ সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, অন্য ব্যবস্থায় তাহা হইতে পারে না।

বাঙ্গালার এই বোর্ডের কার্য্য কিরূপ হয়, তাহা জানিবার জন্য বাঙ্গালার লোকের কৌতূহল স্বাভাবিক।

বোর্ড গঠিত হইলে কি ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইবেন এবং কি কি কাজ করিবেন, সে বিষয়ে বিশেষ বিবরণ শীঘ্রই পাওয়া যাইবে। আমরা অনুসন্ধান ফলে ইহাই জানিতে পারিয়াছি। আমরা সেই বিস্তৃত বিবরণের প্রতীক্ষায় রহিলাম এবং তাহা পাইলে এই সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বর্ত্তমানে আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য বাঙ্গালা সরকারকে অভিনন্দিত করিতেছি।

বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা যে শোচনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাভাবে বাঙ্গালা সরকারের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাও অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হয় নাই ; থানায় থানায় একটি করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করাও সম্ভব হয় নাই ; শিল্পে সাহায্য প্রদান করা হয় নাই, এমন কি—মফঃস্বলে যাযাবর শিক্ষকদল পাঠাইয়া যে লোককে কয়টি শিল্প-শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে, সে জন্যও সাধারণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে! যতদিন দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধিত না হইবে, ততদিন দেশের গঠনকার্য্য আশানুরূপ অগ্রসর করা সম্ভব হইবে না। ইহা ভিন্ন বেকার-সমস্যা দেশে যে উপদ্রবের জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করিতেছে, তাহাও উপেক্ষা করা যায় না।

এই সব মনে করিয়াই বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। বাঙ্গালার গভর্ণর যে বলিয়াছেন, এ জন্য টাকা দিতেই হইবে, তাহা বিশেষ আশার কথা। দেখিতে দেখিতে কয় বৎসর কাটিয়া গেল, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় চিত্তরঞ্জন দাশ—অসহযোগী নেতা হইয়াও গঠনকার্য্যের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া তাহার আগ্রহে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার মফঃস্বলে পানীয় জলের সরবরাহ করিবার জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করিয়া টাকা সংগ্রহ করুন। বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হইলে সে কাজের জন্য আর সরকারকে অগ্রণী হইতেও হইবে না। কিসে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়, তাহা প্রস্তাবিত সমিতি বিবেচনা করিবেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের শ্রী ফিরিবে এবং দেশের লোকের মনে সন্তোষ বিরাজ করিবে।

সুতরাং এক হিসাবে বাঙ্গালার ভাগ্য নিয়ন্ত্রনের ভার এই সমিতির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সমিতির গঠন কিরূপ হইবে, তাহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ২১ জন সভ্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বণিক সভার সদস্য ৬ জন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ২ জন—এই ৮ জন বেসরকারী সদস্য হইবেন। সুতরাং বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা অল্প বলা যায় না। এ দেশে কৃষকদিগের কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের অভাবে যেমন, শ্রমিকদিগের সেইরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের অভাবেও তেমনই, এই দুই সম্প্রদায়ের যথা-ক্রমে ২ জন ও ১ জন প্রতিনিধি সরকারই মনোনীত করিবেন। এই বিষয়ে যখন সরকার দেশের লোকের স্বার্থরক্ষার চেষ্টাই করিতেছেন, তখন সদস্যরা সরকারী কি বেসরকারী তাহা বিচারের কোন প্রয়োজন অনুভূত হইবে না ; সকলে একযোগে ও সোৎসাহে সমিতির নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে অবহিত হইয়া বাঙ্গলার হৃতশ্রীর পুনরুদ্ধার সাধনে তৎপর হইবেন।

আবার এই কার্য্যে হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ ভিন্ন নহে ; ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই। বাঙ্গলার উন্নতিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সমভাবে উপকৃত হইবেন। সংপ্রতি বাঙ্গালার প্রাদেশিক মসলেম লীগ বাঙ্গলায় শিল্প সংস্থাপন দ্বারা দেশের বেকার-সমস্যার

সমাধান করিতে এবং সে জন্য বাঙ্গালা সরকারকে এক কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। তাঁহারা যে সরকারের এই প্রস্তাবে প্রীত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করা যাইতেছে, নানাদিকে বাঙ্গালীরা আর তাহাদিগের প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না—বাঙ্গালার মনীষাও যেন আর পূর্ব্ববৎ স্ফূর্ত্ত হইতেছে না। বাঙ্গলার আর্থিক দুরবস্থার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ নাই? আর্থিক দুরবস্থায় কেবল আর্থিক দুরবস্থাই নহে, পরন্তু নানাবিধ দুরবস্থা সৃষ্ট ও পুষ্ট হইতেছে। স্বাস্থ্যের অভাবজনিত দুর্দ্দশা সে সকলের অন্যতম। লোককে শিল্প শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতেও কিরূপে সরকারকে লোকের অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করিতে হইতেছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কেবল তাহাই নহে, বাঙ্গালীকে বাঙ্গলার আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইতেই হইবে। আজ অন্যান্য প্রদেশ বাঙ্গলার রক্ত শোষণ করিয়া আপনারা পুষ্ট হইবার চেষ্টাও যে করিতেছে না, তাহা নহে। এ বিষয়ে বোম্বাইয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। বোম্বাই কেবল যে বাঙ্গলায় কাপড় বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতেছে তাহাই নহে, পরন্তু টাকার মূল্য বিলাতের মুদ্রা-মূল্যে হ্রাস করিবার চেষ্টায় আন্দোলনও আরম্ভ করিয়াছে। পরিতাপের বিষয় বাঙ্গলায়ও বোম্বাইয়ের লোকের সমর্থনকারী মিলিয়াছে! অথচ ইহাতে যে বাঙ্গলার ক্ষতি অনিবার্য্য, তাহা সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ ব্যক্তিরা দেখাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালীকেই বাঙ্গালীর ও বাঙ্গলার উন্নতির উপায় করিতে হইবে। আজ বাঙ্গালা সরকার সে বিষয়ে উৎসাহী হইয়া বাঙ্গালীকে উৎসাহী হইতে আহ্বান করিতেছেন। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, এই আহ্বান ব্যর্থ হইবে না। বাঙ্গলা সরকার আজ গঠন কার্য্যের প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। দেশের লোকও তাহা বুঝিয়াছেন। সুতরাং যে কাজ ডেনমার্কে সরকারের ও দেশবাসীর সমবেত চেষ্টায় সহজসাধ্য হইয়াছে এবং যাহা আয়র্লণ্ডে কেবল দেশের লোকের চেষ্টায় বিলম্বিত হইলেও সফল হইয়াছে, বাঙ্গালায় সরকারের ও বাঙ্গলার লোকের সমবেত চেষ্টায় তাহা সহজেই সিদ্ধ হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা বলিব, দেশের অনেক লোক বাঙ্গালার অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয় চিন্তা করিয়াছেন—অনেকে সে বিষয়ে উপকরণ সংগ্রহও করিয়াছেন। আজ তাঁহাদিগের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে। তাঁহারা সংগৃহীত উপকরণ প্রদান করুন, আপনাদিগের চিন্তার ফল প্রকাশ করুন। তাঁহাদিগের দেশপ্রেম তাহাই চাহিতেছে। দেশের ভবিষ্যৎ দেশবাসীর কার্য্যের উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালীই বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করিবে।

বাঙ্গালা আজ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যাকুল হইয়াছে; বাঙ্গালা তাহার বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। এ সবই বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে। বাঙ্গালী সে কাজ সুসম্পন্ন করিবে।

আফগানিস্থানে রাজহত্যা—.

আফগানিস্থানের রাজা নাদিরশাহ আততায়ীর আক্রমণে নিহত হইয়াছেন। আফগানিস্থান ভারতবর্ষের রাজনীতিক গগনে ধূমকেতুর মত। আফগানিস্থানের পথে ভারতবর্ষে নানা উপদ্রব প্রবেশ করিয়াছে। রুশিয়া ও ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া আফগানিস্থান এক সময়ে ইংরাজের নিকট হইতে "বার্ষিক" লাভ করিত। তখন আবদর রহমান কাবুলের আমীর। আফগানিস্থানে ইংরাজ সৈন্য প্রেরণ করিলেও তাহা অধিকৃত রাখেন নাই। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শাসক হবিবুল্লা জেলালাবাদে নিহত হইলে কে রাজ্যাধিকারী হইবেন, তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এনায়েৎউল্লা রাজ্যে তাঁহার অধিকার ত্যাগ করিয়া পিতৃব্য নাশেরউল্লার পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু নিহত শাসকের আর এক পুত্র আমানুল্লা সেনাদলের সাহায্যলাভ করিয়া প্রবল হয়েন ও শাসক বলিয়া ঘোষিত হয়েন। দেশের উগ্রপ্রকৃতি লোকের দৃষ্টি দেশ হইতে বিদেশে আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। আফগানরা ভারত সরকারের নিকট পরাভূত হইলেও ইংরাজ আফগানিস্থানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করেন।

আমানুল্লা দেশে প্রতীচ্য প্রথায় যে সব পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা সে দেশে অজ্ঞ জনগণের প্রীতিপ্রদ হয় নাই। তিনি সস্ত্রীক য়ুরোপ পরিভ্রমণকালে তাঁহার পত্নী যে অনবগুণ্ঠিতা হইয়াছিলেন, তাহাতে ধর্ম্মযাজকরা বিরক্তি প্রকাশ করেন। দেশে ফিরিয়া বিদ্রোহহেতু তিনি দেশত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়েন। তখন বাচ্ছাই সাকো নামক একজন লোক সিংহাসন অধিকার করে। নাদীরশাহ তাহাকে পরাভূত করিয়া আফগান সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

নাদীর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সেনাদলে কাজ করিয়া তিনি ক্রমে আফগানিস্থানের সেনাপতি হয়েন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত আফগানদিগের যে ব্যবস্থার বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা নাদীরের সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হইত কি না সন্দেহ। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে নাদীর ফ্রান্সে আফগান দূত হইয়া গমন করেন; কিন্তু আমানুল্লার সহিত মতভেদহেতু পদত্যাগ করেন। আমানুল্লা প্রধান সেনাপতিরূপে তাঁহার কৃত কার্য্যের স্মারক স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন।

নাদীরও প্রতীচ্যপ্রথার অনুরাগী ছিলেন; কিন্তু তিনি

আমানুল্লার মত দ্রুত পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন।

আমানুল্লা দেশত্যাগী হইলে নাদীর দেশে ফিরিয়া বাচ্চাই সাকোকে পরাভূত করেন; কিন্তু আমানুল্লাকে ফিরাইয়া না আনিয়া আপনি রাজা হয়েন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার তাঁহাকে আফগানিস্থানের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। আফগানিস্থানে আমীর আবদর রহমানের মৃত্যুর পর হইতে সিংহাসনাধিকার লইয়া যে রক্তপাত ও নরহত্যা চলিয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, আফগানরা এখনও কঠোর শাসনের পরিবর্ত্তে গণতান্ত্রিক শাসনের উপযুক্ত হয় নাই।

নির্ব্বাসন স্থানে ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লা নাদীরের হত্যা-সংবাদে বলিয়াছেন—নাদীর আফগান, সেই জন্য তাঁহার মৃত্যুতে তিনি দুঃখিত হইলেও নাদীর অত্যাচারী ছিলেন বলিয়া তাহাতে তিনি আনন্দিত। তিনি বলেন, নাদীরের আদেশে বহু মনীষী নিহত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আফগানরা যদি তাঁহাকে ও তাঁহার কার্য্য-পদ্ধতি চাহে, তবে তিনি দেশে ফিরিতে প্রস্তুত আছেন।

আফগানিস্থানের রক্তরঞ্জিত রঙ্গমঞ্চের আবার কোন্ অভিনয় আরম্ভ হইবে, তাহা কে বলিবে?

পরলোকে কবি মোজাম্মেল হক—

আমাদের পরম বন্ধু, প্রাচীনতম মুসলমান কবি মৌলবী মোজাম্মেল হক মহাশয় বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার তাঁহার শান্তিপুরের বাসভবনে ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার প্রস্থানের সময় হইলেও আমরা তাঁহার ন্যায় মহানুভব, সরলস্বভাব, বন্ধুবৎসল কবির প্রয়াণে বিশেষ শোকানুভব করিতেছি। তিনি ৪০ বৎসরকাল শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর সদস্য ছিলেন; কয়েকবার ভাইস-চেয়ারম্যানের কার্য্যও করিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে দেশের লোক তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার এই সুদীর্ঘ জীবনকাল তিনি যেমন দেশের ও দশের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তেমনই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তাঁহার কবিতা ও গদ্যরচনার দ্বারা তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বলিতে গেলে, বাঙ্গালা-সাহিত্য-সেবায় মুসলমানগণের মধ্যে যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন, মৌলবী মোজাম্মেল হক মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়বন্ধুগণের এই গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সম্মান—

বিগত ২রা নভেম্বর লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটীর এক অধিবেশনে আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত সোসাইটীর অনারারী ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র উক্ত সোসাইটীর সাধারণ সদস্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে এইরূপ উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করা হইয়াছে। উক্ত কেমিক্যাল সোসাইটী কদাচিৎ অনারারী ফেলো নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। এ বার কিন্তু তাঁহারা পৃথিবীর নানাস্থান হইতে সাতজন অনারারী ফেলো নির্ব্বাচন করিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক। এই সাতজন পৃথিবী-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মধ্যে আমাদের বরণীয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম গৃহীত হওয়ায় সমস্ত ভারতবাসী গৌরবান্বিত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহার ন্যায় বিশ্ব-বরেণ্য রাসায়নিক পণ্ডিত দেশে বিদেশে এখন যে সম্মানলাভ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর সম্মানলাভ করিয়া ভারতবর্ষের মুখ আরও উজ্জ্বল করিবেন।

ভ্রম সংশোধন

বিগত সংখ্যার ৬৩ পৃঃ ১৪ পংক্তিতে "গদামাবিধ্য তরসা" এইরূপে হইবে। ৬৩ পৃঃ শ্লোক ১৯।২০ স্থানে "১৯—২০" হইবে। ৬৪ পৃঃ ২য় কলমে ১২ পংক্তিতে "প্রশ্বাস" স্থানে "নিশ্বাস" হইবে। ৭৮ পৃঃ ২৩নং ব্যায়ামে "Carge"এর স্থানে "Large" ও "Frollow" স্থানে Follow" হইবে। ৮০ পৃঃ ২৫নং ব্যায়ামে "Lange" স্থানে "Large" হইবে। ৮০ পৃঃ ২৭নং ব্যায়ামে "Bock" স্থানে "Back" হইবে। ব্যায়ামগুলির অনেক স্থানে "Gircle" আছে তাহার স্থানে "Circle" হইবে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত "অবিকল"—১৲
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত "শিশু জগৎ"—১৲
শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত উপন্যাস "হে বিজয়ী বীর"—২৲
শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য "লীলাময়ী"—১৲
শ্রীঅবিনাশ [illegible] প্রণীত উপন্যাস "ডচনচ"—১॥০
শ্রীগিরিশচন্দ্র [illegible] প্রণীত "রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার মহত্ত্ব"—১৲
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ [illegible] প্রণীত "স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা"—১৲
শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত উপন্যাস "ধূসর গোধূলি"—২৲
শ্রীমেঘনাদ শর্ম্মা বিরচিত উপন্যাস "মডেল-সতী"—২৲
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "তৃতীয় নয়ন"—২৲
শ্রীমনোরমা গুহ ঠাকুরতা প্রণীত গল্প "যাদুকর"—৸০
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত "উত্তর ভারতী"—৷০
শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত "শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্ম সাধনা"—১৷০
শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত ছেলেদের গল্প "ঘুম-পাড়ানি"—॥৶০

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
[illegible] GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
Printer—NARENDRA NATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS

"রাহুল ও শুদ্ধোদন"

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অযোধ্যালাল সাহা
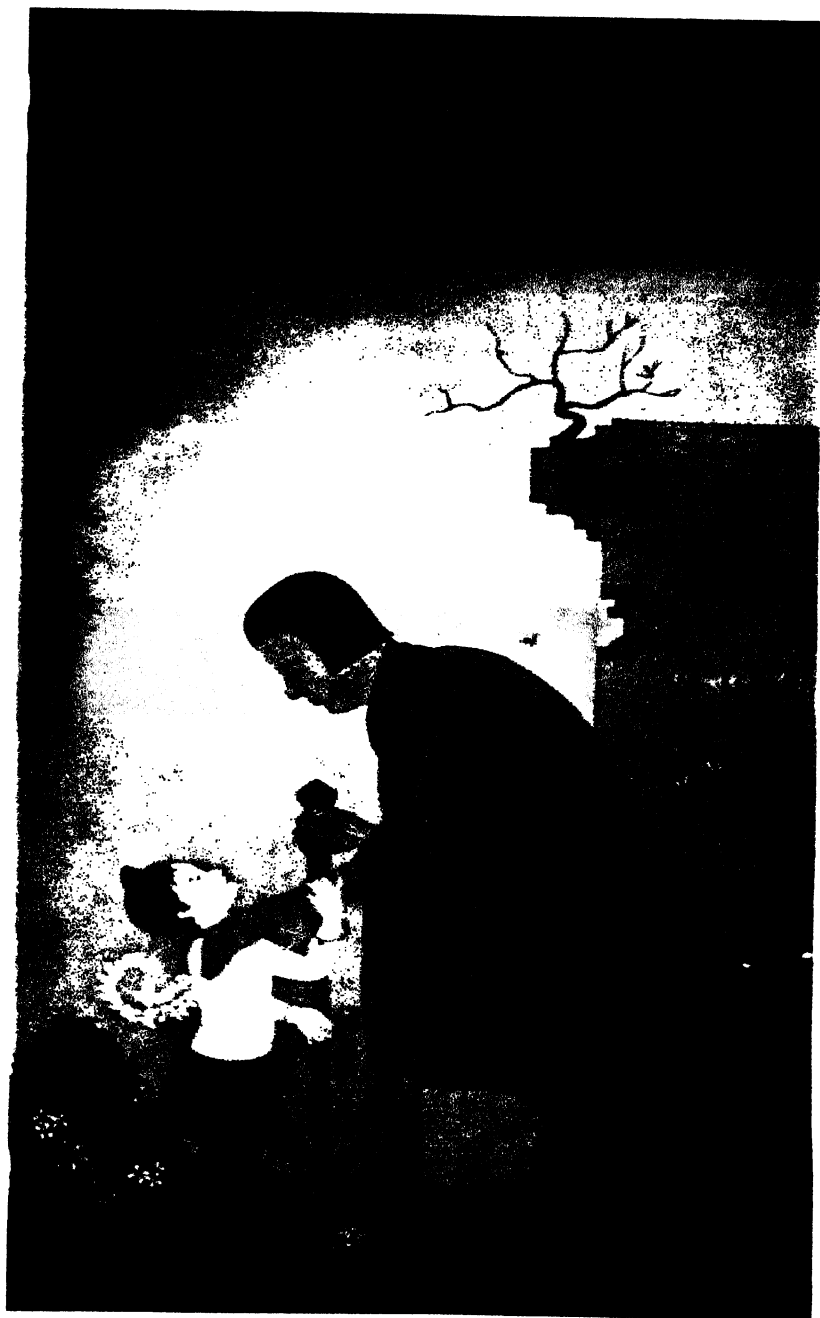
Bharatvarsha Halftone & Printing Works

মাঘ—১৩৪০

দ্বিতীয় খণ্ড | একবিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

ব্রজের কৃষ্ণ কে ও কবে ছিলেন ?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

(১) কৃষ্ণ তিন

বিপুল মহাভারতে কত চরিত কত উপাখ্যান আছে, কিন্তু কৃষ্ণের বাল্য-চরিত ও ব্রজ-লীলার নাম-গন্ধ নাই। খিল হরিবংশে কৃষ্ণ-চরিত বিস্তারিত আছে। কিন্তু এটি মহাভারতের খিল, পরিশিষ্ট, মহাভারত-রচনার সমকালিক নয়। আরও আশ্চর্যের কথা, নানা কালে নানা কবি মহাভারতে নানা বিষয় অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন; কিন্তু কেহ কৃষ্ণের বাল্য-চরিত করেন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, মহাভারতের বহু কাল পরে ইহার সৃষ্টি। কবে ইহার সৃষ্টি ?

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ স্থানে স্থানে নারায়ণের অবতার। স্থানে স্থানে তিনি নারায়ণের অংশ (আদি ৬৭)। ভগবদ্-গীতায় ঈশ্বর। কিন্তু সকলে বিশ্বাস করিত না। করিলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইত না। কেহ কেহ বিশ্বাস করিত, কখনও করিত না। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতেন না। ভগবদ্-গীতায় বিশ্বরূপ-দর্শনের পর অর্জুনের বিশ্বাস জন্মে, কিন্তু সে বিশ্বাস পরে শিথিল হইয়া পড়ে। লোকে অসামান্য শক্তি-সম্পন্ন মানুষে ঐশী-শক্তি অনুমান করে, তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার-জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। এ কথা পুরাণে আছে। কিন্তু সকলেই ঐশী-শক্তি দেখিতে পায় না। তাহারা উদাসীনও থাকে না, বিদ্বেষী হয়। তখন ভক্তেরা অবতারের অলৌকিক কর্ম কীর্তন করে, বহুলোকে বিশ্বাসও করে। মানবের এই দুই বিচিত্র মতি যুগে যুগে প্রকটিত হইয়াছে, অদ্যাপি, অপ্রত্যয়ের দিনেও দুষ্প্রাপ্য হয় নাই। প্রভেদ এই, ইদানী লোকে অবতার না বলিয়া 'মহাপুরুষ', 'ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ,' 'যোগী পুরুষ,' ইত্যাদি বলে। বিদ্বেষ্টা ছিদ্রান্বেষণ করে।

পুরাণে লেখে, বৃক্ষলতা, পশু পক্ষী, গো মনুষ্য, প্রভৃতি যাবতীয় জীব নারায়ণের অবতার। এ সব সামান্য অবতার। বিশেষ অবতারও হইয়াছেন, হইবেন।

কেহ অংশ-অবতার, কেহ অংশাংশ-অবতার, কেহ অংশাংশ-কলা-অবতার। বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ অংশাবতার, ভাগবতে পূর্ণ অবতার, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে পরিপূর্ণ অবতার। এই পুরাণে আর এক কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্বেত-দ্বীপ-বিরাজিত, শ্বেত-দ্বীপ-নিবাসী। মহাভারতের এক স্থানে আছে, নর-নারায়ণ নামে দুই পূর্বদেব, পূর্বঋষি শ্বেতদ্বীপে আছেন। নারদ দেখিতে গিয়াছিলেন। মনে পড়িতেছে, কোন্ কোন পণ্ডিত এই শ্বেত-দ্বীপ নিবাসী নারায়ণকে যিশুখৃষ্ট মনে করিয়াছেন। কিন্তু শ্বেত-দ্বীপ পৃথিবীতে নয়, দিব্যলোকে। সে রহস্য বর্ত্তমানে রহস্যই থাক।

মহাভারতের যুদ্ধকুশল নীতিজ্ঞ কৃষ্ণ, গীতার জ্ঞানযোগী ভগবান্ কৃষ্ণ, আর পুরাণের ব্রজলীলার কৃষ্ণ আদিতে স্বতন্ত্র ছিলেন। পরে মহাভারতের আদি কৃষ্ণ-চরিতে ঐশী শক্তি আসিয়াছে, এবং আরও পরে পুরাণ-বর্ণিত ব্রজলীলা আরোপিত হইয়া সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রজের কৃষ্ণ-চরিতের আরম্ভ বিষ্ণু পুরাণে, প্রসার হরিবংশে ও ভাগবতে, পূর্ণতা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে। 'গো' শব্দের নানা অর্থ আছে। এক অর্থ, স্বর্গ; এক অর্থ রশ্মি। অতএব গোপ সূর্য, গোপী তারকা। দ্ব্যর্থ শব্দ পাইলে ও বিচিত্র নিসর্গ দেখিলে লোকে মনোরঞ্জন উপাখ্যান রচনা করে, কবি তাহা পূর্ণ ও বাস্তবিক করিয়া তুলেন। কবি-প্রতিভাদ্বারা মিথ্যা সৃষ্টি সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। বিষ্ণুপুরাণের কালে কৃষ্ণের ব্রজলীলা রূপকের অবস্থা সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয় নাই। মন দিয়া শব্দার্থ স্মরণ করিয়া পড়িলে বুঝি, কৃষ্ণ সূর্যের প্রতিবিম্ব, গোপীরা তারকা। সেকালে লোকে মনে করিত সূর্য-রশ্মি হেতু তারকার দীপ্তি। ভাগবতে রূপকের চিহ্ন অস্পষ্ট। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে রাধা নাম আসিয়া মূল দেখাইয়া দিয়াছে। কৃষ্ণের ব্রজ-লীলা সূর্যের রূপক। কেহ ব্রজের রাখাল ছিলেন না, গোপীবল্লভও ছিলেন না। অথবা যুগে যুগে ছিলেন, যুগে যুগে থাকিবেন।

ঋগ্বেদে সূর্য্য-ঘটিত রূপক অনেক আছে। শব্দের সামান্য অর্থ দ্বারা রূপক বুঝিতে পারা যায় না। ঐতরেয়োপনিষৎ লিখিয়াছেন, "পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ," দেবতারা পরোক্ষপ্রিয়। অর্থাৎ দেবতার নাম ও কর্ম স্পষ্টার্থ ভাষায় করিবে না। উপনিষদেও স্থানে স্থানে এত রূপক আছে যে সে সাঙ্কেতিক ভাষা বুঝিতে পারা যায় না, নানা ভাষ্যকারের নানা ব্যাখ্যা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ জানিতেন, কৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া রূপক। তিনি কৃষ্ণের রাস-লীলায় ধর্ম-বিরোধী কর্ম দেখিতে পান নাই। ভাগবত পুরাণ পরীক্ষিতের মুখ দিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শুকদেবের উত্তরে রাজা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ রাধা-কৃষ্ণের লোকাচার-ও ধর্ম-বিরুদ্ধ প্রণয় কল্পনা দ্বারা রূপকের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। ঋগ্বেদের যম-যমীর সংবাদও রূপক বটে, কিন্তু ঋষি যম-যমীর ভাই-ভগিনীর বিবাহ দৃষ্য বলিয়া হইতে দেন নাই। উপনিষৎ সবিতার স্তুতি করিয়াছেন কিন্তু সবিতা যে কে, তাহা ভুলেন নাই।

"যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥"

যে দেব অগ্নিতে যিনি জলে যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে, সে দেবকে বার বার নমস্কার করি।

(২) ব্রজের কৃষ্ণ

বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত, ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত আছে। ব্রহ্ম পুরাণে ছিল না। ইহার বর্তমান ওড্রীয় সংস্করণে বিষ্ণুপুরাণ হইতে অবিকল গৃহীত হইয়াছে। বায়ুপুরাণেও ছিল না, কালান্তরে অল্প প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। পদ্মপুরাণ দেখি নাই। পুরাণের মধ্যে বায়ু ও মৎস্য পুরাতন, মহাভারতে এই দুই পুরাণের নাম আছে।

শ্রীকৃষ্ণ কে? বিষ্ণুর অংশাংশ। বিষ্ণু কে? দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ আদিত্যের কনিষ্ঠ আদিত্য। মৎস্য বায়ু বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণে বিষ্ণু ফাল্গুন মাসের আদিত্য। এখনকার ফাল্গুন নয়। এই ফাল্গুনে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইত। পুরাণের কালে পৌষ মাসের। পরে এ বিষয় বিস্তারিত করা যাইবে।

পুরাণ বলেন, দেবকী 'দেবতোপমা,' এবং অদিতির

অংশ। অদিতির পুত্র অবশ্য আদিত্য। বায়ুপুরাণ (অ: ৯০) লিখিয়াছেন

দেবদেবো মহাতেজাঃ পূর্বং কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।
বিহারার্থং মনুষ্যেষু জজ্ঞে নারায়ণঃ প্রভুঃ॥

দেবদেব মহাতেজা 'প্রজাপতি' প্রভু নারায়ণ কৃষ্ণ মনুষ্য-লোকে বিহারার্থ 'পূর্বকালে' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অদিতেরপি পুত্রত্বমেত্য যাদবনন্দনঃ।
দেবো বিষ্ণুরিতি খ্যাতঃ শক্রাদবরজোঽভবৎ॥

যাদব-নন্দন, অদিতির পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া ইন্দ্রের অনুজ বিষ্ণু নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। (বস্তুতঃ কৃষ্ণ উপেন্দ্র, ইন্দ্রস্থানীয়। ইন্দ্র রবির দক্ষিণায়নারম্ভের সূর্য। এ কথা পরে বিশদ করা যাইবে।)

বায়ুপুরাণ শৈব। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাহিনী অনাবশ্যক ভাবে পরে যোজিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণও শৈব, এবং ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু মূলে একই ছিল। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ("বিশ্বকোষে"র) কৃষ্ণের জন্ম-কাহিনী নাই।

ব্রহ্মপুরাণ বৈষ্ণব। ইহার পুরাতন অংশে (অ: ১৪) বসুদেব দেবকীপুত্র শৌরি শ্রীকৃষ্ণের বংশ-বৃত্তান্ত আছে, কিন্তু বাল্যচরিত নাই। নূতন অংশে বিষ্ণুপুরাণ হইতে বাল্যচরিত অবিকল গৃহীত হইয়াছে। মৎস্য পুরাণও বৈষ্ণব। কিন্তু এই পুরাণ কৃষ্ণের অবতারত্ব স্বীকার করেন নাই। এই পুরাণে (অ: ৪৭), অবতার দশ বটে, তন্মধ্যে প্রথম তিনটি 'দিব্য' অর্থাৎ দিব্যলোকে, এবং সাতটি মানুষাবতার। যথা, দত্তাত্রেয়, মান্ধাতা, জামদগ্ন্য, দশরথ-নন্দন রাম, পরাশর-নন্দন বেদব্যাস, বুদ্ধদেব ও কল্কী। ঋষিগণ কহিলেন, বসুদেব কে, দেবকী কে, নন্দগোপ কে, যশোদা কে? সূত কহিলেন, পুরুষয় কশ্যপ, স্ত্রীষয় অদিতি। (কশ্যপ ও অদিতির পুত্র অবশ্য আদিত্য।)

অবশ্য আকাশের আদিত্য স্ব-স্থান ত্যাগ করিয়া মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণে আদিত্যের অংশ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ অংশাবতার। আমরা দুই ব্যক্তির কর্মে সাদৃশ্য দেখিলে দুইকে এক মনে করি। প্রথমে মাত্র উপমা, পরে দুই এক হইয়া পড়ে। কৃষ্ণের জন্মে ও ব্রজলীলায় ইহার বিপরীত ঘটিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বাল্যচরিত জানা ছিল না। সে চরিতটি বিষ্ণুর অংশের চরিত, সূর্যচরিত। এইরূপে বিষ্ণুরই নানা অবতার হইয়াছেন, হইবেন, অন্য কাহারও হয় নাই, হইবে না। ঋগ্বেদে আদিত্যরূপ সূর্যের উপাসনা আছে, ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, পুরাণে আছে। সৃষ্টি পালন-শক্তির নাম বিষ্ণু। বিষ্ণুশক্তিই সূর্যের শক্তি, সূর্য বিষ্ণুর দ্যোতক।

(৩) গর্গ জানিতেন

এক গর্গমুনি দেবকী-নন্দনের নাম কৃষ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি যাদবদিগের পুরোহিত ছিলেন। বসুদেব মুনিকে গোপনে গোকুলে পাঠাইয়াছিলেন। ভাগবত পুরাণ বলিতেছেন, গর্গ যদুকুলের আচার্য, ইহা সকলেই জানিত, কংসও জানিত। বসুদেবের সহিত নন্দের সখ্যও ছিল। অতএব কংস জানিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে গর্গ গোপনে ব্রজে গিয়া কৃষ্ণের নামকরণ ও অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নন্দ গর্গকে পাদ্যার্ঘ্য দ্বারা পূজা করিয়া বলিতেছেন, "জ্যোতির্গণের গতি-বোধক যে জ্যোতিষ শাস্ত্রে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান জন্মে, আপনি সাক্ষাৎ সেই জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। আপনি বেদবেত্তাদিগেরও শ্রেষ্ঠ; অতএব এই বালকের (রাম ও কৃষ্ণের) সংস্কার করা আপনার উচিত।" ("বঙ্গবাসী"র অনুবাদ)। কৃষ্ণ যে কে, গর্গ এই সময়ে নন্দকে অস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন। বৈবর্তপুরাণে গর্গ নন্দ-যশোদাকে স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আশ্চর্য এই, এত জানিয়া শুনিয়াও নন্দ কৃষ্ণকে বনে ধেনু চরাইতে পাঠাইতেন! তিনি নির্ধনও ছিলেন না।

একদা নন্দ শিশু কৃষ্ণকে কোলে লইয়া বৃন্দাবনে গাই চরাইতে গিয়াছিলেন। কৃষ্ণের মায়ায় নভোমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইল, দারুণ ঝঞ্ঝাবাত, মেঘগর্জন, বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল, অতিস্থূল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। নন্দ ভীত হইলেন, গাই রাখিয়া কৃষ্ণকে গৃহে লইতে পারিলেন না। এমন সময় দেখিলেন, সেখানে রাধিকা! নন্দ তাঁহাকে নির্জনে দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু ক্ষণমাত্র। তিনি কহিলেন, "আমি গর্গমুখে জানি, তুমি কে, কৃষ্ণই বা কে।" এই ঘটনাটি যে উদ্দেশ্যে রচিত হউক, গর্গ

জানিতেন কৃষ্ণ কে, রাধিকা কে।* বিষ্ণুপুরাণও লিখিয়াছেন, গর্গ জানিতেন। আশ্চর্য এই, কোনও ঋষি জানিলেন না, ত্রিকালদর্শী বেদব্যাসও জানিলেন না, কৃষ্ণ কে। এক জ্যোতিষী জানিলেন, কৃষ্ণ কে! জ্যোতিষী গ্রহ-নক্ষত্র দেখেন, পাঁজি গণেন। অনুমান হয় কৃষ্ণের বাল্যচরিত তাঁহারই সৃষ্টি।

(৪) কবে জন্ম ?

মৎস্যপুরাণ বলেন (অ: ৪৬), রোহিণী পত্নীর গর্ভে বসুদেবের সাত পুত্র, এবং দেবকীর গর্ভে সাত পুত্র হয়। রোহিণীর জ্যেষ্ঠপুত্র রাম। দেবকীর সাত পুত্রকে কংস বিনাশ করেন। ইহাঁদের জ্যেষ্ঠ শৌরি। দেবকীর সপ্তম পুত্রের নাম একস্থানে ভদ্রবিদেহ, অন্যস্থানে মদন। কেহই কারাগারে জন্মের পরেই বিনষ্ট হন নাই। আর, কৃষ্ণ—

প্রথমা যা অমাবস্যা বার্ষিকী তু ভবিষ্যতি।
তস্যাং জজ্ঞে মহাবাহু: পূর্বং কৃষ্ণ: প্রজাপতি:॥

"প্রথম বার্ষিকী অমাবস্যা তিথিতে মহাবাহু "প্রজাপতি" কৃষ্ণ পূর্বকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" 'বার্ষিকী' শব্দে বৎসরের কিম্বা বর্ষাকালের দুইই বুঝায়। বর্ষাকালের প্রথম অমাবস্যা নির্দিষ্ট ছিল না। এই অর্থ হইতে পারে না। যে অমাবস্যায় বৎসর আরম্ভ হইত, সেই অমাবস্যায় জন্ম হইয়াছিল।

এখানে আরও লিখিত আছে, কৃষ্ণের জন্মের পূর্বে বসুদেবের যে-সকল পুত্র হইয়াছিল তাহারা ভীম-বিক্রম ছিল। অনন্তর কৃষ্ণের বাক্যে বসুদেব শৌরিকে (কৃষ্ণকে) নন্দগোপ-গৃহে রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

মৎস্যপুরাণ এই পর্যন্ত শুনিয়াছিলেন, পরবর্তী কালের শ্রীকৃষ্ণ-জন্মবৃত্তান্ত কিছুই শোনেন নাই। তাঁহার বাল্য-লীলা ব্রজলীলা কিছুই শোনেন নাই। কিন্তু, বংশবৃত্তান্ত জানিতেন।

বিষ্ণুপুরাণ (৫।অ: ১) বলেন, ভগবান্, পরমেশ্বর সুরগণকে শ্বেত ও কৃষ্ণ দুইটি কেশ দিয়াছিলেন।* দেবকীর অষ্টম গর্ভে এই কেশ জন্মগ্রহণ করিয়া কংসকে নিপাতিত করিবে। নারদ কংসকে বলিয়া দলেন। দেবকী ও বসুদেব গৃহমধ্যে আবদ্ধ হইলেন। হিরণ্যকশিপুর ছয় পুত্র বিখ্যাত ছিল। তাহারা পাতালে থাকিত। এই ছয়টি একে একে দেবকীর জঠরে আসিয়া পরে কংস দ্বারা নিহত হইলেন। সপ্তম গর্ভে বিষ্ণুর শেষ (অনন্ত) নামক অংশ প্রবেশ করিলেন। কিন্তু গোকুলে রোহিণীর পুত্র হইলেন। ইহার পর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইল। কোন্ দিন? তিনি যোগমায়াকে বলিতেছেন,

প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপস্যসি॥

"আমি প্রাবৃট্‌কালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে নিশীথ সময়ে জন্মগ্রহণ করিব। আর তুমি নবমীতে করিবে।" (অবশ্য সেই রাত্রে। 'নভসি' সৌর শ্রাবণ)। ইহার পর কি হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন।

কৃষ্ণ প্রজাপতি। প্রজাপতি বৎসর বা বৎসরের অধ্যক্ষ, যুগেরও অধ্যক্ষ। যে-সে দিন বৎসর আরম্ভ হয় না। সূর্যাংশ শ্রীকৃষ্ণও বৎসরের যে-সে দিন জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। বৎসরের বিশেষ দিন চারিটি; দুই বিষুব ও দুই অয়ন দিন।†

রবির দক্ষিণায়ণ দিন হইতে প্রাবৃট্ আরম্ভ। এই দিন অম্বুবাচী। শ্রীকৃষ্ণের জন্মরাত্রে ঘোর বৃষ্টি হইয়াছিল।

---

* এই পুরাণ অত্যুক্তি করিয়াছেন। গর্গ রাধিকার নাম রাখেন নাই। তাঁহার নামও শোনেন নাই।

* বোধ হয়, ছান্দোগ উপনিষদ্ হইতে এই কেশ কল্পনা। সবিতা সূর্যের ত্রিবিধ রশ্মি আছে। লোহিত রশ্মি দ্বারা অগ্নি, শ্বেত রশ্মি দ্বারা জল, এবং কৃষ্ণ রশ্মি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়। এই ভাব পুরাণে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। সূর্যই বৃষ্টির ও ওষধিরূপ অন্নের কারণ। প্রশস্ত কেশ আছে বলিয়া কৃষ্ণের এক নাম কেশব। কেশ রশ্মি।

† যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন এমন কি জন্ম-বৎসর জানা নাই। খ্রিষ্টান পণ্ডিতেরা বলেন, তিনি খ্রি পূ ৮ হইতে ৪ অব্দের মধ্যে জন্মিয়াছিলেন। খ্রি-পূ চতুর্থ শতাব্দ হইতে ২৫শে ডিসেম্বর জন্মদিন ধরা হইতেছে। তৎপূর্বে ৬ই জানুয়ারি ধরা হইত। সেদিন 'মিত্র' নামক আদিত্যের পূজা হইত। এই দিনে পাশ্চাত্য পাঁজি অনুসারে সূর্যের উত্তরায়ণ হইত। অদ্যাপি স্কটল্যাণ্ডে ১লা জানুয়ারি যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন পালন করা হইতেছে।

প্রতি বৎসর দক্ষিণায়ণ হয়, অম্বুবাচী হয়, পূর্ব কালেও হইত। কিন্তু প্রতি-বৎসর শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে হইত না। যদি কোন বৎসর হইত, সে বৎসর পৌষ কৃষ্ণ চতুর্দশীতে উত্তরায়ণও হইত। এবং যদি উত্তরায়ণ দিন হইতে বৎসর আরম্ভ হইত, পৌষ অমাবস্যায় আরম্ভ হইত। সে অমাবস্যা বার্ষিকী প্রথম অমাবস্যা। অতএব দেখা যাইতেছে, মৎস্য ও বিষ্ণু পুরাণের উক্তির মধ্যে সম্বন্ধ আছে। বিষ্ণুপুরাণ দক্ষিণায়ণ দিনে, মৎস্যপুরাণ উত্তরায়ণ দিনে জন্মদিন ধরিয়াছেন। বৎসরটি একই।

পৌষের অষ্টম মাস, শ্রাবণ। প্রকৃত পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সপ্তম গর্ভ। পৌষ মাস শেষ হইতে মাত্র একদিন ছিল। তাঁহাকে পৌষ হইতে শ্রাবণ অষ্টম মাসে অষ্টম গর্ভ হইতে হইয়াছিল। দক্ষিণায়ণের ছয় মাসের ছয় আদিত্য দেবকীর ষড়্ গর্ভ হইয়াছিল। এই ছয় পাতালবাসী ছিল। দক্ষিণায়ণ দিনে রবির উদয়-কালে দক্ষিণায়ণের ছয় মাসের রবি-পথ পৃথিবীর অধোদিকে, পাতালে থাকে। বিনষ্ট ষড়্ গর্ভ হিরণ্যকশিপুর পুত্র। হিরণ্যকশিপু, কালপুরুষ নক্ষত্র দক্ষিণায়ণের ছয় মাসের মধ্যে (অগ্রহায়ণ মাসে) সন্ধ্যার পর উদিত হয়। দুই অয়নের যোগ রাখিবার জন্য ষড়্‌গর্ভের কল্পনা।

পূর্বকালে শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে দক্ষিণায়ণ হইতে পারিত। হইলে পৌষ কৃষ্ণ চতুর্দশীতে উত্তরায়ণ এবং পৌষ আমবস্যায় নূতন বৎসর হইত। বোধ হয় কৃষ্ণাষ্টমীতে জন্মগ্রহণের অন্য হেতুও ছিল। কৃষ্ণাষ্টমী অষ্টকা। বার মাসে বার পূর্ণিমা, বার অষ্টকা, বার অমাবস্যা, 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার ন্যায় অষ্টকা, মাসের বিশেষ দিন গণ্য হইত। অষ্টকায় শ্রাদ্ধ হইত।

কিন্তু, কোন্ বৎসরে ? খ্রিপূ ২৩০০ হইতে ৬০০ অব্দ পর্যন্ত, সতর শত বৎসরে প্রতি শত বর্ষে পাঁচ ছয়টি করিয়া বহু বৎসরে শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে দক্ষিণায়ণ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য প্রতিবারে অষ্টমী মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত ছিলনা। যদি মহাভারতের কৃষ্ণ এইরূপ এক বৎসরে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি খ্রিপূ ১৫০৯ অব্দে করিয়াছিলেন। খ্রিপূ ১৪৫৩ অব্দে ভারত যুদ্ধ। তখন তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর অতীত হইয়াছিল। অসম্ভব নয়।

কিন্তু, পুরাণে প্রজাপতি-কৃষ্ণের জন্ম-তিথি লিখিত হইয়াছে। মহাভারতের কৃষ্ণ প্রজাপতি ছিলেন না। পুরাণের কৃষ্ণ কালীয় দমন করিয়াছিলেন। পরে দেখা যাইবে, ইহা খ্রিপূ ১৩৭২ অব্দের ঘটনা। অতএব যুদ্ধ-কালের আশী বৎসর পরে আসিতে হইতেছে। তদবধি খ্রিপূ ৬০০ অব্দ পর্যন্ত সাত শত বৎসরের মধ্যে প্রায় চল্লিশ বৎসরে শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে দক্ষিণায়ণ হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কোন্ বৎসরে ? দুই কারণে সে বৎসর স্মরণীয় হইতে পারিত। (১) শ্রাবণ অষ্টকায় দক্ষিণায়ণ, মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অষ্টমীর স্থিতি, এবং মধ্যরাত্রে দক্ষিণায়ণ। এরূপ যোগ কদাচিৎ ঘটে। ইহা গণিতে হইলে সে কালের গণনা-রীতি জানা চাই। কারণ তিথি গণিতাগত, প্রত্যক্ষ নয়। দক্ষিণায়ণ দেখিতেও ভুল হইয়া থাকিতে পারে। (২) সে বৎসর কোন এক প্রসিদ্ধ যুগের আদ্য কিম্বা অন্তিম বৎসর হইয়াছিল, অষ্টমী মধ্যরাত্রির পরেও কিছু ছিল।

দৈবক্রমে আমরা সে-কালে সমাদৃত মাহেশ্বর কল্প ও যুগ জানিতে পারিয়াছি। সৌর সায়ন ২৪৭ বর্ষ ১ মাসে এই যুগ পূর্ণ হইত। ইহার সাহায্যে অয়ণ বিষুব ও অন্য সৌরমাস-সংক্রমণতিথি অক্লেশে গণিতে পারা যায়। খ্রিপূ ১৪৪০ হইতে ১১৯৪ অব্দ প্রথম যুগ গিয়াছে। দেখিতেছি, ১১৯৪ অব্দে দক্ষিণায়ণ শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীর প্রায় ৭ দণ্ড গতে হইয়াছিল। ইহার পর দ্বিতীয় যুগ ১১৯৩ অব্দে আরম্ভ হইয়া ৯৪৫ অব্দে পূর্ণ হইয়াছিল। মাহেশ্বর যুগ অনুসারে প্রতি উনিশ বৎসর অন্তরে তিথি অল্পে অল্পে হ্রাস পায়। খ্রিপূ ১১৭৫ অব্দে অষ্টমী প্রায় সারারাত্রি ছিল। তদনন্তর ১১৫৬ অব্দে হ্রাস হইয়া ১১৩৭ অব্দে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ছিল। এই বৎসর জন্মাষ্টমীর বৎসর হইলেও দ্বিতীয় যুগ জন্মাষ্টমীর যুগ বলা চলে। তৃতীয় যুগ শ্রাবণ কৃষ্ণ সপ্তমীর বলা যাইতে পারে। যে বৎসর শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে দক্ষিণায়ণ হয়, সে বৎসর পৌষ কৃষ্ণ চতুর্দশীতে উত্তরায়ণ হয় এবং দুই বিষুবও কৃষ্ণ পক্ষে পড়ে। প্রজাপতি বৎসর কৃষ্ণই রটে।

বিষ্ণুপুরাণে মুচুকুন্দের উপাখ্যানে কৃষ্ণের আবির্ভাব অব্দ বৎসরে লিখিত আছে। উপাখ্যানটি পরে দেওয়া যাইবে। কৃষ্ণকে দেখিয়া মুচুকুন্দ বলিতেছেন,

> পুরা গর্গেণ কথিতমষ্টাবিংশতিমে যুগে।
> দ্বাপরান্তে হরের্জন্ম যদোর্বংশে ভবিষ্যতি॥

পুরাকালে গর্গ বলিয়াছিলেন, অষ্টাবিংশ যুগে দ্বাপরান্তে অর্থাৎ কলিতে যদুবংশে হরির জন্ম হইবে।

এখানে মন্বন্তর লিখিত নাই। বৈবস্বত মন্বন্তর হইবে। কিন্তু সে মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ যুগের দ্বাপরান্তে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। সে বৎসর মহাভারতের কৃষ্ণের জন্ম হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ বিশ্বাসও ছিল। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণ লিখিয়াছেন, ভগবান্ কৃষ্ণ কলি আসন্ন দেখিয়া দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছিলেন। খ্রিপূ ১৩৭২ অব্দে কলি আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি ইহার দুই এক বৎসর পূর্বে চলিয়া গিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি প্রায় আশী বৎসর ছিলেন।

কিন্তু 'অষ্টাবিংশতিমে যুগে' দ্বাপরান্তে জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে। রঘুনন্দন জন্মাষ্টমী তত্ত্বে ব্রহ্ম- পুরাণ হইতে তুলিয়াছেন,

অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌযুগে।
অষ্টাবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ॥

ইহার সহজ অর্থ কলিতে অষ্টাবিংশ যুগে ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাষ্টমীতে দেবকীসুত কৃষ্ণ জাত হইয়াছিলেন। শ্লোকটি 'বঙ্গবাসী' প্রকাশিত ব্রহ্মপুরাণে নাই। নাই থাক, রঘুনন্দন পাইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে শ্রাবণ মাস অমান্ত, ব্রহ্মপুরাণে পূর্ণিমান্ত ধরা হইয়াছে। অমান্ত গণনায় শ্রাবণ পূর্ণিমার পর শ্রাবণ কৃষ্ণপক্ষ, পূর্ণিমান্ত গণনায় শ্রাবণ পূর্ণিমার পর ভাদ্র কৃষ্ণপক্ষ। দিনটি একই, কেবল মাসের নামে ভেদ।*

ব্রহ্মপুরাণের বচনের কলি কদাপি পাঁজির কলিযুগ হইতে পারে না। পাঁজির কলিতে যুগ নাই। রঘুনন্দন মনে করিয়াছেন সাবর্ণিক মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ যুগের কলি। কিন্তু তিনি প্রমাণ তুলেন নাই। না তুলিলেও কোথাও পাইয়া থাকিবেন। তিনি অবশ্য জানিতেন বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ যুগে যুদ্ধ হইয়াছিল। অতএব তাঁহার প্রমাণের মতে যুদ্ধকালের কৃষ্ণ ও সাবর্ণি মন্বন্তরের কৃষ্ণ এক ছিলেন না। "ভারত যুদ্ধ কোন্ বৎসরে" প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে, খ্রি-পূ ১৪৫৩ অব্দে বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশ যুগের দ্বাপর হইয়াছিল। এক মনু ২৮৪ বর্ষ। অতএব ১৪৫৩-২৮৪-১১৬৯ অব্দে সাবর্ণি মনুর অষ্টাবিংশ যুগের দ্বাপর। কিন্তু এই অব্দে শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে দক্ষিণায়ণ হয় নাই। খ্রিপূ ১১৭৫ অব্দে হইয়াছিল। বোধ হয়, অষ্টাবিংশতি বহুজ্ঞাত বলিয়া সে যুগ লিখিত হইয়াছে, কিম্বা সাবর্ণি মন্বন্তরে নয়।

বিষ্ণু ও ব্রহ্ম পুরাণের বচনদ্বয় মিলাইয়া আর এক অর্থ করা যাইতে পারে। কলিতে অষ্টাবিংশ যুগে দ্বাপরান্তে জন্ম হইয়াছিল। পূর্ব প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে, এই কলিযুগ পাঁচ বর্ষের যুগে যুগে বিভক্ত ছিল। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে পঞ্চসংবৎসরময় যুগাধ্যক্ষ প্রজাপতিকে নমস্কার আছে। ইহার আরম্ভ খ্রি-পূ ১৩৭২ অব্দে। অষ্টাবিংশতি যুগে ২৮ × ৫ = ১৪০ বৎসর। অতএব উদ্দিষ্ট অব্দ ১৩৭২ − ১৪০ = ১২৩২। এই অব্দেও দক্ষিণায়ণ শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে হইয়াছিল। অতএব তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ক্রমে প্রায় খ্রি-পূ ১২০০ অব্দ পাওয়া যাইতেছে।

বিষ্ণু পুরাণ জন্ম-নক্ষত্র দেন নাই। ভাগবত রোহিণী নক্ষত্র দিয়াছেন। বায়ু পুরাণে ও হরিবংশে আছে,

অভিজিন্নাম নক্ষত্রং জয়ন্তী নাম শর্বরী।
মুহূর্তো বিজয়ো নাম যত্র জাতঃ জনার্দনঃ॥

অভিজিৎ নক্ষত্রে জয়ন্তী রাত্রিতে ও বিজয় মুহূর্তে জনার্দন জাত হইয়াছিলেন।

নাম তিনটি পারিভাষিক। এখানে অভিজিৎ নামে নক্ষত্র নয়, দিবসের অষ্টম মুহূর্তের নাম অভিজিৎ। হরিবংশ প্রথমে মুহূর্ত লিখিয়া পরে নক্ষত্র লিখিয়াছেন। এখানে দিবা অর্থে রাত্রি বুঝিতে হইবে। দুই দণ্ডে মুহূর্ত; অষ্টম মুহূর্ত রাত্রি ১৪ হইতে ১৬ দণ্ড। রঘুনন্দন জয়ন্তীর বহু বিচার করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে

গতে চ সপ্ত মুহূর্তে চাষ্টমে সমুপস্থিতে।
অর্ধরাত্রে সমুৎপন্নে রোহিণ্যামষ্টমী তিথৌ॥

রাত্রির ১৪ দণ্ড গতে ১৬ দণ্ডের মধ্যে রোহিণীযুক্তা কৃষ্ণাষ্টমীতে। তখন অর্ধচন্দ্র উদয় হইয়াছিল।

রোহিণী-যুক্তা অষ্টমী গর্গের অভিপ্রেত ছিল কিনা,

---

* আমরা বঙ্গদেশে অমান্ত মাস গণি, উত্তর ভারতে পূর্ণিমান্ত মাস প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশীয় রীতিতে শ্রাবণ মাসে জন্মাষ্টমী। আমরা বলিয়া থাকি ভাদ্রমাসে। এই রীতি উত্তর ভারত হইতে প্রাপ্ত। এইরূপ আমরা শিবরাত্রির মাসের নামেও উত্তর ভারতের প্রথা রাখিয়াছি।

তাহা বলিতে পারা যায় না। তাহা হইলেও উল্লিখিত অব্দ ভুল হইবে না। কালে কালে জ্যোতিষীরা ও স্মৃতিকারেরা নানা বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া অষ্টমী ও রোহিণীর স্থিতি দণ্ড বিচার করিয়াছেন, মূল দক্ষিণায়ণ ধরিতে পারেন নাই। খ্রিষ্টের চারিশত বৎসর পরে জন্মবারও আসিয়াছিল। সোমবার কিম্বা বুধবার হওয়া চাই। তাঁহারা ভুলিয়াছিলেন, কৃষ্ণের কালে বার-গণনা ছিল না। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হতাশ হইয়া লিখিয়াছেন, এত গুলির যোগ শত বর্ষেও পাওয়া যাইবে কিনা, সন্দেহ। *

(৫) গর্গ কে, ও কবে ছিলেন ?

যাঁহারা কৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ দিয়াছেন, তাঁহারা গর্গেরও নাম করিয়াছেন। গর্গ জানিতেন, কৃষ্ণ কে। গর্গের অসাধারণ সম্মানও হইয়াছিল। রঘুনন্দন প্রমাণ তুলিয়াছেন, জন্মাষ্টমীব্রতে দৈবকী বসুদেব যশোদা নন্দ বলদেব দক্ষ ব্রহ্মা ও গর্গের প্রতিমা করিতে হইবে। কোন ঋষিও এত সম্মান পান নাই। এই গর্গ ঋষি ছিলেন না। কখন কখন তাঁহাকে মুনি বলা হইয়াছে। তাহাও ভ্রমে। তিনি ঋষিবংশীয় ছিলেন।

গর্গ এক গোত্র-নাম, বহু প্রাচীন। সে বংশে বহু গর্গ জন্মিয়াছিলেন। গর্গের পুত্র গার্গি, গর্গগোত্রীয়া কন্যা গার্গী, গর্গগোত্রীয় পুরুষ গার্গ্য। এক গার্গ্য পিপ্পলাদ ঋষির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। আর এক গার্গ্য কাশিরাজ অজাতশত্রুর শিষ্য হইয়াছিলেন। এক বিদুষী গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত আত্মতত্ত্ব বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু গর্গেরা আচারে ক্ষত্রিয় হইয়া গিয়াছিলেন। গর্গবংশ জ্যোতিষ চর্চার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

পুরাকালের জ্যোতিষ সংহিতা-জ্যোতিষ নামে খ্যাত। এক গর্গ ভরণীনক্ষত্রকালে ছিলেন। ("আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ," ৫৬ পৃঃ)। সেকাল খ্রি-পূ ১৪০০ হইতে ৬০০ অব্দ। মহাভারতে (শল্য, অঃ ৩৮) বৃদ্ধ গর্গের নামে গর্গস্রোতঃ তীর্থ বর্ণিত আছে। এক বৃদ্ধ গর্গের জ্যোতিষ-সংহিতা হইতে পরবর্তীকালে জ্যোতিষী বরাহমিহির ও টীকাকারেরা শ্লোক তুলিয়াছেন। তিনি খ্রি-পূ ১৩১২ অব্দের পরে ছিলেন। কত পরে, তাহা বলিবার উপায় নাই।

গার্গী সংহিতা নামে এক খণ্ডিত ও অশুদ্ধ পুথী পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি তাহা সংশোধিত ও প্রকাশিত হয় নাই। পুরাণে যেমন ভবিষ্য-রাজবংশবর্ণন আছে, এই গার্গী-সংহিতায় তেমন এক অধ্যায় আছে। তাহাতে যবনদিগের দ্বারা অযোধ্যা ও পাটলীপুত্র অধিকারের কথা আছে। ইহা হইতে কোন কোন পাশ্চাত্য বিদ্বান্ মনে করিয়াছেন, গার্গী সংহিতা খ্রি-পূ দ্বিতীয় শতাব্দে রচিত। কিন্তু এই অনুমান ঠিক নয়, সমগ্র সংহিতা-রচনার কাল না বলিয়া সে অধ্যায়-প্রক্ষেপের কাল বলা উচিত। বোধ হয়, এইরূপ অপর কোন প্রক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে জন্মাষ্টমী লিখিত ছিল।

মান্ধাতার পুত্র নরেশ্বর মুচুকুন্দ বৃদ্ধ গর্গের মুখে শুনিয়াছিলেন, কৃষ্ণ কে। উপাখ্যানটি কৌতুকাবহ। এক গার্গ্য যাদববংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার শ্যালক যাদবগণের সম্মুখে তাঁহাকে নপুংসক বলিয়া উপহাস করে। ক্ষুব্ধচিত্ত গার্গ্য এক যবনেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তাহাকে এক মহাবল পুত্র দান করেন। ইহার নাম কাল-যবন। কংস হত হইলে তাহার শ্বশুর জরাসন্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ বিনাশ করিতে মথুরায় আসেন, কৃষ্ণ পলায়ন করেন। জরাসন্ধের পক্ষে অনেক রাজা ছিলেন। একজন কাল-যবনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ দেখিলেন, পূর্ব দিক হইতে জরাসন্ধ, ও সমুদ্রের নিকটবর্তী দক্ষিণ দিক (দক্ষিণ পশ্চিম ?) হইতে কালযবন মথুরা আক্রমণ করিবে।

* খ-মাণিক্য নামে এক গ্রহাচার্য শ্রীকৃষ্ণের জন্মকুণ্ডলীও নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি খ-মাণিক্য, গগনের মণি, সূর্য হইলেও কৃষ্ণের জন্ম সিংহ মাসে লিখিয়াছেন। হইবে কর্কট মাসে, শ্রাবণ মাসে। এইরূপ কৃত্রিম কুণ্ডলীর কিছুমাত্র মূল্য নাই। কর্কট মাসে জন্ম ধরিয়াও কোষ্ঠী নির্মিত হইতে পারে, চরিত্রের সহিত মিলিয়া যাইবে। খ মাণিক্যের দোষ নাই। তাঁহার পূর্বে শাকলসংহিতা লিখিয়াছিলেন,

সিংহার্কে রোহিণীযুক্তা কৃষ্ণাভাপদাষ্টমী।

"সৌর ভাদ্রমাস চান্দ্র ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রির পূর্বাপর এক কলাও রোহিণী থাকিলে জয়ন্তী। সৌর ভাদ্র না পাইলে নতঃ শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী গ্রাহ্য। সে দিনও রোহিণী না পাইলে মাত্র কৃষ্ণাষ্টমী গ্রাহ্য।" দেখা যাইতেছে। শাকল্যসংহিতার কালে শ্রাবণ কিম্বা ভাদ্রমাসে অথবা অন্ত মাসে জন্মাষ্টমী ধরা হইত।

তিনি সাগর-নিকটবর্তী কুশময় দেশে দ্বারকাপুরী নির্মাণ করিয়া সেখানে যাদবগণকে পাঠাইয়া দিয়া একাকী কালযবনের অপেক্ষায় রহিলেন। কালযবন আসিলে তিনি এক গুহাতে প্রবেশ করিলেন। সে গুহাতে মুচুকুন্দ নিদ্রিত ছিলেন। কালযবন কৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া মুচুকুন্দকে কৃষ্ণভ্রমে পদাঘাত করিল। নরেশ্বরের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, এবং তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে যবন-রাজ ভস্ম হইয়া গেল। তদনন্তর কৃষ্ণকে দেখিয়া মুচুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কৃষ্ণ উত্তর করিলেন, তিনি চন্দ্র-বংশীয় যদুকুল-জাত বসুদেব-তনয়। বৃদ্ধ গর্গের বাক্য রাজার স্মরণ হইল। তিনি কহিলেন, হাঁ জানিতে পারিয়াছি, তুমি কে। হরি যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিবেন।

এই কাল-যবনকে চিনিতে পারিলে ভারতের ইতি-হাসের গুহায় আলোক প্রবেশ করিবে। পুরাণে কাল-যবন নামের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ যবন. কালিয় নাম যেমন কৃষ্ণবর্ণ নাগ হইয়াছে, আমার মনে হয় কালযবনও তেমন কৃষ্ণবর্ণ যবন হইয়া গিয়াছে। বোধ হয়, কালযবন কালজ্ঞ যবন, 'কালডিয়ন'। ইহারা জ্যোতিষ-চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। ইহারা প্লক্ষ দ্বীপে (মেসোপোটেমিয়া) রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই দেশের উত্তরে শাল্মল দ্বীপে অসুর রাজ্য ছিল। অসুর-রাও জ্যোতিষ-চর্চায় অগ্রণী হইয়াছিল। গ্রীক যবনেরা এই অসুরদিগের শিষ্য হইয়া জ্যোতিষ শিখিয়াছিল। পুরাকালে আর্যেরা কেবল ভারতবর্ষে বাস করিতেন না। বাণিজ্য হেতু বর্তমান ভারতের বহু পশ্চিমে গমনাগমন করিতেন। এখন ঐতিহাসিকেরা বলিতেছেন, ভারতী আর্য প্লক্ষ দ্বীপে আধিপত্য করিতেন। এই যোগসূত্র বহুকাল পর্যন্ত চলিয়াছিল। অসুর জ্যোতিষীরা সৌর গণনা করিতেন। তাহাদের জ্যোতিষের সহিত আমাদের জ্যোতিষের নানা সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বোধ হয়, এক গর্গ অসুর-দেশে গিয়া সে দেশের জ্যোতিষ শিখিয়া আসিয়া-ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ (২।৫) লিখিয়াছেন, "পুরাণ ঋষি গর্গ পাতালবাসী অনন্তের সেবা করিয়া জ্যোতির্গণ ও নিমিত্ত সকলের শুভাশুভ ফল জানিয়াছিলেন।" পাতালে দানব ও দৈত্যেরা বাস করিত। ইহারা অসুর জাতির দুই শাখা। বায়ুপুরাণে মুচুকুন্দ এক পাতালবাসী দৈত্য। পাতাল অর্থে, নিম্নদেশ। আর্যেরা উচ্চ দেশে থাকিতেন। যখন তুর্কীরা বঙ্গদেশ প্রথম আক্রমণ করে তখন তাহারা গর্গ-যবনবংশ নামে আখ্যাত হইয়াছিল। গার্গেরা যবন-জ্যোতিষের অনুরক্ত হইয়াছিলেন।* এক গর্গ যবন-দিগের ফল-জ্যোতিষের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। আর এক গর্গ শকারম্ভের পরে যুধিষ্ঠিরাব্দ-গণনার সূত্রপাত করিয়া ছিলেন। পূর্বকালে এদেশের ও বিদেশের জ্যোতিষ প্রধানতঃ শুভাশুভফল গণনার জ্যোতিষ ছিল।

কোন্ কালের কোন্ গর্গ দেবকী-নন্দনকে কৃষ্ণ প্রজাপতি করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। খ্রি-পূ একাদশ শতাব্দের হইতে পারেন, দশম শতাব্দেরও হইতে পারেন। খ্রি-পূ ৩য় শতাব্দে সকল গর্গই 'বৃদ্ধগর্গ' হইয়া পড়িয়াছিলেন। বোধ হয় এই সময়ে এক গর্গ স্বীয় বংশের পুরাতন পুথী দেখিয়া কৃষ্ণ প্রজাপতির চরিত পল্লবিত করিয়া ব্রজের কৃষ্ণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নিজ গোত্রের গৌরব-বৃদ্ধিও কাম্য হইয়া থাকিতে পারে।

(৬) কৃষ্ণের অমানুষিক কর্ম

শ্রীকৃষ্ণের কেবল বাল্য-চরিতেই তাঁহার অমানুষিক কর্ম পাওয়া যায়। মহাভারতে তিনি বয়স্থ হইয়াছেন, অলৌকিক কর্মও করেন নাই। কিন্তু যখন তিনি বালক তখন স্বচ্ছন্দে অসুর বধ করিয়াছেন। কোনও অসুর স্বরূপে নাই। কেহ বৃষভ, কেহ গর্দভ, কেহ অশ্ব। বিষ্ণুপুরাণে গুটিকয়েক আছে, ভাগবতে বাড়িয়া গিয়াছে। এই সকল অসুর দিব্যলোকের, নক্ষত্রলোকের। আমরা সকলকে চিনিতে পারিতেছি না। পুরাণ পড়িয়া মনে হইয়াছে, প্রাচীনেরা আকাশের বহু নক্ষত্রের নাম রাখিয়া-ছিলেন, কোনটা অসুর, কোনটা সুর। ইহাদের মধ্যে কয়েকটা চিনিতে পারা যায়। ঋগ্বেদেও কতকগুলি নাম আছে, কয়েকটা মাত্র চিনিতে পারা যায়।

কৃষ্ণের বাল্যচরিতে কংস দৈত্য, কালনেমির অংশে উৎপন্ন। কালনেমি ও হিরণ্যকশিপু এক। বিষ্ণুর সহিত ইহাদের বিবাদ দিব্যলোকে হইয়াছিল। যত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, সকলেরই দ্বিবিধ চরিত ছিল। এক

* আশ্চর্যের বিষয়, বর্তমান কালেও গর্গ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই জ্যোতিষ-চর্চায় অনুরক্ত হইয়া থাকেন।
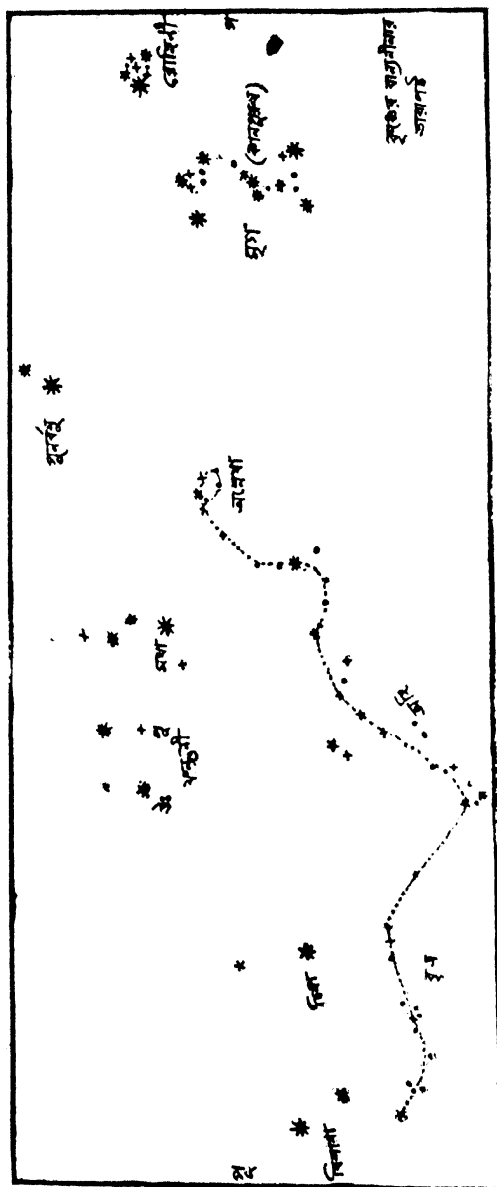
তারা-পট

চরিত আকাশে, আর এক চরিত পৃথিবীতে। সকল উপাখ্যানে এই দ্বিবিধ চরিত পৃথক্ করিতে পারা যায় না, ওতপ্রোত জড়াইয়া গিয়াছে। এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে। এখানে কালনির্ণয় করা যাইতে পারে না, বিস্তারিত ব্যাখ্যারও স্থান হইবে না। এস্থলে মুদ্রিত তারা-পট অবলোকন করিলে ব্যাখ্যা সুবোধ্য হইবে। বিষ্ণুপুরাণ অনুসরণ করি।

পূতনা বধ। নন্দগোপ মথুরা হইতে গোকুলে আসিয়াছেন। একরাত্রে দানবী পূতনা কৃষ্ণকে মারিতে বসিয়াছিল। বাল-ঘাতিনী পূতনা আয়ুর্বেদে উক্ত আছে। ইহার বাঙ্গালা নাম পেঁচো। কোথায় বাস করে, ইহার কেমন রূপ, আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা হোলিকা নাম্নী পিশাচীও ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু বহুকালের বিশ্বাস উত্তর ভারতের নারী স্মরণ করিয়া হোলি উৎসবে তাহাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেয়। এই দুই-ই একেরই দুই নাম। কালপুরুষ নক্ষত্র যে কত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বুঝি ভারত কত বড় দেশ, ও কত কালের পুরাতন। অগ্রহায়ণ মাসে সূর্যাস্তের পর পূতনার উদয় হয়। শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণের জন্ম। কার্ত্তিক মাসে পূতনা-বধ হইয়া থাকিবে। ঘটনাটি খ্রি-পূ ৫০০০৪-০০০ অব্দের। তখন এই নক্ষত্রে বিষুব হইত। কৃষ্ণের কালে বহুদূরে সরিয়া আসিয়াছিল, পূতনা হত হইয়াছিল।

শকট পরিবর্ত্তন। একদিন শ্রীকৃষ্ণকে ঘৃত-ভাণ্ড বহন করিবার শকটের নিম্নে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল। কৃষ্ণ পা ছুড়িয়া শকট উল্টাইয়া দিয়াছিলেন। কে করিল, কে করিল, জিজ্ঞাসা চলিতে লাগিল। বালকেরা বলিল, কৃষ্ণ পা ছুড়িতেছিল, শকট উল্টাইয়া পড়িয়াছে। নন্দাদি গোপেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইল। এই উপাখ্যানের অর্থ আবিষ্কার সোজা। রোহিণী নক্ষত্রে পাঁচটি তারা ত্রিকোণ শকটের আকারে অবস্থিত, এই হেতু ইহার নাম রোহিণী-শকট। সংক্ষেপে শকটও বলা হইত। খ্রি-পূ ৩২৫০ অব্দে রোহিণীতে বিষুব হইত, অর্থাৎ সে নক্ষত্রে সূর্য আসিলে দিবা রাত্রি সমান হইত। কিন্তু সেকাল চলিয়া গেল, কৃষ্ণ শকট উল্টাইয়া দিলেন। বোধহয়, তখন কৃষ্ণের বয়স তিন চারি মাস। অগ্রহায়ণ চলিতেছিল। ইহার পর গর্গ আসিয়া গোপদিগকে না জানাইয়া রামকৃষ্ণ নাম রাখিয়া যান। বোধ হয় মাঘ মাসে।

যমলার্জ্জুন ভঙ্গ। যশোদা চঞ্চল কৃষ্ণকে এক উদূখলে বাঁধিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে গৃহকর্মে ব্যাপৃতা হইলেন। কৃষ্ণ উদূখল টানিয়া দুই অর্জুন বৃক্ষের মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন, বৃক্ষদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। নন্দাদি গোপ দেখিল কৃষ্ণ ভগ্ন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে আছেন, হাস্য করিতেছেন। বৃক্ষ ভঞ্জন যে কৃষ্ণের কর্ম তাহারা বুঝিতে পারিল না, ভাবিল মহোৎপাত। তাহাদের উদ্‌বেগের কারণও ছিল। তাহারা জানিত না, যে অর্জুন সেই ফাল্গুন। ফল্গুনী নক্ষত্র দুইটি, পূর্বফল্গুনী ও উত্তর-ফল্গুনী। প্রত্যেকে দুইটি তারা, উত্তর দক্ষিণে অবস্থিত, যেন দুই বৃক্ষ। একদা এই দুই নক্ষত্রে সূর্য আসিলে দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হইত। পূর্বফল্গুনীতে প্রায় খ্রি-পূ ৩১০০০ অব্দে হইত। কিন্তু সেদিন চলিয়া গেল, অয়ণ পিছাইয়া পড়িল। কৃষ্ণ যমলার্জুন ভঙ্গ করিলেন। বোধহয় তখন ফাল্গুন মাস আসিয়া পড়িয়াছিল।

কালিয় দমন। কৃষ্ণের বয়স সাত আট বৎসর হইল, যমুনার নিকটে বৃন্দাবনে অপর গোপ বালকের সহিত ধেনু রাখিতে যাইতেন। যমুনার এক হ্রদে কালিয় নাগ বাস করিত। কেহ সে জল স্পর্শ করিতে পারিত না। কৃষ্ণ এক কদম্ব বৃক্ষের উচ্চ শাখা হইতে কালিয় হ্রদে ঝাঁপ দিলেন। সর্পরাজ তাঁহাকে কুণ্ডল-বেষ্টিত করিল। বালকেরা ব্রজে গিয়া সকলকে বলিল। এই বজ্রপাতোপম বাক্য শুনিয়া কোথায় কোথায় বলিতে বলিতে নন্দ যশোদা রাম প্রভৃতি আসিয়া কাতরভাবে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিল। রাম সঙ্কেতে বলিলেন, "কিমিদং দেবদেবেশ ভাবোঽয়ং মানুষঃ," হে দেব-দেবেশ, একি, এ মানুষ ভাব কেন? তখন কৃষ্ণ সর্পের মধ্য ফণা নোয়াইয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সর্পরাজ কাতর হইয়া সমুদ্রে গিয়া বাস করিল। তদবধি আর কেহ তাহাকে দেখে নাই।

এই সর্পরাজ বেদের কাল হইতে কত রূপকোপাখ্যানের মূল হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বেদে ইনি অহি, বহুজ্ঞাত নাম বৃত্র। বিশাখা ও চিত্রা তারার

দক্ষিণে ইহার পুচ্ছ। তদনন্তর পশ্চিমাভিমুখে হস্ত', ফল্গুনীদ্বয় ও মঘার দক্ষিণে প্রসারিত হইয়া অশ্লেষায় চক্র ধারণ করিয়াছে। ইংরেজী তারা-পটে ইহার নাম Hydra। চৈত্র মাসে সন্ধ্যার পর আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে অক্লেশে চিনিতে পারা যায়। পুচ্ছ হইতে মস্তক পর্যন্ত ইহার দেহের এক এক স্থানে দক্ষিণায়ণ হইয়া গিয়াছে। বেদের ইন্দ্র মঘা পর্যন্ত বৃত্র-বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ষে বর্ষে গ্রীষ্মকালে জীবিত হইত, দক্ষিণায়ণ হইত। জ্যোতিষগ্রন্থে অশ্লেষার নাম সর্প। শ্রীকৃষ্ণ এই সর্পের মস্তকে আরোহণ করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। তখন মস্তকে দক্ষিণায়ণ হইত। ইহা খ্রি-পূ ১৩৭২ অব্দের কথা। পুরাণেই আছে, কালিয়-দমনের সময় বর্ষাকাল পড়িয়াছিল। রবির দক্ষিণায়ণের দিন হইতে বর্ষাকাল আরম্ভ। নক্ষত্রচক্রের মেরুর নাম কদম্ব, জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। অয়ণকালে কদম্ব ও ধ্রুব এক রেখায় আসে। এইরূপ একদিন কৃষ্ণের জন্মও হইয়াছিল। তিনি সর্পের মস্তকে নৃত্য করিয়াছিলেন। অধোগত ও উর্দ্ধগত হইয়াছিলেন। হোলির দিনেও সূর্য উত্তর দক্ষিণে দোলিত হন। সপ্তম মাসে বিষ্ণুর ঝুলন যাত্রায় সূর্য এইরূপ দোলিত হইয়া থাকেন। আকাশের এক নাম সমুদ্র, ঋগ্বেদে উক্ত আছে। সর্পরাজ নিস্তেজ হইয়া আকাশে বাস করিতেছে। সর্প কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কালিয়, কালীয় নয়। কাল নির্দেশ করিত বলিয়া কালীয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কা-লী-য় বানান আছে।

কবি পর পর বলিয়া আসিতেছিলেন। ফল্গুনীর পর মঘা, তাহার পর অশ্লেষা। কালিয় দমনে অশ্লেষা পাইলাম, কিন্তু মঘাসুর বধ পাইতেছি না। মঘার বৈদিক নাম অঘা। ভাগবতে অঘাসুর-বধ আছে। বিষ্ণুপুরাণে অরিষ্টাসুর। আসুর জ্যোতিষে এটি সিংহাকৃতি। বিষ্ণুপুরাণে অরিষ্টাসুর বৃষভাকৃতি। কেশী অসুরের কেশর ছিল, তাহার রূপ অশ্বের তুল্য। বোধহয়, মঘা নক্ষত্রের কিয়দংশ লইয়া কেশী কল্পিত হইত। এখানে স্মর্তব্য, এই উপাখ্যান-রচনাকালে আসুর জ্যোতিষের সিংহ রাশির সিংহ-কল্পনা এদেশে আসে নাই। অর্থাৎ এদেশে যবনজ্যোতিষ প্রবেশের পূর্বে কৃষ্ণের বাল্য চরিত রচিত হইয়াছিল। বলরামও গুটি দুই অসুর নিধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অসুর বধের নিমিত্ত আবির্ভূত হন নাই। তৎকর্তৃক নিহত অসুরদ্বয় নক্ষত্রচক্রের দূরস্থিত দুই নক্ষত্র হইবে।

গোবর্ধন-গিরি ধারণ। কর্মটি অন্তরীক্ষের। যাস্ক-সঙ্কলিত বৈদিক কোশে গিরি অর্থ মেঘ আছে। প্রথমে মেঘের গর্ভধারণ, পরে বর্ষণ হয়। বরাহ-কৃত বৃহৎ-সংহিতায় গর্ভধারণ বর্ণিত আছে। কেমন মেঘ ? গো-বর্ধন মেঘ, যে মেঘের প্রবর্ষণদ্বারা ভূমি প্রচুর তৃণাচ্ছাদিত হয়। এই কর্ম মর্ত্যলোকের কর্মের সহিত এমন জড়িত হইয়াছে, পৃথক করিতে পারা যায় না। মিশ্র রূপকের দোষই এই। একদিন বলরাম বারুণীপানে মত্ত হইয়া যমুনার স্রোত পরিবর্তন করিয়াছিলেন। যমুনা এক পথে বহিতেছিল, অন্য পথে যায় কেন ? কবি বলরামের দ্বারা যমুনাকর্ষণ করাইলেন। কৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণও সেইরূপ। বৃন্দাবনের নিকটে একটা গণ্ড শৈল হেলিয়া আছে। কবি শৈলের এইরূপ অবস্থিতি কৃষ্ণের কর্ম বলিয়াছেন। বোধহয়, দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ইহা নিরালম্ব দেখা যাইত। এখন মাটি ভরাট হইয়া গিয়াছে। অনেক তীর্থে এইরূপ নৈসর্গিক বস্তু আশ্রয় করিয়া উপাখ্যান রচিত হইয়াছে।

গোবর্ধনধারণের সহিত প্রাচীন ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে। কবি এখানে একটু অসতর্ক হইয়াছেন, শরৎকাল বর্ণনা করিতে করিতে ইন্দ্রযজ্ঞ আনিয়া ফেলিয়াছেন। ইন্দ্রযজ্ঞ প্রাবৃট্ প্রারম্ভে বিহিত। ঋগ্বেদের ঋষিরা ইন্দ্রের নামে কত যজ্ঞ করিয়া গিয়াছেন, সব প্রাবৃট্-প্রারম্ভে। কালান্তরে চেদি-রাজ উপরিচরবসু শক্রধ্বজোত্থান নামে এক উৎসব প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। তিনি জরাসন্ধের উর্দ্ধতন দশম পুরুষ। অতএব খ্রি-পূ অষ্টাদশ শতাব্দে ছিলেন। তিনি আবহ-বিদ্যা অনুশীলন নিমিত্ত পতাকাদ্বারা বায়ুর বেগ ও দিক নির্ণয় করিতেন। এই হেতু উপাধি উপরিচর-বসু। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে যে বসুধারা করা হয়, তাহা সেই বসুর নামে। বৃষ্টিধারার তুল্য ধনবংশ বৃদ্ধি হউক, এই কামনা। ইন্দ্র-পূজা ও ইন্দ্রের ধ্বজোত্তোলন এখনও প্রচলিত আছে, বিষ্ণুপুরের রাজারা করিতেন। লোকে এখনও করে, কিন্তু নামমাত্র রহিয়াছে। এটি ভাদ্রমাসের শুক্ল দ্বাদশীর কৃত্য।

এককালে এইদিন রবির দক্ষিণায়ন হইত। ইন্দ্র পূজায় খ্রি-পূ ৩০০০ অব্দের স্মৃতি এখনও রক্ষিত হইতেছে। বিষ্ণুপুরের রাজারা এই ইন্দ্র-দ্বাদশী হইতে মল্লাব্দ গণিতেন। ওড়িষ্যার রাজারা এখনও রাজকীয় বৎসর গণিতেছেন। নন্দাদি গোপ প্রাচীন প্রথানুসারে ইন্দ্রযজ্ঞ করিতে বসিয়াছিলেন। কৃষ্ণ দেখিলেন অকালে করা হইতেছে। তাঁহার কালে শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে ইন্দ্রযজ্ঞ করা উচিত ছিল। তিনি দিন-পরিবর্তনের ব্যবস্থা পাইলেন না, নন্দকে বুঝাইয়া সে যজ্ঞ রহিত করিয়া গো-পূজা, গো-বর্ধনের নিমিত্ত পূজা করাইয়াছিলেন। ইহার নাম গোষ্ঠাষ্টমী। (কার্তিক শুক্লাষ্টমী)। গো-বর্ধন উৎসবকে সাঁওতালে 'বাঁধনা' বলে। আমরা ইহার উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া এখন গো-প্রদর্শনী খুলিতেছি। বৃন্দাবনের অর্ধশায়িত গিরির নিকট গো-বর্ধন উৎসব হইত। তদবধি গিরির নাম গো-বর্ধন হইয়া গিয়াছে।

ইন্দ্রযজ্ঞ রহিত হইলে ইন্দ্র অবশ্য ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু 'গো-কুলে'র অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। তখন ইন্দ্র কৃষ্ণকে কহিলেন, "আমি গো-গণের বাক্যে আপনাকে উপেন্দ্র করিতেছি, আপনার নাম গো-বিন্দ হইবে।" গো অবশ্য গোরু নয়। গো তারকা। পূর্বকালে যে যে নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ণ হইয়া গিয়াছে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব রক্ষা পাইয়াছে, এখন সেদিন চলিয়া গিয়াছে, কালিয় নাগ-বধের চিহ্ন পর্যন্ত গিয়াছে। নূতন উপেন্দ্র পদ করিতে হইল, কৃষ্ণ ইন্দ্ররূপ সূর্যের স্থানীয় হইলেন।

কৃষ্ণের নানাবিধ অমানুষিক কর্ম দেখিয়া গোপেরা শঙ্কিত ও বিস্মিত হইয়াছিল।

বালক্রীড়েয়মতুলা গোপালত্বং জুগুপ্সিতম্।
দিব্যঞ্চ কর্ম ভবতঃ কিমেতৎ তাত কথ্যতাম্॥

আপনার এই অতুলনীয় বাল্যক্রীড়া, এই 'দিব্য' কর্ম দেখিতেছি। অথচ নিন্দিত গোপকুলে আপনার জন্ম। এ-সকল কি? হে তাত, আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

এখানে কবি আর ঢাকিতে পারিলেন না। ব্যাপারটা কি, আভাস দিলেন। বিষ্ণুপুরাণ লিখিয়াছেন (৫।১), "গবাং সূর্যঃ পরো গুরুঃ।" সূর্য গো-গণের গুরু। এই গো অবশ্য গোরু নয়। গো-কুল, যমুনা, কদম্ব প্রভৃতি কোথায়, তাহা চিন্তা করিলে কবির অদ্ভুত রূপক সৃষ্টিতে স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

(৭) রাস

রাসক্রীড়ার লৌকিক ও জ্যোতিষিক, দুই অর্থই সঙ্গত। গোষ্ঠাষ্টমীর সাত দিন পরে কার্তিক পূর্ণিমা। ইহার অপর নাম রাসপূর্ণিমা হইয়া গিয়াছে। কৌমুদী পূর্ণিমায় কিশোর কৃষ্ণ মধ্য স্থলে দাঁড়াইলেন, গোপীরা তাঁহাকে মণ্ডলাকারে ঘেরিয়া নৃত্যগীত করিতে লাগিল। তৎকালে এইরূপ রাস প্রচলিত ছিল, দূষ্য বিবেচিত হইত না। অদ্যাপি গুজরাট ও কাঠিবাড় প্রদেশে ভদ্রঘরের নারী রাস-নৃত্য করিয়া থাকেন। সেখানে ইহাকে 'গরবা' বলে। গর্ভ শব্দের অপভ্রংশে গরবা। "গর্ভো ভ্রূণেঽর্ভকে কুক্ষৌ সন্ধৌ", গর্ভ অর্থে ভ্রূণ, অর্ভক (খোকা), কুক্ষি, সন্ধি। গরবা, খোকার জন্মোৎসব। কে খোকা? নববর্ষ বা নববর্ষের সূর্য। গরবাতে নারীমণ্ডলের মধ্য-স্থলে এক বহুছিদ্র হাঁড়ী রাখা হয়। তাহাতে এক প্রজ্বলিত দীপ থাকে, ছিদ্রপথে রশ্মি বহির্গত হইয়া সূর্য স্মরণ করায়। অবশ্য লোকে এত বুঝে না, দীপান্বিত হাঁড়ি রাখিতে হয় রাখে। গরবা রাস-নৃত্য বটে, কিন্তু রাসের দিন হয় না। নবরাত্রে (দুর্গা-নবমীতে) গরবা হয়। সে দিনও নূতন বর্ষ জন্মগ্রহণ করিত।

রাস নূতন উৎসব ছিল না, শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত করেন নাই। কার্তিক পূর্ণিমায় শারদ বিষুব হইত, বিষুবের পর নূতন বৎসর হইত। বহু পূর্বকাল হইতে এরূপ ঘটিয়া আসিতেছিল। পরে কার্তিক পূর্ণিমায় বিষুব না হইলেও সেদিন বিষুব ও নববর্ষ ধরা হইত। কবে শেষ হইয়াছে, তাহা মোটামুটি গণিতে পারা যায়। এখন ৭ই আশ্বিন শারদ বিষুব হইতেছে। সেদিন আশ্বিন শুক্ল সপ্তমী হইতে পারে। সেদিন হইতে আশ্বিন কোজাগরী পূর্ণিমা ৭ তিথি এবং কার্তিক পূর্ণিমা ৩০ তিথি। বিষুব এই ৩৭ তিথি পিছাইতে ৩৭ × ৭১ = ২৬২৭ বৎসর গিয়াছে। ইহা হইতে বর্তমান ইংরেজী সন ১৯৩২ বাদ দিলে খ্রি-পূ ৬৯৫ অব্দ পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রায় খ্রি-পূ ৭০০ অব্দের পরে কার্তিক পূর্ণিমায় শারদ বিষুব

আর হয় নাই। আমরা এখন কৃষ্ণের রাসযাত্রা করিতেছি, কিন্তু সেটা স্মারক মাত্র।

বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে, ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ গোপিকা-দিগের রাস হইয়াছিল। কোন গোপী প্রধানা হন নাই। গোবিন্দ, ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণে রাধা-গোবিন্দ হইয়াছেন। রাধা নাম পুরাতন, এবং বিশাখা নক্ষত্রের নামান্তর ছিল। কৃষ্ণ-যজুর্বেদে বিশাখা অনুরাধা ইত্যাদি নক্ষত্র নাম আছে। রাধার পর অনুরাধা। অতএব বিশাখার নাম রাধা। অথর্ব বেদে "রাধো বিশাখে" এই স্পষ্ট উক্তি আছে। বিশাখা নাম হইবার হেতু এই। এই নক্ষত্রে শারদ বিষুব হইত, বৎসর দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া যাইত। ইহা খ্রি-পূ ২৫০০ অব্দের কথা। বোধ হয় ইহার পূর্বে নক্ষত্রের নাম রাধা ছিল। রাধা অর্থে সিদ্ধি। এই নাম কেন হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। আরও অনেক নক্ষত্র নামের সার্থকতা বুঝিতে পারা যায় না। কালক্রমে রাধা বিশাখা একার্থ হইয়া গিয়াছে। মহাভারতে কর্ণের ধাত্রি-মাতার নাম রাধা, এবং কর্ণ রাধেয় নামে সম্বোধিত হইতেন।

কার্তিকী পূর্ণিমায় সূর্য বিশাখার দিকে, বিশাখায় থাকে, রাধার সহিত সূর্যের মিলন হয়, কিন্তু অদৃশ্য। একদা তারা ও সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। প্রাচীনেরা মনে করিতেন সূর্য্যের রশ্মিতেই তারার তারাত্ব, চন্দ্রের চন্দ্রিকা। গো রশ্মি, গোপ কৃষ্ণ, গো-পী তারা। কবি কৃষ্ণ-রবিকে রাস-মধ্যস্থ ও গোপী-তারাকে মণ্ডলাকারে সাজাইয়াছেন। চন্দ্র পুংলিঙ্গ না হইলে তিনি এই নামেই রাধার প্রতি-নায়িকা হইতে পারিতেন। কারণ পূর্ণিমান্তে চন্দ্র রবির বিপরীত দিকে থাকে। প্রতিনায়িকার নিমিত্ত ইদানীর বঙ্গীয় কবিকে চন্দ্রাবলী নাম নির্মাণ করিতে হইয়াছিল। আমাবস্যার রাত্রে চন্দ্র সূর্যের মিলন হয়, কৃষ্ণ গোপনে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ রাধার নাম চন্দ্রাবতী, চন্দ্রাবলী রাখিয়া রূপকটি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। রাধা বৃষভানুর কন্যা। বৃষভানু, অপভ্রংশে বৃথ-ভানু, বৃক-ভানু। বৃষ-রাশিস্থ ভানু, রশ্মি। কৃত্তিকা বৃষরাশিতে অবস্থিত। রাধার জননীর নাম কৃত্তিকা হইবার কথা। পদ্মপুরাণে নামটি নাকি কীর্তিদা। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কলাবতী, অর্থাৎ চন্দ্র। এখানেও রূপক রক্ষিত হয় নাই। এই পুরাণে রাধার স্বামীর নাম রায়ণ। এই নাম সংস্কৃত নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আয়ণ শব্দের রাঢ়ীয় অপভ্রংশ। অয়ণে ভবঃ আয়নঃ। অয়নে, উত্তরায়ণ দিনে জন্ম হেতু আয়ন। পূর্বকালে উত্তরায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ হইত। কিন্তু সে রীতি পরিবর্তিত হইয়া শারদ বিষুব হইতে নব বর্ষ গণ্য হইতে লাগিল। দুর্গাপূজার মহিমা এইখানে। কংস মহামায়াকে বধ করিবার কালে অম্বা উত্থিত হইয়া-ছিলেন। ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, তুমি ভগিনী হইলে, অর্থাৎ উত্তরায়ণে যেমন নববর্ষ হইত, শারদ বিষুবেও তেমন হইবে। তখন উত্তরায়ণ ফলশূন্য নপুংসক হইল। আরও পরে শারদ বিষুব পরিবর্তে বাসন্ত বিষুব হইতে বর্ষ গণ্য হইতে লাগিল। বাসন্তী দুর্গাপূজা ও চৈত্রমাসও আসিয়া পড়িল। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শতবৎসর বিচ্ছেদের পর দ্বারকাপতি কৃষ্ণের সহিত রাধার পুনর্মেলন হইয়াছে, কাব্যের, আধ্যাত্মিক ভাবের ও রূপকের অধঃপতনও হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে গোপীর বস্ত্রহরণ নাই। হরিবংশেও নাই। ভাগবতে প্রথম পাইতেছি। কিন্তু ইহাতে বর্ণিত অনাবশ্যক চপলতা দেখিলে মনে হয় ভাগবতের ন্যায় রসগাঢ় কাব্যে অধ্যায়টি ছিল না, পরে কেহ জুড়িয়া দিয়াছেন। হেমন্তের প্রথম মাসে (অগ্রহায়ণ মাসে) গোপবালারা কাত্যায়নী ব্রত করিত। মাসব্রত উদ্‌যাপনের দিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণ স্নানরতা কুমারীদিগের বস্ত্র অপহরণ করিয়া কদম্ব-বৃক্ষে বসিয়াছিলেন।

যমুনা নীলনভোমণ্ডল, কৃষ্ণের সুদর্শন-চক্র নক্ষত্র-চক্র। নক্ষত্র-চক্রের মেরুর নাম কদম্ব, জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। গোপী-তারকা রবিকর স্পর্শে দীপ্ত। কিরণ তারার বস্ত্র। দিবাভাগে তাহারা বস্ত্রহীন, অদৃশ্য, যেন যমুনাজলে নিমগ্ন। রাত্রি হইলে একে একে বস্ত্র গ্রহণ করে।

রূপকটি নগণ্য, অতি সামান্য প্রতিদিনের কথা রাসলীলার কবির মনেও হইত না। আধ্যাত্মিক ভাবেও রাসলীলার ধারেও যায় না। যে গোপী দেহমনপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছে, তাহাকে নগ্ন করিয়া মন্দ কবি

কাব্যের অপকর্ষ ঘটাইয়াছেন। অগ্রহায়ণ শেষে বস্ত্রহরণ হইলে কৌমুদী পূর্ণিমায় রাসই বা কেমনে সম্ভব হয়?

(৮) কৃষ্ণোপাসনা কত কালের?

প্রশ্নটি গাঢ়। আমি ইহার উত্তর অন্বেষণে সঙ্কুচিত হইতেছি। কৃষ্ণের স্বরূপ কি, কৃষ্ণোপাসনার প্রকৃতি কি? এখানে এই গাঢ় প্রশ্ন বিবেচ্য নহে। মহাভারতে ও পুরাণে যে কৃষ্ণচরিত পাইতেছি তাহার উৎপত্তির কালনির্ণয়ও কঠিন। অল্পে অল্পে বহুকালে উপাসনা স্ফুরিত ও প্রচারিত হইয়াছে। বহু বিজ্ঞজনে এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। আমি যে ক্ষুদ্র নগরে বসিয়া লিখিতেছি, সে নগরে গ্রন্থশালা নাই, পূর্বগামীগণের গবেষণার ফলভাগী হইতেও পারিলাম না।

স্থূলতঃ উত্তর-প্রাপ্তির তিন পথ আছে। (১) কোন্ পুরাতন গ্রন্থে উল্লেখ আছে? (২) কোন্ কালের কোন্ ঘটনা মূল হইয়াছিল? (৩) সে মূল হইতে বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিতে কতকাল লাগিতে পারিত?

ঋগ্বেদের (৮ম মণ্ডল) এক ঋষির নাম কৃষ্ণ ছিল। তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তুতি করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।১৭) দেবকী-নন্দন কৃষ্ণ অঙ্গিরস্ গোত্রের ঘোর নামক এক ঋষির নিকট পুরুষ-যজ্ঞ (জীবন-যজ্ঞ) শিখিয়া অন্য উপাসনার প্রতি স্পৃহাহীন হইয়াছিলেন। ভগবদ্গীতার কৃষ্ণ দেবকী-নন্দন। মহাভারতের কৃষ্ণও দেবকী-নন্দন, বসুদেব-তনয়। তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ, তাঁহার বিষ্ণুর অবতারত্ব, কত কালের?

বিষ্ণু ঋগ্বেদের এক দেবতা। বহু ঋকে তাঁহার স্তুতি না থাকিলেও তিনি নগণ্য দেবতা ছিলেন না। তিনি প্রাচীনতম নহেন, এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু কনিষ্ঠ হইলেও গুণজ্যেষ্ঠ। ভগবদ্-গীতায়, আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ, আমি আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অদ্যাপি গায়ত্রীতে স্মরণ করিতেছেন। তিনি এক পুরাকালে ত্রিপদ-বিক্ষেপ দ্বারা স্বর্গ মর্ত পাতাল ত্রিলোক অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালে উত্তরায়ণের দেবতা ছিলেন, সেখান হইতে তিনি তিন মাস তিন মাস করিয়া চারি পদ দ্বারা বৎসর বিভক্ত করিতেন। ইন্দ্র তাঁহার সখা। কারণ ইন্দ্র দক্ষিণায়ণের, এবং তিনি উত্তরায়নের দেবতা। বিষ্ণু উত্তরায়ণের পূর্ব মাসের, বৎসরের অন্তিম মাসের আদিত্য। এই হেতু তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ।

বর্তমান কালে হিন্দোল উৎসবে বিষ্ণুর প্রাচীনতা প্রমাণিত হইতেছে। লোকে ভুল করে, মনে করে এটি বসন্তোৎসব। বসন্তোৎসব ছিল, সকল ঋতুরই উৎসব ছিল। কিন্তু পূর্বকালে ফাল্গুন মাস কদাপি বসন্ত ঋতুর মাস ছিল না। এটি শীত ঋতুর মাস ছিল; ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। অয়ণ-দিনে সূর্য উত্তর দক্ষিণে দোলিত হয়। এখন ৭ই পৌষ উত্তরায়ণ হইতেছে। সেদিন পৌষ শুক্ল সপ্তমী হইতে পারে। এই সপ্তমী হইতে ফাল্গুন পূর্ণিমা ৬৮ তিথি। এখন হইতে ৪৮৩০ বৎসর পূর্বের ঘটনা হোলি খেলায় স্মরণ করিতেছি। ঋগ্বেদে (৮।৭৭।১০) উক্ত আছে, বিষ্ণু ইন্দ্রের জল দান করেন। সে সময় বিষ্ণুর ঝুলন-যাত্রা। মনে হয়, এই সময়ের কিছু পরে বিষ্ণুর প্রাধান্য হইয়াছে। ইহার সমর্থক অন্য প্রমাণ আছে। গায়ত্রীতে বিষ্ণু আর আদিত্য নাই। তিনি সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্যবর্তী বটেন, কিন্তু ধ্যানের উপলক্ষ মাত্র। তিনি সবিতারও বরেণ্য, তিনি পরম ব্রহ্ম। তিনিই ভগবান্। যাঁহারা তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারা ভাগবত, তাঁহারা বৈষ্ণব।

মহাভারতে (আদি ।৬৭) ধর্মের অংশে যুধিষ্ঠির, বায়ুর অংশে ভীম, ইন্দ্রের অংশে অর্জুন, নারায়ণের অংশে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরাণে বিষ্ণুর অংশে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল। এ কথা বৈষ্ণব মৎস্য পুরাণ জানিতেন না। ব্রহ্মাণ্ড বায়ু ও ব্রহ্মপুরাণও জানিতেন না। বায়ুপুরাণ পরে শুনিয়াছিলেন, ব্রহ্মপুরাণ বিষ্ণুপুরাণের নিকট পাইয়াছিলেন। মৎস্য পুরাণে বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার হইয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণ হন নাই। বায়ুপুরাণেও হন নাই। এমন কি, সেদিনকার জয়দেবও কৃষ্ণকে অবতার গণেন নাই। বায়ুপুরাণে কৃষ্ণ প্রজাপতি এক বার্ষিক অমাবস্যায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জন্মাষ্টমী হইতে এই কাল খ্রি-পূ দ্বাদশ শতাব্দে পাইয়াছি। বোধ হয় কালীয়-দমনই ব্রজের কৃষ্ণের শেষ কীর্তি। সেও এইরূপ কালের। প্রচারক বৃদ্ধ গর্গকে ইহার

পূর্বে মনে করিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ তিনি ইহার পরে ছিলেন, এবং পূর্বকালের ঘটনা স্মরণ করিয়াছেন। তিনি অতি পুরাতন হইলেও খ্রি-পূ ১০০০ অব্দের পূর্বের হইতে পারেন না। প্রকৃত রাসযাত্রা খ্রি-পূ ৬০০ অব্দের এদিকে নয়। অতএব দেখা যাইতেছে, ১০০০ হইতে বুদ্ধকাল ৬০০ অব্দের মধ্যে মহাভারতের কৃষ্ণ ঐশীশক্তি সম্পন্ন হইয়াছিলেন। মহাভারতে দেবর্ষি নারদ নর-নারায়ণ প্রত্যক্ষ করিতে স্বর্গে ক্ষীরোদ সাগরের এক দ্বীপে গিয়াছিলেন, অর্জুন ও কৃষ্ণকে নর-নারায়ণ জ্ঞান করেন নাই। ভাগবত পুরাণ লিখিয়াছেন, নারদ বৈষ্ণব-তন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ভাগবত ধর্ম ভারত যুদ্ধ কালের পূর্ব হইতে চলিতেছিল। খ্রি-পূ চতুর্থ শতাব্দে পাণিনি অর্জুন-ভক্ত অর্জুনক, বাসুদেব-ভক্ত বাসুদেবকে পদ সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভগবদ্‌গীতোক্ত "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং" হইতে জানা যায়, গীতা খ্রি-পূ চতুর্থ শতাব্দের এদিকে হইতে পারে না। (আষাঢ় মাসের ভারতবর্ষে 'মহাভারত যুদ্ধকাল')। ইহার অধিক পূর্বেও নয়। ধর্মের গ্লানি হইলে ভগবান আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বিশ্রুত কীর্তি চন্দ্র সূর্য্য বংশ লুপ, শূদ্র রাজা মহাপদ্মনন্দ একরাট্, কলির পূর্ণ প্রতাপ। ধর্মের এমন গ্লানি আর হয় নাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়দিগকে উত্তেজিত করিয়াছেন। ইহার দুই তিন শত বৎসর পূর্বে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এক হইয়া থাকিবেন।

মহাভারতের অন্য স্থলেও শ্রীকৃষ্ণ ও বিষ্ণু এক জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঐশ্বর্যে মাধুর্য নাই। মধুররস-পিপাসুর তৃপ্তি হইল না, তাহারা তাঁহাকে রাসবিলাসরসিক করিলেন। বিষ্ণু পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ গোপী-বল্লভ হইয়াছেন। এই পুরাণেই প্রথম পাইতেছি। ইহার চতুর্থাংশে ভবিষ্য-রাজবংশ বর্ণন আছে। বোধ হয় আদি বিষ্ণু পুরাণ এইখানেই সমাপ্ত হইয়াছিল। প্রথম চারি অংশে বিষ্ণু নাম শত শতবার আছে, কৃষ্ণের বংশ বর্ণনে সত্যভামা ও জাম্ববতীর সহিত তাঁহার বিবাহ কথিত হইয়াছে, এক স্থানে চতুর্ভুজ পীতাম্বরের রূপ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু গদ্যেও মাত্র দুই এক স্থানে কৃষ্ণ নাম আছে, গোপ-গোপীর কোন কথাই নাই। পঞ্চমাংশ ও অনাবশ্যক ষষ্ঠাংশ পরে যোজিত, ইহ... পঞ্চপাদ, ষট্‌পাদ হইতে ... শতাব্দের পরে রচিত মনে হয়। ... কোন উপজীব্য পাইতেছি না।

পশ্চিম-ভারতে দুই এক যবন নৃপতি ভাগবত অনুরক্ত হইয়াছিলেন। প্রাচীন বিদিশা-নগরীতে খ্রি-পূ দ্বিতীয় শতাব্দের একজনের প্রতিষ্ঠিত গরুড়-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু ভাগবত ধর্ম পুরাতন, বিষ্ণুভক্তি ও গোপালকৃষ্ণভক্তি এক নয়। বিষ্ণু চতুর্ভুজ, তাঁহার বাহন গরুড়, ধাম বৈকুণ্ঠ ধ্রুবলোকে। ব্রজের কৃষ্ণ দ্বিভুজ, তাঁহার বাহন রথ, ধাম বৃন্দাবন বা গো-লোক, ধ্রুব-লোকের ঊর্দ্ধে কদম্বলোকে।

ভাগবত পুরাণে বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু ইচ্ছা করিলে ইহার দ্বৈত ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে। এই পুরাণ বিষ্ণু পুরাণের পরে প্রণীত। তখন দেশে শান্তি বিরাজিত, হরিকথা শ্রবণের যোগ্য কাল চলিতেছিল। ইহাতে (১।৯) ভীষ্মের শরশয্যার উল্লেখ আছে। অতএব ইহা খ্রি-পূ দ্বিতীয় শতাব্দের পরে। অন্য স্থানে (৫.২২) গ্রহ-সন্নিবেশ লিখিত আছে। তাহা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নহে এবং তাহা হইতে সপ্তবার আসিতে পারে না। অতএব খ্রি-পর তৃতীয় শতাব্দের পূর্বে যাইতে হইতেছে। এই পুরাণের রচনাকাল খ্রি-প দ্বিতীয় শতাব্দ মনে হয়।

রাধা-কৃষ্ণ ভজনা ভাগবতের পর আসিয়াছে। কেবল একখানি পুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এই উপাসনা পাইতেছি। রাধাকৃষ্ণ প্রকৃতি ও পুরুষ, যাবতীয় দেবী ও দেব এই দুই হইতে আবির্ভূত। কিন্তু রাধা শাপগ্রস্ত হইয়া নরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে রাধা মানিত না, কবি রাধাকৃষ্ণকে একেরই বামাঙ্গ ও দক্ষিণাঙ্গ বলিলেও লোকে রাধা ভজনার নিন্দা করিত। কবি তাহাদিগকে নির্বংশ ও নরকগামী করিয়াছেন। কিন্তু এই পুরাণের বর্তমান রাঢ়ীয় সংস্করণ হইতে ইহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। মৎস্য পুরাণে ব্রহ্মবৈবর্তের লক্ষণ ও শ্লোক সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। লিখিত আছে, ইহাতে রথন্তর কল্পের বৃত্তান্ত আশ্রয় করিয়া সাবর্ণি মনু নারদের নিকট কৃষ্ণ মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা ও

কাব্যের অপকর্ষ ঘটাইয়াছেন। অগ্রহায়ণ শেষ... হইলে কৌমুদী পূর্ণিমায় রাসই বা কেম... নাই।

(৮) কৃষ্ণোপ... ...কা আছে। ...তে ব্রহ্ম, প্রকৃতি, প্রশ্নটি ... "রহস্যে রাধয়া ক্রীড়া ... ...ক সংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র। ...র্যের পূর্বে রচিত, ষষ্ঠ কি সপ্তম শতা... তৎপূর্বে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রণীত হইয়াছিল। ইহাতে জন্মাষ্টমীর বার-বিচার ও অন্যত্র সপ্তবার গণনা হইতে বুঝিতেছি, ইহা খি-পর তৃতীয় শতাব্দের পূর্বে প্রণীত হয় নাই। বর্তমান সংস্করণেও লিখিত আছে, ইহার শ্লোক সংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র। কিন্তু বস্তুতঃ একবিংশ সহস্র পাওয়া যায়। অতএব অন্ততঃ তিন সহস্র শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আর যে কত সহস্র লুপ্ত হইয়া তৎস্থান নূতন শ্লোকে পূর্ণ হইয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই।*

অমর-কোষ খ্রি-প তৃতীয় শতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। ইহাতে নারায়ণ ও কৃষ্ণের উনচল্লিশটি নাম আছে, কিন্তু একটি নামেও গোপাল-কৃষ্ণ গোপী-কৃষ্ণ নাই। এই কোষে রাধা বিশাখা তারা, কোন গোপী নয়। শুনিতেছি পাহাড়পুরের ভগ্নাবশেষ রাধাকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং সে প্রতিমূর্ত্তি পঞ্চম শতাব্দের। যদি সত্য হয়, রাধা ইহার এক শতাব্দ পূর্বে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

উপাসনা ও ধর্মবিশ্বাস প্রবর্তনের কাল নির্ণয় অতিশয় দুরূহ। কারণ প্রথমে অল্প দেশে প্রচারিত হয়, অল্প লোকে পুরাতন ত্যাগ করিয়া নূতন গ্রহণ করে। একই কালে একই দেশে বিবিধ উপাসনা চলিতে থাকে। পুরাতন সহজে লুপ্ত হয় না। নূতন সকল লোকের মান্য হয় না। এই কথা স্মরণ রাখিয়া নিম্নলিখিত কাল সঙ্কলিত হইল।

খ্রি-পূ ১৪৫০ অব্দ।		ভারত যুদ্ধের কৃষ্ণ
	১২০০	প্রজাপতি কৃষ্ণ
	৬০০	ঈশ্বর কৃষ্ণ
	৪০০	গীতার কৃষ্ণ
	৩০০	ব্রজের কৃষ্ণ
খ্রি-প	৩০০	রাধা কৃষ্ণ

* ১৩৩১ সালের 'ভারতবর্ষে' ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের দেশ ও কাল নির্ণয় করা গিয়াছে।

স্বামী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

১

আধেক তুমি মানুষ এবং আধেক তুমি নারায়ণ,
আধেক তুমি আমার দেহ, আধেক আমার প্রাণ মন।
তুমি আমার সফল স্বপন, তুমি আমার সকল আশ ;
স্বর্গ এবং মর্ত্ত মিলায় তোমার দুটী বাহু পাশ।

২

হেরিনি কই ভগবানে তোমায় তাঁহার আভাস পাই,
বেদান্তেরি ব্রহ্ম তুমি, তুমি ছাড়া কিছুই নাই।
তুমি আমার আঁখির জ্যোতি, তুমি আমার লাবণ্য।
অধর কপোল ফুটায় গোলাপ কাহার লাগি কি জ

৩

এসো মোরা ধরার মাঝে এক সাথেতে ফুটি হে,
প্রেমের পরীরাজ্যে আমায় কর তোমার জুটী হে।
তুমি এবং আমিই দোঁহে যুগের যুগের বধূবর,
সৃজন কর নূতন ধরা অর্দ্ধ নর নারীশ্বর।

৪

দেবতা তুমি পিয়াও মোরে মহা প্রেমের অমৃত,
বক্ষেতে বৈকুণ্ঠ রচি করো আমায় সমৃদ্ধ।
মানুষ তুমি আমার সাথে নিত্য হাস কাঁদ হে,
তোমার বাহুপাশের নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধ হে।

শেষ পথ

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত এম-এ, ডি-এল

১৭

কিছুদিন নির্য্যাতনের পর মাধব বলিয়া ফেলিল, আর এমন করিয়া টেঁকা যায় না। একে নিদারুণ অর্থকষ্ট, তার পর গ্রামবাসীর অত্যাচারে তার জীবন-ধারণ পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। একদিন সে রাগের মাথায় শারদাকে বলিয়া বসিল, শারদাকে বিবাহ করিয়াছিল বলিয়াই তার এত দুর্গতি—বিবাহের পর একদিনও সে সুখের মুখ দেখিল না।

শারদা রাগে ফুলিয়া উঠিল। সে মাধবকে কতকগুলি শক্ত শক্ত কথা বলিল,—তার পর সারা দিন অনাহারে থাকিল, আর কথা কহিল না।

পরের দিন প্রভাতে গোবিন্দ তাঁতির বাড়ীতে গিয়া শারদা তাকে বলিল যে মাধবকে একঘরে করাটা তাদের কেমন বিচার হইল ?

গোবিন্দ বলিল, বিচারে কোনও দোষ হয় নাই। ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে লইয়া ঘর করিলে সমাজে পতিত হইতেই হইবে।

শারদার মুখের গোড়ায় কথাটা আসিল যে, যে স্ত্রী লইয়া গোবিন্দ বৃদ্ধ বয়সে ঘর করিতেছে, তার বয়সকালে অখ্যাতির সীমা ছিল না। কিন্তু সে ক্রোধ শান্ত করিয়া স্থির ভাবে বলিল যে, সে দোষ করিয়া থাকে তাহারই সাজা হওয়া উচিত, তার স্বামী কোনও দোষ করে নাই। আর ব্যভিচারিণী বিন্দুর সহিত ব্যবহার যদি সমাজ অনায়াসে সহিতে পারে, তবে তাহার সঙ্গে বাস করায় তার স্বামীর কোনও অপরাধ হয় নাই।

গোবিন্দ শারদার তর্ক করিবার অপরিসীম ঔদ্ধত্যে ক্ষিপ্ত হইয়া উত্তর করিল যে তাহাতে এবং ইহাতে অনেক প্রভেদ। প্রভেদ যে কিসে তাহা স্বরূপতঃ নির্ণয় করিতে সে পারিল না, কিন্তু প্রভেদ যে আছে তাহাই অত্যন্ত জোর করিয়া সে বলিল। কিন্তু শারদা তাহাতে দমিল না। সে যে-সব যুক্তি প্রয়োগ করিল তাহাতে গোবিন্দ হালে পাণি না পাইয়া শেষে বলিল যে বিন্দু বিধবা, তাহার কথা স্বতন্ত্র—এবং বিন্দু মাধবের স্ত্রী নয়, তাহার সহিত ব্যবহারে কাজেই মাধবের জাতি যাইতে পারে না।

যুক্তি হিসাবে এ কথাটা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় হইলেও, গোবিন্দের কাছে তখন যে কয়জন বসিয়া ছিল সকলেই ঘাড় নাড়িয়া কথাটায় সায় দিল। এ বিষয়ে যুক্তি যতই দুর্ব্বল হউক সংস্কারটা অত্যন্ত প্রবল, এবং যুক্তি সংস্কারের বিরোধে সংস্কারের জয় চিরদিনই হইয়া আসিয়াছে।

শারদা যখন তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না তখন সে বলিল, বেশ কথা। কিন্তু এ অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই ?

গোবিন্দ বলিল, প্রায়শ্চিত্তের বিধান তো করাই হইয়াছে। মাধব তাহা মানিতে চায় নাই বলিয়াই যত গোলযোগ।

তখন শারদা বলিল, দোষ করিয়াছে সে, প্রায়শ্চিত্ত হউক, শাস্তি হউক তাহারই হইতে পারে, তাহার স্বামীর কেন দণ্ড হইবে ?

হারাণ তাঁতি পাশে বসিয়া ছিল, বলিল "ইয়া ওয়াজিব কথা।

গোবিন্দ ধমক দিয়া বলিল, "ওয়াজিব না ওয়াজিব। তুই তো দোষ ক'রছসই—আর সে করে নাই? সে তরে লইয়া ঘর করে ক্যান?"

অনেকক্ষণ তর্কাতর্কিতে শারদার মাথায় খুন চড়িয়া গিয়াছিল, সে বলিল, "ইয়াই তো ঠিক? সে আমারে লইয়া ঘর করে ইয়াই না তার দোষ? সে যদি ঘর না করে?—যদি আমারে তাড়াইয়া দেয় তবেই হইবো—কেমুন?"

গোবিন্দ বলিল "তা সয় কি? নাইলে পেশাকর লইয়া ঘর কইরবো, সমাজেও থাইকবো ইয়া হইবার পাইরবো না। সমাজে থাইকবার হইলে আমাগো শাসন মানা লাইগবো।"

শারদা বসিয়া ছিল। সে একটা প্রবল দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তীব্র দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া বলিল "বেশ!" তার পর তার দৃষ্টি ও সমগ্র শরীরের ভঙ্গীতে বৃদ্ধের প্রতি একটা তীব্র অবজ্ঞা জানাইয়া সে জোরে জোরে পা ফেলিয়া বাড়ীতে চলিয়া গেল।

মাধব সেখানে বিষণ্ণ ভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ছিল। শারদা তার দিকে চাহিল; কিন্তু কোনও কথা কহিল না। রান্নার চালায় গিয়া সে রন্ধন আরম্ভ করিল। সে কার্য্য সমাধা হইলে সে মাধবকে স্নান করিতে পাঠাইল।

মাধবের স্নানাহার সমাপ্ত হইলে শারদা তাকে তাগাদা করিয়া দূরের এক হাটে পাঠাইয়া দিল।

সন্ধ্যাবেলায় হাট হইতে ফিরিয়া মাধব দেখিতে পাইল শারদা ঘরে নাই।

রাত্রি একটু বেশী হইলে সে পাড়ায় খোঁজ করিতে বাহির হইল। কোথাও শারদার সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন সে বাড়ী ফিরিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

সে স্থির করিল লোকে যাহা বলিয়াছিল সে কথাটা সত্য—শারদা ভ্রষ্টা; সে ঘরে থাকিবে কেন?

ভীষণ আক্রোশ তার মনের ভিতর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সে স্থির করিল যে আবার যদি সে কোনও দিন শারদার দেখা পায় তবে তারই একদিন কি শারদারই একদিন।

দেখা সে পাইয়াছিল—কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই।

* * * *

শারদা স্থির করিয়াছিল সে আর স্বামীগৃহে থাকিবে না, এ গ্রামে থাকিবে না। অবিচারের বেদনায় তার প্রাণ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। কোনও কিছু না জানিয়া শুনিয়া গ্রামবাসীরা তাকে দুশ্চরিত্রা সাব্যস্ত করিয়াছে এবং তার নামে রচিত এক বিরাট উপন্যাস বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছে। তাদের এ বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিতেও তার ঘৃণা বোধ হইল। কেন? কিসের জন্য সে এ হীনতা স্বীকার করিতে যাইবে?

এক বৎসর বিদেশে থাকিয়া তার মনের ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া গিয়াছিল। এ গ্রাম, এ সমাজের বাহিরেও একটা জগৎ আছে সে কথা সে জানিয়াছিল। জানিয়াছিল যে বাহিরের সে জগতে শরীর খাটাইয়া জীবন যাপন করা যায়, পয়সা উপার্জ্জন করা যায়। শুনিয়াছিল রংপুরের চেয়ে বড় সহর আছে—কলিকাতা, সেখানে রোজগার আরও বেশী। গ্রামের লোক অনায়াসে তাকে এই নিদারুণ অপমান করিয়াছে, সে কেন ইহাদের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া এখানে পড়িয়া নির্য্যাতিত হইবে?

সে স্থির করিল, কোনও উপায়ে সে একবার কলিকাতা যাইবে। সেখানে গিয়া দাসীবৃত্তি করিয়া জীবন কাটাইবে—এখানে আর থাকিবে না।

মাধবের জন্য তার এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। মাধবকে সে দুই একবার গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে বলিয়াছিল; কিন্তু সে পূর্ব্বপুরুষের ভিটা ছাড়িয়া যাইতে স্বীকৃত হয় নাই। ফল কথা বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে অপ্রবাসী মাধবের একটা নিদারুণ ভীতি ছিল। গৃহের নিরাপদ আশ্রয় ছাড়িলেই চারি দিক হইতে না জানি কি অমঙ্গল আসিয়া পড়িবে এই ভয়ে তার অন্তর এ প্রস্তাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। মাধবকে ছাড়িয়া যাইতে শারদার মন সরিল না, কেন না সে চলিয়া গেলে একঘরে হইয়া মাধবের একা এখানে একদিনও চলিবে না। তাই সে রহিয়া গিয়াছিল।

কাল রাত্রে মাধবের তিরস্কারে তার বড় ক্রোধ

হইয়াছিল। তখনই সে সঙ্কল্প করিয়াছিল যে মাধবকে ছাড়িয়াই সে চলিয়া যাইবে। পরের দিন সকাল বেলায় কিন্তু আবার তার সঙ্কোচ হইল। সে চলিয়া গেলে সমাজের এ নির্য্যাতন সহিয়া মাধব যে মোটেই টিকিতে পারিবে না এ কথা ভাবিয়া তার চিত্ত ব্যথিত হইল। তাই সে একটা মীমাংসার চেষ্টায় গোবিন্দের বাড়ী গিয়াছিল।

গোবিন্দের কাছে যখন সে শুনিল যে সে চলিয়া গেলেই মাধবের সামাজিক শাস্তি উঠিয়া যাইতে পারে, তখন সে মন স্থির করিল।

মাধবকে হাটে পাঠাইয়া সে গৃহকর্ম্ম সমাপ্ত করিল। তার পর দ্বিপ্রহরে নিঃশব্দে সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল তার মায়ের কাছে। স্থির করিল সেখানে কিছুদিন থাকিয়া কোনও একটা জোগাড় করিয়া সে কলিকাতায় যাইবে।

কলিকাতায় হঠাৎ যাওয়া হইল না।

শারদা মায়ের কাছে আসিবার দুই একদিন পরেই তার মা অসুস্থ হইয়া পড়িল। কাজেই শারদার থাকিয়া যাইতে হইল। মায়ের অসুখ হইতেই ভট্টাচার্য্য বাড়ীর কাজ তার ঘাড়ে পড়িল, এবং তার পর মাসখানেক ভোগের পর যখন দুর্গা মারা গেল তখন শারদাকে সেখানেই থাকিতে হইল। দুর্গার বাড়ীখানা এবং একখানা চাকরাণ জমী ছিল, তাই লইয়া শারদা সেখানে সংসারী হইয়া রহিল।

প্রথম প্রথম শারদার মনে আশঙ্কা হইয়াছিল বুঝি-বা মাধব এখানে তার খোঁজ লইতে আসিবে। কিন্তু মাধব নিজেও স্থির করিয়াছিল, তার পাড়াপড়সীরাও তাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছিল যে শারদা পাপিষ্ঠা। তাই শারদার সন্ধান যখন জানিতে পারিল তখনও সে কোনও খোঁজ খবর করিল না। প্রথমে শারদার আশঙ্কা হইয়াছিল। মাধব আসিলে তাকে কি বলিবে, কি বলিয়া তাকে নিবৃত্ত করিবে সেই কথা ভাবিয়া সে ভয়ে মরিতেছিল। কিন্তু যখন তিন মাস চলিয়া গেল অথচ মাধব কোনও খোঁজ খবর লইল না তখন তার মন দুঃখে ভরিয়া গেল। যে আশঙ্কিত সাক্ষাতের ভয় সে পাইল তাহা যে হইল না তাহাতে তার বুক ভাঙিয়া গেল—অভিমান হইল।

তখনও শারদার মনে আশা ছিল শীঘ্রই সে কোনও একটা ব্যবস্থা করিয়া বিদেশে চলিয়া যাইবে। কিন্তু অল্পদিন পরেই একটা প্রকাণ্ড অন্তরায় আসিয়া তার সে সঙ্কল্প ও আশা ভূমিসাৎ করিয়া দিল। শারদা অনুভব করিল সে অন্তঃসত্ত্বা। কাজেই সে বিদেশে যাওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ভট্টাচার্য্য বাড়ীর কাজে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিল।

যথাসময়ে শিশুর জন্ম হইল। যতদিন সে স্বামীগৃহে ছিল ততদিন তার সন্তান হইয়া সুধু নষ্টই হইয়াছে, কিন্তু আজ সে স্বামীর আশ্রয় ছাড়িয়া আসিয়া জীবিত সন্তান কোলে পাইল এবং সে ছেলেটি দিনে দিনে শশীকলার মত বাড়িতে লাগিল। ছেলের মুখ দেখিয়া শারদার আনন্দ হইল—আর দুঃখও হইল। হায়, এ ছেলে সে তার স্বামীর কোলে দিতে পারিল না।

দিবার উপায় ছিল না। কেন না মাধবকে তার পড়সীরা বুঝাইয়াছিল এবং মাধবও বুঝিয়াছিল যে এ সন্তান তার নয়। তাই সে সবার পরামর্শে লোক পাঠাইয়া শারদাকে জানাইয়াছিল যে সে এ পুত্রের জন্ম দায়ী নহে, এবং আরও জানাইয়াছিল যে সে শারদাকে সসন্তান পরিত্যাগ করিয়াছে।

এমন কিছু একটা বড় কথা নয় ইহা। মাধবের এমন কিছু বিত্ত ছিল না যার জন্ম শারদা বা তার ছেলের বেশী দুঃখ হইবার কথা। সেখানে তাদের ক্ষুধার অন্নেরই যথেষ্ট সঞ্চয় ছিল না। বরং এখানে শারদার অন্নবস্ত্রের অভাব নাই, দুর্গাও গোটা পঞ্চাশেক টাকার সঞ্চয় রাখিয়া গিয়াছে—তা ছাড়া তার চাকরাণ চার পাখী জমী আছে। শারদার অবস্থা মাধবের চেয়ে সচ্ছল। তবু শারদা দুঃখে কাঁদিল—নিদারুণ অপমানে কাঁদিল—মাধবকে ভালবাসিত বলিয়া অভিমানে সে কাঁদিল।

কিন্তু সে চুপচাপ মুখ বুজিয়া ভট্টাচার্য্যবাড়ীর কাজ করিয়া গেল—লোকে বুঝিল না কত বড় ব্যথা তার বুকে বাজিয়াছে।

এমনি করিয়া মাসের পর মাস চলিল। দুটি বৎসর ঘুরিয়া গেল।

১৮

দুই বৎসর পর একদিন শারদা দেখিতে পাইল গোপালের বাড়ীতে দুইখানা বড় ঘর উঠিতেছে—টিনের চালা, পাটির বেড়া!

শুনিতে পাইল গোপাল বাড়ী আসিবে। এবার সে স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করিতে আসিতেছে। ক্রমে সে শুনিতে পাইল যে গোপাল ইতিমধ্যে প্রায় এক থাদা জমী পত্তন লইয়াছে এবং একটা তালুকের অংশ কিনিয়া ফেলিয়াছে। সকলে বলিল গোপাল এখন একটা কেষ্টবিষ্টু গোছ হইয়া উঠিয়াছে।

শুনিয়া শারদার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। গোপালের এতখানি সৌভাগ্য হইয়াছে—সিকদারের ছেলে হইয়া সে এতটা উন্নতি করিয়াছে যে এখন সে গ্রামের দশজনের একজন হইয়া বসিয়াছে—তালুকদার হইয়াছে—ইহা কি কম আনন্দের কথা!

ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষার সহিত সে গোপালের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

গোপালের যে অভ্যুদয়ে শারদার এ আনন্দ তাতে গ্রামের লোকের, বিশেষতঃ ভদ্রলোকদের আক্রোশের সীমা ছিল না। গোপালের এ সম্পদ তাদের কাছে একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে হইল। কানাই সিকদারের ছেলে—গোলামের ছেলে—তার এতটা বৃদ্ধি ভদ্রলোক হইয়া কে বরদাস্ত করিতে পারে? কানাইয়ের ছেলে যে গ্রামে আসিয়া তাদেরই মত তালুকদার হইয়া বসিবে, প্রজার উপর আধিপত্য করিবে ইহা অসহ্য! তাঁরা সবাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "কালে কালে হ'ল কি?" কেহ বলিলেন ঘোর কলি! তবে সকলেই এই ভাবিয়া অল্পবিস্তর আশ্বস্ত হইলেন যে এতটা বৃদ্ধি ধর্ম্মে সহিবে না; গোপালের এ সম্পদ থাকিবে না।

এই সব কথা শুনিয়া শুনিয়া শারদার ব্রহ্মতালু জ্বলিয়া উঠিত। ভদ্রলোক মহাশয়দের কথার উপর কথা কহিবার মত বেয়াদবী তার ছিল না—তা ছাড়া গোপালের পক্ষে কোনও কথা বলা বিষয়ে তার সঙ্কোচও যথেষ্ট ছিল। কেন না, গোপালের সঙ্গে তার নাম জুড়িয়া কলঙ্কের কথা গ্রামে যথেষ্টই রটিয়াছিল। শারদা গোপালের সপক্ষে কোনও কথা বলিলে এই চাপা কুৎসাটা চট্ করিয়া মুখর হইয়া উঠিবে এ ভয় শারদার ছিল। তাই সে মুখ বুজিয়া রহিল, আর আনন্দ ও ব্যগ্রতার সহিত গোপালের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

একদিন সকালে সে নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিল—সেই ঘাট যেখানে ছিদাম মাঝি তার উপর অত্যাচার করিতে গিয়াছিল এবং তাকে রক্ষা করিয়াছিল গোপাল। নদীতে গা ডুবাইয়া সে চাহিয়া ছিল তীরের উপর গাছের দিকে, আর ভাবিতেছিল কি অসাধারণ উপস্থিত-বুদ্ধিবলে গোপাল ঐ গাছে চড়িয়া তাকে রক্ষা করিয়াছিল। সে কথা স্মরণ করিয়া তার চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিল।

একখানা বেশ বড় পানসী ধীরে ধীরে সেই ঘাটের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। শারদা সে দিকে পিছন ফিরিয়া ছিল, তাহা লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ নৌকার উপর হইতে একজন হাঁকিল "ওই মাগী সর!"

একটু সরিয়া গিয়া শারদা মুখ ফিরাইয়া চাহিল। সে দেখিতে পাইল আগা-নায় দাঁড়াইয়া গোপাল মাঝিদিগকে এই ঘাটে নৌকা লাগাইবার উপদেশ দিতেছে।

শারদার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে গায়ের কাপড় টানিয়া দিয়া হাসিমুখে গোপালের দিকে চাহিল।

গোপাল তাকে দেখিল, কিন্তু চিনিল কি না বুঝা গেল না। সে অবতরণের প্রতীক্ষা ও আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। শারদাকে দেখিয়া সে মুখ ফিরাইল।

অভিমানে শারদার বুক ভরিয়া উঠিল। সে মুখ ভার করিয়া গম্ভীরভাবে তার স্নান সমাধা করিয়া কলসী ভরিয়া তীরে উঠিল।

তখন নৌকা লাগিয়াছে। গোপাল নৌকা হইতে একটি বধূকে হাতে ধরিয়া সযত্নে নামাইতেছে। বধূর আকণ্ঠ ঘোমটা টানা, তার মুখ দেখা গেল না। তার পশ্চাতে একটি দাসী।

শারদা একবার চক্ষু ফিরাইয়া চাহিল। তার বুকের

ভিতর খচ্ করিয়া উঠিল। তখনই গোপালও একবার তার দিকে চাহিল। চোখে চোখে দেখা হইতেই গোপাল চোখ ফিরাইল।

শারদা জল হইতে উঠিয়া প্রবল পদক্ষেপে অগ্রসর হইল। চলিতে চলিতে সে শুনিতে পাইল তার পশ্চাতে গোপাল মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "ও মাগী সেই দুর্গা তাইত্যানির মেয়া না ?"

মাঝি উত্তর করিল "হ'—শারদী।"

শারদার বুকের ভিতর কথা কয়টা বিদ্যুতের মত ঝলক দিয়া গেল। গোপাল তাকে চিনিয়াছে! তার অবহেলা তবে ইচ্ছাকৃত! "মাগী" এবং "দুর্গা তাইত্যানির মেয়া" বলিয়া তাকে সম্ভাষণ করিয়াছে গোপাল! শারদার বুকে আগুন জলিয়া উঠিল। সে দ্রুতপদে গৃহে চলিয়া গেল।

ঘরে গিয়া শারদা খুব খানিকটা কাঁদিল। সে বড় আশা করিয়া গোপালের আগমনের প্রতীক্ষা করিয়াছিল। নিজের কোনও লাভের আশায় সে ব্যাকুল হয় নাই, কেন না তার কোনও কিছুর প্রয়োজন ছিল না। তার খাওয়া পরার দুঃখ নাই, যৎকিঞ্চিৎ সম্বলও আছে। সে যেমন সচ্ছলতার সহিত তার দরিদ্র জীবন যাপন করিতেছে ইহার চেয়ে ভাল থাকিবার কোনও আদর্শ তার মনে কোনও দিন ছিল না, তাই তার আকাঙ্ক্ষাও তেমন কিছু ছিল না। গোপালের যে সম্পদ তাতে তার কোনও উপকার হইবে এ আশা বা আকাঙ্ক্ষা তার ছিল না। গোপালের প্রেমের লোভও সে করে নাই। একদিন গোপাল তার রূপ যৌবনের কাছে পরাভূত হইয়া তার কাছে দীনভাবে প্রেমভিক্ষা করিয়াছিল, তাহাকে শারদা নির্ম্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। আজ যদিও সে স্বামীর সহবাসে বঞ্চিতা, তবু তার মনের ভাব আজও ঠিক তেমনি আছে। ধর্ম্ম খোয়াইয়া পরপুরুষের প্রেমসম্ভোগের কল্পনাও তার চিত্তে আসে না। তবু সে আনন্দের সহিত গোপালের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিয়াছিল—কেন না গোপাল তার বন্ধু—তার পরম স্নেহের পাত্র,—তার অভ্যুদয়ে তার আনন্দ।

তা ছাড়া যদিও ধর্ম্ম খোয়াইয়া গোপালের কাছে আত্মবিক্রয় সে করিতে চায় না তবু গোপাল যে তাকে এমনি পাগল হইয়া ভালবাসে ইহাতে তার মনে একটা বিচিত্র তৃপ্তি ছিল। কত যে ভালবাসে গোপাল তার বহু পরিচয় শারদা পাইয়াছে। সে ভালবাসার কল্পনায় তার চিত্ত পুলকিত হইত, যদিও তার তৃপ্তিদান করিবার শক্তি বা আকাঙ্ক্ষা তার ছিল না। এই যে প্রীতি ও তৃপ্তি ইহা ছিল তার প্রাণের গোপন সম্পদ। সজ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক সে ইহা পরম পরিতৃপ্তির সহিত অন্তরে উপভোগ করিত।

তাই শারদা বড় ব্যথিত হইল। এত ব্যথা তার যে কেন তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার শক্তি তার ছিল না। কিন্তু ব্যথায় তার বুক যেন ভাজিয়া পড়িতে লাগিল। গোপাল যে তাকে জানিয়া ও চিনিয়া তার তৃপ্তি বা আনন্দের কোনও পরিচয় দেওয়া দূরে থাকুক, তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া অবজ্ঞার সহিত তাকে সম্ভাষণ করিল ইহা তার পক্ষে অসহ্য। 'মাগী' বলিয়া গ্রামের ভদ্রসমাজের সবাই তাকে সম্ভাষণ করে, দুর্গা তাঁতিনীর কন্যা সে, সে কথাও সুপরিচিত। কিন্তু তাই বলিয়া সে কথা তাকে বলিবে গোপাল! এই তো সেদিনও গোপাল তার পায় পড়িয়া প্রেমভিক্ষা করিয়াছে, সে রাণীর মত তাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাকে আদেশ করিয়াছে। আর সেই গোপাল তাকে এমনি সম্ভাষণ করিল! আর কি সে গোপাল! ভদ্রলোকের কাছে অবজ্ঞার সম্ভাষণে দরিদ্রেরা চিরদিন অভ্যস্ত, তাতে তারা দোষ মনে করে না। কিন্তু গোপাল! কানাই খানসামার পুত্র গোপাল,—সে তাকে এমন অবজ্ঞা করে কি সাহসে? ক্রোধে দুঃখে শারদার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। একটা খুব শক্ত রকম প্রতিশোধ লইবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইল তার চিত্তে। কোনও উপায় মনে আসিল না, কিন্তু গ্রামের আর সকলের মত সেও এখন মনে মনে ইহা স্থির করিল যে এতটা বৃদ্ধি ধর্ম্মে সহিবে না—গোপালের পতন হইবেই।

তা ছাড়া, আর এক দিক দিয়া গোপাল শারদাকে তীব্র আঘাত করিয়াছিল—সে কথা শারদা নিজের কাছেও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল। গোপাল সঙ্গে আনিয়াছে একটি বধূ—বিবাহ করিয়া আসিয়াছে সে।

কিছুই আশ্চর্য্য নয়। বিবাহের বয়স তার হইয়াছে, সে বিবাহ করিবে না কেন? তবু!—শারদার বুকটা যেন ইহাতে অযথা চিরিয়া গেল। তার মনে হইল কত আদরের কথা গোপাল তাকে একাধিকবার বলিয়াছে, কত প্রেম তাকে জানাইয়াছে। শারদাকে লইয়া সমাজ ত্যাগ করিয়া সে সমস্ত জীবন উজাড় করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এত ভালবাসা গোপালের ছিল! আর সে কি না বিবাহ করিয়া বসিল!

যুক্তির দিক হইতে শারদার কিছুই বলিবার নাই। কেন না, একে তো সে-কালে পুরুষের পক্ষে প্রেমে একনিষ্ঠতা কেহ আশাই করিত না। প্রেমময়ী পত্নী সত্বেও বিবাহ করাটা সেকালে কোনও একটা দোষের কথাই ছিল না, অবৈধ প্রণয়ের তো কথাই নাই। তা ছাড়া গোপালের এই যে ভালবাসা, শারদা তো তার প্রতিদান দেয় নাই, কোনও দিন দিতে চায় নাই। তবে তার জোর কিসে? কি ওজুহাতে সে আক্ষেপ করিতে পারে? এই সহজ প্রশ্নটা কিন্তু শারদার কিছুতেই মনে হইল না। তার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিল সুধু এই ভাবিয়া যে গোপালের যে ভালবাসা তার গোপন সম্ভোগের ঐশ্বর্য্য ছিল তাহা আর নাই, ওই বালিকা বধূ তাহা নিঃশেষে লুটিয়া লইয়াছে। শারদার মনে হইল ইহা বড় অন্যায়—ইহা তাহার প্রতি একটা নির্ম্মম অত্যাচার!

তাই শারদা পড়িয়া পড়িয়া খুব খানিকটা কাঁদিল। তার পর সে উঠিল।

তার দুই বছরের ছেলেটা আঙিনায় ধূলায় লুটোপুটি হইয়া খেলা করিতেছিল পাড়ার আর কয়েকটি ছেলেপিলের সঙ্গে; শারদা তাকে ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া কোলে তুলিয়া মনিব বাড়ী কাজ করিতে চলিল।

পথে যাইতে যাইতে তার দুই তিনটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হইল, তারা ছুটিয়াছে গোপালের বাড়ীর দিকে। গোপাল আসিয়াছে—বউ লইয়া আসিয়াছে এই খবর রটিয়া যাইতেই গ্রামের সবাই কৌতূহলী হইয়া তার বাড়ীতে ছুটিয়া চলিয়াছে, দেখিবার জন্য। সকলেই শারদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই যাবি না?" শারদা উদাসভাবে উত্তর করিল "না—আমার কাম আছে।"

মনিব বাড়ী গিয়া শারদা দেখিতে পাইল রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া মোক্ষদা খুব হাত পা নাড়িয়া অনেক কথা বলিতেছে, আর গৃহিণী ও বধূরা মিলিয়া ব্যগ্র কৌতূহলের সহিত তার কথা শুনিতেছেন।

শারদাকে দেখিয়া মোক্ষদা হাসিয়া বলিল, "শারদী, গোপাইলা আইচে দেখছস নি? গেছিলি তুই?"

শারদা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত "না" বলিয়া রান্নাঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সে লক্ষ্য করিল কথাটায় সুধু মোক্ষদা নয়, গৃহিণী ও বধূরা সকলেই একটু মুচকি হাসি হাসিলেন। সে হাসিতে তার বুকের ভিতরটা যেন চিড় বিড় করিয়া উঠিল।

ঘরের ভিতর বসিয়া শাক বাছিতে বাছিতে শারদা শুনিতে পাইল মোক্ষদা শতমুখে গোপালের সম্পদের বর্ণনা করিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার নূতন বড়মানসীর প্রতি শ্লেষ করিতেছে। মোক্ষদা বলিল গোপালের বউটি দিব্যি সুন্দরী এবং তার গা' ভরা সোণার গহনা। বয়সও তার কম হইবে না, বছর বারো—দিব্যি 'ডাঙর' মেয়ে। বউ না কি ভাল ভদ্র কায়স্থের মেয়ে। তার বাপ গাইবান্ধায় ওকালতী করে। গোপাল সেখানে তার খানসামা বাপের পরিচয় গোপন করিয়া ঘোষ পদবী গ্রহণ করিয়া ভদ্রলোক বলিয়া আপনাকে চালাইয়া দিয়াছিল এবং সেই পরিচয়ে সে মিত্রের মেয়ে বিবাহ করিয়াছে। বিবাহ হইয়াছে প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে, এইবারে গোপাল পরিবার লইয়া দেশে বাস করিতে আসিয়াছে। অনেক জিনিষপত্র সে লইয়া আসিয়াছে, বাড়ীতে ছুতার মিস্ত্রি লাগাইয়া সে খাট পালঙ্ক সিন্দুক প্রভৃতি তৈয়ার করিয়াছে, এবং "টেবুল" ও চেয়ারও বানাইয়াছে। তার "কাচারী ঘর" হইয়াছে। সেখানে লম্বা ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া গোপাল লোকজনের সঙ্গে কথা কহিতেছে, যেন সে চোদ্দ পুরুষের জমীদার। লতিফ সরকার তার গোমস্তা—সে কাছারীঘরের এক কোণায় বসিয়া কাগজপত্র লইয়া প্রজাদের সঙ্গে দরবার করিতেছে। তার চাল-চরিত্র জাঁকজমক প্রায় জমীদার বাড়ীর মত—ইত্যাদি।

গৃহিণী গোপালের স্পর্দ্ধায় অবাক হইয়া গেলেন। এই গ্রামে বসিয়া, কানাই সিকদারের ছেলে হইয়া

সে যে কি স্পর্দ্ধায় এই বড়মানসী করে তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। বৃদ্ধ জমীদার মহাশয় মারা গিয়াছেন—তিনি বাঁচিয়া থাকিলে গোপালের ঘরবাড়ী ভাঙিয়া উহাকে উচ্ছন্ন দিতেন। তিনি গিয়াছেন, এবং যাইবার পূর্ব্বেই তাঁর ছেলেদের ঋণজালে জড়িত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, ছেলেদের সর্ব্বস্ব যায় যায় হইয়াছে। নতুবা ছেলেরা গোপালকে আস্ত রাখিত না।

কথাগুলি শুনিতে শুনিতে শারদার যেন দম ফাটিবার উপক্রম হইল। তার শাক বাছা হইয়া গেলে সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পুকুর ঘাটে শাক ধুইতে গেল। সেখানে তখন একপাল মেয়ে-ছেলে স্নান করিতে আসিয়াছে—তাদের মুখে অন্য কথা নাই, সুধু গোপাল ও তার বউ! শারদাকে দেখিয়াই সকলে পরম কৌতূহলের সহিত সেই এক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিল—শারদা গোপালের বাড়ী গিয়াছিল কি না। শারদা যখন নিদারুণ বিরক্তির সহিত উত্তর দিল যে সে যায় নাই, তখন সকলেই বিস্ময়ের সহিত এমন ভাবে বলিয়া উঠিল "তুই যাস নাই?" তাদের প্রশ্নের ভিতর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বুঝিতে শারদার কোনই কষ্ট হইল না। শারদা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শাক ধুইতে লাগিল।

একজন জনান্তিকে আর একজনকে বলিল, "ও আর এখন যাইবে কেন? যে বউ আনিয়াছে গোপাল—এখন কি আর শারদার দিকে চাহিবে?"

কথাটা শারদার কাণে গেল। সে একবার বিষাক্ত দৃষ্টিতে সেই মেয়েটির দিকে চাহিল। মেয়েটি তাতে হাসিল।

রোষে ক্ষোভে জর্জ্জরিত হইয়া শারদা তাড়াতাড়ি তার শাকের চুপড়ী লইয়া রান্নাঘরে ফিরিল।

বড় বধূ রান্না করিতেছিলেন। উনানে বড় ধোঁয়া হইতেছে—ফুঁ পাড়িতে পাড়িতে তাঁর চক্ষু লাল হইয়া গিয়াছে। তিনি শারদাকে দেখিয়া বলিলেন, বাইরের চাকর কালাইনাকে এক বোঝা শুকনো কাঠ আনিতে বলিতে। কালাইনা বাড়ীতে কামলার কাজ করে।

শারদা কালাইনার সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে বাহির বাড়ীতে গেল। সেখানে কালাইনা উঠানে বসিয়া দায়ে তামাক কাটিতেছিল। শারদা তাকে দেখিয়া বলিল—"এই কালাইনা—শোন"—তখনই শারদার চোকে যাহা পড়িল তাতে সে এক মুহূর্ত্ত কথা কহিতে পারিল না।

শারদা দেখিল তার সম্মুখে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বৈঠকখানায়—গোপাল! এক মুহূর্ত্ত সে স্তব্ধ হইয়া স্থির দৃষ্টিতে চিত্রার্পিতবৎ তার দিকে চাহিয়া রহিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় মলিন ফরাসের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছেন। গোপাল আসিয়া তাঁর পদধূলি লইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া বিনীত ভাবে কথা কহিতেছে। অনেকক্ষণ কথা হইল, কিন্তু গোপাল দাঁড়াইয়াই রহিল। কারণ, তার বসিবার জায়গা নাই। গ্রামের চিরন্তন প্রথা অনুসারে ফরাসে বসিবার অধিকারী শুধু ভদ্রলোকেরা। গোপালের ভদ্রলোকত্বের দাবী গ্রামে টিঁকিবে কি না সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ থাকায় সে ফরাসে বসিতে সাহস করিল না। বাজে লোক যারা, তারা বসে মেঝের চাটাই পাতিয়া, সেখানে 'বাজে লোক'দের সঙ্গেও গোপাল বসিতে পারে না। তাই সে একটা খুঁটায় ঠেস দিয়া সমস্তক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

চিত্রার্পিতবৎ শারদা তার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

কালাইনা তাহা দেখিয়া একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কও, কি কইবা।"

চমক ভাঙিতে শারদা প্রথমে ভুলিয়া গেল যে সে কালাইনাকে কি কথা বলিতে আসিয়াছিল। তার পর খানিক ভাবিয়া তার স্মরণ হইল। কালাইনাকে কাঠ আনিতে পাঠাইয়া সে আবার গোপালের দিকে চাহিল। এবার গোপালও তার দিকে চাহিল।

শারদা তৎক্ষণাৎ চক্ষু ফিরাইয়া দ্রুতপদে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল।

রান্নাঘরে বসিয়া বাটনা বাটিতে বাটিতে তার চক্ষের জল সে কিছুতেই রোধ করিতে পারিল না। বার বার নোড়া হইতে হাত উঠাইয়া সে চক্ষু মুছিতে লাগিল।

বড় বউ তাহা লক্ষ্য করিয়া সদয় ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদিস কেন?"

কিছুক্ষণ শারদা কোনও উত্তর দিল না—বড় বউর প্রশ্নে তার বুক হইতে আরব্ধ কান্না যেন ঠেলা মারিয়া আসিতে লাগিল।

বড় বউ উঠিয়া কাছে আসিলেন। বার বার প্রশ্ন করিতে শেষে চক্ষু মুছিয়া শারদা বলিল, "আমি কান্দুম না তো কাইন্দবো কে বোঠাইকান। আমার মত দুঃখী আছে কে? সোয়ামী থাইকতে আমার সোয়ামী নাই। পোলাড়া আছে সে বাপের মুখ দেইখলো না। দুঃখে কষ্টে আছি কোনও মতে—কপালের লেখা, কি করুম। কিন্তু তার উপর ইরা সকলে আমারে এমুন জ্বালা দেয়! কনচে বোঠাইকান, আমি কি করছি ইয়াগো যে সকলে আমারে এমুন খোটা দিয়া জ্বালায়? আইজ গোপাইলা আইচে থিক্যা সকলে আমারে খোচাইবার লইচে—যেন গোপাইলা আমার কি? আপনার পাও ছুইয়া কই বোঠাইকান—ইয়া একিবারে মিছা কথা। কোনও দিন গোপাইল্যার সাথে আমি কোনও কিছু করি নাই। সে আমারে সাইধছে—আমি তারে তারাইয়া দিছি—সোয়ামী ছাড়া কোনও পুরষেরে আমি চক্ষু ফিরাইয়া দেখি নাই। তবু ইরা আমারে এমুন ফৈজত করে ক্যান কনচ?"

বড় বউর পা ছুঁইয়া শারদা এই শপথ করিল—আর কাঁদিয়া সে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সহৃদয়তার সহিত বড় বধূ তাকে নানা রকমে সান্ত্বনা করিলেন, যদিও শপথ সত্ত্বেও তিনি শারদার সকল কথা ঠিক বিশ্বাস করিলেন না।

অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া শারদা বলিল, "আপনার পায় ধরি বউঠাইকান, কারুইরে কইবেন না আমি যে কান্দছি। আপনারে যা কইলাম ইয়া কাউরে আমি কই নাই। কমু ক্যান? কেউ কি ইকথা শুইনবার চাইচে কোনও দিন? জিগাইছে আমারে? তবে আমি কমু ক্যান? আপনারে ব্যাগত্তা করি বউ ঠাইক্যান কাউরে কইবেন না।"

বড় বধূ তাকে আশ্বাস দিলেন। কাঁদিয়া কাটিয়া বুকের বোঝা কতকটা নামাইয়া শারদা আবার কাজ করিতে লাগিল।

শারদা যাহা বলিয়াছিল তাহাই তার দুঃখ বা অশ্রুপাতের সম্পূর্ণ হেতু নহে। ইহা ছাড়া অন্য হেতু যাহা ছিল তাহা সে নিজের কাছেও স্বীকার করিল না, হয় তো বা বুঝিলও না। গোপালের অনাদর ও অবজ্ঞা তার বুকের ভিতর বিষের ছুরীর মত বসিয়া গিয়াছিল, কেন না, সমাজ ও সংস্কারের তাড়নায় সে গোপালকে যতই জোরে প্রত্যাখ্যান করুক তার মনের গোপন কন্দরে ছিল গোপালের প্রতি ভালবাসা এবং তার জন্য একটা তীব্র কামনা। সেই কামনা কর্ত্তব্যবোধের চাপে নিপীড়িত নিষ্পেষিত হইয়া প্রকাশ হইত শুধু একটা কামনাহীন স্নেহরূপে। যতদিন গোপাল তাকে কামনা করিয়াছে ততদিন পর্য্যন্ত ইহার বেশী কিছু সে চায় নাই, এবং এই প্রীতির সম্পর্কেই সে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু আজ গোপালের অনাদরের অভিমানে তার সেই নিষ্পেষিত কামনা বুক ঠেলিয়া ভাসিয়া উঠিয়া তাকে দুঃখে ভাসাইয়া দিতেছিল।

তার মনে হইল, সে ইচ্ছা করিলেই তো সব পাইতে পারিত। গোপাল তার পায় ধরিয়া সাধিয়াছিল মাধবকে ছাড়িয়া যাইতে। সে কথা তখন রাখিলে আজ গোপালের যে ঐশ্বর্য্য সবই তো তার হইতে পারিত, আর ওই দুগ্ধপোষ্য বালিকার উপর গোপাল যে ভালবাসা উজাড় করিয়া দিতেছে, সে সব ভালবাসা তো তারই চরণে নিবেদিত হইত। সেই তো মাধবকে ছাড়িয়াই আসিল সে—মাধব তাকে পরিত্যাগ তো করিল—তখন যদি সে ছাড়িত তবে তার অদৃষ্ট ফিরিয়া যাইত, তবে আর আজ তার একলা শুইয়া চক্ষের জলে কাঁথা ভিজাইতে হইত না। শুধু একবার নয়, বার বার গোপাল তার হাতের কাছে এ সৌভাগ্য বাড়াইয়া দিয়াছিল, বার বার শারদা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। গোপালের কি দোষ—দোষ তার অদৃষ্টের!

বিন্দুর কথা তার মনে পড়িল। রূপযৌবনের গৌরব লইয়া শারদা তার স্বামীকে বিন্দুর কবল হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য কত না যত্ন করিয়াছিল। আজ সে বুঝিল কি বেদনা বিন্দু তাতে পাইয়াছিল।

তার নয়নের মণি শিশু পুত্রকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া শারদা সান্ত্বনা খুঁজিল। কিন্তু সন্তানের স্নেহে তার হৃদয়ের এ দারুণ বুভুক্ষা মিটিল না। সে হতাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

খাইবার পাশ

রমাবতী ঘোষ

ভারতীয় নারীগণের অনেকেই কালাপানি পার হইয়া সুদূর ইংলণ্ড, ইয়োরোপ, এমন কি, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছেন ; কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁহাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকেরই "খাইবার পাশ" দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে।

ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দেখিবার ইচ্ছা আমার অনেক দিন হইতেই ছিল। তার পর যখন সত্যসত্যই আমার সে আশা পূর্ণ হইবার সুযোগ মিলিল, তখন আমি আর নিজেকে ঘরের ভিতর আটকাইয়া রাখিতে পারিলাম না। তাই মে মাসের খর রৌদ্রতাপকে অগ্রাহ্য করিয়া সে দিন কাশ্মীরের পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। সর্ব্ব প্রথমে আমরা "খাইবার পাশ" দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাই গোড়াতেই আমি এই গিরিপথটীর সম্বন্ধে কিছু বলিব।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঙ্গে বিজড়িত "খাইবার পাশ" না দেখিয়া কাহারও পেশোয়ার ত্যাগ করা উচিত নয়। যে দুর্গম গিরিপথ একদিন দুর্দ্দান্ত শিখসৈন্য ও ভারতীয় বৃটিশ সৈন্যগণের মনে মহাভীতির সঞ্চার করিত, সেই পথই ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্যার জর্জ্জ পোলক নামক একজন ইংরেজ সেনাপতি মাত্র ৮০০০ সৈন্য লইয়া নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী নভেম্বর মাসে আবার এই সৈন্যদল এই পথ দিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যখন দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ আরম্ভ হয়, সেই সময়ে ইংরেজ সেনাপতি স্যার সাম ব্রাউন 'আলি মস্‌জিদ' আক্রমণ করেন। কিন্তু শত্রুপক্ষ রাত্রিযোগে এই স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। এই গিরিপথ ১৮৯০ হইতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত খাইবারের বরকন্দাজগণের অধিকারে ছিল। পরে খাইবারের পার্ব্বত্য সৈন্যগণ উহা অধিকার করিয়া লয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে 'ল্যাণ্ডিকোটাল' একটী ক্ষুদ্র সৈন্যদলের প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়াছে। এক দল ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-সৈন্য, দুই দল ভারতীয় সৈন্য ও এক দল পদাতিক তথায় অবস্থান করে। জামরুদ, আলি মস্‌জিদ, ও ল্যাণ্ডিখানার সৈন্যদল ভারতীয় পদাতিক সৈন্য লইয়াই গঠিত। খাইবার আফ্রিদিসের জেক্কাকেল, কুকিখেল, মালিকদিন, কামরাই, কাম্বার খেল ও সিকা প্রভৃতি প্রধান দলের সৈন্য-সংখ্যাও প্রায় ২০ হাজারের বেশী। আদাম খেলের সহিত এই গিরিপথের বিশেষ কোন সংস্রব নাই। কাবুল নদীর উত্তরে মহামান্দ ও তীরার দক্ষিণে ওরাকজাই পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত। উহারা কোহাট জেলা হইতে শমন পর্ব্বতমালা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

আফগান সীমান্ত (লাণ্ডিকোটালের দিকে)

পেশোয়ার হইতে উভয় দিক দিয়াই আজকাল এই গিরিপথ অতিক্রম করা যায়। সাধারণ ট্রেন ব্যতীত, লাহোরে N. W. রেলওয়ের এজেণ্টদিগের নিকট

আবেদন করিলে বিশেষ যাত্রী-গাড়ি পাওয়া যায়। ঐ গাড়িতে রন্ধনের ও চাকরদিগের থাকিবার উপযুক্ত স্থান আছে। পেশোয়ারে গাড়ী বদল না করিয়া এই বিশেষ গাড়ীগুলি দ্বারা সোজাসুজি এই গিরিপথ অতিক্রম করা যায়।

লাহোরের এজেণ্ট বা রাওয়াল-পিণ্ডির বিভাগীয় সুপারিনটেণ্ডেণ্ট্ এর নিকট আবেদন করিয়া রেল-মোটর যোগেও এই গিরিপথ অতিক্রম করা যায়। প্রাতঃকালে পেশোয়ার ত্যাগ করিয়া যদি অন্য পথে ভ্রমণের ইচ্ছা থাকে, তবে রেলওয়ে কোম্পানী চালকসহ চারিজন লোক বসিবার স্থান সংযুক্ত মোটর গাড়ী সরবরাহ করিতে

অনুমতি লইবার আবশ্যক হয় না। মধ্যে মধ্যে আইন প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হওয়ায় পেশোয়ারে খাইবারের রাজ-কর্ম্মচারীর নিকট পূর্ব্ব হইতে খোঁজ লইতে হয়। ল্যাণ্ডি-কোটাল ও ল্যাণ্ডিখানার মধ্যস্থিত মিচানিকুণ্ড পর্য্যন্ত যাইতে হইলে কোন অনুমতি লইতে হয় না। কিন্তু উহা পার হইয়া যাইতে হইলেই এই অনুমতি আবশ্যক। এই অনুমতি পাইতে হইলে রাজনৈতিক প্রতিনিধির নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আবেদন করিতে হয়। খাইবার রেলওয়ের কোন refreshment room না থাকায় যাত্রীগণের Luncheon basket এ করিয়া আহার্য্য ও পানীয় লওয়া উচিত। পেশোয়ার হইতে ১০ মাইল

মেডানক
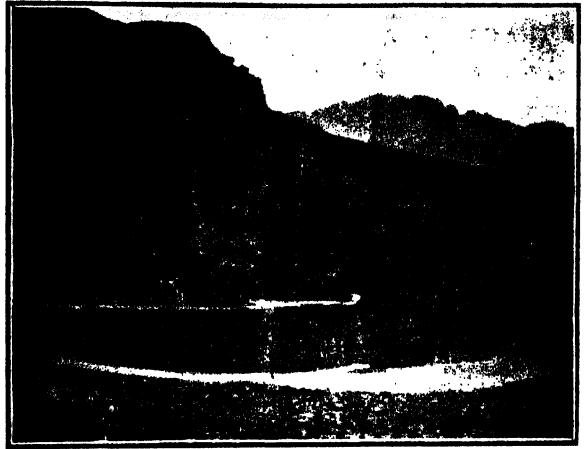
ল্যাণ্ডিকোটালের নিকটস্থ সেতু

পারে। এই গাড়ীতে করিয়া ল্যাণ্ডিকোটাল (32 miles) ও ল্যাণ্ডিখানা (37 miles) পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। ফিরিবার সময়ও এই গাড়ী ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিংবা এই দুই স্থান হইতে দুপুরে ট্রেন ও রেল-মোটর পাওয়া যায়। পেশোয়ার ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে ল্যাণ্ডিকোটাল ও ল্যাণ্ডিখানার প্রথম শ্রেণীর ট্রেণভাড়া যথাক্রমে তিনটাকা ও সাড়ে-তিন টাকা। রেল-মোটরের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ব্যতীত পাঁচ টাকা করিয়া বেশী দিতে হয়। পেশোয়ার ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে পূর্ব্বোক্ত মোটরগাড়ির যাতায়াতের ভাড়া ৮০৲ টাকা। যদি রেলপথে ল্যাণ্ডিখানা যাওয়া যায়, তবে কোন

রাস্তা প্রস্তরময় এবং প্রকৃত পক্ষে পেশোয়ারের সাড়ে দশ মাইল দূরে জামরুদের দুই মাইল পরেই গিরিপথ আরম্ভ হইয়াছে। গিরিপথের মধ্য দিয়া দুইটী রাস্তা আছে। একটী মোটর যাইবার পথ ও অন্যটী কাফিলা গাড়ী ও বলদ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ প্রভৃতি যাইবার পথ। এই জন্য বুনোরা পেশোয়ার হইতে সপ্তাহে মাত্র দুইবার এই পথ দিয়া যাতায়াত করে। বহু প্রাচীন কাল হইতেই এই গিরিপথ বাণিজ্যের প্রধান রাস্তা। এবং এখনও মাল বোঝাই হইয়া অনেক যানাদি এই গিরিপথ অতিক্রম করিয়া থাকে। মঙ্গলবার ও শুক্রবার বণিকগণ বাণিজ্য উপলক্ষে বাহির হয়। এবং ঐ দুই দিন খাস্‌সাদররা (Khassadars)

এই গিরিপথে পাহারা দিয়া থাকে। খাস্‌সাদর একটী স্থানীয় সৈন্যদল। ইহারা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী এবং খাইবারের রাজপ্রতিনিধিগণের অধীনে। কিন্তু সর্দ্দার ও অস্ত্র-শস্ত্র ইহাদের নিজেদের। কাফিলা-গাড়ি শরৎ ও বসন্ত কালে দেখিতে পাওয়া যায়। এই-গুলি কখনও কখনও ৫ মাইল পর্য্যন্তও লম্বা দেখা যায়। এগুলি ভারতের একটী দেখিবার জিনিষ। বণিকগণ ব্যতীত প্রায় এক লক্ষ পার্ব্বত্য জাতি তাহাদের পরিবার-বর্গ লইয়া বৎসরে দুইবার এই গিরিপথ দিয়া গমন করে। শীতের প্রারম্ভে তাহারা মজুর খাটিবার নিমিত্ত সমতল ভূমিতে নামিয়া আসে; এবং বসন্তের আগমনেই আবার ফিরিয়া যায়। তাহাদের এই বাৎসরিক ভ্রমণের তুল্য আড়ম্বরপূর্ণ দৃশ্য আর কিছুই নাই। জামরুদ হইতে এই গিরিপথ অস্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হয়। বর্ত্তমান দুর্গটী শিখ-সেনাপতি সর্দ্দার হরিসিং নালবা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাজা রণজিতসিংহের প্রতিনিধিরূপে তিনি উহা রক্ষা করেন। কিন্তু ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দোস্ত মহম্মদ প্রেরিত আফগান সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। তাঁহার শবদেহ পেশোয়ারের পথের উপর এক স্থানে পোড়ান হইয়াছিল, ঐ স্থানটী এখনও বার্জ্জ হরিসিং নামে খ্যাত। এই দুর্গের প্রাচীরগুলি দশ ফুটের বেশী প্রশস্ত ও ফটকগুলি সুরক্ষিত। ইহারই মধ্যে সেনানিবাস ও রসদের কুটী আছে। ইহার বহির্ভাগেই অর্দ্ধসাপ্তাহিক কাফিলা গাড়ী, রাত্রিতে যখন গিরিপথ বন্ধ থাকে, তখন এইখানেই অবস্থান করে।

জামরুদ হইতে যখন বাঁকা রাস্তা ধরিয়া গাড়ী চলিতে থাকে, এক উচ্চ গিরিশৃঙ্গের উপর অবস্থিত "মজে" দুর্গটী তখন বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র মস্‌জিদও নয়নপথে পতিত হয়। ইহার শীর্ষভাগ-গুলি markhar-মণ্ডিত। এই রাস্তাটী একটী উপত্যকার মধ্য দিয়া ম্যাকেসন পর্ব্বতের উপর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। বিখ্যাত রাজপ্রতিনিধি ম্যাকেসনের নামানুসারে এই পর্ব্বতের নামকরণ করা হইয়াছে। ১৮৫৩ খৃঃ একজন আফগান কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত পেশোয়ারের অন্তর্গত মল পাহাড়ের উপর একটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

জামরুদের দক্ষিণে অবস্থিত সমতল প্রদেশের উপর দিয়া খাইবার নদী চলিয়া গিয়াছে এবং পথটীও নামিয়া আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে গিরি-পথের উত্তরে অবস্থিত টার্টারার (6800 ft) শিখরগুলির একটী সুন্দর দৃশ্য নয়নগোচর হয়। তাহার পর আগ্রাই পর্ব্বতমালা পার হইয়া গেলে পার্ব্বত্য চূড়াগুলি ও আলি মস্‌জিদ দুর্গ দৃষ্ট হয়। গিরিপথটী এইখানে অত্যন্ত
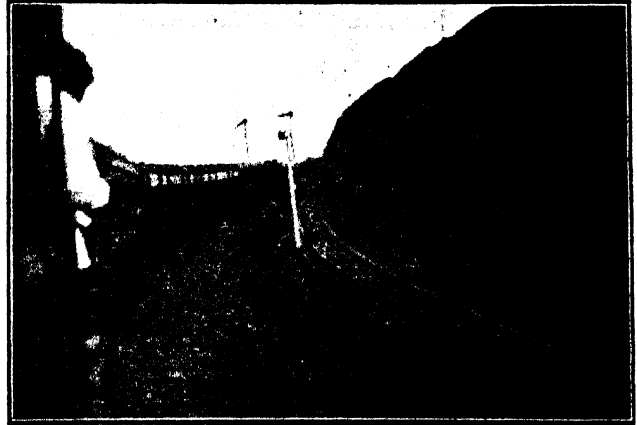
খাইবার পাশের রেল লাইন

অপ্রশস্ত এবং উভয় পার্শ্বেই পর্ব্বতবেষ্টিত। আলি মস্‌জিদের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতগুলিই বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য। পথটী নদীর উত্তর দিক দিয়া চলিয়া গিয়াছে। গিরিপথটী অতিক্রম করিয়া "লালাবেগ" হইতে ল্যাণ্ডিকোটাল (3373 ft) পর্য্যন্ত বিস্তৃত নির্জ্জন উপত্যকার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ল্যাণ্ডিকোটাল পৌঁছিবার তিন মাইল পূর্ব্বেই দু'হাজার বৎসরের প্রাচীন "শালা স্তূপ" অতিক্রম করিতে হয়। রেলরাস্তা ও সাধারণ রাস্তার নিকটবর্ত্তী একটী উন্মুক্ত পর্ব্বতের উপর ইহা অবস্থিত। একটী প্রশস্ত প্রাচীরের উপর অবস্থিত একটী চতুষ্কোণের উপর ইহা উত্তোলিত হইয়াছে। এখানে

উভয় পার্শ্বে শিষ্য-পরিবেষ্টিত বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পিসগা শৃঙ্গ (4500 ft) হইতে

খাইবার পাশ

ল্যাণ্ডিকোটালের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত উপত্যকার দৃশ্য অতীব সুন্দর ; ইহা আফ্‌গান সীমান্ত "ডাকা" হইতে

লাণ্ডিকোটালে ভ্রমণকারী দল

জালালা[illegible] ([illegible]1 miles from Peshawar) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। [illegible] (জালালুদ্দিন) আকবরের নামানুসারে ইহার নাম জালালাবাদ হইয়াছে। এই স্থানটী ১৮৪১ খৃঃ ১২ই নভেম্বর হইতে ১৮৪২ খৃঃ ই এপ্রিল পর্য্যন্ত সেনাপতি স্যর রবার্ট সেল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছি। ল্যাণ্ডিকোটাল হইতে মিচনিকুণ্ড পার হইয়া আফগান সীমান্তের দুই মাইল দূরবর্ত্তী ল্যা'ণ্ডখানা পর্য্যন্ত খাড়াই ভাবে নামিতে হয়। সীমান্ত পার হইতে একেবারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া আছে।

খাইবার পাশের মধ্য দিয়া রেলপথ চালাইবার কথা ১৮৭৯ খৃঃ হইতে চলিতেছিল, কিন্তু ১৯২০ খৃঃ তাহার প্রকৃত গঠনকার্য্য আরম্ভ হয়। ১৯২৫ খৃঃ নভেম্বর মাস হইতে এই পথে গাড়ী চালান হয়। এই রেলপথ তৈয়ার করিতে ২৭১ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল। দার্জ্জিলিং রেলওয়ে, কাল্‌কা সিমলা রেলওয়ে প্রভৃতি ভারতীয় রেলওয়ে-গুলির মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা জামরুদ হইতে আরম্ভ হইয়া ২৬½ মাইল বিস্তৃত। সমস্ত রেলপথটাই বৃটিশ ভারতের বহিঃস্থ পার্ব্বত্যদেশে অবস্থিত। অনেক আঁকিয়া বাঁকিয়া ও অনেক সেতুর উপর দিয়া ও অনেক সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া উহা চলিয়া গিয়াছে। ল্যাণ্ডিকোটালে ইহার উচ্চতা প্রায় ৩৫০০ ফিট্। এই রেলপথটী ৩৪টী সুড়ঙ্গ ও ৯২টী সেতুর উপর দিয়া গিয়াছে। ষ্টেশনগুলি ঠিক দুর্গের আকারে নির্ম্মিত। জামরুদের ঠিক পরেই বগিয়াড়া ষ্টেশন। ইহা গিরি-পথটীর ঠিক সম্মুখেই অবস্থিত। উপত্যকার উপরে সেতুর উপর দিয়া রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। এই উপত্যকার উপর মোটর প্রভৃতি যাতায়াতের রাস্তা আছে। আর একটী লম্বা বাঁক ঘুরিয়া ট্রেনগুলি প্রথম reversing Station

মেডানকে পৌঁছায়। তাহার পরে রেলপথ কাফির টাজি নামক সুড়ঙ্গের সম্মুখে একটী নালার উপর দিয়া উঠিয়াছে। এখান হইতে বাহির হইলে উপত্যকার উপরে আবার দুইটী রাস্তা এবং গিরিপথ-রক্ষাকারী কয়েকটী দুর্গ নয়নগোচর হয়। পরের reversing Station চাঙ্গাই। বগিয়াড়া হইতে দেখিলে মনে হয় যেন চাঙ্গাই আকাশের সহিত মিশিয়া আছে। চাঙ্গাই পার হইয়া রেলপথ একটী উপত্যকার শীর্ষদেশ বেষ্টন করিয়া ক্রমে ক্রমে বাঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিয়া গিয়াছে। তার পর কতকগুলি সুড়ঙ্গ পার হইয়া মজে দুর্গের নিকটবর্ত্তী রাস্তার সহিত মিশিয়াছে। এই বাঁকের চতুর্দ্দিকে গিরিপথের ও পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী কতকগুলি সমতল ভূভাগের মনোরম দৃশ্য দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হয়। মজে দুর্গ হইতে সাগাই ষ্টেশন পর্য্যন্ত রেলপথটী জামরুদ অপেক্ষা ১০০০ ফীটেরও বেশী উচ্চ। ইহার উত্তরে তীরা পর্ব্বতশ্রেণী। সাগাই ছাড়িয়াই যতই আলি মস্‌জিদের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, পাহাড়গুলিও ততই ঘন-সন্নিবিষ্ট বলিয়া মনে হয়। তাহার পর গাড়ী সুড়ঙ্গ-শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং অবশেষে খাইবার নালার উপরে কাঠ্‌কুষ্ট দিয়া বাহির হয়। এইখানে খাইবার উপত্যকায় উঠিবার জন্য রেলপথ খাড়াই হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরেই ভাঙ্গাসেলের মাঠ ও গ্রামসমূহ পার হইতে হয়। এখানকার প্রত্যেক গ্রামটী সুউচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত।

ল্যাণ্ডিকোটালের ঠিক পরের ষ্টেশনই জিন্তারা। এই স্থানের দুর্গ ও সৈন্য-শিবির ঘাটভাই পর্ব্বতশ্রেণী হইতে কিছু দূর। ইহার পরেই টোরা-টিগ্গা reversing Station। ল্যাণ্ডিখানাতে রেলপথ সুড়ঙ্গের মধ্যে শেষ হইয়াছে। এই স্থান হইতে দুই মাইল দূরে থাক প্রদেশের সীমান্ত টোরখান পর্য্যন্ত রেলপথ গিয়াছে, কিন্তু ল্যাণ্ডিখানা পার হইয়া গাড়ী আর যায় না।

ঘূর্ণি হাওয়া

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২৪)

ঘরের মধ্যে ভাত দেওয়া হইয়াছিল। বিশ্বপতিকে ডাকিতে পাঠাইয়া চন্দ্রা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ছিল।

জাতির ব্যবধান সে সন্তর্পণে বাঁচাইয়া চলিয়াছে। সেই জন্য কেবল মাত্র বিশ্বপতির জন্যই ব্রাহ্মণী নিযুক্ত হইয়াছে। চন্দ্রা খুব দূরে দূরে থাকে, যেন কোনক্রমে শুচিতা নষ্ট না হয়।

আত্মভোলা এই লোকটী এত দিনের মধ্যে বুঝিতে পারে নাই—চন্দ্রা সব সময় নিকটে থাকিয়া কেবল মাত্র দুই বেলা তাহার খাওয়ার সময়টিতেই সরিয়া যায় কেন।

আজ আহারের সময় ব্রাহ্মণী উপস্থিত না থাকাতেই মুস্কিল বাধিয়া গেল; চন্দ্রার কারসাজি ধরা পড়িয়া গেল।

চন্দ্রা দরজার কাছে বসিয়া ছিল। কিছুতেই ঘরের মধ্যে আসিল না দেখিয়া বিশ্বপতি একটু হাসিল মাত্র, তখনকার মত কিছুই সে বলিল না।

আহার সমাপ্তে আচমন করিতে করিতে চন্দ্রার পানে তাকাইয়া হাসিমুখে সে বলিল, "জাতের বালাই আমি রাখতে চাইনে; অথচ তুমি জোর করে রাখাও—এর মানে?"

চন্দ্রা দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "পুরুষেরা চিরদিনই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকে। ওরা বাঁধন-হারার জীবন নিয়ে চিরদিনই ছুটতে চায়, মেয়েরাও যদি তাদের মত উচ্ছৃঙ্খল বাঁধনহারা জীবন ভোগ করতে চায়, তবে সবই যে যাবে, কিছুই থাকবে না। পুরুষের উদ্দাম গতি নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যেই তো মেয়েদের দরকার। গতির বেগ সবারই সমান হলে তো চলবে না।"

বিশ্বপতি বলিল, "আজকাল বেশ কথা শিখেছ তো চন্দ্রা?"

চন্দ্রা উত্তর দিল না।

বিশ্বপতি একটা পাণ মুখে দিয়া বলিল, "যাক, জাতের সম্বন্ধে আশ্বস্ত রইলুম। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, বলব আমার জাত যায় নি। কিন্তু মন তো এ কৈফিয়তে খুসি হয় না চন্দ্রা। জিজ্ঞাসা করি—ভাতের হাঁড়ির মধ্যেই কি আমার জাতটা সীমাবদ্ধ রয়েছে ?"

চন্দ্রা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মানে ?"

বিশ্বপতি উত্তর দিল, "মানে খুবই সোজা, জলের মত পাতলা। এর মধ্যে শক্ত তো কিছুই নেই চন্দ্রা, যা বুঝতে দেরী হবে। ছোঁওয়া ভাত খেলেই আমার যে জাত চলে যায় সে জাত যাক না কেন, অমন ঠুনকো জিনিস নাই থাকল। জাত আঁকড়ে থেকে তো লাভ নেই, বরং মানুষ হয়ে বেঁচে থাকায় লাভ আছে।"

চন্দ্রা খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "জাত রাখার দরকার না বুঝে সেকালের লোকেরা তৈরী করেন নি।"

বিশ্বপতি বলিল, "ওইখানেই যে দারুণ ভুল করে গেছেন। একটা মানুষ জাতের মধ্যে হাজার জাত তৈরী করে তাঁরা যে গণ্ডী দিয়ে গেছেন সেই গণ্ডীর জন্যেই না আজ এ রকম ভাবে আমরা ধ্বংস হচ্ছি। আমরা মুখে পরিচয় দিই আমরা বিরাট হিন্দুজাতি, কিন্তু ভাবো দেখি, এই বিরাটকে কত শত খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে ? এর মধ্যে কত জলচল কত অজলচল হিসেব করলে তো স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় ! এগুলো রাখার উপকারিতা কি ? এতে সমাজের, দেশের, দশের কি উপকার হবে, তা আমায় বুঝিয়ে দিতে পারো ?"

চন্দ্রা মাথা নাড়িল "আমি জাতে বাগদী, কি করে বুঝাব ?"

বিশ্বপতি মৃদু হাসিল, বলিল, "তোমার মনের ও-গলদ কিছুতেই কাটবে না দেখছি। বাপরে, কি তোমরা মেয়ে জাত, সংস্কারগুলোকে এমন করে আঁকড়ে ধরেছ—মরলেও ছাড়বে না।"

চন্দ্রা বলিল, "তাই বটে। কিন্তু এও মনে রেখো, তোমরা ভেঙ্গে যাও, আমরা কেবল গড়ে যাই। আর গড়তে গেলে সংস্কারেরই দরকার হয়। ছোট মেয়েটী ঘর গুছায়, রান্না বান্না করে পাঁচজনকে খাওয়ায়, সেই আবার মা হয়ে সন্তান প্রতিপালন করে, অথচ শিক্ষা হয় তো সে কারও কাছে পায় নি। তবে এ বোধশক্তি তার আসে কোথা হতে ? তুমি কি বলবে না এ তার সংস্কার, —তার সংস্কারই তাকে গঠন করতে, পালন করতে প্রবৃত্তি দিয়েছে ?"

বিশ্বপতি বলিল, "শোন চন্দ্রা, তর্ক করতে গেলে ঢের তর্কই করা যায় যার কেবল কথায় মীমাংসা হয় না। আমি যখন তোমার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি, তখন তুমি যা ব্যবস্থা করবে, আমায় তাই পালন করে যেতে হবে, আমি কেবল এইটাই মেনে চলব। তোমার সংস্কার তোমার থাক, আমার মত আমার থাক, কি বল ?"

চন্দ্রা বিষণ্ণ মুখে একটু হাসিল।

"কিন্তু আমি একটা কথা ভাবি,—এক এক সময় তুমি বেশ জ্ঞানীর মত কথা বল, এক এক সময় অমন জ্ঞানহারা হও কেন বল দেখি ?"

বিশ্বপতি মাথাটা কাত করিয়া বলিল, "ঠিক, আমিও ভাবছি কখন তুমি এই প্রশ্নটা করবে। কেন হই তা তুমি জানো তো চন্দ্রা। এ কথা আর কেউ জিজ্ঞাসা করলেও করতে পারে, তোমার জিজ্ঞাসা করা মানায় না।"

চন্দ্রা বলিল, "তবু জিজ্ঞাসা করছি—তোমার মুখ হতে স্পষ্ট কথা শুনতে চাই। শুনেছিলুম নন্দার জন্যেই তুমি নিজেকে পতিত করেছ—"

বিশ্বপতি বাধা দিল, "হ্যাঁ,—আমার পতিত হওয়ার কারণ সেই মেয়েটীই বটে। কিন্তু এর জন্যে তাকে তুমি অভিশাপ দিতে পার না চন্দ্রা। আমাকেই দোষ দাও। দোষী সে নয়—আমি। আজ এই প্রথম তোমার কাছে বলছি চন্দ্রা—জানি তোমার মনে ব্যথা লাগবে,—জানি তুমি আমায় কতখানি স্নেহ কর, কতখানি ভালোবাসো, সেই ভালবাসার জন্যেই কতখানি ত্যাগ করেছ। আমায় হয় তো ঘৃণা করবে চন্দ্রা, কারণ, আমিও তোমায় এ পর্য্যন্ত জানিয়ে এসেছি—আমি তোমায় ঠিক অতখানিই স্নেহ করি—ভালোবাসি। এই ছলনার মধ্যে এতটুকু ফাঁক কোন দিন দেখতে পেয়েছ চন্দ্রা ? না, তা পাও নি। পাছে আলগা হয়ে আসে তাই আমি বাঁধনের পর বাঁধন চাপিয়ে গেছি, বোঝার পর বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি; আলগা হতে এতটুকু সুযোগ দিই নি। আজ নন্দা পরের স্ত্রী, আমি পরের স্বামী। আমাদের মাঝখানে অনন্ত অসীম

ব্যবধান জেগে রয়েছে। মরণের ওপারে গিয়েও যে কেউ কাউকে পাব সে আশা আমি করি নে, সে বিশ্বাসও আমার নেই ; কেন না পরজন্ম—পরলোক তোমরা মানতে পার, আমি মানি নে। আমি জানি মাটির কোলে জন্মেছি, এখান হতে লক্ষ আশা আকাঙ্ক্ষার লয় এখানেই হয়ে যাবে। ঊর্দ্ধে বা অধেঃ কোন দিকেই আমার পথ নেই। আমার মাটি মা নিজেই আমায় তার বুকে টেনে ঘুম পাড়াবে,—বস্, এইটুকুই শেষ।"

চন্দ্রা একটা নিঃশ্বাস ফেলিল—অতি গোপনে—যেন বিশ্বপতির কাণে না যায়। বলিল, "কিন্তু নন্দাকে ভালোবেসে তোমার শান্তি হল কি, তুমি পেলে কি ?"

বিশ্বপতি শুধু হাসিল, "শুধু জ্বালা, বেদনা ছাড়া আর কিছুই পেলুম না। একদিন, জানো চন্দ্রা—প্রথম যখন আমি নন্দাকে ভালোবেসেছিলুম, সেদিন নীল আকাশকে সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম তাকে ছাড়া আর কাউকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করব না, আর কোনও নারীকে ভালোবাসব না, আর কোনও নারীর দেহ স্পর্শ করব না—"

আর্দ্রকণ্ঠে চন্দ্রা বলিল, "কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা তো অটুট রইল না।"

বিশ্বপতির মুখের উপর ক্লান্তির ছায়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শ্রান্তকণ্ঠে সে বলিল, "না, রইল না ; কেন রইল না বলি। যেদিন শুনলুম নন্দার বিয়ে হয়ে গেল, যেদিন দেখলুম তার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে, যেদিন শুনলুম নিজের মুখে সে বললে অসমঞ্জের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় সে সুখী হয়েছে, সেইদিন আমার চোখের উপর হতে একটা কালো পর্দ্দা খসে পড়ে গেল, আমি এক নিমেষে সমস্ত জগৎটাকে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম। সেইদিন হতে আমার জীবনের ওপরে দারুণ বিতৃষ্ণা এলো,—আমি ইচ্ছা করেই নিজেকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে চললুম। মা একবার বলতেই আমি কল্যাণীকে বিয়ে করলুম। তার পর তোমাকে ধ্বংস করলুম—মনে পড়ে চন্দ্রা ? তুমি কোথায় ছিলে, তোমাকে টেনে নিয়ে এসেছি কোথায়। বাগ্দীর ঘরে জন্ম নিলেও হিন্দুর আদর্শ সীতা সাবিত্রীর সম্পদই তো তোমার ছিল। সে সম্পদ চুরি করলে কে,—আমিই নই কি ?"

চন্দ্রার চোখে জল আসিয়াছিল, সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

কাহাকে সে ভালোবাসে, কাহার জন্য সেও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে ? সে কি এই বিশ্বপতিই নহে ? গ্রামে থাকিতে অপর্য্যাপ্ত কলঙ্ক দুই হাতে কুড়াইয়াছে। কেবল মাত্র বিশ্বপতিকে রক্ষা করিবার জন্যই সে সহরে পলাইয়া আসিয়াছিল। এখানে অতখানি প্রতিষ্ঠা, অর্থ সম্পদ লাভ করিয়াও সে সব বিসর্জ্জন দিয়াছে—সে কি এই লোকটীর জন্যই নহে ? অভাগিনী কল্যাণী আজ গৃহত্যাগিনী, কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়া দীনা হীনা কাঙালিনীর মত কোথায় কোন্ পঙ্কের মাঝে নিজের স্থান খুঁজিয়া লইয়াছে—সেও কি ইহার জন্য নয় ? কেবলমাত্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠাটুকু সম্বল করিয়া কয়টী নারী বাঁচিয়া থাকিতে পারে ? তবু তাহার উপর কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের খাতিরে বিশ্বপতির যে আকর্ষণটুকু ছিল, চন্দ্রার উপর তাহাও নাই। তবু চন্দ্রা তাহাকে তেমনি গভীর ভাবে ভালোবাসে, যেমন সর্ব্বপ্রথমে ভালোবাসিয়াছিল।

চন্দ্রা চোখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, "নন্দা আজও তোমায় ভালবাসে ?"

বিশ্বপতি উত্তর দিল, "বাসে—কিন্তু সে ভালোবাসা অন্য ধরণের। বোন যেমন তার ভাইকে ভালোবাসে, মা যেমন তার সন্তানকে ভালোবাসে, নন্দা আমায় সেই রকম ভালোবাসে। আজ ভাবি চন্দ্রা,—হাঁ, দিনরাত নেশায় ভোর হয়ে থাকি বলে যে ভাবি নে তা নয়,—আমি ভাবি—যদি সেদিন তোমার এখানে না এসে আমি বরাবর নন্দার কাছে যেতুম, আমি মানুষ হয়েই বাঁচতুম, এ রকম জানোয়ার হতুম না। তুমি আজ যত সংযত ভাবেই থাক, যত সৎই হও, তবু তুমি তুমিই, নন্দার পায়ের ছায়া স্পর্শ করবার অধিকার তোমার নেই,—তুমি চিরদিন সকলের সামনে ঘৃণিতা হয়েই থাকবে। তুমি নিজেই পাঁকের মধ্যে পড়ে আছ, আমায় তুমি তুলে ধরবে সে শক্তি তোমার কই ? তার সে শক্তি আছে। সে আমায় ভদ্রভাবে ভদ্রসমাজে নিয়ে যেতে পারত, আমার জীবন আলোয় উজ্জ্বল করে দিত, অন্ধকারের মধ্যে এমন করে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আমায় মরতে হতো না।"

হাত দুখানা আড়াআড়ি ভাবে চোখের উপর চাপা দিয়া বিশ্বপতি নিস্তব্ধে পড়িয়া রহিল।

চন্দ্রা হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, "যাবে?"

বিশ্বপতি হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?"

চন্দ্রা বলিল, "নন্দার কাছে? আমি তোমায় এখনি সেখানে পাঠিয়ে দেব।"

বিশ্বপতি হাসিল, ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "মুখ দেখানোর মুখ নেই চন্দ্রা। পথ হয় তো আছে, কিন্তু সে পথে কাঁটা ফেলা। ওর কাছে যাওয়ার পথ আমার চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে। যে মুখ একদিন ওকে দেখিয়েছি, সে মুখে নিজের হাতে কালি মেখেছি।"

চন্দ্রা বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "পথের কাঁটা তুলতে পারা যায়, মুখের কালিও মুছে ফেলা যায়।"

গম্ভীর মুখে বিশ্বপতি বলিল, "হ্যাঁ, তা হয় তো যায়; মনের কালি ওঠে না চন্দ্রা, সেখানকার কাঁটাও ওঠে না। আমার মনের স্মৃতির পাতাগুলি যে কালিতে ভরে গেছে, সে কালি আমি মুছতে পারব কি? তুমি কি মনে ভাবছ, আমার অধঃপতনের এই কাহিনী তার কানে পৌঁছায় নি? একদিন মাতাল অবস্থায় তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে নির্ব্বাকে আমার পানে তাকিয়ে ছিল। সে কি তার স্ত্রীকে গিয়ে এ কথা বলে নি?"

চন্দ্রা নতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিশ্বপতি উদাসভাবে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চন্দ্রার কোনও সাড়া না পাইয়া সে মুখ ফিরাইল—"চন্দ্রা, কাঁদছ?"

চন্দ্রা তেমনই মাথা নত করিয়া রহিল। নিঃশব্দে চোখের জল তাহার আরক্তিম গণ্ড দুইটী ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বপতি বলিল, "ওই দেখ, ওই তো তোমাদের দোষ। কথা শুনতে চাইবে অথচ তা সইবার ক্ষমতা নেই। ওই জন্যেই আমি এত কাল কোন কথা বলি নি, আজও বলতে চাচ্ছিলুম না, নেহাৎ জানতে চাইলে বলেই সব কথা বলে ফেললুম।"

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া চন্দ্রা বলিল, "না, সে জন্যে আমি এতটুকু কষ্ট পাই নি। আমি ভাবছি, তোমার ইহ-পরকাল যে সব গেল, এর জন্যে দায়ী কে,—আমিই নই কি?"

বিশ্বপতি শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "দায়ী কেউ নয়, দোষী কেউ নয়; দোষী আমি—দায়ী আমি। কিন্তু চন্দ্রা—আমায় এখান হতে যেন বিদায় করে দিয়ো না। যখন আশ্রয় দিয়েছ তখন থাকতে দিয়ো। তুমি যা খুসি তাই কর—আমি তাতে আপত্তি করব না, তাকিয়েও দেখব না। আমায় কোণের দিকে একটা ঘর দিয়ো, দিনে কিছু করে মদ দিয়ো, দুবেলা দুটো করে ভাত আর কখানা কাপড় দিয়ো—বস্, আমার দিন বেশ কেটে যাবে।"

চন্দ্রা মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিতেছিল। ঠোঁটের উপর একটু হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল, "দেখা যাবে। আসল কথা বল, আমায় তোমার অসহ্য বোধ হয়েছে; সেই জন্যেই তফাতে থাকবার ব্যবস্থা করার কথা বলছ। বেশ, আমি আজ হতে তোমার আলাদা ব্যবস্থা করে দেব এখন।"

ধীরে ধীরে সে উঠিয়া পড়িল। বিশ্বপতি বিস্মিত নয়নে এই অদ্ভুত মেয়েটীর পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার পানে না তাকাইয়া চন্দ্রা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুনীল আকাশের এক কোণে একখানা মেঘ জমিয়া উঠিয়াছে। এদিক হইতে বাতাসে ভাসিয়া দুইখানি মেঘ তাহার পানে ছুটিয়াছে। তাহারা পরস্পর মিলিতে গিয়া মিলিতে পারিল না; একটী বড় মেঘখানির সহিত মিলিয়া গেল, অপরখানি পাশ কাটাইয়া অনির্দ্দিষ্টের পানে ছুটিয়া চলিল।

কত দিন এমন কত দৃশ্য চন্দ্রার নয়ন সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে,—সে দেখিয়াও দেখে নাই, আজ সে দেখিল।

ওই বৃহতের পানে লক্ষ্য রাখিয়া সকলেই ছুটিয়াছে। কত লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র আসিয়া বৃহতের সহিত মিশিয়া তাহাকে বৃহত্তর করিয়া তুলিতেছে। দূর হইতে ক্ষুদ্রতম কত খণ্ড যে ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া মিলিতে পায় না, অসীম আকাশে দিশা হারাইয়া লক্ষ লক্ষ যুগ তাহাদের ফিরিতে হয় সে সন্ধান কে রাখে, কে তাহাদের পানে তাকায়?

চন্দ্রা আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

(২৫)

তাড়াতাড়ি ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া কি করিয়া পা বাধিয়া পড়িয়া গিয়া মাথায় দারুণ আঘাত পাইয়া বিশ্বপতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। নিজের চারি দিকে এত লোকজন দেখিয়া সে খানিক বিস্মিতভাবে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

যাহারা তাহার সেবার ভার লইয়াছিল তাহারা ছাড়া যাহারা কেবলমাত্র ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—চলিয়া গেল।

বিশ্বপতি উঠিবার উদ্যোগ করিতে একটী ছেলে বলিল, "আর খানিকটা শুয়ে থাকুন মশাই, ডাক্তার বলেছেন আর কুড়ি পঁচিশ মিনিট আপনাকে শুয়ে থাকতে হবে।"

বিশ্বপতি একটু হাসিয়া বলিল, "যে ডাক্তার এ রকম ভাবে শুয়ে বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা করেন তিনি আমাদের মত গরীব লোকদের জন্যে তৈরী হন নি মশাই। এ-সব গরীবের ব্যবস্থা অত ঘড়ি ধরে করতে গেলে চলে না। পড়ে গেলেও আমাদের তখনি উঠতে হয়, খাটতে হয়, আবার—"

বলিতে বলিতে মুখ তুলিয়া সে ছেলে কয়টীর পানে তাকাইয়া হঠাৎ নীরব হইয়া গেল।

যে ছেলেটীর হাতে পাখা ছিল সে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি মশাই?"

বিশ্বপতি উত্তর দিল না। পিছনে যে ছেলেটী আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া ছিল তাহারই পানে তাকাইয়া সে যেন আঘাতের দারুণ বেদনাও ভুলিয়া গেল।

"নিমাই—"

নিজের রূঢ় কণ্ঠস্বরে নিজেই সে চমকাইয়া উঠিয়া নীরব হইয়া গেল।

নিমাই অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহার বিবর্ণ মুখে একটু হাসি। তাহা যেমন ক্ষীণ, তেমনই মলিন—যেন জোর করিয়া টানিয়া আনা।

বিস্মিত ছেলে কয়টীর পানে তাকাইয়া নিমাই বুঝাইয়া দিল—"আমাদের গাঁয়ের লোক, আমাদের বিশুদা, বুঝলি রে সমীর।"

সমীর ছেলেটী যেন হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল, বলিল, "ওঃ, সেই জন্যেই বুঝি তুমি অমন করে ছুটে এলে, বুক দিয়ে পড়ে সেবা করলে নিমাইদা? তাই বল—তোমার দেশের লোক কি না—সেই জন্যেই—"

নিমাই বাধা দিল, "থাম থাম, পাগলামো করিস নে। আমার বিশুদা বলে আমি না হয় সেবা করলুম, তোরা করলি কেন বল তো? একা আমার গুণই গাস নে ভাই, তোদের না পেলে বিশুদাকে ওখান হতে উঠিয়ে এখানে আনতুম কি করে? যাক, এবার একখানা ট্যাক্সি ডাক দেখি, বিশুদাকে বাড়ী নিয়ে যাই।"

বিশ্বপতি যেন আকাশ হইতে পড়িল, "বাড়ী যাব,—কার বাড়ী?"

নিমাই দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমার বাড়ী। আপত্তি করো না বিশুদা, জোর করতে চেয়ো না। আর তুমি জোর করলেও আমি শুনব না, তোমায় দুই হাতে তুলে গাড়ীতে তুলব। দুষ্টুমী ছেড়ে দিয়ে—যা বলি, সুবোধ ছেলের মত তাই শোন দেখি। মাথায় আর হাতে খুব চোট লেগেছে। তোমায় দুদিন এখন চুপচাপ শুয়ে বসে থাকতে হবে—উঠতে পাবে না। গরম গরম লুচি দুধ খেয়ে গায়ে জোর আনতে হবে—এই হচ্ছে তোমার এখনকার ব্যবস্থা। কি বলিস রে তোরা, সব বোবার মত চুপ করে রইলি কেন, কথা বল্ না।"

রমেশ ছেলেটী মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, বিজ্ঞের মত মাথা দোলাইয়া বলিল, "ঠিক, আর ফলও তার সঙ্গে খেতে হবে।"

নিমাই বলিল, "নিশ্চয়ই—বাঁচা তো চাই। আপত্তি করো না বিশুদা, তোমার আপত্তি কিছুতেই টেঁকবে না জেনে রেখো। যে চেহারা হয়েছে—এতে এই আঘাত পেয়েছ। আজ যদি তোমায় ছেড়ে দিই,—কেবল শুশ্রূষা আর পথ্যের অভাবেই তুমি মারা যাবে তা আমি বেশ বুঝছি।"

বিশ্বপতি স্তম্ভিত ভাবে নিমাইয়ের পানে তাকাইয়া রহিল। সে শুনিয়াছে কল্যাণী নিমাইয়ের সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছে, এখনও সে নিমাইয়ের বাড়ী আছে।

কিন্তু নিমাইকে দেখিলে বিশ্বাস হয় না কল্যাণীকে সে লইয়া আসিয়াছে। তাহার কথাবার্ত্তা আগেকার মতই সরল, বাধাশূন্য শিশুর মতই। তেমনই হাসি আজও তাহার মুখে লাগিয়া আছে। নিমাই যদি কল্যাণীকে তাহার বাড়ী রাখিত, সে কি তাহা হইলে বিশ্বপতিকে জোর করিয়া সেই বাড়ীতেই লইয়া যাইবার কথা মুখে আনিতে পারিত?

অবিলম্বে ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল।

বন্ধুদের সাহায্যে নিমাই বিশ্বপতিকে গাড়ীতে তুলিল, বিশ্বপতির আপত্তি কেহ কাণে তুলিল না।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া বিশ্বপতি হতাশ ভাবে হেলান দিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার হতাশ ভাব দেখিয়া মৃদু হাসিয়া নিমাই বলিল, "ভাবছ কেন দাদা, তুমি যেখানে থাক, আমি সেখানে খবর পাঠিয়ে দেব এখন। অনেক দিন ধরে তোমার অনেক খোঁজ করেছি, কিন্তু কোন অন্ধকার খনিতে যে মণি হয়ে জ্বলছ সে খবর কেউ দিতে পারে নি। সেবার দেশে গিয়ে শুনলুম, তুমি নন্দার বাড়ী যাচ্ছ বলে বাক্স বিছানা নিয়ে রওনা হয়েছ। তার পর তোমার আর কোনও উদ্দেশ নেই। এখানে নন্দার বাড়ী খোঁজ নিলুম—শুনলুম তারাও তোমার কোনও সন্ধান জানে না। আজ ভগবান নেহাৎ দয়া করে পথের মাঝখানে তোমায় মিলিয়ে দিলেন দাদা; এ কথা হাজারবার বলব। তাজা অবস্থায় থাকলে হাজার ডাকলেও মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে সে জানা কথা। নেহাৎ না কি বড় কায়দায় পড়েছ—নড়বার ক্ষমতা নেই, বেশী কথা বলবার ক্ষমতা নেই,—তাই আমার হাতের সেবাও তোমায় নিতে হল, বাধ্য হয়ে আমার বাড়ীতেও তোমায় যেতে হচ্ছে।"

দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "থাম থাম নিমাই, তোর ও-সব কথা শুনতে আমার মোটেই ভালো লাগছে না, আমার মাথার মধ্যে কি রকম করছে।"

খুব নরম স্বরে নিমাই বলিল, "ভালো লাগবে দাদা, যখন শুনতে পাবে বাস্তবিকই আমি অপরাধী নই, আমি নির্দ্দোষ। তোমরা যে যাই বল, সকলেই জানো আমি দোষী, কিন্তু আমি জোর করে বলছি—আমি দোষী নই। আমার মাকে জানো তো,—এও জানো আমার মা আমার সব কথাই জানেন। তিনি আমার এত বড় একটা দোষ উপেক্ষা করে কখনই আমার কাছে থাকতে পারতেন না। এই যে বাড়ী এসেছে, গাড়ী রাখো। বিশুদা, এখানে তোমায় নামতে হবে, আমার মা এখানে আছেন।"

বন্ধুরা সঙ্গে আসে নাই। বিশ্বপতিকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছিল। নিমাই বাড়ীর চাকরদের সহায়তায় বিশ্বপতিকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া গিয়া একটী ঘরে বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

দুর্ব্বল বিশ্বপতি খানিকটা দম লইতেছিল। নিমাই বলিল, "কোথায় থাক ঠিকানাটা বল, কাউকে সেখানে পাঠিয়ে দি।"

বিশ্বপতি মাথা নাড়িল, বলিল "খবর কোথাও পাঠাতে হবে না নিমাই, সন্ধ্যে নাগাৎ আমি চলে যাব এখন।"

নিমাই পার্শ্বে একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিল, "দেখা যাবে এখন। সেজন্যে এখনই ভাববার কোনও দরকার নেই, বিশুদা। এখন একটু গরম দুধ আনছে, সেইটুকু খেয়ে ফেল।"

বিশ্বপতি মাথা নাড়িল, "না, এখন থাক।"

পর মুহূর্ত্তে দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে দুধ আনবে—রাঙাবউ? কল্যাণী?"

নিমাই সশব্দে হাসিয়া উঠিল, "ক্ষেপেছ? তোমার মনের ধারণা দেখছি কিছুতেই দূর করতে পারব না। আচ্ছা, ঠিক কথা বল বিশুদা, সত্যই তুমি বিশ্বাস করেছ বউদিকে আমি নিয়ে এসেছি, আমার এখানে রেখেছি? শুনেছ তো এখানে আমার মা আছেন। সন্তান যত খারাপই হোক, মাকে সে চিরদিনই দেবীর আসনে রেখে ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়ে থাকে। মায়ের সামনে যতক্ষণ সে থাকে, ততক্ষণ তাকে সন্তান হয়েই থাকতে হয়। হাজার পাপ করলেও সে থাকে মায়ের কাছে সেই কোলের শিশুটীর মতই। তুমিও তো মা চেনো বিশুদা, তোমারও তো মা ছিল, বল দেখি—মায়ের সামনে কোনও সন্তান যথেচ্ছাচার করতে পারে কি?"

বিশ্বপতি শুইয়া পড়িল, উত্তর দিল না।

নিমাই বলিল, "হয় তো তুমি ভাবছ, এখানে আমার মা আছেন বলে আমি তাকে এখানে রাখি নি, অন্য জায়গায় রেখেছি। ধারণাটা অসম্ভব নয়, কারণ আমার অর্থের অভাব নেই, তার জন্মে একটা বাড়ী ভাড়া করা—তার খরচ চালানো আমার পক্ষে শক্ত নয়। কিন্তু বিশুদা, আমার কথা শোন, আমি অকপটে তোমার কাছে সত্য কথাই বলব, তাতে তুমি বুঝতে পারবে—আমি দোষী নই।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, "এ কথা সত্য—বউদিকে আমি এখানে—আমার মায়ের কাছে রাখব বলে এনেছিলুম। ভেবেছিলুম যে পর্য্যন্ত তুমি না এসো তাকে আটক করে রাখব, আমার ধর্ম্মপরায়ণা পবিত্রা মায়ের কাছে থেকে সেও পবিত্র জীবন যাপন করবে। কিন্তু ভুল যে কতখানি করেছিলুম তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারলুম। আগে বুঝি নি, যে পালাতে চায় তাকে কিছুতেই ধরে রাখা যায় না। যে নিজেকে ধ্বংস করতে চায়, তাকে রক্ষা করা যায় না। বুঝলুম সেই দিন—যেদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই মা এসে খবর দিলেন বউদিকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি সমস্ত কলকাতা সহর তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম। শেষে জানতে পারলুম সে বাংলায় নেই। যখন আমি তাকে খুঁজছিলুম, সে তখন পাটনায় বিশ্রাম করছিল।"

বিশ্বপতি একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, "একেবারে পাটনা?"

বিকৃতমুখে নিমাই বলিল, "হ্যাঁ। তার পর সেখান হতে সে বম্বে গিয়ে কোন্ একটা ফিল্মে নেমেছে। এতে তার খুব নাম হয়েছে। হয় তো তুমিও "পিয়ারা" নামটা শুনে থাকবে।"

বিশ্বপতি বালিসের মধ্যে মুখ লুকাইল।

নিমাই বলিল, "মুখ তোল বিশুদা, অমন করে ভেঙ্গে পড়ো না। যে তোমার মন ভেঙ্গে দিয়ে, পবিত্র কুলে কালি দিয়ে গেছে, তার সম্বন্ধে এত খোঁজ নেওয়ার দরকার আমার ছিল না। কিন্তু জানি—তোমার সঙ্গে একদিন আমায় মুখোমুখি হতে হবে। সে দিন আমায় কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আরও শোন—আরও বলি—সে এখন একটী বিখ্যাত রাজার অন্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধন করছে,—আমার তোমার মত পাঁচ'শটা চাকর সে এখন রাখতে পারে।"

বিশ্বপতি তেমনই ভাবে পড়িয়া রহিল। অনেকক্ষণ তাহার সাড়া না পাইয়া নিমাই তাহার গায়ের উপর হাতখানা রাখিল। শান্ত কণ্ঠে ডাকিল,—"বিশুদা—"

বিশ্বপতি মুখ তুলিল।

"তোর বিশুদাকে মাপ কর নিমাই,—তোকে বুঝতে না পেরে অনেক কথাই বলে গেছি ভাই—"

সে উঠিতেই নিমাই তাহাকে ধরিয়া জোর করিয়া শোয়াইয়া দিল,—"করছ কি, উঠো না বলছি। আমি তোমায় বেশ চিনি বিশুদা, তোমার অগাধ বিশ্বাস আর স্নেহই না আমায় সে মহাপাতক হতে রক্ষা করেছে! আমি এগিয়েছিলুম, কিন্তু যখন দেখলুম বউদি তার ভার আমার ওপরেই দিতে এল, সেই মুহূর্ত্তে মনে হল—আমি করছি কি? না, যাক সে-সব কথা। একটা কথা বলি—বউদি এখানে এসেছে,—কাল বিকেলে আমি গড়ের মাঠে মহারাজার সঙ্গে তাকে বেড়াতে দেখেছি। দেখবে কি? তুমি যদি দেখা করতে চাও বিশুদা—"

"থাম নিমাই থাম, কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিস নে—"

বিকৃত মুখখানার উপর হাত দুখানা চাপা দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া বিকৃত কণ্ঠে বিশ্বপতি বলিল, "সে আমার কাছে মরে গেছে নিমাই, তার নাম লইবার ক্ষমতাও আমার আর নেই।"

নিমাই একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

(২৬)

দুদিন নিমাইয়ের বাড়ীতে কাটাইয়া বিশ্বপতি যেদিন চন্দ্রার বাড়ীতে ফিরিল, সেদিন চন্দ্রা নির্ব্বাক বিস্ময়ে কেবল তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

বিশ্বপতি তাহার সহিত একটা কথাও বলিল না, নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরটীতে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

সে একাই আসিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু নিমাই তাহাকে একা ছাড়িয়া দেয় নাই। তাহার সঙ্গে সেও আসিয়াছিল। বিশ্বপতিকে শতবার জিজ্ঞাসা করিয়া

তাহার বাসস্থানের কথা নিমাই জানিতে পারে নাই। এই বাড়ীর দরজায় আসিয়াই সে তাহার প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছিল।

একটু হাসিয়া সে বলিয়াছিল, "যাক, দুঃখ বিশেষ নেই বিশুদা, জীবনে চলবার পথ বউদি যেমন খুঁজে নিয়েছে—তুমিও তেমনি পেয়েছ, কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যেতে পার নি। আমার দুর্ভাগ্য যে তোমাদের সঙ্গে আমার মত লোকের পথে চলতে মিল হবে না। সেই জন্যে এখান হতেই খসে পড়লুম ;—নমস্কার—"

তাহার কথাগুলা বেশ মিষ্ট হইলেও অন্তরে আঘাত দিয়াছিল বড় বেশী রকম। বিশ্বপতি বিবর্ণ মুখে তাহার পানে তাকাইয়া ছিল, একটী কথা তাহার মুখে ফুটে নাই।

সে যে নিজেই চন্দ্রার বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে সে কথা সে ভুলিয়া গেল। যেন চন্দ্রাই তাহাকে আশ্রয় দিয়া তাহার দশদিককার দশটা পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। জগতে তাহার মুখ দেখাইবার উপায় রাখে নাই। এই জন্য তাহার যত ক্রোধ সবই চন্দ্রার উপর গিয়া পড়িল।

বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পথের উপর চন্দ্রা দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার উপর দৃষ্টি পড়িতে বিশ্বপতির মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল। সে পাশ কাটাইয়া দ্রুত পদে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

খানিক পরে আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া চন্দ্রা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল বিশ্বপতি উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া আছে।

তাহার মাথার কাছে সে বসিয়া পড়িল। আস্তে আস্তে মাথার উপর হাতখানা রাখিতেই বিশ্বপতি চমকাইয়া উঠিয়া মুখ তুলিল। চন্দ্রা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল তাহার চোখে জলধারা।

চন্দ্রা আড়ষ্ট ভাবে খানিক বসিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুমি কাঁদছ—ওগো, তুমি কাঁদছ—"

বলিতে বলিতে সে নিজেই ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

বিশ্বপতি লজ্জিত ভাবে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "ও কি, তুমি কাঁদলে কেন চন্দ্রা? আমার মনে আজ বড় আঘাত লেগেছে ; সেইজন্যেই হয় তো আমার চোখে জল এসেছে। কিন্তু তুমি কেন চোখের জল ফেললে?"

চন্দ্রা উত্তর দিল না, নিঃশব্দে অঞ্চল দিয়া চোখের জল মুছিতে লাগিল।

বিশ্বপতি নীরবে কতক্ষণ পড়িয়া রহিল। তাহার পর রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কই, জিজ্ঞাসা করলে না চন্দ্রা',—দুদিন আমি কোথায় ছিলুম, আমার কি হয়েছিল?"

চন্দ্রা কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "আমি খোঁজ নিয়েছিলুম, তুমি নিমুদার বাড়ীতে আছ।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বপতি বলিল, "শুনেছ চন্দ্রা', সে আমায় কতখানি ঘৃণা করে গেছে? সে বলে গেছে, আমি এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, যেখানে দাঁড়ানোর ফলে সে আমার সঙ্গে যে তার পরিচয় আছে এ কথা মুখে আনতে ঘৃণা বোধ করে। জীবনে সে আর কোন দিন আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না।"

চন্দ্রা মাথা নাড়িল, বলিল, "শুনি নি, কিন্তু এই রকমই যে হবে, এমনই করে সকলের কাছ হতে ঘৃণা কুড়াবে, তা আমি জানতুম। যে-পথে এসে দাঁড়িয়েছি এর তুল্য ঘৃণিত পথ আর নেই। যে কেউ আমার সংস্রবে আসবে সেই সকলের ঘৃণ্য হবে, পরিত্যক্ত হবে। সেই জন্যেই না কেউ না জানতে তোমায় নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলুম?"

"এইবার যাব চন্দ্রা',—জগতের ঘৃণা আমায় সত্য পথ দেখিয়েছে। আমি ওদের ঘৃণা সয়ে আর এখানে থাকতে পারব না। পথে ভিক্ষা করে খাব, গাছতলায় থাকব, সেও ভালো ; তবু এখানে তোমার কাছে রাজার মত সুখে জীবনটা নষ্ট করব না।"

বিশ্বপতি উঠিয়া বসিয়া খোলা জানালা-পথে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল।

আশ্চর্য্য মানুষের স্বভাব। মানুষকে যতদিন কাছে পায়, তত দিন তাহার অস্তিত্ব মানুষের কাছে সব সময় অনুভূত হয় না। কিন্তু যখন চলিয়া যাওয়ার সময় হয়, তখন সমস্ত স্নেহ ভালবাসা ঢালিয়া আঁকড়াইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে।

বিশ্বপতি যত দিন নিজে নড়িতে চায় নাই, তত দিন

চন্দ্রা তাহাকে বাড়ীতে অথবা নন্দার কাছে পাঠাইবার জন্য বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। আজ সে নিজেই চলিয়া যাইতে চাহিতেছে। কথাটা বজ্রাঘাতের মতই তাহার বক্ষে বাজিয়া তাহাকে কতক্ষণ নিস্পন্দ নীরব করিয়া রাখিল।

অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব,—কি ভাবিতেছিল কে জানে। বাহিরের পানে চাহিয়া চাহিয়া শ্রান্ত বিশ্বপতি মুখ ফিরাইয়া সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনিয়া সচকিত হইয়া মুখ তুলিল।

"এখনও তুমি এ ঘরে রয়েছ চন্দ্রা? আমি ভেবেছিলুম চ'লে গেছ।"

চন্দ্রা মলিনমুখে এক-টুকরা হাসি ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল, "না, এইবার যাব।"

বিশ্বপতি বলিল, "হাতে কোন কাজ নেই তো, তা হলে একটু বস। আমার কপালটায় একটু হাত বুলিয়ে দেবে কি? মাথায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।"

নিঃশব্দে চন্দ্রা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, "ও, তোমায় একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ভবানীপুর হতে কে এক ভদ্রলোক তোমায় ডাকতে এসেছিলেন।"

"ভবানীপুর হতে,—আমায় ডাকতে—"

বিশ্বপতি বড় বেশী রকম বিবর্ণ হইয়া গেল।

চন্দ্রা বলিল, "হ্যাঁ, সে ভদ্রলোক তোমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে মোটর এনেছিলেন।"

উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "আমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছিলেন? কেন এসেছেন, কেন আমায় নিয়ে যেতে চান, সে কথা কিছু জিজ্ঞাসাও কর নি চন্দ্রা?"

চন্দ্রা উত্তর দিল, "জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বললেন—নন্দার অসুখ, সে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।"

নন্দার অসুখ—

বিশ্বপতি একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল।

সে জানে অসুখ খুব বাড়াবাড়ি না হইলে নন্দা সংবাদ দেয় নাই, তাহাকে ডাকে নাই। এখানে এতদূরে সন্ধান লইয়া তাহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়াছে, হয় তো—

বিশ্বপতি আর ভাবিতে পারিল না, দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল।

চন্দ্রা ভয় পাইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, অমন করছ কেন?"

শুষ্ক হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "না, কিছুই করছি নে তো? এখন উঠি চন্দ্রা, একবার সেখানে যাই, দেখি কি হয়েছে?"

সে উঠিয়া পড়িল।

চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে মুখ দেখাতে পারবে?"

বিশ্বপতি অগ্রসর হইয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "পারব বই কি। সে যদি ভালো থাকত মুখ দেখাতে পারতুম না, কিন্তু তার অসুখ, সে আমায় ডেকে পাঠিয়েছে। আমার সব গ্লানি—সব দীনতা চাপা দিয়েও আমায় সেখানে যেতে হবে চন্দ্রা, না গেলে চলবেই না।"

চন্দ্রা কেবল চাহিয়াই রহিল। বিশ্বপতি বাহির হইয়া গেল,—একবার পিছন ফিরিয়াও তাহার পানে তাকাইল না।

গলিটা পার হইয়া বড় রাস্তায় পড়িয়া সে একখানা বাসে উঠিয়া বসিল।

ধর্ম্মতলা মোড়ের নিকট বাস থামিয়া গেল। বাসের পাশ দিয়া একখানি রোলস্ রয়েস্ কার ছুটিয়া যাইতে সামনের কয়খানি মোটরের বাধা পাইয়া থামিয়া গেল।

মোটরে ছিল একটী মেয়ে। বিশ্বপতি যে মুহূর্ত্তে অন্যমনস্ক ভাবে মোটরের আরোহী সেই মেয়েটীর পানে তাকাইল, সেও সেই সময় চোখ তুলিল।

বিশ্বপতির মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল। আবার যখন সে মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন কারখানি ভিড় ঠেলিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়াছে। মেয়েটী এমন ভাবে অপর পার্শ্বে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যে, তাহার সুগৌর একখানি হাত ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

কল্যাণী—

বিশ্বপতির মুখে এই একটী শব্দই ভাসিয়া আসিল। সে অধর দংশন করিল।

হ্যাঁ, এ সেই কল্যাণী, বিশ্বপতির রাঙাবউ। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই সুন্দর সুডৌল হাত দুখানি। প্রভেদ এই—সে আজ বহুমূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিতা। তবুও তাহাকে দেখিয়া চিনিতে বিশ্বপতির এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় নাই। একদিন নয়, দুদিন নয়, দীর্ঘ পাঁচ বৎসর সে বিশ্বপতির গৃহলক্ষ্মী, সহধর্ম্মিণী হইয়া বাস করিয়াছিল। আজ সে যতই কেন না নিজেকে পরিবর্ত্তিত করুক, বিশ্বপতির চোখকে প্রতারিত করিতে পারিবে না।

সেও চিনিয়াছে, তাই তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আত্মগোপন মানসেই সে ওদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।

অভাগিনী—

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়াই বিশ্বপতি চমকাইয়া উঠিল। কে অভাগিনী—কল্যাণী? না, সে এখন রাজার রাণী। তাহার মত সৌভাগ্য কাহার? সে যথেষ্ট যশ পাইয়াছে, অর্থ পাইয়াছে, সামান্য সেই পল্লীর কথা—সেই কুটীর-খানির কথা—আর এই দীনতম স্বামীর কথা তাহার মনে হয় কি?

মনে হইয়াও কাজ নাই; কল্যাণী সুখী হোক; ভগবান, উহাকে সুখী কর। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল

অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, বিদ্যাবাচস্পতি, এম-এ

(১)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল সম্বন্ধে দুইটী শ্লোক পাওয়া যায়—একটী চরিতামৃতেরই শেষভাগে এবং অপরটী নিত্যানন্দ দাস কৃত প্রেমবিলাসের ২৪শ বিলাসে। চরিতামৃতের শ্লোক হইতে জানা যায়, ১৫৩৭ শকে বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ-সমাপ্তি; কিন্তু প্রেমবিলাসের শ্লোক অনুসারে ১৫০৩ শকে বা ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে।

চরিতামৃতের শ্লোকটী এই:—"শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যেঽহ্ন্যসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"—অর্থাৎ ১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে রবিবারে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে এই গ্রন্থ (শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত) সম্পূর্ণ হইল।

প্রেমবিলাসের শ্লোকটী এই:—"শাকেঽগ্নি বিন্দু-বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যেঽহ্ন্যামিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"—অর্থাৎ ১৫০৩ শকে জ্যৈষ্ঠ মাসে রবিবারে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে এই গ্রন্থ (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত) সমাপ্ত হইল।

অনেকে [illegible] স্বকপোলকল্পিত বিষয় মূল প্রেম-বিলাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রেমবিলাসেরই নামে চালাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও তাহা বলিয়া থাকেন। প্রথম ১৬ বিলাসের পরবর্ত্তী অংশের উপরে তাঁহার আস্থা নাই (১)। কোনও কোনও স্থলে প্রেমবিলাসের সাড়ে চব্বিশ বিলাস পর্য্যন্তও পাওয়া যায়; কিন্তু অতিরিক্ত অংশ যে কৃত্রিম, তাহা সহজেই বুঝা যায়, ইহাই অনেকের মত। বহরমপুরের সংস্করণেও বিশ বিলাসের বেশী রাখা হয় নাই। অথচ উল্লিখিত "শাকেঽগ্নি বিন্দুবাণেন্দৌ" শ্লোকটী পাওয়া যায় ২৪শ বিলাসে—যাহার কৃত্রিমতা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং উক্ত শ্লোকটীও যে কৃত্রিম, এরূপ সন্দেহ অস্বাভাবিক নহে। অথচ এই শ্লোকটীর উপরেই কেহ কেহ অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন; কেন করিয়াছেন, তাহা পরে বলা হইবে।

ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও

---

(১) Vaisnava Literature, P. 171.

সাহিত্য" নামক পুস্তকে চরিতামৃতের "শাকে সিন্ধ্বগ্নি-বাণেন্দৌ" শ্লোকানুসারেই ১৫৩৭ শক বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দকেই চরিতামৃতের সমাপ্তিকাল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং "শাকে সিন্ধগ্নি" শ্লোকটী যে "চরিতামৃতের অনেকগুলি প্রাচীন ও প্রামাণ্য পুথিতে পাওয়া গিয়াছে," তাহাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (২)। তথাপি কিন্তু স্থানান্তরে তিনি ১৫০৩ শককেই সমাপ্তি-কাল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—যদিও এরূপ মনে করার হেতু তিনি কিছুই দেখান নাই (৩)। আরও কেহ কেহ ১৫০৩ শককেই চরিতামৃতের সমাপ্তিকাল বলিয়াছেন।

বীরভূম শিউড়ির লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শিব-রতন মিত্র মহাশয়ের "রতন লাইব্রেরীতে" চরিতামৃতের অনেক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। মিত্র মহাশয়ের সৌজন্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, এ সমস্ত পাণ্ডুলিপিতে—এমন কি ১৭৮ বৎসরের পুরাতন একখানা পাণ্ডুলিপিতেও—শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ শ্লোকটীই দেখিতে পাওয়া যায়। এক শত বৎসরের প্রাচীন একখানা পুঁথিতে গ্রন্থশেষে এরূপও লিখিত আছে—"গ্রন্থকর্ত্তুঃ শকাব্দা ১৫৩৭॥ শ্রীচৈতন্যস্য জন্মশকাব্দা ১৪০৭॥ অপ্রকট শকাব্দা ১৪৫৫॥ শকাব্দা (লিপিকাল) ১৭৫৫॥" অবশ্য চরিতা-মৃতের সমস্ত সংস্করণে বা সমস্ত পুঁথিতেই যে সমাপ্তিকাল-বাচক শ্লোক পাওয়া যায়, তাহা নহে। যে স্থলে পাওয়া যায়, সে স্থলে "শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ" শ্লোকই পাওয়া যায়; "শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ" শ্লোকটী চরিতামৃতের কোনও সংস্করণে বা পুঁথিতে পাওয়া যায় বলিয়া জানি না। শিবরতন মিত্র মহাশয়ও তাঁহার "সাহিত্যসেবকে" "১৫৩৭ শক বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দকেই চরিতামৃতের সমাপ্তিকাল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন (৪)।

যাহা হউক, ১৫০৩ শকে যে চরিতামৃতের লেখা শেষ হয় নাই, হইতে পারেও না, চরিতামৃতের মধ্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। চরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদেই শ্রীজীবগোস্বামী প্রণীত শ্রীশ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "গোপালচম্পূ করিল গ্রন্থ মহাশূর।" কিন্তু গোপালচম্পূর পূর্ব্বার্দ্ধ পূর্ব্বচম্পূর লেখা শেষ হইয়াছিল ১৫১০ শকে বা ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে এবং উত্তরার্দ্ধ বা উত্তরচম্পূর লেখা শেষ হইয়াছিল ১৫১৪ শকে বা ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে—গ্রন্থ শেষে গ্রন্থকারই এ কথা লিখিয়া গিয়াছেন (৫)। সুতরাং ১৫১৪ বা ১৫১০ শকের পূর্ব্বে চরিতামৃতের লেখা শেষ হইতে পারে না। কাজেই ১৫০৩ শকে যে চরিতামৃতের লেখা শেষ হইতে পারে নাই—অন্ততঃ মধ্যলীলার লেখা আরম্ভও যে তখনও হয় নাই, চরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতেই তাহা দেখা যাইতেছে (৬)। সুতরাং প্রেমবিলাসের শাকেঽগ্নি-বিন্দুবাণেন্দৌ শ্লোকটীও যে কৃত্রিম, তাহাও চরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারাই স্থিরীকৃত হইতেছে।

সমাপ্তিকাল-বাচক দুইটী শ্লোকের মধ্যে একটী কৃত্রিম বলিয়া সপ্রমাণ হওয়ায় অপর শ্লোকটীই অকৃত্রিম বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সকল সময়ে নিরাপদ নহে; তাহাতে দৃঢ়তার সহিত কোনও কথা বলাও সঙ্গত হয় না। এ স্থলে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করার প্রয়োজনও আমাদের নাই। শ্লোক দুইটীর আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বিচার করিলেই বুঝা যাইবে, একটী শ্লোক কৃত্রিম এবং আর একটী শ্লোক অকৃত্রিম। জ্যোতিষের গণনায় এই আভ্যন্তরীণ প্রমাণটী প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

---

(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের চতুর্থ সংস্করণ, ৩০৫ পৃষ্ঠা।

(৩) Vaisnava Literature of Mediæval Bengal P. 63.

(৪) সাহিত্যসেবক, ১২৫ পৃষ্ঠা।

(৫) পূর্ব্বচম্পূর অন্তে লিখিত হইয়াছে:—"সম্বৎপঞ্চকবেদষোড়শযুতং শাকং দশেষেকভাগ্ জাতং যর্হি তদখিলং বিলিখিতা গোপাল-চম্পূরিয়ম্।—যখন ১৬৪৫ সম্বৎ এবং ১৫১০ শকাব্দা, তখনই এই গোপালচম্পূ বিলিখিত হইল।"

উত্তরচম্পূর অন্তে লিখিত হইয়াছে:—"পবনকলামিতি সম্বন্দিন্ বৃন্দাবনান্তঃস্থঃ। জীবঃ কশ্চন চম্পূং সম্পূর্ণাঙ্গী চকার বৈশাখে॥ অথবা॥ বিশ্বাশরেন্দুশাকমিতি প্রথমচরণঃ প্রচারণীয়ঃ॥—বৃন্দাবনস্থ জীবনামা কোনও ব্যক্তি ১৬৪৯ সম্বতে, অথবা ১৫১৪ শকাব্দায় বৈশাখ মাসে এই চম্পূ সমাপ্ত করিয়াছেন।"

(৬) লেখক-সম্পাদিত চরিতামৃতের ভূমিকায়ও এ কথা লিখিত হইয়াছে।

উভয় শ্লোকেই লিখিত হইয়াছে—জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে রবিবারে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। শ্লোক দুইটীর পার্থক্য কেবল শকাঙ্কে—চরিতামৃতের শ্লোক বলে ১৫৩৭ শকে, আর প্রেমবিলাসের শ্লোক বলে ১৫০৩ শকে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই উভয় শকেই জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবারে হইতে পারে কি না। না পারিলে কোন্ শকে হইতে পারে। দুই শকের কোনও শকেই যদি জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবারে না হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, কোনও শ্লোকই বিশ্বাসযোগ্য নহে। যদি একটীমাত্র শকে তাহা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই শককেই সমাপ্তিকাল বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারিবে এবং কাজেই অপরটীকে বাদ দিতে হইবে।

জ্যোতিষের গণনায় দেখা গিয়াছে, ১৫০৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবারে হয় নাই—জ্যৈষ্ঠ মাসকে সৌর মাস ধরিলেও না, চান্দ্র মাস ধরিলেও না। কিন্তু ১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবারেই হইয়াছিল। সেদিন প্রায় ৫৬ দণ্ড পঞ্চমী ছিল। এ স্থলেও কিন্তু চান্দ্র মাস ধরিলে হয় না, সৌর মাস ধরিলে হয়।

জ্যোতিষের গণনায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম-এ মহাশয় একজন প্রাচীন প্রামাণ্য ব্যক্তি। আমাদের গণনার ফল তাঁহার নিকট প্রেরিত হইলে তিনিও স্বতন্ত্র ভাবে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন এবং আমাদের সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের গণনা-প্রণালী আমাদের গণনা-প্রণালী হইতে ভিন্ন ছিল; তথাপি কিন্তু উভয়ের গণনার ফল একরূপই হইয়াছে। গণনা যে নির্ভুল, ইহা বোধ হয় তাহার একটী প্রমাণ (৭)।

যাহা হউক, এক্ষণে দেখা গেল—প্রেমবিলাসের শ্লোকানুসারে ১৫০৩ শকে চরিতামৃত-সমাপ্তির কথা চরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণের প্রতিকূল এবং ঐ শ্লোকানুসারে ১৫০৩ শকে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবারে হওয়ার কথাও জ্যোতিষের গণনায় সমর্থিত হয় না। সুতরাং এই শ্লোকটী যে কৃত্রিম, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। আর, চরিতামৃতের শ্লোকানুসারে ১৫৩৭ শকে গ্রন্থ-সমাপ্তির কথা চরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণেরও অনুকূল এবং উক্ত শ্লোকানুসারে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীও রবিবারেই হইয়াছিল বলিয়া জ্যোতিষের গণনায়ও পাওয়া যায়। সুতরাং এই শ্লোকটী যে সম্যক্ রূপেই নির্ভরযোগ্য এবং ইহা যে অকৃত্রিম, তদ্বিষয়েও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

গ্রন্থকার কখনও গ্রন্থ-সমাপ্তির তারিখ লিখিতে ভুল করিতে পারেন না; কারণ, যেদিন গ্রন্থ সমাপ্ত হয়, ঠিক সেইদিনই তিনি তারিখ লিখিয়া থাকেন; তাহাতে সন, মাস, তিথি, বারাদির ভুল থাকা সম্ভব নয়। অন্য কেহ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ভিন্ন সময়ে তাহা লিখিতে গেলেই ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে। প্রেমবিলাসের "শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ" শ্লোক ভ্রমাত্মক বলিয়া তাহা যে চরিতামৃতকার কবিরাজ-গোস্বামীর লিখিত নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আর, চরিতামৃতের "শাকে সিন্ধ্বগ্নি-

---

(৭) বিগত ১৬।৬।৩৩ ইং তারিখে বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন—"* * * দেখিতেছি, আপনার গণনাই ঠিক। ১৫৩৭ শকে সৌর জ্যৈষ্ঠ ধরিলে অসিত পঞ্চমীতে রবিবার হইয়াছিল। রবিবারে পঞ্চমী প্রায় ৫২ দণ্ড ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য, সৌর জ্যৈষ্ঠ ধরিতে পারি কি না? বোধ হয় পারি। কবি বঙ্গদেশের, সৌর মাস গণিতেন।" এই পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—"বোধ হয় সৌর মাস ধরিতে পারি।" কিন্তু পরের দিন ১৭।৬।৩৩ ইং তারিখেই অপর এক পত্রে তিনি লিখিলেন,—"গত কল্য আপনাকে পত্র লিখিবার পর মনে হইল, সৌর জ্যৈষ্ঠ মাস করিলে কবির অনবধানতা প্রকাশিত হয়। মাসের নাম না থাকিলে তিথি অর্থহীন। 'বোধ হয়' করিবার প্রয়োজন নাই। কবি জ্যৈষ্ঠ মাস গৌণচান্দ্র ধরিয়াছেন। যেটা মুখ্য বৈশাখ কৃষ্ণপক্ষ, সেটা গৌণ জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণপক্ষ। বৈশাখী পূর্ণিমার পর গৌণ জ্যৈষ্ঠমাস আরম্ভ। উত্তর ভারতে গৌণচান্দ্র গণিত হইতেছে। অতএব গৌণচান্দ্র জ্যৈষ্ঠমাসের অসিত-পঞ্চমীতে রবিবার ছিল। হয়ত সৌর জ্যৈষ্ঠ বলাও কবির অভিপ্রেত ছিল।"

যাহা হউক, বৈশাখী পূর্ণিমার অব্যবহিত পরবর্তী যে কৃষ্ণ-পঞ্চমী, তাহাই গৌণচান্দ্র জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাপঞ্চমী এবং ১৫৩৭ শকে তাহা রবিবারে হইয়াছিল।

সূর্য্য যত দিন বৃষরাশিতে থাকে, আমাদের পঞ্জিকার জ্যৈষ্ঠ মাসও ততদিনব্যাপী এবং এইরূপ জ্যৈষ্ঠ মাসকেই আমরা সৌর জ্যৈষ্ঠ মাস বলিয়াছি। ১৫৩৭ শকে গৌণচান্দ্র জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাপঞ্চমীও আমাদের পঞ্জিকানুযায়ী জ্যৈষ্ঠমাসে (এবং রবিবারে) হইয়াছিল: তাই আমরা সৌর জ্যৈষ্ঠ বলিয়াছি।

বাণেন্দৌ" শ্লোকটীতে কোনও রূপ ভ্রম নাই বলিয়া—চরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণে এবং জ্যোতিষের গণনাতেও ইহা সমর্থিত হয় বলিয়া—ইহা যে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীরই লিখিত, তাহাও নিঃসন্দেহেই বলিতে পারা যায়। সুতরাং ১৫৩৭ শকে বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দেই চরিতামৃত সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

প্রশ্ন হইতে পারে, শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ শ্লোকটী গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীরই লিখিত হইয়া থাকিলে চরিতামৃতের সকল প্রতিলিপিতে তাহা না থাকার কারণ কি? লিপিকর-প্রমাদই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয়। কোনও একজন লিপিকর হয় তো ভ্রমে এই শ্লোকটী লিখেন নাই। তাঁহার প্রতিলিপি দেখিয়া পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা গ্রন্থ লিখিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও প্রতিলিপিতেই আর ঐ শ্লোকটী থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে উক্ত শ্লোকহীন প্রতিলিপিও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। (৮)

যাঁহারা ১৫০৩ শকের পক্ষপাতী, তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১৫০৩ শকে সমাপ্ত হইয়াছে মনে না করিলে প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর ও কর্ণানন্দের উক্তিসমূহের সঙ্গতি থাকে না। সঙ্গতি থাকে কি না বিবেচনা করা দরকার।

ভক্তিরত্নাকরাদির যে বিবরণের সহিত চরিতামৃতের সমাপ্তিকালের কিছু সম্পর্ক থাকা সম্ভব, তাহার সার মর্ম্ম এই—গঙ্গাতীরে চাখন্দি গ্রামে শ্রীনিবাসের জন্ম হয়। উপনয়নের পরে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তিনি মাতাকে লইয়া যাজিগ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিতে থাকেন। কিছু কাল পরে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকটে দীক্ষিত হন এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর নিকটে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আচার্য্য উপাধি লাভ করেন। শ্রীনিবাসের পরে নরোত্তম দাস এবং শ্যামানন্দও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তিনজনে কয়েক বৎসর বৃন্দাবনে থাকার পরে একই সঙ্গে দেশের দিকে যাত্রা করেন। তাঁহাদের সঙ্গে কতকগুলি গোস্বামী গ্রন্থ প্রচারার্থ বাঙ্গালা দেশে প্রেরিত হয়। গ্রন্থগুলিকে চারিটী বাক্সে ভরিয়া বাক্সগুলিকে মমজমা দিয়া ঢাকিয়া দুইখানা গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরীর তত্ত্বাবধানে শ্রীজীব শ্রীনিবাসাদির সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বনবিষ্ণুপুরে উপনীত হইলেন, তখন বনবিষ্ণুপুরের তৎকালীন রাজা বীর হাম্বীরের নিয়োজিত দস্যুদল ধনরত্ন মনে করিয়া গাড়ীসহ গ্রন্থবাক্সগুলি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তখন নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে দেশে পাঠাইয়া দিয়া গ্রন্থোদ্ধারের

(৮) এইরূপ হওয়া অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। চরিতামৃতেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের "রাধা-কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ"—প্রভৃতি কয়েকটী শ্লোকের (৫—১৪ শ্লোকের) উপরিভাগে "শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্" কথাটী চরিতামৃতের কোনও কোনও প্রতিলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন কবিরাজ-গোস্বামীর মূল গ্রন্থে উল্লিখিত "শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিকড়চায়াম্" কথাটী ছিল না—"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ" ইত্যাদি শ্লোক কয়টী কবিরাজ গোস্বামীরই রচিত, স্বরূপদামোদরের রচিত নহে। কিন্তু এরূপ অনুমানের বিশেষ কিছু হেতু আছে বলিয়া মনে হয় না। বরং উক্ত শ্লোক কয়টী যে স্বরূপ-দামোদরেরই রচিত, তাহারই যথেষ্ট প্রমাণ চরিতামৃতে পাওয়া যায়। একটীমাত্র প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। উল্লিখিত শ্লোকসমূহের দ্বিতীয় শ্লোক অর্থাৎ আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ৬ষ্ঠ শ্লোকটীতে (শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা ইত্যাদি শ্লোকে) শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের তিনটী মুখ্য কারণ বিবৃত হইয়াছে। এই ষষ্ঠ শ্লোকটীর তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে যাইয়া সূচনায় চরিতামৃতকার কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"* * * অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ। রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥ অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার। দামোদর-স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥ স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ। তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ॥ আদি, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ৯০—৯২ পয়ার॥" ষষ্ঠ শ্লোকে অবতারের যে তিনটী মুখ্য কারণের কথা বলা হইয়াছে, সেই তিনটী কারণ যে স্বরূপ-গোস্বামী ব্যতীত অপর কেহ জানিতেন না, স্বরূপগোস্বামী হইতেই যে সেই তিনটী কারণের সংবাদ সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে, উক্ত পয়ার-সমূহে কবিরাজ গোস্বামীই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং কবিরাজ-গোস্বামীর কথাতেই জানা যাইতেছে, উক্ত শ্লোকটী স্বরূপদামোদরেরই রচিত। উক্ত ষষ্ঠ শ্লোক কেন, আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ৫ম হইতে ১৪শ পর্য্যন্ত সমস্ত শ্লোকই যে স্বরূপদামোদরের রচিত, তাহাতে সন্দেহ করার হেতু কিছু দেখা যায় না। লিপিকর-প্রমাদবশতঃই সম্ভবতঃ কোনও কোনও প্রতিলিপিতে উক্ত শ্লোকসমূহের উপরিভাগে "শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিকড়চায়াম্" কথাটী বাদ পড়িয়া গিয়াছে। তদ্রূপ, লিপিকর-প্রমাদ বশতঃই যে কোনও কোনও প্রতিলিপিতে "শাকে সিন্ধ্বগ্নি" শ্লোকটী বাদ পড়িয়া গিয়াছে, এরূপ অনুমান অস্বাভাবিক হইবে না।

নিমিত্ত শ্রীনিবাস বনবিষ্ণুপুরেই থাকিয়া গেলেন। কিছু দিন পরে রাজসভায় শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ উপলক্ষে রাজা বীর হাম্বীরের সহিত শ্রীনিবাসের পরিচয় হয়। সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া রাজা বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন এবং শ্রীনিবাসের চরণাশ্রয় করিয়া সমস্ত গ্রন্থ ফিরাইয়া দিলেন। কিছু কাল পরে গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাস দেশে ফিরিয়া আসেন এবং পর পর দুইটী বিবাহ করেন। বিবাহের ফলে তাঁহার ছয়টী সন্তান জন্মিয়াছিল। গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসার প্রায় এক বৎসর পরে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন বলিয়াও ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়। যাহা হউক, বৃন্দাবন হইতে শ্রীনিবাসের দেশে ফিরিয়া আসার কিছু কাল পরে খেতুরীর বিরাট মহোৎসব হইয়াছিল। এই মহোৎসবে নিত্যানন্দ-ঘরণী জাহ্নবামাতা গোস্বামিনীও উপস্থিত ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের মতে, এই মহোৎসবের পরে জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তাঁহার দেশে ফিরিয়া আসার কিছু কাল পরে নিত্যানন্দ-তনয় বীরচন্দ্র গোস্বামীও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে শ্রীনিবাস আচার্য্যের দেশে ফিরিয়া আসার পরে তাঁহার নিকটে এবং আরও দু'একজন বঙ্গ দেশীয় ভক্তের নিকটে শ্রীজীব গোস্বামী পত্রাদি লিখিতেন। এরূপ কয়েকখানি পত্র ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে।

যাহা হউক, ১৫০৩ শকেই চরিতামৃত সমাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি এই তিনটী অনুমান :—প্রথমতঃ শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রেরিত এবং বনবিষ্ণুপুরে অপহৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কবিরাজ-গোস্বামীর চরিতামৃতও ছিল; দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থ-চুরির সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই কবিরাজ-গোস্বামী তিরোভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং তৃতীয়তঃ, ১৫০৩ শকেই (১৫৮১ খৃষ্টাব্দেই) গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে বিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন। এই তিনটী অনুমান বিচার-সহ কি না, আমরা এখানে তৎসম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

বলিয়া রাখা উচিত, আমরা এই প্রবন্ধে যে ভক্তি-রত্নাকর, প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দের উল্লেখ করিব, তাহাদের প্রত্যেকখানিই বহরমপুর রাধারমণযন্ত্র হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক।

শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রেরিত গোস্বামিগ্রন্থের মধ্যে চরিতামৃত ছিল কি না

শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে প্রেরিত যে সমস্ত গ্রন্থ বনবিষ্ণুপুরে চুরি হইয়াছিল, তাহাদের বিস্তৃত তালিকা পাওয়া না গেলেও ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাস হইতে তাহাদের একটা দিগ্‌দর্শন যেন পাওয়া যায়। প্রেম-বিলাসে শ্রীনিবাসের জন্মের পূর্ব্বকাহিনী যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, গৌড়ে রূপসনাতনের গ্রন্থপ্রচারের উদ্দেশ্যেই তাঁহার জন্মের প্রয়োজন হইয়াছিল (১ম বিলাস, ৪, ১২ পৃষ্ঠা)। শ্রীনিবাসের প্রতি মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশের মধ্যেও তদ্রূপ ইঙ্গিতই পাওয়া যায় —"যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন রূপ-সনাতন। তুমি গেলে তোমারে করিবে সমর্পণ॥ (৪র্থ বিলাস, ৩৩ পৃষ্ঠা)।" গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাসকে গৌড়ে পাঠাইবার সঙ্কল্প করার সময়েও শ্রীজীব তাহাই জানাইয়াছেন—"মোর প্রভুর গ্রন্থের অনুসারে যত ধর্ম্ম। গৌড়দেশে কেহ ত না জানে ইহার মর্ম্ম॥ এই সব গ্রন্থ লৈয়া আচার্য্য গৌড়ে যায়। (প্রেমবিলাস, ১২শ বিলাস, ১৪১ পৃঃ)।" গ্রন্থ-প্রেরণ-প্রসঙ্গে রূপ-সনাতনের গ্রন্থসম্বন্ধে বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীদের নিকটে শ্রীজীব আরও বলিয়াছেন—"লক্ষ গ্রন্থ কৈল সেই শক্তি করুণায়। তোমরা তাহাতে অতি করিলা সহায়॥ অন্যদেশ হৈতে প্রভুর নিজাস্থা গৌড়দেশ। সর্ব্বমহান্তের বাস অশেষ বিশেষ॥ এ ধর্ম্ম প্রকট হয় গ্রন্থ পরচার। যেমন হয়েন তার করহ প্রকার॥ (প্রেম-বিলাস, ১২শ বিলাস, ১৪৩ পৃষ্ঠা)।" গ্রন্থ প্রেরণের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত মথুরাবাসী স্বীয় সেবক-মহাজনকে ডাকিয়া আনিয়া শ্রীনিবাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়াও শ্রীজীব বলিয়াছেন—"মোর প্রভু লক্ষ গ্রন্থ করিল বর্ণন॥ রাধাকৃষ্ণলীলা তাহে বৈষ্ণব-আচার। তিঁহ গৌড়দেশে লঞা করিব প্রচার॥ (প্রেমবিলাস, ১২শ বিলাস, ১৪৫ পৃঃ)।" বৃন্দাবনত্যাগের প্রাক্কালে শ্রীনিবাস যখন স্বীয় গুরু গোপালভট্টগোস্বামীর নিকটে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীনিবাসের গৌড়-গমনের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভট্টগোস্বামীও বলিয়াছিলেন—"শ্রীরূপের গ্রন্থ গৌড়ে হইবে প্রচারে। (১২শ বিলাস,

১৫৯ পৃঃ)।” শ্রীজীবগোস্বামী নিজহাতে গ্রন্থরাজি সিন্ধুকে সজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। কি কি গ্রন্থ সিন্ধুকে সজ্জিত হইয়াছিল, তাহাও প্রেমবিলাস হইতে জানা যায়। শ্রীজীব—“সিন্ধুক সজ্জা করি পুস্তক ভরেন বিরলে॥ শ্রীরূপের গ্রন্থ যত নিজ গ্রন্থ আর। থরে থরে বসাইলা ভিতরে তাহার॥ বহুলোক লঞা সিন্ধুক আনিল ধরিঞা। গাড়ীর উপরে সব চড়াইল লঞা॥ (১৩শ বিলাস, ১৬২ পৃঃ)।” আবার, মথুরাতে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক শ্রীনিবাসকে বিদায় দেওয়ার সময়েও শ্রীজীব বলিয়াছেন—“চৈতন্যের আজ্ঞা প্রেম প্রকাশিতে। বর্ণন করিলা প্রেম সনাতন তাতে॥ সেই গ্রন্থে সেই ধর্ম্ম প্রকাশ তোমাতে। প্রকাশ করিতে দোঁহে পার সর্ব্বত্রেতে॥ (১৩শ বিলাস, ১৬৩ পৃঃ)।” গোস্বামি-গ্রন্থের পেটারায় অমূল্য রত্ন আছে বলিয়া হাতগণিতা প্রকাশ করাতেই বীর হাম্বীরের লুব্ধ দস্যুগণ গ্রন্থপেটারা চুরি করিয়াছিল; এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াও প্রেম-বিলাসকার বলিয়াছেন, পেটারায় যে অমূল্য রত্ন ছিল, তাহা সত্যই; যেহেতু, “শ্রীরূপের গ্রন্থ যত লীলার প্রসঙ্গ। কত প্রেমধন আছে, তাহার তরঙ্গ॥ (১৩শ বিলাস, ১৬৮ পৃঃ)।” শ্রীনিবাসের সহিত বীর হাম্বীরের সাক্ষাৎ হইলে রাজা যখন তাঁহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীনিবাস নিজেও বলিয়াছিলেন—“শ্রীনিবাস নাম, আইল বৃন্দাবন হৈতে। লক্ষ গ্রন্থ শ্রীরূপের প্রকাশ করিতে॥ গৌড়দেশে লৈয়া তাহা করিব প্রচার। চুরি করি লইল কেবা জীবন আমার॥ (প্রেমবিলাস, ১৩শ বি, ১৭৯ পৃঃ)।”

প্রেমবিলাস হইতে উদ্ধৃত বাক্যসমূহে শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রেরিত গ্রন্থসম্বন্ধে যে পরিচয় পাওয়া গেল, তাহাতে বুঝা যায়, গ্রন্থপেটারায় শ্রীরূপের গ্রন্থই ছিল বেশী; শ্রীসনাতনের এবং শ্রীজীবের গ্রন্থও কিছু কিছু ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের কোনও আভাস পর্য্যন্তও পাওয়া যায় না।

এক্ষণে, ভক্তিরত্নাকর কি বলে, তাহাও দেখা যাউক। শ্রীনিবাসের জন্মের পূর্ব্বাভাসে ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু সেবক গোবিন্দকে বলিয়াছেন—“শ্রীরূপাদিদ্বারে ভক্তি-শাস্ত্র প্রকাশিব। শ্রীনিবাসদ্বারে গ্রন্থরত্ন বিতরিব॥ (ভক্তিরত্নাকর, ২য় তরঙ্গ, ৭১ পৃষ্ঠা)।” শ্রীনিবাস মথুরায় উপনীত হইলে শ্রীরূপ-সনাতন স্বপ্নে দর্শন দিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“করিনু যে গ্রন্থগণ সে সব লইয়া। অতি অবিলম্বে গৌড়ে প্রচারিবে গিয়া॥ ৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৪—৫ পৃঃ।” পেটারায় সজ্জিত গ্রন্থসমূহসম্বন্ধেও বলা হইয়াছে—“যে সকল গ্রন্থ সম্পুটেতে সজ্জ কৈল। সে সব গ্রন্থের নাম পূর্ব্বে জানাইল॥ নিজকৃত সিদ্ধান্তাদি গ্রন্থ কথোদিয়া। মৃদু মৃদু কহে শ্রীনিবাস মুখ চাইয়া॥ রহিল যে গ্রন্থ পরিশোধন করিব। বর্ণিব যে সব তাহা ক্রমে পাঠাইব॥ (৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ৪৭০ পৃঃ)।” পেটারায় সজ্জিত গ্রন্থসমূহের নাম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এইরূপই এই কয় পয়ার হইতে জানা যায়। উল্লিখিত ভক্তি-রত্নাকরের ৭১ এবং ১৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায় যে কেবল রূপ-সনাতনের গ্রন্থেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আবার প্রথম তরঙ্গের ৫৬—৬০ পৃষ্ঠায় শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব এবং শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর অনেক গ্রন্থের নামও উল্লিখিত হইয়াছে। ৪৭০ পৃষ্ঠার পূর্ব্বে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও স্থলে গ্রন্থতালিকা আছে বলিয়া জানি না। ৫৬—৬০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থও শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রেরিত হয় নাই, সংশোধনাদির নিমিত্ত কতকগুলি গ্রন্থ শ্রীজীব রাখিয়া দিয়াছিলেন—৪৭০ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত পয়ার এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকটে লিখিত শ্রীজীবের পত্র হইতে তাহা জানা যায়। যাহা হউক, প্রেরিত গ্রন্থসম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত হইল, কবিরাজ-গোস্বামীর চরিতামৃতের উল্লেখ বা ইঙ্গিতও তাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

এক্ষণে কর্ণানন্দের কথা বিবেচনা করা যাউক। কর্ণানন্দ অকৃত্রিম গ্রন্থ কি না, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সন্দেহের কারণ পরে বলা হইবে। কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে প্রেরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে যে চরিতামৃত ছিল, কর্ণামৃত হইতেও তাহা জানা যায় না। শ্রীনিবাসের জন্মের পূর্ব্বাভাসপ্রসঙ্গেও ভক্তিরত্নাকরেরই ন্যায় কর্ণানন্দ বলিয়াছে—শ্রীরূপ-সনাতনের গ্রন্থ প্রচারের নিমিত্তই তাঁহার আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল। গ্রন্থপ্রেরণ-প্রসঙ্গেও শ্রীজীব সেই উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াই গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে যাওয়ার নিমিত্ত শ্রীনিবাসকে আদেশ

করিয়াছেন (কর্ণানন্দ, ৬ষ্ঠ নির্য্যাস, ১১০ পৃষ্ঠা)। তাঁহার সঙ্গে কোন্ কোন্ গ্রন্থ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ কোথাও নাই। তবে, শ্রীনিবাস গৌড়দেশে কি কি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন, এক স্থলে তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়। "গৌড়দেশে লক্ষ গ্রন্থ কৈল প্রকটন॥ শ্রীরূপ-গোস্বামিকৃত যত গ্রন্থগণ। যত গ্রন্থ প্রকাশিলা গোস্বামী সনাতন॥ শ্রীভট্টগোসাঞি যাহা করিলা প্রকাশ। রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথদাস॥ শ্রীজীব গোস্বামিকৃত যত গ্রন্থচয়। কবিরাজ গ্রন্থ যত কৈলা রসময়॥ এই সব গ্রন্থ লৈয়া গৌড়েতে স্বচ্ছন্দে। বিস্তারিল প্রভু তাহা মনের আনন্দে॥ (১ম নির্য্যাস, ৩ পৃঃ)।" এ স্থলে চরিতামৃতের উল্লেখ না থাকিলেও কবিরাজ-গোস্বামীর "রসময় গ্রন্থ" সমূহের উল্লেখ আছে। চরিতামৃতও এ সমস্ত রসময় গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে। উল্লিখিত পয়ারসমূহে গ্রন্থের নাম নাই, গ্রন্থকারের নাম আছে; কয়েক পয়ার পরে কয়েকখানি গ্রন্থের নামও কর্ণানন্দে লিখিত হইয়াছে; তন্মধ্যে বৈষ্ণব-তোষণীর উল্লেখ আছে। বৈষ্ণব-তোষণী কিন্তু প্রথমবারে প্রেরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ছিল না, কয়েক বৎসর পরে গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছে—তাহা ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায় (১৪শ তরঙ্গ, ১০৩৩ পৃঃ)। কবিরাজ-গোস্বামীর গ্রন্থসমূহও পরে প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়; কারণ, প্রথমবারে প্রেরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কবিরাজ-গোস্বামীর কোনও গ্রন্থ ছিল বলিয়া ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস বা কর্ণানন্দ হইতেও জানা যায় না।

যাহা হউক, শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রথমবারে আনীত গ্রন্থসমূহের প্রসঙ্গে—উল্লিখিত পয়ারগুলি কর্ণানন্দে লিখিত হয় নাই, বিষ্ণুপুরে অপহৃত গ্রন্থসমূহের প্রসঙ্গেও লিখিত হয় নাই; শ্রীনিবাস গৌড়দেশে কি কি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই উক্ত পয়ারে বলা হইয়াছে। বহুবার বহু সময়ে প্রচারার্থ বহু গ্রন্থ বৃন্দাবন হইতে শ্রীনিবাসের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। চরিতামৃতও পরবর্ত্তী কালেই তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইয়া থাকিবে—এরূপ মনে করিলেও উক্ত পয়ারসমূহের মধ্যে কোনও রূপ অসঙ্গতি দেখা যাইবে না। পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

আরও একটী কথা বিবেচ্য। চরিতামৃত লেখার সময়ে কবিরাজ-গোস্বামীর যত বয়স হইয়াছিল, শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন ত্যাগের সময়ে এবং তাহার কিছু কাল পরেও তাঁহার তত বেশী বয়স হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

যে সময়ে তিনি চরিতামৃত লিখিতে আরম্ভ করেন, কবিরাজ-গোস্বামী তখন জরাতুর হইয়া পড়িয়াছিলেন। আদিলীলা শেষ করিয়া মধ্যলীলা আরম্ভ করিবার সময়ে তাঁহার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বুঝা যায়। তৎকালীন শরীরের অবস্থা অনুভব করিয়া অন্ত্যলীলা লিখিতে পারিবেন বলিয়া কবিরাজ-গোস্বামীও বোধ হয় ভরসা পান নাই। তাই মধ্যলীলার প্রারম্ভেই অন্ত্যলীলার সূত্র লিখিয়া কৈফিয়তস্বরূপে তিনি লিখিয়াছেন—"শেষলীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ, ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়। থাকে যদি আয়ুঃশেষ, বিস্তারিব লীলা শেষ, যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥ আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর, মনে কিছু স্মরণ না হয়। না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে, তবু লিখি এ বড় বিস্ময়॥ এই অন্ত্যলীলাসার, সূত্রমধ্যে বিস্তার, করি কিছু করিল বর্ণন। ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে, এই লীলা ভক্তগণধন॥ (চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ)।" গ্রন্থশেষেও তিনি লিখিয়াছেন—"বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥ নানারোগে গ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি। পঞ্চ রোগের পীড়ায় ব্যাকুল—রাত্রি দিনে মরি॥ (অন্ত্যলীলা, ২০শ পরিচ্ছেদ)।"

কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করেন, তখন এবং তাহার পরেও যে কবিরাজ-গোস্বামীর শরীরের অবস্থা চরিতামৃতে বর্ণিত অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল, তখনও তিনি রাধাকুণ্ড হইতে চৌদ্দ মাইল হাঁটিয়া বৃন্দাবনে যাতায়াত করিতে পারিতেন, ভক্তিরত্নাকরাদি হইতে তাহা জানা যায়।

বৃন্দাবন ত্যাগের প্রাক্কালে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ দাস গোস্বামীর সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত রাধাকুণ্ডে গিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাদের সঙ্গে রাধাকুণ্ড হইতে বৃন্দাবন আসিয়াছিলেন (ভক্তি

রত্নাকর, ৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ৪৬৯ পৃঃ)। এবং বৃন্দাবনে হইতে শ্রীজীবাদির সঙ্গে গ্রন্থের গাড়ীর অনুসরণ করিয়া তিনি মথুরায়ও গিয়াছিলেন (ভক্তিরত্নাকর, ৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ৪৮৭ পৃঃ)। শ্রীনিবাসের দেশে আসার কিছু কাল পরে খেতুরীর মহোৎসব হয়। এই মহোৎসবের পরে নিত্যানন্দঘরণী জাহ্নবামাতা গোস্বামিনী শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। তাঁহার বৃন্দাবনে আগমনের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করার নিমিত্ত কবিরাজ-গোস্বামী সাত ক্রোশ পথ হাঁটিয়া রাধাকুণ্ড হইতে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, তাহাও ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায় (১১শ তরঙ্গ, ৬৬৭ পৃঃ। বৃন্দাবন হইতে জাহ্নবামাতা রাধাকুণ্ডে গিয়াছিলেন; কবিরাজ-গোস্বামীও তাঁহারই সঙ্গে বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া একটু তাড়াতাড়ি করিয়া "অগ্রেতে আসিয়া। দাস গোস্বামীর আগে ছিলা দাঁড়াইয়া॥ অবসর পাইয়া করয়ে নিবেদন। শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর হৈল আগমন॥ (ভ. র. ১১শ তরঙ্গ, ৬৬৮ পৃঃ।" ইহার পরেও আবার নিত্যানন্দ-তনয় বীরচন্দ্র গোস্বামী বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন; তাঁহার বৃন্দাবনে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই "সর্ব্বত্র ব্যাপিল বীরচন্দ্রের গমন॥ শুনি বীরচন্দ্রের গমন বৃন্দাবনে। আগুসরি লইতে আইসে সর্ব্বজনে॥ শ্রীজীব-গোসাঞি শ্রীচৈতন্য-প্রেমময়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গুণের আলয়॥ ইত্যাদি। (ভ. র. ১৩শ তরঙ্গ, ১০২০ পৃঃ)।" এ স্থলে দেখা যায়, যাঁহারা প্রভু বীরচন্দ্রকে বৃন্দাবনে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার নিমিত্ত শ্রীজীবাদির সঙ্গে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কবিরাজ-গোস্বামীও ছিলেন। তিনি থাকিতেন রাধাকুণ্ডে; আর শ্রীজীব থাকিতেন বৃন্দাবনে, সাত ক্রোশ দূরে। এত দীর্ঘপথ হাঁটিয়া তিনি বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন প্রভু বীরচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিতে। ইহার পরে বীরচন্দ্রপ্রভু যখন লীলাস্থলী দর্শনে বাহির হইয়াছিলেন তখন তিনি "গোবর্দ্ধন হইতে গেলেন ধীরে ধীরে। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের কুটীরে॥ তথা হৈতে বৃন্দাবন দুই দিনে গেলা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ সঙ্গেই চলিলা॥ (ভক্তিরত্নাকর, ১৩শ তরঙ্গ, ১০২২ পৃঃ)।" তাঁহারা রাধাকুণ্ড হইতে সোজাসুজি বৃন্দাবন আসেন নাই। কাম্যবন, বৃষভানুপুর, নন্দগ্রাম, খদিরবন, যাবট ও গোকুলাদি দর্শন করিয়া ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে বৃন্দাবনে পৌছেন (ভক্তিরত্নাকর, ১৩শ তরঙ্গ, ১০২২—২৬ পৃঃ)।" কবিরাজ-গোস্বামীও এ সকল স্থানে গিয়াছিলেন।

নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সঙ্গে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কার্ত্তিকব্রত-পূরণের মহোৎসব উপলক্ষে কবিরাজ-গোস্বামী যে রাধাকুণ্ড হইতে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, প্রেমবিলাস হইতেও তাহা জানা যায় (প্রেমবিলাস, ১২শ বিলাস, ১৪১ পৃঃ)।

এ সমস্ত উক্তি হইতে অনুমান হয়, চরিতামৃতের মধ্যলীলা লিখনারম্ভে কবিরাজ-গোস্বামীর যত বয়স হইয়াছিল, তিনি যত "বৃদ্ধ ও জরাতুর" হইয়াছিলেন, শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন-ত্যাগের সময়ে এবং তাহার কিছুকাল পরেও তাঁহার তত বয়স হয় নাই, তিনি তত "বৃদ্ধ ও জরাতুর"—তত চলচ্ছক্তিহীন—হন নাই। তাহাতেই অনুমান হয়, তখনও তাঁহার চরিতামৃত লেখা শেষ হয় নাই—মধ্যলীলার লেখা আরম্ভও হয় নাই। সুতরাং শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রেরিত গোস্বামিগ্রন্থের মধ্যে যে কবিরাজ-গোস্বামীর চরিতামৃত ছিল না এবং বনবিষ্ণুপুরে যে তাহা অপহৃত হয় নাই, তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

অতএব এ দিক দিয়াও দেখা যায় যে, ১৫০৩ শক যে চরিতামৃতের সমাপ্তি কাল এ যুক্তি টিঁকে না।
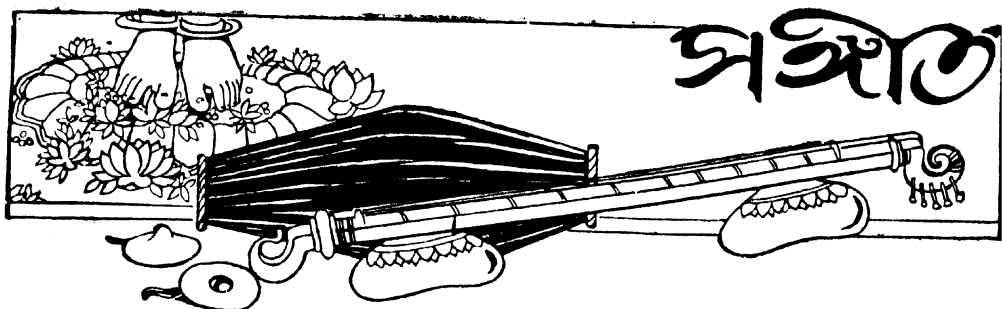
গান ও সুর—শ্রীঅসিতকুমার হালদার

স্বরলিপি—শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত

(গান)

আঁকল ছবি
আজকে রবি
ভোরের বেলা
সে কি শুধু ছেলেখেলা ?
রচলো এ কি
আজকে দেখি
আলপনাতে
শিউলি তলায় ফুলের মেলা।
শিশির ধোয়া সবুজ বনে
রঙিন আলো অকারণে
কি গান দেখি গাইল আজি
হেলা, ফেলা ;—
কান দিলে কেউ নাই বা দিলে
ভোরের বেলা।

দ্‌া ণ্‌া সা সা | া া সা ণ্‌া | সা জ্ঞা জ্ঞ জ্ঞা | ঋা া জ্ঞা | I
আঁ • ক্‌ লো • • ছ বি আ • জ্‌ কে র • বি

II
সা ঋা জ্ঞা মজ্ঞা | ঋা া সা া | দ্‌া ণ্‌া সা সা | া া সা ণ্‌া |
ভো • রে র বে • লা • সে • কি • • • শু ধু

সা ঋা জ্ঞা মজ্ঞা | ঋা া সা া | II
ছে • লে • খে • লা •

দা দা া মা | দা া দা ণা | ণা সা সা া | র্সা র্ঋা ণা র্সা |

রচ্ ০ ০ ল　এ ০ কি ০　আ জ কে ০　দে ০ খি ০

র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা া র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞর্ঋা | র্সা া া া | া া া া |

আ ০ ০ লপ্　না ০ তে ০　০ ০ ০ ০　০ ০ ০ ০

র্সা া া র্সা | র্ঋা া সা া | ণা র্সা ণা ণা | দা া পা া ||

শিউ ০ ০ লি　ত ০ লায় ০　ফু ০ লে র　মে ০ লা ০

দা া দা দা | ণা া র্সা া | র্ঋা া র্সা র্সা | ণা া র্সা া |

শি ০ শি র　ধো ০ য়া ০　স ০ বু জ　ব ০ নে ০

র্সর্জ্ঞা া র্জ্ঞা া | র্মা া র্মা া | র্জ্ঞা া র্ঋা া | ণা া র্সা া |

র ০ ঙিন ০　আ ০ লো ০　অ ০ কা ০　র ০ ণে ০

র্সা র্সা র্সা া | র্ঋা া র্সা া | ণা র্সা ণা া | দা া পা া |

কি ০ গান ০　দে ০ খি ০　গা ই ল ০　আ ০ জি ০

পদা ণা ণা া | দা পমা পা া | সা পা া পা | পা পা া পা |

হে ০ লা ০　ফে ০ লা ০　কা ০ ০ ন　দি লে ০ কেউ

পদা ণা া ণা | দপা মপা পা া | মা পা দা পা | গা রা গা া |

না ই ০ বা　দি ০ লে ০　ভো ০ রে র　বে লা ০ ০

পূজায় মুসুরী

শ্রীবেলা দে

এবার ঠিক হয়েছিল পূজার সময়টা কোনও দূরদেশে কাটান হবে। নাইনিতাল, মুসুরী, সিমলা, উটাকামণ্ড প্রভৃতির কথা নিয়ে বাড়ীতে অনেক জল্পনা কল্পনা হবার পর শেষে মুসুরী যাওয়াই স্থির হল, কারণ সকল hill-station অপেক্ষা মুসুরীর জলবায়ু না কি ভাল। মুসুরী যাওয়া যখন সাব্যস্ত হল তখন মুসুরীতে বাড়ীর জন্য খোঁজখবর চলল। কিন্তু এক দেশ থেকে আর এক দেশে না দেখে-শুনে কেবলমাত্র চিঠির মারফত বাড়ী নেওয়ার অসুবিধা বুঝে সেজদা'কে বাড়ী ঠিক করবার জন্য মুসুরী পাঠান হল। ৩।৪ দিন পরে সেজদা'র টেলিগ্রাম এল, "বাড়ী স্থির হয়েছে, তোমরা এসো"। আমরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মনের আনন্দে সুটকেস্ গোছাতে লাগলাম। ২৩শে সেপ্টেম্বরের ডেরাডুন এক্সপ্রেসে আমাদের জন্য একখানি প্রথম শ্রেণীর কম্পার্টমেণ্ট রিসার্ভ করা ছিল। আমরা তাহাতে উঠে পড়লাম। সেদিন হাবড়া ষ্টেসনে খুবই ভীড়; পশ্চিমগামী ট্রেণগুলো একেবারে ভর্ত্তি। স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় অনেকেই পূজার ছুটিতে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, বাঙ্গলা ছেড়ে চলেছেন। ষ্টেসনে অনেক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হল। রাত সাড়ে দশটায় ট্রেণ ছাড়ল। আমরাও পোষাক পরিচ্ছদ বদল করে রাতের পোষাক পরে শুয়ে পড়লাম।

ভোর বেলা ঘুম ভেঙ্গে দেখি ট্রেণ গয়া ষ্টেসনে দাঁড়িয়েছে। বলা বাহুল্য, আমরা গ্র্যাণ্ড কর্ড দিয়ে যাচ্ছিলাম। এখানে আমরা প্রাতরাশ শেষ করলাম। বেলা প্রায় আট্টার সময় আমরা শোণ নদীর পুল পার হলাম। আগে যতবারই শোণ নদীর উপর দিয়ে গেছি, তেমন জল কোথাও দেখি নাই। কিন্তু এবার দেখলাম স্থানে স্থানে প্রচুর জল জমে রয়েছে। কয়েক দিবস যাবৎ যে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়েছিল তারই চিহ্ন। প্রায় ১১টার সময় মোগলসরাই ছেড়ে ট্রেন ধীরে ধীরে গঙ্গার পুলের উপর উঠল। অগ্রেই বেণীমাধবের ধ্বজা দেখা গেল। তার পর ক্রমে ক্রমে গঙ্গাতীরে বেনারসের মন্দির, ঘাট, সোপান, বাড়ীঘর সবই চোখে পড়ল। চলন্ত ট্রেন থেকে বেনারসের ঘাটের দৃশ্য কতবার দেখেছি, কিন্তু তবু তৃপ্তি হয় না, এ দৃশ্য এত মনোহর! ডেরাডুন্ এক্সপ্রেস্ যখন বেনারস্ ক্যাণ্টনমেণ্ট্ ষ্টেসনে এসে দাঁড়াল তখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা। প্ল্যাটফরমেই মেজদা, মেজবৌদি, ও মেজবৌদির বাবা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরাও এঁদের দেখবার জন্য জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রেখেছিলাম যেন কত যুগ পরে দেখা হচ্ছে ভাবটা! মেজদারা আগের দিন বেনারসে এসেছেন। মেজবৌদি আমাদের জন্য প্রচুর উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যাদি, কাশীর বিখ্যাত রাবড়ি ও মিষ্টান্নাদি এনেছিলেন। আমরাও এ সমস্ত পেয়ে খুব খুসী হয়ে তাঁকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জানালাম। বলা বাহুল্য, এ সকল আমরা যথাসময়ে পরম তৃপ্তির সহিত সদ্ব্যবহার করেছিলাম। আগের বন্দোবস্ত অনুযায়ী মেজদা বেনারস্ থেকে আমাদের সঙ্গেই মুসুরী চললেন। মেজবৌদি ও তাঁর বাবা তাঁদের বেনারসের বাড়ীতে ফিরে গেলেন। ট্রেন বেনারস্ ছাড়ল। পথে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জৌনপুর অতিক্রম করে বেলা সাড়ে তিনটার সময় আমরা অযোধ্যা এলাম। শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা ভাবতেই মনটা শ্রদ্ধায় ভরে এল। রামায়ণের অযোধ্যা দেখি নাই, বর্ণনা পড়েছি কৃত্তিবাসের লেখায়। তাই বর্ত্তমান যুগের অযোধ্যার মধ্যে মন অতীতের অযোধ্যা খুঁজছিল। কিন্তু ষ্টেসন থেকে চার পাশে দেখে বুঝলাম যে "সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই", কেবল শ্রীরামচন্দ্রের কতিপয় অনুচর ষ্টেসনে ঘুরে বেড়াচ্ছে; ট্রেনের উপর উঠছে। ইহারাই বর্ত্তমান যুগের অযোধ্যা এবং রামায়ণের অযোধ্যার connecting link। সন্ধ্যার অল্প পরেই আমরা লক্ষ্ণৌ পৌঁছলাম। চলন্ত ট্রেন থেকেই "লা মার্টিনিয়ার" কলেজের চূড়া দেখা গেল। মাত্র সেদিনকার কথা, তদানীন্তন বড়লাটবাহাদুর লর্ড্ আরুউইন্ লক্ষ্ণৌর এই নূতন ষ্টেসন

open করেছিলেন। প্রকাণ্ড, সুন্দর, হাল ফ্যাসানের ষ্টেসন,—বাঙ্গালী স্যার্ রাজেন্দ্রনাথ মুখাজ্জির মার্টিন কোম্পানির দ্বারা বহু লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ম্মিত হয়েছে। লক্ষ্ণৌ ছিল নবাবের দেশ। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর কত কাহিনী রয়েছে। ফেরবার পথে লক্ষ্ণৌ বেড়িয়ে যাওয়া হবে স্থির করা হল। লক্ষ্ণৌতে আমরা ডিনার খেয়ে নিলাম। ট্রেন লক্ষ্ণৌ ছাড়ল, আমরাও নিদ্রার ব্যবস্থা করলাম। ভোর রাত্রে ট্রেন হরিদ্বারে পৌছল। এখানে ট্রেনের পিছনে একটা এঞ্জিন জুড়ে দেওয়া হল; কারণ হরিদ্বার থেকে ডেরাডুন পর্য্যন্ত পথটা বেশ ধীরে ধীরে উঠে গেছে। সে পথে একটা এঞ্জিন এত বড় ট্রেন টেনে নিয়ে যেতে পারে না। হরিদ্বারের পাণ্ডারা ট্রেনের নিকট ঘোরাঘুরি করছিল; কিন্তু আমা-

মুসুরীর সাধারণ দৃশ্য

দের প্রথম শ্রেণীর কম্পার্টমেন্ট ও সাহেবি বেশভূষা দেখে কাছে ঘেঁষতে ইতঃস্তত: করছিল। মেজদা একজনকে ডেকে হরিদ্বারের অনেক কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নিলেন; কারণ, ফেরবার পথে হরিদ্বার দেখে যাওয়া হবে। হরিদ্বার থেকে ডেরাডুন্ প্রায় দেড় ঘণ্টার পথ। হরিদ্বার ছেড়েই ট্রেন পর পর দুটা টানেলের মধ্য দিয়ে গেল। ক্রমে ভোরের আলো দেখা দিল। ট্রেন তখন বেগে ডেরাডুন অভিমুখে ছুটেছে। মনে হচ্ছিল যে, প্রায় দেড় দিন অবিশ্রান্তভাবে ছুটে এঞ্জিনটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই গন্তব্য স্থান আগতপ্রায় জেনেই এঞ্জিনের আর অস্থিরতার শেষ ছিল না,—ভাবটা যেন শীঘ্র বোঝা নামিয়ে শ্রান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে। লাইনের দু'পাশে গভীর জঙ্গল, সামনে অভ্রভেদী হিমালয়। আমরা যতই এগিয়ে যাচ্ছি, মনে হচ্ছিল, হিমালয়ও ততই যেন পেছিয়ে যাচ্ছে, যেন আমাদের ধরা দিতে চায় না। প্রায় সাড়ে ৬টার সময় ট্রেন ডেরাডুন্ পৌছল। আমরাও প্রায় দেড় দিন পরে ট্রেন থেকে নামলাম। যাবার সময় আমরা ডেরাডুনে থামি নাই, সোজা মুসুরী চলে গেছলাম। ফেরবার পথে আমরা ডেরাডুনে ছিলাম। ডেরাডুনের সম্বন্ধে দুচার কথা পরে বলবার ইচ্ছা রইল। সেজদা মুসুরীতেই ছিলেন। আমাদের জন্য Pioneer Motor Transport Companyর একখানি motor bus রিজার্ভ করে রেখেছিলেন। সে জন্য আমাদের ডেরাডুনে কোনও অসুবিধা হয় নাই। রিজার্ভ-করা busর জন্য ভাড়া পড়েছিল মাত্র ১১॥০ টাকা, খুব সস্তাই বলতে হবে। ডেরাডুনের waiting roomএ আমরা চা পান শেষ করলাম। প্লাটফর্মে মটর কোম্পানির একজন শ্বেতাঙ্গ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন,—আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে busএ তুলে দিলেন। আমাদের জিনিষপত্র busএর চালে তুলে দেওয়া হলে bus ছেড়ে দিল।

ডেরাডুন সহরের ভিতর দিয়ে bus চলল; সুন্দর প্রশস্ত সমতল রাস্তা, দুধারে বড় বড় ইউকালিপ্টাস্ গাছ সকল সগর্ব্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে,—ভাবটা যেন কাহাকেও গ্রাহ্য করি না, হিমালয়কেও নহে। পথের দু'পাশে বড় বড় দোকান—বেশীর ভাগই মটর সংক্রান্ত জিনিষপত্রের; কতগুলি হোটেল, আর ছবির মত সুন্দর bungalows। সহরের বাহিরে দু'একটা

চা বাগানও রয়েছে। প্রথম কয়েক মাইল সমতল রাস্তার উপর দিয়ে গিয়ে আমরা ক্রমে পাহাড়ের গায়ে উঠতে লাগলাম। ডেরাডুন থেকে মুসুরীর উচ্চতা প্রায় পাঁচ হাজার ফিট্। কিন্তু পাহাড়ের গা বেয়ে যে আঁকাবাঁকা রাস্তা ডেরাডুন থেকে মুসুরী পর্য্যন্ত গেছে, তার দূরত্ব হচ্ছে ২১ মাইল। আমরা যতই ভাবছিলাম যে আমরা সামনের ঐ গগনস্পর্শী পর্ব্বতশ্রেণী পার হয়ে পিছনের পর্ব্বতরাজিতে উঠব, ততই আমাদের মন ভয়ে, বিস্ময়ে ও

কেম্পত্ ফল

আনন্দে পরিপ্লুত হচ্ছিল। আমাদের সামনে একখানা মটর যাচ্ছিল, পিছনে আরও তিন চারখানা bus ও মটর আসছিল। মাঝে মাঝে আমরা তলার দিকে ডেরাডুন সহর দেখতে পাচ্ছিলাম। প্রভাত-সূর্য্যের কিরণে ডেরাডুনের বাড়ীঘরগুলো যেন ঝলমল করছিল। যখন আমাদের bus পাহাড়ের কোনও বাঁকের মধ্য দিয়ে যায়, ডেরাডুন আর দেখা যায় না। পরমুহূর্ত্তেই bus যেই বাঁক পার হয়ে সোজা রাস্তায় চলতে থাকে, ডেরাডুন আবার চোখে পড়ে। তলায় ডেরাডুন সহর বা Dun Valley—পাহাড়ের উপর মুসুরী। তারই মধ্য দিয়ে আঁকা বাঁকা রাস্তা বেয়ে আমাদের bus মুসুরী ছুটেছে। যখন পাহাড়ের ঘন বৃক্ষরাজিতে চারদিক ঢাকা পড়ে যায়, কিছুই দেখা যায় না ; যেন ডেরাডুন আর মুসুরীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে আমাদের busখানা এগিয়ে চলেছে,—মুসুরী পৌঁছতে পারলেই তার বুড়ী ছোঁওয়া শেষ হবে। মাঝে মাঝে মুসুরীর দিক থেকেও দু'একখানা মটর নেমে আসছিল। চার দিকে সূর্য্যের এত আলো,—হঠাৎ কোথা থেকে একটা মেঘ সামনে এসে সব আঁধার করে দিল। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখি আবার আলোর রাজ্যে এসে পড়েছি, মেঘ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কখনও বা আমাদের দু'পাশে গভীর জঙ্গল। হিমালয়ের এই প্রদেশের জঙ্গলে নানা জাতীয় জীবজন্তুর বাস। সকল সময় মটর এবং লোকজনের যাতায়াত থাকাতে পাহাড়ের এই পথে জীবজন্তুর আবির্ভাব বড় একটা হয় না। দু'একটা শীর্ণ কায়া ঝরণা কুলকুল শব্দে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে ; কিন্তু কোথায় গিয়ে পড়েছে, তা দেখবার আগেই, আমরা সেখান থেকে বহু দূর চলে যাচ্ছি। রাস্তার বাম দিকে হাজার হাজার ফিট্ নীচু খাদ, আর ডান দিকে গগনস্পর্শী হিমালয়। পাহাড়ের শেষ নাই। যতই উঠছি সামনে আবার নূতন চূড়া এসে দাঁড়াচ্ছে,—যেন মানুষের ক্ষমতার নিকট পরাজয় স্বীকার করতে চায় না! একটা পাহাড় অতিক্রম করে আর একটা পাহাড়ে চলেছি,—মনের মধ্যে এমন সুন্দর ভাবের উদয় হচ্ছিল যে, ইংরাজ কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছা হয়, "to me high mountains are a feeling"। রাস্তার দুপাশে নানা জাতীয় বৃক্ষলতা,—বেশীর ভাগই পাইন্ গাছ। নানা রকম লাল, নীল, বেগুনি, ফুল ফুটে রয়েছে। ছোট বড় রঙ্গ-বেরঙ্গের প্রজাপতি ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে। তলায় প্রাতঃরবির সাদা কিরণে সমতলভূমি এমন ঝলমল করছে—যেন থেকে থেকে পৃথিবীর সঙ্গে আকাশের কোলাকুলি হচ্ছে। এমন বিচিত্র রঙের সমাবেশ জীবনে কখনও দেখি নাই। রূপালি রেখার মত একটা শীর্ণকায়া পার্ব্বত্য নদী কোন্ সুদূর পর্ব্বত থেকে নেমে সমতলভূমির উপর দিয়ে কোন

অজানা দেশের দিকে চলে যাচ্ছে,—মনে হচ্ছে পৃথিবীর বুকের উপর কে একটা আলপনা দিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে Fern জন্মেছে। ইচ্ছা করছিল নেমে গিয়ে তুলে নিয়ে আসি। মাঝে মাঝে পাহাড়িদের ঘর, ছোট ছোট ক্ষেত ও শাকসব্‌জির বাগান; কোথাও বা পাহাড়ি ছেলেমেয়েরা পথের ধারে পাহাড়ের গায়ে ছুটে ছুটে খেলা করছে। নানা রঙের ছোট ছোট পাখীও অনেক উড়ে বেড়াচ্ছে। বড় পাখীর মধ্যে দু'একটা শঙ্খচিল আকাশের গায়ে অনেক উঁচুতে পাক খাচ্ছে। ডেরাডুন থেকে রাজপুর পর্য্যন্ত ১৪ মাইল পথ বেশ চওড়া। up ও down traffic একসঙ্গেই যাতায়াত করে। রাজপুরের পর রাস্তা সরু হয়ে গেছে, up ও down traffic এর জন্য সময় আলাদা। হিমালয়ের বুকের উপর দিয়ে সরীসৃপের মত এঁকে বেঁকে পথ উঠে গেছে। এই পথে মটর চালান খুব শক্ত। কারণ এত বেশী বাঁক আছে যে খুব সতর্ক হয়ে না চালালে যে কোন মুহূর্ত্তে মটর গড়িয়ে হাজার হাজার ফিট্ তলায় চলে যাবে, আর সকলেই প্রাণ হারাবে। সেবার যখন দার্জ্জিলিঙ্গ যাই, শিলিগুড়ি থেকে মটরেই গেছলাম। শিলিগুড়ি থেকে দার্জ্জিলিঙ্গ পর্য্যন্ত একই পথের উপর দিয়ে পাশাপাশি মটর যাওয়া-আসা করে এবং দার্জ্জিলিঙ্গ হিমালয়ান রেলের লাইন; স্থানে স্থানে মটরকে রেলের লাইন অতিক্রম করে যেতে হয়। সে জন্য দার্জ্জিলিঙ্গের পথে অধিকতর সাবধানে মটর চালান দরকার। ডেরাডুন থেকে মুসুরী রেলওয়ে নাই; কেবল মটর এবং রিক্সর পথ; সুতরাং মটর চালান অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু পাহাড়ের রাস্তা যতই বিপদসঙ্কুল হ'ক না কেন, চার পাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এতই চিত্তাকর্ষক যে মনকে উৎকণ্ঠিত হবার সুযোগ দেয় না। স্থানে স্থানে পথের উপর মিস্ত্রি ও মজুররা কাজ করছে। ডেরাডুন থেকে মুসুরী এই ২১ মাইল পথ বছরের সকল সময় সর্ব্বপ্রকারে ঠিক রাখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়, এবং মোটের উপর রাস্তার অবস্থা ভালই দেখলাম। ক্রমে আমাদের বাস রাজপুরে এসে দাঁড়াল। এখান থেকে মুসুরীর দূরত্ব ৭ মাইল। রাজপুর একটি halting station এবং মুসুরী মিউনিসিপাল সীমানার মধ্যে। এখানে মিউনিসিপাল ট্যাক্‌স আদায়ের আফিস্ আছে। মুসুরী যাত্রীদের প্রত্যেককে দেড় টাকা করে ট্যাক্‌স দিতে হয়। ১২ বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের অর্দ্ধেক। বিস্তৃত নিয়মাবলী টোল আদায়ের ঘরের সামনে নোটিস বোর্ডে দেওয়া আছে। এই টোলের পরিমাণ বৎসরে তিন লক্ষ টাকা; এবং উহা এই রাস্তা মেরামতের জন্য ব্যয় করা হয়। টোল দিয়ে যে টিকিট পাওয়া গেল, সেগুলো রেখে দিতে হয়। কিছু দূরে গিয়ে "ভাত্তা" নামক এক জায়গায় মটর দাঁড় করিয়ে সেগুলো চেক্

কুলরির এক অংশ

করে। রাজপুর থেকে মুসুরীর বাড়ীঘরগুলি ছবির মত সুন্দর দেখায়। রাজপুরের আশে-পাশে অনেক ইয়োরোপীয়ানের বাড়ী আছে। বেলা প্রায় সাড়ে ৮টার সময় আমাদের বাস মুসুরী সহরের তলায় সানি ভিউতে এসে থামল। এর পর আর মটর যায় না। দূর থেকেই আমরা সেজদাকে দেখতে পেলাম। সেজদা আমাদের এগিয়ে নেবার জন্য Sunny Viewতে নেমে এসে অপেক্ষা করছিলেন। Sunny View থেকে খাস্

মুসুরী সহরের উচ্চতা প্রায় ৬০০ ফিট্ এবং এই ৬০০ ফিট্ উঠতে হ'লে রিক্স, দাণ্ডি, পনি বা হনটন্ ছাড়া উপায় নাই। এখান থেকে খাস মুসুরী সহরে (কেউ যেন মনে করবেন না যে Sunny View মুসুরী সহরের বাহিরে) পৌছবার দুটা রাস্তা আছে—প্রথমটা নানা পথ ঘুরে মল ও ল্যাণ্ডুর বাজার যাবার রাস্তার junction এ Kulri Hill এর সন্নিকটে Picture Palace এর সামনে এসে সহরে পড়েছে। দ্বিতীয় পথটা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সর্ট-কাট রোড এবং আরও কয়েকটা রাস্তা ঘুরে Hampton Court School ও Y. W. C. A র পাশ দিয়ে এসে Fitch and Company র দোকানের সামনে মলে মিশেছে। Sunny View থেকে এই ৬০০ ফিট্ উঠা বেশ কষ্টকর। এ যাবৎ যাঁরা কেউ মুসুরীর বিষয় দু'কথা লিখেছেন, তাঁরা কেউ Sunny View থেকে মুসুরী উঠার কষ্টটা এবং রাজপুরে টোল আদায়ের কথা বলেন নাই। অথচ এ-সকল সংবাদ না দিলে সাধারণের নিকট ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখার কোন উপকারিতা থাকে না। রাজপুরে টোল দিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু এত কষ্ট করে আবার ৬০০ ফিট্ উঠতে কাহারও কাহারও আপত্তি হলেও হতে পারে।
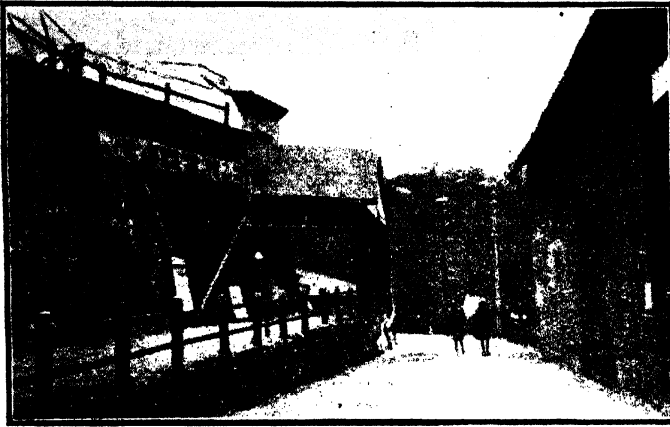
ক্যামেলস্ পার্করোডের এক অংশ

Sunny Viewতে সেজদা আমাদের জন্য চারখানা রিক্স ও অনেকগুলি কুলি ঠিক করে রেখে-ছিলেন। কুলিরা আমাদের মালপত্র তাদের পিঠে বেঁধে নিয়ে পার্ব্বত্য-পথ দিয়ে উপরে উঠে গেল। আমরা খানিক পথ হেঁটে, খানিকটা রিক্স চেপে বেলা প্রায় ১০টার সময় Kulri Hill ও Mall এর সংযোগস্থলের নিকট আমাদের বাড়ী Sanon Lodge এ পৌছলাম; কুলিরা আমাদের মালপত্র নিয়ে আগেই পৌছে গেছল। ২৩শে সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে নটায় আমাদের শ্যামবাজারের বাড়ী "ইন্দ্রধাম" থেকে বেরিয়ে প্রায় দেড় দিন পথে কাটিয়ে আমরা মুসুরীর বাড়ীতে পৌছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। এখানে বলা ভাল যে Sunny View থেকে আমাদের বাড়ী Sanon Lodge আসতে প্রতি রিক্স-ভাড়া এক টাকা চার আনা ও প্রতি কুলির ভাড়া পাঁচ আনা করে পড়েছিল।

এবার পূজার বন্ধে জনসাধারণকে মুসুরী নিয়ে যাবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী সর্ব্বত্র রঙ্গ-বেরঙ্গের ছবি দিয়ে মুসুরীকে খুবই মনোরম করে তুলেছিল। জায়গাটা খুবই চিত্তাকর্ষক তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে Sunny View থেকে ৬০০ ফিট্ পথ উঠে খাস মুসুরী সহরে পৌছান যে বেশ শ্রমসাধ্য, সেটা একটু স্পষ্ট বলে দিলে ভাল হত; কারণ, আগে থাকতে প্রস্তুত হয়ে গেলে কষ্টটা গায়ে লাগে না। শুনলাম Sunny View থেকে খাস মুসুরী সহর পর্য্যন্ত মটর চলাচলের রাস্তা শীঘ্র হবে। তখন অবশ্য মুসুরী যাওয়া খুবই আরামদায়ক হবে সন্দেহ নাই। উপস্থিত রিক্স, দাণ্ডি এবং পনি নিয়েই মুসুরীর যান এবং বাহন গঠিত।

মুসুরী নামটা কি থেকে এল জানবার জন্য উৎসুক হয়ে এখানকার দু'চারজন স্থায়ী অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তেমন সন্তোষজনক উত্তর কোথাও পাই নাই। কেউ কেউ মুসুরী নামের উৎপত্তির বিষয় যা বলেছিলেন তা এই প্রকার—মনসুরী বা মনসু নামে

এখানে এক প্রকার ছোট ছোট ফলের গাছ আছে। পাহাড়ের লোকে এই ফল খায়। হিমালয়ের এই অঞ্চলে মনসু বা মনসুরী ফলের গাছ প্রচুর জন্মায়। এই গাছের নাম থেকে এই অঞ্চলের নাম দাঁড়াইয়াছে মনসুরী বা চল্‌তি ভাষায় মুসুরী। এখনও পাহাড়ের লোকেরা এ জায়গাটাকে মনসুরী পাহাড বলে, মুসুরী বললে অনেকে বুঝতে পারে না। দার্জ্জিলিঙ নামের উৎপত্তি দুর্জ্জয়লিঙ্গের মন্দিরের অবস্থিতি থেকে এটা সহজেই অনুমেয়; কিন্তু মুসুরী নামের উৎপত্তিটা তেমন সন্তোষজনক নয়।

হিমালয়ের দক্ষিণ ভাগের যে ঢালু অংশ আছে, তাহারই উপর সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাত হাজার ফিট্ উচ্চে মুসুরী অবস্থিত। আর মুসুরীর দক্ষিণে সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় আড়াই হাজার ফিট্ উপরে ডেরাডুন একটা বিস্তীর্ণ মালভূমি। মুসুরী হইতে Dun Valleyর দৃশ্য বড়ই সুন্দর এবং পরিষ্কার মেঘমুক্ত রাত্রে ডেরাডুনের আলোগুলি অতি সুন্দর দেখায়। নাইনিতাল, গাড়য়াল প্রভৃতি প্রদেশ কুমায়ুন পর্ব্বতশ্রেণী নামে অভিহিত। আর মুসুরী ডেরাডুন অঞ্চলটাকে শিভালিক পর্ব্বতশ্রেণী বলা হয়। বোধ হয় অতি প্রাচীন কালে হিমালয়ের এই অঞ্চলটা শিবের অতি প্রিয় বিহার-ভূমি ছিল, তাই এখনও ইহাকে শিবালিক পর্ব্বতরাজি বলে। শিবালিক নামের উৎপত্তি যাহাই হউক না কেন, হিমালয়ের এই দিকটা যে শিবের খুবই পরিচিত তাহাতে সন্দেহ নাই; যেহেতু, কেদারনাথ, ত্রিযুগীনাথ, উত্তরকাশী প্রভৃতি তীর্থস্থান, মুসুরীর উত্তরে চিরতুষারাবৃত যে গগন-স্পর্শী পর্ব্বতরাজি বিরাজমান, তাহার মধ্যেই অবস্থিত।

ইংরাজ অধিকারের আগে হিমালয়ের এ প্রদেশটা নেপালের অন্তর্গত ছিল। ১৮১২ খৃঃ ইংরাজদের সঙ্গে নেপালরাজের সংঘর্ষণ আরম্ভ হয়। নেপাল যুদ্ধের সেনাপতি জেনারেল অ্যাকটারলোনীর স্মৃতি-চিহ্ন "অ্যাকটার-লোনী মনুমেণ্ট" আজও কলকাতার গড়ের মাঠে শোভা পাচ্ছে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে সোগোলির সন্ধি অনুযায়ী সিমলা, গাড়য়াল, কুমায়ুন, তেরাই ও ডেরাডুন প্রদেশগুলি ইংরাজ সরকারের হস্তগত হয়। ডেরাডুনের সঙ্গে সঙ্গে মুসুরী, লাণ্ডুর প্রভৃতি পর্ব্বতরাজিও ইংরাজ অধিকৃত হয়। মুসুরীর জন্ম এবং ক্রমবিকাশ এই সময় এবং এই ভাবেই আরম্ভ হয়। অনেক দিন আগে মুসুরী এবং লাণ্ডুর দুটা পাহাড় এবং সহর পরস্পর থেকে পৃথক ছিল। ক্রমে লোকজনের বসবাস অধিক হওয়াতে এবং যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত হইলে দুটা সহর একত্র করিয়া বর্ত্তমানে মুসুরী নামেই পরিচিত। এখানে ইয়োরোপীয় সেনাদের জন্য convalescent home আছে এবং একটি সেনানিবেশও আছে। বর্ত্তমানে মুসুরী ডেরাডুন জিলার একটি administrative unit মাত্র। উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরা

লাণ্ডুর বাজার

সকলেই ডেরাডুনে থাকেন। কেবলমাত্র সিবিল সার্জ্জনই মুসুরীতে অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া অনুমান হইল।

মুসুরী সহরটী বেড়াইবার পক্ষে খুবই প্রশস্ত; অনেক-গুলি রমণীয় পথ এবং দ্রষ্টব্য স্থানও আছে। মুসুরী সহরের পশ্চাতে যে সুদীর্ঘ সমতল পথটী মুসুরী সহরের এক অংশ ঘিরিয়া চলিয়াগিয়াছে, উহাই Camel's Back Road নামে প্রসিদ্ধ। Camel's Back Boadএর দিকেই ইংরাজদের প্রথম বসবাস আরম্ভ হয় এবং পুরাতন গোরস্থান বা old cemetry এই রাস্তায় অবস্থিত।

ভেবেছিলাম Camel's Back Road বোধ হয় উষ্ট্রের পৃষ্ঠের মত মাঝখানে উঁচু হবে—hill-stationএ ও-রকম পথ হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে—কিন্তু যখন সমস্ত Camel's Back Roadএর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরে এসে উষ্ট্রের পৃষ্ঠের মত হওয়া ত দূরের কথা, কোথাও রাস্তা সামান্য একটু উঁচু দেখলাম না—তখন প্রথমটা একটু নিরাশ হলেও, পরে খুব আনন্দিতই হয়েছিলাম; যেহেতু, পার্ব্বত্য প্রদেশে এ-রকম সমতল রাস্তা করা অল্প কৃতিত্বের পরিচয় নহে! Camel's Back Roadএর এক স্থানে বিশ্রাম করিবার জন্য অতি সুন্দর একটা বিশ্রাম স্থান আছে। ইহাই Scandal Point নামে পরিচিত। এখানে বসিয়া হিমালয়ের

হিমালেয়ান ক্লাব

উত্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়, এবং খুব পরিষ্কার দিনে তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজিও দেখা যায়। মুসুরী হইতে সিমলা যাইবার পথও এখান হইতে দেখা যায়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য প্রথম হইতেই মুসুরী খুব পরিচিত হইয়া উঠে। এখানকার হাওয়া তেমন কন্‌কনে নহে এবং জলবায়ু দার্জ্জিলিঙ অঞ্চলের মত "জলো" নহে; পরন্তু আবহাওয়া বেশ শুষ্ক এবং বৃষ্টিপাতও অপেক্ষাকৃত অল্প। অনেক ইয়োরোপীয়ান ও এ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ান এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। সে কারণ এখানে ছেলেমেয়েদের জন্য অনেকগুলি ডে এবং বোর্ডিং স্কুল ও Convent আছে। মুসুরীর স্কুলগুলির মধ্যে St. Georges College, Woodstock College, Oakgrove, Wynburn প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পাঞ্জাব এবং যুক্ত প্রদেশের অনেক দেশীয় রাজা মহারাজা এখানে গ্রীষ্মাবাস নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কপূরতলার মহারাজের প্রাসাদ "Chateau Kapurtalla" খুবই প্রসিদ্ধ। মুসুরীতে ছোট বড় যত হোটেল এবং রেস্তঁরা আছে এত বোধ হয় আর কোনও hill-stationএ নাই। ইয়োরোপীয় হোটেলের মধ্যে Charleville, Savoy, Grand, Stiffles প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় হোটেলের সংখ্যাও অনেক। Rink Theatre, Palladium, Picture Palace, Rialto, Majestic প্রভৃতি অনেকগুলি সিনেমা আছে, এবং নৃত্য-গীত, cabaret, theatre প্রভৃতি এখানকার দৈনন্দিন ব্যাপার। Charleville Hotel-এর অদূরে Happy Valley Tennis Club সকল টেনিস ক্রীড়কের নিকট পরিচিত। মুসুরীতে পোষাক-পরিচ্ছদ, অন্যান্য জিনিসপত্র ইত্যাদির অনেক দোকান আছে এবং নিত্য ব্যবহারের সকল দ্রব্যই এখানে পাওয়া যায়। এখানে Batার দুইটা জুতার দোকানও আছে। Mallএর উপরেই সব বড় বড় দোকান। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের শাখা এবং ডাকঘর মলে। মুসুরীর সর্ব্বত্রই জলের কল এবং ইলেকট্রিক্ আলো আছে। এমন কি এই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সহরের নিজস্ব দৈনিক সংবাদপত্রও আছে, ইহার নাম "মুসুরী হেরাল্ড্"। ভারতবর্ষের হিল্ ষ্টেসনদের মধ্যে মুসুরীর স্থান খুব উচ্চে। অধিকাংশ hill-stationই প্রাদেশিক গভর্ণরের গ্রীষ্মাবাস এবং তাহাদের উন্নতি স্বাভাবিক, কিন্তু মুসুরী কোনও প্রদেশের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী না হইয়াও এত উন্নীত হইয়াছে—ইহা হইতেই মুসুরীর জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। যদিও বাঙ্গলায় আমরা মুসুরী বলি, এটার সঠিক উচ্চারণ মাসুরী।

এখানে Mall সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত রাজপথ। দু'পাশে বড় বড় দোকান, ব্যাঙ্ক, হোটেল, রেস্তঁরা, সিনেমা প্রভৃতি অবস্থিত। দার্জ্জিলিঙের Mallএর মত মুসুরীর Mall

সামান্য একটু স্থান লইয়া শেষ হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে সমস্ত মুসুরী সহরটা লইয়াই Mall; ইহার আরম্ভ Kulri Hill এ Picture Palaceর নিকট এবং Savoy Hotel এর নিকট লাইব্রেরী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। সমস্ত পথ দৈর্ঘ্যে এক মাইলেরও অধিক। লাইব্রেরীর নিকট ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ড আছে। সহরে তিনটা বাজার আছে—অবশ্য বাজার বলিতে আমাদের দেশের সাধারণ বাজারের মত নহে—Library বাজার, Kulri বাজার এবং Landour বাজার। লাণ্ডুর বাজার সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং লাইব্রেরী বাজার সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। কুলরি বাজারে বাঙ্গলা মিষ্টান্নের একটী দোকানও আছে। এখানকার বাজার মানে কতকগুলি দোকানের সমষ্টি মাত্র, যেমন মুদিরদোকান, শাকসবজি ও ফলের দোকান, এবং কাপড় জামার দোকান। এখানকার লঙ্কা আকারে খুব বড়—যেন এক একটা ছোট বেগুন। খাদ্য দ্রব্যাদি খুব দুর্ম্মূল্য নহে। দার্জ্জিলিঙ্গের মত এখানে প্রশস্ত মিউনিসিপ্যাল্ মার্কেট্ নাই। এখানকার বাজারে দুএকটা মাংসের দোকান থাকলেও মাংস এবং মৎস্য প্রত্যহ বাড়ীতে বিক্রি ক'রে যায়। উৎকৃষ্ট রুই বা পোনা মাছের সের এক টাকা এবং মাংসের সের দশ আনা মাত্র। দুগ্ধ বাড়ীতে দিয়া যায়। কুলরি বাজার এবং Mallর নিকট হইতে Camel's Back Road এ যাওয়া যায় এবং সমস্ত পথটা ঘুরিয়া আবার লাইব্রেরীর দিকে Mall এ ফিরিয়া আসা যায়। কুলরি বাজারের নিকট Tilak Memorial Library এবং Free Reading Room আছে। mall এবং কুলির পাহাড়ের মোড়ে Picture Palace এর পাশ দিয়া Landour যাবার রাস্তা উঠে গেছে। এই রাস্তার ধারে একটা প্রাচীন চার্চ্চ আছে। লাণ্ডুর বাজার যাবার পথে Caste Hill এ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার এক অফিস আছে। মুসুরী মিউনিসিপ্যাল অফিসও নিকটেই অবস্থিত এই দিকে হিমালয়ান ক্লাব্ ও রোড্ অবস্থিত। আমরা যে সময় মুসুরীতে ছিলাম তখন মিউনিসিপ্যাল ইলেকসন্ হচ্ছিল। পার্ব্বত্য মিউনিসিপ্যালিটির গঠন অন্য প্রকার। সহরটাকে ওয়ার্ড বা অংশে ভাগ করে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয় না; representation of interest এবং communinies এই ভাবে নির্ব্বাচন হয়, যেমন হাউস্‌ওনার্সদের একজন প্রতিনিধি, ভাড়াটিয়াদের একজন প্রতিনিধি, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের একজন প্রতিনিধি। নির্ব্বাচনের দিন করদাতারা যে খুব উৎসাহ দেখিয়েছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মিউনিসিপ্যালিটির বার্ষিক আয় আট লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে তিন লক্ষ টাকা টোল থেকেই আদায় হয়। শুনলাম এখানকার মিউনিসিপ্যাল এঞ্জিনিয়ারের বেতন মাসিক ১৬০০ মুদ্রা এবং মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারির বেতন মাসিক ৬০০ টাকা; বলা বাহুল্য এঁরা উভয়েই শ্বেতাঙ্গ। লাণ্ডুর বাজারের নিকট Bengali library আছে এবং আর্য্যসমাজের একটি

ম্যাল্

আশ্রমও আছে। মুসুরীর ছড়ি ও লাঠি খুব বিখ্যাত। লাণ্ডুর বাজারে সাহারণপুরের কাঠের জিনিষ, মোরাদাবাদের পিত্তলের জিনিষ এবং কাশ্মীরি শালের ও সিল্কের পোষাক পরিচ্ছদ প্রচুর পাওয়া যায়।

মুসুরীর নিকট অনেকগুলি প্রপাত আছে। তন্মধ্যে Kemptee falls ও Mossy falls বিখ্যাত। আমরা একদিন সকালে তিনখানা রিক্স নিয়ে কেম্প্‌তি ফলস্ দেখতে গেছলাম। লাইব্রেরী বাজারের ডান দিকে চার্লিভিল্ হোটেলের পাশ দিয়ে যে রাস্তা গেছে সেই

পথে Waverly hill এর পশ্চিম পাশ দিয়ে মিউনিসিপ্যাল্ গার্ডেনস্, বা চলিত কথায় কোম্পানীর বাগান অতিক্রম করিয়া কেম্প্ তি ফলস্ যাবার পথ। ঝরণা থেকে দু'মাইল দূরে আমরা রিক্স থেকে নেমে হেঁটে গেছলাম। অশ্বারোহণে ঝরণার আরও অনেক নিকটেই যাওয়া যায়। কিন্তু শেষ খানিকটা পথ-হাঁটা ছাড়া উপায় নাই।
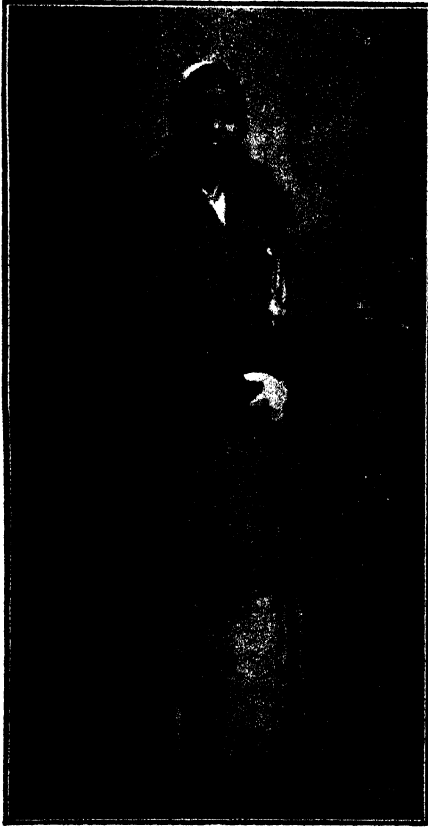
লেখিকা—শ্রীমতী বেলা দে

আমাদের বাড়ী থেকে প্রতি রিক্সর ভাড়া পড়েছিল পাঁচ টাকা। আমরা খাদ্যদ্রব্যাদি সঙ্গে নিয়ে গেছলাম। বাড়ী ফিরলাম বৈকালে। মুসুরীর নিকট সকল ফলস্এর মধ্যে কেম্প্ তিফলস শ্রেষ্ঠ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। জায়গাটা পিকনিকের পক্ষে উপযোগী। পাশাপাশি কয়েকটা জলস্রোত আছে, জল প্রায় ৬০০ ফিট্ তলায় পড়ছে। মুসুরীর আশে পাশে ভ্রমণের উপযোগী আরও অনেক স্থান আছে; যথা, পশ্চিম দিকে ম্যাকিনন্ পার্ক ও ক্লাউড্ এণ্ড; পূর্ব্ব দিকে জাবারক্ষেত ও লাল তিবা। শুনেছি "টপ্ তিবা" নামক পাহাড় থেকে হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত গগনভেদী শৃঙ্গরাজি দেখা যায় এবং পরিষ্কার দিনে বদরীনাথ, কেদারনাথ প্রভৃতি পাহাড়ও দেখা যায়।

মুসুরীর অধিক সংখ্যক লোকই গাড়য়াল প্রদেশের অধিবাসী,—কেউ-বা তেরাই অঞ্চলের লোক। শীতের আধিক্য হলে এরা নিজ নিজ দেশে ফিরে যায়, আবার শীত শেষ হলে এখানে চলে আসে। বেশীর ভাগই হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী। মিস্ত্রি মজুররা অনেকেই পাঞ্জাব সীমান্তের মুসলমান। এখানকার এ্যাংলোইণ্ডিয়ান ও ইয়েরোপীয়ান অধিবাসী সংখ্যা বড় কম নহে। এখানে অনেকগুলি ভারতীয় এবং ইউরোপীয়ান স্ত্রী এবং পুরুষ ডাক্তার আছেন; কয়েকটা ভাল নার্সিঙ্গ হোমও আছে। মুসুরী যদিও যুক্তপ্রদেশের অন্যতম হিল্ ষ্টেসন্, তথাপি এখানে যুক্তপ্রদেশ অপেক্ষা পাঞ্জাব প্রদেশের লোকই বেশী দেখা যায়। মুসুরীতে বৎসরে তিনটা season হয়। এপ্রিল, মে ও জুন অর্থাৎ খুব গরমের সময়কে U. P. Season বলা হয়। তখন যুক্তপ্রদেশের গণ্যমান্য লোকেরা এখানে আসেন। জুলাই, আগষ্ট্ এবং সেপ্টেম্বরকে পাঞ্জাব season বলা হয়। তখন পাঞ্জাবের লোকেরাই বেশী থাকেন। আর অক্টোবর মাসটা বেঙ্গল season; অর্থাৎ বাঙ্গলাদেশে ছুটি থাকে, বাঙ্গলার বড় লোকেরা বেড়াতে আসেন। এখানকার স্থায়ী অধিবাসী অনেকেই পাঞ্জাবের লোক। কেউ-বা সুদূর কাশ্মীর থেকে এসে বসবাস করছেন। এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপসার ইহাদেরই হাতে। এখানকার স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বসাধারণ মালোয়ার ও কোট পরিধান করে। শীতের দেশে এই পোষাক বিশেষ আরামদায়ক। অবাঙ্গালী যাঁরা এখানে বেড়াতে আসেন এবং স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গতিসম্পন্ন, তাঁহারা স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল সময় সুন্দর সিল্ক বা গরম কাপড়ের কাশ্মিরী এবং নানা জাতীয় সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত পোষাক পরিধান করেন। অক্টোবরের শেষ থেকে শৈত্যের

আধিক্য হেতু দোকান-পসার, স্কুল সব বন্ধ হয়ে যায় এবং অবস্থাপন্ন লোকেরা শীতটা সমতলভূমিতে কাটিয়ে গরমের সময় আবার ফিরে আসেন। শুনলাম পাঞ্জাবের অতি সাধারণ লোকও মুসুরীতে বায়ু-পরিবর্ত্তনে আসে। তবে বাঙ্গলার রাজধানী কলিকাতা হইতে মুসুরীর দূরত্ব হেতু—পূজা কনসেসন্ টিকিট থাকা সত্বেও—অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী ছাড়া অপরের পক্ষে সুদূর মুসুরীতে আসা খুবই ব্যয়সাধ্য। তা ছাড়া, সাধারণ বাঙ্গালীর থাকিবার উপযোগী তেমন হোটেলও নাই। যাঁহারা ইয়োরোপীয় ভাবাপন্ন এবং আদবকায়দায় দুরস্ত তাঁহাদের নিকট মুসুরী খুবই মনোরম। অবশ্য যাঁহারা সকল সময় পুরা home comforts পেতে চান, অথচ সব সময়ে পাশ্চাত্য নিয়ম-কানুন মেনে চলতে না চান, তাঁহারা পৃথক বাড়ী ভাড়া নিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবস্থা ক'রে থাকতে পারেন। তবে এখানে পৃথক বাড়ী নাই বলিলেও চলে। বেশীর ভাগই হোটেল, কিন্তু বেশ আলাদা আলাদা; সুতরাং কোন অসুবিধা নাই, যদিও এখানে ভাড়া খুবই বেশী।

প্রায় এক মাস মুসুরীতে কাটিয়ে আমরা ডেরাডুনে ফিরে এলাম। মোটের উপর মুসুরীতে আমরা বেশ ভাল আবহাওয়া পেয়েছিলাম। ডেরাডুনের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি সবই আমরা দেখেছি। সহরটা দুভাগে বিভক্ত, দেশিভাগ ও ক্যান্টনমেণ্ট। দার্জ্জিলিঙের তলায় যেমন শিলিগুড়ি, মুসুরীর তলায় সেইরূপ ডেরাডুন্। কিন্তু ডেরাডুনের স্বাস্থ্য শিলিগুড়ির স্বাস্থ্য অপেক্ষা অনেক ভাল। তাই ডেরাডুন এতবড় একটা সহর হয়ে উঠেছে। এক সময়ে এখানে বহু বাঙ্গালী বড় বড় রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এখনও বাঙ্গালী আছেন; তবে বেশীর ভাগই চাকরি করেন। এখানে কয়েকঘর বাঙ্গালী ঘরবাড়ী করিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে-ছেন এবং প্রতি বৎসর সমারোহের সহিত দুর্গাপূজা করিয়া থাকেন। আমরা ডেরাডুনে Indian Sandhurst অর্থাৎ Prince of Wales Royal Militay Colelge দেখতে গেছলাম। এখানে সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার অফিস্ আছে এবং ত্রিগনোমেট্রিক্যাল সার্ভের এটা হেড কোয়াটারস্।

ডেরাডুনে কখনও বেশী গরম বা বেশী শীত পড়ে না; সে জন্য বার মাস এখানে অনেক লোক বাস করে। এই কারণেই ভারতসরকার এতগুলি বড় বড় অফিস্ এখানে স্থাপন করিয়াছেন। ডেরাডুনের আশে পাশে প্রচুর বনজঙ্গল দেখে বুঝলাম কেন এটাকে ইম্পিরিয়াল ফরেষ্ট রিসার্চের হেড্ কোয়ার্টার্স্ করা হইয়াছে। মিউজিয়ম অফ ফরেষ্ট রিসার্চ প্রডাক্টস্ একটি দ্রষ্টব্য স্থান। এখানে সাত শত বৎসরের পুরাতন এক দেবদারু গাছের একটি অংশ রাখা হয়েছে। ডেরাডুনের আশে পাশের জঙ্গলে নানা জীবজন্তুর বাস এবং শীকারের খুব প্রশস্ত জায়গা। মেঘমুক্ত পরিষ্কার রাত্রে ডেরাডুন থেকে মুসুরীর আলো দেখা যায়,—মনে হয় যেন আমাদের মাথার উপর একখানা তারার মালা ঝলমল করছে। যতক্ষণ ডেরাডুনে ছিলাম একবারও মনে হয় নাই যে আমরা মুসুরী ছেড়ে চলে এসেছি। ডেরাডুনে একটা দিন কাটিয়ে পরের দিন রাত্রে কলিকাতাগামী ডেরাডুন এক্সপ্রেসে আমরা ডেরাডুন ছাড়লাম। সেই সঙ্গে মুসুরীর কাছ থেকেও বিদায় নিলাম—ঠিক বিদায় নহে, au revoir. কারণ; মন বলছিল, আবার মুসুরীর সঙ্গে দেখা হবে!

আই-হ্যাজ (I has)

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১

বাসার নীচের তলায় তখনো ৫।৭টি first class first বসে ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে চক্ষু বুজে ডুবে রয়েছেন। দোর গোড়ায় পৌঁছতেই কানে এলো একজন বলছেন,—"চেঙ্গেজ খাঁ যখন মহিষাদলে এলো সঙ্গে তাঁর ভুবুরাণি। আমি তখন বিশুখুড়োর চণ্ডিমণ্ডপে বসে। তাঁর হাতে ছমুকো তলোয়ার—গা'ময় রক্ত,—'জল জল' করে চেঁচাচ্ছেন। ক্যাস্তো পিসির দয়ার শরীর, সেই মাত্র শিবুদের ছাগলটাকে চ্যালাকাট-পেটা করেছেন। তিনি ভট্‌চায্যিদের পুকুরটা দেখিয়ে দিলেন। খাঁ সায়েব ঘাটে নাবতেই,—সোঁ সোঁ চোঁ চোঁ শব্দ! দেখতে দেখতে এক বাঁশ জল শুকিয়ে পাঁক বেরিয়ে পড়লো। দেখোনি তো?—এই চক্ষে দেখেছি" বলে মাথা তুললেন। দেখি চোখ বুজেই আছেন।

আমরা ঢুকতেই,—আমার প্রথম দিনের বাসা-প্রদর্শক আমার দিকে দেখিয়ে কাকে বললেন—"এই এসেছেন,—ইনিই"......

একজন কোণে বসে ছিলেন, আমরা ঢুকতেই বসা-গলায় গান ধরলেন—"তারা দুভাই এসেছেরে"—

দু'টি সুপক্ব তরুণ, অর্থাৎ বয়স হিসেবে যৌবনের পারে পাড়ি ধরেছেন,—তাড়াতাড়ি উঠে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে—"আপনিই * * * উঃ কি সৌভাগ্য, দেখবার কি প্রবল আকাঙ্ক্ষাই। তা আপনি দয়া করে 'মৃগনাভী' আপিসে একবার পায়ের ধুলো দেননি কেনো? অসিতবাবুকে সেটা বড় আঘাত করেছে,—তায় তিনি ভয়ঙ্কর অসুস্থ—"

ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলুম—"তাতো শুনিনি, কি অসুখ..."

একজন বললে—"অত্যন্ত দেশপ্রাণ খাঁটি মানুষ কিনা,—সিগারেট ছাড়তে গিয়ে পেট ফুলে, মুখে কেবল জল উঠতে আরম্ভ হয়। ডাক্তার রায় মশাই এসে শুনলেন,—ওপর থেকে একটা গোলাপি বিড়ি ধরিয়ে,—টানের কি গন্ধের ধাক্কায় সিঁড়িতে পড়ে যান! তার ওপর মানসিক পীড়া তো ছিলই—যেহেতু সোফেয়ার অবাধে সুইট্ সিগারেট টানছে, আর তিনি...

—"শুনে ডাঃ রায় মশাই বললেন—"বিড়ি লক্ষ্মীমন্তং যশস্বন্তংদের জন্যে নয়, তাঁদের নাড়ী আর সাধারণের নাড়ী! এখন এক পক্ষ—ত্রিতল কক্ষে শুয়ে গুণে গুণে এক লক্ষ Gold Flake টানো, তবে বিড়ির বিষক্রিয়া কাটবে। তার পর এই ব্যবস্থা"—বলে নিজের পকেট থেকে একটি Gold Case (স্বর্ণ সম্পুট) বার করে দেখালেন। সেটি দোতালা। ওপর তলায় গোলাপী বিড়ি সারবন্দি শুয়ে, আর নীচের গোপন তলায় Gold Flake গড়া গড়া বিরাজ করছে। বললেন—"বুঝলে, এই রকম Case already এসে গেছে,—হোয়াইটওয়েতে পাবে, আনিয়ে নাও। তার পর ক্ষেত্র বুঝে ব্যবহার। তা না-তো কি Gentlemanএ বাঁচতে পারে?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

—"এখন অসিতবাবুর ত্রস্তী অবস্থা,—লক্ষান্তে ওপর থেকে নাববেন, তাই নিজে আসতে পারলেন না, মাপ করবেন। নিতান্ত জরুরি কাজে আমাদের পাঠিয়েছেন—"

মুদ্রিত-চক্ষুদের মধ্যে একজন বললে—"পয়সার ওজনে বুদ্ধি কিনা, কি ব্যবস্থাই দিয়েছেন! গুণের কদর আর নেই রে দাদা—গুণের কদর নেই,—কমদরের জিনিষ মনে ধরেনা। সারাদিন পড়ে পড়ে ফুস্ ফুস্ টানবেন, তবু এই বীরের মত সোঁ-টানে চারদণ্ড চৌঘুড়ি চড়বেন-না। যত আতুর থেকো আতুরে গোপাল..."

হরিপ্রাণ বললে—"এঁদের নিয়ে ওপরেই চলুন—জরুরি কথাটা শুনবেন।" এই বলে সে আমাদের দ্বিতলে রওনা করে দিলে। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে কাণে এলো—"এত রাত্রে হরিনাভী থেকে আবার কে এলেন। —বেটারা টাকায় তোলা না করে ছাড়বে না হে।"

ওপরে এসে তারা বসবার পর দেখলুম—একটির একমাথা চুল,—ঘাড়-ঢাকা বাবরি; দ্বিতীয়টির কেশের

বাড় বৃদ্ধিটা সামনেই বেশী,—পশ্চাতে ও দু'পাশে অঙ্কুর দেখা দিচ্ছে মাত্র। যেন shorn lamb ক্লিপ্ কপচানো ভেড়া—

বললুম—"হ্যাঁ, ব্যাপার কি বলো তো ভাই ?"

বাবরি বললেন—"আপনি "মৃগনাভী" পত্রিকার নিয়মিত এবং প্রখ্যাত লেখক, আমি অসিতবাবুর সহকারী সং। আপনি জানেন, নানা বিষয়ের পুস্তক সমালোচনার্থ আমাদের হাতে আসে। যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ ও গুণী অর্থাৎ রসিক, আমরা তাঁদের দিয়ে সেই সেই বিষয়ের পুস্তক সমালোচনা করাই। তাই মৃগনাভীর এত সৌরভ ও সুযশ এবং নিরপেক্ষ সমালোচনার এত মূল্য ও কদর।—

—"পূজার পূর্ব্বে আমাদের প্রাপ্তির মাত্রা এবার উনোপঞ্চাশে পৌছে দিলে। প্রায় সবই গুণীদের কাছে চালান দেওয়া হ'য়েছে, কেবল উনপঞ্চাশ নম্বরের খানি সম্পাদক মশাই কাকেও বিশ্বাস করে দিতে পাচ্ছিলেন না—পাছে অযোগ্য হস্তে পড়ে' বিভ্রাট ঘটে,—'মৃগনাভীর' মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। শুনলেনই তো একে ঐ সঙ্কট পীড়া, তার উপর এই দুর্ভাবনা,—শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। হেনকালে আপনি রাজধানীতে উপস্থিত শুনে তিনি যেন অকূলে কূল পেয়েছেন। বললেন—'আর না ডরি শমনে,—যেমন করে পারো তাঁর অনুসন্ধান করে বইখানি আজই তাঁকে সমালোচনার্থ দিয়ে এসো,—পরশু কাগজ বেরুবে, সমালোচনাটি কালই চাই'।—

—"এখন যা ভালো হয় অনুগ্রহ করে করেন, কাল কখন আসবো বলুন।" এই বলে একখানা বই চেষ্টার-ফিল্ডের পকেট থেকে বার করে আমার হাতে দিলে।

প্রচ্ছদচিত্র সুন্দর—ছাদনাতলায় বর-বধূ দণ্ডায়মান, বরের জোড়-করে দড়ি বাঁধা। বধূর হাসিমাখা মুখ। নীচে লেখা—দড়িদে বেঁধেছি। পুস্তকের নামটি artistic (শিল্প-সম্মত) হরপে লেখা,—যে কোনো নাম হতে' পারে। জামাই ঠকানো আর্ট বা টাইপ্।

বললুম—নামটা ফার্সি নাকি ? টাইপ্ তো তাই।

বাবরি হেসে বললে—দেখলে নামটা তো সেই রকমই বোধ, হয় কিন্তু অর্থবোধে আটকায়।

একাগ্রে চক্ষুপীড়াদায়ক নিরীক্ষণান্তে বললুম—'সটকি কেঁইয়া' (কেঁয়ে সটকেছে), না সেকি হল ? শঠক গেইয়া (সটকে গেছে শঠের গরু)—সে আবার কি ? ওঃ হয়েছে—নটকি ভেঁইয়া (নটের ভাই),—মন কিন্তু সায় দেয়না,—এ আবার কি নাম ? ছবির সঙ্গেও মেলেনা।

শেষ ভেতরের পৃষ্ঠা খুলে বুঝলম,—"লটকি সেঁইয়া"। অঙ্কুর বললে—"তারি বা মানে কি মশাই, আপনি তো পশ্চিমে থাকেন।"

বললুম—হ্যাঁ মানে আছে বই কি, তবে কথাটা বাঈজিদের গানে শুনতে পাই বটে, কিন্তু বইয়ের ও নামকরণের সার্থকতা বুঝলুমনা। 'ল-ট-কি সেঁইয়া মানে সেঁইয়াকে লট্‌কেছি অর্থাৎ বন্ধু বা প্রেমাস্পদকে লট্‌কেছি,—বঁধুকে বেঁধেছি···

বাবরি উত্তেজনার স্বরে বলে উঠলো,—বাঃ সুন্দর নাম তো।—marvellous !

অঙ্কুর বললে—ফার্সিটা শিখতে হবে, রসসাহিত্যে ভাব প্রকাশে ভারি কাজ দেবে। কি মিষ্টি—'লট্‌কি সেঁইয়া' I can die for the name.—মশাই বইখানির রসোদ্ঘাটন নিংড়ে নিংড়ে করা চাই !

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম সাহিত্যের সুদিন এসেছে দেখছি। এদের রস নিংড়োবার কি নিবিড় আগ্রহ !

যাক বার বার—'কাল আসছি, মশাই' বলে তারা বিদায় হ'ল। পরেই হরিপ্রাণ নুঁদ হয়ে—"মৃগনাভী নিলেন নাকি," বলতে বলতে ওপরে উঠলো। ও রাখা ভালো,—ধাত ছাড়লে কাজ দেয়,—এক দানাতেই চাঙ্গা···ইত্যাদি বকতে বকতে এসে বসলো !

* * * *

অসিত বাবু সজ্জন লোক, 'মৃগনাভীর' উন্নতিকল্পে অনেকের সঙ্গেই আলাপ রাখেন। তাঁর মুষ্টিভিক্ষার মায়ায় অনেকেই আবদ্ধ।—যখন ত্যাগের পথই ধরলুম তখন অমন লোককে ক্ষুণ্ণ করি' কেনো,—বিশেষ তাঁর এই শয্যাগত অবস্থায়। এই ভেবেই বইখানি নিয়ে বসলুম। বেশী বড় নয়, মাত্র একশত পৃষ্ঠার একখানি প্রহসন বা সিরিও-কমিক্ নাটক। সবটাই গর্ভাঙ্ক। লেখার চেয়ে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় মার্জিন বেশী,—চার দিক্‌ই

খুব ফরদা।—মাঠের মাঝখানে যেন—বোলপুর ডাক্‌-বাংলার plan—

সহজেই পড়ে ফেললুম,—লাগলোও মন্দ নয়। বিষয় সামান্য হ'লও, আকস্মিক কিছু নয়, গা-সওয়া।

বিষয়টা—ধনঞ্জয়বাবু পুলিসে কাজ করেন, হেড্‌ কনেষ্টেবল্‌ থেকে নিজের দক্ষতা গুণে উন্নতি করেছেন। সাধুপ্রকৃতির মানুষ। তাঁর একমাত্র কন্যা দেবরাণী, ১৫ বচরেই (matric) ম্যাট্রিক্‌ দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। পরিমল গত কয় মাস থেকে তাকে পড়াচ্ছে। পরিমলের সময় কম—B. L. দেবে, তাই রাত্রে ভিন্ন তার সময় নেই। ধনঞ্জয় বাবুর স্ত্রী মেয়েকে দেখে—হঠাৎ একদিন বিকলা হলেন,—কি একটা সন্দেহ তাঁকে শিউরে দিলে। মেয়েকে দু'একটা প্রশ্ন করায়, সে চুপ করে রইলো! মা বিপদটা তাকে বুঝিয়ে দিলে, অগত্যা সে বললে—"আমাকে তিনি বে করবেন বলেছেন।"

স্ত্রী ধনঞ্জয় বাবুকে কথাটা শোনাতে বাধ্য হলেন। ভালোমানুষ—শুনে অন্ধকার দেখলেন। শেষ তাঁর স্ত্রীই নিজে পরিমলের কাছে বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। পরিমল মহা ফ্যাসাদে পড়লো। প্রথমতঃ—তার পয়সার দরকার,—সে ভেবে রেখেছে বি-এলটা পাস্‌ করে' তাকে দাঁও খুঁজতে হবে। দ্বিতীয়তঃ—সে দেবীর রূপে মুগ্ধ নয়, তাকে স্ত্রী হিসেবে নিতে নারাজ। সে জানে ধনঞ্জয় বাবু সামান্য গৃহস্থ—এক পয়সা সঞ্চয় নেই,—সুতরাং কিছু প্রত্যাশাও নেই।—সে গা ঢাকা দিলে।

বিমলা বুদ্ধিমতী, চট্‌' ভায়ের কাছে চলে গেলেন। রজনী বাবু অল্প বয়সেই নামী C. I. D.—সব শুনে অভয় দিলেন, কেবল জিজ্ঞাসা করলেন দেবী পরিমলকে ভালোবাসে তো? শুনলেন—"খুব"।—"যাও, চুপ্‌-চাপ্‌ থেকো।"

এক পক্ষ মধ্যেই রজনী বাবু সন্ধান নিয়ে জানলেন—পরিমল রেঙ্গুনে গিয়ে কুঞ্জ বাবুর বাসায় আশ্রয় পেয়েছে। কুঞ্জবাবু সম্ভ্রান্ত ও সম্মানী এডভোকেট, অতিথি-বৎসল—পরোপকারব্রতী। পরিমল তাঁর বাসায় থেকে সেইখানেই পরীক্ষা দিয়ে, তাঁর সাহায্যে প্রাকটিস্‌ আরম্ভ করবে। ... তিনি তাকে ৭৫ টাকা বেতনে মাষ্টারীতে লাগিয়ে দিয়েছেন। এরূপ সাহায্য অনেকেই তাঁর কাছে পেয়েছে ও পায়।—

—রজনীবাবু দেবীরাণীকে নিয়ে সস্ত্রীক রেঙ্গুনে রওনা হ'য়ে পড়লেন। পরিমল রজনীকে পূর্ব্বে দেখেনি—চেনেনা। বড় পদস্থ অফিসার—inspectionএ এসেছেন। এইভাবে স্বতন্ত্র বাসা নিয়ে তিনি সম্ভ্রান্ত চালে থাকেন।—কুঞ্জবাবুর বাসায় নিত্য সন্ধ্যার পর বেড়াতে আসেন। নূতন বাঙালি পেলে কুঞ্জবাবুর আনন্দ, আদর আপ্যায়নের সীমা থাকেনা। তাঁর প্রকৃতিই তাই।

প্রখর বুদ্ধিশালী রজনী বাবু—তিন দিনেই কুঞ্জবাবুকে মহানুভব বলে বুঝেছিলেন এবং তাঁর কাছে সমস্ত খুলে বললেন। উভয়ে গোপনে একটা পরামর্শ স্থির হয়ে গেল—রজনী বাবু অনূতার (অর্থাৎ দেবীরাণীর) অভিভাবক;—তার যোগ্য পাত্র মিলছেনা বলেই বিবাহ দেননি,—কারণ—রূপে, গুণে, বিদ্যায়, সঙ্গীতে অনূতা অনিন্দ্যা। এসব কথা কুঞ্জবাবুর সঙ্গে রজনীবাবুর যখন হয় তখন পরিমলও উপস্থিত ছিল। কুঞ্জবাবু মেয়েটিকে দেখাবার জন্যে তাঁদের সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন।

রজনী বাবু রূপ-সজ্জা (make-up) দক্ষ। দেবীকে তিনি এমন রূপ, বেশ ও অলঙ্কার দিয়েছেন যে, দেখেই পরিমলের মুণ্ডু ঘুরে গেল, সে মনে মনে আবৃত্তি করে ফেললে—

"যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশী
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল
তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল—"

সেই সময়—ইচ্ছায় বা আচম্বিতে দেবী মৃদু কটাক্ষে একটু হেসেও ছিল। তাতে পরিমল বিকল।

—বাকি কাজ কুঞ্জবাবুর। তাঁরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করে চলে গেলে, তিনি হাসিমুখে পরিমলকে বললেন—"Advocate তো হবেই হে, কিন্তু এমনটি মিলবেনা। এ জিনিস মানস সরোবরেই ফোটে—কিন্তু এডভোকেট তো কোর্ট ঝাট দিলে স্যাভেঞ্জারেও ধরেনা। তোমার advocateটি আর প্রাকটিসের ভার আমার রইলো, কিন্তু এ দুর্লভ রত্নলাভ করতে ইচ্ছা থাকে তো বলো

চেষ্টা পাই। নিজের যে বয়েস নেই”…ইত্যাদি বলে’ হাসলেন।

তার পরের শুভ কাজটা লেখক প্রচ্ছদপটে মধুরেণ সমাপ্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ—সচিত্র দাঁড়দে বেঁধেছি—কিনা; ‘লটকি সেঁইয়া।”

বরকর্ত্তা কুঞ্জবাবুই ছিলেন। পরিশিষ্ট,—দুদিন পরে পরিমলের মুখে পরিতাপের ছায়া দেখে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন,—“আমি এখানকার প্রসিদ্ধ advocate, ব’লতো রজনী বাবুকে সেটা বুঝিয়ে দি! কিন্তু বিষয়টার পশ্চাতে বিশ্রী গলদ রয়েছে, তানাতো,…কি বলো? হোক্ গে,—দু’মাস retrospection—অসময় বই তো নয়—আজকাল ওসব কেউ নোটিস্ করেনা;—আমিও আটাসে ছেলে।

বইখানি ভালই লাগলো। যত পারলুম—প্লটের, লেখার বাঞ্জনার সুখ্যাত করলুম এবং বললুম এ বই সর্ব্বাংশেই Nebula stageএ অভিনীত হবার যোগ্য এবং তা হলে দর্শকেরা উপভোগই করেন।—আক্ষেপের বিষয়—সেটি হবার নিয়ম নেই, যেহেতু কর্ত্তারা স্বঘর ও স্বগোত্র ছাড়া ও কাজ বড় করেননা’।—সনাতনী হিন্দু—বুঝতে পারলুমনা,—লেখক নাম দেননি কেনো। তাঁর নাম জানবার দাবী দেশের লোকের আছে। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি যেন নামটি প্রকাশে কৃপণতা না করেন। এই যদি তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা হয়, তাহলে আমরা বলতে বাধ্য, তিনি আমাদের বিস্মিত করেছেন এবং ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু পাবার আশাও দিয়েছেন। তাঁর লেখনী জয়যুক্ত হোক্।”

সমালোচনাটি পেয়ে অসিতবাবু নাকি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং With vengearce সিগারেট ধ্বংসও করেছিলেন। শুনলুম দেখা করবার জন্যে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেও পাঠিয়েছিলেন।—কিন্তু আমি তখন রাজধানী ছেড়ে স্বস্থানে ফিরেছি।

৩২

আর যা হোক্ রাজধানীতে একটা সুখ ছিল—পরমাত্মীয় বড় কেউ জোটেনি। সেখানে মিথ্যে কথা বলে আলাদা কিছু না থাকায়—সবই সহজ, সার্ব্বজন উপভোগ্য। কথা রক্ষা না করুন—কিন্তু ‘না’ বলবার অভদ্রতা কারুর নেই। কারণ কথা তো আর কাজ নয়, সেটা কইবার জিনিষ, অর্থাৎ—কথা কথাই।—বড়দের কথা বল্‌তে পারিনা—বোধ হয় বড়ই হবে।

আবার সেই জালাতন আর অস্বস্তির মধ্যে চলেছি; বিশ বচর পূর্ব্বে কি জায়গাই ছিল, আর কি মানুষই সব ছিলেন! কাজ কর্ম্ম, খাওয়া পরা, রোজগার সবই ছিল—আওয়াজ ছিলনা। যাক্ আমার আর দুর্ভাবনা কেনো, সেখানে বড় জোর ৫।৭ দিন থাকা। তাই বা কেনো?—কালই বেরিয়ে যেতে পারি,—ভোট-কম্বলখানা আর তুলোভরা মেরজাইটে নিতে আসা। হ্যাঁ—আর লালিম্‌লির সেই সুন্দর ব্যালাকলাভাটা। সুর্য্য সেটা নিজেরটার সাথে মাঝে মাঝে বদলে ফ্যালে। যখন ত্যাগের দিনই পড়ে গেল, সেটা তাকেই দিয়ে যাবো…

—এই সব ভাবতে ভাবতে ট্রেণ ষ্টেসনে এসে থামলো। সন্ধ্যা হয় হয়। পাগাড়িটে বোধ হয় সুন্দর বাঁধা হয়েছিল,—এক এক সময় ‘অটোমেটিকেলি’ হাত খুলে যায়। টিকিটবাবুর হাতে টিকিট দিলুম—টিকিট না দেখে পাগড়ির দিকেই তিনি সতৃষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। “ওঃ আপনি? কোথায় গিয়েছিলেন মশাই! আপনাদের মত লোকের ঠিকানা দিয়ে যাওয়াই উচিত,—পাঁচজন এসে খোঁজ নেয়—বিরক্ত করে। আমাদের কি একটা কাজ, কপি কমলালেবুর চালান চলেছে,—Cold storagc খুলেছে…

বললুম—এত বড় হয়েছি তাতো জানতুম না ভাই…

বললেন—“ওইটেই তো বড়র লক্ষণ মশাই, তাঁরা নিজেরা নিজেকে জানতে পারেননা।—এবার থেকে…

বললুম,—‘আর ভুলব না’ বলে বেরিয়ে এসে গাড়ী করলুম—সন্ধ্যা হয়ে গেল—

আমার খোঁজ করে কে?—বাসায় তো বলে গিয়েছিলুম—দূর করো—আর নয়,—বিশ্বনাথ দর্শন করে—Via হরিদ্বার রওনা হয়েই পড়ি।

চা খাবার জন্যে মনটা অনেকক্ষণ ছট্‌ফট করছে। একটা ষ্টেসনে হিন্দু-চার ষ্টল্ পর্য্যন্ত ধাওয়া করে ফিরে এসেছি।—সেই একই কারণ, কতবার চোখে পড়েছে,

তবু বদ অভ্যাস টেনে নিয়ে যায়। গিয়ে দেখি একজন —বোধ হয় রেলের কুলি,—(কাণ নাক্ ঠোঁট চোখের পাতা দেখলেই ব্যাধিগ্রস্ত বলে মনে হয়)—চা খেয়ে কাপটা রাখলে। Serving boy সেটা তুলে নিয়ে বালতির তলানি-জলে কাপটা একবার ঘুরিয়ে নিলে। দেখে ফিরলুম,—মনে হল—অস্পৃশ্যতা না মানি—রোগটা মানতেই হয়। চা খাওয়া ছেড়েই দেব। এই কটা দিন খেয়ে নি,—আপনিই ছেড়ে যাবে। বাসা আর বেশী দূরে নয়। স্বাতির জন্মে—'তেলেঙ্গা' আর 'তুড়্‌কুসওয়ার' বই দু'খানা এনেছি,—দেখে ভারি খুসি হবে।

—একি,— রাস্তার ধারে জনতা না? সন্ধ্যা হয়ে গেছে—ভাল বুঝা যাচ্ছে না—দু একটি আলো জ্বলছে। হঠাৎ একটি ছোকরা—

"বাবুজি, মেহেরবানি করকে এই তারঠো দেখিয়ে"

কি তার আবার? গাড়ী থামিয়ে হাতে নিলুম।

—"তিন ঘণ্টা ঘুমতেহেঁ বাবু, পাত্তা নেই মিলতা।"

—"তবে খুলেছে কে? এ তো খোলা হয়েছে দেখছি।"

—"এক বাবু আপনা সমঝাকে খোল ডালিস্ থা···

Address রয়েছে—Ch: Purnea—

—"না ভাই, বুঝতে পারলুম না।—পড়ে দেখতে পারি কি?"

"হাঁ হাঁ দেখিয়ে, খুলা তো হায়ই। হাম হায়রাণ হো গেঁয়ে বাবু—"

—বেশ লম্বা তিন পৃষ্ঠা। পড়ে চমকে গেলুম,—কলকেতা থেকে আসছে,—পাঠাচ্ছেন শ্রীনাথ! সংক্ষিপ্ত সার ১৫ দিন চোখে চোখে রেখেও, সেই কাজটায় থাকায় একটুর জন্মে মিস্ করেছি। ভয়ঙ্কর sharp। পূর্ব্বকথিত গাঁজার দোকান থেকে সরে পড়েছেন,—কলকেতায়ও নেই। কাটিহারে হরিশকে তার করলুম। বিশেষ বন্ধু বলে একটা কথা বার করে নিতে পেরেছি। —সত্বর হরিদ্বারের পথে হিমালয়ে যাবেন। যা খোঁজা যাচ্ছে—পেছু নিলেই এইবার তা নির্ঘাৎ মিলবে। Battle-Cows যেন ষ্টেসনে থাকে···

মাথা ঘুরে গেল! টেলিগ্রামখানা খামে পিয়নের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললুম,—না ভাই কার যে তা ঠিক্ করতে পারলুম না। ওখানে ও ভিড় কিসের?

—"কেয়া জানে—পাটনাসে কোন আয়া,—লিকচার হোনেকা বাত হায়।"

—তবে তুমি ভাবচো কেনো, ওখানে গেলেই ঠিকানা মিলবে। চাই কি লোকও মিলতে পারে··

—"বড়া পরেসান কিয়া"—বলতে বলতে সে সেই দিকে চলে গেলো। দেখেই যাই—টেলিগ্রামখানা কে নেয়।

গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিলুম, সে চলে গেল, আমি পায় পায় meetingএর দিকে এগুলুম।

—উঃ সেই শ্রীনাথ,—জব্বলপুরে ৭ মাস বাসায় রেখেছিলুম—হঠযোগে ডুবে থাকতো!—আমি খুঁজে মরছিলুম আর সে কিনা আমাকে ১৫ দিন চোখে চোখে রেখেছিল!

গিয়ে দেখলুম—ভিড় মন্দ নয়—ছেলে ছোকরা সব হাজির হয়েছে, বাকি জনসাধারণ। উকীল মোক্তার প্রভৃতি স্বাধীন আর রোজগেরে কেরাণীকুল কোথায়? মধ্যে খানিকটে স্থান আলোকিত, আশ-পাশ অন্ধকার, এবং অন্ধকারেই জনতা বেশী। সেখানে খদ্যোতের কি সুন্দর খেলা! একসঙ্গে ৫০টি জ্বলছে নিবছে,—আঁধারে আলো!—

বক্তৃতা হিন্দিতে হচ্ছে—বক্তা শিক্ষিত ও সুবক্তা। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলে যাচ্ছেন। জ্ঞাতব্য কথাগুলি সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

দেখি রণগোপাল তার মধ্যে ঘুরছে,—কারুকে বসবার স্থান করে দিচ্ছে, কারুকে উৎসাহের সহিত জিজ্ঞাসা করছে,—কেমন? এবং তার মতামত না নিয়ে ছাড়ছেনা। অভ্যর্থনাদির ভার যেন তার। কখনো অন্ধকারের দিকে ধাওয়া করে কাউকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, "সেকি, আপনি এখানে? চলুন—সামনে বসবেন চলুন।" সাড়া পেয়েই ২।৪ জন পাশ কাটিয়ে মুখ ঢেকে সরে পড়ছে। দেখে বুঝলুম—অন্ধকার আশ্রয় করে গা ঢাকা আছেন ভদ্রবাবুরা, অবশ্য যাঁরা বেশী বুদ্ধি ধরেন। রঞ্জনবাবু প্রভৃতি স্বাধীনদের দেখতে পেলুমনা, পাবার আশাও করা অন্যায়। যেহেতু গীতায় শ্রীভগবানই

বলেছেন—"অজ্ঞানীদের উপদেশ দিতে যেওনা—নিজে কাজ করে দেখিও অর্থাৎ আদর্শ হয়ো। জ্ঞানীর কাজ দেখে তারা শিখুক,—" তাই বোধ হয়।

বক্তৃতা ক্রমে Tropical Zoneএর মধ্যে—গরম-গণ্ডিতে এসে পড়ায় শ্রোতারাও একাগ্র। এমন সময় দেখি সেই পিয়নের সঙ্গে রণগোপাল সভা মধ্যে প্রবেশ করে একজন শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধের হাতে coverটা দিলে। তিনি খামটা দেখে একবার কট্‌মট্ করে তাদের দিকে চেয়ে, না পড়েই বিরক্ত ভাবে উঠে বাইরের দিকে গেলেন। রণগোপাল ও পিয়ন অনুসরণ করলে।

বৃদ্ধ লোকটি আমাদের সেই পরিচিত ফকীর সায়েব যে!

জগতে মিথ্যা জিনিষটা না থাকলে বুদ্ধিমানেরা কি নিয়ে বাঁচতো, তাদের কি দুর্দ্দশাই হোতো? নিজের সৃষ্টির একটা আনন্দ আছে,—সেটা বুঝতে পারি—ডিনামাইট আবিষ্কারক ও জানতেন—হত্যাকাণ্ডের কি বড়িয়া বীজই বার করেছেন। তাতে কত আনন্দ কত খোসনামই পেয়েছিলেন। সেটা ব্যবহারিক সত্য বলে প্রমাণও হ'য়েছে। কিন্তু মিথ্যার পশ্চাতে ছোটার এত স্পর্দ্ধা এত কসরৎ কোথা থেকে আসে? এটা মাথার টানে না পেটের টানে? যাক বাসায় যাই। বক্তৃতা শুনে আর হবে নি,—খানিকটে সময় কাটানো।—কুম্ভকর্ণের পায়ের ধুলো নি,—কি বুদ্ধিমানই ছিলেন! শুনে হ'বে কি?—শত শিক্ষাতেও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়না। জোনাকি জ্বলবেই। না জ্বললে তার পেট চলেনা।

ফেরবার জন্যে পা বাড়াতেই বক্তা যেন টেনে ধরলেন।—বলছেন—"পাটনা থেকে এই দীর্ঘ পথ এলুম,—বাসে, ট্রেনে, জাহজে, কাকেও আর সিগারেট টানতে দেখলুম না। একে বলে জাতীয় জাগরণ—"

দেখি বক্তার পশ্চাতের আঁধার-খণ্ডে জোনাকিগুলি দপ্ করে নিবে গেল,—আর জ্বলছেনা। তবে নাকি প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটেনা? বিরাটের গোয়াল—শাস্ত্র মানেনা?

বক্তা বলছেন—"ভারত জগৎকে অনেক কিছু দিয়েছে, দেখিয়েছে। এইবার এই নব অর্জ্জিত অনাবশ্যক বিলাসিতার বদ অভ্যাস বর্জ্জন করতে সে বদ্ধপরিকর। আপনারা শিক্ষিত—আপনাদের আর এর অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রভাব বুঝিয়ে বলতে হবেনা। ব্যষ্টি ভাবে প্রত্যেকেই আপনারা দেশের প্রাণ এবং সমষ্টি ভাবে দেশ। একমাত্র সিগারেট ত্যাগ করে আপনারা দেশের আড়াই কোটী টাকা দেশেই রাখলেন। তাতে সহস্র সহস্র অনশন-ক্লিষ্ট ভায়েদের রক্ষা করা হ'ল।—

—"আশা করি স্পর্দ্ধিতের অভদ্র বিদ্রূপ আপনাদের দৃঢ়তা বৃদ্ধিই করবে। কারো কারো গাত্রদাহ রূঢ় ভাষার মধ্যে শান্তির প্রলেপ খুঁজছে। কাগজে দেখলুম—একজন লিখছেন—রেঙ্গুন যাত্রী জাহাজের Dining Soloonএ একজন বিদেশী তাঁর বন্ধুর কাছে সিগারেটের complete boycoll (সম্পূর্ণ বর্জ্জন) নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করায়, বন্ধু তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—"Dont worry * * * The * * * will smoke again—কেনো ভাবচো—* * * ফের ধরবে।"—

—"ভাই সকল—এই উক্তির উত্তর তোমাদের নিজের হাতেই রয়েছে—তোমাদের দৃঢ়তাই এর জবাব দেবে—ভারতের গৌরব ও ভারতবাসীর সম্মান রক্ষা করবে।"—

আমার এ সব আর শোনা কেনো—মানস সরোবরের পথে ও-জিনিষের দোকান এখনো বসেনি। ধীরে ধীরে সরবার ফাঁক খুঁজছি। নিবস্ত টানিয়েদের মধ্যে শুনলুম একজন বলছেন—"ও কথা আমাদের affect করেনা। আমরা 'লেগেনের' দল, againএর ধার ধারিনা—লেগে থাকা ঘোচাইনি। বাঁচোয়া—Safe Guard রেখে কাজ ক'রেছি"। আর একজন বললে—"সাবাস্ ভায়া—উকীল না হলে কি বুদ্ধি খ্যালে! তবু বটতলা ব্যাচ্, বাঃ fore sight বটে! কী বাঁচানই বাঁচালে ভাই!

আর শুনতে পেলুমনা, তখন দশ হাত দূরে গিয়ে পড়েছি। রাস্তায় উঠতেই দেখি একদল তরুণ।

একজন একটা সিগারেট ধরাচ্ছে আর বলছে—নে,—সব ধরিয়ে ফ্যাল্। টান্‌,—যতদিন বাঁচবো, ও-শত্রু দেখবো আর পোড়াবো। আমরা তো আর খাচ্ছিনা, মহাত্মা পোড়াতে বলেছেন,—টান্‌,—একদম, ভস্ম করে' ছাড়্।"

দ্রুত সরে পড়লুম। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম—জাতটা কি বুদ্ধিজীবী। এরা তো উকীলের ঢের ওপরে। এদের নিরাপদী (Safe Guard) ওদের চেয়ে সেরা। স্বামীজি ঠিকই বলে গেছেন,—"এরা সব-জান্তা—এদের শেখাবার আর কিছু নেই।"

তাই তো দেখছি। এক মাস পূর্ব্বে ত্যাগের ধুম দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। এরি মধ্যে ঠিক স্বরূপে এসে ঠেকেছে! পাকা Leopard-colour, এ রং কি বদলায়? মিছে ভয় পেয়েছিলুম, ভেবেছিলুম—জাত খোয়ায় বুঝি! স্বভাব গেলে আর রইলো কি? খুব বেঁচে গেছে;—

"জলের বিম্ব জলে উদয় জল হয়ে শেষ মিলায় জলে।"

মহাপুরুষের কথা কি মিছে হয়! (ক্রমশঃ)

উপনিষদে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

আর্য্য ঋষিগণের প্রণীত হিন্দুদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ উপনিষৎসকল পাঠ করিলে জানা যায়, তাঁহারা এক অদ্বিতীয় শক্তি, বিশেষকে—যাঁহাকে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম নামে উল্লেখ করিয়াছেন—এই বিশ্বজগতের একমাত্র আদি কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই পরমাত্মা সচ্চিদানন্দং এবং "জ্ঞানমনন্তম"। তিনি আছেন বলিয়া "সৎ", চৈতন্য স্বরূপ বলিয়া "চিৎ" এবং স্বয়ং পরিপূর্ণ বলিয়া "আনন্দম," তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা স্বরূপ বলিয়া "জ্ঞানমনন্তম"। তিনি এই বিশ্বজগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন; এই বিশ্বই তাঁহার রূপ। তিনি ভিন্ন জগতের অন্য কোন কর্ত্তা নাই। জগতে যাহা কিছু সেই পরমাত্মারই বিকাশ। অজ্ঞান বা ভ্রম বশতঃ আমরা জগৎকে পরমাত্মা হইতে পৃথক জ্ঞান করি। বিবেক বৈরাগ্য ও যোগাভ্যাস দ্বারা ব্রহ্ম ও জগৎ বস্তু এই প্রকার অজ্ঞান বা ভ্রম দূর করিয়া "সর্ব্ব খল্বিমিদং ব্রহ্ম" এই সত্য যাঁহার চিত্তে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনিই সুখ দুঃখের অতীত মুক্ত পুরুষ। তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। পাঠকগণের অবগতির জন্য উপনিষৎ ও বেদান্তদর্শন হইতে কয়েকটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা:—

অসর্পভূতে রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তন্যবস্তারোপঃ অধ্যারোপঃ।

বস্তু সচ্চিদানন্দাদ্বয়ং ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদি সকল জড়সমূহ অবস্তু ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু। বেদান্তসার—

জগৎকে পৃথক বস্তু বলিয়া আমাদের যে জ্ঞান হয় তাহা মিথ্যা জ্ঞান। সর্পের সহিত কোন সম্পর্ক নাই এরূপ যেমন এক রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয় সেইরূপ জগৎকে বস্তু বলিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা ভ্রম বা মিথ্যা জ্ঞান।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ"— বেদান্তদর্শন।

যাহা হইতে জগৎ জন্মিয়াছে, যাহাতে স্থিতি করিতেছি, ও যাহাতে লীন হইবে তাহা ব্রহ্ম।

"ঈক্ষতে না শব্দম্"— বেদান্তদর্শন।

সাংখ্যোক্ত—প্রকৃতি বা প্রধান জগৎ কারণ নহে। সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম ঈক্ষন (আলোচনা) করিয়াছিলেন, তিনিই জগৎ কারণ।

যস্তু সর্ব্বানি ভূতানি ভূতাণ্যাত্মেবা ভুদ্বিজানতঃ
সর্ব্ব ভূযেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মি সর্ব্বান ভূত্যান্যাত্মেবাভূদ্বি জানতঃ
তত্র বা মোহ বা শোক একত্ব মনুপ্শ্যাতে॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে আমাকে দেখিতে পান এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতে দেখেন তাঁহার নিকট সেই আত্মা গুপ্ত থাকেন না। যাঁহার নিকট আত্মা পরিচিত হন, সেই অদ্বৈতদর্শী মনুষ্যের নিকট মোহই বা কি শোকই বা কি?

ব্রহ্মৈব বেদমমৃতং পুরস্তাদব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণত শ্চোত্তরেণ।
অধোশ্চোর্দ্ধিঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম॥

মুণ্ডকোপনিষৎ।

এই অমৃত ব্রহ্ম পূর্ব্বে, এই ব্রহ্মই পশ্চাতে, এই ব্রহ্মই দক্ষিণে এবং উত্তরে, নীচে এবং উপরে এই ব্রহ্মই বিস্তৃত রহিয়াছেন। এই বিশ্বই ব্রহ্ম, এই বিশ্বই বরিষ্ঠ।

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মনা বা।
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতি ধ্যায়মান॥"

মুণ্ডকোপনিষৎ।

তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা বা বাক্য দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। জ্ঞান প্রসাদে বিশুদ্ধ হইলেই ধ্যান প্রসাদে সেই ব্রহ্মকে সন্দর্শন করা যায়।

"স চ এষোঽনিমে তদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং
স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

যিনি ইহাদিগের মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে সর্ব্বদা বিদ্যমান, যাঁহার সত্তাতেই এই বিশ্বজগৎ আত্মবান্ তিনিই আত্মা—হে শ্বেতকেতু! তিনিই তুমি!

"সর্ব্ব খল্বিমিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।"

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

এ সমস্তই ব্রহ্ম, বিশ্বজগৎই ব্রহ্ম। ইহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মেই অবস্থিত রহিয়াছে এবং ব্রহ্মতেই লীন হইবে।

উপনিষৎ সকলে আরও উক্ত হইয়াছে—যে পরমাত্মার প্রকৃতি ও পুরুষ নামে দুইটী পৃথক ভাব আছে। প্রকৃতি সগুণ—অর্থাৎ সত্ব, রজ, তম ত্রিগুণাত্মক এবং পুরুষ নির্গুণ অর্থাৎ ত্রিগুণের অতীত এবং উভয়েই অনাদি।

প্রকৃতি আবার দুই ভাগে বিভক্ত, তাঁহার এক ভাগ জড়াত্মক এবং অপর ভাগ চেতনাত্মক। এই চেতনাত্মক প্রকৃতিই প্রাণিগণের দেহে জীবাত্মারূপে অবস্থিতি করে। এই জড়চেতনাত্মক সগুণ প্রকৃতিই জগৎকারণ বা জগতের স্রষ্টা এবং নির্গুণ পুরুষ উহার দ্রষ্টা ও ভোক্তা এবং প্রকৃতিকে জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে প্রেরণা করেন।

"প্রকৃতি পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান॥
কার্য্য কারণ কর্তৃত্বে হেতু প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষ সুখ দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥"

—গীতা

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে। বিকারসমূহ ও গুণসকল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিবে। কার্য্য ও কারণ ইহাদের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে প্রকৃতিই হেতু আর পুরুষ সুখ দুঃখের ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধে হেতু বলিয়া জানিবে।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

মুণ্ডকোপনিষৎ।

সতত একত্রস্থায়ী, পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একটী বৃক্ষে পরিষক্ত হইয়া আছেন। তাহাদের মধ্যে একটী স্বাদু ফল ভক্ষণ করেন (কর্মফল ভোগ করেন); অন্যটী না খাইয়া চাহিয়া থাকেন (পরমাত্মা কর্মফল ভোগ করেন না)।

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে—
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।"

কঠ উপনিষৎ।

শরীর মধ্যে সর্কোৎকৃষ্ট স্থানে গুহামধ্যে দুই জন প্রবিষ্ট আছেন, তন্মধ্যে একজন অবশ্যম্ভাবী কর্মফল ভোগ করেন; অপর এক জন তাহা প্রদান করেন।

"জীব সংজ্ঞোঽন্তরাত্মান্যঃ সহজঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
যেন বেদয়তে সর্ব্বং সুখং দুঃখঞ্চ জন্মসু॥"—মনু।

অন্তরাত্মা নামে একটী স্বতন্ত্র আত্মা প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের সঙ্গে জন্মে। তাহাই সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে।

ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতি বিদ্ধি মে পরাং
জীব ভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।

—গীতা

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভক্ত। ইহা কিন্তু অপরা, এতদপেক্ষা পরা (শ্রেষ্ঠ) জীব স্বরূপা আমার অন্য এক প্রকৃতি জানিবে, সেই প্রকৃতি দ্বারা এই জগৎ ধৃত রহিয়াছে।

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরম্।
হেতু নানেন যেনন্তের জগদ্ধি পরিবর্ত্ততে।

—গীতা

আমার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি এই সচরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন। এই হেতু বশতঃই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়।

বেদান্তে ব্রহ্মের এই দ্বৈত ভাবের উল্লেখ লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতগণ বলেন উপনিষদে যে নির্গুণ ঈশ্বরের উপাসনার উপদেশ আছে তাহা উচ্চ অধিকারী ও জ্ঞানীদিগের জন্য। নিম্ন অধিকারী জনসাধারণ ও অজ্ঞানীদিগের জন্য ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বরের উপাসনার উপদেশ আছে। সগুণ ঈশ্বরের উপাসনার দ্বারা সাধকের চিত্তশুদ্ধি হইলে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারেন। বৈদিক যুগে জ্ঞানিগণ নির্গুণ ঈশ্বর অর্থাৎ পরমাত্মার নিদিধ্যাসন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন এবং জনসাধারণ সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি পরমাত্মার নৈসর্গিক বিকাশ সকলকে সগুণ ঈশ্বর বা দেবতা জ্ঞানে তাঁহাদের প্রীত্যর্থে স্তব স্তুতি এবং নানাপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগে ভগবৎ উপাসনা সুগম করিবার জন্য ঋষিগণ সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি পরমাত্মার নৈসর্গিক বিকাশ সমূহের উপাসনার পরিবর্ত্তে তাঁহার সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার শক্তির ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রূপ ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এবং তদুদ্দেশ্যে ইতিহাস পুরাণ এবং তন্ত্র শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আমরা যে অষ্টাদশ পুরাণ দেখিতে পাই তৎসমুদয় পরমাত্মার এই ত্রিবিধ ঐশী শক্তির উপাসনা প্রকটিত করিতেছে। এমন কি কোন কোন পুরাণে ব্রহ্মার, কোন কোন পুরাণে বিষ্ণুর এবং কোন কোন পুরাণে শিবের বিশেষ করিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই আঠারখানি পুরাণের মধ্যে ছয়টীকে ব্রহ্মার পুরাণ, ছয়টীকে বিষ্ণুর পুরাণ, এবং ছয়টীকে শিবের পুরাণ বলা যাইতে পারে। পৌরাণিক যুগের মধ্যভাগে ঈশ্বর উপাসনার ভক্তি প্রাধান্য প্রচলিত হওয়ায় রাম ও কৃষ্ণ রূপে বিষ্ণুর পৃথিবীতে নররূপে অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখে রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতাদি ভক্তিপ্রধান ইতিহাস পুরাণ সকল রচিত হইয়াছিল। ঋষিগণ পুরাণ তন্ত্রাদি ধর্ম্মশাস্ত্রসকল প্রণয়ন করিয়া বৈদিক যুগের উপাসনার ধারা পরিবর্ত্তন করিলেও বেদের কর্ম্মকাণ্ড, স্মৃতির সদাচার ও উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই।

তাঁহাদের উপনিষদসকলে লিখিত ব্রহ্মজ্ঞানই পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতে উপাসনার চরম ফল বলিয়া সকল পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রেই উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা ভগবদ্গীতা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, তাহাতে অধিকারী ভেদে সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম উভয়েরই উপাসনার বিধান করিয়া দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য করা হইয়াছে।

প্যারী

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মার্সেইলসে এসে কখন ভোরে জাহাজ দাঁড়িয়ে গেছে। ঘুম ভাঙতেই দেখি জাহাজ এক বিরাট কলরবের মধ্যে দাঁড়িয়ে। অনেকেরই চেনাশোনা বন্ধুবান্ধব তীরে এসে অপেক্ষা কোরছিলেন। আমার সে সবের সৌভাগ্য ছিল না; কাজেই তীর থেকে একটা কুলী ডেকে পাশপোর্ট দেখিয়ে তাড়াতাড়ি জাহাজ থেকে অচিন-দেশের মাটীতে পা দিলাম। জাহাজের সিঁড়ির কাছেই নীচে কুক, আমেরিকান এক্সপ্রেস, গিণ্ডানডার্স প্রভৃতি পাণ্ডা কোম্পানীর লোক দাঁড়িয়ে থাকে যাত্রী ধরবার জন্যে। বাক্সপত্র দিয়ে দিলাম ষ্টেশনে পৌছে দেবার জন্যে। এই পৌছে দেবার জন্যে তারা যে মাশুল আদায় করে তাতে নিজেরই ট্যাক্সীতে আসা চলে; কিন্তু তবু অচেনা দেশ, অজানা ভাষা, অপরিচিত মানুষের মাঝে একলা ঘুরবার লোভে আমি হেঁটেই বার হলাম ষ্টেশনের পথে। জানি, ভাষা না পারব বোলতে, না বুঝতে; তাই ষ্টেশন কথাটার ফরাসী প্রতিশব্দ "লাগার" কুকের দোভাষীর কাছে জেনে নিয়ে পথে পা দিলাম—ইচ্ছা কিছু দূর গিয়ে ট্রাম বা বাস ধোরব। যাবার আগে
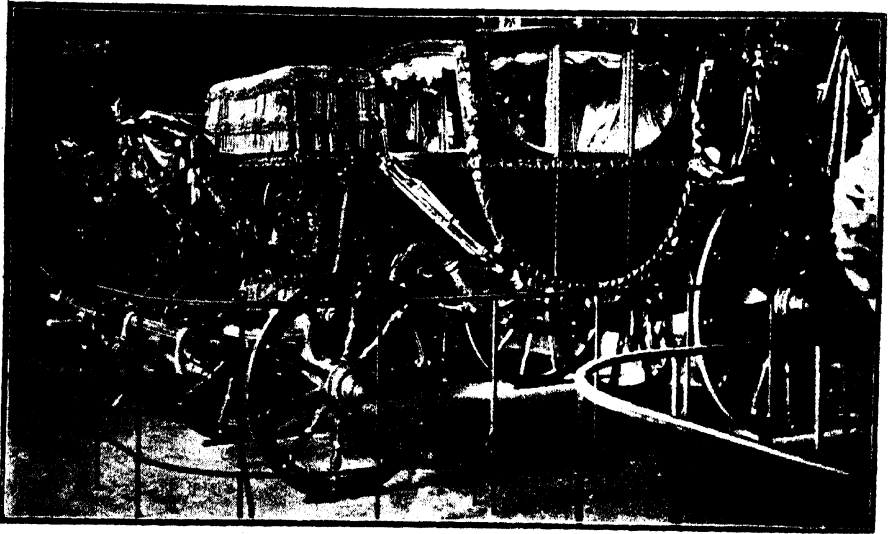
অষ্টদশ শতাব্দীর একটী ঘোড়ার গাড়ী—ক্লুনি মিউজিয়াম

আমি কুকের মারফৎ টিকিট কেটেছিলাম, কাজেই তাদের লোককেই সাহায্যার্থ তলব কোরলাম। বোলে রাখা ভাল, এক কোম্পানীর মারফৎ টিকিট কেটেছি বোলে যে অন্য কোম্পানীর লোক সাহায্য কোরবে না এমন কোনো নিয়ম নেই; কারণ তাতে তাদের গরলাভ নেই—যেটুকু পথই তারা সঙ্গ নেবে সেইটুকু বাবদই কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পকেটস্থ হবে।

কুক কোম্পানীর লোকের জিম্মায় আমার যাবতীয় আর একবার পেছন ফিরে দেখলাম, জাহাজ প্রায় খালি—যাত্রীরা যে যার যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত। তাদের সম্মুখে তখন ভবিষ্যতই সব, অতীত লুপ্ত। যে জাহাজ তাদিকে মায়ের কোলের মত ঝড়ঝাপটা বৃষ্টি বাদলের হাত থেকে বাঁচিয়ে সাত সাগর পারে এনে নিরাপদে পৌছে দিলে, তীরে নামার পর কেউ আর তার দিকে ফিরেও চাইল না। জাহাজের গায়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন জলধারা বইছিল—যেন

মানুষের অকৃতজ্ঞতায় লোহা-কাঠও গুমরে গুমরে কাঁদছিল।

কিছু দূর গিয়ে দেখি ডকের সীমানার মধ্যেই ঘুরছি—যাবার ট্রাম কোন্ দিকে ?" তিনি যে ভাবে তাকালেন তাতে মনে হোলো বিদেশী,—ইংরাজী ভাষায় না বোলে বিশুদ্ধ বাংলা বা সংস্কৃতে বোল্লে তিনি সমানই বুঝতেন।
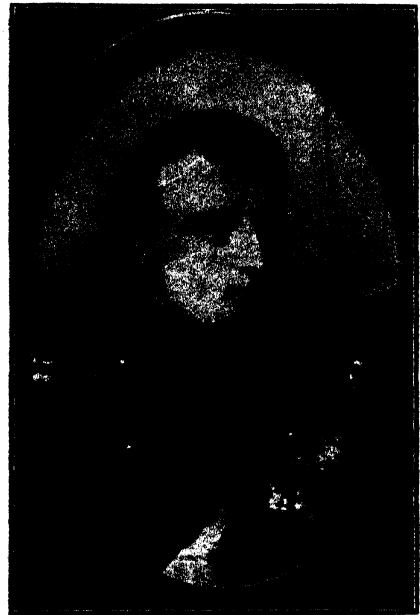
নেপোলিয়ঁার মুখের মডেল—ইনভ্যালিডস

লুভ্রে মিউজিয়ামে নেপোলিয়ঁার তৈলচিত্র

ট্রাম বা বাসের সাড়াশব্দ নাই। তখন এক পথিককে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা কোরলাম "লাগারে (ষ্টেশনে) তিনি না বুঝলেও আমার বোঝান প্রয়োজন, কাজেই "ঠং ঠং, জি জি জি, লাগার" ইত্যাদি সঙ্কেতে ও
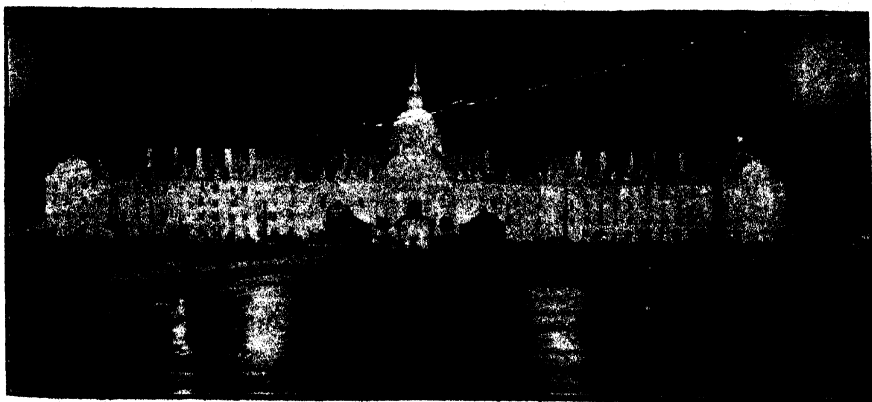
আলোকসজ্জায় ইনভ্যালিডস্

কোরে ও টিকিট কিনে রেখেছিল। টিকিট কেনা ছাড়াও কিছু বেশী দিলে সিট রিজার্ভ হয়। সাধারণতঃ লোকে কোণের সিট পছন্দ করে; কারণ দুটো ঠেস দেবার জায়গা মেলে। সিট রিজার্ভের আগে ইঞ্জিনের দিকে বা উল্টো দিকে মুখ থাকবে এ-সবও জিজ্ঞাসা কোরে নেয়। তবে আমার মনে হোল, সিট রিজার্ভ কাজেই খুব একটা গণ্ডগোল নাই। বেশী মালপত্র নিয়ে গাড়ীর ভেতরে ঠাসা বে-আইনী ও অভদ্রতা। বড় মাল সব লাগেজে দিতে হয়। কামরার মধ্যে মাথার ওপর জালবোনা খানিকটা জায়গা আছে; তাতে ছোট ব্যাগ প্রভৃতি রাখা চলে—বড় জিনিষ রাখা চলে না; কাজেই বাধ্য হোয়েও বড় মালপত্র লাগেজে দিতে

সেক্রেট হার্ট গির্জ্জা
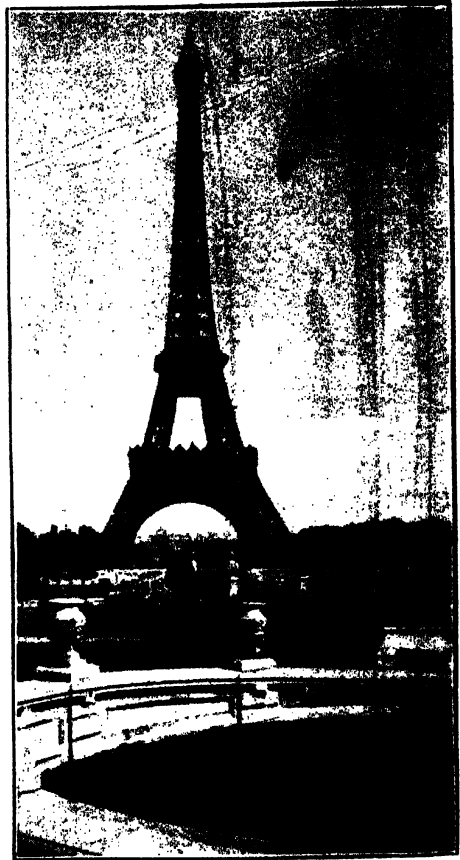
ইফেল টাওয়ার

করাটা অত্যাবশ্যক নয়; কারণ, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে লোক বোসলেই কণ্ডাক্টার ভর্ত্তি সিটের নম্বরগুলি দরজার বাইরের ধাতুফলকে জানিয়ে দেয়—সেই সিটে অন্য কেউ বোসতে যায় না। এ ট্রেনের সবই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী—অন্য শ্রেণী নেই, হয়। ট্রেনে চাপার পর দেখি সেই ট্রেনেই জাহাজের সহযাত্রী মিঃ সারওয়ার্দ্দি চেপেছেন। অধিকাংশ সময় দুজনে গল্প কোরতে কোরতে ট্রেনের বারান্দাতেই (corridore) কাটালাম। প্রত্যেক গাড়ীর দুই দিকে লাইনের ম্যাপ আঁটা আছে। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে

চোখ বুলুই, আর দেখি কত বাকী। এই দীর্ঘ ২০০ মাইলের মধ্যে গাড়ী ৪।৫ জায়গায় থামে। মিঃ সারওয়ার্দ্দির কাছে প্যারিসের একটী ভাল ইংরেজী জানা হোটেলের ঠিকানা নিলাম। তিনি ইতিপূর্ব্বে বার বৎসরের উপর প্যারিসে ছিলেন শুনলাম এবং

তিনি বোল্লেন "ষ্টেশনে আবার আমার বন্ধু আসবে—তাকে নিয়ে অত রাত্রে ঘোরা—"

আমি হেসে বোল্লাম "বন্ধুই ত—মেয়েমানুষ ত নয়।"

তিনি ততোধিক হেসে জবাব দিলেন "নয় কে বোল্লে?"
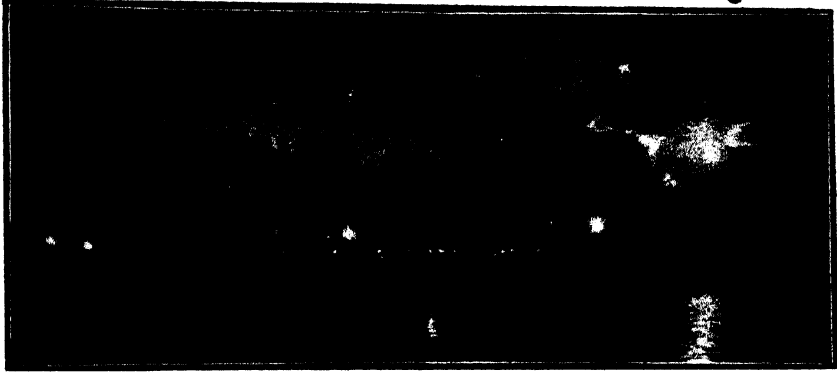
রাতের প্যারী

বাংলা ভাষা তিনি প্রায় ভুলেছেন দেখলাম। তাঁকে বোল্লাম "আমি ত একেবারে এদেশে নূতন—তার ওপর

কেউ বলে নাই এবং সত্যিই স্ত্রীলোকই বটে। গাড়ী থামার পর তাঁকে বান্ধবীর সঙ্গে করমর্দ্দন কোরতে
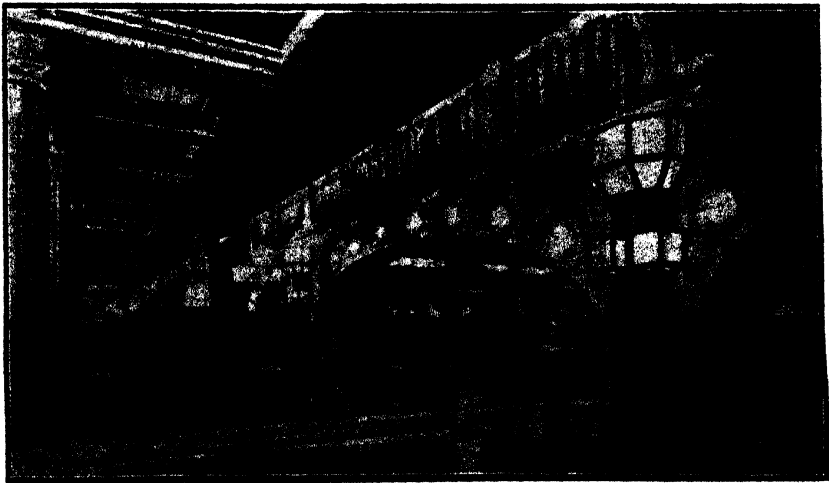
মর্ম্মর সেতু—লিডো—প্যারী

ভাষা জানি না—আপনি যদি আমার হোটেল পর্য্যন্ত পৌছে দেন।"

দেখলাম; কিন্তু তারপর যে তিনি সবান্ধবী কোথায় উপে গেলেন আর সন্ধান পেলাম না। বিদেশে শিক্ষিত

দেশবাসীর নবাগত আগন্তুকের প্রতি এই ব্যবহার দেখে বড় ক্ষুব্ধ হোলাম। এ কথা সত্য আমি তাঁর ভরসায় আসি নাই—তাঁকে না পাওয়ায় আমার যাত্রাও অসম্পূর্ণ হয় নাই; তবু দেশের লোকের এই ব্যবহারে অন্তরে সত্যিই আঘাত লেগেছিল।
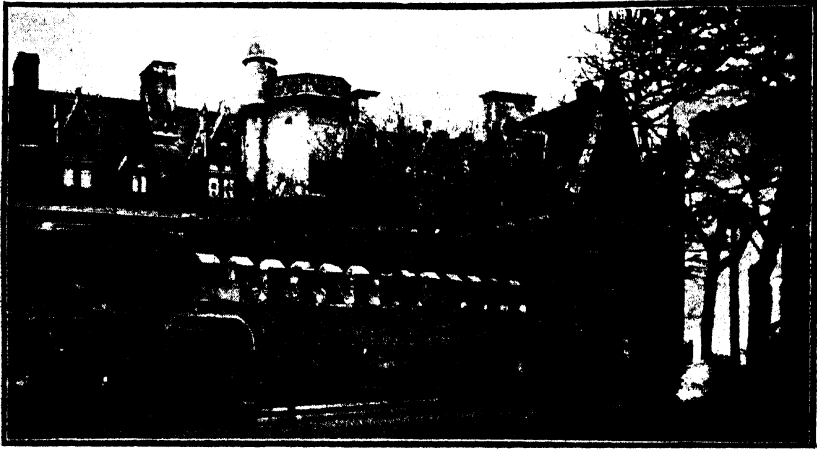
প্যারী ষ্টেশনে নেমে দেখি পোর্টার বা কুলীর অত্যন্ত অভাব। অনেক দূরে প্লাটফর্মের বাইরে কুলীরা সব দাঁড়িয়ে ছিল। যাত্রীরা সেইখান থেকে প্রয়োজনমত কুলী ডেকে আনছিলেন। কিন্তু আমি একলা থাকায় মাল সামলাই না কুলী ডাকি এই সমস্যায় পো'ড়লাম। শেষে মালগুলিকে দেশের লোকের সুবুদ্ধির হাতে ন্যস্ত কো'রে কুলী ডেকে নিয়ে এলাম। কুলীর ঠেলা গাড়ীতে মালগুলি দিয়ে তাকে লাগেজে দেওয়া জিনিষগুলির রসিদ দেখালাম; অর্থাৎ লাগেজের মালগুলিও তোমায় নিতে হবে। সে ঘাড় নেড়ে বল্লে 'উই' অর্থাৎ সে ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। পরে সে লাগেজ

ক্লুনি মিউজিয়াম—প্যারী

লিডোর নাচ হল—সাধারণ দৃশ্য

কামরায় নিয়ে গেল; সেখানে ট্রেনের যাবতীয় মাল এসে জমা হোয়েছে। এইজন্য প্লাটফরমে কুলীর দরকার হয় না; কারণ কুলীর ঘাড়ে দেবার মত মাল অধিকাংশ যাত্রীরাই সঙ্গে রাখে না, লাগেজ ভ্যানে (Van) দেয়। মাল ছাড়ানোর পর কুলী কহিল, "ত্যাক্সি?" (Taxi)

রাতের ইফেল টাওয়ার

ঘাড় নেড়ে জানালাম 'হাঁ।'

ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে মিষ্টার সারওয়ার্দ্দির কাছে তালিম দেওয়ার ভাষায় হোটেলের ঠিকানা বোললাম "নাক রু দে সোমেরার"। কিন্তু অবোধ সে দুর্বোধ্য ভাষার কিছুই বুঝল না। অগত্যা পকেট থেকে নোট-বই বার কোরে নম্বর ও রাস্তার নাম দেখালাম। সে ঘাড় নেড়ে জানালে বুঝেছি।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের প্যারী তখন সুপ্তিমগ্না। রাস্তার ধারে এবং দূরে আলোগুলি উৎসব-শেষের নির্ব্বাণোন্মুখ

প্লা দি কোঁকোর্দ্দের একটী ঝরণা—রাত্রে
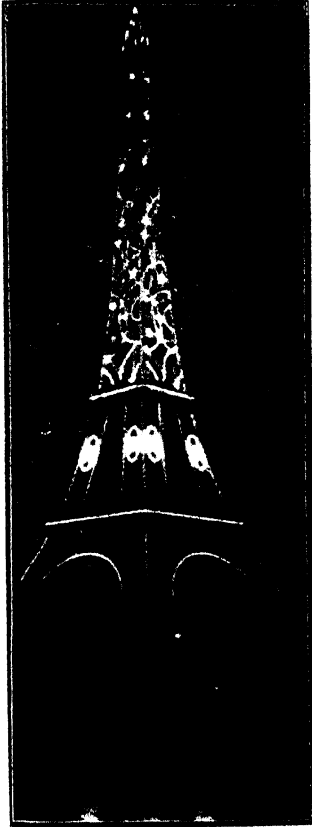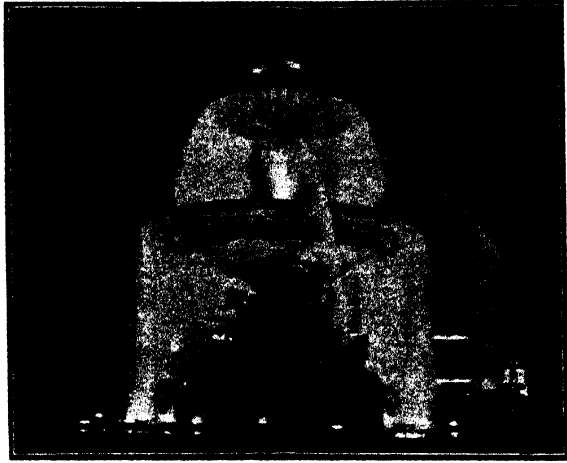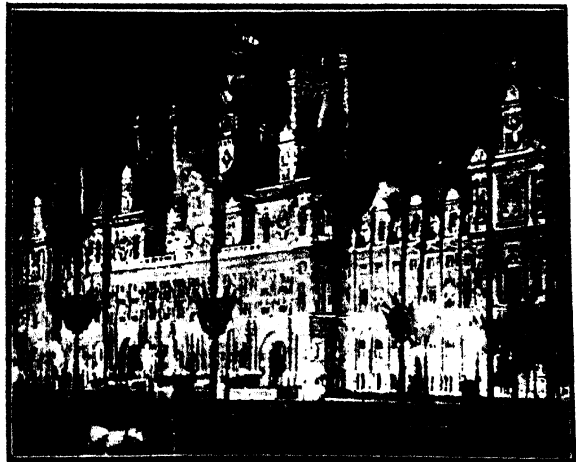
সন্ধ্যায় প্যারীর একটী প্রসিদ্ধ হোটেল (Ville)

প্রদীপ-শিখার মত যেন ম্রিয়মান। কোলাহল কলরোলের লেশ মাত্র নাই। ভাবলাম, এই কি বিশ্ববিশ্রুত উৎসব-আমোদিত জগতের নৈশবিলাস কেন্দ্র? কৈ সে উৎসব, কৈ সে হাসি, কোথা সে উচ্ছ্বাস, মদিরার শুভ্র-

ফেনার বাহ্য প্রকাশ! ট্যাক্সি এক নির্জ্জন পল্লীর শান্ত ক্রোড়ে এক ঘুমন্ত বাড়ীর সামনে এনে হাজির কোর্ল্লে। ড্রাইভার গিয়ে দরজার বোতামটি টিপ্‌তেই ভিতরের আহ্বান সঙ্কেতধ্বনি হোয়ে উঠল; এক বৃদ্ধা নৈশ বিশ্রামের পোষাক পোরে বেরিয়ে এলেন। আর একবার ফরাসী বলার দুশ্চেষ্টা কোরলাম—জিজ্ঞাসা কোরলাম "সাঁবর?" ইংরাজিতেই উত্তর এল, "হ্যাঁ, ঘর চাও ত?"

পরদিন ঘুম ভাঙতে বেশ বেলা হ'ল। নীচে নেমে এসে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ কোর্‌লাম। বুড়ী বেশ লোক। তার বাড়ীতে এর আগেও কয়েকজন ভারতবাসী ছিলেন। প্যারী-প্রবাসী ভারতীয়দের অধিকাংশই এই পাড়াতেই থাকেন। এটি হ'ল ইউনিভারসিটি পাড়া ও প্যারীর একটি প্রাচীন অংশ। গৃহকর্ত্রী বুড়ীকে (ভাগ্যে সে এ লেখা পোড়বেনা; নইলে তার এ বিশেষণ শুনলে সে আমার নামে নিশ্চয় মানহানির

একটী প্রাচীন জাহাজের মডেল, ক্লুনি মিউজিয়াম

প্রাচীন জেলখানা বর্ত্তমানে নৃত্যশালা—প্যারী
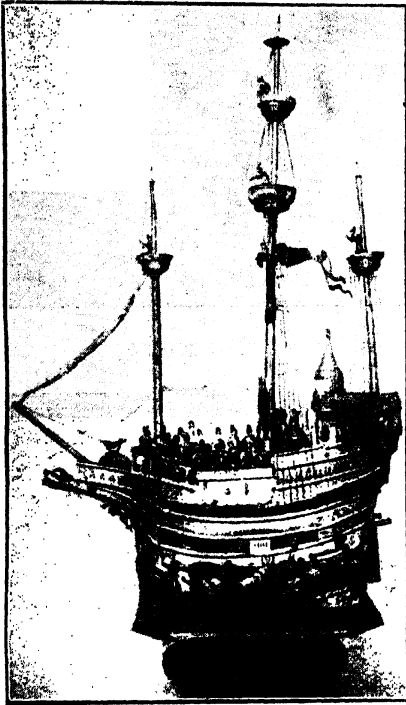
নিশ্চিন্ত হোলাম; তবু দুটো বাক্যব্যয় কোরতে পাব। এখানকার ট্যাক্সি মানুষ ছাড়া মালের ভাড়াও আলাদা নেয় এবং রাত্রি বারটার পর ভাড়া দিনের দ্বিগুণ। বৃদ্ধা গুটিদুয়েক ঘর দেখালেন। তার মধ্যে একটি শোবার ঘর এবং তৎসংলগ্ন বোসবার ঘর পছন্দ কোরে নিলাম। সে রাত্রে আহারাদি কিছুই জুটলোনা।

মকর্দ্দমা আনত, কারণ বুড়ীও সেখানে নিজেকে ছুঁড়ী বোলেই জাহির কোরতে চায়) জিজ্ঞাসা কোরলাম, খাবার দাবার সেখানে কিছু মিলবে কিনা?

সে বোল্‌লে, 'এখানে ত কিছু মিলবে না। রেস্তোঁরায় গিয়ে খেয়ে এস'।'

তার কাছে কতক খাবারের ফরাসী প্রতিশব্দের উচ্চারণ এবং বানান লিখে নিয়ে আহারের সন্ধানে পথে

পা দিলাম। কিছু দূর গিয়ে দেখি সামনে মস্ত এক সাইনবোর্ড 'Hotel'। ভারতবাসী আমরা কাজেই হোটেল বোলতে মনে আসে ভাত, তরকারী, মাছির সঙ্গে হয় আসনপিঁড়ে নয়, স-ছারপোশ টেবিলচেয়ার। যেমনই হোক্ ঐ জায়গায় গেলে পেটের গর্ত্তটা ভর্ত্তি করা যায়, তাই সামনের কাচের দরজাটা ঠেলে সটান ঢুকে পো'ড়লাম। ঢুকেই দেখি সামনে একটি সিঁড়ি, পাশে
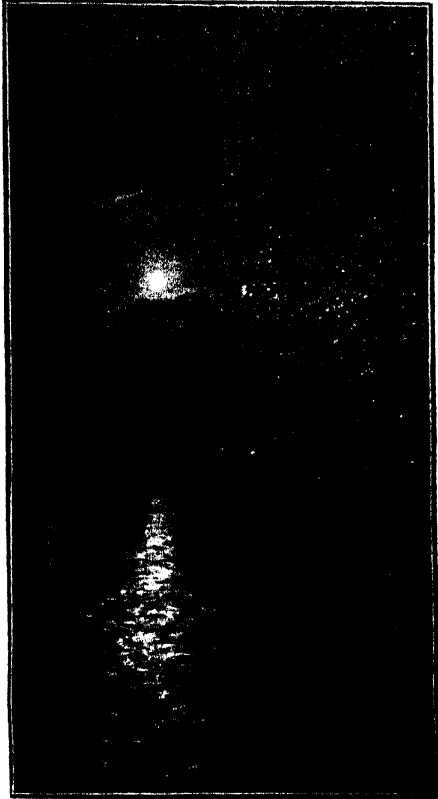
জ্যোৎস্না রাতে সিন নদী

আর একটা দরজা। হোটেল যখন, তখন আর ভাবনা চিন্তা কি? কাজেই বিনা দ্বিধায় দরজাটা ঠেলে দিয়ে ঘর ঢুকলাম। দেখি সেটা একটা সাজান ড্রইংরুম। একটি তরুণী ঘরের কোণে বোসে সেলাই কোরছিলেন। প্রথমটা মনে কেমন খট্‌কা লাগ্‌ল; এ আবার কি ধরণের হোটেল! টেবিল চেয়ার, ঝি চাকর, হাওয়া, কিছুরই মধ্যে ত হোটেলের গন্ধ নেই। আবার মনে হোল দরিদ্র ভারতবাসী আমরা, বাইরের ঐশ্বর্য্য বিলাসের কতটুকু খবরইবা রাখি। জগতের বিলাসকেন্দ্র এই প্যারী—এর যোগ্য হোটেলের রূপ হয় ত এই। ঢুকবামাত্রই মেয়েটী মুখ তুলে জিজ্ঞাসু নয়নে চাইল। আমি গম্ভীর-ভাবে বরাত দিলাম, "রী" অর্থাৎ "ভাত"। সে কিছুই বুঝল না। আরও বারকতক রী রী কোরেও যখন তাকে বোঝাতে পারলাম না, তখন. বুঝলাম কপালে

প্যারীর একটী প্রসিদ্ধ রাস্তা সামনে মেট্রোতে নামবার সিঁড়ি

ভাত আর নেই। কাজেই সেটা বাদ দিয়ে বরাত কোরলাম, 'এফ' অর্থাৎ 'ডিম'।

কিন্তু এ কথার উত্তরে এক কৌতুকমাখা বিস্মিত দৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই মিল্‌ল না। তখন অগত্যা শেষ সম্বল কাগজখানি পকেট থেকে বের কোরে তাঁর সামনে মেলে ধোরলাম। তিনি ভদ্র হাসি হেসে বোল্‌লেন, 'Speak English?" বাপ! বাঁচলাম! যেন মাতৃভাষা শুনলাম!

নিশ্বাস ছেড়ে বোল্লাম 'Yes'।

পরে তিনি বোঝালেন "এটা হোটেল; এখানে থাকবার ঘর পাওয়া যায়। কিন্তু খেতে পাওয়া যায় না। খেতে হোলে যেতে হবে রেস্তোঁরায়। তোমার কি ঘর চাই?"

রাত্রে আর্ক দি ত্রায়াম্প

নেপোলিয়ঁার সমাধিস্তম্ভ, ইনভ্যালিডস

মাপ চেয়ে পেটের দায়ে আবার পথে বেরুলাম। কিছু দূর গিয়ে দেখি, সামনে একটি Bar অর্থাৎ পানীয়-শালা; কিন্তু যতদূর দৃষ্টি যায় রেষ্টুরেণ্টের চিহ্ন চোখে পোড়ল না। অগত্যা "বার"এই জিজ্ঞাসা কোর'লাম, "রেস্তোঁরা?"
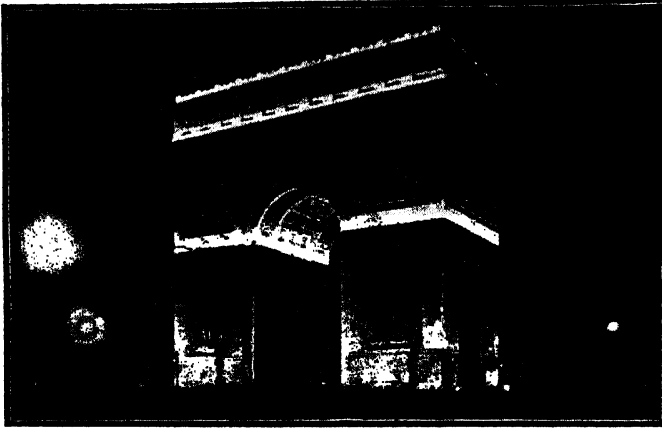
অনেকক্ষণ নিজে বক্তৃতা দেওয়া ও সে বক্তৃতা করার পর বুঝলাম একটু মোড় ঘুরে গেলেই রেস্তোঁরা মিলবে। মিল্‌লেও কিন্তু সেখানেও বদ-জবানের জন্য আমার ফরাসী ভাষা কেউ বুঝল না। তারা আমার সামনে 'menu'টা ফেলে দিলে। সেটা মুখরোচক আহারের তালিকা, না বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রশ্ন-পত্র, কিছুই বুঝলুম না। অনেক হাতড়ে পাকড়ালাম এক Omletকে। জানার মধ্যে এই কথাটা পেলাম; কাজেই সেইটার বরাত কোরলাম। কিন্তু তাতেই কি রক্ষে? আবার তারা কি সব জিজ্ঞাসা করলে। এবার ঘাড় নেড়ে মুখ বেঁকিয়ে সটান বোল্‌লাম "তোমাদের ও-ভাষা আমার এই গোবরপোরা মাথায় ঢোকে না।" খাদ্যা-খাদ্যের বিচার না কোরলে এত হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না। খাবার ত একটা আসবেই—হয় টক, নয় ঝাল, নয় তেত, কিম্বা ফল অথবা মিষ্টি। Omlet এল। যদিও তাতে ক্ষিদে মিট্‌লো না, তবুও এই হাস্যাস্পদ হাঙ্গামার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আর বেশী গোল-মাল না কোরে একখানা নোট বার কোরে দাম চুকিয়ে দিলুম। মিস (Miss) এসে খুচরা ফেরত দিয়ে গেল। আমিও পকেটে পুরে বেরোচ্ছি,

সে আবার কি বল্লে। পরস্পরের অবোধ্য ভাষার অপরূপ দৃশ্যটা যখন বেশ জমে এসেছে, তখন এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমায় বোল্লেন, 'আংলে?" অর্থাৎ ইংরাজি বোঝ? বোল্‌লাম, "হ্যাঁ।"

রাণী জোসেফাইন—লুভ্রে

সে আধা-ইংরাজি আধা-ফ্রেঞ্চে বোঝালে যে মেয়েটি তার বক্‌শিস চাচ্ছে এবং এ ওরা পেয়ে থাকে।

পরে দেখেছিলাম শুধু প্যারীতে নয় ইউরোপের প্রায়

করে না। এই দানের উপর গ্রহীতার দাবী আছে। প্রত্যেক বিলের শতকরা দশ ভাগ "সার্ভিস"এর জন্ম বেশী দিতে হয়। আহার-পর্ব্ব শেষ কোরে এখানকার

একটী প্রাচীন ভাস্কর্য্যশিল্প, ক্লুনি মিউজিয়াম

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনএর ঠিকানা ধোরে স্বদেশবাসীর সন্ধানে বেরুলাম।

ঠিকানা ধোরে গিয়ে দেখি বাড়ীর মাথায় ঠিকই

নারীদের কটীযন্ত্র—ক্লুনি মিউজিয়াম

সব সহরেই রেষ্টুরেণ্টে ও হোটেলে এই বক্‌শিস বা "টিপস্"এর প্রচলন আছে। এর নাম যদিও বক্‌শিস তবুও এর দেওয়া না দেওয়া দাতার মর্জ্জির ওপর নির্ভর

লেখা আছে "এসোসিয়েসঁ দে এতু দিয়াঁ এ্যাঁদ্যু" অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস এসোসিয়েন। দরজাটা বন্ধ ছিল—ঠেলে ঢুকেই বড় অপ্রস্তুতে পোড়লাম। সামনে টেবিলে

কতকগুলো খাতাপত্র ছড়ান, কয়েকটা চেয়ার—কিসের একটা অাফিস বলে মনে হয়; কিন্তু আফিসের কেরাণী-যুগলের মস্তিষ্কে তখন কাজের চেয়ে প্রেমের নেশাই ধোঁয়াচ্ছিল বোধ হয়—দেখি দুটী যুবক-যুবতী প্রায় পরস্পর অঙ্গসংলগ্ন ভাবে দণ্ডায়মান। এমন মুহূর্ত্তে প্রবেশ অনধিকার বোলে অনুতপ্ত হোলাম,—কুণ্ঠিত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোরলাম, 'এইটী কি ভারতীয় সঙ্ঘ?' তারা ফরাসী ভাষায় কি বোল্লে বুঝলাম না। আকার-ইঙ্গিতও অচল হোল। অগত্যা বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় এক ভদ্রলোককে আমার দিকে তাকাতে দেখে সোজা বাড়ীটা খুঁজে দেন। ভদ্রলোক প্রাপ্ত ঠিকানা খুঁজে যে বাড়ীতে এলেন, সেটা, শোনা গেল, চীনাদের আড্ডা এবং তারা আবার পূর্ব্বের ঠিকানায় 'হিন্দুদের' খোঁজ কোরতে বোল্লে। আবার ভদ্রলোক সে বাড়ীতে এসে তার মালিকের সঙ্গে দেখা কোরলেন। কর্ত্রী সঠিক খবর দিলেন—ঐ সমিতি আধুনা লুপ্ত। তবে তার উৎসাহী সেক্রেটারী মিঃ সেন পাশের রাস্তায় থাকেন। সেখানে গেলে সব খবর ও অন্যান্য হিঁদু (ভারতীয়)দের খবর পাওয়া যাবে। যথাস্থানে গিয়ে মিঃ সেনের দেখা পেলাম। দুর্ভাগ্য-ক্রমে তিনি সেই দিনই সুইজার্ল্যাণ্ড

ক্লুনি মিউজিয়ামের একটী ফ্রেস্কো পেণ্টিং

গিয়ে জিজ্ঞাসা কোরলাম "আপনি ইংরাজী জানেন?" ভাগ্য ভাল, তিনি উত্তর দিলেন "হ্যাঁ।"

তাকে সব বুঝিয়ে বোল্লাম এবং ঐটীই ভারতীয় আড্ডা কি না জিজ্ঞাসা কোরে জানাতে বোল্লাম। ভদ্রলোক আবার সে ঘরে এলেন—আমি কিন্তু দরজার বাইরে রইলাম—কে জানে আবার যদি অপরাধের বোঝা বাড়ে। তিনি ফিরে এসে বোল্লেন "এক বছরের ওপর সে প্রতিষ্ঠান এখান থেকে উঠে গিয়েছে। সম্ভবতঃ তারা অন্য বাড়ীতে আছে"। তাঁকে ধোরলাম দয়া কোরে সে যাত্রা কোরছিলেন। কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁর ট্রেন। কাজেই তিনি জিনিষপত্র গোছাতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আবার অন্য একটী বাঙ্গালীর আড্ডায় খোঁজ নিতে বোল্লেন, সেখানে ৩।৪ জনের সন্ধান মিলবে। সঙ্গীহারা একক তখন যূথের জন্যে লালায়িত—তাই আবার ছুটলাম। সেখানেও তিনজন ভারতীয়ই নয় খাস বাঙ্গালীকে আবিষ্কার কোরলাম। সে আবিষ্কারের আনন্দ এডিসনের আবিষ্কারের আনন্দের চেয়েও প্রবল ও গাঢ়। রাত্রে এঁদের সঙ্গে পেটপুরে বিলাতী বেগুনের ঝোল

আর ভাত খাওয়া গেল। তাঁদের খাবার স্থান ও সময়টা জেনে নিলাম, যাতে রোজ দুবেলা ঠিক সময়ে জুটতে পারি। এর পর প্রায় প্রত্যহই মধ্যাহ্ন ও সান্ধ্যভোজন এঁদের সঙ্গেই সেরে নিতাম। চাএর প্রতিশব্দ "তে" এবং "তোষ্‌ত" (টোষ্ট) মুখস্থ কোরে নিয়েছিলাম। কাজেই সেটা কোনোরকমে যত্র তত্র উদরস্থ করে নিতাম।

এখানকার ভারতীয় সমিতিটী উঠে যাওয়া আমাদের দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। বাঙ্গালীরাই এটী গোড়েছিলেন। পরে যখন এটী খুব ভাল চোলছিল, তখন অন্যান্য ভারতীয়েরা এর কর্ত্তৃত্বের দাবী করেন। ফলে বাঙ্গালীরা

একটী ট্যাঙ্ক—ইনভ্যালিড্‌স—প্যারী

অভিমান কোরে এটী ছেড়ে দেন। কিছুদিন পর এর কর্ত্তৃপক্ষেরা তহবিল গোলমাল করেন এবং সমিতিটী উঠে যায়—অন্ততঃ এই ইতিহাস আমি শুনেছিলাম। এই সব প্রতিষ্ঠান বিদেশে নবাগতদের যে কত উপকার করে, তা যাঁরা বাইরে গেছেন তাঁরাই জানেন। এখানে গড়া জিনিষটী এমন ভাবে নষ্ট হোয়েছে শুনে মর্ম্মাহত হোলাম।

এবার প্যারীর পরিচয়ে মন দিই।

সব প্রথম চোখে পড়ে এদের বৃদ্ধা কিশোরী তরুণীর প্রকট তারুণ্য-বাতিক। সকলেই রংএ, রোজে, লিপষ্টিকে নিজেকে কিশোরী প্রমাণ কোরতে ব্যস্ত। খাটো স্কার্টগুলি দেহের প্রত্যেকটী রেখাকে পরিস্ফুট কোরে তুলেছে। ভ্রূ-যুগলের কেশরাশি নানা উপায়ে নির্ম্মূল কোরে তুলি দিয়ে সযত্নে ভ্রূ আঁকা। ট্রেনে, বাসে, ট্রামে মেয়েরা নির্ব্বিকার চিত্তে আয়না নিয়ে গালের রং, ঠোঁটের আভা, চুলের পারিপাট্য রক্ষা কোরতে ব্যস্ত। রেস্তোঁরায় চা খাওয়ার পর হাজার লোকের সামনে লিপষ্টিক ঘষা একটা অতি সাধারণ তুচ্ছ ব্যাপার। এত নির্লজ্জতা আমাদের চোখে বড়ই বিসদৃশ ঠেকে। এই কৃত্রিমতা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সহ্য কোরে কি ভাবে যে পারিবারিক জীবন চলে তা আমাদের ধারণাতীত। উৎসবে পালপর্ব্বণে সাজসজ্জা বা রং মাখাও চোলতে পারে; কিন্তু অহোরাত্র নিজের স্বরূপকে কৃত্রিমতার আবরণে ঢেকে দৈনন্দিন জীবন কাটানর মনস্তত্ব আমাদের অজ্ঞাত।

এখানকার ট্রামগুলির বিদ্যুৎ সরবরাহ সর্ব্বত্র মাথার ওপর থেকে নয়—মাটীর নীচে থেকে। প্রত্যেক রাস্তায় পারাপার কোরবার জায়গায় মোটা মোটা লোহার পেরেক দিয়ে দুটো সমান্তর রেখা আছে—তার ভেতরে কোনো দুর্ঘটনা ঘোটলে ড্রাইভারই দোষী। যানবাহনের চলার নিয়ম keep to the right.

সাধারণ প্রবাদ যে প্যারিসের লোকেরা পয়লা নম্বর ঠক্। কিন্তু আমার মনে হয় কোনো একটা জাতি বা দেশ সম্বন্ধে এমন কোনো মন্তব্য পোষণ ও প্রকাশ করা অনুচিত। প্রত্যেক জাতিই ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণে গঠিত। যিনি দুর্ভাগ্যক্রমে মন্দের পাল্লায় পড়েন, তিনি প্রচার করেন সমস্ত জাতিটাই বদ ও জোচ্চোর। যিনি ভদ্রের সঙ্গে পরিচিত হ'ন তিনি বলেন ঠিক তার উল্টো। প্যারীতেই এক ভারতীয় পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হই। তিনি আমেরিকান স্ত্রী সহ মোটরে ইয়োরোপ বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি আমেরিকার অজস্র নিন্দা কোরলেন। তিনি আমেরিকার যে সব দিক নির্দ্দেশ কোরলেন, তা'তে আমেরিকানদের যে চিত্র Uncle Sham অঙ্কিত কোরেছে তার চেয়েও জঘন্য চিত্র মনে আসে। আবার ইয়োরোপ প্রবাস-কালে ও পরে আমেরিকা-ফেরৎ অন্য স্বদেশবাসীর কাছে আমেরিকার সৌজন্য ও ভদ্রতার অজস্র প্রশংসা শুনেছি। প্যারীতে অনেক জায়গায় ভাষার অজ্ঞতার জন্যে অনেকে আমায় ঠকিয়েছে—বুঝেছি, বোলতে চেষ্টা কোরেছি; কিন্তু তারাও ভাষা না জানার অছিলায় কান দেয় নাই। কিন্তু তাই বোলে ভদ্র প্যারীবাসীও যে নাই এ কথা কে অস্বীকার কোরবে? নৈশজীবন ও অবনত নৈতিক জীবনের জন্য প্যারীর খ্যাতি আছে। তার কারণ বিদেশীরা গিয়ে তাই দেখতে চায়, তাই উপভোগ কোরতে চায়। কিন্তু তাই বোলে প্যারীবাসীদের পারিবারিক জীবন অত কলুষিত নয়—সেখানে রীতিমত কড়াকড়ি আছে। দু'দশ দিন কোনো সহর দেখে বা দেখবার মত চোখ ও প্রবৃত্তি না নিয়ে সারা জীবন দেখেও যাঁরা কোনো দেশ সম্বন্ধে একটা মন্তব্য প্রকাশ করেন তাঁদের মন্তব্য অনেকটা অন্ধদের হাতী দেখার মতই। প্যারীর যেমন মোমার্ত এবং অপেরা অঞ্চলের নৈশ জীবনের অখ্যাতি আছে, তেমনি তার বুকেই রয়েছে বিশ্বখ্যাত লুভ্‌রে মিউজিয়াম, নোত্রে-দাঁর গির্জ্জা, টুইলারী উদ্যান, আর্ক ডি ত্রায়াম্প স্মৃতিস্তম্ভ, লা-ইন-ভ্যাউলডস্‌এ সম্রাট নেপোলিয়ঁার সমাধি ও স্মৃতি, ইফেল টাওয়ারের অপূর্ব্ব স্থাপত্য নিদর্শন। এগুলিকে বাদ দিয়ে প্যারী দেখা শুধু অন্যায় নয়—অপরাধ।

আলোকসজ্জায় অপেরার সম্মুখাংশ

এক একদিন প্যারীর এক একটা অংশ ধোরে তার দ্রষ্টব্যগুলি দেখতে সুরু কোরলাম। তাই তাদের বিবরণও দেব একে একে।

আমার হোটেল ছিল ৯নং রুদে সোমেরার্‌এ; কাজেই নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ রাস্তা "সা মিসেল" (St. Michael) এক একটা দিক ধোরে এক একদিনের যাত্রা সুরু হোত।

প্রথমেই দেখতে গেলাম নিকটবর্ত্তী মিউজিয়াম "ক্লুনি (Cluny)। বাড়ীটীর সর্ব্বাঙ্গে প্রাচীনতার সুস্পষ্ট ছাপ। কোলাহলমুখর সহরের বুকে এর পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে বহু শতাব্দীর স্তব্ধ শান্তি যেন মৌন হোয়ে বন্দী হয়ে আছে। একটী সেকেলে ইঁদারা

উঠানের মাঝে সেকালের স্মৃতি বহন কোরছে। এই প্রকাণ্ড সৌধটী ১৪৯০ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। সেকালের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এটী ভাড়া নিয়ে বাস কোরতেন। সম্রাট দ্বাদশ লুইএর সুন্দরী সহধর্ম্মিণী ম্যারী টিউডর (Mary Tudor) এর শীতল অঙ্কে প্রথম বাস করেন। ফরাসী বিপ্লবের পর সমসাময়িক গভর্ণমেণ্ট এটীকে অধিকার কোরে নেন। এই মিউজিয়ামটীতে প্রধানতঃ প্রাচীন শিল্পকলা, সামাজিক ও সামরিক সাজসজ্জা, আসবাবপত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি আছে। প্রকাণ্ড বড় মিউজিয়াম—সংগ্রহও অজস্র। এক একটী কক্ষ এক একটী বিশেষ যুগের রুচিমত সাজান। খাট বিছানা চেয়ার টেবিল ড্রয়ার, ফুলদানী দিয়ে ঘরগুলি এমন কোরে সাজান যেন কেউ এখনও সেখানে বাস করে—এমন কি অগ্নিকুণ্ডে পোড়া কাঠগুলি পর্য্যন্ত সযত্নে রাখা আছে। সে-কালের অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম্ম, তালাচাবি প্রভৃতিতে একটী কক্ষ ভর্ত্তি। এই কক্ষে প্রাচীন ফরাসীর একটী অদ্ভুত জিনিষ আছে। সেকালে ফরাসী পুরুষেরা যুদ্ধ-যাত্রাকালে বা বিদেশ গমনকালে নারীদের কটিদেশে এক বিশেষ আকৃতির যন্ত্র পরিয়ে তালা দিয়ে যেত—যাতে তা'দের অনুপস্থিতি কালে মেয়েরা কোনো ব্যভিচার কোরতে না পারে। বর্ত্তমান প্যারিসের নৈতিক জীবন বোধ হয় এই কড়াকড়ির প্রতিক্রিয়া। সেকেলে গাড়ী ও চীনেমাটীর বাসনগুলি দেখে মনে হোল, বর্ত্তমান শতাব্দী ঐ সব শিল্পে খুব বেশী অগ্রসর হোতে পারে নাই। সেকালের রাজাদের ঘোড়ার গাড়ী আর আজকের পঞ্চম জর্জ্জের ঘোড়ার গাড়ীতে খুব বেশী পার্থক্য চোখে পোড়ল না। এর কাচের জানলাগুলির গায়ে অনেক মূল্যবান 'ফ্রেস্‌কো' চিত্র আছে। সন্ধ্যার সূর্য্যের রক্ত-রশ্মি এই সব রঙীন কাচগুলির ভেতর দিয়ে পোড়ে নীরব কক্ষগুলির মর্য্যাদা যেন আরো বাড়িয়ে তোলে। এর চার পাশের বাগানে রোম্যান যুগের বহু মূর্ত্তি হাত-ভাঙা, মুণ্ড-হারা অবস্থায় পোড়ে আছে। এই শান্ত নীরব প্রাচীন প্রাসাদটীকে ঘিরে দুই দিকে সাঁ মিসেল (St. Michael) ও সাঁ জারমান (St. Germain) দুটী প্রসিদ্ধ কলরব-মুখর রাস্তা চোলেছে।
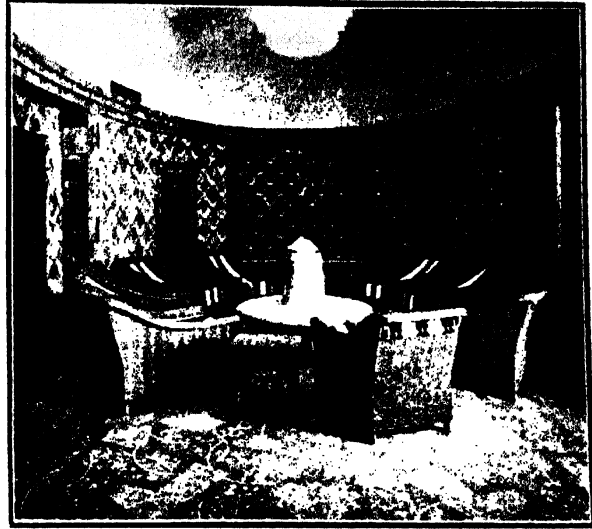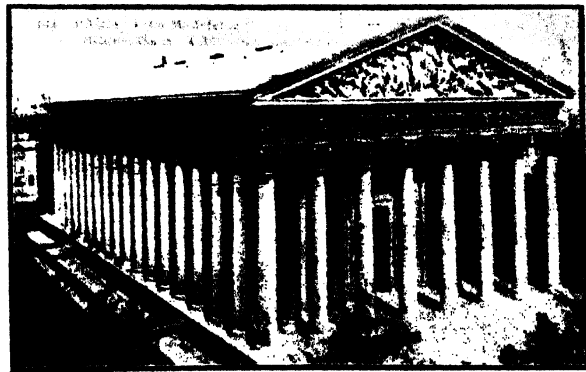
টার্কিশ বাথের কক্ষ—লিডো

মাদোলিন গির্জ্জা

এর কাছেই বিখ্যাত লাক্সেমবুর্গের উদ্যান ও সিনেট হল। স্থানীয় ছাত্রমহলের এইটী বেড়াবার প্রধান জায়গা। বিকেল ও সন্ধ্যায় এর ছায়া-শীতল প্রশস্ত রাস্তাগুলি, আলো-ছায়ায় জড়ান কুঞ্জগুলি, শ্যামল তৃণাবৃত অংশগুলি

সন্ধ্যার পর টুইলারীজ উদ্যান

আবালবৃদ্ধবনিতায় ভোরে যায়। কেউ স্বাস্থ্যান্বেষণে আসে, কেউ প্রাকৃতিক শোভা দেখে, কেউ প্রেমের

আলোকসজ্জায় প্লা দি কোঁকোর্দ্দি। বিজয়স্তম্ভের পাশে আলোকোজ্জ্বল ঝরণা

স্বপ্নে বিভোর। উদ্যানের বুকের প্রকাণ্ড অট্টালিকাটীর এক অংশে সিনেট বসে, অন্য অংশে চারু শিল্পের মিউজিয়াম। এই প্রাসাদেও এক সময় বহু গণ্যমান্য ব্যক্ত বাস কোরতেন। "টুইলারীজ" (Tuileries)এর প্রাসাদে যাবার আগে সম্রাট নেপোলিয়ঁ। এই প্রাসাদেই ছিলেন। কাল-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাসাদটীর নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘোটেছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রাসাদেই বন্দী ও নিহত হোয়েছেন। আজ সেখানে দেশের শুভাশুভ চিন্তায় প্রবীণ প্রাজ্ঞ সিনেটার-গণের ললাট রেখাঙ্কিত হোয়ে ওঠে।

এর কাছেই "সাঁমিসেল" পার হোয়ে বিখ্যাত প্যানথিয়ন (Panthion) গির্জ্জা। Saint Genevieveএর স্মৃতি রক্ষার্থে এই বিরাট প্রাসাদোপম সৌধটী প্রথম নির্ম্মিত হয়। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে স্থিরীকৃত হয় যে, এখানে কেবল ফরাসীর জনমান্য ব্যক্তিদের দেহাবশেষ রাখা হবে। ১৭৯১ খৃঃ অব্দের ৪ঠা এপ্রিলে এই স্মৃতি-সৌধের সম্মুখে ৪০০,০০০ ফরাসী মৃত Mirabeauএর শবদেহের প্রতি সম্মান দেখিয়েছিল। কিন্তু যখনই প্রকাশ পেল যে Mirabeau সম্রাট ও সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য চেষ্টা কোরেছিল, অমনি ক্ষিপ্ত জনতা, একদিন যার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নামিয়েছিল, তার কঙ্কাল কবর থেকে খুঁড়ে বার কোরে টেনে ফেলে দিয়েছিল। রুশো, ভলটেয়ার, জোলা প্রভৃতি স্বনামখ্যাত ফরাসী নেতার দেহাবশেষ এই মন্দিরে রক্ষিত হোয়েছে। এর প্রকাণ্ড পাষাণ-গর্ভের শীতলতা যেন মৃত্যুর কঠিন স্পর্শকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এর পর বিস্তীর্ণ সাঁজার্ম্মাণের বক্ষ খোরে পশ্চিমে এগিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম শান্ত সিন নদীর তীরে। প্রায় সামনেই "গারডি ইনভ্যালিডস্ (Gare des Invalids)। অর্থাৎ "ইনভ্যালিডস"এ যাবার ষ্টেশনে। এর পরেই ইনভ্যালিডস পার্ক; তার পরেই ইনভ্যালিডস

মুসি ডি লারমি (Musee de L' Armee) বা যুদ্ধ যাদুঘর।

এই বিরাট প্রাসাদটীর চারদিকে গড়খাই এবং গেটের দুধারে এখনও সশস্ত্র প্রহরী। সদর দরজা পেরিয়েই প্রকাণ্ড পাথর-বাঁধান উঠান। এই উঠানের বাঁয়ে "ইন-ভ্যালিডস চ্যাপেল"। এতে ঢুকতে গেলে দর্শনী দিতে হয়। ঢুকেই ডান দিকে একটা প্রকাণ্ড হল—এর শেষ প্রান্তে ইয়োরোপ-ত্রাস নেপোলিয়ঁার সমাধি-স্থান। সেণ্ট হেলেনায় ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে মৃত্যুর পর নেপোলিয়ঁার মৃতদেহ ফ্রান্সে আনিয়ে এইখানে কবর দেওয়া হয়। এই স্মৃতিমন্দির ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে শেষ হয়। বীরপূজিত নেপোলিয়ঁার সমাধিকক্ষ বীরের মতই সাজান—কোমল পুষ্প বা ধূপধুনা নাই, আছে তাঁহার বিজয়-চিহ্ন বিভিন্ন-বর্ণের ছিন্ন কেতনগুলি। ওয়াটারলুর যুদ্ধে কামান-বেঁধা একটা বর্ম্ম সযত্নে রক্ষিত আছে। দীর্ঘ জানলার রক্ত-বর্ণের কাঁচগুলির ভেতর দিয়ে উজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মি বিভিন্ন বর্ণের পতাকা ও বর্ম্মগুলির ওপর পোড়ে এক অনির্ব্বচনীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি কোরেছিল। কবরের ওপরে প্রস্তর-ফলকে অনেক কিছু লেখা আছে—যা পোড়তে পারি নাই। অপর দিকের হলটীতেও নানা ছবি ও বীরপূজিত ফরাসী সেনাপতিদের নানা স্মৃতিচিহ্ন আছে। নেপোলিয়ঁার কোট, টুপী, তলোয়ার প্রভৃতিও নীচের হলেই আছে। দোতলার দুটী হলই বিভিন্ন সময়ের বর্ম্ম, চিত্র ও পতাকায় পূর্ণ। একটীতে নেপোলিয়ঁার খাটবিছানা, ঘোড়ার জিন, দোয়াত কলম, তাঁর লেখা চিঠি, যে সব বই পড়তেন সেই সব বই, এমন কি, তাঁর সাদা ঘোড়া ও কুকুরটী পর্য্যন্ত এক সঙ্গে রাখা আছে। একটা টেবিলের ওপর নেপোলিয়ঁার মাথার অবিকল মডেল আছে। কক্ষটী এমন ভাবে সাজান যে, মনে হয়, এইমাত্র নেপোলিয়ঁা বুঝি লিখতে লিখতে কলম ছেড়ে কোথাও উঠে গেছেন—এখুনি বুঝি ফিরে এসে বোসবেন। সমস্ত জিনিষগুলো একত্রে যেন ব্যঙ্গ হাস্যে বোলে উঠল "ওগো, এই মানুষের চরম পরিণতি। আজ সামান্য কটা মুদ্রার বিনিময়ে কৌতুক ও ঔৎসুক্যের দৃষ্টিতে তোমরা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছ; কিন্তু একদিন ছিল, যেদিন আমাদের দর্শন বা স্পর্শ লাভ
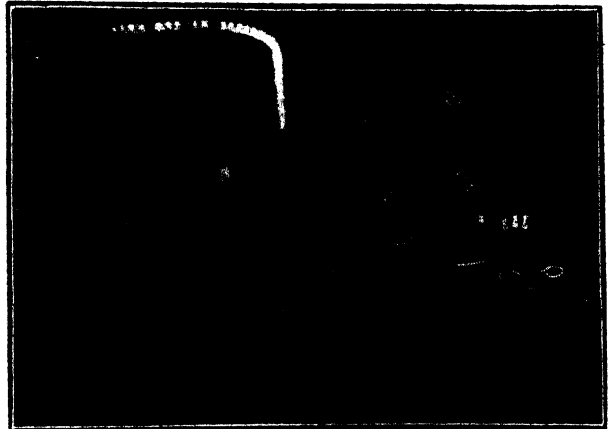
সন্ধ্যায় অজ্ঞাত সৈনিকের কবরে স্মৃতি-শিখা

রেড উইণ্ডমিল

সাধারণের পক্ষে অসম্ভব ছিল।" বিশ্বত্রাস সেনানায়কের ব্যবহার্য্য সব কিছু আজও এখানে পোড়ে আছে—কিন্তু হায় কোথায় সে শৌর্য্য, সে প্রতাপ, সে লোক! নেপোলিয়ঁর সঙ্গে যে সব বিখ্যাত সেনাপতিরা মিশর-জয়যাত্রায় সাফল্যলাভ কোরে এসেছিলেন, তাঁদের ঘোড়ার জিনগুলিও সযত্নে রক্ষিত হোয়েছে। ফরাসীর রণদেবী জোয়ান অব আর্কের সময়কার এবং তার আগের ও পরের যুগের বর্ম্ম, পতাকা ও অস্ত্র-শস্ত্রাদি অপর একটা হলে আছে। এগুলির মাঝে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে মনে হয় বুঝি বহু শত বৎসর পেছিয়ে গিয়েছি। সব-ওপর-তলায় নানা বিখ্যাত যুদ্ধের যুদ্ধভূমির প্ল্যান ও মডেল আছে। সেগুলি দেখতে গেলে আলাদা দর্শনী দিতে হয়। অট্টালিকার অপর দিকগুলি বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধ-সজ্জায় ভর্ত্তি। যে মোটরটীতে ফরাসী ভ্রমণকারী বিরাট সাহারা মরুভূমি পার হোয়েছিলেন সেটী এখানে আছে। প্রকাণ্ড ট্যাঙ্ক, কামান, এরোপ্লেন থেকে আরম্ভ কোরে বিভিন্ন রকমের টর্পেডো, বুলেট, ট্রেঞ্চ ও অন্যান্য যুদ্ধ-সরঞ্জামের মডেল, মাইন প্রভৃতিতে মিউজিয়ামের বিরাট হলগুলি আকণ্ঠ বোঝাই। এই সব মিউজিয়ামগুলো ভাল কোরে দেখলেই যুদ্ধ ও তার সাজ-সরঞ্জাম সম্বন্ধে বেশ একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। গত মহাযুদ্ধ যে বিউগলির তূর্য্যধ্বনিতে শান্ত হোয়েছিল, সেটা এইখানে আছে। এ ছাড়া গত যুদ্ধে হত সেনাপতিদের অস্ত্র-শস্ত্র, বর্ম্ম প্রভৃতি সযত্নে সাজিয়ে বীরের সম্মান দেখিয়ে সাধারণের মধ্যে বীরত্বের আকাঙ্ক্ষা ও অভিমান জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হোয়েছে। ওপরতলার বারান্দাটী ফরাসী জাতির বীর-মণ্ডলীদের প্রতিমূর্ত্তি ও কামান দিয়ে সাজান। এখানে এসে যুদ্ধের নেশা যেন মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমরা ত বিদেশী—ফরাসীদের স্বজাতীয় বীরদের কীর্ত্তিকলাপ ও সম্মান দেখে যে রক্ত নেচে উঠবে এত স্বাভাবিক। আমাদের জাতীয় জীবন অভিশাপগ্রস্ত না হোলে আমাদের দেশে পুণ্যশ্লোক বীরদের এমন সম্মান দেখাবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই থাকত।
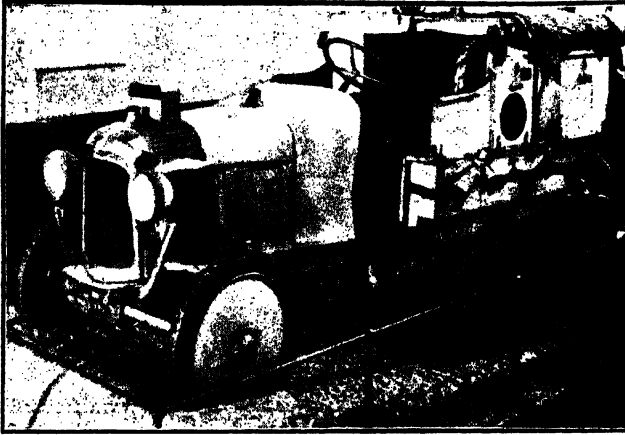
সাহারা অতিক্রমকারী মোটর—মুসি ডি লারমি

রাত্রে সাঁজে এলিজ—প্যারী

এরই অংশবিশেষে পূর্ব্বে সম্রাটের বৃদ্ধ সৈনিকেরা বাস কোরত। এখন মহাযুদ্ধের অক্ষম ও অঙ্গহীন সৈনিকেরা এখানে থাকে; তাই এর নাম "চ্যাপেল ডি

ইনভ্যালিড্‌স।" সমস্ত বাড়ীটা ঘুরে দেখতে একটা পুরো দিন লাগে।

এর কাছেই সামরিক স্কুলের (Ecole Militare) প্রকাণ্ড সৌধ। কিন্তু এর ভেতরে দেখবার কিছু নাই। এই স্কুলের পূর্ব্ব-উত্তরে মার্স পার্ক (Parc du champ de Mars)। পার্কটা সুবিন্যস্ত ও সুন্দর। পার্কটার উত্তর প্রান্তে বিশ্বখ্যাত ইফেল টাওয়ার (Tour Eiffel)। লৌহ কঙ্কালটা ৭॥০ বিঘা জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ওপরে ওঠবার কোনো সিঁড়ি নেই, প্রকাণ্ড লিফট্ (lift) আছে। প্রথম তলায় যাবার ভাড়া পাঁচ ফ্রাঁ, ওপর-তলার দশ ফ্রাঁ। প্রথম তলাটী যথেষ্ট প্রশস্ত—ওপরে একটা রেষ্টুরাণ্ট, থিয়েটার ও কাফে আছে। তা ছাড়া স্মারক দ্রব্যের (souvenir) দোকান ও ভাগ্য-গণনা, চকোলেট, জুয়া প্রভৃতির অটোম্যাট (automat) আছে। সব-ওপর-তলায় গভর্ণমেণ্টের বেতার বার্ত্তার আফিস। গত মহাযুদ্ধে এই সুউচ্চ টাওয়ারটা দ্বারা বেতার বিষয়ে বহু সাহায্য ফরাসী দেশ পেয়েছে। এর ওপরের বিদ্যুৎ-নিয়ন্ত্রণ দণ্ডটার (Llghtnng conductor) উচ্চতা মাটী থেকে হাজার ফিটেরও বেশী। এর ওপর থেকে সমস্ত সহরটা ছবির মত দেখায়। সরল প্রশস্ত রাস্তা—শ্যামল তরুশ্রীর পাশে পাশে সাদা, লাল ও বিভিন্ন বর্ণের বাড়ী ঘরগুলি বড় চমৎকার দেখায়। নীচের পার্কটাকে একটা সবুজ জমির ওপর ফুলতোলা কার্পেট বোলে মনে হয়। সব চেয়ে বিস্ময়ের বস্তু এই যে এত উঁচু একটা লৌহস্তম্ভ মাত্র চারটা জায়গায় মাটীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে ও চারটা বিরাট খিলানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ইফেল টাওয়ারের সামনেই সিন নদীর অপর তীরে প্যালে দ্যু ত্রোকেদেরো (Palais du Trocadero) টাওয়ারের খিলানের মধ্যে দিয়ে একটা চমৎকার ছবির মত লাগে। ইফেল টাওয়ারে আসতে মেট্রো অর্থাৎ মাটীর নীচের রেল সিন নদীর ওপরে চড়েছে।
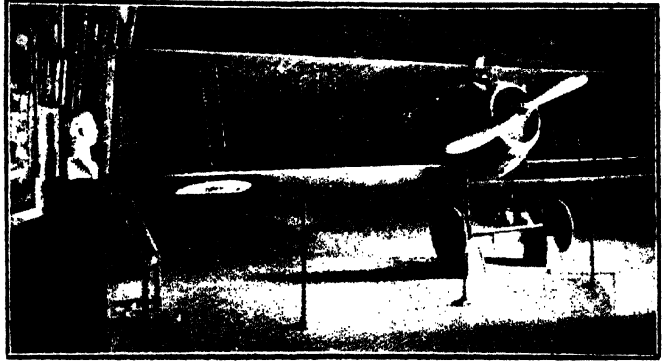
একটী এরোপ্লেন—ইনভ্যালিড্‌স্

"জকি"—বোহেমিয়ান নৃত্যশালা—প্যারী

এখান থেকে সিন নদী পেরিয়ে সোজা উত্তর-মুখো যে-কোনো একটা রাস্তা ধোরে এলে আর্ক দি ত্রায়াম্প-এ (Arc de triomph) পৌছান যায়। এখান থেকে

বারটী বড় রাস্তা বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে গেছে। এই প্রস্তর-তোরণ নেপোলিয়ঁার বিজয়-চিহ্ন-স্বরূপ ১৮০৫-১৮২১ সালে নির্ম্মিত হোয়েছিল। শুধু প্যারিসেই নয়, রোমে, মার্সেইলসেও নেপোলিয়ঁা ঠিক একই ধরণের বিজয়-তোরণ স্থাপন কোরেছিলেন। তাঁর সব জয়যাত্রার গৌরব-কাহিনী এর গায়ে উৎকীর্ণ করা আছে। এর ওপর থেকে প্যারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ একসঙ্গে দৃষ্টিগোচর হয়। সামনেই প্রসিদ্ধ রাস্তা সাঁজে এলিজ (Champs Elysees) সোজা চোলে গিয়ে প্যারীর হৃদপিণ্ড প্লাস দি কোঁকর্দ্দ (Plas de Concorde)এর পায়ে মাথা ঠেকিয়েছে। এই রাস্তাটী বাস্তবিকই চমৎকার। রাস্তার দের সম্মান প্রদর্শনের জন্যে করা হোয়েছে দেখলাম। গত মহাযুদ্ধে নিহত বা খোঁজহীন সৈনিকদের আত্মীয়-স্বজনেরা এসে এই অজ্ঞাত সৈনিকের কবরের ওপর তাদের প্রিয়জনের উদ্দেশে ফুলমালা দেয়, এই ওদের সান্ত্বনা। এখানে দিবারাত্র একটী অগ্নিশিখা গ্যাস সাহায্যে অজ্ঞাত সৈনিকদের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে জ্বোলছে। অজ্ঞাত সৈনিকদের প্রতি সম্মানার্থ এখানে টুপী খুলতে হয়।

এখান থেকে সাঁজে এলিজ ধোরে সোজা এলেই প্লাস দি কোঁকর্দ্দে এসে পড়া যায়। এখানে মিশর জয় করে নেপোলিয়ঁা যে প্রস্তরস্তম্ভ জয়চিহ্ন স্বরূপ
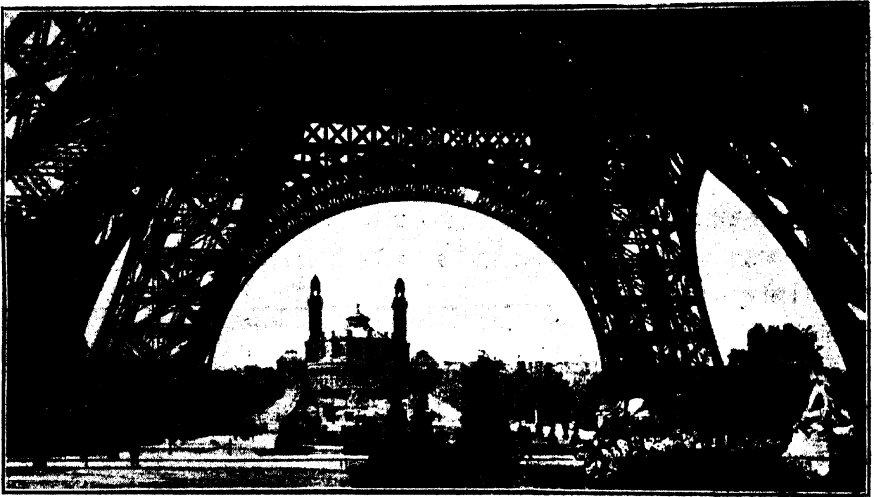
ইফেলটাওয়ারের তলদেশ—দূরে প্যালে দু ত্রোকেদেরো

মাঝে ও পাশে বরাবর চমৎকার বাগান ও বৃক্ষরাজি। মাঝে মাঝে ফোয়ারার শ্রেণী সে শোভাকে আরো সুন্দর কোরে তুলেছে। আর্ক দি ত্রায়াম্পএর ওপর থেকে এক দিকে বুলোনের (Boulogne) অরণ্যশ্রেণীর ওপর দিয়ে দৃষ্টি চক্রবাল রেখায় গিয়ে ঠেকে। অন্য দিকে "প্লাস দি কোঁকর্দ্দ" পেরিয়ে সুবিখ্যাত টুইলারীজ উদ্যান অতিক্রম কোরে লুভ্রে (Louvre) মিউজিয়মে গিয়ে বাধা পায়। এই বিজয়-তোরণের ঠিক নীচে অজ্ঞাত সৈনিকের কবর (Tomb of the unkuown soldier)। প্রত্যেক দেশেই এই জিনিষটা অজ্ঞাত অখ্যাত নামহারা সৈনিক-এনেছিলেন, সেইটী ফরাসীজাতির গৌরব স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। এই জায়গাটী প্যারীর সব চেয়ে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্ত স্থানে। এখানকার আলোকসজ্জা সন্ধ্যায় বড় চমৎকার। প্যারীর প্রত্যেক দ্রষ্টব্যই সন্ধ্যার পর যখন আলোকমালায় উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে, তখন দিনের প্যারিস এক নব রূপ পরিগ্রহ করে। এই জায়গাটী প্যারিসের কেন্দ্রস্বরূপ এবং এর কাছেই সম্রাটের প্রাসাদ লুভ্রে; কাজেই ফরাসী বিপ্লবের সময় এই জায়গায় বহু রক্তপাত ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘোটেছে। পূর্ব্বে এখানে বিজয়স্তম্ভের জায়গায় পঞ্চদশ লুইএর প্রতিমূর্ত্তি ছিল; কিন্তু

বিদ্রোহী প্রজারা ক্ষিপ্ত হোয়ে তা ১৭৯২ খৃঃ অব্দে ধ্বংস কোরে দেয় এবং তার একবছর পরেই ঠিক ঐ জায়গাতেই উন্মত্ত জনতার হাতে ষোড়শ লুই এবং প্রায় তিন হাজার ধনী একে একে পূর্ব্বপুরুষদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। এরই বিস্তীর্ণ বুকে নেপোলিয়ঁা তাঁর বিশাল বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন কোরতেন ; আবার তাঁর পতনে এইখানেই বিজয়ী বিপক্ষদের উল্লাস গগন বিদীর্ণ কোরেছিল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে শেষ ফ্রান্সের সম্রাট লুই ফিলিপ (Louis Philippe) এরই অঞ্চলের আড়ালে পলায়ন করেন। এর নীচে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সের অতীত ইতিহাস মনে কোরলে এখনও যেন সহস্র নিরপরাধ আত্মার কাতর ক্রন্দন-ধ্বনি ও তার পাশে উন্মত্ত জনতার ক্ষিপ্ত উল্লাস কাণে ভেসে আসে।

এর চারি দিকেই নানা সরকারী মহল ও ভিন্ন দেশের রাজপ্রতিনিধিদের আড্ডা। এক পাশে বিস্তীর্ণ টুইলারীজ উদ্যান ও তার পরই বিশ্ববিখ্যাত লুভ্রে মিউজিয়াম। এই বিখ্যাত প্রাসাদটী ১২০০ খৃঃ অব্দে প্রথম ফিলিপ অগষ্ট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় এবং বরাবরই রাজপ্রাসাদরূপে ব্যবহৃত হোয়ে আসছিল। কাজেই সমস্ত সম্রাটই এবং বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত আবশ্যকমত নানা পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন কোরে এসেছেন। এত বড় বিরাট প্রাসাদ আর কোথাও দেখেছি বোলে মনে পড়ে না। যেমন বিস্তীর্ণ এর আয়তন, তেমনি বিরাট এর সংগ্রহ। কত দেশের কত জিনিষ যে এই বিরাট মহলটীতে আছে তার ইয়ত্তা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সমস্ত জিনিষগুলি জানার মত জানতে ও দেখতে গেলে সারা জীবনেও বোধ হয় কুলিয়ে উঠবে না। পুরোনো হীরে, জহরত, মার্ব্বেল, আসবাবপত্র, ছবি, নৌকো, ভাস্কর্য্য যে কত আছে তার হিসেব নেই। এত বড় বিরাট মিউজিয়াম একদিনে দেখা মানে এরোপ্লেনে কোরে একটী

নেপোলিয়ঁার কক্ষ—ইনভ্যালিড্‌স

সহর আধঘণ্টায় দেখা। চোখে পড়ে বটে, কিন্তু সবগুলোই প্রাচীনতার, সৌন্দর্য্যের, শিল্পের দিক দিয়ে এত মূল্যবান যে, কোনোটীকেই প্রাধান্য দেওয়া চলে না, মনেও থাকে না। খ্যাতনামা লিয়োনার্দ দা ভিন্‌সির সুবিখ্যাত ছবি মোনা লিসা, ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন অপ্রতিদ্বন্দ্বী "ভেনাস ডি মিলো" প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত শিল্পরাশি এই প্রাসাদেই রক্ষিত আছে। শুধু হেঁটে বেড়িয়ে একদিনে প্রাসাদের সমস্ত কক্ষগুলি ঘোরা বেশ একটু শক্ত ব্যাপার। এর এক অংশে বর্ত্তমানে রাজস্ব-সচিব বাস করেন।

লুভ্রের পাশেই St. Germain L'auxerrois গির্জ্জা। এই গির্জ্জা থেকেই প্রটেষ্টাণ্টদিগকে হত্যা করবার সঙ্কেতধ্বনি ধ্বনিত হয়। বিখ্যাত নাট্যকার মলেয়ার (Moliere) এখানে বিবাহিত হন এবং চারডিন, কয়পল প্রভৃতি শিল্পীদের এইখানে কবর আছে। এর কাছেই সিন নদীর অপর তীরে "প্যালে দি জাষ্টিস" বা প্রধান বিচারালয়। এখান থেকে অল্প দূর গিয়েই বিখ্যাত নোত্রে দাঁ (Notre dam) গির্জ্জা পাওয়া যায়। এর গথিক স্থাপত্য স্বতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেবল মনে হয় এরই কাছে কোনখানে বুঝি সেই কুঁজোটা (hunch back) বোসে আছে। এই গির্জ্জায় নেপোলিয়ঁা জোসেফাইনের সঙ্গে পরিণীত হ'ন। এখানকার ধনভাণ্ডারে আসল ক্রশের একটা পেরেক আছে বোলে গুজব এবং নেপোলিয়ঁার অভিষেক অঙ্গসজ্জাও এই খানেই আছে। সমস্ত গির্জ্জাটা খ.টা গথিক কায়দায় তৈরী।

হয়ত আমার বিবরণ ক্রমশঃ একঘেয়ে ও নীরস হোয়ে পোড়ছে; কিন্তু তবু প্যারিসের আর একটা দ্রষ্টব্যের নাম না কোরে আমি দ্রষ্টব্যের তালিকা বন্ধ করা অপরাধ বোলে বোধ কোরছি। সেটা প্লাস দি কোঁকর্দের কাছেই 'মাদেলিন' (Madelline) গির্জ্জা। এর প্রকাণ্ড গোল থামগুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটার পূর্ব্বে প্রায় ঐ জায়গাতেই ১৪৮৭ খৃঃ অব্দে একটা গির্জ্জা প্রথম স্থাপিত হয়; কিন্তু ঘরোয়া গণ্ডগোলে সেটা বে-মেরামতিতে নষ্ট হোয়ে যায়। পরে ১৮৪২ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান গির্জ্জ.টা তৈরী হয়। এর কাছ থেকে অনেকগুলি বড় রাস্তা বেরিয়েছে। এর কাছেই কুক কোংর অফিস এবং অনেক বড় বড় দোকানপত্র। সপ্তাহে দুবার কোরে এর চারধারে একটা ফুলের মেলা বসে।

ইনভ্যালিড্‌সএর দ্বিতীয় চত্বর—প্যারী

মাদেলিনের কাছেই উল্লেখযোগ্য আরেকটা প্রতিষ্ঠান এখানকার বিখ্যাত অপেরা। এই বিরাট সৌধটা ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে শেষ হয়। পৃথিবীর মধ্যে এই থিয়েটারটা সর্ব্বাপেক্ষা বড়। দামী দামী মার্ব্বেল ও অন্যান্য পাথরের কাজ যথেষ্ট আছে। এর মধ্যে Foyer de dause নামে একটা হল আছে। সেখানে শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের তৈরী নৃত্যপরায়ণা নারীমূর্ত্তি আছে—ঐ প্রতিষ্ঠানের সভ্য না হোলে শুনলাম সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। এর অন্য অংশে একটা লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম আছে। এই মিউজিয়ামে

বিভিন্ন যুগের থিয়েটারের পোষাক, নাট্যশালার মডেল, ছবি, বই, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি আছে। এর কাছাকাছি বিখ্যাত "ফলিজ বুর্জ্জোয়া" রঙ্গমন্দির—নগ্ন নৃত্য এবং নিপুণ নৃত্যকলা ও রূপসী যুবতী নৃত্যকুশলী নর্ত্তকীদের জন্য এটী প্রসিদ্ধ।

এর কাছেই অনেকগুলি টুরিষ্ট কোম্পানী ও বড় বড় রেষ্টোরাঁ আছে। সাধারণতঃ এর কাছেই বেশ্যার দালালরা এসে বিরক্ত করে। এত বড় একটী জনবহুল প্রকাশ্য রাস্তায় দালালদের অদ্ভুত আচরণ দেখে বিস্মিত হোয়েছিলাম। পরে নিজের দেশে কোলকাতার বুকে এসপ্ল্যানেডে একই জিনিষ দেখে সে বিস্ময় কেটেছে।

চার্চ্চ ও পার্ক দেখতে? নিশ্চয়ই না,—তারা আসে এখানকার অবাধ উচ্ছৃঙ্খল নৈশ জীবন দেখতে ও উপভোগ কোরতে। এই সব নৈশ আড্ডায় একা বিদেশীদের, বিশেষ ভাষানভিজ্ঞদের যাওয়া অনুচিত ভেবে আমি কুকের শরণাপন্ন হ'লাম। তারা Paris by night বোলে একটা ট্রীপ (trip) দেয়। দক্ষিণা যতদূর মনে পড়ে একশ সত্তর ফ্রাঁ বা কাছাকাছি।

ব্যবস্থামত রাত্রি ৯টায় এসে কুকের অফিসের দরজায় হাজির হোলাম। একটী চেরাবাঙ্ক (বড় মোটরকার) অপেক্ষা কোরছিল। যাত্রী—কয়েকজন আমেরিকান ও ইংরাজ এবং আমি একমাত্র কালা আদমী—মহিলা ছিলেন জন তিনেক।
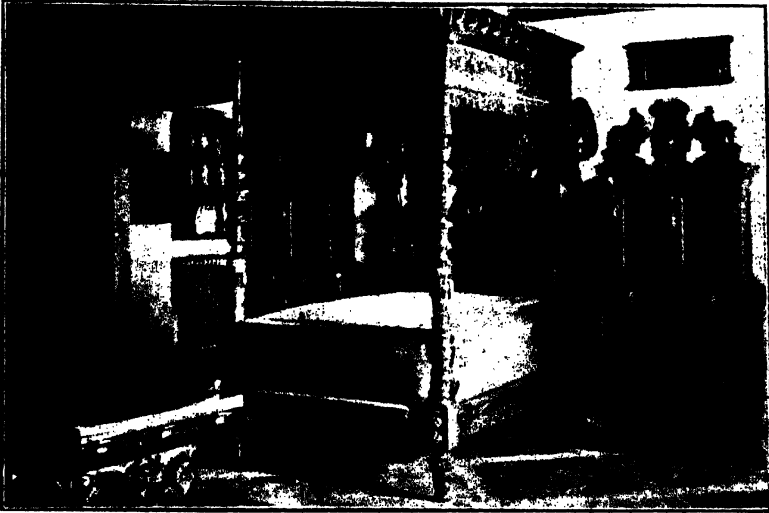
রেনেসাঁ যুগের গৃহশয্যা—ক্লুনি মিউজিয়াম

এই ত গেল নেপোলিয়াঁ, রুশো, ভলটেয়ার, ইফেল, লিয়োনার্দ ডি ভিনসির প্যারী—যে প্যারীর লোক গত মহাযুদ্ধেও হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়ে নিজেদের ইজ্জত রক্ষা কোরেছে। কিন্তু এই-ই প্যারীর একমাত্র রূপ নয়। তার নৈশ রূপ যা উপভোগ কোরবার জন্যে দেশ-বিদেশ থেকে যাত্রী গিয়ে জোটে, তা না বোল্লে আমার কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সবাই জানে এবং প্যারীবাসীরাও তা স্বীকার করে যে, প্রধানতঃ বিদেশী দ্বারাই প্যারীর লোকে জীবিকার্জ্জন করে। এই বিদেশীরা আসে কেন? শুধু কি মিউজিয়াম

প্রথমেই গাড়ী এসে থামল 146 Boulevard du Montparnasseর একটী বোহেমিয়ান নাচঘরে। দরজার ওপর হাঁস ও অন্য কয়েকটা জীবের ছবি আঁকা এবং কাছেই পুলিশ মোতায়েন আছে। নাচ-ঘরটীর নাম Jockey। ছোট হল; ঢুকেই বাঁ দিকে পানীয়ের দোকান। ঢুকবামাত্র একটী তন্বী তরুণী গায়ে নানা রংএর পালক ছুঁড়ে মারতে লাগল, আর পালকগুলি জামায়, চুলে, হাতে আটকে যেতে লাগল—এইভাবে খানিকটা হাসি হোল। তার পর এল পানীয় ও সুরু হোল বাজনা—সঙ্গে সঙ্গে নাচ। যাদের জুড়ী সঙ্গে ছিল

না, তারা সেখানকার মেয়েদিগকে নিয়েই নাচল। প্রায় আধ ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে উঠব এমন সময় দেখি অদ্ভুত সব কার্টুন ছবি এঁকে একজন হাজির। সকলেই পুরস্কার দিলে; কাজেই মহাজনের পন্থাই অবলম্বন কোরতে হোল, কিন্তু নিজের সেই বিদ্‌ঘুটে চেহারা আঁকার জন্যে পুরস্কারের পরিবর্ত্তে তার তিরস্কার পাওয়াই উচিত ছিল।

এর পর কোথায় কোথায় গেলাম তা এতদিন পরে ঠিক পর্য্যায়ক্রমে বোলতে পারব না; তবে একে একে সবগুলোরই উল্লেখ কোরব।

গাড়ী এসে থামল একটা অন্ধকার গলির মধ্যে।
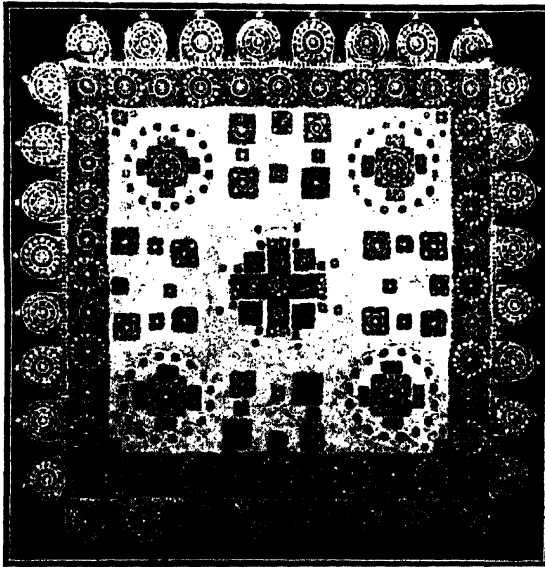
ষষ্ঠদশ শতাব্দীর একটী সূচীশিল্প—ক্লুনি মিউজিয়াম

লোকজনের কোনো সাড়াশব্দ সেখানে নেই। যদি আমি একলা কোনো ট্যাক্সী কোরে আসতাম তা হোলে নিশ্চয় ভাবতাম যে সেই রাত্রি ট্যাক্সী ড্রাইভারের হাতে আমার শেষ রাত্রি হ'বে। সদলবলে নামলাম। টর্চ্চ দেখিয়ে গাইড ও দোভাষী নিয়ে গিয়ে হাজির কোরলে এক পোড়ো অট্টালিকার মাঝখানে। আমরা এসে দাঁড়ালাম এক সুড়ঙ্গ-পথের দরজায়। এর নম্বর 11 Rue St. jullen-b-pauvre। ভেতর থেকে একজন দরজা খুলতেই গানের ও হাসির আওয়াজ কাণে এল। সরু পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে চল্লাম কোন্ পাতালপুরীতে। নীচে যেখানে সিঁড়ি শেষ হোয়েছে, তার দুদিকে দুটী অপ্রশস্ত ঘর। ডান দিকের ঘরটীতে খানকতক টেবিল ও বেঞ্চ আছে। ঘরটী শ্রোতাতে পূর্ণ—শ্রোতৃসংখ্যা বোধ হয় জন কুড়ি। ঘরে ঢুকবার অব্যবহিত আগে গাইড কোনো একটা জিনিষ দেখাবার ছল কোরে মনোযোগ অন্য দিকে আকর্ষণ করে। আর ঠিক সেই অবস্থাতেই ঘরের মধ্যে পা দিলে একটা কাঠের তক্তায় পা পোড়ে যায়। অমনি সেটা হঠাৎ কোরে একটা শব্দ কোরে ঘুরে যায়। এতে যে পা দেয় সে না পোড়লেও বেশ একটু টাল সামলায়। ঘরশুদ্ধ সকলে এটা বেশ উপভোগ করে; কারণ, প্রায় প্রত্যেকেই ঐ ভুল করে,—কাজেই প্রত্যেকেই চায় অপরকে নিজের মতই বোকা দেখতে।

বোসবামাত্র মদ এল। Jockeyতে মদ খাই না বোলে লেমনেড পেয়েছিলাম; কিন্তু এখানে তাও মিল্‌ল না। কাজেই আমি উপবাসীই রইলাম। সামনে ছোট একটা উঁচু বেদীর ওপর কখনও পুরুষ কখনও নারী গান, ব ক্তৃ তা, ঠা ট্টা-তা মা সা কোরে হাসাচ্ছিল। এই কক্ষটী পূর্ব্বে জেলখানা ছিল। যে তক্তাটীতে পা পড়ে তার নীচে দিয়ে শুনলাম সিন নদী বোয়ে চলেছে। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদিগকে সেই অতল-স্পর্শ গহ্বরে নিক্ষেপ কোরে হত্যা করা হোত। এই কক্ষটীর অপর দিকে,—সিঁড়ি থেকে বাঁ দিকে—কয়েকটী সঙ্কীর্ণ কক্ষ। এগুলিতে কয়েদীদিগকে শৃঙ্খলিত কোরে রাখা হোত। তাদের হাতের শৃঙ্খলের ঘর্ষণে পাষাণের বুকেও ক্ষতচিহ্ন রয়েছে—কে জানে কত অভাগা এই কক্ষে জীবনের শেষ শিখাটী নির্ব্বাপিত কোরে চলে গেছে—কত তপ্ত অশ্রুজলে এই পাষাণের শীতল বুক অভিশপ্ত হোয়ে আছে।

ওপরে উঠে এলাম। ওপরের একটা ঘরে একটা ছোটখাট মিউজিয়াম আছে। আগে কি ভাবে ফাঁসী দেওয়া হোত, কি ভাবের হাতকড়া ছিল ইত্যাদি

জেলখানার প্রাচীন ইতিহাস। এখানে 'গিলোটীন' নামে একটী মানুষ মারবার যন্ত্র আছে, যাতে করে ঘণ্টায় ৪০।৫০টী অপরাধীর ভবলীলা সাঙ্গ করা চলে। এখানকার বাতাস যেন ভারী বোধ হচ্ছিল—কত অশান্ত আত্মা এই অন্ধকার জীর্ণ অট্টালিকার চার পাশে যে অস্ফুট কণ্ঠে কেঁদে বেড়াচ্ছে কে জানে!

এখান থেকে গেলাম বহুশ্রুত মোমার্ত্রের (Montmartre) নির্জ্জন পল্লীবুকের একটী সরাইখানায়। এখানেও প্রথম আপ্যায়ন হোল সুরা দিয়ে। পরে গান ও যন্ত্রসঙ্গীত সুরু হোল। এখানে গায়করা সকলেই পুরুষ। এ-দিকটা পাহাড়ী অর্থাৎ রাস্তাঘাট উঁচু নীচু। এই

আর্ক দি ট্রায়াম্প—প্যারী

অঞ্চলেই বিখ্যাত Sacred heart গির্জ্জা। এর পরেই গাড়ী এসে থামল একটা প্রকাণ্ড নাচঘরের সামনে। আলোয় বাড়ীটা ঝলমল কোরছে; আর একটা লাল আলোয় ভরা উইণ্ডমিল ধীরে ধীরে ঘুরছে। এইটীর জন্যেই এই নাচঘরটীর নাম Red windmill। এর আশে পাশে বহু ক্যাবারে (cabaret), নাইট ক্লাব ও নাচঘর আছে। এইটীই এখানকার প্রসিদ্ধ বিলাসমন্দির। কাজেই আমরা এটীতে ঢুকলাম। সিঁড়ি বেয়ে অনেক দূর নেমে গেলে নাচের আসরে পৌছোন যায়। গাইড প্রধান সিঁড়ি ছেড়ে বাঁ দিকের একটা ছোট দরজা দিয়ে আমাদিগকে নিয়ে চোল্ল। অন্ধকার অপ্রশস্ত গলি।

এখানে প্রাচীন প্যারীর নৈশজীবন অসাধারণ ভাস্কর্য্য-শিল্পে সজীব হোয়ে উঠেছে। একটী নাইট ক্লাবে সুরামত্ত নরনারী অচেতন বা অর্দ্ধচেতন অবস্থায় পোড়ে আছে—কারু অধরে মত্ত মৃদু হাসি,—হাতে সিগারেট পুড়ছে, ধোঁয়া উঠছে—কেউ টেবিলের ওপর কেউ চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত। মূর্ত্তিগুলি এত স্বাভাবিক যে সেগুলি যে নির্জ্জীব মূর্ত্তি তা বোলে না দিলে সত্য বোলেই ভ্রম হয়। কোথাও দেখান হোয়েছে কি ভাবে আগে ডাকাতরা ওপর থেকে পাথর ফেলে পথিক হত্যা কোরত, কি ভাবে বারবনিতারা প্রলুব্ধ কোরে ধনীদিগকে নিয়ে গিয়ে গুণ্ডা দিয়ে হত্যা কোরত, কি ভাবে

১৫১৭ খৃঃঅব্দের একটি রাজপোষাক, ক্লুনিমিউজিয়াম

ক্যাবারেতে নাচ হোত ইত্যাদি। এখানে একটা বড় মজার ঘটনা হোয়েছিল। নাচঘরেরই একটী লোক একটী নকল গুণ্ডার পাশে একই রকম ভঙ্গী কোরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা যখন সেটী দেখছিলাম, তখন কেউ সন্দেহ পর্য্যন্ত করিনি যে আসল মানুষ সেখানে কেউ আছে। কারণ নকলে আসলে প্রভেদ ধরা দুঃসাধ্য। যখন বেরিয়ে আসছি সে হঠাৎ তার হাতের ছুরীটা বাগিয়ে ধোরে লাফিয়ে নেমেছে। সকলেই আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলাম—দুটী মহিলা ত রীতিমত চীৎকার কোরে

উঠেছিলেন। মোমার্তের শিল্পীদের যে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি আছে—বুঝলাম সে খ্যাতি অমূলক নয়।

প্রাচীন প্যারী দেখে, এলাম আধুনিক প্যারীর নৈশ-জীবনের মাঝে। প্রকাণ্ড নাচের জায়গা—তার তিন ধারে বোসবার আসন—তারও ওপরের চত্বরে এক দিকে মদের দোকান, অন্য দিকে নানা রকম জুয়ো চোলছে। এখানেও মদ এলো—নাচ চল্লো। বল নাচের মাঝে মাঝে ক্যাবারের মেয়েরা নাচছিল। তাদের কটি থেকে জানুসন্ধি পর্য্যন্ত মাত্র একটী গাত্রবর্ণের সমধর্ম্মী আটসাঁট পরিধেয়—অতি ক্ষীণ বক্ষাস্তরণ কোনোরকমে বক্ষজ দুটীকে ঢেকে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে এদিগকে নগ্নই
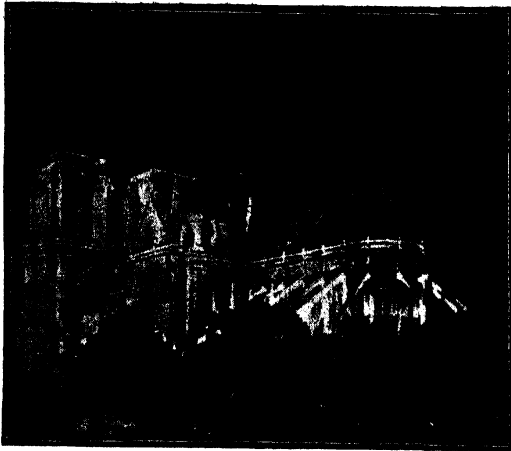
আলোকসজ্জায় নোত্রে দাঁ গির্জ্জা

বলা যেতে পারে। সকলেই যুবতী। এদের অপূর্ব্ব নৃত্যকৌশল ও কসরৎ সত্যই দেখবার জিনিষ। দেখতে দেখতে মনে হয় চিরবসন্ত অনন্তযৌবনসম্পন্ন স্বর্গ বুঝি এইখানেই—অমরাবতীর নৃত্যসভা বুঝি ধরার বুকেই আজ নেমে এসেছে। সৌন্দর্য্য, রূপরস, সজ্জা বিলাস-উপকরণ মানুষ যতদূর কল্পনা কোরতে পারে তার অপূর্ব্ব সমন্বয় হোয়েছে এখানে। মাঝে সঙ্গীরা সব নাচতে গেলেন। আমি একলা না বোসে থেকে একবার চারদিকটা ঘুরে দেখতে বার হোলাম। এক জায়গায় দেখি একটী যুবতী গলা পর্য্যন্ত ঢেকে খাটে শুয়ে আছে। খাটের ওপরে এমন একটী জায়গা আছে, যেখানে বল ছুঁড়ে সঠিক আঘাত কোরতে পারলেই খাটটী আপনা আপনি উল্টে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে নগ্ন নারী মাটীতে পড়ে যাবে। এর জন্যে অনেকে অজস্র অর্থব্যয় কোরছে—কেউ বা সফলকামও হোচ্ছে।—"সিগারেত প্লিজ"—চমকে দেখি একটী যুবতী পাশে এসে দাঁড়িয়ে।

বিস্মিত হোলাম। বোল্লাম "খাই না।"

সে চটুল হেসে বোল্লে "আমি খাই।"

মেয়েটীর প্রকৃতি বুঝলাম—ঈষৎ বিরক্তিভরেই বোল্লাম "আমার কাছে নেই।"

সে অম্লানবদনে চাউনি ও হাসির ফাঁদ আরো একটু বাড়িয়ে বোল্লে "কিনে দাওনা আমার জন্যে।"

বড় বিপদে পোড়লাম। দেখলাম ন্যাকামীই প্রকৃষ্ট উপায়। বোকা সেজে ঘাড় নেড়ে জানালাম "তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

সে তেমনি ভাঙ্গা ইংরেজীতে বোল্লে "আমি অল্প ইংরেজী বোলতে পারি, ভাল পারি না।"

আমিও হাত এড়াবার অছিলা পেয়ে সরছিলাম—সহসা সে আবার বোল্লে "এনি ড্রিঙ্ক (Any drink)।"

বোল্লাম "না—তাও আমি খাই না—আমি তোমার কথা বুঝছি না।"

সে আমার গতিক দেখে আমাকে একটু শক্ত কোরে বাঁধবার জন্যে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বোল্লে "চল, আমি খাব, তুমি বোসবে—চল ঐ দোকানে।" পাশের দোকানটা দেখালে।

আবার কথা না বোঝার ভান কোরলাম। সহসা সে দোকানের একটী মেয়েকে ইসারা কোরে ডাকল। সেও এসে হাস্যমুখে আদেশের আসায় দাঁড়াল। পেশাদার প্রেমিকা তখন বোল্লে "আমি এর সঙ্গে গিয়ে খাচ্ছি, তুমি দাম দিও।" এবারেও বোকা সাজলাম। দোকানের মেয়েটী বোল্লে "ফিফ্‌তি ফ্রাঁ ওন্‌লি।"

বেগতিক দেখে বিনাবা ক্যব্যায়ে আমি সটান্ এসে নিজের জায়গায় বোসলাম। আড়চোখে দেখলাম দুটী মেয়েই ঈষৎ হাসল—ভাবটা বোধ হয় এই যে নেহাৎ কাচা যাত্রী। নৃত্যের সঙ্গে আলোকসম্পাতের ও যন্ত্র-সঙ্গীতের অপূর্ব্ব সমন্বয় উপভোগ্য। এ থেকেও নগ্ননৃত্য ও কুশলী শিল্পী আছে "ফলিজ বুর্জ্জুয়ায়"; তবে সেখানে সাধারণের বল নাচের আসর নাই।

রেড উইণ্ডমিলে প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে আমরা কিছু লম্বা দৌড় দিয়ে এলাম সাঁজে এলিসে বিশ্ববিলাসী-বন্দিত "লিডো" (Lido) তে।

ওপরে একটা প্রকাণ্ড হল—স্বল্পালোকিত এবং ফুলগাছ দিয়ে বাগানের মত কোরে সাজান, নীরব জনহীন। এর মধ্যে কিছু দূর গিয়ে ডান দিক দিয়ে ও কাগজের ব্যাট দিয়ে গেল—এগুলো নিয়ে হোলী-খেলা আরম্ভ হোল। যার যাকে পছন্দ সে তাকে লক্ষ্য কোরে অনর্গল বলগুলো ছুঁড়তে লাগল তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে। তার পর আরম্ভ হোল ভাবে ভঙ্গীতে ইসারায় আলাপ। তার পর নাচের অনুরোধ, প্রেমের গুঞ্জন। তার পর ? জানি না।

এখানেও মাঝে মাঝে নাচের আসরে বলনাচের অবসরে পুরুষ ও নারীতে মিলে কসরৎ প্রভৃতি দেখায় ও নানা ভঙ্গীতে নাচে। ইয়োরোপীয় নারীদের নাচের পোষাক আমাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অশোভন ও অশ্লীল ঠেকে। কাঁধ থেকে কাঁধ পর্য্যন্ত এবং স্তনবৃন্তের কিছু ওপর পর্য্যন্ত সমস্ত বুকটা খোলা—কারু সমস্ত পিঠটা, কারু বা পিঠের মাঝখানটা কোমর পর্য্যন্ত খোলা।
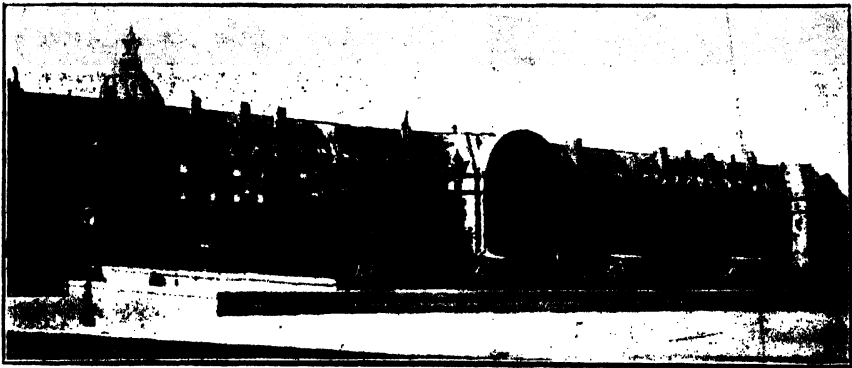
ইনভ্যালিড্‌স ও মুসি ডি লারমি—প্যারী

কটা সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নীচে এসে পৌছলাম ভূগর্ভ হলে। প্রকাণ্ড হল—এক দিকে নাচের আসর; তার পর দর্শকদের বোসবার জায়গা; তার পর জলের প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চাটার গায়েই একটা প্রকাণ্ড আয়না হলটার সমস্ত প্রস্থ জুড়ে দাঁড়িয়ে। এতে চৌবাচ্চার জল প্রতিফলিত হোয়ে অনন্ত সমুদ্রের মত লাগে। দুই ধারের এক দিকে মার্ব্বেলমোড়া মদের দোকান, অন্য দিকে টার্কিশ-বাথ, মেসাজরুম প্রভৃতি। বোসবামাত্র কে কি পানীয় খাবে জিজ্ঞাসা কোরে গেল। এখানে লেমনেড পাওয়া গেল; তবে শুনলাম যে যাই পানীয় খাক দাম একই দিতে হয়। বসার কিছু পরেই ন্যপথলিনের মত একরকম সাদা ছোট ছোট হাল্কা বল হাতের ঝুল কাঁধে থেকেই শেষ—বগলের নীচে অনেক-খানি শরীর দেখা যায়। আজকাল সিনেমা ও ইংরাজী মাসিকের দৌলতে এ বেশ অনেকেই দেখেছেন; কাজেই বেশী বর্ণনা না করাই ভাল। শ্লীল অশ্লীলের মাপকাঠি অবশ্য ভিন্ন দেশে বিভিন্ন। ওরা সৌন্দর্য্যকে শ্লীলতার আগে স্থান দিয়েছে। কাজেই সৌন্দর্য্যের খাতিরে শ্লীলতাকে ক্ষুণ্ণ কোরতে ওরা নারাজ নয়। কিন্তু আমরা তা পারি না বোলেই নাসিকা কুঞ্চিত করি।

জলের ওপরে একটী মার্ব্বেল সেতু আছে। সেখান থেকে ছোট্ট এক নাটিকা অভিনীত হোলো। সেতুর ওপর প্রেমিকা দাঁড়িয়ে গান গাইলে। দূরে নদীতীর থেকে প্রেমিক গানে তার উত্তর দিলে। তার পর তরী বেয়ে

গিয়ে তাকে অবরোধ থেকে মুক্ত কোরে নিয়ে এল। আলোছায়ার খেলায় দৃশ্যটী বড় উপভোগ্য হোয়েছিল। এই চৌবাচ্চায় অনেকে স্নান ও জলকেলি করে। এখানেও যাঁদের সঙ্গী ছিল তাঁরা এবং যাঁদের ছিল না তাঁরা পূর্ব্ববর্ণিত বলের সাহায্যে সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে কয়েকবারই নাচলেন। সহসা আমাদের দলের একজন মহিলা নাচতে নাচতে অজ্ঞান হোয়ে পোড়ে গেলেন। কয়েক মিনিটের জন্য নাচ থামল। তার পর তাঁকে সরিয়ে রেখে আবার নাচ সুরু হোল। প্রত্যেক জায়গাতেই সুরা-দেবীর অর্চ্চনা করায় তাঁর ঐ দশা হোয়েছিল। এই

নেপোলিয়ঁার ঘোড়ার জিন

দুর্ঘটনার জন্যে আমরা সকলেই রাত্রি প্রায় দেড়টায় বাড়ী ফিরলাম। অনেকেরই আসতে আপত্তি ছিল কিন্তু ভোটে হারায় বাধ্য হোয়ে আসতে হোল।

এর পর গাড়ী থামে ল্যাটিন কোয়ার্টারে অর্থাৎ আমাদের পাড়ায়। নৈশ অভিযানের এইখানেই শেষ।

কুক কোংর সাহায্যে না গিয়ে নিজে গেলে খরচ অনেক কম হয় সত্য, কিন্তু যে সব জায়গায় গিয়েছিলাম, তার দুএকটী ছাড়া অন্য জায়গাগুলিতে একলা যাওয়া দুঃসাহসের কাজ। এসবগুলি ছাড়া প্যারীর নৈশ দ্রষ্টব্য আরো অনেক আছে—এগুলি এক এক রকমের নমুনা মাত্র। সেসব দ্রষ্টব্যর সন্ধান যাঁরা নিতে চান তাঁরা অপেরার সামনে মিনিট কয়েক দাঁড়ালে বা চোলে গেলেই অযাচিতভাবে পাবেন। তবে এই সব সন্ধান-দাতাগুলি বিষকুম্ভ পয়োমুখম্‌। এদের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদের অনেকেই এদের প্রকৃতির পরিচয় পাঠকদিগকে দিয়েছেন; তাই আমি সেগুলোর পুনরুক্তি কোরে পাতা বাড়ালাম না।

প্যারীর দ্রষ্টব্য সম্বন্ধেই এতক্ষণ বোলে এলাম—সেখানকার লোকজন ও মাটীর সঙ্গে পরিচয়ের কথা বোলতে অবসর পাই নাই।

প্যারিসিয়ানরা অত্যন্ত বাচাল ও অঙ্গভঙ্গীপ্রিয়। যদি বোলবে "জানি না"—জিবের সঙ্গে সারা দেহ ঝাঁকি খেয়ে উঠবে। দিনের বেলা এরা সকলেই খুব ব্যস্ত ও কাজের লোক; কিন্তু সন্ধ্যার পর রাস্তার দুধারের প্রকাণ্ড রেস্তোঁরা ও কাফেগুলোয় তিলধারণের জায়গা থাকে না। রেস্তোঁরায় টেবিলের ওপর কেউ দাবার ছক, কেউ তাস, কেউ বান্ধবী নিয়ে বোসেছে এক গ্লাস মদ বা কাফি নিয়ে—উঠবে সেই রাত্রি দশটা এগারোটায়। এখানকার অধিকাংশেরই হোটেল-জীবন—থাকে হোটেলে, খায় রেস্তোঁরায়। রাত্রি ৯টার পরই খাবারের দোকান বন্ধ হোয়ে যায়, কিন্তু কাফে ও বারগুলো প্রায় সারারাত্রিই খোলা থাকে। এদের মেয়েপুরুষের কাছে রূপটাই হোল সব চেয়ে বড়—তার উৎকর্ষসাধনে সকলেই ব্যস্ত।

তামাক ও পোষ্টেজ একই দোকানে বিক্রী হয়। কারণ দুটোই সরকারের একচেটে ব্যবসা। রাত্রে ক্যাবারে ও নাচঘর ছাড়াও বড় বড় রাস্তাগুলি দুধারের দোকানের চমৎকার আলোকসজ্জায় ঝলমল করে।

বাস ও ট্রামে চড়া বিদেশীর পক্ষে বিশেষ অসুবিধার নয়— প্রত্যেক ষ্টপে (stop) যে যে বাস সেখানে আসে তার নম্বর ও রাস্তার নক্সা ও নাম থাকে। এর থেকেও সুবিধা মেট্রোয় বা মাটীর নীচের রেলে চড়া। ওপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচের তলায় নামলেই সহরের সমস্ত অংশের ম্যাপ ও কোন্‌

লাইন কোন্ দিকে গেছে তার নির্দ্দেশ আছে এবং টিকিট-ঘরও সেইখানে। প্রথম ও দ্বিতীয় দুটী শ্রেণী আছে এই ট্রেণে। ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকলে গেট আপনাআপনি বন্ধ হোয়ে যায় এবং ট্রেণ ছাড়লে গেট খুলে গিয়ে ট্রেণের দরজা বন্ধ হোয়ে ছিটকিনি লেগে যায়। এক এক জায়গায় ওপরে নীচে তিনচারটী ট্রেণ চোলেছে। ট্রেণগুলি ইলেকট্রিকে চলে, কাজেই বেশ দ্রুতগামী।

সহরটী মোটামুটী বেশ পরিষ্কার—সকালবেলা ঝাড়ুদার মোটর লরী এসে একসঙ্গে ঝাঁট দিয়ে রাস্তা ধুয়ে দিয়ে যায়। প্যারীর দোকানপাট, পরিচ্ছন্নতা, শ্রী সৌন্দর্য্য, আলোকসজ্জা প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের কোনো সহরেরই তুলনা দিয়ে বোঝান যায় না। আমি যে সব দ্রষ্টব্যের কথা উল্লেখ কোরেছি প্যারীতে তাই সব নয়। এ সব ছাড়া আরো কত যাদুঘর, চার্চ্চ, উদ্যান, চিড়িয়াখানা আছে তার হিসেব দেওয়া মুস্কিল। বেতার, বিদ্যুৎ, শিল্প, ভাস্কর্য্য, যুদ্ধ প্রত্যেক জিনিষের পৃথক পৃথক যাদুঘরে প্যারী ভর্ত্তি।

ভাল মন্দয় মিশিয়ে প্যারী সত্যই এক অপূর্ব্ব সহর। আজো মনে হয় প্যারীকে দেখা আমার সম্পূর্ণ হয় নাই, সাধ মেটে নাই—আবার গিয়ে দেখে আসি। প্যারীর নৃত্য, সঙ্গীত, গুঞ্জন আজো আমার কাণে বাজে—মনে হয় সে বুঝি একটা সুখস্বপ্ন।

যায়

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্

হাওয়ায় উড়ে গেছে দূরে প্রাচীন ফুলের গন্ধ রে !
লুপ্ত স্বপ্ন-নদীর ধারা বালির চড়ার অন্তরে।
গেছে উপে' রূপের আভাস অপার পারের আকাশে—
ভিত্তি-ভাঙ্গা কীর্ত্তি লুটায় শুকনা ডাঙ্গার আবাসে।
বোঁটা-খসা ভাবের ভাষায় ফুটে ওঠে অভরসা ;
শূন্যে শূন্যে মহাশূন্যে জাল বোনে না মাকড়সা।

বুক-জুড়ানো সেই-হারানো সেই-পুরাণো ফিরবে না ;
ভাটায় ভাসা সেই যে আশা বাসার কূলে ভিড়বে না।
পাহাড়-ঘেরা বনের বেড়ায় শীতের হাওয়ার ক্রন্দনে ;
ব্যথার কথা রচার মত নূতন গাথার ছন্দ নে'।
শিহর-লাগা পাখীর কুহর জড়িয়ে পাতার মর্ম্মরে—
ফুটবে গানের তানে তানে শূন্যপারের অম্বরে।

প্রাণে-পোষা ভালবাসা চায় কি সীমা লঙ্ঘিতে !
লুটিয়ে পাখা পড়ছে আকাশ সিন্ধুপারের সঙ্গীতে।
অর্দ্ধ-পথে শ্রান্ত ঘুমায় মোহের চুমার মন্ত্রে কি !
চেতন বেদন করবে রোদন অন্ত-বিহীন দ্বন্দ্বে কি !
যেচে বিদায় ঐ বুঝি যায়—বিশ্ব আমায় বর্জ্জিয়া ;
ডুকরে কাঁদে শীতের বাতাস—সিন্ধু কাঁদে গর্জ্জিয়া।
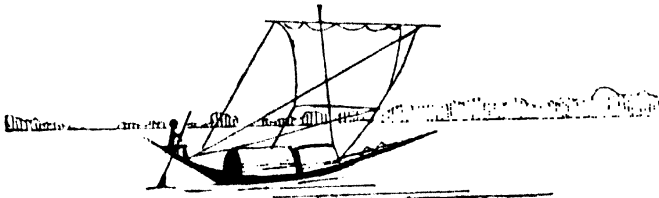
একশো টাকা

শ্রীবিমল সেন

টাকা যখন আর কোথাও কোনো রকমে কারু কাছ থেকে যোগাড় হয় না, বন্ধু রাধেশচন্দ্র একটী চমৎকার আইডিয়া বাৎলে দিলেন।

নাঃ, রাধেশের ব্রেন্ আছে ব'ল্‌তে হবে। কিন্তু মুস্কিল্ হচ্ছে আমার নিজেকে নিয়ে। অশ্বিনী দত্তের ইস্কুলে প'ড়ে বিদ্যে হ'ক কি না হ'ক, একটা জিনিষ প্রচুর মাত্রায় হ'য়েছিল,—সেটা হচ্ছে মরালিটি-কম্‌প্লেক্‌স। কোনো কিছু করবার আগে হাতকে দাবিয়ে মন চুলচেরা বিচার ক'র্‌তে বসে, আচ্ছা, এটা কি নীতিসঙ্গত হবে? না, এটা অন্যায়? আকাশের অবস্থা দেখ্‌তে দেখ্‌তে জোয়ার ব'য়ে যাওয়ার মতন দশা আর কি! যখন একটা কিছু ঠিক্ করি, তখন দেখি কাজ করার কাল চ'লে গেছে!

এতে জিতেছি কি হেরেছি, তার মেটাফিজিকাল্ ব্যাখ্যা আর নাই-বা দিলাম্। মোদ্দা কথা হচ্ছে, পরকালের পথ এতে ক'রে যতই খোলসা হ'ক্, ইহকাল হ'য়ে উঠেছে অচল।

বন্ধুই আমায় সমঝে দিলেন, দেখো হে, দুনিয়ায় ভরতি-পেট যারা, তাদের জন্য একরকম শাস্তর। আর যাদের খালি পেট তাদের জন্য দোস্‌রা শাস্তর।

আমি আপত্তির স্বরে বল্লুম, কিন্তু এই মিথ্যের ওপর চলা……

বাঃ, বন্ধু হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন, কথাটা মিথ্যে হ'ল, সেইটে বড় দুঃখ? না, জীবনটা মিথ্যে হ'ল, সেইটে?

আমি জবাব দিতে গেলুম্, কিন্তু বন্ধুই ব'লে উঠ্‌লেন, জানি তোমরা মরালিষ্টরা ব'ল্‌বে, Man is word, অথবা পাদ্রী-মাফিক বাইবেল আওড়াবে, আদিতে বাক্য ছিলেন, কিন্তু বুঝলে হে, আমার শাস্তর ভিন্ন। আমি বলি, আমার বেঁচে থাকাটাই সব চেয়ে বড় কথা। অতএব……

রাধেশের মতলব মগজে ঢুকিয়ে বাড়ী ফিরে এলুম্।

অমিতা এতো তাড়াতাড়ি আমায় ফির্‌তে দেখে বেশ একটু উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো। তার মনে মনে একটা হিসেব ছিল। যেদিন টাকা পেতুম্ না, সেদিন বাড়ী ফির্‌তে আমার অসম্ভব রকম দেরি হ'ত। পেট যত না ক্ষুধায় জ্বল্‌তো, মন জ্বল্‌তো তার ঢের বেশী; বিশেষ ক'রে যখন দেখ্‌তুম্, যারা অনায়াসে টাকা ধার দিতে পারে, তারাও বিনিয়ে বিনিয়ে বলে, দেখ্‌তেই তো পাচ্ছ, ছেলেটার টাইফয়েডে কত টাকা বেরিয়ে গেলো…। তাদের কথা শেষ ক'র্‌তে না দিয়ে আমি বরাবরই বল্‌তুম্, তার জন্যে আর কি হ'য়েছে, টাকা আমার অন্য এক জায়গায় পাওয়ার কথা আছে। তার পর রাস্তায় বেরিয়ে অনির্দ্দিষ্টভাবে ঘুর্‌তে থাক্‌তুম্।

মনের এই তথ্য তার জানা ছিল কি না, তাই অমিতা প্রশ্ন কর্‌লো, টাকা পেলে বুঝি?

হ্যাঁ……

মিথ্যে ব'ল্‌লুম্। আজ আর মরালিটিতে বাধ্‌লো না। জীবনে অনেক নীতিই তো পরখ করা হ'য়েছে। দেখি না একবার রাধেশের নীতিটা কাজে লাগিয়ে।

চেয়ে দেখি অমিতার চোখে-মুখে এক অনবদ্য অতুলনীয় হাসি।

হাসি!

বুঝি না, তাকে হাসি ব'ল্‌ব? না, ব'ল্‌ব, আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এসে?

রোজ তাকে এসে যখন নিরাশার কথা জানাই, তার মুখ কালো হ'য়ে ওঠে। ক্ষুধার বেদনার চাইতেও সে কালিমায় ব্যক্ত হয় লজ্জা এবং অপমান। তার সে মুখে হাসি ফোটাবার কী দুরন্ত চেষ্টাই না ক'রেছি,—নীতিবাক্য আউড়ে, গীতা পাঠ ক'রে শুনিয়ে, মহাপুরুষদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের দোহাই দিয়ে। হাসি ফুটতো না যে তা নয়, কিন্তু মনে হত, সে হাসির চেয়ে ঢের ভালো কান্না।

কিন্তু আজকের এই হাসি—এ সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের।

চাঁদ যখন ষোলো-কলায় পূর্ণ থাকে, তখন যেন সে এই হাসি হাসে; নদী যখন কানায় কানায় ভরতি হ'য়ে ওঠে, তখন যেন তার মুখে এই হাসির তরঙ্গ খেলে যায়।

মন্দ কি!

এতো কাল এতো সাধুতা, এতো সাধনা করেও যা পাইনি, আজ যদি সামান্য একটি মুখের কথায় তা পাই তাতে কার কি ক্ষতি? তা হ'ক না সে মিথ্যে কথা!

অমিতা মিনিটখানেক হবে বোধ হয় একেবারে চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। তার পর ধীরে ধীরে ব'ল্‌লো, কত টাকা?

একশো টাকা।

আমার দিকে একবার কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে অমিতা সোজা ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো। একবার পিছু ফিরে চাইলও না।

ব্যাপার কি? অমিতা কি তবে আমার ফাঁকি ধ'রে ফেল্‌লো? কিন্তু তাহলেও তো টাকা দেখতে চাইতো? তা যখন চায়নি, তখন……

আমি যেন স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম্, অমিতার এই চটুল গতির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে একটা অপরিসীম ঘৃণা। একশো টাকা দেবে তোমায় ধার?…এই কথাটাই যেন সে ব'ল্‌তে চায় আমাকে। পলকে মনটা ভারি হ'য়ে এলো। খুব শক্ত কথা শুনিয়ে দেব ব'লে আমিও খানিক পরে ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লুম্। কিন্তু যা দেখ্‌লুম ঢুকে, তাতে বুঝ্‌তে পার্‌লুম্, মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝার শক্তি আমার আজো হয়নি।

অমিতা বিছানার ওপর ঝুঁকে ব'সে ফর্দ্দ ক'র্‌ছে। তার হাতের পেন্সিল চ'ল্‌ছে ধীরে, অতি ধীরে; যেন এক-একটা জিনিষের নাম লিখ্‌তে গিয়ে তার মন হ'য়ে আস্‌ছে অভাবের স্মৃতিব্যথায় ভারী।

ফর্দ্দতে মোট উঠ্‌লো একশো তিরিশ টাকা।

অমিতা তা ছিঁড়ে ফেল্‌তে উদ্যত হ'ল।

আমি তাকে চ'ম্‌কে দিয়ে পেছন থেকে ব'লে উঠ্‌লুম্, ছিঁড়ো না অমিতা।

অমিতার মুখ পলকে রাঙা হ'য়ে এলো এক অপূর্ব্ব আনন্দমাখানো লজ্জায়, যাও, ভারি বদ্ অভ্যেস্ তোমার, লুকিয়ে দেখো!

তার পর ফর্দ্দটা সে তাল পাকিয়ে হাতের মুঠোয় নিয়ে বিছানায় শুয়ে প'ড়ে ব'ল্‌লো, কিছুতেই মিল্‌ছে না!

আমি রসিকতা ক'রে ব'ল্‌লুম্, Cut your coat according to your cloth: কিন্তু জম্‌লো না রস। আচ্ছা, এ প্রবাদটা কি সত্যি? কাপড় কম হ'লে কি শুধু দর্জ্জির কসরতেই একটা কোট তৈরি হ'য়ে যায়? হাসি এলো। এই তো দুনিয়ার হাল! মানুষকে নানা বাগাড়ম্বরে শেখানো হয়, চাই চাই ক'র না; যা আছে, তাই দিয়ে কোনো রকমে চালিয়ে দাও, কারণ সন্তোষ সুখের মূল। লা-মিজারেবলের ফ্যান্টাইন্ যেমন শিখেছিল, কেমন ক'রে আলো না জেলে রাতের পর রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়, কেমন ক'রে একটা জামায় একটা শীত কাটান যায়। আর, ফ্যান্টাইন্ কেন? অমিতাও কি তা জানে না? আপনারা কেউ পঞ্চাশ টাকা মাইনের পনের টাকা বাড়ী ভাড়া এবং দশ টাকা ঋণশোধ দিয়ে মাত্র পঁচিশটি টাকায় আটজনের পরিবার চালিয়ে যেতে পারেন মাসের পর মাস? বোধ হয় পারেন না। কিন্তু অমিতা তা-ই পেরেছে।

কাজেই অমিতাও একটু না হেসে পার্‌লো না এ রসিকতায়।

আমি ভুল্ শোধরাবার মতো করে বল্‌লুম্, হিসেব মিল্‌ছে না ব'লে তুমি চাহিদাকে কমাতে যেও না অমিতা।

তবে?—অমিতা কৌতূহলভরে প্রশ্ন ক'র্‌লো।

আমি বল্‌লুম্, অভাব দূর করার পন্থা হচ্ছে আয় বৃদ্ধি করা।

অমিতা হেসে ব'ল্‌লো, কিন্তু জানো, আয়ের সঙ্গে অভাববোধ পাল্লা দিয়ে চলে?

আমি জবাব দিলুম্, সেটা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেই মানুষই হচ্ছে সব চেয়ে জীবন্ত মানুষ, যে বলে, আমি শুধু এইটুকু, বা শুধু ঐ-টুকু পেয়ে খুসি নই, আমি চাই সব-কিছু সম্পূর্ণভাবে।

অমিতা ধপ্ ক'রে এ উচ্চভাব থেকে একেবারে কঠিন মাটিতে নেবে এলো।—কিন্তু এ একশো টাকা দিয়ে কোন্ দিক সাম্‌লাই বলতো? বাড়ীভাড়া এই মাস নিয়ে হ'ল একষট্টি টাকা, দোকানে বাকী ছ'টাকা সাড়ে তিন আনা ·····

আমি জানালার গোড়ায় ব'সে প'ড়ে বাইরের দিকে চেয়ে যেন নিতান্ত উদাসীনের মতো ব'ল্লুম্, তা, এ মাসটা যাহ'ক ক'রে চালিয়ে দাও, সাম্‌নের মাসের মাইনে পেলে……

বিস্ময়ে অমিতা এবার সোজা হ'য়ে ব'স্‌লো, তোমার কি আবার চাকুরী হ'ল নাকি ?

তেম্‌নি উদাসীন্তের সঙ্গে জবাব দিলুম্, হ্যাঁ।

কি চাকুরী ?

বার্ণ কোম্পানীতে। রাধেশ সেখানে বড়বাবু কি না।

আড়চোখে দেখে নিলুম্ অমিতার অবস্থাটা। ঘড়ির হেয়ার-স্প্রিংটা যেন অকস্মাৎ নাড়া পেলো। অমিতা কি ক'র্‌বে, কি ব'ল্‌বে বুঝ্‌তে পারছে না। আমা হেন নাস্তিকের ঘরে একটা দেবতা-দানোর ছবিও নেই যে মাথা ঠুক্‌বে। অগত্যা সে ছিট্‌কে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

নটা হ'তেই খাওয়ার ডাক এলো। সত্য কথা ব'ল্‌তে কি, ইদানীং খাওয়ার দিকে আমার তেমন আর ঝোঁক ছিল না। তার কারণ বৈরাগ্য নয়,—তার কারণ হচ্ছে, ভালো খাবারের অভাব। সেই মুসুরির ডাল আর ভাত, ভাত আর মুসুরির ডাল। কদিন রোচে আর মুখে। বাইরের কেউ জিজ্ঞেস কর্‌লেও অবশ্য এ অরুচিটার কথা জাঁক করি না, বলি, নিরামিষ আহার,—আজকালকার সায়েন্স পর্য্যন্ত এর পক্ষে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু নিজের জিভকে তো আর এ ফাঁকি দেওয়া চলে না। সে গ্যাঁট্ হ'য়ে ব'সে আছে, ভালো খাবার না হ'লে তার চ'ল্‌বে না। তাই যাই-কি-না-যাই ক'র্‌ছিলুম, হঠাৎ ভাই নিমাইচন্দ্র হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বল্‌লো, এসো দাদা, বৌদি ডাক্‌ছে, মাংস…

মাংস !

তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠ্‌লুম ! মুসুরির ডাল থেকে এক লাফে মাংস। আজ এ কি অঘটন ঘটাল অমিতা ? পয়সা পেলো কোথায় ? তেল কেনার মতো পয়সাই তো ছিল না ! ধার ক'রেছে ? কার কাছ থেকে ক'র্‌লো ? সারা পাড়া ঘুর্‌লেও তো আমাদের কেউ একটি আধ্‌লা ধার দেয় না। তবে ?

মাংস খাওয়ার ঔৎসুক্যের চেয়ে এই কথাটা জানার কৌতূহলই বেশী হ'ল। দ্রুতপদবিক্ষেপে রান্নাঘরে গিয়ে আরাম ক'রে বস্‌লুম মাংস খেতে। তার পর অমিতাকে চটাবার জন্য ব'ল্লুম, তবে না কি তোমার কাছে টাকা ছিল না অমিতা ?

অমিতা ব'ল্‌লো, আহা, জানো না ? টাকা যে আমি মাংস-খাওয়ার জন্য জমিয়ে রেখেছিলুম !

অমিতাকে আর আজ রাগানো গেলো না। আনন্দের দিনে ওর মতো মেয়েরা হয় বাঁশীর মতো, যতই জোরে ফুঁ দি, ততই জোরে বেজে ওঠে। বল্‌লুম, এতো অনুগ্রহ হ'ল কার ? কে ধার দিল তোমায় ?

অমিতা ব'ল্‌লো, ফেটির মার থেকে দশটা টাকা চেয়ে আন্‌লুম।

অবাক্ হ'লুম। ফেটির মা টাকার কুমীর, এ কথা কেই বা না জানে। কিন্তু তার কাছ থেকে একটা পয়সা ইদানীং আমরা খসাতে পারতুম না। এবং এই জন্যেই মুড়ি-মুড়্‌কী খেয়ে তিন দিন তিন রাত্র কাটালেও তার কাছে হাত পাততে সাহস পাইনি। সে দিল একটা নয়, দুটো নয়, একেবারে দশ-দশটা টাকা ধার। জিজ্ঞাসুনেত্রে অমিতার দিকে চাইলুম।

তোমার চাকুরী হ'য়েছে শুনে আপনা থেকেই দিলে, অমিতা হেসে ব'ল্‌লো।

আমিও হাসলুম। রাধেশের বুদ্ধি তাহ'লে ফলতে সুরু ক'রেছে।

বিকেল নাগাদ খবরটা পাড়াময় ছড়িয়ে পড়্‌লো যে আমি একটা মোটা মাইনের চাকুরী পেয়েছি।

পাড়ার সার্ব্বজনীন কাকা ভূতনাথ বেড়াতে যাবার পথে আমাকে শুনিয়ে-শুনিয়েই ব'ল্‌লেন, না, ছোক্‌রার পার্ট আছে। ক'ব্‌লে তো ও এমনি একটা চাকুরী যোগাড়, একশো টাকা। কত বি-এ-এম্-এর দল তিরিশ টাকার আশায় তীর্থকাকের মতো ব'সে।

বলা বাহুল্য, এই ইনিই কিছু কাল আগেও প্রকাশ্যে আমার মরাল কারেজের তারিফ ক'রে অপ্রকাশ্যে মন্তব্য ক'রতেন, আরে, রেখে দাও তোমার স্পিরিট, রাখাল-দাস বাবুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চাকুরীটি খুইয়ে এখন

বাছাধন কেমন পস্তাচ্ছেন! একশো টাকার গন্ধ দেখি এরও মন বদ্‌লে দিল।

গয়লানী সেদিন যে দুধ দিল, তা মাপেও যেমন বেশী হ'ল, ঘনত্বেও তেমনি আশ্চর্য্য রকমে অন্য দিনকে ছাড়িয়ে উঠ্‌লো।

এ আর বিচিত্র কি!

ভদ্দর আদ্‌মিরাই যখন টাকার নাম শুনে ভেল্‌ বদ্‌লান, তখন এরা কোন্ ছার! দোকানদার যদি এর পর পঁচিশ টাকা বাকী রাখ্‌তে রাজী হয়, তাহ'লেও অবাক্ হব না, যদিও এই সেদিনও সে পঁচিশটা পয়সা বাকী রাখার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রেছিল অত্যন্ত অভদ্রতার সঙ্গে।

বাড়ীওয়ালাকে ভাড়ার কথা তুল্‌তেই সে যেন বিশেষ ক্ষুব্ধ হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো, তা যখন সুবিধে হয় দিয়ে দিও, মাম্‌লা তো ঐ কটি টাকার, ও নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না।

নবীনের কাছে তিনটে টাকা পেতুম। এক বছর ধ'রে বহু তাগিদ্ দেওয়ার পর সে একটা টাকা শোধ দিয়েছিল। ভেবেছিলুম, ঐ রেটেই সে শোধ দেবে। কিন্তু হঠাৎ সেদিন সে নিজে বাড়ী ব'য়ে টাকা দুটো নিয়ে এলো, নাও দাদা, রোজ মনে করি দিয়ে যাব, সময় আর পাইনে, যে ঝঞ্ঝাটে আছি,···

আমি তাকে আপ্যায়িত ক'রে বিদায় দিতেই অমিতা ব'ল্‌লো, অধমর্ণের ঋণ-শোধের এতোটা গরজ একটু অস্বাভাবিক ব'লে ঠেকে না কি?

হেসে জবাব দিলুম, অস্বাভাবিক নয়, অমিতা। এটা ব্যবসায়ীর পাকা বুদ্ধি, ভবিষ্যতে টাকা ধার পাওয়ার পথ ও খোলসা করে রাখলো।

ওঃ, তাই, ব'লে অমিতা চুপ ক'র্‌লো।

মোট কথা সেদিন সকাল থেকে শুতে যাবার মধ্যে আমার জীবন-যাত্রা এবং ঘরকন্নার মধ্যে এমন একটা সহৃদয়তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সুর বেজে গেলো যে আমি বার-বার তার জন্য রাধেশকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা নিবেদন না করে পারলুম না।

পরদিন ভোরবেলা উঠেই দেখি দুদিক্ থেকে দুদফা নিমন্ত্রণ এসেছে।

রাঙা-কাকা আর রাখালদাসবাবু।

দুজনেরই একটু ইতিহাস আছে।

রাঙা-কাকা আমার পাতানো কাকা নয়। খু[ব] নিকট জ্ঞাতি। আমি হচ্ছি তার father's brother's son's son অর্থাৎ বাপের ভায়ের ছেলের ছেলে। একখানা চিঠিতে এই ব'লে তিনি আমায় তাঁর এক পরিচিতের সঙ্গে introduce ক'রে দিয়েছিলেন, কিন্তু এতো নিকট-আত্মীয়তার সম্পর্ক নিয়ে আমার সে ভদ্রলোকের দ্বারস্থ হবার মতো সাহস হ'ল না ব'লে আমি চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেললুম!

সেই অতি-আত্মীয় রাঙা-কাকার অতি নিকটে বাসা ক'রেও তার নিমন্ত্রণ লাভ করার ভাগ্য আমার হ'য়ে ওঠেনি। না, থুড়ি, হ'য়েছিল। একদিন রাঙা-কাকার বাড়ীর এক চাকর এসেছিল অমিতাকে নিতে। আমরা প্রত্যাখ্যান তো ক'রেছিই, পরন্তু মনে মনে হেসেছিও প্রচুর। এরাই একদিন আমার এক বিশ্বস্ত ছাত্রের সঙ্গে অমিতাকে কোথাও পাঠানোটা অশোভন ব'লে মন্তব্য পাশ ক'রেছিল। মানুষ কি আত্মভোলা, এরাই আমার পাঠালো চাকর!

কিন্তু এবার এসেছেন রাঙা-কাকার এক ভাইপো। কাজেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা গেল না। সেখানে পাঠালুম অমিতাকে।

আর রাখালদাসবাবুর বাড়ীতে গেলুম স্বয়ং আমি।

রাখালদাসবাবু আমার পূর্ব্ব-মুনিব। কথাটা আ[র] একটু ঘুরিয়ে বলি, আমি তাঁর পূর্ব্ব-চাকর। কথাট[া] ব'ল্‌তে লজ্জা হয়, তবু এ সত্যি। এম্‌নি হাম-বড়া আমাদের দেশের কর্ত্তারা যে যেখানে তাঁরা বিরাজ করেন সেখানে চাকুরী বজায় রাখা মানে প্রতিষ্ঠানের আইন-কানুন মানা নয়, তাঁদের ইচ্ছাকে চরম আই[ন] ব'লে মানা। এই রাখালদাসবাবুর কত চাকরকেই আমি আক্ষেপ ক'র্‌তে শুনেছি, এর চেয়ে সরকারি স্কুলের মাষ্টারী করাও ভালো, একটি সবজান্তা লোকের খামখেয়ালীর ওপর তাতে নির্ভর ক'রে ব'সে থাকতে হয় না।

অথচ আমি এবং আরো অনেকেই সেধে তাঁর চাকুরীতে ঢুকিনি। যাক,—অরেজিষ্ট্রী করা চুক্তি আর চাকাহীন লরী, দুটোই সমান—প্রকাশ্য রাস্তায় কোনটাই চলে না। সে কথা তুলে আর লাভ কি। তার চেয়ে বলা দরকার চাকুরীটা কেন গেল। রাখালদাসবাবু আমার দাম কষ্‌তে গিয়ে বারে বারেই ব'ল্‌তেন, তুমি এ-টাকার যোগ্য নও, অমুক এম্‌-একে আমি পাই এর চাইতে ঢের কম টাকায়। তাঁর এই ভাবটাই যখন বেশ ঘন হ'ল, তখন পাকা তালের মতো আমার পাকা চাকুরীটাও আচম্‌কা খ'সে পড়লো।

সেই রাখালদাস বাবু যখন আমার স্মরণ ক'রেছেন তখন এটা সহজবোধ্য যে তিনি তাঁর মত নিশ্চয়ই বদ্‌লেছেন আমার দাম সম্বন্ধে। কৌতূহল হ'ল এবং সেই কৌতূহলই আমায় টেনে নিয়ে গেল তাঁর কাছে।

সন্ধ্যায় অমিতা এবং আমি দুজনে দুদিক থেকে এসে মিলিত হ'লুম আমাদেরই বাড়ীতে।

অমিতার পরণে চমৎকার একখানা কাশ্মীরী সিল্ক। চাঁপাফুলের মতো রঙ্‌। আমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম।

অমিতা বোধ করি আমার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরেই ব'ল্‌লো, দেখ্‌ছো কি? Eighth wonder,·· রাঙা-কাকী দিয়েছেন···

বুঝ্‌লুম, এ একশো টাকার গুণ।

তোমার খবর কি?—অমিতা প্রশ্ন কর্‌লো।

ধীর গম্ভীরস্বরে জবাব দিলুম, Ninth wonder: রাখালদাসবাবুর অধীনে আবার চাকুরী হ'ল।

অমিতা অবাক্‌ হ'য়ে ব'ল্‌লো, সে কি। তুমি না বার্ণ কোম্পানীতে চাকুরী নিয়েছ?

অমিতাকে সব খুলে ব'ল্‌লুম্‌। শুনে তার সে কী হাসি।

আর আমি?

আমি ক'র্‌তে লাগ্‌লুম্‌ বারবার বন্ধু রাধেশচন্দ্রের আইডিয়ার তারিফ্‌।

বেতারের উৎস-সন্ধান

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্‌-এস্‌সি

শূন্য প্রদেশাগত বার্ত্তার উৎস-নির্ণয় আশ্চর্য্য মনে হইলেও, প্রকৃত পক্ষে এই কার্য্য খুব কঠিন নয়। আজ যে-কোন উচ্চাঙ্গের বেতার-গ্রাহক ষ্টেশনে কোন্‌ বার্ত্তা কোন্‌ দিক হইতে আসিতেছে তাহা বলিয়া দেওয়া সহজ কার্য্য; শুধু এইটুকুই নয়—প্রকৃত পক্ষে উৎস কত দূরে কোথায় অবস্থিত তাহাও বলা দুঃসাধ্য নহে।

বেতার গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্রে 'অন্তনা' (Antenna) বা আকাশ-তার (Aerial) অপরিহার্য্য। 'পোপোফ' নামক রুষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন—একটী খাড়া তারের ভিতর দিয়া স্পন্দনশীল বা 'অলটার-নেটিং' (Alternating) প্রবাহ চালিত করিলে অধিকতর শক্তি-সম্পন্ন বিদ্যুৎতরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং শক্তি দূর পথে প্রেরণ সম্ভব হয়। পোপোফের এই আবিষ্কার গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে 'মার্কনি' বেতার-বার্ত্তা প্রেরণে ও গ্রহণে আকাশতার ব্যবহার করিয়া 'বেতার' কার্য্যকরী করেন। প্রকৃত পক্ষে আকাশতারের গুণেই বিদ্যুৎতরঙ্গ দিগন্তে প্রেরণ করা সম্ভব হইয়াছে।

আকাশতারের আকৃতির বিভিন্নতানুযায়ী উহার ধর্ম্ম ও কার্য্য বিভিন্ন হইয়া থাকে ও প্রেরণ-গ্রহণ ক্ষমতার তারতম্য ঘটে। আকাশতারের আকৃতি এরূপ করা হয় যাহাতে যথাসম্ভব বেশী শক্তি শূন্যে ছড়ান যায় (Radiated)। সর্ব্বত্র এক প্রকার আকাশতার ব্যবহৃত হয় না। বিভিন্ন প্রত্যেকটীর শক্তি, ধর্ম্ম ও গুণের স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। আকাশ-তারের আকৃতির বৈশিষ্ট্য প্রভাবে বিদ্যুৎতরঙ্গ বিশিষ্ট এক দিকে প্রেরণ করা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, উল্টা—'L'—(Inverted L) আকৃতি-'অন্তনায়' অত্যধিক পরিমাণে তরঙ্গের একমুখী গতি পাওয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ যদি উপরের শায়িত (horizontal) ভাগটুকু বেশী লম্বা থাকে, তবে এই আকাশতারে শায়িতভাগ যে দিকে রহিয়াছে সেই অভিমুখে বেশী শক্তি পরিব্যাপ্ত হয়। বেতারের অনেক অনেক কার্য্যে শক্তিকে বিশিষ্ট এক দিকে প্রেরণ করার প্রয়োজন হইয়া থাকে। সর্ব্ব দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া যেটুকু শক্তি অযথা নষ্ট হইতেছে, সেইটুকু অভিপ্রেত বিশিষ্ট দিকে চালিত করিতে পারিলে, অনেক শক্তির অপচয় রক্ষা করা যায়। অধিকন্তু যে দিকে প্রেরণ করা প্রয়োজন সেই দিকে বেশী শক্তি নিয়োজিত করা যাইতে পারে। প্রায়শঃ ব্যবহৃত আকাশতার ভিন্ন দিগ্বিশেষে প্রেরণ কার্য্যকরী করিবার জন্য নানাপ্রকার জটিল আকাশতার উদ্ভাবিত হইয়াছে।

পরন্তু এই আকাশতারের গুণেই বেতার-বার্ত্তার উৎস-নির্ণয় সম্ভব হইয়াছে। বেতার তরঙ্গকে ধরিবার জন্য গ্রাহকযন্ত্রেও আকাশতার দরকার। বেতারতরঙ্গ আকাশতারে আঘাত করিয়া গ্রাহকযন্ত্রে বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপাদন করে। গঠন-বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন কোন গ্রাহক-আকাশতার আগত তরঙ্গের দিগানুযায়ী একটা বিশিষ্ট দিকে স্থাপিত হইলে গ্রাহকযন্ত্রে অধিকতর শক্তিশালী বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে সচরাচর সাধারণ সখের গ্রাহক-যন্ত্রের সহিত উল্টা-'L'-'অন্তনা' ব্যবহৃত হয় এবং এই নিয়মানুযায়ী শায়িত ভাগটুকু প্রেরকষ্টেশন (কলিকাতা) অভিমুখে রাখিলে ভাল কার্য্য পাওয়া যায় বলিয়া প্রায়শঃই এই প্রকারে রাখা হয়। দেখা গিয়াছে 'ফ্রেম'-আকাশতার (Frame Aerial)এর অঙ্গ (plane)কে আগত তরঙ্গের দিকের সহিত সমান্তরাল করিয়া রাখিয়া দিলে আকাশ-তার বেশী কার্য্যকরী হয়। দিখিশেষে রক্ষিত হইলে আকাশতারে উৎপন্ন প্রবাহের তারতম্য ঘটে ; এই তারতম্য লক্ষ্য করিয়া বেতারের উৎসের অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

'ফ্রেম'-আকাশতার-সাহায্যে বেতার-তরঙ্গের দিক্‌নির্ণয় খুব সহজ-সাধ্য। যে দিক হইতে তরঙ্গ আসিতেছে, আকাশতারের অঙ্গ সেই দিকের সহিত ৯০° হইতে যত কম কোণ উৎপন্ন করে, গৃহীত শক্তি তত বেশী হয়; এবং ৯০° ডিগ্রীতে লম্বভাবে রাখিয়া দিলে আকাশতারে কোন প্রবাহ উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ঘুরাইয়া পরীক্ষা করিতে পারিলে জানা যাইবে আকাশতার কোন্ দিকে স্থাপিত হইলে কোন প্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে না। তদনুযায়ী আগত তরঙ্গের দিকনির্ণয় করা যাইবে। কিন্তু এবম্প্রকারে আকাশতার ঘুরাইয়া দেখা খুব সহজ নয় বলিয়া সহজ উপায়ে দিকনির্ণয়ার্থ জটিল আকাশতার ব্যবহৃত হয়।

'বেলিনি-টোশী' ব্যবস্থায় ('Bellini Tost' arrangement) দুইটী 'ফ্রেম'—আকাশতারের একটীকে অপরটীর সহিত লম্বভাবে অর্থাৎ ৯০° ডিগ্রীতে রাখা হয়। এই দুইটীকে ইচ্ছা করিলে একেবারে আট-কাইয়া চিরস্থায়ী করিয়া নির্ম্মাণ করা যায় এবং সেই জন্য যদৃচ্ছা বড় করিয়াও নির্ম্মাণ করা চলে। 'ফ্রেমে' না জড়াইয়া মাস্তল পুতিয়াও ঐ ভাবে তৈয়ারী করা যাইতে পারে ; কারণ ইহাকে ঘুরাইবার প্রয়োজন হইবে না। আকাশতার দুইটী আকারে সমান ও সর্ব্বপ্রকারে সমগুণ সম্পন্ন এবং পরস্পর অসংশ্লিষ্ট। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, 'ফ্রেম'-আকাশ-তারে বেতার-তরঙ্গের আঘাতে যে প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহা এই আকাশ-তারের অবস্থানুযায়ী হইয়া থাকে ; এবং আগত-তরঙ্গের দিক্ আকাশতারের সহিত যত কম কোণ (০-৯০° ডিগ্রীমধ্যে) উৎপন্ন করে, প্রবাহ তদনুপাতে বেশী হয়। কথিত আকাশতারদ্বয় পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত ; সুতরাং আগত-তরঙ্গের দিক্ সাধারণতঃ উভয়ের সহিত সমান কোণ উৎপন্ন করিবে না এবং এইজন্য উভয় আকাশতারে প্রবাহিত প্রবাহও সমান হইবে না। ফলতঃ মূল তরঙ্গ উভয় আকাশতারেই আঘাত করিবে ; কিন্তু শক্তি দুই অসম ভাগে বিভক্ত হইয়া আকাশতারদ্বয়ে প্রবাহিত হইবে। এই বিভাগ—দুই আকাশতার আগততরঙ্গের দিকের সহিত যে কোণদ্বয় উৎপন্ন করে তদনুযায়ী হইয়া থাকে। সুতরাং উভয় প্রবাহের অনুপাত নির্ণয় করিতে পারিলে, আগত তরঙ্গের দিক্ ও আকাশতারদ্বয়, ইহাদের মধ্যবর্ত্তী কোণদ্বয়ের নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতে পারে। উৎসের দিকনির্ণয়ে এই কোণদ্বয় নির্ণয় করাই আমাদের কার্য্য।

বিভিন্ন প্রকার 'অন্তনা' (আকাশতার)

আকাশতারে-উৎপন্ন-প্রবাহদ্বয়ের অনুপাত নির্ণয় জন্য আকাশতার দুইটী অপর একটী যন্ত্রে (Radio Goniometer) সংলগ্ন করা হয়। এই যন্ত্রের কার্য্যপ্রণালীর বিবরণ দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু তৎপূর্ব্বে বিদ্যুৎবিকাশের একটী মৌলিক তত্ত্বের উল্লেখ প্রয়োজন।

'ফ্যারাডে' আবিষ্কার করেন, একটী বৈদ্যুতিক চক্রের নিকট অপর একটী তারের কুণ্ডলী আনয়ন করিয়া পূর্ব্বোক্ত চক্রে প্রবাহ চালিত বা

দিক্ নির্ণয়ের মুখ আকাশতার ও রেডিয়ো গনিয়ো মিতার যন্ত্র

রুদ্ধ করিলে প্রথম চক্রের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলেও শেষোক্ত চক্রে ক্ষণিক প্রবাহ পাওয়া যায়। এই রীতিকেই প্রসারিত করিলে বলা যায়, একটী কুণ্ডলীতে স্পন্দনশীল প্রবাহ (মুখ্য) চালিত হইলে নিকটবর্ত্তী অপর কুণ্ডলীতেও স্পন্দনশীল প্রবাহ (গৌণ) উৎপন্ন হয়। গৌণপ্রবাহ উভয় কুণ্ডলীর আকৃতি, অবস্থিতি, মুখ্যপ্রবাহের প্রকৃতি প্রভৃতি কয়েকটী অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্য সকল অবস্থা অপরিবর্ত্তিত রহিলে, নির্দ্দিষ্ট দুই কুণ্ডলীর একটীতে প্রবাহ চালিত করিলে, অপরটীতে উৎপন্ন গৌণপ্রবাহ উভয় কুণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তী কোণের উপর নির্ভর করে; এবং মুখ্যপ্রবাহের শক্তি বর্দ্ধিত করিলে গৌণকুণ্ডলীতেও বর্দ্ধিতশক্তি প্রবাহ পাওয়া যায়। উভয় কুণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তী কোণ যত কম (০°-৯০°) হইবে উৎপন্ন গৌণপ্রবাহ তত বেশী হইবে।

কথিত 'রেডিয়ো-গনিয়োমিতার' যন্ত্রটীতে সর্ব্বপ্রকারে সমগুণসম্পন্ন দুইটী কুণ্ডলী থাকে—যাহারা পরস্পর অসংশ্লিষ্ট ও লম্বভাবে অবস্থিত। এই উভয় কুণ্ডলীর অভ্যন্তরে ও মধ্যস্থলে একটী ঘূর্ণনযোগ্য কুণ্ডলী থাকে। প্রথমোক্ত মুখ্য কুণ্ডলীদ্বয়ে এককালীন স্পন্দনশীল প্রবাহ চালিত হইলে অভ্যন্তরস্থিত গৌণকুণ্ডলীতে পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে এক কালে দুইটী বিভিন্ন স্পন্দনশীল প্রবাহ (গৌণ) উৎপন্ন হইবে। অন্য সকল অবস্থা উভয় কুণ্ডলীতে অভিন্ন হইয়াও মুখ্যপ্রবাহদ্বয় অসম হইলে বা গৌণকুণ্ডলী উভয় মুখ্যকুণ্ডলী হইতে সমান কৌণিক দূরত্বে অবস্থিত না হইলে উৎপন্ন গৌণপ্রবাহদ্বয় সমান হইবে না। যেহেতু গৌণকুণ্ডলীর অবস্থান-পরিবর্ত্তন দ্বারাও গৌণপ্রবাহ পরিবর্ত্তিত করান যায়; সুতরাং মুখ্যপ্রবাহদ্বয়ের শক্তি যাহাই হোক না কেন, গৌণকুণ্ডলী প্রচেষ্টা দ্বারা এরূপ স্থানে অবস্থিত করান সম্ভব, যেখানে উভয় গৌণপ্রবাহ সমান ও বিপরীত অর্থাৎ ফলতঃ তদবস্থায় গৌণকুণ্ডলীতে কোন প্রবাহের সাড়া পাওয়া যাইবে না। যেহেতু উৎপন্ন গৌণপ্রবাহ অন্যান্য অবস্থা স্থির রহিলে গৌণ ও মুখ্য কুণ্ডলীর কৌণিক দূরত্ব ও মুখ্যপ্রবাহের শক্তি—এতদুভয়ের একত্রিত অনুপাতানুযায়ী হইয়া থাকে; সুতরাং যখন উভয় গৌণপ্রবাহের শক্তি সমান ও বিপরীত তদবস্থায় প্রথম মুখ্যকুণ্ডলীর প্রবাহ এবং এই কুণ্ডলী হইতে গৌণকুণ্ডলীর কৌণিক দূরত্ব—এই দুইয়ের একত্রিত অনুপাত ও অপর পক্ষে দ্বিতীয় মুখ্যকুণ্ডলীর প্রবাহ এবং এই কুণ্ডলী হইতে গৌণকুণ্ডলীর কৌণিক দূরত্ব—ইহাদের একত্রিত অনুপাত—এই উভয় অনুপাত সমান ও বিপরীত। অতএব এমতাবস্থায় গৌণকুণ্ডলী মুখ্যকুণ্ডলীদ্বয়ের সহিত যে কোণদ্বয় উৎপন্ন করে সেই কোণদ্বয়ের অনুপাত মুখ্যপ্রবাহদ্বয়ের অনুপাত নির্দ্দেশ করিবে। উভয় গৌণপ্রবাহ যখন সমান ও বিপরীত তখন গৌণকুণ্ডলীতে প্রবাহমাপক যন্ত্র স্থাপিত করিলে যন্ত্রে কোন সাড়া পাওয়া যাইবে না। অভ্যন্তরীণ কুণ্ডলীর অনুরূপ অবস্থান প্রচেষ্টা দ্বারা নির্ণয় করিয়া মুখ্যপ্রবাহদ্বয়ের তুলনা করা চলে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্থাপিত আকাশতারদ্বয়ের এক একটীকে যন্ত্রটীর মুখ্যদ্বয়ের এক একটীর সহিত সংলগ্ন করা হয়।

বেতারতরঙ্গ আকাশতারে আঘাত করিয়া উহাতে স্পন্দনশীল প্রবাহ উৎপন্ন করে। আকাশতারদ্বয় উল্লিখিত যন্ত্রের মুখ্যকুণ্ডলীদ্বয়ে সংযুক্ত হইলে আকাশতারদ্বয়ে প্রবাহিত প্রবাহের অনুরূপ স্পন্দনশীল প্রবাহ মুখ্যকুণ্ডলীদ্বয়েও উৎপন্ন হইবে এবং তাহার ফলে অভ্যন্তরস্থিত গৌণচক্রে প্রবাহ উৎপন্ন হইবে। কুণ্ডলীটী ঘুরাইয়া যে অবস্থানে ফলতঃ এই গৌণচক্রে কোন প্রবাহ উৎপন্ন হয় না তাহা নির্ণয় করা যায়। এমতাবস্থায় গৌণপ্রবাহদ্বয় সমান ও বিপরীত বিধায় অভ্যন্তরীণ কুণ্ডলী প্রাথমিক

কুণ্ডলীদ্বয়ের সহিত যে কোণদ্বয় উৎপন্ন করে তাহারা প্রাথমিকদ্বয়ে অর্থাৎ আকাশতারদ্বয়ে প্রবাহিত প্রবাহের নির্দ্দেশ করে এবং এই প্রবাহদ্বয়ের অনুপাত নির্ণয় দ্বারা কি করিয়া আগত তরঙ্গের দিক্‌নির্ণয় সম্ভব তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এবম্প্রকারে গণিতশাস্ত্রের সহজ হিসাব দ্বারা দেখান যায় যে অভ্যন্তরীণ কুণ্ডলীর অবস্থান লক্ষ্য করিয়া সোজাসুজী আগততরঙ্গের দিকনির্ণয় করা চলে।

এবম্প্রকারে তরঙ্গ কোন্ দিক হইতে আসিতেছে তাহা নিরূপণ করা হইয়া থাকে। যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় বিদ্যুৎরশ্মি বাঁকিয়া যায় না, তবে এই দিগ্‌নির্ণয় দ্বারা উৎস কোন দিকে অবস্থিত তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অনেক অনেক স্থলে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলেও বেতাররশ্মিকে যেখানে সরল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে সেখানে জ্ঞাত দূরত্বে অবস্থিত দুইটী বিভিন্ন স্থান হইতে একই তরঙ্গের দিক্‌নির্ণয় করিয়া উৎসের অবস্থান সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া যাইবে।

অতএব শুধু বেতারবার্ত্তা গ্রহণ করিয়াই বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে প্রেরক কত দূরে, কোথায় রহিয়াছে। পথভ্রান্ত, নিরুদ্দিষ্ট, ভগ্নযান বৈমানিক বা নাবিক নিজের অবস্থান সম্বন্ধে অজ্ঞ হইয়াও ইচ্ছা করিলেই নিকটবর্ত্তী বৈতারিককে নিজের অবস্থিতি জ্ঞাত করাইতে পারে যদি তাহার সঙ্গে কার্য্যক্ষম বেতারপ্রেরক যন্ত্র থাকে।

রামায়ণের যুগে শব্দভেদী শরসন্ধান সাধ্যায়ত্ত ছিল বটে, তবুও অশোকবনে বন্দিনী জনকতনয়ার বিলাপধ্বনি শ্রবণে তাঁহার অন্বেষণ সম্ভব হয় নাই—সে জন্য পবননন্দনকে সাগর ডিঙ্গাইতে হইয়াছিল; কিন্তু আধুনিক যুগের অপহৃতা সীতাকে সন্ধান করিতে এত বিরাট সমারোহের কোন প্রয়োজন হইবে না; একটী বেতারপ্রেরকযন্ত্র থাকিলে অপরিচিত স্থান হইলেও দূরবর্ত্তী সন্ধানকারীগণকে অশোকবনের নির্দ্দেশ দেওয়া বিংশ শতাব্দীর জানকীর পক্ষে হয়ত অসম্ভব নয়।
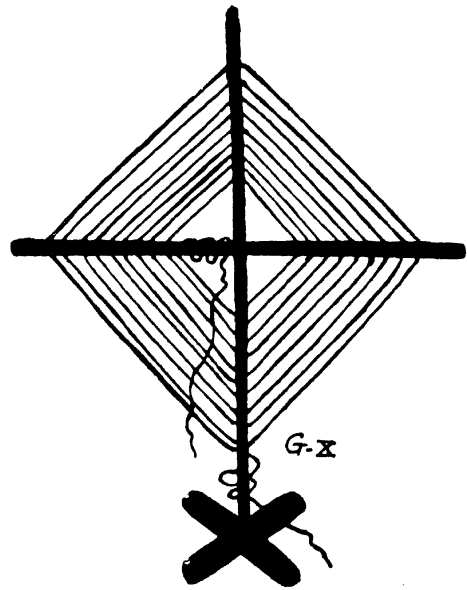
'ফ্রেম-আকাশ তার

প্রবাসিনী

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

ভগীরথ ব'সে ব'সে গল্প কর্‌ছিল।

হাঁসপাতালের সব চেয়ে পুরোণো চাকর সে—একেবারে প্রথম থেকেই তা'র চাকুরি। কতো রোগীকে সে আস্‌তে দেখ্‌ল, কতো রোগীকে সে যেতে দেখ্‌ল; ডাক্তার, নার্স কতো বদ্‌লী হ'ল, কিন্তু তা'কে আর কোথাও বদ্‌লী করা হয়নি। একবার তা'কে জেনারেল হাঁসপাতালে সরাবার কথা হ'য়েছিল, কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ব'লে ক'য়ে সে এখানেই র'য়ে গেচে।

ভগীরথ হাঁসপাতালের পূর্ব্বেকার ইতিহাস বলে। মাত্র জনকয়েক রোগীকে রাখা হ'ত—একজন ডাক্তার, তিনি তাঁর সুবিধা মতো এসে একবার ঘুরে যেতেন। যারা চিকিৎসার জন্যে আস্‌তো—অধিকাংশই একেবারে শেষ অবস্থার রোগী, অধিকাংশই ছিলো পথের ভিখারী—দুনিয়ায় যা'দের হয় তো কেউই নেই। কোথায় বা ছিলো ড্রেণ পাইখানা, কোথায় বা ছিলো বিজলীর বাতী—আর কোথায়ই বা ছিলো এতো লোক জন—এতো সাজ সরঞ্জাম—এতো হৈ রৈ ব্যাপার!

সেই হাঁসপাতাল কি ক'রে এমনটা হ'ল, কেমন ক'রে ক'রে নিত্যি নতুন পরিবর্ত্তন ঘট্‌তে লাগ্‌লে ভগীরথের মুখে শুনতে বেশ লাগে!

আর আমাদের কাজই বা কি!

আজ ভগীরথ একটি ছেলের গল্প ক'র্‌ছিল, এখানে

সে পেসাণ্ট্‌ ছিলো। হাঁসপাতালে ভর্ত্তী হবার কয়েক দিন পরেই হঠাৎ না কি একদিন সকালে দেখা গেল বাথ্‌রুমের ভেতরে সে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুল্‌চে!

ভগীরথ ব'ল্‌ল সে এত দিন এই হাঁসপাতালে কাজ ক'রচে, কতো হরেকরকম রোগী, ঘটনা সে দেখ্‌ল—কিন্তু এমন কাণ্ড সে আর কক্ষণো দেখেনি। দেহ থাক্‌লেই রোগ থাকে, আর রোগের জ্বালাও সবারই থাকে, তাই ব'লে এমন কাজ কেউ কখনো করে?

ভগীরথের মুখে এই ছেলেটির গল্প শুনেই গেলুম বটে, কিন্তু তা'র সম্বন্ধে মনে মনে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করলুম না বা কোনো ধারণাও পোষণ ক'র্‌লুম না। এই আত্মহত্যার মূলে তা'র কাপুরুষতা থাক্‌তে পারে, গভীর কোনো বেদনা থাকতে পারে, হয় তো বীরত্বও থাক্‌তে পারে, ভ্রান্তিও থাক্‌তে পারে। যাই থাকুক না কেন, তা'র কাজের সমালোচনা ক'রবার অধিকার আমার নেই; কিন্তু কষ্ট হ'ল।

কতো রকম রোগীর সাথেই পরিচিত হ'লুম। কেউ কারো যুক্তি মানে না, তর্ক মানে না, সান্ত্বনা মানে না—সবাই যার যার আপন মত প্রতিষ্ঠার জন্যে উদ্‌গ্রীব। তোমার দুঃখ ছোট, আমার দুঃখ বড়ো—এই ভাবটা কথায় বার্ত্তায় ভাবে ভঙ্গীতে প্রত্যেকে প্রকাশ ক'রবার জন্যে উৎসুক; অপরের বেদনায় কর্ণপাত ক'র্‌বার, অপরের দুঃখের সত্যিকার পরিমাণ উপলব্ধি ক'র্‌বার সময় কারোই নেই—অনর্গল ব'লে ব'লেও নিজের কথাই ফুরুতে চায় না! কারুর কারুকে বাধা দেবার জো নেই, দিতে গেলেই সেখানে ঘট্‌বে একটা অপ্রিয় সংঘর্ষ।

কাজে কাজেই সবার কথাই শুনে যাই, শুধু শুনেই যাই; কিন্তু মুখে কোনো কথা বল্‌বার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠি না—মনেও নয়। যে যা করে দেখে যাই। সমর্থন বা প্রতিবাদ ক'র্‌বার জন্যে আমার কোনো আগ্রহও নেই।

এ ছেলেটি আত্মহত্যা ক'রেচে—এতো অনেক বড়ো কথাই হ'ল। যখন নয় নম্বরের মুখে এই অভিযোগ শুনতে পাই যে কেন তা'র এই অসুখ হ'য়েচে—তখন এই ছোট্ট কথাটুকুরই যে উত্তর জমিয়ে উঠ্‌তে পারি না! নয় নম্বর ব'ল্‌তে থাকেন—দেখুন মশাই, মদও কোনো দিন খাইনি, মেয়েমানুষের বাড়ীও যাইনি, গো-হত্যে বেহ্ম-হত্যেও করিনি; কিন্তু কোন্‌ পাপে আমার এমন ব্যাধি হ'ল ব'ল্‌তে প'রেন?

বাইশ নম্বর ভুরু কুঁচকে বলে—করেননি ব'লেই মশাই এই রকম হয়েচে। এই জন্মে এখনো সময় থাক্‌তে এই কম্মোগুলো প্রাণ ভরে করে যান্‌, সামের জন্মে দেখ্‌বেন হাতে হাতে ফল—রোগ নেই, দুঃখু নেই, ইয়া পাট্টা শরীর, টাকার সিন্ধুক—প্রাণ একেবারে গড়ের মাঠ!

আমি সে কথা ব'ল্‌তে চাইনে কিছু, তবে অনবরত শুনে শুনে নয় নম্বরকে একদিন বোঝাতে চেষ্টা ক'রেছিলুম যে অসুখটা তাঁর এক্‌লারই হয়নি—আরো অনেকেরই হ'য়েচে; এবং মদ খাওয়া বা গো-হত্যে বেহ্মহত্যে তাদেরো অনেকেই করেনি।

কিন্তু নয় নম্বর কোনো কথাই মানেন্‌ না। তাঁর ধারণা যে ঈশ্বর অত্যন্ত অবিচার ক'রে অথবা ভুল ক'রে তাঁকে এই ব্যাধিগ্রস্ত ক'রেচেন। গোটা হাঁসপাতালটায় প্রায় দেড় শো রোগীর চিকিৎসা হ'চ্চে এক একবারে—তা' ছাড়া সর্ব্বদাই তো কতো রোগী আসচে, যাচ্চে। এই হাঁসপাতাল ছাড়া আরো কতো হাঁসপাতাল র'য়েচে, এবং সমস্ত হাঁসপাতালের বাইরে আরো কতো রোগী জীবনটাকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে চ'লেচে। এই যে হাজার হাজার লোক—এরা প্রত্যেকে পাপী, এবং নিজেদের পাপের ফলভোগ ক'রচে, কিন্তু নয় নম্বর নিষ্পাপ, নির্দ্দোষ; এবং তাঁর কথাবার্ত্তায় স্পষ্ট বুঝতে পারি—তাঁর সম্বন্ধে ভগবানের বিধানের কোথাও একটি ব্যতিক্রম ঘ'টে গেচে!

নয় নম্বর বলেন—মশাই, একটা দিন থিয়েটারে কি বায়োস্কোপে যাইনি—

হো হো ক'রে হেসে উঠে বাইশ নম্বর বলে—সেই না যাওয়ার পাপেই তো এমনটা হ'য়েচে আপনার! হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়ে নিয়মিত যাবেন—সাবধান, যে ভুল একবার ক'রেচেন, সে ভুল আর ক'র্‌বেন না যেন।

একটু বিরক্ত হ'য়ে নয় নম্বর বলেন, থিয়েটার বায়োস্কোপের পোকা ছিলেন, এ রকম রোগীরও তো এখানে

অভাব নেই; আপনার কথাই যদি ঠিক হবে, তবে তাঁরাই বা এই শ্রীঘর বাস করূচেন কেন?

অট্টহাস্য ক'রে বাইশ নম্বর বলে, এটা আর বুঝ্‌লেন না, সেই পোকা হবার পাপেই তো হ'য়েচে! পাপ একটা না একটা ঘটবেই—যেদিক দিয়ে হোক; নইলে কি অম্নি অম্নি হয়?

নয় নম্বর আরো বিরক্ত হ'য়ে ওঠেন। নয় নম্বরের মাঝে মাঝে এমন ধারণাও হয় যে নিশ্চয় ডাক্তার ব্যাটারাই কোথাও গোলমাল ক'রে ফেলেচে। ওরাই হয় তো একদিন নিজেদের ভুল বুঝ্‌তে পারবে। ডাক্তার-গুলো কি এমন অপদার্থ? অত্যন্ত মিছিমিছি তাঁকে কি ঝঞ্ঝাটের ভেতরেই ফেলে রেখেছে! ওই যে একদিন মুখ দিয়ে রক্ত উঠেচিল, ওই যে জ্বর, ওই যে ওজন ক'মে যাওয়া—ওসব হয় তো একদমই বা'জে। তাঁর ধাত্‌টা একটু চড়া, তাইতেই বোধ হয় ওরকম একটু উপসর্গ মাঝে মাঝে দেখা দেয়! এই হাঁসপাতালে ভর্ত্তী হওয়া হয় তো তাঁর একটি স্বপ্নই মাত্র; স্বপ্নের ঘোর কেটে গেলে তিনি দেখ্‌বেন যে তাঁর কোন দিনই কিছু হ'য়েচিল না—দিব্যি সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ মানুষ তিনি, এবং পৃথিবীর পূর্ণ উৎসবের ভেতরেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন!...

তিনি এমন কথাও আবার ব্যক্ত করেন যে, আদৌ যদি কিছু তাঁর হ'য়েও থাকে, তবে তা' এতোই সামান্য যে আসলে তা' কিছুই নয়। এই যে আর সবাই র'য়েচে এদের মতো এতো বেশী, এতো বিশ্রী—একি তাঁর হ'তে পারে? প্রত্যেকেরই চাইতে তাঁর জীবনী-শক্তি অনেক বেশী, তিনি যে মৃত্যুর কবলে কখনো প'ড়তে পারেন (অপর পেসান্ট্‌গুলোর মতো) এমন অসম্ভব ব্যাপার ঘট্‌তেই পারেনা।

এসবের পরে কোনো মন্তব্য নিরর্থক। নিজেকে নিজে প্রতারিত ক'রে ক'রেই যদি কেউ একটু স্বস্তিতে থাক্‌তে পারে তবে তাই থাকুক। নিজের সম্বন্ধে তা'কে সচেতন করাও সম্ভব নয়, আর সম্ভব হ'লেও তা'র মস্তক আরো বিগ্‌ড়ে দেওয়া সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়।

বাইশ নম্বর আবার সম্পূর্ণ বিপরীত। তা'কে যে এই ব্যাধিতে ধ'রেচে—এ তার যেন মস্ত বড় গর্ব্ব। মাঝে মাঝে সে এতো বুক ফুলিয়ে হাঁটে, যে তা'কে সাবধান ক'রে দেবার দরকার হয় যে অতো বুক ফুলিয়ো না—চট্‌ ক'রে লাংসের সরু একটা আর্টারি ছিঁড়ে যেতে পারে!

কোনো খুঁত্‌খুঁতে স্বভাবের বা মন-মরা-হ'য়ে-থাকা কোনো রোগীকে সে দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না। নিজের অসুখকে সে ভ্রূক্ষেপ করেনা,—অপরের ভীরুতাকে সে বিদ্রূপে জর্জরিত ক'রে তোলে।

মাঝে মাঝে ছাড়াও মাসে মাসে প্রত্যেক রোগীর নিয়মিত একবার ক'রে বুক পরীক্ষা করা হয়—কতোখানি উন্নতি হ'চ্চে দেখ্‌বার জন্যে। প্রায় সকলেরই কিছু না কিছু উন্নতি দেখা যায়, তবুও চার্ট হাতে ক'রে ফিরে আস্‌বার সময়ে কারো মুখ তেমন প্রসন্ন দেখা যায় না। এক ঘুমে রাত্‌ পোয়ানোর সাথে সাথেই কেন অসুখটা ভালো হ'য়ে যাচ্চে না—বোঝা যায় এই-ই সকলের আন্তরিক অভিযোগ। বাইশ নম্বরের বুকের অবস্থা কিন্তু প্রায় একরকমই থাকে; বরঞ্চ কোনো কোনো সময়ে নতুন উপদ্রবের চিহ্নই ধরা পড়ে; কিন্তু তখনই ফূর্ত্তি যেন তা'র বেশী হ'য়ে ওঠে। নিজের বিছানার কাছে এসে একটা উর্দ্দু গজল ধ'রে দিয়ে সায়ের চেয়ারখানাকে সে এমন বাজাতে সুরু ক'রে যে অনেকেরই সন্দেহ হয় ওটার এম্নি ক'রেই একদিন পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘট্‌বে।

একদিন একটি মহিলা বাইশ নম্বরের কাছে বেড়াতে এলেন। পরে শুন্‌লুম তিনি নাকি ওর দিদির এক বন্ধু। হাঁসপাতালের কাছেই বাসা, ওর দিদির চিঠিতে ওর কথা শুনে বেড়াতে এসেচেন।

মহিলাটি খুব হেসে হেসে কথা ব'ল্‌চিলেন। যে আব্‌হাওয়ার ভেতরে আমরা থাকি, সেখানে তাঁর এই অতিরিক্ত চাঞ্চল্য এবং হাসি বড়ো অস্বাভাবিক ঠেক্‌চিল। কিন্তু আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে তিনি এখানকার অধিবাসী নন্‌,—তিনি যে পৃথিবীতে থাকেন, সেখানে সবাই-ই এই রকম চঞ্চল, এই রকমই তা'দের বেশ-ভূষা, এই রকমেই তা'রা হাসে! এখানকার বেদনা তা'দের সম্পূর্ণ অপরিচিত।

মহিলাটি বল্‌চিলেন, আচ্ছা আপনি (তিনি একটি ভালো স্যানাটোরিয়ামের নাম ক'র্‌লেন) ওখানে গেলেই

পারেন? আমার পরিচিত একটি মেয়ে এই অসুখ হ'য়ে সেখানে ছিলো। হাঁসপাতালের চাইতে সেখানকার বন্দোবস্ত সব দিক দিয়েই ভালো, আর জায়গাও অতি চমৎকার—

বাধা দিয়ে বাইশ নম্বর ব'ল্‌ল, সেখানে খরচ কত ব'ল্‌তে পারেন?

—খরচ? দেড়শো টাকা হ'লেই সেখানে আপনি বেশ থাক্‌তে পারেন।

বাইশ নম্বর ব'ল্‌ল, আচ্ছা আপনি আমায় মাসিক দেড়শো টাকা ক'রে দিতে পারেন? তা'হলে না হয় একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তুম!

একটু অপ্রতিভ হ'লেও মহিলাটি ব'ল্‌লেন, না, আমি বোধ হয় দিতে পার্‌বো না, তবে আপ্‌নার জানার জন্যে ব'ল্‌ছিলুম।

—ওঃ জানার জন্যে?…বাইশ নম্বর হেসে বল্‌ল, কোথায় আমার সব চেয়ে ভালো বন্দোবস্ত পাওয়া সম্ভব, সেটা আমি নিজেই এতো বেশী জানি যে অপরের কাছে শুন্‌বার মোটে প্রয়োজনই বোধ করি না। আপনি ওই স্যানাটোরিয়ামের কথা ব'ল্‌লেন, কিন্তু আমি জানি সুইট্‌জারল্যাণ্ডে ডাক্তার রোলিয়ারে লেঁজা স্যানাটোরিয়ামে বা আমেরিকায় সারানাক্ লেক্ অথবা অ্যাডিরন্‌ডাকে মাসিক চার পাঁচশো টাকা খরচ ক'রে থাক্‌তে পার্‌লে আরো ভালো হয়। বুঝ্‌লেন, জানি সবই, কিন্তু কেন করি না, সেটা বুঝ্‌বার ক্ষমতা আপ্‌নার নেই।—বাইশ নম্বর একটু উত্তেজনার সাথে ব'ল্‌ল, আপনি আমার দিদির বন্ধু, কিন্তু দিদি কি অবস্থায় তা'র শ্বশুর-বাড়ী দিন কাটায়—কোনো দিন না খেয়ে, কোনো দিন আধপেটা খেয়ে, দুর্দান্ত স্বামীর হাতে সহস্র লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে—সে খোঁজ কি আপনি রাখেন, বা রাখ্‌বার প্রয়োজন বোধ করেন? সেও আপনাকে তা'র সব কথা জানায় না। আপনি যে তার সাথে আপনার পরিচয় আছে এইটুকু স্বীকার করেন, ধনী বন্ধুর এইটুকু করুণাকেই সে হয় তো সৌভাগ্য ব'লে মনে করে।… নিজের মা বউকে এক বন্ধুর বাড়ীতে রেখে হাঁসপাতালে এসে প'ড়ে আছি। একটি ছেলে আছে, মাঝে মাঝে হাঁসপাতালে আসে—দু'বেলা দুটি ভাত ছাড়া আর কিছু তা'র জন্যে বন্ধু বরাদ্দ করেন নি। বিকেল বেলা আসে, মুখখানা একেবারে শুক্‌নো আম্‌শী—লুকিয়ে নিজের পাউরুটিখানা হাতে দিয়ে দিই, পকেটে ক'রে বাসায় ফিরে যায়। এখানে সম্পূর্ণ ফ্রি-বেড্ পেয়েছি, তাই-ই চালাতে পারিনে। এই যা'র অবস্থা, তা'র কাছে অপর সাত রকম গল্প করুন, কিন্তু এই ধরণের কোনো লম্বা চওড়া কথা ব'লে দয়া ক'রে তা'কে ইচ্ছে ক'রে আহত বা অবমানিত ক'রবেন না।

একেই তো এই হাঁসপাতাল সকলের কাছে বিভীষিকা—পারত্ পক্ষে কেউই এমুখো হ'তে চায় না; যদি কারো কাছে কোনো ভিজিটার আসে, রোগীরা আগ্রহের সাথে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তা'র কথা কৌতূহলের সাথে শোনে। কোনো এক নতুন জগতের নতুন বার্ত্তা যেন সে বহন ক'রে নিয়ে আসে। কোনো মহিলার আবির্ভাব তো একেবারেই কদাচিৎ, কাজেই এঁর সাথে এরকম রূঢ় আচরণ করাতে বাইশ নম্বরের কাছাকাছি বেড্‌এর কয়েকজন রোগী একটু অনুযোগ ক'রে ব'ল্‌ল—যাই বল, তোমার ওরকম বলাটা মোটেই উচিত হয় নি। নিশ্চয়ই উনি মনে মনে অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন।

বাইশ নম্বর অম্লান বদনে বল্‌ল, ওঃ, তাই না কি? আচ্ছা, তা'হলে আজ্‌কে হাঁসপাতালের ভাত চাট্টি বেশী ক'রে খাবো'খন।

কেউ ওকে এতটুকু মৌখিক দরদ দেখিয়ে কথা কয়—এ যেন ও মোটে সইতেই পারে না। বিশেষ ক'রে সে যদি সুস্থ লোক হয়, তা'হলে তা'র ওপরে ত' ও আরো ক্ষেপবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে ওর এক বন্ধু ওকে দেখ্‌তে এসেছিল। সে বলার মধ্যে ব'লেছিল, বাস্তবিক—তোমাদের জীবন সত্যিই বড়ো miserable!

আর কোথায় পালায় বন্ধু! বাইশ নম্বর বেচারিকে একেবারে ক্যাঁট্ ক্যাঁট্ ক'রে চেপে ধ'র্‌ল, বল্‌ল: ত্যাখো, don't say so. কি ক'রে জান্‌লে তুমি যে আমাদের জীবন miserable? আমি তো মনে করি আমরা quite happy! রাস্তায় ফুট্‌পাথের ওপরে কুষ্ঠ রোগীগুলোকে দেখেছো? নাকটা খ'সে প'ড়ে গেছে,

তা'র সাথে বিশেষ কেউই মেশেনা—মিশ্‌বার প্রয়োজনও বোধ করেনা।…আমরা জান্‌তে পেরেচি অসিতা তা'কে সাহায্য করে। প্রত্যেক দিন তা'কে নিজের পয়সা দিয়ে ফল কিনে দেয়। বেচারার নড়াচড়া ক'র্‌বার সাধ্য নাই—এতো রুগ্ন ও দুর্ব্বল। তা'র বিছানার ওপরে ব'সে অসিতা ফলগুলি ছাড়িয়ে প্লেটের ওপরে রাখে। তা'র পরে আস্তে আস্তে লোকটার মুখের কাছে তুলে ধরে। লোকটির করুণ দুটি চোক্ থেকে কৃতজ্ঞতার তপ্ত অশ্রু দুই গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

আমরা সোয়েটার গায়ে দিয়ে, লেপ কম্বল জড়িয়ে, পায়ে মোজা এঁটে আরাম ক'রে শুয়ে থাকি। ভগীরথ ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমাদের কাজগুলো কর্‌তে থাকে; অতি পাত্‌লা তালিমারা একটা পুরোণো সুতোর জামা ছাড়া তা'র গায়ে আর কিছুই ছিলনা। কিছু দিন ধ'রে তা'র গায়ে একটি নতুন ফ্লানেলের সার্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, জিজ্ঞেস ক'রে জেনেচি যে অসিতা টাকা দিয়েছিল, তৈরি ক'রে নিয়েচে।

একজন কুলি লোক যদি তা'র সমস্ত হীনতা নিয়ে লজ্জিত হ'তে থাকে, একজন ভগীরথ যদি দারিদ্র্যের জ্বালায় জর্জ্জরিত হ'তে থাকে—তাতে এই দুনিয়ার কা'র যে কতোখানি এসে যায়—সে আমি জানি। কিন্তু কারো না এসে যাক্, অসিতার যায়। তাইতেই হয় তো সে অপর সমস্ত রোগীর কৌতূহল-দৃষ্টির সামনে, অপর নার্সদের ঠাট্টা-তামাসার মাঝে এই সব হতভাগ্যদের পাশে অতি অনায়াসে এগিয়ে যায়, তাদের জন্যে এতটুকু কিছু ক'র্‌তে পার্‌লে তা'র চোকে মুখে তৃপ্তির রেখা ফুটে ওঠে!

অসিতার এই মহত্ত্বের সামনে আমাদের এতটুকু নীচতা বা অশোভনতা প্রকাশ পাবে কোনো কাজে, এ কথা ভাবতেই আমি মনে মনে লজ্জিত হ'য়ে উঠি; কিন্তু এগারো নম্বর হয় তো এ সব বুঝ্‌বেনা।

আবার ভাবচি, এগারো নম্বরেরও দোষ নেই। এই স্থানই মোটে অসিতার জন্যে নয়। ছোট প্রবৃত্তি, অপ্রয়োজনীয় চিন্তা, অবুঝের মতো কথাবার্ত্তা—এই সব নিয়েই তো আমাদের জগৎ! বাইরের পৃথিবীর লোকেরা যখন আনন্দ ক'র্‌চে, উৎসব ক'র্‌চে, বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন কর্ম্মের ভেতর দিয়ে আহরণ করা সম্পদে অন্তর পূর্ণ ক'রে তুল্‌চে—আমরা তখন অ্যাস্‌পিরিন্ পাউডার বা ক্যাল্‌সিয়াম ক্লোরাইডের নিন্দে কর্‌চি, হাঁসপাতালের ব্যবস্থার মুণ্ডপাত কর্‌চি, ডাক্তারকে অভিশাপ দিচ্চি অথবা বড় জোর কল্‌কাতা বড়ো কি বম্বে বড়ো, আর দার্জ্জিলিং সুন্দর কি উটকামণ্ড সুন্দর—এমনই একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে ব'সে কলহ কর্‌চি।

মাঝে মাঝে ওয়াই. এম্. সি. এ থেকে আমার একটি বন্ধু—মুকুলদা—আমাকে দেখতে আসেন। তিনি হুড়্ হুড়্ ক'রে কতো কথাই বলেন। জার্ম্মাণীতে জু-দের দমন করবার ব্যাপারে হার-হিট্‌লার কতোখানি জাষ্টিফায়েড্—বিশ বাইশ বছর রিপাব্লিক উপভোগ করা সত্ত্বেও ঘরোয়া বিশৃঙ্খলা চায়নাকে কতোখানি পঙ্গু ক'রে রেখেচে—হোয়াইট্ পেপার প্রোপোজাল সম্বন্ধে উইন্‌ষ্টন্ চার্চ্চিল আর লর্ড লয়েডের কতোখানি মাথা ব্যথা—মুকুলদা যখন বল্‌তে থাকেন, শুনে বিস্মিত না হ'য়ে পারিনা। ইঞ্জেক্‌শানের নিড্‌ল্, ষ্টেথোস্কোপ আর ইন্‌হেলেশান্ মাস্ক্ ছাড়া পৃথিবীতে আরও কিছু ঘ'টে থাকে না কি? এবং সে সব সম্বন্ধে খোঁজ রাখবারও দরকার হয় না কি কিছু? মুকুলদা বলেন, রবীন্দ্রনাথের—

হঠাৎ যেন চম্‌কে উঠি। রবীন্দ্রনাথ! একটা যেন অত্যন্ত পরিচিত নাম—হ্যাঁ, একটু একটু মনে পড়ে বহু দিন আগে এই রকম একটা নাম যেন জান্‌তুম! ইচ্ছে হয় মুকুলদাকে জিজ্ঞেস করি—আচ্ছা মুকুলদা, রবীন্দ্রনাথ একজন খুব বড়ো কবি—তাই না? কিন্তু জিজ্ঞেস ক'র্‌তে আবার কেন যেন লজ্জা বোধ হয়। আমি যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একজন কীট ছিলুম এ কথা বহু দিন ভুলে গেচি। 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে'—এটুকু যদি বহু কষ্টে মনে পড়ে, কিন্তু তার পরে আর 'নব-যৌবনা বরষা' মনে পড়েনা, 'ঐ আসে ঐ—' পর্য্যন্ত মনে হ'তেই এক এক ক'রে ভেসে আস্‌তে থাকে, টেম্পারেচার—পাল্‌স্—ব্লাড্—এক্স্‌পেক্‌টোরেশান্—এক্স্‌রে…

দুপুরের খাওয়া সারা হ'য়ে গেল। আমরা একটু

জটলা ক'রুচি। এখন অসিতা এসে সবাইকে কড্‌লিভার অয়েল দিয়ে যাবে; প্রায় প্রত্যেকেই যা'র যা'র বেডএ আছে। শুধু কুড়ি নম্বর একটু বাথরুমে গেচে।

বাইশ নম্বরের মাথায় একটু দুষ্টু বুদ্ধি চাপলো।

কুড়ি নম্বর সাধারণতঃ শোবার সময়ে তা'র টুকটুকে লাল আলোয়ানখানাকে মাথায় জড়িয়ে রেখে দেয়। আল্‌গা থাকলে তা'র কান না কি কন্‌কন্‌ করে। শুধু নাকটা একটু বেরিয়ে থাকে—তা'ও হঠাৎ বোঝা যায়না, আর সমস্ত মাথাটাকেই ঢেকে রাখে। বাইশ নম্বর কুড়ি নম্বরের এই অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে একটু মজা ক'রবার চেষ্টা ক'রুল। ক'রুল কি কুড়ি নম্বরের বেডের ওপরে দুটো বালিশ এনে লম্বালম্বি রেখে র‍্যাগ্‌ দিয়ে ঢেকে দিলো, আর শিয়রের দিকটায় লাল আলোয়ানখানা বালিশের ওপরে এমন ভাবে গুটিয়ে রাখ্‌লো—যে দূর থেকে হঠাৎ দেখলে অবিকল মনে হবে যে কুড়ি নম্বর কাত হ'য়ে শুয়ে আছে।

সবাই তো চুপ্‌ চাপ্‌ ব'সে আছি, ইতিমধ্যে কড্‌লিভার নিয়ে অসিতা এলো। চামচ দিয়ে সবার মুখে ঢেলে দিতে দিতে বিশ নম্বরের কাছে গিয়ে অসিতা আস্তে আস্তে বল্‌ল—কড্‌লিভার!

কিন্তু কোনো সাড়া নেই। অসিতা হয় তো ভাবলো কুড়ি নম্বরের তন্দ্রা মতো এসেচে—শুনতে পায় নি। সে আস্তে আস্তে তা'র গায়ে হাত দিলো।

কিন্তু পেছন থেকে ঘরশুদ্ধ আমরা হেসে উঠ্‌লুম এবং সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা টের পেয়ে অসিতাও হেসে ফেল্‌ল।...

সহসা কুড়ি নম্বরের আবির্ভাব! তা'কে নিয়ে এই মাত্র যে রসিকতা হ'ল এটা সে মুহূর্ত্তের ভেতরে বুঝ্‌লো: বুঝেই একেবারে নিজমূর্ত্তি ধারণ ক'রুল।

আধঘণ্টাব্যাপী আমাদের সবাইকে অত্যন্ত অভদ্র ভাষায় সে একেবারে যাচ্ছেতাই ক'রুতে লাগ্‌লো। বাইশ নম্বরও ছাড়বার পাত্র নয়,—সে আবার তা'কে উস্কে দিতে লাগ্‌লো মাঝে মাঝে টিপ্পুনি কেটে কেটে।

আমি বাস্তবিকই একেবারে থ' হ'য়ে গেলুম। এই তো আমাদের জীবন, আর এই তো আমাদের মনোবৃত্তি! এতোটুকু আমোদ, এতোটুকু হাসি-তামাসা—যা' না কি মানুষের মনকে সমস্ত একঘেয়েমির ভেতরে একটু সরস ক'রে তোলে, যে সব রসিকতা মানুষ অহরহ ক'রে একটু ফূর্ত্তি পাচ্চে—তারই ওপরে আমরা এতো বীতরাগ! অত্যন্ত ভুল ক'রেই ভেবেছিলুম যে কুড়ি নম্বর নিজেও এটাকে বেশ উপভোগ কর্‌বে। কুড়ি নম্বরের এই তুচ্ছ কারণ নিয়ে মাথা খারাপ ক'রে এই চটাচটি সমস্ত আব্‌হাওয়াটাকে আরো কুৎসিত ক'রে তুল্‌ল। আমরা আনন্দকে সহ্য ক'রতে পারিনা—আনন্দ আমাদের কাছে কেন আস্‌বে? সে আমাদের জন্যে নয়।

আমরা এর ভেতরেই দিব্যি সব দিকে মানিয়ে নিয়ে দিন কাটাচ্চি, কিন্তু আমার কষ্ট হয় অসিতার জন্যে। আজ্‌কের অপমান তো তা'কেও স্পর্শ ক'রেচে! তার বাস ক'রবার বৃহৎ জগৎ আছে, দেহ-মনের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য আছে, জীবনকে সার্থক ক'রে তুল্‌বার সহস্র পন্থা আছে। কিন্তু সেই পৃথিবী ছেড়ে এসে আমাদের এই একান্ত অস্বাভাবিকতার ভেতরে যে সে বাস ক'রুচে শুধু তাই নয়, সেই জগতের সাথে যেন তা'র কোনো সম্পর্কই নেই, আর তাকে সে যেন চায়ও না। তা'র কপালে শ্রান্তি, বিরক্তি, অতৃপ্তির রেখা কোনো মুহূর্ত্তে ফুটে উঠ্‌তে দেখিনি—এই যেন তা'র আপন সংসার!

অসিতার ডে-ডিউটি ফুরিয়ে আসে, সুরু হয় নাইট্‌-ডিউটি।

নিয়ম অনুসারে আমাদের সমস্ত ঘরের আলো রাত্রি ন'টার সময়েই নিভিয়ে দেওয়া হয়। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ যে ঘরে এসে বসেন, তারি ঠিক সাম্নেই আরেকটি ছোট ঘর নাইট্‌ ডিউটির নার্সে'র বস্‌বার স্থান। ন'টার সময়ে সমস্ত রোগীদের কাছে একবার ঘুরে অসিতা গিয়ে সেখানে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে।

আমার বেড্‌ থেকে আমি অসিতাকে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই; ব'সে ব'সে হয় তো একটা কিছু সেলাই ক'রুচে অথবা একখানা ম্যাগাজিনের পাতা নাড়াচাড়া করুচে।

আস্তে আস্তে রাত্রি গভীর হ'য়ে আসে। সমস্ত হাসপাতাল ঘুমিয়ে পড়ে—মাঝে মাঝে শুধু দুটি একটি রোগীর কচিৎ কোনো সময়ে কাসির শব্দে শোনা যায়,

অথবা কেউ হয় তো বাথ্‌রুমে যাচ্ছে, তা'র জুতোর শব্দ পাওয়া যায়।

কোনো রাত্রে হয় তো এক সময়ে ঘুমটা ভেঙে যায়। সামনের দিকে নজর প'ড়্‌তেই দেখ্‌তে পাই অসিতা ঠিক একই রকম ভাবে ব'সে আছে, সেই কিছু একটা সেলাই ক'র্‌চে বা একখানা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে; বিজলী-বাতির তীব্র আলো তা'র জাগরণ-ক্লিষ্ট মুখখানির ওপরে এসে ছড়িয়ে প'ড়েচে।

ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজে। প্রত্যেক ঘণ্টায় নার্সকে সমস্ত ওয়ার্ডে একবার ক'রে রাউণ্ড দিয়ে যেতে হয়।

অসিতা উঠ্‌লো।

কয়েকটি রোগীকে লক্ষ্য ক'রে ক'রে অতিক্রম ক'রে এসে ষোলো নম্বর—সেই কুলিটার কাছে এলো। লোকটার গা থেকে কম্বলখানা স'রে গিয়েচে। অতি আস্তে আস্তে—অতি সন্তর্পণে কম্বলখানা তুলে অসিতা লোকটার গায়ে দিলো, ঘুমের ঘোরে সে আরামে পাশ ফিরে শুলো।

আরো কয়েকটি রোগীকে অসিতা তাকিয়ে তাকিয়ে অতিক্রম ক'রে এলো। একজন রোগীকে এপাশ ওপাশ ক'র্‌তে দেখে অত্যন্ত মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস ক'র্‌ল—ঘুমুতে কষ্ট হ'চ্চে কি?

সে উত্তর দিল—হ্যাঁ।

অসিতা আউন্‌স্‌ গ্লাশে ক'রে একটু ঘুমের ওষুধ এনে তাকে খাইয়ে দিল।

আমি জেগে থাক্‌লেও একটুও নড়াচড়া ক'র্‌ছিলুম না, অসিতা আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

আঠারো নম্বরের রাত্তিরে ঘাম হয়। অসিতা ধীরে ধীরে কাছে এসে তা'র কপালে হাত দিল। তা'র পরে তার ডান হাতখানা অত্যন্ত সাবধানে তুলে নিয়ে পাল্‌স্‌টা দেখ্‌ল।

রোগীর ঘুম পাছে ভেঙে যায় এখন হয় তো সে ভয় থাকতে পারে, কিন্তু অন্যান্য সময়েও অসিতার প্রত্যেকটি কাজে এই রকম সতর্কতা দেখ্‌তে পাই। কোনো রোগীকে কোনো কারণে এতটুকু স্পর্শ করার ভেতরেও যেন তা'র অসীম মমতা প্রকাশ পায়—তার শান্ত দুটি চোকে যেন সর্ব্বদাই একটি স্নেহের দৃষ্টি। কর্ত্তব্যের সাধারণ বাঁধা নিয়মে সে চলেনা, সর্ব্ব কাজে তা'র একটি সুপরিস্ফুট আন্তরিকতা। এই হতভাগ্যদের একটু তৃপ্তির ভেতর দিয়ে সে যেন আপন তৃপ্তি খুঁজে পায়!

সেদিন রাত্রে ঘুমটা এসেছিল ভালোই, কিন্তু রাত্তির প্রায় গোটা তিনেকের সময়ে তিন নম্বরের কাসির শব্দে সে ঘুম ভেঙে গেল।

তিন নম্বর অত্যন্ত কাস্‌চে, জেগে জেগে শুন্‌তে লাগ্‌লুম। শেষে আর না থাক্‌তে পেরে উঠ্‌লুম। বেচারা নিজেও ঘুমোতে পার্‌চেনা, আরো রোগীর ঘুম হয় তো ওর কাসির শব্দে ভেঙে যাবে। কিন্তু অসিতা আস্‌চেনা কেন?

অসিতার ঘরের দিকে নজর প'ড়্‌তেই দেখ্‌লুম অসিতা তা'র সামনের টেব্‌লটার ওপর দুই হাত রেখে তা'র ভেতরে মাথা গুঁজে ব'সে আছে।

অসিতা কি ঘুমিয়ে প'ড়েচে?...আস্তে আস্তে পা ফেলে অসিতার কাছে এগিয়ে গেলুম, সত্যিই তাই, অসিতা ঘুমিয়েই প'ড়েচে। সামনে একখানা ম্যাগাজিন খোলা প'ড়ে র'য়েচে, হয় তো একটুক্ষণ আগেই ওরি পাতায় চোক্ বুলোচ্ছিল।

এবারে আমি একটু বিব্রত হ'য়ে পড়্‌লুম। অসিতাকে কি ডাক্‌ব?

কিছুদিন আগেই একটি অতি অপ্রিয় ঘটনা ঘটে গেচে। আমাদের ঘরের পেছনের বারান্দায় একটি রোগীর একেবারে চোখের সামনে একটি আলো ঝোলানো আছে। সেটা অবিশ্যি নিভিয়েই দেওয়া হয়, কিন্তু কয়েকটি ওয়ার্ড-বয় আছে এমন বদ—প্রায় রাত্তিরেই তা'রা যখন খুশী আলোটা জ্বালিয়ে চলা-ফেরা করে, আর কখনো কখনো হয় তো তিন চারজনে মিলে ব'সে হল্লাই কর্‌তে থাকে।

ওই রোগীটির অসুবিধা হ'ত সব চাইতে বেশী করে।

একদিন মাঝরাত্রে কি জন্যে একটি চাকর খট্ ক'রে ওই আলোটা জ্বালাতেই রোগীটির ঘুম ভেঙে গেচে—আর সে এমন চ'টে গেচে যে নিজেকে আর সাম্‌লাতে

পারেনি। ঝড়ের মতো ছুটে তখন যে নার্স নাইট্‌-ডিউটিতে ছিলো তা'র কাছে এসে খুব খানিক ঝগড়া ক'রে গেল।

তা'র হয় তো মেজাজ খারাপ করা ঠিক হয়নি, কিন্তু সেটা কি ক্ষমার্হ নয়? শরীর-মনের কতো রকম অশান্তি নিয়ে সারাটা দিন কাটে, রাত্তিরটুকু শুধু যা' একটু বিস্মৃতি! তখনো যদি এই রকম জ্বালাতন হ'তে হয় তবে একজন অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে কি তা' অত্যন্ত বিরক্তিজনক নয়?

কিন্তু (এক অসিতার ছাড়া) অপর নার্সের তা'তে কিছুই এসে যায়না এবং কোনো রোগীর এতটুকু বেয়াদপীও তা'রা সহ্য ক'রুতে প্রস্তুত নয়।

পরদিনই রেসিডেণ্ট্ ডাক্তারের কাছে নার্স রোগীটির বিরুদ্ধে বিশ্রী রকম ভাবে রিপোর্ট ক'রুলে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ আমাদের সহায় আছেন, এবং তিনি প্রকৃত সহৃদয় এবং বিবেচক লোক—কাজেই আর বেশী দূর ব্যাপারটা গড়ালনা। নইলে হয় তো এই রোগীটির হাসপাতালই ছাড়্তে হ'ত!

চাকরগুলো তো দূরে যা'ক্, নাইট্‌-ডিউটীতে থাক্‌বার সময়ে অপর প্রায় সব ক'টি নর্সের ভেতরেই বিবেচনার অভাব দেখ্‌তে পাই। সব ওয়ার্ডের সব কয়েকজন হয় তো এসে ওই ঘরটিতে একত্র হ'ল, সুরু হ'ল ব্রীজ খেলা। তা'দের সেই কথাবার্ত্তার শব্দ আমাদের কাণে ভেসে আসে। দুটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ নার্স—তা'রা হয় তো P. G. Wodehouse এর একখানা বই নিয়ে খানিকটা সস্তা হাসাহাসি ক'রচে। একটি দিশি নার্স—তার বিদ্যার দৌড় হয় তো কোনোটার সাথেই খাপ খাচ্চেনা, সে সবার চারধারে ঘোরাফেরা ক'রে একটু হেসে, একটু কথা বলে, কাউকে বা একটু ঠাট্টা ক'রে, কাউকে বা একটা প্রশ্ন ক'রে নিজেকে যথাসম্ভব মানিয়ে নেবার চেষ্টা ক'রুচে। রাতটাকে যেন কোনোমতে ভোর ক'রে দেওয়া!…

রাউণ্ডে বেরুবার সময়েও স্বস্তি নেই। ফিস্‌ফাস্ কথা, নিরর্থক গুল্‌পগা হিহি-হুহু হাসি, জোরে জোরে চলার ব্যাপ্রে সাথে কাপড় ও জুতোর শব্দ—ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেলের কথা ছেলেবেলায় প'ড়েছিলুম, এক এক সময় মনে হয় এরা যেন তার (এবং অসিতারও) মূর্ত্তিমতী অপমান!…

এরা বেশ আছে। কোনমতে হাঁসপাতালের ডিউটিটা শেষ ক'রে ছুটি পাওয়া মাত্তর বাইরে। ওরা ফুর্ত্তির আলোর পোকা, অসিতার সাথে ওদের কোনো সংস্রব নেই। সর্ব্ববিষয়ে অসিতাকে সম্পূর্ণ একলা দেখ্‌তে পাই। এখানকার সাথে ওদের শুধু চাকুরী এবং অর্থের সম্পর্ক; কিন্তু অসিতা যেন এটাকেই নিজের জগৎ ক'রে নিয়েচে, আমাদের দুঃখ, দুর্দ্দশার অংশও সে যেন গ্রহণ ক'রেচে।

অসিতা ঘুমিয়ে আছে। রাতের পর রাত্ এই রকম জাগ্‌চে, আজ্‌কেও জেগেচে। শরীরটা হয় তো ওর আজ্‌কে তত ভালো নেই, রাত্রিশেষে মুহূর্ত্তের জন্যে দু'টি চোখে ক্লান্তির অবসাদ নেবে এসেচে।

একবার ভাব্‌লুম—ডাক্‌বোনা। কিন্তু তিন নম্বর যে রকম কাস্‌চে, তা'তে ওর বুকে হঠাৎ খারাপ একটা কিছু ঘটা বিচিত্র নয়। ওর কয়েক দিন ধ'রে গলার উপসর্গ হ'য়েচে, জানি একটা ওষুধ গলার ভেতরে লাগিয়ে দিলেই অনেকটা উপশম হবে।

আস্তে আস্তে ডাক্‌লুম—অসিতা!…কোনো সাড়া পেলুম না। এবারে সত্যিই বড়ো মায়া হ'ল। কিন্তু তিন নম্বরের দম একেবারে বন্ধ হ'য়ে আস্‌চে।…অসিতার ওপরে আমার অসীম বিশ্বাস, সে যে কিছু মনে ক'রুবে না তা' জানি। ভরসা ক'রে আস্তে আস্তে তা'র গায়ের ওপর হাত রেখে ডাক্‌লুম—অসিতা!

এবারে ধড়্‌মড়্ ক'রে অসিতা উঠে ব'স্‌ল। তিন নম্বরের কথা ব'ল্‌লুম। তাড়াতাড়ি অসিতা ম্যাণ্ডেল সলিউশানের শিশি নিয়ে তিন নম্বরের কাছে ছুটে গেল।

ভোর বেলা অসিতার ছুটি। যতটুকু যা' কাজ ছিলো সব সারা ক'রে, নাইট্ রিপোর্ট খাতায় লিখে অসিতা এসে আমার কাছে দাঁড়াল। আমি একটু উৎসুক হ'য়ে তা'র দিকে তাকালুম।

অসিতা একটু সঙ্কোচ-জড়িত স্বরে ব'ল্‌ল, দেখুন, কাল সন্ধ্যেবেলা থেকেই মাথাটা বড্ড ধ'রে ছিলো, হঠাৎ একটু ঘুমিয়ে প'ড়েছিলুম। দয়া ক'রে যেন এটা ডাক্তারের কাছে আর ব'ল্‌বেন্‌না।

আমি স্তব্ধ হ'য়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। আমি ওর সম্বন্ধে ডাক্তারের কাছে কোনো অভিযোগ ক'রতে পারি এ কথা অসিতা ভাবতে পারলো ? যে অসিতা ডিউটিতে থাকলে আমাদের মাঝখানে একটি স্বর্গের দেবীর আবির্ভাব অনুভব করি, যা'র সাথে এদের আর কারো তুলনা ক'রবার কথা ভাবতেও আমি কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠি, তারি এতো তুচ্ছ একটি ত্রুটি গ্রহণ ক'রবো—আমি ? অসিতার মনে কেমন ক'রে এসব কথা এলো ?

ও আমাকে অবিশ্বাস করে এ কথা ভেবে সত্যিই ব্যথা পেলুম।

ও যে অসুস্থ, তা'র ছায়া ওর সমস্ত মুখখানাকে ম্লান ক'রে ঘিরে র'য়েচে। বড়ো বড়ো দুটি চোখের নীচে কালি প'ড়েচে, ওষ্ঠাধর নীলাভ।

অসুস্থতা কেবল আমাদেরই ! এবং তারো দেহে যে সেটা আসতে পারে, সেও যে শ্রান্ত হ'তে পারে—এ কথা বুঝি আমি ভাবতে পারিনা ? কি মনে ক'রলো অসিতা ?

আমি কি একটু ব'লবার চেষ্টা ক'রতেই অসিতা মৃদু হেসে ব'ললো, অবিশ্যি আমি জানতুম যে আপনি কিছু ব'লবেননা, তবুও এম্নিই বললুম। কিছু মনে ক'রবেন্-না যেন—বুঝলেন ?

অসিতার এই কথাটার পরে যেন তবুও একটু তৃপ্তি বোধ করলুম। আমাকে তা'হলে ও অত্যন্তই ভুল বোঝে না !

আমাদের পৃথিবীর দিন এম্নি ক'রেই কাটে। একদিন পরস্পর শুনতে পাই তিন নম্বরকে অপারেশান করা হবে।

ডাক্তার না কি তিন নম্বরকে বলেচেন তা'র পায়ের চাইতেও বুকের অবস্থা আরো অনেক খারাপ এবং তাঁদের আয়ত্তে যতো রকম চিকিৎসা আছে, সব কটিই তা'র ওপরে প্রয়োগ করা হ'য়েচে। এতেও যখন উন্নতি আশাপ্রদ নয়, তাঁরা তা'র ওপর একটি অপারেশন্ ক'রে দেখতে চান্, এই একটি মাত্র ব্যবস্থাই তাঁদের হাতে আর হওয়া সম্ভব। এমন কি ডাক্তার এমন কথাই না কি ব'লেচেন যে সে যদি রাজী না হয় তবে তা'কে চ'লে যেতে হবে ; কারণ বহু দিন তা'কে রাখা হ'য়েচে; আর এখানে প'ড়ে থাকা তা'র নিরর্থক।

অপারেশানটি জানতে পারলুম ডান দিকের বুকের পাঁজরা থেকে ছ' টুকরো হাড় কেটে বাদ দেওয়া হবে।

বেচারা তিন নম্বর শুনলুম অপারেশানে রাজী হয়েচে।

আর রাজী না হ'য়েই বা কি ক'রবে। আড়াইটি বছর এই ভাবে এখানে প'ড়ে আছে, তারও হয় তো কতো দিন পূর্ব্বে থেকে কষ্ট পাচ্ছে। অপূর্ব্ব ওর ধৈর্য্য, অদ্ভুত ওর সংযম—বাঁচবার ইচ্ছা এবং শক্তি যে ও কোথা থেকে আহরণ করে ওই শুধু জানে। ও চায় একেবারে শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা ক'রেও এই যুদ্ধে জয়ী হ'তে—আত্মহত্যার প্রশস্ত পলায়ন-পথ ওর বেছে নিতে হয় তো গর্ব্বে আঘাত লাগে।

মনে মনে একান্ত ভাবে প্রার্থনা করলুম এই অপারেশান যেন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয় এবং ও যেন এই ঝড় অতি শীঘ্র কাটিয়ে উঠতে পারে।

দু'তিন দিন পরেই একদিন সকাল বেলা ডাক্তার, নার্স—প্রত্যেকেরই একটু বেশী ব্যস্ততা লক্ষ্য করি। বুঝলুম আজকেই অপারেশান হবে।

খানিকক্ষণ পরেই ষ্ট্রেচারে ক'রে তিন নম্বরকে অপারেশান-থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

কি যেন একটি যাদুমন্ত্রে সমস্ত হাঁসপাতাল একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেচে। প্রত্যেকের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন—শুধু বাঁধা-ধরা নিয়মে যা'র যা' কাজ সে নিঃশব্দে ক'রে যাচ্ছে। ডাক্তাররা সকলেই অপারেশান-থিয়েটারে, মেট্রনও সেখানে। অসিতাকে সকাল বেলা মুহূর্ত্তের জন্যে একটিবার দেখেছিলুম, তা'র পরে আর তা'র সাক্ষাৎ পাইনি। খুব সম্ভবতঃ সে-ও ওখানেই গেচে।

মিনিটের পর মিনিট অতীত হ'য়ে যেতে লাগলো, কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই। একটি ওয়ার্ড বয়কে দেখলুম অপারেশান-থিয়েটারের দিক থেকে আসচে। হাত ইসারায় তা'কে কাছে ডাকলুম ; জিজ্ঞেস্ করলুম—অপারেশান কি সুরু হ'য়েচে ?

—হ্যাঁ।

এইটুকু উত্তর দিয়েই সে ব্যাটা চ'লে গেল—আমার

চোকের সাম্নে সমস্ত পৃথিবীটা একবার যেন ঘুরে উঠলো। বিভীষিকার মতন যেন দেখতে পেলুম তিন নম্বরের অচেতন দেহ থেকে টেবিলের ওপর দিয়ে রক্তের স্রোত ব'য়ে চ'লেচে, নার্সেরা তুলো, ব্যাণ্ডেজ হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, অ্যাসিষ্টেণ্ট ডাক্তার এক একখানা অস্ত্র এগিয়ে এগিয়ে দিচ্চেন—আর বড় ডাক্তার ওর বুকের হাড়গুলো কাট্‌চেন—কট্‌—কট্‌—কট্‌—···

তাড়াতাড়ি চোক ঢুটো বন্ধ ক'রে ফেল্‌লুম।

চোকের সাম্নে কারো কোনো দিন অপারেশান দেখিনি। মাত্র একবার দেখেছিলুম ম্যাডানের তোলা ফিল্‌মে ডাক্তার কেদার দাসের সিসারিয়ান্ অপারেশান্। একটি নারী-দেহকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে আবার তা'কে জুড়বার যে বীভৎস দৃশ্য সেই ফিল্‌মে দেখেছিলুম—ঠিক সেই রকমি একটা দৃশ্যের সৃষ্টি হয় তো এখন আমাদের হাঁসপাতালের অপারেশান থিয়েটারে হ'য়েচে। অস্ত্রোপচারের শেষে ডাক্তার দাসের দেখলুম নির্ব্বিকার হাসিমুখ; কিন্তু আমি সেদিন রাত্রে এক গ্রাস ভাতও মুখে তুল্‌তে পারিনি।

তিন নম্বরকে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে বিছানার কাছে নিয়ে আসা হ'ল। চাকরগুলো ধরাধরি ক'রে ওর আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত দেহটাকে আস্তে আস্তে খাটের ওপর শুইয়ে দিলো—একবার তাকিয়েই দম যেন আমার আট্‌কে আস্‌তে চাইল।

হ্যাঁ, অসিতা অপারেশানের কাছেই ছিলো। সে এখন দাঁড়িয়ে আছে তিন নম্বরের খাট ঘেঁষে তা'র দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। অসিতার মুখের দিকে মুহূর্ত্তের জন্যে একবার চেয়ে দেখ্‌লুম—সে মুখ একেবারে শুষ্ক, পাংশু, বিবর্ণ!

বেলা গোটা চারেকের সময়ে যখন ডাক্তার-টাক্তাররা আর কেউ থাক্‌লেননা, ধীরে ধীরে তিন নম্বরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

খাট্‌খানার শিয়রের দিকটা উঁচু ক'রে দেওয়া হ'য়েচে, পায়ের দিকটা ঢালু। রক্তে বিছানার চাদর একেবারে ভেসে যাচ্চে। সদ্য জ্ঞান-প্রাপ্ত তিন নম্বরের ঢুটি স্থির, উৎক্ষিপ্ত চোখের তারার দিকে তাকিয়ে আমার আপাদমস্তক শিউরে উঠ্‌লো।

রাত্রে ডাক্তার আবার এসে ইঞ্জেক্‌শান্ ক'রে গেলেন, নার্সকে ওর সমস্ত অবস্থা ভালো ক'রে বুঝিয়ে কি ক'র্‌তে হবে না হবে ব'ল্‌লেন। ডাক্তারের কপালে সূক্ষ্ম রেখা ফুটে উঠেচে, সমস্ত মুখ গম্ভীর।

ভোর রাত্রে বারকতক একটি গোঙানীর শব্দ শুন্‌তে পেলুম, আবার আস্তে আস্তে তা' মিলিয়ে এলো।···

* * * *

অসিতার আবার ডে-ডিউটি সুরু হ'য়েচে।

অসিতা নতমুখে আমার পাল্‌স্ পরীক্ষা ক'র্‌চে। তা'র হাতখানা যে থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌চে এ বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি; বিষণ্ণ ঢুটি চোক্ অশ্রুর বাষ্পে রাঙা!

তিন নম্বরের প্রাণ-হীন দেহটাকে যখন তা'র আত্মীয়েরা এসে হাঁসপাতাল থেকে নিয়ে গেল, তখন আর কারো মুখে ত' কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করিনি! অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে যে যা'র কাজ ক'র্‌চে। একটি নার্সকে মেট্রনের সাথে হেসে হেসে কথা ব'ল্‌তেও দেখ্‌লুম।

হাঁসপাতালের এ তো নিত্যকার ব্যাপার! দুর্ভাগা তিন নম্বর আমাদের মাঝখান থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল, অসিতার তা'তে কি? এতো জনের মাঝখানে তা'র একলার এতো অভিভূত হ'য়ে পড়্‌বার কি আছে?

অসিতার জন্যে দুঃখ হয়। জীবনের উৎসব-ভরা বাইরের আনন্দ-লোক ছেড়ে কেনই সে এই মৃত্যু, এই বীভৎসতার ভেতরে এসেচে? সে অন্যত্র চাকুরী জোটাতে পারেনি—সেইজন্যেই কি?

হয় তো তাই।···

অথবা এর ভেতরে তা'র নিজের জীবনের কোনো নিগূঢ় বেদনার কাহিনী আছে।

হয় তো তাই!

আট্‌লান্টিকের ওপারে

শ্রীকৃষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দীর্ঘ কাল অনুপস্থিতির পর আবার নিউইয়র্ক সহরে ফিরে এলুম। দুই বৎসর পূর্ব্বে একদিন প্রাতঃকালে এই নিউ-ইয়র্ক সহরের টাইমস্কোয়ারের নিকটবর্ত্তী আমাদের হিন্দুর দোকান ক্ষীরা রেস্টোরাণ্ট হইতে লুচিভাজা, বেগুন-ভাজা, প্যাঁড়া, জিলিপি, কমলালেবু প্রভৃতির একটি পুঁটুলি হাতে ক'রে লণ্ডনের ওয়েম্ব্‌লী প্রদর্শনীর উদ্দেশে যাত্রা ক'রেছিলুম, এত দিন পরে আজ আবার সেই পরিচিত প্রবাস-পথেই ফিরে এলুম।

ব্রডওয়ের ধারে সেই সব ৩০।৪০ তোলা বাড়ী যেন কত দিনের বিস্মৃত কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। সেই উল্‌ওয়ার্থ প্রাসাদ ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষুদ্র মানব পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়ে এই বিরাট মূর্ত্তির পানে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে।

যাঁহার ইচ্ছায় ও যে শিল্পীর পরিকল্পনায় এক মহা প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়, জগতে তাঁহাদের দান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে। নিউ ইয়র্ক সহরের বাণিজ্য-মন্দির উলওয়ার্থ প্রাসাদ নির্ম্মাতার নিকট মানবজাতি চিরদিনই ঋণী থাকিবে। এই অসাধারণ সৌন্দর্য্যের কীর্ত্তিস্তম্ভে মানুষের অদম্য ভালবাসা ও সভ্যতার অহঙ্কার মিশান আছে। ইহার প্রকৃত পরিচয় বহুমূল্য পাথরের সৌন্দর্য্যে অথবা ইহার উচ্চতায় পর্য্যবসিত নয়। ইহাতে মানবাত্মার মানসিক উন্নতির চরম প্রকাশ, বাসনার সুন্দর মূর্ত্তি আকাশে মাথা তুলে সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে যেন জড় জগতের ক্ষুদ্র তুচ্ছ লোকারণ্যকে উপহাস করচে।

মধ্যযুগের ধর্ম্ম যেমন শিল্পকলা-বিদ্যাকে নিজস্ব ক'রে রেখেছিল, মার্কিণ দেশে বাণিজ্য তেমনি ভাবে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে সমস্ত দেশটাকেই এক নূতন জগতে পরিণত ক'রে ফেলেছে।

পৌর যুদ্ধের অবসানে এই তরুণ জাতির ছাড়া-পাওয়া সমস্ত বীর্য্য, শক্তি কত যুগযুগান্তের অকর্ষিত ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইল, তার ফলে এই দেশ আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনসম্পন্ন। অর্দ্ধ জগতের লোক এই দেশে ছুটে এল, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার হইল, রেলওয়ে লাইন এই মহাদেশসম বিরাট সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব উপকূল ও পশ্চিম উপকূলকে ঘনিষ্ঠ ভাবে আবদ্ধ করিল, সঙ্গে সঙ্গে চারি দিকে ধনজনপূর্ণ সহরের অভ্যুত্থান হইল। এমনি দোষগুণসমন্বিত ব্যবসা-যুদ্ধের ভিতর দিয়ে বিপুল কল্যাণ সাধিত হয়েছে। ইলিনয়, ইণ্ডিয়ানা, ক্যালিফোর্ণীয়া, আইওয়া ও ডাকোটা রাজ্যের দিগন্ত-প্রসারিত উর্ব্বর ক্ষেত্রসকল পৃথিবীর শস্য-ভাণ্ডারে পরিণত হ'য়েছে। মিচিগান, পেন্‌সিলভেনিয়া, জর্জ্জিয়া ও ছোট ছোট পার্ব্বত্য প্রদেশের খনির তিমির-গর্ভ হইতে ধনরত্ন আহরণ ক'রে জগতের সমস্ত জাতির জীবনযাত্রার পথে রক্ষিত হইয়াছে। এইরূপে আরও বিবিধ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের নিদান এই দেশকে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধিশালী ক'রে তুলেছে। এই সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং অর্থ-সাহায্যের কেন্দ্রস্থান হইল নিউইয়র্ক সহরে। এই স্থানে মানহাত্তান দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে ধরণীর উচ্চতম প্রাসাদশ্রেণীসমূহ সজ্জিত হইয়াছে।

নিশারম্ভে ব্রুকলিন্‌ সেতুর উপর দাঁড়াইলে দেখা যায় সন্ধ্যার ধূসর ছায়া সেই সব ধনমদমত্ত বিরাট প্রাসাদের দীপ্তরেখাগুলি ম্লান ক'রে দেয়। আর দেখিতে দেখিতে সেই স্থানের অসংখ্য গবাক্ষপথে বৈদ্যুতিক আলোকের উজ্জ্বল দৃশ্য, মনে হয়, কবির কল্পনায় বহির্ভূত। আর সেই ৫৮ তোলা উলওয়ার্থ প্রাসাদ তাদের মাঝে যেন এক রাজরাণী—অত্যুজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিক আলোয় স্নাত হয়ে মণিমাণিক্যখচিত অভিনব পরিচ্ছদে বিভূষিত হ'য়ে স্বর্গরাজ্যের প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তার ক্যাডম্যান দৃষ্টিপাত মাত্র ইহার নাম দিয়াছিলেন বাণিজ্য ক্যাথিড্রাল, যেখানে আদান-প্রদান ও বিনিময় প্রথায় সমস্ত বিভিন্ন জাতিকে একত্রীভূত করে, মনে হয় যেন এমনিভাবে সমগ্র মানব-সমাজকে কাজকর্ম্মে ব্যস্ত রাখিতে পারিলে রক্তপাত ও ভয়াবহ যুদ্ধ-বিগ্রহের ভীষণ পরিণাম কতকটা হ্রাস করা যাইতে পারে। এই ৫৮ তোলা

বাড়ী বৈজ্ঞানিক-জগতে এক নূতন সৃষ্টি। এই জনহিতকর কার্য্য ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের প্রশস্ত-হৃদয় মুকুরে প্রথম ছায়াপাত করে এবং শিল্পী ক্যাস গিলবার্ট শেষ পর্য্যন্ত ইহার সৌম্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণে সহায়তা করেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল দিবাবসানে প্রেসিডেণ্ট উইলসন হোয়াইট হাউসে ব'সে একটিমাত্র ছোট বোতাম টিপিলেন ও একসঙ্গে অতি উজ্জ্বল ৮০ হাজার বৈদ্যুতিক আলোক সারা উলওয়ার্থ প্রাসাদকে বিভূষিত করিল। ঐ রাত্রে এই প্রাসাদের সপ্তবিংশতি তোলায় এক মহা উৎসব হয় ও পানামা প্যাসিফিক প্রদর্শনীর কর্ম্মকর্ত্তারা এই বিরাট মূর্ত্তি প্রাসাদকে এক স্বর্ণ পদক উপহার দেন এবং পৃথিবীর সমস্ত বাণিজ্য প্রাসাদের মধ্যে ইহাকেই সর্ব্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করেন।

রজনীর ঘনান্ধকারকে যেন উপহাস ক'রে সেই ২৭ তোলার উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকমালার মধ্যে এক বিরাট প্রীতিভোজনে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের যত সব শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ, ব্যবসাদার, কল-কারখানার ধনী মহাজন, সংবাদপত্র লেখক, পণ্ডিত ও কবিগণের মহাসম্মিলনে মিষ্টার উলওয়ার্থকে ও তাঁহার স্বপ্নপুরীকে বাস্তবে পরিণত করার সাহায্যকারীগণকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। যাবতীয় বাণিজ্য-গৃহের মধ্যে আজও পর্য্যন্ত উলওয়ার্থ প্রাসাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই একটা বাড়ীর মধ্যেই বড় বড় ব্যাঙ্ক, বিরাট কারখানাসমূহের কেরাণীগণ, আমেরিকার নানা স্থানের সুবৃহৎ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিনিধিগণ ও অন্যান্য অনেক নেতৃবর্গই কাজকর্ম্ম করেন। ইহার ভাড়াটিয়ারাই তাহাদের আমলাবর্গসহ সংখ্যায় ১৪,০০০,—একটা ছোটখাট সহরের লোক-সংখ্যা। যে-সে ব্যবসাদার অবশ্য এ বাড়ীতে স্থান পায় না। এ দেশের উদীয়মান শ্রেষ্ঠ উন্নতিশীল মহাজনেরাই এই বাড়ীতে অফিস খুলিতে পারে। প্রাসাদের বহির্ভাগের গথিক কারুকার্য্যসমূহ অতি রমণীয় এবং এরূপ নিখুঁত ভাবে ইহাদের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে যে রাস্তা থেকে ইহার উচ্চতার কথা সহসা মনেই আসে না। কিন্তু ইহাই ছিল পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম প্রাসাদ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা উচ্চতম বাণিজ্য-প্রাসাদ বলিয়া পরিচিত ছিল; কিন্তু আজকাল ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। ফুটপাথের উপর থেকে ৭৯২ ফিট ১ ইঞ্চি উচ্চে ইহার চূড়া যেন আকাশ ভেদ ক'রে স্বর্গে মাথা ঠেকিয়েছে। স্থানটিও তেমনি সবার মাঝখানে ধনজনপূর্ণ মহানগরীর আমদানি ও রপ্তানির পথগুলির মাঝখানে ঠিক যেন হনুমানের মতন শিকড় নামিয়ে দিয়ে অতি প্রশান্ত ভাবেই ব'সে আছে। কোন ভীমেরই সাধ্য নাই যে একে স্থানচ্যুত করে। তিনটা বড় রাস্তায় তিনমুখো হ'য়ে, গমনাগমনের জন্য নয়টা দরজা খুলে, মাটির নিচের বৈদ্যুতিক রেলের দুইটা সুড়ঙ্গ রাস্তার সহিত গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ, যেন এক বিরাট ব্রহ্মদৈত্যের মতই দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তা থেকে ৫৮ তোলা উচ্চে সর্ব্বোপরি অবজারভেসান্ গ্যালারীর খোলা ছাদে দাঁড়াইয়া চারি দিকের নয়নাভিনব দৃশ্য দর্শকগণের মন প্রাণ আকৃষ্ট করে। চারি দিকেই টেলিস্কোপ বসান আছে,—১০ সেণ্টের একটি রৌপ্যখণ্ড ফেলিলেই তালাবদ্ধ টেলিস্কোপ বন্ধন-মুক্ত হইয়া যাইবে এবং যেদিকে ইচ্ছা ঘুরাইয়া বহু দূরের জল-স্থল ঘর-বাড়ী সব দেখা যায়। সূর্য্যরশ্মিপাতে চারি দিকের বাড়ীগুলির দৃশ্য এবং রংএর বাহার, নীচের দিগন্ত প্রসারিত জলস্থলের একাকার সব দিক থেকেই ২৫ মাইল পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। এই অবজারভেসান্ গ্যালারীর খোলা ছাদে দাঁড়াইয়া দর্শকের চক্ষু-সম্মুখীন নিউ ইয়র্কের প্রশস্ত ভূমিতে ৯৫ লক্ষেরও অধিক লোক বাস করে। উত্তর দিকে এই বিরাট সহরটি হাড্‌সন্ নদী ও সুদূরবর্ত্তী উচ্চ ভূমির সহিত মিশে আছে। পূর্ব্বে লঙ্ দ্বীপ ও আট্‌লাণ্টিকের লবণাম্বুরাশির বুকের উপর বহুদূরবর্ত্তী আকাশ ও জলের প্রেমালিঙ্গনবদ্ধ দিকচক্র-রেখা পর্য্যন্ত জলচর জাহাজগুলির গমনাগমন দৃশ্য দক্ষিণে নিউ ইয়র্ক সহরের প্রকাণ্ড বন্দর, গভর্ণরস্ দ্বীপ, স্বাধীনতার বিজয়স্তম্ভ এবং পশ্চিমে আবার হাড্‌সন্ নদী বিস্তৃত প্রান্তর ও পার্ব্বত্য প্রদেশ পূর্ব্ববর্ত্তী নিউ জার্সির সহিত মিশে গেছে। নীচের জনারণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যেন অলি অলি পাখীর ছানাগুলি গলি গলি যায়। উলওয়ার্থ প্রাসাদের দৃশ্যাবলী কেবলমাত্র বহির্ভাগেই পর্য্যবসিত নয়, ভিতরেও যেন রত্নমালার বাসর সজ্জিত হইয়াছে। প্রবেশ-পথেই অতি সুন্দর খিলান-সংযুক্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল রেখাগুলি শাটিনের চাঁদোয়ার ন্যায়

দর্শকের নয়ন মন পুলকিত করে। গ্রীসের উপকূলবর্ত্তী সাইরস্ দ্বীপ হইতে আনীত অতি উৎকৃষ্ট স্বুবর্ণরঞ্জিত মার্ব্বেল পাথরের খিলানগাত্রে বিচিত্র রং-এর বাহার ও গথিক শিল্প-নৈপুণ্যে প্রস্তুত অতি উজ্জল কারুকার্য্যখচিত গম্বুজ এবং রেশমের কাপড়ের ন্যায় সেই অদ্ভুত মার্ব্বেল পাথরের গায়ে লতা-পাতা আঁকা ফুলঝাড়ের মধ্যে মৃদু-মধুর কৃত্রিম আলোকের বাহার, কল্পনানেত্রে যেন রত্ন-প্লাবন স্বজন করে, মনে হয় যেন সোনা, রূপা, হীরা, জহরত, চুণি, পান্না, নীলা প্রভৃতি সকলে মিলে সমরাঙ্গনে অগ্রসর হ'য়েছে।

সর্ব্বনিম্নে বাড়ীর চতুস্পার্শ্বস্থ ভিতের নিচে একেবারে যেন পাতাল প্রদেশে প্রাসাদের আলো বাতাস ও উত্তোলনযন্ত্রে বৈদ্যুতিক শক্তিসঞ্চারের নিমিত্ত পাওয়ার প্ল্যাণ্ট বসান আছে। ইহার চারটি এঞ্জিন এবং ডাইনামো দিনরাত্রি কাজ করিতেছে। এঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানের ইহা এক শ্রেষ্ঠ যন্ত্র। এই যন্ত্রের মোটমাট শক্তি ১,৫০০ কিলওয়াট। ঠেলা বা চাপ দেবার বৈদ্যুতিক শক্তি ও সেকেণ্ডে কতখানি শক্তি খরচ হয় এই দুই গুণ করিলে ওয়াট শক্তি বাহির হয়। এইরূপ এক হাজার ওয়াট শক্তি এক কিলওয়াট শক্তির সমান। এই প্ল্যাণ্টে দুইটা যন্ত্রের ৫০০ কিলওয়াট শক্তি—একটার ৩০০ কিলওয়াট ও আর একটির ২০০ কিলওয়াট শক্তি আছে। এই পাওয়ার প্ল্যাণ্ট ৫০ হাজার অধিবাসী-সমন্বিত একটা সহরে আলো বিতরণ করিতে ও ষ্টীট রেলে শক্তি সঞ্চার করিতে পারে। মাটীর নিচে বাড়ীর তলায় এইরকম গভীর স্থানে তিনতলা পর্য্যন্ত দিনে ৪ বার করিয়া হাওয়া বদল করা হয়। উপরেও ঘরে ঘরে হাওয়া বিতরণের অতি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। বাহির হইতে ছয়তোলা উপরে হাওয়াকে বাড়ীর মধ্যে পুরে চালুনির ছ্যাদার মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গর্ত্তের মধ্যে তাড়িয়ে অনবরত প্রবহমান ফিলটার করা শীতল জলের মধ্যে সেই হাওয়াকে জোর ক'রে ঠেলে চুবিয়ে ধূলা বালি ও রোগের বীজ এমনি ক'রে জলের মধ্যে ফেলে দিয়ে পরিষ্কার বিশুদ্ধ বায়ু ভাড়াটিয়া প্রজাগণকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। গ্রীষ্মকালে এই হাওয়াকে বরফ চাপা নলের মধ্যে দিয়ে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে শীতল করে ও শীতকালে উত্তপ্ত নলের মধ্য দিয়ে তাড়িয়ে গরম ক'রে দেয়।

বয়লার গৃহে ২,৫০০ অশ্ব শক্তির ছয়টি বয়লার বসান আছে। শূন্য ডিগ্রীর নীচে নেমে যাওয়ার প্রচণ্ড শৈত্যের দিন ছাড়া সাধারণতঃ শীতকালে এঞ্জিন এবং পাম্প হইতে নির্গত উত্তপ্ত বাষ্পের দ্বারাই বাড়ীখানিকে গরম রাখা হয়। এক চোটে পেন্‌সিলভেনিয়ার খনি হইতে আনীত কয়লা সব সময় ২,৮০০ টনেরও অধিক ভাঁড়ার ঘরে মজুত রাখা হয়। বাড়ীর নীচে একেবারে পাতাল প্রদেশে বিপুলকায়া এক সাঁতার দেবার দীঘি এবং টারকিস্ বাথ আধুনিক সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য ও বিপদবারণ নিরাপদ প্রণালী সহ রাত্রিদিনই খোলা আছে। এই ভুঁইফোড়া জায়গায় আবার নাপিতের দোকান, খাবারের দোকান, সাধারণের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, দলিল ও দামী গহনাপত্র রাখিবার জন্য ইরভিং কোম্পানীর সেফ্‌টি ভল্ট প্রভৃতি আরও কত কি যে আছে তার ঠিক নেই। ইরভিং ব্যাঙ্কিং কোম্পানী প্রায় অশীতি কোটী টাকারও অধিক কারবার সহ মূলধন নিয়ে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম তোলার অফিসফ্লোরের অংশগুলি ভাড়া নিয়ে বসে আছে।

সব চেয়ে কঠিন সমস্যা এই প্রাসাদের উত্তোলন যন্ত্রগুলির কাজকর্ম্ম চালান; এবং ভাড়াটিয়াদের ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্তই ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। এই কার্য্যও অতি শৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হইতেছে। ২৯টি দ্রুতগ্রামী বৈদ্যুতিক উত্তোলন-যন্ত্র বৎসরের প্রত্যেক দিনেই ২৪ ঘণ্টা ওঠা-নামা করিতেছে। ইহাদের রবিবার অথবা ছুটীর দিনেও বিশ্রাম নাই। অফিস বেলায় প্রতি ২৫।৩০ সেকেণ্ড অন্তর উপরে উঠিবার লিফ্‌ট ছুটিতেছে। যে কোন তোলা হইতে আধ মিনিট অন্তর উপরে উঠিবার কিম্বা নীচে নামিবার একখানা গাড়ী নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। ধনী প্রজাগণের আমলাবর্গ এবং মক্কেলদিগের যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা ও সময় নষ্ট না হয় সে জন্য যন্ত্রগুলি অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত চালান হয়। পৃথিবীর কোথাও আর কোন বাড়ীতে এরূপ দ্রুতগামী লিফ্‌ট নেই। অথচ সাড়া নেই, শব্দ নেই, চেপে হঠাৎ মনেই হয় না যে গাড়ী চ'লচে। প্রবেশ

করেই মনে হবে তুলোর বস্তার ওপর বুঝি পা প'ড়ল। ১০০ ফিট্ উঁচু চুয়ান্ন তোলায় ১ মিনিটে সুড়ুৎ ক'রে তুলে দেবে। দুইটা এক্সপ্রেস গাড়ী একচোটে ৫৪ *তোলা পর্য্যন্ত যায়, মধ্যে আর কোথাও থামে না।* প্যারীসে হাজার ফিট্ উঁচে ইফেল টাওয়ারে উঠিতে দুইবার লিফ্ট বদল করিতে হয়; অর্থাৎ তিনথানি বিভিন্ন লিফ্টে চাপিতে হয়। উলওয়ার্থ প্রাসাদের এই সব অতি দ্রুতগামী উত্তোলন-যন্ত্রে প্রতিদিন প্রায় ৩৫,০০০ লোক ওঠা-নামা করে। এই কারণে দুর্ঘটনা নিবারণের আশ্চর্য্য সমস্ত কৌশল ক'রে রেখেছে। যাতে কোন বিপদ না হ'তে পারে সে জন্যে গাড়ীর নীচে অনেক রকম কলকব্জা বসান আছে। দ্রুতগতি ও ধীরগতি ঠিক করিবার যন্ত্র মাথার ওপর শাসনকর্ত্তার ন্যায় ব'সে আছে। উপরে অথবা নীচে থামিবার আগে গতি কমাইবার জন্য লিমিট সুইচ লাগান আছে। সর্ব্বনিম্ন তলায় এক রকম স্পঞ্জের মত উপাদান তেলে বুড়িয়ে রেখেছে,—যদি কখনও দড়ি ছিঁড়ে লিফ্ট নীচে প'ড়ে যায়, তাহ'লে ঐ তেলের উপরেই গাড়ীর ভার প'ড়বে,—যত ভার প'ড়বে ততই পাঁকে বুড়ে যাবার মতন ভড় ভড় ক'রে ধীরে ধীরে নেমে যাবে। তেলের মধ্যে স্পঞ্জের উপাদান থাকাতে তেল ছিট্‌কে পড়বার কোন উপায় নেই। ইহাতে যাত্রীদের কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। হঠাৎ মধ্যে কোন বিপদ হ'লে চট্ ক'রে থামাবার সেফ্‌টি সুইচ আছে। এরূপ চাকাবিহীন হেঁইয়ো-টানা ঝোলা গাড়ীর আর এক সুবিধা গাড়ী কিম্বা দেয়ালের গায়ে ঝুলে থাকা গাড়ীর সমভার (তাল তাল লোহা প্রভৃতি)। এই উভয় ভারের কোন দিকটা যদি নিয়মবদ্ধ গতির বেশী চলে তাহা হইলে হ্যাঁচকা টানের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়; কারণ গাড়ী কিম্বা সমভারের ভার বোঝা তারের দড়ি থেকে আর এক বৈদ্যুতিক যন্ত্রের দ্বারা কেড়ে নেওয়া হয়। দুর্ঘটনা নিবারণের আরও অনেক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সমস্তই যথাস্থানে লাগান আছে। পথের মধ্যে কোন তোলা নাই এমন কোন যায়গায় হঠাৎ যদি লিফ্ট আটকে যায়, তাহ'লে পাশের এক এমারজেন্সি দরজা দিয়ে অন্য লিফ্টে আরোহীদিগকে নিরাপদে বদলি ক'রে দেওয়া যেতে পারে। ইহাতে কোনরূপ গোলমাল নাই, অথচ সময় নষ্ট হইবে না। যখন যেখান থেকে গাড়ী ছাড়ে, সেই তোলার প্রবেশ-দরজা যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়, ততক্ষণ অপারেটার চেষ্টা করিয়াও লিফ্ট চালাইতেই পারিবে না। ইহাতে অনেক রকমের সাধারণ বিপদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। এ দেশে ট্রাম গাড়ীগুলিতেও এরূপ ব্যবস্থা আছে। ট্রামের দরজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ড্রাইভার গাড়ী হাঁকাইবে না। সিলিণ্ডার ও মোটরের সাহায্যে বাতাসকে টেনে নিয়ে অথবা ঠেলে দিয়ে দরজা খোলা ও বন্ধ করা হয়। মানুষের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় বাতাস এমনি ভাবে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় কত রকমের কাজ করিতেছে। নানা রকমের বিপদ নিবারণের কলকব্জা থাকা সত্বেও মিষ্টার উলওয়ার্থ প্রত্যেক লিফ্টের নীচে হাওয়ার আসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সব গর্ত্ত অথবা খোলের মধ্যে লিফ্টগুলি ওঠা-নামা করে সেগুলি সমস্তই ভারী ভারী ষ্টী'লর কড়ি ও কঙ্ক্রিট দিয়ে গাঁথা। ভিতর দিকে আবার আর এক প্রস্থ ষ্টীলের পাত দিয়ে মোড়া। কোন স্থানে এতটুকু ছিদ্র নাই, যেথান দিয়ে বাতাস বাহির হইয়া যাইতে পারে। গাড়ী যতই হাওয়ার আসনের সমীপবর্ত্তী হয়, অর্থাৎ নিম্ন তলের নিকটবর্ত্তী হয়, হাওয়ার চাপ ততই বাড়িতে থাকে। এইরূপে ধাক্কা খেয়ে রোষে ফুলে উঠে হাওয়া যেন ঢেউ-খেলান আসনের কাজ করে ও লিফ্টখানি সেই আসনে ধীরে উপবেশন করে। যদি সকল রকমের বিপদ-নিবারণ যন্ত্রগুলি খারাপ হ'য়ে গিয়ে কাজ করিতে বিমুখ হয়, ও গাড়ী নীচের দিকে যদি কখনও কোন কালে ধপ ক'রে প'ড়ে যায়, তাহ'লে হাওয়া এত শীঘ্র চাপা প'ড়বে যে নীচের ভ্যাল্‌ব্ অথবা এই ঝোলা গাড়ী ও দেওয়ালের মধ্যস্থিত চার দিকের অতি সামান্য ফাঁক দিয়ে পালাবার সময় পাবে না। কাজে কাজেই হাওয়া ঠেলার চোটে বাধ্য হ'য়ে সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় আসন পেতে দেবে। এমনিভাবে গাড়ীর গতি কমিয়া যাইবে ও ধীরে ধীরে সর্ব্বনিম্নতলে যাইয়া বিশ্রাম করিবে। ইহাতে আরোহীদের কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না। এই হাওয়ার আসনের উপকারিতা নিরূপণ

করিতে একবার এক পরীক্ষা হইয়াছিল। ১০০০ পাউণ্ড ভারের জিনিষপত্র লিফ্‌টের মধ্যে রাখিয়া দড়ি দড়া ও সমস্ত যন্ত্রপাতি খুলিয়া লইয়া ইহাকে ৪৫ তোলা হইতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই লিফ্‌ট নিচে পৌছিলে দেখা যায় ইহার মধ্যস্থিত জিনিষপত্র সমস্তই যথাস্থানে ঠিক আছে, কোনরূপ এদিক ওদিক হয় নাই, এবং এত সামান্য কম্পন হইয়াছিল যে এমন কি ইহার মধ্যে রক্ষিত এক গ্লাস জলের এক বিন্দুও পড়ে নাই।

এই বাড়ীতে আগুন লাগিবার কোন সম্ভাবনা নাই। নির্ম্মাণকালে ইহাতে দাহ্য পদার্থ কিছুই ব্যবহার করা হয় নাই। লৌহ, পাথর, ষ্টীল ও তারে গাঁথা ভারী ভারী কাঁচ ছাড়া আর কিছু নাই। ভাড়াটিয়াদের ঘরের মধ্যে কাগজপত্র ছাড়া আর বিশেষ কিছু দাহ্য পদার্থ নাই। তবু যদি কখনও অসম্ভব সম্ভব হয়, সে জন্যে আগুন নিবাইবার দমকল বসান আছে। এই দমকল মিনিটে ৫০০ গ্যালন জল ৫৮ তোলায় ছাড়িতে পারে এবং ১৬৪০ ফিট পর্য্যন্ত ইহার উর্দ্ধগতি। এই বাড়ীতে এইরূপ একটি দমকল থাকার জন্য আশ পাশের বিষয়-সম্পত্তির প্রতিবাসী স্বত্বাধিকারিগণ ফায়ার ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর নিকট হইতে প্রিমিয়ামের হার কমাইতে পারিয়াছেন। বাড়ীর মধ্যেই এক সুন্দর হাঁসপাতাল রহিয়াছে। প্রজাগণের কেরাণীদের ও অন্য কাহারও কিছু অসুখ-বিসুখ হইলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাক্তারের সাহায্য পাইবে। জমীদারের খরচায় এই হাঁসপাতাল রক্ষিত হইয়াছে। রোগীদের ইহার জন্য কিছুই খরচ করিতে হইবে না। প্রতিদিন দেড় লক্ষেরও বেশী চিঠিপত্র এই বাড়ীতে বিলি হয়। এক ডজন পিয়ন শুধু এই বাড়ীর কাজেই লেগে আছে। দুই হাজার আটশত টেলিফোন সমস্ত বাড়ীখানির কথাবার্ত্তা বহন করিতেছে।

এত উঁচু বাড়ী নিরাপদ কি না এ সম্বন্ধে অনেকেই প্রশ্ন করেন। এক কথায় বলা যাইতে পারে ইহার ভিত্তি পাহাড়ের ন্যায় নিরাপদ। ফুটপাত হইতে মাটীর নীচে ১১০ ফিট পর্য্যন্ত ইহার ষ্টীল ও কঙ্কটের ভিত্তিগুলি নামিয়া গিয়াছে।

প্রথমে মাটীর নীচে তিনতলা পর্য্যন্ত সাধারণ ভাবেই, অতি গভীর পুষ্করিণী খননের ন্যায়, খুঁড়িয়া ফেলা হয়। ইহাতে যে জল বাহির হয় তাহা পাম্প দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়। তার পর নিউম্যাটিক কেসন কায়দায় বাড়ীতে যতগুলি ষ্টীলের থাম আছে ততগুলি সমান আয়তনের ধাতু নির্ম্মিত টিউব ভিত্তি স্বরূপ মাটির নীচে যে পর্য্যন্ত পাহাড়ের প্রস্তরখনি পাওয়া যায় সেই পর্য্যন্ত চালাইয়া দেওয়া হয়। এই নিউম্যাটিক কেসন টিউব মাটীর নীচে ভেদ করিয়া চালাইয়া দেওয়া—সে এক মহা ব্যাপার। বাতাস বাহির হইয়া না যাইতে পারে এমন ভাবে এই সব টিউবগুলির উপরিভাগে তালা বন্ধ করা হয়, যেমন সাইকেলের টিউবে পাম্প করিয়া হাওয়া পোরা যায় ও তাহা বাহির হইয়া যায় না। তার পর ইহাদের ভিতর জলের চাপের সমান চাপযুক্ত হাওয়া পাম্প করিয়া পুরিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে জল গর্ত্তের মধ্যে নিশ্চল চাপা বাতাস ঠেলে আসতে পারে না এবং মজুরেরা টিউবের নিচে দাঁড়াইয়া মাটি খুঁড়িতে পারে। যে সে মজুর অবশ্য সেখানে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে পারে না। ইতালিয়ানদের না কি মাথা খুব শক্ত। তাহারা ঐরূপ স্থানে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে পারে। অবশ্য বাতাসকে সেখানে নিশ্চল করিয়া রাখা হয়, ইলেকট্রিক ফ্যানের মত তাহা ফর্ ফর্ করিয়া বেড়ায় না। তবু সেখানে দাঁড়াবার জন্য শক্ত নিরেট মাথার দরকার। আমাদের ডাল ভাত আলু ভাজা খাওয়া কাঁচা মাথা সেখানে দাঁড়াতে পারে না। টিউবগুলিকে কপিকলের সাহায্যে ঝুলাইয়া রাখা হয়, খানিকটা করে মাটী খোঁড়া হয় ও খানিকটা ক'রে টিউব নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর মজুরদের বদলি করা হয়। দুই ঘণ্টার বেশী সেই তিমির গর্ভে কয়েক শত পাউণ্ড বদ্ধ বাতাসের চাপের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকা বিপদজনক। এইরূপে নামিতে নামিতে টিউব-গুলি যখন ভূমধ্যস্থিত নিরেট প্রস্তর পাহাড়ের গায়ে পৌছায়, তখন সেইগুলি কঙ্ক্রিট দিয়ে ভর্ত্তি করা হয়। এই কঙ্ক্রিটের মধ্যে সিমেন্ট, বালি, পাথরকুচি, লোহার কুচি, চাপড়া চাপড়া লোহা, ষ্টীল, বাঁকা লম্বা লম্বা সরু সরু তার প্রভৃতি পুরিয়া দেওয়া হয়। পরে উপরের তালা খুলিয়া এবং ভরাট শেষ করিয়া নিরেট কঙ্কট ভিত্তির উপরেই প্রাসাদের ষ্টীলের থামগুলি অবস্থান করে। ঐ

সব টিউবগুলির মধ্যে কতকগুলির ব্যাস ১৯ ফিট, এক একটা ঘরের মতন আয়তন। ৬৯টি টিউব এই ভাবে ভূগর্ভের পাহাড়ের সঙ্গে মিশে গেছে। বাড়ীখানা কোন রকমেই হেলিবে না দুলিবে না। কারণ যে কোন থামের উপরের মৃতভার বাড়ীর উপর বাতাসের ঠেলায় দ্বারা উত্তোলন করিবার শক্তির চেয়েও অনেক বেশী। ঘণ্টায় ২০০ মাইল বেগের এক প্রবল ঝঞ্ঝানিল বহিলেও এ বাড়ীর কাঠামর কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। এরূপ বাতাসের বেগ অবশ্য অজানিত। সর্ব্বোপরিভাগে বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ হইয়াছিল; কিন্তু কোনরূপ কম্পন অনুভূত হয় নাই। এই বাড়ীর মধ্যে ফায়ার ব্রীগেড, পুলিস প্রভৃতি নানা রকমের ডিপার্টমেণ্ট মালিকের খরচায় নিয়োজিত রহিয়াছে। পরিষ্কার রাখা, মেরামত করা, যন্ত্রপাতি ঠিক রাখা প্রভৃতি কাজে ভিন্ন ভিন্ন পল্টন রহিয়াছে। ভাড়াটিয়া প্রজাদের ফাই-ফরমাস খাটিবার জন্যই ৩০০ লোক নিযুক্ত রহিয়াছে।

উলওয়ার্থ প্রাসাদকে বাণিজ্য-মন্দির বলা হইয়াছে। ছোট জিনিষের মনুমেণ্ট বটে কিন্তু ইহা সভ্য সমাজে এক বিরাট দীর্ঘকাল স্থায়ী দান বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থকে এক পয়সাও ধার করিতে হয় নাই। ৫ সেণ্ট ও ১০ সেণ্টের নূতন ধরণের খুচরা বিক্রয়ের দোকান খুলিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থে তিনি এত বড় এক ভুবন-বিখ্যাত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বাঙ্গলা ভাষায় নাটক অনেকেই লিখিয়াছেন, রামনারায়ণ নামও অনেকের ছিল এবং আছে। কিন্তু পঙ্কে অনেক উদ্ভিদ জন্মিলেও যেমন পঙ্কজ বলিতে একমাত্র পদ্মকেই বুঝায়, "নাটুকে রামনারায়ণ"ও তেমনি স্বনামধন্য পুরুষ। বাঙ্গলার নাট্যজগতের প্রথম যুগে কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়া পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় তখনকার বাঙ্গলার জনসাধারণের হৃদয় এমন অধিকার করিয়াছিলেন যে, জনসাধারণ আদর করিয়া তাঁহার নাম দিয়াছিল "নাটুকে রামনারায়ণ"। এ যাবৎ অপর কোন নাট্যকার এরূপ মহা সম্মানজনক উপাধির অধিকারী হইতে পারেন নাই।

তর্করত্ন মহাশয়ের দেহান্তের পর তাঁহার হরিনাভির বাটীতে কতকগুলি কাগজপত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত একখানি আত্মবিবরণও ছিল। তাহাতে দেখা যায়—

"সন ১২২৯ সালে আমার জন্ম। আমার পিতৃঠাকুরের নাম ৺রামধন শিরোমণি মহাশয়। ২৪পরগণার অন্তঃপাতি হরিনাভি নামক গ্রামে আমার বাস। আমি বাল্যাবস্থাতে দেশে ও বিদেশে চৌবাড়িতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন করি। পরিশেষে ইং ১৮৪৩ অর্থাৎ ১২৫০ সালে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠার্থ প্রবিষ্ট হই। ইং ১৮৫৩ বাঙ্গলা ১২৬০ সালে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ হিন্দু মিট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পাণ্ডিত্য-পদে নিযুক্ত হই। দুই বৎসর তথায় কর্ম্ম করিয়া ১৮৫৫ সালের ১৬ই জুন তারিখে (বাঙ্গলা ১২৩২ সালে) সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অদ্যাপি সেই কর্ম্মই করিতেছি।"

ইহার পর তর্করত্ন মহাশয় তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ঐ কাগজখানিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২৮ বৎসর সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিবার পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তর্করত্ন মহাশয় অবসর গ্রহণ করেন। ইহার প্রায় তিন বৎসর পরে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী (সন ১২৯২ সালের ৭ই মাঘ) তিনি লোকান্তরিত হন।

তর্করত্ন মহাশয়ের জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে আপাততঃ ইহার অধিক আর কিছুই জানা যায় না। তাঁহার অবশিষ্ট জীবন-কাহিনী তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী। তাঁহার রচনাগুলি যে তাঁহার জীবনের একটা বিশিষ্ট অংশ তাহার কারণ, এই গ্রন্থগুলির রচনার বিবরণ যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, এইগুলি লইয়া তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে বহু আন্দোলন, আলোচনা এবং বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, এবং আজিও তাহার নিবৃত্তি হয় নাই।

তর্করত্ন মহাশয়ের প্রথম রচনা "পতিব্রতোপাখ্যান।" এই গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁহার স্বলিখিত আত্মবিবরণে দেখা যায়—

"১২৫৯ সালে পতিব্রতোপাখ্যান প্রস্তুত করি। রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারী বাবু কালীচন্দ্র রায় উক্ত পুস্তকে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেন।"

গ্রন্থখানির রচনার ইতিহাস এই—রঙ্গপুর জেলার কুণ্ডী নামক স্থানের জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বিদ্যোৎসাহী এবং সাহিত্যিক ছিলেন, অনেকগুলি পরমার্থবিষয়ক সঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন। তিনি একদা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া ঘোষণা করেন যে, পতিব্রতোপাখ্যান সম্বন্ধে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিবেন, তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হইবে। তদনুযায়ী তর্করত্ন মহাশয় পতিব্রতোপাখ্যান গ্রন্থখানি রচনা করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন এম-এ মহাশয় লিখিয়াছেন, উক্ত জমিদার মহাশয় "পতিব্রতোপাখ্যানে"র মুদ্রাঙ্কনের জন্যও ১৫০৲ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। তর্করত্ন মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত বিবরণে কিন্তু এই টাকার কোন উল্লেখ নাই। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থখানি লিখিত ও পুরস্কৃত হয় এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারী প্রকাশিত হয়।

তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব"। এই গ্রন্থ লিখিয়াই তর্করত্ন মহাশয় খ্যাতি লাভ করেন। এই বইখানি লইয়াই বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আত্মবিবরণে লিখিত আছে—

"কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক ১২৬১ সালে রচিত হয়, উহাতেও রঙ্গপুরের উক্ত ভূম্যধিকারী বাবু কালীচন্দ্র রায় ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেন; এবং পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সাহায্যে আরও ৫০৲ টাকা দান করেন। এই নাটক কলিকাতা নূতন বাজারে বাঁশতলার গলিতে ও চুচুড়াতে অভিনীত হয়।"

এই বইখানি লইয়া আন্দোলনের গুরু কারণ ছিল। এক দিকে উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় সমাজ-সংস্কারের দাবী করিতেছিলেন; অপর দিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের পক্ষে এবং বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে এই সমাজ-সমস্যামূলক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ায় তাহা সহজেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ইহার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলায় আধুনিক ধরণের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম প্রথম ইংরেজী এবং সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইত। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের তৃপ্তি হইতেছিল না। কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা সামাজিক নাটক বলিয়াও ইহা অবিলম্বে জনসাধারণের আদর লাভ করিল।

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব সর্ব্বপ্রথম নাটক কি না সে পক্ষে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কেহ কেহ তৎপূর্ব্বে প্রকাশিত দুই একখানি নাটকের নামোল্লেখও করিয়া থাকেন। আবার অনেকে ইহাকেই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা নাটক বলিয়া বিশ্বাসও করেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামক গ্রন্থে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, "বোধ হইতেছে, 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্বে'র পূর্ব্বে বাঙ্গলায় কোন নাটক রচিত হয় নাই; ইহাই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা নাটক।"

দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব'কেই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা নাটক বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা আরও একটি প্রমাণ উপস্থিত করিয়া থাকেন। সে প্রমাণটি একখানি সার্টিফিকেট। এই সার্টিফিকেটখানি তর্করত্ন মহাশয়ের বাটীতে অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে পাওয়া যায়। তাহার প্রতিলিপি এই—

The Bengal Philharmonic Academy.

Patrons :

The Hon'ble Sir Ashley Eden, K. C. S. I.,

Lieutenant Governor of Bengal.
A. W. Croft M. N.
Director of Public Instruction, Bengal.
Rajah Comm. Sourindro Mohun Tagore, Mus. Doc. Sangita-Nayaka, Companion of the Order of Indian Empire.
Diploma of Honour No 14.

The Executive Council of the above-named Academy has, at its sitting of the 9th March, 1882, conferred upon Pandita Ramnarayana Tarkaratna of Harinabhi the title of Kavyopadhyaya, together with a gold HaraKumara Tagore keyura, the insignia thereof, in consideration of his proficiency in dramatic writing and of his being the first writer of Bengali dramas in a systematic form.

Sourindra Mohan Tagore.
Founder and President.

শ্রীচন্দ্রমোহন গোস্বামী

Director.
Baikunthanath Basu
Honourary Secretary.

Calcutta
Pathuriaghata Rajbati
The 22nd August, 1882

কেহ কেহ আবার এমন কথাও বলেন যে, 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' নাটকখানি তর্করত্ন মহাশয়ের লেখা নহে, উহা তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর পণ্ডিত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের (ইনিও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন) লেখা। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ মহাশয় ১৩২৩ সালের কার্ত্তিক মাসের 'ভারতবর্ষে' "বঙ্গভাষায় আদি নাটক" শীর্ষক যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধে এই বিরুদ্ধবাদের খণ্ডন করিয়াছেন।

কুলীনকুলসর্ব্বস্বের পর তর্করত্ন মহাশয় ১২৬৩ সালে "বেণী সংহার" নাটক রচনা করেন। উহা বাবু কালী-প্রসন্ন সিংহের বাটীতে ও নূতনবাজারে বাবু জয়রাম বশাখের বাটীতে অভিনীত হয়।

১২৬৪ সালে তিনি 'রত্নাবলী' নাটক রচনা করেন। ইহার জন্য কান্দিনিবাসী রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। এই নাটক কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলগেছিয়ায় রাজার বাগানবাটীতে ৬-৭ বার অভিনীত হয়।

১২৬৯ সালে অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক রচিত হইয়া শাঁকারীটোলার বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাটীতে পাঁচ বার অভিনীত হয়।

যোড়াশাঁকোয় সেই সময়ে একটী থিয়েটার কমিটী গঠিত হইয়াছিল। সেই কমিটির অনুরোধে তর্করত্ন মহাশয় "নব নাটক" রচনা করেন। ইহাও সমাজসমস্যামূলক। ইহার জন্য যোড়াশাঁকোবাসী বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৲ টাকা পুরস্কার দেন। ইহা তাঁহার বাটীতে ৯ বার অভিনীত হয়।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিনি মালতীমাধব (১২৭৪), সুনীতিসন্তাপ (১২৭৫), রুক্মিণীহরণ (১২৭৮), যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, উভয়সঙ্কট ও চক্ষুদান (এই তিনখানি প্রহসন), কল্কিপুরাণ, উত্তররামচরিত, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের কিয়দংশ (অনুবাদ), কেরলী কুসুম (বা স্বপ্নধন), মহাবিদ্যারাধন, আর্য্যাশতক, ধর্ম্ম-বিজয় নাটক, কংসবধ নাটক, দক্ষযজ্ঞ (পূর্ব্ব ও উত্তরার্দ্ধ) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

অতীতের ঐশ্বর্য্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(প্রাচীন মৃৎশিল্প)
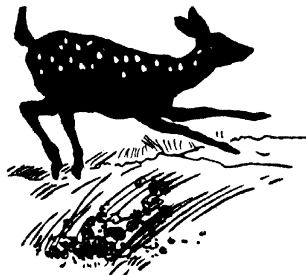
মানুষ যেদিন প্রথম মৃৎপাত্র প্রস্তুত ক'রতে শিখেছিল সে অনেক কাল আগের কথা। ইতিহাসে তার কোনো সন তারিখের সঠিক খবর পাওয়া যায়না, কারণ মাটির জিনিস যেদিন তৈরি হ'য়েছিল সেদিন ইতিহাসের অস্তিত্ব ছিলনা। কাজেই মৃৎশিল্পের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যা বলা হয় তার অধিকাংশই আনুমানিক, অভ্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য নয়। ইতিহাস যেমন মৃৎশিল্প সম্বন্ধে আমাদের কোনো নির্দ্দিষ্ট সন্ধান দিতে পারেনা; মৃৎশিল্পও তেমনি ইতিহাস প্রণয়নে আমাদের কোনো সাহায্যই করেনা; কারণ সকল শ্রেণীর মানুষ সেকালে মৃৎপাত্র ব্যবহার করতোনা। যারা ছিল যাযাবর শ্রেণীর তাদের পক্ষে মাটির জিনিস নিয়ে ঘুরে বেড়ানো অসম্ভব ব'লে তারা কেউ মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ করতোনা। মাটির জিনিস

মূর্ত্তি-ভৃঙ্গার (পেরুর মৃৎশিল্পীদের নির্ম্মিত লালমাটির মূর্ত্তি-ভৃঙ্গার। তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে তৈরি। মাথার উপর ফাঁপা গোল হাতোল, তার উপর সরু মুখনল)

মূর্ত্তি-ভৃঙ্গার (উত্তর পেরুর শিল্পীদের তৈরি বংশী-বাদক মূর্ত্তি-ভৃঙ্গার। মুখনলটি মাথার পিছন থেকে অল্প দেখা যাচ্ছে। মাথায় ফুলদার টুপী, কাণে অলঙ্কার, গায়ে ফুলদার জামা)

যে কেবল ভারি ব'লেই বহনের পক্ষে অসুবিধাজনক তাই নয়, ক্ষণভঙ্গুর ব'লেও ভবঘুরেদের পক্ষে তা ব্যবহার করা চ'লতোনা। তারা বেতের, চিয়াড়ির, কাঠের, চামড়ার তৈজসপত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতো; কারণ এসব জিনিস হাল্‌কা ব'লে বহন করা সহজ এবং যথেচ্ছা ব্যবহারে ভেঙ্গে যায়না।
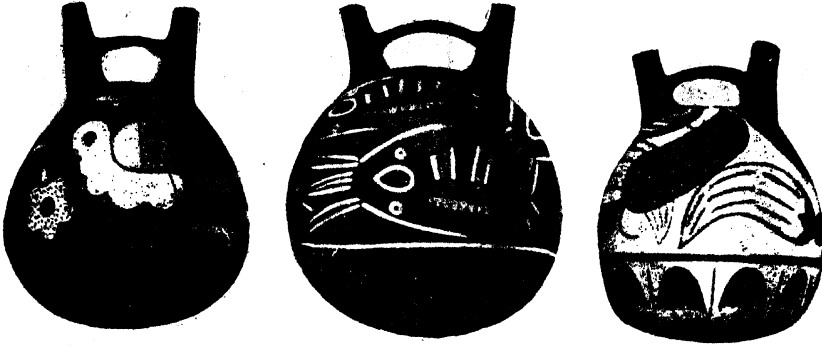
নাস্কার প্রাচীন মৃৎশিল্প—বামে—পাখী আঁকা বাটি, পাখী আঁকা ছ'মুখো ভৃঙ্গার, চিত্রিত পাত্র।
মধ্যে—দু'মুখো চিত্রিত ভৃঙ্গার, দু'মুখো চিংড়িমাছ আঁকা ভৃঙ্গার, মূষিক আঁকা পাত্র।
দক্ষিণে—পুতুল আঁকা বাটি, ফলফুল আঁকা দু'মুখো ভৃঙ্গার, চিত্রিত পাত্র।

কে সেই শিল্পী যে প্রথম এই মৃৎপাত্র গড়েছিল, আজ তার নাম কেউ জানেনা। কোন্ দেশের অধিবাসী সে, এ সংবাদও সকলের অজ্ঞাত। এমন কি এই মৃৎশিল্প বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে একাধিক শিল্পীর দ্বারা উদ্ভাবিত হ'য়েছিল কিনা একথাও বলা কঠিন, তবে এটা ঠিক যে, এই মৃৎশিল্প যে দেশে প্রথম উদ্ভাবিত হ'য়েছিল

মেক্সিকোর প্রাচীন মৃৎশিল্প—বামে—চিত্রিত ঘটি, খুরোওয়ালা বাটি, খুরোওয়ালা জলপাত্র। মধ্যে—পাখীর হাতোল-ওয়ালা বাটি, চিত্রিত থালা, রঙীন কলস। দক্ষিণে—চিত্রিত কুন্‌কে, খুরোওয়ালা বাটি, খুরোওয়ালা গেলাস।

সেই দেশ ও সেই জাতিই সভ্যতার দিকে প্রথম অগ্রসর হ'য়েছিল।

আবার সভ্যতার অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে যেদিন কুম্ভকারের চক্র উদ্ভাবিত হ'ল, মৃৎশিল্পের ইতিহাসে সেদিন এক নূতন যুগ সুরু হ'ল। মাটির জিনিস হাতে গড়তে অনেক সময় লাগতো, চাকে চড়িয়ে তা' চটপট্ তৈরি হ'তে লাগলো এবং জিনিসগুলির আকার ও গড়ন অনেকটা একরকম ধরণের হ'য়ে উঠলো। শিল্পীরও পরিশ্রম ও সময় দুইই চাকের সাহায্যে লঘু ও হ্রস্ব হ'য়ে গেলো।

মূর্ত্তি-ভৃঙ্গার (ট্রাক্সিলোর শিল্পীদের গড়া সঙের মূর্ত্তি-ভৃঙ্গার। হাস্যরসের রূপ। এ জলপাত্রটিতে মুখনল নেই, মাথার পিছনে জল ঢালবার ছিদ্র আছে। মাথায় রঙিন টুপী, গায়ে ফুলদার জামা)

ব্যবসার দিক দিয়ে মৃৎশিল্পের ইতিহাসে চাকের মর্য্যাদা যদিও খুব বেশী কিন্তু, কারুকলার দিক দিয়ে আবার এই চাকই হ'য়ে উঠেছে—মৃৎশিল্পের শত্রু! কারণ, কলকব্জা চিরদিনই শিল্পকলার বিরোধী। কলা কোনোকালেই কলের মুখাপেক্ষী নয়। কলের সাহায্য পাওয়ার ফলে শিল্পী ক্রমশঃ তার হাতের নৈপুণ্য হারিয়ে ফেলেছে। সুদক্ষ শিল্পীর হাতের তৈরি মৃৎপাত্রের তুলনায় চাকের তৈরি মৃৎপাত্র অনেকাংশে নিরেশ। সভ্যতার সংস্পর্শে এসে চাকের সন্ধান পাবার আগে নানা দেশের মানুষেরা যে সমস্ত মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ করেছিল আজ তার নমুনা দেখে আমাদের বিস্মিত হ'তে হয়! বিশেষ ক'রে দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরা এ বিষয়ে আর সকল দেশকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। পীয়ুব্লো-আরিজোনা থেকে সুরু করে মেক্সিকো-পেরু পর্য্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকার সকল প্রদেশে মৃৎশিল্পের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন উন্নত ও সুচারু কলাসম্মত জিনিস আর কোনো দেশেই দেখতে পাওয়া যায়না। চাক উদ্ভাবিত হবার অনেক আগে সুদক্ষ শিল্পীদের নিপুণ হাতে এসব জিনিস তৈরি হ'য়েছিল।

আমেরিকার মৃৎশিল্পীরা যে সব বিস্ময়কর মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ ক'রে গেছে, বিশেষজ্ঞেরা বলেন খৃষ্ট জন্মের একশতাব্দী আগে এগুলি প্রস্তুত হ'য়েছে। এবং খৃষ্ট জন্মের তিনশতাব্দী পরেও এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। চীনের সুপ্রসিদ্ধ 'হান' যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের এরা সমসাময়িক। তবে চীনের সভ্যতা যে এদের চেয়েও প্রাচীন একথা বলাই বাহুল্য। আমেরিকার অধিবাসীরা তখনও অনেকটা প্রস্তর যুগেই পড়েছিল! তারা সোনা ও তামার সবেমাত্র পরিচয় পেয়েছে এবং অলঙ্কার নির্ম্মাণে তা ব্যবহার করতে শিখেছে। কারণ, অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের পক্ষে সোনা যে উপযুক্ত নয় এটা তারা বুঝেছিল এবং তামা তখন একান্ত দুর্লভ ও কোমল ধাতু বলে বিবেচিত হওয়ায় কেবলমাত্র মূল্যবান অলঙ্কারের জন্যই সংগৃহীত হত। কিন্তু, সে যাই হোক, মৃৎশিল্পে সে যুগের প্রাচীন শিল্পীরা যে নৈপুণ্য দেখিয়ে গেছে, সেটা তা'দের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসেরই পরিচায়ক।

সামান্য মৃৎপিণ্ড থেকে একটি সুশ্রী সুগঠিত ভৃঙ্গার নির্ম্মাণ করা বড় সহজ নয়। প্রথমতঃ মাটি তৈরি ক'রতে জানা চাই, মাটির সঙ্গে এমন কতকগুলি মশলা মেশাতে হয় যাতে মাটি আঁট হ'য়। ওস্তাদ কারিগরেরা
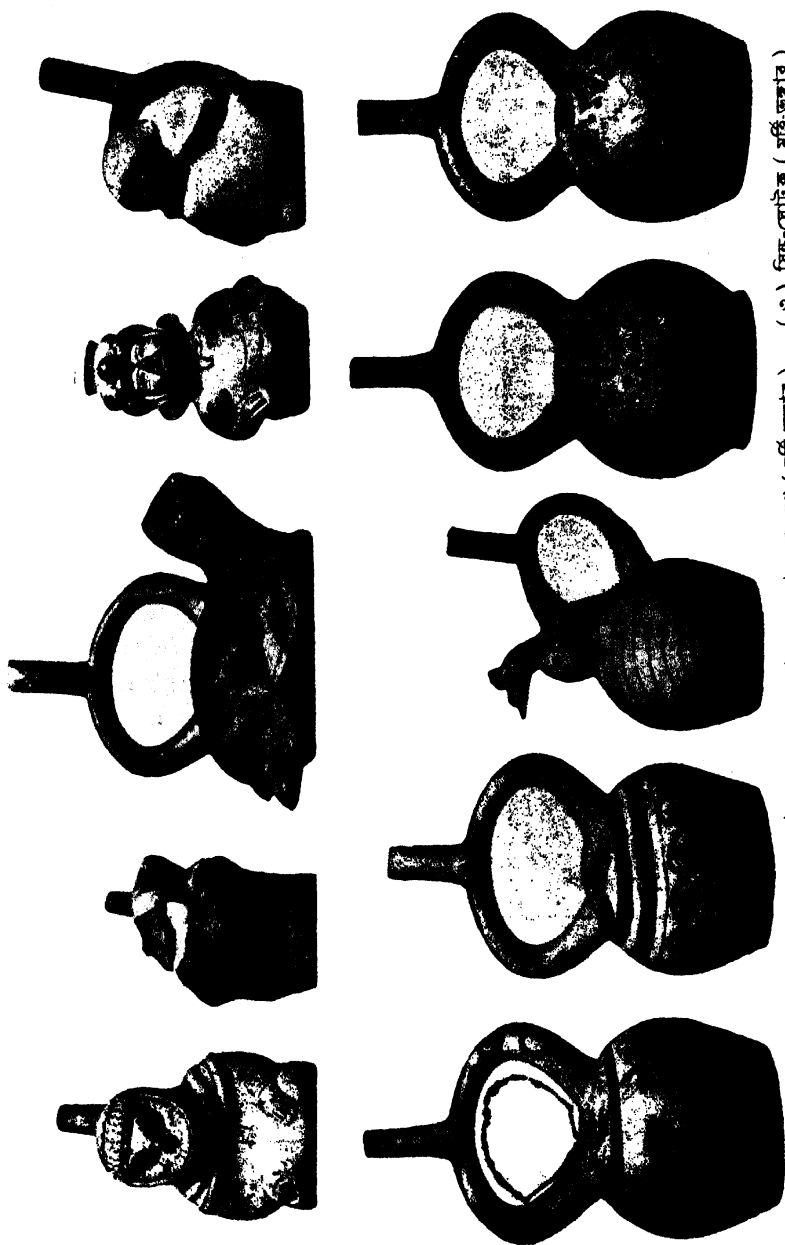
পেরুর প্রাচীন মৃৎশিল্প—(১) পেচক ; (মূর্ত্তি-ভৃঙ্গার) (২) ঘুমন্ত মানুষের মুখ (মূর্ত্তি-ভৃঙ্গার) (৩) সিন্ধু-ঘোটক (মূর্ত্তি-ভৃঙ্গার)
(৪) উপবিষ্ট মহাজন (মূর্ত্তি-ভৃঙ্গার) (৫) বানর (মূর্ত্তি-ভৃঙ্গার) (৬) মৃগ-চিত্রিত জলপাত্র (৭) নাগ-চিত্রিত জলপাত্র
(৮) পক্ষী-ভৃঙ্গার (৯) হংসচিত্রিত জলপাত্র (১০) নৃত্য-চিত্রিত জলপাত্র

এ সব সন্ধান জান্‌তো। ভৃঙ্গারের পাতলা খোল সমান ক'রে হাতে গড়া কেবল অভিজ্ঞ শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। মাটির জিনিস গড়া হ'লে তারপর তাকে আগুনে পোড়ানো সেও এক কঠিন কাজ। অনেকদিনের অভ্যাস ও জানাশোনা না থাকলে সকলে এ কাজ পারেনা। সুগঠিত ও সুন্দর আকারের মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ ক'রতে হ'লে রীতিমত শিক্ষার দরকার। শিক্ষা না পেলে কেউ মৃৎপিণ্ড থেকে হাতের কায়দায় অমন সুশ্রী মৃৎপাত্র গড়তে পারেনা। তারপর সেই মৃৎপাত্র নানা

মূর্ত্তি-ভৃঙ্গার (ট্রাক্সিলোর মৃৎশিল্প। হাতে পানপাত্র, এ মূর্ত্তিটির পোষাক লক্ষ্য করবার মত। সম্ভবতঃ এটি কোনো উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর মূর্ত্তি। মুখের গাম্ভীর্য্য বিচারকের ন্যায়। মুখনলটি মাথার পিছনে)

বিচিত্র রংয়ে চিত্রিত করা সেও শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। কারণ, পাকা রং ক'রতে হ'লে মৃৎপাত্রগুলিকে পোড়াবার আগেই চিত্রিত ক'রতে হয়, সেই সময় কোন্‌ রং আগুনে পুড়লে কি রকম দাঁড়াবে সেটা ভালরকম জানা না থাকলে তার দ্বারা এ কাজ হওয়া সম্ভব নয়।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা যে এই মৃৎশিল্প সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রেছিল এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, তাদের হাতের তৈরি মাটির জিনিসগুলিই এ কথা সপ্রমাণ ক'রছে। এই মৃৎশিল্প সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান ক'রে জানা গেছে যে সেকালের শিল্পীরা মাটির ভৃঙ্গার নির্ম্মাণ করবার জন্য আগে একটা মাটির চাকৃতি গড়ে নিত। সেই চাকৃতিখানিকে তলায় দিয়ে তার উপর পাতলা মাটির সরু সরু বেড় ঘুরিয়ে একটির পর একটি জোড়া দিয়ে দিয়ে ক্রমে সম্পূর্ণ ভৃঙ্গারটি গড়ে তুলতো। পরে তার মুখনল, হাতল, কান, ধারি, খুরো, পায়া প্রভৃতি অন্যান্য অংশ জুড়ে রং করে পোড়ানো হ'ত।

এইভাবে এখানকার আদিম অধিবাসীরা সে যুগে যে সব মৃৎপাত্র তৈরি ক'রেছিল, আজও পৃথিবীর কোনো দেশে তার তুলনা মেলেনা। পেরুর সমুদ্র কূলে এই প্রাচীন যুগে যে সব জাতি বাস ক'রতো, শিল্পী ও সুদক্ষ কারিগর হিসাবে সেকালে তাদের সমকক্ষ আর কেউ ছিলনা। তাদের সমাধিগর্ভ থেকে যে সব মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হ'য়েছে, অনুমান খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে সেগুলি নির্ম্মিত হয়েছিল, কিন্তু, নির্ম্মাণ-কৌশলে গঠন-পারিপাট্যে ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে সেগুলি এত উন্নত ও শ্রেষ্ঠ যে এ যুগের বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক সাহায্য আর সুবিধা নিয়ে যে উচ্চশ্রেণীর মৃৎপাত্র প্রস্তুত হ'চ্ছে তা' তুলনায় সেগুলির কাছে দাঁড়াতে পারেনা।

মার্কিন মৃৎশিল্প আলোচনা ক'রে দেখা যায় সে দেশে এই মৃৎশিল্প দুরকম পদ্ধতি অনুসারে নির্ম্মিত হ'ত। উত্তর দিকের পার্ব্বত্য প্রদেশ ট্রাক্সিলোয় অত্যন্ত জলাভাব, কাজেই জল সেখানে দুর্ম্মূল্য। তাই সেখানে জলপাত্র যা নির্ম্মাণ করা হ'ত সমস্তগুলিরই মুখ সরু, যাতে না সহজে জল পড়ে যায়। তবে এর দোষ হচ্ছে কেবলমাত্র একটি সরু মুখনল দিয়ে জল ঢালতে অনেক দেরী হয়, কারণ বাতাস সহজে তার ভিতর ঢুকতে পারেনা। এই অসুবিধা দূর করবার জন্ত তারা বুদ্ধি করে মুখনলটি একটি ফাঁপা গোল হাতলের মাথায় বসিয়ে

দেয়, ফলে জল-ঢালা ও জল-ভরা সহজ হ'য়ে পড়ে। তা'ছাড়া, গোল হাতলটি থাকার দরুণ জলপাত্রটি বহন করাও সহজ হ'য়ে ওঠে।

ট্রাস্কিলোর অপর একটি পদ্ধতি হ'চ্ছে 'মূর্ত্তি-ভৃঙ্গার'। এই মূর্ত্তি-ভৃঙ্গার নির্ম্মাণে ট্রাস্কিলোর মৃৎশিল্পীদের অপূর্ব্ব কলা-কৌশল ও আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব মূর্ত্তি নানা আকারের। এক একটি চমৎকার ভৃঙ্গারের উপর এক একজন নরনারীর বিবিধ ভঙ্গীর মূর্ত্তি

উত্তর-আমেরিকার প্রাচীন মৃৎশিল্প—বামে—চিত্রিত হাঁড়ি, (পাশের দিক) চিত্রিত হাঁড়ি (উপর দিক) চিত্রিত ঘটি। মধ্যে—চিত্রিত ঘটি, চিত্রিত থালা। দক্ষিণে—চিত্রিত থালা, চিত্রিত বাটি (তলার দিক) চিত্রিত বাটি (সামনের দিক)

গঠিত থাকে—কেউ নৃত্য করছে, কেউ বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে, কেউ হাসছে, কেউ খেলছে ইত্যাদি। নরনারীর মূর্তি ছাড়া পশু পক্ষী মৎস্য, কীটপতঙ্গের মূর্তি এবং বিবিধ ফল ফুলের আকারেও মৃৎপাত্র গড়া প্রচলিত ছিল। মার্কিন শিল্প খুব বেশীরকম ভাবপ্রবণতা মূলক, কিন্তু মৃৎশিল্পে বাস্তবতার প্রভাবও অত্যধিক। এক একটি ভৃঙ্গারে এমন সজীব মনুষ্যমূর্তি দেখতে পাওয়া যায় যে সেগুলি নিশ্চয় কোনো ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিমূর্তি ব'লে দৃঢ় ধারণা জাগে।

এইসব চমৎকার মৃৎশিল্প থেকে আমরা অনেকটা

মূর্তি-ভৃঙ্গার (পেরুর মৃৎশিল্প। এটি ম্যমীর মূর্তি, মাথায় প্যুমার মুকুট, ললাটে চিবুকে অন্তিম তিলক, অঙ্গে শবের পরিচ্ছদ। মাথার পশ্চাতে মোটা মুখনল।)

অনুমান ক'রতে পারি যে সেই প্রতিভাবান শিল্পীরা কি ধরণের মানুষ ছিল। আজ তারা কালের অপ্রতিহত প্রভাবে বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলীন হ'য়ে গেছে বটে, কিন্তু যে অপরূপ শিল্প তারা একদিন সৃষ্টি ক'রে গেছে—তারই মধ্যে তাদের পরিচয় নিহিত রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। তারা কেমনতর বেশভূষা করতো, কি রকম অলঙ্কার পরতো, তাদের কতরকম অস্ত্র ছিল, কি রকম বাদ্যযন্ত্র তারা বাজাতো, শিল্পকার্য্যে কি রকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতো, কেমনতর ঘরে বাস করতো, কি তারা আহার করতো, এমন কি তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধেও কতকটা ধারণা হ'তে পারে। তারা যে কেমন হাস্যরসপ্রিয় ও সুরসিক ছিলেন সে সন্ধানও কিছু কিছু পাওয়া যায়!

'নাস্কা' প্রদেশেও পানীয় জল সুলভ নয়, কাজেই সেখানেও জলপাত্রের মুখ সরু ক'রেই গড়তে হয়। তবে তারা পাত্র থেকে সহজে জলনিকাশের জন্য ট্রাক্সিলোর অনুসরণ না করে জলপাত্রের দুধারে দু'টি সরু মুখনল বসিয়ে তার মাঝখানে একটি নিরেট হাতোল জুড়ে দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য সফল করেছে। বাটির মত আকারের জলপাত্র এবং আধুনিক যুগের জগের মত জিহ্বা সংলগ্ন জলপাত্রও সেখানে প্রচলিত ছিল। মূর্তিভৃঙ্গার 'নাস্কা'য় বড় একটা নির্ম্মিত হতনা! অল্পসল্প যা তৈরি হ'ত তা ট্রাক্সিলোর মূর্তিভৃঙ্গারের তুলনায় অত্যন্ত হীন। কিন্তু মৃৎশিল্পের রংয়ের খেলায় অর্থাৎ জলপাত্রের বর্ণ-বৈচিত্র্যে নাস্কার তৈরি মৃৎপাত্রগুলি ট্রাক্সিলোর মৃৎপাত্র অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিকেরা বলেন সভ্যতার এই প্রাচীনযুগে নাস্কার মৃৎশিল্পীরা যতরকম রংয়ের সন্ধান পেয়েছিল এবং মৃৎপাত্রের গাত্রে তা' যেরকম নিপুণতার সঙ্গে ব্যবহার ক'রতে পেরেছিল, তেমনটি আর সেযুগের কোনো দেশের শিল্পীরা পারেনি।

ট্রাক্সিলোয় আর একরকম জলপাত্র নির্ম্মিত হ'ত তাতে একটি করে বাঁশী সংযুক্ত থাকতো। জল ঢালবার সময় পাত্রের মধ্যে বাতাস প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীটি বেজে উঠতো। নাস্কায় এ ধরণের জলপাত্র বেশী প্রচলিত ছিলনা। বর্তমানে যেসব হুইসল্ দেওয়া কেট্‌লী দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই—কত প্রাচীনকালে আদিমযুগের মৃৎশিল্পীরা এই জিনিসই আরও সুন্দর করে তৈরি করতে পেরেছিল জেনে আরও বেশী অবাক হ'তে হয় না কি?

কেবল যে দক্ষিণ আমেরিকাতেই 'মৃৎশিল্প' সবিশেষ

উন্নতিলাভ করেছিল তাই নয়, কষ্টারীকা ও পানামাতেও উচ্চশ্রেণীর মৃৎশিল্পীদের বসবাস ছিল। দক্ষিণে গোয়েতেমালা এবং উত্তরে হোণ্ডুরাস ও মেক্সিকোর উত্তরে 'মায়া' সভ্যতায় প্রভাবান্বিত 'টোলটেক্' জাতির শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে যে মৃৎশিল্প গড়ে উঠেছিল, কলা কৌশল ও গঠন সৌকর্য্যে তা' যথার্থই

উত্তর আমেরিকার প্রাচীন মৃৎশিল্প—বামে—চিত্রিত থালা, চিত্রিত থালা, মাটির বাটি, মাটির বাটি (বড়)
মধ্যে—চিত্রিত বাটি, চিত্রিত কুঁজা। দক্ষিণে—চিত্রিত হাঁড়ি, চিত্রিত বাটি, চুপ্ড়ির মত চিত্রিত হাঁড়ি।

দক্ষিণ প্রদেশ পর্য্যন্ত যে সভ্যতা প্রসারিত হ'য়েছিল, এই মৃৎশিল্পীরা ছিল তার প্রধান অঙ্গ। মেক্সিকোর আরও প্রশংসনীয়! তবে এটা ঠিক যে পেরুর মৃৎশিল্পের অনেক পরে এদের এখানে মৃৎশিল্পের প্রচলন হয়েছিল। কারণ,

বিশেষজ্ঞেরা বলেন খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে নাকি এখানে প্রথম মৃৎশিল্পের জন্ম হয়েছে। কিন্তু সে যাই হোক্, পেরুর মৃৎশিল্পের তুলনায় এখানকার তৈরি মৃৎপাত্রগুলি গড়নে অনেক শ্রেষ্ঠ, রংয়ের বৈচিত্র্যেও সুন্দরতর এবং এগুলির বিশেষত্ব হ'চ্ছে উচ্চ অঙ্গের পালিশ, যা অন্য কোনো দেশের মৃৎশিল্পে তখন ছিলনা।

'মায়া' সভ্যতায় প্রভাবান্বিত 'টোটোনাক্' নামে আর একজাতি, যারা তখন ভেরাক্রুজে বাস করতো এবং স্পেনের আক্রমণের সময় আজটেক্‌দের অধীন ছিল, তাদের তৈরি বাটির আকারের গোলমৃৎপাত্র এবং খুরো

যুদ্ধ চিত্রিত জলপাত্র (বিজয়ী বীর পরাজিত শত্রুকে জয়গর্ব্বে স্কন্ধে তুলে নিয়ে যাচ্ছে)

বা পায়া সংলগ্ন ও চঞ্চু বা জিহ্বা সংযুক্ত মাটির জলপাত্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের তৈরি ভৃঙ্গার আকারে এমন নিখুঁৎ যে দেখে মনে হয় না এগুলি হাতে-গড়া, মনে হয় যেন এগুলি ছাঁচে তৈরি বা চাকে গড়া।

মেক্সিকোর নিকটবর্ত্তী প্যুয়েব্লা প্রদেশে আজটেক্‌দের দ্বারা [illegible]াড়িত একদল টোলটেক্ গিয়ে বসবাস ক'[illegible]। এদের দ্বারা প্যুয়েব্লোয় যে মৃৎশিল্প গড়ে উঠেছিল তারও সৌন্দর্য্য ও গঠন-পারিপাট্য অতুলনীয়। প্যুয়েব্লোয় মৃৎশিল্পের বিশেষত্ব হ'চ্ছে তার বর্ণ-বৈভব! লাল, কালো এবং গাঢ় কমলা লেবু রং এই তিনটি বর্ণ খুব বেশীরকম তারা ব্যবহার ক'রতো। এই তিনটি রংয়ের ঘোর-ফের ক'রে এমন সুকৌশলে তারা মৃৎপাত্রগুলির উপর বর্ণবিন্যাস ক'রতো যে সেই রংয়ের ঐশ্বর্য্যে মাটির পাত্রগুলি স্বর্ণপাত্রের চেয়েও সুন্দর ও লোভনীয় হয়ে উঠতো।

প্রাচীনকালের আদিম অধিবাসীরা বিনা যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার সাহায্যে এমন সুগঠিত ও সুরঞ্জিত মৃৎপাত্র গড়েছিল দেখে এ যুগের শিল্পীদের আজ আর বিস্ময়ের অবধি নেই। চীনের প্রাচীন মৃৎপাত্র আজও বহুমূল্যে ও বহু সমাদরে দেশ দেশান্তরে গৃহীত ও সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে। কারণ চীনে মৃৎপাত্রের ব্যবহার আজও লুপ্ত হয়নি। চীনের তৈরি মৃৎপাত্র আজও বহু পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে বলে তার সঙ্গে আমাদের একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপিত হয়েছে। আজ যদি উপরোক্ত মৃৎপাত্রগুলি চীনের মৃৎপাত্রের ন্যায় সুলভ হ'ত, তাহ'লে সম্ভবতঃ পৃথিবীর সকল দেশে চীনের মৃৎপাত্রের সঙ্গে এ মৃৎপাত্রগুলিও সমান আদরে সংগৃহীত ও সযত্নে সংরক্ষিত হত।

ভারতবর্ষে বহুদিন থেকেই মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনোদিনই সেগুলির উন্নতির জন্য এদেশের মৃৎশিল্পীরা যত্নবান হয়নি। হারাপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োয় পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন যে মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে তা' অতি সাধারণ, সে মৃৎপাত্র প্রাচীন বটে কিন্তু তার কোনো বিশেষত্ব নেই। বৈদিক যুগের গো-শকটের ন্যায় ভারতবর্ষের মৃৎশিল্প আজও অপরিবর্ত্তিত ও অনুন্নত অবস্থায় আছে। একমাত্র বৌদ্ধযুগে এর কিছুমাত্র উন্নতি দেখা গেছ্‌লো বটে, কিন্তু, পরে আর অগ্রসর হয়নি। এর কারণ অনেকে অনুমান করেন যে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, পিত্তল প্রভৃতি নানাবিধ ধাতুপাত্র ভারতবর্ষ সর্ব্বাগ্রে ব্যবহার ক'রতে শিখেছিল বলে সে মৃৎশিল্পের দিকে বিশেষ মনোযোগী হয়নি। তাছাড়া প্রস্তর যুগের শিলাপাত্র আজও এখানে ব্যবহৃত হয় ব'লে মৃৎপাত্র মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি কোনোদিন।

পল্লীগ্রামের পুনর্গঠন

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে যেমন, বাঙ্গালা দেশেও তেমনই, দুই জন প্রাদেশিক শাসক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, পল্লীগ্রামের পুনর্গঠন ব্যতীত প্রদেশের অনিবার্য্য সর্ব্বনাশ রোধ করা অসম্ভব। এই পল্লীপ্রাণ দেশে পল্লীগ্রাম যে-ভাবে জনশূন্য ও শ্রীহীন হইতেছে, তাহা যিনিই লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনিই চিন্তিত হইয়াছেন। পল্লীর শ্রীভ্রষ্ট হইবার নানা কারণ আছে; কিন্তু সে সকলের মধ্যে শিল্পনাশ যে অন্যতম প্রধান কারণ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমরা সে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মূল কথা বলিব।

ভারতবর্ষের কৃষির অবনতিতে যে দেশের অবনতি—আর্থিক দুরবস্থা ঘটিতেছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এ বিষয়েও সন্দেহ নাই যে, কৃষির উন্নতি ও কৃষকের অবস্থাপরিবর্ত্তন না হইলে, আর কোনরূপ উন্নতি সাধিত হইবে না। ইহা বুঝিয়াই বিলাতের সরকার—এ দেশের সরকারের প্ররোচনায়—১৯২৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কৃষি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কমিশনের সদস্য-নিয়োগ-পত্রে তাহার উদ্দেশ্য নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত হইয়াছিল :—

"ভারতবর্ষের বৃটিশ শাসনাধীন অংশে কৃষি ও গ্রাম্য অর্থনীতিক অবস্থাবিষয়ে অনুসন্ধান এবং কিরূপে কৃষির ও গ্রামবাসীদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্দেশ।"

কমিশন বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া নির্দ্ধারণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিত হইয়াছিল !—

"যদি বহু শতাব্দীর জাড্য দূর করিতে হয়, তবে পল্লীগ্রামের উন্নতি সাধনের জন্য সরকারের অধিকৃত সব উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সরকারের যে সব বিভাগের সহিত পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, সে সব বিভাগকে এই কার্য্যে সজ্ঘবদ্ধভাবে কায করিয়া যাইতে হইবে।"

যে সব বিভাগ—কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমবায়—এই সব কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত, সে সব বিভাগের সহিতই পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ এবং সে সকল বিভাগের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন কমিশন বুঝাইয়া দিয়াছেন।

অথচ এত দিনের মধ্যেও এই সব বিভাগের সমবেত চেষ্টার কোন উপায় হয় নাই। কেবল পঞ্জাবে পল্লীর পুনর্গঠন কার্য্যের জন্য এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত কোন কায হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল শিল্প-বিভাগ কতকগুলি স্বল্পব্যয়সাধ্য শিল্পের উন্নতিসাধন জন্য পরীক্ষা করিয়াছেন এবং অল্পদিন হইতে সরকার—কিছু টাকা ব্যয় করিয়া—কতকগুলি যাযাবর শিক্ষকদল প্রেরণ করিয়া মফঃস্বলে নানা কেন্দ্রে সেই সব উন্নত পদ্ধতি শিক্ষা দিতেছেন। লোক যেরূপ আগ্রহ সহকারে শিক্ষালাভ করিতেছে এবং যাহারা শিক্ষালাভ করিতেছে, তাহারা যেরূপ দ্রুত কায পাইতেছে, তাহাতে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থা যৎসামান্য—ইহার প্রসার বর্দ্ধিত করা একান্ত প্রয়োজন। আর বাঙ্গালীর অন্যান্য উটজ শিল্পেও উন্নতি সাধন প্রয়াসে পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। মাদ্রাজ ও বিহার প্রভৃতি প্রদেশে শিল্পে সরকারী সাহায্য প্রদান করিবার জন্য আইন বিধিবদ্ধ হইবার বহু দিন পরে বাঙ্গালায় ঐরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই আইনানুসারে আজও কায আরম্ভ হয় নাই! অর্থাভাবই ইহার কারণ এবং ইহার জন্য সরকার স্বতন্ত্র তহবিল করিয়া তাহাতে বাহিরের লোকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ ভাবে কায করিলে ঈপ্সিত ফললাভের সম্ভাবনা থাকে না, থাকিতে পারেও না।

লর্ড লিনলিথগো কৃষি কমিশনের সভাপতি ছিলেন। তিনি সংপ্রতি ভারতের কৃষকের সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন :—

"ভারতের সম্পদের অধিকাংশই কৃষিতে। কৃষকের

ক্ষেত্রের উপরই ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা নির্ভর করে। পূর্ব্বে যেমন—এখনও তেমনই—কৃষকই দেশের সম্পদ ও বিরাটত্বের কারণ; ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, কৃষকই ভারতবর্ষ।"

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জনও ইহাই বলিয়াছিলেন। অথচ এই কৃষকের ও তাহার অবজ্ঞাত কৃষির উন্নতির কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা এত দিনে হয় নাই।

যাঁহারা বলেন, কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্যই সরকার সমবায় সমিতিগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা যে অবস্থার সহিত ব্যবস্থার সামঞ্জস্যের শোচনীয় অভাব বিবেচনা করেন নাই, তাহা আমরা অবশ্যই বলিব। বাঙ্গালার কথাই ধরা যাউক—

বাঙ্গালায় কৃষক ঋণজালে জড়িত। বর্ত্তমান ব্যবসামন্দার পূর্ব্বে বাঙ্গালার ব্যাঙ্কিং সন্ধান সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার কৃষকের মোট ঋণের পরিমাণ এক শত কোটি টাকা। তাহার পর ব্যবসামন্দা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ফল কিরূপ হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গলা সরকারের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করিবার সময় অর্থ-সচিব দেখাইয়াছিলেন।

(১) ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় ৮৭লক্ষ গাঁটেরও অধিক পাট উৎপন্ন হইয়াছিল এবং তখন পাটের দাম ছিল—১১ টাকা ২ আনা ৭ পাই মন। তাহার পর পাটের চাহিদা ও মূল্য হ্রাস হওয়ায় পাটচাষও হ্রাস করা হইয়াছে; তথাপি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে দর ৫ টাকা ৩ আনা ১১ পাই মণ ছিল। অর্থাৎ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে উৎপন্ন পাটের মূল্য প্রায় ৪৮ কোটি টাকা ছিল; আর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তাহা প্রায় সাড়ে ১৩ কোটি টাকায় নামিয়া আসিয়াছিল।

(২) ১৯২৮—২৯ খৃষ্টাব্দে উৎপন্ন চাউলের মূল্য ছিল—১৭১ কোটি টাকা; আর ১৯৩১—৩২ খৃষ্টাব্দে তাহা নামিয়া ৮৩ কোটিতে দাঁড়াইয়াছিল।

বাঙ্গলার প্রধান ফসল দুইটিতেই মূল্য হিসাবে কৃষক বৎসরে ১২২ কোটি টাকা কম পাইয়াছে। সুতরাং সে, ঋণের আসল ত পরের কথা, সুদও দিতে পারে নাই। সেই জন্য গত কয় বৎসরে যে তাহার ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া ১৩০ কোটি টাকায় উপনীত হইয়াছে, ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

সমবায় সমিতিগুলি কি এই বিরাট ঋণের অবস্থা-ঘটিত জটিলতার উপশম করিতে পারে? সে সব সমিতির শক্তি কতটুকু—সামর্থ্যের পরিমাণই বা কি?

আবার কৃষকের ঋণে সুদের হারও অত্যধিক—কুত্রাপি শতকরা বার্ষিক ২৪ টাকার কম নহে, অনেক স্থানে ৩৬ হইতে ৭২ টাকা পর্য্যন্ত। ইহাতে ঋণের পরিমাণ যে অতি দ্রুত বর্দ্ধিত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। আবার কোন কোন স্থানে ৬ মাস হইতে ১ বৎসরে ঋণ চক্রবৃদ্ধি হার সুদে বাড়িয়া যায়। মোট ঋণের পরিমাণ যদি ১৩০ কোটি টাকা হয় এবং সুদের হার গড়ে শতকরা ৩৬ টাকা ধরা হয়, তবে বৎসরে সুদের পরিমাণই প্রায় ৪৭ কোটি টাকা হয়। এই ঋণ শোধের উপায় কি?

আর এক দিক দিয়া হিসাব করা যাইতে পারে। স্বাভাবিক সময়ে বাঙ্গালার কৃষিজ পণ্যের বার্ষিক মূল্য—

চাউল	...	...	প্রায় ১৯০ কোটি টাকা
পাট	...	...	„ ৪০ „ „
অন্যান্য ফসল	...	...	„ ৬০ „ „
			মোট—২৯০ কোটি টাকা

যে কৃষকের কৃষিজ পণ্যের মূল্য প্রায় ২৯০ কোটি টাকা সে যে আবশ্যক ও নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্য বৎসরে ১২৫ কোটি টাকা ব্যয় করে, ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে।

যাহাদিগের আয়-ব্যয়ের মোট পরিমাণ প্রায় ৪০০ কোটি টাকা, তাহাদিগের এই টাকা লেনদেন কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে হয় না; অর্থাৎ কোনরূপ ব্যাঙ্ক ইহাতে মধ্যস্থ থাকে না। বিশৃঙ্খলাই ইহার অনিবার্য্য কর। সমবায় সমিতিগুলি এ অবস্থায় কোনরূপ প্রতীকার করিতে পারে নাই।

বাঙ্গালার কৃষকের অবস্থাও ভাল নহে। সমগ্র বাঙ্গালার জমী প্রায় ৬০ হাজার বর্গ মাইল স্থায়ী বন্দোবস্তে বিলি করা—আর কতক অস্থায়ী বন্দোবস্তে বিলি করা, কতক "রায়তেয়ারী"। পশ্চিম বঙ্গে—মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলীর আরামবাগ প্রভৃতি অঞ্চল,

বীরভূম—এ সব স্থানে জমী উর্ব্বর নহে; সেচ ব্যতীত চাষ হওয়াও দুষ্কর। মুর্শিদাবাদে ও যশোহরে অস্বাস্থ্যকর অবস্থাহেতু এবং অনুরূপ কারণে নদীয়া জিলাতেও কৃষির অবনতি হইয়াছে ও হইতেছে। উত্তরবঙ্গে—বরিন্দ অংশে জমীর উর্ব্বরতা অল্প। পূর্ব্ববঙ্গে—মধুপুর জঙ্গলে ও জলপথে অনেক স্থানে চাষ হয় না। চট্টগ্রামে তিনভাগের প্রায় দুই ভাগে চাষ হয় না—নোয়াখালীর কতক অংশও তাহাই। বাখরগঞ্জ ধান্যক্ষেত্র হইলেও তাহার দক্ষিণাংশ উর্ব্বরতায় হীন। ফরিদপুরের রাজবাড়ী অঞ্চলও সেইরূপ।

এই অবস্থায় কৃষক কিরূপে ঋণমুক্ত হইবে; কিরূপেই বা কৃষির উন্নতিকর ব্যবস্থার জন্য আবশ্যক অর্থ বা মূলধন সংগ্রহ করিবে? অথচ ভূমি হইতে কি উৎপন্ন হইবে, তাহা ভূমিতে যাহা প্রদান করা যায় তাহারই উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ জমীতে সার ও সেচ দিলে যে পরিমাণ ফশল লাভ করা যায়, সার ও সেচের অভাব ঘটিলে সে পরিমাণ লাভ করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট বীজের ও বলবান বলদের উল্লেখ করিতে হয়। ফলে হয়—মূলধনের অভাবে ফশলের ফলন কম হয় এবং ফশলের ফলন হ্রাসে মূলধনের অভাব ঘটে। কৃষির পদ্ধতি-পরিবর্ত্তনও প্রয়োজন হইতে পারে।

সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে কৃষির ভিত্তির উপরে অবস্থিত, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সেইজন্য আমরা বাঙ্গালার গভর্ণরকে প্রথমেই কৃষির উন্নতিতে অবহিত হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া আশান্বিত হইয়াছি। কৃষির উন্নতি ও কৃষকের উন্নতিতে কোন প্রভেদ নাই। তিনি বলিতেছেন:—

"আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, বাঙ্গালার গ্রামের আর্থিক অবস্থা পুনর্গঠন জন্য বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। আমরা মনে করি—সে চেষ্টা করিতেই হইবে এবং আমরা সে চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প। আমাদিগের বিশ্বাস—সেই পথ গ্রহণ ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই। বঙ্গদেশে কৃষিই আমাদিগের প্রধান অবলম্বন এবং এখনও বহুদিন কৃষিই প্রধান অবলম্বন থাকিবে। পৃথিবীর কোন দেশে বা রাজ্যে পুনর্গঠনের প্রয়োজন বাঙ্গালার প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক নহে। আমাদিগের প্রধান অবলম্বন কৃষিতে আমাদিগের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। কৃষকরাই বাঙ্গালার লোকের শতকরা ৭০ ভাগ। তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে পারিলে আর সবই হইবে—শিল্পের সমৃদ্ধি, ব্যবসার উন্নতি, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার যুবকদিগের কার্য্যপ্রাপ্তি—সবই হইতে পারিবে।"

ইহার পর কথা, কি উপায়ে এই দুষ্কর কার্য্য সাধিত হইবে? বাঙ্গালার গভর্ণর তাহারও আভাস দিয়াছেন। জমী বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, আর কৃষকের ঋণ কতকটা বাদ দিয়া মিটাইয়া ফেলিতে হইবে। এই ঋণ পরিশোধ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে ও থাকিবে। বলশেভিক রুসিয়া যে রক্তস্রোতের মধ্য দিয়া গঠনের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, সে রক্তস্রোতে পুরাতন ঋণ—সরকারের ও দেশের লোকের—ভাসিয়া বা প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে জাতির ও ব্যক্তির বাজার-সম্ভ্রম নষ্ট হইয়াছে; সেই নষ্ট সম্ভ্রম পুনরায় গঠিত করাও সহজসাধ্য নহে। তাহাতে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি নষ্ট করিয়া নূতন ভিত্তির উপর সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে। ফল কি হইবে, তাহা এখনও বলা যায় না। আমরা সে পদ্ধতির পক্ষপাতী নহি। কোন সম্প্রদায়কে হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ন্যায়সঙ্গত নহে। কৃষি কমিশনও প্রজার ঋণ মিটাইয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছেন; কিন্তু ঋণ অস্বীকার করিতে বলেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন—"ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, ঋণ অবজ্ঞা করিয়া (ঋণ পরিশোধ সম্বন্ধে) কিছুই না করা সমর্থনযোগ্য নীতি নহে।" সে সম্বন্ধে আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়া তাহার পর পল্লীগ্রামের যে আর্থিক ব্যবস্থা গঠিত করিতে হইবে অর্থাৎ পল্লীগ্রামে লোকের টাকা লেনদেনের যে পদ্ধতি স্থির করিতে হইবে, তাহাতে সকল পক্ষেরই স্বার্থ সুরক্ষিত করিতে হইবে।

বাঙ্গালার গভর্ণর যে সময় এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহার মত সুসময় সচরাচর পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে লোকের সর্ব্বপ্রধান অসুবিধা—নগদ টাকা নাই। খাতক টাকা পাইতেছে না—প্রজার টাকা নাই; ফলে মহাজন টাকা ও জমীদার খাজনা পাইতেছেন

না। মফঃস্বলে লোক, যে যাহার সঞ্চয়, সে সব ব্যাঙ্কে ও লোন আফিসে রাখিয়াছিল, সে সবই প্রায় টাকা দিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। প্রজার জমী নিলামে ও জমীদারের সম্পত্তি লাটে উঠিয়াছে। এ সময় জমীদার ও মহাজন প্রাপ্য টাকা সুদ বাদ দিয়া—এমন কি আসলেরও কতকাংশ বাদ দিয়া লইতে কেবল সম্মত নহেন, পরন্তু আগ্রহশীল। মহাজনের অনিচ্ছায় তাহাকে বাধ্য করিয়া ঋণের টাকা মিটাইয়া লইতে বাধ্য করিলে অনেক স্থলে কুফল ফলে। রুসিয়ার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। য়ুরোপের আর যে সব দেশে এইরূপ চেষ্টা হইয়াছে, সে সব দেশেও কুফল ফলিয়াছে। সুতরাং সকল পক্ষের স্বার্থে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কায করিলে সমাজে অকারণ চাঞ্চল্য সৃষ্ট হয় না—বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। ঋণ মিটাইতে হইলেই ঋণের "ইতিহাস" দেখিতে হইবে। আসল কত টাকা—কিরূপে কত দিনে কত টাকায় পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বর্ত্তমানে মহাজনের প্রাপ্য টাকার কত বাদ দিলে তাঁহার প্রতি অবিচার বা অত্যাচার করা হইবে না, তাহা স্থির করিতে হইবে। কারণ, মহাজনই যে "খেয়ার কড়ি দিয়া সাঁতরাইয়া পার হইতে" বাধ্য হইবেন বা "ঘরের পয়সা বাহির করিয়া চোর" হইবেন—তাহাও সঙ্গত হইতে পারে না। এইরূপে ঋণের পরিমাণ স্থির করিয়া লইতে হইবে। সাধারণতঃ মনে করা যাইতে পারে, ইহাতে ঋণের পরিমাণ শতকরা ৫০ টাকা হইতে ৭৫ টাকা হইবে। অর্থাৎ ১৩০ কোটি টাকা ৫০ হইতে ৭৫ কোটিতে দাঁড়াইতে পারে।

কিন্তু তাহা হইলেও টাকার প্রয়োজন। জমী বন্ধকী ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মারফতে কৃষককে যদি টাকা দেওয়া হয় এবং আইন হয়, কৃষক জমী বা ফসল বন্ধক দিতে পারিবে না, তবেই বা কিরূপে সে সব ব্যাঙ্কের মূলধন সংগৃহীত হইবে? এইরূপ ব্যাঙ্কে, কিছু অধিক সুদ দিলে যে টাকা আমানত পাওয়া যাইতে পারিবে, তাহা কেন্দ্রী সমবায় ব্যাঙ্কের দৃষ্টান্তে বুঝা যায়। পাট খরিদ সমিতির সর্ব্বনাশে ও ব্যবসা-মন্দায় এই ব্যাঙ্কের উপর দিয়া প্রবল বাত্যা বহিয়া গিয়াছে এবং সরকার আপনার মাতব্বরীতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে ইহার টাকা পাইবার উপায় করিয়া দেওয়া নিরাপদ মনে করিয়াছেন। কিন্তু সরকারের সাহায্য পাওয়া যাইবে—এই বিশ্বাসেই লোক ব্যাঙ্কে টাকা আমানত করায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনই হয় নাই। সে হিসাবে জমী বন্ধকী ব্যাঙ্কে টাকা আমানতের আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু সে কত টাকা? তাহাতে বাঙ্গালার প্রয়োজন মিটিতে পারে না।

সুতরাং সরকারকে সে টাকা সংস্থান করিতে হইবে। বাঙ্গালার গভর্ণর দৃঢ়তা সহকারে বলিয়াছেন—টাকা দিতেই হইবে। বাঙ্গালার কৃষিসম্পদ জামিন রাখিয়া বাঙ্গালা সরকার অবশ্যই টাকা পাইতে পারিবেন। বর্ত্তমান সময়ে টাকার বাজার যেরূপ, তাহাতে অল্প সুদে—শতকরা সাড়ে ৪ টাকা সুদেও—ভারত সরকারের নিকট হইতে টাকা পাওয়া যাইতে পারে, অথবা বাঙ্গালা সরকার নিজ প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন। আজকাল এ দেশেও সরকারী ঋণের সুদের হার হ্রাস হইয়াছে ও হইতেছে। বিলাতের ত কথাই নাই। মধ্যে এ দেশে অশান্তি, অসহযোগ আন্দোলন, খাজনাবন্ধ আন্দোলন প্রভৃতির সংবাদে বিলাতের বাজারে ভারতীয় ঋণে সুদের হার কিছু বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে—এখন বিলাতের বাজারে ভারতীয় ঋণে টাকা পাইতে আর বিলম্ব হইতেছে না। সুতরাং প্রয়োজন হইলে, বিলাতের বাজারেও এজন্য টাকা পাওয়া যাইতে পারে।

সেইজন্য আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সময়ে বাঙ্গালার গভর্ণর এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প ও আয়োজন করিয়াছেন, তাহার মত সুসময় সচরাচর পাওয়া যায় না। এই সময় যদি প্রজার ঋণ ৭০ বা ৮০ কোটি টাকায় রফার বন্দোবস্ত করিয়া মহাজনের ঋণ শোধ করা হয়, তবে তাহার পর ফল কি দাঁড়ায় এখন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক—

যদি কতকগুলি গ্রাম বা এক একটি জিলা লইয়া হিসাব ধরা যায়, তবে যে স্থানে প্রজাকে মোট ১ কোটি টাকা দিয়া তাহার মহাজনের ঋণ শোধ করিয়া দেওয়া হইবে, সে স্থানে সরকারকে ঐ ১ কোটি টাকার জন্য

শতকরা সাড়ে ৪ টাকা হারে সুদ হিসাবে বার্ষিক ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিতে হইবে। তেমনই আবার ব্যাঙ্কগুলি ঐ ১ কোটি টাকার উপর সুদ পাইবেন। বর্ত্তমানে সমবায় সমিতিগুলিতে সুদের হার শতকরা বার্ষিক—১৫ টাকা। সে হিসাবে ব্যাঙ্কগুলি বৎসরে সুদ হিসাবে ১৫ লক্ষ টাকা পাইবেন। প্রাপ্য সুদের টাকা হইতে দেয় সুদের টাকা বাদ দিলে—১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা থাকে। ইহার মধ্যে কতকাংশ অবশ্য আদায়ের অযোগ্য হইবে। উহা শতকরা ১০ টাকা ধরা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যয় আছে। সে সব ধরিয়া যদি মোট ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও ৮ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট থাকে। এখন :—

(১) এই টাকার অর্দ্ধাংশ যদি ঋণ শোধকল্পে ব্যবহার করা হয়, তবে প্রায় ২০ বৎসরে ঋণ শোধ হইবে এবং তাহার পর সমগ্র টাকাই সরকারের তহবিল বৃদ্ধি করিবে।

(২) অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশে দেশের কল্যাণকর গঠন-কার্য্য হইতে পারিবে। আমরা বলিয়াছি, অর্থাভাবে বাঙ্গালা সরকার শিল্পে অর্থ-সাহায্য প্রদান করিতে পারিতেছেন না, শিল্প বিভাগের শিক্ষাদান কার্য্যও আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না ; এবং আমরা জানি, অর্থাভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা যেমন সম্ভব হইতেছে না, তেমনই দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি, পানীয় জল সংস্থান, নদীসংস্কার প্রভৃতি কার্য্যও হইতেছে না। এই অর্দ্ধাংশে সে সব কায হইতে পারিবে।

(৩) প্রজার ঋণের ও সুদের পরিমাণ হ্রাস হওয়ায় তাহার ব্যয় করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে এবং সেইজন্য টাকা ছড়াইয়া পড়িবে।

(৪) ব্যয়ের জন্য যে টাকা বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বহু লোক চাকরী পাইবে এবং বেকার সমস্যার অন্ততঃ আংশিক সমাধান হইবে।

আমরা কোটি টাকার কেন্দ্র ধরিয়া হিসাব করিলাম। এইরূপ ২৫টি কেন্দ্র ধরিলে যে টাকা পাওয়া যায়, তাহা প্রায় বর্ত্তমান সময়ের হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের জন্য নির্দ্দিষ্ট ব্যয়ের তুল্য হইয়া দাঁড়ায়।

কৃষকের অভাব দূর হইলে সে কৃষির উন্নতিকর কার্য্যের জন্য আবশ্যক অর্থ পাইবে এবং তাহার ফলে ফসল যেমন বাড়িবে, তাহার আয়ও সঙ্গে সঙ্গে তেমনই বাড়িবে।

বোধ হয় ইহা বুঝিয়াই বাঙ্গালার গভর্ণর বলিয়াছেন, "এইরূপ কার্য্যে যে অর্থ ব্যয়িত হইবে তাহা সুপ্রযুক্ত হইবে—লোকমতনায়কদিগের সহায়তায় তাহা সুপ্রযুক্ত হইলে তাহাতে যথেষ্ট লাভ হইবে। হয়ত সাহস করিয়া কতকটা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। পরীক্ষা, অনুসন্ধান ও সতর্কতায় দায়িত্বের ভাগ কমিয়া যাইবে। আর বর্ত্তমানে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে কি শঙ্কার কারণ নাই—দায়িত্ব নাই? যদি দুই দিকেই তাহা থাকে, তবে নিশ্চল হইয়া না থাকিয়া অগ্রসর হওয়াই কি সঙ্গত নহে?"

সরকার একক এই কায করিতে পারেন, এমন কথাও সার জন এণ্ডার্সন বলেন নাই। পরন্তু তিনি স্বীকার করিয়াছেন, জননায়কদিগের সহযোগ ব্যতীত ইহা সম্পন্ন হইতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন :—

"এ সমস্যা কেবল সরকারই সমাধান করিতে পারেন না। আমি দেখিতেছি, সরকারকে সব অনুগ্রহের উৎস বা সব অকল্যাণের কারণ বলিয়া মনে করিবার প্রবৃত্তি সর্ব্বদাই প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। যদি সময়োপযোগী ও অবস্থানুরূপ চেষ্টা করিতে হয়, তবে সমাজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্প্রদায়গুলিকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে হইবে।"

সেই জন্যই কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থানুসন্ধান জন্য যে সমিতি গঠিত হইতেছে, তাহাতে নানা সম্প্রদায়ের (কৃষিজীবী ও শ্রমিক) এবং নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও স্থান পাইবেন। তাঁহারা সরকারী কর্ম্মচারী ও বিশেষজ্ঞদিগের সহিত একযোগে কায করিবেন এবং তাঁহাদিগের অনুসন্ধান-ফলের উপর অবলম্বিত কার্য্য-পদ্ধতি বহু পরিমাণে নির্ভর করিবে।

এক দিকে যেমন এই সমিতির সাহায্যে অনুসন্ধান হইবে, অপর দিকে তেমনই পল্লীর সংস্কার জন্য নিযুক্ত কর্ম্মচারী অনুসন্ধানলব্ধ ফলানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন এবং নিজ বুদ্ধি অনুসারেও ঐ কার্য্য করিতে থাকিবেন।

সক্রেটিস বলিয়াছেন—"কৃষক নানা উপাদেয় দ্রব্য উৎপন্ন করে; কিন্তু সে যে ভূমিকে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করায় তাহাই তাহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি।" এই খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলেও পরীক্ষা প্রয়োজন; আর খাদ্যশস্যের ও অন্য ফশলের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে হইলেও দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রয়োজন :—

(১) পরীক্ষা ও গবেষণা অর্থাৎ বাঙ্গালার ভূমির উপযোগী উৎকৃষ্ট ফশল, কৃষি-পদ্ধতি ও যন্ত্রাদি আবিষ্কার ও সে সকল সম্বন্ধে পরীক্ষা। বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষার ফলে উৎকৃষ্ট বীজ উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে এবং জমীর অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ফশলের চাষের উপায়ও স্থির করা যায়। বাঙ্গালা দেশে ধান্য ও পাট সম্বন্ধেও ইহা দেখা গিয়াছে। চিনির সম্বন্ধে এখন পরীক্ষা প্রয়োজন। কোন্ জাতীয় ইক্ষু এই প্রদেশের উপযোগী অথচ বাঙ্গালার সাধারণ ইক্ষু অপেক্ষা অধিক ও উৎকৃষ্ট রস দিতে পারে, তাহাই দেখিয়া স্থির করিতে হইবে।

(২) প্রদর্শন। পরীক্ষার ও গবেষণার ফল কৃষকের গোচর করিতে হইবে। উৎকৃষ্ট বীজ বপন করিলে, উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিলে, উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি ব্যবহার করিলে কিরূপ লাভ হয়, তাহা কৃষককে দেখাইয়া দিতে হইবে।

(৩) ক্ষেত্রপ্রসার বৃদ্ধি। বাঙ্গালায় অংশ হইয়া হইয়া ক্ষেত্রের পরিমাণ যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সে ক্ষেত্রে উন্নত উপায় অবলম্বন করিয়া চাষ করিলেও বিশেষ লাভের সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য এক একজনের কর্ষিত জমীর পরিমাণ বৃদ্ধির উপায় করা প্রয়োজন।

কিরূপে এই ত্রিবিধ কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। তৃতীয় কার্য্যের জন্য অনুসন্ধান সমিতির নির্দ্ধারণ প্রয়োজন হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় কার্য্যের জন্য নির্দ্ধারণের আশায় বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই; যিনি পল্লীগ্রামের সংস্কার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন, তিনিই এই উপায়দ্বয় অবলম্বনের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমবায় নীতিতে যে কাষ এত দিন হইয়াছে, তাহা আশানুরূপ নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা সর্ব্বাগ্রেই ডেনমার্কের উন্নতির উল্লেখ করিব। ডেনমার্ককে এখন "সমবায় গণতান্ত্রিক দেশ" বলা হয়। বাঙ্গালারই মত কৃষিপ্রধান স্থান কিরূপে সমৃদ্ধ হইতে পারে—কিরূপে কৃষিকার্য্য বর্ত্তমান কালোপযোগী করা যায়, তাহা ডেনমার্কের লোক দেখাইয়াছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ডেনমার্কের এই উন্নতির সূত্রপাতও হয় নাই। সেই সময় কৃষিপ্রধান ডেনমার্ক আপনার বিপদ সম্যক উপলব্ধি করে; দেখিতে পায়, অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতায় দেশে শস্যের মূল্য এত হ্রাস পাইতেছে যে, কৃষিকার্য্যে আর লাভ হয় না। এই অবস্থার প্রতীকারকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া দেশের লোক ও দেশের সরকার একযোগে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। বর্ত্তমানে ডেনমার্কে সমবায় সঙ্ঘের যে জাল বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা অতুলনীয়। তথায় সমবায় সমিতির দ্বারা কৃষকের বীজ ক্রয় করা হয়, কৃষক সার ও যন্ত্রাদি ক্রয় করে, সে ফশল বিক্রয় করে, সমিতি হইতেই সে তাহার আবশ্যক টাকা ঋণ হিসাবে লইয়া থাকে। ইহার ফলে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৩৭ বৎসরে ডেনমার্কের কৃষিজ পণ্যের পরিমাণ শতকরা ৮৫ ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। শতকরা ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি কিরূপ ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আজ ডেনমার্কের অর্থনৈতিক জীবন সমবায় নীতির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

এ দেশের কৃষক রক্ষণশীল—সে বীজ ও কৃষি-পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনরূপ পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিতে চাহে না, এমন অভিযোগও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা যথার্থ বলা যায় না। কারণ, এ দেশের কৃষক কখন লাভজনক ফশল গ্রহণ করিতে—লাভজনক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে দ্বিধা করে নাই। য়ুরোপের কৃষকরাও অল্প রক্ষণশীল নহে। গত শতাব্দীর শেষভাগে সার ফ্রেডরিক নিকলশন বলিয়াছিলেন—য়ুরোপের কৃষক ভারতের কৃষকেরই মত প্রচলিত নিয়মে—পূর্ব্বপুরুষের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া চলে। লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়, এই রক্ষণশীলতার মূলে—বুদ্ধিবিবেচনাই বিদ্যমান। যে দরিদ্র—যাহার "যশোদার দড়ীর দুই মুখ কখন মিলে না"—সে কিরূপে পরিচিত পুরাতনের স্থানে নূতনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সাহস করিতে পারে?

যতক্ষণ পরীক্ষায় নূতনের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন না হয়, ততক্ষণ সে তাহা করিতে পারে না। এই জন্যই তাহাকে নূতনের ফল প্রদর্শন করাইতে হয়। বর্ত্তমানে তাহার কি হইতেছে?

এ সকল বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য নবনিযুক্ত কর্ম্মচারীর সমিতির নির্দ্ধারণের জন্য অপেক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় এই যে, সরকার এই কার্য্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন এবং উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে ও পুরাকীর্ত্তি রক্ষায় যে সরকারের পূর্ব্বেই অন্য লোক প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গে লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছিলেন, সরকারের কোন বিষয় শিখিতে বিলম্ব হয় এবং সেই জন্য কর্ত্তব্যসাধনেও বিলম্ব ঘটে। এ ক্ষেত্রেই তাহাই হইয়াছে। কিন্তু আমরা আশা করি সরকার কার্য্যফলে বিলম্বজনিত ক্রটি সংশোধনোপায় করিবেন।

কৃষকের ও পল্লীবাসীর অবস্থার উন্নতি কেবল কৃষির উন্নতিসাপেক্ষই নহে। সঙ্গে সঙ্গে আরও কায করিতে হইবে। সে সকলের মধ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও শিল্পের উন্নতি সাধন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিল্লীতে ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধনকালে লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছিলেন,—এখনও ভারতবর্ষের নানা স্থানে—পল্লীগ্রামেও যে সব শিল্পী আছেন, তাঁহারা দেশের লোকের প্রয়োজনীয়—নিত্যব্যবহার্য্য ও অন্য নানারূপ পণ্য উৎপাদন করিতে পারেন; তাঁহারা ভারতীয় শিল্পের ধারা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এ কথা কত সত্য, তাহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু অবজ্ঞায় ও অনাদরে সে সব শিল্প নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আজ আমরা একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিব। বহরমপুরে (মুর্শিদাবাদ) রেশম-শিল্পীরা ঝাঁপে নানারূপ নক্সাদার কাপড়—পর্দ্দা, টেবল-ঢাকা প্রভৃতি বয়ন করিত। ডুবরাজ নামক একজন শিল্পীই তাহাদিগের শেষ। তাঁহার বয়ন করা টেবল-ঢাকা দেখিয়া বাঙ্গলার ছোট লাট বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কল ব্যতীত কিরূপে ইহা হইতে পারে?" তিনি বয়ন-পদ্ধতি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ডুবরাজ বলিয়াছিলেন, "ঝাঁপ ত আনিতে পারি না—আপনি যদি দরিদ্রের কুটীরে গমন করেন, তবে দেখাইতে পারি," সার জন উডবার্ণ তাহাই করিয়াছিলেন এবং তাহার বয়ন-চাতুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যাঁহারা ডুবরাজের বয়ন-করা বস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা সে গুলি কোন প্রদর্শনীতে দেখাইতে পারেন।

বাঙ্গলার রঞ্জন শিল্পও একদিন বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। লর্ড কার্মাইকেলের আমলের যে গল্প সার নিকোলাশ বিটশন বেল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা অনেকে জানেন। ব্যবস্থাপক সভায় সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শিল্পে সাহায্যদানের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে সার নিকোলাশ একখানি রেশমী রুমাল দেখাইয়া বলেন—উহা গভর্ণর লর্ড কার্মাইকেলের। তাঁহার পিতা ও তিনি এইরূপ রুমালের আদর করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা এডিনবরার কোন দোকান হইতে তাহা ক্রয় করিতেন। ভারতবর্ষে চাকরী লইয়া আসিবার সময় লর্ড কার্মাইকেল দোকানের অধিকারীকে বলেন, তাঁহাকে আর সে দোকান হইতে রুমাল কিনিতে হইবে না; কারণ, ভারতবর্ষে তিনি সহজেই তাহা পাইবেন। মাদ্রাজে গভর্ণর হইয়া আসিয়া তিনি কোন বড় দোকানে ঐ রুমালের নমুনা পাঠাইয়া রুমাল কিনিতে চাহিলে, তাঁহাকে বলা হয়, রুমাল, বোধহয়, বাঙ্গালার। বাঙ্গালার গভর্ণর হইয়া আসিয়া তিনি কলিকাতার ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বহু দোকানে ঐ রুমাল কিনিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রুমাল পাওয়া যায় না। দোকানীরা বলেন, রুমাল, বোধ হয়, বোম্বাইয়ে প্রস্তুত হয়। বোম্বাইয়ে অনুসন্ধান করিলে রেশমী জিনিষ বিক্রেতারা বলেন, উহা সম্ভবতঃ ব্রহ্মে প্রস্তুত। ব্রহ্মের ব্যবসায়ীরা রুমাল দেখিয়া বলেন, সম্ভবতঃ উহা জাপানী। তখন লর্ড কার্মাইকেল বাণিজ্য বিভাগে রুমালের নমুনা পাঠাইয়া উহার উৎপত্তিস্থান জানিতে চাহেন। বিভাগের বিশেষ-অজ্ঞরা "অনেক চিন্তার পরে" মত প্রকাশ করেন—উহা, বোধ হয়, ভারতীয় নহে—ফ্রান্সের দক্ষিণাংশের। তখন লর্ড কার্মাইকেল এডিনবরার সেই দোকানেই ৬ খানি রুমাল আনিতে দেন ও সঙ্গে সঙ্গে রুমালের উৎপত্তিস্থান জানিতে

চাহেন। যথাকালে রুমালের সঙ্গে তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তর আইসে—রুমাল বাঙ্গালা প্রদেশে মুর্শিদাবাদ নামক স্থানে প্রস্তুত হয়। এ দেশে যাহারা পণ্য উৎপাদন করে তাহাদিগের সহিত ক্রেতৃগণের যোগসাধন কিরূপ দুষ্কর, তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্য সার নিকোলাশ এই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেই যোগ সাধনের কোন উপায় নির্দ্দেশ করেন নাই—উপায় অবলম্বন করা ত পরের কথা।

আয়ার্লণ্ডে সরকারের (তখন ইংরাজই আয়ার্লণ্ডের শাসক) সাহায্য গ্রহণ না করিয়া সার হোরেশ প্লাংকেট প্রমুখ নেতারা পল্লীগ্রামের শিল্পীদিগের সহিত সহরে ক্রেতাদিগের ঘনিষ্ট যোগসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ দেশে সরকারের দ্বারা সৃষ্ট ও সরকারী সাহায্যে পুষ্ট সমবায় বিভাগও সে কায করেন নাই।

শিল্পপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত পল্লীগ্রামের পুনর্গঠন বা সংস্কার কখন সম্পূর্ণ হইবে না—শিল্পের মৃতসঞ্জীবনী বারি না পাইলে এ দেশে উটজ শিল্পের শুষ্কপ্রায় তরু আবার পত্র-পুষ্পে পরিশোভিত হইবে না। সে কথা দেশের লোক বহুদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সে বিষয়ে সরকারের অবলম্বিত কোন নীতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। প্রতীচীর অনুকরণে দেশে কেবল বৃহৎ কলকারখানা সংস্থাপনের চেষ্টাই হইয়াছে। সেই সব কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলেও যে পল্লীগ্রামে উটজশিল্প নূতন ও উন্নত উপায় অবলম্বন করিয়া পুনর্গঠিত হইতে পারে, তাহা অনেকে ভাবিয়া দেখন নাই। ইহার অনিবার্য্য ফলে পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশা দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়াছে। কেবল আর্থিক অবস্থা নহে—সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের সামাজিক সংস্থানও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। এই দুর্দ্দশা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে নৈরাশ্যজনিত জাড্য দূর করা লোকের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এই সময় যে বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি এদিকে পতিত হইয়াছে এবং সরকার সোৎসাহে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা বাঙ্গলার পক্ষে আনন্দের ও বাঙ্গলীর পক্ষে আশার কথা, সন্দেহ নাই। তাই আমরাও সারজন এণ্ডার্সনের মত আশা ও কামনা করিতেছি, সরকারের সঙ্কল্পিত কার্য্য সুসম্পন্ন হউক এবং তাহার ফলে—আমরা যে দেশে বাস করিতেছি সেই দেশের দারিদ্র্যজর্জ্জরিত জনগণ অতি কষ্টে দিনপাত না করিয়া সমৃদ্ধি লাভ করুক।

আজ পল্লীগ্রামের অবস্থা দেখিলে বঙ্কিমচন্দ্রের "মা যা হইয়াছেন" সেই বর্ণনা মনে পড়ে—"কালী—অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী"। সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হউক—"মা যা ছিলেন" সেই মূর্ত্তি আবার আমরা প্রত্যক্ষ করি—"সর্ব্বালঙ্কারপরিভূষিতা, হাস্যময়ী, সুন্দরী * * বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী।"

আমরাও বলি, এ কায কেবল সরকারের নহে—এ কায দেশের, সুতরাং দেশের লোকের। স্বাবলম্বনের পথে যাঁহারা সাফল্যের সুমেরুশিরে স্বরাজ লাভ করিতে প্রয়াসী আজ তাঁহাদিগের যাত্রার আহ্বান আসিয়াছে। এই আহ্বান যদি ব্যর্থ হয়, তবে জাতির ও দেশের উন্নতির আশা কর্ম্মনাশার সলিলে বিসর্জ্জিত হইবে; তাহার পর কতদিনে যে আশা উদ্ধার করা সম্ভব হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

আজ প্রয়োজন কর্ম্মীর—তাঁহারাই কল্পনাকে মূর্ত্তি প্রদান করিবেন; কি উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে তাহা তাঁহারাই নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন; তাঁহাদিগকে সমালোচনা ত্যাগ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে—যে সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি সম্ভব নহে, সেই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

ভক্ত ভোলা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ভক্ত ভোলা তীর্থযাত্রী বন্ধুজনসাথে ;
বহু দিবসের বাঞ্ছা হেরি' জগন্নাথে,
সার্থক করিবে আঁখি। সম্মুখেতে রথ,
অসংখ্য যাত্রীতে ভরা শ্রীক্ষেত্রের পথ।

কত নদী কত মাঠ কত বনছায়—
সুদীর্ঘ সরণি ধরি' পার হয়ে যায়
পায়ে পায়ে। মন বাঁধা যে রথের সনে,
পথের যাতনা যত লাগেনাক মনে।

যেথায় ঘনায় রাত্রি, সেইখানে থামে ;
অজস্র লোকের ভীড় দক্ষিণে ও বামে—
দরিদ্র মানব-মেলা জুটে চারিধারে,
দেবালয়ে পান্থাবাসে কাতারে কাতারে।

কারো বা মিলেনি অন্ন, নিঃসম্বল কেহ ;
বৃক্ষতলে পথে কারো রোগাক্রান্ত দেহ
লুটিছে কাতর কণ্ঠে ফুকারিয়া জল ;
সেবা লাগি' থামে ভোলা বিষণ্ণ বিহ্বল।

কেহ-বা এগিয়ে চলে, কেহ পড়ে পিছে ;
কারো মন গৃহপানে ফিরিয়া চাহিছে—
পথশ্রমে, বর্ষাজলে উদ্‌ভ্রান্ত কাতর ;
সঙ্গীর উৎসাহে শুধু বাঁধিছে অন্তর।

২

সেবারে দুর্ভিক্ষ ভারী উৎকল প্রদেশে ;
সম্মুখে সুভদ্রাগড় ; অনাহারে ক্লেশে
সেথায় মরিছে লোক ; কেহ-বা পলায়ে
ছুটিছে বঙ্গের পথে জঠরের দায়ে !

দুধারেরই জনস্রোত জলস্রোতাকারে
মিশিতেছে পরস্পরে পথের দুধারে ;
পথেই যেন-বা রথ, হেন গণ্ডগোল !
আগে পিছে উচ্চকণ্ঠে উঠে হরিবোল।

চলেছে যাত্রীর দল তথাপি উৎসাহে ;
ভোলা শুধু নিরুৎসাহে চারিপাশে চাহে

হেরি' মানবের দুঃখ ; স্মরি' নারায়ণ—
বাঁধিতে পারে না তবু বিপর্যস্ত মন।

বন্ধু কহে, আছে আর মোটে দিন ছয়,
এইবারে ক্ষিপ্রপদে না চলিলে নয় ;
তব সাথে তীর্থপথে চলা—দেখি, ভার ;
পরের দুঃখের খোঁজে কি কাজ তোমার ?

অপ্রতিভ ভোলা বলে,—এই চল যাই,
কতই বিলম্ব হবে ? বেশী দেরী নাই ;
মেয়েটার জরটুকু ছাড়ে যদি রাতে,
গোবিন্দের নাম নিয়ে পালাব প্রভাতে।

৩

ভদ্রাগড়ে সন্ধ্যা নামে ঠিক পরদিন ;
দ্রুত চলি' দুই বন্ধু চলৎশক্তিহীন।
আহারে বিশ্রামে তবু মিলেনাক ঠাঁই,—
এমনই দেশের দশা—উপায়ও যে নাই।

দুর্ভিক্ষের সহচরী মহামারী আসি'
সুবিস্তীর্ণ জনপদ দিয়া গেছে নাশি'।
সুস্থ যারা—পলায়িত, শুধু রুগ্নজন
নিরুপায় পড়ে' আছে চাহিয়া মরণ।

যে শূন্য মন্দিরে দোঁহে রজনী কাটায়,
তারি পাশে শেষ রাত্রে শব্দ শোনা যায়—
যেন রুদ্ধ হাহাকার মৃত্যুর পরশে !
নিদ্রিত বন্ধুর কানে সে শব্দ না পশে।

ভোলা উঠি' তাড়াতাড়ি হইল বাহির,—
আপন কর্তব্য তা'র বুঝি করি' স্থির
মনে মনে। বন্ধুরে সে জাগা'ল না আর,
না করিয়া মিথ্যা সৃষ্টি নূতন বাধার।

প্রভাতে জাগিয়া বন্ধু চাহে চারিধারে,—
কোথাও নাহিক ভোলা ; বিস্ময়পাথারে
রহিল অবাক হয়ে সারা দিনরাতে ;
হতাশে একাকী যাত্রা করিল প্রভাতে।

৪

ভোলার কষ্টের আর রহিল না পার ;
অশ্রু-চক্ষে হেরে সে যে কৃষি-পরিবার,—
মরণে দু'জন তার শান্তি লভিয়াছে,
স্ত্রীলোক বালক যারা উপবাসী আছে,—

তাদেরও মৃত্যুর বড় নাই বেশী দিন ;
পুরুষের মধ্যে বাকী ছিল যে প্রবীণ,
সংক্ষেপে তাহার কাছে শুনি' সমাচার,
দ্রুতপদে বাহিরে সে চিন্তি' প্রতীকার।

আপন পাথেয় হ'তে যাহা প্রয়োজন,
দীর্ঘপথ ঘুরি' কষ্টে করি' আহরণ,
লাগিল সেবার কার্য্যে হয়ে একমনা—
গোবিন্দের পদে সঁপি' তীর্থের ভাবনা।

সে রাত্রে দেখে সে স্বপ্ন—যেন চারিধারে
অজস্র আর্ত্তের মেলা ; তাহারি মাঝারে
চলেছেন জগবন্ধু হেঁটে খালি পায়ে ;—
ভোলারে দেখিয়া ল'ন দু' বাহু জড়ায়ে !

কাটিল সপ্তাহকাল, পক্ষ কেটে যায় ;
ধীরে ধীরে ক্লান্তিহীন কর্ম্মব্যবস্থায়,
সঞ্চিত পাথেয়বলে, দুস্থ পরিবার
উঠে ক্রমে সুস্থ হয়ে সাহায্যে তাহার।

সময়ে সকলই হয়—পড়ে যায়', উঠে,—
আনন্দে শিশুর কণ্ঠে কলধ্বনি ফুটে,
নর ফিরে' কাজ করে, নারী উঠে হেসে ;—
দেখি' দেশে ফিরে ভোলা আষাঢ়ের শেষে।

৫

সবাই শুধায়,—কি হে, দেখে' এলে রথ ?
মৃদু হাসি' কহে ভক্ত—দেখে' এনু পথ ;—
রথের না পেনু দেখা মানুষের ভিড়ে ;
সবই কপালের লেখা, এনু তাই ফিরে' !

বল কি হে ?—ও হো ! তা' যে বলিবার নয়।
তীর্থকথা মুখে নিলে অপরাধ হয় !
ভালো, তব বন্ধু কোথা—ফিরেনি ত ঘরে !
আরও কোথা গেল বুঝি, পুরী হ'তে পরে ?

ভক্ত ভোলা হেসে শুধু নিজকাজে যায় ;
আরো এক পক্ষ কাটে বন্ধুর আশায়।
ভাবে সে, চাহিব ক্ষমা, আসুক্ ত আগে ;
ভাঙ্গিতে বন্ধুর রাগ কতক্ষণ লাগে !

৬

শ্রাবণে ফিরিল বন্ধু আপন আলয়ে,—
ভোলার নিকটে গিয়া ক্রোধভরে কহে—
মধ্যপথে ছেড়ে যাবে—ছিল যদি মনে,
কি কাজ একত্র তবে যাওয়া মোর সনে ?

ভোলা কহে—ছাড়িয়াছি বটে মাঝপথে,
তবে কিনা—আমি ভাই, যাইনি ত রথে।
মধ্যপথে অন্য কাজে বাঁধি' মোর হাত,
আমারে ফিরায়ে দিল দেব জগন্নাথ !

—মিথ্যাবাদী ! মোর সঙ্গে এই ব্যবহার !
দেখিনু তোমারে আমি তিন তিন বার,
রথের সিঁড়ির 'পরে ঠাকুরের নীচে,—
আমারে ভুলা'তে চাও ধাপ্পা দিয়ে মিছে !

শুধু চোখে দেখা নয়,—এগিয়ে সেখানে
চীৎকারি' ডাকিনু কত, শুনিলে না কানে !
দারুণ লোকের ভিড়ে নারিনু ধরিতে,
বার বার ব্যর্থ হয়ে হইল ফিরিতে !

অশ্রুনীরে তিতি' ভক্ত কহে পুনরায়—
মোটেই পুরীতে আমি যাই নি ত ভাই ;
ভদ্রাগড়ে ছিনু পড়ে' একপক্ষ কাল ;
তীর্থ লাগি' মিথ্যা ক'ব ? হায়'র কপাল !

—কেন বাড়াইছ মিথ্যা, কি বা প্রয়োজন ?
এর আগে নীচতা ত দেখিনি এমন !
তিন তিন বার নিজে দেখিলাম চোখে—
প্রভুর পায়ের কাছে ! তবু যাও বকে' !

শুনি' ভক্ত লুটাইয়া পড়ে ভূমিতলে,
ভাবিয়া প্রভুর কাণ্ড, ভাসি' নেত্রজলে !
ভক্ত আর ভক্তবন্ধু ভিন্ন কথা কয় ;—
কার সত্য সত্যি সত্য—কে করে নিশ্চয় !*

* টলষ্টয়ের অনুসরণে।

সাময়িকী

পাঠ্যপুস্তক ও ঐতিহাসিক সত্য—

কয় বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় শিক্ষকরা আন্দোলন করিয়াছিলেন—ইংরাজ লেখকরা মার্কিণের যে সব ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, সে সকলে সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে—অর্থাৎ ইংরাজের দোষ গোপন করা হইয়াছে, সুতরাং মার্কিণের ছাত্রদিগকে সে সব পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। ইতিহাস সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবে, ইহাই ইতিহাসের আদর্শ। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস রচনার জন্য ইংরাজ বিলাতে বহু অর্থব্যয় করিতেছেন। সে দিন বরোদায় এক সম্মিলনে কোবিদ মিষ্টার জয়শোয়াল দুঃখ করিয়াছেন, ইংলণ্ড ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য অর্থব্যয় করিতে পারে, আর ভারতে ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য অর্থব্যয় হয় না! কিন্তু বাঙ্গলায় পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন সমিতি কি ভাবে ভারতের ইতিহাস হইতে সত্যকে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা জানিলে পৃথিবীর পণ্ডিতগণ কি বলিবেন বলিতে পারি না।

এই পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন সমিতি ("টেক্সট বুক কমিটী") বাঙ্গলার বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে যে সব নিয়ম করিয়াছেন, তাহার কয়টি প্রদত্ত হইল :—

(১) জালাল-উদ্দীন খিলজীর ভ্রাতুষ্পুত্র আলা-উদ্দীন বিশ্বাসঘাতক হইয়া স্নেহশীল খুল্লতাতকে হত্যা করিয়া আপনাকে "সুলতান" ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার কুকার্য্যের পরিচয় ইতিহাস প্রদান করিতেছে। বাঙ্গলার পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন সমিতির সদস্যগণ স্থির করিয়াছেন, যে পুস্তকে আলা-উদ্দীনের পিতৃব্য-হত্যার উল্লেখ থাকিবে, তাহা পাঠ্য হইবে না! কিন্তু ইংরাজের লিখিত ইতিহাসেই আমরা বাল্যকালে পাঠ করিয়াছি—আলা-উদ্দীন "murdered the old man in the act of clasping his hand."

(২) মহম্মদ তোগলক নির্ম্মম হইয়া যে সব নিষ্ঠুরাচরণ অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সে সকলের জন্য তাঁহাকে বিকৃতবুদ্ধিও বলা যায়। তাহা ঐতিহাসিক সত্য। ফতোয়া জারি হইয়াছে, বাঙ্গলার পাঠ্যপুস্তকে তাঁহার কুকার্য্যের উল্লেখ থাকিতে পারিবে না।

(৩) টেক্সট বুক কমিটীর নির্দ্দেশ, শিখদিগের ইতিহাসে নিম্নলিখিত ঘটনার কোন উল্লেখ থাকিবে না—

(ক) জাহাঙ্গীরের আদেশে গুরু অর্জ্জুনকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হইয়াছিল।

(খ) গুরু তেজবাহাদুর ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় ঔরঙ্গজেবের আদেশে নিহত হইয়াছিলেন।

(গ) বাহাদুর শাহের আদেশে বান্দা ও তাঁহার শিষ্যদিগকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হইয়াছিল।

অথচ এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, মুসলমান শাসকদিগের অত্যাচারেই শিখ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

(৪) ঔরঙ্গজেব যে বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন, হিন্দুদিগকে উৎপীড়িত করিয়া ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগের উপর "জেজিয়া" কর স্থাপন করিয়াছিলেন, নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া শম্ভাজীকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যফলে রাজপুতরা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন—এ সবই ঐতিহাসিক সত্য। ইংরাজ ঐতিহাসিক তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"His life would have been a blameless one, if he had had no father to depose, no brethren to murder, and no Hindu subjects to oppress" অর্থাৎ তিনি পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন, ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়াছিলেন এবং হিন্দু প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন। আকবর সাম্রাজ্যের যে ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধররাই যে তাহা নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা ইংরাজ কবি টেনিসন তাঁহার অমর কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এখনও শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দজীর ভগ্নদেউল মন্দির হিন্দুর বক্ষে বেদনার সঞ্চার করে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন সমিতির নির্দ্দেশ—ঔরঙ্গজেবের এই সব

কার্য্যের কোন উল্লেখ পাঠ্যপুস্তকে থাকিবে না—তাঁহার অনুসৃত নীতিই যে মোগল রাজ্যের পতনকারণ তাহাও বলা যাইবে না! মোগল রাজশক্তির বিনাশ যেন বিনা কারণে হইয়াছিল!

(৫) শিবাজী যে আফজল খাঁকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। সার যদুনাথ সরকার অশেষ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে—ঐতিহাসিক প্রমাণ বিচার করিয়া যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, উভয়ে সাক্ষাৎকালে আফজলই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শিবাজীকে নিহত করিবার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করেন; শিবাজী তাঁহার অভিপ্রায় অনুমান করিয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন এবং তিনি তখন আফজলকে আক্রমণ করিলে আফজল নিহত হয়েন। পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন সমিতির নির্দ্দেশ, হয় এই ঘটনার উল্লেখে বিরত থাকিতে হইবে, নহে ত লিখিতে হইবে—কেহ কেহ বলেন, শিবাজীই প্রথমে আফজলকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

আমরা যে পাঁচটি নির্দ্দেশের উল্লেখ করিলাম, সে সকলের উদ্দেশ্য—হিন্দু ও মুসলমান ছাত্ররা যেন মনে করিতে না পারে যে,—

(ক) মুসলমান রাজ্যলাভে স্নেহশীল পিতৃব্যকে হত্যা করিতে পারে।

(খ) মুসলমান রাজা বিকৃতমস্তিষ্ক হইতে বা বিকৃতমস্তিষ্কের মত কাজ করিতে পারে।

(গ) মুসলমান সম্রাটরা নৃশংস হইতে পারেন।

(ঘ) মুসলমান সম্রাট অনাচারী ও অত্যাচারী হইতে পারেন।

(ঙ) মুসলমান রাজকর্ম্মচারী বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে।

আমরা স্বীকার করি, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অনাচার, অত্যাচার পৃথিবীতে মুসলমানাতিরিক্ত লোকের দ্বারাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে—হয় ত ভবিষ্যতেও হইবে। হিন্দু বা খৃষ্টান শাসক বা রাজকর্ম্মচারী যে কখন এ সব পাপে লিপ্ত হইতে পারেন না, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু মুসলমানপ্রধান বাঙ্গলার পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন সমিতি যে ভাবে মুসলমানের দোষ ত্রুটি গোপন করিবার জন্য ইতিহাসের সত্য বিকৃত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা কখনই সমর্থিত হইতে পারে না।

ইতিহাস যে মুহূর্ত্তে সত্য ত্যাগ বা বিকৃত করে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহা আর ইতিহাসের উচ্চ বেদীতে অবস্থিত থাকিতে পারে না, তাহা তখনই অসত্যের পঙ্কে পতিত হয়।

গত মাসে আমরা "শিক্ষা-সংস্কার" প্রসঙ্গে লাট-প্রাসাদে যে বৈঠকের উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহাতে কোন বক্তা বাঙ্গালার পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন সমিতির এই কার্য্যের—ইতিহাসে সত্য গোপনের চেষ্টার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহাতে এক জন মুসলমান বক্তা যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, তাহা আর যাহাই কেন হউক না, বিচারসহ নহে। তাহার কারণ—ইতিহাস যদি অসত্য বর্জ্জন করিতে না পারে, রাজনীতিক বিবেচনা হইতে উর্দ্ধে উঠিতে না পারে,—অর্থাৎ যদি কেবল সত্যকেই গ্রহণ করিতে না পারে, তবে তাহা আর ইতিহাস বলিয়া বিবেচিত ও পরিগণিত হইতে পারে না। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান কাহারও সম্বন্ধে ইতিহাস অসত্য প্রচার বা সত্য গোপন করিবে না। ইহাই ইতিহাসের আদর্শ। ইতিহাস হিন্দু রাজা জয়চাঁদের হীন কার্য্যের যেমন, মুসলমান ঔরঙ্গজেবের হীন নীতির তেমনই নিন্দা করিবে এবং উমিচাঁদের সম্বন্ধে খৃষ্টান ক্লাইবের ঘৃণ্য ব্যবহার গোপন করিবে না।

আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বুঝা যায়, পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন সমিতির সদস্যগণ ঐতিহাসিক সত্যের আদর করিতে প্রস্তুত নহেন—তাঁহারা তাহার মর্য্যাদাও বুঝি বুঝেন না। আমাদিগের এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়—তাঁহারা যে কার্য্যের ভার লাভ করিয়াছেন, সে কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার যোগ্যতা যে তাঁহাদিগের নাই, এমন সন্দেহ করিবার কারণ আছে।

এদেশের ইতিহাস যাহাতে যথাযথ ভাবে লিখিত হয়—যাহাতে তাহাতে কোথাও অসত্য প্রচারিত বা সত্য গোপন করা না হয়—যাহাতে তাহাতে ইতিহাস-বর্ণিত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে নিন্দা প্রশংসা যথাযথভাবে বিভাগ করা হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন

করাই পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন সমিতির সদস্যদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য।

শিল্প-সংরক্ষণ—

ভারতবর্ষ শিল্প-সংরক্ষণ জন্য আবশ্যক আইন করিবার অধিকার লাভ করিবার পর হইতে বিদেশী প্রতিযোগিতা প্রহত করিয়া স্বদেশী শিল্প-সংরক্ষণকল্পে যেরূপ শুল্ক স্থাপন করিয়া আসিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। টাটার লৌহের কারখানা যে সাহায্য লাভ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা অসাধারণ। এমন কি বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দশার সময় তাহা হ্রাস করা প্রয়োজন মনে করিয়া বাঙ্গালা সরকার ভারত সরকারকে পত্র লিখিয়াছেন। কাপড়ের কলের জন্য সাহায্য-ব্যবস্থা হইয়াছে এবং চিনির উপর আমদানী শুল্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়া এদেশে শর্করা শিল্পের সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধারে ব্যবস্থাও হইয়াছে।

সংপ্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য সদস্য সার যোশেফ ভোর ব্যবস্থা পরিষদে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শিল্পকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছেন। এই সকল শিল্প স্বাভাবিক অবস্থায় টারিফ বোর্ডের নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সংরক্ষণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছিল না বটে, কিন্তু এখন বিদেশী প্রতিযোগিতা যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সে সব শিল্পের পক্ষে আত্মরক্ষা করা দুষ্কর হইয়াছে এবং সেই জন্য বিদেশী পণ্যের উপর আমদানী শুল্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে-গুলিকে রক্ষা করা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। যাহাতে অকারণে আমদানী শুল্কের পরিমাণ বর্দ্ধিত না হয়, কিন্তু ভারতীয় শিল্পের বিপদ না ঘটে তাহা বিবেচনা করিয়া শুল্কের পরিমাণ স্থির করা হইবে।

যে সব দেশে মুদ্রার মূল্য হ্রাস হইয়াছে সে সব দেশ এখন অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে ভারতে পণ্য বিক্রয় করিতে পারিতেছে। প্রস্তাবিত শুল্কে যদি সে সব দেশের পণ্যের আমদানী হ্রাস হয়, তবে ভারত সরকার এই শুল্কে বার্ষিক প্রায় ২০ লক্ষ টাকা পাইবেন; আর সে সব দেশের পণ্য আমদানী হইতে থাকিলে এই আয় ৪০ লক্ষে দাঁড়াইবে, এমন আশা করা যায়।

কোন বিশেষ দেশের আমদানী পণ্য সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করা হইবে না; ইহা সকল দেশের পণ্য সম্বন্ধে সমভাবে প্রযুক্ত হইবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টারিফ বোর্ডের নির্দ্দিষ্ট শুল্ক অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে বটে, কিন্তু শুল্কের সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ স্থির থাকিবে। ফলে কোন্ দেশ কি কারণে অত্যন্ত অল্প মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিতে পারিতেছে, তাহা বিবেচনা না করিয়াও ভারত সরকার কেবল স্বদেশী শিল্পের বিপদ নিবারণ কল্পে শুল্কের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

যে সব পণ্যের এইরূপ সাহায্য প্রয়োজন সেই সকল পণ্যের তালিকায় মৎস্যের তৈল ও মিছরীও ভুক্ত করা হইয়াছে।

স্থির হইয়াছে:—

(১) পশমী মোজা গেঞ্জী ও কাপড় শতকরা ৩৫ টাকা হিসাবে অথবা প্রতি অর্দ্ধ সেরে ১ টাকা ২ আনা হিসাবে শুল্ক দিতে বাধ্য হইবে। ইহার মধ্যে যে হিসাবে ধরিলে শুল্কের পরিমাণ অধিক হইবে, সেই হিসাবই ধরা হইবে।

(২) পশম-মিশ্রিত পণ্যের উপর আমদানী শুল্কের পরিমাণ শতকরা ৩৫ টাকা হইবে।

(৩) সূতী গেঞ্জীর উপর আমদানী শুল্ক শতকরা ২৫ টাকা অথবা প্রতি ডজনে অর্থাৎ ১২টিতে ১ টাকা ৮ আনা হইবে।

(৪) সূতী মোজার উপর শুল্কের পরিমাণ শতকরা ২৫ টাকা বা প্রতি ডজনে অর্থাৎ ১২ জোড়ায় ১০ আনা হইবে।

(৪) টালী, মৃৎপাত্র ও পোর্সিলেনের উপর শুল্ক শতকরা ৩০ টাকা বা প্রতি বর্গফুটে ২ আনা হিসাবে ধরা হইবে।

(৫) কাচের চিমনি প্রভৃতি শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে শুল্ক দিতে বাধ্য হইবে।

(৬) লৌহের উপর কলাই করা বাসন প্রভৃতিতে শুল্ক শতকরা ৩০ টাকা হিসাবে আদায় হইবে; কেবল

বিলাতী পণ্যে উহা শতকরা ১০ টাকা হিসাবে কম ধরা হইবে।

(৭) মাখিবার সাবানের উপর শতকরা ৩০ টাকা হিসাবে আমদানী শুল্ক আদায় করা হইবে।

(৮) মৎস্যের তৈল প্রতি হন্দরে ১০ টাকা হিসাবে আমদানী শুল্ক দিতে বাধ্য হইবে।

(৯) মিছরীর উপর শুল্ক হন্দর প্রতি ১০ টাকা ৮ আনা স্থির হইবে।

আমরা উপরে কতকগুলি পণ্যের উল্লেখ করিলাম। ছত্র ও জুতাও তালিকাভুক্ত হইবে।

প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ হইলেই আইন অনুসারে শুল্ক আদায় আরম্ভ হইবে।

সার অষ্টিন চেম্বার্লেন যখন ভারত-সচিব ছিলেন, তখন ভারতে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন!—

"যাঁহারা শুল্কে সংরক্ষণ নীতির সংস্কার করিতে চাহেন, তাঁহারা এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, যথেচ্ছা ব্যবস্থা করিবার অধিকার লাভ করিলে ভারতের লোক-প্রতিনিধিরা নিরবচ্ছিন্ন রক্ষানীতি অবলম্বন করিতেন এবং সে নীতি অন্যান্য দেশের পণ্যের মত বিলাতী পণ্য সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইত।"

সেদিন তিনি ভারতের লোকমত লক্ষ্য করিয়া যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহার যাথার্থ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শাসন-সংস্কারে আর্থিক ব্যাপারে স্বাধীনতা লাভ করিয়াই ভারতবর্ষ স্বদেশী শিল্প রক্ষা করিবার জন্য সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়াছে। ইহার ফলে যে বিদেশের ব্যবসায়ীদিগকে ভারতবর্ষের ব্যবসায়ীদিগের সহিত মীমাংসা করিতে হইতেছে, সংপ্রতি বিলাতের ও জাপানের বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের প্রতিনিধিদিগের ভারতে আগমনে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

কোন কোন দেশ আপনাদিগের মুদ্রার বিনিময় মূল্য হ্রাস করায় তাহারা যে সুবিধা পাইয়াছে এবং সেই সুবিধা লইয়া যে ভাবে ভারতের বাজার অধিকার করিতেছে, তাহাতে রক্ষা শুল্ক স্থাপন বা বৃদ্ধি না করিলে ভারতের শিল্পকে প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করা অসম্ভব। অল্প মূল্যে পণ্য পাইলে দেশের ক্রেতাদিগের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু তাহার ফলে দেশে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠাযোগ্য সে সকল প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় দেশের আর্থিক দুর্গতি অনিবার্য্য হয়। যে দেশ নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত সে দেশের পক্ষে নূতন শিল্পকে অন্যান্য দেশের পুরাতন ও সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমদানী শুল্ক প্রবর্ত্তনের পথই অবলম্বন করিতে হয়।

এ দেশে মাটীর বাসন ও পোর্সিলেনের শিল্প ও কাচশিল্প জাপানী প্রতিযোগিতায় সংপ্রতি কিরূপ আঘাত পাইয়াছে, তাহা যেমন সর্ব্বজনবিদিত, ঐরূপ প্রতিযোগিতায় মোজা ও গেঞ্জী শিল্পের দুর্দ্দশাও তেমনই সপ্রকাশ। পূর্ব্বে জাপান হইতে পশমী জিনিষ অধিক আমদানী হইত না—এ বার তাহাও আরম্ভ হইয়াছে। অথচ বাঙ্গালায়ও বহু কাচের ও মোজা-গেঞ্জীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অল্প দিন পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, "বেঙ্গল পটারিজ" নামক বহুদিনের মৃৎপাত্রাদির ও পোর্সিলেনের কারখানাটিকে অর্থাভাবে অন্য প্রদেশের ব্যবসায়ীর পরিচালনাধীন করিতে হইয়াছে। লৌহের উপর কলাই করা জিনিষের ও সাবানের কারখানাও বঙ্গদেশে অল্প হয় নাই। এই সকল কারখানায় মোট কত টাকা মূলধন প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ হিসাব পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু মনে করা যাইতে পারে যে, এ দেশের হিসাবে প্রযুক্ত মূলধন অল্প বলা চলে না। যে প্রতিযোগিতায় এই সব শিল্প মরণাহত হইতেছিল—জীবন্মৃত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, সেই প্রতিযোগিতা প্রহত না হইলেও প্রশমিত হইলে যে এ দেশের এই সব শিল্প শ্রী সম্পন্ন হইতে পারিবে, এমন আশা অবশ্যই করা যায়। প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ হইলে তাহার ফলে ভারতের বহু শিল্পের কিরূপ সুবিধা হয়, তাহা জানিবার জন্য ভারতবাসীর আগ্রহ স্বাভাবিক। কারণ, ভারতবাসী বুঝিয়াছে, শিল্পের সমৃদ্ধি ব্যতীত দেশের আর্থিক দুর্গতি দূর হইবে না।

—

বৃটিশ সেনাবলের ব্যয়—

ভারতবর্ষের সামরিক বিভাগের ব্যয়ের আধিক্য সম্বন্ধে এ দেশের লোক বহুদিন হইতেই আন্দোলন করিয়া আসিয়াছেন। দেশের লোকের মত এই যে, সামরিক বিভাগের ব্যয় অত্যধিক এবং তাহার হ্রাস না হইলে ভারতবর্ষে নানা উন্নতিকর কার্য্যের প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হইবে না। এ কথা সরকারের ব্যয়সঙ্কোচের উপায় নির্দ্ধারণ জন্য নিযুক্ত ইঞ্চকেপ কমিটীও বলিয়াছিলেন। কয় বৎসর পূর্ব্বে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছিল—বিলাতের সরকারের সমগ্র ব্যয়ের শতকরা ২০ টাকা, কানাডার মোট ব্যয়ের শতকরা ১১ টাকা, দক্ষিণ আফ্রিকার মোট ব্যয়ের শতকরা ৮ টাকা সামরিক বিভাগে ব্যয়িত হয়; আর ভারতবর্ষে সরকারের মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশই এই বাবদে ব্যয়িত হয়।

সাধারণতঃ বলা হয়, দুই কারণে ভারতের সামরিক ব্যয় অত্যন্ত অধিক হইয়াছে—(১) বৃটিশ সাম্রাজ্যের নানা স্থানের প্রয়োজনে ভারতে সেনাবল অধিক করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ ব্যয় ভারতবর্ষকেই বহন করিতে হয়। ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে সেনাদল চীনে, মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ইরাকে পাঠান হইয়াছে। ভবিষ্যতে যে তাহা হইবে, ইহাও সহজে অনুমান করা যায়। (২) এ দেশে ইংরাজ সৈনিকদিগের জন্য অত্যন্ত অধিক ব্যয় হয়। যে সকল কারণে ভারতবর্ষ এখন ভারতীয় সৈনিক দ্বারাই দেশ সুরক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, সে সকলের মধ্যে জাতীয় ভাব সর্ব্বপ্রধান হইলেও বৃটিশ সৈনিকদিগের অতিরিক্ত ব্যয়ও উপেক্ষা করা যায় না।

দেশীয় সৈনিকের অর্থাৎ সিপাহীর তুলনায় এ দেশে বৃটিশ সৈনিকের ব্যয় অত্যন্ত অধিক। প্রথমোক্তের বেতন, সিপাহীর বেতনের প্রায় ছয় গুণ; আর সব ব্যয় হিসাব করিলে দেখা যায়—

বৃটিশ সৈনিকের জন্য বার্ষিক ব্যয় ... ২ হাজার ৫ শত ৩ টাকা

আর

সিপাহীর জন্য বার্ষিক ব্যয় ... ৬ শত ৩১ টাকা।

বিলাতের মত ধনী দেশে মজুরদিগের পারিশ্রমিকের হার অধিক এবং তাহাদিগের মধ্য হইতেই সৈনিক সংগ্রহ করা হয় বলিয়া তাহাদিগের পারিশ্রমিকের অনুপাতেই বৃটিশ সৈনিকের বেতন ধার্য্য করিতে হয়। কেবল তাহাই নহে। বৃটিশ সৈনিকের বেশ ও আহার্য্যের ব্যয়ও অধিক এবং তাহাকে বিজলী আলো ও পাখা দেওয়া হয়। বিলাতে তাহার শিক্ষার ব্যয়ও ভারতবর্ষকে বহন করিতে হয়; তথায় যে সব সামরিক বিদ্যালয় আছে, সে সকলের ব্যয়েরও কতকাংশ ভারতবর্ষকে দিতে হয়। তাহার গতায়াতের ব্যয়ও পূর্ব্বে ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে বহন করিতে হইত—১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভারতের আয়-ব্যয় নির্দ্ধারণ জন্য নিযুক্ত ওয়েলবী কমিশন বলেন—সে ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ বিলাতী সরকারের দেয় এবং তদনুসারে বিলাতী সরকার এই জন্য বৎসরে প্রায় ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হিসাবে দিয়া আসিয়াছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বৃটিশ সৈনিকদিগকে বিদায়কালে কিছু টাকা দিতে হয় এবং ইহারা ভারতের সেনাবলের অংশ নহে—ঠিকা হিসাবে ৫ বৎসর ৪ মাসের অনধিক কালের জন্য বিলাতের সেনাবল হইতে এ দেশে আসিয়া থাকে। অর্থাৎ ভারতবর্ষ ইহাদিগকে সংগ্রহের ও ইহাদিগের শিক্ষার ব্যয় প্রদান করিয়া ইহাদিগকে আনিলেও ইহারা মাত্র ৫ বৎসর ৪ মাসকাল পর্য্যন্ত ভারতে কাজ করিতে পারে—তাহার পর ইহারা বিলাতের সেনাবলের অংশ হয়—ভারতের ব্যয়ের ফল ইংলণ্ড সম্ভোগ করে।

এই জন্য এ দেশে বৃটিশ সেনাবল রক্ষায় আমাদিগের ব্যয় অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশের শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন, তখনও এ দেশে বৃটিশ সৈনিক ছিল; কিন্তু তাহারা বৃটিশ সেনাদলের অংশ ছিল না; সেই জন্য আজ বৃটিশ সৈনিকদিগের জন্য ভারতের যে ব্যয় হয়, তখন তাহা হইত না—অথচ তখন এ দেশে যুদ্ধ লাগিয়াই ছিল।

নূতন ব্যবস্থায় ব্যয় বৃদ্ধির সময় হইতেই ভারত সরকার এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু বিলাতের সমর আফিস সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। বরং তাঁহারা ভারত সরকারের নিকট হইতে আরও টাকা পাইবার জন্য দাবী করিতেছিলেন। এখনও তাঁহারা বলিতেছিলেন—

ভারত সরকার যে বার্ষিক দেয় প্রায় ১ কোটি ৯০

লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হইতে অব্যাহতি পাইবার কথা বলিতেছেন, তাহা হইতে পারে না; পরন্তু সেই দেয় টাকার পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়া বার্ষিক প্রায় ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা করা হউক।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারত সরকার বহুদিন হইতেই বৃটিশ সেনাবলের শিক্ষাদির ব্যয় হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফললাভ হয় নাই। প্রত্যেক সৈনিকের জন্য প্রথমে প্রায় ১শত ৫০ টাকা দিতে হইত; তাহার পর ভারত সরকারের আবেদন ফলে উহা হ্রাস করিয়া প্রায় ১শত ১২ টাকা করা হয়। কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উহা আবার বাড়াইয়া প্রায় ১শত ৬৫ টাকা করা হয়।

ওয়েলবী কমিশনে মিষ্টার বুকানন বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে কেহই ভারতের তহবিল হইতে এই টাকা আদায় ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করে না। কিন্তু বৃটিশ সমর আফিস কিছুতেই বিচলিত হয়েন নাই। বরং দেখা যায়, ওয়েলবী কমিশনের নির্দ্ধারণানুসারে তাঁহারা যখন বৃটিশ সৈনিকদিগের গতায়াত জন্য খরচের অর্দ্ধাংশ হিসাবে বার্ষিক সাড়ে ১৯ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হয়েন তখন সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে সৈনিকদিগের ব্যয় বাবদে বার্ষিক ১শত ১২ টাকা বাড়াইয়া প্রায় ১শত ৬৫ টাকা করিয়া লয়েন। অথচ সৈনিকদিগের গতায়াতের ব্যয় হিসাবেও বৃটিশ সরকারের দেয় টাকা—অধিকতর।

ওয়েলবী কমিশন বিলাতে সৈনিকদিগের শিক্ষাদির ব্যয় বহনে ভারতবর্ষকে বাধ্য করা সঙ্গত কি না, সে বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

এদিকে ভারতবর্ষে কংগ্রেস ও রাজনীতিকরা স্বায়ত্ত-শাসন লাভের জন্য আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়া অবধি আর এ বিষয়ে দৃষ্টি দেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যখন মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব হয়, তখন জার্ম্মাণ যুদ্ধ চলিতেছে। সাম্রাজ্যের ভাগ্য-নির্দ্ধারণ কিরূপ হইবে তাহা দেখিবার জন্য সকলের দৃষ্টি ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে নিবদ্ধ। কাজেই তখন এ বিষয়ের কোন সিদ্ধান্তের চেষ্টা হয় নাই।

তাহার পর সাইমন কমিশন। সাইমন কমিশনের রিপোর্টে দুইটি কারণে এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশে বিরত রহিবার কথা বলা হইয়াছিল—(১) বিষয়টি বিশেষজ্ঞদিগের বিবেচ্য; (২) বিষয়টি ভারত সরকার ও বৃটিশ সরকারের আলোচনার বিষয় হইয়াছিল।

কিন্তু ঐ কমিশন সম্পর্কে মিষ্টার লেটন উল্লেখ করিয়াছিলেন, এই বিষয় এখন বিবেচনাধীন। আর সাইমন কমিশনের রিপোর্ট পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়—কমিশনের সদস্যগণ মনে করিয়াছিলেন, এই ব্যয়ের কতকাংশ বিলাতী সরকারের বহন করা কর্ত্তব্য। কারণ, তাঁহারা দেখাইয়া দিয়াছেন, কানাডা প্রভৃতি দেশ আপনাদিগের সেনাদল গঠন করায় তাহাদিগের সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস হইয়াছে। অর্থাৎ ভারতের সামরিক ব্যয় যে অত্যন্ত অধিক তাঁহারা তাহাও যেমন—প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে—স্বীকার করিয়াছেন, তেমনই বৃটিশ সেনাদলই যে সে ব্যয়-বৃদ্ধির অন্যতম কারণ তাহাও অস্বীকার করেন নাই। ভারতের সেনাদল যে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে পুনঃ পুনঃ ভারতের বাহিরে প্রেরিত হইয়াছে অর্থাৎ ভারতের সেনাবল যে কেবল ভারতের প্রয়োজনেই রক্ষিত নহে তাহাও তাঁহারা "ঐতিহাসিক ব্যাপার" বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

সুতরাং বুঝিতে পারা যায়, সাইমন কমিশন কোনরূপ মত প্রকাশে বিরত থাকিলেও ভারত সরকারের ও ভারতবাসীর দাবী সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

ইহার পর গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশন হয়। প্রথম অধিবেশনেই সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র প্রমুখ বাঙ্গালার প্রতিনিধিরা সামরিক ব্যয়ের কথা উত্থাপিত করেন। বাঙ্গালার প্রতিনিধিগণের মধ্যে কেবল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু তাঁহাদিগের বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন নাই। তাহার কারণ, তিনি মনে করেন—কেবল বৃটিশ সৈনিক-দিগের শিক্ষার ব্যয় বৃটিশ সরকার প্রদান করিলেই ভারতের প্রতি সুবিচার করা হইবে না এবং ভারত-বাসীরা সে ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। তিনি মত প্রকাশ করেন—যত দিন ভারতের প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন কারণে ভারতে বৃটিশ সৈনিক রক্ষা করা হইবে, তত দিন তাহাদিগের সমগ্র ব্যয়ভার বৃটিশ সরকারের বহন করা কর্ত্তব্য। সে যাহাই হউক—অন্যান্য প্রদেশের

প্রতিনিধিদিগের কেহ কেহও উল্লেখিত বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন।

তখনই ভারত-সচিব পার্লামেন্টে বলেন—এই বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্ত একটি স্বতন্ত্র কমিটী গঠিত হইবে। তদনুসারে যে কমিটী বা ট্রাইবিউনাল গঠিত হয় তাহাতে সার রবার্ট গারান সভাপতি হয়েন এবং বৃটিশ সরকার দুই জন (লর্ড ডুনেডিন ও লর্ড টমলিন) সদস্ত ও ভারত সরকার দুই জন (সার সাদীলাল ও সার শাহ মহম্মদ সুলেইমান) সদস্ত মনোনীত করেন।

ট্রাইবিউনাল সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া গত জানুয়ারী মাসে তাঁহাদিগের নির্দ্ধারণ পেশ করেন। সেই নির্দ্ধারণানুসারে কাজ করিতে যে বৃটিশ সরকারের প্রায় এক বৎসর কাটিয়াছে, তাহাতেই মনে হয়—বৃটিশ সমর আফিস "বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী"—পণ ধরিয়াছিলেন। তাঁহারা যে ভারত সরকারকে বার্ষিক দেয় প্রায় ২ কোটি টাকা হইতে অব্যাহতি দেওয়া ত পরের কথা ঐ টাকার পরিমাণ বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে ভারতের দাবী ন্যায্য স্বীকার করিয়া স্বার্থত্যাগ করা অবশ্যই সহজ বলিয়া মনে করা যায় না। বৃটিশ সরকার যে ভারত সরকারের ও ভারতবাসীর দাবী অসঙ্গত মনে করেন নাই, ট্রাইবিউনাল গঠনেই তাহা অনুমান করিতে পারা যায়।

প্রায় দ্বাদশ মাসব্যাপী বিবেচনার পর বৃটিশ সরকার ট্রাইবিউনালের সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তদনুসারে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী এ বিষয় পার্লামেন্টের গোচর করিয়াছেন।

বিলাতের প্রধান মন্ত্রী পার্লামেন্টে যাহা বলেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"বৃটিশ সরকার স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রস্তাব করিবেন যে, ভারত রক্ষার ব্যয় বাবদে বৃটিশ সরকার ভারত সরকারকে বার্ষিক প্রায় ২ কোটি টাকা (১৫ লক্ষ পাউণ্ড) প্রদান করেন। ইহার পূর্ব্বে বৃটিশ সরকারের তহবিল হইতে বৃটিশ সেনাদলের ভারতে গতায়াতের ব্যয় বাবদে বার্ষিক যে প্রায় সাড়ে ১৯ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হইত, তাহা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই টাকা দেওয়া হইবে কি না, তাহাও ট্রাইবিউনালে বিচারার্থ পেশ করা হইয়াছিল।"

অর্থাৎ ভারতের মোট লাভ প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা এবং সৈনিকদিগের গতায়াত বাবদে বৃটিশ সরকারের "বার্ষিক" ধরিলে মোট প্রায় ২ কোটি টাকা হইবে।

আগামী ১লা এপ্রিল হইতেই প্রস্তাবিত ব্যবস্থানুসারে কাজ হইবে। সুতরাং ঐ প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা এবারই ভারত সরকারের বাজেটে আয়ের দিকে দেখান যাইবে। বর্ত্তমান সময়ে এই লাভ উপেক্ষণীয় বলা যায় না।

আমাদিগের মনে হয়, আর্থিক হিসাবেই কেবল এই লাভ লাভ বলিয়া মনে করিলে যথেষ্ট হইবে না। ভারতের লোকমতের সহায়তায় ভারত সরকার দীর্ঘকাল-ব্যাপী সংগ্রামে যে জয়লাভ করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে—বৃটিশ সরকার স্বীকার করেন, এতদিন ভারতবর্ষের নিকট হইতে যে টাকা আদায় করা হইয়াছে, তাহার সঙ্গত কারণ ছিল না এবং সেইজন্ত তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। যে সেনাবল কেবল ভারতের নহে—পরন্তু সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে রক্ষিত ও প্রযুক্ত হয়, তাহার ব্যয়ভার বহনে ভারতবর্ষকে বাধ্য করা অসঙ্গত। "These unpaid-for glories bring nothing but shame." সুতরাং এখন—বৃটিশ সরকারের এই ব্যবস্থার পর—ভারতবর্ষের পক্ষে ভারতের সামরিক ব্যয়ের অংশ গ্রহণ করিবার জন্ত বৃটিশ সরকারকে বলা আরও সহজ হইবে।

এই সংবাদ প্রকাশ-প্রসঙ্গে ভারত সরকার যাহা বলিয়াছে, তাহা যেমন সংযত, তেমনই সত্য। তাঁহারা বলিয়াছেন :—

"যদিও বৃটিশ সরকারের তহবিল হইতে ভারতের সংস্করণ জন্ত যে টাকা দেওয়া হইবে তাহা ট্রাইবিউনালের সিদ্ধান্তানুবর্ত্তী এবং ভারতের সেনাবলের ব্যয়কল্পে সাধারণভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, তথাপি ইহার ফলে ভারতের করদাতারা দশটি ব্যাটালিয়ন বৃটিশ পদাতিক সেনার ব্যয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে।"

অর্থাৎ ইহাতে ভারতবর্ষের ও ভারত সরকারের দাবী

পূর্ণ না হইলেও ইহাতে যে ভারতের কতকটা সুবিধা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৃটিশ সরকারের তহবিল হইতে যে এই টাকা প্রদত্ত হইবে, তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনার অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু আমরা মনে করি, যাহা আমাদিগের প্রাপ্য বলিয়া আমরা বিবেচনা করি, তাহা সমগ্র রূপে পাই নাই বলিয়া যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহা ত্যাগ করা—পাছে পথিমধ্যে দস্যুহস্তে পতিত হই সেই ভয় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য অর্থ-থলি ফেলিয়া দেওয়ার মতই বলা যাইতে পারে। সিপাহী বিদ্রোহের পর যখন সামরিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয় অর্থাৎ যখন হইতে ভারতে বৃটিশ সৈনিকরা বিলাতের সেনাবলের অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবাসীরা ও ভারত সরকার যে দাবী করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাহা সঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যাঁহারা ওয়েলবী কমিশনে গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয়ের সাক্ষ্য পাঠ করিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন—এজন্য ভারতবাসীকে কত চেষ্টা করিতে হইয়াছে। সে চেষ্টা যখন আংশিকরূপে সফল হইয়াছে, তখন অদূর ভবিষ্যতে তাহা সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিবে, এমন আশা অবশ্যই করা যাইতে পারে।

তদ্ভিন্ন ২ কোটি টাকাও উপেক্ষণীয় নহে।

বৃটিশ সরকার এই টাকা দিবেন বলিয়া যে ভারতের সামরিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করিবেন, এমনও নহে।

এখন আমাদিগকে চেষ্টা শিথিল না করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতে ভারতীয় সেনাবলের দ্বারা বৃটিশ সেনাবলের স্থান অধিকার করা সরকার নীতি হিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তদ্ভিন্ন যখন নূতন ও ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখনই (১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে) বড়লাট লর্ড ক্যানিং প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যদি এ দেশে বৃটিশ সেনাবল রক্ষা করাই প্রয়োজন হয়, তবে এ দেশেই বৃটিশ সৈনিক সংগ্রহ করিয়া এ দেশেই তাহাদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। তাহাতে দুই দিকে লাভ হইবে:—(১) এইরূপ সেনাবল অল্পব্যয়সাধ্য হইবে; (২) যে সকল বৃটিশ সৈনিক এই সেনাদলে কাজ করিবে, তাহারা অন্যান্য চাকরীয়ার মত ২৫ বৎসর কাজ করিবে—৫ বৎসর ৪ মাস পরেই চলিয়া যাইবে না।

আজ যখন বুঝা যাইতেছে, এখনই এ দেশ হইতে বৃটিশ সেনাদলকে বিদায় করা সম্ভব হইবে না—সে কাজ করিতে হইলে কিছুদিন ধরিয়া ভারতীয়দিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে, তখন লর্ড ক্যানিং প্রমুখ শাসকদিগের প্রস্তাবও ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

নূতন শাসন-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে নানা পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। সামরিক ব্যয় হ্রাসের প্রয়োজনও কেহ অস্বীকার করেন না—করিতে পারেন না। সুতরাং কিরূপে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহা বিশেষ ভাবে—সকল দিক হইতে বিবেচনা করিয়া প্রস্তাব উপস্থাপিত করা দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

সেই জন্য আমরা আশা করি, ভারত সরকারের এই জয় যাহাতে আরও জয়ের পূর্ব্বগামী হইতে পারে, তাহার উপায় করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা যেন এখন এই সুযোগ না হারাই।

টাকার বিনিময়-মূল্য—

ভারতে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত নাই; অথচ নানা কারণে বিলাতের সহিত ভারতের লেন-দেন অত্যন্ত অধিক। সেই জন্য বিলাতের স্বর্ণমুদ্রার হিসাবে টাকার বিনিময়-মূল্য নির্দ্ধারিত করা হয়। কিছুদিন হইতে এই বিনিময়-মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্স হইয়া আছে। বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীরা মধ্যে মধ্যে এই মূল্য হ্রাস করিবার জন্য বিষম আন্দোলন করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখন বলেন, তাহাতে ভারতবর্ষ নানারূপে লাভবান হইবে; কখন বলেন, তাহাতে কৃষিজ পণ্যের মূল্য বর্দ্ধিত হওয়ায় কৃষকের কল্যাণ সাধিত হইবে। কিন্তু দেখা গিয়াছে, যে সব দেশ মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াছে, সে সব দেশে কৃষিজ পণ্যাদির মূল্য সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হয় নাই। বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীদিগের মত কলিকাতাতেও

প্রতিধ্বনিত হয় এবং তাঁহারা কলিকাতার অবাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেকের দ্বারা আপনাদিগের মতের প্রতিধ্বনিত করাইতে পারেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এ-বার তাঁহারা বাঙ্গালীদিগের মধ্যেও দুই এক জনের দ্বারা সেই কার্য্য করাইতে পারিয়াছেন। এই চেষ্টার বিরুদ্ধে যাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বঙ্গদেশে আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন—এ বিষয়ে বাঙ্গালার স্বার্থ ও ইষ্ট বোম্বাইয়ের স্বার্থ ও ইষ্ট হইতে ভিন্ন; এবং বর্ত্তমানে—যখন বাঙ্গালায় কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং সে সকল বিদেশ হইতে আনিতে হইতেছে তখন—টাকার বিনিময়মূল্য হ্রাসে বাঙ্গালার ক্ষতি অনিবার্য্য।

বোম্বাই যে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিয়া কেবল অর্থলাভই করিয়াছে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালারা বাঙ্গালার আন্দোলনের সুযোগ লইয়া যে ভাবে কাপড়ের দাম চড়াইয়া দিয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালার অর্থশোষণ করিয়া তাহারা সমৃদ্ধ হইয়াছিল বলিতে হয়। এ বিষয়ে বোম্বাই ম্যাঞ্চেষ্টারকে অনায়াসে পরাভূত করিয়াছে।

একান্ত দুঃখের বিষয়, বোম্বাইয়ের পক্ষ হইয়া, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত সর্ব্বত্র সম্মানিত ব্যক্তিকে হীনভাবে আক্রমণ করিবার লোক বাঙ্গালীর মধ্যেও পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। বলা হইয়াছে, আচার্য্য রায় মহাশয় অর্দ্ধ-সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন! এই উক্তি যে একেবারেই অসত্য তাহাই সত্য। সেই জন্য সহযোগী 'ষ্টেটসম্যান' বলিয়াছেন, এ বিষয়ে বিতর্ক যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই ভাল; কারণ দেখা যাইতেছে, (এ ক্ষেত্রে) প্রচারকার্য্যের সহিত অসত্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংযুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া বাঙ্গালায় এইরূপ কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা বিদ্যা বা ব্যবসায় সম্ভ্রমের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আচার্য্য রায় মহাশয়ের সন্নিহিত হইবার যোগ্যতাও অর্জ্জন করেন নাই। তাঁহাদিগের ব্যবহারে বাঙ্গালার শিক্ষিত ও শিষ্ট সম্প্রদায় লজ্জানুভব করিয়াছেন।

টাকার বিনিময়মূল্য কিরূপ হইবে তাহা লইয়া ফাটকাবাজরা কিরূপে লাভবান হইবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার পরিচয় ভারত সরকারের অর্থ-সচিব ব্যবস্থা পরিষদে প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দিল্লীতে যখন এ বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল, তখন কোন কোন লোক—অপরের নাম লইয়া—মিথ্যা সংবাদ তার করিয়াছে ও করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তিনি এই সব লোককে শকুনির সহিত তুলিত করিয়াছেন।

সুখের বিষয়, ব্যবস্থা পরিষদে টাকার বিনিময়মূল্য হ্রাসের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালা এ যাত্রায় বোম্বাইয়ের অনিষ্টচেষ্টা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। এই বিতর্কে বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলি যে দৃঢ়ভাবে বাঙ্গালার স্বার্থ রক্ষার চেষ্টাই করিয়াছেন—ইহা আমরা সুলক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করি। আমরা আশা করি, অতঃপর সকল বিষয়েই বাঙ্গালা তাহার স্বার্থ রক্ষায় অবহিত হইবে এবং বোম্বাই বা অন্য কোন দেশের কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে পরিচালিত হইতে অস্বীকার করিবে।

—

দরিদ্রের অসুবিধা—

টাটার লৌহের কারখানা যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সেই জন্য সরকার বিদেশ হইতে আমদানী লৌহের জিনিষের উপর কয় বৎসরের জন্য শুল্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, সেই সময় শেষ হইয়া আসিতেছে। টাটার কারখানার পক্ষ হইতে আবার কয় বৎসরের জন্য ঐরূপ সুবিধা লাভের চেষ্টা হইতেছে।

এই সময় বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গলার লোকের অসুবিধা জ্ঞাপন করিয়া ভারত সরকারকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা সরকার সংরক্ষণ-সাহায্য প্রদান সম্বন্ধে গৃহীত নীতি সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই; কিন্তু এ কথা বলিয়াছেন যে, এই শুল্কের জন্য বাঙ্গালার—বিশেষ পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে—কৃষকরা গৃহনির্ম্মাণে বিশেষ অসুবিধা অনুভব করিতেছে। তাহারা গৃহের দ্বার ও বেড়ার জন্য করোগেটেড "টিন" ব্যবহার করে। বাঙ্গালার কৃষিজ পণ্যের মূল্যহ্রাস কিরূপে হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বাঙ্গালা সরকার বলিয়াছেন, ১৯২৯

খৃষ্টাব্দে ৩৪ লক্ষ ১৫ হাজার একর জমীতে পাটের চাষ হইলেও এক গাঁইটের দাম ৬৭ টাকা ছিল, আর এখন মাত্র ১৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৩ শত একরে চাষ হইলেও মূল্য ২৬ টাকার অধিক হয় নাই। এই সময় বাঙ্গালার মফঃস্বলে করোগেটেড "টিনের" দাম কমে নাই বলিলেই চলে। এই পণ্যের উপর শুল্ক ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শতকরা ৩০ টাকা হইতে বাড়াইয়া ৬৭ টাকা ধার্য্য করাই যে ইহার মূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পরবৎসর এই শুল্কের হার না না কমাইয়া আরও বাড়াইয়া শতকরা ৮৩ টাকার উপর ধার্য্য করা হইয়াছে !

বাঙ্গালা সরকার দেখাইয়াছেন, করোগেটেড "টিনের" উপর যে শুল্ক স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বিলাস দ্রব্যের উপর স্থাপিত শুল্ক অপেক্ষাও অধিক। অর্থাৎ যে সব দ্রব্যের ব্যবহার বিলাসের জন্য প্রয়োজন এই অবশ্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যের সম্বন্ধে সে সকলের অপেক্ষাও কঠোর ব্যবস্থা হইয়াছে !

দেশে লৌহ শিল্পের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করেন না। কিন্তু এই শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের লোককে যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, তাহারও সীমা থাকা প্রয়োজন। যে শিল্প উপযুক্ত কালের জন্য সংরক্ষণ-সাহায্য লাভ করিয়াও স্বাবলম্বী হইতে পারে না, সে শিল্প হয় দেশের উপযোগী নহে, নহে ত যাঁহারা যে শিল্প পরিচালিত করেন—তাঁহাদিগের ত্রুটি আছে। শিল্প যদি দেশের উপযোগী না হয়, তবে অজস্র সাহায্যের দ্বারাও তাহাকে স্বাবলম্বী করা যায় না —দেশের লোক তাহার জন্য যে ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য হয় তাহা ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপের মত বিফল হয়। টাটার কারখানা যে স্থাপে স্থাপিত হইয়াছে, সে স্থানে লৌহ ও কয়লা উভয়ই সহজপ্রাপ্য অর্থাৎ সুলভ। সে অবস্থাতেও —এত দিন কোটি কোটি টাকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষরূপে সাহায্য লাভ করিয়াও যে কারখানা প্রতিযোগিতা প্রহত করিতে পারে না, সে কারখানার ব্যবস্থা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। টারিফ বোর্ড তাহা করিতেছেন।

এই সময় বাঙ্গালা সরকার করোগেটেড "টিনের" উপর অত্যধিক শুল্ক সংস্থাপনে বাঙ্গলার দরিদ্র লোকের অসুবিধার দিকে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বাঙ্গালার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বাঙ্গালা সরকারের পত্র টারিফ বোর্ডে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। আমরা আশা করি, টারিফ বোর্ড সেই পত্রে প্রদত্ত যুক্তির আলোচনা করিয়া স্বীকার করিবেন—করোগেটেড "টিনের" মত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর শুল্ক হ্রাস করা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমানে এ দেশে লৌহের কারখানায় বৎসরে মোট কত হন্দর করোগেটেড "টিন" প্রস্তুত হইতেছে, এই প্রসঙ্গে তাহাও আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। তাহা জানিলে আমরা এই শিল্পের উন্নতির পরিমাণ পরিমাপ করিতে পারিব।

--

অস্ত্র আমদানী—

বাঙ্গালার নানাস্থানে যে সব ডাকাইতী হইতেছে ও সন্ত্রাসবাদীরা যে সব হত্যাদি করিতেছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে, বে-আইনীভাবে বহু অস্ত্রশস্ত্র আমদানী হইতেছে। ইহার নিবারণ ব্যতীত দেশ হইতে সন্ত্রাসবাদ বিস্তারের ও সন্ত্রাসবাদীদিগের কার্য্যের প্রসারের পথ রুদ্ধ করা সম্ভব হইবে না। এই জন্য অনেকে সরকারকে বে-আইনীভাবে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী বন্ধ করিতে বলিয়াছেন।

এই বিষয় এত দিন সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। সংপ্রতি সরকার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশ্যে এক আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছেন।

দেখা গিয়াছে, নাবিকরা অর্থলোভে বিদেশ হইতে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করে এবং কতকগুলি লোক মধ্যবর্ত্তী হইয়া সে সকল বিক্রয় করে। এই মধ্যবর্ত্তীরাই অধিক বিপজ্জনক ; কারণ, ইহাদিগের সাহায্য ব্যতীত আমদানীকারীরা যেমন অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করিতে পারে না, ক্রয়েচ্ছুরাও তেমনই সে সব পাইতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান আইনে, ইহাদিগের নিকট ঐ সব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায় না বলিয়া, ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করা ও দণ্ড দেওয়া দুষ্কর। সেই জন্য আইনে স্থির করা হইতেছে—

কোন পুলিস কমিশনার বা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট যদি মনে করেন, তাঁহার এলাকায় পূর্ব্বকথিতরূপ কোন মধ্যবর্ত্তী থাকে বা সচরাচর আইসে, তবে তিনি সে বিষয় স্থানীয় সরকারের গোচর করিবেন। তখন স্থানীয় সরকার ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার সম্বন্ধে সংগৃহীত সব প্রমাণ দুই জন বিচারকের নিকট দিবেন। বিচারকদ্বয়ের দায়রা জজের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। বিচারকদ্বয় ঐ সব প্রমাণ পরীক্ষা করিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির কিছু বলিবার থাকিলে তাহা তাহার নিকট হইতে শুনিবেন। তাহার পর বিচারকরা তাঁহাদিগের নির্দ্ধারণ সরকারের গোচর করিবেন এবং সরকার, ইচ্ছা করিলে, তদনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পথে স্থানত্যাগের আদেশ করিতে পারিবেন। যাহার সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ হইবে, সে যদি আদেশবিরুদ্ধ কাজ করে, তবে তাহাকে বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করা যাইবে এবং তাহার দুই বৎসর সশ্রম কারাবাস দণ্ড হইতে পারিবে।

বিচারকদিগের নিকট আসামী বা সরকার কোন পক্ষই উকীল পাঠাইতে পারিবেন না। যাহাতে কোন লোকের বিপদের সম্ভাবনা থাকিতে পারে, বিচারকরা সেরূপ কোন সংবাদ প্রকাশ করিতে পারিবেন না—সেরূপ কোন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিবেন না।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে গুণ্ডাদিগকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, এই আইন তাহারই অনুরূপ।

আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইবে। ইহার ব্যবস্থায় যদি কোন ক্রটি থাকে, তাহা যদি লোকের প্রাপ্য অধিকার সঙ্কুচিত করে, তবে ব্যবস্থাপক সভা অবশ্যই ইহার সেই সকল ক্রটি সংশোধন করিবেন।

যদি এই আইনে বাঙ্গালায় বে-আইনী ভাবে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী বন্ধ হয়, তবে যে বাঙ্গালার কল্যাণ সাধিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ভারতের তুলা রপ্তানী—

ভারতে যে তুলার চাষ হয়, তাহার অনেকাংশ বিদেশে রপ্তানী হয়। এই রপ্তানী তুলার পরিমাণ অল্প নহে। বর্ত্তমান ব্যবসা মন্দার পূর্ব্বে ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে কোন্ দেশে কত টাকার তুলা ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার হিসাব দেখিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়:—

দেশ	পরিমাণ (টন)	মূল্য (টাকা)
বিলাত	৪৩,১০০	সাড়ে ৪ কোটি
জার্ম্মানী	৫৮,০০০	৫ কোটি ৭১ লক্ষ
ইটালী	৫৯,০০০	৬ কোটি ৬১ লক্ষ
জাপান	২৮৭,০০০	২৯ কোটি
বেলজিয়ম	৬২,০০০	৬ কোটি ১৮ লক্ষ
চীন	৭২,০০০	৭ কোটি ২৯ লক্ষ

দেখা যাইতেছে, জাপান সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং বিলাত সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ক্রেতা। বর্ত্তমানে জাপানের কাপড়ের উপর আমদানী শুল্ক সংস্থাপনের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে জাপান ভয় দেখাইতেছে, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সে ভারতের তুলা ক্রয় বন্ধ করিবে। যদি রপ্তানী হ্রাস হয়, তবে তাহাতে যে ভারতের কৃষকদিগের বিশেষ ক্ষতি হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

বিলাতী কাপড় বর্জ্জিত হওয়ায় এ দেশে বিলাতের কাপড়ের ব্যবসায় বিশেষ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। সেই জন্য বিলাতের কাপড় উৎপাদনকারীরা এখন বিলাতী কাপড়ের উপর আমদানী শুল্ক হ্রাসের প্রতিদানে কলে ভারতীয় তুলা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা দুইটি উপায় অবলম্বন করিতেছেন:—

(১) ভারতীয় তুলার আঁকড়া ছোট হইলেও তাহাতে যদি পাতা না থাকে, তবে তাহা কতকটা ব্যবহার করা বিলাতের পক্ষে সম্ভব। মার্কিণের ও মিশরের তুলায় পাতা মিশ্রিত থাকে না। বিলাতে ভারতীয় তুলা পত্র ও অন্যান্য আবর্জ্জনা মুক্ত করিবার জন্য কল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা ব্যবহৃতও হইতেছে এবং ফলে বিলাতের কলে ভারতীয় তুলার ব্যবহার বর্দ্ধিত করা সম্ভব হইয়াছে। সংপ্রতি ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিক সভা

তথায় ভারতীয় তুলায় প্রস্তুত নানারূপ কাপড়ের এক প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যবসায়ীদিগকে সে সব দেখাইয়াছেন। এখন আশা করা যায়, আপনার স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্যও বিলাত অধিক পরিমাণে ভারতীয় তুলা ব্যবহার করিবে।

(২) বিলাতে মার্কিণের তুলার যেমন বাজার আছে, ভারতীয় তুলার সেইরূপ বাজার না থাকায় কলওয়ালারা যখন ইচ্ছা যে কোন পরিমাণে ভারতীয় তুলা কিনিতে পারেন না। সেই জন্য বিলাতে ভারতীয় তুলার বাজার স্থাপিত হইবে।

এই দুইটি কার্য্যের দ্বারা ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কলওয়ালারা পরিবর্ত্তিত অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করায় ভারতের সহিত সহযোগে কাজ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন।

এ দেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা বাড়িতেছে এবং সে বৃদ্ধি অনিবার্য্য ও অভিপ্রেত। অনেক কল কেবল মিহি কাপড় উৎপন্ন করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

কিরূপে ভারতীয় কৃষকের স্বার্থের ও এই সব কলের স্বার্থের সহিত ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া ভারত সরকারকে কাজ করিতে হইবে। তবে যে তুলা রপ্তানীতে ভারতের কৃষক বৎসরে প্রায় ৬০ কোটি টাকা পাইয়া থাকে, তাহার রপ্তানী যাহাতে হ্রাস না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতেই হইবে। তদ্ভিন্ন ভারতের কলগুলিতে যাহাতে ভারতের তুলা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা সম্ভব হয়, কলওয়ালাদিগকে যেমন তাহার উপায় করিতে হইবে, সরকারের কৃষি বিভাগকে তেমনই এ দেশে উৎকৃষ্ট তুলার চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নাই। এইজন্য আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আহ্বানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিদ্যালয়গৃহে এক পরামর্শ-সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে স্থির হইয়াছে—বাঙ্গালায় কাপড়ের কলের পরিচালকদিগের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিচ্ছিন্নভাবে কাজ না করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিলে যে অনেক সুবিধা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। এইজন্য আমরা এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় আনন্দিত হইয়াছি। বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা যে একাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালার প্রতি সদ্ব্যবহার করেন নাই, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু আজ সে সব কথার আলোচনা করা আমরা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। কারণ, বাঙ্গালা অদূর ভবিষ্যতে যেমন বিদেশের উপর আপনার আবশ্যক বস্ত্র যোগাইবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না, তেমনই অন্য কোন প্রদেশের উপরও সেজন্য নির্ভর করিবে না। বাঙ্গালায় যে কাপড়ের কলের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে, তাহাও সকলে জানেন। তথাপি যে এতদিনেও বাঙ্গালা বস্ত্র বিষয়ে স্বাবলম্বী হয় নাই, ইহাই দুঃখের বিষয়। আমরা আশা করি, নবগঠিত সঙ্ঘ বাঙ্গালার কাপড়ের কলের পরিচালকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বাঙ্গালায় এই শিল্পের উন্নতি সাধনের পথ সুগম করিতে পারিবেন। বাঙ্গালায় এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেও যে কেহ কেহ বাধা দিয়াছিলেন, তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়—তাঁহারা মনে করিতেছেন, বাঙ্গালায় এই শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক স্থানে অন্যান্য প্রদেশের লাভের হ্রাস হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা কখন সেজন্য আপনার স্বার্থ নষ্ট করিবে না। আমরা আচার্য্য রায় মহাশয়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই সঙ্ঘের উন্নতি কামনা করি।

কাপড়ের কল সঙ্ঘ—

বঙ্গদেশ বস্ত্রবিষয়ে স্বাবলম্বী হইবার যে সাধু চেষ্টা করিতেছে, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। বাঙ্গালায় কাপড়ের কলের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলের পরিচালকদিগের [illegible] হইবার প্রয়োজনও অনুভূত হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর তাহা আরও অনুভূত হইবে, সন্দেহ

ব্যবস্থা-সচিব—

ভারত সরকারের ব্যবস্থা-সচিব সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের কার্য্যকাল শেষ হইতেছে। ভারত সরকার তাঁহার স্থানে সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারকে ঐ পদ প্রদান করিবেন, প্রকাশ করিয়াছেন। বড়লাটের সদস্য-পরিষদের প্রথম ভারতীয় সদস্য—বাঙ্গালী লর্ড সত্যেন্দ্র

প্রসন্ন সিংহ। ব্যবস্থা-সচিব সতীশরঞ্জন দাস মহাশয়ের অকালমৃত্যুর পর স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ ঐ পদ পাইয়াছিলেন। তিনি ছুটি লইলে বাঙালী স্যর বিপিনবিহারী ঘোষ তাঁহার স্থানে কাজ করেন। এবার আর একজন বাঙালীর নিয়োগে কোন কোন প্রদেশের লোকের মনে ঈর্ষ্যার উদ্ভব হইয়াছে। সেদিন ব্যবস্থা-পরিষদে একজন মদ্রদেশবাসী বলিয়াছেন, বাঙালা অন্য সব বিষয়ে সাফল্য দেখাইতে না পারিলেও ব্যবস্থা-সচিব প্রদানে বিশেষ সাফল্য দেখাইয়াছে। কিন্তু তিনি কি জানেন না, পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখলে একদিন ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ এ সকল লোক বাঙ্গালায় নিয়মের ব্যতিক্রম নহেন; পরন্তু বাঙ্গালীর মনীষার স্বাভাবিক ফল। কোন্ ক্ষেত্রে বাঙ্গালার মনীষা কুণ্ঠিত হইয়াছে? রাজনীতির ক্ষেত্রে কাহারা নেতৃত্ব করিয়াছেন? আজ সমগ্র দেশ যাঁহাকে নবভারতের প্রবর্ত্তক বলিয়া সম্মান করিতেছেন, সেই রাজা রামমোহন যখন সকল দিকে অন্ধকারে আলোক বিস্তার করিয়াছিলেন, এখন পর্য্যন্ত আর কোন্ প্রদেশে তাঁহার সমকক্ষ লোক আবির্ভূত হইয়াছিলেন? আমরা অন্যান্য প্রদেশকে বলি—প্রথমে উপযুক্ত হইয়া পরে। আশা করিতে হয়, এ কথা যেন তাঁহারাও ভুলিয়া না যান—যেন আমরাও না ভুলি।

পরলোকে আচার্য্য মুরলীধর—

বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ (১৩৪০), ইং ৩০এ নবেম্বর ১৯৩৩, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ আচার্য্য মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বিদ্যারত্ন মহাশয়, ৬৮ বৎসর বয়সে, তাঁহার বালিগঞ্জস্থিত গৃহে অবস্থান কালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। সন ১২৮২ সালের ১১ই বৈশাখ, ইং ১৮৬৫ সালের ২৪এ এপ্রেল, চব্বিশপরগণা, খাঁটুরা গ্রামে আচার্য্য মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম হয়। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ ও সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি এম-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজে ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করেন। পরে তিনি ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন, এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ঐ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং উহার সংস্কৃত বিভাগের সমুদয় ভার তাঁহারই উপর ছিল। তিনি শিক্ষা, সমাজ এবং স্ত্রীজাতির উন্নতিবিধান কল্পে অনেক কাজ করিয়াছিলেন। বালিগঞ্জে তিনি

আচার্য্য ৺মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

বালিকাদিগের জন্য একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় এবং নারী সমুন্নতি সমিতি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি বেঙ্গল সোসিয়াল রিফর্ম্ম লীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি কয়েকখানি সংস্কৃত স্কুলপাঠ্য পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছেন। 'ভারতবর্ষে'র লেখক বিলাত-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস মুরলীবাবুর পুত্রগণের অন্যতম। আমরা তাঁহার আত্মীয়স্বজনের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইউনিয়নবোর্ড—

চব্বিশপরগণার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের বার্ষিক সম্মেলনে নদীয়ার জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কয়েকটি যুক্তিপূর্ণ কথা বলিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে সেইগুলির উল্লেখ করিতেছি। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসরে বঙ্গদেশে জেলা বোর্ডের অধীন কি পরিমাণ স্থান এবং কত লোক ইউনিয়ন বোর্ডভুক্ত ছিল, তাহার সংখ্যা এবং ক্রমোন্নতির হিসাব দাখিল করিয়া রায় বাহাদুর সভাপতি মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইউনিয়ন বোর্ডের উপর লোকের প্রথম প্রথম যতটা বিরাগ ছিল এখন আর ততটা নাই,—ক্রমেই উহার উপর তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে, ক্রমেই লোকে ইউনিয়ন বোর্ডের উপকারিতা বুঝিতেছে। কেবল ইহাই নহে,—সঙ্ঘশক্তি সম্বন্ধেও লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং ইউনিয়ন বোর্ডের কল্যাণে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে শিখিতেছে।

—

ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করিয়া দেশবাসী কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি কি উপায়ে উপকৃত হইতে পারে, সভাপতি মহাশয় তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। জাতি-গঠন বিভাগের যে চারিটি মূল সূত্র—স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তা ও জল-সরবরাহ, ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে এই চারিটিরই উন্নতি সাধন করা যায়। কি ভাবে এই সকল কার্য্য পরিচালন করিতে হইবে, এবং কোন্ কোন্ স্থানে কি ভাবে ইহার কার্য্য চলিতেছে, রায় বাহাদুর তাহারও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন আইনের সাহায্যে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি ব্যাপক ভাবে ড্রেণ কাটা, জঙ্গল পরিষ্কার, গর্ত্ত, ডোবা ভরাট করা, এ্যান্টিম্যালেরিয়াল চিকিৎসা-ব্যবস্থা, বসন্তের টীকা, কলেরার টীকা, পরিষ্কার জল সরবরাহ—এ সকলই করিতে পারে। গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা দেশকে কতকগুলি ক্ষেত্রে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক কেন্দ্রে বার্ষিক ২০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়া এক একটি Rural Health Centre গঠন করিয়াছেন,—ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ এই সকল কেন্দ্রের সহিত সহযোগিতা করিয়া গ্রাম্য স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারেন। যাঁহারা ইউনিয়ন বোর্ডের বিরোধী, জাতি-গঠন কার্য্য যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া করিতে চাহেন, তাঁহারা যে উপায়ে পারেন জাতি গঠন ও পল্লী-স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন করুন; তাই বলিয়া, ইউনিয়ন বোর্ড ও Rural Health Centreএর দ্বারা যেটুকু কাজ হইতে পারে, তাহাতে উপেক্ষা করা সুবুদ্ধির কার্য্য হইবে না।

—

মাননীয় রায় বাহাদুর ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে অধিকতর ক্ষমতাশালী দেখিতে চাহেন,—তাহাদের কার্য্য-শক্তি বর্দ্ধিত করিতে চাহেন। স্বায়ত্তশাসন আইনে গৃহ-নির্ম্মাণ বাবদ ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা অতি সামান্য। যথেষ্ট ক্ষমতা পাইলে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি সেই ক্ষমতা পরিচালন করিয়া ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যবিধিসম্মত গৃহ নির্ম্মাণে লোকদিগকে বাধ্য করিতে পারেন। তাহাতে পল্লী স্বাস্থ্যের আরও উন্নতি হইতে পারে। রায় বাহাদুর আরও একটি কথা বলিয়াছেন যে গ্রাম্য দলাদলির ফলে অনেক স্থলে ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্য ব্যাহত হইয়া থাকে। তিনি বলেন, ইহাতে কেবল নিজেদেরই ক্ষতি হইতেছে। তদপেক্ষা, যদি দলাদলি বিসর্জ্জন দিয়া পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করা যায় তাহাতে সকলেরই উপকার। কথাটা যে খুব সত্য তাহা কে অস্বীকার করিবে?

—

পরলোকে হরেন্দ্রলাল রায়—

আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু, 'ভারতবর্ষে'র পরম হিতৈষী, সুধী সাহিত্যিক হরেন্দ্রলাল রায় মহাশয় বিগত ১৫ই পৌষ তারিখে তাঁহার ভাগলপুরের বাস-ভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি ভাগলপুরের উকিল ছিলেন। কিছুদিন হইতে তিনি নানা ব্যাধিতে শয্যাগত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে এত শীঘ্রই লোকান্তরিত

হইবেন, এ আশঙ্কা আমাদের মনে উদিত হয় নাই। হরেন্দ্রবাবু 'ভারতবর্ষে'র প্রতিষ্ঠাতা কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন; দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় তিনিও বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। আমরা হরেন্দ্রবাবুর আত্মীয় স্বজন ও অসংখ্য বন্ধুবান্ধবের গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলন—

সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলন নামে যে অধিবেশন হইয়া গেল, দুঃখের বিষয় জনকয়েক সম্ভ্রান্তা মহিলা ব্যতীত, বাঙ্গলার সাধারণ নারীজাতির সহিত তাহার কোন যোগ ছিল না। বাঙ্গলায় এখন নারীসম্পর্কে প্রধান সমস্যা—নারীহরণ। বাঙ্গলায় নারীর প্রধান ব্যথাই নারীধর্ষণ ব্যাপারের সম্পর্কে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় তথা সমগ্র ভারতে ইহার অপেক্ষা বড় সামাজিক সমস্যা আর নাই বলিলেও চলে। নারীদের মধ্যে পুঁথিগত বিদ্যার প্রচার এখনও বেশী হয় নাই বটে, কিন্তু সে পক্ষে প্রচুর এবং প্রবল উদ্যোগ আয়োজন যে আরম্ভ হইয়াছে তাহার লক্ষণ চারিদিকেই দেখা যাইতেছে। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষালাভের সুবিধার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাড়া, বাঙ্গলার প্রায় প্রত্যেক বেসরকারী ছেলেদের কলেজে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তা ছাড়া গত দুই তিন বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে মেয়েদের জন্য বহুসংখ্যক হাই স্কুল ও মধ্য শ্রেণীর স্কুল স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষাসমস্যা একরূপ সমাধানের পথে চলিয়াছে বলিতে হইবে। এবং অবরোধ প্রথাও ভাঙ্গিয়া আসিল বলিয়া। কলিকাতায় অবরোধ প্রথা অনেকটাই উঠিয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রামে এখনও কিছু কিছু থাকিলেও তাহার কঠোরতা অনেকটা কমিয়াছে। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে নূতন যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে সেটা নারী হরণ ও নারী ধর্ষণ। ইহার জন্য দায়ী পুরুষ জাতির ক্লৈব্য। পুরুষেরা যখন নারীকে রক্ষা করিতে অক্ষম তখন স্বভাবতই নারীকে আত্মরক্ষার ভার নিজ হস্তেই গ্রহণ করিতে হয়। নারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই যখন নারী-সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা, তখন "নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলনে" এই নারী হরণ ও নারী-ধর্ষণই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে, এবং ইহার প্রতিকারেরও একটা উপায় অবলম্বনের আলোচনা হইবে ইহাই দেখিবার প্রত্যাশা সকলেই করিতেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সম্মেলনে এই আলোচনা উত্থাপন করিবার সুযোগও মিলে নাই। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার মহাশয়া সম্মেলনে যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"এই নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বপ্রধান আলোচনার বিষয় নারীহরণ সম্বন্ধে হওয়া উচিত ছিল। বাঙ্গলার কয়েকজন এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা তুলিতে দেওয়া হয় নাই। নারীহরণ সম্বন্ধে প্রত্যেক ভগ্নীরই সজাগ হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের ভগ্নীগণ গৃহে থাকিয়াও নিরাপদ নহেন। সভ্য নাগরিকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুঃখের লজ্জার বিষয় আর কিছু থাকিতে পারে না। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে যদি একটা নারীও নির্য্যাতিতা হন তাহা হইলে প্রত্যেক নারীরই সেই সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ সজাগ হওয়া কর্ত্তব্য। নিজেদের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অনেক নারী ইহাতে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন। যাহাতে সেই দুর্ব্বৃত্তগণ শাস্তি পায়, তজ্জন্য আমাদিগের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা উচিত। ইহার জন্য বিশেষ আদালত বিশেষ আইন প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য; তাহা না হইলে এই নারী সম্মেলন ব্যর্থ হইবে। আমাদের এখন এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে নারী-হরণস্বরূপ দুরপনেয় পাপ ভারত হইতে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়। নারী সম্মেলন হইতে ইহার জন্য একটা বিশেষ সাব-কমিটী গঠন করিয়া যাহাতে এই নারীহরণের প্রতিকার হয়, তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা উচিত।"

"নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলনে" সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান নারী-সমস্যার আলোচনা না হইবার কারণ বোধ হয় এই যে, এই সম্মেলন ভারতের নারী-সমাজের প্রতিনিধি নহেন নচেৎ, সম্মেলনের সঙ্গে সাধারণ নারীসমাজের অন্তরের যোগ থাকিলে কখনই এরূপ বিসদৃশ ব্যাপার ঘটিতে পারিত না।

বাণী-বরণ

(ছাত্র-সমাজের)

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর, বি-এ

এস গো জননি, বছর পরে।
মামুলি প্রথায় ডাকি মা তোমায় শীত-কম্পিত গলার স্বরে॥
মাগো— ডাকিতেছি বটে, দ্বিধা জাগে মনে,
আসিবে কি হায় হেথা অকারণে,
ইটের পাঁচিরে ঘেরা নগরের রুদ্ধ বাতাস বদ্ধ ঘরে!

বিদ্যা যেথায় বিক্রীত হায় বোতলে পুরিয়া লেবেল আঁটি,
বারো-আনা যার মেকি ও ভেজাল, সাড়ে চ'বু্আনাও
মিলে না খাঁটি।
যেথা— পুর-কমলার কৃপা লভিবারে
শুধু আয়োজন বেঞ্চি চেয়ারে,
ছ-পকেট ভরি নুটি খেয়া-কড়ি শুধু পরীক্ষা পাশের তরে॥

সুলভ বিদ্যা বাঁধি বুলি বাঁধা রঙিন মলাটে বিকায় যেথা,
চাপা পড়ে যাবে সে হাটের ভিড়ে হাঁসটি তোমার মহাশ্বেতা।
যেথা— বিদেশীর বুলি শিখিবার লাগি
বাড়া ভাত ফেলি সারা রাত জাগি,
কঠোর সাধনা করি, ভরসা যে মোটর একদা মিলিবে বরে॥

কমলের বন তেয়াগি জননি, আসিবে কি এই বেত্রবনে?
বেণু বীণা যেথা কখনো বাজে না—যেথা মাতে
অহিনকুল রণে।
মাগো— তুমি বুনো রামনাথের জননী
বিজলী-পাখার হাওয়া ত খাওনি,
ভরসা হয়না আসিবে যে তুমি বিজলি যুগের আড়ম্বরে॥

এক কাজ কর, গোলদীঘি-জলে ভাসায়ে হাঁসটি এস মা তবে,
পঙ্কজ নাই, পঙ্ক ত আছে? তোমার চরণই কমল হবে।
কাছে— সেনেট হাউস, গ্রন্থ-বিপণি,
বন্ধ দু'দিন ভয় কি জননি,
আছে ট্রাম বাস মোটরের শিঙা! বীণ্‌টি না হয় এননা করে॥

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস "আকাশ ও মৃত্তিকা"—২৲
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস "মা" শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নাট্যাকারে পরিবর্তিত—১৲
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ব্যাখ্যাত ও সঙ্কলিত "শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা"—৩৲
রায় সাহেব শ্রীদুর্গাচরণ বিদ্যাভূষণ এফ-টি-এস প্রণীত "গীতা ও তাহার যৌগিক ব্যাখ্যা"—২৲
শ্রী[illegible]বিহারী চক্রবর্তী প্রণীত জীবন চরিত "জেম্‌স্ আব্রাম্ গারফীল্ড"—১৷৹
শ্রী[illegible] দত্ত প্রণীত "যুগের বাংলা"—৷৹
শিবদাস প্রণীত নাটক "নর-নারায়ণ"—৷৴৹
শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত (ছোট গল্প)—৸৹
ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল প্রণীত উপন্যাস "নিষ্কণ্টক"—১৷৹
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত মণ্ডামার্কের দপ্তরের সপ্তম গ্রন্থ "ইংলণ্ডে রুষ দস্যু"—১৷৹
শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "উদয় লেখা"—১৲
শ্রীমন্মথ রায় প্রণীত নাটক "অশোক"—১৷৹
শ্রীঅজিতকুমার গুপ্ত প্রণীত "দেবীপূজা"—১৷৹
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য "সুরা ও শোণিত"—১৲
শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য "লীলাময়ী"—১৲
শ্রীদীনবন্ধু দেবশাস্ত্রী কৃত "বেদ সার"—১৴৹
শ্রীশরৎকুমার রায় প্রণীত "রাজর্ষি রামমোহন"—৸৹

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
OF Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS
201, Cornwallis Street, Calcutta

Printer—NARENDRA NATH KUNAR
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS
203-1-1, Cornwallis Street, Cal.

ফাল্গুন—১৩৪০

দ্বিতীয় খণ্ড ‖ একবিংশ বর্ষ ‖ তৃতীয় সংখ্যা

ভস্মাসুর

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

পুরাণে গল্প আছে, এক দৈত্য তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া এক অদ্ভুত বর লইয়াছিল। একে আশুতোষ, তাকে আবার ভোলানাথ; কাজেই, "তথাস্তু" বলিয়া ফেলার সময় আর খেয়াল করেন নাই—বরের শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াইবে। ও দেবতাটির না হয় ভাঙ্ খাইয়া নেশা করার ব্যায়রাম আছে; কিন্তু ব্রহ্মা ও বিষ্ণু খাসা "সেন্ ও সোবার" দেবতা; তাঁরাও দেখি সময় সময় বর দিতে যাইয়া এমন বেতাল হইয়াছেন যে, শেষকালে তাল সাম্‌লাইতে "আত্মারাম খাঁচা ছাড়া" হবার উপক্রম হইয়াছে। এক এক সময় বেশ তালিমও দেখি তাঁদের। হিরণ্যকশিপু তপস্যা করিয়া অমর হবার সাধ করিল। কিন্তু সে আরজি সরাসরি মঞ্জুর হইল না। তখন হিরণ্যকশিপু অবধ্য রহিবার এমন এক ফিরিস্তি বাহির করিল, যাতে সর্ত্তের ফাঁক বাহির করার জন্য শ্রীভগবানের নৃসিংহাবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল। বুদ্ধি খরচ করিয়া ফিরিস্তি বাহির করিলেই ফাঁক কোথাও না কোথাও রহিয়া যাইবেই; আর সেই ফাঁকেই শেষকালে মাৎ হইতে হইবে! এই ব্রহ্মাণ্ডের কারবার যাহা হইতে এবং যাকে আশ্রয় করিয়া চলিতেছে, তার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতির গতি বা ধারাই নিয়তি—Reign of Cosmic Law। এটা একটা বিশ্ববেড়া জাল। এ জালের ভিতরের কোন কিছুর দ্বারা এ জাল এড়াবার যো নাই। "বুদ্ধি"কে "মহৎ" বলা হয় বটে, কিন্তু তার "মহত্ব"ই বা কতটুকু! বিশ্ববেড়া জালের ভেতরেই সে রহিয়াছে ও খেলিতেছে। বুদ্ধি প্রকৃতির দুহিতা। মেয়ে মার ঘাড়ে চড়িবে, মাকে ডিঙাইয়া যাইবে, এমন বেয়াদবী তার থাকিলেও, পরওয়ানা নাই। বুদ্ধি দ্বারা প্রকৃতির ষোল-আনা, এমন কি, আসলটাই, বোঝা যায় না। বুঝিতে গেলে নিজের ঘাড়ে নিজে চাপিতে হইবে, নিজের ছায়া নিজে ডিঙাইতে হইবে। বোঝায় কার্পণ্য রহিবেই, ফাঁক্ থাকিবেই। সেই দার্শনিক কাণ্টের ভাষায়—Thing-in-itself is un-understandable. Forms and Categories have no transcendental application.

এই ত' গেল মেয়ের বাহাদুরি! নাতিটির বাহাদুরি আরও চমৎকার। প্রকৃতিঠাকুরাণীর নাতি অহঙ্কার, অস্মিতা —"আমি"-জ্ঞান। আরও তলাইয়া হিসাব করিয়া নাতির "রাশ নাম" রাখিতে হয়। কিন্তু, আমরা "ডাক নামেই" কাজ চালাইব। নাতিটি যেমন অভিমানী, তেমনি আব্‌দারী। দিদিমণি নাতির আব্‌দারেই এ দুনিয়াদারীর যত কিছু ভাঙ্গিতেছেন, গড়িতেছেন। আব্‌দারও অফুরন্ত, ভাঙ্গাগড়াও অফুরন্ত। কিন্তু একটা আব্‌দার দিদিমণি রাখেন না—রাখার তাঁর সাধ্য নেই। নাতি—অহঙ্কার—আব্‌দার করেন—"দিদিমণি, আমি তোমার চাইতেও বড় হব; তোমাকে ডিঙিয়ে যাব।" দিদিমণি আর সত্য-সত্যই "ছোট" হবেন কিরূপে? তিনিই যে "প্রধান"। তবে, নাতিটিকে ভোলানর জন্য কত-না ফন্দি বাহির করেন। কখনও নাতির চোখে ঠুলি পরাইয়া দিয়া বলেন—"এই দেখ, যাদুমণি, কত রত্তি আমি, আর তুমি কত বড়!" যাদুমণি গোটা, আস্ত দিদিমাটিকে দেখিতে না পাইয়া, তাঁর কাণটুকুতে হাত বুলাইয়াই ভাবে—এই ত' ধ'রেছি, এই ত' পেয়েছি তোমাকে! দিদিমণি নাতির কচি হাতের কাণমলা খাইয়া হাসিয়া আটখানা। ভাবেন—কেমন ঠ'কিয়িছি! নাতিও হাসিয়া কুটপাট। ভাবে—কেমন জিতিছি!

কিন্তু কাণ ধরিয়া টানিলে যে মাথা আসে! মানুষের অভিমান তার দর্শনবিজ্ঞানের ভেতর দিয়া সময় সময় দিদিমণির কাণ ধরিয়া টানিয়াছেও। টানিয়া দেখে—আর একটা কিছু আসিয়া পড়িতেছে! সেটা কাণের চাইতে বড়। মাথা ধরিয়া নাড়ানাড়ি করিলে গর্দ্দান ও ধড় আসিয়া পড়ে। সেগুলো আরও বড়। দিদিমণির আর এক নাম তাই "অব্যক্ত"। তবেই ত'! দিদিমণি ত' আচ্ছা ঠকান ঠ'কিয়েছে! এ বেঠিকের ঠকাটি ঠিক ঠিক বুঝিলেই লেঠা অনেকটা চুকিয়া যায়। তখন চোখের ঠুলি খসিয়া পড়ুক আর নাই পড়ুক, সুস্থির হইয়া দিদিমার "কোল জুড়িয়া" বসিতে পাওয়া যায়। নাতি দিদিমণির মিষ্টি সম্পর্কটুকু বোঝাতেও স্বস্তি! এই "কোল জুড়িয়া" বসাই না কি প্রকৃতিস্থ হওয়া—Live in Nature and according to Nature. অপ্রকৃতিস্থ থাকিতে স্বস্থ হওয়া যায় না। মানুষের অহমিকা তার দর্শনবিজ্ঞানের ভেতর দিয়া নষ্ট "স্বাস্থ্য" ফিরিয়া পাইবে কবে? অবশ্য, "প্রকৃতিস্থ" হবার আর এক মানেও আছে—"স্বরূপপ্রতিষ্ঠ" হওয়া। সেটা আপাততঃ থাক।

বুদ্ধি ও অহঙ্কারের এই স্বাভাবিক ন্যূনতার জন্য তাদের কোনও ফন্দিতে বা ফিরিস্তিতে প্রকৃতির গতি—যেটাকে আমরা বিশ্ববেড়া জাল বলিতেছিলাম—অতিক্রম করা যায় না। গীতায় শ্রীভগবান্ তাই না "মহদ্ ব্রহ্ম" বলিয়াছেন। ফন্দিতে ছিদ্র, ফিরিস্তিতে ফাঁক থাকিবেই। এ ফাঁকি যে বুঝিল না, সে অযুত বর্ষ পঞ্চাগ্নি তপস্যা করিয়াও "কাঁচা ঘুঁটি" রহিয়া গেল। মধুকৈটভ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, আরও কত কে তপস্যার কসুর করেন নাই, কিন্তু সেই "চিরকেলে" নাতিটির খপ্পরে পড়িয়া শেষকালে সগোষ্ঠী নাজেহাল হইয়াছেন দেখি। যাই হোক্, আমরা যে দৈত্যর কথা পাড়িয়াছি, তার পাওয়া বরটি বড়ই অদ্ভুত। অবশ্য, বর মাগিতে গেলে প্রায় কেহই কম করিয়া মাগেন না। প্রহ্লাদের মত দু'একজন "অনপায়িনী", "অব্যভিচারিণী" ভক্তিই মাগিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রায়ই দেখি—মাগিতেছেন, "আমায় অমর বর দেও"। যতখানি আশা, ততখানি অবশ্য পূরে না। আশা না পূরিলে কেহ কেহ নবীন উদ্যমে আরও কঠোর তপঃ করিতে সুরু করিয়া দেন। তখন দেবতাকে আবার ছুটিয়া আসিতে হয়। কিন্তু সেবারও আবৃজি মঞ্জুর হইল না। তখন, অগত্যা, একটা রফা নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিতে হয়। দেবতা হয় ত' সর্ত্তবন্দী করিয়া অমরত্ব দিতে প্রস্তুত। আচ্ছা, তাহাই হোক্। সর্ত্তের ফিরিস্তি মুসাবিদা হইল। যতদূর আঁট সাঁট করা চলে, করা হইল। যিনি বর পাইলেন, তিনি ভাবিলেন,—"কাজ হাঁসিল হইয়াছে। যে রকম বজ্র আঁটনি দিয়াছি, তাতে আমাকে ছোঁয় আর কার সাধ্য!" কিন্তু, সেই বে-আক্কেলে নাতিটির কাঁচা হাতের বজ্র আঁটনি ত'। ও ত' ফস্কা গেরো হইয়াই আছে!

প্রকৃতির গতি অথবা নিয়তিতেই ঢালা-উবুর, ভাঙ্গন-গড়ন চলিতেছে। এ এলেকার মধ্যে সমস্তই ক্ষর; অক্ষর কিছুই নাই। সমস্তই জন্মাদি-ষট্-পরিণামশীল। এ বিশ্বপ্রবাহের ধারা অনতিক্রমনীয়। অন্ততঃ পক্ষে, প্রকৃতির গোষ্ঠী, নাতিপুতি সব খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে

বজায়, কায়েম রাখিয়া কেহই এ ধারা অতিক্রম করিতে সমর্থ নয়। এ ধারার ভেতরে গতি স্থিতি—সবই আপেক্ষিক।—এটা Realm of Relativity. একটানা এক দিকে গতিও বরাবর সম্ভবপর নয়। এমন কি, "শূন্যে"ও নয়। আমাদের এই পৃথিবীর পিঠে এক জায়গা হইতে চলিতে সুরু করিয়া চলিতে চলিতে যেমন আবার সেইখানেই ফিরিয়া আসিতে হয়, তেমনি Space বা নভঃ প্রদেশেও গতিও না কি এক সরল রেখায় অনন্ত নয়; আবার ঘুরিয়া আসিতে হয়। এই শূন্য বা Spaceএর বক্রতা (curvature) শুধু যে গণিতের আজগবি খেয়াল, এমন নয়। দেশ ও কাল—দুই সম্পর্কে দেখিতে বলিতে হয়—এই ব্রহ্মাণ্ডটা একটানা, সোজাসুজি, বরাবর কোন এক দিকে ছুটিতেছে না; ঘুরিয়া ফিরিয়া পূর্ব্বাবস্থায় আসিতেছে; আবার চলিতেছে; আবার ফিরিয়া আসিতেছে। এটা একটা চক্র-গতি—cyclic. যাক্, এ শক্ত কথাটা এখানে পাড়িলাম মাত্র। আসল কথা, অমর হইতে গেলে এই প্রাকৃত ধারা হইতে কোন উপায়ে আলগ্ হইতে হইবে। আলগ্ হবার নানান্ উপায় আছে, অথবা, একই উপায়কে নানান্ রকমে দেখান হইয়াছে। যে সব দৈত্যের তপস্যার কথা বলিয়াছি, তারা কেহই আলগ্ হবার রাস্তা ধরে নাই। অথচ, না ধরিয়াই সাধ করিল—অমর, অজর, অক্ষয় হইব। যাতে যা হবার নয়, তাতে তাই করিতে চাহিল। কাজেই, ফাঁকিতে পড়িতে হইল। উপনিষৎ ইন্দ্র-বিরোচনের উপাখ্যান বলিয়া আমাদের মূল তত্ত্বটি শুনাইয়াছেন। "বিরজাঃ, বিমৃত্যু, বিশোক" বস্তুটিকে পাব বলিলেই পাওয়া যায় না। পাওয়ার রাস্তা ঠিক আছে বটে। সেই ঠিক ঠিক রাস্তায় হাঁটিতে হয়। তপস্যা করিলেই ঠিক রাস্তা ধরা হয় না। আধুনিক যুগের অভিমানী আত্মাও ত' তার বিজ্ঞান-বিদ্যার মধ্য দিয়া কঠোর তপস্যা করিতেছে দেখিতেছি। মাকাল ফলের মতন রঙচঙে বরও কিছু কিছু মিলিতেছে দেখিতেছি। কিন্তু অমর বর? এমন বর যাতে ক'রে মানবের আত্মা সেই বিরজাঃ, বিমৃত্যু, বিশোক, বস্তুটির সন্ধান পাইবে? হায় আশা! বরং উল্টা উৎপত্তি হইতেছে! সমুদ্রমন্থনে হলাহল উঠিতেছে। অমৃতের নামে গরল বিকাইবার ফাঁকি আর কত দিন চলিবে? বিশ্বপ্রাণীর মর্ম্ম সন্তপ্ত, জর্জ্জরিত! বিশ্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা আজ সত্যশিবসুন্দরের হলাহলপায়ি-নীলকণ্ঠ-বিগ্রহাবতারের প্রতীক্ষায় আকুল হইয়া ফুকরিয়া ও গুমরিয়া মরিতেছে যে!

"বিরোচনী মত" বা দেহাত্মবাদ থেকেই এ হলাহল উঠিতেছে বটে, কিন্তু আজিকার দিনে এর উৎস আরও গভীর স্তরে খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। পূর্ব্ব শতাব্দীর দেহাত্মবাদ বা জড়বাদ এখনও "লোকায়ত" হইয়া আছে, সন্দেহ নাই; বরং যেন বেশী বেশী লোকায়ত হইতেছে। গড্ বেচারী ত' আউট্-ভোট হইয়াছেন; রিলিজনও ব্ল্যাক্ লিষ্টে। কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্যার অন্তঃপ্রকোষ্ঠে জড়-বাদের প্রতিষ্ঠা-প্রস্তর শিথিল হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। বিজ্ঞান স্থূলের পূজা ছাড়িয়া সূক্ষ্মের পূজা ধরিয়াছে; "কায়া" ছাড়িয়া "ছায়া" মাগিতেছে, মামুলি কায়াটাই না কি ছায়া। নতুন ছায়ার ভেতরই না কি সত্যিকার কায়া লুকান' আছে। দেখা যাক্—। কথা কয়টা এখন পরিষ্কার হবে না। যাই হোক্—বিজ্ঞানের নূতন পূজার দেবতা যিনি বা যাঁহারা তিনি বা তাঁরা কি অমৃতভাণ্ড হাতে করিয়া এই মথিত, বিক্ষুব্ধ নবযুগক্ষীরো-দধির মধ্য হইতে উঠিতেছেন? ভরসা হয় না! ভরসার লক্ষণই বা কোথায়? বিজ্ঞান যে এখনও চক্রের যেটা "নাভি", সেটা আদৌ স্পর্শ করেন নাই! এখনও যে নেমিতেই পাক খাইতেছেন! এ যে কালনেমি—এর পাকে মৃত্যুই আনে। কোথায় সেই তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি, যিনি স্বস্তি বহন করিবেন? স্থূল ব্রহ্মাণ্ডে যে পাক খাওয়া চলিতেছিল—সৌরজগতে ও নক্ষত্র-জগতে—এখন দেখিতেছি অণুর বা সূক্ষ্মের কোঠাতেও ইলেক্‌ট্রণ ইত্যাদির ঘাড়ে চড়িয়া সেই পাক খাওয়াই চলিতেছে। পাক খাওয়ার মামুলি ধারাটা একটু আধটু অদল-বদল হইলেও চলিতেছে। স্থূলের এলাকায় আইনষ্টাইনের "রেলেটিভিটি" মত একটুখানি ধারা বদল করিয়া দিয়াছে; সূক্ষ্মের এলাকায় "কোয়ান্টাম্" মতও অধিকন্তু নতুন ভোল' ফিরাইতেছে দেখিতেছি। সূক্ষ্মের ভেতরও রেলেটিভিটি, শনৈঃ শনৈঃ নক্রপ্রবেশ; কিন্তু কোয়ান্টাম্ বেজায় একগুঁয়ে, তার

সঙ্গে আপোষ নিষ্পত্তি হইয়া উঠিতেছে না। তদ্বির উভয়পক্ষ থেকে চলিতেছে। কথা কয়টা সমজদারেরা সাটে বুঝিবেন। আমি এখানে বলিতে চাই যে—বিজ্ঞান-বিদ্যা এখনও চাকার নাভিটি স্পর্শ করেন নাই। এটমের যেটাকে বলা হয় "নিউক্লিয়াস্", সেটাও যে নাভি নয়। নাভি কোথায়? কোন্‌খানে নিখিল প্রপঞ্চ আশ্রিত, কিসের দ্বারা বিধৃত? "বৈরোচনী বিদ্যা"য় সেটি মিলিবে না। উপনিষদের উপদেশ—ব্রহ্মবিদ্যা নিলে শেষ পর্য্যন্ত চলিবে না। সেই ঋগ্‌বেদের ঋষিরাই দেখি চক্রের শুধু নেমি ও অর নয়, নাভিরও খোঁজ করিয়াছিলেন। খোঁজ পাইয়াওছিলেন মনে হয়।

চক্রের নাভি ও অরের কথা বিজ্ঞান যে কল্পনায় না ভাবিয়াছেন বা ভাবিতেছেন, এমন নয়। অণু বা এটমের অন্দরে যে যজ্ঞশালাটি এই বিংশ শতকে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই যজ্ঞশালায় যে "অমর" অগ্নি দীপ্যমান, তার অনেকগুলি জিহ্বা। রেডিও-একটিভিটিতে আমরা মুখ্যত: তিনটি জিহ্বার পরিচয় পাই। সেই তিনটি অর্চ্চি: (Rays)কে আমরা আগে "বেদ ও বিজ্ঞান"এর বক্তৃতায় তিনটি "শৃঙ্গ" বলিয়াছিলাম; কেন না, বেদে যেমন "সপ্ত জিহ্বা"র কথা আছে, তেমনি আবার তিনটি "শৃঙ্গ"এর কথাও আছে। যাই হোক্, এই তিনটি অর্চ্চি: আমাদের অনেক "হাঁড়ির খবর" বহন করিয়া আনিয়াছে ও আনিতেছে। এটমের যেটা "নিউক্লিয়াস", তার পরিচয় এরাই যা কিছু আনিয়া দেয়। এখন, এক দফা পরিচয় এই যে—রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রমুখ বিশেষভাবে "যজমান" (রেডিও একটিভ্) বস্তুনিচয়ের যেটা "সার শস্য" (Oore), তাতে "হিলিয়াম নিউক্লিয়াই" রহিয়াছে। ভূতবর্গের (Elements) যে পারম্পর্য্যক্রমের বৈঠক (Periodic series) বিজ্ঞান সাজাইয়া ফেলিয়াছেন, তাতে দেখি, হাইড্রোজেনএর আসন সর্ব্বাগ্রে। হাইড্রোজেনের "ভৌতিক সংখ্যা" (Atomic Number) "রাম"। হিলিয়ামের নম্বর দুই। কাজে কাজেই, হিলিয়াম বেশী "রাশভারী"ও। এখন, এই যে হিলিয়াম নিউক্লিয়াই অর্চ্চি:পথে বিকীর্ণ হইতেছে, এগুলি কি মৌলিক পদার্থ না যৌগিক? ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দেখার সুবিধা এখনও হয় নাই। তবে, নানা কারণে মনে হয়—এরা যৌগিক, কতকগুলি মূল বস্তুর সজ্যাতে সমুৎপন্ন। সে মূল মসলা হইতেছে—হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াই ও ইলেক্‌ট্রণ। তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষায় —পজিটিভ্ ও নেগেটিভ্ চার্জ্জেস্। এই তাড়িত-মিথুনই ভূতগোষ্ঠীর গোড়ায় আদম-ইভ্। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতিতে দেখি—ব্রহ্ম সিসৃক্ষু হইয়া প্রথম স্ত্রী-পুরুষ বা মিথুন হইলেন। জড়তত্ত্বেও এই সনাতন পুরাতন মিথুনকে আমরা পাই। মিথুন কিন্তু দুই-ই যে বরাবর থাকেন, এমন নয়। হাইড্রোজেন এটম্‌এ (যতক্ষণ চার্জ্জবিহীন, নিরপেক্ষ) এক পুরুষ, আর এক স্ত্রী—এক পজেটিভ্ চার্জ্জ, এক নেগেটিভ্ চার্জ্জ। তাদের পরস্পরের বাঁধনে ও আকর্ষণে হাইড্রোজেনের সৃষ্টি, স্থিতি। লয়ের কথাও কেহ কেহ ভাবিয়াছেন। স্ত্রীটি পুরুষকে বেড়িয়া নাচিতেছেন। নাচিয়া বেড়ানর "কক্ষ" ও "ছন্দ:"টি যে সব সময় একই থাকে, এমন নয়। এক কক্ষে পাক খাইতে খাইতে আর এক কক্ষে (বৃত্ত বা বৃত্তাভাসের মতন পথে) লাফ ("jump") মারা হইয়া থাকে। এই লাফ মারার কসরৎ থেকেই না কি আলোকরশ্মির জন্ম; অর্থাৎ, বিন্দুবাসিনী সৌদামিনীর ঐ লাফ মারার সঙ্গে সঙ্গেই "প্রসব"। প্রসূতি প্রসবান্তে আবার নাচিয়া বেড়ান; এক মুহূর্ত্তও জিরেন (Confinement) নেই। যেটি "প্রসূত", সে শক্তিবপু—ঢেউএর বুকে চাপিয়া নিমেষে লক্ষ যোজন বেগে ব্যোমপ্রদেশে (শূন্য না ঈথার?) ধাওয়া করে। তাকে বলি আমরা "রশ্মি"। ইনি বিজলিকুমার। বেদ "অশ্ব" ও "রশ্মি" দুই সরঞ্জামই দিয়াছেন, আদিত্যের রথে। মনে রাখিবেন—বেদের "আদিত্য" শুধু যে ঐ প্রত্যক্ষগোচর সূর্য্য, এমন নয়। সূর্য্য ও সোম—এ দুইটি হইতেছেন ব্রহ্মের এক দফা মিথুন রূপ। ভৌতিক চক্ষে জ্যোতি: বা রেডিয়েসনের পজিটিভ্ ও নেগেটিভ্—এই দুই রূপ ভাবিলে ভাবিতে পারেন। তবে, খুব হুঁসিয়ার হইয়া। বেদের physical interpretation আছে, কিন্তু তাতেই বেদবিদ্যা পর্য্যাপ্ত নহেন। আমরা চোখে যতটুকু দেখি, ততটুকুই জ্যোতি:, এ কথা বিজ্ঞানও বলেন না। জ্যোতি: বিশ্লেষণ করিয়া বিজ্ঞান তার যে নক্সা (Spectrum) পাইয়াছেন, তাতে আমাদের চক্ষু-গ্রাহ্য রশ্মিগুলিই যে শুধু ঠাঁই

পাইয়াছে, এমন নয়। আল্‌ট্রা ও ইন্‌ফ্রা থাক্‌ও আছে। অপ্‌টিক্ স্পেকট্রাম আছে, আবার একস-রে স্পেকট্রামও আছে। আরও কিছু ?

যাই হোক্‌, হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের কথা হইতেছিল। তার ভেতরের নক্সা কল্পনা ছকিতে এখনি তুলি ধরিয়াছেন। সেই সনাতন, পুরাতন মিথুনেরই ঘরকন্না। সর্ব্বত্রই তাই। ইউরেনিয়ামের মতন ঝুনো গেরস্তরা মস্ত বড় সংসার পাতাইয়া ঘরকন্না করে। বহু স্ত্রীপুরুষের সংসার। এটমের যেটা অন্দর বা নিউক্লিয়াস্‌, সেখানে একরাশ পুরুষ ও মেয়ে জটলা করিয়া রহিয়াছে। অন্দরের এই জটলা যেমন জটিল, তেমনি জমকালো। তা ছাড়া, বাহির বাড়ীতে তড়িল্লেখা চটুলচরণা নটীদের খাসা নাচ চলিতেছে। ঢিমে তেতালায় নয়, বেজায় জলদ। কমসে কম বিরানব্বুইটী নাচ-ওয়ালী নানান্‌ রকমের ব্যূহ রচিয়া পাক খাইতেছেন; মাঝে মাঝে খোস খেয়ালে লাফও মারিতেছেন কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে। বলা বাহুল্য, লাফের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঢেউ-সওয়ার রশ্মিকুমারের প্রসব। এই গেল বড় বড় গেরস্তদের কথা। এদের সমাজে এক হাইড্রোজেনই দেখি একনিষ্ঠ—মাত্র একটি "পজেই" আশা পর্য্যাপ্ত! সময় সময় সেটিও বাপের বাড়ী যান। তখন তাঁর রুক্ষ "পজেটিভ্‌" মেজাজ! আর সর্ব্বত্র—বহু বিবাহ, সাদী, নিকা, কন্ঠিবদল, "মোতা ফরম্ অফ্ ম্যারেজ্‌", সবই চলিতেছে। আদিম যুগের সেই রাক্ষস, আসুর প্রভৃতি বিবাহও মঞ্জুর। একের অর্দ্ধাঙ্গিনী এক লহমায় ইলোপ্‌ করিতেছেন; পরকীয়া এক লহমায় বন্দিনী হইতেছেন। সব্বাই না কি তুল্যমূল্য। সকল ইলেকট্রণই রূপগুণশীলে না কি সমান—সকলেরই "চার্জ্জ" এবং "ম্যাস্‌" না কি এক। এদের সমাজে "ন্যাশানালিজেশন্ অফ উইমেন্‌" চলিতেছে। বিশ্বাস না হয়, সমাবৃক্ষেন্ড প্রমুখ হালের ঘটকদের কুলপঞ্জী বাহির করিতে বলিবেন।

যাই হোক্—আমরা হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের গেরস্থালীর কথা কহিতেছিলাম। গৃহলক্ষ্মীটি অসূর্য্যম্পশ্যা—এখনও অন্দর পর্য্যন্ত ঢুকিয়া কেহই "মুখ" দেখেন নাই। তবে, যেটি গোপন, তার কল্পনায়ও সুখ! বরং বেশী বেশী। পরীক্ষা যেখানে পেছুপাও, অন্বীক্ষা (গণিত-বিদ্যা) সেখানেও আগুয়ান। কল্পনা করা হয় যে—হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস—যাহা রেডিও-একটিভ্‌ পদার্থ-গুলি হইতে আল্‌ফা-রেজ্‌ হইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসে, কাজেই, সেই সেই পদার্থের "কুলের খবর" আনিয়া দেয়—এর ভিতরে এক অপরূপ ব্যূহ বিদ্যমান। চারিটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াই (পজিটিভ্‌-পুরুষ), দুইটি ইলেকট্রণ (নেগেটিভ্‌-স্ত্রী) লইয়া ব্যূহ রচনা করিয়াছে। চক্রব্যূহ। ভৈরবীচক্র? চক্রের চারিটি অর (রেডিয়াই) এর প্রান্তে পরিধিতে চারিজন "পুরুষ"; আর, চাকার যেটা "ধুরো", সেটা যেন দুই দিকে একটু একটু বাহির হইয়া আছে; সেই ধুরের দুই মুড়োয় দুইটি "স্ত্রী"। চক্র চলিতেছে। এই গেল হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের "যন্ত্র"।

মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র—এ তিনটি হইতেছে সৃষ্টির গোড়ার কথা। মন্ত্রের তত্ত্ব সংখ্যার তত্ত্ব। হাইড্রোজেনই হোক্‌, হিলিয়ামই হোক্‌, আর যে কেউ ভূতই হোক্‌, প্রত্যেকেই সংখ্যার অধীন, সংখ্যা আশ্রয় করিয়া আপন সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া রহিয়াছে। তার বীজসংখ্যা বা মূলমন্ত্রটি বদল হইলে, সে বদ্‌লাইয়া আর কিছু হইয়া গেল। তার এটমিক্ নাম্বরটিই "জীওনকাঠি মরণকাঠি"। "আইসোটোপ্‌স্‌" অথবা একই নম্বরের ভূত কেউ কেউ যজ্ঞশালায় কদাচিৎ প্রাদুর্ভূত হন বটে; কিন্তু সাধারণতঃ, ভূতগোষ্ঠীর মূল মন্ত্র আলাদা। ভূতের নিউক্লিয়াসে কতখানি নিট্ শক্তিসন্নিবেশ ("চার্জ্জ"), তার হিসাবই তার বীজ-সংখ্যার হিসাব। তার গুরুত্ব বা ম্যাস কতখানি, সেটা অপেক্ষাকৃত গৌণ হিসাব। আগে আগে রসায়নবিদ্যা ঐ গৌণ হিসাব কষিতেই ব্যস্ত ছিলেন। এখনও সেটা আবশ্যক। "ম্যাস্‌" বস্তুটিকে তখনকার দিনে "অব্যয়" জ্ঞান করা হইত। এখনকার দিনে সেটা এনার্জি বা শক্তির সামিল হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই, শক্তির বেশী-কমির সঙ্গে ম্যাসের (কোয়ান্‌টিটি অফ ম্যাটারের) বেশী-কমি হইবে। অল্পস্বল্প কারবারে সেটা নগণ্য। কিন্তু কোন ভূত যদি আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে দৌড়িতে আরম্ভ করে (অর্থাৎ, সেকেণ্ডে প্রায় দু' লাখ মাইল), তবে সে বেজায় "রাশভারি" হইবে। আলোর গতিই না কি পরমা গতি। কোন ভূতই সে পরমা গতি লাভের আশা রাখে না। পরমা গতি লাভ করিলে, সে গুরুর

গুরু তন্ত্র গুরু হইত। রেডিও-একটিভিটির যজ্ঞশালা হইতে যে বিটা-রেজ্ (ইলেকট্রণ) বাহির হন, তিনি না কি পরমা গতির প্রায় কাণ ঘেঁষিয়া যান, কাজেই তাঁর গৌরব অনেকগুণ সমধিক। । সব ইলেকট্রণের ম্যাস যে তুল্য ধরা হয়, সেটা এই রকমধারা গতি-নিরূপিত লাঘব-গৌরবের কমি-বেশীগুলো হিসাব করিয়া বাদ সাদ দিয়া। আইনষ্টাইনের ধারা চলার পর হইতে ম্যাস বা লঘুগুরুর হিসাব জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ট্রু ম্যাস্—বা সত্যিকার গৌরব—অনেক মেহনৎ করিয়া আদায় করিতে হয়। সে যাই হোক্—হিলিয়ামের সংসার যদি সত্যসত্যই ঐ রকমের স্ত্রীপুরুষের (চারি পুরুষ, দুই স্ত্রী) সংসার হয়, তবে, যজ্ঞশালা হইতে যে তিনজন (আল্‌ফা, বিটা, গামা রশ্মি) বাহির হইয়াছিলেন, তাদের ভেতর প্রথম জনা "মৌলিক" শ্রেণীর দাবীটা করিতে পারিলেন না। হাইড্রোজেন-নিউক্লিয়াই (পজেটিভ্, পুরুষ), আর ইলেকট্রণ (নেগেটিভ্, প্রকৃতি)—এই দুইজনাই তা হইলে ভূতবর্গের মধ্যে "নৈকষ্য" মৌলিক সাব্যস্ত হইলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই পুরুষ-প্রকৃতির মিথুনীভূত অবস্থা, বুড়োবুড়ীর "মনের মিলে সুখে থাকার" সংসার। বলা বাহুল্য, ঝগড়াঝাঁটি প্রায়ই হয়, আর, ব্যাপার দেখে পাড়ার লোককে পুলিশও ডাক্‌তে হয়। বুঝ্‌লেন ?

সাংখ্যশাস্ত্রের পুরুষপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের এই বুড়ো-বুড়ীকে কেহ যেন গুলাইয়া না ফেলেন। সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি আরও গভীর স্তরের তত্ত্ব। ভূতের মর্ম্মনাড়ীতে আমরা যে পুরুষ-প্রকৃতিকে দেখিলাম, তাদিগকে বেদের পরিভাষায় অগ্নি ও সোম, সূর্য্য ও সোম বলা চলিবে বটে, কিন্তু সাবধান হইয়া। বড় জিনিসকে খাটো করিয়া দেখিতেছি, এটা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া। যাক্—সে কথা পরে হইবে। আমরা প্রসঙ্গতঃ মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্রের কথা পাড়িয়াছিলাম। মন্ত্র সংখ্যাতত্ত্ব, কালশক্তি। যন্ত্র মানতত্ত্ব, দিক্‌শক্তি। একে Number, অপরে Magnitude। দুয়ে জড়াইয়া Four Dimensions of Space-Time. এ কথাটা, আর তন্ত্রের কথা আপাততঃ খোলসা করিতে চেষ্টা করিলাম না। শুধু এইটুকু বলিয়াই রেহাই লইব যে—মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র কেবল যে মানুষের সাধনাবিশেষের অঙ্গ, এমন কেহ যেন মনে না করেন। তত্ত্ববিদেরা, বিপশ্চিতেরা অত মোটা কথা কহিতেন না। প্রত্যেকটাই এক-একটা জাগতিক রহস্য। জড়ে, প্রাণে, অন্তঃকরণে, স্থূলে, সূক্ষ্মে, অণুতে, মহতে—সর্ব্বত্র তাদের সার্ব্বভৌম অধিকার ও প্রয়োগ। যিনি জড়ের এটমিক্ নাম্বর জানেন, তিনি তার মন্ত্রটি জানেন, সে মন্ত্রশক্তির যথাযথ বিনিয়োগ করিতে পারিলে, তিনি সে জড় সৃষ্টি বা লয় করিতে পারিবেন। প্রাণের ও অন্তঃকরণের রাজ্যেও তাই। বিজ্ঞানের ঋত্বিকেরা প্রাণপাত করিয়া সে চেষ্টা করিতেছেন। বড়, রাদার-ফোর্ড, সামারফেল্ড্, র‍্যাম্‌জে—এঁরা সব বড় বড় ঋত্বিক্। বীজমন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে জড়ের বীজযন্ত্রেরও পরিকল্পনা, ধ্যানধারণা চলিতেছে। অর্থাৎ, ভূতের সংসারের সদর-অন্দরের নক্সা। সংসারে কয়জন ?—এই হইল একটা প্রশ্ন। আমরা খোঁজ লইয়াছি—হাইড্রোজেনে মাত্র দুইজন; হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে ছয় জন। এই রকম আর আর। সপ্তম মণ্ডলে (Seventh Seriesএ) যে ভূতবর্গ আছেন, তাঁরা খুব জাঁদ্‌রেল যজমান (রেডিও-একটিভ্), আর তাঁদের গেরস্থালীও খুব বড়। অন্দরেও (নিউক্লিয়াস) গুলজার, বাহিরেও (পাকখাওয়া, নাচাকোঁদার আসরেও) গুলজার। রেডিয়াম হইতে সুরু করিয়া ইটরেনিয়াম পর্য্যন্ত সপ্তম মণ্ডলে কয়টি "রাবণের গোষ্ঠী" গেরস্ত বিরাজমান। যজমান যে শুধু এঁরাই, এমন না। সম্ভবতঃ ভূতনামাই যজমান অল্প-বিস্তর। দু'কুড়ির উপর যজ্ঞশালার সমাচার এরি মধ্যেই পাইয়াছি। আরও পাইব সন্দেহ নেই। যজ্ঞ শুধু যে "দক্ষযজ্ঞ", মারণ-যজ্ঞ, ভাঙ্গন-যজ্ঞ, এমন নয়। সকল রকম যজ্ঞই আছে, মায়, বশীকরণ। সত্যিই। বিজ্ঞানের কলাসূত্র, তন্ত্রসার, ত সবে এই বিংশশতকে লেখা সুরু হইয়াছে! অনেক কাটাকুটি হইবে, অনেক কিছু লিখিতে মুছিতে হইবে। সবে ত' কলির সন্ধ্যে। ভূতের যন্ত্রের প্রশ্ন—এটমের অন্দরে ও সদরে যারা রহিয়াছে, তারা পরস্পরের "জন্য", পরস্পরের তরে কেমনভাবে সাজিয়া রহিয়াছে (configuration); আর, তাদের চলা-ফেরাই বা কি রকম পথে, কি রকম কায়দায় হইতেছে ? যে পাক খায়, সেটা কি সোজাসুজি

গোল পথেই পাক খায়? না, সে গোলেও কিছু গোল আছে? বৃত্ত, না বৃত্তাভাস (Ellipse), না, আরও জটিল কুটিল? গ্রহদের কল্পিত অভিসার-পথে ভাগ্যে জটিলা কুটিলা কাঁটা দিয়াছিল, তাই না দুই দুইটা জলজীয়ন্ত ফেরারি গ্রহ শেষকালে বামালশুদ্ধ ধরা পড়িয়া গেল! আদাম্স্ ও লাভোয়াসিয়ার অনেক দিন আগে এক ফেরারিকে পাকড়াও করিয়াছিলেন; প্রথমে, আঁকের খাতায়, তার পর দূরবীণে। সেদিনও আর এক ফেরারি গ্রেপ্তার হইল। এরা সকলেই সৌরগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মূল ফেরারি আসামী। বহুদূরে আসমানে পলাতক হইয়াছিল। যাক্—অণুর জগতেও বোধ করি জটিলাকুটিলা অভিসার পথে কাঁটা দেবার জন্যে আছেন। খোঁজ পরে লইব। এই গেল ভূতের মন্ত্র ও যন্ত্রের কথা। আর, ভূতের তন্ত্র হইতেছে—কোনও দিকে, লক্ষ্যে মন্ত্র-তন্ত্রের বিনিয়োগ। বিনিয়োগ বলিতে অধ্যক্ষতা (Control) বুঝায়। কোন কিছু নিয়ামক (Controlling Principle) মানিতে হয়। সেই নিয়ামকই ভূতের ভূতেশ্বর; ভূতের আত্মা; ভূতের ঈরিতা। ইনি গুহাশয়, নিগূঢ়, গুহ্যাদপি গুহ্য। ইনি দহরব্রহ্ম—Infinitesimal Space-Time এর মন্দিরেও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বিজ্ঞান ভূতচক্রের অর, নেমি হাতড়াইয়া মরিতেছে। এখনও নাভির উল্লাস পায় নাই। কবে পাবে জানি না। নাভি যে তত্ত্বটি রহিয়াছেন, তিনিই ভূতের অথবা "পশুর" পতি, ঈরিতা, যজমান, হোতা। পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ। তিনিই "হংস"—বেদ "হংসঃ শুচিষদ্ বসুঃ—" মন্ত্রে যাঁকে বিশ্বভুবনে ওতপ্রোত দেখিয়াছেন। এই হংসহোমেরই পরিচয় আমরা রেডিও-একটিভিটিতে পাই; আল্ফা, বিটা, গামা-রেজ্ রূপ তিনটি জিহ্বা তাঁর লেলিহান দেখি। এই হংস-হোমেই ভূতের জন্ম-জরা-মরণএর চক্র বা সাইকল্ চলিতেছে। ভূতের তন্ত্র বড়ই গুহ্যাদপিগুহ্য তন্ত্র। তুড়ি দিয়া বোঝার নয়, বোঝাবার নয়। এখনি বিজ্ঞান অণুর দেশে (শুধু কি সেখানেই?) কতকগুলো "খাজা খবর" ("brute facts", বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ভাষায়) পাইয়া হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছেন। এগুলো মানুষের বোধশোধের বাহিরে—— Ultra-rational না irrational? শুধু কোয়ানটাম্ নয়, অনেক কিছুই। অনেকের চমক ভাঙিতেছে। এডিংটন্ রেলিটিভিটির একজন বড় পাণ্ডা। তিনি বলিতেছেন—প্রকৃতির যেগুলো "প্রকৃত" ধারা, সেগুলো আমাদের বোধশোধের বাহিরে হওয়াই স্বাভাবিক। যে সব ধারা (Laws) আমরা বুঝি সুঝি, সেগুলো আমাদেরই চাপান', সাজান' (অধ্যাস) কি না, কে বলিবে? আমরা সাগরের জল লইয়া ঘটিতে বাটিতে ঢালা-উবুর করিতেছি; আর, ভাবিতেছি, জলের ঘটির আকার, বাটির আকার! তার সত্যিকার আকার কি? ঋষিরা অনেক ঠেকিয়া শিখিয়া "অনির্ব্বচনীয়" বলিতেন। কোয়ানটাম্ (পরে এর কথা বলিব) অনির্ব্বচনীয়। অনির্ব্বচনীয় বলিয়াই "প্রকৃত"। আমাদিগকে "অবাক্" করিতেছে বলিয়াই সত্যসন্দেশ! সত্যসন্দেশ মুখে পাইলে আর কি বাক্ সরে?

এইবার আসল রাস্তা ধরার উপক্রম হইবে কি? না, আবার বে-মক্কা ঠোক্ ধরিবে? যে গল্পটা গোড়ায় পাড়িয়াছিলাম, সেটা শেষ করি। এক অসুর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া বর পাইল—যার মাথায় সে হাত দিবে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া যাইবে। এটি ভস্মাসুর। ভস্মলোচন এঁরই মাসতুত ভাই। বর পেয়েই যিনি বরদাতা, তাঁর মাথাতেই প্রথম বরের সত্যতা পরখ করিতে ইচ্ছা করিল। শিবের মাথায় হাত দেয় আর কি! শিব তখন পালাবার পথ পান না! শিব পলাইতেছেন, আর, ভস্মাসুর হাত বাড়াইয়া পিছু পিছু ধাওয়া করিতেছে। এই ধরি ধরি! শিব ত্রিভুবনে দৌড়িয়া কোথাও আশ্রয় পাইলেন না; ব্রহ্মলোকেও না। ব্রহ্মারও ভয়, পাছে দৈত্যবেটা গুণিতে ভুল করিয়া মোটে চারিটা আননের মালিককেই খোদ পঞ্চানন ভাবিয়া বসে! শেষকালে গলদ্ঘর্ম্ম দিগম্বর ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে গোলোকে গিয়া উপস্থিত। গোলোকপতি গোলোকে গো-গোপ-গোপী লইয়া বসবাস করেন বটে, কিন্তু বুদ্ধিটা তাঁর অপ্রাপ্ত-ষষ্ঠিবর্ষ "যাদবের" বুদ্ধি নয়। তিনি ব্যাপারখানা বুঝিয়া এক চমৎকার ফাঁক্ বাহির করিলেন। বলিলেন—"আচ্ছা, বৎস অসুর! তুমি বরটি তোমার পরের মাথায় পরখ করার জন্য ছুটিয়া হায়রাণ হইতেছ কেন?

আহা, ত্রিভুবনে ঘোড়দৌড় করিয়া হাঁফাইয়া পড়িয়াছ যে! একটু জিরাইয়া লও। ভাল কথা—নিজের মাথাটা ত সঙ্গেই রহিয়াছে, তাতেই পরখ করিয়া দেখ না কেন, বরটি সত্য কি মিথ্যা।" অসুর ভাবিল—"তাই ত,' ভুল হইয়াছে, এতক্ষণ মিছে হায়রাণ হইয়াছি!" বলা বাহুল্য, যেই নিজের মাথায় হাত ঠেকাইল, আর ভস্মত্ব পাইল। শিবও ছুটি পাইলেন। আবার জটা বাঁধিলেন, বাঘছাল পরিলেন। ভাঙের ঘটিতে চুমুক মারিলেন। ভাঙেই ত' যত ভুল! না ভুলিলে যে, শিবের শিবত্ব, ভোলানাথের ভোলানাথত্বই হয় না!

বিজ্ঞানও শিবের তপস্যা করিয়াছে। সত্য শিব সুন্দরকে সেও খুঁজিয়াছে, খুঁজিতেছে সন্দেহ নাই। শেষ পর্য্যন্ত, খোঁজার বস্তু আর আছেই বা কি? কিন্তু সেই অবুঝ, আব্দেরে নাতিটি তার ঘাড়ে চাপিয়া আছেন। অহমিকা। এটি বোকা সেয়ানা, ভোলানন্দ নহেন। এ ঘাড়ের ভূতটি ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে নাই সে। তাই এমন বর তার মিলিয়াছে, যাতে যা কিছুতে সে হাত দিতেছে, তাই জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাইতেছে। খোদ শিব—জ্ঞানমূর্ত্তি, দক্ষিণামূর্ত্তি, কল্যাণমূর্ত্তি যিনি—পলাইয়া বেড়াইতেছেন। "বিরোচনী" বিদ্যা তাঁর মাথাতেই হাত দেবার বায়না ধরিয়াছে যে! অণুর অন্দরে পলাইতেছেন, লুকাইতেছেন, সেখানেও ধাওয়া; ছায়াপথের ও-পিঠে (Galactical System এর বাইরে) "island universes" গুলোতে পলাইতেছেন, সেখানেও প্রায় ধর'ধর'। দৈত্যগুরুর ধন্য ওস্তাদী বটে! তিনি যত বড় হন, সেও তত বড় হয়; তিনি যত ছোট হন, সেও তত ছোট হয়। আলোর বেগে, তড়িতের বেগে ছোটেন, সেও তাতে পেছ-পা নয়। বিজ্ঞানের সিদ্ধির তারিফ করিতেই হইবে। এ সিদ্ধির অতিবৃদ্ধি কিন্তু স্বল্প ঋদ্ধি।

কিন্তু যেটা ভুবনস্য নাভিঃ—ছোটতেই হোক্, আর বড়তেই হোক্, সচলের সম্পর্কেই হোক, আর অচলের সম্পর্কেই হোক্—সেটা বিজ্ঞান এখনও স্পর্শ করিতে পায় নাই। নেমি, অর—এই সব নিয়েই সে ফাঁপরে পড়িয়া আছে। ও যে গোলকধাঁধার ঘুরপাক! তার নিউক্লিয়াস, সেন্ট্র্, পয়েণ্ট—এসব কেউই নাভি নয়। নাভি স্পর্শ করার হদিশ এখনও সে শেখে নাই। নাভির দুয়ারে যাইয়া তবে শিখিবে। ভুবনের নাভি গোলোক—যে নাভিতে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রজাপতি পদ্মনাভের সমুদ্ভব। সেখানে আসিলে, তাকে নিজের মাথাতেই হাত দিতে হইবে। তার ঘাড়ে যে আব্দারে "নাতিটি" চাপিয়া সব ভস্ম করার বায়না ধরিয়াছে, সে নিজেই ভস্ম হইবে। তখন শিব হবেন নিরুদ্বেগ, শান্ত, স্বস্থ। তখন ভস্মাসুরের মুক্তাত্মা ভস্মবিভূতিভূষণ যিনি, সেই শিবের তাদাত্ম্যই লাভ করিবে। "বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ত্রিবেদীদিব্যচক্ষুষে। শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি নিমিত্তায় নমঃ সোমার্দ্ধধারিণে॥" এখন বিজ্ঞানের যা কিছু জ্ঞান, তা "প্রাকৃত" জ্ঞান;—প্রকৃত, বিশুদ্ধ জ্ঞান নয়—প্রজ্ঞান নয়। যেটাকে এখন সত্য (Truth) বলিতেছি, বিধি (Law) বলিতেছি, সেটা সেই দিদিমণির দুহিতা ও দৌহিত্রের কারিগুরি, কারসাজি। যেটা অনির্ব্বচনীয়, অবাঙ্মনসগোচর, সেটা ঐ ত্রিমূর্ত্তির ভেল্কিপ্রসাদাৎ খাসা খোপদুরস্ত হইয়া আমাদের কারবারে খাটিতেছে। বিজ্ঞানের জগৎ এই হিসাবে—কারবারি (Pragmatic Conventionla) নিজের মাথায় হাত দিয়া, নিজেকে "ফুঁকিয়া" দিয়া, তবে সত্যকে সত্য সত্য স্পর্শ করিবে সে। আমাদের চল্তি কারবারের হিসাবে সে সত্য হয়ত' ভস্মই। আমরা ভস্মকে ভাবি "ছাই," উপনিষৎ কিন্তু ভাবিয়াছেন—সারের সার।

শেষ পথ

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল্

(১৯)

পরের দিন সকালে শারদা অনুভব করিল যে তার মনের তলায় যে প্রচ্ছন্ন কামনা এত দিন সে বহু ক্লেশে নানা আবরণে চাপিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা নিঃসঙ্কোচে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সে বুঝিল যে গোপালের প্রেম ও সঙ্গ তার কাম্য; আর তাহাতে বঞ্চিত হইয়া সে নিরতিশয় দরিদ্র ও ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

একটা উগ্র কৌতূহল তাকে টানিয়া লইয়া চলিল গোপালের বাড়ীর দিকে। গোপাল তার নব-বধূ লইয়া কেমন আছে, কি সে করিতেছে, আপনার চোখে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল তার চিত্ত। দুই তিনবার সে গোপালের বাড়ীর পথে অগ্রসর হইল—দুর্নিবার লজ্জা তাকে নিবৃত্ত করিল। তার যেন মনে হইল তাকে গোপালের বাড়ীতে দেখিবার জন্য, সেখানে সে গেলে কি মজা হয় তাহা জানিবার জন্য সমস্ত গ্রামের কৌতূহলী চক্ষু যেন নিষ্পলক হইয়া তার অনুসরণ করিতেছে। সে অদৃষ্ট চক্ষুর দৃষ্টি যেন তার সারা অঙ্গে ছুঁচের মত বিঁধিল, তার পায় নিগড় বাঁধিয়া দিল। কতবার সে আপনাকে বলিল, কেন সে যাইবে না? এত লোকে যাইতেছে, সে গেলে কে কি বলিতে পারে? কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সাহসে কুলাইল না।

নদীর ঘাটে যাইবার সময় গোপালের বাড়ীর একটু তফাৎ দিয়া যাইতে হয়। সেখান হইতে আমবাগানের গাছগুলির ফাঁক দিয়া গোপালের আঙিনার দু-চারটা টুকরা দেখা যায়। নদীতে যাইবার সময় শারদা সেই ফাঁক দিয়া চক্ষুময় হইয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিতে পাইল আঙিনায় লোকজন চলা-ফেরা করিতেছে; কিন্তু গোপাল বা তার স্ত্রীকে দেখিতে পাইল না। একটু তফাতে লোকের সাড়া পাইয়া শারদা ধরা-পড়া চোরের মত সচকিত হইয়া ত্রস্তপদে নদীর দিকে অগ্রসর হইল।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন চলিয়া গেল, গোপালের বাড়ী সে যাইতে পারিল না। শেষে একদিন দ্বিপ্রহরে তার এক বাল্যসখী তাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গোপালের বাড়ী গেছিলি?"

শারদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল "না।"

গালে হাত দিয়া মেয়েটা বলিল, "ও মা! ক্যা? তুই যাস নাই!—গাঁওসুদ্ধা লোকে গেল, তুই যাস নাই?"

নিদারুণ ঔদাস্যের সহিত শারদা বলিল, "আহা, আমার আর কাম নাই আমি যামু তারে দেইখবার। তার কি পাচটা পাও জালাইচে যে দেখুম।"

সখী একটু হাসিল। তার পর সে বলিল, "চল আমার সাথে চল। বউডা যে আনিচে, কি যে সুন্দর দেখবি অনে চল।"

শারদা অস্বীকার করিল, কিন্তু ভাবিল এই সুযোগে! সখীর নিতান্ত উপরোধের সুযোগে তার যাইবার পথ হইতে পারে। সখী তাকে ছাড়িল না, তাকে টানিয়া লইয়া গেল। যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় সে গেল।

সেখানে গিয়া সে সুখ পাইবে না তাহা সে জানে। যাহা দেখিতে সে যাইতেছে তার প্রত্যেকটি বিন্দু তার মনের ভিতর আগুন জ্বালিয়া দিবে তাও সে জানে। কিন্তু তবু পতঙ্গ যেমন আগুনের দিকে ছোটে, তেমনি

তার মন ছুটিয়াছিল তার দুঃখের আকর ওই গোপালের বাড়ীর দিকে।

গোপালের বাড়ীর একেবারে কাছে আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। তার সঙ্গিনীকে বলিল, সে যাইবে না। কিছুতেই তার পা সরিল না গোপালের বাড়ীর উঠানে পা দিতে।

কিন্তু অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর তার সঙ্গিনী তাকে টানিয়া লইয়া গেল।

রম রম করিতেছে বাড়ীখানা। অনেকগুলি কামলা খাটিতেছে। ঢেঁকী-ঘর, গোয়াল-ঘর, বাড়ীর বেড়া প্রভৃতি অনেক কাজ হইতেছে। উঠানের এক পাশে কাঠের চেলা করা হইতেছে। দলে দলে গাঁয়ের স্ত্রী-পুরুষেরা আসিয়া জুটিতেছে। যারা ভাল জাত তারা ঘরে বা দাওয়ায় গিয়া উঠিতেছে, মুসলমান ও ছোট জাতের লোকেরা উঠানের পাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। বৈঠকখানায় লতিফ সরকার প্রজাদের লইয়া বসিয়া এক-আধটুকু লেখাপড়া করিতেছে, আর তার শতগুণ বক্তৃতা করিতেছে।

কম্পিত পদে আপনাকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া শারদা তার সঙ্গিনীর আড়ালে আড়ালে চলিয়া অন্দরের উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। তার পর পায় পায় উঠিয়া সে গোপালের শয়নগৃহের দাওয়ায় গিয়া উঠিল।

ঘরের ভিতর গোপাল তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কহিতেছিল। কথাটা সাধারণ, সাংসারিক কোনও একটা ব্যাপারের। কিন্তু শারদা দেখিল তাদের দুজনের হাসি, তাদের চোখভরা ভালবাসা! বুকের ভিতরটা তার চড়াৎ করিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পর নব-বধূ বাহির হইয়া আসিল। রূপসী সে—গা-ভরা গয়না তার—শারদা তাহা দেখিল। তার দিকে চাহিয়া শারদার মনটা যেন কালীতে ছাইয়া গেল। সে এখন কতকটা বুঝিতে পারিল যে তার বিবাহের পর তার মুখ দেখিয়া বিন্দুর মনে কি ভাবটা হইয়াছিল। অনেক কথা বিদ্যুৎবেগে তার মনের ভিতর খেলিয়া গেল—তার কোনওটাই সুখের কথা নয়। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস তার অলক্ষিতে বাহির হইয়া পড়িল।

শারদার সঙ্গিনী হাসিমুখে বলিল, "আপনারে দেইখবার আইলাম বোঠাইকান," বলিয়া—সে ঢিপ করিয়া বধূকে প্রণাম করিয়া বসিল।

শারদার ঘৃণা হইল। "বাজে লোকে"র মেয়েরা বামুন বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্র ঘরের ঝি বউদের প্রণাম করিয়া থাকে। কিন্তু সিকদারের ছেলে গোপাল, তার বউকে যে মেয়েটা এমনি করিয়া প্রণাম করিল তাতে শারদার রাগ হইল। শারদা মাথা নোয়াইল না, কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বউ তার মাথার কাপড় সামান্য একটু তুলিয়া খুব মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "তোমাদের নাম কি?"

বাড়ীতে শাশুড়ী ননদ ছিল না—কাউকে দেখিয়া লজ্জা করিবার কারণ ছিল না, তবু নূতন বউ, তার পক্ষে ঘোমটাটা মুখ ঢাকিয়া না দেওয়া বা শ্রাব্যকণ্ঠে কথা কওয়া সেকালে অকল্পনীয় ছিল। তাই মুখের আধখানা ঘোমটায় ঢাকিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বউ জিজ্ঞাসা করিল।

পরিচয় দান শেষ হইলে বউ বলিল, "আচ্ছা, বোস।" বলিয়া সে চলিয়া গেল। তারা বসিল না, দাঁড়াইয়াই রহিল। সঙ্গিনী কৌতূহলী হইয়া গোপালের ঐশ্বর্য্যের সব পরিচয় দেখিতে লাগিল—শারদার চোখে সেই সব যেন আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পর গোপাল ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। গোপাল তাদের দেখিয়া শারদার সঙ্গিনীর সঙ্গে দুই একটা কথা বলিল, খুব ভারিক্কি চালে। তার পর শারদার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া সে বলিল, "দুর্গা তাইত্যানির মেয়া না?—তরে বলে তর সোয়ামী খেদাইয়া দিছে?"

বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া গোপাল বাহিরে চলিয়া গেল।

শারদার সমস্ত অন্তর এ কথায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তার চিত্ত ক্ষোভে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল সুধু এই ভাবিয়া যে, এই অপমান কুড়াইবার জন্য সে এত বাধা ঠেলিয়া গোপালকে দেখিতে আসিয়াছে!

শারদা কোলের শিশুকে চাপিয়া ধরিয়া দম দম করিয়া দাওয়া হইতে নামিয়া রুষ্ট পদক্ষেপে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া বাড়ী ফিরিল।

ঘরে ফিরিয়া শিশুকে দম করিয়া মেঝেয় বসাইয়া দিয়া সে গড়াগড়ি খাইয়া কাঁদিতে লাগিল—বুকের জ্বালায় সে একেবারে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

এত বড় অপমান! গোপাল করে তাকে অপমান! পথের কুকুরের মত যাকে সে তাড়াইয়া দিয়াছে সেই গোপাল! যার অবিবেচনা ও দুর্লোভের ফলে শারদার আজ এ দুর্গতি সেই গোপাল! সিকদারের ছেলে গোপাল—আজ বড়মানুষ হইয়া এতবড় দম্ভ হইয়াছে তার! গ্রামসুদ্ধ মেয়ের সামনে তার এই অপমান—এই লাঞ্ছনা! এত দম্ভ এতবড় অত্যাচার ধর্ম্মে সহিবে? স্বর্গে দেবতারা কি অন্ধ হইয়া বসিয়া আছে, ইহার শাস্তি গোপাল পাইবে না কি?

নানা রকম বীভৎস প্রতিহিংসার চিন্তা তার চিত্তে খেলিয়া গেল। গোপালকে খুব ভয়ানক অপমান ও লাঞ্ছনা করিবার শত শত কল্পনা সে করিল—কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা করিয়া ভাবিয়া সে দেখিল তার কোনওটাই তার পক্ষে সম্ভব নয়—কোনও কিছুই সে করিতে পারিবে না। কোনও হৈ-চৈ করিতে গেলে সে সুধু আপনাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিবে। এই বোধটুকু তার তখনও ছিল যে সে যদি গোপালের সঙ্গে কোনও কলহ করিতে যায়, তাতে গ্রামবাসী কারও সহানুভূতি সে পাইবে না—তারা দেখিবে সুধু রঙ্গ।

তাই শেষে হতাশ হইয়া প্রতিবিধানের ভার দেবতার হাতে দিয়া সে ভাবিতে লাগিল—এত দুঃখ—এই শাস্তি তার কোন্ পাপে? কোনও দোষ তো সে করে নাই, তবে কেন তার এ লাঞ্ছনা? এই প্রশ্ন সে বার বার অদৃশ্য দেবতার কাছে করিতে লাগিল। করিতে করিতে তার মনে পড়িল বিন্দুর কথা—বিন্দুর অভিশাপ কি এ? বিন্দুরও এমনি লাঞ্ছনা, এমনি নির্য্যাতন হইয়াছিল,—শারদা নিজেই তাকে লাঞ্ছিত করিয়াছিল। যে ব্যথা কহিবারও নয়, সহিবারও নয়, সেই নিদারুণ বেদনা শারদার মত বিন্দুও সহিয়াছিল। বিন্দু তাহা লইয়া সোরগোল করিয়া লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হইয়াছিল—তার সে দুর্গতি শারদা কত না উপভোগ করিয়াছে! তার শাপে আজ কি তার এই দুর্গতি!

কিন্তু—বিন্দু পাপ করিয়াছিল, তার শাস্তি হওয়া অনুচিত হয় নাই। শারদা তো পাপ করে নাই। তার স্বামীকে বিন্দুর কবল হইতে কাড়িয়া লওয়া তার ন্যায্য অধিকার—তাতে তার এ শাস্তি কেন? সে পোড়া-কপালী তার পাপের শাস্তি নির্ব্বিবাদে না সহিয়া বাঁচিয়া থাকিতে অনেক বাদই সাধিয়াছে, আর মরিয়াও তার অভিশাপ রাখিয়া গিয়াছে এমনি করিয়া শারদাকে নির্য্যাতন করিবার জন্য! এমন হতভাগিনী সে! শারদা মনে মনে এই কথা স্থির করিয়া তার বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের দায়িত্ব মৃতের স্কন্ধে চাপাইয়া তাকে প্রাণ ভরিয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিল।

অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া সে সুস্থির হইল। তার মনের ভিতর যে দারুণ ঝঞ্ঝা বহিয়া গেল তার খবর আর কেহ পাইল না। সে প্রবলবেগে মনের ভিতর তার সকল ব্যথা চাপিয়া শুষ্কমুখে দিনের পর দিন তার কাজ করিয়া গেল।

(২০)

রংপুরে তার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গোপাল যখন কাজে ভর্ত্তি হইল, তখন সে দেখিতে পাইল যে তার সহকর্ম্মী এবং তাদের বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই—যাকে বলে ভদ্রলোক। তারা হয় ব্রাহ্মণ না হয় ঘোষ, বসু, মিত্র—কিম্বা সাহা। সাহা জাতি জাত্যংশে ছোট হইলেও ধনসম্পদে বড় হওয়ায় তাদের একটা কৌলিন্য আছে। গোপালের মুনিব যে মহাজন তিনি নিজেও জাতিতে সাহা—কাজেই সাহা জাতিকে ছোট বলিয়া তারা কেউ অবজ্ঞা করে না।

ইহারা প্রথমেই গোপালের জাতি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—গোপাল সত্যই বলিয়াছিল, সে কায়স্থ। কাজেই সবার সঙ্গে সমানে সমানে মিশিতে তার কোনও বাধা হয় নাই।

এই সমাজে মিশিয়া গোপাল আপনার জাতিকুলের সম্পূর্ণ সত্য পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল। সে কায়েত হইলেও যে গোলাম কায়েত, এবং তার পিতা যে জমীদার বাড়ীর সিকদার এ পরিচয় সে কিছুতেই প্রকাশ করিল না।

গোপালচন্দ্র ঘোষ বলিয়া সে আপনার পরিচয় দিল

এবং ঘোষ কায়স্থ বলিয়াই সে রংপুরের সমাজে চলিয়া গেল।

যত দিন গেল এবং যতই গোপালের হাতে টাকা পয়সা জমিতে লাগিল, ততই তার এই কৃত্রিম আভিজাত্য তার অন্তরের ভিতর বসিয়া যাইতে লাগিল। যত দিন কানাই সিকদার জীবিত ছিল, তত দিন সে অনেকটা ভয়ে ভয়ে ছিল, কখন বা তার পিতার অবিমৃশ্যকারিতায় তার সত্য পরিচয় প্রকাশ হইয়া যায়; আর তার মিথ্যা পরিচয়ে অর্জ্জিত আভিজাত্যের সম্মান বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কানাই মারা গেলে সে নিশ্চিন্ত হইল।

ক্রমে তার মনে হইল যে তামাকের আড়তের কাজটা ঠিক ভদ্রলোকের কাজ নয়। ইহাতে লেখাপড়ার চেয়ে হাতের কাজই করিতে হয় বেশী।

একটা জমীদারের নায়েব হইতে পারিলে সম্মান ও গৌরব হয় ঢের বেশী।

তাই সে তামাকের কারবার ছাড়িয়া জমীদারীর কাজের সন্ধান করিতে লাগিল। মাহিগঞ্জের কাছারীতে সুমারনবিশের কাজ সে পাইয়া গেল এবং তামাকের ব্যবসা ছাড়িয়া খাতাদেখার সম্ভ্রান্ত কাজে নিযুক্ত হইয়া গেল।

ইহার পর ক্রমে সে একটা নায়েবী পাইয়া গেল।

তখন আর তাকে পায় কে?

সে-কালে জমীদারের নায়েব মহাশয় ছিলেন একটি পরাক্রান্ত ও মহা সম্মানিত ব্যক্তি। দলে দলে পালে পালে প্রজারা আসিয়া রোজ তাকে সেলাম বা নমস্কার করিয়া যায়, গোমস্তা ও পাটোয়ারীরা আসিয়া সেলাম লাগায়, আর তিনি প্রবল প্রতাপের সহিত জমীদারের সব ক্ষমতার জিম্মাদার হইয়া হুকুম চালান।

গোপালের বুক ফুলিয়া উঠিল।

এইবার সে বিবাহ করিল। গাইবান্ধার উকীল বিশ্বেশ্বর মিত্র মহাশয় গোপালের মত যোগ্য কুলীন জামাতা পাইয়া ধন্য হইয়া গেলেন। গোপালও কুলীন কন্যা বিবাহ করিয়া তার আভিজাত্য পাকা করিয়া লইতে পারিয়া ধন্য হইয়া গেল। বধূ যে সুন্দরী ইহা সে উপরি পাওনা গণ্য করিল।

আভিজাত্যের নেশা তাকে এমন পাইয়া বসিল যে শুধু এইটুকুতে তার পরিতৃপ্তি হইল না। বিদেশে বিভূঁয়ে তার এই বৈভব ও সম্ভ্রম অর্জ্জন করিয়া মন উঠিল না। মনে হইল দেশের লোককে একবার এ গৌরব ভাল করিয়া না দেখাইতে পারিলে কিই বা হইল।

সে প্রায়ই মনে করিত দেশে গিয়া কিছু দিন বাস করিবে। হীন ভৃত্যের সন্তান বলিয়া যারা তাকে একদিন অবহেলা করিয়াছে, তাদের কাছে সম্মান আদায় করিবে সে। সে কল্পনায় সে পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছে।

এই সময় সে সংবাদ পাইল যে তার গ্রামের জমীদার মহাশয়ের মৃত্যুর পর জমীদার-পরিবারের নিতান্ত দুরবস্থা হইয়াছে এবং তাঁদের সম্পত্তি লাটে উঠিয়াছে।

গোপালের অন্তর নাচিয়া উঠিল। সে জমীদার মহাশয়ের ছোট একটা সম্পত্তি, সেই গ্রামেরই একখানা খারিজা তালুক কিনিয়া ফেলিল।

লতিফ সরকার জমীদার মহাশয়ের অধীনে একজন গোমস্তা ছিল, তাহাকে সে পত্র দ্বারা গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া আদায় তহশীলের কার্য্যে নিযুক্ত করিল এবং তাহার পৈতৃক ভিটার আশে-পাশে অনেক জমী কিনিয়া খুব ভাল করিয়া একখানা বাড়ী করিবার জন্য টাকা পাঠাইল।

বাড়ীতে বড় বড় ঘর উঠিতে লাগিল, কিন্তু চট্ করিয়া গোপালের বাড়ীতে আসা হইল না।

গোপালের বাড়ী করার সংবাদে গ্রামের অভিজাত সমাজে যথেষ্ট চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। কানাই সিকদারের ছেলে হইয়া গোপাল যে তালুকদার হইবার স্পর্দ্ধা করিয়াছে ইহাতে তাঁহারা একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। আর যে তালুক সে লাটে কিনিয়াছে সে স্বয়ং জমীদার মহাশয়দের একখানা তালুক—তার বাপের মনিবের সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি কেনা এই ছোটলোক গোপালের পক্ষে একটা স্পর্দ্ধা অবিনয় এবং অকৃতজ্ঞতার চরম নিদর্শন বলিয়া তাঁরা মনে করিয়াছিলেন। এই গ্রামে বসিয়া কানাই সিকদারের ছেলে যে জমীদার বাড়ীর নষ্ট সম্পত্তির উপর প্রভুত্ব করিবে, যারা তার বাপের সমকক্ষ ছিল তাহাদিগকে প্রজা বলিয়া শাসন করিবে এবং বাপের মনিবের সমকক্ষ হইবার স্পর্দ্ধা করিবে ইহা একেবারে অসহ্য!

কাজেই অভিজাত-সমাজ তার উপর খড়্গহস্ত হইয়াই ছিলেন। আর যারা 'বাজে' লোক—যারা কানাই সিকদারের সঙ্গে দহরম মহরম করিয়াছে তারাও কম ক্ষিপ্ত হয় নাই। সেই কানাইদা'র ছেলে আসিয়া তাদের মনিব হইয়া বসিবে, তার কাছারী-ঘরের মেঝেয় বসিয়া তার দরবার করিতে হইবে, ইহাতে প্রজারাও মনে মনে দারুণ অসন্তোষ ও অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল।

সুধু যদি ইহাই গোপালের একমাত্র অপরাধ হইত তবু গোপালের গ্রামে তিষ্ঠান কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু গোপালের আরও অপরাধ ছিল, আর সেগুলি সত্য সত্যই অপরাধের কথা। কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল যে গোপাল তার জন্মপরিচয় গোপন করিয়া আপনাকে সম্ভ্রান্ত ঘোষবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা বিবাহ করিয়া আসিয়াছে। এবং এই প্রথম বঞ্চনা হইতে সূত্রপাত করিয়া সে নিজের ভদ্র পদবী প্রতিষ্ঠার জন্য আরও অনেক বঞ্চনাই করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং তার উপর গ্রামের অভিজাত সম্প্রদায়ের আভিজাত্যের আক্রোশ একটা দৃঢ়তর আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। তাঁহারা স্থির করিলেন, গোপালকে কখনই গ্রামে আসিয়া বাস করিতে দেওয়া হইবে না।

প্রথমে জমীদারবাড়ী হইতে তাহাকে কতক শাসাইয়া চিঠি লেখা হইল যে, সে তালুক কিনিয়াছে, কিনুক, কিন্তু এ গ্রামে আসিবার যেন চেষ্টা না করে। গোপালের এক বন্ধুকে দিয়াও তাকে এই পরামর্শ দিয়া চিঠি লেখা হইল। গোপাল কিন্তু তাতে আরও জোর করিয়া লিখিল, গ্রামেই সে আসিয়া বাস করিবে।

তখন গ্রামের ভদ্রলোকেরা যুক্তি করিয়া গাইবান্ধায় গোপালের শ্বশুরের কাছে গোপালের বংশপরিচয় দিয়া সংবাদ দিলেন, এই আশায় যে শ্বশুর এই বঞ্চক জামাতার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিবেন। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হইল। মিত্র মহাশয় প্রথমে এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া একেবারে বজ্রাহত হইয়া গেলেন। কিন্তু তিনি চতুর ব্যক্তি। তিনি বুঝিলেন যে কন্যার বিবাহ যেকালে ফিরিবার নয়, সেকালে গোপালের মিথ্যা দাবীটাই সত্য বলিয়া দাঁড় না করাইলে তাঁর জাতকুল থাকে না। সুতরাং তিনি গোপালের পক্ষে লড়িতে প্রস্তুত হইলেন, তার চতুর্দ্দশ পুরুষের কুরচিনামা প্রস্তুত করাইয়া প্রমাণ করিলেন যে কানাই ঘোষ কোনও সুপ্রসিদ্ধ ঘোষবংশের সন্তান, এবং এই দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন।

তার পর গ্রামের ভদ্র ও বাজে লোক মিলিয়া স্থির করিল যে গোপাল গ্রামে আসিয়া বসিলে তাহাকে উৎখাত করা হইবে। তার প্রজারা কেহ তাহাকে খাজনা দিবে না, তাহার বাড়ীতে কেহ কোনও কর্ম্ম করিবে না এবং যত রকমে সম্ভব তাহাকে বিব্রত করিবার চেষ্টা করিবে। প্রজারা বুক ঠুকিয়া বলিল, কানাই সিকদারের ছেলেকে তারা মনিব বলিয়া কিছুতেই মানিবে না।

লতিফ সরকার যথাসময়ে গোপালকে এ সংবাদ জানাইল এবং দুর্দ্দান্ত প্রজা ও গ্রামের ভদ্রলোকদের এই সমবায়ে যে গোপালের ভয়ের গুরুতর হেতু আছে তাহাও তাহাকে বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিল।

গোপাল ভাবিতে বসিল।

গ্রামে গিয়া সে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে দশ জনের একজন হইয়া বসিবে, গ্রামের লোকের কাছে সে আভিজাত্য ও সম্পদের প্রাপ্য সম্মান আদায় করিবে—এই আকাঙ্ক্ষা তাহাকে একেবারে পাইয়া বসিয়াছিল। গ্রামের লোকের এই বিরুদ্ধতায় তার রোখ চড়িয়া গেল। সে স্থির করিল তাহাদিগকে সে আচ্ছা করিয়া শিক্ষা দিবে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া সে তার শ্বশুরের এক চিঠি লইয়া ময়মনসিংহের এক প্রতিষ্ঠাবান উকীলের কাছে গেল। এই উকীলটি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী নয়আনির জমীদারের বিশ্বস্ত উকীল।

ময়মনসিংহ জেলায় সেকালে জমীদারদের প্রতাপ ছিল অত্যন্ত অধিক। ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিস তাহাদিগকে ঘাঁটাইতে সাহস করিতেন না, এবং অনেকেই নয়আনির জমীদারের মত দুর্দ্দান্ত বড় জমীদারদিগের লাঠিয়ালের ভয়ে তটস্থ হইয়া থাকিতেন। ফলে, ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিস সহরের বাহিরে বড় বিশেষ প্রভুত্ব করিতে পারিতেন না। জমীদারেরা যথেচ্ছ শাসন করিতেন—তাঁরাই ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। নয়আনির জমীদার ছিলেন এই জমীদারদের মধ্যে এ বিষয়ে শীর্ষস্থানীয়।

গোপালের নিজ গ্রামে এবং আশে পাশে নয়আনির জমীদারের সামান্য একটু অংশ ছিল। ময়মনসিংহের উকীলবাবুর সুপারিশে গোপাল নয়আনির জমীদারদের পক্ষে তাঁদের এই সামান্য সম্পত্তির জিম্মাদার হইল।

কথাটা যাতে গ্রামের মধ্যে বেশ ভাল করিয়া প্রচার হয় সে ব্যবস্থা গোপাল করিল।

তার পর বুক ফুলাইয়া গোপাল গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

নয়আনির মত প্রবল জমীদারের আশ্রিত যে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা দ্বন্দ্ব করিবার সাহস কাহারও হইল না। সুতরাং গোপালকে বিপর্য্যস্ত করিবার সকল জল্পনা-কল্পনা ভূমিসাৎ হইয়া গেল। যখন গোপাল তার বধূকে লইয়া আসিয়া গ্রামে সত্য সত্যই বসিল তখন অভিজাত মণ্ডলীর ঘরে ঘরে নানা রকম কানাঘুষা, পরোক্ষে নিন্দা তিরস্কার প্রভৃতি অনেক হইল, কিন্তু গোপালের কেশাগ্র কেহ স্পর্শ করিতে সাহস করিলেন না। দুর্জ্জয় আক্রোশ সুধু তাঁদের মনের ভিতর গর্জ্জন করিতে লাগিল। কলিকালের এই সব নিদারুণ বিপর্য্যয় দেখিয়া তাঁরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, এবং ঘোর কলি হইলেও এতটা বৃদ্ধির যে একটা শাস্তি না হইয়া যাইবে না ইহা সিদ্ধান্ত করিলেন।

ঠিক এই সময়ে আর এক কারণে গোপালের নির্য্যাতন অসম্ভব হইল। ভূতপূর্ব্ব জমীদার মহাশয় কিছুদিন হইল ঋণভারে সম্পত্তি বিষম জড়িত করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, ঋণের দায়ে তাঁর সম্পত্তি প্রায় নিঃশেষে বিক্রয় হইয়া গেল। জমীদারের জ্যেষ্ঠ পুত্রটি তবু বিনা অধিকারে লাঠির জোরে অনেক সম্পত্তি দখল করিতেছিলেন এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে গ্রাম শাসন করিতেছিলেন। গোপালের বিরুদ্ধে সকল আয়োজনের গুরু ও নায়ক ছিলেন তিনি। কিন্তু গোপাল আসিবার সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে তাঁর মৃত্যু হইল। তখন আর জমীদারবাড়ীর পসার প্রতিষ্ঠার কিছু অবশিষ্ট রহিল না।

সুতরাং গ্রামের অভিজাত-সম্প্রদায় তাঁদের অন্তরের সমস্ত আক্রোশ পেটের ভিতর হজম করিয়া উপায়হীন ভাবে গোপালের গ্রামে প্রতিষ্ঠার দিকে সুধু চাহিয়া রহিলেন।

গ্রামে আসিয়া গোপাল সকল বাড়ীতে গিয়া যথাযোগ্য বিনয়ের সহিত সকলকে প্রণাম করিয়া আসিল—তার ব্যবহারের ভিতর কেহ কোনও বিশেষ ত্রুটি বা অভিনয় দেখিতে পাইলেন না। কোনও এমন ফাঁক পাওয়া গেল না যাহা আশ্রয় করিয়া অন্ততঃ তাকে দু'কথা শুনাইয়া দেওয়া যায়। তাঁরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে গোপালকে সম্ভাষণ করিলেন, আর মনে মনে কামনা করিতে লাগিলেন ভগবান যেন কোনও অলৌকিক উপায়ে এই হতভাগাকে শাস্তি দেন!

গোপাল গ্রামের ভদ্রলোকদের সঙ্গে অতিমাত্র বিনয়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেও তার ব্যবহারের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ভাব ছিল যাহাতে সকলকে যেন গালে চড় মারিয়া বলিয়া দিত—'আমি তোমাদের তুচ্ছ করি।' এই ভাবটা ঠিক কিসে প্রকাশ হইত তাহা বলা যায় না। কিন্তু তার সমগ্র হাবভাব, তার ঐশ্বর্য্য ও আভিজাত্যের অতিমাত্র আড়ম্বর, তার কথাবার্ত্তার অতিমাত্র মার্জ্জিত ভাব—সব মিলিয়া যেন সকলকে তিরস্কার করিয়া বলিত—আমি তোদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

যারা 'ভদ্র' নয় তাদের কাছে গোপালের আর একটা চেহারা খুলিয়া গেল। সে একেবারে বিষমভাবে জমীদারী আরম্ভ করিল। তাহার নিজের প্রজা এবং নয়আনির প্রজা, সকলকে সে কারণে অকারণে সর্ব্বদা তার কাছারীতে হাজির করিয়া রাখে। যারা তার প্রজা নয় তাহাদিগকেও নানা ওজুহাতে ডাকাডাকি ধমকাধমকি করে। আজ ইহার জমী কাড়িয়া লয়, কাল উহাকে বেদখল করে, আজ সে বিনা কারণে লোককে জরিমানা করে, কাল উহাকে জুতা পেটা করে, এমনি করিয়া আট দশ দিনের মধ্যে সে গ্রামের মধ্যে একটা আতঙ্কের সাড়া লাগাইয়া দিল।

তার প্রজা হউক বা না হউক সকলে তাহাকে দেখিয়া সশঙ্কিত হইয়া উঠিল। ভয়ে ভয়ে সকলে তাকে সময়ে অসময়ে সর্ব্বদা সেলাম করিতে লাগিল, তাকে খুসী করিবার জন্য যা নয় তাই করিতে লাগিল।

গোপাল এমনি করিয়া সকলের কাছে সভয় সম্মান আদায় করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিল।

ইহার পর ধীরে ধীরে সে তার প্রতাপ ভদ্রলোকদের

উপর বিস্তার করিতে লাগিল। তাঁহাদের চিরকালের দখলী জমী বেদখল করিয়া, অযথা তাঁহাদের উপর মামলা মোকদ্দমা করিয়া সে দেখিতে দেখিতে তাঁদের মধ্যে এমন একটা আতঙ্ক লাগাইয়া দিল যে, ভদ্রলোকেরাও ভয়ে ভয়ে ক্রমে গোপালের খোসামুদী করিতে লাগিলেন।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই গোপাল এমনি করিয়া নিজ গ্রামে এমন একটা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিল যে চরিতার্থতায় তার অন্তর ভরিয়া গেল।

গ্রামের লোক আর কি বলিবে? নয়আনির জমীদারের প্রতাপ যার পশ্চাতে আছে তাহাকে কিছু বলিবে তারা কি সাহসে? তারা সুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল এবং মনে মনে কামনা করিতে লাগিল যে ভগবান যেন কোনও অলৌকিক উপায়ে এই হতভাগাকে শাস্তি দেন। তার নূতন গৃহ ও উপচীয়মান সম্পদের দিকে চাহিয়া কত না নিঃশ্বাস ফেলিলেন তাঁহারা—কিছুই হইল না।

আর কিছু দিন এমনি ভাবে চলিলে তাঁরা ভগবানের অস্তিত্বে সন্দিহান হইবেন এরূপ আশঙ্কা অনেকে করিতে লাগিল। এমন সময় একদিন গ্রামের লোকে পরম আনন্দ ও তৃপ্তির সহিত শুনিতে পাইল যে গোপাল নিদারুণ প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে।

সমস্ত গ্রামময় একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। কোন্ মহামানব এই পরম সুন্দর কার্য্য এমন সৌষ্ঠবের সহিত সম্পাদন করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য সকলে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। অতি অল্প কাল মধ্যেই গ্রামে জানাজানি হইয়া গেল যে এই মহৎ কার্য্য করিয়াছে —শারদা!

ব্যাপারটা এই।

শারদার প্রতি গোপালের অন্তরে যে প্রবল আকর্ষণ ছিল, বিবাহের পর যখন তার স্ত্রীর দেহে যৌবন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল তখন তাহার স্মৃতিও মলিন হইয়া গিয়াছিল। তাই বাড়ী আসিবার সময় সে শারদার কথা মনে একবারও ভাবে নাই। গ্রামে পৌঁছিয়া ঘাটে নৌকা লাগাইবার সময়ই সে যখন শারদাকে দেখিতে পাইল, তার লুব্ধ নয়ন হঠাৎ স্থির হইয়া গেল, মনের ভিতর সেই লুপ্ত চাঞ্চল্য আবার জাগিয়া উঠিল। কিন্তু তখনি তার মনে হইল যে শারদা যে এখানে আছে এটা তার নবলব্ধ আভিজাত্যের পক্ষে বড় বিপদের কথা। চাই কি হঠাৎ যদি ওই তাঁতির মেয়েটা এই মাঝিমাল্লাদের সামনে আহ্লাদে চীৎকার করিয়া তাকে "গোপাইল্যা" বলিয়া ডাকে, তবে তার যত্নরচিত আভিজাত্যের প্রাসাদ একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। সে চট্ করিয়া স্থির করিয়া ফেলিল যে শারদাকে কোনও মতে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না, প্রশ্রয় দিলে তার প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

এইরূপ স্থির করিয়া গোপাল ইচ্ছা করিয়া তাকে অপমান করিবার জন্যই চীৎকার করিয়া উঠিল "এই মাগী, সর!"

গোপাল যাহা ভাবিয়াছিল তাই হইল। শারদা এ অপমানের পর আর তার সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে আসিল না। গোপাল বাঁচিল। এখন তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল তার আভিজাত্য ও সম্মানের প্রতিষ্ঠা। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সে আপনাকে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত করিল।

তার পর শারদা যেদিন তার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল সেদিন তার মনে আবার ভয় হইল—ভয়ও হইল, শারদার অম্লান যৌবনশ্রী দেখিয়া লোভও হইল। লোভটা চাপিয়া সে শারদাকে এমনভাবে সম্ভাষণ করিল যে শারদার অপমানের একশেষ হইল!

তার মুখের এই শেলসম কথা শুনিয়া যখন শারদা ক্রোধে অন্ধ হইয়া দুমদাম করিয়া চলিয়া গেল তখন দূর হইতে তার সেই পীড়িত ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ মুখশ্রী দেখিয়া গোপালের অন্তরটা চড়্‌চড়্ করিয়া উঠিল। ভারী বিষণ্ণ হইয়া গেল তার মন—সে ভাবিল এতটা করিবার কোনও দরকার ছিল না। কিন্তু যে আঘাত সে দিয়াছে তার প্রতিকার করিবার কোনও উপায় তার নাই। জানিয়া সে শুব্ধ হইয়া রহিল।

তার পর গোপাল অনেক দিন শারদাকে দেখিয়াছে। তাকে দেখিয়া তার অন্তর লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

বিদেশে যে আবেষ্টনের ভিতর তার উদীয়মান যৌবন কাটিয়াছে তাতে তার অনেক নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছে। তাহাতে গোপাল যে অভিজ্ঞতা

লাভ করিয়াছে তাহাতে সে নিশ্চয় করিল শারদার প্রতি তার যে লোভ তাহা না মিটিবার কোনও হেতু নাই। শারদা অবশ্য সাধারণ মেয়ে নয় তাহা সে জানে। একাধিকবার সে গোপালকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কিন্তু তখন সে ছিল স্বামীর আদৃতা।—আজ কলঙ্ক দিয়া স্বামী তাকে ত্যাগ করিয়াছে, আজ তার সেই বিরক্তি থাকিবার কথা নয়।

অনেক দিন সে তার লোভ দমন করিল এই ভয়ে যে ইহাতে তার মানের লাঘব হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের পুকুর-ধারে শারদাকে দেখিয়া সে ভারী চঞ্চল হইয়া গেল।

অন্ধকার হইয়া গেলে সে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শারদার কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইল। শারদা তখনও ফিরে নাই। সে দুয়ারের শিকল খুলিয়া অন্ধকার ঘরের ভিতর গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শারদা আসিয়া ঘরে বাতি জ্বালিতেই দেখিতে পাইল গোপাল চুপটি মারিয়া বসিয়া তার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

ক্রোধে শারদার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, কিছুক্ষণ সে কথা কহিতে পারিল না।

গোপাল বলিল, "তুই আমার উপর বড় রাগ ক'রচস—না?" তার হাতের ভিতর সে অলসভাবে কতকগুলি টাকা ঝনঝন করিতে লাগিল।

শারদা সোজা হইয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইল, তার চক্ষু দিয়া আগুন ঝরিতে লাগিল। সে চীৎকার করিয়া দ্বারের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "বাইর হ তুই, বাইর হ' শীগ্‌গির।"

গোপাল একটু হাসিয়া বলিল, "রাগ করিস না শারদী, আমি তরে বুঝাইয়া কই—"

শারদার কণ্ঠ আরও চড়িয়া গেল, তার দেহ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে আরও সুর চড়াইয়া বলিল, "বাইর হ' পোড়াকপাইলা, বাইর হ'।"

গোপাল উঠিয়া বলিল "চুপ, চুপ, চীৎকার পারিস না—শোন—আমি তোর পায় ধরি—আমারে"—

গোপাল শারদার পায়ের দিকে হাত বাড়াইতেছিল, শারদা তাকে এক ঝটকা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "গোলামের বেটা গোলাম বাহর হ' শীগ্‌গির।" বলিয়া সে এদিক ওদিক চাহিয়া একটা চেলাকাঠ কুড়াইয়া লইয়া আবার দ্বারের দিকে নির্দ্দেশ করিল।

গোপাল বলিল, "শারদা সত্য কই, আমি তরে ভালবাসি"—

"তবে রে গোলামের পো" বলিয়া শারদা সেই চেলা দিয়া দম করিয়া মারিল এক ঘা।

গোপাল কেঁউ মেউ করিয়া পলায়ন করিল, শারদা উন্মত্তের মত তার পিছু পিছু ছুটিয়া আরও তিনচার ঘা তাকে লাগাইয়া দিল।

সেদিন শারদা অনেক দিনের পর পরিপূর্ণ শান্তির সহিত নিদ্রা গেল। গোপালকে একটা শক্ত রকম শাস্তি দিতে পারিয়া তার অন্তরের পুঞ্জীভূত দুঃখজ্বালা অনেকটা প্রশান্ত হইল।

পরের দিন কথাটা কেমন করিয়া জানাজানি হইয়া গেল বলা যায় না, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ইহা বেশ লতা-পল্লবিত হইয়া প্রচারিত হইয়া গেল। যাহা প্রচার হইল তাহাতে প্রহারের হেতু সম্বন্ধে অনেক কাল্পনিক কথা ছিল, এবং শাস্তির মাত্রা সম্বন্ধে সত্যের প্রচুর অপলাপ হইয়াছিল। কিন্তু এমন একটা মুখরোচক সংবাদের বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি বা কল্পনা কাহারও হইল না।

ঘটনার দুই দিন পর শোনা গেল যে গোপালের অবস্থা শঙ্কটাপন্ন; মহকুমা হইতে বড় ডাক্তার আসিয়াছেন, চিকিৎসা চলিতেছে, বাঁচিবার সম্ভাবনা অল্প। সকলেই বলিল, ভগবান আছেন তো! না হইবে কেন? পরম আনন্দের সহিত সকলে তার মৃত্যুর প্রীতিকর সম্ভাবনার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

শারদার খাতির বাড়িয়া গেল। এত দিন সে ছিল শুধু একটা তাঁতিনী—কাজ করে, খায়—স্বভাব চরিত্র ভাল নয়, তাই স্বামী তাকে তাড়াইয়াছে। তার সম্বন্ধে ইহা ছাড়া কেউ কিছু ভাবিবার অবসর পাইত না। কিন্তু এই কীর্ত্তির ফলে শারদার সব অপরাধ ধুইয়া মুছিয়া গেল—সে গ্রামের লোকের চক্ষে হইয়া দাঁড়াইল ধর্ম্মের একটা মহীয়সী প্রতিনিধি।

দুই তিন দিন ধরিয়া গ্রামের মেয়েরা এবং কতক

পুরুষেরা শারদার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। সবার মুখে এক কথা "বেশ করিয়াছে—খুব করিয়াছে," আর এক জিজ্ঞাসা, ব্যাপারটা কি হইয়াছিল।

শারদা কাহাকেও কিছু বলিল না, পাশ কাটাইয়া বেড়াইতে লাগিল। নেহাৎ যেখানে না পারিল সেখানে প্রশ্নের উত্তরে সুধু হাঁ, না, বলিয়া সে পলায়ন করিল।

এ ব্যাপারে তার চিত্তে মোটে শান্তি ছিল না।

রাত্রে প্রাণ ভরিয়া প্রহার করিয়া সে গোপালের উপর রাগ ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে, তখন তার ভাবিবার সময় হয় নাই যে শাস্তির মাত্রাটা কতখানি হইল।

পরের দিন সকালে তার মনে গতরাত্রের তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ তত ছিল না—সে ভাবিতেছিল বুঝি-বা শাস্তিটা অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে!

লোকের মুখে মুখে গোপালের অবস্থার কথা শুনিয়া তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে মাথা চাপড়াইয়া বলিল, হায়! হায়! এ কি করিল সে। অবশেষে গোপালকে সে কি মারিয়া ফেলিল! ভয়ে দুঃখে তার বুক ফাটিতে লাগিল।

তৃতীয় দিবস যখন সে শুনিল মহকুমা হইতে ডাক্তার আসিয়া বলিয়াছেন যে জীবন সংশয়—তখন সে আর থাকিতে পারিল না। অস্থির হইয়া সে ছুটিয়া গেল গোপালের বাড়ী। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল

প্রিন্সিপাল শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, বিদ্যাবাচস্পতি, এম-এ

(২)

বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থ চুরির পরে কবিরাজ গোস্বামী প্রকট ছিলেন কি না?

বনবিষ্ণুপুরে গোস্বামি-গ্রন্থসমূহ অপহৃত হওয়ার পরেও কবিরাজ গোস্বামী প্রকট ছিলেন কি না, তাহারই আলোচনা এক্ষণে করা হইবে।

ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, গ্রন্থ চুরির পরে গ্রন্থ-প্রাপ্তির সময় পর্য্যন্ত গ্রন্থবাহী গাড়ী, গাড়োয়ান এবং মথুরাবাসী প্রহরিগণ বনবিষ্ণুপুরেই ছিল। গ্রন্থ প্রাপ্তির পরে গ্রন্থ চুরির, গ্রন্থ প্রাপ্তির এবং রাজা বীরহাম্বীরের মতি পরিবর্ত্তনের সংবাদ জানাইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীজীবের নিকটে এক পত্র লিখিলেন। এই পত্র সহ প্রহরিগণ বৃন্দাবনে প্রেরিত হয়। যে গাড়ীতে গ্রন্থসমূহ আনা হইয়াছিল, সেই গাড়ীও প্রহরিগণের সঙ্গেই গোস্বামিগণের নিমিত্ত বীরহাম্বীরের প্রেরিত উপঢৌকনসহ বৃন্দাবনে ফিরিয়া যায়। পত্র ও উপঢৌকন পাইয়া গোস্বামিগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন; গ্রন্থ চুরির সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাপ্তির সংবাদও পাওয়াতে চুরির সংবাদের নিদারুণ আঘাত গোস্বামীদিগকে মর্ম্মাহত করিতে পারে নাই।

যাহা হউক, শ্রীনিবাসাচার্য্যের বৃন্দাবন ত্যাগের পরেও যে কবিরাজ গোস্বামী যথাবস্থিত দেহে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার একাধিক স্পষ্ট উল্লেখও ভক্তিরত্নাকরে দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্রহায়ণ শুক্লাপঞ্চমীতে শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করেন (ভক্তিরত্নাকর, ৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ৪৬৮ পৃঃ)। ইহার পরের বৎসরেই (১১), অগ্রহায়ণের শেষ ভাগে যাত্রা করিয়া (ভক্তিরত্নাকর, ৯ম তরঙ্গ, ৫৭২ পৃঃ) মাঘ মাসে বসন্ত-পঞ্চমীতে শ্রীনিবাস পুনরায় বৃন্দাবনে উপনীত হন (ভ, র, ৯ম তরঙ্গ, ৫৬৮,৬৯

(১১) অব্যবহিত পরবর্ত্তী বৎসরেই যে শ্রীনিবাস পুনরায় বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, ভক্তিরত্নাকরে অবশ্য ইহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। প্রথমবারের বৃন্দাবনত্যাগ এবং দ্বিতীয়বারে বৃন্দাবনযাত্রার মধ্যবর্ত্তী ঘটনা পরম্পরা বিবেচনা করিয়া এবং শ্রীনিবাসকে পুনরায় বৃন্দাবনে দেখিয়া "এত শীঘ্র ইহার গমন হইল কেনে (ভক্তিরত্নাকর, ৫৭৯ পৃঃ)" ভাবিয়া বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিবৃন্দের বিস্ময়ের কথা বিবেচনা করিয়াই অব্যবহিত পরবর্ত্তী বৎসর অনুমিত হইয়াছে।

পৃঃ)। যে অগ্রহায়ণে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে পুনর্যাত্রা করেন, তাহার পরের পৌষ মাসের শেষ ভাগে রামচন্দ্র কবিরাজও বৃন্দাবনযাত্রা করেন (ভ, র, ৯ম তরঙ্গ, ৫৭২ পৃঃ)। শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডতীরে রামচন্দ্র কবিরাজের— "কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি যত জন। তাসভা সহিত হৈল অপূর্ব্ব মিলন॥ (ভ, র, ৯ম তরঙ্গ, ৫৭৭ পৃঃ)।" ইহার পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পরে খেতুরীর মহোৎসব। এই উৎসবের পরে জাহ্নবামাতা-গোস্বামিনী বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত কবিরাজ-গোস্বামী রাধাকুণ্ড হইতে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন (ভ, র, ১১শ তরঙ্গ, ৬৬৭ পৃঃ), এবং বৃন্দাবন হইতে তাঁহার সঙ্গে পুনরায় রাধাকুণ্ডে গিয়াছিলেন (১১শ তরঙ্গ, ৬৬৮ পৃঃ)। ইহারও পরে প্রভু বীরচন্দ্র (বা বীরভদ্র) গোস্বামী যখন শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখনও কবিরাজ-গোস্বামী রাধাকুণ্ড হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীজীবের সঙ্গে বীরভদ্র প্রভুর অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন (১৩শ তরঙ্গ, ১০২০ পৃঃ) এবং বীরভদ্র যখন রাধাকুণ্ডে গিয়াছিলেন, তখন কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার সঙ্গে নানা লীলাস্থল দর্শন করিয়া দুই দিন পর্য্যন্ত হাঁটিয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন (ভ, র, ১৩শ তরঙ্গ, ১০২২ পৃঃ)।

গ্রন্থ চুরির বহু দিন পরেও যে কবিরাজ-গোস্বামী প্রকট ছিলেন, স্বয়ং জীবগোস্বামীও তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। শ্রীজীবের লিখিত যে পত্রগুলি ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে চতুর্থ পত্রখানি গোবিন্দ কবিরাজের নিকটে লিখিত। এই পত্রখানিতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের নমস্কার জ্ঞাপিত হইয়াছে। "ইহ শ্রীকৃষ্ণ দাসস্য নমস্কারাঃ।" এ স্থলে কৃষ্ণদাস শব্দে যে কৃষ্ণদাস কবিরাজকেই বুঝাইতেছে, ভক্তিরত্নাকর হইতেই তাহা জানা যায়। উক্ত পত্রের শেষে লিখিত হইয়াছে— "পত্রীমধ্যে শ্রীকৃষ্ণদাসের নমস্কার। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রচার॥ (ভ, র, ১৪শ তরঙ্গ, ১০৩৬ পৃঃ)।"

ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা অতীব প্রাঞ্জল, মধুর, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং বিস্তৃত। কবিরাজ-গোস্বামীর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধীয় কোনও কথাই ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রথমবার বৃন্দাবন ত্যাগের—অথবা বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থ চুরির—পরেও বিভিন্ন সময়ে রামচন্দ্র কবিরাজ, জাহ্নবামাতা এবং বীরচন্দ্র গোস্বামীর সহিত কবিরাজের সাক্ষাতের কথা ভক্তিরত্নাকরে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা অবিশ্বাস করিবার হেতু দেখা যায় না। অধিকন্তু, গোবিন্দ কবিরাজের নিকটে লিখিত শ্রীজীব-গোস্বামীর পত্রখানিকে কিছুতেই অবিশ্বাস করা যায় না। গোবিন্দ কবিরাজ ছিলেন রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। প্রথমে তিনি শাক্ত ছিলেন। শ্রীনিবাস প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে দেশে ফিরিয়া আসিলে পর রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার (শ্রীনিবাসের) পরিচয় হয়। তার পর রামচন্দ্রের দীক্ষা; তার পর শ্রীনিবাসের পুনর্বৃন্দাবন গমন, ও রামচন্দ্রেরও বৃন্দাবন গমন। তাঁহারা বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিলে গোবিন্দের দীক্ষা। দীক্ষার পরেই গোবিন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাসম্বন্ধীয় পদ রচনা করিয়া বৃন্দাবনে পাঠান। সেই পদ আস্বাদন করিয়া বৃন্দাবন-বাসী গোস্বামীদের অত্যন্ত আনন্দ জন্মে। উল্লিখিত পত্রেই শ্রীজীব সেই আনন্দের কথা গোবিন্দ কবিরাজকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীনিবাসের প্রথমবার বৃন্দাবন ত্যাগের অনেক দিন পরের এই চিঠি। তাহা হইলে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন ত্যাগের অনেক পরেও যে কবিরাজ-গোস্বামী প্রকট ছিলেন, ভক্তিরত্নাকর হইতে নিঃসন্দেহ রূপেই তাহা জানা যাইতেছে।

এক্ষণে প্রেমবিলাসের উক্তি বিবেচনা করা যাউক। প্রেমবিলাস হইতে জানা যায়—গ্রন্থ চুরির পরে গ্রাম হইতে কালি-কলম-কাগজ সংগ্রহ করিয়া শ্রীজীবগোস্বামীর নামে শ্রীনিবাসাচার্য্য এক পত্র লিখিয়া গ্রন্থ চুরির সংবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এই পত্র লইয়া গাড়োয়ানাদিকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন (প্রেমবিলাস; ১৩শ বিলাস, ১৬৭ পৃঃ)। ইহারা পত্র লইয়া শ্রীজীবের নিকটে দিল, মুখেও সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। প্রেমবিলাস হইতে জানা যায়—"শ্রীজীব পড়িল পত্রের কারণ বুঝিল। লোকনাথ গোসাঞির স্থানে সকল কহিল॥ শ্রীভট্ট গোসাঞি শুনিলেন সব কথা। কান্দিয়া কহয়ে বড় পাইলাম ব্যথা॥ রঘুনাথ কবিরাজ শুনি দুইজনে। কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে লোটাইয়া ভূমে॥ কবিরাজ কহে প্রভু না বুঝি কারণ। কি করিল কিবা হৈল ভাবে মনে

মন॥ জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে। অন্তর্ধান কৈল সেই দুঃখের সহিতে॥ কুণ্ডতীরে বসি সদা করে অনুতাপ। উছলি পড়িল গোসাঞি দিয়া এক ঝাঁপ॥ বিরহ-বেদনা কত সহিব পরাণে। মনের যতেক দুঃখ কেবা তাহা জানে॥ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নিত্যানন্দ কৃপাময়। তোমা বিনু আর কেবা আমার আছয়॥ অদ্বৈতাদি ভক্তগণ করুণা হৃদয়। কৃষ্ণদাস প্রতি সবে হইও সদয়॥ প্রভুরূপসনাতন ভট্ট রঘুনাথ। কোথা গেলে প্রভু মোরে কর আত্মসাৎ॥ লোকনাথ গোপাল ভট্ট শ্রীজীব গোসাঞি। তোমরা করহ দয়া মোর কেহ নাই॥ শ্রীদাস গোসাঞি দেহ নিজ পদ দান। জীবনে মরণে প্রাপ্তি যার করি ধ্যান॥ বুকে হাত দিয়া কান্দে রঘুনাথ দাস। মরমে রহল শেল না পূরল আশ॥ তুমি গেলে আর কোথা কে আছে আমার। ফুকরি ফুকরি কান্দে হস্তে ধরি তাঁর॥ তুমি ছাড়ি যাও মোরে অনাথ করিয়া। কেমনে বঞ্চিব কাল এ দুঃখ সহিয়া॥ নিজ নেত্র কৃষ্ণদাস রঘুনাথের মুখে। চরণ ধরিল আনি আপনার বুকে॥ অথে রাধাকুণ্ডতীর বাস দেহ স্থান। রাধাপ্রিয় রঘুনাথ হয়েন কৃপাবান্॥ যেই গণে স্থিতি তাহা করিতে ভাবন। মুদিত নয়ান প্রাণ কৈল নিষ্ক্রমণ॥ (১৩শ বিলাস, ১৬৮—৬৯ পৃঃ)।"

প্রেমবিলাসের এই উক্তিকে ভিত্তি করিয়া ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—"এই পুস্তক (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত) লেখার পর তাঁহার (কবিরাজ-গোস্বামীর) জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সাধিত হইল—এ কথা মনে উদয় হইয়াছিল। এখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। জীবগোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই পুস্তক অনুমোদন করিলে কবিরাজের স্বহস্তলিখিত পুঁথি গৌড়ে প্রেরিত হয়; কিন্তু পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের নিযুক্ত দস্যুগণ পুস্তক লুণ্ঠন করে; এই পুস্তকের প্রচার চিন্তা করিয়া কৃষ্ণদাস মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে-ছিলেন; সহসা বনবিষ্ণুপুর হইতে বৃন্দাবনে লোক আসিয়া এই শোকাবহ সংবাদ জ্ঞাপন করাইল। অবস্থার কোন আঘাতে যে কৃষ্ণদাস ব্যথিত হন নাই, আজ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রতের ফল—মহাপ্রভুর সেবায় উৎসর্গীকৃত মহা পরিশ্রমের বস্তু অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া কৃষ্ণদাস জীবন বহন করিতে পারিলেন না। জীবনপণে যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহার শোকে জীবন ত্যাগ করিলেন *—রঘুনাথ কবিরাজ শুনিলা দু'জনে। আছাড় খাইয়া কান্দে লোটাইয়া ভূমে॥ বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে। অন্তর্দ্ধান করিলেন দুঃখের সহিতে॥—"প্রেমবিলাস।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; ৪র্থ সংস্করণ, ৩০৮ পৃষ্ঠা)।

দীনেশবাবুর উল্লিখিত উক্তি সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলা দরকার। কবিরাজের স্বহস্তলিখিত শ্রীচরিতামৃত পুঁথি যে শ্রীনিবাসের সঙ্গে গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিল, এই সংবাদ দীনেশবাবু কোথায় পাইলেন, উল্লেখ করিলে ভাল হইত। প্রেমবিলাসে বা ভক্তিরত্নাকরে এরূপ কোনও উক্তি দেখা যায় না। আর, গ্রন্থ চুরির সংবাদ পাইয়াই যে কবিরাজ-গোস্বামী দেহত্যাগ করিয়াছেন, এ কথাও উল্লিখিত কতিপয় পয়ার হইতে বুঝা যায় কি না দেখা যাউক।

গ্রন্থ চুরির সংবাদে লোকনাথ গোস্বামী, গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভৃতিও অনেক মর্ম্মবেদনা পাইয়াছেন, অনেক কাঁদিয়াছেন। দাসগোস্বামী এবং কবিরাজ-গোস্বামী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভূমিতে লুটাইয়াছেন। তার পরে গ্রন্থ চুরির প্রসঙ্গে "কি করিল কিবা হৈল" বলিয়াও কবিরাজ-গোস্বামী অনেক ভাবিয়াছেন। এ সকল কথা বলিয়া তাহার পরেই প্রেমবিলাসে বলা হইয়াছে—"জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে" ইত্যাদি। প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ইতঃপূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি—গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন ত্যাগের সময়েও কবিরাজ-গোস্বামীর শরীরের অবস্থা বেশ ভাল ছিল, স্বচ্ছন্দে তখন তিনি সাত ক্রোশ পথ

* Bankura Gazetteerএর ২৫ পৃষ্ঠায় ওমেলি সাহেবও লিখিয়াছেন—"Two Vaishnava works, *the Prem-Vilasa* of Nityananda Das (*alias* Balaram Das) and the *Bhaktiratnakara* of Narahari Chakrabarty relate that Srinivasa and other *bhaktas* left Brindaban for Gaur with a number of Vaishnava manuscripts, but were robbed on the way by Bir Hambir. This news killed the old Krishnadas Kaviraj author of the *Chaitanya Charitamrita.*

যাতায়াত করিতে সমর্থ ছিলেন; তখনও জরাবশতঃ তিনি চলচ্ছক্তিহীন হন নাই। ইহার পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই গ্রন্থ চুরির সংবাদ বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া থাকিবে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই হঠাৎ জরা আসিয়া তাঁহাকে যে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহার যে "জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে" অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

"জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে" অবস্থার সময়েরও দুইটী বিবরণ উক্ত পয়ার কয়টী হইতে জানা যায়। প্রথমতঃ, কুণ্ডতীরে বসিয়া অনুতাপ করিতে করিতে কবিরাজ কুণ্ডমধ্যে ঝাঁপ দিলেন। দ্বিতীয়তঃ, দাসগোস্বামীর চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তাঁহার বদনে স্বীয় নয়নদ্বয় স্থাপন করিয়া, "যেই গান স্থিতি তাহা ভাবনা করিতে করিতে"—অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলার স্মরণে সখীমঞ্জুরীদের যে যূথের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তিনি নিজেকে চিন্তা করিতেন, অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ সেই যূথে নিজের অবস্থিতি চিন্তা করিতে করিতে—মুদিত নয়নে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। যদি তিনি প্রাণত্যাগ করিবার নিমিত্তই কুণ্ডমধ্যে ঝাঁপ দিয়া থাকেন এবং তাহাতেই যদি তাঁহার তিরোভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে দাসগোস্বামীর চরণে প্রাণনিষ্ক্রামণের কথা মিথ্যা হইয়া পড়ে। আর, দাসগোস্বামীর চরণেই যদি তাঁহার প্রাণনিষ্ক্রামণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগের কথা মিথ্যা হইয়া পড়ে। একই সময়ে একই ব্যক্তির লেখনী হইতে পরস্পরবিরোধী এইরূপ দুইটী বিবরণের কোনওটীর উপরেই আস্থা স্থাপন করা যায় না।

আরও একটী কথা বিবেচ্য। আকস্মিক দুঃসংবাদ শ্রবণে যাঁহাদের প্রাণবিয়োগ হয়, সাধারণতঃ সংবাদ শ্রবণমাত্রেই তাঁহারা হতজ্ঞান হইয়া পড়েন, আর তাঁহাদের চেতনা ফিরিয়া আসে না। উদ্ধৃত পয়ার-সমূহ হইতে গ্রন্থ চুরির সংবাদ প্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামীর তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ—মর্ম্মভেদী দুঃখ—হইয়াছিল, তাহাতে তিনি মাটীতে লুটাইয়া কাঁদিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মূর্চ্ছা হইয়াছিল বলিয়া উক্ত পয়ার-সমূহ হইতে জানা যায় না। কবিরাজ-গোস্বামীর মত একজন ধীর, স্থির, ভজনবিজ্ঞ ভগবদ্‌গতচিত্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ যে নষ্ট বস্তুর শোকে যোগাড়যন্ত্র করিয়া আত্মহত্যা করিবেন, তাহা কিছুতেই আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। উল্লিখিত পয়ার কয়টী হইতে তাহা বুঝাও যায় না। যাহা বুঝা যায়, তাহা তাঁহার ন্যায় সিদ্ধভক্তের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। হরিদাস-ঠাকুরও ঠিক এই ভাবেই মহাপ্রভুর চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, স্বীয় নয়নদ্বয় প্রভুর বদনে স্থাপন করিয়া মুখে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম" উচ্চারণ করিতে করিতে নির্য্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু শীঘ্রই লীলা সম্বরণ করিবেন বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার বিরহ-বেদনা সহ্য করিতে পারিবেন না মনে করিয়াই হরিদাস ঠাকুর স্বেচ্ছায় ঐ ভাবে নির্য্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দাসগোস্বামীর চরণে কবিরাজ-গোস্বামীর যে নির্য্যাণের কথা প্রেমবিলাসে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া মনে হয়; বিরহ-বেদনায় অধীর হইয়াই তিনি এরূপ করিয়াছেন বলিয়া প্রেমবিলাস বলে। যে বিরহ-বেদনা তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহা তাঁহার কৃষ্ণবিরহ-বেদনা; তাই এই বেদনার নিরসনের উদ্দেশ্যে কবিরাজ-গোস্বামী দেহ ত্যাগের প্রাক্কালে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দাদির, শ্রীরূপ-সনাতনাদির কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন—"কোথা গেলে প্রভু মোরে কর আত্মসাৎ" বলিয়া। তাঁহার আক্ষেপের মধ্যে, গ্রন্থ-হারানোর কথার আভাসমাত্রও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থ চুরির সংবাদে তিনি কাঁদিয়াছেন সত্য; অন্য গোস্বামীরাও কাঁদিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়াছেন; দাস-গোস্বামীও তাহা করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতনের অমূল্য গ্রন্থরাজির এই পরিণামের কথা শুনিলে যে-কোনও ভক্তেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিতে পারে। কিন্তু তাঁহার দেহত্যাগের যে বর্ণনা প্রেমবিলাসে দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে অবিসংবাদিতভাবে ইহা বুঝা যায় না যে—তাঁহার চরিতামৃত-অপহরণের সংবাদেই তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এমনও হইতে পারে যে, কবিরাজ-গোস্বামীর প্রসঙ্গ উঠিতেই—গ্রন্থ চুরির সংবাদ প্রাপ্তিতে তাঁহার চিত্তের স্বাভাবিক প্রেম-ব্যাকুলতার কথা

গ্রন্থকারের স্মৃতিপথে উদ্দীপিত হইয়াছিল এবং কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া অন্তিম সময়ে—গ্রন্থ চুরির বহু বৎসর পরে—বৃদ্ধকালে তিনি কিরূপ ভক্তজনোচিতভাবে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, গ্রন্থকার তাহাও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এক কথার প্রসঙ্গে অনুরূপ কথা বর্ণন করার দৃষ্টান্ত প্রাচীন কালের গ্রন্থে অনেক পাওয়া যায়; প্রেমবিলাসেও তাহার অভাব নাই।

তবে কি "কি করিল কিবা হৈল ভাবে মনে মন" পর্য্যন্ত গ্রন্থ চুরির প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়া "জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে" বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে কবিরাজের স্বাভাবিক অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গই বর্ণিত হইয়াছে? এইরূপ অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গে আশ্চর্য্য বা অস্বাভাবিক কিছু নাই। অন্তিম সময়ে এইভাবে অন্তশ্চিন্তিত দেহে লীলা স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগের সৌভাগ্য বৈষ্ণব মাত্রেরই কাম্য।

কিন্তু এরূপ অর্থ করিলেও এক অসঙ্গতি আসিয়া উপস্থিত হয়। উক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায়, দাস-গোস্বামীর পূর্ব্বে কবিরাজ-গোস্বামী তিরোধান প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামীর পূর্ব্বে দাস-গোস্বামীর তিরোধানই বৈষ্ণব-সমাজে সর্ব্বজনবিদিত ঘটনা।

এ সমস্ত কারণে, প্রেমবিলাসের উল্লিখিত পয়ার-সমূহের উক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। ঐ উক্তিগুলি গ্রন্থকারের লিখিত হইলেও, উহা হইতে কবিরাজ-গোস্বামীর দেহত্যাগের সংবাদ পাওয়া যায় বলিয়া মনে করা যায় না।

গ্রন্থ চুরির সংবাদে কবিরাজ-গোস্বামীর দেহত্যাগের কথা যে বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা অন্য ভাবেও বুঝিতে পারা যায়। অগ্রহায়ণের শুক্লাপঞ্চমীতে শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন ত্যাগ করেন। কখন তিনি বনবিষ্ণুপুরে পৌঁছিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ কোথাও না থাকিলেও অনুমান করা চলে। ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, দ্বিতীয়বার যখন শ্রীনিবাস যাজিগ্রাম হইতে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন তিনি "মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাস-শেষে" যাত্রা করিয়া "মাঘ শেষে বসন্ত-পঞ্চমী-দিবসে" বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছিলেন (৯ম তরঙ্গ, ৫৭২, ৫৭৯ পৃঃ)। যাজিগ্রাম হইতে বৃন্দাবন পদব্রজে যাইতে দুই মাস লাগিয়াছিল। বনবিষ্ণুপুর হইতে বৃন্দাবনের পথ আরও কম। সুতরাং বনবিষ্ণুপুর হইতে পদব্রজে বৃন্দাবনে যাইতে দুই মাসের বেশী সময় লাগিতে পারে না। বৃন্দাবন হইতে গোগাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া বনবিষ্ণুপুরে আসিতে কিছু বেশী সময় লাগিতে পারে; এজন্য যদি চারি মাস সময় ধরা যায়, তাহা হইলে চৈত্র মাসে গ্রন্থ চুরি হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রেমবিলাসের মতে চুরির অল্প পরেই বৃন্দাবনে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল। এই সংবাদ পৌঁছিতে দুই মাস সময় লাগিয়াছিল মনে করিলে (সংবাদ লইয়া যাহারা বৃন্দাবনে গিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে গাড়ী যায় নাই; বলদ সহ গাড়ীও দস্যুগণ লইয়া গিয়াছিল—প্রেমবিলাস ১৬৬ পৃঃ) পত্রবাহকগণ পদব্রজে গিয়াছিল, সুতরাং জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীগণ ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যায়। ঐ সংবাদ প্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামীর তিরোভাব হইয়া থাকিলে জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসের মধ্যেই তাহা হইয়া থাকিবে। কিন্তু পঞ্জিকা হইতে জানা যায়, কবিরাজ-গোস্বামীর তিরোভাব-তিথি আশ্বিনের শুক্লাদ্বাদশী। তিরোভাবের সময় হইতে বৈষ্ণব-সমাজ এই শুক্লাদ্বাদশীতেই কবিরাজ-গোস্বামীর তিরোভাব-উৎসব করিয়া আসিতেছেন; সুতরাং পঞ্জিকার উক্তিতে ভুল থাকিতে পারে না। অথচ প্রেমবিলাসের উক্তি অনুসারে গ্রন্থ চুরির সংবাদ প্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামী দেহত্যাগ করিয়া থাকিলে আষাঢ় মাসের মধ্যেই তাহা করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব-সমাজের চিরাচরিত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত পঞ্জিকার উক্তিকে অবিশ্বাস করিয়া প্রেমবিলাসের কিম্বদন্তীমূলক উক্তিতে আস্থা স্থাপন করা যায় না।

গ্রন্থ চুরির অনেক পরেও যে কবিরাজ-গোস্বামী প্রকট ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ ভক্তিরত্নাকর হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইতঃপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। এ সমস্ত প্রমাণকে —বিশেষতঃ শ্রীজীবের পত্রের উক্তিকে—কিছুতেই অবিশ্বাস করা যায় না।

অনেকেই অনেক স্বকপোল-কল্পিত বিষয় মূল প্রেম-বিলাসেরই নামে যে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের কথা উল্লেখ করিয়া

পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রেমবিলাসের যে অংশ কৃত্রিম বলিয়া সহজেই বুঝা যায়, সম্পাদক ও সমালোচকগণ যে সেই অংশ তাঁহাদের বিবেচনার বহির্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু যে পুস্তকের উপরে প্রক্ষেপকারীদের এত অত্যাচার চলিয়াছে, তাহাতে দু'একটী কৃত্রিম বস্তু যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে না, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। অধিকাংশ প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পাঠ একরূপ হইলেও এই সন্দেহের অবকাশ দূর হয় না। প্রাচীন কালেও প্রক্ষেপকারীর অভাব ছিল না, সুযোগ তো যথেষ্টই ছিল। প্রাচীন পুঁথির কোনও কোনও বর্ণনা আবার ভিত্তিহীন কিম্বদন্তীর উপরও প্রতিষ্ঠিত। কবিরাজ-গোস্বামীর তিরোভাব সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে যাহা পাওয়া যায়, তাহাও যে প্রচ্ছন্ন প্রক্ষেপ নহে, তাহাই বা কে বলিবে? শ্রীজীবের পত্রের সঙ্গে যখন ইহার বিরোধ দেখা যায়, তখন ইহার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ জন্মে।

যাহা হউক, কর্ণানন্দ-সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিয়াই এই বিষয়ের আলোচনা শেষ করিব। কর্ণানন্দ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা-ঠাকুরাণীর শিষ্য প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা যদুনন্দন দাস ঠাকুরই কর্ণানন্দের গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া কর্ণানন্দে লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ১৫২৯ শকে (১৬০৭ খৃষ্টাব্দে) লিখিত হইয়াছে বলিয়া কর্ণানন্দেই প্রকাশ। পরবর্ত্তী আলোচনায় দেখা যাইবে, বীরহাম্বীরের রাজত্বকালে ১৫২২ শকের কাছা-কাছি কোনও সময়ে শ্রীনিবাস বনবিষ্ণুপুরে আসিয়া-ছিলেন। তাহার পরে তাঁহার বিবাহ, তাহার পরে সন্তানসন্ততির জন্ম। সুতরাং ১৫২৯ শকে হেমলতা-ঠাকুরাণীর জন্মও হয় তো হয় নাই। অথচ এই হেমলতার আদেশেই না কি তদীয় শিষ্য ১৫২৯ শকে এই পুস্তক লিখিয়াছেন! গ্রন্থকার তারিখ লিখিতে ভুল করিয়াছেন —এ কথাও বলা সঙ্গত হইবে না; কারণ, গ্রন্থ-সমাপ্তির তারিখ লিখিতে গ্রন্থকারের ভুল হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের বিশ্বাস—কর্ণানন্দ একখানা কৃত্রিম গ্রন্থ। এরূপ বিশ্বাসের কয়েকটী হেতু মৎসম্পাদিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ১০০—১০২ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। ইহা যে ভক্তিরত্নাকরেরও পরের লেখা, কর্ণানন্দের মধ্যেই তাহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, প্রথমনির্য্যাসের ৫-৬ পৃষ্ঠায় শ্রীনিবাস-আচার্য্যের সহিত রামচন্দ্র কবিরাজের প্রথম পরিচয়ের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, ভক্তিরত্নাকরের অষ্টম তরঙ্গের ৫৬০—৬১ পৃষ্ঠার বর্ণনার সহিত তাহার প্রায় পংক্তিতে পংক্তিতে মিল দেখা যায়! উভয় পুস্তকেই রামচন্দ্র কবিরাজের রূপবর্ণনা একরূপ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উপমা একরূপ এবং অধিকাংশস্থলে শব্দাদিও প্রায় একরূপ। কেবল—"কন্দর্পসমান" স্থলে "মন্মথ-সমান", "হেম-কেতকী" স্থলে "সুবর্ণকেতকী", "গন্ধর্ব্বতনয় কিবা অশ্বিনীকুমার" স্থলে "কামদেব কিবা অশ্বিনীকুমার। কিবা কোন দেবতা গন্ধর্ব্বপুত্র আর॥"—ইত্যাদিরূপ মাত্র প্রভেদ! ইহাতে মনে হয়, ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা দেখিয়াই কর্ণানন্দের এই অংশ লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থ চুরির সংবাদপ্রাপ্তিতে কবিরাজ গোস্বামীর অবস্থা সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত ভক্তিরত্নাকরের উক্তির একটা সমন্বয়ের চেষ্টাও কর্ণানন্দে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেম-বিলাসের উক্তি অনুসারে কেহ কেহ মনে করেন, গ্রন্থ চুরির সংবাদ প্রাপ্তিতেই কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব। ভক্তিরত্নাকরের মতে গ্রন্থ চুরির বহুকাল পরেও কবিরাজ প্রকট ছিলেন। কর্ণানন্দ এই দুই রকম উক্তির সমন্বয় করিতে যাইয়া হেমলতা ঠাকুরাণীর মুখে বলাইয়াছেন, গ্রন্থ চুরির সংবাদে কবিরাজ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছিল, তাহার পরেও তিনি প্রকট ছিলেন (কর্ণানন্দ ৭ম নির্য্যাস, ১২৬ পৃষ্ঠা)।

এ সমস্ত কারণে স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রেমবিলাস এবং ভক্তিরত্নাকরের পরেই কর্ণানন্দ লিখিত হইয়াছে। আবার পুস্তক মধ্যে পুস্তক-সমাপ্তির তারিখ ১৫২৯ শক দেখিলে ইহাও মনে হয় যে, প্রেমবিলাসের যে অতিরিক্ত অংশ একেবারে কৃত্রিম বলিয়া দীনেশবাবু প্রভৃতি তাঁহাদের বিবেচনার বহির্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারও পরে কর্ণানন্দ লিখিত। কারণ, ঐ কৃত্রিম অংশেই লিখিত

হইয়াছে, ১৫০৩ শকে চরিতামৃত সমাপ্ত হইয়াছে। কর্ণানন্দ-লিখক তাহাই বিশ্বাস করিয়া চরিতামৃত হইতে অনেক উক্তি তাঁহার পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং পুস্তকখানিতে প্রাচীনত্বের ছাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ-সমাপ্তির তারিখ ১৫২৯ শক দিয়া পদকর্তা যদুনন্দন দাসের উপরে গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়াছেন বলিয়াই সন্দেহ জন্মে।

কি উদ্দেশ্যে এই কৃত্রিম গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া যায়। মৎ-সম্পাদিত চরিতামৃতের ভূমিকায় তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

যাঁহারা গোপালচম্পূ পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন—অপ্রকট ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের স্বকীয়াভাবই শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত। শ্রীজীবের অপ্রকটের কিছু কাল পরে এই মতের বিরোধী একটা দলের উদ্ভব হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সময়ে তিনিই এই বিরোধী দলের অগ্রণী হইয়া অপ্রকটে পরকীয়াবাদ প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীজীবের মত ভ্রান্ত—এ কথা বলিতে কেহই সাহসী হন নাই। চক্রবর্ত্তিপাদ-প্রমুখ বিরুদ্ধ-বাদিগণ বলিয়াছেন—শ্রীজীব স্বকীয়াবাদ স্থাপন করিলেও পরকীয়াবাদই ছিল তাঁহার হার্দ্দ; অথবা—শ্রীজীবের লেখার যথাশ্রুত অর্থে অপ্রকটলীলায় স্বকীয়াবাদ সমর্থিত হইলেও তাঁহার লেখার গূঢ় অর্থ পরকীয়াবাদের অনুকূল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, শ্রীজীবের কোনও লেখারই পরকীয়াভাবাত্মক গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিতে এ পর্য্যন্ত কেহ চেষ্টা করেন নাই। এরূপ চেষ্টা সম্ভবও নয়; কারণ, সূর্য্যশব্দের গূঢ় অর্থ অমাবস্যার চন্দ্র—এ কথা বলাও যা, গোপালচম্পূর গূঢ় তাৎপর্য্য পরকীয়াবাদে, এ কথা বলাও তা। বিশেষতঃ, ইহা কেবল শ্রীজীবেরই মত নহে; শ্রীরূপসনাতনেরও এই মত, তাহা শ্রীজীবই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থাদি হইতেও তাহা জানা যায়। আর, কেবল গোপালচম্পূতেও নহে—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীজীবকৃত টীকা, ব্রহ্মসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতার শ্রীজীবকৃত টীকা, গোপালতাপনী শ্রুতি, লোচনরোচনী টীকা, গৌতমীয় তন্ত্রাদি সমস্ত গ্রন্থেই অপ্রকটে স্বকীয়াভাবের কথা পাওয়া যায়। কর্ণানন্দ যে শ্রীজীবের মতের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কাহারও দ্বারা লিখিত হইয়াছে, এই পুস্তিকাখানি তাড়াতাড়িভাবে পড়িয়া গেলেও তাহা সহজে বুঝা যায়।

যাহা হউক, কৃত্রিমই হউক, আর অকৃত্রিমই হউক, কর্ণানন্দ এ কথা বলে না যে, গ্রন্থ চুরির সংবাদ প্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। বরং গ্রন্থ চুরির সংবাদ বৃন্দাবন পৌছিবার পরেও যে তিনি প্রকট ছিলেন, তাহাই কর্ণানন্দ হইতে জানা যায়।
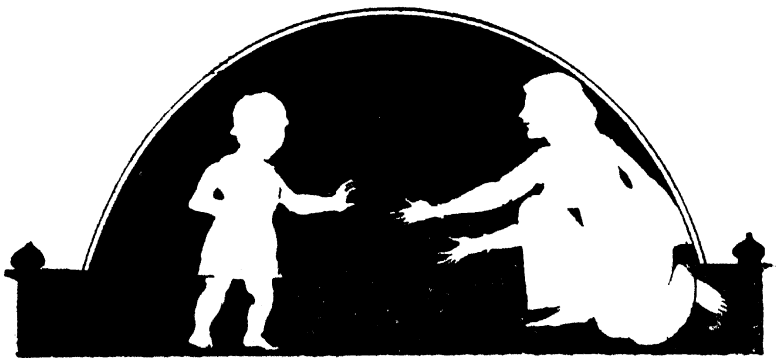
দাসখত

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

—১—

রসময়বাবু ঔষধের বাক্সটি বন্ধ করিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন—এমন সময় তাঁহার দৌহিত্র রমেন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সহাস্যে কহিল—আজকের মত ওষুধ বিলি হয়ে গেল দাদামশায় ?

রসময়বাবু কহিলেন—হ্যাঁ, হয়ে গেল। আজ আর বেশী কেউ আসে নি তো। তোর দিদিমাকে একবার চট্ করে জিজ্ঞাসা করে আয় তো দেখি—কাল অম্বলের ব্যথাটা কম ছিল কি না! যদি না কমে থাকে,—আজকেও একটা ওষুধ দেব।

রমেন কহিল—সে পরে তুমি জিজ্ঞেস করো। নিশ্চয় দিদিমার অম্বলের ব্যথা সেরেছে—নইলে এতক্ষণ ধেয়ে আসতেন। আচ্ছা দাদু, তোমার ওষুধের সবাই তারিপ করছে—অথচ দিদিমা কেন রেগেই আগুন ?

রসময়বাবু রসিকতা করিয়া কহিলেন—বোধ করি তোর দিদিমা তার দিক ছাড়া অন্য কোনও দিকে মন দিই—এ ইচ্ছে——।

কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই এক স্থূলকায়া প্রৌঢ়া রমণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তারস্বরে কহিলেন—ওষুধের বাক্স তো এইবার বন্ধ করলেই হয়। বাজারের সময় বয়ে যায় যে! নন্দা বাজারের ঝোড়া হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে—আর দেরী করলে কি আর পোড়া বাজারে মাছ তরকারি মিলবে! নাতির সাথে বসে বসে ওষুধের গুণ বর্ণনা করলেই দিন যাবে না বুঝেছ।

রসময়বাবু কিন্তু কিন্তু করিয়া কহিলেন—হ্যাঁ, তা যাচ্ছি। তা আজ না হয় নন্দা একাই যাক—আমার শরীরটা তেমন ভাল নাই। বাতের ব্যথাটা যেন একটু——।

গিন্নি ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন—বাতের ব্যথার অপরাধ কি বল দেখি। একটু হাঁটাহাঁটি না করলে বুড়ো বয়সে বাতের ব্যথা চাগাবেই। দিনরাত ওষুধের বাক্স সম্মুখে নিয়ে বসে থাকা—বাবা রে বাবা, বুড়ো বয়সে এ আবার কি আপদ হ'লো বল তো। পুজো নাই, ধ্যান নাই, ঠাকুর-দেবতার নাম নাই, ওষুধ আর ওষুধ। না বাপু, আর আমি বকতে পারবো না। ভাল চাও তো এক্ষুণি বেরোও।

দাদামহাশয়ের দুর্গতি দেখিয়া রমেন হাসিতেছিল, এইবার কহিল—আচ্ছা দিদিমা, দাদামশায়ের ওষুধে তোমার কালকের অম্বলের ব্যথাটা সেরেছে কি না বল দেখি ?

দিদিমা কহিলেন—কি জানি সেরেছে কি না। সারবার হয় আপনিই সারবে—ভারী তো ওষুধ। অমন বিনে পয়সার ডাক্তারি ঢের দেখা আছে আমার।

স্ত্রীর মন্তব্যে রসময়বাবু মুখখানি কাঁচুমাচু করিলেন। রমেন একবার দাদামহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল—তুমি তো ও কথা বলবেই দিদিমা। কিন্তু বাইরে দাদামশায়ের নাম কেমন হয়েছে জান ? আমার সব ফ্রেণ্ডরা বলে—দাদামশায়ের মত ভাল চিকিৎসা করতে পারে এমন ডাক্তার এই টাউনে নেই।

রসময়বাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—কহিলেন—শুনছো তো রমেনের কথা। তুমিই শুধু বিশ্বাস করো না—

—হয়েছে বাপু, হয়েছে। এখন ওষুধের বাক্স রেখে বেরিয়ে পড়।…এই বলিয়া তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রমেন দেখিল—তাহার যে কার্য্য হাসিল করিবার জন্য দাদামশায়ের নিকট আশা তাহার কিছুই হইল না—শুধু গোড়াপত্তন হইয়াছে মাত্র। সে কহিল—আচ্ছা দাদু, তোমার হয়ে আজ আমিই নন্দাকে নিয়ে বাজারে না কেন যাই।

রসময়বাবু কহিলেন—না রে ভাই না—তোর দিদিমা তাহলে আর আমাকে আস্ত রাখবে না। সকালবেলা একটু হেঁটে না এলে বাতের ব্যথায় না কি ভারী কাবু করে। উদ্দেশ্যহীন হাঁটাটা না কি ঠিক নয়—তাই বাজার করবার ভারটা আমারই ওপর পড়েছে।

রমেন কহিল—তাহলে চল না দাদু, গল্প করতে করতে আমিও তোমার সাথেই না হয় যাই।

পথে যাইতে যাইতে রমেন কহিল—ওহো, সে কথা তোমাকে বলতে ভুলেই গিয়েছি। পরশু পেট কামড়ানোর যে ওষুধটা দিলে না দাদু—এক দাগ খাওয়া মাত্রই হাতে হাতে ফল। পেট বেদনা যে কোথায় গেল তার ঠিক নাই, ক্ষিধেয় পরক্ষণেই ছটফট করতে লাগলাম। খান কুড়ি লুচি খেয়ে তবে আমার সেই ছটফটানি থামে।

রসময়বাবু অত্যন্ত খুসি হইয়া কহিলেন—ও হবারই কথা যে। এক ডোজ পলসেটিলা দিয়েছিলাম কি না। একেবারে অব্যর্থ।

—আর দাদু, আমার বন্ধুদের তো তোমার প্রশংসা মুখে ধরে না। সেদিন সমর তোমার ওষুধ এক ডোজ খেয়ে একেবারে মুগ্ধ। তার প্রত্যেক পূর্ণিমা আর অমাবস্যায় একটু একটু জ্বর হতো—সেই এক ডোজ খাবার পর থেকে আর জ্বর হয় না।

রসময়বাবুর চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিলেন—তাই না কি? চায়না তাহলে ঠিক ধরেছে। আচ্ছা তোর বন্ধুদের বাড়ীতে অসুখ বিসুখ করলে আমাকেই না হয় খবর দিস। অবশ্য তারা অন্য ডাক্তারকেও দেখাতে পারে——।

রমেন কহিল—নিশ্চয় তারা তোমাকে দিয়ে দেখাবে। তারা তোমার নামে উন্মত্ত হয়েছে কি না! বলে, বিনে পয়সায় এমন ওষুধ! আমি একবার আমার বন্ধুদের নিয়ে দিদিমার কাছে তোমার গুণ বর্ণনা শোনাতে আসবো বলে দিচ্ছি।

রসময়বাবু অত্যন্ত খুসী হইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রমেন কহিল—আমার আর কি ইচ্ছে হয় জান দাদু। ইচ্ছে করে যে-সব বন্ধুরা তোমার ওষুধের প্রশংসা করে—তাদের একদিন পেট ভরে খাইয়ে দি।

রসময়বাবু উৎসাহিত হইয়া কহিলেন—তা দে না একদিন খাইয়ে। তোর দিদিমাকে বলে না হয়——।

—পাগল হয়েছ দাদামশায়। দিদিমাকে ঐ কথা বল্লে কি আর তাদের বাড়ীতে ঢুকতে দেবে। তোমার ওষুধের প্রশংসা কি দিদিমা সহ্য করবে মনে কর?

রসময়বাবু চিন্তিত হইয়া কহিলেন—তবে না হয় অন্য জায়গাতেই ব্যবস্থা করিস। কত লাগবে বল দেখি?

রমেন দেখিল—অভীষ্ট তাহার সিদ্ধ হইয়াছে। কহিল—সে তুমি যা দেবে দাদামশাই। তা গোটা পাঁচেক টাকা হলেই হবে—কি বল?

রসময়বাবু কহিলেন—টাকাটা মনে করে আজই নিয়ে রাখিস তাহলে। তোর দিদিমাকে আর কিছু বলে কাজ নেই—আমার হাত-খরচের টাকা থেকেই দিয়ে দেব এখন।

—২—

রসময়বাবু যে চিরকালই বিনা পয়সার ডাক্তার ছিলেন—তাহা নয়। তিনি ছিলেন—সরকারী চাকুরে। বছর কুড়ি মুন্সেফী, বছর আষ্টেক সবজজগিরি, এক বছর এগার মাস নয় দিন এ্যাসিষ্টাণ্ট সেসন জজের কাজ এবং দিন একুশ বাইশ জজিয়তি করিয়া সম্প্রতি তিনি পেন্সন লইয়াছেন। চাকুরী-জীবনেও তাঁহার খেয়াল ছিল—বিনা পয়সায় ঔষধ বিতরণ। বই পড়িয়া তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন এবং এই জ্ঞানের ফলে অনেক গরীব দুঃখীর দুঃখ মোচন করিয়াছিলেন। পদমর্য্যাদাসম্পন্ন হইলেও রোগীর কথা শুনিলে তিনি দীনদুঃখীর কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করিতেন না; এবং তাঁহার ঔষধে রোগ আরোগ্য হইলে তিনি নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

কিন্তু তাঁহার এই কার্য্যে তাঁহার স্ত্রী লীলাময়ী সন্তুষ্ট ছিলেন না। মাসান্তে নোটের যে তাড়াটি তাঁহার হস্তগত হইত, তাহার অতি ক্ষুদ্রতম অংশও যে স্বামীর খেয়ালের জন্য ঔষধ ক্রয় করিতে ব্যয় হইবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। ইহা লইয়া তিনি তুমুল আন্দোলন বরাবর করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু স্বামী প্রসন্ন চিত্তে তাহা সহ্য করিতেন।

পেন্সন লইবার কিছু দিন পূর্ব্বেই তিনি সহরে প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। ঠিক তিনিই যে নির্ম্মাণ করিয়াছেন ইহা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে। তাঁহার স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে এবং রুচি অনুযায়ী

এই বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। পেন্সন লইবার পর তিনি সপরিবারে এইখানে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন—অবশিষ্ট জীবন তিনি আলস্যে না কাটাইয়া চিকিৎসা কার্য্যেই ব্রতী থাকিবেন। এই সদিচ্ছার কথা তাঁহার এইখানে আসিবার পরেই সকলে জানিতে পারিল; এবং কেহ কেহ তাঁহার এই কার্য্যকে উপহাস করিলেও বিনা পয়সায় ঔষধের লোভ অনেকেই ত্যাগ করিতে পারিত না।

কিন্তু কেন জানি না তাঁহার বন্ধু-ভাগ্য অত্যন্ত মন্দ ছিল। এইখানে আসিবার পর তিনি অনেকের সঙ্গে মিশিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার পদমর্য্যাদার কথা স্মরণ করিয়া কেহ তাঁহার সহিত মিশিতে চাহিত না। যাহারা আসিত, তাহারা শুধু প্রার্থী মাত্র। কিন্তু ঔষধের প্রার্থী ছাড়া অন্য কোনও রূপ প্রার্থী তাঁহার নিকট আসিলে তাহাকে বিফল-মনোরথ হইতে হইত; এবং ইহার ফলে তিনি 'হাড়কঞ্জুষ' এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ত্রিতল সুদৃশ্য গৃহ, দামী মোটরকার, সর্ব্বাঙ্গে ভারী অলঙ্কারে মণ্ডিতা স্থূলকায়া স্ত্রী, পুত্র-পুত্রবধূগণের সৌখিনতা তাঁহার প্রতিবেশীদের ঈর্ষার উদ্রেক করায় কর্ম্মজীবনের অন্তে তাঁহার ভাগ্যে বিশেষ বন্ধুলাভ হয় নাই।

প্রতিদিন বৈকালে তিনি সহরের উপকণ্ঠস্থিত নদীতটে ভ্রমণ করিতেন। এইখানে তাঁহার সমবয়সী কয়েকটি বৃদ্ধের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু ইহা পরিচয় মাত্র। ইহা বন্ধুত্বে পর্য্যবসিত হয় নাই। যাহা হউক, বৈকালে নদীর ধারে সমবয়স্ক কয়েকটি লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া তিনি একটু স্বস্তি বোধ করিতেন। ইহার মধ্যে একটু বেশী পরিচয় হইয়াছিল তারাকিঙ্কর বাবুর সহিত।

তারাকিঙ্কর বাবু যেদিন রসময় বাবুর সহিত পরিচিত হইলেন, সেদিন সত্যই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব সেসন জজ—যিনি এককালে ফাঁসী দিবার কর্ত্তা ছিলেন—তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া আলাপ করা! ওরে বাপ্‌রে! তিনি চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আভূমি নত হইয়া নমস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন—আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনার মত লোক দেশে এসে বাস করছেন। আপনার নাম আমরা অনেক দিন থেকেই শুনেছি। বাংলাদেশের ক'টা লোক জজের আসনে বসে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হতে পেরেছে? মহা ভাগ্যবান লোক আপনি——।

রসময় বাবু তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ হাসি হাসিয়া কহিলেন—বসুন, বসুন। আমাকে অতটা বাড়িয়ে বলবেন না। অসাধারণ আমি মোটেই নই। আপনাদেরই পাঁচজনের একজন হয়ে যদি আমার বাকি জীবনটা কাটাতে পারি তাহলেই নিজেকে ধন্য মনে করবো। ও কি, এখনও দাঁড়িয়ে রইলেন যে! বসুন বসুন।

তারাকিঙ্কর বাবু কহিলেন—আজ্ঞে, যখন বলছেন, তখন বসছি। দয়া করে বেয়াদবি মাফ করবেন। আপনাদের পদমর্য্যাদার কথা আমার বিলক্ষণ জানা আছে কি না! আপনার সাথে আলাপ হ'লো, এমন কি একাসনে বসবার সৌভাগ্য পর্য্যন্ত দিলেন, এ আমার পূর্ব্বজন্মের অশেষ সুকৃতির ফল।… এই বলিয়া তিনি বেঞ্চের এক কোণ ঘেঁসিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া নিজের পরিচয় দিতে লাগিলেন—আমি এখানকার হাই স্কুলের ফিফ্‌থ টিচার ছিলাম। একাদিক্রমে এক-চল্লিশ বছর শিক্ষকতা কার্য্য করে সম্প্রতি তিন বছর হল অবসর গ্রহণ করেছি। গভর্ণমেণ্টের চাকুরি হলে মাস মাস কিছু পেন্সন পাওয়া যেত। তবু ইস্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে আমি দোষ দিতে পারবো না। তাঁরা দয়া করে আমার অবসর নেবার কালে পাঁচশ' টাকা বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

রসময় বাবু হাসিয়া কহিলেন—একচল্লিশ বছরের পরিশ্রমের পারিতোষিক পাঁচশ' টাকা! বাস্তবিক দেশে যাঁরা শিক্ষকতার কাজ নিয়েছেন—তাঁদের মত দুরদৃষ্ট নিয়ে—।

বাধা দিয়া তারাকিঙ্কর বাবু কহিলেন—আজ্ঞে, আমার এইখানে মতভেদ আছে—মাফ করবেন। শিক্ষকতায় ব্রতী হয়ে আমি কোনও দিন মনের মধ্যে কোনও গ্লানি বোধ করি নি। আমরা গরীব, তাতে কি? যে গরীব সে যদি নির্লোভ হয়, তাহলে তার দুঃখ থাকে কতটুকু? না মশায়, বেশ আছি। আমার জীবনের মূলমন্ত্র কি জানেন? First deserve then desire—আগে উপযুক্ত হও তার পর কামনা ক'রো।

আজকালকার ছেলেদের আমি এই কথাই বলি—কিন্তু তারা মশায় আমার কথায় হাসে। তাদের আগে থেকেই চাঁদ ধরবার সাধ—ছ্যান করেঙ্গে, ত্যান করেঙ্গে—অথচ সামর্থ্য এক কড়ার নাই। কিছু বললে আবার তর্ক করবে—Higher aspiration থাক্‌বে না মশায়? ইচ্ছে হয় দিই দুই গালে চড় কসে! কি আর করি, থেমে যাই—নিজের মানটা রাখতে হবে তো। নইলে তারা-মাষ্টারের সাথে তর্ক—পিঠে বেত ভাঙবো না! আর কি সে দিনকাল আছে মশাই। এই বলিয়া মাষ্টার মশায় সশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। রসময় বাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

তারাকিঙ্কর বাবুও এইবার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন—বাবুজি বোধ হয় ভাবছেন, মাষ্টার তো খুব বক্‌তে পারে। বুড়ো হয়েছি—এখন বকাই তো আমাদের সম্বল।

রসময় বাবু কহিলেন—ঠিক। এখন আমাদের বকে যাবারই বয়স—কিন্তু গ্রাহ্য করে না কেউই।

মাষ্টার জিব কাটিয়া কহিলেন—ও কথা বল্‌বেন না, ও-কথা বলবেন না। আপনার কথা অগ্রাহ্য কর্‌বে এমন লোক কি কেউ আছে! আপনার কথা আলাদা যে। এ কি তারা-মাষ্টার যে পনরো টাকা থেকে ঘঁসে ঘঁসে পঁয়ত্রিশে উঠেছে। এখন আপনার পেন্সন কত চল্‌ছে? পাঁচশো? বেশ, বেশ। তা যাই বলুন, আমিও বেশ আছি। আপনার বোধ হয় বিরক্তি বোধ হচ্ছে?

রসময় বাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—না—না; বিরক্ত হবো কেন—বেশ লাগ্‌ছে আপনার কথা।

—আজ্ঞে হাঁ—বেশ লাগবারই কথা। কিন্তু আজকালকার ছেলেদের আমার কথা বিষবৎ লাগে—বুঝলেন? ফাষ্ট ডিজার্ভ দেন ডিজায়ার—এটা ভারী গুরুতর কথা কি না। আমার সারা জীবন কিন্তু এর পরীক্ষা করেছি। ছিলাম গরীবের ছেলে, কোনও রকমে ভিক্ষা-শিক্ষা করে পড়লাম—নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক। পাশ করে হলাম ইস্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত—মাইনে পনেরো। মনে করলাম—কোনও রকমে পণ্ডিতি থেকে যদি মাষ্টারীতে প্রমোশন পাই, তাহলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। ইস্কুলে তখন আটজন মাষ্টার, দুইজন পণ্ডিত। হায় যদি এইট্‌থ টিচারও হতাম—তাহলেও ছেলেরা বল্‌তো—'সার'। 'পণ্ডিত মশায়' শুন্‌তে শুন্‌তে বিরক্তি ধরে গেল কি না! কিন্তু মাষ্টারী—ওরে বাপ্‌রে! রাজভাষা না শিখ্‌লে তো আর মাষ্টার হওয়া যায় না—এদিকে 'এ' 'বি' 'সি' চোখেও দেখি নি। মনটা ভারী দমে গেল। ইচ্ছা হলো শিখি একটু ইংরাজী। গোপনে কিনলাম একখানা ফাষ্ট বুক। আজ্ঞে বড় বেশী বকে যাচ্ছি—না? আজ না হয় থাক—।

রসময় বাবু কহিলেন—এখনও বাড়ী ফিরতে আমার দেরী আছে—আপনি বলুন। আপনার কথা আমার ভারী interesting বোধ হচ্ছে।

তারাকিঙ্কর বাবু কহিলেন—Interesting হবে না? মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়—একখানা autobiography লিখি—Life of a school teacher। কিন্তু ছাপবে কে মশায়? যাক্, সংক্ষেপেই আমার কথাগুলো বলে যাই। আজ আপনার মত গুণী লোককে মনের কথা বলতে পেরে আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে। হাঁ, তার পর শিখলাম চলনসই ইংরাজী। হেড্ মাষ্টার মশায় আমার উপর প্রথম থেকেই সন্তুষ্ট ছিলেন—পড়াতে কোনও দিন আমি ফাঁকি দিই নি কি না, আর যে ছাত্র আমার ক্লাশে ফাঁকি দিয়েছে তার পিঠে আস্ত বেত ভাঙতেও কসুর করি নি। হেড মাষ্টার করে দিলেন—এইট্‌থ্ টিচার। মাইনে হলো ষোলো। পণ্ডিতি থেকে মাষ্টারীতে প্রমোশন পেয়ে সেদিন যে কি আনন্দ পেয়েছিলাম, সে আর কেউ জানুক বা না জানুক—আমার গিন্নি বিলক্ষণ জেনেছিল। এই বলিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন।

—তার পর জেদ বেড়ে গেল—বেশ শিখলাম ইংরাজী। ইস্কুল-লাইব্রেরীর সমস্ত বই তো পড়লামই—বাইরের বই সংগ্রহ করে পড়াও বাদ গেল না। শেষটায় দিলাম এণ্ট্রান্স পরীক্ষা। পাশ করলাম প্রথম বিভাগে। এদিকে এইট্‌থ টিচারী থেকে ক্রমশঃ প্রমোশন পেলাম ফিফ্‌থ্ টিচারীতে। আর কি চাই! কামনা আমার পূর্ণ হয়েছে। এমন নাম করে ফেললাম যে সবাই বলে তারা-মাষ্টারের মত ইংরাজী এদিকে খুব কম লোক জানে। এদিকে একদিন যা বিপদে পড়েছিলাম—এই গল্পটা করেই আজ শেষ করবো। সেদিন এ্যাডিশনাল হেডমাষ্টার ইস্কুলে আসেন নি—হেডমাষ্টার

বল্লেন—সেকেণ্ড ক্লাশের ইংরাজীটা আমাকে নিতে। বুকটা ঢিপ করে উঠ্‌লো—কিন্তু গৌরবও বোধ করলাম। ভাবলাম—ছেলেগুলো অপ্রস্তুত করবে না তো? প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসলে কি আর ভয় করি মশায়! পড়াই ফিফ্‌থ্‌ ক্লাশ পর্য্যন্ত—একেবারে ঠেল্‌লো সেকেণ্ড ক্লাশে। আমি বলেই সামলে গেলাম—আর কেউ হলে মূর্চ্ছা যেত। দুর্গানাম করে ঢুকলাম ক্লাশে—ছেলেগুলো গুণ গুণ করে উঠ্‌লো। দেখলাম—বেগতিক। কেউ কেউ চাপা স্বরে বল্লে—ওরে Conjugation এসেছে রে! সেকেণ্ড ক্লাশে পড়লে কি হবে—আমার কাছে বেতের ঘা খায় নি, এমন ছেলে এ ইস্কুলে নাই। Conjugation এ একটু ভুল হলে আর রক্ষা ছিল না কি না। ভাবলাম—আজ বুঝি শোধ নেবে। কিন্তু আমিও তারা মাষ্টার। ক্লাশে বসে বই খুলতেই এক ছোক্‌রা বলে উঠলো—সার, বড্ড মেঘ করেছে, ছুটি দেন না। কেউ বা বল্লে—উঃ, কি মেঘের গর্জ্জন! ভারী ভয় করছে ফিফ্‌থ্‌ মাষ্টার মশায়! ফিফ্‌থ মাষ্টার বলার উদ্দেশ্য বুঝলেন তো? আমার পজিশনটা মনে করিয়ে দেওয়া আর কি! উঃ, কি ধড়িবাজ ছেলে সব বাবা! আমিও মনে মনে বল্লাম—এমন শিক্ষা দেব তোমাদের, এখন দুদিন তোমাদের ক্লাশে আসতে পারলে হয়। মুখে বল্লাম—ঠিক তিনটে বাট মিনিটের সময় ছুটি পাবে—তার আগে নয়। এই বলেই পড়াতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য মশায়—কোনও জায়গায় আমার বাধে নি।

এদিকে চারটেও বাজ্‌লো—তুমুল বৃষ্টি আরম্ভ হ'লো। চেয়ার থেকে উঠে ছাতির খোঁজে যেয়ে দেখি ছাতিটি নেই। ভাবলাম—বজ্জাত ছেলেদের কারসাজি—আমাকে জব্দ করবার ফন্দী। আচ্ছা, আমিও তারা-মাষ্টার—কাল তোমাদের দেখাব। সেই বৃষ্টিতেও ছেলে-গুলো সরে পড়েছে কি না!

ভাগ্য ভাল—পরের দিনও সেই ক্লাশ পেলাম। নিয়ে এলাম মোটা দুগাছা বেত হাতে করে। ক্লাশে গিয়া গম্ভীর স্বরে বল্লাম—আমার ছাতি?

—জানি নে তো সার।

—জানো না সার! আরম্ভ হ'লো বেতের আস্ফালন। একখানা বেত ভাঙতেই ছাতি আমার বেরিয়ে এলো। উঃ, কি সব বজ্জাত ছেলে রে বাবা! আরে মশায়, ইস্কুল যে ছেড়েছি এ একরকম ভাল। এখনও যে আমার শক্তি নেই তা মনে করবেন না। কিন্তু বেত ধরবার উপায় নেই যে। আজকালকার দিনে যেমন হয়েছে হেড্‌মাষ্টার তেমনি হয়েছে ছেলেদের অভিভাবক—জ্বালাতন! ছেলেগুলোও হচ্ছে তেম্‌নি। যাক—বাঁচা গেছে।

এই বলিয়া তারাকিঙ্করবাবু থামিলেন। রসময় বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

অতঃপর তারাকিঙ্কর বাবু অত্যন্ত বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন যে যদি রসময় বাবু একদিন দীনের কুটীরে কৃপাপরবশ হইয়া পদধূলি দেন তাহা হইলে তারাকিঙ্কর বাবুর মনুষ্যজন্ম সার্থক হইবে।

রসময় বাবু ব্যগ্রভাবে কহিলেন—নিশ্চয় যাব—নিশ্চয় যাব। আপনার কথা শুনে সত্যিই আপনার বাড়ী দেখবার ইচ্ছা হয়েছে। দেখুন না—কালই সকালে আপনার ওখানে গিয়ে হাজির হচ্ছি।

—৩—

পর দিন প্রাতঃকালে চা পানের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক আলোচনা তুমুলভাবে চলিতেছিল। রসময় বাবুর পুত্র অশোকের গলার স্বরের তীক্ষ্নতা সবাইকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। ইহার অবশ্য কারণ ছিল। সম্প্রতি সে ওকালতি পাশ করিয়াছে—কিন্তু ওকালতি করিতে তাহার ইচ্ছা নাই। একবার বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিতে পারিলে এ্যারিষ্টো-ক্রেটিক সারকল্‌ তাহার বজায় থাকে। তাহার পিতা বিলাত যাওয়ার কথা তেমন গায়ে মাখিতেছেন না—ইহাতে সে রীতিমত চটিয়াছে। সম্প্রতি তাহার শ্বশুর তাহার স্ত্রীকে যে চিঠি লিখিয়াছেন—তাহাতে কিছু ভরসার কথা আছে—অর্থাৎ হয় তো তিনিই বিলাতের খরচটা আপাততঃ দিয়া দিতে পারেন। সুতরাং আজকাল অশোকের বাপের উপর ঝাঁঝটা কিছু বেশী। সে বলিতেছিল—বাস্তবিক মা, বাবার ব্যাপার দেখলে আমাদের মাথা কাটা যায়। কি করে যে উনি জজিয়তি করে এলেন—তাই ভাবি।

অশোকের স্ত্রী রেবা তাহার গায়ে মৃদু আঘাত করিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল—তোমার যেমন বুদ্ধি বাবা কি আর জজিয়তি করেছেন—মায়ের পরামর্শ মত না চললে ওঁর জজিয়তি কবে ঘুচে যেত। আচ্ছা মা, প্রত্যেক কেসের রায় লেখবার সময় বাবা আপনার উপদেশ নিতেন—না? ওঁর ঘটে যে জজিয়তি করবার মত বুদ্ধি ছিল—এ তো চালচলনে বোঝা যায় না।

লীলাময়ী হেলিয়া দুলিয়া গলা উঁচুতে তুলিয়া হি হি করিয়া খানিকটা হাসিয়া লইয়া বলিলেন—শোন আমার পাগলা মেয়ের কথা! তা যুক্তি পরামর্শ কি আর দিতে হয় নি। সেবার হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস তো এই নিয়ে কত ঠাট্টা তামাসা করেছিলেন। আমার মত স্ত্রী পেয়েছিলেন তাই রক্ষে—নইলে এতদিন যে কি দুর্দ্দশা ঘটতো ভগবানই জানেন।

অশোক ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিল—যা বলেছ। এইবার তুমি চেষ্টা করে বাবার ওষুধ দেওয়ার বাতিক ছাড়াও তো দেখি মা। মান-ইজ্জত আর থাক্‌লো না দেখছি। ওষুধের বাক্স নিয়ে যত সব স্লাম কোয়ার্টারে ঘোরাঘুরি! ওঁর কি একটুও লজ্জা করে না? এই সব কথা যদি একবার আমার শ্বশুরবাড়ীতে ওঠে—তাহলে আর লজ্জার সীমা থাকবে না। এমনি তো 'মুন্সেফ-জজে'র ছেলে বলে ঠাট্টা ওদের মুখে লেগেই আছে।

রমেনও টেবিলের এক কোণে বসিয়া চা পান করিতেছিল। একে সে ছেলেমানুষ, তার পর দাদা-মশায়ের সাথে তাহার মাখামাখি বেশী বলিয়া পারিবারিক মজলিসে সে আমল পাইত না। কিন্তু দাদা-মশায়ের গ্লানি শুনিয়া সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। কহিল—দাদা মশায়ের ওষুধের সবাই প্রশংসা করে কিন্তু। আমার বন্ধুরা——।

তাহার দিদিমা ধমক দিয়া বলিলেন—থাম, থাম। তুইই তো ঐ সঙ্গে ইন্ধন দিচ্ছিস। এতে কত টাকা মাসে বাজে খরচ হয় জানিস্? বাজে খরচ করিবার টাকা কোত্থেকে আসে রে?

রমেন দাদা মহাশয়ের হইয়া তর্ক করিয়া যাইতেছিল; কিন্তু সেই সময় রসময়বাবু সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সবাই চুপ করিয়া গম্ভীর মুখে চা পান করিতে লাগিল।

রসময়বাবু একবার ইহার একবার উহার মুখের দিকে চাহিয়া মাথা চুলকাইয়া কহিলেন—আমাকে আজ সকালে একটু বেরোতে হবে- মটোরটা নিয়ে যাব ভাবছি।

রেবা আবদারের সুরে বলিল—বা রে! আমি ভাবছি—চা খেয়ে এক্ষুণি মোটর নিয়ে বেরোব। কাল রাত্তিরে মোটে ঘুমোতে পারি নি—মাথা যা ধরেছে। একটু ঘুরে এলে বোধ হয় মাথা ধরাটা ভাল হ'তো।

রসময় বাবু কহিলেন—তাই তো। কিন্তু আমার বেশী দেরী হবে না বৌমা—আধ ঘণ্টার মধ্যেই—

লীলাময়ী ঝাঁঝিয়া উঠিলেন—থাক, থাক,—ঢের হয়েছে। একেই তো বিনা পয়সায় রোগী দেখা—তার উপর আর পেট্রোল খরচ করে মোটরে যেয়ে কাজ নাই।

রসময় বাবু অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া কহিলেন—আমার কি আর রোগী দেখা ছাড়া অন্য কাজ নাই। তোমরা কি যে ভাব! যাব তারাকিঙ্কর বাবুর বাড়ী। তিনি লোক্যাল স্কুলের ফিফ্‌থ্‌ টিচার ছিলেন কি না। ভারী অমায়িক ভদ্রলোক। আজ তাঁর বাড়ীতে যাব কথা দিয়েছি কি না। তা তোমার যদি অসুবিধে হয় বৌমা—না হয় হেঁটেই যাই।

অশোক একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া মুখখানা আরও গম্ভীর করিল; ভাবখানা—দেখছো তো বাবার কাণ্ডকারখানা! কোথাকার কোন স্কুল-টিচার—তার বাড়ীতে ছুটছেন। না—মান-ইজ্জত আর থাকলো না দেখ্‌ছি।

লীলাময়ী গম্ভীরভাবে কহিলেন—যেতে হয় তাই যাও—কিন্তু বাজার আজ করবে কে? নন্দা বোধ হয় দাঁড়িয়ে আছে।

রসময়বাবু দেখিলেন—মহা বিপদ। মাথা চুলকাইয়া কহিলেন—তাই তো, তাই তো। আজ না হয় রমেনই নন্দার সাথে যাক। আমি ওঁকে কথা দিয়ে এসেছি কি না—সেই না হয়েছে মুস্কিল।...এই বলিয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া হাঁপ ছাড়িলেন। আর একটু হইলেই আটকাইয়া পড়িয়াছিলেন আর কি! মোটর চড়িবার

সখ কেন তাঁহার হইয়াছিল ভাবিয়া তাঁহার অনুশোচনা হইতে লাগিল।

কিন্তু তারাকিঙ্করবাবুর বাড়ী দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সামান্য খড়ের বাড়ী—অথচ কি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বাড়ীটি ঝলমল করিতেছে। বাড়ী সংলগ্ন পুকুর ও উদ্যান। বাহুল্য কিছুই নাই—তবু ইহার মধ্যে যে সুশৃঙ্খলা ও শান্তির হাওয়া বহিতেছে—তাহাতে যেন সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া যায়।

সর্ব্বোপরি তারাকিঙ্কর বাবুর সরল অকপট কথাগুলি তাঁহার বড় ভাল লাগিতেছিল। তিনি যখন অত্যন্ত সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া অজস্র স্তুতিবাক্য বর্ষণ করিতেছিলেন—তখনও তাঁহার অতিশয়োক্তিতে রসময় বাবুর বিরক্তি বোধ হইল না। বরং তিনি লজ্জিত হইয়া পড়িতেছিলেন। এই সরল বৃদ্ধ—যিনি ফিপ্‌থ্‌ টিচারিতে প্রমোশন পাইয়া মাসিক পনেরো টাকা হইতে পঁয়ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতেন—তাঁহার সহিত নিজের তুলনা করিতেও তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন। 'First deserve then desire'—এই নীতি যে তিনি প্রত্যেক কার্য্যে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রত্যেক কথায় পরিস্ফুট হইতেছিল। ঐ সামান্য মাহিয়ানায় কতদূর মিতব্যয়ী হইলে এমন সুশৃঙ্খল গৃহের মালিক হওয়া যায় তাহা তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন। অত্যন্ত গৌরবের সহিত তারাকিঙ্কর বাবু বলিতে লাগিলেন, এই যে পুকুর দেখছেন, এরও একটা ইতিহাস আছে। চিরকালই দরিদ্র ছিলাম; সুতরাং প্রত্যহ মাছ কিনবার পয়সা জুটতো না। অথচ লোভ এমন প্রবল ছিল যে বাজারে গেলেই ইচ্ছা হ'তো কিনে ফেলি। না যে কিনতাম,—তাও নয়। কিন্তু নগদ পয়সা দিয়ে প্রত্যহ মাছ কেনা আমার সামান্য আয়ে যে কত কঠিন ছিল, তা জানতাম আমি আর আমার গৃহিণী। একদিন লোভের বশবর্ত্তী হয়ে বার আনা দিয়ে একটা মাছ কিনলাম। ফলে এমন হ'লো যে মাসের শেষ তিনটে দিন প্রায় অনাহারে কাটাতে হ'লো। কিন্তু তখনই আমি প্রতিজ্ঞা করি, যদি কোনও দিন নিজের পয়সায় পুকুর কেটে সেই পুকুরের মাছ খাবার যোগ্যতা অর্জ্জন করি, তাহলেই আবার মাছ খাওয়া আরম্ভ করবো, নতুবা এই শেষ। এর পঁচিশ বছর পর সাত শো টাকা খরচ করে পুকুরটি কাটিয়েছি। পুকুরে মাছও হয়েছে অনেক—এতে পঁচিশ সের মাছ পর্য্যন্ত আছে।

তার পর মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন, প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করেছি; কিন্তু পুকুরের মাছ একদিনের বেশী খাই নি। এম্‌নই মায়া হয়েছে যে ওগুলোকে ধরতেও কষ্ট বোধ হয়। আর, বাগানে তরি-তরকারি এমন প্রচুর ফলে যে তাই খেয়েই শেষ করতে পারি নে,—মাছের কথা আর মনেও পড়ে না। এই বাগানটিতে আমার খরচ কিছু নেই। আপনার কাছে বলতে আমার লজ্জা নেই—আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এর পেছনে সমান ভাবে খাটি। কোনও দিন একটা বাইরের লোক পর্য্যন্ত রাখতে হয় নি আমাদের। আর পয়সা খরচ করে বাগান করবার মত সখ আমাদের মত লোকের তো হওয়া উচিত নয়। লোকে হাসবে যে! এই বলিয়া তিনি নিজেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তার পর হাসি নামাইয়া বলিতে লাগিলেন, আর এতে আমরা এমন আমোদ পাই যে এই শেষ বয়সে আর কিছুতেই ওটুকু পাবার আশা রাখি নে। নিজের হাতে বীজ বুনে তাতে যখন অঙ্কুর হয়, ধীরে ধীরে দু'একটা পাতা গজায়, তখন কি উল্লাস। তার পর যখন সেই গাছ ফলে ফুলে পূর্ণ হয়ে ও'ঠে, তখন সত্যই আনন্দ চেপে রাখতে পারি নে।···এই বলিয়া তিনি পরম স্নেহে বাগানের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তারাকিঙ্কর বাবু প্রত্যেকটি কথা বলিতে গেলেই অতিশয়োক্তি করিতেছেন ইহা স্পষ্ট বোঝা যায়; কিন্তু ইহাতে অহঙ্কারের নাম গন্ধ মাত্র নাই। তাঁহার নিকট পণ্ডিতি হইতে ফিপ্‌থ্‌ টিচারিতে প্রমোশন পাওয়া যেমন পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার, তেমনি তাঁহার মত স্ত্রী-পুত্র লাভ করাও যেন পৃথিবীতে আর কাহারও ভাগ্যে কোনও দিন ঘটিয়া ওঠে নাই। তাঁহার একমাত্র পুত্রের সুখ্যাতি করিয়া তিনি বলিলেন, এমন ছেলে এ কালে কি করে হলো আমি তাই ভাবি। অবশ্য লেখাপড়া বেশী দূর করাতে পারি নি—কোনও রকমে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়েই কাজে ঢুকিয়ে দিতে হয়েছে। আপনাদের

আশীর্ব্বাদে কাজ তার ভালই হয়েছে,—হাজার হোক গভর্ণমেণ্টের চাকুরি, উন্নতি আছে। আজকাল আমার ছেলেই Execution এর কর্ত্তা কি না।

রসময়বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—Execution এর কর্ত্তা?

—আজ্ঞে হাঁ। মুন্সেফ কোর্টে চাকুরি করছে—যত Execution Case ওই তো Manage করে। আহা, ভারী ভাল ছেলে। বাপমায়ের ওপরও খুব ভক্তি। আমাদের নিজ হাতে কাজ করতে দেখে কত অনুযোগ করে; বলে, লোক রেখে দেব। আমরা বলি—পাগল! এখনও বেশ শক্ত সমর্থ আছি—এ বয়সে বসে থাকলে কি আর রক্ষা আছে। বাত ধরে যাবে যে! 'First deserve then desire'—কি বলেন? এই বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

অত্যন্ত খুসী হইয়া রসময়বাবু ফিরিলেন। পথে আসিতে আসিতে স্থির করিলেন—তাঁহার বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে যে খালি জায়গাটি পড়িয়া আছে, তাতে নিজ হাতে একটি উদ্যান রচনা করিবেন।

তিনি মনে স্থির করিলে কি হয়—ইহাতে বিঘ্ন অনেক জুটিয়া গেল। তাঁহার পত্নী প্রথমেই আপত্তি তুলিয়া বসিলেন—এ-সব সখ গেঁয়ো ভূতদের পোষায়, যাহারা নিজে গতর খাটাইতে পারে। মিছামিছি কতকগুলো পয়সা খরচ করিবার পন্থা পরিষ্কার হইল মাত্র।

রসময় বাবু সহাস্যে বলিলেন—না গো না, আমি তোমাকে লাভ দেখিয়ে দেব। তোমার তরি-তরকারি কিনবার আর পয়সা লাগবে না, বুঝলে।

লীলাময়ী স্বভাবসিদ্ধ ঝঙ্কার তুলিয়া কহিলেন, বুঝেছি, বুঝেছি। মুরোদ যে কত তা আমার জানা আছে।

বাগানের তোড়জোড় হইতেছে দেখিয়া অশোক মাকে কহিল, ঐখানটায় বাবা শাকপাতার জঙ্গল বানাতে চান তাহলে? ওঁর সাথে আর পারা গেল না মা। দেখলে তো কতকগুলো অসভ্য লোকের সাথে মেলামেশার ফল! ছিলেন বিনে পয়সার ডাক্তার, এখন হলেন চাষী। কোন দিন বা বলে বসেন—লাঙল ধর্‌বো। আমার একটা Ambition ছিল—ওখানে একটা ভালরকমের ফুলের বাগান করবো। ভাল ভাল দামী গাছের লিষ্ট করাও হয়ে গেছে আমার। রেবা কেমন ফুল ভালবাসে জান তো মা। ওদের বাড়ীর ফুলবাগান একটা দেখবার মত জিনিষ। আমি যখ‌ই ওদের ওখানে যাই, দুবেলা দুটো বড় ফুলের তোড়া আমার ঘরে আসে। এখানে তোড়া দূরে থাক, একটা ফুলই চোখে দেখবার উপায় নাই। বাস্তবিক ওর ভারী কষ্ট হয়।

রেবা স্নেহের হাসি হাসিয়া রসময়বাবুকে কহিল, আচ্ছা বাবা, আপনার শাক পাতা লাউ কুমড়োর বাগানের এত সখ কেন? ও বুঝেছি—ভাবছেন বুঝি তরি-তরকারি বাড়ীতে হলে আর মা আপনাকে বাজারে পাঠাবেন না। উঃ, কি আলসে আপনি!

রসময় বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, শোন আমার পাগ্‌লী মায়ের কথা।

এদিকে যত টীকা-টিপ্পনিই চলিতে থাকুক, রসময় বাবু দমিলেন না, তিনি বাগানের কাজে মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন। রমেন তাঁহার সহায় হইল। বীজ সংগ্রহ, বীজ বপন, জল সেচন—এই সব কার্য্যই সুচারুরূপে চলিতে লাগিল।

কিন্তু বিপদ আসিল অন্য দিক হইতে। দেখা গেল—বীজ অঙ্কুরিত হইবার পর দুই-চারটি পাতা গজাইলেই পোকায় কাটিয়া দেয়, গাছ আর বড় হইতে পারে না। রসময় বাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তারাকিঙ্কর বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইলেন, তিনি নানা রকমের টোট্‌কার ব্যবস্থা করিলেন—কিছুতেই কিছু হইল না। বীজ বপন, জল সেচন সমান উদ্যমে চলিতে লাগিল! কিন্তু পোকার উপদ্রব কমিল না। গাছ অঙ্কুরিত হইবার পর পাতা গজাইতে থাকিলেই, রসময় বাবু আশান্বিত হইয়া উঠেন, ভাবেন এবার বুঝি গাছগুলি রক্ষা পাইল। কিন্তু কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই দেখা যায়—নকলঙ্ক গাছগুলি শুকাইয়া যাইতেছে, হাত দিয়া টানিলেই গাছগুলি উঠিয়া আসে, মনে হয়—পোকায় শিকড়ের উপর পর্য্যন্ত কাটিয়া দিয়াছে।

তারাকিঙ্কর বাবুও আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, কহিলেন—অদ্ভুত ব্যাপার। পোকা টোকা কিছু দেখা যায় না—অথচ প্রত্যেকটি গাছ নষ্ট করে ফেলে। না, এমনটি

কোনও দিন দেখি নি। হ্যাঁ, পোকায় গাছ নষ্ট করে বটে—কিন্তু একটাও বাদ দেবে না, আশ্চর্য্য। আমার হাত এমন নিসপিস করছে মশায়, যদি ওদের দেখা পেতাম—বেতিয়ে পিঠের চামড়া তুলতাম। ইস্কুল-মাষ্টারের অভ্যাস কি না। হাঃ হাঃ হাঃ!

রমেন বোধ হয় আন্দাজ করিতে পারিয়াছিল; কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিল না; বরং প্রাণপণে দাদা-মহাশয়ের ব্যর্থ উদ্যমে সাহায্য করিতে লাগিল। কিছু দিন পরে দেখা গেল—পোকার আর উপদ্রব নাই—গাছগুলি বেশ একটু বড় হইয়া উঠিয়াছে। রসময় বাবু অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিলেন,—কোন গাছে কি পরিমাণে ফল ফলিবে ইহাই লইয়া রমেনের সহিত তাঁহার আলোচনা তুমুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

সেদিন সন্ধ্যার পর রসময়বাবু বাগানের দিকে চলিলেন। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় গাছগুলির কেমন অপরূপ শোভা হয়—একবার দেখিয়া আসিলে ক্ষতি কি। নিকটে আসিয়া দেখিলেন—অদূরে তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূ বাগানের মধ্যে ঘুরিতেছে। তাঁহার বড় আনন্দ হইল। না, উহারা মুখে যাহাই বলুক—বাগানের উপর উহাদেরও দরদ আছে। তিনি মনে করিলেন—ফিরিয়া যাইবেন। আহা, উহারা দুইজনে একটু আনন্দ পাইতেছে—তিনি কেন ব্যাঘাত দিবেন।

সহসা তাঁহার নজরে পড়িল—তাঁহার পুত্রের হাতে একখানি ছোট কাঁচি, জ্যোৎস্নালোকে তাহা ঝকঝক করিতেছে। তাঁহার বুক ধড়াস করিয়া উঠিল। ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন—প্রত্যেকটি গাছের কাছে আসিয়া অশোক কাঁচি দিয়া গোড়া কাটিয়া দিতেছে—আর তাঁহার পুত্রবধূ সেই ছিন্ন গাছ পুনরায় মাটিতে বসাইতেছে। তিনি সমস্ত বুঝিলেন—তাঁহার মাথা বোঁ বোঁ করিয়া উঠিল, বোধ করি আত্মবিস্মৃত হইয়াই কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—অশোক, বৌমা!

তাহারা চমকিয়া উঠিল এবং অদূরে রসময় বাবুকে দেখিয়া দ্রুতপদে অন্য দিক দিয়া বাগান হইতে বাহির হইয়া গেল।

রসময় বাবু সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল—ঐ জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশ, অদূরে ঐ সুবৃহৎ অট্টালিকা। নিম্নে শিশিরসিক্ত মৃত্তিকা তাঁহার দিকে চাহিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে। এক মুহূর্ত্তে সমস্ত জীবনের ঘটনা তাঁহার মনের মাঝে উঁকি দিয়া উঠিল,—যৌবনে নারীকে আশ্রয় করিয়া নীড় বাঁধিবার কালে যে দাসখত তিনি লিখিয়া দিয়াছেন—তাহা হইতে শেষ নিশ্বাস ফেলা পর্য্যন্ত তাঁহার নিস্তার নাই। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, পরিবার পরিজনবর্গের বিলাসব্যসনের যন্ত্রমাত্র তিনি—ইহা ছাড়া তাঁহার অস্তিত্ব নাই। এই দাসত্বের মূল কোথায় তাহা যেন তিনি এই মুহূর্ত্তে আবিষ্কার করিলেন। অস্ফুটস্বরে কহিলেন—রক্তমাংসের শরীরের দোহাই—দাসখত—ঠিক! তার পর সজোরে চীৎকার করিয়া কহিলেন—তারামাষ্টার, তোমার ছেলে execution এর কর্ত্তা নয়—কর্ত্তা এরা—এরা—।

দক্ষিণাপথের যাত্রী

শ্রীনিবিরাজ হালদার

ধর্ম্মের বালাই আমার কোনও দিনই ছিল না। তা-ছাড়া আমি তীর্থযাত্রীও নই। যাত্রা-পথের পথিকের মত একদিন যৌবনের অফুরন্ত বাসনার ক্রীতদাস হয়ে সেতুবন্ধের পথে সঙ্গীহীন অবস্থায় এসে পৌছুলুম মাদ্রাজ সহরের বুকে। সঙ্গে ছিল এক আত্মীয়ের বাসার ঠিকানা। খুঁজে-খুঁজে বার করলুম তাঁর ট্রিপ্লিকেনের বাসা। আমাকে পেয়ে তাঁদের কি আনন্দ! হঠাৎ দেখি আমার এক বিশেষ পরিচিত বন্ধু,—তাঁকে আমরা বোস মশাই বলে ডাকতুম—তিনি এক কাপ চা নিয়ে এসে বল্লেন, "নাও।"

সে সময় আমার নিতান্তই এক কাপ চায়ের প্রয়োজন হয়েছিল। হাত বাড়িয়ে কাপটি নিয়ে বল্লুম, "বাঁচালেন, তা হঠাৎ—আপনি এখানে?"

তিনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, "তোমার মেসোটিকে ত চেন, আমার কি ছাই এ আজগুবি দেশে পোষায়—জবরদস্তি ধরে নিয়ে এলে আর করি কি বল।"

বোস মশাইকে বল্লুম, "যাক, আমার ভালই হোল। একজন সঙ্গীর ত প্রয়োজন—তবে আমার থাকার মেয়াদ ত জানেন?"

"তুমি কি আজকেই ফিরে যেতে চাও নাকি?"

বল্লুম "না বোস মশাই, আমি যাবো সেতুবন্ধ রামেশ্বরে।"

"ও! তীর্থ করতে?"

হাসতে হাসতে বল্লুম,—"তীর্থ নয়—আমি বেরিয়েছি দেশ-পর্য্যটনের বহুদিনের একটা সাধ পূর্ণ করবার জন্যে। ঠাকুরমা যখন মারা যান, তখন তাঁর মনে ভারি আপশোষ ছিল রামেশ্বর তীর্থ তাঁর হ'লনা; তাই আমার এই দক্ষিণাপথের যাত্রী হবার আরও একটা কারণ। যাক সে অনেক কথা। যখন বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছি তখন এমন কিছু নিয়ে ফেরা চাই যা মানুষের চোখে একটা আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।"

বোস মশাই বল্লেন, "ও-সব কথা এখন থাক, সারারাত্রি জাগরণের পর তোমার বিশ্রাম নিতান্ত প্রয়োজন। স্নানাহার সেরে একটু শুয়ে নাও, তার পর বিকেলে সমুদ্রের ধারে গিয়ে গল্প করা যাবে।"

আলোক-স্তম্ভ—মাদ্রাজ
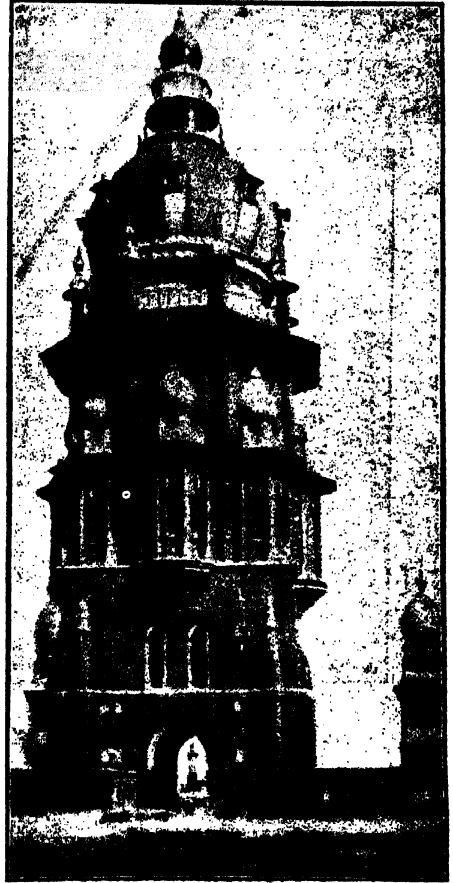
সত্যই সেদিন বিশ্রামের নিতান্ত প্রয়োজন হয়েছিল, সুতরাং বোস মশাইকে মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের যা কিছু করার সব সেরে শুয়ে পড়লুম। বৈকালে বোস

মশাইয়ের সঙ্গে বেরিয়ে বিশাল সমুদ্রের ধারে এসে যখন দাঁড়ালুম, তখন তার উত্তাল ফেনিল জলরাশি দেখে মনে মনে বল্লুম,—

'আমি পৃথিবীর শিশু ব'সে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব; ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম্ম তা'র—বোবার ইঙ্গিত ভাষা হেন
আত্মীয়ের কাছে।—'

ঢেউয়ের পর ঢেউ ফুলে ফুলে যেন পৃথিবীর বুকে আছাড় খেয়ে পড়ছিল। ভাবলুম, আমি সহরে ঘুরবো কেন? কোথায় এমন কি বস্তু আছে যা আমাকে এ দৃশ্যের চেয়ে আরও বেশী আনন্দ দান করতে পারে?

আপনার আকর্ষণের বস্তুর হয় ত অভাবও নেই;—কিন্তু সত্যি করে বলুন ত সময়ে সময়ে আপনার কি মনে হয় না যে আপনি কত অভাবের মধ্যে ডুবে রয়েছেন, কিন্তু তবুও এই সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে তার রূপ ছাড়া নিশ্চয় আর কিছু হয় ত ভাববার সময় পান নি,—ভগবানের সৃষ্টি এমনি সুন্দর!"

"একথা তুমি ঠিক বলেছ, সমুদ্রের ধারে দাঁড়ালে সব কিছুই ভুলে যেতে হয়।"

ক্রমেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল, ফিরিবার পথে মনে মনে বলিলাম,—

'হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানব-ভাষা?—'
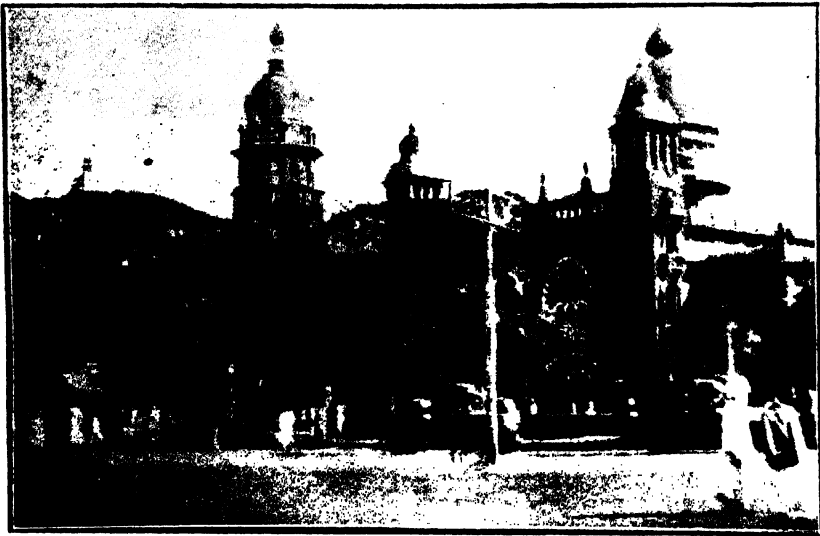
মাদ্রাজ হাইকোর্ট

বোস মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "কিহে, তুমি যে একেবারে বোবার মত চুপ করে রইলে?"

বল্লুম, "আমার আর অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। রাস্তায় বেরিয়ে মানুষ, গাড়ী, ঘোড়া ছাড়া আর ত কিছু দেখতে পাবো না; কিন্তু এই মহাসিন্ধুর বেলাভূমির উপর দাঁড়িয়ে আমার যে আর কিছুই ভাল লাগে না বোস মশাই?"

বোস মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "বৈরাগ্য নাকি?"

বল্লুম, "আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, সংসারে যদিও তুমি সর্ব্বগ্রাসী, তবুও তোমায় দেখিলে চক্ষুর পাতা ফিরিতে চায় না, মনে হয়—তুমি যেন কত আপনার।—

বাসায় ফিরিয়া বোস মশাইয়ের সহিত গল্প করিতেছি, আমার মেসোমহাশয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, মাদ্রাজ সহর তোমার কেমন লাগছে?"

বল্লুম,—"অত্যন্ত খারাপ।"

"কেন?"

"কারণ আমার মন এখানে মোটেই টিকতে চাচ্ছে

না। মানুষের মন যেখানে বসে না, সে দেশকে আমি কেমন করে ভাল বলব বলুন ?"

"তাহলে এখানে এত লোক কেমন করে বাস করছে ?"

আমি বল্লুম, "মানুষের কারো যদি হঠাৎ একটা পা কাটা যায়, তখন বাধ্য হয়ে তাকে অন্যের আশ্রয় নিয়ে সন্ধ্যার আগে একদিন আশে পাশে রাস্তার ধারে একটু লক্ষ্য করে দেখলেই বুঝতে পারবে ছোট বড় কেউ আর বাদ নেই। যত সব ছোটলোকের দল একসঙ্গে বসে বসে ঐ তাড়ি খাচ্ছে। কি জানি, হয় ত ঐটাই ওদের দিনের শেষে আনন্দ-উৎসব।"

সামুদ্রিক আগার—এখানে সমুদ্রের নানা জাতের ও নানা বর্ণের মাছ ও ছোট খাটো জীবজন্তু জীবিত অবস্থায় রক্ষিত আছে

এক পায়েই পথ চলতে হয় ; সুতরাং যেটা যার মজ্জাগত, —যেখানে মানুষ জন্মেছে সুখ সুবিধার অধিকারী হয়ে তার ত সেখানে ভাল লাগবেই।"

"যাক, খাওয়া-দাওয়ার কোনও কষ্ট হচ্ছে না ত ?"

উত্তরে শুধু খানিকটা হাসিয়া বলিলাম, "ভয়ানক।"

আমার মাথা খানিকটা নাড়া দিয়া মেসোমহাশয় কাজে বাহির হইয়া গেলেন। আমি বোস মশাইকে জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা, আমাদের ত মাদ্রাজী খাবারটাবার খাওয়া হোল না।"

"বেশ, আর তার কি, কালই হবে, এখানকার উৎকৃষ্ট খাওয়া হচ্ছে রসম, তারপর তিলের তেল, পেঁয়াজ লঙ্কা, ওল, তেঁতুল, এ সব ত আছেই।"

"তারপর।"

"তারপর নারকেলের তাড়ি যথেষ্টই পাওয়া যায়।

"ঐ কথাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো মনে করছিলুম। সত্যি, কি ব্যাপার বলুন ?, অধিকাংশ নারকেল গাছের মাথাই ত কাটা আর এক একটা
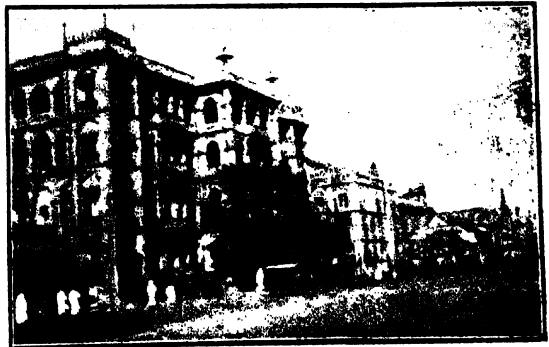
ওয়াই-এম-সি-এ ভবন—মাদ্রাজ

ভাঁড় ঝোলান। তবে কি এদেশে নারকেল পাওয়া যায় না ?"

"পাওয়া যায়, তবে দাম বেশী। বুঝতেই ত পারছ, তাড়ি হলে ত আর নারকেল হবে না।"

হঠাৎ সেদিন রাত্রে দেখি আমাদের বহু-পরিচিত বিনোদদা আসিয়া হাজির। আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, তুই কবে এলি?"

বল্লুম, "রামেশ্বর, মাদুরা প্রভৃতি ঘুরবো বলে বেরিয়েছি।"

বিনোদদা বল্লেন, "আমিও ত যাবো; তবে কাল পরশুর মধ্যেই কিন্তু যেতে হবে।"

নিতান্ত এই নীরস দেশে সঙ্গীলাভ করে অত্যন্ত আনন্দিত হলুম। বিনোদদা রামকৃষ্ণ মঠের একজন ব্রহ্মচারী—তাছাড়া তিনি অনেক দেশ ঘুরেছেন। তিনি আমার মেসোমহাশয়ের ছেলেবেলাকার বন্ধু, তাই তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে না এসে পারেন না। তাঁর মত সঙ্গী পেলে আমার যে কোনও কিছুরই অভাব হবে না তা আমি জানতুম, সুতরাং নিশ্চিন্ত হয়ে রইলাম।

পরদিন মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব। বিনোদদার সঙ্গে আমরা সকলেই হাজির হলাম। বহু ভক্ত ও সাধু-সমাগম হইয়াছিল। প্রসাদ পাওয়ার জন্ত অনেকেই দেখি খুব ব্যস্ত। প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাও ছিল প্রচুর। আমরা কিছুক্ষণ বসিয়া নামকীর্ত্তন শুনিবার পর বিনোদদা ও আর একটী মাদ্রাজী সাধু আসিয়া বলিলেন,—"এইবার কিন্তু তোমাদের প্রসাদ পেতে হবে।"

তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। অবেলায় ভাত ডাল খাবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না; তবু বাঙ্গালীর ছেলে প্রসাদে অভক্তি কোন দিনই নেই; সুতরাং পাতা বিছিয়ে প্রসাদ পেতে আমরা বসে গেলুম। আশার বহু অতিরিক্ত পোলাও, নানা রকম তরকারি, মিষ্টান্ন খাওয়া হলেও একটা জিনিসের আস্বাদ মোটেই ভুলতে পারছিলুম না; সেটা মাদ্রাজীদের উপাদেয় রসম,—অন্ত কিছুই নয়, তেঁতুল আর লঙ্কা গোলা দিয়ে কলায়ের ডালের পাতলা ঝোল। সাধারণ বাঙ্গালীর যা অরুচির খাওয়া তা এদেশের লোকের উপাদেয় খাদ্য। কারুরই দোষ দেওয়া চলে না, কারণ ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি। সাধারণতঃ মাদ্রাজীরা আমাদের মত সরিষার তেল খায় না, তিলের তেলে তাদের রান্না হয়, আমরা যা মোটেই খেতে অভ্যস্ত নই।

মাদ্রাজ-বন্দরের দৃশ্য

সন্ধ্যার পর আমরা বাড়ী ফিরে এলুম। প্রসাদ হলেও খাওয়া হয়ে গিয়েছিল অতিরিক্ত; সুতরাং একটু সকাল সকাল আমাদের মজলিস বন্ধ করে শুয়ে পড়লুম। ঠিক হ'ল পরদিন সকালবেলায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে বিনোদদা আর বোস মশাই এখানে দেখবার যা আছে সব দেখিয়ে দেবেন।

ভোর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই কাণে এসে বাজতে লাগল, অদূরে সমুদ্রের উদ্বেলিত তরঙ্গাঘাতের আওয়াজ। ঝিঁ-ঝিঁর ডাক থেমে গেছে, জোনাকীর আলো নিভে গেছে, তারপর আস্তে আস্তে রাত্রির কালো অন্ধকারও সরে গেল, সবেমাত্র প্রভাতের আলো উঁকি মারতে সুরু করেছে। আমার মনে

হইতে লাগিল যেন প্রাণের ভিতর একটা নূতন জাগরণের সাড়া উঠিয়াছে; দূর হইতে যেন আমার কাণে মহা-সাগরের গান ভাসিয়া আসিতেছে।—এমন সময় হঠাৎ রাস্তা হইতে "কু", "কু" একটা বিকট চীৎকার হতেই দই বিক্রির প্রথার উপর আমি মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারিনি।

যাই হোক রীতিমত সকালবেলা চা টোষ্ট খেয়ে আমি, বিনোদদা আর বোসমশাই এই তিনজনে বেরিয়ে

বিচারালয়—মাদ্রাজ

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি একজন মাদ্রাজি স্ত্রীলোক প্রকাণ্ড একটা কালো হাঁড়ি মাথায় চাপিয়ে ঐ রকম বিকট চীৎকার করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলেছে। অবাক হয়ে বোস মশাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম,—"এ আবার কি ব্যাপার,—ঐ স্ত্রীলোকটা মাথায় কালো হাঁড়িটা নিয়ে চীৎকার করছে কেন?"

বোসমশাই হাসতে হাসতে বল্লেন, "খাবে, ডাকবো?"

বল্লুম, "সে কি, ঐ রকম একটা কেলে হাঁড়ির ভেতর খাবার জিনিষ বিক্রি হচ্ছে?"

"ওতে কি বিক্রি হচ্ছে জানো, টোকো দই,—এদেশে এমনি করে পাড়ায়-পাড়ায় দই ফিরি করে বেড়ায়।"
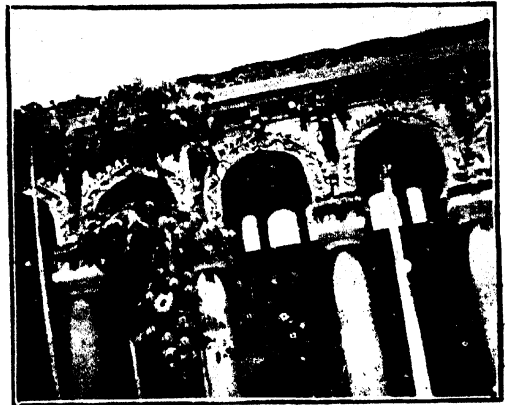
প্রথমটা যদিও ঐ রকম একটা বিকট আওয়াজের জন্যে মনে একটা বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু তখনি অপরের ভাষায় আমি যে অজ্ঞ এ কথাটা ভেবে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে ঐ রকম ভাবে

পড়লুম সহরের দেখবার মত যা আছে তাই দেখতে। রাস্তায় পা বাড়াতেই দেখলুম প্রত্যেক বাড়ীর সামনের খানিকটা করে জলে ভেজান জায়গা আলপনা দিয়ে

মাদুরার প্রাসাদ

আঁকা; আর তারই ওপর যত রাজ্যের আবর্জ্জনার আঁস্তা-কুড় হয়ে আছে। আমি বুঝে উঠতে পারলুম না এমন করে আলপনা দিয়ে ময়লা ফেলার তাৎপর্য্য কি; শেষে

বোসমশাইকে জিজ্ঞাসা করে বুঝলুম, এ দেশের অধিকাংশ বাড়ীর দস্তুরই এই। মানুষের সংস্কার ও অভ্যাসের উপর কোনও কথাই বলা চলে না; সুতরাং বিশেষ আর কোনও কথা না বলে আমরা পার্থ-সারথির মন্দিরে এসে ঢুকলাম। মন্দিরটি খুব বড় না হলেও নেহাত ছোট নয়। ওখানে বেশীর ভাগ মন্দিরেই নারকেলের ভোগ হয়। আমরাও একটা ঝুনো নারকেল ভেঙ্গে পূজা চড়ালাম। বোসমশাই বল্লেন, "দেখছি—তোমার যে খুব ভক্তি হে।" বল্লুম, "বোসমশাই, যদিও আমি আজকালকারই ছেলে, কিন্তু তাই বলে আমি এখনও আমার সংস্কার হারাইনি, তাই মাটীর প্রতিমা দেখলেই আজও আপনা থেকেই মাথা নত হয়ে আসে। বোসমশাই, মাটীর দেবতাই মানুষকে অমর করতে পারে।"

বোসমশাই বল্লেন, "বেশ, চল একবার বাজারটা ঘুরে আসা যাক।" বাজারে ঢুকে দেখি—সহরের বাজার অতি সাধারণ; কোনও জিনিষের বিশেষ কোনও পারিপাট্য নেই,—পেঁয়াজ, লঙ্কা আর তেঁতুলের আমদানীটা আমার চোখে পড়ল বেশী। সমুদ্রের মাছও বিক্রি হচ্ছে; সব বালি মাখানো। শূদ্র আর অপরাপর ছোট জাতরাই মাছ খায়। ওদেশীয় ব্রাহ্মণেরা নিরামিষ আহার করেন; এবং যারা মাছ খায়—তাদের তাঁরা ঘৃণা করেন। প্রকাণ্ড একটা ওল কিনে বোসমশাইকে জিজ্ঞাসা করলুম "আপনি ত প্রায় দু'টি মাস এখানে কাটালেন; এখানকার আচার-বিচার সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা বলতে পারেন?"

তিনি বললেন—"দেখ ভাই, মাদ্রাজে আসা পর্য্যন্ত সমুদ্রের কাছে ট্রিপ্লিকেনেই বরাবর বাস করছি। তা'ছাড়া এ রাস্তাটা সহরের একটা খুব important রাস্তা বলেই মনে হয়। স্কুল, কলেজ, কোর্ট, সমুদ্র সব জায়গায়ই এই রাস্তার ওপর দিয়ে যাতায়াতের সুবিধে। তার ওপর যতটা আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা'তে মনে হয় এ জাতটা ভারী পিট্‌পিটে; ছোঁয়া-নেপা নিয়ে এরা মরে আর বাঁচে। এদিকে দেখ এদের বেশীর ভাগ লোকই এত গরীব, তবুও এরা তাড়ি আর জুয়া না হলে একদণ্ডও বাঁচতে পারে না। অবশ্য ছোট জাতের মধ্যেই এর প্রচলনটা বেশী। আমাদের বাংলাদেশে মেয়েরা যেমন পরদার আড়ালে বাস করে, এ দেশে কিন্তু তেমন নয়, বেপরোয়া চলাফেরা। মোটের ওপর স্ত্রী-স্বাধীনতাটা এখানে খুব বেশী। এ দেশে পুরুষের অনুপাতে মেয়েরাই লেখাপড়ার দিকে বেশী মনোযোগী। এদের মেয়েরা কাছ দিয়ে কাপড় পরে, আর পুরুষরা ঠিক উলটো। কাছা কিম্বা কোঁচা কিছুরই বালাই তাদের নেই। মুসলমানেরা যেমন লুঙ্গি পরে এদের পুরুষরাও ঠিক তেম্‌নি করে একখানা কাপড়

একটা সরোবর—মাদ্রাজ

দুপাট করে লুঙির মত পরে। এমন কি—বড় বড় চাকুরে বাবুরাও পায়ে জুতো না দিয়ে, কাপড়ের ওপর নেকটাই এঁটে আফিস কাছারী করে থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা, সব চেয়ে এরা খেতে কি ভালবাসে বলুন ত ?"

"আগেই ত বলেছি তেঁতুল, লঙ্কা, পেঁয়াজ; তবে সবচেয়ে বেশী খায়—কলায়ের ডাল; কারণ ডালের রসমটাই হচ্ছে এদের একটা উপাদেয় খাদ্য।"

হঠাৎ বিনোদদা বল্লেন, "ওহে, তোমার যদি আর কিছু দেখবার থাকে তাহলে আজই তা সেরে নাও—কারণ—ঠিক করেছি আজই আমরা সন্ধ্যার গাড়ীতে রামেশ্বর রওনা হব—পথে অবশ্য মাদুরায় নামবো।"

বল্লুম, "তবে চলুন, এ্যাকোয়েরীয়ামটা আজকেই দেখা নেওয়া যাক।"

তিনজনেই আমরা এ্যাকোয়েরীয়াম দেখতে গেলুম। সেটা একটা সমুদ্রের নানাবিধ মাছের চিড়িয়াখানা। কত রঙ বেরঙের ছোট বড় লম্বা সরু মাছ যে তাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তা বলা যায় না। সত্যই সেটা দেখবার জিনিষ।

ফেরবার পথে একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের আলাপ হোল। এতদিন ধ'রে কোনও বাঙ্গালীই আমার চোখে পড়েনি। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে জানলুম, বিশ পঁচিশ জন বাঙ্গালী এখানে বাস করেন, কিন্তু এমনি বিড়ম্বনা কেউ কারোর খোঁজ-খবর রাখেন না। এই প্রথম আমার ধারণা হল বাংলাদেশের বাহিরে সামান্য ক-ঘর বাঙ্গালীর মধ্যেও দলাদলি। যাই হোক, তাঁকে আমাদের অভিবাদন জানিয়ে আমরা বাসায় ফিরে এলুম। তখন বেলা হবে প্রায় বারটা। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে দুটি খেয়ে নেওয়া গেল। তারপর একটু বিশ্রাম করে জিনিষপত্র সব গুছিয়ে নেবার ব্যবস্থা আরম্ভ হল, কারণ আগে থেকেই ঠিক করে ফেলেছিলুম আজই মাদ্রাজ সহর ছেড়ে মাদুরা রামেশ্বর যাব। তারপর যদি বরাতে জোটে কলম্বো পর্য্যন্ত পাড়ি দেওয়া যাবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা' হয়নি। তার কারণ passport ও অন্যান্য নানা খুচ্‌রো ইতিহাস।

সমুদ্রের ধারে মুলিয়ারা মাছ ধরছে—এক জনের কোমরে জালের দড়ি বাঁধা রয়েছে

আর কালবিলম্ব না করে বিকেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে সাতটা ক'মিনিটের বোটমেলে (এ দেশের লোকেরা চলতি কথায় এই ট্রেণখানাকে বোটমেল বলে, কারণ এই ট্রেণখানা মাদুরা হয়ে সটাং ধনুষ্কোটি পর্য্যন্ত গিয়ে কলম্বো যাত্রীদের ষ্টীমার ধরিয়ে দেয়) রামেশ্বরের পথে রওনা হয়ে গেলুম। আমাদের সহযাত্রী হলেন

মাদুরায় দৃশ্য

একজন মাদ্রাজি ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে জানলুম-তিনি কোন কলেজের ছাত্র। আমি কল্‌কাতার লোক, এই হিসেবে তিনি আমাকে কনগ্রেস সংক্রান্ত অনেক কথাই জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম, তিনি ত্রিচিনা-পল্লীতে নামবেন। গাড়ীতে ছিল খুব ভীড়, কাজে কাজেই কোনও রকমে ঠেলেঠুলে বসতে হ'ল। যতটুকু পারা যায় বসে বসে ঘুমিয়ে নেওয়া গেল। ভোর রাত্রে যুবকটি নেমে গেলেন। সে রাত্রে আমাদের যাত্রার শেষ ছিলনা; কারণ রামেশ্বর যেতে হলে পরদিন বেলা একটার সময় মাদুরায় গাড়ী পৌছবে। তারপর বেলা চারটেয় ট্রেণ বদলি করে রামেশ্বর। উপায় নেই, পাঁচশ' মাইল পথ আমাদের এমনি করে যেতেই হবে।
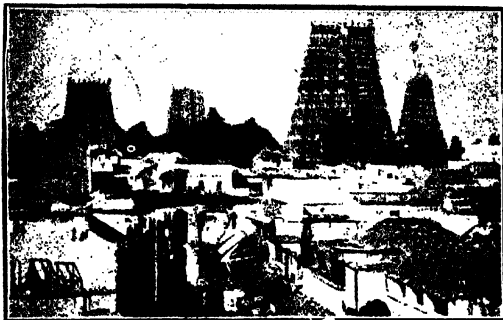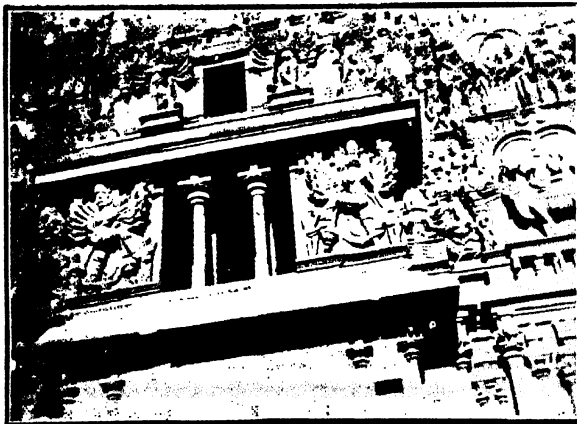
চারিটী মন্দির—মাদুরা

মন্দিরের মধ্যভাগ—মাদুরা

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের গাড়ীগুলো যেমন বিশ্রী, ষ্টেশনগুলোও তেমনি জঘন্য। খাবার জিনিষ ত মোটেই পাওয়া যায় না। মধ্যে মধ্যে এক এক জায়গায় গাড়ী থামছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে পাল, টি, কফি ও উপমাবড়া বিক্রেতার উচ্চ চীৎকারে কাণ যেন একেবারে বধির হয়ে আসছিল। পাল হচ্ছে জোলো দুধ, উপমা বড়া হচ্ছে কলায়ের ডাল আর পিঁয়াজ দিয়ে তিলের তেলে ভাজা একরকম বড়া। সুতরাং দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ করতে আমাদের যা নাকাল হতে হয়েছিল তা আর বিশেষ করে না বলাই ভাল। যাই হোক, কোন প্রকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ীর মধ্যে কাটিয়ে পরদিন বেলা একটার সময় আমরা মাদুরায় পৌছলুম।

নেমে কোথায় একটু শান্তি পাব তা নয়, পাণ্ডার ছড়িদার, অর্থাৎ দালাল এসে পেছু নিলে। তারা বেশ বাংলা বলতে পারে।

কেবলি জিজ্ঞাসা করে, "কোথায় থাকবেন বাবু, কোথায় যাবেন, আপনাদের পাণ্ডা কে?" এই রকম আরও কত কথা।

আর থাকতে না পেরে বললুম,—"বাপু, আমরা তোমাদের দেশে ধর্ম্ম করতে আসিনি, আমাদের কোনও মানসিকও নেই, কেন আমা-দের বিরক্ত করছ?" কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। ছিনে জোঁকের মত তারা আমাদের পেছনে লেগে রইল।

অগত্যা বাধ্য হয়ে একজনকে বললুম—"আচ্ছা, তোমাদের কিছু দেওয়া যাবে, আমাদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিও।"

তাদের নির্দ্দেশ-মত এক ধর্ম্মশালায় ওঠা গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, কিছু জলযোগান্তে মাদুরা সহর দেখতে বেরিয়ে পড়া গেল। সঙ্গে ছিলেন বিনোদবাবু আর ছড়িদার। মাদ্রাজ সহরের তুলনায় মাদুরা বেশ ভালই লাগল। ইতিহাস-বর্ণিত দক্ষিণ

ভারতের মন্দিরের কারুকার্য্য দেখে সত্যিই প্রাণে একটা সাড়া পড়ে গেল।

আমার সঙ্গী বিনোদদাকে বললুম—"দেখুন, এই চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে মাদুরার মন্দিরের চূড়াগুলো কি সুন্দর দেখায়! কত প্রাচীন মন্দির, কিন্তু আজও মনে হচ্ছে যেন কত নূতন।" মন্দিরের গায়ের কারুকার্য্য এত চমৎকার যে তা না দেখলে বর্ণনা করা যায় না। এই মাদুরা জেলার ভাষা হচ্ছে তামিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, এই সহর প্রায় আটশ' বছর আগে পাণ্ডাদের শেষ রাজা সুন্দর পাণ্ডা তৎকালীন জৈ ন দে র উচ্ছেদসাধন করে নিজ অধিকারে আনেন; পরে ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণের দ্বারা মাদুরা অধিকৃত হয়; তারপর ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে মাদুরা পুনরায় হিন্দু রাজার অধীনে আসে। প্রায় তেত্রিশ বছর হিন্দু রাজগণের অধিকারে থাকার পর তৎকালীন নরপতির মৃত্যু ঘটে। সেই সময় মাদুরা রাজ্য খণ্ডীভূত হয়। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যটি চাঁদ সাহেবের অধীনে আসে। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটের নবাবের পক্ষ থেকে ইংরাজেরা এই রাজ্য শাসন করতে আরম্ভ করেন। পরে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে নবাব ইংরাজদের রাজ্যের স্বত্ব ছেড়ে দেন। এই মাদুরার যৎসামান্য ইতিহাস। মাদুরা কাপড়ের জন্যে প্রসিদ্ধ। মাদ্রাজি সাড়ী সবই মাদুরায় প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশের মেয়েরা সাধারণতঃ এগার হাতের বেশী লম্বা কাপড় পরেন না; কিন্তু মাদ্রাজি মেয়েরা ১৩।১৪ হাতের কম লম্বা কাপড়ে কুলোতে পারেন না। কাজেই এদেশে ১৩।১৪ হাতের কম লম্বা কাপড় পাওয়াও যায় না। মাদুরা জেলার অন্তর্গত ডিণ্ডিগুল সহরে বহুপরিমাণে তামাকের চাষ হয়, আর সেই তামাক ত্রিচিনাপল্লিতে এসে চুরুট আকার ধারণ করে নানা দেশে বিক্রয়ের জন্যে প্রেরিত হয়ে থাকে। শোনা যায় ১৬০০ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাদুরা সহরে রোম্যান ক্যাথলিক যাজকরা প্রায় দশ লক্ষ লোককে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষা দেন। যাই হোক, এখন ইতিহাসের কথা ছেড়ে দিয়ে মাদুরার উপস্থিত কিছু কিছু হিসেব-নিকেশ দেওয়া যাক। ভাগৈ নদীর কূলে মাদুরা সহর অবস্থিত। নগরস্থিত দেবালয় আয়তনে, অলঙ্কার-সম্পদে ও শিল্প-নৈপুণ্যে দক্ষিণ ভারতে অতুলনীয়।
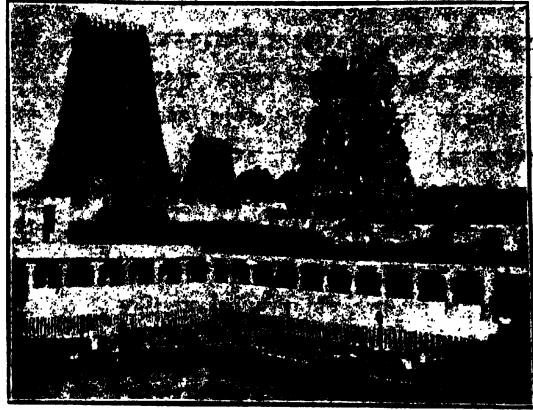
মন্দির-সংলগ্ন পুষ্করিণী

দেবালয়ের প্রধান মূর্ত্তি সুন্দর স্বামী বা সুন্দরেশ্বর। প্রধান নগরের কাছেই মীণাক্ষী দেবীর মন্দির। দেবালয়ের

মাদুরার মন্দির

পরিমাণ উত্তর দক্ষিণে আটশ' সাতচল্লিশ ফিট, আর পূর্ব্ব পশ্চিমে সাতশ' চুয়াল্লিশ ফিট। ন'টি সুউচ্চ স্তম্ভ মানা

দেবমূর্ত্তি সমন্বিত গোপুরম্ এর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করে আছে। সহস্র-স্তম্ভ মণ্ডপ দেবালয়ের প্রধান দর্শনীয় বস্তু। মণ্ডপটি ন'শ' সাতানব্বই স্তম্ভযুক্ত। বিশ্বনাথ নায়কের সেনাপতি ও মন্ত্রী আর্য্য নায়ক এই সুবৃহৎ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের মন্দিরের মত সুন্দর কারুকার্য্যখচিত দেবালয় কুত্রাপি দেখতে পাওয়া যায় না। মন্দিরের কাছেই একটা প্রকাণ্ড সমচতুষ্কোণ জলাশয় আছে। কথিত আছে যে, তৎকালীন তিরুমল নায়ক কর্ত্তৃক টেপ্পকুলম নামে এই বৃহৎ জলাশয়টা প্রতিষ্ঠিত। এই জলাশয়ের প্রত্যেক দিক দু'হাজার চারশ' হাত পরিমিত। জলাশয়ের মাঝখানে একটা দ্বীপ আছে; তার ওপর একটা উচ্চ মন্দির সংস্থাপিত। বছরে একদিন টেপ্পম (এক রকম নৌকা বিশেষ)

গোপুরম্—মাদুরা
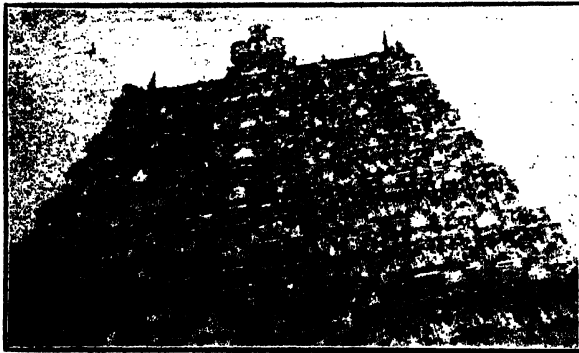
সহযোগে দেবালয়ের মূর্ত্তিগুলি জলাশয়ের চারদিক ঘুরিয়ে আনা হয়, আর সেই উপলক্ষে জলাশয়ের চারি তীরে লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জলিত করা হয়। যদিও আমাদের ভাগ্যে এ দৃশ্য দেখা ঘটে ওঠেনি, তবু বছরের একদিন এই দৃশ্য সত্যিই উপভোগ্য। ছড়িদারের সঙ্গে ঘুরে মন্দিরের ও কাছাকাছি যা প্রধান দেখবার ছিল সব দেখে নিলুম। সমস্ত দিন ট্রেনে জেগে শরীর ও মন এত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে, আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াবার ইচ্ছে হচ্ছিল না। কোন রকমে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হলুম। এর মধ্যে আর একজন বাঙালী ভদ্রলোক ধর্ম্মশালায় জুটেছেন দেখলুম। কথায় কথায় বুঝলুম তিনি কলকাতার কাছাকাছিই থাকেন। সঙ্গে আছেন তাঁর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও একমাত্র অষ্টাদশ বর্ষীয়া কন্যা। ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথা কইছি এমন সময় বৃদ্ধা এসে জিজ্ঞেস করলেন—"তোমরা বুঝি রামেশ্বর যাবে বাবা?"

উত্তর দিলুম—"হ্যাঁ"।

—"আজকেই বুঝি এসেছ?"

বললুম—"আজকেই দুপুরে এসেছি, আজকেই যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ট্রেন না থাকায় কালকে যাব ঠিক করেছি।"

এই সময় মেয়েটি এসে ডাকলে—"ঠাকুরমা, মা ডাকছে একবার এদিকে এস।"

মেয়েটিকে দেখে মনে হল যেন এর ভেতর মোটেই কোনও আড়ষ্ট ভাব নেই; আমাদের দেখে যে কোন লজ্জা বা সঙ্কোচবোধ সে সব এর আছে বলে মনে হল না। তার বাপের সঙ্গে কথা কইছি এমন সময় মেয়েটী এসে আমাদের কথাবার্ত্তা বেশ মন দিয়ে শুনতে লাগল। মাঝে মাঝে দু'এক কথায় যোগ দিতে লাগল। বেশ মনে আছে তার পিতা রামচন্দ্রের সেতুবন্ধ ও রামায়ণ সংক্রান্ত দু' একটি কথা আমাকে শোনচ্ছিলেন, এমন সময় মেয়েটি বললে —"আজকালকার ছেলেরা জলে পাথর ভাসানর কথা বল্লেই হেসে উড়িয়ে দেয় কেন বলুন ত বাবা?"

ভদ্রলোকটির নাম ত্রিলোচন রায়। বয়সে বৃদ্ধ না হলেও যুবক নন।

বললুম—"রায় মশাই, আপনার কন্যাটির কি নাম রেখেছেন বলুন ত? বেশ চালাক দেখছি; পড়াশোনা করে ত?"

ত্রিলোচনবাবু বললেন—"এর নাম হচ্ছে সুধারা, আমরা 'সুধা, সুধা' বলেই ডাকি। ও ওর ঠাকুমার বড় আদরের। গেল বছর Matriculation পাশ করে private এ I. A. দেবার চেষ্টায় আছে।"

সমস্ত শোনার পর ত্রিলোচন বাবুর সঙ্গে বেশ একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে

ঠিক হয়ে গেল কাল আমরা এক সঙ্গেই রামেশ্বর রওনা হব।

অনেকক্ষণ বসে বসে ছড়িদার বললে—"বাবু, তাহ'লে আপনারা খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম করুন, আমি কাল সকালে এসে আপনাদের মন্দির দর্শন করিয়ে নিয়ে আসব।"

ছড়িদার চলে গেলে ত্রিলোচন বাবু বললেন—"আপনার সঙ্গীটির বোধ হয় এতক্ষণ অর্দ্ধেক রাত।"

পিছন ফিরে দেখি বিনোদদা বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমু'চ্ছেন।

তাঁকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"কি, আজ আর খাওয়া-দাওয়া কিছু করবেন না?"

—"এখন আর কোথায় কি পাব যে খাওয়া-দাওয়া করব? কাল সকালে যা হয় চেষ্টা করে দু'টো ডালে চালে ফুটিয়ে নিলেই হবে। তোমার যদি খুব বেশী ক্ষিদে পেয়ে থাকে একটু দুধ কিনে এনে খেতে পার?" বলে তিনি পাশ ফিরলেন।

আর একটী মন্দির—মাদুরা

কে আর দুধ কিনতে যায়, এই ভেবে আমিও কম্বল ও চাদরটা নিয়ে শোবার উপক্রম করছি, এমন সময় ত্রিলোচন বাবুর কন্যা সুধা একটা এ্যালুমিনিয়ামের রেকাবে কিছু ফল ও সন্দেশ নিয়ে এসে বললে—"ঠাকুরমা এই সামান্য ফল ও মিষ্টি পাঠিয়ে দিলেন, বল্লেন রাত-উপোসী থাকতে নেই।"

সুধা এসে কথা ক'টা এমন ভাবে বলে গেল যে তার মানে হয় এখুনি সব না খেয়ে নিলে আর রক্ষে নেই।

বললুম—"ঐখানে রাখ, ডিসটা কাল দিলে চলবে ত?"

বিছানার একধারে ডিসটা নামিয়ে রেখে সুধা তাড়াতাড়ি চাদরটা আমার হাত থেকে নিয়ে পাততে পাততে বললে—"ও এখানকার নয়, কলকাতা থেকে আনা; তিলের তেলের বালাই নেই ওতে।"

বিনোদবাবুকে ডেকে তুলে দু'জনে ফল আর মিষ্টান্ন খেয়ে নিয়ে বললুম—"ভাগ্যিস তোমরা এসেছিলে।"
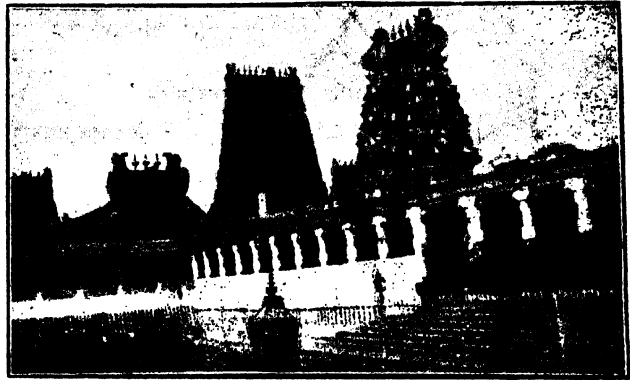
সুধা অমনি হেসে উত্তর দিলে—"আর আপনারা এসেছিলেন, তাই ত দিতে পেলুম।"

বললুম—"বেশ কাল তাহলে দু'টি ভাতও দিও।"

—"সে ত আমাদের সৌভাগ্য; তাহলে আপনাদের কাল আর হাত পুড়িয়ে চাল ডাল ফোটাবার দরকার নেই, বুঝলেন?" বলে সুধা ডিস আর গেলাস নিয়ে চলে গেল। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম এই মেয়েটীর এত মায়া আমাদের ওপর কেন?

(ক্রমশঃ)
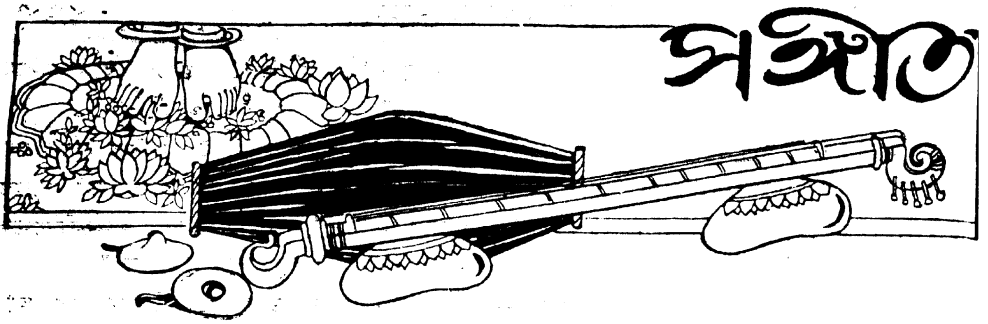
কথা ও সুর ঃ—কাজী নজরুল্ ইস্লাম্। স্বরলিপি ঃ—শ্রীজগৎ ঘটক।

গান

আজি নন্দ-দুলালের সাথে
ঐ খেলে ব্রজনারী হোরি।
কুঙ্কুম আবীর হাতে—
দেখো খেলে শ্যামল খেলে গোরী॥
থালে রাঙা ফাগ,
নয়নে রাঙা রাগ,
ঝরিছে রাঙা সোহাগ—
রাঙা পিচ্‌কারী ভরি॥
পলাশ শিমূলে ডালিম ফুলে
রঙনে অশোকে মরি মরি।
ফাগ-আবীর ঝরে
তরুলতায় চরাচরে,
খেলে কিশোর কিশোরী॥

মা মা II II { । মধা -ধা ধা | ধা -া ণা র্সা I র্সধা -ধণা ধপা -া |
আ জি ০ নন্ দ দু লা ০ লে র সা ০০ থে০ ০

| -া । গমপধা -নর্সা I । পা -পা পর্সা | ণা -ধণধপা মা -গা I
০ ০ ও০০০ ই০ ০ খে লে ব্র০ জ ০০০০ না রী

I গা -মা পা -া | -া -া -া -া } II
হো ০ রি ০ ০ ০ ০ ০

II । গা গা -া | গা মা পা -ধপা I পগা -পমা গা -া | -মগা -রসা সা গা I
• কুম্ কু ম্ আ বী র •• হা •• তে • •• •• দে খো

I । সা গা । | গমা গমা -পধা নর্সা I -া র্সনর্সা -া মা | । গা মা । I
• খে লে • শ্যা • ম • •• •• • •• • ল্ • খে লে •

I র্মর্সা -র্সনা -র্রর্সা -নর্সা | -ধর্সা -র্সণা ণা -ধণধপা I
গো •• •• •• •• •• রী ••••

I । পধা পা ণা | ধা -পা মা গা I গমা -া -পা -া | -া -া -া -া I
• কুম্ কু ম্ আ • বী র হা • • তে • • • • •

I । পা না পা | না -া র্সা র্রা I নর্সা -নর্সা -র্রর্সা নর্সা | -ণা -া -ধণধা -পা I
• খে লে শ্যা ম ল্ খে লে গো• •• •• •• রী • ••• •

I । পা না না | ণা -া ধা -পা I পধা -র্সর্রা -র্গর্মা -র্গর্মর্গর্রা | র্সনা -র্সা । র্জ্ঞা I
• খে লে শ্যা ম ল্ খে লে গো• •• •• •••• • • • •

I র্রর্জ্ঞর্রা র্সনা -র্সা -র্রা | -র্সণা -া -ধণধা -পা I । পা পা পর্সা | ণা -ধণধপা মা গা I
••• • • • রী • • ••• • • খে লে ব্র • জ •••• না রী

I গা -মা মপা -া | -া -া -া -া II II
হো • রি • • • • •

II । মা -া পধা | না না র্সা -া I । না না -র্সা | না র্সর্রর্সা র্সণা -ধা I
• খা • লে • রা ঙা ফা গ্ • ন য় নে রা ঙা •• রা গ্

I । ধর্গা র্গা র্গা | র্গর্মা র্গর্রা র্সনা র্সা I । পনা না র্সর্রা | না -র্সা ণা -ধা I
• ঝ রি ছে রা • ঙা • সো • হাগ্ • রা ঙা পিচ্ কা রী ভ রি

I । পা পা পর্সা | ণা -ধণধপা মা গা I গা -মা মপা -া | -া -া -া -া II II
• খে লে ব্র • জ •••• না রী হো • রি • • • • •

II । র্রা র্রা র্রা র্রা র্রা র্সর্রা -া | - -া -া -া -া । না না না I
• প লা শ শি মু লে • • • • • • • ডা লি ম

I না -না -া -া সর্না -সর্না -সর্না -সর্না | -ধপা -া -পা -ধা -ধর্সা -ধা -র্সা -সরা I
ফু॰ লে • • ॰ • ॰ ॰ •• • • • •• ॰ • ••

I -র্সা -র্রা -র্মর্জ্ঞা -র্রর্জ্ঞর্রর্সা না র্সা র্সর্রর্মর্জ্ঞা -র্রর্জ্ঞর্রর্সা | না র্সা -ণা -া -ধণধা -মপা -া া I
॰ ॰ •• •••• র ঙ নে••• •••• অ শো কে • ••• •• ••

I া না র্সা না র্সা -া -া -া | -ণধা -ণা ণর্রা -র্রর্জ্ঞা -র্রর্জ্ঞ নর্সা -া -া II
• ম রি ম রি ॰ • • •• ॰ • •• • • • ॰

II া পধা ধা ধা | ধা র্সণা ধা ধা I া ধধা ণা র্সা | ধা র্সণা ধা -পা I
• ফা গ আ বী র• ঝ রে ॰ তরু ল তায় চ রা॰ চ রে

I গমা -পধা -নর্সা র্সা | -ণা -ণধা ধা ধা I া ধধা ণা র্সা | ধা র্সণা ধা -পা I
ফা॰ ॰॰ গ • আ বী র • ঝ রে • তরু ল লায় চ রা • চ রে

I া পর্সা র্সা র্সপা | পণা -ধণধপা -মা গা I গা -মা পা -া | -া -া -া -া II II
॰ খে লে কি॰ শো• •••॰ র কি শো • রী ॰ • • ॰ ॰

ঘূর্ণি হাওয়া

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৯)

নন্দার কঠিন ব্যারাম।

একদিন হঠাৎ পড়িয়া গিয়া সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল। চব্বিশ ঘণ্টা পরে সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছিল; কিন্তু সে জ্ঞান বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতেছিল না।

অসমঞ্জ অধীর হইয়া উঠিয়া যেখানে যত ডাক্তার কবিরাজ ছিল সব আনিয়া ফেলিয়াছিল,—ফকীর, সন্ন্যাসী কাহাকেও সে বাদ দেয় নাই। যেমন করিয়াই হোক, নন্দাকে তাহার বাঁচানো চাই, নহিলে তাহার সবই মিথ্যা হইয়া যাইবে।

সেদিন প্রভাতে জ্ঞান হইতে নন্দা যখন বিশ্বপতিকে একবার দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই অসমঞ্জ তাহার জনৈক কর্ম্মচারীকে বিশ্বপতির বাসার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছিল। সেই ভদ্রলোকই অনেক খুঁজিয়া দীর্ঘ দুই ঘণ্টা পরে বিশ্বপতির সন্ধান পাইয়াছিলেন।

বিশ্বপতি যখন সে বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিল, তখন নন্দা আবার মূর্চ্ছিতার মতই পড়িয়া আছে। বিশ্বপতিকে দেখিয়াই অসমঞ্জ তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, "এসেছ বিশুদা, দেখছ—তোমার স্নেহের বোনটীর কি অবস্থা হয়েছে। বাঁচবার কোন আশা নেই,—কখন কি হয়ে পড়বে তার ঠিক নেই। ডাক্তার বলে দিয়েছে, হার্ট ভারি দুর্ব্বল, যে-কোন সময়ে হার্টফেল হয়ে মারা যেতে পারে।

বিশ্বপতি আড়ষ্ট ভাবে নন্দার বিছানার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। শুষ্ক নেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, সেই নন্দার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে, চেনার যো নেই।

আজ কয়দিনকার ব্যারামের যন্ত্রণায় তাহার সোনার মত রং কালি হইয়া গেছে, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে। সে বিছানার পড়িয়া আছে যেন একগাছি শুষ্ক ফুলের মালা,—ফুলের দলগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে,—আছে দুই একটী শুষ্ক দল সহ বোঁটাগুলি। সাক্ষ্য দিতেছে—একদিন সে রূপে গন্ধে অতুলনীয় দলগুলিকে তাজা অবস্থায় একত্র গাঁথিয়া রাখিয়াছিল,—একদিন সেই ফুলগুলি জগতের নয়ন তাহাদের দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল।

আজ তাহার রূপ গিয়াছে, গন্ধ গিয়াছে,—আছে শুধু তাহার থাকার চিহ্নটুকু।

আস্তে আস্তে কখন বিশ্বপতির চোখ দুইটী জলে ভরিয়া উঠিল, চোখের পাতা দুইটী ভিজিয়া ভারি হইয়া গেল; সে নন্দার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

আর্দ্র কণ্ঠে অসমঞ্জ বলিল, "আজ তের দিন ঠিক এই-ভাবেই পড়ে আছে বিশুদা, এই তেরটা দিন আমার যে কি উৎকণ্ঠায় কেটেছে তা কেউ জানে না। কাউকেই দেখাতে তো বাকি রাখছি নে বিশুদা, যে যা বলছে তাই করছি, পয়সার দিকে চাই নি। যেমন করেই হোক আমার শেষ পয়সাটীও ব্যয় করে আমি ওকে বাঁচিয়ে তুলতে চাই বিশুদা,—আমার ওকে চাই-ই, ও না হলে আমার চলবে না।"

সে যেন উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে, তেমনই দৃপ্ত ভাবে তাহার চোখ দুইটী জ্বলিতেছে।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, "আজ কয়দিন ধরে তোমায় দেখতে চাচ্ছে, কয়দিন কেবল তোমার সন্ধানে নানা জায়গায় লোক পাঠাচ্ছি। ভগবান তোমার সন্ধান দিলেন, নইলে তোমায় যদি না পেতুম আর ওর যদি কিছু হতো—"

সে দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তা হলে আমার এ ক্ষোভ রাখবার আর জায়গা থাকত না।"

বিশ্বপতি বদ্ধদৃষ্টিতে নন্দার মুখের পানে তাকাইয়া ছিল। তাহার কাণে তখন কোন কথা আসিতেছিল না, চোখের সম্মুখ হইতে বর্ত্তমান মিশাইয়া গিয়া অতীতের একটী দিনের ছবি জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে সেইদিন—যে দিনে সে এমনই রোগশয্যায় পড়িয়া ছিল, তাহার পার্শ্বে নন্দা ছাড়া আর কেহই ছিল না। নন্দা যখন তাহার বিছানার পাশে পরিপূর্ণ আশার মতই হাসিভরা মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন বিশ্বপতি রোগের যাতনা ভুলিয়া যাইত, বাঁচিবার আশা মনে জাগিত, সাহস আসিত,—আনন্দ হইত। তাহার মনে হইত, একমাত্র নন্দাই তাহাকে বাঁচাইতে পারে,—শমন নন্দার দুইটী কোমল হাতের কঠিন বন্ধন ছিন্ন করিয়া কিছুতেই তাহাকে লইয়া যাইতে পারিবে না।

হইলও তাহাই, নন্দা তাহাকে বাঁচাইল। কত দিন রাত অনাহারে অনিদ্রায় তাহার পার্শ্বে সে কাটাইয়া দিয়াছে, যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। বিশুদার জন্য নন্দার উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না, সে যেখানে গিয়াছে—নন্দার ব্যগ্র ব্যাকুল দুইটী চোখের দৃষ্টি তাহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে।

কিন্তু সে? এমনই বিশ্বাসঘাতক সে যে সেই প্রাণদাত্রীর কথাটী পর্য্যন্ত মনে আনে নাই। সে এই স্বর্গে আসিতে স্বেচ্ছায় পথভ্রান্ত হইয়া উঠিল চন্দ্রার গৃহে, পূতিগন্ধপূর্ণ নরকে। স্বর্গে প্রবেশের অধিকার পাইয়াও যে হারায় তাহার তুল্য হতভাগ্য কে?

বিশ্বপতির চোখ দুইটী কখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া চোখ জ্বালা করিতে লাগিল, তবু সে চোখ ফিরাইতে পারিল না, নন্দার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

অসমঞ্জের অনর্গল কথা চলিতেছিল—সব প্রলাপের মতই অসম্বদ্ধ। নন্দা বিশ্বপতির জন্য কত না কষ্ট পাইয়াছে, কতই না চোখের জল ফেলিয়াছে। বিশ্বপতির অধঃপতন তাহার অন্তরে নিদারুণ ক্ষত উৎপন্ন করিয়াছে। তাহাকে কাছে ফিরাইবার জন্য কত না চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বিশ্বপতির দেখা সে পায় নাই।

শুনিতে শুনিতে বিশ্বপতির মনে হইতেছিল সারা বুকখানা তাহার জ্বলিয়া গেল। সে যেন আর সহ্য করিতে পারে না, ছুটিয়া পলাইতে পারিলেই বাঁচে। কিন্তু যাইবেই বা কেমন করিয়া,—এখান হইতে এক পা নড়িবার সামর্থ্য তাহার নাই।

সন্ধ্যার সময় নন্দা চক্ষু মেলিল, শীর্ণ হাতখানা সামনের

দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল,—"ওগো, শুন্‌ছো—"

অসমঞ্জ তাহার হাতখানা নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। নিজের হাতখানা তাহার মাথায় রাখিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এই যে নন্দা, আমি শুনছি, কি বলবে বল।"

নন্দা দম লইয়া বলিল, "বিশুদা আসে নি? তাকে খুঁজে পেলে না? আমি কিন্তু এইমাত্র স্বপ্ন দেখছিলুম বিশুদা এসেছে, কত কথা বলছে।"

অসমঞ্জ বলিল, "সত্যই বিশুদা এসেছে নন্দা, এই তোমার পাশেই বিশুদা বসে আছে।'

মুখ উঁচু করিয়া নন্দা বিশ্বপতির পানে তাকাইল। হঠাৎ তাহার চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

অসমঞ্জ তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "কাঁদছ কেন নন্দা? বিশুদাকে দেখতে চেয়েছিলে—সে এসেছে, যা বলবার আছে তা বল।"

বিশ্বপতি যেন জড় পদার্থে পরিণত হইয়া গেছে। তাহার মুখে কথা নাই, চোখে পলক নাই। প্রাণবান মানুষটী হঠাৎ যেন পাষাণে পরিণত হইয়াছে।

তাহার কোলের উপর হাতখানা রাখিয়া নন্দা যখন ডাকিল, "বিশুদা—"

তখন আচমকা একটা ধাক্কা খাইয়া তাহার লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

"কি বলছ নন্দা—"

রুদ্ধ কণ্ঠে নন্দা বলিল, "আজ এই শেষ দিনে দেখা দিতে এলে দাদা, ভালো থাকতে একদিন আসতে পারলে না? তোমায় বলব বলে অনেক কথা মনে করে রেখেছিলুম, আজ সে সব হারিয়ে ফেলেছি বিশুদা, কিছু বলতে পারব না। আজ তোমার সময় হল, এত দিনে এতটুকু সময় করে উঠতে পার নি ভাই?"

বিশ্বপতি এত জোরে অধর দংশন করিল যে রক্ত বাহির হইয়া পড়িল।

নন্দা আবার ডাকিল, "বিশুদা—"

বিকৃত কণ্ঠে বিশ্বপতি উত্তর দিল,—"কি?"

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নন্দা বলিল, "কথা বলছ না কেন? না, আমি তোমায় আজ বকব বলে ডাকি নি, বকবার প্রবৃত্তি আমার আর নেই, ক্ষমতাও নেই। তোমায় আজ ডেকেছি শুধু শেষ দেখা করবার জন্যে, শেষ দুটো কথা বলবার জন্যে। বিশুদা—"

বিশ্বপতি তেমনই বিকৃত কণ্ঠে উত্তর দিল, "তোমার পাশেই আছি নন্দা, যাই নি।"

নন্দা বলিল, "তোমায় আজ একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে ভাই। তোমার আগেকার জীবনের সব কথা আমি জানি, বর্ত্তমানের কথাও আমার অজানা নেই,—আমি সব শুনতে পেয়েছি। আমার এই হাতখানা ধরে প্রতিজ্ঞা কর বিশুদা, বল,—তুমি সৎ হবে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আবার সংসারী হবে?"

জিজ্ঞাসু নেত্রে সে বিশ্বপতির পানে তাকাইল।

তাহার শীর্ণ হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বিশ্বপতি বলিল, "প্রতিজ্ঞা করছি নন্দা, তোমার হাত ছুঁয়ে বলছি—আমি ঘরে ফিরে যাব, ভালো হব; কিন্তু সংসারী হব কি নিয়ে? আমার যে কেউ নেই—কিছু নেই।"

ক্লান্তিভরে আবার চক্ষু মুদিয়া আসিতেছিল, প্রাণপণ যত্নে সে ভাব দূর করিয়া নন্দা বলিল, "আবার নতুন করে তোমায় সংসার পাততে হবে বিশুদা—"

বিশ্বপতির চক্ষু দুইটী একবার দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া তখনই স্বাভাবিক হইয়া গেল; সে মাথা নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আর যা বল সব করব, কেবল আবার বিয়ে করে সংসার পাতব না। ওইটী আমায় মাপ কর নন্দা, তুমি তো জানো সবই, আমায় আবার মিথ্যে অভিনয় করতে, মিথ্যে জীবন কাটাতে আদেশ দিয়ো না।"

নন্দা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমি চলে যাচ্ছি বিশুদা, তোমাদের কারও মাঝখানে আর ব্যবধান হয়ে থাকব না। ছেলেবেলার কথা ভুলে যাও ভাই, পূর্ব্ব-স্মৃতি মনে জাগিয়ে রেখে নিজেকে সব রকমে বঞ্চিত করো না।"

বিশ্বপতির মলিন মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। দৃঢ় কণ্ঠে সে বলিল, "মিথ্যে কথা নন্দা, এ একেবারেই অসম্ভব, সেই জন্যেই আমি পারব না। স্মৃতি হতে কোন ছবি মুছে ফেলতে

কেউ কোন দিন পারে নি, পারবেও না; আমার বেলাতেই কি সেই চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম হবে?"

নন্দা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইল। অসমঞ্জের মুখের পানে তাকাইয়া সে হঠাৎ আর্ত্তভাবে কাঁদিয়া ফেলিল।

পক্ষীজননী আর্ত্ত শাবককে যেমন দুটি ডানার নীচে টানিয়া লইয়া ঢাকিয়া ফেলে, অসমঞ্জ তেমনই করিয়া নন্দাকে নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আমি জানি, সব জানি নন্দা, কোন কথাই আমার কাণ অতিক্রম করে যায় নি। ভয় কি নন্দা,—আমি আছি, আমি তোমায় ছাড়ব না। আমি তোমায় অবিশ্বাস করি নি, তোমায় সমস্ত মন দিয়ে ক্ষমা করেছি।"

স্বামীর বুকের নীচে বড় নিশ্চিন্ত হইয়া বড় আরামেই নন্দা ঘুমাইয়া পড়িল।

(২৮)

তিন দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নন্দার বিছানার পাশে সমানে একভাবে বসিয়া থাকিয়াও বিশ্বপতি কিছু করিতে পারিল না। অসমঞ্জের ও তাহার সকল চেষ্টা যত্ন ব্যর্থ করিয়া নির্দ্দয় কাল নন্দার অমূল্য প্রাণ লইয়া চলিয়া গেল।

অসমঞ্জ নন্দার বুকের উপর মাথা দিয়া পড়িয়া রহিল। কি সে তাহার অধীরতা, কি সে যন্ত্রণা,—কিন্তু বিশ্বপতি নীরব—নিস্পন্দ।

সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, নন্দা চলিয়া গেছে, নন্দা আর নাই। সেই নন্দা,—যাহাকে সে এতটুকু বেলা হইতে দেখিয়াছে, কত মারিয়াছে আবার কোলে লইয়াছে, যাহাকে সে নিজের চেয়েও বেশী ভালোবাসিত—সে আজ নাই। তাহার অন্তরে যে চিরস্থায়ী আসন পাতিয়া বসিয়াছিল, কল্যাণী যেখানে প্রবেশাধিকার পায় নাই, চন্দ্রা স্পর্শের অধিকার পায় নাই, সেই নন্দা—সে সকল ভালোবাসা ব্যর্থ করিয়া চিরদিনের মতই চলিয়া গেছে।

যখন তাহার বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিল তখন নন্দার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার জ সুসজ্জিত করা হইয়াছে। অসমঞ্জ উঠিয়া বসিয়াছে, নন্দার নিষ্প্রভ মুখখানার পানে তাকাইয়া নিঃশব্দে সে চোখের জল ফেলিতেছে।

ধড়ফড় করিয়া বিশ্বপতি উঠিয়া পড়িল। সে এ দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারে না, সে পলাইবে।

মৃতদেহ লইয়া পথে বাহির হইয়া অসমঞ্জ বিশ্বপতির হাত দুখানা চাপিয়া ধরিয়া আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "তুমিও সঙ্গে এসো বিশুদা, ওর দেহের সদ্‌গতি করতে হবে—চল। তুমি সঙ্গে না গেলে ওর আত্মা তৃপ্ত হবে না।"

সবেগে মাথা নাড়িয়া বিশ্বপতি বলিল, "না না, আমি যেতে পারব না ভাই, আমায় ক্ষমা কর—চলে যেতে দাও।"

অসমঞ্জ বলিল, "কি করে হবে বিশুদা, ওর—"

বিশ্বপতি বাধা দিয়া আর্ত্ত কণ্ঠে বলিল, "কেন হবে না? ওর ওই দেহখানা পুড়ে আমার চোখের সামনে ছাই হয়ে যাবে, আমায় তাও দেখতে হবে? না, আমি তা সইতে পারব না, কিছুতেই পারব না। অসমঞ্জ, আমার ভালোবাসা স্বর্গীয় নয়, আমি কেবল নন্দার ভেতরকার মানুষটাকেই ভালোবাসি নি, ওর ওই রক্তমাংসের দেহটাকেও ভালোবেসেছিলুম। আমি সব রকমে এমন তাবে পুড়তে পারব না—কিছুতেই না।"

অসমঞ্জের হাত হইতে জোর করিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সে ছুটিয়া পলাইল।

কোথা হইতে কোথায় পা পড়িতেছে তাহার ঠিক নাই, চোখের সম্মুখ হইতে ঘর বাড়ী পথ সব অদৃশ্য হইয়া গেছে।

কোনও ক্রমে বিশ্বপতি যখন চন্দ্রার বাড়ীর দরজায় আসিয়া বসিয়া পড়িল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, পথে পথে বৈদ্যুতিক আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সামনের বাড়ীটায় কে যেন হার্ম্মোনিয়ামের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গাহিতেছে—

প্রিয় যেন প্রেম ভুলো না
এ মিনতি করি হে—

* * * *

আমার সমাধি পরে, দাঁড়ায়ো ক্ষণেক তরে
জুড়াব বিরহ জালা ও চরণ ধরি হে।

"নন্দা নন্দা—"

বিশ্বপতি আকাশের পানে তাকাইল। কোন দিন গানের এই কথাগুলি নন্দার অন্তরে ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল কি ?

কাঁদিতে পারিলে ভালো হইত, কিন্তু এমনই হতভাগ্য সে—কিছুতেই এক ফোঁটা জল তাহার চোখে আসিল না। বুকের ভিতরটা অসহ যাতনায় ফাটিয়া যাইতেছে, চোখের জলে হয় তো এ যন্ত্রণার উপশম হইত।

পাশেই দরজাটা খট করিয়া খুলিয়া গেল, তাহার উপর দাঁড়াইল চন্দ্রা। সম্ভব—কেহ তাহাকে সংবাদ দিয়াছিল বিশ্বপতি ফিরিয়া আসিয়া দরজার ধারে বসিয়া আছে।

একবার তাহার পানে তাকাইয়া বিশ্বপতি চোখ ফিরাইয়া লইল।

চন্দ্রা অগ্রসর হইয়া আসিল, খানিক তাহার পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পর বিশ্বপতির একখানা হাত টানিয়া লইয়া শান্ত সংযত কণ্ঠে বলিল, "ভেতরে এসো।"

বিশ্বপতির সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, মনে পড়িল—আজই সে নন্দার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া শপথ করিয়াছে সে সৎ হইবে—ঘরে ফিরিবে। সে শপথ তাহার রহিল কই,—আবার যে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাকে চন্দ্রার দুয়ারেই আসিয়া দাঁড়াইতে হইল।

চন্দ্রা বলিল, "তবু বসে রইলে কেন, বাড়ীর মধ্যে এসো।"

বিশ্বপতি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, "না চন্দ্রা, আমি আর এ বাড়ীতে যাব না। আজই প্রতিজ্ঞা করেছি এবার হতে সৎ হব—বাড়ী ফিরে গিয়ে সেখানে বাস করব।"

শান্ত কণ্ঠে চন্দ্রা বলিল, "তুমি যে যাবে তা আমি জানি। বাড়ী যাবে যেয়ো, আমিও তোমায় এখানে রাখব না, কাল দিনের বেলা উদ্যোগ করে আমি তোমায় পাঠিয়ে দেব। এখন তোমার মাথার ঠিক নেই, সারাদিন হয় তো জলটুকুও খাও নি,—এ অবস্থায় তোমায় ছেড়ে দিতে পারি নে। তা ছাড়া ট্রেণ কখন তা তোমারও জানা নেই—আমারও জানা নেই। ষ্টেশনে পড়ে থেকে রাত কাটানোর চেয়ে এখানে আজ রাতটা কাটিয়ে যাওয়া ভালো হবে না কি ?"

বিশ্বপতির মন ও দেহ দুই-ই আজ অপ্রকৃতিস্থ ছিল, যন্ত্রচালিতের মতই সে চন্দ্রার অনুসরণ করিল।

(২৯)

দ্বিতলে যে ঘরটায় চন্দ্রা বিশ্বপতিকে লইয়া গেল, প্রথমটায় সে ঘরের পানে দৃষ্টি পড়ে নাই ; খাটে বসিয়াই বিশ্বপতি চমকিয়া উঠিল।

তাহার মনের ভাব বুঝিয়া চন্দ্রা অনুনয়ের সুরে বলিল, "আজ এই ঘরেই থাক গো, তোমায় একা ও-ঘরে রেখে আমার শান্তি হবে না। তা হলে আমাকেও ও-ঘরে তোমার কাছে গিয়ে থাকতে হবে।"

বিশ্বপতি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে হাসিয়া উঠিল—

"আজ যার জন্যে এত ভাবনা চন্দ্রা, কাল সে এতক্ষণ কোথায় থাকবে, শোওয়ার বিছানা পেলে কি না, দুটো ভাত খেতে পেলে কি না তা তো দেখতে পাবে না।"

চন্দ্রা অন্যমনস্ক ভাবে এক দিকে তাকাইয়া রহিল,—অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল।

বিশ্বপতি শুইয়া পড়িয়াছিল, দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়া বলিল, "শুনেছ চন্দ্রা, নন্দা আর নেই, আজ সকালেই সে মারা গেছে ?"

বিকৃত কণ্ঠে চন্দ্রা বলিল, "তোমায় দেখেই তা বুঝতে পেরেছি।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বপতি বলিল, "বুকটা যেন জলে যাচ্ছে, ফেটে যেতে চাইছে, তবু কাঁদতে পারছি নে। ঠিক এই জায়গাটা চন্দ্রা—এখানটায় হাত রেখে দেখ—"

সে চন্দ্রার হাতখানা তুলিয়া নিজের বুকের উপর রাখিল।

চন্দ্রা নত হইয়া পড়িল, তাহার বুকের উপর মুখখানা রাখিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহার কান্না আর থামে না।

চন্দ্রার মাথায় হাতখানা বুলাইতে বুলাইতে বিশ্বপতি বলিল, "কাঁদছ—কাঁদো। উঃ, অমনি করে যদি কাঁদতে পারতুম—"

আর্ত্ত কণ্ঠে চন্দ্রা বলিল, "কাঁদ, খানিকটা কাঁদলে তোমার বুকের যন্ত্রণা কম পড়বে।"

বিশ্বপতি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না, কাঁদতে পারব না চন্দ্রা, বুকটা যেন পাষাণ হয়ে গেছে। আর কত আঘাত সইব চন্দ্রা, সইবারও অতীত হয়ে গেছে। ওকে পরের হাতে দিয়েও সইতে পেরেছিলুম; কিন্তু আজ যে কিছুতেই সান্ত্বনা পাচ্ছি নে। মন যখন বড় খারাপ হতো, ওরই কাছে ছুটে যেতুম। আজ যে আমার জুড়ানোর জায়গা কোথাও রইল না চন্দ্রা—"

চন্দ্রা সোজা হইয়া বসিয়া তাহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বিশ্বপতি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল।

দেয়ালের ঘড়িতে এগারটা বাজিয়া গেল।

চমকিয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "তোমার খাওয়া হয় নি চন্দ্রা ?"

আর্দ্র কণ্ঠে চন্দ্রা বলিল, "খাব এখন।"

"না, তুমি আগে খেয়ে এসো" বলিয়া বিশ্বপতি চন্দ্রার হাতখানা সরাইয়া দিল।

তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ক্ষীণ কণ্ঠে চন্দ্রা বলিল, "না গো, আজ আমায় কিছু খেতে বলো না, আমি খেতে পারব না, আমার খাওয়ার ইচ্ছে নেই। খাব তো রোজই, কিন্তু তোমায় তো রোজ পাব না।"

বিশ্বপতি চুপ করিয়া রহিল।

শেষ রাত্রের দিকে হঠাৎ চন্দ্রার ঘুম ভাঙিয়া গেল; খাটের উপর বিশ্বপতি ঘুমের ঘোরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিতেছে—"নন্দা নন্দা—"

শঙ্কিতা চন্দ্রা দেয়ালের সুইচ টানিয়া দিল। উজ্জ্বল আলোয় সে দেখিল বিশ্বপতি ক্ষুদ্র বালকের মতই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। চন্দ্রা একটা শান্তিপূর্ণ নিঃশ্বাস ফেলিল। অশ্রুধারা যখন গলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে তখন সান্ত্বনা মিলিবে আপনিই।

প্রভাতে বিছানা হইতে উঠিয়াই বিশ্বপতি বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

চন্দ্রা অতি কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া তাহার যাত্রার আয়োজন করিয়া দিতেছিল। যে ছোট ট্রাঙ্কটা বিশ্বপতি লইয়া আসিয়াছিল, এতদিন সেটা আবদ্ধ অবস্থায় ঘরের এক পাশে পড়িয়া ছিল। বিশ্বপতি আর একটা দিনও এ ট্রাঙ্কটার খোঁজ লয় নাই, চন্দ্রাও ইহার মধ্যে কি আছে তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হয় নাই। আজ বহু দিন পরে সেই বাক্সটা খুলিয়া সাজাইয়া দিবার জন্য নন্দার দেওয়া উপহার দ্রব্যগুলার পানে চোখ পড়িতে চন্দ্রা স্তম্ভিত হইয়া গেল।

এক-টুকরা কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা "বউদিকে ভক্তি উপহার"। নীচে নাম লেখা—নন্দা।

নন্দার দেওয়া জিনিসগুলিতে বিশ্বপতি নিজেও হাত দেয় নাই, যক্ষের ধনের মত অতি সন্তর্পণে মানুষের চোখের সুমুখ হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে।

চন্দ্রার চোখ ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া বাক্সের মধ্যে পড়িতে লাগিল। এ সব হইতে সে কোথায়—কতদূরে সরিয়া পড়িয়া আছে। এ সকলের নাগাল পাইবার ক্ষমতা তাহার নাই।

মনে পড়িল দেবতা দর্শনের অধিকার মাত্র তাহার ছিল। মন্দিরের বাহির হইতে সে দেবতা দেখিয়াছে, দরজার উপর উঠিতে কোন দিন সে যোগ্যতা পায় নাই। আজও হৃদয়ে অসীম শ্রদ্ধা প্রেম লইয়া অর্ঘ্য সাজাইয়া সে মন্দিরের বাহিরেই থাকিয়া গেছে, ভিতরে প্রবেশ-লাভের অধিকার সে পায় নাই, কোন দিনই পাইবে না।

দুই হাতে আর্ত্ত বক্ষখানি চাপিয়া ধরিয়া সে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল, "দেহের দেউলে প্রদীপ জ্বলিল, কিন্তু তুমি তো জানিলে না দেবতা ? জন্ম হইতে বঞ্চিতা রাখিয়াছ, দূর হইতে দেখার অধিকারই দিলে,—জীবন-ভোর তোমার আবাহন-গীতি গাহিয়া চলিলাম, তোমায় জাগাইতে পারিলাম না।"

যেমন গোপনে সে বাক্স খুলিয়াছিল তেমনই গোপনে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল।

বিদায়ের কালে সে যখন একতাড়া নোট বিশ্বপতির পকেটে দিল তখন বিশ্বপতি চমকিয়া পিছনে সরিয়া গেল,—"এ কি চন্দ্রা ?"

প্রাণপণে উচ্ছ্বসিত কান্নাটাকে চাপিয়া চন্দ্রা বলিল, "নাও, অনেক দরকারে লাগবে। সৎ ভাবে জীবন কাটাতে গেলেও টাকার দরকার হয়, কেন না চুরি ডাকাতি করতে পারবে না, কোন দিন অদৃষ্টে ভিক্ষেও

না জুটতে পারে। শুনেছি তোমার ঘর পড়ে গেছে, গিয়ে মাথা গুঁজবে এখন একটা আশ্রয় তো চাই।"

বিশ্বপতির চমক লাগিল—তাই বটে।

নোটের তাড়াটা বাহির করিয়া নাড়াচাড়া করিয়া বিশ্বপতি বলিল, "কত দিলে?"

চন্দ্রা বলিল, "বেশী নয়, পাঁচ হাজার।"

বিশ্বপতি যেন আকাশ হইতে পড়িল,—"পাঁচ হাজার! তুমি কি ক্ষেপেছ চন্দ্রা, তোমার যা কিছু সম্বল—যা কিছু জমিয়েছ সব আমায় দিয়ে দিলে? না না, ও সব পাগলামি রাখ, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে বলে' আমার মাথাও তো খারাপ হয় নি যে তোমার সর্ব্বস্ব আমি নিয়ে যাব! আমায় একশ' টাকা দাও, তাতে আমার ঢের চলবে। আমি বেকার অবস্থায় বসে থেকে আমার অতীত জীবনের পাপক্ষয় করবার জন্যে যে কেবল নাম জপ করব তা তো নয়, খেটে খাবই। জমী-জমা করব, তাতে এর পর বেশ আয় দাঁড়িয়ে যাবে যাতে আমার দিনগুলো রাজার হালেই কেটে যাবে।"

সে নোটের তাড়া তুলিতেই চন্দ্রা তাহার পায়ের কাছে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, আর্ত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না গো, এই আমার সর্ব্বস্ব নয়। আমার অনেক আছে—অনেক হবে। আমার মত অভাগিনী মেয়েরা না খেয়ে মরে না। মরলে জীবনে প্রায়শ্চিত্ত হ'ল কই, বুকে আগুন জ্বললো কই? ও টাকা তুমি নিয়ে যাও। আমি যা দিয়েছি তা আর ফিরিয়ে নিতে পারব না।"

বিশ্বপতি কতক্ষণ নির্নিমেষে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নোটের তাড়া পকেটে রাখিল।

চন্দ্রা প্রণাম করিল, বিশ্বপতি একটা কথাও বলিল না।

চন্দ্রা শুধু হাসিয়া বলিল, "পায়ের ধূলো নিলুম, একটা আশীর্ব্বাদও তো করলে না?"

উদাসভাবে বিশ্বপতি বলিল, "কি আশীর্ব্বাদ করব চন্দ্রা?"

চন্দ্রার চোখে জল আসিতেছিল। সে বলিল, "বল—শীগ্‌গির মরণ হোক। আমার কোন দিকেই যাওয়ার পথ নেই, সব পথই কাঁটা ফেলে বন্ধ করেছি। কেবল ওই একটা পথই আমার খোলা আছে। বল—দু একদিনের মধ্যেই যেন মরণ হয়, আমি যেন সকল জ্বালা জুড়াতে পারি।"

বিশ্বপতি অকস্মাৎ যেন সচেতন হইয়া উঠিল, এবং আজ ভালো করিয়াই সামনের মানুষটার পানে তাকাইল।

ইস, এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে চন্দ্রার! এ তো একদিনের পরিবর্ত্তন নয়! কত দিন ধরিয়া অল্পে অল্পে চন্দ্রার দেহ ক্ষয় হইয়া আসিতেছে, তাহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মলিন হইয়া আসিয়াছে, বড় বড় দুটি চোখের নিচে কালি পড়িয়া গেছে। সমস্ত মুখখানার উপরে যে ক্লান্তির ছায়া জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা তো বিশ্বপতি একদিনও দেখে নাই। নিজের খেয়ালেই সে চলিয়াছে। আর একটা মানুষ যে তাহার খেয়ালের জন্য নিজের সুখ-শান্তি, যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতেছে, তাহা সে জানিতেও চাহে নাই।

বিশ্বপতি চন্দ্রার মাথায় হাতখানা রাখিল। স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "না চন্দ্রা, সে আশীর্ব্বাদ আমি করব না, করতে পারব না। আশীর্ব্বাদ করছি তুমি সৎ হও, তোমার তুমিকে কল্যাণময় ভগবানের নামে সঁপে দাও, তাঁর কাজ কর।"

"পারব? আমি সৎ হতে পারব? আমার দ্বারা ভালো কাজ হতে পারবে?"

চন্দ্রা ব্যগ্রভাবে বিশ্বপতির হাতখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিল।

শুষ্ক হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "পারবে না কেন চন্দ্রা? ভগবান তো সাধুর জন্যে নন, তিনি পাপীর জন্যেই রয়েছেন। মহাপাপী জগাই মাধাই পরিত্রাণ লাভ করেছিল, আমার মত মহাপাপীও পরিত্রাণ পাওয়ার আশা যখন করছে, তখন তুমিও পাবে না কেন চন্দ্রা? আমার চেয়ে মহাপাপ তো তুমি কর নি, তবু আমি যখন সৎপথে সৎ হয়ে চলবার আশা করছি, তুমিও সে আশা করতে পারো।"

চন্দ্রা বিশ্বপতির চরণে মাথা রাখিল, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তোমাকেই এই যাত্রাপথের গুরু বলে নিলুম। আজ আমায় যে নূতন ব্রতে ব্রতী করে গেলে, আশীর্ব্বাদ করে যাও—আমার সে ব্রত যেন সম্পূর্ণ করতে পারি।"

নিঃশব্দে সে চোখের জলে বিশ্বপতির পা ভিজাইয়া দিল।

"আসি চন্দ্রা, ট্রেণের সময় হয়ে এলো—"

চন্দ্রা উঠিল, অতি কষ্টে প্রবহমান চোখের জল সামলাইয়া বলিল, "এসো—"

কুলীর মাথায় সেই পুরাতন ট্রাঙ্কটী চাপাইয়া বিশ্বপতি বাড়ীর বাহির হইল।

পথে বাঁক ফিরিবার সময় সে একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল—খোলা দরজার উপর দাঁড়াইয়া চন্দ্রা,—অসহ্য কান্নার চাপে সে আর যেন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছে না, তবু সে চাহিয়া আছে সেই পথটীর পানে—যে পথ বাহিয়া তাহার প্রিয় চিরকালের মতই চলিয়াছে। হয় তো আজ এই চিরবিদায়-ক্ষণে তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে সেই দিনটীর কথা—যেদিনে ওই পথেই সে আসিয়াছিল।

একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বপতি চোখ ফিরাইল।

সামনে পথ—ওই পথ বাহিয়া তাহাকে চলিতে হইবে, পিছনের দৃশ্য অদৃশ্য হইয়া যাক।

(৩০)

দীর্ঘ তিন বৎসর পরে বিশ্বপতি আবার গ্রামের বুকে পদাপণ করিল।

গ্রামের যেন আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে,—সবই আছে অথচ যেন কিছুই নাই।

পথ দিয়া চলিতে বিশ্বপতি দুই দিক পানে চাহিতেছিল। দেখিতেছিল সে যাহা দেখিয়া গিয়াছিল সেগুলি ঠিক আছে কি না।

আষাঢ়ের আকাশ মেঘে ঢাকা। কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে বর্ষা নামিয়াছে, শুষ্ক খাল বিল পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, পথের ধারে ধারে জল জমিয়াছে। শুষ্কপ্রায় গাছগুলিতে নূতন পাতা ধরিয়াছে। খানিক আগে যে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেছে তাহার জল এখনও টুপটাপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। চারি দিক দিয়া জলধারা ছুটিয়া খাল বিল পুষ্করিণীতে পড়িয়া সেগুলিকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। কালো আকাশের বুক চিরিয়া মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে,—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুরু গুরু মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে।

দূরে সোঁ সোঁ করিতেছিল। কোথা হইতে ঝর ঝর করিয়া অজস্র বৃষ্টিধারা আসিয়া পড়িল চঞ্চল কলহাস্য-পরায়ণ একদল শিশুর মতই। নিমেষে তাহারা আবার কোথায় বিলীন হইয়া গেল। পিছনে রাখিয়া গেল কেবল তাহাদের আসার চিহ্নটুকু।

ছাতা ছিল না,—সেই বৃষ্টিধারা বিশ্বপতির সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া দিয়া গেল। দূর হইতে যখন বৃষ্টি আসিতেছিল, তখন বিশ্বপতি মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিতেছিল। যখন তাহাকে সিক্ত করিয়া দিয়া পিছনে ফেলিয়া সে ধারা আবার চলিয়া গেল, তখনও সে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিল।

সুন্দর—অতি সুন্দর। খোলা মাঠে বৃষ্টির এই খেলা কি চমৎকার! জলধারার উন্মাদ নৃত্য নূপুরের ঝম ঝম শব্দ কানে আনিয়া পাগল করে, ইহার শীতল স্পর্শে সকল জ্বালা যেন জুড়াইয়া যায়।

বাড়ীর কাছে আসিয়া বিশ্বপতি থামিল।

বর্ষাস্নাত জনবিরল পথ। এতখানি পথ আসিতে কাহারও সহিত দেখা হইল না। গ্রাম্য পথ যেন এই দিনের বেলাতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বৃষ্টির নূপুর তাহার বুকে বুঝি সুরের তন্দ্রাজাল বুনিয়া দিতেছে। আকাশ মাদল বাজাইয়া সুরের তাল রাখিতেছে।

একখানি ঘর কোনক্রমে এখনও দাঁড়াইয়া আছে, আর দুখানি পড়িয়া গেছে। যে ঘরখানি দাঁড়াইয়া আছে তাহার দরজা বন্ধ।

"সনাতন—"

দীর্ঘ তিন বৎসর পরে নিজের বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া সে ডাকিল।

প্রকৃতির নিস্তব্ধতা টুটিয়া গেল। পাশেই একটী গাছের ডালে জলসিক্ত দেহে একটী কাক বসিয়া ঝিমাইতেছিল, অকস্মাৎ শব্দে চমকিয়া সে তাকাইয়া দেখিল।

বিশ্বপতি আবার ডাকিল—"সনাতন—"

পাশের বাড়ীর জানালা পথে বৃদ্ধা মুখুর্য্যে-গৃহিণীকে দেখা গেল।

"কে, বিশু,—ফিরে এসেছ বাবা? আমাদের বাড়ী

এসো। ঘর তোমার চাবী বন্ধ, চাবী আমার কাছে রয়েছে।"

বিশ্বপতি জিজ্ঞাসা করিল, "সনাতন কি মেয়ের বাড়ী গেছে কাকিমা?"

কাকিমা উত্তর দিলেন, "আ আমার পোড়াকপাল রে,—সে খবরটাও পাও নি! সে কি আর আছে বাবা? আজ মাস তিনেক হল সে মারা গেছে। চাবি আর কারও কাছে দিয়ে গেল না—আমার হাতে দিয়ে গেল। অসুখ শুনে ওর মেয়ে জামাই এসে নিয়ে যাওয়ার জন্তে সে কি টানাটানি! তবু কিছুতেই যদি সে গেল। স্পষ্ট বললে—"দা ঠাকুর আমায় বাড়ী চৌকি দিতে রেখে গেছে। বেঁচে থাকতে এ বাড়ী ছেড়ে আমার যাওয়া হবে না।" হলও ঠিক তাই, ওইখানে—তোমার ভিটেতেই সে মরল—তবু গেল না।"

নন্দা—সনাতন,—

কোথায় তাহারা? তাহারা আজ ওই উর্দ্ধ লোকে স্থান পাইয়াছে। ওখান হইতে তাহারা হতভাগ্য বিশ্বপতির পানে তাকাইয়া আছে কি?

শ্রান্তদেহ বিশ্বপতি দাঁড়াইতে অক্ষম হইয়া বারাণ্ডায় বসিয়া পড়িল।

সে দিনটা বাধ্য হইয়াই তাহাকে কাকিমার বাড়ীতে থাকিতে হইল। পরদিন সকাল হইতে সে নিজের গৃহ-সংস্কারের জন্য লোকজন যোগাড় করিতে ব্যস্ত হইল।

মিস্ত্রী নিযুক্ত হইল—নূতন ঘর তুলিতে হইবে। এই তাহার পিতৃপুরুষের ভিটা। এইখানেই তাহাকে থাকিতে হইবে। এখান হইতে সে আর কোথাও যাইবে না। হাতে যখন সে টাকা লইয়াছে—পিতৃপুরুষের ভিটা, নিজের জন্মভূমি সে ধ্বংস হইতে দিবে না।

বর্ষার জন্য ঘরের কাজ বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না,—মাঝামাঝি স্থগিত হইয়া গেল।

পাড়ার পাঁচজন পরামর্শ দিলেন—এইবার বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হও বাছা,—আর এমন করে লক্ষী-ছাড়ার মত টো টো করে বেড়িয়ো না।

বিশ্বপতি একটু হাসিল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলিল।

বর্ষা অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন ঘরের কাজ আবার আরম্ভ হইল। শীঘ্রই ঘর শেষ হইয়া গেল। একদিন বিশ্বপতি নূতন ঘরে প্রবেশ করিল।

এত দিন পরে সে চন্দ্রাকে একখানি পত্র দিল,—সে নূতন ঘর তুলিয়াছে, যদি চন্দ্রা এক দিন কিছুক্ষণের জন্যও এখানে আসে—যদি দেখিয়া যায়, বিশ্বপতি বড় আনন্দ পাইবে।

চন্দ্রা উত্তর দিল, তাহার গ্রামে ফিরিবার মুখ নাই। কলঙ্কিনী চন্দ্রার কলঙ্কময় পায়ের চিহ্ন পবিত্র গ্রাম-মাতার পথের ধূলায় আর অঙ্কিত হইবে না। বিশ্বপতি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে শুনিয়া সে বড় আনন্দিত হইয়াছে। বিশ্বপতির সামনে সে আর যাইবে না। নিজেকে সে ভয় করে, প্রলোভনের বস্তু হইতে তাই সে তফাতে থাকিতে চায়। তাহার অবস্থা বুঝিয়া বিশ্বপতি যেন তাহাকে ক্ষমা করে, সে এই প্রার্থনা করিতেছে।

আজ কল্যাণীর কথা বিশ্বপতির মনে জাগিল না। জাগিল খুব বড় হইয়া এই যথার্থ দুর্ভাগিনী মেয়েটীর কথা, যে তাহাকে ভালোবাসিয়া কেবল তাহাকে বাঁচাইবার জন্যই জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য দূরে চলিয়া গেছে,—তাহাকে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিশ্বপতির মন আজ উঁচু সুরে বাঁধা। সে নিজেকে ফিরাইয়াছে। নন্দার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার মনে বিশ্বাস আছে—জোর আছে—সে আর পদচ্যুত হইবে না।

চন্দ্রাকে সে আজ বড় করুণার চোখেই দেখে, চন্দ্রার জন্য সে বড় বেশী রকমই ভাবে। চন্দ্রা মুক্তি পাক, সৎ হোক, শান্তিলাভ করুক—আজ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া সে ইহাই প্রার্থনা করে।

(ক্রমশঃ)

"ভিক্ষুণী আজি কাঁদে সম্মুখে গৌতমের"

শ্রীরামেন্দু দত্ত

সেদিন আমারে কী আবেগ-ভরে
প্রদোষ-গগনে কিরণ-পথে
ডাকি' চলি' গেলে ছুটায়ে তোমার
সপ্ত-অশ্ব-হিরণ-রথে !
গোধূলি তখন ধূসর ক'রেছে ধরণীতল,
হাসায়ে তুলেছে গভীর শীতল দীঘির জল,
রঙে সুষমায় মোহ-মায়াময় জলস্থল
আমায় চাহিছে টানিয়া ল'তে,
মরীচিকা-মায়া ধরিয়াছে কায়া কী উজ্জ্বল !
মুগ্ধ মরমে পুলক-স্রোতে !

সেদিন তখনো ছেলেখেলা যত
বাকী ছিল এই বিশ্বমাঝে,
ছু'দিনের তরে রাজা হয়ে, হেসে—
কেঁদে ফেরা পুনঃ ভিখারী সাজে !
বেদনার ভার শোক-হাহাকার ব্যাধির জ্বালা,
নিত্য নিয়ত ব্যথিত হিয়ার অশ্রু ঢালা—
তখনো দুখের সূত্রে গাঁথিনি সুখের মালা,
—সে অনুতাপের অন্ত আছে ?
ছেলেখেলা ফেলে হায় গো সেদিন সন্ধ্যাবেলা
যদি যাইতাম তোমার কাছে !

সেদিন গগনে তব আহ্বান
আলোক-ধারায় উঠিল ফুটি'
কিছু বুঝি নাই, বিস্ময়ে সুধু
বিস্তৃত হ'ল চক্ষু ছ'টি !
তখনো জ্যো'স্না গলিয়া পড়েনি প্লাবিয়া ভূমি,
তখনো কুসুমে মধুর মলয়া যায়নি চুমি'—
পূর্ণিমা রাতে পূর্ণ করিতে ডাকিলে তুমি,
ধরণী আমায় দিল না ছুটি।
আজি মনে হয় কেন যে সেদিন ছুটিয়া গিয়া
পড়িনি তোমার চরণে লুটি' ?

তখনো মেটেনি বাসনা তিয়াস
মর্ত্ত্য তখন রঙীণ, নব।
ভাবিলাম মনে কত না রতনে
শূন্য এ ঝুলি ভরিয়া ল'ব !
তখন তোমার মধুর কণ্ঠ পশিল কাণে
নব-জীবনের নূতন সাধের মধ্যখানে,
বিপুল আবেগে অবনী তখন আমারে টানে,
দেখিতে দিল না মূরতি তব ;
একা চলি' গেলে হৈম বরণ হিরণ-রথে
মরম যাতনা কাহারে ক'ব ?

এখন বসিয়া রহেছি হে নাথ,
জ্বলে জীবনের সন্ধ্যা-চিতা !
নাহি প্রিয়জন, নাহি পরিজন,
ছেড়ে চ'লে গেছে যতেক মিতা !
অসার হ'ল অন্ধ আবেগ যৌবনের
ফুরাইয়া গেল মধু ও গন্ধ মৌ-বনের,
—ভিক্ষুণী আজি কাঁদে সম্মুখে গৌতমের !—
মোহনীয়া মায়া কাঁপিছে মরণ-ভীতা !
মহিমা-কিরণে প্লাবিয়া গগন একটিবার,
নামিয়া আবার এস গো পিতা !

মাংসাশী গাছপালা

শ্রীদেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, বি, এস্‌সি,

আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলে এক প্রকার ভয়ানক উদ্ভিদের কথা ছোট-বেলায় অনেকেই শুনিয়াছেন। এই সকল রক্তপিপাসু বিশাল উদ্ভিদের দ্বারা আক্রান্ত, অসহায় পথিকদের অবস্থা মনে করিয়া, আমাদের শিশু-মন মাঝে মাঝে ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছে এবং এক প্রকার স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হইয়া আমরা ইহাদের বিষয়ে কত কথাই না ভাবিয়াছি। এমন কি বয়োবৃদ্ধির সহিতও ইহাদের নিষ্ঠুর আচরণ অনেকের মনে পূর্ব্বের ন্যায়ই ভীতির চিত্র আনিয়া দিয়াছে।

ঘটাকৃতি ফাঁদ সমেত কমণ্ডলু গাছের" একটী পাতা। L—ঢাকনি (lid) ; N—গ্রীবা (Nick) ; B—উদর (Belly)

প্রকৃত পক্ষে আফ্রিকার হিংস্র গাছপালার যে বিবরণ পূর্ব্বে আমরা পাইয়াছি—সে প্রকার উদ্ভিদ আফ্রিকা কেন পৃথিবীর কোন স্থানেই পাওয়া যায় না—ইহা বিজ্ঞান সন্ধান লইয়া বলিয়া দিয়াছেন। সে সকল উদ্ভিদ ক্রমেই আমাদের কল্পনারাজ্যে স্থান পাইতেছে, এবং ভ্রমণকারিগণ নির্ভয়ে আফ্রিকা পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু হিংস্র গাছপালা একেবারে নাই, এ কথাও বিজ্ঞান বলেন না। বিজ্ঞানের মতে যে সকল উদ্ভিদ মাংসাশী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে তাহারা সাধারণতঃ কীট পতঙ্গাদি খাইয়া থাকে মাত্র। আমাদের নিকট ইহাদের আধুনিক পরিচয়টা যদিও পূর্ব্বের ন্যায় ভয়ের উদ্রেক করে না তথাপি নিরীহ কীটপতঙ্গাদির নিকট ইহারা চিরকালই হিংস্র এবং রক্তপিপাসু বলিয়া পরিচিত থাকিবে।

এই প্রবন্ধে আমরা কয়েকটী সাধারণ হিংস্র গাছপালার বিবরণ, এবং তাহাদের শীকার ধরিবার প্রণালী সম্বন্ধে স্থূল ভাবে আলোচনা করিব। ইহাদের বর্ণনায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যথাসম্ভব বর্জ্জন করা হইবে এবং নিম্নে কয়েকটী চিত্রের সাহায্যে সাধারণ পাঠকবর্গ সহজেই ইহাদের কার্য্যকলাপ বুঝিতে পারিবেন, আশা করা যায়।

কয়েকটী হিংস্র গাছপালা—

(১) কমণ্ডলু গাছ (Pitcher Plants.)
(২) রৌদ্র শিশির গাছ (Sundew Plants.)
(৩) মক্ষিকাজাল গাছ (Venus Fly trap.)
(৪) স্ফোটকধারী গাছ (Bladderworts.)

(১) কমণ্ডলু গাছ (Pitcher Plants.)—

মালয় উপদ্বীপ এবং মাদাগাস্কার দ্বীপে এই জাতীয় গাছ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আসামের খাসিয়া এবং গারো পাহাড়ে এই গাছ পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইহারা আয়তনে বেশী বড় হয় না।

(ক) বিবরণ—

কমণ্ডলু গাছের পাতাগুলি অতি অদ্ভুত ধরণের। প্রত্যেক পাতার মধ্যবর্ত্তী শিরা পাতার অগ্রভাগ হইতে প্রলম্বিত হইয়া কিছু দূর একটা মোটা সুতার ন্যায় গিয়া একটী ছোট ঘটের ন্যায় আকারে শেষ হইয়াছে। এই ঘটাকৃতি দ্রব্যটী কীট পতঙ্গ ধরিবার ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নহে (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। ঘটাকৃতি ফাঁদটী পাতার একটী রূপান্তরিত অংশ, এবং গাছের প্রত্যেক পাতায় এই প্রকার একটী করিয়া ঘট থাকে বলিয়া ইহাদের "কমণ্ডলু গাছ" নাম দেওয়া হইয়াছে।

(খ) "কমণ্ডলু ফাঁদের" বিভিন্ন অংশ—

ডালা বা ঢাকনি (lid)—

ফাঁদের এই অংশটী ঘটের উপরে একটী ঢাকনির ন্যায় দৃষ্ট হয়।

ঢাকনির ভিতরের দিকটী বিচিত্র বর্ণে শোভিত (১নং চিত্রে L চিহ্নিত অংশ)।

ঘটের গ্রীবা (Neck)—

ইহা ঘটের উদ্গত প্রান্ত (rim) এবং প্রশস্ত তলদেশ অংশের মধ্যে অবস্থিত (চিত্রে N—C চিহ্নিত অংশ)। এই স্থানটী বেশ মসৃণ।

ঘটের উদর (Belly)—

ইহা ঘটের তলদেশে অবস্থিত প্রশস্ত অংশ ("B")। উদরের অভ্যন্তরস্থিত দেওয়ালের তলভাগে অনেক লালাগ্রন্থী আছে। এই সকল লালাগ্রন্থী (Glands) হইতে এক প্রকার হজমী রস নির্গত হয়।
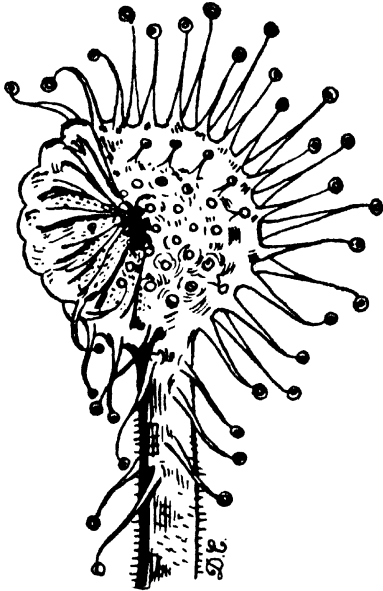
একটী পিপীলিকা ধরিবার প্রণালীতে "রৌদ্র-শিশির" গাছের পাতা

(গ) খাদ্য আহরণ প্রণালী—

প্রথমতঃ ঢাকনির জমকালো রং দেখিয়া কীট পতঙ্গাদি দূর হইতে ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহারা আসিয়া ঘটের উদ্গত প্রান্তে উপবেশন করে। এই স্থানে একপ্রকার মিষ্ট তরল পদার্থ নিঃসৃত থাকে। এই তরল মিষ্ট রস পান করিতে করিতে উহারা আনন্দে ঘটের উদ্গত প্রান্তের আশে পাশে বেড়াইতে থাকে ; আবার মধ্যে মধ্যে আসিয়া সেই মধু খায়। এই প্রকারে যদি কোন পতঙ্গের পা ঘটের ভিতর দিকের মসৃণ গায়ে পড়ে, তৎক্ষণাৎ পতঙ্গটী পিছলাইয়া ঘটের ভিতরে পড়িয়া যাইবে। পিছলাইয়া যাইবার প্রধান কারণ যে, ঘটের গ্রীবার ভিতরের অংশটী অতিশয় মসৃণ, এবং তাহাতে পা পড়িলে পায়ে ভর রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অনেক সময় মধুপানে রত দুর্ব্বল পতঙ্গগুলিকে অধিক বলবান পতঙ্গ ধাক্কা দিয়া ঘটে ফেলিয়া দেয়, এবং তাহাদের স্থানে বসিয়া মধু খাইতে থাকে। ঘটের উদরে হজমীরস মিশ্রিত একপ্রকার জলীয় পদার্থ থাকে। যে সকল পতঙ্গ উপর হইতে পিছলাইয়া বা অন্য কোন উপায়ে ভিতরে পতিত হয় তাহারা অভ্যন্তরস্থিত এই জলে ডুবিয়া মরে।

ঘটের অভ্যন্তরে ইহাদের মৃত্যুর পর ঘটস্থ হজমী রস ইহাদের দেহের মাংসকে ক্রমে পরিপাক করে এবং এই পরিপক্ক সহজ আমিষ খাদ্য
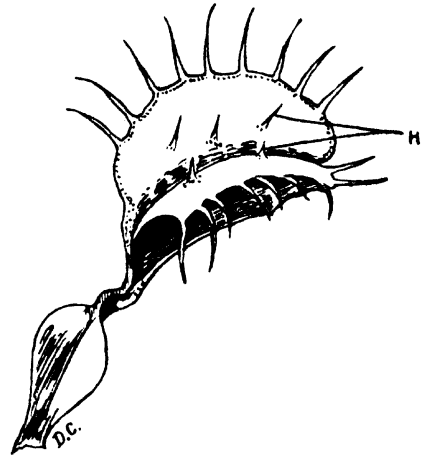
"মক্ষিকা জাল" গাছে একটী পাতা। H—সচেতন রোম

"কমণ্ডলু গাছে" সঞ্চারিত হয়—ইহাকেই আমরা বলিয়া থাকি যে কমণ্ডলু গাছ কীটপতঙ্গ খায়। পতঙ্গের দুই একটী পক্ষ ব্যতীত (শর্করা জাতীয় খাদ্য ব্যতীত) ইহার সমস্ত দেহই পরিপক হইয়া কমণ্ডলু গাছে সঞ্চারিত হইয়া যায়।

পত্রের অগ্রভাগে এই প্রকার ঘটধারী গাছগুলিকে সাধারণ ভাষায় "কমণ্ডলু গাছ" নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানের মতে দেখিতে গেলে এই নামে কয়েকটী গাছকে বুঝান হয়। নিম্নে কয়েকটী কমণ্ডলু গাছের নাম দেওয়া গেল—

গাছের নাম।	পৃথিবীর কোন্ অংশে পাওয়া যায়।
১ নেপেন্থেস্ (Nepenthes)	ভারতবর্ষ (আসাম), আফ্রিকা ও মালয়।
২ স্যারাসোনিয়া (Sarracenia)	উত্তর আমেরিকা।
৩ ডার্লিংটোনিয়া (Darlingtonia)	ক্যালিফোর্নিয়া।
৪ সেফালোটাস্ (Cephalotus)	অষ্ট্রেলিয়া।
৫ হেলিয়াম্ফোরা (Heliamphora)	গুইয়ানা।

"কমণ্ডলু গাছের" বিবরণ হইতে এ কথা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে জীবজন্তুর ন্যায় শীকারের পশ্চাতে দৌড়াইয়া খাদ্য আহরণ করিতে পারে না বলিয়া ইহারা কৌশলে একপ্রকার ফাঁদ সৃষ্টি করিয়া খাদ্যের অপেক্ষা করে। এই ফাঁদের বিভিন্ন অংশগুলির গঠনকার্য্য এবং তাহাদের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত প্রতিভা অনুভব করিলে মনে হয় যে মানবজীবন এবং অন্যান্য পশুজীবনের ন্যায় এই মূক স্থাবর উদ্ভিদ জীবনও নিজেদের প্রাণ ধারণের সমস্যাটী অতি গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে।
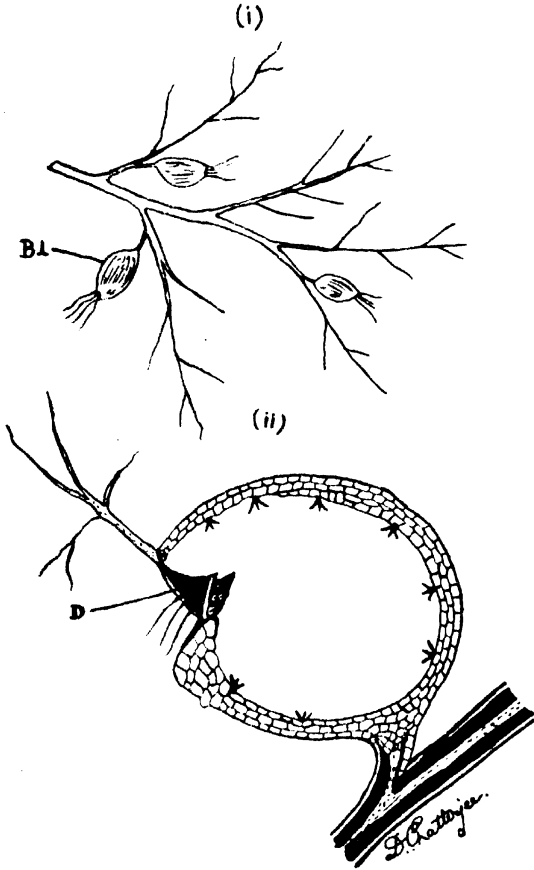
"স্ফোটকধারী" গাছের চিত্র। (i)—একটী পত্রে কয়েকটী স্ফোটক-ফাঁদ Bl-স্ফোটক (Bladder). (ii)—একটী স্ফোটক বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। D—ফাঁদের প্রবেশদ্বার

(২) রৌদ্রশিশির গাছ (Sun-dew plants)—

নাতি-শীতোষ্ণ এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই সকল গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ জলাভূমি বা বালুকাময় অনুর্ব্বর জমিতে ইহারা জন্মে। ইহারা আকারে বেশী বড় হয় না (৩।৪ ইঞ্চি হইতে ৮।১০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত)।

(ক) বিবরণ এবং কার্য্যপ্রণালী—

এই সকল গাছের পাতাগুলি বৃত্তাকার এবং পত্রের উপরিভাগ রোম-বিশিষ্ট। রোমগুলির অগ্রভাগে বিন্দু বিন্দু তরল পদার্থ সঞ্চিত থাকে। এই বিন্দুগুলি সূর্য্যালোকে শিশির-বিন্দুর মত দীপ্তি পায়। সেই জন্য ইহাদের নাম "রৌদ্রশিশির গাছ" দেওয়া হইয়াছে (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

এই সকল বিন্দুগুলিকে কোনপ্রকার তরল খাদ্য ভ্রম করিয়া কীট-পতঙ্গ দূর হইতে ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহাদের নিকট আসিয়া খাদ্যপ্রাপ্তির আনন্দে ইহারা সোজা কয়েকটী রোমের ভিতর দিয়া পত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু এই সকল রোম "সচেতন রোম" অর্থাৎ ইহারা কীট পতঙ্গের সংস্পর্শে আসিলে ইচ্ছামত বাঁকিয়া উহাদের চাপা দিতে পারে। সুতরাং কীট-পতঙ্গ পত্রের ভিতর প্রবেশ করিয়াই বিপদকে টানিয়া আনে। এমন কি পলায়নের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই অনেকগুলি রোমের কবলে পড়িয়া আবদ্ধ হইয়া পড়ে (২নং চিত্রে, একটী পিপীলিকা ধরিবার প্রণালীতে রৌদ্রশিশির গাছের একটী পাতা দেখান হইয়াছে)। এই প্রকারে কিছুকাল থাকিবার পর খাদ্যাভাবে অবসন্ন হইয়া উহারা ক্রমেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শীকারটী মরিয়া গেলে রোমগুলি হইতে হজমীলালা নির্গত হয় এবং উহা ক্রমে পিপীলিকাটীর দেহ পরিপাক করে। পরিপক্ক আমিষ খাদ্য ক্রমে "রৌদ্রশিশির গাছের" দ্বারা ভুক্ত হয়। যে সকল রোমগুলি শিকারটীর উপর বাঁকিয়া পড়িয়াছিল, শীকারটী সম্পূর্ণরূপে ভুক্ত হইয়া গেলে উহারা পূর্ব্ব অবস্থা গ্রহণ করে এবং নকল শিশিরবিন্দু নির্গত করিয়া পুনরায় শীকারান্বেষণে মন দেয়।

আমাদের দেশে এই জাতীয় গাছ ছোটনাগপুর, নীলগিরি, খাসিয়া পাহাড় এবং বাংলাদেশে (বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন) দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় গাছকে বিজ্ঞানের ভাষায় "ড্রসেরা" (Drosera) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

(৩) মক্ষিকাজাল গাছ (Venus' Fly trap)—

রৌদ্রশিশির গাছের মত আরো এক প্রকারের গাছ আছে, —ইহাদের "মক্ষিকাজাল গাছ" নাম দেওয়া হইয়াছে। এই সকল গাছের প্রত্যেক পাতার দুইটী করিয়া সমান অর্দ্ধাংশ আছে। ইহারা যেখানে মিলিত হইয়াছে সেখানে কব্জার ন্যায় একপ্রকার ব্যবস্থা থাকায় পাতার দুই অংশ ইচ্ছামত খুলিতে বা বন্ধ করিতে পারা যায় (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। পাতার দুই অংশ ইংরাজী V অক্ষরের ন্যায় উপরের দিকে খোলা থাকে এবং প্রত্যেক অংশের ভিতরের দিকে তিনটী করিয়া "সচেতন লোম" (Sensitive hairs) সংলগ্ন থাকে (৩নং চিত্রে H চিহ্নিত অংশ)।

খাদ্য আহরণ প্রণালী—

খাদ্যের অন্বেষণ করিতে করিতে যদি কোন মক্ষিকা বা পতঙ্গ এই দুই

পত্রাংশের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া উড়িয়া যায় এবং দুই বা একটা "সচেতন লোম" দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পত্রের দুইটী অংশ বন্ধ হইয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে শীকারটীও এই দুই পত্রাংশের মধ্যে ধৃত হইবে। ইহাদের (ধৃত কীট পতঙ্গাদির) মৃত্যুর পর, তাহাদের দেহের মাংস সহজ আমিষ খাদ্যে পরিণত করিবার কার্য্য পূর্ব্বের মত হজমীলালার সাহায্যে হইয়া থাকে। ইহারা সম্পূর্ণরূপে ভুক্ত হইলে পত্রটী পুনরায় খুলিয়া যায়।

বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে "ডায়োনিয়া" (Dionaea muscipula Ellis.) নাম দিয়াছেন। এই গাছ ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয় নাই। ইহা আমেরিকার "ক্যারোলিনা"তে পাওয়া যায়।

(৪) স্ফোটকধারী গাছ (Bladderworts)—

এই জাতীয় গাছ আমাদের দেশে খাল, বিল এবং পুষ্করিণীতে বহু পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা জলে জন্মে এবং ইহাদের কোন প্রকার শিকড় থাকে না।

বিবরণ এবং খাদ্য আহরণ প্রণালী—

ইহাদের পাতা অনেক ভাগে বিভক্ত; এই সকল বিভক্ত অংশের কতকগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া ছোট ছোট স্ফোটকাকৃতি এক প্রকার গুটিকার আকার ধারণ করে (৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই গুটিকাগুলি বড় করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে ইহারা পোকা ধরিবার ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নহে। ৪নং চিত্রের দ্বিতীয় চিত্রটীতে এই প্রকার একটী গুটিকা বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। উহাতে D চিহ্নিত অংশটী ফাঁদের প্রবেশ-দ্বার। কোন জলকীট খাদ্যের অন্বেষণে আসিয়া এই দ্বারে আঘাত করিলে দ্বারটী আপনা হইতে ভিতরের দিকে খুলিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করে। পোকাটী ভিতরে প্রবেশ করিলে দ্বারটী পুনরায় বন্ধ হইয়া যায়। এই ফাঁদটী এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে ইহাতে একবার প্রবেশ করিলে আর বাহির হওয়া যায় না, কারণ ফাঁদের দরজাটী ভিতর হইতে বাহিরের দিকে খোলা যায় না। এই প্রকার ব্যবস্থা থাকাতে খাদ্যান্বেষী জলকীট খাদ্যের অভাবে উক্ত স্ফোটক ফাঁদে প্রাণ হারায়। অবশেষে তাহারাই গাছের খাদ্যে পরিণত হয়। ফাঁদের অভ্যন্তরে দেওয়ালে অনেক লালাগ্রন্থী আছে। ইহা হইতে হজমীলালা নির্গত হইয়া ধৃত খাদ্য ক্রমেই সহজ আমিষ খাদ্যে পরিণত করে এবং সহজীভূত খাদ্য গাছের দ্বারা ভুক্ত হয়। বৈজ্ঞানিকগণের নিকট এই সকল গাছ "ইউটি কুলেরিয়া" (Utricularia) নামে পরিচিত।

মাংসাশী গাছপালা সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। বিজ্ঞানের মতে মানুষ হত্যা করিবার উপযোগী গাছ এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই —ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এস্‌সি, এফ-এল্ এস্ মহাশয় প্রবন্ধটীর পাণ্ডুলিপি স্থানে স্থানে দেখিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার নিকট প্রবন্ধ লেখক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত চিত্রগুলি প্রবন্ধলেখক কর্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে।

আই-হ্যাজ (I has)

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৩

চেনা জিনিষ বেইমানী করেনা। কোন্ রাস্তা বা কোন্ দিক কিছুই হুঁস্ ছিলনা,—বাসায় কিন্তু ঠিক পৌঁছে দিয়েছে। শীতকালের রাত—৯টা বেজে গিয়েছে,—স্বাতি ঘুমিয়ে পড়েছে।

স্থয্যি তামাক দিয়ে—চা আনলে। এই জন্যেই পুরাতন ভৃত্যের কদর,—বাড়ীর লোকের নাড়ী বোঝে। চেয়ে দেখি ভুলে ভুলে আমারি ব্যালাক্লাভাটা চড়িয়ে ফেলেছে। খুসিই হলুম,—অপঘাতের আশঙ্কা রইলনা। বললুম—"ওটা পরে বনে-বাদাড়ে যাসনে স্থয্যি, বাবুরা বন্দুকের পাশ নিয়েছে,—এন্তোক কাছারির চাপড়াসি। ও-পরে রোববারে যেন বাড়ির-বার হসনি।"

"রামজি মালিক" বলে সে চলে গেল।

শরীর মন দুই অবসন্ন ছিল, তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে ১১টার মধ্যেই শয্যা নিলুম। আজ পড়লেই ঘুম—কই কিছুতেই যে ঘুম্ আসেনা! চোখ বুজলেই শ্রীনাথকে দেখি। যে-সব কথা মনে আসা উচিত নয়—মনের হীনতা ও মলিনতাই প্রকাশ করে, সেই সব বিস্মৃত কথাও রূপ ধরে দেখা দেয়।—জামিন হয়ে ধনিরামের কারবারে ওকে ঢুকিয়ে দিই। অনেক টাকার মাল নিয়ে রায়পুর গেল,—আর ফিরলোনা! তিন বচর পরে খাণ্ডুয়া ষ্টেসনে দেখা,—রেলে কাজ করছে। বললে—"রাত্রে গুরু স্বপ্ন দিলেন—যে অবস্থায় আছিস—সিধে

চিত্রকুটে চলে আয়—তোর সময় হ'য়েছে।"—কি করি ভাই, সে সুযোগ ছাড়তে পারলুমনা, তোমারও অমত হ'তনা জানি। যাক্—গুরুর কৃপায় ভাই, কি আর বোলবো"…। শুনে আনন্দই হল, বহু ভাগ্যে এ কৃপা মেলে, ধন্য শ্রীনাথ!

সেই শ্রীনাথ…এও সম্ভব!

যেন ওপর থেকে মাটিতে কোনো ভারি জিনিষ পড়বার ভীষণ একটা শব্দ হল,—রাত তখন সাড়ে বারোটা। সব নিস্তব্ধ। তাড়াতাড়ি উঠে টর্চ-হাতে সূর্য্যি সূর্য্য বলে ডাক্‌তে ডাক্‌তে বেরুলুম,—সভয়ে। কই—কিছু তো দেখতে পাইনা। আওয়াজটা কিন্তু একটা গরুর ওজনের—সে তো ছোটো জিনিষ হবেনা। —"সূর্য্যি, ওরে সূর্য্যি?"—সেই মাত্র শুয়েছে—উত্তর দেবে কে? তায় সে আবার 'খাকিপন্থী'—দিনে পাঁচবার 'খাকিবাবার' আড্ডায় যায়—ধোঁ ছাড়েনা! বলে—গুরুর প্রসাদ ফেলতে নেই—মহাভক্ত। যাক্—

বৈঠকখানার পাশেই হাস্নাহেনা, তার দক্ষিণেই সুদীর্ঘ যোজনগন্ধা গাছটা যেন পাড়াটার মাস্তুলের মত দাঁড়িয়ে'। সন্ধ্যে হলেই সেদিক থেকে ছেলেদের উৎপাত সরে যায়। তার তলায় বলটা কি মার্বেলটা গিয়ে পড়লে রাত্রে তার সেইখানেই স্থিতি। শয়তান ছেলেও সেখানে ঘেঁশতে সাহস পায়না। তার কাছে আমাদের বাসাটার পরদা নেই,—সবই তার চোখের ওপর।

তার তলায় হঠাৎ কি একটা স্তূপের মত নজরে পড়ায় চম্‌কে উঠলুম। তলা তো পরিষ্কারই থাকে। একটু যেন নোড়লো। গরুই হবে। একটু এগুতেই মানুষ বলে জানার সঙ্গে সঙ্গে গা ছম্‌ছমিয়ে উঠলো। 'চোর চোর' বলে চীৎকার করবার সামর্থ্যও রইলনা', একেবারে ঘরে এসে হাজির হলুম। পরক্ষণেই সেই শব্দটার কথা মনে হ'ল,—ওই লোকটাই পড়েনি তো? তা হলে কি আর বেঁচে আছে? আবার সূর্য্যিকে ডাকলুম;—সূর্য্যি কি আর রাত্রে সাড়া দেয়! হারিকেনটা জেলে এগুলুম —দেখা উচিত। ফ্যাসাদে না পড়তে হয়।

সর্ব্বনাশ—এক ভাবেই যে পড়ে আছে! মাথায় লালিমলির ব্যালাকলাভা—গলা পর্য্যন্ত টানা।• তবে আর সূর্য্যিকে পাবো কোথায়? আহা অনেকদিনের চাকর,—এতো রাতে গাছে উঠতে গিয়েছিল কেনো? গাঁজা টেনে মরেছে দেখছি। গায়েও সেই ছাই রংয়ের গরম জার্সি।—নিশ্চয় সূর্য্যি, কাছেই গেলুম—

—বেঁচে আছে, পাঁজরা দুটো ফুলছে, 'সূর্য্যি সূর্য্যি' বলে ডাকলুম,—উত্তর নেই। অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ব্যালাক্লাভাটা খুলে দিলুম! তার ভেতর থেকে কাগজের মত কি একটা মাটির ওপর পোড়লো। সে আর ত্যাথে কে;—যা দেখলুম—সমস্ত শরীর শিউরে গেল!—এ যে রণগোপাল! ভাববার সময় নেই—ভাঙা ডালটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। মাথা ঘুলিয়ে গেল। কি যে কোরবো ঠিক করতে না পেরে হাত-পায় কাঁপুনি এসে গেল। সে দুমুণি লাশ তুলে ঘরে নে-যাবার শক্তি আমার নেই। কাকে ডাকি!—

—ঘরে ছুটলুম,—কুঁজো থেকে জল নিয়ে গিয়ে তার মাথায় মুখে চোখে অল্প অল্প দিলুম। সেকেলে ইস্কুলে First-aid শেখাতোনা,—কিছুই জানিনা। কিন্তু কিছু তো করা চাই।

টুপির মধ্যে নোট্ ছিলনা তো? কুড়িয়ে দেখলুম একখানা মোটা খাম্—Cover মাত্র—ভেতরে কিছু নেই,—ওপরে লেখা—"এলে ভেতরেই থাকা সম্ভব, রাত একটার মধ্যে তোমার কাছে রিপোর্ট্ চাই।"—Cover খানা তাড়াতাড়ি টুপিটার মধ্যে গুঁজে দিলুম।—মানে কি?—

—কি করি? এখানে এ অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকলে মারা যেতে পারে।…এই দিকেই কে আসছেনা? ও আবার কে? লোকটা চুপচাপ আসছিল, আমি লাণ্ঠন হাতে উঠে দাঁড়াতেই,—প্রচলিত সুমধুর 'হৈ' আওয়াজ দিয়েই—"হুঁয়া ক্যা হায়, কোন্ হায়?"

বল্লুম—"হিঁয়া আও জমাদার,—বাবু গির গিয়া হায়!"

সে দ্রুত এসেই—"ক্যায়সা গিরা, কোন্ গিরায়া, —কব গিরা?" ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্ন।

তাকে দু'কথায় সব বলে—আমার ঘরে তুলে এনে রণগোপালের বাড়ী খবর দিতে বল্লুম। সে বললে—"আমি ডিউটি ছেড়ে কোথাও যেতে পারিনা,—ওঁকে

নাড়াচাড়া করা হবেনা,—জুড়িদারকে ডেকে থানায় খবর দেওয়া দরকার" ব'লে চলে গেল।—ব্যাপারটা যেন সোজা নয়, এর মধ্যে অনেক অনেক গোলমাল আছে এবং তাতে আমিই প্রধান আসামী।

এ আবার এক ক্রোড়পর্ব্ব জুটলো—রাত্রের দফা-রফা শোবার দফা শেষ!

* * * *

১৫ মিনিটের মধ্যেই জমাদারজি সহ-জুড়িদার এবং অনুগামী অচ্যুতবাবু ও চক্রধর দ্রুত এসে হাজির। চক্রধরের হাতের চেটোয় একখানা রুমাল জড়ানো।—এসব দুর্লভ রত্ন এত সহজ-প্রাপ্য হ'ল কি করে!

রণগোপালের তখন জ্ঞান ফিরছে—কিন্তু বে-কায়দায় থাকায় যন্ত্রণায় উঁ আঁ করছে।

চক্রধর দেখে বললে—"তাই তো—এতবড় ডাল ভাংলো কি করে?"

জমাদারজি তখন ডালের সন্ধিস্থলটা পরীক্ষা আরম্ভ করলে—"না, কাটা নয়, ভাঙ্গাই বটে", বলেই, কোথাও দড়ি-বাঁধা আছে বা ছিলো কিনা, দেখতে সুরু করলে। কেউ যেন ফেলবার কল পেতেছিল,—টেনে ফেলে দিয়েছে।

দেখে শুনে আমি তো অবাক্। বললুম—'যাক্ আপনারা এসে গেছেন—বাঁচলুম। আমি যে কি করবো ঠিকই করতে পারছিলুমনা। ছোকরা বড় বে-কায়দায় রয়েছে, পা'টা চেপে মুড়ে গিয়েছে দেখছি, ওইটে আগে ঠিক করে দিন···

অচ্যুতবাবু রাগতভাবে বললেন—"আপনি এতক্ষণ তুলে--"

এ অবস্থায় হাসতে আর পারলুমনা, বললুম—"আমার সে শক্তি থাকলে কি আর · আপনি তো আমার চেয়ে বয়সে কম,—একবার চেষ্টা করুননা। না পারলেও চেষ্টা পেতুম কিন্তু জমাদারজি হাত লাগাতে বারণ করেও গিয়েছিলেন···"

অচ্যুতবাবু একবার এগিয়ে—পেছন ফিরে চক্রধরের দিকে তাকাতেই চক্রধর যেন অপরিচিত জমাদারজিকে সবিনয়ে মেহেরবাণী করতে বললেন। জমাদারজি ও জুড়িদার এবং স্বয়ং অচ্যুতবাবু এই তিন জনের শুভ স্পর্শে যা হয় সেই ভাবে টানা-হেঁচড়া করে রণগোপালের ডান পা'টির মুক্তি সাধন করলেন। সে যন্ত্রণায় অধীর হয়ে পোড়লো। পা পেতে দাঁড়াতে পারলেনা। চক্রধরের অনুনয়ে জুড়িদার ষ্ট্রেচার আনতে ছুটলো।

ছেলে খুব হুঁসিয়ার,—এত যন্ত্রণার মধ্যেও টুপিটা চাইলে। তার কষ্ট দেখে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—"এত রাত্রে গাছে উঠতে কেনো গিয়েছিলে ভাই···"

চক্রধর তাড়াতাড়ি বললে—"গাছের ফুল নাকি পোড়া ঘায়ের মহৌষধ,—আমারি এই···আমি কি জানি রাত্রেই ও···"

অচ্যুত বাবু বললেন—"ওই করেই ও গেলো···কারুর উপকারে আসতে পেলে ওর আর জ্ঞান থাকেনা—সবুর সয়না। ওর কুষ্টিতেও আছে—ওই করেই ও মরবে···"

চক্রধর,—"আমাকে আর লজ্জা দেবেন না, আমারি জন্যে···"

বাহক সহ ষ্ট্রেচার এসে গেল। রণগোপালকে নিয়ে সকলে চলে গেলেন। জমাদারজি ডালটা নিতে ভুললেন না। কেনো তা বুঝলুমনা।...ভূত যখন ছেড়ে যায়, শুনেছি একটা ডাল ভেঙে পড়ে।—ছাড়লে যে বাঁচি।

নানা অবান্তর চিন্তা নিয়ে শয্যায় গিয়ে ঢুকলুম—রাত তখন সাড়ে তিনটে।

* * * *

ঘুম তো হলই না। সকাল ৫টায় উঠে নিজেই গুড়ুক সেজে টানতে টানতে কখন নিদ্রা এসে গেছে জানিনা। ডাকের ওপর ডাক—উঠে পড়লুম—৭৷৷৹টা। দেখি জমাদারজি ডাকছেন—"উঠিয়ে, নিস্‌পেক্টর সাহেব আয়া···।"

বালাপোসখানা গায়ে দিয়ে বাইরে আসতেই দেখি গাছটাকে ঘিরে ৭-৮ জন উর্দ্ধমুখ।—ইন্‌স্‌পেক্টর, দুজন কনষ্টেবল, চক্রধর, অচ্যুতবাবু, রঞ্জনবাবু, রসসিন্দুর এবং ভাঙা ডালটাও এসে হাজির হয়েছেন!

চোকোচোকি হতে রঞ্জনবাবু একটু অস্ফুট হাসি হাসলেন।

ইন্‌সপেক্টর (Inspector) চক্রধরকে প্রশ্ন করলেন—"ডালটা যে এই গাছেরই তার প্রমাণ কি?"

চক্র। পাতা মিলছে...

ইন্‌সপেক্টর। দুনিয়ায় কি এ গাছ আর নেই—

চক্র। তা বটে,—গাছের গায়ে সদ্য শাখাচ্যুতির চিহ্ন তো থাকবেই।

ইন্‌সপেক্টর। আর সেটা গুঁড়ি আর শাখার জোড়ের স্থানে Coincideও করবে I mean ফিট্ (fit) করবে।

রঙ্গনবাবু ধীরে বললেন—"অর্থাৎ রাজ-যোটক হবে।"

কথাটায় কেউ কান দেয়নি। আমার কানদুটো কিছু রস্-খাজা, তাই এড়ালো না। Inspectorবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন—"আপনাদের চাকরকে ডাকুন, গাছে উঠতে হবে..."

বললুম—'ডাকচি, কিন্তু সে আমার চেয়েও দু'বচরের বড়ো!'

করুণাময়ের সৃষ্টিতে এমন জিনিষ নেই যার কোনো কাজ বা গুণ নেই। সূর্য্যি গাঁজার জোরে আজ বেঁচে গেল, তাকে দেখে ইন্‌সপেক্টরবাবুও হতাশ হলেন। কনষ্টেবল হনুমান সিংয়ের দিকে দৃষ্টি দিতেই সে হাত জোড় করে অক্ষমতা প্রকাশ করলে, এবং জানিয়েও দিলে ও-গাছ অপদেবতার অতিপ্রিয়,—"আমি রোঁদে বেরিয়ে (অর্থাৎ লোকের দাওয়ায় ঘুমিয়ে) কয়েকবার দেখেছিও...,কসম্ খা-সেক্তে হুজুর।"

ইন্‌স্‌পেক্টর এ প্রদেশের হিন্দুবংশধর, মুখে না স্বীকার করলেও—বিশ্বাস রাখেন। বললেন—

—"এটা কি গাছ,—নাম কি?" সকলেই মাথা নাড়লে।

উকীল রঙ্গনবাবু বললেন—"ওটা এ দেশের গাছ নয়, য়ুরোপে জন্ম। দেখছেন না—কি-রকম উচ্চশির, গগন-স্পর্শী! ওর নাম Cork tree,—ধরাকে দাবিয়ে উচ্চশিরে থাকে...আমাদের Native areaর মধ্যে কমই পাবেন। যে-সে ওর কাঁধে পা দিয়ে উঠবে, তা কি ও সহ্য করতে পারে মশাই?—হাঁসপাতালে গিয়েই ছেলেটি রেহাই পেলে হয়..."

শুনে অচ্যুতবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল,—তিনি অলক্ষ্যে হাতজোড় করে গাছটিকে নমস্কার করলেন। সেটা অবশ্য কারুর লক্ষ্য না এড়ালেও,—বাৎসল্য বাধা মানেনা।

জমাদারজি গাছে ওঠবার হুকুমের ভয়ে আড়ষ্ট ছিলেন,—সামনে থেকে হঠে পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং মুখটা বিকৃত করে—নিজের হাঁটুতে হাত বুলুতে লাগলেন—বোধ হয় বাত চাগিয়েছে।

ইন্‌সপেক্টরবাবু—বদনমণ্ডলে বোধ হয় হাসির আভাসই হবে, টেনে রঙ্গনবাবুকে বললেন—"এই জন্যেই আপনাদের সর্ব্বজ্ঞ বলে,—গাছের বয়ান পর্য্যন্ত বাদ যায়নি। আপনাকে উকীল সরকার দেখলে খুসী হব।"

তিনিও হাস্যমুখে সেলাম করে বললেন—"আপনারা যদি খুসি হ'ন তো তা হতে' কতক্ষণ।...তা এই বেফায়দা কাজে মিছে কষ্ট পাচ্ছেন কেনো? ওই তো দেখা যাচ্ছে —ডালটা কোথা থেকে ভেঙেছে—" বলে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখালেন।

তখন সেটা সকলেরি নজরে পড়লো।

Inspectorবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন—"ওঃ, ও-যে ২৪ ফিট্ উঁচু হবে! পড়লে কি..."

রঙ্গনবাবু—"ও-সব ছেলে বলেই"—চট্ ঝোঁকটা সামলে বললেন—"ওসব ছেলেকে ধর্ম্মই রক্ষা করেন—পরার্থে উঠেছিল কিনা।..ডালটা এই গাছেরই তাতে আর সন্দেহের কিছু নেই, যাক্,—চা খাওয়া হয়েছে কি?"

অচ্যুতবাবু আমার দিকে চাইলেন।

বললুম—"দয়া করলেই হয়, কাজ মিটলো কি?"

"ও আর জোড়া লাগবে না—আসুন" বলে রঙ্গনবাবু ইন্‌সপেক্টরবাবুকে নিয়ে এগুলেন।

আমি সূর্য্যিকে ডাকলুম।

অচ্যুতবাবু নিশ্চিন্ত ছিলেননা, জানলাটা দিয়ে গাছটার ক্ষতস্থান লক্ষ্য হয় কিনা, পূর্ব্বের মত অলক্ষ্যে দেখে নিলেন, এবং চায়ে চুমুক দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করেই যেন অন্যমনস্কে ধীরে ধীরে বললেন—"সে অবাধ ছেলে নয়, বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ বারণ করলে আর..."

অর্থাৎ আমি যেন দেখেও বারণ করিনি। বললুম—"জগতে কোনো জিনিষই নিরবচ্ছিন্ন মন্দ নয়,—ভালো মন্দের মিশ্রণেই সৃজন—. ডায়বিটিস্ থাকলে কাজ দিতো বটে,—দুঃখের বিষয় তা নেই। শীতকালে লেপ ছেড়ে দুপুর রাত্রে কে গাছে উঠছে সেটা দেখবার সখ্ও তো ছিলনা অচ্যুতবাবু।—অপরাধ হয়ে থাকে তো—ওই ডায়েবিটিসটা না থাকা,—গরজে উঠতে হ'ত..."

ইন্‌সপেক্টরবাবু বললেন—"না না, ও কথাই নয় পুত্রস্নেহে ওঁকে..."

বললুম—"খুব ঠিক কথা,—হওয়াই স্বাভাবিক। হবেনা? রণগোপালের মত ছেলে কমই দেখতে পাওয়া যায়, বয়সের চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধি ধরে। তার পরার্থপরতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি! এই শীতে দুপুর রাত্রে গাছ বেয়ে ২৪ ফিট্ ওঠার record এই প্রথম পেলুম। প্রার্থনা করি সত্বর সেরে উঠুক্,—কত লোকের কত উপকার ওর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।"

চক্রধর আমার কথাগুলি যেন চক্ষু দিয়ে শুনছিল। চোখোচোখি হতেই ক্রূর হাসিটা চোখের কোণ দিয়ে সরে গেল।

রঞ্জনবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন—"চায়ের সঙ্গে বুঝি কিছু খাননা?"

বললুম—"না, ও বিষ্ণুচক্রগুলো আর বয়সের সঙ্গে খাপ্ খায়না"—

এইরূপ দুচার কথার পর সকলে বিদায় হলেন। যেন মেঘ কাটলো। ভাঙা ডালটা কেবল গাছের তলাতেই পড়ে রইলো। সূর্য্যকে বিশেষ করে বারণ করেছিলুম—খবরদার যেন ওটায় হাত না দেয়।—অপদেবতার ভয়ও দেখালুম।

* * * *

থাকতে পারিনা, নিত্যই একবার করে হাঁসপাতালে যাই,—ঘণ্টা দুই রণগোপালের কাছে কাটিয়ে আসি। মধ্যে মধ্যে চক্রধর ও অচ্যুতবাবুর সঙ্গে সেইখানেই দেখা হয়। বুঝলুম—সবই স্বগোত্র—একই গুরুর শিষ্য। রণগোপাল সেরে আসছে। ডাক্তার আমাদের কাছে বলেন,—একটু খুঁৎ থেকে যাবে—২৪ ফিট্ ওঠা এবারকার মত খতম্। শুনে দুঃখ হয়।

অচ্যুতবাবু আমাকে নিয়মিত আসতে ও রণগোপালকে প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করতে দেখে, কৃতজ্ঞতার কথা কন। চক্রধর বলে—"এ কি দেখছেন—ওঁদের ব্রতই দেশের সেবা,—প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, ওঁরা সাধারণ থাকের নন," ইত্যাদি। অচ্যুতবাবু সেটা শতমুখে স্বীকার করেন—"সে আর বলতে হবে কেনো—দেখতেই পাচ্ছি,—কিন্তু সাধ্য কি যে কেউ বোঝে—", ইত্যাদি।

ক্রমে তাদের কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারের সুর যেন বদলে গেল,—সহজ হয়ে এলো। সে সুমধুর দ্ব্যর্থভাব ও ভাষা আর পাচ্ছিনা। সেই দণ্ডে দণ্ডে থামচে থামচে পায়ের ধুলো নেওয়া,—পাশ ফিরতে নমস্কার, কমে গেল। এটা একটা নূতন পথ নাকি? কে জানে।—বিশ্বাস নৈব কর্ত্তব্য দ্বিতীয়েষু।

আর দিন দুই পরে রণগোপাল হাঁসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে। ডাক্তার বল্লেন—"এক গাছা লাঠি ঠিক করে রাখুন। কিছুদিন দরকার হবে।" আমিই সেটা Present করলুম। আমাকেও এক ডিপুটি-বন্ধু Present করেছিলেন, কারণ সেটার চেহারা দেখলে তাঁর পত্নীর হিষ্টিরিয়া চাগাতো।—অপাত্রেই গেলো—আমাদের সাহিত্য পরিষৎ পেলে যত্নে থাকতো।—খুব সম্ভব মহাতপা অষ্টাবক্রের আমলের।

* * * *

বাসায় ফিরে কাশী থেকে মুকুন্দ বাবুর পত্র পেলুম—অনেক দিন পরে। বোধ হয় নন্দকুমারখানা খুইয়েছেন। তা হলেই…

ইষ্ট স্মরণ করে ভয়ে ভয়ে পড়ে দেখি না—তা নয়,—সে আছে, বাঁচলুম। লিখেছেন—"আপনার বাসার চাবি খুলে সপ্তাহে একবার দেখতুম। কাল খুলে,—দেখবার আর কিছু পেলুমনা,—হাতিতে খাওয়া কদ্‌বেলই পেলুম। কাশী থেকে পত্র লেখা বড় কঠিন, মিথ্যা না বেরিয়ে যায়।—দেখছি ফুটো বালতিটে একদিকে পড়ে আছে! আপনি পত্রপাঠ চলে এসে যা করবার করুন; ইত্যাদি—"

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। প্রাচীন বোঝাগুলো কেবল মাঝে মাঝে বিক্ষেপই আনতো।—বৈরাগ্যের পথ সামনে,—পেছু বলে কিছু নেই,—সেটা মুছে চলতে হয়। বিশ্বনাথ মুছে দিয়েছেন।—কি দয়া—একদম ঝাড়'-হাতপা করে দিয়েছেন! সে-সব মাল—কাপড়-চোপড়, বিছানা মাদুর, বাসন-কোসন কারেও হাতে করে দেওয়া যেতনা, দিলেও কেউ নিতোনা।—কোনোটাই পঞ্চাশের কম কাজ দেয়নি। ৫।৭ ঝুড়ি বই আর খাতা যা ছিল (সে নিশ্চয়ই আছে, সে আর কে ছোঁবে?) তার সঙ্গে ১০।১৫ টাকা বাঁধাই খরচ না দিলে কেউ নিতোনা। সবই ছিল—as I—So they. যাক্ ভালই হ'য়েছে,—চিন্তা গেছে;—তারা এগিয়েছে, আমিও

যাচ্ছি। এতো আর সেই অশিক্ষিত ছুতোরের অনটন-বৈরাগ্য নয় যে আবার ফিরবো···

শেষ কথাগুলো আনন্দের আবেগে বোধ হয় বেরিয়ে এসেছিল ;—মুক্তির উচ্ছ্বাস কিনা—

"কি মশাই কার সঙ্গে কথা কচ্ছেন ? কার বৈরাগ্য ? কেরাণির বুঝি ?"

চমকে চেয়ে দেখি পেছনে—পলাশ।

"এই যে, এসো ভায়া,—হাতে ও-সব কি ?"

"কিছুই নয়—লাউশাক, একটা লাউ আর গোটা-কয়েক মূলো ;—বাড়িতেই হয়েছিল। শুধু হাতে আসবো—তাই···"

পলাশ প্রায়ই শুধু হাতে আসেনা।

বললুম—"বাঃ, টাট্‌কা জিনিষের রূপই আলাদা,—দেখ্‌লে আনন্দ হয়।"

সূর্য্যকে দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিলুম। তামাক দিতেও বললুম।—"তার পর ? ছেলেমেয়েরা সব কেমন ?"

"মন্দ আছে বলবার জো নেই মশাই—বড় বাবুরা ও-সব শুনতে ইচ্ছে করেননা। দিন পনেরো আগে মেয়েটার হাম হয়ে সে যায় যায়। একটা দিনের ছুটি চাইলুম, বল্লেন—'হাম আবার একটা অসুখ নাকি ? তায় মেয়ের হাম,—যাও যাও।' মা দয়া করে সারিয়ে দিয়েছেন—আমাদের তিনিই ভরসা।"

বললুম—"তাতে কি আর সন্দেহ আছে পলাশ !"

পলাশ কাতর ভাবে বললে—"কিন্তু অন্য দিকে যে রেহাই পাইনা মশাই। তার কয়েকদিন পরে বাবুর বাড়ি ২।৩টির হাম দেখা দেয়।—ওঁদের বন্ধু সবাই,—ডাক্তারকে পয়সা দিতে হয়না। জানেন তো—বড়দের T. Aর মধ্যেই সব সারতে হয়,—তাঁরা সেটা পরস্পর জানেন। তাঁদের মোটর আছে, পেট্রল আছে, আমাদের পা আছে,—পেট্রল লাগেনা, তাই ছুটোছুটির ভারটা আমাদের ওপরই পড়ে।—এই যাচ্ছি ভার্সেলিস আনতে, এই ছুটছি লিপোড্রোম আনতে—ওষুধের সব বিদকুটে নাম—মনেও থাকেনা মশাই। শেষ হোম লাট খেয়ে পরশু রাতে মেয়েটি তাঁর মারা গেছে। পাষণ্ডের মত আমাকেই সব করতে হ'ল।—আহা সে কচি মুখ দেখলে ·"

পলাশ আর বলতে পারলেনা—চোখ মুছলে।

বললুম—"ছেলে মেয়ে হ'য়েছে—তোমার তো হবেই ভাই, আমারি···"

"না দাদাবাবু, আপনি শোনেননি। এই শীতের রাতে পাঁচ ঘণ্টা সেই তিন মাইল দূরে নদীর ধারে কাটিয়ে সকালে ভিজে কাপড়ে ফিরছি,—বড় বাবুর এক বন্ধু হাসতে হাসতে অম্লান বদনে বললেন—শুনলুম তোমার অভিশাপেই নাকি—(পলাশ কেঁদে ফেললে)

উত্তেজিত ভাবে বল্লুম—"ওরা মানুষ ? ও-কথা মানুষের মুখ থেকে বেরয় ! তুমি ওদের কথার মূল্য দিতে চাও ! নিজের মনুষ্যত্ব খুইওনা ভাই !"

স্বাতী চা দিয়ে গিয়েছিল। বললুম—"এসো চা খাওয়া যাক্।"—পলাশ এক চুমুক খেয়ে বললে—

"হ্যাঁ ছুতুরের বৈরাগ্যের কথা কি বলছিলেন তাই বলুন,···এততেও বৈরাগ্য ঘেঁশেনা মশাই···"

বললুম—"এই চিঠি পেলুম কাশীর বাসাটা পরিষ্কার করে ঝঞ্ঝাটগুলো কে সরিয়ে দিয়েছে,—বিশ্বনাথই হবেন, তা না তো এতো দয়া আর কার। এইবার ঘাটে জল—ঘটি ঘুচে গেছে। মুক্তির আনন্দে ও সব মুখ থেকে আওয়াজ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল বোধ হয়···"

"আনন্দ কি মশাই ! সেদিন মেনির দুধ খাবার দু'পয়সার ঝিনুকখানা কাকে নিয়ে গিয়েছিল, আবার—নেবে তো নিলে সন্ধ্যে বেলায় ! তার পর লাণ্ঠান জেলে রাত দশটা পর্য্যন্ত জঙ্গলে জঙ্গলে ! কোথায় পাবো ? সকাল না হতেই—আবার সুরু। আর আপনার একটা সংসারের সর্ব্বস্ব"······

"তোমরা খুঁজবে বইকি ভাই,—তোমরা এই দ্বিতীয়ে মাত্র পৌঁছেছ বইতো নয়, আমি যে চতুর্থাশ্রমের চৌহদ্দির মধ্যে এসে গিয়েছি।"

"চতুর্থাশ্রমের কথা রেখে দিন মশাই, সে সব মনুর অনুগমন করেছে। এখানে অনেকে চতুর্থাশ্রম টপ্‌কেছেন, দেখেন নি—৭০ পেরিয়ে। রক্ষা খোলোস (preserver) চড়িয়েছেন—মোজা না ছেঁড়ে !"

বল্লুম,—ও ঝিনুক বাসনের বৈরাগ্য বৈরাগ্যই নয়। বৈরাগযোগে তোমায় কৃপা করবেন বড় বাবু, আর আমায় করেছেন—তা'বড়রা। ওঁরাই আমাদের কৃপাময়।"

বলে এতটা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা শান্তিপুর সুবর্ণরেখার মধ্যের কথা নহে, ঐ মহাগ্রন্থের অন্ত্যখণ্ড ২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য৭—ইহাতে আছে, "স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব সকল॥ স্নান করি স্বর্ণরেখা নদী ধন্য করি। চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি॥ রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দ চন্দ্র। সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ॥ কথোদূরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া। নিত্যানন্দ স্বরূপের অপেক্ষা করিয়া॥" অর্থাৎ সুবর্ণরেখায় সকলে স্নান করিয়া পুনরায় যাত্রা করিবার পর কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাদের সঙ্গ-বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল—ইতিপূর্ব্বেকার বর্ণনায় ভাগবতে তাঁহাদের সঙ্গ-বিচ্যুতির কোনও উল্লেখ নাই; কাজে কাজেই উপরিউক্ত আলোচনায় 'রহিলা অনেক পাছে' ইত্যাদি শ্লোকটির প্রয়োগ ঠিক হয় নাই, উপরন্তু এক গোল নিবারণের চেষ্টায় অপর গোলের সৃষ্টি করা হইয়াছে। পাগল-পারা হরিনাম মূর্ত্তি শান্তিপুর হইতে মত্ত-সিংহ-গতি চলিয়াছিলেন বটে, তথাচ আটিসারায় অনন্ত পণ্ডিতের বাটী 'সর্ব্বগণ সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা', ছত্রভোগ অম্বুলিঙ্গ ঘাটে 'আনন্দ আবেশে প্রভু সর্ব্বগণ লৈয়া। সেই ঘাটে স্নান করিলেন সুখী হৈয়া॥' এবং সুবর্ণরেখায় 'স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব সকল'॥ সুতরাং নিত্যানন্দাদি যে কয়েক দিনের জন্য মহাপ্রভুর সঙ্গবিচ্যুত হন নাই, ইহা ঠিক। গোবিন্দ দাস শ্রীচৈতন্য প্রভুকে বর্দ্ধমান মেদিনীপুর পথে লইয়া গিয়া সুবর্ণরেখাতীরে রঘুনাথ দাসের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়াছেন৮: রঘুনাথ দাসের সহিত মহাপ্রভুর সুবর্ণরেখাতীরে দেখা অপর কোন গ্রন্থেই নাই; গোবিন্দের নিবাস কাঞ্চননগর বর্দ্ধমান; সুতরাং হয় ত গোবিন্দ মহাপ্রভুর পথের দাবী করিয়া গৌরবান্বিত হইতে অগ্রসর এবং ইহাই সমর্থনের উদ্দেশ্যে 'রহিলা অনেক পাছে' শ্লোকটির সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এতাদৃশ বিসদৃশ বর্ণনা অত্র গ্রহণ করা যায় না।

২

চৈতন্য ভাগবতে আছে, মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে প্রথম আটিসারায় উপনীত হন এবং তথায় অনন্ত পণ্ডিতের বাড়ী এক রাত্রি থাকেন৯। কিন্তু আটিসারার বৃত্তান্ত বা অনন্ত পণ্ডিতের পরিচয় ধৃত হয় নাই। কুলগ্রন্থাদিতে দেখা যায়, কবি কৃত্তিবাসের জ্ঞাতি-ভ্রাতা লক্ষ্মীধরের এক প্রপৌত্রের নাম অনন্ত। কুলবৃক্ষ এইরূপ—লক্ষ্মীধরের পুত্র মনোহর পণ্ডিত, মনোহরের পুত্র সুসেন পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, ও গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য১০ এবং জগদানন্দের পুত্র অনন্ত। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে কৃত্তিবাস,১১ সুতরাং ঐ শতাব্দীর শেষ তৃতীয় পাদে তাঁহার পৌত্রস্থানীয় সুসেন ও জগদানন্দ১২। তাহা হইলেই ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাংশে জগদানন্দের পুত্র অনন্ত; আবার, মহাপ্রভুর বাল্যকালে দেবীবর ঘটক মেল বন্ধন করেন ও সুসেনাদি ভ্রাতৃত্রয়কে প্রধান করিয়াই ফুলিয়া মেল নিরূপণ করিয়াছিলেন১২। সুতরাং এক্ষণে বলা যাইতে পারে যে জগদানন্দ ঐ সময়েরই ব্যক্তি। পুনশ্চ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় জয়ানন্দের পুথি হইতে দেখাইয়াছেন১৩—'হরিদাস প্রিয় বড় সুসেন পণ্ডিত। মুরারি হৃদয়ানন্দ সংসারে বিদিত। দুর্গাবরাত্মজ মনোহর মহা সে কুলীন। তাঁহার নন্দন সুসেন পণ্ডিত প্রবীণ।' মহাপ্রভুর নীলাচল গমনের পরের বর্ণনার মধ্যে ইহা আছে; সুতরাং ঐ সময় সুসেন প্রবীণ হইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বোক্ত হিসাবের সহিত বেশ মিলিয়াও যাইতেছে। অতএব এ কথা সত্য। তাহা হইলে এক্ষণে অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, যখন সুসেন প্রবীণ, তখন জগদানন্দের১৪ পুত্র অনন্তের পক্ষে নীলাচল-গামী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে আতিথ্যে বরণ করিয়া লওয়া সম্ভব ছিল; এবং ইতিমধ্যে পণ্ডিত আখ্যা লাভ করাও তাঁহার পক্ষে বিস্ময়জনক হয় নাই—তাঁহার পিতা, পিতৃব্য ও পিতামহ 'পণ্ডিত' ছিলেন।

৩

সত্যভামার পুরুষ-অবতার বৈষ্ণব জগদানন্দ১৫; কিন্তু ইঁহার বংশ-পরিচয় অবিদিত। ইনি গৌরাঙ্গ প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ

৭ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত, অন্ত্য ২ অধ্যায়।

৮ পরদিন সুবর্ণরেখার ধারে গিয়া। পুলকিত রঘুনাথ দাসেরে দেখিয়া। গোবিন্দদাসের করচা পৃ ১৮।

৯ চৈ-ভা অন্ত্য ২য় অধ্যায়।

১০ মিশ্রগ্রন্থ, সম্বন্ধ নির্ণয়, কুলসার সংগ্রহ, বলাগড়-পরিচয়—পঞ্চপুষ্প, আষাঢ়, ১৩৩৯।

১১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, বলাগড়-পরিচয় পঞ্চপুষ্প, চৈত্র, ১৩৩৯।

১২ বলাগড়-পরিচয়—পঞ্চপুষ্প, বৈশাখ, ১৩৪০।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণকাণ্ড—"১৪০২শকে মেল প্রচারিত হইলেও ১৪০৭ শকের পরে তাহা প্রকৃত পর্য্যায়বদ্ধ হইয়াছিল।"

'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' ধৃত নুলো পঞ্চাননের কারিকা—'চৈয়ে ছোড়া বড় দুষ্ট নিমে তার নাম। * *। শচীর ছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়। মাতা-পত্নী দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়॥ এই কালে রাঢ়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধূম। বড় বড় ঘর যত হইল নির্দ্ধূম॥ কিছু পরে সঙ্কেতের বংশে একছেলে। নামে খ্যাত দেবীবর লোকে পরে বলে॥ সেই ছোঁড়া মনে করে কুলে করে ভাগ। তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ॥

১৩ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড (২য় সংস্করণ) ১ম অংশ।

১৪ 'চৈতন্য এবং তাঁহার সঙ্গীগণ' নামক ইংরাজী পুস্তকে গ্রন্থকার জগদানন্দকে ('Boy') বালক বলিয়াছেন; পরন্তু, চরিতামৃতে যেখানে আছে 'কালিকার বড়ুয়া জগা' বা 'কাঁহা জগা কালিকার বটুক নবীন' তাহার পরই চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—'প্রভু হাসি কহে—শুন হরিদাস সনাতন। * *। তোমা সবাঁকে করোঁ মুঞি বালক অভিমান॥' তাছাড়া এই বাক্যগুলির তিরস্কার স্থলে ব্যবহার হইয়াছে—জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কার'॥ কারণ প্রভু বলিয়াছেন—"মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে॥"

চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্য ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

১৫ গৌরগণোদ্দেশ; জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল।

করিয়াছিলেন ও শান্তিপুর গমনাগমন করিতেন ১৬। ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে অনন্তের পিতা ফুলিয়া মেলের মুখৈটি জগদানন্দ ও গৌরাঙ্গদেবের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৪০৭ শকের পূর্ব্বে ও পরে (অনন্তর বালক বয়সে) তিনিও শান্তিপুর গমনাগমনে সমর্থ ছিলেন। তাহা হইলে এতদুভয় জগদানন্দ সমকালীন ও প্রায় সমবয়স্ক হইতেছেন। আবার, ইহার পরও মুখৈটি জীবিত ছিলেন ; কারণ অনন্তর পর তাঁহার আরও দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে ১৭। মুখৈটি তাঁহার পুত্রকন্যাগণের প্রথম দুইটির বিবাহে উপস্থিত ছিলেন ১৭। এদিকে মহাপ্রভুর আদিলীলায় বৈষ্ণব জগদানন্দের বিশেষ কোন কথা নাই। জয়ানন্দের নদীয়া-খণ্ডে তাঁহার বিষয়ে যেটুকু উল্লেখ আছে, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে তিনি সর্ব্বসময়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন না। অথচ প্রেমদাস তাঁহাকে বিশ্বম্ভরের বাল্যবন্ধু বলিয়াছেন ১৯। পুনরপি, কুলগ্রন্থাদি অনুসারে, মুখৈটির পুত্রকন্যাগণের শেষ কয়েক জনের বিবাহ তাঁহার সহোদরদ্বয় সুসেন ও গঙ্গানন্দ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল ২০। ইহা দ্বারা তাঁহার ফুলিয়া ত্যাগেরও ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। এ দিকে জয়ানন্দের গ্রন্থে বিশ্বম্ভরের উক্তি এইরূপ—"একে সেবক মোর আছে দেশে দেশে। নবদ্বীপে আসিবেন আমার উদ্দেশে॥" পুনরায় জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, জগদানন্দ মহাপ্রভুর সহিত গয়া যান। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে গয়া হইতে ফিরিয়া জগদানন্দ আর স্বগৃহে ফেরেন নাই, নবদ্বীপেই বাস করিয়াছিলেন ২১। এই সময় হইতেই মধ্যলীলার আরম্ভ এবং মধ্যলীলাতেই জগদানন্দের বহুস্থবার উল্লেখ পাওয়া যায়। উপরন্তু, মুখৈটি২২ ও বৈষ্ণব২৩ উভয়েই 'পণ্ডিত' উপাধিবিশিষ্ট ছিলেন।

এক্ষণে দাঁড়াইল এইরূপ—(১) বৈষ্ণব জগদানন্দ ও মুখৈটি জগদানন্দ সমকালীন ও সম্ভবতঃ সমবয়স্ক, (২) বৈষ্ণবের পরিচয় অবিদিত, মুখৈটির সহিত তাঁহার সকল বিবরণ মিলিয়া যাইতেছে, (৩) আদিলীলায় বৈষ্ণবের বিশেষ কথা কিছুই নাই, তৎকালে মুখৈটি ফুলিয়ায় ২৪ (ফুলিয়ার স্ত্রীপুরুষ ব্রাহ্মণ সকল বৈষ্ণবভক্ত ২৫) (৪) জয়ানন্দের নদীয়াখণ্ডে বৈষ্ণবের সামান্য সামান্য উল্লেখ, তৎকালে মুখৈটি নবদ্বীপ যাতায়াতে সক্ষম ছিলেন, (৫) মধ্যলীলায় বৈষ্ণবের কথা প্রায়ই পাওয়া যায় ; তখন মুখৈটি ফুলিয়ায় অনুপস্থিত, (৬) উভয়েই পণ্ডিত এবং (৭) মুখৈটির পুত্র অনন্ত এবং অনন্তর গৃহে মহাপ্রভুর রঙ্গ। মহাপ্রভু অদ্বৈত গৃহে ২৬ ও অনন্তর গৃহে 'রঙ্গ' ২৭ করিয়াছিলেন,—অন্যত্র 'রঙ্গ' পদটির ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। এই গুলি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে বৈষ্ণব ও মুখৈটি, এতদুভয়ে অভিন্ন ; মুখৈটি জগদানন্দই সত্যভামার পুরুষ-অবতার এবং সেই কারণেই তাঁহার পুত্রের গৃহে মহাপ্রভু রঙ্গ করিয়াছিলেন।

৪

অনন্ত ফুলিয়া মেলভুক্ত ছিলেন এবং ফুলিয়া মেলের কুলীনগণ ফুলিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে বাস করিতেন ২৮। সুতরাং এতৎ প্রদেশেরই কোন গ্রামের নাম ছিল—আটিসারা ; ফুলিয়া বলিলে নিজ ফুলিয়া ব্যতিরেকে অপরাপর কয়েকখানি গ্রামও বুঝাইত ; যেমন নপাড়া, বড়া ইত্যাদি। আটিসারাও তাহাই ছিল কিন্তু এখন নাই ২৯।

অনন্ত গরখড়ী বন্দ্য-বংশীয় আনন্দের সহিত কুল করেন। আবার, তাঁহার প্রপৌত্র বাণেশ্বর গুপ্তিপাড়া নিবাসী গোপীচট্টকে কন্যাদান করেন। আটিসারা ফুলিয়ার নিকটে কোনও স্থল না হইলে এই কার্য্যগুলি সম্ভব হইত না। তৎকালে দূরদেশ গমনাগমনের সুবিধা ত' ছিলই না ; বরং বিপজ্জনক ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়াংশে অনন্ত ; কাজেই তাঁহার প্রপৌত্র বাণেশ্বর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম তৃতীয়াংশের লোক। এই শতাব্দীরই শেষার্দ্ধে ভাগীরথীর উত্তর কূলে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল এবং সেই সময়েই আটিসারা গঙ্গাগর্ভে লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই ৩১। কাজেই শ্রীজগদানন্দ, অনন্ত ও আটিসারার সম্বাদ দুষ্প্রাপ্য।

পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্কলিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতোক্ত স্থান সমূহের ভৌগোলিক বিবরণীর মধ্যে লিখিত হইয়াছে—"আটিসারা নামের দ্বারা আটঘরা গ্রাম উপলক্ষিত হইলেও হইতে পারে"। প্রমাণাভাবে তিনি সঠিক নির্ণয় করেন নাই ; পরন্তু, আটিসারা ও আটঘরার মধ্যে যে শাব্দিক সাদৃশ্য, তদপেক্ষা আটিসারা ও আটিশেওড়া ঘনিষ্ঠ। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে চাকদার সম্মুখে আটি-শেওড়া গ্রাম অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আটিশেওড়ার আধুনিক নাম—বলাগড়।

১৬ 'অসংখ্য নিজ ভক্তের করাঞা অবতার। শেষে অবতীর্ণ হইল ব্রজেন্দ্র কুমার॥ প্রভুর আবির্ভাব পূর্ব্বে সর্ব্ব ভক্তগণ। অদ্বৈতাচার্য্য স্থানে করেন গমন॥' চরিতামৃত, আদি-১০ম।

১৭ কুলসার সংগ্রহ ইত্যাদি।

১৮ জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলের আদিলীলা।

১৯ চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক—১ম অঙ্ক।

২০ কুলসার সংগ্রহ—২য় ভাগ।

২১ প্রেমদাস জগদানন্দকে নবদ্বীপবাসী বলিয়াছেন।

২২ 'পণ্ডিতো জগানন্দ-শ্রীমৎ সুষেণ পণ্ডিতঃ'—মিশ্রগ্রন্থ ; বিভিন্ন কুলগ্রন্থাদি।

২৩ চৈতন্য ভাগবত, চরিতামৃত, চৈতন্য চন্দ্রোদয় ইত্যাদি।

২৪ সম্বন্ধ নির্ণয়।

২৫ চৈতন্য-ভাগবত—আদিখণ্ড।

২৬ চৈতন্য-ভাগবত-অন্ত্য-২য়—
'করিলা অশেষ রঙ্গ অদ্বৈতের ঘরে।'

২৭ আটিসারায়—'আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে।'

২৮ কুলচন্দ্রিকার—
"প্রায়শঃ জাহ্নবীতটে যত আছে গ্রাম।
নবদ্বীপ আশপাশ চতুঃপার্শ্ব ধাম॥
যাহাদের বহু অংশ বাস করে যথা।
কুলীন সমাজে সেই নাম হয় তথা॥"

২৯ পঞ্চপুষ্প, আশ্বিন, ১৩৪০।

৩০ J. A. S. B. July 1870

৩১ পঞ্চপুষ্প আশ্বিন ১৩৪০—আটিসারা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

উত্তরবঙ্গে প্রাচীন সভ্যতার আভাস *

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার এম-এ, বি-এল

১

উত্তরবঙ্গে অথবা বরেন্দ্রীমণ্ডলে প্রাচীন সভ্যতার ও পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন এত অধিক পরিমাণে আবিষ্কৃত হইতেছে যে এই মণ্ডলটি আধুনিক বঙ্গদেশের প্রাচীন সভ্যতার একটি সর্ব্বপ্রধান পুরাতন তীর্থক্ষেত্র বলিয়া ইতিহাসে মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে। বরেন্দ্র কবি সন্ধ্যাকর নন্দী—'রামচরিত কাব্যে' তাঁহার জন্মভূমি বরেন্দ্রমণ্ডলকে—বসুধা শিরো বরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণি কুল-স্থানং অর্থাৎ বসুধার শিরোভাগ বা শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই বিভাগের বিস্তৃতির আলোচনা করিতে গিয়া—অর্প্যাভিতো গঙ্গা করোতোয়ানর্ঘ্য প্রবাহপুণ্যতমাং অপুনর্ভবা-খ্যয় মহাতীর্থ বিকলুষোজ্জ্বলামতঃ" —'গঙ্গা-করোতোয়া' ও অপুনর্ভবা বিধৌত বলিয়া তিনি ইহাকে 'পুণ্যতমা' ও 'মহাতীর্থ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বড়গঙ্গা বা আধুনিক পদ্মাতীরের উত্তরভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া 'করতোয়া' নদীসৈকত পর্য্যন্ত এই বরেন্দ্রমণ্ডল বিস্তৃত। ইহার অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে 'বারেন্দ্র সমাজ' এখনও সুপরিচিত। এই বিস্তৃত ভূভাগের মৃত্তিকার অন্তরালে বাঙ্গলার একাংশের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন লুক্কায়িত আছে।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও এই প্রদেশের অধিবাসিগণের প্রচেষ্টায় বারেন্দ্র ভূমির প্রাচীন সভ্যতাসূচক ভাস্কর্য্যশিল্পের নিদর্শন বহুল পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়া নানা সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত হইয়াছে।

ধর্ম্মপ্রাণতাই ভারতের বৈশিষ্ট্য এবং প্রাচীন ভারতে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য শিল্পকলা সৃষ্টির ইহাই মূল উৎস। ভগবানের উপাসনার জন্য শ্রীমূর্ত্তি গঠনের আবশ্যকতা ও তাহা সংরক্ষণের জন্যই দেবালয় বা মন্দির নির্ম্মাণের আবশ্যকতা সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথমে অনুভূত হয়। বরেন্দ্র সভ্যতার ও কৃষ্টির ইতিহাসেও তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

বাঙ্গালা দেশ নদীমাতৃক এবং প্রস্তরের স্বল্পতা হেতু স্থায়ী প্রস্তরসম্পৎও দুর্লভ। এজন্য স্থাপত্যের নিদর্শন অতি অল্প পরিমাণে আবিষ্কৃত হইলেও বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত "সোমপুর বিহার" যাহাকে স্থানীয় অধিবাসিগণ অদ্যাবধি 'ওমপুর' বলিয়া নির্দ্দেশ করে তাহা বর্ত্তমানে

পাহাড়পুর স্তূপের একাংশের ছবি

স্তূপের আকৃতি পাহাড়ের ন্যায় বলিয়া সম্ভবতঃ মূল নাম বিস্মৃত হইয়া 'পাহাড়পুর স্তূপ' নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিতেছে।

বরেন্দ্রমণ্ডলের ইতিহাসে পাহাড়পুর স্তূপের ইতিবৃত্ত সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য। ১৯১৭ সালে পরলোকগত আচার্য্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই মহোদয় পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি স্তম্ভাংশের ক্ষোদিত লিপির

* (বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সৌজন্যে সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার)

পাঠোদ্ধার করতঃ সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষগণের ঐ স্তূপ খননের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীদশবলগর্ভ নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক রত্নত্রয়া প্রমোদেনানে, অর্থাৎ ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘ—ত্রিরত্নের তুষ্টির জন্য ঐ স্তম্ভদানের উৎসর্গলিপি উৎকীর্ণ আছে। স্তূপ খনন কালে একখানি গুপ্ত যুগের (১৫৯ গুপ্তাব্দ) তাম্রশাসনও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে জনৈক ব্রাহ্মণদম্পতি কর্ত্তৃক জৈন নিগ্রন্থদিগের পূজোপকরণের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভূমি দানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পাহাড়পুর মন্দিরের মূল ভিত্তি কোন্ ধর্ম্মের উদ্দেশে বা কোন্ যুগে স্থাপিত হইয়াছিল

ত্রিরত্ন স্তম্ভলিপি (সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার)

তাহার শেষ স্থির সিদ্ধান্ত করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত এই স্তূপে যে সকল স্মৃতি-নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেরই স্মৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই প্রদেশে জৈন ধর্ম্মের স্মৃতি-নিদর্শন এখন পর্য্যন্ত অতি অল্প পরিমাণেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাহাড়পুরে সামান্য জৈন স্মৃতি-নিদর্শন ব্যতীত বরেন্দ্রভূমিতে প্রাপ্ত তীর্থঙ্কর 'শান্তিনাথের মূর্ত্তি' ও ঋষভনাথের মূর্ত্তি আপাততঃ হুয়েন সাং উল্লিখিত এই প্রদেশে জৈনধর্ম্মের 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া' শাখার অস্তিত্বের এখন পর্য্যন্ত ক্ষীণ পরিচয় বলিয়া কথিত হইতে পারে। খৃঃ অঃ ৭ম শতাব্দীতে চীন দেশীয় পর্য্যটক হুয়েনসাং যখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছিলেন তখন এই প্রদেশের বহুসংখ্যক সঙ্ঘারামের মধ্যে একটী সঙ্ঘারামে সাত শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বাস করিবার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অদ্যাবধি পাহাড়পুর স্তূপের ন্যায় সুবৃহৎ ও সুবিস্তৃত মন্দির আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে সীমা-প্রাচীরের (rampart) গাত্রে বহুসংখ্যক প্রকোষ্ঠ (cells বা dormitories) আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে আশ্রমিক জীবনের (monastic life) নিদর্শন পরিলক্ষিত হওয়ায় পাহাড়পুর স্তূপই হুয়েন সাং কথিত সাত শত মহাযান বৌদ্ধ ভিক্ষুর আবাসস্থল ভবিষ্যৎ খনন ও আবিষ্কারের ফলে স্থিরীকৃত হইতে পারিবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই পাহাড়পুর বা সোমপুর বিহারের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং পালযুগে মগধ দেশের সহিত ইহার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, নালন্দা, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি স্থানে প্রা[illegible] লিপি হইতে তাহার সাক্ষ্য ও আভা[illegible] প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধগয়ার একটি বু[illegible] প্রতিমার পাদদেশে "শ্রী সা ম তা ট কঃ প্রবরমহাযানযায়িনঃ শ্রী মৎ সো ম পু[illegible] মহাবিহারীয় বিনয়বিৎ স্থবির বীর্য্যেন্দ্র ভদ্রস্য।" এইরূপ এক লিপি উৎকী[illegible] আছে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএ[illegible] দক্ষিণ বঙ্গ বা সমতটবাসী প্রবর মহাযান মতাবল[illegible] বিনয় শাস্ত্র পারদর্শী স্থবির সম্প্রদায়ভুক্ত সোমপুর মহা[illegible] বিহারবাসী বীর্য্যেন্দ্র ভদ্রনামা এক তীর্থযাত্রীর দান বলি[illegible] উল্লিখিত হইয়াছে।

নালন্দায় প্রাপ্ত একখানি শিলালিপি হইতে 'বিপুল[illegible] মিত্র' নামক সোমপুর মহাবিহারের একজন বৌদ্ধ যতি[illegible] উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্প্রতি মূল স্তূপের সন্নিক[illegible] 'সত্যপীরের ভিটা' খনিত হইবার পর নালন্দা শিল[illegible] লিপিতে উল্লিখিত প্রাচীন সোমপুরে খৃঃ দশম একাদ[illegible]

শতাব্দীতে একটি 'তারামূর্ত্তি' বিরাজিত মন্দির শোভা পাইবার কথা প্রমাণিত হইবার সুযোগ লাভ করিতেছে। দুইজন তিব্বতীয় গ্রন্থকার সোমপুরে বৌদ্ধমন্দিরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস প্রণেতা লামা তারানাথ এবং Pog Sam jon zaug নামক গ্রন্থেও পালসম্রাট দেবপাল কর্ত্তৃক বরেন্দ্রাধিকারের চিহ্নস্বরূপ বরেন্দ্রভূমিতে 'সোমপুরী' নামক স্থানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া বহু পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। স্তূপ খননকালে বহু সংখ্যক মৃৎনির্ম্মিত মুদ্রা (Terracotta seals) প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে "শ্রীসোমপুরে শ্রীধর্ম্মপালদেব মহাবিহারীয়ার্য্য ভিক্ষু সঙ্ঘস্য" এই উৎসর্গ-বচন হইতে ও অন্যান্য প্রমাণাবলী হইতে পাহাড়পুর স্তূপই যে উল্লিখিত বরেন্দ্র দেশে অবস্থিত প্রাচীন কালের "সোমপুর মহাবিহার" তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারে। সম্প্রতি মূল মন্দিরের অনুরূপ (Replica) একটি ক্ষুদ্র মন্দির আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাচীন ভারতে এই প্রদেশের মন্দির-নির্ম্মাণ-পদ্ধতির কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছে। বুদ্ধগয়ার মন্দির-প্রাঙ্গণেও বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুরূপ একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের আদর্শ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। সম্ভবতঃ তৎকালে নক্সা বা (Plan) স্বরূপ সর্ব্বপ্রথম ঐরূপ ক্ষুদ্র আদর্শ বা (model) মন্দির-শিল্পীর সুবিধার জন্য প্রস্তুত করা হইত বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

পাহাড়পুর মন্দিরের স্থাপত্যের আদর্শ স্তর-বিন্যস্ত বা Terraced type। বর্ত্তমানযুগে এ প্রদেশে দোলমঞ্চ নির্ম্মাণপদ্ধতি সম্ভবতঃ এ প্রদেশের মন্দির নির্ম্মাণের প্রাচীন আদর্শের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ স্তূপ খননের পর যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ঐ মন্দিরের গঠন-ভঙ্গী ও স্থাপত্যের আদর্শ সুদূর যবদ্বীপের বিখ্যাত বরোবদুর মন্দিরের স্থাপত্যরীতির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ায় প্রাচ্য ভারতের তথা বরেন্দ্রভূমির ইতিহাসে ভবিষ্যৎ তথ্যানুসন্ধানের ফলে একটী নূতন উজ্জ্বল অধ্যায় সংযুক্ত করিয়া দিবে বলিয়া ভরসা হয়।

তিরশ্চী

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১

সবাইর মুখের উপর সটান বলে' বসলুম: বিয়ে যখন আমিই করছি, মেয়েও আমিই দেখতে যাবো। তোমরা সব পছন্দ করে' এলে পরে আমি গিয়ে হয়কে নয় করে' দিয়ে এলুম—সেটা কোনো কাজের কথা নয়। মাথার দিকে হোক্, ল্যাজের দিকে হোক্, পাঁঠাটা যখন আমার, আমাকেই কাটতে দাও। যা থাকে কপালে আর যা করেন কালী।

প্রস্তাবটায় কেউ আপত্তি করলে না। তার প্রধান কারণ আমি চাকরি করছি, আর সেটা বেশ মোটা চাকরি।

বাবা দিন ও সময় দেখে দিলেন, আমার মামাতো ভাই রাধেশ আমার সঙ্গে চল্‌লো।

বলা বহুলতরো হ'বে, সেদিনের সাজগোজের ঘটাটা আমার পক্ষে একটু প্রশস্তই হ'য়ে পড়েছিলো। ইদানি বিয়ের কথা-বার্ত্তা হচ্ছিলো বলে' আমি আমার কোঁচার ঝুলটা পঞ্চাশ ইঞ্চিতে নামিয়ে এনেছিলুম, কিন্তু সেদিন যেন পঞ্চাশ ইঞ্চিতেও আমার পায়ের পাতা ঢাকা পড়ছিলো না। চাকরকে বিশ্বাস নেই, জুতোয় নিজেই বুরুশ করতে বসলুম। এবং রাধেশ যখন আমাকে তাড়া দিতে এলো, দেখলুম, মুখটা নির্ম্মূল নির্ম্মল করে' এক মুঠো কিউটিকুরা ঘষে' আমি তার ছায়ায় এসেও দাঁড়াতে পারিনি।

ব্যাপারটা নির্জ্জলা ব্যবসাদারি, তবু মনে নতুন একটা নেশার আবেশ আসছিলো। বলতে গেলে, বইয়ের

থেকে মুখ তুলে সেই আমার প্রথম বাইরের দিকে তাকানো। শরীরে-মনে এতো সচেতন হ'য়ে জীবনে এর আগে কোনোদিন কোনো মেয়ের মুখ দেখেছি বলে' মনে পড়ে না। বিয়ে করবো এই ঘটনাটার মধ্যে ততো চমক নেই, কিন্তু মুখ ফুটে একবার একটি 'হাঁ' বললেই এতো বড়ো পৃথিবীর কে-একটি অপরিচিতা মেয়ে এক নিমেষে আমার একান্ত হ'য়ে উঠবে—এটাই নিদারুণ চমৎকার লাগছিলো। আমি ইচ্ছে করলেই তাকে সঙ্গে করে' আমার বাড়ি নিয়ে আসতে পারি, কারুর কিছু বলবার নেই, বাধা দেবার নেই। অহরহই তো আমরা 'না' বলছি, কিন্তু সাহস করে' একবার 'হাঁ' বলতে পারলেই সে আমার।

গ্রহ-নক্ষত্রদের চক্রান্তে অন্ধ, অভিভূত হ'য়ে রাধেশের সঙ্গে কালিঘাটের ট্রাম ধরলুম।

ভাগ্যিস রাধেশ গোড়াতেই আমাকে কন্যাপক্ষীয়দের কাছে চিহ্নিত করে' দিয়েছিলো, নইলে, তার সাজ-গোজের যে বহর, তাকেই তাঁরা পাত্র বলে' মনে করতেন, অন্তত মনে করতে পারলে সুখী যে হ'তেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে, পুরুষের শোভাই নাকি তার চাকরি, সেই ভরসায় রাধেশের ভ্রাতৃভক্তিকে ভূয়সী স্তুতি করতে-করতে ভদ্রলোকদের সঙ্গে দোতলায় উঠে এলুম।

যবনিকা কখন উঠে গেছে, রঙ্গমঞ্চে আমাদের আবির্ভাব হ'লো। প্রকাণ্ড ঘরটা যেন রুদ্ধশ্বাস নিঃশব্দতায় পাথর হ'য়ে আছে। মেঝের উপর ঢালা ফরাস, তারই মাঝখানে ছোট একটি টিপয়ের সামনে হাতলহীন নিচু একটি চেয়ার। টিপয়ের উপর কড়া-ইস্ত্রির ফর্সা একটি ঢাকনি; একপাশে দোয়াত-দানিতে কালি-কলম, অন্য দিকে স্তূপীকৃত কতোগুলি বই। অদূরে ছোট একটি অর্গ্যান। সেটিংটা নিখুঁত। ওধারে লম্বাটে একটা খালি টেব্‌লের দু'ধারে যে অবস্থায় মুখোমুখি ক'খানা চেয়ার সাজিয়ে রাখা হয়েছে, মনে হ'লো, ওখানে উঠে গিয়েই আমাদের মিষ্টিমুখ করবার অবশ্যকর্তব্যটা পালন করতে হ'বে। মনে হ'লো, রিহার্স্যাল দিয়ে-দিয়ে ভদ্রলোকদের পার্টগুলি আগাগোড়া সব মুখস্থ।

টিপয়টার দিকে মুখ করে' পাশাপাশি দু'খানা চেয়ারে দু'জন বসলুম।

অভিনয় দেখবার জন্যে দর্শকের, সত্য করে' বলা যাক্, দর্শিকার অভাব দেখলুম না। জানলার আনাচে-কানাচে মেয়েদের চোখের ও আঙুলের সঙ্কেতগুলি রাধেশের প্রতি এমন অজস্র ও অবারিত হ'য়ে উঠতে লাগলো যে হাতে নেহাৎ চাকরিটা না থাকলে তাকে জায়গা ছেড়ে সটান বাড়ি চলে' যেতুম। রাধেশ যে বছর দুয়েক ধরে' বি-এ পরীক্ষায় খাবি খাচ্ছে সেইটেই আমার পক্ষে একটা প্রকাণ্ড বাঁচোয়া।

হ্যাঁ, মেয়েটি তো এখন এসে গেলেই পারে। ভদ্রলোকদের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে কখন থেকে হাঁ করে' বসে' আছি।

চক্ষু থেকে শ্রবণেন্দ্রিয়টাই এখন দ্রুত ও তীক্ষ্ণ কাজ করছে। অস্পষ্ট করে' অনুভব করলুম পাশের ঘরেই মেয়ে সাজানো হচ্ছে—বিস্তৃত সাড়ির খসখস ও চুড়ির টুকরো-টুকরো টুং-টাং আমার মনে নতুন বৃষ্টির শব্দের মতো বিবশ একটা তন্দ্রার কুয়াসা এনে দিচ্ছিলো। তার সঙ্গে অনেকগুলি চাপা কণ্ঠের অনুনয় ও তারো অনুচ্চারিত গভীরে কা'র যেন রঙিন খানিকটা লজ্জা। সেই লজ্জা গায়ের উপর স্পর্শের মতো স্পষ্ট টের পেলুম।

রাধেশের কনুইয়ের উপর অলক্ষ্যে একটা চিম্‌টি কাটতে হ'লো।

কব্জির ঘড়ির দিকে চেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে রাধেশ বল্‌লে, —বড্ড দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। সাড়ে ন'-টা পর্য্যন্ত ভালো সময়।

তাড়া খেয়ে ভদ্রলোকদের একজন অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। ফিরতে তাঁর দেরি হ'লো না, বল্‌লেন: এই আসছে।

এবং নতুন করে' প্রস্তুত হ'বার আগেই মেয়েটি ঢুকে পড়লো। ঠিক এলো বলতে পারি না, যেন উদয় হ'লো। অনেকক্ষণ বসে' থাকার জন্যে ভঙ্গিটা শিথিল, ক্লান্ত হ'য়ে এসেছিলো, তাকে যথেষ্ট রকম ভদ্র করে' তোলবার পর্য্যন্ত সময় পেলুম না। সবিস্ময়ে রাধেশের মুখের দিকে তাকালুম।

দেখলুম রাধেশের মুখ প্রসন্নতায় বিশেষ কোমল হ'য়ে আসে নি। তা না আসুক, আমি কিন্তু এক বিষয়ে পরম নিশ্চিন্ত হ'লুম। আর যাই হোক, মেয়েটি রাধেশের

যোগ্য নয়। আর যাই থাক্ বা না থাক, মেয়েটির বয়েস আছে।

টিপয়ের সামনেকার চেয়ারটা একেবারে লক্ষ্যই না করে' মেয়েটি ফরাসের এককোণে হাঁটু মুড়ে বসে' পড়লো। তার আসা ও বসার এই ধরাটা একটা দেখবার জিনিস। তার শরীরে লজ্জার এতোটুকু একটা দুর্ব্বল আঁচড় কোথাও দেখলুম না। প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল, চঞ্চল সেই শরীর একপাত নিষ্ঠুর ইস্পাতের মতো যেন ঝক্‌ঝক্ করছে। কোনো কিছুকেই যেন সে আমোলে আনছে না, সব কিছুর উপরেই সে সমান উদাসীন।

বৃথাই এতোক্ষণ উৎকর্ণ হ'য়ে তার সাজগোজের শব্দ শুনছিলুম, আমার জীবনের আজকের ভোরবেলাটির মতোই মেয়েটি একান্ত পরিচ্ছন্ন, বোধহয় বা বিষাদে একটু ধূসর। পরনে আটপৌরে একখানা সাড়ি, খাটো আঁচলে দুই কাঁধ ঢাকা, হাতে দু'-এক টুকরো ঘরোয়া গয়না, কালকের রাতের শুক্‌নো খোঁপাটা ঘাড়ের উপর এখন অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে। এই তো তাকে দেখবার। এড়িয়ে এসেছে সে সব আয়োজন, ঠেলে ফেলে দিয়েছে সব উপকরণের বোঝা: সে যা, তাই সে হ'তে পারলে যেন বাঁচে। কিন্তু কেন এই ঔদাস্য? মনে-মনে হাসলুম। আমি ইচ্ছে করলে এক মুহূর্ত্তে তার এই বিষাদের মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি। আর তাকে লোলুপদৃষ্টি পুরুষের সামনে রূপের পরীক্ষা দিতে এসে এমন ক্লান্ত, বিরক্ত, কলুষিত হ'তে হয় না।

গায়ের রঙটা যে রাধেশের পছন্দ হয় নি তা প্রথমেই তার মুখ দেখে অনুমান করেছিলুম। বিনয় করে' লাভ নেই, মেয়েটি দস্তুরমতো কালো। চামড়ার তারতম্য বিচারের বেলায় এমন রঙকে আমরা সাধারণতো কালোই বলে' থাকি। শুদ্ধ ভাষায় শ্যামবর্ণ একে বলতে পারো বটে, কিন্তু টুইড্‌লডাম্ ও টুইড্‌লডিতে কোনো তফাৎ নেই।

ভদ্রলোকদের পার্টি সব মুখস্ত। একজন অযাচিত বলে' বসলেন: এমনিতে গায়ের রঙ ওর বেশ ফর্সা, কিন্তু পুরীতে চেঞ্জে গিয়ে সমুদ্রে স্নান করে'-করে' এমনি কালো হ'য়ে এসেছে।

কিন্তু, মনে-মনে ভাবলুম, এর জন্যে এতো জবাবদিহি কেন? মেয়েরা যেমন শুধু আমাদের অর্থোপার্জ্জনের দৌড় দেখছে, তাদের বেলায় আমরাও কি তেমনি শুধু তাদের চামড়ার বুনট দেখবো?

ভদ্রলোকদের একজন আমাকে অনুরোধ করলেন: কিছু জিগ্‌গেস করুন না?

একেবারে অথই জলে পড়লুম। এমন একখানা ভাব করলুম, যেন, আমাকেই যদি আলাপ করতে হয়, তবে ঘরে রাজ্যের এতো লোক কেন?

ভদ্রলোকদের আরেকজন টিপয় থেকে একটা বই তুলে বল্লেন,—কিছু পড়ে' শোনাবে?

আমার কিছু বলবার আগেই রাধেশ এগিয়ে এলো: না। ফার্স্ট ডিভিশনে যে ম্যাট্রিক্ পাশ করেছে তাকে পড়াশুনোর বিষয় কিছু প্রশ্ন করাটাই অবান্তর হ'বে। চেয়ারের মধ্যে রাধেশ উসখুস করে' উঠলো, গলাটা খাঁখ্‌রে মেয়েটিকে জিগ্‌গেস করলে: তোমার নাম কি?

কী আশ্চর্য্য প্রশ্ন! ম্যাট্রিক পাশের খবর পেয়েও তার নামটা কিনা সে জেনে রাখে নি।

দেয়ালের দিকে মুখ করে' মেয়েটি নির্লিপ্ত গলায় বল্‌লে,—সুমিতা ঘোষ।

মনের মধ্যে যুগপৎ দু'টো ভাব খেলে গেলো। প্রথমতো, দিন কয়েক পরে নাম বলতে গিয়ে দেখবে তার ঘোষ কখন আমারই মিত্র হ'য়ে উঠেছে—দেহে-মনে এমন কি নামে পর্য্যন্ত তার সে কী অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! দ্বিতীয়তো, রাধেশের এই ইয়ার্কি আমি বা'র করবো। তার মাষ্টারের এই সম্মানিত, উদ্ধত ভঙ্গিটা যদি সুমিতার পায়ের কাছে প্রণামে না নরম করে' আনতে পারি তো কী বলেছি!

আলাপের দরজা খোলা পেয়ে রাধেশের সাহস যেন আরো বেড়ে গেলো। বল্‌লে,—খবরের কাগজ পড়ো?

সুমিতা চোখ নামিয়ে গম্ভীর গলায় বল্‌লে,—মাঝে-মাঝে।

তবু রাধেশের নির্লজ্জতার সীমা নেই। জিগ্‌গেস করলে: বাঙলা গভর্ণমেণ্টের চিফ্ সেক্রেটারির নাম বলতে পারো?

ভুরু দু'টি কুটিল করে' সুমিতা বল্‌লে,—না।

—উনিশ শো বাইশে গয়ায় যে কংগ্রেস হয়েছিলো তার প্রেসিডেন্ট কে ছিলো ?

সুমিতা স্পষ্ট বল্‌লে,—জানি না।

রাধেশের তবু কী নিদারুণ আস্পর্দ্ধা! জিগ্‌গেস করলে: আন্নামালায়ে যে একটা নূতন ইউনিভার্সিটি হয়েছে তার খবর রাখো ? জায়গাটা কোথায় ?

সুমিতা বল্‌লে,—কী করে' বলবো ?

রাধেশ যেন তার তু' বছরের পরীক্ষা-পাশের অক্ষমতার শোধ নেবার জন্যে মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। সেখানে বসে' তার কান মলে' দেয়া সম্ভব ছিলো না, গোপনে আরেকটা চিমটি কেটে তাকে নিরস্ত করলুম।

সত্যিকারের দেখাটা মানুষের সুদীর্ঘ উপস্থিতিতে নয়, তার আকস্মিক আবির্ভাবে ও অন্তর্ধানে। সুমিতাকে তাই লক্ষ্য করে' বল্‌লুম,—এবার তুমি যেতে পারো।

যা ভেবেছিলুম তাই, তার সেই শরীরের নির্ঝরিণীতে ভঙ্গুর, বিশীর্ণ ক'টি রেখা মুক্তির চঞ্চলতায় ঝিক্‌মিক্ করে' উঠলো। বসায় থেকে তার সেই হঠাৎ দাঁড়ানোর মাঝে গতির যে তীক্ষ্ণ একটা দ্যুতি ছিলো তা নিমেষে আমার তু' চোখকে যেন পিপাসিত করে' তুললে। সুমিতা আর এক মুহূর্ত্তও দ্বিধা করলো না, যেন এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে, এমনি তাড়াতাড়ি পিঠের সঙ্কিপ্ত আঁচলটা মুক্তিতে আলুলায়িত করে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ঠিক চলে' গেলো বলতে পারি না, যেন গেলো নিবে, গেলো হারিয়ে।

মনে-মনে হাসলুম। দিন কয়েক নেহাৎ আগে হ'য়ে পড়ে, নইলে ঐ তার পাখির পাখার মতো মুক্তিতে বিস্ফারিত উড়ন্ত আঁচলটা মুঠিতে চেপে ধরে' অনায়াসে তাকে স্তব্ধ করে' দিতে পারতুম, কিম্বা আমিও যেতে পারতুম তার পিছু-পিছু। আজ যে এতো বিমুখ, সে-ই একদিন অবারিত, অজস্র হ'য়ে উঠবে ভাবতেও কেমন একটা মজা লাগছে। যে আজ পালাতে পারলে বাঁচে, সে-ই একদিন আমার কণ্ঠতট থেকে তার বাহুর ঢেউ তু'টিকে শিথিল করতে চাইবে না।

আমি যেন ঠিক তাকে চলে' যেতে বললুম না, তাড়িয়ে দিলুম—ভদ্রলোকের দল চিন্তিত হ'য়ে উঠলেন। একজন বল্‌লেন,—অন্তত গানটা ওর শুনতেন। স্কুলে ও উপাধি পেয়েছে গীতোর্ম্মিমালিনী।

আরেকজন বল্‌লেন,—এই দেখুন ওর সব সেলাই। স্কার্ফ, মাফ্‌লার, টেপেষ্ট্রি—যা চান্।

আরেকজন যোগ করে' দিলেন: অন্তত ওর হাতের লেখার নমুনাটা একবার—

রুমাল দিয়ে ঘাড়টা সবলে রগ্‌ড়াতে-রগ্‌ড়াতে বল্‌লুম, —কোনো দরকার নেই। এমনিতেই আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

রাধেশের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার চেয়ে তার পিঠে একটা ছুরি আমূল বসিয়ে দিলেও যেন সে বেশি আরাম পেতো।

পুরাঙ্গনরা, যারা এখানে-ওখানে উঁকি-ঝুঁকি মারছিলো, সমমুহূর্ত্তে সবাই কলধ্বনিত হ'য়ে উঠলো। তার মাঝে স্পষ্ট অনুভব করলুম একজনের সলজ্জ, সুন্দর শুব্ধতা।

তারপর সুরু হ'লো ভোজনের বিরাট রাজসূয়। এতো বড়ো একটা ভোজের চেহারা দেখেও রাধেশের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো না।

২

আমি যে কী ভীষণ অবুক ও আনাড়ি, বাড়িতে ফিরে রাধেশ সেইটেই সাব্যস্ত করতে উঠে-পড়ে' লেগে গেছে। এক কথায় মেয়ে পছন্দ করে' এলুম, অথচ খোঁপা খুলে না দেখলুম তার চুলের দীর্ঘতা, না বা দেখলুম হাঁটিয়ে তার লীলা-চাপল্য। সামান্য একটা হাতের লেখা পর্য্যন্ত তার নিয়ে আসি নি।

—তারপর, রাধেশ মুখ টিপে হাসতে লাগলো: এমন তাড়াতাড়ি ভাগিয়ে দিলে যে মেয়েটার চোখ তুটো পর্য্যন্ত ভালো করে' দেখতে পেলুম না। দেখবার মধ্যে দেখলুম শুধু একখানা গায়ের রঙ।

বাড়ির মহিলারা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন: কী রকম ? আমাদের মিনির মতো হ'বে ?

রাধেশের একবিন্দু মায়া-দয়া নেই, অভদ্র, রূঢ় গলায় বল্‌লে,—Apologetically-ও নয়। আমাদের মিনি তো তার তুলনায় দেবী।

আমার রুচিকে কেউ প্রশংসা করতে পারলো না। বাড়ির মহিলারা, যাঁরা তাঁদের যৌবদশায় এমনি বহুতরো পরীক্ষার ব্যূহ ভেদ করে' অবশেষে আমাদের বাড়িতে এসে বহাল হয়েছেন, টিপ্পনি কাটতে লাগলেন: এমন মেয়ে-কাঙাল পুরুষ তো কখনো দেখি নি বাপু। এমন কী দুর্ভিক্ষ হয়েছে যে খাদ্যাখাদ্যের আর বাছ-বিচার করতে হ'বে না। সাধে কি আর পাত্রকে গিয়ে নিজের জন্যে মেয়ে দেখতে দেয়া হয় না? ডব্‌কা বয়সের একটা যেমন-তেমন মেয়ে দেখলেই কি এমনিধারা রাশ ছেড়ে দিতে হয় না?

প্রশ্রয় পেয়ে রাধেশ তার রসনাকে আরো খানিকটা আলগা করে' দিলো: মা হয়তো বা কোনোরকমে পার হ'লেন কিন্তু তাঁর মেয়েদের আর গতি হচ্ছে না এ আমি তোমাদের আগে থাকতে বলে' রাখছি।

সেই অপরিচিতা মেয়েটির হ'য়ে শুধু আমি একা লড়াই করতে লাগলুম। তাকে পছন্দ না করে' যে আর কী করতে পারি কিছুই আমি ভেবে পেলুম না। আমার চোখ না থাক্‌, অন্তত চক্ষুলজ্জা তো আছে।

মা প্রবল প্রতিবাদ সুরু করলেন: কালো বলে'ই ওরা অতো টাকা দিতে চায়। কিন্তু তোর টাকার কী ভাবনা? আমি তোর জন্যে টুকটুকে বৌ এনে দেবো।

হেসে বল্লুম,—টাকা অবিশ্যি আমি ছেড়ে দেবো, মা, কিন্তু মেয়েটিকে ছাড়তে পারবো না। তাকে যখন আমি দেখতে গেছলুম, তখন তাকে বিয়ে করবো বলে'ই দেখতে গেছলুম। একটি মেয়েকে তেমন আত্মীয়তার চোখে একবার দেখে তাকে আমি কিছুতেই আর ফেরাতে পারবো না। তোমরা তাকে পরীক্ষা করতে পারো, কিন্তু আমার শুধু পছন্দ করবার কথা।

এই যে আমার কী এক অন্যায় খেয়াল, আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সবাই সন্দিহান হ'য়ে উঠলো। কিন্তু বাবা আমাকে রক্ষা করলেন। বল্লেন: ওর যখন ওখানেই মত হয়েছে, তখন ওখানেই ওর বিয়ে হ'বে।

তোমরা ঠাট্টা করতে পারো, কিন্তু বলতে আমার দ্বিধা নেই, সুমিতাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। কথাটা একটু হয়তো রূঢ় শোনাচ্ছে, কিন্তু ভালো লাগার একটা বিশেষ অবস্থার নামই কি ভালোবাসা নয়? তাকে এতো ভালো লেগেছে যে তার সমস্ত ত্রুটি, সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাকে আমি বিয়ে করতে চাই, এইটেই কি আমার ভালোবাসার প্রমাণ নয়?

সুমিতা কালো, এবং তারি জন্যে সমস্ত সংসার প্রতিকূলতা করছে, মনে হ'লো, এ-ব্যাপারে সেইটেই আমার কাছে প্রধান আকর্ষণ। সুমিতাকে যে আমি এই অপমান থেকে রক্ষা করতে পারবো সেইটেই আমার পুরুষত্ব।

বাবা দিন-ক্ষণ ঠিক করে' ওদের চিঠি লিখে দিলেন।

পাশাপাশি সে ক'টা দিন-রাত্রি আমার একটানা একটা তন্দ্রার মধ্য দিয়ে কেটে গেলো। কে কোথাকার একটি অচেনা মেয়ে পৃথিবীর অগণন জনতার মধ্যে থেকে হঠাৎ একদিন আমার পাশে এসে দাঁড়াবে তারি বিস্ময়ের রহস্যে মুহূর্তগুলি আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠলো। তার জীবনের এতোগুলি দিন শুধু আমারই জীবনের একটি দিনকে লক্ষ্য করে' তার শরীরে-মনে স্তূপে-স্তূপে সঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে। পুরীতে যখন সে সমুদ্রে ডুব দিতো, তখনো সে ভাবে নি তীরে তার জন্যে কে বসে' আছে। ঘটনাটা এমন নতুন, এমন অপ্রত্যাশিত যে কল্পনায় অসুস্থ হ'য়ে উঠতে লাগলুম। কাজের আবর্তে মনকে যতোই ফেনিল করে' তুলতে চাইলুম, ততোই যেন অবসাদের আর কূল খুঁজে পেলুম না।

হয়তো সুমিতারো মনে এমনি দক্ষিণ থেকে হাওয়া দিয়েছে। বাইরে থেকে কে কোথাকার এক অহঙ্কারী পুরুষ নিমেষে তার অন্তরের অঙ্গ হ'য়ে উঠবে এর বিস্ময় তাকেও করেছে মুহ্যমান। হয়তো সেদিনের পর থেকে তার চোখের দীর্ঘ দুই পল্লবে কপোলের উপর ক্ষণে-ক্ষণে লজ্জার শীতল একটু ছায়া পড়ছে, হয়তো আয়নাতে চুল বাঁধবার সময় তার শুভ্র সীমন্তরেখাটির দিকে চেয়ে সে একটি নিশ্বাস ফেলছে, হয়তো আমারি মতো রাতের অনেকক্ষণ সে ঘুমুতে পারছে না।

৩

বলা বাহুল্য, নইলে এ গল্প লেখার কোনো দরকার হ'তো না, সুমিতার সঙ্গে আমার বিয়েটা শেষ পর্য্যন্ত ঘটে' ওঠে নি।

কেন ওঠে নি, সেইটেই এখন বলতে হ'বে।

বাবা সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মেয়েকে পাকা দেখতে বেরোবেন, সকালবেলার ডাক এসে হাজির। আমারই নামে খামে মোটা একটা চিঠি। মোড়কটা ক্ষিপ্রহাতে খুলে ফেলে নিচে নাম দেখলুম: সুমিতা।

বলতে বাধা নেই, সেই মুহূর্ত্তটা আনন্দে একেবারে বিহ্বল হ'য়ে গেলুম। বিয়ের আগে এমন একখানি চিঠি যেন বিধাতার আশীর্ব্বাদ।

তারপরে লুকিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে' গেলুম চিঠিটা পড়তে। মেয়ের চিঠি, তাই চিঠিটা একটু বিস্তারিত। সুমিতা লিখছে:

মান্যবরেষু,

আপনাকে চিঠি লিখছি দেখে নিশ্চয়ই খুব অবাক হ'বেন, কিন্তু চিঠি না লেখা ছাড়া সত্যি আর আমার কোনো উপায় নেই। রূঢ়তা মার্জ্জনা করবেন এই আশা করে'ই চিঠি লিখছি।

আপনি যে আমাকে পছন্দ করবেন, কেউই যে আমাকে এইভাবে পছন্দ করতে পারে, একথা আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি। আপনার আগে আরো অনেকের কাছে আমাকে রূপের পরীক্ষা দিতে হয়েছিলো, কিন্তু সব জায়গাতেই আমি সসম্মানে ফেল্ করে' বেঁচে গিয়েছিলুম। শুধু আপনিই আমাকে এই অভাবনীয় বিপদে ফেললেন। আপনি আবার এতো উদার, এতো মহানুভব যে আমার বর্ণমালিন্যের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভয়াবহ একটা টাকা পর্য্যন্ত দাবি করলেন না। সব দিক থেকেই আমার পালাবার পথ বন্ধ করে' দিলেন। এর আগে আর কাউকে চিঠি লেখবার আমার দরকার হয় নি, একমাত্র আপনাকে লিখতো হ'লো। জানি আপনি মহানুভব, তাই আমি এতো সাহস দেখাতে সাহস পেলুম।

আপনি আমাকে মুক্তি দিন, এই বিপদ থেকে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। বিয়ে করে' নয়, বিয়ে না করে'। পরিবারের সঙ্গে সংগ্রাম করে'-করে' আমি ক্লান্ত, প্রায় পঙ্গু হ'য়ে পড়েছি—কী যে আমি করতে পারি, কোনোদিকে পথ খুঁজে পাচ্ছি না। জানি, এই ক্ষেত্রে আপনিই শুধু আমাকে বাঁচাতে পারেন, তাই কোনোদিকে না চেয়ে শেষকালে আপনার কাছেই ছুটে এসেছি।

কেন বিয়ে করতে চাই না, তার একটা স্থূল, স্পর্শসহ কারণ না পেলে আপনি আশ্বস্ত হ'বেন না জানি। সে-কারণ আপনাকে জানাতে আমার সঙ্কোচ নেই।

আমি একজনকে ভালোবাসি—কথাটা মাত্র লিখে আমি তার গভীরতা বোঝাতে পারবো না। তার জন্যে আমাকে আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হ'বে, যতোদিন না সে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে, ততোদিন, তারি জন্যে, আমাকে নানা কৌশল করে' এই সব ষড়যন্ত্র পার হ'তে হচ্ছে। রূপের পরীক্ষার চাইতেও সে কী কঠিনতরো সাধনা!

আশা করি, আপনি একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক, আপনার কাছে আমি সহানুভূতি না পেলেও করুণা পাবো। আমার এই অসহায় প্রেমকে আপনি মার্জ্জনা করুন। একজন বন্দিনী বাঙালি মেয়ে আপনার কাছে তার প্রেমের পরমায়ু ভিক্ষা করছে।

তবু, এতোতেও যদি আপনি নিরস্ত না হ'ন তো আমার পরিণাম যে কী হ'বে আমি ভাবতে পারছি না ইতি।

বিনীতা

সুমিতা

চিঠি পড়ে' প্রথম কিন্তু মনে হ'লো সুমিতার হাতের লেখাটি ভারি সুন্দর, লাইন ক'টি সোজা ও পাশাপাশি দুটো লাইনের অন্তরালগুলি সমান! বানানগুলি নির্ভুল, এবং দস্তুরমতো কমা, দাঁড়ি ও প্যারাগ্রাফ বজায় রেখে সে চিঠি লেখে। তার উপর শ্রদ্ধা আমার চতুর্গুণ বেড়ে গেলো এবং যে-পাত্রী আমি মনোনীত করেছি সে যে নেহাৎ একটা যা-তা মেয়ে নয়, সে-কথাটা বাড়ির মহিলাদের কাছে সদ্য-সদ্য প্রমাণ করতে এ-চিঠিটা তাঁদেরকে দেখাবার জন্যে পা বাড়ালুম।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মনে পড়লো, তার চিঠির কথা নয়, চিঠির ভিতরকার কথা। সুখ হ'লো না দুঃখ হ'লো চেতনাটার ঠিক স্বাদ বুঝলুম না। খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মতো সামনের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

ওদিকে বাবা দলবল নিয়ে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি চোখ-কান বুজে তাঁর কাছে ছুটে গেলুম।

বললুম—থাক্, ওখানে গিয়ে আর কাজ নেই। ও-মেয়ে আমি বিয়ে করবো না।

বাবা তো প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন: সে কি কথা?

—হাঁ, আমি আমার মত বদলেছি।

সে একটা বীভৎস কেলেঙ্কারিই হ'লো বলতে হ'বে, কিন্তু সুমিতার জন্যে সব আমি অক্লেশে সহ্য করতে পারবো।

কথাটা দেখতে-দেখতে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ছেঁকে ধরলে: মত বদলাবার কারণ কী?

বললুম,—বড্ড কালো।

হাসবে না কাঁদবে কেউ কিছু ভেবে পেলো না: বললে,—বা, এই কালো জেনেই তো এতো তড় পেছিলি। এই কালোই তো ছিলো ওর বিশেষণ।

কী যুক্তি দেবো ভেবে পাচ্ছিলুম না। বললুম,—বিয়েতে আমার টাকা চাই।

—বেশ ছেলে যা হোক্ বাবা। তুইই না বলতিস বিয়েতে টাকা নেয়ার চাইতে গণিকাবৃত্তিতে বেশি সাধুতা আছে। ভদ্রলোকদের কথা দিয়ে এখন পিছিয়ে যাবার মানে কী?

বললুম,—বেশ তো, তাঁদের অকারণ মনস্তাপের দরুণ না-হয় যথাযোগ্য খেসারৎ দেয়া যাবে।

সবাই বিদ্রূপ করে' উঠলো: এদিকে পণ নিয়ে বিয়ে করবার মতলোব, ওদিকে গরচা খেসারৎ দেয়া হচ্ছে। মাথা তোর বিগড়ে গেলো নাকি?

কিন্তু এদের পাঁচজনকে আমি কী বলে' বোঝাই? শুধু নিজের মনকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি-চুপি বোঝাতে পারি: সুমিতাকে আমি ভালোবেসেছি।

সুমিতাকে আমি ভালোবেসেছি, নিশ্চয় ভালোবেসেছি তার ঐ প্রেম। তাই, তাকে অপমান করি, আমার সাধ্য কী! তাকে যে আমার কেন এতো পছন্দ হয়েছিলো, এ কথা এখন কে বুঝবে?

আমার সঙ্গে তার বিয়ের সম্ভাবনাটা সমূলে ভেঙে দিলুম। নিরীহ একটি মেয়ের অকারণ সর্ব্বনাশ করছি বলে' চারদিক থেকে একটা নিদারুণ ধিক্কার উঠলো, কিন্তু আমি জানি, ঈশ্বর জানেন, আমার এই আত্ম-বিলোপের অন্তরালে কা'র একখানি বেদনায় সুন্দর মুখ সুখে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। কাউকে ভালো না বাসলে আমরা কখনো এতখানি স্বার্থত্যাগ করতে পারি না। সুমিতাকে এতো ভালোবেসেছিলুম বলে'ই তার জন্যে নিজের এতো বড়ো ঐশ্বর্য্য অনায়াসে ছেড়ে দিয়ে এলুম। আমার প্রেম তার ত্যাগের মতোই মহান হ'য়ে উঠুক।

প্রাগ্‌বিচার করা বৃথা, জীবনে সত্যিই সুমিতা সুখী হ'তে পারবে কিনা; কিন্তু প্রেমের কাছে সুখের কল্পনাটা সূর্য্যের কাছে দেয়াশলাইর একটা কাঠি। তার সেই প্রেমকে জায়গা ছেড়ে দিতে আমি আমার ছোট সুখ নিয়ে ফিরে এলুম।

৪

তারপর বছর তিনেক কেটে গেছে, আমি বারাসত থেকে দুবরাজপুরে বদলি হ'য়ে এসেছি।

বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে আমার বৈবাহিক ব্যাপারটা সম্পন্ন হ'য়ে গেছে এবং এবার অতি নির্ব্বিঘ্নে। বলা বাহুল্য এবার আমি নিজে আর মেয়ে দেখতে যাইনি, মা তাঁর কথামতো দিব্যি একটি টুকটুকে বৌ এনে দিয়েছেন। নিতান্ত স্ত্রী বলে'ই তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত হ'তে পারছি না।

আমার স্ত্রী তখন তাঁর বাপের বাড়ি, আসন্নসন্তান-সম্ভবা। আমার কোয়ার্টারে আমি একা, নথি-নজির নিয়ে মশগুল।

এর মধ্যে যে কোনো উপন্যাসের অবকাশ ছিলো তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না।

সেরেস্তাদার তাঁর এক অধীনস্থ কেরানির নামে আমার কাছে নালিশের এক লম্বা ফিরিস্তি পেশ করলেন। পশুপতির চুরিটা অবিশ্যি আমিই ধরে' ফেলেছিলুম। আমারই শাসনে এতোদিনে সেরেস্তাদারের যা-হোক ঘুম ভাঙলো।

নতুন হাকিম, মেজাজটা সাধারণতোই একটু ঝাঁজালো, পশুপতিকে আমি ক্ষমা করলুম না।

আমারই খাসকামরায় পশুপতি দু' হাতে আমার পা

জড়িয়ে লুটিয়ে পড়লো, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লে—হুজুর মা-বাপ,. আমার চাকরিটা নেবেন না। এমন কাজ আর আমি কক্‌খনো করবো না—এই আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি।

পা দু'টো তেমনি অবিচল কঠিন রেখে রুক্ষ গলায় বললুম,—তুমি যে-কাজ করেছ, আর শত করবে না বললেও তার মাপ নেই।

পশুপতি আমাকে গলাবার আরেকবার চেষ্টা করলো: ভয়ানক গরিব হুজুর, তারি জন্যে ভুল হ'য়ে গেছে।

আমারো উত্তর তৈরি: ভুল যখন করেছ, তখন ভয়ানক গরিবই থাকতে হ'বে।

কিন্তু পশুপতি আরো যে কতো ভুল করতে পারে তা তখনো ভেবে দেখি নি।

রাত্রে শোবার ঘরে লণ্ঠনের আলোতে খুব বড়ো একটা মোকদ্দমার যোজনব্যাপী একটা রায় লিখছি, এমন সময় দরজায় অস্পষ্ট কা'র ছায়া পড়লো। স্ত্রীলোকের মতো চেহারা। অকুণ্ঠ পায়ে ঘরের মধ্যে সোজা ঢুকে পড়ছে।

কোনো অফিসারের স্ত্রী বেড়াতে এসেছেন ভেবে সসম্ভ্রমে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অপ্রতিভ হ'য়ে বললুম, —আমার স্ত্রী তো এখানে নেই—

স্ত্রীলোকটি পরিষ্কার গলায় বল্‌লে,—আমি আপনার কাছেই এসেছি।

লণ্ঠনের শিখাটা তাড়াতাড়ি উস্কে দিলুম। গলা থেকে আওয়াজটা খানিক আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এলো: এ কী? তুমি, সুমিতা? তুমি এখানে কী করে' এলে?

তাকে চিনতে পেরেছি দেখে যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে সুমিতা সামনের একটা চেয়ারে বসলো। ঘরের চারদিকে বিষণ্ণ চোখে তাকাতে লাগলো যেখানে খাটে পাতা রয়েছে আমার বিছানা, যেখানে দেয়ালে টাঙানো রয়েছে আমার স্ত্রীর ফটো।

আবার জিগগেস করলুম: তুমি এখানে কী করে' এলে?

সুমিতা আগের মতো তেমনি চোখ নামিয়ে বল্‌লে,—ভাস্‌তে-ভাস্‌তে।

তার এই কথায় তার চারপাশে মুহূর্তে যে আবহাওয়া তৈরি হ'য়ে উঠলো তারই ভিতর দিয়ে তার দিকে তাকালুম। দেখলুম সেই সুমিতা আর নেই। যেন অনেক ক্ষয় পেয়ে গেছে। আগে তার শরীরে বয়সের যে একটা বোঝা ছিলো তা-ও যেন খসে' শিথিল হ'য়ে পড়েছে। সে আজ শুধু কালো নয়, কুৎসিত। পরনের সাড়িটাতে পর্য্যন্ত আটপৌরে একটা সৌষ্ঠব নেই। হাত দু'খানি দু'টি মাত্র শাঁখায় ভারি রিক্ত, অবসন্ন দেখাচ্ছে।

গলা থেকে হাকিমি স্বর বা'র করলুম: আমার কাছে তোমার কী দরকার?

ম্রিয়মাণ দু'টি চোখ তুলে সুমিতা বল্‌লে,—আমার স্বামীকে আপনি রক্ষা করুন।

মনে-মনে হাসলুম। একবার তাকে রক্ষা করেছিলুম, এবার তার স্বামীকে রক্ষা করতে হ'বে। আদালতে সাক্ষীকে যেমন প্রশ্ন করে তেমনি নির্লিপ্ত গলায় জিগ্‌গেস করলুম: তোমার স্বামী কে?

সুমিতা স্বামীর নাম মুখে আনতে পারে না, চোখ নামিয়ে চুপ করে' রইলো।

শেষে নিজেকেই অনুমান করতে হ'লো: তোমার স্বামীর নাম কি পশুপতি?

—হ্যাঁ।

চিত্রার্পিতের মতো তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সেই সুমিতা আর নেই। হাসি মিলিয়ে যাবার পর সে যেন একরাশ স্তব্ধতা। তার ভঙ্গিতে নেই আর সেই ত্বরা, রেখায় নেই আর সেই তীক্ষ্ণতা। মুখের ভাবটি তৃপ্তিতে আর তেমন নিটোল নয়। তার জন্যে মায়া করতে লাগলো।

জিগ্‌গেস করলুম: কদ্দিন তোমরা বিয়ে করেছ?

যেন বহুদূর কোন সময়ের পার হ'তে উত্তর হ'লো: এই তিন বছর।

কথাটার বলার ধরনে চম্‌কে উঠলুম। বললুম,—শেষ পর্য্যন্ত তোমার সেই নির্ব্বাচিতকেই পেলে?

—না।

—না? তবে পশুপতি তোমার কে?

সুমিতার চোখ দু'টো জলে ঝাপসা হ'য়ে উঠলো। বল্‌লে,—আমার স্বামী।

—হুঁ! একটা ঢোঁক গিলে ফের প্রশ্ন করলুম: ওকে বিয়ে করলে কেন?

—না করে' পারলুম না।

—ওকেও চিঠি লিখেছিলে?

—লিখেছিলুম, কিন্তু শুনলেন না।

—শুনলেন না?

—না।

চোখ দু'টো যেন অন্ধকারে জ্বালা করে' উঠলো: শুনলেন না কেন?

সুমিতা বল্লে,—তাঁর দৃষ্টি ছিলো তাঁর নিজের সুখের দিকে।

—নিজের সুখ?

—হ্যাঁ, টাকা। বিয়ে করে' কিছু তিনি টাকা পেয়েছিলেন।

রুক্ষ গলায় বল্লুম,—তুমিই বা নিজের সুখ দেখলে না কেন? কেন গেলে ওকে বিয়ে করতে?

—পারলুম না, হেরে গেলুম। একেক সময় মানুষে আর পারে না। সুমিতা নিচের ঠোঁটটা একটু কামড়ালো।

বল্লুম,—আমার বেলায় তো মরবার পর্য্যন্ত ভয় দেখিয়েছিলে, তখন মরলে না কেন?

হাসবার অস্ফুট একটি চেষ্টা করে' সুমিতা বল্লে,—মরতে আর কী বাকি আছে।

—না, না, তোমার এই ফ্যাসানেব্‌ল্‌ মরা নয়, সত্যি-সত্যি মরে' যাওয়া। প্রেমের জন্যে তবু একটা কীর্ত্তি রেখে যেতে পারতে।

রূঢ় আঘাতে সুমিতা যেন আমূল নড়ে' উঠলো। কথার থেকে যেন অনেক দূর সরে' এসেছে এমনি একটা নৈরাশ্যের ভঙ্গি করে' সে বল্লে,—কিন্তু সে-কথা থাক্‌, আমার স্বামীকে আপনি বাঁচান।

—তোমার স্বামীকে বাঁচাবো? তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে আমার লাভ?

তবু কী আশ্চর্য্য! সুমিতা হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝরঝর্‌ করে' কেঁদে ফেল্লে। বল্লে,—অবস্থার দোষেই এমন করে' ফেলেছেন। এবারটি তাঁকে মাপ করুন। তাঁর চাকরি গেলে আমরা একেবারে পথে ভাসবো। জলে ভরা চোখ দু'টি সে আমার মুখের দিকে তুলে ধরলো।

নথির দিকে চোখ নিবিষ্ট করে' বল্লুম,—তোমার মতো আমারো এর মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে। আমি আর তেমন উদার ও মহানুভব নই।

—না, না, আপনি মুখ তুলে না চাইলে—

বাধা দিয়ে বল্লুম,—কা'র দিকে আর মুখ তুলে চাইবো বলো? তুমি আমাকে যে অপমান করলে—

—অপমান? সুমিতা যেন ভেঙে টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেলো।

—হ্যাঁ, এতোদিন অন্য সংজ্ঞা দিয়েছিলুম, কিন্তু এখন একে অপমান ছাড়া আর কী বলবো? তোমার জন্যে, তোমার প্রেমের জন্যে আমি যে স্বার্থত্যাগ করলুম তুমি তার এতোটুকু সুবিচার করলে না, এতোটুকু সম্মান রাখলে না। শেষকালে পশুপতি কিনা তোমার স্বামী! তোমার স্বামী কিনা শেষকালে পশুপতি! এর পর তুমি আমার কাছ থেকে কী আশা করতে পারো?

—কিন্তু, সুমিতা আমার পায়ের কাছে বসে' পড়লো: তবু, আপনি দয়া না করলে—

চেয়ার ছেড়ে এক লাফে উঠে দাঁড়ালুম। বল্লুম,—কেন দয়া করতে যাবো? তুমি আমার কে?

—কেউ না হ'লে কি আর দয়া করা যায় না?

—না। তুমিই বলো না, কী দেখে আমার আজ দয়া হ'বে? কঠিন, কটু গলায় বল্লুম,—তোমার মাঝে দেখবার মতো আর কী আছে?

সুমিতা উঠে দাঁড়ালো। আজ তার বসার থেকে এই দাঁড়ানোর মাঝে কোনো দীপ্তি নেই। সঙ্কোচে নিতান্ত ম্লান হ'য়ে প্রায় ভয়ে-ভয়ে বল্লে,—সেদিন কী দেখেছিলেন?

উত্তপ্ত গলায় বল্লুম,—সেদিন দেখেছিলুম তোমার প্রেম।

নথি-পত্রের মধ্যে ডুবে যাবার আগে একটা হাকিমি ডাক ছাড়লুম: নগেন।

নগেন আমার পিওন।

বল্লুম,—এঁকে আলো দিয়ে পশুপতিবাবুর ওখানে পৌছে দিয়ে এসো। দেরি কোরো না।

মুমূর্ষু দীপশিখার মতো সুমিতা একবার কেঁপে উঠলো। কী কথা বলতে গিয়ে চম্‌কে বলে' ফেল্‌লে, —না, আলোর দরকার হ'বে না। আমি একাই যেতে পারবো।

দরজার কাছে এসে সুমিতা তবু একবার থাম্‌লো। ঘরের চারদিকে মৃত, শূন্য চোখে চেয়ে একবার চোখ বুজলো। কী যেন আরো তার বলবার ছিলো, কিন্তু একটি কথাও সে বলতে পারলো না।

তার সঙ্গে অস্পষ্ট চোখোচোখি হ'তেই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলুম।

—— ——

ইথার ও বর্ত্তমান পদার্থ-বিজ্ঞানে তাহার স্থান

অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ডি-এসসি

বিংশ শতকের পদার্থ-বিজ্ঞানে জড়তত্ত্ব তরঙ্গ-তত্ত্বে পরিণত হইয়াছে। সারা দেশময় তরঙ্গের পর তরঙ্গ চলিয়াছে। সেই সকল তরঙ্গের দেশ ও কাল-গত বৈশিষ্ট্যই আমাদের তড়িদণু—যাহাকে বর্ত্তমান পদার্থ-বিজ্ঞানে জড়ের চরম উপাদান বলিয়া ধরা হয়।

দুই তিন শতক পূর্ব্বে যখন যন্ত্র-বিজ্ঞানের যুগ ছিল, তখন জ্যোতিঃ, তড়িৎ প্রভৃতি সকল প্রকার কার্য্যশক্তিকে যন্ত্র-বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ না করিতে পারিলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাত্রেরই সাফল্য বোধ হইত না। তখন ব্যবধানে কার্য্যশক্তি বিকাশের নীতি প্রচলিত ছিল। ক্রমে কার্য্য-শক্তির বাহনের প্রয়োজন পড়িল। কারণ পৃথিবীর আকর্ষণে গাছ হইতে আম পড়িল বলিলে ক্রিয়াটী সম্যক্ বোধগম্য হয় না। যদি বলি, পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি বৃক্ষস্থিত আম্র ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী দেশের ইথার নামক পদার্থের ভিতর দিয়া শক্তি ক্ষেত্রের প্রসার করিয়া আমটীকে টানিয়া আনিয়াছে, তাহা হইলে ব্যাপারটী সহজেই আপামর সাধারণের বোধগম্য হয়। এই ভাবে বহু ঘটনার কার্য্য-কারণের সমন্বয় করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক প্রথমে ইথার নামক কল্পিত পদার্থের সৃষ্টি করেন। ক্রমে দেখা গেল যে ঘটনার বৈচিত্র্য হিসাবে ইথারের এমন সব বৈশিষ্ট্য কল্পনা করার প্রয়োজন যাহারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন। একই পদার্থ একই সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ-বিশিষ্ট হইতে পারে না। কাজেই তখন বহু প্রকারের ইথার ঘটনা পরম্পরায় বিজ্ঞানে কল্পিত হইয়াছিল। সেই মতে, শূন্যে, গ্রহ-নক্ষত্রাদি ইথার-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছে; তড়িদাক্রান্ত বস্তুর চতুর্দ্দিকে যে শক্তিক্ষেত্র তাহাও ইথারেরই মধ্যে; এবং আমাদের মানবদেহের অংশবিশেষ হইতে অংশান্তরে অনুভূতিসমূহও ইথার সাহায্যেই বাহিত হয়। পদার্থের উপাদান অণু, পরমাণু প্রভৃতির ফাঁকে ফাঁকে ইথার। বস্তুতঃ ইথার-সমুদ্রের ভিতর সারা বিশ্বজগৎ নিহিত রহিয়াছে।

নূতন নূতন ঘটনার আবিষ্কারে ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইথার সংখ্যায় কমিতে থাকে; কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষ ভাগেও অন্য সকল প্রকার ইথার বিজ্ঞান হইতে নির্ব্বাসিত হইলেও, জ্যোতিঃ তরঙ্গবাহী একমাত্র ইথার বর্ত্তমান থাকে। এই ইথারের বৈশিষ্ট্য হাইগেনস্ (Huyghens) হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যাক্সওয়েল (Maxwell) পর্য্যন্ত সকলেই অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। ইহা এক প্রকার জেলী জাতীয় পদার্থ বিশেষ। ইহাতে তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত ও প্রবাহিত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জ্যোতিঃতরঙ্গের নাম করা যাইতে পারে। এই সকল তরঙ্গ বহু প্রকার দৈর্ঘ্যের ও কম্পন পৌনঃপুনিক সংখ্যার হইতে পারে। এই প্রকার ক্রম অনুসারে আমরা পাই তড়িদ্-তরঙ্গ, তাপ, লোহিতাতীত বর্ণ, দৃশ্য আলো, বেগুনাতীত বর্ণ, রঞ্জনরশ্মি, গামারশ্মি ও ব্যোমজ্যোতিঃ (Cosmic radiation); অর্থাৎ সমগ্র বর্ণচ্ছত্র (Spectrum)। আবার এই পদার্থের ভিতর দিয়াই গ্রহনক্ষত্রাদি বিনা বাধায় পরিভ্রমণ করিতেছে, কারণ, জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা প্রকার গণনায় ঐ প্রকার বাধার অস্তিত্বের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন উঠিল, এই যে ইথার, ইহা সচল না স্থির? গ্রহনক্ষত্রাদির গতি ও অন্যান্য অনেক ঘটনা হইতে এ কথা স্বীকার্য্য যে ইথারের ভিতর দিয়া গমনাগমন করাতে ইথারে কোনও আন্দোলন বা বিকার উপস্থিত হয় না। উল্টা ভাবে এই বলা যায় যে, ইথারের যদি গতি থাকে, তবে তাহা আমাদের পৃথিবী বা গ্রহউপগ্রহাদির ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতে কোনও প্রকার বাধা প্রাপ্ত হইবে না। অথবা পৃথিবীর বক্ষস্থিত স্থির পদার্থসমূহ ইথারের ভিতর দিয়া পৃথিবীর গতির জন্য কোনও প্রকারে আন্দোলিত হইবে না। নিউটন তাঁহার যন্ত্রবিজ্ঞানের যে সকল নিয়ম বাঁধিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও উপর্য্যুক্ত প্রকার হইতেই হইবে। ইহা হইতে এই দাঁড়ায় যে, যেমন সমুদ্রের উপর দিয়া গমনশীল কোন জাহাজের ভিতরই আবদ্ধ কোনও প্রকার পরীক্ষাতেই জাহাজের গতিবেগ নির্ণয় করা যাইবে না, সেইরূপ, পৃথিবীর উপরিস্থ কোনও স্থানে কোনও প্রকার যন্ত্র-সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া ইথারের গতিবেগ সম্বন্ধে কোনও প্রকারেই কোনও ধারণায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইবে না। সুতরাং ইথার সচল কি অচল তাহা নির্ণয়ার্থে অন্য প্রকার পরীক্ষার প্রয়োজন। জ্যোতিঃ বিজ্ঞানের একটী ঘটনা এই বিষয়ে আমাদের সহায় হইল। বিজ্ঞানের এই শাখায় আলোকাপচার (aborration of light) নামে একটী বিষয় আছে। এ বিষয়টী একটী সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সবিশেষ পরিস্ফুট

হইবে। ধরুন, আমার সম্মুখ দিয়া দক্ষিণ হইতে বামে একখানা জাহাজ যাইতেছে, আর আমি তীরে দাঁড়াইয়া লম্বভাবে জাহাজ লক্ষ্য করিয়া গুলী করিতেছি। জাহাজের গতির নিমিত্ত, গুলীটি জাহাজের যে স্থানে প্রবেশ করিবে ঠিক তাহার লম্বভাবে অপর পার্শ্ব দিয়া বাহির হইবে না। গুলীটির প্রবেশ ও নির্গমন-পথ যোগ করিলে যে সরল রেখা হইবে তাহা, যে লম্বরেখা ক্রমে বন্দুক হইতে গুলীটি নিঃসৃত হইবে তাহার সহিত এক হইবে না। দুই রেখার মধ্যে একটী কোণ উৎপন্ন হইবে। মনে করা যাউক, বন্দুকটী জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোনও গ্রহ, গুলী ঐ গ্রহ হইতে বিকীর্ণ জ্যোতিঃকণা, আর জাহাজে গুলীটির প্রবেশ ও নির্গম-পথ যোগ করিয়া যে রেখা তাহা জ্যোতিঃকণা পর্য্যবেক্ষণের জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নল। সুতরাং পূর্ব্বের দৃষ্টান্তক্রমে গ্রহ হইতে যে পথে পর্য্যবেক্ষণকারী জ্যোতিঃকণা ও গ্রহটী দেখিবেন, তাহা প্রকৃত যে রেখা ক্রমে জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে তাহার সঙ্গে এক নহে। অর্থাৎ যে স্থানে গ্রহটী অবস্থিত বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা তাহার সত্য অবস্থিতিস্থান নহে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রটী পৃথিবীতে অবস্থিত, আর পৃথিবী সচল, এই নিমিত্ত উক্ত প্রকার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিতেছে। ইহারই নাম আলোকাপচার। ইহাও একটী আপেক্ষিক গতির বিষয় মাত্র। এখন, উক্ত ঘটনায় যদি আমরা আলোক-তরঙ্গের বাহন স্বরূপ ইথারকে অবলম্বন করি, তাহা হইলে ইহা মানিতে হয় যে ইথার অচল অবস্থায় আছে ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রটী পৃথিবীর সঙ্গে চলিতে থাকিলেও উহার নলের অভ্যন্তরস্থ ইথার চলিতেছে না। অর্থাৎ উপরে যে আলোকাপচার কোণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা দূরবীক্ষণ নলের ভিতরের পদার্থের (ইথারই হউক, বা অন্য কোনও বস্তুই হউক) উপর নির্ভর করিবে ; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিতর দিয়া আলোক-তরঙ্গের গতিবেগও বিভিন্ন। পূর্ব্বের জাহাজ ও বন্দুকের গুলীর দৃষ্টান্তে ইহাই দাঁড়ায় যে, যদি জাহাজের খোল বায়ু-পরিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে গুলীর প্রবেশ ও নির্গমন-পথ যে রেখাক্রমে হইবে, উহা জলে পূর্ণ থাকিলে সে রেখাক্রমে হইবে না। এই বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণার্থে Airy সত্য সত্যই জলপূর্ণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র লইয়া নক্ষত্রের আলোকাপচার-কোণ পরিমাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই হইল যে নলের ভিতর বায়ু বা ইথারের পরিবর্ত্তে জল দেওয়াতেও আলোকাপচার-কোণের কোনও পার্থক্য ঘটিল না। এই ঘটনাকেই আমরা নিউটনের যন্ত্র-যুগের আসন টলিবার প্রথম সূত্রপাত বলিতে পারি। কারণ নিউটনের মতে ইথার স্থির, অচল ; এবং অন্যান্য সমস্ত জাগতিক পদার্থের প্রকৃত গতিবেগ এই উপায়েই নির্ণয় করা যাইত। উপর্য্যুক্ত ঘটনায় কারণ স্বরূপ, ফ্রেনে (Fresnel) প্রথমেই প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে, গতিশীল জলপূর্ণ দূরবীক্ষণের সঙ্গে ইথারও গতিশীল হইয়াছে, এবং উহার ঠিক সেই প্রকার গতিবেগ হইয়াছে যাহার জন্য ইথার ও জলের ভিতর দিয়া আলোক-তরঙ্গের গতিবেগের পার্থক্য অনুভূত হইতেছে না। সাধারণতঃ জলের ভিতর আলোক-তরঙ্গের গতিবেগ ইথার বা বায়ুর ভিতরের গতিবেগ অপেক্ষা কম। সুতরাং Fresnelএর প্রস্তাব এই দাঁড়ায় যে, আলোকের গতিবেগ কোনও অচল পদার্থের ভিতর যাহা হইবে, পদার্থটী সচল হইলে তদপেক্ষা কম বা অধিক হইবে। অতঃপর Fizean অচল ও গতিশীল জলের ভিতর দিয়া আলোক-রশ্মি প্রেরণ করিয়া ও কৌশলে তাহার গতিবেগ নির্ণয় করিয়া সত্য সত্যই আলোকের গতিবেগের উক্ত প্রকার পার্থক্য দেখিতে পান। সুতরাং ইথার সচল এ কথা অবিসংবাদিত সত্যরূপে প্রমাণিত হইল। ইহাই হইল এক ধরণের পরীক্ষা। ইহা ছাড়া আর এক ধরণের পরীক্ষাও হইয়াছে। এইবার তাহার কথা বলিব।

উপরে জাহাজের দৃষ্টান্তে, যদি জাহাজস্থ কোনও আরোহী জাহাজের গতিবেগ নির্ণয় করিতে চায়, তাহা হইলে সমুদ্রস্থ বা তীরস্থ কোনও স্থির পদার্থের সাহায্য লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। যদি সে জাহাজ হইতে একটী রজ্জুর অগ্রভাগে সীসকখণ্ড বাঁধিয়া স্থির সমুদ্র পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেয়, তাহা হইলে ইহা সকলেই জানেন যে সীসকখণ্ডটী যে স্থানে জল স্পর্শ করিবে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সমুদ্রে বৃত্তাকারে ধাবমান তরঙ্গরাজি উৎপন্ন হইবে। ঐ কেন্দ্র স্থির থাকিবে ; কিন্তু জাহাজের গতির সঙ্গে সঙ্গে রজ্জুর অপর প্রান্ত আরোহীর হস্তে থাকায় সীসকখণ্ডটী ঠিক জাহাজের গতিবেগেই চলিতে থাকিবে। সুতরাং উক্ত কেন্দ্র হইতে সীসকখণ্ডের ব্যবধান ও তজ্জনিত সময় জানিতে পারিলেই জাহাজের গতিবেগ নির্দ্ধারণ সম্ভব হইবে। ঠিক এই ধরণের একটী পরীক্ষা আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাইকেলসন ও মর্লি (Michelson & Morley) আলোক-তরঙ্গ সাহায্যে করিয়াছিলেন। তাঁহারা আমেরিকার ওহিও প্রদেশে তাঁহাদের পরীক্ষাগারে একটী আলোকের উৎস স্থাপন করিয়া, উহা হইতে পরস্পর সমকোণ উৎপাদক দুই দিকে ঠিক সমান দূরে দুইখানি মুকুর এরূপ ভাবে সংস্থাপিত করেন যে, উৎস হইতে ইথারে আলোক-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া ঐ দুই মুকুর হইতে প্রতিফলিত হইবার পর, পুনরায় উৎসের নিকটই ফিরিয়া আসিবে। ধরা যাউক, পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে মুকুর দুইটী রাখা হইয়াছে। যদি ইথারের কোনও গতিবেগ না থাকে তবে আলোকধারা দুইটী এক সময়েই প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসিবে। কারণ তাহাদের যাতায়াতের পথ সমান। যদি পৃথিবী ইথারের তুলনায় পশ্চিমমুখে চলিতে থাকে, তাহা হইলে উৎস হইতে মুকুরে যাইতে ও প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে পূর্ব্বগামী আলোকধারার অপর আলোকধারা অপেক্ষা অধিক সময় লাগিবে। তাঁহাদের যন্ত্রটীকে বহু দিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া রাখিয়া মাইকেলসন ও মর্লি উক্ত প্রকার পরীক্ষা করেন। সকল প্রকার পরীক্ষার ফলে এই পাওয়া যায় যে আলোকধারা দুইটী একই সময়ে ফিরিয়া আসে। অর্থাৎ ইথারের তুলনায় পৃথিবীর কোনও গতিবেগ নাই। ইথার-সমুদ্রের ভিতর পৃথিবী স্থির ভাবে বিদ্যমান। কিন্তু ইহাও অবিসংবাদিত সত্য যে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে সেকেণ্ডে ২০ কুড়ি মাইল বেগে ঘুরিতেছে।

Airyর পরীক্ষা হইতে Fresnel আলোকাপচারের নিয়ম সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করেন, উপর্য্যুক্ত পরীক্ষার ফল তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। সেই মতে পৃথিবীর তুলনায় ইথারের গতিবেগ আছে ; অথচ এই পরীক্ষায় তাহা একেবারেই ধরা পড়িল না। পূর্ব্ব মতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ মাইকেলসন ও মর্লির পরীক্ষাফলের ভিন্ন প্রকার

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফিটজারল্ড (Fitzgerald) ও লরেন্সের (Lorentz)এর মত এই যে, সকল পদার্থই সচল অবস্থায় তাহাদের গতিবেগের দিকে দৈর্ঘ্যে সঙ্কুচিত হয়। উপরের পরীক্ষায় যদি পৃথিবী পশ্চিম দিকে যাইতে থাকে, তবে পূর্ব্ব পশ্চিমে কোনও দুইটী স্থানের ব্যবধান সঙ্কোচনের জন্য হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ গতিশীল অবস্থায় যে ব্যবধানকে আমি ১৫ গজ বলিতেছি, আসলে তাহা আরও অধিক। সুতরাং পৃথিবীর গতির জন্য পূর্ব্বগামী আলোকধারার যাতায়াতের পথের যে বৃদ্ধি প্রাপ্তির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যদি ঠিক পৃথিবীর গতির সঙ্গে তাল রাখিয়া ব্যবধান সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইলে আসলে পথের কোনও তারতম্য হইবে না। এই পরীক্ষায় ফল না পাওয়ার ইহাই কারণ। এই যে ব্যবধানের সঙ্কোচনের নিয়ম, ইহাকে একটা বাজে কথা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কারণ লরেন্স তাঁহার তড়িদণুতত্ত্বের সাহায্যে কাগজ-কলমে এই সঙ্কোচনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং তাহাতে মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মতের পোষকতাই হয়।

এখানে আর এক নূতন অসুবিধার সৃষ্টি হইল। কোন প্রকার পদার্থ সংশ্লিষ্ট মাপকাঠি লইয়া ইথারের ভিতর পৃথিবীর গতিবেগ নির্দ্ধারণ অসম্ভব। কারণ ঐ প্রকার সকল মাপকাঠিই গতির জন্য সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাতেও দূরত্ব পরিমাণ করিতে বৈজ্ঞানিকের কোনও অসুবিধার কারণ নাই। গজ, মিটার প্রভৃতি ছাড়াও বৈজ্ঞানিক অন্য প্রকার মাপকাঠি ব্যবহার করিতে পারেন যাহা কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। আলোকরশ্মি বা তড়িদ্‌শক্তি প্রভৃতি অপদার্থসম্ভাত মাপকাঠি লইয়া ইথার-পৃথিবী গতি নির্দ্ধারণের চেষ্টাও হইয়াছে। Quartz, Calcspar প্রভৃতি পদার্থের বৈশিষ্ট্য আছে যে তাহাদের ভিতর দিয়া একটী আলোকরশ্মি প্রবেশ করাইলে দুইটী রশ্মি নির্গত হয়। এই দুইটী রশ্মিতে পার্থক্য আছে; তাহারা সর্ব্বতোভাবে এক নহে। এই বৈশিষ্ট্যের নাম দ্বৈত পরাবর্ত্তন (Double refraction)। উক্ত পদার্থ ছাড়া সাধারণ কাচখণ্ডকেও চাপ প্রয়োগে ঐরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত করা যায়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং ফিটজারল্ড ও লরেন্সের সঙ্কোচননীতি মানিলে, বেগে গতিশীল কাচখণ্ডেরও দ্বৈত-পরাবর্ত্তন গুণবিশিষ্ট হওয়া উচিত। ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে Rayleigh, Brace, Tronton প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই নিষ্ফল প্রয়াস হইয়াছে।

আলোকবাহী ইথারের ধর্ম্ম নির্ণয় সম্বন্ধে যখন ঐ প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে, তখন উনবিংশ শতকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের আলোক-তত্ত্বেরও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন উপস্থিত হইল। ম্যাক্‌স্‌ওয়েল-তত্ত্ব স্থির পদার্থ সম্বন্ধে প্রযুক্ত। সচল পদার্থের উপর তাহার প্রয়োগ সাধন করিতে গিয়া লরেন্স তাঁহার তড়িদণু-তত্ত্বের সাহায্যে দেখাইলেন যে, অচল পদার্থ অপেক্ষা সচল পদার্থের ভিতর দিয়া আলোক-তরঙ্গ বর্দ্ধিত কিংবা হ্রাস-প্রাপ্ত গতিতে ধাবমান হয়। পদার্থটীর গতিবেগ ও আলোকের গতিবেগ একমুখী হইলে আলোকগতি বর্দ্ধিত হয়; আর বিপরীতমুখী হইলে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে কথিত আলোকাপচারের পরীক্ষা হইতেও Fresnel এই নীতি বিবৃত করিয়াছিলেন। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লরেন্স অতি সূক্ষ্ম গণনায় আলোকগতি পরিবর্ত্তনের যে পরিমাণ প্রাপ্ত হইলেন, তাহা প্রায় Fresnelএর কথিত পরিমাণের সমান। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জীমান (Zeeman) পরীক্ষা দ্বারা লরেন্সের গণনার সারবত্তা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। উহা হইতে এই দাঁড়াইল যে যদি ইথারই আলোক-তরঙ্গের বাহন হয়, তাহা হইলে উহা পদার্থের গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুসরণ করিবে। এই যে পদার্থের ইথারকে টানিয়া লওয়া, ইহা কার্য্যতঃ বটে, কিন্তু দৃষ্টতঃ নহে। লরেন্সের মতে ইথার আমাদের পরিচিত জড়-গুণ বিশিষ্ট কোন পদার্থ নহে; ইহা শূন্য দেশেরই এক বিশেষ অবস্থা, যে অবস্থায় উহার ভিতর দিয়া তরঙ্গগতি ধাবমান হইতে পারে।

লরেন্স (Lorentz) আমাদের "কাল" সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে বহু প্রকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন। সে মতে সচল ও অচল উভয় অবস্থাতেই পদার্থের ভিতর আলোকের গতি ম্যাক্‌স্‌ওয়েল-প্রবর্ত্তিত নীতিতেই প্রকাশ করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোনও স্থান হইতে আলোকধারা নির্গত হইতেছে ও "ক" নামক অপর এক স্থানে কোনও পর্য্যবেক্ষক যন্ত্র সহযোগে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। আলোক প্রথম দৃষ্টিগোচর করিবার কাল "ক"এর গতিবেগের উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং "ক"এর গতিবেগ ও আলোকধারার গতিবেগ বিবেচনা করিয়া "ক" হইতে আলোকধারা প্রথম দর্শনের এমন এক কাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যাহা "ক"এর স্থির অবস্থায় প্রথম আলোক দর্শনের কালই হইবে। তাহাকেই আমরা "ক" হইতে আলোক দর্শনের কাল বলিব। সুতরাং এই কালের হিসাবে সচল অচল সকল অবস্থাতেই ম্যাকস্‌ওয়েল নীতি ব্যবহৃত হইতে পারিবে। এই কালকে আমরা "স্থানীয় কাল" বলিতে পারি। এই ভাবে প্রত্যেক স্থান যেমন "দেশে" নির্দ্দিষ্ট, সেইরূপ "কাল" হিসাবেও নির্দ্দিষ্ট হইবে। গতিবেগ হিসাবে প্রত্যেক স্থানের দেশ ও কাল বিভিন্ন। কিন্তু এই দুইটীর একটীকে বাদ দিলে, কোনও পদার্থের অবস্থিতি সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারি না। পূর্ব্বে কথিত গতিশীল পদার্থের সঙ্কোচশীলতা এবং এই "স্থানীয় কাল" এই দুই জ্ঞান আইনষ্টাইনের (Einstein) আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রবর্ত্তনের পথ পরিষ্কার করিয়াছিল। বিংশ শতকের প্রারম্ভেই আইনষ্টাইন্ প্রচার করিলেন যে কোনপ্রকার পরীক্ষা সাহচর্য্যে কাহারও প্রকৃত গতিবেগ নির্ণয় করা যায় না। কারণ প্রকৃত গতিবেগ নির্ণয় করিতে হইলে একটী স্থির বস্তুর প্রয়োজন। আর বিশ্বজগতে তাহার একান্ত অভাব। এই নূতন নীতি পূর্ব্ব-প্রচলিত নিউটন নীতিকে একেবারেই কাবু করিয়া ফেলিল। স্থৈর্য্যের আদর্শ হিসাবেই ইথারের প্রভাব প্রতিপত্তি। সেই আদর্শ-বিচ্যুতির অর্থ এই দাঁড়াইল যে, বিজ্ঞান যেন আর একমাত্র ইথারকেও আমল দিতে চাহিল না। আইনষ্টাইনের তত্ত্বে পৃথিবীর গতি নিমিত্ত আলোক-বিজ্ঞানের কোনও ঘটনার কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। কারণ প্রত্যেক পর্য্যবেক্ষকই তাহার দেশ ও কালের হিসাবে তাহার অবস্থিতি-স্থান হইতে অবলোকিত ঘটনার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন

স্থান-ভেদে দেশ ও কালের মাপকাঠি পরিবর্ত্তিত হইবে সত্য, কিন্তু কোনও পর্য্যবেক্ষকই তাহা বুঝিতে পারিবেন কেন? পরীক্ষায় পরিমাপ করিয়া যাহা পাওয়া যাইবে তাহা সকলেই এক হিসাবে ব্যক্ত করিবেন। ইহাও উক্ত দেশ ও কালের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা। যে ব্যবধান ১২ গজ তাহা সর্ব্বদাই ঐ প্রকার। চলন্ত রেল গাড়ীতেই পরিমাপ করা হউক, কি তথাকথিত স্থির ভূমিতলেই পরিমাপ করা হউক, কোনও পর্য্যবেক্ষণেই উহার ব্যত্যয় হইবে না। কারণ গতিশীল রেল গাড়ীতে যেমন ব্যবধান সঙ্কুচিত হইবে সেইরূপ মাপকাঠিও সঙ্কুচিত হইবে।

ফলে এই পাওয়া যাইতেছে যে প্রত্যেক পর্য্যবেক্ষকের নিজ নিজ ইথার। কিন্তু প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট "দেশ" ও "কাল" থাকাতে তাঁহারা যে আলোক-তরঙ্গ দেখিবেন তাহা একই। সুতরাং আলোক-তরঙ্গবাহী ইথারের আর বৈশিষ্ট্য কি? ইহা প্রত্যেকেরই স্বকপোল-কল্পিত; সুতরাং ইহাকে সকলেই পরিত্যাগ করিলে কাহারও কোনও প্রকার অসুবিধা হওয়ার কথা নাই। আর ইহা না থাকিলেও আলোক-তরঙ্গ যাতায়াতের কোনও অসুবিধা হইবে না। কারণ, বর্ত্তমান বিজ্ঞান এ সত্যও প্রচার করিয়াছেন যে জ্যোতিঃধারা জ্যোতিঃকণার স্রোতমাত্র। ইহারা সাধারণ জড়-গুণবিশিষ্ট। ইহাদের বস্তুমান আছে ও গতিজনিত কার্য্যশক্তিও আছে। সুতরাং জ্যোতিঃকণার পক্ষে শূন্য দেশে ধাবমান হওয়া বা তরঙ্গ উৎপাদন করা আশ্চর্য্য নহে। এই প্রচারে ফ্রেণের (Fresnel) হাতে পড়িয়া যে ইথার কায়া পরিত্যাগ করিয়া ছায়াতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, বিংশ শতকে সেই ছায়াও বিজ্ঞান হইতে নির্ব্বাসিত হইল। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে জড়গুণ-বিশিষ্ট ইথার আর নাই। উহা কার্য্যশক্তিরই নানা প্রকার রূপে পরিব্যক্তমাত্র। যাঁহারা এখনও পুরাতনের মোহ কাটাইতে পারেন নাই তাঁহারা "দেশ"কেই ইথারের নব রূপ কল্পনা করিয়া থাকেন।

রাষ্ট্র-সাধনায় নব অবদান

কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, এম্-এল্-সি

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে অল্প কাল মধ্যে সাধারণ পুস্তকাগারের সংখ্যা অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে সে লাইব্রেরীগুলি কেবল নিষ্ক্রিয় শক্তি বলিয়া গণ্য করা হয় না—এগুলি এখন সদা-কর্ম্মনিরত জীবন্ত প্রতিষ্ঠান।
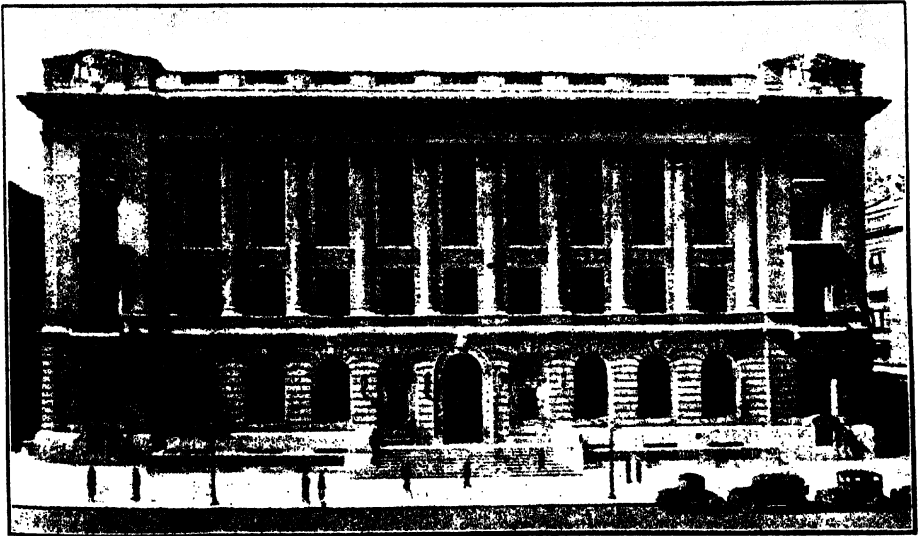
ক্লীভল্যাণ্ড পাবলিক লাইব্রেরী

কারণেও বটে এবং তাহার ফলে লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নূতন ধারণা সমুদ্ভূত হইয়াছে। এখন কেবল পুস্তক সংরক্ষণ এখনকার লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য নহে; এখন প্রধান কাজ দাঁড়াইয়াছে—পাঠেচ্ছু মাত্রেরই

নিকট পুস্তক সহজপ্রাপ্য করা এবং পুস্তক পাঠের আগ্রহ বাড়াইয়া দেওয়া। সাবেক কালের লাইব্রেরী মাত্রেই পুস্তক ভাণ্ডারজাত করিয়া এমন কি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইত; ক্রমশঃ সেগুলির ব্যবহার প্রসারিত করিবার প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। প্রসারের জন্য পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ, একটা পদ্ধতি অনুযায়ী পুস্তক সাজাইয়া রাখা এবং পুস্তকের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা আবশ্যক হয়। পূর্ব্বে যাহারা স্বেচ্ছায় লাইব্রেরীতে আসিত তাহাদের মধ্যেই পুস্তকের ব্যবহার আবদ্ধ থাকিত। কিন্তু আজকাল লাইব্রেরীর দ্বারা সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। তাহার ফলে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান প্রচারের যত রকম সুযোগ এবং সুবিধা করিয়া দেওয়া সম্ভব তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গৃহে ব্যবহার জন্য পুস্তক দাদন, পুস্তকের তাকের নিকট পাঠকের অবাধ গতি, নিজের ঘরের মত অনুভূতি আসে এবং চিত্তে প্রফুল্লতা আনে এরূপভাবে লাইব্রেরীর বাড়ী গড়িয়া তোলা হইতেছে; ছেলেদের জন্য পৃথক পাঠ-কক্ষ, শিক্ষা এবং সমাজ সম্বন্ধীয় সভাগৃহ, স্কুলের সহিত সহযোগিতা, বিভিন্ন লাইব্রেরীর সহিত
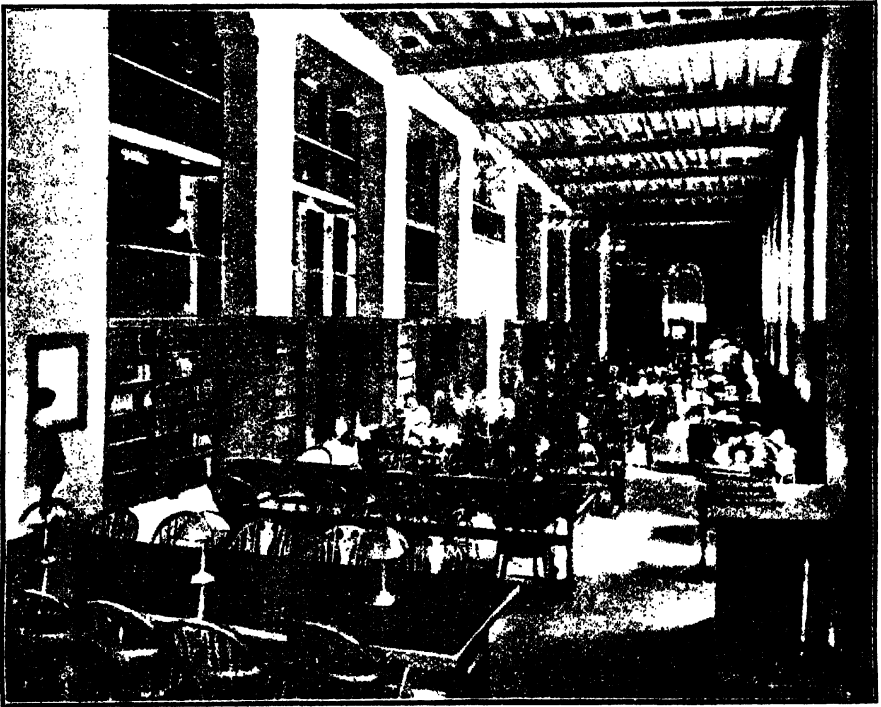
ক্লীভল্যাণ্ড পাবলিক লাইব্রেরী—অভ্যন্তরীণ একাংশের দৃশ্য

লাইব্রেরী সমগ্র লোক-সমাজের সেবা করিবার জন্য সদা উন্মুখ। আধুনিক সাধারণ পুস্তকাগারের উদ্দেশ্য হইতেছে তাতে যত বই আছে প্রত্যেকখানির জন্য পাঠক সংগ্রহ, সমাজের প্রত্যেকের জন্য পুস্তক সরবরাহ এবং যে কোনও উপায়ে হউক পাঠক এবং পুস্তকের সংযোগ বিধান। সমাজের সকল ব্যক্তির সমানাধিকার—কেহ ছোট বা বড় নহে, এই মত প্রতিপাদনের অনুকূল আবহাওয়া পুস্তক লেন-দেন, লাইব্রেরী দীর্ঘ সময়ের জন্য সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা, বিচক্ষণতার সহিত পুস্তক-তালিকা ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা, পাঠককে পরামর্শ দেওয়া, শাখা লাইব্রেরীর, চলন্ত লাইব্রেরীর ও গৃহ লাইব্রেরীর বিস্তৃতি সাধন, বক্তৃতা এবং প্রদর্শনীর দ্বারা কার্য্যের প্রসার করা—এরূপ নানা উপায় অবলম্বন দ্বারা লাইব্রেরীগুলি জনপ্রিয় করিবার এবং সমাজ-সেবার প্রধান যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

লাইব্রেরী সম্বন্ধে এই নব ধারণার প্রসার এবং তাহার ফলে নানা দিকে লাইব্রেরীর কার্য্য-বিস্তার বিনা বাধায় বা একদিনে সম্পন্ন হয় নাই। এখনও অনেক স্থানের গ্রন্থাগারিক এ নব প্রণালী মানিয়া লন নাই—তাঁহারা প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া আছেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রাচীন কালের ইতিহাসের দাবী রাখে না। সেখানে সব বিষয়েই পরীক্ষা চলিয়াছে। তাহাতে সময় সময় যে হঠকারিতা বা হাস্যজনক ব্যাপার প্রকাশ পায় না তাহা নহে। লাইব্রেরীর প্রসার কার্য্যের আরম্ভেই অনেক বাধা-বিপত্তি পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে সব অতিক্রম করিয়া লাইব্রেরীগুলি পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। তাহাতে সাধারণের নানা দিক দিয়া সুবিধাই বাড়িয়া গিয়াছে। সাধারণের জন্য সুবিধাজনক প্রত্যেক ব্যবস্থার প্রারম্ভে বাধা-বিঘ্নের সীমা ছিল না। সবচেয়ে বেশী আপত্তি উঠিয়াছিল পুস্তকের খোলা তাকে পাঠকের অবাধ গতিতে। প্রস্তাবটীর সমর্থনকারী প্রথমে মুষ্টিমেয় ছিল; ক্রমে সাধারণের চাহিদা সকল বাধা সরাইয়া দেয়।

আধুনিক লাইব্রেরী সম্বন্ধে নূতন ধারণার সফলতা লাভের কারণ হইতেছে তাহার সমর্থনকারীরা সকলেই কাজের লোক, আর বিরুদ্ধবাদীরা সব নিষ্ক্রিয় ছিলেন। নিষ্ক্রিয় আপত্তি প্রায়ই নিষ্ফল হইয়া থাকে। তাহাতে জীবনীশক্তি না থাকায়, দু'একটী সেকেলে ধরণের রক্ষণশীল লাইব্রেরী প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া থাকিলেও, অধিকাংশই তাহা উন্নতির পরিপন্থী মনে করিয়া পরিহার

ব্রেট মেমোরিয়াল হল—সাধারণ পাঠাগার

লাইব্রেরীর অন্তর্গত প্রদর্শনী—ব্রেট মেমোরিয়াল হল

করিয়া নব নীতি সাদরে গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের অনেক লাইব্রেরীয়ান সমানাধিকার প্রদানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। সেটা যে একেবারে ন্যায়সঙ্গত নহে তাহা বলা চলে না। প্রথম অবস্থায় আমেরিকায় এ সম্বন্ধে

দ্রষ্টব্য বস্তুর আধার

অতিরিক্ত মাত্রায় একটু বাড়াবাড়ি চলিয়াছিল। তারা এটাকে আমেরিকার লাইব্রেরীর ভণ্ডামী ও বাড়াবাড়ি

বালকবালিকাদিগের বিভাগ—নিউইস ক্যারোল রুম

বলিয়া নির্দ্দেশ করে। যাহারা স্বেচ্ছায় লাইব্রেরীর সাহায্য লয় না তাহাদের জন্য এত মাথা ব্যথা কেন? এই ছিল তাহাদের মনোভাব। সম্প্রতি এ ভাবের কতকটা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ইংলণ্ডেও এখন সমানাধিকারের দিকে ঝোঁক পড়িতেছে।

আধুনিক লাইব্রেরীর লক্ষ্য হইতেছে ব্যবসায়ীর কাট্‌তি বাড়াইবার নিয়মানুসরণ। তবে তাহার মধ্যে পার্থক্য হইতেছে ব্যবসায়ীর মাল কাট্‌তি যত বেশী হয় অর্থাগমও তদনুরূপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; কিন্তু লাইব্রেরীর বই কাট্‌তিতে সেরূপ আর্থিক সুবিধার অভাব। যে মাল বেশী কাটাইতে চায় সে ক্রেতার অপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। সে সমগ্র জনসমাজকে তাহার মালের খরিদ্দার বলিয়া ধরিয়া লয়; আর সকলের রুচি অনুযায়ী মাল সরবরাহে সচেষ্ট হয়। আবার যেখানে তাহার মালের চাহিদা নাই, সেখানে চাহিদার সৃষ্টি করে। বিস্তৃতভাবে জনসমাজে চাহিদা বাড়াইয়া পুস্তক যোগাইতে গেলে লাইব্রেরীয়ানকে ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

আধুনিক কালের লাইব্রেরীয়ানদের প্রধান কার্য্য দাঁড়াইয়াছে যে কোনও উপায়ে হউক জনসমাজে লাইব্রেরীকে পরিচিত করা এবং সকল শ্রেণীর লোককে লাইব্রেরীতে আকৃষ্ট করা। এই কার্য্য সংসাধনের জন্য নানা অভিনব পন্থাও অবলম্বিত হইয়া থাকে। সেন্ট্‌ লুই সাধারণ পাঠাগারের বুদার শাখা যে উপায়ে স্বীয় অস্তিত্ব জাহির করিয়া জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা বড়ই কৌতুকোদ্দীপক।

একটী নির্জ্জন রাস্তার উপর একটি স্কুল আছে। সে পথে লোক চলাচল করে না, কারণ, স্কুল পর্য্যন্তই রাস্তার দৌড়। তার পরই একটী খামার-বাড়ী পথ রোধ করিয়া আছে। এই স্কুল-বাড়ীতে বুদার শাখা সংস্থিত আছে। দরজার উপর "লাইব্রেরীর প্রবেশ দ্বার" আছে বটে,

...লোকে উহাকে স্কুল লাইব্রেরী মনে করিয়া সেদিকে ...ঘেঁষিত না।

শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের শেষ সীমায় সৌত্থাম্পটান্ ...নামক পল্লীতে লাইব্রেরী অবস্থিত। পাড়ার লোকেরা ...জন এবং তাহাদের ভিতর আদব-কায়দা মোটেই ...ই। সেখানে ভাড়া বাড়ী নাই; ...বাই নিজের নিজের বাড়ীতে বাস ...রে, আর নিজেদের ক্ষুদ্র সমাজের ...গৌরব কিসে অক্ষুন্ন থাকে এই তাদের ...চেষ্টা। এখানকার লাইব্রেরী সহ-...রের লাইব্রেরীর শাখা বলিয়া পরিচয় ...লেও পল্লী লাইব্রেরীর অপেক্ষা বেশী ...কিছু ছিল না। যখন শাখাটি প্রথম ...প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন নূতন প্রতিবেশী ...আসিলে লোকে যেমন আসিয়া দেখা-...সাক্ষাৎ করে, এখানকার অধিবাসী-...রাও সেইরূপ লাইব্রেরী দেখিতে ...আসিতে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সৌত্থাম্পটান ...পল্লী-পত্তনের সময় হ'তে আরম্ভ ক'রে একাল পর্য্যন্ত ...চিত্তাকর্ষক পল্লী-কাহিনী বলিতে সমুৎসুক ছিলেন; কিন্তু ...স সব লিপিবদ্ধ করিবার লোক ছিল না। ছেলেদের ...লাইব্রেরীয়ান সেটা লক্ষ্য করে এ বিষয়ে ...স্কুলের শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ...তাঁহারা স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছেলেদের ...সৌত্থাম্পটানের ইতিহাসের মালমশলা ...সংগ্রহ-কার্য্যে নিয়োজিত করেন। ...প্রত্যেক ছাত্রকে এক একটী বিষয়ের ভার ...দেওয়া হয়। কেহ রাস্তার নামের ...উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিল; ...কেহ-বা ব্যবসা বাণিজ্যের স্থান, কেহ-বা ...প্রাচীন গৃহ, কেহ-বা অস্বাভাবিক ঘটনার ...বিবরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত হইল। তাহারা ...ব্যবসাদার এবং বৃদ্ধ অধিবাসীদের সঙ্গে ...দেখা শুনা করিয়া তথ্য এবং স্থানীয় দ্রষ্টব্য দ্রব্য সংগ্রহে ...চেষ্টিত হইল। এই সব দ্রব্য লাইব্রেরীতে সাজাইয়া ...রাখা হইতে লাগিল। সদাশয় ব্যক্তিদের নিকট সৌত্থাম্পটান পত্তনের আমলের পুরাতন ছবি হাওলাৎ লওয়া হইল। সংগ্রহ শেষ হইলে তাহা দেখিবার জন্য সেখানকার অধিবাসীদের লাইব্রেরীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইল। স্থানীয় সংবাদপত্রেও এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইল। সৌত্থাম্প-টানের বেশীর ভাগ লোক লাইব্রেরী প্রদর্শনী দেখিতে আসিলেন।
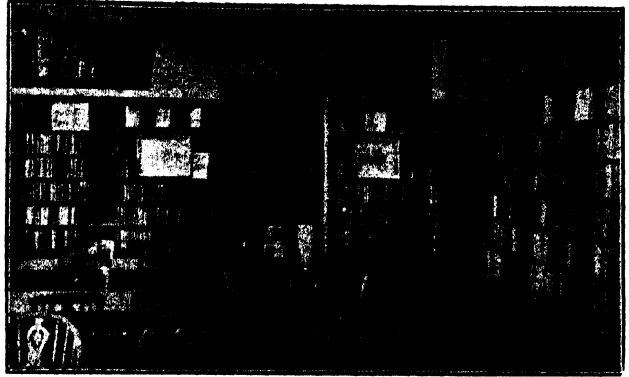
রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন-রুম

সৌত্থাম্পটান সেণ্টলুইর অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র মহকুমা। পল্লীটীও খুব পুরাতন নহে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে একটী উদ্যমশীল স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কীয় কোম্পানী এই পল্লীটি স্থাপন এবং তাহাকে সৌষ্ঠবশালী করিবার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করেন। দর্শকেরা এই পল্লীর কৌতূহলোদ্দীপক

কাউণ্টি লাইব্রেরী ডিপার্টমেণ্ট

কাহিনী শুনিয়া এবং ইহার ক্রমবিকাশের চিত্র সংগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। অতি পুরাকালের না হইলেও চিত্রগুলি বস্তুতঃই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সাবেক দলিল, দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, কার্য্যবিবরণী প্রভৃতির সংগ্রহও কম মনোজ্ঞ হয় নাই।

এই সব দ্রষ্টব্যের সহিত ছেলেদের পুস্তক-সপ্তাহ প্রদর্শনীর অভিনবত্ব ছিল। স্কুলের প্রত্যেক ছাত্রই কিছু-না-কিছু জিনিস দিয়াছিল। বালকবালিকারা পুস্তক সমালোচনা, পুস্তক তালিকা, কবিতা এবং নানারূপ বিজ্ঞাপনী বা পোষ্টার্ (poster) তৈয়ার করিয়া পাঠাইয়াছিল। কোনও কোনও তরুণ শিল্পী লাইব্রেরীর চালিত হয়। তারা নানা বৃক্ষের পাতা সংগ্রহ করিয়া একখানা খাতায় তাহা আঁটিয়া রাখে। পাতা চিনিতে হইলে পুস্তকের সাহায্য আবশ্যক; কাজেই তৎসংক্রান্ত পুস্তক পড়িবার আগ্রহও বেশী রকম উদ্রিক্ত হইতে থাকে।

লাইব্রেরীর কথা ও প্রসিদ্ধ লেখকদের পুস্তকে যে সব চিত্র আছে সে সম্বন্ধে কোনও তরুণ প্রবন্ধ রচনা করে। এমন কি নিম্নশ্রেণীর ছোট ছোট শিশুরাও একখানি বই লিখিয়া ফেলে। প্রত্যেক শিশু এক এক পাতা করিয়া লেখে। সে বইখানির নাম দিল "মোহনভোগ"। ছেলেরা সেই পুস্তক লইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ তো
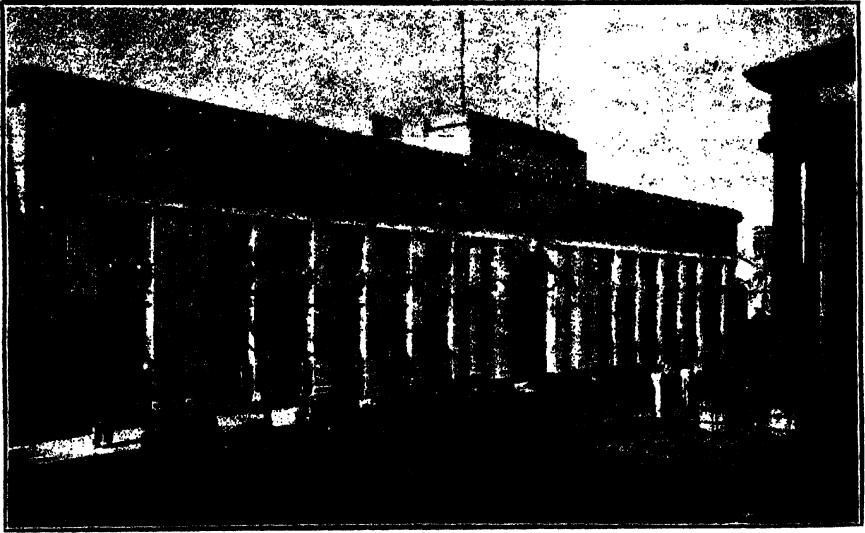
বাল্টিমোর নিউ পাবলিক লাইব্রেরী

বিজ্ঞাপন দিয়া পোষ্টার চিত্রিত করিয়া নিজেদের বাড়ীর জানালায় টাঙাইয়া দিয়াছিল। আবার কোনও শিল্পী নিজেদের প্রিয় বইএর উল্লেখ করিয়া পোষ্টার চিত্রিত করিয়া লাইব্রেরীতে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। উচ্চশ্রেণীর ছেলেদের পুস্তক সমালোচনা পড়িয়া সেই সেই বইয়ের চাহিদা বাড়িয়া যায়। ছেলেমেয়েরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বই পড়িয়া তাহাদের নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে দেখিয়া লাইব্রেরী জনপ্রিয় হইতে লাগিল। কোনও কোনও তরুণের চিন্তার ধারা উদ্ভিদবিদ্যার দিকে পরি-করিলই; অধিকন্তু তাদের বাপ মা ছেলেদের কা[জ] দেখিতে আসিতে লাগিলেন।

একদিন একজন চেঙ্কু নামে এক চীনা পুতু[ল] লাইব্রেরীতে উপহার দিল। তার মা ছিল চীন-প্রবাসী আমেরিকার একটী ছোট মেয়ে। চেঙ্কুর আকৃতি প্রকৃতি অদ্ভূত রকমের ছিল—তাই পাড়া-প্রতিবেশীরা তাকে দলে দলে দেখিতে আসিতে লাগিল। কেহ কেহ বলি[ল] চেঙ্কুকে একলা রাখায় বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। তখ[ন] তার সঙ্গী যোগানর কথা উঠিল। নাটক বা উপন্যা[স]

বর্ণিত ব্যক্তির পরিচ্ছদ-পরিহিত সঙ্গী উপহার দিবার জন্য সাধারণকে অনুরোধ জানান হইল। পোষাকের নমুনার বই এবং ছেলেদের ছবির বই দেখিয়া সেই ধরণের পোষাক পরিধান করাইয়া সঙ্গী তৈয়ারীর চেষ্টা চলিতে লাগিল। চেঙ্কুর প্রথম সঙ্গী এলেন পিনোচিও। প্যাঁউরুটির ছাল দিয়া তার টুপী তৈয়ার হইয়াছিল। তার পর এল ঘুমন্ত সুন্দরী, তাকে পরাণ হ'য়েছিল সাদা সাটিনের পোষাক ও তার মাথায় জড়ান হ'য়েছিল মুক্তা বসান লেশ—আর তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল ফিকে নীল রঙের সিল্কের মোড়া কৌচে। তারপর এলেন রাজা আর্থার, পিটার প্যান্, রবিন হুড্ আরও অনেক রকমের সঙ্গী।

পুতুলের পোষাক পরান লইয়া ঘরে ঘরে আলোচনা হইতে লাগিল। আর কি রকম হয়েছে দেখিবার জন্য মায়েরা লাইব্রেরীতে আসিতে আরম্ভ করিলেন। যখন তাঁরা আসিলেন, তাঁরা এই সব দেখার সঙ্গে দেখিতে পাইলেন নানা রকমের রান্নাবান্না করিবার, গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মের, এবং সূচীকার্য্য সংক্রান্ত ভাল ভাল বই সামনেই সাজান আছে। তাঁরা সেই সব বই পড়িবার জন্য ঘরে লইয়া গেলেন। ক্রমে ঐ সব বইয়ের চাহিদা বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

নাটক নভেলে বর্ণিত ব্যক্তির পরিচ্ছদ পুতুলকে পরানর চেয়ে নিজেদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সেইরূপ পোষাক পরাবার অনেকের সখ হইল। পুতুলের মতো তাহাদের লাইব্রেরীতে আট্‌কাইয়া থাকিতে হইবে না—তারা সেই সব পোষাক পরিধান করিয়া রাস্তায় শোভাযাত্রা করিবে—স্কুলের ব্যাণ্ড আগে আগে ব্যাণ্ড
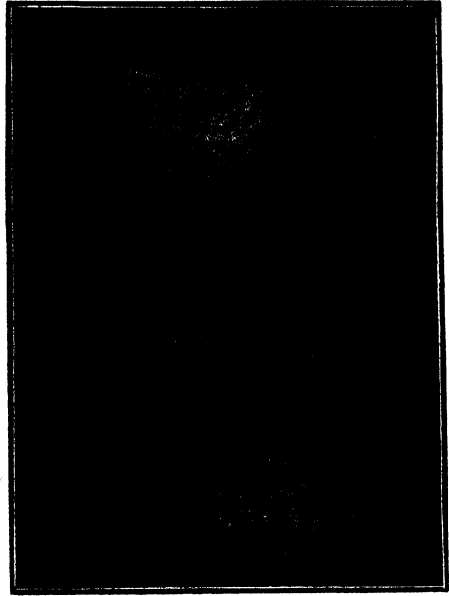
সেণ্ট্রাল হল
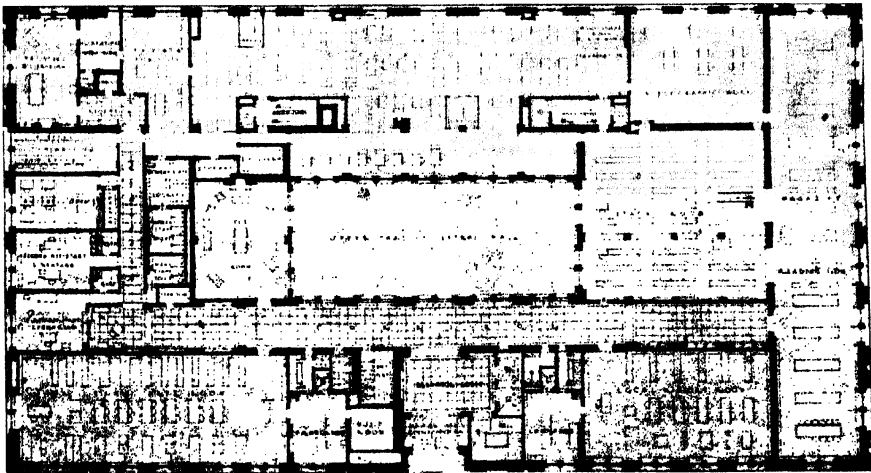
দ্বিতলের নক্সা

বাজাইয়া অগ্রসর হইবে। তার পর ছোট মেয়েরা ঐ সব পোষাকে সজ্জিত হইয়া সারিবন্দী হইয়া চলিবে। আর বা ল ক স্কাউটরা তাহার লাইব্রেরীর সাহিত্য বিলাইতে বিলাইতে তাদের সঙ্গে যাইবে, এরূ ব্যবস্থা হইল।

এখানে প্রতি বর্ষে বসন্ত কালে পক্ষীর বাসার প্রদর্শ হয়। গ্রামের ছেলেরা পাখীর বাসা নির্ম্মাণ করিয়
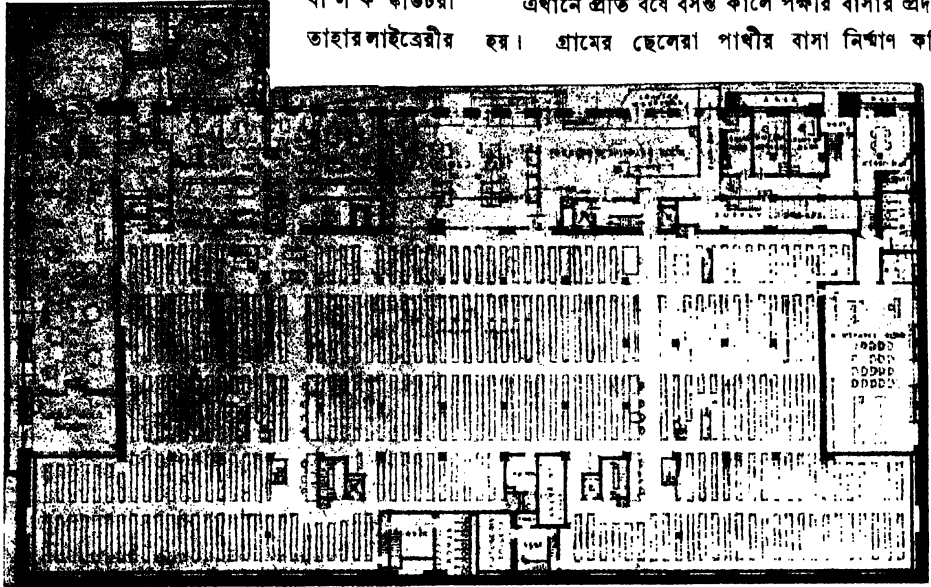
একতলার নক্সা

লাইব্রেরীতে রাখিয়া যায়। নানা রকম পাখীর বা তৈয়ারীর নক্সা ও কৌশল যে সব বইয়ে লেখা আছে তাহা সকলকে দেওয়া হয়। কিন্তু পুস্তকে অনেক সম সব কথা লেখা থাকে না—তাই তারা মাঝে মা হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে। এই ধরুন, একজন ছেলে জানিে চায়—ক্ষুদ্র চড়ুই পাখী কি রং পছন্দ করে। আবার হ তো কেহ জানিতে চায়—আল্‌কাতরা মাখান কাগে পাখীর বাসা তৈয়ার করা চলে কি না। এসব প্রশ্নে উত্তর দিতে লাইব্রেরীয়ানদের ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়।

পাখীর বাসা তৈয়ার শেষ হইয়া গেলে ছেলের সেগুলি লাইব্রেরীতে আনিয়া হাজির করে। যে বাল যে বাসাটী তৈয়ার করে, সেখানে তাহার নাম লিখিয় রাখা হয়। এই ক্ষুদ্র বাসাগুলিতে অসীম বৈচিত্র প্রকটিত হইয়া থাকে। কোনওটীতে ক্ষুদ্র পক্ষীর সংসারে উপযোগী বাসা; আবার পাখীদের বড় বাসাও আছে আবার কোনওটীতে আধুনিকতার স্পর্শ দেদীপ্যমান কোনও কোনও বাসার পারিপাট্য দেখিলে বস্তুত:

সাধারণ অনুসন্ধানের বিভাগ

চমৎকৃত হইতে হয়—মনে হয় না যে সেগুলির শিশু-হস্তে নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছে।

গত বর্ষে এসব পাখীর বাসার এত সুখ্যাতি হইয়াছিল যে শিক্ষাবিভাগ সরকারী ফটোগ্রাফার পাঠাইয়া এই সবের ফটো লইয়া যান। সেগুলি সেণ্ট্‌ লুই সহরের প্রধান সংবাদপত্র "Globe-Democrat"এ প্রত্যেক নির্ম্মাতার নাম দিয়া প্রদর্শনীর বিবরণসহ প্রকাশিত হয়। এত বড় প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় সহরপ্রান্তে অবস্থিত হইলেও বুদার লাইব্রেরীর নাম ডাক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকও এই লাইব্রেরীতে যখন যাহা হইত তাহার বিবরণ বিশদভাবে প্রকাশ করিতে থাকেন।

পাখীর বাসা তৈয়ার হয় পাড়ার পাখী আকর্ষণ করার জন্য। কিন্তু এই পাখীর বাসা উপলক্ষ করিয়া এই লাইব্রেরীর পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। বাপ-মায়েরা প্রদর্শনীতে ছেলেদের কাজ দেখিতে আসিয়া লাইব্রেরীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাদের পছন্দ মত বই বাছাই করিয়া লইয়া যাইতে আরম্ভ করেন। এই সব উপায়ে লাইব্রেরীটি জনপ্রিয় হইয়া গিয়াছে। পাখীর বদলে পাঠকের সংখ্যাই অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

লাইব্রেরী এবং গির্জ্জার পরস্পরের সহিত সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক স্থানেই নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গির্জ্জা আছে। সকলেরই চেষ্টা স্বীয় গির্জ্জায় অধিক লোক আকৃষ্ট করা। সেজন্য বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা আছে। নব ভাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশের পন্থা-সংক্রান্ত পুস্তক লাইব্রেরী হইতে পাদ্‌রীদিগকে দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপযোগী পুস্তক লাইব্রেরী হইতে যোগান হয়। তাঁহাদের উপাসনার বিজ্ঞাপন লাইব্রেরীতে দেওয়া হয় এবং তাহার পরিবর্ত্তে গির্জ্জাতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের উপযুক্ত স্থানে লাইব্রেরীর পোষ্টার টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয় এবং লাইব্রেরীর সংগৃহীত বাছাই বাছাই পুস্তকের তালিকা গির্জ্জার বিজ্ঞাপনী-পুস্তিকার সহিত প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়।

মেয়েদের ক্লাবগুলিতে নানা সম্প্রদায়ের মহিলার সমাবেশ হইয়া থাকে। সেখানে লাইব্রেরীয়ান গিয়া লাইব্রেরীর কথা উত্থাপন করেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহাদের সকলকে লাইব্রেরীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। সেই সব অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিশুদের মনস্তত্ত্ব, ঘরের ভিতর সাজাইবার পুস্তক এবং মহিলাদের চিত্তাকর্ষক অন্যান্য পুস্তক প্রদর্শিত হয় ও মেয়েদের উপযোগী পুস্তক-তালিকা বিতরণ করা হয়। তাহার ফলে অনেকেই আগ্রহের সহিত লাইব্রেরীর পাঠক শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে। যাহারা

বামে—শিশুদিগের পাঠাগার, দক্ষিণে—সাধারণ পাঠাগার

কখনও লাইব্রেরীর ত্রিসীমায় আসে নাই তাহারা এই উপলক্ষে লাইব্রেরীতে আসিয়া থাকে।

গ্রন্থাকৃতি প্রকাণ্ড গ্রন্থাধার। এখানে বই ফেরত দিতে হয়

লাইব্রেরীর বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ব্যবসাদারদের সাহায্য লওয়া হয়। তাহাদের দোকানের সম্মুখে বা জানালার ধারে লাইব্রেরীর পোষ্টার রাখার অনুমতি লইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বিত হয়। অনেককে তাহাদের ব্যবসায় প্রসারের উপযোগী পুস্তক সরবরাহ করিয়া লাইব্রেরীর দিকে আকর্ষণ করা হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ আপনা হইতে লাইব্রেরী পোষ্টারের জন্য স্থানও দিয়া থাকে।

যে কোন বিষয় সাধারণের নিকট প্রচার করিতে হইলে পোষ্টার হইতেছে একটী সহজ উপায়। এই লাইব্রেরীর যে পোষ্টার অঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহাতে লাইব্রেরীর নাম কোথায় অবস্থিত তাহা তো থাকেই; অধিকন্তু সেখানে বিনাব্যয়ে আবাল বৃদ্ধ বণিতা পুস্তক ব্যবহার করিতে পারে তাহা লেখা হয়। মধ্যস্থলে খানিকটা খালি স্থান রাখা হয়। তাহাতে কোন বই হইতে রঙীন ছবি লইয়া আঁটিয়া দেওয়া হয়। রঙীন ছবি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাহাতে একখানি নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের পরিচয় পায়। গির্জ্জায় যে পোষ্টার দেওয়া হয় তাহাতে ধর্ম্ম-পুস্তকের পরিচয় থাকে। গল্পের কার্য্যতালিকাও এই ভাবে প্রচার করা হয়। খুব বড় বড় পোষ্টার যেখানে লাগান হয় তাহাতে ৬/৭ খানি পর্য্যন্ত ছবি দেওয়া হয়।

জন-সমাজে লাইব্রেরী সকলকে কিছু না কিছু উপহার দেয়। যে সব লোক লাইব্রেরীর খবর রাখে না—একটা উপলক্ষ করিয়া তাহাদের সহিত লাইব্রেরীর সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়। প্রদর্শনীর দ্বারাও অনেককে আকৃষ্ট করা যায়। সদা গৃহকর্ম্ম-নিরতা মাতা, যাঁহার লাইব্রেরীতে

সিয়াট্‌ল্ পাবলিক লাইব্রেরী—পশ্চিম শাখা

আসার বা বই পড়িবার সময় হয় না, তিনিও প্রদর্শনীতে ছেলেমেয়েদের কাজ দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না। লাইব্রেরীতে আসিলে তিনি হয় তো পাক-প্রণালীর পুস্তক হইতে নূতন নূতন খাবার তৈয়ারীর প্রণালী শেখেন ; কিম্বা কোন একটা রন্ধন-প্রণালী, যাহা বহুকাল হইতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহা পাইয়া হারান জিনিষ পাওয়ার আনন্দ উপভোগ করেন। হয় তো কোন পিতা পাখীর বাসার প্রদর্শনী দেখিতে আসায় পাঁচ রকম পুস্তকে তাঁহার নজর পড়ে এবং তিনি যে বিষয় জানিতে চান তাহা সেখানে পাইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করেন। হয় তো কোন শিল্পী বই পড়া সময়ের অপচয় মনে করিয়া লাইব্রেরীতে ঘেঁসে না—সেও পোষ্টারে তাহার ব্যবসার অনুকূল পুস্তকের পরিচয় পাইয়া লাইব্রেরীতে আকৃষ্ট হয়। হয় তো কোন বৃদ্ধা মহিলা কেবল বাই-বেল ছাড়া আর কিছু পড়েন না। পাদ্রী সাহেব তাঁহাকে কোন ধর্ম্ম-পুস্তক পড়িবার জন্ত উপদেশ দেন। সে বই এই লাইব্রেরীতে পড়িতে পাইলে তাঁহার লাইব্রেরীর সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন স্বাভাবিক। এই
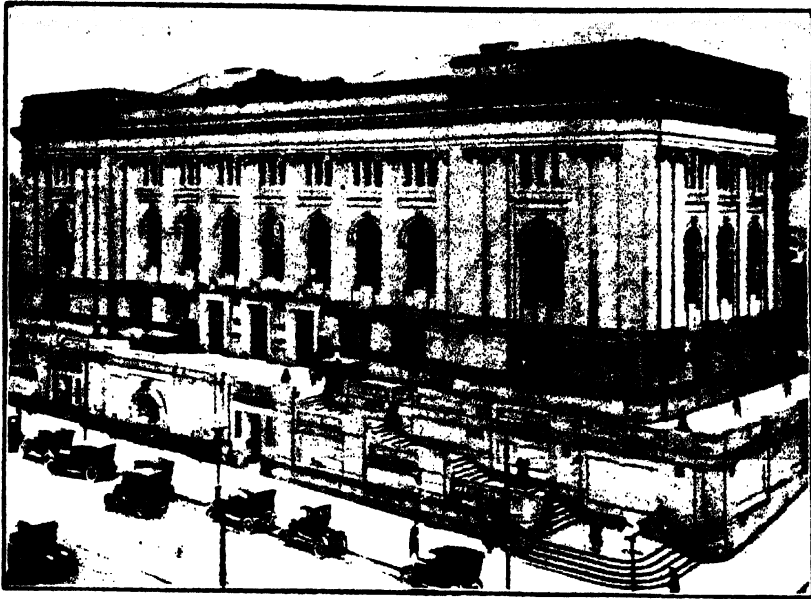
সিয়াট্‌ল্‌ পাবলিক লাইব্রেরী

ভাবে নানা দিক দিয়া লাইব্রেরীর বাণী সকল শ্রেণীর লোকের নিকটেই পৌছিতে পারে—লাইব্রেরী যে সকলেরই সেবক। লাইব্রেরীতে সকলের সমান অধিকার—লাইব্রেরী যে তাঁদেরই, এ ধারণা জন্মিলে
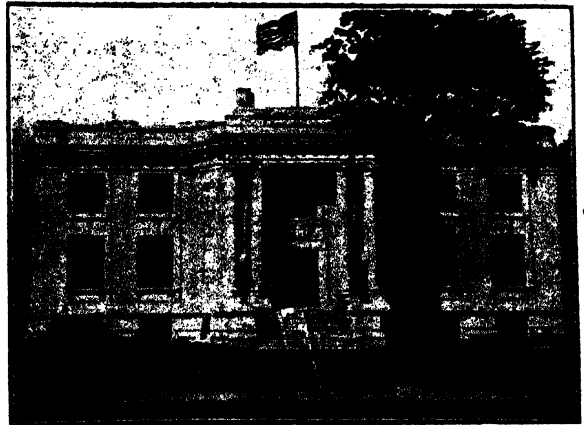
ক্লিণ্টন পাবলিক লাইব্রেরী—আইওআ

আর কোন বাধা থাকে না। লাইব্রেরী সকলেরই সেবা করিবার জন্য সদা উন্মুখ, এ বাণী প্রচার লাইব্রেরীয়ানের অন্যতম কর্ত্তব্য।

এখন সে দেশের একটী আধুনিক বড় লাইব্রেরীর কথা বলিব। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় বাল্টিমোর সহরের লাইব্রেরীর বাড়ী নির্ম্মাণ করার প্রস্তাব হয়। সুজন্য সমস্ত সহরবাসীর ভোট গণনা হয়। বাড়ীর জন্য মিউনিসিপ্যালিটী ত্রিশ লক্ষ ডলার ধার করিলেন। সম্প্রতি বাড়ী নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে
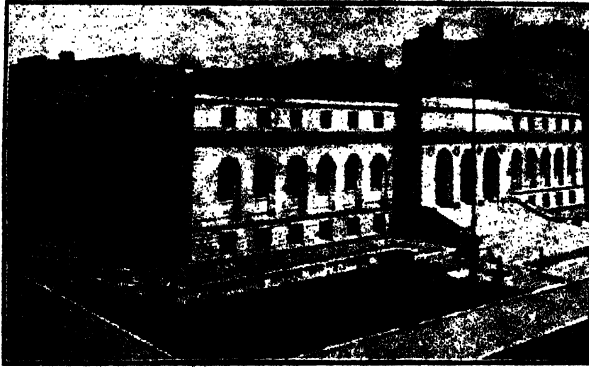
সেণ্ট লুই পাবলিক লাইব্রেরী

ষোল লক্ষ বই থাকিবে। এগার শত পাঠক বসিয়া পড়িতে পারিবেন। শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিভাগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। সকল বইই স্বচ্ছন্দে দেখা যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা আছে। ছেলে-মেয়েদের জন্যও ভাল বন্দোবস্ত আছে। এইরূপ লাইব্রেরী একটী দুটী নয় নিউ ইয়র্ক, ক্লেভল্যাণ্ড, ডেট্রয়েট্ প্রভৃতি সহরের শত শত লাইব্রেরী আজ যুক্ত রাজ্যের মস্তিষ্ক স্বরূপে কাজ করিতেছে। তদ্ভিন্ন লাইব্রেরী অফ কংগ্রেস এক বিরাট ব্যাপার—তাহার পরিচয় দেওয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

জগতের সর্ব্বত্রই বেকার সমস্যা একটা বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার সমাধান কি ভাবে এবং কবে হইবে বড় বড় রাজনীতিজ্ঞগণ তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। য়ুরোপ ও আমেরিকায় এই সুযোগে বেকার-গণকে লাইব্রেরীতে আকৃষ্ট করিবার জন্য বিপুল প্রচেষ্টা চলিতেছে। যে যে কার্য্য উপলক্ষ্য করিয়া

মিলওয়াকি পাবলিক লাইব্রেরী
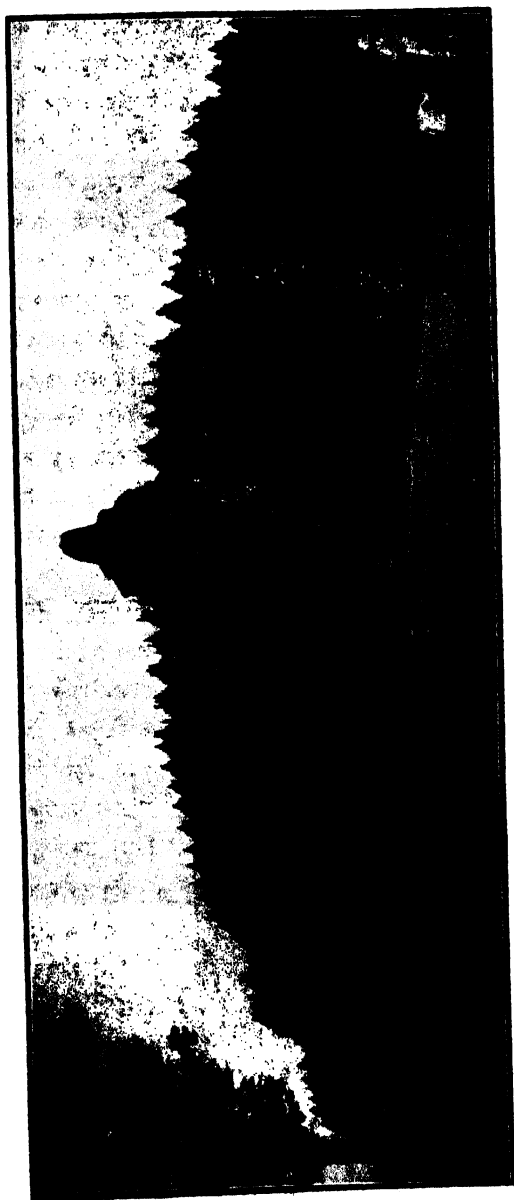
বোরোবুদুর মন্দির

উপযোগী করেই এই বিরাট স্মৃতিমন্দির স্থাপিত হ'য়েছিল অনুমান কিঞ্চিদধিক হাজার বৎসর পূর্ব্বে।

এই মন্দিরকেই যবদ্বীপবাসীরা বলে "বোরোবুদুর" (বড় বুদ্ধের মন্দির ?)। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যে একদা ভারতের বাইরে প্রায় সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে সম্প্রসারিত হয়েছিল একথা বলাই বাহুল্য। ধর্ম্মের অনুসরণ করে ভারতের শিল্পকলাও দেশান্তরে বিস্তৃত হয়েছিল। বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ ঘটেছিল খৃ:পূ: পঞ্চম শতাব্দী প্রথম ভাগে! কিন্তু, যবদ্বীপে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে প্রথম পরিলক্ষিত হয়। এ-সময় যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। ক্রমে হিন্দু প্রাধান্যকে নিস্তেজ ক'রে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যবদ্বীপে যখন প্রবল হ'য়ে উঠেছিল, সেই সময় এই মন্দির নির্ম্মাণ সুরু হয়; সে অনুমান খৃষ্টীয় অষ্টম থেকে সপ্তম শতাব্দী। এই সময় বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছিল। গৌতমের সরল ধর্ম্মোপদেশ ক্রমে জটিল ও রহস্যময় হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধদর্শন ও ধর্ম্মসূত্র নিয়ে মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা দুটি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। উত্তর-ভারতে বুদ্ধদেবের সঙ্গে সঙ্গে অতীত বুদ্ধেরাও দলবেঁধে এলেন, ধ্যানীবুদ্ধ, বোধিসত্ব, প্রভৃতি নানা বুদ্ধমূর্ত্তির উদ্ভব হ'ল সেখানে। ক্রমে, হিন্দুর শিবও বৌদ্ধদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর হয়ে দেখা দিলেন এবং শনৈঃ শনৈঃ আরও অন্যান্য বৌদ্ধ দেবদেবীর আবির্ভাব হল। কিন্তু, দক্ষিণ ভারত সেই গৌতম প্রবর্ত্তিত আদিম বৌদ্ধধর্ম হ'তে বিচ্যুত হয়নি। তারা আজও সেই আচার্য্য নির্দ্দেশিত সরল পথেই চলেছে। সিংহল ব্রহ্মদেশ ও শ্যাম অঞ্চলে এখনও সেই প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে।

মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ চূড়া (এই গম্বুজটির ব্যাস দৈর্ঘ্যে ৫২ ফিট! গম্বুজের পাদমূলে স্তূপাভ্যন্তরস্থ বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে। মর্ম্মর-জালিকার ভিতর থেকে এই বুদ্ধমূর্ত্তিগুলিকে অতি সুন্দর দেখায়)

'বোরোবুদুর' মন্দির কিন্তু উত্তর ভারতীয় বৌদ্ধগণেরই অবিনশ্বর কীর্ত্তি। উত্তর ভারতের ধর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে তদানীন্তন শিল্পকলার চরম পরাকাষ্ঠা ও এই মন্দিরের প্রত্যেক অংশে প্রতিফলিত। মানবচিত্ত যে কেবলমাত্র কয়েকটি ধর্ম্মোপদেশ ও বিধিবিধান মেনে চ'লে পরিতুষ্ট থাকতে পারেনা, তার প্রাণ যে পূজার জন্য দেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়তে চায়, সে যে তার কল্পনার ইষ্টমূর্ত্তিকে রূপ দিয়ে অর্চ্চনা করবার জন্য ব্যাকুল এর প্রমাণ জগতে

যবদ্বীপের এই মন্দিরের স্থাপত্যশিল্প ভারতেরই কলা-পদ্ধতি প্রসূত। প্রাচীন কীর্ত্তির সঠিক সন তারিখ খুঁজে পাওয়া কঠিন, অথচ, সন তারিখ না জানতে পারলেও এই সব প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের সুসম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না।

...ত্রই খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম যা হিন্দুর ...র্ত্তি পূজার সম্পূর্ণ বিরোধী, তার মধ্যেও শেষ পর্য্যন্ত ...ত্তির প্রবেশাধিকার সম্ভব না হ'য়ে পারেনি।

অনুমান ৮৫০ খৃঃ অব্দে 'বোরোবুদুর' 'মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হ'য়েছিল বটে, কিন্তু শেষ হয়ে যেতে ...ত বৎসর লেগেছে। কেউ কেউ বলেন এ মন্দির শেষ হয়নি। মানুষের শক্তির সীমা আছে, বোঝাবার জন্যই ...টি অসমাপ্ত রাখা হ'য়েছিল। কেউ বলেন নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হবার আগেই আগ্নেয় গিরির উৎপাতে মন্দিরের কাজ বন্ধ হয়ে গেছল। যাই হোক্ঃ—বিশেষজ্ঞেরা এর নির্ম্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণা ক'রে স্থির করেছেন যে, এই মন্দিরের নির্মাতারা তাঁদের প্রথম কল্পনা অনুযায়ী এর যে নক্সা করেছিলেন, পরে একাধিকবার তা'-পরিবর্ত্তন ক'রে-ছিলেন; কাজেই মন্দিরটিরও নানা অংশ একাধিকবার পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছিল। বাইরে থেকে 'বোরোবুদুর' দেখতে একটি সোপান-শ্রেণী পরিবেষ্টিত বহুভুজ মন্দির। পূর্ব্বেই বোলেছি একটি অনুন্নত পর্ব্বতকে এই মন্দিরের ভিত্তিরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। মন্দিরটি বহুভুজ হওয়াতে পাহাড়টি কেটে বহুকোণ ক'রে নিতে হয়েছে। মন্দিরটি ১৫০ ফিট উচ্চ, এর এক একটি দিক দৈর্ঘ্যে অন্যূন ৫২০ ফিট। কিন্তু এর কোনোদিকই ঠিক সরল রেখায় নয় বলে মন্দিরটি মিশরের পিরামিড বা মধ্য আমেরিকার পিরামিড আকারের প্রাচীন মন্দিরগুলির অপেক্ষা দেখতে অধিকতর সুশ্রী। এ মন্দিরের ভিত্তি-প্রান্ত পরের পর ঠিক সমভাগে বিভক্ত হয়ে মধ্যে মধ্যে কেন্দ্র সীমা হ'তে অভ্যন্তর প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে এর সকল দিক অসংখ্য কোণে পরিবেষ্টিত। এইভাবে মন্দিরটি গঠিত হওয়ায় ঋজু ও সমতল রেখার পরস্পর সম্মিলনে মন্দিরটি দেখতে হয়েছে যেন পাষাণে গঠিত একটি ছন্দোবন্দনা। ভারতীয় স্থাপত্যকলার এই বিশেষত্বই 'বোরোবুদুর' মন্দিরের শিল্পীকে আমাদের নিকট পরিচিত ক'রে দিয়েছে।

মন্দির-গাত্রের অসংখ্য কোলঙ্গা এবং ছোট ছোট শ্রেণীবদ্ধ স্তূপের দীর্ঘ-শৃঙ্গ চূড়াগুলি মন্দিরের ঋজু রেখাকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলেছে এবং এর ত্রিকোণাংশকে দৃষ্টির অন্তরালে নিয়ে গেছে। 'বোরোবুদুর' মন্দিরের আর একটি বিশেষত্ব হ'চ্ছে যে, মন্দিরটি বহুকোণ হ'লেও এর ছাদ চক্রাকার। এটি বহুস্তর-বিশিষ্ট মন্দির। এর শেষের তিনটি স্তরই গোলাকার। সোপানশ্রেণী দিয়ে পরের পর প্রত্যেক স্তরে ওঠা যায়। প্রত্যেক স্তরের প্রবেশ-পথে মকর-মুখ তোরণদ্বার আছে। মন্দিরের প্রথম স্তরটি অর্থাৎ ভিত্তিপীঠের উপরটি চারপাশ খোলা দালানের মত। কিন্তু, তার পরের চারটি স্তর দেওয়ালের

ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তি (মন্দির-গাত্রের অসংখ্য কোলঙ্গার প্রত্যেকটিতে এই রকম এক একটি সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল)

মত প্রাচীর ঘেরা। প্রত্যেক স্তর তার আগের স্তরের চেয়ে ছোট হ'য়ে হ'য়ে ক্রমে চূড়ো পর্য্যন্ত পৌঁছেচে ব'লে এই সব স্তরের ছাদগুলির প্রান্তভাগ দেখতে যেন গ্যালারীর মত সাজানো। মন্দিরের চারিদিক এই

মন্দির-গাত্রে উদ্গাত শিলাচিত্র (মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে প্রায় ২১৪১ খানি বৃহৎ পাষাণ-ফলকের উপর বৌদ্ধ জাতকের নানা চিত্র উদ্গাত আছে)
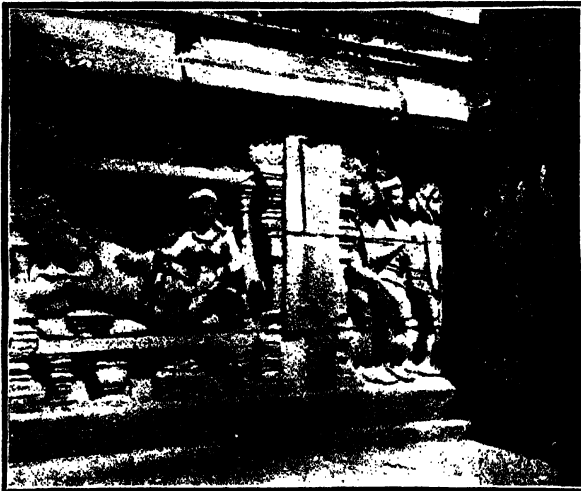
আর একখানি শিলা-চিত্র (বুদ্ধদেবের জন্ম থেকে পরি-নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত তাঁর জীবনের প্রত্যেক ঘটনা শিলাচিত্রে পরের পর এমন সুস্পষ্ট উদ্গাত করা আছে যে এই মন্দির দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেবের জীবনী সম্বন্ধেও দর্শকের অভিজ্ঞতা লাভ হয়)

গ্যালারীর মত পরের পর পেছিয়ে ক্রমোচ্চ হয়েছে বলে' দৃষ্টি কোথাও বাধেনা; প্রত্যেক স্তরের প্রাচীর বেষ্টনও পরের পর ক্রমেই পেছিয়ে গেছে। সুতরাং মন্দিরের দিকে চাইলেই যেদিক থেকেই দেখিনা কেন মন্দিরের সম্পূর্ণ রূপটি দেখতে পাওয়া যায়।

মন্দিরের প্রত্যেক স্তরে যে প্রাচীরবেষ্টনী আছে তার উপর দিকে দুরকম কারুকার্য্য করা আছে। এই দুরকম কারুকার্য্যের কোনটিই অনাবশ্যক করা হয়নি। প্রত্যেকটিরই এক একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। এখানে বলে রাখি যে ভিতরদিক থেকে প্রত্যেক স্তরের এই প্রাচীর বা দেওয়ালের নীচের দিকটা সেই স্তরের দেওয়াল, কিন্তু উপর দিকটা দ্বিতীয় স্তরের বহিপ্র্রাচীর। কাজেই উপর দিকের যে কারুকার্য্য তা' বৃহৎ আকারে করা, কারণ দূর থেকেও তা পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে। এইদিকে যে কোলঙ্গা-গুলি আছে সে শুধু বড় নয়, গভীরও বেশী। এই কোলঙ্গার প্রত্যেকটির মধ্যে এক একটি সুবৃহৎ ধ্যানীবুদ্ধের মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। প্রত্যেক মূর্ত্তিটিই পদ্মাসনে আসীনরূপ, গভীর ধ্যানমগ্ন বা ধ্যানসমাহিত মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির প্রত্যেকটি ভারতীয় ভাস্কর্য্যের অতি সুনিপুণ নিদর্শন। পাষাণের উপর এরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত ভাবমাধুর্য্য-মণ্ডিত জ্যোতির্ম্ময় প্রতিমূর্ত্তি খুব অল্পই দেখতে পাওয়া
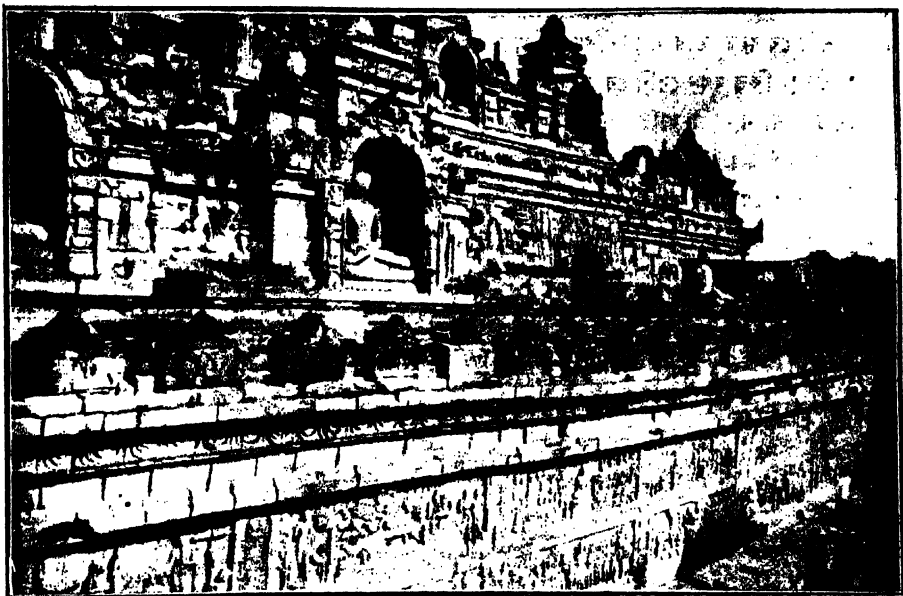
মন্দির-প্রাচীর ও ছাদ (অসংখ্য শিলাচিত্র উদ্গাত এই মন্দির-প্রাচীর। প্রাচীর-গাত্রে কোলঙ্গা ও তার মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি। নিম্নের ও উপরের প্রাচীরের মধ্যে ছাদ দেখা যাচ্ছে)
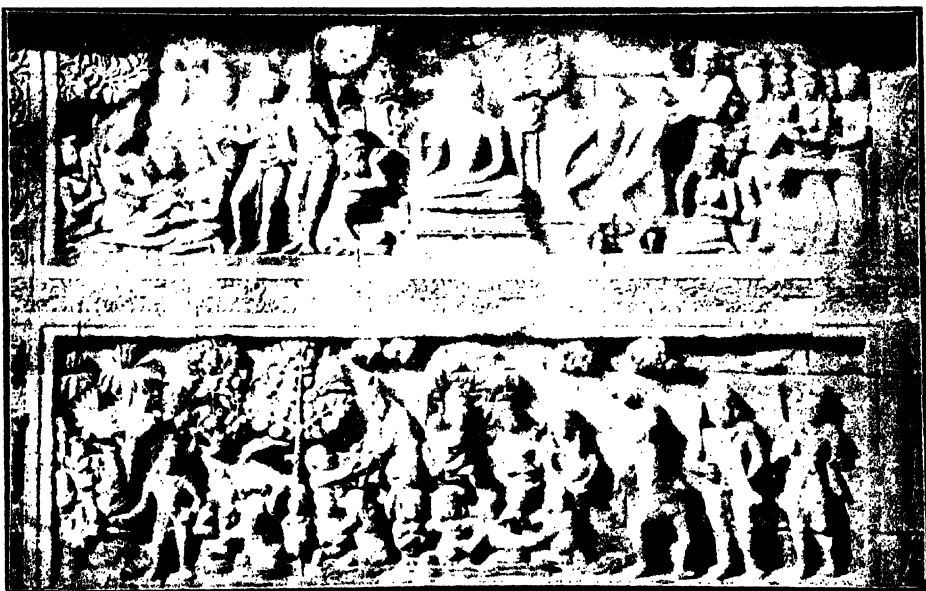
মন্দির-গাত্রে উদ্গাত শিলা-চিত্র (নিম্নে বালবুদ্ধের লীলা, উপরে অর্হত বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ কথন)

য়। একটি মূর্ত্তি দেখলেই মনে হয় এ রূপ একেবারে অদ্বিতীয়। শিল্পী বোধহয় তার সারাজীবনের সাধনায় এই মূর্ত্তিটি গড়েছে! কিন্তু যখন দেখি যে এই একই রকম অপরূপ প্রতিমূর্ত্তি সেখানে সারি সারি প্রায় চার শতাধিক রয়েছে তখন আর দর্শকের বিস্ময়ের অবধি থাকেনা!

এই মূর্ত্তিগুলির পরম সৌন্দর্য্যই মন্দিরটির ধ্বংসের কারণ হ'য়ে উঠেছিল। একাধিকবার শত্রুর আক্রমণে এই মন্দির বিধ্বস্ত হ'য়েছে। যারা পেরেছে, মন্দির থেকে এই মূর্ত্তি লুঠ ক'রে নিয়ে গেছে। বৌদ্ধ-বিদ্বেষী যারা তারা বর্ব্বরের মত এই সুন্দর মূর্ত্তিরও মাথা ভেঙে দিয়ে গেছে। ধর্ম্মের গোঁড়ামী মানুষকে যে কতদূর অন্ধ করে, তার পরিচয় ভারতবর্ষেরও একাধিক বিধ্বস্ত মন্দির নিঃশব্দে বহন ক'রছে। কোলঙ্গার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত এই বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলিই মন্দিরের নিম্নস্তরের প্রধান শোভা ও সৌন্দর্য্য; দূর থেকেই এগুলি দর্শকের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে। দুটি কোলঙ্গার মধ্যস্থলে পাষাণ-ফলকে উদ্গত শিলা-চিত্র মন্দিরটির আপাদমস্তক অলঙ্কৃত ক'রে রেখেছে। সে যুগের শিল্পীরা কোথাও এতটুকু স্থানও শূন্য ফেলে রাখতেন না। মন্দিরটির আগাগোড়া এমন এক বিঘত স্থানও কোথাও নেই যেখানে সুদক্ষ শিলা-শিল্পীর অয়স্-খোদনকের কারু-স্পর্শ পড়েনি।

প্রাচীর-গাত্রের নীচের দিকেও ভিন্ন ভিন্ন পাষাণ-ফলকে উদ্গত শিলাচিত্র আছে। এগুলি দূর থেকে দেখা যায় না বটে, কিন্তু মন্দির দর্শনে যারা উপরে ওঠে, তাদের চোখে এর সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। গভীর রেখায় চিত্রগুলি পাষাণের উপর উদ্গত হয়েছে। এ চিত্রের কলা-কৌশল ও রচনা-নৈপুণ্যের মধ্যে যে নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য ও ছন্দ-মাধুর্য্য বিকশিত হয়ে উঠেছে ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও শিল্পকলার প্রধান ঐশ্বর্য্যই সেইখানে। চিত্রগুলির বিষয়-বস্তু প্রত্যেকটি বিভিন্ন, যদিও, সবগুলিই বৌদ্ধ জাতক অবলম্বনে চিত্রিত। গৌতম বুদ্ধের বর্ত্তমান জীবনের প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তাঁর জন্মের পূর্ব্ব থেকে মহানির্ব্বাণ পর্য্যন্ত এই চিত্র-গুলিতে পরিস্ফুট করা হয়েছে। গৌতমের গত জন্মেরও
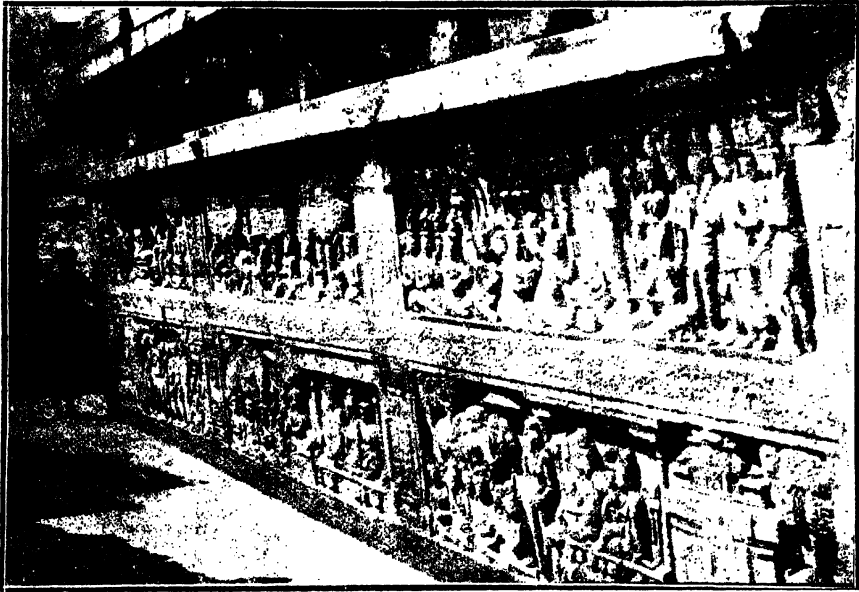
সর্ব্বশেষ প্রাচীর (এই প্রাচীরের পর মন্দিরের যে তিনটি স্তর আছে তাতে আর প্রাচীর-বেষ্টনী নেই। প্রাচীরের কোণে নিম্নস্তরের ছাদ দেখা যাচ্ছে)

বহু ঘটনা এই সব শিলা-চিত্রে খোদিত আছে। মন্দিরের তৃতীয় স্তরে অনাগত গৌতম যিনি মৈত্রেয় বুদ্ধ নামে উল্লিখিত হয়েছেন, তাঁরই বিবরণ বিশেষ ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে।

মন্দিরের চতুর্থ স্তরে ধ্যানী বুদ্ধের ও বোধিসত্ত্বগণের বিবরণ চিত্রিত হয়েছে। এখানে স্বর্গলোকের কল্পনা-সুলভ নানা বিমোহন দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে।

সিদ্ধার্থের প্রতিমূর্ত্তি

এই চিত্রগুলি মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ ক'রলে শিল্পীর আশ্চর্য্য পরিকল্পনা ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে থাকতে হয়। শিলাপটের রচনা-কৌশলে ভারতীয় শিল্পীরা যে রূপ-দক্ষতা ও কলা-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তার আর তুলনা মেলে না। তালমানে অপূর্ব্ব সমতা রক্ষা ক'রে চলায় তাদের নিপুণ হাতে ভাস্কর্য্য-শিল্পে যে একটি সুললিত ছন্দ বিকশিত হয়ে উঠেছে ভারতীয় স্থাপত্য-কলা তার সাহায্যে আজও জগতে অদ্বিতীয় হয়ে রয়েছে।

পাষাণ-ফলকে ক্রমাগত সারি সারি শিলাচিত্র যদি চোখে পড়ে তাহ'লে সে যত সুন্দরই খোদিত হোক না কেন—সেগুলি দর্শকের চোখে একঘেয়ে ঠেকে এবং তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়। বোরোবুদুরের শিল্পীদের এ-কথা

কোলঙ্গার অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি

অজ্ঞাত ছিল না, তাই বোধ হয় মন্দিরের প্রাচীরগাত্র পরের পর সমভাগে বিভক্ত হয় মধ্যে মধ্যে কেন্দ্র হ'তে অভ্যন্তর প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট করা হয়েছে। এর ফলে দর্শকের দৃষ্টিতে প্রত্যেকবার প্রাচীরের অংশ-বিশেষ

মাত্র ধরা পড়ে এবং অপরদিক অদৃশ্য থাকে, সুতরাং সারা মন্দির প্রদক্ষিণ করলেও কোথাও এর কারুকার্য্য একঘেয়ে মনে হয় না। ছাদের কার্ণিশেরও মধ্যে মধ্যে বড় বড় মকর কুম্ভীর হাঙ্গর প্রভৃতির মুখের অনুকরণে জল নিকাশের জন্য সুদৃশ্য নল লাগানো আছে, এজন্য মন্দিরের ছাদের আলিশার ধারটিতেও একটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। জল যাবার জন্য মন্দিরের চারপাশে সুড়ঙ্গের মত লোকচক্ষের অন্তরাল ক'রে নালা কাটা আছে।
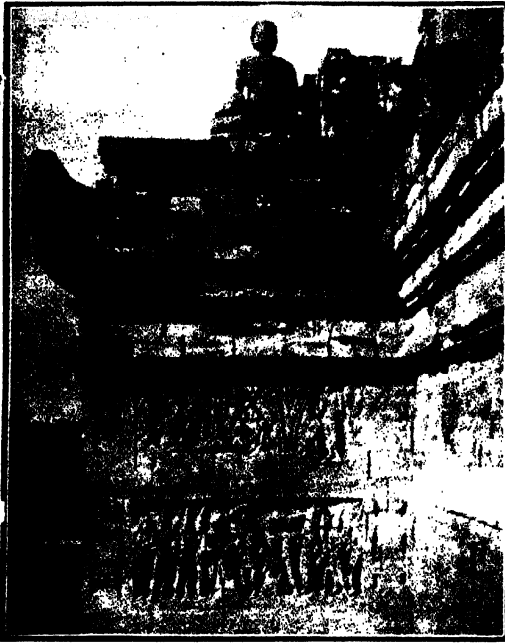
মন্দিরের একটি কোণ (একদিকে জলনিকাশের সিংহ মুখ নল দেখা যাচ্ছে)

নীচের প্রাচীর-বেষ্টিত চতুষ্কোণ স্তরগুলির উপরই মন্দির-চূড়ার শেষ তিনটি চক্রাকার স্তর গড়ে উঠেছে। এ তিনটি স্তরের কোনো প্রাচীর বেষ্টনী নেই। এর গঠন-পদ্ধতিও একেবারে ভিন্ন রূপ। মন্দির দর্শনার্থীদের এখানে আর গ্যালারীর মত ক্রমোচ্চ পথে ও শিলা-চিত্র-মণ্ডিত প্রাচীরের পাশে ঘুরে বেড়াতে হয় না। এখানে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে খোলা ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তারা সম্মুখের অসীম বিস্তৃত শ্যাম শোভা নিরীক্ষণ ক'রতে পারে, তাদের পশ্চাতে থাকে মন্দির চূড়ার মূল দেশ যার সর্ব্বোচ্চ স্তরটি মন্দিরের প্রধান অধিষ্ঠাতা দেবতার পূজা-গৃহ। সর্ব্ব শেষের এই তিনটি স্তরের ধারে ধারে সারি সারি শৃঙ্গ-চূড়াযুক্ত স্তুপের মত ছোট ছোট জালিকাটা গম্বুজ সাজানো আছে। এই গম্বুজগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। স্তুপ-গাত্রের মর্ম্মর-জালিকার ভিতর থেকে এ মূর্ত্তিগুলিকে আব্ছা আব্ছা দেখতে পাওয়া যায় যেন সেই মহাপুরুষের অসংখ্য ছায়া-মূর্ত্তির মত।

মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ স্তরে যেখানে প্রধান দেবমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল তা'র উপর একটি মাত্র ব্যোমমুখী দীর্ঘ ঋজু শৃঙ্গযুক্ত স্তুপাকার প্রকাণ্ড গম্বুজ ভিন্ন আর কিছু নেই। এখানে আর কোনো কারু-কার্য্যও খোদিত করা হয় নি। এখানে এসে মনে হয় যেন মানুষের সব কিছু কলাকৌশলের অতীত লোকে এসে পৌঁছেছি! এই চূড়ার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত ক'রলে বোঝা যায় এর মধ্যে দু'টি গর্ভগৃহ ছিল, একটির উপর আর একটি, কিন্তু এর মধ্যে যে দুটি মূর্ত্তি ছিল তা অপসারিত হ'য়েছে। দু'টি গর্ভগৃহই আজ শূন্য পড়ে রয়েছে। বিশেষজ্ঞেরা বহু গবেষণা করেও আজও স্থির ক'রতে পারেন নি যে সে কোন বুদ্ধমূর্ত্তি যা এই বিরাট মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় সংস্থাপিত হয়েছিল। অনেকে অনুমান করেন যে এখানে ছিল সেই আদি বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি যিনি সকল বুদ্ধের পূর্ব্বতন ও সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি সর্ব্বশক্তিমান ভগবান স্বরূপ, যিনি নিখিল বিশ্বের পরমেশ্বর!

আবার কোনো কোনো অভিজ্ঞের মতে স্থির হয়েছে যে সর্ব্বোচ্চ চূড়ার মধ্যে যে দু'টি গর্ভগৃহ রয়েছে তার নিম্নেরটিতে বহু মূল্যবান আধারে গৌতম বুদ্ধের ভস্মাবশেষ রক্ষিত ছিল এবং উপরেরটিতে তাঁর একটি মণিময় মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, সম্ভবতঃ বিদেশী দস্যুরা তা চুরি করে নিয়ে গেছে!

হিন্দুধর্ম্মকে নিস্তেজ করে যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম একদিন

প্রাধান্ত লাভ করেছিল বটে, কিন্তু, কালক্রমে যবদ্বীপে মুসল্মান আধিপত্য স্থাপিত হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মকে কোণ-ঠেসা করে ইস্‌লাম ধর্ম্মই সেখানে বড় হয়ে উঠেছিল। ফলে বৌদ্ধ মন্দির ও বিহারগুলি পরিত্যক্ত ও ভগ্নস্তূপে পরিণত হ'য়েছিল। অবশ্য পৌত্তলিকতার বিরোধী

তোরণ-দ্বার (সর্ব্বোচ্চ চূড়ার উপর শৃঙ্গ মন্দিরের প্রবেশ-পথে তোরণ-দ্বার)

মুসল্মানগণের আক্রমণে বহু বুদ্ধমূর্ত্তি সেখানে চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়েছিল বটে, কিন্তু দস্যু ও আনাড়ি প্রত্নতাত্ত্বিক-দের অত্যাচারে মন্দিরগুলির তার চেয়েও বেশী ক্ষতি হয়ে গেছে! যবদ্বীপ বর্ত্তমানে ওলান্দাজদের শাসনাধীনে আছে। সৌভাগ্য বশতঃ ওলান্দাজ শাসনকর্ত্তাদের দৃষ্টি বোরোবুদুর মন্দিরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁরা এ মন্দিরের মর্য্যাদা ও মূল্য বুঝতে পেরে বহু যত্নে এর সংস্কার ক'রেছেন। অনেক অনুসন্ধান ক'রে এই মন্দিরের বহু অপহৃত মূর্ত্তি পুনরুদ্ধার করেছেন এবং যথাস্থানে সেগুলির সন্নিবেশ করেছেন।

'বোরোবুদুর' মন্দিরের বিগ্রহ বা আত্মা আজ অন্তর্হিত হ'য়েছে বটে, কিন্তু এর বহু অলঙ্কৃত বিরাট দেহ আজও বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন ক'রছে! একে দেখলে মনে হয়--এ বুঝি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে রয়েছে, আজও প্রাণহীন হয়নি একেবারে। হয়ত এমন এক দিন আসবে যে-দিন এ তার দীর্ঘ সুপ্তি হ'তে জেগে উঠে বিশ্বের বন্দনায় পুনরায় মুখরিত হ'য়ে উঠবে! কবি ব'লেছেন—

"...পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,—
আবার তাহারে
আসিতে হবে এ তীর্থ দ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌন-কণ্ঠে যে বাণী রয়েছে চির স্থির
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র—"বুদ্ধের শরণ লইলাম!"

("বোরোবুদুর"—রবীন্দ্রনাথ)

বাঙ্গালার জমিদারবর্গ *

আচার্য্য সার শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

(৪)

বর্ত্তমান জমিদারদিগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ জমিদারির অর্জ্জন পুরুষকার দ্বারা সংঘটিত হয় নাই। মুসলমান রাজত্বের সময় যাঁহাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাঁহাদের কথা বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের নাম উল্লেখ করিতে হয়। স্রোতস্বিনী পদ্মার বিশাল জলরাশি যে বরেন্দ্রভূমির পাদদেশ প্রক্ষালিত করিতেছে, সেই বিস্তীর্ণ জনপদই রাজশাহী পরগণা। স্বনামধন্য রঘুনন্দন বাল্যে অতিশয় দরিদ্র ছিলেন; এবং পুঁটিয়ার ভূস্বামী দর্পনারায়ণের অনুগ্রহে পালিত হন। স্বীয় প্রতিভা এবং বুদ্ধিমত্তার বলে তিনি তৎকালীন মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলীর্খার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। এই মুর্শিদকুলীর্খা একজন দক্ষিণাপথবাসী ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন। পরে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার পারদর্শিতা দেখিয়া সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে বাঙ্গলার সুবাদার করিয়া পাঠান। নবাবী আমলে যদিও বিচার ও সামরিক বিভাগে মুসলমানগণের একাধিপত্য ছিল; কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় হিন্দুদিগের সাহায্য ভিন্ন চলিত না।— এই কারণে কানুনগো প্রভৃতি পদ অবলম্বন পূর্ব্বক অনেক হিন্দু দেওয়ানী পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতেন। রঘুনন্দন যথন মুর্শিদকুলীর্খার সুনজরে পতিত হইয়া এই গৌরবময় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তথন বাঙ্গলার জমিদার-দিগের নির্য্যাতনের ইতিহাস এক অপূর্ব্ব কাহিনী। বাকী কর আদায়ের জন্য জমিদারদিগের উপর উৎপীড়ন করিবার বহু প্রকার কৌশল উদ্ভাবন করা হইত। তন্মধ্যে ২ বৈকুণ্ঠে প্রেরণই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য।

এইরূপ অত্যাচারের পরও যদি রাজস্ব অনাদায় থাকিত তাহা হইলে জমিদারি একেবারে বাজেয়াপ্ত করা হইত; এবং তাহার পরে জমিদারকে কারারুদ্ধ করা হইত। রঘুনন্দন এই সুবর্ণ সুযোগে অনেক বিশাল জমিদারি তদীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন। বদ্‌নামের এবং লোকনিন্দার ভয়ে নিজ নামে কথনও সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিতেন না। এই প্রকারে অতি অল্প কাল মধ্যেই তিনি সমগ্র বাঙ্গলার এক-পঞ্চমাংশের মালিক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই অত্যুন্নতির ফলেই বাঙ্গলায় "রঘুনন্দনের বাড়" এই প্রবচনের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার নামের সঙ্গে এই প্রবাদ যদিও বাঞ্ছনীয় নহে, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই জমিদারির অর্জ্জনের মূলে সম্পূর্ণ সাধুতা ছিল না।

দীঘাপতিয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায় শৈশবে অতি দরিদ্র ছিলেন। তথনকার নাটোরের মহারাজা রামজীবন রায়ের সুনজরে পতিত হইয়া ইনি সৌভাগ্যবান হন। ভূষণার রাজা সীতারাম বিদ্রোহী হইলে এই দয়ারামই তাঁহাকে বন্দী করিয়া নাটোর রাজবাড়ীতে আনয়ন করেন এবং তাঁহার ধন

(২) বর্ত্তমান পাঠকগণের নিকট বৈকুণ্ঠের পরিচয় প্রয়োজন হইতে পারে। হিন্দুদিগকে উপহাসচ্ছলে পুতি-গন্ধময় বিষ্ঠার দ্বারা পরিপূর্ণ পুষ্করিণীকে বৈকুণ্ঠ নামে অভিহিত করা হইত।

* ভ্রম সংশোধন :—

বিগত কার্ত্তিক সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' বাঙ্গালার জমিদারবর্গ শীর্ষক প্রবন্ধে রাজসাহী কলেজ স্থাপনে যাঁহারা অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু ভুল ও ত্রুটি বশতঃ দুবলহাটী রাজবংশের কথার উল্লেখ করা হয় নাই। তাঁহারা এই কলেজ সংস্থাপনের জন্য বিপুল সম্পত্তি দান করিয়াছেন; এবং এখনও প্রতি বৎসর পাঁচ হাজার টাকা করিয়া জমির মুনফা বাবদ কলেজের উন্নতি কল্পে ব্যয়িত হয়। এতদ্‌বিধ নানা হিতকর অনুষ্ঠানে তাঁহারা অজস্র দান করিয়াছেন।

রত্নাদি লুণ্ঠন করেন। অদ্যাপি দীঘাপতিয়া রাজবাটীতে সীতারাম রায়ের গৃহবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণজীর পূজা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান মুক্তাগাছার আচার্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যও মুর্শিদকুলীখাঁর অনুগ্রহে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন।

এইবার ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল জমিদারের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাদের কথা বলিতেছি। কাশিমবাজার রাজবংশের আদিপুরুষ কান্তবাবুর নাম আজ বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বজনবিদিত।

ইংরাজ বণিকদিগের ব্যবসা সম্পর্কে কান্তবাবু ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সহিত সবিশেষ পরিচিত হন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই সময় কাশিমবাজার কুঠীতে একজন নিম্নতম কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৭৫৬ খৃঃ আলিবর্দ্দির মৃত্যুর পর সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের নবাব হইয়া ইংরাজের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হন, এবং অবিলম্বে কাশিমবাজার কুঠী আক্রমণ করেন। ইংরাজগণ বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইলেন। হেষ্টিংসও এই দলভুক্ত ছিলেন। কোন কৌশলে মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ কাশিমবাজারে আসিয়া কান্তবাবুর আশ্রয় লন। নবাবের রক্তচক্ষুকেও উপেক্ষা করিয়া কান্তবাবু তাঁহাকে আশ্রয় দানে সম্মত হন। পরে ১৭৭৩ খৃঃ যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস গভর্ণর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি এই কান্তবাবুর কথা ভুলিয়া যান নাই। নানা প্রকার অসদুপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অনেক লাভজনক জমিদারি প্রদান করেন, এবং সেই দিন হইতে কান্তবাবুর ভাগ্যের উন্মেষ হয়।

নশীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা দেবীসিংহ লর্ড ক্লাইভের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন এবং কলে-কৌশলে এই জমিদারি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। পাইকপাড়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও সেইরূপভাবে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অনুগ্রহে লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করেন। জমিদার-উৎপীড়নকারী ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার নাম বিজড়িত আছে।

ইদানীন্তন কালেও দেখা যায় যে অনেক জমিদারের মোক্তারগণ লাটের খাজনা দাখিল না করিয়া বেনামীতে সেই সম্পত্তি আবার ক্রয় করিয়া ভূস্বামী হইয়াছেন। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন বাঙ্গলাদেশে নিতান্ত বিরল নয়। ৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরে যখন কলিকাতায় জমিদারি নিলাম হইত, তখন এই বিশ্বাসঘাতকতার ও প্রবঞ্চনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন রকমে পিয়াদাদিগকে ঘুষ দিয়া নিলাম জারির পরওয়ানা গোপন করা হইত। সে সময় ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানে যাতায়াত করিতে ১০।১২ দিনের কম লাগিত না। সুতরাং যাঁহারা কলিকাতার বাসিন্দা ছিলেন, তাঁহারা অতি অল্প মূল্যেই অনেক বিশাল জমিদারি ক্রয় করিয়া ভূস্বামী হইয়াছেন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, বর্ত্তমান বাঙ্গলার অধিকাংশ জমিদারিই পুরুষকার দ্বারা অর্জ্জিত হয় নাই। অতি সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার মূলে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, অসাধুতা এবং বহুবিধ অন্যায়ের সমষ্টি অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। সে সকল কথার উল্লেখ করিয়া আমি জমিদারদিগের বংশমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে চাহি না। জমিদারি যে প্রকারেই অর্জ্জিত হউক না কেন, প্রজার প্রতি তাঁহাদের সত্যকার শুভেচ্ছাই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে জমিদারগণ যে কিরূপ অত্যাচারী ছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। সেই লোমহর্ষণ হৃদয়বিদারক অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া আমি আমার লেখনী কলুষিত করিতে চাহি না। তৎকালীন ইংলণ্ডের বাগ্মিপ্রবর মহামতি Burke পার্লামেণ্টের সদস্যগণের নিকট প্রজা উৎপীড়নের যে বিবরণ প্রদান করেন, তাহা হইতে সামান্য কিছু বলিতেছি। ৪ ইহা কখনও রাজস্ব সংগ্রহ নহে,

(৩) At first the Zemindaries were sold not in the districts to which they belonged but in Calcutta at the Office of the Board of Revenue. This gave rise to extensive frauds and intensified the rigours of the measure.—Economic Annals of Bengal by J. C. Sinha, Page 272.

(4) It was not a rigorous collection of revenue, it was a savage war against the country.

And here my Lords, began such a scene of cruelties and tortures, as I believe no history has ever presented to the indignation of the world, such as I am sure, in the most barbarous ages,

ইহা দেশের উপর অত্যাচারের তাণ্ডব লীলা। জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এইরূপ নৃশংসতার কাহিনী কদাচিৎ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পিতা ও পুত্রকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া যথেচ্ছ পীড়ন, নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার, ইত্যাদির দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করা হইত। Burke এর সেই জ্বালাময়ী ভাষা শ্রবণ করিলে দেহ রোমাঞ্চিত হয়। আমাদের দেশের অনেক অনেক বড় বড় জমিদারের পূর্ব্বপুরুষগণ ছিলেন এই উৎপীড়নের সহায়ক।

এইবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলিতেছি। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ লাভ করেন। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহারা রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, কারণ, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং বিশেষতঃ দেশবাসীর নিকট একেবারেই অপরিচিত। সেই জন্য রেজাখাঁ ও সীতাব রায় নামক দুইজন নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন এবং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় তাঁহাদের উপরেই অর্পিত ছিল। সেই বৎসরের মে মাসেই কোম্পানী স্বহস্তে এই দুরূহ ভার গ্রহণ করেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টা বিফল হওয়াতে, লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার জমিদারদিগের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারগণ ভূমির উন্নতিলব্ধকর লাভের অধিকারী কোন অজুহাতে রাজস্ব মাপ হইতে পারিবে না সত্য; কিন্তু তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে যে হারে খাজনা আদায় করুন না কেন, সব তাঁহাদেরই প্রাপ্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কিন্তু এই উপদেশ দেওয়া আছে যে, ৫ জমিদারবর্গ প্রজাদিগের সুখ, সুবিধা ও উন্নতি বিধানে সর্ব্বদাই যত্নবান থাকিবেন।

কিন্তু এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপব্যবহার হইতে লাগিল। কৃষির উন্নতি বিধান ও জমির উৎকর্ষ সাধন না করিয়া জমিদারগণ নানারূপ বাজে আদায়ে প্রজাদিগকে বিব্রত করিতে লাগিলেন। তাহাতে বাঙ্গলার প্রজাবর্গ দিন দিন নিঃস্ব হইতে লাগিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে James Mill পারলামেণ্টের House of Commons এর সম্মুখে সাক্ষ্য দেন যে ৬ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনেক স্থলে প্রজাদিগের দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছে। জমিদারদিগের নিকট তাহারা ক্রীড়পুত্তলিবৎ; এবং তাহাদের নিকট হইতে যথেচ্ছা শোষণ করা হইত। ধনী জমিদারগণের অধিকাংশই কলিকাতাবাসী বলিয়া জমিদার ও প্রজার মধ্যে কোন সংশ্রব ছিল না।

এইরূপ অত্যাচার হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপন বঙ্গদেশীয় প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনের ফলে জমিদারদিগের ক্ষমতা অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছে এবং প্রজাদিগের অধিকার কতকটা রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত প্রথানুসারে এখনও অনেক স্থানে প্রজা জমি হস্তান্তর করিতে পারে না।

---

no political tyranny, no fanatic persecution has ever exceeded.

The punishments inflicted upon the Ryots both of Rungpore and Dinagepore for non-payment, were in many instances of such a nature, that I would rather wish to draw a veil over them than shock your feelings by the detail.

Children were scourged almost to death in the presence of their parents. This was not enough. The son and father were bound close together, face to face, and body to body and in that situation cruelly lashed together, so that the blow, which escaped the father, fell upon the son, and the blow which missed by the son, wound over the back of the parent.

—Burke's Impeachment

(৫) The proclamation regarding the permanent settlement was couched in the language of distinct declaration as regards the rights of the Zeminders but in language of trust and expectation as regards any definition of their duties towards the ryots.

Land System in Bengal
By K. C. Chowdhary, Page 35

(৬) I believe that in practice the effect of the permanent settlement has been most injurious the ryots are mere tenants at-will of the Zeminders in the permanently settled provinces. The Zeminders take from them all that they can get, in short they exact whatever they please.

* * * * * * *

I believe a very considerable portion of the Zeminders are non-resident. they are rich natives who live in Calcutta.

বর্ত্তমানে বাঙ্গলাদেশে যদিও তাদৃশ উৎপীড়ন নাই, তথাপি, আমি এ কথা বলিতে কখনও কুণ্ঠিত হইব না যে, জমিদারবর্গ দুস্থ প্রজাগণের নিকট হইতে তাহাদের বুকের রক্তস্বরূপ যে কর আদায় করেন, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা কিছুই প্রতিদান দিতে পারেন নাই। ১৯১২ সালে খুলনায় একটী কৃষি-প্রদর্শনী হয়। তত্রস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. Hart কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় যাই। খুলনার জমিদার রাজা হৃষীকেশ লাহা, মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও বোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া যান। আমি সভাস্থলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, যে জমিদার বৎসরে অন্যূন তিন মাস কাল প্রজাবর্গের মধ্যে অবস্থিতি না করেন এবং তাহাদের দুঃখ কষ্টের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করেন, তাঁহার জমিদারি বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত।

বাঙ্গলার জমিদারবর্গের উপর দেশের ও দশের উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে তাঁহারা এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। বাঙ্গলাদেশের কৃষিজীবী আজও অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তদুপরি ঋণগ্রস্ত হইয়া তাহাদের জীবনযাত্রা অধিকতর দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। পরনে কাপড় নাই, দুবেলা অন্ন জোটে না; কিন্তু আজও তাহাদের ভূস্বামিগণের বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব দিয়া রিক্ত হইয়া গৃহে ফিরিতেছে। আর সেই নিরন্ন প্রজাগণের শোণিত স্বরূপ অর্থবল তাঁহারা নানারূপ বদ্‌খেয়ালে অকাতরে নিঃশেষ করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, কয়জন জমিদার তাঁর বিশাল জমিদারির প্রাঙ্গণে কয়টী নিম্নপ্রাইমারী বা উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন? কয়টী পানীয় জলের পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন? আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, সুন্দরবন অঞ্চলের প্রজাবৃন্দ নিদারুণ গ্রীষ্মে নৌকাযোগে ৮।১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পানীয় জল লইতে আসিয়া থাকে। আর সেইখানকারই ভূস্বামী কলিকাতায় বসিয়া পঞ্চাশ সহস্র বা লক্ষাধিক মুদ্রা সেই জমিদারির মুনফা বাবদ ভোগ করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, এক একটী বিবাহে ৬০।৭০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার বিশাল সৌধকে আলোক-মালায় বিভূষিত করিতেছেন। ইহার অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, "বসুন্ধরা কাহারও নহে ভূম্যধিকারিগণ তাহা বণ্টন করিয়া লওয়াতে তাহা কিছু বলিতে হইল। যতক্ষণ জমিদারবাবু সাড়ে সাতমহল পুরীর মধ্যে রঙ্গিন সার্সী প্রেরিত স্নিগ্ধালোকে স্ত্রীকন্যার গৌরকান্তির উপর হীরকদামের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণ পরাণ মণ্ডল, পুত্র সহিত দুইপ্রহর রৌদ্রে, খালি মাথায় খালি পায়, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্ম বিশিষ্ট বলদে ভোতা হালে তাঁহার ভোগের জন্য চাষকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র সাতক্ষীরা খুলনা বারুইপুর প্রভৃতি মহাকুমায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর ছিলেন। সুতরাং তাঁহার এই উক্তি কখনও কল্পনা-প্রসূত উচ্ছ্বাস নহে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভীষণ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঙ্গলার কৃষিজীবী আজও যে তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে ইহাই বিধাতার আশীর্ব্বাদ। আগামী প্রবন্ধে এই বিষয়ে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। [১]

---

(১) শ্রীমান অরবিন্দ সরদার কর্ত্তৃক অনূদিত।
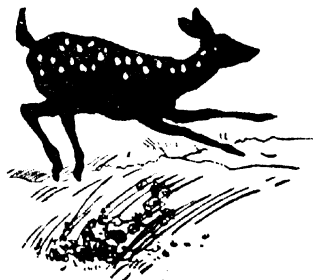
লর্ড সিংহ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

মোগল বাদশাহদিগের আমলে মহারাজা মানসিংহ, রাজা টোডরমল প্রভৃতি কয়েকজন বিজিত ভারতবাসী হিন্দু প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন,—সেকালে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদ বিজিতের পক্ষেও নিতান্ত দুর্লভ ছিল না। কিন্তু ইংরেজের আমলে সর্ব্বপ্রথম যে ভারতবাসী প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি লর্ড সিংহ—বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর বড় আদরের লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ অব রায়পুর। সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের বিলাতী অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া লর্ড উপাধি লাভও বাঙ্গলার তথা ভারতের সামাজিক ইতিহাসে সামান্য ঘটনা নহে।

বীরভূম জেলায় রায়পুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামখানি পূর্ব্বে নগণ্য ছিল,—এক্ষণে যাঁহার দৌলতে বিশ্বখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, সন ১২৬৯ সালের ১২ই চৈত্র (ইংরেজী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৪এ মার্চ্চ) সেই গ্রামে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল তাঁহার গ্রামেই অতিবাহিত হইয়াছিল। উপযুক্ত বয়সে তিনি বীরভূম জেলাস্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সেই স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। দুই বৎসর পরে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর আর তাঁহার কলিকাতায় পড়া হয় নাই—তিনি ভ্রাতা নরেন্দ্রপ্রসন্নের (উত্তরকালে সুপ্রসিদ্ধ মেজর এন, পি, সিংহ আই-এম-এসের) সহিত বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে তিনি আইন অধ্যয়নের জন্য Lincoln's Innএ ভর্ত্তি হন। আইন অধ্যয়নে কৃতিত্বের জন্য তিনি বহু পুরস্কার লাভ করেন এবং অধ্যয়ন শেষে ৫৫০ গিনি উপহার প্রাপ্ত হন। প্রশংসার সহিত ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার ভ্রাতা নরেন্দ্রপ্রসন্নও সেই বৎসর আই-এম-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পর, অন্যান্য জুনিয়ার ব্যারিষ্টারের ন্যায় সত্যেন্দ্রপ্রসন্নেরও প্রথম প্রথম পসার জমে নাই। সেইজন্য কিছুদিন তাঁহাকে বিষয়ান্তরে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি সিটি কলেজের আইন শ্রেণীতে অধ্যাপকতা করিতেন এবং পাইকপাড়ার রাজবংশের আইনের পরামর্শদাতার কার্য্য করিতেন।

কিন্তু প্রতিভা কখনও অনাদৃত থাকে না। কিছু কাল সামান্য সামান্য দুই চারিটি মোকদ্দমায় কাজ করিবার পর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইল—তাঁহার গভীর আইন-জ্ঞান এবং মোকদ্দমা পরিচালনের ক্ষমতা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। Farr নামক একজন ইয়োরোপীয়ান এটর্ণি একটি মামলায় অন্যতম সাক্ষী ছিলেন, এবং মিঃ সিংহ ছিলেন অপর পক্ষের ব্যারিষ্টার। মিঃ ফার আইনজ্ঞ ব্যক্তি। সিংহ মহাশয় এরূপ ব্যক্তিকে এমন দক্ষতা সহকারে জেরা করেন যে, অন্যান্য আইন ব্যবসায়ীগণ এবং জনসাধারণ সকলেই বিস্ময়াভিভূত হন। এই এক মোকদ্দমাতেই তিনি খ্যাতি লাভ করেন। ইহার পর হইতে বড় বড় মামলায় লোকে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে, এবং তাঁহার ব্যবসায় প্রসারতা লাভ করে। ক্রমে তাঁহার পসার প্রতিপত্তি এত বৃদ্ধি পায় যে গবর্ণমেণ্ট ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে Standing Counselএর পদে নিযুক্ত করেন। দুই বৎসর এই কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার পর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সাত মাসের জন্য তিনি অস্থায়ী ভাবে Advocate Generalএর পদে নিযুক্ত হন। ইহারও দুই বৎসর পরে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি দ্বিতীয়বার ঐ পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু তিন মাস পরেই তাঁহাকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়।

সরকার তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় এতই সন্তোষ লাভ

করেন যে, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারত গবর্ণমেন্টের Executive Councilএ ব্যবস্থা সচিব (Law Member) এর আসন শূন্য হইলে তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিন্টো সিংহ মহাশয়কে এই পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড মর্লে তাহাতে সম্মত হন। ভারতসম্রাটও এই নিয়োগের অনুমোদন করেন। তদনুসারে ১৯০৯ সালের ২৩এ মার্চ্চ এই নিয়োগের সংবাদ সরকারী গেজেটে ঘোষিত হয়। ভারতবাসীদের মধ্যে সিংহ মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম এই পদ লাভ করিলেন। ১৭ই এপ্রেল তিনি যখন নূতন পদের কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তখন তোপধ্বনি করিয়া এই সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছিল। এক বৎসর এই পদে কার্য্য করিবার পর তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

ইহার পর তিনি আবার কলিকাতা হাইকোর্টে পূর্ব্ববৎ ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় করিতে থাকেন। অর্থ ও সম্মান প্রচুর পরিমাণেই তাঁহার অধিগত হইতে থাকে। ইহার উপর রাজ-সম্মানও তাঁহার লাভ হইতে লাগিল—১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী নববর্ষের উপাধি বিতরণ উপলক্ষে তিনি নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইয়া স্যার হইলেন।

জনসাধারণও তাঁহার যোগ্যতার উপযুক্ত সম্মান দানে কৃপণতা করে নাই—১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের ছুটীতে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) যে অধিবেশন হয়, স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, এবং অতিশয় দক্ষতার সহিত এই গুরুভার কর্ত্তব্য পালন করেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আর একবার তিনি অস্থায়ীভাবে Advocate Generalএর পদে কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হয়। যুদ্ধকার্য্য সুপরিচালনের জন্য যে War Council গঠিত হয়, ভারতবর্ষ হইতে তাহাতে কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। তদনুসারে ভারত গবর্ণমেণ্ট স্যার জেমস মেষ্টন ও বিকানীয়ের মহারাজের সহিত স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়কেও বিলাতে প্রেরণ করেন।

কিছু দিন পরে স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের শাসন পরিষদের (Executive Council) অন্যতম সদস্য পদে নিযুক্ত করেন।

ইয়োরোপীয় মহাসমর শেষ হইলে সন্ধির কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়। এই Peace Conferenceএ যোগ দিবার জন্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রতিনিধির সহিত স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্নও সদস্যরূপে পুনরায় ইয়োরোপে গমন করেন। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন যখন বিলাতে গমন করেন তখন তাঁহাকে পুরুষানুক্রমে লর্ড উপাধি দিয়া বিলাতী অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া চূড়ান্ত রূপে সম্মানিত করা হয়। এই সময়ে তিনি ভারতসচিবের আপিসে অন্যতম সহকারীর পদে নিযুক্ত হন এবং পার্লামেণ্টারী আণ্ডার সেক্রেটারী রূপে লর্ড সভায় আসন গ্রহণ করেন। এই উপাধি ও এই পদও ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রাপ্ত হন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের জন্য নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রণীত হয়। ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু এবং ভারতের বড়লাট লর্ড মিন্টো একত্র হইয়া এই শাসনবিধি প্রণয়ন করেন বলিয়া উহা মণ্টফোর্ড স্কীম নামে পরিচিত হয়। এই আইন বিলাতী পার্লামেণ্টে দশ বৎসরের জন্য বিধিবদ্ধ হইলে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে উহার কার্য্য আরম্ভ হয়। এই আইন অনুসারে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ এক একজন গবর্ণরের শাসনাধীন হয়, এবং লর্ড সিংহ বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর নিযুক্ত হন। ভারতবাসীদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই পদ প্রাপ্ত হইলেন। (কিছুকাল পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' 'প্রথম বাঙ্গালী' শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধে এই বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা হইয়া গিয়াছে।)

কিন্তু লর্ড সিংহ দীর্ঘকাল এই সম্মান উপভোগ করিতে পারেন নাই—অচির কাল মধ্যে তিনি শিরোঘূর্ণন রোগে আক্রান্ত হইয়া পর বৎসর অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

ইহার পর হইতে শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তিনি সাধারণের কার্য্যে আর বেশী যোগ দিতে পারিতেন না। সন ১৩৩৪ সালের ২০এ ফাল্গুন (১৯২৮ খৃষ্টাব্দের) ৪ঠা মার্চ্চ রবিবার তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের কর্ম্মস্থান বহরমপুরে অকস্মাৎ হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার দেহাবসান হয়। তাঁহার মৃতদেহ মহাসমারোহে কলিকাতায় আনয়ন পূর্ব্বক সৎকার করা হয়।

ভূমিকম্প

গত ১লা মাঘ তারিখে অপরাহ্নে ভূমিকম্পে এ দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, ঐতিহাসিক যুগে তাহার তুলনা নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে যে এ দেশে ভূমিকম্প হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু সে সকল, বোধ হয়, ইহার তুলনায় উপেক্ষনীয়। কয় বৎসর পূর্ব্বে জাপানে যে বিষম ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এ দেশে ভূমিকম্পে বাঙ্গালার উত্তরাংশের ও আসামের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

পুসা-ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রাঙ্গণ বিদীর্ণ হইয়া জল ও বালুকা উঠিতেছে

(আলোকচিত্র-গ্রহীতা—শ্রীসুরেশ ঘোষাল)

বহুদিন পর্য্যন্ত ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর প্রভাতে পোর্টুগালের রাজধানী লিসবন সহরে ভূমিকম্পজনিত ক্ষতির বিবরণই লোকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করিত। আজও লিসবন সহর সেই ক্ষতের সব চিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। সে দিন "অল সেণ্টস ডে"—পর্ব্ব, গির্জ্জাগুলি উপাসনারত নরনারীতে পূর্ণ। প্রস্তর-নির্ম্মিত বিরাট গির্জ্জাগুলির পতনেই প্রায় ৩০ হাজার লোকের প্রাণবিয়োগ হয়। অনুমান—৬০ হাজার লোক এই আকস্মিক প্রাকৃতিক উপদ্রবে প্রাণ হারাইয়াছিল। যাহারা অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল, তাহারা প্রাণরক্ষার চেষ্টায় ব্যবসাপ্রধান সহরের নব-নির্ম্মিত মর্ম্মরপোতাশ্রয়-বেদীর উপর সমবেত হয়। তখন সহরের নিকটস্থ পর্ব্বত-গুলি হইতে বিস্তৃত প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া পড়িতেছে—বিদীর্ণ পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া আকাশ চুম্বন করিতেছে। সমুদ্রের জল কমিয়া গেল—নদীর মুখে চড়া দেখা গেল; তাহার পর জলরাশি প্রায় ৫০ ফিট উচ্চ হইয়া ফেনপুঞ্জচূড় অবস্থায় আসিয়া সহর প্লাবিত করিল—পোতাশ্রয়-বেদীর চিহ্নমাত্র রহিল না।

শিলঙ গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদ—ভূমি কম্পের পূর্ব্বে (১৮৯৭)

শিলঙ গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদ—ভূমিকম্পের পর (১৮৯৭)

শিলঙ গির্জ্জা—ভূমিকম্পের পূর্ব্বে (১৮৯৭)
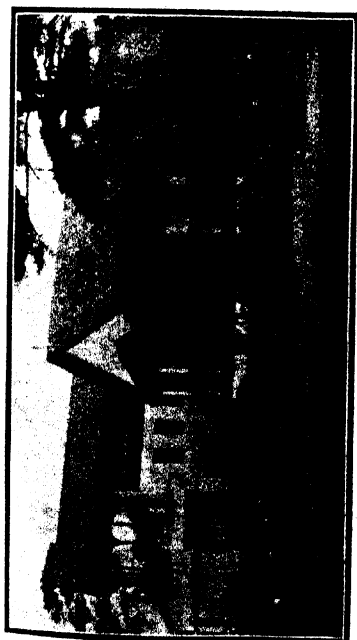
শিলঙ গির্জ্জা—ভূমিকম্পের পর (১৮৯৭)

তাহার পর এ দেশের লোকের অভিজ্ঞতায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে সংঘটিত ভূমিকম্প প্রবল বলিয়া বিবেচিত হয়। জিয়লজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টার মিষ্টার ওল্ডহাম ইহাকে লিসবনের ভূমিকম্পের সহিত তুলিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ব্যাপ্তিতে

পুষা-ইন্‌ষ্টিটিউটের ডেয়ারী কম্পাউণ্ডে একটি ফাটল। ইহার এক পার্শ্ব এক ফুটের বেশী বসিয়া গিয়াছে

[আলোকচিত্র—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল]

ইহাকেই প্রাধান্য প্রদান করিতে হয়। যে ভূখণ্ডে ইহা অনুভূত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্ব-সীমা—আসাম ও ব্রহ্ম এবং পশ্চিম-সীমা—সিমলা। দক্ষিণ দিকে মাদ্রাজ মসলী-পট্টমে এবং উত্তরে নেপালেও ইহার কম্পন অনুভূত হইয়াছিল। সে দিন মহরম শেষ হইয়াছে। অপরাহ্নে নাটোর নগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন

সেণ্টজোসেফ্‌স কনভেণ্ট অরফ্যানেজ—পাটনা

[আলোকচিত্র—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বোস]

মজঃফরপুরের প্রধান বাজার

হইতেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার সভাপতি; মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

বাঙ্গালার বহু মনীষী নাটোরে সমবেত। সহসা ভূমিকম্প আরম্ভ হয়। সেই ভূমিকম্পে কলিকাতারও ক্ষতি অনুভূত হইল। উত্তর-বঙ্গ ভূমিকম্প-প্রবণ; কিন্তু তথায় হইয়াছিল।

মজঃফরপুরে একটি ভগ্ন গৃহের স্তূপের নিম্নে এখনও বহু মৃতদেহ প্রোথিত রহিয়াছে

[আলোকচিত্র—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল]

কেহই পূর্ব্বে এমন প্রবল কম্পন দেখেন নাই। নানা স্থানে ভূমি ফাটিয়া গেল—ভূগর্ভ হইতে ধূম উত্থিত হইতে লাগিল। গৃহ ভূমিসাৎ হইতে লাগিল। লোকের আর্ত্ত চীৎকার গগন পূর্ণ করিতে লাগিল—তাহাদিগের চীৎকারে ভূগর্ভ হইতে উত্থিত রব ডুবিয়া গেল। আসামে ক্ষতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। কৌতূহলী পাঠক আসামের তৎকালীন চীফ কমিশনার সার হেনরী কটনের স্মৃতি-পুস্তকে আসামে ভূমিকম্পের বর্ণনা পাঠ করিতে পারেন। চীফ কমিশনারের প্রাসাদ ভগ্নস্তূপে পরিণত হয় এবং তাঁহাকে সপরিবারে অপরের প্রদত্ত আহার্য্যে সে দিন উদরপূর্ত্তি করিতে হয়। ভূমিকম্পের পরই প্রবল বৃষ্টিপাত

এ বার ভূমিকম্পে বিহারের ত্রিহুত অঞ্চলের সর্ব্বনাশ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নেপালেরও ক্ষতি

রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী দৃশ্য—পাটনা

[আলোক-চিত্র—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বোস]

সামান্য হয় নাই। বিহারের জনবহুল বহু সহর আজ কেবল ভগ্নস্তূপ। সে সকলের মধ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মুঙ্গের ও পাটনা ব্যতীত মজঃফরপুর, দ্বারবঙ্গ, মতিহারী,

ভগ্ন স্তূপের নিম্নে জিনিস পত্রের সন্ধান করিতেছে—মজঃফরপুর [আলোকচিত্র—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল]

প্রভৃতি সহর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোথায় ধন ও প্রাণনাশ কিরূপ হইয়াছে, আজও তাহার পরিমাণ পরি-

জামালপুরের বাজার

মাপ করা যায় নাই—কখনও তাহার পরিমাপ সম্পূর্ণ হইবে কি না, বলিতে পারা যায় না।

বৌদ্ধ যুগের প্রসিদ্ধ নগর পাটলীপুত্র তাহার পূর্ব্ব-গৌরব ও সমৃদ্ধি হারাইলেও নিশ্চিহ্ন হয় নাই। রূপান্তরিত পাটনা মুসলমান শাসনেও বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব-নাজিমের সহকারীর শাসনকেন্দ্র ছিল। বিহারকে বাঙ্গালার অঙ্গচ্যুত করিয়া নূতন প্রদেশ গঠন করিয়া ইংরাজ পাটনাতে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের রাজধানী করিয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গে তথায় লাট প্রাসাদ, হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ, লাট-দপ্তর প্রভৃতি বহু ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। আজ পাটনার দুর্দ্দশা দেখিলে দুঃখ হয়। ভূমিকম্পে অধিকাংশ গৃহই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে—কতকগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

কিন্তু পাটনায় নিহতের সংখ্যা যেমন মুঙ্গেরে নিহতের সংখ্যার তুলনায় তুচ্ছ, সম্পত্তি নাশের পরিমাণও তেমনই মুঙ্গেরে সম্পত্তি নাশের তুলনায় অল্প। মুঙ্গেরও পুরাতন সহর। কিম্বদন্তী ইহার নামোৎপত্তির সহিত প্রাচীন

হিন্দু যুগের স্মৃতি জড়িত করে। রাজা দেবপালের সৈনিক-বাহিনী এই স্থানে নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া দিগ্বিজয়ে গিয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহা বক্তিয়ার খিলজি

মজঃফরপুরের একটি বাজার [আলোকচিত্র—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল]

কর্ত্তৃক বিজিত হয়। তদবধি মুঙ্গেরের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আকবরের রাজত্বকালে টোডর মল্ল বহু দিন মুঙ্গেরে বাস করেন। সামরিক কেন্দ্ররূপে মুঙ্গেরের প্রয়োজনহেতু তিনি মুঙ্গেরের দুর্গ সংস্কৃত ও পুরপ্রাচীর পুনর্গঠিত করেন। শাহ সুজার পর বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন মুসলমান নবাব মীর কাশিম ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় মুঙ্গের হইতে রণসজ্জা করেন। কেহ কেহ বলেন, ইংরাজের সাহায্যকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়া মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ মহাজন জগৎশেঠ দ্বয়কে এই মুঙ্গের দুর্গ হইতে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত করা হয়। তৎকাল-প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে দুর্গ বলিতে দুর্গ ও দুর্গবেষ্টন নগর বুঝাইত—তাহা প্রাচীর-বেষ্টিত হইত। আজ এই দুর্গের মধ্যে মাত্র দুই তিনটি গৃহ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, আর সব গিয়াছে। দুর্গে ও দুর্গ-বাহিরে কত লোক ভগ্নস্তূপমধ্যে সেই দিনই প্রাণ হারাইয়াছিল এবং তাহার পর তথায় কত লোক প্রাণ হারাইয়াছে তাহা স্থির করা দুষ্কর। তবে নিহত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা যে সহরের অধিবাসিসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হইবে, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। মুঙ্গের, বোধ হয়, আর পুনর্গঠিত হইবে না।
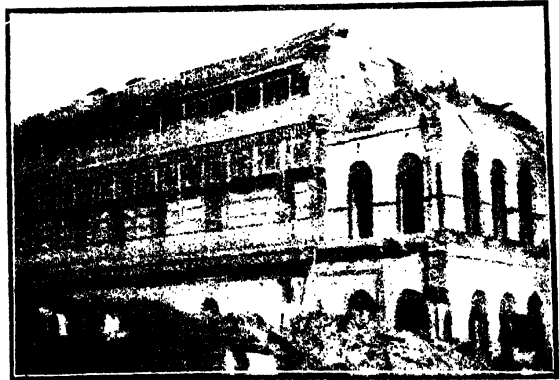
কেদারনাথ গোয়েঙ্কার আবাস—মুঙ্গের

মুঙ্গেরের নিকটে জামালপুরে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের বিরাট কারখানা। সেই কারখানাকে বেষ্টিত করিয়া সহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। জামালপুরেও ধ্বংস সাধারণ হয় নাই।

মুঙ্গেরের যে দুর্দ্দশা—মজঃফরপুরেরও তাহাই। ঘটনার পর দুই দিন যাইলে তবে—এরোপ্লেন পাঠাইয়া—মজঃফরপুরের সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছিল। মজঃফরপুরের একটি ঘটনায় বিপদের আভাস পাওয়া যাইবে। ভূমিকম্পের সময় সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা—'ভারতবর্ষের' পাঠক-পাঠিকার নিকট সুপরিচিতা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী যখন পৌত্রীকে লইয়া গৃহত্যাগ করিতেছিলেন, তখন গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাঁহারা ভগ্ন স্তূপের নিম্নে পতিত হয়েন। বহু কষ্টে তাঁহাদিগের উদ্ধার সাধন হয়। তাঁহার পৌত্রীর জীবন নাশ হইয়াছে। তিনি আঘাতে কাতর—এখনও উত্থানশক্তি রহিত।

একটি ইয়োরোপীয়ের বাসগৃহ। ভগ্ন স্তূপ পরিষ্কার করা হইতেছে

দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজের প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

ঘটনার ছয় দিন পরে নেপাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কাটমুণ্ড সহর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। নেপাল দরবারের অমূল্য পুস্তক-সংগ্রহ নিরাপদ কি না, এখনও জানা যায় নাই।

সরকার পক্ষের বিবৃতিতে প্রকাশ—

(১) একটি সহরেই সরকারী গৃহের ক্ষতির পরিমাণ—প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা।

(২) জামালপুরে ক্ষতির পরিমাণ—৫০ লক্ষ টাকা।

(৩) যে সব স্থানে ভূমিকম্পের প্রবল প্রকোপ অনুভূত হইয়াছিল, সে সব স্থানে কোথাও কোথাও ভূগর্ভ হইতে ধূসর বর্ণের কর্দ্দম ও বালু উত্থিত হইয়াছে। ইহাতে যে ভূমির উর্ব্বরতা ক্ষুণ্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।
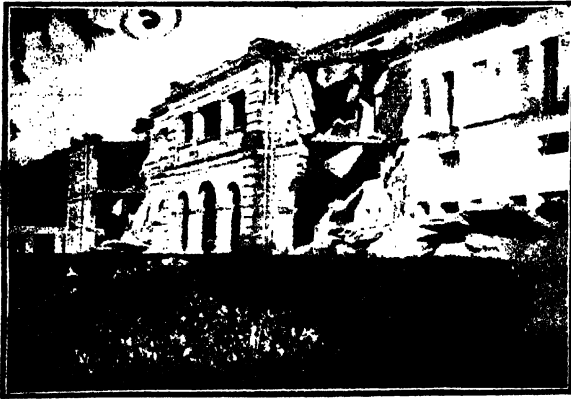
পাটনা মেডিক্যাল কলেজ—নার্সদিগের বাসা

[আলোকচিত্র—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বোস]

এই বিপদে নানা স্থান হইতে সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন ও সাহায্যার্থ অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন। ফ্রান্স হইতে অর্থ সাহায্য আসিয়াছে। বড়লাট যে তহবিল খুলিয়াছেন, তাহাতে অনেকে সাহায্য প্রদান করিতেছেন। তদ্ভিন্ন কলিকাতা ও অন্য নানা স্থানে নানা সাহায্য-সংগ্রহ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উত্তর-বঙ্গে প্লাবনপীড়ন কালে যিনি লোককে সাহায্য-দানে অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, সেই দেশমান্য আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন।

যাহারা এই অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত বিপদে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহাদিগের জন্য যেন শোক করিবার সময়ও

নাই। যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদিগের প্রতি কর্ত্তব্যই অসাধারণ। তাহাদিগকে আহার্য্য ও আশ্রয় এবং দুরন্ত-

কম্প হইলে অস্বাস্থ্যকর অবস্থারও উদ্ভব হয়। এ অনুমান প্রামাণ্য কি না এখনও স্থির হয় নাই।
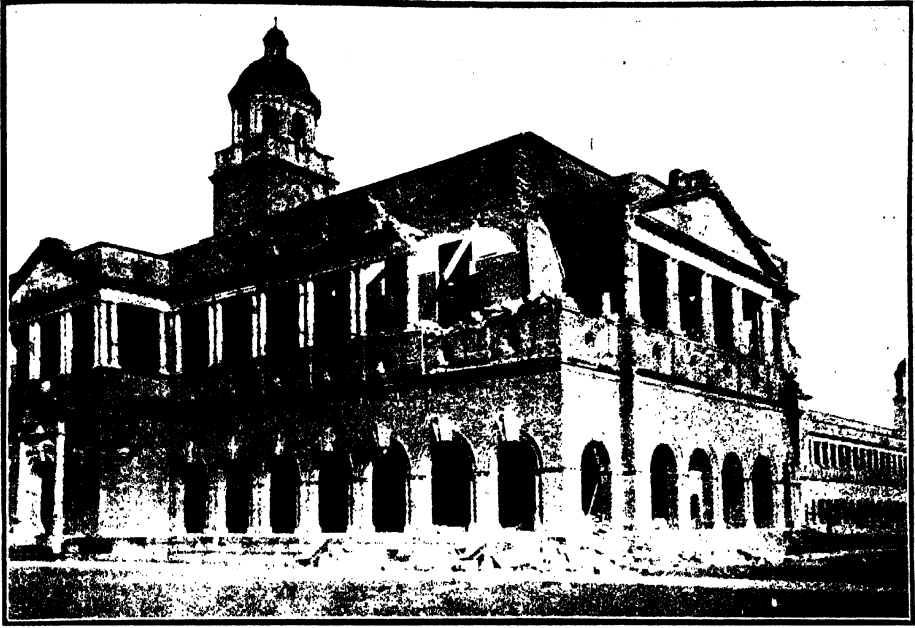
পুষা ইনষ্টিটিউটের একটি ভগ্ন অংশ। এইখানে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ রক্ষিত আছে

[আলোক চিত্র—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল]

শীতে আচ্ছাদন দিতে হইবে। তাহার পর তাহাদিগকে পুনরায় গঠনে সাহায্য করিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বে সার হেনরী কটনের ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পের বর্ণনায় উল্লেখ করিয়াছি। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন —ভূমিকম্পে আসামে যত লোকের মৃত্যু হয়, ভূমিকম্পের ফলে উদ্ভূত ব্যাধিতে তদপেক্ষা অনেক অধিক লোক প্রাণ হারায়। ভূমিকম্পে শিলং সহরে কয়দিন পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা নষ্ট হইয়াছিল। তথায় কলেরা, রক্তামাশয় ও জ্বরে শত শত লোক প্রাণ হারাইয়াছিল। তিনি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে হয়—ভূমি-

রাজা রঘুনন্দনের প্রাসাদের একাংশ—মুঙ্গের

এখন কর্ত্তব্য—পুনর্গঠন।

সরকার এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন; সভ্য

সরকারের কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। দেশের লোকও এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। বিহারের বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ প্রমুখ অসহযোগী নেতারা সরকারের সহিত এ কার্য্যে সাগ্রহে সহযোগ করিতেছেন।

গঠনকার্য্যে জাপানের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। বিহারের চম্পারণ, মজঃফরপুর, দ্বারবঙ্গ জিলাত্রয়ে এবং মুঙ্গের সহরে ও তাহার উপকণ্ঠে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা জাপানের ক্ষতির সহিতই তুলিত হইতে পারে। দুর্ঘটনার পরই জাপান পুনর্গঠনের কিন্তু তাহার পর হইতে যে ভাবে কাজ চলিতেছে, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়।

আজ প্রয়োজন—অর্থের ও কর্ম্মীর।

যাঁহাদিগের অর্থ আছে, তাঁহাদিগকে অর্থ দান করিতে হইবে; যাঁহারা সমর্থ তাঁহাদিগকে কর্ম্মীর শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। সহানুভূতির প্রয়োজন অর্থের প্রয়োজন অপেক্ষা অল্প নহে।

আজ বাঙ্গালার যুবকদিগেরও পরীক্ষা। তাঁহারা বার বার সেবাব্রতে আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন

মজঃফরপুরের এক কাপড়ের দোকান। এই ভগ্ন স্তূপের নিম্নে কয়েকজন ক্রেতাও চাপা পড়িয়াছে

[আলোকচিত্র— শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল]

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং প্রায় ছয় কোটি টাকা ব্যয়ে যথাসম্ভব অল্পকালমধ্যে পুনর্গঠনের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। কি উপায়ে জাপান এই কার্য্য করিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

আকস্মিক বিপদে বিহার সরকার যে প্রথমে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। হয় ত তাহাও সাহায্য দানকার্য্যে বিলম্বের অন্যতম কারণ। করিয়াছেন। আজ আবার তাঁহাদিগকে প্রতিপন্ন করিতে হইবে, নেতৃত্বে তাঁহাদিগের অধিকার সন্দেহ হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। যখন বাঙ্গলার গোমুখী হইতে স্বদেশী আন্দোলনের পাবনী ধারা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষের উদ্ধার-সাধন করিয়াছিল, তখনই—স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীদিগের উপদেশ-নিয়ন্ত্রিত বাঙ্গালী সেবাব্রতে অবহিত হইয়াছিল। অর্দ্ধোদয় যোগ

যাহারা এই ভাণ্ডারের অর্থ-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিবেন, তাঁহারা দাতার প্রদত্ত তালিকায় অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ও যোগ করিতে পারিবেন। বৃত্তিপ্রার্থী এ দেশের কোন—বিশেষ কলিকাতার—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানে বা এঞ্জিনিয়ারিংএ উপাধিধারী হইলেই ভাল হয়।

কোন বিদ্যার্থী যদি শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া স্বয়ং "লালচাঁদ মুখোপাধ্যায় ভাণ্ডার" পুষ্ট করিবার জন্য তাহাতে অর্থ প্রদান করেন, তবে ভাণ্ডারের পরিচালক সমিতি তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বৃত্তি কেবল বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষার্থীকে প্রদান করা হইবে।

গত ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট এই দান গ্রহণ করিবার জন্য সিনেটের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেন।

পিতার নামে বৃত্তি প্রদান জন্য এই ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করিয়া এক বৎসর পরে ডাক্তার হরেন্দ্রকুমার তাঁহার পরলোকগতা জননী প্রসন্নময়ী দেবীর নামে শিক্ষাবিস্তারার্থ ১ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন। যাহাতে প্রথম বৃত্তি পাইয়া শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া শিক্ষার্থী তাহার অধীত বিদ্যার সম্যক সদ্ব্যবহার করিতে পারে, তাহার উপায় করিবার জন্য এই দ্বিতীয় দান কল্পিত। পণ্যবিক্রয়, ব্যবসার জন্য আবশ্যক অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি শিক্ষা করিবার জন্য ছাত্রদিগকে এই ভাণ্ডার হইতে মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হইবে। শিক্ষিত ছাত্ররা ভারতের পাট, তুলা, চাউল, গম, চা, কফি প্রভৃতি পণ্য বিক্রয়ের বাজারের সুব্যবস্থা করিবে; দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবসায়ে আবশ্যক মূলধন প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবে; ভারতীয় মূলধনে ভারতীয় শ্রমিকের দ্বারা ভারতীয় উপকরণে প্রস্তুত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে; ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবে। এই বৃত্তিও উপযুক্ত বাঙ্গালী প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান প্রার্থীদিগকে প্রদান করা হইবে।

দাতা বলিয়াছেন—যদিও তিনি প্রার্থীদিগকে ভারতীয় প্রথায় জীবনযাপন করিতেই হইবে, এমন নিয়ম করিতে চাহেন না, তথাপি তিনি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের বর্ত্তমানে অবজ্ঞাত এই আদর্শ গ্রহণ জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন। তিনি সেই জন্য—দেশের লোকের সেবাই দেশমাতৃকার সেবা ইহা স্মরণ রাখিয়া প্রত্যেক শিক্ষিত বৃত্তিধারীকে ভারতের স্বল্পে তুষ্ট থাকিবার আদর্শ গ্রহণ করিয়া অভাবগ্রস্ত অন্য ছাত্রদিগকে শিক্ষার দ্বারা স্বাবলম্বী হইতে সাহায্য দান করিতে অনুরোধ করেন।

ডাক্তার হরেন্দ্রকুমারের দান কেবল বঙ্গভাষাভাষী পিতামাতার পুত্র প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানদিগের জন্য বলিয়া কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার উত্তরে হরেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন—তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী। কিন্তু তিনি যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায়ের লোকরা আশানুরূপ উন্নতি করিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি এই দান তাঁহাদিগের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা সকলেই ভারত সন্তান—আমরা পরস্পর সম্প্রীতিতে বাস করিতে না পারিলে কখনই দেশের ও জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে না।

ডাক্তার হরেন্দ্রকুমারের পিতামাতা আনুষ্ঠানিক প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রিয়কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে তিনি যে ভাবে দান সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে অপ্রীতি প্রকাশের কোন কারণ থাকিতে পারে না। তিনি যে বৃত্তিধারীদিগকে আমাদিগের জাতীয় আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার অভাব প্রতিপন্ন হয় এবং তিনি যে বাঙ্গালীর জন্যই এই দান করিয়াছেন, তাহাও বৃত্তিদান সর্ত্তে দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গালী খৃষ্টানদিগের নিকট বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার ঋণ অল্প নহে। এই দানের ফলে ডাক্তার হরেন্দ্রকুমারের নাম সেই তালিকাভুক্ত হইল।

হরেন্দ্রবাবুর পুত্রবিয়োগবেদনার বিষয় আমরা অবগত আছি। শুনিতেছি, তিনি পুত্রের নামে আরও যে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন, তাহা কেবল বাঙ্গালী খৃষ্টানদিগেরই প্রাপ্য হইবে না।

হরেন্দ্রবাবুর এই দানের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি উত্তরাধিকারসূত্রেই ধন লাভ করেন নাই। তিনি সমস্ত জীবন

শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছেন—এখনও করিতেছেন ; তবে এখন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিতেছেন না। তিনি সমস্ত জীবনে যে অর্থ অর্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা যেভাবে শিক্ষাবিস্তারকল্পে—দেশের আর্থিক উন্নতির উপায় বিধানে প্রদান করিলেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়।

হরেন্দ্রবাবু যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, বাঙ্গালায় তাহা অনুকৃত হইলে বাঙ্গালীর উন্নতির পথ যে সুগম হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বাঙ্গালী সকলেই বাঙ্গালী—খৃষ্টানের উন্নতিতে যে সমগ্র বাঙ্গালীজাতিরও উন্নতি হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

—

শিল্পের উন্নতি সাধন—

বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগ এ দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি-সাধন-কল্পে যে কাজ করিতেছেন, তাহার বিস্তৃত পরিচয় আমরা পাঠকদিগকে দিয়াছি। সেই পরিচয় প্রদানকালে আমরা বলিয়াছিলাম, যাহাতে আরও শিল্প প্রতিষ্ঠার উপায় হয়, তাহা করা শিল্প বিভাগের কর্ত্তব্য। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, আমাদিগের এই মত গৃহীত হইয়াছে। সংপ্রতি বাঙ্গালা সরকারের শিল্প বিভাগ বেকার সমস্যা সমাধানোপায় সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে, এ দেশে চিকিৎসকদিগের ব্যবহৃত অস্ত্র ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার শিক্ষা-প্রদান-ব্যবস্থা হইয়াছে। এ দেশে যে বৎসর বৎসর বহু টাকার এই সব পণ্য আমদানী হয়, তাহা সকলেই জানেন। ইতঃপূর্ব্বে কোন কোন কারিগর কোম্পানী এই সব এ দেশে প্রস্তুত করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। এখন শিল্প বিভাগের চেষ্টায় যদি উটজ শিল্প হিসাবে এই শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে যে ইহাতে বহু লোকের অর্থার্জ্জনের উপায় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে আমরা দুইটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিব—

(১) সার ডানিয়েল হ্যামিল্টনের জমীদারী গোসাবায় (সুন্দরবন) ও ময়ূরভঞ্জে—যুবকদিগকে শিল্প দানের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ও

(২) বীরনগরে (উলায়) প্রতিষ্ঠিত ঐরূপ প্রতিষ্ঠান।

সার ডানিয়েল স্কটলণ্ডের লোক—ব্যবসা-ব্যপদেশে বহু দিন ভারতবর্ষে ছিলেন এবং সেই সময়েই এ দেশের লোকের—বিশেষ কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন। এখন তিনি ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু সমবায় নীতিতে এ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া লোককে আদর্শ দেখাইবার জন্য সুন্দরবনে ও ময়ূরভঞ্জে অনেক জমী লইয়াছেন। এই সব স্থানে ভদ্র গৃহস্থ যুবকরাও জমী লইয়া চাষ করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্র বয়ন, ফলের চা প্রভৃতি শিল্প করিতে পারে। গোসাবায় এই কাজ কয় বৎসর হইতে চলিতেছে। তথায় কৃষকরা যে শস্যাদি উৎপন্ন করে, তাহা সমবায় বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিক্রীত হয় এবং ঐরূপ অন্য প্রতিষ্ঠান হইতে তাহারা তাহাদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে। কৃষক সমবায় সমিতি হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া কাজ আর করে। তাহার পণ্য-বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে তাহা আবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য দিয়া যে টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহাতে ক্রমে তাহার ঋণ শোধের ব্যবস্থা হয়।

সংপ্রতি সার ডানিয়েল গোসাবায় ও ময়ূরভ শিল্প-শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। সেই প্রতিষ্ঠা দ্বয়ে শিক্ষার্থীরা উন্নত কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিবে ও স সঙ্গে নানা উটজ শিল্পের যে কোনটি শিখিতে পারিবে কৃষিই শিক্ষার প্রধান বিষয়। শিক্ষার পর যুবকরা চ করিবার জন্য জমী পাইবে এবং স্বাধীনভাবে কাজ আর করিতে পারিবে। বাঙ্গালা সরকারের কৃষি, শি ও স্বাস্থ্য বিভাগের এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহায্যে এই শিক্ষালয়গুলি পরিচালিত হইবে এ পরিচালনভার একটি সমিতির উপর ন্যস্ত হইবে।

সার ডানিয়েল এখন প্রতি বৎসর এ দেশে আসি কয় মাস কাটাইয়া থাকেন এবং সে সময়ের অধিকাং গোসাবায় ও ময়ূরভঞ্জে যাপন করেন। তিনি কার্য্যে প্রভূত অর্থ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অপেক্ষাও তাঁহার উদ্যম ও এ দেশের লোকের আর্থি অবস্থার উন্নতি সাধনে আগ্রহ আমরা অধিক মূল্যব বলিয়া বিবেচনা করি। যাঁহারা গোসাবায় ডানিয়েলের সম্পত্তি ও তাহার নিকটে অন্যান্য লোক

সম্পত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা উভয়ের মধ্যে বিস্ময়কর প্রভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন। গোসাবার কৃষকরা ঋণভারগ্রস্ত নহে; তাহারা স্বাবলম্বী এবং তাহাদিগের রোগে চিকিৎসার ও তাহাদিগের পুত্রকন্যাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

এইরূপ উপনিবেশে যদি নানা স্বল্পব্যয়সাধ্য শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে যে এইগুলি সমৃদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

বীরনগর বা উলা বাঙ্গালার প্রাচীন সমৃদ্ধ পল্লীগ্রামের অন্যতম ছিল। উলার সমৃদ্ধি-বিবরণ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিবৃত করিয়াছেন—তাহা পাঠ করিলে যেন চক্ষুর সম্মুখে সোণার বাঙ্গালার রমণীয় ও কমনীয় চিত্র প্রতিভাত হয়। সেই উলা ম্যালেরিয়ায় প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। তথায় বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ভগ্নাবস্থায় শ্বাপদসর্পের আবাস হইয়াছিল; পাঠগোষ্ঠীতে ছাত্র ছিল না; দেবায়তনে সন্ধ্যাদীপও জ্বলিত না; দীর্ঘ দীঘিকা শৈবালদলে পূর্ণ হইতেছিল--জল অপেয় ও ব্যাধি-বিষময় হইয়াছিল। কিন্তু রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীমান কৃষ্ণশেখর বসু প্রভৃতির চেষ্টায় বীরনগর আবার পূর্ব্বসমৃদ্ধি লাভ করিবার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। উলার এই সকল কৃতী সন্তান অর্থ ও সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া উলাকে আবার আদর্শ পল্লীগ্রামে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহাদিগের আন্তরিক চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে না। ইহার মধ্যেই উলায় আবার বসতি হইতেছে—উলার স্বাস্থ্য ও শ্রী ফিরিয়াছে। উলায়ও একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তাহাতেও গোসাবার প্রতিষ্ঠানের মত শিক্ষা প্রদান করা হইবে।

উলা গোসাবা অপেক্ষা নিকটে অবস্থিত। সুন্দরবনের জলবায়ু যেমন কাহারও কাহারও স্বাস্থ্যের অনুভূত নহে, তেমনই জনবহুল স্থান হইতে দূরে বাসও অনেকের ধাতুসহ নহে। উলায় সে সব অসুবিধা নাই। বিশেষ আমাদিগের বিশ্বাস, ফুলের চাষ, গোপালন ও গব্য দ্রব্য উৎপাদন, হাঁস ও মুর্গীর ব্যবসা প্রভৃতি উলায় যেমন হইবে, গোসাবায় তেমন হইবে কি না সন্দেহ। এ সকল অপেক্ষাকৃত শুষ্ক স্থানেই ভাল হয়। উলাতেও স্বল্পব্যয়সাধ্য শিল্প—ছুরী কাঁচী, সাবান, পিতল কাঁসার বাসন, মৃৎপাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করা শিখাইবার ব্যবস্থা হইবে। সব আয়োজন হইয়াছে।

আমাদিগের বিশ্বাস, উলায় যে পরীক্ষা হইবে, তাহার ফল স্বল্প সীমামধ্যে আবদ্ধ থাকিবে না, পরন্তু সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী হইবে। আজ আমরা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি, বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের সংস্কার সাধিত না হইলে, বাঙ্গালার আর্থিক উন্নতি হইবে না। সে জন্য প্রয়োজন—

(১) কৃষির উন্নতিসাধন ও কৃষিজপণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা।

(২) পল্লীগ্রাম যাহাতে লোককে সহরেরই মত আকৃষ্ট করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা।

(৩) পল্লীগ্রামে থাকিয়া যাহাতে লোক অনায়াসে অন্নার্জ্জন করিতে পারে, তাহার উপায় করা।

(৪) পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতিসাধন ও তথায় শিক্ষাদানের উপায়সাধন।

সমবায় নীতির ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে য়ুরোপের নানা দেশে কল্পনাতীত উন্নতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ দেশেও তাহা হইতে পারে। পল্লীবাসীর প্রয়োজন পল্লীগ্রামে মিটাইবার উপায় করা অসম্ভব নহে। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় তাহাই ছিল। এখন পঞ্জাবে পল্লীগ্রামে বেতারবার্ত্তা বহনের ব্যবস্থাও হইতেছে। শিল্পপ্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীকেন্দ্রে বিদ্যুত ব্যবহারও আরম্ভ হইবে। আজকাল মোটর যানের প্রচলনে গতায়াতের কত সুবিধা হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত পল্লীর পুনর্গঠন কখন সম্ভব হইবে না।

শিল্প বলিলেই যে বিরাট কলকারখানা—যন্ত্রের ঘর্ঘর রব—ধূমমলিন গগন ও যন্ত্রবৎ শ্রমিকের দল বুঝিতে হইবে, এমন নহে। যে শিল্পে শিল্পী সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে ও আপনার পরিবারমধ্যে আনন্দে ও সন্তুষ্টাবস্থায় বাস করে, সেই শিল্পই শিল্প এবং তাহাই অধিক আদরণীয়। পল্লীর পুনর্গঠন কার্য্যে সেইরূপ শিল্পের প্রয়োজন কত অধিক তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

ভারতীয় শুল্ক আইন—

আমদানী ও রপ্তানী পণ্যের উপর যে সকল শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়, তৎসম্পর্কে একটি আইনের পাণ্ডুলিপি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিধিবদ্ধ হইবার প্রতীক্ষা করিতেছে। বিলটি বিচারার্থ সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পণ করা হইয়াছিল। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত হইয়াছে। কমিটি বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই, কেবল এনামেলের বাসনের উপর শতকরা ৩০ টাকা হিসাবে যে সংরক্ষণ শুল্ক আছে তাহা তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কমিটি বিবেচনা করেন, এনামেলের বাসন দরিদ্র লোকেরাই ব্যবহার করে। সংরক্ষণ শুল্ক তুলিয়া দিলে, সস্তায় বিদেশী এনামেলের বাসন কিনিতে পাইলে দরিদ্র লোকরা উপকৃত হইবে। এই সংরক্ষণ শিল্প তুলিয়া দেওয়ার পক্ষে কমিটির সকল সদস্য একমত হইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত সতীশ সেন, শ্রীযুক্ত বাগলা ও মিঃ রামজে স্কট স্বতন্ত্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র তাঁহার স্বতন্ত্র মন্তব্যে বলিয়াছেন, এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট তথ্য উপস্থাপিত হয় নাই। এনামেলের বাসনের উপর সংরক্ষণ শুল্ক সম্পর্কে কয়েকটি গুরু প্রশ্ন বিচার্য্য। শুল্ক তুলিয়া দিলে দরিদ্র জনসাধারণের কিছু কিছু সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের অসুবিধা ও অমঙ্গলও বিস্তর ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। দেশে যে দুই একটি এনামেলের বাসনের কারখানা আছে, শুল্ক তুলিয়া দিলে তাহাদের ক্ষতি অনিবার্য্য—হয় ত শিশু শিল্পটির অস্তিত্ব লোপও ঘটিতে পারে। কেবল ইহাই নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে বা সাময়িক পত্রে এইরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, এনামেলের বাসন প্রস্তুত করিবার পড়তা কমাইবার জন্য, লোহার উপর এনামেলের কোটিং প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বেকার মশলা পরিত্যাগ করিয়া নূতন একপ্রকার মশলা ব্যবহৃত হওয়াতে ঐরূপ সস্তার এনামেলের বাসন ব্যবহারে খাস বিলাতে বহু লোক বিষাক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী মসলার নামও এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছিল। দরিদ্রের দুঃখে যাঁহাদের হৃদয় কাঁদিতেছে, তাঁহারা যেন এই কথাটিও বিবেচনা করিয়া দেখেন—সস্তার মোহান্ধ হইয়া দরিদ্র জনসাধারণের প্রাণ ও স্বাস্থ্যহানির কারণ যেন না হন ইহাই আমাদের অনুরোধ। শুনা যাইতেছে, শ্রীযুক্ত সতীশ সেন এনামেল শিল্প সংরক্ষণ জন্য পরিষদে একটি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থাপন করিবেন। এই সঙ্গে তিনি যদি পরিষদে সস্তার এনামেলের দ্বারা খাদ্য বিষাক্ত হওয়ার এবং লোকের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনার কথাও ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে আরও ভাল হয়।

পরলোকগত মধুসূদন দাস—

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রাত্রিকালে কটকে উড়িষ্যার প্রবীণ জননেতা মধুসূদন দাস মহাশয় ৮৭ বৎসর বয়সে লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। নব্য উড়িষ্যা তাঁহারই হাতে গড়া বলিলেই হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৮এ এপ্রেল তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ ও বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি চারিবার সম্মিলিত বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার প্রতিনিধি স্বরূপ তিনি ইম্পীরিয়াল কাউন্সিলে প্রেরিত হন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিহার-উড়িষ্যার অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া দুই বৎসর মন্ত্রিত্ব করেন। ওড়িয়া ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহ লইয়া একটি পৃথক প্রদেশ গঠিত হয় ইহা তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ছিল। অদূর ভবিষ্যতে সেই স্বপ্ন সফল হইতে চলিয়াছে, কিন্তু তিনি তাহা দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। মন্ত্রীদিগের বেতন লওয়া উচিত কিনা এই বিষয়ে দাস মহাশয়ের একটি বিশিষ্ট মত ছিল। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রীরূপে তিনি স্বয়ং বেতন লইতে অনিচ্ছুক ছিলেন, ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাবও করিয়াছিলেন এবং গবর্ণর স্যার হেনরী হুইলারকে এই বিষয়ে পত্রও লিখিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে তৎকালে মিঃ দাস ও গবর্ণরের মধ্যে অনেকগুলি পত্র ব্যবহারও হইয়াছিল। অবশেষে দাস মহাশয়ের প্রস্তাবমত কাজ হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া তিনি পদত্যাগ করেন। মধুসূদন দাস মহাশয় উৎকলে জাতীয়তার প্রতীক স্বরূপ ছিলেন। উ:—

বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল তিনি উড়িষ্যার সকল প্রকার উন্নতির জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় চারুকলাশিল্প ও স্থাপত্যের প্রাচীন নিদর্শন প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। অধুনা সেই শিল্প ও স্থাপত্য অনাদৃত, উপেক্ষিত। দাস মহাশয় তাহাদের পুনরুদ্ধারে যত্নশীল ছিলেন, এবং এজন্য যথাসাধ্য অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রাচীন উৎকলের সুপ্রসিদ্ধ রৌপ্যশিল্পের পুনরুদ্ধারে তাঁহার প্রচেষ্টা অসাধারণ ছিল। উৎকল ট্যানারী নবশিল্পের ক্ষেত্রে তাঁহার একটা উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি। উড়িষ্যার রাজনীতিক আন্দোলন, শিল্পোন্নতি, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি সকল সাধারণ কার্য্যের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দাস মহাশয় উড়িষ্যার অধিবাসী হইলেও বঙ্গদেশে বহুকাল অতিবাহন করেন। জীবনের শেষ দশবারো বৎসর তিনি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল উড়িষ্যা নয়, বঙ্গদেশ এবং সমগ্র ভারতবর্ষ প্রিয়-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছে।

রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারের লোকান্তর—

বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রাত্রি পৌনে দুইটায় সময় মান্দ্রাজে সুপ্রসিদ্ধ "হিন্দু" পত্রের সম্পাদক মিঃ এ, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ৫৭ বৎসর মাত্র বয়সে লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতীয় সাংবাদিক-গণের মধ্যে একজন অতি যোগ্যতম লোকের তিরোধান ঘটিল। এ জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ শোকানুভব করিতেছে। মিঃ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে "হিন্দু" পত্রের সহকারী সম্পাদক রূপে কার্য্যারম্ভ করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে "হিন্দু"র কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি তামিল ভাষার দৈনিক "স্বদেশ মিত্রম্" সংবাদপত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সুপরিচালন-গুণে পত্রখানি দেশ মধ্যে প্রভূত প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি লাভ করে। জনসাধারণের উপর ইহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল। এই পত্রখানিও "হিন্দু" সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারিগণের দ্বারা পরিচালিত। মিঃ এ, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার দীর্ঘকাল "স্বদেশমিত্রম্" সম্পাদন করিবার পর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি "হিন্দু" পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন। সাংবাদিক রূপে তিনি পূর্ব্বে যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, "হিন্দু" পত্র সম্পাদন উপলক্ষে সেই খ্যাতি বহু গুণ প্রসারিত হয়। মিঃ আয়েঙ্গার কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মণ্টফোর্ড রিফর্ম সম্বন্ধে কংগ্রেসের পক্ষে সাক্ষ্যদান করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং সেই বৎসরই পরিষদে স্বরাজ্য দলের সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩১ ও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি শ্বেত পত্র সম্পর্কে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির সহিত পরামর্শ বৈঠকেও আহূত হইয়াছিলেন। সংবাদপত্র ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আয়েঙ্গার মহাশয়ের অসাধারণ প্রভাব ছিল। তাঁহার অকালমৃত্যুতে ভারতের সংবাদপত্র-জগৎ, এবং সমগ্র ভারত ক্ষতিগ্রস্ত ও শোকমগ্ন হইয়াছে।

বস্ত্র শিল্প সংরক্ষণ—

ভারতের বস্ত্র শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেশে এবং ব্যবস্থাপক সভা সমূহে অনেক দিন ধরিয়া আন্দোলন চলিতেছে। বোম্বায়ের কাপড়ের কলওয়ালারা একাধিকবার ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া আইনের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছেন। তদনুসারে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের অবস্থা, বিদেশী প্রতিযোগিতা এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য টেরিফ বোর্ডের উপর ভারার্পণ করা হয়। এই বোর্ড বিস্তৃত ভাবে অনুসন্ধান করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তদনুযায়ী একটি রিপোর্টও তাঁহারা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর একটি আইনের পাণ্ডুলিপি রচিত হইয়াছে। বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী টেরিফ বোর্ডের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপর দিন ব্যবস্থা পরিষদে প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপিত হইয়াছে। বিলটির সম্বন্ধে পরিষদে

আলোচনা কিছুদিন ধরিয়া চলিবে বলিয়া মনে হয়। সেই আলোচনার সম্যক অনুসরণ করিতে হইলে টেরিফ বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোটামুটি ভাবে জানিয়া রাখিলে ভাল হয়। সেইজন্য আমরা বোর্ডের রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম পাঠকগণকে জানাইয়া রাখিতেছি।

রেশম শিল্প সম্পর্কে বোর্ড প্রস্তাব করিয়াছেন যে, রেশমজাত দ্রব্যের মূল্যের উপর শতকরা ৮৩ হিসাবে এবং রেশম ও অন্য বস্তুর মিশ্র দ্রব্যের মূল্যের উপর শতকরা ৬০ হিসাবে শুল্ক আদায় করিতে হইবে।

সর্ব্বপ্রকার কাঁচা রেশম (যাহা হইতে কোনরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করা হয় নাই এমন রেশম বা রেশমের গুটি প্রভৃতি), বা রেশমের সুতা, পরিত্যক্ত রেশম, এবং টাকুতে কাটা রেশমী সুতা প্রভৃতির মূল্যের উপর শতকরা ৫০ শুল্ক।

নকল রেশমের সুতার উপর প্রতি পাউণ্ডে একটাকা হিসাবে বিশেষ শুল্ক।

এই শুল্ক আপাততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য বসিবে। পাঁচবৎসরে কিরূপ কাজ হয় তাহা দেখিয়া পরে আবার অনুসন্ধান এবং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা।

তুলার বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে বোর্ডের প্রস্তাব এই যে, সাধারণ কোরা কাপড়ের প্রতি পাউণ্ডে পাঁচ আনা। পাড়ওয়ালা কোরা ধুতি-শাড়ীর প্রতি পাউণ্ডে সওয়া পাঁচ আনা। ধোয়া কাপড়ের উপর প্রতি পাউণ্ডে ছয় আনা, রঙীন সুতায় বোনা ছিটের কাপড়ের উপর প্রতি পাউণ্ডে ছয় আনা চার পাই।

সুতার উপর শুল্ক প্রতি পাউণ্ডে এক আনা।

গেঞ্জির উপর প্রতি ডজনে বিশেষ শুল্ক একটাকা আট আনা।

মোজার উপর প্রতি ডজনে বিশেষ শুল্ক আটআনা।

অপর কয়েক প্রকার তুলাজাত বস্তুর প্রতি পাউণ্ডে বিশেষ শুল্ক ছয় আনা ও সাড়ে ছয় আনা।

মোটামুটি ভাবে বোর্ড মূল্যের উপর শতকরা হার অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ বস্তুর উপর বিশেষ হারে শুল্ক বসাইবার পক্ষপাতী। তাঁহাদের ধারণা, ইহাতেই রক্ষণ শুল্ক বসাইবার উদ্দেশ্য সম্যক প্রকারে সিদ্ধ হয়। কেমন করিয়া তাহা হয়, বোর্ড তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

রেশমজাত বস্তুর উপর পাঁচসালা ব্যবস্থা করিলে চলিতে পারে; কিন্তু তুলাজাত বস্তুর উপর দশসালা বন্দোবস্ত না হইলে ফলাফল ভাল বুঝা যাইবে না; কাজেই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না তাহাও নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হইবে না। এই সময়ের মধ্যে, যে যে শিল্পের জন্য সংরক্ষণী ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহার 'ধাত' ভালরূপ বুঝা যাইবে, এবং পরে আবশ্যকমত ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে।

ব্যবস্থা পরিষদে বস্ত্র শিল্পসংরক্ষণ বিল সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপনকালে স্যার জোসেফ ভোর বলেন, কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সকল হিসাব বিবেচনা ও বিচার করিয়া দেখা গেল শুল্কের পরিমাণ এমন ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এবং ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে। ইহার পরে পরিষদের আলোচনায় যেরূপ দাঁড়াইবে, আইনটির আকার ও গঠন তদনুরূপ হইবে।

ভূমিকম্পে সাহায্য—

আমরা জানিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীদের মর্য্যাদাবোধ ও আত্মসম্মান জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাহায্য বিতরণের ব্যবস্থা কেন্দ্র সমিতি করিতেছেন। যে ব্যবস্থায় কার্য্য হইতেছে, তাহাতে পক্ষপাতিত্ব ও অব্যবস্থার অভিযোগ তিরোহিত হইবে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনুরোধে ব্যারিষ্টার মিঃ এস, এন, বসু ও প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় প্রাথমিক অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়াছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "গঙ্গা-যমুনা"—১৲

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত "জীবন-বাণী"—২৲

কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় কবিশেখর, এম-এসসি প্রণীত "রোগ ও পথ্য"—১৲

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত ছেলেদের গল্পের বই "সোনার খনির সন্ধানে"—৸৹

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "হোমিওপ্যাথির ব্রহ্মাস্ত্র" প্রথম খণ্ড—১৷৷৹

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত "সরল জ্যোতিষ"—২৲

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "দরদী"—৷৷৹

শ্রীমতী ননীবালা ঘোষ প্রণীত সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী "আর্য্যাবর্ত্ত"—২৲

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সরকার কবিরত্ন কবিরাজ প্রণীত "হিন্দুধর্ম্ম ও অস্পৃশ্যতা"—৷৷৹

শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ক্ষতিপূরণ"—২৲

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ-এস-এস, এফ-আর-ই-এস প্রণীত জীবনী "মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়"—১৷৹

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
OF MESSRS. GURUDAS CHATTERJEA & SONS
201, Cornwallis Street, Calcutta

Printer—NARENDRA NATH KU
THE BHARATVARSHA PRINTING W
203-1-1, Cornwallis Stre

চৈত্র—১৩৪০

দ্বিতীয় খণ্ড || একবিংশ বর্ষ || চতুর্থ সংখ্যা

ভস্মলোচন

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

ভস্মাসুরের গল্পে কিছু কিছু হেঁয়ালি রহিয়া গিয়াছে। ভস্মাসুরের "মাসতুত ভাই" ভস্মলোচন আসিয়া সে হেঁয়ালি আমাদের খোলসা করিয়া দিবে কি? ভস্মাসুরের স্পর্শে ভস্ম; ভস্মলোচনের দৃষ্টিতেই ভস্ম। কাজেই, ভস্মলোচনের কেরামতি বেশী। ভস্মাসুরকে শিবের পিছু পিছু বিশ্বভুবনে ধাওয়া করিতে হইয়াছিল। ভস্মলোচনকে ছুটিয়া মরিতে হয় না। সে দৃষ্টিপাত করিলেই সব ভস্ম। রাম-রাবণের যুদ্ধে একে আমরা দেখিয়াছিলাম না? চোখে ঠুলি পরিয়া থাকিত। রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া রাম-বাহিনীর অভিমুখে দাঁড়াইয়া চোখের ঠুলিটি খুলিলে কারুরই রক্ষা পাবার ত' কথা নয়! সেবার শিব পড়িয়াছিলেন ফাঁপরে, এবার শ্রীরাম। গোড়ার তত্ত্ব একই। বিভীষণের উপদেশে দর্পণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া রাম রক্ষা পাইলেন—দর্পণে নিজেরই মুখ দেখিয়া রাক্ষস নিজেই ভস্মত্ব পাইল। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনেক রকমে লাগসই হইতে পারে। আছেও অনেক রকম। অধ্যাত্মরামায়ণ ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ত' স্থূল ব্যাপারটাকে আগাগোড়া সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম করিয়া দেখা। গীতা বলিয়াছেন—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি রেকেত্র কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥" সেই যে "বহুশাখা", "অনন্তা" বুদ্ধি বা মতি—তাকেই কি দশস্কন্ধ রাবণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে? মতিকে পুংলিঙ্গ করিয়া মনন বা মন বলা যাক্। অবশ্য, বুদ্ধি, মন—এ সব আমরা দার্শনিকের পরিভাষা-মাফিক প্রয়োগ করিতেছি না এখন। তা হইলে, এক রকম মনন বা বিচার হইতেছে—বহুশাখ, অনন্ত। আর, এই মনন বা বিচারের এক সোদর হইতেছে ব্যবসায়াত্মক বিচার—যেটা একনিষ্ঠ, একই। সে বিচার নিখিল ভেদ-বৈচিত্র্যের ভেতরে একেরই অন্বেষণ করে—"সর্ব্বভূতস্থমেকং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষমকারণং পরং ব্রহ্ম"। এই সহোদরটি বিভীষণ। ইনি রামকেই আশ্রয় করেন। রামকে আশ্রয় করেন বলিয়া এঁর ভূতের ভয় পলায়। ভূতের ভয় মৃত্যু—ভূতমাত্রেই মরিতেছে, মরিবে। বিভীষণ অমর। মনন বা মন আরও এক কিসিমের আছে—জড়। ঘুমাইয়াই কাটায়। এটি কুম্ভকর্ণ—আর এক সহোদর। যোগসূত্রে ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, মূঢ়, একাগ্র, নিরুদ্ধ—এই পাঁ

রকম চিত্তের অবস্থার কথা আছে। তার মধ্যে ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত—রজঃপ্রধান। মূঢ়—তমঃপ্রধান। একাগ্র—যুঞ্জান; আর, নিরুদ্ধ—যুক্ত। তার মধ্যে, একাগ্র-যুঞ্জান—সত্ত্বপ্রধান। নিরুদ্ধ বা যুক্ত অবস্থায় নির্ব্বিকল্পভাব, কাজেই গুণাতীত, "উন্মনী" দশা। এই গেল তিনটি ভায়ের সটে পরিচয়।

ভস্মলোচনকে অভিমান ভাবিলে মন্দ হয় না। উপনিষৎ বলিয়াছেন—"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ" ইত্যাদি। বিধাতা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে, আর, ইন্দ্রিয়গ্রামের রাজা অভিমানকে "পরাঙ্মুখ" বা বহির্ম্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বহির্ম্মুখ অভিমান ও ইন্দ্রিয়-গ্রাম এর সংস্পর্শে সবই "ভস্ম" হইতেছে। "ভস্ম" হইতেছে মানে—আর কিছুতে বিভক্ত ও রূপান্তরিত হইতেছে,—resolved and redistributed into something else. শুনিয়া বিস্মিত হবেন না। শুধু আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলো নয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোও এই যজ্ঞ, এই হোম নিত্য করিতেছে। চোখ, কাণ—এরা যে শুধু দেখে আর শোনে, এমন নয়। এরা এক "পোড়ায়," আর কিছু "বানায়"। অথবা, এরা এক একটা ছাঁচ—এরা কাদা ভাঙ্গিয়া, ছানিয়া আপন ছাঁচে ঢালাই করিয়া লয়। প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন বাস্তবতাবাদী (Realist)রা যাই বলুন, এটা ঠিক যে, আমাদের দেখা-শোনা ইত্যাদি সবই "কাঁচামাল" গুলো গড়িয়া পিটিয়া লওয়া। বাহিরের "মাল"কে আগে "কাঁচিয়া" লইতে হয়। একই কাদার তালে কেউ শিব গড়ে, কেউ বা বাঁদর গড়ে। আমাদের জঠরাগ্নিকে এই কাজ নিত্য করিতে হইতেছে। অন্ন "পচন" করিতে হয়। পচন মানে পোড়ান'। তার পর হজম। ফুস্ ফুস্ যে বাতাস টানিয়া লইতেছে, তার দ্বারা দেহের রস-রক্তাদি ধাতুর "পচন" (oxidisation) হইতেছে। এটি আবশ্যক। শাস্ত্র দেখা-শোনা ইত্যাদিকেও "আহার" বলিয়াছেন। ঠিকই বলিয়াছেন। শুধু বাহির হইতে আহরণ বলিয়া আহার নয়। পাক বা পচন অর্থেও আহার। "ভস্ম" এই প্রক্রিয়ার প্রস্তুত একটা কিছু (product of metabolic combustion)। প্রশ্বাসে যে কার্বণ ডাইঅক্সাইড্ বেরোয়, শরীর থেকে যে "মল" নানা ভাবে নির্গত হয়,—তারা এই ভস্মের সামিল। এটা অবশ্য ভস্মের একটা খুব সঙ্কীর্ণ অর্থ। আসল মানে আমরা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যাই হোক্, আমাদের ভেতরে একজন কেউ এই ভস্মলীলা করিতেছে। সে আর তার চরেরা বহির্ম্মুখ। "বহিঃ" আর "অন্তর্" কথা দুটোকে তলাইয়া বুঝিবেন। আমার এই স্থূল দেহের বাহিরে সব কিছু "বাহ্য" মনে করি। ও বাহ্য বড়ই "বাহ্য"। আরও আগলাইয়া চল। মনের বাহিরে যা কিছু, তাই কি বাহ্য? বটে, কিন্তু "এহ বাহ্য, আগে কহ আর।" আসলে, যেটা যার স্বরূপ, যার "আত্মা", সেইটা তার "অন্তর্"। আর, তাই যেটা নয়, সেটা তার "বহিঃ" বা বাহ্য। এই মানে স্মরণ রাখিতে হইবে। নৈলে—ইন্দ্রিয়গ্রাম বহির্ম্মুখ না হয় হইল, কিন্তু অভিমান বহির্ম্মুখ—এ কথাটার মানে বোঝা যায় না। অভিমান বহির্ম্মুখ—মানে সে তার নিজের যেটা স্বরূপ, তাতে দৃষ্টি করে না। সব তাতেই তার দৃষ্টি আছে, শুধু নিজের নিজত্বে তার দৃষ্টি নেই। নিজের বা "আত্মীয়" সম্বন্ধে তার চোখে ঠুলি। পরকীয়, অর্থাৎ স্ব-স্বরূপাতিরিক্ত সম্বন্ধে তার চোখে ঠুলি নেই। সবই ভস্ম, কি না resolve করিতেছে সে। তার হাতিয়ার ইন্দ্রিয়গ্রাম, সংস্কার ইত্যাদি। দর্পণাস্ত্র হইতেছে আত্মবিবেক—স্ব-স্বরূপবোধ ("স্ব"টাকে দু'বার বলিলাম)। যাতে করে নিজেকে নিজে দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিতে গেলেই "নিজেকে"—অর্থাৎ অভিমানকে—ভস্ম হইতে হয়।

এই গেল এক রকমের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এই রকমের একটা কিছু "মনসি নিধায়" ঐ গল্প রচিত হয় নাই? না, ও-সব নির্জ্জলা, গাঁজাখুরি, ছেলে-ভুলান' গল্প? সেকেলে বুড়োরাও না কি "ছেলে" ছিল, তাই তাদের সব কাজেও ছেলেমি, গল্পেও ছেলেমি! আগষ্ট কোঁৎএর সেই মামুলি লেবেলগুলো এই বিংশশতকে এখনও বাতিল হয় নাই? আগে, মাইথোলজিকাল্, তার পর থিও-লজিকাল্, তার পর মেটাফিজিকাল্, সর্ব্বশেষে "পজিটিভ্"! সেই "ভস্মলোচনী" কাণ্ড-কারখানা! এই বিজ্ঞানযুগের অভিমান ভস্মলোচনের মতন আপন "অন্তর" চোখটিতে খাসা ঠুলি আঁটিয়া রহিয়াছে দেখিতেছি! বাইরের চোখ মেলিয়া যা কিছুতে দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাই "ছাই ভস্ম" হইয়া যাইতেছে! ভারতের বেদ তাই

"চাষার গান," ব্রাহ্মণগ্রন্থ (স্বয়ং ম্যাক্‌স্‌মুলারেরই ভাষায়) —"(theological toraddle)"! অর্থাৎ, ছাইভস্ম !

ভস্মলোচন যাঁরই রথে অধিষ্ঠান হইয়াছেন, তিনিই স্বরূপে, কি না আপনার সম্বন্ধে, চোখে ঠুলি পরিয়াছেন। পরের বেলা তিনি শুধু যে ভস্মলোচন এমন নয়, সহস্রলোচন। স্বয়ং হয় ত চালুনি, নিজের সহস্র ছিদ্রে দৃষ্টি নেই ; ছুঁচের মার্গে একটি ছিদ্র অন্বেষণেই তৎপর ! ইনি যে ধর্ম্মের ঘাড়ে চাপিয়াছেন, সে ভাবিয়াছে ও বড় গলা করিয়া বলিয়াছে—আমিই সকল ধর্ম্মের সেরা ; পরধর্ম্মে জাহান্নম। ফলে, সংসারে মৈত্রী, সদ্‌ভাব পুড়ে ভস্ম হইয়া যায় ; ভাই ভায়ের ঘর ছারখার করিয়া দেয় ! কোন বিদ্যা বা কাল্‌চারের ঘাড়ে চাপিলেও তাই। গ্রীক্‌রা "বর্ব্বর" বলিত ; আর কেউ-বা "অনার্য্য" বলিত। এখন আমরা পুরাকালের সব কিছু "মিডিভাল্‌" "লোয়ার্", "প্রিমিটিভ" বলিতেছি। আমাদের গতি "প্রগতি"। বাকি সব বকেয়া, বাতিল। অর্থাৎ, হালের বিদ্যা ভস্মলোচন হইয়া "আপনার বেলায়" চোখে ঠুলি দিয়াছে ; পরের যা কিছু সবই ন স্যাৎ, তুচ্ছ, ছাইভস্ম করিয়া দিতেছে। খোদ বিজ্ঞান খুব চোখোল' বলিয়া নিজের বড়াই করিয়া আসিতেছে। সত্যিই—একটা বালখিল্য পতঙ্গ ধরিয়া তার অঙ্গে শুধু নবদ্বার কেন, নব-নবতি কোটি নিরানব্বুই লক্ষ নিরানব্বুই হাজার নশ' নিরানব্বুইটি "দ্বার" সে দাগিয়া দিয়াছে। হাজার-দুয়ারী ত' নিতান্ত ছোটলোকেরও ঘর ! আমির লোকের দাওলাৎখানা লক্ষ-দুয়ারী ! মলিকিউলের নক্সা, এটমের নক্সা—এ সবই সে আঁকিয়া ফেলিয়াছে। সবই "ভসম্‌-পুরী"—সাতমহলই হোক্‌, আর সাতসাতে উনপঞ্চাশ মহলই হোক্‌। সর্ব্বত্রই কেউ "পুড়িতেছে", পুড়িয়া আর কিছু হইতেছে। কোথাও নাম মেটাবলিজিম্‌, কোথাও বা কম্‌বাস্‌চান্‌, কোথাও বা এটমিক্‌ ডিস্‌রাপ্‌শান্‌। ইত্যাদি। আমাদের লক্ষণমত সবই ভস্ম। পরে লক্ষণটি আরও খোলসা করিব। যাই হোক্‌—বিজ্ঞান এতদিন "সত্যং সত্যং বদাম্যহং" হলপ করিয়া এই বিশ্বভুবনে ওতপ্রোত যজ্ঞের ভস্মই ঘাঁটিতেছে। যজ্ঞ-তিলকের হুঁস নেই। চোখে ছাই উড়িয়া না পড়িতেছে এমন নয়। সময় সময় চোখ রগ্‌ড়াইয়া চোখ লালও করিতেছে দেখি। ছাইএর গাদায় ফুঁ মারিলে তা ত' হবারই কথা ! আজ্‌কের পাকা দেখা কা'ল কাঁচিয়া যাইতেছে—কল্পনা জল্পনার সামিল হইয়া পড়িতেছে ; আজ্‌কের লজ্জাশীলা কল্পনা জল্পনা বধূটি কাল খাসা বাস্তবী গিন্নীবান্নী হইয়া ঘর পাত্তিতেছেন। এ ত' হামেশাই দেখিতেছি। কিন্তু, বিজ্ঞান আপনার বেলায় ? ঠুলি সেখানে বেজায় শক্ত করিয়া আঁটা। তবু সময় সময় একটুখানি ফাঁকও হইয়া পড়ে। তখন বিজ্ঞান নিজেই "ভস্ম" হইয়া উড়িয়া যাবার উপক্রম করে। তখন, বিজ্ঞানের আয়তন হইয়া পড়ে একটা অপরূপ বিচিত্র "মায়াপুরী"—A Universe of Convention. কতকগুলো সংজ্ঞা ও পরিভাষার বীজ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গণিতের বনমানুষের হাড় ছোঁয়াইয়া বিজ্ঞান যাদুকরী এক অপূর্ব্ব বিরাট্‌ ভেল্কি পায়দা করিয়াছে। ইকোয়েশন্‌ ও ফর্‌মূলা এই দুই রাক্ষস-রাক্ষসী সেথায় বাস করে। বলিহারি ! ময়দানবী কাণ্ড ! ভেল্কির পাল্লায় পড়িলে কে বুঝিবে যে এটা ভেল্কি ! নিউটনের "কন্‌ভেন্‌শন্‌" দু'আড়াই শতাব্দী ধরিয়া খাসা চলিল। এখন আইন্‌ষ্টাইন্‌ সে নিউটনী কন্‌ভেন্‌শনে ভুল ধরিয়া শোধন করিতেছেন। এক দিকে মামুলি (traditional) হংস-বিদ্যার (dynamics এর) এই শোধিত সংস্করণ (amended edition) ; অন্য দিকে দহর সূক্ষ্ম আকাশে সদ্যঃ আবির্ভূত রহস্যবপু কোয়ান্‌টাম্‌-ডাইনামিক্স। এই দো-টানায় পড়িয়া বিজ্ঞানের "সত্যসন্ধি"গুলি জরাসন্ধ-বধ হইতে বসিয়াছে যে ! সেই সেদিন এডিংটনের তত্ত্বকথা ত' শুনাইয়া-ছিলাম—প্রকৃতির ধারায় যেটা বুঝি না, যেটা বোঝার না, অর্থাৎ, যেটা অনির্ব্বাচ্য, সেইটাই হয় ত' প্রকৃত, প্রকৃতিনিষ্ঠ ; আর যেটা বুঝিয়া হিসাব করিয়া ফেলিয়াছি ও ফেলিতেছি, সেটা বুদ্ধিগড়া, মনগড়া, সুতরাং, কৃত্রিম, অধ্যস্ত, আরোপিত। সোজা কথায়, বিজ্ঞান নিজের চোখের ঠুলিটি খুলিয়া নিজেকে উড়াইয়া ভস্ম করিয়া দেবার কথাও ভাবিতেছে।

তবে, নিজের সম্বন্ধে এই চোখের ঠুলি খোলায় দেরি হবে। কত দেরি কে জানে ? ঠুলি খসিয়া পড়িলে তাকে ক্যাভেণ্ডিশ্‌ ল্যাবরেটারি ছাড়িয়া নৈমিষারণ্যে আসিয়া বসিতে হইবে না ত' ? সে দূরের কথা। ততদিন ক্যাভেণ্ডিশ্‌ ল্যাবরেটারি চোখে ঠুলি আঁটিয়া

নৈমিষারণ্য-টন্তগুলোতে "ছাই"এর গাদাই দেখিতে থাকুন। ম্যাজিক্ ছাইএর গাদা, মাইথোলজি ছাইএর গাদা। ইত্যাদি। ২৫।৫০ হাজার বছর আগেকার "বুনো"রা গুহাবাসী, জটাবল্কলধারী, এমন কি, পাণিপাত্র দিগম্বর ছিল। আগুন জ্বালিতে হয় ত' শিখিয়াছিল, কিন্তু পাথুরে হাতিয়ার ছাড়া আর কোন রণসম্ভার জানিত না। অথচ, ফ্রান্স, স্পেন ইত্যাদি দেশের পুরাতন গুহাগাত্রে কি অপূর্ব্ব চিত্রশিল্পনৈপুণ্য এই সব "জানোয়ার"রা বিচিত্র বর্ণসম্পদে মণ্ডিত করিয়া অজর অক্ষয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। বুনোর কীর্ত্তি বলিয়া শুধু মুরুব্বিয়ানা তারিফ করিলে হইবে না। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পের সঙ্গে কোন কোন অংশে সেটা তুলনীয়। আর সেটা সখের জিনিষ ছিল না। আমাদের অতর্কিত কোন একটা ধর্ম্মানুষ্ঠানের (যেটা আমরা এখন "ম্যাজিক" বলিতেছি) অচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল সেটা। যাদের এটা কীর্ত্তি, তারা কি সত্য সত্যই "বর্ব্বর" ছিল? গুহাবাসী, পাণিপাত্র, দিগম্বর, "যজমান" হইলেই কি সরাসরি বর্ব্বর হওয়া যায়? সে বর্ব্বরতা কি আর এক রকমের সভ্যতা নয়, যার মর্ম্মোদ্‌ঘাটনের চাবিকাঠিটি আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না আমাদের হালফ্যাসানি বৈঠকখানার নম্বরি ড্রয়ারগুলোতে? যাক্—বিজ্ঞানের কথা আবার পাড়িব। এখন আমরা দেখিতেছি যে—বিজ্ঞানের গোঁড়ামিই কেবল যে সব চাইতে মারাত্মক, গোঁয়ার গোঁড়ামি এমন নয়; বিজ্ঞানের অজ্ঞতাও সব চাইতে মারাত্মক, আকাট্ অজ্ঞতা। বিজ্ঞান পরের বেলা বেজায় বিজ্ঞ; নিজের বেলায় আনাড়ী অজ্ঞ। নিজের নাড়ীটাই সে জানে না। জানিলে ভস্ম হইয়া যাইত!

রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি—এ-সব ক্ষেত্রেও ভস্মলোচনের অভাব নেই। ডিমোক্রেসী দিনকতক জয়ডঙ্কা বাজাইল। এমনটি আর হয় না, হবার নয়। মানুষ মুক্তির কাছা চাপিয়া ধরে আর কি? এখন দেখি, ডিমোক্রেসী বিশ বাঁও জলে। অবশ্য, এখনও কেউ কেউ জয়ঢাকের বাঁওয়া বাজাইতে ছাড়েন নাই। ওটা নাকি মাৎ হইয়া গিয়াছে—It is a failure. অবশ্য, ডিমোক্রেসীর প্রেতটির এখনও "গতি" হয় নাই। সে "জবরদস্তিজ্‌ম"এর (অর্থাৎ Dictatorshipএর) মুখোস পরিয়া তাণ্ডব নাচ নাচিতেছে। রাশিয়ায় লেনিন্-ষ্টালিন্; ইতালীতে মুসোলিনি; জর্ম্মাণিতে হিট্‌লার্; এমন কি, "অতি-প্রগত" মার্কিণেও রুজ্‌ভেল্ট। এঁরা সবাই ডিমোক্রেসীর আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে বসেন নাই? মুখে আওড়ান মন্তরগুলো শুনিয়া ভুলিবেন না। "স্বস্তিকের" লাঞ্ছন পতাকায়, মুখে "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ"। স্বস্তিকের লাঞ্ছন রক্তের লাঞ্ছন হইতে কতক্ষণ, "শান্তিঃ শান্তিঃ" তাথৈ তাণ্ডবনৃত্যের "বব ববম্ বব ববম" হইতে কত দেরি? জগৎ উৎকণ্ঠায় থরহরি কম্পমান। কেননা, ১৯১৪-১৮তে ভূশুণ্ডী কাক উর্দ্ধচঞ্চু হইয়া রক্তপান করিয়াছিল, এবার সে ভস্মপান করিবে। ভাবীর আসমানী যুদ্ধে পৃথিবীটা যাতে চন্দ্রলোকের মতন হাওয়া-জলশূন্য নিরবচ্ছিন্ন আগ্নেয়-ভস্মাচ্ছাদিত বপু হইতে পারেন, এমন বন্দোবস্ত পার্থিব পুঙ্গবেরা আদা-জল-খাইয়া করিতে বসিয়াছেন। অর্থাৎ, সশরীরে, সজ্ঞানে, পৈত্রক প্রাণটি ট্যাঁকে করিয়াও কেহ অত্র বসবাসের ইজারা পাইবেন না। "সর্ব্বং ভস্মনে স্বাহা"—যজ্ঞ বসিয়াছে! সকলে আহুতি দেও।

সমাজ-নীতি, অর্থনীতি ক্ষেত্রেও হা'ল অথৈবচ বল্‌শেভিজ্‌ম, ফ্যাসিজিম্—এ সব পুরানো বিধি-ব্যবস্থা গুলোকে ইন্ধন করিয়া এক এক মহাযজ্ঞ সুরু করিয়া দিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যজ্ঞ "মহামারী" যজ্ঞ হইতেছে। অনেক কিছু ভস্ম হইয়া যাইতেছে, ভস্মবিভূতি মাখিয়া যে নবীন তার লেলিহান শিখাগুলোর ভেতর হইতে উত্থিত হইতেছেন, তাঁর রুদ্রনেত্র ও বজ্রদংষ্ট্রা এখন আমরা দেখিতেছি। জানি না, তিনি শিব কি দানব! রুদ্রের নেত্রাগ্নিতে মদনভস্ম হইয়াছিল, দিব্যসিংহের বজ্রাধিকনখস্পর্শে হিরণ্যকশিপুর স্ফীতো[illegible] বিদীর্ণ হইয়াছিল। বর্ত্তমান আবির্ভাবটি কি ম[illegible] (Lust of Domination) আর হিরণ্য (Power Gold, Capitalism)—এ দুয়ের সংহারের জন্য আপন "স্বরূপে" চোখ মেলিয়া যেদিন ইনি চাহিবে[illegible] সেদিন ইনি নিজেই ভস্ম হইবেন না ত'? কে জা[illegible] বাপু, রকম বেগতিক!

ভস্মলোচনকে নানান্ মূর্ত্তিতে আমরা দেখিতেছি[illegible] আমাদের নিজেদের নিজেদের ভেতরেই ইনি

অধিষ্ঠান করিতেছেন। এইখানে এঁর সত্যমূর্ত্তি। বাইরে ও-সব ছায়ামূর্ত্তি, সঙ্ঘাতমূর্ত্তি। ভেতরে না থাকিলে, বাইরেও নেই। ভেতরের projection বাইরে। ভেতরে ঐ তত্ত্বটি রহিয়াছে বলিয়া যা কিছু "আমি" দেখিতেছি, "ঈক্ষণ" করিতেছি, সেটাকেই ভাঙ্গা-গড়া করিতেছি। মনন, ঈক্ষণ, কল্পনা—এ সবের মানেই তাই। "আমি" যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ এ কাজ করিতেই হইবে। বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র রূপে "আমি" এই কাজটি করিতেছেন। তোমার আমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও সেই কাজেরই অল্প-স্বল্প রিহার্সল চলিতেছে। প্রকৃতির "সাম্যাক্ষোভে" মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি; কিন্তু অহঙ্কারতত্ত্বে না আসা পর্য্যন্ত (একটা Centre of Reference) ঠিক ঠিক সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কাজ সুরু হয় না। তিনটে আলাদা করিয়া বলিতেছি, কিন্তু, তিনেই এক, একেই তিন। অর্থাৎ, রুদ্র সংহার করেন বলিয়া তাঁর জন্য "ছাই" ব্যবস্থা করিয়াছি বটে, কিন্তু সবই ছাই, সবই ভস্ম। হাঁ—উপনিষৎ বলিয়াছেন। ভস্মের মূল লক্ষণ স্মরণ করিবেন। সেটা আরও ভাল করিয়া বোঝার চেষ্টা পরে আমরা করিব। গুরুরূপী রাম দর্পণায় (অর্থাৎ আত্মবিবেক) মারিয়া আমার "আমি"কে দেখাইয়া দেন। "তত্ত্বমসি" ভাবেই হোক্, আর "নিত্য কৃষ্ণদাস" ভাবেই হোক্। উভয়থা, তার ভেতর ঝুঁটা যেটি, "প্রাকৃত" যেটা, সেটা ভস্ম হইয়া যায়। তার ব্যবহারিক বন্ধন ("পশুপাশ") গুলো, মায়ার পাশ resolved ("ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি) হইয়া যায়। সেই ক্ষয়ই ভস্মত্ব। যে "আমি" "হংস" রূপে নিত্য "অন্তর্বহির্বিলায়তে," তাকে "সোঽহং" রূপে দেখাই দর্পণে মুখ দেখা। যে জ্যোতিঃ যাইতেছে, সে আবার ঠিক্‌রাইয়া (reflected হইয়া) ফিরিয়া আসিতেছে। এ কথাটার বিস্তারও পরের এক লেখায় করিব।

এইবার ভস্মাসুরের গুপ্ত আড্ডাগুলো একবার তল্লাস করিয়া দেখিব। নানান্ ঠাঁই থেকে ভস্ম কিছু কিছু আহরণ করিয়া আনি। তার পর বুঝিব আসলে সেটা কি চিজ্। একটু আগে বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ড আর ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের কথা হইতেছিল। সাধনরসিকেরা আমাদের বা জীব-মাত্রেরই দেহকে অনেক সময় ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া গেছেন। তার কারণ আছে। কিন্তু সে কথা আপাততঃ থাক্। আমরা ভস্মাসুরের গল্পে অণুর ব্রহ্মাণ্ড কটাক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। সেখানে দেখিয়াছি—একটা নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রের চারিধারে এবং তারই আকর্ষণে বিধৃত হইয়া এক বা বহু ইলেক্‌ট্রণ (ইউনিট্ নেগেটিভ্ ইলেকট্রিক্ চার্জ্জ) গোলাকার পথে পাক খাইতেছে; পাক খাইতে খাইতে এক গোলাকার পথ হইতে আর এক গোলাকার পথে লাফ মারিতেছে; সময় সময় "ভ্রষ্ট" হইয়া উধাও-ও হইতেছে। কেন্দ্রটাও শান্ত সমাহিত নয়। সেখানেও জটলা। কোন কোনটাতে বা "আগুনের" ফোয়ারা বাহির হইতেছে। হাউইবাজী।

এর পরের লেখায় ছবিখানা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া ফোটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ দেখিতেছি যে, অণুর জগৎ যে "ব্রহ্মাণ্ড," সে পক্ষে সন্দেহ নেই। অতটুক্ যায়গায় "স্ত্রীপুরুষে" সব গা-ঘেঁষাঘেঁষি রহিয়াছে, ভাবিবেন না। আমাদের সৌরজগতের মতনই ঢালাও বন্দোবস্ত। প্রোটন-ইলেক্‌ট্রণদের "দেহের" তুলনায় "চরিয়া খাবার" জায়গা প্রচুর। ফাঁকা জায়গা ঢালাও। এ সবের হিসাব আমরা কিছু কিছু পাইতেছি। স্থূলের তুলনায় সূক্ষ্মে বরং বন্দোবস্ত ঢালাও বেশী বেশী। গতি, শক্তি—এ সব স্কেলে। একটা ইলেক্‌ট্রণ যে রেটে তার কক্ষে ছোটে, তার সঙ্গে তুলনা করিলে আমাদের ধরিত্রীর শূন্যপথে আবর্ত্তনগতি পঙ্গুর গতি! রেডিয়ম জাতীয় পদার্থের ভেতরে যে শক্তি বা এনার্জ্জি স্বতঃ (ঐ ফোয়ারার বা হাউইবাজীর মতন) অভিব্যক্ত হইতেছে, তার সঙ্গে আমাদের পরিচিত কোন শক্তিরই তুলনা হয় না। সমারফেল্ড প্রমুখেরা গণিয়া দেখাইয়াছেন যে, কেমিকাল্ একশনে (ধর, দহনে) যে শক্তি পুটিত (involved) থাকে, তার চাইতে বহু লক্ষগুণ শক্তি রেডিও-একটিভিটিতে সাড়া দেয়। অত শক্তি নইলে মোজ এটমের (অর্থাৎ, যেটা সচরাচর বিভাজ্য নয়) ঘর ভাঙ্গে, পোড়ে? সৌরমণ্ডলের বাইরের মণ্ডলের ("atmosphere"এর—বায়ুমণ্ডল নয়, মনে রাখিবেন) উত্তাপ কম্‌সে কম ৫।৭ হাজার ডিগ্রী। যত তার কেন্দ্রের দিকে যাওয়া যায়, ততই গরম হুহু করিয়া বাড়িতে থাকে। কেন্দ্রের কাছাকাছি উত্তাপ নাকি নিযুতের

সংখ্যায় হিসাব করিতে হয়। কোন কোন নক্ষত্রে আরও বেশী। সূর্য্যের বাইরের মণ্ডলে পার্থিব ভূতগুলোর তৈজসবপু (Platinum gas ইত্যাদি) বিদ্যমান। রশ্মি-বিশ্লেষণ করিয়া (Solar Spectrum এ) তা আমরা জানিতে পারি। কিন্তু, হিসাবমত, সূর্য্যের ভিতর মহলে যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ছবি দেখিতেছি, তাতে মনে হয়, সেখানে পার্থিব ভূতগুলোর অনেকেই শুধু যে "বায়ুভূত নিরাকার" হইয়া আছেন এমন নয়; অনেকেই চিতায় আরোহণ করিয়া ভস্মত্ব, পঞ্চত্ব পাইয়াছেন। অর্থাৎ, ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া আর কিছু হইয়াছেন। গোটা দুচ্চার "শক্তপ্রাণী" আছেন, তাঁরা অমনধারা ফার্নেসে পড়িয়াও, অমন আবর্ত্ত ও বোম্বার্ডমেণ্টের ভেতর রহিয়াও, কায়ক্লেশে টিকিয়া যান। বড় বড় গেরস্তরাই (কম্‌প্লেক্স এটম্‌গুলো) সব্বার আগে কাবাৎ হন; যাঁদের সাদাসিধে গড়ন-চলন, তাঁরা সহজে কাবু হন না। সৌরমণ্ডলে ও কোন কোন নক্ষত্রমণ্ডলে এই দহন ও ভস্মীকরণ জোরসে চলিতেছে বেজায় গরম বলিয়া চলিতেছে। ভেতর মহলে, কেন্দ্রের কাছাকাছি বেজায় গরমও বটে, বেজায় চাপ (প্রেশার্‌)ও বটে। এখন এই যে বিরাট অগ্নিকাণ্ড আর ভস্মলীলা, এটা শুধু যে বিরাটের দেশেই এমন নয়; বালখিল্যের দেশেও বটে। অথচ, বালখিল্যের দেশে শক্তি যে অঙ্গুষ্ঠমাত্রবপু পরিগ্রহ করিয়াছেন, ত নয়। অর্থাৎ, বালখিল্যের দেশে আসিয়া আমরা যেন না ভাবি—এ লিলিপুটিয়ানদের শক্তি সামর্থ্য, গতিস্থিতি সবই গণ্ডূষজলবিহারী সফরীসদৃশ! তা নয়; তাদের ধরণধারণ সব তিমিঙ্গিলগিলতুল্য। মহাতেজাঃ এর, মহান্‌ দের উদ্যম, মহতী এদের পরিণতি! তা নৈলে, এটম্‌ যে এটম্‌, একটা আগ্নেয়গিরির (বৈয়াকরণ দূষবেন নব, কথাটা চলিয়াছে; আর তার ব্যোৎপত্তিক টীক ধরিয়া তাকে টানিয়া রাখা গেল না) অগ্নিগর্ভে যে এটম্‌ বিশীর্ণ হয় না একট মৈনাক হিমালয়ের চাপে যে এটম্‌ পিষিয়া যায় না, সেই এটমই ফুঁকিয়া ভস্ম হইয়া যাইতেছে, ঐ লিলিপুটের দেশের অগ্নিকাণ্ডে! "অগ্নি" শব্দটাকে লক্ষণায় বড় করিয়া দেখিবেন। যাই হোক্‌—এই বালখিল্য জগৎ যে একটা জগৎ, একটা ব্রহ্মাণ্ড, তাতে আর সন্দেহ কি?

আমাদের এই বিরাট্‌, স্থূল জগৎটাকেও (Material Universeটাকে) আমরা ত' চিরদিন ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া আসিতেছি। চারুপাঠে "ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড" পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তাকে ব্রহ্মাণ্ড বলিতাম কেন? ব্রহ্মা "অপ্সু," কি না কারণ-সলিলে, বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই বীজ হইতে ক্রমে এই অণ্ড (আণ্ডা?) পয়দা হইয়াছে,—এই জন্য কি? সলিলে বীজ, তা থেকে আণ্ডা; সেই আণ্ডা ক্রমে বড় হইতে লাগিল; তারির ভেতর, দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এই সব পরিকল্পিত। এ বৃত্তান্ত পুরাণে শুনি। উদাহরণ স্বরূপ —মনুসংহিতার গোড়াতেই। এখন বর্দ্ধমান খাজা না হয় খাসা জিনিয। কিন্তু এই বর্দ্ধমান আণ্ডাটি? "ছোট ডিম" বড় ডিম হইতেছেন। না হইয়া উপায় কি? ডিমের বড়তে আর তেমন লোভ বর্ণগুরুদেরও নেই; ডিম ছোটই না কি সরেশ। ভিটামিন্‌ও বেশী। ছোটর বংশ কেবল ম্লেচ্ছভূমিতে কেন, আর্য্যাবর্ত্তেও নির্ব্বংশ হইতে বসিল। ব্রহ্মাবর্ত্তে, খোদ ব্রহ্মলোকেও, বোধ করি এটা বেজায় লোভের সামগ্রী। প্রজাপতি পাছে নিজের প্রসূত ডিম্বটি "ছোট" দেখিয়া নিজেই নির্ব্বংশ করিয়া বসেন, এই ভয়েই বোধ হয় ডিম পড়িয়াই ঝটিতি বাড়িতে লাগিল—বর্দ্ধমান হইল, "ব্রহ্মা" হইল। সাবধান তাই বর্দ্ধমান, আর বর্দ্ধমান তাই বিদ্যমান। আচ্ছা, এ সব কি স্রেপ গাঁজাখুরি? নৈমিষারণ্যের সিদ্ধাশ্রমের ধোঁয়াটাকেই এতদিন আমরা গাঁজার ধোঁয়া ভাবিয়া আসিয়াছি। এখন দেখিতেছি, ক্যাভেণ্ডিশ্‌ ল্যাবরেটারির ধোঁয়াটাও তাই।

কিছু দিন আগে, এমন কি পনর বিশ বছর আগেও, ও-দেশের জ্যোতিষী ও জড়তত্ত্ববিদেরা ভাবিতেন—এ বিরাট বিশ্বটা অসীম, অনন্ত। কোন এক দিকে "নক্ষত্রবেগে" অথবা, রশ্মিবেগে (speed of light) ছুটিয়া চল—কত কত গ্রহ, তারা, নীহারিকার জগৎ ছাড়াইয়া চলিবে; এক ছাড়াইয়া যাইবে, আর কিছু আসিয়া পড়িবে। এই রকম ধারা অফুরন্ত যাত্রা তব! তা হইলে, এ বিশ্ব, এ বিরাট্‌—"ব্রহ্ম" (কি না, মহৎ বটে, কিন্তু, এটা আর "অণ্ড" মনে করা চলে না। ব্রহ্মাণ্ডের ধারণাটাই আজগবি, ছেলেমি। মাথার ওপর রাত্রিকালে

ঐ নক্ষত্রখচিত নীল চন্দ্রাতপটা একটা "ডোমের" মতন দেখায়। ওটা সেই আণ্ডার ওপরকার খোলা। নীচের আধখানাও তা হইলে আছে। এই ভাবে "ব্রহ্মাণ্ডের" কল্পনা হইয়াছিল। ঐ ছায়াপথটাকে ডিম্বের একটা স্পষ্ট "বেড়" রূপেই দেখিতেছি না কি? পৃথিবীটা একটা আণ্ডার মতন; নিরামিষমতে ("without eggs") কমলা-লেবুর মতন। গ্রহ-টুহ, সূর্য্য, তারা—এরাও প্রায় ঐ আকার। ধূমকেতু, নীহারিকা—এদের ভোল আলাদা। কিন্তু ধরা যাক—কোথাও বা আণ্ডা তৈরি হইতেছে, কোথাও বা আণ্ডা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এতটাও না হয় চলিল। কিন্তু সমগ্র বিরাট্ সম্বন্ধে কোনও একটা আকার কল্পনা করা যায় না। কেন না, স্পেস্ও অসীম, ভুবনও অসীম। ভুবনকে "চতুর্দ্দশ" করা আবার কি? উপরে সাত থাক্, নীচে সাত থাক্—এ আবার কি? ওটা হয় ছেলেমি, নয় রূপক-টুপক একটা কিছু।

কিন্তু এ কি কথা শুনি আজ গণিতের মুখে, হে নব বিজ্ঞান? বিরাট্ জড় জগৎটা (Universeটা) অসীম নয়, সসীম (finite)। খুবই বিরাট্, তবু সসীম। আর এর আকার? যে দেশতত্ত্বে বা Spaceএ এই বিরাট্ রহিয়াছে, সে স্পেস্ বক্র। বাঁকা তুমি শ্যাম, তোমার নয়ন বাঁকা, চলন বাঁকা, বাঁকা তোমার ঠাম, নাম কামও বাঁকা। সোজা কিছুই নেই। স্পেস্ বাঁকিয়া গিয়াছে এমন নয়; বাঁকিয়া আবার ঘুরিয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ, সেই আণ্ডা! "ব্রহ্মাণ্ড" বলিতে তিনটি জিনিষ আসিয়া পড়ে না কি? প্রথম—এটা বড় হইলেও এর একটা সীমা, পরিধি আছে। দ্বিতীয়—এটা বক্র হইয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে। তৃতীয়—এটি বর্দ্ধমান। এটি "মরিয়া" ভূমিষ্ঠ হয় নাই (পুরাণে মার্ত্তণ্ডের গল্প স্মরণ করিবেন)। —Stillborn নয়। জ্যান্ত, তাজা আণ্ডা। ক্রমে বাড়িতে থাকেন। কত বড় যে হইবেন তার ঠিকানা নেই। একেবারে হালের বিজ্ঞানের ভাষায়—Universe শুধু যে Finite এমন নয়; এটা আবার Expanding। কথাটার প্রমাণ সোজা কথায় দেওয়া শক্ত। আইন্‌ষ্টাইন্ ও পরবর্ত্তীদের আঁকের খাতা পাড়িতে হইবে তা হইলে। সেটা চাট্টিখানি কথা নয়। তবে শিষ্ট-উক্তি শুনাইতেছি। শুনিয়া বিচার করিবেন—গাঁজা খাইত কে—সিদ্ধাশ্রম, না, ক্যাভেণ্ডিশ্ ল্যাবরেটরি?

স্যার্ জেম্স্ জিন্‌স্ জাঁদরেল জ্যোতিষী গণৎকারও ভাল, কথকও ভাল। বেতারেও কথা কহিয়া থাকেন। লাখে লাখে বিকোয়'। এঁর একটা বেতারবার্ত্তা এখানে শোনাইব।···But the modern astronomer regards the universe as a finite closed space, as finite as the surface of the earth, and if he is not yet acquainted with the whole universe, he has good reason to hope that he will be before very long. We of to-day no longer think of vast unknown and unsounded depths of space, stretching interminably away from us in all directions. We are beginning to think of the universe as Columbus, and after him Magellan and Drake, thought of the earth—something enormously big, but nevertheless not infinitely big; something whose limits we can fix; something capable of being imagined and studied as a single complete whole; something capable of being circumnavigated, if we like......Scientists now believe that if we could travel straight on through space for long enough, we should come back to our starting point; we should have travelled round the universe.' পুরাণে নানা স্থানে দেখি নারদাদি দেবর্ষিরা ভুবন পরিক্রমা করিতেছেন। পরিক্রমার টাইম-টেবলও আইন্‌ষ্টাইন্-"পন্থী"রা তৈয়ারি করিয়াছেন। পুরাণে বৎসরের মনুষ্যমান, পিতৃমান, দেবমান, ব্রহ্মমান—এসব কথা আছে। তাঁরা রেলিটিভিটির মূলতত্ত্ব জানিতেন। কত লক্ষ কোটি বর্ষে ব্রহ্মার এক দিন হয়, তা কষিয়া দেখিবেন। বর্ত্তমানে জ্যোতিষে "রশ্মিমান" ("Light-year") বর্ষ চলতি। কোন্ তারা হইতে আলো পৃথিবীতে আসিতে কয় বৎসর লাগে, সেটি জানিয়া বলা হয়—অমুক তারা অত "লাইট্-ইয়ার্" দূরে অবস্থিত। লাইট্ প্রতি সেকেণ্ডে পৌনে দু'লাখ মাইলের চাইতেও বেশী চলে। সূর্য্য হইতে আসার সময় মোটে আট মিনিট। এখন, হালের পরিকল্পিত ব্রহ্মাণ্ডের পরিধির হিসাব শুনুন—'The circumference of the

universe is likely to lie somewhere between 8,000 million light-years and 500,000 million light-years." সূক্ষ্ম হিসাব নয়, তবু একটা আন্দাজ করার চেষ্টা হইতেছে ত'! যেমন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে—পাঁচি ধোপানী বি. সি. ৫০০ অথবা এ. ডি. ৫০০এ প্রাদুর্ভূত হইয়া কলিকলুষ ক্ষালন করিয়াছিলেন। ল্যাজা মুড়ো ত' হাতে পাওয়া গেল! আর সে যাবে কোথা? আমরাও দেখিতেছি—বিরাট ব্রহ্মের ল্যাজা মুড়ো হাতে পাইতেছি! রহস্য যাক্—তবে এতে বিরাট্ সত্য সত্যই বামন হইলেন না। আমাদের অতিকায় দূরবীণগুলো এ পর্য্যন্ত এ বিরাটের দেশে যতটুকু জরিপ করিয়াছে, তাহার মাপ বোধ হয় মাত্র ১৪০ নিযুত লাইট্-ইয়ার্। কোথা পঞ্চলক্ষ নিযুত, আর কোথা একশ' চাল্লিশ নিযুত। অজানার মহানিশায় এখনও বিজ্ঞানের বীক্ষণ-প্রেক্ষণ-যন্ত্রগুলো জোনাকির মতন টিপ্ টিপ্ করিতেছে! তবু ত' অসীম নয়, অনন্ত নয়! একদিন—তার বুকের আশা—বিজ্ঞান এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে "একঃ সূর্য্যস্তমো হন্তি" হইয়া দেদীপ্যমান হইবে!

কিন্তু মুস্কিল আছে। অণ্ডটি না কি বর্দ্ধমান। ব্রহ্ম শব্দের ধাতু "বৃংহ"এর এক মানে বৃদ্ধি। "ব্রহ্মাণ্ড" বলিয়া প্রাচীনেরা এই বৃদ্ধিটাও বোঝাইতে চাহিতেছেন। তন্ত্র-শাস্ত্র ব্রহ্মাণ্ডকে বুদ্বুদের তুল্য ভাবিতে বলিতেছেন। বিজ্ঞানও দেখি সোপ্-বাব্লের নমুনা দিতেছেন। বাব্লের পীঠে যদি একটা পোকা ঘুরিয়া চলে, তবে সে ঘুরিয়াই আসিবে; বাব্ল-ছাড়া কখনও হইবে না। স্পেসেও তাই। স্পেসে চলিতে সুরু করিয়া আমরা লক্ষ কোটি লাইট্-ইয়ারে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিব; কিন্তু স্পেস্ ছাড়া কখনও হইব না। যাই হোক্—এই বিশ্ব বুদ্বুদটা জন্মিয়াই বড় হইতে থাকে, ক্রমেই বড়। Lemaitre (একজন বেল্জিয়ান্ "গণৎকার") দেখাইয়াছেন যে—"Einstein's universe has properties like those of a soap-bubble.…As soon as it comes into existence, it starts swelling out in size, and must go on expanding indefinitely." আজব কথা! ভস্মাসুর ও ভস্মলোচনের ভস্ম পরীক্ষায় আমাদের এ সব আর কিছু শুনিতে হইবে।

জীবন-মরণ

শ্রীবীরেন্দ্রলাল রায় বি-এ

মরণ কোথা মরণ কোথা
জীবন যে রে উথ্‌লে ওঠে
আমার প্রাণে তোমার দানে
গন্ধভরা কুসুম ফোটে।
ভোরের পাখী উঠ্‌ল ডাকি—
"জাগো জীবন মরণ বনে"
ফুলের হিয়া উচ্ছ্বসিয়া
সই পাতাল হাওয়ার সনে।
পাগল অলি কুসুম কলি
গোপন গানে জীবন ঢালে;
আশার ছবি প্রভাত রবি
আঁকে তিলক ধরার ভালে।

জীবন ঘুমায় মরণ চুমায়
নদীর পারে সাঁঝে দূরে
প্রিয়ার সনে বৃন্দাবনে
ওই নূপুরে জীবন ঝুরে।
গোপন রাতে আঁখির পাতে
ঝরে ধারা কাহার লাগি'?
অভিসারে বারে বারে
চলে কাহার শরণ মাগি!
মরণ কালো জ্বালায় আলো
প্রেমের রূপে কর্‌তে বরণ;
বাঁচ্‌বি যদি প্রেমের নদী
বইছে নে রে তাহার শরণ॥

ঘূর্ণি হাওয়া

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৩১)

শরীরটা কয় দিন হইতে ভালো যাইতেছিল না। বিশ্বপতি দুই দিন কোথাও বাহির হয় নাই, ঘরেই শুইয়া পড়িয়া দিন কাটাইতেছিল।

আহারের ব্যবস্থা কাকিমার ওখানে ছিল। তিনি প্রত্যহ দু'তিনবার যাওয়া-আসা করিতেন, বিশ্বপতিকে দেখা-শোনা করিতেন।

আজকাল বিশ্বপতিকে দেখার লোকের অভাব ছিল না। তাহার অনেক টাকা হইয়াছে কথাটা খুব শীঘ্র গ্রামের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নবীন মিত্র তাঁহার বয়স্থা কন্যাটীর উপযুক্ত পাত্ররূপে তাহাকেই নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন এবং বিশ্বপতির নিকটে এ প্রস্তাবও করিয়াছিলেন। কিন্তু সে হাঁ বা না কিছুই বলে নাই। নবীন মিত্রের আশা ছিল যথেষ্ট; তিনি সেই জন্যই বিশ্বপতিকে সকলের বেশী যত্ন দেখাইতেছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার পরে বিশ্বপতি একাই ঘরের মধ্যে শুইয়া পড়িয়া ছিল। খানিক আগে নবীন মিত্র চলিয়া গিয়াছেন। কাকিমাও একবার সাড়া দিয়া গিয়াছেন।

বাহিরে শুক্লা দশমীর চাঁদের আলো। চারি দিক অম্লান জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেছে। দূরে কোথায় কোন্ নিভৃত নিকুঞ্জের আড়ালে লুকাইয়া একটী পাপিয়া অবিশ্রান্ত চীৎকার করিতেছিল—চোখ গেল, চোখ গেল।

ঘরে লণ্ঠনটী খুব মৃদু ভাবে জ্বলিতেছিল। এক কোণে আড়ালভাবে থাকায় তাহার মৃদু আলো ঘরের মধ্যে স্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। বাহিরের স্ফুট জ্যোৎস্না মুক্ত জানালাপথে আসিয়া কতকটা বিছানার উপর কতকটা মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাতাস ঝির ঝির করিয়া জানালা দিয়া আসিয়া দেয়ালে বিলম্বিত ছবির কাগজগুলাকে কাঁপাইয়া দিতেছিল।

বিশ্বপতি বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল।

আজ রাত্রিটা কি সুন্দর। মনে পড়িতেছিল পুরীতে সমুদ্রতীরে এমনই জ্যোৎস্নালোকে নন্দার সঙ্গে বেড়ানোর কথা। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র। ঢেউয়ের উপর চাঁদের আলো পড়িয়া কি সুন্দর লুকোচুরি খেলা করিতেছিল। পায়ের তলায় বালুকারাশি ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। আজ যেমন জ্যোৎস্নাদীপ্ত নীলাকাশের বুকে কোথা হইতে টুকরা টুকরা সাদা মেঘ ভাসিয়া আসিয়া দৃপ্ত চাঁদের উপর দিয়া আবার কোন্ অজানা দেশে চলিয়া যাইতেছে—সেদিনও তেমনই চলিতেছিল।

নন্দার সে কি আনন্দ! তাহার মুখের কথা সেদিন ফুরায় নাই। কলকণ্ঠ বিহগীর ন্যায় সে কেবল সেদিন গল্প করিয়াছিল। বিশ্বপতি চলিতে চলিতে কতবার সে জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল হাসিভরা মুখখানার পানে তাকাইয়াছিল। কতবার তাহার মনে হইয়াছিল, আকাশের চাঁদ সুন্দর, না এই মুখখানি সুন্দর। তুলনায় যেন নন্দার মুখখানাই অধিকতর সুন্দর বলিয়া মনে হইয়াছিল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বিশ্বপতির সমস্ত বুকখানা দলিয়া দিয়া গেল। হায় রে, সে আজ কোথায়? সে ওই চাঁদের

রাজ্যেই চলিয়া গেছে। বিশ্বপতির ব্যগ্র দুইটী বাহুর বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেছে। ব্যগ্র বুকের আকুল আহ্বানে দেখা দেওয়া দূরে থাক, একটী সাড়াও দিবে না।

কিন্তু বিশ্বপতি শুনিয়াছে অন্তরের একাগ্রতাময় আহ্বান না কি অনন্তের অধিবাসীকেও চঞ্চল করিয়া তুলে,—তাহাকে ইহলোকে টানিয়া আনে। আজ সে অনন্তকে বিশ্বাস করিতে চায়। মরিলেই সব ফুরায় বলিয়া ধারণা করিতে তাহার বুক ফাটিয়া যায়। নন্দা অনন্তে আছে, তাহার সব শেষ হইয়া যায় নাই—হইতে পারে না। আজ সে প্রাণপণে বড় ব্যগ্রতায় নন্দাকে ডাকে, নন্দা কি একবার আসিয়া তাহাকে দেখা দিয়া যাইতে পারিবে না?

নন্দা, নন্দা, কোথায় নন্দা—কোথায় তুমি? একটী-বার মুহূর্ত্তের জন্যও কি আসিতে পারিবে না? একটীবার চোখের দেখা দিয়া যাইতে পারিবে না? ওগো অনন্ত-বাসিনি, একটীবার মুহূর্ত্তের জন্যও এসো, দেখা দাও।

বিশ্বপতি চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

দূরে কোথায় বাঁশী বাজিতেছিল। জ্যোৎস্না রাত্রে সে বাঁশীর সুর বড় সুন্দর শুনাইতেছিল।

বারাণ্ডায় একটা শব্দ শুনিয়া সে চাহিল,—বোধ হয় মিত্র মহাশয় আসিয়াছেন।

কিছুক্ষণ অতীত হইয়া গেল, কেহ আসিল না।

দরজার কাছ হইতে কে যেন সরিয়া গেল, ক্ষীণ আলোকে যেন তাহার শাড়ীর লাল পাড়টুকু দেখা গেল। কে যেন দরজার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল,—বিশ্বপতি এ পাশ ফিরিতেই সে পাশে লুকাইল।

"কে, কে ওখানে—"

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

নন্দা আসিয়াছে কি? হাঁ, নিশ্চয়ই সে আসিয়াছে। সে ছাড়া আর কেহ নহে। বিশ্বপতিকে সে বড় ভালোবাসিত। বিশ্বপতির আহ্বানে সে তাহার বড় প্রিয় চন্দ্রলোকে পর্য্যন্ত থাকিতে পারে নাই। সে বিশ্বপতির কাছে আসিয়াছে।

"নন্দা, নন্দা—"

বিশ্বপতি ডাকিতে লাগিল—"এদিকে এসো, সামনে এসো নন্দা। এসেছ যদি—নিষ্ঠুরার মত চলে যেয়ো না।"

ধীরপদে একটী নারীমূর্ত্তি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। মৃদু আলোকে স্পষ্ট দেখা গেল না, মনে হইল তাহার মুখের অর্দ্ধেকটা অবগুণ্ঠনে আবৃত।

"নন্দা—"

বিশ্বপতি একেবারে উঠিয়া বসিল।

"আমি নন্দা নই। নন্দা নেই, সে মরে গেছে। মরা মানুষ জীবন্তের রাজত্বে আসতে পারে না।"

এ কি, এ কাহার কণ্ঠস্বর? বিশ্বপতি বিস্ফারিত নেত্রে রমণীর পানে তাকাইয়া রহিল। অস্ফুটে তাহার কণ্ঠ হইতে অজ্ঞাতেই বাহির হইল,—"চন্দ্রা—"

মেয়েটী হঠাৎ তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া, তাহার পায়ের উপর একেবারে উপুড় হইয়া পড়িল। আর্ত্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল, "না গো, বাগ্দীর মেয়ে চন্দ্রাও যে সৌভাগ্য লাভ করেছে, আমি তাও পাই নি। আমি নন্দা নই, চন্দ্রাও নই, আমি অভাগিনী কল্যাণী"—

"কল্যাণী—"

সামনে কালসাপ দেখিয়াও মানুষ বোধ হয় এত চমকাইয়া উঠিত না। বিশ্বপতি পা সরাইয়া লইতে গেল, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িতে গেল, কল্যাণী পা ছাড়িল না। দুই হাতে পা দুখানি চাপিয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিশ্বপতি যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না—কল্যাণী ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই কল্যাণী—যাহাকে সে একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়া বুঝিয়াছিল কল্যাণী কোথায় গিয়াছে, সুখসমৃদ্ধির চরম সীমায় সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেই কল্যাণী, যাহার নাগাল পাওয়া তাহার মত লোকের পক্ষে কল্পনারও অতীত! সে আজ আবার এখানে, এই পল্লীতে—এই কুটীরে ফিরিয়াছে?

উভয়েই নীরব। কল্যাণী কেবল কাঁদিতেছিল। আর বিশ্বপতি ভাবিতেছিল দূর অতীতের ও বর্ত্তমানের কথা।

তবুও তো সে সংসার পাতাইয়াছিল। হয় তো কল্যাণীকে লইয়া সে সুখী হইতে পারিত। বাল্য প্রেমের কথা ভবিষ্যতে কোন দিন না কোন দিন তাহার মন হইতে মিলাইয়া যাইত। তাহা হয় নাই। দারুণ ঈর্ষায়

কল্যাণীর হৃদয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল,—সে নন্দার প্রতি স্বামীর আকর্ষণ সহিতে পারে নাই।

কেই বা পারে? বড় ভালোবাসার পাত্র বা পাত্রীকে অপরের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে কে পারে? নারী আত্মহত্যা করে, সুখের সংসারে আগুন ধরাইয়া দেয়, নিজেকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়,—ইহার মূলে অনেক সময় এই একটী কারণই থাকে না কি? সরল প্রকৃতি পুরুষ অনেক আঘাত সহিতে পারে, অনেক ক্ষতি সহিতে পারে; দুর্ব্বল নারী কোনও আঘাত, কোনও ক্ষতি সহিতে পারে না।

বিশ্বপতি বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল। তখনও বাহিরে অম্লান চাঁদের আলো, তখনও পাপিয়া দূরে কোথায় ডাকিতেছে—চোখ গেল, চোখ গেল।

চাহিয়া চাহিয়া চোখ জ্বালা করিতে লাগিল; বিশ্বপতি চোখ ফিরাইয়া পদতলে নিপতিতা নারীর পানে তাকাইল।

অনুতাপ? বোধ হয় তাহাই ঐশ্বর্য্য। তাহার অনুপমেয় অসীম সৌন্দর্য্যে ইহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে নাই। দরিদ্রের এই পর্ণকুটীরই তাহাকে শত বাহু মেলিয়া ডাকিয়াছে। সে দূরে থাকিতে পারে নাই,—সহস্র বন্ধন দুইটী কোমল হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে ঘরের পানে ছুটিয়া আসিয়াছে।

সে আশ্রয় চায়। এই ঘরে তাহার পূর্ব্ব-স্মৃতি লক্ষ শিকড় ছড়াইয়া ঝাঁকিয়া বসিয়াছে। সে এখন এই স্থানে তাহার জায়গা গড়িয়া লইতে আসিয়াছে। কিন্তু তাহা কি আর সম্ভব হয়? কল্যাণী ভাবিয়াছে, সেই শিকড় দিয়া সে আবার বাঁচিবার সম্বল আহার্য্য যোগাড় করিয়া লইবে। কিন্তু তাই কি হয়? বাহিরের আকর্ষণে সে যখন ঝুঁকিয়াছিল, তখন সেই সূতার মত লক্ষ বাঁধন যে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সে দিক কি সে দেখে নাই?

বিশ্বপতি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

(৩২)

"কল্যাণী,—রাঙাবউ—"

কল্যাণী চমকাইয়া উঠিয়া মুখ তুলিল। সেই "রাঙাবউ" আহ্বান। বহু কাল সে এ ডাক শুনিতে পায় নাই। অনেক আদরের সম্ভাষণ হয় তো সে শুনিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল কি?

একবার মাত্র মুখ তুলিয়াই সে আবার বিশ্বপতির পায়ের উপর মুখখানা রাখিল।

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসটাকে অতি কষ্টে প্রশমিত করিয়া ফেলিয়া বিশ্বপতি বলিল, "কিসের আকর্ষণে আজ রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এই দীন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে এলে রাঙাবউ? এখানে এমন কিছুই নেই যা তোমায় এতটুকু তৃপ্তি শান্তি দিতে পারবে!"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কল্যাণী বলিল, "ভুল বুঝেছ গো, আমায় তুমি ভুল বুঝেছ। আমি আমার অন্তরের ডাকে এসেছি। এই ঘরের আকর্ষণ আমি কিছুতেই ঠেকাতে পারলুম না। এই গাঁয়ের পথ আমায় ডেকেছে, এর ঘাট আমায় ডেকেছে, এর আকাশ, বাতাস, গাছ, লতা আমায় ডেকেছে। এর ডাক এড়িয়ে আমি কোথায়—কেমন করে থাকব গো, আমি কোথায় থেকে শান্তি পাব?"

গম্ভীরভাবে বিশ্বপতি বলিল, "যারা ডেকেছে তাদের কাছে যাও কল্যাণী। আমি তো তোমায় ডাকি নি। তবে আমার কাছে এসেছ কেন?"

"না, তুমি আমায় ডাক নি। না ডাকতে এসেছি, এ অপরাধের শাস্তি দাও। তোমার দেওয়া দণ্ড যতই কঠোর হোক—আমি তা মাথা পেতে নেব। আমায় দণ্ড দাও গো, আমি সেই দণ্ড নিতেই এসেছি।"

সে বিশ্বপতির পায়ের কাছে মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

ব্যস্ত হইয়া বিশ্বপতি তাহাকে ধরিবার জন্য হাতখানা বাড়াইয়াই সরাইয়া লইল,—"আঃ, ও কি করছ কল্যাণী? ওঠ—ছিঃ, ও রকম পাগলামী করো না।"

কল্যাণী মাথা তুলিল।

তাহার মুখ তখন বিষাদ-মলিন, গম্ভীর। বলিল, "আমায় জিজ্ঞাসা করছ কেন এলুম? কেন এলুম সে কথা বললে বিশ্বাস করবে কি?"

বিশ্বপতি বলিল, "আমায় কোন কথা বিশ্বাস করানোর জন্যে তোমার এত ব্যাকুলতা কেন কল্যাণী? আমি অতি ক্ষুদ্র, আমার ওপরে নির্ভর করাই যে তোমার অনুচিত।"

কল্যাণীর মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "আমি কোথাও থাকতে পারি নি, তাই এখানে চলে এসেছি।"

"কিন্তু যে দিন চলে গিয়েছিলে সে দিনে কি ভেবেছিলে কল্যাণী—পেছনে যাকে ফেলে চলছো, সে তোমাকে অবিরত ডাক দেবে, সেই ডাক তোমায় কোথাও স্থির হয়ে থাকতে দেবে না?"

বিশ্বপতি হাত বাড়াইয়া লণ্ঠনের দম বেশী করিয়া দিয়া ভালো করিয়া কল্যাণীর পানে তাকাইল।

কল্যাণী মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল। একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব।

বিশ্বপতি ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। বলিল, "আর রাত করছ কেন—এখন যাও।"

কল্যাণী মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিল। সে চোখে সর্ব্বহারার দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেন তাহার যাহা কিছু ছিল সব সে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ধীর কণ্ঠে সে বলিল, "আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ; কিন্তু আমি যাব বলে তো আসি নি, তোমার পায়ের কাছে থাকব বলে এসেছি। ভয় নেই, আমার দ্বারা তোমার এতটুকু অনিষ্ট হবে না। আমি তোমার কাছ হতে অনেক দূরে সরে থাকব। আমায় কেবল এই ঘরে থাকবার অনুমতি দাও।"

বিশ্বপতি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল, একটী কথাও বলিল না।

কল্যাণী কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আমায় এতটুকু অধিকারও দেবে না, কিন্তু চন্দ্রাকে তো অনেকখানিই অধিকার দিয়েছিলে? ঘৃণ্য বাগ্দীর মেয়ে হয়েও সে যা পেলে, আমি তা পাব না,—তার এতটুকু পাওয়ার দাবী করতে পারব না?"

শক্ত ভাবেই বিশ্বপতি বলিল, "ভুল করেছ কল্যাণী। চন্দ্রা গৃহত্যাগ করে গেলেও তার স্থান ছিল ঘরে—কেন না আমার জন্যেই সে গিয়েছিল। কিন্তু তুমি তো আমার জন্যে—আমায় বাঁচাতে যাও নি কল্যাণী,—আমায় সব রকমে ধ্বংস করতে তুমি চলে গেছলে। কিন্তু কি চমৎকার অভিনয় করতেই শিখেছ, আমি তাই ভাবি। তোমার মত "ষ্টেজ ফ্রি" হতে খুব কম অভিনেত্রীই পারে। সেই জন্যেই তোমার নাম চিত্রজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। চন্দ্রা গ্রাম ত্যাগ করে গেছে, আর সে এখানে আসে নি। আমার জন্যে সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছে, তবু সে আমার শত সহস্র অনুনয়েও এখানে এল না। আর তুমি—তুমি কল্যাণী,—যে মুখে নিজের হাতে চুণ কালি মেখেছ, সেই মুখ দেখাতে গ্রামে ফিরে এসেছ,—তবু আবার থাকতে চাচ্ছো কি করে? মনে রেখো—এখানে তোমার এই অভিনয়ে লক্ষ হাতে করতালি পড়বে না, অগণিত প্রাণের অর্ঘ্য তোমার পায়ের তলায় জমবে না।"

কল্যাণী বদ্ধদৃষ্টিতে বিশ্বপতির কঠিন মুখখানার পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার চোখে এতটুকু জল ছিল না। কিন্তু তাহার আরক্তিম ঠোঁট দুখানা নীল হইয়া গিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

হঠাৎ সে উঠিয়া পড়িল। দরজার দিকে দুই পা অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বপতির পাশে বসিয়া পড়িল। দুই হাতের মধ্যে মুখখানা ঢাকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "নিষ্ঠুর, পাষাণ, আমি যে কেবল তোমার জন্যেই সব ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি, কেবল তোমার জন্যেই এই গ্রামে আবার পা দিয়েছি। তোমার সেবা যদি করতে পাই—লোকে যে যাই বলুক—কারও কথা কাণে নেব না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে লুকিয়ে এসেছি, কাউকে দেখতে দিই নি। ওগো, আমায় এমন করে নিষ্ঠুরের মত তাড়িয়ে দিয়ো না। আমায় এখানে—তোমার ঘরে এতটুকু আশ্রয় দাও। আমি কেবল তোমার কাজ করে দেব, তোমায় চাইব না।"

বিশ্বপতি মাথা নাড়িল, দৃঢ়কণ্ঠেই বলিল, "আর তা হয় না কল্যাণী, আর তা হবে না। সামনে জলন্ত আগুন নিয়ে আমি বাস করতে পারব না। আমার বুকে দিন-রাত আগুন জলছে, আরও জ্বলবে। শেষে আমায় আত্মহত্যা করে সকল জ্বালার অবসান করতে হবে। বুঝলে কল্যাণী, তুমি যেমন আমায় মিথ্যে সন্দেহ করে নিজেকে নষ্ট করেছ, আমি তোমার ওপরে সত্যিকার অভিমান নিয়েই নিজেকে ধ্বংস করেছিলুম। অনেক কষ্টে

আবার মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছি। এ সময় আমায় বাধা দিয়ো না। অনেক মহাপাপ করেছি। অনুতাপ করবার অবকাশ যাতে জীবনকালের মধ্যে পাই—তাই কর। আমায় আর আত্মহত্যারূপ মহাপাতকে ডুবিয়ো না।”

কল্যাণী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, “তাই ভালো, আমি চলে যাব,—তোমাকে আর পাপে ডুবাব না। কিন্তু আজ এই রাত্রে আমায় এতটুকু আশ্রয় দেবে না কি? একা এই রাত্রে কোথায় যাব? কেউ আমায় আশ্রয় দেবে না। অন্ততঃ পক্ষে আজকের রাতটা,—আমি কাল ভোর হতেই উঠে চলে যাব—”

ধড়মড় করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া শশব্যস্ত ভাবে বিশ্বপতি বলিল, “আমার তাতে এতটুকু আপত্তি নেই। আজ রাত্রে তুমি এখানে এই ঘরেই থাকো, আমি বাইরে যাচ্ছি।”

“কিন্তু তোমার যে অসুখ—”

শুষ্ক হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, “এমন কিছু শক্ত ব্যায়রাম নয়, সামান্য জ্বর মাত্র—ওতে কিছু হবে না। আমি বারাণ্ডায় একটা মাদুর পেতে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেব এখন, তুমি ঘরে থাকো।”

কল্যাণী আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া রহিল। বিশ্বপতি একটা মাদুর ও একটা বালিস লইয়া গিয়া বারাণ্ডায় রাখিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল কল্যাণী তখনও সেই-ভাবে বসিয়া আছে।

বিশ্বপতি শান্তভাবে বলিল, “আজ বোধ হয় বিশেষ কিছু খাওয়া হয় নি। ওই আলমারীতে দুধ আছে, ঘরে আর কিছুই নেই। উপোস করে থেকো না, দুধটুকু খেয়ে কুঁজোয় জল আছে নিয়ো। আমি এই বারাণ্ডায় রইলুম। ভয়ের কোন কারণ নেই। তুমি দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে শোও।”

সে বারাণ্ডায় চলিয়া গেল।

বাহিরে মাদুর পাতার শব্দ হইল, বিশ্বপতি যে শুইয়া পড়িল তাহাও বেশ বুঝা গেল।

কল্যাণী উঠিল না, নড়িল না, একটী দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলিতে পারিল না। তাহার বুকের মধ্যে ব্যথার বোঝা জমাট হইয়া বসিয়া ছিল, সে তাহা এতটুকু হাল্কা করিবার চেষ্টাও করিল না, অথবা উপায় খুঁজিয়া পাইল না।

বাহিরে দশমীর চাঁদ তখন ডুবিয়া গেছে, অন্ধকার ঝোপে গর্ত্তে কোথায় লুকাইয়া ছিল, চাঁদ ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত-পিপাসু ব্যাঘ্রের মতই নিরীহা ধরিত্রীর বুকে লাফাইয়া পড়িল।

গান গাহিতে গাহিতে পাখাটী থামিয়া গেছে। অন্ধকার নামিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখেও বুঝি বিশ্বের ঘুম জড়াইয়া আসিয়াছে। নীড়ের মাঝেই বুঝি সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিকটে নারিকেল গাছের একটা পাতার গোড়ার দিকে একটা পেচক আসিয়া বসিল ও বারকত ডানা নাড়িল। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সেই একটা তাহার অভিযোগ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতে লাগিল। আকাশের গায়ে অগণন তারা ফুটিয়া উঠিয়া অন্ধকার ধরিত্রীর পানে নিস্তব্ধে তাকাইয়া ছিল। পেচকের অভিযোগ কেবল তাহাদেরই কাছে পৌঁছিতেছিল।

মধ্য রাত্রিতে অকস্মাৎ বিশ্বপতির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল—ঘরের মধ্যে কল্যাণী যেন মুখে চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। সে তাহার অভিযোগ শুনাইতে চায় কাহাকে? অন্ধকার ঘরে সে কাহার পায়ে প্রাণের গভীর বেদনা উজাড় করিয়া ঢালিতে চায়?

রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া বিশ্বপতি ডাকিল, “কল্যাণী —রাঙাবউ—”

হয় তো তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তখন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। দরজা খোলা থাকিলে হয় তো সে ভূলুণ্ঠিতা কল্যাণীর মাথাটা নিজের কোলেই টানিয়া লইত।

ভিতর হইতে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বোধ হয় গভীর ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে কাঁদিয়াছিল। বিশ্বপতির সাড়া পাইয়া দুঃস্বপ্ন তাহার বিভীষিকা লইয়া সরিয়া গিয়াছে।

আপনা আপনিই কুণ্ঠিত হইয়া বিশ্বপতি নিজের মাদুরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

(৩৩)

ভোরের আলো ধরার গায়ে প্রথম চুম্বনরেখা আঁকিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপতি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

কাল রাত্রে কত কি ঘটিয়া গেছে,—আজ ভোরের আলোয় মনে হইতেছে সে সব যেন একটা স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্ন নয়, এই প্রভাতের আলোর মতই সত্য। কল্যাণী আসিয়াছে,—কাল রাত্রে সে এই ঘরে বাস করিয়াছে,—এখনও ঘরের ভিতর রহিয়াছে। হয় তো এখনও ঘুমাইয়া আছে, দরজা এখনও ভিতর হইতে বন্ধ।

সূর্য্য উঠিয়া পড়িল। সমস্ত বারাণ্ডা, উঠান রৌদ্রে ভরিয়া গেল। একজন দুইজন করিয়া কয়েকজন প্রতিবাসীও আসিয়া পড়িলেন।

বিশ্বপতির শারীরিক খবর লইতে তাঁহারা সকলেই উৎসুক। সে জানাইল সে ভালো আছে। তাঁহারা যে এত ভোরেই তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন, সে জন্য সে তাঁহাদের নিজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইল।

মিত্র মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন, "বাবাজি কাল সারারাত কি এই বারাণ্ডাতেই শুয়েছিলে না কি? ঘর তো দেখছি বন্ধ, এখানে বিছানা পাতা দেখছি—"

বিশ্বপতি উত্তর দিল না।

ততক্ষণে আর দু'একজনে কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। কাল সন্ধ্যার ট্রেণে একটী মেয়ে ষ্টেশনে নামিয়াছে। একাই সে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া গ্রামের পথে চলিতেছিল। সে মেয়েটী কে, কোথায় গেল, ইহাই লইয়া তাঁহারা বিলক্ষণ মাথা ঘামাইতেছিলেন।

বিশ্বপতির মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

তাঁহারা খানিক পরে যখন বিদায় লইলেন, তখন সে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া সে ডাকিতে লাগিল, "কল্যাণী, কল্যাণী—রাঙাবউ—"

উত্তর নাই।

ঘরে যেন মানুষ নাই,—ঘর এমনই নিস্তব্ধ। রাত্রে তবু একটু উসখুস শব্দও পাওয়া গিয়াছিল,—আজ এতটুকু শব্দ নাই।

ব্যস্ত হইয়া বিশ্বপতি ডাকিতে লাগিল—"রাঙাবউ, ওঠো—, দরজা খোল—"

তথাপি উত্তর নাই।

কি একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় বিশ্বপতির সারা হৃদয়খানা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে দরজা ছাড়িয়া জানালার কাছে গিয়া দেখিল কল্যাণী জানালাটিও বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

আশঙ্কা যেন সত্যেই পরিণত হইয়া যায়। রুদ্ধশ্বাসে জানালার এতটুকু একটী ফাঁক দিয়া বিশ্বপতি ঘরের ভিতরটা দেখিবার চেষ্টা করিল।

মেঝের উপর কল্যাণী শুইয়া আছে। তাহার মুখ দেখা গেল না, সে অপর দিকে ফিরিয়া শুইয়া আছে। বিশ্বপতির শত ডাকেও সে নড়িল না।

শঙ্কিত বিশ্বপতি দুই একজন নিম্নশ্রেণীর লোককে ডাকিয়া অবশেষে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

কল্যাণী তখনও শুইয়া। বিশ্বপতি মাথার কাছে জানালাটা খুলিয়া দিতেই এক ঝলক রৌদ্র আসিয়া কল্যাণীর মুখখানার উপর পড়িল।

শান্ত স্থির মুখ, সে যেন ঘুমাইয়া আছে। বিশ্বপতি তাহার কপালে হাত দিল, বুকে হাত দিল, সে দেহ বরফের মতই শীতল। নাসিকায় হাত দিয়া সে পরীক্ষা করিল তাহার নিশ্বাস পড়িতেছে কি না। সকল পরীক্ষা শেষ করিয়া সে কল্যাণীর মাথার কাছে বসিয়া পড়িল।

দরজার নিকট হইতে কালুমিস্ত্রি সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিল, "মা লক্ষী না, দা-ঠাকুর?"

বিশ্বপতি একবার শুধু তাহার পানে তাকাইল। একটী শব্দ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। দেখিতে দেখিতে সমস্ত গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, বিশ্বপতির কুলত্যাগিনী পত্নী কাল রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া এখানেই আত্মহত্যা করিয়াছে। ছোট বড় স্ত্রী পুরুষ যে যেখানে ছিল, সকলেই ব্যাপারটা দেখিতে ছুটিয়া আসিল।

বিশ্বপতি কোন দিকে চাহিল না, একদৃষ্টে কেবল কল্যাণীর মুখের পানেই তাকাইয়া রহিল।

অভাগিনী, সত্যই বড় অভাগিনী। স্বামীর উপর নিদারুণ অভিমান বশে, কেবল স্বামীকে জব্দ করিবার জন্যই সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু জব্দ করিতে গিয়া জব্দ হইল সে নিজেই; নিজের শান্তি সুখ সে নিজেই নষ্ট করিয়াছে। সে রাণীর ঐশ্বর্য্য, সম্মান পাইয়াছিল। প্রভূত ক্ষমতাও তাহার করতলে ছিল। তবু এই কুটীরের মায়া, স্বামীর প্রেম, গ্রামের ডাক সে ভুলিতে পারে নাই; তাই সে ঐশ্বর্য্য, সম্মান, ক্ষমতা সব ফেলিয়া দীন বেশে

াবার স্বামীর কাছে এই কুটীরেই ফিরিয়াছে। এই ীরেই সে তাহার শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়া গেল। খানে তাহার অন্তরে যে প্রেম প্রথম বিকশিত ইয়াছিল, সে প্রেমের সমাধি সে এইখানে এইরূপে িয়া গেল।

মুখের উপর তাহার কি শান্তি, কি তৃপ্তিই না ফুটিয়া ঠিয়াছে। যদিও সে তাহার প্রিয়তমের স্পর্শ পায় াই, তবু সান্নিধ্য পাইয়াছে। সেই যে তাহার মত লত্যাগিনী কলঙ্কিনীর পক্ষে যথেষ্ট পাওয়া।

একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বপতি মুখ ফিরাইল।

কি নিদারুণ অভিশপ্ত জীবন তাহার। সে কিছুই াইল না। যাহারা তাহাকে ভালোবাসিয়াছিল তাহারা বোই তাহার স্মৃতির জালে জড়িত হইয়াই রহিল। কল্পনায় তাহাদের দেখা মিলিবে, সম্প্রতি মিলিবে, বাস্তবে তাহারা চিরদিনের জন্যই বিলীন হইয়া গেল।

ঠিক মাথার কাছেই একখানা পত্র পড়িয়া ছিল,—কল্যাণীর হাতের লেখা। কাল অনেক রাত অবধি ঘরে আলো জ্বলিয়াছিল। সে বোধ হয় বিশ্বপতির কাগজে তাহারই পেন্সিল দিয়া তাহাকেই পত্রখানা লিখিয়া গিয়াছে।

কল্যাণী লিখিয়াছে—

আমায় তুমি ঘরছাড়া করতে চাও নিষ্ঠুর? একবার নিদারুণ অভিমানের বশে রাগে দুঃখে কেবল তোমায় জব্দ করবার জন্যেই স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলুম। আজ যখন ভুল বুঝে ফিরেছি, তখন আর কি ফিরতে পারি,—তাই কি সম্ভব? আমি এসেছি—কোথাও যাব না। এখানে আমার জায়গা, আমি এখানেই থাকব। এইখানে যে শেষ শয্যা বিছাব, তুমি যখনি ঘরে আসবে তোমার মনে সেই স্মৃতিটাই দপ করে জ্বলে উঠবে। আমায় মন হতে তাড়িয়েছ, ঘর হতে তাড়াতে চাও,—পারবে না। আমি জোর করে দখল করব।

আমি মরব,—হ্যাঁ, কেউই আমায় রক্ষা করতে পারবে না। এই মাত্র তুমি আমার রুদ্ধ দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলে কল্যাণী, রাঙাবউ। মন অধীর হয়ে উঠল সে ডাকে। মনে হল—দরজা খুলে দিয়ে তোমার প্রসারিত দুটি হাতের বাঁধনে নিজেকে ধরা দেই। কিন্তু না, আজ রাতে তুমি হয় তো সাময়িক উত্তেজনায় আমায় তোমার পাশে টেনে নেবে। রাত প্রভাতের সঙ্গে মিলবে কি—কেবল ঘৃণা আর অবজ্ঞা নয় কি?

তোমায় আমি হেয় করব না। তুমি যেখানে উঠেছ, আমি সেইখানেই তোমায় রাখব। তুমি জানো—তোমার জন্যে একদিন নিজেকে ধ্বংস করেছি,—আজ প্রাণটাকেও নষ্ট করব।

আজ আমার কি মনে পড়ছে জানো? এই ঘরে প্রথম যে দিন নূতন বউ হয়ে এসে ঢুকলুম, সেই দিনটীর কথা। ফুলশয্যা এই ঘরেই হয়েছিল সে কথা মনে পড়ে কি? হয় তো তোমার মনে নেই, কিন্তু আমার মনে আছে। কেন না, সে দিনের স্মৃতি তুমি আজ ভুলে যেতে পারলেই বাঁচো, কারণ, সে দিনটাকে তুমি সেদিন প্রাণপণে এড়াতে চেয়েছিলে। আমি তা চাই নি; আমি চেয়েছিলুম সেই রাতটীকে সম্পূর্ণভাবে সার্থক করে নিতে, যার স্মৃতি চিরকালই আমার স্মৃতি-মন্দিরে উজ্জল হয়ে জলবে।

তার পর কত জ্যোৎস্নাসিক্ত রাত এসেছে। কত ফুলই কত দিন পেয়েছি। কত রাতে কত পাপিয়া কত কোকিল গান গেয়েছে। কিন্তু সে রাতটী আর পেলুম না। অনেক মুক্তা জহরত জীবনে পরতে পেয়েছিলুম, কিন্তু সেদিনে নিজের অনিচ্ছায় কেবল মায়ের আদেশ পালন করতে যে লোহাটী তুমি নিজের হাতে আমায় পরিয়ে দিয়েছিল তার মূল্য নেই। সে অমূল্য সম্পদ আজও আমি বড় যত্নে হাতে রেখেছি।

ওগো, এ ভুল তো করতুম না—যদি তখন একটীবার আমায় ডাকতে—একটীবার বলতে—"তুমি বেশ করেছ, আমার অসুখের খবর পেয়ে এত দূরে—পুরীতে ছুটে এসেছ।" তুমি আমায় রূঢ় কথা বললে। আমার অন্ধ অভিমান তাই আমায় নিয়ে এল সেইখানে—যেখানে আছে কেবল নিকষ কালো ঘন অন্ধকার। সেখানে, ওগো দেবতা—তুমি নেই, আছে কেবল শয়তান। আরাধ্য দেবতা, তিরস্কার করছ—কর, কিন্তু আমার এই ঘর যে আমায় ডাক দিয়েছে,—আমায় গ্রামের পথ ঘাট যে আমায় ডাক দিয়েছে,—আমি দূরে সরে থাকব কি করে?

আজ প্রাণ ভরে ওদের দেখে নিচ্ছি। জানালা দিয়ে দেখছি ঘুমন্ত পথটা পড়ে রয়েছে। তার এক দিকে অন্ধকার আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে, আর এক দিকে চাঁদের আলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। অদূরে ঘাট দেখা যাচ্ছে। ওইখানে বাসন মাজতে বসে কত দিন ওই গাছগুলোর পানে আনমনে তাকিয়ে থাকতুম। ঘাটের উপরকার বকুল গাছটা আজ আমার মতই রিক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওতে আজ ফুল ধরে নি, কিন্তু কত দিনই ও আমায় কত ফুল উপহার দিয়েছে।

সব গেছে—কিন্তু স্মৃতি তো মন হতে মিলায় নি গো। আজ যাওয়ার বেলায় সব যে একে একে মনে জাগছে। অতি ছোট কথা—ক্ষুদ্র ঘটনাগুলোকেও তো আজ ছোট বলে মনে হচ্ছে না। দীর্ঘ পাঁচটা বছর এখানে কাটিয়েছি, সে তো বড় কম দিন নয়।

নিঃসম্বল হয়ে আসি নি, সম্বল নিয়েই এসেছি। তবু যে কি আশা ছিল বলতে পারি নে। মনে করেছিলুম—হয় তো স্থান পাব,—দাসীর মত এক পাশে পড়ে থাকবার মত এতটুকু স্থান কি আমায় দেবে না? চন্দ্রাও তো স্থান পেত যদি সে আসত। কিন্তু সে আসে নি, কারণ তুমিই বলেছ তার লজ্জা আছে, সঙ্কোচ আছে। সে অভিনেত্রীর জীবন যাপন করে নি, তাই যে গ্রাম সে পেছনে ফেলে গেছে, সে গ্রামে সে আর আসবে না।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—তার আসবার দরকার কি? সে অনেক পেয়েছে। এত বেশী আমি যে আশা করতেও পারি নে। সে তো আমার মত সব দিয়ে কেবল ব্যর্থতাই লাভ করে নি।

ভুল বুঝো না গো,—আমি এখানে অভিনয় করে হাততালি নিতে আসি নি। যশ যথেষ্ট পেয়েছি—গৃহস্থ-ঘরের কল্যাণী বধূরূপে নয়, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে। কিন্তু কে চেয়েছিল তা? সে দিনগুলো যে আমার জীবনের অভিশাপ, দুঃস্বপ্ন।

সম্বল নিয়ে এসেছি, আমার সামনে শিশিতে রয়েছে। কতটুকু? মাত্র কয়েক বিন্দু। কিন্তু ওতেই আমার জীবন নষ্ট হবে। ওই আমার অসময়ের বন্ধু,—আমায় চিরদিনের জন্তে শান্তি দেবে।

তার পর? তার পর অনন্ত লোকে অনন্ত জ্বালা। আমি মানি—সব মানি,—ইহলোক পরলোক, স্বর্গ নরক,—সব। আজ মরণ নিশ্চিত জেনে ভাবছি—ওখানে আমার জন্তে কি শাস্তি তোলা আছে, আমার আমি কি পাব।

জানি—সে জগতেও আমি তোমায় পাব না, সেখানে নন্দা তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে,—আমায় বহু দূরে থাকতে হবে। তবু আমি ছায়ার মত তোমার অনুসরণ করব, আমি তোমায় নিজের করবই। সেদিন নন্দাকে তার সকল দাবী মিটিয়ে নিয়ে সরে যেতে হবে, চন্দ্রা বহুদূরে থাকবে, তুমি সেদিন একান্তভাবে আমারই হবে। এই আশা নিয়ে আমি লক্ষ জন্ম ঘুরব। একটা জন্মে সার্থকতা লাভ করবই, সেই আশায় আমি লক্ষ জন্ম কাটিয়ে দেব।

তোমায় মিনতি করি—আমায় একেবারে মন হতে মুছো না, আমার স্মৃতির সমাধি দিয়ো না। এই ঘরের পানে তাকাতে আমার কথা মনে করো; ভেবো—এইখানে আমি শুয়েছিলুম। জন্ম জন্ম আমি তোমার স্মৃতি বুকে নিয়ে ফিরব, অনন্ত যন্ত্রণা সইব, তুমি আমার জন্তে এইটুকু করতে পারবে না?

বিদায়, ভোরের আর বেশী দেরী নেই,—শেষ রাতের শুকতারাটি জেগে উঠছে দেখতে পাচ্ছি। আমায় আজ যেতেই হবে, থাকার যো নেই। আমার এই বিছানাটার পাশে একটীবার দাঁড়িয়ো গো, এই আমার অনুরোধ, একটীবার ডেকো—রাঙাবউ, কল্যাণী—

আমি চলার পথে তোমার সেই ডাকটী সম্বল করে চলব। বিদায়—

অভাগিনী কল্যাণী।

"রাঙাবউ—কল্যাণী—"

বিশ্বপতি হঠাৎ এই অভাগিনী কুলত্যাগিনীর মুখের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল; তাহার দুইটী চোখের জল ঝর ঝর করিয়া মৃতার মুখের উপর একপসলা বৃষ্টির মতই ঝরিয়া পড়িল।

সমাপ্ত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল

অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, বিদ্যাবাচস্পতি, এম-এ

(৩)

শ্রীনিবাস আচার্য্যের সময় নির্ণয়

বৈষ্ণব-গ্রন্থকারগণের আলোচনায় সাধারণতঃ সাধ্যসাধন-তত্ত্ব, ভক্তির বিকাশ, ভাবের পুষ্টি, ভক্ত ও ভগবানের গুণকীর্ত্তনাদিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তাঁহারা কদাচিৎ তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপকরণ কিছু পাওয়া গেলেও তাহার সাহায্যে কোনও নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রায়ই দুষ্কর। অথচ, তাঁহাদের বর্ণিত ঘটনাদি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের নির্ণয় সময় সময় একরূপ অপরিহার্য্যই হইয়া পড়ে। তাই, যাহা কিছু উপকরণ পাওয়া যায়, তাহার দ্বারাই তথ্য-নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে হয়। প্রেমবিলাসাদি পুস্তকের উক্তি হইতে শ্রীনিবাসের সময় নির্ণয় করিতে আমরাও তদ্রূপ চেষ্টা করিব।

বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের মন্দিরেই যে শ্রীজীবাদি গোস্বামিগণের সহিত শ্রীনিবাসের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ ঘটনা (ভক্তিরত্নাকর, ৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৭ পৃঃ। প্রেমবিলাস, ৬ষ্ঠ বিলাস, ৬১ পৃঃ)। এই ঘটনা হইয়াছিল রূপসনাতনের তিরোভাবের পরে। অম্বরাধিপতি মহারাজ মানসিংহই যে রূপ-সনাতনের তত্ত্বাবধানে গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা। সুতরাং রূপ-সনাতনের তিরোভাবের পরে গোবিন্দজীর যে মন্দিরে শ্রীজীবাদির সহিত শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা যে মানসিংহের নির্ম্মিত মন্দিরই, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এখন দেখিতে হইবে—এই মন্দির কখন নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষ হইতে জানা যায়, আকবর শাহের রাজত্বের ৩৪শ বর্ষে রূপ-সনাতনের তত্ত্বাবধানে মানসিংহ গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার রাজত্বের ৩৪শ বর্ষ হইল ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেনও লিখিয়াছেন, গোবিন্দজীর মন্দিরে যে প্রস্তর-ফলক আছে, তাহা হইতে জানা যায়, ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হইয়াছিল [১]। ইহা হইতে বুঝা যায়, ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের (অর্থাৎ ১৫১২ শকাব্দার) পূর্ব্বে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে যান নাই।

ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, বৈশাখ মাসের ২০শে তারিখে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে পৌছিয়াছিলেন (৪র্থ তরঙ্গ, ১৩১ পৃঃ)। সেই দিন রাত্রিকাল ছিল "বৈশাখী পূর্ণিমানিশি শোভা চমৎকার (১৩৮ পৃঃ)।" পরের দিন (অর্থাৎ প্রতিপদের দিন) প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সমাপন করিয়া শ্রীনিবাস শ্রীজীবের সাক্ষাতে গেলেন; শ্রীজীব তাঁহাকে লইয়া রাধাদামোদর-বিগ্রহ দর্শন করাইলেন এবং "শ্রীরূপগোস্বামীর সমাধি সেইখানে। তথা শ্রীনিবাসে লৈয়া গেলেন আপনে॥ শ্রীনিবাস শ্রীসমাধি দর্শন করিয়া। নেত্রজলে ভাসে ভূমে পড়ে প্রণমিয়া॥" (ভক্তিরত্নাকর, ৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৯ পৃঃ)। শ্রীজীব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া গোপাল ভট্টগোস্বামীর নিকটে লইয়া গেলেন। আদ্যোপান্ত সমস্ত কথাই শ্রীনিবাস তখন ভট্টগোস্বামীর চরণে নিবেদন করিয়া দীক্ষার প্রার্থনা জানাইলেন। দ্বিতীয়াতে দীক্ষা দিবেন বলিয়া ভট্টগোস্বামী অনুমতি দিলেন। তখন "শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসেরে লইয়া। আইলা আপন বাসা অতি হৃষ্ট হৈয়া॥ কল্য প্রাতঃকালে শ্রীনিবাসে শ্রীগোসাঞি। করিবেন শিষ্য জানাইলা সর্ব্বঠাঞি॥ * * * তার পর দিন স্নান করি শ্রীনিবাস। শ্রীজীবের সঙ্গে গেলা গোস্বামীর পাস॥" তখন ভট্টগোস্বামী—"শ্রীনিবাসে

(১) Vaisnava Literature, p. 170

শ্রীরাধারমণ সন্নিধানে। করিলেন শিষ্য অতি অপূর্ব্ব বিধানে॥ ভক্তিরত্নাকর, ১৪৪ পৃঃ।" এ সমস্ত উক্তি দ্বারা বুঝা যায়, বৈশাখ মাসের ২০শে তারিখ পূর্ণিমার দিন শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে উপনীত হইয়াছিলেন এবং ২২শে তারিখে কৃষ্ণা দ্বিতীয়ায় শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামীর নিকটে তিনি দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ১৫১২ শকের পূর্ব্বে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে যান নাই। ১৫১২ শকের ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা ছিল না। ১৫১৩ শকের ২০শে বৈশাখও ছিল শুক্লা চতুর্থী। ১৫১৪ শকের ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা ছিল প্রায় ২১ দণ্ড। সেইদিন সোমবারও ছিল। ২১শে বৈশাখ মঙ্গলবার প্রতিপদ ছিল প্রায় ১৬ দণ্ড এবং ২২শে বৈশাখ বুধবার দ্বিতীয়া ছিল প্রায় ২১ দণ্ড। সুতরাং মনে করা যায় যে, ১৫১৪ শকের (১৫৯২ খৃষ্টাব্দে) ২০শে বৈশাখ সোমবারেই শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে পৌছিয়াছিলেন এবং ২২শে বৈশাখ বুধবারে দ্বিতীয়ার মধ্যে তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন—শ্রীনিবাস ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে (১৫১৩ শকে) বৃন্দাবনে পৌছিয়াছিলেন ২; কিন্তু ১৫১৩ শকের ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা ছিল না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাই, ১৫১৩ শকে তাঁহার বৃন্দাবনে গমন স্বীকার করিলে ভক্তিরত্নাকরের উক্তির সহিত সঙ্গতি থাকে না।

১৫১৪ শকের পরে আবার ১৫৪১ শকের ২০শে বৈশাখ রবিবারে প্রায় ৩৭ দণ্ডের পরে পূর্ণিমা ছিল। কিন্তু এত বিলম্বে—১৫৪১ শকে—শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন-গমন একেবারেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ, বিষ্ণুপুরের শিলালিপি হইতে জানা যায়, ১৬২২ খৃষ্টাব্দে বা ১৫৪৪ শকে রাজা বীরহাম্বীর মল্লেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনিবাসের কয়েক বৎসর বৃন্দাবনে অবস্থিতির পরে গ্রন্থ লইয়া বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশ, তার পর গ্রন্থচুরি, তার পর তৎকর্ত্তৃক বীরহাম্বীরের দীক্ষা এবং তাহারও কয়েক বৎসর পরে মন্দির প্রতিষ্ঠা। শ্রীনিবাস ১৫৪১ শকে বৃন্দাবনে গিয়া থাকিলে এত সব ব্যাপারের পরে, তিন বৎসরের মধ্যে, ১৫৪৪ শকে মল্লেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। সুতরাং ১৫৪১ শকে শ্রীনিবাসের বৃন্দাব[ন] গমনও বিশ্বাসযোগ্য নহে ৩।

১৫১৪ শকের পূর্ব্বে ১৪৯৫ শকেও ২০শে বৈশা[খ] শুক্রবারে পূর্ণিমা ছিল প্রায় ৪২ দণ্ড। ১৪৯৫ শক হই[তে] ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীনিবাসের বৃন্দাব[ন] গমন স্বীকার করিতে গেলে একটী ঐতিহাসিক ঘটন[া]র সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহা এই।

ভক্তিরত্নাকরাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায়, রূপ-সনাতনে[র] অপ্রকটের পরে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন; ইহা[তে] কোনরূপ মতভেদ নাই। পঞ্জিকা হইতে জানা যা[য়] আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সনাতনের এবং শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীরূপের তিরোভাব। ১৫১৪ শকের বৈশাখের পূ[র্ব্বে] তাঁহাদের তিরোভাব হইয়া থাকিলে ১৫১৩ শকে[র] তাহার পূর্ব্বে কোনও শকেই আষাঢ় ও শ্রাবণ মা[সে] তাঁহাদের অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল। ১৫১৩ শকের পৌ[ষে] ইংরেজী ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দের আরম্ভ; সুতরাং ১৫১৩ শকে[র] আষাঢ় শ্রাবণ পড়িয়াছে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে; তাহা হই[তে] ১৫৭২ বা তৎপূর্ব্বে রূপ-সনাতনের তিরোভাব হইয়াছি[ল] —১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা প্রকট ছিলেন না মনে করি[তে] হয়। কিন্তু এই অনুমান সত্য নহে। কারণ, ১৫৭[৩] খৃষ্টাব্দে যে তাঁহারা ধরাধামে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহ[ার] ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে যে মোগ[ল] সম্রাট আকবরশাহ বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ-সনাতনের সহি[ত] সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা ৪ কাজেই ১৪৯৫ শকে বা তৎপূর্ব্বে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে আগমন সম্ভব নয়। বিশেষতঃ ১৪৯৫ শকে গোবিন্দজী[র] মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; অথচ গোবিন্দজীর মন্দিরে শ্রীনিবাস সর্ব্বপ্রথম শ্রীজীবাদির সহিত মিলিত হইয়া[ছিলেন]

(২) Vaisnava Literature, p. 171

(৩) ১৫৩৩ শকের ২০শে বৈশাখও সূর্য্যোদয়ের পরে ৫।৬ দ[ণ্ড] পূর্ণিমা ছিল; এই বৎসরেও শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন গমন সম্ভব নয়। কারণ, এই শকে ২২শে বৈশাখ দ্বিতীয়া ছিল না; সুতরাং ১৫৩৩ শকে বৃন্দাবন-গমন স্বীকার করিলে ২২শে বৈশাখ দ্বিতীয়ায় দীক্ষার কথা মি[থ্যা] হইয়া পড়ে। অধিকন্তু, ১৫৩৩ শকে শ্রীনিবাস বৃন্দাবন গেলেও ১৫৪[৪] শকে বীরহাম্বীর কর্ত্তৃক মল্লেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া পড়ে সুতরাং ১৫৩৩ শকে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন-গমন সম্ভব নয়।

(৪) Growse's History of Mathura, p. 241.

ছিলেন। এ সমস্ত কারণে, ১৫১৪ শকের ২০শে বৈশাখ সোমবার পূর্ণিমার দিনই শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যায়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, গোস্বামীগ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাস কোন্ সময়ে বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, যাঁহাদের আদেশে ও অনুরোধে কবিরাজ-গোস্বামী চরিতামৃত লিখিতে আরম্ভ করেন, ভূগর্ভগোস্বামী ছিলেন তাঁহাদের একতম। চরিতামৃতের আদিলীলার ৮ম পরিচ্ছেদেও ভূগর্ভগোস্বামীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। চরিতামৃত লিখিতে প্রায় ৮।৯ বৎসর লাগিয়াছিল বলিয়া অনেকেই মনে করেন। আর পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, ১৫৩৭ শকে বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে চরিতামৃতের লেখা শেষ হইয়াছে। তাহা হইলে ১৬০৭ কি ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে চরিতামৃতের লেখা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় এবং আদির ৮ম পরিচ্ছেদ—যাহাতে ভূগর্ভগোস্বামীর উল্লেখ আছে, তাহা —১৬০৮ কি ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত হওয়ার সম্ভাবনা। তখনও ভূগর্ভগোস্বামী প্রকট ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে শ্রীজীবের যে কয়খানি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রথম পত্রখানিতে ভূগর্ভ-গোস্বামীর তিরোভাবের কথা লিখিত হইয়াছে; সুতরাং এই পত্রখানিও ১৬০৮ কি ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের পরে বা কাছাকাছি কোনও সময়ে লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। এই পত্রে শ্রীনিবাসের প্রথম পুত্র বৃন্দাবন দাস পড়াশুনা কিছু করিতেছেন কিনা, শ্রীজীব তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং সেই সময় বৃন্দাবনদাসের পড়াশুনায় বয়স—অন্তত: ৭।৮ বৎসর বয়স—হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তাহা হইলে ১৬০১ কি ১৬০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম এবং ১৬০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে শ্রীনিবাসের বিবাহ অনুমান করা যায়। গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসার অল্প কিছু কাল পরেই শ্রীনিবাসের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং ১৫৯৯ কি ১৬০০ খৃষ্টাব্দেই শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন মনে করা যায় ৫।

অন্যান্য প্রমাণ এই সিদ্ধান্তের অনুকূল কি না, তাহা দেখা যাউক। বীরহাম্বীরের রাজত্বকালেই যে শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে মতভেদ নাই। এক্ষণে দেখিতে হইবে, কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত বীরহাম্বীর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং শ্রীনিবাসের আগমন সময়ে বীরহাম্বীরের বয়সই বা কত ছিল।

ভক্তিরত্নাকরাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায়, শ্রীনিবাস গোস্বামি-গ্রন্থ লইয়া যে সময়ে বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে বীরহাম্বীরের সভায় নিত্য ভাগবত পাঠ হইত; রাজা নিত্যই পাঠ শুনিতেন। শ্রীনিবাস যেদিন সর্ব্বপ্রথম রাজসভায় উপনীত হইলেন, সেই দিন রাজা তাঁহাকে ভাগবত পাঠ করার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং কোন্ স্থান পাঠ করা তাঁহার অভিপ্রেত, তাহাও বলিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, বীরহাম্বীর তখন বালক মাত্র ছিলেন না; তখন তাঁহার বয়স অন্তত: পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি ছিল বলিয়া অনুমান করা অস্বাভাবিক হইবে না। কারণ, তদপেক্ষা কম বয়সে নিত্য ভাগবত শ্রবণের প্রবৃত্তি সচরাচর দেখা যায় না। এই সময়ে তাঁহার রাণীর সম্বন্ধে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যায়, তিনিও বালিকা বা কিশোরীমাত্র ছিলেন না। ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, গোস্বামি-গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসার বৎসরখানিক পরে শ্রীনিবাস আবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে বিষ্ণুপুরে অপেক্ষা করিয়া বীরহাম্বীরের পুত্রকে তিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন। দীক্ষার পরে শ্রীজীব এই রাজপুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন গোপালদাস; ভক্তিরত্নাকরের মতে তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল ধাড়ীহাম্বীর ৬। যাহা হউক, দুগ্ধপোষ্য শিশুর দীক্ষা হয় না; দীক্ষার সময়ে এই রাজপুত্রের বয়স অন্তত: ১৫।১৬ বৎসর ছিল মনে করিলেও গ্রন্থ চুরির সময়ে তাঁহার বয়স ১৪।১৫ বৎসর ছিল বলিয়া জানা যায়; তাহা হইলে ঐ সময়ে তাঁহার পিতা বীরহাম্বীরের বয়সও প্রায় পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি বলিয়া মনে করা যায়। এই অনুমান সত্য হইলে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দের

(৫) দীনেশবাবু বলেন, ১৬০০ খৃষ্টাব্দেই শ্রীনিবাস বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন এবং রাজা বীরহাম্বীরকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। Vaisnava Literature, p. 120.

(৬) বাঁকুড়া গেজেটিয়ারের মতে ধাড়ীহাম্বীর ছিলেন বীরহাম্বীরের পিতা। Bankura Gazetteer p. 25.

কাছাকাছি কোনও সময়ে বীরহাম্বীরের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যায়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, বীরহাম্বীর সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক উক্তির সহিত এই সিদ্ধান্তের সঙ্গতি আছে কি না।

বনবিষ্ণুপুরে কতকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে; তাহাদের কতকগুলিতে নির্ম্মাণ-কাল খোদিত আছে, কতকগুলিতে নাই। যে সকল মন্দিরে নির্ম্মাণ-কাল খোদিত আছে, তাহাদের একটীর নাম মল্লেশ্বর-মন্দির। খোদিত লিপি হইতে জানা যায়, ১৬২২ খৃষ্টাব্দে বীরহাম্বীর কর্ত্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ৭। ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর কোনও লিপি পাওয়া যায় না। এই লিপি অনুসারে বুঝা যায়, ১৬২২ খৃষ্টাব্দেও বীরহাম্বীরের রাজত্ব ছিল।

আবার, আবুল-ফজল লিখিত আকবরনামা হইতে জানা যায়, আকবরের রাজত্বের ৩৫শ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে কুতলুখাঁ-পক্ষীয়দের সহিত যুদ্ধে মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ বিপন্ন হইলে হাম্বীর জগৎসিংহকে রক্ষা করিয়া বিষ্ণুপুরে লইয়া আসেন ৮। বাঁকুড়া গেজেটিয়ার হইতেও জানা যায়—আফগানগণ উড়িষ্যাদেশ জয় করিয়া কুতলুখাঁর সৈন্যাধ্যক্ষত্বে যখন মেদিনীপুরেও অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, তখন—১৫৯১ খৃষ্টাব্দে—বীরহাম্বীর মোগলদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। আফগান সৈন্যগণের অতর্কিত নৈশ আক্রমণে মোগল সেনাপতি জগৎসিংহ যখন আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিতেছিলেন, তখন বীরহাম্বীর তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া নিরাপদে বিষ্ণুপুরে লইয়া আসেন ৯। এ সমস্ত ঐতিহাসিক উক্তি হইতে বুঝা যায়, ১৫৯১ খৃষ্টাব্দেও বীরহাম্বীর বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন। এই সময়ে তিনি বেশ যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন এবং নিজেও যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য-পরিচালনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সুতরাং এই সময়ে—১৫৯১ খৃষ্টাব্দে—তাঁহার বয়স অন্ততঃ ২৫ ২৬ বৎসর ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। এই অনুমান সত্য হইলে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কাছাকাছি কোনও সময়ে বীরহাম্বীরের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যায়। ভক্তিরত্নাকরাদির উক্তি হইতেও যে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। সুতরাং ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে (১৪৮৭ শকে) বা তাহার কাছাকাছি কোনও সময়ে বীরহাম্বীরের জন্ম হইয়াছিল এবং অন্ততঃ ১৫৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (১৫১৩ শক হইতে ১৫৪৪ শক পর্য্যন্ত) তাঁহার রাজত্বকাল ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় ১০।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সম্ভবতঃ ১৫৯৯ কি ১৬০০

(৭) Bankura Gazetteer by L. S. S. O' Malley; p. 158.

(৮) Akbarnama, translated by H. Beveridge, vol. III. p. 879.

(৯) Bankura Gazetteer, p. 25. Akbarnama translated by Dowson, vol. VI, p. 86.

(১০) The reign of Bir Hambir fell between 1591 and 1616. Bankura Gazetteer, p. 26

হাণ্টারসাহেব বলেন, বীরহাম্বীর ৮৬৮ মল্লাব্দে বা ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া তের বৎসর বয়সে ৮৮১ মল্লাব্দে বা ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন এবং ১৬২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন (The Annals of Rural Bengal, by W. W. Hunter, Appendix E. p. 445).

বিশ্বকোষে মল্লরাজাদের নামের তালিকা, রাজত্বকাল এবং রাজপুত্রদের নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে এবং শেষভাগে কোনও কোনও রাজার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণীও দেওয়া হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে বীরহাম্বীরের জন্ম ও রাজত্বকাল সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হাণ্টারসাহেবের উক্তির অনুরূপ কিন্তু এই উক্তি নির্ভরযোগ্য নহে, তাহার কারণ, ঐতিহাসিক প্রমাণ-প্রয়োগে আমরা দেখাইয়াছি। বিশ্বকোষ রাজবংশের তালিকায় লিখিত হইয়াছে বীরহাম্বীর তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহা সম্ভব। আমরা দেখাইয়াছি, ১৫৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২২ খৃষ্টাব্দ তাঁহার রাজত্ব-কালের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উহাতেই ৩১।৩২ বৎসর পাওয়া যায়। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দের পরেও তাঁহার রাজত্ব কিছুকাল থাকা অসম্ভব নহে।

যাহা হউক, আমরা বলিয়াছি, ১৫৯৯ কি ১৬০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীনিবাস বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন; হাণ্টারসাহেবের মত সত্য হইলেও ১৫৯৯-১৬০০ খৃষ্টাব্দ বীরহাম্বীরের রাজত্বের মধ্যেই পড়ে।

ঢাকা-মিউজিয়ামের কিউরেটর প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলেন—পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে; হাণ্টার ইত্যাদির প্রাচীন মতের আলোচনা এখন অনাবশ্যক (১৪।৮,৩৩ ইং তারিখের পত্র)। এই প্রবন্ধরচনায় ভট্টশালী মহাশয় আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

খৃষ্টাব্দে (১৫২১ কি ১৫২২ শকাব্দে) শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন। উপরিউক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায়, ঐ সময়ে বীরহাম্বীরেরই রাজত্ব ছিল। ১৫২১ কি ১৫২২ শকে শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুরে আগমন বা গ্রন্থচুরি হইয়াছিল মনে করিলেই ভক্তিরত্নাকরাদির উক্তির সহিত ঐতিহাসিক প্রমাণের সঙ্গতি দেখা যায়। শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ১৫১৪ শকে; ১৫২২ শকে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার বৃন্দাবনে অবস্থিতি হয় আট বৎসর; ইহা অসম্ভব নয়। ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়—শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে যাইয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তাহার ফলে আচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার উপাধি লাভের পরে নরোত্তমদাস বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তাহার পরে শ্যামানন্দ গিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনজনে এক সঙ্গে ব্রজ মণ্ডলের সমস্ত তীর্থস্থানও দর্শন করিয়াছিলেন। পরে তিনজনে এক সঙ্গে দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন—ভক্তিরত্নাকর হইতে এইরূপই জানা যায়। এই অবস্থায় শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে অবস্থিতির কাল আট বৎসর হওয়া বিচিত্র নহে। দীনেশবাবুও বলেন, শ্রীনিবাস ৬।৭ বৎসরের কম বৃন্দাবনে ছিলেন না ১১।

এ সমস্ত যুক্তিপ্রমাণে আমাদের মনে হয়, ১৫২২ শকে (১৬০০ খৃষ্টাব্দে) বা তাহার কাছাকাছি কোনও সময়েই শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থচুরির সময়ের সহিত শ্রীনিবাসের জন্ম সময়ের একটু সম্বন্ধ আছে। ভক্তিরত্নাকরের এক স্থলের উক্তি অনুসারে তাঁহার জন্ম সময় সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে, তাহাতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ লইয়া তাঁহার বনবিষ্ণুপুরে আগমন যেন অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাই তাঁহার জন্ম সময় সম্বন্ধে একটু আলোচনাও অপরিহার্য্য।

শ্রীনিবাস যখন প্রথম বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন, ভক্তিরত্নাকরের মতে তখন তাঁহার "মধ্য যৌবন" (৪র্থ তরঙ্গ, ১৩২ পৃ:); স্বপ্নযোগে শ্রীরূপ সনাতন শ্রীজীবের নিকটে "অল্প বয়স নেত্রে ধারা নিরন্তর" বলিয়া শ্রীনিবাসের পরিচয় দিয়াছেন (ভক্তিরত্নাকর, ৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৫ পৃ:)। প্রেমবিলাস হইতেও জানা যায়, বৃন্দাবনযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীনিবাস যখন নবদ্বীপে গিয়াছিলেন, তখন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে "অল্প বয়স অতি সুকুমার" এবং "বালক"-মাত্র দেখিয়াছিলেন (৪র্থ বিলাস, ৩৯-৪০ পৃ:) এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবক ঈশানও তখন "উঠ উঠ বটু শীঘ্র করহ গমন" বলিয়া শ্রীনিবাসের ঘুম ভাঙ্গাইয়াছিলেন (৪র্থ বিলাস, ৪২ পৃ:)। এ সমস্ত উক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীজীবের সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময়ে শ্রীনিবাসের বয়স কুড়ি বৎসরের অধিক ছিল না—হয় তো ষোল হইতে কুড়ির মধ্যেই ছিল। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ১৪৯৪ শক হইতে ১৪৯৮ শকের (১৫৭২-১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের) মধ্যবর্ত্তী কোনও সময়ই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।

পঞ্জিকায় দেখা যায়, বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীনিবাসের আবির্ভাব। প্রেমবিলাসও তাহাই বলে (১ম বিলাস, ১৯ পৃ:)। ভক্তিরত্নাকর বলে, বৈশাখী পূর্ণিমা রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীনিবাসের জন্ম (২য় তরঙ্গ, ৭৩ পৃ:)। রোহিণী নক্ষত্রের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে; কারণ, বৈশাখী পূর্ণিমা কখনও রোহিণী নক্ষত্রে হইতে পারে না।

যাহা হউক, ১৪৯৭-১৪৯৮ শকে তাঁহার জন্ম হইয়াছে মনে করিলে, তাঁহার জীবনের অন্যান্য ঘটনা সম্বন্ধীয় উক্তিসমূহের সঙ্গতি থাকে কি না দেখা যাউক।

ভক্তিরত্নাকরাদি হইতে জানা যায়, গোস্বামি-গ্রন্থ লইয়া দেশে আসার পরে শ্রীনিবাস একবার বিবাহ করেন; তাহার কিছু কাল পরে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। তাঁহার ছয়টী পুত্রকন্যাও জন্মিয়াছিল। ১৪৯৪-৯৮ শকে জন্ম হইয়া থাকিলে গ্রন্থ লইয়া দেশে ফিরিয়া আসার সময়ে তাঁহার বয়স হইয়াছিল চব্বিশ হইতে আটাইশের মধ্যে। এই বয়সে বিবাহাদি অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে।

এস্থলে ভক্তিরত্নাকরের একটী উক্তি বিশেষ ভাবে বিবেচ্য; কারণ, শ্রীনিবাসের জন্মসময়-নির্ণয়ে এই উক্তির উপরে অনেকেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

ভক্তিরত্নাকর বলেন—পিতার মুখে মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া তাঁহার চরণ দর্শনের নিমিত্ত শ্রীনিবাসের উৎকণ্ঠা জন্মে। তাই পিতৃবিয়োগের পরে তিনি পুরী রওয়ানা হন; প্রভু তখন পুরীতে ছিলেন; কিন্তু পুরীতে পৌছিবার

(১১) Vaisnava Literature, p, 39.

পূর্ব্বেই শুনিলেন যে, মহাপ্রভু অপ্রকট হইয়াছেন। এ কথা যদি সত্য বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়, যে বৎসর মহাপ্রভু অপ্রকট হন, সেই বৎসরেই—১৪৫৫ শকেই—শ্রীনিবাস পুরী গিয়াছিলেন। অত দূরের পথ হাঁটিয়া গিয়াছিলেন; তাই তখন তাঁহার বয়স প্রায় পনর বৎসর ছিল বলিয়া মনে করিলে প্রায় ১৪৪০ শকেই (১৫১৮ খৃষ্টাব্দেই) তাঁহার জন্ম ধরিতে হয়। তাহা হইলে বৃন্দাবনে পৌছিবার সময়ে তাঁহার—সেই "মধ্য-যৌবনের" এবং "অল্প বয়স বটুর"—বয়স ছিল ৭৪ বৎসর!! এবং ইহাও তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, কয়েক বৎসর বৃন্দাবন বাস করার পরে দেশে ফিরিয়া প্রায় বিরাশী তিরাশী বৎসর বয়সের পরে একে একে দুইটী বিবাহ করিয়া তিনি ছয়টী সন্তানের জনক হইয়াছিলেন!!! এ সকল কথা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

মহাপ্রভুর দর্শনের নিমিত্ত শ্রীনিবাসের পুরী গমনের কথা প্রেমবিলাস কিন্তু বলেন না। গৌর-নিত্যানন্দা-দ্বৈতের তিরোভাবের পরেই যে শ্রীনিবাসের জন্ম হইয়াছিল—কিন্তু পূর্ব্বে নহে—প্রেমবিলাস হইতে তাহাই বরং মনে হয়। ঠাকুর নরহরির কৃপায় শ্রীনিবাসের গৌর-অনুরাগ জাগিয়া উঠিলে তিনি গৌর-বিরহে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন; তখন তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়া-ছিলেন—"চৈতন্য প্রভুর নাহি হৈল দরশন। নিত্যানন্দ প্রভুর নাহি দেখিল চরণ॥ অদ্বৈত আচার্য্য রূপ আর না দেখিল। স্বরূপ, রায়, সনাতন, রূপ না পাইল॥ ১২ ভক্তগণ সহিতে না শুনিল সঙ্কীর্ত্তন। হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখন॥ ঊর্দ্ধ মুখ করি অনেক করে আর্ত্তনাদ। পশ্চাৎ জন্ম দিয়া বিধি কৈল সুখবাদ॥ (প্রেমবিলাস, ৪র্থ বিলাস, ২৮ পৃঃ)।" এ সকল উক্তি হইতে মনে হয়, গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতের তিরোভাবের পরেই শ্রীনিবাসের জন্ম হইয়াছিল।

বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থ চুরির পরে দেশে ফিরিয়া আসার সময়ে বা তাহার অল্প কাল পরেও যে শ্রীনিবাসের বয়স যৌবনের সীমার মধ্যেই ছিল, প্রেমবিলাস ও ভক্তি-রত্নাকর হইতেও তাহা জানা যায়। ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়—যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসার পরে শ্রীনিবাস সরকার-নরহরি ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত শ্রীখণ্ডে গেলে সরকার-ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—কিছু কাল যাজিগ্রামে থাকিয়া তোমার মায়ের সেবা কর; আর "বিবাহ করহ বাপ এই মোর মনে। * * শুনি শ্রীনিবাস পাইলেন বড় লাজ॥ শ্রীঠাকুর নরহরি সব তত্ত্ব জানে। ঘুচাইল লাজাদি কহিয়া কত স্থানে॥ (৭ম তরঙ্গ, ৫২৪ পৃঃ)।" শ্রীনিবাস তখন যদি বিরাশী তিরাশী বৎসরের বৃদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে সরকার-ঠাকুর উপযাচক হইয়া তাঁহাকে বিবাহের উপদেশ দিতেন না; এবং বিবাহের প্রস্তাবেও শ্রীনিবাস লজ্জিত হইতেন না। বিবাহের প্রস্তাবে এরূপ লজ্জা যৌবন-সুলভ লজ্জামাত্র। প্রেমবিলাস হইতে আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খণ্ডবাসী রঘুনন্দন ও সুলোচন ঠাকুর এক উৎসব উপলক্ষে যাজিগ্রামে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা শ্রীনিবাস "আচার্য্যের প্রতি কহে হাসি হাসি॥ যদি যাজিগ্রামে রহ সাধ আছে মনে। পাণিগ্রহণ কর ভাল হয়েত বিধানে॥" তার পর সেই গ্রামের ভূম্যধিকারী বিপ্র গোপালদাসের কন্যার সহিত শ্রীনিবাসের বিবাহ হয়। ইহা হইল তাঁহার প্রথম বিবাহ। তার পরে বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী গোপালপুরে রঘু চক্রবর্ত্তীর কন্যা পদ্মাবতীকে তিনি দ্বিতীয়বারে বিবাহ করেন। এই বিবাহ-ব্যাপারে একটু রহস্য আছে। পদ্মাবতী নিজেই আচার্য্য-ঠাকুরকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন; আচার্য্যের নিকটে আত্মদান করার নিমিত্ত তিনি এতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন যে, লজ্জা-সরম ত্যাগ করিয়া পদ্মাবতী নিজেই স্বীয় "পিতারে

(১২) এই পয়ার হইতে মনে হয়, রূপ-সনাতনেরও তিরোভাবের পরে শ্রীনিবাসের জন্ম। কিন্তু তাহা নহে। যে সময়ে শ্রীনিবাস উক্তরূপ খেদ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে তৎকালীন বৈষ্ণব-মহাত্মাদিগের বিশেষ সংবাদ তিনি রাখিতেন বলিয়া প্রেমবিলাস হইতে জানা যায় না; তখন তাঁহার তদনুকূল বয়সও ছিল না। উপনয়নের কিছু কাল পরেই ঠাকুর নরহরির কৃপায় গৌর-প্রেমের স্ফুরণে শ্রীনিবাস উক্তরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তখন তিনি মনে করিয়াছিলেন, রূপ-সনাতনও বুঝি প্রকট ছিলেন না। কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই আকাশবাণীতে তিনি জানিতে পারিলেন, রূপ-সনাতন তখনও প্রকট ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের তিরোভাবের বেশী বিলম্ব ছিল না। "বৃন্দাবনে রসশাস্ত্র রূপ সনাতন। লিখিয়াছেন দুই ভাই তোমার কারণ॥ * * শীঘ্র যাহ যদি তুমি পাবে দরশন॥ বিলম্ব হইলে দুইভাইর দর্শন না পাবে। (প্রেমবিলাস, ৪র্থ বিলাস, ২৯ পৃঃ)।"

কহিল যদি কর অবধান। আচার্য্য-ঠাকুরে মোরে কর সম্প্রদান॥ (১৭শ বিলাস, ২৪৯ পৃঃ)।" প্রায় নব্বই বৎসরের বৃদ্ধের সঙ্গে নিজের বিবাহের নিমিত্ত একজন সুন্দরী কিশোরীর এত আগ্রহ জন্মিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। আচার্য্য তখনও যুবক ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে শ্রীরূপ-সনাতনের তিরোভাব-সময়-সম্বন্ধেও একটু আলোচনা দরকার। প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, আগে সনাতন গোস্বামীর, তার পরে রূপ-গোস্বামীর তিরোভাব।

কেহ কেহ বলেন, ১৪৮০ শকে (১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে) সনাতনের তিরোভাব হইয়াছিল; কিন্তু এ কথা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। কারণ ১৪৯৫ শকেও যে তাঁহারা প্রকট ছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে (১৪৯৫ শকে) মোগল সম্রাট আকবর শাহ শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ ঘটনা ১৩।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১৫১২ শকে রূপ-সনাতনের তত্ত্বাবধানে মহারাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল; ইহাতে বুঝা যায়, ১৫১২ শকেও তাঁহারা প্রকট ছিলেন। আবার ১৫১৪ শকের বৈশাখ মাসে শ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবন পৌঁছিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা অপ্রকট হইয়াছিলেন। সুতরাং ১৫১২ ও ১৫১৪ শকের মধ্যেই তাঁহাদের তিরোভাব হইয়া থাকিবে।

ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, শ্রীনিবাস প্রথম বার মথুরায় প্রবেশ করিয়াই শুনিলেন, পথিক লোকগণ বলাবলি করিতেছে—"এই কত দিনে শ্রীগোসাঞি সনাতন। মোসভার নেত্র হইতে হৈলা অদর্শন॥ এবে অপ্রকট হৈলা শ্রীরূপ গোসাঞি। দেখিয়া আইনু সে দুঃখের অন্ত নাই॥ (৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৩ পৃঃ)।" ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীনিবাসের মথুরায় পৌঁছিবার অল্প পূর্ব্বেই শ্রীরূপের তিরোভাব হইয়াছে, এবং তাহার অল্প আগেই শ্রীসনাতনেরও তিরোভাব হইয়াছে। প্রেমবিলাস কিন্তু সময়ের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণই দিতেছেন। প্রেম-বিলাস হইতে জানা যায়, শ্রীনিবাস যেদিন বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছেন, তাহার চারি দিন পূর্ব্বে শ্রীরূপের এবং তাহারও চারি মাস পূর্ব্বে শ্রীসনাতনের তিরোভাব হইয়াছিল (৫ম বিলাস, ৫৫-৫৭ পৃঃ)। এ কথা সত্য হইলে ১৫১৪ শকের বৈশাখে (১৫৯২ খৃষ্টাব্দে) শ্রীরূপের এবং ১৫১৩ শকের মাঘে সনাতনের তিরোভাব হইয়াছিল মনে করা যায়। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১৫১৪ শকের ২০শে বৈশাখ শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন।

কিন্তু পঞ্জিকা হইতে জানা যায়, আষাঢ়ী পূর্ণিমায় শ্রীসনাতনের এবং শ্রাবণ শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীরূপের তিরোভাব। তাঁহাদের তিরোভাবের সময় হইতেই উক্ত দুই তিথিতে বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাদের তিরোভাব উৎসব করিয়া আসিতেছেন। তাই প্রেমবিলাসের উক্তি অপেক্ষাও ইহার মূল্য বেশী—ইহা চিরাচরিত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই মনে করিতে হইবে, ১৫১৩ শকের (১৫৯১ খৃষ্টাব্দের) আষাঢ়ী পূর্ণিমায় শ্রীপাদ সনাতনের এবং শ্রাবণ শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর তিরোভাব হইয়াছিল ১৪।

১৪৩৬ শকে মহাপ্রভু রামকেলিতে আসিয়াছিলেন। তখন সনাতন গোস্বামীর বয়স চল্লিশের কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং ১৩৯৬ শকে বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও সময়ে জন্ম হইয়া থাকিলে ১৫১৩ শকে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ১১৭ বৎসর। শ্রীরূপের বয়স দুই তিন বৎসর কম হইতে পারে। এত দীর্ঘ আয়ুষ্কাল তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। অদ্বৈত-প্রকাশ হইতে জানা যায়, অদ্বৈত-প্রভুও সওয়া-শত বৎসর প্রকট ছিলেন।

নরোত্তম ও শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়াই মনে হয়। তাঁহাদের তিনজনের দেশে ফিরিয়া আসার প্রায় বৎসর দুই পরেই বিখ্যাত খেতুরীর মহোৎসব হইয়াছিল বলিয়া ভক্তিরত্নাকর পড়িলে মনে হয়। খুব

(১৩) Growse's History if Mathura, p 241.

(১৪) দীনেশবাবু বলেন—১৫৯১ খৃষ্টাব্দের (১৫১৩ শকের) কাছাকছি কোনও সময়ে রূপ-সনাতনের তিরোভাব হইয়াছিল। Vaisnava Literature, p. 40.

সম্ভব ১৫২৩ ও ১৫২৪ শকের (১৬০১-১৬০২ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে কোনও সময়ে এই মহোৎসব হইয়া থাকিবে ১৫।

এইরূপে দেখা যায়, ভক্তিরত্নাকরাদি গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য যে সমস্ত উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সহিত—উপরের আলোচনায় শ্রীনিবাস আচার্য্যের সময় সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহার অসঙ্গতি কিছু নাই। বিশেষতঃ রাজা বীরহাম্বীরের রাজত্বের সময়, মানসিংহ কর্ত্তৃক গোবিন্দজীর মন্দির-নির্ম্মাণের সময় এবং শ্রীবৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের সহিত মোগল-সম্রাট আকবর শাহের সাক্ষাতের সময়—এই তিনটী সময় ইতিহাস হইতেই গৃহীত হইয়াছে, অনুমান বা বিচার-বিতর্ক দ্বারা নির্ণীত হয় নাই—সুতরাং সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য। আর শ্রীনিবাসের সময়-নির্ণয়মূলক আলোচনাও এই তিনটী সময়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। জ্যোতিষের গণনার সাহায্যও সময় সময় লওয়া হইয়াছে। এইরূপ আলোচনা দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কিছু থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, শ্রীনিবাস আচার্য্যের সময় সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহার সার মর্ম্ম এই—১৫৭২-৭৬ খৃষ্টাব্দে (১৪৯৪-৯৮ শকে) তাঁহার জন্ম, ১৫১৪ শকের ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা তিথিতে (১৫৯২ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার বৃন্দাবনে আগমন এবং ১৫৯৯-১৬০০ খৃষ্টাব্দে (১৫২১-১৫২২ শকে) গোস্বামি-গ্রন্থ লইয়া তাঁহার বনবিষ্ণুপুরে আগমন হইয়াছিল।

এক্ষণে নিঃসন্দেহেই জানা যাইতেছে, ১৫০৩ শকে বা ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে বীরহাম্বীরের দস্যুদল কর্ত্তৃক গোস্বামিগ্রন্থ অপহরণের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ১৫০৩ শকে গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন ত্যাগ স্বীকার করিতে হইলে তাহারও ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে—১৪৯৪ কি ১৪৯৬ শকে অর্থাৎ ১৫৭৩ কি ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে—তাঁহার বৃন্দাবন গমনও স্বীকার করিতে হয় এবং তাহারও পূর্ব্বে রূপ-সনাতনের অপ্রকটও স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর শাহের বৃন্দাবন গমন সময়ে এবং ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ কর্ত্তৃক গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মাণ সময়েও যে তাঁহারা প্রকট ছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ১৫০৩ শকে বা ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে বীরহাম্বীরও বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই; সুতরাং ঐ সময়ে তাঁহার নিয়োজিত দস্যুদল কর্ত্তৃক গ্রন্থ চুরি এবং তাঁহার রাজসভায় ভাগবত-পাঠও সম্ভব নয়।

যাঁহারা মনে করেন, ১৫০৩ শকেই শ্রীনিবাস গোস্বামি-গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন, ভক্তিরত্নাকরের দুইটী উক্তি তাঁহাদের অনুকূল। এই দুইটী উক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক।

একটী উক্তি এইরূপ। গোস্বামি-গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে আসার প্রায় এক বৎসর পরে শ্রীনিবাস যখন দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহাকে "শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থারম্ভ শুনাইলা। (৯ম তরঙ্গ, ৫৭০ পৃঃ)।" এই উক্তির মর্ম্ম এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে—ঐ সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বেই শ্রীজীব গোপালচম্পূ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং যতটুকু লেখা হইয়াছিল, ততটুকুই তিনি শ্রীনিবাসকে পড়িয়া শুনাইলেন। ১৫০৩ শকে যদি শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বিষ্ণুপুরে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা ১৫০৪ শকের কথা। ১৫১০ শকে পূর্ব্বচম্পূর লেখা শেষ হইয়াছিল; সুতরাং ১৫০৪ শকে তাহার আরম্ভ অসম্ভব নয়।

অপর উক্তিটী এইরূপ। ভক্তিরত্নাকরের ১৪শ তরঙ্গে ১০৩৩ পৃষ্ঠায় শ্রীনিবাসের নিকটে লিখিত শ্রীজীবের যে পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত হইয়াছে—অপরঞ্চ। * * * * সম্প্রতি শ্রীমদুত্তর-গোপালচম্পূ লিখিতাস্তি, কিন্তু বিচারয়িতব্যাস্তি ইতি নিবেদিতম্।—সম্প্রতি উত্তর-গোপালচম্পূ লিখিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।" এই পত্রে শ্রীনিবাসের পুত্র বৃন্দাবনদাসের প্রতি এবং তাহার ভ্রাতা ভগিনীদের প্রতি আশীর্ব্বাদ জানান হইয়াছে। ১৫১৪ শকের বৈশাখ মাসে উত্তর-গোপালচম্পূর লেখা শেষ হয়। পত্রে "উত্তরচম্পূ সম্প্রতি লিখিত হইয়াছে। ১৫০৩ শকে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ করিয়া থাকিলে ১৫১৪ শকে শ্রীনিবাসের পুত্রকন্যার জন্ম অসম্ভব

(১৫) দীনেশবাবু বলেন ১৬০২ ও ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খেতুরীর মহোৎসব হইয়াছিল। Vaisnava Literature, p. 127.

নয়। কিন্তু ১৫২১-২২ শকে দেশে ফিরিয়া আসিয়া থাকিলে গোপালচম্পূ সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরের উল্লিখিত উক্তিদ্বয় বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

উল্লিখিত উক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রথম উক্তিটী ভক্তি-রত্নাকরের গ্রন্থকারের কথা; উহা কিম্বদন্তীমূলকও হইতে পারে, প্রক্ষিপ্তও হইতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত কথাটী পাওয়া যায় শ্রীজীবের পত্রে; তাই ইহাকে সহজে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। তবে এই উক্তিটীর সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহের কারণও ভক্তিরত্নাকরেই পাওয়া যায়। তাহা এই।

যে পত্রে ঐ কথা কয়টী আছে, তাহা হইতেছে ভক্তি-রত্নাকরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় পত্র। প্রথম পত্রখানি যে দ্বিতীয় পত্রের পূর্ব্বে লিখিত, তারিখ না থাকিলেও তাহা পত্র হইতেই জানা যায়। প্রথমতঃ, প্রথম পত্রে শ্রীনিবাসের পুত্র কেবল বৃন্দাবনদাসের প্রতিই শ্রীজীব আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন; কিন্তু দ্বিতীয় পত্রে বৃন্দাবনদাসের ভ্রাতা-ভগিনীদের প্রতিও আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন; ইহাতে মনে হয়, প্রথম পত্র লেখার সময়ে বৃন্দাবনদাসের ভ্রাতা-ভগিনীদের কথা শ্রীজীব জানিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম পত্রে লেখা হইয়াছে—"হরিনামামৃত ব্যাকরণের সংশোধন কিঞ্চিৎ বাকী আছে, বর্ষাও আরম্ভ হইয়াছে; তাই তখন তাহা বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল না।" দ্বিতীয় পত্রে লিখিত হইয়াছে—"পূর্ব্বে আপনার (শ্রীনিবাসের) নিকটে যে হরিনামামৃত ব্যাকরণ পাঠান হইয়াছে, তাহার অধ্যাপন যদি আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভাষ্যবৃত্ত্যাদি অনুসারে ভ্রমাদির সংশোধন করিয়া লইবেন।" প্রথম পত্রে শ্রীজীবকৃত সংশোধনের কথা আছে; সংশোধনের পরেই তাহা বাঙ্গালায় প্রেরিত হই-য়াছে; তাহার পর দ্বিতীয় পত্র লিখিত হইয়াছে। সুতরাং প্রথম পত্রের পরেই যে দ্বিতীয় পত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, গোপালচম্পূ সম্বন্ধে প্রথম পত্রে লিখিত হইয়াছে—"উত্তরচম্পূর সংশোধন কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে; সম্প্রতি বর্ষাও আরম্ভ হইয়াছে; তাই পাঠান হইল না। দৈবানুকূল হইলে পরে পাঠান হইবে। (ভক্তিরত্নাকর, ১০৩১ পৃঃ)।" ভাদ্র মাসে এই পত্র লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পত্রের প্রথম ভাগে শ্যামাদাসাচার্য্য নামক জনৈক ভক্তের নাম উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"সম্প্রতি শোধয়িত্বা বিচার্য্য চ বৈষ্ণব-তোষণী-দুর্গমসঙ্গমিনী-শ্রীগোপালচম্পূ পুস্তকানি তত্রামিভির্নীয়মানানি সন্তি।"—বিচারমূলক সংশোধনের পরে বৈষ্ণবতোষিণী, দুর্গমসঙ্গমণী, এবং গোপালচম্পূ যে শ্যামাদাসাচার্য্যের সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাই এ স্থলে বলা হইল। প্রথম পত্রে লিখিত উত্তরচম্পূর সংশোধনের কিঞ্চিৎ অবশেষের কথা স্মরণ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, পূর্ব্বচম্পূ ও উত্তরচম্পূ উভয়ই অর্থাৎ সমগ্র গোপালচম্পূ গ্রন্থই—শ্যামাদাসাচার্য্যের সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিল; পূর্ব্বচম্পূ বা উত্তরচম্পূ না লিখিয়া তাই শ্রীজীব দ্বিতীয় পত্রে "শ্রীগোপালচম্পূই" লিখিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—এই দ্বিতীয় পত্রেরই শেষভাগে "অপরঞ্চ" দিয়া লিখিত হইয়াছে—"সম্প্রতি শ্রীমদুত্তর গোপালচম্পূ লিখিতাস্তি, কিন্তু বিচারয়িতব্যাস্তি ইতি নিবেদিতম্।" প্রথম পত্রে শ্রীজীব লিখিলেন—সংশোধনের অল্প বাকী, এত অল্প বাকী যে, ইচ্ছা করিলে তখনই সংশোধন শেষ করিয়া পাঠাইতে পারিতেন; বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া পাঠাইলেন না; সুতরাং গ্রন্থের লেখা যে তাহার অনেক পূর্ব্বেই শেষ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় পত্রের প্রথমাংশের উক্তিও ইহার অনুকূল। কিন্তু শেষাংশে লেখা হইল—উত্তরচম্পূর লেখা সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, বিচারমূলক সংশোধনের তখনও আরম্ভ হয় নাই। এরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তি শ্রীজীবের পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। অধিকন্তু এই উক্তি সত্য হইলে দ্বিতীয় পত্র ১৫১৪ শকে (উত্তরচম্পূসমাপ্তির বৎসরে) লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হয় এবং ১৫১৪ শকেই শ্রীনিবাসের পুত্র-কন্যাও জন্মিয়াছিল বলিয়াও মনে করিতে হয়। কিন্তু ১৫১৪ শকের পূর্ব্বে যে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন-গমনই সম্ভব নয়, তাহা পূর্ব্ব আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে। তাই আমাদের মনে হয়, ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় পত্রের শেষাংশে "সম্প্রতি শ্রীমদুত্তর-গোপালচম্পূর্লিখিতাস্তি" ইত্যাদিরূপে যাহা লিখিত আছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত, অথবা লিপিকর প্রমাদবশতঃ অন্য কোনও গ্রন্থের স্থলে তাহাতে "শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূ" লিখিত হইয়াছে।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—যে তিনটী অনুমানকে ভিত্তি করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন, ১৫০২ শকেই চরিতামৃতের লেখা শেষ হইয়াছিল, সেই তিনটী অনুমানের একটীও বিচারসহ নহে; অর্থাৎ শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রেরিত গোস্বামি-গ্রন্থের মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ছিলনা, বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ চুরির সংবাদপ্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামীও অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হন নাই এবং ১৫০৩ শকেও শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বনবিষ্ণুপুরে আসেন নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে—উক্ত অনুমান তিনটী সত্য না হইলেই কি সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ১৫০৩ শকে চরিতামৃতের লেখা শেষ হয় নাই? ১৫০৩ শকে চরিতামৃত শেষ হইয়া থাকিলেও শ্রীনিবাসের সঙ্গে তাহা প্রেরিত না হইতে পারে। এ কথার উত্তরে ইহাই বলা যায় যে—চরিতামৃতের সমাপ্তিকালসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত উক্ত তিনটী অনুমানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত নহে। প্রবন্ধের প্রথম ভাগেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ১৫৩৭ শকেই গ্রন্থ শেষ হইয়াছিল; আর পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, চরিতামৃত শেষ করার সময় —এমন কি, মধ্যলীলার লিখন আরম্ভ করার সময়ই—কবিরাজ-গোস্বামীর যত বয়স ছিল, ১৫০৩ শকের কথা তো দূরে, ১৫২১—২২ শকে শ্রীনিবাস যখন গোস্বামি-গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার (কবিরাজ-গোস্বামীর) তত বয়স হয় নাই; সুতরাং ১৫২১—২২ শকেও চরিতামৃতের আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যায় না।

চরিতামৃত-সমাপ্তির পরে কবিরাজ-গোস্বামী বেশী দিন প্রকট ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থসমাপ্তির সময়ে তাঁহার বয়স আশী-নব্বই-এর মধ্যে ছিল বলিয়াই অনুমান করা যায়। সুতরাং ১৪৫০ শকের বা ১৫২৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়েই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা চলে।

আই-হ্যাজ (I has)

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৪

পথে একটিও মিত্রের মুখ মেলেনা,—কোনো পীঠস্থানেই পরিচিত পাইনা।—বারুণী, সোনপুর, ছাপরা, কোথাও না।—দূর করো, মহাপ্রস্থানযাত্রীর আবার এ মোহ কেনো? ঠাকুর বলতেন,—নারকোল গাছের বালদো খসে গেলেও দাগটা থাকে, বোধ হয় তাই। ও কিছু নয়—মরা দাগ।

কাশী সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ট্রেন্ প্লাটফর্মে পৌছুতেই একেবারে সরেজমিনে শুভদৃষ্টি—গুরুদেবের সঙ্গে। ভেতরে হাড়গুলো পর্য্যন্ত নড়ে উঠলো। ভগবান দয়া করে কারো নিজের চেহারা দেখতে দেননি। আমার তখন কেমনটা দাঁড়িয়েছিল,—দশজনে দেখে থাকবেন।

আমার হাতে গীতাখানা দেখে বললেন—"আজো বুঝি মুখস্থ হয়নি? আমার মুখস্থ"...

মনে মনে ভাবলুম—"ভারবাহী"।

বললেন, ভগবানের কথা না শুনেই লোকের এত কষ্ট। তিনি বলচেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

তুমি মদ্গতচিত্ত ও মদ্ভক্ত হও, আমারি উপাসক হও এবং আমাকে নমস্কার ক'র—

কি বলেন? অন্যায় বলেছেন?

ভাবলুম—বাকি আর কি? নমস্কার তো করিয়ে রেখেছেন। হাত দু'খানা আপনিই গিয়ে মাথায় ঠেকলো।

দেখে তিনি একটু হাসলেন।

বললেন—তার পর বলছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—

—"আছে না? অর্থাৎ তুমি সমুদয় ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্

পূর্ব্বক একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর। এই তো বলেছেন? আপনার কেমন লাগে? আচ্ছা সে সব ·· এখন তো আর ;···হাসলেন।

সেটা বুঝতেই পারছি, অর্থাৎ "এখন আর যাবে কোথা, এখন মামেকং শরণম্ ব্রজ!" আবার প্রচারক হলেন নাকি!—কার সর্ব্বনাশ করতে!—

আমাকে "আপনি" বলাও হচ্ছে! প্রয়োগটা পরিহাস না সম্মানার্থে বুঝলুমনা। এত সমাদর যে কোনোদিনই সয়নি। বিচলিত করে দিলেন। পরিবারের সম্মানিতা ভগ্নীরা কান দুটো নিয়েই খুসি ছিলেন,—এ যে জান নেবার ব্যবস্থা।

—ক্রমে 'আসুন' বলে যে মোটরে তোলেন! ওতো তাঁদের জন্যে "যারা মাটিতে পা দেননা। আমাদের তো —পা দু'খানাই এ জীবনের এক মাত্রা যান্!"

সন্দেহ ক্রমেই ঘনীভূত,—মহাপ্রস্থান মাঝপথেই মচ্‌কালো দেখছি।

বললেন—"ভাবচেন কি—উঠে পড়ুন। ওখানেই যেতে হবে, আমি সব ব্যবস্থাই করে রেখেছি—"

তা এখন বেশ বুঝতেই পারছি, কম্বলও পাবো। —এখানেই মহাপ্রস্থান সুরু হয়ে গেল!

তবু একবার বললুম—"বাসা রয়েছে, মুকুন্দ বাবুও বিশেষ করে···"

কথা শেষ করতে না দিয়ে সহাস্যে বললেন "মুকুন্দ বাবুকে বলে এসেছি, তিনি নিশ্চিন্তই আছেন, আর আপনার নিজের বাসা?—তার অবস্থা তো খাসা!—শুনেই থাকবেন।"

বুঝলুম—সেটাও জানেন। জানবেন বইকি, নতুন নেপ-খানা গয়াসিং দয়া করে আরাম-সে গায়ে দিচ্ছে হবে। যাক্—মুকুন্দ বাবুকেও নিশ্চিন্ত করে এসেছেন। ভালই করেছেন! দেখা হলে কতকগুলো—'বুদ্ধির দোষ' আর সদুপদেশ শোনাতেন বইতো নয়, ওটা বুদ্ধিমানদের রোগ। যে ফাঁশি যাচ্ছে তাকেও বলতে ভোলেন না—"দেখ্‌লে তো—ভবিষ্যতে এমন কাজ আর কোরোনা···"

হাতে পুঁটলিটে ছিল। দেখে বললেন—"পুঁটলিতে কি?—ও আপনার হাতে কেনো?"

তাতো বটেই; আমার জিনিষ—আর আমার হাতেই বা কেনো!

একজনকে হুকুম করলেন—"এই দিকশূল সিং—লেও।"

আমি একটু কুণ্ঠিত হয়েই বললুম—"ওটা আবৃ..."

বললেন—"কেনো—ওতে কি আছে?—খাবার জিনিষ?"

বললুম—"আজ্ঞে সকলের নয়,—কয়েক জোড়া জুতো···"

সহাস্যে বললেন—"জুতো?—অতো?"

বললুম—"আজ্ঞে সৎসঙ্গ হিসেবে মহাপ্রস্থানের সংস্থান! সেই সঙ্কল্প নিয়েই বেরিয়েছিলুম,—পথের-দাবী আছে তো..."

আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—"মহাপ্রস্থান মানে? যাবেন কোথা?"

তাও ঠিক,—আর যাবো কোথা? যেতে দেবেই বা কে?

বললুম "ভেবেছিলুম কাশী হয়ে পায়-পায় Via গৌরীশঙ্কর···"

বললেন—"সে সব হচ্ছেনা।"

—তা দেখতেই পাচ্ছি!

বললেন—"ভালো কথা,—আপনার মত বিশ্রুত সাহিত্যিক যে বড় থার্ডক্লাসে এলেন?"

বললুম—"যখন দয়া করে সাহিত্যিক বলচেন, তখন আর ও-প্রশ্ন কেনো। ও খেতাবটা honorary—অনাহারিরই রাশ-নাম। ঘোড়াটা ঘাস খায়—বেতও খায়,—race মারেন ধনেশ। আমাদের তো সর্ব্বত্রেই third, অন্ততে alphabetএর তৃতীয়···

এইরূপ কথাবার্ত্তায় 'অষ্টিন' এসে অগস্ত্যকুণ্ডে থামলো। শিষ্যেরা আশাশোঁটা হাতে ছুটে এলো।

বললেন—"লে যাও।"

আবার 'লে যাও' কেনো, গিয়েই তে রয়েছি। বাঘে ধরলে, 'খেয়ে ফ্যাল্' বলবার অপেক্ষা সে রাখেনা।

বললুম—"আমি তো নিজেই যাচ্ছি।"

তিনি হেসে বললেন—"আপনাকে নয়, ঐ পুঁটলিটে নিয়ে যেতে বলছি।"

ভাবলুম,—বেশ, একে-একেই অগস্ত্য যাত্রা হোক্।

বললুম "আজকাল দশাশ্বমেধেই কি······"

বললেন—"হ্যাঁ, আজকাল এখানেই থাকি।"

"থাকি" বলেন যে! বুঝতে পারছিনা। পূর্ব্বে এখানে তো,···তা হবে···। জল সর্ব্বদা বয়ে চলবে, —সাধু বিচরণ করে বেড়াবে, এই নিয়ম,—নইলে ময়লা জমে। যাক্—সে দিকেও নজর রাখেন, বোধহয় জমবার জায়গাও আর নেই······

'আসুন' বলে এগুলেন,—আমি অনুগমন বাধ্য।

বাড়িখানি বেশ, বোধ হয় নিচের বৈঠকখানায় শিষ্যেরা থাকেন। ওপরে একটি বড় ঘরে উপস্থিত হয়ে বললেন—"বসুন,—আসছি।"

ঘরে টেবিল চেয়ার ছাড়া দ্রষ্টব্য বড় কিছু নেই। দেয়ালে নজর পড়লো,—দেখি বিশ পঁচিশখানা ফটো। তা-ই দেখতে লাগলুম। একি—আমারো যে! শিউরে দিলে। দেখেছি সায়েবগঞ্জ ষ্টেসনে পকেটমার্ বা গাঁটকাটাদের ফটো টাঙানো আছে,—লোককে চিনিয়ে সাবধান করবার জন্যে। তাই নাকি?

দেখতে দেখতে আর ভাবতে ভাবতে চেহারাটা সেই রকমই দাঁড়াতে লাগলো। সত্বর তা-থেকে মুখ ফেরাতে বাধ্য হলুম।

গুরুদেব কখন এসে ঢুকেছেন টের পাইনি। একগাল হেসে বললেন—কি দেখছিলেন?

হাসিটে ভালো লাগলোনা। এক-একজনের হাসি বোঝাই যায়না,—সেটা হাসি-মুখ কি রাগের আভাস, কি কান্না। সে মুখ Universal keyর মত সকল তাতেই লাগে—fit করে। নব-রসের ছাঁচ।

বুঝলুম প্রিয়দের চক্ষের আড়াল করতে চাননা তাই দেয়াল চারটে—তরুণ আর যুবকপ্রীতির পরিচয় দিচ্ছে; হংস মধ্যে বুড়ো ঢুকিয়ে বৈ,চত্র্যও বজায় রেখেছেন!

বললেন,—নিন, হাত-মুখ ধুয়ে সন্ধ্যাহ্নিক সেরে নিন, চা আসছে।

এ সব পরিহাস আর কেনো,—ক্রমে বিরক্তি এসে গিয়েছিল। যা হয় হোক্ এই ভেবে বললুম—বাল্যকাল থেকেই সরকারের হাতে রয়েছি—সন্ধ্যে আহ্নিকের আর বালাই নেই।

বললেন—সরকার বারণ করেন নাকি?

বললুম—তাঁরা আর কোন্‌টা নিজে করেন? বালো প্যারীচরণ সরকারের মার্ফৎ First Book এসে—অজ্ঞাতে এমন বীজ ছড়ালেন—সন্ধ্যাহ্নিক সহজেই হ'টে গেল। বলেন তো সন্ধ্যাহ্নিকের অভিনয় করতে রাজি আছি—

প্রভু না হেসে কথা কননা, হেসেই বললেন—আপনার যা ইচ্ছে করুন—চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

এক সঙ্গেই চা খাওয়া হল।

বললেন—আমি কিছুক্ষণের জন্যে বেরুচ্ছি। আপনি একটু আরাম করুন—rest নিন্, 3rd···Class এ নিশ্চয়ই নিদ্রা হয়নি···

আর কেনো,—আজ মরিয়া হয়েই কথা কবো। বললুম—যে আজ ৭ বচর restless, তার জন্যে ভাববেন-না,···যান ব্যবস্থাদি করে আসুন গে···

কি বলতে যাচ্ছিলেন, থেমে গিয়ে বললেন—আচ্ছা সন্ধ্যের পর হবে'খন—

বললুম—"একবার বাসাটা দেখতে পারেন? মুকুন্দ বাবুর কাছেও···"

কথা শেষ না হতেই বললেন—"বৈকালে গিয়ে দেখে আসবেন।—'নন্দকুমারথানা' যত্নেই আছে—পাবেন,"—বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন—

অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম—যোগমার্গ কি অলৌকিক! তাই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন—"অর্জ্জুন তুমি যোগী হও।"—সব-জান্তা হবার অমন উপায় আর নেই···

* * * *

ঘুম হবে কেনো? পড়ে পড়ে চোখ বুজে ভাবছি—"দশ চক্রে ভগবান ভূত" কথাটা যাঁর মুখ থেকে প্রথম বেরিয়েছিল,—সেই নিরীহ অনুতপ্ত লোকটি কত বড় সত্যকেই ভাষা দিয়ে গেছেন!

বোধ হয় তন্দ্রা এসে থাকবে। সহসা ঘরের মধ্যে নারীকণ্ঠ শুনে, চাইতেই দেখি—মলিন বস্ত্রাবরণে একটি স্বর্ণপ্রতিমা,—নব-প্রৌঢ়া। বলছেন—"কাঁদো বুঝি,—কান্না সারাতে এসেছো; কেঁদনা—কেঁদনা। চুপ্ করো। আমার সতু কাঁদতো। আর কাঁদেনা—চুপ্ করেছে"···

শুনে প্রাণটা কেমন করে উঠলো, আমি সসম্ভ্রমে

নমস্কার করলুম। কে একটি স্ত্রীলোক ছুটে এসে তাঁর হাত ধরে বললেন,—"এখানে কেনো বউমা,—ভেতরে চলো—"

আমার দিকে বাঁ হাত নেড়ে—"চুপ করো—কেঁদনা বাবা—কেঁদনা ; আমি আর দেখতে পারবনা"…

অপরা তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন।

স্বপ্ন নয় তো! প্রাণটা আকুলি বিকুলি করে উঠলো। স্তব্ধ বিস্ময়ে ভাবতে লাগলুম,—কে এ পুত্রহীনা পাগলিনী? ও-কথা বলেন কেনো? জগতে কত রহস্যই নীরব রয়েছে। কার ব্যথা কে জানে!—কতটুকু বোঝে?

তাইতো, আমাকে এ সোনার-খাঁচায় রাখা আর কেনো?—সরাসরি রাজগৃহে রেখে এলেই তো ছিলো ভালো। কিছু কথা বার করতে চান বোধ হয়! কি বলবো? অপরাধটা তো আজো বুঝলুমনা। কাশীখণ্ড পড়ে উঠতে পারিনি বটে…

বেশ তো—জিজ্ঞাসা করলেই তো হয়। বলবার মধ্যে,—২৪ পরগণায় বাড়ী, ঈশ্বর শর্ম্মার সন্তান,—অঙ্কাতঙ্কে লেখাপড়া করতে পারিনি। তবু শ্বশুরমশাই দয়া করে কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন। তখনকার দিনে প্রিয়ে বলে ডাকাও ছিলনা, 'ওগো-হ্যাঁগো'তেই দিন কেটেছে—অসুবিধে বোধ হয়নি। রাঁধতেন বাড়তেন, চুল বাঁধতেন, কখনো আলতাও পরতেন,—আবার বাসনও মাজতেন। বোধ হয় তাতে কারো অসুখের কিছু ছিলনা। তবে যদি বলেন ছিলো বইকি, তিনি বলতেননা বা আপনি জানেননা, তা হলে আমি নাচার। তবে যদি অন্যের স্ত্রীকে তার স্বামীর চেয়ে আপনারা ভালো জানেন ও বোঝেন, আমার তাতে আপত্তি নেই, তাতে আপনাদের বিদ্যের বাহাদুরী দেওয়া ছাড়া, আমি গরীব ব্রাহ্মণ medalও দিতে পারিনা, Knight করে দেবার ক্ষমতাও নেই,—অবশ্য Sir বলতে পারি দু'শবার।—

—এ সব কে না জানে—বিদ্যেসাগর মশাই জানতেন, ভূদেব বাবুও জানতেন। এর মধ্যে অপরাধের কি আছে জানিনা।

হ্যাঁ—যা ছিলনা, বঙ্কিম বাবু সেটা এনে দেওয়ায় —সাহিত্য ঘাঁটাঘাঁটির নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন বটে। তাতে মারাত্মক কিছু ছিলনা—এমন কথা বলতে পারিনা।—তা নাতো কুন্দ মরে কেনো। আর ছিল কাগজে আঁকা লাঠি সড়কি তলোয়ার—তাতে একটা ছারপোকাও মরেনা।—তাঁর আনন্দমঠে নির্ভয়ে ও মহানন্দে আমি তাদের বিচরণ করতে স্বচক্ষে দেখেছি। আর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে এবং তা আমার জানা থাকে—তাও বোলবো।—অবশ্য অন্যের কথা বিশ্বাস করবার কথাও নয়—প্রথাও নয়, তা জানি। বেশ—যা ইচ্ছা হয় করুন! আর এ বিরক্তিকর ব্যাপার ভালো লাগেনা, তাঁদেরও মিথ্যার পশ্চাতে ছুটোছুটি থামুক।—

—এই বোলবো;—আর তো বলবার কিছু খুঁজে পাইনা,—আছেই বা কি? হ্যাঁ, ঠাকুর একটি কথা বলতেন—এক সাধু এক গাছতলায় থাকতেন, রাস্তার ওপারে এক বেশ্যা থাকতো [আজ-কালের ভাষায়—'থাকতেন']। সাধু নিজের কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে দিন-রাত গুণতেন—তার বাড়ী কত লোক গেলো,—আর সকালে তাকে নম্বরটা শুনিয়ে উপদেশ দিতেন,—"কচ্ছিস কি—ডুবলি যে"—ইত্যাদি।

৩০ বচর তিনি একনিষ্ঠ হয়ে এই Good Service করেন। সাধু কিনা—দয়ার শরীর! কিন্তু নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা করায় শেষে নাকি তিনিই ডুবেছিলেন! প্রকৃতির পরিহাস বুঝতে পারেননি।

—ইনি তো খুব উচ্চ সাধক—বুদ্ধিও ধরেন ক্ষুরধার—দৃষ্টি ইট কাট লোহার ব্যবধান টোপ্‌কে—নন্দকুমারে নজর পড়েছে! এমন সর্ব্বজ্ঞের আমার বেলাই ভুল হয় কেনো!—ভাগ্যের কথা ভেবে নিজেই হেসে ফেললুম,…

পাশ ফিরতেই চমকে গেলুম। গুরুজি কখন্ কোন্ ফাঁকে ঢুকে, পেছনের দিকের চেয়ারে বসে আছেন! চার চক্ষুর মিলন হতেই—সেই অস্ফুট হাসি। বললেন—ঘুমোননি?—খুব হাসছিলেন যে।

'তাবৎ ভয়স্য ভেতব্যম' পেরিয়ে পড়েছি, তাই বললুম—"হাসতে ভুলে গেছি কিনা দেখছিলুম। আপনি বলায় বিশ্বাস হল।—নিজের হাসি তো দেখতে পাইনা। যাক্—ভুলিনি।"

"একটু ঘুমুলেই তো ভালো ছিল, হাসির অবকাশ তো আছেই।"

"এমন চুণকাম করা ঘরেই না খোলে ভালো,—তাইতো দেখতে পেলেন। অন্ধকারে হেসে বা গুড়ুক খেয়ে সুখ নেই।"

—"আপনার কাছে শেখবার অনেক কিছু আছে দেখছি।"

বললুম—"লক্ষীছাড়া হবার লোভ থাকে তো"—

"আচ্ছা সে রাত্রে দেখা যাবে। এখন বেলা হয়েছে, খাবেন চলুন।"

যতক্ষণ জোটে—জুটুক—

* * * *

পাশের ঘরেই স্থান হয়েছিল। সাড়ে ছ'ফিট্ ছন্দের এক ঠাকুর, ৬৪ ইঞ্চি বুক ফুলিয়ে, ভাতের থাল রেখে বাঁ দিকে ডাল আর ঝোলের বাটী দিলে। পাতেও—লবণ, শাকের ঘণ্ট বাঁ-দস্তুরই ছিল। চরণে শিষ্যের পরিচয় লেখা—বোধহয় 13 by 7. সর্ব্বত্রই কড়ার Safeguard। যাক্—বাটার জুতোগুলো বাঁচবে—ও-পায়ে অচল—

শাক দিয়েই খেয়ে চলেছি দেখে গুরুজি বললেন—ওকি—এসব...

বললুম—"দেখছি পারি কিনা, পেটে কিছু দেওয়া নিয়ে কথা তো? অভ্যাস্ করা ভালো নয়?"

এমন সময় পাঁড়েজি সহসা "আওর্ কুছ্" বলে' উঠতেই, বেড়ালটা ভয় পেয়ে তড়াক্ করে লাফিয়ে পালালো।

আহারান্তে বললেন,—"এইবার একটু ঘুমুন, আমি দোর জানলা বন্ধ ক'রে দি।"

বললুম—সে ভয় করবেননা! ঘুম আমার অনেক দিন গেছে, একটু গড়াই। মুকুন্দবাবুর সঙ্গে যে একবার—

—"বেশ—চা খেয়ে চারটে নাগাদ্ যাবেন। আমি না থাকি সঙ্গে একজন কেউ যাবে'খন..."

"তবে আর যাবনা,—"

"কেনো—কেনো?"

"ও সৎসঙ্গ আজ আর কেনো, ও তো আছেই। থাক্, কি এমন কাজই বা আছে, নাই বা গেলুম..."

"না না, যাবেন বইকি,—বেশ, একাই যাবেন। আপনার সুবিধের জন্যেই..."

"আমার সুবিধে আর মানুষের হাতে নেই।"

তিনি আমার মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে বললেন—আপনার যা ভালো বোধ হয় তাই করবেন, কেউ বাধা দেবেনা। তবে যে-কয়দিন নিজের ব্যবস্থা না হয়, এইখানেই দয়া করে থাকবেন,—এই আমার অনুরোধ।—

—বলতে বলতে চলে গেলেন। তাঁর মুখে বা কথায় বিরুদ্ধ কিছু না পেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম;—সত্যের সাড়াই পেলুম আর কাতর একটা রেস্। বুঝতে পারলুমনা; সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

* * * *

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণলীলা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

মাঘের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় "ব্রজের কৃষ্ণ কে ও কবে ছিলেন?" নামক প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তন্মধ্যে কয়েকটি প্রসঙ্গের আলোচনা করিব।

যোগেশবাবু বলিয়াছেন যে কৃষ্ণের বাল্যচরিত মহাভারতের বহুকাল পরে সৃষ্ট হইয়াছে, কারণ মহাভারতে কৃষ্ণের বাল্যলীলার উল্লেখ নাই, যদিও নানা কালে নানা কবি মহাভারতে নানা বিষয় অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে মহাভারত কৃষ্ণের জীবনচরিত নহে। ইহা পাণ্ডবগণের জীবনচরিত। কৃষ্ণের জীবনের যে অংশ পাণ্ডবগণের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট মহাভারতে সেই অংশের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণের বাল্যচরিতের সহিত পাণ্ডবদের জীবনের কোনও সম্পর্ক নাই। এজন্য মহাভারতে কৃষ্ণের বাল্যচরিতের কোনও উল্লেখ নাই। যদি মহাভারতে কৃষ্ণের বাল্যচরিত একভাবে বর্ণিত হইত এবং সে বর্ণনার সহিত ভাগবত প্রভৃতির বর্ণনা অসঙ্গত হইত, তাহা হইলে যোগেশবাবুর সিদ্ধান্ত যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইত। কিন্তু মহাভারতে কৃষ্ণের বাল্যচরিতের কোনওরূপ বর্ণনাই নাই। ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন যে মহাভারতকার কৃষ্ণের বাল্যচরিত বর্ণনা করা মহাভারত রচনার উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন নাই।

মহাভারতে নানা কালে নানা কবি নানা বিষয় অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন— পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই সিদ্ধান্ত অকাট্য সত্যরূপে গ্রহণ না করিয়া যোগেশবাবু তাহার প্রমাণ উল্লেখ করিলে ভাল করিতেন। হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস সমগ্র মহাভারত বেদব্যাসের রচিত। বিশেষ বলবৎ প্রমাণের অভাবে হিন্দু এ বিশ্বাস ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে।

শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্বন্ধে যোগেশবাবু বলিয়াছেন যে "লোকে অসামান্য-শক্তিসম্পন্ন মানুষে ঐশীশক্তি অনুমান করে, তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতারজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করে।" যোগেশবাবুর এই কল্পনা যদি যথার্থ হইত তাহা হইলে কৃষ্ণকে ভগবানের অবতার না বলিয়া মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনকেই ভগবানের অবতার বলা যুক্তিযুক্ত হইত। কিন্তু যোগেশবাবুর এই অনুমান যথার্থ নহে। ঋষি মুনিরা ধ্যানপ্রভাবে জানিতে পারেন, কে ভগবানের অবতার। হিন্দু ঋষিবাক্যে বিশ্বাস করে। কে ভগবানের অবতার, কে নহে, ইহা হিন্দু এইভাবেই স্থির করে।

যোগেশবাবু বলিয়াছেন, "মহাভারতের যুদ্ধকুশল নীতিজ্ঞ কৃষ্ণ, গীতার জ্ঞানযোগী ভগবান কৃষ্ণ, আর পুরাণের ব্রজলীলার কৃষ্ণ আদিতে স্বতন্ত্র ছিলেন"। মহাভারতের কৃষ্ণ এবং ব্রজলীলার কৃষ্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন, ইহার যোগেশবাবু যে কারণ দিয়াছেন, আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি, এবং দেখাইয়াছি যে, যোগেশবাবুর যুক্তি বিচারসহ নহে। মহাভারতের কৃষ্ণ এবং গীতার কৃষ্ণ এক নহে ইহা মনে করিবারও যোগেশবাবু যথেষ্ট সঙ্গত কারণ দিতে পারেন নাই। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন মহাভারতে "শ্রীকৃষ্ণ স্থানে স্থানে নারায়ণের অবতার"। অর্থাৎ স্থানে স্থানে তিনি অবতার নহেন। মহাভারতের কোন্ স্থানে বলা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ অবতার ছিলেন না, সাধারণ মানব ছিলেন, যোগেশবাবুর তাহা উল্লেখ করা উচিত ছিল। মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্য এরূপ গুরুতর অসঙ্গতি-দোষ-দুষ্ট, ইহা, বিশেষ বলবৎ প্রমাণের অভাবে কেহ বিশ্বাস করিবেন না। মহাভারতে বর্ণিত ব্যক্তিবিশেষ কৃষ্ণকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিতে না পারেন। কিন্তু কৃষ্ণ অবতার ছিলেন ইহাই মহাভারতকারের অভিপ্রায়, এবং তাঁহার অভিপ্রায় বিভিন্ন স্থানে পরস্পর-বিরুদ্ধ হইতে পারে না।

যোগেশবাবু বলিয়াছেন "আশ্চর্য এই, কোনও ঋষি জানিলেন না, ত্রিকালদর্শী বেদব্যাসও জানিলেন না, কৃষ্ণ কে। কেবল জ্যোতিষী গর্গ জানিলেন কৃষ্ণ কে।" এখানে যোগেশবাবু দুইটি ভুল করিয়াছেন। প্রথমতঃ, তিনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে গর্গও ঋষি ছিলেন—জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণয়নকারী ঋষি (শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৮ম অধ্যায় দেখুন)। দ্বিতীয়তঃ যোগেশবাবু যে বলিয়াছেন "ত্রিকালদর্শী বেদব্যাসও জানিলেন না কৃষ্ণ কে," এই উক্তি ভুল। কৃষ্ণ কে তাহা বেদব্যাস বিলক্ষণ জানিতেন। কিন্তু কৃষ্ণ কে ইহা সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন ঋষি গর্গ; এবং ইহা প্রচার করিবার অবসর হয় কৃষ্ণ ও বলরামের দ্বিজাতি যোগ্য সংস্কার করিবার সময়। বেদব্যাসের পূর্ব্বে গর্গেরই কৃষ্ণতত্ত্ব প্রচার করিবার অবসর হইয়াছিল। সুতরাং গর্গ ইহা প্রচার করিয়াছিলেন ইহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই।

যোগেশবাবু লিখিয়াছেন "রাসক্রীড়ায় কৃষ্ণের ধর্মবিরোধী কর্ম দেখিয়া ভাগবত পুরাণ পরীক্ষিতের মুখ দিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শুকদেবের উত্তরে রাজা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ।" ইহা পড়িয়া বোধ হইতেছে যে যোগেশবাবু কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করেন নাই, কেবল পাশ্চাত্য-শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে প্রচলিত অবিশ্বাস প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষ্ণলীলা বুঝিতে অক্ষমতার কারণ এই যে অনেকে মনে করেন যে কৃষ্ণের জীবনে আদর্শ মানবের চরিত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। বঙ্কিমচন্দ্রও কৃষ্ণচরিত্রে এই ভুল করিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণের জীবন এবং আদর্শ মানবের জীবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কারণ কৃষ্ণ মানব ছিলেন না, অতএব আদর্শ মানবও ছিলেন না। এমন কি তিনি ভগবানের অংশ অবতারও নহেন,—তিনি স্বয়ং ভগবান "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"। মানব ও ভগবানে প্রভেদ আছে; এজন্য মানব চরিত্র এবং ভগবানের চরিত্রেও প্রভেদ থাকা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে

ব্যক্তি ভগবানের সকল আদেশ মানিয়া চলে সেই ব্যক্তি আদর্শ মানব। ভগবানের চরিত্র এই যে তিনি ভক্তের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। ভগবান বলিয়াছেন যে ব্যক্তি তাঁহাকে যে ভাবে পাইতে চাহে, তিনি তাহাকে সেই ভাবে দেখা দেন। গোপীরা ভগবানকে (কৃষ্ণকে) পতি ভাবে চাহিয়াছিল, সুতরাং পতি ভাবে গোপীদের সহিত মিলিত হওয়াই কৃষ্ণের স্বাভাবিক ধর্ম,—যদিও আদর্শ মানবের ধর্ম সেরূপ হইবে না। গীতায় কৃষ্ণ ভক্তকে বলিয়াছেন "সকল ধর্ম ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের শরণ লইতে হইবে।" এই আদেশ অনুসারেই সাধু পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য, স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী হইয়া ভগবানের স্মরণ লয়। অল্পবুদ্ধি মানবের সন্দেহ হইতে পারে,—স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে কর্ত্তব্য, তাহাও কি ভগবানের জন্য ত্যাগ করা উচিত? ইহার উত্তর—রাসলীলা।

কেবল রাসলীলা নহে,—অন্যত্রও কৃষ্ণের চরিত্রে এবং আদর্শ মানবের চরিত্রে পার্থক্য সুস্পষ্ট। কংসের রজকের নিকট কৃষ্ণ রাজবেশ চাহিলেন। রজক দিল না,—কৃষ্ণকে সে ভগবান বলিয়া স্বীকার করিল না। কৃষ্ণ রজকের শিরশ্ছেদ করিলেন। আদর্শ মানবের কি তাহা করা উচিত ছিল? নিশ্চয়ই না। কিন্তু কৃষ্ণ ত আদর্শ মানব নহেন। তিনি ভগবান। ভগবান বলিয়াছেন, "যে ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, তাহার বিনাশ হয়" (অসন্নেব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ—উপনিষদ্।) রজক ভগবানকে সম্মুখে দেখিয়াও অস্বীকার করিয়াছিল। এ ক্ষেত্রে তাহার বিনাশই স্বাভাবিক।

কুব্জা বারনারী। শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়াছিল, তাঁহাকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, বারনারী গৃহে গমন আদর্শ মানবের পক্ষে অনুচিত। কিন্তু কৃষ্ণ আদর্শ মানব নহেন। সুতরাং আদর্শ মানবের কর্ত্তব্য এবং তাঁহার কর্ত্তব্য বিভিন্ন। তাঁহার কর্ত্তব্য—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং"—বারনারীও যদি ভগবানকে রূপে প্রার্থনা করে, সে প্রার্থনা পূরণ করাই ভগবানের ধর্ম।

ভগবান শাস্ত্র দ্বারা বহুবার স্পষ্ট ভাবে মানবকে আদেশ করিয়াছেন,—"পরদার সেবা করিবে না" "নরহত্যা করিবে না" "বারনারী গৃহে যাইবে না"। মানবের কি কর্ত্তব্য এ বিষয়ে কোনও ব্যক্তিরই সন্দেহ হইতে পারে না। কৃষ্ণের চরিত্র দেখিয়া কেহ যদি এই সকল নিষিদ্ধ কর্ম করে, সে বলিতে পারে না যে তাহার কর্ত্তব্য কি তাহা সে জানিত না। মহাদেব বিষ পান করিয়াছিলেন দেখিয়া মানব যদি বিষ পান করে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

ভগবানের পক্ষে "পরদার" শব্দের ব্যবহার হইতে পারে না। ভগবান ব্যতীত গোপদের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, গোপীদেরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। তাই যখন গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত রাসলীলা করিতেছিল, তখন তাহাদের পতিগণ ভাবিয়াছিল যে তাহাদের পত্নীরা নিকটেই রহিয়াছে। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৩৩ অধ্যায়)।

ঐশ্বর্য্যশালী নৃপতি জানিতে পারিয়াছেন সাত দিনের মধ্যে সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে। আকুমার ব্রহ্মচারী সর্বত্যাগী সাধু তাঁহাকে ধর্মকথা শুনাইতেছেন। দুর্নীতিমূলক কাহিনী প্রচার করিবার ইহাই উপযুক্ত অবসর নহে। সেইরূপ কাহিনীই এখানে বলা হইয়াছিল যাহা শুনিলে মন সকল প্রকার বাসনা হইতে দ্রুত বিমুক্ত হইয়া ভগবচ্চিন্তাতেই বিলীন হইয়া যায়। রাসলীলা সেইরূপ কাহিনী।

যে লীলা স্মরণ করিয়া চৈতন্যদেব সুখের সংসার, বৃদ্ধা মাতা, যুবতী পত্নী পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তবৎ বৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, সে লীলা দুর্নীতির লীলা নহে। সহস্র সহস্র সর্বত্যাগী সাধু যে লীলা স্মরণ করিয়া চিত্ত পবিত্র এবং ভগবদভিমুখী করিয়াছেন, সে লীলা দুর্নীতির লীলা নহে।

পূতনাবধ, যমলার্জ্জুন ভঙ্গ, কালিয় দমন প্রভৃতি কৃষ্ণের বাল্যলীলার যোগেশবাবু রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঈশ্বরের লীলার রূপক ব্যাখ্যা করিতে কোনও বাধা নাই। যাঁহাদের এই সকল রূপক ব্যাখ্যায় চিত্ত পরিতৃপ্ত হয় তাঁহারা সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু যোগেশবাবুর ব্যাখ্যাগুলি সাধারণের তৃপ্তিদায়ক হইবে এরূপ মনে হয় না। আমাদের মনে হয় যে এই সকল বাল্যলীলা বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে শ্রীকৃষ্ণ যে সাধারণ মানব ছিলেন না, তিনি স্বয়ং ভগবান ছিলেন, এই তত্ত্ব গোপ গোপীগণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। তাহারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল বলিয়াই রাসলীলা সঙ্গত হইয়াছে।
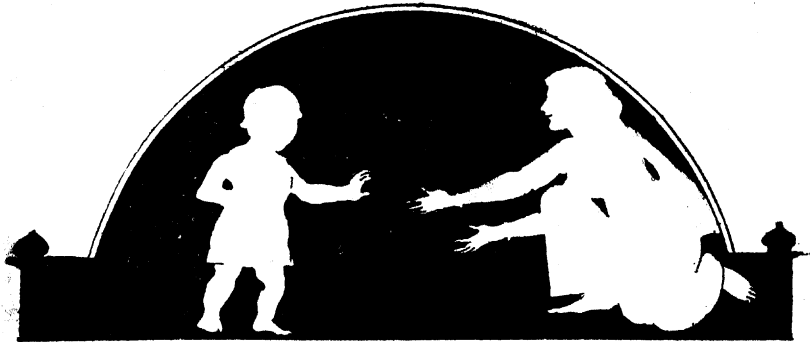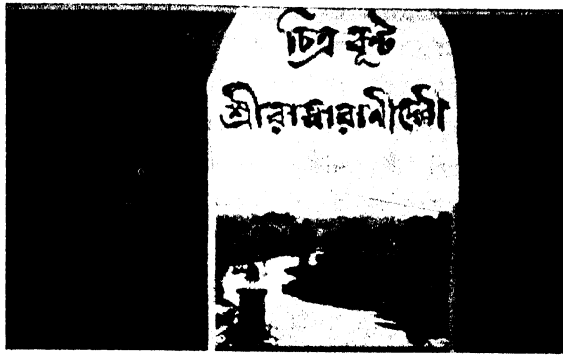
জনৈক সাহিত্যিক বন্ধু গল্পপ্রসঙ্গে একদিন জানালেন, তাঁর শ্বাস-কষ্ট-কাতরা বৌদিদি নাকি নিরাময় হয়েচেন এক দৈবঔষধির গুণে। আমার স্বামী এ'কথা শুনে সাগ্রহে জানতে চাইলেন সে ঔষধির সবিশেষ বিবরণ।

সপরিবার ডাক্তারবাবু

বন্ধু গল্প করলেন সুদূর চিত্রকূট পাহাড়ের গভীর অরণ্যে স্ফটিকশিলা নামে এক পর্ব্বতগুহায় একজন সন্ন্যাসী আছেন। শ্বাসরোগের একটি অব্যর্থ ঔষধি তিনি বিতরণ করেন—বৎসরে মাত্র একটি দিন—আশ্বিনের কোজাগরী পূর্ণিমার নিশুতি রাত্রে। সেই ঔষধ বিশুদ্ধ গোদুগ্ধে প্রস্তুত পবিত্র চরুর সাথে মিশ্রিত করে সমস্ত রাত্রি পূর্ণিমা চন্দ্রালোকে স্থাপিত করে তারপরে

শেফালিকা ও মালবিকা

সেবন করতে হয়। এই ঔষধে নাকি দুরারোগ্য শ্বাস-রোগীও সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েচে।

দীর্ঘকাল নিদারুণ শ্বাসকষ্টে ভুগে ভুগে, ইদানীং প্রায় অর্দ্ধমৃতাবস্থায় আমার দিন কাটছিল। বিজ্ঞানসম্মত

নানাবিধ চিকিৎসার চূড়ান্ত হয়ে গিয়েচে ; কখনও কখনও সুফল পাওয়া গেলেও তা' দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথি বাইওকেমিক্ কবিরাজী হাকিমী এমনকি টোট্‌কা পর্য্যন্ত বাকী নেই। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে দৈব প্রতিষেধকেরও কম সমাবেশ হয়নি। তবুও শ্বাসকষ্ট দিনদিন আমার বেড়ে চলেছে। কাজেই, কোথাও কোনওখানে শ্বাসরোগের ঔষধের সন্ধান পেলেই তা' আমার জন্ম সংগ্রহ করতে স্বামীর অধ্যবসায়ের সীমা নেই। বন্ধুর মুখে রূপকথারই মতো ঔষধের কাহিনীটি শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন তিনি। আমাকে বললেন,—এইবার তোমাকে নিরাময় করে তুলতে পারবো নিঃসন্দেহ। আমি মৃদু হেসে

কাম্যদ গিরি

উত্তর দিলাম—হাঁ, ওষুধটি যে-রকম ভাবে পাওয়া যায় শুনলাম, তাতে রোগ না সেরে উপায় নেই। "চিত্রকূট পর্ব্বত" "স্ফটিকশিলা গুহাবাসী সন্ন্যাসী" "কোজাগরী পূর্ণিমার নিশুতিরাতে বৎসরে একদিনমাত্র ওষুধ প্রাপ্তি" "পবিত্র চরুর সাথে মিশিয়ে সেবন"—সমস্তগুলিই চমৎকার হৃদয়গ্রাহী হয়েচে ; কেবল, নিশ্বাস বন্ধ করে এক ডুবে স্ফটিকসরোবরের তলদেশে গিয়ে তালপত্রের খাঁড়ায় প্রবালস্তম্ভ কেটে কোনও রাজকুমার ঔষধটি বার করতে পারলে বোধহয় এ' রোগ আরোগ্য সম্বন্ধে আর একটুও সন্দেহ থাকতোনা !—

স্বামী বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হয়ে বল্লেন,—যতই রহস্য কর, আগামী কোজাগরী পূর্ণিমায় তোমাকে নিয়ে চিত্রকূট পাহাড়ে ঐ ঔষধের জন্য আমি যাবই।

দৈব ঔষধের উপরে গভীর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাক আর না-ই থাক্, চিত্রকূটের নাম শুনেই চখের সামনে ভেসে উঠলো বাল্মীকির রামায়ণের ছবি।

শৈশবে মায়ের মুখে সুরসংযোগে রামায়ণ পাঠ শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে পড়তাম। কতো নদী গিরি কানন কান্তারের মধ্য দিয়ে চলেছেন জটাবল্কলধারী তরুণ যুবরাজ শ্রীরামচন্দ্র, বামে জনকনন্দিনী সীতা, পিছনে ভ্রাতৃভক্ত অনুজ লক্ষ্মণ। কোথাও বা অন্ত্যজ চণ্ডালের সাথে মিতালি পাতিয়ে, কোথাও বা ভক্তিমতী শবর-নারীর আতিথ্য গ্রহণ করে, কত রাক্ষসের আক্রমণ এড়িয়ে, কত রমণীয় ঋষি-আশ্রমের মাঝ দিয়ে—তাঁদের সুদীর্ঘ বনযাত্রা! সেই সব আশ্রমের ছবি, অরণ্য পর্ব্বতের দৃশ্য মানসচখে স্বর্ণচিত্র মেলে ধরতো, সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে দিতো এক অপূর্ব্ব স্বপ্নকল্পনাজালে।

মনে আছে, আমার বয়স তখন আটবৎসরও বোধ হয় পূর্ণ নয়, মায়ের কৃত্তিবাসী রামায়ণখানি ছিল আমার সবচেয়ে আকর্ষণের সামগ্রী ; সময় ও সুযোগ পেলেই সেই প্রকাণ্ড বইখানি খুলে অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড লঙ্কাকাণ্ড প্রভৃতির মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যেতাম।

যাই হোক, চিত্রকূট পর্ব্বতের নাম আমার বাল্যের সেই রামায়ণ পাঠের স্বপ্নমুগ্ধ দিনগুলিকে বিস্মৃতির সুপ্তি থেকে জাগিয়ে দিল যেন সোণার কাঠী ছুঁইয়ে। মানস-নয়নে ছায়ার মত ভেসে উঠতে লাগলো সেই রাজার পুত্রের বনগমনের অতিকরুণ দৃশ্য। অযোধ্যা হতে শৃঙ্গবেররাজ্য গুহক মিতার দেশ—সেখান থেকে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গমন ; ভরদ্বাজ মুনি কর্ত্তৃক চিত্রকূটে অত্রি মুনির আশ্রমে যাওয়ার উপদেশ ও চিত্রকূট পর্ব্বতের অপূর্ব্ব নিসর্গশ্রীর বর্ণনা—সবই মনে পড়ে গেল। ভ্রাতৃ

ভক্ত ভরত রাজাদশরথের সকরুণ মৃত্যু সম্বাদ নিয়ে যে চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনবার জন্ত কতই না প্রয়াস করেছিলেন! সেই রামায়ণ বর্ণিত চিত্রকূট! স্বামীর প্রস্তাবে মন উৎসাহিতই হয়ে উঠলো। কয়েকমাস বাদেই এসে পড়লো শারদীয়া পূজার অবকাশ। আমরাও প্রস্তুত হলাম।

বোম্বে মেলে দু'খানি সেকেণ্ড-ক্লাশ বার্থ রিসার্ভ করে শারদীয়া সপ্তমীর রাত্রে হাওড়া ষ্টেশনে এসে ট্রেণে উঠলাম আমরা। ই আই আর লাইনের মানিকপুর জংসন পর্য্যন্ত আমাদের যাতায়াতের রিটার্ণ টিকেট করা হয়েছিল। ওধারে জি, আই, পি লাইনে রিটার্ণ টিকেটের সুবিধা ছিলনা। ষ্টেশনে বিদায় দিতে আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধব এসেছিলেন অনেকগুলি। তারমধ্যে জনৈক মারাঠী বন্ধু প্রচুর সুরভি পুষ্প-দামে আমাদের যাত্রাপথ গন্ধামোদিত করে দিয়েছিলেন।

মন্দাকিনী

বন্ধু-বান্ধবের অকৃত্রিম শুভেচ্ছার মধ্য দিয়ে সেদিনকার যাত্রাটী আমাদের মধুরই হয়ে উঠেছিল।

মহাষ্টমীর দিন বেলা বারোটায় মাণিকপুর জংসনে পৌছে সেদিন আর ট্রেণ না থাকায় সারাদিন মাণিকপুর ওয়েটীংরুমে কাটানো হয়েছিল। সঙ্গে ষ্টোভ। ইকমিক্-কুকার ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সমস্তই থাকায় কোনও কষ্ট হয়নি, বরং কেটেছিল ভালোই। বিকালে মাণিকপুরের কয়েকটি মন্দির দেখে ও ক্ষুদ্র গ্রামখানি পরিক্রমণ করে ফিরে এলাম। রাত্রি সাড়ে বারোটায় চিত্রকূট যাওয়ার ট্রেণ। সেকেণ্ড্ক্লাশ কম্পার্টমেণ্ট্ খালি না থাকায় বাধ্য হয়ে ফার্ষ্ট ক্লাশে কারউই পর্য্যন্ত যেতে হল। কারউই একটি ক্ষুদ্র শহর। এখানে ডাকবাংলা আছে। পয়স্বিনী নদীর ধারে জয়েণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের হেড কোয়ার্টার। নারায়ণরাও পেশোওয়ার প্রকাণ্ড প্রাসাদ এখনও এখানে বর্ত্তমান আছে। সেটি উপস্থিত সরকারি কাজে ব্যবহার হ'চ্ছে। এই প্রাসাদটি এখানে

যজ্ঞবেদী

'বোরা' নামে প্রসিদ্ধ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই নারায়ণ রাও পেশোওয়া এখানে

স্বাধীনতা ঘোষণা করে প্রায় বর্ষকাল এ প্রদেশ শাসন করেছিলেন। পেশোওয়াদের সঞ্চিত অগাধ ধনসম্পদ এই প্রাসাদের মধ্যে ভূগর্ভস্থ একটি গুপ্ত কক্ষে লুক্কায়িত ছিল। কারউইতে একটি সুন্দর মন্দির আছে এবং তৎ-সংলগ্ন একটি জলাশয় এবং জলটুঙির মত প্রাচীর ও দালান পরিবেষ্টিত একটি প্রকাণ্ড কূপ আছে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বিনায়ক রাও এই মন্দির ও বহুতলযুক্ত কূপটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানকার লোকে এটিকে বলে গণেশ বাহ্। কারউই ষ্টেশনের ওয়েটীং রুমের বড় টেবিলের উপরে হোল্ড্‌অল্ খুলে বিছানা পেতে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিয়ে বিজয়াদশমীর দিন সকালে টঙ্গা করে চিত্রকূট যাত্রা! কারউই ষ্টেশন থেকে চিত্রকূট কয়েক মাইলমাত্র। 'বাস' সার্ভিস আছে। কিন্তু,
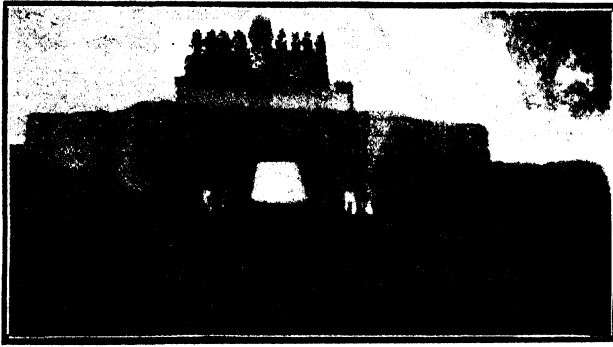
লঙ্কাপুরী

বাসের অপেক্ষায় না থেকে আমরা একখানি টঙ্গা ভাড়া করে রওনা হলাম। পথে একটু দূরেই পড়লো এক নদী! নাম শুনলাম পয়স্বিনী বা পৈস্থূর্ণী। নৌকায় করে আমরা পার হলাম—টঙ্গাওয়ালা অপেক্ষাকৃত কম জলের মধ্য দিয়ে ঘোড়ার মুখ ধরে টঙ্গা পার করে নিল। তারপরে ওপারে গিয়ে আবার টঙ্গায় উঠতে হল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চিত্রকূটের সীতাপুর গ্রামে এসে পৌছুলাম। চিত্রকূট পর্ব্বত "পর্ব্বত" ষ্টেসন থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে। চিত্রকূট ষ্টেশনে যানবাহনাদি পাওয়া যায় না বলে আমরা কারউই ষ্টেশনে নেমে টঙ্গা নিয়ে এসেছিলেম। হিন্দুর পুণ্যতীর্থ এই চিত্রকূট বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ স্থান। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, জনক-দুহিতা ও অনুজ লক্ষ্মণের চরণ-চিহ্নিত ও নানা স্মৃতি বিজড়িত এই চিত্রকূট পর্ব্বতে প্রতিবৎসর ভারতের নানা দিগেশ হইতে বহু যাত্রী এসে পুণ্যার্জ্জন করে ধন্য হ'য়ে যায়। এই চিত্রকূট পর্ব্বত পরিক্রমার জন্য পান্নার মহারাজা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র কুন্‌ওয়ার একটি সুন্দর শিলাপথ নির্ম্মাণ করে দিয়েছিলেন, সে আজ হ'ল প্রায় দেড়শত বৎসরের কথা।

এই চিত্রকূট পর্ব্বতের ক্রোড়ে সীতাদেবীর স্মৃতি বহন করছে যে সীতাপুর গ্রাম, এখানে বৎসরে দুবার দুটি মেলা বসে। একটি আশ্বিন কার্ত্তিকের "দেওয়ালী উৎসব," অন্যটি চৈত্র বৈশাখে "রামনবমীর মেল।"। এছাড়া প্রত্যেক অমাবস্যা এবং চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণের সময়ও ছোট-খাটো মেলা বসে।

এখানে একটিমাত্র বাঙ্গালী সপরিবারে বাস করেন। নাম ফণীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি। তিনি 'ডাক্তার বাবু' নামেই পরিচিত। চিত্রকূটে এঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে একটি সেবাশ্রম স্থাপন করেছেন। অসহায় ও রোগার্ত্ত যাত্রীদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করা এঁদের ব্রত। বহু দরিদ্র ব্যক্তি এখান থেকে বিনামূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসা প্রাপ্ত হয়।

আমাদের বাঙালী দেখে ডাক্তারবাবু সাগ্রহে তাঁর নিজের বাড়ীতে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। আমি ফণীন্দ্রবাবুর পরিবারে অতিথি-সেবার যে আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দেখে এসেছি এর আগে কখনও এ অভিজ্ঞতা ঘটেনি।

পরিবারটি ছোট। গৃহকর্ত্তা ডাক্তারবাবু সদানন্দ ভোলানাথ মানুষ। বাঙ্গালী পেলে আর ছাড়েন না। নিজ বাড়ীতে এনে তাঁদের পরিচর্য্যার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। এই তাঁর স্বভাব। স্ত্রী নলিনী দেবী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা। স্বামীর সেবাশ্রমের চিকিৎসাকার্য্যে তিনি সহকারিণী। দু'টি তরুণী কন্যা কুমারী শেফালিকা ও মালবিকা। এরাই রন্ধনাদি যাবতীয় গৃহকর্ম্ম করে থাকে। মেয়ে দু'টির শ্রমশীলতা অসাধারণ। ঘরে

শিঙাড়া কচুরী রসগোল্লা সন্দেশ জলখাবার তৈরী থেকে মাছ মাংস লুচী রুটী ভাত তরকারী যে-অতিথির যা' প্রয়োজন সমস্ত যথাসময়ে প্রস্তুত করে দিচ্ছে। তিনটি ছেলে। বড় ছেলে শচীন্দ্রের বয়স তেরো থেকে চৌদ্দর মধ্যে। দ্বিতীয় রবীন্দ্রের বয়স বছর দশেক। ছোটটি শিশু, বছর দেড়েক বয়স। শচীন্দ্র ও শেফালিকা দুই ভাই বোনই দেখলাম ডাক্তারবাবুর সংসারের কর্ণধার। সেবাশ্রমের নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে, তার মিস্ত্রী খাটানো থেকে সুরু করে মাল্‌মশলাকেনা, হিসাবপত্র রাখা, সমস্তই সেই তের চৌদ্দ বৎসরের বালক নিপুণভাবে সম্পন্ন করছে। সংসারে পোষ্য অনেকগুলি, শচীন্দ্র ও রবীন্দ্রের দু'টি ঘোড়া, বুদ্ধুকিলাল ও মুন্সিলাল, গাই লক্ষ্মী, হরিণ, নীলগাই প্রভৃতি। শচীন্দ্র ও রবীন্দ্র তাদের ঘোড়ায় চড়ে দুরারোহ পার্ব্বত্য পথে মাইলের পর মাইল বায়ুবেগে অতিক্রম করে যায়। শেফালিকা ও মালবিকাও অশ্বারোহণে পারদর্শিনী।

ডাক্তারবাবু তাঁর বাড়ীর সব চেয়ে ভালো আলো-হাওয়াযুক্ত বড় ঘরখানি আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন। নিজের হাতে মশারী খাটিয়ে দেওয়া থেকে আরম্ভ করে আমাদের আরাম ও সুখ-সুবিধার দিকে তাঁদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং প্রয়াস আন্তরিক দেখতাম। দুই একটি উদাহরণ দিই। রাত্রে যে খাটে আমরা শুয়েছিলাম সেটি পরিসরে ছোট বলে গরমে একটু নিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছিল। আমরা অবশ্য তা' প্র কা শ করিনি। সকালবেলা চা পানের সময় ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, রাত্রে ঘুম কেমন হয়েছিল? স্বামী উত্তরে বললেন, একটু বেশী গরম বোধ হওয়ায় তেমন ভাল ঘুম হয়নি। শুনামাত্র ডাক্তারবাবু এবং তাঁর স্ত্রী স্বতঃসিদ্ধরূপে স্থির করে নিলেন শোবার খাটখানি সরু হওয়ায় নিশ্চয়ই কষ্ট হয়েছে এবং ঘুম হয়নি। তৎক্ষণাৎ শচীন্দ্রকে ডেকে বললেন, "তোমার কাকাবাবুর কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, একখানি চওড়া তক্তাপোষ হলে ওঁদের শোবার বেশ সুবিধা হয়, তুমি
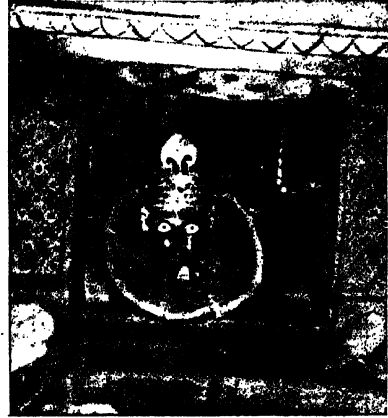
মুখারবিন্দ

ওঁদের জন্য একখানি তক্তাপোষ তৈরী করে দাও।" চিত্রকূটে সব জিনিষ পাওয়া যায় না। শচীন্দ্র ঘোড়ায় চড়ে কাৎউই চলে গেল। তক্তাপোষের কাঠের বন্দোবস্ত করে মিস্ত্রী নিয়ে ফিরে এল। সেই দিনই একখানি বড়
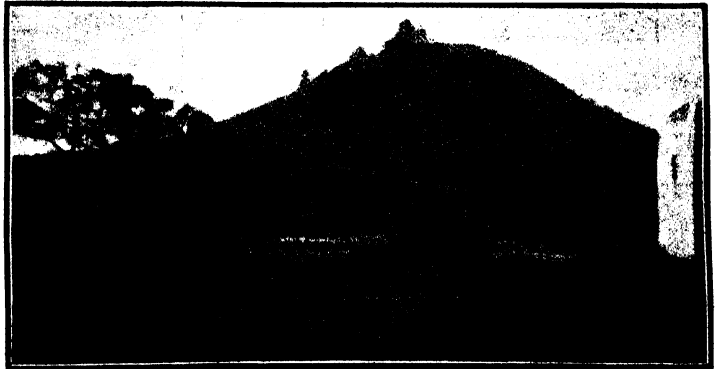
লক্ষ্মণ পাহাড়

তক্তাপোষ আমাদের জন্য তৈরী হ'ল দেখে বিস্মিত ও কৃতজ্ঞ না হ'য়ে পারলাম না।

আমার শরীর তখনও দুর্ব্বল, সবে রোগশয্যা থেকে

উঠে চিত্রকূটে গিয়েছি। একদিন চেয়ারে অনেকক্ষণ বসে থাক্‌বার পর ক্লান্তিবোধ হওয়ায় ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী লক্ষ্য করে বললেন, —"দুর্ব্বল মানুষ,—একখানি ইজিচেয়ার থাকলে বেশ সুবিধা হত আপনার পক্ষে।" ব্যস্‌। তৎক্ষণাৎ অতিথির জন্য ইজিচেয়ার চাই। শচীন্দ্র অশ্বারোহণে আট মাইল দূরে কারউই থেকে ক্যানভাস্‌ ও স্ক্রু পেরেক্‌ প্রভৃতি কিনে এনে দুই ভাইয়ে মিলে সমস্ত দিন পরিশ্রম করে সুন্দর একখানি ক্যানভাসের ফোল্ডিং ইজিচেয়ার প্রস্তুত করে আমার ব্যবহারের জন্য এনে দিলে। আমি তো অবাক!! আমাদের দেশে দশ বছরের ছেলেরা প্রায়

কোটীতীর্থ

মায়ের আদরের দুলাল হয়েই কাটায়। কিন্তু এই দশ বছরের বালক রবীন্দ্রের ঘোড়ায় চড়ায় দক্ষতা দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। তা' ছাড়া, বাড়ীর সমস্ত কাজেই দুই ভাই—বোন দু'টিকে সাহায্য করছে। লেখাপড়াতেও দেখলাম ছেলে দু'টি বেশ। ইংরাজী বেশ ভালই জানে, তা' ছাড়া বাংলা ও হিন্দী ত' জানেই। এরা বাড়ীতেই ম্যাট্রীক্‌ ষ্ট্যাণ্ডার্ডে পড়াশোনা করছে।

চিত্রকূটে যে কোনও বাঙালী বেড়াতে যান্‌, তাঁরা ডাক্তারবাবুর অতিথি না হলে—ওঁদের আন্তরিক ক্ষোভ ও দুঃখের যেন অন্ত থাকে না।

আমরা যখন তাঁর বাড়ীতে ছিলাম, তখন আরও দু' তিন জন বাঙালী অতিথি রয়েচেন তাঁর বাড়ীতে। তার পর কোজাগরী পূর্ণিমায় শ্বাসকষ্টের ওষুধের জন্য আরও বহু বাঙালী এসে পড়লেন এবং তাঁরা সকলেই ডাক্তারবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন দেখলাম। বাংলা হতে বহুদূরে এই একটি বাঙালী পরিবার নীরবে লোকসেবাব্রতে কি রকম ভাবে জীবন যাপন করছেন দেখে বিস্মিত না হয়ে পারিনি।

এবার ১৭ই আশ্বিন মঙ্গলবার—কোজাগরী পূর্ণিমা ছিল। সেইদিন রাত্রে চিত্রকূটে কাম্যদ-পাহাড়ের নীচে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে হাজার হাজার শ্বাসরোগী তাদের

হনুমানধারা

সঙ্গীসহ সমবেত হয় ঐ ঔষধের জন্য। শুনলাম,— স্ফটিকশিলা পাহাড়ে যে সন্ন্যাসী ঐ ঔষধ বিতরণ করতেন তিনি দেহরক্ষা করায় এখন তাঁর চেলারা ঔষধ বিতরণ করেন। রেহুয়া রাজ্যের রাজভ্রাতা এইখানে এসে এই ঔষধ সেবনে নিরাময় হওয়ায় তিনি এই ঔষধের ভেষজ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে জেনে নিয়ে কয়েক বৎসর যাবৎ নিজরাজ্যে এই ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন। রেহুয়াতেও বৎসরে একদিন কোজাগরী পূর্ণিমারাত্রে এই ঔষধ বিতরিত হয়ে থাকে।

চিত্রকূটের কাম্যদ পাহাড়টিকে স্থানীয় লোকেরা

কাম্‌দানাথ বলে থাকে। পাহাড়টি বেশ বড়। এই পাহাড়টিকে নাকি শ্রীরামচন্দ্র কাম্যদ-শিবরূপে পূজা করেছিলেন। পাহাড়টি স্বয়ং শিবরূপে পূজিত হওয়ায় এর উপরে মানুষের ওঠা নিষিদ্ধ। এই পাহাড়টির চতুর্দ্দিক বেষ্টিত করে মোট ৩৬০টি দেব-দেবীর মন্দির আছে। প্রতিদিন একটি করে মন্দিরে পূজা দিলে বর্ষকাল সময়ের প্রয়োজন। কাম্যদগিরির যে প্রধান বিগ্রহ কাম্যদনাথ—তাঁর মূর্ত্তির নাম "মুখারবিন্দ"। অর্থাৎ কাম্যদ পাহাড়রূপী শিবের মুখারবিন্দ। একটি নিকষ কালো পাথরের দেবতার মুখ। হাত পা কিছু নেই।

জানকী কুণ্ড

চিত্রকূট থেকে অর্থাৎ সীতাপুর থেকে কাম্যদ পাহাড় মাইলটাকের উপর দূর। চিত্রকূটে এক হপ্তা থেকে আমরা দ্রষ্টব্যস্থানগুলি ভ্রমণ করেছিলাম। এখানে হাতী ঘোড়া ও অতিক্ষুদ্র ডুলি ছাড়া অন্য কোনও যান-বাহনের সুবিধা নেই। হাতী সব রাস্তা দিয়ে চলে না এবং উঁচু পাহাড়ে চড়াই উৎরাইর পক্ষেও সুবিধার নয়। এখানকার ডুলি একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের ওঠার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। একমাত্র ঘোড়াই এই পার্ব্বত্য প্রদেশের সব চেয়ে সুবিধাজনক বাহন। বাল্যকালে কুচবিহার রাজ্যে হাতী ও ঘোড়ায় চড়লেও, বড় হওয়ার পর ওসব পাট আর ছিল না। সুতরাং প্রথমটা ঘোড়ায় উঠতে একটু ইতস্তত: করলেও শেষটা সবদিক বিবেচনা করে "যস্মিন্ দেশে যদাচার" বলে ঘোড়াই নিয়েছিলাম। প্রথম দিন একটু ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে চলবার পর, পরে আর ভয় ছিল না এবং অবলীলাক্রমে দুর্গম দুরারোহ চড়াই উৎরাই পথ ঘোড়া ছুটিয়ে অতিক্রম করে আসতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হত না, বরং সুবিধাই হত।

মঙ্গলবার কোজাগরী সন্ধ্যায় কাম্যদ পাহাড়ের নীচে সেই প্রান্তরের পানে দু'জনে দু'টি ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করলাম। ডাক্তারবাবুরাও সপরিবারে আমাদের সাথে সেই প্রান্তরে যাত্রা করলেন। সঙ্গে ষ্টোভ্, খাবার, চায়ের সরঞ্জাম ও বসবার সতরঞ্চী, গায়ের গরম শাল আলোয়ান প্রভৃতি নেওয়া হয়েছিল।

জানকী-কুণ্ড-বিধৌত মন্দাকিনী

সুন্দর শুভ্র জ্যোৎস্নায় প্রকাণ্ড তেপান্তরের মাঠ অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করেচে। মেলা বসে গেচে হাজার হাজার লোকের। চায়ের দোকান মেঠাইয়ের দোকানও খোলা হয়েচে সেই পাহাড়তলীর মাঠে। আমরা অনেকগুলি বাঙালী ঔষধপ্রার্থী ছিলাম। তার মধ্যে হিন্দু-

মিশনের স্বামী সত্যানন্দজীও ছিলেন। কলিকাতার জনৈক এম্ বি ডাক্তার এবং তাঁর মাতাঠাকুরাণী, মাজু-গ্রামের জনৈক ভদ্রলোক এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, উলুবেড়িয়া বাণীবনের হেড্মাষ্টার মহাশয় ও আর একটি ভদ্র যুবক, তা' ছাড়া রেওয়ারাজ্য হতে জনদুই বাঙালী ভদ্রলোক এসেছিলেন। আমরা জন বারো-চৌদ্দ ছিলাম; তা' ছাড়া চিত্রকূটের ডাক্তারবাবু তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা সেই মাঠের মাঝে একধারে এক একখানি সতরঞ্চী বিছিয়ে বসে পড়লেম। শেফালিকা ষ্টোভ্ ধরিয়ে চায়ের বন্দোবস্ত সুরু করে দিলেন। শুনলাম, গোময়জ্বালে অর্থাৎ ঘুঁটের আগুনে নূতন মৃৎপাত্রে বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধ ও আতপ চাউলে চরু প্রস্তুত করতে

শিরীষ বন

হবে। রোগীর স্বহস্তে চরু প্রস্তুত বিধি, অক্ষম হলে স্বগোত্রীয় কিম্বা শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের দ্বারাও তৈরী করে নেওয়া চলে। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বললেন, "আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি, তুমি খালি হাতে করে মাটীর ভাঁড়টি আগুনের 'পরে চাপিয়ে দুধ ও চাউল ঢেলে দেবে, তা' হলেই হবে।" ডাক্তারবাবু ব্রাহ্মণ, সুতরাং তাঁর স্ত্রী অনেকেরই চরু প্রস্তুত করে দিলেন। সেদিন চিত্রকূটে গো-দুগ্ধ ১৲ টাকা করে সের। অন্য সময়ে দুই আনা সের। ঘুঁটে সেদিন পয়সায় চারখানি করে বিক্রয় হচ্ছে। শালপাতা এক পয়সায় একখানি করে মাত্র! রন্ধনান্তে শালপাতে চরু ঢেলে রাখতে হয়। সেরটাক্ খাঁটী গো-দুগ্ধ ডাক্তারবাবুর স্ত্রী আমার জন্য বাড়ী থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন। সেই এক সের দুধে এক চামচ আন্দাজ আতপ চাল সিদ্ধ করতে চড়ানো হল। তা'তে মিষ্ট দেবার নিয়ম নেই। হাতার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা হল একটি বেলকাঠের ডাল। প্রত্যেকেরই ঐ ব্যবস্থা। কোনও ধাতুপাত্রে রন্ধন বা ধাতবস্পর্শ নিষেধ। সেই বিশাল তেপান্তরের মাঠে শত শত লোক চরু রান্না করায় স্থানটি ধোঁয়ায় শাদা হয়ে উঠেছিল। চরু প্রস্তুত হলে, প্রত্যেকের চরু ভিন্ন ভিন্ন শালপাতে ঢেলে এমন ভাবে রাখা হল, যাতে সেই শুভ্র চন্দ্রালোক অবারিতভাবে চরুর উপরে পড়তে পারে। তারপর অতি সতর্কভাবে সেই চরু পাহারা দিতে হবে, যাতে কোনও প্রকার ছায়া তার উপরে না পড়ে। প্রত্যেক রোগীর সাথেই তাদের দু'এক জন সঙ্গী এসেছেন; তাঁরাই পাহারা কার্য্যে নিযুক্ত রইলেন। পাহারার জন্য পারি-শ্রমিক দিলে লোকও পাওয়া যায়। শুনলাম, ঔষধটির গুণ নাকি চন্দ্রালোকের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। যদি কোনও কোজাগরী পূর্ণিমা মেঘাচ্ছন্ন থাকে বা বৃষ্টি হয়,—সেবার ঔষধের বিশেষ ফল হয়না। সন্ধ্যা হতে সমস্ত রাত্রি চরু শালপত্রের উপরে জ্যোৎস্নায় মেলা থাকবে,—একে নাকি 'চন্দ্রপক্ক' হওয়া বলে।

যাই হোক, আমাদের প্রত্যেকের চরু ভিন্ন ভিন্ন শাল পাতায় শুভ্র জ্যোৎস্নাকিরণে 'চন্দ্রপক্ক' হ'তে লাগলো, —দু'জন লোক পাহারার জন্য নিযুক্ত করে আমরা বেড়াতে বেরুলাম। যেখান থেকে ঔষধ বিতরণ হয়, সেই মহাবীরের মন্দিরে গিয়ে দেখি বিষম ভীড়! এখন এই ঔষধ বিতরণটি প্রায় ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। যিনি ঔষধ বিতরণ করবেন সেই পূজারীজীর সঙ্গে দেখা হল। প্রত্যেক রোগীকে মহাবীরের মন্দিরে নারিকেল চিনি লালশালু এবং সামর্থ্যানুযায়ী প্রণামী দিতে হয়। দেখলাম, পূজারীজী রীতিমত ব্যবসা সুরু করেছেন।

নারিকেল, শালু ও চিনির একটি দোকান নিজেই খুলেছেন মন্দিরের সামনে। মন্দিরে যে নারিকেল ও শালু পূজা আসছে, তৎক্ষণাৎ সেগুলি ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে দোকানে। মেলাটা ঘুরে ঘুরে দেখে আবার আমাদের 'বেঙ্গল ক্যাম্পে' ফিরে এলাম। স্বামী সত্যানন্দজী আমাদের আড্ডাটির নাম দিয়েছিলেন 'বেঙ্গল ক্যাম্প'। সবাই মিলে গল্প গুজবে চা খেয়ে রাত্রি বারোটা বাজল। মহাবীরের মন্দির থেকে একটি উজ্জ্বল ডে'লাইট নিয়ে জনকতক পূজারী পাণ্ডা বেরুলেন। তাঁরা পাতে পাতে কাঠের গুঁড়ার মত ঔষধ সেই চরুর উপরে ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন ও আদেশ দিয়ে গেলেন, যারা রোগী, তারা কেউ ঘুমুবেন না, জেগে থাকুন। তথাস্তু। রোগী এবং সুস্থ সকলেই জাগ্রত। বিরাট পাহাড়ের তলে প্রকাণ্ড মাঠ জ্যোৎস্নায় শাদা হয়ে গেছে; সেই চাঁদের আলোয় পাহাড়ের নীচে পূর্ণিমা রাত্রি জাগরণে কাটাতে লাগছিল ভালোই। রাত্রি একটা বাজল, দু'টা বাজল,—রাত্রি তিনটার সময় আবার উজ্জ্বল ডে'লাইট সহ পূজারী পাণ্ডরা বেরুলেন মন্দিরের ভিতর থেকে। এবার সেই ঔষধমিশ্রিত চরুর উপরে প্রসাদী বাতাসার টুকরা, নারিকেল কুচি বা এলাচী দানার টুকরা ফেলে দিতে দিতে তাঁরা আদেশ দিয়ে যেতে লাগলেন—"খা' লেও" অর্থাৎ খেয়ে নাও।

খাওয়াটাই তখন হয়ে উঠেছে সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার। সমস্ত রাত্রি খোলা মাঠে চাঁদের আলোয় শাল পাতার উপরে সেই চরু হিম-শীতল হয়ে বরফের মত জমে উঠেচে। তাকে গলাধঃকরণ করা সহজ নয়। পুডিংএর মত জমাট্ চরু তুলে কোনও মতে গলাধঃকরণ করার পর, শুনলাম এইবার পাহাড় পরিক্রমা করা নিয়ম। ঔষধ সেবনের পর আর শোয়ার বা বসার হুকুম নেই; কাম্যদ গিরির চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করে বেড়াতে হয়। দেখলাম শত শত লোক অধিকাংশই পদব্রজে পরিক্রমায় যাত্রা করলেন। কেউ কেউ ডুলি ও ঘোড়াতে উঠেচেন। পাহাড় পরিক্রমা প্রায় চার মাইল্। আমাদের সঙ্গী বাঙালীরা সকলেই পদব্রজে যাত্রা করলেন। কেবল আমরা দু'জন ও ডাক্তারবাবুর ছেলে শচীন্দ্র, এই তিনজন বসে রইলাম; ভীড় অগ্রসর হয়ে চলে গেলে তারপরে আমরা ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করলেম। আমাদের সাথে আর একটি সঙ্গী ছিলেন শ্রীযুক্ত মজুমদার; ইনি পদব্রজেই আমাদের সাথে ছিলেন।

স্ফটিকশিলা

সমস্ত ভীড় পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর আমরা পরিক্রমায় যাত্রা করলাম। ডাক্তারবাবু স্ত্রী ও কন্যাসহ জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ী রওনা হলেন। বারোহাত রেশমী শাড়ীখানি মারাঠি মেয়েদের প্রথায় পরে সামনে

স্ফটিকশিলার পাষাণ বেদী

কোঁচা দিয়ে নিতে হয়েছিল। কবরীর সাথে গুণ্ঠন পিন্ দিয়ে আটকে গায়ে পাতলা শাল জড়িয়ে উঠলাম ঘোড়ায়। উনি মাথায় শালের টুপী চড়ালেন শেষ রাত্রির হিমপাত হতে আত্মরক্ষা করতে। শচীন্দ্র পথ-প্রদর্শক

হয়ে অশ্বারোহণে আগে আগে চল্‌ল, তারপর আমি, পিছনে স্বামী। সঙ্গে পদব্রজে শ্রীযুক্ত মজুমদার।

পাহাড়ের কোলে কোলে পাথর বাঁধানো অসমতল সরু রাস্তা অত্যন্ত বন্ধুর। মাঝে মাঝে চড়াই উৎরাই আছে। এই শিলাপথটি পান্নাষ্টেটের রাজা পরিক্রমাকারী-দের সুবিধার জন্য বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন, সংস্কার অভাবে এখন জীর্ণ ও ভগ্ন হয়ে পড়েছে। প্রথমটা একটু সন্তর্পণে চলতে হচ্ছিল, কারণ পিছন থেকে এসে পড়ছিল মানুষের ভীড়, ডুলিওয়ালা ও অশ্বারোহীর দল। সমস্ত ভীড় সামনে এগিয়ে চলে যাওয়ার পর আমরা তখন ঘোড়ার লাগাম ঢিলা করে দিয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম নিশ্চিন্ত আরামে। শেষ রাত্রির শুভ্র জ্যোৎস্নায় সমস্ত পার্ব্বত্য প্রকৃতি যেন স্বপ্নলোকের মত মায়াময় হয়ে উঠেছে।

অনুসূয়ার পথে

ডাহিনে কালো পাহাড়, কোলে কোলে ধব্‌ধবে শাদা মন্দির-শ্রেণী, মন্দিরের পর মন্দির, যেন তার শেষ নেই। বামে কোথাও সবুজ ক্ষেত, কোথাও নীচু খাদ, কোথাও পাহাড়ের কোলে নিচু জমিতে বৃষ্টির জল জমে চাঁদের কিরণে আয়নার মত ঝক্‌মক্‌ করছে। কখনও পিছনে পিছনে কখনও বা পাশাপাশি চলেছি দু'জনে, চোখের সামনে বয়ে চলেছে পার্ব্বত্য প্রদেশের নৈশ প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্যপ্লাবন! জীবনে জ্যোৎস্নারাত্রির এমন অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা এর আগে কখনো ঘটেনি। অগ্রবর্ত্তী কিশোর শচীন্দ্র মাঝে মাঝে সতর্ক করে দিচ্ছে আমাদের,—"হুঁসিয়ার,—এইবার একটা বড় উৎরাই আছে কাকিমা,—" কিম্বা—"এইখানকার রাস্তা খুব সরু"—"একটা খানা ডিঙোতে হবে—"দেখবেন সাবধান!—" শচীন্দ্র সেদিন ঐরকম সতর্কতার সাথে আমাদের নিয়ে না গেলে সেই বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে কোনও দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র ছিল না। কারণ, সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত দিগন্ত-প্রসারী সবুজ প্রান্তর, নিস্তব্ধ পাহাড়শ্রেণী, নিস্পন্দ অরণ্যানী ও বৃক্ষসারির মাঝখান দিয়ে আমাদের ঘোড়া দু'টি পাশাপাশি চলেছিল আপন ইচ্ছামতই। আমরা যেন স্বপ্নবিমুগ্ধেরই মত আত্মবিস্মৃত ভাবে রাশ ঢিলা করে ছেড়ে নির্ব্বাক হয়ে বসে ছিলাম। মাথার উপরে অনন্ত নীল আকাশ, সম্মুখে ছায়াচিত্রের ছবির মত পাহাড় পর্ব্বত অরণ্য প্রান্তর, জলাশয় প্রভৃতি প্রকৃতির অফুরন্ত উদার রূপৈশ্বর্য্য ফুটে উঠ্‌ছে। যেন আমরা ইহজগতের পরপারে কোন এক অভিনব নূতন লোকে এসে পড়েছি,—যার সমস্তই মায়াময়,—আধছায়া আধ আলোর রহস্যে ভরা! মাথার উপর দিয়ে শীতল হাওয়া বহে যাচ্ছে,—পাহাড়ে পাহাড়ে দুই একটা আধসুপ্ত পাখী নীড় থেকেই কূজন ধ্বনি তুলচে,—জ্যোৎস্নাকে তারা ভুল করেচে উষা ব'লে।—

গাইড্‌ শচীন্দ্র হাত তুলে দেখাচ্ছে—কাকাবাবু! ঐটা লক্ষ্মণ পাহাড়, রাম ও সীতা এই পাহাড়টায় থাকতেন,—লক্ষ্মণ ঐ ছোটো উঁচু পাহাড়টার উপরে ধনুর্ব্বাণ নিয়ে সারারাত্রি জেগে পাহারা দিতেন।...এইটা নৃসিংহগুহা...এটা ব্রহ্ম-কুণ্ড...এটা বিরজা কুণ্ড...

আমরা ঘোড়ার উপর থেকেই দ্রষ্টব্য মন্দিরগুলি দেখলাম, কোনখানে নামলাম না। স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলে চলেছি তো চলেইছি! ক্রমে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না ম্লান পাণ্ডুর হয়ে এলো। ভোরের হাওয়া আরও ঠাণ্ডা হয়ে ঝির্‌ ঝির্‌ করে বইতে সুরু করলো। একটি একটি করে নিভে গেল সমস্ত তারা—উষার আভাষ ফুটে উঠলো পূর্ব্বগগনে। হঠাৎ চমক ভাঙলো। চেয়ে দেখি—পরিক্রমা সাঙ্গ হয়েছে,—যেখান থেকে যাত্রা সুরু করেছিলাম, এসে পৌঁছেচি

সেইখানেই। সেই প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পাশাপাশি দু'টি ঘোড়া চলেচে চিত্রকূটে সীতাপুরের দিকে। আকাশ ধীরে ধীরে রাঙা হয়ে উঠেচে; বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে লক্ষ লক্ষ পাখী প্রভাতী উৎসব আরম্ভ করে দিয়েচে, রাস্তায় সুরু হয়েচে লোকচলাচল। ধীরে ধীরে সহরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলাম,—সমস্ত মন্দির ধর্ম্ম-শালা ও পাথরের বাড়ী নিয়ে চিত্রকূট তখনও সুপ্ত। ডানদিকে নিদ্রিতা মন্দাকিনী নদী, বামে বিচিত্র হর্ম্ম্যসারি, মন্দাকিনীর তীরবর্ত্তী পাথরে বাঁধানো সরু রাস্তাটি ধরে চলেচি। মন্দাকিনীর জল নিথর,—একটু ঢেউ বা চাঞ্চল্য নেই—যেন গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্না! উষার রক্তিম আলো এসে পড়েছে তার স্বচ্ছ বুকের উপরে, তার বাঁধানো ঘাটগুলির 'পরে। পরপারে সবুজ মাঠ, বৃক্ষশ্রেণী, পুরাতন দেউল, রাজবাড়ী প্রভৃতি ছবির মত আঁকা রয়েচে। বাড়ী এসে পৌছুলাম। সকাল হয়ে গেছে। শেফালিকা ও মালবিকা এসে বললে, "বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিন্, চা তৈরী।"

খানিকবাদে আমাদের সঙ্গী বাঙালীদল, স্বামী সত্যানন্দপ্রমুখ অনেকেই কলরব সহকারে এসে পড়লেন। প্রায় সকলেই কিছু দূর পদব্রজে পরিক্রমণ করে পরে ঘোড়া নিতে বাধ্য হয়েচেন। ঘোড়াতেই তাঁরা বাড়ী ফিরলেন। শুধু রবীন্দ্র মজুমদার মহাশয় পাহাড়ের চতুর্দ্দিক পদব্রজে পরিক্রমণ করে বাড়ীতে এসে প্রায় অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতের মত শয্যাগ্রহণ করেছিলেন।

এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি সংক্ষেপে লিখে এইবার চিত্রকূট প্রবন্ধ সমাপ্ত করব।

চিত্রকূট হিন্দুদের প্রাচীন তীর্থ। রাম সীতা ও লক্ষ্মণের অসংখ্য স্মৃতিচিহ্নে পরিপূর্ণ। প্রাকৃতিক শোভায় এবং প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা ও মুসলমানসভ্যতা যুগের স্থাপত্য শিল্পের ভগ্নাবশেষে স্থানটি নয়নাকর্ষক। চিত্রকূট যেন ক্ষুদ্রকায়া বারাণসীতীর্থ। কাশীর মত এখানেও দশাশ্বমেধ ঘাট, কেশীঘাট, রামঘাট, লক্ষ্মণঘাট, মত্তগজেন্দ্রঘাট, হনুমান ঘাট প্রভৃতি অসংখ্য ঘাট আছে। কাম্যদগিরির দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগের গঙ্গাকে পয়স্বিনী বা পৈসুর্ণী বলা হয়। পয়স্বিনীর মধ্যেই ব্রহ্মকুণ্ড। উত্তর-পশ্চিমভাগের গঙ্গাকে রাঘবপ্রয়াগের মন্দাকিনী গঙ্গা বলে। এর মধ্যে

অনুসূয়া

সরযূ নদী অন্তঃসলিলা বলে এরা পরিচয় দেয়। মোটের উপর অর্দ্ধভাগ নদী মন্দাকিনী এবং অপরার্দ্ধ পয়স্বিনী

গুপ্ত গোদাবরী (গুহাভ্যন্তরে)

নামে খ্যাত। চিত্রকূটে যাঁরা তীর্থ করতে যান্ তাঁরা নিম্নলিখিত ভাবে দর্শন করলে সুবিধা হবে।

প্রথম দিন—মন্দাকিনী নদীতে গঙ্গাস্নান করে মহাবীর, তুলসী দাস, পর্ণকুটীর, যজ্ঞবেদী, মত্তগজেন্দ্র মহাদেব ও দক্ষিণপুরীর মহাবীরকে দর্শন করে লঙ্কাপুরীর মধ্যে যেতে হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে অক্ষয়বট ও রাজধরের মন্দির দেখে, কাম্‌দা বাজার হয়ে

কৈলাস তীর্থ

রামমহল্লায় চড়তে হয়। এইখান থেকে কাম্যদ গিরি পরিক্রমা সুরু করতে হয়। কাম্যদ পাহাড় চিত্রকূট থেকে একমাইল পশ্চিমে। এই পাহাড় পরিক্রমা মানে

শ্রীরাম মন্দির

পাহাড়টিকে চারমাইল প্রদক্ষিণ করা। রাম চবুতারা থেকে রেওয়া রাজার সদাব্রত দেখে, মুখারবিন্দ, জানকী চরণপদ্ম, নৃসিংহগুহা, ব্রহ্মকুণ্ড, বিরজাকুণ্ড, কপিলা গাই, চরণ পাদুকা, লক্ষ্মণ পাহাড়, বড় আখড়া, রাম ঝরোকা, চৌপড়া, পিলিকুঠী ও সরযূ হয়ে আবার রামচবুতারায় ফিরে আসতে হয়। "চরণ পাদুকা" হচ্ছে,—ভরত যেখান থেকে রামচন্দ্রের পাদুকা গ্রহণ করেছিলেন অযোধ্যা রাজ্য শাসন করবার জন্য। "চৌপড়া" হচ্ছে খোহীর সাধুদের আশ্রম। "পিলি কোঠী" স্কুল।

দ্বি তী য় দিন।—মন্দাকিনীর দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করে ওপারে নওয়াগাঁও হয়ে কোটীতীর্থে যেতে হয়। কোটী তীর্থ চিত্রকূটের পূর্ব-দিকে চা র মা ই ল দূরে। তিন শো ধাপ সিঁড়ি দিয়ে পাহাড়ে উঠতে হয়। এ' স্থা ন টি অতি মনোরম। পাহাড়ের উপর থেকে সমতলভূমির দৃশ্য ও ম ন্দা কি নী নদীসহ চিত্রকূটনগরী ঠিক ছবির মত মনে হয়। এখানে পাহাড়ের উপরে একমাইল দূরে দেবাঙ্গনা। মাইলচারেক দূরে সীতারসুই বা জানকীর রন্ধনশালা। হনুমানধারা নামে একটি জলপ্রপাত এখানে আছে। এই পাহাড়টির নাম দেবস্থান। এটি দেখবার মত স্থান। হনুমানধারা দেখে দেবস্থান পাহাড় থেকে চারশো ধাপ পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। এদিক থেকে চিত্রকূট মাত্র তিন মাইল।

তৃতীয় দিন—রাঘবপ্রয়াগে সঙ্গমঘাটে স্নান করে রামধাম, কেশবগড়, দাস হনুমান, প্র মো দ ব ন, জানকীকুণ্ড, শিরীষবন, স্ফটিকশিলা দর্শন করে অনসূয়া তীর্থে যেতে হয়। জানকীকুণ্ডের দৃশ্য ও স্ফটিকশিলার দৃশ্য অতি মনোরম। জানকীকুণ্ডে রাম ও সীতার পায়ের ছাপ চারিদিকের পাথরে চিহ্নিত। স্ফটিকশিলা মন্দাকিনী তীরে গভীর অরণ্যের মধ্যে একটি পাহাড়। এই পাহাড়ের কোলে নদীগর্ভে একটি প্রকাণ্ড শিলাবেদী, তার উপরে নাকি রাম সীতা বিশ্রাম করতেন।

অনসূয়াতীর্থ চিত্রকূট থেকে দশমাইল দূরে। এটি মহামুনি অত্রির আশ্রম এবং মন্দাকিনীর উৎপত্তিস্থল।

মহর্ষি অত্রির সাধ্বীপত্নী অনসূয়া দেবীর নামানুসারে এর নাম অনসূয়া ক্ষেত্র। হিন্দুনারীর আয়তিচিহ্ন সিন্দুরের প্রচলন নাকি প্রথম এস্থান থেকেই হয়। সাধ্বী সীতাকে ঋষিপত্নী অনসূয়া দেবী সিন্দুর দ্বারা অভিষিক্ত করে বলেছিলেন,—"পাতিব্রত্যধর্ম্মের উজ্জ্বল চিহ্নস্বরূপ এই যে সিন্দূর আজ তোমার সিঁথিতে দিলাম, এই সিন্দুর হিন্দু সধবা-নারীর আয়তি চিহ্ন হবে।" এখানে অত্রির ও অনসূয়া দেবীর পৃথক পৃথক মন্দির আছে। স্থানটি পুরাণ-বর্ণিত ঋষি-আশ্রমের মতই শান্ত গম্ভীর পবিত্র। একদিকে অভ্রভেদী ঋজুপর্ব্বত,—সেই পর্ব্বতের গায়ে বহু গুহাগৃহ,—শুনেছি এখনও অনেক সাধু সন্ন্যাসী ঐ নির্জ্জন গিরিগুহায় তপস্যা করতে এসে থাকেন। অন্যদিকে উন্মাদিনী মন্দাকিনী পর্ব্বতগৃহ ভেদ করে কলকল্লোলে নৃত্য করে বেগে বহে চলেছে। অসংখ্য বৃহৎ শিলা ও উপলে তার বুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ রচনা করেছে। চারিদিকে গভীর অরণ্য। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনস্পতি দিনের বেলাও সূর্য্য-কিরণ প্রবেশের পথ ছেড়ে দেয়না। জলধারার মধুর কল্লোলে, অরণ্যের গম্ভীর মর্ম্মরে, বিশাল পর্ব্বতের উন্নত গাম্ভীর্য্যে স্থানটি মনের মধ্যে পবিত্র প্রশান্তির উদ্রেক করে। আমরা এখানে এসে একদিন চড়ুইভাতি ক'রে খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে গেছি।

চতুর্থ দিন—অনসূয়াতীর্থ থেকে গুপ্ত গোদাবরী তীর্থ আটমাইল। কিন্তু চিত্রকূট থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে যেতে হলে বারোমাইল পড়ে। পাথরপাল দেবগাঁ হয়েমোরধ্বজ পর্ব্বত দর্শন করে চৌবেপুর গ্রামের ভিতর দিয়ে আর ছু'মাইল গেলেই গুপ্ত গোদাবরীতে পৌছানো যায়। এখানে পাহাড়ের গুহার মধ্যে দেবদর্শন করতে হয়। অতি বিচিত্র মনোহর স্থান। এখানে একটি টর্চ্চ লাইট সঙ্গে আনতে হয়, কারণ, গুপ্ত গোদাবরী গুহার মধ্যে রামকুণ্ড গভীর অন্ধকার, আলো না ফেললে সবটা দেখা যায় না। এখান থেকে ঘুরে আর ছু'মাইল গেলেই কৈলাসতীর্থ। এখানে বিশ্রাম ও আহারাদি করার সুবিধা আছে।

রামঘাট

পঞ্চমদিন।—চিত্রকূটের উত্তরে আটমাইল দূরে ভরত-কূপ, কৈলাসতীর্থ থেকে মাত্র ছ'মাইল। ভরতকূপে স্নান ও ভরতমন্দির দর্শন করে ওখান থেকে পাঁচমাইল

আটার কল (স্রোতের বেগে পরিচালিত)

পূর্ব্বদিকে রামশয্যা দেখে আসতে হয়। রামচন্দ্রের শয়ন স্থান ছিল এখানে। রামশয্যা থেকে চিত্রকূট মাত্র ছু'মাইল, সুতরাং ফিরতে কষ্ট হয়না।

এ' ছাড়া চিত্রকূটের আশেপাশে অনেকগুলি তীর্থ

আছে। ১৪ মাইল দূরে পুষ্কর, ১৮ মাইল দূরে শরভঙ্গ, ১৩ মাইল দূরে মার্কণ্ড, ৮ মাইল দূরে বাঁকেসিদ্ধ, ১৪ মাইল দূরে বিরাধকুণ্ড, ১৯ মাইল দূরে বাল্মীকি আশ্রম,

ধর্ম্মশালা

২২ মাইল দূরে তুলসীদাসের আশ্রম, ২৪ মাইল দূরে কালিঞ্জরের নীলকণ্ঠ মহাদেব, সূর্য্যকুণ্ড, ব্যাসকুণ্ড ইত্যাদি।

চিত্রকূট

চিত্রকূটের কোলে যে সীতাপুর গ্রামখানি আছে সেখানি বেশী বড় নয়। লোকবসতি খুব অল্পই। অধিকাংশেরই উপজীবিকা পাণ্ডাগিরি। বাহিরের তীর্থযাত্রীর ভীড় এখানে প্রায় বারোমাসই থাকে। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র মোটামুটী সব পাওয়া যায়। এখানকার কুটীরশিল্পের মধ্যে পাথরের সামগ্রী ও কাঠের খেলনা ছাড়া সুপারীর কৌটা উল্লেখযোগ্য।

এখানে বানরের উৎপাত ভয়ানক। কাশী বৃন্দাবন মথুরাতেও এ'রকম অত্যধিক বানরের উৎপাৎ দেখিনি। এখানকার বানরেরা অত্যন্ত দুঃসাহসী ও দুষ্টবুদ্ধি-পরায়ণ। আমি দ শ দি ন মা ত্র চিত্রকূটে ছিলাম, এদের অত্যাচার হতে অব্যাহতি লাভ করিনি। বন্ধ বাথ্‌রুমের মধ্যে স্নানের সময় গলার সোণার হার ও কাণের মুক্তার দুল খুলে রেখেছিলাম, জানালা দিয়ে বানর এসে আমার চখের সামনে গুচ্ছবদ্ধ মুক্তার দুল দু'টি তুলে নিয়ে চলে গেল। অনেক চেষ্টা করেও তার পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হোলোনা। সৌভাগ্যক্রমে সোণার হারছড়া নিয়ে যায়নি। চিত্রকূটের সমস্ত খোলার বস্তীর চাল ঘন কুলকাঁটায় ছাওয়া। শুনলাম, খোলার উপরে প্রচুর পরিমাণে কাঁটা দিয়ে না রাখলে চালের উপরে একখানি খোলাও থাকেনা বানরের উৎপাতে। বৃন্দাবন মথুরার বানরের উৎপাত চিত্রকূটের তুলনায় কিছুই নয়।
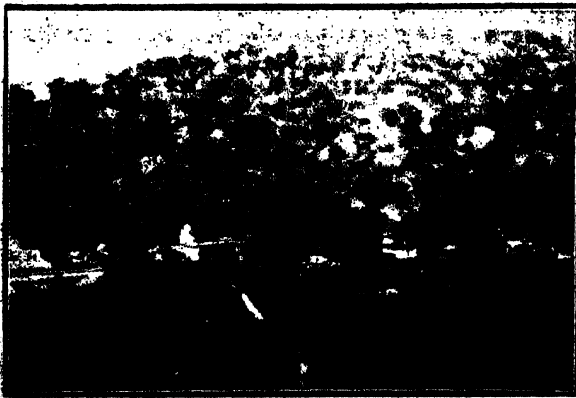
এখানে বলে রাখি চিত্রকূটের ঔষধ সেবন করে আমি এখনও কোনো ফল পাইনি। আর এই প্রবন্ধের ছবিগুলি সংগ্রহ ক'রে দিয়েছেন আমাদের চিত্রকূটের বন্ধু শ্রীযুক্ত বলরাম কুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ মজুমদার ও শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

খাদ্যপ্রাণ গবেষণার ইতিহাস

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় এম-বি, ডি-পি-এইচ

খাদ্যের উপাদান হিসাবে খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ অতি অল্প; কিন্তু ইহার কার্য্যকারিতা অতি গুরু। খাদ্যে এই উভয় গুণের বৈষম্য সহজেই লক্ষিত হয়। খাদ্যপ্রাণের এই অল্পতা তেজ উৎপাদন (energy supply) কিম্বা মাংসপেশী গঠনের সহায়ক নহে; কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটী যে একটী নির্দ্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ তাহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং বিগত আট বৎসরে উহাদের প্রকৃত রাসায়নিক প্রকৃতি (chemical nature) নির্দ্ধারণে যথেষ্ট গবেষণা হইয়াছে। উহাদের ভিতর একটী কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতও হইয়াছে (calciferol—Vitamin 'D')। এই বিগত আট বৎসরে বহু পরীক্ষার ফলে ইহাও স্থির হইয়াছে যে উহাদের সংখ্যা পূর্ব্বকল্পিত সংখ্যার অপেক্ষা অনেক বেশী। পূর্ব্বে আমরা তিনটী খাদ্যপ্রাণের সত্ত্বা অবগত ছিলাম; কিন্তু ইদানীং অন্ততঃপক্ষে আটটী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহাদের প্রত্যেকটীর স্ব স্ব কার্য্যকারিতা আছে। পাশ্চাত্য দেশ হইতে আনীত কলকব্জা দ্বারা যখন এ দেশে চাল সংশোধিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন হইতেই এই কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের কুফল পরিলক্ষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নৌপর্য্যটক এবং ভূ আবিষ্কারকদের অভিজ্ঞতাও আমাদের খাদ্যপ্রাণের আবশ্যকতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু তখন দেশ বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না বলিয়াই এসব অভিজ্ঞতা সেকালে অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন ছিল। এসব ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তের আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষা দ্বারা খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে যে সত্যে আমরা বর্ত্তমানে উপনীত হইয়াছি আমি কেবল তাহারই উল্লেখ করিব।

খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে প্রথম গবেষণার বার্ণ্‌জের (Burnge) গবেষণাগার থেকেই সূত্রপাত হয়। এই গবেষণাগার বেশ্‌ল (Basle, Switzerland) নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে লুনিন (Lunin) নামক বার্ণ্‌জের একজন শিষ্য দুগ্ধের চারিটী উপাদান (ছানা জাতীয়—Protein; তৈল জাতীয়— Fats; শর্করাজাতীয়—Carbohydrate; লবণ—Salts) কৃত্রিম উপায়ে মিশ্রিত করিয়া কতকগুলি ইঁদুরকে খাওয়ান; কিন্তু কয়েক দিবসের মধ্যেই ইহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাতে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে স্বাভাবিক দুগ্ধে উপরিউক্ত চারিটী উপাদান ব্যতীত আরও এমন অজ্ঞাত পদার্থ বর্ত্তমান যাহা দেহ ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই সিদ্ধান্ত অবলম্বনে তিনি 'দেহপুষ্টিতে অজৈব রসায়নের কার্য' নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে শসিন (Socin) নামক বার্ণ্‌জের অপর শিষ্য ইহা লইয়া আলোচনা করেন। যদিও তিনি লুনিনের প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়কে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তথাপি তিনি কৃত্রিম খাদ্যের কার্য্যবিফলতার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন কোন বিশেষ ছানা জাতীয় পদার্থের অভাব (Inadequacy in the quality of proteins)। বার্ণ্‌জের নিজের মতবাদ কিন্তু এই উভয়ের মত হইতে বিভিন্ন ছিল। কৃত্রিম খাদ্য প্রস্তুত হইবার প্রাক্কালে অজৈব রসায়ন জৈব রসায়ন হইতে বিভিন্ন হইয়া যাওয়াকেই তিনি ইহার কার্য্যবিফলতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি মনে করিতেন অজৈব ও জৈব রসায়নের যুক্ত মিশ্রণই কার্য্যকর।

১৯০৫ খৃঃ অব্দে ডচ্ অধ্যাপক পেকেলহারিং (Pekelharing) গবেষণার ফলে এই মত প্রকাশ করিলেন যে—

(ক) দুগ্ধে এমন একটী অজ্ঞাত পদার্থ বর্ত্তমান যাহা সূক্ষ্ম পরিমাণেও আমাদের দৈহিক পুষ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক।

(খ) এই পদার্থটী সব জাতীয় খাদ্যে বর্ত্তমান—কি সব্‌জী জাতীয় (Vegetable) বা প্রাণী জাতীয় (animal); কেবলমাত্র দুগ্ধেই ইহা আবদ্ধ নহে।

(গ) ইহার অবর্ত্তমানে দেহ খাদ্যের প্রধান প্রধান উপাদানগুলির সারবস্তু সংগ্রহ করিতে পারে না; ক্ষুন্নিবৃত্তি বিনষ্ট হয়; খাদ্যের প্রাচুর্য্য বর্ত্তমানেও মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তিনিই প্রথম নির্দ্দেশ করেন যে খাদ্যপ্রাণশূন্যতায় রোগের (Deficiency diseases) সৃষ্টি হয়।

১৮৯০ হইতে ১৮৯৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ক্রিশ্চিয়ান একম্যান (Christiaan Eijkmann) খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ইনি প্রথমে ডচ্ ইণ্ডিজে সামরিক বিভাগে ডাক্তার ছিলেন; পরে উট্রেকটে (Utrecht) স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন।

তিনি ভরদারম্যান (Vorderman) নামক এক ভদ্রলোকের সাহায্যে জাভার ১০১ জন কয়েদী ও কতকগুলি পক্ষীকে ছাঁটাই চাল খাওয়াইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে দীর্ঘকালব্যাপী ছাঁটাই চাল ভক্ষণে মানুষের বেরীবেরী এবং পক্ষীর Polyneuritis রোগ উৎপন্ন হয়; শেষোক্ত রোগ বেরীবেরীরই অনুরূপ। তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে উপরিউক্ত পক্ষীগুলিকে যদি সম্পূর্ণ চালে (Whole rice) অর্থাৎ বাহিরের পর্দ্দা (Pericarp) যুক্ত চাল খাইতে দেওয়া যায় তবে Polyneuritis হয় না। কেন চালের বাহিরের পর্দ্দা (Pericarp) বেরীবেরী বা polyneuritis নিবারণ করে তাহার কারণ স্বরূপ একম্যান এই যুক্তি দেখান যে শর্করা বহুল খাদ্য যেমন চাল অন্ত্রের ভিতর একপ্রকার বিষ তৈয়ারী করে; চালের বাহিরের পর্দ্দা সেই বিষ বিনষ্ট করে। গ্রিন্‌স (Grijns) এই যুক্তির সমর্থন না করিয়া ১৯০১ খৃঃ অব্দে মত প্রকাশ করিলেন যে বেরীবেরীর মূলকারণ খাদ্যে একটী অত্যাবশ্যক জিনিসের অভাব। এই আবশ্যক উপাদানটী চালের উপরকার পর্দ্দায়

অবস্থিত থাকে এবং ছাঁটাই করিলে তাহা বাহির হইয়া যায়। খাদ্যপ্রাণের অভাবই যে রোগোৎপত্তির (Deficiency Diseases) কারণ ইহা গ্রিন্‌সই প্রথম বিশদভাবে বিবৃত করেন।

১৯০৭ খৃঃ অব্দে চালভোজী প্রাচ্যদেশবাসীদের উপর পরীক্ষার ফলে ব্র্যাড্‌ন (Braddon) একম্যানকে সমর্থন করেন। ১৯০৯ খৃঃ অব্দে ফ্র্যাসার ও ষ্ট্যান্‌টন (Fraser and Stanton) উঁহাদের সমর্থন করেন। ১৯০৭ খৃঃ অব্দে হলষ্ট ও ফ্রলিক্ (Holst and Frolich) গিনিপিগের উপর পরীক্ষাকার্য্য চালাইয়া দেখাইলেন যে খাদ্যের অভাবে স্কার্‌ভির (Scurvy) উৎপত্তি হয়।

ক্রমান্বয়ে ১৯০৯, ১৯১১ এবং ১৯১২ খৃঃ অব্দের পরীক্ষার ফলে ষ্টেপ্ (Stepp) এই মত প্রকাশ করিলেন যে লাইপড্ (lipoid) নামক একপ্রকার তৈলজাতীয় পদার্থের সহিত একটী অজ্ঞাত পদার্থ বর্ত্তমান যাহা জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয়। তৎপরে হপকিন্সের গবেষণা উল্লেখযোগ্য। তিনি বাচ্চা ইঁদুর লইয়া পরীক্ষায় রত ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ দেখিলেন যে যদি বাচ্চা ইঁদুরগুলিকে ছানা, শর্করা, তৈল এবং অজৈব রাসায়নিক কৃত্রিম পদার্থ অশোধিত অবস্থায় খাইতে দেওয়া হয় তবে উহারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি এই সব পদার্থগুলি শোধিত করিয়া উহাদের খাওয়ান হয় তবে উহারা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, দেখিলেন যে এই সব শোধিত পদার্থগুলির গায়ে সামান্য পরিমাণে দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া দিলে স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় থাকে।

এই সব পরীক্ষার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে—

(ক) কৃত্রিম খাদ্যে যে পদার্থের অভাব এবং দুগ্ধ দ্বারা যাহা পূর্ণ হয় তাহা জৈব জাতীয়।

(খ) এই জৈব পদার্থ খুব সামান্য পরিমাণেও কায করে।

(গ) ইহার কার্য্য সাহায্যকারী বা উত্তেজক (Catalytic or Stimulating ।)

ইহার পর কেসিমির ফাঙ্কের নাম (Casimir Funk) উল্লেখযোগ্য। তিনিই প্রথম খাদ্যপ্রাণের (Vitamine) নামকরণ করেন। এই 'Vitamine' শব্দটাই 'e' অক্ষর লুপ্ত হইয়া আজকালের 'Vitamin'এ দাঁড়াইয়াছে। ১৯১২ খৃঃ অব্দের জুন মাসে তিনি খাদ্যপ্রাণ অভাবজনিত রোগাদির কারণ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বেরীবেরী, স্কার্‌ভি এবং পেলেগ্রা (Pellagra) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে ফাঙ্কের 'Vitamine' শব্দটী সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার ; 'Vita' অর্থাৎ জীবন ধারণের পক্ষে আবশ্যক কোন পদার্থ ; 'Amine!' অর্থাৎ এমোনিয়া (Ammonia) সম্বন্ধীয় পদার্থ। অনুসন্ধানের ফলে ফাঙ্কের ধারণা হইয়াছিল যে খাদ্যপ্রাণ একটী এমোনিয়া জাত পদার্থ। কিন্তু এক্ষণে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে অন্ততঃপক্ষে দুইটি খাদ্যপ্রাণে নাইট্রোজেনের (Nitrogen) নামগন্ধ পর্য্যন্ত নাই। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে জে, সি, ড্রমণ্ড (J. c. Drummond) 'Vitamine' শব্দটীর 'e' অক্ষরটী বাদ দিয়া 'Vitamin' রাখিলেন। দ্বিতীয় নামেই এক্ষণে উহা সর্ব্বত্র পরিচিত।

১৯১৫ খৃঃ অব্দে ম্যাক কলোম ও ডেভিস্ (Mc Collum and Davis) খাদ্যপ্রাণ 'ক' ও খাদ্যপ্রাণ 'খ'এর (Fat soluble Vitamin 'A' and Water soluble Vitamin 'B') নামকরণ করেন। ১৯১৫ খৃঃঅব্দ হইতে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত খাদ্যপ্রাণ ক' 'খ' ও 'গ' এই তিনটীই সাধারণের কাছে পরিচিত ছিল। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে মেলানবীর (Mellanby) অনুসন্ধানের ফলে খাদ্যপ্রাণ 'ক দুই ভাগে বিভক্ত হয় ; যথা খাদ্যপ্রাণ 'ক' ও খাদ্যপ্রাণ 'ঘ' (Vitamin D')। গবেষণার ফলে খাদ্যপ্রাণ 'ঙ' (Vitamin 'E') ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে খাদ্যপ্রাণ 'খ'তে অন্ততঃ পক্ষে ৫টী খাদ্যপ্রাণ বর্ত্তমান। অল্প দিন হইল Dr. B. C. Guha D. Sc মহোদয় খাদ্যপ্রাণ খ, (Vitamin B,)এর রাসায়নিক প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া ভারতের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্‌মাসিউটিকেল্ ওয়ারকসে খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণায় রত আছেন। এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত খাদ্যপ্রাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। খাদ্যপ্রাণ 'ক' (Fat Soluble Vitamin 'A')
২। মিশ্র খাদ্যপ্রাণ 'খ' (Vitamin 'B' Complex)
যথা—খাদ্যপ্রাণ 'খ১' (Vitamin 'B_1')
খাদ্যপ্রাণ 'খ২' (Vitamin 'B'$_2$)
খাদ্যপ্রাণ 'খ৩' (Vitamin B_3')
খাদ্যপ্রাণ 'খ৪' (Vitamin 'B_4')
খাদ্যপ্রাণ 'খ৫' (Vitamin 'B_5')
ওয়াই ('Y'—factor)
৩। খাদ্যপ্রাণ 'গ' (Water Soluble Vitamin 'C')
৪। খাদ্যপ্রাণ 'ঘ' (Fat Soluble Vitamin 'D')
৫। খাদ্যপ্রাণ 'ঙ' (Fat Soluble Vitamin 'E')

শেষ পথ

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল,

(২১)

গোপালের অবস্থা যত গুরুতর বলিয়া গ্রামে প্রচার হইয়াছিল, তাহা তত গুরুতর মোটেই হয় নাই। তার মাথা ও পিঠটা ফুলিয়া গিয়াছিল এবং পৃষ্ঠের এক জায়গায় একটা ঘা হইয়াছিল। ইহাতে সে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু জীবনের আশঙ্কা কোনও দিনই হয় নাই।

কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত কেহ গোপালের সঙ্গে দেখা করিতে পায় নাই, তার বাড়ী গেলে সকলেই শুনিয়াছে তার অবস্থা সঙ্গীন, মহকুমা হইতে ডাক্তারও আসিয়াছে। গোপালের অবস্থার সম্বন্ধে গ্রামের লোকে যত যাহা শুনিয়াছে গোপাল ইচ্ছা করিয়াই তাহা রটনা করিয়াছিল। তাহার গভীর অভিসন্ধি ছিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যাকালে ভয়ানক খবর শুনিয়া যখন শারদা সসঙ্কোচে গোপালের আঙ্গিনায় পা' দিল তখন তার বুক ভয়ে কাঁপিতেছে।

অতি সন্তর্পণে গোপালের ঘরের কাছে অগ্রসর হইয়া সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর গোপালের স্ত্রী কাছে আসিতে সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "বো ঠাইকান—কেমুন আছে উ!"

গোপালের স্ত্রী মুখ ভার করিয়া বলিল, "বড় খারাপ!"

শারদার বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল। সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। তার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

হঠাৎ ঘরের ভিতর হইতে গোপাল ডাকিল, "শারদা নাকি?"

শারদা ব্যস্তভাবে বলিল, "হ গোপাল।"

গোপাল শারদাকে ঘরে উঠিয়া আসিতে বলিল।

তড়বড় করিয়া শারদা ঘরে গিয়া একেবারে গোপালের পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমারে মাইরা ফালাও গোপাল, আমি তোমারে খুন ক'রছি!"

গোপাল তা হাত ধরিয়া বলিল, "চুপ, ও কথাও কইও না। তাইলে বিপদে পইড়বা।"

গোপাল তখন মৃদুস্বরে অত্যন্ত উদারভাবে বলিল দোষ শারদার নয়, দোষ গোপালের অদৃষ্টের। গোপাল শারদার স্বামীর ঘর খাইল, শারদা গোপালের মাথা ফাটাইল। এ বিধাতার কারসাজী। ইহার প্রতিকার নাই।

এই সব কথা বলিয়া গোপাল বলিল, সে তো যাহা হউক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন উপস্থিত বিপদের কি উপায়?

শারদা বলিল, "কি বিপদ?"

গোপাল বলিল, দারোগাবাবু কি জানি কেমন করিয়া খবর পাইয়াছেন। আজ গোপালের কাছে সংবাদ আসিয়াছে যে আজ সন্ধ্যাবেলায় তিনি অনুসন্ধান করিতে আসিবেন। দারোগা যদি সত্য কথা জানিতে পারেন তবে তো শারদার সমূহ বিপদ!

শারদা ভয়ে বেতসপত্রের মত কাঁপিতে লাগিল।

সেকালে এই সব সুদূর পাড়াগাঁয়ে পুলিসের গতিবিধি প্রায় ছিলই না। দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন জমীদার। দারোগা ও পুলিস ছিল ছেলেদের জুজুর মত ভয়াবহ এবং প্রায় তাদেরই মত অদৃশ্য। কাজেই দারোগা গ্রামে আসিলে সকলের প্রাণেই একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইত। কাজেই শারদা ভয়ে একেবারে গলিয়া গেল।

সে গোপালের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তুই আমারে রক্ষা কর গোপাল—তুই আমারে দারোগার কাছে ধরাইয়া দিস না।"

গোপাল চিন্তিতভাবে বলিল, সে শারদার কোনও অনিষ্ট করিবে না, সেজন্য চিন্তা নাই। কিন্তু গ্রামের লোক ভয়ানক কাণাঘুষা করিতেছে, তাহারা যদি দারোগাকে বলিয়া দেয় তবেই তো মুস্কিল।

আকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শারদা বলিল, "আমারে বাচা তুই গোপাল। আমি জন্ম জন্ম তর দাসী হইয়া থাকুম।"

গোপাল তখন বলিল, একমাত্র উপায় পলায়ন। শারদা যদি ইচ্ছা করে তবে আজ রাত্রেই গোপাল তাকে নিরাপদে বহুদূরে পাঠাইয়া দিতে পারে। আপাততঃ শারদা কলিকাতা গিয়া থাকিতে পারে—তার পর গোলমাল মিটিলে গোপাল যা হয় ব্যবস্থা করিবে। শারদা অনায়াসে সম্মত হইল।

কিছুক্ষণ পর দারোগা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁর সঙ্গে আসিলেন নয়-আনির জমীদারের সদর নায়েব। সদর নায়েব যে পাল্কীতে আসিয়াছিলেন সেই পাল্কীতে করিয়া গভীর রাত্রে শারদাকে গোপাল পাঠাইয়া দিল। পরের দিন প্রত্যুষে ষ্টীমারে উঠিয়া শারদা নয়-আনির জমীদারের এক কর্ম্মচারীর সঙ্গে কলিকাতা যাত্রা করিল।

শারদাকে গ্রাম হইতে সরাইয়া দিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল গোপালের।

শারদার ঘরে গিয়া বিষম প্রহার খাইয়া যখন গোপাল বাড়ী আসিয়াছিল, তখন সে সারারাত্রি যন্ত্রণায় ছট্-ফট্ করিয়াছিল। পরের দিন সকালে তার দুষ্ট বুদ্ধি খুলিয়া গেল এবং সে কল্পনা করিতে লাগিল যে তার এই বিপত্তিকে একটা লাভের উপায় কিরূপে করা যায়।

পরের দিন প্রত্যুষে নয়-আনির প্রজা ছমিরদ্দি আসিয়া তাহার কাছে নালিস করিল যে তাহার কলাইক্ষেত কাল রাত্রে কে যেন ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে।

গোপাল হাতে স্বর্গ পাইল। সে সেই প্রজাকে বলিল যে আজ রাত্রে সে যেন তার ক্ষেতের পাশের আইল লাঙ্গল চষিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং কয়েকজন লোকের গায় জখমের দাগ করিয়া রাখে।

ইহার পর সে থানায় লতিফ সরকারকে দিয়া এজেলা দিল যে, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে পার্শ্ববর্ত্তী জমীদারের বহু লাঠিয়াল জমায়েৎ হইয়া ছমিরদ্দির কলাইক্ষেত বেদখল করিতে আসে এবং ক্ষেত্রের আইল ভাঙ্গিয়া দেয়। ছমিরদ্দী ও তাহার পক্ষের লোক মোজাহেম হইলে তাহাদিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দেয়। সংবাদ পাইয়া গোপাল সেখানে গিয়া বাধা দিতে চেষ্টা করায় তাহাকে গুরুতর জখম করিয়াছে। অপর পক্ষের কতকগুলি দুর্দ্দান্ত লাঠিয়ালকে আসামী করিয়া থানায় এই এজাহার দেওয়া হইল এবং নয়-আনির সরকারেও এই মর্ম্মে এজেলা পাঠান হইল।

দারোগাবাবু সেদিন চর্ব্ব্যচুষ্য-লেহ্যপেয় দিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। পরের দিন সকালে তদন্ত আরম্ভ করিলেন।

গ্রামের লোক সবাই গোপালের আসন্ন মৃত্যুর রমণীয় কল্পনায় আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। সকালে উঠিয়া একে একে অনেকেই গোপালের বাড়ী সেদিনকার অবস্থা জানিতে গেল। সেখানে গিয়া দারোগা বাবু ও লাল পাগড়ী দেখিয়া তাদের চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল। এই অনাশঙ্কিত আবির্ভাব তাদের পরিতৃপ্তির রস ভঙ্গ করিয়া দিল। সকলেই ভয়ে ভয়ে যে যার ঘরে গেল এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে জিজ্ঞাসা করিলে সবাই বলিবে যে এ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গও তারা জানে না।

সকলে স্থির করিল শারদার আর উপায় নাই। কিন্তু দারোগা বাবু গ্রামের উপর বসিয়া আছেন এ অবস্থায় খবর করিতে যাওয়া বা তার পক্ষে দুটো কথা বলার সাহস কারও হইল না।

নয়-আনির সদর নায়েবের তদ্বিরে দারোগা বাবুর অনুসন্ধান বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। বহু সাক্ষ্য দিয়া প্রথম এজেলার সমস্ত বিবরণ সুন্দররূপে প্রমাণ করা হইল। সন্ধ্যাবেলায় আহারান্তে দারোগাবাবু ও নায়েব আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

পরের দিন যখন শারদাকে পাওয়া গেলনা, তখন সকলে মনে করিল যে পুলিস তাহাকেও গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।

কিন্তু পরে যখন প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হইল এবং গোপালের দুর্গতি হইতে যে মোকদ্দমা দাঁড় করান হইয়াছে তাহা জানা গেল, তখন এ দুপুরে ডাকাতি দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ইহার পর দুই পক্ষে মোকদ্দমার জোর তদ্বির হইতে লাগিল। দুই পক্ষই প্রবল জমীদার, কাজেই অজস্র অর্থব্যয় হইতে লাগিল। গোপাল যাহা চাহিয়াছিল তাই হইল। যে সহস্র সংস্র

মুদ্রা নয়-আনির পক্ষে খরচ হইল, তার মধ্যে দাঁত বসাইবার অজস্র সুযোগ গোপালের ঘটিয়া গেল।

গোপালের আঘাতের প্রকৃত বিবরণ জানিয়া অপর পক্ষ শারদার জন্য জোর অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

পাছে সত্য কথাটা কোনও মতে আদালতে বা পুলিসের কাছে প্রকাশ হইয়া যায় সেই ভয়েই গোপাল তাড়াতাড়ি শারদাকে সরাইয়া ফেলিয়াছিল।

শারদা আপনি আসিয়া তার হাতে ধরা দিয়াছিল, তাহাতে গোপাল খুসী হইয়াছিল। কিন্তু সে আপনি না আসিলে সেই রাত্রে তাহাকে গোপনে বল পূর্ব্বক অপহৃত করিবার বন্দোবস্ত সে করিয়াছিল।

যথাকালে গোপালের পক্ষের মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে আসামীদের প্রত্যেকের এক বৎসর করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়া গেল। হাইকোর্ট পর্য্যন্ত লড়িয়া কোনও ফল হইল না।

গোপালের ধন-সম্পদ দেখিতে দেখিতে দ্বিগুণ হইয়া গেল।

(২২)

কলিকাতায় নয়-আনির জমীদারের একটা বাসা-বাড়ী ছিল। সেখানে তাঁদের হাইকোর্টের মোক্তারবাবু সপরিবারে বাস করিতেন এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী দুই একজন ছিল। শারদা আসিয়া এই বাড়ীতে উঠিল। এখানে সে মোক্তারবাবুর কাজকর্ম্ম করে, খায়-দায় থাকে। আসিবার সময় গোপাল তাকে বেশ মোটা টাকা দিয়া দিয়াছিল, তাহা সে গোপনে রাখিয়াছিল। কোনও অভাব কষ্ট তার ছিল না।

এক বৎসর তার এমনি কাটিয়া গেল।

ইতিমধ্যে হাইকোর্টে মোকদ্দমা থাকা কালে গোপাল একবার কলিকাতায় আসিয়াছিল। সেই সময় গোপাল তাকে লইয়া কালীঘাট, আলীপুরের চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, মনুমেণ্ট প্রভৃতি কলিকাতার দৃশ্য সব দেখাইয়া আনিল। এই কয়েকদিন শারদার বড় আনন্দে কাটিল।

গোপালের সঙ্গে তার যে ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা এই কয়দিনে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বিদেশে কলিকাতায় বসিয়া শারদার সঙ্গে আত্মীয়তা করায় গোপালের কোনও মর্য্যাদাহানির সম্ভাবনা ছিল না। তাই নবজাত ভদ্রত্ব রক্ষার জন্য সে আপনার চারিদিকে যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করিয়াছিল, এখানে তাহা রক্ষা করিবার কোনও প্রয়োজন বোধ করিল না।

শারদা ইহাতে অপূর্ব্ব তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিল। একদিন গোপাল যখন তাহার পদপ্রান্তে পড়িয়া প্রেম-ভিক্ষা করিয়াছিল তখন সে তীব্রভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। কিন্তু যখন গোপাল হঠাৎ বিবাহ করিয়া ভদ্রলোক হইয়া তাহার হাতের বাহিরে চলিয়া গেল, তখন এই ব্যবধান তার অন্তরে যে দুঃসহ ব্যথার সৃষ্টি করিয়াছিল তার পর গোপালের এ অপ্রত্যাশিত সমাদর তার কাছে অমূল্য সম্পদের মত মনে হইল।

তবু আবার শারদার কাছে তার পাপ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে গোপাল সহসা সাহস করিল না। শারদা যে ভয়ানক মেয়ে—কি জানি সে চেঁচামেচী করিয়া কি একটা কাণ্ডকারখানা করিয়া বসিবে। মোক্তার মহাশয়ের কাছে হয় তো একটা কেলেঙ্কারী করিয়া ফেলিবে।

শেষে একদিন শারদাকে নিভৃতে পাইয়া সে মনের কথাটা বলিয়া ফেলিল।

"ধেৎ" বলিয়া শারদা হাসিয়া চলিয়া গেল।

তার হাসিতে সাহস পাইয়া পরের দিন গোপাল আবার কথাটা পাড়িল। এবার সাহস করিয়া সে শারদার হাত চাপিয়া ধরিল।

গোপাল পীড়াপীড়ি করিয়া তার কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করিল গভীর রাত্রে সে আসিবে।

ভয়ে, আবেগে, কাঁপিতে কাঁপিতে শারদা অন্তঃপুরে চলিয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া পড়িয়া শারদার শিশুপুত্র গুরুতর আঘাত পাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

অজ্ঞান শিশুকে কোলে করিয়া শারদা হাঁউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; সকল দেবতাকে ডাকিয়া বলিল, ঠাকুর, আমার পাপের শাস্তি আমাকেই দেও, নিরপরাধ শিশুকে রক্ষা কর।

তার মনে এক বিন্দু সংশয় রহিল না যে গোপালের পাপ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া সে যে মহাপাপ করিয়াছে, শিশুর এ আঘাত তাহারই ফল। তাই কায়মনোবাক্যে সকল দেবতাকে ডাকিয়া মাথা খুঁড়িয়া সে বলিল, তার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে, আর সে পাপের পথে যাইবে না।

মাথায় জল ঢালিতে ঢালিতে শিশু সামলাইল, তার নাক-মুখ দিয়া রক্তস্রাবও বন্ধ হইল—তার পর তার হইল জ্বর।

সারারাত্রি শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে সকল দেবতার কাছে মানত করিতে লাগিল এবং তার মানসিক পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রতিজ্ঞা করিল।

দুই দিন পর শিশু সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল। গোপালও সেই দিন চলিয়া গেল।

শারদা আর গোপালের সম্মুখে যাইতে সাহস করিল না।

শিশু রোগ-মুক্ত হইলে শারদা কালীঘাটের কালী প্রভৃতি যে যে দেবতার কাছে মানত করিয়াছিল সকলকে পূজা দিয়া, পরিশেষে তার পুঁজি হইতে কুড়ি টাকা লইয়া মাধবের নামে মণিঅর্ডার করিল, এবং একখানা পত্র লিখাইয়া তাকে জানাইল যে সে অপরাধিনী নয়, মাধব যাহা ভাবিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল ;—সে যে কি কারণে মাধবকে না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া বলিয়া তাহার চরণে শতকোটি প্রণাম জানাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

এত করিয়া তবে তার মন সুস্থ হইল—সে স্থির করিল যে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।

মোক্তার বাবু ছিলেন পরম বৈষ্ণব।

যে কর্ম্ম তিনি করিতেন তাহার ভিতর সাধুতার সহিত কার্য্য করিবার কোনও প্রয়োজন তিনি অনুভব করিতেন না। নানা রকম ফিকির-ফন্দী করিয়া তাঁর মক্কেলের বেশী টাকা খরচ দেখাইয়া নানা বাবদে চুরী করা ছিল তাঁর মোক্তার-ধর্ম। তার সঙ্গে ভাগবত-ধর্ম্মের কোনওখানে কোনও বিরোধ আছে কি না, তাহা তিনি কখনও তলাইয়া দেখেন নাই। তিনি সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দচিত্তে তাঁর মোক্তার-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভাগবত-ধর্ম্মের আচরণ করিতেন। গলায় কণ্ঠী এবং কপালে তাঁর তিলক সর্ব্বদা থাকিত ; সকাল সন্ধ্যায় অনেকটা সময় মালা জপ এবং নিয়মিত গঙ্গাস্নান ও শিবপূজা করিতেন। সঙ্কীর্ত্তন ও কথকতা তাঁর বাড়ীতে প্রায় হইত।

জীবনের এই প্রথম পদস্খলনের আশঙ্কা হইতে দৈবক্রমে মুক্তিলাভ করিয়া শারদা পরম উৎসাহ ও একাগ্রতার সহিত এই সব ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিত। সে নিজে কোনওরূপ মন্ত্র-দীক্ষা লয় নাই, কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনের সময়, কথকতার সময় সে সমস্ত প্রাণমন দিয়া ভক্তি-গদ্গদ-চিত্তে সব শুনিত—সকলে উঠিয়া গেলে আসরে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইত ; এবং সেই আসরের ধুলি কুড়াইয়া সে তার পুত্রের সর্ব্বাঙ্গে মাখাইত।

এমনি করিয়া ক্রমে তার চিত্তে প্রচণ্ড একটা ধর্ম্মোন্মাদ আসিয়া গেল।

একবার নবদ্বীপ হইতে এক অধিকারী কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছিল। শারদা তার পায় গড়াগড়ি খাইয়া বলিল, "ঠাকুর, আমারে নবদ্বীপ লইয়া চলেন।"

অধিকারী ঠাকুর তিন দিন সে বাড়ীতে ছিলেন। তিন দিন ধরিয়া শারদা তাঁর অক্লান্ত সেবা করিয়াছিল। সেবায় পরিতৃপ্ত অধিকারী ঠাকুর বলিলেন মোক্তার বাবুর অনুমতি হইলে তিনি লইয়া যাইতে পারেন।

শারদা জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে তার জীবনোপায়ের কোনও ব্যবস্থা হইতে পারে কি না? অধিকারী ঠাকুর বলিলেন, শ্রীনবদ্বীপ ধামে সে বিষয়ে কোনও চিন্তার কারণ নাই।

শারদা অধিকারী ঠাকুরের সঙ্গে নবদ্বীপ গেল।

সে আখড়ায় থাকে, মন্দিরের কাজ করে, অধিকারী ঠাকুরের সেবা করে এবং তাঁর কাছে ধর্ম্মোপদেশ পায়, হরিনাম শোনে, আর আখড়ায় প্রসাদ পায়।

কিছুদিন এমনি চলিল।

অধিকারী ঠাকুরের যিনি বৈষ্ণবী তিনি গোড়া হইতেই শারদাকে একটু বক্রদৃষ্টিতে দেখিতেন। ক্রমে তাঁর আক্রোশ বাড়িয়া চলিল। শারদাকে তিনি প্রাণপণ করিয়া খাটান। শারদা তিলমাত্র শরীরকে বিশ্রাম দেয় না, তবু তাঁর তিরস্কারের বিরাম নাই। শারদা এসব গায় মাখে না, কারণ অধিকারী ঠাকুর তাকে বড় স্নেহ

করেন। এই স্নেহের মাত্রাধিক্যই যে বৈষ্ণবীর আক্রোশের কারণ, এ-কথা শারদা ক্রমে অনুভব করিল। কথাটা যখন সে ভাল করিয়া বুঝিল, তখন সে মন্দিরে ঠাকুরের কাছে মাথা নোয়াইয়া খুব খানিকটা কাঁদিল। দুঃখী সে, জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছে, তবু কোনও দিন ধর্ম্ম খোয়ায় নাই। অথচ তাহার এ কি লাঞ্ছনা যে —সতী সে, তার নামে লোকে চিরদিনই এই অন্যায় গ্লানি দিয়া আসিতেছে। জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়া সে মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিতে আসিয়াছে—তবু তার মুক্তি নাই! এ কি বিড়ম্বনা!

রাধা-গোবিন্দজিউর বিগ্রহের পদপ্রান্তে লুটাইয়া শারদা আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল ঠাকুরের পূজারী —মধুসূদন ঠাকুর।

মধুসূদন ব্রাহ্মণ। নিবাস তার শ্রীহট্ট জেলায়, কিন্তু আড়াই পুরুষ তাহারা নবদ্বীপের বাসিন্দা। সে অনেক বাড়ীতে পূজা করে, এখানেও করে। মধুসূদন যুবক, গৌরকান্তি, সুদর্শন।

শারদা যখন ঠাকুর-ঘরে লুটাপুটি খাইয়া কাঁদিতেছে, তখন মধুসূদন দ্বারের কাছে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। শারদা তার আগমন লক্ষ্য করিল না। সে আকুলকণ্ঠে ঠাকুরের কাছে তার অভিযোগ করিয়া গেল। সতীর মান যে ঠাকুর রাখিলেন না ইহাই হইল তার প্রধান অভিযোগ।

পূজারী অনেকক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া গদ্গদকণ্ঠে বলিল, "আহা হা, দর্পহারী ঠাকুর, এ কি লীলা তোমার!"

চমকাইয়া উঠিয়া শারদা বসন সংবৃত করিয়া উঠিয়া বসিল। পূজারীকে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া সে সরিয়া বসিল। তার অশ্রুর প্রবাহ রুদ্ধ হইল না, সে নীরবে বসিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিল।

আসন গ্রহণ করিয়া পূজারী শারদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছে গো, তোমার দুঃখ কিসের?"

কি বলিবে শারদা? কিছুই সে বলিতে পারিল না, কেবল অবিশ্রাম অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

পূজারী সস্নেহে তার গায় হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে তোমার থাকতে কষ্ট হয়? কেউ কষ্ট দেয় তোমাকে?"

শারদা তবু কথা কহিল না।

পূজারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কোথাও যেতে চাও? চাও তো বল, আমি তোমার থাকবার সুব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি।"

এইবার শারদা কথা বলিল। সে পূজারীর পা ধরিয়া বলিল, "যদি তা করেন ঠাকুর, তবে আমি আপনার দাসী হইয়া থাকুম।"

পূজারী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বেশ। তবে আজ সন্ধেবেলায় এসে তোমাকে নিয়ে যাব। শ্রীগোবিন্দ! যাও এখন পূজার জোগাড় নিয়ে এসো।"

শারদা উঠিয়া গেল।

পূজার পর মধুসূদন আবার শারদাকে বলিলেন, "আমি ঘর-টর ঠিক ক'রে সন্ধ্যার সময় আসবো, বুঝলে?"

শারদা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আসিয়া পূজারী ঠাকুর শারদাকে লইয়া বহুদূরে একটা বাড়ীতে গেলেন। বাড়ীটি পূর্ব্ববঙ্গের কোনও জমীদারের। কিন্তু বাড়ীর ভার আছে এক বৈরাগীর হাতে, তিনি সবৈষ্ণবী এখানে বাস করিয়া মালিকের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সেবা-পূজাদি করেন। বাড়ীর কয়েকটি ঘর ভাড়া করিয়া কয়েক ঘর বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী বাস করে।

ইহারই একটি ঘরে পূজারী আসিয়া শারদাকে অধিষ্ঠিত করিলেন।

পূজারী বলিলেন, "এখানে কেউ তোমাকে কিছু ব'লতে পারবে না। তোমার ঘর, এখানে তুমি যেমন খুসী থাকবে। আখড়ায় গিয়ে প্রসাদ পাবে আর ঘরে ব'সে মনের আনন্দে হরিনাম ক'রবে। কেমন?"

শারদা খুব খুশী হইল এবং কৃতজ্ঞচিত্তে মধুসূদনকে বার বার প্রণাম করিয়া সে করযোড়ে নিবেদন করিল, পূজারী ঠাকুর যেন অবসর মত আসিয়া তাকে হরিনাম শুনাইয়া যান ও ধর্ম্ম-উপদেশ দেন।

পূজারী আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন।

তার পর শারদা তার সংক্ষিপ্ত সংসার গুছাইয়া ঘর

ঝাঁট দিয়া হাত পা ধুইয়া আসিল। পুজারী মালা হাতে করিয়া বসিয়া রহিলেন।

শারদা ফিরিয়া আসিলে মধুসূদন বলিল, "তোমার সব কথা এখন আমাকে খুলে বল—কি তোমার দুঃখ? কিসের জন্য অমন করে ঠাকুরের কাছে ঐ কান্নাটা কাঁদছিলে?"

শারদা তখন তার জীবনের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। সে মুখ খুলিতেই ঘরের দ্বারদেশে মোহান্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। যে বৈরাগীর জিম্মায় এ বাড়ীখানা, সকলে তাকে বলে মোহান্ত। মোহান্ত কালো, মোটা-সোটা কুশ্রী অর্দ্ধবয়সী একটি লোক। তার গলায় মোটা কাঠের মালা, তার সঙ্গে ঝুলিতেছে মালার থলে'। মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে ফোঁটা তিলকের মহা আড়ম্বর, পরিধানে গৈরিক একখানি কাছাখোলা হ্রস্ব কটিবাস।

শারদার দিকে চাহিয়া তার বৃহৎ দন্তপাটি বিকশিত করিয়া মোহান্ত বলিল, "তা বেশ ঠাকুর—তোমার কপাল ভাল!"

মোহান্তকে দেখিয়াই পুজারী দ্রুতপদে উঠিয়া তার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, এবং মৃদুস্বরে কি যেন বলিল।

মোহান্ত উচ্চকণ্ঠেই বলিল, "ভাড়ার টাকাটা তুমিই দেবে তো?"

পুজারী তাড়াতাড়ি তার টেঁক হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া মোহান্তের হাতে দিয়া তাকে একরকম ঠেলিয়া বিদায় করিল।

দেখিয়া শারদা ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

পুজারী তখন পুনরায় প্রশান্তভাবে আসন গ্রহণ করিয়া শারদাকে বলিলেন, "হুঁ, তার পর?"

তখন শারদা হঠাৎ থমকিয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরের কি ভাড়া দিতে হবে?"

পুজারী আমতা আমতা করিয়া বলিল, "হাঁ, তা সে কিছু নয়—তুমি বল শুনি।"

শারদা বলিল, "কত ভাড়া?"

পুজারী অপ্রস্তুতভাবে বলিল, "দু' টাকা—তা সে জন্য তুমি ভেবো না, আমি তার একটা ব্যবস্থা ক'রবো'খন। একটা উপায় হবেই।"

শারদা বলিল, এভার বহিবার তার শক্তি আছে, এজন্য সে ঠাকুরকে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না। বলিয়া সে তার আঁচল হইতে দুইটি টাকা খুলিয়া ঠাকুরের পায়ের কাছে রাখিল।

ঠাকুর একটু বিব্রতভাবে বলিল, "এখন টাকা দেবার দরকার কি? রাখই না। আমি একটা ব্যবস্থা ক'রে তোমার এ টাকা পাবার জোগাড় ক'রবো'খন—তার পর দিও না ছাই!"

জিভ কাটিয়া শারদা বলিল, সর্ব্বনাশ! ব্রাহ্মণের টাকা লইয়া সে পাতকী হইবে না।

অগত্যা পুজারী টাকা দুইটা তুলিয়া লইল। তার পর পুজারী আবার প্রশ্ন করিতে সে তার জীবনের ইতিহাস বলিয়া গেল। সমস্ত কাহিনী শেষ করিয়া সে বলিল, জীবনে একটি দিনের জন্যও সে তার সতীধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হয় নাই। তবু ভগবান তাকে এমন করিয়া পদে পদে লাঞ্ছনা করিতেছেন কেন?

পুজারী ঠাকুর চক্ষু অর্দ্ধনিমিলিত করিয়া বলিলেন, "আহা! গোবিন্দের অপার লীলা, এর মর্ম্ম কে বুঝবে? তাঁর বড় দয়া শারদা, তোমার উপর, তাই তিনি তোমাকে এমনি ক'রে ঘা' দিচ্ছেন। জান তো আমাদের এ দুষ্টু ঠাকুরটির এমনি স্বভাব, যাকে তিনি প্রাণ ভ'রে ভালবাসেন তাকেই তিনি এমনি ক'রে দুঃখ দেন। তাই শ্রীমতী—আহা, কেঁদে কেঁদেই তাঁর জীবন কেটে গেল! আহা!"

পুজারীর দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। শারদা মুগ্ধ ও চমকিত হইয়া গেল। মনে হইল কথাটা তো ঠিক, শ্রীকৃষ্ণ যাকে ভালবাসিয়াছেন তাকে অনেক দুঃখ দিয়াছেন, অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। বহু দৃষ্টান্ত তার মনে পড়িয়া গেল।

আবেগপূর্ণ কণ্ঠে পুজারী বলিয়া গেল, "শারদা, বড় সৌভাগ্যবতী তুমি—তুমি কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী—ভগবান তোমাকে দু' হাত দিয়ে টানছেন—তোমার মত ভাগ্যবতী কে? তুমি পাবে নারায়ণকে।"

শারদা নীরবে গভীরভাবে ভাবিতে লাগিল।

সে অনেকক্ষণ পর করযোড়ে বলিল, "ঠাকুর, আমি

মূর্খ-সুর্খ মানুষ, আমি কিছুই জানি না, কেমন কইরা তাঁরে পামু আমাকে উপদেশ দেন।"

পূজারি বলিলেন, "যেমন ক'রে শ্রীরাধিকা তাঁকে পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন ব্রজগোপীরা। তাঁকে সব দিয়ে ভালবাস, তবেই তাঁকে পাবে। গোপীরা কি দিয়েছিল? দিয়েছিল, প্রাণ মন—দিয়েছিল কুল মান—দিয়েছিল লজ্জা সম্ভ্রম—তবে না তারা পেয়েছিল। যতক্ষণ অভিমান আছে, দর্প আছে, 'আমার' এই জ্ঞান আছে, ততক্ষণ তাঁকে পাওয়া যায় না। তাঁকে ভালবাসতে গেলে সব দর্প সব অভিমান ছাড়তে হবে—আমার এ গুণ আছে, এ সম্পদ আছে, এ জ্ঞান বিলুপ্ত ক'রে দিতে হবে--তবে না তাঁকে পাবে!"

শারদা কথাগুলি তার মনের ভিতর অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। অনেক ভাবিল সে; তার পর সে বলিল, "ঠাকুর আমি গরীব—তাঁতির মেয়ে। আমার না আছে টাকা পয়সা, না আছে বুদ্ধি বিদ্যা—আমার তো কিছুই নাই, কোনও অভিমান, কোনও অহঙ্কারই নাই। কি লইয়া অহঙ্কার করুম!"

হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়িয়া পুজারী বলিল, "আছে বই কি? মস্ত বড় অহঙ্কার আছে, সেইটুকু যতক্ষণ তুমি না ছাড়তে পারবে, ততক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমে অধিকারী হ'তে পারবে না।"

বিস্মিত হইয়া শারদা বলিল, "আমার কি আছে অহঙ্কার করিবার?"

হাসিয়া পুজারী বলিল, "আছে অহঙ্কার তোমার সতীত্বের! তুমি মনে ভাবছো তুমি মস্ত বড়, কেন না তুমি সতী! এই দর্প না থুইয়ে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে পায় নি। কুল মান ভাসিয়ে দিয়ে, কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে তবে তাঁরা সেই লম্পট-চূড়ামণির কাছে যেতে পেরেছিল। নারীর এ দর্প যতদিন থাকে, ততদিন তার কৃষ্ণপ্রেম কখনও সফল হয় না!"

তার পর মধুসূদন কৃষ্ণলীলার নানা কাহিনীর কতকটা প্রচলিত কতক অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া এই তথ্যটা শারদার মনের ভিতর নিবিড় ভাবে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন, যে সতীত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিঃশেষে দীনহীন অবজ্ঞাত না হইলে কৃষ্ণকে যথার্থ প্রেম করা যায় না। কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা পূজারী এবং তার মত বহু বৈষ্ণব বহুবার বহু নারীর কাছে করিয়াছে। পূজারীর কাছে ইহার কোনও নূতনত্ব ছিল না, কিন্তু শারদার কাছে এ ব্যাখ্যা অত্যন্ত অভিনব এবং অত্যন্ত ভয়াবহ বলিয়া মনে হইল। কথা শুনিতে শুনিতে তার সর্ব্বাঙ্গ বারবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু পূজারীর যুক্তিজাল ভেদ করিয়া সে তার চিরাগত সংস্কারকে আপনার চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে কিছুতেই পারিল না।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পূজারী শারদাকে উপদেশ দিলেন।

শারদা নীরবে নতমস্তকে সুধু শুনিয়া গেল। যে-সব উপদেশ সে শুনিল, যে-সব ভয়ঙ্কর কথা ধর্ম্ম বলিয়া তার কাছে উপস্থিত হইল, তার কল্পনায় তার কণ্ঠতালু শুকাইয়া গেল—সে শুষ্ক কঠিন হইয়া বসিয়া সুধু শুনিয়া গেল। কোনও কথা সে বলিতে পারিল না।

অনেক রাত্রে পূজারী ঠাকুর উঠিল। অত্যন্ত অনিচ্ছায় সে উঠিল, কিন্তু ভাবিয়া দেখিল আজ আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার চেষ্টা সঙ্গত হইবে না।

তার পর দুয়ার বন্ধ করিয়া শারদা শুইয়া পড়িল, তার মনের ভিতর পূজারীর কথাগুলি কেবলি ওলট-পালট খাইতে লাগিল।

দ্বিধা বা সংশয় তার একবারও হইল না। পূজারীর ধর্ম্মোপদেশের ভিতর যে কোথাও ভুলচুক আছে, কিম্বা ইহার ভিতর তার কোনও স্বার্থের যোগ আছে এমন কোনও সন্দেহই তার হইল না। পূজারী যাহা বলিল তাহাই যে বৈষ্ণবধর্ম্মের সার সত্য সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইল না। কিন্তু তার চিরজীবনের শিক্ষা সাধনা ও সংস্কার তাকে এই বিহিত ধর্ম্ম পালনে পরাঙ্মুখ করিয়া তুলিল। সে অনেক ভাবিয়া দেখিল, কৃষ্ণপ্রেম পাইবার জন্য সাধনা সে কখনও করিতে পারিবে বলিয়া মনে হইল না।

তার মনে পড়িল কতবার গোপাল তার পায় ধরিয়া সাধিয়া তার প্রেমভিক্ষা করিয়াছে—তার শৈশবসঙ্গী পরম স্নেহের গোপাল। কাঠের মত হইয়া সে তার উগ্র প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; যখন তার অন্তর

গোপালকে প্রাণপণে কামনা করিয়াছে তখনও সে তাকে বিমুখ করিয়াছে। গোপালের এতখানি প্রেম অগ্রাহ্য করিয়া, আপনার হৃদয়ের এতখানি আবেগ দমন করিয়া সে তার যে সম্পদ, যে গৌরব রক্ষা করিয়াছে, তাহা কি সে কোনওদিন কারও কাছে বিলাইয়া দিতে পারে? সতীত্ব যদি সে পরিহার করে তবে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইবার কি সম্বল তাহার থাকিবে? কোন্ সম্পদ লইয়া সে বাঁচিয়া থাকিবে?

তখনই তার মনে পড়িল পূজারী-ঠাকুর বলিয়াছেন, কৃষ্ণকে পাইতে হইলে একেবারে নিঃসম্বল হইয়া, সব অভিমান সব অহঙ্কারের লেশমাত্র উন্মূলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পায়ে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তাই তো শ্রীকৃষ্ণ নারীর শেষ সম্বল লজ্জাটুকুও গোপীদের হরণ করিয়াছিলেন বস্ত্র-হরণে!

ভাবিতে প্রাণ তার শিহরিয়া উঠিল! কি সর্ব্বনাশ! এমন করিয়া তবে ভগবানকে পাইতে হইবে। হায়, কৃষ্ণ-প্রেম লাভ তার সাধ্য নয়! সে কিছুতেই পারিবে না তার লজ্জা ছাড়িতে, তার সতীত্বের স্পর্দ্ধা ছাড়িতে।

মনে পড়িল বেহুলার কথা। সতী বেহুলা তার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বামীকে স্বর্গ হইতে নামাইয়া আনিয়াছিল, সাবিত্রী যমরাজকে পরাভূত করিয়াছিল। কই তাঁদের কাছে তো ভগবান এ ভিক্ষা করেন নাই। এত বড় পুণ্যশ্লোকা মহিলাদের কাছে যাহা ধর্ম্ম তার কাছে তাহা ধর্ম্ম না হইবে কেন?

পূজারী ঠাকুর এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিল। কৃষ্ণ-প্রেমের পথ সাধনার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ পথ, মধুরভাবে কৃষ্ণকে ভজনা করা সাধনার পরাকাষ্ঠা। এ সাধনের অধিকারী সবাই নয়। কিন্তু যে অধিকারী, তার কাছে কৃষ্ণ এই সাধনাই চান—সে যে তার প্রাণাধিক প্রিয়তমা শ্রীরাধিকা!

অনেক রাত্রে ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া সে এলোমেলো অনেক স্বপ্ন দেখিল। গোপাল, মধুসূদন পূজারী, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এলো-মেলোভাবে মিশ খাইয়া গেল। কুঞ্জবনে যেন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী বাজিয়া উঠিল, উতলা পাগল বেশে শারদা ছুটিয়া গেল। সহস্র ব্রজগোপী তার সঙ্গে ছুটিয়া গেল। দেখিল শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাই-তেছেন। গোপীরা তাহার গায়ের উপর গলিয়া পড়িল, শ্রীকৃষ্ণ তাদের সকলকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। শারদাও ছুটিয়া গেল, অমনি শ্রীকৃষ্ণ তফাতে সরিয়া গেলেন। তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন "ওকে ছুঁয়ো না, ও সতী!"—অবাক হইয়া চাহিয়া শারদা দেখিল, শ্রীকৃষ্ণ—গোপাল!

অমনি সব ব্রজনারী খিল খিল করিয়া হাসিয়া ব্যঙ্গ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "ও সতী—সতী—ছিঃ!"

সকলে শারদাকে ছাড়িয়া পলাইল, সকলে তার গায় থুথু দিল। শারদা কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল। তখন কৃষ্ণ—না গোপাল?—আসিয়া তাকে বলিলেন, "তোমার সময় হয় নি। যাও কুলমান ফেলে এসো।"

একজন কে আসিয়া তার হাত ধরিল ও সস্নেহে তাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "এস শ্যাম-সোহাগিনী।" শারদা চাহিয়া দেখিল পূজারী!

হঠাৎ ভয় পাইয়া শারদা চীৎকার করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

ঘুম ভাঙ্গিয়া শারদা ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল। তার বুক তখনও ধড়্ফড়্ করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি জানালা খুলিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, রাত্রির ঘোর কাটিয়াছে—উষার উদয় হইয়াছে।

শারদা বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। স্বপ্নের কথা সে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়া ভাবিতে লাগিল, এ যে সুধু স্বপ্ন—সুধু একটা অলীক কল্পনা—এ কথা তার একবারও মনে হইল না। মনে হইল ইহা দেবাদেশ। কিন্তু কি এ আদেশ?

এই কি ভগবানের আদেশ যে এই পূজারীকে আশ্রয় করিয়া সে সতীত্ব-গৌরব বিসর্জ্জন করিলেই সে শ্যামের সোহাগভাগিনী হইতে পারিবে?

এ কল্পনা তার মনে উঠিতে তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে তার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল।

দেবাদেশ অবহেলা করিতে সাহস হইল না। কিন্তু পালন করিতেও সাহস হইল না।

শারদার ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। শুইয়া পড়িয়া শারদা পুত্রকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল। ছেলে শান্ত হইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায় তার চিত্ত আবার কাঁপিয়া উঠিল। তার মনে পড়িল আর একদিন যখন সে গোপালের প্ররোচনায় মজিতে বসিয়াছিল, ঠিক সেই সময় তার পুত্রের হঠাৎ প্রাণ-সংশয় হইয়াছিল। সতীত্ব-ধর্ম হইতে স্খলিত হইলে তার যে পাপ হইবে তাতে তার শিশুর অমঙ্গলের আশঙ্কা তাকে আরও বিচলিত করিয়া তুলিল।

সে দু'হাতে শিশুকে বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া সাশ্রুলোচনে ভগবানকে বলিল, হে হরি, এমন আদেশ আমাকে দিও না, বড় কঠিন এ আদেশ, বড় কঠোর সাধনা। আমি পারিব না। দুর্ব্বল আমি, আমাকে রক্ষা কর, আমার বাছাকে রক্ষা কর! আমার সর্ব্বস্বধনের যেন কোন অমঙ্গল না হয় হরি! (ক্রমশঃ)

সত্যনারায়ণ

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

জানি সত্যনারায়ণ, হবে, হবে তোমার প্রকাশ
প্রোজ্জ্বল প্রভাসে—
যদিও মলিন ধূলি, জটিল জঞ্জাল, পাংশুরাশ
আজি চারিপাশে।
এই ঘৃণ্য আবর্জ্জনা, এই সব ছাই পাঁশ ধূলি
মাখি' আর মাখাইয়া, ছড়াইয়া মুষ্টি ভরি' তুলি'
মাতিল এ কারা সব প্রেত সম উন্মাদ ধূলোটে
তোমারে বিস্মরি'!
আশঙ্কায় ভরে প্রাণ—এ মত্ততা—কি জানি কি ঘটে
সেই কথা স্মরি'।

ভয় হয়, তোমার প্রকাশ হয় কোন্ অতর্কিত
আগ্নেয় নিঃস্রাবে,
হয় ত সে অগ্ন্যুচ্ছ্বাসে দূরাকাশ হবে আলোকিত
কিন্তু সব যাবে
দগ্ধীভূত হ'য়ে।—হায়! ভয় হয় সেই কথা ভাবি'।
আবার নূতন করে' দীর্ঘ সাধনার যুগ যাপি'
কত দিনে কত শ্রমে গড়িতে হইবে বনিয়াদ
এই সমাজের,
কে কহিবে—কবে হবে ভাবী সভ্যতার সূত্রপাত
নূতন ধাঁজের।

অসত্যের এই পাংশুজাল—এরা ভাবে সত্য বুঝি এই;
বহ্নি—নির্ব্বাপিত।
অস্বীকার করে নিত্য—সত্যনারায়ণ তুমি নেই;
আত্মা—নির্ব্বাসিত।
শ্রীকাতর ছিদ্রান্বেষ, আচরণে কৃত্রিম মমতা,
পরদুঃখে ছদ্মসুখ, লজ্জাহীন নীচ স্বার্থ-কথা,
ধর্ম্মের নির্ম্মোকধারী দেহবাদ, ভোগী ঐহিকতা,
ব্যসনী বিলাস,
অবিদ্যার আড়ম্বর, দুর্বুদ্ধির অহঙ্কার সদা,
ব্রত—ন্যায়নাশ।

নারায়ণ, যোড়করে করি নতি, তুমি ক্ষমা কর,
তুমি হেসে চাও;
তোমার দক্ষিণ হাতে কল্যাণ-প্রদীপ তুলে' ধর,—
শুভবুদ্ধি দাও।
দাও প্রাণ, দাও প্রেম, দাও ত্যাগ, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞান,
দাও নিষ্ঠা, সংযমন, দাও ধর্ম্ম—আত্মার সম্মান,
দাও কর্ম্ম—বিশ্বহিত। নিত্য হোক্ সত্যের অয়ন
নরচিত্ত তলে।
উজ্জ্বল প্রসন্ন মুখে দেখা দাও সত্যনারায়ণ,
আনন্দে মঙ্গলে!

আফগানিস্থান

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

আফগানিস্থানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ও নিকট। কারণ এক সময়ে আফগানিস্থান ভারতবর্ষেরই একটা অংশ ছিল। বর্ত্তমানে এই একত্বের দাবি আর করা যায় না। কিন্তু তা হ'লেও ঘনিষ্ঠতার দাবি একেবারে মুছে' ফেলাও সম্ভব নয়। কারণ এখনও এরা অত্যন্ত নিকট প্রতিবেশী। ভারতবর্ষের দ্বারাই ও রাজ্যের একটা সীমান্ত রচিত হয়েছে। প্রতিবেশীর সঙ্গে যার ভাব নেই জীবন যে তার অনেক ব্যাপারেই দুঃসহ হ'য়ে ওঠে তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এতো গেল বাইরের কথা। ভিতরের ব্যাপারটা এর চাইতেও ঢের বেশী ঘোরালো। ভারতবর্ষকে নিরাপদে থাকতে হ'লে আফগানিস্থানের সঙ্গে মিতালী প্রতিষ্ঠি করা ভারতবর্ষের পক্ষে অপরিহার্য্য। কারণ এশিয়া উপরের দিক থেকে যারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে চা তাদের প্রবেশ করতে হয় আফগানিস্থানের পথেই। হিসেবে আফগানিস্থানকে ভারতবর্ষের তোরণ-দ্বার বল্লে অত্যুক্তি হয় না। এই জন্যই ইংরেজদের পূ যারা ভারতবর্ষে রাজত্ব ক'রে গেছেন তাঁরা আফগানিস্থানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা ক বারই চেষ্টা করেছিলেন, ইংরেজেরাও সে চেষ্টাই ক'রে আস্‌ছেন।

কিন্তু এ সব বড় বড় রাজনৈতিক ব্যাপার এ সব দিকে ঝোঁক না দিয়েও আফগানিস্থানে খবরটা মোটামুটি ভাবে জেনে রাখা যায়। দেশটা ভারতের এত কাছে এবং যার স ভারতের সম্বন্ধও এত ঘনিষ্ঠ, তার ভৌগলি অবস্থান, সামাজিক রীতিনীতি, জন- সাধারণে চাল-চলন—এগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজ আছে আমাদের সকলেরই।

আফগানিস্থানের একদিকে পারশ্য আর এ দিকে পাঞ্জাব। দক্ষিণে এর বেলুচিস্থান উত্ত তুর্কীস্থান। এর আয়তন প্রায় ২,৫০,০০০ বর্গ-মাইল। সুতরাং আয়তনে এ ইউরোপের অনেক শক্তিশালী রাজ্যের চেয়েও বড়। প্রমাণ-স্বরূপ ফ্রান্সের নাম করা যায়। ফ্রান্সের আয়তন ২,১২,০০০ বর্গমাইল মাত্র। যেসব প্রদেশ নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে এই আফগানিস্থান তাদের ভিতরে কাবুল, হিরাট, কান্দাহার, আফগান-তুর্কীস্থান, বাদকসান, কাফ্রিস্থান, ওয়াকান প্রভৃতির নামই উল্লেখ-যোগ্য।

আফগানিস্থানের জনসংখ্যা ৬৩,৮০,৫০০। এই জন-সঙ্ঘ প্রধানতঃ গুটি ছয় জাতিতে বিভক্ত। তাদের নাম—

বামিয়ান পাহাড়ে বুদ্ধমূর্ত্তি

…রাণী, খিলজাই, হাজারা, আইমাক, উজবেগ এবং …জিক।

আফগানিস্থানের নাম শুনে' স্বভাবতঃ এই কথাই মনে হয় যে, আফগান নামে কোনো একটা বিশেষ জাতির বাসভূমি ব'লেই এই নামের তিলক জায়গাটার ললাটে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আফগান ব'লে কোনো জাতির হদিস আফগানিস্থানে পাওয়া যায় না। কথাটা সম্ভবতঃ এসেছে পারশী ভাষা হ'তে এবং সেখানে তার অর্থ—পাহাড় অঞ্চলের অধিবাসী। সময়ের স্রোতে এবং বাইরের তাড়নায় প্রাচীন আর্য্যেরা এবং তাদেরি মতো আরো অনেকে ভেসে এসে আফগানিস্থানে ডেরা বেঁধেছে। তারা এবং প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগের যারা এখনো রয়েছে সেখানে তারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হ'য়েই র'য়ে গেছে—এক সঙ্গে মিলে' মিশে' এক হ'য়ে গ'ড়ে উঠ্‌তে পারে নি। সুতরাং আফগান জাতির বাসভূমি ব'লে জায়গাটার গায়ে আফগানিস্থানের নামের ছাপ এঁটে দেওয়া হ'য়েছে—এ কথা বল্‌লে তার ভিতরে যুক্তির জোর বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এ সম্বন্ধে অন্য রকমের মতও অবশ্য একটা প্রচলিত আছে। সে মত হচ্ছে এই—আবদালীদের অর্থাৎ যে জাতিটি আফগানিস্থানের প্রধান জাত তাদের আদি পুরুষের নাম ছিল আফগানা। এবং এই আফগানা থেকে এই আফগান জাতির উদ্ভব। আর আফগানদের বাসস্থান ব'লেই এ স্থানটার নাম হয়েছে আফগানিস্থান। আফগানা ছিলেন সাউলের দৌহিত্র। সুতরাং আফগানেরা

আফগান সওদাগরগণ

বালা হিসার

বংশ-গৌরবে ইজরাইলদের সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু ঐতিহাসিকদের অনেকে এ উক্তি বিচারসহ ব'লে মনে করেন না।

নামের আদি রহস্য যাই হোক্ না কেন, আফ-গানিস্থানের সম্প্রদায়গুলির ভিতর নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চল্‌বার দিকে এমন একটা ঝোঁক আছে যে, সহজ সাধারণ ভাবে তাদের সংমিশ্রণ সম্ভবপর নয়। আর তার ফল হ'য়েছে এই যে, তাদের ভিতরে প্রতিনিয়ত চলেছে ঝগড়া-বিবাদ—এমন কি যখন কোনো বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধেও লড়াই কর্‌বার দরকার হয়—সমস্ত সম্প্রদায়ের মিলিত শক্তি নিয়ে দাঁড়াবার প্রয়োজন হয়, তখনো তারা সহজ-স্বাভাবিক ভাবে মিল্‌তে পারে না। তখন মিলনের জন্য প্রয়োজন হয় তাদের উপর বল-প্রয়োগের। জাতির দিক দিয়ে এই একত্বের অভাব রাষ্ট্রের সম্বন্ধেও তাদের মনকে সচেতন ক'রে তুল্‌তে পার্‌ছে না। আর সেই জন্যই রাষ্ট্র-ব্যাপারে প্রাধান্য লাভের নিমিত্ত আফগানিস্থানের বিভিন্ন :সম্প্রদায়ের সর্দ্দারদের ভিতর হানাহানি ও রেষারেষি সব সময় লেগেই আছে এবং সিংহাসনের সম্পর্কে ষড়যন্ত্র তাদের ভিতরে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্র-শক্তি লাভের জন্য তারা অনায়াসে বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌তে পারে, রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর্‌তেও দ্বিধা করে না। সাধারণ লোক অবশ্য রাষ্ট্রতন্ত্রের ব্যাপার নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। কিন্তু তারা অতিমাত্রায় অন্ধবিশ্বাসী। তাই মোল্লাদের প্রভাব তাদের উপরে অসাধারণ। আর সেইজন্য জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ আফগানিস্থানে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। ধর্ম্মের নামে অন্ধবিশ্বাসী আফগানদের ক্ষেপিয়ে তোলা কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়।

জালালাবাদ ও কাবুলের মধ্যপথে জাগদালক গিরিশঙ্কট

পাহাড়ের কোলে যারা মানুষ, দেহের গড়নও হয় অনেক সময় তাদের পাহাড়ের মতোই দৃঢ় ও শক্ত। আফগানদের দেহ দৃঢ় বলিষ্ঠ ও শ্রমসহিষ্ণু। সভ্যতার আলোক এখনও আফগানিস্থানের ভিতর তেমন ভাবে প্রবেশ লাভ কর্‌তে পারে নি। তাই সাধারণ আফগানচরিত্র বর্ত্তমান সভ্যতার কতকগুলি গুণ হ'তে যেমন বঞ্চিত, কতকগুলি বড় দোষ হ'তেও আবার তেমনি মুক্ত। আফগানি-স্থানের লোকেরা স্বভাবতঃই নির্ভীক, একগুঁয়ে। আশ্রিতকে তারা জীবন বিপন্ন ক'রে রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা করে—কিন্তু অন্যদিকে আবার মানুষের প্রাণের মূল্য তাদের কাছে নেই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। কথায় কথায় তাদের হাতে বন্দুক গর্জ্জায়, ছুরি ঝক্‌মক্ ক'রে ওঠে। যেমন অনায়াসে তারা প্রাণ গ্রহণ ক'রে, তেমনি অনায়াসে আবার তারা প্রাণ দেয়ও। নিষ্ঠুরতা ও প্রতিহিংসা-পরায়ণতার সঙ্গে পাশাপাশি জেগে রয়েছে তাদের বুকে আশ্রিতবাৎসল্য ও ধর্ম্মভীরুতা। ভালো-মন্দের পরিমাপ করে তারা সাধারণতঃ নিজেদের খেয়ালের দ্বারা—প্রত্যেক কাজে মনের মর্জ্জিই তাদের প্রধানতঃ গতিপথের নিয়ন্ত্রণ করে।

জাতির প্রকৃতি বা স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায় অনেক সময় তাদের রীতি-নীতির ভিতর দিয়ে। এমন দু' একটা রীতি এই আফগানদের ভিতরেও আছে যা থেকে অতি সহজেই এদের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে এম্‌নি ধরণের একটা রীতির উল্লেখ কর্‌ছি। এটি হচ্ছে আফগান শিশুর জন্মের সময়ের চিরাচরিত প্রথা। শিশুকে আফগানেরা আমাদের মতো বাদ্য বাজিয়ে বা হুলুধ্বনি দিয়ে আহ্বান করে না, আহ্বান করে বন্দুকের গর্জ্জন দিয়ে। ধনীর ঘরেই হোক্, আর দরিদ্রের ঘরেই হোক্, শিশুর জন্মের সময় আফগানের আহ্বান সঙ্গীত বন্দুকের সুরে দিগ্‌দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শিশু যদি পুত্র হয় তবে বন্দুক ছোড়া হয় ১৪ বার, আর কন্যা হ'লে তাকে তারা অভিনন্দিত ক'রে ৭ বার বন্দুক আওয়াজ ক'রে।

সন্তান-পালনের ব্যবস্থার ভিতরেও তাদের দুর্দ্ধর্ষ চরিত্রের এবং স্বাধীনতা-উন্মুখ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কোনো ধাত্রীকে তারা সন্তান-পালনের জন্য কখনো নিযুক্ত করে না, যার স্বামীর ভিতরে কখনো ক্লৈব্য বা দুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, অথবা যার স্বামীর জীবনে কখনো যুদ্ধ-পরাজয়ের কলঙ্কের ছাপ পড়েছে।

আফগানদের সম্পর্কে আমাদের মনে সাধারণতঃ একটা ভুল ধারণা আছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের লোককেই আমরা অনেক সময় আফগান ব'লে মনে করি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। এ দু'টো জাত রাষ্ট্রের দিক দিয়েও এক নয়, জাতের দিক দিয়েও এক নয়। বর্ত্তমান আফগানদের চেয়ে তারা ঢের পুরাণো জাত, এবং তারা কখনো আফগানিস্থানের বশ্যতাও স্বীকার ক'রেনি। বস্তুতঃ তারা কখনো কারো বশ্যতাই স্বীকার ক'রেনি। কোথা থেকে যে তাদের উদ্ভব হ'লো পণ্ডিতেরা এখনো নির্ণয় কর্‌তে পারেন নি তার ইতিহাস।

আফগানিস্থানের উপজাতিগুলির ভিতর প্রকৃতিগত সাম্য যতটা আছে, বৈষম্যও তার চেয়ে কম নয় এবং এই বৈষম্যের কারণ যে কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক পার্থক্য তা নয়, তাতে প্রকৃতির প্রভাবও প্রচুর। বিভিন্ন জল-বায়ুর প্রভাব তাদের চরিত্রের ভিতরে বিভিন্ন উপাদান এনে দিয়েছে। তাই আফগান উপজাতিগুলির চরিত্র একটির সঙ্গে আর একটি একেবারে উল্টো ধরণের হওয়াও অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায় নি।
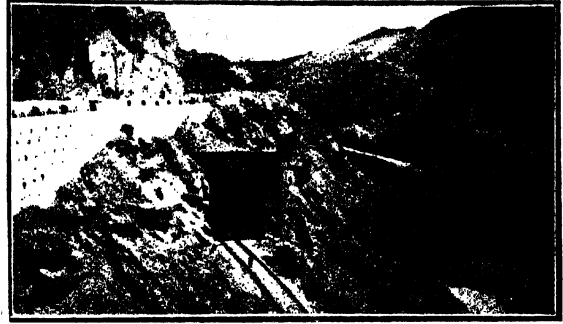
মোটর ও রেলপথ
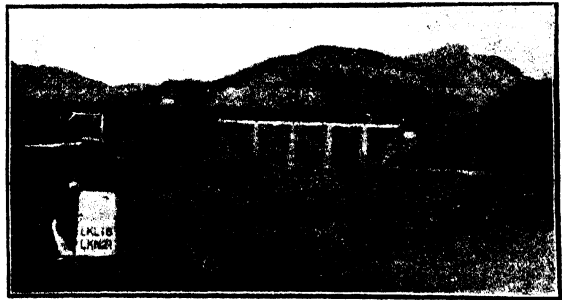
পেশোয়ারের মেল গাড়ী

এশিয়ার যে অংশটা আফগানিস্থান নামে পরিচিত তা একটা প্রকাণ্ড মাল-ভূমির মতো জায়গা। উত্তরের দিকে তা উচ্চতায় প্রায় হিমালয়ের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। তার এই উচ্চতা দক্ষিণের দিকে আস্তে আস্তে ঢালু হ'য়ে নেমে এসেছে একেবারে বেলুচিস্থানের মরুভূমি পর্য্যন্ত। তার মাঝ দিয়ে নানা দিকে ডাল-পালা বিস্তার ক'রে

চলে গেছে পাহাড়ের নতোন্নত তরঙ্গ। আর তারই মাঝে মাঝে গ'ড়ে উঠেছে সমতল ভূমি—নদীর জল-ধারায় কোথাও বা উর্ব্বর, কোথাও বা নদীর স্পর্শ না পাওয়ায় উষর। আফগানিস্থানের কতটা স্থান যে পর্ব্বত-বন্ধুর এবং কতটা স্থান যে চাষবাসের অযোগ্য তা বলা কঠিন। তবে এর বড় বড় নদীর উপত্যকা ভূমিগুলি অধিকাংশ স্থানেই বেশ বড় এবং প্রশস্ত। অক্সাস (আমুদরিয়া), কাবুল, হেলমান্দ, হার-ই-রাদ—এসব নদী অধিকাংশস্থানেই সমতল ভূমির উপর দিয়ে ব'য়ে চলেছে এবং সেই সব স্থানেই গ'ড়ে উঠেছে শস্য-ভার-সমৃদ্ধ কৃষিক্ষেত্র সমূহ। নদীর জল-ধারা সমস্ত স্থানে পরিবেশনের জন্য আধুনিক কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এখনও অবলম্বিত হয়নি। কিন্তু এ অতুলনীয়। কাশ্মীরকে আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য ভূস্বর্গ ব'লে থাকি। আফগানিস্থানের প্রকৃতির ভিতর বহু জায়গায় কাশ্মীরের রূপের এই আভাস পাওয়া যায়। হিন্দুকুশের গিরিশৃঙ্গগুলি মাথা উঁচিয়ে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ থেমে গিয়ে অনেক যায়গায় উপত্যকা-ভূমি রচনা করেছে, সে সব স্থানের সৌন্দর্য্যও অবর্ণনীয়। উচু পাহাড়ের কোলে কোলে যে সব গ্রাম গ'ড়ে উঠেছে তাদের রূপও চমৎকার। কত স্থানে পাহাড়ের বুক বেয়ে চল্‌তে চল্‌তে ঝরণার জল-ধারা উছ্‌লে উঠে' অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে। তা ছাড়া আফগানস্থানে মরু-ভূমির পরিমাণও অল্প নয়। আর মরুভূমির বালুস্তরের তরঙ্গায়িত ধূ ধূ প্রান্তরের দৃশ্য, তা ভীষণ হ'লেও চমৎকার। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অদ্ভুত বিকাশ আফগানিস্থানের
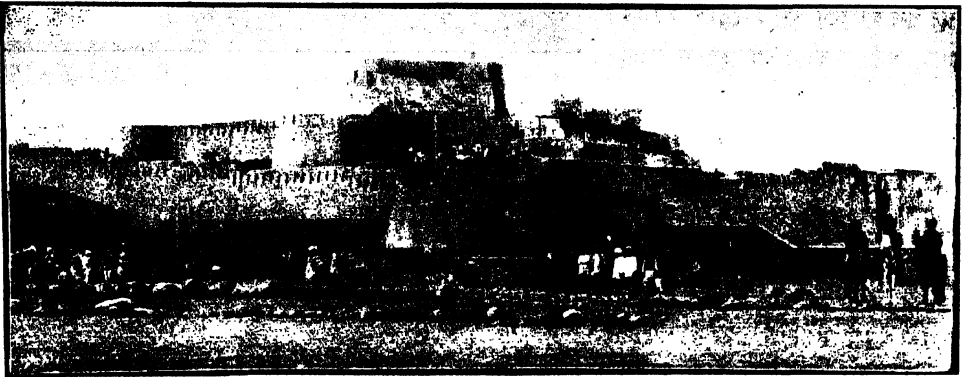
জামরুদ দুর্গ

সম্বন্ধে আফগানদের উদ্ভাবিত অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলিও উপেক্ষণীয় নয়। সেই সব পদ্ধতির সাহায্যে তারা নদীর জল-ধারাকে কর্ষণীয় ভূখণ্ডের উপরে যেভাবে পরিবেশন করে তা প্রশংসা লাভের যোগ্য।

বসন্ত ঋতুতে উত্তর আফগানিস্থান পত্র-পল্লবের সবুজ আভায়, পুষ্প গন্ধে এবং ফল-ভারে ভরে ওঠে। লোজার-উপত্যকা, কোহিস্থানের উপত্যকা, চারদে-সমতলভূমি এ সমস্ত স্থানের শোভা হয় অপরূপ। শীতের সময়েও আফগানিস্থানের নৈসর্গিক চেহারা যে খুব খারাপ হয় তা নয়। বরফে ঢাকা তার পাহাড়ের চুড়োগুলো সূর্য্যালোকে তখন ঝল্‌মল্ করতে থাকে। তার সে শোভাও চারিদিকেই ছড়িয়ে প'ড়ে আছে। বস্তুতঃ আফগানি-স্থানের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ভারি অদ্ভুত। এমন স্থানও সেখানে আছে যেখানে কোনো সময়েই বরফ পড়ে না, অথচ সেখান থেকে মাত্র ঘণ্টা দু'য়ের পথ এগিয়ে গেলেই এমন স্থান এসে পড়ে যার বুকের উপরে চির-বরফের স্তূপ বিরাজমান।

আফগানিস্থানের উল্লেখযোগ্য প্রদেশগুলির নাম পূর্ব্বেই করেছি। কাবুল আফগানিস্থানের রাজধানী। সুতরাং কাবুল প্রদেশের কথাই সকলের আগে বলা যাক্। উত্তর-পূর্ব্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে সমগ্র কাবুল প্রদেশের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০০ মাইল। কাবুলে শস্য-শ্যামল উপত্যকাও

যেমন আছে, তেমনি অনুর্ব্বর বৃক্ষ-লতা-পরিশূন্য স্থানেরও অভাব নেই। সমুদ্রপৃষ্ঠ হ'তে কাবুলের উচ্চতা প্রায় ৫৬০০ ফিট। কাবুল পাহাড় দিয়ে ঘেরা। সুতরাং খুসী মতো বাড়িয়ে একে মনের মতো ক'রে গ'ড়ে নেবার

আফগান সমতলের একটী পল্লী

উপায় নেই। তাই ঘর-বাড়ী রাস্তা-ঘাটের দিক দিয়ে যে সব নতুন সংস্কার হ'য়েছে তা একে বৈচিত্র্য দিয়েছে, কিন্তু এর শ্রী বাড়িয়েছে কিনা সন্দেহ। কাবুলের ফলের বাজার বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। কারণ তার এই সব বাজার থেকে বহু ফল প্রত্যহ দেশ-বিদেশে রপ্তানি হয়। আধুনিক সভ্যতার ছাপ মোটামুটি ভাবে কাবুলে এসে পৌঁছে গেছে। সেখানে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার ষ্টেশন প্রভৃতি গ'ড়ে উঠেছে। রাস্তা-ঘাটেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

আফগানিস্থান যেখানে এসে পারস্যের সীমান্তে শেষ হ'য়েছে তারি কাছাকাছি জায়গাতে হিরাট। এই হিসেবে হিরাটের অবস্থানের দাম আফগানিস্থানের কাছে খুব বেশী। সাধারণতঃ এমন সব স্থানে যারা বাস করে তারা দুর্দ্ধর্ষ হ'য়ে থাকে। কিন্তু হিরাটের লোকেরা সাধারণতঃ শান্ত প্রকৃতির। তারা তলোয়ার চালিয়ে উদরান্নের সংস্থান করে না,—তাদের জীবিকার্জ্জনের আশ্রয় হ'চ্ছে প্রধানতঃ কৃষি কাজ। ইতিহাসে হিরাট চিরদিনই ভারতের তোরণ-দ্বার রূপে পরিচিত।
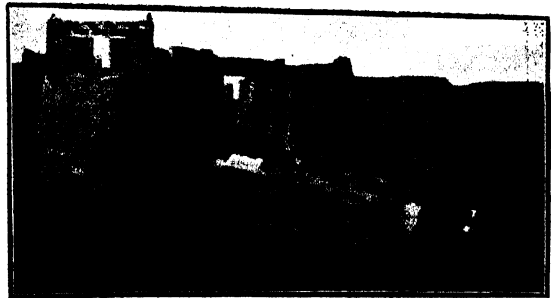
একটী আফগান সহরের মৃণ্ময় প্রাকার

কান্দাহার ভারি কারবারি জায়গা। এর রাস্তাঘাটগুলো বেশ ভালো ও প্রশস্ত। এখানে বহু ভারতীয়

লোক এসে ব্যবসার জন্য আশ্রয় নিয়েছে এবং তারা যথেষ্ট ধন-সম্পদও অর্জ্জন করেছে। কান্দাহারের প্রধান বাসিন্দা ৪টি উপজাতি। তারাই চার ভাগে ভাগ ক'রে নিয়েছে এই প্রদেশটিকে। তা হ'লেও সিন্ধু দেশের হিন্দু এবং বোম্বাইওয়ালারা এখানকার বড় লোক ও প্রতিপত্তিশালী লোক।

আফগানিস্থানের উত্তর সীমান্তে আমু দরিয়া। ওয়াক্কান প্রদেশে এসেই আমু দরিয়া প্রথম প্রবেশ করেছে আফগানিস্থানে। জলের নাম আমাদের দেশে জীবন। আমু দরিয়ার এই জল আফগানিস্থানের বহু অংশে দীর্ঘকাল ধ'রে জীবন জুগিয়ে আসছে। অর্থাৎ এর জল ক'রে তুলেছে আফগানিস্থানের একটা বড় অংশকে শস্য-শ্যামল। ৩০০ মাইল ব্যেপে বিসর্পিত গতিতে আমু দরিয়া ব'য়ে চলেছে, আর চার দিক থেকে অজস্র ঝরণা এসে তার স্রোতধারাকে পুষ্ট করছে। শীতের সময় আমু দরিয়ার জল জ'মে বরফ হ'য়ে যায়। তারপর গ্রীষ্মের বাতাস বইতে সুরু হ'লেই গলতে সুরু করে এই বরফ। তখন আমু দরিয়ায় দেখা দেয় বন্যার প্লাবন। আমু দরিয়া ধ্বংসও করে, আবার শস্য-সম্পদের প্রাচুর্য্যে দেশকে শ্রীও দেয়—সুতরাং জীবনের চাঞ্চল্যেও ভ'রে তোলে।

আফগানিস্থানের উত্তরের দিকে পূর্ব্বপ্রান্ত জুড়ে' আছে বাদাক্সান প্রদেশ। পর্ব্বত-মেখলায় তার কটিতট ঘেরা। বৎসরের অধিকাংশ সময়েই তুষারস্তূপের অপরূপ সৌন্দর্য্যের দীপ্তি তার বুকের উপরে ঝ'রে পড়ে। কিন্তু সে সৌন্দর্য্য বিলাসিনী নারীর সৌন্দর্য্যের মতো। তাতে ধ্বংসের তীব্রতা আছে, সৃষ্টির মৃদুতা নেই। তবে বাদাক্সান খনিজ সম্পদে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এর মাটির নীচে গন্ধক, লৌহ প্রভৃতির খনি তো আছেই, মণি-মাণিক্যেরও খনি আছে। এই খনি যদি কখনো খুঁড়ে' কাজে লাগাবার মতো করা যায় তবে তা যে আফগানিস্থানকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ক'রে তুলবে তাতে সন্দেহ নেই।

কান্দাহারের শিল্পী

আফগান-তুর্কীস্থান আফগানিস্থানের আর একটা প্রদেশ এবং খুব বড় প্রদেশ। অধিবাসীদের বেশী ভাগই তুর্কি অথবা তাতারদের বংশোদ্ভব। আফগানিস্থানের সব চেয়ে সেরা লোক ব'লে এদের অভিহিত করা যায়; কারণ এরা তলোয়ার চালাতেও যেমন দক্ষ, কোদাল চালাতেও তেমনি দক্ষ। এস্থানটি বিশেষভাবে বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। তাসকুর্গান এরই একটা সহর। এই সহরটিতেও অনেক হিন্দু এসে তাদের ডেরা গেড়েছে। আমাদের দেশে যেমন কাবুলীরা এসে টাকা খাটিয়ে একটা প্রচণ্ড ব্যবসা গ'ড়ে তুলেছে, ওদেশেও তেমনি হিন্দুরা টাকা সুদে খাটাবার একটা প্রকাণ্ড ব্যবসা গ'ড়ে তুলেছে।

আফগানিস্থানের নদীগুলির ভিতরে কাবুলনদীই নানা দিক দিয়ে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। এরই পাশে পাশে একটা বিস্তীর্ণ মালভূম গ'ড়ে উঠেছে আফগানিস্থানে। এই মালভূমিতে যে সব প্রাচীন জাতি তাদের বাসস্থান গ'ড়ে তুলেছিল কাফিররা তাদেরই অন্যতম। খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতকের আগেও তারা ছিল এখানে এবং এখনও তারা জুড়ে' ব'সে আছে এই প্রদেশটা। প্রচলিত ধর্ম্মমতের ধার তারা ধারে না। সম্ভবতঃ তাদের নাম থেকেই অবিশ্বাসীদের 'কাফের' নামটার উৎপত্তি হয়েছে। হিন্দু কু'শর দুইধারে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গ'ড়ে তারা বাস করে। সভ্য জগতের সাম্‌নে তারা খুব কমই বার হয় এবং আফগানেরাও বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশটা তাদের হাতে ছেড়ে দিয়েই খুশী হ'য়ে আছে। কিন্তু তা হ'লেও এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, কাফিরস্থান আফগানিস্থানেরই একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ।

আফগানিস্থানের জাতিগুলির ভিতরে আবদালী, ঘিলজাই ও পাঠান এই তিনটি জাতিই প্রধান, যদিও অপ্রধান জাত আরো অনেকগুলো আছে। এই প্রধান জাতি কয়টিই অধিকার ক'রে ব'সে আছে কাবুল, কান্দাহার এবং গজনী। আফগানিস্থানের প্রধান সহরও এই তিনটি। যদিও এই সঙ্গে সঙ্গে জালালাবাদ ও বাল্‌খের নামও করা সঙ্গত। বাল্‌খ অত্যন্ত প্রাচীন সহর। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সহরের মতো এ সহরটি এখনো একেবারে ধ্বংস হ'য়ে যায়নি সত্য, কিন্তু ধ্বংসের চিহ্ন আজ এর সর্ব্বাঙ্গে সুপরিস্ফুট। এর জরা-জীর্ণ প্রাসাদ ও হর্ম্ম্যের ভিতর দিয়ে আজ কেবল অতীত গৌরবের আভাসটুকুই পাওয়া যায়।

আফগান কর্ম্মকার

গুপ্তচর

এই তিনটি প্রধান জাতির ভিতরে আবদালীরা দুরাণী নামে পরিচিত এবং তাদের সম্প্রদায়ের ভিতর থেকেই বর্ত্তমানে সিংহাসন অধিকার কর্‌বার রেওয়াজ চ'লে আসছে। তারা যে ভাষায় কথা বলে তার নাম

পোস্ত ভাষা, যদিও আফগানিস্থানের রাজভাষা পারশী। পোস্ত ভাষার উদ্ভব সংস্কৃত ভাষা হ'তে। পাঠানদের ভাষাও পোস্ত। সোলেমান পর্ব্বত এবং শাফদ-কোর পূর্ব্ব প্রান্তের পাহাড়গুলিতে এই পাঠানেরা ছড়িয়ে আছে। বস্তুতঃ আফগানেরা যে পোস্তভাষায় কথা বলে তার কারণ—তারা এসে ডেরা বেঁধেছিল সেই সব জাতির ভিতরে যারা পোস্তভাষায় কথা বলে। সুতরাং ভাষার দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে, পারস্য এবং তুরস্কের সঙ্গে যাদের জন্মের যোগ নেই তারা ছাড়া আর সব আফগানই পাঠান, যদিও নৃতত্ত্বের দিক থেকে সব পাঠানকে আফগান বলা যায় না। কিন্তু সে যাই হোক, দুরাণীরা বা আবদালীরাই আফগান জাতিগুলির ভিতরে বর্ত্তমানে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার ক'রে আছে এবং আহ্‌মদ শাহ্‌র পর হ'তে তারাই আফগানিস্থান শাসন ক'রে আস্‌ছে।

হিরাটের দৃশ্য

আফগানিস্থানের দু'চারটি রাস্তার উপরে এ যুগের সংস্কারের ছাপ যে পড়েছে তা অস্বীকার কর্‌বার যো নেই। কিন্তু অধিকাংশ রাস্তাই তার এখনো প্রায় তেমনি অবস্থাতেই আছে যেমন অবস্থায় ছিল তারা আলেকজান্দারের আক্রমণের সময়। গুটিকয়েক ভালো মোটর যাতায়াতের রাস্তা সম্প্রতি সেখানে তৈরী হয়েছে। তাছাড়া সৈন্যবাহিনীর চলাচলের সুবিধার জন্যও কয়েকটি রাস্তার উন্নতি হয়েছে ঢের। আফগানিস্থান হ'তে মালের দেওয়া নেওয়া হ'য়ে থাকে ঘোড়ায় বা উটের পিঠে চড়িয়ে। সুতরাং রাস্তা ভালো কর্‌বার দিকে খুব বেশী নজরও দেওয়া হয় না। পায়ে-হাঁটা রাস্তা সেখানে অসংখ্য, কিন্তু সারা বৎসর জুড়ে' যে পথ দিয়ে যাতায়াত করা যায় সে রকমের রাস্তা সেখানে খুব অল্পই আছে।

পূর্ব্বেই বলেছি, আফগানিস্থানকে ভারতের তোরণদ্বার বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষের উপরে লোভ পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলির চিরদিনই ছিল, এখনও আছে। এই দ্বারপথে বহু শত্রু ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে এবং তাকে বিধ্বস্ত করেছে। আফগানিস্থানের দিকে সতর্ক দৃষ্টি তাই দূর অতীতে ভারতে যাঁরা রাজত্ব করেছেন তাঁদেরও ছিল, আজ যাঁরা রাজত্ব কর্‌ছেন তাঁদেরও আছে। যে হিন্দুকুশের পর্ব্বতমালা আফগানিস্থানের মেরুদণ্ড, তারই প্রাচীর দিয়ে ভারতবর্ষও সুরক্ষিত। এশিয়ার উপরের দিক থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ ক'র্‌তে হ'লে এই প্রাচীর বাধা দেয়। তাই সে সব দেশের পক্ষে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করা খুব সহজ নয়। কিন্তু তা হ'লেও এই প্রাচীরের ভিতরে যে দুর্ব্বল স্থান আছে, অতীতের

ইতিহাসে তারও অজস্র পরিচয় ছড়িয়ে প'ড়ে আছে। এই দুর্ব্বল স্থানগুলি দিয়েই বহুবার বহিঃশত্রু ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে এবং তাদের বর্ব্বরতার ছাপ আজও ভারতবর্ষের বুক হ'তে মুছে' যায়নি।

হিন্দুকুশের গিরি-সঙ্কট অনেকগুলি আছে। যারা ভারতকে আক্রমণ করতে চেয়েছে তারা এই সব গিরি-সঙ্কটের কোনো একটাকে বেছে নিয়ে প্রথমে এসে প্রবেশ করেছে কাবুলে; তারপর সেখান থেকে আবার একটা গিরি-সঙ্কট বেছে নিয়ে প্রবেশ করেছে ভারতে। ভারত-প্রবেশের এই সব গিরি-সঙ্কটের ভিতরে খাইবার এবং খুরামের নামই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এই সব গিরিবর্ত্ম দিয়ে সীমান্ত প্রদেশ পেরিয়ে একেবারে সোজা এসে পৌছানো যায় সিন্ধুর উপত্যকা ভূমিতে। সেইজন্ত এই সব গিরিবর্ত্ম রক্ষা করবার জন্ত অতীত যুগে বহু দুর্গ গ'ড়ে উঠেছিল সঙ্কট স্থানগুলির শৈল-চূড়ায়। রাস্তায় রাস্তায় এই সব দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনো প'ড়ে আছে। পরবর্ত্তী সময়ে গজনী যখন আফগানিস্থানের রাজধানী হ'য়ে ছিল তখন আক্রমণের জন্ত সাধারণতঃ ব্যবহার করা হ'তো আর একটা পথ। সে পথটা আফগানিস্থানের দক্ষিণ সীমান্তের মাঝামাঝি জায়গায় গোমালের ভিতর দিয়ে। হিরাট হ'তে কান্দাহার পেরিয়ে পারস্ত সীমান্ত ধ'রেও ভারতে প্রবেশের

গজনীর রাজপথ

কাবুলের সওদাগরগণ

পথ আছে। কিন্তু সে পথ ষোড়শ শতকের আগে আর কখনো ভারত-আক্রমণকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়নি। সর্ব্বপ্রথমে পারস্য-দস্যু নাদির শাই সম্ভবতঃ সে পথের ব্যবহার করেছিলেন।

বর্ত্তমানে পারস্যের পূর্ব্বসীমান্ত ঘেঁসে যে পথ, তাকেই সুরক্ষিত করবার জন্য প্রত্যন্ত প্রদেশে বিশেষভাবে সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। কারণ উত্তরের পথগুলি অর্থাৎ হিন্দুকুশের গিরি-সঙ্কটগুলি সুরক্ষিত করা খুব কঠিন নয়। মাঝের পথটা দিয়েও বিপদের আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম। কারণ কান্দাহার এবং কাবুলের উপর পুরো আধিপত্য না থাকলে সে পথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ সম্ভব নয়। স্বাধীন আফগানিস্থান বাইরের কোনো শত্রুকে সে পথে ভারতে প্রবেশ কর্‌বার সুযোগ দিতে পারে না। কিন্তু কান্দাহার এবং কোয়েটার ভিতর দিয়ে যে পথ তা ঢের সহজ অধিগম্য। আর সেইজন্য দক্ষিণের এই পথটার দিকেই নজর একটু অতিরিক্ত রকমেই তীক্ষ্ণ করা হয়েছে।

আফ্রিদ যোদ্ধা

বোলান গিরি-সঙ্কট

আফগানিস্থান আজ পুরোপুরিভাবেই মুসলমান রাজ্য। কিন্তু সুদূর অতীতে এ রাজ্যটি ছিল হিন্দুদেরই

অধিকারে। তখন বর্ত্তমান আফগানিস্থানের বেশীর ভাগই ছিল ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত। তখন এর নাম ছিল সম্ভবতঃ গান্ধার। আমাদের কাছে এই গান্ধার নামটি অপরিচিত নয়। কারণ গান্ধারের মেয়ে গান্ধারী মহাভারতকারের লেখার ভিতর দিয়ে আজও সব হিন্দুর কাছে অমর হ'য়ে আছেন। আলেকজান্দার যখন আফগানিস্থান

বোলানে পণ্য-ক্রেতাগণ

কাবুলের দৃশ্য

জয় করেছিলেন তখনও সেখানকার বেশীর ভাগ লোকই ছিল হিন্দু। তারপর সম্রাট অশোকের সময় আফগানেরা গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্ম। সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সঙ্ যখন ভারত ভ্রমণে আসেন তখনও তিনি আফগানিস্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাই দেখতে পান। তারপর এলো মুসলমান ধর্ম্মের প্লাবন। সেই প্লাবনে আফগানিস্থান হ'তে হিন্দুরা ভেসে গিয়েছে এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুসলমানদের রাজত্ব। কিন্তু মুসলমান হ'লেও, আফগানেরা যে হিন্দুদেরই সগোত্র তাতে ভুল নেই।

আফগানিস্থানের দৃশ্য

বস্তুতঃ আফগানিস্থানকে ভারতবর্ষে প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ সমূহের একটা প্রকাণ্ড ভাণ্ডার বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। এর পাহাড়গুলোর গায়ে গায়ে ও সমতল ভূমিতে নানা স্থানে সেই সব চিহ্ন ছড়িয়ে প'ড়ে আছে। পথের দুর্গমতা এবং স্থানীয় লোকদের বর্ব্বর নৃশংসতা—এদিক দিয়ে তথ্যাবিষ্কারের পথে বাধা দিয়েছে ব'লেই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার আলো সেগুলোর উপরে এতদিনও পড়্‌তে পারে নি। যদি তা পারৃত তবে এ কথা নিসংশয়েই প্রমাণ হ'য়ে যেত যে, সেখানে কেবল গ্রীসীয় শাসনের ও বৌদ্ধযুগের সভ্যতার ভগ্নাবশেষই লুকিয়ে নেই, বৌদ্ধপূর্ব্ব হিন্দু-সভ্যতারও বহু নিদর্শন লুকিয়ে আছে। লাণ্ডিকোটালের কাছে বিরাট দুর্গ সমূহের ধ্বংসস্তূপ এখনও দেখা যায়। আলেক্‌জান্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখনও সেগুলি যে সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আলেক্‌জান্দার সোয়াট এবং কুনার উপত্যকার ভিতর দিয়ে তাঁর সৈন্য পরিচালনার পথ কেন বেছে নিয়েছিলেন, এ সম্বন্ধে আজ ঐতিহাসিকদের মনে প্রশ্ন জেগেছে। অনেকে মনে করেন যে, সম্ভবতঃ তার একটা কারণ ছিল এই দুর্গগুলিই। এই দুর্গের বাধা প্রতিহত ক'রে অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য ব'লেই তিনি ও-পথ বর্জ্জন করেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, আফগানিস্থানের ভিতরে যদি ভালোভাবে অনুসন্ধান করা যায় তবে এমন সব তথ্য আবিষ্কৃত হ'বে যা সমস্ত জগতকে বিস্মিত ক'রে দেবে। এতদিন সভ্যজগতের ধারণা ছিল—বৌদ্ধযুগ এবং ব্যাক্‌ট্রিয় যুগের সভ্যতার নিদর্শনগুলোই ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু সম্প্রতি যে সব প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার হ'য়েছে, তাতে সুমে-

সভ্যতার যে দীপ্তি ধরা পড়েছে তা ও-দুটো সভ্যতার দীপ্তিকেও ম্লান ক'রে দিয়েছে। তেমনি আফগানিস্থানেও যদি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চলে তবে তার ফলেও হিন্দু-সভ্যতার এমন সব নিদর্শন আবিষ্কৃত হবে যার জন্য ইতিহাস হয়তো আবার নতুন ক'রে লিখ্‌বার প্রয়োজন হ'য়ে পড়্‌বে। এ কথাটা যে অত্যুক্তি নয়, তার ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়েছে এর মধ্যেই। ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ এর মধ্যেই আফগানিস্থানে হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পকলার যে সব সন্ধান পেয়েছেন তার দাম প্রত্নতাত্ত্বিক জগতের কোনো আবিষ্কারের চেয়েই কম নয়।

ভারতবর্ষের মতোই এ দেশটিকেও পুনঃ পুনঃ বহু বহিঃশত্রুর হাতে মার খেতে হ'য়েছে। আর্য্য, তুর্কি, তাতার, গ্রীক, মোগল প্রভৃতি যে জাতই ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে তারা তাদের অত্যাচারের নিশানা এঁকে রেখে গিয়েছে এই আফগানিস্থানের বুকের উপরেও। এই ভাবেই খৃষ্টিয় শতাব্দী সুরু হবার বহু বৎসর পূর্ব্বে আফগানিস্থানের খানিকটে পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়েছিল। পারস্যের সম্রাট দারায়ুস হিরাট, কান্দাহার, কাবুল অধিকার করেছিলেন। তারপর খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩২০ সালে এলেন আলেক্‌জান্দার। তিনিও অঙ্কিত কর্‌লেন হিরাট ও কান্দাহারের উপরে তাঁর বিরাট বাহিনীর জয়-গৌরব। আলেক্‌জান্দারের পর সেখানে প্রতিষ্ঠিত হ'লো তাঁর সেনাপতি সেলুকাসের আধিপত্য। মৌর্য্যবংশের রাজা চন্দ্রগুপ্ত তাঁর হাত থেকে কাবুল উপত্যকা ছিনিয়ে নিলেন। তার পর থেকে পার্থিয়ান, সিথিয়ান, ইউ-চি প্রভৃতি নানা জাতির হাতে আফগানি-স্থান মার খেয়েছে! নানা হাত ঘুরে আফগানিস্থান এসে পড়েছিল অবশেষে কুশান রাজাদের হাতে। এই কুশানেরা দীর্ঘদিন আফগানিস্থানে রাজত্ব করেছিলেন। কেবল তাই নয়, ভারতবর্ষের অনেকখানি জায়গাও তাঁরা অধিকার-ভুক্ত ক'রে নিয়েছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বিদেশী পরিব্রাজক হিউয়েন সঙ, আল বরুণী প্রভৃতির গ্রন্থে এই কুশান রাজবংশের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু নবম শতাব্দীতে আবার আফগানিস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুরাজ্য। দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত কাবুল এই হিন্দু-রাজবংশের রাজাদের দ্বারাই শাসিত হয়েছে।

এর পরে আফগানিস্থানে আর কখনো হিন্দুরাজার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কিন্তু তা না হ'লেও ভারতবর্ষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ঐখানেই যে শেষ হ'য়েছে তাও নয়। সে সম্বন্ধের ভিতরে সময়ে সময়ে যেমন রক্তের কলঙ্কের ছাপও এসে পড়েছে, তেমনি মৈত্রী, প্রীতি ও একত্বের ছাপও পড়েছে। এর পরের প্রবন্ধে আফগানিস্থানের এই পরবর্ত্তী ইতিহাস নিয়েই আমি আলোচনা কর্‌তে চেষ্টা করব।

দুর্ব্বুদ্ধি

শ্রীরামদাস চট্টোপাধ্যায়

'হাঁ! তোমার lecture দেবার ক্ষমতা আছে!'

'ঠাট্টা নয়। এটা খুব খাঁটি কথা যে, সুর তাল লয়ে ভগবানকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ ক'রতে পারা যায়। আজকাল কতকগুলি অপরিণতবুদ্ধি কলাবিৎ গান-বাজনাকে ছেলে-খেলা মনে ক'রে, তার মধ্যেও fashion ঢুকিয়ে ফেলছে।'

'ক্ষতি কি?'

'যথেষ্ট ক্ষতি আছে। এ'তে মহা অনর্থ হ'তে পারে। পুরাকালে মুনি-ঋষিরা যে মন্ত্রোচ্চারণ ক'রতেন, সেই ধ্বনির সঙ্গে পরব্রহ্মের anatomyর অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল।'

* * * *

'ওহে! উদয়শঙ্করের নাচ দেখতে যাবে?'

'নিশ্চয়। তুমি যাবার সময় আমাকে ডেকে নিয়ে যেও।'

* * * *

'কেমন লাগল'?

'মন্দ নয়। তবে কি না—কাজটা ভাল হয় নাই।'

'তা'র অর্থ ?'

'এদেশে বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত, তুষারাচ্ছন্ন গিরিরাজ হিমালয়ের গম্ভীর মূর্ত্তি হ'তেই মহাদেবের রূপের কল্পনা করা হ'য়েছিল। এখানে ও-রকম ভাবে শিবতাণ্ডব নৃত্যের অভিনয় করা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই।'

* * * *

'ওহে! আজ এই পাড়ায় একটি সভা হবে। সেখানে অল্প-বিস্তর গান-বাজনাও হ'তে পারে। যাবে?'

'কোন আপত্তি নাই।'

* * * *

'কি হে! এখনি পালাচ্ছ' নাকি? এই ত' সবে একটি item হ'য়েছে।'

'এদের কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে? ছোট মেয়ে দুটির এমন সুন্দর গলা, এমন নাচ্‌বার ভঙ্গী—কিন্তু গান কি আর খুঁজে পেলে না?'

'কেন! এ গান ত' আজকাল সর্ব্বজনপ্রিয় হ'য়ে গেছে।'

'নিশ্চয় হয়েছে। যেমন আজকালকার সর্ব্বজন, আর তেমনি তা'দের প্রিয় গান। ব'লছি—এর পরিণাম বড়ই শোচনীয় হবে। এই সেদিন উদয়শঙ্করের শিবতাণ্ডব নৃত্য—আজ আবার—

"প্রলয় নাচন নাচ্‌লে যখন
আপন ভুলে
হে নটরাজ!
জটার বাঁধন প'ড়ল খুলে।"

* * * *

'কি হে! খবরের কাগজ প'ড়েছ?'

'এই দেখ!—বিহারে খণ্ড-প্রলয়। প্রকৃতির তিন মিনিটের প্রলয় নাচনে সহস্র সহস্র নর-নারীর জীবন নাশ। অশ্রুতপূর্ব্ব ধ্বংসলীলা। হ'ল ত'? ব'লেছিলাম—'

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী

গভীর রাতে হঠাৎ জেগে উঠে
দাঁড়াই যবে বাতায়নের কোণে,
তোমার কথা মনে প'ড়ে সখা
কি এক আবেশ ঘনায় আপন মনে।
মুখের ওপর বুকের ওপর দিয়ে
রাতের বাতাস লুটায় থাকি থাকি,
মনে হয় ঐ তুমিই বুঝি এলে
মরম মাঝে চরণ-খানি রাখি।
বাতাস তখন কাঁপায় গাছের পাতা,
কালো আকাশ মাথার ওপর রাজে,
আঁধার কোণে হঠাৎ যেন শুনি
কোমল তোমার চরণধ্বনি বাজে।
রাতের আঁধার মুখের 'পরে ভাসে,
দূরের আকাশ তারায় তারায় ভরা,
হঠাৎ ভাবি তুমিই বুঝি এসে
ছায়ার মাঝে আমায় দিলে ধরা।
সত্যি তুমি নেই ত কাছে জানি,
কিন্তু যখন তাকাই আকাশ পানে
দূরের তারায় তোমার চোখের আলো
সোনার স্মৃতি বহন করে আনে।
না জানি কোন্ ছায়াপথের পারে
মিশিয়ে আছে তোমার হরষ-ব্যথা,
বোবা আকাশ আছে কেবল চেয়ে,
আঁধার এসে ঘনায় চোখের পাতা।
বাদলরাতে যখন থেকে থেকে
তোমার খোঁজে আকাশ পানে চাব,
নিঠুর মেঘে তোমায় ঢাকে যদি
বাদলধারায় পরশ আবার পাব॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংস্করণ

অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ

১। কৃত্তিবাসের আবির্ভাব-কাল

বাঙ্গালা রামায়ণের আদি কবি কৃত্তিবাস কবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা লইয়া এতদিন নানারূপ বাদানুবাদ চলিতেছিল। বর্ত্তমান সনের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় জ্যোতির্ব্বেত্তা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় গণিয়া বলিয়াছেন ১৩২০ শকে ১৬ই মাঘ তারিখে (ইংরেজী ১৩৯৯ সন—পুরাতন পাঁজির ১২ই জানুয়ারী) রবিবার শ্রীপঞ্চমীতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গণনার একটু ইতিহাস আছে।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর ডি-লিট্ মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ বর্ত্তমানে একেবারে কাল-বারিত হইয়া পড়িলেও তৎকালে উহার প্রচারে বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের মধ্যে একটা প্রবল সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কারণ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস যতখানি আগাইয়াছিল, ডাঃ সেন মহাশয়ের গ্রন্থ সেই সীমা পার হইয়া বহু দূর চলিয়া আসিয়াছিল। সেন মহাশয়ের গ্রন্থেই বঙ্গ সাহিত্যের প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাসের স্বাদ বাঙ্গালী পাঠকগণ প্রথম প্রাপ্ত হয়। এক বছরের মধ্যেই দীনেশ বাবুর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়। দীনেশবাবু এই সময় অসুস্থ হইয়া পড়েন বলিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব হয়।

এই বিলম্ব কিন্তু অবিমিশ্র ক্ষতির কারণই হয় নাই, নানা দিকে লাভজনকও হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ দীনেশবাবুর পুস্তক প্রচারের ফলে প্রাচীন পুথির আবশ্যকতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনেকে নিজ নিজ পরিবারস্থ প্রাচীন পুথি দিয়া অথবা প্রাচীন পুথি হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইয়া দীনেশ-বাবুকে সহায়তা করিতে আরম্ভ করিলেন। বাঁকুড়া ও হুগলি জেলার সীমানায় বদনগঞ্জ বলিয়া একখানা গ্রাম আছে। এই গ্রামে এক নিঃসন্তান বৃদ্ধ কথক ও গায়ক ছিলেন। ইঁহার নিকটে হাতের লেখা অনেক প্রাচীন পুথি ছিল। তিনি ঐ পুথিগুলি ঐ বদনগঞ্জনিবাসী হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়কে দান করেন। ভক্তিনিধি মহাশয় সাহিত্যরসিক ছিলেন, মধ্যে মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। বৃদ্ধ কথকের পুথির মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের একখানা পুথি ছিল ;—এই পুথি-খানি কি মাত্র আদিকাণ্ডের পুথি অথবা সপ্তকাণ্ডাত্মক সমগ্র রামায়ণের পুথি তাহা জানা যায় নাই। এই পুথি-খানি না কি—১৪২৩ শকাব্দার (১৫০১ খ্রীষ্টাব্দের) নকল ছিল। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পুথি সংগ্রহের কার্য্যে হাত দিয়া ১৩১১, ১৩৮৩, ১৩৮৮, ১৪২৪ ইত্যাদি শকাব্দের সংস্কৃত পুথি পাইয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য বাঁকুড়া হইতে সংগৃহীত শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের পুথিতে তারিখ নাই সত্য, কিন্তু অক্ষর বিচার করিয়া ঐ পুথি যে অন্ততঃ ১৪০০ শকের কাছাকাছি বইয়ের নকল, ইহা অতি সহজেই দেখান যায়। হীরেন্দ্রবাবু যে পুথিখানা অবলম্বন করিয়া পরিষদের জন্য কৃত্তিবাসী উত্তরকাণ্ড সম্পাদন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই পুথি-খানিও ১৫০২ শকের। কাজেই ১৪২৩ শকাব্দের একখানা রামায়ণের পুথি পাওয়া যাইবে তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। ভক্তিনিধি মহাশয় এই পুথিখানিতেই অধুনা সুপরিচিত কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণ পাইয়া দীনেশবাবুকে উহা নকল করিয়া পাঠাইয়া দেন। এই আত্ম-বিবরণ দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হইয়া সাধারণ্যে পরিচিত হয়।

এই আত্ম-বিবরণেই আছে—

> আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
> তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

ইহা অবলম্বন করিয়া রায় মহাশয় গণনা আরম্ভ করেন। ১৩২০ সনের পরিষৎ পত্রিকায় তিনি যে গণনার ফল প্রকাশিত করেন তাহাতে দেখা যায়, ১২৫৯ শকে ৩০শে

মাঘ রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথি হইয়াছিল এবং ১৩৫৪ শকে ২৯ দিনে মাঘ মাস পূর্ণ হইয়াছিল এবং ঐদিনও রবিবার শ্রীপঞ্চমী ছিল। নানা প্রমাণে তখনকার মত ১৩৫৪ শকই (১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে) কৃত্তিবাসের জন্ম শক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

কিন্তু এই নির্দ্ধারণে সমস্ত সন্দেহ মিটিল না। প্রধান আপত্তি, আত্মবিবরণ পড়িয়া পরিষ্কার বুঝা যায়, যে গৌড়েশ্বরের সভায় বিদ্যা সমাপনান্তে কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই হিন্দু রাজ-সভা। উহাতে একটিও মুসলমান কর্ম্মচারীর বা মুসলমানী আচার ব্যবহারের উল্লেখ নাই। বাঙ্গলায় একমাত্র হিন্দু গৌড়েশ্বর রাজা গণেশ ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকে সমগ্র বাঙ্গলায় প্রবল ছিলেন। কাজেই রাজা গণেশের সভায় ২০ হইতে ৩০ বছর বয়সে কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়া থাকিলে তাঁহার জন্ম শক ১৩০৯।১০ হইতে ১৩১৯।২০ শক হওয়া আবশ্যক।

আর এক আপত্তি 'পূর্ণ' শব্দটিতে। প্রাচীন পুথি যাঁহারা ঘাঁটিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন, কোন কোন মাসকে 'পুণ্য' বিশেষণে বিশেষিত করা প্রাচীন সাহিত্যের প্রথা ছিল এবং 'পুণ্য' প্রাচীন পুথিতে সর্ব্বদা 'পুর্ন্ন' রূপে লিখিত হয়। কাজেই গণনায় সম্বল মাত্র আদিত্যবার এবং শ্রীপঞ্চমী।

আমার এই সকল আপত্তি রায় মহাশয়কে জানাইলে তিনি আবার গণিতে বসিলেন। এইবার তিনি গণিয়া বাহির করিয়াছেন, ১৩২০শকে রবিবার দিন শ্রীপঞ্চমী ও সরস্বতী পূজা হইয়াছিল। এই শকেই কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কাজেই, যখন কৃত্তিবাস ১৯।২০ বছরের নবযুবক, তখন তিনি বড় গঙ্গা অর্থাৎ মূল গঙ্গার (ভাগীরথীর নহে) তীরস্থ রাঢ় দেশীয় গুরুগৃহে বিদ্যা সমাপন করিয়া রাজ-পণ্ডিত হইবার আশায় গৌড়েশ্বরকে ভেটিতে চলিয়াছিলেন। রাজা গণেশ ১৩৩৯।৪০ শকে (১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে) এই প্রতিভাশালী ফুলিয়ার মুখটিকে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করিলেন।

২। কৃত্তিবাসের বংশ-পরিচয়

আত্মবিবরণে কৃত্তিবাসের নিম্নরূপ বংশ-পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে দনুজ নামে এক মহারাজা ছিলেন; মুখটি বংশের পূর্ব্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা মহারাজা দনুজের পাত্র ছিলেন। বঙ্গদেশে 'প্রমাদ' হওয়াতে অর্থাৎ পূর্ব্ব বঙ্গে মুসলমান আক্রমণ এবং দনুজ মহারাজের রাজ্য নষ্ট হওয়াতে নরসিংহ পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে চলিয়া আসিলেন এবং শান্তিপুরের অদূরবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করিলেন। এই গ্রামের দক্ষিণ এবং পশ্চিম ধার বেড়িয়া গঙ্গা প্রবাহিতা ছিল। নরসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর। গর্ভেশ্বরের পুত্র মুরারি, সূর্য্য ও গোবিন্দ। মুরারির সাত পুত্র—বনমালী তাহাদের অন্যতম। এই বনমালীর পুত্র কৃত্তিবাস—

> মাতার পতিব্রতা যশ জগতে বাখানি।
> ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
> সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
> ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস॥
> সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষে।
> শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী॥
> বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
> আর এক বহিন হৈল সতাই উদর॥
> মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
> ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী।

কাজেই দেখা যাইতেছে, কৃত্তিবাসের ছয় সহোদর ছিল—কৃত্তিবাসকে ধরিয়া সাত যথা—মৃত্যুঞ্জয়, শান্তি, মাধব, শ্রীধর, বলভদ্র, চতুর্ভুজ। অধিকন্তু সৎমাএর গর্ভজাতা এক ভগিনীও ছিল,—তাহার নাম আত্মবিবরণীতে নাই। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশে নামগুলি নিম্নরূপে পাওয়া যায়; যথা—

> কৃত্তিবাসা কবির্ধীমান্ সামাৎ শান্তি জনপ্রিয়ঃ॥
> মাধবঃ সাধুরেবাসীৎ মৃত্যুঞ্জয়ো জয়াশয়ঃ।
> বলো শ্রীকর্ঠকঃ শ্রীমান্ চতুর্ভুজ ইমে সুতাঃ॥

(শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্ত্তৃক মুদ্রিত মহাবংশ ৬৫ পৃঃ,—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহের 452A, 449A, এবং 2398A নং মহাবংশের হস্তলিখিত পুথি দ্বারা মুদ্রিত পাঠ সংশোধিত) উক্ত শ্লোকার্দ্ধ ও শ্লোকটি বাঙ্গালায় নিম্নরূপে অনূদিতব্য—

"(বনমালীর) এই সকল পুত্র ছিল, যথা কবি ও

ধীমান্ কৃত্তিবাস; শান্ত স্বভাবের জন্য জনপ্রিয় শান্তি; সাধু প্রকৃতির মাধব, (তর্কে) প্রতিপক্ষকে জয়েচ্ছু মৃত্যুঞ্জয়, এবং শ্রীমান্ বল (ভদ্র), শ্রীকণ্ঠ ও চতুর্ভুজ।

আত্মবিবরণ ও মহাবংশ মিলাইলে দেখা যাইবে যে আত্মবিবরণে যাহাকে শ্রীধর বলা হইয়াছে—মহাবংশে তাহাকেই শ্রীকণ্ঠ বলা হইয়াছে।

ধ্রুবানন্দ মিশ্র ১৪০৭ শকে মহাবংশ রচনা করেন বলিয়া খ্যাত হয়। দেবীবর ঘটক ১৪০২ শকে রাঢ়ীয় কুলীন সমাজে যখন মেলবন্ধনের সৃষ্টি করেন, তখন কৃত্তিবাসের ভ্রাতা মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র মালাধরকে লইয়া মালাধর খানী মেল প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—এই ব্যাপার হইতেও কৃত্তিবাসের সময়ের বেশ একটা ধারণা পাওয়া যায়।

মহাবংশের সহিত আত্মবিবরণের কৃত্তিবাস সহোদরগণের তালিকার এই চমৎকার ঐক্য দেখিয়া আত্মবিবরণটি যে অকৃত্রিম, এই ধারণাই হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আত্মবিবরণ যুক্ত এই সুপ্রাচীন রামায়ণের পুথিখানি ভক্তিনিধি মহাশয় কোন দিন কাহাকেও দেখান নাই। তাই, এই আত্মবিবরণ এবং তাহার পুথিখানি সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় এক পত্রে (তারিখ-৩১শে শ্রাবণ ১৩৩৯) আমাকে লিখিয়াছেন—

"হারাধন দত্ত মহাশয়ের নিকট কৃত্তিবাসী একখানি অতি জীর্ণ পুথি আছে শুনিয়া আমরা পরিষদ হইতে ঐ পুথি সংগ্রহের বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিলাম, হারাধন বাবুর সহিত মৌখিক কথাও হইয়াছিল। তিনি দিবেন দিবেন বলিতেন, কিন্তু কখনও (বহু অনুরোধ সত্ত্বেও) ঐ পুথি আমাদিগকে দেখান নাই। তাঁহার আচরণে অবশেষে আমার এই ধারণা হইয়াছিল যে পুথির সংবাদ অলীক।"

বহুবিদ্যাবিৎ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ও একবার এই পুথিখানির খোঁজ করিয়াছিলেন,—ফলাফল তাঁহার ভাষাতেই বলি—

"বদনগঞ্জে (হারাধন দত্ত) ভক্তিবিনোদের (sic সংশোধ্য) বাড়ীতে পুথিখানি দেখিতে এক বন্ধুকে অনুরোধ করি। তিনি নিজে বদনগঞ্জ যাইতে পারেন নাই। অপর এক ব্যক্তি দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়া জানাইয়াছেন·····৺হারাধন দত্ত ঐ সকল পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসীকে বিক্রয় করেন। * * কিন্তু একগ্রন্থ করিয়া নকল তাঁহার বাটীতে আছে।" সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা—১৩.৮, ২৩ পৃঃ।

ফিরিয়া আর একবার যখন ভক্তিনিধি মহাশয়ের বাড়ীতে ঐ নকলের জন্য অনুসন্ধান করা হয় তখন একটুকরা কাগজও তাঁহার বাড়ীতে পাওয়া যায় নাই।

এই পুথিখানির জন্য আমি নিজে বহু অনুসন্ধান করিয়াছি। ভক্তিনিধি মহাশয় যে নগেন্দ্রবালা দাসীকে নিজের পুথিগুলি বিক্রয় করিয়াছিলেন তিনি মুস্তফি পরিবারের বধূ ছিলেন এবং নগেন্দ্রবালা সরস্বতী নামে বঙ্গসাহিত্যে কিঞ্চিৎ কবি-খ্যাতিও লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর স্বামীর নাম ছিল নগেন্দ্রনাথ মুস্তফি। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, ইনি সাবরেজিষ্ট্রারের কার্য্য করিতেন। ইনি যখন ডায়মণ্ড হারবারে ছিলেন তখন ১৩১৩ সনের বৈশাখ মাসে নগেন্দ্রবালা আত্মহত্যা করিয়া পরলোকগত হন। তাঁহার সংগৃহীত পুথিগুলির কি হইল, তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে কেহই আমাকে সেই খোঁজ দিতে পারেন নাই।

এই অমূল্য পুথিখানি স-নকল এইরূপ শোচনীয় রূপে অদৃশ্য হওয়ায় আত্মবিবরণটি পরখ করিয়া লইবার আর কোন উপায় নাই। সৌভাগ্যক্রমে মহাবংশের সমর্থন ছাড়াও অন্য প্রমাণও মিলিয়াছে, যাহার বলে আত্মবিবরণটি অকৃত্রিম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহের কয়েকখানি রামায়ণের পুথিতে আত্মবিবরণের অনুরূপ রচনা পাওয়া গিয়াছে, যথা—

১। পরিষদের ১২নং রামায়ণের আদিকাণ্ডের অসম্পূর্ণ পুথি। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় কর্ত্তৃক দীঘাপতিয়ার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম হইতে সংগৃহীত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে উপহৃত। আরম্ভে বিবিধ বন্দনার পরেই কৃত্তিবাস বন্দনা আছে—

পিতা বনমালি মাতা মেনকার উদরে।
জর্ম্ম লভিলা কির্ত্তিবাস ছয় সহোদরে॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর।
নিত্যানন্দ কির্ত্তিবাস ছয় সহোদর॥

পঞ্চ ভাই পণ্ডিত কিৰ্ত্তিবাস গুণসালি।
অনেক শাস্ত্র পড়্যা রচে শ্রীরাম পাঁচালি॥
সুনিতে অমৃত ধার লোকেত প্রকাশ।
ফুলিয়াতে বৈসেন পণ্ডিত কিৰ্ত্তিবাস॥

২। পরিষদের ১২৪ নং উত্তরকাণ্ডের খণ্ডিত পুথি, প্রাপ্তিস্থান অজ্ঞাত—

কিত্তিবাস পণ্ডিত বন্দ্যো মুরারি ওঝার নাতি।
জার কণ্ঠে কেলি করেন দেবি সরস্বতী॥
মুখুটি বংষে জন্ম ওঝার জগত বিদিত।
ফুলিয়া সমাজে কিৰ্ত্তিবাষ যে পণ্ডিত॥
পিতা বনমালি মাতা মাণিকি উদরে।
জনম লভিলা ওঝা ছয় সহোদরে॥
ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিন্দা পার।
জথা তথা কর্‌্যা বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার॥
বাল্মিকি হইতে হৈল রামায়ণ প্রকাশ।
লোক বুঝাইতে করিল পণ্ডিত কিৰ্ত্তিবাষ॥

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭১৭নং অযোধ্যা কাণ্ডের খণ্ডিত পুথি—

"রাড় দেশ ফুলিয়া জার নাম।
মুখটি বংশেতে জর্ম্ম অতি অনুপাম॥
বাপ বনমালি মা মানকির উদরে।
ছয় ভুঞা জন্মিলেন ছয় সহোদরে॥
ছোটর বন্দো বড়র বন্দো বড় গঙ্গার পার।
জথা তথা করিয়া বেড়ান বির্দ্যার উদ্ধার॥
রাড়া মধে বন্দিপু আচার্য্য চূড়ামণি।
জার ঠাই কিৰ্ত্তিবাস পড়িলা আপুনি॥

৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের K 484নং পুথি। কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ড। ময়মনসিংহ জেলায় সংগৃহীত। মুক্তাগাছার জমীদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী কর্ত্তৃক অন্যান্য প্রায় পাঁচশত পুথির সহিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপহৃত।

চতুর্দ্দিগ ভাগ জানি ফুলিয়া নগরী।
উত্তর দক্ষিণ চাপি বহে সুরেশ্বরী॥
মুকুটী বংশে জন্ম সংসারে বিদীত।
তথা এ উপজিল কিৰ্ত্তিবাস পণ্ডীত॥
বাপ বনমালী মাও মালীকা উদরে।
জন্ম লভিল পণ্ডীত ছয় সহোদরে॥
মাও মালিকা জার বাপ বনমালী।
সহোদর ছয়জন সর্ব্বগুণে জানি॥
সরস কবিতা বাক্য লোকেত প্রকাশ।
ফুলি এ্যা নগরে বাশ হেন কীৰ্ত্তিবাশ॥
কিৰ্ত্তিবাশ পণ্ডিতের কণ্ঠে স্বরস্বতী।
ধ্যান করি বণী দেখে শভার আরতি॥

পরিষদের প্রথম পুথিখানি কৃত্তিবাসের ছয় সহোদরের নাম পর্য্যন্ত করিয়াছে—যদিও নামগুলিতে নানা বিকৃতি ও ভুল প্রবেশ করিয়াছে। এই পুথিগুলির একখানিও সওয়াশত দেড়শত বছরের বেশী পুরাতন নহে—তথাপি এইগুলিতে পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসের পিতামাতার নাম, সহোদরগণের নাম ও সংখ্যা মনে রাখিবার প্রয়াস দেখিয়া মনে হয়, বদনগঞ্জের পুথি ও উহার মধ্যে পাওয়া কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ অলীক নহে। আবার হয় ত একখানি সুপ্রাচীন পুথি হইতে এই আত্মবিবরণটি সম্পূর্ণ পাওয়া যাইবে।

৩। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংস্করণ

১৩৪০ শকাব্দ অথবা ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত অন্য কোন পুথিই যে এই রামায়ণ অপেক্ষা জনপ্রিয় হইতে পারে নাই, ইহা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়। দেখিতে দেখিতে এই মনোহর রামকথার প্রতিলিপি অনুলিপি সারা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল—আসামের সীমা হইতে উড়িষ্যার সীমা পর্য্যন্ত, চাটগাঁ হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসের রামায়ণ পঠিত হইতে লাগিল। পাঁচালী গায়কগণ দেশময় কৃত্তিবাসের রামায়ণ গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। পুথি সংগ্রহে হাত দিয়া দেখা যায়, কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু কৃত্তিবাসের পরে আরও কয়েকজন শক্তিশালী রামায়ণ রচয়িতা বাঙ্গালাদেশে আবির্ভূত হ'ন, তাঁহাদের রামায়ণও বাঙ্গালাদেশে চলিতে থাকে। গায়েনগণ গাহিবার সময় কৃত্তিবাসের ভণিতায়ই গাহিতেন বটে, কিন্তু অন্য রচয়িতার রামায়ণের রসাল অংশ হইতেও অংশ বিশেষ গাহিয়া

সভা জমাইতে চেষ্টা করিতেন। ফলে, যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই কৃত্তিবাসী পুথিগুলিতে মিশ্রণ প্রবেশ করিতে লাগিল।

এই প্রক্ষেপের প্রধান উপকরণ জোগাইয়াছিলেন পাবনা জেলার অমৃতকুণ্ডা নিবাসী নিত্যানন্দ। ইহাঁর উপাধি ছিল অদ্ভুতাচার্য্য। ইহাঁর রচিত রামায়ণ অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ বলিয়া খ্যাত। বর্ত্তমান সিরাজগঞ্জ-ঈশ্বরদি রেল লাইন এই অমৃতকুণ্ডা গ্রামের উপর দিয়া গিয়াছে এবং উহার উপরস্থ চাটমোহর ষ্টেশনটি অমৃতকুণ্ডা গ্রামেরই অন্তর্গত। প্রকৃত চাটমোহর এই স্থানের প্রায় তিন মাইল উত্তরে।

অদ্ভুতাচার্য্যের আবির্ভাবকাল আজিও স্থির হয় নাই। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদে ১১৫১ সনের নকল অদ্ভুতের রামায়ণের একখানি পুথি আছে। অদ্ভুত নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন। তবে কত প্রাচীন, তাহা স্থির করিতে হইলে আরও অনুসন্ধান দরকার। সম্ভবতঃ অদ্ভুত কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী কবি, কিন্তু এই বিষয়েও জোর করিয়া কিছু বলা চলে না। অদ্ভুতের রামায়ণে এমন কোন পরিচয় কোথাও নাই, যাহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে অদ্ভুত কৃত্তিবাসের রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন। অদ্ভুতের রামায়ণ হইতে বহু মনোরম উপাখ্যান যে কৃত্তিবাসে আসিয়া ঢুকিয়াছে, তাহা প্রমাণ করা কঠিন নহে।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনরিগণ রামায়ণ মুদ্রিত করিলেন। বাঙ্গালীরা এই মুদ্রিত রামায়ণ লুফিয়া লইল। ঘরে ঘরে উহা পঠিত হইতে লাগিল—অল্পকালের মধ্যেই উহা ফিরিয়া ফিরিয়া মুদ্রিত হইতে লাগিল। সেই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রিত রামায়ণ এবং বর্ত্তমানে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া পরিচিত শোভন সংস্করণগুলির যে কোন সংস্করণ মিলাইয়া দেখুন,—আজ সওয়া শত বৎসর ধরিয়া আমরা বাঙ্গালাদেশে মূলতঃ সেই শ্রীরামপুরী সংস্করণের রামায়ণই পাঠ করিয়া আসিতেছি, এখানে সেখানে দুই চারিটা শব্দমাত্র বদলাইয়া লইয়াছি।

মিশনরীগণ যখন রামায়ণ ছাপিয়াছিলেন, তখন বিভিন্ন পুথি মিলাইয়া খাঁটি কৃত্তিবাস উদ্ধারের চেষ্টা তাঁহারা নিশ্চয়ই করেন নাই। তাঁহারা কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে পুথি সম্মুখে পাইয়াছিলেন, ভাষা ও বর্ণবিন্যাস কিঞ্চিৎ মাজিয়া ঘষিয়া অবিকল তাহাই ছাপিয়া দিয়াছিলেন। ১৩০০ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠায় হাতের লেখা পুথির দিকে লোকের নজর পড়িল। প্রথম বৎসরের পরিষদ পত্রিকায় "কৃত্তিবাস" প্রবন্ধে (১৩০১ সন, ৬৫ পৃঃ) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় শ্রীরামপুরী মুদ্রিত পুস্তক এবং হাতের লেখা কৃত্তিবাসী পুথি আলোচনা করিয়া দেখাইলেন যে উভয়ের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ বর্ত্তমান। ১৩০২ সনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ উদ্ধারের জন্য পরিষৎ "কৃত্তিবাস রামায়ণ সমিতি" গঠিত করিলেন—হীরেন্দ্রবাবু উহার সম্পাদক হইলেন। ১৩০৭ সনে ইহাঁদের চেষ্টায় এবং হীরেন্দ্রবাবুর সম্পাদনে কয়েকখানি পুথি লইয়া কৃত্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ড প্রকাশিত হইল। ভূমিকায় হীরেন্দ্রবাবু মন্তব্য করিতে বাধ্য হইলেন—

"পুথি ও মুদ্রিত পুস্তকের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, অধুনা প্রচলিত বটতলার রামায়ণের আদর্শস্থানীয় শ্রীরামপুরী রামায়ণ বিশ্বাসযোগ্য পুথি হইতে সংগৃহীত নহে। অতএব প্রচলিত সংস্করণের গোড়ায়ই গলদ রহিয়াছে। অনেক প্রাচীন পুথি ও পুস্তকের মেলন করিয়া শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে।"—"এখন বটতলায় যাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া বিক্রয় হয়, মূল কৃত্তিবাসী হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

…কৃত্তিবাসী খাঁটী রামায়ণে বহুল পরিমাণে আধুনিকতার আবরণ, সংস্কৃতের প্রলেপ, প্রক্ষিপ্তের উৎপাত, পাঠান্তরের সমাবেশ, অপ-পাঠের বাহুল্য, এবং অঙ্গবৈকল্য ও অবয়বহানির সংস্পর্শ ঘটিয়াছে। পরে এই বিষয়ে আরও আলোচনার ফলে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে প্রচলিত রামায়ণে এমন কোন এক পংক্তি বিরল, যাহাতে কিছু না কিছু রূপান্তর ঘটে নাই।"

ইহার পরে হীরেন্দ্রবাবুর সম্পাদনে ১৩১০ সনে উত্তর কাণ্ড প্রকাশিত হয়। তাহার পরে দীর্ঘ ৩০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় সহস্রাধিক কৃত্তিবাসী পুথি সংগৃহীত হইয়াছে—কিন্তু এই বিষম পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে আর কেহ আত্মনিয়োগ করিতে অগ্রসর হ'ন নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আজন্মের আকাঙ্ক্ষা খাঁটী কৃত্তিবাসের উদ্ধারসাধন আকাঙ্ক্ষাই রহিয়া গিয়াছে।

হীরেন্দ্রবাবু বাজার-চলতি কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্বন্ধে যে এত কড়া কড়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন, তাহার সত্যই কি কোন কারণ আছে? বিস্তৃত উত্তর দিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। এখানে শুধু আদিকাণ্ড হইতে সামান্য কয়েকটা উদাহরণ দেখাইব।

কৃত্তিবাস মহা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন—রাজা যখন তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ দিলেন, তখন মূলতঃ তিনি বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহা ধরিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত। বাল্মীকির রামায়ণের আদিকাণ্ডের বিষয়-বিন্যাস নিম্নরূপ।—

১ম সর্গ। বাল্মীকি মহামুনি নারদকে প্রশ্ন করিলেন —সংসারে সর্ব্বগুণশালী আদর্শ পুরুষ কে আছে? উত্তরে নারদ রামের নাম বলিলেন এবং সংক্ষেপে তাঁহার ইতিহাস শুনাইলেন;

২য় সর্গ। বাল্মীকির তমসা তীরে গমন। ব্যাধ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চ বধ। ক্রৌঞ্চশোকে বাল্মীকির মুখে শ্লোকের উৎপত্তি। ব্রহ্মার আগমন এবং ঐ শ্লোকচ্ছন্দে রামচরিত্র বর্ণনার আদেশ।

৩য় সর্গ। বাল্মীকির যোগাসনে বসিয়া ধ্যানযোগে রামের সমস্ত ইতিহাস প্রত্যক্ষীকরণ এবং বর্ণনা। রামায়ণের অনুক্রমণি।

৪র্থ সর্গ। কুশীলবকে রামায়ণ শিক্ষা দান। তপোবনে কুশীলবের রামায়ণ গান ও শ্রবণে মুনিগণের সন্তোষ। অযোধ্যানগরে যাইয়া কুশীলবের রামায়ণ গান। রামের আজ্ঞায় রামের সভায় রামায়ণ গান—তাহাই পরবর্ত্তী রাবণ বধ বা রামায়ণ কাব্য।

৫ম সর্গ। কোশল রাজ্য ও রাজধানী অযোধ্যার বর্ণন।

৬ষ্ঠ সর্গ। অযোধ্যার রাজা দশরথের বর্ণন।

৭ম সর্গ। দশরথের অমাত্যবর্গের বর্ণনা ইত্যাদি।

এই স্থানে বলিয়া রাখা দরকার, অনুরূপ আরম্ভযুক্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণের কয়েকখানি সুপ্রাচীন আদিকাণ্ডই পাওয়া গিয়াছে। এখন তুলনায় সুবিধার জন্য বাজার-চলতি কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিষয়-বিন্যাসও জানা দরকার। উহা নিম্নরূপ।

১। নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ।

২। রাম নামে রত্নাকরের পাপক্ষয়।

৩। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রত্নাকরের বাল্মীকি নামকরণ ও রামায়ণ রচনে বরদান।

৪। নারদ কর্ত্তৃক বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনায় আভাস প্রদান।

৫। চন্দ্রবংশের উপাখ্যান।

৬। মান্ধাতার উপাখ্যান।

৭। সূর্য্যবংশ ধ্বংস এবং হরিতের জন্ম ও রাজ্যাভিষেক।

৮। রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান।

অতঃপর ৯ হইতে ১৮ প্রসঙ্গে সগরবংশের কথা ও গঙ্গাবতরণ কাহিনী।

কৌতূহলী পাঠক যদি একটু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই বিষয়-তালিকার সহিত বাল্মীকির রামায়ণের বিষয়-তালিকা মিলাইয়া দেখেন তবে দেখিতে পাইবেন যে চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশের কাহিনী আছে আদিকাণ্ডের শেষের দিকে,—রামের বিবাহসভায় যেখানে বরপক্ষ কন্যাপক্ষ পরস্পরকে নিজ নিজ কুলের কাহিনী বলিয়াছেন। আর, বিশ্বামিত্রের নিজের আশ্রমে যজ্ঞরক্ষা ও রাক্ষস-বধান্তে রামলক্ষ্মণকে লইয়া যখন বিশ্বামিত্র মিথিলায় চলিয়াছেন তখন শোণনদ পার হইয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া তিনি রামলক্ষ্মণকে গঙ্গাবতরণ কাহিনী শুনাইয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণে রামের বিবাহসভায় মাতৃউদ্ধার প্রীত জনক পুরোহিত অহল্যাপুত্র শতানন্দ সমবেত জনমণ্ডলীকে বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠের বিবাদমূলক কয়েকটি কাহিনী শুনাইয়াছেন—এই মনোহর কাহিনীগুলি বাজার-চলতি রামায়ণে, তথা উহার মূল শ্রীরামপুরী রামায়ণে একেবারেই বাদ পড়িয়াছে। কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডের সুপ্রাচীন ও বিশ্বাসযোগ্য পুথিগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, ঐগুলির বিষয়-বিন্যাস বাল্মীকির অনুরূপ; গঙ্গাবতরণ,

সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ—বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠের বিবাদ ইত্যাদি কাহিনী উহাতে যথাস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে। তখন এই সিদ্ধান্তই কি করিতে হয় না—যে "বটতলার রামায়ণের আদর্শস্থানীয় শ্রীরামপুরী রামায়ণ বিশ্বাসযোগ্য পুথি হইতে সংগৃহীত নহে। অতএব প্রচলিত সংস্করণের গোড়ায়ই গলদ রহিয়াছে?"

প্রচলিত সংস্করণের গোড়াতেই যে নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ শীর্ষক এক বাল্মীকি বহির্ভূত আজগুবী প্রসঙ্গ রহিয়াছে, উহা কোন প্রাচীন কৃত্তিবাসী পুথিতে পাওয়া যায় না। পূর্ববঙ্গের কোন কৃত্তিবাসী পুথিতে উহা নাই। এই প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গীয় কয়েকখানি আধুনিক পুথিতে মাত্র পাওয়া যায়। উহা যে মূল কৃত্তিবাসে ছিল না, ইহা জোর করিয়াই বলা যায়।

রত্নাকরের কাহিনীটি সম্বন্ধেও গুরুতর সন্দেহ আছে। উহা বাল্মীকিতে নাই, সকলেই জানেন। উহার মূল অধ্যাত্ম রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়। রাম প্রয়াগে ভরদ্বাজ আশ্রম হইয়া ভেলা-যোগে যমুনা পার হইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে বাল্মীকির আশ্রমে উপনীত হইলেন। বাল্মীকি রামকে নানারূপ দার্শনিক স্তুতি করিলেন। পরে বলিলেন—"রামহে, তোমার নাম-মাহাত্ম্য কোন্ ব্যক্তি কিরূপে বর্ণন করিবে? আমি সেই নামের প্রভাবে ব্রহ্মর্ষি হইয়াছি।" এই বলিয়া তিনি নিজের পূর্ব্ব জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। তিনি জন্মিয়াছিলেন ব্রাহ্মণকুলে, কিন্তু শূদ্রা বিবাহ করিয়া শূদ্রাচারেই রত ছিলেন। ঐ শূদ্রার গর্ভে অনেকগুলি পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহাদের ভরণপোষণের জন্য মুনি দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিলেন। (মুনির নাম যে এই সময়ে রত্নাকর ছিল, এমন কথা অধ্যাত্ম রামায়ণে নাই। নামটি এক এক পুথিতে এক এক রকম পাওয়া যায়)। একদিন মুনিদস্যু সাতজন ঋষিকে আক্রমণ করায়—পাপের ভাগী পরিজনবর্গ হইবে কি না জানিতে ঋষিগণ তাহাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। কেহ হইবে না জানিয়া মুনিদস্যুর নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। ঋষিগণ তাহাকে রাম নাম উল্টাইয়া ম—রা মন্ত্র জপ করিতে বলিলেন। (কেন নাম উল্টান হইল, তাহার কোন ব্যাখ্যা অর্থাৎ পাপে জিহ্বা জড় হইবার কথা অধ্যাত্ম রামায়ণে নাই। ম—রা দেখিয়া সন্দেহ হয়, গল্পটির উৎপত্তি পূর্ব্ববঙ্গে)। দস্যুমুনি ম—রা জপিতে লাগিলেন—বল্মীক স্তূপে তাহার দেহ ঢাকিয়া গেল। সহস্র যুগ পরে ঐ সপ্তঋষি মুনিদস্যুকে বল্মীক স্তূপ হইতে বাহির করিয়া নাম দিলেন বাল্মীকি।

বাল্মীকি নামের এই সঙ্গত ব্যাখ্যা দেখিয়া মনে হয়, গল্পটি একেবারে অসার নহে। কিন্তু রাম নাম উল্টাইয়া মরা জপের বিধানে নানা সন্দেহ মনে জাগে। যাহা হউক গল্পটি অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ হইতে কৃত্তিবাসী পুথিগুলিতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ আছে। খাঁটি কৃত্তিবাসী কয়েকখানি পুথিতে বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনী মোটেই নাই।

বাজার-চল্‌তি রামায়ণের যখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, তখন খাঁটী কৃত্তিবাস উদ্ধারের চেষ্টা করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা আর বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলে। বিভিন্ন সংগ্রহে কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথিগুলির এক বিশেষত্ব লক্ষ্যের যোগ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে ৪১৯খানা কৃত্তিবাসী পুথি আছে—কিন্তু প্রায় সমস্তগুলিই বিভিন্ন কাণ্ডের পুথি। কচিৎ দুই তিন কাণ্ডে একত্রও আছে,—কিন্তু সমগ্র সপ্তকাণ্ডের পুথি একখানাও নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহও (মোট কৃত্তিবাসী পুথির সংখ্যা ১৬২) তদ্রূপ,—মাত্র কিছুদিন হয় ত্রিপুরা হইতে ১২১৮ সালের একখানা সপ্তকাণ্ডে সম্পূর্ণ পুথি উহাতে উপহার আসিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহেও সপ্তকাণ্ডে সম্পূর্ণ একখানিও কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি নাই। এই অবস্থায় একদিন দৈবাৎ একখানি সপ্তকাণ্ডে সম্পূর্ণ ১৫৭৫ শকাব্দ=১০৫৫ সনের নকল কৃত্তিবাসী রামায়ণ আমার হস্তগত হইল। পরে বিশেষ পরীক্ষায় বুঝিয়াছি,—এই সুপ্রাচীন পুথিখানিও দোষমুক্ত নহে,—কিন্তু এই পুথিখানি পাইয়াই খাঁটী কৃত্তিবাস উদ্ধার করিতে পারিব বলিয়া আমার মনে ভরসা জাগে। প্রথমে সর্ব্বসাধারণের জন্য জনপ্রিয় সংস্করণ করিব বলিয়াই কাজে হাত দিয়াছিলাম—কিন্তু ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইত্যাদি বন্ধুবর্গের পরামর্শে ও অনুরোধে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভারার্পণ সূত্রে বর্ত্তমানে যথাসম্ভব মূল কৃত্তিবাসের উদ্ধারেই দুই বছরের বেশী দিন ধরিয়া পরিশ্রম করিতেছি। আদিকাণ্ড সভূমিকা সম্পাদিত হইয়া প্রায় বছরেক হয় পড়িয়া আছে,—পরিষদ উহা মুদ্রণের কোন উদ্যম করিতেছেন না। সুন্দরকাণ্ডও শেষ হইয়াছে, বর্ত্তমানে উত্তরকাণ্ডের সম্পাদন চলিতেছে। কতদিনে যে এই বিষম পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য শেষ করিতে পারিব, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই।

রোগ-শয্যায়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

১

রাঙা রবির উদয় দেখে
আনন্দে মোর মন মাতে,
ইচ্ছা করে নূতন দেশে
নূতন হয়ে জন্মাতে।
পৌষের নিশির শিশির চাপে
মুমূর্ষ এই কমল কাঁপে,
আবার যে চায় হাসতে যে হায়
প্রভাত-কিরণ-সম্পাতে।

২

পীড়ায় যখন অবশ তনু
ফুরায় যখন আনন্দ,
মৃত্যু যে অমৃত বিলায়
নয় কো মোটেই তা মন্দ।
রুগ্ন শরীর নয়ন নীরে
শাবক হতে চায় রে ফিরে,
মায়ের আনন সে চায় শুধু
চায়না গোটা কানন ত।

৩

ঝঞ্ঝাহত ভগ্নতরু
যায় যে যেতে জাফ্‌রীতে,
শিথিল ফুলের কোরক হবার
আকাঙ্ক্ষা সব পাঁপড়িতে।
মুক্তা যে আর বারে বারে
তারের বাঁধন সইতে নারে,
সে চায় যেতে শুক্তি-কোলে
সাগর-তলে ঝাঁপ দিতে।

৪

ভিড়ের মাঝে হারায় যে মুখ
পাই খুঁজে আর কৈ তারে,
মন-মাঝি আর বাইতে নারে,
বলে' নে এই বৈঠা রে।
তুফানের এই ভাসান্ ভেলা,
সাঙ্গ করে আলোর খেলা
অন্ধকারে ফিরছে খুঁজে
বাঁধা ঘাটের পৈঠা রে।

৫

হেথায় থাকুক ফুলের বাগান,
সাজানো এই ঘর বাড়ী,
চলুক ফুলের মরশুমে ভাই
নবীনতার দরবারই।
তুইরে প্রাচীন, তুই যে একা,
তোর কি হেথায় মানায় থাকা,
নূতন খেলা পাত্‌বি রে চল
নূতন মায়ার কারবারী।

৬

পুরবীতে ললিত মিশে
বাজে যখন ভুল বীণা;
বিশ্ব যখন নিঃস্ব লাগে
সেথায় থাকা চলবেনা।
সাহসহারা দুর্ব্বল ভাই
কোথায় আবার মিলবে রে ঠাঁই?
নূতন দেশে নূতন ঘরে
মায়ের স্নেহের কোল বিনা?

৭

ঝাপ্‌সা লাগা সজল আঁখি
নূতন কাজল মাগ্‌ছে রে।
বুভুক্ষিত তপ্ত হিয়ায়
শুষ্ক তৃষা জাগ্‌ছে রে।
হতাদরের পরাণ যে ফের
চাইছে সোহাগ মা-মাসিদের;
অনাগতের অমৃত ঢেউ
অধর-কোণায় লাগছে রে।

বেলিন ও পট্সড্যাম্

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল ন'টায় প্যারী ছেড়ে জার্ম্মাণ রাজধানী বের্লিন-মুখো রওনা হোলাম। ট্রেণখানি খুব দ্রুতগামী। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণী ছাড়া অন্য কোন গাড়ী ছিল না। ইয়োরোপের দ্বিতীয় শ্রেণীতে আর আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনেকখানি পার্থক্য আছে। আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাত্রীর স্বল্পতা হেতু হোক বা পরাধীন মনোবৃত্তির জন্য হোক দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীরা যাবতীয় মালপত্র নিজের কামরার মধ্যেই ঠেসে নিয়ে চলেন। এমন লোকের সঙ্গে প্রায় হাঁটু ঠেকে। প্রতি বেঞ্চে চারজনের বোসবার জায়গা। বোসবার জায়গার মাথায় ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া আছে; এবং জায়গাগুলি এমন ভাবে নির্দ্দিষ্ট করা আছে যাতে একজনের বেশী বসা চলে না। কাজেই আমাদের গাড়ীর মত "২৮ জন বসিবার" স্থলে ৬৮ জন বোসতে পায় না,—পারেও না। আসনগুলির তলায় শীতের জন্য ষ্টীম হিটার (heater) বা তাপদায়ক যন্ত্র আছে। তাপ বেশী, মাঝারী ও কম কোরবার জন্যে
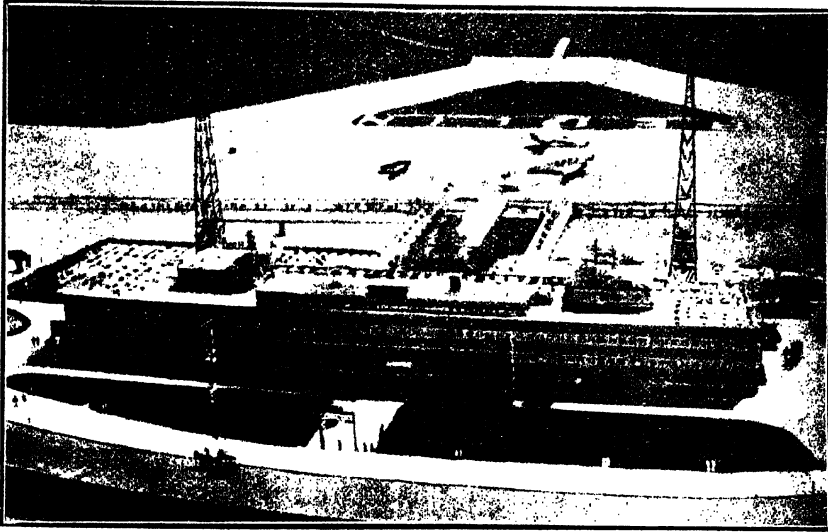
টেম্পলহফে বিমানপোতাশ্রয়—বের্লিন

ঘটনাও দুর্ল্লভ নয় যে বাড়ীর ছেলেমেয়ে ঝি চাকরদিগকে তৃতীয় শ্রেণীতে পূরে কর্ত্তা বাড়তী জিনিষপত্র নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঢুকলেন। এ ছাড়া সাধারণতঃ যাত্রীর স্বল্পতা হেতু দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা অনেক স্থলে গোটা কামরাটা এবং প্রায়ই গোটা বেঞ্চটা দখল কোরে হাত পা মেলে চলেন। ইয়োরোপের দ্বিতীয় শ্রেণী সে হিসাবে অনেক খারাপ। এক একটা ছোট ছোট কামরায় সামনাসামনি দুটা বেঞ্চ, বোসলে সামনের একটা হাতল প্রত্যেক গাড়ীতে আছে। তাপ বেশী-কম করা বা জানলা খোলা বন্ধ করা—সহযাত্রীদের অনুমতি নিয়ে তবে করা উচিত। আমাদের এখানে রেল-কোম্পানীর একটা আইন আছে বটে যে ধূমপান কোরতে গেলে সহযাত্রীদের অনুমতি নিতে হয়; কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তনের বহু পূর্ব্বেই যাত্রী দল সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এই আইনটা বরাবরই অমান্য কোরে আসছে। ইয়োরোপে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধূমপায়ীদের জন্যে আলাদা

কামরা আছে। সেগুলি ছাড়া অন্য কামরায় ধূমপান করা নিষিদ্ধ। গাড়ীগুলির গদি বনাতের। এ ছাড়া গাড়ীর বারান্দার (Corridors) দিকের জানলাগুলি আবশ্যক মত পর্দ্দা দিয়ে বন্ধ করা চলে; এবং শোবার সময় আলো কমিয়ে দেওয়া যায়। প্রায় সারা ইয়োরোপেই

"ভিকটী কলুম"—সৈন্যরা মার্চ্চ করিতেছে—বের্লিন

দেখেছি ট্রেনের বগীগুলি অনেকগুলি কামরায় বিভক্ত; উঠবার নামবার জন্যে দু'প্রান্তে দুটি দরজা আছে। বগীটার আগাগোড়া একটা সরু ঢাকা বারান্দা। এই

মিউনিসিপ্যাল অপেরা হাউস—বের্লিন

বারান্দা থেকেই কামরাগুলিতে ঢোকবার দরজা। দীর্ঘ একটানা ভ্রমণে এই বারান্দার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়। বোসে বোসে যখন ক্লান্তি ধরে তখন এই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে বা বেড়িয়ে একটু আরাম পাওয়া যায়।

আমি যে কামরাটীতে এসে বোসলাম, সেটীতে একটী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা এবং একটী তরুণী ও প্রৌঢ় চোলেছিলেন। অনেক দূর চুপ-চাপই চোল্‌লাম হাতের কাগজটীর দিকে মুখ গুঁজে। অন্যান্য যাত্রীরাও সেই ভাবেই চোলেছিলেন। কিছুক্ষণ পর প্রৌঢ়টী আমার পাশের বৃদ্ধটীর সঙ্গে অল্প অল্প বাক্যালাপ সুরু কোরলেন। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধাও হাতের বই থেকে মুখ তুলে আলাপে যোগ দিতে লাগলেন। তার পর যোগ দিলেন তরুণীটী। বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল এঁরা পরস্পর অচেনাই ছিলেন। যাত্রাপথে এঁদের আলাপ সুরু হোল। কিছুক্ষণ পরে গাড়ীর বারান্দায় মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঘণ্টা বেজে উঠল। 'খানা কামরায়' (restaurant car) গিয়ে আহার সেরে এলাম। আরও কিছুক্ষণ চলার পর বৃদ্ধ আমায় ভাঙ্গা ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা কোরলেন আমি কোথা থেকে আসছি। আমি বল্লাম 'আন্দাজ করুন'।

—'স্পেন?'

ঘাড় নেড়ে বল্লাম "না"।

'—ইটালি।'

হেসে বল্লাম 'এবারেও হোল না।'

'—তবে মিশর?'

বোল্‌লাম 'এবারেও আপনি ধোরতে পারলেন না। আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি।'

বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বোল্লেন 'ভারতবর্ষ? গান্ধী এখন কোথায়? তার খবর ত আমরা এখন কিছু পাই না। তোমাদের আন্দোলন সম্বন্ধেও ত আর কিছু শুনি না। তোমরা কি হেরে গিয়েছ?'

বোল্‌লাম 'এখন দেশের বড় বড় নেতারা সকলেই বন্দী; তবে দেশের অবস্থা শান্ত নয়। তোমরা কি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন সংবাদই পাও না?'

তিনি বোল্‌লেন 'আগে পেতাম। এখন ত কিছু পাই না।'

চুপ কোরে রইলাম। মনে হোল, আমাদের অভিশাপ এইখানেই ;—নিজের দেশের সত্য সংবাদটুকুও বিশ্বজনের কাছে পাঠাবার ক্ষমতা ও উপায় আমাদের নাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই সহযাত্রিনীদ্বয় ও সহযাত্রীটী সেই বৃদ্ধের মারফতে আমার সঙ্গে আলাপ সুরু কোরলেন।

তরুণীটী বৃদ্ধের মারফতে বার্ত্তা পাঠালেন—আমার কোঁকড়ান চুলগুলি ও চোখ দুটী না কি ভারী সুন্দর। তরুণীর এই অযাচিত প্রশংসায় একটু বিব্রত হোয়ে পোড়লাম। বৃদ্ধকে বোল্‌লাম, ওঁর সোনালী ঢেউ-খেলান চুলগুলি এবং নীল চক্ষু দুটীর কাছে আমাকে হার মানতেই হবে। বৃদ্ধ সে কথা তাঁকে ফরাসী ভাষায় আর যদি একে (তরুণীকে দেখিয়ে) তুমি বল তবে "ডু" বোলবে। বোলেই তিনি হো হো কোরে হেসে উঠলেন। তাঁর হাসিতে সবাই ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা কোরলে ; তিনিও সেটা আবার পুনরুক্তি কোরতে সকলেই মায় তরুণীটীও একসঙ্গে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন এবং ঘাড় নেড়ে জানালেন বৃদ্ধ যা বোলেছেন ঠিক।

এর পর আকারে ইঙ্গিতে এবং মারফতে মাঝে মাঝে অনেক কথাই হোল। বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা দুইজনেই ফরাসী। প্রৌঢ় রাশিয়ান, কিন্তু বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীরই অধিবাসী। তরুণী বের্লিনবাসিনী—কার্য্য ব্যপদেশে প্যারিশে এসে-ছিলেন। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা বয়সে বৃদ্ধ হোলেও মনে তরুণই
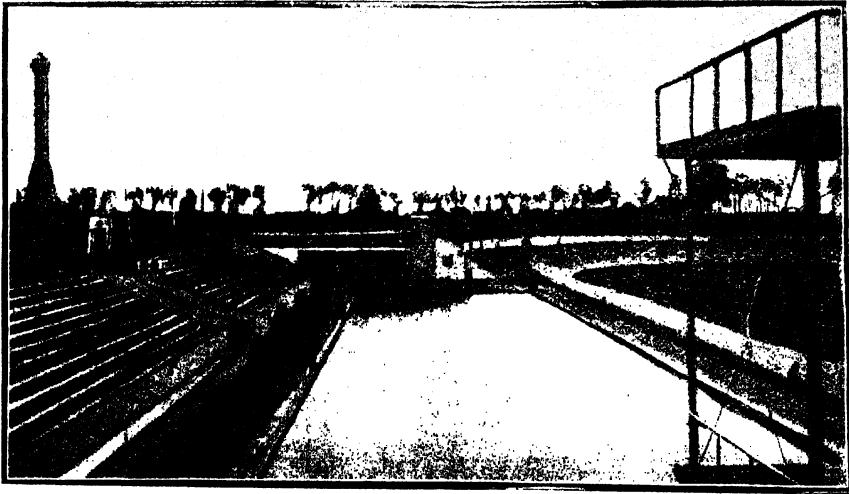
জার্ম্মাণ ষ্টাডিয়ামের মধ্যে সাঁতারের পুকুর—বের্লিন

জানালেন। তরুণীটী সলজ্জ হাসি হেসে আমায় কি বোললেন বুঝলাম না। বৃদ্ধ বুঝিয়ে দিলেন "ও তোমার প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে।"

আলাপ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হোয়ে এল। আমি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা কোরলাম "'তুমির' জার্ম্মাণ প্রতিশব্দ কি?"

বৃদ্ধ বোল্লেন "সি"। তবে যদি আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে অর্থাৎ যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে তাদের সঙ্গে কথা কইতে হয় তবে "ডু" বলাই ভাল। পরে রসিকপ্রবর উদাহরণ দিলেন—এই আমাকে যদি বল তবে "সি"; ছিলেন। এ দেশের একটা বিশেষত্ব চোখে পড়ল যে, এদের মধ্যে কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় নাই। এরা অত্যন্ত খোলা-প্রাণ। অপরিচয়ের সঙ্কোচ আলোচনার গণ্ডীকে সঙ্কীর্ণ কোরে রাখে না। নিজেরা যা ভাবে সুস্পষ্টই বলে। এ দেশে সেক্স (sex) বা নীতির মাপকাঠি আমাদের দেশ থেকে অনেক তফাৎ। ট্রেনেরই একটী ঘটনা বলি। কিছুক্ষণ একত্র চলার পর রাশিয়ান যুবকটী (আমাদের দেশ হিসাবে প্রৌঢ়) জার্ম্মাণ তরুণীর ওপর যে বিশেষ রকমে আকৃষ্ট হোয়ে পোড়লেন, ভাষা না জানলেও বুঝতে দেরী হল না ; কারণ প্রেম ভাষার

গণ্ডীতে বদ্ধ নয়। প্রথমে অল্প-স্বল্প আকার ইঙ্গিত চোল্লো। পরে ক্রমশঃ বেশ বাড়াবাড়িই সুরু হোল। যুবকটী তরুণীর হাতে চুম্বন কোরতে বদ্ধপরিকর; কিন্তু তরুণী কিছুতেই তা কোরতে দেবে না। অবশ্য এই না দেওয়ার মধ্যে কঠোর প্রতিবাদ ছিল না; আর একটু

"ভিটেনবুর্গপ্লাজ"—বের্লিন

খেলাবার প্রবৃত্তি ও প্রচ্ছন্ন সম্মতি ছিল। কাজেই রাশিয়ান ভদ্রলোক একেবারে নাছোড়বান্দা হোয়ে পোড়লেন। তরুণীটী বিরক্তি প্রকাশ কোরে উঠে যাবার জন্য দাঁড়ালেন। ভদ্রলোক অমনি দরজা আগলিয়ে দাঁড়ালেন।

"নোলেনডর্ফপ্লাজ"—পাসে "ষ্টাডভান"—ষ্টেসনের মধ্যে ঢুকিতেছে—বের্লিন

এতে তরুণী হেসে ফেলে আবার বোসলেন। ভদ্রলোকের বুকের পাটাও বাড়ল। তার পর খুঁটিনাটী মান-অভিমানের অনেক পালাই চোল্লো। শেষে বোধ করি মেয়েটীর ঠিকানা জানবার জন্যে ভদ্রলোক ব্যস্ত হোয়ে পোড়লেন। কিন্তু সে কিছুতেই বোললে না। তখন সুটকেসের ওপর ঝোলান কার্ড দেখবার জন্যে তিনি সুটকেশ নামাতে যাবেন; কিন্তু মেয়েটী তা দেবে না। কাজেই একটা খণ্ড যুদ্ধাভিনয় চোল্লো। অবশেষে দুজনেই পরিশ্রান্ত হোয়ে বোসলেন। এই প্রেম-লীলার মাঝে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী বেশ রসিকতা সহকারে মাঝে মাঝে ফোড়ন দিচ্ছিলেন; এবং একবার এর, একবার ওর পক্ষ নিয়ে লড়াই কোরছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটী হঠাৎ উঠে দরজার কাছে গিয়ে, ভদ্রলোকের দিকে এমন ভাবে চেয়ে হেসে বেরিয়ে গেল, যার অর্থ—কেমন, হারিয়ে দিলাম ত। ভদ্রলোকও এ পরাজয় সহজে মেনে নিলেন না—তিনিও উঠলেন। আমরা এ লীলা বেশ উপভোগ কোরছিলাম। হঠাৎ একটী সুউচ্চ নারী কণ্ঠের চীৎকারে আমরা ত্রস্ত হোয়ে বেরিয়ে বারান্দায় এলাম। সে তীক্ষ্ণ চীৎকারে গাড়ীর অন্যান্য কক্ষ থেকেও সকলে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। দেখা গেল, রাশিয়ান ভদ্রলোক ও জার্ম্মাণ তরুণীটী পাশাপাশি দুটী জানালার ফাঁকে মুখ লাগিয়ে নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে। ত্রস্ত জনতার মাঝে তাদের এই নির্লিপ্ততাই আসামী ধরিয়ে দিলে। কিন্তু কোন পক্ষই যখন কোনো অভিযোগ তুল্ল না, তখন সকলেই একটু চাপা হাসি ও বিরক্তি নিয়ে নিজের নিজের কামরায় ফিরে গেল। আসামীদ্বয়ও আমাদের কামরায় এসে বোসলো। ভদ্রলোক ভাবাতিশয্যে বোধ হয় বিশ্রী রকম কিছু একটা বাধিয়ে বোসেছিলেন যা ও-দেশের মেয়েও বরদাস্ত কোরতে পারে নি; তাই চীৎকার কোরে উঠেছিল। এর পর প্রায়ই মাঝে মাঝে আমাদের কামরার বারান্দার দিকের জানলায় কৌতুহলী চোখ দেখা যেতে লাগল।

ভদ্রলোক বিরক্ত হোয়ে জানলার পর্দ্দাটা তাদের চোখের সামনে টেনে দিতেই বাইরে ঘন ঘন দেশলাই জ্বালিয়ে তার প্রতিবাদ জানান হোল। কিছুক্ষণ আবার বেশ নিরুপদ্রবেই কাটল। হঠাৎ দেখি বুড়ো ও বুড়ী (খুড়ী প্রৌঢ়া) উঠে গেলেন। এর কিছুক্ষণ পরে আমিও বাথরুমে যাবার জন্যে উঠে গেলাম। বাথরুমের সামনে যে একটু স্বল্প-পরিসর জায়গা বারান্দা থেকে দৃষ্টির বাইরে পড়ে, সেখানে মোড় ফিরে ঘুরতেই দেখি, বৃদ্ধ বৃদ্ধা প্রেমসাগরে ভাসমান। বুঝলাম এ গোটা গৌরাঙ্গের দেশটাই প্রেমে ভাসছে—আবালবৃদ্ধবনিতার মজ্জায় মজ্জায় প্রেম থৈ থৈ কোরছে। আমরা এখানে জগাই মাধাই—নেহাতই অনাহূত আগন্তুক। সসম্মানে সরে এলাম।

সামান্য ট্রেণের আলাপে যে জাতের নারী-পুরুষ এত সহজে পরস্পর বিলিয়ে দেয়, সে জাতের নৈতিক মাপকাঠি যে আমাদের হিসাবে খুবই নীচু, এ কথা মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু ওদের পক্ষে এটা খুব দোষের নয়,—বরং হামেসাই এই হোয়ে থাকে। আর পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের মধ্যে আমরা যতটা আবরণ টেনে রাখা প্রয়োজন মনে করি, ওরা ততটা করে না। কাজেই এ ব্যাপারে ওদের ঢাক ঢাক গুড় গুড় কম।

রাত্রি বারটায় বের্লিনে গাড়ী পৌছল। বের্লিন সহরে ৮টা ষ্টেশন। এর মধ্যে 'ফ্রেডেরিশষ্ট্রাশে' (Friedrich strasse) ষ্টেশনটাই বড় এবং সহরের মাঝখানে। বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন দেশের ট্রেন এসে আটটা ষ্টেশনের এক একটাতে থামে। কোন কোনটা সহরের বিভিন্ন অংশে তিন চারটা ষ্টেশনেও থামে। প্যারিস থেকেই বের্লিনের ভারতীয় সঙ্ঘের ঠিকানা সংগ্রহ কোরে এনেছিলাম ; এবং সম্ভব হোলে এই নবাগত অনাহূত অতিথিকে অজানা দেশে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সেখানে পত্রও দিয়েছিলাম। ষ্টেশনে নেমে কোন কালো মুখই চোখে পোড়ল না। এর ভেতরে আবার একটা বিভ্রাট বেধেছিল। ফরাসী সীমানা থেকে জার্ম্মাণ সীমানায় যেখানে গাড়ী প্রবেশ করে, সেখানে জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ পাশপোর্ট দেখেন ও জিনিষপত্র খানাতল্লাসী করেন। এই সময়ে জার্ম্মাণীর বিশেষ আইনের জন্যে সীমান্ত প্রদেশেই বিদেশীরা কে কত টাকা নিয়ে দেশে ঢুকছে তাও তদন্ত করা হোল এবং তারপর ছাড়পত্র দেওয়া হল। সেই টাকার বেশী কোন বিদেশী মুদ্রা এবং দুশো মার্কের বেশী জার্ম্মাণ মুদ্রা নিয়ে কারো দেশ থেকে বেরোবার হুকুম ছিল না। এই জায়গায়

চিড়িয়াখানায় সঙ্গীতমণ্ডপ—বের্লিন

আমার সঙ্গের জিনিষপত্র রাজকর্ম্মচারীরা দেখে গেলেন। আমিও নিশ্চিন্ত হোয়ে বোসে রইলাম। তখন খেয়াল হয় নাই যে লাগেজে আমার বড় সুটকেশটী দেওয়া আছে। পরীক্ষা হোয়ে যাবার পর যখন ট্রেণ জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যে চোলেছে, তখন প্রসঙ্গ ক্রমে সেটার কথা বোলতেই সহযাত্রীরা বোল্‌লেন, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই সেই সীমান্ত ষ্টেশনে আটকে রেখেছে। ট্রেণের টিকিট পরিদর্শক (checker)কে এই সম্বন্ধে বলায়, সে পরের ষ্টেশনে টেলিগ্রাফ কোরে এই সম্বন্ধে খোঁজ খবর কোরলে এবং জানালে যে সুটকেশটা সঙ্গেই চোলেছে—বেলিনে খানাতল্লাসী কোরে ছেড়ে দেওয়া হবে। বোলে রাখা ভাল যে, এই সব খোঁজ খবর কোরে দেওয়ার জন্যে পরিদর্শক পারিশ্রমিক দাবী কোরেছিল ও দিতেও হোয়েছিল।

আকাশ হইতে বিমানপোত প্রদর্শনী—বের্লিন

ষ্টেশনে নেমে সুটকেশটা খোঁজ কোরলাম। অনেক ঘোরাঘুরি আর বোঝা না বোঝার পর এইটুকুই জানলাম যে সেটা এত রাত্রে পাওয়ার সুবিধা হবে না। অগত্যা ট্যাক্সিতে জিনিষপত্র চড়িয়ে ঠিকানা বোলে চাপলাম। বিদেশীর জন্যে বের্লিনে বড় চমৎকার ব্যবস্থা আছে। ষ্টেশনের কাছেই অনেকগুলি দোভাষী পুলিশ থাকে। তাদের বাহুতে লাল ফিতায় তারা যে ভাষায় অভিজ্ঞ তার পরিচয় থাকে। অনেক ট্যাক্সি ড্রাইভারেরও এই রকম তকমা আছে। গভর্ণমেণ্টের এই সব লোক ছাড়াও কুক ও আমেরিকান এক্সপ্রেসের দোভাষী প্রায় প্রত্যেক দূরাগত ট্রেণেই হাজির থাকে। এখানকার সব ট্যাক্সিই এক রঙের। ট্যাক্সির ভাড়া যাত্রীর সংখ্যা অনুসারে হিসাব যন্ত্রে (meter) ওঠে; অর্থাৎ একই দূরত্বে একজন গেলে যে ভাড়া উঠবে, দুজন গেলে তার চেয়ে বেশী উঠবে; এ ছাড়া ড্রাইভারের পাশে যে সব জিনিষ থাকে তার ভাড়া এবং "টিপ্‌স্" বা বোখ্‌সিস আলাদা দিতে হয়। ট্যাক্সি অল্পক্ষণের মধ্যেই "উলাণ্ডষ্ট্রাসে" রাস্তায় নির্দ্দিষ্ট নম্বরে এনে হাজির কোরলে। দেখি দরজা বন্ধ এবং সে বাড়ীটির পরিবর্ত্তে পাশের বাড়ীতে লেখা Hindusthan House। দুটী বাড়ীর কোন্‌টার দ্বারে করাঘাত কোরব ভাবছি, এমন সময় ১৭৯নং বাড়ী থেকেই একজন কালা আদমী বেরিয়ে এলেন। সেই নির্জ্জন দ্বিপ্রহর রাত্রে বন্ধুহীন অপরিচিত দেশে তাকে দেবতা-প্রেরিত দূতের মতই মনে হোয়েছিল। ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা কোরলাম "হিন্দুস্থান হাউস কোন্‌টা বোলতে পারেন?"

ইংরাজিতেই উত্তর দিলেন 'এইটাই'!

পরক্ষণেই হিন্দিতে জিজ্ঞাসা কোরলেন "কোথা থেকে আসছেন? এত রাত কেন?"

আমার সব পরিচয় দিতেই তিনি বোল্‌লেন "আপনার ভাগ্য ভাল। অন্য দিন আমরা এতক্ষণ শুয়ে পড়ি—আজ বোধ হয় আপনার জন্যেই জেগে আছি।" তিনি সঙ্গে কোরে ওপরে নিয়ে গেলেন।

ঘরের মধ্যে জনচারেক ভারতীয় বোসে গল্প কোরছিলেন। এদের মধ্যে মিঃ গুপ্ত এখানকার মালিক। মণি সেনও (মিঃ সেন নামের বদলে তিনি এই নামেই করে। বিদেশে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখেছি, দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হোলেই, আলাপে-আলোচনায়, কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে সঙ্কোচের মাত্রা অতি সহজেই কেটে যায়। মনে হয়, বুঝি আমরা বহুদিনের বন্ধু। অন্ততঃ এই আমার নিজের অভিজ্ঞতা। সেই রাত্রি থেকেই হিন্দুস্থান হাউসে থাকবার এবং খাবার বন্দোবস্ত হোয়ে গেল।

বেলিনে প্রায় মাসখানেক ছিলাম। কাজেই দৈনন্দিন ডায়েরীর ফর্দ্দ দিয়ে পাতা এবং পাঠকপাঠিকাদের মন—কাউকেই ভারাক্রান্ত কোরতে চাই না। যা দেখেছি এবং যা মনে হোয়েছে তা সংক্ষেপে পর পর বোলে যাই।

পট্‌সড্যাম্ সহর

পরিচিত) কর্ত্তৃপক্ষের একজন। মিঃ চক্রবর্ত্তী আমেরিকা থেকে বিদ্যুৎ-বিশেষজ্ঞ হোয়ে এখানকার ডিগ্রীর জন্য এসেছেন। এঁদের সঙ্গেই ভবিষ্যতে বেশী মাখামাখি হোয়েছিল বোলেই নাম উল্লেখ কোরলাম। এ ছাড়া বহু বিদ্যার্থী, ডিগ্রীপ্রার্থী এবং প্রবাসীর সঙ্গে আলাপের সুযোগ হোয়েছিল—যাঁদের সকলের নামোল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়। তাঁরা আমাকে দেখবামাত্র অতি-পরিচিতের মত বোলে উঠলেন "আরে আসুন আসুন।" বিদেশের দূরত্ব দেশের লোককে অনেকখানি আপন

সর্ব্বপ্রথম নজরে পড়ে বেলিনের নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা। এমন ঝরঝরে পরিষ্কার সহর খুব কমই চোখে পড়ে। এর পরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুবিন্যস্ত রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ী, কাফে, রেষ্টুরাণ্ট। প্রশস্ত, পীচ-দেওয়া রাস্তাগুলির দুধারে রীতিমত চওড়া ফুটপাথ। তার পরে থেকে বাড়ীর সীমানা। বাড়ীগুলো নিজের নিজের সীমানার শেষ প্রান্ত চেপে ওঠে নি। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সামনেই খানিকটা খোলা বাগান; তার পর বাড়ী। ব্যবসাকেন্দ্রে কেবল কিছু ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। বাড়ীগুলোর বারান্দায় জানলায়

বিভিন্ন ফুলের গাছের টব সাজান থাকে। বাড়ীগুলির বাইরেও যেমন পরিষ্কার ও সাজান, ভেতরও তেমনি। এখানকার সাধারণ গৃহস্থের বাড়ী আমাদের দেশের বিশিষ্ট ধনীদের বাড়ীর চেয়েও পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্ত। প্রত্যেক বাড়ীরই বাইরে আংটীর আকারে বা বোতামের মত সঙ্কেত-ধ্বনির সুইচ আছে। সাধারণ বাড়ীতে ভেতর থেকে লোকে দরজা খুলে দেয়; কিন্তু বড় বড় বাড়ীতে পাঁচ বা সাততলা উপর থেকেই বৈদ্যুতিক বোতামের সাহায্যে আপনা-আপনি দরজা খোলা হয়।
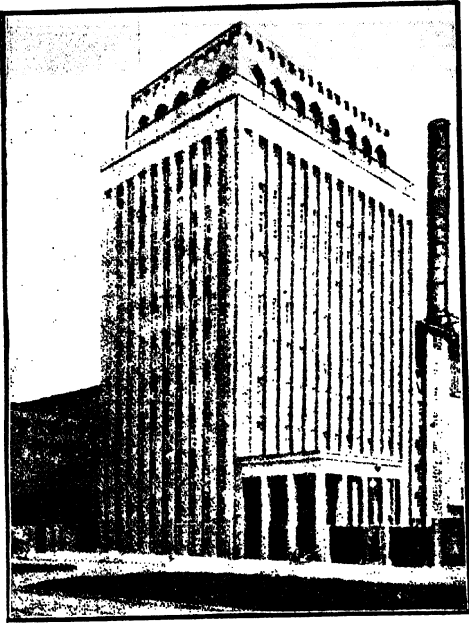
একটী বিদ্যুৎকারখানার আধুনিক ভবন

এই সব বাড়ীর মধ্যে ৮।১০টী অংশ বা ফ্ল্যাট (flate) থাকে। কাজেই সদর দরজা বার বার খুলতে আসা সম্ভব হয় না। তাই সেটা অন্তরীক্ষ থেকেই সমাধা হয়। পরে প্রত্যেক ফ্ল্যাটের দরজায় বোতাম টিপলে বা কড়া টান্‌লে ভেতর থেকে ঝি এসে দরজা খোলে।

'উন্‌টারডেন লিন্‌ডেন' প্রভৃতি বড় রাস্তা এবং 'ভিটেন বুর্গ প্লাজ' প্রভৃতি ভূগর্ভযানের (underground railway) ষ্টেশনগুলি এমন চমৎকার গাছপালা দিয়ে সাজান যে, রাস্তা বা ষ্টেশনের বদলে এগুলিকে পার্ক বোলে ভ্রম হয়। 'উন্‌টারডেন্‌ লিন্‌ডেন্‌' বের্লিনের একটী প্রধান রাস্তা। এর প্রস্থ ১৯৭ ফিট। মাঝখান বরাবর একটী চমৎকার বাগান। তার পর দুই ফুটপাথ; তার পর এক দিকে যাবার ও অন্য দিকে আসবার রাস্তা। তার পর আবার ফুটপাথ; তার পর বাড়ীঘর।

বের্লিনের বুকের ওপর দিয়ে স্প্রী নদী ও 'ল্যাণ্ডভার ক্যানেল' সর্পগতিতে বোয়ে চোলেছে। সহরের বুকের ওপর বিস্তীর্ণ 'টিয়ার গার্টেন'। পূর্ব্বে বোধ হয় প্রকাণ্ড জঙ্গল ছিল। এখন গাছপালা পাতলা কোরে দেওয়া হোয়েছে। ভেতর দিয়ে রাস্তা, ক্যানেল চোলেছে।

উইলহেল্‌ম মেমোরিয়াল গির্জ্জা—বের্লিন

প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্বাস্থ্যান্বেষীর দল, স্বপ্নবিভোর তরুণ তরুণীর দল এর শান্ত শীতল স্তব্ধ কোলে বেড়িয়ে বেড়ায়, বোসে গল্প করে। আত্মভোলা হোয়ে স্বপ্ন দেখে। এই বিস্তীর্ণ পরিচ্ছন্ন উপবন পশ্চিমে 'জুগার্ডেন' থেকে পূর্ব্বে 'উন্‌টারডেন্‌ লিণ্ডেন' পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এটী ছাড়া হিণ্ডেনবুর্গ পার্ক, ক্রুজবার্গ, ক্লিষ্টপার্ক প্রভৃতি আরও কয়েকটী পার্ক সহরের ইট-পাথরের পাশে প্রকৃতির মুখের হাসি স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রত্যেকটী লোকই ব্যস্ত ও কর্ম্মঠ বলে মনে হয়। ট্রাম, বাস, ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক রেল (underground) ও 'রিংভান' বা 'ষ্টাডভান' এই চার রকমের যান সহস্র সহস্র যাত্রী নিয়ে অবিশ্রাম ছুটে বেড়াচ্ছে। ট্রাম, বাস, ও ভূগর্ভ-যান এক বিরাট প্রতিষ্ঠানের (B. V. G.) অধীনে পরিচালিত হয়। যেখানেই যাওয়া যাক ২৫ ফেনিস (প্রায় চার আনা) ভাড়া। ৩০ ফেনিস দিয়ে টিকিট কিনলে ট্রাম থেকে বদল কোরে ভূগর্ভ-যানে যাওয়া যায়। যানবাহনগুলির মালিক মিউনিসিপ্যালটী; কাজেই প্রতিযোগিতা নাই, অনাবশ্যক হুড়োহুড়ি নাই। প্রত্যেকটী বাস প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে (stop এসে দাঁড়ায়—নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী ভর্ত্তি হোয়ে গেলে আর যাত্রী নেয়না,—চাপলেও নামিয়ে দেয়। প্রত্যেক স্তম্ভে (post) লেখা আছে, সেখানে কোন্ কোন্ বাস আসবে এবং কত সংখ্যক বাস কোথায় যাবে। বের্লিনে ২২৫ মাইল ব্যেপে ৩৯টী বাস লাইন আছে। ৪০০০ ট্রাম ৭৪টী বিভিন্ন শাখায় প্রায় ৪০২ মাইল ছড়িয়ে আছে। ভূগর্ভ-যানের গোটা সহরে ৯৪টী ষ্টেশন আছে এবং ১১৮৭টী গাড়ী আছে। এ ছাড়া ষ্টাডভানের বা মাটীর ওপরের রেলের ৩০টী ষ্টেশন আছে। প্রতি দু মিনিট অন্তর এক-একটী ট্রেণ যাওয়া-আসা কোরছে। জার্ম্মানীর সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৩০ সালে B. V. G. কোম্পানী ১,২০০,০০০,০০০, যাত্রী বহন কোরেছে। এ থেকে বোঝা যাবে সে সহরের লোকগুলো কত ব্যস্ত ও কাজের লোক। এ-সব যান ছাড়াও বের্লিনে প্রায় ৯০০০ ট্যাক্সি অনবরত রাস্তা দিয়ে ছুটছে। ষ্টাডভানের লাইন মাটী থেকে প্রায় একতলা ওপরে সাঁকো ও বাঁধের ওপর দিয়ে গিয়েছে। ষ্টেশনের নীচে দোকান, পোষ্ট অফিস, লাগেজ অফিস, প্রভৃতি; উপরে লাইন। এক লাইন থেকে অন্য লাইনে যাবার রাস্তা মাটীর নীচে সুড়ঙ্গ দিয়ে; অর্থাৎ "ওভার ব্রিজের" বদলে "আণ্ডার ব্রিজ।" ষ্টেশনের উপর অটোমেটিক টিকিট, খবরের কাগজ, চকোলেট, সিগারেটের কল; নির্দ্দিষ্ট মুদ্রা ফেলে দিলেই ইপ্সিত জিনিষ আপনা-আপনি বেরিয়ে আসে।
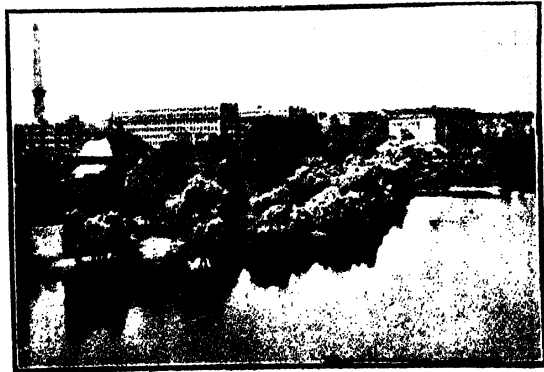
প্যারিস-প্লাজ—বের্লিন

বেতারবার্ত্তা গৃহের নিকট "লিটজেনসি"হ্রদ—বের্লিন

বের্লিনের কাফে, রেষ্টুরেণ্ট, সিনেমা ও নাচঘরগুলি বের্লিনের অন্যতম সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণ। উইনটার গার্ডেন, রেসিডেন্স ক্যাসিনো, ক্রল গার্ডেন, ফেমিনা রায়োরিটা, ডেলফি প্রভৃতি প্রমোদ-ভবনগুলি প্যারিসের

বিখ্যাত বিলাস-মন্দিরগুলির সঙ্গে রীতিমত পাল্লা দিয়ে চোলেছে! ক্রল গার্ডেনে পাঁচ হাজার লোকের বসবার জায়গা আছে। রেসিডেন্স ক্যাসিনোতে ১০০টী টেবিল টেলিফোন আছে এবং প্রত্যেক টেবিল থেকে অন্য

টেম্পলহফের উলষ্টিন হাউস—বের্লিন

টেবিলে নলযোগে চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা (Pneumatic Mail Service) আছে। প্রত্যহ চা নৃত্য (Tea dance) ও নৈশ ভোজন-নৃত্য (dinner dance) এই দুবার করে
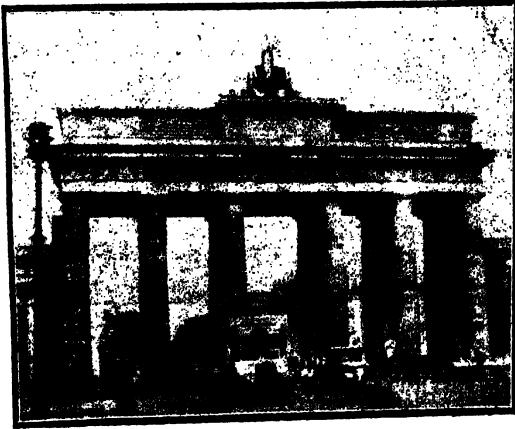
ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ তোড়ল—বের্লিন

নাচ চলে। বিকালের চা নৃত্যে সাধারণতঃ কেবল বল নাচই হয়। রাত্রে অনেক জায়গায় বল নাচের মাঝে মাঝে 'ক্যাবারে' নাচ ও অন্যান্য নাচ গান চলে। নাচ-ঘরগুলি আগন্তুকদের চমৎকার পরিচ্ছদ-পারিপাট্যে, আলোছায়ার মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তনের খেলায়, যন্ত্র-সঙ্গীতের নিপুণ সমন্বয়ে এক অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করে। কোথাও বলনাচের পর ক্যাবারে নাচের সময় নাচের মঞ্চটী (platform) বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনেকখানি উঠে আসে। জার্মান তরুণীরা সজ্জায়, ব্যবহারে, চলনে, ভঙ্গীতে প্যারিসিয়ান তরুণীদিগকেও ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টায় অন্ধ-গতিতে ছুটেছে—নাচঘরগুলিতে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সেদিন বোধ হয় ডেলফিতে আমি ও বন্ধু মি: মুখার্জ্জি চা খেতে গিয়েছিলাম। বন্ধুবর নাচতে গেলেন; আমি বোসে বোসে চা ধ্বংস কোরতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি, টেবিলের টেলিফোনটা একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন কোরছে এবং তার পায়ের লাল বাতিটা জ্বোল্‌চে ও নিব্‌চে। ফোন্‌টা তুলে ধোরলাম "হ্যালো"। কামিনী কণ্ঠে উত্তর এলো "স্পিক ইংলিশ?" (ইংরাজী বলেন?) বোল্লাম "ইয়েশ"। বিস্মিত আনন্দে শুন্‌লাম "নাচবে আমার সঙ্গে?" বোল্লাম "কত নম্বর তোমার?" হঠাৎ সে কেটে দিলে। বন্ধু নাচ শেষ হোলে টেবিলে এলেন। তাঁকে সব বোললাম। তিনি ত আপ্‌শোষ কোরে অস্থির; বোল্লেম "প্রথমেই নম্বরটা জিজ্ঞেস কোরলেন না কেন?" এর ঘণ্টা দুয়েক পরে হঠাৎ আবার টেলিফোন সাড়া দিলে। তুলতেই শুনলাম "গুডনাইট, সুইটহার্ট"। কিছু বোলবার আগেই যোগ-সূত্র ছিন্ন হোয়ে গেল। বুঝলাম হয় ত কেউ ঠাট্টা কোরলে। মনকে সান্ত্বনা দিলাম—কোনো অচেনা রূপসী আমার রূপে পাগল হোয়েছে—বেচারা নিজেকে প্রকাশ কোরতে পারলে না! হায় হতা প্রেমিক!

সন্ধ্যার পর নাচঘর ও কাফেগুলি লোকে ভর্ত্তি হোয়ে যায়। কারণ সস্তায় এত স্ফূর্ত্তি আর কিছু ত হয় না

পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখই যদি বড় হয় এবং সেরা সুখের মাপ-কাঠি হয়, তাহলে সে সুখ এখানে মেলে, এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে। কোনো কোনো নাচঘরে দর্শনী দিয়ে ঢুকতে হয়। কোথাও প্রবেশ-মূল্য কিছুই নাই; তবে গিয়ে বোসলেই কিছু খেয়ে আসতে হবে। এই সব রেষ্টুরাণ্টে, কাফেতে ও নাচঘরে সন্ধ্যায় ঢুকে এক কাপ চা বা এক গেলাস মদ নিয়ে রাত্রি বারটায় বা একটায় বেরিয়ে আসা চলে। রেষ্টরাণ্টে ও কাফেতে নাচের ব্যবস্থা নাই; তবে চমৎকার বাজনা আছে। এখানকার ছেলে-মেয়েদের এইগুলিই ঘটকের কাজ করে। তারা পরস্পর নাচঘরেই পরিচিত হয় ও পরে হয় ত বিবাহিত হয়। নৈতিক চরিত্রের ধারণা ক্রমশই আমেরিকা ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের মত এখানেও শিথিল হোয়ে আসছে। সখ্য বিবাহ (Companionate marriage) পরখ্‌মিলন (trial mating) প্রভৃতির ভক্ত ক্রমশঃই বাড়ছে এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেল, লিণ্ডসে প্রভৃতির আধুনিক মতবাদ খুব দ্রুতগতি ছড়িয়ে পোড়ছে। বিবাহ-বন্ধনের বাইরে তরুণ তরুণীরা সঙ্গ সুখ ভোগ কোরতে বিশেষ দ্বিধা বোধ করে না—জন্ম নিয়ন্ত্রণের নবাবিষ্কৃত পন্থাগুলি এ-সবের বিশেষ সহায়ক। আমার কয়েকজন বন্ধুর নিজেদের কথায় জেনেছিলাম যে তাঁরা সেখানে অনেক পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে সখ্য-সূত্রে দৈহিক মিলন- সুখ পর্য্যন্ত নিয়মিত উপভোগ কোরে থাকেন। এঁদের অনেকের বান্ধবীর সঙ্গেও পরিচিত হোয়েছিলাম—অনেকেই বিশিষ্ট ঘরের মেয়ে। নাচঘরের আলাপে সেই রাত্রেই বাইরে এসে নির্জ্জনে আমার এক বন্ধুকে কোন তরুণীকে চুম্বন কোরতে দেখেছি। অথচ সে সাধারণ ব্যবসাদার প্রেমিকা নয়; কারণ, বাড়ীর অভিভাবকের ভয় তার চোখে মুখে সুস্পষ্ট ছিল। আমাদের পক্ষে এ খবরটা হয় ত একটা প্রচণ্ড দুঃসংবাদ—অসহ্য সমাজ-দ্রোহিতা; কিন্তু ওদের সমাজ আমাদের সমাজের বর্ত্তমান স্তর থেকে অনেক এগিয়ে গিয়েছে এবং সেই অগ্রগতির অনিবার্য্য ফল স্বরূপ তারা আজ পুরানো সমাজের বহু আইন-কানুন ভেঙ্গে নতুন কোরে গড়বার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কোরছে। এ পরিবর্ত্তন ভাল বা মন্দ, এ নিয়ে তর্ক চোলবে না। কারণ যাই হোক, সমাজের অবশ্যম্ভাবী অগ্রগতির ফলে এ পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হোয়ে পোড়েছে।
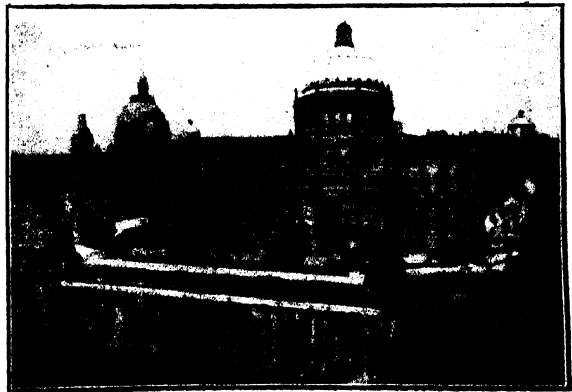
"লিপজিগার প্লাজ"—বের্লিনের একটী রাস্তা

কাইজারের প্রাসাদ—বের্লিন

বের্লিনের পুলিশ ইয়োরোপের অন্য দেশের পুলিশের

মতই সভ্য ও শিক্ষিত। পথিক কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরলেই সে আগে সেলাম বাজিয়ে তবে কথা বোলবে। এরা ভদ্রও খুব। বের্লিনের রাস্তায় বাজে কাগজপত্র বা ময়লা ফেলা বে-আইনী। থুথু পর্য্যন্ত কেউ রাস্তায় ফেলে

জার্ম্মাণ ষ্টাডিয়াম—বের্লিন

না। এ আইন আমি জান্‌তাম না। একদিন একটা হাণ্ডবিল বা অমনি কিছু বাজে কাগজ রাস্তায় পোড়তে-পোড়তে চোলেছিলাম। পড়া শেষে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চোলেছি—হঠাৎ শুনি পেছন থেকে কে চীৎকার কোরে

ক্যাথিড্র্যাল—বের্লিন

ডাকছে। থাম্‌লাম। দেখি, একটা পুলিসম্যান সেই হাণ্ড-বিলটা কুড়িয়ে এনে সেলাম কোরে হাতে দিয়ে আলোক-স্তম্ভে আট্‌কান কাগজ ফেলবার বাক্স দেখিয়ে বোল্লে "এটা রাস্তায় ফেলো না, ঐখানে ফেল।" বিদেশী বোলে সর্ব্বত্রই আমরা একটু বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকি।

বের্লিন থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে ওরানিয়েনবুর্গ নামে একটা পল্লীগ্রামে সেখানকার সরকারী গোশালা দেখতে গিয়েছিলাম। বের্লিনের সরকারী কৃষিবিভাগ থেকে সেখানকার অধ্যক্ষের নামে একটী চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম। ট্রেণ থেকে নেমে বাসে অনেকখানি যেতে হয়। সেখানে গিয়ে ফার্ম্মের লোকদিগকে চিঠিটা দেখালাম—কিন্তু তারা কি বোল্লে কিছুই বুঝলাম না। জার্ম্মাণ ভাষায় যে অতি সীমাবদ্ধ জ্ঞান ছিল, তার দ্বারাই বোঝালাম 'তোমাদের কথা বুঝতে পারছি না, এখানে কি কেউ ইংরাজি বলে না?" সেখানকার সমস্ত লোক দেখলাম আমার জন্য ছুটোছুটী কোরে বেড়াচ্ছে। পরে একজন এসে ইংরাজিতে বোল্লে "ইংরাজি জানা লোক আসছে।" বোল্লাম "এই চিঠি যাঁর নামে তিনি কোথায়? তিনি কি ইংরাজি জানেন না?" মহিলাটী হেসে জানাল ইংরাজিতে তার অধিকার অত্যন্ত অল্প; অত কথা সে বুঝতে বা বোলতে পারে না। বুঝলাম আমারই জুড়ী। এর পর ইংরেজী-জানা সেখানকার অধ্যক্ষের স্ত্রী এলেন এবং তাঁর স্বামী অসুস্থাবস্থায় হাঁসপাতালে আছেন জানালেন ও নিজেই অতি যত্ন সহকারে সব দেখিয়ে বেড়ালেন। বের্লিনে কোথাও বিদেশীকে ঠকাবার চেষ্টা চোখে পড়ে নাই;—ট্রামে, বাসে, সর্ব্বত্রই সকলে বিদেশীকে যথাসাধ্য সাহায্য কোরে থাকে। এখানে ভূগর্ভ-যানের শ্রেণীবিভাগ দ্বিতীয় ও তৃতীয়; প্রথম শ্রেণী নাই। ট্রামের গাড়ী যদিও

জোড়া, কিন্তু শ্রেণীবিভাগ নাই। একটা ধূমপানের জন্য, অপরটীতে ধূমপান নিষেধ। ট্রেণেও ধূমপায়ীদের জন্য "roucher" (রাউকার) চিহ্নিত আলাদা গাড়ী আছে। বাসের নীচের তলায় কেউ সিগারেট খেতে পায় না—ধোঁয়ার আড্ডা ওপর তলায়। সব যানেই প্রত্যেক আসনের নীচে বাষ্পনল (steam pipe) দিয়ে গরম রাখবার ব্যবস্থা আছে।

এইবার বের্লিনের দ্রষ্টব্যগুলির মোটামুটী পরিচয় দিই।

বের্লিনের দ্রষ্টব্য কেন্দ্র বোলতে পারা যায় উন্টার্য়ডেন লিণ্ডেনের পূর্ব্ব প্রান্তকে—যেখানে এই বিখ্যাত রাস্তাটী স্প্রী নদীর প্রথম শাখাটীর সেতু "ইলেকটারস্ ব্রিজে" গিয়ে মিশেছে। এই সেতুটী পার হোয়েই অনেকগুলি সৌধ চোখে পড়ে। ডাইনে একটী বিশালপ্রাসাদ,—বিশ্বত্রাস ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ সম্রাট কাইজারের প্রাসাদ। কৌতূহল হোল, এতবড় একটী সম্রাটের প্রাসাদ দেখবার লোভ দমন কোরতে পারলাম না। ফটকের কাছে গিয়ে দেখি, সিংহদ্বার উন্মুক্ত—প্রহরী নাই। অতীত রাজ-বংশের রথচক্রের চরণচিহ্ন ফটকের পাষাণ-বুকে এখনও গভীর ভাবে অঙ্কিত হোয়ে আছে। ভিতরে দু'টী চত্বর। প্রথম চত্বরে ঢুকতে গেলে কোন দর্শনী দিতে হয় না; দ্বিতীয় চত্বরে "প্রাসাদ-যাদুঘরের" (palace museum) প্রবেশ-পথ। তাই এখানে ঢুকতে গেলে পঞ্চাশ ফেনিস দর্শনী দিতে হয়। এই যাদুঘরে অনেক-গুলি চারু শিল্পের সংগ্রহ আছে। তবে এই সবের চেয়ে এখানকার দেখবার জিনিষ মদগর্ব্বী শক্তিমান জার্ম্মাণ সম্রাটের ইতিহাস-জড়িত বিভিন্ন কক্ষগুলি। "বারবেরিনা কক্ষ" মানুষের দুর্ব্বলতার একটী উজ্জ্বল সাক্ষ্য। কাই-

জারকে আমরা দুর্দ্দান্ত অমিততেজা যুদ্ধবিশারদ সেনাপতি বোলে জানি—কঠোর প্রতাপশালী একটা জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা হিসাবে জানি—একটা খণ্ড প্রলয়ের অগ্রদূত এবং অধিনায়ক বোলে জানি। কিন্তু জানি না যে এই আগ্নেয়গিরির এক পাশেই একটা প্রকাণ্ড পঙ্ককুণ্ড ছিল। এতবড় একটা দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অধিনায়ক যে এই বারবেরিণার অসামান্য রূপবহ্নিতে পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়েছিলেন সে কথা আমরা জানি না। সম্রাট কাইজার এই বারবেরিণার রূপে মুগ্ধ—অন্ধ ছিলেন। এর জন্য দেশের লোকের বিরাগ, নিজের স্ত্রীপুত্রের অসন্তোষ সবই তিনি অসঙ্কোচে সহ্য কোরেছিলেন। এই বিরাট

ডারউইনের পূর্ব্বপুরুষ—ক্রমশঃ সভ্য হইতেছে চিড়িয়াখানা—বের্লিন
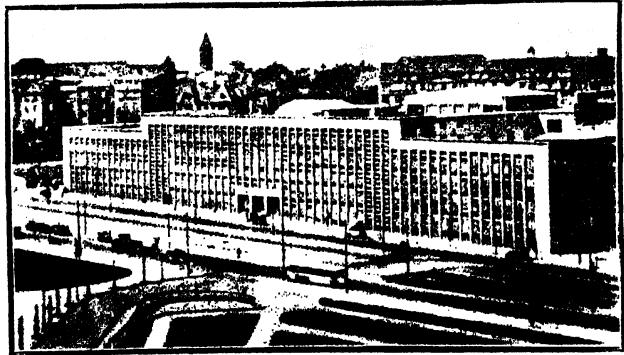
বিমানপোত প্রদর্শনীর নিকট বেতারবার্ত্তার বিরাট গৃহ—বের্লিন

প্রাসাদের এক একটী কক্ষ জার্ম্মাণ রাজপরিবারের ও গত মহাযুদ্ধের বহু স্মৃতি ও ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। এই মৌন প্রাসাদটীতে ঘুরতে ঘুরতে মনে হয়, কর্ম্মশক্তি, পুরুষকার সবই বুঝি মিছে, ভূয়ো; ভাগ্য ও নিয়তিই

চিড়িয়াখানায় পেঙ্গুইনের দল—বের্লিন

বোধ হয় প্রবল। আজও কাইজার বেঁচে; তাঁর উপযুক্ত পুত্রেরা সশরীরে বর্ত্তমান। সেই প্রাসাদ, সেই কক্ষ, সেই বের্লিন সবই আছে, তবু হতভাগ্য সম্রাটের নিজের ভিটেতে ফিরে আসবার অধিকারটুকুও নাই।
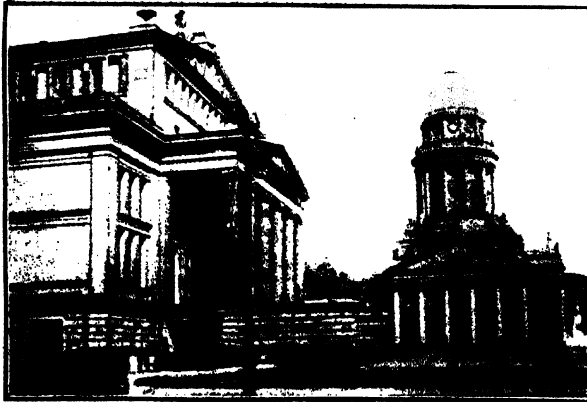
থিয়েটার ও ফ্রেঞ্চক্যাথিড্রাল—বের্লিন

বাড়ীর গায়ে দেখবার মত কারুকার্য্য বিশেষ কিছু নাই। প্রকাণ্ড পাথরের বাড়ী—বয়সের জন্যে কালো হোয়ে আসছে। সোনালী বারান্দার রেলিংগুলো লক্ষ্মী-হীন হোয়ে ম্লান হোয়ে আসছে। কাইজারের নিজের যে-সব আসবাবপত্র ছিল, সেগুলো তিনি তাঁর হল্যাণ্ডের বর্ত্তমান আবাসে নিয়ে গেছেন। কেবল যেগুলো সরকারী আসবাবপত্র, সেগুলো এখানে আছে।

এর পাশেই রাস্তার অপর দিকে বিখ্যাত "ক্যাথিড্রাল"। ক্যাথিড্রালটীর এক দিকে স্প্রী নদী গা ঘেঁসে চোলেছে, অন্যদিকে পাথর-বাঁধান প্রকাণ্ড উঠান। এই বিরাট গীর্জ্জাটী দ্বাদশ খৃঃ অব্দে সেণ্ট নিকোলাস তৈরী করেন। সমস্ত বের্লিনে প্রায় ১৩০টী চার্চ্চ আছে। এখানে একটী বৌদ্ধ বিহারও আছে। এইটীর পাশেই পাশাপাশি Old and new museums, Kaiser freidrich museums, German Museum ও সুবিখ্যাত National gallery। সোমবার ছাড়া অন্য সব বারেই যাদুঘরগুলি বেলা ন'টা থেকে তিনটে পর্য্যন্ত খোলা থাকে। সাধারণতঃ দর্শনী ৫০ ফেনিস। শনি, রবি ও বুধবারে দর্শনী লাগে না। এই যাদুঘরগুলিতে অনেক পুরোন ও নূতন ভাস্কর্য্য, চিত্র ও শিল্পের সংগ্রহ আছে। Kaiser freidrich museumটীতে ডাচ এবং ইটালিয়ান চিত্রকরদের বিভিন্ন যুগের ছবি এবং প্রথম ক্রিশ্চিয়ান, ইটালীয়ান, জার্ম্মাণ ইসলামিক ও বাইজানটাইন যুগের চিত্রকলা সংগৃহীত আছে। জার্ম্মাণ মিউজিয়মটীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ের শিল্পকলার নিদর্শন রক্ষিত হোয়েছে।

রাজপ্রাসাদের বাঁ পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেছে 'কনিগ্‌শ ষ্ট্রাশে'। এই জনবহুল এবং অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ রাস্তাটী দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেলেই ডাইনে একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদোপম লাল রংএর বাড়ী

চোখে পড়ে। এটী বের্লিনের টাউন হল। এই বাড়ীটী প্রদক্ষিণ কোরছি, এমন সময় কিসের একটা আওয়াজ পেয়ে মাথার উপর চেয়ে দেখি একটা ছোট্ট জেপ্‌লিন উড়ে চোলেছে। Museum-island বা প্রাসাদ ও যাদুঘর দ্বীপ থেকে 'উণ্টারডেন্‌ লিন্‌ডেন্‌' ধোরে কিছু দূর গেলেই ডাইনে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও তার পরেই প্রাশিয়ান সরকারী গ্রন্থাগার। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়টী থেকে বিদেশী ছাত্রগণকে সব রকম সংবাদ সরবরাহ কোরবার জন্যে একটী বিশেষ বিভাগ আছে। এই বিভাগ থেকে কয়েকটী জিনিষ জানবার জন্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই। সেখানে আমার সদ্য-অর্জ্জিত অদ্ভুত জার্ম্মাণ ভাষার দ্বারা ছাত্রদিগকে আমার বক্তব্য জানানয় তারা সকলেই যথাসাধ্য আমায় সাহায্য কোরেছিল। একজন তার পড়ার ক্ষতি কোরেও আমার সঙ্গে থেকে বৈদেশিক বিভাগ খুঁজে কাজ উদ্ধার কোরে দিয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়টীতে ১৪৭৪০টী ছাত্র পড়ে (১৯৩০-৩১ সালের অঙ্ক)। এইটী ছাড়াও টেকনিক্যাল এ্যাকাডেমীতে (Techn Hochschule) ৬১০০ জন, এ্যাকাডেমী অফ কমার্সে ১৮৪০ জন, এ্যাকাডেমী অফ এগ্রিকালচারে ৪৩২ জন ছাত্র পড়ে। এই সব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এ্যাকাডেমী অফ মিউজিক, এক্যাডেমী অফ সেক্রেড এ্যাণ্ড স্কুল মিউজিক (sacred and school music), এ্যাকাডেমী অফ আর্ট, স্কুল অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে। এ ছাড়া বের্লিনে ১৬৩টী সেকেণ্ডারী, ৫৮৩টী প্রাইমারী ও ২৮টী ইণ্টার মিডিয়েট বিদ্যালয় আছে এবং বিশেষ বিষয় পড়বার জন্যে উনষাটটী মিউনিসিপ্যাল ও ৬০টী সাধারণ বিদ্যালয় আছে। বিশ্ববিদ্যালয়টীতে একটী ভোজনাগার আছে—যেখানে দরিদ্র ছাত্ররা সস্তায় ভাল খাবার পায়। প্রাশিয়ান গ্রন্থাগারের কাছেই বের্লিনের অন্যতম প্রধান রাস্তা 'ফ্রীড্রিশ ট্রাসে' 'উণ্টারডেন্‌ লিণ্ডেনের' বুক চিরে সমকোণ ভাবে চোলে গ্যাছে। এরই আশে-পাশে অনেকগুলি ছোট বড় রঙ্গমঞ্চ আছে। প্রকৃত পক্ষে এইটাই বের্লিনের রঙ্গালয়-পাড়া। বের্লিনে প্রায় ৪৫টী নাট্যশালা ও অসংখ্য নাচঘর অপেরা প্রভৃতি আছে। সেপটেম্বর থেকে মে মাস পর্য্যন্ত এইগুলি পুরো দমে চলে। এর পর উণ্টারডেন লিণ্ডেনের অপর মাথায় দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড 'ব্রাণ্ডেন্‌বুর্গ' তোরণ। এই সুউচ্চ তোরণটী রাস্তার এক দিক থেকে অপর দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং বিরাট গোল স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এথেন্সের একটী বিখ্যাত

আকাশ হইতে উইলহেল্‌ম্‌ গির্জ্জা ও পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তাসমূহ—বের্লিন

টাউনহল হইতে যাদুঘর দ্বীপের দৃশ্য—বের্লিন

স্থাপত্যের অনুকরণে এটী ১৭৮৮-৯১ সালে তৈরী হয়। দোতলা বাসগুলি অনায়াসে এর ভেতর দিয়ে পেরিয়ে যায়। এর উপরে একটী ধাতুময় চার ঘোড়ার রথ G. Schadowর জয়চিহ্ন স্বরূপ স্থাপিত আছে। এইটীর কাছেই বিখ্যাত "প্যারিস প্লাজ" এবং এ্যাকাডেমী অফ

পার্লামেণ্ট—সামনে বিসমার্কের মূর্ত্তি—বের্লিন

আর্টস। এইখান থেকেই "উইলহেল্ম ষ্ট্রাশে' বা বের্লিনের ডাউনিং ষ্ট্রীট বেরিয়েছে। উইলহেল্ম ষ্ট্রাশের ওপরেই জার্ম্মাণ প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদ, চ্যানসেলারএর বাড়ী এবং

হার্ডেনবুর্গষ্ট্রাসের সামনে উইলহোম গির্জ্জা—বের্লিন

চ্যানসারী ভবন। ব্রাণ্ডেনবুর্গ তোরণ পার হোয়েই টিয়ার গার্ডেনের সীমানা। এরই এক অংশে "প্লাজ-ডি-রিপাবলিক পার্ক।" এই সুবিস্তৃত পার্কটীর উপর জার্ম্মাণ পার্লামেণ্ট বা রিশ্‌ট্যাগ' ও'কলম্ অফ ভিকটী' (Column of Victory)। পার্লামেণ্ট সৌধটী প্রকাণ্ড বড়—বয়সের জন্য কালো হোয়ে এসেছে। সৌধের সামনে সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ রাজনীতিজ্ঞ বিশমার্কের একটী প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। পার্লামেণ্টের ঠিক সামনেই "ভিকটী কলম্" বা বিজয়স্তম্ভ। একটী উঁচু বেদী থেকে জয়স্তম্ভটী উঠেছে। জার্ম্মাণীর বিভিন্ন যুদ্ধের ইতিহাস এর গায়ে উৎকীর্ণ আছে। কোন বিশেষ উৎসবাদিতে জার্ম্মাণ সৈন্যরা এখানে এসে পূর্ব্ব বীরদের প্রতি সম্মান দেখায়। "প্লাজডি-রিপাব্লিক" থেকে রাস্তা সোজা বেরিয়ে "টিয়ার-গার্টেন ষ্ট্রাশেতে" পোড়েছে। এই রাস্তাটী প্রকাণ্ড চওড়া; পূর্ব্বে এখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এখানে অশ্বারোহণে ভ্রমণ কোরতেন; কাজেই এখানে অশ্বারোহীদের ও পাদচারীদের জন্যে আলাদা আলাদা রাস্তা আছে। দেশের অতীত রাজনৈতিক কবি, দার্শনিক প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মর্ম্মর মূর্ত্তি সমান্তর ভাবে এই রাস্তাটীর আগাগোড়া শোভা বর্দ্ধন কোরেছে। এর পর পূর্ব্বাঞ্চলে "বেলেভিউ প্যালেস" ছাড়া আর বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নাই। পশ্চিম অঞ্চলের (West end) দ্রষ্টব্যের মধ্যে "জু-গার্ডেন" "কাইজার উইলহেল্ম মেমোরিয়েল চার্চ্চ" ও প্ল্যানেটেরিয়াম। হিন্দুস্থান হাউস এই অঞ্চলেই। যাঁরা এখানে আসতে চান তাঁদের "বানহফস্যু" বা সারলোটেনবুর্গ ষ্টেশনে নামাই সুবিধা। যাঁরা পূর্ব্বাঞ্চলে নাম্‌তে চান তাঁদের বানহফ (ষ্টেশন) ফ্রিড্রিশ ষ্ট্রাশেতে নামাই সুবিধা। "বানহফস্যুর" কাছেই জু-গার্ডেন। এর জার্ম্মাণ উচ্চারণ "সুগার্টেন। 'জু'টীও প্রকৃত পক্ষে টিয়ার গার্টেনেরই অন্তর্ভুক্ত। চিড়িয়াখানার মধ্যে একটী এ্যাকোয়ারিয়াম (Aquerium) আছে। এখানে দর্শনী পৃথক দিতে হয়। জু-গার্টেনটী বেশ বড়;

সংগ্রহও যথেষ্ট। হাতী, জিরাফ, বাঘ প্রভৃতি গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের জীব জানোয়ারও রেখেছে। অনেক জীবই জলের খাল ঘিরে দ্বীপ সৃষ্টি কোরে ছেড়ে রাখা আছে। সন্ধ্যার সময় সমুদ্র-সিংহ, পিঙ্গুইন এবং শীল মাছকে খাওয়ানর দৃশ্য ভারী কৌতুককর ও উপভোগ্য। শীলটী মাছের লোভে ল্যাজের উপর ভর দিয়ে প্রায় সোজা হোয়ে দাঁড়াচ্ছিল; আর পিঠের-দিকে ল্যাজটা নেড়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিল। পিঙ্গুইনেরা খাবারের লোভে রীতিমত মারামারি আরম্ভ কোরে দিচ্ছিলেন। এক জায়গায় কতকগুলো খাঁদা প্যাঁচা পর্য্যন্ত ঘরবাড়ী পেয়েছে। হনুমান বাঁদরদিগকে একটা আলাদা ঘরে বন্ধ কোরে রাখা হোয়েছে। এখানে একটী আট বৎসরের খোকা গরিলার তার পরিচারকের গায়ে ঠেস দিয়ে আরাম কোরে বসার ভঙ্গী দেখে হাসতে হাসতে পেট ফাটবার জোগাড় হোয়েছিল। আর এক জায়গায় দেখি, একটী শিম্পাঞ্জি দিব্যি টেবিলের উপর বোসে পুরোদস্তুর সভ্য সাহেবী কায়দায় ডিস থেকে চামচ দিয়ে "সুপ" খাচ্ছে। অন্য এক জায়গায় একটা ভালুককে কৃত্রিম পাহাড় বানিয়ে যত দূর সম্ভব তার স্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে রাখা হোয়েছে। বাইরে থেকে ছেলেরা রুটীর টুকরো ফেলে দিচ্ছে; সে মাঝে মাঝে এসে সেগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আবার চিৎপটাং হোয়ে জলে ধুঁক্‌ছে। বোঝা গেল ইয়োরোপে গেলেও ভালুকের লাইফ ইনসিওরের প্রিমিয়াম কমবে না। অনেক মৃৎশিল্পী ও চিত্রকর এক একটী বিশেষ জন্তুর অবরোধের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতিমূর্ত্তি তৈরী কোরছে বা আঁকছে। পশুশালার একটা দিক বেশ সাজান-গোছান এবং আলোয় ভরা। বিকাল থেকেই বাদ্যমঞ্চে ঐক্যতান বাদ্য সুরু হয়। আর দর্শকের দল ক্লান্ত হোয়ে এসে এখানে বোসে বোসে তাই শোনে। এর ভিতর ছেলেদের খেলবার একটী মাঠ ও ভোজন-মন্দির আছে। পশু-শালার কাছেই প্লানেটেরিয়াম (Planetarium)। এর দর্শনী সত্তর ফেনিস। একটা প্রকাণ্ড গোল কক্ষ, ছাদটা একটা বিরাট খিলান-করা গম্বুজ। ভেতরের আলো ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার মত কমে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর গম্বুজের গায়ে অস্পষ্ট তারার মালা ফুটে ওঠে। ক্রমশঃ যতই অন্ধকার হোয়ে আসে ততই তারাগুলো স্পষ্টতর হয়। ক্রমে ক্রমে মনে হয় বুঝি কোন্ এক অন্তহীন বিরাট প্রান্তরের মাঝে অমাবস্যা রাত্রে দাঁড়িয়ে। আকাশে চাঁদ নাই; কিন্তু প্রত্যেকটী তারা নিজের নিজের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে; এমন কি, ছায়াপথটী পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। এর পর আকাশের

নিউপ্যালেস—পট্‌সড্যাম্

গায়ে দেখা যায় একটা উজ্জ্বল তীর এবং অন্ধকারের মধ্যেই শুনতে পাওয়া যায় অধ্যাপকের বক্তৃতা। খবিদ্যা-বিশারদ বক্তা বক্তৃতা এবং তীরের সাহায্যে আকাশের গায়ে প্রধান প্রধান গ্রহ-নক্ষত্রের নাম, ক্ষেত্র, অবস্থান-ভঙ্গী ও পরিবর্ত্তন বুঝিয়ে দেন। যা আমরা এখানে পুথির পাতায় বছরের পর বছর ধোরে পোড়েও সঠিক আয়ত্ত কোরতে পারি না, এখানে মাত্র ঘণ্টা দেড়েকে সে সম্বন্ধে বেশ একটা স্পষ্ট ধারণা হয়। স্বাধীন দেশের শিক্ষা-প্রণালীই আলাদা,—বিশেষ কোরে জনশিক্ষা।

আকাশ হইতে প্যারিসপ্লাজ ও ব্রান্ডেনবুর্গ তোরণ—বের্লিন

ফ্রিড্রিক যাদুঘর—বের্লিন

পশ্চিমের অঞ্চলের চিত্রশালা, নাচঘর, রঙ্গমঞ্চ পানীয়শালা (cafe) প্রভৃতি বিলাসমন্দিরগুলি সবই পশুশালার কাছাকাছি। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ছায়া-চিত্রশালার অধিকারী বের্লিন। জার্ম্মাণীর বিখ্যাত ছায়া ও কথক-যন্ত্র-শিল্প (talkie) উফার (Ufa) নাম চিত্রামোদী মাত্রেই জানেন। উফার অনেকগুলি নিজস্ব চিত্রশালা এই অঞ্চলে আছে। এইখানেই প্রকাণ্ড চৌমাথার উপর দাঁড়িয়ে সম্রাট উইল্‌হেল্মের স্মৃতি বুকে নিয়ে একটা গির্জ্জা। এটী ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে তৈরী। এখানকার অনেকগুলি বড় রাস্তা থেকে এই বিখ্যাত ধর্ম্মমন্দিরটীর সুউচ্চ চূড়াগুলি দেখা যায়; কারণ, অনেকগুলি বড় রাস্তা এর পায়ে এসে মাথা ঠেকিয়েছে। একদিন এইটীর কাছ থেকে একটা রাস্তা ধোরে সোজা হেঁটে চোলেছি,—রাত্রি তখন প্রায় ন'টা। প্রবাসে এটা আমার একটা খেয়াল ছিল। অজানা অচেনা রাস্তা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোলে যেতাম। তার পর কোনো চেনা রাস্তা পেতাম ভালোই; নইলে ভূগর্ভযান বা বাসের সাহায্যে যথাস্থানে ফিরে আসতাম। সেদিনও এমনি এঁকে বেঁকে রাস্তার পর রাস্তা পার হোয়ে চোলেছি,—হঠাৎ একটী মেয়ে এসে আমায় কি বোল্লে। ঠিক তার ভাষাটা বুঝলাম না। তবে ভঙ্গীটা কিছু যেন বুঝলাম। তবু অবুঝের ছল কোরেই জার্ম্মাণ ভাষায় বোল্লাম "ইংরাজি বলি, জার্ম্মাণ বুঝি না।" সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা আধা ইংরাজী ও জার্ম্মাণীতে যা বোল্লে তাতে সন্দেহের লেশমাত্র কেটে গেল। হন্‌হন্ কোরে এগিয়ে চোল্লাম। রাস্তায় লোক খুব অল্পই। কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার পাশের একটী বাড়ীর দরজা থেকে আর একটা মেয়ে কুশ্রী ভঙ্গীসহ অশ্লীল ইঙ্গিত জানাল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে কিছুদূর যেতেই সামনে চোখে পোড়ল "উইলহেল্ম মেমোরিয়াল চার্চ্চ"। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম—যা'হোক নিরাপদ জায়গায় এসে পৌছেছি। পরে হিন্দুস্থান হাউসে বন্ধুদের কাছে যখন গল্প করি যে আজ ঘুরতে

ঘুরতে এক অজানা রাস্তায় গিয়ে পড়েছিলাম,—তার নাম "ক্রুই ষ্ট্রাসে," তার পর হঠাৎ দেখি সামনে চার্চ্চটী, তখন বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই বোল্লেন "সে কি মশাই, ঐ রাস্তায় একলাই বেড়িয়ে এলেন—সঙ্গী জোটে নি ?" বুঝলাম ঐ পাড়াটারই সুনাম আছে।

টেলিফোনের ঘর আছে। সাধারণ ডাকের ব্যবস্থা ছাড়াও "রুড়পোষ্‌ত" অর্থাৎ টিউব পোষ্ট বা নলডাক আছে। এর জন্যে দক্ষিণা আলাদা। মোটর বা ট্রেণে-না দিয়ে এই সব চিঠি নলের মধ্যে পুরে হাওয়ার জোরে যথাস্থানে পৌছে দেয়—এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠি যায়।
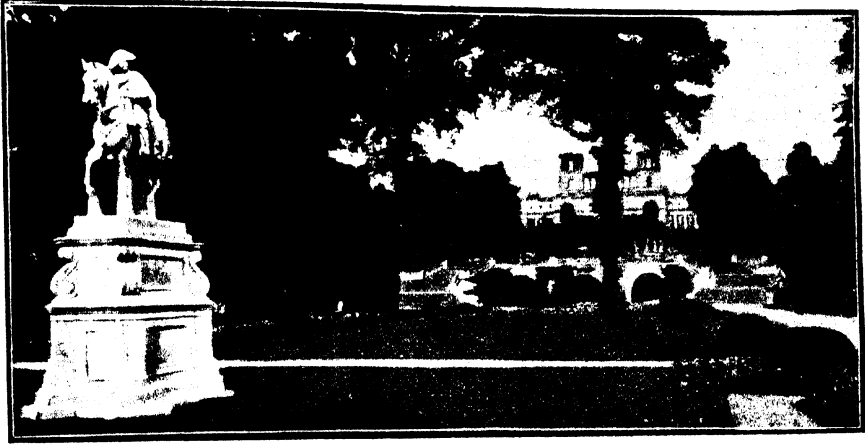
ওরানজেরী উদ্যান—পট্‌সড্যাম্

জু-গার্ডেনের কাছেই "বানহফ্ জু-টী" (জু-ষ্টেশন)ও সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নীচের তলায় খবরের কাগজ, বইএর দোকান, গহনা, সুটকেশ, ফুলের বড় বড় দোকান, ডাক ও তারঘর মুদ্রা-বিনিময় বিপণি, মালকামরা (luggage room), পুলিসের আড্ডা— উপরতলা দিয়ে রিং ভান বা ষ্ট্যাডভান চোলেছে। রিংভান ট্রেণটী বের্লিনকে গোল কোরে ঘিরে আছে এবং প্রায় বরাবরই মাটীর উপরে সহরের রাস্তাঘাটের উপর সাঁকো দিয়ে চোলেছে। বড় বড় জংসনগুলিতে উপরে উঠবার সিঁড়িগুলি বৈদ্যুতিক শক্তিতে চোলেছে। সিঁড়ির উপর শুধু দাঁড়ালেই নামিয়ে বা তুলে দেবে। আবার ইচ্ছা কোরলে চলা সিঁড়ির উপর পায়ে চোলেও তাড়াতাড়ি যাওয়া চোলবে। টিকিট অধিকাংশ জায়গাতেই "অটো-ম্যাটিক" অর্থাৎ কলে পাওয়া যায়। তবে যদি ২৫ ফেনিসের ভাঙ্গানী না থাকে তাহলে টিকিট-ঘরেও টিকিট কেনা চলে।

সহরের নানা জায়গায় স্বয়ংক্রিয় (automatic) বাইরে থেকে কোনো টেলিগ্রাম এলে, টেলিগ্রাম পাঠাবার আগেই সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে সে সংবাদ দিয়ে দ্যায়। পরে কাগজে লেখা সংবাদ আসে। ডাকঘরগুলি

সারলোটেনবুর্গ কবরস্থান

সাধারণতঃ সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে, এবং রবিবার দিন সকাল বেলা ৮টা থেকে ৯টা পর্য্যন্ত এক ঘণ্টা খোলা থাকে। নল-ডাকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত চিঠি দেওয়া চলে। রেলওয়ে ষ্টেশনগুলিতে

সারা দিনরাত্রি টেলিগ্রাম করা চলে। জার্ম্মাণীর বাইরে খামের ডাকমাশুল সাধারণতঃ (২০ গ্রামে) ২৫ ফেনিস এবং পোষ্টকার্ডে ১৫ ফেনিস। আর বের্লিনের মধ্যে চিঠিপত্র ৮ ফেনিস। টেলিফোন মাশুল ১০ ফেনিস। অর্থাৎ ভারতবর্ষের চেয়ে এই সবের দক্ষিণা কমই।

আমি যখন বের্লিনে ছিলাম, তখন সেখানে একটী প্রকাণ্ড LUFT DELA অর্থাৎ বিমানপোত-প্রদর্শনী চোল্‌ছিল। রিংভানে চোড়ে কয়েক জায়গায় গাড়ী বদল কোরে দেখতে গেলাম। এক মার্ক দর্শনী। আমি না জানায় দু' মার্ক দিয়েছিলাম ; এক মার্ক ফেরৎ দিলে। প্রকাণ্ড জায়গা জুড়ে প্রদর্শনীটী বোসেছে। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, এত বড় প্রদর্শনীটী কেবল বায়ুযান সম্বন্ধেই। আমাদের মতন "কচ্‌ঘাদা" অর্থাৎ জগা-খিচুড়ী নয় ; বা আনন্দচক্র (Joy wheel), জুয়া ও হরেক রকম প্রলোভন দিয়ে দর্শক আকর্ষণের ব্যবস্থা নেই। তবু ভিড় যথেষ্টই। প্রদর্শনীর প্রথম কক্ষটীর মাঝখানে নানা রকমের বিভিন্ন আকারের ও শক্তির ব্যোমযান রাখা আছে। চারধারের অলিন্দ (gallery)গুলিতে প্রাচীন পুঁথি, বই, ছবি ও নমুনা (model) দিয়ে পূর্ব্বেকার লোকদের ওড়ার কল্পনা এবং পরে মানুষ যে যে ভাবে উড়তে চেষ্টা কোরেছে এই সবের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। এই প্রদর্শনীতে যতগুলি বিমানপোত রাখা ছিল, তার সবগুলিরই অবয়ব (body) ও যন্ত্রাদি (engine) যে-কোন দর্শক নেড়েচেড়ে দেখতে পেত। বিভিন্ন কোম্পানী তাদের বিভিন্ন রকমের ব্যোমযানের যন্ত্রাদি বেচবার জন্য দোকান ভাড়া নিয়েছে। কেউ কুয়াসার মধ্যে বায়ুযান-চালকের চশমায় যাতে বাষ্পবিন্দু জোমে দৃষ্টি অবরোধ না করে, তারই পেটেণ্ট ঔষধ বেচ্‌ছে। কোথাও গ্লাইডার অর্থাৎ যন্ত্রশক্তিবিহীন আকাশযান বিক্রী হোচ্ছে। এগুলিকে অন্য কোন যন্ত্রযুক্ত ব্যোমযানের বা মটরের পিছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হয় ; এবং ব্যোমপথ-বিহারেচ্ছু ব্যক্তি তার মধ্যে চালন-চক্র হাতে নিয়ে বোসে থাকে। পরে যখন বেশ গতি লাভ করে, তখন সামনের হুকটীর মুখ খুলে

ফ্রিডিক দি গ্রেটের তৈলচিত্র

ইতিহাস বিজড়িত জীর্ণ "উইণ্ডমিল"—পট্‌সড্যাম্‌

দিলেই অপর যানটীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হোয়ে যায়। তখন "গ্লাইডারের" গতি, চালকের কৌশল ও বায়ুস্তরের গুরুত্বের ওপর নির্ভর কোরে এগুলি আকাশে উড়তে

আকাশ হইতে নিউপ্যালেস—পট্‌সড্যাম্‌

থাকে। সাধারণত: ৪।৫ ঘণ্টা অনায়াসে ওড়ে। এই গ্লাইডারে ওড়ার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক "রেকর্ড" বোধ হয় ৪৫ ঘণ্টার ওপর। এখানে দুই-আসন-বিশিষ্ট একটী "এরোপ্লেনের" দাম জিজ্ঞাসা কোরলাম; শুনলাম ৫৯০০ মার্ক (প্রায় অত টাকা)। গ্লাইডারের দাম প্রায় ৫০০ মার্ক। এইগুলি লম্বা-চওড়ায় ও আকারে সত্যকার এরোপ্লেনের মতই। "সিপ্লেন," "মোনোপ্লেন" প্রভৃতি এবং মাথার উপর প্রপেলারওয়ালা ট্যাঙ্কের (Tank) আকার বিশিষ্ট, স্থা ক্ক হী ন প্রভৃতি নানা রকমের এরোপ্লেনে প্রদর্শনীটী ভর্ত্তি। কি ভাবে ভুল নামার ফলে এরোপ্লেন ধ্বংস হয়, কি ভাবে প্যারাসুটে নামতে হয়, রাত্রে আলোকমালায় কি ভাবে সঙ্কেত হয়,—এ সমস্ত সত্যকার জিনিস দিয়ে বোঝান আছে। এখানে যে কয়েকটী দোকান বোসেছিল, সবগুলিই ছোট-বড় খেলনার এরোপ্লেনই বিক্রী কোরছিল; অন্য কিছুর দোকান ছিল না। আন্তর্জাতিক ব্যোমপথের নক্সার ও ভাড়া বলবার জন্যে একটী সরকারী দপ্তর ছিল। একটী প্রকাণ্ড হলে কি ভাবে এরোপ্লেনের প্রত্যেকটী অংশ তৈরী হয় তা হাতে-কলমে তৈরী কোরে দেখাচ্ছিল। এরোপ্লেনগুলির শরীর অত্যন্ত পাতলা। যথাসম্ভব পাতলা কাঠের কাঠাম এবং পাখাগুলো

রাস্তার উপর তোরণ—পট্‌সড্যাম্‌

ক্যাম্বিশের মত এক রকম কাপড় দ্বারা নির্ম্মিত; অর্থাৎ যথাসম্ভব হালকা। এই জন্যেই বোধ হয় ধাক্কা লাগলেই

এরোপ্লেনে এত শীগ্‌গির আগুন ধরে যায়। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির যুগে অবশ্য এখন ৪০-৫০ জন যাত্রীবাহী বড় বড় ব্যোমযানও তৈরী হোচ্ছে। প্রদর্শনীর মধ্যেই একটা

"গ্রীবনিজসি"-হ্রদ—পট্‌সড্যামের পথে
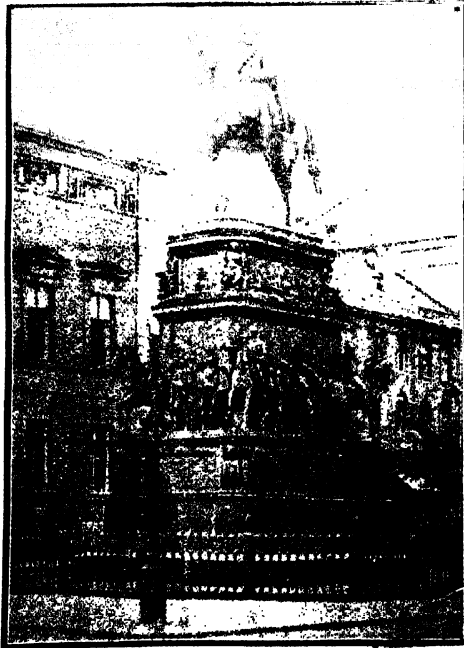
উন্‌টারডেনলিণ্ডেনে ফ্রিড্রিক দি গ্রেটের প্রতিমূর্ত্তি

ভোজনাগারে মধ্যাহ্ন-ভোজন সারলাম। এই প্রদর্শনী-ক্ষেত্রটার আয়তন ছিল ৭৫০,০০০, বর্গফুট। এর বুকেই ছিল প্রকাণ্ড উঁচু বেতারবার্ত্তা সরবরাহকারক লৌহস্তম্ভ। এই স্তম্ভটার উপর তলায় ইফেল টাওয়ারের মত মাটী থেকে ১৭৭ ফিট উর্দ্ধে একটী 'রেষ্টুরাণ্ট' আছে। এর কাছেই জগতের বৃহত্তম বেতারবার্ত্তা সরবরাহ কেন্দ্র। এখানে তিনটী ষ্টুডিও আছে। বাড়ীটার সামনের দৈর্ঘ্য ৪৯২ ফিট। প্রদর্শনীটী দেখবার পর এরোপ্লেন সম্বন্ধে মোটামুটি বেশ একটা জ্ঞান হয়। এই রকম সব প্রদর্শনীর সাহায্যে ওরা বিজ্ঞানকে জনসাধারণের মাঝে এমন কোরে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। এই সব সরকারী প্রচেষ্টার ফলেই ওদের সারা দেশ এত বৈজ্ঞানিক হোয়ে উঠেছে। এর পর একদিন বের্লিনের সবচেয়ে বড় বিমান-পোতাশ্রয় "টেম্পলহফ" (Templehof) দেখতে গিয়েছিলাম। প্রবেশ-মূল্য ২০ ফেনিস। প্রকাণ্ড বড় ময়দানের এক দিকে কার্য্যালয়, ভোজনাগার, বিমান-পোতাশ্রয়, আলোক-সঙ্কেতের স্তম্ভ, ঘর-বাড়ী। অন্য তিন দিক খোলা। মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড বড় বড় অক্ষরে লেখা BERLIN। মাঝে মাঝে মাঠের মাঝখানে এক একটা বোমের আওয়াজ হোচ্ছিল ;—বোধ হয় সঙ্কেত-ধ্বনি। অনেক এরোপ্লেন যাওয়া-আসা কোরছিল। কোনো কোনোটা মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে থেমে চিঠিপত্র দিয়ে বা নিয়ে পেট্রল ভরে আবার চোলে যাচ্ছিল। একটী এরোপ্লেন কখনও সোজা হোয়ে মাটীর সঙ্গে সমকোণ কোরে, কখনও সম্পূর্ণ পাশ ফিরে, কখনও চিৎ হোয়ে উড়ছিল। আবার কখনও অনেক উঁচু থেকে মাটীর দিকে নাক ঠুকে, পোড়তে-পোড়তে, ওলট-পালট খেতে-খেতে, দর্শকদের মধ্যে আতঙ্ক জাগিয়ে তুলে, পরক্ষণেই আবার সোজা হোয়ে উঠে যাচ্ছিল। এখানকার সমস্ত এরোপ্লেনের সামনে একটী কোরে পাখা দেখলাম। মাঠটার চারি দিকে অনেকগুলি উচ্চভাষী যন্ত্রের (loud speaker) সাহায্যে ব্যাণ্ডের বাজনা মাঠময়

ছড়ান হোচ্ছিল। এখানকার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় ভোজনশালার দোতলায় খোলা ছাদের উপর বোসে চা পান সত্যই উপভোগ্য। তবে তার মূল্যও উল্লেখযোগ্য। চা-রুটী ও মাখনের দাম দিতে হয়েছিল দেড়মার্ক। এখানকার কার্যভবনে ব্যোমপথ-যাত্রা ও বিমান-ডাক সম্বন্ধে সকল খবর পাওয়া যায়। এখান থেকে জগতের বিভিন্ন দিকে ২২টী পথে নিয়মিত ভাবে বিমান-পোত যাতায়াত করে। এই বিরাট মাঠটী ছাড়াও Staa-kenএ জেপিলিনের আর একটী মাঠ আছে। রিংভান ও U-Bhan (ভূগর্ভযান) উভয় পথেই এখানে যাওয়া যায়।
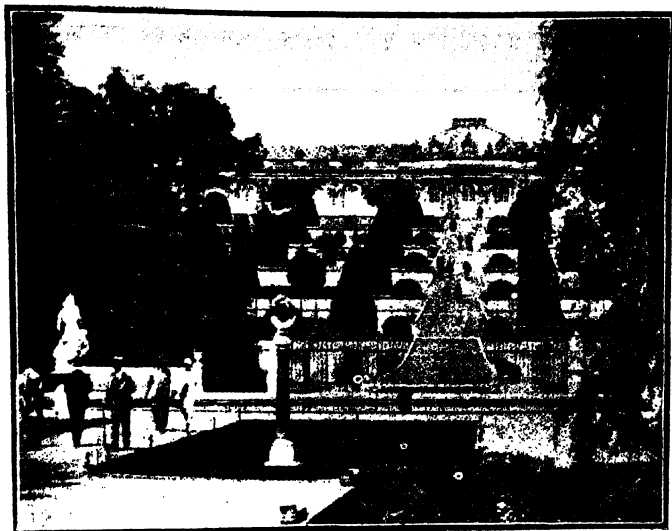
জুলগ গার্টেন (Zoolog garten) ষ্টেশনের কাছেই একটী বেসরকারী সিনেমা-প্রদর্শনী বোসেছিল। সামান্য কিছু দর্শনী দিয়ে ঢুকলাম। নানা বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চিত্রে কক্ষ দুটী পূর্ণ। এক দিকে অনেকগুলি অশ্লীল চিত্রের টিনের বাক্স রাখা আছে। একখানি কোরে ছবি দেখা যাচ্ছে। যন্ত্রগুলি স্বয়ংক্রিয় সামনের গর্ত্তে (slot) পয়সা দিলে হাতল ঘুরিয়ে বাকী ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। ছবি-গুলির সামনের কাচের কায়-দায় ছবিগুলিকে প্রায় সজীব দেখায়,—আপেক্ষিক দূরত্বাদি স্পষ্ট হয়। মানুষের রিরংসা-প্রবৃত্তির সুযোগ নিয়ে জগতের সর্ব্বত্রই পয়সা রোজগার চোলেছে। কেউ এই সব ছবি দেখে আকাঙ্ক্ষা মেটায়; কেউ ছোটে নাচঘরে, কেউ মুলারুজে, কেউ ফলিজ বুর্জ্জোয়ায়, কেউ রঙ্গমঞ্চে বা চিত্রশালায়, কেউ-বা বেশ্যালয়ে। আসলে সবার মনের প্রবৃত্তির কেন্দ্র একই—কারু প্রকট, কারু বা প্রচ্ছন্ন। এখানে

সাঁসোসিপ্রাসাদ—পট্‌সড্যাম্‌

কি ভাবে trick film অর্থাৎ মিকি মাউস প্রভৃতি নির্জ্জীব জীবের নড়াচড়া দেখান ফিল্ম তৈরী হয়, তা দেখান আছে। কি ভাবে সত্যিকার বরফের বদলে খেলনার বরফ, ঘরবাড়ী তৈরী কোরে ফিল্ম তোলা হয়

"কারফিরষ্টানড্যাম" রাস্তা—হিন্দুস্থান হাউসের কাছেই

ইত্যাদিও দেখান আছে। সাতাশ বছর আগে যখন জার্ম্মাণীতে ফিল্ম জন্ম গ্রহণ করে, তখন কি ভাবে তা প্রদর্শিত হোত, তা একজন লোক ঠিক আগেকার সিনেমার মত একটা অপরিসর চুন-বালি খসা, বিজ্ঞাপনের-কাগজ-আঁটা ঘরে পুরানো ফিল্ম ঘুরিয়ে দেখায়। সে

সারলোটেনবুর্গ প্রাসাদ

আমলে একজন লোক পর্দ্দার পাশে দাঁড়িয়ে চীৎকার কোরে ঘটনাবলী বোলে যেত। এই লোকটী বড় রসিক—সে-আমলের ফিল্মের দোষ-ত্রুটী বেশ রসিকতা সহকারে

"ইলেকটারস্ ব্রিজ" প্রাসাদ ও ক্যাথিড্রাল

বোলে যাচ্ছিল। যেমন, অদৃশ্য হাত দেখিয়ে বাপ মেয়েকে বোল্লেন 'যাও'; অর্থাৎ বাপ ক্যামেরার দিকে পেছন ফিরে হাত দেখানয় হাতটী ফিল্মে উঠে নাই। মাত্র

সাতাশ বৎসর আগে জার্ম্মাণীর মেয়েদের পোষাক ছিল ঠিক পেঁয়াজের খোসার মত,—একটার পর একটা ছেড়েই চোলেছে, তবু স্নানের পোষাক পরবার অবস্থা আসছে না। আর আজকের মেয়েদের পুরো পোষাক পরা সত্বেও লজ্জা নিবারণ দুষ্কর। তবে কি না লজ্জাটাই গ্যাছে কমে; কাজেই নিবারণের তত প্রয়োজন হয় না।

বের্লিনের যানবাহন-নিয়ন্ত্রণ প্যারী অপেক্ষা ভাল বোলে মনে হোল। সবই স্বয়ংক্রিয় আলোক-চিহ্ন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোচ্ছে। মোটরগুলি হুড়ো-হুড়ি কোরে আগে যাবার চেষ্টা করে না,—একটা নির্দ্দিষ্ট গতিতে সকলেই চোলেছে। তবে ভূগর্ভযানের নির্দ্দেশাদি (direction) প্যারীতে ভাল মনে হোল। এখানে অপরিচিত ষ্টেশন খুঁজে বার কোরতে প্যারিস থেকে কষ্ট হয়। বের্লিনে কয়েকটী 'অটোম্যাট' দোকান আছে। সেগুলি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খোলা থাকে। অন্যান্য খাবারের দোকান রাত্রি ন'দশটার পর বন্ধ হোয়ে যায়। কাচের বাক্সয় খাবার ডিসে কোরে সাজান আছে ও দাম উপরে লেখা আছে। যেটীতে খুসী পয়সা দিলেই ডিস-শুদ্ধ খাবার বেরিয়ে আসে। কাজেই বিক্রী কোরবার দোকানী নাই। কেবল ডিসগুলি ধোবার ও কাঁটা-চামচ দেবার জন্যে লোক আছে। বের্লিনের সব অটোম্যাটেই জিনিষ না থাকলে পয়সা বেরিয়ে আসে। কতকগুলিতে ভাঙ্গানীও পাওয়া যায়। এখানে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত রাস্তায় খবরের কাগজ বিক্রী হয়।

বের্লিনের অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে প্রকাণ্ড ষ্টাডিয়ামটী (stadium) উল্লেখযোগ্য। এখানে দৌড়বার ও সাইকেলের জন্য আলাদা পথ আছে। একটী প্রকাণ্ড পুকুর, খেলবার মাঠ ও ব্যায়ামের আখড়া আছে;

প্রায় পঞ্চাশ হাজার দর্শকের আসনের ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া সারলোটেনবুর্গ প্রাসাদ (Charlotenburg palace) বোট্যানিকেল গার্ডেন, জার্ম্মাণ স্পোর্টস ফোরাম (German Sports Forum), বিভিন্ন খেলার মাঠ, বিবিধ যাদুঘর প্রভৃতি বহু জিনিষ এখানে দেখবার আছে। তবে সে গুলো তত উল্লেখযোগ্য নয়।

বের্লিন আজ পৃথিবীর বৃহত্তম নগরী সমূহের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার কোরেছে। কিন্তু যে দ্রুত গতিতে সে তার প্রতিযোগী লণ্ডন ও নিউইয়র্কের সঙ্গে পাল্লা দিয়েচোলেছে, তাতে মনে হয় হয়ত সে কোন্ দিন এগিয়ে পোড়বে—যদি না ইতিমধ্যে বিধাতার কোনো অলক্ষিত রুদ্র রোষে সে ভস্মীভূত হয়। ইয়োরোপ এখন যে সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চোলেছে, তাতে যে-কোনো দিন একটা প্রলয়ঙ্করী দুর্ঘটনা যে ঘোটতে পারে, সকলেই এ আশঙ্কা কোরছেন। কাজেই সে ঝঞ্ঝায় যে কোন্ দেশের কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে তা বলা শক্ত। তবে যাঁর অলক্ষিত ইঙ্গিতে ১৩০৭ সালের কোলন (Kolln) ও বের্লিন নামে দুটী অতি ক্ষুদ্র জেলেদের গ্রাম আজ পৃথিবীর তৃতীয় সহর বোলে পরিগণিত হোয়েছে, কে জানে সেই খামখেয়ালীর খেয়াল ভবিষ্যতে তাকে কি রূপ দেবে!

বের্লিনের নগরশোভা ছাড়াও সহরের উপকণ্ঠে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও চমৎকার। বের্লিন থেকে কয়েক মাইল দূরেই 'পট্সড্যাম্' তার প্রাকৃতিক ও প্রাসাদশোভার জন্যে বিখ্যাত। বের্লিন থেকে মোটরে, ষ্ট্যাড্-ভানে এবং ষ্টীমারেও এখানে যাওয়া চলে। ষ্টীমারে যাওয়াই উপভোগ্য। 'গ্রোসার ভানজি' বা 'গ্রিবনিজজি' যে-কোনো হ্রদ দিয়ে এখানে মোটরলাঞ্চে যাওয়া চলে। দুটী হ্রদেরই পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চমৎকার।
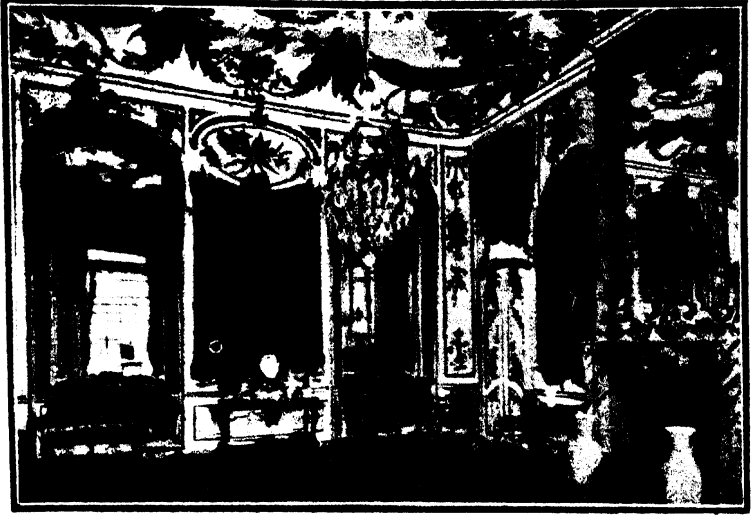
সাঁসোসি প্রাসাদের ঐক্যতান কক্ষ
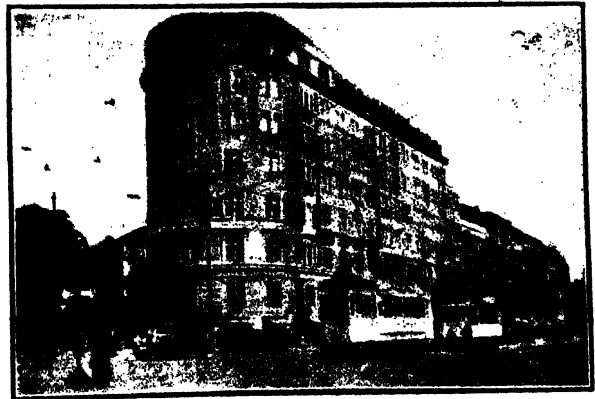
বের্লিনের একটী প্রকাণ্ড বাড়ী

কাইজার উইলিয়াম সেতুটীকে পট্সডামের প্রবেশ-পথ বলা যেতে পারে। এইটী পার হোয়েই বাঁয়ে চমৎকার

লাষ্ট গার্টেন (Lust garten) উদ্যান একেবারে শান্ত-সলিলা স্রোতস্বতীর ধারেই। আরো কিছু দূর এগিয়ে গেলে কয়েকটা চার্চ্চ ও বড় বড় অট্টালিকা চোখে পড়ে। সহরটা খুব জনবহুল মনে হোল না। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানকার বর্ত্তমান বাসিন্দার সংখ্যা ৭২৪০০

খোকা গরিলার আয়েষ চিড়িয়াখানা—বের্লিন

জন। এটা হিসাব-পরীক্ষা (audit) প্রভৃতি কয়েকটা সরকারী বিভাগের প্রধান কার্য্যপীঠ। সহরটা পাহাড় ও জলের কোলে চমৎকার ছবির মত দেখায়। ফ্রিডারিক

হিন্দুস্থান হাউসে একটা প্রীতিভোজ ছবির বামদিকের শ্রেণীর দ্বিতীয় চেয়ারে লেখক

দি গ্রেট এই সহরটা নির্ম্মাণ কোরেছিলেন এবং এখানকার যা কিছু বর্ত্তমান দ্রষ্টব্য সব তাঁরই আমলের। এখানকার বিখ্যাত সাঁসোঁসি (Sanssonci) প্রাসাদ ফ্রিডারিক দি গ্রেট ১৭৪৫-৪৭ খৃঃ অব্দে নিজের পছন্দমত তৈরী করান। এই প্রাসাদটী অনুপম না হোলেও পৃথিবীর অতি অল্পসংখ্যক প্রাসাদের সঙ্গেই এর উপমা দেওয়া চলে। প্রকাণ্ড ২১০০ বিঘা বিস্তৃত উদ্যানের উপর এই রাজপ্রাসাদ। এর ফোয়ারা থেকে ৯৮ ফিট ঊর্দ্ধে জলধারা উৎক্ষিপ্ত হয়। চত্বরে-চত্বরে সিঁড়ির থাক উঠে গেছে। প্রত্যেকটা চত্বরই সুবিন্যস্ত ভাবে গাছপালা দিয়ে সাজান। এই প্রাসাদের মর্ম্মর-কক্ষ (marble hall), সঙ্গীত-কক্ষ (concert hall), গ্রন্থাগার এবং যে কক্ষে সম্রাট ফ্রিডারিক চল্লিশ বৎসর এই প্রাসাদে বাস করার পর দেহত্যাগ করেন সেইটী সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সম্রাটের কাছে পটসড্যামও যেমন তার সৌন্দর্য্য ও প্রতিষ্ঠার জন্য ঋণী, তেমনি বের্লিনও বহু বিষয়ে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতার বের্লিন স্বীকার কোরেছে 'উন্‌টারডেন্‌ লিণ্ডেনের' বুকে তাঁর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কোরে ও বিখ্যাত রাস্তা "ফ্রেড্রিস্‌ট্রাসে" তাঁর নামে উৎসর্গ কোরে।

পটস্‌ড্যামের অপর একটী দ্রষ্টব্য "নিউ প্যালেস্‌"। এই প্রাসাদটীতে ২০০টী কক্ষ আছে। এর মধ্যে মর্ম্মর-কক্ষ (marble hall) ও গ্রোটোহল (Grotto hall) উল্লেখযোগ্য। এটীও ১৭৬৩-৬৯ সালে নির্ম্মিত হয়। এর পরই উল্লেখযোগ্য ওরানজেরিস প্রাসাদ (Orangeries Schoess)। এটীর একটী কক্ষের নাম বিখ্যাত চিত্রকর র‍্যাফেলের নামে উৎসর্গীকৃত করা আছে। এটীর সংলগ্ন একটী বেশ বড় শীতোদ্যান (winter garden) আছে। পটস্‌ড্যামে একটী জীর্ণ উইণ্ডমিল আছে। সেটী সম্বন্ধে প্রবাদ যে ফ্রিডারিক তার শব্দে বিরক্ত হোয়ে সেটা ভেঙ্গে ফেলতে বলেন; কিন্তু তার দরিদ্র মালিক তার সম্পত্তি রাজাদেশে ছেড়ে দিতে অসম্মত হয় এবং সম্রাটের আদেশ, অনুরোধ ও অর্থ উপেক্ষা করে। সম্রাট সেটী নষ্ট কোরতে পারেন নি। এই জীর্ণ কাঠামোটী আজও ন্যায়পরায়ণ সম্রাটের মহত্বের ও দরিদ্র প্রজার নির্ভীকতার সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান।

এখানে রাস্তার ওপরে দুধারে দুটী প্রকাণ্ড মিনার-

ওয়ালা তোরণ দেখেছিলাম—এর নাম বা ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ কোরতে পারি নি। এসব ছাড়াও এখানকার দ্রষ্টব্য 'রয়্যাল টাউন রেসিডেন্স', 'সারলোটেন হফ", 'চার্চ্চ-অফ সেণ্ট নিকোলাস' ইত্যাদি। কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ায় এগুলি দেখবার অবকাশ পাই নাই। ফিরবার পথে ষ্ট্যাডভানেই ফিরলাম।

অবশেষে যে সব বন্ধুদের সাহচর্য্যে ও সাহায্যে এই বিদেশে আমি নিরাপদে বেড়িয়েছি, পথের সন্ধান নিয়েছি, তাঁদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানালে এ কাহিনী অপূর্ণাঙ্গ হোয়ে থাকবে। প্রায় এক মাস যাঁরা আমায় বন্ধুর সম্মানে, ভায়ের আদরে রেখে দেশের অভাব ভুলিয়েছিলেন, আমার সেই সমস্ত সুদূর-প্রবাসী বন্ধুদিগকে আজ কৃতজ্ঞতায় নতি জানাচ্ছি। জানি না আজ হিটলারের রাজত্বে অনার্য্যের দলে পোড়ে তাঁরা কি অবস্থায় বাস কোরছেন। মনে আছে, আমি যখন বের্লিনে ছিলাম, তখন এই নাজিরাই বেআইনী ঘোষিত হোয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে কোরে আমাদের কাছে ভিক্ষা চেয়ে গেছে, আর আজ সেই ভিখারীর দল সম্রাট। তাদের চোখে আমরা অনার্য্য—যেহেতু আমাদের তার প্রতিবাদ কোরবার শক্তি ও সাহস নাই। অথচ জাপান অনার্য্য ঘোষিত হোয়েও চোখ রাঙ্গিয়ে আর্য্যের আসন ফিরে পেয়েছে। জগৎ-সভায় প্রথম আর্য্য কণ্ঠে যারা সভ্যতা ও জ্ঞানের বাণী শুনিয়েছিল, শিখিয়েছিল—জ্ঞান-চর্চ্চা, স্বাধীনতা ও শক্তির অভাবে আজ তাদের মৃত্যু হোয়েছে—তাদের কঙ্কাল কাপুরুষের দল আজ আবার বিশ্ব-সভায় অনার্য্য বোলে ঘোষিত হোল!

অস্পৃশ্য আচার্য্য নম্পদোয়ান্ ও তিরুপ্পনালোয়ার

স্বামী সুন্দরানন্দ

গত তামিল কার্থিকাই (Karthikai) মাসে দক্ষিণ ভারতের সুবিখ্যাত অস্পৃশ্য চণ্ডাল সাধক—নম্পদোয়ান্ (Nampaduran) ও পঞ্চম তিরুপ্পনালোয়ার (Tiruppanalwar) এর জন্মতিথি উৎসব তামিল দেশের সর্ব্বত্র বিশেষ সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। দক্ষিণ দেশের উচ্চ শ্রেণীর গোঁড়া সমুদ্রী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এই অস্পৃশ্য মহাপুরুষদ্বয়ের উৎসব প্রধানতঃ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের তথাকথিত স্পৃশ্য অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা সত্ত্বেও এই অস্পৃশ্য আচার্য্যদ্বয়ের প্রতি সবর্ণ হিন্দুগণের শ্রদ্ধাপ্রদর্শন হিন্দু ধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ ঔদার্য্যই ঘোষণা করে।

মহাত্মা নম্পদোয়ানের ইতিবৃত্ত "বরাহ পুরাণ"এ উল্লিখিত আছে। শ্রীবিষ্ণু বরাহ-অবতারে তৎপত্নী ভূ-দেবীর নিকট ইহা বর্ণনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহাবৈরাগ্যবান নম্পদোয়ান জাতিতে 'চণ্ডাল' ছিলেন এবং ভগবানে তাঁহার অনন্যসাধারণ ভক্তি ছিল। সাধক রামপ্রসাদের মত সঙ্গীত তাঁহার উপাসনার প্রধান অঙ্গ ছিল। রাত্রিকালে যখন সকলে গভীর নিদ্রামগ্ন থাকিতেন, তখন তিনি 'বীণা' লইয়া প্রত্যহ জনপ্রাণীশূন্য এক সুদূরস্থ প্রান্তরে যাইয়া দেব বিনিন্দিত কণ্ঠে আত্মহারা হইয়া দীর্ঘকাল শ্রীভগবানের গুণগান করিতেন। কথিত আছে, একদিন যখন তিনি নিশীথে এইরূপভাবে গন্তব্য স্থানে যাইতেছিলেন, তখন এক ব্রহ্ম-রাক্ষস রাস্তায় তাঁহাকে ধৃত করেন। এই রাক্ষস পূর্ব্ব জীবনে ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু তিনি নানাভাবে ভীষণ অপকর্ম্ম করার ফলে দেহান্তে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হন। ভীতিপূর্ণ বিকটাকৃতি ব্রহ্ম-রাক্ষস তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সাধু নম্পদোয়ানকে তাঁহার দেহ দান করিতে অনুরোধ করেন, তিনি ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলেন, "যদি আমার এই নশ্বর দেহদানে তোমার কিছুমাত্র উপকার হয়, তাহা হইলে আমি সানন্দে উহা দান করিতে প্রস্তুত। যদি আমার ভৌতিক দেহের বিনিময়ে একটী জীবেরও কল্যাণ হয়, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। সুতরাং আমি হৃষ্ট চিত্তে তোমাকে উহা নিশ্চয় দান করিব। কিন্তু আমার নিত্যকর্ম্ম আজ এ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই। আমাকে কিছু সময় দাও। আমি কর্ত্তব্য সমাপনান্তে এখানে আসিয়া তোমাকে নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণ করিব।" ব্রহ্মরাক্ষস এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে তিনি তাঁহার নির্দ্ধারিত স্থানে যাইয়া, বীণা বাদ্য সহযোগে সুললিত কণ্ঠে ভজন-সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। আজ তাঁহার লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত ও মূল্যহীন অস্পৃশ্য জীবন পরার্থে দান করিবার সুযোগ উপস্থিত, এ আনন্দ তাঁহার আর ধরে না। এই ত্যাগের—এই আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া মানুষ অকুণ্ঠিত হৃদয়ে উন্মাদের মত সর্ব্বস্ব মিলাইয়া দেয়। কি অপার্থিব, কি অলৌকিক এই উন্মাদনা! ভাবের আতিশয্যে তিনি অনেকক্ষণ ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত ভজন করিয়া নির্দ্ধারিত স্থানে ব্রহ্মরাক্ষসের নিকট আসিয়া প্রতিশ্রুতি মত দেহদানের সংকল্প জানাইলেন। ব্রহ্মরাক্ষস এই নিরক্ষর অস্পৃশ্য চণ্ডাল সাধকের অপূর্ব্ব ভাবভক্তি এবং অশ্রুতপূর্ব্ব আত্মত্যাগে মোহিত হইয়া বলিলেন, "যদি আপনার অদ্য রাত্রির সাধন ফল আমাকে অর্পণ করেন তাহা হইলে

আপনাকে আমি ছাড়িয়া দিতে পারি।" মহাত্মা নম্পদোয়ান্ তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ-দান করিতে প্রস্তুত থাকিলেও তদীয় সাধন ফল দান করিতে সম্মত ছিলেন না। পরে ব্রহ্মরাক্ষস আবেগভরে সাধকশ্রেষ্ঠ নম্পদোয়ানের শ্রীপাদপদ্মে আপনার উদ্ধারের জন্য সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন। এইরূপে অতি নীচ জাতীয় অস্পৃশ্য চণ্ডাল নম্পদোয়ান্ করুণা-পরবশ হইয়া তাঁহার মাত্র এক রাত্রির সাধন-ফল দান করতঃ অতি উচ্চ জাতীয় একজন ব্রাহ্মণকে রাক্ষস-দেহ হইতে মুক্তিদান করেন। যে ভজন সঙ্গীতের ফল তিনি ব্রহ্ম-রাক্ষসকে দান করিয়াছিলেন, উহা তামিল দেশে "কৈশিক" বলিয়া আজও প্রসিদ্ধ। চণ্ডাল কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের এইরূপ উদ্ধার সাধনের ইতিবৃত্ত তামিল 'কার্থিকাই' মাসের শুক্লা দ্বাদশী বা "কৈশিকদ্বাদশী" তিথি (২০শে নবেম্বর, ৩৩)তে দক্ষিণ দেশের সকল বৈষ্ণব-মন্দিরে পঠিত হইয়াছে। কথিত আছে যে আচার্য্য রামানুজের ঠিক পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্য পরাশর ভট্টর শ্রীরঙ্গমের বিখ্যাত বিষ্ণু-মন্দিরে বিশেষ ভক্তি সহকারে একবার ইহার পাঠ সমাপন করিলে মন্দিরাধিষ্ঠিত বিগ্রহ "রঙ্গনাথ" (Ranganadha) এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে উক্ত ভক্তরাজ 'ভট্টর'কে মিছিল করতঃ তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইতে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। আচার্য্য পরাশর 'ভট্টর' বংশধরগণ তদবধি এই বিখ্যাত মন্দিরে প্রতি বৎসর 'কৈশিক দ্বাদশী' তিথিতে এই অপূর্ব্ব পুরাণ পাঠ করেন এবং পাঠকের সম্মানার্থ অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত 'মিছিল' বাহির করা হইয়া থাকে।

তামিল দেশের যে দশজন আলোয়ার্ বা মহান সাধু প্রত্যেক বিষ্ণু-মন্দিরের প্রধান বিগ্রহের সঙ্গে পূজিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে তথাকথিত অস্পৃশ্য তিরুপ্পনালোয়ার অন্যতম। কাবেরী নদীর তীরস্থিত শ্রীরঙ্গম হিন্দুদের পরম পবিত্র তীর্থস্থান, যোগী তিরুপ্পনালোয়ার ইহার অপর তীরে "উরাইউর্" (Oraiyur) নামক পল্লীতে বাস করিতেন। তিনি অস্পৃশ্য পঞ্চমা জাতিভুক্ত বলিয়া তাঁহার এই তীর্থক্ষেত্রে পদবিক্ষেপের অধিকার ছিল না। 'শ্রীরঙ্গনাথকে' দর্শনের অধিকার না পাইলেও তাঁহার উপর এই অস্পৃশ্য সাধকপ্রবরের অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি প্রত্যহ পুণ্যতোয়া কাবেরী নদীর তীরে উপবেশন করতঃ অপর পার্শ্বস্থিত মন্দিরের দিকে লক্ষ্য করিয়া 'শ্রীরঙ্গনাথ'এর শ্রীমূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিতেন। কথিত আছে যে একদিন উক্ত মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ লোকষড়ঙ্গ মুনি (Loke Saranga Muni) কোন কার্য্য ব্যপদেশে অপর তীরে যাইয়া 'পানার' (Panar) বা পঞ্চমা জাতির তিরুপ্পনকে ধ্যান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে উঠিয়া যাইতে বলেন, কারণ, ব্রাহ্মণদেব বিধান মতে তাঁহার ধ্যান করিবার অধিকার নাই। কিন্তু তিনি তৎকালে ধ্যানে এরূপ সমাধিমগ্ন ছিলেন যে ব্রাহ্মণের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। ইহাতে ব্রাহ্মণ-প্রবর ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি একটী প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করেন। লোষ্ট্রটী তাঁহার মুখে লাগিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি স্বভাবসিদ্ধ দীনতাবশে রক্তধারা প্রক্ষালন করিতে করিতে নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় ব্রাহ্মণপুঙ্গবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পূজারী ষড়ঙ্গ মুনি তদীয় কর্ত্তব্য সমাপনান্তে নদী পার হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র বুঝিতে পারিলেন যে বিগ্রহ শ্রীরঙ্গনাথ কোন অজ্ঞেয় কারণে তাঁহার প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সেই দিনই তিনি অস্পৃশ্য সাধক তিরুপ্পনএর বাড়ী যাইয়া ক্ষমাভিক্ষা করতঃ তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া শ্রীরঙ্গনাথের সম্মুখে আনয়ন করিবার জন্য 'আকাশ-বাণী' প্রাপ্ত হন। এই ব্রাহ্মণেরও যথেষ্ট ভাব-ভক্তি ছিল। তিনি এই দেবাদেশে নিজকে কৃতার্থ মনে করতঃ পঞ্চমা সাধু তিরুপ্পনের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়া, তাঁহাকে স্কন্ধে বহনপূর্ব্বক বিগ্রহের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করেন। যোগীরাজ তিরুপ্পন 'শ্রীরঙ্গনাথের' শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে একাগ্র ভাব বিহ্বল অন্তকরণে তাঁহার উদ্দেশে যে সকল স্তব-স্তুতি ও প্রার্থনা করিয়াছিলেন, উহা তামিল-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ স্বরূপে পরিগণিত। অদ্যাবধি উহা সর্ব্বশ্রেণীর ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধাসহকারে ভজন-স্বরূপে গীত। পূজারী ব্রাহ্মণ লোকষড়ঙ্গ মুনির স্কন্ধে চড়িয়া মন্দিরে আসিয়াছিলেন বলিয়া—যোগী তিরুপ্পনালোয়ার "মুনি-বাহন" বা "যোগী-বাহন" বলিয়া সাধারণে সম্মানিত। এই তথাকথিত অস্পৃশ্য সাধকশ্রেষ্ঠ তিরুপ্পনালোয়ারের জন্মতিথি উৎসব গত ২রা ডিসেম্বর দক্ষিণ দেশের সকল বিষ্ণু-মন্দিরে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত এবং এতদুপলক্ষে তাঁহার অমূল্য উপদেশ পঠিত হইয়াছে।

হিন্দু জাতির মধ্যে এবম্বিধভাবে কত অস্পৃশ্য নম্পদোয়ান ও তিরুপ্পনালোয়ার যে উচ্চ বর্ণের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অত্যাচারের অসম্মান চক্ষের জলে বক্ষে ধারণ করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করতঃ অদৃশ্য হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা কে গণনা করিবে?
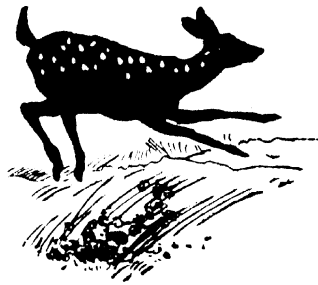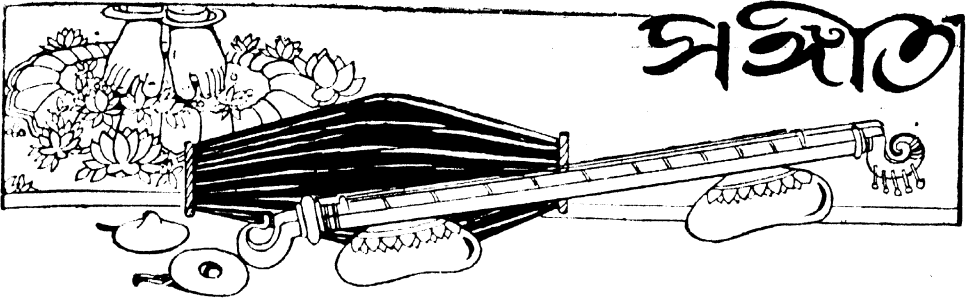
কথা—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী   স্বরলিপি—কুমারী তৃপ্তিসুধা (গৌরী) সর্ব্বাধিকারী

"দুয়ারে"

(ঠুংরী)

মিশ্র তিলক-কামোদ—একতালা

দেখে আয় সখি, দেখে আয় ওরে,
দুয়ারে এল কি কালিয়া ?

আশা পথ চাহি নিতি দিন গেছে,
নয়নের জল নয়নে মিশেছে ;
কুসুম বাসর বিফল হয়েছে,
কত রাতি গেছে জাগিয়া।
তবুও আসেনি কালিয়া !

যতনে গেঁথেছি গুঞ্জা মালা,
সাজায়েছি সখি বরণ ডালা ;
বিরহ তাপিত মরম মাঝারে,
রেখেছি আসন পাতিয়া।
কখন আসিবে কালিয়া ?

বহু দিন পরে এসেছে বঁধুয়া,
লইব সজনি বরণ করিয়া ;
চরণে তাহার নিজেরে সঁপিয়া,
সব দুখ যাব ভুলিয়া॥
দুয়ারে আমার শ্যামলিয়া !

স্থায়ী

[গা গা গরা | রা সা সা]

০			১			+			৩		
ন্া	প্া	না	সা	রা	রা	রগা	রগা	মা	গরা	গা	রসা
দে,	খে	আ	য়	স	খি	দে	খে	আয়	ও	।	রে
রা	মা	রা	মা	পা	পা	রমা	রমা	পধা	পা	মগা	র
দু	য়া	রে	এ	লো	কি	কা	।	।	লি	য়া	।

অন্তরা ও আভোগ

° ১

| মা পা পনা | না না না | র্সা নর্সা র্সা | সা র্সা র্সা |

আ শা প থ চা হি নি তি দি ন গে ছে

ব হু দি ন প রে এ সে ছে বঁ ধু য়া

| পা না না | না সনা সা | পনা পনা সর্রা | ণা ধা পা |

ন য় নে র জ ল ন য় নে মি শে ছে

ল ই ব স জ নি ব র ণ ক রি য়া

| পা র্রা রা | র্রা র্রা র্রা | রা র্গা র্রর্গর্মা | র্গর্রর্গা র্রর্সা নর্সা |

কু সু ম বা স র বি ফ ল হ য়ে ছে

চ র ণে তা হা র নি জে রে সঁ পি য়া

| পা পনা না | না র্সা র্সা | না র্সা নর্সর্রা | সণা ধপা মগরা |

ক ত রা তি গে ছে জা গি । য়া । ।

স ব হু খ যা ব ভু লি । য়া । ।

| রা মা রা | মা পা পা | রমা রমা পধা | পা মগা রা |

ত বু ত আ সে নি কা । । লি য়া ।

তু য়া রে আ মা র শ্যা । ম লি য়া ।

সঞ্চারী

° ১ + ৩

| সা রা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রা সা রা | ন্া ন্া ন্া |

য ত নে গেঁ থে ছি গু ন্ জা মা । লা

| সা রা সরগমা | মা মা মা | গা রা গা | সন্া । সা |

সা জা য়ে ছি স খি ব র ণ ডা । লা

| মরা মা পা | পা পা পা | রা মা পণা | পা মগা রা |

বি র হ তা পি ত ম র ম মা ঝা রে

| রা পা মা | রা রা রা | ন্া । রা | সা । । |

রে খে ছি আ স ন পা । তি য়া । ।

| রা মা রা | মা পা পা | ণা ণা ণা | ধা পা । |

ক থ ন আ সি বে কা । । লি য়া ।

উজ্জ্বল

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

সকল কোলাহল একে একে শেষ হয়ে যায় এমন একটা সময় আসে মানুষের জীবনে, তাকে বলি বার্দ্ধক্য। লগ্নে লগ্নে তখন আর নতুন ক'রে বাঁশী বাজে না, ছুটে ছুটে আসে না নব নব তরঙ্গ, শুষ্ক ছিন্নপত্রের দল ধুলোয় লুটোয়,—উড়ে উড়ে বেড়ায় হাওয়ায় হাওয়ায়।

আমাদের সোমেশ্বর এই বয়সে এসে দাঁড়িয়েছেন। যদিচ সোমেশ্বরের চেয়ে বয়সে আমি কিছু ছোট, তবু আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের বাধা ঘটেনি। ঘটবার কথাও নয়। যে জাতীয় আলাপ আমাদের উভয়ের মধ্যে সাধারণত চলে তা শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যেও চলবার উপযোগী। যৌবনে আমরা পরস্পরের সহিত পরিচিত ছিলাম না, পথ ছিল দু'জনের বিভিন্ন, চিন্তা-ধারাও হয়ত ছিল বিভিন্নমুখী। কিন্তু বার্দ্ধক্যে সবাই একই জায়গায় এসে দাঁড়ায়, সেখানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় একটিমাত্র পরিণাম; সোমেশ্বর আর আমি—আমরা উভয়েই সেই পরিণাম প্রত্যক্ষ করছি।

সোমেশ্বরের পরিচয়টা আমার জানা আছে। পূর্ব্ব-বঙ্গের একটি জেলায় এঁদের ছিল প্রচুর জমিদারি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই অর্থনৈতিক দুর্দ্দিনেও তার আয় বেশ সচ্ছল। পুরুষানুক্রমে সোমেশ্বরদের 'রাজা' উপাধি। এই পর্য্যন্ত জানি, এর বেশি জানার ব্যগ্রতা আমার নেই। জমিদারের ছেলের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে জানবার বিশেষ কিছু থাকেও না। হাতে প্রচুর অর্থ ও প্রচুরতর অবকাশ—অতএব সেই একই গল্পের পুনরাবৃত্তি।

আমরা—অর্থাৎ বৃদ্ধরা চঞ্চল নই। সব কাজ প্রায় ফুরিয়েছে, সময়ও সংক্ষিপ্ত। যেটুকু সময় হাতে আছে সেটুকু গীতা আর গড়গড়াতেই যাবে কেটে। কাটেও তাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের গোড়াকার কারণটা ভাবি, ভাবি শীঘ্রই জীর্ণ বস্ত্রের মতো এই দেহটা ত্যাগ ক'রে আবার নব কলেবর ধারণ পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে। মা ফলেষু কদাচন। যাক্ অনেক কষ্টে যৌবন বয়সটাকে অতিক্রম ক'রে এসেছি, ওই বয়সে কোথা দিয়ে যে এক একটা সমস্যা এসে জোটে ভেবে পাইনে, অনেক দুঃখ দিয়েছে যা হোক,—এখন নদী স্তিমিত, তরঙ্গহীন। চোখ বুজে অতীত কালটাকে দেখি। সোমেশ্বর সেদিন বলছিলেন, অভিজ্ঞতার ইতিহাস হচ্ছে বোকামির ইতিবৃত্ত।

সমস্ত দিন কাটে। কাটে না বিকাল, কাটে না সন্ধ্যা। কেন কাটে না বলা কঠিন। তখন ভাবি সোমেশ্বর ছাড়া আমার আর মনের মানুষ নেই। ছোকরাদের সঙ্গে কথা বলবার ধৈর্য্য থাকে না। তারা প্রাচীন উপন্যাসের আধুনিক পুনর্মুদ্রণ। পুরোনো কথাটা ঘুরিয়ে বলতে গিয়ে তারা নিজেদের জটিল ক'রে তোলে।

ভালো লাগে তাই গিয়ে বসি সোমেশ্বরের কাছে। প্রাচীন বনেদী আসবাবে তাঁর বৈঠকখানাটি সজ্জিত, অনেকটা নবাবী আমলের সাক্ষ্য দেয়। ঘরের মেঝেটা কার্পেট করা। সেদিন গিয়ে বসতেই তিনি বললেন, আজ এত সকাল সকাল যে?

চুল পাকা ইস্তক স্পষ্ট কথা বলতে শিখেছি। বললাম, ভাল লাগল না বাড়ীতে।

কেন?

তোমার ওই গড়গড়াটার মোহ। গীতায় ভগবান বলেছেন, আসক্তি থেকে বন্ধন। আর তা ছাড়া কি জানো, তোমার মুখে গল্প শোনবার একটা চাপা লোভ রয়েছে।

সোমেশ্বর বললেন, ভালো কথা, তোমার জন্যে একখানা বাংলা গল্পের বই সংগ্রহ ক'রে রেখেছি—

বললাম, ক্ষমা করো সোমেশ্বর, মহাভারত পড়ার পর থেকে আমি গল্প পড়া ত্যাগ করেছি। এই আজকেই পড়ছিলুম একখানা মাসিকপত্র। একজন

নামজাদা লেখক একটা প্রেমের গল্প লিখে যাচ্ছেন। হিসেব ক'রে দেখলুম তাঁর কথাবার্ত্তার মধ্যে সাতচল্লিশ-বার 'কিন্তু' শব্দটার ব্যবহার—থাক্ বাংলা আর পড়ব না সোমেশ্বর। প্রেমের গল্প বলতে এত 'কিন্তু' অসহ্য।

আমার উত্তেজনার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না সোমেশ্বরের কাছে। কোনোদিনই সাড়া পাইনে। তাঁর প্রশান্ত মুখের প্রসন্নতা কোনো উদ্বেগেই বিচলিত হয় না। ঘরের মাঝখানে ল্যাম্প-ষ্ট্যাণ্ডে জ্বলছে মোম-বাতি। তার মৃদু আলোয় দেখলাম তিনি চোখ বুজে আছেন। এটি তাঁর অভ্যাস; অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আলোচনায় তিনি চোখ খুলে থাকেন না, চোখে তাঁর নিদ্রা আসে। আমাকেও চোখ বুজতে হোলো।

তাঁর গলার স্বর শুনে পুনরায় চোখ খুললাম। দেখি ইতিমধ্যে চাকর এসে তাঁর সুমুখের টেব্‌লে প্রায় আধ গ্লাস হুইস্কি রেখে গেছে, পাশে একটা সোডার বোতল। সোমেশ্বর যথারীতি গ্লাসে সোডার জল ঢাললেন এবং যথারীতি শতকরা নব্বইজন জমিদারপুত্রের ন্যায় সেবন করলেন। তাঁর ধারণা আমি ওসব স্পর্শ করিনে। আমার সম্বন্ধে অনেক ধারণা আছে লোকের মনে।

মদ্যপানের পর সোমেশ্বরের প্রত্যহই ঘটে ভাবস্থিতি। বাস্তবিক, এমন সুধীর ব্যক্তি আমি আর দেখিনি। তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেন, সত্যিই বলেছ তুমি, প্রেমের চিত্র আঁকা বড় কঠিন। এই ব'লে তিনি চুপ করলেন।

আর বেশিদূর অগ্রসর না হলেই ভাল হয়। প্রেম কথাটা তুলতে বৃদ্ধবয়সে মনে লজ্জা আসে। ও বস্তু আমাদের দ্বারা ইতিমধ্যেই চর্ব্বিত, অতএব ওটা চর্ব্বণের ভার এখন ছেলে-ছোক্‌রাদের উপর। কথাটা আজ না তুললেই ভাল হোতো। ছেলেমানুষীটা ছেলেদের পক্ষেই শোভা পায়। আমি তরুণ নই।

প্রাচীন কাল থেকে, বুঝেছ—সোমেশ্বর চোখ খুলে বলতে লাগলেন, প্রাচীন কাল থেকে ভালবাসার কয়েকটা বহু পরীক্ষিত প্রিন্‌সিপল্ মানুষের মনের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে। সকল প্রেমের যাচাই হয় সেই কষ্টিপাথরে।

সোমেশ্বরের ভূমিকায় অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। এসব আমি যে পছন্দ করিনে তা তিনিও জানেন। মনের মধ্যে আমার ভূমিকম্প হতে লাগল। পুরুষের শেষ বয়স কাটে অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে, মেয়েদের শেষ বয়স কাটে ধর্ম্মচর্চ্চা ও পরনিন্দায়। জীবনের সকল স্তরগুলি আমি ও সোমেশ্বর একে একে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি আর সহ্য হবে না। এখন বুঝতে শিখেছি মৃত্যুই হচ্ছে জীবনের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ, তার কারণ, আমরা ফুরিয়ে গেছি।

সোমেশ্বর বললেন, আজ তোমাকে একটা গল্প শোনাবো।

কী গল্প?

গল্পটা আমার যৌবন-কালের। ব'লে তিনি পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করলেন।

যা ভেবেছিলুম তাই। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে আজ সাপ বেরুল। প্রেমের গল্প ছাড়া যৌবনে আর গল্প নেই। মনে হচ্ছে ভবিষ্যৎ কালে আমাদের দেশে প্রেমের গল্প ও উপন্যাস খানিকটা পাঠযোগ্য হবে, অন্তত এখনকার মতো মাসিকপত্রের পাতা উল্‌টাতে তখন আর ভয় করবে না। তার কারণ, দেশের বিদ্যালয়গুলিতে ছেলেমেয়ের সহশিক্ষা প্রবর্ত্তন করার চেষ্টা চলছে। স্ত্রীপুরুষের মন খানিকটা বিশুদ্ধ হবে, আত্মজ্ঞান জাগবে। সেদিন সোমেশ্বর বলছিলেন, অদূর কালে বিদ্যালয়গুলির বহির্মুখী রূপটা হবে শিক্ষাকেন্দ্র, অন্তর্মুখী রূপটা হবে প্রজাপতি-সজ্ঘ। তরুণ গল্প লিখিয়েদের সেদিন বিশেষ সুদিন।

প্রশান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে সোমেশ্বর বললেন, গ্রাম ছেড়ে আমি তখন প্রথম শহরে এসেছি। এক দরিদ্র গৃহস্থের একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল। কেমন ক'রে ঘটল তার খুঁটিনাটি জানতে চেয়ো না, ভিতরের তাগিদ থাকলে পথটা সহজ হয়ে যায়। তা ছাড়া কি জানো, অর্থশালী যুবকের সঙ্গে দরিদ্র গৃহস্থরা সোজা পথেই আলাপ ক'রে থাকে।

আবার আমি সঙ্কুচিত হয়ে উঠলাম। এর পরে তরুণ জমিদারের যৌবনকালের গল্প কোন্ পথে যাবে তার কিয়দংশ আমি এখনই উপলব্ধি করতে পারি। অন্দরমহলের দিকে লক্ষ্য করলাম, এখনই কেউ হয়ত এসে পড়বে। বৃদ্ধবয়সে আত্মসম্মান ছাড়া আর আমাদের

কোনো সম্বল নেই। তাড়াতাড়ি বললাম, থাক্ সোমেশ্বর, আজ থাক্—ও আমি বুঝতে পেরেছি। অনেকেরই অনেক কাহিনী চাপা থাকে, সব কথা প্রকাশ করতে নেই। ছেলেপুলেরা রয়েছে ভেতরে।

সোমেশ্বর হাসলেন, অর্থাৎ কিছু প্রকাশ করতে তিনি ভয় পান্ না। কিন্তু ভয় আমি পাই। প্রেমের গল্প বলতে যা বুঝি, তা প্রেমও নয়, গল্পও নয়, কতকগুলি অপ্রকাশ্য ইঙ্গিত-ইসারা মাত্র। প্রেম সম্বন্ধে নিরাসক্তিই বার্দ্ধক্যের বিশিষ্ট চেহারা। আমি এখন সেই স্তরে। গীতায় ভগবান বলেছেন, মানুষের প্রেম দৈহিক আসক্তিতে আচ্ছন্ন, প্রকৃতির প্রয়োজন সিদ্ধ করার ছলনামাত্র। আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি, গীতাপাঠের পূর্ব্বেই গীতার অনেক তত্ত্ব আমার জানা ছিল।

সোমেশ্বর বললেন, তোমার কি শোনবার ইচ্ছে নেই?

বললাম, আত্মবঞ্চনা করব না, শোনবার খুবই ইচ্ছে। তবে কি জানো, আজ একজন নামজাদা লেখকের একখানা বই পড়ছিলাম। একটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালবাসল এই কথাটা বলতে গিয়ে ভদ্রলোক একশো পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন। বিড়াল ইঁদুর ধরতে কতক্ষণ সময় নেয় সোমেশ্বর?

ওই সময়টুকু নিয়েই বোধকরি সাহিত্যের কারবার। আমার গল্পটা শোনো, এতে সময়ের অপব্যয় নেই। এবং খুব সম্ভব এটা সাহিত্যের বিষয়বস্তুও নয়!

চমক লাগল তাঁর কথায়। সাহিত্যের বিষয়বস্তু যা নয় তাই নিয়ে গল্প বলাটা এই প্রবীণ বয়সে সোমেশ্বরকেও পেয়ে বসল কেন? এ কি হুইস্কির গুণ? কিন্তু নেশা ত তাঁর হয়নি?

চাকর একবার এসে গড়গড়াটা দিয়ে গেল, আমি নলটা ধরলাম।

সোমেশ্বর বলতে লাগলেন, ভয় পেয়ো না, শোনো। যদি কোথাও অশ্লীলতার গন্ধ থাকে জোরে জোরে তামাক টেনো কিন্তু প্রকাশ করতে বাধা দিয়ো না। গীতায় বলেছেন, নিগ্রহের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় না, বুদ্ধি ও জ্ঞানের পথে বিচারের দ্বারা সংযম লাভ হয়।

মানুষের চরিত্রের নিম্নস্তরে কতকগুলি প্রবৃত্তি জমা থাকে আমি তখন তাদেরই তাড়নায় ঘুরছি। এমন দিনে আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল ওই দরিদ্র গৃহস্থ-কন্যা, নাম তার মৃণাল। প্রচুর ঐশ্বর্য্যে ভরা তার দেহ, কিন্তু কুরূপা মেয়ে। দুঃখের জীবন, বিবাহের সম্প্রদানের পর বাসর-ঘর থেকে স্বামীটা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, আর ফেরেনি। কুশণ্ডিকার সিঁদুর ওঠেনি মাথায়, বিবাহিত মেয়ে কুমারীই রয়ে গেল। একদিন মৃণাল বললে, তিনি পালিয়ে গেলেন কেন জানো?

কেন?

আমার কদাকার চেহারা দেখে। ভদ্রঘরের শিক্ষিত সন্তান তিনি, তাঁর রুচি আছে, সৌন্দর্য্যবোধ আছে। তাঁকে আমি এখনো শ্রদ্ধা করি।

আমি চুপ ক'রে যেতুম। এখনকার মতো তখন স্ত্রী-পুরুষের এতটা স্বাধীনতা ছিল না, আমার পাল্কি গাড়ীতে মৃণালকে নিয়ে শহরের প্রান্তে চলে যেতুম। একা দুটি তরুণ তরুণী, কিন্তু আশ্চর্য্য, প্রকৃতির খেলা ছিলনা আমাদের মধ্যে। আমি অর্থশালী যুবক, পুরুষানুক্রমে একটু উচ্ছৃঙ্খল, অথচ এই মেয়েটির কাছে এলে আমার পরিবর্ত্তন ঘটত। পুরুষের দেহ-লালসার যে যে লক্ষণ তোমার জানা আছে তা আমার প্রকাশ পেত না। সে কুরূপা কদাকার, কিন্তু তার সুস্থ সবল দেহের এমন অসামান্য ঐশ্বর্য্য ছিল যে, আমার প্রবৃত্তিতে কিছুতেই আটকাতো না। একদা সে বললে, তুমি রাত ক'রে বাড়ী ফেরো কেন?

কোনো অধিকার তার নেই তবু এই প্রশ্ন। বললুম, অনেক কাজ থাকে বাইরে।

কী কাজ এত?

এই ধরো বন্ধু-বান্ধব, বেড়ানো, গান বাজনা—

রাতে কি করো?

পড়াশুনো করি।

মৃণাল করুণ কণ্ঠে বললে, বেশি রাত জেগো না, দয়া ক'রে আমার অনুরোধটা মনে রেখো। অনেক রাতে খেয়ো না।

এমন কথা শুনিনি কোনোদিন। আমার চারি-পাশের পরিচিত যারা আমার এদিকটায় তারা ভ্রূক্ষেপ

করেনা, আমার মনের নিভৃত অন্দর মহলে তাদের প্রবেশ নেই, তারা সদর মহলের অতিথি অভ্যাগত; কিন্তু এ মেয়েটি সোজা চলে আসে আমার অন্তরের মণি কোঠায়, আমার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি কুণ্ঠিত হয়ে মাথা নত করে। তখন বুঝি আমার শরীরের দাম আছে, আমার বাঁচার অর্থ আছে, এমন কি সবচেয়ে যেটা বিস্ময়কর, আমি ভাবি মৃণালের কাছে বসে মনের কথা বলার প্রয়োজন আছে আমার।

একদিন বললুম, তোমাকে আমি ভালবাসি মৃণাল।

মৃণাল শরাহত পাখীর মতো শঙ্কিত চোখে আমার প্রতি তাকাল। বললে, ক'দিন থেকে ভাবছিলুম এই কথাটাই তুমি আমাকে শোনাবে। নিজের কাছে তুমি সত্যি হও সোমেশ্বর।

আমি কি ভালোবাসিনে?

অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে মৃণাল চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলে, তারপর বললে, এসব ছাড়ো, অন্য কথা হোক। বলে সে একটু সরে বসলে। আমাকে তার দেহের কাছ থেকে সরিয়ে রাখাই তার সকলের চেয়ে বড় কাজ।

কিয়ৎক্ষণ পরে মৃণাল বললে, আমি কি ভাবি জানো, আমার ইচ্ছে করে সারাদিন ধরে দেখি কেমন ক'রে তোমার দিন কাটে। রাত্রে তুমি খোলা জায়গায় শোও না ত? ঠাণ্ডা লেগে যদি তোমার অসুখ করে তাহলে আমি দেখতে যেতে পারব না, জানো ত? লোকে তোমায় মন্দ বলবে!

অত্যন্ত গ্রাম্য ভালবাসা। এ ভালবাসা বুদ্ধিতে উজ্জ্বল নয়, পাণ্ডিত্যে গভীর নয়, কবিত্বে হৃদয়গ্রাহী করার চেষ্টা নেই। যে সমাজটায় আমার আনাগোনা সেটার নাম শিক্ষিত সমাজ, পালিশ করা সভ্যতায় সেটা চকচকে। সেখানে বহু সুন্দরী রমণী, তাদের চোখে আমি আদর্শ যুবক, আমি তাদের লোভের বস্তু এও জানি। তাদের যথাযোগ্য মূল্যও দিয়ে থাকি। কিন্তু মৃণালের আবহাওয়ায় এমন একটি অত্যাশ্চর্য্য প্রশান্তি যে আমি এক অনির্ব্বচনীয় আধ্যাত্মিকতার গভীরে তলিয়ে যাই, সেটি আমার সত্য পরিচয়। কী আছে তার? দেহ? আমি জানি আমার চারিদিকে সহজলভ্য সুন্দর দেহ অনেকগুলি রয়েছে। পুরুষের কামনা অনেক বড়, তারা রূপের ভিতর দিয়ে চায় রূপাতীতকে, দেহের ভিতর দিয়ে দেহাতীতকে।—বলে' সোমেশ্বর চোখ বুজলেন।

আমি বললাম, বেশ ত, এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন, সংসারে এমন উচ্চস্তরের ভালোবাসা আছে বৈাক। কুরূপা মেয়েরা সাধারণত সচেতন, স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক গোপন দম্ভ তাদের মধ্যে কিছু পরিমাণে কম থাকে।

কম?—সোমেশ্বর চোখ চেয়ে বললেন, একদিন মৃণালকে কিছু গহনা উপহার দিতে গেলুম, অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল তার মুখ। স্পষ্ট বললে, আমাকে অপমান ক'রো না সোমেশ্বর, তুমি কিছু দেবার চেষ্টা করলেই আমার আত্মহত্যা করবার ইচ্ছে হয়, ওসব তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তুমি ভালোও বেসো না, দিতেও কিছু এসো না, এই অনুরোধটা রেখো। তুমি কিছু দিতে এলেই ভাবি সেই সঙ্গে আমাকেও তুমি ফিরিয়ে দিলে।—সোমেশ্বর নীরব হয়ে গেলেন।

বললাম, অনেক কুমারী মেয়ে আছে যারা হেঁয়ালী পছন্দ করে বেশি। পুরুষের সংসর্গ না পেয়ে তারা নিজেদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে থাকে। এই সব মেয়েরাই একদিন প্লাবনে ভেসে যায়।

সোমেশ্বর বললেন, বলো, যা কিছু তোমার সত্যি ব'লে মনে হয় তাই বলো, কিছু বাদ দিয়ো না। আমিও একদিন তোমার মতো নানা দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করেছি মৃণালকে, অনেক দিক দিয়ে আকর্ষণ করেছি তাকে, কিন্তু কোনো বন্ধন সে মানেনি। এতখানি কুরূপা বলেই তার এত বড় অহঙ্কার, এতখানি উপেক্ষিত বলেই এত বড় তার পরিচয়। একদিন বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে গেছি তার কাছে, সে ত রেগেই আগুন! কাছে বসিয়ে আঁচল দিয়ে মাথা মুছিয়ে সে বললে, এমন দুরন্ত তুমি? এই দুর্য্যোগে কেউ বাইরে বেরোয়? কী ক্ষতি হোতো না এলে?

বললুম, কী বলচ মৃণাল, বর্ষা-বাদলে যে মনে পড়ে তোমাকে! মিষ্টার ডাটের বাড়ীর মেয়েরা নেমন্তন্ন করেছিলেন জলবৃষ্টি দেখে, তাঁরা চেয়েছিলেন আমাকে

বর্ষার গান শোনাতে, সেখানে না গিয়ে এলুম তোমার এখানে, তুমি বলচ এই কথা ?

বাইরের বৃষ্টিধারার দিকে চেয়ে মৃণাল বললে, তোমার দিন এমনি ক'রে নষ্ট হয়, তোমাকে বোঝে না কেউ, তোমার যে ওসব ভালো লাগে না তা তারা বুঝতে পারে না।—তারপর চট ক'রে কথা ঘুরিয়ে সে বলতে লাগল, গেলেই ভাল করতে সোমেশ্বর, তোমাকে যারা কাছে চায় তারাও আমার প্রিয়, সত্যি বলছি তোমাকে, তোমার প্রশংসা যারা করে তারা আমার বড় আপন।

সস্নেহে তার গায়ে হাত দিতে গেলুম, সে সরে দাঁড়াল। বললে, ছুঁয়ো না, তুমি হাত বাড়ালেই ভয় করে ; ছুঁলে তুমি ছোট হয়ে যাবে, তুমি সাধারণ মানুষ হয়ে গেলেই আমার কান্না পায়।—হাত বাড়িয়ে হুইস্কির গ্লাসটায় সোমেশ্বর শেষ চুমুক দিলেন।

আমি বললাম, বুড়ো হয়েছি কিন্তু যুবককালে এমন ভালোবাসার গল্প কাব্যে সাহিত্যে পড়েছি বৈকি। সেদিন এসব ভালোও লাগত। আশ্চর্য্য!—গড়গড়ার পাইপটা টানতে লাগলাম।

সোমেশ্বর বলতে লাগলেন, দুর্য্যোগের দিনে দেখা হলেই ধমক খেতুম। প্রকৃতির চেহারা ঘনিয়ে এলে শুনেছি নারী তার প্রিয়তমকে কাছে পাবার ব্যাকুলতায় বলে, হরি বিনে কেমন ক'রে কাটবে আমার এমন দিন ; অভিসারিকার বেশে সেই চিরন্তনী নারী ছুটে যায় পথে ঘোর নিশীথ রাত্রে, কিন্তু এখানে সেই লোকোত্তর প্রেমের আকুলতা নেই! অত্যন্ত স্পষ্ট কণ্ঠে মৃণাল বললে, বেরিয়ো না তুমি এমন দিনে, জল পড়বে মাথায়, ঝড় লাগবে গায়ে···তোমার দু'টি পা'য় পড়ি সোমেশ্বর, আমার কথা শোনো, তোমার ভালো হবে।

তার কথা শুনলে আমার ভালো হবে এই ছিল তার ধারণা, একটি গভীর কল্যাণবুদ্ধি ছিল তার আমার সম্বন্ধে ; শুধু আমার শরীর নয়, আমার মনকে নির্ম্মল রাখাও ছিল তার বড় কাজ।

আমার সম্বন্ধে মনে মনে বিশ্রী কিছু ভাবো না ত ?—মৃণালের এই কথাটা শুনে আমি অবাক হতুম। বলতুম, কী ভাববো বল ত ?

মানুষেরা যা ভাবে। দোহাই তোমার, আমার কাছ থেকে গিয়েই আমার কথা তুমি ভুলে যেয়ো!

এমন কথা কেন বলচ মৃণাল ?

কিছু মনে করো না, তোমার যে শরীর খারাপ হবে, তোমার মন যে ঘুলিয়ে উঠবে!

একদিন বললে, এই যে তুমি চলে যাও আমার কাছ থেকে, আমার মন যায় তোমার পিছু পিছু ; সারাদিন তোমার সব কাজ কর্ম্মের পাশে থাকি, সব দেখতে পাই তোমার। ঘুমিয়ে পড়লে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে আসি।

অবাক হয়ে যেতুম তার সরল স্বীকারোক্তিতে। একি সত্য, একি সম্ভব? ভালবাসা কি একেই বলে ? কোনো চাঞ্চল্য নেই, প্রত্যাশা নেই, দান-প্রতিদানের হিসেব-নিকেশ নেই, এমন কি ভাবলে অবাক হই, একটু কোথাও উচ্ছ্বাস পর্য্যন্ত খুঁজে পাইনে, এমন প্রশান্ত চেহারা এর ? আমাদের কাছে জ্যোৎস্না রাত অর্থহীন, দক্ষিণ বাতাস ব্যর্থ, ফুলের গন্ধ, প্রকৃতির শোভা মেঘ-মেদুর আকাশ—এরা নিতান্তই হাস্যকর, এমন সুস্পষ্ট ভালোবাসার চেহারা আমি আর কোথাও দেখিনি। এই কুরূপা কদাকার মেয়েটার জন্যে আমি ছাড়লুম বন্ধু-বান্ধব, সামাজিকতা, আমোদ আহ্লাদ, অথচ আমার চারিদিকে এরা প্রচুর ছিল। আমি বিলাসী ধনাঢ্য যুবক, পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ভোগের সামগ্রী ছিল আমার সকল দিকে। আসক্তিকে নষ্ট করাই কি ভালোবাসার সকলের চেয়ে বড় কাজ ?

একদিন বললুম, তুমি এই যে আমার সঙ্গে বেড়াও মৃণাল, লোকে ত তোমায় নানা কথা বলতে পারে।

মৃণাল হাসলে। বললে, পারে কিন্তু বলেনা।

বলেনা, তুমি জানো ?

জানি।

তাহলে তোমাকে তারা এইদিকে প্রশ্রয় দেয় বলো ?

মৃণাল আবার হাসলে,—যারা প্রশ্রয় দিতে পারে কলঙ্কও রটাতে পারে তারা। কিন্তু সবাই জানে, খুব ভালো করেই জানে, আমার দ্বারা কলঙ্কের কাজ হয়ে উঠবে না।

তবু তারা ত আর ঘাস খায় না মৃণাল। বুঝতে পারে সব।

ঘাস যারা খায় না তারা আমাকে বিশ্বাস করে সোমেশ্বর। আমার কিন্তু বিশ্বাসের মূল্য দেবার চেষ্টা নেই। মানুষকে আমি ভয় করিনে।

আমি বললুম, তুমি জানো আমার চরিত্র কেমন? জানো আমি তোমার এই ভালোবাসার যোগ্য নই?

কেন?—মৃণাল মুখ তুললে।

সেদিন আমি প্রস্তুত ছিলুম। বললুম, তুমি কি জানতে পেরেছ আমি সচ্চরিত্র নই?

জানতে চাইনে।

তবু জানতে তোমাকে হবে।—আমি চেপে বসলুম তার কাছে। আমি বলতে আরম্ভ করলুম, সে নিঃশব্দে চিন্তিত মুখে শুনে যেতে লাগল। সমস্ত সন্ধ্যাটা ধরে' বললুম আমার দীর্ঘকালের স্খলন-পতনের কাহিনী। এমন অকপটে কথা আমি আর কাউকে বলিনি। আমার নিকটতম বন্ধুর কাছেও যে সব কথা বলতে বাধতো, তাও আমি অসঙ্কোচে প্রকাশ ক'রে দিলুম। মৃণাল কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আমি যেন তাকে শরবিদ্ধ করেছি, তার পাঁজর ভেঙে দিয়েছি, তাকে সর্ব্বস্বান্ত করে দিয়েছি। সেদিন ফেরবার পথে আসতে আসতে ভাবলুম, যাক্ বাঁচা গেল, আমি মুক্ত, মৃণালকে আমি মুক্তি দিতে পেরেছি, মোহ ভেঙে গেছে। ভূমিকম্পে তার প্রাসাদ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল, এবার যাক্ সে নিজের পথে। বাঁচলুম।

কয়েকদিন পরে আবার দেখি সে খবর পাঠাল। গেলাম। আমাকে দেখেই যেন তার মুখের উপরে আলো জ্বলে উঠল।

শরীর ভাল ছিল ত? রাত জেগে পড়াশুনো বন্ধ করেছ?

বললুম, আবার যে ডাকলে?

ওমা, ডাকব না কেন? এসো। শীতের দিন গরম জামা পরোনি কেন?

তোমাকে আমি চুম্বন করব মৃণাল।

মৃণাল গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, অমন করে' চেয়ো না সোমেশ্বর, নির্ভয়ে আমাকে কাছে বসতে দাও।—কাছে বসে' সে বললে, মাঝে মাঝে তোমাকে দেখলে আমার ভয় করে। তুমি কখনো দস্যু, কখনো বন্ধু। দেহ নিয়ে টানাটানির মানে কী জানো, নিজেদের ধ্বংস করা। যারা সংযত তারাই বুদ্ধিমান।—সোমেশ্বর আবার চোখ বুজলেন।

চাকর এসে গড়গড়ার কল্‌কেটা বদলে দিয়ে গেল। রাত ঘনিয়ে এসেছে। নতুন করে' তামাক টানতে টানতে বললাম, কোনো কোনো মেয়ে কোনো কোনো ছেলে এমন হয় দেখেছি। মেয়েরা তাত্ত্বিক হয় পুরুষ-সংসর্গের ঠিক আগে, পুরুষরা তাত্ত্বিক হয় স্ত্রী-সংসর্গের ঠিক পরে। মেয়েদের চরিত্রের মাধুর্য্য পাওয়া যায় কুমারী অবস্থায়, পুরুষের চরিত্রের ঐশ্বর্য্য পাই তাদের বিবাহের পরে। তোমার মৃণালের ধরণ একটু আলাদা। মনে পড়ে, চুল পাকবার ঠিক্ আগে একটি স্ত্রীলোককে দেখেছিলাম। সুন্দরী এবং চরিত্রবতী। কিন্তু তার কাজ ছিল, আপন রূপ এবং সচ্চরিত্র প্রকাশ ক'রে ছেলেদের কাছে স্বার্থ ও সুবিধা নেওয়া—সে স্বার্থ সময় সময় অত্যন্ত স্থূল এবং সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠত। যৌন-বিজ্ঞানে আছে, সেক্‌স্-এর য়্যাপীল দিয়ে মেটিরিয়ল্ য়্যাডভান্টেজ্ আদায় করা। তোমার মৃণাল অবশ্য একটু সুপীরিয়র এলিমেন্ট্। কিন্তু তুমি মনে করো না তোমার এ ভালোবাসা দেহহীন; দেহ আছে, কিন্তু এ প্রেম খানিকটা যৌন-রঞ্জিত। বস্তুর চেয়ে গন্ধে বেশি নেশা হয়। ইংরেজিতে বলে, নন্-নরম্যাল্।

সোমেশ্বর হেসে চোখ খুললেন। বললেন, তোমার মতো একদিন আমিও বুদ্ধি ও বিজ্ঞান দিয়ে মৃণালকে বিচার করেছি। কিন্তু তার প্রাণের দিকে নিয়ত আমার দৃষ্টি জেগে থাকত, তার লীলা আছে, ধর্ম্ম আছে। বুদ্ধি দিয়ে তাকে মাপা যায় না, বিজ্ঞান দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না। কথায় জমে ওঠে কথা, প্রাণ ওঠে হাঁপিয়ে, যুক্তির ভারে হৃদয়াবেগের হয় কণ্ঠরোধ। বুদ্ধি-তর্কের রাক্ষসীবৃত্তিতে রসতত্ত্বের যজ্ঞ পণ্ড হয়।

একদিন মৃণাল বললে, তোমার ভালো'তেই আমার ভালো এট ভুলো না সোমেশ্বর। আমি যতদিন বাঁচবো, যেন দেখি তুমি সুস্থ আছো। আর যদি কোনো মেয়ে তোমাকে আনন্দ দেয়, ভালোবাসে, জানবে সে আনন্দ আমার!

সোমেশ্বর উত্তেজিত হয়ে বললেন, কোন্ মিথ্যাবাদী

প্রচার করে, মেয়েরা মরে ত জায়গা ছেড়ে দেয় না,—এত বড় অন্যায় ধারণা আর নেই। আজ তুমি যে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের গল্পটা পড়ছিলে সেটাও ওই পাঠক-ভোলানো সস্তা রঙীন প্রেম, চুড়ির আওয়াজ আর আঁচলের খুঁট নিয়ে চিত্তবিলাস, মনস্তত্ত্বের জটিল গ্রন্থি নিয়ে টানাটানি, অধস্তন প্রবৃত্তির গায়ে কলম ছুঁয়ে সুড়সুড়ি দেওয়া। কথন-ভঙ্গীকে হৃদয়গ্রাহী ক'রে বক্তব্যের দৈন্যকে চাপা দিলেই জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হওয়া সহজ হয়।

উত্যক্ত হ'য়ে বললাম, যাক, গল্পের মাঝপথে তর্কের ঝুলি এলিয়ে বসো না, বলো।

সোমেশ্বর বলতে লাগলেন, ভালোবাসার কতকগুলি মহত্তর নীতি আছে, সর্ব্বজ্ঞানীদের বিচার-বুদ্ধিতে সেই নীতিগুলি চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত। মৃণালের প্রাণের ভিতরেও সেই নীতিবোধ; এ তার সহজাত। সে আমাকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে একদিন বলেছিল, আমাকে পেয়ে তার পরম আত্মোপলব্ধি ঘটেছে,—যেমন অপরিচিত ভ্রমরের পদরেণুস্পৃষ্ট নিভৃত নীলপদ্মের আত্মপ্রকাশ।

বুড়ো হয়েছি, কাব্য আর সহ্য হয় না। ছোক্‌রা বয়স হ'লে সোমেশ্বরের উচ্ছ্বাসটা বিরক্তিকর হ'তো না! কিন্তু কী করা যাবে, রূপার গড়গড়ায় অম্বুরী তামাক সে খেতে দিয়েছে। বেঁধে মারে, সয় ভালো। বৃদ্ধ বয়সে সোজা কথাটা সহজ ক'রে বুঝতে অভ্যাস করেছি, সকল প্রেমই এক সময়ে শেষ হয় সৃষ্টিতত্ত্বে, প্রকৃতির নানা ছলনা, নীলপদ্ম অথবা রক্তজবার উপমায় তাকে ভোলানো কঠিন। ও বস্তু নির্ব্বোধ নরনারীর মনে মায়া বিস্তার ক'রে আপন খেয়ালে তাদের চালিত করছে।

সোমেশ্বর বললেন, একবার তাকে না বলে' এক বন্ধুর সঙ্গে বিদেশে রওনা হয়েছিলুম। পথের নানা কষ্টে রোগ নিয়ে ফিরলুম দেশে। দেখেই ত মৃণালের চক্ষু স্থির। বললে, উন্মাদিনীর মতো উচ্চকণ্ঠে বললে, আমি জানি যে তোমার এমন হবে, আমি যে সেদিন স্বপ্ন দেখলুম! মানৎ ক'রে রেখেছি মহাকালীর কাছে। আমার অবাধ্য হ'লে বিপদে তুমি পড়বেই সোমেশ্বর, তোমার সকল বিপদ আমি আড়াল ক'রে থাকি। নিশ্চয় তোমার সেই বন্ধু পথে তোমাকে কষ্ট দিয়েছিল!

কিছু দিয়েছিল বটে মৃণাল।

তা ত দেবেই; আমার কাছ থেকে যে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় সে কখনো তোমার বন্ধু নয়। জীবনে তুমি দুর্নীতির রসদ যুগিয়েছ যাদের, তারাই কষ্ট দেবে তোমাকে, তাদের কাছ থেকেই আসবে শত্রুতা। পাপকে বাঁচিয়ে রাখলে সেই পাপই একদিন দুঃখ দেয়। আমার কি হয়েছিল জানো সোমেশ্বর?

কি হয়েছিল মৃণাল?—আমি অবাক হয়ে চেয়েছিলুম তার দিকে।

তুমি—তুমি চলে' গেলেই আমি ভাবি অন্য কথা। তুমি দূরে গেলেই পুতুলের মতো ছোট হয়ে যাও এত ছোট যে একটি শিশুর মতন, সন্তানের মতন...ইচ্ছে করে আঁচলের আড়ালে ঢেকে পথটা তোমায় পার ক'রে দিয়ে আসি, তোমার গায়ে যেন বিপদের আঁচড়টি না লাগে।—চেয়ে দেখলুম এক প্রকার অস্বাভাবিক আবেগে মৃণালের সর্ব্বশরীর ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে। এমন জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি, সত্যিই তোমায় বলছি, আমি আর দেখিনি।

ভূতে পেলে এমন হয়।

সোমেশ্বর হেসে বললেন, সেদিনের কথাটাও তোমায় বলব। বিলাস-ব্যসনের জীবন হলেও আমার মধ্যে কোথায় একটা দুঃসহ দারিদ্র্য ছিল। একদিন কি কারণে কোথায় যেন অত্যন্ত অপমানিত হয়েছিলুম। কোথায় ছুটব সান্ত্বনার জন্য! গেলুম মৃণালের ওখানে। চোখ দিয়ে আমার ঝর ঝর ক'রে জল পড়ছিল। সেইদিন—কেবল সেইদিনটির জন্য মৃণাল ভুলে গিয়েছিল তার চারপাশের জনসমাজ, ভুলে গেল তার আত্মীয়স্বজন, গুরুজনদের কথা। সকলের মাঝখান দিয়ে ছুটে এসে সে আমার হাত ধরে' বললে, কি হয়েছে সোমেশ্বর?

একলা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। কাছে বসিয়ে মাথাটা টেনে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে বললে, কোথায় লাগল?

তা বলতে পাচ্ছিনে মৃণাল!

বলতে পারছ না, তবে বুঝি বুকের ভেতরে লেগেছে? বড় পরিশ্রম করেছ, নয়? আজ আর তোমায় ছেড়ে দেবো না, এমনি ক'রে শুয়ে থাকো সারারাত!

গলার আওয়াজ তার কাঁপছে। কান্নায় কাঁপছে তার মন, তার প্রাণ। একে বলব ভালোবাসা। মানুষের ভিতর দিয়ে ভালবাসছে সে মানবাতীত দেবত্বকে। দুর্লভকে চাওয়াটাই প্রেম। সেদিন একবারটি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তার গলার আওয়াজ। বললে, না, তুমি থেকো না, তুমি যাও। কোথায় এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে রাখব তোমায়? বুকের মধ্যে কোথায় তোমার কাঁটা ফুটেছে, কেমন করে খুঁজবো! তুমি ঝড়, ওলট-পালোট করতে এসেছিলে, এবার যাও, যাও।

ঝরঝরিয়ে মৃণালের চোখের জল পড়ল।

আসবার আগে বললুম, তোমাকে বিয়ে করব মৃণাল।

বিয়ে করবে? আমাকে?

তোমাকে। মৃণালকে।

ছি সোমেশ্বর।—স্থির কণ্ঠে মৃণাল বললে, এমন কথা আর বোলো না। যারা কুরূপ তারা কমে যাক্ সংসার থেকে তাদের সংখ্যা আর বাড়িয়ো না। তারা পাপ।

কী বলছ মৃণাল?

বলছি বিয়ে আমি করব না। পারব না আমি কুশ্রী সন্তানদের লালন করতে। আমার রুচি আছে, আমি রূপের ভক্ত। তুমি রূপবান, তোমার বংশধারাকে মলিন করবার অধিকার আমার নেই সোমেশ্বর।

বুদ্ধি আর জ্ঞানে উজ্জ্বল যে ভালোবাসা—সোমেশ্বর বলতে লাগলেন, তাই আমি পেয়েছিলুম মৃণালের কাছে। তত্ত্ব নয়, মনস্তত্ত্বও নয়—তার বিচারের রীতি তরবারির মতো উজ্জ্বল। নাটক-নভেলের প্রেম হচ্ছে আত্মবঞ্চনার বিশ্লেষণ। মৃণালের হৃদয়ের প্রথম স্তরে ছিল নারীমূর্ত্তি, নিচের স্তরে ছিল মাতৃমূর্ত্তি, প্রশান্ত দুটি রূপ। একটির সঙ্গে আরেকটির অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য। যা সে দিলে তা সর্ব্বকূলপ্লাবী, রিক্ত ক'রে দিলে; প্রতিদানে নেবার কিছু ছিল না তার, যা দেবো তাই তার কাছে সামান্য, অকিঞ্চিৎকর। এই চেহারা ভালোবাসার। অশ্রুর বিলাস নয়, সমাজের কচকচি নয়, কোনো উচ্ছ্বাস-আবেগ নেই, মান-অভিমানের লোভনীয় অভিনয় করেনি, আলোছায়ার লীলা ছিল না, তার ভিতর দিয়ে আমি আমার সর্ব্বোত্তম মনুষ্যত্বকে অনুভব করেছি।—সোমেশ্বর চোখ বুজলেন।

কতকাল গেল তার পরে।—চোখ বুজেই তিনি পুনরায় সুরু করলেন, ক' বছর তা আর মনে নেই। স্ত্রী পুত্র নিয়ে সংসারে মন দিয়েছি, টাক্ পড়েছে মাথায়। আমার স্ত্রী ছিলেন মৃণালের বড় প্রিয়, বড় আত্মীয়। কিন্তু আমার বিয়ের পর থেকেই মৃণাল দেশ ছেড়েছিল, স্ত্রীর হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে। মানা করেছিল, তাকে যেন না খুঁজি। খুঁজিয়োনি তাকে।

আমি এইবার বললাম, খোঁজনি কেন?

কেন?—সোমেশ্বর বললেন, খুঁজবো তাকে মনে, খুঁজবো প্রাণ দিয়ে। ভগবৎ গীতার মতো সে মধুর। যখনই ভাবি তখনই নতুন অর্থ পাই, নতুন ক'রে চোখ খুলে যায় দিকে দিকে।

তারপর?

তারপর এই জীবনে কেবলমাত্র আর পাঁচ মিনিটের জন্য তার দেখা পেয়েছিলুম। দেখা না পেলেও কিছু এসে যেত না। কমলেশ্বর তীর্থের পথে দেখা তার সঙ্গে, চম্পারণের এক রেলওয়ে ষ্টেশনের ধারে। বাউলের বেশে গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা ক'রে ফিরছে। জীর্ণ মলিন বেশ, বিগতযৌবনা, তার কুরূপ আরও কিছু কদাকার হয়ে উঠেছে,—ধনাঢ্য এবং সুপুরুষ 'রাজপুত্র' আমি সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালুম। কেমন একটা অদ্ভুত ইচ্ছা হোলো সেদিন তার পায়ের ধুলো নিতে। বেশি কথা হবার অবকাশ ছিল না। দু'জনের মাঝখানে যেন একটা প্রকাণ্ড ফাঁক, কাল-কালান্ত ধ'রে ছুটলেও তাকে ধরা কঠিন। আশ্চর্য্য, আমার কুশল সে আর জিজ্ঞাসা করলে না, আমার সম্বন্ধে আর তার উদ্বেগ নেই, ভাল ক'রে লক্ষ্যও করলে না আমাকে। আমার কাছ থেকে চলে' যেতে পারলেই সে যেন খুসি হয়। তার পথে বাধা দিয়ে বললুম, কি জন্যে তুমি এমন ক'রে সর্ব্বস্বান্ত করলে নিজেকে মৃণাল?

আমার কম্পিত উদ্বেলিত কণ্ঠে তার মুখে হাসি ফুটল, তপোবনের ঋষিকন্যার মতো জ্যোতির্ম্ময় হাসি তার। সোহাগের সুরে আমার কাঁধে হাত রেখে বললে, সর্ব্বস্বান্ত হয়ে সর্ব্বস্বকে পেয়েছি সোমেশ্বর।

চমকে উঠলুম। বললুম, কে সে? তুমি আমাকে আর ভালোবাসোনা মৃণাল?

না।

তবে?

যাঁকে ভালোবাসি তিনি আছেন আমার মনে।—বুকে হাত রেখে মৃণাল বললে, তাঁর পথ আমার মহাপ্রাণের মহাবৃন্দাবনে। আমি কোনোদিন কারুকেই ভালোবাসিনি সোমেশ্বর।

সে কি, বঞ্চনা ক'রে এসেছ আমাকে এতকাল?

না, আমাদের মিলনের তুমিই ছিলে দূত!—হেসে সে আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিলে। তারপর বললে, ঠাকুর, কিছু ভিক্ষা দেবে গরীবকে?

দিলুম না ভিক্ষে, দেবার সাধ্য ছিল না, শক্তি ছিল না; কেবল আমার স্তম্ভিত দৃষ্টির সুমুখ দিয়ে দেখলুম, মৃণাল চলে' গেল হেসে হেসে, বাউলের একটা গানের ধুয়ো ধরে' হেলে দুলে। সে যেন পরম প্রেমিককে পেয়ে গেছে সখ্যভাবের মাধুর্য্য দিয়ে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তিমান বৈজ্ঞানিক। দেশ-বিদেশের বহু মনীষী তাঁহার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির মুক্তকণ্ঠে যশোগান করিতেছেন। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ কীর্ত্তিত করিয়াছেন। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ্‌-জীবনবিৎ রুষিয়ানিবাসী অধ্যাপক টিমিরিয়াজেফ্ বলিয়াছেন—His work must at once be acknow-

আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র

আচার্য্য বসুর সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা অবলা বসু

পণ্ডিতপ্রবর সোডাট্ আচার্য্য জগদীশের পরীক্ষাপ্রণালীকে marvellous methods of experimentation বলিয়া ledged as a classic in the field of physiological research. হাবারল্যাণ্ড লিখিয়াছেন যে আচার্য্য বসু

মহাশয় দ্বারা অদৃষ্টপূর্ব্ব জীবনের বিবিধ তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। লোকোত্তর প্রতিভাশালী জগদ্বিখ্যাত আইনষ্টাইন্ বলিয়াছেন—A monument should be erected in recognition of human achievement so great as that of Bose. মনীষী বার্ণার্ড শ' তাঁহাকে the greatest biologist বলিয়া শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য জগদীশের এই সকল কীর্ত্তি অপেক্ষা বহুগুণে মহত্তর যে তাঁহার অপূর্ব্ব তেজোদীপ্ত জীবন অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত চিরদিন বিশ্বব্যাপী কীর্ত্তিকে পশ্চাতে ফেলিয়া গোপনে প্রবাহিত হইতেছে তাহার সন্ধান খুব কম লোকে জানে। সে বিষয়ে দু'একটি কথা এই প্রবন্ধে আমি বলিব।

করিয়াছিল আচার্য্যের পরবর্ত্তী জীবনে তাহা সমগ্র রূপে ও রসে পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ কর্ণের চরিত্র আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জীবনে আশ্চর্য্যরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ব্যর্থতার সঙ্গে নিয়ত দ্বন্দ্ব করিয়া আপন পৌরুষ মন্ত্র সম্বল করিয়া কর্ণ অদৃষ্টের পরিহাস সহ্য করিয়াছেন কিন্তু জীবনের প্রজ্ঞালব্ধ পরম সত্যকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই. আচার্য্য জগদীশও তেমনি সকল লোভ, সকল সুখ, আপাত শান্তি, করতলগত যশঃ তুচ্ছ করিয়া সত্যের মহিমা প্রচারে নিত্যব্রতী আছেন, কর্ণেরই মত জীবনে কখনও বীরের সদ্‌গতি হইতে তিনি ভ্রষ্ট হন নাই। আযৌবন আমরা তাঁহার
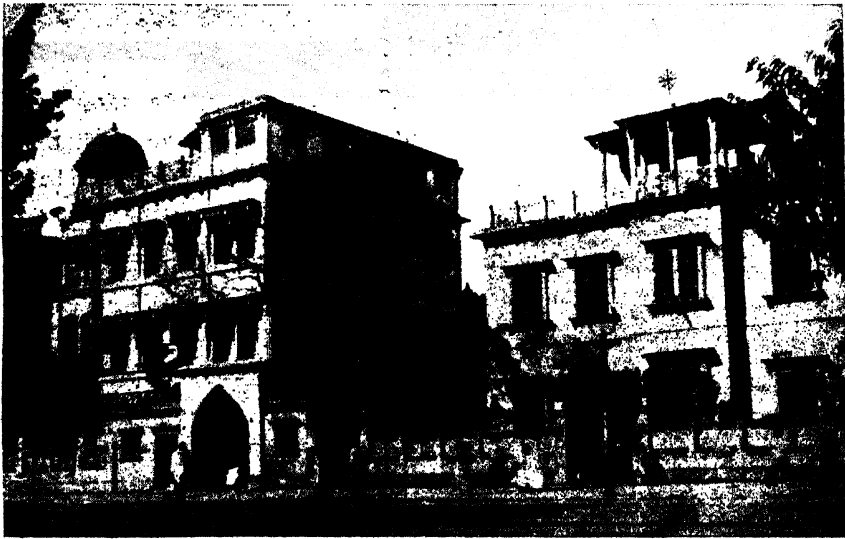
বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

জীবন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের নামান্তর মাত্র। যাঁহারা এই সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে ভীত হন না, বিজয়ী হইবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা যাঁহাদের মনে নিত্য জাগ্রত থাকে তাঁহারাই বিশ্বে প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়া বন্দিত হইয়া থাকেন। আচার্য্য জগদীশের জীবনে আমরা এই সংগ্রামস্পৃহা—এই বিজিগীষা মূর্ত্ত দেখিতে পাই। বাল্যে মহাভারতের কর্ণ-চরিত্র তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল; পৌরুষসর্ব্বস্ব এই বীর তাঁহার শিশু মনে যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার

জীবনে সত্য-প্রতিষ্ঠার জন্য এই বীরত্বের নিদর্শন খুঁজিয়া পাই।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তখনকার দিনে Imperial Service-এ অধিষ্ঠিত থাকিয়াও ভারতবাসিগণ ইউরোপীয়দিগের ⅔ংশ বেতন মাত্র পাইবার অধিকারী ছিলেন। বিদ্যাবত্তায়, অধ্যাপন-কুশলতায়, চরিত্রবলে শ্রেষ্ঠতর হইলেও ভারতবাসীর পক্ষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত না। এইরূপ ব্যবস্থার

অন্তরালে ভারতীয়ের প্রতি যে এক নিদারুণ অবজ্ঞা ও রূঢ় অবিচার পুষ্পে কীট সম লুক্কায়িত থাকিয়া বিশ্বের দরবারে ভারতবাসীকে হীন প্রতিপন্ন করিতেছিল, পরিপূর্ণ প্রাণশক্তিতে বলীয়ান জগদীশচন্দ্রের নিকট তাহা মনুষ্যত্বের গভীর অপমান বলিয়া মনে হইল। তিনি সুতীব্র প্রতিবাদ দ্বারা এই অপমান, এই অন্যায়, এই লজ্জাকর অসঙ্গতি দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি স্থির করিলেন যতদিন এই অনুচিত অসামঞ্জস্য বিদূরিত না হইবে প্রতিবাদস্বরূপ তিনি তাঁহার প্রাপ্য বেতন গ্রহণ না করিয়া যথারীতি কর্ত্তব্যসম্পাদন করিয়া যাইবেন। তখন তাঁহার পারিবারিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না, বহুব্যয়সাধ্য শিক্ষা সমাপন করিয়া সদ্য তিনি তখন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, অপরিশোধিত পিতৃ-ঋণ দুর্ব্বিষহ বোঝার মত স্কন্ধে চাপিয়া আছে, বেতনগ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় নানা অভাবের মধ্য দিয়া কষ্টে তাঁহার দিনাতিপাত হইতে লাগিল, তথাপি তিনি তাঁহার সঙ্কল্প হইতে তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। দীর্ঘ তিন বৎসর ধরিয়া এই সংগ্রাম চলিল। অবশেষে সত্যের জয় হইল, গবর্ণমেণ্ট জগদীশ-চন্দ্রকে স্থায়ী অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার তিন বৎসরের পূর্ণ বেতন এক সঙ্গে দিতে বাধ্য হইলেন।

এই সংগ্রামের ফলে জগদীশচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে স্বাধীনতা না থাকিলে কেবল পরদেশবাসীদিগের মুখাপেক্ষী হইলে বিজ্ঞানচর্চ্চায় বা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভারতীয়গণের কখনও সফলতালাভ হইবে না। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব বেতন ও পরবর্ত্তী জীবনের কষ্ট-সঞ্চিত সমগ্র অর্থ বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত করিলেন।

বস্তুতঃ ভারতবাসী কর্ত্তৃক বিজ্ঞানে নূতন আবিষ্ক্রিয়া ব্যতীত জগৎসমাজে ভারত কখনও সম্মানিত স্থান অধিকার করিতে পারে না। ঐ সময় বিদ্যুৎতরঙ্গ সম্বন্ধীয় গবেষণায় আচার্য্য এতগুলি নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেন যে জগদ্বিখ্যাত লর্ড কেল্‌ভিন লিখিলেন—I am literally filled with wonder and admiration. বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্যার জে, জে টমসনও লিখিয়াছেন যে এই সমস্ত আবিষ্কার mark the dawn of the revival in India of interest in researches in Physical Science; this which has been so marked a feature of the last thirty years is very largely due to the work and influene of Sir Jagadis Bose. এইরূপে অভিনব গবেষণা দ্বারা জগৎ-সভায় প্রতিষ্ঠার আসন অর্জ্জন করিয়া আপন প্রতিভাবলে অবশেষে তিনি ভারতীয় ও ইউরোপীয় অধ্যাপকদিগের

গবেষণা-নিরত আচার্য্য বসু

মধ্যে অসঙ্গত পার্থক্য তুলিয়া দিতে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিলেন। বিজয় সম্পূর্ণ হইল। বাঙ্গালীর মনে এ ঘটনা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, কারণ এই জয় শুধু ব্যক্তিগত গৌরবের বিষয় নহে, ইহা ভারতবাসীর জাতীয় গর্ব্ব ও জাতীয় সম্মানকে জগতের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; ভারতবাসীর প্রতি যে গ্লানিকর অবিচার ও অপমান বিনাপ্রতিবাদে এতদিন অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতে-ছিল একজন বাঙ্গালীর তেজস্বিতায় তাহা চিরতরে অপনোদিত হইয়াছে।

সত্যপ্রতিষ্ঠা ও ন্যায়ের মর্য্যাদারক্ষার জন্য এইরূপ নির্ভীক তেজস্বিতা জগদীশচন্দ্রের জীবনে উত্তরোত্তর

শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। দুরতিক্রম্য বাধা-বিঘ্ন কখনও তাঁহাকে হীনবল করিতে পারে নাই, পরন্তু দ্বিগুণিত বিক্রমে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া অগ্রসর হইবার উৎসাহ জোগাইয়াছে। পদার্থবিজ্ঞানে লব্ধকীর্ত্তি জগদীশচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার পরিকল্পিত ক্ষুদ্রতরঙ্গোৎপাদক বেতার-যন্ত্রের বার্ত্তাগ্রাহক অংশটি লইয়া কার্য্য করিতে করিতে একদিন লক্ষ্য করিলেন যে উহা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। অজৈব পদার্থনির্ম্মিত গ্রাহকযন্ত্রের এইরূপ ক্লান্তির নবোদ্‌ঘাটিত ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিয়া তিনি দেখিলেন উহার প্রণালী প্রাণিপেশীর অনুরূপ। উদ্ভিদ্‌জীবনে এই অনুরূপতা আরও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইল। তখন হইতে তাঁহার মানসনয়নে জৈব-অজৈবের সীমারেখা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল এবং উভয়ের মিলনক্ষেত্র সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১০মে তারিখে তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত জীববিজ্ঞানের এই অভিনব তথ্য রয়াল সোসাইটিতে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিলেন। এই তথ্য প্রচলিত মতবিরুদ্ধ বলিয়া প্রাণতত্ত্ববিদ্যার দু' একজন অগ্রণী ইহার বিরোধিতা করিলেন। তাঁহাদের মতে জগদীশচন্দ্র প্রধানতঃ পদার্থতত্ত্ববিৎ, স্বীয় গণ্ডি অতিক্রম করিয়া জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের সমাজভুক্ত হইবার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা ও রীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে। এ সম্পর্কে আরও দু'একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ ছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে একজন জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারগুলিকে পরে তাঁহার নিজের বলিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপে বহুকাল ধরিয়া বহুপ্রকারে তাঁহার সমুদয় কার্য্য পণ্ড করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। কিন্তু জগদীশচন্দ্র ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। আশৈশব কর্ণচরিত্র যাঁহার জীবনের আদর্শ, প্রতিকূল অবস্থার তাড়নায় তিনি নিরুৎসাহ হইবেন কেন?—নিষ্ফলতার বিরুদ্ধে, ঘনায়মান ব্যর্থতার সঙ্গে সংগ্রাম করাই যে তাঁহার আবাল্য আদর্শের বিশেষত্ব। সমবেত প্রাণতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রতিবাদকে তিনি সত্যনির্দ্ধারণের সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বীর স্পর্দ্ধিত আহ্বান বলিয়া গ্রহণ করিলেন। অতঃপর বহুরথীবেষ্টিত এই কঠোর সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইল। তিনি একক, কিন্তু প্রতিপক্ষ দলবদ্ধ; ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, জয়-পরাজয় অনিশ্চিত। এদিকে পদার্থবিজ্ঞানে তাঁহার খ্যাতি তখন সুদূরবিস্তৃত হইয়াছে, লর্ড কেল্‌ভিন প্রমুখ দিক্‌পালগণ সসম্ভ্রম বিস্ময়ে তাঁহার গবেষণার মৌলিকতা স্বীকার করিয়াছেন, পদার্থবিদ্যার যশোলক্ষ্মী বহুসাধনায় অর্জ্জিত তাঁহার কণ্ঠে দোলায়মান বিজয়মাল্যের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ধ্রুব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র ছাড়িয়া অজ্ঞাত অন্ধকারে ঝাঁপাইয়া পড়িতে তাঁহাকে নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু সত্যমুগ্ধ চিত্ত তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠায় আপনার সঙ্কল্পসাধনে বদ্ধপরিকর হইল। পদার্থতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকে অন্যপথে যাইতে দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন, প্রাণতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বীরের হৃদয় তাহাতে কম্পিত হইল না, সকলের সহানুভূতি এবং সাহচর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার সঙ্কল্প আরও দৃঢ়ীভূত হইল মাত্র। তিনি আপনার পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়া ঘোষণা করিলেন,—"যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলনিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাসনয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন, বার বার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই সেই একদিন বিজয়ী হইয়াছে।"

(২)

বিজ্ঞান বস্তুতঃপক্ষে সার্ব্বভৌমিক। কিন্তু বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কি কোনও স্থান নাই যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অনধিকৃত বা অসম্পূর্ণ থাকিবে? এ সম্বন্ধে আচার্য্য জগদীশ বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহুবিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্য দেশে কার্য্যের সুবিধার জন্য তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্য জগৎ অতি বিচিত্র এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে, তাহা কোনরূপেই বোধগম্য হয় না। এই সতত চঞ্চল প্রাণী আর চির মৌন অবিচলিত উদ্ভিদ্, ইহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই

উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্নরূপে সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড় উদ্ভিদ্ এবং জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে। এতদর্থে ভারতীয় সাধক কখনও তাহার চিন্তা কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়াছে এবং পর-মুহূর্ত্তেই তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়াছে। যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে তথায় অতীন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল তাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। কৃত্রিম চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যদৃষ্টির অভাবনীয় এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাহার দুইটি চক্ষু একসময়ে জাগরিত থাকে না, পর্য্যায়ক্রমে একটি ঘুমায়, আর একটি জাগিয়া থাকে। ধাতুপত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছে। অদৃশ্য আলোক সাহায্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের ভিতরের নির্ম্মাণ-কৌশল বাহির করিয়াছে। আণবিক কারুকার্য্য ঘূর্ণ্যমান বিদ্যুৎ-ঊর্ম্মির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে মানবজীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া নির্ব্বাক জীবনের উত্তেজনা মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিয়াছে। বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি মাপিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন আহার-বিহার ও ব্যবহারে সেই বৃদ্ধির মাত্রার পরিবর্ত্তন মুহূর্ত্তে ধরিয়াছে। হস্তের আঘাতে যে বৃক্ষ সঙ্কুচিত হয় তাহা প্রমাণ করিয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহাদের একই রকম ক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। উদ্ভিদের পেশীস্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদয়স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছে। বৃক্ষশরীরে স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে যে, যে সকল কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্দ্ধিত বা মন্দীভূত হয় সেই একই কারণে উদ্ভিদস্নায়ুর আবেগ উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়।"

উদ্ধৃতাংশে আচার্য্য যে সকল তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য অভিনব যন্ত্রসমূহের পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণ সম্পূর্ণরূপে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। এই যন্ত্রগুলি দ্বারা জীবকোষের সঙ্কোচন অথবা প্রসারণ কোটিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল সূক্ষ্ম পরীক্ষাসিদ্ধ তথ্যের আবিষ্কারে এইরূপ অপূর্ব্ব সফলতা পূর্ব্বে কখনও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় নাই। সেই হেতু বিজ্ঞান-মন্দিরে নির্ম্মিত যন্ত্রসমূহের কার্য্যকারিতা নিরূপণকল্পে রয়াল সোসাইটির এক কমিটি নিযুক্ত হয়। কমিটির সকল সদস্য একবাক্যে স্বীকার করেন যে—We are satisfied that the growth of plant tissues is correctly recorded by Sir J. C. Bose's Crescograph, and at a magnification of from one million to ten million times. বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে উদ্ভাবিত ও তাহার কারখানায় নির্ম্মিত অন্যান্য যন্ত্র সম্বন্ধেও সমান খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছে। এই সকল যন্ত্র ও তল্লব্ধ পরীক্ষার ফল চাক্ষুষ দেখিয়া পূর্ব্বে যাঁহারা জগদীশচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এখন তাঁহাদের অনেকেই তাঁহার গুণগ্রাহী হইয়াছেন। বিরুদ্ধ পক্ষের সেই জীবতত্ত্ব-বিদ্‌গণই আচার্য্য বসুকে রয়াল সোসাইটির সদস্য মনোনীত করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। ভিয়েনা একাডেমি অব সায়েন্স তাঁহাকে বিশেষ সম্মানিত সভ্য নিয়োগ করিয়া তাঁহার গবেষণাসমূহকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও উচ্চ লক্ষ্য সম্বন্ধে ইংলণ্ডের জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে—We recognise the position in the scientific world which has been attained by the Bose Institute for the advancement of science, and to add the expression of our high appreciation of the work achieved and the new methods devised there, to the universal interest which they have excited. * * * We welcome the co-operation of the East with the West in the advancement of knowledge, and believe that a further expansion of the activities of the Institute will lead, as they have in its short past, to results both scientific and material, which will redound to the credit of India and her Goverment. ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার প্রশংসা করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দির সম্পর্কে বলিয়াছেন—Growth of the Bose Institute proves also that India possesses men of great public spirit. Action similar to that of Sir Jagadis Bose might well be imitated in Great Britain which is greatly in need of such manifestations of genuine patriotism.

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের বিভিন্নমুখী নানাবিধ গবেষণার ফলে পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, এমন কি মনস্তত্ত্ববিদ্যাও এক কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। যথার্থ উক্ত হইয়াছে যে "বিধাতা যদি কোন বিশেষ তীর্থ ভারতীয় বিজ্ঞানসাধকের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তবে এই চতুর্বেণী-সঙ্গমেই সেই মহাতীর্থ।" এই মহাতীর্থের প্রতিষ্ঠাতা পরম সাধক আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রতিকূল অবস্থার সহিত নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফলেই আজ বিজ্ঞানের অনতিক্রমণীয় সঙ্কীর্ণ কক্ষবিভাগ বিদূরিত হইয়া স্বীকৃত হইয়াছে—A physiologist must to a certain extent be at once a physicist, a chemist and a morphologist.

পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিঃসহায় অবস্থায় প্রতিভা কিরূপে আপনার পথ করিয়া লয়—কুলাবধূতাচার্য্য পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহার দৃষ্টান্তস্থল। বঙ্গদেশে যাঁহারা পাণ্ডিত্যখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই দরিদ্রের সন্তান। বঙ্গীয় পণ্ডিতসমাজ অর্থকে কোন দিনই প্রাধান্ত দেন নাই—দারিদ্র্যই ছিল তাঁহাদের অলঙ্কার ও অহঙ্কার। চিরদিন তাঁহারা অর্থকে অবহেলা করিয়া জ্ঞানানুশীলনেই জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। চব্বিশপরগণার অন্তর্গত বড়িশা-বেহালার নিকটবর্ত্তী মুবাদিপুর গ্রামে এইরূপ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহে সন ১২৩৫ সালে জগন্মোহন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রাঘবেন্দ্র স্থায়বাচস্পতি মহাশয় বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন।

বালক জগন্মোহনের প্রথম বিদ্যারম্ভ হয় গ্রামস্থ এক পাঠশালায়। কিন্তু বাল্যকালে তিনি এত দুরন্ত ছিলেন যে, গুরুমহাশয় কিছুতেই তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া বালককে স্থায়বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট আনিয়া বলিলেন যে, এই অনাবিষ্ট বালককে লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র—ইহার লেখাপড়া শিখিবার কোনই আশা নাই।

গুরুমহাশয় যখন হাল ছাড়িয়া দিলেন, তখন স্থায়-বাচস্পতি মহাশয়কেই হাল ধরিতে হইল—পিতা স্বয়ং পুত্রের শিক্ষাভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনিও গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। স্থায়বাচস্পতি মহাশয় দেশমান্ত পণ্ডিত, অথচ নিজের পুত্রকেই ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে অকৃতকার্য্য হইলেন। অগত্যা বিরক্ত হইয়া তিনি সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া পুঁথি পুস্তক কাড়িয়া লইলেন। বালকের লেখা-পড়া শিখিবার বালাই দূর হইল। তিনি সানন্দ চিত্তে কেবল খেলাধূলা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। প্রতিভার ইহা একটি অভ্রান্ত লক্ষণ। বহু প্রতিভাবান ব্যক্তির বাল্য জীবনে পাঠে অমনোযোগ লক্ষিত হয়; অথচ, উত্তরকালে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত হয়।

জগন্মোহনের বেলাও তাহাই হইয়াছিল। গুরুমহাশয় এবং পণ্ডিত পিতা—উভয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে দেখিয়া জগন্মোহনের জননীর হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি বাষ্পাকুল নয়নে পুত্রকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তুমি এত বড় পণ্ডিতের পুত্র হইয়াও মূর্খ হইয়া থাকিলে বংশে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। মাতার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া বালকের প্রাণ গলিল। তিনি জননীর কাছে প্রতিশ্রুত হইলেন, লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। কিন্তু গুরুমহাশয় বা পিতার নিকট পড়িবেন না। তখন মাতাপুত্রে পরামর্শের পর স্থির হইল জগন্মোহন কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিবেন। কিন্তু ইহাতেও এক বিষম বাধা উপস্থিত হইল। স্থায়বাচস্পতি মহাশয়ের অবস্থা এরূপ নহে যে তিনি পুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া সংস্কৃত কলেজে পড়াইবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারেন। অনেক পরামর্শ ও চেষ্টার পর কলিকাতাস্থিত তাঁহার এক আত্মীয়ের গৃহে আশ্রয় মিলিল।

কিন্তু আত্মীয়ের সহিত তাঁহার বনিবনাও হইল না—কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি এই আশ্রয় ত্যাগ করিয়া একদিন সকাল বেলা বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, এবং যথাসময়ে বিদ্যালয়ে গমন করিলেন। তাঁহার শুষ্ক চিন্তাকুল বিষণ্ণ বদন দেখিয়া কলেজের অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া সহানুভূতি ও স্নেহপূর্ণ মিষ্টবাক্যে প্রশ্ন করিয়া করিয়া তাঁহার দুঃখের বৃত্তান্ত সকলই অবগত হইলেন, এবং আরও জানিতে পারিলেন যে সেদিন বালকের আদৌ আহার হয় নাই। গোস্বামী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, জগন্মোহন যদি তাঁহার বাড়ীতে রন্ধন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে আহারের চিন্তা করিতে হইবে না, গোস্বামী মহাশয় তাহার লেখাপড়া শিক্ষার ভারও গ্রহণ করিতে পারিবেন। জগন্মোহন সানন্দে ও সাগ্রহে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

তাঁহার একটা আশ্রয় মিলিল। জগন্মোহনের পূর্ব্বে এবং পরে দেশে-বিদেশে তাঁহার ন্যায় আরও কত-শত বালককে এই ভাবে দুর্ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইয়াছে।

কিন্তু জগন্মোহন বালক মাত্র—দুগ্ধপোষ্য শিশু বলিলেই হয়। গৃহে তাঁহার পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বর্ত্তমান। তাঁহাকে কখনও গৃহে বা অন্যত্র হাঁড়ী ঠেলিতে হয় নাই। তিনি রন্ধনের কি জানেন? কাজেই, গোস্বামী মহাশয়ের সংসারে জগন্মোহনের দ্বারা রন্ধনের কাজ যে কিরূপ সুশৃঙ্খলে চলিতে লাগিল তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। ভাত কোন দিন অর্দ্ধসিদ্ধ অবস্থায় নামানো হয়; কোন দিন অতিসিদ্ধ হইয়া গলিয়া যায়, কোন দিন বা পুড়িয়া যায়। তরকারীতে কোন দিন লবণ ও অন্যান্য মশলা পড়ে, কোন দিন পড়ে না, আবার কোন দিন লবণ মশলা এত বেশী পড়ে যে, তাহা মুখে করিতে পারা যায় না।

গতিক দেখিয়া জগন্মোহনকে রন্ধনের দায় হইতে নিষ্কৃতি দিয়া গোস্বামী মহাশয়কে রন্ধনের জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে হইল। জগন্মোহন ভাবিলেন, তাঁহার এ আশ্রয়টিও গেল। তিনি অন্যত্র আশ্রয়ানুসন্ধানে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতা আর তাঁহাকে বিপদে ফেলিলেন না। গোস্বামী মহাশয় জগন্মোহনকে বলিলেন, তোমাকে রাঁধিতেও হইবে না, অন্য কোথাও যাইতেও হইবে না। আমি তোমার ভার লইয়াছি। তুমি এইখানে থাকিয়াই নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনা কর। জগন্মোহনের পক্ষে ইহার অপেক্ষা আনন্দ ও আশ্বাসের কথা আর কি হইতে পারে! তিনি এইবার নিশ্চিন্ত হইলেন এবং অখণ্ড মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করিতে লাগিলেন।

অধ্যবসায়ের ফলও অচিরে ফলিল—প্রতিভা জয়যুক্ত হইল। বাৎসরিক পরীক্ষায় জগন্মোহন নিজ শ্রেণীর ও তাহার উপরের শ্রেণীর এককালে পরীক্ষা দিয়া প্রথম হইয়া বৃত্তি লাভ করিলেন। তাঁহার দুঃখ-দুর্দ্দশার আপাততঃ অবসান হইল।

জগন্মোহন নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নচেৎ, তাঁহার আত্মসম্মান-জ্ঞানের অভাব ছিল না—পরঘরী ও পরভাতী হইয়া থাকা যে অকর্ত্তব্য, এ বোধ তাঁহার সেই বালক বয়সেই যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তিনি বৃত্তি পাইয়া এক্ষণে আত্মনির্ভরশীল হইয়াছেন—তিনি আর গোস্বামী মহাশয়ের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে চাহিলেন না। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে বহু উপরোধ অনুরোধ করিলেন যে তুমি যেমন আছ তেমনি থাকিয়া যেমন পড়াশুনা করিতেছিলে তেমনি করিতে থাক। জগন্মোহন তাহা শুনিলেন না। কিন্তু তাঁহাকে বৃত্তির টাকা হইতে কিছুই খরচ করিতে হইত না। তিনি প্রত্যহ সিধা পাইতেন, বাজার হইতে তোলা পাইতেন। কেবল তাঁহাকে নিজের রন্ধনটা নিজেই করিয়া লইতে হইত; বৃত্তির টাকা প্রতি মাসেই পুরাপুরি সঞ্চিত হইত। কয়েক মাসে কিছু সঞ্চয় হইলে সমস্ত টাকা লইয়া তিনি নিজ গৃহে গমন করিয়া পিতাকে প্রদান করেন। ইহাতে তাঁহার পিতা যে কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। পুত্র-গৌরবে পিতা পরম গৌরবান্বিত বোধ করিতে লাগিলেন। সেই অনাবিষ্ট বালক, যাহাকে তিনি শত চেষ্টাতেও ব্যাকরণ শিখাইতে না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সে এখন সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র, বৃত্তিধারী, আত্মনির্ভরশীল। ইহাতে কোন্ পিতার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া না উঠে? দরিদ্র ব্রাহ্মণ একসঙ্গে অনেকগুলি টাকা পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গেলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া জগন্মোহন আবার যথারীতি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। পড়া যত অগ্রসর হইতে লাগিল, বৃত্তির পরিমাণও তত বাড়িতে লাগিল। যখন তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর, তখন তাঁহার বৃত্তির পরিমাণও ষোল টাকা। এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, সংসারের গুরু ভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার অধ্যয়ন বন্ধ হইবার কথা। কিন্তু তাহা হয় নাই। বৃত্তির টাকায় তাঁহার সংসার ও অধ্যয়ন সমান ভাবে চলিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে তিনি সাহিত্য, ন্যায়, অলঙ্কার, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করিলেন। এবং তর্কালঙ্কার উপাধি লাভ করিলেন।

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থশালাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইয়াছিল। অধ্যয়ন শেষ করিয়াই তিনি এই পদে নিযুক্ত হইলেন। এখন তাঁহার অর্থাভাব ঘুচিল, সংসারের অবস্থা সচ্ছল হইল; এবং অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়নও চলিতে লাগিল। কলেজের গ্রন্থাগারে সঞ্চিত রাশি রাশি শাস্ত্র গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে কলেজের কোন অধ্যাপক অবসর গ্রহণ করিলে তিনি অস্থায়ী ভাবে সেই পদে নিযুক্ত হইয়া অধ্যাপনাও করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধ্যাপনায় ছাত্রগণও প্রীতি লাভ করিতেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ও তাঁহার অধ্যাপনায় সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার প্রশংসা করিতেন।

গ্রন্থাধ্যক্ষতা করিতে করিতে তর্কালঙ্কার মহাশয় চণ্ড-কৌশিকী গ্রন্থের একখানি টীকা রচনা করেন। তাহা এত সুন্দর হইয়াছিল যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা এম-এ পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচন করেন। জগন্মোহন সঙ্গয়ী ছিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে "ভাবপ্রকাশ যন্ত্রালয়" ও "পুরাণ প্রকাশ যন্ত্রালয়" নামে দুইটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন এবং বহু সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। "পরিদর্শক" নামে একখানি বাঙ্গলা দৈনিক এবং একখানি বাঙ্গলা মাসিকও তিনি কিছু দিন প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকখানি তন্ত্রশাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থও ছিল। সদাশিবোক্ত তন্ত্রসার তিনি বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অনুবাদ করিয়া তিনি প্রচার করিলে তাহার অত্যধিক আদর হইয়াছিল—অনেকে তন্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং সকলেই তাঁহার অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। যে সকল প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বর্দ্ধমানের রাজবাটীর মহাভারত অনুবাদে সহায়তা করিয়াছিলেন, জগন্মোহন তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন এবং প্রথম পুরস্কার তিনিই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে ছাপাখানা দুইটি হস্তান্তরিত হইল। এখন তিনি সাধন-মার্গের পথিক হইলেন। তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনায় তিনি তন্ত্রের সার মর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে সংসার-চিন্তা হইতে অবসর লইয়া তন্ত্রমতে শিব-সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে সাধন-মার্গে তিনি এতদূর অগ্রসর হইলেন যে, লোকে তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ বিবেচনা করিতে লাগিল, এবং বহু ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যোগ্য পাত্র বিবেচনায় অনেককে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া তিনি ধন্য করিলেন। কেবল তর্কালঙ্কার রূপে তিনি যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অনুবাদের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তর্কালঙ্কার ও সাধক রূপে তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলেন। এই সংস্করণে তাঁহার সাধনলব্ধ জ্ঞান সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থখানির প্রভূত উন্নতি হইল। ইহার পর তিনি শিবসংহিতা মূল ও তাহার উৎকৃষ্ট অনুবাদ প্রকাশ করেন। এখানি যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

তর্কালঙ্কার মহাশয় যে সকল গ্রন্থ রচনা ও যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাদের সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায় না। এখানে কেবল কয়েকখানির মাত্র নামোল্লেখ করা যাইতেছে। (১) সানুবাদ মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র; (২) নিত্য পূজা পদ্ধতি; (৩) দশবিধ সংস্কার পদ্ধতি। (৪) শ্রাদ্ধ পদ্ধতি; (৫) গুরুতন্ত্রম্; (৬) সংশয় নিরাস; (৭) রহস্য পূজা পদ্ধতি; (৮) সানুবাদ শিব সংহিতা ইত্যাদি।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতিভা ছিল যেমন অনন্য-সাধারণ, তদ্রূপ অদম্য অধ্যবসায়ও ছিল। সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ ছিল তাঁহার বিশিষ্টতা। বাল্যকালে তিনি দুরন্তের শিরোমণি ছিলেন—এত দুরন্ত ছিলেন যে তাঁহার গুরু মহাশয় ও পিতা কেহই তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইতে পারেন নাই। আবার যখন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন প্রথম বৎসরই নিজের শ্রেণী ও তাহার উপরের শ্রেণীর পাঠ একসঙ্গে শেষ করিয়া পরীক্ষায় প্রথম হইলেন। যখন তিনি জ্যোতিষের শ্রেণীতে পড়িতে-ছিলেন তখন অধ্যাপক মহাশয় জ্যোতিষের কোন পাঠ্য গ্রন্থের একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া ছাত্রদিগকে বলিলেন, এই অংশ অতি দুরূহ; ইহা বুঝিতে এবং বুঝাইতে পারেন, এমন পণ্ডিত বঙ্গদেশে নাই। আমি নিজেও ইহা বুঝিতে পারি নাই, তা তোমাদিগকে বুঝাইব কি? অন্যান্য ছাত্র অধ্যাপকের উক্তি শিরোধার্য্য করিয়া তাহাতেই সায় দিয়া

গেলেন। কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথা স্বতন্ত্র। অধ্যবসায়ী তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বয়ং যত্ন সহকারে ঐ দুরূহ অংশ অধ্যয়ন করিয়া উহার মর্ম্ম অবগত হইলেন এবং সতীর্থদিগকে অক্লেশে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। আবার সাধন-মার্গেও দেখি, তিনি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন এবং দলে দলে লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

শেষ জীবনে তন্ত্রজগতের ভাস্কর স্বরূপ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় কুলাবধূতাচার্য্য এবং সাধকবর্গের মধ্যে পূর্ণানন্দ তীর্থনাথ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি কেবল গ্রন্থ প্রচার দ্বারা শৈব মার্গ প্রদর্শন করেন নাই, স্বয়ং সাধক রূপেও আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে হইতে তিনি গঙ্গাবাসী হন এবং বাগবাজারের জমিদার নন্দলাল বসু মহাশয়ের খড়দহস্থ বাগানবাটীতে বাস করিতে থাকেন। সেইখানে ১৩০৬ সালের ১১ই চৈত্র তারিখে (২৪ মার্চ্চ ১৯০০) শনিবার শীতলাষ্টমী তিথিতে এই প্রশস্ত-ললাট, উজ্জ্বল-নেত্র, শান্তমূর্ত্তি, প্রতিভামণ্ডিত-গম্ভীর-প্রফুল্ল-বদন, তন্ত্রজ্ঞ-প্রধান সাধকপ্রবর মহাত্মা জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় দেহত্যাগ করিয়া শিবলোক প্রাপ্ত হন।

সীমাহীন ব্যবধান

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী বি-এ

সেদিন বুঝি বা শরৎকালের শুক্লা চতুর্দ্দশী,
রূপালি আলোকে ভেসে গেল ধরা—উঠেছিল নভে শশী।
গৃহ-তরুতলে কি যেন কি ছলে গিয়েছিলে, পড়ে মনে;
অপরাজিতার ঘুম ভেঙেছিল কঙ্কণ-নিক্বণে।
মোর চোখে বুঝি ছিল বিস্ময়—যুগান্তরের আশা;
তোমারো চোখের তারায় ছিল যে তারে খুঁজিবার ভাষা।
বাহুর পেষণে দেহ হতে তব অঞ্চল গেল খসি।
সেদিন বুঝিবা শরৎকালের শুক্লা চতুর্দ্দশী।

আকাশে সেদিন ঘন মেঘ-ভার, ঝটিকার বিদ্রোহ;
তোমার হিয়ার অতলে কি জানি কেন জেগেছিল মোহ।
তমাল তরুর কম্পিত শাখে বিহ্বল ব্যাকুলতা
তোমার নয়নে এনেছিল সেকি অনুরাগ-মদিরতা।
গৃহদীপশিখা আঁধারে মিলালো, তুমি তারি সমতুল
নিয়েছিলে আসি আমার বুকের আশ্রয় অনুকূল।
বাহিরে নিমেষে মুছে গেল সব—সে কি সুখ-সমারোহ!
আকাশে সেদিন ঘন মেঘ-ভার ঝটিকার বিদ্রোহ।

এলো ফাল্গুন, সেদিন সমীরে জেগেছিল ফুলদল।
তোমার দেহের কানায় কানায় যৌবন উচ্ছল।
বঁইচি-বনের ও-ধারে নিরালা মাধবী-লতার তলে
বাঁকা গ্রীবাখানি হেলায়ে সহসা চেয়েছিলে কুতূহলে।
ছিল কটীতটে মৃণালী মেখলা, অলকে ঝুমকো ফুল;
ওই দু'টি ঠোঁট হলো উন্মুখ চুম্বন-বেয়াকুল।
সুন্দর হলো পদতলে তৃণ, সুদূরের নীলাচল।
এলো ফাল্গুন, সেদিন সমীরে জেগেছিল ফুলদল।

বাহুতে তোমার ছিল যে জড়ায়ে সুদূর সম্ভাবনা,
তোমার হাসির বাঁশীতে বেজেছে ফল্গু কলস্বনা;
তোমার দিঠির আলোক ছুঁয়েছে আকাশের পরিসীমা,
দেখেছি তোমার হৃদয়ের পাশে জীবনের মাধুরিমা;
কপোলে তোমার ছিল লাল হয়ে কল্পলোকের আশা
পেয়েছিনু যেন তোমার বুকের কম্পন-পরিভাষা!
আজ সবি কি গো বৃথা হয়ে যাবে—সে দিনের অবদান?
তোমার আমার মাঝারে বহিবে সীমাহীন ব্যবধান?

অনুরাধা

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১)

কন্যার বিবাহ-যোগ্য বয়সের সম্বন্ধে যত মিথ্যা চালানো যায় চালাইয়াও সীমানা ডিঙাইয়াছে। বিবাহের আশাও শেষ হইয়াছে।—'ওমা, সে কি কথা!' হইতে আরম্ভ করিয়া চোখ টিপিয়া কন্যার ছেলে-মেয়ের সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিয়াও এখন আর কেহ রস পায় না, সমাজে এ রসিকতাও বাহুল্য হইয়াছে। এম্‌নি দশা অনুরাধার। অথচ, ঘটনা সে-যুগের নয়, নিতান্তই আধুনিক কালের। এমন দিনেও যে কেবল মাত্র গণ-পণ, ঠিকুজি-কোষ্ঠী ও কুল-শীলের যাচাই বাছাই করিতে এমনটা ঘটিল—অনুরাধার বয়স তেইশ পার হইয়া গেল, বর জুটিল না,—একথা সহজে বিশ্বাস হয়না। তবু ঘটনা সত্য। সকালে এই গল্পই চলিতেছিল আজ জমিদারের কাছারিতে। নূতন জমিদারের নাম হরিহর ঘোষাল,—কলিকাতা বাসী—তাঁর ছোট ছেলে বিজয় আসিয়াছে গ্রামে।

বিজয় মুখের চুরুটটা নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বল্‌লে গগন চাটুয্যের বোন্? বাড়ী ছাড়বেনা?

যে-লোকটা খবর আনিয়াছিল সে কহিল, বল্‌লে যা' বল্‌বার ছোটবাবু এলে তাঁকেই বলবো।

বিজয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তার বল্‌বার আছে কি! এর মানে তাদের বার করে দিতে আমাকে যেতে হবে নিজে। লোক দিয়ে হবেনা?

লোকটা চুপ করিয়া রহিল, বিজয় পুনশ্চ কহিল, বলবার তার কিছুই নেই বিনোদ,—কিছুই আমি শুনবোনা। তবু তারি জন্যে আমাকেই যেতে হবে তাঁর কাছে—তিনি নিজে এসে দুঃখ জানাতে পারবেননা?

বিনোদ কহিল, আমি তাও বলেছিলাম। অনুরাধা বললে আমিও ভদ্র-গেরস্ত-ঘরের মেয়ে বিনোদদা, বাড়ী ছেড়ে যদি বার হতেই হয় তাঁকে জানিয়ে একেবারেই বার হয়ে যাবো, বার বার বাইরে আসতে পারবোনা।

—কি নাম বললে হে অনুরাধা? নামের ত দেখি ভারি চটক্,—তাই বুঝি এখনো অহঙ্কার ঘুচ্‌লোনা?

—আজ্ঞে না।

বিনোদ গ্রামের লোক, অনুরাধাদের দুর্দ্দশার ইতিহাস সে-ই বলিতেছিল। কিন্তু অনতিপূর্ব্ব ইতিহাসেরও একটা অতিপূর্ব্ব ইতিহাস থাকে,—সেইটা বলি।

এই গ্রামখানির নাম গণেশপুর, একদিন ইহা অনুরাধাদেরই ছিল, বছর পাঁচেক হইল হাত-বদল হইয়াছে। সম্পত্তির মুনাফা হাজার দুইয়ের বেশি নয় কিন্তু অনুরাধার পিতা অমর চাটুয্যের চাল-চলন ছিল বিশ হাজারের মতো। অতএব ঋণের দায়ে ভদ্রাসন পর্য্যন্ত গেল ডিক্রি হইয়া। ডিক্রি হইল, কিন্তু জারি হইল না,—মহাজন ভয়ে থামিয়া রহিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন যেমন বড় কুলীন তেমনি ছিল প্রচণ্ড তাঁর জপ-তপ ক্রিয়া-কর্ম্মের খ্যাতি। তলা-ফুটা সংসার-তরণী অপব্যয়ের লোনা-জলে কানায়-কানায় পূর্ণ হইল কিন্তু ডুবিল না। হিন্দু-গোঁড়ামির পরিস্ফীত পালে সর্ব্বসাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধার ঝোড়ো হাওয়া এই নিমজ্জিত-প্রায় নৌকাখানিকে ঠেলিতে ঠেলিতে দিল অমর চাটুয্যের আয়ুষ্কালের সীমানা উত্তীর্ণ করিয়া। অতএব, চাটুয্যের জীবদ্দশাটা একপ্রকার ভালই কাটিল। তিনি মরিলেনও ঘটা করিয়া, শ্রাদ্ধশান্তিও নির্ব্বাহিত হইল ঘটা করিয়া, কিন্তু সম্পত্তির পরিসমাপ্তি ঘটিলও এইখানে। এতদিন নাকটুকু মাত্র ভাসাইয়া যে-তরণী কোনমতে নিশ্বাস টানিতেছিল এইবার 'বাবুদের-বাড়ীর' সমস্ত মর্য্যাদা লইয়া অতলে তলাইতে আর কাল-বিলম্ব করিলনা।

পিতার মৃত্যুতে পুত্র গগন পাইল এক জরা-জীর্ণ ডিক্রি-করা পৈতৃক বাস্তুভিটা, আকণ্ঠ ঋণ-ভার-গ্রস্ত গ্রাম্য সম্পত্তি, গোটা কয়েক গরু-ছাগল-কুকুর-বিড়াল এবং ঘাড়ে পড়িল পিতার দ্বিতীয় পক্ষের অনূঢ়া কন্যা অনুরাধা।

এইবার পাত্র জুটিল গ্রামেরই এক ভদ্র ব্যক্তি। গোটা পাঁচ ছয় ছেলে-মেয়ে ও নাতী-পুতী রাখিয়া বছর দুই হইল তাহার স্ত্রী মরিয়াছে, সে বিবাহ করিতে চায়।

এম সি সি ভারতবর্ষে এসে যতোগুলি ম্যাচ খেলেছে তার ফলাফলের তালিকা দিচ্ছি :—

(১) এম্ সি সি—২৯২ ও ৭০ (চার উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ; রুবিজ্ ইলেভন—৯৯ ও ১০৩ (ছয় উইকেট)। ফল ড্র।

(২) এম্ সি সি—৩৬২ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ; করাচী—৮৯ ও ১১২ (৪ উইকেট)। ফল ড্র।

(৩) এম্ সি সি—৩০৭ (৫ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ও ১৪০ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ; সিন্ধ্—১৮৯ ও ১৬৭। এম সি সি ৯১ রানে জেতে।

(৪) এম্ সি সি—৩৫০ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ; উত্তর সীমান্ত প্রদেশ—৯৪ ও ১২১। এম সি সি জেতে এক ইনিংস্ ও ১৩৫ রানে।

(৫) এম্ সি সি—৪০২ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ; পাঞ্জাব গভর্ণারস্ ইলেভন্—২৫৩ (৮ উইকেট) ফল ড্র।

(৬) এম্ সি সি—২৪৬ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ; উত্তর ভারত—৫৩ আর ৫৮। এম্ সি সি এক ইনিংস্ ও ১৩৫ রানে জেতে।

(৭) এম্ সি সি—৪৫০ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ; দক্ষিণ পাঞ্জাব—২৬৪ আর ১০৩ (এক উইকেট)। ফল ড্র।

(৮) এম্ সি সি—৩৩০ ; পাতিয়ালা—৩৩৫ (৬ উইকেট)। ফল ড্র।

(৯) এম্ সি সি—৩৩৩ ; দিল্লী ও ডিস্‌ট্রিকটস্—৯৮ আর ১০২। এম সি সি জেতে এক ইনিংশ ও ১৩৩ রানে।

(১০) এম্ সি সি—৪৩১ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ; ভাইসরয়েস্ ইলেভন্—১৬০ ও ৬৩। এম্ সি সি এক ইনিংস্ ও ২০৮ রানে জেতে।

(১১) এম্ সি সি—২১৩ ; রাজপুতানা—৩২ ও ৭৪। এম্ সি সি জেতে এক ইনিংস্ ও ১০৭ রানে।

(১২) এম্ সি সি—২৫৪ (৬ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ও ৬০ (৬ উইকেট) ; পশ্চিম ভারতীয় করদ রাজ্য—৬৪ ও ২৪৯। এম্ সি সি চার উইকেটে জেতে।

(১৩) এম্ সি সি—১৫১ (৯ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ; জামনগর—৯০ ও ৪৫ (৬ উইকেট)। খেলা হয়েছিলো অনেকটা স্ফূর্ত্তি করবার জন্যে। ফল অবিশ্যি বলতে গেলে ড্রই বলতে হ'বে।

(১৪) এম্ সি সি—৪৮১ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ; বোম্বাই প্রেসিডেন্সি—৮৭ ও ১৯১ (৫ উইকেট)। ফল ড্র।

(১৫) এম্ সি সি—৩১৯ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ; বোম্বাই সিটি—১৪০ ও ৫৬ (২ উইকেট)। ফল ড্র।

(১৬) **প্রথম টেষ্ট :** ভারতবর্ষ—২১৯ ও ২৫৮ ; ইংলণ্ড—৪৩৮ ও ৪০ (১ উইকেট)। ইংলণ্ডের ৯ উইকেটে জিত।

(১৭) এম্ সি সি—১৬১ (৫ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ; পুনা—৮৩ ও ৩৯ (২ উইকেট)। একদিন খেলা হ'তে পারে না বৃষ্টির জন্যে। ফল ড্র।

(১৮) এম্ সি সি—১৮৭ (৫ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ; বঙ্গ ও আসামের ব্রিটিশ দল—১২১ (৮ উইকেট)। ফল ড্র।

(১৯) এম্ সি সি—১৭৯ (৬ উইকেট—২ উইকেটেই ডিক্লেয়ার্ড) ; বঙ্গ-ফেরঙ্গ দল—১২৩। এম্ সি সি আট উইকেটে জেতে।

(২০) এম্ সি সি—৩৩১ ও ২৭৯ (৫ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ; অল ইণ্ডিয়া—১৬৮ ও ১৫২ (১ উইকেট)। ফল ড্র।

(২১) **দ্বিতীয় টেষ্ট :** ইংলণ্ড—৪০৩ ও ৭ (২ উইকেট) ; ভারতবর্ষ—২৪৭ ও ২৩৭। ফল ড্র।

(২২) এম্ সি সি—১১১ ও ১৩৯ ; ভিজিয়ানাগ্রাম ইলেভন্—১২৪ ও ১৪০। এম্ সি সির ১৪ রানে হার। একমাত্র হার এ দেশে। প্রত্যেক ইনিংসেই কম।

(২৩) এম্ সি সি—১৫৭ ও ৫২ (০ উইকেট) ; মধ্যভারত—১৫৭। ফল ড্র।

(২৪) এম্ সি সি—২৬১ ও ১২৯ (৪ উইকেট) ; মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—১৯৫ ও ১৮৮। এম্ সি সি জিতে ছয় উইকেটে।

(২৫) এম্ সি সি—১১২ ও ৩০৩ ; মইমুদ্দৌল্লা ইলেভন্ (সেকেন্দ্রাবাদ)—১৯৪ ও ১৮৮ (৯ উইকেট)। ফল ড্র।

(২৬) এম সি সি—৪৫১ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ও ৭২ (০ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড); মহীশূর ইলেভন—১০৭ ও ৫৫। এম সি সির ৩৬১ রানে জিতে।

(২৭) এম সি সি—৬০৩ ; মাদ্রাজ ইলেভন—১০৬ ও ১৪৫। এম সি সি এক ইনিংস ও ৩৫২ রানে জেতে।

(২৮) এম সি সি—২৬৮ (৬ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড); ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট ফেডারেশন (মাদ্রাজ)—৮১। এম সি সির ১৮৭ রানে জিত।

(২৯) **তৃতীয় টেষ্ট :** ইংলণ্ড—৩৩৫ ও ২৬১ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড); ভারতবর্ষ—১৪৫ ও ২৪৯। ইংলণ্ডের ২০২ রানে জিত।

(৩০) এম সি সি—২৭২ ও ২৫ (০ উইকেট); অল সিলোন ইলেভন—১০৬ ও ১৮৯। এম সি সি ১০ উইকেটে জেতে।

(৩১) এম সি সি—৫৯ (২ উইকেট); গ্যালে ইলেভন—৭৯ (৭ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড)। বৃষ্টির জন্ম খেলা বন্ধ হ'য়ে যায় ; প্রায় তিন ঘণ্টা খেলা হয়। ফল ড্র।

(৩২) এম সি সি—১৫৫ ও ৭৮ ; ইণ্ডো-সিলোন—১০৪ ও ১২১। এম সি সি মাত্র ৮ রানে জেতে।

(৩৩) এম সি সি—২২৮ (২ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ও ৫৩ (১ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড); আপ্‌কান্ট্রি সিলোন—৭২ ও ১০০ (২ উইকেট)। এম সি সি ১০৯ রানে জেতে। ইহা পিকনিক ম্যাচের মতন খেলা হয়।

(৩৪) এম সি সি—২২৪ ও ২১৫ ; এল ইণ্ডিয়া—২৩৮ ও ১১২ (৪ উইকেট)। ফল ড্র। ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত বিহারের দুর্গতদের সাহায্যার্থে এই ম্যাচ খেলা হয়। খরচখরচা বাদে প্রায় বার হাজার টাকা উঠেছে।

১৯২৬-২৭ সালে এম সি সি এদেশে এসে গিলিগানের নেতৃত্বে যে এগারটা ম্যাচ জিতেছিলো তার ফলাফল :

এম সি সি—করাচিতে, অল করাচি ইলেভনকে হারায় এক ইনিংস ও ১৪৮ রানে।

„ —লাহোরে, উত্তর ভারতকে, এক ইংনিস ও ১৫২ রানে।

„ —আজমীরে, রাজপুতানা ও মধ্যভারত ইলেভনকে, এক ইনিংস ও ১৬৭ রানে।

„ —বোম্বাই-এ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীকে এক ইনিংস ও ১১৭ রানে।

„ —কলিকাতায়, ইণ্ডিয়ান ও এ আই ইলেভনকে ১১৯ রানে।

„ —কলিকাতায়, ভারতের ইয়োরোপীয়ান ইলেভনকে এক ইনিংস ও ৫৫ রানে।

„ —কলিকাতায়, এল ইণ্ডিয়া ইলেভনকে ৪ উইকেটে।

„ —রেঙ্গুনে, অলবর্মা ইলেভনকে ১০ উইকেটে।

„ —মাদ্রাজে, অল মাদ্রাজ ইলেভনকে ২১১ রানে।

„ —কলম্বোয়, সিলোন ইলেভনকে এক ইনিংস ও ২১ রানে।

„ —আলিগড়ে, আলিগড় ইউনিভারসিটি অতীত ও বর্ত্তমান ইলেভনকে এক ইনিংস ও ১৪ রানে।

এম সি সির এবারের সমস্ত খেলার সংক্ষেপে ফলাফল :

খেলা	জিত	ড্র	হার
৩৪	১৬	১৭	১

	মোট রান	উইকেট	এভারেজ
এম সি সি	১১২১৫	৩২৭	৩১'৯৫
বিপক্ষদল	৭৮৪২	৪৭০	১৯'৯৮

এম সি সির ১৯২৬-২৭ সালের সংক্ষেপে ফলাফল :

খেলা	জিত	ড্র	হার
৩৪	১১	২৩	০

	মোট রান	উইকেট	এভারেজ
এম সি সি	১২১৪১	৩২৭	৩৭'১২
বিপক্ষদল	৯৩৯৪	৪৭০	১৯'৯৮

পল্লীগ্রামের পুনর্গঠন

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

(২)

ইতঃপূর্ব্বে আমরা পল্লীগ্রামের পুনর্গঠনকল্পে বাঙ্গলা সরকার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার আলোচনা করিয়াছি। বাঙ্গলার গভর্ণর সারজন এণ্ডার্শন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—প্রথমেই কৃষি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। কৃষি ও কৃষক অভিন্ন; এবং এ দেশকে যে কৃষকের সাম্রাজ্য বলা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত নহে। সার জন এণ্ডার্শন আজ যাহা বলিতেছেন "আইরিশ এগ্রিকাল্‌চারাল অর্গানাইজেশন সোসাইটী" নামক বিশ্ব-বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকালে সার হোরেস প্লাংকেট তাহাই বলিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সার হোরেস সর্ব্বপ্রথম যে পুস্তিকা প্রচার করেন, তাহাতে লিখিত হয়:—

"আয়ার্লণ্ডকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিতে হইলে নানা কায করিতে হইবে, নানা শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইবে।"

আজ বাঙ্গলার গভর্ণর তাহাই বলিয়াছেন। তিনি আয়ার্লণ্ডের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন; হয়ত সেই দেশের ব্যবস্থাই এ দেশের উপযোগী করিতে চাহিতেছেন। এ বিষয়ে আয়র্লণ্ডের সহিত ভারতের সাদৃশ্য অসাধারণ। কেন না আয়ার্লণ্ডও এই দেশের মত কৃষিপ্রধান এবং সম্ভবতঃ এখনও বহুকাল কৃষিপ্রধান থাকিবে অর্থাৎ এই দেশদ্বয়ে সকল শ্রেণীর লোকের কল্যাণ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—

(১) ভূমি হইতে উৎপন্ন ধনের পরিমাণ

(২) এই ধনোৎপাদনের দক্ষতা

(৩) স্বল্প ব্যয়ে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষও আয়র্লণ্ডেরই মত কেবল স্বদেশে ব্যবহার জন্য নহে, পরন্তু বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্যও, কৃষিজ পণ্য উৎপন্ন করে।

যে সময় আয়র্লণ্ডে পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সময় সে দেশের কৃষির যে অবস্থা—যে দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, আজ এ দেশে কৃষির সেই দুরবস্থা পরিলক্ষিত হইতেছে। আমরা কৃষিজ পণ্যেও বিদেশের প্রতিযোগিতা প্রহত করিতে পারিতেছি না। সমগ্র ভারতবর্ষে ৮ কোটি একর জমীতে ধান্যের ও ২ কোটি ৩৯ লক্ষ একর জমীতে গমের চাষ হয়। যখন কৃষি কমিশন এ দেশে কৃষির অবস্থা পরীক্ষা করিয়া তাহার উন্নতিসাধনোপায় নির্দ্ধারণের কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন ভারতবর্ষ হইতে গম রপ্তানী করিবার জন্য করাচী বন্দরের বিস্তার ব্যবস্থা হইতেছিল। পঞ্জাবে সেচের খালে বহু জমীতে গমের চাষ হইতেছিল। তখনই অবস্থা পরীক্ষা করিয়া কমিশন মত প্রকাশ করেন, অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষ বিদেশে গম রপ্তানী না করিয়া বিদেশ হইতে গম আমদানী করিবে। অর্থাৎ ভারতবর্ষে উৎপন্ন গম যে মূল্যে বিক্রয় না করিলে লাভ হইবে না, তদপেক্ষা অল্প মূল্যে এ দেশে বিদেশ হইতে আমদানী গম বিক্রীত হইবে। এখন তাহাই হইয়াছে এবং পঞ্জাবের কৃষকরা রেলের ভাড়া হ্রাস প্রভৃতি নানা সুবিধা লাভ করিয়াও বিদেশী গমের সমান মূল্যে কলিকাতায় গম বিক্রয় করিতে পারিতেছে না। ধান্য যে বাঙ্গালার তুলনায় কোন য়ুরোপীয় দেশ অল্প ব্যয়ে উৎপন্ন করিতে পারে, দশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহার মধ্যেই বিলাতের বাজারে বাঙ্গলার ও ভারতের চাউল হস্তচ্যুত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

এইরূপ অবস্থা উপলব্ধি করিয়াই আয়ার্লণ্ডে কয় জন দেশসেবক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া—সরকারের সাহায্যের অপেক্ষা না রাখিয়া—কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সার হোরেস প্লাংকেট তাঁহাদিগের নেতা ও অগ্রণী। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সার হোরেস প্রমুখ কয়জন লোক এই উদ্দেশ্যে এক সমিতি

গঠিত করেন। ডেনমার্কে ও সুইডেনে কি উপায়ে কৃষির উন্নতি সাধিত হয়, তাহা দেখিয়া আসিবার জন্য তাঁহারা সমিতির এক জন সদস্যকে ঐ দেশদ্বয়ে প্রেরণ করেন। তাঁহারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন এবং প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।

একান্ত পরিতাপের বিষয়, বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত কেহই এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। যাঁহারা সরকারী সাহায্যে বৃত্তি লাভ করিয়া বিদেশে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অনেকেই স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরী লইয়াছিলেন! সে দেশে কর্ম্মীরা সরকারী সাহায্য গ্রহণ করেন নাই; এ দেশে আমরা সরকারের উপরই নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি।

সরকারের সাহায্যের মূল্য যে আয়র্লণ্ডের দেশপ্রেমিকরা উপলব্ধি করিতেন না, তাহা নহে। আমরা পূর্ব্বে সার হোরেস প্লাংকেটের যে পুস্তিকার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে লিখিত ছিল:—অন্যান্য দেশে কৃষির যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা কতকাংশে সরকারী সাহায্যহেতু। কিন্তু তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল, আত্মনির্ভরশীল কৃষকরা একযোগে কায করিলে যে সাফল্য লাভ করিতে পারে, সরকারী সাহায্যে তাহা পারে না। সেই জন্য তাঁহারা কৃষক-সমিতি গঠিত করিয়া সে সকল সমবায় নীতিতে পরিচালিত করিতে থাকেন।

তাঁহারা যে বলিয়াছিলেন, কৃষির উন্নতি সাধন ব্যতীত আরও নানা কায করিয়া দেশের সমৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে, তাহা আমরাও অনুভব করি এবং সেই জন্য মনে করি, পল্লীগ্রাম পুনরায় গঠিত করিতে হইলে, তথায় নানা শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কৃষকদিগকে শিক্ষা প্রদানও প্রয়োজন।

সংপ্রতি বরোদা দরবারের দাওয়ান এক বিবৃতিতে কোসাম্বার পল্লীর পুনর্গঠন কার্য্যের জন্য কেন্দ্র স্থাপনের কারণ ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন:—

"ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, ঋতুগত ও অন্যান্য কারণে বৎসরের কয় মাসমাত্র জমীতে চাষের কায করা যায়। সেই জন্য লক্ষ লক্ষ লোক বৎসরের কতকাংশ কার্য্যের অভাবে অলস ভাবে যাপন করে। যে সব স্থানে সেচের সুব্যবস্থা থাকায় কৃষিকার্য্যের সুবিধা আছে, সে সব স্থানে কৃষকরা বৎসরে দুই তিন মাস নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকে; আর যে অঞ্চলে জমীর আর্দ্রতা অল্প সে অঞ্চলে তাহারা বৎসরে আট হইতে নয় মাস পর্য্যন্ত কায পায় না। এইরূপে লোককে যে দীর্ঘকাল বাধ্য হইয়া অলস থাকিতে হয়, তাহার ফলে আর্থিক ও নৈতিক নানা উৎপাতের আবির্ভাব অনিবার্য্য হয়,—লোক অপরিচ্ছন্ন হয়, ঈর্ষ্যাপরায়ণ হয়, দলাদলিতে মত্ত হয় এবং যে মোকর্দ্দমা দেশে দ্বিতীয় প্রধান ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার অনুশীলন করে। সুতরাং কৃষকদিগের জন্য অবসরকালে কায যোগাইবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সর্ব্বত্র যে একই শিল্প প্রতিষ্ঠা করা চলে অর্থাৎ তাহাতে লাভ হয়, এমন নহে। সুতরাং গ্রামের বা অঞ্চলের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া কোথায় কোন্ শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিলে নরনারী কৃষির অবসরকালে তাহাতে আত্মনিয়োগ করিয়া লাভবান হইতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং ব্যবস্থা স্থির করিয়া ধীরভাবে কায সম্পন্ন করিতে হইবে।"

বাঙ্গালারও অবস্থা এইরূপ। সার জন এণ্ডার্সন সে দিন বলিয়াছেন:—

"বাঙ্গালার প্রাকৃতিক সম্পদ অল্প নহে—বাঙ্গালায় লোকেরও অভাব নাই। কিন্তু যে ব্যবস্থায় এই অবস্থায় বাঙ্গালার বিরাট কৃষকসম্প্রদায় ঋণভারে পীড়িত হইয়া কোনরূপে দিনপাত করে এবং দ্বাদশ মাসের মধ্যে নয় মাস কাযের অভাব অনুভব করে, সে ব্যবস্থায় কোথায় কোন ত্রুটি আছে।"

ত্রুটি যে আছে, তাহাতে সন্দেহ কি? পূর্ব্বে যখন সত্য সত্যই স্বচ্ছন্দবনজাত শাকে লোকের উদর পূর্ণ হইত—যখন বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা ছিল—নদীনালা বর্ষাকালে কূল ছাপাইয়া জমীতে যে পলি দিয়া যাইত, তাহার ফলে স্বল্প চেষ্টায় প্রভূত শস্য উৎপন্ন হইত—লোকসংখ্যা অল্প থাকায় জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা অনুভূত হইত না—গোচরের প্রাচুর্য্যে বিনা ব্যয়ে পয়স্বিনী গবী পালন করিয়া দুগ্ধ ও নদীনালার বাহুল্যে মৎস্য লাভ করা যাইত,

বর্ত্তমান জীবনযাত্রার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় জীবন-যাত্রার ব্যয় অল্প ছিল এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপন হেতু ব্যয় অল্প হইত—তখনও বাঙ্গালা শিল্পশূন্য ছিলনা—বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান হইলেও কৃষিপ্রাণ ছিল না। বাঙ্গালায় কৃষিজ পণ্য হইতে চিনি, নীল, পাটের চট ও থলিয়া প্রস্তুত হইত। বাঙ্গালায় যে কার্পাস বস্ত্র বয়ন করা হইত, তাহা দেশে ও বিদেশে আদৃত ছিল। বাঙ্গালার কতকগুলি স্থান রেশমী কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আজ আমরা যখন কলিকাতার উপকণ্ঠে গঙ্গার উভয় কূলে পাটকলগুলি দেখি, তখন কয় জন মনে করি, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রয়েল তাঁহার ভারতের আঁশপূর্ণ উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় পুস্তকে হেনলী নামক কলিকাতার কোন ব্যবসায়ীর পাট শিল্প সম্বন্ধে যে বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়, তখন বাঙ্গালার নরনারী পাটের কাপড় বয়ন করিয়া লাভবান হইত। হেনলী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"থলিয়া প্রস্তুত করিবার জন্য চট বয়ন করাতেই পাট অধিক প্রযুক্ত হয়। নিম্ন বঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলে এই চট বয়ন শিল্প গৃহস্থের অন্যতম প্রধান শিল্প বলা যায়। সকল শ্রেণীর লোক—গৃহে গৃহে এই শিল্পের অনুশীলন করিয়া থাকে। ইহাতে পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক—সকলেরই কাযের অভাব দূর হয়। অবসরকালে নৌকার মাঝি, চাষী, পাল্কীর বাহক, বাড়ীর চাকর—সকলেই পাট হইতে সুতা প্রস্তুত করে। এই সুতা প্রস্তুত করিয়া চট বয়ন করায় অর্থাৎ অর্থার্জ্জন করায় হিন্দু বিধবা তাঁহার স্বজনগণের নিকট ভার বলিয়া গণ্য হয়েন না। এইরূপে স্বল্প ব্যয়ে চট ও থলিয়া প্রস্তুত হয় বলিয়া সমগ্র ব্যবসায় জগতে বাঙ্গালার চট ও থলিয়া এত আদৃত।"

তাহার পর বাঙ্গালার স্থানে স্থানে নানারূপ শিল্প বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সাধারণতঃ গ্রামের কৃষক ও অন্যান্য অধিবাসীর নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য গ্রামেই প্রস্তুত হইত। কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, গোপ, তৈলিক প্রভৃতি গ্রামেই বাস করিত। তাহারা গ্রামের লোকের অভাব পূর্ণ করিয়া গ্রামের বাহিরেও পণ্য বিক্রয় করিত। কোন কোন স্থানের মৃত্তিকার বা মৃৎপাত্র পুড়াইবার পদ্ধতির উৎকর্ষ হেতু সেই সব স্থানের মৃৎপাত্র বিশেষ আদৃত ছিল। এখনও কলিকাতায় পাইতালের হাঁড়ী আদৃত। যে সব স্থানে গোচর অধিক, সে সব স্থান হইতে মাখন, ঘৃত প্রভৃতি রপ্তানী হইত। ঢাকা, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের মিহি এবং যশোহর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানের মোটা কাপড় যেমন, ময়নামতীর ও কুষ্টিয়ার ছিট তেমনই প্রচলিত ছিল। মুর্শিদাবাদে রেশম শিল্প বহু গৃহস্থের সমৃদ্ধির সোপান ছিল এবং বিষ্ণুপুর, মালদহ, বীরভূম প্রভৃতি স্থানেও রেশমী কাপড় প্রস্তুত হইত। খাগড়ার কাঁসার বাসন সর্ব্বত্র সাদরে ব্যবহৃত হইত। জঙ্গীপুরে ও বাঁকুড়ার কম্বল প্রস্তুত হইত। এখনও অনেক স্থানে এই সব শিল্পের অবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। "বিশ্বভারতীর" চেষ্টায় বীরভূমের গালার কায মৃত্যু হইতে নব-জীবন লাভ করিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অভাব চেষ্টার। চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালার রেশম শিল্পে নবজীবন সঞ্চার করিয়া বিদেশে তাহার এত আদর করাইতে পারিয়াছিলেন যে, ফ্রান্স আপনার রেশম শিল্প রক্ষার জন্য আমদানী শুল্ক অত্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া বহরমপুরের (মুর্শিদাবাদ) রেশমী কাপড়ের আমদানী বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কাঞ্চননগরের (বর্দ্ধমান) কর্ম্মকাররা যে ছুরি, কাঁচী প্রস্তুত করিত তাহার উৎকর্ষ অসাধারণ।

সরকার মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালার যে সব শিল্প-বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন, সে সকল পাঠ করিলেই বাঙ্গালার বহু শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালার পুরাতন সাহিত্যের সাহায্যে সে সকলের তালিকা প্রস্তুত করাও অসাধ্য নহে।

সেই জন্যই আমরা বলিয়াছি, বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান হইলেও পূর্ব্বে কৃষিপ্রাণ ছিল না। আজ সে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াই কৃষকরা বৎসরে আট নয় মাস কোন কায পায় না—মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার-সমস্যার তীব্রতা আজ দেশে সন্ত্রাসবাদ বিস্তারের অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কথা ছিল—

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ,
রাজসেবা কত থচমচ।"

অথচ আজ রাজসেবা অর্থাৎ চাকরীই বাঙ্গালীর কাম্য

হইয়াছে—তাহাতেই দেশের এত দুর্দ্দশা। কৃষক ও শিল্পীর পণ্য লইয়া বণিকরা বাণিজ্য করিতেন—বাঙ্গালার বণিকরা বাঙ্গালীর নৌকায় পণ্য লইয়া বিদেশে পণ্য বিক্রয় করিয়া বিনিময়ে ধন আনিতেন—বিনিময়ে যে পণ্য আনিতেন, তাহা বিক্রয় করিয়াও লাভবান হইতেন।

আজ কৃষকের কায যোগাইবার জন্য ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে পল্লীগ্রামে বাস সম্ভব করিবার জন্য পল্লীগ্রামে শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বিশেষভাবেই অনুভূত হইতেছে।

বাঙ্গালার শিল্প বিভাগ যে ভাবে সে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে উন্নতির উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদিগের পরীক্ষিত পদ্ধতিতে যে সব পণ্য উৎপন্ন হইবে, সে সকলে স্থানীয় প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া পণ্য স্থানান্তরেও বিক্রয় করা যাইবে। সে জন্য বাজার-বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। সেদিন শিল্প বিভাগের কর্ত্তা কৃষ্ণনগরে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে জিলাবোর্ডগুলিকে এই কার্য্যে অবহিত হইতে পরামর্শ দিয়া আসিয়াছেন।

যত দিন পল্লীগ্রামে শিল্প প্রতিষ্ঠা না হইবে ও শিল্পজ পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা না যাইবে, তত দিন পল্লীগ্রামের পুনর্গঠনকার্য্য আশানুরূপ অগ্রসর হইবে না।

বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে পূর্ব্বে যে সব শিল্প ছিল সে সকলের কথা আমরা বলিয়াছি। সে সকল শিল্পের অবনতির নানা কারণের মধ্যে উৎপাদনোপায়ের উন্নতির অভাবে উৎপাদন-ব্যয়ের বাহুল্য অন্যতম। কিরূপে তাহা নিবারণ করা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন পণ্যোৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা দেখিতে হইবে। বাঙ্গালার শিল্পবিভাগ যে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। পণ্যোৎপাদন জন্য যে সকল যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়, সে সকলের উন্নতি সাধন যে সম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। একটি অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়া কথাটি বুঝান যায়। অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, সাধারণ ছাতীর বাঁটে ও ছড়িতে দাগ বা নক্সা করা হয়। পূর্ব্বে প্রদীপের শিখা ফুৎকারে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সে সব করা হইত। বদ্ধ ঘরে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় সে কায করা হইত বলিয়া বাঙ্গালী যুবকরা সে কাজ করিতে পারিত না। কিন্তু সরকারের শিল্প বিভাগের দ্বারা যে নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে ফুৎকার প্রয়োগের প্রয়োজন না হওয়ায় এখন বহু বাঙ্গালী যুবক এই ব্যবসা করিতেছে।

শিল্প বিভাগ কতকগুলি শিল্পে উন্নত পণ্যোৎপাদন-পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। সে সকলের প্রয়োগপদ্ধতি ব্যবহারের উপায়ও লোককে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

এখন পল্লীগ্রামে এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যাঁহারা পল্লীগ্রামের সংস্কার-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই এই সুযোগের সম্যক সদ্ব্যবহার করিবেন।

তাহার পর শিক্ষার কথা। শিক্ষা বলিতে কেবল কিতাবতি শিক্ষাই বুঝায় না। বরোদা দরবারের বিবৃতিতে লিখিত হইয়াছে :—

"এই প্রসঙ্গে কৃষকরা যে অনুৎপাদক ঋণ গ্রহণ করে, তাহারও উল্লেখ করিতে হয়। দরবার হইতে যে অনুসন্ধান হয়, তাহাতে দেখা গিয়াছিল, কৃষকরা যে ঋণভারে পীড়িত তাহার অর্দ্ধাংশেরও অধিক বিবাহ বা শ্রাদ্ধাদির জন্য। কাযেই যত দিন কৃষকরা পূর্ব্বপ্রথার প্রভাবমুক্ত না হয়, তত দিন তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি-সাধন সম্ভব হইবে না। এ বিষয়ে বহু কর্ম্মীর অবহিত হওয়া প্রয়োজন।"

এ কথা কেবল বরোদা দরবারই বলেন নাই। যিনি পঞ্জাবের কৃষকের অবস্থা বিশেষভাবে ও সহানুভূতি সহকারে লক্ষ্য ও পরীক্ষা করিয়াছেন এবং পঞ্জাবের কৃষকের সম্বন্ধে যাঁহার পুস্তক প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত, সেই ডার্লিং বলিয়াছেন :—

"যাহারা বিশেষ ঋণশালী নহে তাহাদিগের ছয় মাসের বা তাহারও অধিককালের আয় বিবাহেই ব্যয় হইয়া যায়। আবার জমীর বিভাগহেতু কৃষির উন্নতি-সাধন অসম্ভব হয়। ফলে এই হয় যে, জাপানে যে সম্পদ জাতীয় উন্নতির ভিত্তি হইয়াছে, এ দেশে তাহা সরকারের পক্ষে বিব্রতকারী অনর্থের নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

দুঃখের বিষয় এ দেশে কৃষককে অর্থনীতি সম্বন্ধে আবশ্যক শিক্ষা প্রদানের কোনরূপ সুব্যবস্থা হয় নাই। সরকার যখন সমবায় ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠার দ্বারা কৃষককে মহাজনের ঋণের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার

চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে মিতব্যয়িতার ও অপব্যয় বর্জ্জনের শিক্ষা প্রদান করা হয় নাই। পঞ্জাবে জমী হস্তান্তর করা যাহাতে সহজসাধ্য না থাকে, সে জন্ম আইন করা হইয়াছে। তাহাতে কেবল সুফলই ফলে নাই। বাঙ্গালার ভূমিবন্দোবস্ত ভিন্নরূপ, সুতরাং বাঙ্গালায় ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহাও ভিন্নরূপ হইবে।

কৃষককে ঋণের বিষম ভার হইতে মুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু ঋণ অস্বীকার করিলে সমাজে অর্থনীতিক বিপ্লব হয়। কাযেই ঋণ কি ভাবে শোধ করা হইবে, তাহা ভাবিবার বিষয়। সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু কৃষক যে ঋণ করে—অসঙ্গত ভাবে ঋণগ্রস্ত হয়—তাহার অজ্ঞতাই কি তাহার কারণ নহে? বাঙ্গালা সরকার আজকাল চলচ্চিত্রের সাহায্যে কৃষককে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন; পঞ্জাবে বেতারের ব্যবস্থাও কল্পিত হইতেছে। এই সব উপায়ে কি কৃষককে মিতব্যয়িতার সুবিধা ও প্রয়োজন বুঝান যায় না?

বাঙ্গালা সরকারের প্রচার বিভাগ আছে। আমরা প্রচার বিভাগের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করি। প্রচার বিভাগ যদি কেবল রাজনীতিক কার্য্যেই অবহিত না থাকিয়া গঠনকার্য্যে অধিক মনোযোগ দেন, তবে ভাল হয়। কারণ, গঠনকার্য্যের প্রয়োজন যত অধিক, তত আর কিছুরই নহে। প্রচার বিভাগের সাহায্যে কৃষি ও শিল্পের নানারূপ উন্নতির উপায় করা যায়। সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইতে হইবে। বাঙ্গালা সরকার প্রচারকার্য্যদ্বারা যে এই সব বিষয়ে লোককে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্যান্য দেশে ইহা হইতেছে, এবং যুক্ত প্রদেশেও বুলন্দসহরের ম্যাজিষ্ট্রেট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অজ্ঞতা দূর হইলে কৃষক আর অমিতব্যয়ী হইয়া কার্য্য করিবে না, এমন আশা অবশ্যই করা যায়।

আমরা বরোদা দরবারের বিবৃতির শেষাংশের আলোচনা করিব। তাহাতে লিখিত আছে :—

"পল্লী-জীবনের সকল বিভাগে একসঙ্গে কাষ আরম্ভ না করিলে—(অর্থাৎ সকল দিকে ত্রুটি সংশোধনের ও গঠনের উপায় না করিলে)—স্থায়ী সুফল লাভের আশা থাকিতে পারে না। পল্লী-জীবনের নানা বিভাগ যে পরস্পরের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত ও পরস্পর-সাপেক্ষ এবং উন্নতির জন্ম সকল বিভাগে কায করিয়া লোকের উন্নতিলাভস্পৃহা বলবতী করিতে হইবে, ইহা বুঝিতে না পারিলে কোন ফল হইবে না। জীবন-যাত্রার আদর্শ উন্নত করিবার জন্ম যে বাসনা, তাহাই এই সমস্যার কেন্দ্র—অর্থাৎ মনের ভাব পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। উন্নতভাবে জীবন যাপন করিব, এই সঙ্কল্পের উৎস হইতেই উন্নতি সাধনের উৎসাহ উদ্গত হইবে।"

পল্লী-জীবনের সকল অংশ যে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা তাহা বিশেষভাবে বুঝিতে পারিতেছি এবং বাঙ্গলার পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশায় তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। আজ সেই দুর্দ্দশা এত বহুদূরগত হইয়াছে যে, তাহা দূর করা সত্য সত্যই কষ্টসাধ্য হইয়াছে। সেই জন্ম আমরা সর্ব্বতোভাবে সার জন এণ্ডার্শনের উক্তির সমর্থন করি—এই সমস্যার সমাধানচেষ্টা করিতে হইলে সকলকে একযোগে কায করিতে হইবে।

আয়র্লণ্ডে যাহা হইয়াছে, এ দেশে তাহা হইতে দেখিলে আমরা আনন্দিত হইতাম। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি অগ্রণী হইয়া পল্লীগ্রামের পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহারা স্বাবলম্বনের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতেন, তাহা জাতির জয়যাত্রায় সহায় হইত। তাহা হয় নাই। এখন বাঙ্গালা সরকার—পঞ্জাবের সরকারের মত এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়া দেশের লোকের সাহায্য চাহিতেছেন।

আমরা জানি, এ কায দেশের লোকের। বিশেষ এই কার্য্যের কতকগুলি অংশ দেশের লোকের চেষ্টা ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। বাঙ্গলা সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন, যে সব উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে, সে সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) জমী বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা

(২) ঋন কতকটা কমাইয়া লওয়া

(৩) গ্রাম্য দেউলিয়া আইনের ব্যবস্থা সহজ করা

(৪) সমবায় সমিতির দ্বারা কায করা

কিন্তু যদি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, ঋণ মিটাইয়া লইবার ব্যবস্থা হয়, সমবায় সমিতির সুব্যবস্থা হয়—তথাপি

লোককে এই সব সুযোগের সম্যক সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। আয়ার্লণ্ডে দেখা গিয়াছিল, অজ্ঞ আইরিশ কৃষকরা সরকারের সহিত সংস্রব থাকিলে প্রতিষ্ঠান সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিত। এই বাঙ্গালায় আমরা দেখিয়াছি, যে মহাজনরা প্রজাকে ঋণের নাগপাশবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারাই রটাইয়াছে, সমবায় ঋণ দান সমিতির উদ্দেশ্য—প্রজার জমা সরকারের খাস করিয়া দেওয়া! আর অজ্ঞ কৃষকরা যে এ কথা একেবারে অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাও নহে। যে দেশে অজ্ঞ জনগণ বিশ্বাস করে—সরকারের লোক কূপে রোগবীজ ফেলিয়া ব্যাধি বিস্তার করায়, সে দেশে জনগণের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া কার্য্যসিদ্ধি করা দুষ্কর নহে। যাহাতে স্বার্থসিদ্ধিরত লোকরা তাহা করিতে না পারে, সে জন্য দেশের শিক্ষিত লোকদিগকেই অগ্রসর হইয়া লোককে শিক্ষা দিতে হইবে। অজ্ঞ লোক কুসংস্কার হেতু কিরূপ কায করিতে পারে, তাহা বুঝাইবার জন্য সার আলফ্রেড লায়াল তাঁহার কল্পিত পিণ্ডারীকে বলাইয়াছেন—জমীপের হাকিম তাহাকে যে (উৎকৃষ্ট নূতন) বীজ বপন জন্য দিয়াছিলেন, সে তাহা সিদ্ধ করিয়া লইয়া তবে বপন করিয়াছিল—পাছে তাহা অঙ্কুরিত হয়—

"I sowed the cotton he gave me, but first
I boiled the seed."

সরকারী কর্ম্মচারী অপেক্ষা দেশের লোকই এই সব কুসংস্কার প্রহত করিতে লোককে অধিক সাহায্য প্রদান করিতে পারেন। ব্যাঙ্ক প্রভৃতি যে সব প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পল্লীগ্রামের অধিবাসী কৃষক ও শিল্পীদিগকে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে, সে সব গ্রামের লোককেই পরিচালিত করিতে হইবে—নহিলে তাহার ব্যয়ই তাহার উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। সার জন এণ্ডার্শন বলিয়াছেন, এই সব প্রতিষ্ঠান সরকারের নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত হইবে বটে, কিন্তু সরকারের দ্বারা পরিচালিত হইবে না। তাহার পর পল্লীগ্রামের লোককে শিক্ষা দিতে হইবে—তাহাদিগকে স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে উপদেশ দিতে হইবে। এ সব কাযও কি আমাদিগের নহে? সে কালে কি গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিরা, ভূস্বামীরা, এই সব কায করিতেন না? তাঁহারাই কি টোলে ও বিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য করিতেন না? তাঁহাদিগের চেষ্টাতেই কি গ্রামের পুষ্করিণী সংস্কৃত হইত না?

যে সব প্রতিষ্ঠান হইতে পল্লীবাসীরা কাযের জন্য আবশ্যক অর্থ ঋণ হিসাবে পাইবে, সে সকলের সম্বন্ধে সার জন এণ্ডার্শন বলিয়াছেন—সে সকলের লাভের কতৃকাংশ পল্লীগ্রামের উন্নতি সাধনের জন্য পাওয়া যাইবে।

আমরা সর্ব্বতোভাবে এই ব্যবস্থার সমর্থন করি। যদি পল্লীগ্রামে কৃষির উন্নতি ও শিল্প-প্রতিষ্ঠা হয়, তবে তথায় কৃষক ও শিল্পীর অবস্থার উন্নতি অনিবার্য্য হইবে। তাহাদিগের আয়বৃদ্ধি তাহাদিগের ব্যয় করিবার ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিবে—গ্রামে অধিক টাকার লেন-দেন হইবে—জীবনযাত্রার আদর্শ উচ্চ হইয়া উঠিবে।

পল্লীগ্রামে যদি স্বাবলম্বনের শিক্ষা ফলবতী হয়, তবে তাহাই প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনের আরম্ভ হইবে। যাঁহারা রাজনীতির দিক হইতেই এই প্রভাব বিচার করিবেন, তাঁহারাও ইহার অনাদর করিতে পারিবেন না। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, যে সাম্প্রদায়িকতা ও ভেদবুদ্ধি আমাদিগের রাজনীতিক উন্নতির দারুণ অন্তরায়, ইহাতে সেই দুইটিই দূর হইবে। দেশের জলকষ্ট নিবারণে, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতিতে, দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠায়, শিল্পীর পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থায়, দেশে শিক্ষার বিস্তারে—সম্প্রদায় বিশেষেরই উপকার হয় না। সে উপকার সকলেই সম্ভোগ করিয়া থাকেন। কাযেই এই সব বিষয়ে সকলে একযোগে কায করিবেন—সাম্প্রদায়িকতা আপনা আপনি দূর হইয়া যাইবে। এই সব জনহিতকর কার্য্যে গ্রামের শিক্ষিতে ও অশিক্ষিতে—ধনীতে ও দরিদ্রে যে ঘনিষ্ঠ যোগ সাধিত হইবে, তাহা অমূল্য। দেশের দরিদ্র ব্যক্তিরা যখন বুঝিবে, শিক্ষিত ব্যক্তিরা ও ধনীরা তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট, তখন তাহারা তাঁহাদিগের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়া তাঁহাদিগের অনুসরণ করিবে—তাহার পূর্ব্বে নহে।

পল্লীগ্রামের পুনর্গঠন-প্রয়োজন সম্বন্ধে মতভেদ নাই। যাঁহারা মনে করেন, পল্লীগ্রামের শ্রীনাশ অবশ্যম্ভাবী, তাঁহারা ভ্রান্ত। শতবর্ষের অভিজ্ঞতায় আজ ইংরাজ তাহা বুঝিতে পারিতেছে;—বুঝিতেছে—পল্লীগ্রামের শ্রীনাশে সমগ্রজাতির অনিষ্ট ঘটে। তাই আজ বিলাতে পল্লীগ্রামের পুনর্গঠনচেষ্টা হইতেছে। বিলাত ধনশালী, এ দেশ দরিদ্র; বিলাতে পল্লীগ্রামের পুনর্গঠনের জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় করা সম্ভব, এ দেশে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং আমাদিগকে বিশেষ সতর্কতা সহকারে—মিতব্যয়ী হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সে কার্য্যে দেশের লোককে অগ্রণী হইতে হইবে—সরকারকে উপদেশ দিতে হইবে, সরকারের সাহায্যের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

আজ সেই সুযোগ আসিয়াছে—ইহা যেন ব্যর্থ না হয়। আমরা যেন ইহা না হারাই। যে জাতি আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে না পারে, পৃথিবীতে অন্য কোন জাতি তাহাকে রক্ষা করিতে—ধ্বংস হইতে মুক্তি দিতে পারে না। পরবশ্যতাই দুঃখ—আত্মবশ হওয়াতে—স্বাবলম্বী হওয়াতেই সুখ।

সাময়িকী

বাঙ্গালার বাজেট—

বাঙ্গালার অর্থ-সচিব বাঙ্গালা সরকারের আগামী বর্ষের আয়-ব্যয়ের যে আনুমানিক হিসাব রচনা করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে বা বাঙ্গালা প্রদেশকে অভিনন্দিত করা যায় না। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনাবধি বাঙ্গালা সরকারের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়াই আছে—আয়ে ব্যয়সঙ্কুলান করা সম্ভব হয় নাই। শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলেই বাঙ্গালার অর্থ-সচিবকে ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া ভারতসরকারের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সরকার ব্যয়-সঙ্কোচ ও আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। আয়-বৃদ্ধির স্বরূপ কতকগুলি নূতন করে সপ্রকাশ। বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড লিটন এক বার বলিয়াছিলেন, তিনি যে স্থানেই গমন করেন, সেই স্থানেই লোক জনহিতকর কার্য্যের জন্য অর্থ প্রদান করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করে—কিন্তু বাঙ্গালা সরকারের টাকা নাই। টাকার অভাবে বাঙ্গালা সরকার প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতা-মূলক করিতে পারেন নাই; টাকার অভাবে বাঙ্গালার থানায় থানায় দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ত পরের কথা দাতব্য চিকিৎসালয়ে সমাগত রোগীদিগের চিকিৎসার্থ আবশ্যক পরিমাণ ঔষধ প্রদান করাও সম্ভব হয় নাই; টাকার অভাবে সরকার এখনও পল্লীগ্রামে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিতে পারেন নাই; টাকার অভাবে শিল্পে সরকারী সাহায্য প্রদানজন্য আইন বিধিবদ্ধ করিয়াও তাহার নির্দ্ধারণ কার্য্যে পরিণত করা যায় নাই।

বাঙ্গালার অর্থ-সচিব মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, বাঙ্গালার দুর্দ্দশা অন্যায় আর্থিক বন্দোবস্তের ফল। এই বন্দোবস্তের ফলে বাঙ্গলা তাহার দুইটি প্রধান আয়ে বঞ্চিত :—

(১) পাটের রপ্তানী শুল্ক

(২) আয়কর

পঞ্জাব হইতে গম, মাদ্রাজ হইতে নারিকেলের শস্য, যুক্তপ্রদেশ হইতে নানা শস্য রপ্তানী হয়; সে সকলের উপর রপ্তানী শুল্ক আদায় করা হয় না। রপ্তানী শুল্ক কেবল বাঙ্গালার পাটের উপর আদায় হয় এবং সে টাকা ভারত সরকারই গ্রহণ করেন। আয়কর সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবস্থা আছে। তবে পাটের শুল্ক সম্বন্ধে বাঙ্গালার প্রতি যে ব্যবহার করা হয়, তাহা অন্য কোন প্রদেশে প্রয়োগ করা হয় না। সেই জন্যই বাঙ্গালার লোকমত ও বাঙ্গালা সরকার একযোগে আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন—পাটের উপর রপ্তানী শুল্কের আয় বাঙ্গালার প্রাপ্য, তাহা বাঙ্গালাকে প্রদান করা হউক। এতদিনে সে আন্দোলনে ফললাভের আশা হইয়াছে। কারণ, বিলাতের পার্লামেণ্ট "শ্বেতপত্রে" ভারতে শাসন-সংস্কারের যে পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে, এই আয়ের অন্যূন অর্দ্ধাংশ পাটপ্রসূ প্রদেশকে প্রদান করা হইবে। সেই ব্যবস্থা বিবেচনা করিয়াই পার্লামেণ্ট স্থির করিয়াছেন, বাঙ্গালায় আয়ে ব্যয়নির্ব্বাহের বাধা হইবে না।

কিন্তু তাহাই কি যথেষ্ট? পাটের উপর রপ্তানী শুল্কজ আয় সম্পূর্ণরূপে না পাইলে বাঙ্গালার সাধারণ শাসনকার্য্য চলিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে অতি প্রয়োজনীয় জনহিতকর কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্পপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কথা আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে এই নদীমাতৃক প্রদেশে জলপথের দুর্দ্দশার উল্লেখ করিতে হয়। বাঙ্গালার জলপথ নষ্ট হইতেছে—তাহাই বাঙ্গালার শ্রীনাশের অন্যতম প্রধান কারণ। যে নানা কারণে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, সে সকলের আলোচনার স্থান আমাদিগের নাই। কিন্তু সেই সব কারণের নিবারণ ও দুর্দ্দশা অপসারণ ব্যতীত বাঙ্গলার শ্রী ফিরিবে না।

সেজন্য আরও অর্থের প্রয়োজন। আজ কেবল অর্থ-সচিব ঋণ করিবার সময় আশা করিতেছেন—নূতন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনকালে ভারত সরকার এই ঋণ

হইতে বাঙ্গালাকে অব্যাহতি দিবেন এবং তাহার পর বাঙ্গালা আর তাহার ন্যায্য প্রাপ্যে বঞ্চিত হইবে না।

ইহা ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু আশা মরীচিকাও যে না হইতে পারে এমন নহে। বর্ত্তমানের অবস্থা শোচনীয়। বাঙ্গালার সহিত তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, এ বার বোম্বাইয়ে ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক দেখাইয়া বাজেট রচিত হইয়াছে। ভূমিকম্পে বিহার বিধ্বস্ত হইবার মাত্র আড়াই ঘণ্টা পূর্ব্বে বিহারের সরকার যে বাজেট রচনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেও ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক দেখান সম্ভব হইয়াছিল! বাঙ্গালায় তাহা কল্পনাতীত। সেই জন্যই হিসাবে দেখা গিয়াছে,—বর্ত্তমান ব্যবসা মন্দা আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালা সরকার জনপ্রতি যে টাকা ব্যয় করিতে পারিয়াছেন, কেবল বিহার ও উড়িষ্যা তদপেক্ষা অল্পব্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ঐ বৎসরের জনপ্রতি ব্যয়ের হিসাব এইরূপ :—

মাদ্রাজ	...	৪ টাকার অধিক
বোম্বাই	...	৮ টাকা ৪ আনা
বাঙ্গালা	...	২ টাকা ৮ আনা

ইহার পর দুই কারণে বাঙ্গালার আর্থিক দুর্দ্দশা বর্দ্ধিত হইয়াছে—ব্যবসা মন্দা ও সন্ত্রাসবাদ। ব্যবসা মন্দা-জনিত দুর্দ্দশা হইতে কেবল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশই নহে, কোন দেশই অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। সন্ত্রাসবাদে বাঙ্গালার অবস্থাই শোচনীয় হইয়াছে। সন্ত্রাসবাদ দমন অর্থাৎ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকারকে যে অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইয়াছে, তাহার হিসাব এইরূপ—

১৯৩১—৩২ খৃষ্টাব্দে	...	২১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
১৯৩২—৩৩ খৃষ্টাব্দে	...	৪৭ লক্ষ টাকা
১৯৩৩—৩৪ খৃষ্টাব্দে	...	৫৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা
১৯৩৪—৩৫ খৃষ্টাব্দ	...	(আনুমানিক ব্যয়)··· ৫২ লক্ষ টাকা
মোট ৪ বৎসরে		১ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।

এ বার যে বাজেট হইয়াছে, তাহার স্থূল কথা এই যে, আগামী বর্ষে বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা বর্ত্তমান বৎসরের অবস্থা অপেক্ষাও শোচনীয় হইবে। কারণ, আগামী বর্ষে :—

আনুমানিক ব্যয়	...	১১, ২৯, ১৭,০০০ টাকা
আনুমানিক আয়	...	৯, ০৭, ৪৭,০০০ "
ফাজিল	...	২, ২১, ৭০,০০০ টাকা

অর্থাৎ ফাজিলের পরিমাণ মোট আয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ!

আর এক দিক হইতে কথাটা বুঝিলে দেখা যায়—আগামী বৎসরের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্প—এই সকল বিভাগের জন্য যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, ফাজিলের পরিমাণ প্রায় তাহাই। কারণ, এই সব বিভাগের বরাদ্দ ব্যয়—২ কোটি ৫১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। আর ফাজিলের পরিমাণ—২ কোটি ২১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা।

সেই জন্য অর্থ-সচিব বলিয়াছেন, যদি বাঙ্গালার আর্থিক বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে অবস্থা যে অতি শোচনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা হইলে সে ভাবে ব্যবস্থা না করিলে চলে না, তাহাতে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হয়।

কেহ কেহ মনে করেন, ব্যয়সঙ্কোচের দ্বারা এই ফাজিল পূরণ করা যায়। তাঁহারা ভ্রান্ত। বাঙ্গালায় ব্যয়সঙ্কোচের উপায় যে নাই তাহা নহে। কিন্তু তাহাতে এত টাকা পাওয়া যায় না এবং ব্যয়সঙ্কোচ বিষয়ে বাঙ্গালা সরকারও অনবহিত নহেন। বাঙ্গালা সরকার ইতোমধ্যে দুই বার ব্যয়সঙ্কোচের পন্থা নির্দ্দেশ জন্য সমিতি গঠিত করিয়াছেন। উভয় সমিতির উপদেশ আংশিকরূপে গৃহীতও হইয়াছে। এ বারও অর্থ-সচিব সে বিষয়ের সম্যক আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, ৯৪ লক্ষ টাকারও অধিক ব্যয়সঙ্কোচ হইয়াছে।

অর্থ-সচিব দেখাইয়াছেন, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে যে ব্যবসা মন্দা চলিয়া আসিতেছে, অন্যান্য দেশে তাহার কিছু পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইয়াছে। বিলাতে ব্যবসার কিছু উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে এবং তথায় শিল্পে, রেলের আয়-বৃদ্ধিতে ও মাল রপ্তানী বৃদ্ধিতে উন্নতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কি কি কারণে ইহা হইয়াছে এবং বিলাত ও মার্কিণ স্বর্ণমান ত্যাগ করার

সহিত এই পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধ কি, তাহা তিনি আলোচনা করেন নাই। তবে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, এই উন্নতি এমন নহে যে, তাহার তরঙ্গাঘাত বাঙ্গালাতেও অনুভূত হইতে পারে এবং বাঙ্গালার পাটের ও ধানের মূল্য বাড়ে নাই। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে পাট কাটার সময় পাটের দাম যত কম হইয়াছিল, তত কম আর কখন হয় নাই। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করায় পাটের দাম সেই সময় কিছু বাড়িয়াছিল, আর পর-বৎসর ঐ সময় বাজার কিছু চড়িয়া গিয়াছিল। গত বৎসর কিন্তু পাটের দর প্রথমে কিছু চড়িলেও যখন পাট বাজারে নীত হয় তখন অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। ধানের দামও অত্যন্ত কমিয়া যায়—প্রায় ১ টাকা ৭ আনা ৭ পাই মণ দরে বিক্রয় হয়। গত বৎসরই দেখা গিয়াছিল, পাটে ও ধানে বাঙ্গালার কৃষক ব্যবসা মন্দার সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের তুলনায় পণ্যমূল্যে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা কম পাইয়াছিল। সেই জন্য গত বৎসর মোট ২ কোটি ৯ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা কম পড়িবে মনে করা হইয়াছিল। তবে এখন দেখা যাইতেছে, আয় অপেক্ষা ব্যয় মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ ৭ হাজার টাকা অধিক হইয়াছে।

পর পর কয় বৎসর দুর্দ্দশা হেতু কৃষক যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই জন্য যে সব বিভাগ হইতে সরকারের আয় প্রধানতঃ হয়, সেই ভূমিরাজস্ব, একসাইস, ষ্ট্যাম্প, রেজেষ্টারী ও বন—এই বিভাগগুলিতে মোট ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দের আয়ের তুলনায় ইহা ২ কোটি ৪১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা কম।

এই অবস্থায় যে বাঙ্গালা সরকারকে সন্ত্রাসবাদ দমন করিবার জন্য ৫০ লক্ষেরও অধিক টাকা ব্যয় করিতে হইবে, এই অপব্যয়ের জন্য অর্থ-সচিব দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গত বৎসর তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—যে সময় বাঙ্গালার রাজস্ব যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বপ্রযত্নে ব্যয়সঙ্কোচ করা প্রয়োজন, সেই সময় যে এই ব্যাপারে বাঙ্গালাকে এত টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইতেছে, ইহা একান্ত পরিতাপের বিষয়। এ বারও তিনি সেইরূপ আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, অল্পকাল মধ্যে যে এই অতিরিক্ত ব্যয় হইতে অব্যাহতি লাভ করা যাইবে, এমনও মনে হয় না। চারি বৎসরে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় যে বাঙ্গালার স্কন্ধে দুর্ব্বহ ভার ন্যস্ত করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে লোকের যে দুর্গতি ঘটিতেছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই টাকায় বাঙ্গালার প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কার্য্য অগ্রসর হইলে ও দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইলে যেমন দেশের স্থায়ী কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির উপায় হইতে পারিত, তেমনই ইহার কতকাংশ পাইলেই বাঙ্গালার মফঃস্বলে পানীয় জল সংস্থানের সুব্যবস্থা হইতে পারিত। যে শিল্প-প্রতিষ্ঠা ব্যতীত দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হইতে পারে না, সেই শিল্প প্রতিষ্ঠার কার্য্যে সরকার অর্থ দিতে পারিতেছেন না, আর এই ব্যর্থ ব্যয়ের পরিমাণ শঙ্কাজনক হইয়া উঠিতেছে! ইহা যে বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এখন জিজ্ঞাস্য—উপায় কি?

আমরা এ কথার উত্তর অনেক বার দিয়াছি। অর্থ-সচিবও বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে তাহাই বলিয়াছেন—বাঙ্গালাকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য টাকা দিতে হইবে। বাঙ্গালার কৃষক রৌদ্রে পুড়িয়া ও জলে ভিজিয়া যে পাট উৎপন্ন করে—যে পাটের চাষ বহু পরিমাণে বাঙ্গালার অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য দায়ী—সেই পাটের উপর যে রপ্তানী শুল্ক আছে তাহার সম্পূর্ণ আয় বাঙ্গালাকে দিতে হইবে। এই আয়ের পরিমাণ অল্প নহে এবং বিলাতের পার্লামেণ্ট হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ইহার অর্দ্ধাংশ পাইলেই বাঙ্গালা তাহার বাজেট হইতে "ফাজিল" মুছিয়া ফেলিতে পারিবে। আর বাঙ্গালায় সংগৃহীত আয়করের কতকাংশও বাঙ্গালাকে প্রদান করিতে হইবে।

বাঙ্গালাকে অর্থ প্রদানে ভারত সরকার বহু দিন হইতেই কার্পণ্য প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। মাদ্রাজে, যুক্তপ্রদেশে, পঞ্জাবে সেচের খালে জমীতে ফসল বাড়িয়াছে—কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া সে সব

সেচের খাল খনন করা হইয়াছে; আর বাঙ্গালায় নদীনালা মজিয়া যাইতেছে—সে সকলেরও সংস্কারের কোন ব্যবস্থা হয় না! মাদ্রাজে—এমন কি বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশেও শিল্পে সরকারী সাহায্য প্রদানের জন্য আইন বিধিবদ্ধ হইবার অনেক দিন পরে, বাঙ্গালায় সে আইন হইয়াছে বটে, কিন্তু অর্থাভাবে কোন কাজ হইতেছে না। কোন কোন প্রদেশে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া শিল্পের উন্নতিসাধনোপায় করা হইতেছে—বাঙ্গালায় সেরূপ কোন চেষ্টা নাই। কলিকাতা বিরাট বন্দর—ব্যবসার কেন্দ্র, পাট বাঙ্গালার সম্পদ, বাঙ্গালায় চা ও ধান যথেষ্ট উৎপন্ন হয়—অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদে বাঙ্গালা দরিদ্র নহে। অথচ সেই বাঙ্গালা সরকারের আয়ে ব্যয় সঙ্কুলান হয় না—সরকার জনপ্রতি বার্ষিক ২ টাকা ৮ আনার অধিক ব্যয় করিতে পারেন না। এই অবস্থাকে অস্বাভাবিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালা কেবল অর্থাভাবেই অন্যান্য প্রদেশের মত আর্থিক উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। এ বিষয়ে বাঙ্গালার লোক ও বাঙ্গলা সরকার একমত।

মুকুরে যেমন আকৃতির স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়, সরকারের বাজেটে তেমনই প্রদেশের আর্থিক অবস্থা প্রতিবিম্বিত হয়। বৎসরের পর বৎসর বাঙ্গালা সরকারের বাজেটে বাঙ্গালার যে আর্থিক অবস্থা প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহা শোচনীয়। তাহা দেখিয়া বাঙ্গালার অর্থ-সচিবও শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতেছেন। তাঁহারও একমাত্র আশা—নূতন শাসন-ব্যবস্থায় বাঙ্গালার প্রতি অবিচারের অবসান হইবে—সুবিচার হইবে। গোলটেবিল বৈঠকে সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র ও সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ বাঙ্গালীরা সে জন্য যেমন চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙ্গালা সরকারও তাঁহাদিগের বিবৃতিতে তেমনই চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালার গভর্ণর সে কথা অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলিয়াছেন এবং যে সব বাঙ্গালী সে চেষ্টা করিয়াছেন সরকারের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রশংসা-জ্ঞাপনও করিয়াছেন। বাঙ্গালার আর্থিক দুরবস্থার সহিত সন্ত্রাসবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। সেই জন্য তিনি বাঙ্গলার এই আর্থিক দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনেও ব্যস্ত হইয়াছেন। এ সব সুলক্ষণ। কিন্তু এ সকলের সাফল্য নূতন শাসন-ব্যবস্থায় বাঙ্গলার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইবে, তাহারই উপর নির্ভর করিবে। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন যদি নামশেষ না হয়, তবে সে শাসনের জন্য আবশ্যক অর্থের ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না।

বাঙ্গলার বাজেট দুর্গতের বাজেট—দরিদ্রের বাজেট। এই বাজেট যাহাতে সমৃদ্ধ প্রদেশের বাজেটে পরিণত হয়, সেই জন্য সকলকে সমবেত চেষ্টায় ব্যাপৃত হইতে হইবে। অন্য পথ নাই।

জমী বন্ধকী ব্যাঙ্ক—

কয়মাস পূর্ব্বে বাঙ্গলার পুনর্গঠন প্রসঙ্গে বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন এণ্ডার্শন যে সব উপায়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন—জমী বন্ধকী ব্যাঙ্ক সে সকলের অন্যতম। বাঙ্গালার কৃষকের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। সে ঋণ-ভারে এমনই পিষ্ট যে, তাহার কার্য্যে উৎসাহ ও জীবনে আনন্দ নাই; সে যে তাহার জমীর ও ফশলের ফলনের উন্নতির জন্য আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ ও উদ্যম প্রয়োগ করিবে এমন আশাই করা যায় না। তাহাকে এই অবস্থার দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে এ প্রদেশের উন্নতির রথচক্র যে পঙ্কে বদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে সরকার এ দেশে কৃষির ও কৃষকের উন্নতি সাধন জন্য যে কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার সদস্যরা বলিয়াছিলেন—ঋণ অবজ্ঞা করা মূঢ়তার পরিচায়ক। অর্থাৎ তাহা পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহারই জন্য জমী বন্ধকী ব্যাঙ্ক অন্যতম উপায় রূপে কল্পিত। বলা বাহুল্য, কৃষকের ঋণ যদি তাহার পরিশোধ ক্ষমতার অতীত হয়, তবে কোন উপায়ই ঈপ্সিত ফল প্রসব করে না। সেই জন্য সঙ্গে সঙ্গে ঋণের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনানুসারে তাহা মিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। সে জন্য স্বতন্ত্র আইন করিতে হইবে এবং সেই কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও অবশ্যই করিতে হইবে। হয়ত সে ব্যবস্থা পুনর্গঠন ভার কমিশনারের উপর ন্যস্ত হইবে।

জমী বন্ধকী ব্যাঙ্কের কল্পনা নূতন নহে। অন্য কতব

গুলি দেশে ইহা প্রতিষ্ঠিতও হইয়াছে। সে সকল দেশের মধ্যে জার্ম্মানী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সংপ্রতি বাঙ্গালায় এইরূপ প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ময়মনসিংহে কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নবাব কে, জি, এম ফরোকী এইরূপ একটি ব্যাঙ্কের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

তিনি সেই উপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল—

সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত জমী বন্ধকী ব্যাঙ্ক সমবায় অনুষ্ঠানের বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিণতি। যাহাতে কৃষক তাহার পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিতে এবং জমীর ও চাষের পদ্ধতির উন্নতি সাধন করিতে পারে, সেই জন্য কিছুদিন হইতেই এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে।

বাঙ্গালায় বর্ত্তমানে যে সব কেন্দ্রী ব্যাঙ্ক আছে, সে-গুলি তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ সমিতির মধ্যবর্ত্তিতায় এক হইতে পাঁচ বৎসরে পরিশোধ্য ঋণ দিয়া থাকে। এরূপ ঋণের দ্বারা কৃষকের সাধারণ বার্ষিক প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার পুরাতন ঋণ পরিশোধের, ও নূতন সম্পত্তি ক্রয় বা বর্ত্তমান জমীর উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন সম্ভব হয় না।

সেই জন্য তাহাদিগের মধ্যে যাহারা উপযুক্ত জামিন দিতে পারে, তাহাদিগকে ঋণ পরিশোধ ও জমীর উন্নতি সাধনোদ্দেশ্যে দীর্ঘকালে পরিশোধ্য ঋণ দানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কেবল ইহাই নহে—যে সকল স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন কৃষক বা ভূস্বামী এতদিন সমবায় নীতিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন নাই, তাঁহারাই বিস্তৃত জমীর অধিকারী ও বাঙ্গালায় কৃষির মেরুদণ্ড। আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন জন্য তাঁহাদিগের ঋণ গ্রহণ প্রয়োজন। জমী বন্ধকী ব্যাঙ্কে তাঁহারা যেমন দীর্ঘকালের জন্য ঋণ পাইবেন, তেমনই যাঁহারা উপযুক্ত জামীন দিতে পারে সেই শ্রেণীর লোক—সমবায় সমিতির সদস্যগণও আবশ্যক অর্থ পাইতে পারিবেন।

এই ব্যাঙ্ক প্রথম পাওনাদা...
স্বল্প খাজনাভোগীদিগকে দীর্ঘকালে...
দিবে, তাহা ছয় মাস অন্তর বা বার্ষিক ...
ব্যবস্থা হইবে।

বর্ত্তমানে ফল কিরূপ হয় তাহা পরীক্ষার্থ বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি স্থানে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং "ডিবেঞ্চার" বাহির করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা হইবে। যত দিনের জন্য ঐরূপে টাকা সংগৃহীত হইবে, সরকার তত দিনের জন্য উহার সুদ দিতে দায়ী থাকিবেন।

এই ব্যাঙ্ক যে টাকা ঋণ দিবে তাহা এখন কিছু দিন পূর্ব্বের বন্ধক খালাশ করিতে ও অনুরূপ ঋণ পরিশোধ করিতেই প্রযুক্ত হইবে। জমীর উন্নতি সাধন, কৃষির উন্নত পদ্ধতি প্রবর্ত্তন, জমী ক্রয়—এ সকল পরে হইবে।

যেরূপ কার্য্যে ব্যাঙ্কের সদস্যদিগের আর্থিক উপকার হইবে না, ব্যাঙ্ক সেরূপ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না।

সরকার ব্যাঙ্কে এক জন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন বটে, কিন্তু তাহাতে ডিরেক্টারদিগের দায়িত্বের অবসান হইবে না।

মন্ত্রীর এই উক্তিতে ব্যাঙ্কের কাঠাম কিরূপ হইবে, তাহার পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নাই। আর সে দিন বাঙ্গলা সরকারের আগামী বৎসরের আয়-ব্যয়ের যে আনুমানিক হিসাব বা বাজেট পেশ হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, পাঁচটি জমী বন্ধকী ব্যাঙ্কের জন্য আগামী বর্ষে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। মন্ত্রীর বক্তৃতায় উক্ত হইয়াছে—সরকার ইহার মূলধন দিবেন না, কেবল মূলধনের জন্য যে টাকা সংগ্রহ করা হইবে, তাহার সুদ দিতে বাধ্য থাকিবেন। এই চল্লিশ হাজার টাকা সেই বাবদে বরাদ্দ নহে—ব্যয়ের জন্য। সরকার সুদের জন্য জামিন থাকিলেও আসল সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কিরূপ থাকিবে—মূলধন সংগ্রহ চেষ্টার সাফল্য তাহার উপর নির্ভর করিবে। সরকার সে সম্বন্ধে কতটা দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন, বলিতে পারি না। তবে বাঙ্গালার গভর্ণর যে বক্তৃতায় বাঙ্গালার কৃষকের উন্নতি সাধনের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—আবশ্যক অর্থ দিতেই হইবে। সরকারের সহায়তার বিষয়

জানিতে পারিলে যে লোক ব্যাঙ্কের জন্য টাকা দিতে প্রস্তুত হইবে, এমন আশা অবশ্যই করা যায়। কারণ, বাঙ্গালার বার্ষিক শাসন বিবরণে দেখা গিয়াছে, নানা কারণে প্রাদেশিক কেন্দ্রী সমবার ব্যাঙ্কের অবস্থা শঙ্কা-জনক হইতেও পারে বুঝিয়া সরকার তাঁহাদিগের জামীনীতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে উহার ত্রিশ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে ঋণ গ্রহণ করা প্রয়োজন হয় নাই—অর্থাৎ লোক জমা টাকা তুলিয়া না লইয়া নূতন টাকা জমা দিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জমী বন্ধকী ব্যাঙ্ক নূতন নহে এবং অন্য অনেক দেশে তাহাতে সুফল ফলিয়াছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিতে হয় যে, সকল দেশের অর্থনীতিক অবস্থা একরূপ নহে; বিশেষ বাঙ্গালায় জমীর অধিকার-ব্যবস্থাও অন্যান্য দেশের ব্যবস্থা হইতে ভিন্ন প্রকারের। কাজেই বাঙ্গলায় যে ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে অবস্থানুরূপ করিতে হইবে। বাঙ্গালার কৃষকের ঋণের পরিমাণও অল্প নহে। কাজেই যে মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে তাহা অল্প হইবে না। সে টাকা যদি বাঙ্গলায় সংগৃহীত হয়, তবে বড়ই সুখের বিষয় হইবে। কারণ, তাহা হইলে সে টাকাও বাঙ্গালায় থাকিবে। আর পূর্ব্বে আমরা বাঙ্গালার গভর্ণরের যে বক্তৃতার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, এইরূপ প্রতিষ্ঠানে যে টাকা লাভ হইবে, তাহার কতকাংশ পল্লীজীবনের উন্নতিসাধক কার্য্যে ব্যয় করা সম্ভব হইবে। তিনিই বলিয়াছেন, এই সব প্রতিষ্ঠান সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন হইলেও সরকারী প্রতিষ্ঠান হইবে না। কাজেই ইহা বাঙ্গালার লোকের স্বাবলম্বন শিক্ষার কেন্দ্রও হইতে পারিবে। এই প্রতিষ্ঠানের কলের উপর বাঙ্গালার উন্নতি যে বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, তাহাতে অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ নাই।

পাটের কথা—

পূর্ণ দুই বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালায় আর্থিক দুরবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য এক সমিতি নিয়োগের যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে সরকারের কৃষি বিভাগ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, ঐরূপ সমিতি নিয়োগে কোনরূপ সুফল লাভের সম্ভাবনা না থাকিলেও বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান অর্থপ্রদ উৎপন্ন দ্রব্য পাটের মূল্য হ্রাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে কিছু উপকার হইতে পারে। সেই-জন্য তাঁহারা এক সমিতি গঠিত করেন। সমিতির কার্য্যের নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদত্ত হয়—

(১) পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রন।

(২) পাট বিক্রয়ের ব্যবস্থা ও সঙ্গে সঙ্গে—নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠা ও পাটোৎপাদকদিগকে পাটের বাজার সম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহ করা।

(৩) বাঙ্গালায় পাট সমিতি প্রতিষ্ঠা ও তাহার আনুমানিক ব্যয়।

(৪) পাটের পরিবর্ত্তে কি পরিমাণে অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহৃত হইতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে সেইরূপ ব্যবহার্য্য অন্যান্য দ্রব্যের আবিষ্কার-সম্ভাবনা।

(৫) বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নতি সাধিত হইতে পারে এমন ভাবে অন্যান্য কার্য্যে পাট ব্যবহারের উপায়।

বাঙ্গালার পাটের দামের উন্নতি ও অবনতি যে বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও অবনতির কারণ তাহা বলাই বাহুল্য। পাট ও ধানই বাঙ্গালার সম্পদ। এই দুই ফশলের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও অবনতির কারণ। পাটের মূল্য ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের হিসাবে অর্দ্ধেক হইয়াছে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ছিল ৮৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৫ শত ৭০ গাঁইট, আর দর—মণকরা ১১ টাকা ২ আনা ৭ পাই; আর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের হিসাবে—পাটের পরিমাণ—৫১ লক্ষ ২৭ হাজার ৫ শত গাঁইট, আর দর—৫ টাকা ৩ আনা ১১ পাই মণ। সুতরাং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে যেস্থানে পাট বিক্রয় করিয়া পাওয়া গিয়াছিল—প্রায় ৮ কোটি টাকা, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সেস্থানে পাওয়া যায়, সাড়ে ১৩ কোটি টাকা। এই বিষম অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিবার জন্য সমিতি গঠিত হইয়াছিল। তাহার নির্দ্ধারণ প্রকাশিত হইয়াছে—দীর্ঘ দুই বৎসর পরে! এত দিনে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। সুতরাং চারি শত পৃষ্ঠারও অধিক

ব্যাপী যে রিপোর্ট প্রচারিত হইয়াছে, তাহার মূল্য অন্য হিসাবে যাহাই কেন হউক না—প্রকৃত উদ্দেশ্য-সিদ্ধি বিষয়ে কিছুই নাই। এই ব্যর্থ রিপোর্ট রচনায় বাঙ্গালায় লোকের কত টাকা খরচ হইয়াছে, তাহাই জানিবার বিষয়।

কমিটীর সদস্যরা যে যাহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মতভেদ এমনই প্রবল যে, এই রিপোর্টে নির্ভর করিয়া বাঙ্গালা সরকার পাটচাষীর ও বাঙ্গালার উন্নতি সাধনের কোন উপায় করিতে পারিতেছেন না। আমাদিগের মনে হয়, এইরূপ অবস্থায়, সরকারের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া কাজ করাই কর্ত্তব্য। আমাদিগের বিশ্বাস, এই সমিতি গঠিত না হইলে সরকার এ বিষয়ে কোন কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করিয়া ফেলিতেন।

পাট বাঙ্গালার সম্পদ বলিয়া ইহার উন্নতি সাধন জন্য সরকার বিশেষ ও প্রশংসনীয় চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিসে অধিক ফলনের পাটের চাষ বাড়ে এবং পাটের ফলন বাড়ে সে জন্য সরকারের চেষ্টার পরিচয় লর্ড জেটল্যাণ্ড (বাঙ্গালার গভর্ণর—লর্ড রোণল্ডসে) দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কাকিয়া বোম্বাই "নামক যে পাটের বীজ পূর্ব্ববঙ্গে কৃষকদিগকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে প্রতি একর জমীতে সাধারণ পাট অপেক্ষা ফলন অর্থাৎ আঁশ ২ মণ অধিক হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২ লক্ষ একর জমীতে এই পাটের চাষ হয়। ইহার চাষে এত সাফল্য লাভ হয় যে, মনে হইয়াছিল, বাঙ্গালার যে জমীতে পাটের চাষ হয় তাহাতে এই বীজ ব্যবহার করিলে ৫০ লক্ষ মণ অধিক পাট উৎপন্ন হইতে এবং তাহার মূল্য অল্প নহে। ইহার পর যে পাট আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ফলন আরও অধিক।

ফলন যদি অধিক হয়, তবে অল্প জমীতেই চাহিদার অনুরূপ পাট উৎপন্ন করা সম্ভব হইবে এবং অবশিষ্ট জমীতে অন্য কোন ফশলের চাষ করিলে লাভ হইবে। পাটের প্রয়োজনের সীমা আছে। কেবল তাহাই নহে—পাট যদি পাটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য দ্রব্যের তুলনায় অল্পমূল্য না হয়, তবে লোক পাটই ব্যবহার করিবে কেন? ইতোমধ্যেই য়ুরোপের নানা দেশে পাটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য দ্রব্যের সন্ধান চলিতেছে। জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় পাটের অভাবে জার্ম্মানী কাগজের থলিয়াও ব্যবহার করিয়াছিল। মার্কিণ তুলার স্থতায় থলিয়া করিবার চেষ্টা করিতেছে।

স্থতরাং কিসে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রিত করিয়া কৃষক ন্যায্য মূল্য পায়—অথচ পাটের মূল্য পাটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক না হয়—সরকার তাহা বিবেচনা করিতেছেন।

আমাদিগের মনে হয়, সেই অনুসন্ধানে সাহায্য হইবে মনে করিয়াই সরকার পাট কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের আশা ফলবতী হয় নাই। কমিটীর সভ্যরা নানা জন নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন।

যাঁহারা সংখ্যায় অল্প তাঁহাদিগের রিপোর্টে কতকগুলি কথা সমর্থনযোগ্য নহে। যথা—

(১) অসম্ভব স্বীকার করিয়াও তাঁহারা বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্শ নামক সভার প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, সে প্রস্তাব মন্দ নহে! প্রস্তাব এই যে, একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকেই বাঙ্গালায় উৎপন্ন সব পাটের বিক্রয়ভার প্রদান করা হউক। সদস্যরা স্বীকার করিয়াছেন—অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই। অথচ তাঁহারা এই অসম্ভব প্রস্তাবটির আলোচনায় রিপোর্টের অনেকটা স্থানের অপব্যয় করিতে দ্বিধানুভব করেন নাই! বাঙ্গালার সমবায় বিভাগ স্বল্পায়তনে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—তাহার পরিণতি হইয়াছে—বহু সংলগ্ন প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বনাশে ও বহু টাকার ক্ষতিতে। যাঁহারা অসম্ভব প্রস্তাবের আলোচনা করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের নিকট কার্য্যোপযোগী প্রস্তাব করিবার আশা দুরাশা মাত্র।

(২) ইঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন—আইনের বলে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রিত করা হউক। এই প্রস্তাব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী; কারণ ইহাতে কেবল যে কৃষকের বিচারবুদ্ধিতে দোষারোপ করা হয়, তাহাই নহে; পরন্তু তাহাকে স্বৈর ক্ষমতার অধীন করা হয়। আমাদিগের

মতে প্রচার-কার্য্যের দ্বারা—সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নানা-দেশে পাটের চাহিদার সম্ভাবনার হিসাব দিয়া—কৃষককে পাটচাষ নিয়ন্ত্রিত করিতে শিখানই সঙ্গত। তাহাতে যেমন পাটচাষ নিয়ন্ত্রিত হইবে, তেমনই কৃষকও স্বাবলম্বী হইবে।

আমরা কমিটীর অধিকাংশ সদস্যের রিপোর্টই সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করি। নিম্নে সেই রিপোর্টের নির্দ্ধারণের সার সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইল—

(১) পাটচাষ নিয়ন্ত্রন।—আইনের বলে পাটচাষ নিয়ন্ত্রিত করা সমর্থনযোগ্য নহে। সে কার্য্য প্রচারের দ্বারা—সংবাদ সরবরাহের দ্বারা করাই সঙ্গত। জিলার কালেক্টার প্রচার-কার্য্যের ভার পাইবেন।

(২) পাটচাষ কমাইলে যে জমী পাওয়া যাইবে, তাহাতে ধান্য ব্যতীত আর কি কি লাভজনক ফশল উৎপন্ন করা যায়, তাহা দেখিতে হইবে। তামাকের চাষ বাড়ান যায়; ইক্ষুর চাষও বাড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

(৩) সপ্তাহে সপ্তাহে পাট সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং পাটের আনুমানিক হিসাব ইংরাজীতে ও দেশীয় ভাষায় প্রচার করিতে হইবে।

(৪) নির্দ্দিষ্ট ওজন ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা ও পাটের সময় মফঃস্বলে পাটের দর প্রচার সম্বন্ধে আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) পাটের রকম বাছিয়া সে সকলের আদর্শ স্থির করিতে হইবে।

(৬) বর্ত্তমানে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা যে ভাবে পাটের ব্যবসা—বিদেশে পাট রপ্তানী করেন, তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। যাহাতে নিকৃষ্ট পাট রপ্তানী না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

(৭) পাট বিক্রয় সমিতির অসাফল্যেই প্রতিপন্ন হয় না যে, সমবায় নীতিতে পাট বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইতে পারে না। কতকগুলি গ্রামে সমবায় বিভাগের উপদেশ অনুসারে কাজ করিবার জন্য এইরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফল পরীক্ষা করিলে ভাল হয়। প্রথমে সমিতি-গুলি—পাট ক্রয় করিয়া লোকশানের সম্ভাবনা রাখিয়া কাজ না করিয়া কেবল সভ্যদিগের পাট বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিবে। ক্রমে গ্রাম্য বিক্রয় সমিতিগুলি সরাসরি ব্যবসায়ীদিগের কাছে মাল বিক্রয় করিতে পারিবে।

(৮) বেরারে ও বোম্বাইয়ে যেরূপ নিয়ন্ত্রিত তূলার বাজার আছে, বাঙ্গালায় সেইরূপ গুটিকতক পাটের বাজার প্রতিষ্ঠা করিলে ভাল হয়। বাজার প্রতিষ্ঠার স্থান নির্ব্বাচনে ও বাজার পরিচালনে বিশেষ যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্রথমে অর্থাৎ পরীক্ষাকালে ক্রেতা বা বিক্রেতাকে ইহার ব্যয়ভার প্রদান করা সঙ্গত হইবে না। পরে বর্ণিত পাট কমিটী ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে।

(৯) সকলকেই একরূপ ওজন ব্যবহারে আইনতঃ বাধ্য করিতে হইবে।

(১০) ভবিষ্যতে বিক্রয়ের বাজার সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

(১১) পাট বুনানের সময়ের পূর্ব্বে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা গ্রামে গ্রামে যাইয়া ভারতবর্ষে ও অন্যান্য-দেশে মজুদ পাটের হিসাব ও পূর্ব্ববর্ত্তী দুই তিন বৎসরে পাটের গড় দর লোককে জানাইয়া দিবেন। স্থানে স্থানে বেতার বার্ত্তার দ্বারা কাজ চালান যায়। আর সব স্থানে সপ্তাহে দুই বা তিন দিন সংবাদ ডাকে পাঠান হইবে। এ বিষয়ে চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক লণ্ঠনের দ্বারা কাজ করা যায়।

(১২) আইনের বলে পাট কমিটী গঠিত করিতে হইবে। ইহা উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করিবে এবং ফশলের অবস্থা ও পাট সম্বন্ধে অন্যান্য সংবাদ প্রদানের ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, উৎকৃষ্ট বীজের পরীক্ষা ও প্রচার, পাট বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত থাকিবে। ইহার অধীনে রাসায়নিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা থাকিবে। শিল্প বিভাগের সহিত একযোগে এই কমিটী কিরূপে উটজ শিল্পে পাটের ব্যবহার বাড়ান যাইতে পারে, সে বিষয়ে চেষ্টা করিবে। পাটচাষ নিয়ন্ত্রনের কার্য্যে কালেক্টারের অধীনে যে সব লোক নিযুক্ত করিতে হইবে এই কমিটী তাঁহাদিগের ব্যয়ভার বহন করিবে। বর্ত্তমানে জুট মিলস এসোসিয়েশন যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কল্পনা করিয়াছেন,

তাহা যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তবে কমিটী তাহার সহিতও একযোগে কাজ করিবেন। কোন কোন সভ্য বাঙ্গালায় একটি স্বতন্ত্র পাট কমিটী প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী; আবার কেহ কেহ মনে করেন—কেন্দ্রী কমিটী স্থাপনই অভিপ্রেত। পাটের রপ্তানী শুল্ক হইতে এই কমিটীর ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে (এই কমিটীর জন্য বৎসরে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিতে হইবে।)

(১১) দুই দিকে পাটের প্রতিযোগিতা প্রবল হইতেছে:—

(ক) বর্ত্তমানে পণ্য অধিক পরিমাণে একসঙ্গে প্রেরিত হওয়ায় পাটের থলিয়ার ব্যবহার কমিতেছে।

(খ) থলিয়া প্রস্তুত করিবার জন্য পাটের পরিবর্ত্তে কাগজ ও কোথাও কোথাও তুলা ব্যবহৃত হইতেছে।

যাহাতে এই প্রতিযোগিতা প্রহত করিয়া পাট অধিক পরিমাণে ব্যবহারের সুবিধা হয়, তাহা করিতে হইবে। যাহাতে অন্যান্য দেশেও পাট বিক্রয় হয় এবং নূতন নূতন কার্য্যে পাট ব্যবহৃত হয়, সে বিষয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। যাহাতে অধিক ফলনের উৎকৃষ্টতর জাতীয় পাট উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে আবশ্যক পরীক্ষা করিতে হইবে।

উপরে আমরা কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের নির্দ্ধারণের সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম। ইহাতেই কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধ হইবে। ইহা বিবেচনা করিলে মনে হয়, এতদিন যে এ বিষয়ে কোন কাজ হয় নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। পাটের সহিত বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থার সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এক সময়ে বাঙ্গালা চিনি উৎপন্ন করিয়া যথেষ্ট অর্থ পাইত। পর্য্যটক বার্ণিয়ার বলিয়াছেন, বাঙ্গালা হইতে কেবল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেই নহে, পরন্তু আরবে, পারস্যে ও ইরাকেও চিনি রপ্তানী হইত। আজ বাঙ্গালা অন্যান্য দেশ হইতে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে নিজ ব্যবহার্য্য চিনি আমদানী করিতেছে। এক দিন বাঙ্গালা হইতে কার্পাস বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। যখন ঢাকার মশলিন রোমক সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতৃগণের অঙ্গাবরণ হইত, তখন তাহাতে বাঙ্গলার অর্থাগম হইত—মিশরে রক্ষিত শবের আবরণ বস্ত্রও এ দেশের। তাহার পর দেখা যায়, খৃষ্টীয় ১৫১৭ সালেও মালদহের ব্যবসায়ী শেক ভিক পারস্যোপসাগরের পথে রুসিয়ায় তিন জাহাজ মালদহী কাপড় পাঠাইয়াছিলেন। আজ বাঙ্গালা বিদেশের ও অন্য প্রদেশের বস্ত্র ব্যবহার করিতেছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কবি নবীনচন্দ্র ভারতবর্ষের কথায় বলিয়াছিলেন—

"ভারতের তন্তু নীরব সকল,
দুঃখিনীর লজ্জা রক্ষে ম্যাঞ্চেষ্টার।"

আজ বিদেশী বস্ত্রের আমদানী কিছু কমিলেও বোম্বাই সে স্থান অবাধে অধিকার করিয়াছে। ইহার পর ছিল নীলের চাষ ও নীল উৎপন্ন করা। তাহাও আর নাই। কাজেই বাঙ্গালাতে যদি আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হয়, তবে কাপড়ের ও চিনির কল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যে সব উপায়ে বাঙ্গালার অর্থাগম হইতেছে সে সকলের উন্নতি বিধান করিতে হইবে। পাট সে সকলের অন্যতম এবং পাটে বাঙ্গলার আয় অল্প নহে। বিশেষ বাঙ্গালার বাজেটে যদি ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক করিতে হয়, তবে এই পাটের উপর আমদানী শুল্ক সবটা বাঙ্গলাকে প্রদান করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সুতরাং পাটের বিক্রয় যত বাড়িবে, ততই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে।

আমরা বলিয়াছি, পাট কমিটীর সদস্যদিগের মধ্যে মতান্তর এত প্রবল যে, কমিটীর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সরকার অবশ্যই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। সুতরাং কমিটীর নির্দ্ধারণে যত মতভেদই কেন থাকুক না, সরকারকে এ বিষয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেই হইবে। কারণ, যত দিন যাইবে, ততই প্রতিযোগিতা প্রবল হইয়া দাঁড়াইবে, প্রতিযোগিতা প্রহত করা দুষ্কর হইবে।

আমাদিগের মনে হয়, সরকার যদি পাট কমিটীর অধিকাংশ সদস্যের মতই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিয়া তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন এবং তাঁহাদিগের নির্দ্ধারণ

আপনাদিগের বিবেচনানুসারে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্জ্জিত করেন, তবে তাঁহারা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাতে ইপ্সিত ফললাভ হইবে। যে পণ্য উৎপন্ন করিয়া বাঙ্গালা বৎসরে ৬০ কোটি টাকা পর্য্যন্ত পাইতে পারে, তাহার প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। তাহা রক্ষা করাও যে তেমনই প্রয়োজন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

পাট কমিটীর নিকট বাঙ্গালার লোক ও সরকার যে আশা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। এখন আশা —সরকার নিশ্চিন্ত না থাকিয়া বাঙ্গলার পাট ও পাঠ-শিল্পের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনে অধিক মনোযোগী হইবেন।

বাঙ্গলার শাসন পরিষদে—

বাঙ্গালার শাসন পরিষদে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের মৃত্যুতে তাঁহার স্থানে সার চারুচন্দ্র ঘোষ সদস্য নিযুক্ত হইয়াছে।

সার প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যু যেমন অতর্কিত, তেমনই অপ্রত্যাশিত। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি লাট প্রাসাদে শাসন পরিষদের অধিবেশনান্তে বেলা প্রায় ১২টার সময় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্নান করিতে স্নানাগারে প্রবেশ করেন এবং স্নান শেষ করিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়েন—দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। ভারতে হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারক সার রমেশচন্দ্র মিত্রের তৃতীয় পুত্র সার প্রভাসচন্দ্র ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র তখন যাঁহারা তাঁহার সতীর্থ ছিলেন, তাঁহারা অনেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, সার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, সার চারুচন্দ্র ঘোষ, সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, পরলোকগত দেওয়ান বাহাদুর জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী, হাইকোর্টের বিচারক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ও অনুশীলনতীক্ষ্ণ শ্রমশীলতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সকল বিষয়ের আলোচনার প্রবৃত্তি তাহার প্রধান কারণ।

যৌবনেই তিনি রাজনীতি চর্চ্চায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত একযোগে কাজ করিতেন। নেতারা যুবক প্রভাসচন্দ্রের মেধায় ও অর্জ্জিত সংবাদ-সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে বিশেষ আদর করিতেন।

যখন লিয়োনেল কার্টিস এ দেশে শাসন-সংস্কারের স্বরূপ নির্দ্ধারণ জন্য ভারতে আগমন করেন, তখন সার

স্বর্গীয় সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র

প্রভাসচন্দ্র শাসন-সংস্কারের যে প্রস্তাব করেন, তাহা তৎপূর্ব্বে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারী সদস্য-দিগের প্রস্তাবের তুলনায় বহু অগ্রগামী এবং তাহাতে তাঁহার শাসন-পদ্ধতি পর্য্যালোচনার পরিচয় প্রকট। এ

দেশে সন্ত্রাসবাদ দমন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য যে কমিটী সরকার গঠিত করেন, তাহাতে তাঁহাকে সদস্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের পর বাঙ্গালার প্রথম মন্ত্রিমণ্ডলে তিনি মন্ত্রিত্রয়ের এক জন ছিলেন। দ্বিতীয় পর্ব্বে তিনি মন্ত্রী হইবার চেষ্টা করেন নাই বটে, কিন্তু স্বরাজ্যদল যখন পুনঃ পুনঃ মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙ্গিতে থাকেন, তখন গভর্ণর সার ষ্ট্যানলী জ্যাকশন তাঁহাকে মন্ত্রী করিলে মন্ত্রিমণ্ডল স্থায়ী হয়। মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে বাঙ্গালার শাসন পরিষদে যে সদস্যপদ শূন্য হয়, তিনি তাহাতে নিযুক্ত হয়েন এবং তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইলে তাহা বর্দ্ধিত করা হয়—আগামী জুন মাস পর্য্যন্ত তাঁহার কাজ করিবার কথা ছিল।

তিনি এ দেশে লিবারল রাজনীতিক দলের শক্তিশালী নেতা ছিলেন এবং বাঙ্গালার জমীদাররা তাঁহাকে নেতা বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

বাঙ্গালা হইতে যে পাট রপ্তানী হয়, তাহার উপর রপ্তানী শুল্ক হিসাবে যে কোটি কোটি টাকা বার্ষিক আয় হয়, তাহা যে বাঙ্গালার প্রাপ্য, তাহা তিনি যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনাবধি সে বিষয়ে আন্দোলন করিতে থাকেন এবং গোলটেবিল বৈঠকে বাঙ্গালার অন্যতম প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া যাইয়া তিনি এই বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন করেন। তদ্ভিন্ন ভারতের সেনাবল সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য করিয়া রক্ষা করায় তাহার ব্যয়-বৃদ্ধি হয় বলিয়া সে ব্যয়ের কতকাংশ বৃটিশ সরকারের তহবিল হইতে দিবার জন্যও তিনি আন্দোলন করেন। এই উভয় বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা কতকাংশে ফলবতী হইয়াছে, ইহা তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। কারণ—পার্লামেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন, পাটের রপ্তানী শুল্কের অন্যূন অর্দ্ধাংশ পাটোৎপাদনকারী প্রদেশের প্রাপ্য হইবে এবং "ক্যাপিটেশন ট্রাইবিউনাল"—এ দেশের সেনাবলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক প্রায় ২ কোটি টাকা দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাও গৃহীত হইয়াছে।

বাঙ্গলার আর্থিক উন্নতি সাধন সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অবহিত ছিলেন এবং সংপ্রতি যে পুনর্গঠন প্রস্তাব সরকার কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাও তাঁহার নিয়ন্ত্রনাধীন হইবার কথা ছিল। কিন্তু তাহা আর হইল না।

আমরা সার প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যুতে একজন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ বাঙ্গালী—সামাজিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হারাইলাম। আমরা তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে এই দারুণ শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সার চারুচন্দ্র ঘোষ

যিনি তাঁহার স্থানে শাসন পরিষদের সদস্য হইয়াছেন তিনি তাঁহার সহপাঠী। সার চারুচন্দ্রের পিতা রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর কলিকাতায় প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ও কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যরূপে অনেক কাজ করিয়াছিলেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি

কলেজে পাঠ শেষ করিয়া সার চারুচন্দ্র ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন এবং কয় বৎসর পরে বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আইসেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হয়েন এবং তদবধি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রধান বিচারপতির পদ হইতে অতি অল্প দিন পূর্ব্বে অবসর গ্রহণ করেন।

সার চারুচন্দ্র যৌবনাবধি রাজনীতি চর্চ্চায় অবহিত ছিলেন এবং সংবাদপত্রের সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ ছিল।

হাইকোর্টে তাঁহার কোন কোন রায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও জনসাধারণের অধিকার রক্ষায় তাঁহার মনোযোগের পরিচায়ক।

তিনি পরিণত বয়সে—অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা লইয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করি। তিনি সার প্রভাসচন্দ্রের স্থানে বাঙ্গলার রাজস্ব বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সার প্রভাসচন্দ্র যে এই প্রদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই কার্য্যের সাফল্যের উপর বাঙ্গালার শ্রী নির্ভর করিতেছে। আমরা আশা করি, সার চারুচন্দ্র ঘোষ এই কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইয়া তাঁহার দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন এবং স্বয়ং যশস্বী হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবেন। তিনি দীর্ঘকাল বাঙ্গালার প্রধান বিচারালয়ে বিচারকের কার্য্যে যে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা সুপ্রযুক্ত হইলে তাহাতে যে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কল্যাণ সাধিত হইবে, এ বিশ্বাস আমাদিগের আছে।

দেশ আজ কর্ম্মীর অভাব অনুভব করিতেছে এবং কর্ম্মীরাও যে কাজ করিবার আশানুরূপ সুযোগ পাইতেছেন না, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সার চারুচন্দ্র সেই সব সুযোগ পাইয়াছেন—তিনি সে সকলের সম্যক সদ্ব্যবহার করুন—ইহাই আমাদিগের কামনা ও অনুরোধ।

স্বামী শিবানন্দ—

গত ৮ই ফাল্গুন বেলুড় মঠে মঠের প্রধান স্বামী শিবানন্দের দেহাবসান হইয়াছে। সংসারাশ্রমে ইঁহার নাম—তারকনাথ ছিল। ইঁহার পিতা রামকানাই ঘোষাল "রাণী" রাসমণির সম্পত্তির উকীল ছিলেন এবং সেই সূত্রে তাঁহার সহিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের পরিচয় হয়। তারকনাথ প্রথম যৌবনে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন; কিন্তু পরে ইনি রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্যত্ব

স্বর্গীয় স্বামী শিবানন্দ

স্বীকার করেন। তদবধি তিনি রামকৃষ্ণ শিষ্যসম্প্রদায়ের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং কোন আফিসে যে চাকরী করিতেন, তাহা ত্যাগ করেন। এই সময় তিনি সুযোগ পাইলেই ভারতের নানা তীর্থস্থানে গমন করিতেন। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর বরাহনগরে যে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তাহাতে যোগ দেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম্মসভার জন্য যখন আমেরিকায় গমন করেন, শিবানন্দ তখন ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। এই সময় আলমোরায় তাঁহার সহিত থিয়জফিষ্ট ষ্টার্ডির আলোচনার ফলে তিনি বিলাতে যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দকে বিলাতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় আলমোরায় মঠ প্রতিষ্ঠার কার্য্য আরম্ভ হয়।

তিনি প্রচারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং কিছুদিন দক্ষিণ ভারতে প্রচারকার্য্য পরিচালিত করিয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সেই উদ্দেশ্যে সিংহলে গমন করেন।

কাশীতে তিনিই অদ্বৈতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আশ্রমের কার্য্যে তাঁহাকে যে অসাধারণ শ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বারাণসীতে অবস্থিতিকালে স্বামী শিবানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের সিকাগোয় প্রদত্ত বক্তৃতার হিন্দী অনুবাদ প্রচার করেন।

তিনি প্রথমাবধি বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাষ্টী ছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দের শরীর অপটু হইলে তিনিই কার্য্যতঃ মঠের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দের মৃত্যুর পর তিনিই রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি পদে বৃত হয়েন।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। জরা-জনিত দৌর্ব্বল্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াও তিনি যেভাবে মঠের বিপুল কাজ করিতেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয় এবং অসাধারণ মানসিক শক্তির পরিচায়ক।

প্রায় ১ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায় এবং তিনি মস্তিষ্কের আংশিক পক্ষাঘাতে কাতর হইয়া পড়েন।

মৃত্যুকালে শিবানন্দের বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল।

তিনি মঠবাসী সন্ন্যাসী, ভক্ত ও কর্ম্মীদিগকে উপদেশ দিতেন—

"ভগবানের যোগে মানুষের সেবা হয়। আগে সত্য অন্তরে অনুভব কর, তাহা হইলে অন্যের সেবা করিতে পারিবে।"

যাঁহাদিগের ঐকান্তিক চেষ্টায়—সাধনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—আজ রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রধানদলভুক্ত হইয়াছে--যাঁহারা মানুষের সেবাই জীবনে আধ্যাত্মিক সাধনার সহগামী করিয়া দেশবাসীকে নূতন আদর্শে আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন—স্বামী শিবানন্দের মৃত্যুতে তাঁহাদিগেরই এক জনের তিরোভাব হইল।

ভারত সরকারের বাজেট—

ভারত সরকারের যে বাজেট এখন ব্যবস্থা পরিষদে আলোচিত হইতেছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় করিব। বাজেটের মূল কথা—

এ বার আনুমানিক আয় ১১৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ও ব্যয় ১১৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।

ভারত সরকার বাঙ্গালার আর্থিক দুর্গতিতে শঙ্কিত হইয়া বলিয়াছেন, এ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। সেই জন্য তাঁহারা পার্লামেণ্টের প্রস্তাবানুসারে স্থির করিয়াছেন—

পাটের উপর রপ্তানী শুল্কের অর্দ্ধেক টাকা পাটপ্রসূ প্রদেশসমূহকে দেওয়া হইবে। এই অর্দ্ধেক টাকার মোট পরিমাণ হইবে—১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। তাহা হইতে বাঙ্গালা পাইবে—১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা।

আমরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। কারণ, আমরা জানি :—

(১) ইহাতেও বাঙ্গালা সরকারের ব্যয় আয় অপেক্ষা ৫০ লক্ষ টাকারও অধিক, থাকিবে।

(২) পাটের রপ্তানী শুল্কের সমগ্র অংশ বাঙ্গালা সরকারের প্রাপ্য।

(৩) আয়করের কতকাংশও না পাইলে বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতিসাধন সম্ভব হইবে না।

ভারতে যে, চিনি প্রস্তুত হইবে, তাহার উপর হন্দর

প্রতি ১ টাকা ৫ আনা শুল্ক আদায় হইবে এবং উহা হইতেই ১ আনা হিসাবে লইয়া ইক্ষু চাষীদিগকে সমবায় সমিতিতে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইবে।

নিম্নলিখিত পণ্যের উপর আমদানী শুল্কে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইবে :—

(১) তামাক

(২) সিগারেট

(৩) রৌপ্য

গোমহিষের চামড়ার উপর রপ্তানী শুল্ক রদ করা হইবে।

অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠির মাশুল ৫ পয়সার পরিবর্ত্তে ৪ পয়সা করা হইবে। খামের মূল্য ১ পাই কমিবে। ৫ তোলা পর্য্যন্ত বুকপোষ্টের মাশুল ২ পয়সার পরিবর্ত্তে ৩ পয়সা হইবে।

সাধারণ টেলিগ্রাম ৮ কথা পর্য্যন্ত ৯ আনায় যাইবে। জরুরী টেলিগ্রামের জন্য ১ টাকা ১০ আনার স্থানে ১ টাকা ২ আনা গৃহীত হইবে।

ভারত সরকারের ব্যয় অপেক্ষা আয় যে ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা অধিক হইবে—সেই টাকা ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত বিহার পাইবে।

বাঙ্গালা প্রভৃতি পাটপ্রসূ প্রদেশকে তাহাদিগের প্রাপ্যের অর্দ্ধাংশ দিবার জন্য এ দেশে উৎপন্ন দেশালাইয়ের উপর প্রতি গ্রোসে ২ টাকা ৪ আনা শুল্ক ধরিয়া ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আদায় করা হইবে।

পরলোকে যোগেশচন্দ্র ঘোষ—

বিগত ৩০শে জানুয়ারী যোগেশচন্দ্র ঘোষ পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি জলপাইগুড়ীর একজন বিশিষ্ট অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা ৺গোলোকচন্দ্র ঘোষ মহাশয় চায়ের ব্যবসায়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যোগেশবাবু কিছুদিন ওকালতী ব্যবসা করিয়া পরে পিতার কার্য্যে আত্মবিনিয়োগ করেন এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও প্রতিভা, কর্ম্মশীলতা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা নিজকে ব্যবসাক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় জলপাইগুড়ীতে ভারতীয় চা-কর সমিতি স্থাপিত হয়; তিনি আমরণ এই সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন। তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় ১৯৩২ খ্রীঃ অটাওয়াতে ইম্পিরিয়াল ইকনমিক কন্‌ফারেন্সে উক্ত সমিতিকে নিমন্ত্রণ করা হয়। ভারতীয় চা-কর সমিতির ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে তিনি ভারতীয় চা-সেস্ কমিটিরও সভ্য ছিলেন;—এক কথায়, তিনি বাঙ্গালীকে চায়ের ব্যবসায়কে প্রধান আসনে বসাইয়াছিলেন। যে সমস্ত ইংরেজ ব্যবসায়ী বাণিজ্যসূত্রে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার কর্ম্মপটুতার ও সততার প্রশংসা করেন। ইহা ভিন্ন জলপাইগুড়ীর মিউনিসিপ্যালিটী, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ঢাকা জেলায় তাঁহার নিজগ্রামে তিনি ছেলেদের জন্য একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষালয় ও জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করেন। বঙ্গদেশের বহু প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করিয়া অভয়াশ্রম, তাঁহার দানশীলতার পরিচয় বহুবার পাইয়াছেন।

কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলন—

আগামী গুড্‌ফ্রাইডের অবকাশে (২৯শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা হইতে) তালতলা পাব্‌লিক্ লাইব্রেরীর উদ্যোগে কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই সম্মিলনের মূল সভাপতি হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শাখা সভাপতিগণের নাম নিম্নে বিজ্ঞাপিত হইল।

(ক) সাহিত্য-শাখা—সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে।

(খ) বিজ্ঞান-শাখা " ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র।

(গ) বৃহত্তর বঙ্গ শাখা " ডাঃ শ্রীযুক্ত
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(ঘ) ইতিহাস শাখা— " ডাঃ শ্রীযুক্ত
সুরেন্দ্রনাথ সেন।

(ঙ) বাংলা ভাষা ও মুসলিম সাহিত্য-শাখা—
শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর।

(চ) ধনবিজ্ঞান শাখা—শ্রীযুক্ত
বিনয়কুমার সরকার।

(ছ) চারুকলা ও লোকসাহিত্য শাখা—
শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন।

(জ) শিশু সাহিত্য ও মহিলা শাখা—সভানেত্রী
শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বসাক।

(ঝ) গ্রন্থাগার আন্দোলন শাখা—সভাপতি
শ্রীযুক্ত কে, এম, আশাদুল্লা।

সকল সাহিত্যিক মহোদয়গণের উৎসাহ ও সাহায্য ব্যতিরেকে সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নয়। আমরা সকল সাহিত্যিককেই এই সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। আশা করি, সুধীবৃন্দ বিভিন্ন শাখায় প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া সম্মিলনের পূর্ণতা সাধনে আমাদের সাহায্য করিবেন।

প্রবন্ধাদি তালতলা পাব্লিক্ লাইব্রেরীর সম্পাদকের নামে ১২ নং নিয়োগী পুকুর লেনে ২০শে মার্চ্চ তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

তালতলা পাব্লিক্ লাইব্রেরী মন্দিরে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে ৮॥০ ঘটিকার মধ্যে শুভাগমন করিলে, সাহিত্য সম্মিলনের সকল তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণেব ন্যূনপক্ষে দুই টাকা চাঁদা ধার্য্য হইয়াছে। যাঁহারা অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা দুই টাকা চাঁদা তালতলা পাব্লিক্ লাইব্রেরীর সম্পাদকের নিকট ১৫ই মার্চ্চ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করিবেন।

দেশের ভবিষ্যৎ—

এবারকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের পরীক্ষার্থীদের সংখ্যার হিসাবে দেখা যায়, ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবার ২৩০৭৭; ইণ্টার-মিডিয়েট আর্ট ও সায়েন্স পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮১৭৯ এবং ব্যাচেলার অব আর্ট এণ্ড সায়েন্সের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৮১৬; অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ৩৫০০০। ইঁহারা পুরুষ। তার পর মেয়েরা আছেন। এবার মহিলা পরিক্ষার্থিনীর সংখ্যা ম্যাট্রিকে ১০০০; ইণ্টার-মিডিয়েট আর্ট এণ্ড সায়েন্সে ৫০০র অধিক; এবং বি-এ'তে ২০০। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অবধি আর কোনবারই এবারকার মত এত অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী উপস্থিত হয় নাই। অতঃপর, প্রতি বৎসরই পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যা যে ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

এখন কথা হইতেছে, এই সকল পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যতে গতি কি হইবে? এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য যে দেশের যুবক সম্প্রদায় (এবং যুবতীরাও) বিশেষতঃ, শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা দেশের ভাবী নাগরিক, নাগরিকা—দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা—assets of the Nation! ইঁহারাই জাতি গঠন করিবেন! শিক্ষার বিস্তার অবশ্যই বাঞ্ছনীয়; এবং এই সকল শিক্ষা-প্রাপ্ত তরুণ তরুণীরা যে ভাবী বাঙ্গালী জাতিকে সুগঠিত করিয়া তুলিবেন, দেশের লোকে ইহাই আশা করিয়া থাকে। দেশবাসীর সে আশার কতদূর পূরণ হইবে, তাহাই বিবেচনার স্থল। জাতি গঠন করিতে হইলে প্রথমে ত বাঁচিতে হইবে! জীবন-সংগ্রাম দিন দিন কিরূপ কঠোর হইতেছে, তাহা ত সকলেই দেখিতে পাইতেছেন।

এই যে সাঁইত্রিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার্থীরূপে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে, ইহারা সকলেই কেতাবী শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান, ধনশালী ব্যক্তিগণের সন্তানের সংখ্যা অতি অল্প। এই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তানগণ

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও অনুত্তীর্ণ হইয়া পরে কি করিবে? ইহাদের মধ্যে কতজন জীবিকা উপার্জ্জনের উপযুক্ত কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করিয়াছে? ইহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সনন্দ লাভ করিয়া দেশে বেকারের সংখ্যাই বৃদ্ধি করিবে। এই পরীক্ষার্থীদিগের অর্দ্ধেক সংখ্যাও যদি কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করিত, তাহা হইলে দেশের অনেক উন্নতি হইত, তাহাদেরও সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না। শিক্ষালাভ করা সকলেরই কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে উপেক্ষা করা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে; কিন্তু দেশের যে অবস্থা হইয়াছে, জীবন-সংগ্রাম ক্রমে ক্রমে যে প্রকার কঠোর হইতেছে, তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের দিকেই চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। সুখের বিষয় মেয়েদের কার্য্যকরী শিক্ষা দানের জন্য কলিকাতা ও মফস্বলের অনেক স্থানে নানা সমিতি, সঙ্ঘ, আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে সকল স্থানে দরজীর কাজ ও অন্যান্য শিল্প শিক্ষা করিয়া স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনভাবে জীবিকা-উপার্জ্জনের সুবিধা পাইতেছে। এবার সাঁইত্রিশ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে যে পঁয়ত্রিশ হাজার ছাত্র আছে, তাহাদের কিয়দংশও যদি এই প্রকার শিল্প-শিক্ষা করিয়া দরিদ্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিত, তাহা হইলে দেশের এই দারুণ জীবন-সংগ্রামের সামান্য একটুও ত উপশম হইত। এত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দেখিয়া আমরা সেই কথাই চিন্তা করিতেছি।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "অনুরাধা, সতী ও পরেশ"—১৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "কুঞ্জতলে অন্ধ বালিকা"—১৲
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ প্রণীত "ন্যায়-পরিচয়"—২৷৷৹
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সঙ্কলিত "সরস্বতী" প্রথম খণ্ড—৩৲
শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত "রাজা রামমোহন"—৷৷৵৹
মহাম্মদ আজহারউদ্দীন প্রণীত "হাদীছের আলো"—১৷৷৹
শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত "দিল্লীকা লাড্ডু"—৷৷৹
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ষোড়শজন লেখক-লেখিকার গল্পের বই "পুষ্পাঞ্জলি"—২৲
শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেন প্রণীত সামাজিক নাটক "গ্রহমুক্তি"—৸৹
শ্রীবিপিনবিহারী জ্যোতিঃ শাস্ত্রী প্রণীত "হাতের ভাষা"—১৷৷৹
শ্রীসুধাংশুকুমার সান্যাল প্রণীত চিত্রনাট্য "কো-এডুকেশন"—৷৹
শ্রীআশুতোষ (বাগচি) চক্রবর্ত্তী প্রণীত উপন্যাস "নির্ব্বাণ পথে"—৷৷৹
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "চালিয়াৎ চাদর"—৷৷৹
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য "তারা ও ফুল"—১৲
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "তুমি আর আমি"—১৷৹
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত "ছোটদের পরমহংস"—৷৹
শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত "আবুহোসেন"—৷৵৹
শ্রীকনকলতা ঘোষ প্রণীত গল্পের বই "নূতন পথে"—১৷৷৹
মোহাম্মদ মোদাব্বের প্রণীত গল্পের বই" হীরের ফুল"—৷৵৹
৺যজ্ঞেশ্বর ভৌমিক প্রণীত "বীর রমণী"—১৲
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্য লহরী উপন্যাস মালার অন্তর্ভুক্ত "ছায়ার কায়া" ও "প্রচ্ছন্ন আততায়ী"—প্রত্যেকখানি ৸৹
শ্রীমনোরম গুহ ঠাকুরতা প্রণীত শিকারের কাহিনী "বনে জঙ্গলে"—৸৹
শ্রীশ্যামধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "চলতি দুনিয়া"—২৲

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
OF MESSRS. GURUDAS CHATTERJEA & SONS
201, Cornwallis Street, Calcutta

Printer—NARENDRA NATH KUNAR
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS
203-1-1, Cornwallis Street, Cal.

বৈশাখ—১৩৪১

দ্বিতীয় খণ্ড | একবিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

সাহিত্যে ভোগাসক্তি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটি গল্প আছে। দেবতাগণ এবং অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির সন্তান। তন্মধ্যে দেবগণ কনিষ্ঠ, অসুরগণই জ্যেষ্ঠ। উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। দেবগণ মনে করিয়াছিলেন যজ্ঞে উদ্গীথকর্ম অনুষ্ঠান করিয়া আমরা অসুরদিগকে অতিক্রম করিব। এইরূপ সংকল্প করিয়া দেবগণ বাক্‌ইন্দ্রিয়কে বলিলেন "তুমি আমাদের হইয়া উদ্গীথ গান কর।" বাক্ ইন্দ্রিয় উদ্গীথ গান আরম্ভ করিলে অসুরগণ বাক্‌ইন্দ্রিয়কে আক্রমণ করিল এবং ভোগাসক্তি-রূপ পাপ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। লোকে যে অনুচিত বাক্য বলিয়া থাকে তাহাই সেই পাপ। অতঃপর দেবগণ ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়কে উদ্গীথ গান করিতে বলিলেন। অসুরগণ তাঁহাকেও আক্রমণ করিয়া ভোগাসক্তি-রূপ পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। লোকে যে নিন্দিত ঘ্রাণ করে, তাহাই সেই পাপ। অতঃপর শ্রবণেন্দ্রিয়ও পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইল। লোকে যে অপ্রিয় বাক্য শুনিয়া থাকে তাহাই এই পাপ। এই ভাবে মনও পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইল। লোকে যে অনুচিত সংকল্প করে তাহাই এই পাপ। ইত্যাদি।

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে এখানে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকেই দেবতা এবং অসুর বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ যখন শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান এবং কর্মানুষ্ঠানে অভিরত থাকে, তখন তাহারা দীপ্তিমান হয়, এজন্য দেব শব্দ বাচ্য হয়। ইন্দ্রিয়গণ যখন কেবল ভোগাসক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম করে, তখন তাহারা কেবলমাত্র প্রাণ বা "অসু"র পরিতৃপ্তিতে নিরত থাকে, এজন্য অসুর শব্দ বাচ্য হয়। শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্মে প্রবৃত্তি বহু আয়াসসাধ্য, এজন্য অল্প। ভোগাসক্তিহেতু কর্মে প্রবৃত্তিই স্বাভাবিক, এজন্য বহুসংখ্যক। এই কারণে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, দেবগণ কনিষ্ঠ, এবং অসুরগণ জ্যেষ্ঠ।

যজ্ঞে অর্থাৎ ঈশ্বরপূজনে নিযুক্ত করাই বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সার্থকতা। দেবগণ এইভাবে অসুরগণকে

অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভোগাসক্তি হেতু ইন্দ্রিয়গণ ঈশ্বরারাধনারূপ সাধনা হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এই ভোগাসক্তিই পাপ। পাপের স্পর্শনিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণ অনুচিত কর্মই নিষ্পন্ন করে।

উপনিষদুক্ত আখ্যায়িকার অনুসরণ করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে সাহিত্যও অসুরগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভোগাসক্তি-রূপ পাপ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার ফলে অসৎসাহিত্যের আবির্ভাব হইয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ যেরূপ ঈশ্বরের উদ্দেশে নিযুক্ত হইলেই সার্থক হয়, ভোগের জন্য নিযুক্ত হইলে তাহার অপব্যবহার হয়,—সেইরূপ সাহিত্যেরও সার্থকতা শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থ তাহাকে নিযুক্ত করা, এবং সাহিত্যের অপব্যবহার হইতেছে দুর্নীতিপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করা। এইভাবে দুই শ্রেণীর সাহিত্যের সৃষ্টি হয়,—সৎসাহিত্য এবং অসৎসাহিত্য। সৎসাহিত্য মানবকে ভগবদভিমুখী করে; অসৎসাহিত্য মানবকে ভোগাভিমুখী করে, এবং ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য ব্যাকুল করে।

আজকাল সাহিত্যে আর্টের (Art) কথা প্রায় শোনা যায়। আধুনিক সাহিত্যিকগণ বলিয়া থাকেন যে Artই সাহিত্যের প্রাণ। যাহাতে Art আছে তাহাই ভাল সাহিত্য। যাহাতে Art নাই, তাহা সাহিত্য নামের যোগ্য নহে। সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করিবার জন্য সাহিত্যের সুনীতি-দুর্নীতির কথা অপ্রাসঙ্গিক। এই Art কি বস্তু, তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যাহা চিত্তাকর্ষক তাহাই Art। বলা বাহুল্য ভাল ও মন্দ উভয় বস্তুই চিত্তাকর্ষকভাবে কথিত হইতে পারে। সুতরাং আধুনিক সাহিত্যিকগণ যাহাকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য বলিবেন তাহা ভাল ও মন্দ দুই প্রকারই হইতে পারে। যাঁহারা অর্ব্বাচীন, তাঁহারা ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের সাহিত্যই আদর করিবেন,—যদি সে সাহিত্য চিত্তাকর্ষক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর * হয়। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা মন্দ সাহিত্য ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর হইলেও তাহা বর্জন করেন। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগজনিত যে সুখ তাহা ক্ষণস্থায়ী। এই সুখে আসক্তি থাকিলে পরিণামে,—এই সুখের অবসানে,—দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। এজন্য গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং তিতিক্ষস্ব ভারত॥

গীতা ২।১৪

"বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংবন্ধ হইলে কখনও শীত কখনও উষ্ণ, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ,—নানাবিধ ভাবের উদয় হয়। এই সকল ভাব অনিত্য জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ পাইলে হর্ষান্বিত হন না, দুঃখ পাইলে বিষণ্ণ হন না।"

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞানের লক্ষণ নির্দেশ করিবার সময় বলিয়াছেন "ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্"—যে সকল দ্রব্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর তাহাতে আসক্তি বর্জন করিতে হইবে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান পুনরায় বলিয়াছেন,

বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতং॥ ১৮।৩৮

বিষয়ের সহিত সংযোগ হইলে ইন্দ্রিয়ের যে সুখ হয় তাহা প্রথমে অমৃতের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু পরিণামে বিষের ন্যায়। এই সুখের নাম রাজস সুখ।

জ্ঞানী "আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ" (২৫৫) নিজের মধ্যেই তুষ্টি অনুভব করেন, বাহ্য বস্তুর সংযোগের অপেক্ষা করেন না, এবং কূর্ম যেরূপ স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজ দেহের মধ্যে সঙ্কুচিত করে, জ্ঞানী সেইরূপ বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গুলি সংহরণ করিয়া রাখেন (২৫৮)।

জ্ঞানী সুন্দর দৃশ্য দেখিলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তির কথা ভাবেন না। তিনি ভাবেন এই সুন্দর দৃশ্য যাঁহার মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, তিনি নিজে কি অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর। এইরূপ ভাব হইতে যে সাহিত্যের আবির্ভাব হয়, তাহা সৎসাহিত্য।

মনে হইতে পারে জীবনের সকল বিষয়ে এরূপ অধ্যাত্ম চর্চ্চা করিতে গেলে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া যদি বলা যায় "আহা চক্ষু জুড়াইল", সুন্দর গান শুনিয়া যদি বলা যায় "কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল" তাহা হইলে ক্ষতি কি? ক্ষতি এই যে মনকে ভোগোন্মুখ

* চিত্ত বা মনও একটি ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় একাদশটি,—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং মন (উভয়েন্দ্রিয়)।

করা হয়; যাহা কল্যাণকর তাহার জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি হয় না; যাহা আপাতমধুর তাহার জন্য অভিরুচি বর্দ্ধিত হয়; শ্রেয়র পরিবর্ত্তে প্রেয়কে বরণ করা হয়। যাহা ভাল লাগে তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া গেলে সুনীতি-দুর্নীতির পার্থক্য বিলুপ্ত হয়। "আমরা একটা মহৎ বিষয়ের চর্চ্চা করিতেছি" এইরূপ মিথ্যা ভাবের আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির আয়োজন প্রবলভাবে চলিতে থাকে। দুর্নীতি ললিতকলার মুখোস পরিয়া সমাজে সমাদর লাভ করে।

সাহিত্যের ক্ষমতা আছে মানবচিত্তকে আকৃষ্ট করা। এই ক্ষমতার উচিত মত ব্যবহার হইলে সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়। তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ,—রামায়ণ ও মহাভারত। এই দুই গ্রন্থ যেমন প্রবলভাবে মানব-মন আকর্ষণ করে সেইরূপ গভীরভাবে মানব-মনের উপর ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্যের সংস্কার অঙ্কিত করিয়া দেয়। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের জনসাধারণ এই দুই গ্রন্থ হইতে সুশিক্ষা লাভ করিয়া আসিতেছে। ইহাই সাহিত্যের সদ্ব্যবহার। অসৎ সাহিত্যে দুর্নীতিকে চিত্তাকর্ষকভাবে অঙ্কিত করা হয় এবং ধর্ম্মকে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। দুঃখের বিষয় আজকাল কয়েকজন শক্তিশালী লেখক এরূপ অসৎ সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁহাদের প্রতিভা নিযুক্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, তাঁহারা তাহার অপব্যবহার করিতেছেন। এ বিষয়ে সাহিত্যস্রষ্টাদের যেরূপ দায়িত্ব আছে, সাহিত্য-প্রচারক এবং সাহিত্য-পাঠকদেরও সেইরূপ দায়িত্ব আছে। অসৎ সাহিত্য লোকে না পাঠ করিলে লেখকগণ সেরূপ সাহিত্যরচনা হইতে বিরত হইবেন। সাহিত্যিকের দায়িত্ব অতি গুরুতর। এই দায়িত্বজ্ঞান বর্জ্জন করিলে সমাজ দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। আজকাল সমাজ-ধ্বংসকর অসৎ সাহিত্য অবাধে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে এবং অপরিণত বয়স্ক যুবক যুবতী আগ্রহের সহিত সে সকল সাহিত্য পাঠ করিয়া দুর্নীতিরূপ বিষে চিত্ত কলুষিত করে। আমাদের সমাজের নেতাদের এ বিষয়ে কত দিন পরে চেতনা হইবে বলিতে পারি না।

মানুষ কর

শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী

গন্তব্য কোথায় তা'ত জানিনাক আমি পথহারা,
মিথিল সৃজন-দৃশ্য বাঁধে মোর জ্ঞান-আঁখি-তারা।
লক্ষ্যহীন তরী সম ভেসে যাই কামনা-সাগরে,
দিশেহারা ঘুরিতেছি মরু-তৃষা সদা বুকে ধরে।

কোথা তৃপ্তি, কোথা শান্তি অহর্নিশ যন্ত্রণা কেবল;
পলে পলে বাড়ে হৃদে ধূমান্বিত বাসনা-অনল।
জীবনের পথ হতে বহু দূরে আসিয়াছি স'রে;
রতন-কাঞ্চন ফেলি কাচ খণ্ড নিছি হেসে ধ'রে।

আপাত শান্তির মোহে রচি সদা দুখের সাহারা,
প্রবৃত্তির বশে গড়ি নিজ হাতে নিজ লৌহ-কারা।
স্বর্ণ-পাত্রে হলাহল সুধা সম করি সুখে পান;
রিপুর ছলনা-স্রোতে ভেসে যায় সদা নীতি-জ্ঞান।

পাপ-পঙ্ক হৃদয়ের মুছে দাও বিশ্বের মালিক,
দেবতা না হতে সাধ—কর মোরে মানুষ সঠিক।

শেষ পথ

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(২৩)

মধুসূদন ঠাকুরের বিশেষ কোনও তাড়া নাই। সে আসে যায়, ধর্ম্মালাপ করে, ধর্ম্মোপদেশ দেয়, ক্রমে ক্রমে সে শারদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াইয়া চলে।

শারদা তাকে দেবতার মত ভক্তি করিতে আরম্ভ করিল। মধুসূদনের নিষ্ঠা, সদাচার, তার দেবভক্তি, আর তার মুখে নিয়ত সুমধুর হরিনাম, এ সকলই শারদাকে অভিভূত করিল।

শারদা রোজ গঙ্গাস্নান করিয়া মধুসূদনের সঙ্গে গিয়া দুই তিন বাড়ীতে তার পূজার জোগান দেয়। দ্বিপ্রহরে আথড়ায় প্রসাদ পায়, কীর্ত্তন শোনে, পাঠ শোনে; আর দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায়, যখন মধুসূদনের অবসর হয় তখনই তার কাছে ধর্ম্মোপদেশ নেয়। মধুসূদন উপদেশ দেয় অনেক প্রকার। ভাগবত হইতে নানা উপাখ্যান সে কথকদের কাছে শুনিয়াছিল। তার সেই শোনা কথা ও উপদেশ সে বেশ নিপুণতার সঙ্গে শারদার কাছে পুনরাবৃত্তি করিয়া যাইত। গীতা হইতে দুই একটা শ্লোক মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিয়া বুঝাইত। সে বলিত শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

অর্থাৎ ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইতে হইবে। পাপ পুণ্যের হিসাব করিলে চলিবে না। পাপ তাতে হয় হউক তাহাতে কোনও চিন্তা নাই। কৃষ্ণপ্রেম যে করিয়াছে তার সব পাপ ভগবান মোচন করিবেন। সতীধর্ম্ম সাধারণের জন্য। তাহা ত্যাগ করিলে যে পাপ, তাতে কৃষ্ণপ্রেমীকে স্পর্শ করে না, কেন না শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন তিনি তার সকল পাপ মোচন করিবেন। এমনি করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যহই সে মধুরভাবে ভগবৎসাধনার ব্যাখ্যাচ্ছলে এ কথাটা শারদাকে বুঝাইতে ভুলিত না যে সতীত্ব বস্তুটাই কৃষ্ণপ্রেম লাভের প্রধান অন্তরায়।

ক্রমে ক্রমে মধুসূদন তার মধুররস ব্যাখ্যানের মধ্যে আদিরসাস্থত বহু বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিতে আরম্ভ করিল, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অপেক্ষাকৃত বিশদ বিবরণ দিতে লাগিল। লজ্জায় অধোবদন হইয়া শারদা শুনিত— লজ্জা হইত তার, কিন্তু বিদ্রোহ হইত না।

শারদা ভাগবতপাঠ শুনিত, কীর্ত্তন শুনিত। সেখানে সে যাহা শুনিত তাহা মধুসূদনের রসব্যাখ্যানের সঙ্গে মিলিয়া যাইত। ইহাতে মধুসূদনের প্রতি তার শ্রদ্ধা ভক্তি বাড়িয়া যাইত।

মধুসূদন শারদাকে যে উপদেশ দেয় শারদার প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীগণ দিনরাত সেই ধর্ম্মেরই ব্যাখ্যা করে—বাক্যে ও কর্ম্মে। শারদা যে বাড়ীতে থাকে সেই বাড়ীতে আরও অনেকগুলি বৈষ্ণবী বাস করে—এবং তাহারা প্রত্যেকেই মধুরভাবে ভগবানের আরাধনা করিবার জন্য কোনও না কোনও বৈষ্ণবের সেবাদাসী হইয়া আছে। ইহাদের সঙ্গে নিত্য সাহচর্য্যে ও আলাপ আলোচনায় ক্রমে ক্রমে শারদার চিত্ত হইতে তার

পূর্ব্ব ধারণাগুলি একে একে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল এবং সতীত্বধর্ম্মের অত্যাজ্যতা সম্বন্ধে তার যে তীব্র ধারণা, তাহা অনেক দুর্ব্বল হইয়া গেল।

শারদা ভেক লইল।

শেষে একদিন, অতি উগ্র প্রেমের কাছে যে সম্পদ সে বিসর্জ্জন করিতে অস্বীকার করিয়াছিল, হৃদয়কে নির্ম্মমভাবে নিষ্পেষিত করিয়া যে সম্পদ সে রক্ষা করিয়াছিল, ভালবাসার আবেদনে সে যাহা দেয় নাই, ধর্ম্মের নাম করিয়া মধুসূদন তার সে সম্পদ হরণ করিয়া লইল।

কিছুদিন আত্মগ্লানির তার সীমা রহিল না। কিন্তু ক্রমে সহিয়া গেল।

কিন্তু মধুসূদনকে সে বেশী দিন সহিতে পারিল না। নিবিড় পরিচয়ে যে দিন শারদা বুঝিতে পারিল যে ধর্ম্মটা মধুসূদনের শুধু একটা ভান—আসলে সে শুধু লম্পট ও বঞ্চক, ধর্ম্মের নাম করিয়া সে ঠকাইয়া লইয়াছে তার যথাসর্ব্বস্ব, সেই দিন শারদা মধুসূদনকে ঝাঁটা-পেটা করিয়া বিদায় করিল।

তাহার পর মধুসূদন আর শারদার শত হস্তের ভিতর আসিতে সাহসী হয় নাই।

মধুসূদনকে তাড়াইয়া শারদার অন্তরের গ্লানি মিটিল না। মধুসূদন তার যে সর্ব্বনাশ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তাহা তো সহস্র শতমুখী দিয়া বিদায় করিবার নয়। তার সেই সর্ব্বনাশের কথা ভাবিয়া শারদার দিবসে শান্তি ছিল না, রাত্রে নিদ্রা ছিল না।

মন শান্ত করিবার জন্য সে ঠাকুরঘরে বসিয়া নামজপ করিত। কিন্তু তাহাতে সে শান্তি পাইত না। এই ঠাকুরের নাম করিয়া ইহারই দোহাই দিয়া মধুসূদন শারদার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। দেবতার নামে ছলনা করিয়া এত বড় পাপাচার করিয়াছে। তাই দেবমন্দিরে বসিয়া তার প্রাণ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিত।

সে মাথা কুটিয়া ঠাকুরকে বলিত, "তুমি তো জান ঠাকুর, আমার কোনও দোষ নাই। আমি মূর্খ, বুদ্ধিহীন নারী, আমাকে তোমার নাম করিয়া এ সর্ব্বনাশ করিয়াছে—তুমি আমায় ক্ষমা করিবে না কি?"

দিনের পর দিন সে এমনি করিয়া ঠাকুরঘরে মাথা খুঁড়িয়া আপনার চিত্তে শান্তি আনিবার চেষ্টা করিল।

(২৪)

কিছু দিন তার এমনি কাটিল। দেবসেবায় নাম কীর্ত্তনে তন্ময় হইয়া সে জীবন কাটাইতে লাগিল। তার উপর উৎপাতের অন্ত ছিল না। মধুসূদন যখন পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল, তখন মোহান্ত স্বয়ং আসিয়া তার উপর কৃপাদৃষ্টি দিবার চেষ্টা করিলেন। তার রূপ যৌবন এবং তার বৈষ্ণবীর বেশ দেখিয়া লম্পটের দল তাকে ভুলাইবার কত না চেষ্টা করিল, কত না বৈরাগী আসিয়া তাকে সেবাদাসী করিবার প্রস্তাব করিল। পথে ঘাটে চলিতে, গঙ্গাস্নানের সময়, এমন কি নিজের গৃহে ও দেবমন্দিরেও কামুকের লোলুপ দৃষ্টি ও অসংযত জিহ্বা তাকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

শারদা অস্থির হইয়া উঠিল। ভয়ে তার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। শেষে সে স্থির করিল এই অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায় কোনও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা।

যখন সে এমনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, তখন একদিন নবদ্বীপের একটি বৃহৎ আখড়ার অধিকারী মহাশয় তার উপর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অধিকারীর বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসর। শরীর শীর্ণ ও অসুস্থ; কিন্তু সুন্দরী যুবতীর সঙ্গ-কামনা তাঁর ঘুচে নাই। অধিকারীর কথা শুনিয়া শারদার হাসি পাইল। তার মত জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধ যে কল্পনা করে যে কোনও সুন্দরী যুবতী তার প্রতি অনুরাগিণী হইতে পারে ইহা ভাবিয়া সে হাসিল।

অধিকারী অনেক দিন আনাগোনা করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি তাঁহার বৈষ্ণবী বিয়োগ হইয়াছে, সুতরাং তাঁর হৃদয়ের সিংহাসন একেবারে শূন্য। শারদা—ওরফে গৌরদাসী কেবল একটা হাঁ বলিলেই অধিকারীর সমগ্র জীবনের এবং আখড়ার বিপুল বিত্তের একেশ্বরী হইতে পারে, এই কথা তিনি বার বার তাকে শুনাইলেন। শারদা তাঁকে "হাঁ"ও বলিল না, "না" ও বলিল না।

কয়েক দিন পর শারদা ভাবিল দূর হোক ছাই, অধিকারীর আশ্রয়ে গেলে সে পথে ঘাটে প্রেমিকের হা হুতাশের হাত হইতে মুক্তি পাইবে!

সে সম্মত হইল। অধিকারীর সহিত রীতিমত কণ্ঠীবদল করিয়া আখড়ার অধীশ্বরী হইয়া বসিল।

সে দেখিতে পাইল অধিকারী লোকটি বিনয়ী নম্র এবং ধর্ম্মপরায়ণ। বৈষ্ণবের ধর্ম্ম সে জ্ঞান বিশ্বাস অনুসারে যথাসাধ্য পালন করে এবং তার ভগবদ্ভক্তি মধুসূদন ঠাকুরের মত সম্পূর্ণ মেকী জিনিষ নয়।

অধিকারী সকলের সঙ্গেই বিনীত ও নম্র ব্যবহার করেন, কিন্তু গৌরদাসীর কাছে তাঁর নম্রতার আর সীমা নাই। শারদা যে তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী হইতে স্বীকার করিয়া তাঁর উপর কত বড় অনুগ্রহ, কত প্রকাণ্ড পুরস্কার করিয়াছে, তিনি তা মুখে বেশী বলিতে পারিতেন না; কিন্তু শারদাকে যত্ন ও সেবা করিয়া এবং নিরন্তর অনুগত ভৃত্যের মত তার আদেশ পালন করিয়া তিনি তাহা ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ করিতেন।

বৃদ্ধের এই সেবা ও অনুরাগে শারদার প্রথম হাসি পাইত। কিন্তু ক্রমে তার চিত্ত করুণা ও সহৃদয়তায় ভরিয়া গেল। অধিকারী তার কাছে সাহস করিয়া কিছু চায় না। কিন্তু একটু মিষ্টি কথা, একটু সমাদর পাইলে আনন্দে গলিয়া যায়! দেখিয়া শারদার বড় মায়া হয়। ভাল সে ইহাকে বাসিতে পারে না, তবু সে বৃদ্ধকে আনন্দ দিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়া তাকে ভালবাসা দেখায়।

বড় জ্বালা বড় গ্লানি লইয়া শারদা অতিষ্ঠ হইয়া অধিকারীর আশ্রয় স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে তার মনের গ্লানি কাটিয়া গেল, অধিকারীর গৃহিণী হইয়া তাহার সেবা যত্ন করিয়া সে সত্য সত্যই তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিল।

তা ছাড়া তার সাধন-ভজনে সে অধিকারীর কাছে সহায়তা পায়, উৎসাহ পায়, আখড়ায় ধর্ম্মের একটা আবহাওয়া সে অনুভব করিতে পায়। ইহাতে তার অন্তর শান্তিলাভ করিল।

এক মাসের মধ্যে শারদা তার নূতন আবেষ্টনের ভিতর পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত আপনাকে মানাইয়া লইল। তার অতীত জীবনের সকল দুঃখ গ্লানি সম্পূর্ণরূপে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে আনন্দের সহিত ধর্ম্ম সাধনা ও অধিকারীর সেবা করিতে লাগিল।

কিন্তু এক মাস পর তার এই পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও আনন্দ হঠাৎ একদিন নির্ম্মূল হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তার ছেলেটি ছিল তার নয়নের মণি! সেই ছেলে একদিন হঠাৎ গঙ্গায় পড়িয়া মারা গেল।

একটা প্রচণ্ড দাবানলে নিমেষের মধ্যে তার সমস্ত অন্তর যেন পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল। তার জীবন অর্থশূন্য, অন্তর মরুভূমির মত উদাস হইয়া উঠিল।

সবচেয়ে বেশী মনঃপীড়া তার হইল এই ভাবিয়া যে তার ছেলের মৃত্যু তার পাপের শাস্তি। স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হইয়া সতীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সে যে ভীষণ পাপ করিয়াছে তারই ফলে ভগবান তাকে এই মর্ম্মান্তিক শাস্তি দিলেন।

ইহা তো তার জানাই ছিল। ভগবান তো তাকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে ত্রুটি করেন নাই। যে-দিন গোপালের কাছে সে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল সেই দিনই শিশুকে নিদারুণ আঘাত দিয়া ভগবান তাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে সে সতীধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইলে তার শিশু বাঁচিবে না। হায় রে, জানিয়া শুনিয়া সে ভগবানের এ সুস্পষ্ট আদেশ অবহেলা করিতে সাহসী হইয়াছিল—ভগবান তার উচিত শাস্তি দিয়াছেন!

জীবনের সব সুখ তার ফুরাইয়া গেল। যে তৃপ্তি ও শান্তি সে এখানে আসিয়া পাইয়াছিল তাহা মিলাইয়া গেল। একটা নিদারুণ হাহাকার সুধু তার চিত্তে অনির্ব্বাণ অগ্নির মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

সে হাত পা নাড়া ছাড়িয়া দিল। সুধু জড়পিণ্ডের মত সে বসিয়া থাকে আর কাঁদে। বেশীর ভাগ সময় ঠাকুর-ঘরে দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া সে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে বিগ্রহের মুখের দিকে, আর দরদর ধারে তার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইয়া যায়। কত যে অভিযোগ, কত যে আবেদন সে নীরবে বসিয়া দেবতার কাছে করে, কত তিরস্কার সে নিষ্ঠুর দেবতাকে করে, তাহা সুধু সে-ই জানে, আর জানেন তার অন্তর্যামী।

অধিকারী বেচারা সর্ব্বক্ষণ তার চারিপাশে ঘুর ঘুর করিয়া ঘোরে, তার সাধ্যমত তাকে সান্ত্বনার কথা বলে, ধর্ম্মের কথা, ঠাকুরের করুণার কথা কত করিয়া তাকে

বুঝাইতে চায়। শারদা সুধু নীরবে শুনিয়া যায়। অধিকারী খুব যখন কথা বলিবার জন্য পীড়া-পীড়ি করে তখন সে সুধু সংক্ষেপে উত্তর দেয় 'হাঁ' কি 'না'।

অধিকারী আকুল হইয়া উঠিল। সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। সে ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করিল, শারদা যন্ত্র-চালিতের মত গিয়া পাঠ শোনে—শুনিতে শুনিতে তার দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিতে থাকে। অধিকারী বিশেষ করিয়া কীর্ত্তনের আয়োজন করিলেন, মহোৎসব করিলেন, বড় বড় পণ্ডিত গোস্বামীদের আনিয়া শারদাকে উপদেশ দেওয়াইলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। শারদাকে যাহা বলা হয় তাই সে করে—অসাড় যন্ত্রের মত, কোনও কিছুতেই তার মনের ভিতর সাড়া দেয় না।

এমনি করিয়া অনেক দিন কাটিয়া গেল। সান্ত্বনায় যাহা সম্ভব হইল না, সময়ে তাহা সহনীয় হইয়া গেল। শারদার এত বড় শোক তাও তার শান্ত হইল। শারদা আবার পূর্ব্বের মত আখড়ার কাজকর্ম্ম করে, অধিকারীর গৃহকর্ম্ম করে, তাঁর সেবা করে—সবই করে। কিন্তু তার কর্ম্মে যে তৃপ্তি ও আনন্দের স্বাদ সে একদিন পাইয়াছিল, তাহা সে জন্মের মত হারাইল।

(২৫)

অনেক দিন পর একদিন একদল যাত্রী শ্যামসুন্দর অধিকারীর আখড়ায় আসিল। তাদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক, সঙ্গে দুই চারিটি পুরুষ আছে।

শারদা তখন মহাপ্রভুর মন্দিরে শীতল ভোগের জোগাড় করিতেছিল। যাত্রীদল আসিয়া প্রণাম করিতে তাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া সে বুঝিল ইহারা টাঙ্গাইল অঞ্চলের লোক।

শারদা তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিল যে তারা অধিকাংশই ভগীরথপুরের সন্নিকটবর্ত্তী সব গ্রাম হইতে আসিয়াছে। আরও জানিল যে ইহারা আসিয়াছে রামকমল চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে।

রামকমল চক্রবর্ত্তীকে শারদা চিনিত। ইনি চট্টগ্রামের ব্রাহ্মণ, পূজারী হইয়া শারদার গ্রামে প্রথম আসেন। তার পর পাঠশালার পণ্ডিত ও কিছুকাল জমীদারের গোমস্তা হইয়াছিলেন। জমীদার-গৃহিণীর সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের অধিকাংশ তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তীর্থের সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তার পর হইতে তিনি এই নূতন ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। বড় কোনও একটা যোগ বা ধর্ম্মোৎসবের সময় তিনি দেশ হইতে যাত্রী সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে তীর্থ ভ্রমণ করান। যাত্রীরা তাঁর পারিশ্রমিক দেয়। এই ব্যবসায়ে তাঁর দক্ষতা বিষয়ে এই অঞ্চলের লোকের একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাই তাঁর সঙ্গ লইবার জন্য এ অঞ্চলের বহু গ্রাম হইতে যাত্রীর অভাব হইত না।

রামকমল চক্রবর্ত্তীর নাম শুনিয়া শারদা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিল। রামকমল বাহিরে ছিলেন, তাঁহাকে যাত্রীরা ডাকিয়া আনিল।

শারদা রামকমলকে বাড়ীর ভিতর লইয়া অশেষ যত্ন করিয়া তাঁকে প্রসাদ ভোজন করাইয়া তাঁর কাছে দেশের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল।

রামকমল শারদাকে প্রথমে চিনিতে পারিলেন না।

শারদা জিজ্ঞাসা করিল, ভট্টাচার্য্য গৃহিণীর কথা, নীয়োগী পরিবারের কথা। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁদের সকল সংবাদ জানাইলেন। তার পর গোপালের কথা জিজ্ঞাসা করিতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি ইয়াগো চিনলেন কেমনে?"

এখন শারদার ভাষা এতটা মার্জ্জিত হইয়া গিয়াছিল যে, হঠাৎ তাকে পূর্ব্ব-বঙ্গের লোক বলিয়া মনে হয় না।

শারদা হাসিয়া বলিল, "আমি যে ঐ দেশেরই মেয়ে ঠাকুর। আপনাকে ছেলেবেলায় দেখেছি যে আমি।"

অবাক হইয়া চক্রবর্ত্তী তার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার পিতার নিবাস?"

শারদা একটু হাসিয়া বলিল, "আপনাদের গ্রামেই।"

"কি নাম তান?"

"তাঁর নাম ব'ল্লে চিনবেন না, আপনি তাঁকে দেখেনই নি। বরং আমার নাম ব'ল্লে চিনবেন—আমি শারদা।"

চমকাইয়া উঠিয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "শারদা! দুর্গা তাইত্যানীর মেয়া?"

শারদা বলিল "হাঁ ঠাকুর।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তুমি এখানে—কি?"

একটু লজ্জিতভাবে শারদা বলিল, "অধিকারী ঠাকুর আমাকে অনুগ্রহ করেন, তাঁর আশ্রয়ে আছি।"

"তুমি তান সেবাদাসী ?"

শারদা বলিল, "চুপ ! হাঁ তাই, কিন্তু দয়া ক'রে দেশে কথাটা প্রকাশ ক'রবেন না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "আরে নাঃ—আমি অমন ছেবলা না।" কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন যে দেশে যাইয়া এই কথা বলিয়া তিনি অনেক স্থলে আসর জমাইতে পারিবেন। শারদা যে কুলত্যাগ করিয়া আসিয়া অবশেষে এত বড় একটা আখড়ার অধিষ্ঠাত্রী হইয়াছে, এটা একটা সংবাদের মত সংবাদ !

ক্রমে চক্রবর্ত্তী শারদাকে গোপালের সংবাদ জানাইলেন। গোপালের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাহার অত্যাচারে গ্রামের লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক লোককে সে ঠকাইয়াছিল। সেই আক্রোশে কে একজন রাত্রে তার ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছিল। সেই গৃহদাহে তার যথাসর্ব্বস্ব পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। তার স্ত্রী ও সে নিজে ভয়ানক ভাবে দগ্ধ হইয়াছিল। গোপাল রক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু তার স্ত্রীটি মারা গিয়াছে।

এ দিকে গোপালের মনিব নয়-আনির জমীদার তাহার উপর রুষ্ট হইয়া তাহাকে বরখাস্ত করিয়া তার উপর অনেকগুলি মোকদ্দমা ডিক্রী করিয়া তার জমী-জমার অধিকাংশ বিক্রয় ও জবর-দখল করিয়া লইয়াছেন। গোপাল এখন সেই সব মামলা মোকদ্দমা লড়িতেছে, কিন্তু তার সহায়ও নাই, সম্বলও নাই। সে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে !

গোপালের দুর্দ্দশার বিস্তীর্ণ বিবরণ শুনিয়া শারদার চক্ষে জল আসিল। সে চক্ষু মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর-মশায় কি আমার সোয়ামীর কোনও খবর জানেন ?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "মাধব ? হু' জানি তার কথা।"

বলিলেন, এক মাস পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী মহাশয় যাত্রী সংগ্রহ করিতে মাধবের গ্রামে গিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন মাধব ভয়ানক অসুস্থ। প্লীহাজ্বরে সে ভুগিয়া ভুগিয়া ভয়ানক শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বাঁচিবার সম্ভাবনা অল্প ! এতদিন আছে কি নাই বলা যায় না।

হঠাৎ শারদা এমন একটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল যে চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলেন।

চীৎকার করিয়া শারদা বলিল, "হায়, হায়, হায়, হায়, কি সর্ব্বনাশ ক'রলাম আমি ?—সব খেলাম, সব খেলাম ! পুত্র খেলাম, স্বামী খেলাম, সব খেলাম ! হায় রে পোড়া কপাল আমার !" বলিয়া সে মেঝের উপর দমাদম মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

চক্রবর্ত্তী "হা হা" করিয়া অগ্রসর হইয়া তাকে ধরিলেন।

ক্রমে অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া শারদা বলিল, "ঠাকুর, আমাকে আজই দেশে নিয়ে যেতে পারবেন ?"

চক্রবর্ত্তী বলিল, তাঁর দেশে ফিরিতে এখনও আট দশ দিন বিলম্ব আছে।

শারদা কাতরভাবে তাঁকে অনুনয় করিল, পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিল—তাঁকে একশত টাকা পারি-শ্রমিক দিতে চাহিল।

চক্রবর্ত্তী ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিবার জন্য একটু সময় লইয়া বাহিরে গেলেন।

শারদা উঠিয়া অধিকারীর কাছে গিয়া তার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "প্রভু, আপনি অনেক দয়া ক'রেছেন, আমায় একটা ভিক্ষা আজ দেবেন।"

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অধিকারী শারদাকে দুই হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, "আরে, কি ? কি ? কি হ'য়েছে ?"

শারদা ভিক্ষা করিল সে চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেশে যাইবে।

স্বীকার করা ছাড়া অধিকারীর আর উপায় ছিল না।

চক্রবর্ত্তী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন তিনি যাইতে প্রস্তুত আছেন। যাত্রীদল এখানে সাত দিন থাকিবে। ইতিমধ্যে তিনি শারদাকে পৌঁছাইয়া ফিরিবেন, এই বন্দোবস্ত তিনি করিয়াছেন।

শারদা তার সঞ্চিত টাকা লইয়া অবিলম্বে যাত্রার উদ্যোগ করিল। একটি দাসী সঙ্গে লইবার জন্য অধিকারী অনেক অনুনয় করিয়াছিল, শারদা স্বীকৃত হইল না।

যাইবার পূর্ব্বে সে চক্রবর্ত্তীকে দিয়া গোপনে বাজার হইতে দুইজোড়া পেড়ে শাড়ী, শাঁখা ও এককৌটা সিন্দূর কিনিয়া লইল।

নৌকায় উঠিয়াই শারদা তার বৈরাগিনী বেশ ত্যাগ করিয়া শাড়ী শাঁখা পরিল, সিঁথিতে খুব মোটা করিয়া সিন্দূর পরিল, মনে মনে বলিল "ঠাকুর, আমার এ সিন্দূর যেন অক্ষয় হয়—স্বামীকে যেন বাঁচাইতে পারি !"

চক্রবর্ত্তীর পায়ের কাছে এক শত টাকা রাখিয়া সে বলিল "ঠাকুর, আমার যে দশা দেখলেন আপনি দয়া ক'রে দেশে প্রকাশ ক'রবেন না।"

চক্রবর্ত্তী স্বীকার করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, প্রকাশ তিনি করিবেন না, কিন্তু তাঁর বন্ধু নীলমাধব ও গোকুল—ও রমেশ—এবং সতীশ—আর, গোবিন্দ, আর হরেকৃষ্ণ—এদের কাছে গোপনে না বলিলে চলিবে না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অতীতের ঐশ্বর্য্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(মিশরের 'ম্যমি')

মৃত ব্যক্তির শবদেহ দাহ না ক'রে প্রাচীন মিশরবাসীরা সযত্নে উহা রক্ষা ক'রত। কালের সর্ব্ব-বিধ্বংসী প্রভাবকে তুচ্ছ ক'রে ঐ মৃতদেহগুলি কি ক'রে যে শত শত বৎসর অবিকৃত থাকত এটা কারুর না জানা থাকায় মিশরের শব চিরদিন বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন ক'রেছে।

য়ুরোপ হ'তে যে প্রথম যাত্রী মিশরে পদার্পণ করেছিলেন তিনি সেই ইতিহাস-বিশ্রুত হেরোডোটাস্। তিনিই পৃথিবীর লোককে প্রথম জানিয়েছিলেন যে জগতে এমন একটি দেশ আছে যেখানে মানুষের জীবনান্ত হ'লেও তার দেহের বিনাশ ঘটে না! মিশরের এই শব রক্ষার ব্যাপারে হেরোডোটাস্ এত বেশী চমৎকৃত হয়েছিলেন যে তিনি এই 'ম্যমি' সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান ক'রে এ বিষয়ে বিশদ ভাবে লিখে রেখে গেছেন।

যে দেশের প্রতিভাশালী মানুষেরা জীবনকে জয় ক'রতে না পারলেও তার প্রাণহীন দেহটাকে অনন্তকাল ধ'রে রাখতে সক্ষম হ'য়েছিলেন, তাঁদের এই কীর্ত্তির সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় কেবলমাত্র অলস কৌতূহলের বশবর্ত্তী না হ'য়ে একটু শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে এ বিষয়ের অনুধাবন করা উচিত; কারণ, শিল্প বিজ্ঞানে যাঁদের অসামান্য দক্ষতার গুণেই আমরা আজ এমন সব মানুষের মুখ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ ক'রতে পেরেছি যাঁরা তিন চার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জগতে প্রাচীন সভ্যতার বিস্তার ও বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন ক'রে গেছলেন, তাঁদের সম্বন্ধে লঘুচিত্তে আলোচনা করা কোনোদিনই কর্ত্তব্য নয়।

মৃতদেহ রক্ষার এই যে বিস্ময়কর ব্যবস্থা প্রাচীন মিশরে প্রচলিত ছিল এ বিষয়ে যতই অনুসন্ধান করা যায় ততই নানা দিক দিয়ে বহু আশ্চর্য্য ব্যাপার অবগত হ'তে পারা যায়। কেবল যে তিন হাজার বছর আগের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটেরা দেখতে কেমন ছিলেন এইটুকু কৌতূহল চরিতার্থ হওয়া এবং প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অভ্রান্ত সত্য পরিচয় জ্ঞাত হওয়াই এর চরম শিক্ষা—তা' নয়।
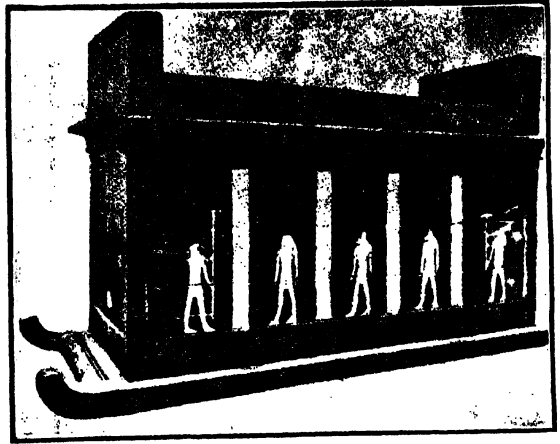
আইয়ুআর শবাধার (আইয়ুআ রাণী তাইয়ীর পিতা। তাইয়ী ফ্যারো তৃতীয় আমেনহোটেপের পত্নী। এই শবাধারটি মূল্যবান কাষ্ঠনির্ম্মিত। কাঠের উপর গালার কারু-কার্য্য করা ও মিশরীয় চিত্রবর্ণে মৃতের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।)

শবদেহ সংরক্ষণের যে উপায় মিশর শিল্পীরা আবিষ্কার করেছিলেন তার পশ্চাতে ছিল প্রাচীন সভ্যতার উন্নত আদর্শ যুগোপযোগী শিল্প-বিজ্ঞানের অশেষ অভিজ্ঞতা; মিশরীয় কারুকলার চরমোৎকর্ষ, এবং মানুষের অন্তরের গভীর ধর্ম্ম বিশ্বাস। মিশরের যে শাস্ত্রবাক্য সেদিন এই
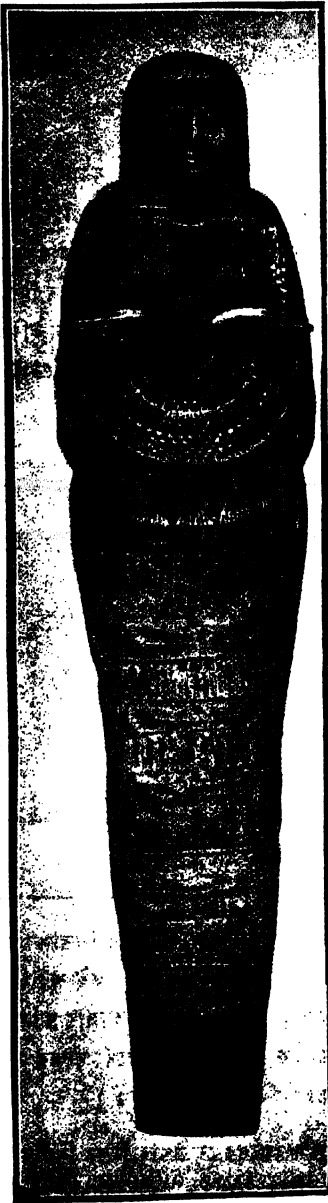
ম্যমির সুরঞ্জিত বহিরাবরণ (মিশর দেবতা 'আমন-রা'র জনৈক মহিলা পূজারিণীর শবদেহ এর মধ্যে রক্ষিত আছে —খৃঃ পূঃ ১৬০০ শতাব্দীর শবপেটিকা)
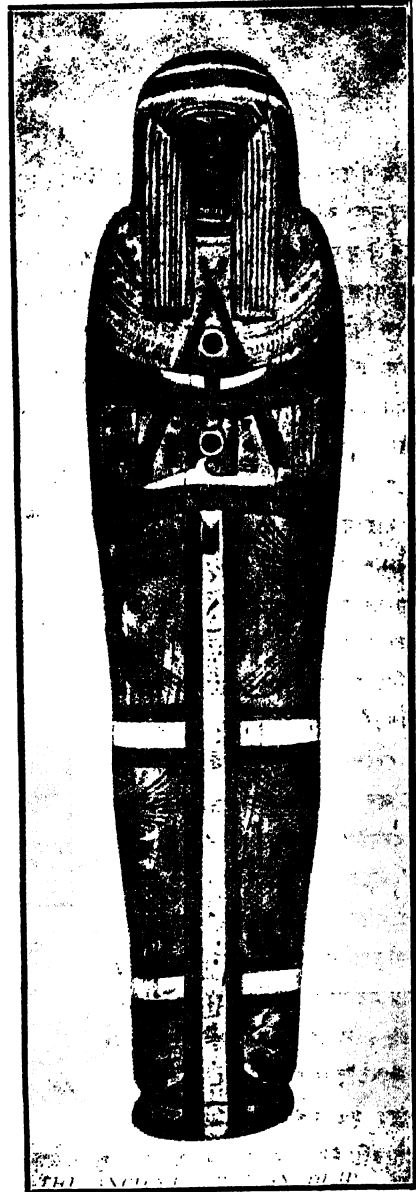
মৃতদেহের সুচিত্রিত আচ্ছাদন (আঁথ্-ফেন খেনসুর শবাচ্ছাদন, খৃঃপূঃ ১২০০ শতাব্দীর শবপেটিকা)

বাণী নির্দ্দেশ করেছিল যে "—মালিন্য মুক্ত হয়ে নির্মল ভব; মৃত্যুকে জয় করে অমৃত লভ'!" "অক্ষয় হও

অবিনশ্বর হও"—এরও উদ্ভব হয়েছে ঐ একই উৎস হ'তে। প্রাচীন মিশর মানুষের অমৃতত্বের সন্ধান পেয়েছিল এই

বিচিত্র শবাধার (হুয়েন-আমেনের শবাধার খৃঃ পূঃ ৮০০ শতাব্দীর ম্যাম)
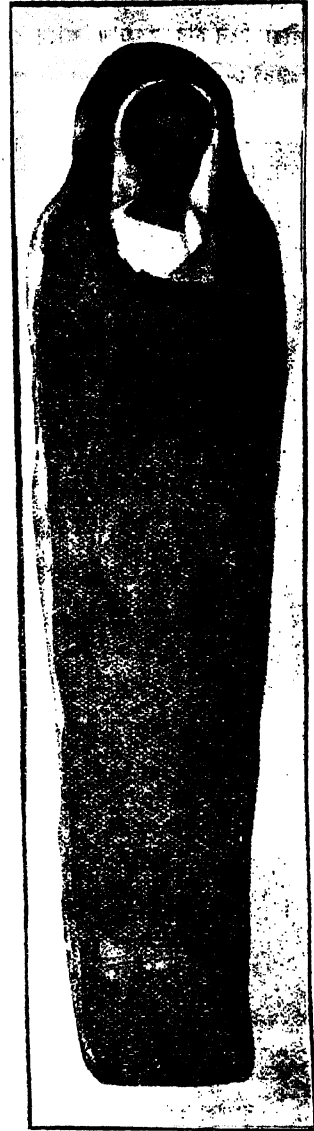
গ্রীকের ম্যমি (আর্টেমিডোয়াস্ নামক জনৈক গ্রীকের মৃতদেহ রক্ষিত হয়েছে এর মধ্যে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ফেয়ুমে এই মৃতদেহ সমাহৃত হয়।)

দেহের অবিনশ্বরতার ভিতর দিয়েই। খৃষ্টান শবদেহ সমাহিত করবার সময় অধুনা সমাধিক্ষেত্রে যে অন্ত্যেষ্টি উপাসনা হয় তাতে ধর্ম্মযাজকেরা বাচনিক যে কথা বলেন মিশরবাসীরা তিন চার সহস্রাব্দ আগে সেটা কার্য্যত: করবার প্রচেষ্ট দেখিয়েছেন।

মৃতের প্রতিমূর্ত্তি (এই ভগ্ন প্রতিমূর্ত্তিটি কোনো সম্ভ্রান্ত মিশর-বংশীয়া তরুণীর। এঁর শবাধারের সঙ্গে সমাধিমন্দিরে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে রাখা হয়েছিল।)

কারুশিল্পের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রথমেই শবাধার সম্পর্কে। মৃতদেহ রক্ষাকল্পে যে প্রস্তর মৃত্তিকা বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত কফিন নির্ম্মাণ ক'রতে হয়, দারু শিল্পের উন্নতির বীজ সেইখানেই প্রথম উপ্ত হয়েছিল। তারপর সেই শবাধার সমাহিত করবার জন্ম পাষাণ ভেদ করে যে সমাধিকক্ষ প্রস্তুত করা হ'ত মিশরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্প তারই অবশ্যম্ভাবী ক্রমিক পরিণতি। কারণ সমাধি-কক্ষে কেবলমাত্র শবাধারই রাখা হতনা, মৃতব্যক্তির প্রস্তর নির্ম্মিত একটি প্রতিমূর্ত্তিও সযত্নে স্থাপিত করা হত। সুতরাং সে সমাধিকক্ষ কেবল শবরক্ষার একটি গহ্বরমাত্র নয়, সে একটি প্রশস্ত মন্দির।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে মিশরের এই মৃতদেহকে 'ম্যমি' ক'রে সযত্নে রক্ষা করার মধ্যে কেবলমাত্র যে মানুষের দেহের প্রতি সযত্ন মমত্ব-বোধের পরিচয়ই ফুটে উঠেছে তাই নয়—সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান যে শিল্প-কলা—স্থাপত্য ভাস্কর্য্য এবং জাতির উচ্চতর ধর্ম্মজ্ঞান—এ সমস্ত বিষয়ও এই 'ম্যমি'র সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত রয়েছে। যাই হোক, ঐতিহাসিকদের চক্ষে একটা প্রাচীন জাতির ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও তাদের শিল্প-কলার পরিচয় ইত্যাদির দিক থেকে 'ম্যমি'র যতই সার্থকতা থাকুক, তথাপি এটা স্বীকার করতেই হবে যে এই মৃতদেহ রক্ষা করার মত একটা অদ্ভুত ও ভয়াবহ ব্যাপার সেখানে কেন যে প্রচলিত ছিল এটা জানবার কৌতূহল হওয়া এ যুগের মানুষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

মৃতদেহ রক্ষা করবার জন্ম মৃতের পেট থেকে বুক পর্য্যন্ত চিরে তার সমস্ত নাড়ীভুঁড়ি যকৃৎ ফুসফুস্ হৃদপিণ্ড প্রভৃতি টেনে বার ক'রে রাখা হ'ত। ঠিক যে উপায়ে আজকাল যাদুঘরে মৃত সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি জীবজন্তুর প্রাণহীন দেহটাকে সযত্নে রক্ষা করা হয়; ঠিক তেমনি

করেই একসময়ে মিশরে মানুষের দেহটাকে রাখবার জন্য তার পেট চিরে সমস্ত নাড়ীভুঁড়ি বার ক'রে রাখা হ'ত, কিন্তু ফেলে দেওয়া হ'তনা। মৃত প্রিয়জনের দেহকে এমন ভাবে ছিন্ন-বিছিন্ন করা এ যুগের কোনো মানুষেরই শেখেনি। দীর্ঘকাল ধরে নানাপ্রকারে চেষ্টা ক'রতে ক'রতে তবে তাঁরা এ কাজে সিদ্ধিলাভ ক'রতে পেরেছিলেন। মৃতের দেহকে তাঁরা চিরদিনই সম্মান ও শ্রদ্ধার বস্তু বলে মনে ক'রতেন। তাঁদের এই মনোভাব

শবপেটিকা (প্রথম) আইয়ুয়ার শবাধারের মধ্যে এই কারুকার্য্য-খচিত শবপেটিকা ছিল। পর পর তিনটি শবপেটিকা পাওয়া গেছে। শেষ পেটিকার মধ্যে শবদেহ রক্ষিত ছিল। প্রত্যেক শবপেটিকার গঠন ম্যমির আকার।
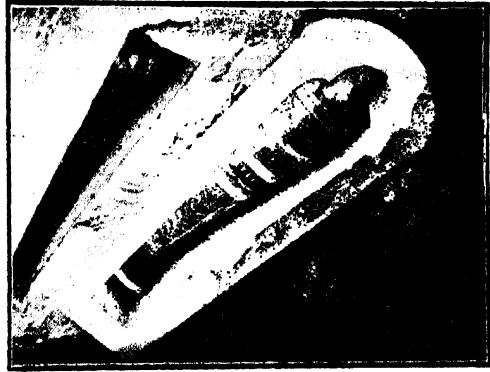
ম্যমি-আকারে শবাধার (এই প্রস্তর নির্ম্মিত শবাধারগুলিও ম্যমির আকারে তৈরি করা হত। এর মধ্যে যে-রঙীন ও চিত্রিত শবপেটিকা দেখা যাচ্ছে তার ভিতর মৃতের দেহ রক্ষিত আছে।)

লুক্কায়িত শবাধার (কবর-চোরেদের উৎপাতের ভয়ে এই শবাধারগুলি শৈল গুহার অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। দু'হাজার বছর পরে এর সন্ধান পাওয়া গেছে।)

ভাল লাগবেনা হয়ত', কিন্তু, এই বিশ্রী ব্যাপার কেন যে তারা ক'রতো এটা বুঝতে হ'লে মিশরীদের এ সম্বন্ধে কি মনোভাব সেটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। এই দেহরক্ষা করবার কৌশল মিশরীরা এক দিনে

ক্রমে শবদেহকে দেববিগ্রহতুল্য পূজা ক'রে তুলেছিল। তাদের ধর্ম্মবিশ্বাস যে, দেহ যতদিন থাকবে—জীবনও ততদিন নিঃশেষ হবেনা। সেই জন্যই তাঁদের মধ্যে মৃতদেহরক্ষার এই বিপুল প্রয়াস দেখা দিয়েছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা এ চেষ্টায় সফলকাম হ'তে পেরেছিলেন। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য যে কাজ করা অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন ব'লে তাঁরা মনে ক'রেছিলেন সে কাজ বীভৎস হ'লেও তাঁরা তা' করতে কুণ্ঠিত হতেন না। যেমন চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য ও অপঘাত মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্য শবব্যবচ্ছেদ আজকাল অবশ্য প্রয়োজনীয় ব'লে মনে হওয়ায় সেটা ক'রতে মানুষের আর কোনো কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ-বোধ হয় না, মিশরীরাও তেমনি দেহরক্ষার প্রয়োজনে শবদেহকে ব্যবচ্ছিন্ন করায় ক্রমে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছিল।

শবপেটিকা (দ্বিতীয়)

শবপেটিকা (তৃতীয়)

মিশরীদের অনুকরণে এই শবদেহ রক্ষার প্রথা ক্রমে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রচলিত হয়েছিল দেখা যায়। কিন্তু মিশরীদের ন্যায় এ কাজে আর কোনো দেশ সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জ্জন ক'রতে পারেনি। য়ুরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, ওশেনীয়া, আমেরিকা প্রভৃতি সকল দেশেরই কোনো না কোনা অংশে এই শবদেহ রক্ষার প্রচেষ্টা প্রচলিত হয়েছিল দেখে এটা বেশ বোঝা যায় যে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার প্রভাব একদিন সমস্ত পৃথিবীতেই বিস্তৃত হ'য়েছিল।

মিশরবাসীরা কবে এবং কেমন ক'রে এই শবদেহ রক্ষার উপায় আবিষ্কার ক'রেছিল সে সম্বন্ধে জানতে হ'লে আমাদের চার পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ফিরে যেতে হবে, অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারতের যুগেরও আগে। প্রাচীন মিশরের সভ্যতার আলোক তখন সবেমাত্র জগতের অন্ধকার দূর করবার জন্য পৃথিবীতে প্রসারিত হ'চ্ছে। মিশর সেদিন ক্ষেত্র কর্ষণ ক'রে শস্য উৎপাদন ক'রতে শিখেছে; পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ ক'রে জলাভাব দূর ক'রতে পেরেছে। গৃহপালিত পশুর ব্যবহার জেনেছে; মৃৎপাত্র ও প্রস্তর শিল্পে অভিজ্ঞ হ'য়ে উ'ঠেছে। বস্ত্রবয়ণ ও রঞ্জন কার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করেছে। ধাতুর সন্ধান পেয়েছে ও তার মূল্য নির্দ্ধারণ ক'রেছে। স্বর্ণকে আজ সমস্ত পৃথিবী যে মর্য্যাদার সঙ্গে গ্রহণ ক'রেছে মিশরই প্রথম এ ধাতুকে সেই মর্য্যাদা দিয়েছিল। মিশরের সভ্যতা সেদিন বিশ্বের আদর্শ হ'য়ে উঠেছিল।

সেই পুরাকাল থেকেই শবদেহ সমাহিত করবার জন্য মিশরে সমাধি-গুহা খনন ও তন্মধ্যে শব-স্থাপনের শাস্ত্রানুমোদিত বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সমাধিকক্ষে শবদেহের সঙ্গে মৃতের যা কিছু পার্থিব প্রিয় বস্তু সমস্ত সংগ্রহ ক'রে দেওয়া হ'ত এবং পরলোকে যাত্রা-পথে তার যা কিছু প্রয়োজন হ'তে পারে সেগুলিও সযত্নে সংরক্ষিত হ'ত। মৃতের সঙ্গে এই যে সব মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী দেওয়া হ'ত এইগুলি অপহরণ ক'রবার লোভে

মিশরে কবর-চোরেরও প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। তারাই প্রথম পুরাতন কবর খনন ক'রে জিনিসপত্র অপহরণ ক'রতে গিয়ে সমাহিত ব্যক্তির মৃতদেহ ভূগর্ভে অবিকৃত রয়েছে দেখতে পায়। মিশরের প্রখর রৌদ্রতপ্ত বালুকাময় লোনা মৃত্তিকায় প্রোথিত থাকায় মৃতদেহগুলি পচিয়া বিকৃত হয় না, মাংস চর্ম্ম নখ চুল এমন কি চক্ষু দুটি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে।

এই সন্ধান অবগত হবার পর থেকেই সম্ভবতঃ মিশরীদের মাথায় মৃতদেহ রক্ষা করবার কল্পনা উদয় হয়েছিল এবং তাদের মনে এই ধারণাও বদ্ধমূল হ'য়েছিল যে মানুষের প্রাণহীন দেহটিকে ধ'রে রাখতে পারলে মৃতের জাগতিক অস্তিত্বও দীর্ঘতর ক'রে তোলা যায়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়েই তারা শবদেহ রক্ষা করবার জন্য বিবিধ আয়োজন সুরু করেছিল। প্রথমে শব রক্ষার জন্য শবাধার প্রস্তুত হল; তারপর শবাধার রাখবার জন্য ভূগর্ভে কক্ষ নির্ম্মাণ করা হ'ল। শবের সঙ্গে প্রদত্ত দ্রব্যসম্ভারের সংখ্যা ক্রমে যতই বাড়তে লাগল সমাধি-কক্ষের আয়তন ও সংখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে আরম্ভ হল। ক্রমে সমাধিগর্ভ সমাধি মন্দিরে পরিণত হ'ল এবং সে মন্দির উচ্চ হ'তে উচ্চতর হ'তে হ'তে শেষে পীরামিডের আকার ধারণ করলে!

শবপেটিকা ও তন্মধ্যস্থ শবদেহ (বস্ত্রাবৃত)

শিশুদের মমি (এ দুটি ফোয়ুমে প্রাপ্ত গ্রীক্‌-শিশুর ম্যামি)

কিন্তু, ভূগর্ভ হ'তে শবদেহ যখন কাষ্ঠ, মৃত্তিকা বা প্রস্তর-নির্ম্মিত শবাধারে রাখা সুরু হ'ল তখন দেখা গেল শবদেহ আর অবিকৃত থাকচে না, পচতে ও গলে যেতে সুরু হয়েছে। সাধারণ কবরের মধ্যে তপ্ত বালুকাময় লোনা মৃত্তিকার সংস্পর্শে যে মৃতদেহ একটুও নষ্ট হতনা, মূল্যবান আধারে ব্যয়বহুল সমাধি-কক্ষের মধ্যে বহুযত্নে তা' রাখা সত্ত্বেও শবদেহ বিগলিত হ'য়ে পড়েছে। তখন নানা কৃত্রিম উপায়ে সেই শবদেহ অবিকৃত রাখবার চেষ্টা চলতে লাগ্‌ল। ক্ষারমাটি, লবণ, ধুনা বা রজন প্রভৃতি নানা দ্রব্য শবদেহে লেপন ক'রে পরীক্ষা আরম্ভ হ'ল। রজনের বা ধুনার সংস্পর্শে শবদেহ অবিকৃত থাকে জেনে রজন বা ধুনার ভক্ত হয়ে উঠলো মিশরীরা। আয়ুর্দেবতা অশিরিসের ন্যায়—যে গাছের আটা থেকে রজন বা ধুনা পাওয়া যায়, সে গাছের পূজাও সুরু হ'য়ে গেল। সে গাছ জীবনদায়ক ও আয়ুবৃদ্ধিকারক বলে পরিগণিত হ'ল।

আয়ুদেবতা অসিরিসের স্থায় মানুষও যাতে অমর হতে পারে অর্থাৎ চিরঞ্জীব হ'তে পারে এই উদ্দেশ্য থেকেই মিশরে 'ম্যমি'র উৎপত্তি হয়েছে এবং তিন হাজার বছর ধরে এই লক্ষ্য নিয়েই তারা মৃতদেহ রক্ষা করে এসেছে। লিন্‌কন্-ইন্ ও লণ্ডনের রয়েল কলেজ অফ সার্জ্জন্‌সের যাদুঘরে দুটি খুব প্রাচীন ম্যমি রক্ষিত মাথা এবং মুখটি রক্ষা করবার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছিল বলে বোঝা যায়। কিন্তু এত যত্ন সত্ত্বেও এ মৃতদেহটি অবিকৃত নেই। ব্যাণ্ডেজের কতকাংশ খুলে দেখা গেছে ভিতরে শুধু অস্থি কঙ্কাল! সুতরাং এটিকে ঠিক আসল 'ম্যমি' বলা চলে না। তবে ব্যাণ্ডেজের একেবারে শেষ পরদা অর্থাৎ যে স্তরের ফিতে একেবারে
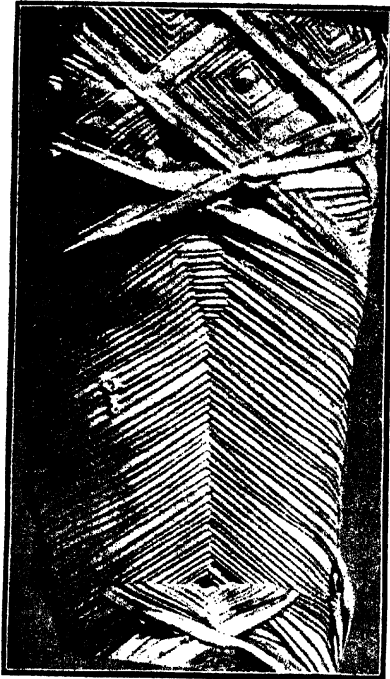
ম্যমির বাঁধন (শবদেহ ফিতের মত কাপড়ে আপাদমস্তক ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রাখা হয়।)

ম্যমির বাঁধন (ভিন্ন প্রকার) (এ দুটি আগের মত একেবারে বুনোট বাঁধন নয়। বাদামী ঘর ছেড়ে বাঁধন দেওয়া হয়েছে। একটির প্রত্যেক বাদামী ঘরের মাঝখানে সোণালী তবক মারা আছে—অপরটিতে গিল্‌টির বোতাম আঁটা।)

আছে। একটি ১৮৯২ সালে মেছুম পীরামিডের নিকট থেকে অধ্যাপক ফ্লিণ্ডার্স পেট্রী সংগ্রহ করে এনেছিলেন এবং অপরটি শাকারা থেকে শ্রীযুক্ত জে. ই, কুইবেল সংগ্রহ করেছিলেন। এই দুটি ম্যমি পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, সাকারায় প্রাপ্ত ম্যমিটি খৃঃ পূর্ব্ব তিন হাজার বৎসর আগের এবং মেছুমের ম্যমিটি খৃঃ পূর্ব্ব ২৭৫০ থেকে ২৬২৫ বৎসরের মধ্যে প্রস্তুত হয়েছে। শাকারার ম্যমিটির আপাদ-মস্তক এমন ভাবে ডাক্তারী ব্যাণ্ডেজের মত ফিতে জড়িয়ে বাঁধা, যাতে মৃতের আকৃতি একেবারে অটুট থাকে। মৃত ব্যক্তির গাত্র চর্ম্মের উপর ছিল তাতে যে-ছোপ ধরেছে সেই ফিতে পরীক্ষা ক'রে জানা গেছে যে সুগন্ধি দ্রব্য লেপন ক'রে দেহ রক্ষা করবার চেষ্টা করা হ'য়েছিল, কিন্তু, সে চেষ্টা সফল হয়নি। অথচ, মেছুমের

যে 'ম্যামিটি' সেটি কিছুমাত্র বিকৃত হয়নি। সমস্ত মানুষটি একেবারে অক্ষুণ্ণভাবে বজায় আছে। এই মৃতদেহটি রক্ষা করবার প্রয়াস সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে। সুতরাং এই দুটি 'ম্যামি' থেকে আমরা এই কথাটা জানতে পারছি যে খৃঃ পূর্ব্ব তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেও শবদেহ রক্ষার চেষ্টায় মিশরীরা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হ'তে পারেনি, কিন্তু তার তিন চার শত বৎসর পরেই তারা এ বিষয়ে অদ্ভুত দক্ষতা লাভ ক'রতে পেরেছিল।

রজনের আঠা-মাখা আবরণের নীচেয় মৃতের দেহ একেবারে অক্ষত অবিনশ্বর হয়ে বিদ্যমান রয়েছে এবং বর্ত্তমান জগতের বিস্ময় উৎপাদন ক'রছে।

এই যে মৃত-দেহ রজনের আটা-মাখানো ব্যাণ্ডেজে বেঁধে রাখা হ'ত এর দুটি উদ্দেশ্য বুঝতে পারা যায়। প্রথম—শব অবিকৃত থাকবে বলে, দ্বিতীয়—মৃতের শরীরের একটি অন্তিম প্রতিচ্ছবি রাখা। গোড়ায় চেষ্টা হয়েছিল যাতে এই 'ম্যামিটিকেই' মৃতের প্রতিমূর্ত্তি ক'রে

মিশরের অন্ত্যেষ্টি (মৃতদেহকে ৭০ দিন সুরভি আরকে ভিজিয়ে রাখবার পর তুলে সুগন্ধী আঠায় সিক্ত ফিতের মত কাপড়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে 'ম্যামি'তে পরিণত করা হচ্ছে।)

মেতুমের 'ম্যামিতে যে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো আছে সেগুলি রজনের আঠায় ভিজিয়ে আঁটা এবং এমন সুকৌশলে জড়ানো যে উপর থেকে মৃত ব্যক্তির আকৃতি অবিকল চেনা যায়। মুখখানি এত যত্নে আবৃত করা হ'য়েছে যাতে জীবন্ত মুখের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য না থাকে। গোঁফ চুল সমস্ত হুবহু বোঝাবার জন্য সবুজ ও মেটে রং মিশিয়ে এঁকে দেওয়া হয়েছে, এমন কি চোখের পাতা পল্লব মণি ও ভ্রূ দুটি পর্য্যন্ত জীবন্তের মত ক'রে রেখেছে। তোলা যায়। কিন্তু, যখন দেখা গেল যে সেটা সম্ভব নয়, তখন কাঠের পাথরের কিম্বা চুণের একটি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে সেটি আবার ঠিক মৃত ব্যক্তির চেহারার মত রং ক'রে এবং তার বস্ত্র ও অস্ত্রাদিতে সজ্জিত ক'রে সমাধিকক্ষে শবের সঙ্গে স্থাপিত করা হ'ত। এই মূর্ত্তি গড়ার পশ্চাতে ছিল মিশরীদের নব জন্ম বা জন্মান্তরে নবজীবনের উপর বিশ্বাস। কারণ এই মূর্ত্তি যারা নির্ম্মাণ করে দিত মিশরীরা তাদের নাম দিয়েছিল 'পুনর্জীবক'

ভাস্কর্য্যকে তারা বলত 'নবসৃষ্টি'! মূর্ত্তি নির্ম্মাণকে তারা মনে করত' "নবজীবন দান!"

মিশরপতি মেনটুহোটেপ্ যে পীরামিড নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন তারই ধ্বংসাবশেষের ভিতর হ'তে ফ্যারোয়ার যে ছয় রাণী ও এক রাজপুত্রের 'ম্যমি' পাওয়া গেছে সেগুলি পরীক্ষা ক'রে জানা গেছে যে এ পর্য্যন্ত যে উপায়ে মিশরে শবদেহ রক্ষিত হচ্ছিল এগুলি সে উপায় রক্ষা করা হয়নি। এই ছয় রাণী ও কুমারের

মিশরাধিপতি ফ্যারো প্রথম শেটীর মৃতদেহ

ম্যমিরথ ও মৃতদেহ (প্রথম শেটী)

টোটেসমে মিশরের চতুর্থ ফ্যারো এবং এক রাণীর মৃতদেহের ম্যমি

মৃত-দেহ সম্পূর্ণ এক বিভিন্ন প্রথায় অবিকৃত রাখা হয়েছে। তাছাড়া এই মৃত-দেহগুলির আর একটি বিশেষত্ব হ'চ্ছে এর মধ্যে দুটি রাণীর অঙ্গে উল্কী চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেছে। মিশরে ইতিপূর্ব্বে আর কোনো শবের দেহে উল্কী চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়নি; সুতরাং, অনুমান করা যেতে পারে যে উল্কী-প্রসাধন-প্রথা এই সময় থেকেই প্রথম মিশরে প্রচলিত হয়েছিল। এ প্রায় হেরোডোটাস্ মিশরে যাবার ষোলো শ' বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা।

শবদেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত রাখবার কৌশল মিশর সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উন্নত রূপে আয়ত্ত করতে পেরেছিল খৃঃ পূর্ব্ব দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে। এই সময় মিশরের অধিকারে এসেছিল প্যালেষ্টাইন, সিরীয়া, পূর্ব্ব আফ্রিকা, আরব প্রভৃতি দেশ, যেখান থেকে প্রচুর ধূনা গুগ্গুল্ রজন, সুগন্ধি নির্য্যাস, আবলুশ্ কাষ্ঠ ইত্যাদি পাওয়া যেতো। শবদেহ রক্ষার জন্য এ সকল একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল তাদের। কাজেই শবদেহকে সুগন্ধি নির্য্যাসে প্রলিপ্ত ক'রে কাষ্ঠাধারের মধ্যে রক্ষণ করার প্রণালীটা বিজ্ঞান ও কলা হিসাবে এ সময় প্রভূত উন্নতি লাভে সমর্থ হয়েছিল। এর পরও এ ব্যাপারের আরও বেশী ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া গেছে চারজন টোটেমসের, দ্বিতীয় আমেনহোটেপ্, অয়ুআ, তুয়া,—রাজ্ঞী তাইয়ীর পিতামাতা প্রভৃতির

ম্যমিতে। আবার, আরও উৎকৃষ্টতর মামি পাওয়া গেছে ফ্যারো প্রথম শেটী ও দ্বিতীয় রামাসেশ্ প্রভৃতির শবাধারে। এ প্রায় খৃঃ পূঃ সহস্র বৎসরের কিঞ্চিদধিক পূর্ব্বে।

এরপর মিশরে কিছুদিন ভীষণ অরাজকতা চলেছিল। অর্থাভাব, অন্নাভাব এবং বেকার সংখ্যা বেড়ে ওঠায় চারিদিকে চুরি ডাকাতি লুঠ ও রাহাজানি সুরু হয়েছিল। এই সময় অধিকাংশ ফ্যারোদের সমাধি মন্দির ও শবাধার লুঠ হয়েছিল। কারণ পূর্ব্বেই বলেছি যে মূল্যবান শবাধারের সঙ্গে বহুমূল্য আসবাবপত্র মণি মাণিক্য স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি দেওয়া হত। সম্প্রতি টুটেনখামেনের যে সমাধি আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে এই ঐশ্বর্য্যের কতক নিদর্শন পাওয়া যায়। কারণ টুটেনখামেনের সময়
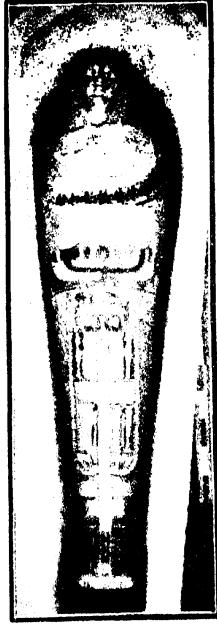
ম্যমি আকারে শবপেটীকা

আইয়ুআর মৃত-দেহের মুখ

মিশর নৃপতিদের ভগ্নদশা উপস্থিত হয়েছে। সেই অবস্থাতেও যদি তাঁর সমাধি-কক্ষে এত ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ হ'তে পেরে থাকে তাহ'লে প্রবল পরাক্রান্ত ফ্যারো তৃতীয় টোটমেশ, তৃতীয় আমেন হোটেপ্, প্রথম শেটী, এবং মহাবল র‍্যামাশেসের কবর—যাদের পদতলে তদানীন্তন সমস্ত সভ্য জগতের সকল সম্পদ লুটিয়ে পড়েছিল,

ম্যমির চরণ-যুগল (জনৈক মৃতা মিশর তরুণীর সালঙ্কারা পাদপদ্ম)

তাদের সমাধি কক্ষে না জানি আরও কত মহামূল্য দ্রব্যসম্ভারই না ছিল। যাইহোক্ এই লুঠ তরাজ ও অরাজকতা বন্ধ হয়ে যখন মিশরে আবার শান্তি স্থাপিত
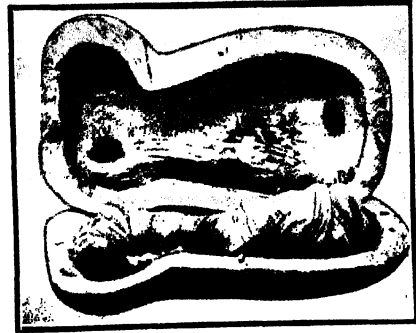
দেহাংশের ম্যমি (সম্ভবতঃ মৃতের দেহ পাওয়া যায় নি, বন্য পশুর আক্রমণে মৃত্যু হয়েছিল। যেটুকু দেহাংশ পাওয়া গেছল তাই-ই ম্যমি করে রাখা হয়েছে।)

হ'ল তখন এই সব অপহৃত রাজশবের অনুসন্ধান চলতে লাগলো এবং বহু চেষ্টায় কতক কতক উদ্ধারও হ'ল; কিন্তু

শবের গাত্র হ'তে মূল্যবান আচ্ছাদন খুলে নেওয়ার ফলে এবং শবদেহ অযত্নে ফেলে রাখার জন্য ফ্যারোদের ম্যমি-গুলির অধিকাংশই তখন আর অক্ষত অবস্থায় ছিলনা, কাজেই সেগুলি আবার পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা হয়েছিল; এবং আর যাতে চুরি না হয় এজন্য সুদৃঢ় শবাধারে রাখা হয়েছিল।

এই সব বিনষ্ট 'ম্যমি'গুলিকে পুনর্গঠিত করবার সময় যে প্রথা অবলম্বন করা হয়েছিল তা' মিশরে শবদেহ রক্ষার জন্য প্রচলিত কোনো ব্যবস্থার সঙ্গেই মেলেনা। সদ্যমৃতের দেহ যে সুরভি নির্য্যাসে বা সুগন্ধ আরকে অভিষিক্ত করে নিয়ে চিরস্থায়ী করবার চেষ্টা করা হ'ত, বরং তাদের প্রতিমূর্ত্তি বলা যায়। শেষের দিকে মিশরে অনেক সদ্যমৃতের দেহও এইভাবে সংস্কৃত ক'রে রাখা হত।

পূর্ব্বেই ব'লেছি মৃতদেহ রক্ষা করবার পূর্ব্বে তার পেট থেকে বুক পর্য্যন্ত চিরে নাড়ী ভুঁড়ি প্রভৃতি বার ক'রে ফেলা হ'ত; কিন্তু, সেগুলি নষ্ট করা হতনা। পৃথক পৃথক কড়ির জারের মধ্যে সুগন্ধি আরকে ভিজিয়ে মৃতের শবের সঙ্গে সমাধি-কক্ষে রাখা হ'ত। পরে খৃষ্ট পূর্ব্ব সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে শবদেহ রক্ষার সুদীর্ঘ সাধনায় মিশর যখন পূর্ণ সিদ্ধিলাভ ক'রেছিল তখন এই ফুসফুস্ যকৃত পাকস্থলি অন্ত্র মূত্রাশয় প্রভৃতি শবদেহ চিরে

রাজ শবাধার (মিশরের ফ্যারো নৃপতি দ্বিতীয় আমেনহোটেপের শবাধার ও তন্মধ্যস্থ শবদেহ)

এই ক্ষত-বিক্ষত ও ধ্বংসোন্মুখ পুরাতন ম্যমিগুলিকে আর সে উপায়ে উদ্ধার করা সম্ভব নয় বুঝেই অন্ত্যেষ্টিকার পুরোহিতেরা শবদেহগুলির বিনষ্ট অংশ পুনর্গঠনের জন্য ছিন্নবস্ত্রখণ্ড ও কাদামাটি ব্যবহার করতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। নষ্ট চক্ষু পুনরুদ্ধারের আর কোনো উপায় না দেখে নকল চোখ বসিয়ে দিয়েছিলেন। নাক কান ঠোঁট প্রভৃতির জন্য মোমের ছাঁচ ব্যবহার ক'রেছিলেন। এবং শেষে মৃতের বর্ণানুসারে শবদেহে রং দিয়ে গাত্রচর্ম্ম সজীবের ন্যায় ক'রে তুলেছিলেন। সুতরাং এই সব পুনর্গঠিত 'ম্যমি'গুলিকে' আর মৃতের শবদেহ বলা চলেনা, বার ক'রে পরে সুরভি আরকে সেগুলিকে অবিনশ্বর ক'রে নিয়ে পুনরায় মৃতের শরীরের মধ্যে ভরে দেওয়া হ'ত; প্রত্যেকটিকে অবশ্য সযত্নে প্যাক করে করাতের গুঁড়োর সঙ্গে মৃতের দেহাভ্যন্তরে তুলে রাখা হ'ত।

কিন্তু, এই দেহরক্ষার ব্যাপারে এত বেশী হাঙ্গামা বা ল্যাটা অর্থাৎ এতরকম খুটিনাটি ও কূটকচালে কাজের ঝঞ্ঝাট, আর এত সময় নষ্ট ও অর্থব্যয় হয় যে ক্রমে লোকে আর অতটা পেরে উঠছিল না। কাজেই মিশরের এই বিস্ময়কর শব-সংরক্ষণ-শিল্পেরও ক্রমশঃ অবনতি ঘটতে সুরু হল। তখন দেহরক্ষার প্রতি তত মনোযোগ না

দিয়ে 'ম্যমির' বহিরাবরণ বা আচ্ছাদন-বস্ত্রের কারুকার্য্যের দিকেই অধিক লক্ষ্য পড়েছিল তাদের। গ্রীক্ ও রোমান অভিযানের সময় মিশরে এইরকম নানা বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত শবাধারে সুরঞ্জিত ও সুচিত্রিত বহিরাবরণে আচ্ছাদিত 'ম্যমি' একাধিক দেখা যেত। খৃষ্টান পাদ্রীরা অনেক চেষ্টা করেছিল মিশরের এই দেহ-রক্ষা করবার বর্ব্বর প্রথা বন্ধ ক'রতে। মিশর সেদিন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল তবু পাদ্রীদের আদেশ মানেনি। তাদের পৌরাণিক শবরক্ষার প্রথা তারা খৃষ্টান হয়েও পরিত্যাগ করেনি। তারপর যখন আরব আক্রমণে বিধ্বস্ত হ'য়ে সমস্ত মিশর ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রলে সেদিন কঠোর মুসলমান শাসনের প্রচণ্ড পীড়নে মিশরের দীর্ঘকালের এই পৌরাণিক অন্ত্যেষ্টি প্রথা—মিশর সভ্যতার এই বিশিষ্ট দান—'শবদেহ রক্ষা' একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেছল।

নষ্ট-নীড়

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

আমারই জ্যাঠ্‌তুতো বোন্। বয়স হয়েচে, কিন্তু বিশ্বাস হয় না, অর্থাৎ বয়সের চপলতা কিছুমাত্র নেই। ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে, তবুও শিশু। জন্মতারিখ খতিয়ে দেখ্‌তে গেলে দেখা যায়, ম্যাট্রিক পড়ার অনুপাতে বয়স কিছুমাত্র কম নয়, বরং বেশীই। দেহের অনুপাতেও বয়স অল্প দেখায় না। সমস্ত অঙ্গে প্রথম-যৌবনের চমক-লাগা ঢেউ। খুঁত যা আছে তা চোখেই পড়ে না। সমস্ত মুখে যে লাবণ্য, তা সচরাচর দেখা যায় না। বোন্ ব'লে বল্‌চি তা' নয়, বরং খাটো করেই বলচি। যাই হোক্, বোনের রূপবর্ণনা করা যখন নীতিবিরুদ্ধ, তখন সংক্ষেপে বলে রাখি, সুষমা সুন্দরী। রূপ, যৌবন, শিক্ষা, জন্মতারিখ—কোনোটাই তার শিশু-বয়সের স্বপক্ষে নয়, তবু বল্‌লাম শিশু। কেন, সেই কথাই বল্‌ব।

সুষমার বয়স হয়েচে, কিন্তু বিবাহের বয়স নয়। জ্যাঠামশায়ের মত গোঁড়া হিন্দুর সমাজেও কেন যে বল্‌লাম সুষমার বিয়ের বয়স হয় নাই, সে কথা বুঝিয়ে বলা দরকার। সুষমা বিবাহ-শিশু। বাল্যবয়সে বিয়েটা আমাদের দেশে নতুন নয়—হামেসাই ঘট্‌চে, সংসারও তাদের নিয়ে চল্‌চে। তার কারণ, আমাদের দেশে মেয়েদের বিবাহসংস্কার যেন জন্মগত। এইখানেই সুষমার সঙ্গে সাধারণের প্রভেদ, এইখানেই সে শিশু। জ্যাঠামশায় নির্ধন, কিন্তু অসামান্য পণ্ডিত। ইংরেজি সাহিত্য, সংস্কৃত ও দর্শনে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, যদিও বাইরে সে সংবাদ যায় না—তার কারণ তিনি সে বিষয়ে উদাসীন। মেয়েকে বাড়ীতে পড়িয়েচেন, ম্যাট্রিক দেবে-দেবে। জ্যাঠামশায়কে গোঁড়া হিন্দু বলেচি, কিন্তু তিনি ঠিক্ তা' ন'ন্। তিনি গোঁড়া সমাজের গতানুগতিক হিন্দু। হিন্দুর গোঁড়ামি তাঁর ছিল না, অথচ সমাজের গোঁড়ামিকে মনে মনে ভয় করতেন। সমাজধর্ম্ম সবই মানতেন, কিন্তু ছেলে-মেয়েদের ভুলেও কোন দিন, কখনো ও-সম্বন্ধে কোনো কথা বল্‌তেন না। ফলে, তা'রা এ সম্বন্ধে কিছু ভাব্‌ত না। এম্‌নি সব কারণে সুষমার পরিগঠন হয়েছিল যে উপাদানে তা দেশী মেয়েদের থেকে পৃথক্। বাঙ্গালী মেয়েদের বৌ-বৌ, পুতুল-খেলা প্রভৃতি থেকে সুরু করে কোনো সংস্কারই সে পায় নাই।

স্বভাবতঃই সুষমা অস্বাভাবিক গম্ভীর ও ধীর, অত্যন্ত চুপ্‌চাপ্, বিনয়ী, অসাধারণ সংযত, ভারী সাদাসিধে ও প্রখর বুদ্ধিমতী। সঙ্কোচ, জড়তা একেবারেই নেই। এক কথায়, সে যেন অস্বাভাবিক। সুষমাকে কখনো সশব্দে হাস্‌তে শুনেচি ব'লে মনে হয় না। তার স্বাভাবিক বিষণ্ণ মুখে সামান্য হাসি ধরা পড়ে না। সে ভাল কি মন্দ, এ কথা মনেই হয় না,—শুধু মনে হয় সে অনন্যসাধারণ।
হয় ত কোনো কাজে 'শান্তিনিকেতনে' বেড়াতে গেছি। ভাবলুম, কল্‌কাতা ফিরবার আগে একবার দেশের বাড়ীটা ঘুরে আসি, অন্ততঃ ঘণ্টাখানেকের জন্য। গ্রামের প্রান্তে স্কুলঘরের সাম্‌নে বড় মাঠ, চারি দিকে ধানের ক্ষেত, পাশে আমবাগান, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য। পৌছে

দেখি, সুষমা একা নির্ভয়ে পায়চারি কর্‌ছে। খোলা মাঠ, এক পাশে কোঁকড়-চুল সাঁওতালদের ছেলে বাঁশী বাজাচ্ছে, স্কুলের ক'টা দুরন্ত ছেলে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, আর গ্রামের ফক্কড় ছেলেরা সিগারেট-মুখে বসে গল্প করচে। সুষমার দৃক্‌পাত নেই। মনে হল যেন, যতদূর দেখা যায় কেবল সে—ই একা—এই ভাব। আমাকে দেখে যে আনন্দের ক্ষণপ্রভা খেলে গেল তা বুঝতে পারলুম, কিন্তু ভাবে বা ভাষায় তা প্রকাশ পেল না। পা ছুঁয়ে আমায় সেই মাঠের মধ্যে প্রণাম করে দাঁড়াল। একবার জিজ্ঞেস্ কর্‌লে না, আমি কোথা থেকে আর কী জন্যই বা অকস্মাৎ এখানে এলাম। বিস্ময়ই প্রকাশ করলে না। বল্‌লাম, "সুষি, তুই বুঝি প্রত্যহ বিকেলে এখানে বেড়াস্?" বল্‌লে, "হ্যাঁ দাদা"—বলে এমন ভাবে মুখের দিকে তাকালে যে সেখানে দাঁড়িয়ে গোবর্দ্ধন ন্যায়রত্নমশায়ের মুখেও নিষেধের কোনো ভাষা উচ্চারিত হ'তে পারে না। তাকে দেখলে, তার কোনো কিছুতেই নিষেধের কথা মনেও হয় না।

কিন্তু এই সুষমার বিয়ের জন্যই কিছু দিন যাবৎ জ্যেঠামশায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন; বলেন, বয়স হ'য়েচে। আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যদি পাত্র মেলে এই মর্ম্মে একদিন জ্যেঠামশায়ের পত্র পেলাম। আমি লিখ্‌লাম, সুষির বিয়ের বয়স হ'তে এখনো দশ বৎসর। জ্যেঠামশায় চটে গেলেন, লিখ্‌লেন, তোকে লেখাই আমার অন্যায় হয়েছিল,—তুই হলি 'বেহ্ম'। তিনি আমার মতামতের জন্য আমায় কখনো সাহেব, কখনো 'বেহ্ম' বলে পরিহাস করতেন। যাই হোক্, এবার উত্তরে দীর্ঘ চিঠি লিখে বস্‌লাম। লিখলাম্, শুধু যে সুষির বিয়ে বহু দেরীতে দেওয়া যায় তাই নয়, তার বিয়ে না দিলেও কোন ক্ষতি নেই। তাকে যতদূর জানি, তার মধ্যে সংযমের একটা অসীম শক্তি আছে। অকাল-বিবাহের পরিহাসের মধ্য দিয়ে সেটাকে ব্যর্থ হতে দেওয়া শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, নিছক মূর্খতা। অনেক এ'কথা সে'কথা লেখার পর, টলষ্টয় উদ্ধৃত করে লিখলাম, নারীত্ব একটা বিরাট জিনিষ; মাতৃত্বের সঙ্গে এর বিরোধ যদিই বা না বাধে, অন্ততঃ তাতেই যে এর একমাত্র বিকাশ নয়, সে কথা জোর গলায় বলা যায়। নারীকে পূর্ণা মহীয়সী তখনি বল্‌ব, যখন "...she regards virginity as the highest state, and does not, as at present, consider the highest state of a human being a shame and a disgrace." সব শেষে লিখ্‌লাম; আমি বিবাহ উঠিয়ে দিয়ে পৃথিবীটাকে moral gymnasium বানাতে আসি নাই। আমি শুধু বল্‌তে চাই, বিয়ে দাও ক্ষতি নাই, কিন্তু বিয়ে দিতেই হবে, এর কোন মানে হয় না। বিয়ে দেওয়ার জন্য এই হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। অন্ততঃ সুষির মত মেয়ের জন্য যে এ উন্মত্ততা শোভা পায় না, সে কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

উত্তরে জ্যেঠামশায় লিখলেন, বাবা, তোমার যুক্তির বিরুদ্ধে ঠিক যে কি বলা উচিত তা আমি ভেবে পাচ্ছি না। সবই বুঝি, তবু সমাজে যখন আছি তখন সমাজকে আমি ঠেকাতে পারব না, সত্যকে ঠেকালেও। তার ম্যাট্রিক দেওয়ার কথা লিখেচ; দেখি কতদূর কী হয়!—এ চিঠির আর আমি জবাব দিলাম না।

(২)

সুষমার বিয়ের জন্য আমার মতের প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং আমি যখন জ্যেঠামশায়ের চিঠি পেলাম যে তার বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেছে, এমন কি, নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপানোও হ'য়েছে এবং আমি যেন ৭ই অঘ্রাণ অবশ্য অবশ্য যাই, তখন বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্য হই নাই। সুষিকে অত্যন্ত স্নেহ করতাম বলেই যেতে হল। অধ্যাপনার কাজ দু'দিনের জন্য মুলতুবি রেখে ছুটি নিলাম।

শুনলাম, পাত্রটি বি-এ পাস ক'রে ডেপুটি হয়েচে এবং দেখতেও সুশ্রী। কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম। যাক্, মেয়েটা সুখী হতে পারবে। এমন কি পড়াশুনোও আরো কিছুদূর চল্‌তে পারে এমন আশাও হ'ল।

সুষমার সঙ্গে দেখা হ'ল। বাইরে থেকে তার কোনো পরিবর্ত্তন চোখে পড়ে না। কিন্তু আমার যেন মনে হ'ল, সে বলতে চায়, এ'র কোনো দরকার ছিল না। যাই হোক্, ঠাট্টা করে বল্‌লাম, কি রে পাগ্‌লি! এবার ত ডেপুটি-গিন্নি; আমাদের সঙ্গে কি আর কথা বল্‌বি?

সে বিষণ্ণ ভাবে হাস্‌লে। একবার চার দিকে চেয়ে বল্‌লে, দাদা, বহু দিনের স্বপ্ন ছিল, ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত-সাহিত্য; স্বপ্ন ছিল, তোমার মতো জীবন—কলেজের অধ্যাপক। তোমার বড় স্নেহের দান, John Masefield'এর কাব্যগ্রন্থ,—কত সাধ ক'রে কিনে দিয়েছিলে। কালও রাত্তিরে চোখের জল ফেলেচি, আর পড়েচি,

I must go down to the seas again,
to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship, and
a star to steer her by.

কিন্তু আজ সে সব জন্মের মত বাক্স-বন্দী করে রাখলাম। এ জীবনে তাদের সঙ্গে আর কখনো সাক্ষাৎ হবে না। সান্ত্বনার সুরে বল্‌লাম, সে কি রে! বিয়ের পরও ত কত মেয়ে বি-এ, এম-এ পাশ করচে। তুই ঘাব্‌ড়াস্ কেন? সে এবার অত্যন্ত কঁাদ্‌তে লাগ্‌ল। খানিক পরে কিছু শান্ত হ'য়ে বল্‌লে, সে হবার জো নেই, দাদা! Matric দেব বলে বাবা মত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, মত দিলেন না। ক্ষুব্ধ হ'য়ে চুপ্ করলাম। কিছু পরে বললাম, আরে তুই ভাবিস্ কেন? স্বয়ং ডেপুটি সায়েব তোর সহায়।—আমার ধারণা ছিল, একটা আধুনিক শিক্ষিত যুবকের কাছে অন্ততঃ এটুকু আশা করা যায়। সুবি কিন্তু ঘাড় নেড়ে বল্লে—তাঁরই অমত। এর পরে আর সান্ত্বনার ভাষাও খুঁজে পেলাম না। কাজেই ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করলাম।

বরের আসনে ধীরেনকে দেখে যেমন বিস্মিত তেম্নি পুলকিত হলাম। চার বছর একসঙ্গে সাহেবী কলেজে পড়েছি। মাত্র আজ বছর তিনেক ছাড়াছাড়ি। অনেক কথাই মনে পড়তে লাগ্‌ল। ধীরেন ও আমার বন্ধুত্ব খুবই নিবিড় ছিল। দুজনে কী না করেছি। কেমন করে সমাজ-সংস্কার করব, দেশের কাজ করব, অবিবাহিত-জীবন মহাত্মা গান্ধীর মত নৈতিকভাবে যাপন করব, এই সব রাত্রি জেগে চিন্তা করেচি। দুজনে মিলে টলষ্টয়কে গিলে খেয়েছি, আবার স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে কত বড় বড় 'স্কীম্' তৈরি করেচি। সেই ধীরেন দেখি দিব্যি ডেপুটিবাবু হয়ে বিয়ে করতে এসেচে। ধীরেন ও আমি হষ্টেলের মধ্যে নামকরা কালাপাহাড় ছিলাম,—কিছুই মান্‌তাম না, কোন নিষেধই না। দুইজনে 'বার্ণাড্ শ' আওড়াতাম আর বল্‌তাম,—"Construction cumbers the ground with institutions made by busy bodies. Destruction clears it and gives us breathing space and liberty." ভাঙবার মতলবে, নিষেধ অবহেলা করবার সঙ্কল্পে, যদিই বা আমার কোথাও বাধ-বাধ ঠেক্‌ত, ভাবাবেগে সংস্কারাতিশয্যে ধীরেন তা গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌ত না। মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্র নিয়ে আমি যদি কখনো বল্‌তে যেতাম, দেখ্ ধীরেন, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মেয়েরা সীমা-স্বর্গের ইন্দ্রাণী; তাই তাদের——"——সে বাধা দিয়ে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠ্‌ত, Hang রবীন্দ্রনাথ, তোমার মাথা,—জগতের দিকে তাকিয়ে দেখ—এটা suffragism এর যুগ, ইত্যাদি। পরে Amy Johnson ও Ibsen এর Nora প্রভৃতিকে এনে এক কাণ্ড বাধিয়ে তুল্‌ত। আমি যদি বল্‌তাম,—"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বম্" সে একটু বদ্‌লে বল্‌ত,—পুরাণমিত্যেব অসাধু সর্ব্বম্।"

সেই ধীরেন বিয়ে করতে এসেচে। আসুক ক্ষতি নেই। কিন্তু ধীরেন ধীরেনই আছে ত? যৌবনের কল্পনাটা না হয় নিছক কল্পনাই, কিন্তু মতটা ত হঠাৎ বদলানোর জিনিষ নয়। সহসা পরিবর্ত্তমান মতিকে ত সত্যকার মতি কোনমতেই বলা যায় না। চপলমতি কপটাচারীতেই শোভা পায়। যে মতিকে লক্ষ্য করে উপনিষৎ বলেছেন,—"নৈষা তর্কেন মতিরপনেয়া"—সেই মতিই ত সত্যকার মতি—তাতেই ত দেশের কল্যাণ সাধিত হয়। এই সমস্ত ভেবেই ধীরেনকে দেখে আমি বিস্মিত হলেও পুলকিতও হয়েছিলাম। আর বোনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটু আশার আলোও যেন দেখলাম। এমন কি সুবি যে বলেছিল—"তাঁরই অমত"—সে কথা আমার অবিশ্বাস্য বলে মনে হল।

আমি বেশ উৎফুল্ল হয়ে ধীরেনকে সম্বোধন করলাম —"আরে ধীরেন যে! Gracious Goodness!—এত নিকট সম্বন্ধের মধ্যে যে কোনো দিন তোকে পাব তা ভাবি নি! আমার ভগিনীপতি হচ্ছিস্, বুঝলি রে?" বেশ লক্ষ্য করলাম ধীরেন আমায় দেখে একটু অপ্রতিভ হয়েছে,—এমন কি সে যেন অত্যন্ত শুষ্ক হয়ে উঠল। তবু

জোর করে বল্লে,—"আরে নিখিল-দা যে!" তার পর হঠাৎ রসিকতা করে বলতে গেল, "শেষে বেম্মর বাড়ীতে বিয়ে করতে এসে পড়লাম দেখ্‌চি যে। এখন উপায়!" হেসে বল্‌লাম, "উপায় ত সামনেই। ঐ ফুলেঢাকা মোটর দাঁড়িয়ে আছে—speed off back! কিন্তু আমি না হয় বেম্ম, তুই এত হিঁদু হলি কবে থেকে বল্ দেখি!" বেশ দেখলাম, ধীরেন আপাদ-মস্তক চম্‌কে উঠ্‌ল। তার পর লজ্জায় লাল হয়ে বল্লে, "আর দাদা, চিরকাল কি আর তোমার মতো Bohemian হয়ে বেড়ালে চলে?"—বলে গম্‌স্ওয়াদ্দি 'কোট্' করে বল্লে—"Everybody who is anybody has got to buckle to." আমাকে 'বহীমিয়ান্' বলার কোনো সঙ্গত কারণ দেখতে পেলাম না, কিন্তু সে সম্বন্ধে চুপ্ ক'রে থাক্‌লাম। বল্‌লাম, "ধীরেন, সুষি আমার জাঠতুতো বোন্। কিন্তু ভাইবোন্ বল্‌তে আমার ঐ একটিই পুঁজি। সে যে এখন তোর হাতে পড়চে, এই আমার বড় সান্ত্বনা। সুষিকে যতদিন পেরেচি পড়িয়েচি; কিন্তু তার ওপর আমার বিশেষ জোর খাটল না বলেই তার অকালে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এটা তোকে না জানিয়েই পারলাম না। সুষিও একাল সেকালের মধ্যে মানুষ হয়েছে, কিন্তু সে ঠিক "কুমারসম্ভবের" গৌরীও হয় নাই, "যোগাযোগের" 'কুমু'ও হয় নাই। বিপ্রদাসের মত দাদা সে পায় নাই সত্য, কিন্তু বরের আসনে যে মধুসূদন ঘোষাল আসে নাই সে বিশ্বাস আমার আছে।" দেখলাম ধীরেন বোকার মত আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমিও কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে গেলাম। খানিক পরে সুরু করলাম, "দেখ্ ধীরেন, কাল সকালেই আমায় যেতে হবে। আবার কখন তোকে পাব জানি না। এই বেলা দুটো কথা ব'লে নি—কিছু মনে করিস্ না ভাই!" সে যেন একটু সন্ত্রস্ত হ'য়েই তাকালো। বল্‌লাম, "বিশেষ কিছুই নয়। সুষি একটু পড়া-পাগল; তাকে তুই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নিস্ না। ঘরে বসে ভাল ভাল বই পড়বার freedomটুকু অন্ততঃ তোর মত ছেলের কাছে আশা করা যায়। তুই তাকে সেটুকু সুযোগ থেকে বঞ্চিত করিস্ না।" এইটুকু ব'লেই আমি ধীরেনের দিকে চাইলাম। সে একটু গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে নিলে, পরে উত্তর করলে, "দেখ নিখিলদা, তুমি ভাই রাগ ক'রো না। একটা কথা বলি—কলেজের সে সব তরল-যৌক্তিক কথাগুলো ভুলে যাও। আসলে, আমার বর্ত্তমান মত হচ্ছে যে মেয়েদের বি-এ, এম-এ পাশ করানোর কোনো প্রয়োজন নাই; বিশেষ ক'রে বিয়ের পর পড়াশুনো মানে, domestic duty অবহেলা করা। তবে আমি ঘরে ভাল ভাল বই পড়ার যদ্দূর সম্ভব liberty দেবো।" ধীরেনের বক্তৃতায় অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম। সে থাম্‌লে পর আমি তার দিকে বিষণ্ণ-কঠিন দৃষ্টিতে তাকালাম। সে কিছুক্ষণের জন্য তার দৃষ্টি নত করল। পরে ঠিক যেন সান্ত্বনার সুরে বল্লে, "নিখিলদা, ওঁর কোন্ subjectএ বেশী taste বল ত, আমি ওঁকে সে বিষয়ে বই-টই দিয়ে পড়ার সুযোগ দেবো!" আমার কাছে কোন জবাব না পেয়ে আবার বল্লে, "Literatureএ taste বেশী বোধ হয়—কী বল?" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লাম, "বই ওকে তোমায় কিনে দিতে হবে না,—সে ওর যথেষ্ট আছে। তবে tasteএর কথা যা বলছ, সেটা ঐ অল্প বয়সের মেয়ের সম্বন্ধে ঠিক করা কঠিন। আমি ত কলেজে পর্য্যন্ত সাহিত্যেরই ভাল ছাত্র ছিলাম; অথচ শেষটা specialise করলাম অঙ্কে। এমন্ কী আজ অবধি সাহিত্যকে ছাড়তে পারলাম না। সুষির ঝোঁক সাহিত্যে সত্য, কিন্তু অঙ্ক বা অর্থনীতি তার পক্ষে সুবিধা হত না, সে কথা নিশ্চিন্তভাবে বলা যায় না।" ধীরেন কোনো উত্তর করল না। বোধ হল যেন সে বিরক্তিভরে চুপ করে আছে। বল্‌লাম, "যাক্ ভাই, তোকে অনর্থক কষ্ট দিলাম। সব ভুলে যা। আমি প্রার্থনা করি, তোরা শান্তিতে থাক্।" একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আমি ধীরে ধীরে উঠে গেলাম।

কল্‌কাতা রওনা হওয়ার আগে সুষির সঙ্গে একবার দেখা করে গেলাম। মনে মনে বললাম,—"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।"

৩

সুষমার ওপর আমার অনেকখানি আশাই ছিল। তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, ও নানা বিষয়ের মেধায় আমার বিশেষ আস্থা ছিল। কল্পনা ছিল, সাধারণের একটু

ওপরের ধাপের মন-ওয়ালা সামান্য বাঙালী মেয়ের দ্বারা, গৃহের অবরোধের মধ্যেও যে কতখানি শুভ দৃষ্টান্ত শিক্ষায় দীক্ষায় দেখানো সম্ভব, তা ওর মধ্য দিয়ে আমি সফল ক'রে তুল্‌ব। কল্পনায় বাধা যে ছিল না, তা নয়, কিন্তু সে'টা তত বড় হয়ে চোখে পড়ে নাই; কারণ, আমার ধারণা ছিল, বাড়ীর মধ্যে ঐ একটি মেয়ে—তাকে পড়ানোর বা মানুষ করবার সুযোগ কিছু দিন অন্ততঃ মিল্‌বেই। অবশেষে তা কিন্তু হ'ল না।

শ্বশুর-বাড়ী থেকে সুষমার চিঠি পেতাম, ধীরেনের কর্ম্মস্থল থেকেও। প্রথম প্রথম ছোট্ট চিঠি জুড়ে একটা বিষাদময় হতাশার সুর অনুভব করতাম। উত্তরে 'গীতার' কোটেশন পাঠাতাম; কিন্তু আমার আশা হ'ত। সুষির হতাশায় আমার আশা হ'ত এই জন্য যে আমি মানতাম —যতদিন সুষি জান্‌বে সে একটা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে ততদিন সংসারের মধ্যে থেকেও এই আনন্দের টান সে প্রতিপলে উপলব্ধি করবে। তাই তার ভগ্নাশার সঙ্গে আমারও হতাশার যে অন্ধকার মিশেছিল, তা'তে আমি ক্ষীণ আলোও একটু দেখতাম। ক্রমে সুষির চিঠি দীর্ঘ হ'তে লাগ্‌ল। সূর্য্যদেব মাথার দিকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছায়া যেমন ছোট হয়ে আসে, সুষির নৈরাশ্যের ছায়াও তেম্নি তার চিঠির দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতর হতে লাগ্‌ল।…"The call of the running tide, is a wild and a clear call that may not be denied"—এ-সব কবিতা আর তার চিঠিতে পাই না; 'গীতা' বা 'গীতাঞ্জলি'র প্রয়োজন আর আছে ব'লে মনে হয় না। আমার দেওয়া 'পঞ্চদশী'-বেদান্ত পঞ্চভূতের সামগ্রী হয়েছে, তা'ও মনে হ'তে লাগ্‌ল। তার চিঠিতে এখন থেকে জ্বল্‌ল আশার আলো, আমার মনে পড়ল নৈরাশ্যের দীর্ঘ ছায়া। ভাব্‌লাম, আমার আর প্রয়োজন নাই, সুষি এবার সংসার-জীবনের শুভ আস্বাদ পেয়েছে। ধীরেনের চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, "নিখিল-দা, বিয়ের দিন, আমি যখন তোমায় বলি যে, বেদান্ত-ফেদান্ত রাখ, ফ্রয়েড্‌ প'ড়, বিয়ে-থা করো, তখন তুমি হেসেছিলে; বলেছিলে, আর যাই করিস্‌, সুষির মাথায় ফ্রয়েড্‌ ঢোকাস্‌নে। বিবাহের উপহারে তুমি দিয়েছিলে 'উপনিষৎ', আমি দিয়েছিলাম Havelock Elis. আর আজ কী হয়েচে, জানো নিখিল-দা? তোমার বোনের মাথা থেকে উপনিষদের ধুঁয়ো একদম কেটে গিয়ে, ফ্রয়েডের আগুন জ্বল্‌চে। তোমার পঞ্চদশী পঞ্চ হাজার গ্রন্থের মধ্যে নির্ব্বাসিত, আর সেক্সপীয়র মোক্ষমূলারের পাশে অনাদৃত।" ধীরেনের চিঠি পেয়ে হাসি এল; দুঃখিতও হলাম; আবার আনন্দও হ'ল। লিখ্‌লাম, "ধীরেন, তোদের সুখেই আমার আনন্দ; সুষি সুখে শান্তিতে থাকে, এ' কী আমি চাই না রে! এই আমার সব চেয়ে বড় কাম্য। উপনিষদের অনাদরের কথা যে লিখেছিস্‌, তাতেও আমার দুঃখের কিছু নেই। আমাদের শাস্ত্রে অধিকার-ভেদকে একটা মস্ত জিনিষ বলা হয়েচে। আমার ভুল হ'য়েছিল এইখানেই। কিন্তু সে ভুল ঋষিদেরও হতে পারত। তাই সে জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত নই। বরং এ খুব ভালই হয়েচে। কারণ এইটি না হ'লে হয় ত বহু অঘটন ঘট্‌ত।—উপনিষদের ধুঁয়ো হয় ত সুষির মাথার ওপর দিয়ে না গিয়ে তোমার ঘরের মেজে থেকে উঠ্‌ত, ফ্রয়েডের আগুন হয় ত সুষির নিজের হাত দিয়ে তার কাপড়ে গিয়ে লাগ্‌ত। তাই বলি ভাই, এ খুব ভালই হয়েচে। এই সঙ্গে একটা শুভ খবর দিচ্ছি, সরকারের সাগর পার হওয়ার বৃত্তিটা এবার আমার ভাগ্যেই পড়ল। শীঘ্রই বছর তিনেকের জন্য এবার আমি-শুদ্ধ নির্ব্বাসিত হ'চ্ছি, 'উপনিষৎ' ত দূরের কথা। দেখ্‌চি, তোর পুণ্যের জোর আছে। আমি সর্ব্বান্তঃ-করণে তোদের মঙ্গল প্রার্থনা করি।" উত্তরে ধীরেন ও সুষি দু'জনেই নানারকমে ক্ষমাভিক্ষা ক'রে, আমার কল্যাণকামনা ক'রে চিঠি দিয়েচে। আমি লিখ্‌লাম, "আমার কোন দুঃখ নেই। তোরা ভাল থাক্‌। আর ঈশ্বর আমাদের শুভ-বুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত রাখুন—এ ছাড়া আমার বল্‌বার কিছু নেই।"

তিন বৎসর পর দেশে ফিরে কাজ পেলাম বম্বেতে। কাজেই বাংলা দেশের মুখ দেখ্‌তে বিলম্ব হ'ল। কিন্তু চতুর্থ বৎসরের শেষে বাড়ী থেকে জ্যেঠামশায়ের চিঠিতে যখন জান্‌লাম অনেক দিন পর সুষি তার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এসেছে, তখন আমি আর থাকতে পারলাম না। কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে শ্যামল বাংলায়

শৈবালশ্যামল পুকুরের ভয় কাটিয়ে জন্মভূমিতে পা দিতেই হ'ল।

সুষি এখন দুই পুত্র ও এক কন্যার জননী। মেয়েটি কোলের,—সুষির শৈশব-মূর্ত্তি মনে করিয়ে দেয়। সুষিকে চিন্তে যে আমার কোনো কষ্ট পেতে হ'ল তা নয়। তা'র খুব এমন-কিছু পরিবর্ত্তন টেরই পেলুম না। কিন্তু তার সে দেহশ্রী আর নাই, স্থূলতাক্লিষ্ট তনিমা তা'কে কতকটা যেন কুৎসিতই করে তুলেছে। ইয়োরোপের নানান্ দেশের অবাধ-গতি, অনায়াস-ভঙ্গী ঝর্ণার মত চঞ্চল, হাস্যমুখর তরুণীদের দেখে এসে, বম্বেতেও নিরবরোধ স্বচ্ছন্দাগতি মেয়েদের দেখে, সুষিকে সহসা আমার আর এক জগতের জীব ব'লে মনে হ'ল। মনে হ'ল বেণী দুলিয়ে, সাবলীল গতিতে সংযত-গাম্ভীর্য্যের সহিত ক্ষণে ক্ষণে এসে আব্দারের সুরে যে সুষি বলত, 'দাদা, এ্যালজ্যাব্রার প্রব্লেম মিলচে না, অথবা জিয়মেট্রির ডিডাক্শন্ হচ্ছে না, কিংবা বলত ট্রান্স্লেসন্ কর্‌রেক্ট ক'রে দাও'—এ সে সুষি নয়। এ যেন রক্ত-মাংসে নির্ম্মিত, স্বর্ণালঙ্কৃত-দেহ মেদবহুল কোন্ ডেপুটি-গৃহিণী। তবু সে সুষি'ই। তার ছেলেমেয়েদের আদর করলাম। বল্লাম, "সুষি, ছেলেমেয়েদের নাম কী দিলি ?" সে বল্লে, "সে'ত তোমায় লিখেই ছিলাম। বড় খোকার নাম সুললিত, ছোট'র নাম অরুণ ; মেয়ের নাম দেওয়া হয় নি, তোমায় দিতে হবে।" কিছুক্ষণ ভেবে বল্লাম, "মেয়ের নাম রাখ্ অপলা।" সুষি বল্লে, "ও মা, ও কি নাম ! ওর অর্থ কী ?" বল্লাম, "অর্থ যাই হোক্, বেদরচয়িত্রী ঋষি-কন্যার যদি ও-নাম রাখা চলে, তবে তোর মেয়ের নাম রাখ্লেও অর্থ'র জন্য কিছু আট্কাবে না।" ও বল্লে, "তা বেশ। নামটিও মিষ্টি। তবে ওঁর আবার পছন্দ হ'লে হয় !" এর পর আর কথা চলে না। সুতরাং চুপ করে থাকলাম। পরে কথা ঘুরোবার জন্য প্রশ্ন করলাম, ধীরেন আজকাল কোথা রয়েচে ? সে বল্লে, বোগ্‌রায়। তার পর বলে যেতে লাগ্‌ল, "চল দাদা, তোমায় একবার ওখানে যেতেই হ'বে। বেশ জায়গা। আমার বড় ভাল লাগে। ছোট্ট খাট্ট সহর, কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ! বেড়ানো'ও বেশ হয়। সুন্দর একটি পার্ক্ আছে। রাস্তাঘাটও বেশ। মেশ্‌বার মত দু'চার ঘর গভর্মেণ্ট্ অফিসিয়াল্‌স্'ও ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। খুব যাওয়া আসা আছে।"—ব'লে হঠাৎ একটু থেমে, মুখ টিপে হেসে বল্লে, "তোমার জন্য একটি মেয়ে দেখে রেখেচি। এবার আর 'না' বল্লে শুন্‌চি না। চিরকাল সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়াতে তোমায় আমি দেব না।" শুধু তা'র সাহস দেখে অবাক্ হ'লাম তাই নয়, ব্যথিত বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে ভাব্‌লাম, "এই সুষি' আর সেই সুষি ! এ'ই একদিন বিবাহের নিষ্প্রয়োজনীয়তা, আমৃত্যু সংযম, শুধু বিদ্যাশিক্ষা নয়, বিদ্যারাধনা সম্বন্ধে, আমার কাছে ভক্ত-শিষ্যার মত শ্রদ্ধার সঙ্গে সমস্ত বক্তৃতা শুনেচে, অন্যের কাছে বলেছে, এমন্ কী জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে তর্ক করেছে। সু'ষ ব'লে যেতে লাগ্‌ল, "খুব ভাল মেয়ে দাদা। আই-এ অব্‌ধি পড়েছে, গান-বাজ্‌না জানে, খুব সুন্দরী। উনি' ত আমায় বলেন, ভীষ্মদেবকে টলাতে পার, তোমার দাদাকে নয়।" আমিও ব'লেচি, "এবার তোমায় দেখাব। শুন্‌চ, দাদা, তুমি—।" সে হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। আমার মুখে সে কিসের চিহ্ন দেখেছিল, সে'ই জানে। রাগের নিশ্চয়ই নয়, হয় ত বা ভয়ের। আমি কিন্তু বিষণ্ণ বিরস মুখে শুধু তা'র দিকে স্থির হ'য়ে চেয়েছিলাম, যেন তা'র ভাষা আমার কাছে দুর্ব্বোধ্য। সত্য-সত্যই। ভাষা না হ'লেও অন্ততঃ ভাবটা। সুষি যে জন্যই থেমে যাক্, আমি অনুভব করলাম, সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েচে এবং আমার উচিত কিছু বলা। কিন্তু ঠিক্ যে কী বলা সঙ্গত তা যখন ঠিক্ ক'রে উঠ্‌তে পার্‌চি না, সেই সময় যাঁ'রা সুষিকে সম্বোধন ক'রে ঢুকলেন, তাঁরা একটী নাতিবৃহৎ দল। তাকিয়েই চিন্‌লাম—দলটি আমাদের প্রতিবেশী উকিল-গৃহিণী, বোধ হয় তাঁর ছোট ছেলেমেয়ে, জ্যেষ্ঠা কন্যা ও তার আর এক পাল ছেলে মেয়েদের নিয়ে। সুষি অভ্যাগতদের নিয়ে পাশের বড় ঘরে গেল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

একা একা আরাম-কেদারায় ব'সে চিন্তা করতে লাগ্‌লাম। কী যে চিন্তা করছিলাম তা'ও ঠিক্ জানি না। শুধু পাঁচ বছর আগেকার ঘটনাগুলো চোখের

সামনে ভাসতে লাগল। ভাবছিলাম, বোন এমন্ হয়! এই সুষি আজ যদি কলেজ লাইফে থাকত! তা হ'লে কী হ'ত! কে তা'র উত্তর দেবে। একবার মনে হ'ল, হয় ত এ'ই ভাল হয়েছে। কিন্তু মন বলতে লাগল—না, না, না। সেই মুক্ত পবিত্র জীবনই সুষিকে সত্য জীবন দিয়ে মহীয়সী ক'রে তুলত। আজ সে বহু ধাপ নেমে গেছে।

সুষির গলা কানে এল, "এইটি বুঝি আপনার প্রথম মেয়ে? পরের তিনটি'ও মেয়ে! আর ছেলে মেয়ে এখনো হয় নি?......ছোটটির বয়স বুঝি দুই? ... তা এবার নিশ্চয় বেটাছেলে হবে।......তা ছেলে না হওয়ার খোঁটা খেতে হয় না ত? বাবা! আমাদের বাড়ীতে———." আমি আর শুনতে পারলাম না। সুষির 'হাই টপিক' বড় পীড়া দিতে লাগল। চেঁচিয়ে বললাম, "সুষি, এবার রমণ নোবেল্ প্রাইজ্ পেলেন, জানিস্?" সে "ও:!" ব'লে চুপ করলে। আমি'ও চুপ করলাম, কারণ, আর কিছু করবার খুঁজে পেলাম না। একটু পরে ফের বললাম, "সুষি, সুবেদাকে মনে পড়ে?" এবার মনে হ'ল, সুষির বক্তৃতা থমকে থেমে গেল। সে জিজ্ঞেস করলে, অনুচ্চ কণ্ঠে, "সুবেদা মিত্র, —দাদা?" বললাম, "হাঁরে। সে যে এবার বি-এতে ইংরাজী অনার্সে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছে।" কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ। খানিক পরে দেখি, সুষি আমার ঘরে ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করচে। সে অত্যন্ত করুণ-স্বরে আমায় প্রশ্ন করলে, "সুবেদা'র খবর কোথায় পেলে, দাদা?" মনে হ'ল, এই একটি কথা, তাকে বহুদূরে নিয়ে গেছে,—আমারই মত তা'কেও পাঁচ বছর আগেকার স্বপ্নের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। বললাম, "এই 'ত আমার কাছে ক্যাল্‌কাটা গেজেট্ রয়েচে; বি-এ রেজাল্ট্ বেরিয়েচে। তোদের অসিতা 'ত ফিলসফিতে ফা'ষ্ট হয়েচে। লতিকা ডিস্‌টিঙ্ক্‌শন্, বেলা হিষ্ট্রিতে সে'কণ্ড্ ক্লাস পেয়েচে। তোর পরিচিত অনেককে এখানে পাবি।" পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম, "আজ হয়ত তোরই result দেখবার জন্য এই গেজেট্ আমায় কিনতে হ'ত। সত্যি বোন, তা'র থেকে আনন্দ আমার আর কিছুতে হ'ত না।" অত্যন্ত করুণ দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে সে তাকিয়ে ছিল। একটু পরে বিষণ্ণভাবে বল্লে, "সত্যি দাদা, আমার আর সিকতা'র কিছু হ'ল না। আচ্ছা, সিকতা'র স্বামী বুঝি ডাক্তার, না?" বললাম, "সিকতা'র হ'ল না কী রে! সে 'ত বিয়ের পর কোন দিনই লেখাপড়া ছাড়ে নি। এই দেখ্ না গেজেট্, সিকতা পাস্ কোর্সে উৎরে গেছে।' এবার অনুভব করলাম, আমি তা'কে "Unkindest cut of all" দিয়েছি।

ক্ষুণ্ণমনে যখন ভাবচি, এ-সব কথা না তুল্লেই হ'ত, সুষি বললে,—তা'র গলা কেঁপে উঠল, "আমিই শুধু একা পড়লাম।" মনে ভাবলাম, তা নয়, তোমার দলই ভারী, কিন্তু প্রকাশ্যে কী সান্ত্বনা দেব বুঝতে পারলাম না, বললাম, "তুই এক কাজ কর্. সুষি,————ফের্ পড়াশুনো খুঁচিয়ে জাগা। সংস্কৃততে ত তুই বেশ ভালই ছিলি——এবার কাব্যের উপাধির জন্য প্রস্তুত হ, আদ্য-মধ্যটা দিয়ে ফেল্।" সে ঘাড় নেড়ে বল্লে, "নাঃ, সে হবে না। একে' ত বই পড়লেই বলেন, 'টাইম্ ওয়েষ্ট'; তা'র ওপর আবার কাব্য পড়লে আর রক্ষা নেই। বলেন, কাব্যি কাব্যি ক'রে দেশটা উচ্ছন্ন গেল। মেয়েদের 'ত কাব্য পড়তে দেওয়াই উচিত নয়, মতি তরল করে দেয়। সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে কী বলেন জানো? বলেন, ও'টা মেয়েদের কাছে একেবারেই চলতে পারে না, Vulgar। আর আমাকে কেবল ঠাট্টা করেন, রবি-ঠাকুর আর ইয়েট্‌স্ করেই ভাইবোনে গেলেন।" হতবাক্ হয়ে গেলাম, শুধু বিস্ময়ে দুঃখে নয়, ক্রোধে। কালিদাসের কাব্য হ'ল Vulgar, আর সুষির 'হাই টপিক', ফ্রয়েড্ হ'ল moral!" কিন্তু আত্মদমন 'করে মৌন থাকলাম। এই সময় সুষি'র মেয়ে কেঁদে ওঠায় সে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল। শুনলাম উকিল-গৃহিণীর কণ্ঠ—"আজ আসি, মা। আবার সময় পেলেই আসব। তুমিও যেও যেন, মা।"

কিছুক্ষণ পর সুষিকে ডাক দিলাম। বললাম, "চল্, শান্তিনিকেতনে যাওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেবেন, 'আমাদের জাতীয়তা' সম্বন্ধে।" সে যেন দ্বিধাভরে খানিক মৌন থাকল, পরে বললে, "না, দাদা। ও-সব কতকটা Political meeting। আমি যাব না। ওঁর

আবার যা চাকরী—শুনলেই রাগ করবেন।" আপন নির্বুদ্ধিতার জন্য আপনাকে শত ধিক্ দিলাম। একটি কথাও বললাম না। শুধু দাঁতে দাঁত চেপে চুপ ক'রে থেকে ভাবলাম, কেন এমন্ হয়! সুষি আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরে ফিরে এসে, কী জানি কেন, নম্র কণ্ঠে বল্লে, "চলো দাদা, আমিও শান্তি নিকেতনে যাব। তুমি গাড়ী ঠিক্ করো।" বিষাদ-তীক্ষ্ণ কঠিন কণ্ঠে সহসা জবাব দিলাম, "না থাক্।"

—— ——

* ভারতে শর্করা-শিল্প

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৫)

শর্করার সর্ব্বপ্রধান উপকরণ ইক্ষুর কথা এখন আলোচনা করা যাক্। ইক্ষুর আদি জন্মভূমি ভারতবর্ষ; ভারত হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইক্ষুর চাষ বিস্তৃত এবং প্রচারিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষ ব্যতীত ইউরোপের স্পেনে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়, এসিয়ার যবদ্বীপ (জাভা) প্রভৃতি ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিসে, জাপান এবং ফরমোসায়, চীন ও ইণ্ডো-চীনে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে, এবং আফ্রিকার স্থানে স্থানে ও অষ্ট্রেলিয়াতে ইক্ষুর চাষ হয়। কোন্ দেশ ইক্ষুর চাষে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা নীচের তালিকা দেখিলেই অনুমান করা যাইবে। নীচে প্রত্যেক দেশের ইক্ষু হইতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ দেওয়া হইল। বীট হইতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

ইং ১৯৩০-৩১ সালে বিভিন্ন দেশের ইক্ষু হইতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ :—

(১) ইউরোপ—

স্পেন—প্রায় ২৮ হাজার টন। ইউরোপের অন্য কোন স্থানে ইক্ষু উৎপন্ন হয়না।

(২) উত্তর আমেরিকা—

লুসিয়ানা এবং ফ্লোরিডা	প্রায়	২১০	হাজার	টন
পোর্টোরিকো	„	৭০০	„	„
হাওয়াই	„	৮৩০	„	„
ভার্জিন দ্বীপ	„	৪	„	„
কিউবা	„	৫০০০	„	„
ট্রিনিদাদ	„	৮০	„	„
বার্ব্বাডো	„	৬৬	„	„
জামেইকা	„	৫৫	„	„
ব্রিটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্	„	৪৫	„	„
মার্টিনিক ও গুইদালোপ	„	৬৫	„	„
স্যাণ্টো ডোমিঙ্গো ও হায়তী	„	৩৫৩	„	„
মেক্সিকো	„	২৫৩	„	„
মধ্য আমেরিকা, গোয়াতিমালা, পানামা, নিকারাগোয়া, হণ্ডুরাস প্রভৃতি	„	১৪১	„	„

(৩) দক্ষিণ আমেরিকা—

ব্রিটিশ গুইয়ানা	„	১১৪	„	„
ডাচ „	„	১৯	„	„
আর্জ্জেণ্টাইন	„	৪১০	„	„
ব্রেজিল	„	৭০০	„	„
পেরু	„	৪০০	„	„

* 'ভারতের চিনি' নামে এই প্রবন্ধ গত বৈশাখ, আষাঢ় ও ভাদ্রমাসের ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। এইবার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'ভারতে শর্করা-শিল্প' এই নাম করা হইল। লেখক

ভেনিজুয়েলা, কলাম্বিয়া, বলিভিয়া, প্যারাগোয়া প্রভৃতি	„	৭৯	„	„
(৪) এসিয়া—				
জাভা	প্রায়	৩১৭৩	হাজার	টন
জাপান } ফরমোসা }	„	৯২০	„	„
ফিলিপাইন দ্বীপ	„	৭৭০	„	„
চীন ও ইণ্ডো-চীন	„	২২০	„	„
(৫) আফ্রিকা—				
ইজিপ্ট	„	১০০	„	„
মরিশস	„	২২০	„	„
রিইউনিয়ন	„	৫০	„	„
সাউথ আফ্রিকান ইউনিয়ন	„	৩৫০	„	„
মোজাম্বিক	„	৭৫	„	„
মাডাগাস্কর, কেনিয়া, সোমালিল্যাণ্ড, এ্যাঙ্গোলা প্রভৃতি	„	৪০	„	„
(৬) অষ্ট্রেলিয়া—				
কুইন্‌স্ ল্যাণ্ড } নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্ }	„	৫২৩	„	„
ফিজি দ্বীপ	„	১০২	„	„

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মোটামুটি বলিতে গেলে, পৃথিবীতে যত চিনি উৎপন্ন হয় তাহার ২/৩ দুই তৃতীয়াংশ ইক্ষু-শর্করা (আকের চিনি) এবং ১/৩ এক তৃতীয়াংশ বীট। ইউরোপে যেমন ইক্ষু (আক) হয় না, এসিয়াতেও তেমনি বীট হয় না। জাভা এবং কিউবাতে আকের চাষ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। যদিও জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার বীট চিনি ভারতের চিনি ধ্বংস করিয়াছে, তথাপি এখন জাভা হইতেই ভারতে চিনি আমদানী হইয়া থাকে প্রধানতঃ। সেইজন্য ভারতে শর্করা-শিল্প রক্ষার আইন পাশ হওয়ায় জাভাই আঘাত পাইয়াছে খুব বেশী। সেদিন হল্যাণ্ডের মন্ত্রী M. Van wirderen (Dutch Minister), লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সভায় এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রয়টার তাঁহার বক্তৃতার রিপোর্ট দিয়াছে—

"The possibility of Holland being compelled to reconsider the "open door" policy in the Dutch East Indies in consequence of the Indian Sugar Tariffs, was mentioned by the Dutch Minister, M. Van Winderen, at a meeting of the East Indian Association to-day at which an address on Dutch Policy in the East Indies was given by an official of the Dutch Colonial office. M. Van winderen said that the Indian Tariff walls against sugar were so high that any one who tried to jump them, would jump to death. He dwelt on the prejudicial effect of these on the East Indian Sugar Industry and appealed for the mutual benefits of trade between India and the Dutch East Indies." * ডাচ্ মন্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন যে, "ভারতের এই শর্করা-শিল্প রক্ষার আইন অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে; শুল্কের প্রাচীর এত উচ্চ হইয়াছে যে তাহা ডিঙ্গাইতে চেষ্টা করিলে গভীর খাদে পড়িয়া মৃত্যু অনিবার্য্য; ইহা জাভা প্রভৃতি দেশের শর্করা-শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি করিবে; অতএব ভারতবর্ষ এবং ডাচ্ ইষ্ট্ ইণ্ডিসের মধ্যে পরস্পরের ব্যবসা সম্বন্ধে সেই পুরাতন মধুর সম্পর্ক পুনরায় স্থাপিত হউক।"

টাকার আঘাত বড় আঘাত। এ আঘাতে লোক অন্ধ হইয়া যায়; তাহা না হইলে মন্ত্রী মহাশয় দেখিতে পাইতেন যে, তাঁহার নিজের দেশেই, ইউরোপেই, ভারতের শর্করা-শুল্ক অপেক্ষাও উচ্চ শুল্কের প্রাচীর গাঁথা রহিয়াছে, যাহাতে অন্য দেশের চিনি প্রবেশ করিতে না পারে কোনও রকমে। জার্ম্মাণীতেই প্রতিমণ চিনির উপর শুল্ক (protective duty) আছে ৭৸৹ সাত টাকা তের আনা; ভারতের শুল্ক হইয়াছে প্রতিমণের উপর পাঁচ টাকা সাড়ে সাত আনা। ইউরোপ, আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন দেশের শুল্কের হার পূর্ব্বে দিয়াছি।

সেদিনের ঐ সভায় ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটারী সার স্যামুয়েল হোর মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বিশ্বদূত রয়টার তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্মও দিয়াছে—

* The Statesman, Feb, 1., 1934

"Sir Samuel Hoare, Secretary of State for India presiding, pointed out that the Netherlands Government in the East Indies and the British Government in India were faced with similar problems; for instance, mastering the problem of relations between the East and West and the problem of the economic depression. He hoped that the Dutch would succeed in keeping the East Indies happy and prosperous and "play the part in our common endeavour to neconcile the aspirations of East and west." *"

সার স্যামুয়েল হোর শুল্ক সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করার আশা ভরসা দেননি। এজন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। জাভার ব্যবসায়ীরা এবং ডাচ্ গভর্ণমেণ্ট ভারতের শর্করা-শুল্ক কম করার জন্য স্বর্গ মর্ত্ত আন্দোলিত করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি; কিন্তু আমরা এ আশঙ্কা করি না যে তাঁহারা সফল-কাম হইবেন। আমাদিগকেও অবশ্যই সজাগ থাকিতে হইবে। নূতন শাসন-সংস্কার আসিতেছে; ভারতের এই সব স্বার্থরক্ষার চেষ্টা হয়তো তখন ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী হইবে, এ আশা আমরা করিতে পারি।

(৬)

ভারতবর্ষে আকের চাষের অবস্থা এখন কি রকম, দেখা যাক্। গোড়াতেই একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ যে প্রথায় আবাদী জমির পরিমাণ বা অন্যান্য তথ্য (statistics) সংগ্রহ করেন, তাহাতে এই সব পরিমাণ বা অঙ্কের উপর বেশী আস্থা স্থাপন করা উচিত নয়। কিন্তু অন্য কোন প্রকৃষ্ট পন্থা না থাকায়, এই সব পরিমাণ বা অঙ্ককেই আমাদের অনুমানের একটা মূল-ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে প্রকৃত অবস্থা অঙ্কশাস্ত্র অনুযায়ী বিশুদ্ধ না হইলেও, প্রকৃত তথ্যের কাছাকাছি একটা অনুমান করার বাধা হইবে না।

টেরিফ বোর্ড ইং ১৯১০ সালে ভারতবর্ষে আকের আবাদী জমির পরিমাণ গড়ে প্রায় ২৮ লক্ষ একর (প্রায় ৮৪ লক্ষ বিঘা) নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী গত ইং ১৯৩২—৩৩ সালে ভারতে মোট ২৯ লক্ষ ৯৮ হাজার একর জমিতে আকের আবাদ হইয়াছিল। ইং ১৯৩৩—৩৪ সালের প্রাথমিক রিপোর্টে প্রকাশ যে, ভারতে মোট ৩৩ লক্ষ ৪৯ হাজার একর অর্থাৎ এক কোটী ৪৭ হাজার বিঘা জমিতে আকের চাষ হইয়াছে। ভারতে শর্করা-শুল্কের আইন পাশ হওয়ার পর হইতেই ক্রমে আকের আবাদ বাড়িতেছে।

ইং ১৯৩৩—৩৪ সালের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ জমিতে আকের চাষ হইয়াছে, তাহা নিচে দেওয়া হইল :—

প্রদেশ	একর			বিঘা	
যুক্তপ্রদেশ (ইউ, পি)	১৭,৯১	হাজার-	প্রায়	৫৩,৭৩	হাজার
পাঞ্জাব	৫,১০	"	"	১৫,৩০	"
বিহার উড়িষ্যা	৪,১৮	"	"	১২,৭৪	"
বাংলা	২,৫৪	"	"	৭,৬২	"
মাদ্রাজ	১,১৩	"	"	৩,৩৯	"
বোম্বাই	৯৫	"	"	২,৮৫	"
আসাম	৩১	"	"	৯৩	"
মধ্যপ্রদেশ (সি, পি,)	২৯	"	"	৮৭	"
দিল্লী	৪	"	"	১২	"
হায়দরাবাদ	৪৬	"	"	১,৩৮	"
বরোদা	২	"	"	৬	"
উঃ পঃ সীমান্ত	৫২	"	"	১,৫৬	"
ভূপাল রাজ্য	৪	"	"	১২	"

মোট একর ৩৩, ৪৯০০০—বিঘা ১,০০, ৪৭০০০

মোট এক কোটী সাতচল্লিশ হাজার বিঘা

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষে মোট যে ইক্ষু উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা হার গড়ে প্রত্যেক প্রদেশের এইরূপ :—

যুক্তপ্রদেশ	শতকরা	প্রায়	৫২	ভাগ
পাঞ্জাব	"	"	১৪	"
বিহার উড়িষ্যা	"	"	৯	"
বাংলা	"	"	৭	"
মাদ্রাজ	"	"	৩	"

* The Stateman, Feb. 1., 1934.

বোম্বাই　　"　　"　　৩　"

আসাম　　"　　"　　১　"

মধ্যপ্রদেশ　　"　　"　　১　"

উঃ পঃ সীমান্ত }
হায়দরাবাদ } শতকরা ১ ভাগের কিছু বেশী

ভূপাল, বরোদা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে শতকরা এক ভাগেরও অনেক কম আক আবাদ হয়; মহীশূর রাজ্যে প্রায় আসামের সমান আবাদ হয়। যুক্তপ্রদেশেই অর্দ্ধেকের বেশী এবং বাংলায় শতকরা ৭ ভাগ মাত্র আক আবাদ হয়। কিন্তু সমস্ত ভারতে যে বিদেশী চিনি আমদানী হয়, তাহার আড়াই ভাগের এক ভাগ চিনি বাংলা দেশেই ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ প্রায় ১৫ পনর কোটী টাকার বিদেশী চিনির মধ্যে প্রায় ৬ কোটী টাকার চিনি বাংলা ব্যবহার করে। বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটী।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবের দক্ষিণাংশের জমি কতকটা যুক্তপ্রদেশের জমির মত। এই দিকে আকের আবাদ বেশী হইতে পারে। পাঞ্জাবের উত্তরাংশে প্রচণ্ড শীতে আকের আবাদ নষ্ট হইয়া যায়। আকের আবাদ ৮-১০ মাস জমির উপরে থাকে। খরচ মণ-প্রতি প্রায় সাড়ে পাঁচ আনা। চেষ্টা করিলে দক্ষিণ-পাঞ্জাবে উন্নত প্রকারের আকের আবাদ যথেষ্ট হইতে পারে।

যুক্তপ্রদেশ (ইউ. পি.)

সমস্ত ভারতবর্ষের উৎপন্ন মোট ইক্ষুর শতকরা ৫০ ভাগের বেশী অর্থাৎ অর্দ্ধেকের বেশী আবাদ হয় এই যুক্ত প্রদেশেই। আবাদ ৯ মাস হইতে ১১ মাস জমির উপর থাকে। পৌষ মাস হইতে আক কাটা আরম্ভ হয়, চৈত্র মাসে শেষ হয়। দেশী আক সাধারণতঃ একার-প্রতি ৩৫০/০ মণ (বিঘা-প্রতি প্রায় ১১৬/০ মণ) জন্মে। কইম্বাটোর আক (Co. 213) যত্ন সহকারে আবাদ করিলে গড়ে এক হাজার মণ (বিঘা-প্রতি ৩৩৩/০ মণ) জন্মে; কোনও কোনও জমিতে বেশীও জন্মিয়াছে। এই প্রদেশে ফ্যাক্টরীতে আক বিক্রয় করার প্রথা এত বেশী প্রচলিত হইতেছে যে, গুড় প্রস্তত করা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। আক আবাদের খরচ মণ-প্রতি চারি আনা হইতে পাঁচ আনা। এই প্রদেশে আকের আবাদ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

বিহার-উড়িষ্যা

এই প্রদেশের জমিও অনেকটা যুক্ত প্রদেশের জমির মত। কইম্বাটোর আক সাধারণতঃ বিঘা-প্রতি ১৫০-২০০/০ মণ উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ বিহারে জল সেচনের সুবিধা থাকায় কইম্বাটোর আক একর-প্রতি হাজার মণও (বিঘা প্রতি ৩৩৩/০ মণ) উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে।

মাদ্রাজ

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি গ্রীষ্মপ্রধান (tropical)। টেরিফ বোর্ড মন্তব্য করিয়াছেন, ভারতবর্ষের মধ্যে মাদ্রাজ প্রদেশই ইক্ষু চাষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। মাদ্রাজে একর-প্রতি ৭৭৫/০ মণ (বিঘা-প্রতি ২৫৮/০ মণ) ইক্ষু সাধারণতঃ জন্মিয়া থাকে। এই প্রদেশে কোন কোন স্থানে ১০ মাস হইতে ১২ মাস, কোন কোন স্থানে ১৫ মাস পর্য্যন্ত ইক্ষুর আবাদ জমিতে থাকে। জমি ইক্ষু চাষের উপযোগী হইলেও মাদ্রাজে ইক্ষুর চাষ বেশী নয়। যত্ন-সহকারে উন্নত প্রণালীতে আবাদ করিলে এই প্রদেশে বিঘা-প্রতি অনেক অধিক ইক্ষু উৎপন্ন হইতে পারে। গোদাবরী এবং ভিজাগাপটম্ জেলায় খুব ঝড় হয় বলিয়া বাঁশের খুঁটী দিয়া ইক্ষু রক্ষা করিতে হয়; এই-জন্য খরচ বেশী পড়ে। এমন কি গড়ে মণ-প্রতি ইক্ষু আবাদের খরচ ৭ আনা হইতে ১২ আনা পর্য্যন্ত পড়ে। মাদ্রাজে জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড বিভক্ত হওয়ায় উন্নত প্রণালীতে ইক্ষু চাষের আর এক অসুবিধা।

বোম্বাই

সিন্ধু ছাড়িয়া দিলে, এই প্রদেশও tropical, গ্রীষ্ম-প্রধান; এখানেও যথেষ্ট পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হইতে পারে। বেলাপুর এষ্টেটের কোন কোন জমিতে বিঘা-প্রতি ৩৫০/০ মণেরও কিছু বেশী ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল, প্রায় জাভার সমান সমান। উক্ত এষ্টেটে গত ১৯৩০ সালে গড়ে বিঘা-প্রতি ২২৫/০ মণ ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল। বেলাপুরে কইম্বাটোর আক আবাদ করিয়া খুব ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে ইক্ষু আবাদের খরচ কিছু বেশী। দাক্ষিণাত্যে

গভর্ণমেণ্টের সেচ-বিভাগ (Deccan Irrigation Department) আছে। সেচের খাল কাটিতে গভর্ণমেণ্টের অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছিল; সুতরাং জমিতে জল সেচন করার জন্য যে ট্যাক্স দিতে হয়, তাহার পরিমাণ বা হার বেশী। আবাদের খরচও সেইজন্য বেশী পড়ে। গভর্ণমেণ্টের সদয় দৃষ্টি এই দিকে পড়িলে কৃষকদের সুবিধা হইতে পারে।

(৭)

বাংলা

টেরিফ বোর্ডের রিপোর্টে বাংলাদেশ, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের মত ইক্ষু আবাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী বলিয়া বর্ণিত না হইলেও, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, পূর্ব্বে বাংলায় যথেষ্ট পরিমাণে ইক্ষুর আবাদ হইত এবং বাংলাদেশ হইতেই অনেক দেশে ইক্ষুর আবাদ বিস্তৃত বা প্রচলিত হইয়াছে। ব্রেজিলে মুখে খাওয়ার জন্য এক রকম আকের আবাদ এখনও হয়; বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে তাহা বাংলা দেশেরই আক। মুসলমান লেখকগণের বর্ণনায় আছে যে, ইংরেজদের আগমনের অনেক পূর্ব্বে, বাংলার বর্দ্ধমান মুর্শিদাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া অযোধ্যা পর্য্যন্ত এই সমস্ত প্রদেশে গুড় হইতে প্রচুর পরিমাণে সাদা চিনি প্রস্তুত হইত। সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক বার্ণিয়ার (Bernier) সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিতেছেন—

"Bengal abounds in sugar with which it supplies the Kingdoms of Golkonda and the Karnatick, where very little is grown, Arabia and Mesopotamia, through the towns of Moka, and Bassora, and even Persia by way of Bandar-Abbosi." সপ্তদশ শতাব্দীতেও বাংলা দেশ হইতে গোলকণ্ডা, কর্ণাট-রাজ্য, আরব এবং পারস্যে চিনি রপ্তানী হইত। এ কথা আজ কে বিশ্বাস করিবে? কে বিশ্বাস করিবে যে, বার্ণিয়ারের বর্ণিত সেই বাংলা দেশই এই বাংলা দেশ, যেখান হইতে এক ছটাক চিনিও আজ আর বাহিরে রপ্তানী হয় না। কে বিশ্বাস করিবে যে, সেই বাঙ্গালী জাতিই এই বাঙ্গালী জাতি যাহারা আজ শর্করা প্রস্তুতের প্রণালীই ভুলিয়া গিয়াছে, যাহারা নিজেদের নিত্যব্যবহার্য্য চিনি যাহা দরকার হয় তাহার সহস্রাংশের একাংশও নিজেরা প্রস্তুত করিতে পারেনা? বাঙ্গালীরাই হয়তো আজ এ কথা বিশ্বাস করিবার হেতু খুঁজিয়া পাইবেনা। কিন্তু তথাপি ইহা সত্য। সেই যুগের শিল্প-নিপুণ বাঙ্গালী জাতির শিল্প-সমৃদ্ধির অতীত গৌরব-কাহিনী, আজ এই যুগের শিল্প বাণিজ্যহীন, দুর্দ্দশা'ক্লিষ্ট, নিঃসহায় বাঙ্গালী জাতির দারিদ্র্যের করুণ ইতিহাস, এ উভয়ই সত্য। বাঙ্গালীর সেই বহু-বিস্তৃত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত শর্করা-শিল্পের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কেমন করিয়া সম্পন্ন হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বাংলা দেশের জমি ইক্ষু চাষের উপযোগী কিনা, সে সম্বন্ধে বাংলা গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের মন্তব্য হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"It may be safely stated that the climatic conditions of Bengal are generally more favourable than up-country. This means a longer and heavier rain-fall, with a corresponding longer period of growth. The grey silt areas, too, usually consist of fairly rich soil, so that these two factors should and do produce a heavier-yielding crop than in most other provinces, provided ordinary care taken with cultivation. Irrigation too, usually a fairly expensive business, is generally not required over the major part of the province, as the rain-fall, both in incidence and amount is suficient for the needs of the crop." অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম ভারতের জমি অপেক্ষা বাংলার জমি আক চাষের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। বাংলায় বৃষ্টি বেশী; জমি ভাল; বাংলার আকের জমিতে জল সেচনের প্রয়োজন নাই; উত্তর-পশ্চিম বা যুক্ত-প্রদেশে জল-সেচনের খুব প্রয়োজন হয়; বাংলায় সে একটা বড় খরচ নাই। ফল কথা বাংলা দেশের অনেক জমিতে, বিশেষতঃ উত্তর-বঙ্গে এবং মধ্য-বঙ্গে, যথেষ্ট পরিমাণে উৎকৃষ্ট ইক্ষু জন্মিতে পারে এবং যত্নের সহিত আবাদ করিলে ভারতের কোন প্রদেশ অপেক্ষা বাংলার জমিতে কম ইক্ষু উৎপন্ন হইবে না, বাংলার মাটীতে সোণাই ফলিবে।

কৃষি বিভাগের দ্বিতীয় রিপোর্টে দেখা যায় যে, বাংলা দেশে বর্ত্তমান ইং ১৯৩৩-৩৪ সালে (বাং সন ১৩৪০ সালে)

মোট ২৫৩৬০০ একর (প্রায় ৭ লক্ষ ৬০ হাজার বিঘা) জমিতে আকের আবাদ হইয়াছে। প্রতি জেলার হিসাব এই :—

জেলা	একর	বিঘা
চব্বিশপরগণা	২৫০০	৭,৫০০
নদীয়া	৯২০০	২৭,৬০০
মুর্শিদাবাদ	২৯০০	৮,৭০০
যশোহর	৩২০০	৯,৬০০
খুলনা	৫০০	১,৫০০
বৰ্দ্ধমান	৭২০০	২১,৬০০
বীরভূম	৮৬০০	২৫,৮০০
বাঁকুড়া	৩১০০	৯,৩০০
মেদিনীপুর	৫৪০০	১৬,২০০
হুগলী	৩১০০	৯,৩০০
হাওড়া	৪০০০	১২,০০০
রাজসাহী	১২০০০	৩৬,০০০
দিনাজপুর	৩৫১০০	১,০৫,০০০
জলপাইগুড়ী	৫০০০	১৫,০০০
দার্জ্জিলিং	৩০০	৯০০
রংপুর	২৬০০০	৭৮,০০০
বগুড়া	৬০০০	১৮,০০০
পাবনা	৪২০০	১২,৬০০
মালদহ	১৮০০	৫,৪০০
ঢাকা	২৪৬০০	৭৩,৮০০
ময়মনসিং	২৪৬০০	৭৩,৮০০
ফরিদপুর	১২৩০০	৩৬,৯০০
বাখরগঞ্জ (বরিশাল)	৪২০০০	১,২৬,০০০
চট্টগ্রাম	৬০০০	১৮,০০০
ত্রিপুরা	১৩০০	৩,৯০০
নোয়াখালী	১৬০০	৪,৮০০
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	১১০০	৩,৩০০

মোট একর— ২,৫৩,৬০০

বিঘা— ৭,৬০,৮০০

বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিং, ফরিদপুর, নদীয়া, বৰ্দ্ধমান, বীরভূম, রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর মোটামুটি এই কয়েকটী জেলায় আকের আবাদ বেশী হয়। বাখর-গঞ্জ বরিশাল, জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; তারপরে দিনাজপুর, তারপরে রংপুর।

যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও বিহার হইতে এখন বাংলায় আকের আবাদ কম। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যেমন, বাংলায়ও তেমনি, আকের আবাদ কম হওয়ার কারণ চিনির ব্যবসা ধ্বংস হইয়া যাওয়া। পাটের চাষ প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরে, আকের আবাদ অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা দেশে আরও কম হইয়া গিয়াছে। আকের জমিতে পাট হয়; ধানের জমিতেও হয়। শর্করা-শিল্প রক্ষার জন্য নূতন আইন পাশ হওয়ায় এবং পাটের মূল্য বর্ত্তমানে অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় আবার বাংলায় আকের আবাদ একটু করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে।

বাঙ্গালী চিনি প্রস্তুত করে না, কিন্তু বৎসরে প্রায় ৫ ৬ কোটী টাকার চিনি ব্যবহার করে। এই টাকাটা বাংলার বাহিরে চলিয়া যায়। এ ক্ষতি সহজ নয়; অথচ এ ক্ষতি নিবারণের উপায় আছে। বাংলায় আক চাষের উপযোগী যথেষ্ট জমি আছে; কোনও প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা দেশের জমিতে আক কম উৎপন্ন হওয়ার আশঙ্কা নাই; খরচও অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বেশী পড়িবেনা; শর্করা-শিল্প রক্ষার নূতন আইন হওয়ায় চিনি প্রস্তুত করার যথেষ্ট সুযোগও হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও যদি বাঙ্গালীরা ঘুমাইয়াই থাকে, নিতান্ত অবহেলা করিয়া যদি তাহারা এ সুবিধা গ্রহণ না করে এবং প্রতি বৎসর এমনি করিয়া কোটী কোটী টাকা ঘর হইতে বাহির করিয়া অন্যের পকেটে ঢালিতেই থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যের শেষ সীমা-রেখা এখনও অনেক দূরে। বাংলার অর্থশালী সম্প্রদায়ের যেমন এ সুযোগ ছাড়িয়া না দিয়া, আগ্রহের সহিত এ দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত, তেমনি বাংলা গভর্ণমেণ্টেরও এদিকে সত্যিকার আগ্রহের সহিত মনোযোগী হওয়া উচিত। বাংলার কৃষি-বিভাগ কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে আকের আবাদ বাড়ে; পাটের বর্ত্তমান মূল্যে পরিশ্রমের দামও পোষায় না বলিয়া আকের আবাদ কিছু কিছু বাড়িতেছেও। কিন্তু এই বৃদ্ধির ক্রম রক্ষা

করিতে হইলে এবং বাংলার শর্করা-শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, পাটের চাষ নিয়ন্ত্রিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। পাট বাংলার একচেটিয়া সম্পত্তি; কিন্তু বাংলার কৃষক তাহার এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাদের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। অধিক লোভে কৃষকেরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আবাদ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। পৃথিবীর প্রয়োজন কত মণ পাট, তাহার অনুমান করা কঠিন নয়; সেই হিসাবে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষিত হয়, আকের আবাদও বেশী হয়। আকের আবাদ বেশী হইলেই বাংলায় শর্করা-শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হয়। তাহা না হইলে, সুচতুর ব্যবসায়ীরা নিজেদের প্রয়োজন মত যখনই একটু চড়া দরের প্রলোভন দেখাইবে, তখনই বাংলার কৃষক আকের আবাদ ছাড়িয়া দিয়া নিজের উঠান চষিয়া পাট আবাদ করা আরম্ভ করিবে। উপদেশে লোভ সহজে খাটো হয় না, তাহা দেখা গিয়াছে; কাহারও হয় না, কৃষকেরও হয় না। উপদেশের দ্বারা পাটের আবাদ কম করার জন্য অনেকেই যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; ফল হয় নাই। বিগত বৎসর এরোপ্লেনের সাহায্যে উপদেশের ইস্তাহার পুষ্প-বৃষ্টির মত নির্ব্বিচারে এবং অকুণ্ঠ-হস্তে কৃষকদের শিরে বর্ষিত হইয়াছিল। কোন ফল তো হয়ই নি, বরং গত বৎসর পাটের আবাদ আরও বেশীই হইয়াছিল। পাট-চাষ নিয়ন্ত্রনের জন্য যে কমিটী হইয়াছিল, তাহাতে নানা মুনির নানা মত হওয়ায় ফল কিছুই হয় নাই। সুতরাং, আর কমিটী না করিয়া গভর্ণমেণ্ট সরাসরি এই কার্য্যে অগ্রসর হইলেই সুফলের আশা করা যাইতে পারে।

নববর্ষ

শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

এস নববর্ষ! ভুলাইয়া অতীতের স্মৃতি,
মুছাইয়া বেদনার তপ্ত অশ্রু-জল।

এস, নব বেশে, নব সাজে সাজি,
আন, আশাহীন বুকে নব নব বল।

আজ সারা বিশ্ব নব পত্রে নব পুষ্পে ভরা
ঝরিয়াছে অতীতের শুষ্ক পত্র ফুল,

মর্ম্মর ধ্বনিতে আজ নব গান উঠে
দুর্ব্বল মানব তবু, কাঁদিয়া আকুল।

চাহিয়া বিশ্বের দিকে প্রকৃতির পানে,
ভুলে যাও অতীতের সব দুখভার।

যে বরষ চলে গেছে দুখ দিয়া প্রাণে
বৃথা তারে টানি কেন কর হাহাকার।

আসিয়াছে নববর্ষ পরি ফুলহার—
এস, নব প্রাণে তাঁরে করি নমস্কার।

আই-হ্যাজ (I has)

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৫

বেলা তিনটের পর দুর্গানাম করতে করতে বেরুলুম। নীচে নাবতে দু' তিনজন দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম করলে। আমি সোজা এগিয়ে পড়লুম, কেউ একটি কথাও কইলেনা, বাধাও দিলেনা। খানিক এগিয়ে গিয়ে পেছনে ফিরে দেখলুম—না কেউ আসেনি।

মুকুন্দবাবু বাইরের রোয়াকটায় গুণপেতে বসে ছিলেন। চোখে পেতলের ফ্রেমের চশমা, পশ্চাতে দড়ি বেঁধে control করেছেন। সামনে জীর্ণ একখানা 'যোগবাশিষ্ঠ' খোলা রয়েছে। এক মাগী ঘুঁটে গুণে স্তূপাকার করছে, বাজরা প্রায় খালি। তার সঙ্গে গুণ্‌তির ভুল ধরে তকরার করছেন। সে প্রত্যেকবার পাঁচখানা করে তুলছিল,—'এক-পাচ' নাকি ফাঁকি দিয়েছে। সে বলছে, "না বাবু ঠিক্ আছে";—বাবু বলছেন "না ভুল করেছিস"। সেই হাঁ আর নার মধ্যে আমি উপস্থিত।

আমাকে দেখেই শশব্যস্তে যেন সভয়ে বললেন—"ওই ঘরটায় গিয়ে বসুন—জানলাটা ভেজিয়ে দেবেন। —ঘুঁটেগুনো পাল্‌টে গুণিয়ে আসছি।"

বললুম,—"পাঁচখানার মামলা বইতো নয়, আর পাল্‌টে গোণানো কেনো?"

"ওই বুদ্ধিতেই তো,...যান বসুন গে।" ভাবটা—বাইরে আর দাঁড়াবেন না।

প্রকৃতিটে জানাই ছিলো,—'কেমন আছি কখন এলুম' জিজ্ঞাসার ভদ্রতা না পেলেও, ক্ষুণ্ণ বা বিরক্ত হবার কারণ ছিলনা। পুরোনো লোক,—মানুষ ভালো।

ঘুঁটেউলি বেচারিকে পালটে আবার গুণতেই হল এবং ভুলটা মুকুন্দ বাবুরই প্রমাণ হল। তার পয়সা চুকিয়ে, যোগবাশিষ্ঠ আর গুণখানা হাতে করে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই—

—"কেমন তখুনি বলেছিলুম—ওই কেলে ছোঁড়াকে আমল দেবেন না। আপনি বললেন—আনন্দ মঠের শেষ পরিণাম বুঝতে চায়,—তাই...।—এখন পরিণামটা সে বুঝবে, না আপনি?"

তাঁর মুখের ভাব দেখে, হেসে ফেললুম,—বললুম "মাইকেল লিখেছেন—"গ্রহ দোষে দোষী জনে"...

তিনি জ্বলে-উঠে বললেন—

"রাখুন আপনার সাহিত্য, আমাকে ওসব শোনাবেন না। আমার গ্রহ দু'বেটাও বাড়িতেই বসে' থাকে, আবার ভবানীরাও আছেন। তাঁরা আসায় বুঝেছি—ও-জিনিষের একটা পেল্লেয়ে মোহ আছে।—সাড়ে তিন বছরে বাড়ী যেন মেট্‌কাফ-হল বানিয়ে বসেছে। তাতে না আছেন দাশুরায়, না আছেন অন্নদা মঙ্গল, আছেন—'খিড়কি দোর', 'গবাক্ষ-মঙ্গল'—নমস্কার আপনাদের সাহিত্যে..."

বললুম "বউমা'রা কেমন?"

বললেন "তা বেশ, একদম মিলিটারী—দিশি মার্কা বিলিতি, এসেই সব ছেলে কোলে করেছেন—আবার হাতের পাঁচ! কাশীর জল-হাওয়া আর বিশ্বনাথের কৃপা।"

বললুম "তখন তো সার্দ্দা বিল পাশ হয়নি—তবে..."

বললেন—"লোকটা খুব বুদ্ধিমান গো—নিশ্চয়ই তাঁর ছেলে-পুলে অনেক; ধাড়ি না হলে বেটাদের সামলাবে কে? ছেলেদের জেলের বাইরে রাখবার—নান্য পন্থা। সে কি সাধে বয়েস বাড়িয়েছে। লোকটা চতুর বটে। মহাশয়রা কি দয়াই করেছেন, দু' বেটাই বাড়ী থেকে আর নড়েনা, বাজার আমাকেই করতে হয়। বেটারা বিলিতির বাতাস সইতে পারতোনা,—পুত্তুর অলষ্টার বানালে, গায়ে দিলেনা—বললে বিলিতি সুতোর সেলাই! শেষ দিশি টাট্টু ঘোড়ার বালামচি ছিঁড়ে তাই দিয়ে শেলাই করিয়ে গায়ে দিলে। বাড়াবাড়ি কি কম্! মগন্ লালের ঘোড়াটা বেঁড়ে হয়ে গেল,—তাকে দশটাকা দিয়ে মেটাই।

বললুম—'এখন'?

"এখন ওদের ঘরে যদি এক পয়সার দিশি জিনিষ পান আমার কাণ মলে দেবেন, অবশ্য পৈত্রিক রংটা ছাড়া। এখন সব ম্যাকেসর্ মাখেন, হোয়াইট্ রোজ শোঁকেন, ওভালটিন্ খান, টমেটো না হলে চলেনা। তবে আপনাদের সাহিত্যের আর কবিত্বের বলিহারি,—দেশকে এতো মিথ্যেও শেখান্! ওই নামগুলো আমার পছন্দ হয়না। একজন রেণুকা আর একটি লতিকা, অর্থ বোধে অনর্থ ঘটায়, সামঞ্জস্য পাইনা। যাক্—তাতে ভালই হয়েছে; Law of Gravitation এ ছেলে বেটাদের লম্ফোtion ঘুচেছে—যখন তখন বাড়ি ছেড়ে লম্বা হওয়া আর নেই। এখন তাঁরা 'চরণ ছাড়িয়ে কথা কও' বললেও,—বেটারা নড়েনা।"

এসব শুনে কেউ ক্ষুব্ধ বা অভদ্র মনে করবেন না, সে-কালের লোকের কথা-বার্ত্তাই ছিল এই রকম।

বললুম, "তা হলে আছেন ভালো?"

বললেন, "হ্যাঁ—গেলেই বাঁচি। অসদুপায়ে উপার্জ্জনের টাকা,—তাই আজো দাঁড়িয়ে আছি। কুচো বংশধরেরা ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে ফি মাসে—all-wool সোয়েটার, মোজা আর ক্যাপ্ কিনতেই ফতুর করলে। হঠাৎ দেখলে সেগুলোকে ভেড়ার বাচ্চা বলেই মনে হয়। আবার নাকি আসছেন,—Welcome,—কাশীবাস সার্থক হক্।"

হঠাৎ চম্‌কে উঠে বাইরে বেড়িয়ে দেখে এলেন। বললেন "ওসব কথা চুলোয় যাক্, আপনার খবর বলুন। আর বলবেনই বা কি—ওতো জানাই ছিলো। তবে দুঃখু হয়, আপনার মত নিরীহ সহৃদয় লোক্ কোনো কিছুতে না থেকেও···আমি তো সব জানি, কিন্তু শুনবে কে? দেখুন-দিকি—মিছিমিছি এই দুর্ভোগ কেনো ডেকে আনা। ডেকে-আনা বোলবো না তো কি? কাশীবাস করতে এসে গরীবদের ছেলে পড়াবার মাথা ব্যথাই বা কেনো?—যারা ইট বইবে, বিড়ি পাকাবে, তাদের পড়া-শোনার দরকারই বা কি? কাশীতে পয়সা দিয়ে একটা মজুর মেলেনা। ভিক্ষে করবে তবু কাজ করবেনা, এ আমার দেখা। কোত্থেকে যে আপনাদের উলটো বুদ্ধি আসে! তাই না 'কেলে' সুযোগ পেলে। বয়সই হয়েছে—দেশটাকে তো বুঝলেননা। বৈঠকে বৈঠকে শুনতে পাবেন—"আমার জন্মভূমি"—সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটের শ্রাদ্ধ, চপ আর চা। নির্ল্লজ্জ! বলে দিশি সিগারেট উঠেছে। উঠবে বইকি; না উঠলে যে রাধা বাঁচেনা। বুদ্ধিমানেরা সুযোগ ছাড়বে কেনো? এই তো সাধুদের কারবারের সময়। এই আমার দেশ!···"

আবার বাইরে গিয়ে দেখে এলেন।

বললুম "ও-সব আর কেনো শোনাচ্ছেন। আমি তো ও-সব কোনো দিনই seriously ভাবিনি,—আপনি তো দেখ্‌ছি অনেক ভেবেছেন। হ্যাঁ—কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তার উত্তর দিতে হয় বটে। জানেন তো—ছেলেদের ভালোবাসি, তাদের ক্ষুন্ন করতে পারিনা; আর ভালোবাসি—সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া। এ যদি অপরাধ হয়, নিশ্চয়ই অপরাধী—সেটা অস্বীকার করছিনা। তবে একটা কথা বুঝেছি,—আপনারা স্বদেশী বলতে যা বোঝেন, সে সব ছেলেরা তার দিক দিয়েও যায়না। মানুষের একটা নেশাই যথেষ্ট, কারণ নেশা মানে প্রেম। তার দুটোর অবকাশ নেই। যে সাহিত্য-পাগল তাকে সন্দেহ করবার চেয়ে ভুল আর নেই।"

বললেন,—"আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আমি যেন বুঝলুম। রস তো একটা নয়, যাদের অন্ন রসের কারবার যে-রস তাদের রস যোগায়—তারা বুঝবে কেনো?"

বললুম "সেখানে ভাগ্যকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় আছে কি?"

একটু নীরব থেকে বললেন—"এ বয়সে যে···

বললুম "কি হয়েছে যে আপনি এত ভাবছেন সকলেই মানুষ, মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করি।"

বললেন,—"তবে যাক ও-কথা—অত শ্রদ্ধায় শ্রাদ্ধ না গড়ালেই হল। চিটিতো পেয়েইছেন। বাসার শূন্যতা মূল্য হিসেবে ভাড়া গুণে আর কি হবে, তাই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।"

"ভালই করেছেন। এখন কাশীবাস যদি করতে হয়—নিখর্চ্চায় চলবে। বইগুলোও কি···"

"না চোরে নেয়নি, গোরে গেছে—পাঁচ না ছ' সিন্দুক মাটি আর উই পেলুম।"

বললুম,—"যাক্ কাশী পেয়েছে তো—বাঁচিয়েছে, শে

পর্য্যন্ত ফেলতে পারতুম না। (বুক-ভাঙা শ্বাসটা কিন্তু চাপতে পারলুমনা) সুখে দুখে সঙ্গ ছাড়েনি। যাক্, ওদের মারে কে, জগৎ জুড়ে আছে, থাকবেও।"

সন্ধ্যে হয়ে গেল, কথা কইবার মত মনোভাব উভয়েরি কমে গেল। বিদায়ের কথা কইতে মুকুন্দবাবু কথা খুঁজে না পেয়ে বললেন—"আমার দ্বারা যদি কিছু···আমি হলফ করতে প্রস্তুত আছি।"

বললুম—"আমাকে ঐ যা দিলেন ওর চেয়ে বেশী কিছু আমি চাইনা, ওর চেয়ে বড় কিছু নেইও।—আপনাদের মঙ্গল হোক্।"

প্রণাম করলেন। বেরিয়ে পড়লুম। হেঁকে বললেন "নন্দকুমার খানা।" বললুম—"ফিরে এসে।" দেখি চোখ মুছচেন!

সবার চেয়ে মানুষ বড়, সে দেখা না দিয়ে পারেনা। প্রায়ই সন্ধিক্ষণে সে বেরিয়ে পড়ে।

৩৬

ত্যাগ করেছি বললেই ত্যাগ হয়না—প্রিয় যে, সে অলক্ষ্যে অন্তরের কোন্ নিভৃতে যে বাসা বেঁধে অবসরের অপেক্ষায় থাকে কেউ বলতে পারেনা। ফউষ্ট্খানা ফুট্ কাটলে! গ্যেটেও যাবেনা, ফউষ্টও যাবেনা, কিন্তু Noteগুলো?—যাক্—পেন্সিলের দুটো আঁচড়ের ওপরও মানুষের এত মমতা-বুদ্ধি!—পৃথিবীতে এসে, দেখছি, কোনো জন্মেই, কারুর মুক্তি নেই,—মোহ-মমতাই বারবার ফেরাবে?

গরুগুলো সারাদিন এ-মাঠ ও-মাঠ ঘুরে সন্ধ্যের সময় ঠিক গোয়ালে গিয়ে ঢোকে। আমিও দেখি, কোনো দিকে না চেয়েও এবং অন্য চিন্তায় অন্যমনস্ক থেকেও—গুরুগৃহে ঠিক্ পৌছে গেছি। দু'চার জন দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম করলে,—কি নির্ম্মম পরিহাস! মানুষকে আঘাত করবার কত রকম অস্ত্রই আছে! সম্মান দেখানোটাও অবস্থান্তরে প্রয়োগভেদে অন্তর্চ্ছেদে অসীম শক্তি ধরে। এতবড় বুদ্ধির পরিচয় এক মানুষই দিতে পারে!

ধীরে ধীরে ঘরে উপস্থিত হয়ে দেখি, প্রভু একাই রয়েছেন। সামনে একখানি দোহারা গোছের বই খোলা, দৃষ্টি তাতেই আবদ্ধ। আমি ঢুকতেই 'আসুন' বলে দাঁড়িয়ে উঠলেন। হাসি পেলে,—বললুম—"উত্তর-মীমাংসা বুঝি?"

—উত্তর-মীমাংসা?

হাসতে হাসতেই বললুম—"পেনাল-কোডের রাশ্-নাম না?" কথাটা মুখ থেকে বেরুতেই, তার রূঢ়তায় নিজের অন্তরটা ছি ছি করে উঠলো। যাঁকে স্মরণ হলেই শিউরেছি, আজ এতটা বিস্মৃতি—যা সহজ ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে,—কে এনে দিলে?

তাঁকে নীরবে একটু ম্লান হাসির চেষ্টা করতে দেখে, বললুম—"মাপ করবেন,—যাদের সঙ্গ, এত দুঃখ-কষ্টেও আনন্দে রেখেছিল, সেই ৫।৬ সিন্দুক বইও আমাকে অসহায় করে চ'লে গিয়েছে শুনে মনটা বেদনা-বিক্ষিপ্ত ছিল, কিছু মনে করবেন না। অতিষ্ঠ ও উত্ত্যক্ত অবস্থায় দিনগুলো বৃথা কাটছে—তাতেও অমানুষ করে ফেলেছে।"

বললেন,—"আপনার অত কুণ্ঠিত হবার কোনো কারণ ঘটেনি,—বেসুরো কথাও কননি। তবে সত্যটা অপরাধীদের লজ্জাও দেয়; আঘাতও করে। পিনাল-কোড (Penal code) ভাবা তো আপনার তরফ্ থেকে ভুল হয়নি।"

দেখি—বইখানা শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীকৃত গীতার ব্যাখ্যা।

বললেন—"আশ্চর্য্য হচ্ছেন বোধহয়?"

বললুম—"হওয়া তো উচিত ছিলনা।"

একটু চুপ করে থেকে বললেন—"আহারাদির পর কথা হবে—অনেক কথা আছে।"

বললুম, "বৃথা কষ্ট পাবেননা, আমার বলবার কিছু নেই,—স্বপক্ষেও না।"

হাস্যমুখে বললেন—"বেশ,—শুনতে আপত্তি নেই তো।"

বললুম—"আমি চিরদিনই সহিষ্ণু শ্রোতা। কেহ না ক্ষুণ্ণ হন—সাধ্যমত সেই চেষ্টাই পেয়ে এসেছি।"

বললেন—"আজ তার পরীক্ষা দিতে হবে।"

* * * *

আহারান্তে চাকর (যে সব মূর্ত্তির সঙ্গে শেষ-মুহূর্ত্তে দেখা হয় শুনেছি, যেন তাদেরি মডেল্) তামাক দিয়ে গেল।

কর্ত্তা উঠে ঘরের দোর-জানালা বন্ধ করলেন। হাসতে হাসতে বললেন—"এইবার আপনার সহিষ্ণুতার পরিচয় পাবো…"

বললুম,—"বেশ, আরম্ভ করুন।"

বললেন—"আমাকে বন্ধু ভাবতে আপনার আপত্তি আছে কি?"

আশ্চর্য্য হয়ে বললুম—"ও সম্বন্ধটা তো এক-তরফা হয়না, ভাষার ওপরও দাঁড়ায়না,—অন্তরের অনুমোদন-সাপেক্ষ। আমি এখন resigned man (বাতিল-দাবী-শূন্য লোক) আপত্তি বা সম্মতির অর্থ আর আমার কাছে নেই,—এখন দুই-ই সমান। এই পর্য্যন্ত বলতে পারি—আমি আপনার শত্রু নই,—আপনার বিপক্ষে আমার কোনো নালিস্ নেই…"

আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—"এটা আপনি সত্য বলছেন না…"

বললুম—যে "যে-কাজের জন্য নিযুক্ত, সে তার নির্দ্দিষ্ট ধারা বা আদেশ মত কর্ত্তব্য করতে বাধ্য;—জীবনোপায় বা প্রতিষ্ঠা যে তার তাতেই রয়েছে,—অন্যায়টা কোথায়?"

একটু হাসি টেনে বললেন—"সবটা বললেন না।"

বললুম—"মনের অগোচরই যদি নেই,—থাকবার কথাও নয়,—'ইন্দ্রিয়ানাম মন শ্চাস্মি যে'…তবে বৃথা আমাকে দিয়ে বলানো কেনো?"

বললেন—"তবু শুনতে ইচ্ছে হয়—"

বললুম,—"বেশ, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলতে পণ্ডিতেরা নিষেধ করেছেন। কেন যে করে গেছেন—এ জীবনে তার পরীক্ষাও অনেক হয়ে গেছে। নাই বা শুনলেন।"

জেদ করায় বললুম,—"মানুষ জ্ঞানে কি বুদ্ধিতে নিজে ছোট হতে চায়না বা নিজেকে ছোট স্বীকার করতে চায়না। চাইবে কেনো? চাইতে সে যে পারেনা;—সত্যিই যিনি বড়, তিনি যে সবার মধ্যে রয়েছেন। তাই এটা অস্বাভাবিক নয়। ভুলের বেলাও তাই। সেটা স্বীকার করতেও সহজে কেউ চায়না। ভুল যিনি স্বীকার করেন, তিনি মহৎ। যিনি তা করতে চান্না, তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষার্থে ভুল বজায়ের জেদ ধরেন, তাতে ক্রমেই অকারণ আক্রোশ বাড়ে। বুদ্ধি তখন বিপথে গিয়ে পড়ে অনিষ্টই করায়;—এটা আর মনেই আসেনা, নির্দ্দোষীর তাতে যে কি সর্ব্বনাশটা করা হচ্ছে। অহং সেটা বুঝতে দেয়না।—ভুল দিয়ে ভুল শোধরানোও যায়না। ক্ষমতার জোরে, জেদ্ মিটিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করা চলে বোধ হয়। ঠিক বলতে পারিনা, সেটা শেষ পর্য্যন্ত ট্যাকে কি না, প্রাণ সমর্থন করে কি না।—যাক্ আমার তো কথা কবার কথা নয়, শোনবার কথা। বলুন কি বলবেন"…

সহাস নেত্রে চেয়ে বললেন—"বেশ লাগছিলো,——বড্ডো হাতে রেখে বলছিলেন কিন্তু…"

(মুখের দিকে চাইলুম) বললুম—"আমার হাতে থাকলেও, আপনার মন তো ফতুর হয়নি, সেখানে জমা ঠিকই পাবেন।"

বললেন—"আর বলবেন না?"

বললুম—"না, যেহেতু সে সব আপনার অজানা নয়। মানুষ সকল জীবের সমষ্টি হলেও—মানুষ মানুষই,—কেবল সামঞ্জস্য বোধেই এই তারতম্য।"

কয়েক সেকেণ্ড আমার দিকে চেয়ে, শেষ বললেন, "তবে শুনুন—সংক্ষেপেই বলবো—"

—"বাবা ছিলেন ফৌজদারী আদালতের নামজাদা উকীল—সঙ্কট-তারণ। হয় কে নয়—নয় কে হয় করা ছিল তাঁর বিলাসের মধ্যে। আমি তাঁর মধ্যাহ্ন-প্রাখর্য্যের শুভক্ষণে জন্মাই,—প্রথম সন্তান। কি পড়া-শোনায়, কি মার-পিটে, কি সাহসে, কি শক্তিতে, কি কূট বুদ্ধিতে—সহপাঠিদের সর্দ্দার দাঁড়িয়ে যাই। বাবার বলা ছিল—আমার ছেলে হয়ে হেরে এসেছে—এটা না আমাকে শুনতে হয়।—তা হয়নি।

—"Boisgoby, Gaborioর বই খুঁজে খুঁজে আনতুম। ডিটেকটিভ্ নভেল ছিল আমার প্রিয়-পাঠ্য। লিকো, সারলক্ হোম্স্ আমার উপাস্য ছিল। তাদের বুদ্ধির কসরৎ আমাকে লুব্ধ ও মুগ্ধ করতো। যখন 1st Yearএ পড়ি, তখন থেকে ওই বিভাগে ঢোকবার জন্যে চেষ্টা পাই, কিন্তু বয়েস কম বলে কমিশনার সায়েব অপেক্ষা করতে বলেন। বাবা আশ্বাস দিয়ে বললেন—Scotland Yardএ পাঠাবার সুযোগ খুঁজছি,—ও-একটা মস্ত art, হাতে-কলমে শেখা দরকার। কিন্তু চাকরি

নিওনা, ইচ্ছা হয়—প্রাইভেট এমেচার থেকে কাজ কোরো,—তাও হয়। আমার ইচ্ছাও ছিল তাই।

বাবা একদিন হঠাৎ কোর্টেই in harness, heart-fail হার্ট ফেল্ করে মারা গেলেন,—হাজার চল্লিশ টাকা রেখে।

Scotland Yardএর কথাও থেমে গেল। কমিশনার সায়েব আমাকে ছেলের মত ভালবাসতে লাগলেন। তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ মত প্রাইভেট্ (Private) থেকেই কাজ আরম্ভ করলুম। তাঁর ছাড়-পত্র আমাকে সর্ব্বত্রই সকল প্রকার সাহায্যের অধিকারী করে দিলে। সাত মাসের চিন্তা-চেষ্টায় একটা ভয়ঙ্কর জটিল রহস্যোদ্ঘাটন করে' দেওয়ায়, আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গেল। Private হলেও, বিশিষ্টদের মধ্যে স্থান পেলুম,—গতি অবাধ হল', মতের মূল্য বাড়লো।—

"তার পর অনেক কাজই করেছি—যার ভাল-মন্দের জন্যে আমিই দায়ী, কারণ আমি Private। উচ্চ পদে পাকা চাকরি নেবার জন্যে কয়েকবার প্রস্তাব এলেও আমি বাবার ইচ্ছামত privateই আছি,—বেতন-বদ্ধ হইনি। কমিশনার সায়েব—ভালোবাসতেন, তাঁদের নির্লিপ্তই রেখেছি। যা করি নিজেই। দায়িত্ব আমার।—

"ভগবান এতটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়েছেন—জগৎকে একটা কিছু দিয়ে যাবই। অভিজ্ঞতা আর চিন্তা মিশিয়ে এ কাজের five vital principles—পঞ্চ মোক্ষম নীতি আবিষ্কার করে ফেললুম,—যা ধরে' চললে মোটামুটি অনেক কিছু সমাধান হয়,—বেরিয়ে পড়ে। যথা—

(১) সবাই মিথ্যা কথা কয়,—সাধুতা একটা ভান মাত্র।—ঠকাতে পারলে কেউ ছাড়ে না, কারুর কিছু হাত লাগলে, স্বইচ্ছায় কেউ ফিরিয়ে দিতে আসে না বা দেয় না।

(২) সুবিধে পেলে সবাই চুরি করে। ফাঁকি দেয়।

(৩) টাকার চেয়ে ধর্ম্ম বড় নয়, লোকের প্রাণও বড় নয়।

(৪) মারের চেয়ে অসুধ নেই। ভূত পালায়—

(৫) নিজের সম্মানকে ছোট হ'তে দিতে কেউ চায়না। অপরকে প্রশংসা করতেই যদি হয় তো অনেকখানি হাতে রেখে করা, নিজেকে খাটো কোরে না ফ্যালা হয়,..."

প্রভুর সকল ইন্দ্রিয়ই খুরধার। আমি অতিষ্ঠ হয়েছি লক্ষ্য করে বললেন—

"আপনি নিজেই বলেছেন—সহিষ্ণু শ্রোতা।"

বললুম—"আমি অতি দুর্ব্বল-চিত্ত,—নতুন করে কিছু শেখবার আগ্রহও নেই, বয়সও নেই; শিখে আর এখন ফলও নেই। আপনার মস্তিষ্ক শক্তিশালী, তাই ভয় হয়—পূর্ব্ব ধারণাগুলো যদি ওলট্-পালট্ হয়ে যায়,—আমার দুকুলই নষ্ট হবে। আপনি জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ দিয়েছেন যে সব চরিত্র অনুসরণে, অথবা যে সব চিন্তায় বা কার্য্যে কাটিয়েছেন যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে, তা নিয়ে বিশ্বের বিচার চলে কি? সেটা মানব-সমাজের একটা রোগদুষ্ট বা ব্যাধিগ্রস্ত অংশ নয় কি?"

বললেন—"আপনার নিজের সম্বন্ধে ভয়টা আমি মেনে নিলুম। কিন্তু আমার সম্পর্কে যা বললেন তা মানতে পারিনা,—প্রত্যক্ষকে অবিশ্বাস করতে পারিনা। আপনি যাদের কথা বললেন—তাদের নিয়ে থাকে সাধারণ পুলিস বিভাগ,—নূতন ব্রতিদের হাতেখড়ি তাদের নিয়েই বটে,—চোর জোচ্চোর চুনো-পুঁটিদের নিয়েই তাদের কাজ। বড়দের কাতলা নিয়ে কাজ—যা বড় বড় পদ্ম-ঢাকা ঝিলে বেড়ায়। দেশ বোঝে না যে তাদের জন্যেই...(হঠাৎ থেমে)—তাদের নিয়েই বড়দের প্রধান কাজ। তাদেরই রহস্যোদ্ঘাটনে আনন্দ আছে, risk ও বিপদও কম নেই। শিক্ষিতদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুখও পেতুম।"

মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—পেতুম?

অন্যমনস্ক ভাবে বললেন—"বোধ হয় তাই।—

দেখুন ছোটর প্রভাবই দেখছি এখন বেশি, তারা মোড় ফেরায় সহজে,—চৌঘুড়িতে সে সুবিধে নেই।

একটু উদাস দৃষ্টিতে নীরব থেকে বললেন—জগতের সকল কাজের মূলেই নেশা। নেশায় না পেলে—'বেতার'ও বেরুত না, 'উড়ো জাহাজ'ও পেতেন না। কিন্তু ছোটগুলো নজরের বাইরে পড়ে' যায়—তুচ্ছ হয়ে যায়। বড়র যে বুদ্ধির ওপর সনাতন দাবী র'য়েছে। তাই বড় নিয়ে থাকতেই তারা ভালোবাসে।

—"নেশায় অজ্ঞানও আনে, সুতরাং ভুলও করায়। ছোট ছোট বিষয়ে তা কত করে থাকবো জানিনা। নিজের কাছে ধরা পড়লেও exceptionএর কোটায় ফেলে দিতুম,—সে চিন্তায় সময় নষ্ট করতুম না। ও দৌর্ব্বল্য রাখলে চলেনা—set principle ধরে—নীতি মেনে কাজ করা হলেই হ'ল।"—

থেমে জিজ্ঞাসা করলেন—"ঘুম পাচ্ছে ?"

বললুম—"বলেছি তো সেটা সাত বচর নেই, এই-বার গ্যালও বোধ হয় জন্মের মত। আরো আছে নাকি ?"

বললেন—"১৮ বছরে থাকাই তো সম্ভব, তবে সখের কাজে discount থাকে। সাফল্যের গৌরব আর আত্মপ্রসাদ ছাড়া লাভ বা লোভের ত' কিছু ছিল না। যাক্ সে কথা।"

—"জানেন তো জগতে নিজের মাথাই ধরে, আর কারুর ধরে না,—তারা সব মিছে কথা কয়। না ?"

চুপ করে রইলুম।

—"আমার ভাইপো ম্যাট্রিক দেবে,—হরেন বলে একটি ছেলে তাকে পড়াতো। সে মায়ের একমাত্র ছেলে, বড় গরীব, B. A. Englishএ Honour. ছেলে পড়িয়ে নিজে এম-এ পড়ছিল। ভাইপোর পড়বার ঘরেই আমার পোষাক পরিচ্ছদ থাকতো। কোটের বুক-পকেটে আমার সোনার ফাউন্টেন্-পেনটাও clip লাগানো থাকতো—কমিশনার সাহেব প্রেজেন্ট কোরে-ছিলেন! একদিন সেটা দেখতে না পেয়ে পাতি পাতি করে খোঁজা হল, কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না।—এ হরেন ছাড়া আর কারুর কাজ নয়। কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকার করলে না, বললে—"আমি তো দেড় বছর আসছি—যাচ্ছি, আমাকে আপনার সন্দেহ করবার কারণ কি ?" আমি ও-বিষয়ের ওস্তাদ—expert, আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করে ? চেনে না ? আচ্ছা চেনাচ্ছি!—তৃতীয় দিনে ১২ বেত খাইয়ে দিলুম। পরদিন সকালে শুনলুম এসিড (acid) খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। যাক্—চোর কমাই ভালো। তবু—তার মাকে আমার বাড়ীতে এসে থাকতে বললুম। এলো না, পাগল হয়ে গেল, রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। আমার দোষ কি,—কর্ত্তব্যে দৌর্ব্বল্য—কাজের কথা নয়। ও-সব তুচ্ছ কথা ভাবাই বা কেনো।

আমার ভায়রাভাই বীমা কোম্পানীর এজেন্ট, দেড় মাস পরে রাজপুতানা ঘুরে এসে—কলমটা ফিরিয়ে দিলে!…"

শুনে চমকে উঠলুম,—আমাকে বিচলিত হতে দেখে বললেন,—

বলেছেন—"আমি সহিষ্ণু শ্রোতা।"

বললুম—কথাটা ঠিক হলেও শরীর আমার শক্ত নয়, নার্ভ (Nerve) বড় দুর্ব্বল,—ভাঙন ধরেছে—

বললেন—"বেশ, গল্প মনে করেই আমার বিষয়টা শুনুন না।"

চুপ করে রইলুম,—তিনি আরম্ভ করলেন—

—"পথে সাইকেল্‌টা একদিন বিগড়ে যাওয়ায়, নিকটে যে দোকানটা পেলুম, সেইখানেই সেটা ঠিক্ করতে দিলুম। কার দোকান বোঝবার জো নেই,—কয়েকটি লক্ষ্মীছাড়া—বাঙালীর ছেলে, বসে বসে বিড়ি ফোঁকে, আড্ডা মারে, হোটেলে খায়, সকলেই ওস্তাদ। তাদের ওপরেও নজর রাখতে হয়,—কারণ সন্দেহ জাগায়। আমি যে পোষাকে ছিলুম তাতে আমাকে চেনবার কোনো উপায়ই ছিলনা। এদিক উদিক ঘুরে, মিনিট পনেরো পরে—তাদের ছ'আনা মজুরি দিয়ে সাইকেলে চড়ে আরো পাঁচ জায়গা ঘুরে, চলে এলুম। কখনো কখনো আবশ্যক মত দিনে-রাতে সাতবার পোষাক বদলাতে হয়। তিনদিন পরে মনি-ব্যাগটার খোঁজ পড়লো। কোথাও পেলুমনা। ইতিমধ্যে পঞ্চাশ জায়গায় গিয়েছি, বসেছি—কোথায় ফেলেছি বা পড়ে গিয়েছে, ঠিক নেই।—

—"আমাদের দৃষ্টি সব দিকে, বিশেষ যেখানে সন্দেহ থাকে। দেখি সেই সাইকেলের দোকানে বড় বড় বাংলা ও হিন্দি হরপে লেখা একখানা বোর্ড ঝুলছে। এটা তো ছিলনা! লেখা—"কারো কিছু খোয়া গিয়ে থাকে তো, সে সম্বন্ধে ঠিক্ ঠিক্ বর্ণনা দিলে, এখানে পাবেন"। সেদিন আমি ছিলুম মাদ্রাজী, আজ কাশ্মীরি শাল বিক্রেতা। গিয়ে বললুম, আমার একটা চামড়ার কেস্ খোয়া গিয়েছে, তাতে ছিল আটখানা দশটাকার

নাট ৬ টাকা নগদ আর ইংরেজি লেখা আধ sheet চিঠির কাগজ।

ময়লা কাপড় আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরা একটি ১৮।১৯ বছরের ছেলে একখানা সাইকেলের অংশ খুলে পরিষ্কার করছিল। দ্বিরুক্তি না করে, কাজ ফেলে, কালি-ঝুলি মাখা হাতেই, দোকানে রাখা মাটির গণেশের পেছন থেকে ব্যাগটি এনে আমার হাতে দিয়ে,—মাত্র বললে 'দেখে নিন'। পরেই নির্লিপ্তের মত কাজে মন দিলে। আমি ঠিক্ ঠিক্ পেয়ে নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত! যারা আড্ডা দিচ্ছিলো তাদের একজন হাসতে হাসতে বললে—'সবই নিয়ে যাবেন'?—"এ থেকে যা ইচ্ছা নাও" বলে ব্যাগটা এগিয়ে ধরতে প্রথম ছেলেটি রুক্ষভাবে বলে'—উঠলো 'কি ছোটেলোকমি করচো,—আপনি যান মশাই।" আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথাও যোগালোনা। চলে এলুম। কিন্তু মস্ত চাবুক খেয়ে।—

"ভগবানকে স্মরণ করে আমার একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো।—এই ছেলেরাই আমার দেশের মূলধন,—

"কথা কইলেন না, আমার দিকে চাইলেন মাত্র। শেষ বললেন—"বিশুরা তিন ভাই, বাপ সাড়ে ছ'লাক টাকা রেখে মারা গেলেন। বিশু চরিত্রবান, ধর্ম্মপ্রাণ, মাতৃভক্ত। 3rd yearএ বি-এ পড়ছিল। বিবাহ করেনি। অন্য ভায়েদের সব দোষই ছিল—মাকে নিয়ে এক সংসারে থাকা তাদের পোষাবেনা। বিশু তাতে রাজি হলনা—শেষে জাল উইলের সাহায্যে বিশুকে বঞ্চিত করে তারা এখন বালিগঞ্জে বড়-লোক।

—"বিশু একবার যদি বলে—'সইটে বাবার নয়' সহজেই সব উলটে যায়, কারণ সকলেই এবং সবই ছিল তার স্বপক্ষে,—হাকিম পর্য্যন্ত। সে বললে অত টাকা নিয়ে কি হবে—পশু হয়েও যেতে পারি। আর বড় জোর ২৫।৩০ বচর থাকা,—মরে যেতে হবেই, টাকাতে তা রুকবেনা, দাদাদের বিপন্ন করি কেনো।—

—"সে এখন ছেলে পড়িয়ে ২০।২৫ টাকা পায়, তাতে মার কাশীবাস চলে, নিজের—তাঁর প্রসাদ পাওয়াও চলে। সদাই প্রফুল্ল মুখ; জিজ্ঞাসা করলে বলে "মায়ের কৃপায় বেঁচে গেছি কাকাবাবু,—কোনো চিন্তাই নেই—বেশ আছি—কি হতুম তা কে জানে"!—পড়া-শোনা নিয়েই থাকে।

বললুম—"বিশ্ব-সভায় এরাই ভারতের পরিচয়।"

বললেন—"বেশ লাগছে বোধ হয়,—তবে বলি,—"

"দেখছেন, আমি আমার পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী basic principle (মূল নীতি) ধরেই চলেছি, তা লঙ্ঘন করে অবান্তর কথা শুনিয়ে আপনাকে বিরক্ত করবনা, আমার তা উদ্দেশ্যও নয়। ১৮ বচরের অভিজ্ঞতা, সবগুলিই বার-বার পরীক্ষা করা ছিল।—

—"একটা ভারি interesting ব্যাপার মাথায় ঘুরছিল,—তার রহস্য ভেদ করার মধ্যে আমার সখের এবং জীবনেরও যেন চরম সার্থকতা অপেক্ষা করছিল। সেই তন্ময় অবস্থায় বাড়ী ঢুকতেই—ছেলেটার কান্নার শব্দে চিন্তাধারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।—কবচ ধারণ, পুজা, মানত, দৈব ক্রিয়াদির পর ছেলেটি হয়, সুতরাং আদরের সীমা ছিলনা। তখন মাত্র ১৭ মাসে পড়েছে। তার কান্নায় স্ত্রীর ওপর ভয়ঙ্কর চটে গেলুম—"একটা ছেলে থামাতে পারনা—আদরে আদরে সর্ব্বনাশ করতে বসেছ?" পত্নী বললেন—"কি করবো—কিছুতে থামচেনা, বোধ হয় পেট কামড়াচ্ছে, কি কাণ কট্ কট্ করছে।" —"বড়-বড়রা থামে আর ও থামবেনা—দাও" বলে টেনে নিয়ে এক চড় লাগালুম। তবু কান্না—আর এক চড়। —"কি করচো গো—দুধের বাছা, মেরে ফেলবে নাকি" বলে ছুটে নিতে এলেন।—"ফের কান্না, থাম্ বলছি" বলে চড় পড়তেই তার মা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে তাকে টেনে নিলে। ছেলে চুপ করলো। তার পরই—"ওগো কি সর্ব্বনাশ করলে গো "বলে স্ত্রী আছড়ে পড়লেন।—

শুনে আমার তখন নার্ভাস tremor (কম্পন) আরম্ভ হয়ে গেছে,—কাণের দু পাশ দে যেন ট্রেণ চলছে। বসে বসে বারাণ্ডায় গিয়ে, মাথায় মুখে চোখে জল দিয়ে, ঘরে ঢুকেই ফরাশের ওপরই শুয়ে পড়লুম।

—শীত ধরতে উঠে বসলুম। দেখি গোলাপের গন্ধে ঘর ভরে গেছে, পাশে গোলাপ জলের বোতল। মাথা বয়ে গোলাপ জল ঝরছে!

—"উঃ তাই মা-লক্ষ্মী কাঁদতে মানা করেছিলেন। পাগলিনী হয়েও সন্তানদের ভোলেননি, ছুটে

এসেছিলেন। জগৎজননী শান্ত হও! (মাথায় হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলুম)—মারবেন বলে মারেন নি,—principle রক্ষা করেছেন! মনুষ্যত্বের অপমান! মারের চোটে ভূত পালায়, কথাটায় ভুল নেই—দেহটা পঞ্চভূতের।

"দু ফোঁটা গোলাপ জল নাকের দু'ধার দিয়ে গড়িয়ে এসে গোঁফ ভিজিয়ে দেওয়ায়—(এবার ও অপরাধটা রয়ে গেছে—গোঁফ ওঠার আগেই বাপ্ মা মারা গেছেন,—ফেলবার কারণ ঘটেনি)—গন্ধটা ঘোরালো হয়েই নাকে ঢুকলো।—দুঃখের মধ্যে একটু হাসি ফুটলো।—চোখের জলও অপেক্ষা করছে…

"হাসছেন যে?"

চমকে দিলে। তিনি যে একখানা চেয়ারে নীরবে অপেক্ষা করছিলেন, সেটা ভাবতেই পারিনি। ট্রাজিডির শেষেই ড্রপ পড়ে'—চলে গিয়ে থাকবেন,—এই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলুম।

বললুম—চার্জটা আজকেই শুনিয়ে দিন, আমি প্রস্তুত। আশা করি এর ওপর আর কিছু নেই—

মুখময় বিশ্রী হাসি টেনে বললেন,—"বলেছেন না মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই।—সে নিষ্ঠুরতাতেও বড়,—পশুকেও পরাস্ত করেছে—যমের চেয়েও নির্ম্মম। আপনি বড় weak nerve এর (দুর্ব্বল স্নায়ুর) লোক,—সে-সব শুনতে পারবেন না।

অন্তরটা শিউরে উঠলো। বললুম, "শুনতে না পারলেও আপনাদের কর্ত্তব্য তো রেহাই দেবেনা।"

বললেন—তবে শুনে রাখাই ভালো…

বললুম—সহিষ্ণু শ্রোতার গর্ব্ব আমার আর নেই—

বললেন—"কদাচ দু'একজনকে বলতে শুনেছি—যা হয় এখনি হোক্। তারা দয়া চায়না—"

মরিয়ার মত হাসতে হাসতেই বললুম—"দয়াও আছে নাকি?—সে দয়া আমিও চাইনা।"

বললেন—"আপনি তা চাননা—আমি জানি।—শুনুন—

বিপক্ষের একটা কোনো ভীষণ উদ্দেশ্যের পশ্চাতে তাদের একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র চলছিল,—সেটা বোঝা কঠিন ছিলনা, কিন্তু তাদের আড্ডার দ্রুত পরিবর্ত্তন এপক্ষকে বোকা বানিয়ে দেয়। কথাটা আমার কানে আসায়—আমার সখ্ তার প্রিয় বস্তুই পেলে,—উৎসাহ, উদ্যম, আনন্দ ও যশোলিপ্সা (শেষেরটা সাধুদেরও ত্যাগ হয়না) একসঙ্গেই জেগে উঠলো। আমার নিজের ব্যবস্থায়—অপর-নির্লিপ্ত ভাবে [অর্থাৎ জয়ের প্রশংসার অংশীদার না রেখে] অন্য পন্থায় কাজ আরম্ভ করেছিলুম।—ব্যাপারটার পশ্চাতে একজন পাকা মাথাওলা director আছেই, তাকে পেলেই সব পাওয়া হবে। আপনার ওপর নজর পোড়লো,—কেনো যে,—সে সব খুঁটি-নাটি শোনাবার প্রয়োজন নেই। তার মধ্যে একটা হচ্ছে—তরুণেরা আপনার প্রিয়, প্রীতি-ভাজন,—কোনদিন একটি সমবয়সী বয়স্থ বা বৃদ্ধের সঙ্গে আপনাকে কথনো দেখিনি। আপনার পূর্ব্বালাপি পরিচিতদের মধ্যে—বেকার আর অবস্থাপীড়িতদের সন্ধান নিয়ে, নিজ ব্যয়ে তাদের নিযুক্ত করলুম।—কোনো কাজ দিলেনা। পূর্ব্ব পরিচয় যা পেলুম—তাও আমাকে সাহায্য করেনা। কাশীবাস করে কাশীখণ্ড পড়েননা, সাহিত্যচর্চ্চা করেন,—খুবই অস্বাভাবিক নয় কি?"

সহাস্যে বললুম—এবং লজ্জার কথাও—

বললেন—"তা বলতে পারিনা…তবে ওটাকে আমরা ভয়ের বা সন্দেহের কারণ বলে ধরিনা। কারণ—সাহিত্যিকদের যা কিছু দৌড় তা প্রায়ই লেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাজের 'ক'-এর সঙ্গেও তাদের পরিচয় নেই। তাই সাহিত্যিকদের আমরা অপকারী জীব বলে গণ্য করিনা—অকেজো বলেই ধরি। রুসো, ভল্টেয়ার বা মার্ক্সের মত লেখক এ দেশে জন্মাতে পায় না। যাক্—

—"ইতিমধ্যে ছেলেটা গেল। যাকে খুঁজছিলুম তাকেও অপর পক্ষ বার করলে। নিজের বহু টাকা খরচ হয়ে যাবার পর সেটা কি সাংঘাতিক আঘাত!—ক্ষিপ্ত করে দিলে। তখন জেদ্ হ'ল—আপনার সঙ্গে ওর একটা কিছু যোগসূত্র সৃষ্টি করতেই হ'বে,—আত্মসম্মানে আঘাত যে বড়ই নির্ম্মম! আপনি কলকেতায় গেলেন। খোঁজ নিয়ে আপনার পূর্ব্বপরিচিত ধার্ম্মিকদের ধরলুম,—সৃষ্টি-কার্য্যে যারা পিতামহের ওপর।

বললুম,—"তা দেখে এসেছি।"…

সহাস্যে বললেন,—"তখনো আপনাকে ডুপ্‌লিকেট্‌ (duplicate) হিসেবে রেখেছি, সকল বড় অভিনেতাদের (actorদের) duplicate (পরিবর্ত্ত) রাখতে হয়,—কাজে লাগে। কিন্তু কোনো যোগসূত্র পাচ্ছি না,—চক্রধরের মত expert (ওস্তাদ) চক্রীও কাজে আসছে না—জেদ্‌ বেড়েই চলেছে…

"তখনো আমার ধারণা—লোক পাকড়েছি ঠিক,—যেমনি খলিফা তেমনি চতুর—ধরা ছোঁয়া দেয়না,—যাকে বলে dangerous type—ভীষণ। এরাই হয় পাকা কর্ণধার—born-helmsman—জন্ম-নেতা—"

বললুম,—খুব বাহবা (Compliment) দিচ্ছেন যে—

বললেন—আপনি ওসবেরও ওপোর…

নির্ভয়েই বললুম,—তাহলে বুঝেছি—বাপের কষ্টার্জ্জিত অর্থ নষ্ট করবার জন্যেই সখ্‌ চেপেছিল, অর্থাৎ আপনাকে গ্রহে টেনেছিল,—

বললেন—"এখন এক একবার সেই সন্দেহই উঁকি মারে,—তখুনি সেটা দূর করেছি,—আত্মপ্রসাদ নষ্ট করি কেনো। যাক্‌—

একটা কথা বলতে ভুলেছি,—বিশ বচর আগে একবার থিয়েটারের সখও চেপেছিল। তার নাটকও লিখি আমি। তার ভাল-মন্দ বিচারের অবকাশ কারুর ছিলনা,—কারণ পয়সাগুলো ছিল আমারি বাপের—কাপ্তেন আমি।—

—"ছেলেটা যাওয়ায় বাড়ীর শান্তিও চলে গেল। সেই বিশ বছর আগের আনন্দের দিন মনে পড়তে লাগলো। সে কি আর ফেরেনা? না—ফেরেনা। বাইরে বাইরেই কাটাই, বাড়ী ঢুকলেই অশান্তি। বাইরের ঘরেই থাকি—সময় কাটেনা।—কি নিয়ে থাকি? বিশ বছর আগে তো লিখেছিলুম, এখন লিখতে পারি না? কি লিখি?—

—"এই সময় নিজেদের মধ্যেই একটা নাটকীয় বিবাহ ব্যাপার ঘটে গেল,—আমাকেই যার শেষ রক্ষায় সাহায্য করতে হ'ল। তাতে অভিনবত্ব থাকায়—সেই হয় আমার লেখার বিষয় (subject)। লেখা, কাপি করা, প্রুফ্‌ দেখা, আর ছাপানোতে কয়েক মাস বেশ কাটলো।—অবশ্য তার মাঝে আপনাকে ভুলিনি, সেটা ঠিকই ছিল। বইখানা যে পড়ে সেই প্রশংসা করে। ভয়ে ভক্তি নয় তো? বলে, কলকেতার কোনো থিয়েটারে দিন—এখন নাট্যকার বড় নেই,—লুফে নেবে।—আচ্ছা আগে শ্রেষ্ঠ মাসিকখানায় সমালোচনা দেখি,—তার পর সে চেষ্টা।—

—"নিত্য ফেরবার মুখে ডাকঘর হয়ে আসি। দেখি—মৃগনাভী মাসিকখানি এসেছে কিনা। একদিন পেয়ে সাগ্রহে সেইখানেই খুলে ফেললুম,—এই যে বেরিয়েছে। দুরুদুরু বক্ষে যত পড়ি—বিশ্বাস হয়না। আবার বইখানার নাম দেখি,—অন্য কারো নয়তো। কিন্তু এ কি, এ যে আশাতীত।—

উঃ কি করি, আনন্দে অধীর করে দিলে। বহু চিন্তা, বহু চেষ্টার পর সমূহ বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে, বড় বড় মহারথিদের অন্ধকার থেকে আলোকে এনেও আনন্দ অনুভব করেছি বহুৎ—কিন্তু সে এমন স্বচ্ছ নয়, এ একেবারে স্বতন্ত্র! তারা দুনিয়ায় ছিল,—এ যে নিজের সৃষ্টির!—

—"কার অভিমত, সমালোচক কে? এমন লোক আছেন যিনি অপরিচিত লেখককে এত বড় উচ্চাসন দেন। লোক সব পারে, কিন্তু…আমার 5 principle (পঞ্চতন্ত্র) ফুরিয়ে গেল,—ফেল (fail) করলে।—কি প্রীতিমাখা উৎসাহ দান। দেখি নিচে ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা নবীন বন্দ্যো। চম্‌কে গেলুম,—আপনিই নাকি? তখুনি জরুরি তার পাঠিয়ে সংবাদ পেলুম—'তিনিই'!

—"প্রাণটা ছিছি করে উঠলো! এই লোককে মিছে ডুপ্‌লিকেট করে' হাতে রেখে অশান্তি ভোগ করাচ্ছি? তৎক্ষণাৎ অনুচরদের আপনার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত টেলিগ্রাফ করে—অনুসন্ধান, অনুসরণ নিষেধ করে দিলুম।—সংবাদও পেলুম—তিনি কাশী যাত্রা করলেন,—সঙ্গে আছে একমোট জুতো"!

বাধা দিয়ে বললুম—"দেখুন—সত্যের অপমান করা লেখকদের কাজ নয়। তাঁরা সুন্দরের পুজারী—ভাল কিছু পেলে কেবল নিজেরাই উপভোগ করে' সুখ পাননা, সেটা পাঁচ জনের মধ্যে পৌঁছে দেওয়াতেই তাঁদের তৃপ্তি।"

বললেন—"পূর্ব্বে বলেছেন—মানুষেই ভুল করে।—এখন আমারও সখ মিটেছে। ঠিকই বলেছেন—গ্রহে টেনেছিল—সকল শান্তিই খুইয়েছি—এখন এই নির্ব্বিরোধ বন্ধু নিয়েই থাকবো—যে শুধু আনন্দই দেয়।" উদাস ভাবে আপনা আপনিই আওড়ালেন—"ভুল আর দুঃখ কষ্টই মানুষকে সত্যের সন্ধান দেয়—চৈতন্য জাগায়…"

এতদিনে মোড় ফিরছেন। টেঁক্লে হয়—

বললেন—"তিনটে বাজলো, শুয়ে পড়ুন…"

বললুম—"শেষ কথাটা শুনিয়ে গেলেই আমার প্রতি দয়া করা হয়, নিশ্চিন্ত হয়ে শুই…"

হাত জোড় করে বললেন—"আর লজ্জা দেবেননা—কিন্তু একটা Condition (সর্ত্ত) আছে—আমাকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করতে হবে।"

বললুম—"সেটা কি এখনো বাকি আছে, আমি আপনার জন্য সত্যই দুঃখিত, আপনারা শান্তি পান এই প্রার্থনা করি।"

হৃদয়াবেগে স্বর ভঙ্গ হওয়ায় কথা বেধে গেল,—তাড়াতাড়ি পা ছুঁয়েই দ্রুত চলে গেলেন।

বিস্ময়-স্তম্ভিত বসে রইলুম।—নিজের লেখার প্রতি মানুষের মোহ কি অপরিসীম!—দেখ্‌ছি ব্যাঘ্র প্রকৃতিও তা'তে বদ্ধ!—সাহিত্যের নেশা শান্তি দেয় কিনা জানিনা,—সে ভুলিয়ে রাখে বটে।—সংসারের লোকসেনে আস্‌বাব বানিয়েও দেয়;—আবার জগতের দরকারী জীব তাদের মধ্যেই পাই।—সমালোচনা যেন আঘাত বাঁচিয়ে, পথ দেখিয়ে, করতে পারি।

স্তব্ধতার ফাঁকে এই সব এলো-মেলো চিন্তা এলো-গ্যালো।

ভগবানকে স্মরণ করে শয্যা নিলুম। কেবলই মনে হতে লাগলো—"লটকি সেঁইয়া" এঁরই লেখা, আশ্চর্য্য! কি বিরুদ্ধ সমাবেশ! পঙ্গুম্ লঙ্ঘয়তে গিরিম্—যৎ কৃপা। তুমি সবই পারো……

* * * *

সকালে যখন দেখা হল,—পূর্ব্বের সে লোকই নন। যাঁকে মনে পড়লে শিউরে উঠতুম, যাঁর মুখের দিকে চাইতে পারতুমনা,—কতকগুলো ভীতিপ্রদ রেখার সমষ্টি বলে মনে হ'ত—মুখে ভীষণতা মাখিয়ে রাখতো, কথা নীরস কর্কশ ছিল, আজ সে-সব মুছে কি সহজ হয়েছে!

এখন কি করবো, কোথায় থাকবো, জীবনের প্রোগ্রাম কি, প্রভৃতি সহজ স্বাভাবিক কথাই হতে লাগলো।

সেই সময়—"আসতে পারি কি ভৈরব বাবু?" বলে অপেক্ষা না করেই একটি অতিকায় প্রৌঢ় প্রবেশ করলেন। সিঁড়ি ভেঙে উঠে সশব্দে হাঁপাচ্ছিলেন।

"আসুন আসুন, কবে এলেন? কোনো খবর দেননি তো? কেমন আছেন বলুন?"

ভৈরববাবু এক নিশ্বাসে প্রশ্নের এই চৌতাল চাপান আমি ভাববার সময় পেলুম।—

লোকটি শ্রীমন্ত এবং লক্ষ্মীমন্তও, অর্থ নৈতিক সমস্যা মূর্ত্ত সমাধান। কলকেতার আধুনিক কারবারিই হবেন লুচি আর বেগুন ভাজার সমাবেশে শ্রীঘৃতের কুপো বড়-বুকের-পাটা না থাকলে সিংহের গুহায় এ-ভাবে মা গলাতে কেউ সাহস করেনা।

ভৈরববাবু পরিচয় দিলেন,—"নাম শুনলে আপ নিশ্চয়ই চিনবেন—শ্রীযুক্ত বিসর্জ্জন কুণ্ডু—সুপ্রসি পাবলিসার—"

না জানলেও ভদ্রলোকদের অনেক কথা বল হয়—

বললুম—"আর বলতে হবেনা ওঁদের পরিচয় কে জানে। তবে নামটি সম্বন্ধে একটু কৌতূহল…

আগন্তুক খল-খল হাস্যে বললেন—"ও রহস্য আমাকে বহন করতে হয়……"

মুখ থেকে সহজেই বেরিয়ে গেল—"এবং আপ বোধ করি তা অনায়াসে পারেনও……"

তিনি হেসেই বললেন,—"ঠিকই বলেছেন,—শুনে আমার সাতটি ভাই ভূমিষ্ঠ হবার পরই মারা যায়, ত আমি হতেই বাবা আমাকে দেবতাদের অর্পণ ক' ওই নাম রেখেছিলেন…"

—"অর্থাৎ—এখনি তো মরবে তাই যথাল হিসেবে বোধহয় তাড়াতাড়ি ঠাকুরদের দিয়ে ফ্যালে বাঃ খুব ব্যবসা-বুদ্ধি ধরতেন তো! উত্তরাধিকা আপনাকে এতো উন্নতি আর প্রসিদ্ধি দিয়েছে। ঠাকু

নবীন যুবক

প্রবোধকুমার সান্যাল

১

শীতের শেষে প্রথম বসন্তকালে আমার পৈতৃক গ্রাম ভালোই লাগল। বাবার জমিদারিটা বেশ শাঁসালো। তিনি পুরাতন কালের মানুষ। তিনি জানেন গ্রাম আমার ভালো লাগে না, আমার জন্ম এবং কর্মক্ষেত্র কলিকাতায়। মা জীবিত নেই অনেক দিন। দু বছর আগে পর্য্যন্ত এই গ্রামে নিয়মিত আসতাম; মাসে একবার একদিনের জন্য। সম্প্রতি পড়াশুনো এবং নানা কাজে আর আসতে পারিনে।

দু দিনের জন্য গ্রামে এসেছি, আদর-অভ্যর্থনার ত্রুটি হচ্ছে না। যে লোকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ মারা, দেশের সম্বন্ধে নানা সংবাদ যে রাখে, খবরের কাগজে যার নাম ওঠে—গ্রামের চোখে সে-লোকটা সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সর্ব্বজ্ঞ, কল্পলোকের বিচিত্র মানুষ। ইতিমধ্যেই গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ ও যুবক-সঙ্ঘের উদ্যোগে গোটা দুই 'জয়ন্তী' হয়ে গেছে। সুলভ সুখ্যাতিতে এখনকার ছেলেরা আর লজ্জিত হয় না।

দু দিন ধরে' নিশ্বাস নেবার সময় ছিল না। গ্রামের যুবকদের ড্রামাটিক্ ক্লাব, ব্যায়ামের আখ্ড়া, লাইব্রেরী এবং পল্লীসংস্কার সমিতির টানাটানিতে প্রাণ কণ্ঠাগত হচ্ছিল, এমন সময় বাবা এসে বললেন, কাল ভোর রাতের গাড়ী ধরবে ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তাহলে এখানকার পাল্কি বলে' রাখি। টাকাকড়ি সঙ্গে থাকবে, অন্ধকারে এবারে আর হেঁটে গিয়ে কাজ নেই। হ্যাঁ, আমি শীঘ্রই কল্কাতায় যাবো। টেলিগ্রাম করলেই একটা বাড়ী দেখে রেখো। ও বাড়ীটায় ভাড়া এসেছে, নয়?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাবা অর্থাৎ শ্রীযুক্ত দীননাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্থান করলেন। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে সুস্থির হয়ে বসলাম। আজ অপরাহ্ণে আর পথে বা'র হবো না, যুবজনতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হতে আর সাধ নেই। গ্রামের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, হিতৈষী ও শুভানুধ্যায়ীগণের সহিত দেখা করার পালা সাঙ্গ করেছি। আর একটি-মাত্র জায়গা বাকি। সকলের আগে যেখানে যাবার কথা, সকলের পরে সেখানে গেলেও চলবে। গ্রামে এবার পদার্পণ করার গোপন কারণ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার নাম্‌ল। চা খাওয়া শেষ ক'রে পথে নেমে এলাম। যে পথটা দিয়ে চললাম ঐ পথে আজ দু দিন নানা কাজে ঘুরেছি, নানা অনুরোধ এবং উপলক্ষ্য নিয়ে। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় লক্ষ্য যখন একান্ত হোলো, পথের চেহারা গেল বদলে। চলতে চলতে দুই পাশে তাল-খেজুরের বনে একটি অশ্রুত ভাষা মর্ম্মরিত হতে লাগল, আকাশের তারা পরস্পর কথা কয়ে উঠল। আমার মন অত্যন্ত স্পর্শাতুর। ঘাসের ডগা কাঁপলে আমার প্রাণ ওঠে কেঁপে, মেঘের সহিত মেঘের কোলাকুলিতে আমার মাথায় রক্তে দোলা লাগে।

কা'রা যেন দূরে কথা কইতে কইতে আসছিল, আমি দ্রুতগতিতে পথ থেকে নেমে অন্ধকারে আত্মগোপন করলাম। কাছে এসে যখন তারা পার হয়ে চলে' গেল, বুঝলাম আমারই আলোচনা তাদের মুখে মুখে। নিজের চৌর্য্যবৃত্তিতে প্রথমটা লজ্জিত হলাম। অথচ লজ্জিত হবার কারণ নেই। সুপরিচিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে আমরা একটি আজগুবী কল্পনা ক'রে রাখি, সেখান থেকে তাদের বিচ্যুতি ঘটলেই আমাদের মনে আসে অশ্রদ্ধা। জনসাধারণের বিচার-বুদ্ধির পরিমাপে যে উপরে উঠতে পেরেছে, সে যে প্রয়োজন হোলে নিচেও নামতে পারে এমন কথা জানবার সময় এসেছে।

গ্রামের এক প্রান্তে একখানা বাড়ীর উঠোনে এসে

একেবারে থামলাম। এদিকটায় বড় একটা চেনা-পরিচিত কেউ নেই, চেনা ও জানা কেউ না থাকলেই খুসি হই।

মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম, পিসিমা কোথায়? পিসিমা?

এই যে আসুন। ব'লে যে বেরিয়ে এল তার জন্যই আমার এখানে আসা। হেসে দালানের উপরে উঠলাম। বললাম, কেমন আছ ভগবতী?

যদিচ বয়সে আমরা প্রায় সমবয়সী তবুও ভগবতী আমার পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, ভালো আছি। আপনার আসতে এত দেরি হোলো কেন? মনে বুঝি পড়তেই চায় না?—চকিত ও ত্রস্ত চক্ষে সে একবার এদিক ওদিক তাকাল।

বললাম, তোমরা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে হোলে অনেক আগেই মনে পড়ত।

তা বুঝতে পেরেছি। আসুন ঘরের ভেতরে। ব'লে ভগবতী অগ্রসর হোলো।

পিসিমা কোথায়?

সন্ত্রস্ত ও অস্পষ্টকণ্ঠে সে বললে, তিনি আহ্নিকে বসেছেন।

তার নিজের ঘরে এনে আমাকে বসালো। নতুন একটা টেব্‌ল্ ল্যাম্প একধারে জ্বল্‌ছে। বড় ঘরখানায় প্রকাণ্ড একখানা পার্শিয়ান্ কার্পেট্ পাতা। অতিথি সম্বর্দ্ধনার একটা আয়োজনের চিহ্ন সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। অবস্থা এদের এখনো ভালোই আছে।

আলোয় এসে তার দিকে ফিরে বললাম, দু বছরে তুমি কিন্তু অনেক বদলে গেছ মিনু।

ভগবতী হেসে বললে, তবু ভালো। ভাবছিলুন ডাকনামটা আমার বুঝি ভুলেই গেলেন। বদ্‌লাব না কেন বলুন, বয়স ত বাড়ছে দিন দিন। আবার সে একবার এদিক ওদিক তাকাল, তারপর চুপি চুপি বললে, শুনুন, চিঠি পেয়েছিলেন আমার?

আমাদের মধ্যে আপনি এবং তুমিটা বরাবরই চ'লে আসছে, সেটার আর পরিবর্ত্তন ঘটেনি। আমিও প্রতিবাদ করিনি, সেও দাবি জানায়নি। আমার কাছে কোনো দাবি জানানো তার পক্ষে অনেক দিন থেকেই কঠিন। আমরা খুব স্পষ্ট করেই জানি, আমাদের মধ্যে যে বস্তুটা আছে সেটা প্রেম নয়, প্রীতি। কিছু প্রাণের উত্তাপে জড়ানো একটা হাল্‌কা বন্ধুত্ব।

বললাম, চিঠি পেয়েছি বলেই ত এলাম। তুমি কি সত্যিই চলে' যেতে চাও? গ্রামে কি তোমার ঠাঁই হোলো না?

একটু আস্তে বলুন। ঠাঁই যদি হবে তবে এতকাল পরে আপনাকে চিঠি লিখব কেন সোমনাথবাবু? বলুন আপনি, আমার কোনো ব্যবস্থা ক'রে এসেছেন কিনা।

করেছি।

দরজাটা আস্তে আস্তে ভগবতী ভেজিয়ে দিল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, পিসিমা যেন কিছু বুঝতে না পারেন। উনি বলছিলেন আমাকে ওঁর শ্বশুর বাড়ীর দেশে নিয়ে যাবার কথা। যেতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু সেও যে গ্রাম। এখানেও যে জ্বালা সেখানেও সেই যন্ত্রণা। আপনার কাছে কেবল আমার এই মিনতি, আমাকে শুধু ভালো একটা জায়গায় থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিন, টাকাকড়ির ব্যবস্থা আমার সব ঠিক আছে।

আমার কণ্ঠেও এবার দ্রুততা এল। বললাম, কাল ভোর রাত্রেই যাবার ঠিক হয়েছে, রাত সাড়ে চারটের গাড়ী।

ভগবতী বললে, আমারও সব গোছানো আছে। কল্‌কাতায় গিয়ে বড়দাদাকে চিঠি দেবো, তিনি এখানকার জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করবেন।

তিনি এখন আছেন কোথায়?

রংপুরে।

তোমাকে তিনি কাছে রাখলেন না কেন?

সে কথাও আপনাকে বুঝিয়ে বল্‌তে হবে সোমনাথদা?

বললাম, তোমার টাকাকড়ি কার কাছে?

ভগবতী বললে, আমার নামে টাকাকড়ি মা সমস্তই ব্যাঙ্কে রেখে গেছেন। তিনি বেশ দেখতে পেয়েছিলেন আমার ভবিষ্যতের চেহারাটা। মা'র কথা শুনেই যে মাথা হেঁট করলেন?

না, আমি ভাবছি অন্য কথা, কল্‌কাতায় তোমার থাকার সম্বন্ধে—

ভগবতী এবার চিন্তিত মুখে বললে, ভাবছি আপনার

সঙ্গে গেলে এ গ্রামে আপনার স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট হবে। লোকে যে-ভাষায় আলোচনা করবে সে ভাষা আপনি জানেন না, আমার কিছু কিছু জানা আছে। আমাকে বিপদ থেকে তুলতে গিয়ে আপনি পড়বেন নানা বিপদে।

ভুল বুঝবে তা'রা আমাকে।—আমি বললাম, একজন মেয়েকে সাহায্য করাটা ত আর অপরাধ নয়, কলঙ্কও নয়।

এতক্ষণ পিসিমার আবির্ভাবের কল্পনা করছিলাম। এবার বললাম, আমি এসেছি পিসিমা জানতে পেরেছেন ?

ভগবতী ব্যস্ত হয়ে গিয়ে দরজাটা খুললে। বাইরে বেরিয়ে একবারটি ঘুরে এল। তারপর হাত নেড়ে ডেকে বললে, জানতে বোধ হয় পারেননি, ভালোই হয়েছে, জানবার আগেই আপনি চলে' যান্। ওই সময় যাবার ঠিক ত ?

হ্যাঁ।

হেঁটে যাবেন, না পাল্‌কিতে ?

পাল্‌কিতেই যাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

বেশ, আমি যাবো আপনার পাল্‌কির পেছনে পেছনে।

ভীতকণ্ঠে বললাম, যদি বেহারারা টের পায় ?

সে ভাবনা আমার। আপনি তবে এখন আসুন।

পিসিমার অলক্ষ্যেই আমি দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলাম। পথের কিছুদূর গিয়েও দেখা গেল, পাথরের মূর্ত্তির মতো ভগবতী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্লাট্‌ফরমের উপরে উঠে বেহারারা পাল্‌কি নামাল। রাত তখনো ঘোর অন্ধকার। সুটকেস ও বিছানা ছাড়া সঙ্গে আর কিছু নেই। ট্রেণ আসবার দেরি ছিল না, ব্যাগটা নামানো হয়েছে। আমি সোজা দুখানা কলকাতার টিকেট কেটে আনলাম। এদিক ওদিক তাকাবার প্রয়োজন ছিল না, আমি জানি ভগবতী হাতে একটা ছোট হাণ্ডব্যাগ নিয়ে কাছাকাছিই আছে।

অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। দৈনিক সংবাদপত্র খুললেই এমন ঘটনা অসংখ্য চোখে পড়ে: একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে। তবু এইবার রাজ্যের ভয় এবং লজ্জা দুই পায়ে এসে জড়াচ্ছে। অন্যায় উদ্দেশ্য নেই, বিপথের দিকে লক্ষ্য নেই কিন্তু এমন দুঃসাহসিক কাজ জীবনে আমার এই প্রথম। স্ত্রীলোকের সহিত আমরা কথা কই, গল্প করি, হাসি, ভালোবাসি, তাদের নির্দ্দেশ মেনে চলতে খুসি হই, কিন্তু সময় বিশেষে তাদের গুরুভার আকণ্ঠ হয়ে ওঠে, নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে, কাঁধ থেকে তাদের নামিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি। এই অন্ধকার রাত্রে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে মনে হতে লাগল, জগতসুদ্ধ সবাই তীব্র ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছি ছি করছে। মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে কথা বলবার আর মুখ রইল না।

এমন সময় বাঁশীর আওয়াজ করে' ট্রেণ এসে দাঁড়াল। আধ মিনিট মাত্র থামবে। জিনিসপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বেহারাদের কিছু বকশিস দিয়ে বিদায় করলাম। তাদের চলে যাবার পরমুহূর্ত্তেই আপাদ মস্তক চাদরে আবৃত করে' ভগবতী যখন দ্রুতপদে গাড়ীতে এসে উঠল, বাঁশী বাজিয়ে ট্রেন তখনি ছেড়ে দিল। আমার রুদ্ধ নিশ্বাস এতক্ষণে ধীরে ধীরে পড়তে লাগল। যেন মান-সম্ভ্রমের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।

এতক্ষণে ভিতরে চেয়ে দেখলাম। এত বড় গাড়ীখানায় আমরা ছাড়া আর তিনটিমাত্র প্রাণী। দুটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক একধারে নিদ্রিত। আমরা এধারে জায়গা নিলাম। জায়গা নিয়ে যখন নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি, পূর্ব্বাকাশে তখন ঈষৎ আলো দেখা দিচ্ছে। ভগবতী নীরবে বসেছিল।

বললাম, ঘুমোবার চেষ্টা করা আর বোধ হয় চলবে না, কি বল মিনু ?

মিনু প্রথমটা কথা বললে না। দেখলাম আমার অলক্ষ্যে সে চোখ মুছল। এতক্ষণে আমার বুঝা উচিত ছিল তার পথশ্রমের কথাটা, অন্ধকারে তিন মাইল মাঠের পথ তাকে খালি পায়ে ছুটে আসতে হয়েছে। দুই পা তার ধূলোয় ভরে গেছে।

এবারে তার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, ছেড়ে যখন আসতেই হবে তার জন্যে কান্না কেন মিনু ?

ভগবতী এবারে কথা বললে, মাথার ঘোমটা মাথায়

রেখেই বলতে লাগল, ছেড়ে আসবার ইচ্ছে আমার কোনোদিনই ছিল না, এলাম কেবল প্রাণের দায়ে। আপনি জানেন না, কবেকার একটা পারিবারিক কলঙ্কের জন্ম কি নিদারুণ অপমানই আমাকে সইতে হয়েছে। তারপর এই বয়সটাই হয়েছে আমার পক্ষে ভয়ানক বিপদ।—এই বলে' সে তার হাণ্ডব্যাগটা খুলতে লাগল।

রূপের প্রশংসা তার না ক'রে পারিনে। গ্রামের মেয়ে হলেও তার শরীরের কোথাও অপরিচ্ছন্ন গ্রাম্যতা নেই। যৌবনের ঐশ্বর্য্য তার অপরিমিত। বললাম, বয়স তা হোলো বৈ কি। আমারই যখন তেইশ, তোমার অন্তত বাইশ নিশ্চয়ই হয়েছে। আচ্ছা, এতদিনেও তোমার বিয়ের চেষ্টা হয়নি?

ভগবতী বললে, চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু গ্রামের লোক বিয়ে হতে দেবে কেন? প্রকাশ্যে এই, গোপনে গ্রামের কোনো কোনো ছেলে চিঠি লিখে জানালে, আমাকে লুকিয়ে তারা বিয়ে করতে চায়।

তুমি রাজি হলে না কেন?

কেন হলুম না সে কথা আপনাকে কেমন ক'রে বোঝাবো?

মনের মধ্যে আর একটা প্রশ্ন উঠে দাঁড়াল। বললাম, কল্‌কাতায় যাচ্ছ কিন্তু কি নিয়ে সেখানে থাকবে?

আপাতত পড়াশুনো করব।

তারপর?

মাথা হেঁট ক'রে ভগবতী বললে, তারপরের কথা তারপরে! কল্‌কাতায় এমন অনেক মেয়ে আছে যাদের কিছুই নেই। আর তা ছাড়া যে-মেয়ে অন্ধকার রাতে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়, সে কি কখনো তার ভবিষ্যৎ ভাবে? আমি ত ভেসে চললাম!

গাড়ী গমগম্ ক'রে ছুটছে। আকাশ অল্প অল্প পরিষ্কার হয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে কোন্ ষ্টেশনে গাড়ী কতক্ষণ থেমে আবার কখন্ ছুটেছে আমরা কেউই লক্ষ্য করিনি। সেদিকে লক্ষ্য করিনি বটে কিন্তু আমার চোখ ছিল ভগবতীর মনের দিকে। এই মেয়েটি কবে এবং কেমন ক'রে যে এমন কল্পনাপ্রবণ ও স্বপ্নবাদিনী হয়ে উঠেছে তা আমি জানতেও পারিনি। দুঃখ হোলো, সহানুভূতি হোলো। ভগবতী বই পড়েছে বটে কিন্তু অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেনি। তার কল্পনা অনুযায়ী পৃথিবী ঘোরে না, সংসার চলে না। জগতের নিষ্ঠুর সত্যের সঙ্গে যেদিন তার হাতে-কলমে পরিচয় ঘটবে, সেদিন স্বপ্নের প্রাসাদ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়বে। তার এই দুঃসাহসিক যাত্রা এবং ভেসে যাওয়ার রূপটা মন মেনে নিতে চাইল না। অথচ আমি অবাক হয়ে যাই ভগবতীর নির্ভরশীল মনের দিকে চেয়ে। আমাকে সে বিশ্বাস করেছে। পৃথিবীতে এত লোক থাকতে আমাকেই সে চিঠি লিখে কল্‌কাতা থেকে আনিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। নিজের মান সম্ভ্রম, দায়িত্ব, যৌবনকালের বিপদ আপদ—সমস্ত সে নির্ব্বিবাদে আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছে। কী-ই বা তার সঙ্গে আমার পরিচয়, কতটুকুই বা; কদাচিৎ গ্রামে আসি, সকলের অলক্ষ্যে চলে' যাই; তার সঙ্গে আমার প্রাণের সম্পর্কও নেই, পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতাও নেই। যারা সস্তা রঙীন কাচ চোখে লাগিয়ে এই ঘটনার গায়ে রঙ ধরিয়ে বলবে প্রেম, মোহ, আসক্তি, তাদের অকিঞ্চিৎকর কল্পনাও বুঝি। কিন্তু আমরা দুজনেই জানি আমরা পরস্পরের কাছ থেকে কতদূরে। আমাদের দুজনেরই পথ বিপরীতমুখী।

কল্‌কাতার ভাড়া কত লাগল সোমনাথ বাবু?

বললাম, এক একজনের দু' টাকা বারো আনা।

মণিব্যাগ থেকে একখানা দশটাকার নোট বা'র করে' সে বললে, এই টাকা ক'টা রাখুন আপনার কাছে।

বিস্মিত হয়ে বললাম, সে কি, কেন?

আপনি কেন খরচ করবেন আমার জন্যে?

অত্যন্ত স্পষ্ট কথা। কিছুমাত্র চক্ষুলজ্জা, কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই। থাকবার কথাও নয়। এক মুহূর্তও যদি টাকা নিতে দ্বিধা করি তবে দুজনের পক্ষেই অত্যন্ত লজ্জার কারণ হবে। আমি এসেছি পাল্‌কিতে, সে এসেছে হেঁটে, কিছুমাত্র বিবেচনা করিনি; তাকে পথ দেখিয়ে এনেছি মাত্র, এতটুকু আত্মীয়তা প্রকাশ করিনি সুতরাং টাকা না নিয়ে অসঙ্গত ঘনিষ্ঠতা প্রকাশের বিন্দুমাত্রও অবসর নেই। তার মুখের দিকে তাকিয়ে

বললাম, কল্‌কাতার খরচ অনেক, টাকা হাতছাড়া করা কি সঙ্গত হবে ?

তা হোক, নিজের খরচ আমি চালাতে পারব।

বেশ, এখন রেখে দাও। সবশুদ্ধ কত খরচ হয় দেখে এক সময় হিসেব ক'রে নেওয়া যাবে ?

কল্‌কাতায় গিয়ে যদি আপনার সঙ্গে আর দেখা না হয় ? এখনি নিন্ না ?

দেখা হয়ত হতেও পারে। যদি না হয় ঠিকানা দেবো, সেইখানেই পাঠিয়ে দিয়ো। তোমার সুবিধের জন্যই বলছি নৈলে টাকা নিতে আমার সঙ্কোচ হবে না।

ভগবতী স্নিগ্ধ হেসে আবার টাকা তুলে রাখল। জান্‌লার বাইরে চেয়ে দেখলাম, আকাশে সোনার লিখন ফুটে উঠেছে। প্রান্তরের শ্যামলতা, দূর দিগন্তের বনশ্রেণী, খালবিলের জল এবং গ্রামান্তের কোনো কোনো পথ ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। জান্‌লায় একটা হাতের উপর মাথার ভর দিয়ে ভগবতী নীরবে বসে রইল। যাক্ নিশ্চিন্ত জানা গেল, আমার সহিত সে কোনো জটিল সম্পর্ক রাখতে চায় না।

কলিকাতার ষ্টেশনে যখন নামলাম তখন বেলা ন'টা বাজে। আমাদের কথাবার্ত্তা বন্ধ হয়ে গেল। কথা বলবার কথা নয়, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার কথা। জিনিসপত্র কুলির মাথায় চাপিয়ে আমরা পথে বেরিয়ে এলাম।

কাছেই একখানা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ব্যাগ ও বিছানাগুলি তার উপরে তুলে কুলির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বসতেই ভগবতী জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে কি কোনো বোর্ডিংয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন ?

তুমি কি বোর্ডিংয়ে থাকতে চাও ?

ভগবতী বললে, আমি নির্ব্বিঘ্নে থাকতে চাই। এক বিপদ থেকে বেরিয়ে আর এক বিপদে না পড়ি।

বিপদে পড়া না পড়া তোমার ওপর নির্ভর করে ভগবতী।—ব'লে ড্রাইভারকে শ্যামবাজারের দিকে যাবার নির্দ্দেশ ক'রে দিলাম।

গাড়ী যখন চলল, তখন সে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি এখন কলকাতায় কি করেন ? পড়েন ?

বললাম, পড়া ছেড়ে দিয়েছি।

তবু তাকে মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে পুনরায় বললাম, ঠিক যে কি করি তা বলতেও পারিনে। এম্‌নি দিন কাটে।

থাকেন কোথায় ?

সেটাও নির্দ্দিষ্ট ক'রে বলা কঠিন। এক জায়গায় থাকাটা ঠিক হয়ে ওঠে না।

ভগবতী বললে, কিছু কাজ নিয়ে থাকা ত দরকার।

হেসে বললাম, বাবা জানেন পড়াশুনো নিয়েই থাকি।

আর বেশি কিছু জানবার অধিকার ভগবতীর ছিল না, সে চুপ ক'রে রইল। সে আরো কিছু জানবার চেষ্টা করে এমন ইচ্ছাও আমার নয়। কি নিয়ে আমার দিন কাটে এমন প্রশ্ন শুনলেই আমার মন বিদ্রোহে বিমুখ হয়ে ওঠে। কাজের কথা বললেই কাজের প্রতি আসে অনাসক্তি। অনেক আত্মীয়র অনেক আত্মীয়পনা দেখেছি, তাদের মৌখিক সহানুভূতি ও কৌতূহলে অপ্রসন্ন তরুণ মন উত্তক্ত হয়ে ওঠে। আজ ভগবতীর সেই চেহারা দেখলে তাকে তিরস্কারই করব, স্ত্রীলোক ব'লে ক্ষমা করব না।

শ্যামবাজারের একখানা বড় বাড়ীর ধারে এসে গাড়ী দাঁড়াল। আমি আগে নামলাম। বললাম, তুমি ভেতরে চল, লোক আছে জিনিসপত্র নিয়ে যাবে।—ব'লে গাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে দিলাম।

গাড়ীর শব্দটা সম্ভবত ভিতরে পৌঁছেছিল। দরজা পার হয়ে আমরা ভিতরে ঢুকতেই যিনি এসে হাসিমুখে দাঁড়ালেন তাঁর দিকে চেয়ে বললাম, ভগবতী, ইনি আমার মা। এঁরই কাছে তুমি—

ভগবতী জান্‌ত মা আমার জীবিত নেই। আমার মুখের দিকে তাকাতেই অধিকতর স্পষ্টকণ্ঠে পুনরায় বললাম, ইনিই আমার মা! মায়ের অভাব এদেশে হয়না মিনু।

ভগবতী হেঁট হয়ে মা'র পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই মা তার হাত ধ'রে বললেন, এসো, মা এসো, ঘর সাজিয়ে রেখেছি তোমার জন্যে। ভয় কি, আমার পাশে তুমি থাকবে চিরদিন। চলো।

অপ্রত্যাশিত নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে ভগবতীর গলা অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় কেঁপে উঠল, কি যেন বলতে

গেল আওয়াজ ফুটল না, কেবল নীরবে মায়ের হাত ধ'রে অন্দরমহলের দিকে অগ্রসর হোলো।

আমার কাজ ফুরিয়েছে জানি। জানি কাজ আসে, কাজ ফুরোয়, আমি কেবল অগ্রগামী পথিক। মা আহার করবার জন্য অনুরোধ করলেন, কথা রাখতে পারলাম না, প্রখর রৌদ্রেই পথে বেরিয়ে পড়লাম। আমি তাঁর বাধ্য নয় বলেই তিনি আমার প্রতি স্নেহান্ধ।

পরোপকারী নই, নিছক স্বার্থত্যাগ করতেও বিশেষ কুণ্ঠিত হই, কিন্তু একজনের কিছু কাজে আসতে পেরেছি এইটি অনুভব ক'রে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করি। সেই আত্মপ্রসাদের চেহারা আপন অহমিকার গায়ে সুড়সুড়ি লাগা নয়, কিন্তু নিজের প্রকৃত মূল্য জানা, মূল্য ফিরে পাওয়া। আমরা কাজ করি, কোথাও সিদ্ধ হই কোথাও হই অকৃতকার্য্য, কিন্তু সেইটি আসল কথা নয়, কাজ করি আত্মপ্রকাশের জন্য, আত্মার প্রকৃতিগত বিকাশের তাড়নায়।

তিন চারদিন বন্ধুবান্ধবদের দেখিনি, ভিতরটা তৃষ্ণায় টা টা করছিল। স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষের সাহচর্য্য আমার প্রিয়। পুরুষের দুঃখ-সুখের আন্তরিক অংশীদার স্ত্রীলোক নয়, পুরুষ। প্রথমেই গিয়ে উঠলাম গণপতির ওখানে। রাস্তার উপরেই একতলা পুরোনো বাড়ীর প্রথম ঘরখানায় গণপতি থাকে। সোজা ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখি সে নেই, তার পরিবর্ত্তে বসে রয়েছে জগদীশ। আদর অভ্যর্থনার প্রয়োজন হয় না, আমরা সবাই সবাইয়ের পরমাত্মীয়।

জগদীশ বললে, বসো। কোথায় ছিলে এ ক'দিন?

দেশে। গণপতি কই?

ভেতরে গেছে। ভারি বিপদে পড়েছে গণপতি হে। এক পাল ছেলেপুলে নিয়ে তার বোন আজ এসে হাজির। বোনের সূতিকার ব্যায়রাম।

ভয়ে কেঁপে উঠলাম। আমরা সবাই জানি গণপতির আর্থিক অবস্থার কথা। কোন্ এক বাঙালী কোম্পানীতে সামান্য চাকরি করে, নিয়মিত বেতন পায় না। দোকানে একখানা ছবি বাঁধাতে দিয়েছে আজ দেড় মাস, সাত আনা পয়সার জন্য সেখানা এখনো আনা হয়নি। কথাটা ব'লে জগদীশ ঘরের চারিদিকে তাকাতে লাগল। চরম দারিদ্র্য চারিদিক থেকে এই ঘরখানার কণ্ঠরোধ করেছে, সেইদিকে তাকিয়ে জগদীশ পুনরায় বললে, মাসে চার পাঁচদিন ভাতের সঙ্গে তরকারি জুটত তাও এবার বন্ধ হোলো। উপায় কিছু নেই, ছোট ভাইটা বসে রয়েছে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে দরখাস্ত পাঠায়, আজ অবধি একটা চাকরি জুটল না।

এমন সময় গণপতি ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। আমরা কোনো প্রশ্ন করবার আগেই সে বললে, ঝগড়া বেধেছে শুনতে পাচ্ছ?

জগদীশ বললে, তোমার বউয়ের গলাই ত শুনছি।

বরাবর তাই শুনবে।—শুষ্ক উপবাসী মুখে গণপতি বলতে লাগল, বোনটা আসতেই মা'র সঙ্গে বাধিয়েছে ঝগড়া। রান্না নিয়ে গোলমাল। অভাব অনটনের সংসারে ঝগড়া বাধলে আর,—একেই ত আমার বউ একটু রগচটা, খিটখিটে।

দেয়ালে মাথা হেলান দিয়ে চৌকির উপরে সে বসে' পড়ল। বেলা তখন দুপুর বেজে গেছে।

জগদীশ উত্তেজিত হয়ে ফস ক'রে বললে, কিন্তু তোমার ভগ্নিপতির এমন ব্যবহার করা উচিত হয়নি। তোমার এই অবস্থা দেখেও স্ত্রীকে সে পাঠাল কেন?

গণপতি চুপ ক'রে রইল। ভেবেছিলাম ছুটির দিনে তাকে নিয়ে এদিক ওদিক একটু ঘুরতে বেরুনো যাবে কিন্তু তা আর সম্ভব হোলো না। জগদীশ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, জেল্ থেকে বেরিয়ে পর্য্যন্ত ভালো লাগছে না, ভাবছি আবার না হয় ফ্ল্যাগ্ উড়িয়ে সরকারি হোটেলে ঢুকে পড়ি। চলো হে সোমনাথ, ওঠা যাক্।

গণপতি ম্লানমুখে বললে, একটু পরে ডাক্তারখানায় যাবো, ওষুধের টাকা ধার করতে পাঠিয়েছি, নৈলে যেতুম তোমাদের সঙ্গে।

চুলোয় যাও তুমি। ব'লে জগদীশ আমার হাত ধ'রে টেনে পথে বেরিয়ে পড়ল। আজকের দিনটাই আমাদের মাটি।

পথে চলতে চলতে জগদীশ বললে, টাকা এনেছিস বাড়ী থেকে?

বললাম, এনেছি।

তবে দিলিনে কেন গণপতিকে? হতভাগা যে ভারি কষ্ট পাচ্ছে।

দিতে সাহস হোলো না যে। কী ভাববে!

জগদীশ আমার মুখের দিকে তাকাল, তাকিয়ে হাসল। বললে, পাছে অনুগ্রহ ব'লে ভাবে এই ভয় করছিস ত? পাগল আর কি, বন্ধুত্ব যেখানে প্রকৃত, আত্মসম্মানজ্ঞান সেখানে বড় নয়।

তবে তুমি রাখো জগদীশ, তুমিই দিয়ো।—ব'লে পকেট থেকে টাকাগুলো বা'র ক'রে তার হাতে দিয়ে স্বস্তি পেলাম। সে বললে, দিলি বটে আমার হাতে, আমি কিন্তু পাঁচটা টাকা এর থেকে অন্তত ওড়াবো। রাজি ত?

সে তোমার খুসি।

জগদীশ অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা, তার মন্তব্যগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট ব'লে কন্‌গ্রেস কমিটিতে তার জায়গা হয়নি। শত্রু এবং মিত্র—দুই পক্ষই তার উপর বিশেষ চটা। তার ভিতরে দলাদলির মনোভাব নেই বলেই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে তাকে তাড়ানো হয়েছে। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বললে, জমিদারের ছেলে তুই, যে ক'টা দিন পারি তোকেই শোষণ করা যাক্। আমার আর কারো ওপর মায়া দয়া নেই, চক্ষুলজ্জাও নেই, বুঝলি সোমনাথ?

বললাম, তোমার মা কোথায়?

জানিসনে? বুড়িকে এবার গলা ধাক্কা দিয়ে কাশী পাঠিয়েছি। পাঁচ টাকা বরাদ্দ, যেমন করেই হোক দেবো মাসে মাসে। মরলে পরে হাড়খানা পাথর হয়ে থাকবে বাঙালীটোলার পথে। জেলে থাকতে বউটা মরেছে, ছেলেটাকে নিয়ে গেছে তার মামারা। বেঁচে গেছি ভাই এযাত্রা, এবার শালা ঝাড়া হাত-পা।

আর বিয়ে করবে না?

আবার?—চোখ পাকিয়ে জগদীশ বললে, দেবো মাথায় তোর তিন ঠোক্কর। ও জাতকে আবার ঘরে আনে! দেখছিসনে গণপতি শালার অবস্থা?

আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, এর পরে দেখতে দেখতে তার মুখে হরিজন-সম্প্রদায়ের ভাষা ফুটে উঠতে থাকবে, অতএব এইখানেই ক্ষান্ত হলাম। রাজপথের বহুদূর পর্য্যন্ত এসে দুজনেই আমরা পরিশ্রান্ত। মাথার উপরে চৈত্রের রোদ, প্রাসাদময় মহানগর কলিকাতার পথে কোথাও ছায়া নেই, মায়া নেই। চারিদিকের ঐশ্বর্য্য আপন নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যে উন্নতশির, প্রাণসম্পর্কহীন।

পথের উপর আমাদের পরিচিত একটি চায়ের দোকান পড়ে। শহরের অনেকগুলি বিশেষ পাড়ায় বিশেষ কতকগুলি হোটেলে আমরা নিয়মিত যাতায়াত ক'রে থাকি। এক একটি দোকান আমাদের এক একটি মিলন-কেন্দ্র। জগদীশ এক জায়গায় থেমে বললে, আয় কিছু খাওয়া যাক্।

দোকানে গিয়ে উঠে জগদীশ বললে, বিপিনবাবু, খান আষ্টেক টোষ্ট ক'রে দাও ত,—আরে লোকনাথ যে, লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে···একেবারে গ্রোগ্রাসে গিল্‌ছে দেখছি।

লোকনাথ মুখে একটা কি দিয়ে চিবোচ্ছিল। বললে, বড় অপরাধ করেছি! তোমারো ত জমিদারি আছে, খেতে পারো না পেট ভ'রে?

জগদীশ হেসে বললে, আমার জমিদারি? সোনার পাথরবাটি!

জমিদারি নয়ত কি। প্রচার কার্য্যের নাম ক'রে দেশের টাকা নিয়ে অন্তত ঘরের চালাটাও ত ছেয়ে নিতে পারো?

চাল ছেয়ে না নিলেও পেট ভ'রে খেয়ে নিয়েছি ক'দিন।

দুজনে তার পাশে এসে বসলাম। বিবাদ রেখে আসল কথাটা লোকনাথ এবার বললে, তোমাকেই খুঁজছিলাম সোমনাথ। আবার ওখানকার চিঠি পেয়েছি হে।

কি চিঠি তা আমিও জানি লোকনাথও জানে। কিন্তু জগদীশ কৌতূহলবশত একটু ঝুঁকে পড়তেই লোকনাথ ব্যস্ত হয়ে বললে, তুমি কেন আমাদের কথায়? এসব গোপনীয় ব্যাপারে সোমনাথ ছাড়া আর কেউ—

জগদীশ হেসে বললে, তোর স্ত্রীর চিঠি বুঝি?

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। লোকনাথ বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললে, তুই জান্‌লি কি ক'রে?

এইবার জগদীশ মুখ খুললে, হতভাগা, গাধা, বাঁদর—তোর স্ত্রীর চিঠির সম্বন্ধে টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্য্যন্ত জানেনা কে? ভদ্রঘরের মেয়ে বিয়ে ক'রে কুৎসিত ভাষায় চিঠি লেখালেখি করিস, তোদের চিঠি ফুঁড়ে বেরোয় দেহের ক্লেদ, রক্ত মাংসের দুর্গন্ধ! ওই চিঠির কথা আবার রাস্তা ঘাটে ব'লে বেড়াস?

লোকনাথ অত্যন্ত আহত হয়েছে বুঝা গেল। অত্যন্ত উজ্জ্বল মুখ অতিরিক্ত ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু আমরা কেউ কারো বিরুদ্ধে সহজে উত্তেজিত হইনে। অথচ সবাই সবাইকে তিরস্কার এবং কটূক্তি করার প্রাথমিক অধিকার বজায় রাখি। তবু লোকনাথ তার কথার প্রতিবাদ ক'রে বললে, ভালোবাসার চিঠির ওপর এমন মন্তব্য ক'রো না জগদীশ!

ভালোবাসা?—জগদীশ উত্তেজিত হয়ে উঠল, এবং তার আগুন একবার জ্ব'লে উঠলে অন্যের পক্ষে নেবানো কঠিন; বললে, কেরাণির প্রেম? কাঁঠালের আমসত্ব? যৌনপ্রকৃতর গা চাটাচাটির নাম ভালোবাসা? তোমার প্রেমপত্রের চেয়ে বটতলার বইখানার দাম বেশি। আমি মুখস্থ ব'লে দিতে পারি তোমার চিঠিতে কি কি আছে। বাংলা দেশের মেয়ে পতিদেবতার মনস্তুষ্টি করতে বাধ্য, তোমার মতো কেরাণির কুপ্রবৃত্তিকে খুসি ক'রে রাখাই তার স্ত্রীধর্ম্ম! লোকনাথ, প্রেমের সত্যরূপ বুঝতে গেলে সংশিক্ষার দরকার, ধ্যান ও সাধনার দরকার, আমাদের তা নেই।

আছে কিনা একদিন দেখিয়ে দেবো—লোকনাথ অভিমানাহত কণ্ঠে বলতে লাগল, তোমাদের ব'লে রেখেছি এবার চাকরি হলে বউকে কল্‌কাতায় এনে বাসা ভাড়া করব, একদিন নেমন্তন্ন ক'রে তার হাতের রান্না তোমাদের খাওয়াবো। দেখবে তখন!

জগদীশ ততক্ষণে জুড়িয়ে গেছে। এবার হাসতে হাসতে বললে, সেই আশায় আমাদের তিন বছর কাটল, নারে সোমনাথ?

হোটেল থেকে তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। খেতে পেলেই আমাদের মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। ভালো খেতে পাওয়া আর ভালো ক'রে বাঁচতে পাওয়া, এই হলেই আমাদের উত্তেজনা কমে যায়। আমাদের যা কিছু স্খলন পতন, যা কিছু বিদ্রোহ এবং আক্রোশ—তার গোড়াতে রয়েছে সুন্দর জীবন যাপনের অনন্ত তৃষ্ণা। অন্তত সোজা কথাটা এই।

পথে নেমে লোকনাথ বলতে লাগল, দেখা হয়ে গেল তোমাদের সঙ্গে, চলো স্বামীজীর ওখানেই যাওয়া যাক্‌, আজ কি যেন একটা বক্তৃতা হবে। বৌদিদিও ওখানে আসবেন।

বৌদিদি মানে প্রিয়ম্বদা। ভদ্রমহিলার নাম ধ'রে ডাকা চলে না তাই সবাই আমরা বৌদিদি ব'লে থাকি। একহারা গড়নের গৌরবর্ণ একটি স্ত্রীলোক, পরণে চওড়া লালপেড়ে খদ্দরের সাড়ী, মাথায় ডগডগে এতখানি সিঁদুর। রাঙাপাড় সাড়ী ছাড়া তিনি আর কোনো পাড়ের সাড়ী পরেন না। হাতে কয়েকগাছি মিহি সোনার চুড়ি। সুডৌল হাত দুখানা নেড়ে তাঁকে মাঝে মাঝে চুড়ির শব্দ করতে আমরা শুনেছি।

জগদীশ বললে, তুমি বৌদিদির খুব ভক্ত, নয়?

লোকনাথ বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে বল্‌'ল, আমি কি একা? কত ছেলে ওঁকে দেবীর মতন পূজো করে। স্বামীর সঙ্গে বিবাদ ক'রে যেদিন দেশের জন্য জেলে যান্‌, ছেলেরা সেদিন 'বন্দে মাতরম্‌' বলতে বলতে মুখ দিয়ে ফেনা বা'র করেছিল। ওঃ যেদিন খালাস পেলেন, সেদিন পথ লোকে লোকারণ্য! এমন মহীয়সী, এত বড় দেশপ্রেমিকা—

লোকনাথের উজ্জ্বল চক্ষু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

জগদীশ তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললে, বৌদিদিকে চোখেই দেখি মাত্র, আলাপ নেই, নৈলে তাঁর বয়সটা কত জিজ্ঞেসা করতুম, জানতে পারতুম কত বয়স ব'লে তিনি নিজেকে চালান্‌—

এ কি তোমার কথা জগদীশ, ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে... ছি!

ভদ্রমহিলা বলেই ত ভদ্রভাবে জান্‌ব। বয়সটাই হচ্ছে মেয়েদের বড় মূলধন, এ তাঁরা জানেন। অনেক কুরূপা এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নিঃস্বার্থভাবে এবং নিঃশব্দে দেশের কাজে নেমেছেন এ আমি জানি, কিন্তু তোমার ওই প্রিয়ম্বদা বৌদিদি যুবসম্প্রদায়ের হাততালি পান্‌ কেন জানো? সুগৌর বর্ণ, সুপুষ্ট নিটোল দেহ, হাসিমাখা

মুখ, হাঁসের মতো চলন আর ডবল্-ঘের-দিয়ে-পরা রাঙাসাড়ীর জেল্লা! তোমার মতো আর ক'জন ভক্ত তাঁর হাতের নাগালে আছে লোকনাথ?

কী যে বলো তুমি জগদীশ! বৌদিদির সম্বন্ধে এত কটু-কাটব্য—

ভুল করছ। তাঁকে কটু কথা বলিনে, কারণ স্ত্রীলোকের রসবোধ নেই। বলছি তাদের যারা বৌদিদির রসের পরিমণ্ডলে মধু-মক্ষিকার মতো বিচরণ করে। ভিক্ষার হাত পেতে থাকে তাঁর খেয়াল-খুসির ছিটে-ফোঁটার আশায়।

লোকনাথ ভিতরে ভিতরে সম্ভবত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। জগদীশের কথার উত্তর না দিয়ে আমার দিকে ফিরে সে বললে, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, এই ত সবাই যাচ্ছি সেখানে, গিয়ে শুনলেই হয় তাঁর কথাবার্ত্তা? কি বলো সোমনাথ?

জগদীশ হাসতে লাগল।

গল্প করতে করতে শহরের একপ্রান্তে এসে পড়েছি। পশ্চিম-মুখো একটা পথের মোড়ে ঘুরে আমাদের গল্প থামল, লক্ষ্যস্থল এসে পড়েছে। লোকনাথ আমাদের আগে আগে এসে এক জায়গায় দাঁড়াল। সম্মুখে রাণীগঞ্জের টালি-ছাওয়া একখানা আধপাকা বাড়ী, তারই দালানে একজন অল্পবয়স্ক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী বসে রয়েছেন। আমরা সবাই তাঁর বিশেষ পরিচিত। তাঁর সম্মুখে আরো কয়েকজন স্ত্রী ও পুরুষ উপবিষ্ট। বৌদিদিও আছেন।

লোকনাথ দালানে উঠে বললে, এদের ধরে এনেছি স্বামীজী। এই যে, বৌদিদিও আছেন দেখছি, নমস্কার।

যদিও স্বামীজী বয়সে জগদীশের প্রায় সমবয়সী, তবুও একটি বিশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। বৌদিদি শ্রোত্রীমণ্ডলের ভিতর থেকে লোকনাথের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, এসো ভাই, আসোনি যে ত্'দিন?

এই আত্মীয়তাটুকুতেই লোকনাথের গলার আওয়াজ গদগদ হয়ে উঠল। গর্ব্বভরে আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে একটি বিশেষ ঘনিষ্ঠতার অধিকার প্রকাশ ক'রে সে বৌদিদির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। বললে, এই ত এসেছি বৌদি, আপনি না দেখলে ব্যস্ত হন্ তাই যেখানেই থাকি একবার ক'রে—আপনার শরীর ভালো আছে ত?

বৌদিদি বললেন, আমার শরীর ত বরাবরই ভালো থাকে?

হাঁ, তাই বলছি। যে পরিশ্রম আপনাকে করতে হয়—

আজকাল ত আমার বিশেষ পরিশ্রম নেই!

নেই? এর নাম নেই?—চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে লোকনাথ বললে, সেই চেহারা আপনার কি আর দেখব কোনোদিন? এ ত' কেবল অমানুষিক পরিশ্রমের জন্যই। আমার টাকা থাকলে এখনি আপনাকে চেঞ্জে নিয়ে যেতুম বৌদিদি।

বৌদিদি হেসে বললেন, নেই যখন চুপটি ক'রে বোসো।

জগদীশ হেসে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল, আমি তার অনুসরণ করলাম। খান চারেক ঘরের মধ্যে এইখানা আমাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া আছে; যে যখনই আসুক এই ঘরে সে আশ্রয় পায়। কেবল আশ্রয়ই নয়, আমরা এই আশ্রমের প্রচার-কার্য্য করি ব'লে নিয়মিত আহার্য্য পাবারো অধিকার রাখি। বিছানা ও প্রয়োজনীয় যৎসামান্য হাত-খরচ এবং খুঁটিনাটি জিনিসপত্রও আমাদের জন্য বরাদ্দ আছে। আমরা তুজনেই ক্লান্ত, একখানা মাতুর ছড়িয়ে গা এলিয়ে দিলাম।

বাইরের কথাবার্ত্তার দিকে আমাদের কান ছিল। স্বামীজী, যিনি জীবনকৃষ্ণ ভারতী ব'লে লোক-সমাজে প্রচলিত, তিনি সাধুভাষায় রসের খোঁচ দিয়ে বক্তৃতা করছিলেন: বক্তৃতা শুনে জগদীশ ত হেসেই খুন।

'এই নতুন জগৎটার সঙ্গে আজো আপনাদের পরিচয় ঘটেনি, এখানকার ছেলে আর মেয়ে সবাই নতুন, নতুন সমাজ আর নতুন মন—'

জীবনকৃষ্ণর কথাগুলো অনেকটা এই ধরণের:

'এই যে এদের দেখছেন, এদের সঙ্গে জনসাধারণের রুচি আর নীতি মিলবেনা, বিচিত্র স্বপ্ন আর অভিনব আদর্শ নিয়ে নতুন কালে এরা এসে জন্মগ্রহণ করেছে

এক রূপকথার দেশে। সেই চিরমন্দারের দেশ, চির-প্রত্যাশার অলকাপুরীর নাম কি জানেন?

কলিকাতা মহানগরী!—প্রিয়ম্বদা বললেন।

অস্ফুট একটা হাসির গুঞ্জন উঠল তাঁর রসিকতায়। উচ্চকণ্ঠে যে হাসল সে লোকনাথ। জগদীশ চুপি চুপি বললে, উল্লুক।

স্বামীজী বলতে লাগলেন, প্রিয়ম্বদা সত্যই বলেছেন, এই যন্ত্রজর্জ্জর মহানগরীর চারিদিকে চেয়ে দেখুন, সমগ্র বাংলার সঙ্গে এই স্ফীতকায় দাম্ভিক শহরের কোথাও অন্তরের যোগ নেই। বস্তুপুঞ্জের চাপে হৃদয়াবেগ গেল শুকিয়ে, প্রাণ হোলো কণ্ঠাগত; এই স্নেহলেশহীন মরুভূমির একপ্রান্তে একটি প্রাণরসের সুশ্যামল ক্ষেত্র আছে, কল্পলোকের নরনারীর দ্বারা সেই স্থান সঞ্জীবিত, এখানে জীবন-সংগ্রামের বিন্দুমাত্রও হানাহানি নেই—

জগদীশ পুলকিত কণ্ঠে চুপি চুপি বললে, লোকটা ভাবের কুয়াসায় পথ দেখতে পাচ্ছে না। একদিন দেশ-নেতাদের মুখে এমনি বক্তৃতা শুনে জেলে গিয়েছিলুম।

আমার মন ছিল স্বামীজীর কথার দিকে। তিনি বলছিলেন: এই আশ্রম দেখাতে চায় আবার সেই প্রাচীন বেদান্ত ভারতের পথ। অমৃতের পুত্র আমরা, আমরা আর্য্য-সভ্যতার প্রদীপ-বাহক, পশ্চিমের বস্তু-তান্ত্রিক শিক্ষা ও সভ্যতার অনুকরণ ক'রে আমরা আত্মস্বাতন্ত্র্য হারিয়েছি, বর্ণশঙ্কর সৃষ্টি করেছি···ফিরে যেতে হবে সেই চিরনবীন পুরাতনের হাওয়ায়, দেখাতে হবে জীবনের নীতির পথ, প্রাণধর্ম্মের সহজ ও সনাতন প্রবাহ।

বাইরে হাততালির শব্দ শুনে জগদীশ হেসে উঠল। স্বামীজীর পরে স্ত্রীকণ্ঠের আওয়াজ শুনা গেল। প্রিয়ম্বদা এবার দাঁড়িয়ে উঠেছেন। জগদীশ উঠে বসলো।

দেখতে দেখতে বৌদিদি বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। বললেন: স্বামীজীর সকল মতের সঙ্গে আমার মিল নেই তা বোধহয় আপনারা জানেন। পুরুষের নাগপাশ থেকে আজ নারীশক্তিকে মুক্তি দিতে হবে। নারীর অবাধ স্বাধীনতাই দেশের কল্যাণের পথ। পারিবারিক জীবনের সহস্র বন্ধনের ভিতরে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। আমরা পুরুষের দাসী, তাদের খেয়ালের খেলা, আমরা তাদের পাশবিকতার ইন্ধন মাত্র। আমাদের স্বাবলম্বনের উপায় নেই, অবাধ গতিবিধির স্বাধীনতা নেই, স্বতন্ত্র ধ্যান-ধারণার সুবিধা নেই। আমরা পুরুষের ক্রীতদাসী—

এমন সময় উন্মাদের মতো লোকনাথ আমাদের ঘরে এসে ঢুকল। বললে, দেখলে জগদীশ, শুনলে ত সব?—তার কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসছিল, গলা কাঁপছে। বললে, মহীয়সী, আদর্শ স্থানীয়া···কত বড় সৌভাগ্যে আমরা ওঁকে লাভ করেছি দেশের এই দুর্দ্দিনে ওঁর মতন···সব টুকে রাখছি, সাপ্তাহিক পত্রে ফটোসুদ্ধ পাঠিয়ে দেবো,—এই ব'লে সে হাঁপাতে লাগল,—আমাদের মতন পুরুষ ওঁর পায়ে মাথা রাখবার যোগ্য নয়!

হঠাৎ জগদীশের মুখের চেহারা দেখে সে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল, আমার দিকে ফিরে বললে, সোমনাথ, তুইও আজ শুন্‌লি, তোরও কতবড় সৌভাগ্য—বলতে বলতে অশ্রুপূর্ণ চক্ষে সে আবার দ্রুতপদে উঠে বেরিয়ে গেল।

জগদীশ নিশ্বাস ফেলে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল, তারপর হতাশ কণ্ঠে বললে, আচ্ছা, লোকনাথের কোনো রোগ নেই ত?

উষ্ণকণ্ঠে বললাম, ঠাট্টা ক'রো না জগদীশ, মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধার মূল্য হিসাবে—

জগদীশ আমার কথায় কান দিল না। শুষ্ককণ্ঠে বললে, ওই স্ত্রীলোকটার খেয়াল একদিন হয়ত শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু দুঃখ এই, বোকা লোকনাথটা চিরদিন তার স্বভাবরোগে ভুগে মরবে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আলো জ্ব'লে উঠল কোথাও কোথাও। বাইরের বক্তৃতাগুলো থাম্‌ল। বলা বাহুল্য, থামলেই ভালো শোনায়। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরে দেখি, জগদীশের চোখে তন্দ্রা এসেছে। কিছুকাল থেকে লক্ষ্য করছি, জায়গা পেলেই সে যখন তখন ঘুমোবার চেষ্টা করে। লোকনাথের আর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না; সম্ভবত সে প্রিয়ম্বদাকে বাড়ী পৌছে দিতে গেছে,—পিছনে পিছনে যেমন রোজই যায়। এই অবসরে

আস্তে আস্তে উঠে আমি চায়ের সন্ধানে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

দিন চারেক পরে একদিন রাত্রে বাসার দরজায় পা দিতেই মেসের ঠাকুর বললে, আপনার জন্যে একটি বাবু অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন।

কোথায়?—জিজ্ঞাসা করলাম।

ওপরে, আপনার ঘরে।

দোতলায় দক্ষিণ দিকে আমার ঘর। মেসে সাধারণত একটি নিজস্ব ঘর পাওয়া কঠিন। আমি পেয়েছি, তার কারণ শাঁসালো জমিদারের ছেলে আমি, কিছু মূল্য বেশি দিতে পারি। নিজস্ব ঘর না হলে থাকতে পারিনে। সমস্ত দিন সকলের সঙ্গে অবাধে মিশে যাই, কিন্তু রাত্রিকালে বিশেষ একটি সময়ে নিভৃত অবকাশের প্রয়োজন হয়, তখন আর কোনো মানুষকেই ভালো লাগে না। তখন আমি একা, প্রাণের মধ্যে অনন্ত একাকীত্ব নিয়ে নীরবে রাত্রির প্রহরগুলি গুণ্‌তে থাকি। সোজা দোতলায় এসে উঠলাম। বারান্দা পার হতে গিয়ে কানে এল, আমারই পুরনো ভাঙা হারমোনিয়মটার আওয়াজ। বুঝতে আর বাকি রইল না এ কাজ বঙ্কিমের। হাসিমুখে ঘরে এসে ঢুকলাম।

বঙ্কিম গান না থামিয়েই হাত নেড়ে আমাকে বসতে বললে। গান-বাজনায় সে পাগল। একই স্কুলে পড়েছি বরাবর, কলেজে এসে ছাড়াছাড়ি। চিরদিন রোমান্টিক্ ব'লে এই ছেলেটির একটি প্রসিদ্ধি ছিল। চেহারা সুন্দর, এবং আমার বিশ্বাস বহু যুবকের ভিতরেও সে সুন্দর। সোনার চশমার ভিতর দিয়ে তার চোখ দুটো দেখতে খুব ভালো লাগে। বাড়ীর অবস্থা স্বচ্ছল, সেই জন্য তার কোনো কাজকর্ম্ম না করলেও চলে। ইংরেজি নভেল, শেলী ও রবিঠাকুরের কবিতা, বাউলের গান, এরা তার বড় প্রিয়। একটি বিশেষ রসের জগতে সে বিচরণ করে, আমাদের মতো শুষ্ক কাষ্ঠের সঙ্গে সে মাটিতে পা গুণে চলে না। এমন ভাবের স্রোতে গা-এলানো, এমন বেপরোয়া ও বেহিসেবী, এমন আত্মবিস্মৃত খেয়ালী অন্তত আমাদের মধ্যে আর কেউ নেই।

গান থামল। আলোটা জ্বালতে গেলাম, সে বাধা দিয়ে বললে, 'থাক্, এমন চমৎকার চাঁদের আলোয় আর ঘরে আলো জ্বালিসনে।—ব'লে সে সটান চৌকীর উপর শুয়ে পড়ল।

বললাম, খুঁজছিলে কেন আমাকে?

ভাবছিলুম তোকে নিয়ে আজ বেড়াতে যাবো। চল্, নৌকো ক'রে গঙ্গায় বেড়িয়ে আসি।

এই রাতে? যদি ঝড় ওঠে?

বঙ্কিম উঠে বসে বললে, তুই কি সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছিস? এমন ত ছিলি নে!

তার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন একটা সন্দেহ হোলো। কাছে সরে' গিয়ে বললাম, পেটে কিছু পড়েছে নাকি আজ?

বঙ্কিম হাসল। হেসে বললে, ধরা যায় না, একটু-খানি খেয়েছি, এক পেগ্ মাত্র!—এই বলেই সে গুন্‌গুন্ ক'রে ওমর খৈয়াম আবৃত্তি ক'রে উঠল:

'স্বপনে নিশিভোরে কে ব'লে গেল মোরে,
কাটাবি কতকাল, রে মূঢ় ঘুমঘোরে?
শুকালো আয়ু-সুধা মিটাবি কবে ক্ষুধা?
সিরাজি এই বেলা পেয়ালা নেরে ভ'রে!'

কবিতা আবৃত্তি ক'রে বেড়ানোটা তার নেশা। তার উপরে সুরার স্পর্শ পেয়ে তাকে সামলে রাখা আজ হয়ত কঠিন হবে। এই ত্রুটির জন্য আমরা কেউই তার উপরে রুষ্ট হইনে। বরং এমন দেখেছি, বন্ধুবান্ধবদের খুব একটা চিন্তাক্লিষ্ট ও শোকাচ্ছন্ন অবস্থাকে সে সময়োচিত কোনো কবিতার অংশ আবৃত্তি ক'রে হাল্‌কা ক'রে দিয়েছে, স্ফূর্তি ও আনন্দ বহন ক'রে এনেছে।

আবৃত্তির কিয়ৎক্ষণ পরে সে বললে, তোর সঙ্গে কথা আছে সোমনাথ। আমি আজ মা'র ওখানে গিয়েছিলুম।

তারপর?

কাছে মুখখানা সরিয়ে এনে বঙ্কিম বললে, একটি মেয়েকে তুই সেদিন ওখানে রেখে এসেছিস, নাম শুনলুম ভগবতী, কে রে সে মেয়েটি? তোর কেউ হয়?

বললাম, আমার কেউ হয় না।

তবে তোর সঙ্গে পরিচয় হোলো কেমন ক'রে?

আমাদের গ্রামের মেয়ে। সেদিন এসেছে আমার সঙ্গে। কল্‌কাতায় থেকে পড়াশুনো করবে।

ভালবাসা আছে বুঝি তোদের মধ্যে ?

ছি ছি, এমন কথা বলো না বঙ্কিম।

বঙ্কিম সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল। বললে, নেই ? ধন্যবাদ। Oh, she is an angel ! রূপ দেখেছি অনেক, এমন অপরূপ আর দেখিনি। বাস্তবিক, divine beauty ! তোর জন্য ওকে দেখতে পেলুম, চিরদিন তোর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব সোমনাথ।

বললাম, ব্যাপার কি হে ?

এইবার বঙ্কিম আসল কথাটা বললে, মা'র ওখানে গিয়েছিলুম, মা দিলেন পরিচয় করিয়ে। হাসিমুখে ভগবতী এমন ক'রে নমস্কার করলে, ah, it was a sight for the gods to see. সোমনাথ, এতদিন যাকে স্বপ্নেই কেবল দেখতুম আজ দেখলুম সেও মর্ত্ত্যের মানবী হতে পারে। যখন জল-খাবার দিলে এসে, তখন তার আঙুলে আমার হাত ঠেকে গেল। চিরদিন—চিরদিন আমার মনে থাকবে এই স্পর্শটুকু, আমার সমস্ত রক্তের চলাচলের মধ্যে ঝন্‌ঝন্ ক'রে যেন একটা মহাযুদ্ধের বাজনা বাজতে লাগল।

একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছ বলো ?

শুধু মুগ্ধ ? I am dead and gone ! পদ্মপলাশের মতো চোখ, শ্রাবণের মেঘের মতো চুল···শরৎ পূর্ণিমার জ্যোৎস্না দেখেছিস গঙ্গার বুকে ? তেমনি তার দেহ ! আমি জানাবো সোমনাথ, আমি জানাবো তাঁকে আমার হৃদয়ের ভাষা !

হেসে বললাম, সেবারেও ত তোমার এমনি অবস্থা হয়েছিল থিয়েটারের সেই অভিনেত্রীটির সম্বন্ধে—?

সে ? damned hell ! পতিতা স্ত্রীলোকরা কি জানে ভালোবাসার মর্ম্ম ? বেশ্যার খেয়ালকে প্রেম বল্‌ব ? সেটা সাহিত্যে মানায়, জীবনে দাঁড়ায় না। আমার মনের অগাধ গভীরতার সে মূল্য দিতে পারে কতটুকু ? আজ ভগবতীর কাছে গিয়ে নিজের সত্য পরিচয় আমি জানতে পেরেছি সোমনাথ।

তার কণ্ঠের আন্তরিকতা আমার মনকে স্পর্শ করল। তবু বললাম, আচ্ছা ধরো তোমার সঙ্গে ভগবতীর ঘনিষ্ঠ আলাপই হোলো। কিন্তু পরে তিনি যদি জানতে পারেন তুমি মদ খাও, তুমি একজন পতিতা স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত ছিলে, তাহ'লে—

বঙ্কিম উঠে এসে আমার হাত ধরলে। করুণ কণ্ঠে বললে, মানুষের চরিত্র কি একদিন বদলাতে পারে না সোমনাথ ? কবে আমি আমার কুপ্রবৃত্তিকে কিছু প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছিলুম সেইটেই কি আমার মহত্ত্বর সাধনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে ? আমি ত সামান্য, কিন্তু যে-কোনো জগৎ-বরেণ্য লোকের কথা ভাবো, যারা নিয়ে গেছে মানুষকে যুগে যুগে সৎ ও সত্যের পথে, তাদের জীবনেও কি যৌনপ্রকৃতির সাময়িক তাড়না ছিল না ? ধার্ম্মিক ও নীতিবিদরা কি জৈবিক ধর্ম্ম পালন করেন নি ?

ভালো হোক বা মন্দ হোক, নিজের কোনো একটা বিশেষ মতকে নানা সম্ভব ও অসম্ভব যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা বঙ্কিমের চিরকাল। আমি জানি তার এই সমস্ত বক্তৃতা ও পরিশুদ্ধ বাংলা ভাষার পিছনে ছিল ভগবতীর প্রতি আসক্তি। সুন্দরী নারীর মোহ মানুষকে এক আশ্চর্য্য পথে নিয়ে যায়। আসক্তির সঞ্চার হয় যে-পাত্রে, সেই পাত্র থেকে একই কালে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে থাকে নীতি ও নীচতা, ধর্ম্মবুদ্ধি ও ঈর্ষা, উদারতা ও প্রলোভন, ঔদাসীন্য ও দীনতা। নারীর সংস্পর্শে পুরুষের প্রকৃত চেহারা ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়।

হেসে বললাম, তোমার কথা বলছিনে কিন্তু ভগবতী যদি তোমার সম্বন্ধে কিছু জান্‌তে পারেন ?

জানতে না পারেন সেই ভারটাই তোমাকে নিতে হবে সোমনাথ। তিনি আমাকে ঘৃণা করলে আমি—আমি আত্মহত্যা করব। আশা করছি আমার যত কিছু লজ্জা তাঁর স্পর্শে সোনা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমি যদি তাঁকে ভালোবাসি তোমার কোনো আপত্তি নেই ত ?

এইবার হেসে উঠলাম, আপত্তি ? কি আশ্চর্য্য ! একটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালোবাসবে, আমার আপত্তি ?

বঙ্কিম বললে, তোমার মনের কোনে তাঁর সম্বন্ধে কোনোরূপ কিছু—?

কিছুমাত্র না, তুমি নিশ্চিন্ত হও।—ব'লে সুইচ্ টিপে আলোটা জ্বেলে দিলাম।

বঙ্কিম উঠে দাঁড়িয়ে হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরলে। বললে, আমি যদি আজ জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ লাভ করি তবে—তবে সে কেবল তোরই দয়ায় সোমনাথ। আজ আসি ভাই।—বলেই সে একটি কবিতার চরণ ধরলে :

'দে দোল্ দোল্। দে দোল্ দোল্।
এ মহাসাগরে তুফান তোল্।
বধূরে আমার পেয়েছি আবার ভরেছে কোল।'

বলতে বলতে উল্লাসে ছুটে সে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে' গেল।

আলোটা জ্বেলেছিলাম কিন্তু জ্বেলে রাখার আর কিছু প্রয়োজন রইল না, সুইচ্ বন্ধ ক'রে বাইরে গেলাম। মেসের নানা লোকের নানা কণ্ঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় একবার চেয়ে দেখলাম, আপন আত্মার অনন্ত নৈঃশব্দ্য নিয়ে আমি একান্তই একা। সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে ছাদে উঠে এলাম। শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় দিগদিগন্ত প্লাবিত হয়ে গেছে।

কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত একটা নূতন কর্ম্মপথ আমার চোখের সম্মুখে ছিল। গ্রামে ফিরে গিয়ে নূতন গ্রাম গড়ব। স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, সভ্যতায় সেই গ্রাম হবে দেশের আদর্শ স্থানীয়। দেবতার মন্দির দাঁড়িয়ে উঠবে গ্রামের চারিদিকে, দুঃখী-দরিদ্রের অভাব-অভিযোগ কোথাও শোনা যাবে না, প্রত্যেক মানুষ আপন আপন অধিকার সমানভাবে বণ্টন ক'রে নেবে, দরিদ্র ও ধনাঢ্যের ভিতরে পার্থক্য যাবে ঘুচে। কিন্তু অল্পে অল্পে জানতে পেরেছি তা হবার যো নেই। মদীয় পিতৃদেব অত্যন্ত রক্ষণশীল। একদিন আমার কর্ম্মপদ্ধতির একটা খসড়া তাঁর কাছে ধরতেই তিনি হাসিমুখে এমন একটি বক্তৃতা দিলেন যে, আমার আইডিয়াগুলো সব ধোঁয়ার মতো উড়ে গেল। বক্তৃতাটার মর্ম্ম এই, পৈতৃক সম্পত্তিকে যারা সুলভ সাম্যবাদের আওতায় ফেলে ঈর্ষাকাতর অকর্ম্মণ্য সাধারণের লুণ্ঠনের সামগ্রী ক'রে তোলে তারা আর্য্য সভ্যতার ঘোরতর শত্রু। পশ্চিমের ধারকরা মতবাদ ও আদর্শ আমাদের দেশের মাটিতে শিকড় পায়না। এই সকল উপদেশের পর পিতৃদেব আমাকে অনুরোধ করেছেন, এবার থেকে সৎসঙ্গে মেশবার চেষ্টা ক'রো সোমনাথ। তোমাকে কলকাতায় আর একলা রাখা চলছে না, তুমি ভুল পথে যাচ্ছ।

হয়ত তাই হবে, হয়ত ভুল পথেই চলেছি। পথ নেই, নবীনের চলবার পথ বড় জটিল, ভুল পথে গিয়ে গিয়েই তাকে জীবনের চেহারা দেখে নিতে হবে। আমি জানি, আমার চারিদিকে সে-সমাজ আজ প্রসারিত, তার ভিতরে কেবলই দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব, কেবলই সংশয় আর জিজ্ঞাসা। কোথাও সমস্যা জেগে উঠছে বিস্ফোটকের মতো, কোথাও প্রতিবাদ জ্বলে' উঠছে দাবানলের মতো। কোন্ অলক্ষ্য ছিদ্রপথ দিয়ে এসেছে জীবনের প্রতি এই বৈরাগ্য, এই অতৃপ্তি? বর্ত্তমান যুগ কোন্ বাণী বহন করে' এনেছে, কোন্ সত্যের পথে সে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে?

জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে আমার চোখে নাম্‌ল তন্দ্রা।

সকাল বেলা উঠে সবেমাত্র চা খেয়ে সুস্থির হয়ে বসেছি এমন সময় নিচে থেকে ডাক পড়ল। সম্ভবত জগদীশ কি লোকনাথ কেউ হবে। কিন্তু সূর্য্যোদয় হতে না-হতেই তারা যে শয্যাত্যাগ ক'রে আসবে এমন কথা ত তাদের শাস্ত্রে লেখা নেই। সূর্য্যোদয় তারা কোনোদিন দেখেছে কিনা সন্দেহ।

ডাক শুনে নিচে নেমে যেতে হোলো। সদর দরজায় পা দিয়েই দেখি আমাদের বাড়ীর পুরোনো বুড়ো চাকর দাঁড়িয়ে। খুসি হয়ে হেসে গিয়ে তার হাত ধরলাম,—কিরে দুখীরাম, কবে এলি তোরা? বাবা খবর না দিয়েই এসে পড়লেন যে?

দুখীরাম হাতটা ছাড়িয়ে নিল। বললে, আমি তোমার মুখ দেখতে চাইনে।

তার মুখের চেহারা দেখে ত্রস্ত হলাম। দুখীরাম আমার মৃতা মাতা ও জীবিত পিতার পরম বিশ্বাসী ভৃত্য। আমাদের পরিবারের তিন পুরুষের ইতিহাসের সঙ্গে এই লোকটা বিশেষভাবে জড়িত। লোকটার বাড়ী বিহারের চম্পারণ জেলায়, কিন্তু বাঙালী ব'লে তাকে স্বীকার না করলে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। সে যেন আমার পিতা ও মাতার সংমিশ্রিত বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি।

হেসে বললাম, মুখ দেখাবিনে কেন, দাড়ি কামাইনি ব'লে ?

আমার হাসির উত্তরে সে চোখ পাকিয়ে বললে, বাবু এসেছেন, তা জানো ?

সে ত' তোকে দেখেই বুঝতে পাচ্ছি, তুই ত তাঁর গাধাবোট।

সম্ভবত দুখীরাম এতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মসম্বরণ ক'রেছিল, এইবার সে হঠাৎ বিদীর্ণকণ্ঠে কেঁদে উঠল এবং আমাকে একেবারে তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, দাদা গো, আমরা ভেবেছিলুম পুলিশে আর তোমাকে ছাড়বে না··· বাবু এখানে এসেই উকীলের বাড়ী হাঁটাহাঁটি করছেন—

বিস্মিত হয়ে বললাম, পুলিশ ? উকীলের বাড়ী হাঁটাহাঁটি ? ব্যাপারটা কি বল্ দিকি ?

দুখীরাম আমাকে টান্‌তে টান্‌তে কিছুদূর নিয়ে গিয়ে বললে, আবার ধরবে, আবার ধরবে, এখুনি চলো আমার সঙ্গে···তোমাকে এমন লুকিয়ে রাখবো যে··· ধিঙ্গি রাক্কুসির পাল্লায় প'ড়ে তোমার এই আবস্ত'—

আঃ ছাড়্ দুখীরাম, রাস্তার মাঝখানে মেয়েলিপনা করিসনে।

একটা হাত দুখীরাম কিছুতেই ছাড়তে চাইল না। চোখ মুছে বললে, শিগগির চলো আমার সঙ্গে নৈলে চেঁচিয়ে আমি হাট বাধাবো। আজ পাঁচ দিন ধ'রে আমার উপবাস—বলতে বলতে আবার তার গলা বন্ধ হয়ে এল।

দুখীরামের চোখের জল আমি জীবনে দেখিনি। একজন কাঁদে আর একজনের জন্য, এই দৃশ্য দেখলে আমি যেন কোথায় ভেঙে পড়ি। মুখে কেবল বললাম, কি আশ্চয্যি, এই ত যাচ্ছি তোর সঙ্গে, অমন করিস কেন দুখীরাম ? এইবার বল্ কি হয়েছে।

পথের মোড়ে এসে সে একখানা গাড়ী ডেকে আমাকে তোলবার চেষ্টা করলে। বিরক্ত হয়ে বললাম, জমিদারের ছেলে আমি, থার্ডক্লাস ছ্যাকড়ায় চড়িনে। হাতী যখন এখানে পাওয়া যাবে না তখন তোরই কাঁধে চড়ে' যাই চল্।

অগত্যা একখানা ট্যাক্সি ডেকে দু'জনে উঠলাম। উঠেই আমার মুখে হাসি। কিছু দুঃখ দিতে পেরেছি দুখীরামকে, এই আনন্দে মন খুসিতে ভরে উঠেছে। এটা বেশ জানিয়ে দিলাম আমি আজকাল নিতান্ত সামান্য লোক নয়, আমার বহুদর্শন হয়েছে। এও তাকে জানাতে ভুললাম না, যেমন বরাবর তাকে জানিয়ে এসেছি, পিতৃবিয়োগের পর যেদিন জমিদারিটা আমার হাতে আসবে, একদিন আসবেই, সেদিন তাকে 'ম্যানেজার' ক'রে দেবো।

গাড়ী থামলে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে দুখীরাম আমার হাত ধ'রে নাম্‌ল। নতুন একখানা বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে। প্রথমেই কয়েকজন চোগা চাপকান্ পরা অপরিচিত লোকের ভিতর থেকে আমাদের গ্রামের চক্রবর্ত্তী মশাইকে দেখা গেল। দুখীরাম বিজয়গর্ব্বে আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে সকলের মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। সকলের মুখে চোখে কৌতূহল দেখে বিরক্তিও হোলো, একটু ভীতও হলাম। আমি যেন একটা অদ্ভুত জীব।

কবে এলেন ন-কাকা ?

চক্রবর্ত্তী মাথা হেঁট ক'রে সরে গেলেন। আমি অবাক হয়ে সকলের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলাম। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র, তারপরই দুখীরামের অনুসরণ করে' সোজা ভিতরে গেলাম। সুমুখে চিন্তাকুল চোখে চেয়ে বাবা ব'সে রয়েছেন।

হঠাৎ একটা অজানা আশঙ্কা ও লজ্জায় সন্ত্রস্ত হলাম কিন্তু সেও মুহূর্ত্ত মাত্র, পরক্ষণেই সাহসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, টেলিগ্রাম না করেই এখানে এলেন যে ?

জানিয়ে এলে কি তোমার কোনো সুবিধে হোতো ?

ওরে বাবা! চাঁচাছোলা গলার আওয়াজ, রসের আমেজটুকু পর্য্যন্ত নেই। বেশ অনুভব করছি দরজার বাইরে অনভিপ্রেত জনতা দাঁড়িয়ে কান পেতে আমাদের অর্থাৎ পিতা ও পুত্রের আলোচনা শুন্‌ছে।

নিজের কুণ্ঠার কারণ নিজেই বুঝতে পাচ্ছিনে, তবুও অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে একখানা চৌকির উপর মাথা হেঁট ক'রে বসলাম। বাবা সোজা আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, এতটা তোমার কাছে আমি আশা করিনি সোমনাথ।

মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকালাম, তাঁর চোখের উপর

মার চোখ স্থির হয়ে রইল। দরজার কাছে আড়ালে ড়িয়ে দুখীরাম আমাকে পিতার পায়ে ধরবার জন্য াকুল ভাবে ইঙ্গিত করছে।

সবিনয়ে বললাম, আপনি কি বলতে চাইছেন বাবা?

বলতে চাইছি তুমি আমার বংশকে কলঙ্কিত রেছ,—শ্রীযুক্ত দীননাথ চৌধুরীর কণ্ঠ বিদীর্ণ হয়ে ঠল,—তুমি আমার পিতৃপিতামহের নরকবাসের ব্যবস্থা রেছ!

মাথা হেঁট ক'রে বললাম, আপনার কথা আমি কছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।

বুঝবে কেমন ক'রে? সৃষ্টি করবার শক্তি নিয়ে তামরা আসোনি, সমাজকে সৎভাবে লালন করবার শক্ষা তোমাদের নেই, তোমরা এসেছ ধ্বংস করতে। ুমি এমন কাজ ক'রে এসেছ সোমনাথ যে, আমাদের মস্ত গ্রাম স্তম্ভিত হয়ে গেছে। মানুষের মনে এই চমক াগাবার বাহাদুরির তলায় তোমার কি ছিল জানো,—যৌবনকালের কুৎসিত কুপ্রবৃত্তি!

মাথা আমার হেঁট হয়েই রইল, বাবা বলতে াগলেন, এটা তোমার কল্‌কাতার শিক্ষা কিন্তু দেশের শিক্ষা নয়। তোমার সম্বন্ধে আমাদের অন্য ধারণা ছিল। ভেবেছিলুম তুমি বুঝি নিজের চরিত্রকে বড়ো ক'রে তুলতে পেরেছ, বুঝি মানুষ হয়ে উঠেছ,—আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু আজ—আজ আমি চেয়ে দেখি, গোপনে গোপনে তোমার চরিত্রে সর্ব্বনাশের বারুদ জমে উঠেছে, তোমার মধ্যে আমাদের কল্যাণ চিন্তা নেই, সমাজের শুভচিহ্ন নেই। এর চেয়ে—এর চেয়ে তোমার মরণ ভালো ছিল সোমনাথ।—তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠ্‌ল।

প্রতিবাদ কিছু করবার আগেই তিনি বললেন, আমার সন্তান ব'লে তুমি আর পরিচিত হবার চেষ্টা ক'রো না। আমার বংশের স্বভাবকে তুমি কলুষিত করবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠেছ, তোমার প্রকৃতির মধ্যে পাপ বাসা বেঁধেছে। আমি ক্ষমা করব না তোমাকে।

আমার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। বললাম, কিন্তু—

না, কিন্তু নয়। তোমার পক্ষে অন্য বিচার আমার আর নেই। তোমাকে স্বীকার করব না এই তোমার শাস্তি। তুমি যাও সোমনাথ, দেশ থেকে দূর হয়ে যাও, সমাজের প্রাণধর্ম্মকে বিষাক্ত করেছ, তুমি আমাদের সকলের শত্রু!

দুখীরাম ওদিকে কান্নাকাটি সুরু করেছে। তার দিকে একবার তাকিয়ে বললাম, আমার কথাটা শুনুন—?

উচ্চকণ্ঠে বাবা বললেন, আপোষ কিছু নেই, তোমার ঘটনা নিয়ে মজলিশ বসাতেও চাইনে!

কিন্তু আমি কি করেছি বললেন না ত?

হঠাৎ চক্রবর্ত্তী এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, এমন প্রবৃত্তি কি ভালো সোমনাথ? তুমি আমাদের গ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন, সমাজের মুখোজ্জ্বল করেছিলে, ব্রাহ্মণের সদ্বংশের সন্তান! তোমার কি উচিত হয়েছে ভগবতীর হাত ধ'রে চলে' আসা? সেই মেয়ে, যার মা সন্তান ঘরে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়? সবাইকে ত্যাগ ক'রে নিজের লজ্জা নিয়ে তুমি কি সুখে থাকবে সোমনাথ?—বলতে বলতে তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। এ যেন একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র, একটা চক্রান্ত! কিন্তু আমার কৈফিয়ৎ শোনবার ধৈর্য্য পর্য্যন্ত যাদের নেই, ভয় তাদের আমি করব না। ভয় ক'রে এসেছি আজীবন, ভয়ের মধ্যে আমরা মানুষ, ভয় আর অপমান আর অধীনতায় আমরা শৃঙ্খলিত, জর্জ্জরিত!

উঠে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে বললাম, কিন্তু আমি জানি আমি কোনো অন্যায় করিনি।

বাবা বললেন, তোমার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি শোনবার সময় আমার নেই। আমি জানতে চাই এখন থেকে তুমি কি করবে।

সে আমি নিজেই জানিনে।

তিনি বললেন, আজ তোমাকে আমার সঙ্গে গ্রামে ফিরে যেতে হবে এবং চিরদিনের মতো কল্‌কাতায় আসা বন্ধ করতে হবে। সেখানে সকলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে এবং প্রায়শ্চিত্ত করবে। এখন থেকে আমার ব্যবস্থা অনুযায়ী তোমাকে চলতে হবে।

স্পষ্টকণ্ঠে তাঁর মুখের উপর ব'লে দিলাম, যদি পারেন আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন কিন্তু আপনার এই ব্যবস্থা আমি মেনে নিতে পারব না।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, চক্রবর্ত্তী ?

চক্রবর্ত্তী মশাই এসে দাঁড়াতেই তিনি পুনরায় বললেন, দুখীরামকে ব'লে দাও আজ আমাদের যাওয়া হবে না।—আমার দিকে ফিরে বললেন, আজ থেকে আমি অস্বীকার করব যে তুমি আমার সন্তান, এবং তুমিও যদি পারো তবে সমস্ত সম্পর্ক মুছে দিয়ো।

সর্ব্বশরীর আমার কাঁপছিল। আমার দুরন্ত প্রাণধারা থর থর করছে, স্নায়ুমণ্ডলীর প্রতি গ্রন্থিতে, জীবনচেতনার উদ্দাম ব্যাকুলতা। সংযত কণ্ঠে বললাম, আমাকে তবে বিদায় দিন্ ?

তিনি কম্পিতকণ্ঠে বললেন, দুর্ব্বল পিতার অন্ধ বাৎসল্য আমার কাছে আশা ক'রো না। বিদায় আমি তোমাকে দিচ্ছিনে, বিদায় তুমি নিজেই নিলে। কিন্তু তোমাকে মেনে নিয়ে আমি দেশের নীতিকে আঘাত করব না, বিষাক্ত করতে পারব না সমাজের মনকে, তুমি যাও। আমার রক্ত আছে তোমার মধ্যে এজন্য আমি লজ্জিত। তুমি চ'লে যাও।—থাক্, পা ছুঁয়ো না আমার, আশীর্ব্বাদ তোমাকে করতে পারব না, তোমার দীর্ঘ জীবনের কামনা করতে পারব না এই মুখে। কেবল বলি, যে-আঘাত তুমি দিয়ে গেলে, এর প্রতিফল যেন তোমার সমস্ত জীবনকে ধ্বংস করে। যতদিন বাঁচবে, দুঃখ যেন তোমার আকণ্ঠ হয়ে ওঠে, বিপদের আঘাতে প্রতিদিন ছিন্নভিন্ন হোয়ো—

চক্রবর্ত্তী তাঁকে থামাতে এলেন, আর সবাই ছুটে এসে ঘরের ভিতরে দাঁড়াল। কিন্তু পিতৃদেব নিরস্ত হলেন না। অগ্নি-সংযুক্ত বারুদের ন্যায় রক্তাক্ত চক্ষে মূর্ত্তিমান অভিশাপের মতো তিনি আবেগভরে বলতে লাগলেন, অপমানে যেন তোমার মাথা হেঁট হয় চিরদিন, অভাবে-দারিদ্র্যে নিজের বুকের রক্ত যেন তোমায় খেতে হয়,—জালা আর যন্ত্রণায় সংসারের সকল দরজায় মাথা ঠুকে ঠুকে তোমার প্রাণ যেন মরুভূমি হয়ে ওঠে···যাও, এই আশীর্ব্বাদ নিয়ে তুমি চলে' যাও।

কান্নায় আমার চোখ কাঁপছে, কান্নায় কাঁপছে আমার সর্ব্বশরীর, কাঁপছে আমার প্রাণের মর্ম্মমূল পর্য্যন্ত। ক্ষমা চাইব না, দেবো না কৈফিয়ৎ, চূরমার হয়ে ভেঙে পড়ব না আজ তাঁর পায়ে। কেবল একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। খুঁজে খুঁজে বা'র করলাম সদর দরজাটা, পথের দিশা আমার হারিয়ে গেছে,—হাতড়ে হাতড়ে রৌদ্রক্লিষ্ট পথে নেমে এলাম, চোখ দুটো তখন আমার উত্তপ্ত অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে গেছে।

কোথায় ছিল দুখীরাম, ছুটে এসে পথ আগলে দাঁড়াল। ফিরে দেখি তার হাতে দুটো মিষ্টি আর এক ঘটি জল। বললে, রোদ্দুরের দন·· দাদাভাই, এই জলখাবারটুকু···

না, না, জল নয়, সান্ত্বনা নয় ; বুক আমার ফেটে যাক, তৃষ্ণায় বিদীর্ণ হোক্ ! কোনো দিকে আর না চেয়ে আমি দ্রুতপদে রাজপথের উপর দিয়ে ছুটে চললাম। —ক্রমশঃ

বুদ্ধ ও উপনিষদ
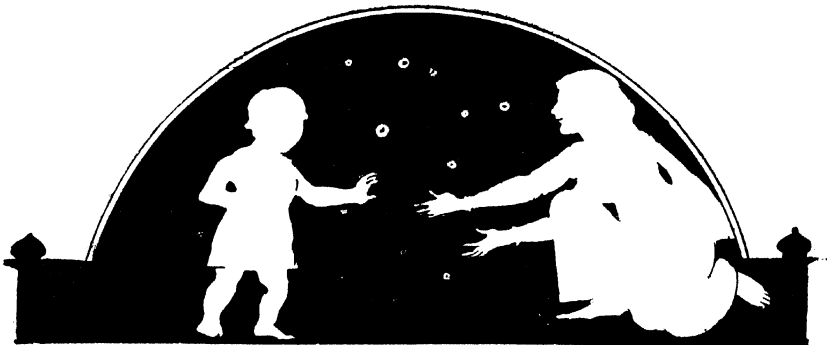
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ডাক্তার মিসেস্ রাইজ ডেভিড্স্ সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠতম পালি-ভাষা ও শাস্ত্রবিৎ বিদুষী ইংরাজ-মহিলা। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পালির অধ্যাপক ও ইংলণ্ডের পালি টেক্স্ট সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্বামী পালি-পণ্ডিত টি, ডবলিউ, রাইজ্ ডেভিড্স্ এই সমিতি স্থাপন করিয়া আজীবন ইহার সভাপতি রূপে পশ্চিমে পালি-প্রচার করিয়াছেন। সিংহলে সিভিলিয়ান রূপে অবস্থান কালীন তিনি পালিভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার বুদ্ধিমতী ও বিদুষী স্ত্রীকে পরে পালি শাস্ত্রের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। জগৎ বিখ্যাত এই দম্পতী-যুগলের প্রত্যেকেই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমানভাবে পালি সাহিত্য গভীর ভাবে অধ্যয়ন, অনুবাদ, সমালোচনা ও প্রচার করিয়াছেন। মিসেস্ রাইজ ডেভিড্স্ বর্ত্তমানে তাঁহার বৃদ্ধ-বয়স সত্ত্বেও পালি-ত্রিপিটকের একটী Concordance প্রণয়নে নিযুক্তা আছেন। পালি ভাষায় হীনযান বা থেরাবাদ বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমস্ত শাস্ত্র বর্ত্তমান। তিনি তাঁহার মূল্যবান জীবনের প্রায় সমগ্র সময়ই পালিশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সমস্ত চিন্তা, গবেষণা ও অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা তিনখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি জীবনব্যাপী সাধনার ফল স্বরূপ পালি বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত-গুলিতে উপনীত হইয়াছেন, তাহা যে কেবল নিঃসন্দেহে নির্ভুল ও খাঁটি সত্য, তাহা বলা বাহুল্য ; এবং তাঁহার এই সিদ্ধান্ত-গুলির প্রতিবাদ করিতে দ্বিতীয় কোন পণ্ডিতের সাধ্য ও যোগ্যতা নাই।

মিসেস্ রাইজ্ ডেভিড্স্ তাঁহার "Gotama, the man." "Sakya origins" এবং "Manual of Buddhism" এই তিনখানি গ্রন্থে বিশেষতঃ শেষখানিতে হীনযানের মূল সত্যগুলি ইতিহাসের আলোকে ও ভারতীয় চিন্তার সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এমন সুন্দর ভাবে সমাবেশ করিয়াছেন যে, পালি-দর্শন অধ্যয়নার্থীর পক্ষে তাহা অত্যাবশ্যক। পালি-সাহিত্যরূপ অসীম সাগরের মধ্যে তাঁহার এই পুস্তকখানি দিঙ্-নির্ণয় যন্ত্রের মত সহায়ক হইবে। কারণ অধিকাংশ লোকেই স্বাধীন ভাবে অধ্যয়ন করিতে যাইয়া হীনযান সম্বন্ধে একটী ভুল ধারণা করিয়া বসিয়াছেন। ভারতীয় চিন্তা জগতের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপ পালি চিন্তা অধ্যয়ন না করিলে বিকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া স্বাভাবিক। পালি ত্রিপিটক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বুদ্ধ ঘোষ কর্ত্তৃক সিংহলস্থ মাতালের 'আলু বিহারে' লিখিত হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে সিংহলে আসিয়াছে—সিংহল হইতে শ্যামে ও ব্রহ্মদেশে গিয়াছে। কিন্তু উহা সিংহল হইতে ভারতে যায় নাই। কাজেই ভারতীয় দর্শনের আলোকে, বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা না করিলে পূর্ণ অবহেলা করিয়া অংশ গ্রহণের ন্যায় সে প্রচেষ্টা পণ্ড হইবে। বৌদ্ধধর্ম্ম বহির্ভারতে মূল উৎস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। ডাঃ রাইজ্ ডেভিড্স্ পালি ত্রিপিটকের ২০খানি প্রধান গ্রন্থ টীকা, টিপ্পনী ও চূর্ণ সহ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বুদ্ধবাণী এত বিকৃত, বিমিশ্রিত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়াছে যে, বুদ্ধ বাণীর ঐতিহাসিক মূল ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে এখন কষ্টকর। ভারতীয় ভিত্তিতেই বৌদ্ধদর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে—আর বুদ্ধদেব নিজেই ছিলেন ভারতের সাধনার প্রতি-মূর্ত্তি। কাজেই তাঁহাকে বুঝিতে হইলে ভারতের আলোকেই বুঝিতে হইবে।

বুদ্ধদেব বেদ-বিদ্রোহী বা ব্রাহ্মণদ্বেষী ছিলেন না। তিনি বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি বৈদিক জ্ঞান-মার্গ স্বীয় জীবনে পালন করিয়া জনসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। নিজের শ্রমণ শিষ্যদের সহিত তিনি ব্রাহ্মণদের সমান চক্ষে দেখিতেন। আর তিনি ব্রাহ্মণদের পদতলে বসিয়াই ত বাল্যকালে ভারতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শারীপুত্র, মোগ্যালান ও কাশ্যপ প্রভৃতি তাঁহার প্রধান শিষ্যগুলি ছিলেন শিক্ষিত সম্রান্ত ব্রাহ্মণ। তিনি হিন্দু ভাবেই ভূমিষ্ঠ, প্রতিপালিত হন, এবং দেহত্যাগ করেন। বুদ্ধ ত আর বৌদ্ধ ছিলেন না। তিনি সর্ব্বতোভাবে হিন্দু সন্ন্যাসীর আদর্শ নিজ জীবনে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথমে হিন্দুধর্ম্ম হইতে পৃথক্ ভাবে ভারতে ছিল না। যত দিন উহা ভারতে ছিল তত দিন উহা ভারতীয় ধর্ম্মের এক অংশ রূপেই ছিল। কিন্তু যখন হিন্দু ভারত ধর্ম্মে ও দর্শনে প্রসার লাভ করিয়া বুদ্ধদেবের নববাণী অঙ্গীভূত করিয়া লইল—এবং বুদ্ধ-বাণী বহির্ভারতে প্রচারিত হইল, তখনই ভারতেতর প্রদেশেই বৌদ্ধধর্ম্ম নামে একটী পৃথক ধর্ম্মের সৃষ্টি হইল। ভারতের উদার ও বিশাল বক্ষে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমতেরই স্থান আছে। বর্ত্তমান ভারতেই যখন তাহা সম্ভব, প্রাচীন ভারতে তাহা আরও অধিকভাবে সম্ভবপর ছিল। ইহুদী ধর্ম্ম ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে যে পার্থক্য বা সম্বন্ধ, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে ঠিক তাই। তবে ইহুদীগণ ভগবান ঈশাকে ক্রুশবিদ্ধ ও ত্যাগ করিলেন ; আর হিন্দুগণ বুদ্ধদেবকে দেবমানব জ্ঞানে পূজা করিয়া গ্রহণ করিলেন। হিন্দুধর্ম্ম যদি মূল ও কাণ্ড হয় বুদ্ধবাণী তাহার শাখা প্রশাখা মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্মকে তাই জনৈক মহাপুরুষ ভারতীয় ধর্ম্মের 'বিদ্রোহী-শিশু' বলিয়াছেন।

পালিগ্রন্থ বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমগ্র শাস্ত্র নহে ; সুতরাং পালি-সিদ্ধান্ত-গুলিও বৌদ্ধধর্ম্মের সার বা শেষ কথা নহে। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের অধিকাংশ পুস্তকই সংস্কৃতে বর্ত্তমান। আর মহাযানের সহিত হিন্দু-বেদান্তের অদ্ভুত সাদৃশ্য। থেরাবাদীগণ মুখে যতই বলুন না কেন যে তাঁরা নাস্তিক—সিংহল, ব্রহ্মদেশ বা শ্যামে গিয়া প্রত্যক্ষ দেখিলে দেখা

যায় জনসাধারণ বুদ্ধদেবকে ঈশ্বরবৎ পূজাই করে হিন্দুদের মত। ফুল-চন্দন, ধূপধূনা, ফল ও অন্যান্য আহার্য্য দিয়া পূজা ও ভোগ দেয়। তবে তফাৎ এই—হিন্দুগণ নিবেদিত নৈবেদ্যের বা প্রসাদের সবই নিজেরা গ্রহণ করে; কিন্তু বৌদ্ধগণ ঐগুলি পশু-পক্ষীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেয়। পালিতে বুদ্ধদেবের একটী নাম দেবাদিদেব। আর মহাযানীগণ ত বুদ্ধকে অতিমানব অবতার জ্ঞানেই পূজা-আরাধনা করিয়া থাকে। বুদ্ধদেব উপনিষদোক্ত মূল সত্যগুলি জনসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র। বুদ্ধের মত মহামানবগণের লোকসংগ্রহার্থ আগমন; কাজেই তাঁরা কোন কিছু ভাঙ্গেন না। তাঁহাদের জীবনের মিশন হচ্ছে গঠনমূলক কার্য্য। বুদ্ধদেব ধর্ম্মকে দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনে আনিয়া দিলেন। তাই তিনি ধর্ম্মসংক্রান্ত দার্শনিক প্রশ্নগুলিতে মাথা না ঘামাইয়া ধর্ম্মকে জীবনে কিরূপে পরিণত করিতে হইবে তাহা পালন ও প্রচার করিয়া গেলেন। অর্হৎ তথাগত, সম্যক সম্বুদ্ধ বুদ্ধদেব ধর্ম্ম মন্দিরে বা পুস্তকে নিবদ্ধ না রাখিয়া জীবনে জীবন্ত করিয়া তুলিলেন।

উপনিষৎ মন্ত্রই বুদ্ধ-মন্ত্র। হিন্দুর পরমার্থ, অবিদ্যা প্রভৃতি শব্দগুলিই হুবহু বৌদ্ধ শাস্ত্রে সৌগতগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। উপনিষদে মানুষের নির্গুণ সৎস্বরূপের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে—আর বুদ্ধদেব মানুষের সগুণ ভাব-স্বরূপের—বর্দ্ধমান আত্মার উপর জোর দিলেন। তিনি অনাত্মা বলিতে এই প্রকাশ করিতেন যে, রূপ, নাম, ও জগতের দ্রব্যরাজি অনাত্মা ও অনীশ্বর—কিন্তু তাই বলিয়া তিনি পরমাত্মার অস্বীকার কোথাও করেন নাই। হিন্দু শাস্ত্রে যেমন জীবাত্মাকে পরমাত্মার প্রতিবিম্বরূপে বলা হইয়াছে—জীবাত্মার অনন্ত অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া সান্ত অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে—তেমনি বুদ্ধদেব মানবাত্মার জীবত্ব অস্বীকার করিয়া ঈশ্বরত্বই আরোপ করিয়াছেন। তিনি আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব থাকিতেন—এই জন্যে নয় যে, নাস্তিক, অনাত্মবাদী বা সন্দেহ-বাদী ছিলেন—পরন্ত এই সকল পারমার্থিক বস্তুর উপলব্ধি ব্যতীত প্রকাশ করা সম্ভব নয়—তাই তিনি মৌন থাকিতেন। তাঁহার তুষ্ণীভাব অনুভূতিলব্ধ ভাবপূর্ণতার জন্য।

উদানে আছে একবার বুদ্ধদেবের জনৈক শিষ্য তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন সম্বোধি বা নির্ব্বাণের অনুভূতির বিষয় স্পষ্টভাবে তাঁহাকে বলিয়া দিতে হইবে। তথাগতকে ঈশ্বর বা আত্মা সম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে—তিনি কোন উত্তর দিতেন না। যদি কোন শিষ্য বলিতেন—তবে কি ঈশ্বর বা আত্মা নাই—বুদ্ধদেব উত্তর দিতেন যে, আমি কি বলিয়াছি—নাই? আবার যদি কেহ 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' মনে করিয়া বলিতেন 'তবে কি ঈশ্বর ও আত্মা আছে, বুদ্ধদেব বলিতেন, আমি কি বলিয়াছি—আছে?' যাই হোক উপরিউক্ত উদান-কথিত শিষ্যটী 'নাছোড়বান্দা' হইয়া তথাগতকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন "ভিক্ষু, যদি অস্পৃষ্ট, অজাত, অধিকৃত ও অসংস্কৃত বস্তু কিছু না থাকে—তবে স্পৃষ্ট, জাত, বিকৃত ও সংস্কৃত সংসার হইতে মুক্তিলাভের যে কোন উপায় থাকিব না"। নবীন ভারতে হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনাত্মবাদ ও নিরীশ্বরবাদ আবার মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। সিংহলী বৌদ্ধগণ আবার ভারতে নির্ব্বাসিত ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধরাজ স্থাপনে যত্নশীল। এই সময়ে হিন্দুদের বৌদ্ধ ধর্ম্মের সারতত্ত্বগুলি জানিয়া রাখা আবশ্যক। হিন্দুভারত বুদ্ধকে গ্রহণ করিবে; কিন্তু থেরাবাদের বিরূপ বুদ্ধ-বাণী অর্থাৎ অনাত্মবাদ ও নাস্তিকবাদ আদৌ গ্রহণ করিবে না। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যেন ভুলিয়া না যান যে, হিন্দু-ধর্ম্ম বিরোধী এই দুইটী 'বাদ' প্রচার করার জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল।

নাটেলাই রকোটক সাহেব তাঁহার "Foundations of Buddhism" নামক গ্রন্থে বলেন যে, বুদ্ধ বাণী বৌদ্ধ ধর্ম্মে নিবদ্ধ নহে। ধর্ম্মের গভীর অনুভূতিসমূহ সাধারণে প্রকাশ করিলে তাহা বিকৃত হইবে—তাই তথাগত আধ্যাত্মিকতত্ত্ব বিষয়ে মৌনভাব অবলম্বন করিতেন। একদা কৌশাম্বির শিংশপাবনে তথাগত উপরিস্থ বৃক্ষ হইতে কয়েকটী পাতা আনিয়া সমাগত শিষ্যদের বলিলেন "বৃক্ষোপরিস্থ পাতাসমূহের তুলনায় যেমন আমার হাতের পাতাগুলি অতি সামান্য, তেমনি হে ভিক্ষুগণ, আমি যাহা তোমাদের নিকট বলিয়াছি উহা যাহা নিজে অনুভূতি করিয়াছি তাহার তুলনায় যৎকিঞ্চিৎ মাত্র।" তাঁহার তিন প্রকারের শিষ্য ছিল; এক দল অন্তরঙ্গ, অপর দল সঙ্ঘের সমস্ত ভিক্ষু এবং তৃতীয় দল সঙ্ঘের বাহিরের ভক্তগণ। বুদ্ধদেব 'প্রতীত্যসমুৎপদে' বা ক্ষণিকবাদকে একটা চক্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যকেও এইরূপ ভাবটী পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 'ব্রহ্ম-চক্র' শব্দটী পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগের প্রথমেও 'ভাব-চক্র' 'ধর্ম্ম-চক্র' শব্দগুলি ব্যবহৃত হইত। হাভেল সাহেব তাঁহার "Ideals of Indian Art" পুস্তকে বলেন যে, বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞের সহিত সামগান করিবার সময় একটী চক্র ডান দিকে ঘুরাইতেন। তাহা হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মে 'ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন' শব্দটী আসিয়াছে। মহাযান ও বেদান্তের মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। পরিভাষার পার্থক্য বাদ দিলে উভয় দর্শনই এক। বেদান্তে যেমন বলে যে, এক পরমাত্মার প্রতিবিম্ব হচ্ছে বহু জীবাত্মা—তেমনি বাসুবন্ধু ও অশ্বঘোষ বলেন যে, এক বিশ্বমনের বহু অংশ এই ব্যষ্টি মানব-মন। শান্তিদেব "বোধিচর্য্যাবতারে" বলেন যে, বুদ্ধদেবের ত্রিকায় আছে, যথা ধর্ম্মকায়, সম্ভোগকায় ও নির্ম্মাণকায়। এই ধর্ম্মকায় বেদান্তের ব্রহ্মের ন্যায় নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ, সম্ভোগকায় ঠিক ঈশ্বরের ন্যায় সগুণ ও সবিশেষ এবং নির্ম্মাণকায় মানবশরীরধারী বুদ্ধ অর্থাৎ অবতার। শান্তিদেব তাঁহার 'শিক্ষাসমুচ্চয়' গ্রন্থে বলেন যে, সত্য দুই প্রকার,—পারমার্থিক ও সম্বৃতি সত্য। সত্যের এই দুই বিভাগ উপনিষদোক্ত পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সত্যের ন্যায়।

সার এস, রাধাকৃষ্ণান্ বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মোক্ত চারিটী প্রধান সত্যের সহিত সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যের খুব সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবিদ্যা, সংস্কার, অবিজ্ঞান, নামরূপ, ষদায়তন, প্রতীত্য সমুৎপাদ প্রভৃতি সাংখ্যের প্রধান বুদ্ধি, অহঙ্কার, তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয় ও প্রত্যয় সর্গের ন্যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের জেন শাখাটী পাতঞ্জল যোগের ভিন্ন নামমাত্র। যোগের ধ্যান শব্দটীকে পালিতে 'ঝান' চীনে 'চান' এবং জাপানে 'জেন' বলে। কার্পেণ্টার সাহেব তাঁহার "Buddhism and Christianity" নামক গ্রন্থে বলেন যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ধ্যানগুলি রাজযোগ হইতে গৃহীত।

পাতঞ্জলীয় প্রাণায়ামকে পালিতে আনা পান মতী বলে। সার এইচ, এস, গৌর তাঁহার "Spirit of Buddhism" নামক গ্রন্থে বলেন যে সাংখ্য ও বৌদ্ধ দর্শন যেন দুটী স্রোতস্বতীর মত বেদান্ত-নদীতে মিশিয়া পরে তীর উছলিয়া খানিক দূর গিয়া আবার একই নদীতে পতিত হইয়াছে। ব্রহ্মার যেমন শক্তি সরস্বতী তেমনি আদিবুদ্ধ ও অবলোকিতেশ্বরের শক্তি যথাক্রমে প্রজ্ঞাপারমিতা ও মঞ্জুশ্রী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হিন্দুর এই ত্রিত্ববাদ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘে পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উভয় শাখা এই বিষয়ে একমত যে, মানব মাত্রেই অব্যক্ত বুদ্ধ। আর উপনিষদে আছে—'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'—ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হইয়া যান। আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বুদ্ধ ও ব্রহ্ম প্রায় সমানার্থবাচক। জাপানের বিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার সুজুকি বলেন যে, জাপানের প্রধান ৮টী শাখার অন্যতম শিংগন (যাহা মহাবৈরোচন সূত্র এবং বজ্রশেখর সূত্রের উপর স্থাপিত এবং কোবো দৈশি নামক ভিক্ষু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত)—তাহার মতে ফুনিশেনই সত্য। অর্থাৎ একই সত্য বহু নহে। ইহা ঠিক ঋগ্বেদের 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'র ন্যায়। এই শিংগন মত ঠিক বেদান্তের অনুরূপ। বেদান্তে যেমন আছে যে, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—তেমনি শিংগনের মত সর্ব্ব প্রাণী, মানব ও জন্তুর অন্তরে এই এক ধর্ম্মকায় বুদ্ধ বিরাজমান। নির্ব্বাণ লাভ করার অর্থ এই যে বুদ্ধত্ব লাভ করা—সম্বুদ্ধ হওয়া। বুদ্ধ ধর্ম্মের বোধি এবং বেদান্তের চিৎ একার্থবাচক। একটী পালি সূত্র আছে যে, 'নিব্বাণং পরমং সুখং'—আবার বেদান্তেও বলেও 'আনন্দং ব্রহ্ম'—ভূমানন্দ লাভই ব্রহ্মানুভূতি। বস্তুতঃ উপনিষদিক সমাধি—এবং বৌদ্ধ নির্ব্বাণ একই তুরীয় অবস্থার বিভিন্ন নামমাত্র।

ভিক্ষু সাইকো প্রতিষ্ঠিত এবং সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরিকের উপর স্থাপিত জাপানের টেণ্ডাই শাখার মতে বহুর পশ্চাতে একাত্মানুভূতিই নির্ব্বাণ। সেই পরমার্থ সৎ এক—কখনও বহু নহে। ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিতে তাহা বহু প্রতিভাত হয়। জাকোবি সাহেব বলেন যে, গৃহহীন সন্ন্যাসের আদর্শ বুদ্ধদেবের নবাবিষ্কার নহে—উহা খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে ভগবান বুদ্ধদেবের অনেক পূর্ব্বেও ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। হাভেল সাহেব বলেন যে, বুদ্ধ প্রচারিত আর্য্য অষ্ট মার্গ বুদ্ধের পূর্ব্বেও ভারতে ছিল। 'অষ্টমার্গ' কথাটীও সুরক্ষিত আর্য্য উপনিবেশের আটটী ফটক হইতে গৃহীত। বৌদ্ধসঙ্ঘের নিয়মগুলিও ব্রাহ্মণশাস্ত্র হইতে আনীত। বৌদ্ধ স্তূপবাদ—যাহা হইতে বৌদ্ধজগতে অসংখ্য ডাগোবা ও পাগোডার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বৈদিক যজ্ঞবেদি হইতে গৃহীত হইয়াছে। মৃত আর্য্য অধিপতিগণের মনুমেণ্ট এই স্তূপ। ডাগোবা অর্থে ধাতুগর্ভ। বৌদ্ধ স্তূপ আরাধনা আর্য্য বৈদিক শ্রাদ্ধের ভিন্ন সংস্করণ মাত্র। আর বৌদ্ধ ও বৈদিক যুগেও সন্ন্যাসীরাই সমাজের গুরু ও নেতা ছিলেন। ডাঃ রাইজ্ ডেভিডস্ ও জাকোবী সাহেব উভয়ে একমত যে, বৌদ্ধধর্ম্ম সাংখ্যের টীকা ও টিপ্পনি মাত্র।

অশ্বঘোষ তাঁহার 'বুদ্ধ-চরিতে' বলেন যে, বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলাবাস্তু সহরটী সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিল মুনির স্মরণার্থে স্থাপিত হইয়াছে। ওয়েবার সাহেব বলেন যে কপিল মুনি ও গৌতম বুদ্ধ সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি ছিলেন। উইলসন সাহেবের মতে বৌদ্ধদর্শনের অনেকগুলি মত সাংখ্য হইতে গৃহীত। এমন কি বুদ্ধদেব নিজে পূর্ব্বাচরিত বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানগুলিতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। একদা শৃগাল নামক জনৈক ব্যক্তি গৃহরক্ষার্থ পিতৃ-অনুশাসনে ছয় দিকে মন্ত্রপুত কোন অনুষ্ঠান করিতেছিল। বুদ্ধদেব তাহা দেখিয়া তাহাকে ভৎর্সনা না করিয়া বা তাহার অনুষ্ঠানগুলির সমালোচনা না করিয়া এইগুলির গুহ্যার্থ বলিয়া দিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন যে, সৎ কর্ম্ম এবং সৎ চিন্তাই উহার ভাবার্থ। বৌদ্ধ ধর্ম্মের কর্ম্মবাদ ও পুনর্জ্জন্মবাদ উপনিষদ হইতে গৃহীত। পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকার করিলেই জন্মমরণশীল একটী মানবাত্মা স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধদেব নিজে তাঁহার বহু পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করিতে পারিয়াছিলেন। যদি সংমরণশীল আত্মা এক না হয়—কর্ম্মফল ভোক্তা জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করা হয়—তবে পুনর্জ্জন্মবাদ যে, ন্যায়-সঙ্গত হয় না। বেদান্তে যেমন জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তির কথা আছে—বৌদ্ধধর্ম্মেও নির্ব্বাণ ও পরিনির্ব্বাণের উল্লেখ আছে। ফলতঃ মুক্তি ও নির্ব্বাণ একই।

নাগার্জ্জুন 'মাধ্যমিক কারিকা'তে নির্ব্বাণ ও পরিনির্ব্বাণকে জনশূন্য গ্রাম ও ভস্মীভূত গ্রামের সহিত তুলনা করিয়াছেন। নির্ব্বাণে সর্ব্ব বাসনা-মুক্তি লাভ হয়। সিদ্ধ শস্যের যেমন আর অঙ্কুরোদ্গম হয় না—তেমনি বাসনাহীন নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি আর জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয় না। তার সংস্কারের 'পুঁটুলিটী' ভস্মীভূত হয়। নির্ব্বাণ-সমাধির ন্যায় 'অবাঙ্মনসোগোচরম' অবস্থা। উপনিষদেও আছে 'মৌন মেব ব্রহ্ম'—ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয়।

শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে একটী বৈদিক আখ্যায়িকা বলিয়াছেন। একদা কোন শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল—"ব্রহ্ম কি?" গুরু মৌন রহিলেন। শিষ্য ২।৩ বার প্রশ্নটী করিলে গুরু বলিলেন—'আমি তোমাকে বলিয়াছি—ব্রহ্ম কি—তুমি বুঝিতে পার নাই। ব্রহ্ম বাক্যমনাতীত।" বৌদ্ধ শাস্ত্রেও ঠিক এইরূপ একটী গল্প আছে। একবার মঞ্জুশ্রী বিমল কীর্ত্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—নির্ব্বাণ কি?' তিনি কিছু না বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। তখন মঞ্জুশ্রী আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—বিমলকীর্ত্তি, তুমিই নির্ব্বাণানুভূতি লাভ করিয়াছ। নির্ব্বাণ প্রকাশ করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্ম ব্যতীত দুনিয়ার সব বস্তুই মানব মুখে উচ্ছিষ্ট হইয়াছে—ব্রহ্মকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে নাই। উহা মূকের আনন্দ প্রকাশের মত অসম্ভব। মোক্ষমূলার ও চাইল্ডারস্ সাহেব পালিশাস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিয়াছেন যে, কোথায়ও নির্ব্বাণকে শূন্য রূপে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে আছে যে, পরিনির্ব্বাণ লাভের প্রাক্কালে ভগবান বুদ্ধ যে সকল সুন্দর স্থান নিজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন—সেই সব স্মরণ করিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন 'আহা, রাজগৃহ কি সুন্দর, বৈশালী কি সুন্দর!' ইত্যাদি। আনন্দ একবার তথাগতকে বলেন যে, "ভগবান, সুন্দরের চিন্তা, সুন্দরের সংসর্গ, এবং সুন্দরে (lovely)র স্মৃতি ধর্ম্ম-

জীবনের অর্দ্ধেক।" ভগবান তাহাকে তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বলিলেন, 'আনন্দ, উহা ধর্ম্ম-জীবনের অর্দ্ধেক—এ কথা বলিও না—উহা ধর্ম্মজীবনের সম্পূর্ণ। জ. ওর্স্‌লে (Worsley) সাহেব তাহার "Concepts of morism" পুস্তকে সত্যই বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব যদি যৌবনে দুইজন বেদজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্গ লাভ করিতেন তবে প্রাচ্যের পুরাবৃত্ত নূতন আকার ধারণ করিত।

আমরা উপরে যাহার বর্ণনা করিলাম—তাহা স্বকপোলকল্পিত বা 'মনগড়া' নহে। ডাঃ রাইজ্‌ ডেভিড্‌স্‌, ও হোম্‌স্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধ-শাস্ত্রবিৎগণ যাহা যাহা সমস্ত জীবন অধ্যয়ন ও চিন্তা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—তাহারই সংক্ষেপ বর্ণনা করিলাম। বুদ্ধদেব অনাত্মবাদ বা নিরীশ্বরবাদ প্রচার করেন নাই—তিনি উপনিষদোক্ত ধর্ম্মই জনসাধারণের নিকট প্রাঞ্জল ভাষায় বলিয়াছেন। আমার মনে হয় ডাঃ রাইজ ডেভিড্‌স্‌ বৌদ্ধজগৎকে এই গবেষণা প্রকাশের দ্বারা অনাত্মবাদ ও নাস্তিক্যবাদরূপ নরক হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

বৈশাখ বিদায়

শ্রীহাসিরাশি দেবী

বিদায় বৈশাখ !
শুভ—নব বরষের বিদ্যুজ্জ্বল-নয়ন-নির্ব্বাক
তুলিয়া ইঙ্গিত করি অনাগত সময়ের পানে
ছুটে চল প্রলয়াভিযানে
অশ্বখুর পথ-ধূলি গগনের গায়ে—
সদর্পে মিলায়ে,—
বৈজয়ন্তী তুলি রথ-পরে ;
আঁকিয়া অধরে
দুর্ব্বাসার ক্রোধ-রক্ত ক্রূর পরিহাস,
বক্ষে লয়ে উন্মত্তের আকুল উচ্ছ্বাস,
সাঙ্গ করি তাণ্ডবের নটরাজ-লীলা
সম্বরিলা
মুক্তকেশ পাশ,—
তপঃক্ষীণ কটীতটে বাঁধিলা অসংযত বাস।
দিগন্তের সীমা হ'তে ঐ স'রে যায়
তোমার গৈরিক উত্তরীয় ; ভেসে ওঠে ধূসর ছায়ায়
শান্ত,—ম্লান বিষাদ গম্ভীর
ক্লান্ত প্রকৃতির মুখ ; উতল—আথর
বাতাস হইল শান্ত,—ভীরু-কম্প্রমান,—
নবোঢ়া কিশোরী সমা ;
ভগ্নশাখে তবু কাঁপে বিহগীর নষ্ট নীড়খান—,
তবু কাঁদে পক্ষীমাতা শাবকে ঢাকিয়া
ভগ্ন পক্ষপুটে ; ফিরিছে মাগিয়া
গৃহ,—গৃহহারা চির পথি-বেশে !
বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাস তবু ধীরে নভোতলে মেশে।
তব পদ স্পর্শ করি ধূম্রজালাচ্ছন্ন অন্ধকার,—
নূতনের তোরণ-দুয়ার।
তবু জানি আছে,—
তারই পাছে
আলোকের উৎসব প্রভাত,
জ্যোৎস্নাময়ী রাত,—
আছে হাসি, ফুল, পাখী, আছে সুর গান,—
আছে নব প্রাণ !
তুমি শুধু এসেছিলে হে নব উদাসী,—
বাজাইয়া মন্ত্রপূত বাঁশী
সৃষ্টিরে তেয়াগি' পুন করিবারে নূতনে সৃজন,
এনেছিলে নব আকিঞ্চন।
আজি লহ গুটায়ে অঞ্চল,—
হে চির চঞ্চল।
একে একে সাঙ্গ করি খেলা,—
আজি তব যাইবার বেলা,—
লহ মোর শ্রদ্ধা নমস্কার !—
ঝঙ্কাক্ষত পরাণের কম্প্রহারে শেষ উপহার,
বিদায় নিশীথে
তুলে দিনু কণ্ঠে তব শোক-
শান্ত চিতে ॥

Keatsএর কবিতায় উপনিষদের ব্রহ্ম ও পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ

উপনিষদ বলেন—

(১) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

তৈত্তিরীয় ২।১।১

ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য, জ্ঞান, অনন্ত। (যাহার নাশ নাই তাহাই সত্য সকল সময়েই একভাব, অপরিচ্ছিন্ন।)

(২) বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৮

ব্রহ্ম হইতেছেন বিজ্ঞান ও আনন্দ।

(৩) ব্রহ্মণো নাম সত্যম্। ছান্দোগ্য ৮।৪।৪

ব্রহ্মের নাম, সত্য।

(৪) আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ। কৌষীতকী ৩।৮

ব্রহ্ম আনন্দ, অজর, অমৃত।

(৫) আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

তৈত্তিরীয় ২।৪

ব্রহ্মানন্দে কদাচ ভয় আসেনা।

(৬) যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরম সাম্যমুপৈতি॥ মুণ্ডক ৩।১।৩

যে পুরুষ সুবর্ণবর্ণ অথবা জ্যোতিষ্মানভাবে সুন্দর, যিনি কর্ত্তা, ঈশ, ব্রহ্মার জন্মদাতা, সে পুরুষকে যিনি দেখেন, তিনি পাপ-পুণ্যাতীত নির্ম্মল ভাব প্রাপ্ত হইয়া পরম সাম্যভাব লাভ করেন। ইত্যাদি।

বলিতে হইবেনা যে, এ সকল কথা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সম্বন্ধে ঠিক খাটেনা। কারণ তিনি অনির্দ্দেশ্য—বিশেষিত হইবার নহেন। উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহা সবিশেষ ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করে, বলা যাইতে পারে। এক কথায়, সবিশেষ ব্রহ্ম হইতেছেন পৌরাণিকের ভগবান্ বা ভগবতী। আবার সেই পৌরাণিকের কথায় শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ ব্রহ্ম উভয়ই। তিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম (নির্ব্বিশেষ) এবং পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান, (সবিশেষ)। অবশ্য তাহার বিচার এ সন্দর্ভের উদ্দেশ্য নহে।

উপরে উপনিষদের যে সকল শ্লোকাংশ আমরা উঠাইয়াছি, তাহাতে আমরা পাইয়াছি যে ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য, জ্ঞান অনন্ত, আনন্দ, অজর, অমৃত, সুন্দর। এই সকলের মধ্যে সত্য, সৌন্দর্য্য ও আনন্দ আমাদের বক্তব্য-বিষয়ে প্রয়োজন ; কারণ ঐ তিনটী কথারই উল্লেখ Keats তাঁহার রচনায় করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে Keatsএর জন্ম ; উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—মাত্র ২৫।২৬ বৎসর বয়সে—তাঁহার মৃত্যু। তিনি যে একজন বড়দরের কবি ছিলেন, এমত নহে। তথাপি সেই অল্প বয়সের মধ্যেই, তাঁহার রচনা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—

Beauty is truth, truth beauty—that is all
Ye know on earth, and all we need to know. *

ইহার অর্থ, সৌন্দর্য্যই সত্য আর সত্যই সৌন্দর্য্য ; ইহাই পৃথিবীর সার ; যা কিছু জ্ঞাতব্য, সে সব ইহাতেই।

বুঝিলাম যে, সত্যই সুন্দর আর সত্যে ও সুন্দরে কোন প্রভেদ নাই।

ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই সুন্দর, ব্রহ্মই আনন্দ, ইহা আমরা দেখিয়াছি। অতএব কবি উপনিষদের কথাই বলিয়াছেন। তিনি আবার স্থানান্তরে লিখিয়াছেন—

A thing of beauty is a joy for ever †

অর্থাৎ যাহা সুন্দর তাহা চিরানন্দকর। পাঠক দেখিবেন, ইহা উপনিষদের ব্রহ্মানন্দের কথা ; বিশেষভাবে ঐ সব হইতেছে বৈষ্ণব তত্ত্বের মুল কথা। বৈষ্ণবদের প্রেমভক্তিবাদের যাহা মূল—সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব—Keatsএর ঐ সব কথা তাহারই অন্তর্গত। বৈষ্ণবদের ঐ তত্ত্ব কথা-সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলিব। সে কথাও উপনিষদ হইতে আমাদের পূর্ব্বের তিনটি বাছা কথা অর্থাৎ "সত্য," "সৌন্দর্য্য" এবং "আনন্দ" অবলম্বন করিয়াই বলিব। Keats ঐ কথাগুলিকে ক্রমান্বয়ে truth, beauty, joy বলিয়াছেন, এবং ঐ তিনই যে এক তাহাও তিনি বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পৌরাণিকের "সচ্চিদানন্দ"। তিনি পরম সত্য (Truth) অনন্ত সুন্দর (Beauty) এবং পরমানন্দ (Joy)।—তিনি যে পরম সত্য, এ কথা হিন্দুকে নূতন করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই ; তিনি যে অনন্ত-সুন্দর ইহাও হিন্দুর কাছে নূতন কথা নহে। দেহে রূপের "হুড়াহুড়ি" বলিয়া যদি কোন-কিছুর কল্পনা করা যায়, তবে তাহা তাঁহারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন প্রতি পলকে ঘটিত, বৈষ্ণব-পদাবলী সে সব কথায় উচ্ছ্বসিত—"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল"—ইত্যাদি ; আর পুরাণ-রূপ গভীর সাগর সে সব কথায় চির-তরঙ্গায়িত। তাই "লীলা-শুক" বিল্বমঙ্গল বুক ফাটাইয়া সে দিন সে রূপের গান গাইয়াছিলেন :—

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মথুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরম্।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মথুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥ ইত্যাদি।

* Ode on a Grecian urn.

† Endymion.

শ্রীভগবানের এই রূপ অনন্ত-সৌন্দর্য্যে বৃন্দাবনের গোপ-গোপীগণ পরানন্দে একেবারে উদ্‌ভ্রান্তের মত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; অর্থাৎ এ সেই কথা —A thing of beauty is a joy for ever। গোপীগণের দশা তখন—

মুক্তাহারলসৎ পীনতুঙ্গস্তনভারানতাঃ
স্রস্তধর্ম্মিল্লবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ ॥

এইরূপ হইয়াছিল। সকলেই আত্মহারা—আলু থালু ; কুল, শীল, অপমান, কুৎসা প্রভৃতি কিছুরই জ্ঞান তখন তাঁহাদের ছিল না ; কারণ সেই আর এক কথা—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। রাসমণ্ডলে গোপিকাগণের উন্মাদনাময় নৃত্যগীত সেই অনন্ত-সুন্দরেরই দর্শনের আনন্দ-জনিত আমি সেই পরম ব্রহ্মকে কোটী কোটী প্রণাম করি।

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুন্তলাক্রান্ত গণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিত সুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্তবেণুম্
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতযুতং ব্রহ্ম গোপালবেশম্ ॥

Keatsএর জনৈক স্বদেশীয় জীবনী-লেখক লিখিয়াছেন—

One line in *Endymion* has become familiar as a "house-hold word" wherever the English language is spoken.

অর্থাৎ *Endymion*এর একটা লাইন যেন "ঘোরো" কথার মত হইয়া পড়িয়াছে ; যে যে পরিবারে ইংরেজী হইতেছে কথোপকথনের ভাষা, সে সব স্থানেই সে কথাটা খুব প্রচলিত। সে লাইনটা হইতেছে—(উক্ত লেখক বলেন) A thing of beauty is a joy for ever। বাস্তবিক Keatsএর ঐ কথাটা খুব বড় দরে।

আমরা Keatsএর তিনটি কথাই (truth, beauty, joy) শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলিয়াছি। ব্রহ্মসংহিতা বলেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিনের মধ্যে Keats কেবল সৎ ও আনন্দ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন ; তদতিরিক্ত মাধুর্য্য সম্বন্ধে ও তিনি বলিয়াছেন ; কিন্তু চিৎ সম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলেন নাই। নিষ্প্রয়োজন বোধে আমরাও তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না।

এখন পাঠক, এই ব্যাপার আপনি আশ্চর্য্য বলিবেন কি না? দেখুন এই গুহ্যতত্ত্ব—বৈষ্ণব ধর্ম্মের যাহা প্রাণ—"সাত সমুদ্র তের নদী পারের" একজন ইংরেজের মানস চক্ষুতে কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখুন! Keats খ্রীষ্টান্ হইলেও হিন্দু।

ম্লান সন্ধ্যা

শ্রীসুকুমার দে সরকার

বাড়ীর সামনে গরুর গাড়ীটা এসে থামতেই এক মুহূর্ত্তে হেমাঙ্গিনীর বুকের রক্ত-চলাচল বেড়ে গেল। স্থান কাল ভুলিয়ে, বহু প্রার্থিত কিন্তু প্রায় অসম্ভব আশার সাফল্যে তাঁর মন যেন বলে উঠল—গিরি এলি মা? কতকটা আচ্ছন্নের মত। কিন্তু মুখে তিনি কিছু না বলে উৎসুক ভাবে দোরের দিকে চাইলেন। গাড়ীর লণ্ঠনটা নিবুতে নিবুতে শিবু সাড়া দিলে—মা-ঠাকরুণ, বাবু বলে দিলেন রেতে হরিদাসীকে এনে রাখতে।

হেমাঙ্গিনীর চমক ভাঙ্গল: উনি ত সবে আজ গেলেন, এরি মধ্যে গিরি আসবে কি করে? যেন ভীমরতি হচ্ছে দিন দিন। আস্তে আস্তে বললেন—তুই হরিদাসীকে ডেকে দিয়ে যা না বাবা।

শিবু চলে গেলে দরজার হুড়কোটা টেনে দিয়ে এসে হেমাঙ্গিনী দাওয়ায় বসলেন। এখনি হরিদাসী এলে খুলে দিতে হবে। আজ আর রান্না নেই, একা মানুষ, চিঁড়ে মুড়ি ত আছেই। আজ রাতটা সম্পূর্ণ ফাঁকা ; কিন্তু কাল গিরি আসবে—তখন কত কাজ! কন্যার রুচি অনুযায়ী রান্নার তালিকা হেমাঙ্গিনী ঠিক করতে বসলেন।

রান্নাঘরের দাওয়াটার গা ঘেঁসে ওঠা ঝাঁকড়া-মাথা কাঁঠাল গাছটার পাতার ভিতর দিয়ে চাঁদ উঠছে ; কাল পূর্ণিমা হয়ে গেছে, আজ তাই বড় ম্লান। সেদিকে চেয়ে হেমাঙ্গিনীর মনে হ'ল সেই কবে গিরি এসেছিল গেল বছর পূজোর সময়, আর একটা পূজো ঘুরে গিয়ে এখন অঘ্রাণ মাস। প্রায় দেড় বছর হতে চলল। আড়াই বছর মেয়েটার বিয়ে হয়েছে ; এর মধ্যে তারা পাঠিয়েছিল মোটে একবার। মেয়েটার কপাল! এ দিকে শ্বশুর শ্বাশুড়ী ত মন্দ নয়, কিন্তু এক দোষ—পাঠাতে চায় না। গিরির সেই প্রথম চিঠিগুলির কথায় এখনও হেমাঙ্গিনীর কান্না পায়।—মা তোমরা আমায় নিয়ে যাচ্ছ না কেন? আমার এখানে ভাল লাগছে না। পেসা কেমন আছে, আমার জন্যে কাঁদে না ত? ইত্যাদি। প্রসাদ ওরফে পেসা গিরির ছোট ভাই, দিদির কোলেপিঠে মানুষ হয়েছে।

কড়াটা নড়ে উঠল। দরজাটা বন্ধ করতে করতে হরিদাসী জিগেস করলে—কাল দিদিমণি আসবেন মা?

—হ্যাঁ।

—বাবা, ক'দিন পরে! তুমি কেমন করে থাক মা? হেমাঙ্গিনীর মনে হ'ল যেন পেসা কেঁদে উঠল।

—একটু বস্ মা, খোকাটাকে একটু চাপড়ে আসি। জানলার ভিতর দিয়ে ওপারের পোড়ো জমীটার

কেয়া ঝোপে জোনাকীর মেলা বসেছে। দীঘির জলে টুপ করে একটা পাতা পড়ল বোধ হয়। গ্রাম নিস্তব্ধ, প্রায় সুষুপ্ত,—শুধু অনেক দূরে রেল লাইনের ওপর সিগন্যালের বাতি রক্তচোখে গাঁয়ের দিকে চেয়ে আছে। অঘ্রাণের কুয়াসা মাঠের ওপর নামতে সুরু করেছে। ম্লান জোছনার আলো—কুয়াসা আর অন্ধকার, তিনে মিলে সৃষ্টি করছে মায়া।

হেমাঙ্গিনীর ডান চোখ নাচল।

হরিদাসী ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে—খোকা ঘুমোল?

—হ্যাঁ।

—আজ কি রাঁধলে মা?

—এবেলা আর হাঁড়ী চড়ালাম না, একটা ত পেট। আচ্ছা হরিদাসী, কাল ভোঁদার মাকে চারটি কলমি শাক তুলে দিতে বলিস্ ত, আর পুঁটি মাছ কেউ ধরে ত দিয়ে যেতে বলিস। গিরি বড্ড ভালবাসে।

—দিদিমণির শাশুড়ী—মত দিলে যে, হরিদাসী জিগেস করে।

—ঠিক করাই ছিল, পূজোর সময় আসতে পারল না, অঘ্রাণ মাসে নিয়ে আসব।

—জামাইবাবুর কথা কিছু লেখেন দিদিমণি?

নিঃশ্বাস ফেলে হেমাঙ্গিনী জবাব দেন—চিঠিই বেশী দেয় না এমন মেয়ে, বলে কাজ—সময় পাই না। মেয়েটাকে খাটিয়ে মারলে, যেমন্ কপাল নিয়ে এসেছিল।

রাতের নিরবিচ্ছিন্ন অন্ধকার, কর্ম্মাভাব, সুদূর প্রবাসী কন্যার চিন্তা, সব মিলে হেমাঙ্গিনীর মনে বাজছিল একটা নিরাশ করুণ রাগিনীর মত।

আবার হেমাঙ্গিনীর ডান চোখ নাচল।—সাঁঝ থেকে কেবল ডান চোখ নাচছে, ঠাকুর কপালে কি দুঃখ লিখেছেন কি জানি! শুয়ে পড় হরিদাসী, রাত হল।

ঘুম আর আসে না। বুকের কাছে পেসা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ও পাশটিতে গিরি শুয়ে থাকত এই ত সেদিন! বাবা মেয়ের কি শোয়া। শীতের রাতে লেপ কম্বল কোথায় চলে যেত ঘুমের ঘোরে। কত দিন উঠে আবার তিনি সেগুলো গায়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। ঠাণ্ডা লাগবে বলে আস্তে আস্তে পাশতলার জানলা বন্ধ করে দিয়েছেন। মেয়ের আবার একটা জানলা না খোলা থাকলে ঘুম হয় না।

হেমাঙ্গিনীর তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। গোয়ালে যেন একটা কি শব্দ হচ্ছে না? উঠে কেরোসীনের ল্যাম্পটা জ্বালালেন। বাইরে চাঁদের আলোয় সব হাসছে। উঠানের কোণে হাস্নুহানা গাছটা সাদা হয়ে গেছে।

নাঃ গোয়ালে সব ঠিক আছে। বোধ হয় পাখাটাখী কিছু ঝটপট করেছে কোথাও। শেকলটা তুলে দিয়ে এসে তিনি শুয়ে পড়লেন।

বাইরে অগাধ স্তব্ধতা। মাঝে মাঝে একসঙ্গে কয়েকটা শেয়াল ডেকে ওঠে। গাছের পাতা থেকে শিশির ঝরে পড়ার টুপটাপ শব্দ শোনা যায়। সমস্তই হেমাঙ্গিনীর জীবনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। নিজের বধূজীবন মনে পড়ে যায়। সেই কবে স্বামীর সঙ্গে নৌকোয় উঠেছিলেন। তখন স্বামী কি, শ্বশুরবাড়ী কি, কিছুই জ্ঞান ছিল না। মা ঘাটে তুলে দিতে এসে কি রকম কাঁদছিলেন মনে পড়ে। ঠাকুরমার গলা জড়িয়ে ছোট-বোন শৈলও কেঁদে ফেলেছিল। আহা বেচারীর সঙ্গে পুতুল নিয়ে কত ঝগড়াই হয়েছে। নিজের কন্যার কথার সঙ্গে বিস্মৃতপ্রায় বিগত ধূসর জীবন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রথম শ্বশুরবাড়ী এসে কি রকম মন কেমন করত মায়ের জন্যে, শৈলির জন্যে। সেই আমবনে ছুটোছুটী, ক্ষীরখেজুর গাছতলায় শিব গড়া, এখানে কিছুই ছিল না; কিন্তু কেমন করে জড়িয়ে পড়লেন আস্তে আস্তে। সামনের ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন ভুলিয়ে দিল বাল্যজীবন।

সেবারে যখন গিয়েছিলেন বাপের বাড়ী—মনে পড়ে বাবার সেই পরিচিত স্বর—ও মুকুন্দো দেখতো কার পাল্‌কী নামল বাইরে।

মায়ের কত আদর-যত্ন, কিন্তু সেবারে শ্বশুরবাড়ীর কথাই বেশী করে মনে পড়েছিল। আসবার আগের রাতে রমানাথের কথাগুলি কানে লেগেছিল—সেখানে গিয়ে আমায় ভুলে যাবে ত?……

হেমাঙ্গিনীর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল—গিরিও তেমনি হয়ে গেছে বোধ হয়।

গিরিজায়াই তাঁর প্রথম সন্তান, কত আদরের। কত কষ্টে তিনি তাকে পেয়েছিলেন, বহু মানত করে, সাপুরের বুড়ো শিবের বিল্বপত্র ধারণ করে। না হলে সবাই ত তাঁকে বাঁজাই বলে দিয়েছিল। গিরি তাঁদের কত আদরের সন্তান।

সেবারের কথা মনে আছে, বোশেখ মাস, সন্ধ্যের দিকে পশ্চিমে কালো করে মেঘ উঠল, গাঢ়, আলুথালু। খানিক বাদে গর্জ্জন করে নেমে এল বাতাস, উঁচুমাথা গাছগুলোর ওপরই যেন যত আক্রোশ। ফোঁটা ফোঁটা বিষ্টিও পড়'তে সুরু হল। আঁচলে ঢাকা দিয়ে কোন রকমে পিদ্দিমটা তুলসীতলায় দেখিয়ে এসে শাশুড়ী বললেন—বৌমা, গিরি কোথায় গেল ?

বুকটা তখন ছাঁৎ করে উঠছিল। খুঁজে কোথাও পাওয়া যায় না, কালবোশেখীর ঝড় বেড়েই চলেছে। একটা ব্যস্ততা পড়ে গেল। শাশুড়ী নিজেই বেরিয়ে পড়লেন, রমানাথ ঘরে ছিল না। কিছুক্ষণ পরে,—যেটুকু সময় তাঁর বর আর দোর করে কেটেছে,—জলে ভিজে জুবড়ী হয়ে দুজনে হাজির। শাশুড়ী আর মেয়ে।

—কি দস্যি মেয়ে বাবা রায়েদের কাঁচামিঠের তলায় আম কুড়চ্ছিল। যদি একটা ডাল ভেঙ্গে পড়ত।

হেমাঙ্গিনী মেয়েকে চিপিয়ে দিয়েছিলেন। এমন করে তাকে পরের হাতে তুলে দিতে হবে জানলে কি আর তিনি তখন তার গায়ে হাত তুলতেন ?

দিনগুলি কেমন করে এগিয়ে চলে! কত আগমনী, বিজয়ার গান একে একে পেছিয়ে পড়ে গেল। কত নহবতে ভৈরবীর সুরে দিন আরম্ভ হল, পূরবীতে শেষ! শাশুড়ী গত হলেন। হেমাঙ্গিনী গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হয়ে উঠলেন। কত বছর পরে কোলজুড়ে আবার পেসা এল। গিরির বিয়ে হয়ে গেল ভিনগাঁয়ে। নিজের সংসার ছেলেমেয়ে হাতে তুলে নিয়ে বাপের বাড়ীর কথা, শুধু ছবি হয়ে রইল জীবনের পূর্ণতার মাঝে।

সকালবেলা উঠে হেমাঙ্গিনী বললেন—হুলো বেরালটা কাল সারারাত কেঁদেছে, শুনেছিলি হরিদাসী ?

—না মা, আমি ঘুমিয়েছি মড়ার মত—

—কপালে কি আছে কি জানি, জল ছড়া দিতে দিতে হেমাঙ্গিনী বললেন।

—তোদার মাকে শাগের কথা বলতে ভুলিস নি মা, আর তুই আজ এখানে খাবি, ঘরে যেতে হবে না।

প্রভাতের রৌদ্রে আগমনীর নির্ম্মলতা, বাতাসে শীতল শান্তি—হেমাঙ্গিনী কাজে ডুবে গেলেন। আজ গিরি আসবে কত কাজ পড়ে রয়েছে। ছোট ঘরটা আজাড় করতে হবে—জামাই মাঝে মাঝে এসে থাকবে। বিছানা বালিস তোষক রোদে দিয়ে ঠিক করে রাখতে হবে।

দুপুরে কেবল কর্ম্মহীন, অক্লান্ত অবসর।—ঘুমো পেসা আর জ্বালাস নি, এখন একটু ঘুমিয়ে নে, রাত্তিরে দিদি আসবে দেখবি না ?

পেসা বলে—দিদি চলে গেছে কেন মা ?

—বা রে, শ্বশুরবাড়ী যাবে না ? তুই বড় হলে তোরও বৌ আসবে, সোনার বৌ।

—সেই যক্খিবুড়ির দেশ থেকে মা ? সেই গল্পটা বল না মা !

—আর জ্বালাস নি খোকা—

—হ্যাঁ মা বল, না হলে ঘুমোব না ত !

হেমাঙ্গিনী সেই বহুবার শ্রুত গল্পটা বলতে বসেন—

সেই যক্খিবুড়ি রাজকন্যেকে কোথায় দীঘির তলায় রাজবাড়ীতে বন্দী করে রেখেছে,—রাজকন্যের একা একা দিন কাটে। কবে এল হংসপুরের রাজপুত্তুর হাঁসের পিঠে চড়ে, দুধে আলতার মত রং, চাঁদের মত মুখ। আর রাজকন্যে আমাদের ত চাঁদ ছেঁচে গড়া। দুজনের দুজনকে দেখে চোখের পলক পড়ে না। তার পরে কত পরামর্শ—কেমন করে পালান যায়।

রাজকন্যে আয়ীবুড়ীর উকুন বাছতে বাছতে তার প্রাণের খবর কেমন করে জেনে নিলে। রাজপুত্তুর ফটিক স্তম্ভের ওপর রেখে এক কোপে বোয়াল মাছটার মুণ্ডু কাটতেই যক্খিবুড়ীর দফা শেষ। তার পরে কি ধুম ধাম করে বিয়ে!

দুপুরের রোদ তখন মাঠের ওপর ঝাঁ ঝাঁ করছে, দূরে কতকগুলি চালশূন্য ঘর, ভাঙ্গা মাটির দেয়াল। একটা ছোট খড়ের স্তূপ, ধানের মরাইটার পাশে তিনটে ছাগল চরছে। গোটাকতক উলঙ্গ ছেলেমেয়ের খেলা এখনও শেষ হয়নি। পুকুরের ঢালু পাড়ে বসে বুঝি গাইটা জাবর কাটছে, শূন্য প্রকৃতি সামনে পড়ে ধূ ধূ করছে।

সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় পিদ্দিম দিয়ে হেমাঙ্গিনী প্রণাম করছিলেন—বাইরে গরুর গাড়ী এসে থামল। ব্যস্ত হয়ে এসে দরজা খুলে দিতে রমানাথ এসে বাড়ীতে ঢুকলেন, পিছনে কেউ নেই। গরুর গাড়ীর ছৈটা সামনের আকাশকে আটকে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাইতে রমানাথ বললেন—তার শ্বশুরের শরীর খারাপ, বললে এখন কি করে যাই বাবা ? দিন কতক পরে যাব।

হেমাঙ্গিনী একটু চুপ করে থেকে বললেন—পথে কোন কষ্ট হয়নি ত ?

—না, কষ্ট আর কি ?

—গিরি ভাল আছে ? কেমন দেখলে—

—হ্যাঁ ভালই আছে, খুব গিন্নি-বান্নি হয়েছে। বললে, মায়ের জন্যে মন কেমন করে, কিন্তু এখন গেলে এঁরা কি ভাববেন বাবা। হেমাঙ্গিনী কিছু বললেন না।

রাতে হরিদাসী যখন বললে—দুদিনের জন্যেও ত এলে পারত মা, একবার তোমাদের দেখে যেত।

তখন হেমাঙ্গিনী উত্তর দিলেন—না মা, নিজের ঘর-দোর চিনে নিক। স্বামীর ঘরে গিন্নি হয়ে বসবে এর চেয়ে বড় আর মেয়েমানুষের কি হতে পারে !

রান্নাঘরের মাথায় কাঁঠাল পাতার ফাঁক দিয়ে ম্লানতর চাঁদ তখন উঁকি দিতে সুরু করেছে, বিশ্বকর্ম্মার কামারশালা থেকে, পোড়া একতাল লোহার মত।

দক্ষিণাপথের যাত্রী

শ্রীনিধিরাজ হালদার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নিদ্রাদেবী আমাদের উভয়কেই পাইয়া বসিয়াছিল সুতরাং কি ভাবে যে উহা ছোট্ট একটা স্বপ্নের ইতিহাস রাখিয়া রাত্রি প্রভাত হইল আজ সেই কথাই বলিব। জীবনের ইতিহাসে অনেক অঘটন ঘটিয়াছে। বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর বুকে মানুষের কলরব যখন দিগন্ত মুখরিত, এমনি একদিনে, সন্ধ্যা হয় হয়, পশ্চিম গগনে অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রেখাটা তখনও মিশাইয়া যায় নাই। লোকালয়ের বাহিরে বিস্তীর্ণ মরুভূমির এক প্রান্তে একাকী শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছি, দিনের আলো ত নিভিয়া গেল, এখন কেমন করিয়া অন্ধকারে অজানাপথে বাড়ী ফিরিব। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে যেন এক অতি পরিচিত সঙ্গীতের সুমিষ্ট স্বর আমার কানে আসিয়া বাজিল। আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মাঝে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া রহিলাম। প্রতীক্ষায় সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। নির্জ্জন বালুময় মরুভূমির প্রতি স্তরে স্তরে অন্ধকারের কালো রঙ অনতিদূরে ভাসমান সুরের সহিত মিশিয়া নির্জ্জনতাকে আরও গভীর করিয়া তুলিতেছিল। ভয় হইল বুঝি-বা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কোন মৃত পথহারা পথিকের প্রেত-আত্মা আমাকে ছলনা করিতেছে। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। তাহার পর আকাশের গায়ে পুঞ্জীভূত তারার আলোকে বুঝিতে পারিলাম কোনও এক নারীমূর্ত্তি সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মনে করিলাম আমারই মত সে-ও বুঝি পথহারা, শ্রান্ত—আশ্রয় খুঁজিতেছে। শুইয়া শুইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে?' উত্তর আসিল, 'কে'।

রামেশ্বরম্ মন্দিরের পূর্ব্ব তোরণ

মনে করিলাম আমার নিম্নস্বর অবগুণ্ঠিতা নারীর কর্ণে গিয়া পশে নাই। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুমি এমনি করে একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছ ?"

প্রতিধ্বনি হইল বটে কিন্তু উত্তর আসিল, "আপনার নতুন যায়গায় কষ্ট হচ্ছে না ?"

কষ্ট—কেন কিসের কষ্ট, বেশ আরাম করিয়া রাত্রিতে শুই, দিনের বেলায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই ; কৈ আমার ত কোনও কষ্ট হয় না। হঠাৎ পিছন হইতে অট্টহাসির শব্দে চাহিয়া দেখি রায় মহাশয়ের কন্যা সুধা খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। ভোর হইয়া গিয়াছিল, ছড়িদারের

রামেশ্বরের মন্দির (মেরামত হইতেছে)

ডাকে ঘুম ভাঙিয়া যাইতে চাহিয়া দেখি, ধর্ম্মশালার একটা ঘরে বিনোদ-দা তখনও ঘুমাইতেছেন। বিনোদদাকে ডাকিয়া তুলিয়া বলিলাম,—'এইবার উঠুন, ভোর হয়েছে।' গত রাত্রের জলখাবার দেওয়া হইতে বিছানায় চাদর পাতা পর্য্যন্ত সব কথাই আবার নূতন করিয়া মনে পড়িয়া গেল। উপরন্তু স্বপ্নের কথা মনটাকে আর এক বোঝা চিন্তার খোরাক জোগাড় করিয়া দিয়া গেল।

হাত মুখ ধুইয়া বসিয়া আছি, বিনোদ-দা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিহে ওঠ এইবার, সহরটা একটু ঘুরে দেখে আসা যাক।"

বলিলাম,—"চলুন না, রায় মশাইকেও সঙ্গে নেওয়া যাক। ওঁরাও ত রামেশ্বর যাবেন, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।"

বিনোদ-দা বলিলেন,—"মেয়েছেলে নিয়ে এত তাড়াতাড়ি উনি কি আমাদের সঙ্গে গিয়ে উঠতে পারবেন।"

কি একটা বলিতে যাইতেছিলাম, ছড়িদার ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "চলুন বাবু, মন্দির যে দর্শন করবেন, আজ যদি রামেশ্বর যেতে হয় তাহলে আর দেরী করবেন না, তাছাড়া ঘুরে ফিরে দেখতে বেলাও হয়ে যাবে অনেক।"

বলিলাম, "না-হয় একদিন দেরীই হবে, সকালবেলা এক কাপ চা না খেলে যে একপাও নড়তে ইচ্ছে করে না ছড়িদার।"

এমন সময় রায় মহাশয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, কাল রাত্রে ঘুম হয়েছিল ত ?"

বলিলাম, "রায় মশাই, নির্ভাবনায় আমরা ঘুমিয়েছি। জানি যে ক'দিন এই দেশে থাকা যাবে সে ক'দিন আমাদের বেশ সুখেই কাটবে।"

রায় মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কেন, এই দেশটা আপনাদের বুঝি ভারি ভাল লেগেছে ?"

বলিলাম, "দেশ যত ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, সবচেয়ে ভাল লেগেছে এই সুদূর দক্ষিণাপথে আপনাদের সঙ্গ লাভ করে।"

"সেটা আমার পরম সৌভাগ্য।"

সেই সময় সুধা দুইটী এ্যানামেলের গ্লাসে চা লইয়া আসিয়া বলিল, "নিন এই গ্লাসেই আপনাদের খেতে হবে, কারণ বুঝতেই পারছেন।"

মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কেমন করে জানলে আমরা চা খাই, আমরা যে চা খাইনা।"

সুধা অবাক হইয়া বলিল, "আপনারা কলকাতার লোক, বাড়ীতে চা আর পান দিয়ে লোক-লৌকিকতা করেন। আপনি বলেন কি না, চা খান না, এটা আমার কাছে ভারি আশ্চর্য্য বলে মনে হচ্ছে।"

হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "আর যদি খাই তাহলে বোধ হয় আরও আশ্চর্য্য হবে, কেমন।"

আর কোনও কথা না বলিয়া একটা সেলাম বিনোদদাকে আগাইয়া দিয়া বলিলাম, "যখন এত কষ্ট করে তৈয়ারী করে আনলে, তখন কি না খেয়ে পারি সুধা।"

সুধা বলিল, "না না, আপনাদের যদি খাওয়া অভ্যাস না থাকে তবে খেয়ে আমাকে খুসী করতে গিয়ে অনর্থক শরীর খারাপ করে লাভ কি বলুন।"

চা খাওয়া শেষ করিয়া বিনোদদা বলিলেন, "সুধীরা, "আমাদের সঙ্গে না হয় নাই যাবেন, কিন্তু এতদূর এসে রামেশ্বর না গিয়ে নিশ্চয় থাকতে পারবেন না।"

সুধার কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরব হইয়া থাকিলাম; রায় মহাশয় বলিলেন, "কি, আজ ত আমাদের যেতে হবে, তাহলে আর দেরী করে লাভ কি, চলুন বেরুনো যাক।"

আর বাক্যব্যয় না করিয়া সকলে মিলিয়া ছড়িদারের সহিত আর একবার ভাল করিয়া মাদুরা সহরের যাহা কিছু দেখা বাকী আছে তাহা দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। মাদুরা সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা

রামেশ্বরম্ মন্দিরের মধ্যভাগের একটী দৃশ্য

তোমার কোনও চিন্তা নেই, চা না খেলে বরঞ্চ আমাদের শরীর খারাপ হবে, চা'র অপেক্ষায় আমরা বসেছিলুম কারণ জানি তোমাদের সঙ্গে যখন কেটলি এসেছে তখন অন্তত: এক ঢোকও আমরা ভাগ পা'ব।"

সুধা গ্লাস লইয়া আমাকে বলিল, "আচ্ছা আমাকে যেমন ঠকালেন আমি কিন্তু এর প্রতিশোধ নো'ব।"

হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "যদি তোমাদের সঙ্গে আমরা রামেশ্বর না যাই?"

আগেই বলিয়াছি। মন্দির দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে রায় মহাশয় একটি কাপড়ের দোকানে সওদা করিবার জন্য ঢুকিতেই বলিলাম, "আমি আর যাবোনা, যা নেবার কিনে আসুন, আমি ততক্ষণ রাস্তায় একটু পায়চারি করি।"

রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, আপনার বুঝি কিছু কেনার বরাত নেই?"

ব্রহ্মচারী বিনোদদা বলিলেন, "ও সুবোধ, মাদুরায় এসেছিস, যাহোক একটা কিছু কিনে নিয়ে যা, তবুও একটা চিহ্ন থাকবে।"

হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"হ্যাঁ যাবার সময় এক টিন নস্যি আমি নোব' আপনারও হবে আমারও হবে।"

বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি আর বিনোদদা কথাবার্ত্তা বলিতেছি, এমন সময় সুধা আসিয়া তাড়াতাড়ি একখানা প্রকাণ্ড রঙচঙে শাড়ী আমার হাতে দিয়া বলিল,—"সুবোধদা, দেখুন ত কাপড়খানা কেমন, আপনার পছন্দ হয় ?"

বলিলাম,—"সুধা, তোমার চেহারা যেমন সুন্দর,
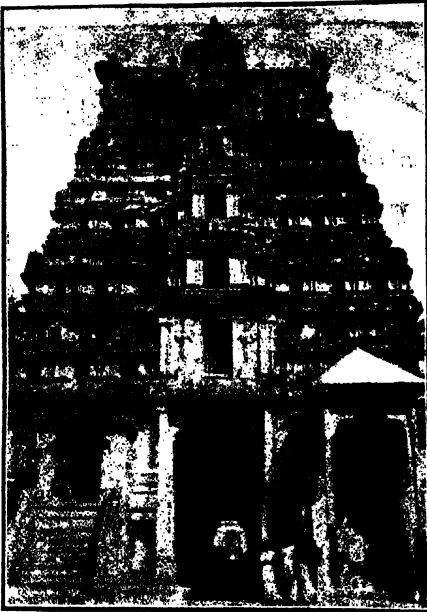
রামেশ্বর মন্দিরের পশ্চিম গোপুরম্

কাপড়খানাও তেমনি সুন্দর, তোমাকে চমৎকার মানাবে।"

"আমাকে ঠাট্টা করছেন বুঝি সুবোধ দা ?"

সুধার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলাম, "যে সুন্দর তাকে সুন্দর বলতেও কি দোষ সুধা ?"

সুধা মুখটা একটু ভারি করিয়া বলিল, "আমাকে দেখতে সুন্দর কিনা তা ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিনি।"

"সুধা তাকি কেউ কখনও জিজ্ঞাসা করে,—যারা বুদ্ধিমান লোক তারা আপনিই তা বুঝতে পারে। কাপড়খানা যে তোমার নিজের জন্যে পছন্দ করতে চাও একথাটা ত আর মিথ্যা নয়, সুতরাং তোমার চেহারার অনুপাতে এটা যে মানানসই, আমি তোমাকে ঐকথাটাই বলেছি—এতে কেমন করে তুমি বুঝলে তোমাকে ঠাট্টা করছি ?"

সুধা আর কোনও কথা না বলিয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি দোকানে ফিরিয়া যাইতে রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুবোধ বাবু কি বললেন ?"

সুধা বলিল,—"সুবোধদার কাপড়টা ভারি পছন্দ হয়েছে বাবা, আমি ত তোমাকে তখনি বলেছি কাপড়টা ভাল।"

কাপড়ের দাম নগদ চুকাইয়া দিয়া সকলে ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিতেই রায় মহাশয় বলিলেন, "আমাদের কটায় ট্রেণ ?"

টাইম-টেবলখানা ভাল করিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বলিলাম, "এখন অনেক সময় আছে—বেলা দেড়টার পরে, আমরা ঠিক সন্ধ্যের আগেই রামেশ্বর পৌঁছাব।"

ব্রহ্মচারী বিনোদদা সাংসারিক কোনও কথায় থাকিতেন না, কিন্তু তিনি তবুও রসিকতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায় মহাশয়, কাল রাত্রি থেকে সুধীরা আমাদের কিন্তু ভাতে-ভাতের নিমন্ত্রণ করে রেখেছে, তার কতদূর বলুন ত।"

রায়মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তীর্থ দর্শনের পর ব্রাহ্মণ সাধু ভোজন করান' তীর্থ-দর্শনের আর একটা অঙ্গ—অসম্পূর্ণ যাতে না থাকে মা আমার তাই দেখছি আগে থেকেই আপনাদের নিমন্ত্রণ করে রেখেছে। সত্যি কথা বলতে কি—এমনি ভাবে পথের মাঝে আপনাদের পা'ব তা আমি কোনও দিনও ভাবতে পারিনি। সঙ্গী অবশ্য অনেক পাওয়া যায় কিন্তু আপনাদের মত এত আপনার হয়ে জোটা, সেটাও পুণ্যফল।"

বলিলাম, "একা একাই সবটুকু পুণ্য আপনারা ভোগ করবেন, যদিও আমরা তীর্থযাত্রী নই, কিন্তু তীর্থ স্থানে মন্দির ত আমরা দর্শন করেছি—কিন্তু এমনি

বরাত, কোথায় আমরা ব্রাহ্মণ-ভোজন করাব' না ভোজন করেই যাচ্ছি।"

সুধা আসিয়া বলিল, "ভোজন করবার প্রয়োজন আছে বলেই বাধ্য হয়ে করতে হবে।"

বলিলাম, "সুধা, এ জগতে মানুষের অনেক কিছুই প্রয়োজন আছে, সুতরাং তাদের অনেক কিছুই ভেবে কাজ করতে হয়।"

সুধা বলিল, "বেশ আমি দাঁড়িয়ে রইলুম—ভাবুন এবার, ভেবেই আমাকে বলুন।"

ব্রহ্মচারী বিনোদদা বলিলেন,—"সুধীরা, তোমার সুবোধদার কথা বাদ দাও,—তোমার এখন কি বক্তব্য তাই বল শুনি।"

বলিলাম, "বেশ, এখন থেকে যে কদিন তোমাদের সঙ্গে আমাদের ঘোরবার মেয়াদ আছে অন্ততঃ সে কদিন আমি মুখটি বুজে থাকব'—এখন চল তোমাদের তীর্থ-দর্শনের শেষ পুণ্যটুকু সঞ্চয় করিয়ে দিয়ে আসি।"

কম্বল বিছাইয়া ধর্ম্মশালার একটা ঘরে রায় মহাশয়, আমি ও ব্রহ্মচারী বিনোদদা খাইতে বসিয়াছি; সম্মুখে রায় মহাশয়ের বৃদ্ধা মাতা বসিয়া রহিয়াছেন। সুধা আসিয়া কলাপাতা বিছাইয়া ভাত, ঘি, মুগের ডাল, আলুভাতেও একটা নিরামিষ আলুর তরকারী পরিবেশন করিল। সেগুলি খাওয়ার পর, বৃদ্ধা বলিলেন,—"যাও মা এইবার—দুধ, কলা আর চিনি এনে দাও; বিদেশে ধর্ম্মশালায় খাবার কত কষ্ট হ'ল।"
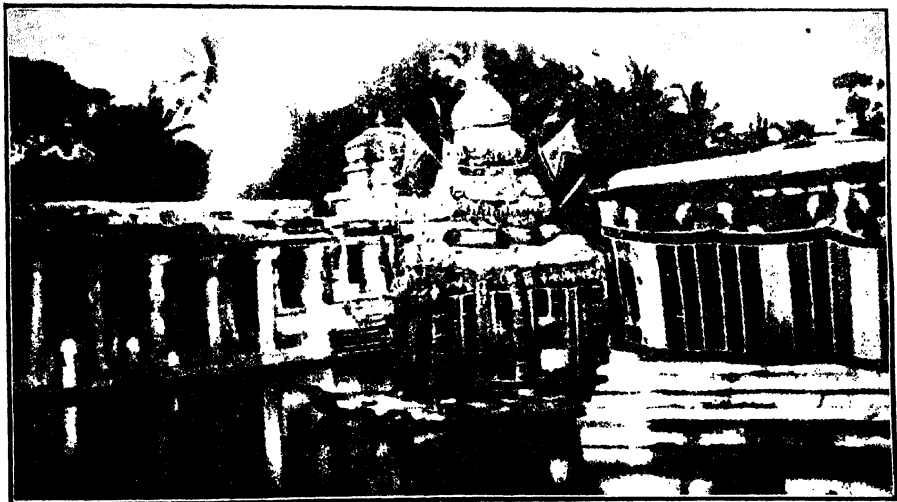
লক্ষ্মণতীর্থ—রামেশ্বরম্

সুধা বলিল, "বেশ ব্রহ্মচারী মশাই, আপনিই তবে একাই আসুন, সুবোধদাকে জগতের প্রয়োজন চিন্তা করতে দিন।"

হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুধা এরই মধ্যে আমাদের ভাতে-ভাত প্রস্তুত, তা বলতে হয়।"

সুধা জবাব দিল, 'সোজা কথায় আপনাকে জবাব দিলে ত চলবে না সুবোধদা, একটা কথা বল্লে বারোবার তার মানে না করলে আপনার কাছে নিস্তার পাওয়াই দায়।"

বৃদ্ধা আপনার মনে শেষ কথা কয়টা বলিয়া যাই বার পর—বলিলাম,—"আচ্ছা ঠাকুরমা, আপনি কি বলতে চান আমরা বাড়ীতে রোজই মোণ্ডা মেঠাই খেয়ে থাকি? আজ যে রকম আপনার আশীর্ব্বাদে খাওয়া হ'ল—এরকম যদি রোজ জোটে তাহলে আমি আপনার সঙ্গে সমস্ত তীর্থ দর্শন করতে প্রস্তুত আছি।"

ব্রহ্মচারী বিনোদদা বলিলেন,—"এও কিন্তু আমাদের জোটেনা মা ঠাকরুণ।"

"তা যাই হোক বাবা—তোমাদের তৃপ্ত হলেই হোল" বলিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া গেলেন।

সুধা দুধের বাটী হাতে করিয়া তখনও দাঁড়াইয়া ছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি সুধা দাঁড়িয়ে আছ যে; আবার কি মুগের ডাল থেকে খাওয়াতে চাও নাকি ?"

সুধা বলিল, "আপনি যদি খেতে চান তা আবার খাওয়াতে পারি বৈকি।"

"না আধপেটাই ভাল—শেষে তোমার ভাতে কম পড়লে মনে মনে' গালাগালি দেবে ত, দরকার নেই।" বলিয়া উঠিয়া পড়িতেই ব্রহ্মচারী বিনোদদা বলিলেন,
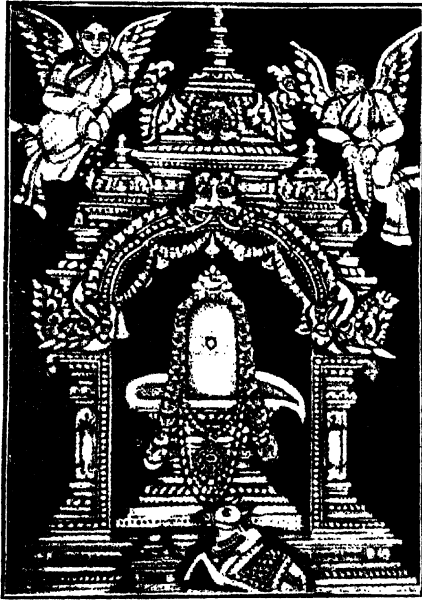
রামেশ্বর শিবমূর্ত্তি

"তিলের তেলের চোটে এতদিন আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছিল, আজ তবু মুখটা বদলান' গেল, রান্নাগুলি চমৎকার হয়েছে।"

সুধাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বিনোদদাকে বলিলাম, "সুধার রান্না ভারি চমৎকার—সব চেয়ে আমার কিন্তু ভাল লেগেছে আলু-ভাতেটা।"

বিনোদদা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, সুধা মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল।

আর ঘণ্টাখানেক বাদেই আমাদের মাদুরার মায়া কাটাইয়া রামেশ্বর রওনা হইতে হইবে—ছড়িদার আমাদের সঙ্গেই যাইবে, পূর্ব্বেই তাহা ঠিক হইয়া গিয়াছিল।

সামান্য বিছানা গুটাইয়া লইতে বসিলাম। সুধার ঠাকুরমা আসিয়া আমাদের মুখশুদ্ধি দিয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের সকলের খাওয়া হোল' ত ঠাকুরমা।"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"হ্যাঁ বাবা, আজকের মত একরকম চুকে গেল, দেড়টায় গাড়ী বুঝি ?"

বলিলাম, "প্রায় দেড়টা, বিছানাপত্র সব গুছিয়ে নিন, ছড়িদার এলেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।"

বৃদ্ধা চলিয়া যাইবার সময় বলিলাম,—"ঠাকুরমা সুধাকে এক গ্লাস জল দিয়ে যেতে বলুন না।"

সুধা জল লইয়া আসিয়া আমার সম্মুখে গ্লাস নামাইয়া রাখিয়া নীরব হইয়া দাড়াইয়া রহিল। এক নিঃশ্বাসে এক গ্লাস জল পান করিয়া বলিলাম, "সুধা আমার ওপর তুমি রাগ করেছ, না ?"

সুধা তত্রাপি নীরব।

বিনোদদা বলিলেন, "না না, রাগ করবে কেন, যদি রাগই করবে তা হলে বলবামাত্রই জল এনে দিত না।"

জলের গ্লাসটা তুলিয়া লইয়া সুধা বলিল,—"সুবোধদা আপনি মনে করবেন না যে আমি রাঁধতে পারিনা,—আমি যা জানি আপনার কলকাতার অনেক বড় বড় উড়ে বামুনের চেয়ে তা ভাল। তা ছাড়া আলু-ভাতের কথা যদি বলেন,—তাহলে ঐ রেষ্টুরেণ্টের চপ, ডিম-সেদ্ধ আর মাংসের কারীর চেয়ে আলুভাতে ঢের ভাল তা আমি একশোবার বলব। মনে করবেন না যে আলুভাতে রান্না করা যায় না।"

"বেশ, মুখে বলে' সে কথা ত লাভ নেই—কাজে দেখিয়ে দিলেই হয়। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, নতুন ধরণের কত রান্না তুমি ত জানবেই, রান্নার কত বড় বড় ইংরিজী বই তোমাদের পড়তে হয়েছে।"

সুধা বলিল,—"আচ্ছা এই কিস্কিন্ধ্যার দেশে আমাকে বলে নিন, কলকাতায় ফিরে গিয়ে বই-পড়া বিদ্যেরই কিছু পরিচয় আপনাকে দেব।"

এমন সময় ছড়িদার আসিয়া বলিল, 'চলুন,—আপনারা সব গুছিয়ে নিয়েছেন ত ?'

আমরা সকলে প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম—বলিবামাত্র বাহির হইয়া পড়িলাম। যাইবার পথে পিছন হইতে মন্দিরগুলিকে আর একবার প্রণাম করিয়া মাদুরা সহর হইতে বিদায় লইলাম।

রামেশ্বরগামী ট্রেণ যাত্রী লইবার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল, আমরা একটা ছোট্ট কামরায় সকলে মিলিয়া উঠিয়া বসিলাম। ছড়িদার বলিল, "আপনাদের সকলকে রামেশ্বরে আমি নাবিয়ে নোব,—আর একবার গাড়ী বদল করতে হবে। আমি পেছনের গাড়ীতেই রইলুম। পথে যদি কেউ এসে অন্য কোনও পাণ্ডার কথা বলে, আপনারা গোবর্দ্ধন পাণ্ডার নাম করলে কেউ আর কিছু বলবে না।"

ছড়িদার চলিয়া গেলে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, বলিলাম 'যত বেটা এসে জুটেছে কেবল পয়সা মারবার ফিকির।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "না বাবা, এ ছড়িদার লোকটা ভাল।"

বলিলাম, "প্রথম প্রথম ওরকম সবাই ভাল থাকে—তারপর তীর্থগুরুর প্রণামী নিয়েই গণ্ডগোল বাধে। তা যাই হোক সে ভাবনা আপনাদের পোয়াতে হবে না শুনেছি রামেশ্বরের পাণ্ডারা নাকি ভাল লোক—বেশ যত্ন করে।"

সুধা জিজ্ঞাসা করিল,—"সুবোধদা, এই ত সেই সেতুবন্ধ রামেশ্বর, এই সমুদ্রইত পাথর দিয়ে বেঁধে রামচন্দ্র লঙ্কার রাবণকে বধ করে সীতা উদ্ধার করেছিলেন ?"

বলিলাম, "যদিও সে রাম নাই, লঙ্কাও নাই—তবুও সেই ত্রেতায় একপাল বাঁদর মিলে সমুদ্রের জলে পাথর ভাসিয়ে কি যে এক অঘটন ঘটিয়েছিল তার কিছু কিছু নিদর্শন অন্ততঃ আমরা পাব। ভগবান রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে এই রামেশ্বর হিন্দুমাত্রেরই পরম পবিত্র তীর্থস্থান।"

রামেশ্বরম্ মন্দিরের সম্মুখভাগে রামেশ্বরের দুইটী কাষ্ঠ রথ ও একটী রৌপ্য রথ রহিয়াছে

গাড়ী মেঠো পথ ধরে ছুটে চলেছে,—পেছনে পড়ে থাকছে কত অসংখ্য তাল, নারকেলের বাগান, মাঠ আর মাঠ। কত ছোট ছোট এষ্টেসনে গাড়ী থামতে থামতে শেষে একটা এষ্টেসনে এসে গাড়ী প্রায় আধঘণ্টা থেমে রইল ;—ছড়িদার এসে বল্লে, "যাঁরা কলম্বো যাবেন ডাক্তার এখানে তাঁদের পরীক্ষা করবে।" বুঝলুম কোয়ারেণ-টাইন একজামিনেসন। ছড়িদারকে জিজ্ঞাসা করলুম, "এর পরেই তাহলে আমাদের আবার গাড়ী বদলাতে হবে ত ?"

ছড়িদার বল্লে, "হ্যা বাবু, ছোট লাইন মাত্র আট ন

মাইল পথ। রামেশ্বরে পৌছাবার আর বেশী দেরী নেই, আপনারা কলকাতার লোক—এতদূরে একটু কষ্ট হবে কিন্তু মন্দির দর্শন করলে সত্যই আনন্দ পাবেন।”

কোয়ারেণটাইন পরীক্ষা শেষ হবার পর গাড়ী ছেড়ে যখন পামবন ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হল আমরা সবাই তাড়াতাড়ি নেমে পড়লুম। সুধা জিজ্ঞাসা করলে “এ গাড়ীটা কোথায় যাবে সুবোধদা।”

বললুম, “এটা এদেশের চলতি কথায় হচ্ছে বোট মেল, একটু পরেই ধনুস্কোটি ষ্টেশনে গিয়ে থামলে যাঁরা কলম্বো যাবেন সমুদ্রের ধারেই নাগোরা ষ্টেশনে তাঁরা
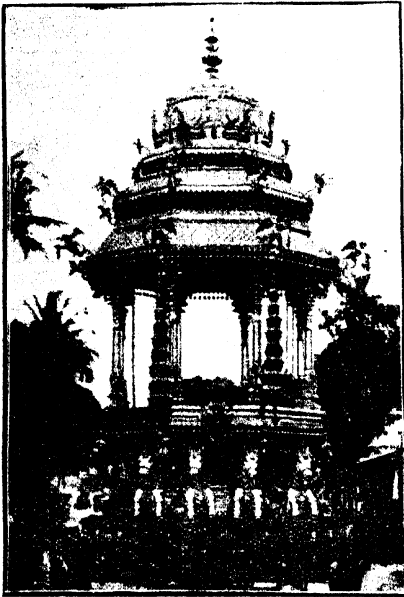
রামেশ্বরের রৌপ্য-রথ

ষ্টীমার পাবেন ওপারে যাবার জন্তে, যাকে চলতি কথায় এখনও আমরা লঙ্কা বলে থাকি।”

আমরা গাড়ী বদল করে পামবন ব্রীজের উপর এসে উপস্থিত হলুম। দেড়মাইল লম্বা ব্রীজ, সমুদ্রের উপর যে পুল সম্ভব হতে পারে, তা এই প্রথম দেখে যতখানি না আশ্চর্য্যান্বিত হ’লুম তার শতগুণ বেশী আনন্দিত হয়েছিলুম; তার কারণ সমুদ্রের উপর দিয়ে রেল গাড়ী ছুটে চলেছে,—তলায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ জলে ভেসে রয়েছে—আর তারই উপর সমুদ্রের জল আছড়ে আছড়ে পড়ছে। এই পাথরের উপর রেল কোম্পানী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বীম বরগার সাহায্যে এমনি ভাবে পুল নির্ম্মাণ করেছেন যে ইচ্ছে করলে মাঝখান দিয়ে পুলটাকে ষ্টিমার যাবার জন্তে খোলাও যেতে পারে। সত্যই এখানকার দৃশ্য এতই সুন্দর যে যুগ-যুগান্তর ধরে বসে বসে দেখলেও যেন আশ মেটেনা। নীচে সমুদ্রের ওপর পাথরের আশে পাশে কতকটা যায়গা চড়া বলে মনে হ’ল; সেখানে জলের গভীরতা খুব অল্প, ঢেউয়ের জোরও তেমন নেই। কিন্তু একটা কথা এখনও আমার মনে হয় যে, এই বিশাল সমুদ্রের ধারে এত বড় বড় পাথর কেমন করে এসে হাজির হল। পাথরের চেহারা দেখে অবশ্য মনে হয় যেন তারা কত যুগ-যুগান্তর ধরে সমুদ্রের নোনা জলে মিশে ঝোঁপরা হয়ে পড়ে রয়েছে, কত কালো কালো শেওলা তাদের ওপর এসে জমা হয়েছে। তাই আজও ভাবি, পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়।

আমরা পুল পার হয়ে ডাঙায় এসে পড়তেই রেলের জানালা দিয়ে দুপাশে চেয়ে দেখি কেবলই বালি আর বালি, যেন আমরা মরুভূমির রাজ্যে এসে পৌচেছি। রেলের লাইনের ধারে ধারে পনর বিশ হাত অন্তর অন্তর কুলিরা লাইনের ওপর থেকে কেবলই বালি পরিষ্কার করে দিচ্ছে।

রামেশ্বরটা একটা ছোট্ট দ্বীপ, চারি পাশেই তার সমুদ্র ঘিরে রয়েছে, তাই তার চারিদিকে বালির আর অভাব নেই। চারি দিকে এত বালি হলেও পথের মাঝে মাঝে তাল নারকেলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগান দেখতে পাওয়া গেল। আমাদের রেল বালির ওপর দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে, মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বালির পাহাড় এমনি ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে, তাদের ফাঁক দিয়ে দূরে সীমাহীন সমুদ্র আমাদের নজরে পড়ছিল। তখনও চারিদিকে রৌদ্রের বেশ জোর ছিল, তাই দূর থেকে সমুদ্রের জলগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন গলান রূপো চারিদিকে টলমল করছে।

সন্ধ্যে হবার তখনও কিছু বাকী আছে, আমরা

রামেশ্বরম্ ইষ্টেশনে এসে নামলুম। ছড়িদার বল্লে, "বাবু—এখান থেকে মন্দির খুব কাছে, আরও কাছে আপনাদের থাকবার নতুন ধর্ম্মশালা।"

বল্লুম, "বেশ, চল আগে ধর্ম্মশালায় গিয়ে ওঠা যাক,—"

সুধা বল্লে, "এখানে গাড়ী পাওয়া যায় না?"

ছড়িদার বল্লে,—"না এখানে যেতে হলে এক গরুর গাড়ী ছাড়া অন্য কোন গাড়ী পাওয়া যায় না।"

সুধাকে বল্লুম,—"তোমরা তাহলে গরুর গাড়ীতেই এস, সামান্য একটুখানি পথ আমি হেঁটে মেরে দোব।"

সুধা বল্লে,—"তবে চলুন আমিও তাহলে আপনাদের সঙ্গে যাই।"

রায় মহাশয় তাঁর মার জন্যে একটা গোযান ঠিক করলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি গরুর গাড়ীতে চড়তে রাজী হলেন না। বৃদ্ধা বল্লেন, "তীর্থ করতে এসে গরুর গাড়ীতে আমি চড়তে পারব না।"

অগত্যা সমস্ত মালপত্র গরুর গাড়ীতে তুলে আমরা পদব্রজেই ধর্ম্মশালায় হাজির হলুম। ধর্ম্মশালা এমন সুন্দর স্থানে তৈয়ারী হয়েছে যে, ঘরে বসে বসে সমুদ্রকে প্রাণ ভরে দেখা চলে। সামনেই বেশ পরিষ্কার রাস্তা, একেবারে মন্দির পর্য্যন্ত চলে গেছে। রাস্তায় জলের কলও দেখতে পেলুম; আবার ধর্ম্মশালার ভেতরেও বেশ বাঁধান' ইন্দারা রয়েছে। কাছেই সামান্য একটু বাজার। ছড়িদারকে জিজ্ঞাসা করলুম, "এখানকার লোকে কি তিলের তেল খায়।" আমাদের মনের কথা বুঝতে পেরে ছড়িদার বল্লে, "না বাবু এখানে আপনি পশ্চিমা হিন্দুস্থানির খাবারের দোকান পাবেন, সেখানে ঘিয়ের পুরি, তরকারী, রাবড়ী, পেড়া ভালই কিনতে পাবেন। রান্না না করলেও আজকের রাতে আপনাদের খাওয়ার কোনও কষ্ট হবে না।"

ছড়িদারের সঙ্গে কথা কচ্ছি, এক পাল পাণ্ডা এসে খোঁজ-খবর নিতে লাগল',—আমরা কোথা থেকে আসছি—আমাদের আগে এখানে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ কেউ এসেছিল কিনা, বড় বড় লম্বা লম্বা জাব্দা খাতা নিয়ে তারা হিসেব দেখার মত আমাদের পূর্ব্বপুরুষের নাম ধাম খুঁজতে লাগল, কারণ যদি কারুর খাতায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষের নাম পায়—তাহ'লে যার খাতায় তা পাওয়া যাবে তাকেই আমাদের পাণ্ডা বলে মেনে নিতে হবে, অন্ততঃ তাই নেওয়াই উচিত। শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ছড়িদারের পাণ্ডাই ঠিক রয়ে গেল।
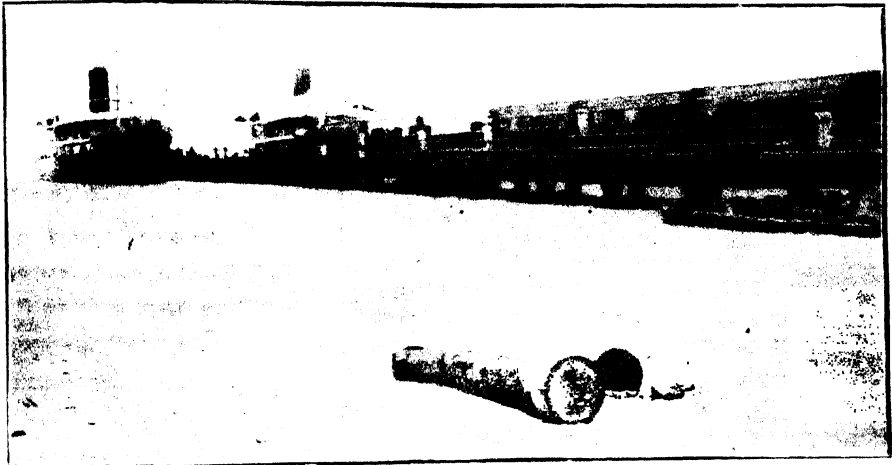
ধনুষ্কোটীর পুল—এইখান হইতে কলম্বোর পথে যাইতে হয়

পাণ্ডার গোলমাল মিটবার পর ছড়িদারকে বল্লুম, "আচ্ছা তুমি তাহলে এবার এস, আমরা সন্ধ্যের পর মন্দিরে আরতিটা দেখে আসবো, তার পর কাল সব কিছু ঘুরে ফিরে সারা যাবে।" ছড়িদার চলে গেল।

সেদিন সত্যই আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম;

তবুও আমি মুখ হাত পা ধুয়ে ছড়িদারের অপেক্ষায় না থেকে ফাঁকা পথে একটু বেরিয়ে পড়লুম। খানিকদূরে এসে পেছন ফিরে চেয়ে দেখি সুধা আমার পেছু নিয়েছে। বল্লুম, "কি সুধা তুমি যে এলে ?"

সুধা হাসতে হাসতে বল্লে, "বা, আপনি ত বেশ মজার লোক, আমাকে একলাটী ফেলে চলে এলেন।"

বল্লাম, "তোমাকে একলা ফেলে এলুম কি রকম।"

"তা হোক, চলুন না একটু ঘুরে আসি ; ওদের সঙ্গে চুপটি করে বসে থাকতে আমার মোটেই ভাল লাগেনা, আপনার মধ্যে প্রাণ আছে—তাই আপনার সঙ্গ আমার যত ভাল লাগে, অন্য কাউকে আমার ততটা পছন্দ হয় না।"
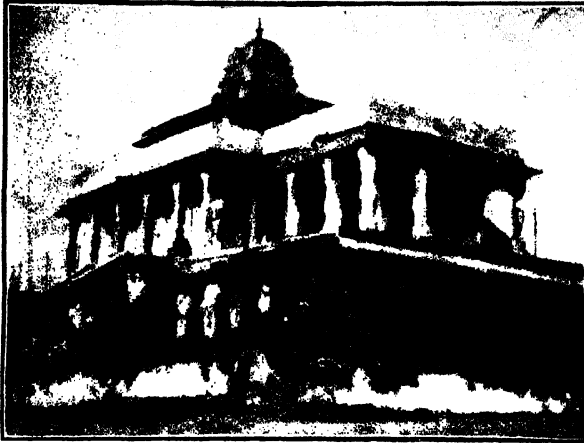
রামদ্বারকা বা গন্ধমাদন পর্ব্বত—রামেশ্বরম্

মুখে সুধাকে কিছু না বলিলেও মনে মনে বলিলাম জানি না এ পছন্দের পরিণতি কোথায়।

এদিক-সেদিক একটু ঘুরিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি ছড়িদার আমাদের দুইজনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে ; আমরা সকলে ছড়িদারের সহিত মন্দির দর্শনে বাহির হইয়া পড়িলাম।

মন্দিরে ঢুকিয়াই মনে হইল বুঝি আমরা আবার মাদুরায় ফিরিয়া আসিয়াছি। দক্ষিণ ভারতের মন্দির যে এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, তাহা আমি আগে জানিতাম না। অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি—আর ভাবি নিশ্চয় এ বোধ হয় মানুষের তৈয়ারী নয়। মন্দিরের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পথগুলি বিজলীর আলোকে মনে হয় যেন উহা মানবশূন্য মধ্যরাত্রে কোনও এক নীরব নগরীর রাজপথ। রামেশ্বর ও মাদুরার মন্দির যেন অবিকল একই ছাঁচে ঢালা—তবে কেহ কেহ বলেন, মাদুরার মন্দির রামেশ্বরের মন্দির হইতে কিছু বড়। সে যাহাই হউক না কেন, দক্ষিণ ভারতের এই মন্দিরগুলি যদি একবার প্রদক্ষিণ করিতে হয় তাহা হইলে কয়েক মাইল হাঁটার কাজ হয়।

রাত্রে আর কি দেখিব, সুধাকে বলিলাম, "চল এইবার বাড়ী ফেরা যাক, কাল দিনের আলোয় এখানকার যা কিছু সবই দেখে নেওয়া যাবে।"

সুধা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কালই ফিরে যেতে চান নাকি ?"

বলিলাম,—'সুধা, সব কিছু যদি দেখাই হয়ে যায় তাহলে মিছামিছি ধর্ম্মশালায় পড়ে থেকে লাভ কি, বরঞ্চ কলকাতায় ফিরে তোমাদের বাড়ী গিয়ে রোজ তোমার নতুন নতুন রান্না খেয়ে আসব', তখন হয়ত তুমি চিনতে পারবে না কি বল ?"

সুধা বলিল,—"যান আপনি ভারি দুষ্টু—আপনার সঙ্গে আর কথা কইব' না।"

তা ড়া তা ড়ি তাহার পি ঠ টা চাপড়াইয়া বলিলাম, "সুধা তুমি রাগ করলে, আমাকে তাহলে তুমি দেখতে পা'রনা বল।"

সুধার গম্ভীর মুখ অমনি হাসিতে ভরিয়া উঠিল, সম্মুখে চাহিয়া দেখি আর সকলেই অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে।

পরদিন প্রাতঃকালে স্নান সারিয়া রামেশ্বরের যাহা কিছু দেখিবার—লক্ষ্মণ-তীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া সবই দেখিয়া শুনিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়াছি।

তীর্থ করিতে না আসিলেও পাণ্ডাকে দক্ষিণা দিয়া তীর্থগুরু স্বীকার করিয়া তাহাদের জাবদা খাতায় নাম ঠিকানা লিখিয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে রায় মহাশয়কেও

তাহাই করিতে হইল। রামেশ্বরে আসিয়া কি দেখিয়াছি আমার কি ভাল লাগিল না লাগিল সুধা আমাকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল।

বলিলাম, "এই সেতুবন্ধ রামেশ্বর নিয়ে প্রকাণ্ড ইতিহাস লেখা আছে, রামায়ণ পড়লে অনেক কিছুই জানতে পারবে, মিছামিছি আবার রামায়ণের আদি কাণ্ড থেকে লঙ্কা কাণ্ড পর্য্যন্ত বলে কোনও লাভ হবে না। তবে যদি বল অনেকেই আসে, মন্দির দেখে চলে যায়, আমি কিন্তু আমার বাহ্যিক চোখ দিয়ে মন্দির দর্শন করিনি সুধা, আমার মনের চোখ দুটো দেখার সবটুকু রস নিঙড়ে বার করে নিয়েছে। আজ এই বিংশ শতাব্দির যুগে মানব-সভ্যতার ইতিহাসের কথা যতই ভাবি, ততই আমার মনে হয় যাহারা বিদ্যার বড়াই করে তাহারা কি পাগল হইয়া গিয়াছে। পুরাকালের ইতিহাস তাহারা কি একবারও পড়িয়া দেখে নাই! কিন্তু কি বলিব লিখিতেও লজ্জা হয়, যাঁহারা পরের ধার-করা বিদ্যা লইয়া সুখ পান তাঁহারা কেমন করিয়া আমাদের এই অসভ্য নগণ্য ভারতের পুরাতন সভ্যতার নিদর্শন চোখে চসমা আঁটিয়াও দেখিতে পাইবেন।"

সুধা জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে আপনি বর্ত্তমান সভ্যতাকে নিন্দা করেন?"

'নিন্দা আমি করিনা, তবে এইটুকু বলিতে চাই, আমাদের দেশে বড় বড় আর্কিটেক্ট ও ইনজিনিয়ারের মাথা ঘুরিয়া উঠিবে এই সব মন্দিরের নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য চিন্তা করিতে, কারণ তাঁহারা শক্তিশালী বিদেশী ডিগ্রিধারী পণ্ডিত।"

সুধা আর কোনও কথা বলিল না। আমাদের ট্রেণের সময় হইয়া আসিয়াছিল, প্রায় তিন দিন ট্রেণে কর্ম্ম-

রামেশ্বর মন্দিরে পার্ব্বতী ও শিবমূর্ত্তি
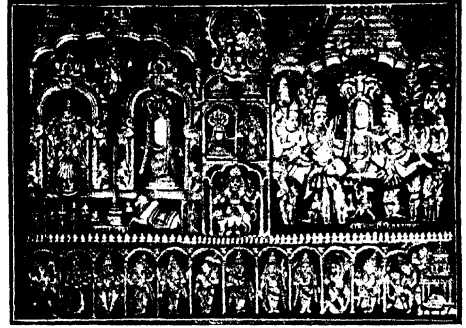
ভোগের পর হাওড়ায় পৌছিয়াছি। রায় মহাশয়কে বিদায় দিবার সময় তাঁহার বাসার ঠিকানা লইয়া এবং
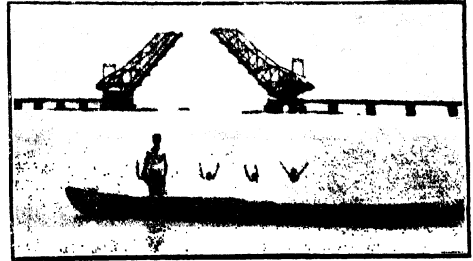
রামেশ্বরের পুল বা সেতুবন্ধ রামেশ্বর

আমাদের ঠিকানা দিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে ভাবিতে লাগিলাম সুধার কথা।
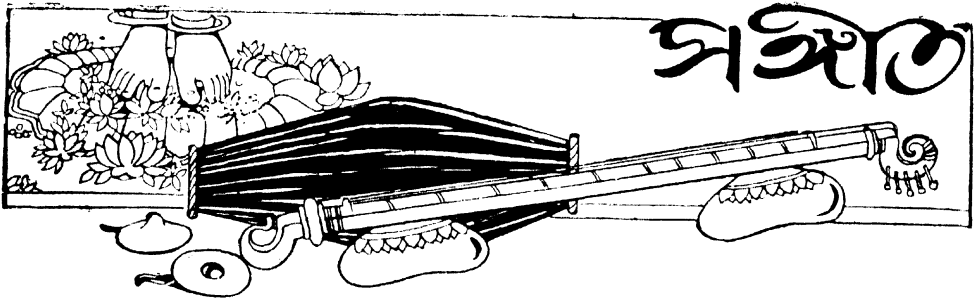
কথা—শ্রীব্রজমোহন দাশ　　　　　　　　　　সুর—শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

স্বরলিপি—কুমারী বেলা রায়

মিশ্র ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা

দিলি কার গলে আজ কুন্দমালা
কার পায়ে আজ শেফালী ;
আ-মর্ বন-দুলালী !

কেতকীর গন্ধ-আঁধা,　　টগর ফুলে নাগর বাঁধা ;
মন সরে না　পা ওঠে না
তবু তোর আনাগোনা
লোক-হাসালি !

কমল তোর রূপসায়রে ঢেউ লেগেছে যে—
তা কি তুই জানিয়ে দিবি জেগে ঘুমোয় যে ?
মহুয়ায় দোদুল্ মঞ্জুল্ ঝুল্ ঝুল লাখ্ বুল্‌বুল্ ;
নীল্-পাখী তোর এ কি রে ভুল
আধ-ফোটাতে ঘুম ভাঙালি !

II সা সা | সা রা সা ণ্ ধ্ ণ্ | সা -া ন সা -া | সা রা সা ণ্ ধ্ ণ্ | সা জ্ঞ মা পা -া |
দি লি　কা র গ লে আ জ কু ন্দ মা লা -　কা র পা য়ে আ জ শে ফা - লী -

পা পা -া -া | মা দ পা মা জ্ঞ -া |
আ ম র্ -　ব ন দু লা লী -

ণ ণ ণ -া | ধা ণ -া | ধা ণ -া -া -া | ণ ণ ণ -া | ধা ণ -া | ধা পা -া -া -া -া |
কে ত কী র　গ ন্ধ -　আঁ ধা - - -　ট গ র ফু লে না গ　র বাঁ ধা - - -

র্সা -া ন র্রা র্সা -া | ণ -া ণ ধা ণ -া -া -া | ণ ণ ণ -া | ধা ণ -া ধা পা -া -া |
ম　ন স রে না　পা - ও ঠে না - - -　ত বু তো র আ না - গো না - -

মা গামা গা মা পা -া -া -া -া | পা পা -া | মা দ পা মা জ্ঞ -া -া -া |
লো ক হা সা লি - - - - আ ম র্ ব ন দু লা লী - - -

ন ন ন -া | ন ন -া | ন -া -া -া -া -া | ধা ন -া র্সা র্রা | র্সা -া -া -া -া -া |
ক ম ল - তো র রূ প সা য় রে - - ঢে উ লে গে ছে যে - - - - -

ণ ণ ণ -া | ধা ণ -া | ধা ণ -া -া -া | রা জ্ঞ -া | মা পা -া | ণ ধা পা মা -া -া |
তা কি তু ই জা নি য়ে দি বি - - - জে গে - ঘু মো য় যে - - - - -

পা পা পা -া | দ পা -া | মা পা -া -া -া | ণ ণ ণ -া | ধা ণ -া ধা পা -া -া -া |
ম হু য়া য় দো দু ল্ ম ক ল্ - - ঝ ল্ ঝ ল্ লা খ্ বু ল্ বু ল্ - -

র্সা -া ন র্রা র্সা -া | ণ ণ -া ণ ণ -া | পা ধা মা মা -া | জ্ঞ মা জ্ঞ মা পা -া -া -া -া |
নী ল পা খী তো র এ কি রে ভু ল - আ ধ ফো টা তে ঘু ম ভা ঙা লি - - - -

পা পা -া | জ্ঞ মা -া -া -া | দ পা -া জ্ঞ | -া -া -া -া -া II
আ ম র্ ব ন - - - দু লা লী -া - - - - -

উত্তরবঙ্গে শিল্পাদর্শের ও কৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের আভাস

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার এম-এ, বি-এল্

(২)

একদা বাঙ্গালী যে প্রস্তর-শিল্পেও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, এ যুগের অনেক বাঙ্গালী তাহা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন। বাঙ্গলায় ভাস্কর্য্যবিদ্যার অনুশীলনের কৃতিত্বের প্রকৃত পরিচয়, বাঙ্গলাদেশে প্রাপ্ত পুরাতন ভাস্কর্য্য-নিদর্শন। ইহার বিশিষ্টতাও ইহাকে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ভাস্কর্য্য-নিদর্শন হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গলার আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা বাঙ্গালাকে যেরূপ এক অতুলনীয় বিশিষ্টতা দান করিয়াছে, সেরূপ বাঙ্গলার শিল্পেও তাহার অভিব্যক্তি দেদীপ্যমান। নানা দেশের ও নানা যুগের শিল্পনিদর্শনের তুলনামূলক সমালোচনা করিতে যাঁহাদের চক্ষু অভ্যস্ত, সেরূপ পরিদর্শক মাত্রেই রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সংগ্রহালয়ে আসিয়া সংগৃহীত শিল্পনিদর্শনগুলিকে বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ বলিয়াই অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

লামা তারানাথের তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাসে প্রসঙ্গক্রমে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লিখিত আছে, তাহা ক্রমে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তাহাতে লিখিত আছে—ভারতবর্ষে স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে পর্য্যায়ক্রমে দেব-যক্ষ-নাগ নামক তিনটি শিল্পপদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তাহার পর কিয়ৎকাল শিল্পচর্চ্চা অধোগতি লাভ করে। পুনরায়

দুই স্থানে শিল্পের পুনরুজ্জীবন সাধিত হইয়াছিল। মগধে বিম্বিসার নামক শিল্পীর প্রতিভায় দেব-শিল্পরীতির এবং বরেন্দ্রে (উত্তরবঙ্গে) ধর্ম্মপাল ও দেবপাল নামক নরপতি-দ্বয়ের শাসন সময়ে ধীমানের প্রতিভায় যক্ষ-শিল্পরীতির পুনরুজ্জীবন সাধিত হইয়াছিল। ধীমান্ ও তাহার পুত্র বীতপাল বরেন্দ্রে (উত্তরবঙ্গে) ও মগধে এই রীতি প্রচলিত করিবার পর ইহার প্রভাব নেপালাদি দেশের ভিতর দিয়া দূর দূরান্তরে ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। এই শিল্পরীতির প্রকৃতি কিরূপ ছিল ক্রমশঃ তাহার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতেছে। নালন্দার বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে লিপি সংযুক্ত যে সমুদয় শিল্পনিদর্শন বাহির হইয়াছে ও (সম্প্রতি) ১৯৩০ খৃঃ অঃ গয়ার সন্নিকটে কুর্কিহার (কুক্কুটপাদ বিহার) নামক স্থান হইতে যে সকল অসংখ্য ধাতু নির্ম্মিত (অষ্ট ধাতু) শ্রীমূর্ত্তি প্রায় একই যুগের যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত সমালোচকের দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিলে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তির সহিত নালন্দায় ও কুর্কিহারে আবিষ্কৃত এই সকল ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তির কুলপ্রথানুগত সাদৃশ্য দেদীপ্যমান।

লামা তারানাথের সমস্ত উক্তি লৌকিক উপকথার ন্যায় সর্ব্বপ্রথমে ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া সুধীসমাজ গ্রহণ করিতে পারে নাই। কিন্তু গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুর তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পর প্রজাশক্তির সাহায্যে বঙ্গে পাল রাজবংশের উদ্ভবের কাহিনী স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত থাকায় তারানাথের উক্তির সহিত সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। তাম্রশাসনের সহিত তাহার সামঞ্জস্য রক্ষিত হওয়ায় এক্ষণে তারানাথের উক্তি ইতিহাসে মর্য্যাদা লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বরেন্দ্রনিবাসী ধীমান ও বীতপালের উদ্ভাবিত বারেন্দ্র শিল্পকলার অস্তিত্বের বিষয়ে কোন কোন পুরাতত্ত্ববিৎ এখনও সংশয় প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং লামা তারানাথের প্রায় এক শত বৎসর পরবর্ত্তী আর একখানি "প্যাগ্‌সাম যোনজ্যাং" নামক তিব্বতীয় গ্রন্থে ঐ সম্পর্কে 'বারেন্দ্র' স্থানে 'নালেন্দ্র' পাঠ উল্লিখিত থাকায় নালেন্দ্র ও নলিন্দা অভিন্ন জ্ঞানে ধীমান ও বীতপালকে মগধের শিল্পী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। প্যাগসামে উল্লিখিত 'বারেন্দ্র' স্থলে 'নালেন্দ্র' লিপি প্রমাদ বলিয়া গণ্য না হইলেও, একটি মাত্র গ্রন্থের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া বারেন্দ্র শিল্পীর অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশ করিলে প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য নিরূপনের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না।

রাজসাহী সহরের অনতিদূরে গোদাগাড়ীর নিকট দেওপাড়া নামক গ্রামে একটি শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শিলালিপি হইতে সেন রাজবংশের সুবিখ্যাত নৃপতি বল্লালসেনের পিতা নৃপতি বিজয়সেন কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক মহাদেব মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা লিপিবদ্ধ আছে। এই মন্দিরের পুরোভাগে এক সরোবর খনিত হয়। এখন মন্দির নাই, সরোবর আছে। ঐ প্রস্তর-ফলকে প্রশস্তিকর্ত্তা কবি উমাপতি ধর এবং প্রশস্তি উৎকীর্ণকারী রাণক শূলপাণির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কবি রাণক শূলপাণির পরিচয় দিতে গিয়া—"(চথান) বারেন্দ্রক শিল্পীগোষ্ঠী চূড়ামণী" রাণক শূলপাণিঃ" অর্থাৎ লিপি উৎকীর্ণকারী রাণক শূলপাণিকে বরেন্দ্র দেশে তৎকালীন শিল্পী সম্প্রদায়ের শিরোমণি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বরেন্দ্র দেশে শিল্পী সম্প্রদায়ের একেবারে অসদ্ভাব থাকিলে "বারেন্দ্রক শিল্পী গোষ্ঠী" কথার আর কোন তাৎপর্য্য পরিলক্ষিত হয় না।

এতদ্ভিন্ন রাজকবি কলিকাল বাল্মীকি উপাধিধারী সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিত" কাব্যে মদনপালদেবের রাজত্বকালে স্বদেশের সংক্ষেপে পরিচয় দিতে গিয়া একটি মাত্র শ্লোকে এই বরেন্দ্র মণ্ডলের শিল্পরুচির উল্লেখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"সুকলাপান্বিত কুণ্ডল রুচি মাবিল লাটঃকান্তি মবনমদন্ধাং "অর্থাৎ বরেন্দ্র দেশের শিল্পরুচি কুণ্ডল বা অন্ধ্রদেশের (দাক্ষিণাত্যের) প্রসিদ্ধ শিল্পরুচিকে পরাভূত করিয়াছিল, কান্তিতে লাট বা গুজরাট রাজ্যের কান্তি বা শোভা সম্পদকে আবিল করিয়া দিয়াছিল এবং অন্ধ্রদেশকে অবনত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহা কবির উক্তি, স্বদেশ-প্রেমিক বারেন্দ্র কবির উক্তি এবং অতিশয়োক্তি বলিয়া কথিত হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে সে সকল ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায়, বহু তাম্রশাসনে ও

শিলালিপিতে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত অসংখ্য অনিন্দ্যসুন্দর শ্রীমূর্ত্তির সমাবেশ ও তাহার রচনা-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই লামা তারানাথের উক্তির সার্থকতা দান করিতে পারে। প্যাগসামযোনজ্যাং নামক গ্রন্থকে উপজীব্য করিয়া বারেন্দ্র শিল্পের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিলে ইতিহাসের কষ্টি পাথরে পরীক্ষিত চরম সত্যকে উপেক্ষা করা ভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না। প্রাচ্য ভারতের স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের প্রভাব সুদূর যবদ্বীপ, কাম্বোডিয়া, বলি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের শিল্পকলাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ ক্রমে আবিষ্কৃত হইবার অবকাশ লাভ করিতেছে। বরেন্দ্র-মণ্ডলে অবস্থিত পাহাড়পুর মন্দিরের গঠন-প্রণালী ও যবদ্বীপের বরোবদর মন্দিরের গঠন-প্রণালীর সাদৃশ্য সুধীবর্গের প্রাণে এক নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি করিবে।

প্রস্তরশূন্য বাঙ্গলার সমতলক্ষেত্রে প্রস্তরশিল্পের অভ্যুদয় বাঙ্গালীর পক্ষে বিস্ময়জনক বলিয়াই প্রতিভাত হইবার কথা। কতকগুলি কারণে এই অসম্ভব ব্যাপারও স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শিল্পপ্রতিভার সঙ্গে উপাদানের সম্বন্ধ আছে। অনেক সময় প্রতিভা উপযুক্ত উপাদান নির্ব্বাচন করিয়া লয়, কখনও বা উপাদানই প্রতিভার বিকাশ সাধনের সহায় হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বালুকা-প্রস্তরই (sand stone) প্রধান উপাদানরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার ভাস্কর্য্যের উপাদান পৃথক,—তাহা কষ্টিপাথর (Black chlorite stone) নামে পরিচিত। প্রস্তরহীন বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমান যুগের ন্যায় শিল্পীর পক্ষে শ্রীমূর্ত্তি গঠনে মৃত্তিকাই সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথম উপাদান ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বরেন্দ্রে আবিষ্কৃত কঠিন প্রস্তরীভূত শিল্প নিদর্শনের মধ্যেও কর্দ্দমমূলক কমনীয়তার অভাব নাই। প্রস্তরীভূত কর্দ্দম বলিয়া কঠিন কোমলের মিশ্রণোৎপন্ন শিল্প যেন অনন্য সাধারণ সমাবেশ!

কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য

শৌর্য্যবীর্য্যের দিক দিয়াও এ প্রদেশের জনসমাজ হীন ছিল না। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক গৌড়-রাজের বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ণ হত্যার কাহিনী ও [illegible]কিয়ে গণের দ্বারা কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ ও তাহাদের প্রতিহিংসার কথা উল্লেখ করিতে গিয়া কবি কহ্লন মিশ্র গৌড়-অধিবাসীগণের যে সাহসিকতার বিবরণ সঙ্কলিত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে পুরাকালে বরেন্দ্রবাসীগণের শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্যক্ষেত্রেও বরেন্দ্রবাসীর কৃতিত্বের ও মৌলিকত্বের প্রমাণাভাব নাই। সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট রীতি—গৌড়ি রীতি নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। তাহা ওজোগুণান্বিত, সমাসবহুল, মাংসল এবং পদডম্বর-যুক্ত।[১]

এ প্রদেশের কৃষ্টি ও সভ্যতার আদর্শ অভিনব ছিল। দেখা যায় যে গৌরবের মূল—জ্ঞান নহে—যোগ্যতাই সকল পদমর্য্যাদার সকল মূল। দেখিতে পাওয়া যায় যে বরেন্দ্রভূমিতে মহাযান বৌদ্ধ মতের প্রভাবে অস্পৃশ্য [হাড়ি ডোম চণ্ডালাদি] জাতি পর্য্যন্ত সাধন বলে গুরুর পদে আরোহণ করিয়াছিল। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি ব্যাধের মূর্ত্তি অস্পৃশ্য হইলেও ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছে। ইহাতেও আধ্যাত্মিক যোগ্যতা অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া দিবার ইঙ্গিত প্রকাশ করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেশে "গুণাঃ পূজা স্থানং" ইহাই চিরদিন মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। ক্ষোদিত লিপিতে দেখা যায় রাজা নির্ব্বাচনে সকলে মিলিয়া যাহাকে রাজা করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন বৌদ্ধ—মন্ত্রীগণ ছিলেন বৈদিক আচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, সন্ধি-বিগ্রহিকেরা ছিলেন কায়স্থ, নৌসেনাপতিরা ছিলেন কৈবর্ত্ত। রাজভাষা ছিল সংস্কৃত—উচ্চশিক্ষা ছিল সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচায়ক।

ধাতুপট লিপি হইতে জানিতে পারা যায়—"অগাধ জলধিমূল গভীর গর্ত্ত সরোবর" এবং "কুলাচল ভূধর তুল্য কক্ষ দেবমন্দির"[২] প্রতিষ্ঠার কল্পনাই যেন তৎকালীন অর্থবান জনসমাজের বড় আদর্শ ছিল।

---

(১) ওজঃ প্রসাদমাধুর্য্যগুণত্রিতয় ভেদতঃ।
গৌড়বৈদর্ভপাঞ্চালরীতয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

এই কারিকা অনুসারে গৌড়ীরীতি ওজোগুণান্বিত। তাহার লক্ষণ "ওজঃ যমানভূয়স্ত্বং মাংসলং পদডম্বরং"।

(২) বাণগড়লিপি।

রাজধানীর বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়—"অগণিত হস্তী অশ্ব পদাতি সৈন্য ও নৌবলের পরিচয় প্রদান করিতেছে। রাজা কিরূপ লোকপ্রিয় ছিলেন তাহা অদ্যাবধি "মহীপালের গীত" এই প্রবাদ বাক্যেই—প্রাচীন লিপির সাক্ষ্য ব্যতীত তাহার স্মৃতি অদ্যাবধি বিজড়িত রহিয়াছে। রাজকোষ প্রজাবর্গের জন্য উন্মুক্ত—"স্বয়ম্ অপহৃত বিত্তানার্থিনো বো অমুমেনে"[৩]; অর্থাৎ তখন রাজমন্ত্রী যাচকগণকে যাচক মনে করিতেন না—পরন্তু মনে করিতেন তাহার দ্বারা অপহৃতবিত্ত হইয়াই তাহারা যাচক হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল পরিচয়ই দেশের লোকের সভ্যতা ও কৃষ্টির অভ্রান্ত পরিচয়।

বরেন্দ্রভূমির লুপ্ত গরিমা উদ্ধার করিতে ও বরেন্দ্রভূমির বিলুপ্ত কাহিনী সঙ্কলিত করিয়া প্রকৃত ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইলে এই সকল স্মৃতি-নিদর্শনের আশ্রয় লইতে হইবে। বাঙ্গালার তথা বরেন্দ্রের পুরাকীর্ত্তি-নিদর্শন এখনও মৃত্তিকার অন্তরালে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। বরেন্দ্র দেশের কথা বরেন্দ্র-বাসীর নিকট এখনও তাহার সত্য মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয় নাই। এখনও বরেন্দ্রবাসিগণ তাহার প্রচ্ছন্ন আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই। এখনও এ দেশের কথা সভ্য জনসমাজের নিকট উপেক্ষিত বা অবজ্ঞাত।

বরেন্দ্রভূমির পুরাকীর্ত্তি—বাণগড়, মহাস্থান জগদ্দল, বিহারেল, বামাবতিনগর প্রভৃতি অসংখ্য প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ঘাটিত হইলে এ প্রদেশের অতীত গৌরব পুনরুজ্জীবিত হইতে পারিবে।

(৩) গরুড়স্তম্ভলিপি।

প্রতিশোধ

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল্

বেহারের এক বড় সহরে শান্ত শীতল পৃথিবীর বুকে নবোদিত সূর্য্যের কনক কিরণ ছড়িয়ে পড়েছিল। দুর্দ্দান্ত শীতের সকালে সে যতখানি আলো দিয়েছিল, ততখানি তাপ দিতে পারে নি। শিশিরে ভেজা গাছের মাথা থেকে টপ্ টপ্ করে শিশিরবিন্দু পড়ছিল,—মাঠের ওপর সবুজ ঘাস আগাগোড়া ভেজা। নিদ্রা-ক্লান্ত নগরী সবেমাত্র জাগতে সুরু করেছে—পরম নিশ্চিন্তের জাগরণ, ধীর, মন্থর। অচলা ধরিত্রীর আচরণে কোনও দিন সন্দেহ হবার অবকাশ হয়নি তার অগাধ ধৈর্য্য সম্বন্ধে,—কালও যেমন তার কঠিন বক্ষের ওপর মানুষ নিঃসন্দেহে ঘর বেঁধে তার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা চালিয়েছে, আজও তেমনি নিঃশঙ্ক জীবন-যাত্রার পথে নির্ভর জাগরণ!

শিউশরণ, কনেষ্টবলদের সর্দ্দার। তার পাহারা গেছে রাত একটা অবধি, তার পর ঘুমিয়ে এই মাত্র উঠেছে। পূব-মুখো কনেষ্টবলদের ব্যারাকে বসে সে প্রাতঃসূর্য্যকে দুই-হাত যোড় করে প্রণাম করে, একটা মোটা দাঁতন নিয়ে লোটা হাতে ক'রে, প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করবার জন্য বেরোচ্ছিল,—ইচ্ছা একেবারে গঙ্গাস্নান করে ফিরবে। মুখে "রাম-রাম সিয়া-রাম, ভকত-বৎসল সিয়া রাম",—খড়ম পরা একটা পা বারান্দায়, অপর পা সিঁড়িতে, এমন সময় সে কার স্বরে চমকে দাঁড়াল।

রাম-ভজন সিং তাদের গাঁয়ের! এ সময় এখানে!

রাম-ভজন বল্লে বন্দে-গী।

শিউশরণ মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রত্যভিবাদন করলে, রাম রাম ভাইয়া, কুশল-মঙ্গল। রাম-ভজন ছিপ্‌ছিপে সুগঠিত সুন্দর-দর্শন যুবক। বল্লে, হ্যাঁ কুশল।

শিউ-শরণ লোটা রেখে রাম-ভজনের হাত ধরলে। বল্লে, এসো, ওপরে এসো। কিন্তু হঠাৎ এত-দূরে এখানে যে! গড়বড় কিছু নয় ত।

রাম-ভজন মিষ্টি হেসে বল্লে, না, গড়বড় কিছু নয়।

শিউ-শরণ বল্লে, তবে হঠাৎ ভাইয়ার আগমন হ'ল যে! একটা খবর পর্য্যন্ত নেই—

রাম-ভজন হাসলে, বল্লে, কেন আসতে নেই কি?

তোমরা সবাই রয়েছ আপনার লোক, একবার যদি আসি-ই তাতে দোষটা কি ?

শিউ-শরণও খুব হাসলে, বল্লে, দোষ! না দোষ কিসের ?—জন্মভূমি থেকে এত দূরে পড়ে আছি আমরা, মাঝে মাঝে ভাই ভাইয়ারা যদি আমাদের এমনি করে স্মরণ করে দেখা দেন ত' সে ত' আমাদের পরম আনন্দের কথা।

ব'লে একটা কম্বল টেনে নিয়ে শিউ-শরণ বসল, রাম-ভজনকেও বসালে।

রাম-ভজন বল্লে, তুমি যাচ্ছিলে বোধ করি আস্নান করতে, দেরী হয়ে যাবে না ?

শিউ-শরণ বল্লে, তা হ'ক। রোজ ত' রাম-ভজন ভাইয়া আসছে না। আচ্ছ', ভজন, আমাদের জমিদারের ছেলে সেই যে ভুগছিল, অনেক খরচ-পত্র করে পাহাড়ে গেল, তার খবর ?

ভজন বল্লে, সে ত' মারা গেছে আজ তিন মাস!

শুনে শিউ-শরণ তালু আর জিহ্বায় একটা শব্দ করে শোক প্রকাশ করলে। বল্লে, ভগদিরে না থাকলে কেউ কিছু করতে পারে না। আহা সুন্দর ছেলেটি, যেমন দেখতে তেমনি লেখা-পড়ায়। ভগবানের মর্জ্জি। আর গোবিন্দ চাচার খবর ?

ভজন বল্লে, চাচা চারোধাম তীরথ করে ফিরেছেন, কিন্তু তাঁর আর সংসারে থাকবার ইচ্ছে নেই, বোধ হয় শীঘ্রই পাহাড়-টাহাড়ে চলে যাবেন।

শিউ-শরণ বল্লে, আর সব খবর ভাল গাঁও-ঘরের ?

ভজন বল্লে, ভাল—সব ভাল। আরও একটা মস্ত খবর ভাইয়া। পার্ব্বতীর দেখা পেয়েছি!

শিউশরণ চমকে উঠল, বল্লে, পার্ব্বতীর ? কোথায়, কেমন আছে সে ?

রাম-ভজন চুপ্ করে বসে রইল খানিকটা,—মুখ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না। তার চোখ দিয়ে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বেরোতে লাগল। আকাশের দিকে খানিকটা তাকিয়ে থেকে বল্লে, আজমীরে, জঘন্য পল্লীতে!

শিউশরণ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রৈল।

রাম-ভজন বল্লে, সারা দুনিয়া তাকে খুঁজে ফিরেছি, কোথাও সন্ধান পাওয়া যায় না, এমনি করে লুকিয়ে রেখেছিল!

এ একটা মস্ত বেদনার কাহিনী। রামভজন ও শিউশরণ উত্তর-পশ্চিমের এক গ্রামের লোক। শিউ-শরণ বেহারে পুলিশের চাকুরী নিয়েছে কয়েক বৎসর আগে; রাম-ভজনদের অবস্থা ভাল,—চাষ-বাস ক্ষেত-খামার প্রচুর। রাম-ভজনের বাপ মা মারা যাবার সময়, তার হাতে তার বিধবা বোন পার্ব্বতীকে দিয়ে যান, তাঁদের পা ছুঁয়ে সে প্রতিজ্ঞা করে যে নিজের জী—জানের সমান করে সে বহিনকে মানুষ করবে। করছিলও তাই। পার্ব্বতীরই মত দেখতে এবং স্বভাবে সুন্দর এই বোনটির জন্য সে দুনিয়ায় না করতে পারত এমন কায নেই। স্নেহের সুকোমল নীড়ে দুই ভাই বোন বেড়ে উঠছিল, পরম নিশ্চিন্তে—কোথাও বাধা নেই, বিঘ্ন নেই।

এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। একদিন সকালে উঠে পার্ব্বতীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সমস্ত দিন আতি-পাতি করে খুঁজেও যখন তাকে পাওয়া গেল না, তখন রাম-ভজন বুঝতে পারলে যে, তার আশ্চর্য্য রূপ হয়েছে তার কাল। সে নিশ্চয়ই কোন নরপশুর কবলে পড়েছে। তার সরলতা, তার কোমল স্বভাবের সুযোগ নিয়ে কোন পিশাচ তার সর্ব্বনাশ করেছে। তা নইলে পার্ব্বতী তার সুখের গৃহ-কোণ থেকে, তার ভাইয়ের স্নেহ-বন্ধনের মধ্য থেকে কিছুতেই যেতে পারে না। এ নিশ্চয়ই একটা মস্ত বড় চক্র, প্রকাণ্ড প্রলোভন।

পরের দিন সকালে রাম-ভজন তার ভাইকে ডাকলে। বল্লে, ক্ষেত-খামার টাকা-কড়ি রইল তোমার জিম্মায়। আমি চল্লাম পার্ব্বতীকে খুঁজে বার করতে। যতদিন না পাই ফিরবো না।

ভাই চুপ করে রইল।

রাম-ভজন বল্লে, সে যদি বেঁচে থাকে ত' আমি তাকে বার করবই, যেখানেই থাকুক না সে।

এইবার ভাই কথা কইলে। বল্লে, খুঁজেও যদি পাও তাকে, ত' কি হবে ? তাকে ত' আর নেওয়া চলবে না।

রাম-ভজন চোখ বুঝে খানিকটা ভাবলে। তার

বোকা তুই চোখের পাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বল্লে, চলবে। দুনিয়া যদি না নিতে চায়—তবুও আমি নোবো। তাতে একা থাকতে হয়, সেও ভাল। আমার সেই ছোট বোনটি, মা-বাবার নিজের হাতে গড়ে দেওয়া বোন। তুই বুঝবি না,—চলবে, আলবৎ চলবে।

বলে' সে বুকের নিভৃত স্থানে একটা ধারালো ছোরা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, বল্লে, আমার জন্যে ভাবিস নে তুই।

আট মাস ঘুরে ঘুরে দেখা মিল্লো আজমীরে। রূপোপজীবিনীদের পল্লীতে একটা ছোট মাটির ঘরে থাকে, দাসী-বৃত্তি করে দিন কাটায়। ভদ্র-ঘরে কায দেয় না, তাই এদেরই দাসীর কায করে। প্রায়শ্চিত্তের আগুনে পুড়ে দেহ হয়েছে কালো, সে রূপ ছাই হয়ে গেছে। চিনিয়ে দেয় আগেকার সেই চোখ দুটি।

সন্ধান পেয়ে রাম-ভজন যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যা-বেলা। দেখলে মাটির ঢাবায় একটা কেরোসিনের ডিবে নিয়ে তন্ময় হয়ে পার্ব্বতী পড়ছে তুলসী-দাসের রামায়ণ। পিঠের ওপর কালো এলো চুল—দুই চোখে অশ্রু।

রাম-ভজন যখন বল্লে, পার্ব্বতী এসেছি, তখন চমকে উঠে পার্ব্বতী তার দিকে চেয়ে রৈল একদৃষ্টে, যেন তৃষ্ণার্ত্ত দেখতে পেয়েছে শীতল জলের অগাধ সরোবর। হাসলে না, কাঁদলে না, কোনও কথা কইলে না। দূর থেকে গড় করে প্রণাম ক'রে, তাকে বসতে দিলে।

রাম-ভজন বল্লে, দুনিয়ায় এমন জায়গা নেই, যেখানে তোকে খুঁজি নি। একটা চিঠি দিতে পারিস নি বোকা।

পার্ব্বতী ঘাড় নেড়ে জানালে—না।

রামভজন বল্লে, আমাকে দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিস্ খুব, না?

পার্ব্বতী বল্লে, না। আমি জানতাম তুমি আসবেই। তারই প্রতীক্ষায় কাটিয়েছি রোজ।

রামভজন কথাটা উল্টে নিলে। বল্লে, কিছু খেতে দে বহিন। ক্ষিদে পেয়েছে।

পার্ব্বতী কাঠের মত বসে রইল। বল্লে, রাতে আমি কিছু খাইনে দাদা। তুমি বরং বাজার থেকে খেয়ে এসো।

ভজনের কণ্ঠে কান্না ঠেলে উঠতে লাগল—কষ্টে দমন করলে। নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায় এই হতভাগিনী। গলা উঁচু করে দেখে বল্লে, ওই ত রয়েছে মুড়ি, বাঃ—ওইতেই আমার ঢের হবে।

বলে মুড়ির পাত্রটা আনতে যাই রামভজন উঠল, অমনি পার্ব্বতী ছিন্ন-লতার মত তার দুই পা জড়িয়ে কেঁদে উঠল বল্লে, ও তুমি ছুঁতে পাবে না দাদা, আমার ছোঁওয়া খাবার কিছুতেই চলবে না, আমি কুত্তা, কুত্তা!

রামভজনের দুই চোখ ফেটে জল এলো, সে বসে পড়ে পার্ব্বতীর মাথায় হাত বুলাতে লাগল, বলতে লাগল, তুই আমার সেই বহিন পার্ব্বতী, আর কেউ নোস্, কেউ নোস্।

দুই ভাই বোনে অনেক রাত্রি অবধি কথা হ'ল। কেমন করে সে পিশাচের কবলে পড়ল, কি প্রবঞ্চনা, কি শঠতার ফেরে, তার পর কি করে এখানে এলো, কেমন করে দিবারাত্র সে ভাই-এর সঙ্গে দেখা হবার একমাত্র কামনা নিয়ে বেঁচে আছে, এই সব কথা। সে পিশাচ তাদেরই গ্রামের লোক এবং তারই পরিচিত বন্ধু। শুনে ভজনের সমস্ত দেহের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে লাগল, বুকের মধ্যে রক্ষিত সেই ছোরার ওপর একটা কঠিন চাপ দিয়ে সে নিজেকে সংযত করলে।

পার্ব্বতী বল্লে, এর 'বদলা' নেবে না দাদা?

রামভজন হো—হো করে হেসে উঠল। সে হাসি যেন থামতে চায় না,—দীর্ঘ দীর্ঘ হাসি, উচ্চ উচ্চতর। ঘরের সীমা ছাড়িয়ে আকাশে তার কঠিন ধ্বনি বেজে উঠতে লাগল।

বল্লে, তা আবার বলতে হবে পার্ব্বতি! সেই ত' আমার জীবনের ব্রত। দেখতে পাচ্ছিস না, বলে বুকের আড়াল থেকে সেই ঝক্-ঝকে ছোরার অগ্রভাগ-টুকু দেখালে।

পার্ব্বতীর মুখ উজ্জ্বল হ'ল। নিজের শাড়ীর রাঙ্গা-পাড় ছিঁড়ে ভাই-এর দক্ষিণ-হস্তে বেঁধে দিয়ে বল্লে, এই নাও আমার রাখী, আমার সমস্ত কামনা, সমস্ত জীবন রৈল ওতে।

রাম-ভজন হাসলে, বল্লে, বেশ, তবে চলো আমার সঙ্গে কাল। আমরা দুজনে থাকব, সেই আগেকার

মত, নিশ্চিন্তে, পরম আনন্দে। আর যদি কেউ থাকতে না চায়, ত না থাকুক,—আমরা দুই ভাই-বহিনে মিলে আমাদের পৃথক স্বর্গ গড়ব তুলে।

পার্ব্বতীও হাসলে, বল্লে, তাই হবে দাদা, তোমার ইচ্ছা যখন।

সকালবেলা উঠে পার্ব্বতী নিজের হাতে রেঁধে ভাইকে খাওয়ালে পরিতৃপ্ত ক'রে। রাত্রে ভাল খাওয়া হয় নি।

রাম-ভজন বল্লে, আমি দু'ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব; —তুই তৈয়ের হয়ে নে, আজ বিকালের গাড়ীতেই রওনা হব, বুঝলি পার্ব্বতি?

পার্ব্বতী খুব হাসতে লাগল টেনে টেনে—বল্লে, রওনা হতে হবে, তা আর বুঝি নি? কিন্তু তুমি তার পরের কথাটা ভুলো না যেন।

রামভজন বল্লে, কিছুতেই না।

তিন ঘণ্টা পরে ফিরে এসে রাম-ভজন ডাকলে, পার্ব্বতি, পার্ব্বতি!

সাড়া নেই।

ধক্ করে উঠল বুকটা।

বারান্দার পাশে ছোট কুটুরীটা বন্ধ—ঠেল্‌লে খোলে না। অবশেষে দরজা ভাঙতে হ'ল।

রাম-ভজন দেখে শিউরে উঠল। পার্ব্বতী নিঃশব্দ, নিস্পন্দ শুয়ে আছে। কপালে হাত দিয়ে অনুভব হ'ল মৃত্যু-শীতল।

পাশে নিঃশেষিত বিষের কৌটা।

রামভজন অনেকক্ষণ ঝুঁকে দেখলে, যেন উপলব্ধি করতে পারছে না। তার পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিতে নিতে হাহাকার করে উঠল।

২

শিউশরণ জিজ্ঞাসা করলে, আজমীরে? আজমীরে সে কি করছিল?

রাম-ভজন খানিকটা আকাশের দিকে চেয়ে চুপ্ করে রইল। তার পর বল্লে, আমার প্রতীক্ষায় আজমীরে সে কোনও রকম করে দিন কাটাচ্ছিল—কটা দিন মাত্র। দাসীবৃত্তি করত। যে কুত্তাটা তার এই হাল করেছিল, সে তাকে আজমীরে ফেলে পালিয়েছিল—

শিউ-শরণ রাম-ভজনের দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, কে সে?

রাম-ভজন হেসে উঠল, কিন্তু তার সে হাসি ঠিক যেন কান্নার মত বোধ হতে লাগল। বল্লে, সে কুত্তা আমাদের গাঁয়েরই ভাইয়া। এখন ভয়ে পালিয়ে চলে এসেছে গাঁ ছেড়ে। আছে খুব কাছাকাছি—এমন কি খবর পেলাম এইখানে!

শিউ-শরণ বিস্মিত হয়ে বল্লে, এই-খানে? কে সে রাম-ভজন?

রাম-ভজন তেমনি করে হাসতে লাগল। বল্লে, তার সন্ধান মিলবেই। কিন্তু পার্ব্বতী আর নেই ভাইয়া। সে টক্‌টকে এই রাখী বেঁধে দিলে আমার হাতে। তার পর বিষ খেয়ে চলে গেছে রাম-জীর চরণ-প্রান্তে।

বলে' সে তার হাতের বাজু খুলে দেখালে সেই রাঙা রাখী!

শিউ-শরণ চমকে উঠে দেখলে সকালে নবীন সূর্য্যের আলোকে সেই রাখী যেন জ্বলছে—তাজা রক্তের মত লাল।

শিউশরণ খানিকক্ষণ নিজের কাঁচা-পাকা চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে ভাবতে লাগল। তার পর বল্লে, ভাল কর নি ভজন এই সময়ে ঘর ছেড়ে এসে। মনটা এখন রয়েছে চঞ্চল। মনকে শান্ত করা ত উচিত।

ভজন হাসলে, বল্লে, মন আমার কিছুমাত্র চঞ্চল নেই ভাইয়া, একেবারে দৃঢ়, স্থির-নিশ্চয়। এই রাখী না খুলে ঘরে ফিরছি না।

বলে সে যাই উঠে দাঁড়াতে যাবে, অমনি পাশ থেকে কার ছায়া দেখা গেল।

দু'জনেই চেয়ে দেখলে ইউনিফর্ম পরা মোহন। সে প্যারেড থেকে ফিরছে।

ওদেরই গাঁয়ের লোক! মাসকতক ভর্ত্তি হয়েছে পুলিশে, এখনও ঘাস-বিছালির' পালা চলছে।

রাম-ভজনকে দেখে মোহন দাঁড়িয়ে রইল একেবারে পাথরের মতন, মুখ থেকে সমস্ত সজীবতা চ'লে গিয়ে দেখাতে লাগল ঠিক যেন মড়ার মত পাঁশুটে!

বাঘ যেমন শীকার দেখলে লাফিয়ে ওঠে—তেমনি ক্ষিপ্র লম্ফে দাঁড়িয়ে উঠে রামভজন হঠাৎ আপনাকে

সংযত করে, শিউশরণকে নিঃশব্দ অভিবাদন ক'রে, সিঁড়ি বেয়ে দ্রুতগতিতে নীচে নেমে গেল।

খানিক পরে চমক ভেঙ্গে শিউশরণ ডাকলে, ভজন—রামভজন। কিন্তু রামভজন তখন আর নেই।

শিউশরণ চুপ্ করে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইল এবং মোহন কাঠের মত সেইখানেই দাঁড়িয়ে রৈল।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। মোহন কথা কইলে। বল্লে, হঠাৎ ভজন এসেছে যে।

শিউশরণ তার লোটাটা ধরবার চেষ্টা করছিল, পারছিল না এমন থর-থর করে কাঁপছিল তার হাত। জবাবে বল্লে, ঠিক জানি না, জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলে এর কারণ জানতে পারবে মোহনের কাছে! বলে, সে উঠে দাঁড়িয়ে কথা-মাত্রর অপেক্ষা না করে চলে গেল। মোহন দাঁড়িয়ে রৈল কাঠের পুতুলের মত।

৩

সহরের এক প্রান্তে এক দেশী হোটেল! সামনে প্ল্যাকার্ডে বড় বড় দেবনাগরী অক্ষরে লেখা 'পবিত্র হোটেল'। বাড়ীখানি পঞ্চাশ বৎসরের কম নয়; ভেতরের ঘর পাকা; বারান্দা খাপড়ার। বাইরের রং শেওলা পড়ে কালো; কিন্তু তাতে কারুরই আটকায় না,—না হোটেলওয়ালার, না যারা খেতে আসে তাদের। হোটেলে খাওয়া ত' চলেই,—পয়সা দিলে থাকতেও পাওয়া যায়।

রামভজন হোটেলওয়ালার কাছ থেকে একটা ঘর ভাড়া নিলে, আপাততঃ তিন দিনের জন্য। ছোট অন্ধকার ঘর,—কিন্তু কাজ চলে যায়।

খাওয়া-দাওয়া করে উঠতে বেলা একটা বেজে গেল। রাত্রে গাড়ীতে ছিল বেজায় ভীড়, একটুও ঘুম হয় নি, সুতরাং আপনার ঘরে গিয়ে শুতেই রামভজন ঘুমিয়ে পড়ল অগাধে।

ঘড়িতে সওয়া দুটো; রামভজন গভীর নিদ্রিত। দুনিয়া চলছে নিয়মিত; ব্যবসাদার ব্যবসায়ে লিপ্ত, উকীল করছে ওকালতি, হাকিম হাকিমি, মজুর মজুরী, নিঃশঙ্ক নিশ্চিন্ত চিত্তে,—কোথাও যে কোনও প্রকারে বাধা ঘটতে পারে তার সন্দেহ মাত্রর কারণ নেই।

এমন সময় ধরিত্রীর কোন্ অন্তরতম প্রদেশ থেকে গভীর গুরু-গুরু ধ্বনি উঠল জেগে!

তার সঙ্গে সঙ্গে, তীব্র কম্পন,—ভূমি-কম্প!

দোল দোল—দে-দোল! মনে হ'তে লাগল মাটির পাৎলা স্তরটুকুমাত্র অবশিষ্ট রয়েছে; ঠিক তার নীচেই ধরিত্রীর আশ্চর্য্য রহস্যময় অভ্যন্তর সমুদ্রের ঢেউএর মত দুলে দুলে ফুঁকে ফুঁকে উঠছে—কখনও পূর্ব্বে, কখনও পশ্চিমে, কখনও উত্তরে, কখনও দক্ষিণে, কখনও ওপরে, কখনও নীচে, কখনও বৃত্তে, কখনও লম্বে! দে-দোল, দে-দোল,—সহস্রশীর্ষ বাসুকি যেন আর দুর্ভর পৃথিবীর বোঝা বইতে পারচে না, তাই আজ হঠাৎ তার ফণা উঠল দুলে—আজ নটরাজের প্রচণ্ড তাণ্ডব জাগল কোন্ কৈলাস-ভূমে, কোন্ মন্দাকিনীর পারে; আর সেই তীব্র তাণ্ডবের ঢেউ এসে পৃথিবীর বুকে লেগে তাকে নাচিয়ে তুল্লে। এমন নাচলে, সূর্য্য-কিরণ-খচিত বিরাট নীল আকাশের তলে, যে—মনে হ'তে লাগল এ নাচন আর থামবে না, এ চলবে যুগ-যুগান্তর ধরে, সময়ের সীমার পার পর্য্যন্ত, যতদিন পর্য্যন্ত না সমস্ত সৃষ্টি নট-রাজের উদ্দণ্ড চরণ-ক্ষেপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলার মত উড়ে প্রলয়-লুপ্ত হয়ে যায়।

একটা বিরাট সময়ের আর্ত্ত ক্রন্দন উঠল জেগে নিঃসহায় নর-নারীর অন্তস্তল ভেদ করে ঊর্দ্ধে আকাশের পানে। চারিদিকে হাহাকার, ক্ষিপ্তের মত সবাই বেরিয়ে এল মুক্ত আকাশের তলে,—চোখে উদ্‌ভ্রান্ত ভীতির দৃষ্টি। তাসের ঘরের মত পড়তে লাগল বৎসরের পর বৎসর ধরে সযত্নে গড়ে-তোলা ঘর-বাড়ী, তাদের ঠোকা-ঠুকি আর পড়ার শব্দ বিরাট দৈত্যের কঠিন শুষ্ক উপহাসের মত খট্ খট্ ক'রে বাজতে লাগল চারিদিকময়, চূর্ণীকৃত গৃহ থেকে উৎক্ষিপ্ত ধূলাবালি মুহূর্ত্তে আকাশকে করে দিলে ঘোলাটে। সমস্তটা মিলে এমন একটা অবস্থা হয়ে দাঁড়াল যাতে প্রত্যেকেরই মনে হতে লাগল যে সৃষ্টির শেষের পতনশীল কালো ভারী যবনিকার প্রান্তটুকু চোখের সামনে নেমে এসেছে, আর বোধ হয় এক-আধ মুহূর্ত্তেই সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারকারা ছিঁড়ে পড়ে পৃথিবীকে দেবে দারুণ সংঘর্ষের আঘাত এবং তার পর সবগুলো মিলে তাল পাকিয়ে চলবে উল্কাগতিতে কোন্

মহা-প্রলয়ের দুর্দ্দান্ত অন্ধকারের অসীম ভয়ঙ্কর ধ্বংস-পথে!

বহু লোক পড়ল পতনশীল বাড়ীর নীচে চাপা। সাহায্যের জন্য তাদের আর্ত্ত হাহাকারে এবং আঘাতের চীৎকারে ভ'রে উঠল দিগ্বিদিক। যারা বেরিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাতর স্বরে ডাকতে লাগল আজ এই দুর্দ্দিনে মনে-পড়া দিন-দুনিয়ার মালিককে। কেউ কাঁদতে লাগল বালকের মত করুণ ক্রন্দনে!

রামভজনের গভীর নিদ্রা ভাঙ্গতে দেরী হ'ল। যখন সে উঠল তখন এই অভূত-পূর্ব্ব ব্যাপারে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে গেল। তার পর যখন এর গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করলে তখন আর উপায় নেই। সেই জীর্ণ গৃহ ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেছে। দেওয়াল পড়ে দুয়ার রুদ্ধ। ওপরের দিকে চেয়ে দেখলে ছাত ভেঙ্গে পড়ছে। সে হাঁটু গেড়ে বসে দুই হাত দিয়ে পতনশীল ছাত আটকাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে চীৎকার করে উঠল, ভগবান, এতেও আমার দুঃখ নেই,—শুধু একটা দিন বাঁচতে দেও, একটা দিন, এমন করে আবদ্ধ হ'য়ে—তার পরই মাথার ওপর থেকে ছাত এবং পাশের থেকে দেওয়াল প'ড়ে তাকে মুহূর্ত্তে চূর্ণ করে দিলে।

ধীরে ধীরে কম্পন গেল থেমে। দাবানলে সমস্ত জঙ্গল পুড়ে গেলে জানোয়ারদের যেমন ভাব হয়, তেমনি উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্তের মত জীবিত বা পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

৪

কোন্ উদ্‌ভ্রান্ত নৃত্যশীল নটরাজের মিনিট কয়েকের খেয়ালে দুর্ব্বল মানুষের শতাব্দীর সযত্ন রচনা হয়ে গেল শেষ, পাঁচ মিনিট আগেকার সমৃদ্ধ নগরী হয়ে গেল শ্মশান।

এক দিক থেকে আর এক দিক পর্য্যন্ত যতদূর চোখ যায়,—ভগ্নস্তূপের পর ভগ্নস্তূপ; ইঁট, কাঠ, বালি, সুরকি, চূণের সমুদ্র। ধনীর বিলাস-মন্দির ধূলায় গড়াগড়ি,—পরিবারের হয় ত' সকলেই, নয় ত অধিকাংশ স্তূপের নীচে সমাহিত। সমাধির নীচে যারা এখনও বেঁচে আছে তারা চীৎকার করছে সাহায্যের জন্য, উদ্ধারের জন্য,—কিন্তু কে করে সাহায্য, কে করে উদ্ধার;—বিপদের তীব্রতা, মানুষকে করে দিয়েছে উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মাদ।

দুই তিন ঘণ্টা এমনি চলে গেল। ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর বুক থেকে উঠতে লাগল আর্ত্ত ক্রন্দন, হা-হুতাশ, এবং মুমূর্ষুর গোঙানি! সমস্তটা পরিণত হ'য়েছে যেন একটা মহাশ্মশানে!

আজ হয় ত' বেশী কিছু হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসছে, রাত্রে রক্ষা করতে হবে এই নগরীকে, যার ভস্মস্তূপের মধ্যে কোটি কোটি টাকা সমাহিত হয়ে পড়েছে। যারা আহত হয়ে বেঁচে আছে স্তূপের বাইরে, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, যে জীবিতরা আশ্রয়হীন হল আজ এই অতি শীতল মাঘের রাত্রে, তাদের বাঁচবার উপায় করতে হবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, যে কয়জন কর্ম্মক্ষম ছিল, তাদের ডেকে কাজ ভাগ করে দিলেন। সমস্ত সহরে যতটুকু সাধ্য পাহারার বন্দোবস্ত হ'ল—সেই সঙ্গে সঙ্গে সম্ভব হলে সমাহিতের উদ্ধার।

সহরের আলোর ব্যবস্থা হয়ে গেছে ধ্বংস। সন্ধ্যার পর গভীর জমাট অন্ধকার নেমে এল এই মহাশ্মশানের ওপর একটা প্রকাণ্ড কালো দৈত্যের মত! বেত্রাহত বালকের মত এই নগরী রইল পড়ে মৌন মূক হয়ে, শুধু মাঝে মাঝে জেগে উঠতে লাগল মর্ম্মভেদী গোঙানির মত আহতের ক্রন্দন, মুমূর্ষুর চীৎকার!

যে জায়গাটা ছিল বাজার, সেইখানে পড়েছে মোহনের পাহারা। একটা বুল্‌স-আই লণ্ঠন সম্বল, হাতে একটা লাঠি। চারিদিক অন্ধকার, মানুষ লক্ষ্য হয় না। অন্ধকারের এই প্রেতপুরীর মধ্যে একা প্রেতের মত দাঁড়িয়ে থাকা। কণ্ঠে গান আসে না, শুধু মাঝে মাঝে রামজীর নাম বুকের মধ্য থেকে কোনও রকম করে কেঁপে কেঁপে বেরোচ্ছে।

কত রাত্রি হয়েছে তারও আন্দাজ পাওয়া কঠিন, দেশের পেটা ঘড়ি বাজে না।

প্রচণ্ড শীতের কনকনে হাওয়ায় বুক উঠছে গুরু গুরু করে। মোটা ওভার-কোটেও শীত নিবারণ হয় না। বাইরের শীতের চেয়ে ভেতরের শীতলতা আরও

বেশী। কাঁপুনি যখন আসে তখন কিছুতেই থামতে চায় না—সারা দেহ কাঁপতে থাকে ঠক্ ঠক্ ক'রে অনবরত।

মনে হচ্ছে যেন মানুষের বাস গিয়েছে উঠে—তার জায়গায় সুরু হয়েছে প্রেতের আসর। বিরাট কামনা, প্রচণ্ড বাসনা নিয়ে যারা সহসা গেল দিনের আলোয় ভগ্ন-স্তূপের নীচে, তাদের বিদায় নেওয়া যেন এখনও শেষ হয় নি, তারা যেন বেরোলো আবার এই সূচিভেদ্য অন্ধকারের মাঝ-খানে, তাদের অশরীরী জীবন-স্রোত যেন সুরু হয়ে গেল, তাকে ঘিরে তারি খুব কাছে, আশে—পাশে, এমন কি তার গায়ে ঘেঁস দিয়ে!

মনে হ'ল কার পদশব্দ! চমকে উঠে মোহন তার স্তিমিত লণ্ঠন ভয়ে ভয়ে ফেললে সেই দিকে। সেই আলোয় একটা ভাঙ্গা দেওয়ালের চুণ-কাম করা অংশ যেন বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে নিঃশব্দে উপহাস করলে তাকে।

ভয় পেয়ে ফিরিয়ে নিলে লণ্ঠন আর এক দিকে।

মনে হ'ল কারা যেন সব চুপি-চুপি কথা কয়ে ফিরছে,—তার দেহের ঠিক পাশ থেকে সুরু করে দূর—দূর পর্য্যন্ত, সেই যেখানে আকাশের কোলে গিয়ে মিশেছে ধরিত্রী। ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফিস্,—চাপা ফিস্-ফিসানীর শব্দ যেন একটা অবিচ্ছিন্ন সেতু বানিয়ে দিয়েছে এ পার থেকে পরপারে!

কাদের যেন আর্ত্ত দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে লাগল ঠিক কাণের কাছে, তার হাওয়ার স্পর্শ লাগতে লাগল দুই কাণে! মোহন জোর করে দুই কাণ চেপে ধরলে তার দুই হাতে! কিন্তু তবু বিরাম নেই, তবু সেই তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

বহু দূর হতে, হাজার ঝাউ-গাছের মধ্যে দিয়ে বওয়া ঠাণ্ডা বাতাস যেন লক্ষ কণ্ঠের গোঙানীর মত শোনাতে লাগল, যেন পৃথিবীর বুকের সকল অশরীরীরা আজ এক-জোটে কাঁদতে বসেছে।

হঠাৎ কুকুরের ডাকে মনে হয় ও যেন কুকুর নয়। দূরে ফেউ এর ডাক শুনে মনে হয় বিশ্বের রক্ত-লালসা আজ মূর্ত্ত হয়ে এসেছে শোণিতের সন্ধানে!

বেড়াতে ভয় করে, দাঁড়িয়ে থাকলে কাঁপুনি আসে, রাস্তায় পড়া একটা ভগ্নস্তূপের ওপর মোহন ব'সে পড়ল চোখ বুজে,—মোটা লাঠির ওপর তার মাথা রেখে।

৫

হঠাৎ ক্ষীণ কণ্ঠের আর্ত্ত আওয়াজ, বাঁচাও ভাই বাঁচাও।

চমকে উঠল মোহন। ডাক ত' বেশী দূরে নয়। কিন্তু ভয় করে;—কে না কে ডাকে। কত সহস্র লোক ত' সমাহিত হয়ে রয়েছে এই শ্মশান-নগরীতে, নাই বা বাঁচল আর একটা লোক;—গেলই বা। তাই বলে কি সে তার প্রাণটা দেবে বিসর্জ্জন? দেখা যাবে কাল সকাল হলে।

মোহন মোটা লাঠিটার উপর তার মাথা রেখে বসল গোঁজ হয়ে। মনে মনে বলতে লাগল "চিত্ত-ভুলালা সিয়া-রাম, সব-ভয়-হারী সিয়া-রাম।"

মোহন, মোহন!

নাম ধরে ডাকে! মোহন শিউরে দাঁড়িয়ে উঠল, তবে ত চেনা লোক! শিউ-শরণ ত' নয়! সে এখানে থাকতে, দশ হাতের মধ্যে মরবে তার সেই পরিচিত, যে মরবার সময় চাইলে তার কাছে শেষ প্রাণভিক্ষা? তবু সে ভয় করবে?—তবু সে জানোয়ারের মত দাঁড়িয়ে থাকবে?

মোহন দাঁড়িয়ে উঠল; ভয় করে সত্য, তবু তাকে যেতে হবে। সেই করুণ আহ্বান যেন তাকে টানছে। বাধা দেবার শক্তি যেন নেই।

সেই দিকে চল্লো মোহন। খুব কাছে থেকেই আওয়াজ এসেছে—তার লণ্ঠনটার আলো ফেলে মোহন নিরীক্ষণ করতে লাগল। শুধু ভগ্নস্তূপ, কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না।

হঠাৎ সেই স্তূপের মধ্য থেকে মনে হ'ল যেন একটা হাত বেরিয়ে রয়েছে। ভাল করে দেখলে, হাত-ই ত'। যেন নড়ছে, যেন ডাকছে।

মোহন তার লাঠি সেই স্তূপের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে ভাঙ্গা ইঁট-পাটকেলগুলো সরাতে লাগল; কে যেন তাকে এ কাযে বাধ্য করেছে, যেন না করে উপায় নেই। যখন খানিকটা সরিয়ে একটু ফাঁক করেছে, তখন সে সেই হাত ধ'রে টানতে লাগল, যদি বার করা যায়।

কিন্তু গেল না বার করা। তখন সে খুব ক'রে আর একবার চেষ্টা করবার জন্যে ঝুঁকে পড়ল। পড়তেই মনে হ'ল কে যেন তার গলা জড়িয়ে ধ'রে টানছে সেই স্তূপের মধ্যে—সে কি প্রবল টান!

মোহন থতমত খেয়ে গেল, কিছুই যেন বুঝতে পারে না, মাথা যায় গোলমাল হয়ে। কে টানছে তা দেখা যায় না, অথচ সে কি দুর্দ্দান্ত আকর্ষণ! তার গা ঘামে ভিজে গেল, মুখের শিরা গেল ফুলে। সে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল, সেই দুর্জ্জেয়, দুর্জ্জয় আকর্ষণ থেকে উদ্ধার পেতে; কিন্তু উপায় নেই! তার গলায় যেন কে প্রকাণ্ড পাঁচমুণি লোহা দিয়েছে বেঁধে; আর তার ভারে নিরুপায় হ'য়ে সে চলেছে জলের নীচে! তার হাত থেকে লাঠি গেল খসে, ঝন্‌ঝন্ করে লণ্ঠন গেল পড়ে।

তখন সে চেঁচাতে চেষ্টা করলে, বাঁচাও বাঁচাও আমাকে কে কোথায় আছ, কিন্তু গলার আওয়াজ হয়ে গেছে বন্ধ!

মনে হ'তে লাগল সে চলেছে কোন অন্ধকার থেকে অন্ধকারতম দেশে, যেখানে আলো নেই, হাওয়া নেই, শব্দ নেই।

মনে হ'ল কে যেন তাকে দৃঢ়বলে জড়িয়ে ধরছে,—যেন দেহের সমস্ত অস্থি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। বুকের ভেতর দম বন্ধ হয়ে এলো,—চোখের সামনে নামল একটা কালো ভারী পর্দ্দা!

৬

সকালে দেখা গেল মোহন পাহারা থেকে ফেরে নি, তার কোনও সন্ধানও নেই।

পুলিশ সাহেব শিউ-শরণকে ডেকে বল্লেন, তোমার দেশের লোক, খবর নেও দিকিনি কি হ'ল। পালাল না কি! নতুন লোক,—এই প্রকাণ্ড বিপদের সময় ভয় পেয়ে পালাতেও পারে।

শিউ-শরণ বল্লে, তা করবে না হুজুর, আখের রাজপুতই ত'!

সাহেব বল্লেন, তা যদি হয় ত' এর কঠিন শাস্তি দোবো আমি, খবর নেও তার।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শিউ-শরণ খবর নিয়ে ফিরে এল, বল্লে, তাজ্জব ব্যাপার, হুজুর গিয়ে দেখেন এই প্রার্থনা, পরে গোল না হয়।

সাহেব গিয়ে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একটা বাড়ীর স্তূপ সরিয়ে যে দৃশ্য দেখা যায় তা রোমাঞ্চকর। একটা পুতিগন্ধময় শবের দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ মোহন, এবং তার বুকের কাছ থেকে বেরোনো রক্তে সমস্ত ইউনিফর্ম রঞ্জিত।

সাহেব বিস্মিত হয়ে বল্লেন, এ কি! ও-লোকটার দেহ দেখে মনে হয়, সে কাল ভূমিকম্পের সময় মরেছে এবং মোহন মরেছে বোধ করি রাত্রি-শেষে! অথচ মোহনের মৃত্যুর কারণ ওই! এ কেমন করে হয়?

পরীক্ষা করে দেখা গেল, মোহনের বুকে গভীর ক্ষত, যা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে তার সমস্ত দেহ দিয়েছে ভিজিয়ে; এবং অপর লোকটার বুকের মাঝখানে ছোরায় তখনও জমাট-বাঁধা রক্ত!

সাহেব অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করে বল্লেন, কিছুই ত বোঝা যায় না। মৃতের হাতে জীবন্ত পড়ল মারা! এর ভেতর অন্য কোনও গভীর ক্রাইম আছে, এ হতেই পারে না!

শিউ-শরণ খানিকটা চুপ করে থেকে বল্লে, শুনেছি সাহেব এমনও মাঝে মাঝে হয়।

সাহেব বল্লেন, হয়! কি রকম? তুমি চেনো এ লোকটাকে?

শিউ-শরণ বল্লে, চিনি। এও আমাদেরই গাঁয়ের। মোহন এর ওপর করেছিল অতি বড় অন্যায়। এত কঠিন অন্যায় যে, এই লোকটা দুনিয়াময় ঘুরে বেড়িয়েছে প্রতিহিংসার বশে। জীবন্ত প্রতিশোধ নিতে পারে নি; অসময়ে আচম্বিতে হারালে প্রাণ প্রচণ্ড ভূমিকম্পে কাল, কিন্তু তার দারুণ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি গেল না। এত দুর্জ্জয় প্রতিহিংসা যে মৃত্যুর পরেও সে 'বদলা' নিয়েছে। আমার ত' এমনি সন্দেহ হয়, হুজুর!

সাহেব বল্লেন, এ সব বিশ্বাস কর শিউ-শরণ?

শিউ-শরণ বিনীত ভাবে বল্লে, বিশ্বাস অবিশ্বাসের ত' অবসর নেই হুজুর,—ঘটনা যে প্রত্যক্ষ,—চোখের সামনে এখনও!

মা

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

অন্ধকার গলিপথে চলেছি একেলা অন্য মনে ;
সহসা শুনিনু স্বর—
"মা, দরজা খুলে দাও।"—
কোন্ এক দ্বারপ্রান্তে শিশুকণ্ঠ হ'তে।
তখনও জ্বলেনি আলো ;
ক্ষুদ্র সরু গলিপথে অন্ধকার অতীব নিবিড় ;
কোলের মানুষ চেনা ভার।
তারি মাঝে "মা, দরজা খুলে দাও"—উঠিল এ ধ্বনি !
চমক ভাঙিল মোর।
অন্ধকারে আঁখি মেলি' দেখি চারিধার,
কিছু নাহি দেখা যায়।
কেবল সে ধ্বনি
কান দিয়ে মনে প্রাণে পশিয়া আমারে
ক'রে দিল উতল ব্যাকুল।

অন্ধকারে জবাব উঠিল রণি' মাতৃকণ্ঠ হ'তে—
"কে এলি, পটল ? দাঁড়া খুলে দিই।"
কেবল ডাকিল ছেলে অন্ধকারে আশঙ্কা-আকুল,
জননী আশ্বাস দিল।
এই কাতরতা আর এই এ আশ্বাস
চিত্তে মোর দিল দোল।

* * * *

ওরে শিশু ভয়মূঢ়, ওরে অন্ধকারে অসহায়,
ওরে ও আশ্রয়হীন,
এক ডাকে লভিলি জবাব জননীর স্নেহাশ্বাসভরা।
অসীম সৌভাগ্য তোর।
আর আমি ?
আর্ত্ত পিষ্ট ব্যথাতুর দৈন্যজীর্ণ চিন্তাম্লান আশ্রয়বিহীন
পথে পথে ঘুরি আর মনে মনে ডাকি
পরম শরণ মোর মৃত্যুলীনা বিগতা মাতারে ;
দেখা নাহি পাই,
না শুনি আশ্বাসবাণী।

নাহি স্নেহময় কোল, নাহি আলিঙ্গন,
নাহি সে উদ্বিগ্ন যত্ন, নাহি সে আদর।

* * * *

মা আমার স্নেহময়ী করুণা-আধার,
স্নেহের পুতলী তব যত্নে-গড়া ছেলে
আজি যে মলিন হ'ল, জ্ব'লেপু'ড়ে গেল
সংসার-বেদন-দাহে।
দেখা দাও, ডাকো আরবার—
"কে এলি ? আয় রে ঘরে। খুলেছি দরজা।"

এমনি ফিরেছি কত দিন—
সাঙ্গ করি' সঙ্গী সাথে কত ছেলেখেলা ;
সন্ধ্যা কেটে রাত্রি হ'য়ে গেছে কত—
দ্বারপ্রান্তে এসে
দেখেছি জননী মোর বাতায়নে ব'সে
উদ্বেগ-আশঙ্কা-ভরা, দৃষ্টি-শিখা মেলি'
অন্ধকারে খুঁজিছে কাহারে !
যেমনি ডেকেছি—"মা গো,"—
"আয়, আয়" ব'লে
দরজা খুলেছে মাতা।
মিষ্ট তিরস্কার—
"দুষ্টু, পাজী, ফিরিবার থাকে না খেয়াল কোনো দিন ?
খেতে তোরে নাহি দিব।"
কে তার জবাব দেয় ?
নত নেত্রে দাঁড়াইয়া থাকি কিছুকাল মৌন মুখে।
না কাটিতে পাঁচটি মিনিট
সশাসন কণ্ঠে ক'ন মাতা—
"যাও, ক'রো না এমন কাজ আর কোনোদিন ;
ঘরে গিয়ে খেয়ে নাও।"
পাঁচ মিনিটের রোষ কাটিল তাঁহার।
সে রোষ যে কত মিছে,
সে শাসন কত ভাণকরা,

চোখে তা' উঠিত ফুটে :
ক্ষেনে নিত শিশু-হিয়া মোর।

*　　*　　*　　*

আজও চলি অন্ধকার পথে ;
সংসারের কর্ত্তব্য সমাপি' রাত্রিও হয়েছে আজ।
আজ সাথে নাই সেই আনন্দের সাথী,
আজিকার খেলা সানন্দ লম্ফন নয় ;
আজিকার খেলা—জীবন-মরণ-দোলা।
দৈন্যের তাড়ন আর জীবিকার কঠোর সন্ধান
এই জীবনেরে অবিরাম
এক প্রান্ত হ'তে ধাক্কা দিয়ে ফেলি' দেয় আর প্রান্তে।
এ দুর্দ্দম প্রবল তাড়নে
সাথে সাথী নাই যার কাঁধে করি ভর—
ঘরে নাই অফুরন্ত স্বচ্ছ সুবিমল
মাতৃ-স্নেহ-রস-ধারা,
জুড়াইতে জিয়াইতে জাগাইতে এ পিষ্ট পরাণ।
তাই আজ গলিপথে বালকের কণ্ঠস্বর শুনি'
শুনি' জননীর স্নেহোত্তর,
বাল্যের সে পিয়াসা আমার,
সেই স্নেহসুধা তরে সেই সুপ্ত ক্ষুধা
জাগিল প্রবল হ'য়ে।
কোথায় জননী মোর ?
এস গো কল্যাণী,
এস করুণার মূর্ত্তি,
কোমলা নির্ম্মলা অয়ি আদর-উচ্ছলা,
হে সতত ক্ষমাশীলা, সুমিষ্ট-শাসনা,
আনন্দদায়িনী শুভা সর্ব্ব-ভয়-হরা !
দাও তব স্পর্শ দাও,
স্পর্শ দাও সেই তব কোমল করের।
ওষ্ঠে আর শিরে মোর বুলাইয়া কর,
ভুলাইয়া দাও এই জগতের সর্ব্ব গ্লানি,
সর্ব্ব তাপ, সর্ব্ব কঠোরতা।
নম্র শিরে তব বক্ষে রাখি' মাথা দাঁড়াইয়া থাকি ;
বুলাও বুলাও কর শিরে পৃষ্ঠে মোর।
চক্ষু মুদি' নিমেষে ডুবিয়া যাই
অগাধ অপার তব স্নেহসিন্ধু মাঝে।

মা আমার বেদনানাশিনী,
সকল সন্তাপ হ'তে উদ্ধারকারিণী,
অন্তরের অন্তস্তলে লুকায়িত যত ক্লেশ মোর
তোমার পরশে সব হোক্ বিদূরিত।

*　　*　　*　　*

অন্ধকার, অন্ধকার, ঘোরতর গাঢ় অন্ধকার
ঘিরে মোরে রচে ভীতি।
গৃহ নাই, নাহিক আশ্রয়।
আর্ত্তকণ্ঠে ডাকি পুনঃ আজ—
"মা আমার, মা আমার, কোথা কোথা তুমি ?
খোল গো দরজা খোল,
কোলে তুলে নাও।"
দিবে না জবাব, মা গো ?
কোলে তুলে গৃহ মাঝে দিবে না আশ্রয় ?
এই যে আঁধার-ঘেরা এ বিশ্ব-ভবন,
এরি কোনো গুপ্ত কক্ষে মৃত্যুপারে তুমি আছ ব'সে ;
সেথা মোর আর্ত্তস্বর পশিবে নিশ্চয়,
করিবে উতল তোমা'।

*　　*　　*　　*

ঐ ঐ কাঁপে যেন অন্ধকার,
আঁধার কপাট খুলি' ঐ যেন আসে
ত্রস্তপদে মা আমার ;
আঁখি দু'টি সেই, আশঙ্কা-উদ্বেগ-ভরা সেই জ্যোতির্ম্ময়।
ছুটে যাই, ছুটে যাই, ছুটে যাই আমি,—
জননী দিয়েছে দেখা,—
স্নেহময়ী কৃপাময়ী সদা যত্নময়ী জননী আমার।
বিস্তৃত দু' বাহু তাঁর প্রসারিত মোর পানে।
ভয় নাই, আর কোথা ভয় ?
নাহি দুঃখ, নাহি তাপ।
যাই যাই, জননী আমার,
কোলে নাও,
বুকে রাখ একবারে চিরদিন তরে।
শান্ত-স্নিগ্ধ বক্ষতলে দাও বাস, চিরন্তন বাস।
যাই যাই আমি,
আঁধারে পেয়েছি দেখা আঁধারহারিণী জননীরে।

সঙ্গীত-পরিচয়

ডাঃ শ্রীরমাপ্রসাদ রায়

বহু পুরাকাল হইতেই আমাদের দেশ বিজ্ঞান-সম্মত সঙ্গীতের আলোচনায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের অবহেলায় ভারতের এই অমূল্য সম্পদ এখন প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। পূর্ব্বে যে ভাবে ঘরে ঘরে সঙ্গীতের আলোচনা হইত, এখন আর তাহার সহস্রাংশের একাংশও নাই। এক সময়ে বেদবিৎ ঋষিগণের উদাত্ত সামগানে ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত হইত, দেবায়তনে সুমধুর স্তবগানে সমাজের কলুষরাশি মুছিয়া যাইত, সুপ্রসিদ্ধ কলাবৎগণের অপরূপ সঙ্গীতরসে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিত্য মধুময় হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন আর সে সামগান ভারতাকাশ তেমন মুখরিত করে না। ভক্তির অভাবে দেব-মন্দিরের সে স্তবগান এখন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। আর যথার্থ অনুশীলনের অভাবে পূর্ব্বের সে সঙ্গীত-গঙ্গা আজ ক্ষীণা স্রোতহীনা ক্ষুদ্র জলরেখায় পরিণত হইয়াছে। এখন অল্প কয়েকজন মাত্র প্রকৃত সাধক ব্যতীত দেশ প্রায় অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত স্বয়ংসিদ্ধ গায়কে ভরিয়া গিয়াছে। সুর ও স্বরের লঘুতায় এখন গান শুনিলে আনন্দের পরিবর্ত্তে লজ্জার উদ্রেক হয় মাত্র। অনেক রাগ রাগিনী লোপ পাইয়াছে। যাহা আছে তাহারও অধিকাংশ আর বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে কিছু দিন পূর্ব্বে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সঙ্গীতের আদর একেবারেই ছিল না বলিলেই হয়।

সুখের বিষয়, এখন যেন স্রোত একটু ফিরিয়াছে বলিয়া মনে হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্প অল্প করিয়া পূর্ব্বের সে ঔদাসীন্য যেন দূর হইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতের সে লুপ্ত সঙ্গীত-সম্পদ আবার যে কখন ফিরিয়া পাওয়া যাইবে, সে আশা দুরাশা মাত্র।

সঙ্গীত আমাদের দেশে বৈদিক যুগের সম্পদ। "উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত" ইহা বৈদিক যুগেরই পরিকল্পনা। স্বর ও বর্ণহীন মন্ত্র কার্য্যে প্রয়োগ করিলে বিফল হয়। উপাসনা-প্রধান দ্বিতীয় বেদের নাম সামবেদ। ইহা মন্ত্র ও গান ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। মন্ত্রভাগকে আর্চ্চিক বলে। আর্চ্চিক গ্রন্থ ৪টী—পূর্ব্ব, আরণ্যক, মহাজাম্নি ও উহ্য। ঋক্ অর্থাৎ পদ্যাত্মক মন্ত্রই সামের মূলমন্ত্র স্বরূপ। আর্চ্চিক গ্রন্থ যে প্রকার সামের মূলস্বরূপ, ঋকের সঙ্গে সেই প্রকার যজুর অর্থাৎ পদ্যাত্মক গ্রন্থের সঙ্গেই স্তোভগ্রন্থের সম্বন্ধ। স্তোভহীন গান আবির্গান, ঋকের সহিত স্তোভযুক্ত গান লেশগান এবং ঋকহীন গান ছন্নগান। বেদগানে ওঁ সকল গানের মূল স্বরূপ এবং দ্বিমাত্রক দীর্ঘ এবং ত্রিমাত্রা, ওঁ—অ, উ, ম।

সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা শুধু মাধুর্য্যে নহে, ইহা স্বাস্থ্যে সম্পদ ও ভোগ এবং মোক্ষের সমন্বয়। চিত্ত-বিনোদনকারী মধুরিমাময় সঙ্গীত জগতে সকল সময়ে সকল জাতির মধ্যেই প্রভূত জ্ঞান, শান্তি ও শক্তি দান করিয়াছে। সুরের মোহজাল ভারতকে চিরদিনই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সঙ্গীত ভারতের প্রাণ। অন্যান্য দেশীয় সঙ্গীত প্রায়ই জাতীয় সঙ্গীত ভিন্ন আর কিছুই নহে ; কিন্তু তথাচ তাহা জাতির হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করিয়াছে। কেহ হয় ত উন্মত্তপ্রায় হইয়া সঙ্গীতকে বলিয়াছে—

Away ! Away ! thou speakest to me of things which in all my endless life I have not found, and shall not find !

(Jean Paul Richter)

বাস্তবিকই Emersonএর কথানুসারে সকলকেই মানিয়া লইতে হয়—A wonderful expression through musical sound, is the deepest and simplest attribute of our nature, and therefore most intelligible at least to those souls which have this attribute.

আর আমাদের ভারতে সঙ্গীতই জীবন। তাই ভারতে বলে—

সঙ্গীত সাহিত্য রসানভিজ্ঞঃ।
প্রায় পশুঃ পুচ্ছবিষানহীনঃ॥

অর্থাৎ—যে সঙ্গীতের রসাস্বাদ করিতে না পারে তাহাকে পশু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতই সঙ্গীতের প্রভাব অপরিসীম—তাই কবি বলিয়াছেন—

অজ্ঞাত বিষয়াস্বাদো বালকঃ পর্য্যঙ্কশায়নে।
রুদন্ গীতামৃতং তাহ হর্ষোৎকর্ষং প্রপদ্যতে॥

অর্থাৎ—রোরুদ্যমান শিশু যাহার ইন্দ্রিয় শক্তির স্ফূর্ত্তি হয় নাই—সেই বালকও সঙ্গীত শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করে। এতদ্ভিন্ন সঙ্গীত সাধনার অঙ্গ এবং স্বাস্থ্যসম্পদকেও অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রাখে। চিকিৎসকগণ বলেন—

মানবের কণ্ঠস্বরের চালনায় তালু, জিহ্বা, আলজিহ্বা, ফুসফুস, গলনালী প্রভৃতি বিশেষভাবে পরিচালিত হয় এবং তাহার ফলে এই সকল যন্ত্রের দৃঢ়তা উৎপাদিত হওয়ায় সহজে কোন প্রকার রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। বস্তুতঃ গায়কের ফুসফুস্ প্রভৃতি যে সুদৃঢ় কার্য্যক্ষম হয়—ইহা সাধারণতঃ দেখা যায়। এমন কি সঙ্গীতচর্চ্চার

দ্বারা অনেক সময়ে কঠিন ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়—ইহাও অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

গায়কের গুণাবগুণ

শাস্ত্রোক্ত নীতি অনুসারে গায়কদিগের সাধনা করা উচিত। শব্দ-বিজ্ঞান চর্চ্চা করিলে বুঝা যায় যে সাধনার অভাবে আমাদের গান সুমধুর সঙ্গীত (Musical sound) না হইয়া কেবল কোলাহল (noise) হয় মাত্র। সঙ্গীতের বিশেষত্ব ইহার "ওজন" (Periodicitv) রক্ষা করা। এতদ্ভিন্ন শব্দের উচ্চ নীচাদি প্রকৃতি ভেদ যেন সুসঙ্গত (of the same intensity, pitch, quality) ও সুমিষ্ট (Harmonious) হয়। গ্রহ, অংশ, ন্যাস, বাদী, সম্বাদী, বিবাদী, গমক, মূর্চ্ছনা ইত্যাদির সমবায়ে যে স্বর উৎপন্ন হয় তাহা সঙ্গত ভাবে হইলেই সঙ্গীত হইল। উপরিউক্ত সম্বাদী প্রভৃতির সঙ্গত যোজনা বড়ই কঠিন। ইহা বিজ্ঞানসম্মতভাবে করিতে হইলে স্বরের মিশ্রণ (Resultant) সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—সঙ্গীত-সাধনাকে অপরোক্ষ ভাবে নাদ-সাধনা বলা যায়। এই "নাদ" সমুদ্রের অন্ত নাই।

যথা—

"নাদ সমুদ্র অপরাম্পর কোহি নেহি রাপওয়াক ভেদ"

তাই নাকি শাস্ত্র বলিতেছেন—

"নাদাব্ধেস্তু পরপারং ন জানাতি সরস্বতী।
তস্মাপি মজ্জন ভয়াৎ তুম্বং বহতি বক্ষসি॥"

এই সকল জ্ঞান ছাড়া গায়ক দেখিবেন যেন গানটী শ্রুতিমধুর হয় ও শাস্ত্র-সঙ্গত হয়। যথা—

"সঙ্গীতং মোহিনীরূপমিত্যাহ সত্যমেবতৎ।
যোগ্য রস ভাব ভাষা রাগ প্রভৃতি সাধনৈঃ।
গায়ক শ্রোতৃমনসি নিয়ত জনয়েৎ ফলম্॥"

লক্ষসঙ্গীত শাস্ত্রম্

অন্যত্র— "হৃদ্যশব্দ সুষারিরোগ্রহ মোক্ষ বিচক্ষণ।
রাগ রাগাঙ্গ ভাষাঙ্গ ক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গো কোবিদঃ।
প্রবন্ধ গান নিষ্ণাতো বিবিধা লোপ্তি-তত্ত্ববিদ্।
সর্ব্ব স্থানোচ্চ গমকৈঃ অনায়াসো অলসদ্গতি।
আয়ত্ত কণ্ঠ স্তালজ্ঞ সাবধানোজিত শ্রমো।
শুদ্ধচ্ছায়ালগাভিজ্ঞ সর্ব্বকাকু বিশেষঃ বিদ্।
অপার স্থায় সঞ্চায় সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত।
ক্রিয়া পরোঽজস্র লয় সুঘটো ধারণান্বিত।
স্ফুর্য্যো নির্ব্যবনো হারিরহঃ ক্রিদভজনো দুর।
সুশংস প্রদায়ো গীতজ্ঞৈ গীয়তে গায়ক শ্রেণী।

সঙ্গীত রত্নাকর

দ্বিতীয়তঃ, গায়ক যেন কোনরূপ মুখবিকৃতি বা ভীতি-প্রদ শব্দাদি বা শ্রোতার ভীতিব্যঞ্জক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির চালনা না করেন—পরন্তু সৌম্য শান্তভাবে শ্রোতৃগণের মনোরঞ্জন করেন ; যথা—

"ভাষাত্যক্তাহাবভাবাঃ প্রতিয়ন্তে বিবক্ষতাঃ।
তস্মা শ্রেষ্ঠাস্তথাহক্রোশা কেলেম্ কর্কশামতাঃ।
এতাদৃগ্ গায়নাগ্নস্তাৎ পরিণাম হি অভীপ্সিতঃ।
স্য রসস্যৈব কেবলমস্বাদ সমুদ্ভব॥ সঙ্গীত শাস্ত্রম

প্রত্যুতঃ, অনেক স্থলে গায়ক নিজেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির চালনায় ও অদ্ভুত চীৎকারে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়েন।

অন্যত্র— "সংদষ্ট উদ্ঘৃষ্ট সূৎকারী ভীত শঙ্কিত কম্পিতাঃ।
করালী বিকল কাকো বিতা লোকর তোদ্‌ড়া।
সোম্বক স্তম্বকো বক্রো প্রসারো বিনি মোলকঃ।
বিরসাপস্বরাত্যক্ত স্থানভ্রষ্টা অব্যবস্থিতাঃ।
মিশ্রকোহনবধানশ্চ তথান্যন্নাসানুনাসিকঃ।
পঞ্চবিংশতিরিত্যেতে গায়নানিন্দিতা মতাঃ॥

গায়ক এই সকল দোষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলিবেন। বস্তুতঃ এই সমস্ত দোষযুক্ত গায়ক, গায়ক আখ্যাধারী হইতে পারেন না। আর একটী কথা—ইদানীং রাগ রাগিনীকে অনেকে নূতন নূতন রূপ প্রদান করিতে চান—ইহাতে রাগ রাগিনীর প্রকৃত রূপ ও গঠন বিকৃতই হয়। English notation অনুসারে তদ্দেশীয় সঙ্গীতজ্ঞরা চলিয়া থাকেন—একটুও এদিক ওদিক করেন না। বিদুষী মিস্ বলিংব্রোক বলিয়াছেন,

"The great secret of the singer's power over the hearts of her hearers, lies in her total forgetfulness of self and surroundings and in entering heart and soul into the conceptions of the composer"

সত্য সত্যই ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত নায়ক তান্‌সেন, নায়ক গোপাল প্রমুখ গায়কগণ, যাঁহারা রাগ রাগিণীর নূতন রূপ দিতে পারিতেন, তাঁহারা যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহার লঙ্ঘন করা ধৃষ্টতা মাত্র। আজ আমরা বিনা সাধনায় সাধক। অগ্রে যথার্থ সাধক হইয়া তাহার পর রাগের উৎকর্ষ ও অপকর্ষাদির ভেদাভেদ বিচার করিতে যাওয়াই ভাল। যাঁহারা আজীবন সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন প্রথমতঃ সেই পথেই সাধনায় সিদ্ধ হইতে হইবে।

পুরাবৃত্ত

ভারতীয় সঙ্গীত যে ঠিক কবে ও কোথায় প্রথম প্রতিষ্ঠাত হয়, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে শাস্ত্রে বলে স্বয়ং মহাদেবই ইহার উদ্ভাবন-কর্ত্তা। মহাদেব তাঁহার পরম প্রিয় শিষ্য ব্রহ্মাকে ইহা শিক্ষা দেন। ব্রহ্মা আবার তাঁহার পঞ্চ শিষ্য ও নারদকে শিক্ষা দেন। নারদই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সঙ্গীতবিশারদ হইয়া বীণা সংযোগে সর্ব্বত্র ইহার প্রচার করেন। তবে সে সঙ্গীত বোধ হয়—আধুনিক প্রচলিত সঙ্গীত অপেক্ষা অন্য কোন উচ্চ স্তরের ভাব-সাধনা হইবে। ইহার পর ভরত ঋষি নাটকের উদ্ভাবন করেন এবং হুহু (Hoohm) ও তম্বু (Tambhoo) যন্ত্রসঙ্গীতে সকলকে অতিক্রম করেন। এই তম্বুই (Tambhoo) "তম্বুরা" নামক বিশ্ববিমোহন

সুর-যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা। এই "তম্বুরা" বা তানপুরা সপ্ত সুরের ও উনপঞ্চাশ কূটতানের আধার। "রাম্ভু" নামক জনৈক নৃত্যকলাবিৎ তথন দেবতাদিগের সভায় খ্যাত ছিলেন। শুনা যায় দশানন রাবণও বেহালা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা গেল পৌরাণিক বৃত্তান্ত।

ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যা মুসলমানদিগের সময়েই বিশেষ উন্নতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তথন গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে অনেক সঙ্গীতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মানসিংহের রাজত্বকালে (১৪৮৬-১৫১০) ভারতীয় ধ্রুপদ জাতীয় গানের বিশেষ চর্চ্চা ও আদর হইয়াছিল। তথন "বক্সু নায়ক" অদ্বিতীয় ধ্রুপদী হইয়া উঠিয়াছিলেন। হুমায়ুন যথন অতুল বিক্রমে রাজত্ব করিতেছিলেন তথন "নায়ক গোপাল" ও "বৈজুবাওরা" নামে দুইজন বিখ্যাত গায়ক ভারতবর্ষকে ধন্য করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মত গায়ক বোধ হয় ভারতে আর জন্মিবে না। ইঁহারা বনের পশুকেও সঙ্গীতে আকর্ষণ করিয়া আনিতেন। ইহার পরবর্ত্তী বাদশাহ আকবরের সভায় প্রধান গায়ক নবরত্নের অন্যতম রত্ন তানসেনের নাম আজও লোকের মুখে মুখে কীর্ত্তিত হইতেছে। তানসেন বা তন্নুমিশ্র (১৫৫৮-১৬০৫) সঙ্গীত-গুরু হরিদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন। তানসেনের পুত্র "তন্তরঙ্গ" (Tantaranga) ও বিলাস খাঁ (Bilas Khan) উপযুক্ত পিতার সন্তান ছিলেন। আজও বিলাস খাঁ-কৃত "বিলাসী টোড়ী" ভারতে বিখ্যাত। পরে জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে খুরান্দাদ, জগন্নাথ, হরিভান প্রভৃতি গায়কদিগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সঙ্গীত-চর্চ্চা কিছু কালের জন্য কমিয়া গিয়াছিল, কারণ জাহাঙ্গীর গোঁড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞদের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। জাহাঙ্গীরের পরবর্ত্তী বাদশাহেরা আবার সঙ্গীতের আদর করায় তথন হইতে ভারতীয় সঙ্গীত পুনরুজ্জীবিত হয়। জাহাঙ্গীরের পর দশম সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে পুনরায় সঙ্গীত পূর্ণ কলেবর ধারণ করে। সেই সময়ে ধ্রুপদ অপেক্ষা খেয়াল বা অলঙ্কারপূর্ণ গানের বিশেষ প্রচলন হয়। সেই সময়ে সদারঙ্গ নামক প্রসিদ্ধ গায়ক "খেয়াল" জাতীয় গানের প্রচলন করেন এবং সঙ্গীতও এই সময়ে উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া ভারতকে নূতন আনন্দরসে আপ্লুত করে। প্রায় এই সময়েই (১৭৫৯-১৮০৯) "গোলামনবী" নামক এক বিখ্যাত গায়ক "টপ্পা" জাতীয় গানে সকলকে মোহিত করেন। এই "টপ্পা" জাতীয় গানের সহিত শোরী মিঞার নাম সংশ্লিষ্ট। ঠুংরী ও গজল টপ্পার অন্তর্গত—কেবল হিন্দুস্থানী শোরী-কৃত ও হমদম্-কৃত টপ্পা ভিন্ন অন্য টপ্পাকে ঠুংরী বলে। মানলাদাদ, মহারাজ নওলকিশোর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গায়কের নাম আজও সকলে স্মরণ করে।

ধ্রুপদে (ধ্রুবপদ) চারিটী তুক্ আছে, যথা ;—আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। কোন কোন ধ্রুপদে কেবল আস্থায়ী ও অন্তরা থাকে। খেয়াল, ধ্রুপদ, টপ্পা ইহাদের আবার অনেক প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। ছন্দ, প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ, ধারু, বাগমালা, জাত বা জ্যাট, চতুরঙ্গ, ত্রিবট, ওলনকস্, রালবানা, তেলেনা, বাতিয়ালা, ঠুংরী ও গজল। এই সকলের মধ্যে ছন্দ, প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ ও ধারু ধ্রুপদের অন্তর্গত। যে ধ্রুপদে ছন্দ এই কথাটীর উল্লেখ আছে এবং যাহা পদ্যে রচিত তাহাকে ছন্দধ্রুপদ কহে। যে ধ্রুপদে "ধারু"—এই কথাটীর উল্লেখ থাকে তাহাকে ধারুধ্রুপদ কহে। ধারুধ্রুপদ নায়ক গোপালের সৃষ্টি। ত্রিবট, ওলনকস্, চতুরঙ্গ, কলবানা—ইহারা খেয়ালের অন্তর্গত। রাগমালা, জাত বা জ্যাট, তেলেনা—ইহারা এতদুভয়ের অন্তর্গত। সদারঙ্গকৃত খেয়ালে সদারঙ্গের নাম আছে।

সাধারণতঃ সপ্তস্বর প্রাকৃতিক ও গ্রাম্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক কতকগুলি শব্দের অনুকরণে সাতটী স্বরের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। আমরা "ষড়জ" সুরকে ময়ূরের কেকারব হইতে গ্রহণ করিয়াছি। ষাঁড়ের ডাক হইতে "ঋষভ," ছাগলের ডাক হইতে "গান্ধার," শৃগালের ডাক হইতে "মধ্যম," কোকিলের ডাক হইতে "পঞ্চম," অশ্বের হ্রেষারব হইতে "ধৈবত" ও হস্তীর বৃংহন হইতে "নিষাদ" সুরের উৎপত্তি হইয়াছে। Sir William Jones বলেন বিড়ালাদি জন্তুর অনাহারজনিত কষ্টের শব্দ (Moaning) হইতে কোমল গান্ধারের সৃষ্টি হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক এই সমস্ত সুরের রূপরসাদি কিরূপ ? "ষড়জ" সুর বিশ্রামদায়ক (Rest), অর্থাৎ মনের মধ্যে একটা শান্তি আনয়ন করে। ঐ প্রকার "ঋষভ" সুর মানুষের মনে উৎসাহ ও "গান্ধার" সুর পূর্ণ শান্তি (Peace) আনয়ন করে। "মধ্যম" সুর নিরাশা (Despondency), "পঞ্চম" সুর আড়ম্বর (Gorgeousness), "ধৈবত" সুর দুঃখ (Grief) ও "নিষাদ" সুর তীব্রতা (Sharpness) প্রকাশ করে। এই সপ্তস্বরের আবার সপ্তদেবতা আছে, যথা—"ষড়জ" বা "ষড়জ" সুরের দেবতা অগ্নি, "ঋষভ" সুরের দেবতা—ব্রহ্মা, "গান্ধার" সুরের দেবতা—সরস্বতী, "মধ্যম" সুরের দেবতা—মহাদেব, "পঞ্চম" সুরের দেবতা—বিষ্ণু, 'ধৈবত" সুরের দেবতা—গণেশ, "নিষাদ" সুরের দেবতা—সূর্য্য। ইহাই হিন্দু শাস্ত্রকারগণের মত।

সপ্তস্বর যে বেদনিহিত বা বেদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ইহাও পৌরাণিক মত-সম্মত। "ষড়জ" ও "ঋষভ" সুর ঋগ্বেদ হইতে, "মধ্যম" ও "ধৈবত" যজুর্ব্বেদ হইতে, "গান্ধার" ও "পঞ্চম" সামবেদ হইতে এবং "নিষাদ" সুর অথর্ব্ববেদ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কিং

শ্রীরামেন্দ্রনাথ রায়

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে, ইয়োরোপ ও আমেরিকা হইতে ফিরিয়া ভারতে প্রথম পদার্পণ করিয়া তাহার দারিদ্র্য চোখের সামনে জল জল করিয়া উঠে। ঠিক কথা। এ দেশে জনপ্রতি বার্ষিক আয় গড়ে প্রায় ৫০ৎ টাকা মাত্র। পক্ষান্তরে, আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের (U. S. A.) অধিবাসীদের মাথা পিছু গড়ে আয় প্রায় ১১২৫ৎ টাকা এবং ইংলণ্ডের প্রায় ১০০০ৎ টাকা। তবেই দেখুন, আমাদের এ ভীষণ দারিদ্র্যের তুলনা বোধ করি আর নাই। লোক-বৃদ্ধির সঙ্গে এবং উপযুক্ত শিল্প-বাণিজ্যের অভাবে দারিদ্র্য ক্রমেই ভীষণতর হইতেছে। আমেরিকা এবং ইয়োরোপের যে-কোন দেশে অর্থাগমের পরিমাণে একটু ভাটা পড়িলেই সে দেশের গভর্ণমেণ্ট ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন, দেশে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া যায়। বেকার অবস্থা এবং আয়ের অল্পতাহেতু Standard of life এর খর্ব্বতা—এই উভয় সমস্যাই যে কোন সভ্য দেশের পক্ষে (ভারতবর্ষ ব্যতীত) মস্ত বড় সমস্যা। আমাদের এই হতভাগা দেশে কত কোটি লোক যে অনশনে অর্দ্ধাশনে থাকে, পরিধানে বস্ত্র পায় না, রোগে ঔষধ পথ্য পায় না, হয় ত মাথা গুঁজিবার জায়গা নাই, কে তাহার খোঁজ রাখে? সে মাথা ব্যথাই বা কয়-জনের আছে?

বিগত আদমস্থমারীর রিপোর্ট হইতে দেখা যায়, যে আমাদের দেশে শতকরা ৭১ জন লোক কৃষির উপর নির্ভর করে এবং ১১জন শিল্পবাণিজ্যের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। অন্যান্য সভ্য এবং আর্থিক ব্যাপারে উন্নত দেশের অবস্থা প্রায় উল্টো। তার পর, ভারতে যে পরিমাণ জমির উপর যত লোক জীবিকার জন্য নির্ভর করে, ইংলণ্ডে ইহার চতুর্থাংশ লোক তত পরিমাণ জমির উপর নির্ভর করে। ইহাতেই আমাদের দারিদ্র্যের মূল হেতু এবং ভীষণতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শিল্পবাণিজ্য বৃদ্ধি করা এবং ইহার আন্তর্জ্জাতিক প্রসার ভিন্ন আমাদের দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্য উপায় নাই।

কোন বিরাট শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং সুষ্ঠুভাবে তৈয়ারী মাল অথবা কাঁচা মালের ব্যবসা দেশ বিদেশে করিতে হইলে প্রভূত অর্থ আবশ্যক। হাজার হাজার শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং আমদানী রপ্তানী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে টাকা যোগান দেওয়া ব্যাঙ্ক ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। প্রত্যেক সভ্য দেশকেই অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয়বিধ বাণিজ্যের প্রতি নির্ভর করিতে হয়; এবং এই উভয়বিধ বাণিজ্যের প্রসার এবং স্থায়িত্ব ব্যাঙ্কের সাহায্য-সাপেক্ষ। বিশেষতঃ জগতে আজ এমন কোন দেশ নাই, যাহা একেবারে আত্মনির্ভরশীল এবং আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধমুক্ত। এই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-ব্যবসায়ের চাবি ব্যাঙ্কের হাতে। সুতরাং ব্যাঙ্কিং এবং ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের সম্যক অবহিত হইতে হইবে। এ বিষয়ে আমরা একেবারে অজ্ঞ বলিলেও চলে। চারিদিকে নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে এবং সাধারণের এদিকে যথেষ্ট আগ্রহ পরি-লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু এগুলিকে খাদ্য যোগাইবার জন্য বড় বড় ব্যাঙ্ক স্থাপনের চেষ্টা বা আগ্রহ দেখা যাইতেছে না।

ইয়োরোপ এবং আমেরিকার প্রত্যেক দেশে অসংখ্য ব্যাঙ্ক কাজ করে—স্বদেশী এবং বিদেশী উভয়ই। সে তুলনায় আমরা অতি শিশু। আমাদের সহরে লইড্‌স্ ব্যাঙ্ক, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক, ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, হঙ্কং এবং সাংহাই ব্যাঙ্ক প্রভৃতির বিরাট সৌধ ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হই; এবং ভাবি, কত টাকাই না এরা নাড়াচাড়া করে! কিন্তু এই ব্যাঙ্কগুলি শাখামাত্র এবং একমাত্র লইড্‌স্ ব্যাঙ্ক ছাড়া আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক জগতে এরা প্রথম শ্রেণীর নয়। ইংলণ্ডে পাঁচটি ব্যাঙ্ক (The Big Five) সে দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—

লইড্‌স্‌, বার্কলেস্‌, ওয়েষ্টমিনষ্টার, মিড্‌ল্যাণ্ড এবং ন্যাশানাল প্রভিন্সিয়াল। এক ইংলণ্ডেই (ইংলণ্ড আমাদের বাংলাদেশ অপেক্ষা অনেক ছোট্ট) ইহাদের এক একটির হাজার দেড় হাজার শাখা আছে। আর প্রত্যেকে বার্ষিক লাভ করে চার হইতে পাঁচ মিলিয়ন পাউণ্ড। অর্থাৎ পাউণ্ডের দর ১৩॥০ হিসাবে ধরিলে আমাদের টাকার হিসাবে লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪,০০০,০০০্‌ হইতে ৬৭, ৫০০,০০০্‌ টাকা। এই পাঁচটি ছাড়াও ত আরও কত শত ব্যাঙ্ক আছে। অথচ ইংলণ্ডের লোক-সংখ্যা মাত্র সাড়ে তিন কোটি। আর আমাদের এই গোটা ভারতবর্ষে, যেথানে লোকসংখ্যা পঁয়ত্রিশ কোটির উপর, পরিচয় দিবার মত মাত্র একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক আছে—সেটি হইতেছে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া; আর তার শাখা হইতেছে মাত্র বিশটি। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ১৯১১ সালে স্থাপিত হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই বাইশ বৎসরের মধ্যে আর একটিও অনুরূপ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইল না। অনেক প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কিং করপোরেশান প্রভৃতি গালভরা নাম দিয়া নিজেদের জাহির করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে। কিন্তু এগুলি প্রকৃতপক্ষে লোন কোম্পানী ছাড়া আর কিছু নয়। তবে আমাদের ত ধারণা 'পাঁচটাকা পাঁচ-টাকা দু কড়ি দশ টাকা,' তাই লাখ টাকা মূলধনের কারবার শুনিলেই মুখের ও চোখের ভাব অন্যরূপ হইয়া যায়। এ কথা ধ্রুব সত্য যে, বড় বড় জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত না হইলে আমাদের দেশে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার করিয়া দারিদ্র্য দূরীকরণের আশা কথন সাফল্য লাভ করিবে না।

আমাদের অনেকের ধারণা যে, ব্যাঙ্কে টাকা রাখিলে আর ফেরত পাবার আশা কম, যেমন পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে, জীবনবীমা করিলে আর বেশী দিন বাঁচিতে হইবে না অথবা কোম্পানী ফেল পড়িয়া টাকা মারা যাইবে। একটা বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক বা একটা য়্যালায়েন্স ব্যাঙ্ক অফ সিমলা ফেল মারিয়াছে বলিয়া যে সব ব্যাঙ্কই ফেল মারিবে তার মানে কি? যে কোন ব্যবসায়ই ত ফেল মারিতে পারে, আর তাই যদি নিত্য-নৈমিত্তিকের ঘটনা হয় তাহা হইলে ত দুনিয়াই অচল হইয়া যায়। আপনার বহু কষ্টে অর্জ্জিত ও সঞ্চিত অর্থ অহরহৎও ত একদিন ডাকাতে লুঠ করিয়া লইয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশে অনেক কুসংস্কার ও অহেতুক ভীতি আমাদের উন্নতির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এর ফল অনেক সময় এই হয় যে, আমরা না করিতে পারি নিজের উন্নতি, না করিতে পারি দেশের উন্নতি। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বল ধারণা আমাদের মন হইতে দূর করিতে হইবে। আমি এথন আমাদের দেশে কয় শ্রেণীর ব্যাঙ্ক আছে, তাহাদের কার্য্যকলাপ এবং ব্যাঙ্ক শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে কি ভাবে সাহায্য করিতে পারে, এই সব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

আমাদের দেশে চারি শ্রেণীর ব্যাঙ্ক আছে—(১) ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া: (২) এক্‌স্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক, যথা, চাটার্ড ব্যাঙ্ক, ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, পি এণ্ড ও ব্যাঙ্ক, ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি; (৩) জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক, যথা, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি। এই পর্য্যায়ে লোন কোম্পানী এবং কো-অপারেটিভ্‌ ব্যাঙ্কগুলিও পড়ে; (৪) প্রাইভেট্‌ ব্যাঙ্কার, যেমন বাঙ্গলার মহাজন এবং মাদ্রাজের চেট্টিরা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ১৯২০ সালে ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল, ব্যাঙ্ক অফ বোম্বে এবং ব্যাঙ্ক অফ মাদ্রাজ এই তিনটি ব্যাঙ্ককে একশ্রেণীভূত করিয়া স্থাপিত হয়। এই ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী বিশেষ আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্কওয়ালাদের ব্যাঙ্ক, এবং গভর্ণ-মেণ্টের ব্যাঙ্ক; সাধারণে বিশেষ কোন সাহায্য বা সুবিধা পান না। গভর্ণমেণ্টের অনেক টাকা এথানে গচ্ছিত থাকে, তার জন্য কোন সুদ লওয়া হয় না এবং গভর্ণ-মেণ্টের সর্ব্ববিধ ব্যাঙ্কিং কার্য্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মারফত করা হয়। সকল বড় ব্যাঙ্কই (Clearing Banks) এই ব্যাঙ্কে হিসাব রাখেন। তাহাতে মস্ত সুবিধা এই যে, প্রত্যহ যত চেক্‌ এই সব ব্যাঙ্ক পায় (যেগুলি ক্রস্‌ করা এবং কাউণ্টারে টাকা দিতে হয় না), সেগুলি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের Clearing Houseএ পাঠান হয় এবং সেথানে স্ব স্ব হিসাবে জমা-থরচ করা হয়। ধরুন, আপনি কাহারও নিকট হইতে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের উপর একথানি চেক্‌ পাইলেন। আপনার হিসাব আছে

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে এবং সেখানে আপনি ঐ চেক্‌খানি দিলেন টাকা আদায় করিয়া আপনার হিসাবে জমা করিবার জন্য। প্রত্যেক ব্যাঙ্কে এইরূপ শত শত চেক্ রোজ আসে। ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা এই সব চেক্ লইয়া Clearing Houseএ যায়। আপনার ঐ চেক্‌খানি Clearing Houseএ গেল। সেখান হইতে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি ওখানি লইয়া স্বীয় ব্যাঙ্কে যাইয়া দেখে যে চেকের সহি ঠিক আছে কি না, উপযুক্ত পরিমাণ টাকা আছে কি না, ইত্যাদি। ঠিক থাকিলে Clearing Houseএ ফিরাইয়া আনা হয় এবং ঐ টাকা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের হিসাবে খরচ লিখিয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা দেওয়া হয়। তদনুযায়ী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক আপনার হিসাবে চেকের টাকা জমা দেয় এবং এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, আপনি যাহার নিকট হইতে চেক্ পাইয়াছিলেন, তাহার হিসাবে খরচ লেখে।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত সাধারণের সংস্রব অতি কম; এবং এই ব্যাঙ্ক শিল্প-বাণিজ্যে সাহায্য বিশেষ করে না এবং আইনতঃ করিতেও পারে না। এক্‌স্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির বিশাল প্রাসাদ দেখিয়া সহজেই মনে করিতে পারেন ইহারা কিরূপ লাভ করে। কিন্তু ইহাদের নিকট হইতে দেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি আশানুরূপ সাহায্য পায় না; এবং যেমন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর অর্থে পুষ্ট রেল কোম্পানী প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সুখ-সুবিধার জন্যই উদ্‌গ্রীব, তেমনই এ দেশীয় আমানতে পুষ্ট এ দেশস্থ শাখা এক্‌স্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি স্বদেশীয় কোম্পানীগুলিকে সাহায্য প্রদানে সদাই উদ্‌গ্রীব। এমন কি স্বদেশীয় কর্ম্মচারীরাও অতি উচ্চ বেতনে নিযুক্ত হয়। কোন ইয়োরোপীয় পর্য্যটক কলিকাতার এক্‌স্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি দেখিয়া বলিয়াছিলেন 'যখন দেখিলাম যে ভিতরে বসিয়া যে দেশীয় কেরাণীগুলি কায করিতেছে তাহাদের প্রায় সকলেই উৎসাহহীন, শীর্ণকায়, মলিন অর্দ্ধ-ছিন্নবাস পরিহিত এবং অকালবৃদ্ধ, তখন ভাবিলাম এসব প্রাসাদ নির্ম্মাণে কোন সার্থকতা নাই।" তার পর এই এক্‌স্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক আমাদের কোন দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার বা overdraft দিতে হইলে যে সব কড়াকড় সর্ত্ত উপস্থিত করে, তাহাতে রাজী হওয়ার মত শক্তি শতকরা বোধ হয় ৮০টি ফার্ম্মেরই থাকে না। এ কারণ জাতীয় বড় বড় ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করিতেই হইবে।

বিদেশী এক্‌স্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি অনেক মূলধন লইয়া স্থাপিত এবং আমানত টাকাও প্রচুর; সর্ব্বোপরি কার্য্য-কলাপ বহু বিস্তৃত। এই হেতু ইহারা অল্প সুদে টাকা ধার দেয়—সাধারণতঃ ৬%হইতে ৯%। পক্ষান্তরে, আমাদের দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি ইহাদের কাছে অতি শিশু (Pigmy); অল্প পুঁজি লইয়া কারবার এবং তাহাও সীমাবদ্ধ। সুতরাং ইহারা আবশ্যক হইলে এক পার্টিকে খুব বেশী টাকা দিতে পারে না এবং টাকার সুদ অত্যধিক লয়—সাধারণতঃ ১২% হইতে ১৫%। বর্ত্তমানে ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অতি প্রবল, অনেক সময় নামমাত্র লাভে কায করিতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রস্তুত অথবা ক্রয় খরচের উপর (cost of production or cost of purchase) এত অত্যধিক সুদের হার যোগ দিয়া বিক্রয়-মূল্য নির্দ্ধারণ করিলে বিশেষতঃ আজকাল বিদেশী প্রতিযোগিতায়—মাল বেশী বিক্রীর সম্ভাবনা থাকে না। তাই আমার মনে হয়, যখন সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া শীঘ্র বড় বড় ব্যাঙ্ক স্থাপন সহজসাধ্য নয়, তখন ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে মিলিত (amalgamated) করিয়া বৃহৎ বৃহৎ ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা নূতন ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যশক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে। প্রচুর মূলধন ও আমানতের সাহায্য পাইলে ব্যাঙ্কের পক্ষে ব্যাপকভাবে কার্য্য করা সহজ হইয়া পড়ে—যথা বিভিন্ন স্থানে শাখা স্থাপন, বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে চাহিদা মত টাকা ধার দিবার শক্তি, অল্প সুদে টাকা লগ্নীকরণ, মক্কেলদের মাহিনা পেন্সন, অন্যত্র লগ্নীকৃত টাকার সুদ আদায় করণ প্রভৃতি ব্যাঙ্কের ঠিকানায় মক্কেলদের চিঠিপত্র গ্রহণ এবং যথাস্থানে প্রেরণ ইত্যাদি ইত্যাদি; কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে শক্তিশালী হইতে হইলে যেমন বহু মূলধন ও আমানত দরকার, তেমন মক্কেলকে সর্ব্বদা সেবা ও সমৃদ্ধ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকা একান্ত আবশ্যক। উপরিউক্ত উপায়ে ব্যাঙ্ক যেমন মক্কেলকে সেবা করিবে, তেমন মক্কেলকে তাঁহার ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে, টাকার লগ্নীকরণ (investment) ব্যাপারে, মোট কথা, যাহাতে মক্কেলের

স্বার্থ সংরক্ষিত হয় তদুপযুক্ত উপদেশ প্রদানে সর্ব্বদা সাহায্য করিবে। এ কারণ ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞ ম্যানেজার এবং কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। উহা ছোট ছোট ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ধরুন, আমার স্থানীয় কোন ছোট ব্যাঙ্কে হিসাব আছে। আমি কাণপুরে ব্যবসা উপলক্ষে যাইতে চাই। আবশ্যক টাকা সঙ্গে লইয়া যাওয়া বিপজ্জনক। সুতরাং টাকা এখানে জমা দিয়া কাণপুরের কোন ব্যাঙ্কের উপর draft বা pay order লওয়াই আমার পক্ষে নিরাপদ এবং সুবিধাজনক। ইহা ছাড়া, যে পার্টির সঙ্গে সওদা করিবার জন্য কাণপুরে যাইতেছি তাঁহার বিশেষ কোন পরিচয় (reference) জানি না এবং ইহাও আমার জানা একান্ত আবশ্যক। আমার ব্যাঙ্কের কোন শাখা বা এজেণ্ট কাণপুরে নাই। সুতরাং এ ব্যাঙ্কের পক্ষে আমাকে সাহায্য করা সম্ভবপর নয়। তবে এক হইতে পারে যে এই ব্যাঙ্ক কোন বড় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে উপরিউক্ত draft এবং তাঁহাদের কাণপুর শাখার উপর আমাকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধপত্র যোগাড় করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু এ কায একটু সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়সাপেক্ষ; কারণ, আমার ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের সাহায্য লইবেন এবং দুই ব্যাঙ্কের কমিশনে একটু মোটা অঙ্ক হইয়া যাইবে। এ অবস্থা আমার পক্ষে প্রীতিকর নহে। তখন ভাবি, নাঃ, বড় ব্যাঙ্কেই হিসাব রাখা ভাল।

কিন্তু এরূপ দেশীয় বড় ব্যাঙ্ক আমাদের নাই বলিলেই চলে—দুই একটি যা আছে তার দ্বারা কি এই বিশাল দেশের আবশ্যকতা মিটে? তাই আমরা ছুটি ঐ এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের কাছে।

আমি এই প্রবন্ধে "এক্সচেঞ্জ" বা বিনিময় ব্যাঙ্কের নাম অনেকবার করিয়াছি। সাধারণের নিকট এই নাম তেমন পরিচিত না হইতে পারে। এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি সাধারণ ব্যাঙ্কিং ছাড়া বিনিময়ের কায করে এবং ইহাতে প্রচুর অর্থলাভ হয়। একটি উদাহরণ দি। ধরুন, আপনি ইংলণ্ডে কোন কোম্পানীর নিকট একটি মেসিনের অর্ডার দিলেন, উহার দাম ৫০০০ পাউণ্ড। ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মারফতে আপনার উপর ড্রাফ্‌ট আসিল। সাধারণ বিনিময়ের হার এক টাকা—এক শিলিং ছয় পেন্স। এই হিসাবে আপনার দেয় হয় টাঃ ৬৬,৬৬৬৸৴৮ পাই। কিন্তু আপনার ত পাউণ্ড নাই, আপনি ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাউণ্ড কিনিলেন। ব্যাঙ্ক ত লাভ করিবে, আপনার নিকট শিলিং ১%৫৩২ রেটে বিক্রী করিল এবং এই হিসাবে আপনার দিতে হইল টাঃ ৬৬,৭৯৬৶৴ আনা। রপ্তানীর বেলায়ও একই অবস্থা। আপনি ৫,০০০ পাউণ্ড মূল্যের চা ইংলণ্ডে রপ্তানী করিলেন এবং ক্রেতার উপর ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মারফত ড্রাফ্‌ট পাঠাইলেন। পার্টি ইংলণ্ডে পাউণ্ড দিয়া দিল। কিন্তু আপনি এই পাউণ্ড লইয়া কি করিবেন? আপনার টাকা চাই, তাই পাউণ্ড বেচিলেন ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে। সাধারণ রেট্ হিসাবে টাঃ ৬৬,৬৬৬৸৴৮ পাই আপনার প্রাপ্য, কিন্তু ব্যাঙ্ক ত বেচিয়াও লাভ করিবে আপনাকে শিঃ ১%৬১৬=১৲ হিসাবে টাকা দিল। অর্থাৎ আপনি পাইলেন টাঃ ৬৬,৪৩৩,৮ পাই। এইরূপ আমদানী রপ্তানীর মূল্য বাবদ বিদেশী মুদ্রা যথা পাউণ্ড, ডলার, মার্ক প্রভৃতির কেনা-বেচা রোজই এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক সমূহে হইতেছে। উপরিউক্ত দৃষ্টান্তানুযায়ী আপনি সহজেই ধারণা করিতে পারিবেন যে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি বিনিময় ব্যবসায়ে কিরূপ লাভ করে। ইহা ছাড়া তাহারা কমিশনও নেয়। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি যে দুই একটি দেশীয় ব্যাঙ্ক বিদেশে সম্মান অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের মারফতেও আমদানী রপ্তানী সংক্রান্ত দলিলাদি (documents) আনান বা পাঠান যাইতে পারে, এবং মুদ্রার বিনিময় কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কিছু লোক্‌সান হয়, কারণ এসব ব্যাঙ্ককেও কোন এক্‌সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের নিকট মুদ্রা কেনা-বেচা করিতে হয়; আর উহা বিনা লাভে তাহারা করে না। এ জায়গায় একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। এই বিদেশী মুদ্রা টাকার বিনিময়ে বেচা-কেনার সময় বাজারে মাছ তরকারী কেনা-বেচার মত দর কষাকষি হয়। অনেকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকায় দরুণ বেশ ঠকেন। প্রায়শই বিভিন্ন ব্যাঙ্কের রেটের ফরক হয়। এ কারণ সমস্ত ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করিয়া বিনিময়

করা ভাল। কোন সম্ভ্রান্ত এক্‌সচেঞ্জ ব্রোকারের মারফত কায করা অনেক দিক হইতে সুবিধাজনক। এক্‌সচেঞ্জের কায যেমন লাভজনক, তেমনি ক্ষতিকরও মধ্যে মধ্যে হয়। এ কারণ যে সব ব্যাঙ্কের কোটি কোটি টাকা মূলধন এবং যাহারা আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ তাহারাই এ কায করিতে পারে।

আর যে শ্রেণীর ব্যাঙ্কাররা আমাদের দেশে আছেন এবং যাঁদের মক্কেলরা হইতেছে আমাদের দেশের 'সর্ব্বহারা'রা, তাঁহাদের সাধারণতঃ বলা হয় মহাজন। মাদ্রাজে এই মহাজন শ্রেণীর নাম চেট্টি। ইহারা, শুনিয়াছি, টাকা যেমন ধার দেয় তেমন অল্প সুদে অপরের টাকা ডিপোজিট রাখে। আমাদের দেশে কাবুলীওয়ালারাও এখন সর্ব্বত্র মহাজনী ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে। এ ছাড়া স্থানীয় দেশীয় মহাজনেরা ত আছেই। আমাদের এই সব মহাজনেরা 'একাদশী বৈরাগীর' মত টাকা জমা রাখে বলিয়া আমার জানা নাই, আর রাখিলেও বোধ হয় এরূপ মহাজনের সংখ্যা অতি অল্প। মোট কথা, এই সব মহাজনদের ব্যবসায়ের বিস্তৃতি এবং পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নহে। ভারতে চাষীদের ঋণের পরিমাণ মোটামুটি ধার্য্য হইয়াছে ৯০০ কোটি টাকা। সকলেই জানেন চাষীদের উত্তমর্ণ মহাজনেরা—অংশতঃ সমবায় সমিতিগুলি। এই indigenous banking এর বিস্তৃত আলোচনা আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

আমরা এখন সংক্ষেপতঃ দেখিব ব্যাঙ্কের সাহায্য শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কিরূপ অপরিহার্য্য। তাহা হইলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি ও উন্নতি দ্রুত এবং কায়েম করিতে হইলে বড় বড় ব্যাঙ্ক স্থাপনও একান্ত আবশ্যক। শিশুকে যেমন মাতৃদুগ্ধ বাঁচাইয়া রাখে এবং বর্দ্ধিত করে, ব্যবসা ও শিল্পের সঙ্গে ব্যাঙ্কের সম্বন্ধও তদ্রূপ। বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির মত অর্থশালী ও শক্তিশালী ব্যাঙ্ক স্থাপন করা বড় সহজসাধ্য নয়, কিন্তু সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মত আর গুটিকয়েক ব্যাঙ্ক কি স্থাপন করা যায় না? নিশ্চয়ই যায়। আর না পারা যাইলে শিল্পোন্নতির আশা আমাদের দেশে সুদূর পরাহত হইবে। বিদেশী ব্যাঙ্কের দ্বারে চিরকাল ধন্না দিয়া কোন জাতীয় শিল্প ব্যবসায় উন্নত হইতে পারে না। অনেকে বলেন বিদেশী ব্যাঙ্কের কাছে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। তা ত যাবেই। তাদের শক্তি সামর্থ্য অসাধারণ। আমাদের দেশে বড় বড় ব্যাঙ্ক স্থাপন করুন, যথেষ্ট সুবিধা উপভোগ করিতে পারিবেন। সেণ্টাল ব্যাঙ্ক যে সুদের হারে টাকা ধার দেয় অন্য কোন স্থানীয় দেশীয় ব্যাঙ্ক তার চেয়ে বেশী হারে সুদ নেয়। কারণ বলা নিষ্প্রয়োজন। অন্তবিধ সুবিধাও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অনেক দিতে পারে। এখন, ব্যাঙ্কের সঙ্গে ব্যবসায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কিছু আলোচনা করা যাক।

আপনি কর্পোরেশন বা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৫০,০০০৲ টাকার মেসিনারী সরবরাহ করিবার অর্ডার পাইলেন। এই সব সাধারণ বা সরকারী প্রতিষ্ঠান কোন আগাম টাকা দেন না। মাল ডেলিভারি দিলে কতকাংশ দেওয়া হয় এবং সন্তোষজনক প্রমাণিত হইলে কয়েক মাস পরে বক্রী টাকা দেওয়া হয়। মেসিনারী আপনাকে বিলাত হইতে আনাইতে হইবে, কিন্তু নির্ম্মাতাকে কিছু টাকা অগ্রিম দিতে হইবে এবং বক্রী কলিকাতায় জাহাজের রসিদ পৌঁছিলে। আপনার এত টাকা নাই। আপনার একমাত্র উপায় কোন ব্যাঙ্কের নিকট যাইয়া সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার করিয়া বুঝান, এবং কাগজপত্র দেখাইয়া প্রমাণিত করা যে এই সওদা বেশ লাভজনক। তার পর আপনি যেখানে মাল বিক্রী করিয়াছেন তাঁহাদের উপর আপনার বিল করিয়া ব্যাঙ্কের নামে এন্‌ডোর্স করিয়া ব্যাঙ্কের হাতে দিলে ব্যাঙ্ক আপনাকে আবশ্যক অর্থ সরবরাহ করিবে এবং পরে পার্টির নিকট হইতে টাকা আদায় হইলে সুদ সহ পাওনা টাকা কাটিয়া রাখিয়া বক্রী টাকা আপনাকে ফেরত দিবে। ব্যাঙ্কের সাহায্য না পাইলে এই ব্যবসা করা আপনার পক্ষে সম্ভবপর হইত না।

আর একটি দৃষ্টান্ত নিন্। ধরুন, আপনার একটি মোজা গেঞ্জি তৈয়ারী করিবার কারখানা আছে। খোঁজ পাইলেন কোথায় এক লট্ সূতা সস্তাদরে বিক্রী হইতেছে, অথচ আপনার হাতে টাকা নাই। আপনি কি

করিবেন? কোন ব্যাঙ্কের নিকট যাইয়া তাঁহাদের দুই সর্ত্তে টাকা ধার দিতে রাজী করিতে চেষ্টা করিবেন—হয় প্রস্তাব করিবেন যে সুতার লট্ কিনিয়া ঋণ পরিশোধের কাল পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কেই বন্ধক রাখিবেন, নয় আপনার মেসিনারী বন্ধক রাখিয়াও টাকা চাহিতে পারেন। তবেই দেখুন ব্যবসা সংক্রান্ত কার্য্যে প্রতি পদক্ষেপে ব্যাঙ্কের সাহায্য অপরিহার্য্য। আবার ধরুন, আপনি ঢাকায় একজন ভাল এজেণ্ট পাইলেন যিনি ৬০ দিনের ধারে মাল পাইলে যথেষ্ট মাল কাটাইতে পারেন, কারণ ঐ সময়ের মধ্যে তিনি সমস্ত বা অধিকাংশ মাল বিক্রী করিয়া আপনার টাকা পরিশোধের আশা করেন। তাঁর পরিচয় (reference) সন্তোষজনক, কিন্তু আপনারও টাকা এতদিন ফেলিয়া রাখিবার শক্তি নাই। আপনি পার্টির reference দেখাইয়া কোন ব্যাঙ্ককে রাজী করিতে পারেন যাঁহারা ঐ পার্টি আপনার বিলের টাকা মানিয়া লইলে এবং ৬০ দিনে পরিশোধের অঙ্গীকারে ড্রাফ্‌ট্ লিখিয়া দিলে আপনাকে আপনার প্রাপ্য টাকার ৭০—৮০% দিয়া দিবেন।

আজকাল সহজশোধ্য প্রথায় (instalment system) মাল বিক্রীর খুব রেওয়াজ হইয়াছে এবং এই হেতু মালের কাটতিও বাড়িতেছে। অনেকে হয়ত লক্ষ লক্ষ টাকার মাল এই ভাবে ছাড়িয়া দেন। বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার দিনে এই প্রথা ভিন্ন মেসিন প্রভৃতি বিক্রী করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ব্যাঙ্কের সাহায্য ভিন্ন এরূপ ব্যবসার বিস্তৃতি অসম্ভব। আপনি Hire Purchase Document ব্যাঙ্কের নামে করাইয়া দিলে অথবা instalment গুলির জন্য প্রাপ্ত হুণ্ডিগুলি ব্যাঙ্কের নামে endorse করিয়া দিলে আপনি ৭০—৮০% টাকা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাইয়া যাইবেন। ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা হইতেছে দুই অবিচ্ছেদ্য বন্ধু।

রেলপথে

শ্রীনীহারবালা দেবী

ব্লু এক্সপ্রেসখানি হাওড়া প্লাটফর্ম্মে ইন্ হইয়াছে, তিন নম্বর প্লাটফর্ম্মের ফটকের সম্মুখে কিরূপ ভীড় হইয়া উঠিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। ইতিমধ্যেই কেহ খোসামোদ করিয়া, কেহ রেল কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, কেহ-বা অন্য কোন উপায়ে, কেহ-বা অগত্যা একখানা প্লাটফর্ম্ম টিকেট কিনিয়া প্লাটফর্ম্মের উপর জিনিসপত্র নামাইয়া দিল্লীগামী গাড়ীখানার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

এই একখানা গাড়ীই দ্রুতগামী। ইহার ষ্টেজ কম, বেগ বেশী। দূরগামী যাত্রীদের এই গাড়ীখানায় গেলেই বিশেষ সুবিধা। ইহাতে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েকখানি বগি আছে। সুতরাং প্রথম, দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীর সম্মুখে যত না ভীড়, এই তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলির সম্মুখে তাহার শতগুণ ভীড় হইয়াছে। কালেভদ্রে কখনো কোনো প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী যদি এই গাড়ীতে আরোহণ করেন, সেইজন্য ইহাতে যত না যাত্রী আশা করা যায় তাহার চতুর্গুণ সংখ্যক গাড়ী জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যেখানে যাত্রীর সংখ্যা অধিক সেখানে যাত্রী অনুপাতে গাড়ী দেওয়া হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ। ইহাই রেল-কোম্পানীর সনাতন প্রথা।

দশ মিনিটের মধ্যেই তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি ভর্ত্তি হইয়া গেল। কেহ রাত্রে ঘুমাইবার সুবিধার জন্য বাঙ্কের উপর বিছানা পাতিয়া শয়নের সুব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে, কেহ-বা বিছানাটী বেঞ্চির উপর বিছাইয়া তিনজনের জায়গা অধিকার করিয়া বসিয়াছে, কেহ আবার এই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দিব্বি নাক ডাকাইবার ভান করিতেছেন। নিদ্রিত বোধে কোন ভদ্রলোক দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে না জাগাইলে হয় তো গন্তব্য স্থান পর্য্যন্ত আরাম করিয়াই যাইতে পারিবেন। এলাহাবাদ যাত্রী কোন ভদ্রলোক একখানি গাড়ীর ভিতর

এত মাল তুলিলেন যে রেল-কোম্পানীর তাহা ওজন করিবারও ধৈর্য্য থাকিতে পারে না। যথাসম্ভব বাঙ্কের উপর ট্রাঙ্ক ও বিছানাগুলি সাজাইয়া ছোট-খাটো জিনিসগুলি বেঞ্চির নীচে রাখিলেন। একজন ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এত মাল, ব্রেকে দিতে পারেন নি ?"

এলাহাবাদগামী ভদ্রলোকটী ইহার জবাব দিলেন না,—বুদ্ধিমানের মতন স্বকর্ম্ম সাধন করিতে লাগিলেন। ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে মনে করিয়া ঝাড়ু তৈরী করিবার জন্য সের দশেক কাঁচামাল আনিয়াছিলেন; তাহা রাখিবার জন্য বাঙ্কের উপর একটু সুবিধামত জায়গা দেখিতে লাগিলেন।

আর এক ভদ্রলোক একছড়া কলা ও একটী তোলা উনুন (বালতীর তৈরী) রাখিবার জায়গা খুঁজিতেছিলেন। অন্য কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া উপরে বন্দুক রাখিবার হুকের সঙ্গে লট্‌কাইয়া দিলেন। আর এক ভদ্রলোক ইহা দেখিয়া বলিলেন, "এদিকের হুকে না রেখে বরং মহাশয়ের মাথার উপর যে হুকটী আছে তাহাতে রাখুন। দৈবাৎ, বলা যায় না, ছিঁড়ে পড়লে এ বুড়োকে আর কেন কষ্ট দেবেন ?" সকলে হাসিয়া উঠিল। প্রথম ভদ্রলোকটীর ভয় হচ্ছিল নিশ্চয়ই; তাহা না হইলে নিজের জিনিস নিজের মাথার উপর না রাখিয়া অন্যের মাথার উপর লট্‌কাইবার আর কিই-বা কারণ থাকিতে পারে ? দ্বিতীয় ভদ্রলোকটী দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আপনার দু'-আনা দামের তোলা উনুন ছিঁড়ে পড়লে লাখ টাকার প্রাণটা যাবে। তা তো কোন কাজের কথা নয় মশাই।" প্রথম ভদ্রলোকটী হাসিয়া বলিলেন, "রেখে যখন দিয়েছি একবার, আবার কি সত্য সত্যই কষ্ট করে অন্যত্র রাখবো ? আচ্ছা আর একটা দড়ী দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিচ্ছি বরং।" এই বলিয়া দড়ী দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিতে লাগিয়া গেলেন।

মাড়োয়ারী ভাইয়ারা সবচেয়ে চতুর ও বুদ্ধিমান। তাঁহাদের যাইতে হইবে বিকানীর অথবা আলোয়ার, নামাত হবে দিল্লীতে; সুতরাং তাঁহাদের শেষ পর্য্যন্ত আরাম করিয়া যাওয়াই দরকার। তাঁহারা যাবেন হয় তো দু'-তিনজন; সঙ্গে See off করতে এসেছেন পনর জন। সঙ্গের লোকগুলি বেঞ্চিতে বসিয়া জায়গা অধিকার করিয়া আছে। ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিলেই সুড় সুড় করিয়া সকলে নামিয়া যাইবেন। নামিয়া যাইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারো জানবার উপায় নাই তাঁহারা ট্রেণের যাত্রী নন।

কেহ-বা তৈজসপত্র এমন প্রচুর পরিমাণে ঢোকাইয়াছেন যে তাহা দেখিলে কাহারো ইচ্ছা হয় না, এই গাড়ীতে আশ্রয় লয়। তাহা বাদে মালগুলি চলাচলের রাস্তার উপর এবং ট্রেণের দরজার গা ঠেসিয়া এমন এলোমেলো ভাবে রাখা, কি ভিতর হইতে, কি বাহির হইতে কাহারো বাহির হইবার বা ভিতরে আসিবার উপায় নাই। জানালার ভিতর মাথা গলাইয়া কসরত করিয়া যদিও বা প্রবেশ করিবার এবং বাহির হইবার উপায় আছে; কিন্তু কোন বাক্স বিছানা তাহার ভিতর প্রবেশ করাইবার জো নাই।

স্ত্রীলোকের গাড়ীর অবস্থা আরও ভয়াবহ। নারী অবলা, মুখে কথাটী নাই। সুতরাং তাহার ভিতর যতদূর ইচ্ছা মাল ও মানুষ প্রবেশ করাও, কাহারো কোন আপত্তি হইবার কথা নয়। অনেকে আবার কষ্টে-সৃষ্টে পুরুষ গাড়ীতে আশ্রয় পাইল; কিন্তু মালগুলি উঠাইল স্ত্রীলোকের গাড়ীতে। কারণ শত অসুবিধায় থাকিলেও এই শ্রেণীর আরোহীরা কোন প্রতিবাদ করিবেন না। এ কথা পুরুষেরা ভালরূপই জানেন। বৃদ্ধা প্রৌঢ়া যুবতী কুমারী শিশু এবং চৌদ্দ পনর বৎসর বয়স্ক কিশোরও মালের সহিত সঙ্কীর্ণ এই গাড়ীর ভিতর আশ্রয় পাইল।

গার্ড সাহেবের হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ফালতু মাড়োয়ারী ভাইয়ারা গাড়ীগুলিকে অপেক্ষাকৃত জনবিরল করিয়া নামিয়া গেলেন। যাঁহারা দাঁড়াইয়া ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো বসিবার জায়গা হইল। কেহবা মালের উপরই বসিলেন। গাড়ীখানার গতি বাড়িতে লাগিল।

একখানা এবম্বিধ গাড়ীর ভিতর একজন ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন—তিনি যাইবেন আলিগড়ে। তাঁহার পার্শ্বেই আর একটী যুবক বসিয়াছেন—তিনি বৃন্দাবন-যাত্রী। দেখিলে বাঙ্গালী বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু তিনি উড়িষ্যাবাসী

—কটক রেভেনশ কলেজের বি-এ ক্লাসের ছাত্র। মস্তক মুণ্ডিত এবং দাড়ী গোঁফ কামানো। একটু হাত পা ছড়াইয়া বসিবার জন্য ব্যগ্র সকলেই। দুই শত মাইলের এদিকে কাহারো নামিবার কথা নয়,—তবু অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য সবাই নিজ নিজ পার্শ্ববর্ত্তীর গন্তব্য স্থান জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেছেন। আশা এই, কখন তাহার একটু বসিবার জন্য বিস্তৃত জায়গা মিলিবে তাহার একটা আন্দাজ করিয়া লওয়া।

উড়িয়া যুবকটী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কোথায় যাওয়া হবে?"

আলিগড়গামী ভদ্রলোকটী উত্তর করিলেন, "আলিগড়।"

উড়িয়া-যুবক—"আলিগড় টুণ্ডলার এদিকে কি ওদিকে?"

আলিগড়গামী, "আজ্ঞে, আমাকে টুণ্ডলার আরও দু ষ্টেশন পর নামতে হবে।"

যুবকটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সম্ভবতঃ মনে মনে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছিলেন।

গাড়ীখানা বর্দ্ধমানে থামিতেই যুবকটী গাড়ী হইতে নামিতে চাহিলেন। স্ত্রীলোকের গাড়ীতে তাঁহার সঙ্গের আরও যাত্রী আছেন, তাঁহাদের খবরাখবর লইবার ইচ্ছা। যুবক অতি কষ্টে গাড়ী হইতে নামিলেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে আর পারেন না। অতি কষ্টে ভিতরে দেহখানি প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তাহার পর তাঁহার আর কোন কষ্ট নাই—সকলে হাতাহাতি করিয়া তাঁহাকে একখানা বেঞ্চির উপর পৌঁছাইয়া দিল। বেঞ্চির সে জায়গাটী পূর্ব্বে খালি ছিল না—একটী লোক শুইয়া ছিল। সুতরাং তাঁহাকে বিছানার উপর দিয়া জুতা পায়ে নিজের জায়গায় পৌঁছতে কোনই বেগ পাইতে হইল না।

বিকানীরগামী এক ভদ্রলোক তাঁহার এই অন্যায় ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন, কেন না বিছানাটী তাহার সঙ্গীর। সে সম্প্রতি পাইখানার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। ভদ্রলোকটী উচ্চ স্বরে হিন্দিভাষায় স্বগতোক্তি করিয়া বলিলেন, "মহাশয় যখন এমন আরামপ্রিয়, তখন উচিত ছিল একখানা গাড়ী রিজার্ভ করিয়া যাওয়া।"

উড়িয়া যুবক সম্ভবতঃ এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিল না। কেন না সে কোনই উত্তর দিল না। কিন্তু এ কথার উত্তর আসিল আলিগড়গামীর মুখ হইতে। সে বলিল, "এ কথা খুবই সত্য—আরামপ্রিয়দের গাড়ী রিজার্ভ করিয়া যাওয়াই সঙ্গত। তাহাতে বিছানাও নষ্ট হয় না, অন্য কাহারো মুখদর্শন করিতেও হয় না। তা ছাড়া একলা তিনজনের জায়গা দখল করিলে হিংসা করবারও কেহ থাকে না।"

বিকানীরগামীর মাথায় আর কোন জবাব আসিতেছিল না। সে নীরবে বসিয়া একখানা পুরাতন বস্ত্রকে খণ্ড খণ্ড করিতেছিল,—কেন না তাহা তাহার সঙ্গীর কাজে লাগিবে। ক্ষণকাল পরে যখন পাইখানাগামী আসিল, তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া সকলে থ হইয়া গেল। তাহা দেখিলে মনে হয় না তাহার শরীরে রক্তের লেশও আছে। তাহার দুতিন জন সহযাত্রী তাহাকে ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল এবং একজন তাহার মস্তকে হাওয়া করিতে লাগিল।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল প্রকার তত্ত্বের উপরই বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করিয়া কমবেশী তাহাদের স্বরূপ লোকসমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু 'গন্ধ' তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা নির্ব্বাক। এ সম্বন্ধে লেখকের ধারণা—গন্ধের প্রভাব দিনের আলোতে তত বেশী বিস্তৃত হয় না, যত না কি সে রাত্রের আবহাওয়ায় নিজেকে বিস্তৃত করে। এর প্রমাণ হাস্নাহেনার গন্ধ। দিনের বেলায় গাড়ীর দুর্গন্ধ অনুভূত হয় নাই; কিন্তু ধানবাদে গাড়ী পৌঁছিতেই এমন তীব্র দুর্গন্ধ অনুভূত হইতে লাগিল যে ইহা সহ্য করিয়া পঞ্চাশ ষাটটী প্রাণী কি করিয়া গাড়ীর ভিতর শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িতেছেন তাহা চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত। একজন "গন্ধ গন্ধ" বলিয়া নাকে রুমাল দিতেই সকলে সমস্বরে 'আহা' 'উহু' করিয়া নাকে রুমাল অথবা সাধ্যমত গামছা বা পরিধেয় বস্ত্র তুলিয়া নাসিকা বন্ধ করিতে লাগিল।

কারণ খুব স্পষ্ট। রোগী বিকানীরগামীরই এই কর্ম্ম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, রোগীটী বৎসরাধিক কাল রক্ত আমাশয় রোগে ভুগিতেছে। সম্ভবতঃ এ তাহার একেবারে অন্তিম অবস্থা এবং নাড়ীভুঁড়িগুলি পচিয়া তাহাই মলাকারে অনবরত বাহির হইতেছে।

গার্ড সাহেব গাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন।

দিল্লীযাত্রী একজন বাঙ্গালী ইংরেজী ভাষায় বলিলেন, এ গাড়ীর ভিতর ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, একটী লোক অনবরত মলত্যাগ করিতেছে।"

গার্ড সাহেব জানালার ভিতর উঁকি মারিয়া রোগীকে দেখিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কি কলেরা?"

বিকানীরগামী বলিলেন "না সাহেব, এক বৎসর হবে আমাশয় রোগ এর।"

গার্ড সাহেব দিল্লীগামীকে বলিলেন, "যখন ইহার কলেরা নয়, তখন ইহাকে নামিয়ে রাখা চলে না। সেও ভাড়া দিয়া যাইতেছে। আপনারও এই ট্রেনে চলিবার যেমন অধিকার উহারও তেমনি অধিকার আছে।"

ইহা শুনিয়া পাঁচ সাতটী ভদ্রলোক সমস্বরে এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করিল এবং গার্ড সাহেবকে শুনাইয়া দিল, যদি প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীদের মধ্যে এরূপ ঘটিত তাহা হইলে এই প্রকার মন্তব্য তিনি কিছুতেই প্রচার করিতে পারিতেন না। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। গার্ড সাহেব অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে বলিয়া গেলেন, "গয়া ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিলে উহাকে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করান হইবে। তিনি যদি বলেন গাড়ী হইতে ইহাকে নামান হইবে।"

সত্যই তো। যাহারা তিনগুণ কিম্বা সাতগুণ ভাড়া গুণতে না পারবে তাহাদের আবার গন্ধাগন্ধের বিচার কি? তাহারা যে গাড়ীর ভিতর বেঞ্চির উপর একটু স্থান পাইয়াছে তাহাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। অথচ, যদি প্রত্যেক শ্রেণীর সুখ-সুবিধার সাজসরঞ্জামের ওজন রেল কোম্পানীর আয় ব্যয়ের হিসাবের মাপকাঠি হয় তাহা হইলে হয় তো দেখা যাইবে প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী ও তাহাদের সুবিধার জন্য নিয়োজিত রেষ্টুরেণ্ট ওজন এই হতভাগ্য তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর গাড়ীর চেয়ে অধিকই হইবে এবং সেই অনুপাতে এই দ্বিবিধ যাত্রীদের নিকট হইতে আয়ের হিসাব করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে এই শেষোক্ত শ্রেণীর হতভাগারা প্রথমোক্ত শ্রেণী-দের চেয়ে চতুর্গুণ মূল্য দিতেছে। অথচ তাহাদের সুখসুবি-ধার বিষয় চিন্তা করিলে, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ব্যতীত আর কোনই কথা বলা চলে না। অন্ধকূপ হত্যার মতন ভীড় হইলেও চিরন্তন প্রথার এদিক ওদিক হইবে না।

একখানি গাড়ীতে কতজন সৈন্য এবং কতজন সাধারণ যাত্রী বসিবে তাহার স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্দেশ আছে। যাত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ হইলে আয়ের অঙ্কও দ্বিগুণিত হয়। কিন্তু গাড়ীর সংখ্যা একেবারে নির্দ্দিষ্ট। যাত্রী রেল কোম্পানীকে ফাঁকি না দেয় তাহার জন্য টি-টি-আই আছে, ক্রু আছে। কিন্তু যাত্রীর সুবিধা অসুবিধা দেখিবার জন্য ভগবান ব্যতীত আর কেহই নাই। টি, টি, আই কিম্বা ক্রুর নিকট অসুবিধার কথা বলিলে তাহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ব্যতীত একচুল এদিক ওদিক করিতে পারেন না। অসুবিধা হয় উচ্চতর শ্রেণীতে যাও, সেখানে অসুবিধা হয়, আরও উচ্চতর শ্রেণীতে টিকেট বদলি কর। সেখানে অসুবিধা বোধ করিলে গাড়ী রিজার্ভ করিতে পার। যাহারা অপারগ তাহাদের সহ্য করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় পথ নাই।

রাত্রি প্রায় বারটা নাগাদ গাড়ী গয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। সকলের মনেই আশা হইতেছিল গয়ায় আসিলে এ যন্ত্রণার একটু লাঘব হইবে। কারণ ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই যাত্রীদের দুঃখ বুঝিবেন। ষ্টেশনে গাড়ী আসিবা মাত্রই ডাক্তারবাবুর আবির্ভাব হইল। অনুষ্ঠানের ত্রুটী নাই; কারণ ধানবাদ হইতেই টেলিগ্রাম কিম্বা টেলিফোনে এই সংবাদ গয়ায় জানান হইয়াছিল। ডাক্তারবাবু প্লাটফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "যদি এই লোকটীর কলেরা কিম্বা অন্য কোনো ছোঁয়াচে রোগ হয় তাহা হইলে গাড়ীখানি কাটিয়া রাখিয়া অন্য গাড়ী যুড়িয়া দেওয়া হইবে। সেই গাড়ীতে আপনাদিগকে উঠিতে হইবে।" ডাক্তারের কথায় যাত্রীরা সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। তাহাদের মনোভাব যেন এই,—এর চেয়ে দ্বিগুণ দুর্গন্ধ সহ্য করিতেও রাজি আছি কিন্তু বাবা, গাড়ী ছাড়তে পারবো না। সকলের উৎসাহ যেন একেবারে নিভিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু কয়েকটী কুলীর সাহায্যে রোগীকে গাড়ী হইতে বাহিরে নামাইলেন এবং ষ্টেথোস্কোপ দ্বারা তাহার বক্ষ পরীক্ষা করিতে লাগিয়া গেলেন। মাড়োয়ারীরা যা-হোক খুব কাজের লোক। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে জানেন। তাহাদের মধ্যে দু'একজন প্লাটফর্ম্মে নামিয়া ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কিছু বাক্যালাপ করিলেন।

কিছু আদান-প্রদান হইল কি না রাত্রের অন্ধকারে লোকচক্ষুর অগোচরেই রহিল। পরীক্ষান্তে যখন ডাক্তার বাবু রায় বাহির করিলেন তখন কিন্তু সকলেরই চক্ষুস্থির। ডাক্তারবাবু বলিলেন, "রোগ ছোঁয়াচে নয়, কলেরাও নয়। আমাশয় সুতরাং ট্রেণে যাইতে কোন বাধা নাই।" যাইবার সময় একটী টাইকোটিস টেবলেট তাহার মুখে পুরিয়া দিবার জন্য কম্পাউণ্ডারকে আদেশ করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। আরোহীবৃন্দ গাড়ী হইতে নামিতে হইল না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিলেন।

দীর্ঘতম রাত্রিরও অবসান হয়; কিন্তু দুঃখের রজনী এমনই দীর্ঘ হইয়া ওঠে যে তাহার যেন আর শেষ নাই। সকলেই সম্ভবতঃ ডাক্তারবাবুর সুবিচারটী মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। ডাক্তারবাবু গাড়ীর ভিতর আসিয়া একবার পর্য্যুসিত মলের গন্ধের তীব্রতা অনুভব করিলেন না, একটী লোকের জন্য পঞ্চাশ যাটটী লোক কত অবর্ণনীয় অসুবিধা ভোগ করিতেছে তাহা বুঝিলেন না, অথচ নিঃসঙ্কোচে বলিয়া দিলেন ভয়ের কোন কারণ নাই। কি রাজভাষায় সুদক্ষ দুই শত টাকা মাইনার কেরাণী, কি নবদ্বীপের আচার-নিষ্ঠাবান বেনারসযাত্রী ব্রাহ্মণ—এই গাড়ীতে যখন ঢুকিয়াছ, তখন তোমাদের সঙ্গে ঐ বিকানীরগামী মুমূর্ষুর কিম্বা আচার-নিষ্ঠাবর্জ্জিত চণ্ডালের পার্থক্য কিছুই নাই।

যে জাতির মনে ত্যাগের স্থান নাই তাহারা অসুবিধা ভোগ করিবে না তো কে করিবে? পনর মিনিট পূর্ব্বে আসিয়া নির্ঝঞ্ঝাটে যে মালপত্র ব্রেকে দেওয়া চলে, তাহা না করিয়া যাহারা শত শত যাত্রীর অসুবিধা করিয়া রাশিকৃত মাল সঙ্কীর্ণ গাড়ীর মধ্যে চালান করে, দু'আনা দামের তোলা উনুন যাহাদের কাছে লাখ টাকার প্রাণের চেয়ে মূল্যবান; এবং সেটী পড়িয়া গেলে নিজেরো ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে হইবে না—অথচ মাথাটা অন্যেরই ভাঙিবে, এরূপ যাহাদের মনোবৃত্তি, তাহাদের নিকট ত্যাগের মাহাত্ম্য প্রচার করা অরণ্যে রোদনের মতই নিস্ফল। আজ রেল কোম্পানী দয়া পরবশ হইয়া একখানা Invalid গাড়ী স্বতন্ত্রভাবে জুড়িয়া দিলে তাহাতে সুস্থ সবলকায় যাত্রীর প্রবেশের বাধা হইবে না; কিম্বা তাহার রোগের অজুহাতেরও অভাব হবে না, অথচ প্রকৃত রোগীর জন্য সে গাড়ীতে স্থান দুর্লভ হইবে। অন্যের অসুবিধার প্রতি আমরা দৃকপাত করিব না, অথচ নিজেদের সুখ সুবিধা ষোল আনা চাই, এরূপ ভাব যাহাদের মনের মধ্যে বলবৎ তাহাদের দুঃখের অবসান করিবার ক্ষমতা ভগবানেরও নাই।

রোগী মাড়োয়ারী ভাইয়া স্বদেশের আবহাওয়ায় রোগমুক্ত হউন অথবা মোক্ষলাভ করুন তাহাতে কাহারো কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। রোগীর উপর সবলকায়ের সহানুভূতি জন্মগত; এজন্য তিনি যেন সংসারকে নির্ম্মম প্রতিপন্ন না করেন। কিন্তু মৃত কি মুমূর্ষু যদি সবলকায়ের সঙ্গে টাকার জোরে সমান তালে পা ঠুকিয়া চলিতে চাহেন তাহা হইলে উভয় শ্রেণীর মধ্যে একটু ঠোকাঠুকি অনিবার্য্য। ডাক্তারবাবু যেরূপ সুবিচার করিলেন, রেলে ষ্টীমারে সেরূপ সুবিচার অনিবার্য্য এবং তাহা আমাদের গা সহা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে এই অসংখ্য নরনারী যে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিল, তাহা তাহাদের মনে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

পল্লীর বেদনা

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

নীরব হয়েছে গ্রাম, অশথ পাতার গায়
জ্যোছনা করিছে চিকমিক,
বাঁশ বনে ঝিঁঝিঁ ডাকে, বাতাবি ফুলের বাস
মাঝে মাঝে ভুলে যায় দিক্।

ছেঁড়া মাদুরের পরে ঘুমাইছে অকাতরে
মাতৃহারা ছেলে মেয়ে গুলি,
মাঝে মাঝে স্বপ্ন-ঘোরে তাহাদের শীর্ণ বুক
দীর্ঘশ্বাসে উঠে ফুলি ফুলি।

দাওয়ায় বসিয়া পাঁচু ভাবে গালে রাখি হাত
চোখে জল ঝরে দরদর,
সারা দিন খেটে খুটে নিরিবিলি এই তার
কাঁদিবার শুধু অবসর।

ভাবে পাঁচু মনে মনে ক'রে ত গোরুর সেবা
ক্ষেতে মাঠে সব কাজ সারি',
এই ত বাঁটনা বেঁটে শাক পাত কুটে নিয়ে
দুই বেলা রাঁধিতেও পারি।

ওয়ায়ে খাওয়ায়ে নিতি এদের পাড়াই ঘুম,
তামাক নিজেই নিই সেজে,
য়ের পুকুর হ'তে আনিতেও পারি জল,
থালা বাটি নিজে লই মেজে।

কলা সবি ত পারি, তবে কেন মিছিমিছি
তারে আমি খাটাতাম এত?
পটে ছেলে পিঠে ছেলে রান্নাঘরে ঢেঁকিশালে
না জানি সে কত দুঃখ পেত।

আট হাতী শাড়ী প'রে ধূলা ধোঁয়া ঝুল মেখে,
খাটিয়া যেত সে দিন ভোর,
সবল দেহটা নিয়ে দেখে ভাবিতাম ব'সে,
ও-কাজ আমার নয়,—ওর।

সময়ে না পেলে ভাত করিতাম রাগারাগি,
বুঝিনি কখনও তার জ্বালা,
যাহা মুখে আসে তাই বলেছিনু একদিন
ভেঙ্গে গেলে পিতলের থালা।

সাধে কি বলিয়া চাষা লোকে কয় কটুভাষা,
বোকা ব'লে করে অনাদর,
বানরের গলে হায় শোভে কি মোতির মালা?
কেমনে সে বুঝিবে কদর?

খেটে খেটে হয়রাণ হলো কি তাহার প্রাণ?
চ'লে গেল তাই ক'রে রাগ?
কোন দিন মুখ ফুটে বলেনি ত, 'লও তুমি
একটুকু খাটুনির ভাগ।'

হাতে হাত রেখে মোর ব'লে গেল,—"লও এই
ছেলেপুলে, রহিল সংসার,
চ'লে যাই, পিছে চাই ভেবে বড় ব্যথা পাই
একলা কেমনে ব'বে ভার।"

আজ যদি ফিরে আসে বলি তবে—"দেখ ব'সে
একলাই সব আমি পারি,
খোকাধনে কোলে ক'রে তুমি শুধু দেখে যাও,
ছেড়ে দাও ডালা কুলো হাঁড়ি।

এ খাটায় এ দেহের কিছুই হ'বে না ওগো,
আমারে মরণ করে ভয়,
তুমি শুধু চেয়ে দেখ, তুমি শুধু বেঁচে থাক,
ঘরখানি ক'রে আলোময়।"

———

অগ্নিগর্ভ মাঞ্চুরিয়া

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

১৮৬০ সালে কোরিয়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের অত্যাচারে পীড়িত কোরিয়ানরা দলে দলে মাঞ্চুরিয়ার অন্তর্গত চিয়েন্তাওয়ে পালিয়ে যায়। উপস্থিত মাঞ্চুরিয়া-প্রবাসী কোরিয়ানদের সংখ্যা দশ লক্ষের অধিক। এদের শতকরা নব্বই জন কৃষিজীবী, অবশিষ্ট শতকরা দশজন সহরে বাস করে। এদের মূলধন নেই, সম্পত্তি বলে কিছু নেই। তারা মাঞ্চুরিয়ায় গিয়ে পড়ে,—জমি নিয়ে চাষবাস আরম্ভ করে। চীনা জমিদারের কাছ থেকে তারা নেয় টাকা ধার এবং ফসল বিক্রী করে দেনা শোধ দেয়। জমিদাররা সুদে আসলে যা ফেরৎ পায় তা আসলের প্রায় দ্বিগুণ।

১৯২১ সালে চ্যাং-সো-লিন কোরিয়ান্ কৃষকদের সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি-নিষেধ প্রচার করেন। অর্থাৎ চাষের জমিতে জল আনবার প্রয়োজন হলে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ নিতে হবে, ফসল সীমান্তের বাইরে বিক্রী করা চলবে না; এবং যদি কোন চীনা জমিদার কোরিয়ানদের জমি বিক্রী করে, তা হ'লে বিনা অনুমতিতে সরকারী জমি বিক্রী করবার অপরাধে তার দণ্ড হবে। উপরন্তু কোরিয়ানরা সঙ্গে রিভলভার রাখতে পারবে না, কোন সামরিক দল গঠন করতে পারবে না। কোরিয়ানদের অভিযোগ এই যে, মাঞ্চুরিয়ার মত নির্ব্বিঘ্নতা-শূন্য স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অস্ত্রাদি রাখবার প্রয়োজন খুব বেশী। চাং-সো-লিনের আধিপত্যের সময় এই আদেশগুলি কেবল প্রচার করাই হয়েছিল, সঠিক প্রয়োগ করা হয় নি। যে দিন চাং সুয়ে লিয়াংএর হাতে ক্ষমতা এল, সে দিন হ'তে এই বিধি-নিষেধগুলি এমন কঠোরতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হতে লাগল যে, কোরিয়ানরা উঠল অস্থির হয়ে। নানা অজুহাতে কোরিয়ানদের গ্রেপ্তার করে স্থানান্তরে প্রেরণ করা হতে লাগলো। এমন কি, কোরিয়ানদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির উপরেও কর্ত্তৃপক্ষ অত্যাচার-উপদ্রব আরম্ভ করেন। কোরিয়ানদের সম্বন্ধে চীন ও জাপানের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, চীনের কাছে তার আর কোন মূল্যই রইল না। ধৃত কোরিয়ানদের বিচারের সময় জাপানী কর্ম্মচারীরা সাহায্য করতে গিয়েও পূর্ণ সুযোগ পেত না।

প্রতিনিধিসভার নূতন অট্টালিকা

রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বার

এ ছাড়া, বিভিন্ন খনির অধিকার নিয়েও চীন-জাপানের মধ্যে যে গোলযোগ চলে এসেচে, তাও উপেক্ষার বিষয় নয়। ১৯০৯ সালে চীন-জাপানের যে চুক্তি হয়, তদনুসারে দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ ও অন্তঃ-মুকদেন রেলপথের ধারের খনিগুলিতে চীন ও জাপানের

টোকিয়োর একটী প্রসিদ্ধ হোটেল

সমান অধিকার পাবার কথা। ১৯১৫ সালের চুক্তি অনুসারে আরও নয়টী খনিতে জাপানের কাজ চালাবার অধিকার লাভ করবার কথা। কিন্তু ক্রমে ক্রমে চীন কর্তৃপক্ষের আচরণের ফলে অবস্থা এমনি দাঁড়ায় যে, কতকগুলি খনি জাপানের হস্তচ্যুত হয় বললেই হয়।

অবস্থা যদি সত্যই এমনি আকার ধারণ করে থাকে, তা হলে জাপানের অসন্তোষের কারণ ছিল বলা যেতে পারে। জাপানের মতে, চীনের ব্যবহারে জাপানের ধৈর্য্যচ্যুতির যথেষ্ট এবং সঙ্গত কারণ ছিল। ১৯৩১ সালে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। নিজের হৃত অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য অতিমাত্রায় ব্যাকুল হয়ে চীন এমন সব আচরণ করলে, যা জাপানের মত শক্তিশালী জাতির পক্ষে সহ্য করা কঠিন। জাপান ইতঃপূর্ব্বে শান্ত ভাবে চীনের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করছিল, কিন্তু চীন সেটাকে জাপানের দুর্ব্বলতা বলে ভুল করলো। এই ভুল ধারণার ফলে তাদের মনে জাগলো দুঃসাহস; এবং ওয়ান্‌পায়োসানের ঘটনা, মুকদেনে জাপানীদের উপর

অষ্টাদশ শতাব্দীর একখানি চিত্র

চীনা পুলিশের অত্যাচার, হারবিনে জাপানীদের অপমান ও জাপানীদের বাঁধ নির্ম্মাণ-কার্য্যে চীনের হস্তক্ষেপ তারই ফল। ওয়ান্‌পারোসানে চাংচুন থেকে চৌদ্দ

তাওয়াদা হ্রদ

মাইল দূরে একটী ছোট গ্রাম। চীনা কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ নিয়ে এখানকার শস্যক্ষেত্রগুলিতে প্রতিদিন প্রায় দুই শত কোরিয়ান কৃষক কাজ করে। ১৯৩১ সালের মে মাসের

শেষে চাংচুন পুলিশ এই অঞ্চলে বাঁধ নির্ম্মাণ বন্ধ করবার আদেশ দেয় এবং পঞ্চাশজন সশস্ত্র পুলিশ পাঠিয়ে সেখান থেকে কোরিয়ানদের তাড়াতে আরম্ভ করে। এই শস্যক্ষেত্রগুলি থেকে যথেষ্ট লাভ হবার সম্ভাবনা ছিল বলেই চীনের কর্ত্তৃপক্ষ এই উপায় অবলম্বন করেছিলেন এবং মার্শাল চ্যাং সুয়েলিয়াং চেয়েছিলেন মাঞ্চুরিয়া থেকে জাপানের প্রভাব দূর করতে।

একটী পুরাতন প্রাসাদের নৈশ দৃশ্য

কোরিয়ানরা কিছু কাল অত্যাচার-উপদ্রব নিঃশব্দে সহ্য করেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদেরও ধৈর্য্যের বাঁধ গেল ভেঙে। চীনের কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জাপানের অসন্তোষ ভীষণ আকার ধারণ করলো ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে—ক্যাপ্টেন নিকামুরাকে হত্যা করার সংবাদ প্রচারিত হবার পর। ক্যাপ্টেন নিকামুরা একজন মঙ্গোলিয়ান ও আর একজন রাশিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ব্ব-চীন রেলপথে তাওনান অঞ্চল পরিদর্শন করতে যান এবং সেইখানেই চীনা সৈনিকরা তাঁকে ঘেরাও করে' হত্যা করে। ক্যাপ্টেন নিকামুরা জুন মাসে নিহত হন, কিন্তু সে সংবাদ ব্যক্ত হয় জুলাই মাসে। এত কাল সংবাদটা বোধ করি চেপে রাখা হয়েছিল।

তার পর ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা। এই দিন রাত্রিতে চীনা-বাহিনী লিউতিয়াকাও নামক স্থানের রেলওয়ে সেতুটী ডিনামাইটের সাহায্যে উড়িয়ে দেয়। এই ঘটনায় জাপানের সমস্ত অবরুদ্ধ ক্রোধ আগুনের মত জ্বলে উঠ্‌লো এবং মাঞ্চুরিয়াকে কেন্দ্র করে চীন ও জাপানের মধ্যে যে দীর্ঘ সংগ্রাম চলেছিল এইটাই তার প্রত্যক্ষ কারণ।

কাবুকী থিয়েটার

মাঞ্চুরিয়াকে উপলক্ষ্য করে চীন জাপানের এই যে সংগ্রাম তা এত

চালের ঘটনা যে এখানে তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। সুতরাং এইবার আমরা মাঞ্চুরিয়ায় নূতন শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করে এই প্রবন্ধ শেষ করবো।

মাঞ্চুরিয়া এবং মঙ্গোলিয়া এক কালে চীন গণতন্ত্রের অর্দ্ধ-স্বাধীন দুটী অংশ ছিল বললে আর যাই হক সত্যের অপলাপ করা হয় না। কিন্তু চ্যাং-সো-লিন এবং তাঁর পুত্র চ্যাং-সুয়ে-লিয়াং এর অত্যাচারে মাঞ্চুরিয়ার অধিবাসীরা ক্রমে বন্ধন-মুক্তির জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। তার পর ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিউতিয়াওকোউ নামক এক স্থানে গিয়ে একদল চীনা সৈন্য যখন দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া রেলপথের একাংশ বিনষ্ট করলো, তখন মাঞ্চুরিয়া এবং জাপানের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। সংঘর্ষ বাধলো এবং তার ফলে জেনারল চ্যাং-সুয়েলিয়াং দলবল সহ মাঞ্চুরিয়া থেকে বিতাড়িত হলেন। মাঞ্চুরিয়ার জনসাধারণের মধ্যে একটা নূতন ভাবের সন্ধান মিললো। এই ভাবগতির প্রতি লক্ষ্য রেখে সর্ব্বপ্রথম নানকিং গভর্ণমেণ্টের আধিপত্য অস্বীকার করে কিরিন প্রদেশের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন জেনারল সি, সিয়া। মাঞ্চুরিয়াতেই তাঁর জন্ম এবং তিনি সর্ব্বপ্রথম চীনের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সুয়ানতাংকে মাঞ্চুরিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবার প্রস্তাব করেন। চীন এবং জাপানের মধ্যে যখন সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন তিনিই কিরিন-প্রদেশের উত্তরবিভাগের সৈন্যবাহিনীর ষ্টাফ জেনারেল ছিলেন। মুকদেনে হাঙ্গামা করিবার দশ দিন পরে অর্থাৎ ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি কিরিনে স্বাধীন শাসনতন্ত্র গঠন করে নিজেই তার কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এমনি করে তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে কিরিন নানকিং সরকারের রাহু গ্রাস থেকে মুক্ত হয়। কিরিনের স্বাতন্ত্র্য ক্রমে অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের চিত্তে প্রেরণা সঞ্চারিত ও সংক্রামিত করে।
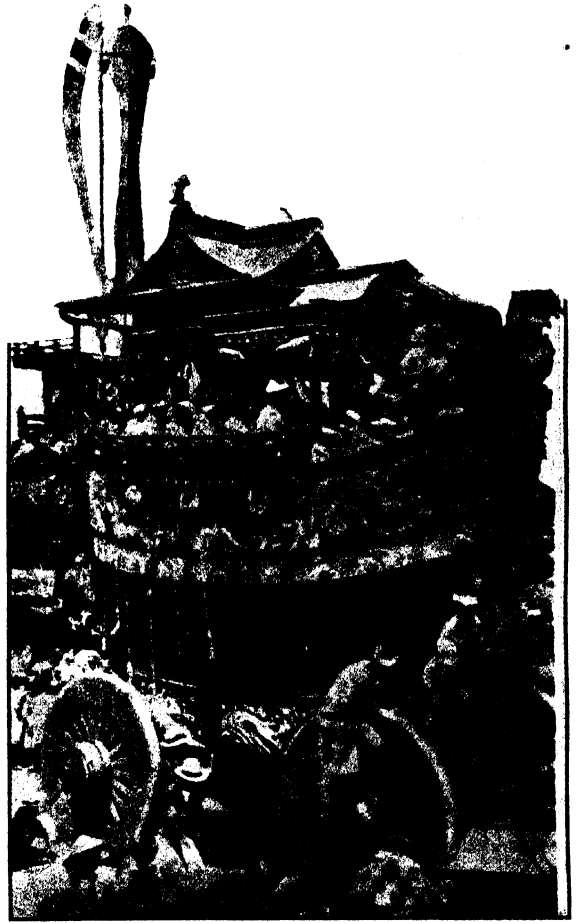
উৎসবের রথ

'নো'-নৃত্যাভিনয়

অক্টোবর মাসের প্রথমেই তাওসো সীমান্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক চ্যাং-হাই-পেং উক্ত অঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজেই গভর্ণর হয়ে বসেন। ইনি চীনের ভূতপূর্ব্ব সম্রাটকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন এবং প্রতিদিন প্রাতে তাঁর প্রতিকৃতিকে নমস্কার করেন। তাওসো অঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণার পর কয়েকদিন যেতে না যেতে হারবিনের পূর্ব্ব অঞ্চলের

প্রাচীন দেবী-মূর্ত্তি

নেতা মিষ্টার চ্যাংচিঙ্ হুইও হারবিনের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন। ১৫ই অক্টোবর পূর্ব্ব সীমান্তের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। শেষ পর্য্যন্ত মুকদেনও জেনারল চ্যাং-সুয়ে-লিয়াং-এর অধীনতা অস্বীকার করে।

সিৎসিহারের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হেলুংকিয়াং প্রদেশের অস্থায়ী নেতা জেনারল মা-চান-সান রাজধানী ত্যাগ করে তাঁর নিজের দেশ হাইলুনে পালিয়ে যান। ফলে হারবিণ অঞ্চলের নেতা ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে সেই স্থানে গিয়ে কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং এই অঞ্চলও স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হয়। এমনি করে পূর্ব্ব দিকের তিনটী প্রদেশ চীন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'ল এবং হুলুনবেয়ারের রাজাও মধ্য মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত চেলিমুর নেতাও এই স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। জেহল প্রদেশের নেতা তাং-ইউ লিন্ও অবশেষে সকল প্রকার দ্বিধা-সঙ্কোচ ত্যাগ করে জেহলের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। মঙ্গোলিয়া এবং মাঞ্চুরিয়া থেকে নানকিং গভর্ণমেণ্টের আধিপত্য দূর হল এবং স্বতন্ত্র একটী রাষ্ট্র-গঠনের ভিত্তি স্থাপিত হ'ল।

আদিম বাসিন্দা

এইবার বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সম্মিলিত একটী রাষ্ট্র গঠনের জন্য আলোচনা চলতে লাগলো। ১৯৩২ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী হারবিন্ সহরে জেনারল মা চান্-শান্ এবং মিষ্টার চ্যাংচিংহুইর মধ্যে আলোচনার ফলে স্থির হ'ল, নব রাষ্ট্র গঠনের জন্য মুকদেন সহরে ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে তিন দিন ব্যাপী আলোচনা আরম্ভ হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাঞ্চুরিয়ার পূর্ব্ব অঞ্চলের সকল অংশ থেকে এসে নেতারা মুকদেনে সমবেত হ'লেন এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারী বেলা তিনটের

সময় মিষ্টার চ্যাংচিংহুইর বাটীতে আলোচনা-সভা বসল। ১৮ই তারিখে মিষ্টার চ্যাংচাও সিন্-পোর বাটীতে এই আলোচনা শেষ হ'ল এবং নবরাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের উপযোগী সমস্ত বিষয়ে মোটামুটি একটা মীমাংসা করা হ'ল। এই দিনই বেলা সাড়ে এগারটার সময় সভার কার্য্য-নির্ব্বাহকসমিতি এক দীর্ঘ ঘোষণাপত্র প্রচার করে জানালেন যে উত্তর-পূর্ব্ব মাঞ্চুরিয়ার চারিটী প্রদেশ মিলে নবরাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এই নবরাষ্ট্র নানকিনের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখবে না,—এই নূতন রাষ্ট্র হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি মিষ্টার চ্যাংচিং-হুই, মিষ্টার শ্যাং শী-ই, জেনারল মা চান্‌শান, মিষ্টার টাং ইউলিন এবং মঙ্গোলিয়ার রাজকুমার দ্বয়—লিং শেং ও চিওয়াং।

২৫শে ফেব্রুয়ারী এই কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির আর একটী সভা হয় এবং এই সভায় স্থির হয়—

(১) এই রাজ্যের নাম হ'বে 'মাঞ্চুষ্টেট্'

(২) এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

(৩) এই রাজ্যের অভিজ্ঞান হবে পাঁচটী রংএর একটী নূতন পতাকা।

(৪) চাংচন সহর হবে নবরাষ্ট্রের রাজধানী।

নবরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ১লা মার্চ্চ আর একটী ঘোষণাপত্র প্রচার করে জানান হয় যে তাঁরা চৈনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করলেন, সাময়িক আধিপত্য অস্বীকার করলেন। তাঁরা আরও জানালেন যে পুরাতন শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করা হবে, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রচারিত
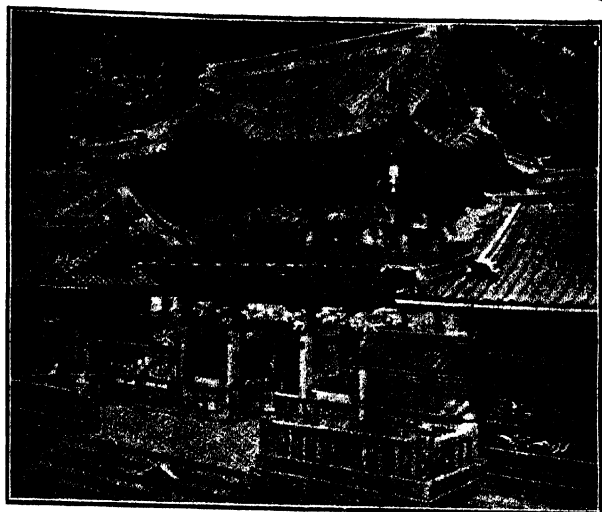
জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মন্দির তোশুগুর প্রবেশ-পথ

হবে, আর্থিক অবস্থা ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা হবে। এই সঙ্গে এ কথাও প্রচার করা হয় যে চীনের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট মিষ্টার পুই এই নবরাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার হবেন।
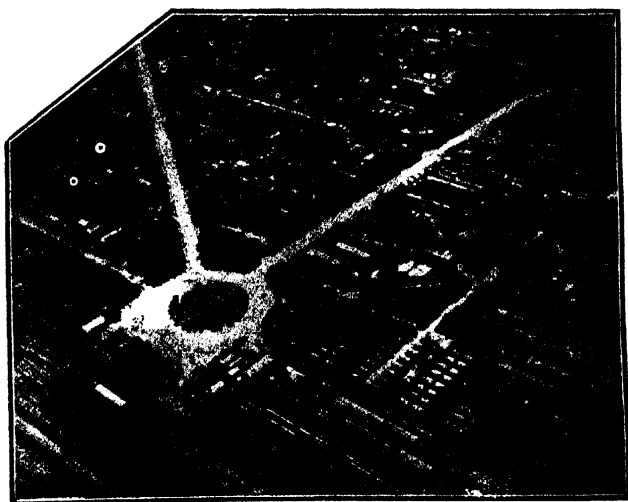
মাঞ্চুরাজ্যের রাজধানী চাংচন্—বিমানপোত থেকে

ঘোষণা অনুযায়ী তাঁরা মিষ্টার পুইকে এই নূতন রাষ্ট্রের ভার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন; এবং তিনি ভার গ্রহণ করতে সম্মত হলে, ৯ই মার্চ্চ চাংচন সহরে বিপুল সমারোহের সঙ্গে নবরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উৎসব সম্পন্ন হয়।

মাঞ্চুরিয়ার নবরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে মাঞ্চুরিয়ার ব্যবস্থাপক-সঙ্ঘের সভাপতি ডকটর চাও-সিন্ পো যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার কতকটা এখানে উদ্ধৃত করচি। তাই থেকে মাঞ্চুরিয়ার নবরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সহজে বোঝা যাবে বলে আমার বিশ্বাস। তিনি বলেছিলেন—

মাঞ্চু-বংশের দ্বিতীয় সম্রাট তাই-তাং ওয়েনের সমাধি

'আজ আপনাদের কাছে একটা লোকের কথা বলবো। লোকটা আফিমের প্রতি অনুরক্ত। সে ঘুমোয় দিনের বেলা,—তার ঘুম ভাঙ্গে বেলা তিনটে চারটের পর। নেশায় নিজেকে চাঙ্গা করে নিয়ে সে মত্ত হয় নারীদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদে, কিম্বা সুরু করে জুয়োখেলা। এমনি করে প্রতিদিন সময় কাটিয়ে সে শুতে যায়। প্রকৃতি তার নিষ্ঠুর। একবার ক্রুদ্ধ হলে হিংস্র কাজ করতে তার কুণ্ঠা হয় না। এই ধরণের কোন লোকের সঙ্গে দেখা হলে আপনারা কি করতেন? আপনারা কি তাকে আপনাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে শ্রদ্ধা করতেন?

এই লোকটার নাম চ্যাং সুয়ে-লিয়াং। যে দিন উত্তর-পূর্ব্বের প্রদেশগুলিতে তার শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই দিন থেকে সে তার স্বেচ্ছাচার-বাসনা তৃপ্ত করবার জন্যে জনসাধারণের রক্ত শোষণ করচে। শস্যের বদলে সে কৃষকদের দিয়েচে জাল নোট এবং শস্যসামগ্রী বিদেশে বিক্রী করে পেয়েচে খাঁটী সোণা এবং সেই খাঁটি সোণা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েচে। নরহত্যা প্রিয় হাজার হাজার সৈনিকের ভরণ-পোষণের জন্যে সে জনগণের উপর অসম্ভব কর বসিয়েচে এবং অধীন কর্ম্মচারীদের পত্নী ও ভগ্নীদের করেচে অসম্মান। সেদিন থেকে জন-সাধারণ দেউলে হয়েচে, তাদের গৃহের শান্তি ঘুচে গেছে।

ভেবে দেখুন, আপনারা কি এমনি অত্যাচার সহ্য করতে পারেন? আপনারা কি কোন রকম আপত্তি না করে পীড়নের তলে প্রাণ দিতে পারেন? এমনি ধরণের একটা লোকই কি তার ক্ষমতার শিখরে বসে থাকবে? জনগণের সম্মুখে আজ মাত্র দুটী পথ রয়েচে—হয় তারা অত্যাচার সহ্য করতে করতে বিনা-প্রতিবাদে মৃত্যু বরণ করুক, কিম্বা জাগ্রত হয়ে তার বিরুদ্ধে করুক সংগ্রাম।"

ডক্টর চাও সেদিন চ্যাংসুয়েলিয়াং‌এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছিলেন তা কতদূর সত্য সে কথা বিচার করা দুরূহ, কিন্তু তাঁরই অত্যাচারে যে প্রপীড়িত মাঞ্চুরিয়াবাসীর মনে স্বাধীনতার কামনা জেগেছিল তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

সে-দিন এই বক্তৃতায় নবরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে ডাক্তার চাও বলেছিলেন—

জনগণের সন্তুষ্টির নাম শান্তি। সুতরাং জনগণকে সন্তুষ্ট করা ভিন্ন সুদূর প্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'বার সম্ভাবনা নেই। আমরাও এই দিক দিয়েই সুদূর প্রাচ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করচি। আমাদের কার্য্যনীতিই হ'ল তাই। আমাদের যথেষ্ট সময় না দিয়ে অন্যান্য জাতি যেন আমাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করেন; তা'তে সহযোগিতা ও মৈত্রীর বিস্তার বাধা পাবে।

হাকোন হ্রদ
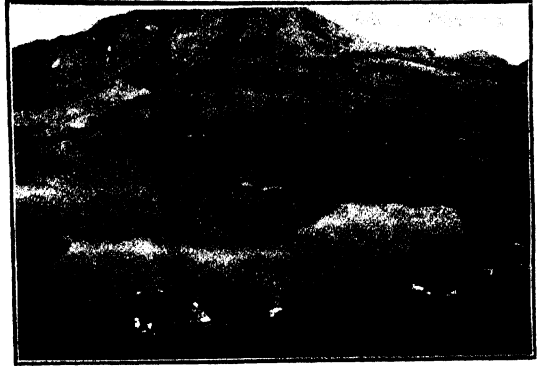
প্রত্যেক নবরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সময় প্রতিষ্ঠাতাদের মুখে এমনি মহৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তার পর একদিন সহযোগিতার পরিবর্ত্তে দেখা দেয় সঙ্কীর্ণতা, জনগণের সেবার পরিবর্ত্তে প্রকাশ পায় সাম্রাজ্যবাদী-সুলভ কার্য্যকলাপ। সুতরাং মাঞ্চুরিয়ায় নবরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই মাঞ্চুরিয়া শান্ত হল এ কথা মনে করে নিশ্চিন্ত হবার প্রয়োজন নেই। অদূর দিনে এই মাঞ্চুরিয়াকে কেন্দ্র করেই যদি আবার অশান্তির অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হয় তা হ'লে আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ থাকবে না।

ত্রিপুরা রাজ্যের সেন্সাস

ডাক্তার রায় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর ডি-লিট্

১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের ত্রিপুর রাজ্যের সেন্সাস বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এখন ১৩৪৩ ত্রিপুরাব্দ চলিতেছে. সুতরাং প্রচলিত বাঙ্গলা সনের সঙ্গে ইহার তিন বৎসর মাত্র তফাৎ।

"সেন্সাস বিবরণীটি" অতি সহজ সুন্দর বাঙ্গলা ভাষায় রচিত হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষা চিরকালই ত্রিপুর রাজদরবারে আদৃত; তাহার ফলে ষ্টেটের সমস্ত দলিল-পত্র আবহমান কাল হইতে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইয়া আসিতেছে। এই সেন্সাস বিবরণীখানি এত প্রয়োজনীয় তত্ত্ববহুল, যে, আমাদের বিশেষ আনন্দ ও গৌরবের বিষয় যে, ত্রিপুরার জনসাধারণ ইহা পড়িয়া বুঝিতে পারিবে। কোন দেশের সেন্সাসের ফলাফল সম্বলিত বিবরণ সেই দেশের নিত্য পাঠ্য অতি দরকারী সামগ্রী; সমগ্র ত্রিপুরবাসী ইহা পড়িয়া তাহাদের সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবে। নিজেদের সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতা জাতীয় শিক্ষার প্রথম সোপান। দুর্ভাগ্যের বিষয় খাস্ বাঙ্গলার বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন প্রণালীর। যে ভাষায় বই লিখিয়া বাঙ্গালী তাহার অনুবাদের দ্বারা জগৎ-বিখ্যাত প্রসিদ্ধি লাভ পূর্ব্বক নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, সেই গৌরবান্বিত বঙ্গভাষা বাঙ্গলার রাজদরবারে অনাদৃত। বাঙ্গালীর শত সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে যে সেন্সাট রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাহা বিদেশী ভাষায় রচিত হইয়া থাকে, বাঙ্গালী জনসাধারণের নিকট তাহা অনধিগম্য। যাহা হউক, এ সকল কথা লইয়া পরিতাপ করা বৃথা।

ত্রিপুরার এই সেন্সাস-বিবরণী লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত ঠাকুর সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা, এম-এ (হার্ভার্ড)। ইনিই ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দে সেন্সাসের অফিসার ছিলেন এবং বর্ত্তমান কালে ত্রিপুরা ষ্টেটের অন্যতম কর্ণধার—সিনিয়ার নায়েব দেওয়ান। ইঁহার আরও একটি গৌরবজনক পরিচয় আছে। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুরের নাম বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। আধুনিক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি এবং সর্ব্ব বিষয়ে পাণ্ডিত্য দ্বারা ইনি ত্রিপুররাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় উচ্চ শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি খাস বঙ্গদেশেও অনেক নাই। তাঁহার উচ্চ শিক্ষিত পুত্র বঙ্গভাষায় যে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা সেই প্রথিত-যশা পিতৃদেবেরই যোগ্য।

এই আদম সুমারী ১৩ই ফাল্গুন ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দে (২৬শে ফেব্রুয়ারী

১৯৩১ খৃঃ) সম্পাদিত হইয়াছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫,২৬২ ; ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সংখ্যা বাড়িয়া হইল ৯৫,৬৩৭ ; তার পর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জনসংখ্যা ১,৩৭,৪৪২ অঙ্কে দাঁড়াইল। কিন্তু ত্রিপুর রাজ্যের এই তিন বৎসরের আদম শুমারী গ্রহণ করিয়াছিলেন ভারত সরকার,—উহা সমস্ত ভারতবর্ষের সেন্সাসের অন্তর্গত ছিল।

১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ত্রিপুরা ষ্টেট স্বয়ং সেন্সাসের ভার গ্রহণ করেন। ১৯০১ হইতে ১৯৩১—এই ত্রিশ বৎসরে চারবার সেন্সাস লওয়া হইয়াছে। যথাক্রমে জন সংখ্যা এই ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে ;—১৯০১—১৭৩ ৩২৫ ; ১৯১১—২২৯৬১৩ ;—১৯২১—৩০৪৪৩৭, ১৯৩১—৩৮২৪৫০। ১৩২০ত্রি (১৯১১ খৃঃ) হইতে ১৩৩০ ত্রি (১৯২১ খৃঃ) পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে জনসংখ্যা শতকরা ১০১ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিগত দশ বৎসরে এই বৃদ্ধি শতকরা ৩০৩এ দাঁড়াইয়াছে। সেন্সাস অফিসার লিখিয়াছেন এই "বৃদ্ধি সন্তোষজনক হইলেও বিভাগের প্রজা বসতির ঘনত্ব খুব নিম্নে" ; আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা সন্তোষজনক নহে। কিন্তু আশার বিষয় এই যে এখনও জনসংখ্যার সুপ্রচুর বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সে সকল লোকনিকটবর্ত্তী প্রদেশ হইতে পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় আসিয়া বসবাস পূর্ব্বক ত্রিপুরার জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, তাহাদের মধ্যে শ্রীহট্টের কৃষকগণের সংখ্যাই সমধিক।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল—

১৯৩১ খৃঃ অব্দে মোট জনসংখ্যা ৩,৮২, ৪৫০

হিন্দু	২,৬১, ৪৮৯ ;—শতকরা	৬৮·৪০।
মুসলমান	১,০৩, ৭১০ ;	২৭·১২।
বৌদ্ধ	১৪, ৩৫১ ;	৩·৮০।
খৃষ্টান	২,৫৯৬ ;	·৬৮।

পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলিতে—চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ও ব্রিটিস ত্রিপুরায় মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৮০ এবং তদূর্দ্ধে। "চতুষ্পার্শ্বে মুসলমানা-ধ্যুসিত স্থানসমূহ বেষ্টিত হইয়াও যে হিন্দু জনসংখ্যা এ রাজ্যে প্রবল ও সন্তোষজনকরূপে উত্তরোত্তররূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মূল কারণ এই যে রাজ্যাধিপতি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, এবং সাম্প্রদায়িক কলহের অবর্ত্তমানে হিন্দুগণ নিরুপদ্রবে এ রাজ্যে বাস করিতে পারে।" তাহা ছাড়া পাহাড়িয়া প্রজাগণ ক্রমশ হিন্দুধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া ভূত প্রেত পূজা ছাড়িয়া হিন্দু সমাজের অন্তর্গত হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী বৃটিস রাজ্যসমূহ হইতে ত্রিপুরার উর্ব্বর ভূমির প্রতি ক্রমশঃ মুসলমান কৃষকগণ আকৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং তাহাদের জনসংখ্যা কালে হিন্দুদিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দী হইতে পারে ; ইহা স্বাভাবিক নিয়মেই হইবে বলিয়া মনে হয়। সেন্সাস অফিসর লিখিয়াছেন "হিন্দুর তুলনায় মুসলমানগণ অধিকতর শ্রমসহিষ্ণু ও উৎসাহশীল।" সুতরাং যোগ্যতার জয়ে যদি মুসলমান সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহা ভারতের উন্নতির পরিপন্থী হইবে না। গত ত্রিশ বৎসরে হিন্দুর জন-সংখ্যা ১,৪৩, ৩৯৭ এবং মুসলমানের সংখ্যা ৫৮,৩৯৭ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৮৮১—১৮৯১ খৃঃ পর্য্যন্ত খৃষ্টানদের বৃদ্ধি যৎসামান্য ছিল, কিন্তু শেষোক্ত সালে ইহাদের বৃদ্ধি বিস্ময়জনকরূপে ঘটিয়াছিল। ঐ সালে সংখ্যায় শতকরা ১২৪৭ জন খৃষ্টান বৃদ্ধি পাইয়াছিল ! এই সময়ে একযোগে বহু লুসাই ও কুকী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধগণও সংখ্যায় খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বৌদ্ধগণের সংখ্যা মোট ৯,৫৩২ বৃদ্ধি পাইয়াছে। "হিন্দু ও মুসলমানের তুলনায় বৌদ্ধগণের বৃদ্ধির হার বহু উচ্চে।"

প্রতি হাজার পুরুষে ত্রিপুরা রাজ্যে কতটি স্ত্রীলোক নিম্ন তালিকায় তাহা দেখান হইল—

হিন্দু ৮৯৮, মুসলমান ৮৪৬, বৌদ্ধ ৯১১ এবং খৃষ্টান ৯৬৯। সুতরাং বৌদ্ধ ও খৃষ্টান সমাজে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা প্রায় তুল্যরূপ ; হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। ইহার একটি কারণ এই— যাহারা স্থায়ী অধিবাসী তাহারাই স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করে, কিন্তু যাহারা কৃষি কিম্বা অন্য কোন ব্যাবসায়ের জন্য রাজ্যে আসিয়া বাস করিতেছে, তাহারা অনেক সময়ই পারিবারিক জীবন হইতে বঞ্চিত। স্ত্রীলোকের সংখ্যার অল্পতার দরুণ ত্রিপুরা জনসাধারণের মধ্যে মেয়েদিগের জন্য অভিভাবকেরা পণ পাইয়া থাকে।

শিক্ষা সম্বন্ধে সেন্সাস অফিসার লিখিয়াছেন, "বৈদ্যজাতি বাংলাদেশে শিক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। এ রাজ্যেও ইহাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ২৩৫ জন, অথবা শতকরা ৩২ জন লেখাপড়া জানে। তন্নিম্নে ব্রাহ্মণগণের স্থান, শতকরা ২৩ জন ব্রাহ্মণ শিক্ষিত। কায়স্থগণের মধ্যে ১৬২৭ জন লিখিতে পড়িতে জানে। কায়স্থের মোট সংখ্যা ৭৪৪৪ ; ইহাদের মধ্যে শতকরা ২২ জন শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

"ত্রিপুরা জাতির মধ্যে ৫৯০৯ ; হালামগণের ১৩৩৯ জন, মণীপুরীদের ৮৪১ জন, হিন্দু কুকীদের ৪১ জন, গারোদের ২৪ জন শিক্ষিত।" ইহা ছাড়া বারুই ৩৭১ জন, ধুপী ৭২ জন, গোয়ালা ১৪৩ জন, জালিয়া ৬৬, যোগী ২৪৫, কামার ১৩৫, কুমার ৩৭, মাহিষ্য ৫৯, নমঃশূদ্র ২৯০, নাপিত ৭২, সাহা ২২২, বাউরী ২১, চামার ২১, ডোম ১৫ এবং হাড়ি ৮ জন লোক লিখিতে পড়িতে জানে। প্রতি হাজারে হিন্দু ৯ জন এবং মুসলমান ৪ জন ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত।

ত্রিপুররাজ্যে বয়ন শিল্পের অনেকটা অবনতি ঘটিলেও এখনও মোট ৫,৪০৯ শিল্পী বিদ্যমান। এদেশে মোট ৪১, ৪২২ খানি তাঁত এবং ৪১১১৮ খানি চরকা চলিতেছে। দুঃখের বিষয় খাঁটি বাঙ্গালীরা এই বিদ্যা ভুলিয়া গিয়াছে। ত্রিপুর ক্ষত্রিয়, মণিপুরী, হালাম, লুসাই, কুকী, মগ ও চাকমা জাতীয় লোকেরাই এই ব্যবসায় প্রচলিত রাখিয়াছে— তাহাদের মেয়েরাই প্রধানতঃ এ কাজ করিয়া থাকে। আমরা শ্রীশ্রীযুত ত্রিপুরেশ্বর মাণিক্য বাহাদুরের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিতেছি ; তাঁহার রাজ্যের তুলার শীতবস্ত্র ও নানারূপ রঙ্গিন বহু মূল্য গাত্রবস্ত্র এখনও এ দেশের গৌরবের বিষয়। উৎসাহের অভাবে এমন একটা শ্লাঘনীয় শিল্প যেন নষ্ট না হয়। আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা উপন্যাস্ পড়িতে শিখিলে ও সিনেমা দেখিতে সুবিধা পাইলে তাঁত বা চরকা হাতে লইলেই তাঁহাদের মাথা ধরিবে।

এই সেন্সাস বিবরণী খানি "বর্ণ পরিচয়ের" মতই ত্রিপুরার প্রত্যেক গৃহস্থের প্রাথমিক শিক্ষার সহায় হওয়া উচিত। পুস্তকখানির সারাংশ প্রাঞ্জল ভাষায় সঙ্কলিত হইয়া ইহার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ত্রিপুরার প্রত্যেক স্কুলে পাঠ্য হইলে ভাল হয়। তাহাতে শিক্ষা বিভাগের একটা আয় দাঁড়াইবে ; এবং ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেক বালক-বালিকার স্বীয় দেশের অবশ্য-জ্ঞাতব্য খুঁটিনাটি তত্ত্বের দিকে চোখ খুলিবে। বাঙ্গলা দেশের সেন্সাস রিপোর্ট জনসাধারণের অধিগম্য হয় না ; জনসাধারণকে তাহাদের দেশের অবস্থা জানাইবার পক্ষে এই বিবরণীর তুল্য আর কোন উপায় নাই। দেশে কতগুলি জাতি আছে, তাহাদের জনসংখ্যা, হ্রাস বৃদ্ধি উন্নতি অবনতি কি কারণে ঘটিতেছে, তাহা শিক্ষার সূচনায়ই যদি বালক-বালিকারা জানিতে পারে, তবে তাহাদের জীবনে শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা হইবে।

আমরা এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রিপোর্টখানির জন্য ত্রিপুরা ষ্টেটকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ত্রিপুরার বস্ত্র বয়ন সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে আমাদের স্বভাবতঃই কৌতূহল জন্মিতেছে। এই অধ্যায়টি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইলে সুখী হইতাম।

মজঃফরপুরে একদিন

(ভূমিকম্পের বাইশ দিন পরে)

শ্রীসুধা বসু

এই সেদিন মজঃফরপুর হয়ে এলাম, ভূমিকম্পের বাইশ দিন পরে। ধ্বংসের এতবড় একটা বিরাট মূর্ত্তির কল্পনাও হয় ত আপনারা করতে পারবেন না। কি যে দেখে এলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব এবং এখানকার অনেককে যথাসাধ্য বলবার পরও দেখলাম যে অনেক কিছু যেন ঠিক বলা হলো না।

সমস্ত সহর ঘুরে আমার বন্ধুকে বল্লাম "যারা বেঁচে আছে, তারা যে কেমন করে বেঁচে গেল, তাই আমি ভাবছি।" উত্তরে সে দেখালে তারা যে বাড়ীতে আছে, একতলা খুব Low Roofর পাকা বাড়ী।

ওই রকমই বাড়ীর কতকগুলি দাঁড়িয়ে আছে, আর Newly built Re-inforced concreteএর গোটা-কয়েক। সমস্ত মজঃফরপুর সহরের ওইটুকুই শেষ চিহ্ন।

যে রাস্তা দিয়ে গেলাম, যে দিকেই তাকালাম, বিধ্বস্ত নগরের উলঙ্গ মূর্ত্তির ভয়াবহ বিকৃত অবস্থা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না। রাস্তার দুই ধারের প্রত্যেকটী বাড়ী—গরীবের কুটীর থেকে রাজার প্রাসাদ পর্য্যন্ত তাদের সমস্ত ইঁট পাথর চূণ বালি নিয়ে মাটির উপর নেমে এসেছে; দেখ্‌লেই মনে হয়, যেন প্রত্যেকটী বাড়ী পাশেরটীর সঙ্গে কোমর বেঁধে, ধ্বংসের দিকে কে কতদূর অগ্রসর হতে পারে তার প্রতিযোগিতা চালিয়েছে।

জায়গায়-জায়গায় রাস্তাগুলি এমন ভাবে কেবল ফেটেছে নয়—ফেটে নীচে নেমে গেছে, যে, একেবারে হতভম্ব হয়ে যেতে হয়, যে বিরাট শক্তি এটা করতে পারলে, তার অসীম বিশালতা ভেবে। ফাটলের প্রশস্ততা এবং গভীরতা এখনও বিশেষ বিশেষ স্থানে এমন ভয়াবহ, যে, তার পাশে যেতেই বুক দুর্ দুর্ করে ওঠে। এই সব ফাটল দিয়েই বালি ও গরম জল বেরিয়ে, জীবিত তখনও যারা ছিল, তাদের নিদারুণ শঙ্কিত করে অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

পার্থিব উন্নতির সমস্ত নিদর্শন, সভ্যতার চরম বিকাশ, সব আদিম যুগের প্রাথমিক অবস্থার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। বুদ্ধি দিয়ে, পরিশ্রম করে, মানুষ নিজের সুবিধার জন্য, শতাব্দী ধরে যা কিছু করেছিল,—বাড়ী ও রাস্তা, তার চিহ্নমাত্র নেই। এ যেন তাসের ঘর, ফুৎকার সইতে পারলে না। এ যেন কাঁচের বাসন, অসাবধানতার একটুখানি স্পর্শতেই চুরমার হয়ে গেল। দু'মিনিট আগেও মানুষ ক্ষমতার গর্ব্বে, বুদ্ধির অহঙ্কারে স্ফীত ছিল। প্রকৃতি তখন মুখ টিপে একটু হেসেছিল হয় ত।

অনেকগুলি দৃষ্টান্তের কয়েকটা বলি এবার।

একজন ভদ্রলোক তাদের বাড়ীর অবস্থা দেখাতে নিয়ে গেলেন। দোতলা বাড়ীর প্রায় অর্দ্ধেকটা কোন রকম করে দাঁড়িয়ে আছে তখনও। দেখ্‌লেই মনে হয় এই বুঝি বা ধ্বসে পড়্‌লো। বিরাট ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ওটার স্থিতিটাও তখন যেন একটা বিস্ময়। বুক বেঁধে ভেতরে প্রবেশ করা গেল। প্রত্যেকটী ঘরের কোমর পর্য্যন্ত বালিতে ভরে গিয়েছে। সমস্ত জিনিষ, খাট, বিছানা, এবং আরো যা কিছু ছিল, সব তারই নীচে চাপা পড়ে গেছে। উঠোনে গিয়ে দেখলাম গলা পর্য্যন্ত বালি, তখনও ভেজা, যেন চেপে বসে আছে সমস্ত জায়গাটা। তারই উপরে ভাঙ্গা বাড়ীর চাল ও ইটের নানা রকমের টুকরো স্তূপাকার হয়ে, অতি বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করেছে। খানিকটা দূরে রান্নাঘর যেটা তাদের ছিল, তার একদিকের অর্দ্ধেকটা মাটির মধ্যে ঢুকে, দেখবার জিনিষ হয়ে আছে।

কি জানি কেন, এগুলি সব দেখতে বিস্ময় জাগছিল —কারণ এরকম কখন দেখিনি বলে বোধ হয়। বিস্ময়ের

বোবা হয়ে গিয়েছিলুম। এ কী হয়েছে! কী আমি দেখছি! কিসের গর্ব্ব আমরা করতাম বা করে থাকি। এত ভয়ঙ্কর অসহায়তার এতটুকুও জ্ঞান মানুষের দুমিনিট আগেও ছিল না হয় ত। ভঙ্গুর সবই, কিন্তু সে যে এক লহমার এদিক আর ওদিক, তা আজ ভূমিকম্পজনিত বিধ্বস্ত নগরীর বেঁচে যারা গেছে, তারা অতি নিদারুণ রূপে সেই অপ্রিয় সত্যের উপলব্ধি মর্ম্মে মর্ম্মে কর্‌ছে।

একটী ছোট পাঁচ ফিট উঁচু হবে, খড়ের ঘরের সামনে একটী প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোক বসে তামাক টান্‌ছিলেন —নির্বিকার হয়ে। বন্ধু আমার বল্লে "এর অবস্থা একটু দেখে আসবি চল।"

"সামনে গিয়ে বলা হলো "এই যে নমস্কার, ভাল আছেন ত ?"

"এসো এসো, ভাল আছি বৈ কি। ভগবানের রাজ্যে ভাল না থাকবার উপায় আছে। তা ও-বাড়ীর দিকে তাকাচ্ছ কেন ? ওটা গেছে বলেই তুমি ভগবানের অসীম দয়াকে সন্দেহ করতে পার না।" (তামাকে টান দিলেন) "বড় জোর আমার হাজার চল্লিশ টাকার বাড়ীটা গেছে। তা একদিন ত ওটা পড়েই যেত। অত বড় মোগল রাজাদের বড় বড় প্রাসাদই রইলো না— তো আমারটা কোন্ ছার্। ওতে আমার কিছু দুঃখ নেই।" (এখানে আবার তামাকে টান দিলেন) "ছেলে-মেয়েগুলো চাপা পড়ে মারা গেছে—তা যাক্;—ওরা একদিন ত মারা পড়তোই—বেঁচে থাকবার জন্য তো আর কেউ জন্ম নেয় না। কাজেই ভগবানের নিরপেক্ষ বিচারে সন্দিহান হবার কোনই কারণ নেই।" (ঘন ঘন দুইবার তামাকে টান দিলেন) "নশ্বর জীবন, এ তো জানা কথা। জ্ঞানীরা তো তাই বলে থাকেন। অতি মামুলী কথা এটা। অ—তি মামুলী।" (এই সময়ে দীর্ঘব্যাপী একটা তামাকে টান দিয়ে এমন ধুঁয়ো ছাড়্লেন যে তাঁর চেহারা আমাদের কাছে আব্ছা হয়ে উঠলো) একটু পরে "কিন্তু ভগবানের অপার দয়া দেখছ। এই দেখ (পাশের বাগানে নিয়ে গেলেন),

দ্যা—খ, জমিটা এখানে ফেটেছে; ফেটে বাড়ীর তলা দিয়ে গিয়ে বাড়ীটাকে দু ফাঁক করে দিয়েছে। কিন্তু এই যে গোলাপফুলের গাছগুলো দেখ্‌ছ, তার পাশ কাটিয়ে কেমন চমৎকার চলে গেছে। এতটুকুও নষ্ট হয়নি। ভগবানের দয়া কি না। সোনপুরের মেলা থেকে অনেকগুলো পয়সা খরচ করে এনে, ওদের এখানে অতি যত্নে পুঁতেছিলাম। ভগবানই এখন তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে! রাখে কেষ্ট মারে কে। (এখানে বেশ একটু হেসে নিলেন—কিন্তু তামাক একবারও টানতে দেখলাম না। গাছ দেখাতে এতই ব্যস্ত ছিলেন) "অসীম দয়া কি না ভগবানের" (হাসতে হাসতেই বল্লেন) তার পর "এ গাছের ফুল হলে দেবো একটা তোমাকে। খু—ব মিষ্টি গন্ধ শুনেছি।" বলেই এমন গম্ভীরভাবে তামাকে টান দিলেন, যেন এর আগে একটীও কথা বলেন নি আমাদের কাছে।

রাস্তায় এসে বন্ধুকে বল্লাম "এ কি ?"

"অতি স্বাভাবিক। ভদ্রলোক ভূমিকম্পের আন্দাজ আধ ঘণ্টা পরে, বাজারে গিয়েছিলেন, খুব ভাল তামাকের খোঁজে। বাড়ীর সবশুদ্ধ ৯ জনের মধ্যে এই বৃদ্ধই এখন বংশের শেষ। মনের যে এটা কী ভীষণ অবস্থা......" বলেই সে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লে।

আমি তখন আস্তে আস্তে নিজেকেই হয় ত বল্লাম "এদের অবস্থা চোখে না দেখলে, আমি কি বুঝতে পারতাম যে এদের বুকেও যে "ফাটল" হয়েছে তা অসহ্য ব্যথায় ভরা তলহীন রক্তের পাগলা স্রোতে প্রবহমান, এবং মন যে ধাক্কা খেয়েছে তা অতি ভীষণরূপে প্রচণ্ড। এরা বেঁচেও মরে আছে—কান্নার এদের ভাষা নেই। নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত এদের অবস্থান এখন।"

আমার এক আত্মীয়া সেখানে ছিলেন। তাঁর সন্ধানে (আগেই শুনেছিলাম তিনি আহতা এবং খড়ের চালা করে আছেন।) যখন আমরা, ব্যস্ত তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। Electric Lightএর আলোয় উদ্ভাসিত, সমৃদ্ধিশালী মজঃফরপুর, জনবিরল দুঃস্থ পল্লীগ্রামের সন্ধ্যার স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার নিয়ে চোখের উপর ফুটে উঠলো। গ্রামেরই নীরবতা, সেখানকারই প্রাণময়ী নিস্তব্ধতা একসঙ্গে মিশে গিয়ে চারি দিকে ছেয়েছিল—সব জায়গায়, একদা মুখরিত, উচ্ছলিত জনবহুল, কল্যাণী, সরাইয়াগঞ্জ, পুরাণী বাজার, চাঁদওয়ারা, এবং আরো অনেক স্থানে।

কোথাও কোন আলো নেই। খড়ের ঘরের ভিতর দিয়ে, আবছা আলো যা চোখে লাগছিল, তাই লক্ষ্য করে আমরা এগিয়ে চল্লাম, সেই সব ভগ্নস্তূপের মধ্য দিয়ে। অন্ধকারেরও একটা আলো আছে। সেই আলোতে দাঁড়িয়ে যখন চারি দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, তখন সামান্য একটু শব্দ, বন্ধুর একটুখানি কথা, বুকের মধ্যে এসে ছ্যাঁত করে লাগছিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে ধ্বংসের বিরাট প্রসারতা, গভীরতম ভাবে উপলব্ধি করছিলাম। তার বীভৎসতা সজীব হয়ে চলে বেড়াচ্ছিলো তখন। অশরীরী আত্মার আবছা উপস্থিতি যেন সব দিকে অনুভব করছিলাম।

প্রায় অনেক কুটীরেই (খড়ের চালা, এত ছোট যে মাথা নীচু করে প্রবেশ করতে হয়), কেউ না কেউ, বিশেষ করে মা, বোন এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাই, শরীরের কোথাও না কোথাও, আঘাত নিয়ে শুয়ে আছে দেখলাম। আমাদের প্রশ্নের সব কটা উত্তরেই তাদের কথায় হতাশার চিহ্ন চোখে নির্লিপ্তের ভাব সুস্পষ্ট ফুটে উঠছিলো। অসহায়তার ব্যথা, অসহনীয় দুঃখ ও কষ্টের ভবিষ্যৎ উপস্থিতি, যেন তাদের সর্ব্বদা শঙ্কিত করে রেখেছে।

পাশের বন্ধুকে বল্লাম "জান কেন, মেয়েরাই বেশী মারা পড়েছে, কিম্বা আঘাত পেয়েছে? স্বার্থপ্রবল, কঠিনপ্রাণ পুরুষ যখন বিপদের আবির্ভাবেই প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে, তখন স্নেহপ্রবণ মায়ের জাত, নিজের সন্তানদের ফেলে পালাতে গিয়ে, দ্বিধায় পড়ে, মুহূর্ত্তের এদিকে ওদিকে প্রাণ হারিয়েছে, কিম্বা তাদের নিয়ে পালাতে গিয়ে, যে আঘাত নিজের সন্তানদের পক্ষে প্রাণঘাতী হতো, তা মাথায় পেতে নিয়ে নিজেদের জখম করেছে।"

"অনেক ক্ষেত্রে তো পুরুষরাও তাই করেছে।"

"আহা-হা কূটতর্ক না ভাই। এদের দেখে এবং তাদের কথা শুনে আমার এখন তাই মনে হচ্ছে। আর Factও তাই। নয় কি?"

"হাঁ—অনেক case বোধ হয় তাই।"

চুপ করে গেলাম। উত্তর আর দেবার ইচ্ছা হলো না।

অনেকগুলি খড়ের ঘর পার হয়ে, সন্ধানে যেটা জানতে পারলাম আমার আত্মীয়ার বাড়ী, সেখানে এসে উপস্থিত হলাম। মাথাটীকে বেশ নীচু করে সে ঘরের মধ্যে যাওয়া গেল। একটী খাটে তিনি শুয়েছিলেন চিৎ হয়ে। কোমরে একটা Beam পড়ে ভীষণ চোট পেয়ে একেবারে চলৎশক্তি রহিত হয়ে আছেন। বাইশ দিন হয়ে গেছে তবুও এপাশ-ওপাশ করা সম্ভবের বাইরে। পাশেই একটা Kerosine Box টেনে নিয়ে বসলাম। ঘরের মিট্‌মিটে Kerosine Lampর আলোয় তাঁর এবং ঘরের অনেকের মুখই অস্পষ্ট ছিল।

মনে আছে একদিন এঁদেরই বাড়ীতে Drawing Roomএর যে Couchএ বসেছিলাম, সে রকম আমার ভাগ্যে প্রথম হয়ে উঠেছিল। Couchএর মধ্যে প্রায় ডুবে গিয়ে, মাথার উপর Electric fan ও Lightএর ঝলমলানিতে বসে, একটু একটু করে কথা বলা, অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার কাছে একটা লোভনীয় আকর্ষণ ছিল। সেই দিনের সেই উজ্জ্বল আলো, হঠাৎ সেই মুহূর্ত্তে অতি নিষ্ঠুররূপে ম্লান হয়ে এলো।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম "কেমন আছেন?" অতি মামুলী প্রথম কথা, নিজেকে অস্বস্তিকর আবহাওয়া থেকে উদ্ধার করবার জন্য।

ম্লান একটু হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল। তার পর "ভালই আছি" বলে' বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে যে খোকাটী খিল্ খিল্ করে হাসছিল, তার মাথায়, তার চুলের ভেতর হাত বোলাতে লাগলেন। সুন্দর ফুটফুটে, নাদুসনুদুস ছেলে।

তার ফোলা ফোলা গালে, দুটো আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে বল্লাম "ভয়ানক হাসি হচ্ছে যে"—

তাকে একটী ছোট্ট চুমো দিয়ে আত্মীয়াটী বল্লেন "একে বাঁচাতে গিয়েই তো আমার চোট লাগলো। সকলে যখন পালালো, তখন একে আনতে গিয়েই আমার পালাতে একটু দেরী হয়ে গেল। ভাগ্যিস ও আমার বুকের নীচে ছিল, তাই Beamটা কোমরে পড়াতে খোকা বেঁচে গেল। তা না হলে আজ আমার এ বেঁচে থাকায় কোনই সুখ ছিল না—বেঁচে আমি থাকৃতামও না হয় ত।" বলেই অতি নিবিড় ভাবে

খোকার গায়ে ও মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। খোকা তখন তার মায়ের আঁচলের অনেকটা মুখের মধ্যে দিয়ে আমাদের দিকে ভাসা ভাসা চোখ নিয়ে তাকিয়ে ছিল।

এই সময়ে আমি আমার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে দেখি, সেও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার পর এ কথা সে কথার পর উঠে চলে এলাম। সমস্ত রাস্তাটা যেন বিরাট নিস্তব্ধতা ও বীভৎস অন্ধকার নিয়ে আমাদেরই জন্য অপেক্ষা করছিল। বন্ধুর বাড়ীতে যখন আসা গেল তখন রাত্রি দশটা।

ছাপরাতে এসে Diaryতে প্রথমেই লিখলাম—জীবনের তুচ্ছতাকে, বাস্তব যা কিছু তার অসারতাকে, অতি উৎকটরূপে চোখের সামনে ধরে দিয়েছিলে', এই সেইদিনকার অতি ভয়াবহ ১লা মাঘ। কিন্তু আশ্চর্য্য এই—বেঁচে যারা আছে, তাদের বেঁচে থাকবার চেষ্টার কোন শিথিলতা হয়নি। বেঁচে থাকতে হলে, মানুষের যা যা দরকার, তার এতটুকুও ত্রুটী লক্ষ্য করবার উপায় নেই। সেই কেনা-বেচা, বাজারের হট্টগোল, কথার মার প্যাঁচ, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ব্যস্ততার চিহ্ন, হীনতা, শঠতা, সাবেক ভাবেই চলেছে। আর এইগুলো চলেছে ঠিক সেইখানে না হলেও, তার পাশেই হয় ত, যেখানে অগণিত লোক একমুহূর্ত্তের মধ্যে অপমৃত্যুর করাল কবলে নিষ্পেষিত হয়েছে—এবং চালাচ্ছে তারাই, যাদের যে কোন কেউ, এক, দুই বা ততোধিক আত্মীয়-স্বজন—কিম্বা ভাই বন্ধু প্রাণ হারিয়েছে অকালে এবং অসহ্য যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে।

Struggle for existence যে কী জিনিষ, তা যে কেউ বেঁচে আছে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত যে কোন স্থানে, তারা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছে। চোখের জল তাদের শুকিয়ে গেছে—দুঃখে ভেজা চোখ আর ব্যথা-ভরা বুক নিয়েই, তারা সেই ভাঙ্গা বাড়ী জোড়া দিয়ে, ফাটা জমি ভর্ত্তি করে, আবার বাসোপযোগী করে তুলছে।

বেঁচে ত থাকতে হবে। এ জগৎ যে মায়া, জীবন যে তুচ্ছ, বাস্তব যা কিছু সব ভঙ্গুর,—এ কথা জ্ঞানীদের দয়ায় অনেকেই তাদের মধ্যে জানে। কিন্তু তবুও এই যে বেঁচে থাকবার জন্য খাঁটি পরিশ্রম উদ্যম ও উদ্যোগ সেটা কী? কেন লোকে এ-সব করে সব জেনে শুনেও?

"ফুট্‌লো মউল দূর বনে, আর বাতাস বাউল গন্ধে তা'রি"

শ্রীরামেন্দু দত্ত

ফুট্‌লো মউল; বনের হাওয়া বাউল হ'ল
গন্ধে তা'রি!
সহর কোঠার কোটর-কোণে বিরস মনে
রইতে নারি!
আকাশ-মুখী আঁখির তারা
হায়, অসহায়, পাখীর পারা!
বাহির পানে সদাই টানে; কে-ই বা তারে দেয় গো ছাড়ি'!
ফুট্‌লো মউল দূর বনে, আর বাতাস বাউল গন্ধে তা'রি!
এই ফাগুনের পূর্ণিমা চাঁদ আজ ফাগুয়ায়
জ্যো'স্না ঢেলে;
পাতার ফাঁকে তরুর শাখে আলোর হোলী
যাচ্ছে খেলে!
খেল্‌ছে হাওয়া বনের বুকে
গায় কোয়েলা মনের সুখে,
পাহাড় বেয়ে ঝর্ণা মেয়ে নাম্‌ছে জরীর আঁচল মেলে!
পূর্ণিমা চাঁদ চুম খেয়ে তায় সিনান করায় জ্যো'স্না ঢেলে!

শৈশবে আর কৈশোরে যার রূপ দেখেছি
এম্‌নি ধারা
সেই পহেলী বন-সহেলী বল্‌ছে আমায়
"ভাঙরে কারা!"
বল্‌ছে, "ওরে আয় ছুটে আয়!
ফুট্‌লো মউল শাখায় শাখায়,—
সহর কোঠার কোটর ছেড়ে আয় রে হেথায় আত্মহারা!
দখিন হাওয়ায় ফুল ফুটেছে। পিচ্‌কারীতে জ্যো'স্না ধারা!"
বনের হরিণ শিকল বাঁধা; বনের পাখী
খাঁচায় কাঁদে!
সোনার শিকল, সোনার খাঁচায় মনকে তাদের
কেউ কি বাঁধে?
নীল আকাশের বিশাল দিঠি,
লক্ষ তারায় লিখ্‌লো চিঠি,
হাতছানি দেয় দূর বনানী, দখিন হাওয়া, নানান ছাঁদে!
আকাশ-মুখী আঁখির তারা পাখীর পারা খাঁচায় কাঁদে!

মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

নৈয়ায়িকপ্রধান নবদ্বীপের বহু প্রাচীন অধ্যাপকবংশ বঙ্গদেশে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ এক বিখ্যাত ন্যায়-অধ্যাপকবংশে মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ঠিক শত বর্ষ পূর্ব্বে ১৭৫৫ শকাব্দের (সন ১২৪০ সালের) ২৯এ পৌষ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। এই বংশ পুরুষানুক্রমে পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের প্রপিতামহ রামভদ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় 'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থের 'রামভদ্রী টীকা' এবং 'গৌতমসূত্রের' পদার্থখণ্ডনের টীকা রচনা করেন। এই গ্রন্থদ্বয় তৎকালীন বিদ্যার্থীগণ সাদরে অধ্যয়ন করিতেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের পিতামহ গোপীনাথ ন্যায়পঞ্চানন এবং পিতা সূর্য্যকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়দ্বয়ও দেশবিশ্রুত পণ্ডিত ছিলেন।

বিদ্যারম্ভ করিয়া রাজকৃষ্ণ প্রথমে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, অভিধান এবং কাব্য ও অলঙ্কার অধ্যয়ন করেন। এই অধ্যাপকবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন—বলিতে গেলে এই বংশ নৈয়ায়িকের বংশ। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া রাজকৃষ্ণ পিতামহের চতুষ্পাঠিতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ন্যায়শাস্ত্রে বংশগত অনুরাগবশতঃ তিনিও যে পূর্ব্বপুরুষগণের পন্থানুসরণ করিবেন ইহা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। ফলতঃ, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াই তিনি এই শাস্ত্রের প্রতি যেরূপ অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতপ্রধানগণ তাঁহাকে নিয়ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন যে, কালে তিনি অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। তাঁহাদের এই আশা সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল। এই সকল পণ্ডিতগণের মধ্যে তৎকালে মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় অগ্রণী ছিলেন। তিনি তরুণ বিদ্যার্থীর ন্যায়শাস্ত্রালাপ শ্রবণ করিয়া কেবল মুখে উৎসাহ দিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই—রাজকৃষ্ণকে নিজের টোলে লইয়া গিয়া যত্ন সহকারে তাঁহাকে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া রাজকৃষ্ণ 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি লাভ করিলেন। ছাত্রের কৃতিত্বে অধ্যাপক মহাশয় এতাদৃশী প্রীতি লাভ করেন যে, তিনি প্রিয় ছাত্রকে তাঁহার চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনার ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইহাতে তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের কোন আপত্তি ছিল না; কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় তৎকালে গুরুর টোলের ভার গ্রহণ করা হইয়া উঠিল না। কারণ, অধ্যয়ন শেষ হইবার পরই তর্কপঞ্চানন মহাশয় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন।

দুই বৎসর কাল নানাবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকায় তর্কপঞ্চানন মহাশয় এই দুই বৎসর কাল গুরুর অভিপ্রায়ানুযায়ী তাঁহার চতুষ্পাঠীর ভার গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ১২৭১ সালের ঝটিকাবর্ত্তে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের চতুষ্পাঠী ভূমিসাৎ হয়। তখন তর্কপঞ্চানন মহাশয় সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। এইবার তিনি গুরুদেবের ভগ্ন চতুষ্পাঠীর জিনিসপত্র লইয়া গিয়া স্বয়ং চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। উপযুক্ত শিষ্যকে টোলের ভার লইতে দেখিয়া তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তৃপ্ত চিত্তে ছয় মাস পরে স্বর্গারোহণ করেন।

মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় তৎকালে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। ১৩০৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে নদীয়ার মহারাজা বাহাদুর রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মাহশয়কেই নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িকের পদে বরণ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে গবর্ণমেণ্ট তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান পূর্ব্বক সম্মানিত করেন এবং ন্যায়শাস্ত্র

চর্চ্চায় উৎসাহদানার্থ মাসিক পঞ্চাশ টাকার একটী বৃত্তি প্রদান করেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা এবং বহুকাল গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি ভোগ করেন।

সন ১৩১৯ সালের ৯ই বৈশাখ মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া ৺গঙ্গালাভ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎস হইয়াছিল।

তর্কপঞ্চানন মহাশয় সেকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণে ন্যায় সরলতার আধার ছিলেন। অনাড়ম্বর জীবন যাপ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি ন্যায়শাস্ত্রে অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন।

হাসপাতালে

শ্রীবিমল সেন বি-এস্‌সি

'ওয়ার্ডে দৌড়ধূপ পড়িয়া গেল। একটা 'পয়জ্‌নিং কেস' আসিয়াছে।

দেড় ঘণ্টা ধরিয়া যেন যমে-মানুষে টানাটানি।

ষ্টমাক্ ওয়াশিং, এ্যাট্রোপীন্ ইনজেক্‌শন্, ষ্ট্রিক্‌নীন্ ইন্‌জেক্‌শন্, আর্টিফিশিয়াল রেস্‌পিরেশন—সবই করা হইল। কিন্তু রোগীর আর জ্ঞান ফিরিল না। ধীরে ধীরে তাহার হার্টের গতি বন্ধ হইয়া গেল।

ডাক্তার সুধীর দত্তর নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় ছিল না। এতক্ষণে মাথা তুলিয়া বলিল—হি ইজ্ ডেড্, সিষ্টার—আর কোন লাভ নেই। ষ্টমাক্ ওয়াশিংটা রেখো। ওপিয়ম্ পয়জ্‌নিং বলে মনে হচ্ছে।

বেড-এর চারি দিক ঘিরিয়া সিষ্টার, দুইজন নার্স, এবং ঐ হাসপাতালের জনদুই ছাত্র দাঁড়াইয়া।

একটি ছেলে তৎক্ষণাৎ সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, মৃত ব্যক্তির চোখের পাতা দুইটা মেলিয়া ধরিল। সহপাঠী বন্ধুকে বলিল—পিন্-পয়েণ্ট পিউপিল্ দেখেছিস?… হার্টটা এগ্‌জামিন্ করনা। রেস্‌পিরেশন্ বন্ধ হয়েছে, কিন্তু হার্ট হয়ত এখনও ওয়ার্ক করছে…দেখ্ শীগ্‌গীর।

অন্য ছেলেটি ষ্টেথস্‌কোপ্ কানে গুঁজিয়া হার্ট 'এগ্‌জামিন' করিতে লাগিল। রোগী তখন অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে।

নার্স কম্বল দিয়া মৃতদেহ ঢাকিয়া অন্য কাজে চলিয়া গেল। সিষ্টার 'ওয়ার্ড বয়'কে বলিয়া গেল—বেড-এ চাদরটা বদ্‌লে দিস্।

দ্বিতীয় ছেলেটি তখনও 'এগ্‌জামিন' করিতেছে।

এখানে এম্‌নিই হইয়া থাকে।

হাসপাতাল ছাড়িয়া গৃহে ফিরিয়া যাওয়া, এবং পৃথি ছাড়িয়া পরপারে পাড়ী দেওয়া দুই-ই যেন সমান।

ডাহিনে, বামে নিত্য কত লোক মরি কাহারও বুকে তাহাতে সামান্য রেখাপাতও হয় না তেম্‌নি ভাবেই নার্স আসিয়া কম্বল-চাপা দিয়া যা ডোমেরা ষ্ট্রেচারে করিয়া মৃতদেহ 'কোল্ড্-রুমে' লই যায়; সিষ্টার আসিয়া বলে,—চাদরটা বদ্‌লে দিস।

আবার হয়ত তখনই সেই বেড-এ অন্য রোগী আসে

বাংলা দেশ হইতে প্রায় দেড় হাজার মাইল দূরে এক খুব বড় শহরের হাসপাতালে ডাক্তার সুধীর দ 'হাউস-ফিজিসিয়ানে'র কাজ করে। হাসপাতালে সহিত কলেজও থাকে। সুধীর সেই কলেজ হইতে সম্প্রতি পাস্ করিয়া বাহির হইয়াছে।

এই ওয়ার্ডের একদিককার পঁচিশটা রোগীর চিকিৎ এবং তত্ত্বাবধান তাহাকেই করিতে হয়। 'ফিমেল ওয়ার্ড এবং ছেলেদের ওয়ার্ডেও তাহার রোগী আছে। সর্ব্বসমে প্রায় ত্রিশটি রোগী। সকাল-সন্ধ্যা 'রাউণ্ড' লাগাইতে হয়

'পয়জ্‌নিং কেস্‌'টা সারিয়া, সে তাহার 'রাউণ্ডে' বাহির হইল।

সারি সারি পঁচিশটা বেড্‌।

একটাও খালি পড়িয়া নাই।

'বেড্‌ নং ওয়ান্‌'—রোগীর মাথার কাছে টেম্পারেচার চার্ট এবং অন্য দিকে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রাদি দেয়ালে টাঙ্গান। টেম্পারেচার চার্টের এক পার্শ্বে ডায়গ্‌নোসিস্‌ লেখা—'হেমিপ্লেজিয়া'। পক্ষাঘাত-এ এক অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে। অসহায় শিশুর মত রোগী বিছানায় শুইয়া থাকে।

বেড নং সিক্স্‌—'টাইফয়েড্‌।' ক্ষীণ দেহ বিছানার সহিত প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। জ্বরের ঘোরে সর্ব্বদা বকর্‌ বকর্‌ করিয়া কি সব বলে; না হয়, বিছানার চাদর ধরিয়া মুচ্‌ড়াইতে থাকে।

বেড নং টেন্‌—'থাইসিস।' ইহাকেও জীবন্ত মানুষ বলিয়া মনে হয় না। শুধু চামড়া আর হাড়। কোটরগত চক্ষু দুটি সর্ব্বদাই জ্বল জ্বল করিতেছে। এতদিন বাঁচিয়া থাকিবার কথা নহে।

সুধীর কাছে আসিয়া কুশল প্রশ্ন করিতে, সে শুষ্ক হাসিয়া বলে—আজ অনেক ভাল আছি, ডাক্তারবাবু! কাশিও কম, রক্তও আর ওঠেনি। একটু থামিয়া বলে—সেরে উঠব, কি বল, ডাক্তারবাবু? মরব না। এমন বিশেষ কিছু ত হয়নি!…তুমি একটু ভরসা দাও, ডাক্তারবাবু!

সুধীর জানে, আর বড় জোর তিনটা দিন রোগীর জীবনের মেয়াদ। আজও হয়ত মরিতে পারে। কিন্তু সে এখনও পাকা ডাক্তার হইতে পারে নাই। তাই চোখ দুইটা অশ্রুসিক্ত হইয়া ওঠে। মাথায় হাত বুলাইয়া বলে—সেরে উঠবে বৈ কি! কি-ই বা হয়েছে। শীগ্‌গিরই সব সেরে যাবে।

এখনও যাহার বাঁচিয়া থাকিবার ষোল আনা সাধ, ঐ সামান্য আশ্বাস-বাণীটুকু তাহার পক্ষে কত মূল্যবান!

বেড নং থার্‌টিন্‌—'ডায়বিটিস্‌।' রোগী বাঙালী। লম্বা-চওড়া, মোটা-সোটা চেহারা।

সুধীরকে দেখিয়াই একেবারে তিরিক্ষি হইয়া উঠেন। হাত মুখ নাড়িয়া বলেন—আপনাদের ঐ কেমনতর হস্পিটাল, মশাই? কাল রাত্তির থেকে এ অবধি কিছু খেতে দেয়নি!…এ কি না খাইয়ে মেরে ফেলবে না কি, বাবা? ওষুধ-পত্তরের বেলায়ও ত ঢু ঢু।

সব বাঙালীর ঐ ধরণ। দাতব্য চিকিৎসালয়ে আসিয়া তাঁহারা মনে করেন, বুঝি সবাইকে কৃতার্থ করিতেই আসিয়াছেন। তাঁহারা চান যে, ডাক্তার হইতে আরম্ভ করিয়া সিষ্টার, নার্স, মায় 'ওয়ার্ড বয়' পর্য্যন্ত সবাই আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের মত সর্ব্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধানেই ব্যস্ত থাকিবে। বিশেষ করিয়া, সে ওয়ার্ডের ডাক্তার যদি বাঙালী হয়, তাহা হইলে ত রক্ষাই নাই। শুধু তাহাই নহে; অত দিন বিনা ব্যয়ে হাসপাতালে থাকিয়া, সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া গৃহে ফিরিয়া যান, এবং সুযোগ পাইলেই মুখ বিকৃত করিয়া বলেন—আরে মশাই, যাস্‌সে তাই—একেবারে যাস্‌সে তাই। চিকিচ্ছে হয় না, এ আবার কেমনতর…ইত্যাদি।

সতের নম্বর রোগীর হার্টের অসুখ। খুব ভাল 'কেস্‌'—সহসা ও-সব 'কেস্‌' চোখে পড়ে না। তাই, দিনের ভিতর পঞ্চাশবার ডাক্তার হইতে আরম্ভ করিয়া ছেলেরা সবাই পরীক্ষা করিয়া থাকে।

জনে জনে আসিয়া রোগীকে একই প্রশ্ন করে—কি কষ্ট? কেমন করিয়া আরম্ভ হইল! কত দিন হইতে ভুগিতেছে!

তাহার পর, একই ভাবে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া, উঠাইয়া-বসাইয়া, ডন্‌ লাগাইয়া পরীক্ষা চলে।

ছেলেদেরও দোষ নাই। তাহারা জ্ঞানার্জ্জন করিতে আসিয়াছে। দেখিতে ত হইবেই। কিন্তু রোগীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। নিরুপায় হইয়া সে সবার হুকুম তামিল করিয়া যায়। আজও তাহার বুকের উপর, চারিটা ষ্টেথস্‌কোপ্‌ লাগাইয়া চারিজন পরীক্ষা করিতেছে।

*　　*　　*　　*

একুশ নম্বর রোগীর 'নিউমোনিয়া' হইয়াছে। অবস্থা ভাল নহে। চল্লিশ বৎসর বয়স। খৃষ্টান।

সুধীরের সব প্রশ্নের জবাব দিয়া, ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—রুবী আজ কেমন আছে, ডাক্তার?

রুবী রোগীর স্ত্রী। সেও 'নিউমোনিয়া' রোগাক্রান্ত হইয়া 'ফিমেল ওয়ার্ডে' পড়িয়া আছে। দুইজনে একসঙ্গে আসিয়াছিল। কোলে তাহার এক বৎসরের একটি

ছেলে। আত্মীয়-স্বজন আর কেহ নাই বলিয়া শিশুটিকেও 'চিল্‌ড্রেন্স' ওয়ার্ডে' রাখা হইয়াছে। তাহারও শরীর ভাল নহে। পেটের অসুখে ভোগে।

সুধীর আশ্বাস দিয়া জানাইল—আপনার স্ত্রী ভালই আছেন—আর ভয়ের কারণ নেই।

জন্ জিজ্ঞাসা করিল—আর, বাচ্ছাটা?

—ওঃ, সে ত চমৎকার আছে। সিষ্টারের কোলে কোলেই থাকে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া জন্ বলিল—যাক্, ওরা ভাল থাকলেই হল। জানেন ডাক্তার দত্ত, রুবীর ভাবনায় মনে আমার একটুও শান্তি নেই। অল্প বয়স, সমস্ত জীবন ওর সামনে পড়ে আছে। আমার ঘরে এসে একদিনও সুখে কাটাতে পারেনি। অভাব, অনটন চারিদিকে। বিয়ের আগে, কত করে বলেছি, রুবী, আমি গরীব, তোমাকে ত সুখে রাখতে পারব না। কেন তুমি তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করছ?· কিন্তু, কোন কথাই শুনলে না।

একটু দম্ লইয়া, আবার বলিতে লাগিল—আমার দিন ত ফুরিয়ে এসেছে জানি। যে তার স্ত্রী-পুত্রকে দুবেলা দুটি খেতে দিতে পারে না, তার মত লোকের মরাই ভাল।··· রুবী ছেলেমানুষ—আবার বিয়ে করে সুখী হোক; বাচ্ছাটাও সুখে থাকবে।

সুধীর তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল—ও-সব কথা ভাববেন না। সেরেই ত উঠছেন আপনারা।

কিন্তু, এ আশ্বাসবাণীতে সে আর ভোলে না। সে বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার জীবনের মেয়াদ ফুরাইয়াছে।

একটু শুষ্ক হাসিয়া জন্ বলিল—ধন্যবাদ, ডাক্তার দত্ত।···দয়া করে একবার সিষ্টারকে বলে যাবেন, আজ যেন ছেলেটাকে একটু দেখিয়ে নিয়ে যায়।

* * * *

'ফিমেল ওয়ার্ডে' রুবী বেশ সারিয়া উঠিতেছে। চারিদিন হইল 'ক্রাইসিস্' কাটিয়া গিয়াছে—আর ভয়ের কোন কারণ নাই। বয়স পঁচিশ। দেখিতে সুশ্রী। কিন্তু, অসুখে ভুগিয়া দেহ হাড্ডিসার হইয়াছে।

সুধীর কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই বলিল—দেখুন ডাক্তার দত্ত, কাল রাত্তিরে অনেক কান্নাকাটি করলুম। সিষ্টারের পায়ে ধরে বললুম—সিষ্টার, ছেলেটাকে একবারটি এখানে নিয়ে এসো; আমার কেবলি মনে হচ্ছে—তার যেন শরীর ভাল নেই।

সিষ্টার চুপি চুপি গিয়ে নিয়ে এল।···ঠিক তাই, শরীরটে তার ভাল ছিল না। একা একা ওখানে নাকি কাঁদ্‌ছিল।···আমাকে দেখে, কোলে আসবার জন্যে কী যে আঁকুপাঁকু করতে লাগল!··সিষ্টার এইখানে শুইয়ে দিলে। ছোট্ট একটু, তুলোর প্যাট্‌রার মত অমনি চুপ্‌টি করে সে শুয়ে রইল। বলিয়া ধীরে ধীরে, তাহার পার্শ্বে, বিছানার সেই অংশটুকুতে হাত বুলাইতে লাগিল।

শিশুটিকে তাহার মাতা-পিতার কাছে আনিতে তখনও ডাক্তারের নিষেধ ছিল। তাই, সুধীর বিস্মিত হইয়া বলিল—সে কি, ছেলেটিকে সিষ্টার খাটে শুইয়েছিল?

রুবী কাতরকণ্ঠে বলিল—সিষ্টারের কোন দোষ নেই। আমার কাছে আসবার জন্যে তার সে ছট্‌ফটানি দেখে, কোন মেয়েমানুষ স্থির থাকতে পারে না, ডাক্তার দত্ত। আমি তাকে কিচ্ছু খাওয়াইনি ত—শুধু কিছুক্ষণ শুয়ে ছিল। আহা ঐটুকু শিশু সারাদিন একলাটি পড়ে থাকে···

সুধীর কঠিন হইয়া বলিল—না, এখনও তাকে আপনার কাছে এনে শোয়ান উচিত নয়। তা' হতে পারবে না। সিষ্টারকে এত করে বারণ··

রুবী সহসা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—কিন্তু, ডাক্তার, আপনি কখনও বোধ হয় ঐটুকু বাচ্ছাকে কোলে নেন নি—নিলে বুঝতেন।···মনমরা হয়ে গেছে। যেন বুঝতে পেরেছে, তার দুখিনী মায়ের খুব অসুখ।

—কিন্তু, অমন করলে, তারও যে ছোঁয়াচ লাগতে পারে, তা বুঝছেন না কেন?

এ কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ রুবীর কান্না বন্ধ হইয়া গেল। ভয়ার্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—এখনও ছোঁয়াচ লাগবার ভয় আছে?···তা'হলে আর আনতে বলব না, ঐখানেই থাক। একদিনে কিছু হবে না ত, ডাক্তার?

তার পর, সুধীরকে সে বিশদ্‌ভাবে বুঝাইতে বসিল—শিশুটিকে কি ভাবে দুধ খাওয়াইলে চুপ্ করিয়া খায়, কেমন করিয়া ঘুম পাড়াইতে হয়, কাঁদিলে কি ভাবে চুপ্ করাইতে হয়।

সুধীর বলিল—আচ্ছা, সে ওয়ার্ডের সিষ্টারকে সব বুঝিয়ে দেব'খন—আপনি চিন্তিত হবেন না।

—ধন্যবাদ, ডাক্তার দত্ত, বিশেষ ধন্যবাদ।

শেষে আরম্ভ হইল, জন্-এর কথা। রুবী দিন গুণিতেছে—কবে উঠিতে পারিবে, কবে ছেলেটাকে কোলে লইয়া, জন্-এর হাত ধরিয়া, আবার তাহাদের ভাঙ্গা ঘরে ফিরিয়া যাইবে। এমন অবস্থায় জন-এর একটুও সেবা করিতে পারিতেছে না বলিয়া সে কাঁদিয়া ভাসাইল।

এই অবস্থার লোকেদের ভিতর, এমন একটি স্নেহময়ী মাতা এবং প্রেমময়ী স্ত্রী সুধীর পূর্ব্বে দেখে নাই।

নিজের অসুখে পাশ ফিরিয়া শুইতে কষ্ট হয়। তবু, স্বামী-পুত্রের চিন্তায়ই সে বিকল হইয়াছে বেশী। দুশ্চিন্তার তাহার যেন সীমা নাই।

* * * *

সে ওয়ার্ড হইতে বাহিরে আসিয়াই সুধীর দেখিল, চিল্ড্রেন্স ওয়ার্ডের 'বয়' ছুটিয়া আসিতেছে, হাতের চিরকুটটা আগাইয়া দিয়া বলিল—শীগ্‌গীর চলুন, ডাক্তার সাহেব।

সিষ্টার ডাকিয়া পাঠাইয়াছে—শীঘ্র আসুন। ৪নং বেড-এর রোগী হঠাৎ কেমন হইয়া পড়িয়াছে। 'কোল্যাপ্স' করিতেছে।

রুবীর ছেলে?...কি হইল তাহার আবার? ক'দিন হইতে তাহার পেটের গোলমাল চলিতেছিল, তাহা সুধীর জানে। কিন্তু, হঠাৎ কোল্যাপ্স্?

ওয়ার্ডে আসিয়া দেখিল, খাটের চারিদিকে পর্দ্দা দেওয়া হইয়াছে। শিশুটি নির্জ্জীবের মত পড়িয়া।

কোটরগত চক্ষু, সমস্ত দেহ কালিবর্ণ, পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে। এক রাত্রে এত পরিবর্ত্তন!

নিবেদন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

খ্যাতির আমি নই ক মালিক
যশে আমার দাবী নাই।
আমার কথা ভাববে যে কেউ
সে কথাও ভাবি নাই।
ভয় করেছি পদে পদে,
ধনী মানীর পরিষদে,
দুরাশারি মন্দিরেতে
একটী রাতও যাপি' নাই।

২

মিঠা মেঠো পল্লী-পথে
আনন্দে গান গেয়েছি,
অকূল নদীর বিজন বুকে
জীবন-তরী বেয়েছি।
সরল বুকের ভালবাসা
ভক্তি প্রীতি ভরসা আশা,
কতই সোহাগ, কতই আদর
ব্যথার সাথে পেয়েছি।

৩

ক্ষুদ্র হিয়ায় দুখের সুখের
যখন যে ঢেউ লেগেছে,
ভাঙন ধরা ব্যাকুল বুকে,
কলধ্বনি জেগেছে।
কাঁদিয়াছে কান্না হেরি।
উৎপীড়িত লাঞ্ছিতেরি
বিরাম বিহীন ব্যাহন ঘরে
হরির কৃপা মেগেছে।

৪

পসারা যে হচ্ছে ভারী
দিবস আসে ভাটায়ে,
চিন ঘুড়িতে টান বাজিছে
ফুরায় সুতা লাটায়ে।
আস্‌ছে আঁধার ডুবছে চাকি,
সকল কাজই রইল বাকি,
ভূর্জ্জ পাতায় আঁখর এঁকে
দিবস দিলাম কাটায়ে।

৫

এসেছিলাম ক্ষণের পথিক,
হোলির দিনে একা ভাই,
পান্থশালায় আবীর রাঙা
গানের খাতা রেখে যাই।
মাথা অনুরাগের ফাগে,
পূত রাঙা পায়ের দাগে,
ইচ্ছা হলে ছিন্ন করো
কিম্বা তুলে দেখো ভাই।

সাময়িকী

শিক্ষার বাহন—

সংপ্রতি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে,—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে ছাত্রের মাতৃভাষাকে তাহার জন্য শিক্ষার বাহন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, বাঙ্গালা সরকার তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতি বর্ষাধিক কাল পূর্ব্বে এই প্রস্তাব বাঙ্গালা সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন, সরকারের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা সমবেত হইয়া নিয়ম নির্দ্ধারণ করিবেন।

এই সংবাদে আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। বাঙ্গালা সরকার এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যেরূপ বিলম্ব করিয়াছেন এবং এই সংবাদ প্রকাশের প্রায় পক্ষকাল পূর্ব্বে দিল্লীতে বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলনে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, তাহাতে অনেকে আশঙ্কা করিতেছিলেন, এই প্রস্তাব সরকার কর্তৃক গৃহীত হইবে না।

দিল্লীর সম্মিলনে মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি ছাত্রের মাতৃভাষাকে তাহার শিক্ষার বাহন করিবার যে প্রস্তাব করেন, তাহা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য কর্তৃক সমর্থিত হয়। মালব্যজী বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথার উল্লেখ করিয়া বলেন, তথায় ছাত্রের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা সাফল্য লাভ করিয়াছে। সার আকবর হায়দারী বলেন, ভারতবর্ষে বহু ভাষা প্রচলিত থাকিলেও তাহার জন্য ছাত্রের মাতৃভাষায় তাহাকে শিক্ষাদানে বাধা দূর করা অসম্ভব নহে; কারণ, অনেক ভাষার অক্ষর স্বতন্ত্র হইলেও ভাষার ধাতু বা প্রকৃতিতে বিশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান। যে জাতি বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করে, যে জাতি কখন পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে সম্পদ দান করিতে পারে না।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সার আকবরের এই যুক্তি ও মালব্যজীর উক্তি সত্বেও এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সার কে, আর, মেনন—ভারতবর্ষে ভাষা-বাহুল্যই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধ যুক্তি বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং বলেন, যে ভাষা (অর্থাৎ ইংরাজী) কেবল ভারতের সর্ব্বত্র নহে, পরন্তু সমগ্র সভ্য জগতে প্রচলিত তাহা শিক্ষা করিবার সুযোগ ত্যাগ করিয়া ভারতীয় ছাত্ররা কি জন্য ভারতের আর একটি ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষাতিরিক্ত ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইবে? আমরা তাঁহার যুক্তির অসারতায় লজ্জিত হইয়াছি। শিক্ষার্থী তাহার মাতৃভাষাতেই শিক্ষালাভ করিবে—বাঙ্গালা-ভাষাভাষী বা তামিল-ভাষাভাষীকে বাধ্য হইয়া হিন্দী শিক্ষা করিতে হইবে না। মাতৃভাষায় শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান বলিতে ভারতের আর একটি ভাষা শিক্ষায় তাহাকে বাধ্য করা বুঝায় না।

ডাক্তার হায়দারের যুক্তি আরও বিস্ময়কর। তিনি কেবল চাকরীর হিসাবে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি বিবেচনা করিয়া দারুণ সঙ্কীর্ণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, পঞ্জাবে চাকরী কমিশনের পরীক্ষা যখন ইংরাজীতে হয়, তখন তিনি ছাত্রের মাতৃভাষাকে তাহার শিক্ষার বাহন করিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবেনই।

এ দেশে যখন এমন মনোবৃত্তির অধিকারী শিক্ষিত লোকও বিদ্যমান তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সম্বন্ধে যাঁহারা মনে সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না।

আমরা দিল্লী সম্মিলন সম্পর্কে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্যের উক্তির উল্লেখ করিয়াছি। ইহার মাসাধিককাল পূর্ব্বে (৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪) হায়দ্রাবাদে উশমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে নবাব মেহদী ইয়ারজঙ্গ বাহাদুর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও বিশেষ আলোচ্য। তিনি বলেন, উশমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাবধি হায়দ্রাবাদে হিন্দুস্থানী ভাষাই বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদানার্থ ব্যবহৃত হইয়া

আসিতেছে। অনুবাদক সমিতির পরিশ্রমের এবং শিক্ষকদিগের উৎসাহের ফলে ইহাতে বিশেষ সাফল্যলাভ করা সম্ভব হইয়াছে। নবাব বাহাদুর বলেন, লর্ড মেকলে এ দেশে শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে যে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার প্রচারাবধি আমাদিগের মাতৃভাষার দৈন্য ও হীনতা সম্বন্ধে যে বিশ্বাস আমরা মনে পুষ্ট করিয়া আসিতেছি, তাহার জন্যই অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে পারিতেছেন না। যতদিন লোকের মনে এই বিশ্বাস থাকিবে যে, যে ভাষা পারিবারিক ব্যবহারের উপযুক্ত তাহা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-বাহন হইতে পারে না, ততদিন লোক সে বিশ্বাস সত্য কি না এবং সত্য হইলেও মাতৃভাষা ব্যবহারের বিঘ্ন দূর করা যায় কি না, তাহা বিচার করিতেও নিস্পৃহ থাকিবে। আমাদিগের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা বর্ত্তমান থাকাতেই আমাদিগের মধ্যে মৌলিক চিন্তার যেমন অভাব প্রবল, পাঠ্য পুস্তক কণ্ঠস্থ করিবার প্রবৃত্তি তেমনই উগ্র,—আর সেই জন্যই আমরা পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে সম্পদ প্রদান করিতে পারিতেছি না।

আমরা সর্ব্বতোভাবে নবাব বাহাদুরের উক্তির সমর্থন করি। তিনি মেকলের যে বিবৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন। মেকলে প্রাচীর কোন সাহিত্যের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন না। তাঁহাতে ইংরাজের দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতারও অভাব ছিল না। তাই তিনি প্রাচীর সাহিত্যকে নগণ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে, এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনফলে অল্পকাল মধ্যেই এ দেশে প্রতীচ্য বিজ্ঞান-জ্ঞানসম্পন্ন রচনাকুশল বহু লোকের আবির্ভাব হইবে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, এ দেশে দেশীয় ভাষার বিনাশ সাধন মেকলে প্রমুখ ইংরাজী শিক্ষানুরাগীদিগের উদ্দেশ্য ছিল না। অর্থাৎ কোন কোন ইংরাজ জাতীয়তার বিনাশ-সাধনোদ্দেশ্যে যেমন আয়র্লণ্ডে আইরিশ ভাষার বিলোপসাধন প্রচেষ্টা করিয়াছিল—তাঁহারা তেমন কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া কায করেন নাই। আইরিশরা বিজেতৃগণের চেষ্টায় যখন তাঁহাদিগের প্রাচীন সামাজিক সংস্থান হারাইতে থাকেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে আইরিশ নেতারা ভাবপ্রকাশের উপায় মাতৃভাষাও ত্যাগ করিতে থাকেন।

সুখের বিষয় এ দেশে তাহা হয় নাই। মেকলের বিবৃতি প্রচারের পরই এ দেশে যে সকল শিক্ষিত—ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহারা মাতৃভাষার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এ দেশে ইংরাজ—দেশশাসনকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য যেমন দেশীয় ভাষার অধ্যয়ন-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তেমনই—ঐ কার্য্যের জন্যই—এ দেশের লোককে ইংরাজী শিক্ষা দিয়া বিরাট চাকরীয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে ও সুশাসন প্রবর্ত্তিত হইলে যাঁহারা এ দেশে—বিশেষ বাঙ্গলায়—নূতন সাহিত্যের প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারা দেশের লোকের কল্যাণকল্পেই সে কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ব্রহ্মমোহন মল্লিক, দুর্গাদাস কর প্রভৃতির চেষ্টায় নানা বিভাগে নূতন সাহিত্যের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী চিকিৎসা শিক্ষার্থীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"এ দেশের ভাষাই তোমাদিগের মাতৃভাষা। তাহা আয়ত্ত করিতে তোমাদিগকে অধিক শ্রম বা অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। সুতরাং স্বল্পব্যয় ও সহজবোধ্যতা মাতৃভাষার অনুশীলনের বিশেষ কারণ। বর্ত্তমানে অসুবিধা এই যে, চিকিৎসাবিদ্যার বহু গ্রন্থ (দেশীয় ভাষায়) নাই।"

ইহার পূর্ব্বে ১৮৫৪ ও ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এ দেশের সরকারও বিলাতে লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষের লোকের মাতৃভাষাই তাহাদিগের শিক্ষার বাহন হইবে।"

কিন্তু উশমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নবাব বাহাদুর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই আমাদিগের মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার পক্ষে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজীতে সুশিক্ষিত তাঁহাদিগের অনেকে দেশীয় ভাষাকে পুষ্ট করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহা দীন মনে করিয়া অবজ্ঞা করিতে থাকেন। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শন' প্রচার করেন, তখন তিনি মাতৃভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আপনার সঙ্কল্প সমর্থন প্রয়োজন মনে

করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই উপযুক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। কারণ—

"এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজীতে না বলিলে সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, এক-পরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজীর দ্বারা সাধনীয়; কেন না এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলন-ভূমি ইংরাজী ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যতদূর ইংরাজী চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক।"

মনে রাখিতে হইবে কংগ্রেস কল্পিত হইবারও বহু পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন:—

"কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। * * * পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই [illegible]য়া উঠিবে না। গিল্‌টী পিতল হইতে খাঁটি রূ[illegible] ভাল। * * নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহনীয়। ইংরাজী লেখক, ইংরাজীবাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, তত-দিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না।"

আজ বাঙ্গালা ভাষা সর্ব্বভাবপ্রকাশক্ষম এবং বাঙ্গালা সাহিত্য পরিপুষ্ট। কিন্তু সে সরকারের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টায় নহে—তাঁহাদিগের অবজ্ঞা ও উপেক্ষা সত্ত্বেও। বাঙ্গালা ভাষা যে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানলাভ করিয়াছে, সে কেবল বিশ্ববিদ্যালয় আর ইহাতে অবজ্ঞা করিতে পারেন না বলিয়া।

এখনও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বাহন হইবার পথে যে সব বাধা বিদ্যমান, সে সকলের মধ্যে তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(১) ইংরাজীর অযথা ও অ[illegible] আদর; (২) বাঙ্গালী মুসলমানদিগের বাঙ্গালাকে মাতৃভাষা বলিতে লজ্জাবোধ; (৩) হিন্দীকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করিবার [illegible] এক দল রাজনীতিকের চেষ্টা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী ছাত্রের মাতৃভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা-দানের সুবিধা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি যে বলিয়াছিলেন, এ দেশের ভাষায় বহু চিকিৎসা গ্রন্থের অভাব, বাঙ্গালায় সে অভাবও পূর্ণ হইয়াছে। তথাপি —কলিকাতার ক্যাম্পবেল স্কুলে বাঙ্গলার পরিবর্ত্তে ইংরাজীতে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং তাহার পর যে সব ডাক্তারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সকলে[illegible] ইংরাজী ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলে শিক্ষা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়সাধ্য হইয়াছে। বাঙ্গালী চিকিৎসক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন—রোগের নিদান নির্ণয় ও ঔষধের বিধান করিবার জন্য, ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি দেখাইবার জন্য নহে। সে অবস্থায় শিক্ষাদান বাঙ্গালায় না হইয়া কি জন্য ইংরাজীতে হইবে? বরং দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বব্যবস্থার পরিবর্ত্তনফলে বাঙ্গালায় চিকিৎসা বিদ্যাবিষয়ক সাহিত্যের পুষ্টি নিবারিত হইয়াছে। আমাদিগের মনে হয়, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা যদি তাঁহাদিগের গবেষাফল বাঙ্গালায় লিপিবদ্ধ করিতেন, তবে যে কেবল তাঁহাদিগের লক্ষ লক্ষ দেশবাসী সে সকলের আস্বাদ পাইতে পারিতেন তাহাই নহে, পরন্তু বিদেশী বৈজ্ঞানিকরাও বাঙ্গালা শিখিতে বাধ্য হইতেন। বাঙ্গালীরা বাঙ্গালাতেই আপনাদিগের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিবেন, এমন আশা কেন দুরাশা হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ইংরাজীর এই অকারণ আদরের কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

বাঙ্গালার মুসলমানরা বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে উর্দ্দু ভাষা ব্যবহারই যেন আভিজাত্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন!

বাঙ্গালার মুসলমানরা একটু শিক্ষিত হইলেই উর্দ্দু শিখিতে চেষ্টা করেন। ফলে মুসলমান বালককে মাতৃভাষা

ব.., া, রাজভাষা ইংরাজী ও আভিজাত্যের পরিচায় ' উর্দ্দু ভাষা শিখিতে চেষ্টা করিতে হয়—প্রায়ই কোনটিতে অধিকার ভাল হয় না। অথচ মুসলমানের ধর্ম্মগ্রন্থ ৬ তে লিখিত নহে—তাহা আরবীতে লিখিত। সো ন বাঙ্গালায় আগা খাঁকে মুসলমানরা অভিনন্দিত করিলে তিনি মুসলমানদিগকে বাঙ্গালার অনুশীলন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

"বাঙ্গালা অতি সুন্দর ভাষা। সেই ভাষায় মানুষের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা যায়। বাঙ্গালায় উপযুক্ত ইসলামিক পুস্তকের একান্ত অভাব।"

তিনি বাঙ্গালী মুসলমানদিগের জন্য মুসলমানের গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদের ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দেন। পূর্ব্বে মুসলমানরা বাঙ্গালায় উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিতেন —.দুর পুরাণও তাঁহারা কবিতায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। আগা খাঁ মুসলমানদিগের নেতা এবং বিলাতেই বাস করেন। তিনি বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে মাতৃভাষার অনুশীলন জন্য যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালার মুসলমানরা পালন করিবেন কি?

শেষ বিপদ—হিন্দীর আক্রমণ। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা সাহিত্য যে হিন্দী সাহিত্যকে পরাভূত করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু এক দল বাঙ্গালী ভারতের রাজনীতিক নেতার দণ্ড অন্য প্রদেশের লোককে প্রদান করায় এখন হিন্দীকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করিবার চেষ্টা করিতে তাঁহারা সাহস পাইয়াছেন। বাঙ্গালীকে "নিজ বাসভূমে পরবাসী" করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে, ইহা তাহারই এক রূপ। বাঙ্গালী বালকবালিকা সাধারণতঃ জ্ঞানার্জ্জনের ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বাঙ্গালা ভাষারই অনুশীলন করিবে। তাহার পর রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বা ঐরূপ অন্য কারণে তাহারা ইচ্ছা করিলে ইংরাজী শিখিবে। তাহারা হিন্দী শিখিবে কেন? ভারতবর্ষের অতীত ও গৌরবময় যুগের অনুশীলনের সহিত যদি তাহাদিগের পরিচয় করিতে হয়, তবে তাহারা সংস্কৃত শিখিবে। তাহাদিগের পক্ষে হিন্দীভাষা শিখিবার কোন প্রলোভন থাকিতে পারে না। বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করিবার—বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিপথ রুদ্ধ করিবার—বাঙ্গালীকে রাজনীতিক হিসাবে নিজ প্রভাবাধীন করিবার জন্য অন্য প্রদেশের লোকের এই যে চেষ্টা, ইহা বাঙ্গালীকে প্রহত করিতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে এতদিনে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষাকেই তাহার শিক্ষার বাহন করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন, ইহা আমরা সুলক্ষণ বলিয়াই বিবেচনা করি। বাঙ্গালী ছাত্রের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। বিহার স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—উড়িষ্যাও তাহাই করিতেছে। সুতরাং বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের পক্ষে আর অন্য প্রদেশের মুখের দিকে চাহিবার কোন প্রয়োজন নাই।

আমরা আশা করি, অতঃপর বাঙ্গালী শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষা স্বল্পশ্রমলভ্য ও স্বল্পব্যয়সাধ্য হইবে—তাহা সহজে পরিপাক হইবে এবং ফলে বাঙ্গালী মৌলিক চিন্তার দ্বারা ভারতবর্ষের ও বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

সার আশুতোষের মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা—

বিগত ২৫শে মার্চ্চ রবিবার পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ও চৌরঙ্গী রোডের সঙ্গমস্থলে বাঙ্গালার পুরুষ-সিংহ পরলোকগত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্রোঞ্জ ধাতু নির্ম্মিত একটী প্রতিমূর্ত্তি মহা সমারোহে উন্মোচিত হইয়াছে। সন্তোষের রাজা মাননীয় সার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্নে এই প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তিনিই সেদিন এই মূর্ত্তির উন্মোচন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রথমে মান্দ্রাজ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ, প্রথিতনামা বাঙ্গালী ভাস্কর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয় প্যারিস প্লাষ্টারের দ্বারা এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। এখানে সেই মূর্ত্তিরই আলোকচিত্র দেওয়া হইল। সার আশুতোষের মূর্ত্তির পার্শ্বেই শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ বাবুর মূর্ত্তি রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ বাবু যৎসামান্য পারিশ্রমিক, সাড়ে চারি হাজার টাকা লইয়া এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। তাহার পর সেই মূর্ত্তি ইটালীতে প্রেরণ

। সেখানকার প্রসিদ্ধ ভাস্করেরা মূর্ত্তিটি ব্রোঞ্জের পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন। এতদিন পরে সেই মূর্ত্তি রা গঠিত করেন এবং সেজন্য দশহাজার টাকা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই উপলক্ষে খ্যাতনামা বাগ্মী সভাপতি মাননীয় রাজা সার মন্মথনাথ যে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা রাজা বাহাদুর ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্রোঞ্জধাতু নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি

ডাক্তার প্রমথনাথ নন্দী—

মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে কলিকাতার ও বাঙ্গালার অন্যতম প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার পি, নন্দী নামে অধিক পরিচিত প্রমথনাথ নন্দী পরলোকগত হইয়াছেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রমথ-[illegible]র জন্ম হয় এবং মৃত্যুর দুই দিন মাত্র পূর্ব্বে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষ বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং মেডিক্যাল কলেজে প্রতিভাবান ছাত্র বলিয়া বিবেচিত ছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি এল, এম, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা ব্যবসা অবলম্বন করেন ও ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে "ডাক্তার" (এম, ডি) উপাধি লাভ করেন। পরবৎসর হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি কার্মাইকেল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক ও চিকিৎসক ছিলেন। এই কলেজের প্রতি তাঁহার অসাধারণ স্নেহ ছিল। যখন হাওড়ার নির্ব্বাচকরা তাঁহাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক

সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত করিতে চাহেন, তখন তিনি—উহাতে তাঁহার কলেজের কায ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া—সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই।

প্রমথনাথ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও চিকিৎসা বিভাগে সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর বাঙ্গলার কাউন্সিল অব মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সভ্য ছিলেন।

কয় মাস পূর্ব্বে তিনি বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। অসুস্থ অবস্থাতেই । তাঁহার

ডাক্তার প্রমথনাথ নন্দী

কোন পীড়িত আত্মীয়কে দেখিতে গমন করেন। ৩রা জানুয়ারী তিনি তথায় গমন করেন এবং তৃতীয় সপ্তাহের শেষে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ফেবরারী মাসের মধ্যভাগে তাঁহার অসুস্থতা দূর হয় বলিয়া মনে হয়। তখন কে জানিত, তিনি মৃত্যুপথের যাত্রী? ১১ই মার্চ্চ বন্ধুদিগের সহিত আলাপ করিতে করিতে তিনি মুখ প্রক্ষালনের জন্য জল চাহেন। তাহার পর জলের গ্লাসটি টেবলের উপর রাখিয়া দুইবার "হরিবোল" বলিয়া শয্যায় শয়ন করেন—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবনান্ত হয়।

প্রমথনাথ চিকিৎসাশিক্ষার্থীদিগকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। কলিকাতায় কোন ছাত্রাবাসে কোন শিক্ষার্থী অসুস্থ হইলে স্বয়ং যেমন তাহার চিকিৎসা করিতেন, তেমনই নিজ গৃহ হইতে তাহার পথ্য পর্য্যন্ত প্রস্তুত করাইয়া লইয়া যাইতেন—এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

আমরা তাঁহার বিধবাকে ও পুত্রকন্যাদিগকে তাঁহাদিগের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

যামিনীভূষণ আয়ুর্ব্বেদীয় যক্ষ্মা-চিকিৎসাগার—

মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় স্বর্গত ত্যাগী মহাপুরুষ কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়ের পুণ্যফলে—এই কলিকাতা মহানগরীর এক প্রান্তে, পাতিপুকুর শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ রোডের উপর তাঁহারই উদ্যানে, তাঁহার সহকর্ম্মীগণের অক্লান্ত চেষ্টায় "যামিনীভূষণ আয়ুর্ব্বেদীয় যক্ষ্মা-চিকিৎসাগার" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাদান এবং তাহার প্রচারের জন্য কলিকাতায় একটি কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা যামিনীভূষণের শেষ জীবনের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান ও লক্ষ্য হইয়াছিল। তিনি প্রথমে ফড়িয়াপুকুরে একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া এইরূপ কলেজ ও হাসপাতালের মাত্র বহির্বিভাগ (out-door dispensary) স্থাপিত করেন এবং এতদুভয়ের সমস্ত ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করিতে থাকেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার সে কল্পনার কলেজ ও হাসপাতালগৃহের ভিত্তিস্থাপন মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য হস্ত দ্বারা সম্পন্ন হয়। আজ তাহা "যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল" নামে রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের উপর উন্নতশীর্ষে এবং সাফল্য-গৌরবে বিরাজ করিতেছে। মাননীয় জষ্টিস্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন সরস্বতী, লোকহিতানুরাগী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে, শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রমুখ যে মহোদয়গণ যামিনীভূষণের সহিত তাঁহার ব্রতসাধনে আপনাদিগকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পরলোকগমনের পর

তাঁহাদেরই মিলিত চেষ্টার ফলে "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল" আজ সমগ্র ভারতবর্ষের এক গৌরবময় প্রতিষ্ঠান বলিয়া সাধারণ সমক্ষে পরিগণিত। এখন সে কলেজের ছাত্রসংখ্যা প্রায় আড়াইশত। হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে (In-door) প্রায় একশত রোগীর থাকিবার সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে, এবং প্রতিদিন আড়াইশত হইতে তিনশত রোগী বহির্বিভাগে চিকিৎসিত হইতেছে। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে এই হাসপাতালের কার্য্যনির্বাহক সভা স্থির করেন যে আয়ুর্ব্বেদ মতে যক্ষ্মা রোগীগণের বিশিষ্ট ভাবে চিকিৎসার জন্য ইহারই শাখারূপে একটি যক্ষ্মা-হাসপাতাল নিতান্ত প্রয়োজন। কলিকাতা করপোরেশন্‌কে আবেদন করায় তাঁহারা গৃহনির্ম্মাণে সাহায্যের জন্য এক কালীন পঁচিশ হাজার টাকা দান করেন। তাঁহাদের আনুকূল্য ব্যতীত কর্ত্তৃপক্ষগণের এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। ইংরাজী ১৯৩২ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের তৎকালীন মেয়র সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এই যক্ষ্মা হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত করেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়কে এই গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে সমস্ত বন্দোবস্ত ও তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়। তাঁহার অনুরোধে বিখ্যাত কণ্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত পি, সি, কুমার মহাশয় বিনা লাভে এই সুন্দর হাসপাতাল-গৃহ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন। পাঁড়ে মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নিয়ত পরিদর্শন করায় হাসপাতালের সকল বিষয়ে সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অধ্যক্ষ ও হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ কবিরাজ শ্রীযুক্ত শিবনাথ সেন ও যক্ষ্মা-হাসপাতাল সাব-কমিটির প্রত্যেক সদস্য এই মহাসাধনে বিশেষ পরিশ্রম ও কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। বিগত ২৫শে মার্চ্চ তারিখে কলিকাতার প্রধান নাগরিক শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু এই হাসপাতালের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। ঐ উপলক্ষে আহূত সভায় কলিকাতার বহু চিকিৎসক ও আর্ত্তসেবারত অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে হাসপাতালগৃহ গঠনে আলোকে, মুক্ত বাতাসে ও সূর্য্যকিরণসম্পাতে আশাতীত নির্ম্মাণ-কৌশলের পরিচয় দিতেছে। বহুব্যয়সাধ্য এ

যামিনীভূষণ আয়ুর্ব্বেদীয় যক্ষ্মাচিকিৎসাগার

চিকিৎসাগার পরিচালনের জন্ত কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আশা করা যায় এ প্রার্থনা ব্যর্থ হইবে না। সভাপতি মহাশয় সকলের সমক্ষে সেদিন বিজ্ঞাপিত করিলেন, যে চীৎপুর রোড নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় চারি সহস্র টাকা এই

স্বর্গত কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়

[হাস]পাতালে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, হিরীটোলার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদগোপাল মিত্র মহাশয় [...] হাজার টাকার প্রথম চেক এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থ [দি]য়াছেন। সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির সহানুভূতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাহাতে হাসপাতালে যাইবার রাস্তাটি বর্ষাকালে জলে না ডুবিয়া যায়, তাহার প্রতিকারের জন্ত তথাকার চেয়ারম্যান ও কমিশনার মহোদয়গণ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

এই হাসপাতালে চল্লিশজন রোগীর স্থান আছে, তন্মধ্যে আটাশজনের চিকিৎসা বিনামূল্যে করিবার ব্যবস্থা আছে। অপর ১২জনকে হাসপাতালে বাস এবং চিকিৎসার নানাবিধ ব্যয়ের জন্ত দৈনিক ২৲ হারে দিতে হইবে।

আয়ুর্ব্বেদে কথিত আছে,—

অজাগরিষ্টঃ সর্ব্বৈরপি শোষলিঙ্গৈ রূপদ্রুত সাধ্যোজ্ঞেয়ঃ।

—চরক, নিদানস্থান

যদিও কোন রোগীর যক্ষ্মাসূচক সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তথাপি তাহার রোগ চিকিৎসাসাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে—কেবলমাত্র যদি তখনও মৃত্যুর নিশ্চিত লক্ষণ সকল প্রকাশ না পাইয়া থাকে।

হতাশের বুকে আশার দীপশিখাসম ঋষি-কথিত এই অভয়বাণী ভারতের দিকে দিকে আশার সঞ্চার করুক, রোগবিভীষিকায় পরিম্লান কুটীরে, সৌধে, নগরে, পল্লীতে আবার মুক্তির আনন্দরশ্মি ফুটিয়া উঠুক, অযুত দার্শনিক-কণ্ঠে আয়ুর্ব্বেদের জয়গাথা নানা স্থানে গীত হউক, আর ভগবৎকৃপাবর্ষণে তাহারই সুমিষ্ট সুশীতল ফলে পৃথিবীর অজস্র কল্যাণ সাধিত হউক,—এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

পরলোকে নফরচন্দ্র পালচৌধুরী—

নদীয়া নাটুদহের দেশহিতৈষী জমিদার নফরচন্দ্র পালচৌধুরী মহাশয় বিগত ২৬েশ মার্চ্চ তাঁহার কলিকাতার প্রবাস-ভবনে বসন্ত রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। নফরবাবু নদীয়া জেলার সকল দেশহিতকর কার্য্যের অগ্রণী ছিলেন; রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত যে রেলপথ আছে, তাহা প্রধানতঃ নফরবাবুর উদ্যোগেই নির্ম্মিত হয়। তিনি বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। নদীয়া

জেলার নীলকরদিগের সহিত বহুদিন সংগ্রাম করিয়া তিনি তাঁহার জমিদারীর এক বিশিষ্ট অংশ উদ্ধার করেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের শীর্ষে যে ঘড়ি আছে, তাহা নফরবাবুর অর্থেই নির্ম্মিত হয়। তাঁহার স্বজাতি তাম্বুলী সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য তিনি চেষ্টা যত্ন ও অর্থব্যয়ে কখন কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

পরলোকে সুরেন্দ্রলাল রায়—

দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় এবং তাঁহার পুত্র কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কল্যাণে কৃষ্ণনগরের রায়বংশের কথা বাঙলায় অবিদিত নয়। এই পরিবারের সহিত নদীয়া রাজপরিবারের বংশপরম্পরায় সম্বন্ধ। এই স্বনামখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সুরেন্দ্রলাল আজীবন ইহার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইনি দেওয়ানজীর অষ্টমপুত্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি বহুকাল নদীয়ার মহারাজ বাহাদুর ক্ষিতীশচন্দ্রের ম্যানেজার ছিলেন এবং চিরকাল কৃতিত্বের সহিত এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন—এতদ্ব্যতীত তিনি স্থানীয় কলেজ, স্কুল, সরকারী হাসপাতাল ইত্যাদি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটীর সভ্য হিসাবে তিনি বাইশ বৎসর সেবা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহাকে কেহ কখনও রাগিতে দেখে নাই। সুরেন্দ্রলালের জন্মভূমি-প্রীতি অনন্যসাধারণ। তাঁহার পুত্রেরা সকলেই কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে থাকিতে বাধ্য;—তিনি ইচ্ছা করিলেই কাহারও নিকট অধিকতর সুখে বিদেশে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া চিরকাল তিনি কৃষ্ণনগরে একেবারে একলা নিঃসঙ্গ অবস্থায় অসুস্থ শরীর লইয়া পড়িয়া থাকিতেন। জন্মভূমিপ্রীতির অনুরোধে তিনি নিজের দৈহিক সুখসাচ্ছন্দ্য সানন্দে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে সকল সময়ই তিনি গীতা ও অন্যান্য ধর্ম্মপুস্তক লইয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গত ১৩ই চৈত্র শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে দুই পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র পৌত্রীদের মাঝখানে সুখে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার এই মৃত্যুকে ইচ্ছামৃত্যু বলা চলে, কারণ বহুদিন হইতেই তিনি নিজের মৃত্যুদিন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আসিয়াছিলেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় যে তিনি সেই নিজের নিরূপিত সময়েই দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সব-রেজিষ্টার এবং কনিষ্ঠ বর্দ্ধমান-রাজের দেবোত্তর এষ্টেটের ম্যানেজার এবং 'ভারতবর্ষের' লেখক।

পরলোকে কুমুদনাথ চৌধুরী—

আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি, আমাদের পরম বন্ধু, প্রবীণ সাহিত্যিক, সুপ্রসিদ্ধ শিকারী ব্যারিষ্টার-প্রবর কুমুদনাথ চৌধুরী বিগত ১লা এপ্রিল রবিবারে ব্যাঘ্রকবলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি চিরজীবন কার্য্য হইতে সামান্য অবসর লাভ করিলেই ভারতবর্ষের নানা স্থানে শিকার করিতে যাইতেন; ভারতবর্ষে তাঁহার ন্যায় শিকারী আর অধিক নাই বলিলেও হয়। এবারও ইষ্টারের অবকাশ সময়ে তিনি মধ্য-প্রদেশের গড়জাত-মহলের অন্তর্গত কালাহাণ্ডি করদ-রাজ্যের অরণ্যে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। ১লা এপ্রিল শিকারমঞ্চের উপর হইতে তিনি একটী বিপুলকায় ব্যাঘ্র দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ 'মাচান' হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ব্যাঘ্রটীর দিকে অগ্রসর হন; ব্যাঘ্রটি তখনই তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং তাঁহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয় এবং অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। যিনি এই ৭১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কত ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু শিকার করিয়াছেন, বিধাতার অমোঘ বিধানে কালাহাণ্ডির অরণ্যে সেই জীবনের এমন শোচনীয় অবসান হইল। কুমুদনাথ শুধু প্রসিদ্ধ শিকারীই ছিলেন না, তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন; ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসামান্য দখল ছিল। তিনি শিকার বিষয়ে ইংরাজীতে অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন; বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত তাঁহার 'ঝিলে ও জঙ্গলে শিকার' বিশেষ জনাদর লাভ করিয়াছিল। তিনি পরলোকগত বিচারপতি খ্যাতনামা আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের

কনিষ্ঠ-ভ্রাতা। আমরা তাঁহার পুত্রদ্বয় কালীপ্রসাদ ও কল্যাণকুমার এবং তাঁহার ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও অগণিত বন্ধু-বান্ধবের গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺কুমুদনাথ চৌধুরী

৩রা এপ্রিল তাঁহার শবদেহ কলিকাতায় আনীত হইয়া যথারীতি শেষকার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে।

—

ব্যায়ামকুশল শ্রীমান বিধুভূষণ জানা—

আজকাল শরীরচর্চ্চার দিকে বাঙ্গলার তরুণ সমাজের অনুকূল দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়—আশার কথা। মনে হয়, এইভাবে চর্চ্চা করিতে থাকিলে, কালে, বাঙ্গলার তরুণ-তরুণীর দুর্ব্বলতার কলঙ্কমোচন হইতে পারে। আজ আমরা আর একটি তরুণ ব্যায়াম-বীরের সহিত পাঠক-পাঠিকার পরিচয় করাইয়া দিতেছি। শ্রীমান বিধুভূষণ জানা নিখিল বঙ্গীয় ব্যায়াম-চর্চ্চা সমিতির (All Bengal Physical Culture Association) এবং বেকার হোষ্টেলের ব্যায়ামশিক্ষক। বাঙ্গলার ছাত্র-সমাজের নিকট ইনি সুপরিচিত। ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও ইনি ব্যায়ামবীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। "স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম" শীর্ষক একখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বাঙ্গলার তরুণ সমাজকে, কি প্রকারে ব্যায়ামচর্চ্চার দ্বারা শরীরকে

ব্যায়ামকুশল শ্রীমান্ বিধুভূষণ জানা

সুস্থ, দৃঢ় ও কর্ম্মক্ষম রাখিতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সকল প্রকার ব্যায়াম-চর্চ্চা করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন—বইখানি সেই অভিজ্ঞতার ফল। এই তরুণ যুবকটি অজীর্ণ, অম্ল, বাত, ক্ষীণতা, স্থূলত্ব, অকাল-বার্দ্ধক্য প্রভৃতি শারীরিক বিকৃত অবস্থাগুলি বিভিন্ন প্রকার ব্যায়ামচর্চ্চার দ্বারা আরোগ্য করাইয়া দিতে সমর্থ। বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া, নিয়মিতভাবে ব্যায়ামচর্চ্চা করিয়া, সরলভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, সুস্থ দেহে দীর্ঘজীবী হওয়া যায় ইহাই তাঁহার মত। আমরা শ্রীমানকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

—

ভারত সরকারের বাজেট—

গতবার আমরা ভারত সরকারের বাজেটের সামান্য পরিচয় দিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলাম। আমরা বলিতে বাধ্য, এই বাজেট পরীক্ষা করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। বর্ত্তমান অর্থ-সচিব সার জর্জ্জ সুস্তারের কার্য্যকাল শেষ হইয়া আসিতেছে। তিনি যদি মনে করিয়া থাকেন, "যেন তেন প্রকারেণ" ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক দেখাইয়া তিনি সানন্দে বিদায় লইবেন, তবে তিনি ভ্রান্ত। কেন না, তিনি যে উপায়ে ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা "হস্তেস্থিত" দেখাইয়াছেন, তাহা, হিসাবে যেমনই কেন দেখা যাউক না, প্রকৃত প্রস্তাবে অমূলক। বরং দেখা যাইতেছে, তিনি নূতন শুল্ক স্থাপিত না করিয়া আয়ে ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারেন নাই। কারণ, তিনি স্বীকার করিয়াছেন—

বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ঋণ হইতে অব্যাহতি লাভের ও ঋণের পরিমাণ হ্রাসের জন্য যে টাকা রাখিতে হয়, তাহা রাখা হইবে না।

ইহা কখনই অর্থনীতিকোচিত নহে। কারণ, এই যে সঞ্চয়ভাণ্ডার ইহার উপযোগিতা ও প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক এবং সেই জন্যই ভাণ্ডারে সঞ্চয় রাখা হয়। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে,—

সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ বাড়িয়াছে।

যদিও অর্থ-সচিব বলিয়াছেন, ঋণ যে পরিমাণ বাড়িয়াছে, উৎপাদক সম্পত্তির মূল্য তদপেক্ষা অধিক বাড়িয়াছে, তথাপি ঋণবৃদ্ধি সমর্থনযোগ্য নহে।

কেবল তাহাই নহে—ভারতবর্ষ হইতে যে স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইতেছে, তাহাও চিন্তার বিষয়।

এই ব্যবসা মন্দার সময় অর্থ-সচিব শুল্কভার হ্রাস করা ত পরের কথা, শুল্কবৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছেন—

(১) এ দেশে যে দেশলাই উৎপন্ন হয়, তাহাতে গ্রোস প্রতি ২ টাকা ৪ আনা হিসাবে শুল্ক স্থাপিত করিয়া সরকার ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আয়ের আশা করেন।

এতদ্ভিন্ন—

(২) এ দেশে যে চিনি উৎপন্ন হয়, তাহার উপরও হন্দর প্রতি ১ টাকা ৫ আনা হিসাবে শুল্ক স্থাপিত হইবে। ইহার মধ্যে ১ আনা ইক্ষু উৎপাদকদিগকে সমবায় সমিতিতে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে দেওয়া হইবে বটে, কিন্তু অবশিষ্ট ১ টাকা ৪ আনা ভারত সরকারের তহবিলে জমা হইবে।

এ দেশে চিনির শিল্প এককালে সমৃদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু তাহার পর তাহার দুর্দ্দশার বিষয় সকলেই অবগত আছেন। শর্করাশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পেই আমদানী শুল্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অথচ দেশে এই শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতেই এই নূতন শুল্ক প্রতিষ্ঠিত হইল! ইহার ফলে শর্করাশিল্পের অনিষ্ট হইবে এবং চিনি ব্যবহারকারী দেশের লোককে অধিক মূল্যে চিনি ক্রয় করিতে হইবে।

দেশলাই সম্বন্ধেও কতকটা এই কথা বলা যায়।

নিত্যব্যবহার্য্য ও অপরিহার্য্য পণ্যের উপর শুল্ক প্রতিষ্ঠা করায় তাহার মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য্য হয়—অর্থাৎ তাহাতে দেশের জনসাধারণের ব্যয় বাড়িয়া যায়। লর্ড কার্জ্জন যখন বিদেশী চিনির উপর আমদানী শুল্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তখন তাহাতে চিনির মূল্য বাড়িবে বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের মত দেশের লোক কখন অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থক হইতে পারে না। কারণ, তাহাদিগকে শিল্প-প্রতিষ্ঠা করিয়া বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। কিন্তু শুল্ক যদি শঙ্খবণিকের করাতের মত "আসিতে যাইতে কাটে"—তবে তাহা কষ্টকর হইয়া উঠে।

দেশলাইয়ের উপর যে শুল্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে সরকার ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আদায় করিবার আশা করেন। তাহা হইতে পাটপ্রসূ প্রদেশত্রয়কে অর্থাৎ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসামকে যথাক্রমে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা, ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হইবে। একুনে এই ১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা দিয়াও ভারত সরকার অবশিষ্ট প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিবেন। তদ্ভিন্ন চিনির উপর হন্দর প্রতি ১ টাকা ৪ আনাতেও অল্প লাভ হইবে না।

পাটের উপর যে রপ্তানী শুল্ক আদায় হয়, তাহার অর্দ্ধাংশে বাঙ্গালা ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা পাইবে বটে, কিন্তু দেশলাইয়ের জন্য বাঙ্গালাকেও আপন অংশে অনেক টাকা দিতে হইবে—সুতরাং ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা

পাইবার জন্যও বাঙ্গালাকে কতক টাকা দিতে হইবে। তদ্ভিন্ন চিনির উপর যে শুল্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার ফলে বাঙ্গালার শর্করাশিল্পের সমৃদ্ধির পথ বিঘ্নাস্তৃত হইবে।

সত্য বটে বাঙ্গালা ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা পাইবে, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালা সুবিচার পাইবে না। তাহার কারণ—

(১) বাঙ্গালা পাটের রপ্তানী শুল্কের সর্ব্বাংশ পাইবে না; এবং

(২) যাহা দেওয়া হইবে, তাহাও বাঙ্গালার অবশ্য-প্রাপ্য হিসাবে দেওয়া হইবে না।

এই টাকা বাঙ্গালাকে যেন দয়া পরবশ হইয়াই ভারত সরকার দিতেছেন! অর্থ-সচিব বলিয়াছেন—

"যত অনুসন্ধান হইয়াছে, সবগুলিতেই দেখা গিয়াছে, বাঙ্গালাকে বিশেষভাবে সাহায্য করা প্রয়োজন। নূতন শাসন-সংস্কার-প্রস্তাবেও বাঙ্গালাকে সাহায্য প্রদানের প্রয়োজন উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ভারত সরকারও সেই মত গ্রহণ করিয়াছেন। আবার, যদি এ সম্বন্ধে কিছু করিতে হয়, তবে অবিলম্বে করাই সঙ্গত। কারণ, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালার ঋণ বার্ষিক প্রায় দুই কোটি টাকা হিসাবে পুঞ্জীভূত হইতেছে এবং ইহার পরে ঋণভার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াও অর্থ-সচিব নিরস্ত হয়েন নাই। তিনি বলিয়াছেন:—

"যদি এ বিষয়ে কিছু করিতে হয় অর্থাৎ ভারত সরকারকে যদি বাঙ্গালাকে অর্থ সাহায্য করিতে হয়, তবে প্রথমে দেখিতে হইবে—বাঙ্গালা সরকার ও বাঙ্গালার ব্যবস্থা-পরিষদ আপনাদিগের সাহায্যার্থ যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা যাহা করিব, তাহা এই সর্ত্তে।"

এ কথা বিদ্বিষ্ট বোম্বাইয়ের মুখে শোভা পায় বটে, কিন্তু ভারত সরকারের অর্থ-সচিবের মুখে নহে। ভারত সরকারের অর্থ-সচিব স্বীকার করেন না, পাটের উপর রপ্তানী শুল্কের সব টাকা বাঙ্গালার ন্যায্য প্রাপ্য; সে টাকা ভারত সরকার আত্মসাৎ করিলে বাঙ্গালার প্রতি অবিচারই করা হয়। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারে যে আর্থিক বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার প্রতি কিরূপ অবিচার করা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। তূলা, নারিকেলের শস্য, গম, প্রভৃতি কৃষিজ পণ্যের উপর রপ্তানী শুল্ক নাই; আছে কেবল বাঙ্গালার পাটের উপর। আর সেই শুল্কের আয় বাঙ্গলা পায় না! ফলে বাঙ্গালা জনহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দ এই ত্রয়োদশ-বর্ষের হিসাবে দেখা যায়, দ্বিতীয় তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম—বর্ষচতুষ্টয় বাদ দিলে কেবল আর দুই বৎসর ব্যতীত বাঙ্গালা সরকারের ফাজিল কখন এক কোটি টাকার কম হয় নাই—প্রায়ই দুই কোটি হইয়াছে। প্রথমে যে বর্ষচতুষ্টয়ের কথা বলা হইয়াছে, সে কয় বৎসর বাঙ্গালা সরকার নানারূপে ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়াও কুলাইতে না পারায় নূতন কর সংস্থাপনে বাধ্য হইয়াছিলেন। আর যে দুই বৎসর আয় ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল, সে দুই বৎসরে এই আধিক্য মাত্র ৮ লক্ষ ও ২ লক্ষ টাকা।

ব্যয়ের হিসাব হইতে বাঙ্গালার শোচনীয় অবস্থা ভালরূপ বুঝা যায়। ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে শিক্ষার জন্য লোক-প্রতি ব্যয় দেখিলে দেখা যায়, কেবল বিহারে ব্যয় বাঙ্গালা অপেক্ষা অল্প হইয়াছে। বোম্বাই বাঙ্গালার পাঁচগুণ ব্যয় করিতে পারিয়াছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও বাঙ্গালার ব্যয় বোম্বাইয়ের অর্দ্ধেক—অথচ বাঙ্গালায় স্বাস্থ্যোন্নতির যত প্রয়োজন, তত আর কোন প্রদেশে নহে।

বাঙ্গালাকে ভারত সরকার তাহার ন্যায্য প্রাপ্যে বঞ্চিত করিয়াছেন, তবুও বাঙ্গালাকে এবার "দয়াদত্ত দান হিসাবে" পাটের রপ্তানী শুল্কের অর্দ্ধাংশ প্রদানের প্রস্তাবে বোম্বাই নির্লজ্জভাবে প্রতিবাদ করিয়াছে। আর বাঙ্গালায়ও বোম্বাই তাহার সমর্থক পাইয়াছে! বোম্বাইয়ের এই ব্যবহারের প্রতিবাদে কলিকাতায় আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে কোন বক্তা বলিয়াছিলেন—বোম্বাই যদি তাহার উক্তি প্রত্যাহার না করে, তবে বাঙ্গালার পক্ষে বোম্বাইয়ের পণ্য বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা আজও বাঙ্গালার কয়লা ব্যবহারে বিরত। যখন তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্য

বলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা ব্যবহার করিতেন, তখন পরলোকগত গোখলে মহাশয় বলিয়াছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার যে সব খনি হইতে সেই কয়লা আইসে সে সকলেই ভারতবাসীর উপর অকথ্য অত্যাচার হয়।

বাঙ্গালা অন্ত হিসাবেও ভারত সরকারকে অন্যান্ত প্রদেশ অপেক্ষা অধিক অর্থ প্রদান করে। আয় করে বাঙ্গালা হইতে বোম্বাইয়ের দ্বিগুণ টাকা আদায় হয়। সে টাকা সবই ভারত সরকার পাইয়া থাকেন।

বাঙ্গালায় সেচের জন্ত এ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্থ-ব্যয় হয় নাই। অথচ বাঙ্গালায় সেচের ব্যবস্থার প্রয়োজন সামান্ত নহে।

বাঙ্গালা দীর্ঘকাল হইতে উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। আর সেই জন্তই বাঙ্গালায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সেচ—এ সকলে বিশেষ মনোযোগদান প্রয়োজন।

ভারত সরকার যে বাঙ্গালার ঋণ বাড়িতেছে বলিয়া দেশলাইয়ের উপর শুল্ক স্থাপিত করিয়া বাঙ্গালাকে পাটের রপ্তানী শুল্কের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিবেন—ইহাতে বাঙ্গালা কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারে না। বাঙ্গালাকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া এই শুল্কের সর্ব্বাংশ এবং আয়করের কতকাংশ দিতে হইবে।

সাধারণ হিসাবে আমরা ভারত সরকারের বাজেটে ক্রটির উল্লেখ করিয়াছি। আজ আমরা একটি বিশেষ ক্রটির উল্লেখ করিব। সামরিক ব্যয়ে ভারতের রাজস্বের অনেক অংশ নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। সামরিক বিভাগের ব্যয় ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে ৫৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ছিল এবং এ বার ৪৪ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অর্থ-সচিব মনে করিয়াছেন, তিনি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। কিন্তু যদি ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দের আয়ের সহিত বর্ত্তমান সময়ের আয়ের তুলনা করা যায়, তবে আমরা কি দেখিতে পাই? তদ্ভিন্ন "ক্যাপিটেশন" খরচ হিসাবে বিলাতের সরকার বার্ষিক দুই কোটি টাকা দিবেন—তাহাও হিসাবে ধরিতে হয়।

সামরিক বিভাগে ভারত সরকার যে ব্যয় করেন, তাহা সঙ্কোচ করা সম্ভব নহে এবং তাহা প্রয়োজনীয়ও অনিবার্য্য প্রতিপন্ন করিবার জন্ত সমর বিভাগ নয়টি প্রবন্ধ রচনা করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণ করিয়া আপনাদিগের ওকালতী করিয়াছেন। আমরা কিন্তু প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া সামরিক বিভাগের ব্যয়ের আধিক্য সম্বন্ধে মতপরিবর্ত্তন করিতে পারি নাই। আমাদিগের বিশ্বাস :—

(১) ভারতে যে সেনাদল রক্ষিত হয়, তাহা ভারতের প্রয়োজনাতিরিক্ত;

(২) ভারতের পক্ষে বহুব্যয়সাপেক্ষ ইংরাজ সেনাবল রক্ষার প্রয়োজন অল্প।

আমাদিগের এই বিশ্বাস যে যুক্তিযুক্ত তাহা প্রতিপন্ন করা "সাময়িকীর" স্বল্প পরিসরে সম্ভব নহে; সেজন্ত স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবতারণা করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে, ভারতবর্ষ হইতে সেনাবল চীনে, মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, ফ্রান্সে ও ইরাকে প্রেরিত হইয়াছে। বিশেষ জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় বড়লাট লর্ড হার্ডিং যে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় সব সৈনিক বিদেশে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ভারতে কোন বিপদ ঘটে নাই, তাহা সকলেই জানেন। এ কথা সামরিক বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ সংগ্রামের ভারকেন্দ্র প্রাচীতে আসিয়াছে এবং মধ্য এসিয়ায় যুদ্ধের সময় ইংরাজকে কতকটা ভারতের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। এই সকল হইতেই বুঝা যায়, ভারতে যে সেনাবল রক্ষিত হয়, তাহা ভারতবর্ষকে বিদেশ হইতে আক্রমণসম্ভাবনায় সুরক্ষিত রাখিবার ও ভারতে অন্তর্বিপ্লববাদি দলনের জন্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত। সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে যে সেনাবল রক্ষিত হয়, তাহার ব্যয়ভার সমগ্র সাম্রাজ্যের বহন করাই সঙ্গত।

তাহার পর ইংরাজ সৈনিক রক্ষার কথা। ইংরাজ সৈনিকরা ভারতীয় সেনাবলের অংশ নহে—বিলাতের সেনাবল হইতে অল্প দিনের মেয়াদে নীত হয়। তাহাদিগকে এ দেশে রক্ষা করিতে অত্যন্ত অধিক ব্যয় হয়। যে জাতি স্বদেশরক্ষার ভার না পায়, তাহার পক্ষে স্বায়ত্ত-শাসন লাভ সম্ভব নহে। আর এ দেশে বিপুল বিদেশী সেনাবল রক্ষার মূলে এ দেশের লোকের সম্বন্ধে অবিশ্বাসই পরিলক্ষিত হয়। যখন ইংরাজ বলেন, এ দেশে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠাই ইংরাজ শাসনের

উদ্দেশ্য, তখন এ দেশের লোককে দেশরক্ষার ভার প্রদানের পথে অগ্রসর হওয়াই সঙ্গত।

ভারতবর্ষে বিপুল সেনাবল রক্ষিত হওয়ায় ও বিদেশী সেনাবলের ব্যয়াধিক্যহেতু যে অবস্থা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে এ দেশে সামরিক ব্যয় অন্য যে কোন দেশের তুলনায় অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং দরিদ্র দেশের পক্ষে সেই ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সামরিক বিভাগের ব্যয়সঙ্কোচ করা সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য।

এ দেশে শাসন বিভাগে ব্যয়সঙ্কোচেরও অনেক উপায় আছে। এ দেশে বড়লাট হইতে সিভিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত যে হারে বেতন পাইয়া থাকেন, তাহা অন্য যে কোন স্বায়ত্ত-শাসনশীল দেশের তুলনায় অত্যধিক। বেতনের এই হারের আমূল সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। যতদিন তাহা না হইবে, ততদিন ভারত-বাসীর করভার লঘু করা সম্ভব হইবে না এবং ততদিন দেশের উন্নতিকর কার্য্যে অধিক অর্থপ্রয়োগও অসম্ভব থাকিবে। অথচ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে পাঁচ বা দশ বৎসরের মধ্যে অর্থনীতিক হিসাবে পুনর্গঠনের প্রয়োজন অন্য যে কোন দেশ অপেক্ষা অধিক। অর্থাভাবে তাহার ব্যবস্থা হইতেছে না। দারিদ্র্যজনিত নানা ব্যাধিও ভারতবর্ষে স্থায়ী হইয়াছে—সে সকলের উচ্ছেদ সাধন প্রয়োজন।

দেশের শাসন-পদ্ধতি যাহাই কেন হউক না এবং যেমনই কেন হউক না, যদি দেশের আবশ্যক কার্য্যের জন্য তাহাকে প্রয়োজনানুরূপ অর্থের ব্যবস্থা না থাকে, তবে তাহা কখনই সুফল প্রসব করিতে পারে না। ফলে দেশে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়। বেকার সমস্যাসঞ্জাত অসন্তোষে বাঙ্গালা দেশ যে বিব্রত, তাহা বাঙ্গালার গবর্ণর স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার সরকার শিল্পে সরকারী সাহায্য প্রদান বিষয়ক আইনের বিধানও কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন না।

আবশ্যক অর্থের অভাবে দেশে কত কল্যাণকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব হইয়া আছে, তাহা আমরা সকলেই জানি।

ভারত সরকারের বাজেটের প্রভাব যে সকল প্রাদেশিক সরকারের বাজেট প্রভাবিত করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ কেন্দ্রী-সরকার কেবল যে প্রথমে আপনার পরিচালনব্যয়ের উপায় করিবেন, তাহাই নহে; পরন্তু উড়িষ্যা, সিন্ধু প্রভৃতি যে সব প্রদেশের সৃষ্টি হইতেছে, সে সব প্রদেশের ব্যয়সঙ্কুলানও করিতে বাধ্য হইবেন।

এই সকল বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, যত দিন ভারত সরকারের বাজেট সমৃদ্ধির পরিচায়ক না হইবে, তত দিন প্রদেশসমূহের পক্ষে সমৃদ্ধিলাভের আশা দুরাশা মাত্র থাকিবে; তত দিন প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন নাম-শেষ হইবে এবং প্রাদেশিক সরকারকে কেবল কলঙ্কভাগী হইতে হইবে।

এ বার ঋণ পরিশোধ তহবিলে ব্যবস্থানুরূপ সঞ্চয় না রাখিয়া ভারত সরকারের অর্থ-সচিব যে সমৃদ্ধির পরিচায়ক বাজেট পাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত সমৃদ্ধির পরিচায়ক নহে এবং তাঁহাতে কেহ ভারত সরকারের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা মনে পোষণও করিবে না।

বর্ত্তমান আর্থিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন আমরা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করি। নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের সময় তাহা করা হইবে কি?

রেলপথে ক্ষতি—

এ-বার রেলের যে আনুমানিক আয়ব্যয় হিসাব প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে, পূর্ব্বের কয় বৎসরেরই মত, লোকশান দেখা যাইতেছে। ১৯৩০—৩১ খৃষ্টাব্দে যে লোকশান আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার জের মিটিতেছে না। ঐ বৎসর লোকশানের পরিমাণ ছিল—৫ কোটি টাকা। পরবৎসর লোকশানের পরিমাণ বাড়িয়া ৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায় এবং তাহার পরের বৎসরে লোকশান আরও ১ কোটি টাকা অধিক হয়। যে বৎসর শেষ হইল, তাহাতে লোকশানের পরিমাণ—৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবার সম্ভাবনা। এ বৎসরের আনুমানিক হিসাব এইরূপ ধরা হইতেছে :—

আয় ... ৯১,২৫,০০,০০০ টাকা

ব্যয় ... ৬৪,৫০,০০,০০০ "
সুদ বাবদ ব্যয়··· ৩২,০০,০০,০০০ "
মোট লোকশান···৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাক।

রেলের পরিচালকদিগের আশা—এ বৎসর মালের ভাড়ার আয় গত বৎসর অপেক্ষা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অধিক হইবে। এই আশার উৎস-সন্ধান কিন্তু আমরা পাই নাই। তবে তাঁহারাও মনে করেন, এ-বার যাত্রীর ভাড়ার আয় গত বৎসর অপেক্ষাও অল্প হইবে। বোধ হয়, লোকের আর্থিক দুরবস্থাই এইরূপ অনুমানের কারণ।

এখন কথা—এই যে ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা লোকশান, ইহা আসিবে কোথা হইতে? রেলে অবনতিজনিত ক্ষতি-পূরণ জন্য যে টাকা রাখা হয়, তাহা হইতেই এই টাকা ঋণ হিসাবে গৃহীত হইবে। এই ভাণ্ডার বর্ষশেষে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে।

ব্যবসা-মন্দাই যে রেলপথে এই ক্ষতির জন্য প্রধানত: দায়ী, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু রেলপথের উপযোগিতা ও প্রয়োজন অস্বীকার না করিয়াও বলা যায়, অন্যান্য দেশে যে উদ্দেশ্য ও যেভাবে রেলপথ-বিস্তার হয়, এ দেশে তাহা হয় নাই। অন্যান্য দেশে অন্ত-র্বাণিজ্যের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই রেলপথ রচনা করা হয়। এ দেশে বহির্বাণিজ্যের সুবিধাই রেলপথ রচনানীতি নিয়ন্ত্রিত করে। সেই জন্যই একবার ভারত সরকারের অর্থ-সচিব বলিয়াছিলেন—ইংরাজ বণিকরা ক্রমাগত রেলপথ বিস্তারের জন্য যে জিদ করেন, তাহাতে সরকার বিব্রত হইয়া উঠিতেছেন। সেই জন্যই বহু দিন রেলপথে দেশের লোক লাভবান না হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিয়াছে। যখন পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয় বলিয়াছিলেন, রেলপথে যে টাকা লোকশান হইয়াছে, তাহা যদি দেশে স্বাস্থ্যোন্নতির ও শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যয়িত হইত, তবে দেশের অশেষ কল্যাণ হইত—তখনই হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছিল, সেচের খালে সরকারের লাভ হয়—অথচ সরকার রেল-পথের জন্য অবাধে অর্থব্যয় করিলেও সেচের খাল খননে সেরূপ মনোযোগ দেন না।

রেলপথ নির্ম্মাণকালে সময় সময় কিরূপ ভুল করা হয়, তাহার দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত আজ আমরা দিব—(১) নৈহাটীর নিয়ে গঙ্গার উপর যে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা আশানুরূপ কার্য্যোপযোগী হয় নাই, (২) সারায় কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মার উপর যে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নিকট হইতে পদ্মা সরিয়া যাইতেছে এবং পদ্মার প্রবাহ বর্ত্তমান খাতে প্রবাহিত রাখিবার জন্য আবার প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে—ফল কি হইবে, বলা যায় না।

যাহাতে ভবিষ্যতে রেলপথ রচনায় অধিক সতর্কতা অবলম্বিত হয় এবং ব্যবসার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রেলপথ রচিত হয়, সে জন্য ভারতবর্ষের করদাতারা অবশ্যই জিদ করিতে পারেন। লোকসান দিবার জন্য কখন এরূপ কাজ করা সঙ্গত হইতে পারে না। রেলপথ রচনা-নীতির বিশেষ পরীক্ষা প্রয়োজন।

নূতন আইন—

সন্ত্রাসবাদ দমনকল্পে বাঙ্গালা সরকার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে ব্যাপক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করিয়া-ছিলেন এবং যাহা অধিকাংশ সদস্যের মতে গৃহীত হইয়া-ছিল, তাহা বড়লাটের সম্মতিলাভ করিয়া আইনে পরিণত হইল।

ইহাতে বাঙ্গালার শান্তিপ্রিয় জনগণের অধিকার সঙ্কুচিত হইল। এই অধিকার সঙ্কোচের গণ্ডীতে সংবাদ-পত্রকেও পড়িতে হইয়াছে।

যদি এমন মনে করিবার কারণ থাকে যে, আগ্নেয়াস্ত্র হত্যার জন্য ব্যবহৃত হইবে ইহা জানিয়া কেহ আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া কোথাও যাতায়াত করিয়াছে বা আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক পদার্থ রাখিয়াছে, তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারিবে। যে সময় পৃথিবীর নানা দেশে প্রাণদণ্ড বর্ব্বর যুগের ব্যবস্থা বলিয়া ত্যক্ত হইতেছে, সেই সময় যে এ দেশে কয়টি নূতন অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডেরই ব্যবস্থা হইল, ইহা দুঃখের বিষয়।

প্রাদেশিক সরকারের মতে যে জাতীয় সংবাদ প্রচারের ফলে সন্ত্রাসবাদের সহিত সহানুভূতির উদ্ভব বা সন্ত্রাসবাদীদিগের দলপুষ্টি হইতে পারে, সরকার সেই

জাতীয় সংবাদ প্রচার নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন। পূর্ব্বে সরকার আপত্তিজনক বলিয়া বিবেচিত কোন সংবাদ প্রকাশের জন্য কোন সংবাদপত্রকে দণ্ড দিলে সংবাদ-পত্রের পক্ষে হাইকোর্টে আপীল করিবার অধিকার ছিল। এখন সে অধিকার আর রহিল না।

এত দিন নিয়ম ছিল, সরকার কাহাকেও প্রকাশ্য-ভাবে আদালতে বিচার ব্যতীত আটক করিলে তাহার পোষ্যদিগকে মাসিক বৃত্তি দিতে বাধ্য থাকিতেন। এখন স্থির হইল, সেরূপ বৃত্তি প্রদান করা না করা সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে।

আমরা নূতন আইনের তিনটিমাত্র ব্যবস্থার উল্লেখ করিলাম। ইহাতেই আইনের প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

আইনের বিধান যে উগ্র, তাহা সরকারও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা স্বীকার করিয়া আপনাদিগের পক্ষ সমর্থনার্থ বলিয়াছেন—বর্ত্তমানে যে অস্বাভাবিক অবস্থার (অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদের) উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে সাধারণ আইনের স্থানে অসাধারণ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ নাই। কিন্তু যে ব্যবস্থা হইল তাহাতেই সে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে কি না তাহাই বিবেচ্য। ইতঃপূর্ব্বে এই উদ্দেশ্য সাধন জন্যই নানা নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সে সকলে ঈপ্সিত ফল লাভ হয় নাই। এবার যে সব ব্যবস্থা হইল সে সকলের ফল কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

কেহই সন্ত্রাসবাদের পক্ষপাতী নহে—বিশেষ সন্ত্রাস-বাদে দেশের লোকের যত ক্ষতি তত আর কাহারও নহে। সে কথা ব্যবস্থাপক সভায় এই আইনের নানা বিধানের বিরোধীরাও বলিয়াছেন। কিন্তু বিধান নিদানোপযোগী হইল কি না, সে বিষয়ে মতভেদ লক্ষিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার গভর্ণর রাজনীতিকোচিত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন—দেশবাসীর মতই হিংসানীতি-ধ্বংসকারী পরিবেষ্টনের সৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং যাহাতে—যে ব্যবস্থায় দেশের লোকের সম্মতি ও সহযোগ লাভ করা যায়, সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।

আইনের বিধান প্রয়োগে যে ত্রুটি বিচ্যুতি হইতে পারে, তাহাও সরকার স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু বলিয়াছেন, যাহাতে তাহা না হয়, সে জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হইবে।

পুনর্গঠনের আরম্ভ—

বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গালায় অর্থনীতিক অনুসন্ধান জন্য যে বোর্ড বা সমিতি গঠিত করিয়াছেন, তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। উদ্বোধনে বাঙ্গালার গভর্ণর সমিতির সদস্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, বাঙ্গালার অনেক আশা এই বোর্ডে কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে। অর্থাৎ বোর্ডের কাযের উপর বাঙ্গালার অনেক আশার সাফল্য নির্ভর করিবে।

বোর্ড যে ভাবে গঠিত তাহাতে তাঁহার আশা কতদূর ফলবতী হইবে, তাহা দেখিবার জন্য দেশবাসী উদ্গ্রীব হইয়া থাকিবে। বোর্ডের কার্য্যফল যাহাই কেন হউক না—সার জন এণ্ডার্সনের যে চেষ্টার ত্রুটি নাই, আন্তরিকতার অভাব নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

সার জন বলিয়াছেন, এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন বঙ্গ-দেশেই প্রথম হইল।

বাঙ্গালার পূর্ব্বে পঞ্জাবে পুনর্গঠন কার্য্যে সরকার অবহিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সে কার্য্যে জনসাধারণের সহযোগ লইয়া কোন প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় নাই। বাঙ্গালায় যেমন ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার নিযুক্ত করা হইয়াছে, তথায় সেইরূপ একজন কর্ম্মচারী কায করিতে-ছেন। বাঙ্গালার সরকারের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সহিত একযোগে কমিশনার কায করিবেন—বোর্ড তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। শাসন-পরিষদের সদস্য ও মন্ত্রীদিগকে লইয়া গভর্ণরের পরিষদ গঠিত,—সেই পরিষদের শাখা পরিষদ আছে;—অর্থনীতিক শাখা পরিষদ সে সকলের অন্যতম। রাজস্ব-বিভাগের ভার-প্রাপ্ত শাসন-পরিষদের সদস্য সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র এই

শাখা পরিষদের সভাপতি এবং অর্থসচিব মিষ্টার উডহেড ও মন্ত্রী নবাব কে, জি, এম, ফরোক্কী ইহার সদস্য ছিলেন। প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থান কে গ্রহণ করিবেন, এখনও জানা যায় নাই। তবে তাঁহার মৃত্যুতে যে পুনর্গঠন কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, তিনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কমিশনার এই শাখা-পরিষদের অধীনে কায করিবেন। তবে তাঁহার সহিত বোর্ডের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিবে।

বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথম বোর্ড গঠিত হইল বটে, কিন্তু বাঙ্গালার মত অন্যান্য স্থানেও—সামন্ত রাজ্যগুলিতেও পুনর্গঠনের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার ফ্রেডরিক সাইক্‌স কার্য্যকাল শেষ হইবার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। বরোদা দরবার পুনর্গঠন-কেন্দ্র স্থাপিত করিয়া সেই সব কেন্দ্র হইতে কায করিতে-ছেন। তথায় অর্থনীতিক অনুসন্ধানও হইয়াছে।

সংপ্রতি মিষ্টার জি, রুদ্রাপ্পা মহীশূরের ও বৃটিশ শাসিত ভারতে পল্লীর পুনর্গঠন সম্বন্ধে বাঙ্গালোরে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমরা তাহা পাইয়াছি। তাহাতে দেখা যায়, তথায়ও পল্লীগ্রামের পুনর্গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। কয় বৎসর পূর্ব্বে মহীশূর দরবার আদর্শ পল্লীগ্রাম প্রতিষ্ঠার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন। এবার মিষ্টার রুদ্রাপ্পা পল্লীসংস্কারের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান পল্লীজীবনের নানা ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সকল ত্রুটি সংশোধনের উপায় কি তাহা বলেন নাই।

তবে তাঁহার বক্তৃতায় মনে হয়, তিনি মনস্তত্ত্বের দিক হইতে কাযটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতার এক স্থানে বলিয়াছেন—

"জনসাধারণের ও যাঁহারা সহরে বাস করেন তাঁহা-দিগের মনোভাব সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। এদেশকে যদি অন্যান্য উন্নতিশীল দেশের সম স্তরে উন্নীত করিতে হয়, তবে অবিলম্বে তাঁহাদিগের মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। জনগণের মনে নূতন আকাজ্ক্ষা, নূতন ভাব, নূতন আশা উদ্রিক্ত ও সৃষ্ট করিতে হইবে। সার ফ্রেডরিক সাইক্‌স যথার্থই বলিয়াছেন, এই সকল লোকের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষার ও উন্নত জীবন-যাত্রার উপকরণ লাভের দাবী করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের লোককে বিশেষ ভাবে পল্লীর ও পল্লীবাসীর দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। যাহাতে পল্লীসমাজ সর্ব্বতোভাবে স্বায়ত্ত-শাসনশীল হয়, এবং পল্লীবাসীদিগের উপার্জ্জন, স্বাস্থ্য ও সুখের মাত্রা বর্দ্ধিত হয়, জাতিকে সে বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। যদি সে কায হয়, তবে ভারতের সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।" সার ফ্রেডরিক যে তাঁহার পল্লীর সংস্কার-পদ্ধতি পুস্তকের মুখবন্ধে বলিয়াছেন—মনে ও কল্পনায় আবার জমীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে—ইহাই তাহার অর্থ।

আমাদিগের মনে হয়, ভারতবাসীর মনোভাব সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জিত বা ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত। তিনি সামাজিক প্রথার ও শাস্ত্রের "দৌরাত্ম্য" সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও সমর্থনযোগ্য নহে। সত্য বটে, ভারতবর্ষের জনসাধারণ রক্ষণশীল; কিন্তু সার ফ্রেডরিক নিকল্‌শন বলিয়াছেন, খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্য্যন্ত য়ুরোপের কৃষক ভারতীয় কৃষকেরই মত অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ছিল। রক্ষণশীলতা সতর্কতার পরিচায়ক এবং তাহার সহিত উন্নতির কোন বিরোধ নাই। পরন্তু সার জর্জ্জ বার্ডউডের মত ইংরাজও বলিয়াছেন—ভারতের সামাজিক সংস্থান এদেশে শিল্পীর শিল্পোন্নতির অন্যতম কারণ। তিনি বর্ণ-ভেদকে উন্নতির অন্তরায় মনে করিয়াছেন, কিন্তু যে মধুসূদন দাস উড়িষ্যায় শিল্পোন্নতির অগ্রণী ছিলেন, তিনি বর্ণবিভাগকে ভারতের শিল্পজীবনের ভিত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পুরুষানুক্রমে একই শিল্পের অনুশীলনে যে পটুত্ব অর্জ্জিত হয়, তাহা উপেক্ষা করা যায় না।

সে যাহাই হউক, দেশের লোকের মনোভাব পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁহার সহিত সকলেই একমত। কিন্তু তাহার উপায় কি? আদর্শ ও শিক্ষা ব্যতীত এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। তাহাই করিতে হইবে।

এত দিন দেশের শিক্ষিত লোকরা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত

করেন নাই। দেখা গিয়াছে, যাঁহারা তাহা করিতে পারিতেন, তাঁহারাই পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। কিরূপে এ কায করিতে হয়, সে শিক্ষাও অশিক্ষিত পল্লীগ্রামবাসীদিগকে প্রদানের ব্যবস্থা হয় নাই। কেন ইহা হয় নাই, তাহার আলোচনায় অধিক সময়ক্ষেপ করিলে কোন উপকার হইবে না বটে, কিন্তু সেই কারণ-নির্ণয় চেষ্টায় ভবিষ্যতের পথিনির্দ্দেশ হইতে পারে। ইংরাজীতে শিক্ষালাভ করিলে চাকরী পাওয়া ও ওকালতী ডাক্তারী প্রভৃতিতে অধিক অর্থার্জ্জন যতদিন সম্ভব ছিল, ততদিন ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীরা চাকরী ও ঐ সব ব্যবসা ব্যপদেশে সহরে আসিয়া বাস করিতেন—পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থা নষ্ট হইয়া যাইত—পল্লীগ্রামের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইত। আজ আর ইংরাজী শিক্ষালাভ করিলেই সহরে অর্থার্জ্জন হয় না। এই ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তনের সহিত পল্লীসংস্কার স্পৃহার সম্বন্ধ অস্বীকার করিলে "ভাবের ঘরে চুরী" করা হইবে।

সহর এদেশে পূর্ব্বে যে ছিল না, তাহা নহে—কিন্তু সহর তখন সমৃদ্ধ পল্লীগ্রাম হইতে উদ্ভূত হইত। যে স্থানে শাসক বাস করিতেন তথায় যেমন—শিল্প ও ব্যবসার কেন্দ্রে তেমনই সহরের উদ্ভব হইত। এখন অবস্থা অন্যরূপ। অনেক সহর শিল্প ও ব্যবসার সম্পর্কশূন্য।

শিক্ষিত ব্যক্তিরা ও ধনীরা পল্লীগ্রাম ত্যাগ করায় বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে দুর্গতি হইয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি বটে, কিন্তু তাহার প্রতীকার করিতে পারিতেছি না। কৃষি ও শিল্প অশিক্ষিতের অবলম্বন হইয়াছে বলিয়াই সে সকলের কোনরূপ উন্নতি নাই; পরন্তু সে সকল অবনত। আর সেই জন্যই পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের মধ্যে নূতন আকাঙ্ক্ষার, নূতন আশার ও নূতন আনন্দের সঞ্চার সম্ভব হয় না। নূতন ভাব শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দ্বারাই প্রচারিত হইতে পারে, নূতন আশা তাঁহাদিগের মনেই প্রথম আবির্ভূত হয়, নূতন আনন্দ তাঁহারাই লোককে দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। বাঙ্গলার সেকালের পল্লীজীবনের আলোচনা করিলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। তখন গ্রামের জমীদারের গৃহেই পূজা-পার্ব্বণে আনন্দের আয়োজন হইত—অথচ সে কেবল তাঁহার বা তাঁহার গৃহবাসীদিগের জন্য নহে, সকল গ্রামবাসীর জন্য। তখন গ্রামের ধনশালী ব্যবসায়ীদিগের উদ্যোগে "বারোয়ারী" অর্থাৎ সমবায় পদ্ধতিতে উৎসবের আয়োজন হইত—তাহা সর্ব্বসাধারণের জন্য। আবার এই সব উৎসবে যে অর্থ ব্যয় হইত, তাহার অনেকাংশ গ্রামবাসীদিগের মধ্যেই ছড়াইয়া পড়িত। ধনীরা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিতেন; ধনীরা গবাদি পশুর উন্নতি সাধনের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতেন—তাঁহাদিগের আদর্শ উপদেশ অপেক্ষা অধিক ফলোপধায়ী হইত। সহর তখন অর্থার্জ্জনের স্থান ছিল—কিন্তু সে পল্লীগ্রামকে সমৃদ্ধ করিত।

পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে দেশের শিক্ষিত ও ধনবান অধিবাসীদিগের কর্ত্তব্য তখন সামাজিক নিয়মে বদ্ধ ছিল—সরকারের কর্ম্মচারীদিগকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে হইত না। আজ যখন বাঙ্গালা সরকার অবস্থার গুরুত্ব দেখিয়া প্রতীকার প্রয়োজনে সংস্কারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তখন কমিশনার দেখিতে পাইতেছেন, অনেক পল্লীগ্রামে শিক্ষিত লোক নাই;—যাঁহার সাহায্যে লোককে নূতন আশার ও আকাঙ্ক্ষার কথা জানান হয়—কৃষির উন্নতির ও শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বুঝান যায়, সেরূপ লোক গ্রামে নাই। বিদেশের অনুকরণে যখন এদেশে বেতারের সাহায্যে লোককে শিক্ষাদানের ও আনন্দ প্রদানের কল্পনা হইতেছে, তখন বিবেচনার বিষয়—লোক কোথায় সমবেত হইবে? একযোগে কায করিবার প্রয়োজন ও উপযোগিতা লোককে কে বুঝাইবে?

এই যে "মানুষের" অভাব—ইহা দূর করা কিরূপে সম্ভব হইবে? প্রতি পল্লীগ্রামে সরকারী কর্ম্মচারী রাখিবার কল্পনা কখন কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না এ বিষয়ে দেশের শিক্ষিত লোকের উৎসাহের অভা ইতঃপূর্ব্বে—কংগ্রেসের কর্ম্মীদিগের দ্বারা—শোচনীয়রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অসহযোগ যখন কংগ্রেস কর্ত্তৃক নীতি হিসাবে অবলম্বিত হয়, তখনই পল্লীগ্রামের পুনর্গঠনে প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। সরকারী বা সরকার সাহায্যপুষ্ট বিদ্যালয় বর্জ্জন, ইংরাজের আদালত ত্যাগ-এসব যদি স্বাবলম্বনের ভিত্তি হিসাবে করিতে হয়, তা

দেশের জনগণের সাহায্য প্রয়োজন। সে সাহায্যলাভ সহরে বক্তৃতামঞ্চে বক্তৃতার দ্বারা হইতে পারে না—সে জন্য গ্রামে গ্রামে কর্ম্মীর কার্য্যের প্রয়োজন। ত্যাগী ও আন্তরিকতায় অনুপ্রাণিত কর্ম্মীর দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে—আর কাহারও দ্বারা নহে। কংগ্রেসের কর্ম্মীরা সে কায করিতে পারেন নাই। দুঃখের বিষয় হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হয়।

এ কার্য্য যে দেশের লোকের সহযোগ ও সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহা বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন এণ্ডার্সন বুঝিয়াছেন। সেই জন্যই তিনি বলিয়াছেন—এই কার্য্যে যদি সাফল্য লাভ করিতে হয় তবে সমাজের সকল উৎকৃষ্ট অংশকে অর্থাৎ কর্ম্মীদিগকে এই কার্য্যে আকৃষ্ট করিতে হইবে। সেই জন্যই তিনি বোর্ড গঠিত করিয়াছেন। অনুসন্ধান কার্য্যের উপদেশ প্রদান সরকারের অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা যে হইতে পারে না বা হয় না, তাহা নহে। কমিশনারকেই প্রধানতঃ কায করিতে হইবে। কিন্তু বোর্ড গঠনের সার্থকতা—দেশের লোককে এই কার্য্যে আকৃষ্ট করায়। নহিলে যে সব বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পল্লীগ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, যাহাদিগের অধিকাংশ সদস্য অন্য প্রদেশের লোক—বাঙ্গালা কেবল তাঁহাদিগের অর্থার্জ্জনের ক্ষেত্র; যে সব প্রতিষ্ঠান "one man show"—সে সব প্রতিষ্ঠানকেও প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার প্রদানের কোন সার্থকতা থাকিত না। সেই জন্যই পাট সমিতির রিপোর্টের ব্যর্থতার পরও সার জন এণ্ডার্সন এই বোর্ড গঠিত করিয়াছেন এবং আশা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার ফলে বাঙ্গালার কল্যাণ সাধিত হইবে।

প্রাকৃতিক উপদ্রবে ও বিপদে কি ভাবে সকলকে একযোগে কায করিতে হয়, তাহা বিপন্ন বিহারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অসহযোগ নীতির প্রবর্ত্তক গান্ধীজীও সেজন্য সে নীতি বর্জ্জন করিয়াছেন।

বাঙ্গালার পল্লীর পুনর্গঠন কার্য্যে আরও একরূপ সহযোগের প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িক বিরোধ বর্জ্জন করিয়া সকল সম্প্রদায়কে একযোগে কায করিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, রোগ, জলকষ্ট, এই সকলের সহিত সংগ্রাম কেবল সকলের সমবেত চেষ্টায় জয়যুক্ত হয়। বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম—পল্লীপ্রাণ বাঙ্গালার কেন্দ্র পল্লীগ্রাম আজ রোগের, অজ্ঞতার, দারিদ্র্যের লীলাভূমি। তাহাকে এই দুর্দ্দশা-দুঃখমুক্ত করিতে হইবে। এ কায আমাদিগের। যদি দেশের লোক উদ্যোগী হইয়া এই কার্য্যে সরকারের সহযোগ চাহিতেন, তবে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিতাম। এখন সরকার উদ্যোগী হইয়া দেশের লোকের সাহায্য চাহিতেছেন। যাহাতে সরকারের ভাগ অপেক্ষা দেশবাসীর ভাগই সাফল্যের উপচয়নে অধিক হয়, তাহাই করা আমাদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি।

সার জন এণ্ডার্সন বলিয়াছেন, পল্লীগ্রামের পুনর্গঠন কার্য্যে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা দিতেই হইবে। এই কার্য্য বাঙ্গালার স্বল্প রাজস্ব হইতে সম্পন্ন হইতে পারে কি না, সন্দেহ। সুতরাং এই কার্য্যের জন্য, প্রয়োজন হইলে, ভারত সরকারের নিকট হইতে বা সাধারণ ভাবে, ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থ পাইলে যাহাতে তাহার অপব্যয় না হয়, এবং তাহা সুপ্রযুক্ত হয়, সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেজন্য কেবল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে অর্থপ্রয়োগ ব্যবস্থা করিলেই হইবে না—সেজন্য আবশ্যক আইন করিতে হইবে, ব্যবস্থাপক সভার সাহায্য প্রয়োজন হইবে।

সমস্যার গুরুত্ব যে অসাধারণ এবং জটিলত্ব অধিক, তাহা আমরা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকি। ইহার এক এক ভাগের সমাধান করিতেই যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় প্রয়োজন। অথচ এক সঙ্গে ইহাকে সকল দিক হইতে আক্রমণ না করিলে সমস্যার সমাধান অকারণ বিলম্বিত হইবে।

সরকার ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সেইজন্যই কমিশনার নিয়োগ করিয়া তাঁহারা নিরস্ত হয়েন নাই, সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড গঠিত করিয়া ব্যাপকভাবে কার্য্যারম্ভের পদ্ধতি নির্দ্ধারণ চেষ্টা করিয়াছেন।

সার জন এণ্ডার্সনের মত আমরাও এই উদ্যম হইতে অনেক সুফল লাভের আশা করি। আমরা আশা করি, দেশের লোকরা এই কার্য্যে যিনি যেরূপে পারেন, সাহায্য করিবেন এবং সকলের সমবেত চেষ্টা বাঙ্গালায় নবযুগের প্রবর্ত্তন করিবে; সে যুগ দারিদ্র্যের স্থানে সমৃদ্ধি, রোগের স্থানে স্বাস্থ্য ও অজ্ঞতার স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করিবে।

কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের

স্বাস্থ্য-সংখ্যা—

শ্রীমান অমল হোম সম্পাদিত কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের স্বাস্থ্য-সংখ্যার ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর এই সময়ে একখানি করিয়া স্বাস্থ্য-সংখ্যা প্রকাশিত হয়; এখানি ষষ্ঠ বৎসরের সংখ্যা। প্রতি বৎসর যেমন হয় এবারও এই সংখ্যায় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং সম্পাদকের অতুলনীয় সম্পাদন-কুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। এই সংখ্যার বাহ্যসৌন্দর্য্য যেমন মনোহর হইয়াছে, আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যও তদনুরূপ হইয়াছে। আমরা সম্পাদক শ্রীমান অমল হোমের চেষ্টা, যত্ন ও কার্য্য-কুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি।

খেলা-ধূলা

বাঙ্গালী ছেলেদের কিছুদিন থেকে স্পোর্টসের দিকে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। ইহা যে জাতির সুলক্ষণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মেয়েরাও আজকাল খেলা ধূলায় দেহ সুস্থ, স্বাস্থ্য সবল হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। কর্পোরেশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহেও ব্যায়াম সম্বন্ধে যত্ন লওয়া হ'চ্ছে। কলিকাতায় এখন

সিটি এথেলেটিক্ স্পোর্টস্। ৮৩ গজ নীচু হার্ডল রেস। প্রথম—কুমারী বেটি এড্ওয়ার্ডস্ —কাঞ্চন—

যোগ দিচ্ছে। শারীরিক সৌন্দর্য্য রক্ষা করতে ব্যায়াম অত্যাবশ্যক। শরীর গঠনের জন্য শারীরিক ব্যায়ামের ছোটবেলা থেকেই বিশেষ দরকার। খেলা-ধূলার ভেতর দিয়ে ব্যায়াম বিশেষ উপকারী, ইহাতে শরীর ও মন উভয়েরই পরিপুষ্টি হয়।

অধুনা স্কুল-কলেজে পড়াশুনার সঙ্গে ব্যায়াম করার ব্যবস্থা হ'য়েছে—মেয়েদের স্কুলেও হ'য়েছে। শুধু বইয়ের পাতা মুখস্থ করে পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করেই সত্যিকারের মানুষ হওয়া যায় না। ছেলে-মেয়েরা জাতির ভবিষ্যৎ জীবন। যাতে তাদের

নানা স্থানে নানা স্পোর্টস্ প্রতিযোগিতা হ'চ্ছে। এরূপ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান এদেশে আরো বেশী হওয়া আবশ্যক।

আনন্দ মেলা স্পোর্টস্। একশত গজ দৌড়।
প্রথম—কুমারী রমা চক্রবর্ত্তী (বেথুন) —কাঞ্চন—

নিখিল ভারত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা।
প্রথম—মিঃ ভরতন্ (ক্যানানোর—মাদ্রাজ)।
ইনি এক হাতে ভারোত্তোলন করিতেছেন। —কাঞ্চন—

কালীঘাট স্পোর্টস্।
এক মাইল দৌড়। সময়—৪ মিনিট, ৪৫½ সেকেণ্ড।
প্রথম—আর, গাজ (ধানবাদ)। —কাঞ্চন—

বাঙ্গালীর ছেলেদের যাকে বলে 'ডান-পিঠে', তাই হ'তে হবে। শুধু পড়াশুনায় 'ভাল' ছেলে হলে হ'বে না। খেলায়, কুস্তিতে, সাঁতারে, দৌড়ে, বাচ-খেলায় (rowing), ঘুষো-ঘুষিতে (boxing), অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে হবে।

বাচ-খেলার ব্যবস্থা কলিকাতায় বিশেষ নেই। দক্ষিণ কলিকাতায় লেকে মাত্র একটী ভারতীয় ক্লাব হ'য়েছে। তাতে কেবলমাত্র বিশিষ্ট ভারতীয়রাই প্রবেশ করতে পারেন। সাধারণ লোকের উপযোগী আরো প্রতিষ্ঠান হওয়া আবশ্যক। কলিকাতা করপোরেশনের এ বিষয়ে সহায়তা করা উচিত।

বিলাতে কেম্ব্রিজ আর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে পাল্লা দিয়া বাচ-খেলা বিশ্ববিখ্যাত ব্যাপার। এই প্রতিযোগিতা সেখানে জাতীয় উৎসবে পরিগণিত হ'য়েছে।

বাঙ্গলাদেশেও ঢাকা আর কলিকাতায় দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে—বড় বড় নদ-নদীরও এখানে অভাব নেই। অভাব কেবল উদ্যম ও উৎসাহের। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা এ বিষয়ে উদ্যোগী হ'লে আর ছেলেদের উৎসাহ থাকলে এদেশে ঐ ধরণের বাচ-খেলার অনুষ্ঠান আরম্ভ করা কঠিন হয় না, মনে করি।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪১

দ্বিতীয় খণ্ড | একবিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

বাঙ্গলার জমিদারবর্গ

আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

(৫)

আমি 'ভারতবর্ষে'র মারফতে বাঙ্গলার জমিদারদিগের বিষয় কিছু আলোচনা করিতেছি,—জমিদারগণের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তাঁহাদের পূর্ব্বকার অবস্থার তুলনামূলক সমালোচনাই আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আজ দিন দিন একটা সম্প্রদায় উৎসাহহীন ও কর্ম্মশক্তিতে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে—ইহা যে দেশের পক্ষে অশেষ ক্ষতিকারক, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলা দেশ স্বভাবতই কৃষিপ্রধান। সকলের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে আমাদের দেশের দুস্থ কৃষকরা। উকিল মোক্তার ডাক্তার রাজকর্ম্মচারী সকলেই পরগাছা (Parasite),—ইঁহারা কেহই অর্থ উৎপাদন করিতে পারেন না। কৃষকবৃন্দের পরিশ্রমলব্ধ শস্যের উপরই দেশের আর্থিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে। সুতরাং তাহাদের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা, নিরক্ষরতা দূর করিয়া তাহাদের জীবন-ধারণের পথকে সহজ ও সুগম করিয়া তোলা প্রত্যেক সহৃদয় দেশবাসীর কর্ত্তব্য। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাঙ্গলাদেশে শিল্প বাণিজ্যের সমৃদ্ধি নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য যাহা কিছু আজও বর্ত্তমান আছে, সবই পরের হাতে সঁপিয়া আজ আমরা অর্থহারা হইয়া চাকরীর মোহাবিষ্ট। এই দুর্দ্দিনে জমিদারগণ একেবারে নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়িলে দেশের অবস্থা আরও ভীষণ হইয়া উঠিবে।

পূর্ব্বেই জমিদারগণের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ কিছু কিছু উদ্ঘাটিত করিয়াছি। অলসতা, কর্ম্মবিমুখতা, সর্ব্বোপরি বিলাস-ব্যসনই তাঁহাদের এই অধোগতির কারণ। আজ দেশের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন তেমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই; তাহার একটী প্রধান কারণ—জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রসার হয় নাই, বরং পদে পদে বাধাগ্রস্ত হইয়া আসিতেছে। ইঁহারাই সব চেয়ে বেশী দাসভাবাপন্ন। বাঙ্গলা দেশে

আজও জমিদারগণের প্রভাব ক্রিয়াশীল। তাঁহারা আজও দেশের একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা তাঁহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহার কিছুই কার্য্যকরী হয় নাই। কর্ম্মশক্তিহীন হইয়া তাঁহারা সমাজের উন্নতির পথে বিঘ্ন হইয়া আছেন এবং তাঁহাদের জীবনের গতিও নিস্তব্ধ হইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অগ্রগতির ইতিহাস তাঁহাদিগকে কোন মতেই অনুপ্রাণিত করিতে পারে নাই।

আমি গত তিন-চার বৎসরের কথা বাদ দিতেছি। এখন না হয় বিশ্বব্যাপী আর্থিক অনটন, ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবই মন্দা। এই দুর্দ্দিনে খাজনা আদায় একেবারে বন্ধ,—সম্পত্তি সব নিলামে উঠিতেছে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যখন দেশের অবস্থা অধিকতর সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল, পাটের দর যখন মণকরা ১৫।২০।২৫ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল, তখনও অনেক জমিদারি কোর্ট্ অব্ ওয়ার্ডস্ (Court of Wards) এর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে বর্ত্তমানে প্রায় এক শত কুড়িটী এষ্টেট গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে। ইঁহারা এমনই অসহায় যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাদের নাবালকত্ব ঘুচাইতে পারিলেন না। এই সব লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি তাঁহারা নিজেরা রক্ষা করিতে পারিলেন না, ইহা কি তাঁহাদের অপদার্থতার পরিচায়ক নহে?

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ আমাদের জমিদারবর্গ অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে কোন রকমে গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিয়া যাইতে পারিলে জমিদারি অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু এই সুবিধা তাঁহাদিগকে অধিকতর নির্ভরশীল করিয়া ফেলিল। তাহার ফলে হইল এই যে, তাঁহারা সহরে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন; এবং জমিদারি পরিচালনের ভার পড়িল অল্প বেতনভোগী অশিক্ষিত নায়েব গোমস্তার হস্তে। প্রজাদিগের অভাব অভিযোগ কদাচিৎ জমিদারের কর্ণকুহরে আসিয়া প্রবেশ করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জলকষ্ট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইহাদের জীবন-যাত্রাপথের সম্বল। শিক্ষার অভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া এবং অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তাহারা চিরদিনই দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। জমিদারগণ এইরূপ উদাসীন হওয়ার ফলেই তাহাদের এই নির্য্যাতন। খাজনা ব্যতীত নায়েব গোমস্তাদিগকেও সন্তুষ্ট রাখা তাহাদের একটী প্রধান সমস্যা। এইখানে Resolution on the Land Revenue Policy of the Indian Government, 1902 হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি,—"While the Government of India are proud of the fact that there are many worthy and liberal-minded landlords in Bengal—as there are also in other parts of India—they know that the evils of absenteeism, of management of state by unsympathetic agents, of unhappy relations between landlords and tenants, and the multiplication of the tenure-holders or middle-men, between the Zemindar and the cultivator in many and various degrees are at least as marked and as much on the increase there as elsewhere" প্রায় ৩২ বৎসর পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। আজ যদি গভর্ণমেণ্টকে কোন বিবৃতি প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে—'There are many' স্থলে 'An insignificant few' ব্যবহার করিতে হইবে, অর্থাৎ সংখ্যা অতি মুষ্টিমেয় হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কৃষির উন্নতির ও গোপালনের দিকে আমাদের জমিদারবর্গের আদৌ মনোযোগ নাই। আজও সেই পুরাতন মামুলী প্রথায় দেশের চাষকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে! এবং এক একটী গো-মড়কে লক্ষ লক্ষ বলদ গাভী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। আজ ইংলণ্ড আমেরিকা জাপান প্রভৃতি দেশের জমির উৎপাদিকা শক্তির কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিছু দিন আগে জাপানীরা ব্রহ্ম, শ্যাম, বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল গম প্রভৃতি রপ্তানী করিত; কিন্তু উন্নত কৃষি-প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাহারা আজ ভারতবর্ষেও জাহাজ বোঝাই করিয়া চাউল আমদানী করিতেছে। সার ও জলসেচন দ্বারা তাহারা জমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত করে। আর আমাদের "সুজলা সুফলা" দেশে কৃষিপ্রণালী আবহমান কাল ধরিয়া সেই এক পর্য্যায়ে চলিয়া আসিতেছে। আজ জমিদারবর্গ ঘোর মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছে।

যুক্ত প্রদেশের বর্ত্তমান গভর্ণর Sir Malcolm Hailey, Royal Empire Societyর সম্মুখে যথার্থ-ই বলিয়াছেন * যে জমিদার সম্প্রদায় প্রজাদিগের সংরক্ষণের জন্য কিছুই করেন না। কৃষির উন্নতির প্রতি তাঁহারা একেবারেই উদাসীন। অনেকে হয় ত ভাবিতে পারেন যে, আমি জমিদারদিগের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন; কিন্তু Hailey জমিদারদিগের হিতাকাঙ্ক্ষীভাবে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা হইতে বিবৃত করিলাম। কৃষির উন্নতি বিধান না করিলে তাঁহারাই যে পরিণামে বিপদগ্রস্ত হইবেন, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না।

অপরিণামদর্শিতার ফলে জমিদারদিগের আজ এই দুর্দ্দশা। লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তির মালিক হইয়া যাঁহারা দু'তিন বৎসরের লাটের টাকা সঞ্চিত রাখিতে পারেন না, তাঁহাদের এই দুর্দ্দিনের অজুহাত একেবারেই অযৌক্তিক। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আমাদের দেশের উন্নতির পক্ষে তেমন অনুকূল নহে। অন্যান্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ইহারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। যাহা এক কালে আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল, আজ তাহা উন্নতির পরিপন্থী হইয়া উঠিয়াছে। প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ Herald Laski যথার্থই বলিয়াছেন—"The existing rights of property represent after all, but a moment in historic time. They are not to-day what they were yester-day, and to-morrow they will again be different. It cannot be affirmed that whatever the changes in social institutions, the rights of property are to remain permanent. Property is a social fact like any other, and it is the character of social facts to alter. It has assumed the most varied aspects and it is capable of yet further changes." অর্থাৎ সমাজের অন্যান্য বিবর্ত্তনের সঙ্গে জমিদারিরও পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য।

আমি বাঙ্গলার জমিদারবর্গের পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিহাস ও বর্ত্তমান জমিদারদিগের কার্য্যাবলী কতকটা আলোচনা করিলাম। অনেকে হয় ত ভাবিবেন যে জমিদারদিগের প্রতি প্রজাবৃন্দের বিদ্বেষ-বহ্নি ইহাতে আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু আমি কখনও তাহাদের উচ্ছেদ সাধনের মত পরিপোষণ করি না। জমিদার সম্প্রদায় দেশের সর্ব্ব কার্য্যে মুখপাত্র স্বরূপ হোন ইহাই আমার মনোগত ইচ্ছা। আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিতই জমিদারগণের উপর দোষারোপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তাঁহাদের হতশ্রীর কথা বহুবার বলিয়াছি। তাঁহাদের পূর্ব্বের মত শ্রীবৃদ্ধি আর নাই। পুরাতন মামুলী প্রথায় আজও জমিদারের গৃহাঙ্গনে ক্ষীণ উৎসব-কলাপ বর্ত্তমান আছে, কিন্তু ভিতরকার সে আনন্দস্রোত নাই; কারণ, অনেক স্থলে দেখা যায় যে, জমিদারদিগের বংশধরগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছেন,—তাহাও আবার শতধা বিভক্ত। যাঁহারা এখনও লক্ষ্মীভ্রষ্ট হন নাই, তাঁহাদের চিত্তধারাও পল্লীমাতার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়া তাঁহারা কেবল পশ্চিমদেশীয়দের বাহ্যিক অনুকরণে ব্যস্ত; বাঙ্গালী চরিত্রের যে দুর্ব্বলতা ও অন্ধতা, তাহা হইতে কোনক্রমেই বিমুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা এখনও সংস্কারে বিজড়িত। ভগবান তাঁহাদিগকে অর্থ দিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের ধন-সম্পত্তি অধিকাংশ স্থলেই অনর্থ হইতেছে। মানব-জীবনের সত্যকার সার্থকতা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। আজ বাঙ্গালীর অন্ন-সমস্যার সঙ্গে জমিদারদিগের সমস্যা সম্পূর্ণ বিজড়িত। আজ যদি বাঙ্গলার জমিদারবর্গের এইরূপ দুর্গতি না হইত, তাহা হইলে দেশ এতদূর হতশ্রী হইত না, এবং দেশের শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্যও এমন ভাবে তিরোহিত হইত না। *

* The landlord class has lost much of its economic value in that it does not make a contribution to the soil or to the protection of the cultivator proportionate to the share of produce represented by the rentals; and there is likely to be increasing pressure on the part of the vast cultivating population for state assistance in adjustment of the relations of landlord and tenants to correspond with economic fact.

* শ্রীমান অরবিন্দ সরদার কর্তৃক অনূদিত।

শেষ পথ

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(২৫)

শারদাকে মাধবের বাড়ীর কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াই রামকমল চক্রবর্ত্তী বিদায় হইলেন।

বাড়ীর আঙ্গিনায় আসিয়া শারদার পা উঠিল না।

তার এতদিনকার আশ্রয়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া তার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। দৈন্য যেন তার বিকট দংষ্ট্রা বিস্তার করিয়া চারি দিক ছাইয়া রহিয়াছে। সমস্ত বাড়ী জঙ্গলে ছাইয়া গিয়াছে, আঙ্গিনা পর্য্যন্ত ঘাস ও জঙ্গলে ছাইয়া গিয়াছে। যে গৃহের সৌষ্ঠব সম্পাদনে সে তার জীবনের এতগুলি দিন ব্যয় করিয়াছে, সে গৃহের না আছে শ্রী, না আছে সৌষ্ঠব।

বিন্দুর জন্য মাধব যে ঘরখানা তুলিয়াছিল, তার ভিটার চিহ্নমাত্র আছে, তার উপর আগাছার স্তূপ ভেদ করিয়া একটা সজিনা গাছ লম্বা হইয়া উঠিয়াছে। রান্নার যে একখানা চালা ছিল তার চিহ্নমাত্র নাই।

তার শুইবার যে ঘরখানি ছিল তাহাও নাই। তার বড় ভিটার মাঝখানে ছোট একখানা চালা ভাঙ্গাচোরা কতকগুলি বেড়া দিয়া ঘেরা আছে। ইহাই মাধবের বর্ত্তমান আবাস!

তার এত যত্নের, এত স্নেহপ্রীতিভরা গৃহের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শারদার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, ওষ্ঠাধর কম্পিত হইল।

শারদার সঙ্গে যে লোক তার একটা তোরঙ্গ বহিয়া আনিয়াছিল সে তার বোঝা উঠানের মাঝখানে নামাইয়া দিয়া পারিশ্রমিক লইয়া বিদায় হইল। তার পর ধীরে, অতি সন্তর্পণে, কম্পিত বক্ষে শারদা ঘরের দিকে পা বাড়াইতে লাগিল।

তখন সবে প্রভাত হইয়াছে। গ্রামবাসীরা কেহ বড় বাহির হয় নাই। গ্রামের নীরবতা যেন আরও নিবিড় হইয়া এই গৃহের উপর একটা ভিজা কম্বলের মত চাপিয়া বসিয়াছে।

ঘরের যে জীর্ণ অবশেষের ভিতর মাধব বিশ্রাম করিতেছিল, তাহার কপাট ছিল না। একটা ঝাঁপ দিয়া আলগা করিয়া দুয়ারটা বন্ধ করা ছিল।

শারদা ঝাঁপের উপর কাণ রাখিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল। সে শুনিল কে যেন বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছে। তার পর হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার! শারদার বুক যেন সে চীৎকারে বিদীর্ণ হইয়া গেল।

সবলে ঝাঁপ ঠেলিয়া ফেলিয়া শারদা সবেগে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

সে দেখিতে পাইল মেঝের উপর একখানা মাদুরে মাধবের রোগজীর্ণ উলঙ্গ দেহ পড়িয়া আছে। মাধব প্রলাপ বকিতেছে, মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছে, হাত পা ছুঁড়িতেছে।

একটা লোক পাশে শুইয়া ছিল; সে উঠিয়া বলিল, "শালায় জ্বালাইয়া খাইলো—মরেও না, তরেও না। চুপ দে!" বলিয়া উঠিয়া সে প্রবলবেগে রোগীকে চাপিয়া ধরিল। লোকটি মাধবের এক প্রতিবেশীর ছেলে।

শারদা ছুটিয়া গিয়া মাধবের শয্যাপার্শ্বে বসিল। স্বামীর রোগজীর্ণ বিকৃত মুখ দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া

একবার কাঁদিয়া উঠিল। তার পর সে শুশ্রূষাকারীর হাত চাপিয়া ধরিয়া আকুল কণ্ঠে বলিল, "রাঘব, তুই যা একবার—ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন।"

রাঘব বলিল, ডাক্তারবাবু আসিবেন না। সাত দিন আগে একবার তাঁকে আনিয়া দেখান হইয়াছিল, তিনি জবাব দিয়া গিয়াছেন।

শারদা বলিল, "তবু একবার যা—এই টাকা দুটো নিয়ে তাঁকে বল একবার আসতে।" বলিয়া আঁচল হইতে টাকা খুলিয়া রাঘবের হাতে দিল।

রাঘব দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। এতক্ষণে ভাল করিয়া চাহিয়া সে কতকটা অনুমানে বুঝিল আগন্তুক শারদা। টাকা হাতে করিয়া অবাক বিস্ময়ে সে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

তার পর সে টাকা দুইটি হাতে করিয়া ছুটিয়া ডাক্তারবাবুর কাছে গেল এবং পথে যাইতে যাইতে সে গ্রামবাসী সকলের কাছে কথাটা প্রচার করিয়া গেল যে শারদা ফিরিয়া আসিয়াছে।

শারদা মাধবের গায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং যথাসাধ্য তার বিকারের চাঞ্চল্য প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিল।

নগদ দুইটা টাকা হাতে পাইয়া ডাক্তারবাবু রাঘবের সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তারবাবু বাঙ্গলা-নবীশ এবং সেকালের ঢাকার বাঙ্গলা স্কুলের পাশ। তাহা হইলেও, তিনি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় তাঁর অসাধারণ স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। এই জন্য তাঁর এ অঞ্চলে পশার প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু বেশী পয়সা খরচ করিয়া ডাক্তারী ঔষধ খায় এমন সঙ্গতি বেশী লোকের ছিল না। তাই ডাক্তারবাবুর ঔষধের পুঁজি ছিল অতি সামান্য। সাধারণ অসুখ বিসুখের সাধারণ ঔষধ তাঁর কাছে থাকিত, কিন্তু একটু বেয়াড়া রকমের কিছু হইলেই তাঁর সম্বলে কুলাইত না।

মাধবের চিকিৎসা তিনি কিছুদিন করিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন যে রোগীর অবস্থার উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করিবার শক্তি তাঁর নাই, এবং মাধবেরও ঔষধের মূল্য দিবার সামর্থ্য হইবে না, তখন তিনি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আজ টাকার সন্ধান পাইয়া তিনি আবার আসিলেন।

কিন্তু এখন মাধবের অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে। এখন তিনি রোগীকে দেখিয়া বলিলেন, আর কিছুই করিবার নাই।

শারদা কাঁদিয়া বলিল, কিছুই কি করা যায় না? টাঙ্গাইল হইতে বড় ডাক্তার আনিলে কোনও উপায় হয় না!

ডাক্তারবাবু বলিলেন, সে চেষ্টা ক'রে দেখতে পার।

শারদা টাকা বাহির করিয়া দিল। ডাক্তারবাবু টাঙ্গাইলে লোক পাঠাইলেন। বড় ডাক্তার আসিলেন; কিন্তু কিছুই হইল না।

সেদিন রাত্রে মাধবের বিকার অনেকটা প্রশান্ত হইল। শেষ রাত্রে সে চক্ষু মেলিয়া স্বাভাবিক ভাবে চাহিয়া শারদাকে দেখিল। কি যেন বলিল, শারদা ব্যগ্র হইয়া মুখের কাছে কাণ লইয়া গেল। কিছু শোনা গেল না।

তার পর মাধবের চক্ষু চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল।

শারদা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দুই হাতে কপাল ঠুকিয়া সে কেবলি বলিতে লাগিল, রাক্ষসী সে, সর্ব্বনাশী সে, পুত্র খাইল, স্বামী খাইল সে!

রাঘবের মুখে সংবাদ শুনিয়া পূর্ব্বের দিনই গ্রামশুদ্ধ লোক ছুটিয়া আসিয়াছিল শারদাকে দেখিতে। দুই মাস কাল মাধব শয্যাগত। এত দিন রাঘব ও তার পিতামাতা ছাড়া কেহ তাকে দেখিতে আসে নাই। রাঘবেরা একেবারে ফেলিতে পারে না বলিয়া নিতান্ত যাহা না করিলে নয় সেই শুশ্রূষাটুকু করিত। কিন্তু আজ মাধবের আঙ্গিনায় লোক ধরে না।

মাধবের মৃত্যুশয্যায় শারদার সেবা এবং মৃত্যুর পর তার হাহাকার শুনিয়া দুই একজন প্রতিবেশিনী অগ্রসর হইয়া তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মনে মনে সবাই তার শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া হাসিল। কেউ কেউ অর্দ্ধশ্রুত কণ্ঠে বলিয়া গেল, "মা লো মা! কত ঢং জানে মাগী!"

শারদা এই সব সমালোচনা শুনিতে পাইল না। এ সব কথা শুনিবার শক্তি তার ছিল না। সে কেবল লুটোপুটি খাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঘরের দাওয়ায় পড়িয়া অনেকক্ষণ চীৎকার করিয়া সে ঘরের ভিতর ছুটিয়া গেল।

তখন গ্রামবাসী তাঁতিরা আসিয়া মাধবের দেহ সৎকারের জন্য লইবার ব্যবস্থা করিতেছে। ঘরের ভিতর চার পাঁচজন যুবকের সহিত গোবিন্দ তাঁতি বসিয়া কথা বলিতেছিল। আলোচনাটা হইতেছিল মুখাগ্নি কে করিবে, তাহা লইয়া।

শারদা ছুটিয়া আসিতেই গোবিন্দ তার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, "বউ, তুমি মড়া ছুঁইও না।"

শারদা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া একবার তার দিকে চাহিল।

গোবিন্দ বলিল, শারদা দেহ স্পর্শ করিলে কেহ সৎকার করিবে না।

শারদা ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। তার পর নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া সে বলিল, "একবার—আর একবার—একটাবার আমারে যাইবার দেন।"

গোবিন্দ ঘাড় নাড়িল। যুবক চতুষ্টয় তার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। হতাশ হইয়া শারদা তাদের মুখের দিকে চাহিল।

(২৬)

মাধবের অন্ত্যেষ্টি হইয়া গেলে শারদা গেল তার পিত্রালয়ে। যাইবার সময় তার সধবার বেশ ঘুচাইয়া সে বৈরাগিনীর বেশ ধারণ করিল।

সে প্রথমে গিয়া উঠিল তার নিজের ভিটায়। সেখানে গিয়া সে দেখিতে পাইল তার ভিটা দখল করিয়া বসিয়া আছে অন্য লোক। এ ভিটা তার মায়ের চাকরাণ ছিল। শারদা গ্রাম ত্যাগ করিবার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহা অন্য লোকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

যে ভিটায় তার জন্ম, যেখানে সে দীর্ঘকাল সুখে দুঃখে কাটাইয়াছে, সেখানে তার স্থান নাই দেখিয়া শারদা মনে একটা প্রবল ধাক্কা খাইল। স্বামীর মৃত্যুতে ব্যথাতুর হইয়া ছিল তার অন্তর, সে এই আঘাতে কাঁদিয়া ফেলিল।

অনেকক্ষণ পর সেখান হইতে উঠিয়া সে তার প্রতিবেশিনী শ্যামার বাড়ীতে গেল। শ্যামাও তার মত দাসীবৃত্তি করিয়া দুঃখে কষ্টে বাস করে। তার সঙ্গে শারদার আশৈশব হৃদ্যতা ছিল।

শ্যামা শারদাকে বৈষ্ণবীবেশে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। সে বলিল, সর্ব্বনাশ! শারদাকে দেখিলে গ্রামের লোক তাকে আস্ত রাখিবে না। একে সে কুলত্যাগিনী, তা ছাড়া গোপালের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দিয়া পলায়ন করিয়া সে গ্রামবাসীদের বিশেষ বিরাগের ভাজন হইয়াছে। তাহাকে এ গ্রামের কেহ আশ্রয় দিবে না, বরং বিধিমতে নির্য্যাতন করিবে।

শ্যামা শারদাকে দু'হাতে ঠেলিয়া বিদায় করিল এবং অবিলম্বে গ্রামান্তরে যাইবার উপদেশ দিল।

দুঃখে কষ্টে শারদা জীর্ণ হইয়াছিল; তার উপর পথশ্রমে সে ক্লান্ত। ক্লিষ্ট কণ্ঠে সে সুধু এক বেলার জন্য শ্যামার কাছে আশ্রয় চাহিল। শ্যামা ঝাড়িয়া অস্বীকার করিল।

তার পর শারদা একে একে তার একাধিক বাল্য বন্ধুর কাছে গেল,—সবাই তাকে বিদায় করিয়া দিল; কেহ বা সুধু সভয়ে, কেহ বা অত্যন্ত রূঢ়তার সহিত।

শেষে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে ক্লান্ত চরণে গোপালের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

সে বাড়ীর দশা দেখিয়া তার কান্না পাইল। ইহার পূর্ব্বে যখন সে আসিয়াছিল, তখন সৌভাগ্য ও সম্পদে এই গৃহ উজ্জ্বল হইয়া ছিল। সে গৃহের কিছুই অবশিষ্ট নাই—আছে সুধু শূন্য ভিটার উপর কয়েকটি কাঠের খুঁটির দগ্ধাবশেষ। একখানি ভিটায় ছোট্ট একখানি ঘর আছে।

বাড়ীতে লোকজনের সাড়া নাই। তার একমাত্র ঘরের দুয়ারে তালাবন্ধ। গোপাল বাড়ী নাই। কোথায় সে গিয়াছে তাহার সন্ধান দিবারও কেহ নাই। শারদা বসিয়া পড়িল।

তার পা আর চলে না। শরীর তার ক্লান্ত, চিত্ত শোকদীর্ণ। তার উপর সমস্ত লোকের অবজ্ঞা ও অনাদরে তার হৃদয় একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। গোপালের গৃহের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া তার মন একেবারে বসিয়া গেল,—হাত পা অচল হইয়া পড়িল।

একমাত্র অবশিষ্ট কুটীরখানির এক পাশে আপনাকে

কোনও মতে টানিয়া আনিয়া শারদা তার ছায়ায় শুইয়া পড়িল এবং ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙ্গিলে শারদা দেখিল তার সামনে বসিয়া আছে গোপাল !

* * * *

গোপাল সবিস্ময়ে শারদাকে বলিল, "তোর এ দশা কেন ?"

শারদা গোপালকে বলিল, সে ভেক লইয়াছে। বলিল তার পুত্র সে হারাইয়াছে, স্বামী আর বাঁচিয়া নাই। তার দুঃখের অনেক কথাই সে অশ্রুজলে ভাসাইয়া এক মুহূর্ত্তের মধ্যে গোপালকে জানাইল।

তার দুঃখের কথা শুনিয়া গোপাল ম্লানমুখে অশেষ সহৃদয়তার সহিত তাকে সান্ত্বনা দিল।

অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর গোপাল জিজ্ঞাসা করিল শারদার আহার হইয়াছে কি না।

শারদা ঘাড় নাড়িল। এই কথায় ক্রমে তার দুঃখের কাহিনীর আর এক পরিচ্ছেদের উপরকার পরদা উঠিয়া গেল। এত দুঃখ কষ্ট পাইয়া সে গ্রামবাসীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কোথাও আশ্রয় পাইল না, এই কথা বলিতে শারদা আবার ভাঙ্গিয়া পড়িল।

গোপালের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, "কি কমু ভগবান আমারে মারছে—নাইলে ইয়ার শাস্তি ওয়াগো দিতাম।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "নে এখন ওঠ, দুইডা মুখে দে, তার পর সব কথা কমু।"

মরুভূমির পথে চলিতে চলিতে এক ফোঁটা জলের সন্ধান পাইলে তাপদগ্ধ পথিকের যে আনন্দ হয়, তেমনি আনন্দ হইল শারদার। দেশে ফিরিয়া অবধি সকলের কাছে সে পাইয়াছে সুধু অনাদর, অবহেলা, অবজ্ঞা। গোপালের সহৃদয়তায় তার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

কূপ হইতে জল তুলিয়া শারদা স্নান করিল। তার পর গোপাল তাকে তার কুটীরের ভিতর লইয়া গেল।

খাদ্যদ্রব্য তার বড় বেশী কিছু ছিল না। চিঁড়া ভিজাইয়া তেঁতুল ও বাতাসা দিয়া শারদা খাইল এবং পরিতৃপ্তির সহিত শীতল জল একঘটি ভরিয়া পান করিল।

তার পর দুজনে বসিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

গোপাল বলিল, সে বাড়ী ছিল না। তাহার মোকদ্দমার জন্য ময়মনসিংহ গিয়াছিল, এইমাত্র ফিরিয়াছে।

শারদা বলিল, মোকদ্দমার কথা সে শুনিয়াছে। মোকদ্দমা কি হইয়া গিয়াছে ?

গোপাল বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হইয়া গিয়াছে ; গোপাল পরাজিত হইয়াছে।

এত পরিপূর্ণ অবসন্নতার সহিত গোপাল কথাগুলি বলিল যে শারদার অন্তর সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল।

ক্রমে শারদা জানিতে পারিল এই মোকদ্দমায় পরাজয়ের ফলে গোপালকে একেবারে পথের ভিখারী হইতে হইবে। তাহার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া গোপাল এ মোকদ্দমা লড়িতেছিল। সকলেই আশা দিয়াছিল সে জয়ী হইবে। কিন্তু নিঃশেষে সে পরাজিত হইল। এখন তার কপর্দ্দক মাত্র সম্বল নাই,—কি খাইবে তার উপায় নাই। ময়মনসিংহের উকীল বাবুরা পরামর্শ দিলেন হাইকোর্টে আপীল করিতে। হিসাব করিয়া দেখা গেল তাতে তিন চার শো টাকা খরচ। তাই মামলা মোকদ্দমায় ইতি দিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া গোপাল গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে।

আর দু'দিন বাদে ডিক্রীদার ডিক্রীজারী করিয়া তাহাকে এ ভিটেখানি হইতে গলায় হাত দিয়া বাহির করিয়া দিবে। তখন গোপালের মাথা রাখিবার ঠাঁইটুকুও থাকিবে না,—উদরান্ন তো দূরের কথা।

এমন সর্ব্বনাশ তাহার হইয়া গেল, তবু গ্রামের ভিতর এমন কেউ নাই যে তার দুঃখে একবার আহা বলিবে। ভিটে ছাড়া হইয়া এক রাত্রের জন্য আশ্রয় খুঁজিতে গেলে, শারদার যে দশা হইয়াছে সেই দশা হইবে গোপালের। হয় তো তার চেয়ে বেশী হইবে। সকলে আনন্দের সহিত তার গায় থুথু দিবে, চাঁদা করিয়া চাঁটি মারিয়া তাহাকে বিদায় করিবে।

এত বড় সংসারের মধ্যে গোপালের আপনার বলিতে কেহ নাই, দুঃসময়ে তাকে একটু সাহায্য করিবে এমন একটি লোক নাই। তার দুর্দ্দশায় সকলে উল্লসিত, তার লাঞ্ছনা করিতে পারিলে সকলে আনন্দিত হইবে।

গোপালও শারদার মত, একটু সহানুভূতি, একটু দরদ, একটু করুণার জন্য ডুকাইয়া মরিতেছিল। তার

এতগুলি দুঃখ, এত দুর্দ্দশার ভিতর, চারিদিক চাহিয়া কারও কাছে সে একটু মিষ্টি কথা পর্য্যন্ত শুনিতে পায় নাই। তাহারই উকীল, তার নিকট পারিশ্রমিক লইয়া তার মোকদ্দমা করিয়াছেন—তিনিও তাকে বলিয়াছেন, "বাপধন, চিরদিন লোকের গলায় ছুরী মেরে এসেছো, এখন তোমার গলায় ছুরী ব'সছে তাতে চেঁচালে চ'লবে কেন?" চারিদিকে তার ক্রূর রুষ্ট দৃষ্টি,—একটু করুণা, একটু সহৃদয়তা সে কারও চোখে চাহিয়া পায় নাই।

সন্তাপে তার বুক পুড়িয়া যাইতেছিল। সে দুঃখ যার কাছে ঝাড়িয়া ফেলিবে এমন লোক সে কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই। এমন একটি বন্ধু তার নাই, যার কাছে দুঃখের কথা খুলিয়া বলিলে, সে একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবে।

তিক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল তার চিত্ত! তৃষিত হইয়া সে খুঁজিতেছিল এক ফোঁটা করুণা, একবিন্দু শান্তিবারি। শারদাকে পাইয়া সে তার বুকের সব দুঃখ উজাড় করিয়া তার কাছে ঢালিয়া দিল। শারদা পরম সহৃদয়তার সহিত সব কথা শুনিল। শুনিতে শুনিতে দুই চক্ষু তার জলে ভরিয়া উঠিল।

সকল কথা শুনিয়া শারদা বলিল, "তুমি কর আপীল, আমি টাকা দিব। পাঁচশ' টাকা আমার আছে।"

গোপাল বিস্মিত হইয়া একবার তার দিকে চাহিল। সে বলিল, "তুই দিবি আঁমারে টাকা? কিসের সাহসে? আর তো পাবি না তা।"

শারদা বলিল, "না পেলাম। আমার টাকার আর কি দরকার। বৈরাগিনী আমি, ভিক্ষা ক'রে খাব। ভগবানের সেবা ক'রবো। তুই নে টাকা।"

বলিয়া সে তার কোমরের বাঁধন খুলিয়া একটা নোটের তাড়া বাহির করিয়া গোপালের সামনে ফেলিয়া দিল। গোপাল মাথা নীচু করিয়া ঘাড় নাড়িল।

শারদা বলিল, "কেন নিবি না তুই? তুই যখন আমার অভাবের দিনে আমাকে টাকা দিয়েছিলি তখন আমি নিই নি? তখন কি তুই ফেরত পাবি ব'লে দিয়েছিলি?"

গোপাল গম্ভীরভাবে নোটগুলি তুলিয়া শারদার হাতে দিয়া বলিল, "না শারদা, আমার টাকার কাম নাই। কোনও কিছুরই কাম নাই! পৃথিবীতে এমন কিছু নাই যাতে আর লালচ আছে। আমি ঠিক করছি—সব ছাইড়া দিমু!"

শারদা বলিল, "পাগলের কথা। মোকদ্দমা না করিস না করলি। টাকা তুই নে। এই টাকা নিয়ে আবার ব্যবসা কর, আবার বড়লোক হবি।"

বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িয়া গোপাল বলিল, "বড়লোক হওনের সাধ আর আমার নাই। টাকা পয়সা তুচ্ছ সব। আগে ভাবতাম টাকাই বুঝি সব—কিন্তু দেখছি আমি টাকায় মাইনসের মন কিনা যায় না। আর টাকা চাই না।"

উদাসভাবে গোপাল বলিয়া গেল যে, ভৃত্যের ঘরে জন্মিয়া তার নীচ কুলের জন্য চিত্তে বড় গ্লানি ছিল। তাই যখন সম্পদের মুখ দেখিল তখন তার একমাত্র সাধনা হইয়াছিল আভিজাত্যের সম্মান পাইবার। সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হইয়া সে না করিয়াছে এমন কর্ম্ম নাই। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে সে মিথ্যা কহিয়াছে, প্রবঞ্চনা করিয়াছে।

সে ভাবিয়াছিল অর্থ হইলে লোকে আপনি তার সম্মান করিবে, তাই অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য কোনও দুষ্কার্য্য করিতে সে কুণ্ঠিত হয় নাই। অর্থ তার হইয়াছিল, অর্থের বলে সে অনেক কিছুই পাইয়াছিল। অর্থের বিনিময়ে সে সেবা পাইয়াছে, প্রজার দল তার দ্বারস্থ হইয়া হুজুর হুজুর করিয়াছে, গ্রামবাসীরা অনেকেই তার কাছে হাত জোড় করিয়া থাকিয়াছে। অর্থ ছিল তার। তার চেয়ে বেশী প্রতিপত্তির জন্য সে নয়-আনির গোমস্তাগিরী সংগ্রহ করিয়াছিল। তার ফলে তার প্রতাপে সমস্ত গ্রামবাসী কম্পিত হইয়াছে।

কি একটা মোহ তার হইয়াছিল, যে তার প্রতাপ দেখাইতে পারিলেই সে লোকের কাছে সম্মান পাইবে। তাই সে যেখানে অবসর পাইয়াছে লোককে তার প্রতাপ দেখাইয়াছে,—তার প্রতাপ দেখাইবার নিত্য নূতন পথ সৃষ্টি করিয়াছে। তার ক্ষমতার বলে শক্তিমানকে অভিভূত পীড়িত করিয়াই ছিল তার আনন্দ—কেন না, তাহা হইলেই সে পাইবে সম্মান।

এত দিনে সে বুঝিয়াছে কত বড় ভুল ছিল তার ধারণা। সম্মান সে পায় নাই। লোকের উপর অত্যাচার করিয়া সে তাহাদিগকে ভীত ও বশীভূত করিয়াছে, কিন্তু অন্তরের শ্রদ্ধা সে তো কারও কাছে পায় নাই। এখন সে বুঝিয়াছে এই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের মূল্য কত বেশী!

দেখিতে দেখিতে একদিন যখন তার শক্তি ও প্রতাপ সহসা লুপ্ত হইয়া গেল, তার সম্পদ তার হাত হইতে খসিয়া পড়িল, তখন সে বুঝিতে পারিল কত তুচ্ছ ছিল তার এই মেকী সম্মান। যখন অর্থ গেল, শক্তি গেল, তখন সে একেবারে নিঃস্ব হইয়া গেল। কোনও লোকের মনে তার প্রতি এক ফোঁটা শ্রদ্ধা, একটু প্রীতি অবশিষ্ট রহিল না।

এখন তার চোখ ফুটিয়াছে। সে বুঝিয়াছে ধনজনের গর্ব্ব কিছুই নয়—তুচ্ছ এ-সব—খাঁটি জিনিষ সুধু ভালবাসা। সেই ভালবাসা সে জীবনে একটি দিন পায় নাই কারও কাছে, পাইবার চেষ্টা করে নাই। এখন তার প্রাণ হাহাকার করিতেছে সুধু এক ফোঁটা ভালবাসার জন্য।

হতাশভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া গোপাল এ কথা বলিল,—তার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

শারদার হৃদয় এ কথা শুনিয়া বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। সে কোনও কথা বলিল না।

অনেকক্ষণ পর সে সস্নেহে গোপালকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া নীরবে তার চক্ষের জল মুছাইয়া দিল। তার এই সমাদরে গোপালের অন্তর স্নিগ্ধ হইয়া গেল।

তার পর গোপাল অনেকক্ষণ শারদার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, "ভাইব্যা দেইখলাম শারদা—তুই যে পথ ধ'রেছিস সেই আমারও পথ।" বলিল, সংসারের সঙ্গে কারবার তার মিটিয়াছে—এখন অবশিষ্ট জীবন সে ভগবানের পায় সমর্পণ করিয়া দিবে। ভগবান যদি দেন, তবে সে আজ যেমন লোকের কাছে পাইয়াছে সুধু অপমান ও নির্য্যাতন, হয় তো একদিন পাইতে পারে তাদের কাছে এমন সম্মান, এমন ভালবাসা, যাহা জন্ম জন্ম তার থাকিবে,—একটা দুর্ভাগ্যের ঝাপটা হাওয়ায় তাসের বাড়ীর মত হঠাৎ উড়িয়া যাইবে না। আকুলভাবে সে শারদাকে বলিল, "সেই পথ তুই আমায় দেখা, আমাকে হাতে ধরিয়া সেই পথে তুলিয়া দে, যাতে ভগবানকে পাওয়া যায়।"

শারদার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে গোপালের উত্তপ্ত মাথাটা তার বুকের ভিতর সাপটিয়া ধরিয়া বলিল, "চল গোপাল, তাই চল। তোর যে এমন মতি হ'য়েছে তাতে আমার কি আনন্দ যে হ'চ্ছে তা' কি ব'লবো। তোর এই মতি হবে আর তোর হাত ধ'রে আমি তাঁর পাদপদ্মে তোকে নিয়ে যাব ব'লেই বুঝি গোবিন্দ এমনি ক'রে আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে তোর কাছে এনে ফেলেছেন। আর আমার কোনও দুঃখ নেই। এখন মনে হ'চ্ছে, গোবিন্দ যে আমার ছেলে নিয়েছেন, স্বামী নিয়েছেন, আমাকে সর্ব্বহারা ক'রে দিয়েছেন—সে কেবল তাঁর দয়া।

"ভালবাসার কাঙ্গাল তুই? আমার বুকে যে ভালবাসা আছে তাই দিয়ে আমি তোকে স্নান করিয়ে দেব। কোনও দিনই আমি তোর চেয়ে কাউকে বেশী ভালবাসি নি—কিন্তু গোবিন্দের এমনি লীলা, তবু আমি তোকে কত না দুঃখ দিয়েছি। আজ গোবিন্দের আদেশ এসেছে—আর আমি তোকে ছাড়বো না, কৃষ্ণ-প্রেমে আমরা আমাদের দুজনের আত্মাকে এক ক'রে দিয়ে তাঁর পায় আপনাদের নিবেদন ক'রে দেব! আর আমাদের দুঃখ কি?"

বলিয়া শারদা দু'হাতে গোপালের মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া গোবিন্দের নাম করিয়া তার অশ্রুভরা মুখ চুম্বন করিল। গোপাল শারদাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বন করিল।

স্থির হইল তাহারা শান্তিপুরে যাইবে। গোপাল ভেক লইলে তাহারা কণ্ঠীবদল করিয়া দু'জনে বৃন্দাবনে গিয়া ভগবানের নামে ভিক্ষা করিয়া জীবন-যাপন করিবে।

দুঃখ আর রহিল না। আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল তাদের দুজনার মুখ।

আনন্দে তারা হাতে হাত ধরিয়া গৃহত্যাগ করিয়া পথে গিয়া দাঁড়াইল।

নদীর ধারের লম্বা পথ দিয়া তারা চলিল। শারদ-

সন্ধ্যায় তখন সে পথের চারিধার অপরূপ শোভায় ভরিয়া উঠিয়াছিল।

জীবনের প্রারম্ভে তারা একদিন এই পথ দিয়া হাতে হাত ধরিয়া চলিয়াছিল। সেদিনও শরতের শোভায় ভরিয়াছিল এই পথ।

সেদিন ছিল প্রভাত—আজ সন্ধ্যা।

সেদিন প্রকৃতি তাহাদিগকে এক সূত্রে গাঁথিয়া দিয়াছিল, তাই তারা এক সাথে চলিয়াছিল।

যৌবনে সমাজ আসিয়া তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দিয়াছিল।

আজ সমাজের সব দেনা চুকাইয়া আবার তারা এক সাথে মিলিয়া চলিয়াছে—তাদের শৈশবের আরব্ধ সেই পথে।

সেদিন তারা ছিল জীবনের রসে ভরপুর। আজ তাদের জীবন পড়িয়া আছে পশ্চাতে,—অন্তর তাদের ভরিয়া আছে পরপারের রসে।

সেদিন তারা ছিল উৎসাহভরা দু'টি শিশু। আজ তারা জীবনের পথে পরিশ্রান্ত দু'টি যাত্রী—ধরিয়াছে তাহাদের শেষ পথ।

শেষ

আফগানিস্থান

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

আফগানিস্থানের সহিত হিন্দুদের সত্যিকারের বিচ্ছেদ সুরু হয় মুসলমান ধর্ম্মের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে। এই বিচ্ছেদের ইতিহাসটা আগাগোড়াই অনুদার ধর্ম্মান্ধতার কলঙ্কে পরিপূর্ণ। অতি প্রচীনযুগের আর্য্যেরা যেমন নিষ্ঠুর পাশবিকতার দ্বারা তাদের জয়-যাত্রার পথকে সুগম ক'রে তুলেছিল, মুসলমান দিগ্বিজয়ী বীর ব'লে যাঁরা পরিচিত, তাঁদের ভিতরেও তেমনি শক্তির সেই চেহারাটাই সব চেয়ে বড় হ'য়ে ধরা পড়ে।

দ্বিকুব্জ-পৃষ্ঠ উষ্ট্র

আফগানিস্থান, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ হ'তে যে সব মুসলমান অভিযান এসেছে ভারতবর্ষে, দুই একটি ছাড়া তাদের প্রত্যেকটিতেই এই কলঙ্কের কাহিনী রক্তের লেখায় রূপ নিয়ে ফুটে' উঠেছে। আর এ ব্যাপারে সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই অত্যাচার সঙ্ঘটিত হ'য়েছে কেবলমাত্র তাদের দ্বারা নয় যারা অসভ্য ও বর্ব্বর, সমান ভাবে তাদের দ্বারাও যাদের মন সভ্যতার আলোর স্পর্শ-শূন্য ছিল না। গজনীর সুলতান মামুদ যে ভাবে হিন্দুদের মন্দিরগুলো ধ্বংস করেছেন তার ইতিহাস আমরা জানি। এই দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করার ভিতরে যে কোনো রকমের অগৌরব থাকতে পারে সে কথাটাও তাঁর মনে হয় নি। কেবল তাই নয়, মন্দির ও দেবমূর্ত্তির ধ্বংস-কারী ব'লে তাঁকে গর্ব্বই অনুভব করতে দেখা গিয়েছে। অথচ এই সুলতান মামুদের মন যে সভ্যতার আলো-বর্জ্জিত ছিল তাও মনে করবার কোনো কারণ নেই। মানুষের জীবনের উপরে সে যুগের শক্তিমান মুসলমান সেনা-নায়কেরা যে কোনো মূল্য দেন নি তার পরিচয় এত সুস্পষ্ট যে, তার উদাহরণ উদ্ধৃত করাও অনেকের কাছে হয় তো বাহুল্য ব'লে মনে হ'বে। তৈমুরলং, নাদির শা প্রভৃতির অভিযান ভারতের কাছে

এখনও বিভীষিকার বস্তু হ'য়েই আছে। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তৈমুরলং ভারতবর্ষ আক্রমণ ক'রেছিলেন। প্রায় একলক্ষ হিন্দুকে হত্যা ক'রে তিনি মিটিয়েছিলেন তাঁর রক্ত-পিপাসা। নাদিরশার দিল্লী জয়ের পাশবিকতাও এর চেয়ে কম বীভৎস ছিল না। ছোট বড় এমনি ধরণের অজস্র উদাহরণ উদ্ধৃত করা যায়। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও বলা দরকার যে, তাঁরা কেবল যে হিন্দুদের উপরেই এই সব অত্যাচারের অনুষ্ঠান ক'রেছেন তা নয়, তাঁদের খেয়াল মুসলমানের রক্ত দিয়ে হোলী খেল্‌তেও দ্বিধা করে নি।
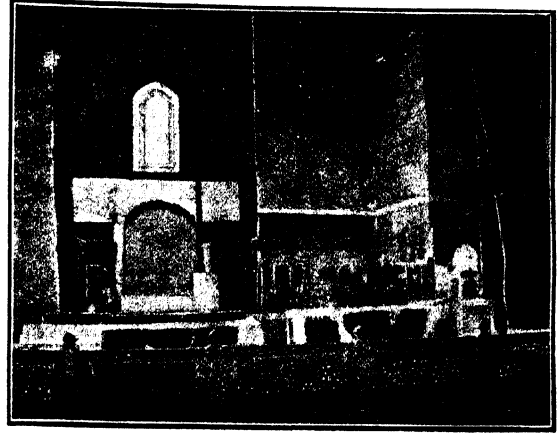
ভারতবর্ষের দিকে আফগানিস্থানের প্রথম চোখ পড়ে সাবক্তজিনের সময়। আলপ্‌তেজিন গজনীতে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর সেই রাজ্য অধিকার করেন সাবক্তজিন। তাঁর লোলুপ দৃষ্টি এসে পড়্‌ল জয়পালের রাজ্যের উপরে। জয়পালের রাজত্ব কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাবক্তজিন তাঁর রাজ্য আক্রমণ কর্‌লেন। যে যুদ্ধ হয় তাতে জয়-লক্ষ্মী তাঁর জয়মাল্য দান করেছিলেন সাবক্তজিনকেই। সাবক্তজিনের পর রাজা হ'ন সুলতান মামুদ। তাঁর রাজত্বের ইতিহাস ভারত আক্রমণের ইতিহাস বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষের বহু প্রদেশ তাঁর সেনাদলের পায়ের চাপে বহুবার কেঁপে উঠ্‌ল। মাটি রাঙা হ'য়ে গেল রক্তের ধারায়। ভারতের অনেকখানি জায়গা জুড়ে' উড়্‌ল তাঁর বিজয়-পতাকা। কিন্তু তা হ'লেও তাঁকে ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ব'লে মেনে নেওয়া যায় না। ভারতের অজস্র ধন-রত্ন, মণি-মাণিক্য লুণ্ঠিত হ'য়েছে তাঁর দ্বারা, অনর্থক দেবতার লাঞ্ছনার দ্বারা ভারতের মন তিনি বিষাক্ত ক'রে তুলেছেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে, অকারণ যুদ্ধের বোঝা নিরীহ প্রজার মাথার উপরে তিনি চাপিয়েছেন। কিন্তু তা হ'লেও ইতিহাস তাঁকে ভারতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার গৌরব কখনো দান করে নি—ইতিহাস জেনেছে তাঁকে লুণ্ঠনকারী হিন্দুমূর্ত্তি ও মন্দির-ধ্বংসকারী হিসাবেই।
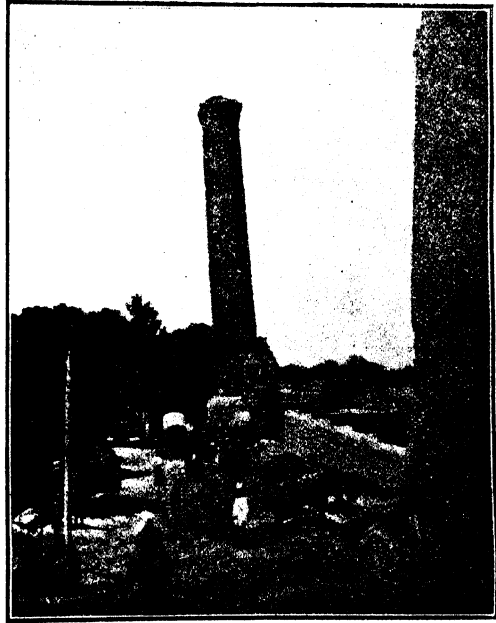
তৈমুরলংএর সমাধি—সমরকন্দ

তৈমুরলংএর স্মৃতিস্তম্ভ—সমরকন্দ

ভারতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার সত্যিকারের গোড়াপত্তন সুরু হয় ১১৯২ খৃষ্টাব্দে তারাইন বা তালাওয়ারী যুদ্ধের পর। পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ক'রে মুসলমানদের যে জয়-পতাকা সাহাব-উদ্-দিন মহম্মদ ঘোরী ভারতের বুকের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাই পরিণামে বিরাট মুসলমান সাম্রাজ্যে পরিণত হ'য়েছিল। এই সাহাব-উদ্-দিনও ছিলেন আফগানিস্থানেরই লোক। হিরাটের পূবদিকে ঘোর নামে একটা পার্ব্বত্য প্রদেশ আছে। রাজ্যটিকে গজনীর মামুদ নিজের রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে এই ঘোরের রাজার শক্তিই হ'য়ে উঠল বড়। সুতরাং সুলতান মামুদের বংশধরদের পরাজিত ক'রে তাঁরাই গজনী অধিকার ক'রে বস্‌লেন। এবং কেবল তাই নয়, ভারতবর্ষেও প্রতিষ্ঠিত কর্‌লেন তাঁরা আফগানিস্থানের আধিপত্য।
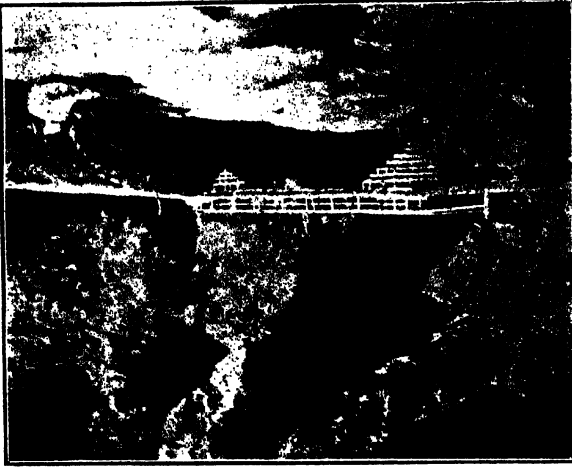
অক্সাস নদীর উপরিস্থ সেতু

মধ্য এশিয়ার রেলপথ

ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের অনেকগুলো স্তর আছে। একই বংশের রাজারা যে সেখানে রাজত্ব ক'রে গেছেন তা নয়। গজনীর পরে এসেছেন ঘোররা, ঘোরদের পর এসেছেন দাসবংশের রাজারা, তারপর খিলিজি বংশ, তারপর তোগলক বংশ, তারপর লোদিবংশ। এমনি ক'রে বহু মুসলমান বংশ ভারতবর্ষে রাজত্ব ক'রে গেছেন। মুসলমান সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে তার সমৃদ্ধির চরম সীমায় উঠেছিল মোগল বাদ্‌শাদের রাজত্বকালে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান বংশের আধিপত্য ভারতবর্ষে চল্‌লেও একটা ব্যাপার বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য এবং সে ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে, এই সব রাজবংশের প্রায় সবগুলিরই উদ্ভব আফগানিস্থানের বিভিন্ন জাতি হ'তে। এমন কি যাঁরা আকস্মিক আক্রমণের দ্বারা উল্কার মতো ভারতের বুকের উপরে নেমে এসে ধ্বংসের আগুন ছড়িয়ে গেছেন তার চারদিকে, দু'একজন ছাড়া তাঁদেরও প্রায় সকলেই ছিলেন আফগানিস্থানেরই লোক।

মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পর থেকে আফগানিস্থান হ'তে হিন্দু-রাজত্ব লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু আফগানিস্থানের সঙ্গে ভারতের যোগ সেইখানেই শেষ হয় নি। বরং তার পর থেকে উভয় দেশের ভেতর

সম্বন্ধ আরো দৃঢ় হ'য়ে উঠেছিল। আফগানিস্থানের মুসলমানেরা ভারতবর্ষেই তাঁদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন, কিন্তু আফগানিস্থানের মায়াও তাঁরা পরিহার করতে পারেন নি। তাই একাদশ খৃষ্টাব্দ হ'তে সপ্তদশ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় সব সময়েই দেখা যায় কাবুল কান্দাহার প্রভৃতি আফগানিস্থানের বড় বড় প্রদেশগুলি শাসিত হ'য়েছে এই ভারতবর্ষ থেকেই। অবশ্য মাঝে মাঝে যে এর ব্যতিক্রম না ঘটেছে তা নয়।

ভারতবর্ষ থেকে আফগানিস্থান পুরোপুরি ভাবে শাসিত হ'তে থাকে মোগলদের অভ্যুত্থানের সময় হ'তে। আকবরের সময় আফগানিস্থান একেবারে দিল্লীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েই পড়েছিল। তারপর থেকে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত আফগানিস্থানের অধিকাংশ ভাগই ছিল মোগল বাদশাদের হাতে। বস্তুতঃ ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল পর্য্যন্ত ভারতের শক্তি রীতিমত ভাবেই অনুভূত হয়েছে আফগানিস্থানে। মাঝখানে কেবলমাত্র কান্দাহার তাঁদের হস্তচ্যুত হ'য়ে গিয়েছিল। পারস্য তাকে দখল ক'রে নেয়। এই বেদখলী অংশটাকে উদ্ধার করবার অনেক চেষ্টাও হয়েছে মোগল সম্রাটদের তরফ থেকে। কিন্তু সে চেষ্টা তাঁদের ফলপ্রসূ হয় নি।

ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সূচনা যেমন দেখা দেয়, তেমনি আফগানিস্থানেও দেখা দেয় স্বতন্ত্র রাজ্য-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বাভাস। আফগানিস্থান যে একটা আলাদা দেশ, আফগানেরা যে একটা আলাদা জাতি, দিল্লীর সাম্রাজ্য ও দিল্লীর লোকদের থেকে যে তারা স্বতন্ত্র—এই মনোভাব ধীরে ধীরে সেই সময় থেকেই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌তে থাকে তাদের মনে। আর সেই জন্যই এ-কথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না যে, আফগানিস্থান অত্যন্ত আধুনিক দেশ এবং বর্ত্তমান আফগান জাতিও অত্যন্ত আধুনিক জাতি।

নিজেদের এই জাতীয়তার বোধ একেবারেই অকস্মাৎ পরিপূর্ণ রূপ নিয়েও দেখা দেয়নি আফগানদের মনে। পৃথিবীর আর সমস্ত জাতির মনেও জাতীয়তার বোধ যেমন ধীরে আস্তে বিস্তার লাভ করে, আফগানদের মনেও তা তেমনি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে। এই বিস্তার লাভের কাজ এখনও শেষ হ'য়েছে ব'লে

জল-বিক্রেতা

মনে হয় না। কারণ জাতীয়তার অনুপ্রেরণায় যে জাতি পরিপূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ওঠে, নানা

মুরঘাব উপত্যকার রেলপথ

ঘরোয়া এবং ব্যক্তিগত ব্যাপার তার রাজনৈতিক আকাশকে কখনো এমনভাবে ঘোরালো ক'রে রাখ্বার অবকাশ পায় না।

কিন্তু সে যাই হোক্, পারস্যের অধিকার থেকে আফগানিস্থানের প্রদেশগুলি ছিনিয়ে আন্বার চেষ্টার

রুষ-আফগান সীমা

ভিতর দিয়েই আফগান অভ্যুদয়ের সূচনার প্রথম পরিচয় পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। ভারতবর্ষের মোগল সম্রাটেরা যেমন আফগানিস্থানের কতকগুলো দেশ নিজেদের
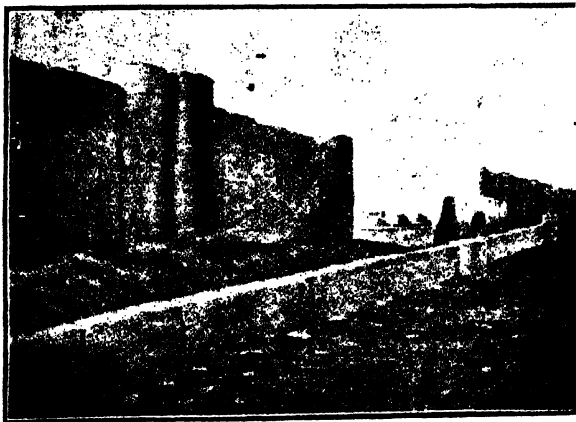
ইরাকের তোরণ

অধিকারভুক্ত ক'রে নিয়েছিলেন, তেমনি নিয়েছিল পারস্য। এই পারস্যের হাত থেকে কান্দাহার কেড়ে নেওয়াই বর্ত্তমান আফগান জাতির অভ্যুদয়ের প্রথম সূচনা।

১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন কান্দাহার মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু ১৬২১ খৃষ্টাব্দে পারস্য তাকে অধিকার ক'রে নেয়। তার পর থেকে এই প্রদেশটির অধিকার নিয়ে তলোয়ারের মুখে বোঝাপড়া চল্‌তে থাকে ভারতীয় ও পারস্য সৈন্যদের ভিতরে। একবার যশোবন্ত সিংহও তাঁর রাজপুত সৈন্যদল নিয়ে অভিযান ক'রেছিলেন আফগানিস্থানে। ফলে কিছুদিনের জন্য কান্দাহার আবার এলো মোগল বাদ্‌শাহের অধিকারে। কিন্তু এ অধিকার তাঁরা বজায় রাখ্‌তে পার্‌লেন না। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার আবার পারস্যের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়্‌ল। তার পর থেকে ঔরঙ্গজেব বহুবার চেষ্টা করেছেন এই কান্দাহারকে আবার মোগল সাম্রাজ্যের ভিতরে ফিরিয়া আন্‌বার জন্য। কিন্তু সে চেষ্টা তাঁর সফল হয় নি। ঔরঙ্গজেবের চেষ্টা সফল হ'লো না সত্য, কিন্তু পারস্যও তার অধিকার বজায় রাখ্‌তে পার্‌লে না কান্দাহারের উপরে। মির ওয়াইজ নামে একজন ঘিলজাই সর্দ্দার কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ ক'রে নিয়ে কান্দাহার আক্রমণ করলেন। তার পারসিক শাসনকর্ত্তা যুবরাজ গুরগিন পরাজিত হ'লেন এই ঘিলজাই সর্দ্দারের হাতে। এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'লো কান্দাহারে একটি স্বাধীন রাজ্য। নতুন আফগান রাজ্য প্রতিষ্ঠার বনিয়াদ তৈরী হ'লো এই কান্দাহার জয়ের ভিতর দিয়েই।

স্বাধীনতার উন্মাদনা যখন জাগে কোনো জাতির কোনো এক সম্প্রদায়ের ভিতরে, তখন তা' তার অন্যান্য সম্প্রদায়কেও চঞ্চল ও অসহিষ্ণু ক'রে তোলে। তাই কান্দাহারে যা সুরু হ'লো হীরাটেও ছড়িয়ে পড়্‌ল তার ঢেউ। সেখানে আবদালী-সর্দ্দার আসাতুল্লা খাঁ সাদুজাই দাঁড়ালেন পারস্যের শক্তির বিরুদ্ধে। আফ-

গানদেরই জয় হ'লো। হিরাট হ'তেও পারস্যকে পাত্তাড়ি গুটাতে হ'লো।

কিন্তু নব-জাগ্রত জাতির রাজ্য-জয়ের স্পৃহা মাতালের মদের নেশার মতো বেড়েই চলে। তাই নিজেদের দেশকে স্বাধীন ক'রেই আফগানদের ক্ষুধা মিট্‌ল না, তারা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল পারস্যকেও জয় কর্‌বার জন্য। মির ওয়াইজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মামুদ রাজা হ'লেন। পারস্যকে জয় কর্‌বার নেশায় তিনি উঠ্‌লেন মাতাল হ'য়ে। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে তাঁর সৈন্যদের দ্বারা পারস্য আক্রান্ত হ'লো। তারা পারসিকদের হাত হ'তে ছিনিয়ে নিলে কিরমান। ঘিলজাই-দের এই দৃষ্টান্ত আবদালীরাও অনুসরণ কর্‌লে। পরের বৎসর তারা মেসাদ আক্রমণ ক'রে জয় ক'রে নিলে।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে মামুদ আবার তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তৈরী হ'লেন। এবার তাঁর দুর্দম আকাঙ্ক্ষা সমগ্র পারস্যকে জয় কর্‌বার দুরাশায় মেতে উঠ্‌ল। পাহাড় অঞ্চলের বুনো আফগানীদের সংগ্রহ করা হ'লো সৈন্য-বাহিনী তৈরী কর্‌বার জন্য। বিশ হাজার লোক তাঁর পতাকার তলে সমবেত হ'লো। হাতিয়ার নিয়ে এই অশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী বেরিয়ে পড়্‌ল পারস্য জয়ের উদ্দেশ্যে। হাতিয়ার তাদের সেই সেকালের তলোয়ার আর গাদা বন্দুক। এই সম্পদ নিয়ে তারা এসে দাঁড়ালো পারস্যের চল্লিশ হাজার সৈন্যের সম্মুখে—যাদের রণসজ্জায় তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠতম উন্নতির ছাপ পড়েছে। ইস্পাহান থেকে এগার মাইল দূরে দুই সৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ হ'য়ে গেল। চল্লিশ হাজারের ভিতরে দু' হাজারের মৃতদেহ পালাতে সুরু ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌তে না-পড়্‌তেই পারস্যের সৈন্যগণ দিলে ছুট। আফগান সৈন্যেরা এসে ইস্পাহান অধিকার ক'রে বস্‌ল। শাহ হুসেন ছিলেন তখন পারস্যের সিংহাসনে। তিনি ভাব্‌লেন—এত অল্প সৈন্য নিয়ে তাঁর অত বড় বিরাট বাহিনীকে যারা পরাজিত কর্‌তে পারে তারা খোদার আশ্রিত লোক। সুতরাং খোদার বিরুদ্ধে লড়াই করা অনর্থক মনে ক'রেই তিনি আফগানদের হাতে আত্ম-সমর্পণ কর্‌লেন। এর কিছুদিন পরেই মামুদ সিরাজও জয় করেন।
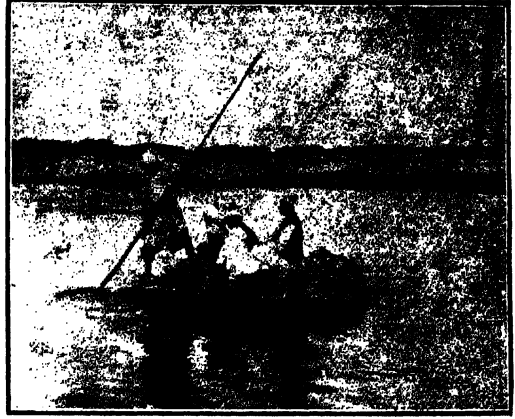
হেলমন্দ নদী পার হইতেছে

উষ্ট্র-বিপণি—নাসরতাবাদ

জয়ের পরে সুরু হ'লো তাঁর হত্যা উৎসব। দু' হাজার পারস্য সৈনিক তাঁর খেয়ালের মুখে জীবন বলি দিলে। বহু সম্ভ্রান্ত পারসিক হারালেন তাঁদের জীবন।

রাজপরিবারের যে সমস্ত লোককে হাতের কাছে পাওয়া গেল তাঁদের প্রায় সকলকেই কোতল করা হ'লো। এমন কি সিয়া সম্প্রদায়ের সব মুসলমানকে উচ্ছেদ করার সঙ্কল্পেও হত্যা সুরু হ'য়ে গেল।

বেলুচিস্থানের উষ্ট্রসাদী সৈন্য

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মামুদের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে আস্‌রফ খাঁ তাঁর সিংহাসন অধিকার

নাসরতাবাদের তোরণ

করেন। পিতার নর-হত্যার জের তিনিও পুরোপুরি-ভাবে বজায় রেখেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেও পারস্যের বহু সম্ভ্রান্ত লোক প্রাণ হারিয়েছিল।

কিন্তু এত অত্যাচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত যে রাজত্ব তা টেঁকে না। তাই দশ বৎসরের ভিতরেই পারস্য আফগানদের হস্তচ্যুত হ'য়ে গেল। শাহ হুসেনের পুত্র শাহ তহ্‌মস্ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। অবশিষ্ট পারস্য সৈন্য এবং বহু তুর্কী এসে যোগদান করল তাঁর পতাকার তলে। বিখ্যাত নাদির শাহ গ্রহণ করলেন তাঁর সৈন্যচালনার ভার। পর পর তিনটি যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে আস্‌রফ খাঁ ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে পলায়ন করলেন এবং পথেই একজন বাহ্‌লুলি-সর্দ্দারের অস্ত্রাঘাতে নিহত হ'লেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ কান্দাহার জয় করেন। তার পরেই সুরু হয় তাঁর ভারতবর্ষ জয়ের অভিযান। এই নাদির শার অত্যাচারের কাহিনীই ভারতবর্ষের ইতিহাসে আজও বিভীষিকা বস্তু হ'য়ে আছে। নয়ঘণ্টা ধ'রে দাঁড়িয়ে নাদির-শা নিজে দিল্লীতে তাঁর এই হত্যা-উৎসব পর্য্যবেক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু হাজার হাজার লোকের এই হত্যাও তাঁর নিজেকে হত্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারলে না। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে নাদির-শা সলাহ্‌ বেগ নামে তাঁর নিজের একজন সৈনাধ্যক্ষের দ্বারাই নিহত হ'ন।

নাদির শার হাতে আফগানিস্থানের যে পরাজয় তা অত্যন্ত সাময়িক ব্যাপার। জাতীয়তা-বোধের বিকাশের যে সূত্রপাত হয়েছিল এর আগেই আফগানদের মনে, তার প্রসারকেও এ পরাজয় ধ্বংস করতে পারেনি। তাই নাদির শার মৃত্যুর পরেই আহমদ শাহ আবদালী এলেন আফগানিস্থানের রঙ্গমঞ্চে নতুন শক্তি নতুন অনুপ্রেরণা নিয়ে। বস্তুতঃ আফগানিস্থানের মানচিত্রের যে রূপ আজ আমরা দেখতে পাই সে রূপের কাঠামটা এই সময়েরই তৈরী। তাঁর অভ্যুদয়ের আগে আফগানিস্থানের প্রদেশগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র রাজ্যেই বিভক্ত

ছিল। বর্ত্তমান আফগানিস্থানের রাজ্যগুলোকে এক সঙ্গে বেঁধে একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য এবং জাতি রূপে গ'ড়ে তোল্‌বার যে যোগসূত্র, তা রচিত হয় এই আহ্‌মদ-শাহ্ আবদালীর সময়েই।

নাদির শার সেনা-নায়কদেরই একজন ছিলেন এই আহ্‌মদ শা। অবদালীদের সাদুজাই বংশে তাঁর জন্ম। পূর্ব্বেই বলেছি এই অবদালীরা নিজেদের ইজরেইলএর বংশোদ্ভব বলে মনে করে। নাদিরশার মৃত্যুর সময় আহ্‌মদ শার বয়স ছিল মাত্র ২৪ বৎসর। সুতরাং পরিপূর্ণ যৌবনের দুর্দ্দম দুরাশা তাঁর বুকে। এই দুরাশাই রচনা করলে তাঁর মনে স্বাধীন আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা। অধীনে ছিল তাঁর ১০,০০০ বাছাই-করা সাহসী অশ্বারোহী। তা ছাড়া নাদির শার মৃত্যুর পর তাঁরই হাতে এসে পড়্‌ল তাঁর সমস্ত ধন-রত্ন, এমন কি ভারত হ'তে অপহৃত কহিনূর মণিটি পর্য্যন্ত। এত বড় তিনটি সম্পদ যার সহায় হয়, ভাগ্য যে তার প্রতি প্রসন্ন, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং অনতি-বিলম্বেই নাদির শার আফগান প্রদেশগুলি তাঁর অধিকার-ভুক্ত হ'য়ে পড়্‌ল। তিনি দুরাণী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর্‌লেন।

এর পর আরম্ভ হ'লো তাঁরও ভারত-অভিযান। মোগল বাদ্‌শাদের আধিপত্য তখন প্রায় লুপ্ত হওয়ার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। কোনো আক্রমণকেই বাধা দেবার শক্তি তাঁদের আর নেই। সুতরাং সুযোগ বুঝে'ই আহ্‌মদ শাহ্ দাবি ক'রে বস্‌লেন নাদির শার অধিকৃত মোগল শাসনাধীনের প্রদেশগুলি এবং সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণও সুরু হ'লো। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ হ'তে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ভিতর আহ্‌মদ শাহ্ ৪ বার ভারত আক্রমণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে থাকে লুট-তরাজ, অগ্নিদাহ, হত্যা ইত্যাদি। ভারতে তাঁর সব চেয়ে বড় যুদ্ধ হয় মারাঠাদের সঙ্গে পাণিপথে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে। মারাঠা শক্তি তখন ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্পর্দ্ধায় মেতে উঠেছে। তাদের এই শক্তিকে ধ্বংস কর্‌বার জন্ত রোহিলা-দের দ্বারা নিমন্ত্রিত হ'য়ে এলেন আহ্‌মদ শাহ। ভারতের ইতিহাসের কোনো খবর যাঁরা রাখেন তারাই জানেন, পাণিপথের এই যুদ্ধে মারাঠাশক্তি যে ঘা খেয়েছিল সে আঘাতের চোট্ জীবনে আর তারা সাম্‌লিয়ে উঠ্‌তে পারেনি।

বালুচি মেষপালক রাখাল
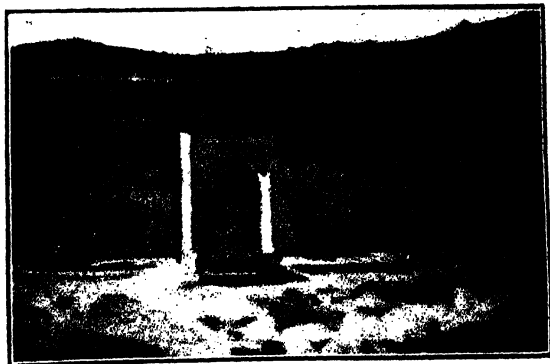
কাবুলের সন্নিহিত সম্রাট বাবরের সমাধি

এর পরেও আরো কয়েকবার আহ্‌মদ শাহ আবদালি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর পরবর্ত্তী স—
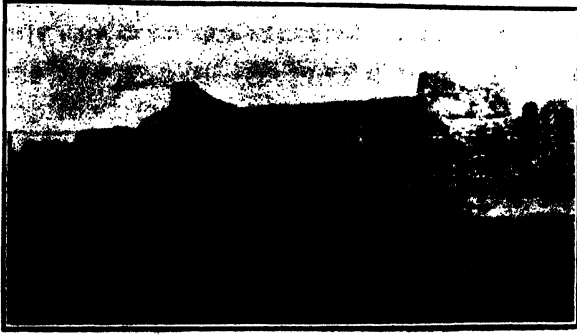
একটি আফগান দুর্গ

আফগানিস্থানের আমীরের শীতাবাস
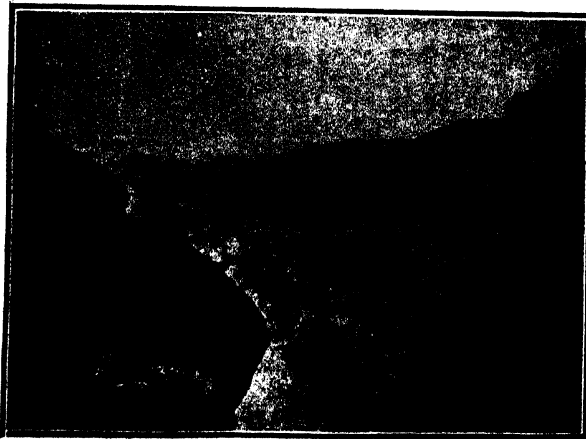
খাইবার গিরিসঙ্কট—লাণ্ডিখানা যাইবার পথ

গুলি সবই হয় প্রায় শিখদের সঙ্গে। এ সব সংঘর্ষের ইতিহাস জয়-পরাজয় মিশ্রিত। আহ্মদ শা আবদালীর জীবনে জয়লাভ বহুবার ঘটেছে। কিন্তু সে জয় স্থায়ী সাম্রাজ্যে কখনো পরিণতি লাভ করতে পারে নি। তাঁর জীবনে এই 'ট্রাজেডির' রূপ কানিংহামের একটি কথার ভিতর দিয়ে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। আহ্মদ শা আবদালীর সম্পর্কেই তিনি লিখেছেন—

"The Prince, the very ideal of the Afgan genius, hardy and enterprising, fitted for conquest, yet incapable of empire, seemed but to exist for the sake of losing and recovering provinces."

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ শাহ আবদালীর অভিযান-অভিশপ্ত জীবনের শেষ হয়। প্রত্যেকটি অভিযানের ভিতর দিয়ে বিজয়-লক্ষ্মীর যে প্রসাদ তিনি লাভ করেছিলেন, তা যদি অক্ষুণ্ণ থাকত তা হ'লে একদিকে ভারতবর্ষ ও অন্য দিকে পারস্যের উপরেও তাঁর সাম্রাজ্যের বিপুল প্রাসাদ গ'ড়ে উঠ্‌ত। কিন্তু তা হয় নি। তাঁর রাজত্ব বিস্তার লাভ করেছিল শুধু পেশোয়ার থেকে হিরাট পর্য্যন্ত এবং কাশ্মীর থেকে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত। অর্থাৎ কেবল সমস্ত উত্তর পশ্চিম ভারতই আফগানিস্থানের অধিকারের আওতার ভিতরে এসে পড়ে। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র তৈমুর। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তৈমুর আফগানিস্থানের সিংহাসন নিয়ে মারামারি ও হানাহানি করবার জন্য রেখে যান অনেকগুলি পুত্র-কন্যা। এক একটি সম্প্রদায়ের সর্দারের আশ্রয়ে এঁরা পেশ করতে সুরু করলেন

সিংহাসনের উপরে এঁদের দাবি। সুতরাং গুপ্ত-হত্যা ও ভ্রাতৃ-রক্তে কলঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌ল আফগানিস্থানের সিংহাসন। এই রক্ত-কলঙ্কিত ইতিহাসের জের আফগানিস্থান এখনও টেনে চলেছে প্রতিপদে তার সিংহাসন অধিকারের ব্যাপার নিয়ে।

তৈমুরের ছেলেদের ভিতরে সিংহাসন অধিকার করেন প্রথম সাহজেমান। তিনি তৈমুরের দ্বিতীয় পুত্র। তবু উজির পেইন্দাহ খাঁর চেষ্টায় রাজদণ্ড তাঁরই করতলগত হ'লো। বড় ভাই বাধা দিয়েছিলেন। ফলে তিনি যখন পরাজিত হ'লেন তাঁর চোখ দু'টো উপড়িয়ে নিয়ে তাঁকে দেওয়া হ'লো তাঁর অবমৃষ্যকারিতার পুরস্কার। এই চোখ খসিয়ে নেওয়ার বর্ব্বর শাস্তির সঙ্গে পরিচয় আফগানিস্থানে রাজ-পদ-মর্য্যাদাভিলাষীদের ভাগ্যে কত বার যে ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই। সাহজেমান ছিলেন তাঁর পিতামহের মতোই দুঃসাহসী ও দুরাকাঙ্ক্ষী লোক। সুতরাং তাঁর সময়ে আবার ভারত-আক্রমণের অধ্যায় সুরু হ'লো। কিন্তু দূরদেশ জয়ের উন্মাদনায় তিনি ভুলে' গেলেন তাঁর নিজের সিংহাসনের বিপদ-সঙ্কুল অবস্থার কথা। ফলে, যা হবার তাই হ'লো। তিনি সিংহাসনচ্যুত হ'লেন এবং দু'টো চোখও হারালেন। তারপর এলেন তাঁরই আর এক ভ্রাতা—মামুদশা। মামুদ শাহের রাজ্যও স্থায়ী হ'লো না। দুদিন যেতে না যেতেই তাঁর স্থান অধিকার ক'রে বস্‌লেন তৈমুর শারই আর এক পুত্র শাহ সুজা। শাহ সুজার মন ছিল তাঁর ভাইদের চেয়ে ঢের উদার। তাই ভাইকে রাজ্যচ্যুত ক'রেই তিনি খুসি হ'লেন, তাঁর চোখ দুটো আর উপ্‌ড়িয়ে নিলেন না। এই শাহ সুজার সময়েই আফগানিস্থানে যায় মিঃ মাউণ্টষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের অধীনে ব্রিটিশ মিশন।
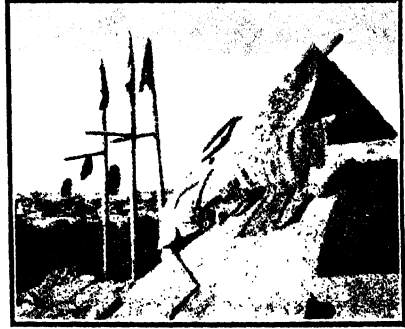
একজন পীরের কবর

ভারতবর্ষে এবং আফগানিস্থানে আর এক নতুন অধ্যায় সুরু হ'য়েছিল তার কিছুদিন আগে থেকেই। এবং সেই অধ্যায়ই বর্ত্তমান আফগানিস্থানের ইতিহাসে সব চেয়ে বড় অধ্যায়। দু'কথায় তাকে শেষ করা সম্ভব নয়। সুতরাং এর পরের বার আমরা তা নিয়ে আলোচনা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

বাংলার মা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, এম্‌-এ

সেদিন ছিল রবিবার। সৃষ্টিকর্ত্তা না কি ছয় দিনে বিরাট সৃষ্টিকার্য্য শেষ করিয়া ঐ দিনটি বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তা' সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্রাম করুন আর নাই করুন, হতভাগ্য চাকুরীজীবীর দল যে সারা সপ্তাহের হাড়ভাঙা খাটুনির মধ্যে ব্যাকুল আগ্রহে শুধু ঐ দিনটিরই প্রতীক্ষা করে, এ সত্যটি ভুক্তভোগী মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। রবিবার চাকুরীগত প্রাণ বাঙ্গালীর অতি পবিত্র দিন!

প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় বিভূতিভূষণের বৈঠকখানায় দু'চারজন বন্ধুর সমাগম হয়। অন্য দিন সকলেই অনবসর —কাহারও ছেলেপড়ানো আছে, কাহারও আফিস হইতে ফিরিতেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়,—বাসায় ফিরিয়া কোথাও বাহির হইবার শক্তি বা আগ্রহ থাকে না। ঐ দিনটি তাঁহারা তাই সান্ধ্য-সম্মিলনের জন্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন,—রবিবার তাঁহাদের our day—সম্পূর্ণ নিজস্ব।

বিভূতিভূষণ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বৈঠকখানায় বসিয়া বন্ধুগণের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন, দুই বৎসরের শিশু পুত্র অমলকান্তি তাঁহার কাঁধে ঝুঁকিয়া হেলিয়া দুলিয়া অর্দ্ধোচ্চারিত কণ্ঠে বলিতেছে, 'মাঘ মন্দয় মাঘ মন্দয়, থোনার কুন্দর।' পার্শ্বেই বিভূতিভূষণের পঞ্চম-

বর্ষীয়া বালিকা কন্যা বীণা পুতুল লইয়া খেলা করিতে-ছিল; বিজ্ঞের সুরে বলিয়া উঠিল, 'থোনায় কুন্দর কিরে; সোণার কুণ্ডল, সোণার কুণ্ডল।' অমলকান্তি বলিল, 'থো-না-য় কু-ন্দ-র।' বীণা হাসিল, বিভূতিভূষণ হাসিয়া খোকাকে বুকে তুলিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। এমন সময় জ্যোৎস্নাপ্রমুখ বন্ধুবর্গ আসিয়া জুটিলেন। জ্যোৎস্না বলিলেন, 'কি হচ্ছে মাসি?'—বীণাকে তাঁহারা কেহ মা, কেহ মাসি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বীণা বলিল, 'আমি মাঘমণ্ডল করি কি না, খোকা তাই বলে মাঘ মন্দয় থোনায় কুন্দর। খোকা ভাল করে কথা বলতে শেখে নি কি না।' অমল এইবার দিদির ভুল সংশোধন করিয়া বলিল, 'থোনায় কুন্দয় কিরে থোনায় কুন্দয়।'

পরিমল বলিলেন, 'মেয়েকে বুঝি এই সব রাবিশ্ শেখানো হচ্ছে?'

বিভূতিভূষণ হাসিয়া বলিলেন, 'রাবিস্ কেন, ভাই, ব্রতকথার ভিতর দিয়ে বাংলার মেয়েরা অনেক জিনিষ শিক্ষা করে। এই ধর শীতের রাত, ছেলেমেয়েরা একবার লেপ জড়িয়ে শুলো ত' উঠবে পরদিন বেলা দশটায়! কিন্তু ব্রতের তাগিদ রয়েছে, কাউকে কিছু বলতে হ'ল না, ভোর হ'তে না হ'তেই ঐ একরত্তি মেয়েরা সব উঠে পড়ল যে যার ব্রত করবার জন্য। তাদের উৎসাহ কত! ফূর্ত্তি কত! তার পর ঐ ছড়াগুলির ভিতরেই কি কম শিখবার জিনিষ রয়েছে! ওরই ভিতর দিয়ে মেয়েরা প্রথম শিখে নেয় শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, দেওর, ননদ নিয়েই তাদের ভবিষ্যৎ সংসার,—শিখে নেয় পরের সেবায় নিজকে ঢেলে দেওয়াই নারীত্বের পরিপূর্ণ সার্থকতা। তাই পরাধীনতার সহস্র দৈন্যের মাঝেও বাঙ্গালীর যা কিছু গর্ব্বের তা' ঐ বাঙ্গালীর মেয়ে ও বাঙ্গালীর মা।'

জ্যোৎস্না বলিলেন, 'এ-সব, দাদা, বক্তৃতায় শোনায় ভাল। কিন্তু সত্যই কি তাই? সত্যই কি বাঙ্গালীর মেয়ের ভিতর গর্ব্বের কিছু আছে? অশিক্ষিতা, সঙ্কীর্ণচেতা, কলহপ্রিয়া—'

বাধা দিয়া বিভূতিভূষণ বলিলেন, 'না, ভাই, সে শুধুই বাঙ্গালী মেয়ের একটা বিকৃত সংস্করণ মাত্র। কবির ভাষায় বাঙ্গালীর মেয়ে—

"পতিপ্রিয়া, পতি-ভকতা, সখী পতিসহ পরিহাসে,
দুঃখে দীনা দাসী প্রেমিকা, নীরবা নিঠুর ভাষে,
পীড়নে প্রিয়ভাষিণী সহিষ্ণু সম এ ধরারে;
দেবী গৃহলক্ষ্মী, বঙ্গ-গরিমা, পুণ্যবতীরে,
সাবিত্রী সীতানুধ্যায়িনী, বিশ্বপূজ্যা সতীরে,
মর্ম্মর দৃঢ়চরিতা, জলকোমলাঙ্গ ধরা রে।"

এইটি বাঙ্গালী মেয়ের স্বরূপ মূর্ত্তি, আর বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এমন গৃহলক্ষ্মী বিরাজ করেন বলেই আজও আমরা বেঁচে আছি। দুঃখ-দৈন্য-অভাব-অনটনের বেষ্টনের মধ্য দিয়ে কল্যাণময়ী দেবীরা কেমন করে এক-একখানি ক্ষুদ্র সংসারকে গুছিয়ে রাখেন ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। দুঃখে সান্ত্বনা দিতে, রোগশয্যার সেবা করতে এমন নারী কি জগতে কোথাও আছে? নিজের যা কিছু দু'হাতে উজাড় করে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবে, প্রতিদানে কিছু চাইবে না, কিছুরই প্রত্যাশা রাখবে না—ধীরা, স্থিরা, সেবাব্রতা, একান্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠাবতী বাংলার মেয়ে মর্ত্তে বিশ্বজননীর প্রতিচ্ছবি।'

বিভূতিভূষণ ক্ষণকাল নীরব রহিলেন; বন্ধুরাও নীরব। ক্ষণপরে তিনি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'বহু বৎসরের পুরোনো একখানা ছবি আজ হঠাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সেই গল্পই আজ তোমাদের বল্‌ব—

তখনও আমি বাঁকুড়ায় মাষ্টারী করি, ছেলেমেয়ের ভিতর দু'বৎসরের মেয়ে পুতুল। প্রতুলকে তোমরা দেখেছ ত'?—আমার ছোট ভাই প্রতুল, আজকাল মেদিনীপুরে প্রফেসর—সে তখন বাঁকুড়া কলেজে পড়ত। পঞ্চাশ টাকা মাইনে পেতাম। বাসাভাড়া দিতে হত দশ টাকা, বাকী চল্লিশ টাকায় কোন রকমে সংসার চালাতাম।

আমাদের হেড্‌মাষ্টার যিনি ছিলেন, ইন্দিরার ভাষায় তিনি একটি "কালির বোতল", আর ঠিক "গলায় গলায় কালি"। কেউ এক মুহূর্ত্ত সুস্থ হয়ে বসে আছে এটা তাঁর কিছুতেই সইত না। কোন কাজ যদি না রইল ত' বলতেন, এ-জিনিষটা এ-খাতা থেকে ও-খাতায় তুলুন, ও-খাতা থেকে সে-খাতায় তুলুন। এমনি করে রবিবার দিনটিও আমাদের বাদ যেত না। তা'ছাড়া কথায় কথায় কৈফিয়তের পালা। যাক্, 'দোরে দোরে কাঙ্গালী,

কলমপেশা বাঙ্গালী'—দৈন্য লাঞ্ছনা তার নিত্য সহচর। নীরবে কাজ করে যেতাম।

একদিন,—তারিখটি আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে,—ভাদ্র মাসের অমাবস্যার রাত্রে মেয়েটার জ্বর হ'ল। এমন জ্বর—গা যেন পুড়ে যায়। সারাটা রাত বেহুঁসের মত পড়ে রইল। ভোর হতেই ছুটলাম ডাক্তারের বাড়ী। মেয়েকে দেখিয়ে, ব্যবস্থাপত্র করিয়ে, ঔষধ নিয়ে যখন বাড়ী ফিরলাম, তখন দশটা বাজে। সাড়ে দশটায় স্কুল। তাড়াতাড়ি মাথায় এক ঘড়া জল দিয়ে, দু'মুঠো ভাত মুখে গুঁজে প্রতুলকে বললাম, 'আজ আর কলেজে যাস নে, খুকীর কাছে থাকিস।' তার পর ছুটলাম স্কুলের দিকে, ভয়—পাছে এক মিনিট দেরী হ'য়ে যায়!

সেদিন একটু সকাল করেই ছুটী পেলাম। বাড়ী ফিরে দেখি বিরাট ব্যাপার—মেয়ে প্রায় অচেতন। তোমাদের বৌদি শিয়রে বসে হাওয়া করছে, প্রতুল পায়ে গরম জলের সেক দিচ্ছে। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, আমি চলে যাবার খানিক বাদেই খুকী একবার বমি করে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে। অমন সুন্দর দুধে-আলতায় বরণ—দেখেছ ত'?—একেবারে নীল হ'য়ে যায়, মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে থাকে। তার পর ডাক্তারের ব্যবস্থামত এই সব সেক্ চলছে। চা'র দিন চা'র রাত কি ক'রে কাটালেম সে আর আজ তোমাদের কি করে বুঝাব! দু'বছরের কচি মেয়ে অব্যক্ত যাতনায় ছটফট করত, কখন বা অসাড় হ'য়ে পড়ে' থাকত। নিষ্প্রভ, রোগ-পাণ্ডুর মুখখানির দিকে চাইতাম, মনে হত,—এই মুখ প্রণয়ের প্রথম দান,—কতক্ষণ আর এ ছবিখানি দেখতে পাব! কঙ্কালসার দেহখানিকে জড়িয়ে ধরতাম। মনে হ'ত, কতক্ষণ—মুহূর্ত্ত পরেই হয় ত এই ভরা বুক শূন্য করে, সকল বিশ্ব আঁধার ক'রে মা আমার বিজয়ার বিদায় নেবে। পড়ে রইবে শূন্য শয্যা, শূন্য ঘর, আর দুই আর্ত্ত নরনারী।

তোমাদের বৌদির মনেও একই আশঙ্কা, একই ব্যাকুলতা। কিন্তু যে ভয়ের কল্পনামাত্রে বুক কেঁপে উঠত, কেউ কাউকে মুখ ফুটে সে সর্ব্বনেশে আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করতে পারি নি। চা'র দিন চা'র রাত তোমাদের বৌদি সমানভাবে মেয়ের শিয়রে বসে,—আহার নাই, নিদ্রা নাই। আমি শুধু ভাবতেম ঠাকুর, জীবনে এমন কোন পুণ্য করি নি, যার বলে আজ জোর করে মেয়ের প্রাণ ভিক্ষা চাইব, কিন্তু এমন আপনভোলা সেবাকে ব্যর্থ কোরো না। প্রার্থনা করতেম, সন্তাকুল-রাণী শিবানী বিশ্বজননী মাগো, মায়ের মর্য্যাদা রেখো।

অবশেষে মায়েরই জয় হ'ল। পঞ্চম দিন ভোরে জ্বর বিরাম হ'ল। সকালে ডাক্তার এসে বলে গেলেন, আর আশঙ্কা নাই। একটা পর্ব্বতপ্রমাণ বোঝা বুকের উপর থেকে নেমে গেল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেছি। অনেক দিন পর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছি,—উঠতে একটু বেলাই হয়েছিল। চেয়ে দেখি, সদ্যস্নাতা তোমাদের বৌদি গরদের কাপড় পরে দাঁড়িয়ে। তারই পিছনে বাসার ঠিকা ঝি। হাতে তার একখানি সাজিতে নানাবিধ পূজোপকরণ। জিজ্ঞাসা করলেম 'ব্যাপার কি?' তোমাদের বৌদি হেসে বললে, 'মা'র বাড়ী যাচ্ছি।' ঝি বললে, 'জান ত, বাবু, এ ক'দিন মা এক মুঠো ভাত গেলে নি। আজ মা'র পূজো সেরে তবে মুখে অন্ন দেবে।' মনে মনে ভাবলেম, যে ধর্ম্মের আবেষ্টনের ভিতর দিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে এমন মা জন্মেছে এ জগতে বুঝি তার তুলনা নাই।

খানিক বাদে ফিরে এসে তোমাদের বৌদি যখন মেয়ের মাথায় মায়ের আশীর্ব্বাদী ফুল দিলে—মনে হল, বুঝি বা দেবী ভগবতী আপনার শুভস্পর্শে সন্তানের সকল অকল্যাণ দূর করে দিলেন। আমার হাতে একটি ফুল দিয়ে বললে, মায়ের আশীর্ব্বাদ। আমি ভক্তিমান হৃদয়ে ফুলটি মাথায় তুলে নিলাম। শুধু দেবতার নির্ম্মাল্য বলে নয়; আমি তা ভক্তিভরে গ্রহণ করলেম, কারণ এ ফুল বাঙ্গলার মাতৃ-হৃদয়ের ঐকান্তিকী প্রার্থনায় পূত-পবিত্র। তোমাদের বৌদি এই যে পুতুলের কথা বলতে বলতে পুতুল এসে হাজির! কি মা?'

দশ বৎসরের ফুটফুটে মেয়ে, পুতুলেরই মত দিব্য-কান্তি। পুতুল পিতার সম্মুখে আসিয়া বলিল, 'তোমাদের গল্প আর ফুরাবে না, বাবা? মা যে সেই কখন থেকে আসন পেতে বসে রয়েছে! কাকাবাবুদের নিয়ে চল।'

বিভূতিভূষণ হাসিয়া বলিলেন, 'ঐ যা, আসল কথাটাই ভুলেছিলাম। তোমাদের বৌদি যে আজ সারাদিন বসে বসে তোমাদের জন্য পিটে তৈয়ার করেছেন। খাবে চল।'
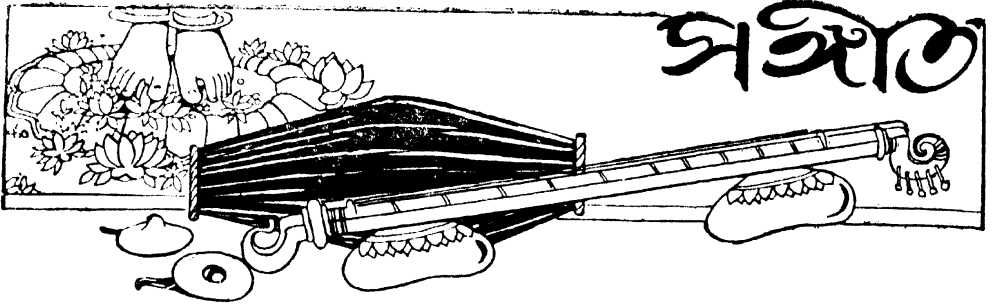
কথা ও সুর ঃ—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

স্বরলিপি ঃ—জগৎ ঘটক

ভজন

লাচ্ছাশাখ—ত্রিতালী

শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির-নির্ম্মল
শান্ত অচঞ্চল ধ্রুব-জ্যোতি !
অশান্ত এ চিত কর হে সমাহিত
সদা আনন্দিত রাখ মতি ॥
দুঃখ শোক সহি অসীম সাহসে
অটল রহি যেন সম্মানে যশে,
তোমার ধ্যানের আনন্দ-রসে
নিমগ্ন রহি হে বিশ্ব-পতি ॥
মন যেন না টলে খল কোলাহলে
হে রাজ-রাজ !
অন্তরে তুমি নাথ সতত বিরাজ,
হে রাজ-রাজ !
বহে তব ত্রিলোক ব্যাপিয়া, হে গুণী,
ওঁঙ্কার-সঙ্গীত-সুর-সুরধুনী !
হে মহামৌনী, যেন সদা শুনি
সে সুরে তোমার নীরব আরতি ॥

২ ৩ ০ ১
II { গা -রা গা পমা | রগা -রা সা সা | রা -া সা -সা | ন্া -সা ধ্া -ন্া I
শু ০ ভ্র স মু ০ জ্জ্ব ল হে ০ চি র নি র্ ম ল্

I প্া রা রা রসা | গা -রা সা সা | সপা -া পা পা | ধপা -মগা -রসা ধন্া } I
শা ন্ ত অ০ চ ন্ চ ল ধ্রু০ ০ ব জ্যো তি০ ০০ ০০ ০০

I { সগা গা -গা গা | গা -া গা গাম | রগা গা রা রসা | সা -া সা সা } I
অ শা ন্ ত এ ০ চি ত ক র হে স০ মা ০ হি ত

I সা সরা -া রা | রন্া -সা ধ্া -ন্া | সা পা পা পা | ধপা -মগা -রসা -ধ্না II
স দা ০ আ ন ন্ দি ত রা ০ থ ম তি০ ০০ ০০ ০০

II {পা -া পা পর্সা | -া র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সনা | ধা -না র্সা -া I
দু ০ খ শো ০ ক স হি অ সী ম সা০ হ ০ সে ০

I র্গা র্রা র্গা র্মা | র্রর্গা -র্রা র্সা র্সা | পর্সা -া র্সা র্সা | না -ধা না -া } I
অ ট ল র হি০ ০ যে ন স ম্ মা নে য ০ শে ০

I {র্সা র্সা -পা -পা | পধা -া -মা -া | গা সা -রা গমা | রগা -রা সা -া } I
তো মা ০ র ধ্যা ০ নে র আ ন ন্ দ০ র ০ সে ০

I পা পর্সা -া র্সা | পধা পর্সা -া পা | ধপা -মগা -রা রা | পমা -গরা -সন্া ধ্না II
নি ম গ্ ন র০ হি০ ০ হে বি০ ০০ শ্ব প তি০ ০০ ০০ ০০

II {সা সা গা গমা | মপা -া পা পা | ধা পা মা গা | রা -গা মা -া I
ম ন যে ন০ না ০ ট লে খ ল কো লা হ ০ লে ০

I পা গা -া মা | রা -া -সা -া | সগা -া গা গমা | রগা রা সা -সা I
হে রা ০ জ রা ০ জ ০ অ ন্ ত রে০ তু মি না থ

I পা পা ধা না | ধনা -ধা পা -া | পা গা -া মা | রা -া সা -া } I
স ত ত বি রা ০ জ ০ হে রা ০ জ রা ০ জ ০

I {পা পা পর্সা র্সা | র্সা -া র্সা -র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সনা | ধা -না র্সা -া I
ব হে ত ব ত্রি ০ লো ক ব্যা পি য়া হে০ গু ০ ণী ০

I র্গা -র্রা র্গা -র্মা | র্রর্গা -র্রা র্সা র্সা | পর্সা র্সা র্সা র্সা | না -ধা না -া } I
ও ঙ্ কা র স ঙ্ গী ত সু র সু র ধু ০ নী ০

I {র্সা -পা পা পা | পধা -া -মা -া | রগা সা রা গমা | রগা -রা -সা -া } I
হে ০ ম হা মৌ০ ০ নী ০ যে ন স দা০ শু০ ০ নি ০

I পা পর্সা -া র্সা | পধা পর্সা -া পা | ধপা -মগা রা রা | পমা -গরা -সন্া -ধ্না II
সে সু ০ রে তো০ মা০ র্ নি র০ ব্০ আ র তি০ ০০ ০০ ০০

বরোদা প্রাচ্যবিদ্যা সম্মিলনে

পথের কথা

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ

বহু বৎসর ধরিয়াই শুনিয়া আসিতেছি, বরোদা রাজ্য সর্ব্ব বিষয়েই দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে উন্নততম। মহারাজা সয়াজি রাও গাইকোবাড় সদাজাগ্রত দৃষ্টিতে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া রাজ্যের উন্নতির জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাহারই ফলে আজ অনতিবৃহৎ বরোদা রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে শিক্ষিততম ভূখণ্ড,—স্ত্রী-শিক্ষায়, স্ত্রী-স্বাধীনতায়, স্ত্রীলোকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। প্রাচ্য-বিদ্যা-সম্মিলন এবার বরোদায় হইবে, অনেক দিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলাম। বরোদায় না হইয়া হনলুলুতে হইলেও আমার পক্ষে সমান কথাই হইত,—দুই-ই আমার নিকট সমান দুরধিগম্য। পকেটের পয়সা খরচ করিয়া অত দূরে যাইবার ক্ষমতা নাই; যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করি, রিট্রেঞ্চমেণ্টের ফলে তাহারও আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। এই অসাচ্ছল্যের দিনে কর্ত্তৃপক্ষ যে বরোদা যাইবার খরচ বহন করিবেন বা যাইবার অনুমতি দিবেন এমন ভরসা করিতে পারিলাম না। সংবাদ কানে আসিতে লাগিল, প্রতিবাসী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মিলনে পাঁচজন মহা মহা রথী প্রতিনিধি পাঠাইতেছে,—তাঁহারা প্রবন্ধাস্ত্র শানাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বরোদা সম্মিলনের সম্পাদক পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ ডাক্তার বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য (মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র) ঘন ঘন বুলেটিন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উহাদের প্রথমটা পড়িয়া জানিলাম, অমুক অমুক মহারথী অমুক অমুক শাখায় সভাপতি হইবেন। দ্বিতীয়টা পড়িয়া জানিলাম—সম্মিলনে যে সকল প্রতিনিধি যোগদান করিবেন, তাঁহাদের জন্য অভ্যর্থনার কি কি বিপুল আয়োজন হইতেছে! তৃতীয়টা পড়িয়া জানিলাম,—প্রতিনিধিগণের দ্বারকা, আবু পাহাড়, অজন্তা ইত্যাদি স্থানে যাইবার বন্দোবস্তও প্রায় সম্পূর্ণ! ইহার উপরে সৌরাষ্ট্রের রৈবতক পর্ব্বতশিখরে বসিয়া কে যেন অশ্রান্ত রাগিণীতে বাঁশীর সুরে আকর্ষণ করিতে লাগিল,—"ওরে আয়, জীবনে এমন সুযোগ হয় ত আর আসিবে না!"

মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, ঘরে থাকা দায় হইল,—সঞ্জীববর্ণিত বধূর মত কেবলি মনে হইতে লাগিল—হায় আমি বড়ই অভাগিনী, জলে যাইতে পারিলাম না।

বেপরোয়া হইয়া আমার উপর-ওয়ালা কমিটির সম্পাদকের নিকট একদিন কথাটা পাড়িলাম। তথায় কিঞ্চিৎ আনুকূল্য পাইয়া প্রেসিডেণ্টের নিকট এক দরখাস্ত প্রেরণ করিলাম। যথাসময়ে উহা মঞ্জুর হইয়া আসিল। তখন প্রতিনিধির দেয় চাঁদা পাঠাইবার সময় প্রায় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি বিনয়তোষের ভরসায় চাঁদা পাঠাইয়া দিলাম। একটা প্রবন্ধ পড়া দরকার, অথচ তখন পর্য্যন্ত কিছুই লেখা নাই। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসারও চাঁদার সহিতই পাঠান দরকার। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩৩৮ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় "ভারতে যাদববংশ" নামক একটি গবেষণাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। উহার প্রধান এক সিদ্ধান্ত ছিল এই যে কৃষ্ণের নায়কত্বে যাদবগণ মথুরা হইতে যাইয়া যখন সৌরাষ্ট্রে উপনিবিষ্ট হয়, তখন তাঁহাদের রাজধানী দ্বারবতী নগরী রৈবতক পর্ব্বতের অনতিদূরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের আমল হইতে তাহাই গিরিনগর নামে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল এবং উহা বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত অস্তিত্ববান্ জুনাগড় সহর হইতে অভিন্ন। এই রচনাটি বাঙ্গালা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কৃষ্ণের আমলের মথুরা আজিও আছে, গোকুলও মথুরার বিপরীত পারে নিতান্তই পরিচিত স্থান। কিন্তু কৃষ্ণের আমলের কোন প্রাসাদ বা দুর্গ এই দুই স্থানে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আছে বলিয়া কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় না। উক্ত প্রবন্ধে আমার

বক্তব্য ছিল যে জুনাগড়ে যে ভীমকান্তি উপর-কোট দুর্গ অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে, তাহা যে মৌর্য্য আমল হইতে আছে, তাহা তো সহজেই প্রমাণ করা যায়। অধিকন্তু এই সেই রৈবতক রক্ষিত দ্বারবতী নগরীর দুর্গ, যাহার গর্ব্ব কৃষ্ণ সভা-পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের নিকট করিয়াছিলেন (সভা-পর্ব্ব, ১৪শ অধ্যায়)। কাজেই এই দুর্গ কৃষ্ণের আমলের ইমারৎ,—এবং ভারতবর্ষে অদ্যাপি বর্ত্তমান ঐ আমলের আর দ্বিতীয় ইমারতের কথা আমরা অবগত নহি। 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত প্রবন্ধটির এই অংশ বিস্তৃততর প্রমাণ-প্রয়োগসহকারে সম্মিলনে পাঠ করিব, এই রকমই স্থির করিলাম—এবং প্রবন্ধ লিখিত না হইতেই তাহার সংক্ষিপ্তসার পাঠাইয়া দিলাম।

তাহার পরে প্রবন্ধ লেখা, প্রবন্ধ মুদ্রণ,—যাত্রার উপযোগী কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র সংগ্রহ ইত্যাদি হুলস্থূল ব্যাপার! ডিসেম্বরের (১৯৩৩) ২৭-২৮-২৯ তারিখে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। তখন ঢাকায়ই বেজায় শীত,—পশ্চিমাঞ্চলের তো কথাই নাই। পশ্চিমাঞ্চলের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বন্ধুবর্গ মুরব্বিয়ানা সহকারে ভয় দেখাইতে লাগিলেন—"জমে যাবে হে, জমে যাবে! ভালমত গরম কাপড়-চোপড় নিও।" ওদিকে বিনয়তোষ তাহার বুলেটিন মারফৎ খবর দিয়াছেন যে, এই সময় না কি বরোদার আবহাওয়া খুব bracing, (বাঙ্গালা কি?) এবং পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির নীচে বড় নামে না! ঢাকার আবহাওয়ার উত্তাপ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিতেও নামিতে কোন দিনই শুনি নাই। তাই অনুমান করিলাম,—bracing এর অর্থ অভিধানে যে লেখে embracing, তাহাই সম্ভবতঃ এই ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট,—শ্রীমান বিনয় যুবক-সুলভ লজ্জাবশতঃ কথাটা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে পারে নাই। এই আলিঙ্গনপ্রবণ আবহাওয়ার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপযোগী বস্ত্রাদি সঙ্গে লইতে ত্রুটি করিলাম না।

ইহার উপর সহসা জুটিল রবিবাবু যে বিপদকে classical করিয়া রাখিয়াছেন—সেই শাশ্বত সনাতন বিপদ—"পরিবার তার সাথে যেতে চায়!" একটা আপোষ বন্দোবস্ত হইল যে তিনি তাঁহার দলবলসহ কলিকাতা পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইবেন, এবং আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, পরেশনাথের মন্দির করিয়া বেড়াইবেন—আর আমি সুকৃৎ করিয়া বরোদা হইয়া ফিরিয়া আসিব;—এইরূপে 'সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য' হইবে—এবং তাহারই বলে বিহারে বিঘোরে একা চড়িয়াও আস্ত হাত পা লইয়াই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতে পারিব!

এইরূপ নানাবিধ বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রি দশটায় যখন হাওড়ায় দেরাদুন এক্সপ্রেসে চড়িয়া বসিলাম তখন গাড়ীতে যাত্রীর অল্পতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। বড়দিনের বন্ধে ভীষণ ভীড় হইবার কথা। আমি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, মধ্যম শ্রেণীর যাত্রী, একটা গোটা কামরাই খালি পাইলাম। টীকেট করিবার সময় একটি সুদর্শন যুবককে হাট্‌রাসের টীকেট করিতে দেখিয়াছিলাম। অল্প পরেই তিনি কক্ষদ্বারে দেখা দিলে আগ্রহসহকারে তাঁহাকে কক্ষে তুলিলাম। সঙ্গে তাঁহার বৃদ্ধা বিধবা জননী এবং একটি তন্বী তরুণী,—উজ্জ্বল গৌরবর্ণা। সহজ অকুণ্ঠিত চালচলনে কথাবার্ত্তায় যুবকের সহিত তরুণীর সম্পর্ক নির্ণয়ে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছিল। পরদিন প্রায় সন্ধ্যায় উহাঁরা মথুরা বৃন্দাবন যাইবার জন্য হাটরাসে নামিয়া গেলেন। ইহার মধ্যে অন্য লোক আর কেহ স্থায়ীভাবে আমাদের কামরায় উঠে নাই। কাজেই এই প্রায় ২০ ঘণ্টার একত্র বাস ফলে আমি এই তীর্থযাত্রী পরিবারের একজনের মত হইয়া গেলাম। ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ে জানিলাম, যুবক আমাদের স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, মাতা ও পত্নীকে লইয়া মথুরা ও বৃন্দাবন দেখাইতে চলিয়াছেন। যুবক বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ত্তকলেজের পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার, চাকরীও ভালই করেন। তীক্ষ্ণনাসিক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অতি মিষ্টভাষী ও সদালাপী। মাতৃদেবী রাশভারী—অল্পভাষিণী, পরম স্নেহপরায়ণা, সদাজাগ্রত চক্ষু। ষ্টেশনের পান কিনিতে যাইতেছি,—তিনি স্পষ্ট আদেশ করিলেন—"ও পান কিনো না, দিন কাল ভাল নয়।" বধূটি সঞ্চারিণী দীপশিখার মত। এমন তাহার সহজ, অনাড়ম্বর, মিথ্যা কুণ্ঠামুক্ত সরস ব্যবহার যে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মাতৃদেবীর কন্যা বলিয়াই ধারণা করিয়াছিলাম,—পুত্রবধূ এবং সহযাত্রী পুত্রেরই যে বধূ তাহা বুঝিতে দেরী লাগিয়া-

ছিল। বয়স ২৪।২৫ বলিয়া অনুমান হইল,—এত বয়সেও ছেলেপিলে হয় নাই দেখিয়া একটু দুঃখ অনুভব করিলাম এবং ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়কে নেপথ্যে অনুযোগ দিলাম। তিনি অদৃষ্টের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিলেন!

অল্পক্ষণ আলাপের পরেই ইঞ্জিনিয়ার সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি মিষ্টার ভট্টশালী?"

চমকিয়া উঠিলাম! বলিলাম—"হ্যাঁ, কি করিয়া বুঝিলেন, বলুন্ তো?"

ইঞ্জিনিয়র বলিলেন—"ঢাকা হইতে আসিতেছেন, চলিয়াছেন—প্রাচ্য-বিদ্যা-সম্মিলনে,—বুঝা আর বিশেষ কঠিন কি?"

সহজেই উত্তর দিতে পারিতাম—ঢাকায় আমি ছাড়া আরও দুই চারিজন কৃতী মনস্বী প্রাচ্যবিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বরকমেই তাঁহারা আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের দুইজনের বরোদা যাইবার কথাও আছে। তবে তাঁহারা মধ্যশ্রেণীতে কখনই ভ্রমণ করিতেন না, ইহাতেই সম্ভবতঃ সর্ব্বরকমে মধ্য ও মন্দভাগ্য ভট্টশালীকে ধরাইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, ভদ্রলোকের তীক্ষ্ণ অনুমান-শক্তি তাঁহার নাসিকার অনুপাতেই তীক্ষ্ণ (এমন তীক্ষ্ণ নাসিকা একমাত্র সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের ছিল বলিয়া জানি) ইহা মনে মনে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম।

ট্রেন যখন শোণ নদ পার হইতেছিল তখনও ভাল করিয়া ফর্সা হয় নাই। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া এই বিশ্রুতখ্যাতি নদের শোভা দেখিতে চেষ্টা করিলাম। বি-এ ক্লাশে বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস আমাদের পাঠ্য ছিল;—তাহাতে চাণক্যের মুখে প্রদত্ত একটি তেজীয়ান্ শ্লোকে শোণ নদের শোভা সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি জোরদার কথা আছে। ঠিক কথা কয়টি ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু ঐ শ্লোকটি হইতে ধারণা হইয়া রহিয়াছে যে শোণ একটা বড় জবর নদী,—যেমনা ব্রহ্মপুত্রের সগোত্র। কবি যমুনা নদীর দুর্দ্দশা দেখিয়া করুণ ছন্দে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে ইনিই সেই কালিন্দী কি না, যাঁহার বিশাল তটে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেন। কিন্তু পুরুষ জাতি বলিয়া শোণনদ কোন কবির ঐ পরিমাণ দরদ উদ্রেক করিতে পারে নাই। নচেৎ পদ্মা মেঘনার বিশাল বিস্তার ও অনন্ত জলরাশি দেখিয়া অভ্যস্ত আমার নয়নদ্বয় দিয়া শোণের যে দুর্দ্দশা দেখিলাম তাহা কবিতায় শোচনীয়ই বটে। বিশাল-বিস্তার নদ,—এক কালে ইহার আভিজাত্য ছিল, ইহার বর্ত্তমান শীর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়াও তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু নদের গভীরতা নিতান্তই নগণ্য, জল তো একরকম নাই বলিলেই চলে। শোণ বর্ত্তমানে ফল্গু নদীর সগোত্র,—ফল্গুর বিশাল বক্ষের মধ্য দিয়া ক্ষীণধারা বহিয়া চলিয়াছে, শোণেরও তাহাই। অথচ প্রশস্ততায় শোণ যে-কোন বড় নদ-নদীর সহিত তুলনীয়। এখন ইহার সমস্তটাই কেবল উষর ধূসর বালুকাক্ষেত্র। বর্ষায় যখন ইহার সমস্ত বুক জুড়িয়া জলস্রোত প্রবাহিত হয়, তখন নিশ্চয়ই ইহা ইহার প্রাচীন আভিজাত্য ফিরিয়া পায়।

ট্রেন যখন মোগলসরাই পৌঁছিল তখন বেশ বেলা হইয়াছে। মোগলসরাইতে জলযোগ সারিয়া লইলাম। ট্রেন আবার চলিল—চুণার, মির্জ্জাপুর, বিন্ধ্যাচল, নাইনী ইত্যাদি বিখ্যাত স্থান অতিক্রম করিয়া প্রায় ১১টায় এলাহাবাদ যাইয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশনের সংলগ্ন সরকারী হোটেলে ডাল ভাত তরকারী ইত্যাদি সমস্তই পাওয়া যায়। অর্ডার দিলেই গাড়ীতে সমস্ত তুলিয়া দিয়া যায়, পরের ষ্টেশনে বাসনপত্র নামাইয়া লইয়া যায়। একবেলার আহারের মূল্য ১।০ মাত্র! এইবারের পরে আরও দুই একবার এই পথে যাতায়াত করিয়া দেখিয়াছি, আটার লুচিতে যাঁহাদের অরুচি না থাকে, তাঁহাদের পক্ষে মাত্র দুই আনা ব্যয়ে উদরপূর্ত্তি করিয়া উৎকৃষ্ট আহারের অন্য ব্যবস্থাও আছে। প্রত্যেক বড় ষ্টেশনেই ট্রেন থামিবামাত্র খাবারওয়ালা "পুরীগরম" ডাকিতে থাকে দুই আনা মূল্যে উহার নিকট একবেলা খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট পুরী এবং তরকারী পাওয়া যায়। পুরী মহিষের ঘৃতে তৈয়ারী, অতি সুস্বাদু; তরকারী প্রায়ই শুধু আলুর,—সময় সময় কপি এবং কড়াইসুঁটি সংযুক্তও পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনেই উৎকৃষ্ট পেয়ারা, সাস্ত্রা বা কমলালেবু, কুলের দিনে কুল, বেদানা, ডালিম, নেসপাতি, আপেল, আঙ্গুর, কলা ইত্যাদি পাওয়া যায়। 'মুড়্‌ফালি' বা চীনাবাদামও প্রচুর। নানা প্রকার মিঠাই, রাবড়ী

গরম দুধ, চা ইত্যাদি তো আছেই ই—আই—আর এ ভ্রমণ করিতে খাইবার কষ্ট মোটেই নাই।

এলাহাবাদে প্রবেশ করিতে যমুনার পুল পার হইতে হইল। পূর্ব্ব দিকে চাহিয়া মাইলখানিক দূরে এলাহাবাদের ফোর্ট (দুর্গ) এবং আরও কিছু দূরে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম দেখা গেল। যমুনা এলাহাবাদে মোটেই শোচনীয়া নহেন; বরং তাঁহার স্বচ্ছ শীতল সুনীল বারিরাশি দেখিয়া চোখ যেন জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। বিক্রমপুরের ছেলে আমরা, অর্দ্ধ-জলচর। সেই তরল মরকতরাশি দেখিয়া ইচ্ছা হইতে লাগিল যে লাফাইয়া পড়িয়া একবার প্রাণ ভরিয়া সাঁতার কাটিয়া স্নান করিয়া লই। প্রত্যাবর্ত্তন-পথে এই ইচ্ছা মিটাইবার সুযোগ যথেষ্টই পাইয়াছিলাম। পূর্ব্ববঙ্গে সার্থকনাম্নী শীতল লক্ষ্যার জলে এইরকম মরকত-স্বচ্ছতা দেখিয়াছি।

এলাহাবাদ ষ্টেশনের জনতায় লক্ষ্য করিতে লাগিলাম ভদ্রঘরের মেয়েদের গায়ের চমৎকার রং। দুধে-আলতা রং পূর্ব্ববঙ্গে তো দুর্লভই, কলিকাতা অঞ্চলেও প্রচুর নহে। কিন্তু এ দেশে আধাআধি মেয়ের গায়ের রং অমনি উজ্জ্বল ও সুন্দর বলিয়া মনে হইল। শারীরিক গঠনেও বাঙ্গালী মেয়েদের সহিত ইহাদের প্রভেদ আছে।

এলাহাবাদ হইতে গাড়ী আবার উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। ফতেপুর, কানপুর, এটাওয়া, শিকোহাবাদ একে একে পার হইয়া টুণ্ডলা আসিল। এক একবারে ৬০।৭০ মাইল দৌড়িয়া গাড়ী আসিতেছিল। আগ্রা যাইতে টুণ্ডলায় গাড়ী বদলাইতে হয়,—আগ্রা টুণ্ডলা হইতে ১০।১১ মাইল মাত্র দূর। সন্ধ্যায় গাড়ী হাটরাসে পৌঁছিল। ইঞ্জিনিয়র যুবক মাতা ও পত্নীকে লইয়া হাট্‌রাসে নামিয়া গেলেন। আমি মাতৃদেবীকে পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইঁহারা নামিয়া গেলেন পরে শূন্য কক্ষে যে কয়েক ঘণ্টা আমার কেমন করিয়া কাটিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কাহাকেও বুঝাইতে পারিব না। ইঁহাদের সহিত আমার মাত্র ২০ ঘণ্টার পরিচয় ও সাহচর্য্য। হয় ত বাকী জীবনে আর কোন দিন দেখাও হইবে না। তবু সেই নায়মান সন্ধ্যার আঁধারে মাতৃদেবীকে প্রণাম করিয়া যখন গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম, তখন বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে মাকে হারাইয়াছি সেই মায়ের কথা উছলিয়া উছলিয়া যেন বুকের মধ্যে আলোড়ন উপস্থিত করিতে লাগিল। অবাক্ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, এই অশ্রুপ্রবণতা কি বাঙ্গালীর জাতিগত দুর্ব্বলতা, না আমারই ব্যক্তিগত হৃদয়-দৌর্ব্বল্য? কাহারও সঙ্গে যে কাহারও কোনই সম্পর্ক নাই, সংসারযাত্রায় মানুষ যে ভয়ঙ্কর একা—এই তত্ত্ব সহস্র সহস্র লোক সহস্র সহস্র বার উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এ কি অদ্ভুত রহস্য মানব হৃদয়ের? দিনেকের পরিচয়ে অপরিচিতকে সে ভাই বলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিতে চাহে,—মা বলিয়া ডাকিয়া গর্ভজাত সন্তানেরই অপরিচিতার উপর স্নেহের জুলুম আরম্ভ করিয়া দেয়!

আলিগড়, গাজিয়াবাদ পার হইয়া রাত্রি প্রায় ৯টায় গাড়ী যাইয়া দিল্লী পৌঁছিল। খোঁজ লইয়া জানিলাম বোম্বেগামী এক্সপ্রেস্ গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—উহাতেই বরোদা যাইতে হইবে। এইবার তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতে হইবে, কারণ এই গাড়ীতে মধ্যশ্রেণী নাই। গাড়ী বদলাইয়া বোম্বাইগামী গাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণীর একখানি বেঞ্চ দখল করিয়া, বিছানা করিয়া, ঐ বিছানা ও মালপত্রের পাহারায় এক কুলিকে বসাইয়া, কিছু ভোজ্যের সন্ধানে চলিলাম। তৃপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া কুলিকে বকশীস্ দিয়া বিদায় করিলাম এবং বিছানা দখল করিয়া বসিলাম। অল্পক্ষণ পরেই বন্দুক-হস্ত এক রাজপুত যুবক আসিয়া আমার বিপরীত বেঞ্চে আশ্রয় লইলেন। জিজ্ঞাসায় জানিলাম তিনি কোটা যাইবেন। ইংরেজী জানেন, কাজেই জোরে আলাপ চলিতে লাগিল। যুবক এক ঝুড়ি প্রকাণ্ড আকারের সান্ত্রা বা কমলালেবু লইয়া চলিয়াছিলেন।

বলিলেন—"খাবে বাবু?"

আমি বলিলাম—"আমাদের ছিলেটের কমলা লেবু খাইয়া অভ্যাস, তোমাদের দেশের এই টক সান্ত্রা আমরা খাইতে পারি না।"

উত্তরে যুবক দুইটি সান্ত্রা হাতে গুঁজিয়া দিলেন। বলিলেন—"খাইয়া দেখ,—বেশী টক নহে।"

রাস্তায় সান্ত্রার অভিজ্ঞতা হইতে মনে বড় ভরসাও পাইলাম না। তবু ভদ্রলোকের অনুরোধ রক্ষা করিতে

সাত্মা ভোজনে রত হইতে হইল। এগুলি প্রকৃতই রাস্তারগুলির মত টক ছিল না, তবে ছিলেটের লেবুর তুলনায় রসহীন ও পান্স। আকারে কিন্তু এগুলি সিলেটের বৃহত্তম লেবুর দ্বিগুণ।

রাত্রির মত শয়ন করিলাম। এ পর্য্যন্ত শীত কিন্তু দেশের শীতের মতই; বন্ধুরা যে রকম ভয় দেখাইয়াছিলেন, তেমন কিছুই নয়। দিল্লীর পরে নয়া দিল্লী। তাহার পরেই একদৌড়ে গাড়ী ৯০ মাইল ছুটিয়া মথুরায় আসিয়া থামিল। অর্দ্ধঘুমে জাগরণে শুনিতে লাগিলাম —ফেরিওয়ালা ডাকিতেছে—"মথুরাজীকা প্যাড়ে"। কোটায় যাইয়া ভোর হইল, রাজপুত যুবক করমর্দ্দন করিয়া সুপ্রভাত জানাইয়া নামিয়া গেলেন।

এই রেলওয়ে লাইনটির নাম বোম্বে-বরোদা এবং সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে,—সংক্ষেপে বি-বি-সি-আই। হাওড়া হইতে সমগ্র ভারত রেলওয়ে গাইড কিনিয়াছিলাম। এই গাইডের মানচিত্র হইতে দেখিলাম, কোটার ১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বুঁদি,—

"জলস্পর্শ করব না আর"
চিতোর রাজার পণ,—
"বুঁদির কেল্লা মাটির পরে
থাকবে যতক্ষণ।"

সেই বুঁদি।—

চিতোরগড় কোটা হইতে সোজা পশ্চিমে বাট মাইল। উদয়পুর আবার চিতোরগড় হইতে সোজা পশ্চিমে পয়তাল্লিশ মাইল। খোদ রাজপুতানার মধ্য দিয়া চলিয়াছি বুঝিয়া বীররসে হৃদয় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। অনভ্যস্ত রসের আবির্ভাবে ক্ষুধা বোধ হইতে লাগিল বিষম রকমের, কিন্তু রাজপুতানার ষ্টেশনগুলিতে খাদ্যের চেহারা দেখিয়া কিছুই খাইতে প্রবৃত্তি হইল না। অবশেষে বেলা প্রায় দেড়টার সময় নাগ্দা ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে খাদ্য অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছি, এমন সময় একেবারে খোদ বাঙ্গালাভাষায় পিছন হইতে ডাক শুনিলাম— "আরে, নলিনীবাবু যে! এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?"

রাজপুতানার মরুভূমিতে বাঙ্গালাভাষায় আহ্বান শুনিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা ক্ষণেকের তরে ভুলিয়া গেলাম। দেখিলাম ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী এক দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষে দুঃখাসীন হইয়া এই বাঙ্গালভাষা-সুধা বর্ষণ করিয়াছেন। কক্ষখানিতে উহার আয়তনের অতিরিক্ত আরোহী বোঝাই,—আমাকে দেখিয়া সুরেন্দ্র বাবু তড়াক্ করিয়া প্লাটফর্ম্মে নামিয়া পড়িলেন এবং রাস্তায় খাদ্যাভাবে কি রকম কষ্ট পাইয়াছেন, তাহারই করুণ কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। তিনিও বরোদা যাত্রী। উভয়ে মিলিয়া কিঞ্চিৎ 'পুরী-গরম্' এবং বীজবহুল বেগুনের তরকারী সংগ্রহ করিয়া যে যাহার কক্ষে উঠিয়া পড়িলাম। দিল্লীতে যে সম্পূর্ণ বেঞ্চখানায় দখল লইয়াছিলাম, তথা হইতে কেহই আমাকে বেদখল করে নাই। কাজেই সিন্‌ক্লেয়ার লুইর বেবিট পাঠ করিতে করিতে সারা রাস্তা আরামেই চলিয়াছিলাম। ভূপাল হইতে যে গাড়ীখানা আসে, এই সময়ে তাহা আসিয়া ষ্টেশনে থামিল। দুইজন ভদ্রলোক আমার কক্ষে উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি ভাষার অধ্যাপক। তাঁহার নিকট সংবাদ পাইলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ, যথা,—ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন,— এই গাড়ীতেই চলিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া অমনি ছুটিলাম তাঁহাদের কক্ষে,—দেখিলাম চারিজনে মিলিয়া দিব্যি তাসের আড্ডা গড়িয়া তুলিয়াছেন। কিঞ্চিৎ আলাপ করিয়া নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম—গাড়ী আবার দৌড়িল।

কোটা হইতেই লক্ষ্য করিতেছিলাম, ভূমি প্রস্তরবহুল। যেখানে সেখানে মাটির নীচ হইতে প্রস্তরপিণ্ড মাথা উচাইয়াছে। এখন রেল লাইনের দুধারেই পাহাড় দেখা যাইতে লাগিল। অধিকাংশ স্থানেই উষর মৃত্তিকা, চাষবাসের চিহ্নমাত্র নাই। দূরে দূরে দলে দলে মহিষ চরিতেছে। পাহাড়গুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁধের মত, মাটি হইতে কতক দূর পর্য্যন্ত উঠিয়া ঐ উচ্চতা বজায় রাখিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে। এই শিখর বিরহিত পুরুষ জাতীয় নিতান্ত একঘেয়ে একাহারা চেহারার গদ্য পাহাড় দেখিতে দেখিতে বিরক্তি ধরিয়া গেল। নদীগুলির চেহারা আরও শোচনীয়। সারা বুক ভরিয়া জীর্ণ

পঞ্জরের মত পাথর জাগিয়া আছে। মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া অতি ক্ষীণপ্রাণ স্রোত বহিয়া জানাইতেছে যে উহারা বাঁচিয়াই আছে, মরে নাই। ষ্টেশনে ষ্টেশনে যে সকল পুরুষ উঠা-নামা করিল তাহাদের কাহাকেও বড় প্রতাপসিংহ দুর্গাদাসের জাতি বলিয়া মনে হইল না। তবে সুদীর্ঘ কাপড়ের পাগড়ী একটা সকলের মাথায়ই আছে বটে। এলাহাবাদ অঞ্চলের নারীগণের গঠন-পারিপাট্য এবং গোলাপী রং দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। রাজপুতানায় রমণীগণের মধ্যে পর্দ্দার বড় কড়াকড়ি দেখিলাম,—বস্ত্রাবৃত সচল মূর্ত্তিগুলির মধ্যে প্রশংসার যোগ্য বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিলাম না। তবে ভদ্রঘরের মহিলাগণের গায়ের রং বেশীর ভাগই গৌর। ইহা ছাড়া পাহাড়, নদী, পুরুষ, নারী, সকলেরই রচনা যেন একই ছন্দে!

এই সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব চিন্তা করিতেছি এবং শুষ্কতার প্রতিষেধক স্বরূপ মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা দেশের চিরপ্রচুর-তোয়া নদী খালের দুই ধারের গ্রামগুলির শ্যামল শোভা ধ্যান করিয়া মধ্যে মধ্যে মনে স্নিগ্ধতার প্রলেপ দিতেছি, এমন সময় সহসা ষ্টেশন হইতে দূরে একটা রাস্তা পার হইয়াই গাড়ী থামিয়া গেল। খোঁজ করিয়া জানা গেল, ঐ রাস্তার লেভেল ক্রসিংএর পাহারাদার কাটা পড়িয়াছে। গাড়ীশুদ্ধ লোক দৌড়িল ঐ বীভৎস দৃশ্য দেখিতে। আমাদের প্রকোষ্ঠে কয়েকটি নারী ছিল—তাহারা পর্য্যন্ত রেলের কাটা মানুষ কি রকম দেখা যায় তাহা দেখিবার জন্য দৌড়িল! আমি নির্ব্বিকার চিত্তে বিছানায় শুইয়া শুইয়া সিন্‌ক্লেয়ার লুইর বেবিট্ পড়িতে লাগিলাম। এই রকমের বীভৎস মৃতদেহ দেখায় ফল কি তাহা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। অনভ্যাসের ফলেই হউক অথবা বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও তীব্রতার জন্যই হউক,—এই অপ্রীতিকর দৃশ্যগুলি মস্তিষ্কে স্থায়ী ভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়, এবং আমরণ স্মৃতিতে উজ্জ্বল থাকে। আমি বাল্যকালে পাড়ায় এক ফাঁসীর মড়া গাছে ঝুলা অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। আজিও সেই বীভৎস দৃশ্য স্পষ্ট মনে করিতে পারি। সুন্দর, স্নিগ্ধ, সুললিত দৃশ্য যেমন মস্তিষ্কে স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায়, এবং অনুকূল কারণে মানস-নয়নে ভাসিয়া উঠিয়া আনন্দের কারণ হয়,—কুশ্রী, বীভৎস, ন্যক্কারজনক দৃশ্যগুলিও তেমনি প্রবলভাবে মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া বর্ত্তমান থাকিয়া নিরানন্দের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বেসুরা গান শুনার ফল সঙ্গীত সাধনার পক্ষে কি রকম মারাত্মক তাহা সঙ্গীতবিৎ মাত্রেই অবগত আছেন।

ইট পাথর লইয়া যাহাঁদের কারবার, তাঁহারা উপন্যাস পড়েন কি না জানি না। আমার কিন্তু এ দুর্ব্বলতা যথেষ্ট পরিমাণে আছে,—মাসিক পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ্য-গুলিও বড় বাদ দিই না। রেল ষ্টীমারে ভ্রমণের সঙ্গী স্বরূপ প্রায়ই দুই একখানা ভাল উপন্যাস সঙ্গে লইয়া থাকি। এবারে লইয়াছিলাম বেবিট ও ফরসাইট সাগার এক অংশ;—ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে উপন্যাসের পাঠক হিসাবে আপ-টু-ডেটত্ব (আধুনিকত্ব) রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সিন্‌ক্লেয়ার লুই নোবেল-প্রাইজওয়ালা, গলস্‌ওয়ার্দ্দিও সম্ভবতঃ তাহাই। সিনক্লেয়ারের ফ্রি এয়ার, মেইন ষ্ট্রীট এবং বেবিট এই তিনখানা বই পড়িলাম। মতামত লিপিবদ্ধ করিতে বড়ই সঙ্কোচ বোধ হইতেছে; কারণ, আমার মতামতে লুইর নোবেল প্রাইজটা আর উড়িয়া যাইবে না। কিন্তু এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে চাই বেবিট বা মেইনষ্ট্রীট, এই দুইখানা প্রকাণ্ড বইএর একখানাও আমি ফিরিয়া পড়িবার পরিশ্রম স্বীকার করিতে রাজি নই,—ফিরিয়া পড়িবার জন্য মনে বিন্দুমাত্র আগ্রহও নাই। অথচ শতবার-পঠিত দেবী চৌধুরাণী বা শ্রীকান্ত যে-কোন পৃষ্ঠা হইতে আবার শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া ফেলিতে বিন্দুমাত্রও কষ্ট হয় না। বেবিটে এবং মেইন ষ্ট্রীটে কি প্রশংসার যোগ্য জিনিস নাই? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমার সন্দেহ হইতেছে, অনর্থক বাজে কথা লিখিয়া, বাজে জিনিসের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়া পুঁথি বাড়াইবার প্রলোভন হইতে লুই মুক্ত নহেন। ছোট মুখে বড় কথার মত শুনাইবে,—কিন্তু আমার মত নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তিও এই পুঁথি দুইখানি ছাঁটিয়া কাটিয়া, চারিদিকের অনাবশ্যক আবর্জ্জনারাশি হইতে মুক্ত করিয়া, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে টিকিয়া থাকিবার মত যে সার পদার্থ-টুকু আছে তাহা বাহির করিয়া দিয়া একটি সুসংবদ্ধ সৌন্দর্য্যসার ক্ষুদ্রতর আয়তনের

উপন্যাস গড়িয়া দিতে পারে। লুইর বইগুলি পাড়য়া কেবলি মনে হইতে থাকে,—খাঁটি জিনিসের সঙ্গে লেখক বেজায় ভেজাল চালাইয়াছেন—সুন্দরের সহিত বিস্তর অসুন্দর, অনাবশ্যক, সৌন্দর্য্যবর্জ্জিত অতি সাধারণ জিনিস চালাইয়া দিয়াছেন। ফরাসী লেখক হিউগোও এই দোষ হইতে মুক্ত নহেন। তাঁহার লা মিজারেবল্, নটারডেইম ইত্যাদি বিখ্যাত গ্রন্থেও বহু বিরক্তিজনক অবান্তরের অবতারণা আছে। কিন্তু কাব্যের উৎকর্ষে এই সমস্ত প্রায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। লুইর কাব্যের উৎকর্ষ অবান্তরে চাপা পড়িয়াছে। লুইর বইগুলি যেন নিতান্ত প্রকাশ্য সদর রাস্তার ফটোগ্রাফ, চিত্রের সৌন্দর্য্য কদাচিৎই তাহাতে আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছে।

তবে লুইর সাহসের প্রশংসা করিতে হয়। বেবিট বাড়ী বিক্রয়ের দালাল, বয়স পঁয়তাল্লিশ, নিতান্ত গদ্যময় জীবন। এমন লোককে নায়ক করিয়া,—এমন নিতান্ত সাধারণ লোকের নিতান্ত আটপৌরে জীবনযাত্রার বহুবিধ চিত্র দেখাইয়া যে একখানা উপন্যাস খাড়া করিতে পারিয়াছেন এবং তাহাও লোকে পয়সা দিয়া কিনিয়া পড়িতেছে, ইহাতে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় বই কি? শ্যামবাজার হইতে কালীঘাট ভ্রমণের চিত্রও যাহার হাতে অপাঠ্য হইয়া দাঁড়ায় না, তাঁহার ক্ষমতা আছে স্বীকার করিতেই হইবে। লুইর ফ্রি এয়ার বইখানা মনে মধুময় ছাপ রাখিয়া গিয়াছে,—উহা, ফিরিয়া ফিরিয়া পড়া কঠিন হইবে না।

সাহিত্য রস পানে বহুক্ষণই কাটিয়া গেল—বোধ হয় দেড় ঘণ্টা থামিয়া থাকিয়া গাড়ী আবার চলিল এবং রাত্রি প্রায় ৯॥০টায় বরোদা যাইয়া দাঁড়াইল। ষ্টেশনে ভলান্টিয়ারগণ ছিল—এবং কোন্ প্রতিনিধির কোন্ ক্যাম্পএ স্থান হইয়াছে, তালিকা পড়িয়া তাহাই বলিয়া দিতেছিল। দেখিলাম বিনয়তোষ আমাকে নিজের বাড়ীতে স্থান দিয়াছে। একখানা টাঙ্গা করিয়া বিনয়ের বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বিনয় তখন পর্য্যন্ত সম্মিলনের কাজেই চরকীর মত ঘুরিতেছে। বিনয়ের ভাগিনেয় শ্রীমান নীলকণ্ঠ প্রসন্ন বদনে অভ্যর্থনা করিল। নীলকণ্ঠকে বলিলাম—"নিজের নামের অর্থটা জানা আছে তো হে?" নীলকণ্ঠ হাসিয়া বলিল—"কেন, বলুন তো?" আমি বলিলাম,—"আমার জন্য এই কয়দিনে অনেক বিষ তোমাকে প্রত্যহ হজম করিয়া তোমার নামের সার্থকতার প্রমাণ দিতে হইবে।"

কতক্ষণ পরে, দরবার-পাগড়ী মস্তকে, পামসু পায়ে, চাপকান গায়ে শ্রীমান বিনয়তোষ ঝড়ের মত আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন,—আর সেই সুপরিচিত প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া অভ্যাগতকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

আই-হ্যাজ (I has)

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩৭)

দশাশ্বমেধে গঙ্গাস্নান করে, বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শনান্তে ফিরে এসে, মা কালীকে মনের কথা জানিয়ে মাথা তুলতেই দেখি—শিবুদা ব্যস্ত হয়ে চলেছেন—দু'হাতই জোড়া,—কাপড়েও কি সব···

ডাকতেই বিরক্ত ভাবে পেছন ফিরে চাইলেন। পরেই প্রসন্ন মুখে—"এখানে রয়েছিস আর দেখাটাও করিসনা?"

বললুম—"এখানে রয়েছি কে বললে?"

বললেন—"হবে যে আজো বেঁচে?—কি ভয়ঙ্কর জায়গা রে ভাই,—মরণ ঘ্যাঁশেনা!—

বললুম,—"সব চুল যে পাকিয়ে ফেলেছেন দেখছি—"

বললেন—"চুল পেকে আর কোলো কি, বাজার করাটাও তো বন্ধ হ'লনা।—ভুরু না পাকলে কি মেবেনা? কাশীখণ্ডে তো ও-সম্বন্ধে কিছু খুঁজে পাইনা! ৩৭ বছর কাশীবাসই করছি দেশে ফেরবার দফাও রফা—দয়াময়েরা,—বুঝতে পারলিনি? জ্ঞাতিরা রে,—

ভিটেটুকুও ভাগাভাগি করে নিয়েছেন—তা নিন।—তার পর তাঁরা নিজেরা সব সাবাড়ও হয়ে গেছেন,—তা যান। —এখন দেশে গেলে আর চিনবে কে? কি বিপদ বল্ দিকি!"

বললুম—"তা বটে,—কি করবেন, হাত তো নেই—"

বললেন—"থাকবেনা কেনো,—এই তো বাজার করার তরে তো বেশ রয়েছে—"

কথা না বাড়িয়ে বললুম—"এতো বেলায়, এসব কি?"

দু'হাত জোড়া,—কপালে ডান হাতের উলটো পিঠটা ঠেকিয়ে বললেন—

—"ভাই, কে জানে কে দু'জন আমার সাতপুরুষের আত্মীয় এসে হাজির হয়েছেন। নিজের খাবার তাঁদের বেড়ে দিয়ে, মুড়ি কিনতে এসেছি। এখন আবার রাঁধে কে? বিকেলে একজন চায়ের সঙ্গে সেনাটোজেন খান, —তাই এই দুধ।—আমার তো কাপ্ নেই—ভাঁড়েই বানাবেন, তাই ভাঁড়টা নিলুম। সেনাটোজেন-ভোজীর এ অনাটনের আস্তানায় কষ্ট পেতেই আসা—"

দু'তিন সেকেণ্ড নীরব থেকে বললেন—"ভুলের সাজা রে ভাই—ভুলের সাজা! কাশীবাস করেও ভুল করেছি। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন) সারা জীবনটাই 'I has' হয়ে গেল! কা'কেও সুখী করতে পারলুম না—"

আমি সোৎসাহে বলে উঠলুম—"বড় কথা মনে করে দিয়েছেন দাদা। ইচ্ছে করে I has বলেন কেনো, ওর গূঢ় অর্থ-টা কি?"

তিনি আশ্চর্য্য হয়ে আমার দিকে বিস্ময়-নেত্রে চেয়ে বললেন—"ওটা সত্যিই আজো তোর আক্কেলে আসেনি নাকি? বলিস্ কি! এতো ঘুরলি, এতো দেখলি, এতো দিন রইলি, তবু অ্যাঃ!"

আমি অপ্রতিভ ভাবেই স্বীকার করলুম—সত্যিই বুঝিনি দাদা,—বরং শুনলে খট্ করে কানে বেসুরো লাগে।

—"লাগ্‌বে, লাগ্‌বে, তোরা গ্রামার-দুরস্ত ছেলে,—লাগবে বইকি! আর বিশ্বটা যে সজ্ঞানে ভুলের ওপর দে বুক ফুলিয়ে চলেছে···সেটা লাগেনা! কি অমৃতই গিলেচিস্! আমাদের I বলে কিছু নেই রে—সব 'it', —third person Singular! এতদিন তবে দেখলি কি? Iটা আমাদের ঝুটো অভিনয়ের মুখোস!—অর্জুন ক্লীব হয়ে বিরাটের রাজ্যে বেশ নিরাপদে ছিলেন, তাঁর Iটি রেখে এসেছিলেন শমীবৃক্ষের চুড়োয়। আমাদের আছে খুরোয়—যাক—ভাবিস্‌নি—শনৈঃ পন্থা। It এখন বিশেষণে উঠেছে—গুণবাচক দাঁড়িয়েছে—খবর রাখিস? বড় বড় নাম্না অভিনেত্রীরা নাকি It girl—তোদের গ্রামারকে নমস্কার।"

—"দেখে শুনে তাই অসবর্ণ-ই মঞ্জুর করেছি। কেনো জানিস্? তোদের একবার যেন বলেছি বোধ হয়। একজন up to date হালী বাবুর বাড়ী যেতে হবে, কিন্তু জুতো জোড়াটা কিনে পর্য্যন্ত ব্রস্কো দেখেনি। কাজেই পা আর এগোয়না!—হাসিসনি—Cultural Sway—কৃষ্টির কৃপা—কোবরায় ফেটেছে! যাক্—কাশী এসে বিশ্বনাথে নাম পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছিলুম,—সে দিন তাঁকে ডাকতেই হ'ল—ব্রস্কোর ব্যবস্থা করে দাও বাবা।—

—"এক তেমাথায় ফুটপাথে দেখি, এক চামার তোড় জোড় নিয়ে বসে'—"পার করো মেরি নেইয়া" বলে গান ধরেছে। তাকে বললুম—"বাবা আমাকে তো আগে পার করো—ভদ্রসমাজে যেতে পারছিনা···"

"দিজিয়ে বাবুজি" বলে, পা থেকে এক পাটি খুলে নিয়ে ঝাড়তে বোসলো। তখন বিশ্বনাথে প্রগাঢ় বিশ্বাস এলো,—ডাক্ শোনেন বটে! সেই সময় এক কুদৃশ্য এক্কা এসে উপস্থিত, তার হতভাগা গাড়োয়ানটা কতকগুলো ছেঁড়া-খোঁড়া চামড়া এনে সকাতরে বললে,—"দু'টো ফোঁড় লাগিয়ে দে ভাই, সওয়ারী বসে,—বিশ্বনাথের কৃপায় মিলেছে ভাই—নেবে গেলে ছেলেপুলেরা খেতে পাবেনা—এই তিনটি পয়সা আছে।"

মুচি আমার জুতো হাত থেকে নাবিয়ে রেখে আমাকে বললে—"বাবু পাঁচ মিনিট্ মেহেরবানি কি-জিয়ে, আপকো তো সওক্ (সখ্),—ইস্‌কা বড়া জরুরৎ,—লেড়কা-বালা ভুখা হায়" বলে তাড়াতাড়ি তার কাজ আরম্ভ করে দিলে।

সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল, ব্যাটা ছোটলোকের আক্কেল ভ্যাখো! ও পরে এলো, আবার ওর কাজই জরুরি হল। ছেড়ে যেতেও পারিনা—গুম্ হ'য়ে রইলুম। ও-বেটা যেন চামার,—বিশ্বনাথের ব্যবহারটা কি? এতে আর ঠাকুর দেবতা মানতে ইচ্ছে হয়?—

—"এক্কাওলার কাজ হয়ে গেল, সে তিনটি পয়সা

বার করতেই মুচি বেটা বললে—"ও রাক্কো ভেইয়া, লেড়কা বালাকো খিলাও যাকে, হামকো রামজি দেই দেগা।" তার কাতর মুখে চামার বোধ হয় তার হৃদয়ের সত্য ছবিটা দেখতে পেয়েছিল,—গরিব গরিবকে চেনে। —আমার কাছে হাত জোড় করে মাপ চেয়ে বললে—"ওর সওয়ারিটি ছিলেন 'বাবু'—তাঁর অপেক্ষা সইতোনা, অনায়াসে নেবে যেতেন, বেচারার অবস্থা ভাবতেননা,—তাই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি।"

যাক্—তার পর আমার জুতো ঝক্ ঝক্ করে উঠলো বটে—মনটা কিন্তু ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে গেল। চামারের গ্রামারই প্রাণটা দখল করে রইলো। সে কেবলই বলতে লাগলো—"কপালে লম্বা লম্বা I (আই) টেনে আর লজ্জা বাড়িওনা, টানতে হয় তো বরং এদের ভাই বলে' কোলে টেনে নাও, এরাই সত্যিকারের ভারতবর্ষ।"—শিবুদা নীরব হলেন—

বললুম—"স্বীকার করি সব দিকেই ভুলের আস্ফালন, সেইটাই সর্ব্বত্র সহজ সত্য হয়ে নৃত্য করছে,—জগৎময়! সত্যের শবের ওপর নব নব মিথ্যার সাধনাও চলছে—তবু I has বলতে...যেন—"

বললেন,—"ঠিক বলেছ ভায়া, শিক্ষিত যে—লজ্জা করে—না? ওইটাই তো বুঝতে পারলুমনা। কিন্তু আর সব তো বেশ জেনে শুনে, ভেবে চিন্তে দিব্যি চলছে!—I hasও চলে রে—। শোন্—

—"হরগোবিন্দ বাবু বিচক্ষণ Sub-Judge (সব-জজ্) ছিলেন—রায় বাহাদুর। ছেলে ননীগোপাল Englishএ (ইংরিজিতে) এম-এ—Class First—

—"ছোট লাটসাহেব আসায়, ছেলেকে সঙ্গে করে interviewএ (দেখা করতে) গেলেন। প্রথমে নিজে ঢুকে ভূমি স্পর্শ করে সেলামান্তে জানালেন—আপনাদের কৃপায় ছেলে এবার এম-এ পরীক্ষায় ইংরিজিতে 1st class 1st হয়েছে। সে সঙ্গে এসেছে,—হুজুরের কাছে Deputy mountainship এর জন্যে ভিক্ষাপ্রার্থী। (অর্থাৎ ডেপুটি-গিরির জন্যে)। লাটসাহেব ছেলেকে দেখতে চাইলেন। —সে দোর-গোড়াতেই ছিল। বাপের কথা তার কাণে যাচ্ছিল, আর ভ্রূ নাক মুখ বিষম কোঁচ্‌কাচ্ছিল।

হরগোবিন্দ বাবু তাকে ডেকে এনে বললেন—It is I son sir—

লাটসাহেব বললেন—It is you son Haragobind—very very glad—I shall see—he gets Deputy mountainship—

হরগোবিন্দ সেলাম করে বললেন—"Your 'see' and our 'done' same thing my Lord—(আপনাদের 'দেখবেন বলা' আর আমাদের 'কাজ হওয়া' একই কথা) ইত্যাদি।

ছেলে লজ্জায় মাথা হেঁট করে লাল মারছিল আর ঘামছিল। বেরিয়ে এসে বাঁচলো। তার রুষ্ট বিরক্ত মুখ দেখে বাপ বললেন—

—"যদি হয় তো ওই I son এই হবে। তুই তোর ছেলের বেলায় my son বলিস। তাতে চাপরাসিগিরিও জুটবে না।"

—"মাথায় ঢুকলো?—'I has'ই কাজ দেয়।—পাসের পরীক্ষা-পত্রে ছাড়া।"

আমি পায়ের ধূলো নিলুম।

শিবুদার হুঁস হল,—"যাঃ আমার দুধটো এতক্ষণ বেড়ালে মেরে দিলে!" ছুটলেন।

আমি নির্ব্বাক নিস্পন্দ শিবুদার দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি মানুষের মধ্যে মিশিয়ে কখন্ যে মহামানুষ হয়ে গেছেন, সে হুঁস নেই। আমার দৃষ্টি তাঁর গমন-পথেই আবদ্ধ, আমার চোখে শিবুদাই বর্ত্তমান—তাঁর সেই graduates gown পরে সহাস মুখে গ্রামে প্রথম ঢোকা থেকে আজকের গামছা কাঁধে আটহাতি পরা শিবুদা, এক এক করে প্যানোরামা পিক্‌চারের মত দেখা দিচ্ছিলো,—পুরাতনের মধ্যে কেবল হাসির সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটেনি। গাউন্-গর্ব্বিত সেই শিবুদা—এখন গ্রামার ভুলে—চামারের গ্রামারই স্বীকার করেছেন।

একজন এক্কাওলা, খইনি খাচ্ছিলো, দোড়াটা মুখ হেঁট করে—কাশীর মাটি সোনা কিনা তাই বোধহয় দেখছিলো।—অভাবের উপভোগ্য বিলাস!

লোকটাকে বললুম,—যাবি?

"আইয়ে বাবুজি—কাঁহা?"

বললুম—"কাঁহা আবার জিজ্ঞেস্ করতা হায়? সোজা শঙ্কট মোচনূরে বাবা!"

সে একগাল হাসি গিলতে গিলতে হাঁকিয়ে দিলে, এবং জোরসে গান হেঁকেও দিলে?—তুঁহি দীন কাণ্ডারী হামারি—

সমাপ্ত

শিবপুরীর যাত্রী

শ্রীচুণীলাল মুখোপাধ্যায় বি-এল

শারদীয়া শুক্লা চতুর্থীর কৌমুদী-স্নাতা তাজ দেখে শাজাহাঁর বাদশার প্রেমের প্রভায় দুঃস্থ মনটাকে ভরিয়ে নিয়ে—কোজাগর পূর্ণিমার দিন বেলা নয়টার সময় গোয়ালিয়রে ফিরে এলাম। নিজের ঘরটিতে বসে পশ্চিম দিকে চাইতেই আবার সেই গোয়ালিয়র দুর্গটা চোখে পড়ল; সে তার নিষ্ঠুর স্মৃতির বোঝা মাথায় নিয়ে যুগের কালিমা আকাশ-পটে লেপে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অমনি অন্তরের সেই মহাপ্রেমিকের মহান্ ছবিটাকে নিমেষে খান্ খান্ ক'রে দিয়ে ভেতর থেকে ক্ষুব্ধ স্বর গর্জ্জে উঠলো, এ কি তোমার লীলা দয়াময়! পিতার বক্ষের এ অফুরন্ত প্রেম-নির্ঝরের মধ্যে এ পীযূষের ধারা বহাইয়া তোমার সৃষ্টি-তত্ত্বের কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'লো? সমুদ্র-মন্থনের যদি আবার আবশ্যক হয়েছিল, তবে গরল পান ক'রে সৃষ্টি রক্ষা কর্‌বার উপায় কেন কর্লে না মঙ্গলময়?

যাক্, আর আত্মহারা হবোনা।—এই রকম যখন মনের অবস্থা, তখন আমার ভাগ্নে শ্রীমান রমাপতি—গোয়ালিয়র জীয়াজিরাও কটন মিলের ম্যানেজার—এসে বল্লে "মামা! বৈকাল পাঁচটার সময় 'শিপ্‌রী' (শিবপুরী) যেতে হবে, তৈরী থেকো।" আমি উৎসাহের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে বল্লুম "ব্যাপার?" সে বল্লে, "ব্যাপার আবার কি? কোল্‌কাতা থেকে প্রভুদয়াল এসেছে; চল সকলে ঘুরে আসা যাক্, একটা বেশ Excursion হবে। আর আজ সারদ পূর্ণিমা—আজ ত প্রকৃতি তার সৌন্দর্য্যের হাট বসাবে।" আমি হেসে বল্লুম "ম্যানেজার মশায়ের কবিত্ব জেগেছে দেখ্‌ছি যে। আচ্ছা আমি ত পা বাড়িয়েই আছি। তারপর এখন একটু প্রস্তাবনা কর তো শুনি।" শ্রীমান্ ত হেসেই আকুল "তোমার সব তাতেই হেঁয়ালী। প্রস্তাবনা আবার কি? এখান থেকে মটরে যাওয়া হবে—দূরত্ব ৭৫ মাইল। রাস্তা ভাল, যেতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগবে। আর আমাদের দল হবে—তুমি, আমি, শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, শ্রীযুক্ত রাধাকিষণ বিরলা, একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, মিষ্টার বেঞ্জামিন, আর শিখ সিপাহী ফের শিং ও একজন চাকর ও দুইজন মটর-চালক। থাকবো সেখানে গিয়ে গ্র্যাণ্ড হোটেলে"। আমি বল্লুম "তা যা হোক মন্দ হবে না। দলটি ত Cosmopolitan গোছেরই হয়েছে। সময়টা তা হলে কাটবে মন্দ নয়।"

(১) প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকা, (২) পরিব্রাজক, (৩) লেখক (শ্রীচুণীলাল মুখোপাধ্যায়), (৪) রমাপতি ব্যানার্জ্জি, (৫) মিঃ বিরলা

আমাদের দলের লোকগুলির কতকটা পরিচয় দিয়ে নিলে পাঠক-পাঠিকাদিগের সুবিধা হবে। আমার পরিচয় ফলে;—আমার ভাগ্নে শ্রীমান রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়—তিনি গোয়ালিয়রের সর্ব্বজনবিদিত মিষ্টার

ব্যানার্জ্জি, ভারত-বিখ্যাত Manufacturer Prince বিরালা ব্রাদার্সের জিয়াজীরাও কটনমিলের ম্যানেজার, আজ নয় বৎসর এখানে আছেন। শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা কলিকাতা উচ্চ-আদালতের Attorney ও কলিকাতা কর্পোরেশনের সুযোগ্য কাউন্সিলার ও শ্রীমান্ রমাপতির বাল্যবন্ধু। শ্রীযুক্ত রাধাকিষণ বিরলা উক্ত কটনমিলের Assistant Secretary; পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর আর পরিচয় কি—তিনি ভবঘুরে। মিঃ বেঞ্জামিন্—একজন জুইস ধর্ম্মাবলম্বী। গোয়ালিয়র মিলের weaving master। দুইজন মটর চালকের মধ্যে একজন—মতি, স্থানীয় লোক, সব জানে শোনে, আর সিপাহী ফের সিং যুদ্ধ-প্রত্যাগত, ভাল রাইফেল চালাতে জানে এবং সাউথ আফ্রিকায় একটা বাঘও মেরেছিল। আর একটা মোটরচালক ও চাকরের পরিচয় অনাবশ্যক। গাড়ী দুইখানির একখানি "বুইক", আর একখানি জগদ্বিখ্যাত "মাষ্টার Ford."

যাহা হউক দিনের বাকী সময়টা ত আগ্রহ উপেক্ষায় কাটিয়ে দেওয়া গেল। বেলা চারটা বাজতেই যাত্রার আয়োজনের ধুম প'ড়ে গেল। গাড়ী বাড়ীর গেটে আসিয়া "সিঙ্গা" ফুঁকিয়া তা'র আগমন-বার্ত্তা শুনিয়ে দিলে। শ্রীমান্ তাড়া দিয়ে বল্লে "কি কর্চ্ছ মামা! এখনও হ'লো না। তা'রা কতক্ষণ বেরিয়ে গেছে।" আমি বল্লুম 'কারা'!...."কেন, বুইক গাড়ীর যাত্রীরা—প্রভুদয়াল, রাজকিষণ, বাবাজী ইত্যাদি।"

আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি দু'-একটা অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র একটা সুটকেসে ভরে নিয়ে এবং নিজে সময়োপযোগী পরিচ্ছদাদি পরে দুর্গা নাম স্মরণ করে বেরিয়ে পড়্লুম। তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। আমাদের পশ্চাতে সূর্য্যদেব সমস্তদিনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর সেই নির্দ্দয় গোয়ালিয়র দুর্গাটার কাছে গিয়ে যেন তার নিষ্ঠুরতার কাহিনী মনে ক'রে তার উপরে অগ্নি বর্ষণ কর্চ্ছে।

আমাদের মটর ফোর্ড, চালক মতি—তার পাশে নির্ম্মম, নির্ভীক শিখ ফের সিং, হাতে জার্ম্মাণ রাইফেল। পেছনে বসিবার জায়গায় শ্রীমান্ আমি ও মিঃ বেঞ্জামিন। গাড়ী ছেড়ে দিল। গোয়ালিয়র ষ্টেশন পশ্চাতে রেখে আমাদের গাড়ী দক্ষিণ দিকে প্রবল বেগে ছুট্‌ল। ক্রমে সহরতলি পার হয়ে আমরা পর্ব্বতময় স্থানে এসে প'ড়লুম। এখানে পাহাড়গুলি কিছু দূরে দূরে। প্রায় দুদিকেই পাহাড় এবং কতক-কতক গাছে ঢাকা। আমাদের মটর ঘণ্টায় ২৫।৩০ মাইল বেগে চলেছে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়ে আমরা দুইটি রাস্তার সংযোগস্থলে এসে পৌছিলাম—একটী আগ্রা-বম্বে রোড ও অপরটী ঝাঁসি রোড। আমরা ঝাঁসি রোড বামে রেখে আগ্রা-বম্বে রোড ধরলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতশ্রেণী ঘনসন্নিবিষ্ট ও নিকটবর্ত্তী হতে লাগল। চতুর্দ্দিকে চেয়ে দেখলাম যে আমরা ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতমালার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়ছি। এ-সকল স্থানের দৃশ্য দেখে মনে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের ভাব জেগে উঠে। প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্য কত গভীর ও রহস্যভরা। মনে হয় জননী যেন সন্তানকে তার সৌন্দর্য্যসম্ভার সাজিয়ে নিয়ে ডাকৃছে—বল্‌ছে, আয় আয় তোরা আমার কাছে আয়—সেই মহাস্রষ্টার সৃষ্টি-তত্ত্বের গূঢ় রহস্য তোদের বলে দিই। কিন্তু মানুষ ত' তা যাবে না। সে যে তার নিজের সৃষ্টির রাজ্য নিয়েই ব্যস্ত। তারা যে চায় তারই মধ্যে দিয়ে সেই জগৎস্রষ্টার সৃষ্টির মাহাত্ম্যকে হীন করে দিতে। এই সংগ্রাম-লিপ্সাই তাদের আত্মহারা করে তুলেছে। তারা সয়তানের মতই আবার ভগবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে। ওরে পাগলেরা, তোদের যে ধ্বংস অনিবার্য্য—বজ্র, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, ঝঞ্ঝা, মহামারী ইত্যাদির একটারও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন কর্ত্তে পেরেছিস্ কি? তারপর তাঁকে আক্রমণের কথা? কেবল কতকগুলো খেলনার সৃষ্টি করে উদ্ভাবনী শক্তির বাহাদুরী নিলে ত' আর চলে না।

যাক্, কথায় কথায় অনেক অর্থহীন অবান্তর কথার অবতারণা করে ফেল্‌লুম। এখনি হয়ত বিরাট বিজ্ঞান-জগতের ধুরন্ধরগণ তাঁদের তাল বেতালকে নিয়ে যুদ্ধঘোষণা করে দেবেন। (আর আমার যত না হোক দুর্ভাগ্যগ্রস্থ প্রকাশকের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে।)

কোনও কোনও স্থানে রাস্তার দুধারে পাহাড়, আবার কোথাও একদিকে পাহাড় ও অপরদিকে সমতলক্ষেত্র

বা গভীর খাদ। এখানে রাস্তার প্রশস্ততা প্রায় ৪০' ফুট হবে,—রাস্তা পাকা এবং সুন্দর; রাস্তা প্রস্তুত করবার মধ্যে নির্ম্মাণকর্ত্তার বেশ বাহাদুরি আছে। এই পর্ব্বতময় প্রদেশের এই রাস্তাগুলি দেখলে মনে হয় যেন এগুলি প্রকৃতির রহস্যরাজ্যের মধ্যে ঢুকে তার সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্ব্বার প্রবেশদ্বার। আমরা যতই অগ্রসর হতে লাগলাম পর্ব্বতশ্রেণী ততই আমাদের নিকটবর্ত্তী হতে লাগল এবং কোথাও আমাদের রাস্তা পর্ব্বতবক্ষ বিদীর্ণ করে চলে যাচ্ছে ব'লে মনে হল। দূরে বৃহত্তর পর্ব্বতগুলি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। কোনটি ঘন বনাচ্ছাদিত। এইপ্রকার দৃশ্যাদি দেখ্তে দেখ্তে এবং পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্যদেবকে হারিয়ে ফেলে ক্রমে আমরা সন্ধ্যার রাজত্বে এসে পড়লুম। কিন্তু তাতে আমাদের দৃষ্টির আনন্দ উপভোগ কর্ব্বার অসুবিধা হবার সম্ভাবনা ছিল না—কারণ সেদিন পূর্ণিমা।

আমরা প্রায় ৩০ মাইল এসে গাড়ী দাঁড় করালাম। সে জায়গাটি একটি রেলওয়ে ষ্টেশন —নাম "মোহনা"। আর বলতে ভুলে গিয়েছি যে আমাদের দক্ষিণে গোয়ালিয়র ষ্টেট্ রেলওয়ে লাইন শিবপুরী পর্য্যন্ত গিয়াছে। এবং তাহারই এক একটি ষ্টেশনের নিকট এসে আমরা পল্লীর সন্ধান পাচ্ছিলাম। দূরে দূরে পাহাড়ের কোলে দুই একখানি গণ্ডগ্রাম দৃষ্ট হচ্ছিল। এখানে এসে আমরা গাড়ী থেকে নেমে একটু পায়চারী করে নিলাম এবং চাঁদিনীস্নাতা প্রকৃতির হাস্যময়ী শোভা প্রাণ ভ'রে পান করবার লোভে মটরের 'হুড' ফেলে দেওয়া হল। তারপর আবার গাড়ী ছাড়ল। ক্রমেই রাস্তা ভয়ানক হতে লাগল। পাহাড়, ঘন জঙ্গল, আর গভীর খাদের মধ্য দিয়ে রাস্তা। রাস্তা পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিসর এবং তাহা কোথাও কোথাও সম্পূর্ণ বেঁকেছে এবং স্থানে স্থানে তাহা শতাধিক পরিমাণ উর্দ্ধে গিয়া আবার ঐ পরিমাণ নিম্নগামী হয়েছে। ক্রমে ক্রমে পূর্ণিমার চন্দ্র তার স্নিগ্ধ-মধুর চন্দ্রমায় সমস্ত প্রকৃতিকে অপূর্ব্ব প্রভায় উদ্ভাসিত করে তুল্ল। সে যে প্রকৃতিদেবীর কি প্রাণমাতান হাস্যময়ী বেশ, তা উপলব্ধি করা সহজ, কিন্তু তদুপযুক্ত ভাষা দিয়ে সাজিয়ে তা অপরকে বোঝান শক্ত। বিরাট পর্ব্বতসকল চাঁদিমা-ধৌত হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে যেন আমাদের তাদের রূপ দেখতে আহ্বান করছে; আবার কোথাও সেই পর্ব্বতের ছায়া পড়ে সে আলোর সৌন্দর্য্য যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এইরকম আলো ও ছায়ার খেলা দেখ্তে দেখ্তে আমি মিঃ ঝোমিনের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে চলেছি। আমার বেশ মনে পড়ে তাঁকে আমি বলেছিলুম "দেখ ঝো সাহেব! প্রকৃতি-দেবী এমন রিক্ত হস্তে সৌন্দর্য্য বিলিয়ে জীবকে কি আর কোথাও ধন্য করে?" সাহেব আমার কথা শুনে বলেছিল "ইংলণ্ডে আমরা এমন কখনও দেখি নাই"। হঠাৎ আমার বামদিকে কে বলে উঠলো "ব্যাঘ্রাৎ বিভেতি"। আমি চম্‌কে উঠলুম। চারিদিকে চেয়ে দেখলুম—জঙ্গল বেশ ঘন, আর চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ; তবে জ্যোৎস্নায় সমস্ত আলোকিত। আমি বুঝতে পারলুম যে শ্রীমান্ উক্ত কথা কয়টি উচ্চারণ করে নিস্তব্ধ ভাবে একদিকে আছে। তা দেখে প্রথমে মনে হ'ল সেগুলি অর্থহীন উক্তি। তাই আবার আমরা গল্প আরম্ভ করলুম। কিন্তু আবার শ্রীমানের গম্ভীর বাণী "চুপ"। এবার আর তা অগ্রাহ্য কর্ত্তে পারলুম না। তার দিকে ফিরে চাইলাম এবং তার উৎকণ্ঠাপূর্ণ দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে সম্মুখে চাইতেই আমার অন্তরাত্মা ভয়ে আলোড়িত হয়ে উঠ্‌ল। দেখি শের নয় বটে, তবে 'শেরঘাতী' শিখ ফের সিং তার জার্ম্মাণ রাইফেল নিয়ে সামনের 'সিটে' বেশ উঁচু হ'য়ে বসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চেয়ে আছে। হাতে বন্দুক দৃঢ়-মুষ্টিবদ্ধ —ছুড়লেই হয়। তখন আর অবস্থা বুঝতে বাকী রইলনা। আরও মহা বিপদ এই যে, রাস্তার বক্রগতি ও অসমতল অবস্থার জন্য মতি মটরের গতি হ্রাস করতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মহা উৎসাহের সঙ্গে মাথার উপরের যে আচ্ছাদনটা ফেলে দিয়েছিলুম জ্যোৎস্না উপভোগ কর্ব্বার জন্য, এখন সেইটাই হলো মহাবিপদের ও আশঙ্কার কারণ। আর, উপায়ও নেই যে, গাড়ী থামিয়ে সেটা তুলে দেওয়া যায়। শ্রীমান রমাপতি বল্লে "এখানে কথা কয়ো না। অত্যন্ত বাঘের ভয়।" আমি বল্লাম "রয়াল বেঙ্গল আছে নাকি?" সে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। আমি ঘাড় নেড়ে মাথাটায়

একবার খোঁজ নিয়ে দেখলুম সেটা তখনও ঠিক জায়গায় আছে কিনা। আমার আরও একটা মুস্কিল হ'লো, কয়েকদিন পূর্ব্বের একটা ছোট্ট ঘটনা মনে ক'রে। বিজয়া-দশমীর দিন এদেশে "দশহরা" উৎসব হয়। ঐ দিনটা গোয়ালিয়রে এক বিরাট ব্যাপার। মহারাজা বাহাদুর ঐদিন খুব আড়ম্বর করে তাঁর সৈন্য বাহিনী আর সভাসদ্‌গণকে নিয়ে রাজপথ দিয়ে তাঁর প্রজাদের সম্মুখে বাহির হন। ঐদিন আমিও সেই উৎসব দেখ্‌তে যাই। জনৈক বাঙ্গালী যুবক আমার বিশেষ পরিচিত এবং গোয়ালিয়র ষ্টেটের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর পুত্র গল্প করেন যে, এবারে শিবপুরীর জঙ্গলে বাঘের উৎপাত বড় বেশী হয়েছে। এখন সেই অমঙ্গলের কথাটাও সুযোগ পেয়ে মনের মধ্যে বেশ উজ্জ্বল হ'য়ে ভেসে উঠ্‌লো। এই রকম কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে, আবার আপনা আপনিই তা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যায়, আবার কখনও বা তার কোনওটি অবস্থার অনুকূল বাতাস পেয়ে খুব বড় হ'য়ে দেখা দেয়। সমস্তগুলো মিলে অন্তরটাকে বেশ সশঙ্কিত করে তুল্লে। তার পর রাস্তার অবস্থা এমন ভীষণ হয়ে উঠতে লাগলো যে তা মহাপ্রভুদের আক্রমণেরই বেশী অনুকূল। দুধারেই ঘন জঙ্গল এবং রাস্তার ঠিক পরেই খুব বড় বড় ঘাস। তার ভিতরে বাঘ কেন এক আধটা হাতীও আত্মগোপন করে থাকতে পারে। তবে ভরসা একমাত্র যে আমাদের গাড়ীতে খুব উজ্জ্বল head-light ছিল এবং তার সাহায্যে অনেকদূর অবধি দেখা যাচ্ছিল। আর জানা ছিল যে উজ্জ্বল আলো দেখলে তাঁরা নাকি সহজে সেখানে আত্মপ্রকাশ করেন না। কিন্তু আবার ভাবনা, পেছন থেকেও ত যা হয় একটা কিছু কর্ত্তে পারেন ;—তবে ভরসা এই যে তাঁরা 'রয়েল বেঙ্গল'—কাপুরুষ নয়—আক্রমণ করেন ত সামনে থেকেই করবেন। যাহা হউক সকলেই সামনে এবং আশে-পাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দিলুম। ক্রমে ক্রমে কতক সাহস হ'লো—মটর চলছে, সামনে শিখবীর ফেরসিং—শমন-দণ্ড সদৃশ জার্ম্মাণ রাইফেল তৈরী, আর আমিও দুজনের মাঝখানে বসে। আবার এক একবার সত্য কথা বলতে হয় সেই অফুরন্ত জ্যোৎস্নার আলোকে শ্রীমূর্ত্তি দেখতে ইচ্ছা হতে লাগ্‌লো। সর্ব্বনাশ! হাতে-হাতে ফল। ভগবান কি রসিক, ভাল জিনিষ চাইলে কই তা দিতে ত এত ব্যাকুলতা দেখি না। সাম্‌নেই কিছুদূরে দেখি যে ঠিক সেই—পিঙ্গলাভ দুটি চোখ আমাদের মটরের উজ্জ্বল আলোকে ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলছে। পাকা শিকারী ফেরসিংএরও সতর্ক দৃষ্টি তা এড়ায়নি। সেও তার রাইফেল উঁচু করে ধরেছে। শ্রীমান আদেশ দিলে "মাত মারো, উও আপনাসে ভাগ যায়েগা।" আমি মনে মনে বল্লুম, এ আবার কি? আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল "মানে?" শ্রীমান বল্লে "মহারাজার হুকুম না হ'লে বাঘ শিকার কর্ত্তে পারবে না, তবে আত্মরক্ষা করার জন্য মারতে পারা যায়।" আমাদের গাড়ী আরও নিকটবর্ত্তী হতে সেই উজ্জ্বল নয়ন-যুগল সমেত তার বপুখানি হঠাৎ পাশের জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হ'ল। অনুমানে যতদূর বোঝা গেল জীবটি যিনিই হোন, আকারে বেশী বৃহৎ নহে এবং বাঘ না হওয়াই সম্ভব। তবে সাবধানের মার নেই।

ক্রমে আমরা danger zone পার হয়ে এলুম। রাস্তায় আর কোনও উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা ঘটেনি। তবে আগাগোড়া আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করছিলাম। আমরা ত অত সতর্কতা অবলম্বন করেও হৃদ্‌কম্পের বেগ সামলাতে পারছিলুম না, কিন্তু ঐ যে মানুষগুলো—ছেলে, বুড়ো, আধাবয়সী, স্ত্রীলোক, সকলেই কাহারও হাতে বা একগাছা লাঠি, কেহ বা তা না নিয়েও রাস্তায় দিব্বি নিশ্চিন্ত চিত্তে হেঁটে যাচ্ছে; এদের বুকগুলো কি পাথরে গড়া, না দেহ ইস্পাতের বর্ম্মে আবৃত? বোধ হয় ব্যাঘ্র বা অন্য বন্য জন্তুরা সব এদের সঙ্গে অনেকদিন একত্র বাস করে শৈলচারী, মহাপুরুষ শিবাজী-দীক্ষিত মারাঠা বীরের শক্তির পরীক্ষা ক'রে এদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছে। ঐ ত পর্ব্বতের পাদদেশে, প্রান্তরের ভিতর—এখানে সেখানে সামান্য কুটীর মাত্র নির্ম্মাণ করে ওরা রয়েছে;—না আছে ওদের বৈদ্যুতিক আলো—না আছে আত্মরক্ষার নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়! তবে কি ওরা রোজই মরে—না ওরা মৃত্যুঞ্জয়ী! এরাই আমাদের দেশের লক্ষ্মীর বাহন—এরাই চাষা,—চাষ ক'রে মাথার

ক'রে এনে দেয় সহরের বৃহৎ অট্টালিকায় অধিষ্ঠিত গর্ব্বী ধনীর পায়ের তলায়—প্রকৃতি-জননীর সযত্ন-সজ্জিত উপহারের ডালি। এরা সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, আলোকে ও আঁধারে জননীর শ্যামল কোলেই আশ্রয় নিয়ে আছে। এরা সভ্যতার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে ধরার দুঃখভার বাড়িয়ে তোলেনি; বরং তাদের স্বভাব-সুলভ সরলতা দিয়ে সে ভার কতকটা লাঘব করেই দিয়েছে। আর হীন সভ্যতার উপাসক আমরা এদের রক্ত নিঙড়ে নিয়ে নিজেরা পৈশাচিক উল্লাসে নৃত্য করছি; আর এদের মাথায় রোগ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছি,—আবার তাদেরই দোষ দেখিয়ে গাল দিচ্ছি,—"এরা বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন কর্ব্বে না, তা হবে কি?" বিজ্ঞান! বিজ্ঞান!! বলি বিজ্ঞান এদের করেছে কি? পৃথিবীর কয়জন বৈজ্ঞানিক এদের দুঃখ ঘোচাবার জন্য মাথা ঘামায়? এরা রোগে ভোগে—ওষুধ পায় না, এদের ছেলে-মেয়েরা একটা উপভোগের জিনিস পাবার জন্য আব্দার কর্লে তারা তাদের ধমকে মেরে ভয় দেখিয়ে থামিয়ে দেয়;—আর নির্ম্মমতার আঘাত যখন নিজের বুকে খুব জোরে বাজে, তখন নীরবে অশ্রুবর্ষণ করে। কোন্ বৈজ্ঞানিক কৃষক জাতিকে উত্তমর্ণের কঠোর শোষণ থেকে বাঁচাবার উপায় উদ্ভাবন করেছে? কেবল শোন, ওরা বড় অবিবেচক! ওরা মিথ্যা অনেক বাজে-খরচ করে—ছেলের বিয়ে দিতে—পূজা পার্ব্বন কর্ত্তে! অখণ্ডনীয় যুক্তি—নিরপেক্ষ বিচার! বলি ওরা কি? মানুষ না ভারবাহী বলদ। না—না—না—ওরা মানুষ—ওরা তাদেরই মত মনোবৃত্তির অধিকারী যারা ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব বলে আত্মাভিমানে অন্ধ হয়ে পৃথিবীর সমস্ত সুখ শান্তি হরণ কর্ত্তে চায়। রাজনৈতিক রাজ্যের বিজ্ঞেরা ত অনেক বড় বড় কথা বলেন। সেগুলি কি তাঁরাই সৃষ্টি করেছেন রাজনীতিকে সরগরম রাখবার জন্য, না ভগবানের রাজত্বেও তার একটা সার্থকতা আছে?

এই সকল কথা ভাবতে ভাবতে কতক্ষণ যে বিমনা হয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ 'এই শিপ্‌রী' শ্রীমানের এই কথা কয়টিতে আমি সম্মুখে চেয়েই দেখি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত বৈদ্যুতিক আলো, সুন্দর সুন্দর লাল মাটির রাস্তা, দূরে দূরে এক একখানি বাড়ী।

শিপ্‌রী অথবা শিবপুরী অতিশয় পুরাতন স্থান। বর্ত্তমানে এটি গোয়ালিয়র মহারাজার ষ্টেটভুক্ত এবং তাঁহার গ্রীষ্মাবাস। শিপ্‌রী মহারাজার ষ্টেটভুক্ত একটি সুবা এবং উহা একজন সুবাদারের শাসনাধীন। স্থানটির
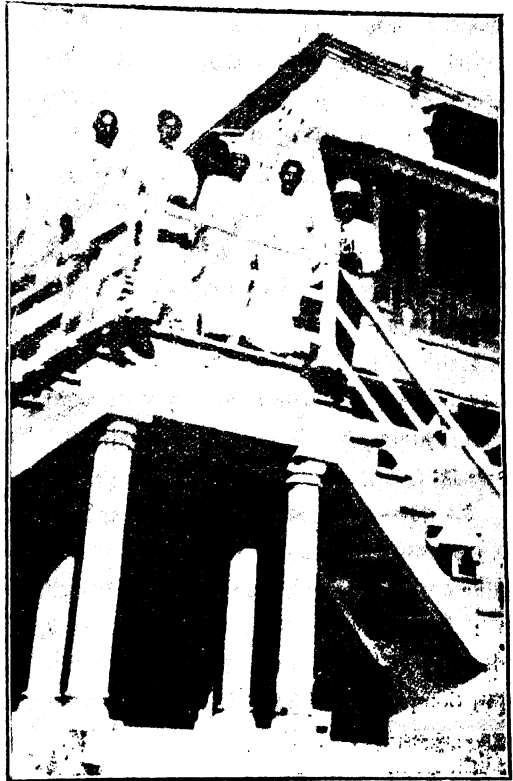
শিবপুরীর জলটুঙ্গী

বিশেষত্ব এই যে খুব স্বাস্থ্যকর এবং এখানে চির-বসন্ত বিরাজমান—খুব গ্রীষ্মও নয়—খুব শীতও নয়। চতুর্দ্দিকে পাহাড় আর নানাপ্রকার বৃক্ষাদি শোভিত। রাস্তাও অনেকগুলি; এবং সমস্তই বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। শিপ্‌রীতে প্রবেশ-মুখে সবচেয়ে আমাদের ভাল লাগল—সেখানকার মধুর হাওয়া এবং সবার

আগে চোখে পড়লো আলোক-মালা-বিভূষিত একটি মন্দিরের চূড়া। এই মন্দিরের বর্ণনা আমি যথাসময়ে ক'র্ব্বো। তারপর এ-রাস্তা সে-রাস্তা পার হয়ে আমাদের "দুর্গমপথজয়ী" ফোর্ড হোটেলের কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ ক'র্লো। তখন রাত্রি ৭—৫০ মিঃ। তখন চাঁদের স্নিগ্ধ আলোকে চারিদিক হাসছে। আমাদের বন্ধুবরগণ বুইক গাড়ীর আরোহীরা আমাদের কিছু আগেই পৌছেছেন জানা গেল। আমাদের তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন। হোটেলের বাড়ীটি বেশ বড়—দ্বিতল—লাল রং এবং উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং পূর্ব্বদিকেও একতলায় কয়েকখানি ঘর আছে। বাড়ীটির সামনে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে গাড়ীবারাণ্ডা এবং উপরে উঠিবার সিঁড়ি। আমাদের থাকবার জন্য দ্বিতলে দক্ষিণদিকের কয়েকখানি ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমরা একটু পায়চারী করে উপরে গেলাম এবং একটু বিশ্রাম করে হাত মুখ ধুয়ে খেতে গেলাম। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে আহারাদি শেষ ক'রে দুখানা গাড়ী নিয়ে বে'র হওয়া গেল। ইতিমধ্যে মটরচালক ও সিপাহী ও চাকর তাদের আহার সেরে নিয়েছিল। তখন রাত্রি প্রায় ৯-৩০ মিঃ।

চাঁদপাটা—প্রথমেই আমরা মহারাজার জলবিহার দেখতে গেলাম। মটরে যেতে আমাদের প্রায় ১০ মিনিট লেগেছিল। একটি বিস্তীর্ণ হ্রদ এবং তারই উপরে জলের ভিতর থেকে নির্ম্মাণ-করা পাশাপাশি দুটি ছোট বাঙ্লো। যাঁরা কলিকাতার দক্ষিণে ঢাকুরিয়াস্থিত নূতন Bompas লেক দেখেছেন তাঁদের বোঝবার সুবিধা হবে। এ জলাশয়টি উক্ত Bompas লেক অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনেক বড়। জলাশয়বক্ষে অনেকগুলি নানা বর্ণের নৌকা ও ষ্টিমলাঞ্চ্ ভাসছে। বাড়ী-দুটি হ্রদের পশ্চিমদিকেই অবস্থিত এবং হ্রদটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। বাড়ী-দুটির পশ্চিমে খানিকটা খোলা জায়গা, তারপরই পাহাড় আরম্ভ হয়েছে এবং একটি পথও পাহাড়ে উঠবার রয়েছে। ঐ পাহাড়ের উপর একটি বহুকালের শিব-মন্দির আছে; সেখানে নিয়মিত পূজা হয়। এই হ্রদটির নাম চাঁদপাটা। চাঁদপাটায় সেদিন চাঁদের হাট—আর আমরা এতগুলি সোনার চাঁদ গিয়ে হাজির,—আসর সরগরম হ'য়ে উঠলো। উক্ত বাঙ্লো দুটির অভিভাবক শ্রীমান্ বাহাদুর সিং তাঁর সুখনিদ্রা ত্যাগ ক'রে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন এবং এতগুলো লোককে এত রাত্রে তাঁর রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করতে দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শ্রীমান ত আমাদের মুখপাত্র; সে-ই ঐ দেশীয় ভাষায় তাঁকে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিলে। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর লণ্ঠনের সাহায্যে আমাদের একটি বাঙ্লোর ভেতর নিয়ে গেলেন। এখানে বলা প্রয়োজন, উক্ত বাড়ীটিতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু অতিথি না এলে ব্যবহার হয় না। যাঁরা বহুপূর্ব্বে ভবানীপুরের 'জলটুঙ্গী' দেখেছেন তাঁরা কতকটা এ বাড়ীটির ধারণা কর্ত্তে পার্ব্বেন।

যাক্, ভিতরে প্রবেশ ক'রে আমরা একটি সেতুর মত রাস্তা পার হয়ে একটি হলঘরে গেলাম। সে ঘরটি বেশ বড়—তার উত্তর-দক্ষিণে দুইটি ছোট ঘর; তার পূর্ব্বদিকে একটি খোলা বারাণ্ডা; তারপরই জলে নামবার দুটি সিঁড়ি। বারাণ্ডা থেকে সমস্ত হ্রদটি দেখা যায়। হ্রদে তখন জল খুব বেশী নেই, ৪।৫ ফিট গভীর হবে, কারণ জল বাহির করে দেওয়া হয়েছিল। ঘরের ভিতরে চতুর্দ্দিক সুন্দর সুন্দর সোফা কৌচ দিয়ে সাজান এবং মধ্যস্থলে একখানি খুব বড় টেবিল, আর তারই কিছু দূরে একখানি 'টিপয়ের' উপরে একখানি বড় ছবির 'Album' দেখলাম। শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল আমাদের দেখালেন ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যখন দরবারের সময় মহারাজার অতিথি হ'য়ে গোয়ালিয়রকে সম্মানিত করেন, সেই সময়ের বিভিন্ন অবস্থার ছবি তা'তে আছে। ইতিমধ্যে বড় আনন্দকর এক ঘটনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শ্রীমান্ রমাপতি উক্ত বাহাদুর সিংকে নিয়ে সেখানকার বাঘের কথা, তাদের ডাক কখন্ শোনা যায়, তারা আক্রমণ করে না কেন ইত্যাদি নানা কথায় তাঁকে বিব্রত করে তুলেছে। তিনিও তাঁর ক্ষমতানুযায়ী উত্তর দিয়ে যত আমাদের কৌতূহল দমন কর্ত্তে চেষ্টা করেন, ততই আমাদের ঔৎসুক্য আরও বেড়ে যায়। তাঁরও ঐকান্তিক চেষ্টা, বাবুদের সন্তুষ্ট ক'রে বাহবা নেন—

আমাদের ইচ্ছা নির্দ্দোষ আনন্দ উপভোগ করা। এই বাড়ীটির উত্তরদিকস্থ অনুরূপ বাড়ীটি স্ত্রীলোকদিগের জন্য; তা' আর আমাদের দেখার আবশ্যক হ'ল না। তারপর বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে আর একবার হ্রদের দিকে চোখ ফেরালুম। চাঁদের কিরণ-মাখা স্বচ্ছ শান্ত বারি-রাশি তারকাচন্দ্রখচিত আকাশের সুন্দর ছবি বুকে ক'রে কি অপূর্ব্ব শোভাই মেলিয়ে দিয়েছে। বার বার সেই সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার মহাসুন্দরকে প্রণাম ক'রে সেখান থেকে বিদায় নিলাম। আসবার সময়ে অবশ্য বাহাদুর সিং তাঁর প্রাপ্য ধন্যবাদ থেকে বঞ্চিত হননি; আর আর্থিক পুরস্কার দিতে গেলে তিনি তা' তাঁর স্বভাবোচিত সরলতা দিয়ে প্রত্যাখ্যান কর্লেন।

ছত্রী—ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা নানা রাস্তা ঘুরে সেই পূর্ব্বকথিত আলোকমালা-বিভূষিত মন্দির লক্ষ্য ক'রে চল্লুম। কখনও কখনও সেই মন্দিরটি দূর থেকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল—যেন একটি আলোর রাজ্য। আবার সেটি কখনও পাহাড়ের অন্তরালে অদৃশ্য হচ্ছিল। এইটি হচ্ছে পর্ব্বতময় স্থানের বিশেষত্ব। এম্নি করে সেই মন্দিরটি আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল। তারপর কিছুক্ষণ বাদে আমাদের গাড়ী একটা মোড় ফিরতেই একেবারে সেই আলোর রাজ্যের মধ্যে এসে প'ড়লো। আমাদের দৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য সেই অপূর্ব্ব আলোকমালায় ঝল্‌সে গেল। সে কি আলোর খেলা! গাছে, মন্দিরে, পাহাড়ে, ফটকে সর্ব্বত্রই উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর সাজ! প্রকৃতির 'আলো'-কে আজ মানুষ যেন তার আলোর অর্ঘ্য দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এ যেন গঙ্গাজলে গঙ্গার পূজা। এ মন্দিরটিকে দেশীয় ভাষায় 'ছত্রী' বলা হয়। আমরা বুঝলাম সেটি গোয়া-লিয়রের মহারাজবংশের একটি স্মৃতিমন্দির বা সৌধ। আর সেদিন শরৎ-পূর্ণিমার উৎসব; তাই অত আলোর সজ্জা, আর অনেক লোক-সমাগম হয়েছিল। সেই স্মৃতি-সৌধটির চারদিকে সুন্দর বাগান এবং একদিকে নিকটেই একটি বড় পাহাড়। আশেপাশে অনেকগুলি ঘর আছে; তাতে মহারাজার লোকজন এবং পূজারী থাকেন। মধ্যস্থলে খুব বড় একটা চত্বর শ্বেত পাথরে বাঁধান। সেই উঠানের একদিকে একটি সুন্দর মর্ম্মর-প্রস্তরে-বাঁধান সরোবর এবং তার মধ্যস্থল ও চতুষ্পার্শ্ব দিয়ে অপর দিকে গমনাগমনের রাস্তা। এই চত্বরের অপর দিকে কিছু উর্দ্ধে স্মৃতি-সৌধ। যাক্, আমরা ত গাড়ী থেকে নেমে একবার চারিদিকে চেয়ে সব জিনিষটা দেখে নিলুম। অনেক লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। কিছুক্ষণ পরে একটি ক্ষীণকায় ভদ্রবেশী মারাঠী বৃদ্ধ আমাদের কাছে এলেন এবং আমাদের পরিচয় ও অভিপ্রায় শুনে আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা কর্লেন। তারপর আমরা সকলে পাদুকা খুলে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ কর্ত্তে যাচ্ছি, এমন সময়ে বাধা। কি ব্যাপার? সকলের মাথায় কোন না কোন একটা আবরণ থাকা চাই। প্রভুদয়ালজীর মাথায় গান্ধী 'ক্যাপ', বাবাজীর মাথায় পাগড়ী, আর মিঃ বেঞ্জামিনের মাথায় 'হ্যাট' ছিল; কিন্তু আমরা মাথায় কি দেবো? অম্নি উদ্ভাবনী শক্তি সব বিপদের মীমাংসা করে দিলে। সকলের পকেটেই রুমাল ছিল এবং তাই বের করে বিভিন্ন উপায়ে যে যার মাথায় বেঁধে ফেল্লুম। অম্নি আমাদের অভ্যর্থনাকারী সেই ভদ্রলোকটি একটু হেসে বল্লেন 'আইয়ে'। ভাবলুম এ মন্দ নয়। সম্মান প্রদর্শনের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে মস্তকাবরণ উন্মোচন করাই ত নিয়ম জানতুম,—এ দেখলুম বিপরীত। যাক্, এ তত্ত্বের মীমাংসা কর্ব্বার আর তখন অবসর হ'লো না। আমরা একেবারে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মাঝখানে এসে পড়লুম। স্নিগ্ধ চন্দ্রমা আর বৈদ্যুতিক আলো এই দুটি মিলে মর্ম্মর-গাত্রে প্রতিফলিত হ'য়ে এমন মনোমুগ্ধকর শোভার সৃষ্টি করেছে যে তা দেখে আত্মহারা না হ'য়ে থাকতে পারা বড় শক্ত। যাহা হউক, সেই বৃদ্ধ অতি যত্নে আমাদের সব ঘুরে ফিরে দেখালেন। সেই সরোবর, একটি ঠাকুরের মন্দির, তারপর স্বর্গগত মহারাজার স্মৃতিমন্দির এবং তাহারই পাশে আর একটি মর্ম্মর-সৌধ যার নির্ম্মাণ-কার্য্য এখনও শেষ হয় নি। শুনলাম, স্বর্গগত মহারাজার বর্ত্তমান স্মৃতিমন্দিরের পরিবর্ত্তে নূতন মর্ম্মর-সৌধ দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হচ্ছে। স্বর্গগত মহারাজা প্যারিসে পরলোকে গমন করেন। অতঃপর সেখান থেকে তাঁর অস্থি এনে এখানে পুনরায় দাহ করা হয়; এবং তার উপর এই ক্ষুদ্র

মন্দিরটি নির্ম্মাণ করা হয়। এখন এই সুন্দর মর্ম্মর-সৌধের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হ'লে সেখানেই তাঁর চিতাভস্ম রক্ষিত হবে। তারপর আমরা সেখান থেকে ফিরে এসে এইবার প্রধান স্মৃতি-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলাম। এটি স্বর্গগত মহারাজার জননীর অর্থাৎ বর্ত্তমান মহারাজার পিতামহীর স্মৃতি-মন্দির। আমরা মর্ম্মর-প্রস্তর নির্ম্মিত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। মন্দিরটি চত্বর থেকে প্রায় ১৫।২০ ফিট উঁচু। সামনেই দালান। তার মেঝে ও প্রাচীরগাত্র শুভ্র মর্ম্মর-প্রস্তর নির্ম্মিত। তারপর একটি কারুকার্য্যখচিত দ্বার পার হয়ে আমরা আর একটি চত্বরে প্রবেশ কর্লাম। এর তিন দিকেই অল্প উচ্চ দালান; আর মধ্যস্থলে তদপেক্ষা কিছু নিম্ন একটি বড় হল এবং তিন দিকেই দ্বিতল গৃহ। আর সামনেই মহারাণীর আসল স্মৃতিমন্দির। আমরা পূর্ব্বোক্ত দালান দিয়ে সেখানে গেলাম এবং কয়েকটি সোপান অতিক্রম করে উপরে উঠলাম। প্রথমে একটি দালান, তারপরই কক্ষের মধ্যে দেবীর তুষারশুভ্র মর্ম্মরমূর্ত্তি। যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার অঙ্গহানি করে শিল্পী তাতে শিল্প-চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক সেই মূর্ত্তি-গাত্রে, মর্ম্মর প্রাচীরে ও চত্বরে প্রতিফলিত হ'য়ে এক অপূর্ব্ব উজ্জ্বল শোভার সৃষ্টি করেছে। মনে হয় যেন তুষারধবল হিমাদ্রিশীর্ষে প্রভাতসূর্য্যের কিরণসম্পাত। মহারাণীর মূর্ত্তিতে সধবার বেশ পরিহিত। রাজঐশ্বর্য্যশালিনী দেবী রাজরাজেশ্বরীর বেশ পরে মর্ম্মর-সিংহাসনে সমাসীনা। শিল্পী! ধন্য তোমার সৃষ্টি! মূর্ত্তিকে জীবন্ত ক'রে তোলবার কল্পনা ও দক্ষতায় এমন সহজ ও সুন্দর সংমিশ্রণ শিল্পরাজ্যে দুর্লভ। এ গৌরবের অধিকারী বোম্বাইয়ের এক বিখ্যাত শিল্পী। এই অপরূপ শোভা দেখে বারবার মাতৃভক্তির সেই অপূর্ব্ব নিদর্শনের পাদমূলে প্রণাম কল্লুম; আর মনে মনে স্বর্গগত মহারাজা ও গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রজাবৃন্দকে তাঁদের জননীর স্মৃতি-পূজার মহান্ আড়ম্বর দেখে উৎফুল্ল হ'য়ে অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর্লুম। মনে হ'লো হিন্দুরা পত্নীপ্রেমের গৌরব-স্মৃতি জগতের বক্ষে অমর করে রাখতে 'তাজের' মত স্মৃতিতীর্থ কিছু গড়েনি বটে, কিন্তু তারা স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর বক্ষঃনিঃসৃত পীযূষ-ধারার চরণে ভক্তির অর্ঘ্য ঢেলে দিতে হৃদয়ের ভক্তির পবিত্র উৎস নিঃসারিত কোরে জগতের বক্ষে স্বর্গীয় আদর্শের বাণী সোনার অক্ষরে লিখে রেখে গেছে। আমরা মাতৃভক্তির এই অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে অঞ্জলি ভরে সুধাপান ক'রে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সেই মধ্যস্থিত প্রশস্ত চত্বরে সেই দেবীর সম্মুখে শরৎ পূর্ণিমায় উৎসব উপলক্ষে গীতবাদ্য হচ্ছিল। বাঙ্লায় কোজাগর পূর্ণিমায় লক্ষ্মীর পূজা হয়; এঁরাও ঐ দিনে এই রাজলক্ষ্মীর পূজা কচ্ছিলেন। আমরা বেরিয়ে আস্ছি, এমন সময় সেই বৃদ্ধটি আমাদের মহা সমাদরে গান শুনতে অনুরোধ কর্লেন। আমরা সকলে বসে গেলুম। আরও অনেক শ্রোতা ছিলেন। গান চলছিল। গায়ক বৃদ্ধ গোয়ালিয়র-বাসী। একজন সারেঙ্গী ও তবলচি তাঁকে সাহায্য করছিলেন। বৃদ্ধ গায়ক অনেক চেষ্টা করে গান কর্চ্ছিলেন বটে, আর হয়ত কালোয়াতীর দিক থেকে তা খুবই উঁচুদরের হচ্ছিল—অর্থাৎ তাতে হয় ত গমক, মীড়, হলতাতান ইত্যাদি নানাপ্রকার সঙ্গীত-বিজ্ঞানের উপকরণও ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আজও সে সবের মধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে পারি নি,—যদিও তার অনেকগুলি প্রবেশ-পথ আমার সমুখে সদাই উন্মুক্ত। আমি গানের মধ্যে খুঁজি কণ্ঠের মধুরতা আর ভাবের স্পর্শ। প্রাণহীন সঙ্গীত আমরা ভাল লাগে না। যে গানে প্রাণ স্পর্শ কর্ত্তে পারে না, অন্তরে ভাবের অনুভূতি জাগিয়ে দেয় না, সে সঙ্গীত হ'তে পারে খুব বিজ্ঞান-সঙ্গত, কিন্তু আমি তাকে বড় স্থান দিতে পারি না। শুধু গায়ের জোরে তর্কের ধাঁধা সৃষ্টি ক'রে যাঁরা গায়ক হ'তে চান, তাঁরা সঙ্গীত-বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধি নিয়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখুন—আমরা একটু শান্তি পাই। সঙ্গীত যদি ভাববর্জ্জিত হবে, তবে তার বিভিন্ন আকার কোথা থেকে এলো, আর কোন্ কাল্পনিক কেবল কল্পনার সাহায্যে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনীর শ্রেণী-বিভাগ ক'রে তার নাম করণ কর্লে? এক কথায়, আমার মনে হয়, সেই গায়কই রাগরাগিনীর মর্য্যাদা রক্ষা তত কর্ত্তে পারেন, যাঁর স্বর যত বেশী বিভিন্ন গুণ-বিশিষ্ট এবং মিষ্ট। বোধ হয় অনেক অনধিকার-চর্চ্চা করে ফেলিছি। কিন্তু অনন্যোপায়। অমন মধুর মনের ভাবটা আমাদের, সেই

গায়কের ভাবস্পর্শহীন গানে একেবারে গন্ধময় হ'য়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি আমরা উঠে পড়লুম। বাহিরে এসে দেখি সে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! ইতিমধ্যে সেই বিস্তীর্ণ উঠানটি বহু সংখ্যক কাষ্ঠাসনে পূর্ণ। ব্যাপার বুঝতে বাকী রইল না। আমরা ত আস্তে আস্তে পাশ কাটিয়ে চলে আস্‌ছি; কারণ, কিছু পূর্ব্বেই রাত্রের আহার বেশ করে শেষ করে বের হয়েছিলাম। হরি! হরি!! আমাদের মনোযোগী অভ্যর্থনাকারী আমাদের ভোলেন নি। এসে ধরলেন—খেয়ে যেতে হবে। আমি বল্লুম, "খাওয়ার আর বাকী কি আছে? আর খাবার স্থানই বা কোথায়?"—কে কার কথা শোনে। বসতেই হবে। প্রভুদয়ালজী বল্লেন "চলুন, আর তর্ক বাড়িয়ে কাজ নাই—এঁরা ছাড়বেন না।" ফিরলুম—দেখি আশ্চর্য্য ব্যাপার—প্রায় সব কাষ্ঠাসন-গুলিই এরই মধ্যে অধিকৃত। জাতিভেদ নাই, হিন্দু মুসলমান সকলেই পাশাপাশি বসে গেছেন। একদিকে কতকগুলি আসন খালি ছিল—আমরা তাইতে বসে গেলুম। সঙ্গে সঙ্গে এক একটি রূপার বাটী এসে সামনে প'ড়ল—কলাপাতা নয়। আমি ত অবাক—এ কি! বাটী কেন? রাত্রে কি সরবৎ খাওয়াবে না কি?" শ্রীমান পাশেই ছিল, বল্লে 'দুধভোগ্য'। ভাবলাম "হাতে পাঁজী মঙ্গলবার।" দেখি ২০।২৫ জন লোক এক একটি বড় বড় কমণ্ডলুর মত রূপার পাত্র ক'রে সেই পেয়ালা ভরে সবুজ রংয়ের তরল পদার্থ ঢেলে দিচ্ছে। তার রং দেখেই আমার মুখ দিয়ে অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে গেল 'এ যে ভাঙ্'! সেই বৃদ্ধটি সামনে দাঁড়িয়ে—আধ হাত জিভ বার করে বল্লেন, 'আপ পিজিয়ে বাবুসাব—ইয়ে কই খারাপ চিজ্ নেহি হায়।' সঙ্গে সঙ্গে বাটী মুখে উঠ্‌লো, আর নিজের মূঢ়তাকে ধিক্কার দিতে হ'লো। সত্যই অমন সুস্বাদু এবং নির্দ্দোষ দুগ্ধের জিনিস পূর্ব্বে কখনও খাই নাই। আমার পাশেই তখনও মিঃ বেঞ্জামিন বসে ইতস্ততঃ করছেন খাবেন কি না। আমি বল্লাম 'সাহেব খাও, নয় তো এঁরা অসন্তুষ্ট হবেন।' অমি সাহেব আস্তে আস্তে পান কর্লে'ন। তারপর সকলেই আর এক এক বাটী পান করে উঠে পড়লুম। তারপর সেই বৃদ্ধটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আর একবার সেই আলোকমালার অপরূপ শোভা দেখে মটরে এসে উঠলুম এবং মিঃ বেঞ্জামিনকে সতীদেবীর স্বামী-নিন্দা শ্রবণে পিত্রালয়ে দেহত্যাগ—দেবাদিদেব মহাদেবের মত্তাবস্থায় প্রিয় স্ত্রীর মৃতদেহ স্কন্ধে ক'রে সারা পৃথিবীময় 'প্রলয় নাচন', তারপর সৃষ্টি-ধ্বংস ভয়ে বিষ্ণুলোকে সমস্ত দেবতার 'Round Table Conference' এবং বিষ্ণুদেব কর্ত্তৃক সুদর্শন চক্রাঘাতে সতীর অঙ্গচ্ছেদন ও ভারতের বিভিন্ন অংশে মহাদেবীর দেহাংশ পতন ও তজ্জনিত এক একটি পীঠস্থানের উৎপত্তি এই সব কাহিনী শোনাতে শোনাতে হোটেলে পৌঁছে

মিঃ বেঞ্জামিন

নিজ শয্যায় শয়ন ক'রে অবিলম্বে সুষুপ্তির কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় নিলুম।

পরদিন প্রত্যূষে উঠে ফিরে আসবার এবং আরও কয়েকটি স্থান দেখতে যাবার আয়োজনের ধুম পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি ও চা পান শেষ ক'রে বেরিয়ে পড়া গেল। এবারে আমরা প্রথমে গেলাম জৈন ধর্ম্মের একটি স্মৃতিতীর্থ দেখতে। সেখানে গিয়ে কতকগুলি কল্পনার জিনিষ চোখের সামনে

দেখলুম। এই শিবপুরীতে এই স্থানেই গত ইংরাজী ১৯২২ সালে জৈনধর্ম্মের এক মহাত্মা প্রচারক সন্ন্যাসী শ্রীশ্রী৺বিজয়ধর্ম্ম সুরী দেহরক্ষা করেন। তাঁহারই স্মৃতিরক্ষা-কল্পে শ্রীযুক্ত বিজয় ইন্দ্র সুরিজী প্রমুখ তাঁহার ভক্ত শিষ্যগণের চেষ্টায় ও মহামান্য ধর্ম্মপ্রাণ গোয়ালিয়রের মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সেই মহাপুরুষের স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হয়েছে এবং তন্মধ্যে সেই মহাত্মার মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত হয়েছে। এখানে সেই মহাপুরুষের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। শ্রীশ্রী৺বিজয়ধর্ম্ম সুরীর পূর্ব্ব নাম 'মূলাচন্দ্র'। তিনি ইংরাজী ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কাটিহারের অন্তর্গত মহুয়া গ্রামে এক বৈশ্য পরিবারে ধর্ম্মপ্রাণ বণিক্ রামচন্দ্রের ঔরসে ও অশেষ গুণবতী শ্রীযুক্তা কমলাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে মূলাচন্দ্র অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির ছিলেন এবং বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার তাদৃশ আসক্তি ছিল না। যৌবনে তিনি উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি ও জুয়াখেলায় অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পিতার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের অপব্যয় আরম্ভ করেন। একদিন জুয়াখেলায় বহু অর্থ নষ্ট করায় পিতা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেন। তাতে তিনি অনুতপ্ত হয়ে সংসার-সুখের অনিত্যতা উপলব্ধি করতে থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁর বৈরাগ্যের উদয় হয়। অতঃপর তিনি উপযুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করে বহু দিবস নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে সুপণ্ডিত হয়ে উঠেন এবং দাক্ষিণাত্য, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বঙ্গদেশ ইত্যাদি বহু স্থানে জৈনধর্ম্ম প্রচার করে বহু ব্যক্তিকে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি নানা উপায়ে এই বিশাল ধর্ম্ম মতটিকে প্রচার করে যান। বহু স্থানে তিনি পুস্তকালয়, গুরুকুল, ধর্ম্মসভা ইত্যাদি স্থাপন করে যান। তাঁর ধর্ম্মমতের প্রধান বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি কোনও ধর্ম্মমতকে অবজ্ঞা করতেন না; বরং সকল মতের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করাই তিনি শ্রেয়ঃ বিবেচনা করতেন। এই শিবপুরীতেই তিনি শিষ্যদিগকে জৈনধর্ম্ম প্রচার-কার্য্য শিক্ষা দেবার জন্য ভীর-তত্ত্ব-প্রকাশ-মণ্ডল নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপন করেন। তাঁর স্বর্গারোহণের পরে তাঁর উপযুক্ত শিষ্য শ্রীবিজয়ইন্দ্র সুরিজী এইখানেই যশোবিজয় জৈন গুরুকুল নামে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন।

যাক্, আবার কাহিনীর সূত্র ধরা যাক। আমরা ত মটর থেকে নেমে ফটক অতিক্রম ক'রে ভেতরে প্রবেশ কর্লুম। অম্নি একটি যুবক ভদ্রলোক এসে অভ্যর্থনা ক'রে আমাদের একটি সৌম্য প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনিই আচার্য্য শ্রীবিজয়ইন্দ্র সুরিজী। লোকটি মহাপণ্ডিত, নম্র, গুরুভক্ত; এবং সব চেয়ে প্রীতিকর যে, তিনি নিজের ধর্ম্মমত অন্তরের সহিত যেমন উপলব্ধি করেছেন, তেম্নি আবার অন্য ধর্ম্মমতকে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিতেও কাতর নন। তিনি ধর্ম্মের সার বস্তুটির সন্ধান পেয়েছেন, এ কথা তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করেই আমরা বুঝতে পারলুম। তারপরে তিনি আমাদের উদ্দেশ্য অবগত হ'য়ে অত্যন্ত উৎসাহিত হ'লেন এবং নিজে সঙ্গে করে আমাদের সমস্ত দেখাতে লাগলেন। এই প্রতিষ্ঠানটিতে পূর্ব্বেই বলেছি তিনটি জিনিস আছে। প্রথম ৺বিজয়ধর্ম্ম সুরিজীর স্মৃতিমন্দির, দ্বিতীয় 'ভীরতত্ত্ব-প্রকাশমণ্ডল' ও তৃতীয় 'যশোবিজয় জৈন গুরুকুল'। প্রায় ১০ বিঘা জমি নিয়ে সমস্ত বাড়ীটি। মধ্যস্থলে একটি বিস্তৃত খোলা মাঠ—ছেলেদের ক্রীড়াক্ষেত্র। পূর্ব্বদিকে দুটি ফটক এবং ফটক হতে সেই মাঠের তিনদিকে বেড়ে রাস্তা এবং সেই রাস্তার পরে সেই মাঠের তিনদিকে গৃহাদি। পশ্চিমে উক্ত স্মৃতিমন্দির, তার পরিচয় পূর্ব্বে দিয়েছি। দক্ষিণ দিকে একটি বড় হল। তা'তে ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা ও বক্তৃতাদি হয়। তার পর ছাত্রদের থাকবার ঘর। উত্তরদিকে বিদ্যালয়-গৃহ, আফিস, পাকশালা ইত্যাদি। উপরে পাঠাগার। এখানে বর্ত্তমানে ৬০জন ছাত্র আছে। ৬ বৎসর হইতে ২০ বৎসর বয়সের ছাত্র আছে। ছাত্রেরা কেবল কাপড় আর জামা নিয়ে আসে। তদ্ব্যতীত সমস্ত দ্রব্য—পুস্তক, আহার, শয্যাদ্রব্য ইত্যাদি ছাত্রদের দেওয়া হয়। আদর্শ বিদ্যাস্থান—সংস্কৃত, উর্দ্দু, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল, গণিতশাস্ত্র ইত্যাদি সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা ও বক্তৃতা বিষয়েও যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়। স্বাভাবিক ও শাস্ত্রসঙ্গত 'আসনাদির' দ্বারা ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আহারাদির ব্যবস্থাও সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর। ছাত্রদের মধ্যে গুজরাটী ও দক্ষিণী

ছাত্রের সংখ্যা অধিক। আমরা সব দেখে, বালকদের বক্তৃতা শুনে, আচার্য্যদেবের সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা ক'রে এই ধর্ম্মশালার বিষয়ে খুব একটা উচ্চ ধারণা নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে প'ড়লুম। আরও শুনে এলাম হাসপাতাল নির্ম্মাণের জন্য গোয়ালিয়র ষ্টেট থেকে ৫০০০৲ টাকা ও তদুপযুক্ত জমি এই প্রতিষ্ঠানটিকে দেওয়া হয়েছে।

কত দিন কত বন্ধুর কাছে অনুযোগ করেছি—এম্নি ক'রে ছেলেদের শিক্ষাকেন্দ্র গ্রামে গ্রামে স্থাপিত না হ'লে শুধু অসার শিক্ষার প্রচলনে কোনও কাজই হ'বে না। কোমলমতি বালকদের অস্বাস্থ্যকর স্থানে রেখে সংসারের শত প্রলোভনের মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে তাদের দেহমনের কোনওটারই উৎকর্ষ সাধন হয় না, আর হতেও পারে না। ভারতবর্ষের সমাজের বিধি-নিয়মের সৃষ্টি-কর্ত্তারা আর যাই হোন, তাঁদের কল্পনা অনেক বিষয়ে সঙ্গত, তাতে আর সন্দেহ নাই। সংসারের নানা প্রকার আবিলতা থেকে কিশোরবয়স্ক ছেলেদের গুরুগৃহে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে তাঁরা সমাজকে কি সুন্দরভাবে বিধিবদ্ধ করে গেছেন, আর কত জটিল সমস্যার মীমাংসা করে দিয়ে গেছেন, তা আজ আমরা এই জিনিসটি হারিয়ে ফেলে বুঝতে পারছি। আর একটি জিনিস আমার মনের সঙ্গে বেশ গ্রথিত হ'য়ে গেল যে, প্রচার-কার্য্য ধর্ম্মকে অনেক জীবনীশক্তি এনে দেয় এবং তাকে পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে ঠিক সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলবার যোগ্য করে। সব ধর্ম্মই এ কথা মেনে নিয়েছে। খৃষ্ট, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান ইত্যাদি সমস্ত ধর্ম্মমত প্রচারের সুদৃঢ় নিয়মের মধ্যে দিয়ে শক্তি সংগ্রহ কর্চ্ছে। আর সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম তার যুগব্যাপী জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে তার প্রসার প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলছে। ধর্ম্ম-কর্ত্তারা তাঁদের তর্কের জাল ছিন্ন ক'রে ফেলে দিয়ে একটা স্বামী বিবেকানন্দকে পৃথিবীর বুকে ছেড়ে দিয়ে তার ফল দেখুন। আমরা বেশ একটা বিমল শান্ত ভাব নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে চড়লুম; এবং উঁচু-নিচু, সুন্দর ও ভয়ানক, পরিষ্কার ও জঙ্গলাবৃত অনেক রাস্তা পার হ'য়ে প্রায় ২০ মিনিট পরে 'ভাদাইয়া কুণ্ড' নামক স্থানে এসে পৌঁছলুম। এটি একটি পাহাড়ের ঝরণা। স্থানটি বেশ নির্জ্জন। খুব উঁচু পাহাড় এবং ঘন বৃক্ষাচ্ছাদিত। আমরা এক জায়গায় গাড়ী ছেড়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলুম। ক্রমে ক্রমে আমরা ঘন বৃক্ষগুল্মাচ্ছাদিত স্থানে এসে পড়লুম এবং সামনেই পর্ব্বত-গাত্রে নীচে নামবার সিঁড়ি পেলুম। উপরে সবুজপত্রের আচ্ছাদন; তার ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যকিরণ এসে পড়েছে। আর নীচে একটি ছোট্ট স্রোতস্বিনী বৃক্ষাচ্ছাদনের আড়ালে পথের কাণ্ডারীকে হারিয়ে ফেলে পাহাড়ের গা বেয়ে 'পথভোলা পথিকের' মত

পরিব্রাজক

থেমে থেমে সেই পথের সাথীকে অজানা পথের সন্ধান জানিয়ে দেবার আকুল আবেদন জানাতে অদৃষ্ট নির্ভর করে অদৃশ্য পথে বয়ে গিয়েছে। আমরা নামতে নামতে সেই পর্ব্বত-নির্ঝরিণীর কুলুকুলু ধ্বনি দূর থেকে শুনতে পেলাম। এবং যতই অগ্রসর হ'তে লাগলাম, ততই সে গানের স্বর ও ভাষা স্পষ্টতর হ'য়ে উঠতে লাগলো—যেন সে তার অভ্যর্থনা-বাণী জানিয়ে বলছে

"ত্বরা চলে এস, আমার গতিরুদ্ধ হয় না—আমি চলেছি—আমি থামি না।" আমরা সেই গানের আহ্বানে উন্মুখ হ'য়ে আর একটু এগিয়ে গিয়ে দক্ষিণ দিকে ফিরতেই সেই পর্ব্বত-তটিনীর উৎস আমাদের চোখের সামনে তার সহস্র ধারার রূপ নিয়ে ঝলমলিয়ে উঠ্‌লো। সেই ধারার নীচেই একটা জায়গায় জল এসে জমে তারপর তটিনীর আকারে বয়ে যাচ্ছে। শ্রীমান বল্লে "প্রভুদয়াল! এ জল mineral water—এ জল বিলেতে এক বোতল আট আনা মূল্যে বিক্রী হয়।" আমি ত চারদিকে চেয়ে দেখে চক্ষের ক্ষুধা আর মেটাতে পারি না। চতুর্দ্দিক নিম অশ্বত্থ বট ও অন্যান্য বৃক্ষে ঢাকা। তার ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যকিরণ এসে পড়ে একটা আলো-আঁধারের জাল বুনে দিয়েছে। সেই বনান্তরালের, সেই ঝর্ণার শীকরকণাবাহী স্নিগ্ধ সমীরণ আমাদের সমস্ত শ্রান্তি নিমেষে কোমল হস্তে অপসারিত ক'রে দিলে। এগিয়ে গিয়ে আট আনা মূল্যের জল বিনা পয়সায় পান করে স্বাস্থ্যোন্নতির কাজ সেরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। জলের আস্বাদ অতুলনীয়। মিষ্টস্পর্শ, তুষারশীতল, স্ফটিক-স্বচ্ছ। ভগবানের জীবন্ত সৃষ্টি এই উৎসগুলি—শুষ্ক পাহাড়ের বক্ষ নিঙ্‌ড়ে জল বেরুচ্ছে—তা কত শীতল ও স্বচ্ছ। সে সমস্ত দৃশ্যটা আর একবার নয়ন ভরে দেখে নিয়ে দুঃস্থ দেহমনের তৃষ্ণা মিটিয়ে সেখান থেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেকে টেনে নিয়ে ফিরতে হ'লো। আসতে আসতে যতক্ষণ দেখা গেল দেখতে দেখতে এলুম; আর নিজেকেই বলতে লাগলুম—'এই ত সেই মহাজ্ঞানী যোগীপুরুষদের আসন—এখানে বসেই তাঁরা স্বর্গমর্ত্ত্যের বিষয় ভেবে আর্য্যাবর্ত্তের এতবড় সভ্যতাটা গড়ে দিয়ে গেছেন।'

সেখান থেকে বেরিয়ে এবার আমরা গোয়ালিয়র মহারাজার শৈলবিহার উদ্দেশে রওনা হলাম। কিয়দ্দূর অপেক্ষাকৃত সমতল রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালিয়ে এসে আমরা ক্রমে ক্রমে উঁচু দিকে উঠতে লাগলুম। এইবার ঠিক পার্ব্বত্য রাস্তা আরম্ভ হ'ল। চতুর্দ্দিকে বনে ঢাকা পাহাড়: তারই গা বেয়ে ২৫ ফিট প্রশস্ত রাস্তা এঁকে বেঁকে উপরের দিকে উঠে গেছে। আমাদের দুখানি গাড়ী পর পর যাচ্ছে। এখানে মটরের শক্তি এবং চালকের নিপুণতা ঠিক পরীক্ষিত হয়। পিছন দিকে ফিরে দেখলে ভয় হয় এই বুঝি গাড়ী গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সে সব কিছুই হয় নি। আমরা নিরাপদে প্রায় ১০০০ ফিট উঁচুতে গিয়ে এক সমতল ভূমি পেলাম। আর একটু এগিয়ে যেতেই, বৃক্ষাবরণ সরে গিয়ে একটি ছোট্ট দ্বিতল পাথরের বাড়ী আমাদের দৃষ্টিপথে তার গর্ব্বোন্নত সৌন্দর্য্য নিয়ে উদয় হ'লো। এই 'জর্জ্জ ক্যাসেল' বলেই চালক গাড়ী বেঁধে ফেল্লে। আমরাও অমনি গাড়ী থেকে নেমে একবার চারিদিকে বেশ করে দেখে নিলুম। পাহাড়ের উপরিস্থিত সেই সমতল ক্ষেত্রটি খুব প্রশস্ত নয়। সর্ব্ব-সমেত ৭.৮ কাঠা জমি হবে। তার খানিকটা খালি ও খানিকটার উপরে সেই বাড়ীটি নির্ম্মিত। আমরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে গেলাম। তারপর মহারাজার শয়ন ঘর, বসিবার ঘর, দুই দিকের বারাণ্ডা সমস্ত দেখলাম। ঘরগুলি ছোট অথচ অতি সুন্দর। শ্বেতপাথর ও গোয়ালিয়র ষ্টেট পটারী ওয়ার্কসের টাইল দিয়ে সুন্দর-রূপে মেঝে ও দেওয়ালগাত্র নির্ম্মিত। দেওয়ালে বর্ত্তমান মহারাজার এবং মহারাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণের অনেকগুলি ফটো টাঙ্গানো আছে। বাড়ীটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। পশ্চিম দিকে বারাণ্ডা ও কিছু খালি জমি আছে। আমরা পশ্চিম দিকে গিয়ে একবার নিম্নস্থ সমতল ক্ষেত্র দেখলুম। কারণ ঐ খালি জমির কিছু পরেই পাহাড়ের অবতরণ আরম্ভ হয়েছে। সেদিক দুরধিগম্য। নীচে আমরা শস্যক্ষেত্র ও খুব বড় একটি জলাশয় ও পয়ঃ-প্রণালী দেখ্‌লাম যেন। সেগুলি কোনও ভাবুক চিত্রকর সযত্নে তুলিকায় চিত্রপটে চিত্রিত করে রেখেছে। দূর থেকে সে দৃশ্য দেখলে চোখ ফেরান যায় না। আমরা এখান থেকে দুখানি ফটো তুললাম। আমাদের সঙ্গে দুটি ক্যামেরা ছিল। আর এই পাহাড়ের অপর স্থান থেকে একখানি ফটো তোলা হয়। সেখানে ঐ দুর্গটির রক্ষণাবেক্ষণ জন্য কয়েকজন কর্ম্মচারী ও চাকর দ্বারবান থাকে। তারা আমাদের বেশ ভাল করে সমস্ত দেখালে। আমরা সেখান থেকে তারপর নামতে আরম্ভ করলুম। এবার গাড়ী বেশ সহজেই চলতে লাগলো; কিন্তু বেশ বুঝতে পারলুম চালকের কি একাগ্রতার সঙ্গে গাড়ীর steering ধরে বসে থাকতে

হয়েছে। গাড়ী তখন ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে নামছে এবং রাস্তা ঐ রকম ঘুরে ফিরে নেমেছে। সশঙ্কিত অবস্থা।

যাক্, সেই বন, পাহাড় ও তার ভয়ানক অঙ্গশ্রী এবং তার বক্ষভেদী দারুণ রাস্তা—সব আমরা ক্রমে ক্রমে পেছনে ফেলে রেখে আবার 'জমিনে' ফিরে এলুম; এবং এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে-ফিরে গাড়ী দ্রুতবেগে সামনের দিকে ছুটল। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই রকম চড়াই ঠেলে গাড়ী উঠতে লাগলো। তবে এবার রাস্তা অত খাড়া হ'য়ে উঠে নি; কিন্তু ঘন জঙ্গলাবৃত এবং লোকালয়ের চিহ্নমাত্রশূন্য। আমাদের গাড়ীতে আমি, রাধাকিষণজী ও মিঃ বেঞ্জামিন ছিলাম। রাধাকিষণজী বল্লেন "আমরা এবার 'বু রা খে রে' জঙ্গলে যাচ্ছি। সে অতিশয় সুন্দর জায়গা"। মিঃ বে ঞ্জা মি ন বল্লেন "আমরা কি ফেরবার পথ ধরি নি?" রাধাকিষণজী উত্তর দিলেন "হ্যাঁ—সেটা ফেরবার রাস্তাতেই পড়বে।" তারপর সব চুপচাপ। মটরের ইঞ্জিনের স্বাভাবিক শব্দ ও মধ্যে মধ্যে বাঁকের মুখে 'হর্ণ' বাজার আওয়াজ। সমস্তরই শেষ আছে। অতএব প্রায় ৪৫ মিনিট গাড়ী চলবার পর আমাদের রাস্তারও শেষ হ'ল। খানিকটা খুব খাড়াই অতিক্রম করে আমাদের গাড়ী একটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তার পাহাড়ে উঠার পরিশ্রমের জন্যে দুঃখ প্রকাশ কর্লে। যাক্, তা শুনতে গেলে আর আমাদের চলে না। বাহক বা ভৃত্যদের অনুযোগ শুনতে গেলে প্রভুর চলে না। তাদের কষ্টও সহ্য কর্ত্তে হ'বে, আর কাজও কর্ত্তে হবে,—তাতে তাদের অন্তর রক্তাক্ত হয়েই যাক্ আর হৃদয় চূর্ণ হয়েই যাক্।

সাম্‌নেই একটি ঘর দেখলুম। তাতে কেউ আছে বলে বোধ হ'লো না। আর একদিকে বড় বড় গাছ; আর অপরদিকে জাওয়ারের ক্ষেত। জাওয়ার গাছগুলি ঠিক আখগাছেরই অনুরূপ। আমরা সামনের সেই ঘরটিকে বাঁদিকে রেখে এগিয়ে চল্লুম। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একেবারে একটা নিবিড় জঙ্গলের প্রবেশ-দ্বারে এসে পৌছলুম। সামনে চেয়ে দেখি—ও বাবা! ও কি! এ যে অমানিশা হার মেনে যায়! আমরা পাহাড়-গাত্রস্থিত পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলুম। মনে হ'লো ঠিক যেন প্লুটোর রাজত্বে প্রবেশ কচ্ছি। ৬।৭ মিনিট নামার পর আমরা এক জায়গায় এসে থামলুম। চতুর্দ্দিকে খুব উঁচু পাহাড়; তার উপরে খুব বড় বড় গাছ উঠে পরস্পরে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে নীচের আলোকটুকু সমস্ত নিঃশেষ করে নিয়েছে। একধারে একটি স্বচ্ছ-তোয়া ছোট্ট হ্রদ। সামনের দিকেই পর্ব্বত-গাত্রে একটি ছোট্ট মন্দির; তাতে বিগ্রহমূর্ত্তি। তার উপরে বহুদূর অবধি পাহাড় উঠে গেছে। অনেক উপরে দুটি কৌপীন-পরিহিত সন্ন্যাসী বসে আমাদের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে আছে। মন্দিরের পাশের একটি ঘর থেকে একজন বেরিয়ে এলেন। আমরা তাঁকে পেয়ে সেখানকার সব কথা জানতে লাগলুম। উপরের সেই সন্ন্যাসী দুজন আমাদের দিকে অবাক হয়ে চাইতে লাগলো। সেই লোকটিকে আমাদের প্রথম প্রশ্ন হলো—এখানে কেউ থাকে কি না? সে লোকটি বল্লে "আমি থাকি আর পূজারী থাকে; আর নাগা সন্ন্যাসীরা থাকে। এখানে ঐ মন্দিরে নিয়মিত পূজা হয়—মহারাজার ব্যবস্থা আছে।'

"শ্রীমান বন্দুক লক্ষ্য করেছে"

তার পরে 'বাঘ এখানে দেখা যায় কি না?' সে বল্লে "কেন দেখা যাবে না? এই হ্রদে জল খেতে আসে। আর তারা কাছেই ত থাকে। সন্ধ্যার পরই তাদের আওয়াজ শোনা যায়"। আমরা সেই জলাশয়ের নিকটে গিয়ে তার জল স্পর্শ করলুম। তাতে অগণিত মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে শ্রীমান বল্লে "কেমন মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে।" অমি প্রভুদয়ালজী একটু খোঁচা দিয়ে বল্লেন "তোমরা এমন নিষ্ঠুরভাবে কেমন করে যে জীবহত্যা ক'রে উদর পূরণ করো তা বলতে পারি নি।" শ্রীমান বল্লে "আরে স্যার জগদীশের নিয়মানুসারে তোমরাও আর বাদ পড়ো নি।" যাক, সে অপ্রিয় প্রসঙ্গটাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লুম "এবারে ফটো তোলা যাক্।"

মহারাজার শৈলবিহারে

এ কথায় সকলে ব্যস্ত হ'য়ে সুন্দর একটা স্থান দেখে ফটো তোলাবার জন্ম প্রস্তুত হলাম। একটা ছোট্ট দুর্ঘটনার ফলে আমাদের ছবি প্রায় চলচ্চিত্রে পরিণত হয়েছিল আর কি! রাধাকিষণজীর এক হাত আমার হাতের মধ্যে ছিল; আর অপর হাত ছিল মিঃ বেঞ্জামিনের কাঁধের উপরে। আর তাঁর চরণযুগল যে বহুদিন-সঞ্চিত প্রস্তরবক্ষস্থিত পিচ্ছিল শেওলার উপর ছিল তা কেউই জানতে পারি নি। Camera Exposure শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাধাকিষণজীর পা-দুখানি স্খলিত হ'লো। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুজনকে নিয়ে তিনি একেবারে হ্রদাভিমুখে ধাবমান। তিনজনেই একই সময়ে প্রাণপণ শক্তিতে দেহের গতি সংযত ক'রে কোনও প্রকারে সেই তুষারশীতল জলে অবগাহন ও পার্শ্বস্থিত প্রস্তরের আঘাত থেকে রক্ষা পেলাম। বিভিন্ন অবস্থায় আরও দুখানি ছবি তুলে আমরা সেখান থেকে ফেরবার উদ্যোগ করলুম। প্রকৃতির এই শান্ত গম্ভীর ছবি দেখে চিন্তার ধারা বেশ একটু বদ্‌লে গেল। ভাবলুম, এখানেই মনুষ্য জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে যেন প্রকৃতি ও তার বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও প্রকৃতির কলহাস্যময়ী ছবি দেখে বালকের চপল আনন্দের কথা মনে করিয়ে দেয়। আবার কোথাও তার এই রকম গাম্ভীর্য্য চোখে পড়লে প্রৌঢ় জীবনের চিন্তা ও দায়িত্বপূর্ণ অচঞ্চল অবস্থার কথা মনে পড়ে। যাক, অতঃপর সেই মন্দিরস্থ বিগ্রহ দেবকে, উপস্থিত সন্ন্যাসীদের ও সেই বনদেবীকে যথাযোগ্য প্রণাম করতে করতে মটরের কাছে ফিরে এলুম। প্রভুদয়ালজী মটরে উঠে বসেছেন, রাধাকিষণজী উঠ্‌ছেন, আমি উঠবো উঠবো কর্চ্ছি, মিঃ বেঞ্জামিন লুকিয়ে আমাদের একটা ছবি নেবার চেষ্টা করছে; আর শ্রীমান্ বন্দুকটা নিয়ে আপশোষ কর্চ্ছে "বন্দুকটাই খালি কিছু আহার পেলে না"—এমন সময়ে সামনের সেই জাওয়ার ক্ষেতটার কিয়দংশ প্রবল-বেগে আলোড়িত হ'য়ে উঠলো; আর আমাদের সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলে। দেখলুম একটা বড় 'বুনো শোর'। আমি ত দেখেই আঁতকে উঠে যা হয় একটা তুলে নিয়ে আত্মরক্ষা কর্ত্তে প্রস্তুত—অবশ্য কার্য্যকালে কি কর্ত্তুম বলতে পারি না। শ্রীমান বন্দুক লক্ষ্য করেছে; অমনি মিঃ বেঞ্জামিন ভয়ে কি না তা জানি না Cameraর কল টিপে দিয়েছেন। শূকর ত পালিয়ে গেল; কিন্তু সাহেবের কার্য্যকলে ক্যামেরার লেন্‌স্ তার কাজ কর্ত্তে ভোলেনি—আমার সেই ভয়বিহ্বল মুখের একটা ছবি তুলে নিলে। আর এ কাহিনী টেনে টেনে বাড়াব না। দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট তাঁর পুরীর শান্তি বিধ্বস্ত করার অপরাধ

ক্ষমা করবার প্রার্থনা জানিয়ে তাঁর চরণ উদ্দেশে বার বার শির নত ক'রে আমরা গাড়ীতে উঠে বসলুম। যে যেমন এসেছিলুম সেই রকমই বসা হ'লো। বুইক আগে চলে গেল। আমরা তার চক্রোদ্গত ধূলো থেকে আত্মরক্ষা কর্‌বার জন্য একটু পেছিয়ে পড়লুম। সাহেবের সঙ্গে সমাজ, ধর্ম্ম, দেশ, বিদেশ, জাতি, ভাষা ইত্যাদি নানা বিষয়ের গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে আর মাঝে মাঝে সেই সব রাস্তা, পাহাড়, খাদ, জঙ্গল, কৃষকের কুটীর, ক্ষেত্র ইত্যাদি দেখতে দেখতে ফিরতে লাগলুম। তখন বেলা ১০-৩০ মিঃ—সূর্য্য বেশ প্রখর ভাবে কিরণ দিচ্ছিল। যে দৃশ্য জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোকে স্নান ক'রে নয়নমুগ্ধকর শান্ত শোভা ধারণ করেছিল, তাই আজ প্রখর মার্ত্তণ্ড-কিরণে দগ্ধ হ'য়ে চক্ষু ঝল্‌সে দিতে লাগল। ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল; আর সঙ্গে সঙ্গে দিনকর তার প্রখরতা নিয়ে আমাদের মাথার উপর এসে আমাদের পুড়িয়ে দিতে বদ্ধ-পরিকর হ'য়ে উঠতে লাগলো। রাস্তা আর ফুরোতে চায় না। তখন কেবলি চোখ ফিরে ফিরে অপ্রিয়দর্শন সেই পরিচিত দুর্গটাকে খুঁজতে লাগলো। এই পাহাড়টা পার হলেই বুঝি সেই পাহাড়ে দুর্গটা সাম্‌নে ভেসে উঠবে। আঃ, এ যে পাহাড়ের আর শেষ হয় না। এখন দেখছি বিপদ দেখে সেই গোয়ালিয়র দুর্গটাও প্রতিশোধ নিতে আত্মগোপন করেছে। সব দুঃখেরই শেষ আছে, এই ভেবে কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলুম। কতক্ষণ এই রকম ছিলুম জানি না—হঠাৎ একটা 'ধাক্কা খেয়ে চোখ চেয়ে দেখি, গাড়ী মোড় ফিরতেই সেই গিরিদুর্গ চোখের সাম্‌নে তার কালো রূপ নিয়ে বেরিয়ে প'ড়লো। আঃ! বাঁচলুম! এই ত এসে পড়েছি। মনে মনে বোধ করি সেই হতভাগা দুর্গটাকেও একটা ধন্যবাদ দিলুম। ক্রমে গাড়ী সহর পার হ'য়ে মিলের ফটকে প্রবেশ করে যথাস্থানে এসে দাঁড়াল। বেলা তখন ১২-৩০ মিঃ। ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে গাড়ী থেকে নামলুম। মনের ভেতর তখন সমস্ত দৃশ্যের ছবিটা বেশ পরিস্ফুট রয়েছে। একটা আনন্দ-মিশ্রিত ক্লান্তি নিয়ে ধীরে ধীরে আবার যথাস্থানে উপস্থিত হলাম।

আশ্রিত

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

অশ্রু-ছলছল আঁখি, আশ্রিত দুজন
ম্লান, নতমুখ,—তারা ভাই আর বোন্;
হৃতকর্ম্ম গৃহস্বামী আমি কহি, "শোন্,
এখানে হবে না আর—।" অস্ফুট কূজন
সমস্বরে শ্রুত হ'ল—"কোথা তবে যাব?"
ক্রোধ হ'ল—"ভেবেছিস্ তোদেরে খাওয়াব
আমরা উপোসী থেকে?" বালিকার দিকে
নির্দ্দেশি' স্ত্রী কহিলেন, "চাটুয্যে গিন্নীকে
বলেছি, তাঁদের বাড়ী হতভাগী র'বে,
গতর খাটিয়ে খেলে দুটি ভাত হবে।"
বালিকা—দ্বাদশী মাত্র। কিন্তু কি উপায়
ইহা ছাড়া? পত্নী-পুত্রে মোরা চারজন,—
দুইদিন অর্দ্ধাশনে আছি—অনশন
ধ্রুব আজ।—নিঃস্ব.—নিরুপায়!

বালক—সে নবমক। আমি কহিলাম,
"অনাথ-আশ্রম আছে,—না হয় দিলাম
রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে ওরে; কিন্তু ওরা দুটি
ভাই-বোন্—আহা! একাশ্রয়-বৃন্তে ফুটি'
আছে দুটি পুষ্প যেন যুক্ত পরস্পরে;
শুকাইয়া যাবে না কি ছাড়িয়া এ-ওরে?"

পত্নী ফিরালেন মুখ। ভা'য়েরে বোন্‌টি
আরো কাছে টেনে নিল ; অঞ্চল-কোণটি
চাপিয়া ধরিল ভাই তাহার দিদির।
নিরুপায়, সত্য,—কিন্তু—? নিষ্ঠুর বিধির
কি-জানি-কি মনে আছে!—যাহা হয় হবে।
কহিলাম, "কাজ নাই,—ওরা যাক্ তবে।"
কহিলেন তিনি, "যাহা স্থির তুমি কর,
তা'ই হবে।—আশ্রিত যে আপনারো বড়ো :"

গয়লা, কয়লা-ওলা, মুদী—একে-একে
এল রাঙাইয়া চোখ, চোখা চোখা শর
উঁচাইয়া তীক্ষ্ণ তিরস্কারে ;—তারপর
বাড়ীওলা-প্রতিনিধি দুষ্ট দরোয়ান
করে' গেল রুষ্ট অপবাক্যে অপমান
বহুতর।—সহিলাম। গণ্ডগোল দেখে,
একাধিক প্রতিবেশী আসি' দয়া করে'
উপদেশ-অগ্নি সহ দাঁড়ালেন দোরে
মুখে সাধু-হাসি। একজন কহিলেন,
"সঞ্চয় করনি কিছু সময় থাকিতে,
ভরিয়া রেখেছ গৃহ ঋণের ফাঁকিতে
পরিণামজ্ঞানহীন—।" ইন্ধন দিলেন
পার্শ্ববর্ত্তী—"মূর্খ আর দেখিনি এমন!
কর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম আছে—আশ্রিত-পালন!"

ও-বাড়ীর বর্ষীয়সী দয়াময়ী খুড়ী
জড়তা ভাঙিয়া—তুলি' হাই, দিয়া তুড়ি,
বারান্দায় উঠে' বসি' কহিলেন, "বাবা,
বয়সে কচিটি নও, এদিকে ত' হাবা!
হাভাতে হাঘরে দুটি—কি এত আপন?
বৌটিও ভারী কাঁচা!—নাড়ী-ছেঁড়া ধন
নাড়ী শুকাইয়া মরে,—সোয়ামী বেকার,—
এত কি দরদ, বাপু? বাড়াইয়া ভার
স্বেচ্ছায় সংসার-ডুবি!" খুড়ী দয়াময়ী
দয়া করি' গেলেন চলিয়া। আমি রহি
কিছুক্ষণ নির্ব্বাক আনত,—চাহি ফিরে'
গৃহিণীর মুখে,—কহি পরে ধীরে ধীরে,
"কাজ নাই,—ওরা যাক্, এই হ'ল ঠিক্।"
প্রত্যুত্তরে দীর্ঘশ্বাস।—এ জীবনে ধিক্!

বাল্যে মা'র মুখে শোনা সে এক কাহিনী:
সেই রাত্রে স্বপ্নে দেখি।—'এক পরিবার
নদী-পথে তীর্থযাত্রী ; সেই সাথে আর
এক দীন দূরাত্মীয়—অনন্য-আশ্রয়।
তারপর একদিন—তীর্থ আর নয়
বেশী দূর,—দিনার্দ্ধের পথ। প্রবাহিনী
খরস্রোতা, আবর্ত্তসঙ্কুলা।—সহসাই
আবিষ্কৃত হ'ল, তরী-তলে কোন্ ঠাঁই
ছিদ্র কোথা যেন! ভার-মোচনের ছলে
আশ্রিত সে পরিত্যক্ত হ'ল সেই স্থলে
জল-ঘেরা অর্দ্ধোত্থিত ক্ষুদ্র এক চরে,—
দৃষ্টি না ফিরাতে গেল কুম্ভীর-উদরে।
কিন্তু বাঁচিল না তরী—।' জাগিনু চীৎকারি',-
"ওরা থাক্, ওরা থাক্,—আশ্রিত আমারি!"

নবীন যুবক

প্রবোধকুমার সান্যাল

২

লক্ষ্যহীন হয়ে রাস্তায় ছুটছি। রক্তের সঙ্গে রক্তের যে বন্ধন ছিল এতদিন, আজ যেন সমস্তটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কেন যে বার বার চোখে জল আসছে তা বেশ জানি। অন্যায় অবিচার পেয়েছি ব'লে নয়, জগতে একমাত্র পরমাত্মীয়কে হারালাম ব'লে নয়, কিন্তু আজ সত্যি বিচ্ছেদের আঘাত বুকে বাজল—সেই কারণে। উদার ঔদাসীন্যে সবাইকে মন থেকে ত্যাগ করেছি বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আজ নাড়িতে যখন টান পড়ল তখন চেয়ে দেখি, রক্তের বন্ধন কত জটিল। অশ্রু সম্বরণ করতে করতে প্রথমেই মনে হোলো, অনন্ত শূন্যের দিকে কে যেন আজ অকস্মাৎ প্রচণ্ড টান দিয়ে আমাকে ছুড়ে দিল, কোথাও আর কোনো অবলম্বন নেই।

মুখের ভিতর থেকে একটা আওয়াজ ছুটে আসছে, সেটা বোধ হয় কান্নার, প্রাণের একটা অস্ফুট আর্তনাদ। বোধ হয় এই কথাটাই প্রকাশ করবার চেষ্টা করছি, পিতা, তোমার এই সর্বোত্তম অভিশাপ যেন মাথায় নিয়ে চলতে পারি! তোমার দয়া ভিক্ষা নিয়ে তোমাকে যেন কোনোদিন অপমান না করি।

কিন্তু এবারে কোন্ দিকে যাব? এ যে অবারিত মুক্তি, ছায়ালেশহীন অনাবৃত রিক্ততা! স্থায়ী আশ্রয় একটা বাঁধা ছিল বলেই যেখানে সেখানে এতদিন বেপরোয়া ঘুরে বেড়িয়েছি, পড়াশুনো করেছি, ভাবের স্রোতে গা ভাসিয়েছি, নানা তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি, কিন্তু বাঁচতে হয় কেমন ক'রে তা ত' কই শিখিনি? জীবন সংগ্রামের একটা অত্যন্ত স্থূল সমস্যা এই রৌদ্রক্লিষ্ট পথের উপর এক বিরাট ক্ষুধার্ত মূর্তি নিয়ে এসে দাঁড়াল—জীবন-বিধাতার বক্র বিদ্রূপের মতো।

তা হোক, মানব না শাসন, মানব না স্নেহ, স্বীকার করব না এই তাসের দেশের সংরক্ষণশীলতাকে,—পথ আমাদের আলাদা। সে পথ নিশ্চিন্ত অনড় পল্লী পার হয়ে এসে মিলেছে দেশের দিকে, দেশ উত্তীর্ণ হয়ে এক বিস্তীর্ণ বিশাল মহাপথের দিকে সে যাবে, আমরা যাবো প্রদীপ হাতে নিয়ে।

কখনো কুণ্ঠিত ভয়ত্রস্ত, কখনো সাহসবিস্তৃত বক্ষ,—এমন অবস্থায় মেসে এসে পৌঁছলাম। কয়েক ঘণ্টায় আমার যেন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। জামায়, কাপড়ে, হাতে, পায়ে যেন একটা অদ্ভুত দারিদ্র্যের ছায়া নেমে এসেছে। সঙ্গতিহীন শক্তিহীন একটা দারিদ্র্য। কোনোরূপে সকলের চোখ এড়িয়ে সোজা নিজের ঘরে এসে ঢুকলাম। এতদিন অনুভব করিনি, নিজেকে পরীক্ষা করিনি, ঐশ্বর্য্যশালীর পুত্র ব'লে মনের কোন্ গোপনে সামান্য দম্ভ ছিল, বিলাসপ্রিয়তা ছিল, একটি নিশ্চিন্ত নির্ভরতা ছিল—কিন্তু আজ? ক্ষুধার অন্ন থেকে বঞ্চিত হলাম ব'লে অস্বাভাবিক অস্থির ক্ষুধা জেগে উঠ্‌ল, অপ্রাকৃত অলৌকিক কামনা বুকের ভিতরে পাক খেয়ে ফিরতে লাগল। মনে হোলো, কিছুই আমার পাওয়া হয়নি, কিছুতেই আমার তৃপ্তি নেই। বাল্যকাল থেকে ঐশ্বর্য্যের আবরণে যে অসন্তোষ আমার মধ্যে চাপা ছিল, আজ সেই আবরণ স'রে যেতেই ভিতরের ভয়াবহ রূপটা স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। ক্ষুধা, অনন্ত ক্ষুধা। অন্নের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা, আত্মার ক্ষুধা। আমার বন্ধুরা—জগদীশ, গণপতি, লোকনাথ প্রভৃতি, দেবতার আকস্মিক অনুগ্রহে যাদের সঙ্গে সমপর্য্যায়ভুক্ত হবার সৌভাগ্যলাভ ক'রে আজ ধন্য হলাম,—তারাও এই ক্ষুধার চক্ররেখায় দিনের পর দিন ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হচ্ছে।

পায়ের শব্দে ফিরে তাকালাম। মেসের ঠাকুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, চান ক'রে নিন্ বাবু, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, এই যাই।

ঠাকুর বললে, আপনি বারণ ক'রে যান না, রোজই একবেলা আপনার ভাত ফেলা যায়···মিথ্যে পয়সা নষ্ট

হ'লে আমাদেরও গায়ে লাগে বাবু। আপনাদের নিয়েই ত আমাদের—

বললাম, আচ্ছা এবার থেকে সাবধান হবো।

ঠাকুর আম্‌তা আম্‌তা ক'রে এবার আসল কথাটা বললে, ম্যানেজারবাবু বলছিলেন এমাসে অনেক খরচ হয়েছে···কাল আপনার টাকাটা দেবার কথা ছিল, যদি এখন দেন্—

বললাম, এখনই ঠিক দিতে পাচ্ছিনে ঠাকুর, তবে আজকালের মধ্যেই···ম্যানেজারবাবুকে বোলো যে—

আচ্ছা বাবু, তাই বল্‌ব। আপনি এবার চান্ করতে যান্, চৌবাচ্ছায় বোধ হয় জলও ফুরিয়ে গেল।

স্নান এবং আহারাদির পর বেরোবার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপরাহ্ণে ঠাকুরকে একবার ডেকে পাঠালাম। লোকটা ঘুমচোখে উঠে এসে দাঁড়াল। বললাম, এই স্যুট্‌কেসটা নিয়ে চললুম ঠাকুর, শীঘ্র এখন ফিরতে পারব কিনা সন্দেহ, এই যা কিছু আসবাবপত্র আমার রইল সমস্ত বিক্রি ক'রে তোমাদের টাকাকড়ি তুলে নিয়ো ঠাকুর।

সে কি কথা বাবু?—লোকটা পরিষ্কার চোখে তাকাল। আমি তার সঙ্গে পরিহাস করছি কিনা সে লক্ষ্য করতে লাগল।

হ্যাঁ, টাকা আমার পক্ষে এখন দেওয়া কঠিন। শীঘ্র দিতে পারব ব'লে মনেও হচ্ছেনা। বুঝতে পেরেছ?

ঠাকুর চোখ কপালে তুলে বললে, এ যে অনেক টাকার মাল বাবু?

তা হোক, ওসব আর আমার আর দরকার নেই।

কিন্তু বিশ তিরিশ টাকার জন্যে এত টাকার জিনিস-পত্র ছেড়ে যাবেন?

বাকি টাকা তোমার কাছে রেখে দিয়ো, কোনো এক সময় এসে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। আচ্ছা, আমি এখন চললুম।—ব'লে কোনো উত্তর এবং আলোচনা শোনবার আগেই স্যুট্‌কেসটা হাতে নিয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

পথে নামতেই বাধা পড়ল। জগদীশ আর লোকনাথ হাসতে হাসতে আসছে। প্রথমেই আমার হাতের দিকে তাদের নজর পড়ল। কাছে এসে জগদীশ বললে, হাতে স্যুটকেশ যে? আবার কোনো স্ত্রীলোককে নিয়ে পালাচ্ছিস নাকি রে?

তার সুন্দর হাসিতে মনের অবরুদ্ধ গ্লানি যেন একটি মুহূর্ত্তেই হাল্‌কা হয়ে গেল। হেসে বললাম, রাজকুমার বিবাগী হয়েছেন। পিতার রাজ্য থেকে তাঁর চির-নির্ব্বাসন দণ্ড!

লোকনাথ আমার সব খবর জানে, তার মুখে চোখে নিরুপায় ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠ্‌ল। আমাকে সহসা সান্ত্বনা দেবার আর কোনো পথ না পেয়ে সে কেবল ভারী স্যুটকেশটা হাত বাড়িয়ে টেনে নিল।

পথে চলতে চলতে জগদীশ বললে, কুলে কালি দিয়ে এলেম তোমার রস আর রসদের টানে, হে প্রাণ-বল্লভ, তোমার বিহনে যে একূলে ওকূলে দুকূলে গোকুলে আর ঠাঁই পাব না। আমাদের উপায়?

সকলের হাসিতে পথ মুখরিত হতে লাগল। হাসি থামলে সকল কথা বললাম। জগদীশ বললে, একটা মেয়ের জন্যে এই কাণ্ড? হায়রে, জাতও গেল, পেটও ভরল না! এখন কোথায় যাবি? চল্ আপাতত স্যুট্‌কেসটা আমার ওখানে রেখে আসবি। ভয় পাসনে, আয়।

জগদীশ থাকে তার এক ছাত্রের বাড়ীতে। দুটি ছোট ছেলেকে পড়ানোর বিনিময়ে তার আহার এবং বাসস্থান জুটে যায়। ভোর বেলা মাত্র ঘণ্টা দুই সে ছোট ছাত্র দুটিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। লোকনাথের আড্ডা তার এক দূর সম্পর্কের মাসির ওখানে, সেখানে বন্ধুবান্ধবদের যাতায়াতের ভারি অসুবিধা। ডাকতে গেলেই মাসি তেড়ে এসে বলেন, বেনোজল ঢুকে বেড়াজল টেনো না বাবা; তোমরা ভবঘুরে, কাজকর্ম্ম নেই, আমার বোনপোটার মাথা খাও কেন গা?

অতএব সে-দরজাও বন্ধ। সত্য কথা বলতে কি, কোনো গৃহস্থই আমাদের স্থান দিতে রাজি নয়, আমাদের ভিতরে নাকি বন্যার উন্মাদনা আছে।

জগদীশের বাসা হয়ে যখন আমরা পথ ধরলাম, তখন বিকাল হয়েছে। রাজপথ অগণ্য লোকের ব্যস্ততায় মুখরিত। জানি আমার সদ্য আপতিত দুর্ভাগ্যের জন্য জগদীশ আর লোকনাথ অত্যন্ত চিন্তিত

হয়ে চলেছে, তাদের মুখে সান্ত্বনার কোনো ভাষা নেই। তারা জানে জীবনসংগ্রামের প্রকৃত চেহারাটা, তারা জানে দারিদ্র্য, তারা জানে অন্নহীনের যন্ত্রণা। আমার কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে একসময় করুণ রসিকতা ক'রে জগদীশ বললে, সোমনাথ, বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য করবার আগে নতুন একজোড়া জুতো আদায় ক'রে নিতে হয় রে!

বললাম, চলো জগদীশ, সবাই মিলে কাজ খুঁজে বেড়ানো যাক্। বাঁচতে হবে ত?

তুই বড়লোকের ছেলে, কি কাজ জানিস?

কিছু না জানি কুলিগিরিও ত করতে পারব?

লোকনাথ এইবার বিদীর্ণ হয়ে উঠ্ল। বললে, ননসেন্স্, কুলিগিরি ক'রে ভদ্রঘরের ছেলেকে যদি বাঁচতে হয় তবে আত্মহত্যা করা ঢের ভালো।

জগদীশ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য সহকারে বললে, কেন, 'ডিগ্‌নিটি অফ্ লেবর্!'

তোমার মাথা!—লোকনাথ উচ্চকণ্ঠে বিকৃতমুখে বলতে লাগল, মাসির অনাদরের একমুঠা ভাত, অপমানের অন্ন সেও আমার ভালো, কিন্তু—কিন্তু মজুরি আমরা করতে পারব না জগদীশ। কি জন্যে সম্রান্ত ঘরে জন্মেছি, কি জন্যে শিখেছি লেখাপড়া, কি জন্যে আমাদের শিক্ষা আর রুচি উন্নত হয়েছে? সে সব ভুলে গিয়ে সামান্য কুলির পেশা নিয়ে নিজের টুঁটি টিপে মারব? জলাঞ্জলি দেবো সব? বাজে কথা বলিসনে জগদীশ।'

সামান্য কুলি বলছ কেন? সবাই কি আমরা সমান নয়?

না, সবাই সমান নয়। এটা তোমার ধারকরা পশ্চিমী বুলি। একজন কুলি নিতান্ত সামান্য জীব, সে কেবল কায়ক্লেশে নিজের গতর খাটিয়ে বাঁচে, সেটা নিতান্তই টিঁকে থাকা কিন্তু আমরা কি ঠিক তেমনি বাঁচাই বাঁচতে চাই জগদীশ, আমাদের জীবনে কি আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না? মজুরি ক'রে বাঁচাটা ডিগ্‌নিটি অফ লেবর্ হ'তে পারে কিন্তু সেটা শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের পক্ষে খুব বড় পরিচয় হোলো না জগদীশ। একটা পিঁপড়ে পর্য্যন্ত খাবার জিনিস আহরণ করে এনে খায়, প্রকৃতি তাকে নিজের নিয়মে খাটিয়ে নেয়। কিন্তু—কিন্তু আমরা কি তাই পারি? বেঁচে থাকা ছাড়া কি আমাদের আর কোনো কাজ নেই?

লোকনাথের উত্তেজিত মুখের দিকে চেয়ে জগদীশ বলতে লাগল, এটা তোমার আভিজাত্যের কথা হোলো লোকনাথ।

লোকনাথ বললে, তার জন্যে লজ্জিত নই। শ্রেণী-বিভাগ শেষ পর্য্যন্ত একটা থেকেই যায়। কেউ কাজ করে, কেউ বা কাজের পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু ছাগলকে দিয়ে যব মাড়াবার চেষ্টা হলেই সমাজে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। আমাদের রক্তের ভিতর দিয়ে যে ভদ্রশিক্ষার ধারা বয়ে এসেছে, দিনমজুরিটা তার স্বভাবের মধ্যে নেই। মাথায় মোট বয়ে বাঁচাটা আমাদের ভয়ানক অপমৃত্যু। যাক গে, এ আমি তোমাকে ভালো ক'রে বোঝাতে পারব না।

পথে হাঁটতে হাঁটতে জগদীশ বক্রকটাক্ষে হেসে বললে, সোমনাথ, শুনচিস ত লোকনাথের কথা? এ সেই মানুষ, স্ত্রীর সঙ্গে যে অশ্লীল ভাষায় চিঠি চালাচালি করে, যে-লোকটা স্ত্রীর চেয়ে বৌদিদির ভক্ত বেশি। তোর দিদি আর বৌদিদির সংখ্যা কতগুলো রে?—ব'লে সে এগিয়ে এসে লোকনাথের কাঁধে হাত রাখ্ল।

লোকনাথ বললে, যাও, যখন তখন ইয়ার্কি করো না। মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, একটা চাকৃরি বাকৃরি না হ'লে আর কিছু ভালো লাগছে না ভাই।

কেন, তোর সেই দৈনিক খবরের কাগজের 'সাব-এডিটরিটা' হোলো না?

জানিনে, হয়ত হোতেও পারে। চারিদিকে শকুনির দল বসে আছে, তার মাঝখান থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। গোপনে সুপারিশ যোগাড় ক'রে বেড়াতে হচ্ছে।

কথা কইতে কইতে তারা চলেছে, আমি আছি পিছনে পিছনে। ঠিক নেই কোন্‌দিকে চলেছি, উদ্দেশ্য নেই, লক্ষ্য নেই। সান্ধ্যভ্রমণ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিকর, ভ্রমণ করি আমরা সারাদিন—জলে, রৌদ্রে ঝড়ে, হিমে, বিশ্রাম নেবার অবকাশ আমাদের নেই। বিশ্রাম যখন নিই তখন আর উঠিনে, অনাসক্ত বীতশ্রদ্ধ

বিশ্রাম। ভিতরে একটা অভাব রি রি করছে, বলতে পারিনে সেটা কী, বোঝাতে পারিনে ঠিক কী চাই, ঠিক কেমন ক'রে বাঁচলে খুসি হই তা আমার জানা নেই। অনেকের অনেক জীবন কাহিনী পড়েছি, গল্পে উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার চরিত্রের ক্রমবিকাশ অনুসরণ করেছি, জীবন-বৈরাগীর নির্ব্বিকার নিরাসক্তির কথাও জানি, কিন্তু এই যে সম্মুখে বিপুল জীবনবাহিনী—এর ভিতর দিয়ে আমাদের কোন্ পথ? অন্ধকার অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াতে ভয় করে, জানিনে সেখানে কোন্ লিপি লেখা আছে! এ কথা মিথ্যা নয়, জনসাধারণের ভিতরে আমরা অসাধারণ। সবাই খুসি হয়ে গার্হস্থ্যের গণ্ডীর ভিত'র স্বেচ্ছাবন্দী হয়, আমাদেরও তাই হবার কথা,—স্ত্রী, সন্তান, অর্থ, যশ, আরামের সংসার,—কিন্তু তারপর? তারপর অনন্ত মৃত্যুস্রোতে ভেসে যেতে হবে, এই কি পরম পরিণাম?

কেবলমাত্র বাঁচা আর কেবলমাত্র মরা, এই কি শেষ কথা? মানুষের সমাজের চিরপ্রচলিত অভ্যাসের অনুকরণ করতে কিছুতেই মন উঠে না, সেই অভ্যাসকে নিষ্ঠুর উৎপীড়নে ভাঙবার জন্য আত্মবিদ্রোহ জেগে ওঠে। কানে এখনো ফুটছে পিতৃদেবের কথাগুলো, প্রাচীনের অচল জড়তার চেহারাটা যেন আজ প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি। আমরা নতুন নই, নবীন। জীবন-নির্ব্বাহের অভ্যস্ত ধারাটার প্রতি নবীন মনের এসেছে সংশয়, এসেছে গূঢ় অবিশ্বাস। বর্ত্তমান যুগের অন্তরে যে সন্দেহের জিজ্ঞাসা বারে বারে ভেসে উঠছে, নবীন কালের মানুষ তারই প্রতিরূপ।

অকস্মাৎ নূতন গলার আওয়াজে চমক ভাঙল। চেয়ে দেখি চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। একখানা মোটর কাছে এসে দাঁড়াল। ফিরে দেখি আমাদের সুপ্রসিদ্ধ কবি বাণীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। জগদীশ আর লোকনাথ হেসে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাণীপদ তার গায়ের উড়ানি সামলে গাড়ী থেকে নাম্‌ল। স্নিগ্ধ হেসে মধুর কণ্ঠে বললে, ভাগ্যি দেখতে পেলুম তোমাদের, আমাকে এমন দলছাড়া ক'রে দিলে কেন বল ত? তোমরা বেড়াও চাকরি খুঁজে, আমি বেড়াই তোমাদের খুঁজে।

তার সুন্দর হাসি, সুন্দর কণ্ঠ, সুন্দর আচার ব্যবহার। তার চেহারায় অভিজাত সমাজের পালিশ, পরিচ্ছন্ন তার সাজসজ্জা, ঝুম্‌কো ফুলের গোছার মতো তার ঘন কালো চুল,—রেশমের মতো সেই চুলের ঐশ্বর্য্য ও শ্রী। বিশাল দুটি চোখ একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবে ভরা, আপন গভীরতায় আত্মগত। সে এত সুন্দর বলেই আমাদের মধ্যে তার ঠাঁই নেই। কাছে এসে দাঁড়াল কিন্তু তার বলিষ্ঠ সুবিস্তৃত দেহটা আমাদের মাথা ছাড়িয়ে উঠ্‌ল। শরীরের গঠনের আভিজাত্যটা তার যশ ও প্রতিষ্ঠায় অনেকখানি সাহায্য করেছে। কোনো কোনো সাপ্তাহিক কাগজ বলে, বাণীপদ নাকি নবীন যুগের প্রতিভা।

জগদীশ বললে, সাহিত্যিক, তোমার রুচি আর সৌন্দর্য্যবোধ অত্যন্ত উঁচু সুরে বাঁধা, তোমার প্রকৃতি আর রসজ্ঞান পাছে কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় তাই ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলি। কিছু মনে কোরো না।

বাণীপদ ক্ষমাসুন্দর হাসি হেসে বললে, মনে করাকরির কথাটা আপাতত চেপে রেখে দাও। অনেক সময় পাওয়া যাবে। এসো, কোন্‌দিকে যাবে বল?

লোকনাথ বললে, তোমার পথে কি আমাদের নিয়ে যেতে চাও নাকি? আমরা তোমার অনুসরণ করলে খুসি হও?

বাণীপদ বললে, এ ত' মন্দ নয়, আমার অবস্থাটা অভিমন্যুর মতো হয়ে দাঁড়াল দেখছি। কোথায় আমার অপরাধটা জম্‌ল বল দেখি?

জগদীশ বললে, অপরাধ করোনি জীবনে এইটেই বোধ হয় তোমার বিরুদ্ধে এদের নালিশ। কুসুমাস্তীর্ণ পথ দিয়ে তোমার যাতায়াত তাইতেই বোধ হয় আমাদের রাগ। রাগ আর চাপা বিদ্বেষ।—ব'লে সে হেসে উঠ্‌ল।

আমি এবার বললাম, তোমার 'কুঞ্জবন' গল্পটার খুব সুখ্যাতি হয়েছে চারিদিকে, ব'লে রাখি। গল্পটা প'ড়ে এই জগদীশই সেদিন তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাচ্ছিল। সত্যি, নতুন লেখকদের মধ্যে তুমি অদ্বিতীয়!

বাণীপদ বললে. কেমন জগদীশ, মনে মনে সায় দিচ্ছ ত?

বরাবরই দিয়ে থাকি।—জগদীশ বলতে লাগল,

বিধাতার বরে তুমি একখানা আয়না পেয়েছ, তোমার সেই আয়নায় আমাদের রহস্যময় প্রকৃতির সত্য চেহারাটা দেখতে পাই, খুসি হয়ে বলি, তুমি দীর্ঘজীবী হও। কিন্তু তুমি কাছাকাছি এলেই মন বিরূপ হয়ে ওঠে, সুদূর ঔদাসীন্যের রাজ্যে তোমার বাস, অনেক চেষ্টাতেও আমরা সেখানে পৌঁছতে পারিনে। সকলের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে ভেবেছ সকলকেই তুমি পাবে, কিন্তু পাওনি, আজ সবাই তোমাকে ত্যাগ করেছে।

বাধিত হলুম।—বাণীপদ বললে, এখন আমার ওখানে এসো, চা খাওয়াবো। মিষ্টান্ন না দিলে তোমাদের কণ্ঠ মধুর হবে না।

লোকনাথ বললে, ভয় করে ভাই বাণীপদ, তোমার সমাজে যাওয়া আমাদের অভ্যেস নেই। তোমার সমাজে সবাই তোমারই উপগ্রহ, তারাও সব ছোট-বড়-মাঝারি বাণীপদর দল। কেতা-দুরস্ত মিহি চাল-চলনের সৌখীন সম্প্রদায়ের ঝাঁক। অতি ভদ্রতা আর অতিরিক্ত সহানুভূতি সেখানে আমাদের অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে, গোপন তাচ্ছিল্য প্রকাশ পাবে প্রকাশ্য আলাপের আতিশয্যে।

জগদীশ বললে, এমন সুবিধে আর কখনো পাইনি ভাই বাণীপদ, পথে একলা পেয়ে তোমায় ঠুকে নিই। ভক্ত টক্ত কাছাকাছি কেউ এখন নেই তাই বাঁচোয়া। তোমার চেয়ে তোমার অনুচরেরা এককাঠি সরেশ,—বুঝতে পেরেছ? তোমার একটা লেখার সমালোচনা করতে গিয়ে সেদিন তাই দেখা গেল। নবীন লেখক তুমি, তাই তোমার ভক্ত জনকয়েক কাঁচা তরুণ। ব্রাহ্ম সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন এক ছোক্‌রার সঙ্গে আমার প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম, সে জান্‌ত না আমি তোমার পরিচিত।

বাণীপদ প্রমুখ আমরা সবাই হাসছিলাম।

অবশেষে সকলে তার মোটরে উঠতে বাধ্য হলাম। জগদীশ হেসে বললে, এমন মোটরে আমাদের চড়বার কথা নয় বাণীপদ, চাপা যাবার কথা।

সোফার গাড়ী চালাল। পথ বেশি দূর নয়, বাণীপদর বাড়ী আমরা সবাই জানি, জানে অনেকেই, কিন্তু কোনোদিন যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। না যাওয়ার কারণটা স্পষ্ট নয়, কিন্তু যেতেও বাধে। আমাদের সঙ্গে বাণীপদর যে প্রভেদ, সেটা যাতায়াতের দ্বারা সমান ক'রে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন।

তার বাড়ীর গেট্ পার হয়ে গাড়ী ভিতরে এসে দাঁড়াল। কলিকাতা শহরের এত গোলমাল, এত আন্দোলন—সমস্তটা যেন বিশেষ একটি মন্ত্রের স্পর্শে সহসা শুদ্ধ হয়ে গেল। মনে হোলো এ বাড়ীটা যেন শহর থেকে, দেশ থেকে, জনসাধারণের সমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন, এ বাড়ীর মানুষরা যেন ভাবে-ভাসা রূপকথার বিচিত্র মানুষ, এরা খায় না, আমোদ-প্রমোদ করে না, এদের নিশ্চিন্ত নিভৃত জীবনে কোথাও ঘাত-সংঘাত নেই,—প্রথম দৃষ্টিতে এদের বিসদৃশ শান্তি-প্রিয়তাটাই কেবল চক্ষুকে পীড়া দিতে থাকে। পরস্পরের কথাবার্ত্তা বন্ধ হয়ে গেল।

গাড়ী থেকে নেমে আমরা অন্দরের দিকে চললাম, বাণীপদ আমাদের আগে আগে। দেউড়ির দারোয়ান সহসা উঠে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকাল, সম্ভবত আমাদের লক্ষ্য ক'রে নয়। বাণীপদর গায়ের চাদরের মিষ্ট গন্ধটা আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আমরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে বোধ হয় এই কথাটাই ভাবছিলাম, আমাদের গায়ের জামা কাপড়গুলি এ বাড়ীতে প্রবেশ করার উপযোগী নয়। আর একটু প্রস্তুত হয়ে এলেই হয়ত ভালো হোতো।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেয়ালের দুধারে নানা রকম ছবি টাঙানো। প্রাচীন শিল্পকলার অনুসারী সেই রহস্যময় চিত্রগুলির স্পষ্ট অর্থও আমরা জানিনে, চেয়ে চেয়ে একটি নির্ব্বোধ বিস্ময় জাগে। সেই ছবিতে মনস্তত্ত্বের জটিল অর্থভরা, আপাত দৃষ্টিতে যদি সেগুলি দুর্ব্বোধ্য মনে হয় তবে সেটা আমাদেরই বোধশক্তির অভাব ব'লে প্রতীয়মান হবে। তাদের নিয়ে আলোচনা করার সাহস নেই আমাদের। বাণীপদর শিল্পজ্ঞান আমাদের বুদ্ধির এলাকার বাইরে। এদের শিক্ষার ধারার সঙ্গে জনসাধারণের মেলে না।

দোতলার চওড়া দালানে উঠে এসে আমরা দাঁড়ালাম। আমরা যেন কিছুতেই সহজ হতে পাচ্ছিনে, পায়ে আসছে জড়তা, জগদীশের মুখে পর্য্যন্ত কথা বন্ধ

হয়ে গেছে। এখানে ওজনকরা হাঁটা, ওজনকরা চালচলন, কথাবার্ত্তায় চুলচেরা মাত্রাজ্ঞান, কেতাদুরস্ত ভাবভঙ্গী। বাণীপদ বললে, ঘরে বসবে তোমরা ?

দালানের চেয়ে ঘর আরো ভয়ঙ্কর। সেখানকার প্রত্যেকটি ছবি থেকে সামান্য আসবাবটি পর্য্যন্ত অটল নীরবতা নিয়ে যেন আমাদের চালচলন বিশ্লেষণ করবার জন্য উদ্যত। কোথাও যেন জীবনের সহজ অবলীলা নেই, একটি শ্বাসরোধ করা যন্ত্রণাদায়ক নিঃশব্দতা মুখব্যাদান করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জগদীশ বললে, থাক্, বাইরেই বসি হে, এখানে হাওয়া আছে।

জগদীশ নিজেই অগ্রসর হয়ে একখানা মার্বল্ টেবলের পাশে একখানা চেয়ারে ব'সে পড়ল, বসতে পেয়ে সে যেন অকূল সমুদ্রে কূল পেয়ে গেল। আমরাও তার দেখাদেখি গিয়ে দু'খানা চেয়ার দখল ক'রে বসলাম। লোকনাথ অন্যমনস্কে একবার পা তুলে বসতে গিয়ে হঠাৎ সজাগ হয়ে আবার পা নামিয়ে দিল। আর যাই হোক, এখানে পা তুলে অশোভন ভাবে বসাটা চলবে না। পাশের চেয়ারখানা খালি রইল, সেখানায় হাতীর দাঁতের কারুকার্য্য করা; এবং সেখানায় যে বাণীপদ এসে বসবে এতে আর সংশয় নেই। এই পার্থক্যটুকু বজায় রাখতে আমরা যেন বাধ্য হলাম।

বাণীপদ আমাদের রেখে ভিতরে গিয়েছিল, এইবার বেরিয়ে এসে বললে, কিছু গানবাজনার আয়োজন ক'রতে ব'লে দিলুম, তোমাদের খানিকটা সময় যদি নষ্ট করি আপত্তি তুলবে না ত ?

তার কণ্ঠের মাধুর্য্য বিশেষ ক'রে আমাকে মুগ্ধ ক'রে দেয়। সকলের হয়ে জবাবটা এবার আমিই দিলাম, আপত্তি আর কি, রাত দশটা পর্য্যন্ত আমাদের কোনো কাজ নেই। দশটার পরে খাবার খুঁজতে যাই।

বাণীপদ ঠিক সেই চেয়ারখানাতেই এসে বসল। জগদীশ এবার বললে, সাহিত্যিক, আবার বলি তোমাকে দেখলে আমাদের ঈর্ষা হয়।

তেমনি ক'রে বাণীপদ সুন্দর হাসি হাসল। বললে, বাড়ীতে এসেছ কি সেই ঈর্ষাটাই প্রকাশ করতে ?

হ্যাঁ, যতদিন তোমার দেখব সেই ঈর্ষাটাই কেবল প্রকাশ ক'রে যাব বাণীপদ। তোমার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তোমার সাহিত্য, তোমার জীবন একই সূত্রে গ্রথিত। নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ, নিষ্কণ্টক সম্ভোগ—তোমার জীবনকে ফলে ফুলে বিকশিত করার মূলে এরা অক্লান্ত সাহায্য করেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে তোমাকে দাঁড়িয়ে উঠতে হয়নি এইটি তোমার পক্ষে সকলের চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ।

বাণীপদ বললে, দুঃখের চেহারাটা কি কেবল বাহ্যিক জগদীশ ?

জগদীশ বললে, সাহিত্যিক, অনেক কথা আছে এ সম্বন্ধে, জানি দুঃখের চেহারাটা বাহ্যিক নয়, জানি অন্নবস্ত্রের অভাবটা বড় অভাব নয়, জানি প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রামটাই সত্য নয়, লাভ ক্ষতি কলহ কলঙ্কটা বাঁচা ও মরার মাঝখানে শেষ কথা নয়—সবই জানি, কিন্তু—কিন্তু একটা জায়গায় সান্ত্বনার ভয়ানক অভাব ঘটে, সাহিত্যিক। কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ নিয়ে কোনোমতে যারা বাঁচে, অপমানের অন্ন খেয়ে মনের দুঃখে যক্ষ্মায় ভুগে যারা মৃত্যুবরণ করে, হয়ত তাদের মধ্যেও তোমার মতো শক্তিধর প্রাণ ছিল, তারাও হয়ত একদিন দেশের আকাশে সূর্য্যের মতো জ্যোতির্ম্ময় হয়ে প্রকাশ পেতে পারতো।

বাণীপদ বললে, বুঝতে পারলুম না, এটা কি আমার বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ ?

লোকনাথ হেসে বললে, অভিযোগ নয়, ঈর্ষা।

ঈর্ষার জন্ম প্রশংসায়। তোমাদের ঈর্ষা দেখে আমার ত খুসি হবার কথা !

আসরটা আজ দেখতে দেখতে বেশ জাঁকিয়ে উঠ্ল।

জগদীশ বললে, তোমাকে আমরা ভালোবাসি সাহিত্যিক, কিন্তু কাছে টান্তে গেলেই একটা দুর্ভেদ্য আবরণ সামনে টেনে দাও, তোমার সেই আবরণটাই তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার ডিগ্নিটি। তোমার ঐশ্বর্য্য দিয়েছে তোমার ব্যক্তিত্ব, আর শারীরিক গঠন ও রূপ দিয়েছে তোমার ডিগ্নিটি। জনসাধারণের মাথার ভিতর থেকে মাথা উঁচুতে উঠলেই সহজে পাওয়া যায় পূজা। পূজা তুমি এখনো পাওনি, পেয়েছ জনকয়েক ভক্তের বন্দনা। ভবিষ্যৎ তোমার অবশ্য আলোকোজ্জ্বল !

এমন অবস্থায় কথায় বাধা পড়ল। আমাদের সকলেরই চোখ পড়ল দরজার দিকে। ভিতর থেকে

একটি তরুণী বেরিয়ে এলেন, পরণে রক্তবাস,—তাঁর পিছনে পিছনে একজন চাকরের কাঁধে জলখাবার ইত্যাদির ট্রে। লোকনাথ চমৎকৃত হয়ে আর চোখ ফেরাতে পারলে না। তরুণীটি কাছাকাছি আসতেই বাণীপদ সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বললে, ইনি হচ্ছেন শ্যামলিকা দেবী।

চমৎকার নামটি ত আপনার?—লোকনাথ একটু অধীর হয়ে তারিফ ক'রে উঠ্‌ল।

শ্যামলিকা স্নিগ্ধহাস্যে লোকনাথের অভিনন্দনটুকু গ্রহণ করলেন, বললেন, আপনাদের জন্য কোকো তৈরী করেছি, অসুবিধে হবে না ত?

জগদীশ হেসে বললে, কিছুমাত্র না, কেবলমাত্র গরম জল হোলেও চ'লে যেত!

তার কথায় আমরা সবাই হাসলাম, শ্যামলিকা হাসলেন, এবং সেখানে কোনো মৃতদেহ পড়ে' থাকলেও জগদীশের কথায় না হেসে থাকতে পারত না। এই মেয়েটি এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ বাতাসটা ঘুরে গেল। তাঁর আভায় আমরা যেন সবাই আলোকিত হয়ে উঠলাম। অসাধারণ তাঁর সাজসজ্জা, এবং তাঁর সেই পরিপাটি প্রসাধন এড়িয়ে সর্ব্বপ্রথমে মাথার এলো-খোঁপায় গোঁজা রক্ত গোপালটি আমাদের চোখে পড়ল। লোকনাথের একাগ্র দৃষ্টি যেন অবশ হয়ে গেছে, ভদ্রসমাজের বিচারে তার চাহনিটা হয়ত কিছু পরিমাণে অশোভন, অসঙ্গত—কিন্তু সৌন্দর্য্যোপলব্ধির যে পরম আন্তরিকতা তার মুখে চোখে ফুটে উঠেছে তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। আমি হঠাৎ লোকনাথকে আড়াল ক'রে উঠে দাঁড়ালাম, জায়গা ছেড়ে দিয়ে বললাম, আপনি বসুন?

শ্যামলিকা বললেন, এখুনি আসছি, এসে বসব।—তারপর বাণীপদর দিকে চেয়ে পুনরায় বললেন, ফোন্ ক'রে ওদের ডাকলুম, ওরা গেছে বেরিয়ে, কি করা যায়?

বাণীপদ বললে, তুমি গাইবে, গলা ভালো আছে?

দু'একটা গাইতে পারি।—ব'লে চাকরের হাত থেকে ট্রে-টা টেব্‌লের উপর নামিয়ে শ্যামলিকা সন্দেশের রেকাবগুলি একে একে সাজিয়ে রেখে চলে' গেলেন।

আবার যেন সবটা অন্ধকার হয়ে গেল। লোকনাথ চোখ নামিয়ে নীরবে বসে রইল। জগদীশ বাতাসটা ফিরিয়ে দিল। বললে, সাহিত্যিক, তোমার রচনা কিছু প'ড়ে শোনাও, অনেকদিনের সাধ।

নতুন ত কিছু লিখিনি জগদীশ?

পুরোনো লেখাই শোনা যাক্।

আমি বললাম, আমি তোমার আবৃত্তির বিশেষ অনুরাগী।

বাণীপদ হেসে উঠে ঘরের ভিতরে গেল। জগদীশ কৌতুক ক'রে বললে, আমাদের কলেজের সতীকান্তর কথা মনে আছে সোমনাথ? তার কবিতা শোনানোর বাতিকটা কী পীড়াদায়ক! রাস্তার লোক ডেকে খাবার খাইয়ে কবিতা শোনাত, একবার শোনাতে আরম্ভ করলে আর থামায় কার সাধ্য!

লোকনাথ বললে, শেষকালে চোখ টেপাটিপি ক'রে নানা অছিলায় পালিয়ে আত্মরক্ষা! হতভাগার এতটুকু মাত্রাজ্ঞান ছিল না।

আমি বললাম, কিন্তু খাওয়াত খুব।

জগদীশ বললে, ওটা ঘুষ।

লোকনাথ বললে, কবিতা কিন্তু ভালো লিখ্‌ত যাই বল।

তা বললে কি হয়, ভালো সন্দেশও বেশি খেলে এক সময় পেট হাঁসফাঁস করে। ধরে বেঁধে যারা রচনা শোনায় রসিক সমাজে তারা উপেক্ষিত।

এমন সময় বাণীপদ একখানি খাতা হাতে নিয়ে এসে বসল। মরক্কো বাঁধাই সুন্দর একখানি খাতা, পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য, এ যেন তারই যোগ্য। খাতাখানি খুলে সে বিনা ভূমিকাতেই একটি কবিতা তার স্বাভাবিক সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি ক'রে যেতে লাগল। তার কণ্ঠে একটি নিবিড় প্রাণের উত্তাপ মাখানো।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম। প্রদীপ্ত বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে তার রচনা যেন সোনার সুতায় গাঁথা। তার শক্তির তুলনায় পাঠক সমাজে তার প্রসিদ্ধি যথেষ্টই অল্প বলতে হবে। সমস্ত রচনাটির মধ্যে জীবন সম্বন্ধে যেন একটি পরম আশ্বাসবাণী ধ্বনিত হচ্ছে, তার সহজ ও প্রশান্ত ভাষার ভিতর দিয়ে যেন একটি বেগবান রসতরঙ্গ আমাদের হৃদয়ের তটে এসে আঘাত করতে লাগল। বাণীপদ সেই জাতীয় সাহিত্য রচনা করে, যা পাঠককে

সাধারণ চিন্তার স্তর থেকে উর্দ্ধলোকে নিয়ে চলে, ভাবের গভীরতা আনে চিত্তে, রসলোকের দিকে উন্মনা মন প্রসারিতপক্ষ হয়ে উড়ে চলে' যায়।

আবৃত্তি থাম্‌ল। আমরা যেন কেউ কারুকে আর চিন্‌তে পাচ্ছিনে, এমনি অভিভূত হয়ে গেছি। আলো পড়েছে আমাদের মনে, আলো দেখছি চারিদিকে। কিয়ৎক্ষণের জন্ম আমরা যেন উচ্চতর জীবন লাভ ক'রে ধন্য হয়ে গেছি। লক্ষ্যই করিনি ইতিমধ্যে কখন্ চাকর এসে কোকোর বাটি সাজিয়ে দিয়ে গেছে। বাণীপদ এবার স্নিগ্ধ হেসে বললে, সন্দেশগুলো অবাক হয়ে তোমাদের ঔদাসীন্যের দিকে চেয়ে রয়েছে হে।

এতক্ষণে যেন আমাদের চমক ভাঙল। সবাই সোরগোল ক'রে খেতে বসে গেলাম। খাওয়া আরম্ভ করতেই নারীকণ্ঠের গান এল কানে। মনে হোলো, রূপার ঘুঙুরের আওয়াজ। রাত্রির ওই দিগন্ত প্রসারিত অন্ধকার যেন হঠাৎ করুণকণ্ঠে কথা কয়ে উঠ্‌ল। সম্মুখের ওই ফুলবাগান, কৃষ্ণচূড়ার গাছ, নিঃশব্দ প্রহরীর মতো এই চক্‌মিলানো বাড়ীর বড় বড় থাম, দূর আকাশের ওই নক্ষত্রনিচয়, দেয়ালে টাঙানো এই রহস্যময় চিত্রগুলি, এদেরও যেন একটি রূপবান ভাষা আছে। আমরা কোথায় আছি, কি করছি, কি ভাবছি, কিছুই আর ঠিক রইল না। অপলক চক্ষু, রুদ্ধকণ্ঠ, অবশ দেহ, অবসন্ন মন,—কেবল সর্ব্বশরীরের ভিতরে একটা অস্বাভাবিক রক্ত চলাচলের শব্দ অনুভব করতে পারছিলাম। ওই মেয়েটির নামই জেনেছি মাত্র, কিন্তু পরিচয় জানতে পারিনি। বাণীপদর স্ত্রী নেই, তার ভগ্নিকেও আমরা চিনি,—শ্যামলিকা হয়ত কোনো আত্মীয়া হবেন। কিন্তু আত্মীয়া যদি নাও হন্, কেবলমাত্র তিনি যদি বাণীপদর অনুপ্রাণনারও অবলম্বনও হন্ তাতেও কোনো কথা নেই। তাঁর সুর প্রতিভার অলোকসামান্য শক্তিকে আমরা সবাই মনে মনে সকৃতজ্ঞ প্রণতি জানালাম।

গান থামবার পর কতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা স্তম্ভিত হয়ে বসেছিলাম মনে নেই, হঠাৎ সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ শুনে সবাই মুখ তুলে তাকালাম। বঙ্কিম এক দৌড়ে ওপরে উঠে এল।

হ্যালো, কবি? আরে, তোরাও হাজির যে সোমনাথ? বাস্‌রে, সন্দেশের এক্‌জিবিশন্। একটা ভারি দুঃসংবাদ আছে জগদীশ, এসে বলছি। শ্যামলি, শ্যামলি কই?—বলতে বলতে বঙ্কিম সোজা যে-ঘরে গান হচ্ছিল সেই ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। সকল সমাজে তার অবাধ প্রবেশ।

লোকনাথ হঠাৎ মুখের একটা শব্দ ক'রে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল। কানের কাছে মুখ এনে বললে, এ আমার কিছুতেই বরদাস্ত হবে না সোমনাথ। ওই রাস্কেল্‌টার বেপরোয়া রোম্যান্টিক্ পোজ্‌টা আমি চিনি, সব ওর শয়তানি, সব মেয়েকে ও হাতে রাখতে চায়!

জগদীশ বললে, থাম্ লোকনাথ, স্ত্রীর চিঠির গল্প এখানে করিসনে। হ্যাংলা কোথাকার!

লোকনাথ সন্ত্রস্ত হয়ে বসল। বাণীপদ হেসে বললে, এই বঙ্কিম এক পাগল, বুঝলে লোকনাথ। রাশ ছিঁড়ে দৌড় দিয়েছে সমাজের ওপর দিয়ে। সমাজ-বিদ্রোহী সাহিত্যের আওতায় গড়ে উঠেছে ও চরিত্র। মানে না নীতি, মানে না ধর্ম্ম, হৃদয়ের পথ দিয়ে চলে, বন্যার জলে ভেসে বেড়ায়, আকাশের প্রলয়ের ভ্রূকুটি দেখলে নেচে ওঠে ওর প্রাণ।

লোকনাথ বঙ্কিমের প্রতি এই প্রশংসাবাক্যে উত্যক্ত হয়ে উঠ্‌ল, ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে, তোমার প্রশ্রয় পেলে ও আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে, বাণীপদ।

থাম্ লোকনাথ, পরশ্রীকাতরতাটা ভদ্রভাষায় প্রকাশ করতে শেখ্।—জগদীশ ব'লে উঠ্‌ল, সাহিত্যিক, কিছু মনে কোরো না, লোকনাথটা ভদ্রসমাজের অযোগ্য, নিজের প্রকৃতিকে গোপন করতে জানে না।

লোকনাথ আহত হয়ে বললে, আমি কি তাই বলছি···তোমার এক কথা জগদীশ। সমাজে যখন রয়েছি একটা নীতি মেনে চল্‌তে হবে না? তুমি কি বল্‌তে চাও অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতাকে সায় দিয়ে যাবো?

জগদীশ এবার হাসল। লোকনাথের পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, কিন্তু নিজের যেখানে অক্ষমতা, আশা চরিতার্থ করা যখন সাধ্যাতীত, তখন সেই গাত্রদাহ নিয়ে সাধুতার ভাণ করা অন্যায়। ও মেয়েটি তোমার কে হন্ বাণীপদ?

বাণীপদ বললে, কেউ হন্ না। এমনিই আমার এখানে থাকতে উনি ভালোবাসেন। আমার কাকার এক বন্ধুর মেয়ে। এবারে এম-এ দেবার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

লোকনাথ বললে, বঙ্কিমের মতো বন্ধু জুটলে পরীক্ষায় পাস করা কি আর সম্ভব হবে?

বাণীপদ হেসে বললে, তা বটে। এই ছাখোনা, বঙ্কিম এত দুরন্তপনা করে এখানে, কিন্তু কখন্ নিঃশব্দে যে সে শ্যামলিকার হৃদয় জয় করেছে আমি বুঝতেই পারিনি। আমি প্রায় বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠ্ছি।

এত সহজ তার কথা, এত স্পষ্ট যে, অত্যন্ত উদারপন্থী লোকও এখানে থাকলে নির্ব্বাক হয়ে যেত। লোকনাথের চোখদুটো দপ্ দপ্ করতে লাগল। জগদীশ অলক্ষ্যে তার দিকে একবার তাকিয়ে বললে, সাহিত্যিক, উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের প্রতি তোমার একটা স্বাভাবিক মমত্ববোধ দেখে আসছি। তুমি ফ্যাশনেব্‌ল্ পাড়ার লোক, জানিনে তোমার পূর্ব্বজীবনটা কি ধরণের। তোমার গল্প আর উপন্যাসগুলোর মধ্যে যৌনদুর্নীতির প্রতি একটি সূক্ষ্ম পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। সুন্দর ভাষা আর মনোরম লিখন-ভঙ্গীর আড়ালে দাঁড়িয়ে তুমি ছেলেমেয়েদের দুর্নীতির দিকে ঠেলে দাও। তোমার আর্টের বাহাদুরি এইখানে।

আমি ত জানিনে জগদীশ, কী লিখি আমি?

জানো তুমি, সেই কথাটাই আমি বলব। তোমার মধ্যে একটি রসের প্রকৃতি রয়েছে সেটা অত্যন্ত দেহ-লোলুপ। রসের পাক দিয়ে সেটাকে মনোহর ক'রে তোলার শক্তি আছে তোমার। সাহিত্যিকরা অত্যন্ত স্বার্থপর জীব, নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্য তারা জীবনকে নিয়ে খেয়ালের খেলার মতো নাড়াচাড়া করে। স্ত্রীলোক তাদের কাছে আত্মবিকাশের উপকরণ মাত্র, কেবলমাত্র প্রয়োজন। তারা মানেনা স্ত্রীলোকের ব্যক্তিত্ব, স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য। যখন খুসি গ্রহণ করবে, যখন খুসি করবে বর্জ্জন। সাহিত্যিক, এ কথা তুমি নিশ্চয়ই জানো, যারা সত্যি আর্টিস্‌ট্ তারা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। তোমরা স্নেহহীন, তোমরা দয়াহীন। তোমার মনে বিদ্বেষ আসবে না, কারণ নারীর সম্বন্ধে তোমার কোনো সামাজিক দায়িত্ব-বোধ নেই। স্ত্রীলোক থেকে রসের আনন্দ লুণ্ঠন ক'রে নিলেই তোমার কাজ ফুরোয়, তুমি তাকে দূর ক'রে দাও। কিন্তু—কিন্তু সংসারে দুঃখ পায় এই বোকা লোকনাথরা—যারা মেয়েদের সম্মান দিতে যায়, ভালো-বাসতে যায়, কর্ত্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে স্ত্রীজাতির রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য ছুটোছুটি করে। মানুষ হিসাবে সমাজে তোমার চেয়ে এদের মূল্য বেশি।

এমন সময়টায় বঙ্কিম ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এতক্ষণ ভিতরে শ্যামলিকার সঙ্গে কী নিয়ে যেন তার একটা অস্ফুট বচসা আমাদের কানে আসছিল, সেটা অনুমান করা কঠিন। এবার সে তাড়াতাড়ি এসে পকেট থেকে পাটকরা একখানা বাঙলা দৈনিক কাগজ টেব্‌লের ওপর রেখে বললে, খবর তোরা কিছুই রাখিসনে দেখছি। কালির দাগ দেওয়া আছে, পড়্ সোমনাথ।

সকলে উন্মুখ হয়ে উঠ্‌ল। কাগজখানা হাতে নিয়ে খুঁজে খুঁজে কালির আঁচড়কাটা সংবাদটার দিকে চোখ পড়ল। কয়েক ছত্র পড়তেই মুখ দিয়ে আমার একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ বেরিয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

কি? কি খবর সোমনাথ?

জগদীশ কাগজখানা তাড়াতাড়ি নিয়ে চোখ বুলোতে লাগল, এবং তন্মুহূর্ত্তে সেও চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, রঘুপতি আত্মহত্যা করেছে? গণপতির ছোট ভাই?

সবাই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বঙ্কিম বললে, গত পরশু তারিখে এই ঘটনা। চাকরি একটা জুট্‌ল না তার, শেষ পর্য্যন্ত দারিদ্র্য আর সহ্য করতে পারল না। একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে, ভারি করুণ চিঠি।

লোকনাথ বললে, আমরা ত কিছুই জানতে পারিনি!

বঙ্কিম বললে, আমিও জানতে পারিনি। আজ সকালে গিয়ে পড়েছিলুম গণপতির ওখানে, দেখি পোষ্ট মর্টেম্ পরীক্ষার পর লাস বার করলে গণপতি···আমাকে দেখে বললে, বঙ্কিম, ভাই মরেছে পরে কাঁদব, এখন পোড়াবার খরচ পাই কোথায়?—যাই হোক, সন্ধ্যার সময় আমরা শ্মশান থেকে ফিরলুম।

বাণীপদ নিঃশব্দে মাথা হেঁট ক'রে রইল। লোকনাথ

কাগজখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ চক্ষে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, আমাকে—আমাকে ক্ষমা করিস বঙ্কিম, অনেক গালাগাল দিয়েছি তোকে। তুই সেখানে না থাকলে গণপতি হয়ত—

এবং তারপর কান্না সে আর সামলাতে পারল না; দেশ-কাল-পাত্র ভুলে গেল, ভুলে গেল শ্যামলিকা হয়ত এখুনি এসে পড়তে পারেন,—আমার হাত ধরে বালকের মতো বলতে লাগল, তোরা জানিসনে সোমনাথ, কত দুঃখে দুর্দ্দিনে কত বড় বন্ধু রঘুপতি আমার ছিল···জীবনে সে কোনোদিন অন্যায় করেনি। চরিত্রের দিক থেকে যে কোনো আদর্শ পুরুষের সে সমকক্ষ।

পাথরের মতো সবাই নির্ব্বাক, নিঃশব্দ।

আমি ধীরে ধীরে তার হাতটা ছাড়িয়ে বারান্দার একান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাণীপদ লোকনাথের পিঠের উপর হাত রেখে বললে, বলবার কথা গেল ফুরিয়ে, কী বললে তোমাদের দুঃখের লাঘব হবে তা জানিনে। ওঠো লোকনাথ, সংসারে অনেক দুঃখ আছে, আছে অনেক অমঙ্গল—অনেক অভিশাপ—আর ··

জগদীশ এইবার হঠাৎ বারুদের মতো জলে উঠ্‌ল,—সান্ত্বনা দিচ্ছ সাহিত্যিক? পাথরের পাঁচিলে কী দুঃখে দরিদ্র মাথা ঠুকে নিজেকে শেষ ক'রে দেয় তা তুমি কোনোদিন জেনেছ? সান্ত্বনা,—কাব্যের ভাষায় আজ তুমি আমাদের সান্ত্বনা দিতে এসেছ! ভদ্র সন্তান, শিক্ষিত যুবক,—উদরান্ন সংস্থান করবার জন্য যারা শহরের মরুভূমিতে লালায়িত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তোমাদের অট্টালিকার নীচে বসতে গিয়ে যারা দারোয়ানের বিদ্রূপ সহ্য করে—সাহিত্যিক, তাদের প্রতিদিনের গভীর আত্মগ্লানির ভাষা কি তোমার কলমের মুখে ফুটে উঠেছে কোনোদিন?

বাণীপদ অপ্রস্তুত হয়ে বললে, আমাকে ভুল বুঝোনা জগদীশ, আমি—

পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো জগদীশ অল্প একটু জায়গার মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। বললে, সোনার সুতোয় চিন্তার বিলাস গেঁথে ফিরি করাই তোমার পেশা, বর্ষা আর বসন্ত নিয়ে তোমার রসের খেলা, প্রেমের সাহিত্য নিয়ে আর্টের কেরামতি দেখানো তোমার কাজ, বর্ত্তমান কালকে বাদ দিয়ে চিরন্তন কাল নিয়ে তোমার টানা-হেঁচড়া,—সাহিত্যিক, তুমি জানো না মানুষের প্রয়োজনের কাছে এ সব অতি তুচ্ছ।—এই ব'লে সে যাবার জন্য প্রস্তুত হোলো।

লোকনাথ বসে পড়েছিল, আবার উঠে দাঁড়াল। বললে, তোমাকে আক্রমণ করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তোমার দৃষ্টি কেবল এই দিকে ফেরাবার চেষ্টা করছি। তুমি শক্তিমান, একদিন জাতি হয়ত নিজের কথা তোমার মুখ দিয়ে প্রকাশ করবে, তুমি হয়ত সবাইকে একদিন টেনে তুলবে—সবই জানি; কিন্তু আজকের এই অন্যায়, এই উৎপীড়ন, এই বর্ব্বরতা, এই শৃঙ্খলাবদ্ধ দারিদ্র্যের উপরে তোমার প্রবল ভাষাকে চালনা করছ না কেন? শাণিত তরবারির মতো ঝকঝকে, উজ্জ্বল বিদ্রূপ তোমার কলমে নেই কেন? দলদর্পী দাম্ভিকের বিরুদ্ধে তোমার জ্বালাময় শাসনের বাণী ছুটে যায় না কেন?—বলতে বলতে সে হাঁপাতে লাগল।

বঙ্কিম ইতিমধ্যে কখন্ পালিয়েছে। বাণীপদ বিমূঢ়ের মতো একখানা ছবির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। জগদীশ থেমে বললে, চলো লোকনাথ, আর দাঁড়াবার সময় নেই। সোমনাথ, আয় রে—বলতে বলতে সে আর একবার বাণীপদর দিকে চেয়ে ব'লে উঠ্‌ল, সাহিত্যিক, জানি তুমি সব পারো, সে শক্তি তোমার মধ্যে যথেষ্টই আছে—কিন্তু তুমি প্রকাশ করতে ভয় পাও, তোমাদের ফ্যাশনেব্‌ল্ পাড়ার দার্শনিক ঔদাসীন্যের পাশে রয়েছে একটি চাপা ভীরুতা,—সেটা তোমাদের লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয়! চোখ চেয়ে যেদিন দেখবে, দেখতে পাবে জনসাধারণকে কৃপার চক্ষে দেখতে গিয়ে জাতির কাছে তোমাদের চরিত্রগত ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল্ সবারি কৃপার বস্তুই হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, আসি আজকের মতো।

লোকনাথকে সঙ্গে নিয়ে জগদীশ দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল বাস্তবিক, রঘুপতি ছিল তার বড় প্রিয়।

বাণীপদ কাছে এসে কাঁধের ওপর হাত রেখে ডাকল, সোমনাথ?

বুঝতে পারলাম, চোখের জলে আমার মুখ ভেসে

গেছে, আমার হাতায় মুখ মুছে বললাম, ওদের কথায় তুমি কিছু মনে ক'রো না বাণীপদ। বন্ধুর বুকের রক্তে আমাদের চলবার পথ লাল হয়ে উঠেছে, নিষ্ফল উত্তেজনায় তাই আমরা তোমাকে আঘাত ক'রে গেলাম। ক্ষমা কোরো।

বিদায় নিয়ে নামবার সময় বাণীপদ একপ্রকার মলিন রহস্যময় হাসি হেসে বললে, তবু একথা স্পষ্ট করেই একদিন তোমরা বুঝবে, মানুষের কোনো দুঃখই মানুষ ঘোচাতে পারে না। দুঃখের পথই মানুষের পথ।

আমি দ্রুতগতিতে বন্ধুদের অনুসরণ করলাম। এখনই গণপতির ওখানে আমাদের সবাইকে যেতে হবে।

পথে নেমে এসে তিন বন্ধুতে মিলিত হলাম। রাস্তা যেন আর চিনতে পাচ্ছিনে। জগদীশ কথা বলছে না, লোকনাথও নীরব। কথা বলবারও আর কিছু নেই। যে-মৃত্যু আমাদের ভিতরে ঘটে গেল এ কেবল সকরুণ দারিদ্র্যের কথাই জানিয়ে গেল না, একথাও জানিয়ে গেল, এই-ই আমাদের পরিণাম। আমাদের একই পথ।

কয়েকদিন ধরেই আমরা রঘুপতিকে খুঁজছিলাম। সেদিন বেলেঘাটা রেল-লাইনের ধারে তাকে শেষ দেখেছি। অত্যন্ত করুণ এবং কুণ্ঠিত মুখ। অতি দুঃখে, অতিরিক্ত কষ্টে বাল্যকাল থেকে লেখাপড়া শিখেছিল। কলেজে ভর্ত্তি হোলো কিন্তু মাসিক বেতন জোটাতে পারল না ব'লে বি-এ পাশ করার আশা তাকে ছাড়তে হোলো। আশা ছিল তার অনেক। সে বড় হবে, বড় হয়ে আর সবাইকে বড় ক'রে তুলবে। বড় ভাইয়ের অন্নে প্রতিপালিত, গণপতির সংসারে একটানা অভাব, লজ্জায় রঘুপতি আর মাথা তুলতে পারত না। এদিকেও ছিল তার নানা কাজ। বারোয়ারির চাঁদা তোলা, মড়া পোড়ানো, লাইব্রেরীর বই সংগ্রহ করা, সাহায্য-সমিতির জন্য মুষ্টিভিক্ষা আদায় ক'রে বেড়ানো,—সে ছিল নানা কাজের মানুষ।

জগদীশ এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল।—তোরা কোন্ দিকে যাবি রে সোমনাথ?

তার গলার আওয়াজটা ভারি। লোকনাথ আমাদের কথায় ভ্রূক্ষেপ করলে না কিন্তু সে নিরর্থক দৃষ্টিতে একদিকে তাকিয়ে চলতে লাগল। তার পায়ে যেন আর আগল নেই। হঠাৎ রঘুপতির মৃত্যুটা তাকে যেন উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দিয়েছে।

বললাম, গণপতির ওখানে যাবে না?

জগদীশ লোকনাথের পথের দিকে তাকিয়ে বললে,' গিয়ে আর কি হবে, কেবল ভিড় বাড়ানো। হয়ত এখনো সবাই কান্নাকাটি করছে। সহানুভূতি প্রকাশ করতে যাবার কি কোনো মানে হয়?—হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে নিলে, মনে হোলো অশ্রু গোপন করার চেষ্টা করছে,—বললে, আমি গিয়ে এখন শুয়ে পড়বো রে, আর কিছু পারব না। ভালো কথা, লোকনাথকে পৌঁছে দিয়ে তুই কিছু খাবার কিনে তাড়াতাড়ি সেবাশ্রমে চলে' যা—বুঝলি? খাস কিছু কিনে, কেমন?

বললাম, আচ্ছা। কিন্তু কাল তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে কখন্?

হবেই একসময়। ব'লে জগদীশ একপ্রকার উদাসীন হয়ে একদিকে চল্‌তে লাগল। মৃত্যু—মৃত্যু আজ আমাদের ভিতরে যেন কেমন একটা গভীর সন্ন্যাস এনে দিয়েছে। আমাদের সকলের জীবনের শিকড় শিথিল হয়ে গেছে।

মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি লোকনাথকে ধরবার জন্য চললাম। কিছু দূর এসেও কিন্তু তাকে দেখা গেল না, কোথায় সে ছিট্‌কে রাত্রির অন্ধকার ও পথের জনতার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল কে জানে! এ-পথ ও-পথ অনেকদিকে ঘুরলাম, কিন্তু সে-পাগল কোন্ পথ দিয়ে কোথায় পালাল, এই রাত্তে তাকে খুঁজে বার করা অসম্ভব। হয়ত সারারাত্রি ধরেই সে আজ হাঁটতে থাকবে। লোকনাথকে যারা জানে এ ধারণা হওয়া তাদের পক্ষে বিচিত্র নয়।

অগত্যা তার আশা ত্যাগ করতে হোলো। ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূর গিয়ে পড়েছিলাম। ফিরবার মুখে হঠাৎ একস্থানে দাঁড়িয়ে দেখি, মায়ের বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছি। ওদিককার ঘরে আলো জ্বলছে। সদর দরজা তখনো বন্ধ হয়ে যায়নি। আজকের রাতটা এখানে থেকে গেলে মন্দ কি! একটুখানি আরামে আজ নিদ্রা দেবার জন্য সমস্ত মন লালায়িত হয়ে উঠেছে।

ভিতরে ঢুকে যে ঘরখানা আমাদের কারো কারো জন্য নির্দ্দিষ্ট সেই ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালাম। ঘরে আলো নেই, কিন্তু কলিকাতার রাজপথে এতক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও যা দেখতে পাওয়া যায়নি, এতক্ষণ পরে ঘরের একান্তে দক্ষিণের জান্‌লাটার কাছে সেই অতি ক্ষীণ চন্দ্রালোকটুকু দেখা গেল। অল্প অল্প ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। বিছানার উপর উঠে আমি সটান্ শুয়ে পড়লাম। বন্ধুর মৃত্যু গভীর অবসাদ এনেছে মনে।

চোখ বুজে হয়ত কিছু ভাবছিলাম, হয়ত বা চোখে তন্দ্রাই নেমে আসছিল, সহসা দপ ক'রে আলো জ্বলতেই জেগে উঠলাম। দেখি ভগবতী সুমুখে দাঁড়িয়ে। বললাম, কি মিনু, এখনো ঘুমোওনি যে?

ভগবতী বললে, এই শুতে যাচ্ছিলুম সোমনাথদা। তখনি দেখলুম, কে যেন ঢুকল। আমি ভাবলুম আর কেউ। আপনি যে তিন চারদিন আসেননি?

এমনি। নানারকম কাজ। তোমার পড়াশুনো কেমন চলছে?

মন্দ না। বেশ ভালই আছি এখানে।

মা ঘুমিয়েছেন?

তাঁর ঘুমোতে এখনো অনেক দেরি। রাত বারোটা একটা পর্য্যন্ত জেগে তাঁর পড়াশুনো করা চাই। দেশের কোনো নতুন খবর নেই সোমনাথদা?

বললাম, বাবা এসেছেন। আজ সকালে গিয়েছিলুম তাঁর কাছে। সঙ্গে এসেছেন চক্রবর্ত্তী মশাই আর দুখীরাম।

ভগবতী দরজার কপাটে হাত রেখে ভীতকণ্ঠে বললে, তারপর?

তারপর সাধারণতঃ যা ঘটে তাই ঘটেছে মিনু। তিনি আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। জীবনে আমরা আর কেউ কারো মুখ দেখব না।

ভগবতী ঢোক গিলে বললে, আমি যে আপনারই সঙ্গে চ'লে এসেছি গ্রামের লোক জান্‌ল কি ক'রে?

সম্ভবত আমার পাল্‌কির বেয়ারারা ব'লে দিয়ে থাকবে। তা ছাড়া এসব খবর বাতাসে ভেসে কানে গিয়ে ওঠে মিনু।

আশঙ্কায় ও অনুশোচনায় তার চোখে জল এল। বললে, তাহলে এখন উপায় সোমনাথদা? আমার যা হয় তাই হবে কিন্তু আপনার এই অবস্থা আমার হাত দিয়ে হোলো?

তা হোলো কিন্তু তার জন্যে কিছু উপকার পেলাম মিনু। জানা গেল, আমরা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। তুমি এর জন্যে এতটুকু লজ্জিত হোয়ো না ভগবতী।

ভগবতী অধীর হয়ে বললে, এই সামান্য ত্রুটির জন্যে তিনি আপনাকে এমন অকূলে ভাসিয়ে দিতে পারলেন!

পেরেছেন ব'লে আমি গর্ব্বিত।—আমি বললাম, তাঁর ধর্ম্মবিশ্বাস এবং নৈতিক আচারের এত বড় মহিমা যে, একমাত্র সন্তানও তুচ্ছ হয়ে গেল। আমি তাঁর দৃঢ়তাকে শ্রদ্ধা করি।

ভগবতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ ক'রে রইল, তারপর বললে, এ বাড়ী থেকে আপনার আর কোথাও যাওয়া হবে না সোমনাথদা, আমি মা'কে বল্‌ব সব কথা। আর—আর আমাকে পর মনে করবেন না, আমার যা আয় আছে তাতে অনায়াসে আপনার আর আমার চ'লে যাবে।

হেসে বললাম, বেশ ত, দরকার হলেই চেয়ে নেবো মিনু? আপাতত আমি কাজ একটা কিছু করবই।

মিনু বললে, বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে, সারাদিন খাওয়া হয়নি ত? শিগগির এসে মুখ-হাত ধো'ন্ বলছি, আমার সব তৈরী রয়েছে।—বলতে বলতে সে দ্রুতপদে ভিতরে চলে গেল। এখুনি গিয়ে সে হয়ত মা'কে খবর দেবে।

কিন্তু মিনু এটা লক্ষ্য করল না কোথা দিয়ে আসে মানুষের মনে পরিবর্ত্তনের সুর, কোথা দিয়ে আসে ঝড়। অল্পক্ষণ মাত্র আগে যে আরামের লোভটুকু আমাকে টেনে এখানে এনেছিল, এই মেয়েটির স্নেহস্পর্শে আমার সেই লুব্ধ মন বিপরীত পথ ধরলো। সোজা উঠে দাঁড়ালাম। মনে হোলো, কেন এই ভিক্ষা, এই দৈন্য কেন? এই রাত্রি, এই আলো, আমার ক্লান্ত দেহ, অশান্ত মন, একটি তরুণীর ঐকান্তিক ঔৎসুক্য, সাদর সেবা—কিন্তু কে বলেছে আমার অবচেতনায় এদের প্রতি আমার গোপন আসক্তি জমা আছে? এরা আমার লোভের উপকরণ, কিন্তু এরা যে আমার কাম্য নয়!

সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে উঠান পার হয়ে নিঃশব্দে পথে নেমে এলাম। কে যেন ঠেলে দিল, দাঁড়াবার উপায় নেই! মিনু আঘাত পাবে? পা'ক্। আঘাত তাকে দেওয়া দরকার। ছোট জীবনের দৈন্য, বিনা মূল্যের সামান্য স্নেহ, তরুণীর অকিঞ্চিৎকর হৃদয়ের সুর,—এদের নিয়ে ভুল্‌ব সব,—আমি কি ঠিক সেই সুরে? জানি এ আমার গর্ব্ব নয়, এ আমার সংযমের বাহাদুরি নয়, স্ত্রীলোককে অকারণে তাচ্ছিল্য করবার মতো নারী-বিদ্বেষ প্রচারের সুলভ ভণিতা আমার নেই, কিন্তু আমি জানি এরা আমাকে সঙ্কীর্ণ দিনযাপনের দিকে টানে, এরা আমার বড় জীবনের কল্পনাকে ব্যর্থ ক'রে দেয়, হেয় ক'রে তোলে; এরা গভীর তৃপ্তি দেয় না, এদের মধ্যে আমার আবাল্যের অপরূপ স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে যায়।

অনেক রাত হয়েছে, পথে লোক চলাচল কমে' এসেছে। লোকনাথকে খুঁজে পাবার জন্য তখনো মনে একটা চেষ্টা ছিল। কিন্তু খুঁজে তাকে পাবার কথা নয়। পা দুটো আপনা থেকে চলছে, এবং চলছে যেদিকে সেদিকে না গিয়ে আমার মনের স্বস্তি নেই। আজ রঘুপতির শবদেহটা ছাড়া আর কিছু আমার চোখে পড়ছে না।

খালের পুল পার হয়ে যে-পথটা সোজা রেল লাইনের দিকে গেছে, সেই পথে কিছুদূর এসে বাঁ-হাতি সঙ্কীর্ণ গলিতে ঘুর্‌লাম। সরকারি আলো একটিমাত্র, চাঁদের আলোও দরিদ্র পল্লীর উপর পড়ে না,—সেই আবছা অন্ধকারে চিনে চিনে গণপতির বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালাম। গা ছম ছম করছিল, হয়ত কান্নাকাটি এখনো থামেনি। দরজার কাছে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে, সেই আলোয় দেখা গেল, পাশে কয়েকটা নিমপাতা, কতকগুলি কাঁচা মটর ডাল এবং পাশে একখানা মাটির সরায় কতকগুলো আংরা। কেমন ক'রে ডাকব তাই আকাশ পাতাল ভাবছি।

হঠাৎ একটা কুকুর ডেকে উঠ্‌ল, এবং আমাকেই লক্ষ্য ক'রে দূর থেকে ছুটে আসতে লাগল। তখনই দরজার কাছে ঘেঁষে কড়া নেড়ে মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম, গণপতি?

এই যে, যাই।

তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গণপতি এসে দাঁড়াল। কুকুরটা ডাকতে ডাকতে এসে আবার চলে' গেল। দুজনে মুখোমুখি,—প্রথমটা কি কথা বল্‌ব ভেবেই পেলাম না। পরে গণপতিই কথা সুরু করলে, একা এলি এই রাতে?

বললাম, এইটুকু ত পথ।

গণপতি বললে, তোকে বসাবার পর্য্যন্ত জায়গা নেই। আর বসেই বা কি করবি! মা এইমাত্র কান্নাকাটি ক'রে ঘুমিয়েছেন। চল্, তোকে একটু এগিয়ে দিই।

গলির পথ দিয়ে দু'জনে বেরিয়ে এলাম। বললাম, কখন্ ফিরলে শ্মশান থেকে?

সন্ধ্যেবেলা। উঃ, ভাগ্যি বঙ্কিম এসে পড়েছিল সেই সময়। নৈলে টাকার জন্যে মুদ্দোভারাসের কাছে অপমান হতে হোতো। ভগবানকে ডাকছিলুম, দোহাই বাবা, সোমনাথটা যেন এসে পড়ে। শেষ মুহূর্ত্তে তোর বদলে এল বঙ্কিম। বাঁচলুম। আগে মড়ায় আগুন দিই, তারপর কান্নাকাটি! হতভাগা গলায় দড়ি দেবার চারদিন আগে থেকে কিছু খায়নি!—বলতে বলতে গণপতির বলা বন্ধ হয়ে এল।

একটু থেমে আবার বললে, চিঠিতে কি লিখে রেখে গেছে জানিস? লিখিছে—'আফিডের পয়সাটা কিছুতেই জোগাড় করতে পারলুম না, নতুন লাক্‌লাইন্ দড়িরও অভাব, তাই কাপড় পাকিয়ে কাজ সারতে হোলো। মৃত্যুর দ্বারা আমি দারিদ্র্যের প্রতিবাদ ক'রে গেলুম। আত্মহত্যার জন্য লজ্জিত নই।'

গণপতির চোখে জল এল।

বললাম, এবার তুমি গিয়ে শুয়ে পড়োগে, আমি বেশ চ'লে যেতে পারব।

শোন্, শোন্ সোমনাথ; মৃত্যুর পরেও ভগবান যে বিদ্রূপ করতে পারেন মানুষের প্রতি, সেই কথাটাই তুই চুপি চুপি শুনে যা।

দরিদ্রের ভগবান নেই গণপতি!

আছে, আমি বলছি আছে—গণপতি চোখ দুটো উজ্জ্বল ক'রে বলতে লাগল, কিন্তু সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অত্যন্ত কুটিল। আজ দিল্লী থেকে রঘুপতির পুরোনো

একখানা দরখাস্তর জবাব এসেছে, ভালো একটা চাকরি হয়েছে তার!

অ্যাঁ? কি বললে?

- গণপতি অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে বললে, বলছি যে, আছে দরিদ্রের ভগবান, ভালো ক'রে দেখিস সোমনাথ, সে আছে, কিন্তু সে সাপের চেয়েও ক্রুর, বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর!—ব'লে সে মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চলে' গেল। চলে' গেল মাতালের মতো।

কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। এইবার আমার আশ্রয় খুঁজে নেবার পালা। অনেকদূরে এসে পড়েছি, ঘণ্টাখানেক না হাঁটলে আর আশ্রমে পৌছতে পারব না। কিন্তু ভিতরে কোথায় যেন একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করছি। সে যন্ত্রণা স্থানবিশেষে নয়, সে যেন সর্ব্বশরীরে, সমস্ত মনে, মর্ম্মের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। কেন আমি এত ক্লান্ত, কেন এত পরিশ্রান্ত? এদের মতো আমারও ত চলবার পথ আছে। অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভিতর দিয়ে, অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে খুঁজতে, এই ঈশ্বরহীন, সৌন্দর্য্যহীন, মনুষ্যত্বহীন জীবপ্রবাহের পাশ কাটিয়ে আমাকেও ত পার হয়ে যেতে হবে এই দীর্ঘপথ!

এই যে একটা শোচনীয় মৃত্যু ঘটে' গেল এর জন্য দায়ি কে? শিক্ষায় দীক্ষায় আমাদের চেয়ে রঘুপতি কম ছিল না, স্বাস্থ্য সামর্থ্য উৎসাহ যে কোনো নবীন যুবকের মতো তারো ছিল, তারো বুকে ছিল অনির্ব্বাণ আশা, সর্ব্বপ্লাবী প্রেম, মনুষ্যত্বের মহিমা,—তার মৃত্যুর জন্য কেবল কি দারিদ্র্যই দায়ি? জীবনের প্রতি অসন্তোষ ফুটে উঠেছে সকলের মনে, বিতৃষ্ণায় সবাই জর্জ্জরিত, নূতন আশা করবার আর কিছু নেই! আত্মহত্যা সে করেছে, সে কেবল ক্ষুধার জন্যই নয়, দুনিয়ার সকলের সম্বন্ধে তার ছিল একটি নিগূঢ় অভিমান। তার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আজ যেন চোখে পড়ল, মানুষ মানুষের উপর অবিশ্রান্ত দস্যুপণা ক'রে চলেছে, আত্মাভিমানী ধনাঢ্যরা শোষণ করছে সহায়হীন দুর্ব্বলকে, জাতি প্রবঞ্চনা করছে জাতিকে। লোভে স্বার্থে অন্যায়ে এই যন্ত্রজর্জ্জরিত সভ্যতা, মানুষের কলঙ্কলেখাঙ্কিত এই বর্ত্তমান যুগ—এর পরিণতির পথ আর কত দূরে? আদর্শবাদ গেল ভেসে, প্রাণধর্ম্ম গেল তলিয়ে, জীবনের নীতি গেল মুছে—এ কোন্ সর্ব্বনাশা দিন এল ঘনিয়ে? ক্ষুধা, কেবল স্থূল ভয়ঙ্কর ক্ষুধার চেহারা চারিদিকে। শোষণের ক্ষুধা, জয়ের ক্ষুধা, আবিষ্কারের ক্ষুধা, অস্ত্রের ক্ষুধা, যুদ্ধের ক্ষুধা। এক বিরাটকায় ক্ষুধিত চণ্ডাল অলক্ষ্যে ব'সে ধারালো নখর দিয়ে বিংশ শতাব্দির সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিচ্ছে!

এই বিশাল অন্ধকারের নিচে দিয়ে জনহীন পথে আমি একা চলেছি। কারুকে কোনোদিন জানতে দেবো না, প্রতিদিনের খানিকটা সময় আমি থাকি একান্ত একা। সমস্ত দিনের সকল কর্ম্মের অবসানে সবাই আপন আপন আশ্রয়ে গিয়ে উঠেছে, এবার আমার সময় হয়েছে নিজের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাবার। কী অসহায় আমি, কী দরিদ্র! নানা অহঙ্কার আছে প্রকাশ্য চেহারাটায়, আছে নানা অভিমান, কিন্তু—কিন্তু সে আমার সঠিক পরিচয় নয়। আপন শক্তিহীনতাকে আমি অত্যাশ্চর্য্য শক্তির দ্বারা গোপন ক'রে রাখি। সংসারে কিছুই আমি পেরে উঠিনে। অকর্ম্মণ্য আমি চেয়ে চেয়ে দেখে যাই সব, চোখে ছায়া পড়ে, চোখে পড়ে মায়া। সম্মুখে এই রুদ্ধশ্বাস অটল রাত্রির রূপ আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে, তারায় তারায় বেজে ওঠে একটি অতি সূক্ষ্ম শব্দহীন সঙ্গীত, সকল আকাশ জুড়ে আমারই নিভৃত প্রাণের একটি মহিমান্বিত প্রশান্তির রূপ দেখতে পাই। অকস্মাৎ মনে হয়,—মনে হতে নিজের কাছেও বিস্ময় লাগে,—এই দুঃখ অভাব ও ব্যর্থতাময় জীবনকে উত্তীর্ণ হয়ে আমি যেন উধাও একাকী ছুটে চলে' যাই, সব থাকে পিছনে পড়ে, একটি সুদীর্ঘ নিঃশব্দ মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে নীড়সন্ধানী পাখীর মতো উড়ে চলে যেতে থাকি। শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন সেই পাখীর পাখার তলায় পার হয়ে যায় প্রভাত, পার হয়ে যায় সন্ধ্যা,—আলো এবং অন্ধকার ডিঙিয়ে অনন্ত দূরে অন্ধ হয়ে সে ছুটেছে।

নিজের ভিতরে যেন একটি নদীর প্রবাহকে অনুভব করি। পায়ের বাঁধন যেন শিথিল হয়ে যায়। অস্বাভাবিক বেগে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে যাই। (ক্রমশঃ)

প্রাচীন ভারতের লুপ্ত ইতিহাসের এক অধ্যায়

শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন এম্‌-এ

ভারতে নাগবংশ

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অনেক স্থান তমসাচ্ছন্ন। পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিতগণের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশের ঐতিহাসিকগণও প্রচুর গবেষণা করিতেছেন এবং ভারতের লুপ্ত ইতিহাসের অনেক অধ্যায় উদ্ধার করিতেছেন। নিত্য নূতন তথ্য প্রকাশিত হইয়া, অসম্পূর্ণ ইতিহাস আজ ক্রমশঃ পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতেছে। উপযুক্ত প্রমাণাদির অভাবে কেবল মাত্র কল্পনা-শক্তির অনুশীলনে ইতিহাসের নামে সময় সময় অনেক কথা প্রচারিত হয়। আমরা তাহাকে প্রকৃত ইতিহাসের পর্য্যায়ভুক্ত করিতে প্রস্তুত নহি। নানা স্থানে বিস্তৃত খুঁটিনাটি প্রমাণ সকলের একত্র সমাবেশ করিয়া প্রথমে একটা বহিরাবরণ তৈয়ারি করিতে হইবে। ঐতিহাসিক সেই আবরণের ভিতরে যথাসম্ভব সংলগ্নভাবে ঘটনা সন্নিবেশ করিয়া থাকেন। এইখানেই মৌলিক গবেষণা করিবার সুযোগ; এবং এইখানেই চিন্তাশীল ঐতিহাসিকের কৃতিত্ব।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক জয়সওয়াল (Jayaswal) এইরূপ গবেষণা করিয়া প্রাচীন নাগ এবং বাকাটক বংশের কাহিনীর পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে এই দুই বংশের সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। স্মিথ (Smith) প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ ভারতে কুশান সাম্রাজ্যের পতনের পরে এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্ব্বে এক শত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অন্ধকারময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জয়সওয়াল খণ্ড খণ্ড প্রমাণাদির সঙ্গে পুরাণের বর্ণিত ইতিহাস একত্র গ্রথিত করিয়া "History of India from 150 A. D to 350 A. D" নামক এক বিরাট চিন্তাশীল প্রবন্ধ Journal of the Bihar and Orissa Research Society"র বর্ত্তমান সালের মার্চ্চ হইতে জুন মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাকে একখানি পুস্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহাতে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে—প্রথমে ভারশিব অথবা নাগবংশ তৎপর বাকাটক বংশ—এই দুই বংশই বহু কাল ভারত সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড সবল হস্তে পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ইতিহাস প্রস্তুতের উপাদান থাকা সত্ত্বেও আমরা এযাবৎ তাঁহাদিগকে কোন প্রাধান্য দিই নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে এই দুই বংশের হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শে প্রণোদিত হইয়াই গুপ্তরাজগণ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া দেড় শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রবল পরাক্রমে শাসন করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্যবাদের (Imperialism) ধারাবাহিক ইতিহাসে এই নাগ এবং বাকাটক বংশ উভয়েই যে স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা সামান্য নহে।

প্রথমে আমরা নাগ বা ভারশিব বংশের কথা বলিব। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-গঠনের প্রধান অবলম্বন, প্রশস্তি (Inscriptions), মুদ্রা (Coins) এবং সাহিত্য। গুপ্ত কিংবা পালদের ইতিহাসের মত নাগবংশের ইতিহাস স্পষ্ট এবং ধারাবাহিকরূপে কোন তাম্রলিপি কিংবা শিলালিপিতে পাইবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। তজ্জন্য তাঁহাদের সম্বন্ধে গবেষণা একটু জটিল। বোধ হয় এই কারণেই স্মিথ, প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ প্রণীত আমাদের পাঠ্য পুস্তকগুলিতে নাগবংশ কোন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নাই। কিন্তু প্রধানতঃ মুদ্রা এবং পুরাণের সাহায্যে এই বংশের ইতিহাস আজ আমাদের কাছে সন্তোষজনক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

পৌরাণিক সাহিত্যে বর্ণিত 'বংশানুচরিত' আমরা কেবল মাত্র তাহার বলেই ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। পুরাণের কাহিনী তখনই প্রকৃত ইতিহাস হইয়া দাঁড়ায়, যখন তাহার সহিত শিলালিপি, তাম্রলিপি, মুদ্রা কিংবা অন্য কোন সমসাময়িক সাহিত্যে বর্ণিত ইতিহাস মিলিয়া যায়। যদি একবার সাদৃশ্য দেখিতে পাই, তবে আমরা পুরাণের ধারাবাহিক বংশের তালিকা এবং রাজাদের রাজ্যশাসন-কাল মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করি না। জয়সওয়াল কর্ত্তৃক নাগবংশের ইতিহাস এই ভাবেই আজ রহস্যোদ্ঘাটিত হইয়াছে।

পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ভারতবর্ষে শতবর্ষব্যাপী ম্লেচ্ছাধিকারের পর গঙ্গার পূত অভিষেকবারিসিঞ্চনে শৈব হিন্দু নব নাগবংশের (ভারশিব বংশ) প্রথম সার্ব্বভৌম রাজা সিংহাসনে আসীন হইলেন। ইহাই ভারশিব বংশের গৌরবময় ইতিহাসের গোড়ার কথা। এখানে কুশানদের ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে এবং তাহাদের ভারত সাম্রাজ্য অধিকার শত বর্ষ কাল, ইহাও আমরা কুশান প্রশস্তি এবং মুদ্রা হইতে জানি। ম্লেচ্ছদের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া পুনরায় ভারতের জাতীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা যে ভারশিব বংশের বাহুবলে এবং বুদ্ধিবলেই সম্ভব হইয়াছিল, ইহার পুরাণে পরিষ্কার উল্লেখ না থাকিলেও আমরা বাকাটক প্রশস্তির সাহায্যে অনায়াসে বুঝিতে পারি। এই বংশের পরবর্ত্তী কার্য্যাবলীর যে সামান্য পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি তাহা ইহারই সমর্থক। ভারশিব বংশই নাগ বংশ। কারণ বাকাটক বংশের এক প্রশস্তিতে ভারশিব বংশের এক রাজার নাম "মহারাজ শ্রীভবনাগ" দেখিতে পাই। ইহা ছাড়াও নাগ, নব নাগ এবং ভারশিব বংশের অভিন্নত্বের প্রমাণ আমরা ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইব।

এই নাগবংশকে পুরাকালে অর্থাৎ শুঙ্গ বংশের মগধে সাম্রাজ্য শাসনের সময় হইতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিদিশা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। বিদিশার নাগবংশ পুরাণের কাহিনীতে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

প্রথম ভাগের রাজগণ সুঙ্গ বংশের পতনের পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের নাম পুরাণে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত আছে—

১। শেষ

২। ভোগিন্ (সম্ভবতঃ শেষের পুত্র)

৩। রামচন্দ্র (শেষের পৌত্র)

৪। ধন বা ধর্ম্ম বর্ম্মা (তাহাকে শেষ হইতে অধস্তন তৃতীয় পুরুষ ধরা যাইতে পারে)

৫। বঙ্গর (শেষ হইতে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ)

রামচন্দ্রের (৩) পরবর্ত্তী রাজার নাম নগপান অথবা নগনাম। তিনি বৈদেশিক বলিয়া উপরিউক্ত নাগবংশাবলীতে স্থান পান নাই। বিষ্ণু-পুরাণ তাঁহার নামোল্লেখও করেন নাই। এই ছয়জন রাজা জয়সওয়ালের মতে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩১ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ রাজা বঙ্গরের অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা পরবর্ত্তী গুপ্ত রাজ্য-শাসনের কালে মহারাজ হস্তিনের খোঃ তাম্রলিপিতে (Khoh coppe plate) বঙ্গর নামক স্থানের উল্লেখে পাই। মনে হয় ওই স্থানের নাম করণ রাজা বঙ্গরের নাম হইতে হইয়াছে।

সুঙ্গ বংশের পতনের পরবর্ত্তী এবং কুশান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩১ হইতে খৃষ্টাব্দ ৭৮ পর্য্যন্ত নাগ রাজগণের নাম পুরাণ দ্বিতীয় পর্য্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র অথবা সাতবাহন রাজগণের অপ্রতিহত ক্ষমতা। এই অন্ধ্রগণ উত্তরাপথের রাজ্য সকল জয় করিয়া কিছুকালের জন্য মগধও অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধীনে নাগদিগের যাওয়া স্বাভাবিক। এই সময়ের নিম্নলিখিত রাজার নাম পুরাণে স্থান পাইয়াছে।

৬। ভূতনন্দী অথবা ভূতিনন্দী

৭। শিশুনন্দী (সম্ভবতঃ ভূতনন্দীর পুত্র)

৮। যশোনন্দী (শিশুনন্দীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা)

যশোনন্দীর পরে নাগরাজগণের সম্বন্ধে পুরাণ নীরব। ইহাদের নাম জয়সওয়াল মুদ্রা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারা (৯) পুরুষদাত (নন্দী) ; (১০) উত্তমদাত (নন্দী) (১১) কামদাত (নন্দী) ; (১২) ভবদাত (নন্দী) ; (১৩) শিবদাত (নন্দী)। ১

৯ হইতে ১৩ পর্য্যন্ত রাজগণের পরস্পর অনুগমন অনিশ্চিত।

স্মিথ সঙ্কলিত মুদ্রাতালিকায় ২ অনেকগুলি অচেনা মুদ্রা (coins unidentified) আছে। সেই মুদ্রাগুলির সম্যক্ তথ্য এ যাবৎ আমরা জানিতাম না। জয়সওয়াল, তাহাদের পরস্পর সাদৃশ্য এবং অন্যান্য সাঙ্কেতিক চিহ্নের বলে সেগুলিকে নাগরাজগণের মুদ্রা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। পুরাণের কাহিনীর সমর্থক এবং ন্যূনতা পূরকরূপে এই মুদ্রাগুলি অতিশয় মূল্যবান। মুদ্রাতে খোদিত শেষদাত, রামদাত এবং শিশুচন্দ্র দাতকে যথাক্রমে শেষ (১) ; রামচন্দ্র (৩) এবং শিশুনন্দী (৭) বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

একটী বিষয় আমাদের লক্ষ্য করিবার আছে। বায়ুপুরাণ বিদিশা নাগদের "বৃষ" বলিয়াছেন। পুরাণে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের নাগরাজগণের পশ্চাতে 'নন্দীব' উল্লেখও দেখিতে পাই। এই "বৃষ" এবং "নন্দী" উভয়ে ভগবান শিবের কল্পিত মূর্ত্তির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। পরবর্ত্তীকালে শৈব নাগদের 'ভারশিব' নাম গ্রহণের পশ্চাতে বোধ হয় ইহার প্রভাব রহিয়াছে।

রাজা শিবনন্দীর এক প্রশস্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তাহা কুশানের ঠিক পূর্ব্বে নাগবংশের ইতিহাস গঠনের কার্য্যে প্রভূত সাহায্য করে। ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন পদ্মাবতী নগরীকে বর্ত্তমান "পদম্‌পাওয়াইয়া" (Padampawaya) নামক স্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ৩। সেই স্থানে আবিষ্কৃত যক্ষ মণিভদ্রের মূর্ত্তিতে ৪ আমরা দেখিতে পাই যে স্বামী শিবনন্দী নামক রাজার রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে উহা এক নাগরিক সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল। এই শিবনন্দী এবং মুদ্রার শিবদাত (১৩) অভিন্ন। যক্ষমূর্ত্তিকে উপলক্ষ করিয়া জয়সওয়াল কয়েকটী প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

প্রাচীন পদ্মাবতী নগরী নাগগণের প্রতিষ্ঠিত এক রাজধানী হওয়া সম্ভব। জয়সওয়াল অনুমান করেন যে মহারাজ ভূতনন্দী (৬) কর্ত্তৃক এই নগরী স্থাপিত হইয়াছিল। বিদিশা হইতে নাগগণের পদ্মাবতী আসিবার নানা কারণের ভিতরে শকাদি ম্লেচ্ছগণের আক্রমণও এক কারণ হইতে পারে। যাহা হউক ইহার পর হইতে পদ্মাবতী নাগগণের একটী প্রধান বসতি স্থান হইল।

রাজা শিবনন্দী (১৩) বোধ হয় কুশান পূর্ব্ববর্ত্তী নাগবংশের শেষ স্বাধীন নরপতি। স্বাধীন বলিলাম, কেন না, পুরাণে এবং মুদ্রায় তাঁহাদের ইতিহাস-লিখন-পদ্ধতি দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাজা বলিয়াই অনুমান হয়। হয় তো ক্রমান্বয়ে সুঙ্গ এবং অন্ধ্রদের অধীনতা তাঁহারা নামে মাত্র মানিয়া লইয়াছিলেন, এবং তৎপরে কালক্রমে নিজেরাই স্বাধীন হইয়া বসিয়াছিলেন। শিবনন্দীর রাজত্বের চতুর্থ বৎসরের পরেই সম্ভবতঃ কুশান বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কণিষ্ক নাগরাজ্য ৫ অধিকার করিয়া লইলেন। নাগগণ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

১। মুদ্রায় প্রাপ্ত রাজাদিগের নামের পশ্চাতে 'দাত' উল্লিখিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে উহা দত্তের অপভ্রংশ। জয়সওয়ালের মত ইহা হইতে ভিন্ন। দান হইতে দাতের আগমন এবং উহা নাগ-রাজগণের দানশীলতাসূচক এক রাজকীয় সাঙ্কেতিক চিহ্ন হইতে পারে।

২। 'Catalogue of Coins in the Indian Museum (Calcutta) Vol. I by Smith.

৩। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই নগরীকে কানিংহাম আধুনিক নর্ব্বার (Narvar) নামক দেশের সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরিয়াছেন। ভবভূতির "মালতী-মাধব" নাটক এই নগরীকে বিখ্যাত করিয়া রাখিয়াছে।

৪। Archaeological Survey of India Report 1915—1916, p. 106.

৫। পুরাণে উল্লেখ আছে যে কুশানগণ পদ্মাবতী নগরী জয় করিয়া, সেই স্থানকে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার রাজধানীতে পরিণত করিলেন।

কুশান রাজত্বের সময় এই নাগগণের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা আমরা সঠিক জানি না। তাঁহারা বোধ হয় বিন্ধ্যাটবীতে পলাতক অবস্থায় অনেক দিন ছিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। এই অবস্থা-বিপর্য্যয় এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের ভিতর দিয়াও তাঁহারা তাঁহাদের অস্তিত্ব, যে প্রকারে হউক, বজায় রাখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই সময়ে নাগবংশের কোন রাজার নাম কিম্বা কার্য্যাবলীর কোন পরিচয় আমাদের জানা নাই।

কুশানদের পতন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নাগদের গৌরবময় সাম্রাজ্য স্থাপনের ইতিহাস আরম্ভ হইল। এই সাম্রাজ্যবাদী ভারশিব বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, তাহার সহিত বিগত নাগবংশের প্রকৃত সম্বন্ধের খোঁজ লইতে আমরা উৎসুক হই। উপস্থিত মুদ্রা এবং পৌরাণিক সাহিত্যের বলে, জয়সওয়াল নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে পরবর্ত্তী ভারশিব ৬ সম্রাটগণ প্রাচীন নাগবংশের বংশধর। প্রথম সম্রাট নবনাগ কাহার পুত্র পুরাণেও তাহার উল্লেখ নাই। নবনাগ পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন। কুশানদের উপর সমুচিত প্রতিশোধ লওয়া হইল। তিনি আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট হইলেন।

নবনাগ এবং পরবর্ত্তী সম্রাটগণের নাম প্রধানতঃ মুদ্রা ৭ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। প্রাচীন কৌশাম্বী নগরীর টাকশালে খোদিত একটী মুদ্রা এতদিন ঐতিহাসিকগণের কাছে একটা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। জয়সওয়াল তাহাতে লিখিত 'নবশ' এবং অঙ্কিত নাগমূর্ত্তির সম্যক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। উহা ভারশিব অথবা পুরাণের মতে নবনাগ বংশের প্রতিষ্ঠাতা নবনাগের মুদ্রা। মুদ্রার বলে নবনাগ এক দিকে বিদিশা নাগদের এবং অপর দিকে দ্বিতীয় সম্রাট্ বীরসেন (নাগ) কে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার রাজত্ব সম্পর্কে প্রাপ্ত মুদ্রা সকল নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিকে ইঙ্গিত করিতেছে। সম্রাট্ নবনাগ বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বকাল ন্যূনকল্পে ২৭ বৎসর। কুশান প্রচলিত মুদ্রার (বিশেষতঃ সম্রাট্ হুবিষ্ক এবং বাসুদেবের মুদ্রার) সহিত নবনাগের মুদ্রার বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই বিশেষত্ব দেখিয়া তাঁহার রাজত্বকাল খৃষ্টীয় ১৪০-৭০এর মধ্যে আরোপিত করা হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক রুদ্রদেব (সেন) হইতে গণনা করিয়া সমস্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ভারশিব রাজগণের শাসনকাল নির্দ্ধারণ করিতে গেলে নবনাগের উপরিউক্ত তারিখই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে নাগ বংশের এক রাজা মথুরা পুনরুদ্ধার করিয়া সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নবনাগের আরব্ধ কার্য্য এইবার সমাপ্ত হইল। মথুরা অনেক কাল শক, কুশান প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণের অধিকারে ছিল। সুতরাং মথুরাতে পুনরায় এই হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। এই রাজার নাম বীরসেন। তাঁহার সময়ে অনেক মুদ্রা পাঞ্জাবের পূর্ব্বভাগে এবং যুক্তপ্রদেশে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের কোন কোন মুদ্রায় এক পৃষ্ঠে তালবৃক্ষ এবং অপর পৃষ্ঠে সিংহাসনে আসীন এক মূর্ত্তি। তালবৃক্ষকে নাগের প্রতীক ধরিতে হইবে। অপর নাগ মুদ্রার সঙ্গে বীরসেনের মুদ্রার নিকট সাদৃশ্য থাকায় বীরসেন নাগ অথবা ভারশিব বংশের নরপতি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। তাঁহার মুদ্রার নানা সংস্করণে দেখি, একজন বলবান পুরুষ একটী সর্প হস্তে লইয়া আছে। আবার কোন মুদ্রায় দেখি, একটী স্ত্রীলোক, এবং সিংহাসনের উপর একটী সর্প রাজছত্র ধরিবার ছল করিয়া উর্দ্ধে ফণা বিস্তার করিয়া আছে। এই সকল মুদ্রার প্রচারও বিস্তৃত ছিল। অনুমান হয়, বীরসেন বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক ছিলেন। মোটামুটি ভাবে সমগ্র মধ্যপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের কিয়দংশ তাঁহার অধিকারে ছিল।

ফরাক্কাবাদের অন্তর্গত জাঙ্খত্ নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রশস্তিতে৮ উল্লিখিত রাজা বীরসেনকে, জয়সওয়াল, নাগবংশের বীরসেন বলিয়াছেন; এবং সেখানে উৎকীর্ণ '১৩'কে রাজা বীরসেনের রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসর বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে দ্বিমত আছে, কারণ, শুধু লিপির অক্ষর দেখিয়া তাহার কাল নির্ণয় করা হইয়াছে। কেহ কেহ ৯ এই প্রশস্তি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত বলিয়া মনে করেন। বীরসেনের কার্য্যাবলীর যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে ভারশিব অথবা নবনাগ বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া ইতিহাসে স্থান দিতে পারি। মুদ্রা হইতে অবগত হই যে তিনি অন্ততঃ ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এখানে একটী প্রয়োজনীয় ব্যাপার মনে রাখা দরকার। জয়সওয়াল যে অচেনা মুদ্রাগুলি পাঠ করিয়া এই ভারশিব বংশের ইতিহাস উদ্ধার করিয়াছেন এবং পুরাণের ইতিহাসের সঙ্গে তাহার মিলনের সূত্র বাহির করিয়া তাহার ন্যূনতা পূর্ণ করিয়াছেন, সেই মুদ্রাগুলির পরস্পর সাদৃশ্য তাঁহার এ কার্য্যে প্রধান সহায়। নাগের প্রতীক্ তালবৃক্ষের ছাপ দেখিয়া তিনি ভারশিব বংশের মুদ্রা-লিখন-পদ্ধতি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশিত নাগস্থাপত্যের নিদর্শনগুলির গাত্রেও এই তালবৃক্ষ কারুকার্য্য-সহকারে খোদিত আছে। এই মুদ্রাগুলি ভারশিব মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করিয়া আমরা তাঁহার রচিত ইতিহাস যুক্তিপূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তাঁহার মুদ্রাপাঠ সম্পূর্ণ নির্ভুল না হইলেও, অন্য কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত, আমরা জয়সওয়ালের মত মোটের উপর মানিয়া লইতে ইতস্ততঃ করি না।

বীরসেনের পরবর্ত্তী আর চারিজন রাজার নাম আমরা মুদ্রাতে পাই। তাঁহারা যথাক্রমে,—হয়নাগ, ত্রয়নাগ, বর্হিননাগ এবং চর্য্যনাগ। মুদ্রাতে তাঁহাদের রাজত্বকাল দেওয়া আছে। এই চারিজন রাজা কমপক্ষে ৮০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। জয়সওয়ালের হিসাব মত আমরা নিম্-

৬। জয়সওয়াল অনুমান করেন যে সাম্রাজ্যবাদী নাগদের রাজকীয় পদবী "ভারশিব" ছিল।

৭। Catalogue of Coins in the Indian Museum (Calcutta) Vol. I, by Smith.

৮ Jankhat Inscription—Epigraphia Indica, Vol. XI, p. 85; Edited by Pargiter.

৯ Pargiter.

লিখিত ভাবে ভারশিব বংশের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি। প্রত্যেক রাজার রাজত্বকাল প্রাপ্ত মুদ্রার তারিখের উপর ভিত্তি করিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। সুতরাং দু-এক বৎসর কম বেশী হইতে পারে।

রাজার নাম	আনুমানিক রাজত্বকাল	মুদ্রায় প্রাপ্ত বৎসর
১। নবনাগ।	খৃষ্টাব্দ ১৪০—১৭০	২৭ বৎসর
২। বীরসেন (নাগ)	„ ১৭০—২১০	৩৪ „
৩। হয়নাগ।	„ ২১০—২৪৫	৩০ „
৪। ত্রয়নাগ।	„ ২৪৫—২৫০	দেওয়া নাই
৫। বর্হিন নাগ।	„ ২৫০—২৬০	৭ বৎসর
৬। চর্য্যনাগ।	„ ২৬০—২৯০	৩০ „

নবনাগের মুদ্রার বিশেষত্ব দেখিয়া তাঁহার রাজত্বকাল নিরূপিত হইয়াছে, এ কথা পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার মুদ্রার সঙ্গে কুশানগণের মুদ্রার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। অথচ তৎপরবর্ত্তী নাগরাজগণের মুদ্রাগুলি ক্রমশঃ স্বাধীন ভারতীয় ভাবে খোদিত হইতেছে, এইরূপ বুঝা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বীরসেনের মুদ্রা ধরা যাইতে পারে। এইভাবে নবনাগের প্রাচীনত্ব এবং শেষ কুশানরাজ হুবিষ্ক এবং বাসুদেবের সঙ্গে সমসাময়িকত্ব আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত ছয় জন রাজার পরস্পর কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকের সুদীর্ঘ রাজত্বকাল দেখিয়া মনে হয় যে তাঁহাদের সম্পর্ক "পিতাপুত্র" কিম্বা অন্য কোনরূপ ঘনিষ্ঠভাবে ছিল।

নবনাগ বংশের সপ্তমরাজা ভবনাগ। গুপ্ত এবং বাকাটক প্রশস্তি ১০ হইতে আমরা তাঁহার বিষয় অবগত হই। ভবনাগের রাজত্ব আনুমানিক খৃষ্টাব্দ ২৯০ হইতে ৩১৫ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২৫ বৎসর। তিনি চর্য্যনাগের উত্তরাধিকারী। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাকাটকরাজ প্রথম প্রবরসেন তাঁহার সমসাময়িক এবং অতুলপ্রভাবান্বিত গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের কিছুকাল আগে তিনি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার দৌহিত্র বাকাটক রুদ্রসেন ১১ সমুদ্রগুপ্তের হস্তে পরাস্ত হন।

পুরাণে বর্ণিত নবনাগ বংশের ইতিহাসের সঙ্গে মুদ্রা এবং প্রশস্তি হইতে সংগৃহীত উপরিউক্ত ভারশিব বংশের ইতিহাস মোটের উপর মিলিয়া যায়। পুরাণের মতেও নবনাগ বংশের সাত জন রাজা রাজত্ব করেন। পৌরাণিক সাহিত্যে ভারশিব বংশকে নবনাগ বংশ বলা হইয়াছে। প্রবল কুশানের পরবর্ত্তী নাগরাজগণ নববলে বলীয়ান হইয়া এবং নব আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাহা পুরুষ পরম্পরায় ভোগ করিয়া গিয়াছিলেন। পুরাতন নাগবংশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও, সাম্রাজ্যবাদী নবনাগ বংশের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে নূতন এবং স্বাধীন ইতিহাস। সেই কারণেই মনে হয় প্রথম সম্রাটের নামানুসারে এই বংশকে বলা হইয়াছে নবনাগ বংশ।

ভারশিব বংশের সম্রাটগণের স্ব স্ব কার্য্যাবলীর সম্যক পরিচয় আজও আমাদের কাছে অপ্রকাশিত। সম্রাটদের নাম এবং কয়েকটী বিশেষ ঘটনা ব্যতীত আর কিছুই আমরা জানি না। তাঁহাদের খ্যাতির পরিচয় আমরা বাকাটক লিপিতে পাই। ফ্লিট (Fleet) প্রণীত গুপ্ত প্রশস্তির তালিকায় প্রদত্ত বাকাটক লিপিতে ১২ তাঁহাদের সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে, তাহার ভাব বাংলায় এইভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে—"এই বংশের রাজগণ পরম দেবতা শিবের নিদর্শনের ভার স্কন্ধে বহন করিয়া তাঁহারই প্রসন্ন আশীর্ব্বাদে 'ভারশিব' নাম গ্রহণ করিলেন। ভাগীরথীর পূত সলিলে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, তাঁহারা সেই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন, যাহা তাঁহাদের লাভ করা বাহুবলেই সম্ভব হইয়াছিল। দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ ভাগীরথীর তীরে সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা সেই সলিলে অবগাহন করিলেন।" অন্য এক স্বাধীন বংশের প্রশস্তিতে কোন রাজবংশের এইরূপ প্রশংসা পাইবার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল। ভারশিব বংশের সাময়িক অভ্যুদয় এবং তাহার যশোগৌরবের স্মৃতি বাকাটক লিপিতে এইরূপ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। নাগ বংশের 'ভারশিব' পদবী গ্রহণের তথ্যও ইহাতে প্রকটিত হয়।

দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সৌভাগ্য ভারতবর্ষে খুব কম রাজবংশের হইয়াছে। কিন্তু ভারশিব বংশ দশ দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া বার বার নিজেদের অনতিক্রমনীয় ক্ষমতা জাহির করিয়াছেন। বাকাটক লিপিতে আমরা আরও অবগত হই যে সেই বংশের "সম্রাট" প্রথম প্রবরসেনের পুত্র যুবরাজ গৌতমীপুত্র ভারশিবরাজ ভবনাগের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র বিখ্যাত রুদ্রসেন বা পুরাণের মতে শিশুক। এই বিবাহকে উপলক্ষ করিয়া আমরা কতকগুলি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। এই বিবাহের ফলে ভারশিবগণ বাকাটকগণের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া গেলেন। অনুমান হয় যে ভারশিব বংশের পরবর্ত্তী সম্রাট্‌দের রাজত্বকালেই বাকাটক বংশ নিজেদের প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং উভয় দলের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তাহা বহুকালস্থায়ী হওয়াও স্বাভাবিক। অবশেষে এই রাজনৈতিক বিবাহ দ্বারা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে শান্তি স্থাপিত হইল এবং

১০। Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. III, by Fleet.

১১। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে রুদ্রসেনকে রুদ্রদেব বলা হইয়াছে। প্রশস্তিতে 'সেন'কে 'দেব' বলিয়া উল্লেখ করিবার রীতি ছিল। প্রশস্তিতে বসন্তসেনকে বসন্তদেব বলা হইয়াছে।

১২। Fleet—Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III—The Vakataka historiographer gives in three pregnant lines, the history of the Bharasivas :—"Of (the dynasty of) the Bharasivas, whose royal line owed its origin to the great satisfaction of Siva, on account of their carrying the load of the symbol of Siva on their shoulders—the Bharasivas who were anointed to sovereignty with the holy water of the Bhagirathi which had been obtained by their valour—the Bharasivas who performed their sacred bath on the completion of their ten Asvamedhas."

উত্তয়ে উত্থানের পথে গুপ্তগণকে বাধা দিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়াস যে শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আমরা এলাহাবাদ প্রশস্তিতে[১৩] পাই।

যাহা হউক, এ রাজনৈতিক বিবাহকে বাকাটক বংশের প্রায় রাজকীয় লিপিতেই প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ভারশিব বংশেরই গৌরব সূচিত হইতেছে। প্রথম প্রবরসেনের মৃত্যুর পর যে কারণেই হউক, তাহার পুত্র গৌতমীপুত্র সিংহাসন পাইলেন না। পৌত্র রুদ্রসেন সম্রাট হইলেন। লিচ্ছবি দৌহিত্র বলিয়া প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বীরবাহু সমুদ্রগুপ্ত গর্ব্ব অনুভব করিতেন। রুদ্রসেনের ভারশিব-দৌহিত্র বলিয়া সমুদ্রগুপ্ত হইতেও বেশী পরিমাণে গর্ব্ব অনুভব করার পরিচয় আমরা বাকাটক লিপিতে পাইয়াছি। এমন কি বালাঘাট প্রশস্তিতে[১৪] রুদ্রসেনকে ভারশিবরাজ বলা হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে এই রুদ্রদেব (সেন) বীর বলিয়া প্রশংসা পাইয়াছেন। পিতাকে ছাপাইয়া বীর পুত্রের সিংহাসনে বসিবার পশ্চাতে এই ভারশিব বংশের এবং নামের প্রভাব রহিয়াছে, এ অনুমান অসঙ্গত নহে। ইহা অনেকটা মোগল সম্রাট আক্‌বরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরকে সরাইয়া মানসিংহের ভাগিনেয়, জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খস্‌রুকে দিল্লীর সিংহাসন দিবার ষড়যন্ত্রের মত। কিন্তু রুদ্রসেনের মত সিংহাসন পাইবার সৌভাগ্য খস্‌রুর হইয়াছিল না, ইহা আমরা জানি। গৌতমী পুত্রের রাজা না হইবার কারণ অবশ্য ইহাও হইতে পারে, যে তিনি পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রবরসেনের সুদীর্ঘ রাজত্বের কথা স্মরণ রাখিলে, দ্বিতীয় সিদ্ধান্তও অসম্ভব মনে হয় না।

নবনাগবংশের রাজ্যের সীমা আমরা মোটের উপর নির্দ্ধারণ করিতে বিরাজমান থাকিবে। উপস্থিত প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করিয়া জয়সওয়াল নাগশাসন-প্রণালীর এইরূপ চমকপ্রদ বিবরণ দিয়াছেন—

নাগ সাম্রাজ্য কতকগুলি রাজ্য-সমন্বয়ে একটী রাষ্ট্র-সংহতি (Federation)তে পরিণত হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় রাজ্যের প্রত্যন্ত দেশের ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র রাজগণ আভ্যন্তরিক শাসন-কার্য্যে স্বাধীন থাকিতেন এবং নাগ-সাম্রাজ্যের ভিতরে নিজেদের রাজ্য অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেন। এই অধীন রাজগণের বেশীর ভাগ প্রধান নাগবংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। কিন্তু সম্পর্কিত ছাড়াও নাগরাষ্ট্র-সংহতিতে অন্যান্য ক্ষত্রিয় জাতি অবস্থিত ছিল[১৫]। এ বিষয়ে লক্ষ্য করিবার জিনিষ এই যে, অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের মত এই নবনাগবংশের সম্রাটগণ সংলগ্ন রাজ্যের রাজগণের স্বাধীনতা বিনা কারণে খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইতেন না। জয়সওয়াল গবেষণা করিয়া এই রাষ্ট্র-সংহতির প্রধান নাগগণের রাজধানী "কান্তিপুরী" নামক নগরীতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কান্তিপুরীর নব-নাগের অধীনতা (নামে মাত্র) স্বীকার করিলেও, ভিন্ন ভিন্ন রাজগণ নিজেদের রাজ্যে স্বাধীন রাজার সকল সুবিধা এবং ক্ষমতা ভোগ করিতেন।

নাগবংশ বিস্তার লাভ করিয়া ক্রমে তিনটী রাজধানী স্থাপন করিল। তাহারা যথাক্রমে পদ্মাবতী, কান্তিপুরী এবং মথুরা। ইহার মধ্যে কান্তিপুরীর নাগগণই প্রধান বংশ। নাগ বংশ ক্রমে এইভাবে শাখা প্রশাখায় পরিণত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাস করিতে লাগিল। নাগরাষ্ট্র-সংহতি এইরূপে গঠিত হইল। জয়সওয়াল কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত নিম্নলিখিত তালিকা হইতে নাগরাজত্বের তথ্য প্রকাশিত হইবে।

ভাবশিব বংশের কান্তিপুরীতে উত্থান (খৃষ্টাব্দ ১৪০)

নবনাগ—বংশের প্রতিষ্ঠা।

বীরসেন—মথুরা এবং পদ্মাবতী-শাখার প্রতিষ্ঠাতা।

পদ্মাবতী	কান্তিপুরী	মথুরা
(টাক বংশ)[১৬]	(ভারশিব বংশ)।	(যদু বংশ)[১৭]
ভীমনাগ (খৃষ্টাব্দ ২১০-৩০)।	হয়নাগ (খৃষ্টাব্দ ২১০-২৪৫)।	নাম অজানা
স্কন্দ নাগ („ ২৩০-৫০)।	ত্রয়নাগ („ ২৪৫-৫০)।	
বৃহস্পতি নাগ („ ২৫০-৭০)।	বর্হিননাগ („ ২৫০-৬০)।	

পারি। বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশ নাগরাজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল। তদুপরি বিহারের পশ্চিমাংশ এবং পাঞ্জাবের পূর্ব্বাংশ তাহাদের অধিকারে ছিল। কিন্তু ইহা ব্যতীত তাঁহাদের সাম্রাজ্য চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ছিল। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে, নাগরাজ্য-শাসন-প্রণালী জানা দরকার। জয়সওয়াল সেই শাসন-প্রণালীর যে বর্ণনা আমাদের দিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে ভারতের ইতিহাসে এক অতি উচ্চাঙ্গের রাজনীতির দৃষ্টান্ত

১৩। Allahabad Pillar Inscription of Samudra-gupta—Fleet—Corpus Inscriptionum—Vol. III.

১৪। Balaghat Plate—Epigraphia Indica Volume IX. p. 270.

১৫। জয়সওয়ালের মতে, মালব, যৌধেয়, মদ্রক প্রভৃতি গণ-তন্ত্রাবলম্বী ক্ষত্রিয় বংশগুলি নিজ নিজ রাজ্য সকল কুশান কবল হইতে পুনরুদ্ধার করিবার মানসে, নবনাগবংশের পতাকা-তলে সমবেত হইয়াছিল। কুশান পতনের পরে তাহাদের পুনর্থোদিত মুদ্রাবলীতে তিনি নাগমুদ্রার প্রভাব গভীর পর্য্যবেক্ষণে লক্ষ্য করিয়াছেন। অতএব, নামে মাত্র হইলেও, নাগ-সম্রাটদের প্রাধান্ত তাঁহারা স্বীকার করিতেন। জয়সওয়ালের এই মন্তব্য কতদূর গ্রহণীয় তাহা বিচারের বিষয়।

১৬। 'ভাবশতক' নামক গ্রন্থে পদ্মাবতীর নাগগণের রাজকীয় পদবী 'টাক বংশ' দেওয়া আছে।

১৭। কৌমুদী মহোৎসব নামক আর একখানা গ্রন্থে মথুরার রাজবংশকে যদুবংশ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জয়সওয়াল 'ভাবশতক

(ইহার পর নাগবংশের হস্ত হইতে সার্ব্বভৌম নরপতিত্ব স্খলিত হইয়া বাকাটক বংশের সবল রাজগণের হাতে গমন করিল। কিন্তু বাহিরের এই বিরাট পরিবর্ত্তনেও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া নাগরাষ্ট্র-সংহতি পূর্ব্বের মতই চলিতে লাগিল।)

নাগবংশের শেষভাগের ইতিহাসের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অল্প। আমরা জানি, পরাক্রমশালী গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত নাগবংশকে অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয়, অভিমানী নাগগণ সম্পূর্ণভাবে গুপ্তদের বশ্যতা স্বীকার কোন দিন করিতে পারেন নাই।

পদ্মাবতী	কান্তিপুরী	মথুরা
ব্যাঘ্রনাগ (খৃষ্টাব্দ ২১০—৯০)।	চর্য্যনাগ (খৃষ্টাব্দ ২৬০—৯০)	
দেবনাগ (" ২৯০—৩১০)।	ভবনাগ (" ২৯০—৩১৫)	কৃতিসেন (খৃষ্টাব্দ ৩১৫—৩৪০)
গণপতিনাগ (" ৩১০—৪৪)।	পুরিকার রুদ্রসেন অথবা শিশুক (" ৩১৫—৩৪৪)।	নাগসেন (" ৩৪০—৪৪)

নিম্নলিখিত রাজবংশগুলি ও নবনাগদের অধীনতা মানিয়া চলিত এবং তাহাদের সহিত রক্তের সম্বন্ধে সংযুক্ত ছিল।

আহিচ্ছত্র বংশ	অন্তর্বেদী বংশ	স্রুঘ্ন (?)	চম্পাবতী বংশ
অচ্যুতনন্দী (খৃঃ আঃ ৩২৪—৪৪)।	(গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের পশ্চিমাংশ)। মটিল অথবা মট্টিল (৩২৪—৪৪ খৃষ্টাব্দ) — ইহার রাজধানী সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বুলন্দশরের অন্তর্গত ইন্দ্রপুরে ছিল	নাগদত্ত (খৃঃ ৩২৪—৪৪)	নাম অজ্ঞানা। মহারাজ মহেশ্বর নাগ (৩৪৪—৬৪ খৃঃ)

উপরিউক্ত তালিকা হইতে নাগরাষ্ট্রসংহতির প্রকৃত অবস্থা আমরা বুঝিতে পারি। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে আমরা এই তালিকা-ভুক্ত গণপতিনাগ, রুদ্রসেন (দেব) এবং সম্ভবতঃ নাগসেনের নামও দেখিতে পাই। জয়সওয়ালের মতানুসারে উঁহারা সংহতির সভ্য ছিলেন এবং সমুদ্রগুপ্তের উঁহাদের প্রত্যেককে পরাজিত করিয়া সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক করিতে হইয়াছিল। বাকাটকরাজ রুদ্রসেন সম্রাট্ হইবার পূর্ব্বে পুরিকাতে বহুকাল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার অধিকারে বাস করিতেন। ভারশিব-বংশের দৌহিত্রভাবে, এবং বালাঘাট লিপির বলে তিনি এই তালিকায় স্থান পাইয়াছেন। অন্তর্বেদী বংশের মটিল্ অথবা মট্টিলের নাম এবং আহিচ্ছত্র বংশের অচ্যুতনন্দীর নামও এলাহাবাদ প্রশস্তিতে স্থান পাইয়াছে।

গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্তের ইন্দোর প্রশস্তিতে ১৮ আমরা দেখিতে পাই যে অন্তর্বেদীর প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদ তিনি সর্ব্বনাগ নামক একজন বিচক্ষণ এবং সক্ষম লোকের হাতে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। এই সর্ব্বনাগের নাগবংশের লোক হওয়া স্বাভাবিক।

সুযোগ পাইলেই তাঁহারা গুপ্তদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার নিষ্ফল প্রয়াস করিতেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মহাদেবী অর্থাৎ প্রধানা মহিষী ছিলেন কুবের নাগা। তিনি নাগরাজ বংশের কন্যা বলিয়াই আমাদের অনুমান হয়। তাহা হইলে, বিজিত নাগবংশ তখনও গুপ্ত সম্রাটদের কন্যাদান করিবার স্পর্দ্ধা রাখিত। স্কন্দগুপ্তের এক প্রশস্তিতে আমরা অবগত হই যে উক্ত সম্রাটের এক নাগ-বিদ্রোহ দমন করিতে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল।১৯

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে নাগ বা ভারশিব বংশের স্থান নির্দেশ করিতে গেলে, তাঁহাদের ধর্ম্মমত, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতিরও আলোচনা করা দরকার। উপস্থিত প্রমাণাদির সাহায্যে এ সকল বিষয়ে আমরা কিছু কিছু জানিতে পারি। জয়সওয়াল এ ক্ষেত্রে সামান্য অবলম্বন আশ্রয় করিয়া বৃহৎ বৃহৎ সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন, ইহা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে।

ম্লেচ্ছাধিকার হইতে মুক্ত করিয়া ভারশিব বংশ ভারতে পুনরায় হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন। ভারশিব রাজগণ পরম শৈব ছিলেন। প্রকৃত হিন্দুরাজার আদর্শে তাঁহারা রাজ্যশাসন করিতেন। সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ তাঁহারা নিজেদের জীবনে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেন। গণতন্ত্রের

এবং কৌমুদী মহোৎসব' গ্রন্থ দুইখানাকে প্রায় একই সময়ে লিখিত বলিয়া মনে করেন।

১৮। Corpus Inscriptionum Indicarum. Vol. III, by Fleet.

১৯। Fleet—Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. III, p. 59—Junagarh Inscription.

প্রজাদিগের স্বাধীনতা এবং স্বচ্ছন্দতার মত ভারশিব রাজতন্ত্রের প্রজাগণও স্বাধীনতা ও স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতেন। এমন কি জয়সওয়াল ভারশিব সম্রাটদিগকে (অশোকের মত) সম্রাট-সন্ন্যাসী বলিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

শিল্প ও স্থাপত্যের ইতিহাসে নাগদের দান সামান্য নহে। অজন্তা নাগসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলেও আমাদের অনুমান হয় যে অজন্তার কোন কোন গুহার চিত্র (Fresco painting) নাগদের সময় অঙ্কিত হইয়াছিল।

পদ্মাবতী নগরীতে 'স্বর্ণবিন্দু' নামক একটী শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদিন ইহার নির্ম্মাতার খোঁজ না পাইয়া ইহাকে স্বয়ং শিবের মত স্বয়ম্ভু বলা হইত। ইহাতে শিল্পকারুকার্য্যের যে নিদর্শন পাই, তাহা পরবর্ত্তী গুপ্তশিল্পে (Gupta school of Art) আমরা দেখিতে পাইব। মনে হয়, ইহা নাগদের সময়কার শিল্পের নিদর্শন। রাজনীতির মত শিল্পের কৃতিত্বের জন্যও গুপ্তগণ ভারশিবগণের কাছে ঋণী। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ভূমরা মন্দির নাগদের নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান হয়। ওই মন্দিরের গাত্রে তালবৃক্ষ খোদিত আছে এবং এই তালবৃক্ষ ভারশিব বংশের মুদ্রাতে আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। সুতরাং এই ভূমরা মন্দিরকে জয়সওয়াল নাগদিগের মন্দির বলিয়াছেন। স্থাপত্যের 'নাগর পদ্ধতি' (Nagara style of Architecture) প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত আছে। এই নাগর পদ্ধতিতে নির্ম্মিত কোন মন্দির অথবা দুর্গ ঐতিহাসিকগণ আজিও নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। জয়সওয়াল অনুমান করেন নাগর পদ্ধতি নাগগণেরই উদ্ভাবিত। তাঁহার মতে নাগরী অক্ষরও নাগদের কল্পিত অক্ষর হইতে আসিয়াছে। নাগদের সময়ে লিখিত 'ভাবশতক' নামক একখানা মূল্যবান গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। উহা রাজা গণপতি নাগকে উৎসৃষ্ট করা হইয়াছে। নাগ সাময়িক ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ আমরা উহাতে পাই।

কল্পনাশক্তির সাহায্যে জয়সওয়াল আরও অনুমান করিয়াছেন যে বর্ত্তমান নাগোয়া নামক স্থান—যাহা আজ কাশীর বিখ্যাত হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় বুকে করিয়া আছে—তাহা নামের ভিতর দিয়া নাগবংশের স্মৃতি বহন করিতেছে। নাগরাজগণের দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সাক্ষীস্বরূপ কাশীর পবিত্র দশাশ্বমেধ ঘাট আজিও রহিয়াছে। এমন কি নাগপুর নামের পশ্চাতেও নাকি নাগদের প্রভাব আছে।

উপরিউক্ত মন্তব্যগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমাদের উপযুক্ত প্রমাণাদি উপস্থিত করিতে হইবে। কেবল নামের মিল এবং ভাষার ঐক্যের দোহাই দিয়া আর যাহাই বলুন না কেন, সত্যিকার ইতিহাস লেখা চলিতে পারে না। ইতিহাস এবং গল্পের এখানেই প্রভেদ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে জয়সওয়াল প্রণীত নাগবংশের ইতিহাস সকল স্থানে সন্দেহমুক্ত বলিয়া আমরা মানিয়া লইতে পারি না। অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং মৌলিকত্বের বলে তিনি নাগবংশের জটিল ইতিহাস আজ আমাদের কাছে স্বচ্ছ সরল করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের রাজবংশাবলীর ইতিহাস গঠন করার শ্রেষ্ঠ উপাদান প্রশস্তি। ভারশিব বংশের প্রণীত বিশেষ কোন প্রশস্তি আমরা পাই নাই। সুতরাং প্রধানতঃ মুদ্রা এবং পৌরাণিক সাহিত্যকে ভিত্তি করিয়া ভারশিব বা নাগবংশের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। অবশ্য এলাহাবাদ প্রশস্তিতে লিখিত নাগরাজগণের সঙ্গে যথাসম্ভব মিল রাখিয়া এবং বাকাটক বংশের লিপির সাহায্য লইয়া জয়সওয়াল তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা অযৌক্তিক না হইলেও, আমাদের মনে হয়, কোন কোন জায়গায় দুর্ব্বল ভিত্তির উপর যেন রাজ-অট্টালিকা গড়া হইয়াছে। তদুপরি জয়সওয়াল অচেনা মুদ্রাগুলির যে অর্থোদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহা অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ কতদূর মানিয়া লইবেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। আমাদের এই মন্তব্যের উদাহরণ স্বরূপ আমরা উপরিউক্ত নাগরাষ্ট্র-সংহতি কিম্বা নাগশিল্প ও স্থাপত্যের ইতিহাস ধরিতে পারি। একটু তলাইয়া দেখিলেই জয়সওয়ালের সিদ্ধান্তগুলির কোন কোন জায়গায় প্রশ্ন উঠান যায়।

কিন্তু জয়সওয়ালের সিদ্ধান্তগুলি ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রমাণ করিবার উপযুক্ত উপকরণাদিও আজ আমাদের হাতে নাই। সুতরাং অখণ্ডনীয় বলিয়া না গ্রহণ করিলেও, তাঁহার রচিত ইতিহাসই আজ আমাদের কাছে সব চাইতে সন্তোষজনক ইতিহাস। ভবিষ্যতে এই ইতিহাসের কোন কোন ভাগের হয়তো পরিবর্ত্তন হইবে, কিন্তু মোটের উপর ভারশিব অথবা নাগবংশের ইতিহাসের এই ধারাই বজায় থাকিবে, তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

মঞ্জরীর বেহায়াপণা

শ্রীআশা দেবী

সেদিন মহিলা-সমিতিতে সমিতির কাজ বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতেছিল না। কারণ সেদিকে বড় কাহারও মনোযোগ ছিল না। মেয়েরা যে কথাটা লইয়া এতক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও অশেষবিধ মন্তব্য করিতে-ছিলেন, তাহা সমিতির আয়ব্যয়ের হিসাবও নয়, বন্যাপীড়িতদের জন্য সাহায্য, চরকা স্কুলের জন্য দান বা দুঃস্থ বিধবাদের মাসোহারার বন্দোবস্তও নয়। তাঁহাদের আজিকার আলোচনার বিষয় মঞ্জরীর বেহায়াপণা। সম্পাদিকার সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ অনেকক্ষণ হইয়া গেছে। গুটি তিন চার ছোট ছোট মেয়ে অর্গ্যানের কাছে দাঁড়াইয়া "জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা" গানটি গাহিতেছে। কিন্তু গানের দিকে কাহারও মনোযোগ নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। চাকরে ল্যাম্প জ্বালাইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। অন্য দিন সন্ধ্যা লাগিতে না লাগিতে সমিতির মেয়েরা বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। আজ সেদিকেও বিশেষ কাহারও লক্ষ্য নাই। তাঁহাদের এত ঔৎসুক্যময় আলোচনার কারণটা যাহা ঘটিয়াছিল, সে কথাটা খুলিয়া বলিতে গেলে, তাহার পূর্ব্ব-ইতিহাসও কিছু বলিতে হয়।

এখানকার দেওয়ানী কোর্টের বড় উকীল সুরসুন্দর, স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিতে বরাবর উগ্র রকম সাহেবিভাবাপন্ন ছিলেন। এই লইয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত কত দিন হইয়াছে কত মনোমালিন্য, কত রাগারাগি। স্ত্রী ছিলেন খাঁটি পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে। অবশেষে রফা হইয়াছিল। তিনি থাকিতেন আপন অন্তঃপুরে আপন নিয়ম আচারের গণ্ডীর মধ্যে। আর সুরসুন্দর বহির্ব্বাটীতে তাঁহার নিজস্ব বন্ধুবান্ধবমণ্ডলী খানা পার্টি ইত্যাদি লইয়া। কিন্তু অকস্মাৎ সেই শুদ্ধান্তঃপুরিকা শুচিবায়ুগ্রস্তা স্ত্রী যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতে ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়া সাত দিনের মধ্যে মারা গেলেন, তখন সকলেই আশা করিয়াছিল সুরসুন্দরের অতি-আধুনিক চালচলনের নৌকাখানায় অন্দর হইতে এতদিন যেটুকু বাধা-বাঁধনের নোঙর ছিল, এইবারে সেইটুকু নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এখন হইতে তাঁর স্বাধীনতার আর আদি অন্ত থাকিবে না।

কিন্তু এই সুনিশ্চিত সম্ভাবনার পরিবর্ত্তে সকলে অবাক হইয়া দেখিল, অন্তরের কোন নিগূঢ় প্রতিক্রিয়া-বশতঃ সুরসুন্দরের সাহেবি ধরণ-ধারণের সমস্তই বদলাইয়া আসিতেছে। ঠিক যাহা আশা করা গিয়াছিল, তাহার উল্‌টা দাঁড়াইয়াছে। সুরসুন্দর এখন প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করেন, শিখা রাখিয়াছেন। আতপ চাউলের অন্ন এবং নিরামিষ আহার করেন। সন্তানের মধ্যে তাঁহার দুইটি মাত্র মেয়ে। বড় মেয়ের মা বাঁচিয়া থাকিতেই বিবাহ দিয়াছিলেন কলিকাতার এক বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টারের সহিত। যে অবিবাহিতা বারো বছরের মেয়েটি এখন বাড়ীতে আছে তাহার নাম মঞ্জরী।

সুরসুন্দর মঞ্জরীকে আরও কাছে টানিয়া লইলেন। নিজের সহিত আচারে বিচারে, আতপ চালের অন্ন গ্রহণে মেয়েকে করিতে চাহিলেন সাথী। কিন্তু গোল বাধাইল মঞ্জরী।

মা বাঁচিয়া থাকিতে সে মায়ের দিক ঘেঁষিত না,—বাবার কাছেই মানুষ হইয়াছে। তাহার সেই পূর্ব্বতন কালের বাবা তাহাকে নিজে ইংরাজী শিখাইয়াছেন, গান শিখিতে উৎসাহ দিয়াছেন। বারো বছরেও বেণী দুলাইয়া, ফ্রক পরিয়া সে স্কুলে গিয়াছে। আজই হঠাৎ তাহার বাবা তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া লইতে চান। হালফ্যাশানের ফ্রকের বদলে আসিয়াছে শাড়ি এবং মাসিকপত্র ও গল্পের বইয়ের পরিবর্ত্তে শ্রীমদ্ভাগবত ও চণ্ডীর বাংলা অনুবাদ বাড়ীতে আসিতেছে।

মঞ্জরী বিদ্রোহ করিল। বেণী দুলাইয়া কহিল, "বাঃ রে, আমি বুঝি এখন থেকেই স্কুলে নাম কাটাব। এই সেদিনও হেড মিষ্ট্রেস আমাকে বলছিলেন, মঞ্জরী তোমার

যেমন বুদ্ধি, ম্যাট্রিকে স্কলারসিপ্ তুমি নিশ্চয়ই পাবে। সে তো এখনও তিন বছর, বাঃ রে, এরই মধ্যে বুঝি··· না না···নাম আমি কিছুতেই কাটাব না··· ”

সুরসুন্দর স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, “মঞ্জরি! আমার শোয়ার ঘরে তোমার মায়ের বড় অয়েল পেন্টিং আছে, সেইখানে খানিকক্ষণ চুপ করে বসো গে। আপনি মন স্থির হবে।”

মঞ্জরী শয়নঘরে যাইবার পরিবর্ত্তে ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মাথায় পরিপাটি করিয়া ফিতা বাঁধিয়া স্কুলের বাসে চড়িল। কিন্তু ক্রমশঃ এত শাসন বাঁধনের মধ্যে থাকা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। তাহার বড় দিদি কলিকাতা হইতে একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। কেবল চিঠিতে নিমন্ত্রণ নয়, দিন কয়েক পরে জামাইবাবু নিজে তাহাকে লইতে আসিলেন।

বাবার পূরোপূরি সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই মঞ্জরী তাহার জামাইবাবুর সহিত কলিকাতাগামী এক্সপ্রেসের একখানা সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে উঠিয়া পড়িল।

ইহার পর হইতে সুরসুন্দর তাঁহার শূন্য গৃহে কোর্টে যাওয়া, মক্কেলের কাগজপত্র দেখা এবং জপ তপ আহ্নিক লইয়া নিমগ্ন রহিলেন।

মঞ্জরী কলিকাতার ডায়োসেসন্ স্কুলে ভর্ত্তি হইল। তাহার পরে সে ম্যাট্রিক পাশ করিল, আই-এ পড়িতে সুরু করিল। কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে একবারও দিদির বাড়ী ছাড়িয়া বাবার কাছে গেল না। দিদিরও ছিল না ছেলেপুলে। তিনি তাঁহার গৃহসংসারের কেন্দ্র-স্থলটিতে মঞ্জরীকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। মঞ্জরীর কৌতুক কলহাস্যে, তাহার দ্রুতধাবনে, তাহার সঙ্গীতে সে বাড়ী মুখরিত হইয়া থাকিত।

এত দিন অবধি একরকম কাটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মঞ্জরীর বয়স যখন সতের বৎসর, দিদি ও জামাইবাবুর সহিত শিমুলতলায় বেড়াইতে গিয়া একদিন প্রভাতবেলায় একজনের সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি বাড়ীওয়ালা নরেশবাবু। বাড়ীওয়ালা বলিতেই যে চিত্র চোখের সুমুখে ভাসিয়া উঠে, নরেশের সহিত তাহার কোনখানে মিল নাই। তাহার বয়স বছর ছাব্বিশ সাতাশ। পায়ে কটকি কাজ-করা শুঁড়তোলা নাগরা জুতা, গায়ে আলোয়ান এবং চোখে চশমা। সে বাড়ী ভাড়ার টাকার জন্য তাগাদা করিতে আসে নাই, আসিয়াছিল মঞ্জরীর জামাইবাবু সীতেশবাবুদের কোন প্রকার অসুবিধা হইতেছে কি না, জানিতে। হাতে তাহার ছিল একটি গোলাপ ফুলের তোড়া। শিমুলতলায় নরেশবাবুদের যত বাড়ী আছে সে সমস্তই গোলাপ বাগানের সংলগ্ন।

দেখা করিতে আসিয়া সবচেয়ে প্রথমেই দেখা হইয়া গেল যাহার সঙ্গে;—নরেশ অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল এত দীর্ঘ দিন রাত্রি তাহাকে না দেখিয়া কাটিয়াছে কেমন করিয়া।

মঞ্জরী বাগানে বেড়াইতেছিল, বারান্দার সিঁড়িতে এক পা এবং ঘাসের উপর এক পা রাখিয়া প্রশ্ন করিল, “কাকে খুঁজচেন? ····জামাইবাবু? ও, তিনি বুঝি এখনও ঘুম ভেঙ্গে ওঠেন নি। ততক্ষণ আপনি আমাদের ব’সবার ঘরটায় একটু ব’সতে পারেন।”

নরেশ নির্ব্বিবাদে আসিয়া ব’সিল। হাতের তোড়াটা টেবিলের উপর রাখিল।

মঞ্জরী বলিল, “চমৎকার ফুল!”

তা, যত বড় এবং যত উচ্চ প্রেমের কাহিনীই হো’ক, প্রথম আলাপে কি কথা হইয়াছিল, তাহার পর্য্যালোচনা করিতে গেলে ইহার চেয়ে বেশী পুঁজিও বুঝি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কিন্তু প্রথম আলাপের বাঁধুনী যত সামান্য কথা দিয়াই হোক, তাহা ক্রমশঃ দ্রুতগতিতে এমন স্থানে আসিয়া পৌছিল যে, দু’জনেই অবাক হইয়া নিঃশব্দে নিজের অন্তস্তলের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, এ কে? ইহাকে কিছু দিন আগে তো চিনিতামও না। ইহারই মধ্যে এমন করিয়া এ জীবনের সহিত জড়াইয়া গেল কী করিয়া!

শিমুলতলার নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রকৃতি, বনময় আবেষ্টন, ফাল্গুনের ঈষদুষ্ণ বাতাস, আকাশের ঘন নীল—এ সমস্তই একযোগে মঞ্জরী ও নরেশের চিত্তকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন নরেশ বেড়াইতে বাহির হইয়া মঞ্জরীর জামাইবাবুর কাছে একটা কথা পাড়িল।

বাড়ী ফিরিয়া সীতেশ স্ত্রীকে কথাটা বলিল।

মঞ্জরীর দিদি উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, 'বেশ তো, ভালোই তো। নরেশের মত এমন পাত্র সহজে চোখে পড়ে না। সে যদি নিজে থেকে মঞ্জরীকে বিয়ে ক'রবার প্রস্তাব করে থাকে, সে তো ভাগ্যের কথা। বড়লোক, মাথার উপর তেমন অভিভাবকও কেউ নেই……' কিন্তু অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইয়া উঠিতে-উঠিতে হঠাৎ কি ভাবিয়া একটু চিন্তান্বিতা হইয়া মঞ্জরীর দিদি কহিলেন, "কিন্তু নরেশরা মৈত্র নয়? বারেন্দ্র শ্রেণী। আমরা তো রাঢ়ী। এ বিয়েতে বাবার মত হ'লে হয়।"

সীতেশ একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, "অমন বিয়ে আজকাল হামেশাই হচ্ছে। এই তো আমার বন্ধুদের মধ্যে—"

বাধা দিয়া তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "সে তো আমিও জানি। আমার বাবাও এককালে এই ধরণের বিবাহের পক্ষ নিয়ে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করেছিলেন, কাগজে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু আজকালকার ধরণ ধারণ তো জান।"

সীতেশ বলিল, "তোমার বাবা যদি অত সেকেলে, তাহলে মঞ্জরীকে আমাদের কাছে এনে রেখে এমন ভাবে মানুষ করা আমাদের অন্যায় হয়েচে। তোমার বাবার আপত্তির ফলে নরেশের সঙ্গে যদি ওর বিয়ে না হয়, আর সে অসুখী হয় তবে—"

মঞ্জরীর দিদি মাথা নাড়িয়া, কর্ণভূষা দোলাইয়া কহিলেন,—"ইস্ তাই হতে দিলে তো!"

কার্য্যকালে ঠিক তাহাই হইল। মঞ্জরীর পিতা কিছুতেই রাজী হইতে চাহিলেন না প্রথমটায়। সীতেশের কলিকাতার বাড়ীতেই বিবাহের সমস্ত উদ্‌যোগ আয়োজন হইতে লাগিল।

মঞ্জরী আনন্দ এবং বিষাদের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় দুলিতে লাগিল। আনন্দ যে জন্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আর ক্ষণে ক্ষণে বিষণ্ন হইয়া যাইতে লাগিল এই মনে করিয়া যে তাহার মা নাই, বাবা আছেন কিন্তু তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান শুভদিনে তিনিও তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ মন ভার করিয়া বসিয়া থাকিবারও যো ছিল না। দিদি তাহাকে টানিয়া তুলিয়া ট্যাক্সিতে পুরিয়া নিউমার্কেট, চাঁদনী, এমনতরো হাজারটা দোকানে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছিলেন।

সেদিনও সন্ধ্যার সময় এমনি সমস্তদিনব্যাপী ঘোরা-ঘুরি ও পরিশ্রমের পর মঞ্জরী শ্রান্ত হইয়া তাহার বসিবার ঘরে আসিয়া বসিয়াছে, মাথার উপর পাখা ঘুরিতেছে, এমন সময় নীচের গাড়ীবারান্দায় একটা পরিচিত স্বর শোনা গেল।

মঞ্জরী চমকিয়া উঠিল।

এ যে তাহার বাবার গলার আওয়াজ! হয় তো ভুল হইয়াছে মনে করিয়া সে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া নীচে নামিবার উপক্রম করিল। কিন্তু পরক্ষণেই সুরসুন্দর ঘরে ঢুকিলেন। মঞ্জরী অনেক দিন তাঁহাকে দেখে নাই। এখন চাহিয়া দেখিল তাঁহার শীর্ণ মুখে বেদনার ছায়া। তাঁহার পায়ের কাছে প্রণতা মঞ্জরীকে তিনি যখন ধরিয়া তুলিলেন, তখন তাঁহার চোখে জলের আভাস।

দুয়ারটা ভেজাইয়া দিয়া সুরসুন্দর বলিলেন, "মা বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

দু'জনেই কিছু কাল নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তাহার পর সুরসুন্দর বলিলেন, "আমার উপর রাগ করেচ মা? কিন্তু আমার কথা সমস্ত না শুনে আমার উপর রাগ করতে পাবে না তা বলে দিচ্ছি। তোমার মা মারা যাবার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বুঝতে পারি নি তাঁকে কত ভালোবাসতুম। যখন বুঝতে পারলুম, তখন বোঝাটা একতরফাই হো'ল। আর কাউকে বোঝাতে পারলুম না। তিনি তখন সমস্ত বোঝা না বোঝার বাইরে চলে গেছেন। কিন্তু আমার কেমন মনে হো'ল আমার জীবনে সমস্ত খুঁটিনাটি তিনি যেন দূর থেকে দেখচেন। এর পর থেকে তাঁর অপ্রিয় কাজ কিছুতেই করতে পারতুম না। বন্ধুরা অনেক ঠাট্টা করেচে আমার জপ তপ আহ্নিকের কৃচ্ছ সাধনা দেখে। আত্মীয়েরা করেচে বিদ্রূপ, পরিচিত অনেক বলেচে, খামখেয়ালী। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও থামতে পারতুম না। খুব যে ভালো লাগত তা'ও নয়। কিন্তু কে যেন আমাকে দিয়ে জোর করে করিয়ে নিত।'

গজল ও বৈষ্ণব কবিতা

শ্রীবিষ্ণুপদ রায় এম-এ, বি-এল, বি-টি

মায়াবাদপূর্ণ তার্কিকের দেশে প্রেমের বার্ত্তা লইয়া মহাপ্রভু আগমন করিলেন; সঙ্গে-সঙ্গে দেশ রূপান্তরিত হইল। বসন্ত-সমাগমে ধরণীর মত বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্র সুষমায় সুন্দর ও মধুর হইয়া উঠিল। পারস্য দেশে সূফীদের আবির্ভাবে পারস্য সাহিত্যেও তেমনি নবযুগের সঞ্চার হইয়াছিল। সাদি, হাফেজ, জামি ও রুমি প্রভৃতি ইরাণের শ্রেষ্ঠ কবিগণ সকলেই খ্যাতনামা সূফী ছিলেন। কর্ত্তব্যধর্ম্ম-কঠোর ইসলামের মধ্যে সূফীরা প্রেমের বাণী আনিয়া দিয়াছিল, জীবনে তথা সাহিত্যে রসের সঞ্চার করিয়াছিল, তপস্যা-শুষ্ক সাধন-জগৎকে প্রেমাশ্রু-ধারায় প্লাবিত করিয়াছিল। আধুনিক বঙ্গে সর্ব্বত্র সুপরিচিত গজলের প্রথম উন্নতি এই সূফীদের দ্বারাই হইয়াছিল।

ইসলামীয় পারস্যের পূর্ব্বকবিগণ অনেকেই আরব সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। আরব কবিতার কসিদার সহিত গজলের কিছু সম্বন্ধও আছে। কসিদা কাহারও প্রশংসাসূচক বা নিন্দাব্যঞ্জক কবিতা। ইহাতে ন্যূনকল্পে পঞ্চদশটী শ্লোক থাকে। গজল যৌবনের, সৌন্দর্য্যের ও প্রেমের গান। মধ্যযুগে যখন কাব্যামোদী নরপতিগণের প্রাসাদে বসিয়া তাঁহাদের প্রসাদপুষ্ট কবিগণ কাব্য রচনা করিতেন, তখন নৃপপ্রশস্তিই ছিল কাব্যের প্রধান উপজীব্য। সেই জন্য আরব্য কসিদা ও পারসিক গজলে তখন পার্থক্য বড় অধিক থাকিত না। প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বড় কেহ গজল লিখিত না। তদানীন্তন কালের গজলে শব্দাড়ম্বর ও ছন্দোবৈচিত্র্যই বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইত। প্রমাণ স্বরূপ আন্ওয়ারি, খাকানি, জাওয়ালি, মস্উদ প্রভৃতি কবিবৃন্দের গজলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল কবি শব্দচয়নে ও পদলালিত্যে বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু আন্তরিকতায় ও ভাবের গভীরতায় ইঁহারা ছিলেন নিতান্ত দরিদ্র। সূফীরা আসিয়া ইরাণের কবিতাকে সঞ্জীবিত করিল! ধর্ম্মসাধনায় প্রেমই ছিল সূফীদের একমাত্র পুঁজি। সূফীদের মতে একমাত্র প্রেমের দ্বারাই ভগবৎ-কৃপা লাভ করা যায়। তাই যেদিন সূফীত্বে ও কবিত্বে সম্মিলন হইল, সেদিন পারস্য সাহিত্যের এক গৌরবময় দিন। গজল সেদিন নূতন আকারে দেখা দিল। সপ্তম হিজরিতে পারস্যের বিখ্যাত সালজুকিয়া রাজবংশের পতন হয়।' এই বিদ্যোৎসাহী রাজবংশের পতনের পর কবিযশঃপ্রার্থিগণের রাজ-সম্মানলাভের আশা ইরাণ হইতে বিলুপ্ত হয়। সঙ্গে-সঙ্গে কবিত্বও রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়ন করিয়া অকিঞ্চন সূফীগণের কম্বলাশ্রয় গ্রহণ করে। এতদিন কবিগণ রুবাইয়ত ও মসনবির সাহায্যে হৃদয়ের দরদ প্রকাশ করিতেন, কসিদা রচনা করিয়া রাজার তুষ্টিবিধান করিতেন। এখন সকলেরই দৃষ্টি পড়িল গজলের উপর। এতদিন কবিরা কবিতা লিখিতেন রাজার মুখ চাহিয়া; এখন আর সে বালাই থাকিল না। সমগ্র সমাজ বিদ্যোৎসাহী রাজার স্থান গ্রহণ করিল। রাজার প্রাসাদ-শিখর হইতে অবতরণ করিয়া কবি আসিয়া দাঁড়াইলেন জনগণের প্রশস্ত প্রাঙ্গণতলে। প্রেমই মানবজীবনে চিরন্তন, প্রধান ও আদি রস। প্রেমের কথাই দেশকাল-পাত্রভেদে মানবহৃদয় স্পর্শ করে। সেই জন্য সূফী সাধকগণ যেদিন ধর্ম্ম-সাধনার মধ্যে প্রেমকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিল, সেদিন জনসাধারণ সে সাধনতত্ত্ব বুঝিল কি না জানি না; কিন্তু সূফীদের প্রেমের গান সাগ্রহে শুনিয়াছিল। গজল গান তাই সূফীসাধনার সঙ্কেতসূচক সঙ্গীত হইয়াও সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিল। বঙ্গদেশেও সহজিয়া সাধক যেদিন "পীরিতি"র গান গাহিল, সেদিন সে প্রেমতত্ত্বের কথা, সে প্রেমসাধনার বিষয় সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করে নাই; কিন্তু তবু সেই গান প্রাণের ভিতর দিয়া তাহাদের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল।

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,

অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা,—এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে থাকা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে—এ কি শুধু দেবতার ?
এ সঙ্গীত-রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের।

তপ্ত প্রেম তৃষা ?”

রবীন্দ্রনাথ “বৈষ্ণব কবিতা”য় এই যে প্রশ্ন করিয়াছেন পারস্যের অধিবাসীরাও সুফীদের প্রেম-কবিতা তথা গজল সম্বন্ধেও সেই প্রশ্নই করিয়াছিল।

বৈষ্ণবগণের মত সুফীরাও জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে নায়ক-নায়িকারূপে কল্পনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণের ভগবান পরম প্রেমময় চিরসুন্দর নবীন নটরাজ পরকীয় নায়ক; আর সুফীদের কাছে তিনি চিররহস্যময়ী অপূর্ব্ব সুন্দরী নায়িকা। এই নায়িকার জন্য সুফী পাগল। প্রেমোন্মত্ত নায়কের মত সে হাসিয়াছে, কাঁদিয়াছে, মূর্চ্ছিত হইয়াছে। বৈষ্ণব নায়ক-নায়িকারই মত তাহার স্বেদকম্পপুলকাদি হয়। সুফীশ্রেষ্ঠ জেলালুদ্দিন রুমি তাঁহার একটী গজলে বলিয়াছেন,—

আমি যে ঘুম-হারা নয়ন জ্বালা সই।
পাগল প্রাণ লয়ে শয়ন হয় কই ?
বনের পশু পাখী হল যে হায়রান
ভাবে ও ক্যাপা কেন কাঁদে ও গায় গান !
নয়ন অনিমেষে চাহিয়া আসমান
ভাবে ও অহরহ কাঁদে ও করে গান ?
প্রেমের যাদু আজ পৃথিবী দিল ছেয়ে ;
পাগল হোয়ে তাই মরি যে গেয়ে গেয়ে।

প্রেমোন্মত্ত সুফী কবি প্রিয়তমার জন্য নিরত অশ্রুপাত করিতেছেন। তাঁহার নয়নের নিদ্রা আজ অন্তর্হিত, বিরামশয্যা আজ কণ্টকময়। নিরন্তর তাঁহার এই আর্ত্তনাদ শুনিয়া-শুনিয়া বনের পশু-পক্ষীরাও বুঝি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের মোহিনী মায়ায় আজ যে কবির চক্ষুতে বিশ্বভুবন সমাচ্ছন্ন। তাই কবি-হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। আজ আর তাঁহার মন মানে না, গান থামে না ! সুফী কবির এই গজল বৈষ্ণব কবির বিরহবিধুরা রাধার উক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়।

“নয়নক নিন্দ গেও, বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ, দুঃখ হাম পাশ॥

(বিদ্যাপতি)

সুফীকবি-নায়কের মতই বৈষ্ণব কবির রাধা কৃষ্ণ-বিরহে নিরন্তর অশ্রুপাত করিতেছেন, পূর্ণিমার ইন্দুর মত তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল আজ বেদনাম্লান ক্ষীণ শশিরেখায় পরিণত হইয়াছে, তাঁহার চিন্তার ও দুঃখের অন্ত নাই—

মাধব, সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু নিঝর
জনু ঘন সাঙন মালা।
পুনমিক-ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সো ভেল অব শশি রেহা
কলেবর কমল-কাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা
উপবন হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ
পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতিপর লিখই
পাণি কপোল অবলম্ব।
ঐছন হেরি তুরিতে হাম আয়নু
অব তুঁহু করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
বুঝনু কুলিশক সার।

সুফী গজলের কবির কাছে মনে হয়,—যাঁহার জন্য তিনি কাঁদিয়া মরিতেছেন, বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছেন, তাঁহার সাড়া পাওয়া যায় না কেন ? নিষ্ঠুরা নায়িকা যদি তাঁহারই মত প্রেমবিহ্বল নায়ক হইতেন, আর কবি যদি নায়িকা হইতেন, তবে হয় ত কবির প্রেমাস্পদা কবির এই আর্ত্তি ও দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। অথবা প্রেমিক যদি একবারও নায়িকার দিকে ফিরিয়া না চাহিতেন, নিত্য-অভিমানে মত্ত হইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া না তাকাইতেন, নির্দ্দয় ব্যবহারে নায়িকার দর্প চূর্ণ করিয়া দিতেন, তবে হয় ত নায়িকা কবির এই ব্যথা, এই

আকুতি বুঝিতে পারিতেন। প্রেমের ব্যথা বোধ হয় নায়িকার হৃদয় স্পর্শ করে নাই—তাই কবির এত প্রেম-নিবেদনেও তাঁহার এই অবহেলা!

যাতনাকাতর নিদ্রাবিহীন আমি যে বেদনা পাই!
যার লাগি আমি নিতি কেঁদে মরি এ দুখ সে বুঝে নাই!
নিঠুর নায়ক যদি সে পাইত, হৃদয় চূর্ণ করা,
অভিমানময়, নিত্যবিমুখ সকল দর্প হরা
তবে সে বুঝিত মোর দিনরাত কেমনে আসে ও যায়।
প্রেমের দরদ বোঝে না সেজন, এত অবহেলা তাই।

(জেলালুদ্দিন রুমির গজল)

এইরূপ অভিমানপূর্ণ কথা বৈষ্ণবপদাবলীর মধ্যে বহুল পরিমাণে লক্ষিত হইবে। মানময়ী শ্রীমতী নায়ককে লক্ষ্য করিয়া বহুবার এইরূপ উক্তি করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় যেমন বৈষ্ণব-কবিতার নায়িকার সকল আর্ত্তি, সকল দৈন্য সতত প্রকাশিত হইত, সুফী কবি রুমির কাব্যের এইরূপ আর্ত্তি ও দৈন্য তেমনই কবির বাস্তব জীবনের মধ্যে দৃষ্ট হইত।

বৈষ্ণব কবির বৃন্দাবনে যেমন ঐশ্বর্য্যের অধিকার নাই—সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যরসে নিখিলব্রহ্মাণ্ডপতি সখা, সন্তান ও সামান্য নায়ক হইয়াছেন, সুফীর গজলের প্রেমরাজ্যেও তেমনই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের প্রভাব নাই,—সেখানে তিনি অপূর্ব্বরহস্যময়ী অনন্তযৌবনা অসীম রূপবতী নারী। তাঁহার প্রেমপূর্ণ কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য সুফী কবি পাগল। কবি তাঁহার উপর মান অভিমান করিতেছেন, কখনও বা তাঁহাকে সোহাগ করিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন, কখনও বা আবার কত তীব্র তিরস্কারও করিতেছেন।

বৈষ্ণবকবির নায়িকা কৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে অন্তহীন দুঃখ অনুভব করিতেছেন ও ভাবিতেছেন 'আগে জানিলে এ পথে পা বাড়াইতাম না।' তবুও আবার কৃষ্ণপ্রেমেই ডুবিয়া থাকিতে চাহিতেছেন। তাঁহার নিকট কৃষ্ণই দুঃখের মূল; আবার কৃষ্ণই সকল দুঃখহরণ প্রাণারাম। তাঁহার নিকট—

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি ঘসিতে সৌরভময়,
ঘসিয়া ঘসিয়া হৃদয়ে লইতে দহন দ্বিগুণ হয়।

(চণ্ডীদাস)

কিন্তু—

দশমী দশায়ে আছয়ে এক ঔষধ—
শ্রবণে কহয়ে তুয়া নাম
শুনইতে তবহি পরাণ ফিরি আওত
সে দুখ কি কহন যায়।

(বলরামদাস)

সুফী কবি ঠিক এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই যেন বলিয়াছেন,—

প্রথম দিবসে জানিতাম যদি
এত দুখ মোর হবে,
তোমার মাঝারে পরাণ আমার
নাহি সঁপিতাম তবে। (রুমির গজল)

অথবা,

তারি প্রেমে মোর ক্ষতবিক্ষত
হয়েছে হৃদয়খানি,
এ দারুণ ঘায়ে তারি প্রেমে পুন
প্রলেপ বলিয়া মানি।

(রুমির গজল)

বৈষ্ণব কবিতার বাসকসজ্জায় আমরা নায়িকাকে নায়কের সহিত মিলনের আশায় প্রতীক্ষা করিতে দেখি, তাঁহাকে বলিতে শুনি,—

বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা
তাম্বুল সাজনু দীপ উজারিণু
মন্দির হইল আলা।
সই, এ সব কি হবে আন?
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান? (চণ্ডীদাস)

সুফী কবিও সেই নিঠুরা প্রিয়তমার প্রতীক্ষায় সুরা-পাত্র হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, ধরণীর শেষ দিবস পর্য্যন্ত তিনি এমনই করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন।

সরাবের পাত্র হাতে তারি প্রতীক্ষায়
অনন্ত রজনীদিন রব জাগি নিদ্রাহীন
রব দাঁড়াইয়া তার মিলন আশায়।

(রুমির গজল)

বৈষ্ণব কবির রাধা কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা, তিনি কুল-মান বিসর্জ্জন দিয়াছেন, জীবনের সকল সুখে বিরাগিনী হইয়াছেন, কোনও অলঙ্কারে তাঁহার প্রয়োজন নাই।

ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া,
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া।
কাল মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে,
কানুগুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে।
কানু অনুরাগ-রাঙা বসন পরিব,
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব।
চণ্ডীদাস কহে কেন হইলা উদাস,
মরণের সাথি যেই সে কি ছাড়ে পাশ।

সুফী কবির গজলেও ঠিক এই ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রিয়তমার জন্য তিনি বসনভূষণ, বিদ্যাবুদ্ধি ও তর্কশক্তি—তাঁহার যাহা কিছু ছিল সবই বিসর্জ্জন দিয়াছেন, "মারফতে"র নদীতে তরী ভাসাইয়াছেন, জীবনে আর তাঁহার কোন স্পৃহা নাই, প্রিয়তমাকে খুঁজিয়া এখন জীবন কাটাইবেন।

মনেরে দিয়েছি মাসুকের পথে
কি আছে আমার আর ?
পড়ে আছে শুধু হৃদয় বেদনা
নয়নে অশ্রুধার।
বসন ভূষণ, বিদ্যা বুদ্ধি,
বাদানুবাদের বল
অতল সলিলে দিয়েছি ফেলিয়া
কিবা তাহে আর ফল ?
প্রেম দরিয়ায় ছাড়িয়াছি তরী।
সন্ধান করি তার
এরি তীরে তীরে বেড়াব ফিরিয়া।
জীবনে কি কাজ আর ? (রুমির গজল)

বহু যন্ত্রণাময় "পিরীতি" ত রাধার জীবনে শুধু দুঃখই দিল, তাই তিনি কতবার মনে করিয়াছেন, এ প্রেমের প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রেমহীনা হইয়া বাঁচিবেন কেমন করিয়া? সুফী কবিকেও বন্ধুরা প্রেম ত্যাগ করিতে উপদেশ দিল। কিন্তু তিনিও ভাবিতেছেন, প্রেমের কথা ত্যাগ করিলে মন আর কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে ?

বন্ধুরা কহে, এইবার কবি, ছাড় এই আসনাই।
প্রেম যদি যাবে, আমি ভাবি তবে জীবনে কি কাজ হায়।
(রুমির গজল)

উদাহরণ স্বরূপ যে সকল গজলের অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহার সকলগুলিই জেলালুদ্দিন-রুমি-রচিত। বিখ্যাত কবি হাফেজ গজল রচনায় রুমি অপেক্ষা অধিক সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কাব্যসৌন্দর্য্যেও হাফেজের গজল রুমির বহু উর্দ্ধে। কিন্তু রুমির গজলকে আমরা সুফী-গজল-রচনার আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি। রুমি একাধারে সুফী কবি ও সুফী সাধক। সুফী-সাধনা রুমির জীবনে যেমন মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিয়াছে, এমনটী আর ইরাণের কোনও কবির মধ্যে পাওয়া যায় না। তাই সুফীগণের প্রেমসাধনার কথা তাঁহার গজলে জীবন্ত। রুমির জীবনের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রেমোজ্জ্বল জীবনের সাদৃশ্য যেমন লক্ষিত হয়, রুমির গজলের সহিত তেমনই বৈষ্ণবগণের পদাবলীর সাদৃশ্যও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

নবীন ও প্রবীণ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের মধ্যে যে প্রবল ধর্ম্মবিপ্লব দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে কেবল উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে নয়, প্রায় প্রতি গৃহেই অন্তর্দ্রোহ জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে। অশান্তির তীব্রতাও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ভবিষ্যৎ ভাল কি মন্দ তাহার স্থির সিদ্ধান্ত করা সহজসাধ্য নহে। বিপ্লব অবস্থা-বিশেষে সুফলপ্রসূ হয়; আবার কুফলও প্রসব করে যদি সুনিয়ন্ত্রিত না হয়। যাহা হউক, এ বিষয়ে নবীন ও প্রবীণ উভয় পক্ষের বিশ্বাস বিভিন্ন। উভয় পক্ষই পরস্পর পরস্পরকে দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী করিয়া থাকেন। এক শ্রেণীর লোক মনে করেন, কতকগুলি অন্ধবিশ্বাসী কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়ার দল ভারতে প্রগতির অন্তরায় হওয়ায় দেশ উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। আর এক শ্রেণীর লোক বলেন, কতকগুলি উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন লোকের যথেচ্ছাচারের ফলে দেশ ক্রমেই অধঃপতনের দিকে যাইতেছে। এই উভয় পক্ষেই উচ্চ শিক্ষিত দেশহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন। কিন্তু এই উভয় দলকে বিশ্লেষণ করিলে এক দিকে ইংরাজী-শিক্ষিত উৎসাহী যুবকদলের প্রাধান্য ও অপর দিকে শাস্ত্রভীরু নৈষ্ঠিক প্রবীণ দলের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই নবীন দলকে উদারনৈতিক ও প্রবীণদলকে রক্ষণশীল বলা হইয়া থাকে। অবশ্য উদারনৈতিকের মধ্যেও প্রবীণ আছেন এবং রক্ষণশীলের মধ্যেও নবীন একেবারে নাই বলা চলে না। বলা বাহুল্য, উভয় দল পিতা পুত্রাদিরূপে সম্বন্ধ যুক্ত হইয়াও মতের বিভিন্নতা হেতু অনেক স্থলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট ও ভক্তি স্নেহাদি শূন্য হওয়ায় সাংসারিক শান্তি শৃঙ্খলা ও উন্নতিতে বাধা জন্মিতেছে। কেহ কাহাকেও স্বমতে আনিতে সমর্থ হইতেছেন না। বিরুদ্ধবাদীর যুক্তি স্থিরভাবে সহৃদয়তার সহিত শুনিবার বা বুঝিবার মত ধৈর্য্যও অনেকের নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সংস্কার ও বোধশক্তিকে প্রাধান্য দিতেছেন। আপোষের চেষ্টা তেমন হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। তর্ক্কার লড়াইয়ের মত কথা-কাটাকাটি মধ্যে মধ্যে চলিলেও, মীমাংসায় উপনীত হইবার ভাব দেখা যাইতেছে না। নবীনপন্থীর ধারণা—প্রাচীনের ধ্বংস স্তূপে নবীন ভারত নবভাবে গড়িয়া উঠিবে। প্রাচীনপন্থীর বিশ্বাস—নবীন দল অনাচারের ফলে যেরূপ স্বাস্থ্য, শক্তি ও আয়ুঃ লাভ করিতেছে তাহাতে গড়িবার পূর্ব্বেই জাতি হিসাবে হিন্দুর নাশ অনিবার্য্য। যাহা হউক, নবীনপন্থীগণ নিজেদের কল্পনানুযায়ী নবীন ভারত গঠনোদ্দেশ্যে যেরূপ উৎসাহ এবং কর্ম্মদক্ষতা দেখাইতেছেন, প্রাচীনপন্থীগণের মধ্যে তাহা না থাকিলেও, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা ও চিন্তাশীলতাকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। এ কথা কাহারও ভুলিলে চলিবে না যে দেশের এবং জাতির কল্যাণরূপ স্বার্থ উভয়েরই এক এবং একই লক্ষ্যকে উদ্দেশ করিয়া দুইটী বিপরীতমুখী মতবাদের সৃষ্টি হইলেও কেহ কাহারো পর বা শত্রু নহে। উভয়েই বর্ত্তমান পতন হইতে উত্থানের প্রয়াসী সুতরাং সংস্কারকামী। এক দল পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আদর্শ করিয়া উঠিতে ইচ্ছুক। অপর দল সনাতন সভ্যতার পক্ষপাতী। প্রথমোক্ত দলের ধারণা এই যে ধর্ম্মকে দেশ কাল পাত্রের উপযোগী করিয়া গড়িতে না পারিলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত খাপ্ খাওয়াইয়া জাতি বাঁচিতে পারে না। সুদূর অতীত কালের উপযোগী বিধান বর্ত্তমান সভ্য যুগে চালাইতে যাওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। সেকাল ও একাল এক নয়। একালে দৃষ্টি ও কর্ম্মক্ষেত্র কেবল ভারতের মধ্যে নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করতঃ বিশ্বের সহিত সমান তালে চলিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। নতুবা কতকগুলি কুসংস্কারের মোহে আড়ষ্ট হইয়া ধর্ম্ম গেল ধর্ম্ম গেল চীৎকারে জাতির অগ্রগতিকে বাধা দিলে, কেবল যে সেই গরুর গাড়ীর যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে তাহা নহে; পরন্তু অন্যান্য জাতির চাপে ইহার নিশ্চিত ধ্বংস রোধ করিবার উপায়ান্তর থাকিবে না। সুতরাং উন্নতিশীল জাতিসমূহের অনুকরণে সংস্কার আবশ্যক। দ্বিতীয় দলের বিশ্বাস—হিন্দুর ধর্ম্ম মানব-কল্পিত নহে; উহা ব্রহ্মবিৎ ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে জীবের কল্যাণার্থে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভগবৎবাণী। অলৌকিক প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তু লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহে। অভিজ্ঞতার মূল্য প্রাচীনেরই বেশী। অপরাপর জাতি কয় দিনের সভ্যতার গৌরব করিবে। তাহাদের বর্ত্তমান উন্নতি যে অনতিবিলম্বে অবনতির কারণ হইয়া না দাঁড়াইবে তাহার প্রমাণ কি? সুতরাং সংস্কার অপরের অনুকরণে নহে, নিজেদের পরমার্থবাদের ভিত্তিতে শাস্ত্রীয় মতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাপ্রসূত মতবাদের দ্বারা সনাতন ধর্ম্মকে ক্ষুণ্ণ করা চলে না। ভেদপ্রয়োগ-নিপুণ বৈদেশিকের মিথ্যা রটনায় অনুপ্রাণিত হইয়া প্রতীচ্যের মতে সমাজ বা ধর্ম্ম সংস্কার করিতে যাওয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট আত্মসমর্পণেরই নামান্তর। এই দুইটী মূল কারণ অবলম্বন করিয়া নানা বাদ-প্রতিবাদে দুই পক্ষেরই প্রবল যুক্তি আছে। তন্মধ্যে প্রথম পক্ষে লৌকিক যুক্তির প্রাধান্য ও দ্বিতীয় পক্ষে শাস্ত্রীয় যুক্তির প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য নবীনপন্থীরাও আজকাল কিছু কিছু শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং প্রাচীনপন্থীরাও লৌকিক যুক্তি একেবারে দেখাইতেছেন না তাহা নহে। নবীনপন্থীগণ দ্রুত সংস্কার প্রয়াসী হইয়া জনমত গঠন ও নিজের অশাস্ত্রীয় আচার সমর্থন কল্পে প্রাচীনপন্থী ও তাঁহাদের অবলম্বিত শাস্ত্রাদির ছিদ্রানুসন্ধান করতঃ দোষের দিক্‌টা বড় করিয়া সামাজিকের নিকট প্রচার করিতেছেন। প্রাচীনপন্থীগণও নবীনের উচ্ছৃঙ্খলতা যত দেখিতে-ছেন তাহাদের গুণের তেমন আদর করিতে পারিতেছেন না। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সংঘর্ষজাত অগ্নি উভয়েরই ক্ষতি

করিতেছে ; উভয়কেই বাধা দিতেছে। তাহাতে হিন্দুগণই অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছেন। যাহা হউক, নবীনপন্থীগণ সংস্কারের নিম্নলিখিতরূপ তালিকা উদ্ভাবন করিয়াছেন, যথা, স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, আন্তর্জাতিক বিবাহ, বাল্যবিবাহ নিরোধ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, হরিজনের মন্দির প্রবেশ, বিলাতযাত্রা, সর্ব্ববর্ণের বেদাধিকার, জাতিভেদ উচ্ছেদ, পৌত্তলিকতা ধ্বংস প্রভৃতি। তন্মধ্যে শেষোক্ত দুইটী সম্বন্ধে নবীন-পন্থীগণের মধ্যেও মতভেদ থাকায় এ বিষয়ে বাহ্যিক আন্দোলন একরূপ বন্ধ আছে বলা যায়। আবার কতকগুলি, আশু প্রয়োজন বিধায়, প্রবল আন্দোলনের বিষয়ীভূত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটী সমর্থনকল্পে যত প্রকার যুক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই যে পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রসূত অতএব স্বাধিকারবাদ ও ভোগবাদমূলক, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এবং ঐ সকল সংস্কার্য্য বিষয়গুলির বিরুদ্ধে রক্ষণশীলগণের যত প্রকার যুক্তি আছে, তাহার অধিকাংশই শাস্ত্র-বিশ্বাস-সঞ্জাত হইলেও, প্রবীণগণ সকলেই যে সর্ব্ব বিষয়ে ধর্ম্মানুগত পথে চলিতে-ছেন বা চলিতে সমর্থ তাহাও বলা চলে না। উভয় মতের মধ্যে ভ্রান্তিও আছে, আংশিক সত্যও আছে। অন্যান্য জাতির চাকচিক্যময় বর্ত্তমান ঐহিক উন্নতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যাঁহারা অতীত ভাবধারার প্রতি বীতশ্রদ্ধ তাঁহারা যেমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আবার অতীত উন্নতির গৌরবে অভিভূত হইয়া যাঁহারা বর্ত্তমানের দিকে দৃষ্টিহীন তাঁহারাও তেমনি সংস্কারান্ধ।

এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে না পারিলে প্রকৃত কল্যাণাত্মক গঠন হইতে পারে না। সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংস এই তিন লইয়া জগৎ ; সুতরাং স্থিতিকার্য্যে সহায়ক রক্ষণশীল দলের যেমন প্রয়োজন, ধ্বংসের সহায়ক বিপ্লবীদলেরও তেমনি উপযোগিতা আছে। এই রক্ষণশীল ও উদারনৈতিকের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিতে যাঁহারা সক্ষম হইবেন, সৃষ্টির সহায়ক হইবেন তাঁহারাই। তাহার পূর্ব্বে দ্বন্দ্ব কেবল ধ্বংসের কার্য্য করিবে। এখন এই সামঞ্জস্য আনিতে হইলে যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে দলগত অভিমান ত্যাগ করিয়া পরস্পরের প্রতি দরদ রাখিয়া উভয়বিধ মনোভাবের কারণ অনুসন্ধান করিয়া বিচার বিশ্লেষণপূর্ব্বক সত্য বাহির করিতে হইবে। প্রথমতঃ নবীনপন্থীগণ কেন দ্রুত সংস্কার প্রয়াসী হইয়া দুর্দ্দমনীয় অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন স্থিরভাবে তাহার কারণানুসন্ধান প্রয়োজন। সাধনার উন্নত স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণ মানুষ চিরদিন একভাবে কঠোর কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়া চলিতে পারে না। সম্মুখে লোভনীয় বস্তু দেখিলে তাহার দিকে হস্ত প্রসারণ করিবেই যদি সেখানে বাধাদানের উপযুক্ত শক্তিশালী পুরুষ না থাকেন। কর্ত্তব্যপালনে যে আনন্দ, ধর্ম্মবিশ্বাস দৃঢ় থাকিলেই তাহা সম্ভব। স্বধর্ম্ম পালনের পশ্চাতে যে কল্যাণ আছে তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান ও আদর্শ সম্মুখে না থাকিলে স্বাধিকারবাদ বা ভোগবাদ প্রবল হইয়া ঐহিকতা বৃদ্ধি পায় ও অপ্রত্যক্ষ পরলোক-বিশ্বাস নষ্ট করিয়া দেয়। এ দেশে যে সময় পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রথম প্রবেশলাভ করে সে সময় স্মৃত্যুক্ত সদাচারাদির উপযোগিতা বুঝাইয়া নিজের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আধুনিকতার মোহ মুক্ত করিয়া স্বধর্ম্ম পালনে অনুরক্ত করিবার মত শক্তিশালী আদর্শ ধর্ম্মবীর দেশে ছিলেন না। থাকিলেও সাধারণের দৃষ্টির বাহিরে ব্যক্তিগত সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। অথবা ইহলোক বাদ দিয়া কেবল পরলোক চিন্তা যে অচল, এই সত্য বুঝাইবার জন্য প্রতীচ্যের শিক্ষা প্রয়োজন ছিল। নব্য দল দেখিলেন ধর্ম্মের বন্ধন অনেক ক্ষেত্রে উন্নতির পরিপন্থী। যাঁহারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেন, তাঁহারাও সকল স্থলে প্রকৃত ধার্ম্মিক নহেন। ধর্ম্ম আর অন্ন যোগাইতে পারে না। অভ্যুদয় এখন ধর্ম্মের আয়ত্তাধীন নাই। ধর্ম্মের দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ হয় কি না তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। থাকিলেও, ইহকাল যাহার দুঃখময়, তাহার পক্ষে পরকালের জন্য ধর্ম্মচিন্তার অবসর কোথায়? ধর্ম্মের নামে যে সকল রীতিপ্রথা বা অনুষ্ঠান সমাজে প্রচলিত, সেগুলি প্রকৃত কি না, সে বিষয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে। তদ্ভিন্ন, সর্ব্বদা ছোট-বড় সকল ব্যাপারে শাস্ত্রের শাসন মানিয়া চলিতে গেলে, এই প্রতিযোগিতার যুগে দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকাই অসম্ভব। জীবনকে সরস, কর্ম্মক্ষম করিয়া মানুষের মত বাঁচিতে হইলে ভোগকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না ; এবং ভোগের যাহা উপকরণ তাহা সংগ্রহ করিতে হইলে গতানুগতিক পথে গেলে চলিবে না। বিশ্বের সকলে যে পদ্ধতি ও কৌশলে প্রগতির পথে চলিতেছে, আমাদিগকেও তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেছি তাহা যদি পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলেই ঘটিয়া থাকে, তাহাতে দোষের কি আছে? যাহা শুভ, যাহা সত্য, তাহা সর্ব্বকালেই সর্ব্বদেশেই গ্রাহ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষাতেই স্বাধীন চিন্তার স্রোত ফিরিয়াছে, জড়ত্ব ঘুচিয়াছে, কূপমণ্ডুকতা গিয়াছে, উন্নতির চেষ্টা আসিয়াছে, নব জাগরণ দেখা দিয়াছে। ভারতের যে সকল মনীষী দেশ-বিদেশে প্রখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইংরাজী শিক্ষিত। প্রাচীনগণের কর্ম্মশক্তি কমিয়া যায়, উৎসাহ থাকে না, ভীরুতা দেখা দেয় বলিয়া কোনরূপ পরিবর্ত্তনের নামে তাঁহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। পরিবর্ত্তনশীল জগতে একই নিয়ম চিরদিন খাটে না। হিন্দু সমাজ আজ যে ভাবে চলিতেছে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে কি তাহাই ছিল? অতীতের কার্য্যই বর্ত্তমানের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই যে সংস্কারের প্রয়োজন আসিয়াছে তাহার জন্য অতীতের নিবন্ধকারগণই দায়ী। ঋষিগণ যদি ত্রিকালজ্ঞই হইবেন, তবে ঋষি-শাসিত দেশ আজ অন্যান্য জাতির তুলনায় হীন কেন? যে সকল সংস্কারের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা কি সত্যই নিরর্থক? যে সকল সামাজিক দোষ-ত্রুটি আছে, তাহা সংশোধনের চেষ্টা কি জীবন-সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকিবার অনুকূল নহে?

কালোপযোগী স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন চেষ্টা যদি অপরাধ হয়, তবে মস্তিষ্কের প্রয়োজন কি? ইত্যাদি বহু যুক্তি ও প্রমাণ উদারনৈতিকগণের অনুকূলে আছে। রক্ষণশীলগণ মনে করেন পরিবর্ত্তনশীল জগতে উত্থান-পতন সুখ-দুঃখ কখনও স্থিরভাবে থাকে না। যতবড় বুদ্ধিমান জাতিই হউক না কেন প্রকৃতির নিয়মে তার পতন আছেই। যে মূল শক্তিত্রয় জগতের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল তাহাদের সাম্যাবস্থা আসিলে সৃষ্টি থাকিতে পারে না। সুতরাং উন্নতির পর অবনতি স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া থাকে। কিন্তু তাহার স্থিতিকাল নির্ভর করে নিজেদের কৃতকার্য্যতার উপর। দুঃখের

শিক্ষা না পাইলে মানুষ উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয় না। আবার উন্নতি আসিলে সুখে বিভোর হইয়া দুঃখের কথা ভুলিয়া যায়। আলস্য, অনবধানতা আসিয়া তমোভাবাপন্ন করিয়া তোলে। রজোগুণলব্ধ ক্রিয়াশীলতা থাকে না; সাত্ত্বিক জ্ঞান লোপ পায়। ফলে পতন অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এই দুরবস্থার কারণ বুঝিতে পারিয়া যে সংশোধন করিতে সমর্থ হয়, সেই জীবিত থাকে ও পুনরায় উন্নতিশীল হইতে পারে। অন্যথায় ধ্বংস হইয়া যায়। কি ব্যক্তি কি জাতি সকলকেই ঐ নিয়মের অধীন হইতে দেখা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দুজাতি দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের হাতে নিষ্কৃতি পায় নাই। যে সময় ভারত আত্মবিস্মৃত অবস্থায় সঙ্ঘশক্তিশূন্য ও সর্ব্ববিষয়ে অবনত, সেই সুযোগে সুচতুর উন্নতিশীল ইংরাজ এ দেশে আধিপত্য বিস্তার করে ও চমকপ্রদ পাশ্চাত্য সভ্যতার আবির্ভাব হয়। সে সময় নিজদিগকে হীন দুর্ব্বল ও অপরকে উন্নত সবল লক্ষ্য করিয়া প্রতীচ্যের আদর্শে শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বাভাবিকভাবে ঝুঁকিয়া পড়েন। তাহার উপর ভারতের ঐশ্বর্য্যের প্রতি প্রলুব্ধ চতুর বণিকগণ কৌশলে দেশবাসীগণকে মুগ্ধ করিয়া নিজেদের কার্য্যোদ্ধারের প্রয়াস পাইতে থাকেন। তাঁহারা দেখিলেন এ দেশের লোক নিজেদের স্বার্থরক্ষায় সুচতুর না হইলেও কতকগুলি সংস্কারের বৈশিষ্ট্য দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। ইহাদের সমাজ-বন্ধন এত দৃঢ় ও সুনিয়ন্ত্রিত যে তাহার মধ্যে অপরের প্রবেশ দুর্ঘট। এই সমাজের অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে ভিতরকার সমুদয় দুর্ব্বলতার সন্ধান পাওয়া যায় না। জাতির ভাবরাজ্য অধিকার করিতে না পারিলে বাহিরের রাজ্য বেশী দিন অধিকারে রাখা যায় না।

বিদেশী লবণ চিনি কাপড় প্রভৃতিকে লোক অস্পৃশ্য জ্ঞান করিত। তাহাতে বণিকগণের ব্যবসা কষ্টসাধ্য হইতে থাকে। সুতরাং দেশবাসীর হৃদয় আকর্ষণ ও তাহাদের সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালান কতকগুলি শ্বেতকায় প্রভুর জীবনব্রত হয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও শিক্ষকতা দ্বারা তাঁহারা নিজেদের মনোমত জনমত গঠনকল্পে কতকগুলি ছাত্রকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। হিন্দুধর্ম্ম তথা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচারই শিক্ষকদের প্রধান কার্য্য ছিল। হিন্দুস্কুলের ডিরোজিও সাহেবকে তাহার একজন প্রধান পাণ্ডা বলা যাইতে পারে। মানুষের চিত্ত স্বভাবতঃ বহির্মুখী ও ভোগান্বেষী। সুতরাং নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ছাত্রগণকে ঐহিকতায় প্রলুব্ধ করিয়া হিন্দু-বিদ্বেষী করিতে গুরুগণকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। সে সময় নূতন আলোক-প্রাপ্ত নবোৎসাহী ছাত্রগণ কি ভাবে বিপুল উদ্যমে অদম্য সাহসের সহিত ধর্ম্ম ও সমাজ-বন্ধন ছিন্ন করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন, তাহা "সেকাল ও একাল" নামক ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানের জাগরণ ও সমাজ-সংস্কারের বীজ ঐ হিন্দু স্কুলের শিক্ষার মধ্যে নিহিত ছিল। সেই সময় হইতেই শিক্ষিত বিশেষতঃ বিলাত ফেরৎ সম্প্রদায় সমাজ-সংস্কারের জন্য সচেষ্ট হইতে থাকেন। তখনকার প্রথম জাগ্রত মনীষী বলিতে মহাত্মা রামমোহন রায়কে বুঝায়। তিনিই প্রথম সমাজ-সংস্কারের সূত্রপাত করেন। তিনি একজন অসামান্য পণ্ডিত ও অসাধারণ ত্যাগী ছিলেন। তিনি সকলকে এক ব্রাহ্মসমাজভুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই সামান্য এক শত বৎসরের মধ্যে তাঁহার দল তিনটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন; তাঁহার সেই সমাজ আজ নাম মাত্রে পর্য্যবসিত। কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমাজ আজ ৫০০ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে। কেবলমাত্র প্রতিভা ও অনুকৃতি সম্বল করিয়া সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিলেও সকল সময় জাতীয় কল্যাণ সাধন করা যায় না, যদি না তাহা ভগবদিচ্ছার সহিত মিলিত হয়। যে প্রণালীতে চিরদিন এ দেশে সমাজ-সংস্কার হইয়া আসিতেছে তাহাকে বাদ দিয়া পশ্চিমের অনুকৃতিকে রক্ষণশীলগণ পছন্দ করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া কি চলে? পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা রাজা রামমোহনের অন্যতম গৌরব; কিন্তু এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—"রাজা রামমোহন ইংরাজী ভাষার প্রাধান্য স্বীকার পূর্ব্বক বিদ্যালয় সমূহে উহার প্রচলন করায় বিষম ভ্রমে নিপতিত হইয়াছিলেন। অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসরের জন্য উহাতে দেশটাকে পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐরূপ না করিয়া যদি তিনি সংস্কৃত ভাষার প্রচলন রাখিতেন এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানাদি বিদ্যা ও গ্রহণযোগ্য চিন্তাসমূহ ঐ ভাষায় অনূদিত করিয়া গ্রন্থাবলী প্রকাশ পূর্ব্বক বিদ্যালয়সমূহে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই দেশময় ঐ সকলের প্রচার সাধিত হইয়া সমগ্র জাতিটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইত।" যে শিক্ষা-প্রচলনকে দেশের বহু লোক সৌভাগ্য মনে করিয়া থাকেন, একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী তাহার নিন্দা করিলেন কেন? এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে প্রণালী অবলম্বনে দেশের লোক হিতাহিত নির্ণয় ও সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে বহু কাল হইতে অভ্যস্ত হইয়াছিল, ইংরাজী ভাষা প্রচলনে মানুষের বুঝিবার প্রণালী অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। বাহিরে স্বদেশী হইলেও ভিতরে ভাব রাজ্যে অনেকেই বিদেশী। জাতীয়তা শব্দটী বহু লোকের মুখে উচ্চারিত হইলেও ভারতীয় জাতীয়তার সুস্পষ্ট ধারণা সকলের নাই। বিদেশী চিনি প্রভৃতিকে যে সময় দেশের লোক অস্পৃশ্য জ্ঞান করিত, সে সময় বহু উদারনৈতিক তাহার নিন্দা করিয়াছেন। পরে যখন ঐ সকল বিদেশী দ্রব্য দেশের মধ্যে স্বদেশীর মূলোচ্ছেদ করিয়া বহু লোকের অন্ন ধ্বংস করিল, তখন বিদেশী বর্জ্জনের জন্য উদার নৈতিকগণকে বিপুল অর্থব্যয়, বহু পরিশ্রম ও কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। ইত্যাদি কারণে সংস্কারকামী উদারনৈতিক নবীনগণ ত্যাগী, কর্ম্মী ও প্রতিভাবান হইলেও, তাঁহাদের প্রত্যেক কর্ম্মকে নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করেন না। বিশেষতঃ ধর্ম্ম বিষয়ে যাঁরা অজ্ঞ, ধর্ম্ম সংস্কার তাঁহাদের অধিকারের বিষয়ীভূত নহে। সাধারণ লোক চিকিৎসককে চিকিৎসার ভার, উকিলকে ওকালতনামা দিয়া থাকেন। কিন্তু নবীন সম্প্রদায় নাস্তিক হইয়াও ধর্ম্ম ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেও তাহার নিয়মানুযায়ী খদ্দর পরিধান, চাঁদা দান প্রভৃতি না করিলে কথা কহিতে দেওয়া হয় না। আর যাঁহারা প্রস্রাবে জলশৌচ করেন না, নিত্য আহ্নিক করাটা প্রয়োজনের মধ্যে আনেন না, তাঁহারাও ধর্ম্ম সংস্কারক সাজিয়া প্রচার কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যতপ্রকার নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে ও দিতেছে, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসহীনতাই তাহার অন্যতম কারণ বলিয়া অনেকের ধারণা।

ধর্মের অবিরোধেও বহু সংস্কার্য্য বিষয় আছে—যথা, স্বদেশী প্রচলন, স্বাস্থ্যোন্নতি, ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, জ্ঞানের উৎকর্ষ বিধান, শিক্ষার বহুল প্রচলন প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিলে রক্ষণশীলের কোন আপত্তি নাই। ধর্মের সংস্কার ধার্ম্মিকের জন্য রাখিয়া অন্যান্য বিষয়ে উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি প্রয়োগ করিলে বিরোধ বাধিত না। সমাজ সংস্কার যদি করিতে হয়, ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়াই করিতে হইবে,—রাজনীতিকে ভিত্তি করিয়া নহে। শাস্ত্রের শাসন লঙ্ঘন করিয়া কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিভোত্থিত অহঙ্কার-বিজৃম্ভিত মতবাদকে ধর্মের আসনে বসাইয়া সমাজ-সংস্কার করিতে যাওয়া সনাতন ধর্মের রীতি বা আস্তিক্যের লক্ষণ নহে। উহা নাস্তিকতা বা সম্পূর্ণ পশ্চিমের অনুকৃতি। প্রতীচ্য ও প্রাচ্য এক নহে,—উভয়ের আদর্শ ও প্রকৃতি বিভিন্ন। একের জাতীয়তা ঐহিক প্রতিপত্তিকে ভিত্তি করিয়া কল্পিত ; ও অপরের জাতীয়তা পরমার্থ সাধনকে লক্ষ্য করিয়া গঠিত। প্রতীচ্যের জাতীয়তার পরিচালক রাষ্ট্রনীতি ও প্রাচ্যের জাতীয়তার নিয়ামক ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্মবিৎ ঋষি। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যুগাবতারগণ যে নীতিতে যুগোচিত সংস্কার সাধন করিয়াছেন, তাহাই আর্য্যজাতির প্রকৃতি ও আদর্শের অনুকূল এবং ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। যদি আমাদের জাতীয় সভ্যতার মধ্যে লৌকিক দৃষ্টিতে বা বুঝিবার প্রণালী দোষে কোন ত্রুটি লক্ষিত হয়, তাহা আমারই দেশমাতৃকার প্রসাদ মনে করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন "সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ"। এমন কোন কার্য্য পাওয়া যায় না, যাহার মধ্যে কোন দিকে কিছু মাত্র দোষ নাই। সেই জন্য পুনরায় বলিতেছেন "সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি নত্যজেৎ।" অতএব যে সভ্যতার প্রভাবে হিন্দু অমর হইয়া আছে, যে ধর্ম্মকে ধরিয়া হিন্দু বহু বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়াছে, সেই ধর্ম্ম বিশ্বাস, সেই জাতীয় ভাবধারাকে বিলুপ্ত করিয়া কোন সংস্কার হইতে পারে না,—সংহার হইতে পারে। চটের মত মোটা কাপড়কে স্বদেশী বলিয়া গৌরব করা যায় ; কিন্তু ধর্মের প্রতি অনুরাগকে স্বদেশী বলিয়া গৌরব আসে না কেন ? অহঙ্কার বা অনুকৃতি সনাতনীগণের এই প্রকার মনোভাবের কারণ নয়। কোন প্রকার সংস্কার শাস্ত্রসম্মত বলিয়া শাস্ত্রীগণ কর্তৃক গৃহীত না হইলে, তাহা সমাজে প্রচলন করিবার পক্ষে যে বাধা তাহা রক্ষণশীলগণের স্বকপোল-কল্পিত নহে। এ বিষয়ে সর্ব্বজনমান্য গীতাকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়।

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ নস সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং" "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণংতে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি" ইত্যাদি বহু প্রমাণকে অবজ্ঞা করতঃ সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কল্পিত ব্যক্তি-বিশেষের মতবাদকে বেদবাক্যরূপে গ্রহণ করিতে যদি কাহারো সঙ্কোচ আসে, তাহাকে দোষ দেওয়া ধর্ম্মানুমোদিত নহে,—স্বার্থানুমোদিত। এতক্ষণ রক্ষণশীলগণের রক্ষণশীলতার স্বপক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, তাহার প্রধান-প্রধানগুলি দেখান হইল। এইভাবে বাদ প্রতিবাদ চালাইতে কোন পক্ষই দুর্ব্বল নহেন। নবীনপন্থীর যুক্তি যেমন অনেক স্থলে খণ্ডনীয়, প্রাচীনপন্থীর যুক্তিও তেমনি অখণ্ডনীয় নহে। দোষ এবং গুণ উভয়ের মধ্যেই আছে। এই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার রামনদে প্রদত্ত বক্তৃতায় জীর্ণ হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামী ও আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা এই উভয়কেই জাতীয় উন্নতির পরিপন্থীরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং নানা যুক্তির অবতারণা করতঃ বলিয়াছিলেন যদি দুইটীর একটীকে দেশের জন্য মনোনীত করিতে হয় আমি প্রাচীন হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামীর পক্ষেই মত দিব। কারণ তাঁহারা সনাতন জাতীয় জীবন ছন্দটী বজায় রাখিয়াছেন ; তাঁহাদের একটা প্রতিষ্ঠা-ভূমি, একটা অবলম্বন, একটা বলবত্তা আছে। সমগ্র জাতির প্রাণনশক্তির উৎস পরমার্থ নিষ্ঠাকে আঁকড়াইয়া ধরার দরুণ ইহাদের বাঁচিবার আশা আছে। আর যাহারা জড় ভ্রান্তি বিবর্দ্ধিনী পাশ্চাত্য সভ্যতার পশ্চাতে ধাবমান তাঁহারা মেরুদণ্ডবিহীন ; আপনার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার শক্তি তাঁহাদের নাই। তাঁহারা একটা আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিতেছেন মাত্র ইত্যাদি। যাহা হউক, নবীন ও প্রবীণের দুইটী বিরুদ্ধ মতবাদকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই—এক পক্ষে পরকালের ভাবনা, অপর পক্ষে ইহকালের চিন্তা প্রবল। একজনের বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে অতীতের গৌরব কাহিনীতে ; আর একজনের ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে বর্ত্তমান জগতের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া। একের সংস্কারের উৎস শাস্ত্র ; অপরের বিশ্বাসের কেন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষা। একদল প্রজ্ঞানের পক্ষপাতী, অপরদল বিজ্ঞানের অনুরক্ত। প্রাচীনপন্থী অলৌকিক প্রত্যক্ষ বিশ্বাসী ও নবীনপন্থী লৌকিক প্রত্যক্ষের পক্ষপাতী। রক্ষণশীলগণের ধারণা—বুদ্ধিবলে, যুক্তিতর্ক, বিচারগবেষণা দ্বারা প্রকৃত সত্য নির্ণয় হয় না। রজো ও তমোগুণ নির্ম্মুক্ত শুদ্ধ সত্ত্ব চিত্তে সত্যের স্বয়ং প্রকাশ ঘটে। তাহা সাধনাসাপেক্ষ। উপযুক্ত সাধক ব্যতীত সত্যের যথার্থ সন্ধান পায় না। আর উদারনৈতিকগণের বিশ্বাস—উপযুক্ত যুক্তিতর্ক বিচার দ্বারা যে সত্য নির্ণীত হয়, যদি তাহা ভবিষ্যতে ভ্রান্তি বলিয়া প্রমাণিত হয়—তথাপি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তদনুসারে চলিতে না চাওয়া পাপ। এই যে উভয়ের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কারগত পার্থক্য, ইহার একটা মিলনভূমি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বর্ত্তমানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ উদারনৈতিক দলভুক্ত হওয়ায়, সংখ্যাল্পতা-প্রযুক্ত রক্ষণশীলদলকে দুর্ব্বল বলা চলে। এই সংখ্যাধিক্যের সুযোগ পাইয়া, বুঝাইয়া না পারিলেও আইনের বলে নবীনপন্থীগণ অদূর ভবিষ্যতে একদিন প্রাচীনপন্থীগণের বিশ্বাস ও মতবাদের কণ্ঠরোধ করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাতে জাতির ইষ্ট হইবে কি অনিষ্ট হইবে তাহা নির্ণয় করা যায় না। ভোটের দ্বারা জয়লাভ সম্ভব হইলেও অনেক ক্ষেত্রেই সত্য নির্ণীত হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উদারনৈতিকগণ রাজনৈতিক ভিত্তিতে জাতি গঠনের পক্ষপাতী। সে সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিয়াছেন "এ কথা পরিষ্কাররূপে স্বীকার্য্য যে ভালর জন্যই বল, আর মন্দর জন্যই বল, আমাদের প্রাণশক্তি আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে। তুমি ইহাকে আর পরিবর্ত্তন করিতে পার না ; ইহার পরিবর্ত্তে ইহাকে নষ্ট করিয়া প্রাণশক্তির জন্য অপর আশ্রয় স্বীকার করিতে পার না। তুমি কি বল হিমতুষার গর্ভে আবার ভাগীরথী ফিরিয়া যাইবে এবং পুনর্ব্বার নূতন পথে প্রবাহিত হইবে ? তাও যদিই বা সম্ভব হয় তবুও জানিও আমাদের

দেশের পক্ষে পরমার্থ সাধনরূপ বিশেষ জীবন খাতটী পরিহার করা অসম্ভব এবং রাজনৈতিক বা অন্যভাবে আবার জীবন প্রবাহের সূত্রপাত করাও অসম্ভব।" অতএব দেখা যাইতেছে, রাজনৈতিক ভিত্তিতে জাতীয় জীবন গঠন করা স্বামীজীরও মত নহে। সুতরাং উদারনৈতিকগণের কর্ত্তব্য পরমার্থ-বাদের ভিত্তিতে শাস্ত্রীয় প্রথায় সনাতনীগণের ধর্ম্ম বিশ্বাসে যথাসম্ভব আঘাত না দিয়া সংস্কার কার্য্য সাধন করা এবং রক্ষণশীলগণের কর্ত্তব্য কালধর্ম্ম স্বীকার করতঃ নবীনপন্থীগণের প্রতি কার্য্যে বাধা না দিয়া নিজে যথাসম্ভব আদর্শ রক্ষা করিয়া চলা। নবীন ও বীণ উভয়ের নিকট অনুরোধ তাঁহারা যেন মতান্তরকে মনান্তরে পরিণত হইতে না দেন পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি না হারান। সহৃদয়তার সহিত ধৈর্য্যসহকারে উভয়কে বুঝিতে চেষ্টা করেন। দলগত পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করতঃ সত্যানুসন্ধিৎসু হইবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন। জয়লাভই মাত্র উদ্দেশ্য নয়—সত্য ও স্থায়ী কল্যাণই লক্ষ্য। দেশকে ভালবাসিতে হইলে দেশের কুকুরও ভালবাসার পাত্র না হইয়া যায় না।

মরণে বাধা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

যাবো যাবো করি, কিন্তু যে আমি
এক সন্তান মার,
নিতুই দেখ্‌ছি পদে পদে তাই
বহু বাধা মরিবার।

২

মাতা পিতা মোর 'বদরীনাথের'
চরণে মানত রাখি,
এখনো আমার দীর্ঘজীবন
মাগেন সজল আঁখি।

৩

কামনা করিয়া 'রামেশ্বরের'
শিরে দেন বেলপাতা,
'অমরনাথে'র আশীষ রয়েছে
মাদুলীতে মোর গাঁথা।

৪

এ ক্ষীণ তনুরে জিয়ায়ে রাখিতে
কত যে যতন মার,
'হিংলাজ' হতে বিভূতি এনেছে
সিঁদুর 'কামাখ্যার'।

৫

তেত্রিশ কোটী দেবতার আঁখি
আজও মোর পানে জাগে,
মায়ের মিনতি তাঁদের সকাশে
পঁহুছয়ে সব আগে।

৬

ভাই-দ্বিতীয়ায় বোনেরা আবার
কপালেতে ফোঁটা দিয়া,
কাঁটা দিয়া রোধে যমের দুয়ার
এমনি অবোধ হিয়া!

৭

পত্নীরও মোর সিঁদুর শাঁখাকে
বুঝি ভয় করে যম,
বর দিতে গিয়ে যদি পুনরায়
করে ফেলে কোনো ভ্রম।

৮

গ্রাম-গৃহিনীরা ষষ্ঠীতলায়
হলুদ মাথায়ে গাছে,
মায়ের মতন এখনো আমার
দীর্ঘ জীবন যাচে।

৯

এত জীবনের স্নেহ-প্রীতি ধারা
দেখি বুকে ব্যথা বাজে,
যতনে লালিত এ তৃণ কুসুম
লাগিল না কোনো কাজে।

১০

সুরভিত করি দেবমন্দির
সাজল না পূজা-থালা,
রহিল কেবল কৌটায় তোলা
ক্ষীণ কর্পূরমালা।

১১

হ'ল নাক পাঠ, লাগিল না কাজে
বারেক হল না খোলা,
স্নেহের ডোরেতে জড়ানো এ পুঁথি
তাকেই রহিল তোলা।

চণ্ডীচরণ সেন

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যাঁহার গ্রন্থরাজি এ দেশের লোকের প্রাণে সর্ব্বপ্রথম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিস্থাপনা করে, ১২৫১ বঙ্গাব্দের ২রা মাঘ, ইংরাজী ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী মঙ্গলবার বাখরগঞ্জ জেলার বাসণ্ডা গ্রামে সেই চণ্ডীচরন সেন মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নিমচাঁদ সেন মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহস্থ ছিলেন। চণ্ডীচরণ তাঁহার সর্ব্বশেষ সন্তান ও একমাত্র পুত্র।

মাতা গৌরীদেবী প্রথম বয়সে অনেকগুলি শিশুসন্তান হারান। তাই চণ্ডীচরণ তাঁহার বড়ই আদরের ধন ছিলেন। গৌরীদেবী ও তাঁহার স্বামী সর্ব্বদাই জপতপ, ব্রত-উপবাসাদিতে কাটাইতেন। দেবদেবীর প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক ভক্তি শোকে তাপে অধিকতর গভীর হয়। পুত্রকামনায় ইঁহারা প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করিতেন। সেজন্য পুত্র জন্মিলে তাঁহার নাম চণ্ডীচরণ রাখেন।

চণ্ডীচরণের স্বাস্থ্য বাল্যে ভাল ছিল না। দোষ করিলেও তাই তাঁহাকে কেহ তাড়না করিত না। ফলে বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বালক অতিশয় দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির হইয়া উঠিল। গ্রামে তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যেমন প্রশংসা ছিল, বালস্বভাবসুলভ চপলতার জন্য তদ্রূপ অখ্যাতিও বড় কম হয় নাই।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ মেধার বলে চণ্ডীচরণ অতি অল্প কালের মধ্যেই পাঠশালার পড়া সাঙ্গ করেন। ইংরাজী শিক্ষালাভের জন্য বরিশাল যাওয়া ব্যতীত তখন আর অন্য উপায় ছিল না। শূন্য গৃহে কেমন করিয়া পিতামাতা থাকিবেন? অবশেষে সকলে পরামর্শ করিয়া স্বগ্রামস্থ চন্দ্রমোহন দাসের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার সহিত চণ্ডীচরণের বিবাহ দিলেন। উদ্দেশ্য—চণ্ডীচরণ প্রবাসে থাকিলে বধূকে লইয়া তাঁহার পিতামাতা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিবেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে চণ্ডীচরণ বরিশাল গবর্ণমেণ্ট স্কুলে প্রেরিত হন। ইহার ঠিক দুই বৎসর পরেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটে।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বরিশালে তাঁহার ভগিনীপতি আনন্দচন্দ্র সেনের বাড়ী থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন। সে সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুরাপান, অখাদ্য ভোজন প্রভৃতি সভ্যতার লক্ষণ ছিল। তাঁহার বরিশালের সঙ্গীরাও এই সুরাস্রোতের হাত এড়াইতে পারে নাই। কিন্তু নিষ্ঠাবান জনকের ও অসাধারণ ভক্তিমতি জননীর আদর্শ তাঁহাকে রক্ষা করে,—তিনি শিক্ষিত সমাজের এবম্প্রকার অনাচার অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

এই সময়ে পূজনীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় বরিশাল স্কুলের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। চণ্ডীচরণকে তিনি আকর্ষণ করিলেন। কিছু দিন পরে গিরিশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ব্রাহ্মপ্রচারকবর্গ বরিশালে উপস্থিত হইলে চণ্ডীচরণ ও অন্য বহু উৎসাহী যুবক ব্রাহ্মদিগের সহিত যোগদান করেন। দুর্গামোহন দাস মহাশয় সে সময়ে বরিশালে ওকালতী করিতেন। চণ্ডীচরণের সহিত এই সূত্রে তাঁহার আমরণ-কালস্থায়ী সৌহার্দ্দের সূত্রপাত হয়।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চণ্ডীচরণ ভবানীপুরে দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠাগ্রজ হাইকোর্টের উকীল কালীমোহন দাস মহাশয়ের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ও কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সাহায্যে ফ্রি চার্চ্চ ইনষ্টিটিউসনে (পরে ডফ কলেজ) ভর্ত্তি হইলেন। পিতার অবস্থা ভাল নহে, তাই তাঁহাকে প্রত্যহ ভবানীপুর হইতে নিমতলা পর্য্যন্ত পদব্রজে আসা-যাওয়া করিতে হইত। ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়।

কলেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কয়েক মাস স্বগ্রামে পিতার নিকট অবস্থান করিয়া তিনি ঢাকায় যাইয়া একটি বৃত্তি লাভ করিয়া ওকালতী পড়িবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও বৃত্তি পাইলেন না। এই সময় তাঁহার কলিকাতায় সামান্য একটী চাকরীর যোগাড় হয়। উপায়ান্তর না দেখিয়া নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তিনি ইহা

গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। কলিকাতা যাইবার ষ্টীমারের সময় নিরূপণার্থ তিনি ঘাটে গিয়াছেন, হঠাৎ লিভিংষ্টোন নামে একটী সাহেবের সহিত দেখা হইল। সাহেব কথায় কথায় চণ্ডীচরণকে জানাইলেন যে তিনি বাঙ্গলা শিখিতে চাহেন, সেজন্য মাসিক ১৫৲ দিয়া শিক্ষক নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক। চণ্ডীচরণ তৎক্ষণাৎ কলিকাতা যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া লিভিংষ্টোন সাহেবকে বাঙ্গলা শিখাইতে লাগিলেন। উত্তরকালে চণ্ডীচরণ এই লিভিংষ্টোন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎকে পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ (direct intervention) বলিয়া মনে করিতেন। একবার কলিকাতায় আসিয়া সামান্য কেরাণীগিরিতে যোগ দিলে আর তাঁহার উকীল, মুন্সেফ ও সবজজ হইবার সুযোগ কখনও ঘটিত না। এইরূপে দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করিয়া তিনি অবশেষে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে Higher Grade Pleadership পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

বরিশালে থাকিতেই চণ্ডীচরণ ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হন। ঢাকায় আসিয়া পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশ শ্রবণে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও ঢাকায় ওকালতীর অসুবিধা দর্শনে বরিশালে চলিয়া আসেন। একমাত্র পুত্রের ধর্ম্মত্যাগে ব্যথিত হইয়া ভগ্ন হৃদয়ে বৃদ্ধ নিমচাঁদ পর বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই সময় চণ্ডীচরণের দুই কন্যা—জ্যেষ্ঠা কন্যা কামিনী ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয়া কন্যা যামিনী (পরে লেডী ডাক্তার) ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পত্নী ও কন্যাদ্বয়কে স্বগ্রাম হইতে বরিশালে আনয়ন করেন। কিন্তু ওকালতীতে সুবিধা করিতে না পারিয়া অবশেষে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বরিশালের অতিরিক্ত (অস্থায়ী) মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে স্থায়ী মুন্সেফিতে নিযুক্ত হইয়া প্রথমে ২৪পরগণার বারুইপুর ও পরে পাবনা জেলার সাহাজাদপুরে স্থাপিত হন।

এই সাহাজাদপুরে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। তাঁহার মোহরের নাজির পদপ্রার্থী হইয়া health certificateএর জন্য পাবনার ইংরাজ সিবিল সার্জ্জনের নিকট যায়। সিবিল সার্জ্জন প্রথমতঃ স্বাস্থ্য ভাল নহে বলিয়া ঐ ব্যক্তিকে Certificate দিতে অস্বীকার করেন। অবশেষে মোহরের নাছোড়বান্দা হইয়া "ডবল ফিসের" জোরে Certificate আদায় করে। চণ্ডীচরণ এই অবৈধ কার্য্যের কথা জানিতে পারিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, জেলা জজের নিকট এ বিষয়ে লিখিয়া পাঠাইলেন। হিতে বিপরীত হইল,—সাহেবের নামে সাহেবের নিকট অপবাদ দেওয়া? নিম্নপদস্থ কালা হাকিমের এ বেয়াদবী কি সহ্য হয়? জজসাহেব চণ্ডীচরণের উপর খড়্গহস্ত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কৃত ও স্থানান্তরিত (repremanded and transferred) করিয়া তবে ছাড়িলেন। উচ্চপদস্থ ইংরাজকুল তাঁহাকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিলেও জনসাধারণের নিকট তিনি যে কতখানি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গুণমুগ্ধ কোন অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য কবির নিম্নলিখিত পদ্যটীতে সুপ্রকাশ—

"বুদ্ধে যেন বৃহস্পতি, বিচারেতে দাশরথি,
ধর্ম্মে যেন ধর্ম্মের নন্দন,
দীন প্রতি দয়া অতি, প্রজার কল্যাণে মতি,
নাম সেন শ্রীচণ্ডীচরণ ॥"

স্ত্রী শিক্ষায় তাঁহার উৎসাহ অপরিসীম ছিল। তাঁহার তিনটী কন্যাকেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা দিয়াছিলেন। কামিনী রায়ের পরিচয় কোনও বঙ্গীয় পাঠককে দিতে হইবে না। যত দিন বঙ্গসাহিত্য থাকিবে, তত দিন কামিনী রায়ের কবিতাবলী তাঁহার উজ্জ্বল রত্ন রূপে বিরাজ করিবে। সুখের বিষয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলার এই শ্রেষ্ঠা মহিলা কবিকে সমাদর করিতে ক্রটী করেন নাই,—জগত্তারিণী পদক প্রদানে তাঁহার সম্মান রাখিয়াছেন। ইনি সম্মানের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। দ্বিতীয়া কন্যা যামিনী ডাক্তারী পরীক্ষায় ও তৃতীয়া প্রেমকুসুম বি-এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম বাঙ্গলা রচনায় মনোযোগী হইলেন। "পুত্র কর্ত্তৃক পিতার পরাজয়ের" গৌরব তিনি লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁহার রচনার ভাষা সংশোধন করিয়া দিতেন। তাঁহার প্রথম রচিত প্রবন্ধগুলি ঐতিহাসিক,—নামা

মাসিকে প্রকাশিত হইত। অতঃপর "জীবনগতি নির্ণয়" নামক দার্শনিক পুস্তিকা রচনা করেন। উহা এখন দুষ্প্রাপ্য। ইহার পর রামায়ণে উল্লিখিত কতকগুলি নামের অন্তরালে তৎকালীন ইংরাজ শাসনাধীন বঙ্গের অবস্থা বর্ণনা করিয়া "লঙ্কাকাণ্ড" নামে একখানি বিদ্রূপাত্মক কাব্য রচনা করেন। ইহা যখন মুদ্রিত হয়, তখন রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি চণ্ডীচরণের বাসায় মধ্যে মধ্যে আসিয়া চণ্ডীচরণের স্ত্রীর স্বহস্তকৃত মিষ্টান্নাদি পরম পরিতোষ সহকারে আহার করিতেন। লঙ্কাকাণ্ডে গবর্ণমেণ্টকে বিদ্রূপ করা হইয়াছিল। তিনি একদিন আসিয়া পরামর্শ দিলেন যে বইগুলি যেন প্রচার করা না হয়। উহাতে সাময়িক ঘটনাবলী অবলম্বনে হাস্যোদ্দীপক বিদ্রূপ ছিল মাত্র, বিদ্বেষ বা বিদ্রোহভাবের কিছুই ছিল না,—এ কারণে চণ্ডীচরণ পুস্তকখানি নষ্ট করিতে সম্মত হন নাই। দুঃখের বিষয় উহা আর পাওয়া যায় না।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে টম্‌কাকার কুটীর আরব্ধ হইয়া ১৮৮৫তে প্রকাশিত হয়। এই বৎসরই তিনি দীর্ঘকালের জন্য ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসেন ও "কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী" হইতে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর" সময়কার কাগজপত্র ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়া "মহারাজ নন্দকুমার" প্রকাশিত করেন। পরে যথাক্রমে "দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ" (১৮৮৬), "অযোধ্যার বেগম" ও "মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতা" (১৮৮৭), "ঝান্সির রাণী" (১৮৮৮), ও শেষ বয়সে "এই কি রামের অযোধ্যা" (১৮৯৫) প্রকাশিত হয়। ইতিহাসের সহিত ধর্ম্ম ও নীতি প্রচারই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু পুস্তকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা আর সম্ভবে না,—কারণ, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থ মহামান্য সরকার বাহাদুর চণ্ডীচরণের পুস্তকাবলি আজ বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

"মহারাজা নন্দকুমার" লেখার ফল তাঁহাকে হাতে হাতে পাইতে হইল। ছুটী হইতে কর্ম্মে যোগ দিবার পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তাঁহার পদোন্নতির পরিবর্ত্তে তাঁহার নিম্নপদস্থ কয়েকজনকে প্রমোশন দেওয়া হয়। তিনি ইহাতে অযথা অপমানিত বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ পদত্যাগের পত্র পাঠাইয়া দেন। অবশেষে কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের বিশেষ অনুরোধে উহা প্রত্যাহার করিয়াছিলেন।

ধারাবাহিকরূপে তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনা লেখা সম্ভব নহে। তিনি মুন্সেফ ও সবজজ রূপে যে সর্ব্বদা নির্ভীকভাবে ন্যায় ও সত্যের পথে থাকিয়া বিচার করিতেন, ইহা সেকালে সর্ব্বজনবিদিত ছিল।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি অবসর গ্রহণ করেন ও ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শেষ উপন্যাস, টলষ্টয় অবলম্বনে "চল্লিশ বৎসর" লেখেন।

ঐ বৎসরই তাহার তৃতীয়া কন্যা প্রেমকুসুম অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নবপরিণীত জ্যেষ্ঠপুত্র যতীন্দ্রমোহনের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। এই দুইটী আঘাত তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, ঐ বৎসরই ১০ই জুন সন্ধ্যার সময় তিনি পরলোক গমন করেন।

তাঁহার চারি কন্যার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা শ্রীমতী চিন্ময়ী দেবী এবং চারি পুত্র,—কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন, পূর্ণিয়ার ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার সেন, হাওড়া মিউনিসিপালিটীর চিফ্ এনজিনিয়ার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেন, বর্ত্তমান।

যার যেমন মন

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর বি-এ

বড়দিনের সন্ধ্যায় সম্মোহন সস্ত্রীক বেড়াইয়া ফিরিতেছিল। ঠিক বেড়াইয়া নয়, ফিরিতেছিল বায়োস্কোপ দেখিয়া। তবে ফিরিবার পথে গাড়ীতে না করিয়া খানিকটা পথ হাঁটিয়া আসিতেছিল। স্ত্রীকে লইয়া অনেক দিন বাদে সে আজ পথে বাহির হইয়াছে। পূজার সময় তাহারা তো কলিকাতায় ছিল না। তাহার আগে সেই গত বছরের বড়দিনের কথা,—আজ লইয়া এক বছর হইয়া গেছে। দীর্ঘ একটী বছরের অবিরাম কাজের মধ্যে দুবার তো মাত্র মুক্তির নিশ্বাস ফেলিবার অবসর সে পায়,—পূজায় ও বড়দিনে। পূজা তো এবার কাটিয়াছে বাহিরেই,—বড়দিনে ইচ্ছা করিয়াই সে এখানে আছে,—এই বিরাট নগরীর আনন্দের অসীমতার মধ্যে নিজেকে সাময়িক ভাবে ডুবাইয়া রাখিবার জন্যই। বড়দিনের আনন্দ! নগরীর দিকে দিকে জাগিতেছে প্রাণের সাড়া, আলোর উজ্জ্বলতা, সার্কাস, বায়োস্কোপ, কার্ণিভ্যাল, প্রদর্শনী—চারি পাশেই আকর্ষণ। নরনারী সব ছুটিয়া চলিয়াছে আনন্দ আহরণ করিতে। শাদায় ও কালোয় মিলিয়া গেছে। সুশ্রী সুবেশ সাহেব-মেমদের পিছনেই সমতালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে শ্যামাঙ্গ বাঙালীর দল। চাহিয়া চাহিয়া ভুলিয়া যাইতে হয় বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা। মনে হয় না—অর্থাভাবে অনাহারে এই জাতি মুমূর্ষু, পঙ্গু হইতে বসিয়াছে। এই সব আনন্দলিপ্সু নরনারীর বাড়ীর সামনের রাজপথ দিয়া অনাহারক্লিষ্ট ভিখারীর দল কাতর চীৎকারে গলা ফাটাইয়া ফাটাইয়া এক পয়সা না পাইয়া বিফল-মনোরথ হইয়া চলিয়া যায়। ইহাদেরি প্রতিবেশী হয় তো চার-পাঁচটী পোষ্য লইয়া রিট্রেঞ্চমেণ্টে চাকরী হারাইয়া কি করিবে ঠিক করিতে পারিতেছে না। চারি পাশের আনন্দ-কোলাহলের ফাঁকে অর্থব্যয়ের বহর দেখিলে ধারণা করা যায় না যে, ইহারা সেই জাতিরই প্রতিভূ, যাহাদের চারি পাশ ঘিরিয়া রুদ্র নটরাজ নির্ম্মমভাবে নৃত্য করিয়া ফিরিতেছে। বছরের পর বছর ধরিয়া নদী তাহার সহস্র উচ্ছ্বাস লইয়া দু'পাশের তটকে গ্রাস করিবার জন্য আগাইয়া আসে,—গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিয়া যায় প্লাবনের জল। একে একে ম্যালেরিয়া নির্জ্জীব করিয়া তোলে গ্রামবাসীদের। কলেরা ও বসন্তের মহামারী আর ঘূর্ণী ঝড় সর্ব্বগ্রাসী মহাকালের অট্টহাসি লইয়া ছুটিয়া চলে ইহাদেরি গৃহের আশপাশ দিয়া। তথাপি নির্ব্বিবাদী ইহারা ছুটিয়া চলিয়াছে। চোখে জাগিয়াছে আনন্দলোভীর উচ্ছ্বাস। পারিপার্শ্বিকতার সম্বন্ধে হইয়া আছে আত্মসমাহিত। দেশের সঙ্গে ইহাদের কোন যোগসূত্র নাই। ইহারা যেন এ দেশের মানুষই নয়। সে-ও তো আজ আত্মবিস্মৃত হইয়া ইহাদেরি একজন হইয়া পড়িয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে সম্মোহন স্ত্রীর হাত ধরিয়া হগ্ মার্কেটে আসিয়া ঢুকিল। বড়দিনের যত ভীড় জমিয়া উঠিয়াছে এই বাজারটীর মধ্যেই। অনেকে আসিয়াছে কিছু কিনিতে। আর যাহারা কিছুই কিনিতে আসে নাই, তাহারা আসিয়াছে ভীড় বাড়াইতে, দোকান-পসারীর চাকচিক্য দেখিতে, সুন্দরী সুবেশা তরুণীদের মুখের পানে তাকাইতে। আজকের এই দোকানগুলির চাকচিক্য চোখের সামনে কেমন যেন মায়া জাগায়। অতি সাধারণ প্রতিদিনের দেখা জিনিষগুলিকে বিদ্যুতের আলোর কুহকে আর চিনিবার উপায় নাই,—শুধু সাজাইবার কৌশলে অতি সাধারণ জিনিষও আজ আকর্ষণীয়। যাহা অন্য জায়গায় দেখিয়া দেখিয়া পুরানো হইয়া গেছে, আজ এখানে তাহারই পানে তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে প্রতিটী আকর্ষণীয় বস্তুকে তুলিয়া লইয়া গিয়া নিজের গৃহে এমনি জমকালো করিয়াই সাজাইয়া রাখি। তাকাইয়া তাকাইয়া এই সাহেব জাতটার উপর হিংসা হয়। কোথাও এতটুকু অসামঞ্জস্য নাই, অবিন্যাস নাই।

অপরিচ্ছন্নতা পার হইয়া ইহারা যেন অনেক উচ্চ স্তরে উঠিয়া গেছে। শুধু আনন্দ আহরণ করিয়া লইতেই যেন ইহাদের জীবন। এই দুঃখ-দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট মর্ত্ত্যের কোন দাবী নাই বুঝি এই সব রক্তাভ লোকগুলির উপর। এ যুগের স্বর্গবাসী বলিলে ইহাদেরি বুঝিতে হয় বুঝি। ইহাদের সহিত তাহাদের তুলনা কোথায়! মানুষ হইয়াও ইহারা বুঝি মানুষ নয়।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে সম্মোহন আসিয়া পড়িল কেক্‌-বিস্কুট প্রভৃতির ষ্টলের মাঝে। টিনের ট্রেতে কেক্ সাজাইয়া রাখিয়া দোকানীরা খদ্দের ডাকিয়া ফিরিতেছে। সস্ত্রীক সম্মোহনকে দেখিয়া পাশ হইতে একটী মুসলমান ছোকরা বলিয়া উঠিল—নেবেন্ না বাবু, ক্রীষ্ট্‌মাস কেক্—টাট্‌কা তৈরী!

গৃহিণী থামিয়া পড়িল। সম্মোহনের পানে চাহিয়া বলিল—কেনো না একখানা কেক্ খোকার জন্তে।

গৃহিণীর কথা সম্মোহনের মনে লাগিল—সত্যই তো খোকার জন্য একখানি কেক্ কিনিয়া লইয়া গেলে মন্দ হয় না। তাহাকে বায়োস্কোপে আনা হয় নাই সেজন্য অভিমান করিয়া থাকিবে হয় তো। আর ও-রকম প্রেমের বই তাহাকে না দেখাইয়া সে ভালই করিয়াছে। তাহার জন্য একখানি কেক্ কিনিয়া লইয়া গেলে সে খুসী হইবে,—অভিমান করা তাহার আর হইবে না।

সম্মোহন দাঁড়াইল। একখানি ক্রীষ্ট্‌মাস্ কেকের দাম জানিল আট আনা। মণিব্যাগে খুচরো আট আনা পয়সাই ছিল। তাহা দিয়া সম্মোহন কেক্ কিনিয়া ফেলিল।

কেক্ কিনিয়া বাজারের বাহিরে আসিয়া একখানি ফিটন্ ভাড়া করিবে মনে করিয়াছিল; কিন্তু গৃহিণী বলিল—এখনি গাড়ি-ভাড়া করায় দরকার কি,—আরেকটু ঘুরলে মন্দ হয় না।

স্ত্রীর কথায় সম্মোহন হাসিল। খাঁচার পাখী একটু ছাড়া পাইয়াই মুক্তির আনন্দে আজ ছুটিয়া বেড়াইতে চাহিতেছে। ছোট খাঁচায় পরিধির মধ্যে যে পাখা সে পূর্ণোদ্যমে প্রসারণ ও আলোড়ন করিতে পারে নাই, আজ সেই সীমার বাহিরে আসিয়া, সেই বদ্ধ পক্ষকে মেলিয়া ধরিয়া, নিজের সামর্থ্যকে সে বুঝিয়া লইতে চায়। সম্মোহন স্ত্রীর পানে চাহিল। লাল শাড়ীখানি তাহাকে মানাইয়াছে বেশ। অগ্নিশিখার মত বিস্ময়াবহ ঔজ্জ্বল্যে তাহাকে মহীয়সী করিয়া তুলিয়াছে। যেন প্রভাতী মাটীর শ্যামলিমা ও আকাশের নীলিমাকে রাঙাইয়া দিয়া সূর্য্যকিরণ আসিয়া পড়িতেছে—গৌরবময়, লোভনীয়। আজিকার মত উৎসবময় আলোকোজ্জ্বল পথে এমনি এক সুবেশা তরুণীকে সঙ্গে লইয়া চলিলে গৌরব আছে। চারি পাশের রূপবুভুক্ষু চক্ষু আসিয়া পড়িবে সহযাত্রীর উপর; অল্পক্ষণের জন্য বহুজন ঈর্ষা করিবে তাহার পত্নীভাগ্যের।

ফিটন লওয়া আর হইল না। স্ত্রীর হাত ধরিয়া ধীর মন্থর পদে সম্মোহন চৌরঙ্গীর পথ ধরিল। স্ত্রীর হাত ধরিয়া পথ চলিতে তাহার ভাল লাগিতেছিল,—ইচ্ছা করিতেছিল খানিকটা লক্ষ্যহীনের মত ঘুরিয়া বেড়ায়,—বাড়ী যাইবার কোন তাড়া থাকিবে না। একটী ছেলে যে বসিয়া বসিয়া অভিমানে চোখ ফুলাইতেছে, তাহা সে ভুলিয়া যাইবে,—ভুলিয়া যাইবে কোন্ পথে বাড়ী ফিরিতে হইবে। ঘড়িতে কয়টা বাজিতেছে তাহা দেখিবার প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। শুধু স্ত্রীকে আরেকটু কাছে টানিয়া, তার হাতখানি আরেকটু নিকটে আকর্ষণ করিয়া, পাশাপাশি নিকটতম হইয়া সে আগাইয়া যাইবে। সম্মুখে থাকিবে শুধু পিচ্‌ঢালা পালিশকরা পথ। দু'সারি উজ্জ্বল আলোর ছটা গায় মাখিয়া গম্যমান নরনারী চলিতে থাকিবে দু' পাশ দিয়া, আর উপরে জাগিবে আকাশের চন্দ্রালোকিত বিবর্ণ নীলিমা। এই যে এত আলো, এত আয়োজন, ইহাকে সারা অন্তর দিয়া লুটিয়া লইতে সেই বা পারিবে না কেন!

—একটী পয়সা বাবু!

ডাক শুনিয়া চিন্তাচ্যুত হইয়া সম্মোহন পাশের ভিখারীটীর পানে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল: বয়স কম, এখনও বছর চৌদ্দ পার হয় নাই; কি হয় তো বয়স বাড়িয়া গেছে, অনাহারে অর্দ্ধাহারে দেহের বৃদ্ধি হয় নাই। মাথার চুলে তেল না পড়িয়া পিঙ্গল হইয়া উঠিয়াছে, মুখে কত দিনের কালিঝুলির ছোপ যে লাগিয়া আছে, গায়ের রং চিনিবার উপায় নাই। গায়ের ছেঁড়া জামাকাপড়গুলো সত্যিকারের জামাকাপড় কোন দিন ছিল কি না সন্দেহ জাগায়।

সম্মোহনকে থমকিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া ছেলেটী সাহস পাইল। কত লোকের সামনে গিয়া তো সে হাত পাতে,—ভ্রুক্ষেপমাত্র করিয়া সকলেই গম্ভীরভাবে আগাইয়া যায়,—এমন করিয়া তো তাকাইয়া দেখে না কেহ। সাহস পাইয়া ছেলেটী সম্মোহনের পায়ের উপর মাথা ঠোকে,—তাহার স্ত্রীর পায়ের ধুলো লয়। তার পর হাতখানি সামনের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—সকালসে ভূখা আছি মাই, একটী পয়সা মাইজী!

গৃহিণী বিব্রত হইয়া উঠিল। সম্মোহন তাড়াতাড়ি পকেট হইতে মণিব্যাগটী বাহির করিয়া খুলিয়া তার মধ্যে হাত ভরিয়া দিল। কিন্তু পয়সা কই? পয়সা তো নাই! একটী আনাও না,—সব টাকা। কেক্ কিনিবার সময় ব্যাগে খুচরা যা ছিল, সবই তো সে ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে, এ কথা তো তাহার মনে ছিল না। ভিখারীটীর সামনে ব্যাগ খুলিয়াই তো সে মুস্কিল বাধাইয়াছে,—এখন কিছু না দিলেই বা চলিবে কেন। স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া সম্মোহন জিজ্ঞাসা করিল—তোমার কাছে খুচরো পয়সা আছে? না হলে এক-আনি?

স্ত্রী মাথা নাড়িয়া জানাইল, নাই।

প্রত্যাশী ছেলেটী তখনও তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া হাত পাতিয়া আছে,—ব্যাগ যখন বাবু খুলিয়াছেন, তখন কিছু না দিয়া যাইবেন না। সম্মোহনও বুঝিল ব্যাগ খুলিয়া সে অন্যায় করিয়াছে,—আর সকলের মত সেও তো পাশ কাটাইতে পারিত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে সে একটী টাকা দিয়া ফেলিবে, তাই বা কেমন করিয়া হয়। তাহার মত দেড়শো টাকা মাইনের কেরাণী এতটা উদারতা পাইবে কোথা হইতে। দিনের পর দিন ধরিয়া পরের দাসখতে নাম লিখিয়া প্রতিদিন যাহারা নিজেকে হেয় হইতে হেয়তর প্রতিপন্ন করিতেছে, তাহাদের সঙ্কুচিত বুক সামান্য একটী নিরন্ন ভিক্ষুককে দেখিয়া স্ফীত হইতে পারে না। তাহার পকেটে খুচরো যখন কিছুই নাই, তখন সে দিবে না, দিবার বাধ্যবাধকতা তো কিছুই নাই এই ভিখারীর সঙ্গে। আর সকাল হইতে অনাহারে আছি বলিলেই যে বিশ্বাস করিতে হইবে, এ-ই বা কি কথা। শীতটা আজ একটু বেশী পড়িয়াছে,—গাঁজা কি তাড়ির পয়সা দু' একটী হয় তো কম পড়িয়া গেছে। তা জোগাড় করিয়া লইতে হইবে। এমনি পয়সা দাও বলিলেই তো কেউ আর পয়সা দিবে না। তাই ওই কথাটী তাহারা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে। যখন তখনই দু'দিন খাই নাই বলিয়া হাত পাতিয়া বসিল। সবটাই মিথ্যা। ইহাদের এই মিথ্যার চাপে, সত্যিকারের অনাহারীদের ভিক্ষা মেলে না। ইহাকে সে প্রশ্রয় দিবে না।

সম্মোহন পাশ কাটাইল।

পথের ধারেই একটী ফিটন দাঁড়াইয়া ছিল। কোচম্যান ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—গাড়ী হবে বাবু—গাড়ী?

হ্যাঁ, গাড়ী একখানি ভাড়া করিয়া তাহাতে চাপিয়া বসাই তাহার পক্ষে এখন ভাল, না হইলে এই ছোকরা ভিখারীর হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া তাহার পক্ষে মুস্কিল হইবে। জোঁকের মত আধ মাইল পথ ইহারা পায় ধরিয়া, জামা টানিয়া বিব্রত করিয়া তুলিবে। সে একা থাকিলে কিছু আসিয়া যাইত না, কিন্তু সঙ্গে স্ত্রী থাকিয়াই তো খারাপ করিয়াছে। একেই তো বহুদিনের অনভ্যাসে এত লোকের চোখের সামনে দিয়া ভাল করিয়া চলিতেই পারে না। তার উপর এই ছেলেটী ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া পা'য় মাথা খুঁড়িতে সুরু করিলে চলা মুস্কিল হইবে। সম্মোহন গাড়ীর সামনে আগাইয়া আসিয়া কহিল—চোরবাগান যাব, কত নেবে?

কোচম্যান বলিল—আপনিই বলুন না বাবু, কত দেবেন।

সম্মোহন তাহার উত্তর দিবার আগেই ভিখারী ছেলেটী আগাইয়া আসিয়া তাহার পায় বার বার মাথা ঠুকিতে সুরু করিয়া দিল। বিব্রতভাবে সম্মোহন পা টানিয়া লইতে, করুণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া ছেলেটী হাত পাতিল—আজ সকাল্‌সে ভূখা আছি বাবুজী!

তাহার মুখের পানে চাহিয়া বিব্রত সম্মোহন কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। অসহায় দৃষ্টিতে সে পত্নীর মুখের পানে চাহিল। স্ত্রীর হাতে কাগজে মোড়া ক্রীষ্টমাস্ কেক্‌খানার উপর নজর পড়িতেই সহসা একটা কথা তাহার মনে জাগিল। স্ত্রীর হাত হইতে কেক্‌টী লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া সম্মোহন বলিল—কেকটী দাও তো,

ওরই খানিকটা কেটে দি। ছেলেটা যখন বলছে সকাল থেকে কিছু খায় নি, দাও···ছুরী আমার পকেটে আছে —বলিয়া ছুরী বাহির কবিবার জন্য সম্মোহন সত্যিই পকেটের মধ্যে হাত ভরিয়া দিল।

স্বামীর ভাব দেখিয়া স্ত্রী বিরক্ত হইল, বলিল—কি যে বল তার ঠিক নেই। পথে কে একটা ভিখিরী হাত পেতে এসে দাঁড়ালো বলেই তাকে এই কেক্‌টা দিয়ে দিতে হবে! সকাল থেকে খায় নি তো এমনি তোমার প্রত্যাশায় শুকিয়ে আছে। চলো গাড়ীতে উঠে বসিগে,— ওকে খাওয়াবো বলেই যেন আমি এই কেকখানা কিনেছি।

ভিখারী ছেলেটার উপর একবার কঠোর দৃষ্টিতে তাকাইয়া গৃহিণী সামনের ফিটনটাতে উঠিয়া পড়িল। গৃহিণীর সে দৃষ্টিতে ছেলেটা ব্যথিত হইল, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল কতক্ষণ। সম্মোহন তখন গৃহিণীর পিছনে পিছনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছে। ছেলেটা আগাইয়া আসিয়া আবার পয়সা চাহিত হয় তো; কিন্তু কোচম্যান তাহাকে এক ধমক দিয়া চাবুকটা হাতে তুলিয়া লইল। অনিবার্য্য চাবুক খাইবার ভয়ে ছেলেটা একটু তফাতে সরিয়া গিয়া করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল শুধু। কোচম্যান তখন ঘোড়ার রাশ টানিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে। গাড়ী চলিতে সুরু করিলে কোচম্যান বলিল—চোদ্দ আনা দিতে হবে বাবু!

সম্মোহন সে কথার কোন জবাব দিল না। ছেলেটার প্রত্যাশিত দৃষ্টি তখন তাহার চোখের সামনে জাগিতেছিল। সামান্য একটা পয়সা সে তাহাকে দিতে পারিল না,—কেকের আধখানা কাটিয়া দিলেই বা কি এমন ক্ষতি হইত। অথচ এই ছেলেটাকে ফাঁকি দিতে গিয়া তাড়াতাড়িতে ভাড়া ঠিক করিয়া না ওঠার জন্য আট আনার স্থলে তাহাকে চোদ্দ আনা দিতে হইবে, তাহাতে ক্ষতি হইবে না। এক টাকা দু' আনার টিকিটে তাহারা বায়োস্কোপ দেখিবে, বহুদিনের আনন্দ লুঠিতে মুক্ত হস্তে দু'হাতে ব্যয় করিয়া যাইবে। তাহাদের পয়সা লুঠিয়া অভিনেতারা মদ খাইবে, ফিল্মষ্টারেরা চুম্বনের মধ্যে রোম্যান্স খুঁজিবে, হাসিবার সময় গালে টোল খাইলে ইন্‌সিওর করিয়া রাখিবে, সার্কাস ও ক্যার্ণিভ্যালের চারি পাশে লাল নীল সবুজ আলোর ঝর্ণা বহিবে, নতুন নতুন স্বদেশী প্রদর্শনী খুলিবে, নব নব টকী হাউসে সহর ছাইয়া যাইবে, এম্-সি-সির জন্য খেলার মাঠে গ্যালারী সাজানো হইবে, কিন্তু অনাহারীর মুখে অন্ন উঠিবে না, অন্ন চাহিলে চাবুক লাফাইয়া উঠিবে তাহার মুখের উপর, মহানদীর প্লাবনের দিকে কেহ ফিরিয়া দেখিবে না, ম্যালেরিয়ার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবে না কোন দিনই। সহরের দিগন্ত জমকাইয়া বিত্তশালী মুষ্টিমেয়কে লইয়া অর্থ ও আনন্দের জয়জয়কার উঠিবে। কত পরিবারকে গৃহহীন করিয়া দিয়া প্রশস্ত রাজপথ বাহির হইয়া যাইবে। সহরের শোভা বাড়াইবার জন্য দরিদ্রের খোলার ঘর, টিনের ঘর ভাঙিয়া দিতে হইবে। পথের উপর দাঁড়াইয়া একজন ফেরিওয়ালাকে ফেরি করিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের সুযোগ দেওয়া হইবে না। একটা গৃহহীন ভিখারীকে শুইতে দেওয়া হইবে না ফুটপাতের গাড়ী-বারান্দার নীচে। শুধু পিচের পালিশ রাখা হইবে নিঃশব্দে মোটর যাইবার জন্য। চওড়া ফুটপাত রাখা হইবে পথের মানানসই করিয়া। তবেই বোঝা যাইবে সভ্যতা ক্রম-বিকাশ লাভ করিতেছে। তবেই জানা যাইবে বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সমতালে পা ফেলিয়া আমরাও চলিয়াছি। অর্থকে লইয়া বণিক ও সভ্যতা জাগিয়া থাকিবে। শীতের হিমক্লিষ্ট নিরন্ন ভিখারী ফুটপাতে মরিয়া পড়িয়া থাকিলে কেহ ভ্রূক্ষেপ করিবে না। শতাব্দী সভ্যতার প্রগতি তথাপি দৃপ্তভাবে আগাইয়া চলিবে,—থামিবে না, পিছনের পানে তাকাইবে না, কি ছিলাম সে আদর্শ মানিবে না।

ইতিমধ্যে ফিটন কখন চোরবাগানের পথে আসিয়া পড়িয়াছে। কোচম্যান সম্মোহনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কত নম্বর বাড়ী বাবু? কোন দিকে যাব?

সম্মোহন পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া সম্মোহন দেখিল, যাহা সে ভাবিয়া রাখিয়াছে তাহা মিথ্যা হয় নাই। তাহাদের দেখিয়াই খোকা গম্ভীর হইয়া গিয়া টেবিলের উপরকার কি একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইয়া যাইতেছে। বাবা ও

মায়ের বাড়ী আসার মধ্যে যেন কোন বিস্ময় নাই এমনি নির্লিপ্ত তাহার ভাব। সম্মোহন মিষ্টি কথা বলিলে তাহার চোখের কোলে জল জমিবে। তার পর আস্তে আস্তে মুখে ফুটিয়া উঠিবে হাসি।

গৃহিণীও বুঝিয়াছিল। সেই প্রথমে খোকাকে ডাকিয়া বলিল—খোকা, তোমার জন্যে কি এনেছি, দেখ।

দেখিবার আগ্রহ যে খোকার না হইল তা নয়। তথাপি নিরুত্তর হইয়া পূর্ব্বের মতই সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, মুখটী পর্য্যন্ত এদিকে ফিরাইল না।

এবার সম্মোহন কাছে গিয়া সস্নেহে পুত্রের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল—আমাদের ওপর রাগ করেছ, খোকাবাবু?

মুখ তুলিয়া ধরিতে দেখা গেল খোকার দুচোখ ছলছল করিতেছে,—এখনি পক্ষ্ম ছাপাইয়া জল গড়াইয়া পড়িবে হয় তো। সম্মোহন খোকাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—তুমি তো তখন বাড়ী ছিলে না খোকাবাবু, তাই তো তোমায় নিয়ে যাওয়া হোল না। তোমায় এবার একদিন সার্কাস দেখিয়ে নিয়ে আসবো'খন।

এদিকে খোকার সামনে টেবিলের উপর ক্রীষ্টমাস কেকখানি রাখিয়া দিয়া মা বলিল—দেখ্ খোকা, তোর জন্যে কি এনেছি, খাবিনে?

খোকার ঠোঁট দু'খানি এবার অভিমানে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল, কেক্‌খানির প্রতি একবার লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া, খোকা অভিমান-কম্পিত অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিল —না, আমি খাব না, সার্কাসে আমি কক্ষনো যাব না!

মা আদর করিয়া কেক্‌খানি খোকার হাতে তুলিয়া দিতে গেল, খোকা ধরিল না, মায়ের মুখের পানে একবার চাহিয়া,—না আমি খাবো না, কখ্‌খনো খাব না, বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সম্মোহন খোকাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল—ছি, খোকাবাবু, শুধু শুধু রাগ করে কাঁদতে আছে! তোমায় কাল আমি সার্কাসে নিয়ে যাবো'খন, বলিয়া কেক্‌খানি স্ত্রীর হাত হইতে লইয়া গৃহিণীর উপর ছদ্ম রাগ দেখাইয়া বলিল—তোমার যেন কি! কেক্‌খানা কেটে দিতে হয়, খোকা কি এমনি খাবে না কি!

সম্মোহন পকেট হইতে পেন্সিল-কাটা ছুরী বাহির করিয়া রুমালে বার দুয়েক মুছিয়া লইয়া কেক্ কাটিতে সুরু করিয়া দিল। কেক্ কাটা দেখিতে দেখিতে খোকার চোখের জল কখন শুকাইয়া গেল। প্রথম কাটা টুকরাটী খোকার হাতে তুলিয়া দিতেই সে খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল, পিতামাতার মুখেও হাসি ফুটিল।

সে রাত্রি কেক্ খাইয়াই খোকার পেট ভরিয়া গেল, আর কিছুই সে খাইল না। কিন্তু এই কেক্ খাওয়া লইয়াই বিপত্তি ঘটিল মধ্যরাত্রে। খোকা সহসা ঘুমন্ত মাকে ডাকিয়া তুলিয়া বলিল—মা, বমি করবো, পেটটা ভয়ানক ব্যথা করছে।

মা উঠিল, খোকাকে লইয়া বাহিরে আসিল, খোকা বমি করিতে বসিল।

বমি আর থামিতে চায় না। মা ভয় পাইয়া গেল। স্বামীর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়া স্বামীকে উঠাইল। সম্মোহন বাহির হইয়া সব দেখিয়া শুনিয়া ভয় পাইয়া গেল। তথাপি মুখে সাহস দেখাইয়া বলিল—ও কিছু না, এখুনি বন্ধ হয়ে যাবে। আমার কাছে ওষুধ আছে, এক ফোঁটাতেই কাজ হবে—বলিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স খুলিয়া প্যালসেটিলার শিশি খুঁজিয়া লইয়া কাচের গ্লাসে জল ঢালিয়া ডোজ ঠিক করিয়া লইল। তার পর গ্লাসে এক ফোঁটা ওষুধ ঢালিয়া গ্লাসের মুখে একটা চাপা দিয়া গৃহিণীর উদ্দেশে বলিল—বমি থামলেই এটা খাইয়ে দিও, আর কিছু হবে না।

বমি থামিলে খোকাকে ওষুধ খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। সম্মোহন চুপ করিয়া দেখিতে লাগিল ওষুধের ফলাফল। তাহার মনে তখন ভয় জাগিয়াছে। খোকার সত্যই কলেরা হইল না তো! যদি কলেরাই হইয়া থাকে, কোন্ ডাক্তারকে তাহা হইলে ডাকিবে? হোমিওপাথী করিবে না এলোপাথী? স্যালাইন্ ইঞ্জেক্‌শনে তবু বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে—এলোপাথীই সে করিবে। এসিয়াটিক কলেরায় চব্বিশ ঘণ্টাতেই সব শেষ হইয়া যায় বলিয়াই তো সে শুনিয়াছে। যদি এসিয়াটিক কলেরাই হইয়া থাকে! এখুনি আবার যদি

বমি আরম্ভ হয়, তাহা হইলে এখুনি ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিতে হইবে। অবিলম্বে সকল পূর্ব্ব ব্যবস্থা করিতে হইবে। ডাক্তারবাবুর হাতে ধরিয়া সে বলিবে খোকাকে বাঁচাইয়া দিতে। তাহার একটী মাত্র পুত্র, তাহার জন্য যত ব্যয় হউক সে কুণ্ঠিত হইবে না, খোকাকে তাহার বাঁচাইতেই হইবে।

ইতোমধ্যে খোকার আবার বমি আরম্ভ হইল। ওষুধ পেটে তলাইল না দেখিয়া সম্মোহন বাহির হইয়া পড়িল ডাক্তার ডাকিতে। খোকার তাহা হইলে সত্যই কলেরা হইল। ওই কেক্‌খানি খাইয়াই এই অনর্থ বাধিল। যে ছেলেটী খাদ্যের অভাবে হাত পাতিল তাহাকে কেক্‌খানি দিয়া দিলেই তো হইত! তাহার ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টির সাম্‌নে হইতে কেক্‌খানি কাড়িয়া লইয়া আসিয়া সে অন্যায় করিয়াছে। প্রকৃত ক্ষুধার্ত্তকে সে করিয়াছে বঞ্চিত। তাহার শাস্তি তাহাকে পাইতেই হইবে। ভগবান তাহার উপর বিরূপ হইয়াছেন। খাবারের লোভে ভিখারী ছেলেটীর চোখে কি বিষণ্ণতাই ঘনাইয়া উঠিয়াছিল! কেন সে দিল না কেক্‌খানি ছেলেটীকে খাইতে! ভিখারীর ক্ষুধার্ত্ত উদরে যাহা হজম হইত, প্রাচুর্য্যের মধ্যে পালিত তাহার পুত্রের তাহা হইবে কেন। তাহা হইলে তো ছেলেটী কলেরা হইতে বাঁচিয়া যাইত। আর ভিখারী ছেলেটীর হইলই বা কলেরা, তাহাতে তাহার তো কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হইত না। নিজের স্বার্থের দিকটা বড় করিয়া দেখিতে গিয়া যে অনর্থ সে টানিয়া আনিয়াছে, তাহার ফল তাহাকে সহিতেই হইবে। খোকাকে সে হারাইবে নিশ্চয়ই। আজ সন্ধ্যায় ভিখারীটীর উপর যে নির্ম্মমতার পরিচয় সে দিয়াছে, ভগবানও তাহার প্রতি সেই নির্ম্মমতার ইঙ্গিতই তো দিয়াছেন। তাঁহার বজ্রকে বুক পাতিয়া লইবার জন্য এখন হইতেই তাহাকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। খোকাকে সে হারাইবেই।

সম্মোহন ডাক্তারবাবুর বাড়ীর দরজায় আসিয়া কড়া নাড়িয়া ডাকিল—ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু!

প্রথমে কোন উত্তরই পাওয়া গেল না। কতক্ষণ ডাকাডাকির পর ভিতর হইতে ডাক্তারবাবুর তন্দ্রাজড়িত স্বর ভাসিয়া আসিল—কে?

—আমি সম্মোহন, একবার এদিকে আসুন দিকি।

ডাক্তারবাবু আলোয়ান গায়ে জড়াইয়া জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েছে?

—খোকার কলেরার মত হয়েছে, এখুনি আপনাকে একবার যেতে হবে।

—আচ্ছা দাঁড়ান যাচ্ছি,—বলিয়া ডাক্তারবাবু সরিয়া গেলেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পোষাক পরিচ্ছদ করিয়া ডাক্তারী ব্যাগ লইয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। তাহাকে লইয়া সম্মোহন অগ্রসর হইল।

প্রথমে ডাক্তারবাবুই প্রশ্ন করিলেন—কতক্ষণ থেকে সুরু হয়েছে?

—এই মিনিট পনেরো হবে। দু'বার উপরি-উপরি বমি করেছে দেখে এসেছি, একডোজ্ 'প্যালসেটিলা' দিয়েছিলুম, পেটে তলায়নি। আমার মনে হয় এসিয়াটিক কলেরা হয়েছে।

ডাক্তারবাবু হাসিলেন, বলিলেন—এত তাড়াতাড়ি আপনার মনে হলে তো চলবে না। চলুন, আগে গিয়ে দেখে আসিগে। মাত্র দু'বার বমি করেছে, এতেই আপনি এসিয়াটিক্ কলেরা বললেন,—হয় তো কিছুই হয় নি। না দেখে তো কিছু বলা যায় না। বিকালে কিছু বাজারের খাবার-টাবার খেয়েছিল বলে জানেন?

—আস্ত একখানা ক্রীষ্টমাস্ কেক্ খেয়েছিল—আমিই কিনে এনেছিলুম। এমন জানলে······

কথা বলিতে সম্মোহনের স্বর কাঁপিতেছিল। ডাক্তারবাবু তাহার কাঁধে একখানি হাত রাখিয়া বলিলেন—এত নার্ভাস হচ্ছেন কেন? অসুখটা কি আগে দেখি, তবে তো!

সম্মোহন কিন্তু বুকে বল পাইল না। তাহার মনে জাগিতেছিল ভিখারী ছেলেটীর বিষণ্ণ দৃষ্টি,—সে তাহাকে অভিসম্পাত দিতেছে। কেক্‌খানা তাহাকে দিয়া দিলেই তো হইত,—তাহার এই অভিসম্পাত হইতে সে বাঁচিয়া যাইত। কেন সে তাহা দিল না? ছেলেটীকে সেই জন্যই তো সে আজ হারাইতে বসিয়াছে!

ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে লইয়া সম্মোহন বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল।

ডাক্তারবাবু দেখিলেন। খোকা তখন দু'বার বমি

করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ভাল করিয়া খোকাকে পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন—কোন ভয় নেই,—আপনারা যা ভয় করছিলেন তা নয়। অতিরিক্ত খাওয়ার জন্তে দু'বার বমি হয়ে গেছে মাত্র। এই একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, নিয়ে এসে খাইয়ে দিন, এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে'খন।

সম্মোহন যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইল।

ডাক্তারবাবুকে বিদায় দিয়া তখুনি সে ছুটিল ওষুধ লইয়া আসিতে।

পথ চলিতে চলিতে সে কেমন যেন অভূতপূর্ব্ব আনন্দ পাইতেছিল। একটু আগেই যে আতঙ্কে তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, আসন্ন ভূমিকম্পের যে আশঙ্কায় সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা হইতে সে মুক্তি পাইল। বুক ভরিয়া সে নিশ্বাস লইল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল রাত্রির শুব্ধ নির্জ্জন রাজপথে প্রাণ ভরিয়া সে একবার ছুটিয়া লয়। তাহার পুত্রের বিপদ কাটিয়া গেছে। আজ সে আনন্দ পাইয়াছে, পাইয়াছে ভগবানের আশীর্ব্বাদ। খোকা বাঁচিয়া যাইবে,—ওষুধ লইয়া গিয়া খাওয়াইয়া দিবার অপেক্ষা শুধু। সম্মোহনের মাথাটা যেন আগের চেয়ে হাল্কা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আকণ্ঠ ভরিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস লইল। বাতাস তো নয়, যেন অমৃত পান করিতেছে।

ডিস্পেন্সারী বেশী দূরে নয়। কম্পাউণ্ডার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সম্মোহন তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া প্রেস্‌ক্রপ্‌শনখানি তাহার হাতে দিল। তার পর ওষুধ তৈরী করিতে দেরী হইতেছে মনে করিয়া, দশ মিনিটের মধ্যেই তিনবার তাগিদ দিয়া অস্থির করিয়া তুলিল—কই, দিন্ তাড়াতাড়ি, ঢুলছেন বুঝি?

কম্পাউণ্ডার বোঝে,—তাড়াতাড়ি ওষুধ তৈরী করিয়া দেয়। ওষুধের শিশি হাতে লইয়া সম্মোহনের আনন্দ হয়। শক্তি-শেলাহত লক্ষ্মণের জন্ত মৃতসঞ্জীবনী হাতে পাইয়া রামচন্দ্রের এত আনন্দ হইয়াছিল কি না কে জানে।

পয়সা চুকাইয়া দিয়া সম্মোহন বাড়ীর পথে অগ্রসর হইল। খোকা তাহা হইলে এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল। ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন ওষুধ লইয়া গিয়া খাওয়াইয়া দিলেই সে ঘুমাইয়া পড়িবে। ওষুধ লইয়া গিয়া খাওয়াইয়া দিতে তাহার আর কতক্ষণই বা লাগিবে। কিন্তু সত্যই ঘুমাইয়া পড়িবে তো! না, ডাক্তারবাবু স্তোকবাক্য বলিয়া গেলেন কিছুই হয় নাই, বাড়ী গিয়াই সে দেখিবে খোকা অবিরাম বমি করিতেছে। ওষুধ খাওয়ানই তখন চলিবে না। খাওয়াইলেও ফল কিছুই পাওয়া যাইবে না,—ওষুধ তখন পেটে আর তলাইবে না। তখন আবার তাহাকে ডাক্তার ডাকিতে হইবে। ডাক্তারবাবু কিছু না করিতে পারিলে আরো বড় ডাক্তার ডাকিতে হইবে। কলেরা কেস। অবসর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তাহার মধ্যেই প্রতিকার করিতে হইবে অত্যন্ত ক্ষিপ্রভাবে। ডাক্তারের মুখের পানে তাকাইয়া নতুন নতুন ওষুধের জন্ত ছুটাছুটী করিয়াই এ রাত্রি তাহার কাটিয়া যাইবে। তার পর কি হইবে কে জানে। এসিয়াটিক কলেরা তো প্রথমেই ভীষণ হইয়া আত্মপ্রকাশ করে না, প্রথমে এমনি দু-একবার বমি হইয়াই তো সুরু হয়।

সম্মোহনের বুক কাঁপিতে লাগিল,—একরকম ছুটিয়াই সে বাড়ী আসিয়া পড়িল। গৃহিণী তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার হাতে ওষুধের শিশিটা দিয়া সম্মোহন জিজ্ঞাসা করিল—আর বমি হয় নি তো?

—না, তবে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে,—বলিয়া গৃহিণী খোকাকে ওষুধ খাওয়াইতে গেল, সম্মোহনও চলিল তাহার পিছনে পিছনে।

খোকাকে ডাকিয়া ওষুধ খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। দু'বার বমি করিয়া সে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ওষুধ খাইয়া সে ক্লান্তিতে আবার চক্ষু মুদিল। সম্মোহনের ভয় হইল, দু'একবার বমি করিয়াই তো কতলোক মারা যায়, ডাক্তার ডাকিবার অবসর পর্য্যন্ত থাকে না, খোকার তেমন কিছু হইবে না তো!

জুতা খুলিবার কথা সম্মোহনের মনে রহিল না। একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া সে খোকার সামনে বসিয়া পড়িল। মৃত্যুকে সে আজ আগুলিয়া রাখিবে,—খোকার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া সে জাগিয়া বসিয়া থাকিবে। সামান্ত একটা দুর্লক্ষণ দেখা দিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ একজন ভাল ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিবে,—মৃত্যুকে সে ফাঁকি দিতে দিবে না। কি ভাবিয়া কি

করিতে গিয়া, তাহার ভাগ্যে আজ কি হইল। ক্রীষ্টমাস কেক্ আনিয়া আদর করিয়া খোকাকে খাওয়াইয়া সে কি অন্যায়ই করিয়াছে। বাজারের খাবার কিনিয়া না আনাই তাহার উচিত ছিল। আর কিনিয়াই যখন ফেলিয়াছিল ভিখারী ছেলেটাকে দিয়া দিলেই তো সব চুকিয়া যাইত। ভিখারী সে, অনাহারে তো মরিতেই বসিয়াছে,—না হয় একদিন ভাল করিয়া খাইয়াই মরিত। ভিখারী ছেলের মৃত্যুতে জগতে এমন কিছুই তো ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না! দেশের ও দশের কোন উপকারই তো সে করিতে পারিবে না! কিন্তু তাহার পুত্র বাঁচিয়া থাকিলে একদিন একটা বড় কিছু হইবে।—সুশিক্ষা পাইবে, গৌরব লাভ করিবে, বরণীয় হইবে। খোকার বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন আছে। কেক্‌খানা ভিখারী ছেলেটাকে দিয়া দিলেই তো হইত!

ঘুমন্ত খোকার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া সম্মোহন কখন ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম যখন ভাঙিল তখন শেষরাত্রির কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া তাহাকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। ঘুমন্ত খোকা ও পত্নীর পানে একবার তাকাইয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া সে নিজের ঘরে শুইতে চলিয়া গেল।

আকাশের পূর্ব্ব দিকটায় তখন সবেমাত্র একটা বিবর্ণ শুভ্রতা জাগিয়াছে।

কালবোশেখীর স্মৃতি

[বীরভদ্র]

জুড়ে নভ-ঠাঁই ছোটে শাঁই শাঁই কালবোশেখীর কাজল মেঘ,
প্রভঞ্জনের ব্যঞ্জনা ঘোর, গুঞ্জন অতি ভীষণ বেগ।

চলে ঝটিকার তাণ্ডব নাচ,
হাউইএর মত ওড়ে দোলে গাছ,

ধূলি বালুকার ধূমান্বিত সাজ পরি' ধরণীর রুদ্ররূপ;
অশনির ধ্বনি ওঠে শুধু রণি, মেঘমাঝে জ্বলে অগ্নি-ধূপ।

বাজে বজ্রের দজ্জাল রব,
দামামার ভেরী ভরে দিক সব,

গুরু গুরু ডাক মহা বৈভব তোলে মন্দ্রের শিহর তান;
ছোটে ঝঞ্ঝার ঝন্ ঝন্ রেশ,—বধির করিছে সবার কান।
চঞ্চলিকার অঞ্চলখানি সঞ্চরণিছে আকাশ গায়,
বিজলীর আলো বিদ্যুৎবেগে বক্রগতিতে বিমানে ধায়।

রুদ্র এ ক্রিয়া বড় ভাল লাগে
রক্তের দোল অন্তরে লাগে,

দামিনীর খেলা দরশের ভাগে নির্ঘোষে ত্বরা কি যেন বাণী,
কালবৈশাখী বাঁধি এস রাখি,—বন্দনা করি ঝড়ের রাণী॥

তারপরে নামে দখিণে ও বামে শিলাবৃষ্টির শীতল ধার,
ঝড় বাদলের মল্লার রব গুমরিয়া ওঠে সুদূর পার।

কুয়াশার মত ঘন আবরণ
ঝরে ঝর্ ঝর্ নয়ন শোভন,

আকাশ ও পৃথিবী প্রণয়ে মগন, বিজলী তাদের প্রেমোচ্ছ্বাস ;
অভিসারী বায়ু কেঁদে কেঁদে ফেরে মিটে নাচে তার ব্যাকুল আশ।

বাতায়নে বসে হেরিতাম বেশ
বাদল প্রিয়ার আলু থালু কেশ,

মেদুরিত হত বাথি-বনদেশ, কেয়া-কেতকী-কদম চূড়,
তোমাদের কানে জানিনা কেমনে পশিত ভীতির মন্দ্রসুর।
গুরু গুরু ধ্বনি উঠিত যেমনি দামিনী যখন চিরিত বুক,
ভীতা-হরিণীর মত পাশে এসে বারেক শিহরি লুকাতে মুখ।

তখনো পড়িছে ছোট বড় শিলা,
তখনো চমকে বিদ্যুৎ-লীলা,

ক্ষণিকের আলো দূর করি দিলা মোদের মাঝের তিমির ঠাঁই,
কাছে টেনে এনে চুম্বন দিনু,—মনে কিছু তার পড়িছে ভাই ?
হয়ত ভুলেছ হৃদয় পুরেছ বিস্মরণেরি নিঠুর বায়,
চলে যাবে, এনু সেইক্ষণে পেনু তোমাদের মূক ঘৃণাটি হায়।

ভুলে যদি থাক নাহি কোন দুখ,
ভুলেতেই জাগে শত নব সুখ,

ধরণীতে আছে বহু ভুলচুক্ তারই জের শুধু টানিছে সব,
ভোর হ'ল ভেবে ভুল করে বসে কাক-জ্যোৎস্নায় কোকিল রব।

মরীচিকা দেখে ভুলিছে মরুরে,
আঁধারে ভুলিছে পেয়ে আলেয়ারে,

মদেতে ভুলিল বিরহ নিঠুরে, জোয়ারে ভুলেছে ভাঁটা যে তটিনী ;
চুমুতে ভুলিছে তৃষিতেরই বুক, ভুলেছে মেয়েরে কুলটা মোহিনী।
অমাবস্যায় সকলে ভুলিছে লভি' পূর্ণিমার রজত-লিপিকা,
দিনের আলোয় ভুলিছে তারারে, ভুলিছে হেলায় রাতের দীপিকা।

স্মরণে ভুলিছে মরণ-গোধূলি,
চিতারে ভুলিছে নিভে গেলে চুলি,

ভুলিছে ঝটিকা মিলালে বিজুলী, মাটিতে ভুলিছে সভয়ে সাহারা,
প্রবাসী-পথিকে তোমরা ভুলেছ, যতনে রেখেছ ঘৃণায় পাহারা॥

আমি-তুমি-ও সে

শ্রীপ্রভাতকুমার দেব সরকার

(১)

অমর সারাদিন রোদে' ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে অসিতের বাড়ী এল। জুলাই মাস। স্কুল-কলেজ সব গ্রীষ্মাবকাশের পর খুলেছে। অসিত বাড়ীতেই ছিল,—ডাকতে বেরিয়ে এল।

—"কি হে! কিছু জোগাড়যন্তর করতে পারলে?"—

বিষাদের গভীর নিঃশ্বাস ফেলে' অমর কহিল, কই, কিছু ত হ'ল না আজও—পড়াশুনা বোধ হয় ছাড়তে হবে,—কলেজের Principal এর কাছে রোজ গিয়ে পায়ের চামড়া উঠে গেল ভাই, তবু কিছু ক'রে উঠতে পারলাম না। তিনি কোন ভরসা দিলেন না,—সেই এক কথা, 'Second Division, আমরা কিছু করতে পারি না'···আমি ঠিক ক'রেছি আর তাঁর কাছে যাব না—একটা যদি tutiony পাই,—

—"হুঁ:, এই বাজারে ওটাও বড় দুষ্প্রাপ্য,—কত বি-এ, এম্-এ ঘুরে বেড়াচ্ছে, দু' পাঁচ টাকার জন্যে।"

অমরের ইচ্ছে হ'ল একবার অসিতকে বলে, 'কেন, তোমার ভাইটাকে—।" কেমনতর সঙ্কোচ যেন তাকে বাধা দিল—গলাটা চেপে ধরল।

অসিত ধনীর ছেলে। নাদুষ-নুদুষ চেহারা, চোখে চশ্‌মা, মুচ্‌কি হাসি ও মিহী গলা। একটু যেন ব্যথিত হ'য়ে কহিল,—তাই তো, বড় মুস্কিলে প'ড়েছ ত!

আরো দু'পাঁচ কথার পর' অমর চল্‌লো বাড়ীর দিকে। অসিত দোর ভেজিয়ে শিষ্ দিতে দিতে উপরে উঠলো—ভাবটা যেন, ভারি তো স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি বলে' এখনও তার দাবী!

(২)

অমর যে বাড়ীতে এসে ঢুকলো, সেটার এক কথায় নাম দেওয়া যেতে পারে, 'স্বাস্থ্যবিরোধী প্রেক্ষাগার'। বাড়ীটার আশে-পাশে চারিদিকে যেন গৃহস্থিত লোক-গুলোকে অচিরে বিনাশ করবার ষড়যন্ত্র চলেছে। ঘরে ঢুকে কাঁথাজড়ান ভাইটাকে একটু আদর ক'রে, জামা কাপড় ছাড়ল। মা বললেন, কি রে কিছু হ'লো, রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে মুখটাকে তো কালী করে এনেছিস্।

—"না, কিছু হয়নি—হ'বেও না বোধ হয়।"

—"আমাদের বরাতটাই মন্দ রে!—তা' না হ'লে উনি এত শীগ্‌গীর চলে যাবেন কেন!"—বল্‌তে বল্‌তে উচ্ছ্বসিত বাষ্পে তাঁর কণ্ঠনালী ভরে' এল।

পুরোনো শোকটা আবার ওঠে দেখে, অমর ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। তার চোখটা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ঝাপ্‌সা হ'য়ে এল। দু'চার মিনিট কান্নার পর মা কহিলেন,—ওঠ, কিছু খা'।

আজ প্রায় মাসতিনেক হ'ল, অমরের বাবা মারা গেছেন। জাতকেরাণী ছিলেন। কোনরকমে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করতেন।...বয়স হ'য়ে এসেছিল অনেক,—তবু দিচ্ছিলেন বুড়ি গাইয়ের মত দুধ,—কার যেন তাড়ন ও পোষণের দায়ে!—উপস্থিত সংসারে চারটী প্রাণী,—অমরের বড় ভাই-ই এখন সংসার দেখে। ···কোন রকমে চলে যায়,—চলা মানে বাঁচতে হয় তাই বাঁচা গোছের,—বৈচিত্র্যহীন জীবন টেনে; যে বাঁচা, শতকরা নিরানব্বুইজন বাঁচে,—উদরপূর্ত্তির জন্য হীনতা দীনতার পরিচয় দিয়ে। এসেছে কোনরকমে পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে; বেরিয়ে যাবে কাটা মাথায় টাপ্পি বেঁধে,—ভিড়ের মধ্যে গুঁতোগুঁতি ক'রে। চল্‌তে হ'বে, উপায় না কি নেই! এই ফাটা মাথার টাপ্পি লাগাবার জন্যে করতে হ'বে, হাতজোড়, কাকুতি-মিনতি ও পায়ে পড়ার অভিনয়!

(৩)

বহুদিনের পুরোনো অভিনয় দেখতে এসে মানুষ যেমন বিরক্ত হ'য়ে পড়ে, অমরও এই জীবন বহন ব্যাপার নিয়ে বিরক্ত হ'য়ে পড়েছে। নূতন বৎসরের

নূতন উদ্দাম উৎসাহ কেমন যেন নিবে এসেছে—এই ছ'মাসের ব্যবধানে। ছোট ভাইটা একটু বড় হ'য়েছে। ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসে। অমরের সেই সময়টা বেশ লাগে। দাদার মাইনে সেই পচিশই আছে,—বাড়েও না, কমেও না, বরং মাঝে মাঝে ফাইন হয়। মা' বেশ আছেন,—অবশ্য 'বেশ' মানে আমরা যা' বুঝি তা' নয়,—এর মানে দুঃখীর সংসারে যে 'বেশের' দরকার হয়।

অভিনয় পুরোণো হ'লেও সেটার মধ্যে যদি কোন 'কমিক' পার্ট থাকে, হাস্তে হয় জোর ক'রে—যদিও আগের মত প্রাণ থাকে না। প্রথম প্রথম ভায়ের কচি মুখের হাসি বেশ লাগতো, উপভোগ্যও ছিল। এখন যেন আর তত ভাল লাগে না। সাংসারিক ব্যাপার গেল ছ'মাসে চলছে এইরূপ—চল্‌বেও বোধ হয় এইরূপ। মাঝে মাঝে 'হসন্ত' 'বিসর্গ' এসে বোঝার ওপর 'শাকের' আঁটি চাপাবে এই যা,—আর কিছু নয়। অমরের পড়াশুনার দিক্ দিয়ে বিশেষ কিছুর নব আবির্ভাব হয় নি। তবে আশা পেয়েছে, হ'বে বলে'—কদ্দূর কি হয় বলা যায় না। কেউ যে বড় বেশী একটা নজর দিতে চায় না।

সকাল হয়েছে আলো বাতাস ছড়িয়ে। এর আগমনে বহু লোকের আনন্দ হ'ল বহুলোকের দুঃখ হ'ল—ভয়ও হলো যথেষ্ট। গরীব যারা পেটের চিন্তায় ছুটলো; ধনী যারা চায়ের পেয়ালা মুখে, চুরোট হাতে, খবরের কাগজ নিয়ে বসল। পাওনাদার যারা নূতন আশা কড়া বুলি আওড়াতে আওড়াতে চল্‌ল খাতকের কাছে। খাতক যারা লুকোবার চেষ্টা দেখল। এমনি ধারা আর কত কি!

চোখ রগড়াতে রগ্‌ড়াতে অমর বিছানা ছাড়ল। আজকে একটা আশা আছে। রাস্তা দিয়ে চলেছে বহু কথার জাল বুন্‌তে বুন্‌তে। একবার মনে হ'চ্ছে হ'বে,—আর একবার মনে হচ্ছে হ'বে না,—ভয় হচ্ছে খুব। হবার কথাটা যেই মনে হ'ল, তার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত ঘটনা যোজনা করা যায় তারা কেমন যেন চক্‌চকে হ'য়ে উঠ্‌ল—চোখের সুমুখে। মনটা নেচে উঠ্‌ল। পড়ার কথা মনে হ'তেই তিন চারটা পাশের ডিগ্রী এসে তা'তে যোগ দিল। আশাটা যখন আমাদের ঈপ্সিত বস্তুর পক্ষ সমর্থন ক'রে, যা'র জন্যে আমাদের 'আশা' সেটার গণ্ডি ক্রমশঃ বাড়্‌তে থাকে। তাই যখন নিরাশ হই মনটা বড় দুম্‌ড়ে যায়। গত কাল অমর তার এক মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে বন্ধুর সাথে দেখা ক'রে আশা পেয়ে এসেছে,—৬৲ টাকা মাহিনার ছেলেপড়ানর কাজ পাবে। বন্ধুটীর নাম সত্যেন। সে পড়ছিল। অমর যেতে যথারীতি অভ্যর্থনার পালা সেরে বহু প্রশ্নের পর ছেলে পড়ানর কাজটা আগামী কাল থেকে করতে হ'বে,—তাই জানিয়ে দিল। গৌরচন্দ্রিকাটা বেশ লাগে শেষে যদি কিছু পাবার আশা থাকে।

(৪)

অসিত, সত্যেন আর অমর, এদের তিনজনেরই মধ্যে চেনাশুনা ছেলেবেলা থেকে। স্কুলে এক ক্লাসে পড়তো। এ' তিনজনের মধ্যে দু'জনের সময়মত কলেজ লাইফ্' আরম্ভ হ'য়ে গেছে, শেষটীর হয়নি, একজন ধনী; একজন মধ্যবিত্ত; অপরজন নিঃস্ব। একজন ধনের প্রভাবে, গায়ের জোরে সব কিছু উৎরে যাচ্ছে। একজন ধনের পেছন থেকে চালাচ্ছে। আর একজন সম্পূর্ণ ধনের ঝিল্‌মিল্ ছটা থেকে দূরে অন্ধকারে,—এই যা প্রভেদ, আর কিছু নয়।

(৫)

সত্যেনের সহায়তায় অমর Tuitionতে বাহাল হয়েছে। বাড়ী থেকে প্রায় মাইলখানেকের পথ রোজ যেতে হয়। Tuition নেওয়া ও পাওয়ার কথা ভাবতে অমরের বিস্ময় লাগে।—৬৲ টাকায় দু'টী ছেলে! চমৎকার,—আবার এই ছ'টাকা না কি যথেষ্ট।—ছাত্রের বাপ কথাটা বলেছিলেন,—আমরা একটা হাঁড়িকে দশবার বাজিয়ে নিই—ইত্যাদি এমন কত কি! সহ্য করতে হয়েছে সব।

* * * *

আঠার বছরের ছেলে,—সংসারে এসে অন্য কিছু পাবার ও উপভোগ করবার আগেই দারিদ্র্যটাকে পেয়েছে ও বুঝেছে এবং উপভোগ করছে বেশী ক'রে। জন্মের সঙ্গে নাড়ীর মত তা'র সাথে সম্বন্ধ করে নিয়েছে।

চারদিক থেকে কেবল, 'নেই—নেই' কথাটাই কানে আস্ছে। তাই এখন দারিদ্র্য কথাটা তা'র মনে ভয়ের বিভীষিকা তোলে না। অন্ধকারে বসে' ভগবানের দেওয়া চোঁখ দুটো দিয়ে আলোর সন্ধানে বড়ই উৎসুক। আর যে পারে না!

টিউশেনীটা পেয়েই অমর আর কোন দিকে না চেয়ে কলেজে ভর্ত্তি হ'য়ে পড়ল। দাদা বল্লেন, কিছুর চেষ্টা দেখ—পড়াশুনা করে কি হ'বে—ইত্যাদি অনেক কথা। এতে অমর সন্তুষ্ট হ'তে পারেনি মোটেই। তাই ভীষ্মের মত দাদার কথা মেনে নিয়ে মাথা নাড়তে পারেনি।

কলেজে এসে তবু সারাদিনের নেওয়া বদ্ধ হাওয়াটা ফেল্‌তে পারে, মুক্ত বাতাসে হৈ-হৈ করে কেটে যায়; মন্দ লাগে না। সঙ্গী জোটে অনেক। কিন্তু আশ্চর্য্য হয় সঙ্গীভাগ্য দেখে। এখানেও সেই 'আমি-তুমি-সে' নীতির প্রভাব চলে পুরো মাত্রায়।

সত্যেন আর অসিত এক বছরের সিনিয়র হ'য়ে গেছে। সত্যেন ডেকেডুকে কথা কয়, অসিত মাঝে মাঝে কখন-সখন হেসে ইঙ্গিত ইসারায় মনের ভাব ব্যক্ত করে। মোটের ওপর চলছে একরকম।

(৬)

বছর ঘুরে গেল, তিনশ' পয়ষট্টি দিন শেষ ক'রে, আর একটা নতুন বছর এল—বাড়ীর মধ্যে নিত্য-পরিচিতের মাঝে নব ব্যক্তির আগমনের মত। দু'চারদিন বেশ লাগলো তাকে। ব্যাস্, তার পর পুরোনো ও নিত্য পরিচিতের সঙ্গে মিশে, সে আর রইল না নূতন হ'য়ে। প্রথম প্রথম কেলেণ্ডার দেখে তারিখ মনে রেখে অনেক আবেদন নিবেদন জানিয়ে তাকে মনে রাখা হ'ল।—তার পর কে জানে জানুয়ারী, কে জানে জুন; সব সমান হ'য়ে গেল। সবাই বলে, আর ক'টা দিন বা। অমর দিল 2nd yearএর পরীক্ষা, অসিত আর সত্যেন গেল I. A. পরীক্ষা দিতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দোরগোড়ায়। খবর বেরোল। অসিত এল ফিরে, পুরোনো বন্ধুর কাছে; সত্যেন গেল চৌকাট ডিঙিয়ে। এ তো গেল কলেজের ব্যাপারে এক বছরের হিসেব। পারিবারিক হিসেব কিন্তু তিনজনের তিন রকমে হয়েছে।—

—অসিত ধনীর ছেলে। গাড়ীবাড়ী সব কিছুই আছে। সত্যেন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। বাবা চাকুরী করেন; মোটা মাইনে পান; কোলকাতায় সামান্য বাড়ী আছে। আর বেচারা অমর! এদের কারো সঙ্গেই সামঞ্জস্য নেই। না-আছে গাড়ী,—আর না-আছে উদরপূর্ত্তির ভাল উপায়।

অসিতদের গাড়ীর ওপর গাড়ী, বাড়ীর ওপর বাড়ী হ'য়েছে। সত্যেনের বাপের চাকুরীর উন্নতি হ'য়েছে। আর অমরের দাদার চাকুরীর ওপর ফাইনের গণ্ডা চেপে বসেছে গ্যাঁট্ হয়ে। উন্নতি হ'লো দু'জনের, অবনতির ও উন্নতির মাঝে রইল একজন।

এমনি ক'রে চলল তিনজনের জীবনযাত্রা—জানা, আধ-জানা ও অজানা পথের সন্ধানে।

তিনজনের যাত্রা তিন রকম হ'লেও, যাত্রার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুই প্রকার;—একটী উদ্দেশ্য, একটী নিরুদ্দেশ্য। আবার এই যাত্রার পাথেয় ও পথ দু'রকম। একজনের পাথেয় প্রচুর; পথ বিপদ্-মুক্তি। আর একজনের পাথেয় ব'লে যে জিনিষ আছে তার ঘরে শূন্য; পথ বিপদসঙ্কুল। মজা এইখানে!

(৭)

আবার বছর এল ঘুরে, ভোর ছটা থেকে বেলা দশটা পর্য্যন্ত সময়; কেরাণীবাবুদের যেমন করে যায়। অসিত আবার গেল পরীক্ষা দিতে। অমর রইল পরীক্ষার স্বপ্ন দেখ্‌তে, টাকার অভাবে পড়ে। এবারেও অসিত ফিরে এল। মুখের, মনের ও চলাফেরার ভাব রইল একই। সত্যেন 4th yearএ এসে পৌছল, পাশটাস্ ক'রে উকীল হয় এই তার ইচ্ছে।

*

* *

আজ দু'দিন হলো অমরের ছোট ভাইয়ের বড় জ্বর হয়েছে,—বেহুঁস্। বেলা দশটা হ'বে। দাদা প্রেসের কাজে বেরিয়ে গেছে। অমর বসে বসে ভাইয়ের মাথায় জলনেকড়ার টাপ্পি লাগাচ্ছে। মা এ-দিক ও-দিককার কাজ সারছেন। বাইরের দরজা ভেজান ছিল,—আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হ'ল। অমর উঠি উঠি করছে, মা ঘরে ঢুকলেন। মাকে ভায়ের কাছে

বসিয়ে সে উঠে গেল। শব্দ হ'ল, কি হে, বাড়ী আছ না কি?

দরজা খুলতেই দেখল, সত্যেন ও অসিত দাঁড়িয়ে। অসিত নাক মুখ সিঁটকে যথাসম্ভব আড়ষ্ট হ'য়ে আছে।

সত্যেন কহিল, এই তোমায় নেমতন্ন করতে এলুম। আমার বোনের বে—পরশু যেও কিন্তু। হ্যাঁ:, আজ তুমি কলেজ যাও নি কেন বল ত?

—ছোট ভাইটার বড় অসুক করেছে। আর গিয়েই বা কি করছি বল। টাকা দিয়ে ইউনিভার্সিটির মুখ দেখার অবস্থাও তো কোন দিন হ'বে না।

সত্যেন একটু ব্যথিত হ'ল। অসিত ভ্রূ কোচ্‌কাল।—"চল, তোমার ভাইকে দেখে আসি," বলে সত্যেন পা বাড়াতেই অসিত জামার হাতা ধরে টান দিল,—"না হে, আর ও-দিকে গিয়ে কাজ নেই। এখন অনেক বাকী। সামান্য জ্বর তার আর দেখবে কি।" অসিতের সুরের মধ্যে যে অবজ্ঞা প্রচ্ছন্ন ভাবে ব্যক্ত হ'ল, তার আঁচ অমর অনুভব করল।

সত্যেন ব্যাপারটাকে চাপা দেবার জন্যে বল্‌ল,—তবে পরশু যেও কিন্তু।

যে পথে অসিত ও সত্যেন এসেছিল, সেই পথেই চলে গেল। অমরের অজান্তে একটা নিঃশ্বেস বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা কন্‌কনিয়ে উঠল।

(৮)

আরো বছরখানেক কেটে গেল। অসিত কোন রকমে I. A. পাশ করেছে। অমরকে বাধ্য হ'য়েই পড়া ছাড়তে হয়েছে,—আশার শেকড়টাকে নিজ হাতে নির্মূল ক'রে। সত্যেন 'ল' ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছে।

আজ মাসখানেক হ'ল অমরের মা দু'দিনের ভেদ-বমিতে মারা গেছেন। অমরের দাদা অজয়, অমর ও ছোট ভাই এখন সংসারের প্রাণী। পড়াশুনার বালাই নাই। অমর রাঁধে বাড়ে,—দাদা ও ভাইকে খাওয়ায়, আর কিছুদিন হ'ল পাড়ার যে কয়জন শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি আছেন,—তাঁরা অজয়কে বে' করবার নিমিত্ত উপদেশ দিচ্ছেন,—"সংসারটা যে লক্ষীছাড়া হ'য়ে গেল হে; এবার বে' থা' কর, আর কেন, মাইনে ত পঁচিশ পাও।"

কানের কাছে রোজ ঘ্যান্ ঘ্যান্ আর সহ্য না করতে পেরে, সংসারের, ছোট ভাই-এর ভার ও খাবার-দাবার ভারটা অন্ততঃ যা'তে সুসম্পন্ন হয়,—এই ভেবে অজয় একটী বয়স্থা মেয়েই ঘরে আন্‌ল।

নূতন বৌদি'কে আদর অভ্যর্থনার ভার অমরকে নিতে হ'ল,—মা, ননদ, ইত্যাদি প্রভৃতির স্থান তা'কে পূর্ণ করতে হ'ল। বৌদি' লোকটা মন্দ নয়। তবে, বৌদি' আসা থেকে সে কেমন যেন ধীরে ধীরে পর হ'য়ে যাচ্ছে—তার সব চাওয়া যেন তেমন সহজ ও অসঙ্কোচে হয় না—গলার মধ্যে কেমন যেন একটা ঘড়্‌ঘড়ানি শব্দ হয়।

আজ দু'দিন হ'ল অমরের টিউশনীটী গেছে, বছর দুয়েকের মধ্যে ছ' টাকার Tuitionই কমতে কমতে, ক্রমে ৪৲ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছিল। গত কাল সেটী কমার হাত থেকে একেবারে অব্যাহতি পেয়ে হাতছাড়া হ'য়েছে। ছাত্রের বাপ অনেক কথারই অবতারণা করেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত যার মানে কর্ম্মচ্যুতি—ইস্তফা। তিনি খুবই দুঃখিত হ'য়ে বললেন,—সব তো বুঝ্‌চি, কি করবো বলুন—আমারও অবস্থাটা দিন দিন খারাপ হ'য়ে আস্‌ছে। তাই এবার ঠিক করেছি ও পয়সাটা আর খরচ না করে—অন্য কিছুতে লাগালে কাজ দেখতে পারে। ভাগনেটা এসেছে, আমার কাছে থাকবে বলে', তাকে দিয়েই, ভাবছি ও-কাজটা করিয়ে নেব, হেঁ:, হেঁ:—একগাল হেসে তিনি আপ্যায়িত ক'রেছিলেন।

*　　*　　*　　*

খেয়ালী মানুষ অসিত। চলেছে খেয়াল বসে। পড়াশুনা আর ভাল লাগে না,—ছেড়ে দিয়েছে। এখন সকাল আটটায় ঘুম থেকে ওঠা—রাত বারটায় বাড়ী ফেরা, তার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য হয়েছে। সেই এখন বাড়ীর কর্ত্তা। অভিভাবকের মধ্যে আছেন কেবল মা। বাবা গত হয়েছেন আজ প্রায় মাস তিনেক হ'ল। তবে ছেলে খুব হুঁসিয়ার। ইয়ার বন্ধু থাক্‌লেও তারা বেশী কিছু করতে পারে না। আড্ডাটা একটু বেশী দেয়, এই যা!

মা কত বলেন, এবার বিয়ে-থা কর, আর কতদিন বাউণ্ডুলে হ'য়ে থাকবি, ইত্যাদি। অসিত বলে, বিয়ে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না! যখন ইচ্ছে করলেই

হলো। তুমি দেখে নিয়ো আমাদের জন্তে একটা মেয়ের অভাব বিয়ের বাজারে হ'বে না।

ধনীর ছেলে। মোসাহেব জুটেছে অনেক। তারা মুচ্‌কি, কাষ্ঠ ইত্যাদি হাসির ফাঁকে, বন্ধুকে আমোদ ও ফূর্ত্তি যে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এ'কথা জানিয়ে দিতে ভোলে না। ব্যোম্‌কেশটা 4th class পর্য্যন্ত পড়েছিল বোধ হয়, প্রায়ই বলে, আরে ভায়া, drink and be merry.

(৯)

সেদিন রাত্রি বারোটা হ'বে বোধ হয়। অসিত সবেমাত্র বাড়ী ফিরেছে। এমন সময় বা'র দরজা থেকে ডাক এল,—অসিত, শীগ্‌গীর বেরিয়ে এস তো। গলাটা সত্যেনের। বাধ্য হয়েই অসিতকে বাহিরে আস্‌তে হ'ল।

—"কি হে এতরাত্রে ডাকাডাকি কিসের ?" সত্যেন ব্যস্ত হ'য়ে বলল, অমরের ছোট ভাইটা এইমাত্র মারা গেল—চালচুলোহীন খোলার ঘরে; বড় বিপদে পড়েছে। আমার বাড়ী গেছল' ডাকতে। তা আমার কি জান ভাই, কোন কাজ একলা করতে পারি না। সে তো একধারে নিঝুম হ'য়ে বসে আছে। আমায় সব কর্‌তে হ'বে আর কি,—তাই তোমার কাছে এলুম,—যদি যাও তো ভাল হয়, হাজার হোক ছেলেবেলার বন্ধু তো!

অসিত নির্লিপ্তভাবে কহিল, আমার দ্বারা ও-সব হবে না, এখন রাত দুপুর। রাত-ভিত নেই! এখন যাব বন্ধুত্বের নেক্‌রা করতে আর কি! অত বন্ধুত্বের বাই আমার চাগে নি। একটা ভিখারি সে আবার চায় বন্ধু হ'তে—লজ্জায় মরি! যাও, যাও, আমি যেতে পারব না। গরীব বলে' পয়সা দিচ্ছি। লোক ক'রে নাওগে যাও।

সত্যেনের ইচ্ছে হ'ল, দু'কথা শুনিয়ে দেয়। আবার মনে হলো, কোন লাভ নেই এতে,—ওরা বুঝ্‌বে না। সে কেবল কহিল, তুমি ধনী, তোমার কাছে পয়সা চেয়ে নিজেকে ছোট কর্‌তে আসিনি। এসেছিলুম মানবতার দোহাই দিয়ে,—তুমি যে আস্‌বে না একটা নিঃস্ব দরিদ্রকে সাহায্য করতে, সে আমি জানতুম্—অন্ততঃ জা'না উচিত। অমরের নিঃসহায় অবস্থা দেখে আমি সে কথা ভুলেই গেলুম। আজ তার দাদা, তাকে আর তার ছোট ভাইকে ফেলে, বৌ নিয়ে এলাহাবাদে বদলী হয়ে গেছে। যার ভাই, একটা দুগ্ধপোষ্য শিশুর হাতে মাতৃস্তনপায়ীর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েছে, তার জন্তে জগতের আর কেই বা ভাববে বল! আমার ভুল হ'য়েছে ভাই, আমি জানতুম না, যে, তোমাদের মত মানুষ এতখানি নির্দ্দয় হ'তে পারে। যাক্, চললুম্। আজ শিক্ষা হ'লো, আর কখন আসব না। যদি কখন আসি তো তোমাদের মোসাহেব হ'য়ে আসবো।—বলেই হন্ হন্ ক'রে চলে গেল।

অসিত একটু ভ্রূ কুচকে, বক্র হেসে, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দেবার আশা! বলে' অস্পষ্ট শব্দ করিল।

(১০)

তার পর মাস চারেক কাল কেটে গেছে। অমর তার ঝড়-জলে ভাঙা ডিঙি নিয়ে এখন পাড়ি দেবার চেষ্টা করছে,—পাল ছিঁড়েছে, হাল ভেঙেছে, আছে শুধু স্ক্রু দিয়ে আঁটা চার পাঁচটা তক্তা। সত্যেনের নৌকার অবস্থা ভাল নয়,—অল্প দামের কাঠ, ভাঙবার আশা পলে পলে। অসিতের তরী সংযত, ধীর, স্থির; কোন কিছুই তাকে অবশ করতে পারেনি,—ময়ূরপঙ্খীর মত শান্ত সমুদ্রে ভেসে চলেছে। আর সেই তরীতে বসে' অসিত ও তা'র পাশে সুষমামণ্ডিত স্থূলাঙ্গী অর্দ্ধাঙ্গিনী। পাল রং-চঙ্-এ, হাল দামী কাঠের; মাঝি মাল্লা সব ভীত সন্ত্রস্ত, আদেশ পালনে সদা তৎপর। দু'জনেই অতখানি তরী ভর্ত্তি করে ফেলেছে, বল্‌ছে—আর স্থান নেই।

অমর ও সত্যেনের তরী মগ্ন হ'লেও—স্থান অল্প হলেও, বলছে, এখনও তরীতে আছে স্থান।

অমর ভাঙা নৌকা থেকে কখন পড়ে, হাবুডুবু খায়, আধমরা হ'য়ে আবার ওঠে। সত্যেনের অবস্থা একরকম। আর অসিত সে পাড়ি দেবেই কোন ভুল নেই। তিনজনের জীবনযাত্রা তিন রকম তালে নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে চলেছে। কেউ নাচে আনাড়ির মত; কেউ তার চেয়ে একটু উন্নত; আর কেউ নাচে তাল-সুর সব-কিছু বজায় রেখে। তার নাচের সঙ্গে সঙ্গে শত শত হাততালির শব্দ আকাশ বাতাস ভরিয়ে দিচ্ছে। কোন্‌টার ভঙ্গিমা ভাল, তা' জানি না। তবে যার জন্তে হাততালি পড়ে,—সেটা ভাল নিশ্চয়ই।

পাখীর "কথ্য-ভাষা"

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য বি-এ

ভাষা বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি লইয়া কি মানুষ, কি পশু, কি পক্ষী সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। পশুপক্ষীরা বিভিন্ন ধ্বনি দ্বারা সমশ্রেণীতে পরস্পরের মনোভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, মূক তাহার জন্য অঙ্গ-ভঙ্গিমার উপর নির্ভর করে, আর শিশু ক্রন্দন করিয়া বা হাসিয়া তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। এইভাবে প্রত্যেক শ্রেণীই নিজস্ব বিশিষ্ট ভাষার মধ্য দিয়া স্বচ্ছন্দে পরস্পরের মনোভাব প্রকাশ করিয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে। এক সময়ে মানুষও তাহার আদিম অবস্থায় সামান্য কয়েকটীমাত্র ধ্বনি ও অঙ্গভঙ্গিমার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে; এবং তাহার সেই অবস্থার ভাষার সহিত পশুপক্ষীর ভাষার তুলনায় হয় ত সামান্যই পার্থক্য মিলিবে। মানুষের তখন কার্য্য-কলাপের গণ্ডী এত সঙ্কীর্ণ ছিল যে তাহার জন্য কথ্য-ভাষার এরূপ প্রসারের প্রয়োজন হয় নাই। এখনও কোন কোন স্থানে এরূপ আদিম প্রকৃতির মানুষ বর্ত্তমান, যাহাদের প্রয়োজনীয়তা ও কর্ম্মক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হওয়ায়, মস্তিষ্ক বিশেষ উন্নত অবস্থায় পৌঁছে নাই; এবং স্বল্প ভাষা দ্বারাই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অষ্ট্রেলিয়ার সন্নিকটস্থ কোন কোন ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসিগণ দুইএর বেশী সংখ্যা গণনা করিতে পারে না। কিন্তু আজ মানুষ যুগযুগান্তরের কর্ম্ম ও মানসিক চর্চ্চার ফলে ক্রমে যে কথ্যভাষার অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার সহিত পশুপক্ষী বা আদিম মানুষের ভাষার কোন তুলনাই সঙ্গত হয় না। এই কথ্যভাষাই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ।

টীয়ার ধ্বনি উচ্চারণের অঙ্গের আকার

ময়নার ধ্বনি উচ্চারণের অঙ্গের আকার

কথা বা কথ্যভাষা এক অথবা অধিক ধ্বনির সমষ্টি মাত্র। নির্দ্দিষ্ট রূপ লইয়া ইহার অর্থবোধক ক্ষমতা প্রয়োজনানুসারে মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে। ক্রন্দন ও হাসি ব্যতীত শিশু এবং মূক অন্য কোন ধ্বনির দ্বারা কোন বিশিষ্ট মনোভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। পশুপক্ষীর ধ্বনি অতি অল্পসংখ্যক এবং তাহা আংশিকভাবে আপন আপন শ্রেণীতে পরস্পরের মনোভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ। মানুষের কথ্যভাষার সঙ্গে পশুপক্ষীর ধ্বনিযুক্ত প্রকাশের পার্থক্য এই যে, মানুষ ইচ্ছানুযায়ী ধ্বনি গঠন করিয়া বিভিন্ন রূপ দিতে পারে, এবং তাহা দ্বারা যে কোন প্রকার ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু পশুপক্ষী যে কোনরূপ ভাব প্রকাশ দূরের কথা তাহার নিজের গণ্ডী ছাড়াইয়া অন্য কোন ভিন্ন ধ্বনি গঠন করিতেও অক্ষম। কিন্তু এই সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়মেরও ব্যতিক্রম কোন কোন ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়, এবং তাহাতে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

আমরা দেখিতে পাই, কয়েকটী পাখী, যেমন টীয়া, ময়না, কাকাতুয়া ইত্যাদিকে শিখাইলে কিছু কিছু কথা বলিতে শেখে—যদিও তাহার স্পষ্টতা এবং অর্থবোধকতা নিতান্ত সামান্য। কিন্তু ইহার কারণ কি? পক্ষীবিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তক এ পর্য্যন্ত যথেষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাদের মনুষ্য-ধ্বনি নকল করিয়া উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিত হয় নাই। কোন কোন পাশ্চাত্য পক্ষীতত্ত্ববিদ্ উক্ত পাখী কয়টীর কথা নকল করিবার ক্ষমতা আছে এইমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, এবং শিখাইবার প্রণালী সম্বন্ধে সামান্য আভাষও কেহ কেহ দিয়াছেন; কিন্তু কেহই ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন নাই। ইহা ছাড়া, পশুদের উচ্চারণ সম্বন্ধে কোন কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কিছু কিছু পর্য্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন দেখা যায়। আমেরিকার ডক্টর জারণার বহু বানরের ধ্বনি পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, —যে বানর যত উচ্চ স্তরের, তাহার বাক্‌যন্ত্র তত সুগঠিত ও ধ্বনি স্পষ্ট উচ্চারিত হয় এবং একই শব্দ বার বার একই স্বরে উচ্চারণ করিতে পারে

ও সেই সকল শব্দের অর্থ বোধও তাহাদের আছে। মানুষের নিম্ন স্তরে সিম্পাঞ্জীর স্থান এবং সেই ভাবে তাহাদের মস্তিষ্ক অন্যান্য পশু অপেক্ষা উন্নত। ডক্টর জারণার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাদের ধ্বনি-সমূহের মানুষের স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিসমূহের সঙ্গে আংশিক মিল আছে —এবং কোন কোন ধ্বনির সমষ্টি হইতে নিজ ভাষার অর্থবোধক কথাও পাইয়াছেন। এইরূপ, একবার জার্ম্মাণীতে একটা কুকুরের কথা কহিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে খবরের কাগজে বিশেষ আন্দোলন হয়। সে কয়েকটা প্রশ্নের জবাবও না কি ঠিক ঠিক দিতে পারিত। যেমন "তোমার নাম কি?" জিজ্ঞাসা করিলে, "ডন"; "তোমার কি হইয়াছে?" "হাঙ্গার (hunger)"; "তমি কি চাও?"—"হাবেন (খাইব)"; ইত্যাদি। কুকুরটাকে জার্ম্মাণীর একজন বড় মনস্তত্ত্ববিদ্ ডক্টর অস্কার ফাংষ্ট (Dr. Oscar Fungst) নানাভাবে পরীক্ষা করেন ও দেখেন যে তাহার উচ্চারিত ধ্বনিগুলি আংশিকভাবে মনুষ্য-সমধ্বনি এবং সেই

কাকাতুয়ার ধ্বনি উচ্চারণের অঙ্গের আকার

অনুযায়ী বোধ্য; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ভ্রমবশতঃ শ্রোতার নিকট অর্থ-বোধক বলিয়া মনে হয়। সেজন্য তিনি বৈজ্ঞানিক ভাবে ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারেন নাই।

পাখীর 'কথ্যভাষা' সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যেটুকু গবেষণা করিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি যে, স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহের অধিকাংশ ধ্বনিই আংশিকভাবে তাহাদের দ্বারা উচ্চারিত হয়—যদিও সে ধ্বনিসমূহের স্বরগুণ (sound quality) মনুষ্য স্বরগুণ হইতে কিছু ভিন্ন। কিন্তু ধ্বনি সমষ্টি দ্বারা শব্দ (words) অথবা ভাষা প্রায় ক্ষেত্রেই স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় না। যাঁহারা তাহাদের কথা শুনিতে অভ্যস্ত তাঁহাদের নিকট ইহা সহজবোধ্য ও অর্থবোধক, কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিতের কাছে কোন কোন ক্ষেত্রে আংশিকভাবে বোধ্য। ইহাদের কথা শিখিবার পদ্ধতি ও ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনায় দেখা যায় যে, ইহারাও মানুষের ন্যায় স্তরে স্তরে কিছুদূর অগ্রসর হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা প্রায় একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ; এবং স্পষ্টতাও কখন ভালরূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না। তাহারাও আমাদের ন্যায় কানে শুনিয়াই উচ্চারণ আয়ত্ত করিতে শেখে। শিশু অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম নিয়মিতভাবে দু-চারটী কথা কিছুদিন ধরিয়া শুনাইলে ক্রমশঃ সেই কথার ধ্বনিগুলি নিজ ধ্বনি দ্বারা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা দেখা যায় এবং তাহাতে মুখবিবরের মধ্যে জিহ্বা ও ওষ্ঠের একটা আলোড়ন সুরু হয়। এই আলোড়নের ধ্বনিকেই 'কপ্‌চান' বলা হয়—ইহাই আমাদের শিশু অবস্থার আধ-আধ কথার (Babble) ন্যায়। পাখী কপচাইতে পারিলেই বুঝিতে হইবে যে সে কিছু না কিছু কথা বলিতে সমর্থ হইবে। তারপর তিন মাস হইতে ছয় মাসের মধ্যে দু একটা করিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃ অনেক কথা বলিতে শেখে। প্রথম প্রথম অবশ্য শুনিয়া মানে না বুঝিয়াই কথা নকল করে—পরে ক্রমশঃ যেটুকু শিক্ষিত হয় তাহা দ্বারা কিছু নিজ মনের ভাব প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে এবং কিছু কেবলমাত্র কতকগুলি ধ্বনি ও শব্দ উচ্চারণ করিবার নিমিত্তই কথা বলিয়া থাকে। এইভাবে একটু অভ্যস্ত হইবার পর আপনা হইতেই ক্রমশঃ শুনিয়া সাধ্যমত কিছু কিছু কথা নকল করিতেও সমর্থ হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, বৃদ্ধলোককে ভেংচাইবার জন্য তাহাদের কাশি ও হাসি নকল করিয়া প্রয়োজনমত ব্যক্ত করে, এবং, এমন কি, গরুর গাড়ীর চাকার 'ক্যাঁচ ক্যাঁচ' আওয়াজ নকল করিয়া চমৎকার ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে। শিক্ষিত হইবার পর তাহারা যে যখন-তখনই কথা বলিবে এমনও নয়, প্রয়োজন মত এবং অনেক সময় তাহাদের খুসী মত কথা বলিয়া থাকে। পাশ্চাত্য পক্ষীতত্ত্ববিদ্ মিষ্টার ডগলাস ডেওয়ার পাখীদের কথা শিখাইবার নিয়ম সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকে কিছু কিছু লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে কোন পাখীকে শীঘ্র কথা শিখাইতে হইলে প্রথম যথেষ্ট পরিমাণে খারাপ কথা (Swear words) দেওয়া প্রয়োজন। ইহার যুক্তিসঙ্গত কারণ যে বিশেষ কিছু আছে, তাহা আমার মনে হয় না। কেন না আমাদের দেশে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই "রাধাকৃষ্ণ, রাম রাম" ইত্যাদি ঠাকুর-দেবতার নাম দিয়াই প্রথম শিখাইতে দেখা যায়। মিষ্টার ডেওয়ার ভারতীয় পাখী কয়টীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মত আংশিকভাবে এইরূপে হয় ত সমর্থন করা যায় যে, আমাদের দেশে সাধারণতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নশ্রেণীর লোকদের অথবা বারবনিতাদের দ্বারা পাখী পালিত ও শিক্ষিত হয়; এবং সেখানে তাহারা কথা বলিতে অভ্যস্ত হওয়ার পর খারাপ কথা নকল করিবার

যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। নিজেও এরূপ প্রমাণ কোন কোন স্থানে পাইয়াছি। এ ছাড়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, গ্রামোফোনের সাহায্যে কল ধীরে ধীরে চালাইয়া কথা শেখান যাইতে পারে। তাহার জন্ত বিশিষ্ট রেকর্ডও আছে—তাহা Pollys Lesson নামে পরিচিত। প্রতি দফায় এই রেকর্ড দ্বারা শিক্ষা দশমিনিটের অধিক দেওয়া নিষেধ—কেন না বেশী সময় একসঙ্গে দিলে পাখীদের Brain Fever হইবার সম্ভাবনা। মিষ্টার ডেওয়ারের মতে ভারতীয় টীয়া, ময়না ও কাকাতুয়া অপেক্ষা পশ্চিম আফ্রিকার টীয়া সুস্পষ্টভাবে কথা বলিতে পারে।

নিম্নে পাখীর কথার কয়েকটী নমুনা ও বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইল—

(১) টীয়া, বয়স তিন বৎসর। চার মাস বয়স হইতে শিখান আরম্ভ হয় এবং তিন মাস শেখানর পর হইতে কিছু কিছু বলিতে আরম্ভ করে —"তাই তো বটে গো, সে সব কপালে করে," এই কথা কয়টী গৃহকর্ত্রী খুব বেশী ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাখীটী এই কথাগুলি শুনিয়া আপনা হইতেই শিখিয়াছে। "ছাতু খাবে, ও মেজ-মা, মা, কতি গেছ মা," খাইতে দেওয়ার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় এই কয়টী কথা বারে বারে বলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে একটী
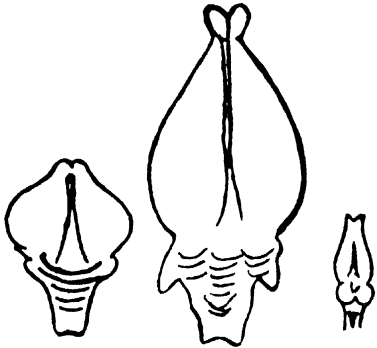
পায়রার মস্তিষ্ক খরগোসের মস্তিষ্ক ব্যাংএর মস্তিষ্ক

দইওয়ালার চীৎকারে সেও "দই, দই, দই," বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। উক্ত ছত্র কয়টী হইতে বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পাখীটার 'স ও র' একেবারেই গঠিত হয় নাই; এবং তাহার পরিবর্ত্তে সে স্বরবর্ণ ব্যবহার করে, যেমন "সে সব, স্থলে এ অব এবং কপালে করে, স্থলে কয়ে।" "ম, প, ব, ছ"এ কিছু কিছু অস্পষ্টতা আছে। "স্বরবর্ণগুলি এবং ক ও ত" একরূপ পরিষ্কার বলিলেও চলে।

(২) ময়না—বয়স পাঁচ বৎসর। তিন বৎসর বয়স হইতে শেখান হইতেছে—"বাবু, পড় ত। কু-কু-কু—শিস্। মা। রাধে কৃষ্ণ রাম রাম। কটা বাজল। মা বারটা বাজল। হা-হা-হা (হাসি)। বাবু পড় ত। বেলা হল। মা কু-কু বেলা হল।" এই পাখীটার "র ও ত" ব্যতীত অন্যান্য বর্ণগুলি বেশ পরিষ্কারই বলা যায়।

(৩) কাকাতুয়া—বয়স ৫০ বৎসর। শিশুকাল হইতেই শেখান হইতেছে।—"খোকা বাবু—বাবু এসেছে। ও কে গো। কাকাতুয়া—কাকাতুয়া।" প্রায় সকল কথাই বেশ পরিষ্কার।

ময়না, টীয়া ও কাকাতুয়ার মধ্যে কাকাতুয়ার উচ্চারণ সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। উক্ত তিনটী পাখীকেই ঠাকুর-দেবতার নাম দিয়া আরম্ভ করা হয়। স্বর এবং ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বারা অথবা অনির্দ্দিষ্ট ধ্বনি এবং আধ-আধ কথার দ্বারা আরম্ভ করিলে কি হয় বলা যায় না—যদিও তাহা বিজ্ঞান-সম্মত নয়।

ধ্বনি গঠনের ও কথ্যভাষা প্রকাশের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানুষের মস্তিষ্ক ও তৎকেন্দ্র সকল, শ্রবণেন্দ্রিয় এবং বাক্য উচ্চারণের অঙ্গগুলি সুস্থ থাকিলে স্বাভাবিক ভাবে ধ্বনি উচ্চারণ ও কথ্যভাষা প্রকাশ সম্ভব হয়। ইহাদের কোন একটার অভাবে বা ব্যাধিগ্রস্ত হইলে ধ্বনি স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয় না। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে উচ্চারণ গঠন হয় বলিয়া, জন্মবধির অথবা শিশু যাহার কথা ভালরূপ আয়ত্ত হইবার পূর্ব্বে শ্রবণশক্তি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের মূক হইতে হয়। সাধারণতঃ মূকদিগের মস্তিষ্ক ও বাক্য উচ্চারণের অঙ্গ সকল সুস্থ ও সজীব থাকায় কৃত্রিম উপায়ে কথা বলিতে শেখান সম্ভব হয়। মস্তিষ্কে বাক্য-কেন্দ্র, শ্রবণ-কেন্দ্র, তাহাদের সংজ্ঞাবহা বাতনাড়ী (Sensory nerves) সংযোগতন্ত্রী (Association fibers), এবং চেষ্টাবহা
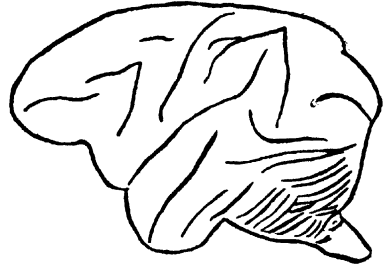
বানরের মস্তিষ্ক

বাতনাড়ী (Motor nerves)—ইহাদের কোন একটা ব্যাধিগ্রস্ত অথবা নষ্ট হইলে বাক্য উচ্চারণের ক্ষমতা প্রায় একেবারেই নষ্ট হয়। কখন কখন চিকিৎসায় এবং বিশিষ্ট শিক্ষা দ্বারা সামান্য ফল পাওয়া যায়। আর বাক্য উচ্চারণের অঙ্গ যেমন স্বরযন্ত্র (larynx), কণ্ঠগহ্বর (Pharynx), নাসিকারন্ধ্র, মুখগহ্বর, জিহ্বা, তালু, দাঁত ও ওষ্ঠ—ইহাদের মধ্যে কোন একটা ব্যাধিগ্রস্ত, অথবা কোনটির অভাব হইলে কথা বলিবার ক্ষমতা প্রায় ক্ষেত্রেই একেবারে নষ্ট হয় না—কেবল মাত্র উচ্চারণ বিকৃত হয় এবং কোন কোন বর্ণ অনুচ্চারিত থাকে। ফুসফুসের সাহায্য ব্যতীত কোন বর্ণই স্বরময় (Voiced) হয় না; কেন না শ্বাসই স্বরতন্ত্রীকে (Vocal chords) কাঁপাইয়া উচ্চারিত ধ্বনিসমূহকে স্বরময় করে। প্রথম যে-কোন ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা সংজ্ঞাবহা বাতনাড়ীর সাহায্যে মস্তিষ্কে শ্রবণকেন্দ্রে নীত হইয়া উচ্চারণ জন্ত সংযোগতন্ত্রী দ্বারা বাক্যকেন্দ্রে উপস্থিত হয়। বাক্যকেন্দ্র প্রয়োজন মত তাহার বিভিন্ন চেষ্টাবহা বাতনাড়ীগুলিকে উত্তেজিত করিয়া

জিহ্বা, ওষ্ঠ প্রভৃতি অন্যান্য বাক্য উচ্চারণের অঙ্গগুলিকে তাহাদের পেশীর চালনা দ্বারা বিভিন্ন ধ্বনি গঠনে সমর্থ করে এবং স্বরযন্ত্র ও শ্বাসের সাহায্যে ধ্বনিগুলি স্বরময় হইয়া অর্থবোধক ও শ্রবণীয় কথ্যভাষায় পরিণত হয়। শিশু অবশ্য একই ধ্বনি বারংবার উচ্চারণ করিয়া সুগঠিত ও শুদ্ধ করিয়া লয় এবং এইভাবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র ভাবধারা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হইয়া কেন্দ্রগুলিতে সংরক্ষিত হয় এবং প্রয়োজনমত মনোভাব প্রকাশের জন্য আপনা হইতেই বাক্যকেন্দ্রের সাহায্যে কথ্য-ভাষায় ব্যক্ত হয়।

এইভাবে কথ্যভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে এবং তাহা তাহার মস্তিষ্কের উন্নততম অবস্থার জন্যই সম্ভব। বিবিধ পশুপক্ষী ও মানুষের মস্তিষ্ক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দ্বারা জানা গিয়াছে যে, যাহার মস্তিষ্কের—মহামস্তিষ্কভাগ
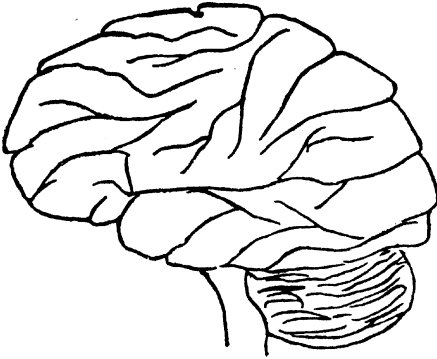
মানুষের মস্তিষ্ক

(Cerebrum) যত বেশী আকারে বৃহৎ ও জটিল (Convoluted) সে সেই অনুপাতে উন্নত। এই নিয়মে স্তর ভাগ করিলে দেখা যায়, মানুষের নিম্নে সিম্পাঞ্জী জাতীয় বানর এবং তাহার অনেক পরে অন্যান্য পশুপক্ষীদের স্থান—যদিও কোন কোন পশুপক্ষীর মস্তিষ্কে কোন বিশিষ্ট কেন্দ্র মানুষের উক্ত কেন্দ্র হইতে উন্নত,—যেমন কুকুরের ঘ্রাণশক্তি-কেন্দ্র, শকুনের দর্শনশক্তি-কেন্দ্র, খরগোসের শ্রবণশক্তি-কেন্দ্র ইত্যাদি। যে সব পাখী নানারূপ সুমিষ্ট আওয়াজ দিতে পারে—যেমন ময়না প্রভৃতি, তাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অন্তরভাগে (Internal ear) একটী বিশিষ্ট স্বরঅঙ্গ (Organ of corti) মানুষের উক্ত বিশিষ্ট অঙ্গ হইতে বিশেষ উন্নত। কোন কোন পশুপক্ষীর এইরূপ বিশিষ্ট কেন্দ্র বা অঙ্গ মানুষ হইতে উন্নত হইলেও কাহারই মহামস্তিষ্ক মানুষের ন্যায় আকারে বৃহৎ ও জটিল নয়।

মস্তিষ্কের এই কয়টী প্রতিকৃতি (Diagram) হইতে কিছু কিছু বুঝা যাইবে—

ব্যাং খরগোস পায়রা বানর মানুষ

যে কয়টী পাখী কথ্যভাষা নকল করিয়া উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় তাহাদের মধ্যে টীয়া ও কাকাতুয়ার জিহ্বা মানুষের জিহ্বার প্রায় অনুরূপ, কিন্তু ময়নার জিহ্বা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। কাহারই দাঁত নাই সেজন্য ওষ্ঠই তৎপরিবর্ত্তে কার্য্য করিয়া থাকে। ওষ্ঠ, জিহ্বা, তালু ইত্যাদির গঠন মানুষের ন্যায় সমভাবে না হইলেও ব্যঞ্জনবর্ণগুলির ধ্বনি একেবারে অস্পষ্ট হয় না। নাক বাহ্যিকভাবে না থাকিলেও তাহাদের নাসিকারন্ধ্রই অনুনাসিক বর্ণ গঠনের পক্ষে যথেষ্ট। ওষ্ঠ কঠিন হওয়ায় বিভিন্ন আকার লওয়া সম্ভব নয়; সেজন্য স্বরবর্ণগুলির উচ্চারণ জিহ্বা ও তালুর সাহায্যেই প্রায় ঘটিয়া থাকে। মাথার খুলি (Skull) ও মুখগহ্বর ধ্বনি ঝঙ্কারের প্রকোষ্ঠের (Resonating Chamber) উপযুক্ত নয় বলিয়া তাহার পরিবর্ত্তে কণ্ঠনালী (Trachea) এমন ভাবে গঠিত যে, প্রয়োজনমত তাহার সঙ্কোচন প্রসারণ দ্বারা ধ্বনি ঝঙ্কারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। স্বরযন্ত্র ও শ্রবণেন্দ্রিয় বর্ত্তমান এবং বিশেষ উন্নত। নিম্নের প্রতিকৃতি হইতে পক্ষীদের বাক্য উচ্চারণের অঙ্গগুলির আকার কিছু বুঝা যাইবে। টীয়া। ময়না। কাকাতুয়া।

ধ্বনি উচ্চারণের জন্য যে সকল অঙ্গ প্রয়োজন তাহা মোটামুটি প্রায় সবই পাখীদের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু এই অঙ্গগুলি প্রকৃতভাবে কেহই নয়—ইহারা গৌনভাবে কার্য্য করিয়া থাকে মাত্র। মস্তিষ্কই একমাত্র উপাদান যাহার উন্নত অবস্থার দ্বারা মানুষের পক্ষে কথ্য ভাষার অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে। কিন্তু এই বিশিষ্ট পাখী কয়টীর কথ্যভাষা আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা দেখিয়া ইহাই কি মনে হয় না যে তাহাদের মস্তিষ্কে হয় ত বাক্য উচ্চারণের উপযুক্ত কেন্দ্র সকল আংশিকভাবে বর্ত্তমান; এবং তাহার উপযুক্ত শিক্ষা ও চর্চ্চার দ্বারা কার্য্যকরী হইয়া থাকে। নচেৎ ইহা কিরূপে সম্ভব?

মানুষের কথ্যভাষার সঙ্গে পাখীর আংশিক উচ্চারণ ও কথ্যভাষা আয়ত্তের ক্ষমতার তুলনা দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়—ইহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিরূপণের চেষ্টাই একমাত্র উদ্দেশ্য। আধুনিক জগতে অবৈজ্ঞানিক ভাবে কিছুই ঘটিতে পারে না, সেজন্য আশা করি, এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।
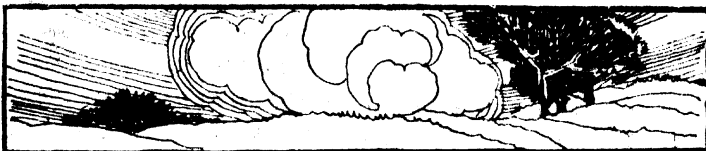
হাসপাতালে

শ্রীবিমল সেন বি-এস্-সি

(শেষার্দ্ধ)

সিষ্টার এবং একজন নার্স খাটের উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুধীর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি, সিষ্টার ?…হঠাৎ কি হল ?

সিষ্টারের চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেটার প্রতি তাহার একটু মায়া পড়িয়াছিল।

বলিল—কি জানি ডাক্তার দত্ত; দুদিন থেকে পেট ভাল নেই—আজ ভোরবেলায় হঠাৎ বমি করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে কী সে চীৎকার! বিছানায় পড়ে পড়ে ছট্‌ফট্ করেছে!…তারপর, এখন এই দেখুন অবস্থা!

আবশ্যকীয় দুই চারিটি প্রশ্ন করিয়া, এবং রোগীর পেট পরীক্ষা করিয়া প্রথমেই সুধীরের মনে যাহা আশঙ্কা হইল, তাহা রোগীর পক্ষে একেবারেই আশাপ্রদ নহে।

শঙ্কিতভাবেই বলিল—একে এক্ষুণি 'অপারেশন্ থিয়েটারে' পাঠাবার ব্যবস্থা কর, সিষ্টার। আমি সার্জ্জনকে ফোন্ করতে চললুম!

হায় রুবী…বেচারি জন্!—ছেলেটা বুঝি বাঁচে না! যদি না বাঁচে—তাহা হইলে, রোগ শয্যায় পড়িয়া উহারা কী নিদারুণ শোকটাই না পাইবে। ভাবিতে সুধীরের সমস্ত অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ এমন হইবে, তাহা যে কেহ ধারণা করিতে পারে না!

*　　*　　*　　*

'অপারেশন্ থিয়েটার'—

দিনে আট-দশটা করিয়া 'অপারেশন্' হইয়া থাকে।

আজও ছিল।

কিন্তু, 'আর্জ্জেণ্ট্' কেস্ আসিয়া পড়াতে, অন্যান্য 'অপারেশন্' স্থগিত রাখিয়া রুবীর ছেলেকে আনিয়া 'টেবিলে' শোয়ান হইয়াছে।

ছোট ঘর। দেয়াল, মেঝে সব পরিষ্কার চকচক করিতেছে।

ঠিক মাঝখানে অপারেশন্ টেবিল।

নানান কল-কব্জা লাগান। ইচ্ছামত উঁচু-নীচু, কিম্বা এ পাশ-ওপাশে কাৎ করা চলে।

উপরে, প্রকাণ্ড ঘণ্টাকৃতি একটি আলো ঝুলিতেছে।

অনেক দামী জিনিষ। চারিদিকে আর্শীর টুক্‌রা লাগান—যাহাতে কাহারও ছায়া পড়িয়া 'অপারেশন্ ফীল্ড্' ঢাকা না পড়ে।

দুইদিকে, ছোট ছোট সাদা টেবিলের উপর, দুশো রকমের যন্ত্রপাতি সাজান। মাথার কাছের টেবিলে, 'ক্লোরোফর্ম্', ঈথর, মুখে পরাইবার 'মাস্ক,' এবং 'অক্সিজেন্ সিলিণ্ডার' রহিয়াছে।

ছাতের কাছের চারিটা দেওয়ালে চারিটা 'সার্চ্চ লাইট্'—বড় বড় চোখ মেলিয়া সেগুলা টেবিলে শায়িত রোগীর প্রতি চাহিয়া আছে।

সার্জ্জন হাত ধুইয়া, প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন।

বিরাট পুরুষ। পরণে সাদা আল্‌খাল্লা! দুইহাতে পাত্‌লা রবারের দস্তানা। সমস্ত মুখ এবং মাথা কাপড়ের মুখোসে ঢাকা।

শুধু চোখদুটি খোলা রহিয়াছে। পার্শ্বে, তাঁহার দুইজন এ্যাসিস্টেণ্ট্ এবং সাহায্যকারিণী সিষ্টারেরও ঐ সাজ। আল্‌খাল্লা পরিয়া, মুখোসে মুখ ঢাকিয়া উহারা যেন ভূতের মত দাঁড়াইয়া।

চেহারা দেখিয়া রোগীর প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া ওঠে।

কাহারও মুখে টুঁ শব্দটি নাই। ঘরে বোধ হয়, ছুঁচ্ পড়িলেও শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

ছেলেটির পেট সাবান-জলে ধুইয়া, টিংচার আইওডিন লাগাইয়া দিয়া, সিষ্টার প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

এইবার অজ্ঞান করিবার পালা—এ্যানেস্‌থেটিষ্টের কাজ।

ছেলেটির নাক এবং মুখ ঢাকিয়া একটি কাপড়ের মুখোস রাখা হইল। এ্যানেস্থেটিষ্ট্ তাহার উপর ধীরে ধীরে ক্লোরোফর্ম্ম ঢালিতে লাগিলেন।

গন্ধ নাকে যাওয়াতে শিশুটি প্রথমে একবার পাশ-মোড়া দিয়া উঠিল।

আর কয়েক ফোঁটা ক্লোরোফর্ম্ম্……

রোগী চীৎকার করিয়া, হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল।

আরও কয়েক ফোঁটা…

ধীরে ধীরে তাহার হাত-পা অবশ হইয়া আসিল। গলা দিয়া নানা রকমের শব্দ করিতে করিতে রোগী ঘুমাইয়া পড়িল।

একটা অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলেও, সে আর টের পাইবে না।

ছুরি হস্তে সার্জ্জন প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

—রেডি?

এ্যানেস্থেটিষ্ট্ শিশুর চোখের একটা পাতা উল্টাইয়া দেখিয়া বলিলেন—ইয়েস, সার! ষ্টার্ট্!

ছুরি চলিল।

চক্ষের নিমেষে শিশুর পেটের উপর হইতে নীচে অবধি ফাঁক হইয়া গেল।

দস্তানা-পরা ডান হাতটা প্রায় সম্পূর্ণ পেটের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া সার্জ্জন সমস্ত 'ভিসেরা' গুলি ঘাঁটিয়া দেখিতে লাগিলেন।

দর্শকেরা গলা বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ ঘাঁটিয়া সার্জ্জন, শিশুর পেটের ভিতরকার অন্ত্রের একটা অংশ টানিয়া বাহির করিলেন। দেখা গেল, অন্ত্রের একটা অংশ, আর একটা অংশের ভিতর ঢুকিয়া জড়াইয়া গিয়াছে।

সার্জ্জন পার্শ্বের এ্যাসিসটেণ্টের প্রতি ঝুঁকিয়া বলিলেন—ইন্‌টাসাসেপ্‌শন্'—ঠিকই ধরেছিলে।

কঠিন ব্যাধি—ছেলে-পিলেদেরই হইয়া থাকে। তৎক্ষণাৎ 'অপারেশন' করা ছাড়া রোগীকে বাঁচান মুস্কিল।

—ষ্টপ্, সার! পেশেণ্ট্ 'ব্রীদ' করছে না।

হঠাৎ, মাথার নিকট হইতে এ্যানেস্থেটিষ্টের শঙ্কিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

রোগীর শ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

মুখ এবং আঙ্গুলের ডগাগুলি নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

এ্যানেস্থেটিষ্টের কথার সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন টেবিলের চারিদিকে যেন ঝড় বহিয়া গেল।

সার্জ্জন ছুরি ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন।

এ্যানেস্থেটিষ্ট্ এক লাফে রোগীর পার্শ্বে আসিয়া, দুই হস্তে তাহার বুকের দুই দিকে ঘন ঘন চাপ্ দিতে লাগিলেন।

'আর্টিফিশিয়েল রেস্‌পিরেশন'।

কিছুক্ষণ এইরূপ করিলে, রোগী আবার শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে থাকে।

—অক্সিজেন সিলিণ্ডারটা আন…শীগ্‌গীর…

টিউবের ভিতর দিয়া রোগীকে অক্সিজেন দেওয়া হইল।

এ্যানেসথেটিষ্টের হাতের কাজ দ্রুততর হইয়া উঠিতে লাগিল।

সবার উৎকণ্ঠার সীমা নাই। হাতের কাজ ফেলিয়া সকলে টেবিলের চতুপার্শ্বে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

রোগী এখনও ত শ্বাস লইল না।

টেবিলেই বুঝি মারা যায়!

আহা, ঐটুকু শিশু!……

হাসপাতালের পক্ষেও ত কলঙ্কের কথা।

প্রায় পনের মিনিট ধরিয়া ঐ ক্ষুদ্র শিশুকে লইয়া ধস্তাধস্তি। এই বুঝি শ্বাস লয়…এই বুঝি বাঁচিয়া ওঠে।…

কিন্তু, সে-সব কিছুই হইল না। ধীরে ধীরে তাহার হার্টের গতিও বন্ধ হইয়া গেল।

এ্যানেস্থেটিষ্ট্ মাথা হেঁট করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

সবাই কানঘুসা করে……

সবাই দুঃখিত……

আহা, এ'টুকু শিশু……

সার্জ্জন আবার ক্ষিপ্রহস্তে পেট সেলাই করিয়া দিলেন। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, ফিস্ ফিস্ করিয়া সিষ্টারকে বলিলেন—শীগ্‌গীর ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দাও—এক্ষুনি।

ইহার অর্থ,—পরদিন রিপোর্ট বাহির হইবে—'অপারেশ ওয়াজ্ সাক্‌সেস্‌ফুল্; বাট্ পেসেণ্ট্ সাম্‌ড্ আফটার ওয়ার্ডস্।"

কারণ, টেবিলের উপর রোগীর মরাটা কলঙ্কের কথা। মৃত শিশুকে কোল্ড রুমের পরিবর্ত্তে পুনর্ব্বার ওয়ার্ডে লইয়া যাওয়া হইল।

*

* *

হায় রুবী···বেচারি জন্ ..

আজই ত সুধীর তাহাদের আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে—ভাল আছে বলিয়া। তাহাদের কাছে যাইতে সুধীরের যেন পা জড়াইয়া আসে।

সবাইকে বারম্বার নিষেধ করিয়া দিয়াছে—এ সংবাদ তাহাদের যেন এখন জানান না হয়। আর একটু সুস্থ না হইলে হয়ত শেষে সামলাইতে পারিবে না।

দুইদিন অতিবাহিত হইয়া গেল।

সুধীর হেঁট মাথায় ওয়ার্ডের কাজ করিয়া যায়।

জন্ দুইবেলাই জিজ্ঞাসা করে—রুবী উঠে বসতে পারে আজকাল ?···আর বাচ্ছাটা কেমন আছে ? তাকে ত কই এখানে নিয়ে এল না ?

—আচ্ছা, দেখব'—বলিয়া, ব্যস্ততার ভান দেখাইয়া সুধীর পলাইয়া যায়।

রুবীও ভাল আছে।

দেখা হইলেই বলে—দেখুন, ডাক্তার দত্ত, সিষ্টারকে বললুম,—সিষ্টার, বাচ্ছাটাকে এখানে নিয়ে এসো না কেন। এখানে এনে, কোলে নিয়ে বসে, বোতলটা একটু উঁচু করে ধ'র, তাহলেই দেখো, কেমন চুক্ চুক্ করে দুধ টানবে। আমাকে না দেখতে পেয়েই ত ও অমন করে···

সুধীর একটা কিছু বলিয়া সরিয়া যায়।

এমন করিয়া ক'দিন চলিবে ?

জন্-এর ত বাঁচিবার আশা নাই ; কিন্তু রুবী আর একটু সুস্থ হইয়া উঠুক। নহিলে আবার একটা কিছু হইতে পারে।

তৃতীয় দিন। অন্যান্য রোগীদের ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া, জন-এর বেডের কাছে গিয়া সুধীর দেখিল, সে গলা দিয়া রক্ত তুলিতেছে।

জ্বরও বেশী। সুধীরকে দেখিয়া, দুর্ব্বল দেহ বিছানার উপর এলাইয়া দিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল।

—গুড মর্নিং ডাক্তার।

—গুড মর্নিং।···আজ আবার রক্ত উঠ্‌ছে ?

বলিয়াই সুধীর সরিয়া যাইতেছিল। জন ডাকিল—ডাক্তার !

সুধীর দাঁড়াইল। দেখিল, জন-এর দুই চোখ বাহিয়া অশ্রুর-ধারা নামিয়াছে। চারিদিকে একবার দেখিয়া লইয়া, সুধীরের একটা হাত ধরিয়া জন বলিল—সব শুনতে পেয়েছি, ডাক্তার।···আমাকে বলতে ত বাধা ছিল না ; পা' ত বাড়িয়েই আছি।···যদিও···যদিও, এত শীগ্‌গীর এ আমি ভাবতে পারিনি···ও যে মরবে তা···

সুধীর কাষ্ঠপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কে যেন সংবাদ দিয়া গিয়াছে। কতদিন আর চাপা থাকিবে !

একটু সামলাইয়া লইয়া জন্ বলিল—যাক্, আমি ত তার কাছেই চললুম। কিন্তু ডাক্তার, তোমার পায়ে ধরে বলছি, রুবীকে এ সংবাদ এখনও দিয়ো না। সইতে পারবে না। সেরে না ওঠা পর্য্যন্ত ও যেন টের না পায়।···এ ব্যবস্থাটি তোমাকে করতে হবে, ডাক্তার। আমি সিষ্টার, নার্স, এমন কি ওয়ার্ড বয়গুলোরও পায়ে ধরে মনতি করেছি।··জান ত ডাক্তার, ছেলেটা ওর চোখের মণি ছিল—সামলাতে পারবে না।

সুধীরের হাত ধরিয়া সে আবার ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

* * * *

রুবীর হঠাৎ আজ আবার জ্বর আসিয়াছে। মাথার বালিশটা বুকের উপর চাপিয়া, মুখ ঢাকিয়া সে পড়িয়া ছিল। সুধীর চোরের মত পা' টিপিয়া আসিয়া, তাহার ব্যবস্থা-পত্রাদি লিখিয়া আবার চুপি চুপি সরিয়া যাইতেছিল। রুবী হঠাৎ মুখ তুলিয়া ডাকিল—ডাক্তার দত্ত।

বালিশটা চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছে।

সুধীরের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, রুবীর কাছেও সংবাদ আর গোপন নাই।

কাছে গিয়া দাঁড়াইতে, সে ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল—জন্‌কে এ সংবাদ দিয়ো না, ডাক্তার দত্ত। তার বুকের অসুখ, শুনলে বুকখানা ফেটে চৌচীর হয়ে যাবে। তাকে বোলো, বাচ্ছাটা ভালই আছে—তার মায়ের কোলের কাছে শুয়ে তেমনি চুক্ চুক্ করে দুধ খায়, হাসে, কথা কইতে চেষ্টা করে।···প্রতিজ্ঞা কর ডাক্তার, ···আমার হাত ছুঁয়ে বল।···আমি এখানে অন্যান্য সবাইকে বলে দিয়েছি—তারাও কেউ বলবে না।··· সেও সেরে উঠুক, তারপর দুজনে মিলে, শক্ত কঁদে বসে বসে কাঁদব সমস্ত দিন · সারা জীবন! ছেলেটা জন-এর অন্ধের নড়ির মত ছিল, ডাক্তার!···

বলিয়া, আবার বালিশটা বুকের উপর আঁকড়াইয়া ধরিয়া রুবী কাঁদিতে লাগিল···জন,···আমার সোনার জন্······

* * * *

তিন দিন পরে। বেডের চারিদিকে পর্দ্দা দেওয়া।

নার্স আসিয়া, তাহার মৃতদেহ কম্বলে ঢাকিয়া, চোখের পাতাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সিষ্টার আসিয়া, একবার দেখিয়া, ওয়ার্ড বয়কে বলিয়া গেল—চাদরটা বদ্‌লে দিস্।

আমারে স্মরিয়ো সবে

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ এম-এ, বি-এল্

১

আমি যবে রহিবনা তোমাদের ধরণীর ’পরে,
আমারে স্মরিয়ো সবে, করিয়ো না ঘৃণা হেলা-ভরে—
আছে দোষ-ক্রটী, ক্রটীর কুটীরে মানবের মেলা,
তবু ক্ষমিয়ো আমারে—ভুলের ভুবনে মিথ্যার খেলা!

২

চোখে যারে লেগেছিলো ভালো তারে দিনু দূর করি,
ডুবে যাবে জানি মরণের কূলে স্মরণের তরী—
তবু করি হাহাকার, বুকে জ্বলে সাহারার জ্বালা,
দহনের ছলে এ কী দিলে মোরে মিলনের মালা?

৩

আমি যবে রহিব না তোমাদের ধরণীর ’পরে,
জ্যোৎস্নার আলো নিভে যাবে কিগো বেদনার ভরে?
যত অশ্রু ফেলিয়াছি আর গাহিয়াছি যত গান,
তারা কি হেথায় হায় কোন বুকে লভে নাই স্থান?

৪

যাক্, চুকে যাক্—অভিযোগে আজ নাই কোন কাজ,
যে স্বপন ভাই মোটে ফলে নাই তারি লাগি লাজ!
মৃত্যু ঘিরেছে মোরে, দুটী আঁখি তবু জলে ওঠে ভরে—
অশ্রু যার নিত্য-সাথী তারে নিতে আসা এত করে!

৫

যদি কোনদিন তোমাদের আমি দিয়ে থাকি দাগা,
আজ শুধু আছে বাকী জোড় হাতে ক্ষমাটুকু মাগা—
কোনদিন যদি আমি গেয়ে থাকি বেদনার গীতি,
সবি ভুলো ভাই, আজ কিছু নাই—আছে শুধু প্রীতি!

অতীতের ঐশ্বর্য্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আদিম আর্য্য উপনিবেশ

(কারক্কেমিষ্)

য়ুফ্রেটিস্ নদীর দক্ষিণ তীরে আলেপ্পো নগরের প্রায় পঁচাত্তর মাইল উত্তরে যেখানে বর্ত্তমান আরবপল্লী জেরাব্‌লুস্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনুমান কিঞ্চিদধিক চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে সেখানে প্রাচীন সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত কার্কেমিশ বা কারক্কেমিষ্ রাজস্থান স্থাপিত হয়েছিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে এশিয়ার সহিত য়ুরোপের একটা সহজ সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণ কর্ম্মীরা যে বোগ্দাদ-বার্লিন রেলপথের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত ক'রতে উদ্যত হয়েছিল তারা য়ুফ্রেটিস্ পার হবার জন্য ঠিক্ এইখানেই প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মাণের আয়োজন করেছিল। চার হাজার বৎসর পূর্ব্বের মানুষেরাও ঠিক্ এই প্রদেশেই পশ্চিমের সহিত পূর্ব্বের একটা রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যগত সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হ'য়েছিলেন। কারণ বিশাল য়ুফ্রেটিস্ নদীর যে কয়টি পারঘাট আছে তার মধ্যে এই কার্কেমিশের ঘাটটিই য়ুরোপের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম। গ্রীষ্মের সময় এখানে নদীর জল এত কমে যায় যে হেঁটেও নদী পার হওয়া চলে। এই সুবিধাটুকু থাকায় চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন রেলগাড়ী বা ষ্টীমার প্রভৃতি ছিল না, মানুষ যখন উটের পিঠে, ঘোড়ায় চড়ে, বা নৌকা নিয়ে বাণিজ্য-যাত্রা করতো সেই সময় এই কার্কেমিশ হয়ে উঠেছিল তাদের একটা প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

কারক্কেমিষ্ নগরের ধ্বংসাবশেষ। (পাষাণ ভিত্তিমূলে উৎকীর্ণ শিলাচিত্র)

কার্কেমিশের বাজারে আসতো বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে সারি সারি উটের পিঠে মেসোপোটেমিয়ার বণিকের দল।

পারস্যের ও কুর্দ্দিস্থানের বাণিজ্য ব্যবসায়ীরা আসতো তাদের দেশের শিল্প-সামগ্রী নিয়ে। এখানে তাদের সঙ্গে দেখা হ'ত মিশর ও ফিনিশীয় বণিকসম্প্রদায় এবং উত্তর হিট্টাইটের ব্যবসায়ীদের। কার্কেমিশের রাজ-সরকার সকল দেশের বণিকদের নিকট শুল্ক আদায় করতেন, ফলে কার্কেমিশের ধনসম্পদ সিরীয়ার অন্য সকল প্রদেশের অপেক্ষা সত্বর বৃদ্ধি পাওয়ায় কার্কেমিশ একটি সুসমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

কার্কেমিশের অধিবাসীরা সকলেই হিট্টাইট্। এদের আদিম নিবাস ছিল এশিয়া মাইনরে। হিট্টাইটেরা একটা মিশ্রজাতি। এরা কতক সিরীয়ার—কতক এশিয়া মাইনর কতক বা ককেশিয়ার লোক। এদের ভাষাও ছিল বিভিন্ন। হিট্টাইটদের মধ্যে ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার প্রচলনই ছিল বেশী। অনেকটা গ্রীক্‌ভাষার সঙ্গে এ ভাষার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেণ যে গ্রীকৃদ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ক্রীটে যে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষাভাষী হিট্টাইটেরা তাদেরই আত্মীয়। হিট্টাইটদের ইতিহাসের অধিকাংশ পৃষ্ঠা কেবল তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী। কারণ তারা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হ'য়ে স্বস্ব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। এই সব ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে আবার দলাদলি ছিল খুব বেশী। যে কোনো দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিবাদ আরম্ভ হলেই তারা বলবৃদ্ধির জন্য অন্যান্য দলের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ হ'ত। শেষে একজন শক্তিশালী নৃপতিকে সার্ব্বভৌম বলে স্বীকার ক'রে নিয়ে সকলে তার শাসনাধীনে আসতে বাধ্য হ'ত।

খৃষ্টজন্মের আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও হিট্টাইট্‌দের মধ্যে যে একটা প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ লাভ ঘটেছিল তার একাধিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। কেবল যে ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়েই তাদের মধ্যে একটা সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ও বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা প্রচলিত ছিল তাই নয়, বিচারবিভাগেও তাদের বেশ একটা উন্নত ও সুবিহিত ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।
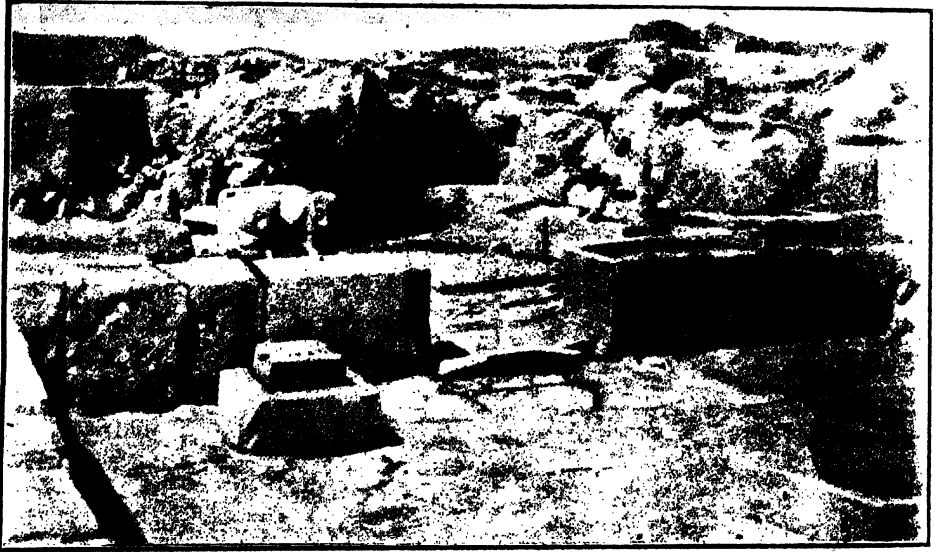
মন্দিরাভ্যন্তরস্থ গর্ভগৃহ। (গর্ভগৃহে কোনো কারুকার্য্য ছিল না, দেবতার বেদীও আজ শূন্য, কিন্তু নাটমন্দিরে পাথরের যুগ্মবৃষবাহিত জলাধার ও হোমকুণ্ড প্রভৃতি পাওয়া গেছে)

হিট্টাইটরা প্রথমে মেসোপোটেমিয়ার অধীনে মিত্র-রাজ্য হিসাবে কার্কেমিশ শাসন ক'রত বটে, কিন্তু পরে এ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। শৌর্য্যে বীর্য্যে ও রণকৌশলে হিট্টাইটরা একদিন সকলের অগ্রগণ্য হয়ে
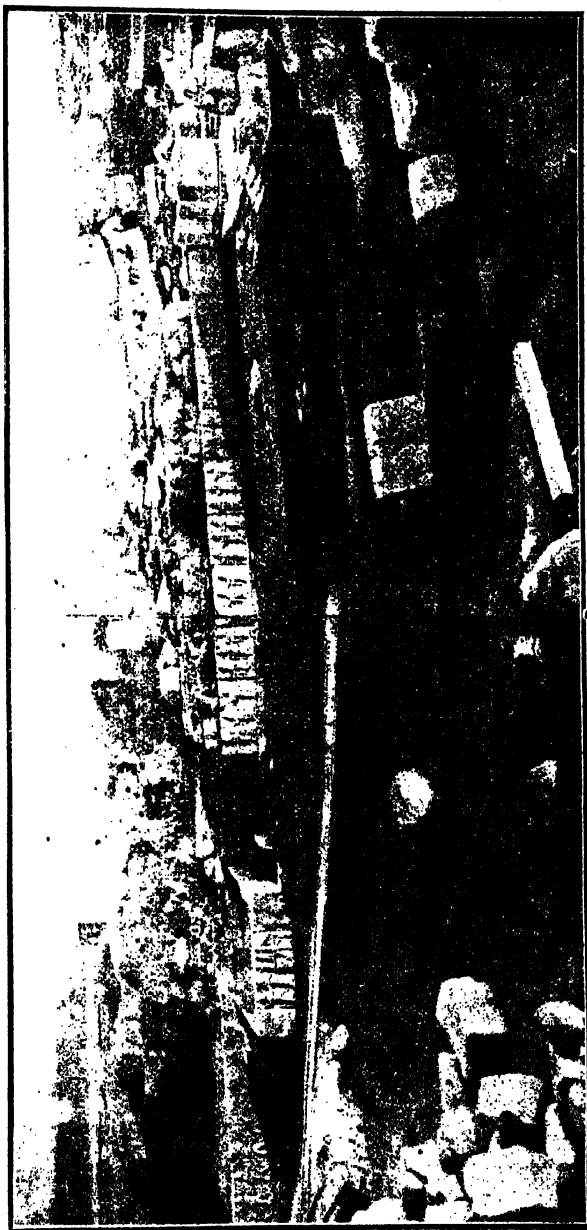
কারকেমিসের প্রমোদ-উদ্যান। (এই উদ্যান বেষ্টন ক'রে যে প্রাচীর ছিল তার পাষাণ-ভিত্তিমূল সমস্তটা উদ্গত শিলাশিল্পে বিমণ্ডিত ছিল)

উঠেছিল। মেসোপোটেমিয়া জয় করে খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তারা বাবিলন আক্রমণপূর্ব্বক নগরটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেছিল।

রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ প্রাচীরগাত্রের ভাস্কর্য্য ভূষা। (প্রাসাদের প্রত্যেক কক্ষে চারিদিকের দেওয়ালে এইরূপ উদ্গত শিলা-শিল্প প্রাচীরের কটিহার রূপে ব্যবহৃত হয়েছে)

বর্শাধারী হিট্টাইট সৈন্য। (নগরপ্রাচীরে এইরূপ সৈন্যশ্রেণীর উদ্গত শিলাচিত্র উৎকীর্ণ আছে। এদের বেশভূষা অনেকটা খৃঃপূঃ পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক্ সৈনিকের মত)

এ সকল ব্যাপারের বহুপূর্ব্বে কার্কেমিশ ছিল য়ুক্রেটিসের ধারে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম মাত্র। এই গ্রাম ক্রমে বিস্তার লাভ করে একটি প্রকাণ্ড নগরে পরিণত হয়েছিল এবং সেই নগরকে কেন্দ্র করে শেষে বিরাট হিট্টাইট্ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। ব্যবসা বাণিজ্য জাতীয় সম্পদ ও রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিট্টাইটরা কার্কেমিশ নগরটিকে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে ক্রমে এটিকে একটি বিশাল দুর্গে পরিণত করেছিল। শহরের চারিদিক বেষ্টন করে গভীর খাল খনন ক'রেছিল এবং প্রায় ষাট ফুট উঁচু ভিতের উপর দুর্লঙ্ঘ্য নগরপ্রাকার নির্ম্মাণ করেছিল। নগরটি ছিল ডিম্বাকার এবং তার পরিমাপ নয়লক্ষ বর্গফুট। নগরের মধ্যে রাজপ্রাসাদ সৈন্যাবাস ও দেবদেবীর মন্দির ছাড়া বহুলোকের বাসভবনও ছিল।

কার্কেমিশের এই পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর কোন্ শতাব্দীতে ঘটেছিল তা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। ঐতিহাসিকেরা কেউ কেউ বলেন খৃঃপূর্ব্ব দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ যে সময় সিরীয়ায় দ্বিতীয়বার হিট্টাইটদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল; আবার কেউ কেউ বলেন খৃঃপূর্ব্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি হিট্টাইট সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি ও প্রবলপ্রতাপের যুগেই এই কার্কেমিশ শহরটিকে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

খৃঃপূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কাপ্পাডোশিয়ার হিট্টাইটদের প্রতাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময় কাপ্পাডোশিয়ার হিট্টাইট্‌রাজ সুব্বিলুলায়ুমা সার্ব্বভৌম অধীশ্বর হয়ে সমস্ত এশিয়া মাইনর ও উত্তর সিরীয়ায় একাধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। এঁর বিজয়-অভিযান মিশর সাম্রাজ্যের সীমানা লঙ্ঘন ক'রতে উদ্যত হয়েছিল বলে মিশরপতি ফ্যারাওদের সঙ্গে এঁর প্রবল যুদ্ধ চলেছিল। এই যুদ্ধের জের দীর্ঘকালেও শেষ হয়নি। পরবর্ত্তী হিট্টাইট্‌রাজ ও ফ্যারাওদের মধ্যেও নিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেছিল। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর পর খৃঃপূঃ ১২৭০

সালে মিশরের সঙ্গে হিট্টাইটদের যখন সন্ধি স্থাপিত হ'ল তখন উভয়পক্ষই বলক্ষয়ে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। হিট্টাইট্রা এরপর আর মাথা তুলতে পারেনি। পরবর্ত্তী অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণপূর্ব্ব য়ুরোপ হ'তে বিদেশী কিছু পাওয়া যায়নি। প্রাচীন কার্কেমিশ শহরের কেবলমাত্র দুর্গপ্রাকার ও তন্মধ্যস্থ কয়েকখানি পুরাতন বাসভবন পাওয়া গেছে। এই বাসভবনের তলদেশে মৃত্তিকার নিম্নে কতকগুলি সমাধিকক্ষ আবিষ্কৃত হয়েছে।
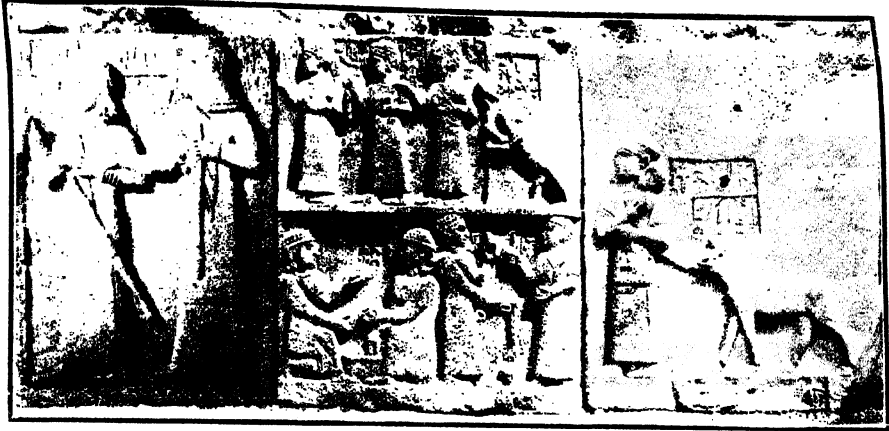
উদ্ঘাত শিলাচিত্র। (রাজপরিবার বিজয়ী সৈনিকদের সম্বর্দ্ধনা করতে অগ্রসর হ'চ্ছেন)

আক্রমণকারীরা এসে বারম্বার হিট্টাইটদের রাজ্য বিধ্বস্ত ও হিট্টাইট জাতটাকেই প্রায় বিলুপ্ত ক'রে দিয়েছিল। একে একে কার্কেমিশ্ ও কাপ্পাডোশিয়া ধ্বংস ক'রে তারা মিশরের দিকে অগ্রসর হ'য়েছিল, কিন্তু ফ্যারাও তৃতীয় র‍্যামেশিসের শিক্ষিত বাহিনীর কাছে বাধা পেয়ে তারা নিরস্ত হ'তে বাধ্য হ'য়েছিল।

নীলনদের নাগাল না পেয়ে তারা হিট্টাইটদের সঙ্গেই বসবাস সুরু করে দিলে। এদের মিলিত চেষ্টায় ক্রমে ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন করে কার্কেমিশ শহর গড়ে উঠলো। এর পর থেকে উত্তর সিরীয়ায় হিট্টাইট্ সাম্রাজ্যের প্রধান নগর হ'য়ে রইল এই কার্কেমিশ্। ব্রিটীশ মিউজিয়মের পক্ষ থেকে যে প্রত্নতাত্ত্বিকের দল এই বিলুপ্ত প্রাচীন নগরের সন্ধানে গিয়েছিলেন তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় ১১৯১ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত জেরাবুস্ খনন করে যে কার্কেমিশ নগর উদ্ধার হ'য়েছে সে এই দ্বিতীয়বারের নবনির্ম্মিত কার্কেমিশের কঙ্কাল। প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শনের মধ্যে পাথরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র এবং মাটীর তৈরি তৈজসপত্র ছাড়া আর

এই সমাধিকক্ষগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত এবং শবদেহ যাতে এর মধ্যে সম্পূর্ণ লম্বমান অবস্থায় শায়িত রাখা যায় এরূপভাবে এগুলি প্রশস্ত। প্রত্যেক সমাধিকক্ষে শবদেহের পার্শ্বে
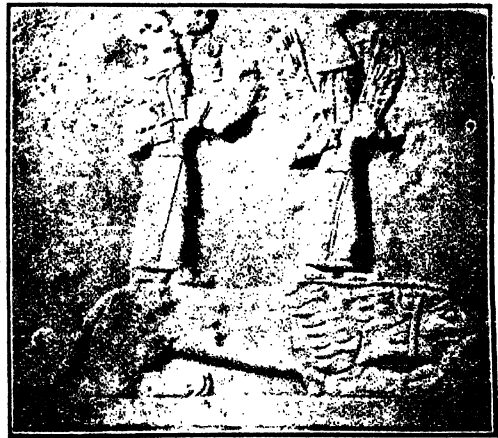
সিংহারূঢ় হিট্টাইট্ দেবতা। (চন্দ্র ও সূর্য্য। সূর্য্যের উভয় স্কন্ধ আলোকপক্ষ সংযুক্ত)

মৃতের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র ও তৈজসপত্র পাওয়া গেছে। তৈজসপত্রগুলির মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে

একপ্রকার পানপাত্র যার তলার দিকটি খুব সরু ও লম্বা। অনেকটা আধুনিক মদের গেলাসের মত দেখতে। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন এগুলি পানপাত্র নয়, মৃতের শিয়রে জ্বেলে দেওয়া তৈল-প্রদীপ মাত্র! যাই হোক, এ গুলিকে পানপাত্র ব'লে ধরে নিয়েই এ যুগের নামকরণ হয়েছে "শ্যাম্পেন যুগ।"
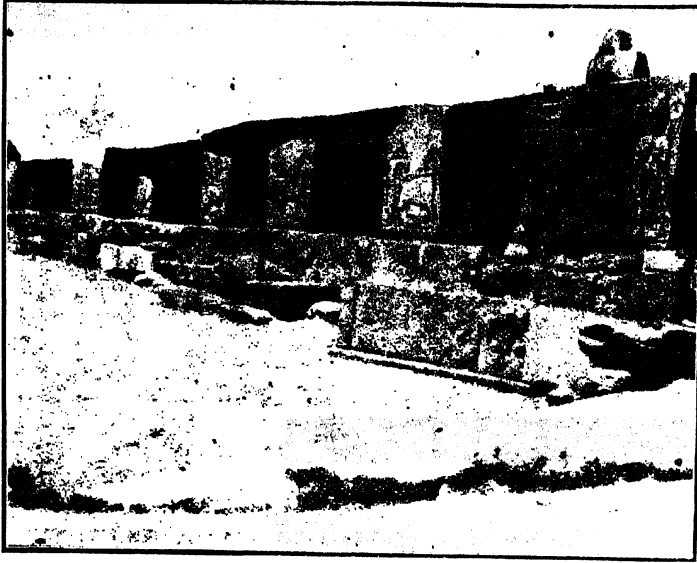
ধ্বংসাবশিষ্ট রাজপ্রাসাদ। (প্রাসাদের দেওয়ালে উদ্গত শিলাচিত্রে নানা রাজকীর্ত্তি উৎকীর্ণ রয়েছে)

কার্কেমিশ শহর দ্বিতীয়বার নির্ম্মাণ করবার সময় হিট্টাইটরা যে নগর-প্রাকার গড়েছিল ত' ইঁটকে নির্ম্মিত। কিন্তু প্রাকারের মূলদেশ হ'তে কটি পর্য্যন্ত বড় বড় পাথর দিয়ে গাঁথা। পাথরগুলি এক একখানি পনেরো ফুট দীর্ঘ এবং সাড়ে চার ফুট প্রশস্ত। অথচ এই বিশালকায় পাথরগুলিকে এমন অবলীলাক্রমে তারা গেঁথেছে যে দেখে বিস্মিত হ'য়ে আধুনিক জগতের লোকেরা ভাবে হিট্টাইট্ স্থপতিরা কি বিশ্বকর্ম্মা ছিল? কারণ, বৃহৎ পাথরগুলিকে এত উচ্চ প্রাচীরের আকারে গেঁথে তোলার মধ্যেই যে তাঁরা অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাই নয় কোনো-প্রকার মালমশলার সাহায্য না নিয়েও এমন নিপুণভাবে এই পাথরগুলিকে সাজিয়েছেন যে দু'খানি পাথরের জোড়ের মুখে অনেক চেষ্টা করেও একখানি ছুরির ফলা প্রবেশ করানো যায় না।

বৃষদ্বয়। (নিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া এই পাষাণ বৃষযুগল হিট্টাইট ভাস্কর্য্যের বলিষ্ঠ ভঙ্গীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। এই বৃষবাহনের উপর যে মূর্ত্তি ছিল সেটি অপহৃত হয়েছে)

নগরের দক্ষিণ তোরণ-

দ্বারও এইরূপ বড় বড় পাথরে গাঁথা। এ পাথরগুলির প্রত্যেকখানি ন'ফুট লম্বা এবং চারফুট মোটা। এই পাথরের বিরাট তোরণদ্বার নগরের ঐশ্বর্য্য ও মর্য্যাদার পরিচায়ক। তোরণদ্বারের প্রবেশ-পথের উভয় পার্শ্বে পাথরের সিংহ শ্রেণী আছে। এই সিংহগুলি মুখব্যাদান করে রয়েছে। তাদের তীক্ষ্ণ দন্ত পথিকের ভীতি উৎপাদন করে। তোরণ-দ্বারের উপর যে পাথরের নির্ম্মিত রক্ষীদের গৃহ আছে তাহার উপর আবার শিখরচূড়া শোভিত।

হিট্টাইট্ দেবদেবীর মূর্ত্তি। (প্রমোদ-উদ্যানের প্রাচীর-গাত্রে খোদিত বিজয় লক্ষ্মীর মূর্ত্তি)

নৃসিংহ দেব (পক্ষসংযুক্ত সিংহ-দেহে বীরের মূর্ত্তি! হিট্টাইটদের পৌরাণিক দেবতা)

রথারূঢ় যোদ্ধা। (পূর্ব্বোক্ত বৃষদ্বয়ের ন্যায় এই রথাশ্বের মধ্যেও হিট্টাইট্ শিল্পের যে বিশেষত্ব চ'খে পড়ে তাতে বোঝা যায় হিট্টাইটরা ছিল বাস্তবাসক্ত ভাবতান্ত্রিকের দল)

তোরণদ্বারের পথও প্রস্তর-নির্ম্মিত। দীর্ঘকাল ধ'রে অসংখ্য রথচক্রের ঘর্ষণে পথের পাথরগুলি স্থানে স্থানে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। তোরণ-দ্বারের একদিকে একটি বিরাট শুভ্র মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন দীর্ঘশ্মশ্রুযুক্ত ও মস্তকে উষ্ণীষমণ্ডিত এই মূর্ত্তিটি কোনো হিট্টাইট্ রাজার প্রতিমূর্ত্তি।

নগরাভ্যন্তরে যে সকল বাসগৃহ ছিল বিদেশীদের আক্রমণে তা বিধ্বস্ত হয়েছে বলে মনে হয়। সমস্ত শহরটি যে একসময় ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছিল আজও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সকল মূর্ত্তি-খোদিত প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গেছে সেগুলিরও অস্তিত্ব হয়ত থাকতো না যদি না দ্বিতীয়বার কার্কেমিশ শহর নির্ম্মাণের সময় এই পাথরগুলি আবার ব্যবহার করা হ'ত। এ যুগে আর গৃহতলে মৃতকে সমাহিত করার প্রথা প্রচলিত ছিল না। শহরের আট মাইল দূরে একটি পৃথক সমাধি-ক্ষেত্র আবিষ্কার হয়েছে। তবে, এখানেও প্রত্যেক সমাধি-

গর্ত যথেষ্ট প্রশস্ত এবং মৃতদেহগুলি সেখানে সম্পূর্ণ লম্বমান অবস্থায় শায়িত ছিল। এ যুগের সমাধিগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে কোনোটিতেই আর মৃতের শিয়রে সুরা-পাত্রের মত পানাধার বা প্রদীপ দেওয়া নেই এবং মৃতের পার্শ্বে যে অস্ত্রশস্ত্র রাখা হয়েছে সেগুলি ব্রোঞ্জের তৈরি। মাটীর তৈজসপত্রগুলিও বেশ উন্নত ধরণের, সুগঠিত এবং রং লোকেদের কোনো সম্পর্কই ছিল না! এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় লোক! তবে হিট্টাইট্ শিক্ষা ও সভ্যতাই যে তারা গ্রহণ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের ভাষা ও লিপির মধ্যে। সেই একই হিট্টাইট্ ভাষায় এ যুগের একাধিক প্রস্তর-ফলক ও স্মৃতি-স্তম্ভের উপর সেই হিট্টাইট্ চিত্রাক্ষরে (Hierogliphic) নানা লিপি

সিংহাসনারূঢ় গরুড়বাহন দেবতা। (হিট্টাইট্‌দের এই গরুড়বাহন দেবতার সঙ্গে আমাদের গরুড়বাহনের বাহনগত সাদৃশ্য থাকলেও আকৃতিগত সাদৃশ্য কিছু নেই)

হিট্টাইট্ রাজন্যবর্গের প্রতিমূর্ত্তি (মূর্ত্তি শিল্পেও হিট্টাইট ভাস্করেরা যে সুদক্ষ ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় এই রাজ-মূর্ত্তিগুলির মধ্যে)

পাথরের সিংহাসন (কার্কেমিষের রাজ-প্রাসাদে পাওয়া গেছে)

পালিশে উজ্জ্বল। সুতরাং, মৃৎশিল্পেরও যে সে যুগে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

এই দ্বিতীয়বার সংস্থাপিত কার্কেমিশের অধিবাসীদের সঙ্গে আবার তৃতীয় পর্য্যায়ের হিট্টাইট্ যুগের এত বেশী পার্থক্য যে মনে হয় সেকালের লোকেদের সঙ্গে একালের
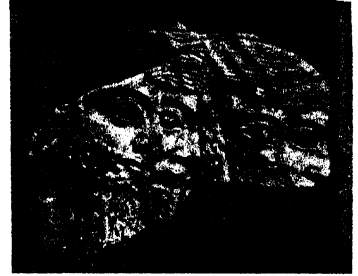
খোদিত হ'য়েছিল দেখা যায়। পরবর্ত্তী যুগের ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যকলার মধ্যে এবং অলঙ্কার প্রভৃতিতেও হিট্টাইট্ প্রভাব পূর্ণ-মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। তবে, এই সঙ্গে আসুরীয় (Assyrian) শিল্পের প্রাদুর্ভাবও কিছু কিছু চোখে পড়ে। কিন্তু, এ যুগে লক্ষ্য করবার মত সবচেয়ে বড় পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে হিট্টাইটরা এই সময় থেকে মৃতদেহ

আর সমাধিস্থ না করে অগ্নিসৎকার সুরু করেছিল। মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া হ'চ্ছে একটা জাতির ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপার। আর ধর্ম্মের ব্যাপারে সেকালের লোকেরা যে বেশ একটু গোঁড়া ছিলেন এ কথা বলাই বাহুল্য। অথচ সেইদিক থেকেই এত বড় একটা পরিবর্ত্তন সে যুগে কেমন ক'রে যে সম্ভব হ'য়েছিল এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রলে জানা যায় যে হিট্টাইটদের মধ্যে সকলদিক দিয়েই এ সময় একটা বিরাট পরিবর্ত্তন এসেছিল। তারা এ সময় ব্রোঞ্জের পরিবর্ত্তে লৌহ-

এই সমস্ত পরিবর্ত্তন দেখে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে এ সময় যাঁরা এখানে এসেছিলেন তাঁরা এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ পশ্চিম অংশের অধিবাসী। সেইখানেই একদিন হিট্টাইটদের কাপ্পাডোশিয়া রাজ্য গড়ে উঠেছিল। নবাগতেরা আর কিছু না করুক তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যটুকু হারায় নি। হিট্টাইটদের জীবনযাপনের প্রাচীন ধারা এবং কার্কেমিশ নগরের অতীত মর্য্যাদার কথা তারা ভোলেনি। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই তারা নূতন করে কার্কেমিশ শহর প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তার

বিজয়োৎসব। (বাদকেরা শৃঙ্গনাদ ক'রছে ও ঢাক বাজাচ্ছে, মেয়েরা শস্য ও প্রদীপ নিয়ে বরণে অগ্রসর, যবশীর্ষ হাতে পুরোহিতেরা আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করছেন। বলির জন্য উৎসর্গিত মৃগস্কন্ধে যুবকেরা মহোল্লাসে চলেছে মন্দিরের পথে)

নির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রতে শিখেছিল। তাদের মৃৎশিল্প এযুগে এতদূর উন্নতি লাভ ক'রেছিল যে সে সব সুগঠিত রঙীন কারুকার্য্যখচিত ও উজ্জ্বল পালিশ করা মাটির তৈজসপত্র দেখে বিস্মিত না হ'য়ে পারা যায় না।

সীমানাও পূর্ব্বের চেয়ে অনেকটা বিস্তৃত করেছিল এ যুগের স্থাপত্য ভাস্কর্য্য ও শিল্পকলা অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে ব'লেই হিট্টাইটদের সম্বন্ধে আমরা আজ অনেক কিছু জানতে পারছি।

নদীতীরে যে নগর তোরণ নির্ম্মিত হ'য়েছিল সেখা

থেকে একটি প্রস্তর-মণ্ডিত প্রশস্ত পথ চ'লে গেছে দুর্গ প্রদক্ষিণ করে নগরের মধ্যে। এইদিকের নগর-প্রাচীরে অসংখ্য শিলা খোদিত ও উদ্গত ভাস্কর্য্য শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। উপরোক্ত পথের দু'ধারে ছিল অসংখ্য প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা। একটি মন্দিরের সুদীর্ঘ সোপান-শ্রেণী দেখে অনুমান হয় মন্দিরটি ছিল শহরের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। মন্দিরের এই সিঁড়ির দু'পাশের দেওয়ালে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ ছিল। প্রত্যেক দেব-দেবীর মূর্ত্তির সঙ্গে তাদের নিজ নিজ বাহন ও ভক্তের প্রতিমূর্ত্তিও উৎকীর্ণ করা আছে।

বুকে। এই সোপান-শ্রেণীর উভয় পার্শ্বের প্রাচীর-মূলে কাল পাথরের কটিবেষ্টন (Dado) বিবিধ ভাস্কর্য্য শিল্পে মণ্ডিত ছিল। সোপান-শ্রেণীর মধ্যে মধ্যে যে গতি-বিরামক অবতরণিকা আছে শত্রুর পথরোধের জন্য সেই সব চত্বরের সম্মুখে বিশাল কবাট সংলগ্ন রয়েছে। এই কবাট-বক্ষে পক্ষ সংযুক্ত রবিচক্র উৎকীর্ণ করা আছে। হিট্টাইটদের রাজ-প্রতীক এই রবি-চক্র। সোপান-চত্বরের প্রত্যেক কোণে কাল পাথরের বড় বড় সিংহ স্থাপিত রয়েছে। এরা যেন পরের পর দাঁড়িয়ে প্রাসাদের ক্রমোচ্চ উপর তলার ভার ভাগাভাগি করে বহন করছে

রাজপ্রাসাদের দীর্ঘ সোপানশ্রেণী। (এই সোপানশ্রেণী রাজপ্রাসাদ হ'তে নেমে এসেছে একেবারে প্রমোদ-উদ্যানের বুকে)

মন্দিরের প্রায় সমতুল্য ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত ছিল কারকে-মিষের রাজপ্রাসাদ। এই রাজপ্রাসাদও নদীতীর হ'তে অনেক উচ্চ ভূমিতে এক টিলার উপর নির্ম্মিত। এখানেও দীর্ঘ সোপান-শ্রেণী উত্তীর্ণ হ'য়ে উপরের প্রাসাদে প্রবেশ করতে হয়। রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ নিম্নভূমিতে একটি বিশাল প্রমোদ-উদ্যান ছিল। এ উদ্যানে সাধারণের বিহারে অধিকার নিষিদ্ধ ছিল না। রাজপ্রাসাদের সোপান-শ্রেণী নেমে এসেছিল একেবারে এই উদ্যানের

এবং বিকট মুখভঙ্গী করে অনধিকার-প্রবেশকারীকে ভয় দেখাচ্ছে!

রাজপ্রাসাদের দক্ষিণে এক প্রকাণ্ড পাষাণ স্তম্ভ আকাশের দিকে মাথা তুলে যেন অহোরাত্র জগতের কাছে ঘোষণা করছে হিট্টাইট রাজশক্তির বিপুল মহিমা। এই স্তম্ভগাত্রে খোদিত আছে চন্দ্র সূর্য্য দেবতাদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি। এই স্তম্ভটি হিট্টাইট রাজশক্তির কোনো বিজয়-ধ্বজা বলে অনুমান হয়। কেউ কেউ বলেন এটি

মন্দিরের সম্পত্তি। কারণ এই স্তম্ভ-গাত্রে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, ভিতরে প্রস্তরাধার সংস্থাপিত, পথিক ভক্তেরা দেবতার পূজার জন্য এই ছিদ্র-পথে প্রণামী ফেলে দিয়ে যেত।

এই স্তম্ভের পশ্চাতে ছিল আর এক দেবতার প্রতিমূর্ত্তি। মূর্ত্তির কোনো চিহ্ন আজ আর নেই, কিন্তু তাঁর বাহনদ্বয় এখনও অক্ষত রয়েছে। কাল পাথরের দুই বিরাট বৃষ এখনও দাঁড়িয়ে আছে, যেন তাদের প্রভুর প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় যুগ যুগান্তকাল অপেক্ষা করছে!—বৃষদ্বয়ের শৃঙ্গ স্বর্ণবর্ণের উজ্জ্বল ধাতুতে নির্ম্মিত। চোখগুলি রঙিন পাথর বসিয়ে আঁকা, সুতরাং জীবন্ত চোখের ন্যায় দেখতে! বাস্তব শিল্প হিসাবে এই সব একটু-আধটু চিহ্ন থাকলেও বৃষদ্বয়ের গঠন-ভঙ্গীর মধ্যে এমন একটা সূক্ষ্ম ও সংহত ভাবতান্ত্রিক শিল্প বোধ সকলের চোখে পড়ে যে এ যুগের কারকেমিষ্‌ শিল্পীদের শ্রদ্ধা না ক'রে উপায় নেই।

কেবল যে নগর প্রাচীর, মন্দিরের দেওয়াল ও প্রাসাদ প্রাকারেই হিট্টাইট্‌রা নানা ভাস্কর্য্য ও শিলা-শিল্প খোদিত করে রেখেছেন তাই নয়, কার্কেমিশের প্রত্যেক গৃহ প্রতিভবন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন-স্বরূপ ছিল। মিশরীদের মত হিট্টাইটরাও রঙীন পাথরের কারুকার্য্যে অদ্ভুত নৈপুণ্য অর্জ্জন করেছিল। কক্ষাভ্যন্তরের ও গৃহের বাইরের প্রত্যেক প্রাচীর-গাত্রে তারা শিলা-শিল্পে ত্রিবিধ কার্যকার্য্য করে রেখেছে। প্রাচীরমূল প্রাচীরকটী প্রাচীরবক্ষ ও প্রাচীরশির্ষ তারা যে পাষাণ-খোদিত ভাস্কর্য্য হারে ভূষিত করে রেখেছে তা অতুলনীয়। প্রাচীরগাত্রের এই শিল্পোৎকীর্ণ শিলাহার (Frieze) এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত যে এর সুরু যেন যেখানে প্রথমে চোখ পড়ে সেখান থেকেই হয়েছে বলে মনে হয় এবং শেষ কোথা খুঁজে পাওয়া যায় না।—চলেছে ত' চলেইছে! বিজয়ী হিট্টাইট্‌ সৈন্যদল রণস্থল
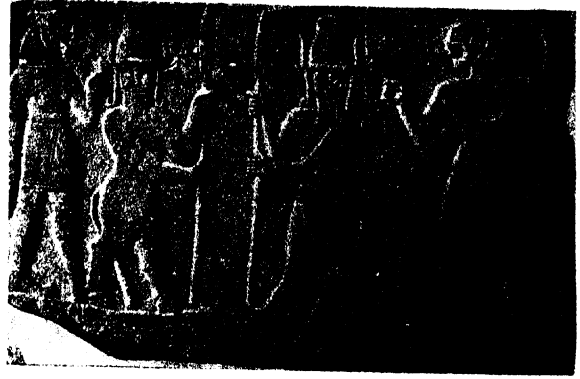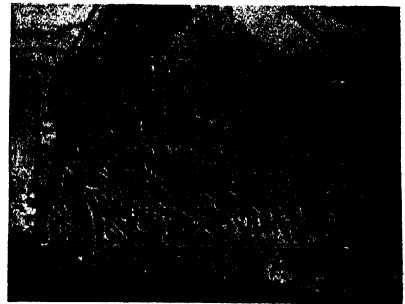
হিট্টাইটদের পৌরাণিক দেবদেবী। (আমাদের নৃসিংহদেবের ন্যায় বা কূর্ম্ম ও বরাহ অবতারের ন্যায় এদেরমধ্যেও নরমুণ্ড ও পশুদেহ এবং পশুমুণ্ড ও নরদেহ দেবদেবীর অস্তিত্ব ছিল)

পশুপতি। (অরণ্যের সকল পশুই এই দেবতার অধীন)

শিলালিপি (বেদীমূলে উৎকীর্ণ এই শিলালিপিরও আজও পাঠোদ্ধার হয়নি)

হ'তে মহা-গৌরবে নগরে ফিরছে! রথ-অশ্ব-পদাতিক দল বেঁধে চলেছে, চক্রতলে শত্রুদল দলিত হ'চ্ছে! যোদ্ধারা ভল্লমুখে শত্রুর ছিন্নমুণ্ড গেঁথে নিয়ে বীরদর্পে গৃহে ফিরছে। রথের অশ্বগুলি পর্য্যন্ত উল্লাসে অশান্ত

বৃষযুদ্ধ (হিট্টাইট্ ভাস্কর্য্যের চমৎকার নিদর্শন)

অধীর! মধ্যে মধ্যে শিলাফলকের উপর চিত্রাক্ষরে যুদ্ধ ও রণজয়ের বর্ণনালিপি নিবদ্ধ ক'রে রাখা হ'য়েছে।

বিজ্ঞাপন (প্রবেশদ্বার পার্শ্বে উৎকীর্ণ এই শিলালিপিরও পাঠোদ্ধার হয়নি। অনুমান এটি প্রবেশার্থীদের জন্য দ্বারপার্শ্বে রক্ষিত বিধিনিষেধ সম্বলিত বিজ্ঞাপন)

হিট্টাইটদের এই চিত্রাক্ষর প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বহু চেষ্টা করেও কেউ এ পর্য্যন্ত পাঠোদ্ধার করতে পারেনি। বাবিরুণীয় ও আসুরীয় হরফে লেখা প্রচুর মৃৎ-ফলক জার্ম্মাণ ও অন্যান্য দেশের ঐতিহাসিকেরা এসে সন্ধান ক'রে পেয়েছিল কাপ্পাডোশিয়া ও এশিয়া মাইনরের উত্তরাঞ্চলে। এগুলি খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ হতে ত্রয়োদশ

গরুড়দম্পতী (গরুড় মুখ দেবতার সঙ্গে কেবল যে হিন্দুদেরই পরিচয় ছিল তা নয়, গ্রীক্ পুরাণে, হিট্টাইট্ ও আসুরীয়দের মধ্যেও গরুড়ের দেখা পাওয়া যায়)

শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানকার রাজদরবারের বিবিধ কার্য্য বিবরণী। এশিয়া মাইনরের বহু দুর্লভ ঐতিহাসিক তথ্য

সিংহ-বলি! (হিট্টাইট্দের 'তেসুব' (ত্রিশুভ!) দেবতার নিকট সিংহবলির ব্যবস্থা ছিল)

এগুলির সাহায্যে পাওয়া গেছে। হিট্টাইট্দের এই চিত্রাক্ষর যেদিন কেউ পড়তে পারবে সেদিন প্রাচীন আর্য্যদের সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু নূতন সংবাদ জানা যাবে।

রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন একটি ছোট দেবমন্দিরও আবিষ্কৃত হ'য়েছে। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে এ মন্দিরটি কেবলমাত্র রাজপরিবারের ব্যবহারের জন্যই নির্ম্মিত হয়েছিল। জনসাধারণের এর মধ্যে প্রবেশাধিকার ছিল না। এ-মন্দিরটি খৃ-পূর্ব্ব একাদশ হ'তে দশম শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কৌশল এবং এর ভিত্তির নক্সার সঙ্গে আশ্চর্য্য রকম মিল দেখতে পাওয়া যায়—নৃপতি সলোমনের জন্য যে থিহোভার মন্দির নির্ম্মিত হ'য়েছিল, সে মন্দিরটি ফিনিশীয় নৃপতিরা নির্ম্মাণ করেছিলেন। উভয় মন্দিরই চতুষ্কোণ এবং প্রধান মন্দির অর্থাৎ গর্ভগৃহ, ও নাটমন্দির এই দু' ভাগে বিভক্ত। গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বার সম্মুখে নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে

কারক্কেমিষের নগর-প্রাচীর (নগরপ্রাচীরে উৎকীর্ণ উদ্গত শিলাচিত্রে হিট্টাইটদের জীবন-ইতিহাসের অতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়)
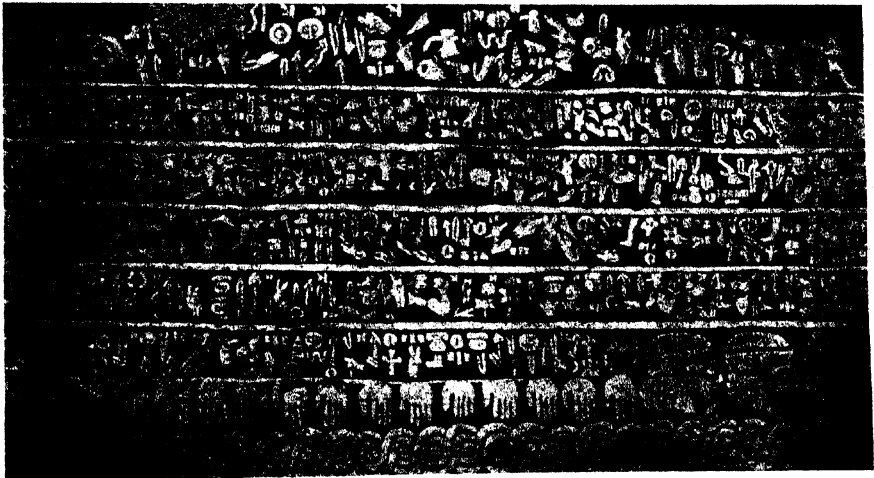
ঘোষণাপত্র (হিট্টাইট্ চিত্রাক্ষরে উৎকীর্ণ এই শিলালিপির আজও পাঠোদ্ধার হয়নি, তবে অনুমান এটি কোনো যুদ্ধের বিজয় ঘোষণা)

পাষাণে গড়া যুগল বৃষবাহিত একটি বিরাট জলাধার। একদিকে পাথরের প্রকাণ্ড হোমকুণ্ড। এই হোমকুণ্ডের মধ্যে এখনও সেকালের দেবার্চ্চনের ভস্মরাশি ও দেবতার নামে উৎসর্গিত প্রাণীর দগ্ধ অস্থি প্রভৃতি পাওয়া গেছে। জেরুসালেমের য়ুহুদীরাজা সলোমনের মন্দিরের সঙ্গে এ মন্দিরের এই একান্ত সাদৃশ্য দেখে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন যে সলোমনের মন্দির নির্ম্মাণ করাবার ভার যিনি গ্রহণ করেছিলেন তিনি টাইরারের রাজা হিরাম। কার্কেমিশের রাজাদের সঙ্গে এই

টাইয়ারাধিপতি হিরামের খুব নিকট আত্মীয়তা ছিল; তা' ছাড়া ফিনিশীয় স্থাপত্যশিল্প হিট্টাইট্ পদ্ধতি অনুসরণ করেই বড় হয়ে উঠেছে। সুতরাং, সলোমনের মন্দিরের সঙ্গে কার্কেমিশের মন্দিরের সাদৃশ্য থাকা কিছু বিচিত্র নয়।

কার্কেমিশের রাজপ্রাসাদের অন্যান্য অংশেও অজস্র উদ্গাত শিলা-শিল্প উৎকীর্ণ রয়েছে। কত পৌরাণিক কাহিনী, কত দেবদেবীর মূর্ত্তি, কত যুদ্ধ বিগ্রহের চিত্র, কত উৎসবের মিছিল, শিকারের ঘটনা, পূজা অনুষ্ঠান, বলিদান, রথযাত্রা, রাজা ও রাজপরিবারের রূপ, খেলা ধূলার ছবি, জীব-জন্তু নরনারী—কিছুরই অভাব নেই এর মধ্যে। এখানে আর একটি প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'চ্ছে একখানি আসুরীয় হরফে লেখা মৃৎফলক। মিশরীয় দেবদেবীর কয়েকটি ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত ছোট ছোট মূর্ত্তি, রাজমূর্ত্তি অঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয়ক এবং ফ্যারাও নেকোর নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন কার্কেমিশের সৌভাগ্য-সূর্য্য এইখানেই অস্তমিত হয়েছিল। এইটিই নাকি এ রাজ্যের শেষ অভিনয়ের দৃশ্য। কারণ এ রাজ্যের শাসকগণ ছিলেন আসুরীয় সম্রাটের অধীন। এই অধীনতা-পাশ ছিন্ন করবার জন্য তারা মিশরের সাহায্য পাবার আশায় ফ্যারাওদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল। ফ্যারাও নেকো সসৈন্যে এদের সাহায্য করতে এসেছিলেন, কিন্তু আসুরীয় সম্রাটের নিকট পরাস্ত

কারকেমিষের সমাধি! (য়ুফ্রেটিশ নদীর নির্জ্জনতীরে এই মৃত্তিকাস্তুপের অভ্যন্তরে শত্রুবিধ্বস্ত কারকেমিষ নগর দীর্ঘকাল সমাহিত ছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়মের প্রত্নতাত্ত্বিকগণের চেষ্টায় এর পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে)

আবিষ্কৃত হ'য়েছে। এটিকে অগ্নি-সংযোগে ধ্বংস করা হ'য়েছিল। এই ধ্বংসস্তূপের চারিদিক ঘিরে তীর ফলা বর্শা ভল্ল প্রভৃতি অসংখ্য অস্ত্র প্রোথিত করা রয়েছে দেখা যায়। এ থেকে অনুমান হয় যে একসময়ে এই গৃহের অধিবাসীদের সঙ্গে কোনো পক্ষের একটা তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে বিপক্ষ দল এদের প্রত্যেককে হত্যা করে অবশেষে গৃহটি অগ্নি-সংযোগে ভস্মসাৎ করে দিয়েছিল। ভগ্নস্তূপের মধ্যে যে সকল দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া গেছে হন। খৃঃ পূঃ ৬০৪ সালে এই যুদ্ধ হয়েছিল এবং বিজয়ী আসুরীয়েরা নৃশংসভাবে হিট্টাইটদের বিধ্বস্ত এবং কার্কেমিশ নগর ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই দুর্ঘটনার পর দেশের একটি লোকও আর সেখানে বাস ক'রতে পারেনি। তারা কার্কেমিশ পরিত্যাগ করে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষে একদিন যে আর্য্যগণ এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন একাধিক ঐতিহাসিকের মতে তাঁরা এশিয়ামাইনরের অধিবাসী এই হিট্টাইটদেরই জ্ঞাতি।

জাতীয় নাটকের বিকাশ

স্যর যদুনাথ সরকার, কেটি, সি-আই-ই

মধ্যযুগে হিন্দু ও মুঘলেরা মিলিয়া যে ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টি করে তাহা কালের গতিতে জীবনীশক্তি ক্ষয় করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লোপ পাইল, বঙ্গে মুসলমান-শাসনের অবসান হইল। ধূলি কুয়াশা ও রক্তবৃষ্টির মধ্যে এক সভ্যতার সূর্য্য অস্তমিত হইল বটে, কিন্তু তাহার পরক্ষণে অমানিশা আসিল না। এদেশে বৃটিশ শান্তি ও নিয়মিত শাসনতন্ত্র স্থাপিত হইল। দূর যুনানী-মণ্ডল হইতে আগত, অধিকতর উন্নত, যৌবনবলে বলীয়ান্ অপর এক সভ্যতার পূর্ণ জ্যোতিঃ অমনি বঙ্গের উপর পড়িল, ক্রমে ক্রমে দেশবাসিগণ তাহা মানিয়া লইল। কিছুদিন পরে প্রদেশময়—ক্রমে ভারতময়, এক নবীন সভ্যতার উদয় হইল। আমাদের পিতৃগণ এই বিদেশী দানকে নিজস্ব করিয়া ফেলিলেন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাব ও আদর্শ, জ্ঞান ও কৃষ্টির মধ্যে প্রথমে সংঘর্ষ পরে সামঞ্জস্যের ফলে এক নূতন জিনিষের সৃষ্টি হইল যাহার শক্তি ও প্রভাব আজ পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হয় নাই, বরং নিত্য কলেবর বৃদ্ধি করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

বঙ্গদেশ তুমি ধন্য, প্রথম [এই] প্রভাত উদয় তব গগনে। এই নবীন সভ্যতার স্রোত জাহ্নবীর মত শত মুখে প্রবাহিত হইয়াছে, নানা দিকে অপূর্ব্ব চেষ্টায় হাত বাড়াইয়া দিয়া নবীন প্রণালীর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে; নানা ভুল ও সংশোধন, বিফলতা ও সার্থকতার ভিতর দিয়া অবশেষে বর্ত্তমান আকারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নিখিল ভারতের নবজীবনের এই শত সহস্র ধারার মধ্যে শিক্ষা এবং শিক্ষার বাহন সাহিত্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান, এবং নাট্যশালার ক্রমবিকাশের কাহিনী তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। কারণ, নাটক সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ভব্য নাগরিক ও নিরক্ষর কৃষক, সকলকেই ইহা আকর্ষণ করে, সকলকেই নিজ প্রভাবে অভিভূত করে। এই যে নবেল আজ সাহিত্যে সর্ব্বত্র রাজত্ব করিতেছে, ইহা বুঝিতে হইলে পড়িবার শক্তি আবশ্যক; কিন্তু নাটক দেখিতে ও ভোগ করিতে অক্ষরজ্ঞান দরকার হয় না। আর নাটক অতি প্রাচীন কাল হইতে সহস্র সহস্র লোকের সামনে অভিনীত হইয়া আসিয়াছে, এবং সেই কারণে বিশ্বমানবের হৃদয় অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে; ইহা একমাত্র ধনী বা পণ্ডিতের জন্য বিশেষ করিয়া সৃষ্ট পদার্থ নহে। এই জন্য প্রাচীন গ্রীসে প্রজাতন্ত্রের প্রবল প্রতাপের সময়, এবং ইংলণ্ডে এলিজাবেথের রাজ্যকালে জনসাধারণের প্রথম জাতীয় উন্মুক্ত প্রসারণ এবং সাহিত্যে সবেগে প্রবেশের যুগে, এত বেশী নাটক, এত এত অমর নাটক সৃষ্ট হয়।

বঙ্গেও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই কারণে নাটকের বিকাশ হইয়াছিল। এই বিকাশের কাহিনী অতি মনোরম, ঐতিহাসিকের ও মনস্তত্ত্ববিদের সমান কুতূহল জাগাইয়া দেয়। বঙ্গীয় নাটক, দুটি প্রাচীন পবিত্র ও প্রবল সাহিত্যিক ধারার মিলনের ফলে প্রয়াগের মত বিখ্যাত পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে। নাটক জিনিষটা বঙ্গে নূতন নহে। সংস্কৃত নাটকের পাঠ দেশে প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, আর বৈষ্ণব আচার্য্যগণ মধ্যযুগের শেষাশেষি নূতন সংস্কৃত নাটক লিখিয়াছিলেন, সুতরাং এই শ্রেণীর সাহিত্য এ প্রদেশে জীবন্ত ধারায় চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু আবৃত্তি হইত, অভিনয় নহে, অথবা কচিৎ কদাচিৎ। বিক্রমাদিত্যের যুগে রাজপ্রাসাদে বা মহাকাল মন্দিরের প্রাঙ্গণে যে অভিনয় হইত তাহার স্মৃতি বঙ্গে লোপ পাইয়াছিল; লোকে যাত্রা কীর্ত্তন বা ভাঁড়ের নাচেই শেষ করিতে বাধ্য হইত।

আজ আমরা নাটক ও থিয়েটার বলিতে যাহা বুঝি তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি। নব্য বাঙ্গালীরা খাটিয়া খাটিয়া চেষ্টা ও পরীক্ষা করিয়া তবে এই দুটিকে বর্ত্তমান আকারে আনিতে পারিয়াছে, এবং সমগ্র ভারতকে, অপরাপর সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাকে এ দুটি দান করিয়াছে।

একখানি ইংরাজী শিশুবোধে ছবি দেখিয়াছি যে ব্যাং চারিটি বিভিন্ন দশার মধ্যে দিয়া তবে পূর্ণ গঠিত আকারে পৌছে। বঙ্গীয় নাটকের ও থিয়েটারের বেঙাচি অবস্থার নিখুঁত সত্য বিস্তারিত চিত্র বর্ষের পর বর্ষ,—কখন মাসের পর মাস—ধরিয়া যদি কেহ দেখিতে চান তবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অনুগ্রহে আজ তাহা সম্ভব হইয়াছে। অসংখ্য প্রাচীন কীটদষ্ট সংবাদপত্র, জীবনস্মৃতি, ভ্রমণ-কাহিনী, এমন কি বিজ্ঞাপন—এবং শুধু বাঙ্গলায় নহে ইংরাজী ভাষাতেও,—অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নের সহিত ঘাঁটিয়া বাছিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" সংকলন করিয়াছেন।* তাঁহার গত দুই-তিন বর্ষে প্রকাশিত "সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা"-র মত ইহা অমূল্য; কারণ এই তিনখানি আধার একত্র না করিলে বঙ্গের নবজীবনের (রেনার্সাঁজ-এর) ইতিহাস জানা সম্ভব নহে। এই গ্রন্থে বৃটিশ যুগের নাটক ও নাট্যশালার ধারাবাহিক তারিখ ও প্রমাণ সহিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকদের পক্ষে ইহা প্রথমশ্রেণীর উপকরণ, অর্থাৎ কাঠামো। তবে প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ইহার উপর তিনটি জিনিষ যোগ করিয়া দিতে হইবে—

(১) উল্লিখিত বাঙ্গলা নাটকগুলির সাহিত্য হিসাবে দোষগুণ তুলনায় সমালোচন,—সাহিত্যে ভাবের ক্রম-বিকাশ,—এদেশে নাটকের বর্ত্তমান অধঃপতন বিচার।

(২) পেশাদার অভিনেতা শ্রেণীর বঙ্গসমাজে ক্রমে হরিজন-দশা হইতে সম্মানিত স্থান অর্জ্জন। মনে রাখিতে হইবে যে ইংলণ্ডে ড্রাইডেনের সময় পর্য্যন্ত পেশাদার কবি ও নাট্যকার এবং অভিনেতাকে "ভদ্র সমাজ" কুলী মজুর অথবা অভিজাত গৃহের দরিদ্র চাটুকারের সমান গণ্য করিতেন।

(৩) অভিনেতা অথচ গ্রন্থকার শ্রেণী হইতে গিরীশ ও অমৃতলালের উচ্চ সাহিত্যের সোপানে আরোহণ।

এগুলির প্রকৃত ঐতিহাসিক চর্চ্চা এখনও হয় নাই, কিন্তু এইরূপ গ্রন্থ হইতে কার্য্যটি সম্ভব ও সহজ হইবে।

* "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস"—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও শ্রীসুশীলকুমার দে, এম. এ., ডি. লিট. লিখিত ভূমিকা সহিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—পরিষদের সদস্য পক্ষে ১।০ ও সাধারণের পক্ষে ১॥০।

বিক্রমপুর

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ

গত কার্ত্তিক মাসের 'ভারতবর্ষে' (পৃঃ ৬৭৪-৬৭১) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের বর্ম্মবংশীয় সামল-বর্ম্মার একখানি নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এতদিন সামল—বা শ্যামলবর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে এই বংশে ভোজবর্ম্মার পূর্ব্বানুগামী তিন পুরুষের নাম জানা গিয়াছিল, যথা পিতা শ্যামলবর্ম্মা, পিতামহ জাতবর্ম্মা, ও প্রপিতামহ বজ্রবর্ম্মা। কিন্তু সামলবর্ম্মার এই নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনখানি ভগ্ন ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেলেও, ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, জাতবর্ম্মা ও শ্যামলবর্ম্মার মধ্যে হরিবর্ম্মদেব ও তাঁহার অজ্ঞাতনামা পুত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। এতদিন যাঁহারা তর্ক করিয়াছিলেন, হরিবর্ম্মা নিশ্চয়ই ভোজবর্ম্মার পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের পরাজয় ঘটিল। এই তর্কের বিরুদ্ধে বোধ করি একমাত্র ৺রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করিয়া-ছিলেন, হরিবর্ম্মদেব কখনই ভোজবর্ম্মার পরবর্ত্তী হইতে পারেন না। সামলবর্ম্মার এই তাম্রশাসনখানির অস্তিত্বের সংবাদ অবগত না হইয়াও, কেবলমাত্র হরিবর্ম্মদেবের পূর্ব্বাবিষ্কৃত অস্পষ্ট তাম্রশাসনের অক্ষর দেখিয়াই পরলোকগত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতে

সমর্থ হইয়াছিলেন যে, "কমৌলিতে আবিষ্কৃত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন অপেক্ষা হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনের অক্ষর প্রাচীন।...নূতন আবিষ্কার না হইলে হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বকাল নির্ণীত হইতে পারে না। তবে ইহা স্থির যে, হরিবর্ম্মদেব শ্যামলবর্ম্মা অথবা ভোজবর্ম্মার পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত হন নাই এবং বজ্রবর্ম্মা বা জাতবর্ম্মা (র) পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন [১]।" বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে দেখিয়াও, ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে এই কথার, এমন কি, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নামটা পর্য্যন্ত, উল্লেখ করেন নাই।

বজ্রবর্ম্মা কখনও রাজমুকুট ধারণ করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ, এবং সামলবর্ম্মার তাম্রশাসনখানি অখণ্ডিত ও অবিকৃত অবস্থায় না পাওয়া যাওয়ায় শ্যামলবর্ম্মা ও জাতবর্ম্মার সহিত হরিবর্ম্মার সম্বন্ধ বা সম্পর্কটাও সঠিক জানা গেল না। যাহা হৌক, বর্ম্মদিগের জ্ঞাত ইতিহাসটা এইরূপ দাঁড়াইতেছে,—একাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে [২] পালবংশীয় তৃতীয় বিগ্রহপালের সমসাময়িক জাতবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন। তৎপরে বিক্রমপুরের সিংহাসনে (তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ?) হরিবর্ম্মদেব উপবেশন করিয়াছিলেন এবং অন্যন ৩৯ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে হরিবর্ম্মার অজ্ঞাত-নামা পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সামলবর্ম্মার তাম্রশাসনখানিতে এই পুত্রের প্রশংসাসূচক কয়েকটি শব্দের উল্লেখ থাকায় অনুমান হইতেছে, শ্যামলবর্ম্মা তাঁহাকে ষড়যন্ত্র করিয়া সিংহাসন-চ্যুত করেন নাই,—তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটিয়াছিল। হরিবর্ম্মা ও তাঁহার পুত্রের পরে সিংহাসনে আরোহণ করায়,—শ্যামলবর্ম্মার অদৃষ্টে সম্ভবতঃ অধিক বৎসর রাজ্যভোগ করা ঘটে নাই। শ্যামলবর্ম্মার পরে তাঁহার পুত্র ভোজবর্ম্মা রাজ্যলাভ করিয়া অন্যন পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বরেন্দ্রভূমির কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহের সময় জীবিত ছিলেন; এবং বিদ্রোহ দমনান্তে রামপাল পাল-সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, ভোজবর্ম্মা অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী কোনও বর্ম্মরাজ নিজের পরিত্রাণের নিমিত্ত হস্তী ও রথ প্রভৃতি রামপালকে উপঢৌকন দিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন।

ভোজবর্ম্মা অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীর হস্ত হইতে, বোধ করি দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে [৩], সেন-বংশীয় বিজয়সেন পূর্ব্ববঙ্গের অধিকার কাড়িয়া লইয়াছিলেন।' যে বিপদ হইতে পরিত্রাণের জন্য বর্ম্ম রাজ রামপালদেবের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে বিপদটা কি তাহা জানা যায় না, কিন্তু তাহা সেন-সৈন্যের আক্রমণ হইলেও, বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেন বঙ্গ আক্রমণ করায় বর্ম্মরাজ রামপালের আশ্রয়ভিক্ষা করিয়াছিলেন, এ অনুমান ভিত্তিহীন। বিজয়সেনের পৌত্র লক্ষ্মণসেন ১১৯৯ বা ১২০০ খৃষ্টাব্দে নদীয়া হইতে পলায়ন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং লক্ষ্মণসেনের পুত্রদ্বয়—বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন—যথাক্রমে বিক্রমপুর-সমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতে পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গ ১২৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণসেনের বংশধরদিগের হস্তে ছিল, এ কথা মিন্‌হাজ্-উস্-সিরাজের 'তবকৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থের সাক্ষ্যে পাওয়া যায় [৪]। ইহার পরে বিক্রমপুর অরিরাজ-দনুজ-মাধব দশরথ-দেব এক রাজার অধীনে আসে, দেখা যায়। বিক্রমপুরের আদাবাড়ী গ্রামে ইঁহার একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে (ভারতবর্ষ, ১৩৩২, পৌষ, পৃঃ ৭৮—৮১)। সেন-বংশের সহিত এই নৃপতির সম্পর্ক ছিল কি না, তাহা জানা যায় না, কিন্তু এই দনুজ-মাধব দশরথই যে সোণারগাঁর রাজা বলিয়া বর্ণিত দনুজ-রায়ের সহিত অভিন্ন, ভট্টশালী মহাশয়ের এই অনুমান সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। ১২৮৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট গিয়াসুদ্দিন্ বল্‌বন্ যখন তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহ দমন করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলায় আগমন করেন, তখন দনুজ-রায় সম্রাটসকাশে উপস্থিত হইয়া, জলপথে বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তার পলায়ন-চেষ্টা প্রতিরোধ করিবার ভার প্রাপ্ত হন [৫]।

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, প্রথম সং, পৃঃ ২৭৪-২৭৫।

(২) ভট্টশালী মহাশয়ের মতে, আনুমানিক ১০৩০ খৃষ্টাব্দে বর্ম্মবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (ভারতবর্ষ, ১৩৩২, আষাঢ়, পৃঃ ৪৪)।

(৩) ভট্টশালী মহাশয়ের মতে, আনুমানিক ১০৯০ খৃষ্টাব্দে (ঐ), এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দের Indian Antiquary পত্রিকায় (পৃঃ ১৫৩) জনৈক লেখকের মতে দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে।

(৪) Major Raverty's tr. P. 558.

(৫) Elliot and Dowson's History of India, as told by its own historians. Vol. III., P. 116.

ভট্টশালী মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দশরথ আনুমানিক ১২৬০ হইতে ১২৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু দশরথের তাম্রশাসন সম্পাদন-কালে তিনি অবগত ছিলেন না যে, ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে মধুসেন নামক জনৈক বৌদ্ধনৃপতি পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। এই রাজার উল্লেখ ও তারিখটা স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত "Descriptive catalogue of Sanskrit Mss. in the Government Collection, under the care of the Asiatic Society of Bengal"—এর প্রথম খণ্ডে বর্ণিত একখানি বৌদ্ধগ্রন্থের পুষ্পিকায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দশরথের রাজত্ব আরম্ভের নির্দ্দেশিত তারিখের সহিতও আমি একমত নহি। সময়ান্তরে দশরথের ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। মধুসেন অথবা তাহার হস্ত হইতে বঙ্গের কর্ত্তৃত্ব মুসলমানের হস্তে গিয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করা বর্ত্তমানে অসম্ভব, কিন্তু মোটামুটি হিসাবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং রুকনুদ্দিন কৈকায়ুসের রাজত্বকালে পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীনতা মুসলমান কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, ঐতিহাসিকগণ এইরূপ অনুমান করেন।

বঙ্গে বৈষ্ণব বর্ম্মবংশ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তথায় বৌদ্ধ চন্দ্রবংশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এই রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ রোহিতাগিরি, অর্থাৎ ত্রিপুরা জেলার লালমাই পাহাড় অঞ্চলে বাস করিতেন। চন্দ্রবংশীয় ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের (বরিশাল) রাজা ছিলেন। ভট্টশালী মহাশয়ের মতে, তিনি হরিফেল (? হরিকেল) রাজার অধীনে চন্দ্রদ্বীপে সামন্তরাজা ছিলেন [৬]। যাহাই হৌক, ত্রৈলোক্যচন্দ্র বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই, হইয়াছিলেন তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র। চন্দ্রদ্বীপও খুব সম্ভবতঃ শ্রীচন্দ্রের অধিকার-ভুক্ত ছিল। ভট্টশালী মহাশয় বলেন, "রোহিতাগিরি ও তাহার আশে পাশের জায়গা তো আগে হইতেই চন্দ্রদের হাতে ছিল। শ্রীচন্দ্র তাই এইবার ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জের মালিক হইয়া বসিলেন। প্রাচীন নাম বলিতে গেলে, তিনি সমতট ও বঙ্গের একছত্র রাজা হইলেন [৭]।"

কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, সকল সময়ে,—অন্ততঃ সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন-সাঙের সময়, ত্রিপুরা (কুমিল্লা, কমলাঙ্ক) সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল না [৮]। তবে কুমিল্লার বাঘাউরা গ্রামে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠে পালবংশীয় প্রথম মহীপালের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে খোদিত-লিপি অনুসারে, ঐ সময়ে কুমিল্লা বা ত্রিপুরা জেলা সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং যেহেতু শ্রীচন্দ্র প্রথম মহীপালের সমসাময়িক বা কিছু পরবর্ত্তী ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়, অতএব শ্রীচন্দ্রের সময়েও ত্রিপুরা সমতটের অন্তর্ভুক্ত থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু রোহিতাগিরি অঞ্চলে চন্দ্রদিগের অর্থাৎ চন্দ্রবংশীয় ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থান ছিল বলিয়াই শ্রীচন্দ্রদেব বঙ্গে রাজা হইবার কালে ঐ অঞ্চলেরও মালিক হইলেন, এ সিদ্ধান্ত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

শ্রীচন্দ্রদেবের সময় সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা ইঙ্গিত করা হইয়াছে, নূতন আবিষ্কারের আলোকসম্পাত না হইলে তদতিরিক্ত কিছু বলা সম্ভবপর নয়। তবে অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণানুসারে তাঁহার তাম্রশাসন দশম শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করা চলে না। এই হেতু, আপাততঃ ধরিয়া লইতে হয়, তিনি একাদশ শতাব্দীর প্রথম অথবা দ্বিতীয় পাদে রাজা হইয়াছিলেন।

শ্রীচন্দ্রদেবের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিক্রমপুরে কে রাজা ছিলেন, সে সম্বন্ধে ভট্টশালী মহাশয় এক অভিনব মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে হরিকেল রাজের অধীনে ত্রৈলোক্যচন্দ্র সামন্ত রাজা ছিলেন, তিনি কান্তিদেব, এবং তাঁহারই হস্ত হইতে শ্রীচন্দ্র হরিকেল ব পূর্ব্ববঙ্গ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। [৯]

'মহারাজাধিরাজ' কান্তিদেবের যে তাম্রশাসনখানি চট্টগ্রামের এক বৈষ্ণব আখড়া হইতে উদ্ধার করা হই

(৬) ভারতবর্ষ, ১৩৩২, আষাঢ়, পৃঃ ৪৪।

(৭) ভারতবর্ষ, ১৩৩২, আষাঢ়, পৃঃ ৪৪।

(৮) এ বিষয়ে ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসের India Antiquary পত্রিকায় আমার 'To the east of Samatata' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৯) ভারতবর্ষ, ১৩৩২, আষাঢ়, পৃঃ ৪৪।

য়াছে, তাহাতে দেখা যায়, তিনি 'বর্দ্ধমানপুর' জয়স্কন্ধাধার হইতে হরিকেল মণ্ডলের ভাবী ভূপতিগণকে তাঁহার ভূমিদান মান্ত করিবার উদ্দেশ্যে সম্বোধন করিতেছেন। ইহা হইতে এইটুকুই প্রতিপন্ন হয় যে, কান্তিদেব হরিকেল মণ্ডলেরও অধীশ্বর ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাজধানী বর্দ্ধমানপুরও যে হরিকেল মণ্ডলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, এ কথা প্রতিপন্ন হয় না, এবং ভট্টশালী মহাশয়ও তাহার প্রমাণ দিতে পারেন নাই। চীন দেশীয় মানচিত্র অনুসারে হরিকেল তাম্রলিপ্তি ও উড়িষ্যা এই দুই স্থানের মধ্যে হইলেও, চীনা পরিব্রাজক ই-চিং সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে ৫৬-৫৭ জন চীনা বৌদ্ধ ভারত-পর্য্যটনকারী ভিক্ষুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, হরিকেল (হো-লি-কি-লোও) পূর্ব্ব-ভারতের পূর্ব্ব সীমানায় অবস্থিত, এবং জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত। হরিকেল সম্বন্ধে আর একটু যাহা জানা যায় তাহা এই যে, ইহা একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থ ছিল [১০]। হরিকেল পূর্ব্ববঙ্গে ছিল এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু আমার একটা সংস্কার রহিয়া গিয়াছে, হরিকেল সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গের নামান্তর নয়, বরঞ্চ উহার কোনও অংশ-বিশেষের নাম। সেকালে জাহাজে করিয়া সরাসরি হরিকেলে উপস্থিত হওয়া যাইত, চীনা পরিব্রাজকদিগের এই বিবরণ দেখিয়া, এবং চট্টগ্রামে হরিকেলেরই জনৈক রাজার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায়, উপরন্তু চট্টগ্রামের ইতিহাসে বৌদ্ধ প্রাধান্যের কথা স্মরণ করিয়া, পূর্ব্ব-ভারতের পূর্ব্বসীমানায় অবস্থিত চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলেরই প্রাচীন নাম 'হরিকেল' ছিল কি না, এ প্রশ্ন কতবার মনে উদয় হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহা হৌক্, হরিকেল সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গের নামান্তর নয়, আমার এই সংস্কার মানিলে, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চল হরিকেলের অন্তর্গত ছিল, এ প্রশ্নের সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের সিংহাসনে কান্তিদেবকে বসাইবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। উহা না মানিলেও, ভট্টশালী মহাশয়ের 'থিওরি' অচল। শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনানুসারে, ত্রৈলোক্যচন্দ্রের সমসাময়িক হরিকেল-রাজের রাজছত্র ককুদ-(সর্প) চিহ্নিত ছিল, এবং এদিকে হরিকেলের অধীশ্বর কান্তিদেবের তাম্রশাসনে যে রাজমুদ্রা সংলগ্ন ছিল, সেই "সমগ্র মুদ্রাটির নিম্নাংশ বেষ্টন করিয়া লাঙ্গুলে লাঙ্গুলে জড়াইয়া দুইটি বৃহৎ সর্প ফণা ধরিয়া আছে", ইহা হইতে কান্তিদেব ত্রৈলোক্যচন্দ্রের সমসাময়িক রাজা ছিলেন, ইহা প্রমাণ হওয়া দূরে থাক্,—বলা বাহুল্য, কান্তিদেবের রাজছত্রও যে সর্প-চিহ্নিত ছিল, এই সামান্য কথাটাই প্রমাণ হয় না। অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণানুসারে কান্তিদেবের ও শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন একই শতাব্দীতে পড়ে, ভট্টশালী মহাশয় এমন কথা লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই। অথচ, "কান্তিদেবের তাম্রশাসনের অক্ষর এবং শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনের অক্ষরের তুলনা-মূলক বিচার দ্বারা কান্তিদেবের বংশ চন্দ্ররাজগণের বংশ অপেক্ষা প্রাচীনতর", "এ পর্য্যন্ত (পূর্ব্ববঙ্গে) এইরূপ যতগুলি রাজবংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ কান্তিদেব প্রতিষ্ঠিত বংশই তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া বোধ হয়"—ইত্যাদি সাধারণ কথাগুলি বলিয়াও, কান্তিদেবের তাম্রশাসনের বিবরণ যাঁহারা দিয়াছেন, তাঁহাদের মতে তাম্রশাসনখানির আনুমানিক বয়স কত, সেই কথাটিই উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এই ভুলটা না হইলে, তাঁহার মতবাদের মূল্য সর্ব্বসাধারণে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার হাতে হাতে সুযোগ পাইত।

তিব্বতীয় ঐতিহ্য অনুসারে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার 'বিক্রমণিপুরে' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই তথা-কথিত 'বিক্রমণিপুর' আলোচ্য বিক্রমপুর হইলে, স্বীকার করিতে হয়, শ্রীচন্দ্রের পূর্ব্বেও বিক্রমপুর নগরীর অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 'বিক্রমপুর' এই নাম পাওয়া যায় না দেখিয়া পূর্ব্বে যাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন নামটি আধুনিক, বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত পরিচয় থাকিলে তাঁহারা অধুনা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিতেছেন।

বলা অনাবশ্যক, 'বিক্রমপুর' বলিতে বর্ত্তমানে ঢাকা জেলার এক বিস্তৃত পরগণাকে বুঝায়। এই পরগণার ভিতরে কোথাও প্রাচীন বিক্রমপুর নগরী—যেখানে চন্দ্র,

---

(১০) বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম ভাগ, প্রথম সং, পৃঃ ২৪৭—২৪৮ দ্রষ্টব্য।

বর্ম্ম ও সেন অন্ততঃ এই তিন রাজবংশের জয়স্কন্ধাবার স্থাপিত ছিল বলিয়া জানা যায়—অবস্থিত ছিল, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু সেই সমৃদ্ধিশালী, গৌরবশালী, মহিমময় নগরের সঠিক অবস্থান আজও নির্ণীত হয় নাই। মৃত্তিকাভ্যন্তরে সেই বিপুলায়তন নগরীর ধ্বংসাবশেষের কোনও চিহ্ন লুক্কায়িত আছে কি না, অথবা হৃদয়হীন বহিঃশত্রুর উপদ্রব ও কালের অত্যাচারের ফলে ধরণীর পৃষ্ঠ হইতে সে নগরের সকল চিহ্নই নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? দুর্দ্দৈব বশতঃ ও অদৃষ্টের লাঞ্ছনায় অশীতিক মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন নদীয়া হইতে পলায়ন করিলে পর, পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গ ক্রমে ক্রমে যখন মুসলমানের করায়ত্ত হইয়া গেল, তখনও বীরপ্রসূ বিক্রমপুরের শৌর্য্যসম্পন্ন সন্তানগণ, পূর্ব্ববঙ্গের অপরাপর স্থানের বীরবাহুগণের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রিয়তম নরপতির বিজয়-বৈজয়ন্তীতলে দণ্ডায়মান হইয়া ন্যূনাধিক এক শত বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীনতা-ভাস্করের অস্তাচল গমন রোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন,—সেই বিক্রমপুরের অবস্থান নির্ণীত না হওয়া দুঃসহ দুঃখের কথা, জাতির পক্ষে কলঙ্কের কথা, লজ্জার কথা। একদা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' রামপালের নব-নির্ম্মিত রাজধানী 'রামাবতী'র অবস্থান স্পষ্টাক্ষরে গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যে থাকার উল্লেখ সত্ত্বেও, পূর্ব্ববঙ্গের 'রামপাল'কে রামাবতী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে আবার দেখিতেছি, সেই রামপাল ও তাহার আশে পাশে কয়েক মাইল জুড়িয়া যে ভগ্নাবশেষ দেখা যায় তাহাকে ভট্টশালী মহাশয় প্রাচীন বিক্রমপুর নগরের ভগ্নাবশেষ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন [১১]। তথা-কথিত 'পাঁথুরে' অথবা তাম্রশাসনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অনাগত কালে ভট্টশালী মহাশয়ের অনুমান সমর্থিত হইলে, সুখের কারণ হইবে।

বিক্রমপুরের 'বিক্রমপুর' নাম হইল কি করিয়া? 'বিপ্রকুলকল্পলতিকা' নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থধৃত একটি শ্লোক অনুসারে, বাংলার সেনরাজগণের বিক্রম-সেন নামক জনৈক পূর্ব্বপুরুষ না কি বিক্রমপুর স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কুলশাস্ত্রকার মহাশয়ের জানা ছিল যে, পুরাকালে বিক্রমপুরে সেনরাজগণ রাজত্ব করিতেন। অতএব যে নগরের নাম বিক্রমপুর, তাহার প্রতিষ্ঠাতার নাম তিনি 'বিক্রম'—এর সহিত 'সেন' যোগ করিয়া 'বিক্রমসেন' রাখিয়া দিয়া একটা মস্ত কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। শুনা যায়, কেহ কেহ না কি আবার এই শ্লোকটির উপর আস্থাবান! বোধ করি, তাহার কারণ, শ্লোকটি দেবভাষায় রচিত বলিয়া। 'দিগ্বিজয়' নামে আর একখানি গ্রন্থ আছে, তাহার রচয়িতা অধিকতর চতুর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অত-শত গণ্ডগোলের ভিতর না গিয়া সোজাসুজি বলিয়াছেন, বিক্রম নামক রাজার বাস হেতু বিক্রমপুর নাম হইয়াছে—"বিক্রমভূপ বাসত্বাৎ বিক্রমপুর মতো বিদুঃ।" পরলোকগত হাণ্টার সাহেব তাঁহার 'Statistical Account of Bengal' নামক গ্রন্থে (পৃঃ ১১৮) একটা জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন—"There is a tradition that the celebrated Hindu Raja Bickramaditya held his court in the southern portion of the district for some years, and gave his name to the Pargana of Bickrampur." হাণ্টার সাহেবের শ্রুত প্রবাদে উজ্জয়িনীর নাম নাই বটে, কিন্তু গন্ধটা আছে। উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য বলিলে সাধারণতঃ লোকে গল্প-লোকের বিক্রমাদিত্য, যিনি সুবাহু রাজার নিকট হইতে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার উপর স্থাপিত সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই স্মরণ করে। কিন্তু এই গল্পলোকের বিক্রমাদিত্য আসিয়া বঙ্গভূমের বাস্তব বিক্রমপুর স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, এ কথায় কাহারও অনুরাগ আছে কি না জানি না।

১৩২২ সালের আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে (পৃঃ ৩৮৮-৩৮৯) শ্রীযুক্ত ভট্টশালী মহাশয় গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক বিক্রমপুর নগর প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক বিক্রমপুর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে, কোনও কোনও পুরাণে এবং ফা-হিয়েন ও হুয়েন-সাঙের, অন্ততঃপক্ষে শেষোক্ত জনের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই নগরের উল্লেখ না থাকা বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু আয়াস স্বীকার করিয়া এই মত

(১১) প্রবাসী, ১৩২২ আষাঢ়, পৃঃ ৩৮৭—৩৯৩

খণ্ডন করার প্রয়োজন নাই, কারণ, এই মত এতই অসার যে, তিনি নিজেও অবশেষে উহা বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছেন। কি কি কারণে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে তিনি অলীক মনে করিয়াছেন, তাহা জানি না, কিন্তু কান্তিদেবের তাম্রশাসনের উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমপুরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে এক নূতন মত তিনি প্রচার করিয়াছেন, এবং সেই পরিবর্ত্তিত মত 'প্রবাসী'র পরিবর্ত্তে 'ভারতবর্ষে' ছাপিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "কান্তিদেবের সময়ে যাহার নাম বর্দ্ধমানপুর ছিল, (শ্রীচন্দ্রদেব কর্ত্তৃক) বিক্রম-পণ্যে লব্ধ হইয়া তাহা বিক্রমপুর বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিল।"[১২] কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার একটা মত-বাদ যদি বাঙ্গালার ইতিহাস-ক্ষেত্রে থাকা অনিবার্য্যই হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ পরিবর্ত্তিত মত অপেক্ষা পূর্ব্ব মত থাকাটাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় ছিল। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, হরিকেল মণ্ডল যদি বা বঙ্গের নামান্তরও হয়, তথাপি বর্দ্ধমানপুর হরিকেলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, ইহার প্রমাণ বিদ্যমান নাই, এবং দ্বিতীয়তঃ, অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান হিসাবে, বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠা শ্রীচন্দ্রদেবের রাজত্বের পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। অতএব কান্তিদেবের জয়স্কন্ধাবার বর্দ্ধমানপুরকে শ্রীচন্দ্রদেব কর্ত্তৃক বিক্রমপুরে পরিণত করা অসম্ভব। ভট্টশালী মহাশয়ের পরিবর্ত্তিত মত সম্বন্ধে আরও একটা বিষম কথা বলি,—এক রাজার নিকট হইতে কোনও একটা নগরী অন্য রাজা কর্ত্তৃক 'বিক্রমপণ্যে লব্ধ' হইলেই যদি সে নগরীর 'বিক্রমপুর' নামকরণ করিতে হয়, তবে দেশে দেশে ও যুগে যুগে গোটাকয়েক করিয়া 'বিক্রমপুর' থাকিতে হয় !!

আমার সামান্য জ্ঞানে মনে হয়, বাঙ্গালার যে একজন মাত্র জ্ঞাত বিক্রমশালী নরপতির 'বিক্রম' দিয়া উপাধি বা বিরুদ ছিল, 'বিক্রমপুর' এই নাম তাঁহারই স্মৃতি বহন করিতেছে। তিনি মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপাল, এবং তাঁহার একটা বিরুদ ছিল 'বিক্রমশীল'। মনে রাখা উচিত, সম্রাট ধর্ম্মপালের সময় সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহারই অধিকারভুক্ত ছিল।

মগধে যে 'বিক্রমশীলা' নামে বিরাট বৌদ্ধ মহাবিহার ছিল, তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথ কাম্পিল্যের কাহিনীর মধ্য দিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মপালেরই কীর্ত্তি। ধর্ম্মপাল তাহা হইলে নিজেরই বিরুদানুসারে বিহারটি স্থাপন করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে দেখা যায়, বিহারটিকে 'বিক্রমশীলা'-বিহার না বলিয়া একেবারে পরিষ্কাররূপে 'বিক্রমশীল-দেব'-বিহার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কাশ্মীরের সুবজ্ঞ মিত্রের প্রণীত 'স্রগ্ধরাস্তোত্রের' জিনরক্ষিত যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার একখানি পুঁথিতে স্পষ্ট লেখা আছে 'শ্রীমদ্বিক্রমশীলদেব মহাবিহারীয়'[১৩]। পালবংশীয় দ্বিতীয় গোপালদেবের ১৫ রাজ্যাঙ্কে লিখিত 'অষ্টসাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা'র একখানি পুঁথিতেও[১৪] ঐরূপই পাই 'শ্রীমদ্বিক্রমশীলদেব বিহার' ইত্যাদি।

বস্তুতঃ, ধর্ম্মপালের সময় হইতেই বিক্রমশীলা বিহারের ইতিহাস আরম্ভ, এবং এ বিষয়ে এ যাবৎ কেহ সংশয় প্রকাশ করেন নাই। ধর্ম্মপালের আড়াই শত বৎসর পরে অতীশ দীপঙ্কর কিন্তু ইহাতে সামান্য একটু ভুল করিয়াছেন, দেখা যায়। 'রত্নকরণ্ডোদ্ঘাট' নামে তিনি মধ্যমক-দর্শন সম্বন্ধীয় যে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহার পুষ্পিকায় লেখা আছে,[১৫] বিক্রমশীল মহাবিহার (ধর্ম্মপাল দেবের পুত্র) দেবপাল দেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। তবে ধর্ম্মপালের পরে দেবপাল ঐ বিহারের প্রভূত উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, এই হিসাবে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের উক্তি গ্রহণ করিলে, উহাকে ভুল না বলিলেও চলে। আপাততঃ মোটামুটি হিসাবে বলা যায়, পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে হইয়াছিল। বিক্রমশীলা বিহার পালবংশ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়া থাকিলে, সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজকগণ নিশ্চয়ই উহার উল্লেখ করিতেন। পক্ষান্তরে অতীশ দীপঙ্কর ভুল করিয়া থাকিলেও, ঐ

---

(১২) ভারতবর্ষ,—আষাঢ়, ১৩৩২, পৃঃ ৪৪।

(১৩) Nepalese Buddhist Literature by R. L. Mitra, Cal, 1882 p. 229 ; ভারতী, ১৩১৫, পৃঃ ২।

(১৪) J. R. A. S. 1910 pp. 150-51.

(১৫) Catalogue du fonds Tibétain de la Bibliotbhèque Nationale, par P. Cordier, Paris, 1915, Vol. III., pp. 321-22.

ভুলের দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় যে, বিহারটি দেবপালের সময় বিদ্যমান ছিল। অতএব ধর্ম্মপালকে উহার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া তারনাথ যে উক্তি করিয়াছেন, তারনাথ ১৬০৭-৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিলেও, এবং তাঁহার গ্রন্থে পালবংশের ইতিহাসে অনেক ভুল-ভ্রান্তি থাকিলেও, ঐ উক্তি নির্ভুল।

ধর্ম্মপালের যে 'বিক্রমশীল' বিরুদ ছিল, তাহা কবি অভিনন্দের 'রামচরিত' কাব্য হইতে প্রতীয়মান হয়[১৬]। অভিনন্দ বিক্রমশীল-নন্দন যুবরাজ হারবর্ষের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেন। ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর দেবপাল পাল-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মপালের ৩২ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ খালিমপুর তাম্রশাসনে যাঁহাকে যুবরাজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার নাম ত্রিভুবনপাল। তাহা হইলে, হয় দেবপাল ও ত্রিভুবনপাল একই ব্যক্তি, না হয় ধর্ম্মপালের ৩২ রাজ্যাঙ্কের পর এবং তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ ত্রিভুবন পাল পরলোকগমন করিয়াছিলেন, এবং পরে দ্বিতীয় পুত্র দেবপালের অদৃষ্টে সিংহাসন লাভ ঘটিয়াছিল। দেবপাল ও ত্রিভুবন পাল স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইলে, ধর্ম্মপালের রাজত্বের সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যিনি যুবরাজ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই ত্রিভুবন পালকেই কবি অভিনন্দের পৃষ্ঠপোষক 'যুবরাজ হারবর্ষ' বলিয়া মনে করিতে হয়। দেবপালের পরেই যিনি পাল-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি শূরপাল ও বিগ্রহপাল এই দুই নামেই অভিহিত হইতেন দেখিয়া, ত্রিভুবন পাল ও দেবপাল একই ব্যক্তির দুই নাম হওয়াও অসম্ভব বিবেচনা করা চলে না। 'বর্ষ' সংযুক্ত বিরুদ বা নাম সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-বংশীয় নরপালদিগকেই ব্যবহার করিতে দেখা যায়, কিন্তু ধর্ম্মপালের পুত্রের পক্ষে 'হার-বর্ষ' নাম বা বিরুদ থাকার খুব সম্ভবতঃ ইহাই কারণ ছিল যে, ধর্ম্মপাল 'পরবল' বিরুদ (বা নামধারী) কোনও রাষ্ট্রকূটরাজের দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পাল রাজবংশে রাষ্ট্রকূট-বংশীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করার ইহাই একমাত্র দৃষ্টান্ত নহে, কিন্তু পাল-বংশের অপর কাহারও 'বর্ষ' সংযুক্ত বিরুদ বা উপাধি ছিল কি না, তাহা অজ্ঞাত। বৌদ্ধ হার-বর্ষের আশ্রিত কবি অভিনন্দও বৌদ্ধ ছিলেন, কারণ তাঁহার একটা নামান্তর ছিল 'আর্য্য-বিলাস', এবং বৌদ্ধ কুলতন্ত্রের 'ক্রিয়া সংগ্রহ পঞ্জিকা' নামক গ্রন্থে প্রদত্ত ব্যাখ্যানুসারে 'আর্য্য' শব্দের অর্থ,—যে বৌদ্ধ ভিক্ষু বিবাহিত জীবন যাপন করেন[১৭]। অভিনন্দের কাব্যে স্থানে স্থানে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক যুবরাজকে এমন ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, যেন তিনিই স্বয়ং নরপতিরূপে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন, কিন্তু তাহার হেতু সুস্পষ্ট। ধর্ম্মপাল,—যিনি অন্ততঃ বত্রিশ বৎসর ধরিয়া সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন,—তাঁহার শেষ জীবনে অতি-বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন, এবং যুবরাজ হারবর্ষই প্রকৃত পক্ষে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন।

রাজসাহীর পাহাড়পুর খনন কালে একটি লিপি-সংযুক্ত মুদ্রা (Seal) পাওয়া গিয়াছে।[১৮] তাহা হইতে জানা যায় যে 'সোমপুর' বিহার ধর্ম্মপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ পাহাড়পুর মন্দিরই অতঃপর ধর্ম্মপাল কর্তৃক বৌদ্ধ-বিহারে পরিণত হইয়াছিল।

ত্যেঙ্গুরে বাঙ্গালা দেশের আর একটি বিহারের উল্লেখ আছে, তাহার নাম 'বিক্রমপুরী' বিহার[১৯]। এই বিহারে বসিয়াই আচার্য্য অবধূত কুমারচন্দ্র একখানি বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রের টীকা লিখিয়াছিলেন, এবং উহা পরে ভারতের লীলাবজ্র ও তিব্বতের পুণ্যধ্বজ তিব্বতীয় ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। ত্যেঙ্গুরের ক্যাটালগে বিহারটির অবস্থান সম্বন্ধে কেবল এইটুকুই পাওয়া যায় যে উহা মগধের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় অবস্থিত ছিল। (Vihara de Vikramapuri du Bengale, dans le Magadha oriental)[২০]। কিন্তু বিক্রমপুরী নামক বিহারটি যে বঙ্গের বিক্রমপুরে অবস্থিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। অনুমান হইতেছে, 'বিক্রম'-

(১৬) অভিনন্দের রামচরিত, শ্রীযুক্ত কে, এস্, রামস্বামী শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯৩০, ভূমিকা পৃঃ ২২।

(১৭) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৩, পৃঃ ৯০।

(১৮) Ann, Rep. of the Arch. Surv. of India, 1926-27, p. 149.

(১৯) Cordier, op. cit., II., pp. 159-60.

(২০) Ibid.

শীলা ও সোম-‘পুরী’ বিহারদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতাই বিক্রমপুরী বিহারটিও স্থাপন করিয়াছিলেন। পরম সৌগত বিক্রমশীল-ধর্ম্মপাল দেব তাঁহার স্বীয় ধর্ম্মমতাবলম্বিগণের জন্য মগধে, উত্তর বঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে,—অন্ততঃ এই তিন স্থানে তিনটি বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন।

তাহা হইলে, দুইটি বিকল্প উপস্থিত হইতেছে, (১) হয় বিক্রমপুরে অবস্থিত বলিয়া বিহারটিরও নামকরণ বিক্রমপুরী-বিহার হইয়াছিল, (২) না হয় পূর্ব্বে বিহার, ও পরে বিহারের নাম হইতেই স্থানেরও নাম বিক্রমপুর হইয়াছে, এবং বিহারের গরিমাই স্থানের প্রসিদ্ধির মূল কারণ। কিন্তু যে-কোনও ক্ষেত্রেই হৌক্, বিক্রমশীল-ধর্ম্মপালের নামের সহিত বিক্রমপুরের নামোৎপত্তির ইতিহাস বিজড়িত রহিয়াছে, ইহাতে আপাততঃ সংশয়ের হেতু দেখিতেছি না।

গত শ্রাবণ মাসের ‘ভারতবর্ষে’ (পৃঃ ২৪৭-২৪৯) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত ‘পালবংশের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়’ শীর্ষক এক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিক্রমশীল ও ধর্ম্মপাল অভিন্ন নহেন, কারণ বিক্রমশীল-নন্দন যুবরাজ হারবর্ষকে কবি অভিনন্দ এক স্থানে “ধর্ম্মপাল কুল কৈরব কাননেন্দু” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ধর্ম্মপালের কুলকে কৈরব (কুমুদ কাননের সহিত, এবং হারবর্ষকে ইন্দুর সহিত তুলনা করায় তাঁহার বোধগম্য হইয়াছে যে, যুবরাজ হারবর্ষ ধর্ম্মপাল হইতে কয়েক পুরুষ ব্যবধান ছিলেন। কিন্তু কাব্যের এই অংশ পড়িয়া ‘রামচরিতে’র সম্পাদক শ্রীযুক্ত কে, এস্, রামস্বামী শাস্ত্রী মহাশয়ের ইহা বোধগম্য হয় নাই; এবং স্বর্গীয় বুহ্লার সাহেব যখন Indian Antiquary পত্রিকার দ্বিতীয় ভাগে (পৃঃ ১০৩) ‘রামচরিতে’র অস্তিত্বের সংবাদ বোধ করি সর্ব্বপ্রথম জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তখনও এই অংশ উদ্ধারকালে তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। ইঁহারা সংস্কৃতে অজ্ঞ, এ কথা সম্ভবতঃ অধ্যাপক মহাশয়ও বলিতে সাহসী হইবেন না। পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে কোনও কবি যদি কাব্য করিয়া বলেনই যে তিনি “পাণ্ডুকুলকৈরব কাননেন্দু” ছিলেন, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে, যুধিষ্ঠির পাণ্ডু হইতে কয়েক পুরুষ ব্যবধান ছিলেন? অমুকের কুলে অমুকের জন্ম হইয়াছিল, ইহা বলিলে সর্ব্বত্রই দুইয়ের ‘ব্যবধান’ বুঝিতে হইবে ইহার কি অর্থ আছে?

বিক্রমশীল ও ধর্ম্মপাল ভিন্ন ব্যক্তি, ইহা বোধগম্য হওয়ায় অধ্যাপক মহাশয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ৮১৪ খৃষ্টাব্দে মৃত ধর্ম্মপালের পর পাল-বংশে দেবপালের ন্যায় প্রতাপশালী নৃপতি আর ছিল না। (সেই হেতু?) ধর্ম্মপাল দেবপালকে, তাঁহার সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত ভাবিয়া (অর্থাৎ ত্রিভুবন পালকে অনুপযুক্ত ভাবিয়া), ত্রিভুবন পালকে তিনি ৮৬০ খৃষ্টাব্দে জীবিত তাঁহার অপুত্রক শ্বশুর দশার্ণের রাজা পরবলকে দত্তক প্রদান করিয়াছিলেন। ত্রিভুবনপাল দশার্ণে গিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার অনিকট বংশধর বিক্রমশীল ও তদীয় পুত্র যুবরাজ হারবর্ষও দশার্ণের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি এই প্রবন্ধের লেখক হইলে, এইখানেই থামিতাম না, আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া প্রবন্ধটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা করিতাম। বৌদ্ধ ধর্ম্মপালের সম্ভবতঃ অতিক্রান্ত-যৌবন-প্রায় পুত্র ত্রিভুবন পাল নামক খোকাটিকে যখন খোকার দাদামহাশয় অবৌদ্ধ পরবল দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করিলেন, তখন নিশ্চয়ই খোকাকে ‘শুদ্ধি’ করিয়া ঘরে তুলিতে হইয়াছিল; কিন্তু সেই মহোৎসবের সময় কোন্ কোন্ স্বামিজি উপস্থিত থাকিয়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছিলেন,—প্রবন্ধটি আমি লিখিলে তাহারও একটা লিষ্ট্ ছাপিতে কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ হইতাম না। এবং যে ত্রিভুবন পালকে স্বদেশের সিংহাসনে বসিবার অনুপযুক্ত দেখিয়া ধর্ম্মপাল তাহাকে দত্তক দিয়া বিদায় করিলেন, সেই ত্রিভুবন পাল পথে যাইতে যাইতে কোন্ কোন্ গুরুমহাশয়ের টোলে ‘পলিটিক্স্’ পড়িয়া ঘোর বিদেশ দশার্ণে (বর্ত্তমান ভূপাল) বংশানুক্রমে রাজত্ব করিবার শক্তি সঞ্চয় করিলেন, তাঁহাদেরও নাম-ধাম প্রকাশ করিয়া দিতাম। অধ্যাপক মহাশয় লিখিতেছেন, “পরবলের বংশধরদের নাম অজ্ঞাত। পরবল অপুত্রক হইয়া থাকিলে তাঁহার দৌহিত্র ত্রিভুবন পাল ও দেবপাল দশার্ণের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন।” পরবলের বংশধরদের নাম অজ্ঞাত বলিয়াই

তাঁহাকে অপুত্রক ভাবিতে হইবে, তাহা না হয় হইল; কিন্তু, তিনি অপুত্রক না হইলে ত্রিভুবন পালের কি গতি হইয়াছিল, এবং দেবপাল ও ত্রিভুবন পাল স্বতন্ত্র ব্যক্তি না হইলে দশার্ণের সিংহাসন কোথায় গড়াইয়া গেল, এ সব কথার অবতারণা কই? দশার্ণের পরবল অপুত্রক হইলেই বা, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় প্রভৃতিকে বাদ দিয়া তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব কেন দৌহিত্রের উপর গিয়া বর্ত্তিবে,—দশার্ণ রাজ্যে তখন মিতাক্ষরা বা দায়ভাগ কোন আইন প্রচলিত ছিল, তাহা না জানাইলে কি করিয়া বোঝা যায়?

পদ্মার চর

বন্দে আলী মিয়া

স্রোত গেছে চলি এই পার ছাড়ি', ওপারে ভাঙিছে ফের্,
চর বাঁধিয়াছে তিন গাঁও জুড়ে—শেষ নাই যেন এর,
এপাশে ওপাশে সমুখে পিছনে যে-দিকে তাকানো যায়
বালুর সাগর থৈ থৈ করি কাঁপিছে পুবালী-বায়।
শিশু ঝাউ গাছ আলোর সাথেতে খেলা করে সারা দিন
ডালে আর তার সবুজ পাতায় মাটির মায়ের ঋণ।
হেথায় হোথায় ফেটে গেছে তার মিল নেই কোনোখানে
মাটির নিশাস ওই পথে যেন যায় আস্‌মান পানে;—
বিহানে দুপুরে নানান্ জাতের পাখীরা আইসে সেথা,
পর্ খসে পড়ে—ডিম পাড়ে কেহ—উড়ে যায় ফেলে সে তা।

চরের এপাশে ছোটো অতি ছোটো পদ্মার ক্ষীণধারা
চলে এঁকে বেঁকে ঝির্ ঝির্ করি, নাই যেন কোনো তাড়া।
পাড়া থেকে সব গোয়ালের মেয়ে কলসী কাঁখেতে আসে,
ওরি পানি ভরে যায় সার বেঁধে—কথা কয় আর হাসে;
পারে বসি কেহ মাজে থালা বাটি—মুখ হাত কেহ ধোয়,
পানি এনে কেহ গরুর চাড়িতে কেবলি ঢালিয়া থোয়।

চরের পানেতে চাহিয়া মনেতে কত কথা আজ জাগে
তারা নাহি কেহ—নাহি কোনো চিন্—
যারা ছিলো হেথা আগে।
পদ্মা-ভাঙনে ঘর দোর ছেড়ে চলে গেছে ভিন্ গাঁয়,
সেইখানে ওরা বাসা বেঁধে ফের্ দিনরাত গুজরায়।
এই ঠাঁয়ে ফের পড়িয়াছে চর—সরে গেছে পানি তায়,
নতুন লোকেরা আসিয়া গড়িছে বাড়ী ঘর আর বার—
তারাই হোথায় বুনিয়াছে ধান—বুনেছে কলাই যব,
বাতাসের সাথে খেলা করে, আর করে মহা কলরব।
সোনালি রঙের কাঁচা পাকা শীষ সবুজ বরণ পাতা
পদ্মা নদীর পানির মাঝারে দুলে দুলে নাড়ে মাথা

বালুর চরের 'পরে
কে তুমি গো মেয়ে আসিলে হেথায় ভাবনার অগোচরে;
স্বপনে তোমারে মনে করা যায় লুকাইয়া সযতনে
মাটির ওপরে দেখিব তোমায় ভাবি নাই কোনো খনে!
রোদের মতন মুখেতে তোমার আলো করে ঝলমল,
গাঙের মতন টলমল দেহে যৌবন উচ্ছল।
বুকেতে মুখেতে পয়লা রসের ঢেউ সে দিয়েছে দোল',
চলিতে ফিরিতে ফুলে ফুলে ওঠে—
পিঠে লোটে বেণী খোলা:
বালু খুঁড়ে খুঁড়ে আখা বানাইয়া ভাত রাঁধো তুমি তায়,
ছোটো ভাইবোন দু'পাশে বসিয়া উৎসুক হয়ে চায়।
কী নাম তোমার—তুমি যেন মেয়ে এই এ চরের রাণী,
তোমার হাসিতে তোমার কথায় বায়ু করে কানাকানি;
তুমি যদি বলো এইখানে মেয়ে ছন্‌খড়ে বাঁধি ঘর
তোমারে লইয়া খেলা করি আজ পউষের দিন ভর্—
তুমি রবে পাশে—আমি সযতনে সাজাবো তোমার দেহ,
মোদের চরেতে সুধু তুমি আমি—আর না রহিবে কেহ।

ওগো মেয়ে শোনো, আজিকার কথা কাল তো রবে না মনে,
তুমি আর আমি রবো বা কোথায় কাল গো এতেক খনে!
আলো কমে আসে—মেঘে আর মেঘে রঙের আমেজ লাগে
দিন ডুবে যায় পদ্মার জলে—নরম আঁধার লাগে,—
তোমার চোখের মুখের হাসিটি ভালো মোর লাগে প্রিয়,
চাহনি তোমার ভালো লাগে আরো—
নয়নের সুধা দিয়ো।
তুমি ছুটে চলো বালু উড়াইয়া পায়ে পায়ে রেখা আঁকি,
সোনা হয়ে গেল এ-চর আজিকে তোমার পরশ মাখি।

কৃষ্ণলীলা

—সেবায়েত—

চৈত্র মাসের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের—"ব্রজের কৃষ্ণ কে ও কবে ছিলেন" প্রবন্ধের প্রতিবাদ স্বরূপ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত প্রবন্ধের অনুকূলে বা প্রতিকূলে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার তাদৃশ যোগ্যতাও নাই। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আলোচনা প্রয়োজনীয় বলিয়া দু'একটী কথা বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

আমার মনে হয়, বিদ্যানিধি মহাশয় ঐতিহাসিকের চক্ষে সত্যানুসন্ধান হেতু শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র আলোচনা করিতেছেন ; আর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্ম-তত্ত্বের দিক দিয়া তাঁহার বক্তব্য বলিতেছেন। আমাদের পৌরাণিকরা ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য শাস্ত্রাদি লিখিয়াছেন। আধুনিক সময়ের ন্যায় শুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা ও রাজাদিগের জীবনী লিপিবদ্ধ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহারা নীরস ইতিহাস লেখার জন্য চেষ্টা করেন নাই এবং তাহার প্রয়োজনও অনুভব করিতেন না। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল এমন ভাবে পুরাণ লেখা, যাহা সাধারণকে একাধারে ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতি-নীতি—যাবতীয় বিষয়ের মূলতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা ও আনন্দ দান করিতে পারে। অন্ততঃ আমার ধারণা পুরাণে তাঁহারা কলাবিদ্যা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব, প্রভৃতি একাধারে গ্রথিত করিয়াছেন। সাধারণের সহজে চিত্তরঞ্জন ও জ্ঞানার্জ্জন বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহারা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনীর উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া পুরাণ প্রভৃতি লিখিয়াছেন। ঐরূপ উদ্দেশ্য না থাকিলে নানাবিধ উপনিষদ্ সত্ত্বেও পুরাণাদির প্রয়োজন কেন হইয়াছে, তাহা ধারণায় আসে না। আরও দেখা যায় যে, একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে সামান্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত। তাঁহারা যে স্বেচ্ছায় ঐরূপ করিয়াছেন তাহাও বলা যায় না। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, কোন কোনও পুরাণে ইচ্ছা করিয়াই সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে। রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়াছেন ইহাও শুনি। আর অসিতারূপিণী সীতা শতস্কন্ধ রাবণ বধ করিয়াছেন তাহাও শুনি। কোন্‌টা সত্য বলিব ? সুতরাং মনে হয়, আবশ্যক অনুযায়ী ও তৎকালিক প্রয়োজন বোধে মূল, শিক্ষনীয় বিষয় যথার্থ রাখিয়া, ঘটনাবলীর বর্ণনকালীন কিছু কিছু পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধনাদি করা হইয়াছে। তাহাতে শিক্ষনীয় বিষয়ের জ্ঞানার্জ্জন সম্বন্ধে কিছুই তারতম্য হয় না বলিয়া, অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষা যাহাকে বলে সে বিষয় তারতম্য হয় না বলিয়া, ঐরূপ ঘটনাবলীর বিরোধিতা ধর্ত্তব্য নয়। আর যদি তর্কের খাতিরে বলিতে হয় যে, ঐ সকল অনৈক্য দোষে দূষণীয়, তাহা হইলে, সকল ঋষির দিব্যদৃষ্টি সমান কি না সন্দেহ করিতে হয়। আর নয় ত বলিতে হয়, দিব্যদৃষ্টি কথাটার আমরা উচ্চারণ মাত্র শিখিয়া রাখিয়াছি—প্রকৃত অর্থ জানি না। সত্য কথা বলিতে কি, দিব্যদৃষ্টি বা ইংরাজী রেভেলেযান কাহাকে বলে, আমি আজ পর্য্যন্ত নানা' চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের ব্যাখ্যা সাধারণের তৃপ্তিকর হইবে কি না এ বিষয় পূর্ব্ব হইতে বলা শক্ত। অন্ততঃ আমি তো অতৃপ্তির কারণ দেখিতেছি না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিয়াছেন—রাধাকৃষ্ণ মানো আর না মানো ভাবটুকু নাও। সুতরাং যাঁহারা সাধনমার্গে অগ্রসর ও ভক্ত, তাঁহাদের প্রাণের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ যেমন তেমনই তাঁহাদের হৃদয়ে থাকিবেন। শত শত ঐতিহাসিক কি বলিতেছেন না বলিতেছেন তাহা তাঁহারা গ্রাহ্যই করিবেন না। আর গ্রাহ্য করাও উচিত নয়, অতৃপ্ত হওয়াও উচিত নয়। ভগবান যদি দেখেন যে ভক্তেরা ঐতিহাসিক হইতেছেন, তিনি তাঁহাদের ঐতিহাসিক সাধনার পুরস্কার দিবেন, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সাধনার পুরস্কার দিবেন না। সুতরাং যাঁহারা সাধক, তাঁহাদের অতৃপ্তির বিষয় কিছুই হইতে পারে না। আর যাঁহারা ধর্ম্মসাধনার দিক দিয়া বা ঐতিহাসিক সত্যের দিক দিয়া না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র বিষয়ে বিদ্যানিধি মহাশয়ের ব্যাখ্যায় অতৃপ্ত হইবেন, তাহার আর উপায় কি হইতে পারে বুঝিতে পারিতেছি না।

বিদ্যানিধি মহাশয় যেরূপ উদ্যমে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল নির্ণয় করিয়াছেন ও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত সঠিক হউক বা ভ্রমপূর্ণ হউক, সে বিষয়ে মন্তব্য দিবার ধৃষ্টতা নাই। তবে বলিতে পারি যে, তিনি জ্ঞানভাণ্ডারে রত্ন দান করিবার জন্য অকপট ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। হয় তো তিনি তাঁহার জীবিত কালে না পারিলে, তাঁহার মতন অপর পণ্ডিতমণ্ডলীর চেষ্টায় এক সময় না এক সময় সত্যযুগ হইতে না হউক দ্বাপরযুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিবার উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে। তিনি আমাদের সম্মানের ও পূজার পাত্র। আর তিনি সরল বিশ্বাসে ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা যুক্তিপূর্ণ না হইলে গ্রহণ করা না করা পাঠকের ইচ্ছাধীন। অতৃপ্তির বিষয় ইহাতে কিছু নাই।

বঙ্কিমবাবু কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা কালে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহাই বা কিরূপে বলা যায় ? তিনিও হয় তো শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে কতটা রূপক কতটা ঐতিহাসিক কতটা আধ্যাত্মিক বিষয় আছে নির্ণয় করিতেছিলেন। এখনও শুনিয়া থাকি যে, নিত্যবৃন্দাবনে নিত্যরাসলীলা হইতেছে। আসাম যোড়হাট সারস্বত মঠের স্বামী নিগমানন্দের কোনও পুস্তক, সম্ভবতঃ প্রেমিক গুরু পড়িয়া মনে হইল যে, বৃন্দাবন ব্যাপারটী পুরাপুরি আধ্যাত্মিক বিষয়—রূপকে লিখিত। কোথাও যেন পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় যে, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবকে ধর্ম্মবৃক্ষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিন্ধ্যগিরি

সূর্য্যের সহিত বিবাদকালে অগস্ত্যমুনিকে দেখিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন বলিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত এখনও আকাশে সংলগ্ন হইতে পারেন নাই। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন "নটবরবেশে বৃন্দাবনে কালী হলে মা রাসবিহারী।" ঐতিহাসিকের চক্ষে মা যে রাসবিহারী হইয়াছেন, বিশ্বাস করিতে পারি না। তবে ভগবানের পক্ষে মৎস্য কূর্ম্ম হইতে সবই পারা যায়। তিনিই তো বিরাট বিশ্ব হইয়াছেন। দারুণ দুর্য্যোগে যখন ব্যাকুল হইয়া প্রকৃতির ভীষণ মূর্ত্তি দেখি, তখন আপনা হতেই বলি মা কালী। আবার যখন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় মেঘহীন আকাশ দেখি, তখন আপনা হতেই বলি শ্যামসুন্দর মদনমোহন। যাক!

বেশী বাচালতা যুক্তিযুক্ত নয়। বিদ্যানিধি মহাশয় ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উভয়ই আমাদের পূজনীয়। পুরাণ প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্যক সর্ব্বপ্রকারে বুঝিতে পারা কঠিন। যাহাতে বাস্তবিক আমরা পুরাণ শাস্ত্রাদি প্রকৃতভাবে বুঝিতে পারি, তাহাই আমাদের কাম্য। পুরাণ শাস্ত্রাদির মধ্যে কতটা ঐতিহাসিক, সামাজিক ও কতটা আধ্যাত্মিক বিষয় বর্ণিত আছে সে বিষয় বিদ্যানিধি মহাশয়, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও অপরাপর পণ্ডিতমণ্ডলী আমাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিলে সম্পূর্ণ না হউক সামান্য কিছু কিছু জ্ঞানলাভও তো করিতে পারি। তাহাতেও আমাদের যথেষ্ট উপকার। আমি বিনীতভাবে স্বীকার করিতেছি যে আমার বক্তব্য সমূহ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বা একদেশী হইতে পারে। সুতরাং আমার প্রার্থনা, আমার অজ্ঞতা ও ত্রুটী বিদ্যানিধি মহাশয় ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উভয়ই মার্জ্জনা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে ভাল করিয়া জানিবার সুবিধা হইবে বলিয়াই এ সব বিষয়ের অবতারণা করিলাম।

'প্রিয়ার ইচ্ছা প্রেমের ধর্ম্মে বিরোধ বেধেছে আজ'

শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত বি-এ

ভোরের আলোর ভয়ে গায়ের লেপটা টেনে নিয়ে মুখ অবধি মুড়ি দেবার উপক্রম ক'র্‌ছি, আর কে সেটা খুলে দিলে। কে তা' বুঝ্‌তে বাকি রইলো না। পাছে অসন্তোষটা প্রকাশ করা নিয়ে আবার একদফা সময় নষ্ট হয়, অথবা আগন্তুকের অত্যাচারের মাত্রা পরিহাস থেকে জেদ পর্য্যন্ত গড়ায়—সেই ভয়ে খোলা অংশটার সঙ্গে খানিকটা না-বোঝার ভান জড়িয়ে পাশ ফিরে শোবার আয়োজন করলাম। কিন্তু যিনি এসেছিলেন, তিনি যে প্রায়ই ব'লে থাকেন—আমিই তাঁর গর্ভে স্থান লাভ করেছি—তিনি আমার নন্,—অর্থাৎ আমার যে-কোনো ধাপ্পা তাঁর কাছে সর্ব্বকালেই অচল—সে কথা এ ক্ষেত্রেও প্রতিপন্ন ক'রে ছাড়্‌লেন। খপ্‌ ক'রে লেপের প্রান্তটা চেপে ধ'রে বল্লেন,—"দেখ্‌বি, হতভাগা, দেব গালে হাত বুলিয়ে?"—কথাটা যে মন্ত্রের মত কাজ করবে তা তিনি জান্‌তেন। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কারণ, এই কন্‌কনে শীতে প্রাতঃস্নান করার দরুণ ঐ হাতখানির টেম্পারেচার ছিল ফ্রিজিং পয়েণ্টের অন্ততঃ দশ ডিগ্রি নীচে।

—"ব্যাপার কি বল তো? ভোর রাত্রির দুঃস্বপ্নের মত ঘুমটাকে এমন ক'রে মাটি ক'রে কী লাভ হোলো?"—

একটা হাসির হল্লায় বাকি আলস্যটুকু ঘরছাড়া ক'রে মা বল্লেন—"তবু শুধু "ভোর" বল্‌বিনে, "রাত্রি"টা জুড়ে শুয়ে থাক্‌বার একটা ওজর রাখ্‌বি! কি প্যাঁচাই তুই হইচিস্‌ বিনে?"

—"প্যাঁচার কোটরে উষারাণীকে তো নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে পাঠাইনি গো, এ অনধিকার প্রবেশের দরকারই বা কি ছিল'—ব'লে মা'র দিকে তাকালাম। উপমাটায় অত্যুক্তি কিছু ছিল না, বাইরে যে শিশির-স্নাত উষা কুয়াসার কাপড়খানি প'রে—ছলছলরূপে বিশ্বের ঘুমন্ত-দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে—ঘরের মধ্যে মা যেন তারি প্রতিমা। আমাদের বাড়ী থেকে গঙ্গা কাছেই; কোন্‌ অন্ধকার থাক্‌তে সেখানে অবগাহন ক'রে এসেছেন—তার পর পূজো ক'রেছেন—সংসারের খুটিনাটিও দু'একটি সেরেছেন,—তার পরে এসেছেন আমার ভোররাত্রির বিশ্রামে বাধা দিতে। পরনে গরদের সাড়ী, তারই লালপাড়ের কূল ভাসিয়ে ভিজে চুলের বন্যা বইচে পিঠে। একটা মুগ্ধ প্রসন্নতা বিশ্রামহানির ক্ষতিটা ভুলিয়ে দিতে চায়;—কিন্তু মহিমার কাছে অন্তরে হার মানা সহজ, বাইরে তা প্রকাশ ক'রতে বাধে। যথাসাধ্য বিরক্তির সুর বজায় রেখেই বল্লাম,—"নাঃ ভাল লাগে না; সত্যি সারাটা দিন আজ মাথা ধ'রে থাক্‌বে'খন। তোমার আর কি।"

ততক্ষণে জানালাগুলি সব খোলা হ'য়ে গেছে, এক ঝলক বাঁকা রোদ ঘরে ঢুকে পড়েছে। নির্ব্বিকার কণ্ঠের জবাব এল—"বিনু, সকালবেলা মিছিমিছি তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি বাপু, কাজ আছে।"

—"আলবাৎ, সোনা আছে আর সোহাগা নেই! ঘুমের মাথায় মুগুর মেরেছ, আর কাজের বরাত নিয়ে আসনি!"

—"দেখ্, সুধাময় অনেক দিন আসেনি। সেই যে বিজয়ার প্রণাম ক'রে গেছে, তার পর আর আসেনি। আহা, বাছা সেদিন শরীর ভাল ছিল না ব'লে, অমনি মুখে গেছে। অনেক দিন খবর পাইনি, কেমন আছে তাও জানিনে। যা না বাবা, একবার দেখে আয়। হ্যাঁ, বলিস্ ওবেলা এখানে খাবে।"—কথাটা আমিও ক'দিন থেকে ভাব্‌ছিলাম, কিন্তু, তাই ব'লে সকাল-বেলাকার এই আয়েসটুকু পণ্ড করায় সায় দিতে পারিনে; বল্লাম,—

—"এই এরি জন্যে এত কাণ্ড! সে তোমার নেমন্তন্নর পিত্যেশে হ্যাঁ ক'রে ব'সে আছে কল্‌কাতায়! কাল থেকে বড়দিন আরম্ভ হয়েছে না? হয় এলাহাবাদ নয় শ্যামনগর গেছেই। তাছাড়া এবেলা আর গাড়ীই বা কই, আট্‌টার প্যাসেঞ্জার ধরবারও সময় নেই। ওবেলা বিকেলের দিকে দেখা যাবে।"—

—"যা ভাল বুঝিস্ কর্। এবেলা যে তোর শেকড় ছিঁড়বে না তা কি আর জানিনে। ওবেলা যাস্ কিন্তু।" —মা চ'লে গেলেন।

সকালের পর্ব্ব এইখানেই শেষ।

সন্ধ্যাবেলা সুধাময়দের ওখানে হাজির হওয়া গেল। দেখা যে পাওয়া যাবে না তাতে একরকম নিঃসন্দেহ ছিলাম। প্রথমতঃ ছুটিতে সে বাইরে গেছেই—আর না গেলেও মেসে সে কখনই নেই। একটি শ্যামের বাঁশীর টানে ব্রজনাগরীরা সব গাগরী নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন, —আর এম্-সি-সি, হেগেনবেগ, টাট্টু এই ত্রয়ীর বাঁশীতে যেখানে সহরের হুজুগের যমুনায় উজান বইচে সেখানে সে-টান কাটিয়ে মেসের খুপ্‌ড়ী আঁক্‌ড়ে এই ভরাসাঁঝে প'ড়ে থাকবার মত গৃহ-প্রীতি আর যার থাক, সুধাময়ের যে নেই—এ আমি জান্‌তাম। কিন্তু বিস্ময়ের আর অবধি রইলো না, যখন দরওয়ান বল্লে 'বাবু ভিতরমে হ্যায়।

শঙ্কিত মনেই সিঁড়ি ধরলাম—সত্যিই কি ছোঁড়াটার অসুখ বিসুখ করলো না কি। হ্যাঁ অসুখই তো। দেখি, জানলার দিকে মুখ ক'রে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে—র‍্যাগ্‌টা দিয়ে পা অবধি মুড়ি দেওয়া!

"সুধা?"—

ক্ষীণকণ্ঠে সাড়া এল—"কে, বিনয়! আয়, বোস্"—

—"হ্যাঁ, এসেছি তো বটেই, দাঁড়িয়েও থাক্‌বো না, কিন্তু এর মানে কি বল্‌তো?"

—"কিসের?"

—"এই বড়দিন—বাড়ী যাস্‌নি; সন্ধ্যেবেলা, বাইরে বেরুস্‌নি; আপাদমস্তক কম্বল জড়িয়ে সন্ধ্যের অন্ধকারে প্রহেলিকা রচনা ক'রে প'ড়ে থাকার? ভাল আছিস্ তো?"

একটু চিম্‌সে হাসি হেসে বল্লে—"নাঃ শারীরিক কিছু নয়—"

—"তবু ভাল। তা মানসিকটা কি শুনি?"—ও নিরুত্তর।

—"কি রে ক্রমশই যে মিষ্টিক্ হ'য়ে উঠ্‌লি!" তবু জবাব নেই।

বিস্ময়টা বিরক্তিতে গিয়ে পৌঁছুলো; বল্লাম—"দেখ্ রহস্যটা তোর কাছে যত মজারই হোক, যে জানেনা তার কাছে সেটা যে একটা painful suspense এ মানিস্ তো। তবে এ-ভাবে আমাকে ভুগিয়ে লাভ কি?"

এইবার ওর বুলি ফুট্‌লো, বল্লে—"রহস্য নয় রে, সমস্যা।"

—"ঐ একই হোলো, সমস্যার মুখে যতক্ষণ ছিপি এঁটে রাখ্‌বি, ততক্ষণ সমস্যা মানেই রহস্য। সমস্যাটা কি শুনি?"

খানিকক্ষণ কি ভাব্‌লে, তার পর হঠাৎ করুণ আবৃত্তির সুরে ব'লে উঠ্‌লো—"বন্ধু, প্রিয়ার ইচ্ছা প্রেমের ধর্ম্মে বিরোধ বেধেছে আজ।"

এতক্ষণে অবস্থাটার রং ফিরলো, জিজ্ঞাসা করলাম "ইচ্ছার বিজ্ঞাপন কই?" ফস্ ক'রে বালিসের তলা

থেকে একটা গোলাপী রঙের খাম বের ক'রে হাতে দিলে। পড়্‌তে লাগলাম—

এলাহাবাদ
৮ই পৌষ, শনিবার।

প্রিয়তম,—

তোমার চিঠির উত্তর দেব দেব, ক'রে দেওয়া হ'চ্ছিল না। তুমি যেতে লিখেছ, আমিও তো তাই ঠিক্ ক'রেছিলুম। তাছাড়া, মন কেমন করাটা তো একচেটে নয় গো। কিন্তু মাঝখানে একটা বাধা গজিয়ে উঠ্‌লো। জিতুদার নাম তুমি শুনেছ বোধ হয়—সেই যিনি বিলেত গেছ্‌লেন। গেল সোমবার তিনি ফিরে এসেছেন। বেনারসে মামার কাছে উঠেছেন। কাকাবাবু বড় গোঁড়া, তুমি শুনেছ তো। প্রায়শ্চিত্ত না ক'রে ছেলেকে ঘরে তুল্‌তে পারবেন না। যাই হোক, তাঁর কাছ থেকে তাগিদ এসেছে সেখানে যাবার। বিয়ের পরে তো আর দেখেন নি। ইচ্ছেটা, অবিশ্যি, যুগল মূর্ত্তি দর্শনের,—কিন্তু সে কি ক'রে হবে। সামনে তোমার এক্‌জামিন। না, না, সে হয় না। শুধু নোট্ মুখস্থ ক'রে তো আর ডাক্তার হওয়া যায় না—জীবন-মরণের ব্যাপারে গোঁজামিল চল্‌বে না তো। আর চল্‌লেও আমার বর তা কখনই চালাবে না। সামনে বড়দিন, তার প্রতিটি দিন হবে তোমার সাধনার এক একটি সোপান। আর হ্যাঁ, সেই যে নতুন দুল গড়াতে দেবে ব'লেছিলে—হ'য়েছে কি? হ'লে, চিঠি পেয়েই পাঠিয়ে দিও। যদিই বেনারসে যাই। যে জোড়াটা আছে, তার প্যাটার্ন্‌টা নেহাৎ সেকেলে। যদি না হ'য়ে থাকে তো কাজ নেই। পড়াশুনোর ক্ষতি ক'রে হাঁটাহাঁটি কোরো না। ভেবো না। আমি ভাল আছি। তুমি কেমন আছ? সাবধানে থেকো। ইতি—

তোমার—চৈতালী।

পুঃ,—দেখ, মেজ্‌দি বল্‌ছিলো, তুমি হ'য় তো বড়-দিনের ছুটিতে শুট ক'রে পালিয়ে আস্‌বে এখানে। আমি বল্লুম, না, তার সামনে এক্‌জামিন, পড়াশুনো ফেলে আস্‌বার ছেলেই সে নয়। সত্যি, লক্ষীটি, আর কোন দিকে মন দিও না। ইতি—

—"বাবা, এ যে একেবারে গার্জেন-টিউটার রে! চৈতিটা তো ভারি মুরুব্বি বনে গেছে দেখ্‌ছি"—চৈতালী আমার দূর সম্পর্কে পিস্‌তুতো বোন।

সুধা একটু হাস্‌লে, গর্ব্বে কি দুঃখে বোঝা গেল না। বোধ হয় প্রতিবাদ বা সমর্থন কোনোটারই জোরালো ভাষা খুঁজে পেলে না।

বল্লাম,—"কিন্তু, মেয়েগুলো কি রকম স্বার্থপর হয় দেখেছিস্? উপদেশের এত ঘটার মধ্যেও দুল-জোড়াটার কথা ভোলেনি। আবার লেখা হ'য়েছে—না হয় তো কাজ নেই। একেই বলে 'খাব না, খাব না, আঁচলে বেঁধে দে'।—"

বন্ধুর কথাটা মনঃপূত হোলো না। বল্লে—"না রে, তা ঠিক নয়, ঐ যে কি বেনারস যাবে না কি লিখেছে,—তাই চেয়ে পাঠিয়েছে।" হাসি পেল। বল্লাম,—"সত্যি সুধা, তোদের দেখ্‌লে করুণা হয়। হিসেবের ভুল পাছে ধরা পড়ে ব'লে, তোরা ইচ্ছে করে নিজের অঙ্কে গোঁজামিল দিয়ে চলিস্। প্রেমুকতার মোহ তোদের চোখ্‌কে ভোলায় ভোলাক, কিন্তু এত পড়াশুনো-করা বুদ্ধিটাকে যে কি ক'রে ফাঁকি দিয়ে চলে বুঝ্‌তে পারিনে। মনকে তোরা এম্‌নি ক'রেই মরফিয়া দিয়ে অসাড় ক'রে রাখ্‌তে পারিস্ বটে!"

একটা সুগভীর বিশ্বাসের হাসি দিয়ে মুখখানিকে উদ্ভাসিত ক'রে সুধাময় বল্লে,—"সে তুই বুঝবিনে বোকা, চিরকাল থুব্‌ড়ো হ'য়ে থেকে। গোঁজা মিল আমরা দিইনেরে, মিল আমাদের হিসেবের শেষে আপনি এসে ধরা দেয়। আর দেখ্, মনের হাটে মুদীর দোকান খুলে ধনী হওয়া যায় না। অবশ্য তা তোকে বোঝাবার ধৈর্য্য এবং বিদ্যে আমার নেই। তবে এইটুকু জানিস্ যে প্রেম মানে ম্যাথ্‌মেটিক্স্ নয়, প্রেম একটা আর্ট্।" তার পর একটু রঙ্গের সুরে চুপিচুপি বল্লে,—"প্রেমে আগে পড়্, তবে তো প্রেমের মর্ম্ম বুঝ্‌বি।"

শেষের দিকটায় কান না দিয়ে জবাব দিলাম,—"হুঁ, আর্ট বই কি। তোমাদের প্রেমিকারা ফ্লার্ট করার বিদ্যায় যিনি যত নিপুণা তিনি তত বড় আর্টিষ্ট। বিরহী ভর্ত্তার ভাগে কলার ব্যবস্থা ক'রে যাঁরা এমন ক'রে ভাইয়ের অভ্যর্থনায় দেশভ্রমণে বাহির হ'তে পারেন,

অথচ দুটো কথার মার প্যাঁচে গৃহপালিত জীবটির গলায় পরাধীনতার শৃঙ্খল বেঁধে যেতেও পারেন, তাঁরাই তো আসল কলাবিৎ রে। প্রেম কি শুধু আর্ট, একেবারে ব্ল্যাক্-আর্ট্।"

কপট রোষের ঝঙ্কার দিয়ে সুধাময় বল্লে,—"এ রকম ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা তোর অনধিকারচর্চ্চা। আমি এর প্রতিবাদ করি।"

ওর কথা শুনে নয়, এই কপটতা দেখে গা জ্বলে গেল। অন্ধ আপনার চক্ষুহীনতা স্বীকার করে; তাই জগতের দয়া চায় এবং পায়। কিন্তু এই যে অন্ধবিশ্বাসাগুলি আপনাদের মূঢ়তায় মশ্গুল্ হ'য়ে বাইরের সাহায্য থেকে মুখ ফিরিয়ে ব'সে থাকে—এদের প্রতি অনুকম্পাও পাপ। গম্ভীর হ'য়ে চুপ ক'রে গেলাম।

নীরবতা ক্রমে বিসদৃশ হ'য়ে উঠ্তে ও-ই প্রথমে বল্লে,—"এই, চটুলি না কি? জানিস্ তো ভাই 'ভিন্নমতাঃ হি লোকাঃ।' রাগ করিস্ নে,—গরজ বড় বালাই, আবার আমাকেই খোসামোদ ক'রতে হবে।"

মুখের গাম্ভীর্য্য বজায় রেখেই জিজ্ঞাসা করলাম "কেন?"

—"কেন, আর। তোকে আমার দরকার ব'লে। আর সেই জন্যেই তো তোর এই আকস্মিক আবির্ভাব হ'য়েছে।"

—"কেন আবির্ভাব হয়েছে?"

—"পরিত্রাণায় সাধূনাং। দু'মাসের ওপর হ'তে চল্লো, একে দেখিনি ভাই।"

—"ওঃ, কিন্তু 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং'ও তো হ'তে পারে, এবং সেইটেই আপাততঃ অবতার মহাশয়ের প্রথম উদ্দেশ্য ব'লে ধ'রে নে।"

সুধাময় শঙ্কিত হ'য়ে ওঠার ভান ক'রে বল্লে—"সে আবার কিরে!"

—"এমন কিছু নয়,—শুধু তোমার অধ্যয়নরূপ তপস্যার বিঘ্নকারী এই প্রেমদানব বধ। ঠাট্টা নয়, সুধা, ও-সব ছেলেমানুষী ছেড়ে দে। চৈতি যা লিখেছে, তাতে কিছু সত্য আছেই। পাঠে লেগে পড়—চাই কি, একটু ধৈর্য্য রেখে নিজের ঔদাসীন্যটা দেখাতে পারিস্ তো প্রেমের সঙ্গে সম্মানও পাবি। আর দেখ্, পুরুষ একটু পরুষ না হ'লে—প্রেম ফ্রেম, বুঝিনে বাবা—নারীর কাছ থেকে অন্ততঃ আগ্রহ এবং মর্য্যাদা আদায় ক'রতে পারে না যে এটা ঠিক। তোদের বিশ্বকবিরও তাই তো মত। 'রাজারাণীতে' সুমিত্রা এক স্থানে বিক্রমকে বল্‌চে,—

—"তোমরা রহিবে কিছু স্নেহময়, কিছু
উদাসীন; কিছু মুক্ত কিছু বা জড়িত"—

আমি না হয় থুব্‌ড়ো, কিন্তু এই বুড়োকবির তো একবার বিয়ে হ'য়েছিল—প্রেমের মর্ম্ম কিছু জানেনই। তাছাড়া, কবিহিসেবেও এ ব্যাপারে তাঁকে অথরিটি ধরা যেতে পারে। আমায় না হয়, পাত্তা নাই দিলি"—একটু থেমে বল্লাম,—"তবে নেহাৎ যদি—" সুধা এতক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরের আলোকিত জনস্রোতের সঙ্গে মন ভাসিয়ে বসে ছিল। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে, আমার ডান হাতের মুষ্টি ওর মুঠোর মধ্যে শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—"যদি—যদি,—তার পর, বল্ ভাই বল্, —আমার মন বলছে এতক্ষণে তুই একটা খাঁটি কথা বলবি"

—"তার আগেই আমাকে মেডিকেল কলেজে যেতে হবে, কাঁধের খিল যে খুলে এল রে—উঃ!"

চট্ ক'রে শান্ত হ'য়ে গেল সুধা।—"এইবার বল"—কণ্ঠস্বরে বেশ একটু বিজ্ঞতাসুলভ ধীরতা এবং গাম্ভীর্য্য মিশিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বল্লাম,—"চৈতিকে লিখে দে, এখানে চ'লে আসুক। মানে, তোর খুড়িমার কাছে শ্যামনগরে। কাশী যাওয়া আপাততঃ স্থগিত থাক।"—ফিরে দেখি সুধা কখন চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়েছে,—মুখে চোখে একটা হতাশার ছায়া, অসহায় ভাব।

—"কি, রে, শয্যা নিলি যে!" ও নিস্তব্ধ।

—"সুধা?"—"কি?"—"শুলি যে?"—"সে হয় না।" "কেন?"

—"কারণ আছে।"

—"বাবাঃ, এতই যখন তোদের কারণ, তখন সে 'কারণের' গোলকধাঁধায় মিছে ঘোরাবার কি দরকার ছিল? পরামর্শ নেবার আগে তা বল্‌তে হয়"—

একটু ভেবে ও গম্ভীর স্বরে ব'লে উঠ্‌লো,— "তবে শোন্,

পুষ্পবাসরে প্রেয়সীর সাথে
প্রথম আলাপ ক্ষণে
দোঁহে একমনা বন্ধু হইব
পণ করিলাম মনে।
কভু তার কাযে দিব না ক বাধা
আপন মতের লাগি'
খেয়াল খুসীতে মিলিব তাহার
মনে মনে ভাগাভাগি।
প্রেমের পীড়নে সে সত্য হায়,
কেমন ভাঙ্গিব আজ"—

এতখানি ব'লে ফোঁস্ ক'রে একটা নিশ্বাস ফেল্‌লে। হাসির দমকায় পেটে সমুদ্র-মন্থন সুরু হ'য়েছিল। এতক্ষণে ওর সমস্যার সূত্র ধরা গেল। তাড়াতাড়ি হাসিটাকে বাগে এনে, বাকি লাইনটা মিলিয়ে দিলাম।

—"এতেক ভাবিয়া ফেলে নিশ্বাস
চৈতীশ দ্বিজরাজ"।

ভুল হোলো না। সুধাময় মানে চাঁদ, দ্বিজরাজ মানেও চাঁদ। রবিবাবুর "দ্রুমরাজে' আর আমার দ্বিজরাজে 'দ'য়ের অনুপ্রাসটাও মিল্‌লো। ও বল্লে—"হ্যাঁ ভাই, নিশ্বাস নয়, এটা নাভিশ্বাস—অবস্থাটা সেই রকমই দাঁড়িয়েছে প্রায়।"

চাকর অনেকক্ষণ আলো জেলে দিয়ে গিয়েছিল। টেবিলের ওপরে সুধার সিগারেট্ কেস্ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাতে ধরাতে বল্লাম,—"ততক্ষণ একটু চায়ের ব্যবস্থা কর দিকিনি। চট্ ক'রে একটা কিছু সমাধান বের করা সম্ভব নয়। বুদ্ধির মূলদেশ একটু ধূমায়িত ক'রে নি, জিবটাও একটু ভিজিয়ে নিতে হবে"—

রাত্রি আটটা বেজে গেল, কিছুই কিনারা হোলো না। তার পর একরকম জোর ক'রেই ওকে আমাদের বাড়ী নিয়ে চল্লাম। কিছুতেই যাবে না, শেষে মা'র কথা বলতে নরম হোলো। বল্লে,—"হ্যাঁ রে, বই-টই, খানদুই নেব না কি ?"—

বল্লাম,—"না, একটা রাত সিঁড়ি না গাঁথলেও চলবে। কাল এসে বরং একটা বড় ক'রে গাঁথিস্, পুষিয়ে যাবে।"

হাওড়ায় এসে দু'খানা বংশবাটীর ইন্‌টার ক্লাস কেটে গাড়ীতে চেপে বস্‌লাম।

তিন দিন পরের কথা। বেলা আন্দাজ তিনটে কি সাড়ে-তিনটে হবে, আমাদের বাড়ীর দরজায় একটি ঘোড়ার গাড়ী এসে দাঁড়াল। আগে একটি মেয়ে, পরে দুটি পুরুষ অবতরণ করলেন। মা সুধাময়ের মাথায় জলপটি দিচ্ছিলেন, আমি টেম্পারেচার চার্ট্‌টা ফেয়ার করছি। শব্দ শুনে দুজনেই তাকিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি মা ব'লে উঠ্‌লেন—"যা, যা, বৌমারা এলেন বোধ হয়।" দৌড়ে বাইরে গিয়ে দেখি বিশুয়া মোটঘাটগুলো ততক্ষণে নামিয়েছে। ঝঞ্ঝাহত মল্লিকাফুলের মত একটি তরুণীর দুটি বাহু শক্ত ক'রে ধ'রে একটি প্রৌঢ় ও একটি যুবক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। চৈতির কেশবাস অসংবৃত, সীঁথি নিরবগুণ্ঠন। তিনজনেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার পানে চাইলেন। আমার উত্তর যোগাল না। কখন মা এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে দেখে চৈতি একটি অস্ফুটস্বরে ফুঁপিয়ে উঠ্‌তেই মা বুকের ওপর টেনে নিয়ে বল্লেন,—"ভয় কি মা, সুধা আজ একটু ভালই আছে, বোধ হয় ঘুমিয়েছে। অসুখ হ'য়েছে, সেরে যাবে, ভাবনা কি। বিনু, তুই ওঁদের দেখ্।"

সুধার খুড়িমা কাল অনেক রাত অবধি জেগেছিলেন; মা তাঁকে জোর ক'রেই দুপুরবেলাটা বিশ্রাম নেবার জন্ত পাঠিয়েছিলেন। কথাবার্ত্তা শুনে তিনিও বেরিয়ে এসেছিলেন। চৈতিকে তিনি কোলের কাছে টেনে নিলেন। সুধীর এগিয়ে এসে বল্লে,—"বাবা হাত পা ধুচ্চেন, বিশুয়া আছে। সুধাবাবুর কি হ'য়েছে বড়দা?"

মা-ই উত্তর দিলেন, "সেই তো বাবা। সোমবার দিন আমি ডেকে পাঠিয়েছিলুম, বিনু ক'ল্‌কাতা থেকে নিয়ে এল ওকে। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া ক'রে দুজনে শুলো। কিছু নয়। সকালবেলা চা দিতে গেলাম, বল্লে,—মা, মাথাটা ধরেছে জলখাবার খাব না। বেলা এগারটা, বিনু কোথায় বেরিয়েছে, সুধাকে চান করবার কথা বল্‌তে গিয়ে দেখি গা গরম, চোখদুটি লাল হ'য়েচে। দুপুরবেলা ভুল বকতে লাগল। আমি ভয় পেয়ে

তোমাদের 'তার' করতে বল্লাম। বিশুয়াকে পাঠালাম, দিদিকে শ্যামনগর থেকে আনবার জন্তে। ঘুম নেই। কাল ভোর রাত্তিরের দিকে একটু তন্দ্রা এসেছিল।

সুধীর বল্লে,—"কে দেখ্‌ছে ?"

—"ওদেরই একটি বন্ধু, নতুন পাশ ক'রে বেরিয়েছে। আহা, কাল থেকে সে সমানে ছিল। আজ দুপুরে একটু ঘুমুতে দেখে তবে গেছে।"

সুধীরের বাবা এলেন। আমরা ঘরে গিয়ে দেখি, সুধা উঠে বসেছে। ধীরে ধীরে শুইয়ে দিলাম। কিছুই বল্লে না। অসংলগ্ন দু'একটা কথা—মনে হোলো, 'চৈতি' 'বেণারস' এমনি দু'একটা কি যেন বল্লে।

চৈতির চোখদুটি বারেক থই থই ক'রে উঠেই ভেসে গেল।

পাঁচ দিন সেবা ও ওষুধের সঙ্গে লড়াই ক'রে জ্বরটা নির্জীব হ'য়ে এল। আরো দিন দুই পরে সুধা পথ্য পেলে।

দুপুর-বেলা ওর ঘুমটাকে পাহারা দেবার জন্য আমি সুধীর ও চৈতি ওকে ঘিরে ব'সে আছি। মা খুড়িমা পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছেন। পিসেমশায় সুধাকে একটু ভাল দেখে এলাহাবাদ চ'লে গেছেন।

আমি বল্লাম—"সুধীর,'তার'টা তোরা পেলি কখন ?"

—"তা, দুটো নাগাত হবে। চৈতির তো আগের দিনই কাশী যাবার কথা মেজদির সঙ্গে। ও গেল না। সুধাবাবুর চিঠির অপেক্ষায় রইল। আমি বাড়ী ছিলুম না। 'তার' চৈতিই রিসিভ্ ক'রেছিল। এসে দেখি ঠিক ষ্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে আছে—কাগজখানা মাটিতে পড়ে। এক ফোঁটা জল নেই চোখে। বাবা ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন ওর জন্যে। সমস্ত রাস্তাটা গাড়োয়ান বা রেলের লোক ছাড়া একটিও কথা হয় নি কারো সঙ্গে। চৈতি পাথর না মানুষ বোঝবার জো ছিল না বড়দা।"

চৈতির পানে তাকাতে গিয়ে দেখি বাদল দিনের মেঘবিচ্ছেদে বারেকের রৌদ্র-বিভার মত একটি লজ্জারুণ হাসির ছটা ক্ষণেকের জন্য ফুটতে গিয়ে ঝরঝরো অশ্রু-আসারে ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেল। আর সুধার চোখের কোণ চক্ চক্ করছে। প্রকাণ্ড একটা পাহাড়ের তলায় এসে দাঁড়ালে নিজের অস্তিত্বটা যেমন অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে পড়ে, তেমনি কি যেন একটা বৃহতের সান্নিধ্য অনুভব ক'রে সহসা বড় ছোট হ'য়ে গেলাম। বহুক্ষণ সকলে নির্ব্বাক। ঘরের এই ধ্যান-গম্ভীর মৌনতা কোনো লঘু আলোচনার অবতারণা ক'রে ভঙ্গ করার রুচি এবং সাহস যেন কারো হোলো না। এমনিতর নিবিড়তম নীরবতার মাঝে সকলেই আপনার হৃদ্‌স্পন্দনের ধ্বনি শুণ্‌তে শুণ্‌তে আত্মোপলব্ধির স্বপ্নরাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় 'মূর্ত্তো বিঘ্নস্তপস ইব' নীরেন এসে ঘরে ঢুক্‌লো। বাঁ হাতে ওষুধের বাক্স, ডান বগলে হ্যাট্। সহাস্য অভিনন্দনে সকলকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি হে, আলোচ্য বিষয়টা কি ?" সুধীর পাল্টা হেসে জবাব দিলে—"এই রোগের ইতিবৃত্ত এবং আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী আর কি !"

—"আমি কিন্তু বেশ ছন্দে গেঁথে এর সংক্ষিপ্ত সঙ্কেতটি বলে দিতে পারি।"—সকলে কৌতূহলভরে নীরেনের দিকে তাকালাম। ও তেমনি রহস্যভরে ব'লে যেতে লাগলো—

> "প্রিয়ার ইচ্ছা প্রেমের ধর্ম্মে
> বিরোধ মেটাতে আজ,
> বংশবাটীতে মর মর প্রাণ
> বৌদীশ দ্বিজরাজ।"—

সুধীর ও চৈতি কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকাতে লাগ্‌লো। সুধাময়ের মুখ পোড়া ঘুঁটের মত ফ্যাকাশে। সকলের অলক্ষ্যে গোড়ালি দিয়ে নীরেনের জুতোর ওপরটা সজোরে মাড়িয়ে দিতেই ও উঃ ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো। বল্লাম "কি হোলো রে—"

বল্লে—"পায়ে একটা ফোস্কা হ'য়েছে, একটু অসাবধান হ'লেই লাগে।"

—"অসাবধান না হ'লেই পারিস্, লাগে যখন।"—তার পর লঘুহাস্যে সুধীরের দিকে ফিরে বল্লাম—"বলো কেন। নীরেনের কাব্য কথায় কথায়। মানে, চৈতির জন্যে মন কেমন ক'রে ক'রে সুধার অসুখ ক'রেছে এই অর্থ। রবিবাবুর সেই পণরক্ষা কবিতাটার প্যারডি ক'রে তাই বলা হোলো।"

নীরেন সহাস্যে সমর্থন ক'রে বল্লে—"সত্যিই বৌদির পতিভাগ্য দেখে, আমারই গৃহিণীর হ'য়ে হিংসে ক'রতে ইচ্ছে ক'রছে।"

আমি বল্লাম,—"তবু তো বৌদির কথা শুনিস্ নি ! তাহ'লে পরের হয়ে হিংসে করবার আগে নিজের অদৃষ্টের

ওপর বিভেষ্টায় আত্মঘাতী হতিস্।"—সুধার পত্নীভাগ্য এমনই।

সুধা এতক্ষণে সহজভাবে হাসিতে যোগ দিলে। সুধীর সুগভীর স্নেহ ও পরিতৃপ্তিপ্লুত দৃষ্টি দিয়ে পতিগত-প্রাণা বোনটির ক্লিষ্ট দেহমন যেন ধুইয়ে দিতে লাগ্‌লো।

বিশুয়া এমন সময় একখানা চিঠি নিয়ে এল। এলাহাবাদের ছাপ। সুধীরের হাতে দিলাম। সুধীর পড়ে বল্লে, "বাবা লিখেছেন শোনো বড়দা—

বাবা সুধীর, তোমার শেষ পত্রে শ্রীমান্ সুধাময় ২১৷ দিনের মধ্যেই অন্নপথ্য করিবেন শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। শ্রীমান্ একটু বল পাইলেই তুমি তাঁকে লইয়া এখানে চলিয়া আসিবে—

সুধা বাধা দিয়ে বল্লে "কি ক'রে হবে ভাই, পরীক্ষা আস্‌ছে"—

সুধীর পড়্‌তে লাগলো—পড়াশুনার জন্য যেন আপত্তা না হয়। আমার বিবেচনায় স্বাস্থ্যের কথা আগে ভাবা উচিত। এ সম্বন্ধে বৈবাহিকা ঠাকুরাণী-গণের সহিত এবং ডাক্তারবাবুর সহিত পরামর্শ করিও। তোমার গর্ভধারিণী ও বাটীর সকলেই শ্রীমান্ শ্রীমতীর জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া আছেন। আমার স্নেহাশীষ লইও। সম্ভব হইলে ৺কাশীধাম হইতে শ্রীমান্ জিতেন্দ্র বাবাজীকে লইয়া আসিও। ইতি—

আঃ শ্রীসন্তোষকুমার বসু

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, চৈতালী কোন্ ফাঁকে উঠে গেছে। সুধীর চিঠি নিয়ে তার সন্ধানে বাড়ীর মধ্যে গেল।

নীরেন বল্লে, "সেই বিয়ে হয়, তবু কনে সোন্দর নয়। জীতুবাবুর সেই যুগল রূপ দর্শন ঘটলো—কেবল নিরর্থক কতগুলি প্রাণীর দুর্ভাগ্যের পর।"

সুধা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। সহসা দশ দিনের সদ্য-পতিকরা রুগী সিংহবিক্রমে লাফিয়ে উঠে নীরেনের টুঁটি টিপে ধরলে।

—"ওরে বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন"—

নীরেন প্রাণপণ বলে ছাড়িয়ে নিয়ে ওকে ঠেলে দিয়ে বল্লে,—'থাম হতভাগা। তবু তো "হত ইতি গজঃ" করেছি। কতখানি শাস্তি হওয়া উচিত তোর এই পাষণ্ডতার জন্যে ভেবে দেখ্‌গে যা।"—সুধা অত্যন্ত দুর্ব্বলের মত বিছানায় এলিয়ে পড়ল। বল্লে,—

"সত্যি, নীরো। বিনু, দুল জোড়াটা এনেছিস্?" কণ্ঠস্বর খুব কাতর। আমি পকেট থেকে ছোট্ট কেস্‌টি বের ক'রে খুলে ধরতেই—প্রোজ্জ্বল হীরার তীব্র দ্যুতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মত তিনজনের চোখে ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়তে লাগ্‌ল।

অনেকক্ষণ পরে সুধা খুব শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে বল্লে,—"নীরো, ওর কাছে আগাগোড়া সব খুলে বল্‌বো। আমি মনস্থির করেছি।"—মুখে একটা মরিয়া ভাব; বুঝলাম বাধা দেবার বাইরে।

নীরেন একটু বিব্রতভাবে বল্লে,—"দেখিস্ ভাই, কেলেঙ্কারী বেশী দূর যেন গড়ায় না।" চৈতি চিঠিখানা নিয়ে ঢুকতেই আমরা সুট্ ক'রে স'রে পড়লাম।

সেদিন রাত্রে নীরেনের সঙ্গে কলকাতায় পালালাম। মাকে বলা ছিল রাত্রে ওদের ওখানে খাব। খুনী আসামীর পুলিসের কাছে যাবার যেটুকু সাহস থাকে, চৈতির সান্নিধ্যে যাওয়ার সেটুকু ভরসাও ছিল না আমার। রাগ হচ্ছিল সুধার ওপর। দুর্ব্বলচিত্ত, ধর্ম্ম-জ্ঞানী কোথাকার!

পরের দিন ওদের ব্যাণ্ডেলের গাড়ী ধরিয়ে দিতে যেতে হোলো। নীরেনও এসেছিল। সুধা চৈতি গাড়ীতে বসে আছে। আমরা টিকিট কাটা, মালপত্র তদারক নিয়ে কোনো গতিকে সময়টুকু কাটিয়ে দেবার ফিকিরে আছি। আর মিনিট পাঁচেক কাটাতে পাল্লেই হয়। হঠাৎ সুধার গলা এল। "নীরেন, বিনু।" তাকিয়ে দেখি হাতছানি দিয়ে সুধা ডাক্‌ছে। চৈতিও। রাগে গা রি রি করতে লাগ্‌ল। সব ওর চক্রান্ত। কাছে যেতে চৈতি বল্লে,—"বড়দা, কেন তোমরা এমন লজ্জিত হ'চ্ছো। আমি জানি সমস্ত ওর দোষ।"

যার ওপর দোষারোপ করা হোলো সে দন্তবিকাশ করে হাস্‌ছিল। কারণ, তার মনের অবস্থা তখন পরম-হংসের মত। নিন্দাস্তুতির অতীত। ষ্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে গালাগালি দিলে, নেপথ্যের সম্পর্কে দাগ লাগে

না তো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ওদের যা বোঝা-পড়া হ'য়েছে, তাতে সুধা শুয়ার নিজের জন্যে ওকালতি করতে একটুও কসুর করেনি। আবার ঢং ক'রে বল্‌তে গেল—"জান চৈতি, বিনু আমায় গোড়া থেকেই বারণ করেছিল, কিন্তু আমি—"

—"থাম তুই!" ধমক খেয়ে ও চুপ ক'রে গেল।

তার পর চৈতির ডানহাতটা টেনে নিয়ে বল্লাম—"দোষ নয় রে, আমাদের অপরাধ। আর তার ভাগ সকলেরই সমান আছে। তুই আমার ছোট বোন, অকল্যাণের ভয়ে তোর কাছে ক্ষমা চাইতে পারিনে। তবে এইটুকু করিস্ ভাই,—পিসিমা পিসেমশায়, এমন কি সুধীরের কানেও যেন ওঠে না দেখিস্।"

—"তুমি কি পাগল হ'য়েছ বড়দা।"

—দেখ্ চৈতালী, মানুষের জীবনটা যেমন বছরের পর বছরের মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে, তার মনটাও তেমনি মত থেকে মতান্তরের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। এই ভুলের ভেতরেও আমি অনেক সত্য লাভ ক'রেছি, যার দাম আছে।"—সুধা ও চৈতি যেন একবার পরস্পর চোখে চোখে কি ব'লে নিলে, মনে হোলো। কিন্তু আমি না দেখারই ভান করলাম।

নীরেন বল্লে, "বিনু যা বল্লে, তা আমারও কথা বৌদি, আমিও চক্রান্তকারীদের অন্যতম। কিন্তু মাপ চাওয়ার কথা তুলবার সাহস আমার সবচেয়ে কম।"

চৈতি স্নিগ্ধ হেসে জবাব দিলে,—"কিন্তু অপরাধের সঙ্গে সঙ্গেই তো 'ফাইন' দেওয়া সুরু করেছিলেন। চিকিৎসক ওষুধের সঙ্গে নিজের গাঁট থেকে এমন দামী দামী টিন ভর্ত্তি বিলিতি পত্তির ব্যবস্থা করলে দেবতাদেরও যে অসুখ করবার সখ হয়। তবে পেশাদার পূজুরী বামুনরা অত গোপনে অমন ভোগ-নিবেদন সরবরাহ করতে পারেন না এই যা দুঃখ। আচ্ছা সুস্থ মানুষের গায়ের উত্তাপ অমন চমৎকার ভাবে বাড়াবার বিদ্যে কি ডাক্তারী শাস্ত্রেই লেখা আছে? না, রসুন বগলে রাখার অভিনব ব্যবস্থার কোন উপশাস্ত্র আছে?"

নীরেন হেসে জবাব দিলে,—"না, ওটা ইন্‌ষ্টিংটিভ্ জ্ঞান। বাল্যে আয়ত্ত করেছিলাম। বিদ্যালয়টা খুব মনোরম লাগতো না, এবং মাষ্টার মশাইদের কাছেও কোনো সহানুভূতির আশা ছিল না ব'লে এই রসুন-মার্গই বেছে নিতে হ'য়েছিল, মুক্তির সন্ধানে।

"কিন্তু বাল্যে যা মুক্তির কারণ হ'য়েছিল, আজ তা প্রায় নিরয়গামী করেছিল আর কি! কপালজোর, যাঁর কাছে অপরাধ, তিনি ধরিত্রীদেবীর চেয়েও ক্ষমাশীলা—এ যাত্রা তাই নিস্তার পেয়ে গেছি।"

চৈতালী কানের নতুন দুল জোড়াটি ছেলেমানুষের ভঙ্গীতে দেখিয়ে বল্লে,—"বলেন কি, এমন ঘুস পেলে যে চিত্রগুপ্ত ও যিশুখৃষ্ট হ'য়ে পড়েন। ক্ষমা কি অমনি আসে?"

নীরেন বল্লে,—"ও নাকুর বদলে নরুণ বৌদি"—

আমার মুখে কে যেন এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দিলে। চৈতি তা লক্ষ্য ক'রেই বলে উঠ্‌লো,—"বড়দা কিন্তু ভারী হয়ে, এখনও মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যাঁ বড়দা, দুল তুমি পছন্দ করেছ না?—ওর যা পছন্দ, ও নইলেই বা এমন চমৎকার জিনিষ কিন্‌বে কে? নিশ্চয়ই তোমার পছন্দ।"—ওর প্রতি স্নেহে এবং কৃতজ্ঞতায় হাস্‌তে হোলো, এমনি আবদার ছিল সুরে।

গাড়ী ন'ড়ে উঠ্‌তেই নীরেন বল্লে, 'নমস্কার বৌদি'।

চৈতি প্রত্যভিবাদন ক'রে তাড়াতাড়ি আমার পায়ের ধূলো নিলে।

সুধীর একরাশ পান নিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লো। গাড়ী চল্‌ছে, নীরেন মুখ বাড়িয়ে বল্লে,—"একটু সাবধানে যাবেন সুধীরবাবু।"

সুধীর ব্যস্তভাবে উত্তর দিলে—"হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, কোনো ভয় নেই, সেখানে বাবা সবই ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন।"—

একটা কৌতুকের উচ্ছ্বাস চারজনের চোখে উথ্‌লে উঠতেই আমি তাড়াতাড়ি পেছন ফিরলাম। হাস্‌তে আমার তখনও লজ্জা করছিল। ওরা দুজনে যে প্রাণ খুলে হাস্‌তে হাস্‌তে যাবে তা জান্‌তাম। ওদের আকাশে তো কুয়াসা জমে থাকে না। নিবিড় মেঘ যখন ঘনিয়ে আসে, আসে। খানিকক্ষণ পরে আবার যখন সে মেঘ নিঃশেষে ঝ'রে যায়, ওদের ভিজে ডানার ধোওয়া পালকে তখন সোনালি কিরণ ঝিক্‌মিক করে।

অসাধ্য সাধনা

শ্রীধনঞ্জয় শর্ম্মা

দেবি! বহু চাটুকার মিলেছে তোমার পত্র-তলে
বহু মৎলব আনি';
আমি অভাগ্য বহিয়া এনেছি এই বগলে
গোপন রচনাখানি।

তুমি বুঝিয়াছ আমার চালাকি,
ধরিয়া ফেলেছ বিদ্যার ফাঁকি,
তবু মনে মোর স্পর্দ্ধা ত রাখি
দিবসনিশি।
মনে যাহা ছিল, জানিল তা পর,
শিব গড়িবারে হ'ল তা বাঁদর,
বুদ্ধির সাথে ফন্দী ইতর
গিয়াছে মিশি'।

তবু ওগো দেবি! বহু মেহনতে পরাণপণ
চরণে দিতেছি আনি'—
মোর এই মূঢ় দাম্ভিকতার পরম ধন
ব্যর্থ রচনাখানি।
ওগো, ব্যর্থ রচনাখানি—
দেখিয়া হাসিছে চারিধারে আজি
যত জ্ঞানী অজ্ঞানী!

তুমি যদি তবু ক্ষমি' অপরাধ
ভুলি' দেশজোড়া এই অপবাদ
লহ নিজে এই কৈতববাদ
করুণা মানি';
সব নিন্দারে ভুলিবে আমার
ব্যর্থ রচনাখানি।

দেবি! পাঁচশ' বছর কত জ্ঞানীগুণী শুনা'ল গান
কত না যত্ন আনি',
আমি আসিয়াছি ফাঁকতালে তারি লভিতে মান
বাজায়ে বগলখানি।

তুমি জান দেবি,—জানি নাক কিছু,
তবু তাহাদেরি করিবারে নীচু,
ছুটিয়া চলেছি দুরাশার পিছু
উচ্চরবে;
মনে যে কথার আছিল আভাস,
যে কাজ সাধিতে করেছিনু আশ,
বিদ্যার দোষে হয়ে গেল ফাঁস,—
জানিল সবে!

বোকা হয়ে তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সভার মাঝে
কথা ফুটিছেনা আর,
উপাধির ঝুলি লাগিলনা, দেখি, এ হেন কাজে,
মুখ তুলে' চাওয়া ভার।

ওগো, বিদ্যার ঝুলি!
হাসিয়া তোমায় দেখায় সবাই
জোড়া বৃদ্ধাঙ্গুলি।
তুমি যদি শুধু কর গো আদর,
কষ্টিতে তব কসে' লও দর,
লুটায়ে লব ও চরণের পর
চরণধূলি;
ছিল যা আশায়, ফুটিবে ভাষায়
প্রলাপ-বুলি!

দেবি! এ বয়সে আমি করেছি যোগাড় অনেক মান,
পেয়েছি অনেক ফল,
সে আমি বিশ্ববিদ্যালয়েরে করেছি দান,
ভরেছি এ করতল।

শিখি নাই যাহা, শিখাইতে যাই,
বেতনের তা'য় কোনো ক্ষতি নাই,
বাংলাভাষার মাথাটি চিবাই
ছাত্রমাঝে;—
মরে' তবু বেটি পরলোকে, হায়,
পুত্রের কাছে পিণ্ড সে চায়,
সাজাইতে তাই তোমারি পাতায়
চাই যে লাজে!

খাস্-বাগানের তাই এ একশ' বাছাই কলা
চরণে দিতেছি আসি'—
খোষ্-খেয়ালের খোসামদে-ভরা পচা ও গলা
বিফল কদলীরাশি!

ওগো, বিফল বাসনারাশি—
দেখি' চারিধারে ঘরে-পরে সবে
হাসিছে ঘৃণার হাসি।
তুমি যদি তবু ভালো বলো খালি,
তোমারি দলটি দেয় করতালি,
সেই দেমাকের 'চেরা'ক'টি জ্বালি'
যাইব ফাঁসি।
তুমি খালি তব কচুর পাতায়
বাজিও আমার বাঁশী।

সাময়িকী

সেচ ও ম্যালেরিয়া—

কৃষিকার্য্যের জন্য সেচের প্রয়োজন এই কৃষিপ্রধান দেশের অধিবাসীরা বহুকাল হইতে উপলব্ধি করিয়া আসিয়াছে। প্রসিদ্ধ এঞ্জিনিয়ার সার উইলিয়ম উইল্‌কক্স এমন মতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, এ দেশে অনেক নদীই মানবের খনিত খাল। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন তিনি রূপক বলিয়া অনুমান করেন। সে যাহাই হউক, এ দেশের লোক যে সেচের প্রয়োজন উপলব্ধি করিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানেই পূর্ব্বে বৎসর বৎসর বর্ষার সময় নদী ও নালা কূল ছাপাইয়া জমীর উপর জল ছড়াইয়া দিত; সেই পলীপূর্ণ জল ক্ষেত্রের উপর পড়িয়া যেমন ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিত, তেমনই গ্রামের মধ্যে পুষ্করিণী প্রভৃতির বদ্ধ জল দূর করিয়া সে সকলে নূতন জল ও মৎস্যের "পোনা" প্রদান করিত। যে সব স্থানে নদী বা খালের অভাবে এইরূপ সেচের ব্যবস্থা করা যাইত না, সে সব স্থানে পুষ্করিণী ও বাঁধে জলসঞ্চয়ের কিরূপ সুব্যবস্থা ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুরে দেখিতে পাওয়া যায়।

মুসলমান-শাসনেও এ দেশে—বিশেষ দিল্লী অঞ্চলে প্রাসাদে পানীয় জল সরবরাহের ও সেচের জন্য খাল খনিত হইয়াছিল। ইংরাজ-শাসনে সেচের জন্য খাল খননের ব্যাপার বিরাট হইয়াছে। এখন সেচের খালে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে মরুভূমি শস্যশ্যামল হইয়াছে। পঞ্জাবে প্রায় ৯০ লক্ষ একর জমী সেচের খালে শস্যপ্রসূ হইয়াছে। মাদ্রাজে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীদ্বয়ের জল খালে প্রবাহিত করার ফলে প্রায় ৯০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। এই সব খাল খননের ফলে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার বার্ষিক মূল্য খাল খননের ব্যয়ের চতুর্গুণ। আজ বার বৎসর মাত্র পূর্ব্বে শক্করবাঁধ ও খাল প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতে ৭৫ হাজার মাইল সেচের খালে প্রায় ৫, কোটি একর জমীতে সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কিন্তু ইংরাজের শাসনে সেচ সম্বন্ধে বাঙ্গালা অসঙ্গত-রূপে অবজ্ঞাত হইয়া আসিয়াছে। কোটি কোটি টাকার অতি সামান্য অংশই বাঙ্গালায় ব্যয়িত হইয়াছে—সে ব্যয় উল্লেখযোগ্যই নহে। গতবৎসর বর্দ্ধমানের নিকটে যে দামোদরের খাল খনন শেষ হইয়াছে, তাহার পরিচয় আমরা যথাকালে পাঠকদিগকে দিয়াছিলাম। তাহা বাদ দিলে বাঙ্গালায় খনিত খাল উল্লেখযোগ্যই নহে। মেদিনীপুরে খালের দৈর্ঘ্য ৭২ মাইল এবং হিজলীর খাল মাত্র ২৯ মাইল দীর্ঘ। কতকগুলি মজা নদীতে জল দিবার উদ্দেশ্যে যে ইডেন খাল খনিত হয়, তাহাও ক্ষুদ্র এবং তাহা খননের উদ্দেশ্যও এতদিন সফল হয় নাই—এখন দামোদর খাল হইতে তাহাতে জল দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাঙ্গালা নদীমাতৃক—এই ভাগ্যবান প্রদেশে প্রকৃতিই সেচের কায সুসম্পন্ন করেন, এই বিশ্বাসে বাঙ্গালায় সেচের খাল খনিত হয় নাই। অথচ বাঁধে, রেলের রাস্তায় ও অন্যান্য উপদ্রবে বাঙ্গালার নদীগুলিও মজিয়া যাইতেছে। এককালে যাহা বাঙ্গালার সম্পদ ছিল, এখন তাহা বিপদে পরিণত হইতেছে।

সেই জন্যই দামোদর খাল খননে আমরা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম।

সেচের জল কৃষির জন্য প্রয়োজন। কিন্তু বন্যার জলে যেমন কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয়, তেমনই লোকের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। বিলাতে ট্রেন্ট প্রভৃতি নদীর কূলে কৃষকরা নদীর ঘোলা জল ক্ষেত্রে লইয়া যায় ও জলের পলী জমীতে পড়িলে, জল ছাড়িয়া দেয়। ইটালীতে জমীর উপর জল লইয়া পলীতে জমী উচ্চ করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া নিবারিত হয়। যে স্থানে প্রয়োজন এই ব্যবস্থা করিবার জন্য ইটালীর সরকার আইন করিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন।

সংপ্রতি সরকারের সেচ বিভাগ বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া

প্রশমনকল্পে বন্যার জলে সেচের ব্যবস্থা করিয়া যে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার ফল কিরূপ হয় জানিবার জন্য দেশের লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন।

মেদিনীপুরের কতকগুলি স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপ লক্ষ্য করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার পেডী এই পরীক্ষার আয়োজন করেন। মেদিনীপুরের খালের জলে সেচের ব্যবস্থা করিলে ফল কিরূপ হয়, তাহা দেখিবার সঙ্কল্প করিয়া তিনি স্বাস্থ্য ও সেচ বিভাগদ্বয়ের মতজিজ্ঞাসু হয়েন। স্থির হয়, খালের জল জমীতে লইয়া ধান্যক্ষেত্র ও অন্যান্য জমীর উপর যথাসম্ভব অধিকক্ষণ রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। প্রথমে স্থির হয়, নারায়ণগড়, পিঙ্গলা ও দেবরা থানায় যে সব স্থানে শতকরা ৫৫ হইতে ৮৪ জন বালকবালিকার প্লীহা বিবর্দ্ধিত, খালের কূলস্থ সেই সব স্থানে প্রথম পরীক্ষা হইবে। মিষ্টার পেডী জানিতেন, নূতন কোন কায অজ্ঞ জনগণ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। সেই জন্য প্রচার কার্য্যের দ্বারা লোকমত গঠনের অভিপ্রায়ে ও জল দিবার ব্যবস্থাভার লইবার জন্য তিনি স্থানীয় সমিতি গঠিত করেন। ইহার ফলে অনেক গ্রামবাসী লিখিয়া দেন, যদি সেচের ফলে তাঁহাদিগের কোন ক্ষতি হয়, তাঁহারা সে জন্য কাহাকেও দায়ী করিবেন না। নারায়ণগড় ও পিঙ্গলা থানার এলাকায় মোট ৩ হাজার ৫ শত একর জমীতে জল লইবার ব্যবস্থা হয়। বর্ষা সাধারণতঃ যে সময় হয়, তাহার পূর্ব্বে হওয়ায় সে বৎসর জুন মাসে দেখা যায়, ক্ষেত্রের ধান্য সেচ সহ্য করিতে পারিবে না; সেই জন্য জুলাই মাসে কায আরম্ভ করা হয়। পরীক্ষাক্ষেত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভক্ত করা হয় এবং যাহাতে এক ক্ষেত্র হইতে জল অন্য ক্ষেত্রে যাইয়া শস্য নষ্ট না করে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখাও হয়।

এ দিকে স্থানীয় সমিতিসমূহের চেষ্টায় স্থানীয় লোকরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কার্য্যে সহযোগী হয়। ছোট ছোট নালা কাটিয়া খালের রক্তবর্ণ পলীপূর্ণ জল পুষ্করিণী হইতে পুষ্করিণীতে ও ডোবা হইতে ডোবায় লওয়া হয়। পিঙ্গলা থানার এলাকার লোক পরীক্ষা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ বলিয়া তথায় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন হইয়াছিল। পুষ্করিণীর ও ডোবার ব্যাধিবীজপূর্ণ বদ্ধ জল বাহির হইয়া কালিয়াঘাই নদীতে ও পাঁচথুবীর খালে পতিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন জলে সে সব পূর্ণ হয়।

এই সময় মশকডিম্বের পরীক্ষায় স্থির হয়, এই সব জমীতে আর একবার সেচ দিতে হইবে এবং অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে তাহাই করা হয়। ইহার পূর্ব্বেই এই পরীক্ষার প্রবর্ত্তক মিষ্টার পেডী আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছিলেন। মিষ্টার বার্জ্জ যখন ম্যাজিষ্ট্রেট তখন, পরীক্ষাফল লক্ষ্য করিয়া, প্লাবিত গ্রামসমূহের ও নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামের অধিবাসীরা তাঁহার সভাপতিত্বে এক সভায় সমবেত হইয়া সেচ-কার্য্য পরিচালিত ও বিস্তৃত করিতে অনুরোধ করেন।

গ্রামের লোকের সহযোগিতায় এরূপ কার্য্য কিরূপ সহজে ও স্বল্পব্যয়ে সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহা এই পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে। ব্যয়ের পরিমাণ—

নারায়ণগড় এলাকায়	১৭ টাকা
পিঙ্গলা থানার এলাকায়	৯০ "

ইহার ফল কিরূপ হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায়—

(১) যে স্থানে সেচ দেওয়া হইয়াছে, তথায় সেচের পূর্ব্বে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে, মৃত্যুর হার ৪২ ছিল, সেচের পর তাহা ২৬ হইয়াছে এবং ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বরে মৃত্যুর হার ২৩ হইতে ১৫ হইয়াছে।

(২) দুই হইতে দশ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাকে পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, যে স্থানে শতকরা ৪৫ জনের প্লীহা বিবর্দ্ধিত ছিল, সেই স্থানে শতকরা ২৪ জনের প্লীহা বিবর্দ্ধিত।

এক বৎসরের পরীক্ষাফলে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে। কারণ, কোন অজ্ঞাত কারণে কোন কোন বৎসর যেমন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ প্রবল হয়, তেমনই আবার কোন কোন বৎসর প্রশমিত হয়। সেই জন্য আরও কিছুদিন পরীক্ষা প্রয়োজন। কেবল তাহাই নহে—ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানেও এইরূপ পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত করা প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য। যে সব স্থানে নদী বা খাল নিকটে নাই, সে সকল স্থানে কি ব্যবস্থা করা যায়, তাহাও চিন্তার বিষয়।

কারণ, ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালার যে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা অসাধারণ। বৎসর বৎসর ম্যালেরিয়ায় বঙ্গদেশে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার হইতে ৪ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু কেবল মৃত্যুসংখ্যাতেই ইহার অপকারিতা সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। যে স্থানে এক জনের মৃত্যু হয়, সে স্থানে হয়ত একশত জন রোগাক্রান্ত হয়—যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারাও অনেকে জীবন্মৃত অবস্থায় থাকে। তাহাদিগের উদ্যম, উৎসাহ, শক্তি ও প্রজননক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয়। তাহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য পরিচালিত কার্য্যেও বিঘ্ন ঘটে এবং বাঙ্গালীর দারিদ্র্য-বৃদ্ধি হয়।

বাঙ্গালা ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও শক্তি কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয়ের অভাব নাই। আমরা এক জন বিদেশী লেখকের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি। মিষ্টার কোলসওয়ার্দ্দী গ্রাণ্ট প্রসিদ্ধ শিল্পী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার পল্লী-জীবন সম্বন্ধে যে সচিত্র মনোজ্ঞ পুস্তক ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি মালনাথ (মোল্লাবেড়ে) নামক নীল-কুঠীতে সংঘটিত নিম্নলিখিত ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন।—

"একবার মালনাথে সমবেত অতিথিদিগের মধ্যে এক জনের কলিকাতায় একখানি পত্র পাঠাইবার প্রয়োজন হয়। পত্রখানি পরদিন প্রাতেই কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিতে না পারিলে সে সপ্তাহে বিলাতী ডাকে যায় না। কুঠীর মালিক বরকন্দাজ রুদী বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করেন, সে কি কিছু বক্‌শিষ পাইলে পত্রখানি পরদিন প্রত্যূষে কলিকাতায় বেঙ্গল ক্লাবে পৌঁছাইয়া দিতে পারে? তখন তিনি জানিতেন না যে, বিশ্বাস সেই দিন প্রাতে ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী চাকদা হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছে। বিশ্বাস সম্মত হয় ও অপরাহ্ণ ৪টার সময় বাহির হইয়া মাঠের পথে সারারাত্রি চলিয়া প্রত্যূষে ৪টার সময় যথাস্থানে পত্রখানি পৌঁছাইয়া দেয়। ১২ ঘণ্টায় সে ৫২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিল! নৌকায় সন্ধ্যায় চাকদায় পৌঁছিয়া সে আবার ১৬ মাইল হাঁটিয়া মালনাথে পৌঁছায়।"

এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

বাঙ্গালায় ডাক্তার বেণ্টলী ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, বন্যার জলের সেচ বন্ধ হওয়াতেই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও বাঙ্গালার জমীর উর্ব্বরতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন বটে, বন্যার জলে জমীতে পলী পড়ায় যে ফশলের ফলন বর্দ্ধিত হয়, তাহা নহে, পরন্তু ধান্যের ক্ষেত্র দিয়া জল যখন বহিয়া যায়, তখন ধান্যের মূল তাহা হইতে যে উদযান আকর্ষণ করে, তাহাতে গাছ সতেজ হয় ও ফসল ভাল হয়। আমরা এই মতের সমর্থন করি না বটে, কিন্তু এই মতেও বন্যার প্রয়োজন প্রতিপন্ন হয়।

যিনি নীল নদের সেচের সুব্যবস্থা করিয়া মিশরে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সার উইলিয়ম উইল্‌কক্স পরিণত বয়সে বাঙ্গালায় আসিয়া—বাঙ্গালার অবস্থা দেখিয়া যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বন্যার মূল্যবান রক্তবর্ণ জল প্রচুর পরিমাণে জমীতে দিয়া জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি ও ম্যালেরিয়া নাশ—বাঙ্গালায় প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। শীতকালের আরম্ভে যে সেচের জল দেওয়া হয়, তাহাতে এতদুভয়ের কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। যে বৎসর বৃষ্টি অল্প হয়, সেই বৎসরই দ্বিতীয় সেচের প্রয়োজন হয়। প্রথম সেচের জন্য কখন জলের অভাব হয় না; দ্বিতীয় সেচের জন্য যে জল পাওয়া যায় তাহা অসীম নহে। প্রথম সেচ নিতান্ত প্রয়োজন; দ্বিতীয় সেচ না দিলেও চলে—তাহা বিলাস। প্রথম সেচে জমীতে বন্যার পলীপূর্ণ জল আসিলে ক্ষেত্রে গাছের এমন তেজ হয় যে, তাহা যে ভাবে অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে—সে সেচে বঞ্চিত গাছ তাহা পারে না। নির্জ্জীব শস্যক্ষেত্র ও নির্জ্জীব মানব—একই স্থানে দেখা যায়।"

তিনিই আর একস্থানে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন :—

"২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯২৮ খৃষ্টাব্দে) তারিখে আমি ডাক্তার বেণ্টলীর সহিত লালগোলা ঘাট হইতে আসিতে-ছিলাম। আমরা প্রথমে যে ৯।১০ মাইল স্থান অতিক্রম করি, তাহাতে শস্যক্ষেত্র সতেজ গাছে পূর্ণ। তাহার পর আমরা যে স্থানে উপনীত হই—তথায় ক্ষেত্রের অবস্থা দেখিয়া আমার মনে হয়, পঙ্গপাল শস্যক্ষেত্রে গাছ নষ্ট করিয়াছে। ডাক্তার বেণ্টলী আমাকে বুঝাইয়া

দেন—বাঁধের জন্য তথায় বন্যার জল জমীতে উঠিতে পারে নাই।"

বাঁধে বাঙ্গালার স্বাস্থ্য ও উর্ব্বরতা কিরূপ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা গত বর্দ্ধমান বন্যায় দেখা গিয়াছিল। সে বার দামোদর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গ্রাম ভাসাইলে ম্যালেরিয়া যেরূপ অল্প হয় ও ফশলের ফলন যত অধিক হয় তাহা বহুদিন দেখা যায় নাই। প্রাকৃতিক নিয়মে যে ভাবে বন্যার জল জমীতে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা নষ্ট করা কথনই সঙ্গত ও কল্যাণকর হইতে পারে না।

মেদিনীপুরে যে সব স্থানে বন্যার জলে সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে, সে সব স্থানে ম্যালেরিয়া নিবারণই প্রধান উদ্দেশ্য থাকায় ফশল সম্বন্ধে আবশ্যক সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সে সংবাদ সংগ্রহের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

আমরা জানিয়া প্রীত হইলাম যে, বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জিলাত্রয়ের কোন কোন স্থানে—মেদিনীপুরের দৃষ্টান্তে—সেচের ব্যবস্থার আয়োজন হইতেছে। দামোদর নদের, ইডেন খালের ও নবনির্ম্মিত দামোদর খালের জল লইয়া সেচ ব্যবস্থা করা হইবে—তাহারই কল্পনা হইতেছে। নদীয়া বিভাগের কোন কোন স্থানেও পরীক্ষা হইবে। আমরা আশা করি—এখন হইতে যে স্থানেই বন্যায় সেচের ব্যবস্থা হইবে, সেই স্থানেই যেমন তাহাতে লোকের স্বাস্থ্য কিরূপ হয় অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিরূপ প্রশমিত হয় তাহা দেখা হইবে তেমনই ফশলের ফলনবৃদ্ধিও লক্ষ্য করা হইবে।

আমরা শুনিয়াছি, যিনি সংপ্রতি বাঙ্গালার ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার অর্থাৎ পুনর্গঠনকার্য্যভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি গঠনকার্য্যের আরম্ভেই সেচের ব্যবস্থা করিতে বলিতেছেন।

আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমাংশেই বলিয়াছি, সেচ বিষয়ে বাঙ্গালা বহুকাল অযথারূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। এখন কি সেচ বিভাগ সেই ত্রুটি সংশোধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন?

সার উইলিয়ম উইল্‌কক্স বলিয়াছেন:—

"বাঙ্গালায় দেখা যায়, প্রাচীনকালের লোক যে বন্যার জলে সেচের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে যেমন বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের ও সম্পদের উন্নতি হইয়াছিল, তেমনই তাহা ত্যাগের ফলে ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্য প্রবল হইয়াছে। ইহা মনে রাখিয়া কায করিলে আমাদিগের সাফল্য সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।"

ডাক্তার বেণ্টলী বহুবর্ষব্যাপী অনুসন্ধানফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার যে সব স্থানে এখনও বন্যার জল জমীতে ছড়াইয়া পড়ে, সে সব স্থানে ম্যালেরিয়া নাই বলিলেও বলা যায়; আর যে সব স্থানে তাহা বন্ধ হইয়াছে, সেই সব স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ প্রবল। তিনি বলিয়াছেন—নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জিলায় অনেক গ্রাম জনশূন্য ও অনেক জমী "পতিত" হইয়া আছে। সে সব স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নিবারণ করিতে হইলে জমীতে চাষের উপায় করিতে হইবে। ইহার দ্বিবিধ উপায় আছে—জমীতে সার প্রয়োগ, আর জমীতে পলী পতনের উপায় করা।

সার প্রদান যে ব্যয়সাধ্য তাহা বলা বাহুল্য। সারের উপকারিতা বাঙ্গালার কৃষক বুঝে। কিন্তু যে দারিদ্র্য হেতু রন্ধনের ইন্ধন যোগাইতে না পারিয়া গোময়ও জ্বালানীরূপে ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়, সে কিরূপে সার সংগ্রহ করিবে? এ কথা বহুদিন পূর্ব্বে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় মিষ্টার সিয়ানী বলিয়াছিলেন। সেচের জন্য যদি বন্যার জল ব্যবহৃত হয়, তবে তাহা কিরূপ স্বল্পব্যয়সাধ্য হইতে পারে, তাহা মেদিনীপুরে দেখা গিয়াছে। যাহারা ইহাতে উপকৃত হইবে, তাহারা যে সাগ্রহে ইহার জন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাও মেদিনীপুরে দেখা গিয়াছে। তথায় লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কায করায় ব্যয় উল্লেখযোগ্যই নহে।

বাঙ্গালা আজ যেমন ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ, তেমনই অন্নাভাবে শীর্ণ। বন্যার জলে সেচের ফলে যদি বাঙ্গালার এই দ্বিবিধ দারুণ দুর্গতি দূর হয়, তবে যে অসাধ্যসাধন হইবে এবং বাঙ্গালা তাহার প্রনষ্ট শ্রী লাভ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র লোকের দৃষ্টি মেদিনীপুরে এই পরীক্ষাফলের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি। দেশের লোক উদ্যোগী হইয়া এই কার্যের ব্যবস্থা করুন। কার্য্য-

পদ্ধতি স্থির করিবার জন্য স্বাস্থ্য ও সেচ বিভাগদ্বয়ের বিশেষজ্ঞদিগের যে পরামর্শ ও সাহায্য প্রয়োজন, সরকার তাহা দিবার জন্য প্রস্তুত থাকুন, আর জিলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সে পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণের উপায় করিয়া আপনাদিগের অস্তিত্ব সার্থক করুন।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা সরকারকে ব্যাপকভাবে বাঙ্গালার জলপ্রবাহ সংস্কারের কার্য্যে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। সার উইলিয়ম উইল্‌কক্স মিশরে যে কায করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে অমর করিয়াছে। তিনি বাঙ্গালায় জলপথ সংস্কারের যে পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া—তাহাতে প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন করিয়া তাহা প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব কি না, তাহা দেখিবার সময় সমুপস্থিত।

বাঙ্গালার নদী খাল বিল আজ দূষিত জলের আধার—তাহার পর কচুরীপানা নূতন বিপদ আনিয়াছে। দেশের জলনিকাশের ও বন্যার জল গ্রহণের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া নানা বাঁধ ও রাজপথ রচিত হইয়াছে। এই সঙ্গে রেলপথেরও উল্লেখ করিতে হয়। আমরা আশা করি, কিরূপে বাঙ্গালার এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করা যায়, সরকার—দেশের লোকের ও বিশেষজ্ঞদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া—তাহা স্থির করিবেন এবং স্থির করিয়া সোৎসাহে সাফল্যলাভের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

মেদিনীপুরে যেরূপ স্থানীয় সমিতি গঠিত হইয়াছে, বাঙ্গালার নানাস্থানে সেইরূপ সমিতি গঠন ও লোককে বুঝাইবার ব্যবস্থা করা যে প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য।

স্বরাজ্যদলের পুনরুজ্জীবন—

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের সময় কংগ্রেস যখন বর্জ্জননীতি অবলম্বন ও অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখনই কংগ্রেসের বহু মতাবলম্বী বহু লোক ব্যবস্থা পরিষদে ও ব্যবস্থাপক সভাসমূহে প্রবেশের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাস, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লজপত রায় প্রভৃতি কংগ্রেসের বহুমত শিরোধার্য্য করিয়া লইলেও ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের সমর্থক ছিলেন না। সেই জন্য কারামুক্ত হইয়া আসিয়া চিত্তরঞ্জন অগ্রণী হইয়া স্বরাজ্য দল গঠিত করেন। সে দল কংগ্রেসের আশ্রয় ত্যাগ না করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং সেই দলের নেতারা কেহ কেহ ব্যবস্থা পরিষদে ও কেহ কেহ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। সেই সব সভায় তাঁহারা সংখ্যায় অধিক না হইলেও অন্যান্য সদস্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া একাধিক ব্যাপারে সরকার পক্ষকে পরাভূত করেন। তাহার পর কংগ্রেসের নির্দ্দেশে স্বরাজ্য দলের কংগ্রেসকর্ম্মীরা আবার ব্যবস্থাপক সভাদি ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সেই ত্যাগের পর তাঁহারা যেন কিছু অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন এবং মনে করিতেছিলেন, বর্ত্তমান অবস্থায় সে সব সভায় প্রবেশ করিলে তাঁহারা লোকের কল্যাণকর কার্য্য করিতে পারিবেন।

এদিকে সরকার কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং কংগ্রেসের প্রকৃত অধিবেশনও হইতে পারে নাই। কংগ্রেস কর্ত্তৃক আইনভঙ্গ আন্দোলন সমর্থনই সরকারের এই ব্যবস্থার কারণ।

ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ পুনরায় কংগ্রেস কর্ত্তৃক অনুমোদিত করাইবার জন্য ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ ব্যক্তিরা দিল্লীতে এক পরামর্শ বৈঠকের আয়োজন করিয়াছিলেন এবং সেই বৈঠকে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

যদিও মহাত্মা গান্ধী কারামুক্ত হইয়া আসিয়া রাজনীতিক কার্য্য ত্যাগ করিয়া "হরিজন" আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তথাপি বৈঠকের প্রতিনিধিরা তাঁহার সম্মতির জন্য প্রস্তাব লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গান্ধীজী বলিয়াছেন, ব্যবস্থাপক সভাপ্রবেশ সম্বন্ধে তাঁহার মত পূর্ব্ববৎ থাকিলেও তিনি কংগ্রেসের কর্ম্মীদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশে বাধা দিবেন না।

ইহার পর তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—আইনভঙ্গ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইল। এবার কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন, জনগত অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধভাবে আইনভঙ্গ বন্ধ করা হইবে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সেই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচারও হইয়াছিল। কিন্তু তখন কথা হইয়াছিল—ব্যক্তিগত ভাবে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, আইনভঙ্গের স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবেন।

দিল্লীর বৈঠকে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় বলেন—নানা কারণে বাঙ্গালা কোনরূপ আইনভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিতে পারে না। এখন গান্ধীজী বলিয়াছেন—স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবেও আইনভঙ্গ করা হইবে না এবং তিনিই একক আইনভঙ্গ আন্দোলনের প্রতীকরূপে বিরাজ করিবেন।

ইতঃপূর্ব্বে বিহারে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা দেখিয়া গান্ধীজী সরকারের সহিত সহযোগ স্বীকার করিয়াছেন।

এবার তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসের পূর্ব্বনেতৃগণের মত—যে স্থানে সম্ভব সরকারের সহিত সহযোগ করা হইবে, কিন্তু যে স্থানে প্রয়োজন অসহযোগ করিতে দ্বিধা করা হইবে না।

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব ব্যবস্থা পরিষদে বলিয়াছেন, যদি কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আইনভঙ্গ আন্দোলন প্রত্যাহার প্রস্তাব করিবার জন্য সমবেত হয়েন বা কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করেন, তবে সরকার তাহাতে বাধা দিবেন না। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে সে প্রতিশ্রুতি কে বা কাহারা দিতে পারেন?

যখন দিল্লী বৈঠকে সমবেত কংগ্রেসকর্ম্মীরা ব্যবস্থাপক সভাপ্রবেশের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন এবং মহাত্মাজী তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন ও আইনভঙ্গ আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়াছেন, তখন মতের গতি কোন্ দিকে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সে অবস্থায় সরকার যদি বিনাসর্ত্তে কংগ্রেসের অধিবেশনজন্য অনুমতি প্রদান করিতেন, তাহাতে কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল বলিয়া মনে হয় না।

এ দিকে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—সরকার যেমন বলিয়াছেন, আইনভঙ্গ প্রত্যাহৃত হইলে আইনভঙ্গজন্য কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে মুক্তিপ্রদান করা সম্ভব হইবে, তেমনই তাঁহারা বাঙ্গালায় বিনা বিচারে আটক আসামীদিগকেও মুক্তিপ্রদান করুন।

যখন মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়, তখন সম্রাট তাঁহার ঘোষণায় বলিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসে যে নবযুগের প্রবর্ত্তন হইতেছে তাহাতে দেশের লোকের ও শাসকদিগের মধ্যে সর্ব্ববিধ অপ্রীতির অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া তিনি বড় লাটকে উপদেশ দিতেছেন, তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করিলেই যেন সকল রাজনীতিক বন্দী প্রভৃতিকে মুক্তিদান করেন।

আজও আবার ভারতবর্ষের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। এই সময় সরকার কি রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ বিবেচনা করিয়া কায করিবেন? অনুগ্রহ কি ব্যর্থ হয়? সে বার সম্রাটের অনুগ্রহে যাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই যে শান্তিপ্রিয়—এমন কি সন্ত্রাসবাদবিরোধী হইয়াছেন, তাহাও সরকার জানেন—দেশের লোকও তাহা দেখিয়াছেন।

দেশে এতদিন যে চাঞ্চল্যের স্থিতি ছিল, এ বার তাহার অবসান হইবে, এমন মনে করা যায়। গান্ধীজী দেশবাসীকে গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

এ দিকে যে সব পুরাতন কংগ্রেসনেতা অসহযোগ ও আইনভঙ্গের জন্য কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাও হয় ত আবার কংগ্রেসে যোগ দিয়া কংগ্রেসকে জাতির প্রকৃত রাজনীতিক প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে সম্মত হইবেন। যদি তাহা হয়, অর্থাৎ অনৈক্যের স্থানে আবার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহা যে বিশেষ সুখের ও আশার কারণ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা দিল্লী বৈঠকের পরিণতি দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিলাম। সেদিন রাঁচীতে নেতৃবর্গের এক বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, স্বরাজদল পুনরায় গঠিত হইবে এবং সে দল ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবেন। শীঘ্রই পাটনায় কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে এই ব্যবস্থা পাকা হইবে। এখন আমরা আশা করিতে পারি, ইহার ফলে চাঞ্চল্যশ্রান্ত দেশ আবার শান্তি সম্ভোগ করিবে এবং নিয়মানুগ আন্দোলনের পথে ভারতবর্ষ স্বরাজের সিংহদ্বারে উপনীত হইয়া সেই দ্বার মুক্ত দেখিতে পাইবে।

ব্যয়-বৃদ্ধি—

সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারকে যে দিন ভারত সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করা হয়, সে দিন তিনি প্রস্তাবিত শাসন-পদ্ধতির ব্যয়-বাহুল্যের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, এই ব্যয়-বাহুল্যের জন্যই তাহা অচল হইবার সম্ভাবনা। বাঙ্গালার কথাই ধরা যাউক। বৎসরের পর বৎসর বাঙ্গালা সরকারের আয়ে ব্যয়-সঙ্কুলান হইতেছে না। দুইটি আয় বাঙ্গালা প্রাপ্য বলিয়া দাবি করে—(১) পাটের রপ্তানী-শুল্কের আয় ও (২) আয় করের আয়।

এবার যে বাঙ্গালাকে বাঙ্গালা হইতে রপ্তানী পাটের উপর শুল্কের অর্দ্ধাংশ (পূর্ণ নহে) দেওয়া হইবে, তাহাও দেশলাইয়ের উপর কর স্থাপিত করিয়া। অর্থাৎ সাধারণতঃ যাহাকে "খানা বুজাইয়া খানা কাটা" বলে, তাহাই করিয়া। ভারত-সচিব কবুল-জবাব দিয়াছেন, এখন কিছুকাল বাঙ্গালার পক্ষে আয়-করের কিছুই পাইবার আশা নাই। কেন্দ্রী সরকারের ব্যয়সঙ্কুলান করিবার জন্য সে টাকা প্রয়োজন হইবে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বাঙ্গালা সরকার কোনরূপে "যশোদার দড়ীর" দুই মুখ এক করিবেন—আয়ে ব্যয় কুলাইবেন। বাঙ্গালার লোকের কল্যাণকর কোন কায করা, অর্থাভাবে, সম্ভব হইবে না। অথচ পল্লীর পুনর্গঠনের যে কার্য্যে সরকার প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়াছেন, তাহাও ব্যয়-সাপেক্ষ।

যখন অবস্থা এইরূপ, তখন আবার প্রদেশের সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হইতেছে। সিন্ধু ও উড়িষ্যা দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইবে। সিন্ধুর আয়ে যে তাহার ব্যয়-সঙ্কুলান হইবে না, তাহা অনুসন্ধান কমিটী বলিয়াছেন। উড়িষ্যায়ও তাহাই হইবে। যে স্থানে পূর্ব্বে নদীর প্রবাহ ছিল এবং অল্প জমী খনন করিলেই জল পাওয়া যায়, সে সব স্থানে যেমন "ঘোষের গঙ্গা," "বসুর গঙ্গা", "সেনের গঙ্গা" প্রভৃতির বাহুল্য—সেইরূপ প্রদেশের বাহুল্য হইতেছে। আর প্রদেশ হইলেই তাহার গভর্ণর, লাট-প্রসাদ, শৈল-বিহারের জন্য দ্বিতীয় রাজধানী, গভর্ণরের ব্যাণ্ড ও বডিগার্ড, মন্ত্রী, শাসন-পরিষদের সদস্য, ব্যবস্থাপক সভা, হাইকোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি আসবাব সরবরাহ করিতে হয়। বর্ত্তমানে প্রদেশের সংখ্যা না বাড়াইয়া কমাইলেই বরং ভাল হয়। বিহারের বঙ্গভাষা-ভাষীদিগের অধ্যুসিত জিলাগুলি বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করিয়া অবশিষ্ট জিলাগুলি যুক্তপ্রদেশে দিয়া বারাণসীতে দ্বিতীয় রাজধানী করা যাইতে পারে। ঐরূপে উড়িষ্যার কতকাংশ বাঙ্গালায় ও কতকাংশ মাদ্রাজে দেওয়া যায়—ইত্যাদি। তাহাতে ব্যয়-সঙ্কোচ হয়।

আর এক কথা—প্রাদেশিক চাকরীর বেতন যেমন হ্রাস করা হইল, সিভিল সার্ভিসের বেতন তেমনই হ্রাস করা প্রয়োজন। লয়েড জর্জ্জ প্রভৃতি ইংরাজ সিভিলিয়ানের প্রয়োজন যত অধিকই কেন মনে করুন না, সব দেশই আপনার দেশের লোকের দ্বারা দেশের শাসন ও বিচারকার্য্য পরিচালিত করে এবং তাহাতেই ব্যয়-সঙ্কোচ সম্ভব হয়। মনীষী লাফকাডিও হেয়ার্ণ বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে জাপানী সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন। তখন তাঁহার বেতন অধিক ছিল। দীর্ঘকাল জাপানে বাস করিয়া তিনি এক জাপানী মহিলাকে বিবাহ করেন ও জাপানের বাসিন্দা বলিয়া আপনাকে পরিচিত করেন। যে মাসে তিনি আপনাকে জাপানী বাসিন্দা বলিয়া ঘোষণা করেন, সেই মাস হইতেই তাঁহার বেতন—পূর্ব্ব বেতনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ হয়; তাহাই জাপানে জাপানীর বেতন। এ দেশেও কেন সেই ব্যবস্থা হইবে না? যদি স্বতন্ত্র সিভিল সার্ভিস রাখিতে হয়, তবে তাহাতে কর্ম্মচারীদিগের নিয়োগ এ দেশে—এ দেশের বেতনের হারে করা হউক। সংপ্রতি ব্যবস্থা-পরিষদে কলিকাতা হাইকোর্ট সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—হাইকোর্টে সাধারণতঃ ছুটীর বহরই বড় নহে, অনেক জজ বিনা ছুটীতে আদালতে অনুপস্থিত থাকেন—ইত্যাদি। যদি বিদেশী বিচারকদিগের পক্ষে এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিক পরিশ্রম করা কষ্টকর হয়, তবে তাঁহাদিগের স্থানে বাঙ্গালী জজ নিযুক্ত করিলেই চুকিয়া যায়। তাহাতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? যে সময় বিলাতের লোক এই "জল জঙ্গল আঁধার রাতের" দেশে চাকরী করিতে আসিতে আগ্রহ প্রকাশ করিত না, সেই সময় তাহাদিগকে চাকরীকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য

"রাজার হারে" যে বেতনের ব্যবস্থা হইয়াছিল, এখন সে বেতন বজায় রাখিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। অথচ পূর্ব্ব বেতন বহাল না রাখিয়া বেতন ও ভাতার হার কেবলই বাড়ান হইয়াছে! সে বৃদ্ধির শেষ ব্যবস্থা হইয়াছে—লী কমিশনে।

লী কমিশনেও "ইণ্ডিয়ানাইজেসনের" প্রস্তাব ছিল অর্থাৎ শতকরা কতকগুলি বড় চাকরী ভারতবাসীকে প্রদান করা হইবে; তাহাও ক্রমশঃ। ঐ সব চাকরীতে যে সব ভারতীয় নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা ইংরাজ চাকরীয়াদিগের সঙ্গে সমান বেতন পাইবেন—তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে সস্ত্রীক বিলাত ঘুরিয়া আসিবার জন্য খরচ পাইবেন—ইত্যাদি! প্রথমতঃ স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত করিলে বিদেশী কর্ম্মচারীর প্রয়োজন—(বিশেষজ্ঞ ব্যতীত)—থাকে না। দ্বিতীয়তঃ বেতনের হার এ দেশের চাকরীয়ার হিসাবেই নির্দ্দিষ্ট করা সঙ্গত।

এ দেশে দেশের উন্নতিকর কার্য্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন এত অধিক যে, আয় বর্দ্ধিত করিবার জন্য প্রথমে ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া সেই অর্থ উন্নতিকর কার্য্যে প্রযুক্ত করিতে হইবে। নহিলে হইবে না।

সমর-বিভাগের ব্যয়বাহুল্য সহজেই দৃষ্টিপথে পতিত হয় সত্য, কিন্তু শাসন ও অন্যান্য বিভাগের ব্যয়ও অল্প নহে। যাহাকে "তিল কুড়াইয়া তাল" বলে—এ সব বিভাগের ব্যয় যোগ করিলে তাহাই দেখা যায়।

যদি ব্যয়বাহুল্যহেতু দেশের উন্নতিকর কার্য্যে অর্থ-নিয়োগ অসম্ভব হয়, তবে যে সেই জন্যই নূতন শাসন-পদ্ধতি লোকের অপ্রীতি অর্জ্জন করিবে, তাহা শাসন-সংস্কার কমিটীর সদস্যরাও স্বীকার করিয়াছেন। এ দেশে শিক্ষা বিস্তার, শিল্প প্রতিষ্ঠা, সেচের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যোন্নতি—এ সবই বহুদিন উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালা সরকার যদি দেশের প্রকৃত পুনর্গঠন করেন, তবে সে জন্যও অল্প অর্থের প্রয়োজন হইবে না। ব্যাপকভাবে কায না করিলে ঈপ্সিত ফললাভের আশা করা যায় না।

নূতন শাসন-পদ্ধতি যেমনই কেন হউক না, তাহাতে যদি ব্যয়-বৃদ্ধি হয়, তবে সেই কারণেই যে তাহা অচল হইবে, সে সম্বন্ধে আমরা স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের সহিত একমত।

সেই জন্য আমরা প্রস্তাব করি—(১) প্রদেশের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া সংখ্যা হ্রাস করা হউক; (২) এ দেশের লোককেই এ দেশে সরকারী চাকরীয়া করা হউক এবং চাকরীতে বেতনের হার হ্রাস করা হউক; (৩) গভর্ণর প্রভৃতি চাকরীয়ার সম্ভ্রম সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ও ভ্রান্ত ধারণা বর্জ্জন করা হউক। ভারতবর্ষ প্রাচ্য দেশ—প্রাচীর লোকেরা আড়ম্বর ও সম্ভ্রম অভিন্ন মনে করে—এ ধারণা অসঙ্গত। স্বৈরশাসনশীল মোগল বাদশাহরা অসঙ্গত ব্যয় করিতেন বলিয়া যে বর্ত্তমান সময়েও গভর্ণর প্রভৃতিকে সেই অপরাধ করিতে হইবে, এ যুক্তি কি হাস্যোদ্দীপক নহে?

দেশের লোককে এ বিষয়ে আন্দোলন করিতে হইবে এবং যতদিন আন্দোলনের ফল লাভ করা না যায়, ততদিন নিরস্ত হইলে চলিবে না। দেশের লোক আর নূতন করভার বহন করিতে পারে না;—অথচ দেশের উন্নতির ও সমৃদ্ধিবৃদ্ধির জন্য অর্থনিয়োগ প্রয়োজন। এই অবস্থায় ব্যয়-সঙ্কোচ ব্যতীত আর কি উপায় থাকিতে পারে?

জমী-বন্ধকী ব্যাঙ্ক—

এতদিন বাঙ্গালায় সরকার জমী-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার যে আয়োজন করিতেছেন, তাহার কথা আমরা যথাকালে আলোচনা করিয়াছি। সংপ্রতি সে সম্বন্ধে সরকারের নীতি-বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়—গত কয় বৎসরের মধ্যে কৃষিজ পণ্যের মূল্য-হ্রাসহেতু যে অর্থনীতিক দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালায় সমবায় নীতিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ইহার ফলে কৃষকের বাজার-সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং তাহার পক্ষে স্বীয় সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। টাকার অভাব ঘটিয়াছে। এই কারণে কৃষককে সাহায্য করিতে হইবে। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের জন্য তাহার ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা করিয়া দেওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সেই জন্য বাছিয়া কয়টি স্থানে—পরীক্ষার হিসাবে—পাঁচটি জমী-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা স্থির হইয়াছে। যাহাতে উপযুক্ত

কৃষকরা, ছোট ছোট খাজনা লাভকারী ভূস্বামীরা এবং স্বল্প আয়ের অন্যান্য লোক নিম্নলিখিত কার্য্যের জন্য দীর্ঘকালে পরিশোধ্য ঋণ লাভ করেন, তাহাই এই সব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য :—

(১) জমী বন্ধক রাখিয়া গৃহীত ও পূর্ব্বকৃত অন্যান্য ঋণ পরিশোধ ;

(২) জমীর ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন ;

(৩) যে জমী ক্রয় করিলে কৃষকের চাষের সুবিধা হয় সেই জমী ক্রয়।

যাহাতে পরিচালন-ব্যয় যথাসম্ভব অল্প হয়, সেই জন্য বর্ত্তমানে এক একটি মহকুমায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হইলেও স্থানীয় কেন্দ্রী সমবায় ব্যাঙ্কের সহিত যথাসম্ভব একযোগে ইহার কার্য্য পরিচালিত হইবে।

ব্যাঙ্কের সদস্য ব্যতীত আর কাহাকেও ঋণ হিসাবে টাকা দেওয়া হইবে না। এই সকল লোককে যে সমবায় সমিতির সদস্য হইতেই হইবে, তাহা নহে। সদস্যদিগের মধ্যে অংশ বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কের মূলধন সংগৃহীত হইবে। তাঁহারা কেহই গৃহীত অংশের মূল্যের অধিক টাকার জন্য দায়ী হইবেন না ; অর্থাৎ যদি লোকশান হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে উহার অধিক টাকার জন্য দায়ী করা যাইবে না। ব্যাঙ্কে যে টাকা খাঁটি মুনাফা হইবে, তাহার শতকরা ৭৫ টাকা সঞ্চয় ভাণ্ডারে রক্ষিত হইবে, অবশিষ্ট ২৫ টাকা মূলধনের উপর লভ্যাংশ প্রভৃতি হিসাবে ব্যয়িত হইবে। সঞ্চয় ভাণ্ডারের টাকা, স্বতন্ত্র হিসাব রাখিয়া, ঋণ দানে প্রযুক্ত হইবে। মূলধনের যে টাকা ব্যাঙ্ক পাইবে তাহার ও সঞ্চয় ভাণ্ডারের মোট টাকার ২০ গুণ টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কেন্দ্রী সমবায় ব্যাঙ্ক এই টাকা ঋণ দিবেন এবং যতদিন একটি কেন্দ্রী জমী-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন এই সব ব্যাঙ্কই ঐ কেন্দ্রী সমবায় ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত থাকিবে। ঋণ হিসাবে যে টাকা গৃহীত হইবে তাহা যতদিনের জন্য লওয়া হইবে, সরকার ততদিনের জন্য তাহার সুদের জামিন থাকিবেন। তবে সরকার মোট ১২লক্ষ ৫০ হাজার টাকার অধিক টাকার জন্য সুদের দায়ী থাকিবেন না। প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের লেন-দেন জমী-বন্ধকী বিভাগের সাহায্য হইবে এবং এই বিভাগ ব্যাঙ্কের অন্যান্য বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র রাখা হইবে।

ব্যাঙ্কের সদস্যরা যে যাহার ক্রীত অংশের জন্য প্রদত্ত টাকার ২০ গুণ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ পাইতে পারিবেন। কিন্তু সাধারণতঃ কাহাকেও ২ হাজার ৫শত টাকার অধিক ঋণ হিসাবে দেওয়া হইবে না এবং সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রারের অনুমোদনে তিনি ৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঋণ পাইতে পারিবেন।

জমী বন্ধক রাখিয়া যে টাকা ঋণ দেওয়া হইবে, তাহা জমীর মূল্যের অর্দ্ধাংশের অথবা যে সময়ের মেয়াদে বন্ধক রাখা হইবে সেই সময়ে জমী হইতে যে ফশল পাওয়া যাইতে পারে তাহার মূল্যের শতকরা ৭৫ টাকার অধিক হইবে না। যিনি তাঁহার জমীর কৃষিজ আয় হইতে স্বীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া ঋণের সুদ ও কিস্তীর টাকা দিতে পারিবেন না, তাঁহাকে ঋণ দান করা হইবে না। জমীর উপর প্রথম বন্ধকী সর্ত্তে—জমী দখল লইয়া বা না লইয়াই—ঋণ প্রদান করা হইবে। এই জমী বন্ধক দেওয়া ব্যতীত প্রত্যেক ঋণ গ্রহণকারী অর্থাৎ খাতককে দুই জন সদস্যকে অতিরিক্ত জামিন দিতে হইবে। কোন ঋণের পরিশোধকাল ২০ বৎসরের অধিক হইবে না। খাতকের প্রস্তাবে ও পরিচালকদিগের অনুমোদনে বার্ষিক বা অনুরূপ কিস্তিবন্দী হিসাবে ঋণশোধের ব্যবস্থা হইবে।

যাহাতে কিস্তী খেলাপ না হয় অর্থাৎ যথাকালে খাতক দেয় টাকা দেন, সে সম্বন্ধে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইবে এবং খাতক যাহাতে অন্যত্র আরও টাকা ঋণ না করেন, সেই জন্য প্রতি বৎসর তাঁহাকে তাঁহার ঋণের হিসাব দাখিল করিতে হইবে। কেবল ব্যাঙ্কের অনুমতি লইয়া খাতক অল্পদিনের জন্য সমবায় সমিতির বা অন্য মহাজনের নিকট ঋণ করিতে পারিবেন। টাকা দিবার সময় ব্যাঙ্ক এমন সর্ত্তও করিতে পারিবেন যে, খাতক বোর্ডের নির্দ্দেশানুসারে বীজ ও যন্ত্রাদি ক্রয় করিতে ও কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করাইতে বাধ্য থাকিবেন।

ব্যাঙ্ক যাঁহাদিগের নিকট ঋণ গ্রহণ করিবেন, তাঁহা-

দিগের স্বার্থ যাহাতে যথাযথভাবে রক্ষিত হয়, সে পক্ষে দৃষ্টি রাখিবার জন্য এক জন ট্রাষ্টী নিযুক্ত করা হইবে। প্রথমে সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রারই ঐ ট্রাষ্টির কায করিবেন। ব্যাঙ্ক যে সব জমী বন্ধক রাখিয়া টাকা দিবেন, সে সকল জমীর বন্ধকী দলিল ব্যাঙ্ক কেন্দ্রী প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে এবং ঐ ব্যাঙ্ক ট্রাষ্টীর বরাবর লিখিয়া দিবেন।

প্রথমে যে কয়টি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই কয়টির কর্ম্মচারীর বেতন প্রভৃতি ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সরকার ৪০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। ঋণ হিসাবে গৃহীত টাকার যে সুদের জন্য সরকার জামিন থাকিবেন, তাহার সহিত এই ৪০ হাজার টাকার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রথম বৎসরে মোট ৫টি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্যাঙ্কের কার্য্যপরিদর্শনের ব্যয় সরকারই বহন করিবেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসর পরিচালনব্যয় যদি লাভের অপেক্ষা অধিক হয়, তবে লাভের টাকার অতিরিক্ত ব্যয় সরকার দিবেন। তৃতীয় বৎসরের পর হইতে সরকার পরিচালনের কোন দায়িত্ব রাখিবেন না।

বাঙ্গালার কৃষকদিগকে ঋণের নাগপাশ মুক্ত করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, এই সব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সেই চেষ্টার এক অংশ। প্রথমে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যফল কিরূপ হয়, তাহা দেখিয়া আরও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে।

আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি, এইরূপ ব্যাঙ্ক এ দেশে নূতন হইলেও অন্যান্য দেশে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে। সে সকল দেশে ইহার ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া দেশকালোপযোগী ব্যবস্থা করিলে এ দেশেও এই অনুষ্ঠানের দ্বারা উপকার লাভ করা যাইবে, এমন আশা অবশ্যই করা যায়।

ডাক্তার আশুতোষ রায়—

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রেল মঙ্গলবার হাজারিবাগ-প্রবাসী ডাক্তার আশুতোষ রায় এল-এম-এস, এম-আর-এ-এস মহাশয় লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। ১লা এপ্রেল পর্য্যন্ত তিনি নিয়মিত ভাবে তাঁহার চিকিৎসা-ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। রবিবার বেলা দশটার সময় তিনি অকস্মাৎ অপস্মার রোগে আক্রান্ত হইয়া সংজ্ঞাহীন হন। তাহার পর আর তাঁহার জ্ঞানসঞ্চার হয় নাই। ডাক্তার রায় কলিকাতার এক সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কলিকাতায়ই শিক্ষা লাভ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল-এম-এস উপাধি লইয়া তিনি কিছু দিন কলিকাতায় প্র্যাকটিস করেন। পরে দুই এক স্থানে অল্প কাল চাকুরী করিয়া অবশেষে ১৯০৮ সাল

ডাক্তার আশুতোষ রায়

হইতে হাজারিবাগে স্থায়ী ভাবে বাস পূর্ব্বক চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে হাজারিবাগে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে ডাক্তার রায় নিজ পদ্ধতিক্রমে কলেরার টীকা দিয়া হাজারিবাগ হইতে এই রোগ দূরীভূত করেন। এই বিষয়ে তিনি এতাদৃশ সফলতা অর্জ্জন করেন যে, বিদেশে পর্য্যন্ত তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হয়। তাঁহার টীকা-পদ্ধতির রিপোর্ট ১৯১৯ সালের নবেম্বর মাসের "ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে" প্রকাশিত

হয়; এবং তাহার সার মর্ম্ম লণ্ডনের "মেডিক্যাল এ্যান্যুয়াল" এবং আমেরিকার নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশিত সাজুস এনসাইক্লোপিডিয়া অব মেডিসিনে প্রকাশিত হয়। গবর্ণমেণ্টও তাঁহার প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন এবং একটি রেজোলিউসনও পাস করেন। ডাক্তার রায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসক হইলেও আয়ুর্ব্বেদ, ইউনানি হাকিমি চিকিৎসা পদ্ধতি এবং হোমিওপ্যাথির প্রতি সমান অনুরাগী ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ হইতে মহামূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়া তিনি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িক পত্র সমূহে ইংরেজী ও বাঙ্গলায় বহু সারগর্ভ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা আমষ্টার্ডাম ও জার্ম্মাণীর বহু সাময়িক পত্রেও তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রার্থনা করি তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার তৃপ্তি হউক।

সতীর জীবন-বিসর্জ্জন—

বিগত ১৫ই এপ্রেল ২রা বৈশাখ কলিকাতার নিমতলা ঘাট যিনি মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন, শত শত নরনারী যে সতী-সাধ্বীকে দর্শন ও প্রণাম করিতেছিলেন, সীমন্তে অক্ষয় সিন্দূর, কুসুমদাম অলক্তক ও মহামূল্য পট্টবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মৃত্যুর মহান মাধুরী মুখে মাখিয়া অন্তিম শয়নে যিনি স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন, সেই মহীয়সী পুণ্যপ্রতিমা—শ্রীমতী প্রতিমা পালিত, শ্রীমান অমরনাথ পালিতের সহধর্ম্মিণী।

সতী প্রতিমা পালিত

কয়েকমাস যাবৎ কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী স্বামীর অক্লান্ত সেবায় শ্রীমতী প্রতিমা নিরত ছিলেন। অমরনাথের অবস্থা ক্রমশঃ অতীব সঙ্কটাপন্ন হওয়ায় তাঁহার মৃত্যুর ছয়দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি দিবারাত্রি স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া অমানুষিক পরিচর্য্যায় তাঁহাকে ইহজগতে ধরিয়া রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রতিমার এ চেষ্টা সত্যই প্রাণ-পণ চেষ্টা। স্বামীর পরলোক গমনের দিন প্রত্যূষে যখন তিনি বুঝিতে পারেন স্বামীর জীবনের আর কোনো আশা নাই, তখন তিনি অমরনাথের ভাগিনেয় ডাক্তার নীরজ বসুকে সকাতরে জিজ্ঞাসা করেন—"আর কত দেরী?" ডাক্তার নীরজ তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন এবং স্বামীর কাছে বসিয়া ঔষধ পথ্যাদি দিতে সাশ্রুনয়নে অনুনয় করেন। তিনি তাঁহার কথা শুনেন এবং শেষ ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন মানুষের কোনো শক্তিই তাঁহার স্বামীকে আর বাঁচাইতে পারিবে না, তখন তিনি স্বামীর বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িয়া সপ্রেমভক্তি ভালবাসার ও পতিভক্তির শেষ ও সুগভীর নিদর্শন জানাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই জ্ঞানশূন্য হইয়া ঢলিয়া পড়েন। বহু চেষ্টাতেও তাঁহার সংজ্ঞা আর ফিরিয়া আসে নাই। পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের ক্রোড়ে তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীমতী প্রতিমা সম্পূর্ণ নীরোগ ছিলেন। এই সময় তাঁহার স্বামী অমরনাথও ধীরে ধীরে জীবনের পরপারে চলিয়া যাইতেছিলেন। মর্ম্মস্পর্শী ক্রন্দনরোলে মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন চক্ষু সহসা উন্মীলন করিয়া অমরনাথ বলিয়া উঠেন—"এমন ত দেখা যায় না।" ইহার ঠিক তিনঘণ্টা পরে প্রতি-মার স্বামী অমরনাথের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে প্রতিমার বয়স ৩৩ ও অমরনাথের ৪৪।

পরলোকগত অমরনাথ পালিত

অমরনাথ স্বনামধন্য পরলোকগত অধ্যাপক অনাথনাথ পালিতের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা। অমরনাথ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের M.Sc., B.L.। কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই সোপ ওয়ার্কসে তিনি তাঁহার

যথাসর্ব্বস্ব দান করেন, কিন্তু পরিবর্ত্তে কিছুই পান নাই। আরো ২।১টি ব্যবসাকে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় গড়িয়া তুলিয়া অপরের হাতে নিঃস্বার্থ ভাবে তাহার সমস্ত কার্য্যভার ও লাভালাভ প্রদান করেন। এ সংবাদ সাধারণের গোচরীভূত নহে। তিনি অধুনা Butterworth Co.র Legal adviser ও এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের উকিল ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধাবী, মিষ্টভাষী ছিলেন, অমরনাথ। বিপন্নের বন্ধু, গোপনদানে মুক্ত-হস্ত ছিলেন অমরনাথ। চিরদিন পরোপকার ব্রতী ছিলেন অমরনাথ। অমরনাথের সহধর্ম্মিণী পটলডাঙ্গার সুবিখ্যাত বিশ্বাসগোষ্ঠির শ্যামাচরণ দে বিশ্বাসের পৌত্রীর কন্যা, বেঙ্গল কেমিক্যালের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর (পরশুরামের) একমাত্র দুহিতা। শ্রীমতী প্রতিমা পিতামাতার একমাত্র সন্তান।

অমর-প্রতিমা একটি কন্যা শ্রীমতী আশা ও একটি পুত্র শ্রীমান অশোককে রাখিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যে কাহিনী রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অবিনশ্বর—অপার্থিব। এই পতিগতপ্রাণা কুসুমকোমলা সতী-শিরোমণি স্বর্ণপ্রতিমা বৈধব্যকে জয় করিবার অজেয় শক্তি ও মানসিক তেজ কোথা হইতে পাইয়াছিলেন তাহা আমাদের ধারণার অতীত। আমাদের মনে হয় শোকসন্তপ্ত পিতামাতাকে ও এই দম্পতির পরিজনবর্গকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের জানা নাই, তবুও এই প্রতিমার পুণ্যবান জনক ও পুণ্যশীলা জননীকে ও তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনকে অতি সুগভীর সমবেদনা জানাইয়া সতী সাধ্বীর অপূর্ব্ব মহিমা কীর্ত্তন করিয়া নিজেকে পুণ্যবান মনে করিতেছি। ভগবান তাঁহাদের শোক-সন্তপ্ত চিত্তকে শান্ত করুন।

৺নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, বিশ্বব্যাপী ভেদনীতির যুগে, বাঙ্গলার সনাতন সৌভ্রাত্রমূলক কোন একান্নবর্ত্তী পরিবারের পরিচয় পাইলে কাহার না হৃদয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হইয়া উঠে? কলিকাতা চোরবাগান রামচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি লেন নিবাসী নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ এক একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন। গত ১৯৩৪ সালের ১লা এপ্রেল (১৮ই চৈত্র, ১৩৪০) তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল। সাধারণ্যে ইনি চণ্ডী বাবু নামে পরিচিত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পৈত্রিক আদি নিবাস ছিল কলিকাতা শিবনারায়ণ দাসের লেনে। চণ্ডীবাবুর পিতার নির্দ্দেশক্রমে এই বাটী তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণকে ছাড়িয়া দিয়া তিনি নাবালক সহোদরগণকে লইয়া চোরবাগানে

৺নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আসিয়া নূতন বাটী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে চণ্ডীবাবু লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া কিলবরণ কোম্পানীর আপিসের টি ডিপার্টমেণ্টে কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং চুয়ান্ন বৎসর এক কলমে কাজ করিয়া ১৯৩১ সালে পেনশন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার অবসর গ্রহণের সময় উক্ত কোম্পানী তাঁহাকে মানপত্র এবং নিত্যব্যবহার্য্য রৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসপত্র উপহার দিয়া

সম্মানিত করেন। চণ্ডীবাবুর পুত্রকন্যা ছিল না; তিনি নিজ কনিষ্ঠ সহোদরগণ এবং তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রকন্যাগণকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ও সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র—

সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ভারত-সরকারের ব্যবস্থা-সচিব ছিলেন; তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় তিনি অবসর
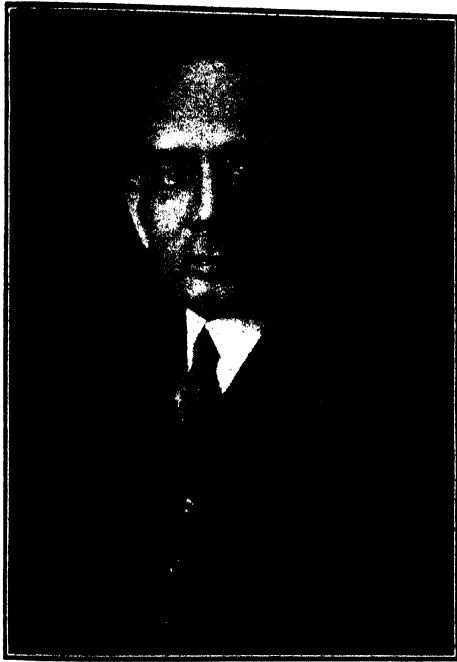
সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র

গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার ব্যবহার-গুণে যেমন ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদিগের প্রিয় হইয়াছিলেন, তেমনই কার্য্যদক্ষতায় সরকারের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই জন্যই বাঙ্গালা সরকার তাঁহাকে বাঙ্গালার শাসন পরিষদে সদস্যপদ গ্রহণে প্ররোচিত করিয়া তাঁহার সম্মতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সতীর্থ সার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের আকস্মিক মৃত্যুর পর বাঙ্গালার গভর্ণর তাঁহার আর এক জন সহাধ্যায়ী—সার চারুচন্দ্র ঘোষকে ঐ পদ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন চারুচন্দ্র স্থায়ীভাবে পদ গ্রহণ করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন; সার ব্রজেন্দ্রলাল এখন ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সার ব্রজেন্দ্রলালের পত্নী লেডী প্রতিমা মিত্র দিল্লীতে ও সিমলায় বাঙ্গালীর সকল অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইয়া বাঙ্গালী-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় আসিতেছেন বলিয়া প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজ—বিশেষ মহিলা সমাজ বিশেষ দুঃখানুভব করিতেছেন। ইনি

লেডি প্রতিমা মিত্র

প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ ও কোবিদ পরলোকগত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের কন্যা এবং রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের দৌহিত্রী।

বড়লাটের শাসন-পরিষদে প্রথম ভারতীয় সদস্য সার (পরে লর্ড) সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ সেই সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া আসিয়া কিছুদিন পরে বাঙ্গালার গভর্ণরের শাসন-পরিষদে সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহাকে প্রথম বড়লাটের শাসন-পরিষদে সদস্য নিয়োগের

কথা হয়, তখন ভারতবন্ধু লর্ড রিপণও সে প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। ভারতের সামরিক ব্যাপারের সব সংবাদ ভারতবাসী জানিবেন, ইহা তাঁহার নিকট সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তাহার পর লর্ড রিপণ সম্মত হইলেও রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ইহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু ভারতসচিব লর্ড মর্লি তাঁহাকে জানান, বিলাতের রাজা মন্ত্রিমণ্ডলের মতবিরুদ্ধ কায করিতে পারেন না।

সার ব্রজেন্দ্রলাল শাসন-পরিষদে সদস্যপদ লাভের পূর্ব্বে কখন সক্রিয়ভাবে রাজনীতি চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন নাই। সে দিন তিনি ব্যবস্থা-পরিষদে বলিয়াছেন,
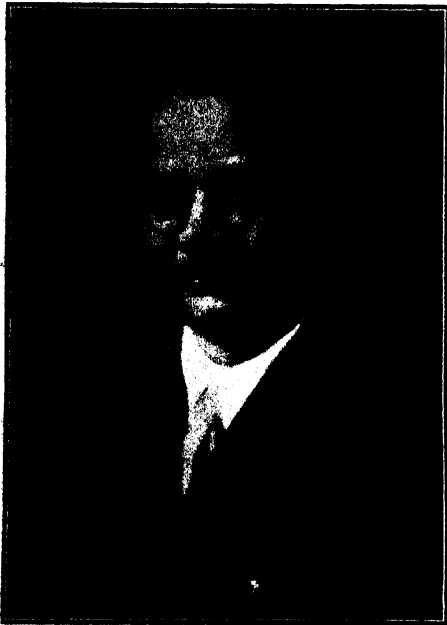
সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

রাজনীতির আস্বাদ পাইয়া তাঁহার ইচ্ছা হইতেছে, তিনি সরকারের দল হইতে অপর পক্ষে গমন করেন।

সার ব্রজেন্দ্রলালের স্থানে তাঁহারই সতীর্থ বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব এডভোকেট জেনারল সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বড়লাটের শাসন পরিষদে ব্যবস্থা-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পদ ভারতবাসীর অধিগম্য হইবার পর লর্ড সিংহ, সতীশরঞ্জন দাস, সার ব্রজেন্দ্রলাল ও সার নৃপেন্দ্রনাথ চারি জন বাঙ্গালী ব্যবস্থা-সচিব হইলেন। সেই জন্য সেদিন ব্যবস্থা পরিষদে এক জন ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালায় কেবল পাট ও ব্যবস্থা-সচিবের উদ্ভব হয়।

সার নৃপেন্দ্রনাথ গোলটেবিল বৈঠকে বাঙ্গালার পক্ষ হইয়া যে সংগ্রাম করিয়াছেন, সেজন্য বাঙ্গালী তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। বিশেষ বাঙ্গালার হিন্দুদিগের সম্বন্ধে যে অবিচার করা হইয়াছে, তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

তিনি অসাধারণ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া বড়লাটের শাসন পরিষদে সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যে সে পদের সম্ভ্রম রক্ষা ও তাহার ঔজ্জ্বল্য সাধন করিতে পারিবেন, এ আশা ও এই বিশ্বাস আমাদিগের আছে। আমরা তাঁহার নূতন কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার সাফল্য কামনা করিতেছি।

প্রমথনাথ বসু—

গত ১৫ই বৈশাখ রাঁচীতে পরিণত বয়সে প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে তাঁহার জন্ম হয়; সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইয়াছিল। এই বয়সেও তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও রচনায় আগ্রহ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তিনি নানা পত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন এবং সেই সব রচনায় তাঁহার ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টাই সে সকলের বৈশিষ্ট্য ছিল। মৃত্যুর ২।৩ দিন পূর্ব্বেও তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' প্রকাশ জন্য তাঁহার স্মৃতিকথার একাংশের পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়াছিলেন।

২৪ পরগণা গোবরডাঙ্গার নিকটস্থ গৈপুর গ্রাম তাঁহার পৈত্রিক বাসভূমি। সেই গ্রামে ৭০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি পিতামাতার ও ভ্রাতাভগিনীদিগের সহিত কিরূপে আনন্দে দিনযাপন করিয়াছেন, তাহার বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা হইতে আমরা দুইটি মাত্র বিষয় উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মত বুঝাইবার চেষ্টা করিব।—

(১) অর্থার্জ্জনের জন্য সংগ্রামেই স্বার্থপরতার বিকট মূর্ত্তি বিশেষ প্রকট হয়। বর্ণবিভাগ ও একান্নবর্ত্তী পরিবার

প্রথা এই সংগ্রামের তীব্রতা ক্ষুন্ন করিয়া স্বার্থপরতার প্রাবল্য নিবারণ করে।

(২) যুরোপীয় যাহা লাভ করেন, তাহা আপনার জন্ম রাখেন; হিন্দু যাহা লাভ করেন, তাহা নিঃস্বদিগের সহিত বণ্টন করিয়া সম্ভোগ করেন।

তাঁহার মতে ভারতের গ্রাম্যমণ্ডলী যেমন লোককে স্বাবলম্বী করিত, তেমনই সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করিত। তাহাতে গ্রামবাসীরা আপনাদিগের অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া আপনারাই শিক্ষার, স্বাস্থ্যরক্ষার পথ ও সেতু প্রভৃতি গঠনের, বিচারের—উপায় করিত।

পরলোকগত প্রমথনাথ বসু

নবভারত যদি সেই আদর্শ রক্ষা করিত, তবে যে বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাল্যকালেই বসু মহাশয় পাঠানুরাগের ও নিষ্ঠার পরিচয় দেন। বিলাত যাইয়া তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া আসিয়া সরকারের ভূতত্ত্ব বিভাগে চাকরী গ্রহণ করেন।

সেই সময় হইতেই তিনি বাঙ্গালায় ও ইংরাজীতে বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রকাশ করিতে থাকেন। সে সময় 'ভারতী'তে তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

সরকারের ভূতত্ত্ববিভাগে চাকরীর সময় ও ময়ূরভঞ্জ দরবারে কাযের ফলে তিনি নানারূপে যশঃ অর্জ্জন করেন। তাঁহারই গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে বিহারে লৌহ পাওয়া যায় এবং আজ টাটার যে বিরাট লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা ভারতবর্ষকে লৌহ ও ইস্পাত সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করিতে পারিবে বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার মূলে বসু মহাশয়ের অনুসন্ধিৎসা বিদ্যমান।

তিনি জাতীয় শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং যখন বাঙ্গালায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহাতে ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দেন। এ দেশে যাহাতে জাতীয় শিক্ষা আদৃত হয় সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল।

চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি রাঁচিতে বাস করিতেন এবং তথায় আপনার অধ্যয়ন-ফল তাঁহার দেশবাসীকে প্রদানের জন্ম সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

পরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর যে ক্ষতি হইল তাহা পূর্ণ হইবে কি না, সন্দেহ। প্রাচীর ও প্রতীচীর গুণের সমন্বয় এবং প্রাচীনের ও নবীনের ভাবে সামঞ্জস্য-সাধন তিনি যেরূপ ভাবে করিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রবাসে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব—

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, গয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও-বি-ই, সি-এস ত্রিহুত বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রবাসে বাঙ্গালীর এই কৃতিত্বে বাঙ্গালী মাত্রেরই আনন্দিত হইবার কথা। চারুবাবু প্রেসিডেন্সী বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ইনস্পেক্টর অব স্কুলস স্বর্গীয় রায়বাহাদুর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সি-আই-ই মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র এবং বঙ্গদর্শনের আমলের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নবেম্বর চারুবাবুর জন্ম হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তিনি মুর্শিদাবাদে ডেপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। পরে তাঁহাকে বাঙ্গলার বাঁকুড়া, যশোহর ও খুলনা জেলায় কাজ করিতে হইয়াছিল। তিনি সাতক্ষীরা ও ঝিনাইদহের সব-

ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। ১৯১০ সালে দুইবার বাঁকুড়া জেলার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল। ১৯১২ সালে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ গঠিত হইলে চারুবাবু বিহারে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ১৯১৬ ও ১৭ সালে তিনি দ্বারভাঙ্গার মধুবনীর সবডিভিসনাল অফিসার হন। ১৯১৭ হইতে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি ছোটনাগপুরের কমিশনারের পার্শনাল এসিষ্ট্যাণ্ট ছিলেন। ১৯২৬ হইতে ১৯২৮ পর্য্যন্ত তিনি বিহার উড়িষ্যার বোর্ড অব রেভিনিউর সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি মুঙ্গের, পুর্ণিয়া, মানভূম ও গয়ায় কলেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলেন। গত বৎসর তিনি ভাগলপুরে অস্থায়ীভাবে কমিশনারের পদে নিযুক্ত

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

হইয়াছিলেন। এ বৎসর ত্রিহুতে পাকা। বিহার ও উড়িষ্যার প্রাদেশিক কর্ম্মচারীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কমিশনারের পদ পাইলেন। তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের দরুণ তিনি ১৯২৩ সালে রায় বাহাদুর এবং ১৯৩০ সালে ও-বি-ই উপাধি প্রাপ্ত হন।

রায় বাহাদুর চারু বাবু কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্গীয় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেটি মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাক্তার শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সি-আই-ই, এম-এ, ডি-এল মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। চারু বাবুর সাহিত্যেও বিলক্ষণ অনুরাগ আছে। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন এবং সাহিত্যিক সফলতা কামনা করি।

সার দীনশা মোল্লা—

গত ২৬শে এপ্রিল তারিখে বোম্বাইয়ে সার দীনশা ফার্দুনজী মোল্লার মৃত্যুতে ভারতে বর্ত্তমান যুগে আইনজ্ঞ ও ব্যবস্থা-প্রবীণ ভারতীয়দিগের মধ্যে নেতৃস্থানীয় এক-জনের অভাব হইল। এই পার্শী ব্যবহারাজীব প্রথমে এটর্ণী হইয়া পরে ব্যারিষ্টার হইয়া আইসেন এবং বোম্বাই হাইকোর্টের জজের পদও লাভ করেন। আইনের মূল নীতি সম্বন্ধে ও আইনের ব্যবস্থা বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্বের খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত ছিল। তিনি কিছু দিন ভারত-সরকারের ব্যবস্থা-সচিবের পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান আইন সম্বন্ধীয় বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি অন্যান্য বিষয়েও পণ্ডিত ছিলেন—কিছু দিন পার্শী সাহিত্যের অধ্যাপকের কাযও করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে বিচারক নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু অল্প দিন পরেই পদত্যাগ করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন। পার্শীদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই পদ লাভ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর হইয়াছিল।

তাঁহার সম্পাদিত ও রচিত বহু আইন গ্রন্থ আজকাল ব্যবহারাজীবরা প্রামাণ্য ও অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচনা ও ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সকল পাণ্ডিত্য পরিচায়ক পুস্তকই তাঁহাকে অক্ষয় যশে যশস্বী করিয়া রাখিবে।

কলিকাতার মেয়র—

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের বিধানানুসারে প্রতি বৎসর কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচন হয়। কলিকাতা কর্পোরেশন নূতন ব্যবস্থায় এখন যে ভাবে পরিচালিত তাহাতে রাজনীতিক প্রভাব নাগরিক কর্ত্তব্য বিবেচনাকে পরিম্লান করে। এবারও সেই জন্য যে দুইজন লোক নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছিলেন, উভয়েই কংগ্রেসের নাম লইয়া নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; একজন—মৌলবী ফজলুল হক; আর একজন

নলিনীরঞ্জন সরকার। তুলনায় সমালোচনা বা যোগ্যতার আলোচনা করা আমরা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করি। কেবল আমাদিগের মনে হয়, উভয়েই ব্যক্তিগত ভাবে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইলে ভাল হইত। কারণ, কেহই কংগ্রেসের নীতি সম্পর্কে একনিষ্ঠ থাকেন নাই। সে যাহাই হউক, নির্ব্বাচন সভায় যিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি মত প্রকাশ করেন—৩১শে মার্চ্চ মনোনীত কাউন্সিলারদিগের কার্য্যকাল শেষ হইয়াছে—সুতরাং তাঁহারা পুনরায় নির্ব্বাচিত না হওয়ায় ভোট দিতে পারেন না। সভাপতির এই নির্দ্ধারণে তাঁহারা প্রতিবাদকল্পে সভা

মৌলবী ফজলুল হক (মেয়র)
(টি, পি, সেনের গৃহীত আলোকচিত্র)

ত্যাগ করেন। বিস্ময়ের বিষয়, সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় কাউন্সিলাররাও সভা হইতে চলিয়া যান! তখন ঘোষিত হয়—মিষ্টার ফজলুল হক মেয়র ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হইলেন।

ইহার পর সরকারের মনোনীত কাউন্সিলার কয়জন, য়ুরোপীয়রা, পরাভূত প্রার্থী প্রভৃতি সরকারের কাছে আবেদন করিয়াছেন—নির্ব্বাচন নাকচ করা হউক। এদিকে সরকার ঐ আবেদন পাইয়া এ সম্বন্ধে কর্পোরেশনের কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। আবার যাঁহারা নূতন সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মনোনয়ন অসিদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য হাইকোর্টে মামলা রুজু হইয়াছে। এদিকে আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় এক জনসভায় প্রথম মুসলমান মেয়র নির্ব্বাচনে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে এবং মুসলমানদিগের নানা প্রতিষ্ঠান এই নির্ব্বাচনে প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। এখন দেখিবার বিষয়, সরকার কি করিবেন? স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন
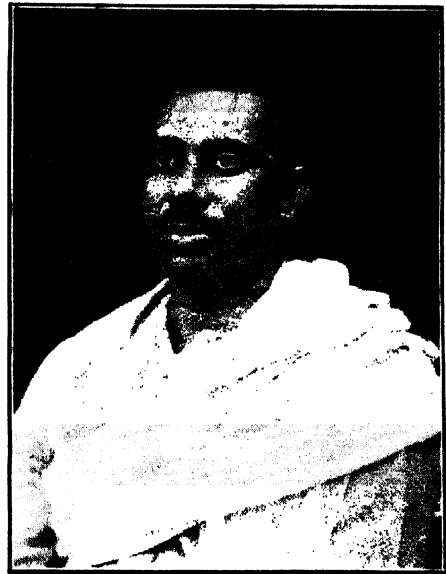
অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ (ডেপুটি মেয়র)
(টি, পি, সেনের গৃহীত আলোকচিত্র)

সম্বন্ধে সরকারের নীতি এই যে—বিশেষ অন্যায় কার্য্য না করিলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ভুল করিয়া তাহার ফলে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পাইবে—তথাপি তাহাদিগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। সরকারের মনোনীত সদস্যরা ভোট প্রদানের অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া সরকার এই নীতি অনুসারে কায করিবেন কি না, তাহাই এখন দেখিবার বিষয়।

উদয়শঙ্করের প্রতি পোলা নেগ্রী—

পাঠকেরা বোধ হয় অবগত আছেন, বঙ্গগৌরব তরুণ নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর এখন আমেরিকায়। সেদিন নিউ ইয়র্কের সেণ্ট জেমস থিয়েটারে প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী মিস পোলা নেগ্রীর সহিত উদয়শঙ্করের সাক্ষাতালাপ হইয়াছিল। পোলা নেগ্রী পরলোকগতা নর্ত্তকী আন্না পাভলোয়ার বিশেষ অনুরাগিনী। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আন্না পাভলোয়া যখন হিন্দু ব্যালেট নৃত্যে উদয়শঙ্করের

উদয়শঙ্কর ও পোলা নেগ্রী

নৃত্যসঙ্গিনী ছিলেন, তখন, কালিফোর্ণিয়ার উদয়শঙ্করের সহিত পোলা নেগ্রীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আর নিউইয়র্কে এই দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ। পোলা নেগ্রী ইয়োরোপ হইতে হোলিউডে যাইবার পথে নিউইয়র্কে আসিয়া শুনিতে পান যে উদয়শঙ্কর সেণ্ট জেমস থিয়েটারে নৃত্য করিতেছেন। মিস নেগ্রী তৎক্ষণাৎ ঐ থিয়েটারে একটি বক্স ভাড়া করিয়া কয়েকটি বন্ধুর সহিত থিয়েটার দেখিতে গেলেন।

প্রথম অবচ্ছেদের সময় মিস নেগ্রী রঙ্গমঞ্চে গিয়া উদয়শঙ্করকে অভিনন্দিত করিলেন। বলিলেন, বহু বৎসর আমি এমন কলাকুশল নৃত্য দেখি নাই। শেষ যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা আন্না পাভলোয়ার। তার পর এই আপনার যা দেখিতেছি। দুঃখের বিষয়, আন্না পাভলোয়ার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। আপনি জানেন, আমি সেই অপূর্ব্ব নৃত্যশিল্পীকে কতটা শ্রদ্ধা করিতাম।

উদয়শঙ্কর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, হাঁ, আমি জানি তা। আপনিও জানেন আমিও তাঁকে কতটা শ্রদ্ধা করিতাম। আমার দুঃখ হয় যে, আমার পূর্ণ দলবল—হিন্দু নর্ত্তক ও গায়কদের লইয়া এক রাত্রিও তাঁহার সহিত নৃত্য করিতে পারি নাই।

মিস নেগ্রী বলিলেন, আমি ভারতবর্ষে যাইতেছি। আশা করি সেখানে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

উদয়শঙ্কর বলিলেন, ভারতবর্ষে আপনাকে অভ্যর্থনা করিতে পাইলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব। সেখানে আমি সানন্দে আপনাকে ভারতীয় কলাশিল্পের অতুলনীয় গৌরব দেখাইব।

মিস নেগ্রী শেষ পর্য্যন্ত অভিনয় দর্শন করেন। অভিনয়ের উপসংহারে যখন তাণ্ডব নৃত্য শেষ হইল তখন মিস নেগ্রী দাঁড়াইয়া উঠিয়া উচ্চ কণ্ঠে উদয়শঙ্করের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। শঙ্করও তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় মিস নেগ্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাণ্ডব নৃত্য কেমন লাগিল?

মিস নেগ্রী সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—চমৎকার! বাস্তবিক, শঙ্করের প্রত্যেক নৃত্যের প্রত্যেক গতিভঙ্গীই চমৎকার! Shankar is simply divine. I can not say more; and I can not say less,

Shankar is simply divine! (শঙ্করের নৃত্য স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত! ইহার বেশীও বলিতে পারি না, কমও বলিতে পারি না। শঙ্করের নৃত্য একেবারে স্বর্গীয়!)

সার শঙ্করণ নায়ার—

গত ১২ই বৈশাখ (১৩৪১) মান্দ্রাজে সার শঙ্করণ নায়ার মহাশয় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৭৭ বৎসর হইয়াছিল এবং প্রায় ৪০ বৎসর কাল তিনি নানা কার্য্যের ফলে ভারতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের বৎসর মালাবারে তাঁহার জন্ম হয় এবং উকীল হইয়া তিনি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ হাইকোর্টে প্রবেশ করেন। তিনি ব্যবহারাজীবের ব্যবসা অবলম্বন করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই অসাধারণ মনীষার পরিচয় প্রদান করেন। সেই সময় হইতেই তিনি সংবাদপত্রাদিতে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন; এবং তিনি একবার হাইকোর্টের জজের কাজ করিবার পর, তাহার পরবার ঐ পদ শূন্য হইলে যে তাঁহাকে তাহা দেওয়া হয় নাই, অনেকের বিশ্বাস, বিলাতের কোন পত্রে ভারতে বিচার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশই তাহার কারণ। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি—সার সুব্রহ্মণ্য আয়ারের অবসর গ্রহণে—হাইকোর্টের স্থায়ী জজ নিযুক্ত হয়েন এবং বিচারকার্য্যে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন।

ইহার পূর্ব্ব হইতেই সার শঙ্করণ রাজনীতি-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠাবধি তিনি তাহার সহিত সংযুক্ত ছিলেন এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অমরাবতীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভাপতির পদে বৃত হয়েন। তখন ভারতের রাজনীতিক গগনে ঘনঘটা—বালগঙ্গাধর তিলক তখন রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত, নাটুভ্রাতারা বিনাবিচারে নির্ব্বাসিত। সেই সময়েও সভাপতির আসন হইতে সার শঙ্করণ নির্ভীক ভাবে ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। বাস্তবিক এই স্পষ্টবাদী নেতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে বলিতে হয়—তিনি কখন ভয় করিতেন না—যাহা সঙ্গত মনে করিতেন, তাহাই করিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের নানা-কার্য্যেও এই বৈশিষ্ট্য বিকশিত হইয়াছিল।

এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ওডয়ারের শাসনে পঞ্জাবে যখন সামরিক আইন প্রবর্ত্তিত হয় এবং আসামীদিগকে ব্যবহারাজীব নিয়োগের অধিকারে বঞ্চিত করা হয়, তখন তিনি তাহার প্রতিবাদে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ইহা তাঁহার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। হাইকোর্টের জজের পদ হইতে তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদে শিক্ষা-সচিবের পদ প্রাপ্ত হয়েন। পাঞ্জাবী ব্যাপারে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। কেবল পরিষদে থাকিলে শাসন-সংস্কার ব্যবস্থায় ভারতবাসীর অধিকার বিস্তারে সহায়তা করিতে পারিবেন মনে করিয়াই পূর্ব্বে পদত্যাগ করেন নাই। সরকার তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা

সার শঙ্করণ নায়ার

করিতেন তাহা এই পদত্যাগের পরই তাঁহাকে ভারত-সচিবের পরামর্শ-পরিষদে নিয়োগে বুঝিতে পারা যায়।

তিনি মনে করিতেন, স্বায়ত্ত-শাসন লাভের অধিকার ভারতবাসীর আছে এবং তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। শিক্ষা-সচিবরূপে তিনি তাঁহার পূর্ব্বগঠিত মতানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন—বিদ্যার্থীর মাতৃভাষাই তাহার শিক্ষার বাহন হইবে।

পাঞ্জাবে সার মাইকেল ওডয়ারের শাসনে যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তিনি যেমন তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়া মানহানির জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন ও প্রায় তিনলক্ষ টাকা দণ্ড দিয়াছিলেন, তেমনই মালাবারে হিন্দুদিগের উপর মোপলাদিগের পৈশাচিক অত্যাচার হেতু—

অসহযোগ আন্দোলনসৃষ্ট বিশৃঙ্খলাই তাহার কারণ মনে করিয়া মহাত্মা গান্ধীকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়া দেশের বহু লোকের অপ্রীতি অর্জ্জন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধানুভব করেন নাই।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং পরিষদ হইতে সাইমন কমিশনের সহিত কায করিবার জন্য যে সমিতি গঠিত হয়, তিনিই তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন।

ভারতের শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি অকুণ্ঠচিত্তে যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

"ভারতের রাজনীতিক নেতারা কখনই ভারতের শাসন-পদ্ধতি রচনার অধিকার ত্যাগ করিয়া তাহা ইংরাজদিগকে প্রদান করিবেন না। ভারতের ভাগ্য ভারতীয়রাই নিয়ন্ত্রিত করিবেন—ইংরাজরা তাহা করিতে পারেন না। যদি এই সত্য উপেক্ষিত হয়, তবে যেবিষম অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহাতে কেবল ভারতের নহে, পরন্তু ইংলণ্ডের ও সমগ্র জগতের অনিষ্ট অনিবার্য্য হইবে।"

কি জন্য ভারতীয়দিগকেই ভারতের শাসন-পদ্ধতি রচনার ভার প্রদান করা হইবে, তিনি তাহার সমর্থনে প্রবল যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন।

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ব্যাপারে তিনি অনাড়ম্বর ছিলেন এবং এ দেশের প্রাচীন চিকিৎসা প্রণালীর প্রতি তাঁহার এমনই শ্রদ্ধা ছিল যে, তাঁহার পত্নীর কঠিন পীড়ায় তিনি কলিকাতায় আসিয়া ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের আতিথ্য-গ্রহণ করিয়া—কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়ের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করান।

তিনি কংগ্রেসের পুরাতন মতানুবর্ত্তী ছিলেন এবং যাহা সত্য বলিয়া মনে করিতেন সরল ও সবলভাবে তাহা অবলম্বন করিতেন—তাহার ফলাফলের জন্য ব্যস্ত হইতেন না। তিনি হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

*

সার কুমার স্বামী শাস্ত্রী—

মাদ্রাজ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সার কুমারস্বামী শাস্ত্রী ৬৪ বৎসর বয়সে গত ২৪শে এপ্রিল তারিখে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি রৌলট কমিটীর সদস্য ছিলেন এবং অস্থায়ীভাবে মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারকের পদেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহার একটি রায় সাংবাদিকদিগের অধিকার সম্বন্ধীয় প্রশ্ন উত্থাপিত করায় বিশেষ আলোচিত হইয়াছিল। সে আজ প্রায় নয় বৎসরের কথা। রাজমহেন্দ্রী নগরে গোদাবরী তটে একটি ছিন্নমুণ্ড শব দেখিয়া মাদ্রাজের 'স্বরাজ্য' পত্রের সংবাদদাতা পুলিসকে সে সংবাদ না দিয়া 'স্বরাজ্য' পত্রে তার করেন। পুলিস তাঁহাকে লিখিত এজাহার দিতে বলিলে তিনি তাহা দিতে অস্বীকার করেন। তিনি নাগরিকের কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার জরিমানা করেন। আপীলে কুমারস্বামী শাস্ত্রী সেই দণ্ড বহাল রাখেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় ইহাই দাঁড়ায় যে, সাংবাদিক সর্ব্বাগ্রে নিজ পত্রে সংবাদ প্রদানের আগ্রহেও নাগরিকের কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতে পারেন না।

বীমা কোম্পানীর হীরক-জুবিলী—

ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ এ্যাস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড একটী সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। বিগত ৫ই মে, ১৯৩৪, এই কোম্পানীর হীরক-জুবিলী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে এই বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ইহার বয়স ষাট বৎসর পূর্ণ হইল। বোম্বাই প্রদেশের নয়জন প্রধান ব্যক্তিকে লইয়া বর্ত্তমানে ইহার বোর্ড অব ডাইরেক্টার্স গঠিত। হীরক জুবিলী উপলক্ষে কোম্পানী যে পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, বীমা ব্যবসায়ে কোম্পানী যে অসাধারণ সফলতা লাভ করিয়াছেন,—তাঁহারা যে এই বিষয়ে যে-কোন প্রথম শ্রেণীর ইয়োরোপীয় বীমা কোম্পানীর সমকক্ষ—তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বিগত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে—মাত্র এক বৎসরে—এই কোম্পানী প্রায় এক কোটিরও অধিক পরিমাণ টাকার ৩৮,১৯১টি নূতন 'পলিসি' ইস্যু করিয়াছেন। ভারতের সকল প্রধান স্থানেই কোম্পানীর আপিস আছে। একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের এই সফলতায় ভারতবাসী মাত্রেরই আনন্দিত হইবার কথা।

খেলাধূলা

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় খেলোয়াড়দল ঃ

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আই, এফ, একে একটি ফুটবল খেলোয়াড়দল সেদেশে পাঠাবার জন্ম নিমন্ত্রণ করা হলে আই, এফ, এ একটি বাছাই ভারতীয়দল পাঠাতে মনস্থ করেছেন। এই নিয়ে নানা মতামত কাগজে বেরুচ্ছে। একপক্ষ পাঠানর পক্ষে—তাতে নাকি জগতের সম্মুখে এবং যে সকল দেশ আমাদের দেশের কথা জানেই না, সেখানে এদেশের চিত্র উজ্জল হ'য়ে রাজী নন। যদি কোন দেশে কোন কালে কোন বাছাই দল পাঠাতেই হয় তা'হলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাছাই দলই পাঠান উচিত। সম্প্রতি যে বাছাই দল উত্তরভারতে খেলতে গিয়েছিল, তারা বাঙ্গলাদেশের মুখোজ্জল না করে মুখ পুড়িয়ে এসেছে। এখন এখানে ফুটবল লীগ খেলা আরম্ভ হয়েছে; প্রত্যেক দলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রা যদি এসময় বিদেশে খেলতে চলে যায়, তাহ'লে এখানকার ভারতীয় বিভিন্ন দলগুলির লীগ প্রতিযোগিতার ফলাফল খারাপই হবে। সেক্ষেত্রে প্রমোশন ও

প্রথম ডিভিশন হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন ও বাইটন্‌কাপ্ বিজয়ী রেঞ্জার্স দল। দণ্ডায়মান:—ডব্লিউ, ডেভিড্‌সন, ঈঙ্গল্‌স্, অস্‌বর্ণ, ডে, স্কট, লামস্‌ডেন। উপবিষ্ট:—সি হজেস্, এল, ডেভিড্‌সন, চার্লস্ নিউবেরি (বি, এইচ এর সেক্রেটারী ও রেঞ্জার্স ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট), নেষ্টর (ক্যাপ্টেন), এট্‌কিন্‌সন্ ও সিরকোর

ফুটে উঠ্‌বে। এমন কি পঞ্চাশটি গোলটেবিল বৈঠকে যা' ফল হবে না একটা খেলোয়াড়দল আফ্রিকার জঙ্গলে খেলতে গেলে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী কাজ হবে! অপরপক্ষ সেদেশে ভীষণ বর্ণবৈষম্য বর্ত্তমান থাকায় আমাদের ছেলেদের সেখানে গিয়ে অপমানিত হতে দিতে রেলিগেশন বন্ধ না করলে ক্লাবদের প্রতি অন্যায় করা হবে। আবার উঠা-নামা বন্ধ করতেও অনেক ক্লাব রাজী নন। আফ্রিকায় য়ুরোপীয়গণ নেটিভদের সঙ্গে খেলে না, এমন কি তাদের খেলা দেখাও তারা অপমানজনক মনে করে। এদেশীয় ভারতীয়দল যে

সেখানকার য়ুরোপীয়দলদের সঙ্গে খেলতে পাবে না তাহা নিশ্চিত। এরূপক্ষেত্রে সেখানে খেলতে দল পাঠিয়ে যেচে অপমানিত হওয়ার পক্ষে দেশের লোকের মত না থাকাই উচিত।

প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও মোহনবাগান ক্লাবের সেক্রেটারী মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জি এবং ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের মিঃ এস্, সি, তালুকদার আফ্রিকায় টীম পাঠানর বিপক্ষে সংবাদপত্র মারফত তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন। আরো নানা জনে সপক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করেছেন। আমরাও এক্ষেত্রে সেদেশে ভারতীয় দল পাঠানর পক্ষে মত দিতে পারছি না।

tory," published by Imperial Indian Citizenship Association, Bombay :—

NATAL

"It is unnecessary to record at length the many minor insults and humiliations that are imposed upon the free Indian community, traders and nontraders. On the railroads, in the tram-cars, in the streets, on the footpaths, everywhere, it may truly be said the Indian may expect to be insulted and if he moves from one place to another, it is on peril of having his feelings outraged and his sense of
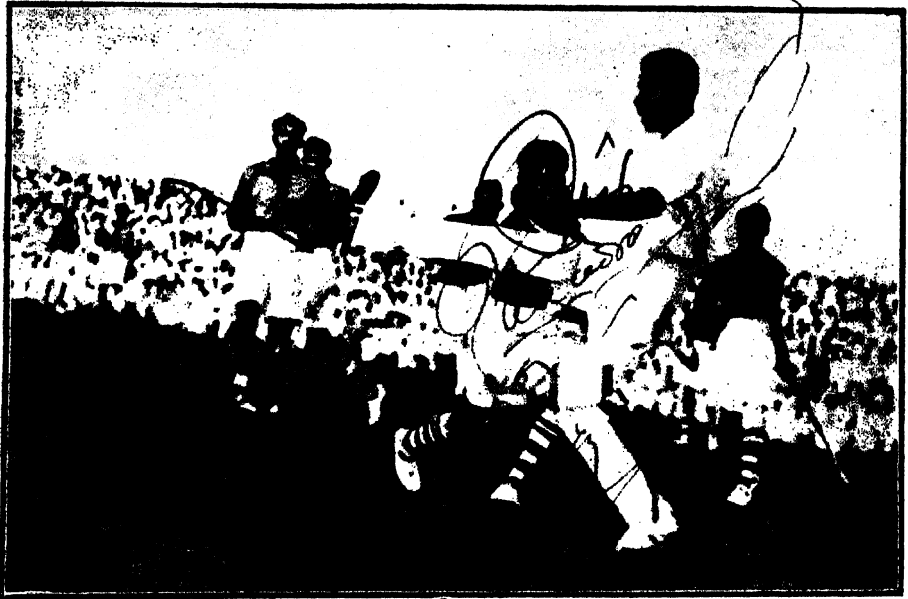
বাইটন্ কাপ্ খেলা। গত বৎসরের হোল্ডার বিখ্যাত ঝান্সি হিরোজ দলকে মোহন বাগান (২-১) গোলে পরাজিত করে। মোহন বাগানের গোল-কিপার নির্ম্মল মুখার্জ্জি পা দিয়ে গোল রক্ষা করছে —কাঞ্চন—

আফ্রিকার Color Bar যে কতদূর ভীষণ—ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান সিটিজেন-সিপ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিষ্টার এস, এ, ওয়াইজ অমৃতবাজার পত্রিকার যে চিঠি ছেপেছেন তা' থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। আমরা তাঁর চিঠির কতকাংশ এখানে তুলে দিলুম :—

I therefore, make no apologies in quoting below extracts from "Indians Abroad Direc-

decency offended in a number of ways. The least epithet that is applied to him is "coolie" with or without some lurid adjectival prefix. "Sammy", too, is quite a common method of address. Both of these terms are customary all over South Africa. The origin of the first is obvious. But it is strange to hear the expression "coolie lawyer", "coolie doctor",

ডিক্লেয়ার্ড)—৩৬৫ রান। ব্র্যাডম্যান ৯০ মিনিটে মাত্র ৬৫ রান করে আউট হন। কিপ্যাক্স ও ম্যাক্‌ক্যাবের খেলাই ভাল হয়েছিল। লিষ্টার প্রথম ইনিংসে ১৫২ রান করে সকলে আউট হ'য়ে যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬৩ রান করে ৯ জন আউট হ'য়ে গেলে সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় খেলা ড্র বলে ঘোষিত হয়েছে।

সারে বনাম এম সি সি খেলায়, সারে এক ইনিংস্ ও ১৭৩ রানে জিতেছে। স্কোর সারে—৫৫৮ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড), এম, সি, সি—১৪২ ও ২৪৩। গ্রেগারী (সারে) তিন ঘণ্টায় ৯৯ রান করেছে।

সারে বনাম গ্লামর্গ্যান খেলায় গ্লামর্গ্যান প্রথম ইনিংসে ৩৫২, সারে প্রথম ইনিংস্- ১১৩ ও দ্বিতীয় ইনিংস্ ১৪৭ গ্লামর্গ্যানের এক ইনিংস্ ও ৯২ রানে জিত হলো।

এম, সি, সি বনাম ইয়র্কসায়ার খেলায়, ওয়ারউইকের ক্যাপ্‌টেন্ ওয়্যাট চাম্পিয়ান ইয়র্কসায়ারের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ১৭৩ রান করেছেন। ইহাতে টেষ্টম্যাচ খেলায় তাঁর ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন হবার সম্ভাবনা খুব বেশী হ'লো। ইয়র্কসায়ার প্রথম ইনিংস্—৪১০, দ্বিতীয় ইনিংস্— (০ উইকেটে)১৪, এম, সি, সি প্রথম ইনিংস্—৩৩৬।

মুষ্টিযুদ্ধ ঃ

গত ৫ই মে (১৯৩৪) শ্যামবাজারে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্যাল কালচারের মন্দিরে কলিকাতার বিখ্যাত মুষ্টি যোদ্ধা অল্ ব্রাউনের সহিত জিতেশ মজুমদারের মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা হ'য়েছিল। মজুমদার লণ্ডনের বৃটিশ বক্সিং বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলের মিঃ এ, রাজ্জাকের ছাত্র। উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ছয় রাউণ্ড খেলা হয়। খেলা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হ'য়েছিল। জিতেশ মজুমদার জয়লাভ করেন।
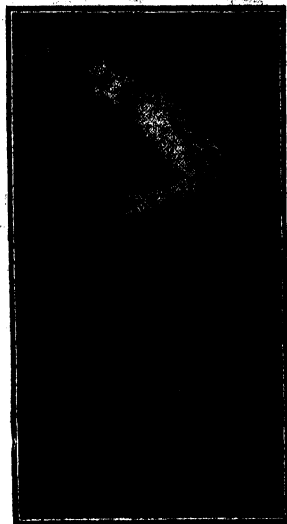
মুষ্টিযোদ্ধা জিতেশ মজুমদার

রোড-রেস ঃ

পাঁচ-মাইল রোড রেসে মেদিনীপুর স্পোর্টিং ক্লাবের পি, বি, চন্দ্র প্রথম হয়েছেন। সর্ব্বসমেত ৪২জন দৌড়াইতে আরম্ভ করেন, মাত্র ৩০জন শেষ পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। প্রথম—পি, বি, চন্দ্র (মেদিনীপুর), সময় ৩০ মিনিট, ২৬ সেকেণ্ড। দ্বিতীয়—কে, কে, নন্দী (বীডন স্কোয়ার)— তৃতীয়—বি, বিশ্বাস (ঘোষের কলেজ)।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত নূতন উপন্যাস "আসমুদ্র"—২৲
শ্রীআশালতা দেবী প্রণীত গল্প পুস্তক "অভিমান"—১৷৹
শ্রীনন্দকুমার গোস্বামী তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থেন প্রণীতা "শ্রীবৈষ্ণব কণ্ঠরত্নম্"—১৲
রায় বিহারীলাল সরকার বাহাদুর প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণ"—৷৴৹
শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ প্রণীত "জপজী" দ্বিতীয় সংস্করণ—৷৹
অধ্যাপক শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস এম-এস সি প্রণীত "শ্রীশ্রীব্রহ্মদর্শন"—১৷৹
শ্রীবিমলা দেবী ও শ্রীঅমলা দেবী প্রণীত উপন্যাস "পরিহাস"—১৲
শ্রীমনোজ বসু প্রণীত উপন্যাস "নরবাঁধ-বাঘুর"—১৷৹
শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "শ্রীক্ষেত্রের ইতিহাস"—৶৹
শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত নাটক "পূর্ণিমা মিলন"—১৲
শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু ও শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "মিত্রের ভুল"—১৲
শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত শিশুপাঠ্য "ছেলেধরা"—৷৹
শ্রীনন্দকুমার গোস্বামী তত্ত্বনিধি কাব্যতীর্থেন প্রণীতা "বাক্যার্থ জ্ঞান-চন্দ্রিকা"—৵৹
শ্রীরমেশচন্দ্র দাশ প্রণীত শিশু উপন্যাস "অজ্ঞাত দেশ"—১৲
শ্রীযতীন সাহা প্রণীত ছোটদের "ঝিকিমিকি"—৷৴৹

নিবেদন

আগামী আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষে'র দ্বাবিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬৸৹, ভি, পিতে ৬৷৶৹, ষাণ্মাসিক ৩৶৹ আনা, ভি, পিতে ৩৷৹। এই জন্য ভি, পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক। ভি, পির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায়; সুতরাং পরবর্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা ভি, পি, করা হইবে। পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ কুপনে টাকা পাঠাইবার পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে গ্রাহক-নম্বর দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ নূতন বলিয়া উল্লেখ করিবেন, নতুবা টাকা জমা করিবার বিশেষ অসুবিধা হয়।

একবিংশ বর্ষকাল "ভারতবর্ষে" সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের যে সকল শ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠক-পাঠিকা মহোদয়গণের অগোচর নাই। কেবল এক বৎসরের কথাই বলি, একবিংশবর্ষে—২০০০ পৃষ্ঠা পঠিতব্য বিষয়, ৬০ খানি বহুবর্ণ চিত্র ও ন্যূনাধিক ১০০ খানি একবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ আনন্দের কথা এই যে, গতবর্ষে বহু বিশেষজ্ঞ লেখক "ভারতবর্ষে" গবেষণামূলক নূতন নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। আগামী বর্ষে আরও নূতন নূতন বিষয়ের আলোচনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, প্রথম বর্ষ হইতে "ভারতবর্ষ" যে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব লাভ করিয়াছিল, আজও তাহা একটুও ম্লান হয় নাই। দ্বাবিংশ বর্ষের জন্য "ভারতবর্ষ" কিরূপ আয়োজন করিয়াছে, আমরা নিজ মুখে সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে চাহি না—বিগত একবিংশ বর্ষের "ভারতবর্ষে"র পরিচালনার কথা আলোচনা করিলেই পাঠকগণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
OF MESSRS. GURUDAS CHATTERJEA & SONS
201, Cornwallis Street, Calcutta

Printer—NARENDRA NATH KUNAR
THE BHARATVARSH PRINTING WORKS
203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta